Regd. No.

সচিত্র বাঙ্গালা মাসিক

ত্রয়োদশ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড

[পৌষ ১৩৫২—জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩]

ষাণ্মাসিক সূচী

সম্পাদক

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস লিমিটেড্

৯০, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

বিষয় ও লেখক-সূচী

উপন্যাস

কবিতা

গল্প

নাটক

প্রবন্ধ

পুস্তক ও আলোচনা

শিশু-সংসদ্

সম্পাদকীয়

গান্ধীজী শিল্পী : চিত্রগুপ্ত

"লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"

ত্রয়োদশ বর্ষ } পৌষ—১৩৫২ { ২য় খণ্ড—১ম সংখ্যা

লোকবৃদ্ধি এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

সাম্রাজ্যবাদীদিগের তৃতীয় রিপুটি অত্যন্ত প্রবল। অন্যকে যথাসম্ভব অল্প দিয়া আপনারা যাহাতে সিংহভাগ ভোগ করিতে পারেন, তাহাই তাঁহাদের জীবনের এবং কার্য্যনীতির একমাত্র লক্ষ্য। প্রতারণাই সাম্রাজ্যবাদী নীতির সর্ব্বস্ব।১ সেইজন্য সাম্রাজ্যবাদীদিগের পক্ষ হইতে কোন কথা বলা হইলে তাহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের জন্য আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সম্প্রতি বিলাতে এক শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদী জন্মনিয়ন্ত্রণের ধূয়া ধরিয়া লোকসংখ্যা কমাইবার চেষ্টা করিতেছেন। ইঁহাদের মতে "লোকসংখ্যা-বৃদ্ধিই যুদ্ধের কারণ", অতএব জন্মনিয়ন্ত্রণ দ্বারা লোক সংখ্যা কমাও। সম্প্রতি মিস্ মারগারেট স্যাশার নাম্নী জনৈক অবিবাহিতা নারী একখানি মার্কিণী কাগজে এই জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে ওকালতি করিয়া একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার কথার সারমর্ম্ম এই যে লোকসংখ্যা-বৃদ্ধিই যুদ্ধের অন্যতম প্রবল কারণ। ভারতে লোকসংখ্যা বড়ই বাড়িয়া যাইতেছে। অতএব ভারত-বাসীকে জন্মনিয়ন্ত্রণের কৌশল শিখাইয়া জন্মনিয়ন্ত্রণ করিতে বাধ্য কর।

লোকসংখ্যা বৃদ্ধিই যুদ্ধের প্রকৃত কারণ অথবা প্রবল জাতির দুর্ব্বল জাতির উপর আধিপত্য স্থাপন এবং তাঁহাদের অতিলোভই যুদ্ধের আসল কারণ, এক্ষেত্রে আমরা সে কথার আলোচনা করিব না। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, লোকবৃদ্ধি অভাবের কারণ বটে, কিন্তু যুদ্ধের কারণ নহে। লোকবৃদ্ধির কারণ মৃত্যুর হারবৃদ্ধি। কথাটা শুনিতে যেন কেমন কেমন মনে হইতে পারে সত্য, কিন্তু তথ্যের দ্বারা কথাটা যে সত্য, তাহা প্রমাণ করা যায়। এখন ইংলণ্ড এবং ওয়েল্‌সে লোকের মৃত্যুর হার শতকরা ১২ জন সাড়ে ১২ জনে কমিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে জন্মের হারও কমিয়া হাজার করা ১৪—১৫ জনে নামিয়াছে। কিন্তু এমন চিরকাল ছিল না। ১৮৮১ হইতে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঐ ইংলণ্ড এবং ওয়েল্‌সে মৃত্যুর হার ছিল হাজার করা প্রায় ২১ জন, তখন জন্মের হার ছিল হাজার করা সাড়ে ৩৩ জন ৩৪ জন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ঐ বিলাতে মৃত্যুর হার ছিল হাজার করা সাড়ে ১৯ জন; সেই বৎসর জন্মের হার হইয়াছিল হাজার করা ৩০ জনের কিছু অধিক। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুর হার কমিয়া হাজার করা ১৮ জনের কিছু অধিক হইয়াছিল, ঐ বৎসরে জন্মের হারও কমিয়া প্রায় পৌণে ২৯ জনে নামিয়া পড়ে। এইরূপ প্রতি বৎসরেই মৃত্যুর হার যেমন কমিয়াছে জন্মের হারও মাসে মাসে তেমনই নামিয়া আসিয়াছে। সকলেই স্বীকার করিবেন যে, ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে রুশিয়ায় জনসাধারণের অবস্থা বর্ত্তমান ভারতবর্ষের জনসাধারণের অবস্থা হইতে কোন দিকেই ভাল ছিল না। ১৮৯১—৯৩ খৃষ্টাব্দে অর্দ্ধ রুশিয়া দুর্ভিক্ষে দগ্ধ হইয়াছিল। জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের আমলে শ্বেতাঙ্গ, রুশ জাতি যেন পক্ষাঘাতরোগগ্রস্ত রোগীর মত জাতীয় পক্ষাঘাতে আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। জিলা বোর্ড এবং লোকাল বোর্ডের ন্যায় স্থানীয় প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি (Zemstuos)

১ The whole policy of Imperialism is riddled with this deception.
Hudson's Imperialism, pp. 174.

তথাকার আইনসভায় প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিতেন না। তখন রুশ সরকার সমাজতন্ত্রবাদীদিগকে কঠোর হস্তে নিপীড়ন করিতেন। জনসাধারণ সদাই সঙ্কুচিত ছিল, ব্যাধি ও শিশুমড়ক নিতান্ত অল্প ছিল না। সেই সময়ে ১৮৯০—১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রুশিয়ায় মৃত্যুর হার ছিল হাজার করা ৩১ হইতে ৩৬ জন পর্য্যন্ত আর জন্মের হার ছিল হাজার করা ৪৮ হইতে ৪৯ জন পর্য্যন্ত। আর আজ (যুদ্ধের পূর্ব্ব সময়ে) সেই রুশিয়ায় স্বাভাবিক মৃত্যুর হার হাজার করা ১৬ জন এবং জন্মের হার ২৮—২৯ জন। মার্কিণের পূর্ব্ববর্ত্তী হিসাব পাওয়া যায় না সত্য, কিন্তু ইহা সত্য যে, গত ১৯০০ খৃষ্টাব্দ হইতে তথায় মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গেই জন্মসংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। সকল দেশেই লোকের আর্থিক ও স্বাস্থ্যের অবস্থা যেমন ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে—দেশ হইতে ব্যাধি এবং জন-পীড়াকর বিধি যেমন নির্ব্বাসিত হইতেছে প্রকৃত শিক্ষার (জাতীয় শিক্ষার) যেমন বিস্তারসাধন হইতেছে, লোক যেমন হাতে হাতিয়ারে আপনাদের স্বাস্থ্য ও শিল্প-সম্পর্কিত ব্যবস্থা পরিকল্পনাপূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছে, তেমনই তাহাদের মধ্যে অকালমৃত্যুর এবং অস্বাভাবিক হারে জন্মহারের তিরোধান ঘটিতেছে। আপাতদর্শী য়ুরোপীয়রা মহাপ্রকৃতিকে জড় বা বিবেচনাশূন্যা মনে করিয়া বিষম ভুল করেন। তিনি যে এমন একটা ব্যবস্থা করিবেন যাহাতে লোকের ঘোর কষ্ট হইবে, যাহার প্রতিকারের কোন উপায় থাকিবে না—ইহা হইতেই পারে না। লোকের অস্বাভাবিক অবস্থার উচ্ছেদ করিলে,—আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিলে,—জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের প্রতিকূল ব্যবস্থাগুলি বিসর্জ্জন করিলে জন্মের হার কমিবেই কমিবে। নতুবা সার জিরেমী রেইসম্যান ও মিস মার্গারেট স্যাশারের ন্যায় উল্টা ও অস্বাভাবিক ব্যবস্থা করিলে কখনই তাহা পরিণামে সুবিধাজনক হইবে না।

ম্যালথাস যখন তাঁহার মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে বহু মনস্বী ব্যক্তি উহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ইন্‌গ্রাম্, এপিশন, স্যাডলার, ডবলডে এবং কোয়েটেলেটের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা ম্যাল্‌থাসের মতের প্রতিবাদে যে সকল যুক্তি দেখাইয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত ছিল। কিন্তু ম্যাল্‌থাসের মত সহজবোধ্য এবং সাম্প্রতিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া অনেকেই তাহা সহজে গ্রহণ করিয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিশারদ জন ষ্টুয়ার্ট মিল উহার সমর্থন করেন এবং জীববিজ্ঞানের যুগান্তরকারী মনীষী চার্লস ডারউইন ম্যাল্‌থাসের সংগৃহীত তথ্য হইতে জীবন-সংগ্রাম (struggle for existence) এবং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন প্রভৃতি সিদ্ধান্ত পরিপুষ্ট করেন। সেই জন্য সাধারণ লোক গতানুগতিক ন্যায়ে এই মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাধারণ লোক কোন কালেই স্বাধীনভাবে এবং সাকল্যরূপে কোন বিষয় ভাবিয়া দেখিতে পারে না। তাহারা চিরকালই অসাধারণেরই অনুবর্ত্তী এবং অনুযায়ী হইয়া থাকে। কিন্তু ইতিহাস ম্যাল্‌থাসের মত অভ্রান্ত বলিয়া সাক্ষ্য দেয় না। অধ্যাপক রজার্স বলেন—খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইংলণ্ড এবং ওয়েল্‌সের অর্থাৎ বিলাতের লোকসংখ্যা ছিল ২০ লক্ষ। যদি প্রতি ২৫ বৎসরে জনসাধারণ দ্বিগুণ হইত, তাহা হইলে ১৬০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিলাতের লোকসংখ্যা কত হইত? ১৮০০ খৃষ্টাব্দেই হইত ৫১ কোটি ২০ লক্ষ এবং ১৯০০ খৃষ্টাব্দে হইত ৮ শত ১৯ কোটি ২০ লক্ষ। জিজ্ঞাস্য—ইংরাজ জাতির এত বংশধর এখন ইংলণ্ড এবং ওয়েলসে ত দূরের কথা—সমস্ত পৃথিবীতে আছে কি? তাহা নাই। এই তিন শত বৎসরে বিলাতে কোন মহামারী হয় নাই, দুর্ভিক্ষও হয় নাই, দেশবিধ্বংসী ভূমিকম্পও হয় নাই। কোন ইংরাজ কোনখানে অনাহারে মরে নাই, তবে ঐ তিন শত বৎসরে বিলাতের লোকসংখ্যা অপ্রতিহত ভাবে সমগুণ শ্রেণীতে বাড়িয়া আসিল না কেন? অতএব ম্যাল্‌থাসের এ মত বে-বনিয়াদ।

পৃথিবীর কোন সমৃদ্ধিশালী দেশেই ম্যাল্‌থাসী সিদ্ধান্ত অনুসারে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায় নাই, এমন কি মার্কিণে এবং কানাডাতেও—যেখানে জমি যথেষ্ট সেই সকল দেশেও—এত দ্রুত লোক বৃদ্ধি পায় নাই, ইহা দেখিয়া আধুনিক পাশ্চাত্ত্য বুধগণের মনে এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, প্রকৃতির ঐ নিয়ম ব্যর্থ করিবার আর কোন প্রতিকূল নিয়ম নিশ্চয়ই আছে, আমরা এখনও তাহার সমস্তটার সন্ধান পাই নাই। তবে কিছু কিছু জানা গিয়াছে। দেখা গিয়াছে যাহাদের অবস্থা পুরুষ-পুরুষানুক্রমে স্বচ্ছল, যাহাদের অন্নকষ্ট নাই, ব্যাধির বিড়ম্বনা নাই, সাংসারিক দুশ্চিন্তা নাই, চিকিৎসার সম্পূর্ণ সুব্যবস্থা আছে, তাহাদের অনেকের—প্রায় সকলের বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—বংশে বাতি দিবার কেহ থাকে না। আমাদের দেশে অনেক আঢ্য ব্যক্তিকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া বংশধারা রক্ষা ও বিষয়ের উত্তরাধিকারী করিতে হয়। এমন বড় প্রাচীন জমিদার-বংশ নাই যাহাদের বংশে পোষ্যপুত্র লইয়া বংশধারা রক্ষা করিতে না হইয়াছে। কেবল আমাদের দেশে নহে,—বিলাতেও অনেক আভিজাত বংশ পুত্রসন্তানের অভাবে লোপ পাইয়াছে। অনেক ব্যারণ বংশের আভিখ্যার উত্তরাধিকারত্ব লইয়া গোল ঘটিয়াছে। ইতিহাস প্রাচীন গ্রীস এবং রোম হইতে এরূপ আর্ত্তনাদ কালের ধ্বংসিনী-শক্তিকে প্রতিহত করিয়া বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত বহন করিয়া আনিতেছে। লণ্ডন, বার্ম্মিংহাম, লীড্‌স্ ও ও ম্যাঞ্চেষ্টারের নোংরা পল্লীতে কিছুদিন পূর্ব্বে মা ষষ্ঠীর যত কৃপা দেখা যাইত, এখনও যায়, ধনী শিল্পপতিদিগের গৃহে তাঁহার তত অনুগ্রহের ছড়াছড়ি ত দেখা যায়ই না, অধিকন্তু তাঁহার কৃপাকণা-দানে কার্পণ্য লক্ষিত হয়। কমলার কৃপাপ্রাপ্তির দুই তিন পুরুষ পরেই ষষ্ঠীর কৃপাবর্ষণে অভাব ঘটে। ইহাতে বুঝা যায় যে, স্বচ্ছলতা ও প্রাচুর্য্য প্রজনন-শক্তিকে সঙ্কুচিত করে।

দ্বিতীয়তঃ, মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাইলে প্রজনন-শক্তি হ্রাস পায় বা লুপ্ত হয় (The tendency of central development to lessen fecundity)। আমাদের দেশে সার জগদীশ বসু, সার পি, সি, রায় (অবিবাহিত), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ, দ্বারিকানাথ মিত্র, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, শশধর তর্কচূড়ামণি, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অপুত্রক। আর আনন্দমোহন বসু, হরীশ মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়,

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিত্তরঞ্জন দাস, মনোমোহন ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহেন্দ্রনাথ সরকার, যাত্রামোহন সেন প্রভৃতির একটি করিয়া পুত্র। প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের মধ্যে দ্বিপুত্রক দুই একজনকে দেখা যায়, বহুপুত্রক প্রায় নাই। যেমন সেকস্‌পিয়র, নিউটন, মিলটন, বেকন, জন ষ্টুয়ার্ট মিল্‌, ডারউইন, কেপলার ফ্যারাডে, লর্ড কেলভিন প্রভৃতি মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ অপুত্রক, কেহ বা একপুত্রক কিন্তু ইহাদের মধ্যে বহু-পুত্রকের সংখ্যা অল্প। সেই জন্য অনেকে এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন নাই। তবে মোটের উপর প্রতিভাশালী ব্যক্তিদি র সন্তান বিশেষতঃ পুত্রসন্তান—অল্প হয়, ইহা স্বীকার্য্য। মানসিক উন্নতি প্রজননশক্তি হ্রাসের সম্বন্ধে কারণ—কি উহার অন্য আনুষঙ্গিক কারণ আছে তাহা বুঝা না গেলেও যখন দেখা যাইতেছে যে,শিক্ষিত এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের সন্তান,বিশেষতঃ পুত্রসন্তান, অল্প হয় তখন শিক্ষার বিস্তারসাধন এবং জনসাধারণের উন্নতিসাধন যে জন্মনিয়ন্ত্রণের অন্যতম উপায় তাহা অস্বীকার করা যায় না।

সংসারে অবাঞ্ছিত, দরিদ্র, ব্যাধি-বিড়ম্বিত, দুর্গতি-লাঞ্ছিত এবং অশিক্ষিত লোকরাই অধিক সন্তান প্রসব করে। ইহাদের প্রজননী শক্তি অতি ভীষণ। মিষ্টার বার্ণার্ড শ' সে কথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। আমি তাঁহার মত পাদটীকায় উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।(২) ইহাতে ইহাই দৃঢ়তার সহিত সপ্রমাণ হইতেছে যে, কু-শাসনের ফলেই মানবসমাজে দারিদ্র্য, ব্যাধি এবং অজ্ঞতা দেখা দেয় এবং তাহার ফল স্বরূপ মৃত্যুর হার এবং জন্মের হার বৃদ্ধি পায়। কিন্তু দারিদ্র্য, ব্যাধিবিড়ম্বনা, এবং মূর্খতা সুশাসনপ্রভাবেই অনেকটা নষ্ট করা যায়। ইহার প্রত্যেকটির প্রতিকারই মানুষের সাধ্যায়ত্ত। যে সমাজে উহার বাহুল্য সে সমাজ সুশাসনের অভাবই সূচনা করে। এই তিনটির উচ্ছেদ হইলেই জন্মের হার কমিয়া যাইবেই যাইবে। নতুবা প্রকৃতির প্রতিকূল ব্যবস্থা করিলেই উহা পরিণামে আরও ভীষণ অনিষ্টদায়ক হইবেই হইবে। প্রকৃতির প্রতিকূলে কার্য্য করিয়া মানুষ যেখানে যাহা কিছু করিতে গিয়াছে সেইখানে সে দুঃখকে বরণ করিয়া ঘরে আনিয়াছে। প্রাণিবিজ্ঞানে বিশেষ ব্যুৎপন্ন লুই আগাসিজ উদাত্ত স্বরে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন—প্রকৃতিকে অগ্রাহ্য করিও না। প্রকৃতির অতি ক্ষুদ্র কার্য্যও মহৎ জ্ঞানপ্রসূত।(৩) আর বর্ত্তমান সময়ের উদ্ধত বিজ্ঞান প্রকৃতির ভ্রম ও ত্রুটি সংশোধন করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গিয়াছেন। তাতে হাতে তাহার ফল ফলিতেছে, তবুও আমাদের চৈতন্য হয় না। বিজ্ঞান যখন সয়তানের বা অসুরের হস্তে পড়ে, তখন সে আসুরিক কার্য্য সাধনের উদ্দেশ্যে বিনিযুক্ত হয়। কিন্তু উহা চিরকাল জয়যুক্ত হইতে পারে না।

কেহ কেহ বলেন যে, প্রকৃতির কার্য্যের যদি একটা উদ্দেশ্য থাকিত, তাহা হইলে প্রকৃতির কার্য্যফলে মানবসমাজে এত দুঃখ-দারিদ্র্য ঘটিত না। আমরা জিজ্ঞাসা করি, এই দুঃখ, দারিদ্র্য, ব্যাধি প্রভৃতির জন্য দায়ী কে? মানুষ না প্রকৃতি? আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই দুঃখ-দারিদ্র্যের অধিকাংশই মানুষের সৃষ্ট,—কিছু প্রকৃতির সৃষ্টও আছে সত্য, কিন্তু তাহার মূলে আছে —প্রকৃতির মানুষকে দিয়া মানুষের উন্নতিসাধনের অভিপ্রায়। এই খাদ্যের উপর বর্ত্তমান মানুষের চাপ—এই জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা প্রভৃতির মূলে রহিয়াছে মানুষের উন্নতিসাধনের জন্য প্রবৃত্তির এবং প্রচেষ্টার জাগর্ত্তি। এই জীবন-সংগ্রামের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়াছে, সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছে, জঙ্গল কাটিয়া নগর পত্তন করিয়াছে, কৃষির ও শিল্পের উদ্ভাবনা ও উন্নতি করিয়াছে, সহানুভূতি, প্রেম প্রভৃতি সামাজিক প্রবৃত্তির উন্নতি এবং উৎকর্ষ সাধিত করিয়াছে এবং দাম্পত্য ও গার্হস্থ্য জীবন অবলম্বন করিয়াছে। যতদিন ধরাপৃষ্ঠস্থ মানবজীবনের পূর্ণ পরিণতি না হইবে, ততদিন এই জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা থাকিবেই থাকিবে।(৪) দানবীয় উপায়ে তাহা রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলে প্রকৃতিই তাহার প্রতিহিংসা লইবেন। প্রকৃতি মানুষকে যে মনীষা ও প্রতিভার অধিকারী করিয়াছেন জানিও তাহা কেবল তাহার নিজের উপকারের জন্য বিনিয়োগার্থ নহে,—তাহা মানবসমাজের সার্ব্বজনীন মঙ্গলের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগের জন্য। এ সংসারে কোন ব্যক্তিই তাঁহার মনীষা-প্রসূত উদ্ভাবনার চরম ফল দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। ইহাতেই বুঝা যায় যে মানুষকে প্রকৃতি যে জ্ঞান দেন, তাহা ব্যক্তিগত উপকারার্থ নহে, সমস্ত মানবজাতির হিতার্থে। মানব-সংহারের জন্য নহে।

---

(২) The defectives are appallingly prolific; the others have fewer children even when they do not practise birth-control. It is one of the troubles of our present civilziation that the inferior stocks are outbreeding the superior ones.

(৩) **You should not trifle with Nature. At the** lowest her works are the works of the highest powers the highest something in whatever way we may look at it. A laboratory of Natural History is a sanctuary where nothing profane should be treated.

(৪) The excess of fertility has rendered the progress of civilization inevitable. and the process of civilization must inevitably diminish fertility and at last destroy it. From the beginning, pressure of population has been the proximate cause of progress. It produced the original diffusion of race. It compelled men to abandon predatory habits and take to agriculture. It led to the clearing of the earth's surface. It forced men into

উপসংহারে একটা কথা চিন্তা করা আবশ্যক। ধরণীগর্ভে মানুষ যত বাড়ে, খাদ্য তত বৃদ্ধি করিতে পারা যায় কি না? সমস্যাটি সঙ্গিন। খাদ্যবস্তুর পরিমাণ প্রতি বৎসরেই শত গুণ বর্দ্ধিত করা যায়, যদি তাহা উৎপাদনের উপযুক্ত ক্ষেত্র পাওয়া যায়। অনুকূল অবস্থায় পড়িলে একটি গোল আলুর অঙ্কুর বা "ক'ল" তিন গুণ আলু উৎপাদন করিতে পারে, একটি গমের দানা ২ শত গুণ গমের দানা জন্মাইতে পারে, একটি ধানের বীজও ঐরূপ। একটি মটরের দানা হইতে সহস্র মটরের দানা, একটি শিমের বীজ হইতে দুই সহস্র শিম জন্মিতে পারে। এইরূপ যব, বজরা, মুগ, ছোলা প্রভৃতির এক একটি দানা বহু শত গুণ দানা উৎপাদন করিতে সমর্থ। সুতরাং পর্য্যাপ্ত ক্ষেত্র পাইলে খাদ্য-শস্য, ফল প্রভৃতি এত বৃদ্ধি করা যায় যে মানুষ তাহা খাইয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু শস্যাদি উৎপাদনের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। উহার জন্য অধিক জমি পাওয়া যায় না। কিন্তু বিজ্ঞানবলে ফসলের ফলন দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ করা অসম্ভব নহে। অবশ্য ধরাতলে জমিও বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রবাল-কীটে সাগরবক্ষে অনেক দ্বীপ সৃষ্টি করিতেছে। নদীর ধোয়াটে অনেক দেশের আয়তন ধীরে ধীরে বাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু কেবল স্থলেই খাদ্যশস্যের সন্ধান নিবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। এই ধরণীর বক্ষে এখন ৭২ ভাগ জল আর ২৮ ভাগ স্থল। এই ৭২ ভাগ জলে সন্ধান করিলে মানুষের অনেক আহার্য্য বস্তু মিলিতে পারে। পণ্ডিতরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, একটা কড (cod) মাছ, ৫০ লক্ষ বা তাহার অধিক মৎস্য-উৎপাদন-ক্ষম ডিম্ব প্রসব করে। তাহার অধিকাংশ অন্য জলজন্তুতে খাইয়া ফেলে অথবা মরিয়া যায়। বড় জোর দুই তিনটি পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। ভাঙ্গন (salmon) ট্রাউট, ইলিস, ভেটকি, হেরিং প্রভৃতি মৎস্যও বহু ডিম্ব প্রসব করে। তদ্ভিন্ন সমুদ্রজ উদ্ভিদ, ও অন্যান্য জীব হইতেও খাদ্য সংগ্রহ হইতে পারে। দুষ্পাচ্য জিনিষকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সুপাচ্য করা কঠিন হইবে না। সুতরাং খাদ্যাভাবের সম্ভাবনায় আতঙ্কিত হইয়া লোকসংহারে প্রবৃত্ত হইলে বিশ্বের অকল্যাণই করা হইবে। ঐ কার্য্য স্বার্থসর্ব্বস্ব সাম্রাজ্যনীতিসঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু মনুষ্যত্বের ও ধর্ম্মনীতির অনুমোদিত নহে।

তাই বলি—ধীরে রজনী ধীরে। ভ্রূণ হত্যার দ্বারা জাতি-নাশের জন্য কোমর বাঁধা কর্ত্তব্য নহে। লোকাভাবে ফ্রান্সের আজ কি দুর্গতি হইল তাহা ভাবিয়া দেখ। নব্বই বৎসরের জরাজীর্ণ বৃদ্ধকে আজ ফাঁসী দিলে সে ত্রুটির—সে পাপের—সংশোধন হইবে না। উপযুক্ত লোকের অভাব, অর্থাৎ প্রতিভা-শালী লোকের জন্ম বন্ধ করিয়া দেওয়ার ফলে—গত যুদ্ধে ৮৫ বৎসরবয়স্ক ভীমরতিগ্রস্ত পেঁতার হস্তে বীর ফরাসী জাতি জাতীয় দুর্দ্দিনে তাহাদের দেশের শাসন-তরণী পরিচালনার ভার দিতে বাধ্য হইয়াছিল! সে দোষ পেঁতার নয়, সে দোষ ফরাসীজাতির। জন্মনিয়ন্ত্রিত ফ্রান্সে সঙ্কটকালে লোকাভাব হইয়াছিল। বাঙ্গালায়ও জন্মনিয়ন্ত্রণের ফলে বুদ্ধিমান্ সম্প্রদায় ধীরে ধীরে লোপ পাইতে বসিয়াছে। নিম্ন জাতিরা জন্মনিয়ন্ত্রণ করিবে না। ইহা তাহাদের সাধ্যাতীত এবং সংস্কার-বিরুদ্ধ। ডক্টর এডিথ সামার হিলের কথাই ঠিক। কুমারী মারগারেট স্যাঙ্গার জন্মনিয়ন্ত্রণ-কৌশলে যতই ব্যুৎপন্ন হউন না কেন, তাঁহার সিদ্ধান্ত মিথ্যা। আসল কথা তোমরা দেশ হইতে ব্যাধি নির্ব্বাসিত কর, দারিদ্র্য দূর কর, শিক্ষার—প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার বিস্তার কর, শিল্পের উন্নতি কর, তাহা হইলে প্রাকৃতিক নিয়মবশে সুষ্ঠুভাবে লোক বৃদ্ধি পাইবে। উহাতে যদি কিছু জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা থাকে, তাহা হইলে তাহা প্রকৃত উন্নতির কারণ হইবে। নতুবা দারিদ্র্যক্লিষ্ট ব্যাধি-পীড়িত অজ্ঞতাচ্ছন্ন এবং কর্ম্মহীন জনসমাজে জন্মনিয়ন্ত্রণ করিলে জাতির বিলোপ ঘটিবে। যাহারা নীতিধর্ম্ম মানে না, ধর্ম্ম-নীতিকে অলীক আধ্যাত্মিকবাদের একটা মানসিক ব্যাধি মনে করিয়া উপহাস করে এবং আপনাদের স্বল্পস্থায়ী জীবনে কেবল হীন পূতিগন্ধী পাপপঙ্কাকীর্ণ নীচ স্বার্থসাধনকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য মনে করে, তাহাদের ভাঁওতায় ভুলিলে পরিণামে সর্ব্বনাশ ঘটিবে। কিন্তু সব মানুষের দৃষ্টি সমান নহে। কেহ দেখে স্বার্থকে বড় করিয়া, কেহ পরার্থকে, মঙ্গলকে প্রধান করিয়া। এ বৈষম্য মানুষের মধ্যে থাকিবেই। দাম্ভিকের এবং ধার্ম্মিকের দৃষ্টি সমান হয় না।

Two men stood looking through the bars.
One saw the mud, the other saw stars.

---

social state and made social organisation inevitable and has developed the social sentiments etc.
Principles of Biology Vol, II p. 520.

সত্যের নীরবতা

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার ঘোষ

সাগর কহিল, "পাহাড় তোমায়
আমিই বাঁচিয়ে রাখি,
কত জ্বালাময়ী দহন হইতে
মেঘে ও তুষারে ঢাকি।"
পাহাড় কহিল, "ভুলি নাই তাহা
আমি শুধি তব ঋণ,
লক্ষ নদীর বুক ভ'রে জল
পাঠাইয়া প্রতিদিন।"
দুই বিরাটের দ্বন্দ্ব দেখিয়া
অসীম সুনীলাকাশে
চির-ভাস্বর গরিমা-দীপ্ত
সূর্য্য নীরবে হাসে।

শ্রীবোধায়ন-কবি-কৃত ভগবদজ্জুকীয়

(প্রহসন)

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

—২—

শাণ্ডিল্য। আচ্ছা, প্রভু! এই নরলোকে ত উৎসব নিত্যই লেগে আছে—আর এখানে সুখই প্রধান। এমন নিত্য উৎসবময় সুখ-প্রধান নরলোকে কোন্ বিধান অনুসারে প্রভু ভিক্ষা মেগে থাকেন?

পরিব্রাজক। শোন। মান ও কাম বর্জ্জনপূর্ব্বক ধর্ষণাদিও সহ্য ক'রে পাপহীন ব্যক্তির গৃহে ভিক্ষা দ্বারা দেহ ধারণপূর্ব্বক এই দোষ-ব্যসন-পূর্ণ জগৎ মধ্যে ভ্রমণ ক'রে থাকি। অতি সাবধান ব্যক্তি যেমন গ্রাহসঙ্কুল হ্রদে অতি সন্তর্পণে সন্তরণ করে—(আমারও অবস্থা তদ্রূপ)।

শাণ্ডিল্য। প্রভু হে!—

আমারও আপনার বলতে কিছুই নেই—ভাইও নেই—বাপও নেই—ভরসা কেবল প্রভুর কৃপা! পেটের ভাতের অভাবে একলা আমি লাঠিগাছাটির (মত আপনার) উপর নির্ভর করে আছি—ধর্ম্মলোভে নয় (অর্থাৎ ধর্ম্ম-অর্জ্জনের আশায় আপনার শিষ্য হই নি)।

পরিব্রাজক। শাণ্ডিল্য! এ (সব) কি (কথা)!

শাণ্ডিল্য। আচ্ছা, প্রভু! আপনি ত বলেন যে, সত্য আর মিথ্যা—দুই মোক্ষের প্রতিবন্ধক!

পরি। ঠিক। সত্য আর মিথ্যা—সকামভাবে এদের প্রয়োগ করা হলে বন্ধনের কারণই হয়। কেন?—

যখন কোন সাবধান-চিত্ত সংযতেন্দ্রিয় মানব এই ফল আমার হোক—এই সঙ্কল্প নিয়ে যাগাদি কর্ম্ম করেন, সেই সময় থেকে আরম্ভ ক'রে সেই কর্ম্মের ফল সর্ব্বদা দেবতাদের দ্বারা গচ্ছিত ধনের মতই সুরক্ষিত হ'তে থাকে (দেবতারা কর্ম্মফল ততক্ষণ সাবধানে রক্ষা করেন, যতক্ষণ না কর্ম্মকর্ত্তা কৃতকর্ম্মের ফল অনুভব করেন।)

শাণ্ডিল্য। কখন তার ফল পাওয়া যায়?

পরি। যখন বৈরাগ্য পুষ্টিলাভ করে।

শা। তাই বা আবার কি ক'রে হয়?

পরি। অসঙ্গতা দ্বারা (অর্থাৎ আসক্তি-বর্জ্জন-দ্বারা)।

শা। প্রভু এই অ-সঙ্গতা কাকে বলেন?

পরি। রাগ ও দ্বেষে মধ্যস্থভাব (অসঙ্গতা)। কেন?—সুখে ও দুঃখে নিত্য তুল্যতা—ভয়ে ও হর্ষে কোনরূপ আধিক্যের অভাব (অর্থাৎ সাম্য) সুহৃৎ ও শত্রুকে তুল্যভাব—তত্ত্ববিদ্‌গণ একেই বলেন অসঙ্গতা।

শা। এও আবার হয় না কি?

পরি। যা অসৎ তার সংজ্ঞা হয় না।

শা। এ (অভ্যাস) করাও যায়—এই কথাই কি প্রভু বলছেন?

পরি। (তাতে) সংশয়ের কারণ কি?

শা। অলীক—এ অলীক।

পরি। কেন?

শা। প্রভু তা হ'লে কেন আমার উপর কোপ করেন?

পরি। পড় না ব'লে।

শা। আমি যদি পড়ি বা না পড়ি, তাতে মুক্ত পুরুষ আপনি—আপনার কি (আসে যায়)?

পরি। না—ও-কথা বোলো না। (মোক্ষার্থ) সমাগত শিষ্যের উদ্দেশ্যে তাড়ন স্মৃতিতে বিহিত আছে। তাই আমি কুপিত না হ'য়েও তোমার মঙ্গলার্থই তোমাকে তাড়না ক'রে থাকি।

শা। আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! অকুপিত থেকেও আমার তাড়ন করেন। ছাড়ুন এ সব কথা। ভিক্ষার বেলা যে চলে যায়।

পরি। আরে মূর্খ! এ যে সবে প্রাতঃকাল—মধ্যাহ্ন এখনও হয় নি। মুসল নামাবার পর—অঙ্গার ফেলবার পর—সকলের খাওয়া হ'য়ে যাবার পর (যতির) ভিক্ষার কাল—এই ত (শাস্ত্রের) উপদেশ [উদূখল মুসল দিয়ে ধান ভানা শেষ হবার পর মুসল নামিয়ে রাখলে যতির ভিক্ষার কাল উপস্থিত হয়—অর্থাৎ ধান ভানবার সময় যতি ভিক্ষা চাহিতে যাইবেন না; অঙ্গার ফেলে দেবার পর উনুনের আগুন নিভে গেলে ছাই তুলে ফেলবার পর যতির ভিক্ষার কাল; আর সকলের খাওয়া শেষ হবার পর যতি গৃহস্থবাড়ী ভিক্ষায় যাবেন—যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তাই নিয়ে সানন্দে ফিরবেন—এই শাস্ত্রের উপদেশ] তাই (এখন) বিশ্রামার্থ এই বাগানে এস ঢুকি।

শা। হা! হা! প্রভু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলেন।

পরি। কেন? কি রকম!

শা। আচ্ছা, প্রভু, আপনি ত সুখে দুঃখে সমান।

পরি। নিশ্চয়। আমার আত্মা সুখে-দুঃখে সমান। (কিন্তু) (আমার) কর্ম্মাত্মা (অর্থাৎ দেহ) বিশ্রাম চাইছে।

শা। প্রভু হে! এই আত্মা (জিনিষটি) কে? আর এ ছাড়া অন্য কর্ম্মাত্মাই বা কে?

পরি। শোন—

যে সুষুপ্তিকালে আকাশে যায়, সেই অন্তরাত্মা। আর যে বিধিবিহিত (কর্ম্মার্জ্জিত স্বর্গ-নরকাদিতে) গমন করে, সেই আত্মা। এই দেহ 'নর' নামে অথবা অন্য সংজ্ঞায় (পশু প্রভৃতি) সংজ্ঞিত হয়ে থাকে। (আর) নরগণের কর্ম্মাত্মা (যথার্থ আত্মার) শ্রম-সুখভোগের পাত্রস্বরূপ [অর্থাৎ সুষুপ্তি দশায় দেহেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ নিষ্ক্রিয় হওয়ায় উপাধি-পরিচ্ছিন্ন আত্মার সাময়িক উপাধি-বিলয়ে আত্মা পরমাত্মার সহিত প্রায় মিলিত হয়ে যায়। আর দেহ-পরিচ্ছিন্ন রূপে স্বকর্ম্মের দ্বারা অর্জ্জিত কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত স্বর্গ-নরকাদিতে যিনি গমন করেন, তিনিই আত্মা। পক্ষান্তরে, এই ক্ষয়শীল দেহটাই 'নর' নামে কিংবা অন্য 'পশু' 'পক্ষী', 'ইন্দুর', 'কীট', 'পতঙ্গ' ইত্যাদি নামে পরিচিত। আর কর্ম্মাত্মা (বা দেহ) আত্মার শ্রম-সুখ ইত্যাদি ভোগের সাধক।

শা। (তা হ'লে—হ'ল গিয়ে) যে অজর-অমর অচ্ছেদ্য-অভেদ্য সেই হ'ল আত্মা। (আর) যে হাসে, হাসায়, শোয়, খায় ও বিলীন হয়, সেই বুঝি কর্ম্মাত্মা ?

পরি। যেমন বোঝবার যোগ্যতা, তেমনি বুঝেছ !

শা। আঃ! দূর হও। হেরে গেছ।

পরি। কি রকম ?

শা। আচ্ছা, সেই (পরমাত্মাই) ত এখন এই (কর্ম্মাত্মা) শরীর ছাড়া ত (আর) কিছুই নেই)।

পরি। লৌকিক (স্মৃতি-ইতিহাস-পুরাণাদিতে কথিত) তত্ত্ব বলেছি (মাত্র)। যেহেতু (লৌকিক সিদ্ধান্তে) (সুর-নর-পশু-পক্ষী ইত্যাদি) ভেদ-ভিন্ন প্রাণিগণের (দেহাদিরূপ অমিথ্যা) স্থান (অর্থাৎ আধার) শ্রুত হয়ে থাকে—তাই এই কথা বলেছি (অর্থাৎ —ইতিহাস-পুরাণাদিতে পরিণাম-বাদানুযায়ী প্রতিদেহে আত্মভেদ ও প্রপঞ্চের অমিথ্যাত্ব বলা আছে—সেই সিদ্ধান্তই আমি তোমাকে বলেছি। যথার্থ শ্রুতিসিদ্ধান্তে উপনিষদে সকল শরীরে আত্মা এক ও প্রপঞ্চ মিথ্যা—এই পরম সিদ্ধান্ত—এ মত আমি ব্যক্ত করি নি)।

শা। আচ্ছা, এখন সব কথা থাক্। তুমি, প্রভু (আসলে) কে ?

পরি। শোন—আমি কোন এক প্রাণিধর্ম্মা। আকাশ বাতাস জল তেজের এক এক অংশ মিলিয়া আমার এই চলনশীল মূর্ত্তি গড়া হয়েছে, এতে পার্থিবদ্রব্য (পৃথিবী-পরমাণু) রাশীকৃত (প্রচুরপরিমাণে) বর্ত্তমান (অর্থাৎ আমার এই চল দেহের উপাদান আকাশ-বায়ু-জল-অগ্নির এক এক অংশ কিন্তু পৃথিবীর অংশই এতে খুব বেশী)। কর্ণ-নয়ন-জিহ্বা-নাসা-ত্বক্ (এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা) (শব্দ-রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ এই পঞ্চ বিষয়ের) জ্ঞান আমি পাই, 'নর' এই সংজ্ঞা (নাম) আমার করা হয়েছে।

শা। হা হা! এই রকম আত্মাকেও লোকে জানে না—পরমাত্মা ত দূরের কথা! (অর্থাৎ দেহে আত্মার বোধ—এও সাধারণ লোকের নেই—যথার্থ আত্মার জ্ঞান ত অতি দুর্লভ।) প্রভু! এই যে বাগান।

পরি। আগে ঢোক। শূন্য গৃহ আর অরণ্যই আমাদের বিশ্রামস্থান।

শা। প্রভুই আগে ঢুকুন। আমি পিছনে পিছনে ঢুকছি।

পরি। কেন ?

শা। আমার অতিবৃদ্ধা জননীর কাছে শুনেছিলুম—অশোক-পল্লবের ভিতরে বাঘ লুকিয়ে বাস করে। তাই প্রভুই আগে ঢুকুন। আমি পিছু পিছু ঢুকছি।

পরি। বেশ, তাই হোক। [প্রবেশ]

শা। আ-হা-হা-হা! বাঘে ধরেছে আমায়। বাঘের মুখ থেকে ছাড়ান আমায়। অনাথের মত বাঘে খাচ্ছে আমায়। এই যে রক্ত ঝরছে গলা থেকে।

পরি। শাণ্ডিল্য! ভয় নেই—ভয় পেও না। এ যে ময়ূর!

শা। সত্যি ময়ূর ?

পরি। হাঁ হাঁ। সত্যই ময়ূর।

শাণ্ডিল্য। যদি ময়ূরই হয়, তবে চোখ দুটো খুলি।

পরি। স্বচ্ছন্দে।

শা। আ-হা! দাসীর পুত বাঘটা আমার ভয়ে ময়ূরের রূপ ধরে পালাচ্ছে—দেখ! দেখ! (বাগানটি দেখে) হী হী হী! আহা কি রমণীয়ই না এ বাগানটি! চাঁপা-কদম-নীপ নিচুলৎতিল-কর্ণিকার-কুরবক-কর্পূর-আম্রপ্রিয়ঙ্গু-শাল-তাল তমাল-পুন্নাগ-নাগ-বকুল সরল সর্জ্জ সিন্ধুবার-তৃণশূল ছাতিম-করবী কুড়চি বর্ণি-চন্দন অশোক, মল্লিকা-নন্দ্যাবর্ত্তি-তগর-খয়ের-কলা প্রভৃতি গাছে ভরা, বসন্তের স্পর্শে শোভমান প্রবাল-পত্র-পল্লব পুষ্প-মঞ্জুরীতে ভরপুর, অতিমুক্ত-মাধবীলতামণ্ডপে শোভিত,—ময়ূর-কোকিল-মত্ত ভ্রমরের মধুর স্বরে পূর্ণ, প্রিয়জন-বিরহে উৎপন্ন শোকে অভিভূত যুবতীজনের সন্তাপদায়ক, আর প্রিয়জনসহ মিলিত যুবক-যুবতীর সুখাবহ (এ উদ্যান)।

পরি। মূর্খ! দিনের পর দিন যখন ইন্দ্রিয়গুলি জরাবশতঃ হীয়মান (ক্ষীণ) হ'য়ে পড়ছে—তবে আর তোমার রমণীয় কি ? কেন ?—

কিসলয়াভরণ বসন্ত অভ্যাগত—কুমুদশ্রেণীভূষিতা শরৎ সমাগতা—(এইরূপে) বালক (অর্থাৎ বিবেকরহিত ব্যক্তি) নব (পরিণত) ঋতুসমূহে অনুরাগ প্রকাশ করে। হায়! যা তার জীবন হরণ করে, তাই ত তার নিকট রমণীয় [ঋতু মাত্রই কালের অংশ—কাল জীবের জীবন হরণ করে; তথাপি যদি জীব নিজ জীবনহর কালাংশ ঋতুতে রমণীয়বোধে আকৃষ্ট হয়, তবে তাহা দারুণ নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।)

শা। যখন যা রমণীয় (লোকে) তখন তাকেই রমণীয় বলে।

পরি। অপণ্ডিতের মত বলা হয়ে থাকে। দেখ, যারা অনাগতের প্রার্থনা করে, অতিক্রান্তের নিমিত্ত শোক করে, আর যারা বর্ত্তমানে অসন্তুষ্ট—তাদের নির্ব্বাণ (-সুখ) সম্ভব নয়।

শা। অতি দীর্ঘপথ (চলা হয়েছে)। কোথায় এখন বসব আমরা ?

পরি। এইখানেই বসব। [ক্রমশঃ

ডেট্

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দাস

তরুণটী দেখিতে সুশ্রী, বর্ণ উজ্জ্বল গৌর, সূক্ষ্মাগ্র নাসিকা, চোখ দুটী কেমন বলিবার উপায় নাই, কারণ চোখের উপর সুদৃশ্য কালো বর্ণের রিমযুক্ত ঈষৎ ছাই রঙের গোল চশমা; গায়ে সেলুলার কাপড়ের সচ্ছিদ্র গেঞ্জী, তার উপর পাতলা আদ্দির পাঞ্জাবী, এক পার্শ্বে সোনার মিনাকরা চেপ্টা বোতামের তিনটী লাগান, উপরেরটী খোলা; পাঞ্জাবীর হাতা ও ফরাসডাঙ্গার পাতলা ফিনফিনে ধুতির কোঁচা গিলা করা, পায়ে গ্লেসকিডের সুনির্ম্মিত স্লিপার; হাতে রোলগোল্ডের চৌকা রিষ্টওয়াচ, ঈষৎ হরিদ্বর্ণ চামড়ায় বাঁধা। চুল মাথার পেছনের অর্দ্ধেক ক্ষুর দিয়ে চাঁচা; তৎপর ক্রমবর্দ্ধনশীল। সম্মুখে দীর্ঘ ও ব্যাক্ ব্রাস করা।

নামটীও বলিয়া রাখি—বিনয়ভূষণ বসু অর্থাৎ বি কিউব্ড্। রিটায়ার্ড ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পুত্র। প্রিলিমিনারী বি এল, পাশ করিয়া ইণ্টারমিডিয়েট বি, এল, ক্লাশে পড়িতেছে। সাহিত্যিক এবং কবি বা কবিভাবাপন্ন। আমেরিকার ট্রু ষ্টরি, ট্রু এক্সপিরিয়েন্স ও ট্রু রোমান্সের রীতিমত পাঠক।

কলিকাতার নবনির্ম্মিত ট্রামগাড়ীর নামকরণ হইয়াছে Silver fox বা রূপালী শৃগাল। ইহার প্রথম শ্রেণীতে দুইটী একজন মাত্র বসিবার সিঙ্গ্‌ল সিট আছে। একটী গাড়ীর পেছনে—মধ্যভাগে! উহাতে যে বসে তাহাকে গাড়ীর Helmsman অথবা হালধারী মাঝির মত দেখা যায়। ট্রাম কোম্পানী কেন যে একটী ক্ষুদ্র Symbolic হাল গাড়ীর পেছনে লাগিয়ে দেয় না, আমার নিকট উহা বিস্ময়ের বিষয়। শুধু বলিব, উহাদের সেন্স অব হিউমারের অভাব। আমি আইডিয়াটী দিয়া দিলাম।

দ্বিতীয়টী বামদিকের লেডীস্ সিটের পেছনে, প্রায় লেডীস্ সিট-সংলগ্ন। আমাদের উপরোক্ত তরুণটীর এই আসনটী দখল করিবার প্রবল আগ্রহ ছিল। আগ্রহ থাকিলেই উদ্যম আসে এবং উদ্যম অনেক সময় সাফল্যমণ্ডিত হয়। এই সিটটী দখল করিবার আগ্রহে তরুণটী কখনও কখনও ট্রামের রওনা হইবার স্থানে যাইত এবং ডিপো হইতে ট্রামগাড়ী বাহির হইবামাত্র ঝটিতি ট্রাম গাড়ীতে চড়িয়া সিটটী আয়ত্ত করিত।

কোন কোন বন্ধু বিনয়কে ঠাট্টা করিয়া বলিত, "তুই ডগ সিটে বসতে এত ভালবাসিস কেন?" বিনয় বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিত, "ডগ সিট কাকে বলিস?" বন্ধু উত্তরে বলিত, "এই তুই যেখানে বসে আছিস। বিলাতে এই সিটটী লেডিদের ল্যাপ-ডগের জন্য রিজার্ভড থাকে।" বিনয় হাসিয়া উত্তর করিত, "সত্যি, আমি লেডীদের ল্যাপডগ হওয়া ভাগ্য মনে করি।"

এই সিটটী সম্বন্ধে বিনয়ের একটী মনোবিজ্ঞান-সম্মত স্পষ্ট মতবাদ ছিল। তাহার মতে এই সিটটীতে বসলে শুধু রমণীর সান্নিধ্য উপভোগ করা যায়, এরূপ নহে। ইহাতে বসলে রমণীর রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ—সকলই অল্পাধিক উপভোগ করা যায়। এই সিট হইতে একটী রমণীর পৃষ্ঠদেশ, গ্রীবা ও অংসদ্বয় এবং অপর তিনটি রমণীর মুখ ও শরীরের উপরার্দ্ধ ইচ্ছামত প্রাণ ভরিয়া দর্শন করা যায়। অনেক রমণীর জানালা দিয়া নিষ্ঠিবন ত্যাগ করিবার অথবা অঙ্গুলিদ্বারা ললাটের স্বেদবিন্দু বাহিরের দিকে ফেলিবার অভ্যাস আছে। বিনয় এই নিষ্ঠীবন-কণিকাকে অধরামৃতরূপে কল্পনা করিত এবং স্বেদবিন্দুকে অন্তর-রস-স্ফুরণ বলিয়া মনে করিত। গন্ধের প্রাচুর্য্য উপভোগ করিত—কেশ-তৈলের, পাউডারের, পোমেডের, স্নোর, এসেন্সের সুগন্ধ প্রচুর পরিমাণে পাইত—অল্প পরিমাণে রমণীর দেহের মৃদু গন্ধ এবং মধ্যে মধ্যে ঘর্ম্মের তীব্র গন্ধ অনুভব করিত। মধ্যে মধ্যে মনে হইত, খাদ্য ও পানীয়ের বেলা যদি 'ঘ্রাণেন অর্দ্ধভোজনং' হয়, তবে তরুণী-দেহ সম্বন্ধে তাহার ব্যতিক্রম হইবে কেন? কখনও কখনও যেন অনবধানতাবশতঃ লেডীস্ সিটের উপর হাত রাখিত এবং তাহার একান্ত সন্নিহিত রমণীর বস্ত্র বা দেহ ঈষৎ স্পর্শ করিত। রমণী ক্রোধ, বিরক্তি ও ঘৃণার সহিত, মুখ ফিরাইয়া তাহার দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করিত। বিনয় অমনি হাত সরাইয়া নিত এবং এই অবসরে এতক্ষণ যে রমণীর শুধু পৃষ্ঠ, গ্রীবা ও অংসদ্বয় দেখিতে পাইতেছিল, তাহার মুখ দেখিবার সুযোগ পাইত। কিন্তু মুক্তাকেশ ও মুক্ত কেশপাশের স্পর্শ সে প্রচুর পরিমাণে অনুভব করিত। তার পরে যখন দুই মুখরা তরুণী কলস্বরে নিজেদের অন্তরের কথা কহিত, তাহার অনেকটা তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিত।

বিনয়কে আমরা sensual, এমন কি sensuous বলিব না, মৃদু ভাষায় বলিব feminist, নারীপ্রিয়।

এহেন বিনয় একদিন প্রাতে ডালহৌসি স্কোয়ারের উত্তর-পশ্চিমকোণে, যেখানে ট্রাম খালি হয়, সেখানে ট্রামে আরোহণ করিয়া লেডিস্ সিটের পশ্চাদ্বর্ত্তী ডগ সিটটি অধিকার করিল। ইসপ্লানেড পর্য্যন্ত লেডীস্ সিট দুটি খালিই রহিল। এসপ্লানেডে ডানদিকের লেডীস সিটে একজন পাঞ্জাবী ও একজন মাদ্রাজী স্ত্রীলোক আসন গ্রহণ করিলেন। ট্রামগাড়ী লিণ্ডসে ষ্ট্রীটের বিপরীত দিকে—এক তরুণী ও তাহার প্রৌঢ় পিতা ট্রামে আরোহণ করিয়া বিনয়ের সম্মুখের লেডীস সিটে বসিলেন। তরুণী ও তাহার পিতার হাতে নানাপ্রকার প্যাকেজ ও দ্রব্যসম্ভার, সম্ভবতঃ ম্যুনাসিপাল মার্কেটে আসিয়াছিলেন।

তরুণীটি অসামান্য সুন্দরী ও গৌরী। বয়স বৎসর বিশেক হইবে। অভিজাত্য ও সুরুচির ছাপ উহার মুখে, অবয়বে, পরিচ্ছদে। উহার পিতা বোধ হয় কোন অবসরপ্রাপ্ত উচ্চ সরকারী কর্ম্মচারী। বর্ত্তমানে পেট্রলের দুষ্প্রাপ্যতার দিনে বাড়ীর মোটরে না আসিয়া ট্রামযোগে মার্কেটে আসিয়াছিলেন।

বিনয় তাহার পূর্ব্ব অভ্যাস মত, যেন অসাবধানে, হাত রাখিতে গিয়া তরুণীর পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিল। তরুণী বিরক্তি ও ঘৃণাভরে পশ্চাৎ ফিরিল না। সঙ্কুচিত হইয়া পিতার পার্শ্বে সরিয়া বসিল। কিন্তু বিনয় তরুণীর কেশ ও বাস হইতে নির্গত সুগন্ধের প্রাচুর্য্য ও অকলপ্রান্ত স্পর্শ হইতে বঞ্চিত হইল না।

বালিগঞ্জের একটা বড় পার্কের নিকট তরুণী ও তাহার পিতা

ট্রাম হইতে নামিতে উদ্যত হইলেন। বিনয় এই সময় তরুণীর অপূর্ব্ব মুখশ্রী সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাইল। চট করিয়া বিনয়ের মাথার মধ্যে একটি খেয়াল চাপিয়া বসিল। সেও সেইখানে ট্রাম হইতে নামিয়া প'ড়ল এবং একটু দূরে দূরে থাকিয়া তরুণীর অনুসরণ করিল। দেখিল, পার্কের ধারেই একটা সুদৃশ্য বাগানযুক্ত দ্বিতল গৃহে পিতা-পুত্রী প্রবেশ করিল। দুই মিনিট পরে বিনয় দেখিল বাড়ীর গায়ে ছোট শ্বেত প্রস্তরফলকে লিখিত আছে "N. Mitter, Retd. District Judge" দেখিয়া তাহার মনটা হর্ষোৎফুল্ল হ'ল।

তার পর আবার ধীরে ধীরে মিত্র মহাশয়ের বাগানের মধ্য দিয়া গৃহের বারান্দায় উঠিয়া কড়া নাড়িল। মিত্র মহাশয় নিজে দরজা খুলিয়া দিলেন এবং বিনয়কে দেখিয়া বিস্মিত ও মনে মনে বিরক্ত হইলেন। তথাপি ধীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, '.তামার কি চাই? তুমিই না ট্রাম গাড়ীতে আমার মেয়ের পেছনে বসেছিলে এবং অস্থির ভাব দেখিয়েছিলে?'

বিনয়। আজ্ঞে হাঁ, আমার সে সৌভাগ্য হয়েছিল। সে জন্যই আজ বিশেষ প্রয়োজনে আপনার মেয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছি।

মিত্র মহাশয় বারান্দায় অগ্রসর হইয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। বাহিরে দুইখানি চেয়ার ছিল. একটীতে নিজে বসিলেন। বিনয় দাঁড়াইয়া রহিল এমন সময় মিত্র মহাশয়ের এক বন্ধু ডাঃ দাশ গুপ্ত প্রবেশ করিয়া অন্য চেয়ারটীতে বসিলেন। মিত্র মহাশয় আরক্ত নেত্রে বলিলেন: 'আমার মেয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে? কি প্রয়োজন? তোমার স্পর্দ্ধা তো কম নয়!"

বিনয় সবিনয়ে বলিল, 'আজ্ঞে ওঁর সাথে একটি ডেট* স্থির করতে চাই।'

ডাঃ দাশগুপ্ত বলিলেন, ডেট মানে খেজুর। এ বাড়ীর পেছনে একটা খেজুর গাছ আছে, আর তার কাঁটাগুলি যেমন বড় তেমনি ধারালো। এখন গাছে তো রসও নাই। ফলও নাই, তবে খেজুরের কাঁটা অনেক আছে চাও?

বিনয়। আজ্ঞে, আপনি রহস্য করছেন। আমি ডেট শব্দ তারিখ অর্থে ব্যবহার করেছি। আমি ওঁর কন্যার সঙ্গে একটা তারিখ অর্থাৎ বার ও সময় স্থির করতে চাই।

ডাঃ গুপ্ত। তুমি কি ওর মেয়েকে চেন?

বিনয়। আগে চিনতুম না, আজ চিনেছি। এখন ওঁর সঙ্গে আলাপ হলেই উনি আমাকে ভাল করে চিনতে পারবেন।

মিত্র। ছোকরা, তোমার মাথা খারাপ। ডেট, তারিখ, বার, সময়, এ সব কি বলছলে?

বিনয় পকেট হইতে মরক্কো চামড়ায় বাঁধান একখানি নোট বই বাহির করিয়া মিত্র মহাশয়ের হাতে দিল, বলিল, 'এই দেখুন আমার ডেট বুক, নূতন কিনেছি। আপনার মেয়ের সঙ্গেই হবে আমার সপ্তম ডেট।"

*তরুণীর সম্মতি থাকলে উহার সহিত একত্র বাহিরে যাওয়ার রীতি পাশ্চাত্য দেশে প্রথম মহাযুদ্ধের পর প্রচলিত হইয়াছে।

ডাঃ দাশগুপ্ত হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তারিখ, বার, সময় ঠিক করবে কিসের জন্য?"

বিনয়। প্রথমতঃ ওঁকে নিয়ে চুঙওয়া রেস্তোরাঁতে যেয়ে লাঞ্চ খাব। তারপর মেট্রোতে গিয়ে সিনেমা দেখবো। ৫।॰ টায় সিনেমা ভাঙ্গলে ফারপোতে যেয়ে চা খাব। পরে মিস্ মিত্রকে সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে ফিরিয়ে আনব। পরিচয় গাঢ় হলে, নাইট-শোতে সিনেমা বা থিয়েটার দেখে, তার পর ডিনার খেয়ে, মধ্য-রাত্রির পূর্ব্বে ফিরিয়ে দিয়ে যাব।

মিত্র। বেল্লিক, বাঁদর বলে কি? কাণমলা খাওয়ার ইচ্ছে হ'য়েছে? আমাদের দেশে ডেট-ফেট চলবে না!

বিনয়। আজ্ঞে চলবে না কেন? আমেরিকা, ইয়োরোপ প্রভৃতি সভ্য দেশে যদি চলতে পারে, আমাদের দেশে চলবে না কেন? আপনারা একটু backward অর্থাৎ পেছনে পড়ে আছেন। আপনার ন্যায় শিক্ষিত উচ্চ রাজকর্ম্মচারী যদি পাইওনিয়র না হন, অর্থাৎ পথ না দেখান, তবে আমাদের দেশ অনেক পেছনে পড়ে থাকবে।

মিত্র। তা, আমরা পেছনে পড়ে থাকতে রাজি আছি।

বিনয়। আজ্ঞে, অন্য সব বিষয়ে অগ্রগামী হ'য়েও বিষয়ে পেছনে থাকলে চলবে কেন? ধরুন, চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আপনি যখন কলেজে পড়তেন, তখন কি মেয়েরা এমন সেজেগুজে পায়ে হেঁটে বা ট্রামে চড়ে মার্কেটে গিয়ে জিনিস-পত্র খরিদ করে আনতো? একাকিনী অথবা যুবক কাজিন বা প্রতিবেশীর সঙ্গে ট্রামে বাসে বেড়াত? মিস্ মিত্রও নিশ্চয় এরূপ ভাবে বেড়াতে বের হন্। গত চাল্লশ বৎসরে আমাদের দেশ অনেক অগ্রসর হয়েছে। এটা হচ্ছে প্রগ্রেসের অর্থাৎ প্রগতির যুগ।

ডাঃ গুপ্ত। কাজিনরা সম্পর্কিত, প্রতিবেশী যুবকেরা পরিচিত। তুমি সম্পর্কিতও নও, পরিচিতও নও।

বিনয়। আজ্ঞে, মাপ করবেন, তরুণ-তরুণীর নিকট সম্পর্ক বা পরিচয়ের বাঁধন বড্ড আল্‌গা—মোটেই শক্ত নয়। যদি চান আমার পরিচয় দিচ্ছি। দেখবেন আমি কাজিন অথবা প্রতিবেশী যুবকদের চেয়ে কম desirable অর্থাৎ কাম্য নই। আমি শ্রীবনয়ভূষণ বসু। রিটায়ার্ড ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পুত্র। বি,এ পাশ করে ইণ্টারমিডিয়েট ল পড়ছি। আমি সাহিত্যিক ও কবি।

ডাঃ গুপ্ত। আচ্ছা তোমার বোন্ আছে? যদি কোন যুবক তোমার বোনের সঙ্গে ডেট. স্থির কর্ত্তে চায়, তবে কেমন লাগে?

বিনয়। এবার আপনি হাসালেন। আমার বোন ডলি ডাইওসেসানের বি, এ। আজকাল ডেটের জন্য তার টিকিটি দেখবার যো নাই। সকালে ৮টা থেকে ১১টা, বিকালে ১টা থেকে ৬টা এবং রাত্রিতে ৭টা থেকে ১২টা, কখনও দেড়টা দুটা পর্য্যন্ত ডেট থাকে। যাঁরা ডলির সঙ্গে ডেট্ স্থির করেন তাঁদের অনেককে আমার বাবা বা আমি চিনিও না। এ বিষয়ে আমাদের ডলি in advance of the times অর্থাৎ সময়ের অগ্রে চলে গেছে।

মিঃ মিত্র। তোমার ও তোমার বোনের পরিচয়ে আপ্যায়িত হ'লেম। এইবার মানে মানে সরে পড়।

বিনয়। আজ্ঞে, আপনার মেয়েকে একবার ডেকে দিন্। তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে, তার পরে যাব।

মিত্র। ডেঁপো ছোকরা! তার সঙ্গে তোমার দেখা হ'বে না।

বিনয়। স্যর, এখানে আপনি আইনতঃ ভুল করলেন। ওঁকে দেখে মনে হ'ল ওঁর বয়স আঠার বৎসরের উপর অর্থাৎ উনি মেজর অর্থাৎ উনি বর্ত্তীতে পৌছেছেন। উনি sui juris অর্থাৎ নিজের কার্য্য নিজে করবার অধিকারিণী। ওঁর মতামত না নিয়ে ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হবে না, আপনার এরূপ বলবার রাইট্ নেই। এ বিষয়ে আপনার কোন Locus standii অর্থাৎ দাঁড়াবার স্থান নেই। আপনি আপনার মেয়েকে তার আইনসম্মত অধিকার থেকে বঞ্চিত কর্চ্ছে'ন। আপনি ল ব্রেক্' অর্থাৎ আইন ভঙ্গ কর্চ্ছে'ন।

মিঃ মিত্র। তবে রে ছুঁচো, জজ্‌কে আইন শেখাতে এয়েছ। দারোয়ান, মালী, এই বেল্লিককে গেটের বার করে দাও! যদি জোর করে, দোল খাইয়ে ছুঁড়ে ফেলে দাও। গেটের বাঁদিকে যে ডাষ্ট্‌বিন্ আছে, তার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দাও।

দারোয়ান ও মালী এসে বিনয়ের দু' হাত ধরল। বিনয় এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে বলল, "আপনার কাজ অত্যন্ত অসভ্য, বর্ব্বরোচিত, বন্য, জঘন্য, বে-আইনী। আমি আপনার উপর কেস্ করতে পারি, জানেন?" বলিয়া সে হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তখন দারোয়ান বিনয়ের দু'হাত ধরিল এবং মালী উহার দু'পা ধরিল। উহাকে চ্যাঙ্গ্‌দোলা করিয়া নিয়া ডাষ্ট্‌বিনের দিকে নিক্ষেপ করিল। সৌভাগ্যক্রমে বিনয় ডাষ্ট্‌বিনের মধ্যে না পড়িয়া ডাষ্ট্‌বিনের এক পার্শ্বে, যেখানে অতিরিক্ত রাবিশ জমা ছিল, তাহার উপর পড়িল। পায়ে বা কোমরে আঘাত পাইল না সত্য, কিন্তু তাহার সুদৃশ্য পরিচ্ছদের পশ্চাদ্‌ভাগের অত্যন্ত দুর্গতি হইল। বিনয় ধীরে ধীরে সেই রাবিশের উপর উঠিয়া বসিল। তার মুখে দারুণ লজ্জা, অপমান, ঘোর নৈরাশ্য ও অঙ্কুরোন্মুখ প্রেমের ব্যর্থতার ভাব ফুটিয়া উঠিল।

এক মিনিট পরে বিনয় উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল। এমন সময় একজন স্থূলদেহ প্রৌঢ় ভদ্রলোক বিনয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া করজোড়ে বলিল, "আজ্ঞে, উঠ্‌বেন না। দু' মিনিট যেমন ভাবে বসে আছেন, সেইরূপ বসে থাকুন্।" বলিয়া ভদ্রলোক "ক্যামেরাম্যান্, ক্যামেরাম্যান্" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। বিনয় তো বিস্ময়ে হতবাক্।

ক্যামেরাম্যান্ একটা বড় ক্যামেরা নিয়া দৌড়াইয়া আসিল। বিনয়ের সম্মুখে রাস্তার অপর দিকে ক্যামেরা বসাইয়া এক মিনিটে ফোকাস্ করিল, তারপর উপর্য্যুপরি দুইখানা প্লেট এক্স্‌পোজ্ করিয়া ক্লিক্ করিল। পরে ক্যামেরাম্যান্ তাহার যন্ত্র নিয়া পার্কের ভিতরে প্রবেশ করিল। সেখানে ফিল্ম্ সুট করিবার জন্য বহু লোক জমা হইয়াছিল।

বিনয় উঠিয়া দাঁড়াইলে প্রৌঢ় ভদ্রলোক অগ্রসর হইয়া তাহাকে ধন্যবাদ দিলেন এবং পকেট হইতে চেক্‌বুক্ বাহির করিয়া এক শ' টাকার একখানা চেক্ লিখিয়া বিনয়ের হাতে দিলেন। বিনয় কুণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি?"

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলিলেন, "বাবা! আজ বড্ড বিপদ্ থেকে বাঁচিয়েছ। বেঁচে থাক। আমি ষ্টার ফিল্ম্ কোম্পানীর ডিরেক্টার। আজ আমাকে "ব্যর্থ প্রণয়ীর মুখভাবের ছবি সুট করতে হবে। আমাদের যে হিরো সাজে, তাকে দিয়ে অনেক চেষ্টা ক'রেও মুখের সেরূপ এক্স্‌প্রেশন্ আদায় কর্ত্তে পাল্লুম না। ভাগ্যে তুমি ছিলে। তাই আমাদের আজকের সুটিং পুরো হ'ল। তা ছাড়া, তোমার মুখখানি অবিকল আমাদের হিরোর মুখের মত, আশ্চর্য্যের বিষয়! তোমায় প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ কর্চ্ছি!

বিনয় বলিল, "কি বল্লেন, ষ্টার ফিল্ম্ কোম্পানী? তবে তো মুখের মিল হবেই। আপনাদের হিরো আমার যমজ ভাই। দয়া করে একখানা ট্যাক্সি ডাকিয়ে দিন্। আমাকে বেশ-পরিবর্ত্তনের জন্য এখনই বাড়ী যেতে হবে।"

আঁকে মনে স্বপ্ন

বন্দে আলী

আমি বন-হরিণী
　　নেচে চলি ছন্দে
কাননে কাননে ফিরি
　　কস্তুরী-গন্ধে;
নাচে গিরি ঝর্ণা-
　বিদ্যুৎ বর্ণা
তার সনে ছুটি গো
　　মনের আনন্দে।

শুক-শারী, গানে জাগে
　　সাত ভাই চম্পা,
আসে মেঘ বাতায়নে
　　উর্ব্বশী রম্ভা।
শ্যামল অরণ্য
আঁকে মনে স্বপ্ন,
ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফুলদল
　　যাই মৃদু মন্দে।

বিশ্বশান্তি প্রচেষ্টা কি সার্থক হইবে

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহের অবসান দ্বারা জগতে শান্তিসংস্থাপনের প্রচেষ্টা সেই রামায়ণ-মহাভারতের প্রাচীন যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহজগতে চিরশান্তি অসম্ভব। সৃষ্টির উদ্দেশ্যও তাহা নহে। সৃষ্টির নিমিত্ত ধ্বংসের প্রয়োজন এবং ধ্বংস পূরণার্থ পুনঃ সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী। ইহাই সৃষ্টিলীলা। কাল চিরপ্রবহমান, চিরপরিবর্ত্তনশীল। পুরাতনের ক্ষয় ও লয় এবং নূতনের আবির্ভাব ও অভ্যুদয়, ইহাই প্রকৃতির চিরন্তন নিয়ম। জীব-জন্তু, বৃক্ষ-লতা, পত্র পুষ্প প্রভৃতি সৃষ্টির বিভিন্ন প্রকরণে পুরাতনের অন্তর্দ্ধান এবং নূতনের আবির্ভাব ও আবিষ্কার অহরহ অবিশ্রান্ত ভাবে চলিয়াছে। প্রতি পর্য্যায়ে সৃষ্টি ও বৃদ্ধি এবং ক্ষয় ও লয় নিরন্তর ক্রিয়মান। প্রাণীজগতের সকলেই এই হেতু চিরউদ্যমশীল। আমরা একটি ইংরাজী কবিতায় পড়িয়াছি যে, ভগবান সৃষ্টির পর মানুষকে একমাত্র বিশ্রাম ব্যতীত তাঁহার অন্যান্য সমস্ত শ্রেষ্ঠদান সমর্পণ করিয়াছিলেন। প্রাণী মাত্রকেই অবিরত প্রাণধারণের নিমিত্ত পরিশ্রম করিতে হয় এবং বিধাতা প্রাণিগণকে ইতর-শ্রেষ্ঠ ক্রমে পরস্পরের খাদ্য-খাদক সম্বন্ধে নির্দ্ধারিত করিয়া হিংসার বীজ বপন করিয়াছেন। হিংসা হইতেই যুদ্ধের উদ্ভব এবং তাহার সহচর কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদ, মাৎসর্য্য। সৃষ্টির প্রারম্ভে দিতি ও অদিতির সন্তানদের মধ্যে অমৃতের অধিকার লইয়াই প্রথম যুদ্ধের সূচনা। তাহার পর সৃষ্টির ক্রম-নিম্ন-ক্রমে এই হিংসার প্রবৃদ্ধ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের নিত্যলীলা; ব্যক্তিগত জীবন হইতে সমষ্টিগত জীবনে ইহার পরিব্যাপ্তি, পারিবারিক জীবন হইতে সামাজিক জীবনে এবং সামাজিক জীবন হইতে বৃহত্তর রাষ্ট্রিক জীবনে ইহার উগ্রতা, তীব্রতা, এবং তীক্ষ্ণতার পরিবৃদ্ধি। রাষ্ট্রীক জীবনে, ইতিহাসের যুগে আসিয়া আমরা দেখিতে পাই যে ষোড়শ শতাব্দীতে অষ্ট্রীয়ার বোহেমিয়া প্রদেশের প্রথম বিশ্বশান্তি প্রচেষ্টার সূত্রপাত। বোহেমিয়া তখন স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল। বিগত মহাযুদ্ধে স্বাধীনতা পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া, বর্ত্তমান মহাবিপ্লবে বোহেমিয়া তাহা পুনরায় হারাইয়াছিল। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের অবসানে শান্তিবৈঠকে তাহার ব্যবস্থা কিরূপ হইবে, তাহা এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। যাহা হউক, আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন যুবক লেডিস্‌লল্‌ ছিলেন বোহেমিয়ার রাজা এবং প্রটেষ্টাণ্ট জর্জ্জ পোডিব্রাড ছিলেন তাঁহার অভিভাবক। জীবনপ্রভাতে মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া এই যুবক মুমূর্ষু রাজা তাঁহার প্রাজ্ঞ অভিভাবকের নিকট এই অন্তিম অনুরোধ নিবেদন করিয়াছিলেন যে তিনি যেন তাঁহার প্রজাবৃন্দের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া ধনী-দরিদ্র নির্ব্বিশেষে ন্যায় বিচার করেন।

যুবক রাজার মৃত্যুর পর বোহেমিয়ার গুণমুগ্ধ অধিবাসিবৃন্দ মৃত রাজার বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ অভিভাবক জর্জ্জ পোডিব্রাডকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজদণ্ডের অধিকারী হইয়া কৃতজ্ঞ জর্জ্জ পোডিব্রাড মৃত প্রভুর অন্তিম আদেশ প্রতিপালন করিবার বিশেষ প্রযত্ন করিয়াছিলেন। যুদ্ধ পরিহার করিয়া বিভিন্ন দেশের রাজন্যবর্গ যাহাতে বিচার-বৈঠকে সমবেত হইয়া পরস্পরের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ আপোষে মিটাইয়া লইতে পারেন, তজ্জন্য তিনি একটি আন্তর্জ্জাতিক মহাসভা (A Parliament of Nations) প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব বিভিন্ন রাজদরবারে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু, একমাত্র প্রবলপরাক্রান্ত তদানীন্তন ধর্ম্মভীরু ফরাসী নৃপতি ব্যতীত, অন্য কোন প্রজাপালকের নিকট তিনি সহানুভূতি মাত্রও লাভ করিতে পারেন নাই।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম-চতুর্থাংশে ইংলণ্ডে রাজা চার্লসের রাজত্বকালে জর্জ্জ ফক্স নামক এক মহানুভব ব্যক্তি—খৃষ্টধর্ম্ম-পুস্তক বাইবেলের "নরহত্যা করিবে না" (Thou shalt do no murder) এই অহিংস মহাধর্ম্মনীতির উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া "সোসাইটি অব ফ্রেণ্ডস্" (Society of Friends) এই আখ্যা দিয়া এক যুদ্ধ-বিরোধী শান্তিকামী দলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহারা অধুনা "কোয়েকার" (Quaker) নামে পরিচিত। অশেষ অত্যাচার-অনাচার এবং নির্ম্মম নির্য্যাতন সহ্য করিয়া প্রথম চার্লসের শিরশ্ছেদের পর অলিভার ক্রমওয়েলের শাসন সময়ে মহাত্মা ফক্স ক্রমওয়েলের অনুগ্রহে পার্লিয়ামেণ্ট হইতে নির্ভয়ে ও নির্ব্বিঘ্নে স্বীয় ধর্ম্মমত প্রচার করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু অহিংস নীতি আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই; যুদ্ধ বিগ্রহেরও অবসান ঘটে নাই। মধ্যযুগে য়ুরোপে যুদ্ধ ছিল রাজন্যবর্গের নর্ম্ম ক্রীড়া (sport)। ফরাসীর সিংহাসনে একজন ইংরাজ নৃপতিকে প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত ইংলণ্ড ফরাসীর সহিত শতবর্ষ যুদ্ধ চালাইয়াছিল। ধর্ম্মসংস্কার হেতু ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড চলিয়াছিল তাহা ইতিহাস-পাঠকের অবিদিত নাই। য়ুরোপের ন্যায় ভারতেও মধ্যযুগে যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং আক্রমণ-অত্যাচারের অন্ত ছিল না।

এই ভারতেই দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে গৌতম বুদ্ধ "অহিংসাই পরম ধর্ম্ম"—এই মহানীতি প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু যেমন য়ুরোপে যিশুখৃষ্টের ধর্ম্মাবলম্বিগণ, তেমনি এশিয়া মহাদেশে গৌতম বুদ্ধের শিষ্যগণ, এখনও ভীষণ লোকক্ষয়কারী হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত রহিয়াছেন। আমাদের জীবিতকালে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের তুর্কী-গ্রীক যুদ্ধ হইতে বুয়র যুদ্ধ, রুশ-জাপান যুদ্ধ, বিগত মহাযুদ্ধ, আবিসিনিয়ার যুদ্ধ, চীন-জাপান সংঘর্ষ এবং বর্ত্তমান যুদ্ধ প্রভৃতি আমরা যেমন প্রত্যক্ষ করিলাম, তেমনি ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের হেগ শান্তি বৈঠক হইতে ভার্সাই, মিউনিচ প্রভৃতি বহু শান্তি-প্রচেষ্টার ব্যর্থতাও প্রত্যক্ষ করিলাম।

আমাদের জীবিতকালেই সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডকে য়ুরোপে শান্তি স্থাপনের নিমিত্ত বিশেষ প্রয়াস পাইতে দেখিয়াছি। শান্তি সংস্থাপন প্রচেষ্টায় তাঁহার আন্তরিকতা লক্ষ্য করিয়া লোকে তাঁহাকে "শান্তি প্রতিষ্ঠাতা এডওয়ার্ড" আখ্যা প্রদান করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর চার বৎসর পরেই য়ুরোপে ১৯২৪—১৮ খৃষ্টাব্দে মহাসমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল। এই মহাযুদ্ধে কেবলমাত্র ইংরাজ পক্ষেই সাড়ে আট লক্ষ লোক হতাহত হইয়া

ছিল। ফরাসী, জার্ম্মাণী প্রভৃতি জাতিরও লোকক্ষয় ইহা অপেক্ষা কম হয় নাই। কত পুরাতন রাজ্য ধ্বংস হইয়াছিল, কত নূতন রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, কত পরাধীন রাজ্য স্বাধীন হইয়াছিল, এবং প্রাচীন বোহেমিয়ায় চেকোস্লোভাকিয়া নামক সাধারণ তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

এই মহাযুদ্ধের ফলে ভাবী যুদ্ধ নিবারণ উদ্দেশ্যে, জগতের বিভিন্ন জাতি লইয়া "লীগ অব নেশনস্" নামক এক বিরাট জাতি-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে যুক্তরাষ্ট্র ও রুশিয়া এই সঙ্ঘে যোগদান করে নাই। তথাপি, প্রায় অর্দ্ধ-শতাধিক রাষ্ট্র লইয়া এই বিরাট সঙ্ঘ স্থাপিত হইয়াছিল। ভাবী যুদ্ধ নিবারণের চেষ্টা ব্যতীত, সঙ্ঘ সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের নিমিত্ত একটি আন্তর্জ্জাতিক স্বাস্থ্যবিভাগ ও একটি আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ইহার প্রতিষ্ঠা হইতে, জাতিসঙ্ঘ অনেক জনহিতকর কার্য্য করিয়াছে, কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহ নিবারণ করিতে পারে নাই। ইতালী কর্ত্তৃক আবিসিনিয়া জয় প্রতিরোধ করা দূরে থাকুক, সঙ্ঘের সভ্য রাষ্ট্রগণ ইতালীর সহিত তাহাদের অর্থ-নৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়াও তাহাকে সংযত করিতে পারে নাই। বিনা অপরাধে জাপান কর্ত্তৃক চীন আক্রমণেও জাতিসঙ্ঘ চীনকে কোন প্রকার সাহায্যই করিতে পারে নাই। স্পেনের অন্তর্দ্বন্দ্বেও জাতিসঙ্ঘ নিষ্ক্রিয় ছিল। জাতিসঙ্ঘের এই বিফলতার মুখ্য কারণ—স্বকীয় সামরিক শক্তির অভাব; এবং গৌণ কারণ, কতিপয় সাম্রাজ্য-লোলুপ প্রবল পরাক্রান্ত জাতির স্বার্থান্ধ সাম্রাজ্য-বিস্তার লিপ্সা। জার্ম্মাণ জাতির শেষ অধিনায়ক হিটলার এবং ইতালীর অধিনায়ক মুসোলিনী পূর্ব্ব গৌরব ও সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার বাসনায় বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রবর্ত্তন ও বিশ্বব্যাপী বিস্তার সাধন করিয়া পরিণামে স্ব স্ব দেশ ও জাতিকে হৃতসর্ব্বস্ব ও পরপদানত করিয়া, বিনষ্ট হইয়াছেন। অহেতুক অত্যাচার ও অনাচারের পরিণাম কখনই কল্যাণজনক নহে। ধনবল ও জনবলের তারতম্যানুসারে যুদ্ধে জয় ও পরাজয় ঘটে। পরাজয় মৃত্যুতুল্য; কিন্তু জয়-লাভও প্রভূত ক্ষয় ও ক্ষতির কারণ। বৈর কখনই বৈর দ্বারা প্রশমিত হইবার নহে। বহুকাল গত হইলেও বৈর উপশমিত হয় না; বরং পরাজয়ের পরিতাপ ধূমায়িত হইয়া, কালে বৈরানল পুনঃ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। সাম, দান ও ভেদ দ্বারা দুরাকাঙ্ক্ষা সিদ্ধ না হইলেই যুদ্ধ অনিবার্য্য হয়; কিন্তু যুদ্ধে জয় পরাজয় দৈবায়ত্ত। এই নিমিত্ত, যুদ্ধে জয়-পরাজয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্তিমার্গ অবলম্বনই বিধেয়।

সর্ব্বশস্ত্র ও শাস্ত্রবেত্তা অমিতপরাক্রম, অতিরথ ভীষ্ম মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিয়াছিলেন,—"চতুরঙ্গিণী সেনা সংগ্রহ করিয়া ও প্রথমে সান্ত্ববাদ দ্বারা শত্রুর সহিত সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা করিবে। সন্ধি স্থাপনে কোন মতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য।" কিন্তু সে যুদ্ধ, ন্যায়যুদ্ধ; অন্যায় যুদ্ধ নহে; অহেতুক পরস্বাপহরণ নহে। সান্ত্ববাদ দ্বারা শান্তি-সংস্থাপনে অকৃতকার্য্য হইয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্তি দিয়াছিলেন। যুদ্ধ সেকালেও যেমন ছিল, একালেও তেমনি, ক্ষেত্র বিশেষে, অনিবার্য্য ও অপরিহার্য্য। মানব-সভ্যতার ক্রমোন্নতির সহিত যুদ্ধের রীতি-নীতি, কল-কৌশল, প্রকার-প্রকরণ এবং উপায়-উপকরণেরও যুগে যুগে বহুল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে; অস্ত্র-শস্ত্র, যান-বাহন বিমান-বিস্ফোরক প্রভৃতিরও বিপুল ধ্বংসকারী শক্তি প্রবর্দ্ধিত হইয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞান, জনকল্যাণ সাধনের হিতকর ব্রতে ব্রতী হইয়া পররাষ্ট্রলোলুপ রাষ্ট্রনায়কগণের প্ররোচনায় ধন-জন ও সম্পদ-সম্পত্তি ধ্বংস ও বিধ্বস্ত করিবার কূট কৌশলে বিনিযুক্ত হইয়াছে। মানুষের প্রাণ ও সম্পদ্ রক্ষার উপায় উদ্ভাবনের শুভ সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হইয়া, ধ্বংস ও নাশের কূট উপায় উদ্ভাবনে বৈজ্ঞানিকের শক্তি-সামর্থ্য অপব্যয়িত হইতেছে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ভীষণ বিস্ফোরক "ডিনামাইটের" আবিষ্কর্ত্তা সুইডেনের সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাঃ এলফ্রেড নোবেল বিস্ফোরকের ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ-সংগ্রহ করিয়া ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুকালে নিখিল জগতের মানব কল্যাণ-কল্পে আট হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ অন্যূন লক্ষ টাকা মূল্যের পাঁচটি পুরস্কারের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। প্রতি বৎসর পাঁচটি বিষয়ে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জনকল্যাণ-সংসাধক মনীষীকে এই পুরস্কার প্রদত্ত হয়। ইহার মধ্যে একটি বিষয় জগতে শান্তি সংস্থাপন প্রচেষ্টা; অন্যগুলি,—বস্তুবিজ্ঞান, রসায়ন, জীবতত্ত্ব কিম্বা ঔষধ-প্রস্তুতি এবং সাহিত্য। মহামতি নোবেলের এই শান্তি-সংস্থাপন প্রচেষ্টার পুরস্কার অতি অল্প লোকেই লাভ করিয়াছে; কারণ, এই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদ-মাৎসর্য্য পরিপূর্ণ জগতে চির শান্তি দূরে থাকুক, দীর্ঘকালস্থায়ী শান্তিও অতি-দুর্লভ। সৃষ্টিকর্ত্তার তাহা অভিপ্রেত নহে। সংগ্রামই জঙ্গম জীবন।

যাহা হউক বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের অতি শোচনীয় ও শোকাবহ অপরিসীম ধ্বংস ও নাশের পরিণাম ফলে, বর্ত্তমান যুদ্ধ-পরিচালনা মিত্র পক্ষের সম্মিলিত জাতিসমুদয় জগতে স্থায়ী শান্তি স্থাপনার্থে যে প্রশংসনীয় প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত আছেন, তাহা শত্রু-মিত্রনির্ব্বিশেষে সর্ব্বজাতির অকুণ্ঠিত আন্তরিক সমর্থনযোগ্য। এই যুদ্ধের ঘোর সঙ্কটকালে একমাত্র বৃটেনই সর্ব্বগ্রাসী জার্ম্মাণী ও তাহার তাঁবেদার ইতালী প্রভৃতি অধিকৃত ও শত্রুকবলিত রাষ্ট্রসমূহের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান ছিলেন। পরে যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য ও সহযোগিতা এবং তৎপশ্চাৎ সোভিয়েট রুশিয়ার সাহচর্য্য লাভ করিয়া শত্রু দমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া যুক্ত-রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট ও যুক্তরাজ্যের প্রধান মন্ত্রী আটলান্টিক মহাসাগরবক্ষে একত্রিত হইয়া যুদ্ধ পরিচালন রীতিনীতি ও কৌশল সংক্রান্ত আলোচনার সহিত যুদ্ধোত্তর শান্তিনীতি ও নিরাপত্তা সম্পর্কে ভবিষ্যৎ কার্য্যক্রম নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। এই নিগূঢ় আলাপ-আলোচনার ফলে যে আটলান্টিক সনন্দ রচিত হয় তাহাতে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট চারিটি স্বাধীনতার প্রচার ও প্রবর্ত্তন নির্দ্ধারিত করেন। প্রথম ভয় হইতে মুক্তি; দ্বিতীয় অভাব হইতে মুক্তি; তৃতীয়, নির্ভয়ে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, এবং চতুর্থ নিঃসঙ্কোচে সকলের সহিত মিলিবার ও মিশিবার

স্বাধীনতা। এই সার্ব্বজনীন চারিটি স্বাধীনতা ব্যতীত জার্ম্মাণ-কবলিত স্বাধীন দেশসমূহের পুনরুদ্ধার ও তাহাদের নিরঙ্কুশ স্বায়ত্ত-শাসন ও শ্রীবৃদ্ধিসাধন প্রচেষ্টার পরিপূর্ণ নিরাপত্তার বিধি-বিধানও নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। দুর্ভাগ্য ভারতের ইহাতে কোন প্রত্যক্ষ সংস্রব ছিল না। অচিরে যখন বিশ্বাসঘাতক জার্ম্মাণী রুশিয়ার সহিত অনতিপূর্ব্বে স্বাক্ষরিত চুক্তি পদদলিত করিয়া রুশিয়ার বুকে বজ্রপ্রহার করিল, তখন রুশিয়ার রাষ্ট্রকর্ণধার মার্শাল ষ্টালিন ও বৃটেনের চার্চ্চিল যুক্তরাষ্ট্রের রুজভেল্টের সহিত তেহেরাণে মিলিত হইয়া জার্ম্মাণী, ইতালী ও জাপানের অক্ষশক্তিকে খর্ব্ব করিবার উপায় উদ্ভাবনের সহিত নিখিল জগতের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা রক্ষা করিবার নিমিত্ত, যুদ্ধোত্তর শান্তি পরিকল্পনারও কাঠামো বিরচিত করিয়াছিলেন। রুজভেল্ট চার্চ্চিল পরে ডামবার্টন-ওকস্ ও ইয়ল্টা নামক স্থানদ্বয়ে মিলিত হইয়া চীনের রাষ্ট্রনায়ক চিয়াংকাইশেক ও বৃটেন, চীন, এবং মার্কিণের পররাষ্ট্র-সচিব ও সমর বিভাগের অধ্যক্ষ ও অধিনায়কগণের সহিত পরামর্শ করিয়া যুদ্ধে উপর্য্যুপরি দ্রুত সাফল্য লাভ করেন এবং যুদ্ধোত্তর নিরাপত্তার পরিকল্পনা ধীরে ধীরে পরিপুষ্ট করেন। ইতিমধ্যে শত্রুর উপর্য্যুপরি পরাজয়, ফরাসীর পুনরুদ্ধার, ইতালীর সহিত মিত্র পক্ষে যোগদান, রুশিয়ার জার্ম্মাণী অভিমুখে ত্বরিত অগ্রগতির ফলে শত্রুবিধ্বস্ত বহু দেশ মিত্র পক্ষে যোগদান করে। অত্যন্ত বিচক্ষণতার সহিত রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট প্রথম একটি আন্তর্জ্জাতিক খাদ্য বৈঠক, পরে একটি আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক বৈঠক এবং তৎপশ্চাতে স্যানফ্রান্সিস্কো নগরে ন্যূনাধিক পঞ্চাশটি বিভিন্ন জাতি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি লইয়া একটি নিখিল জগতের ভবিষ্যৎ শান্তি ও নিরাপত্তা বিধায়ক মননশীল বৈঠকের আহ্বান করেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ এই বৈঠকের পূর্ব্বেই রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটে। যাহা হউক নূতন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের তত্ত্বাবধানে এই সম্মিলিত জাতি-সমুচ্চয়ের রাষ্ট্র প্রতিনিধিগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার ফলে নিখিল জগতের নিরাপত্তা বিধায়ক একটি সর্ব্ববাদিসম্মত সনন্দ বিরচিত ও স্বাক্ষরিত হইয়াছে। মার্কিণের রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণ পরিষদদ্বয় ইতিমধ্যে এই সনন্দ সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিয়াছেন। সুতরাং অন্যান্য রাষ্ট্রগুলিও যে এই সনন্দ অঙ্গীকার করিয়া লইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। এই বৈঠকে ভারতের তথাকথিত প্রতিনিধি তিনজন উপস্থিত ছিলেন এবং সরকারের পরোক্ষ নির্দ্দেশ ও নিয়ন্ত্রণে তাঁহাদের ভূমিকায় যথাযোগ্য ও যথাসাধ্য অভিনয় করিয়াছেন।

জগতের প্রায় সমস্ত জাতির এই সম্মিলনী-বৈঠকে যে নিখিল জগতের নিরাপত্তা-বিধায়ক সনন্দ অঙ্গীকৃত হইয়াছে তাহার মহৎ উদ্দেশ্য হইতেছে, রাষ্ট্র জগতকে যুদ্ধ-বিগ্রহ হইতে বিমুক্ত রাখিয়া, বিভিন্ন জাতি যাহাতে সৎ-প্রতিবেশীরূপে পরস্পর শান্তিতে পরমতসহিষ্ণু হইয়া স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন করিতে পারে তন্নিমিত্ত একটি সম্মিলিত জাতিসমুচ্চয় প্রতিষ্ঠা। এই সম্মেলিত জাতিসমুচ্চয়ের ছয়টি প্রধান অঙ্গ। প্রথম, সাধারণ সভা; দ্বিতীয়, নিরাপত্তা সংসদ; তৃতীয়, অর্থ নৈতিক ও সামাজিক সংসদ্; চতুর্থ, ন্যাসরক্ষক অভিভাবক সংসদ্; পঞ্চম, আন্তর্জ্জাতিক বিচারালয় এবং ষষ্ঠ, কর্ম্মচারী দপ্তর। বর্ত্তমান জাতিসঙ্ঘ অপেক্ষা সম্মিলিত জাতি-সমুচ্চয়ের কর্ম্ম-পরিধি বহুল পরিমাণে বিস্তৃত ও ব্যাপক, এবং ইহার কর্ম্মশক্তিও তদনুরূপ প্রচুর। বর্ত্তমান জাতি-সঙ্ঘের সূচনাতেই দুইটি প্রধান রাষ্ট্র ইহার সংস্রব পরিহার করিয়াছিল। প্রথম, যুক্তরাষ্ট্র এবং দ্বিতীয় রুশসাম্রাজ্য। বর্ত্তমান জাতিসঙ্ঘের কর্ম্মপ্রবণতা ছিল নীতিমূলক, অর্থাৎ অনুনয়-বিনয়, অনুরোধ-বিরোধ এবং যুক্তি-তর্ক মূলক। কিন্তু প্রবল পরাক্রান্ত জগতের সর্ব্বপ্রধান পঞ্চ মহাশক্তিশালী জাতির পৃষ্ঠপোষকতা ও সক্রিয় সমর্থনের প্রভাবে সম্মিলিত জাতি সমুচ্চয়ের কর্ম্ম-ক্ষমতা হইবে শক্তিমূলক, অর্থাৎ ইহার আয়ত্তের মধ্যে, কেবল নিষ্ফল যুক্তিতর্ক নহে, সশস্ত্র সৈন্যসামন্তও থাকিবে। প্রয়োজন হইলে, বল প্রয়োগ দ্বারা এই সমুচ্চয় যে কোন বিদ্রোহী জাতি, অথবা রাষ্ট্রকে দমন করিতে পারিবে। অস্ত্রবলই জগতে শ্রেষ্ঠ বল; যুক্তি-তর্কের পশ্চাতে সামরিক শক্তি ব্যতীত বিভিন্ন প্রকৃতির বিভিন্ন জাতির ক্ষুদ্র অথবা কূট স্বার্থ-দুষ্ট প্রবৃত্তি নিচয়কে শাসনে সংযত ও সংহত রাখা সম্ভবপর নহে। গার্হস্থ্য হইতে রাষ্ট্রিক পর্য্যন্ত সর্ব্বক্ষেত্রে শাসনের মূলে শক্তি প্রয়োজন। সম্মিলিত জাতি-সমুচ্চয়ের শাখা প্রতিষ্ঠানগুলির সংগঠন ও কর্ম্ম-সূচী এইরূপ :

(১) সম্মিলিত জাতি সমুচ্চয়ের প্রত্যেকের পাঁচজন প্রতিনিধি লইয়া সাধারণ সভা (General Assembly) গঠিত হইবে। ইহার নিকট উপস্থাপিত বিষয়গুলির সম্যক্ আলোচনা করিয়া এই সভা, কোন্ বিষয়ে কিরূপ কর্ত্তব্য, তাহার বিধান দিবেন।

(২) নিরাপত্তা সংসদের (Security Council) সদস্য সংখ্যা এগার। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, রুশিয়া, চীন ও ফরাসী এই পঞ্চ প্রধান রাষ্ট্রের পাঁচজন প্রতিনিধি ইহার স্থায়ী সদস্য। বাকী ছয়টি অস্থায়ী সদস্য নির্ব্বাচিত হইবে সাধারণ সভা কর্ত্তৃক। নিখিল জগতের নিরাপত্তা বিষয়ে সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতা এই সংসদের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে। কর্ম্মপদ্ধতি ব্যতীত অন্য সকল বিষয়ে এই সংসদ যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবেন, উপযুক্ত পাঁচটি স্থায়ী সদস্যের তাহা নাকোচ করিয়া দিবার ক্ষমতা থাকিবে।

(৩) অর্থ নৈতিক ও সামাজিক সংসদের (Economic and Social Council) সদস্য সংখ্যা হইবে আঠার। ইহারা সকলেই সাধারণ সভা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবে। এই সংসদ আন্তর্জ্জাতিক, অর্থ নৈতিক, সামাজিক, কৃষ্টিশিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক ব্যবস্থা সম্পর্কে সাধারণ সভার নিকটে প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবে।

(৪) ন্যাসরক্ষক অভিভাবক সংসদের (Trusteeship Council) দায়িত্ব হইবে যে-সমস্ত দেশ বিদেশী রাষ্ট্রের অভিভাবকত্বের অধীনে থাকিবে তাহাদের সর্ব্ববিধ উন্নতি বিধান।

(৫) আন্তর্জ্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice) আন্তর্জ্জাতিক মামলা মোকদ্দমা ও বিবাদ বিরোধের বিচার আদালত।

(৬) কর্ম্মচারী দপ্তর (Secretariat) সম্মিলিত জাতি-সমুচ্চয়ের কেন্দ্রীয় ও শাখা প্রতিষ্ঠানগুলির সরকারী দপ্তরখানা।

এই দপ্তরখানা অবশ্য কোন রাষ্ট্র বিশেষের আদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিবে না।

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা এবং রক্ষার নিমিত্ত এই যে বিরাট সংগঠন, ইহা কার্য্যক্ষেত্রে কিরূপ সাফল্য লাভ করিবে তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। এই প্রচেষ্টার কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সম্মিলিত জাতি সমুচ্চয় (The United Nations)। যে সকল জাতি মিত্রপক্ষে যোগদান করে নাই, তাহাদের এই সংগঠনে যোগদান করিবার বাধা নাই, কিন্তু সকলে করিবে কিনা তাহার নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং যাহারা এই শান্তি-সনন্দ স্বাক্ষর করে নাই, তাহারা শান্তি ভঙ্গ করিতে পারে। সামরিক বল প্রয়োগ ব্যতীত শান্তি ভঙ্গ-কারীকে হয়ত শেষ পর্য্যন্ত দমন করিতে পারা যাইবে না। অতএব যুদ্ধের আশঙ্কা তিরোহিত হয় নাই। য়ুরোপে যুদ্ধ বন্ধ হইয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যে তথাকার শত্রু-কবলবিমুক্ত জাতিগুলির ঘরে বাহিরে ভীষণ রেশারেশি ও দ্বেষাদ্বেষি চলিতেছে। বিরোধের সঙ্গত কারণ এবং প্রচণ্ড প্রবৃত্তি প্রায় সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। কোথাও স্ব স্ব সীমান্ত নির্দ্ধারণ, কোথাও রাষ্ট্র পরিচালন ক্ষমতা লইয়া এখনও ঘোর বিবাদ বিরোধ চলিতেছে। আন্তর্জ্জাতিক স্বার্থদ্বন্দ্বের অন্ত নাই।

কেবল যে রাষ্ট্রীক কারণে জাতি সমূহের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ উপস্থিত হয়, তাহা নহে; অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কারণই তাহার মূল ভিত্তি। কদাচিৎ সামাজিক কারণেও বিরোধ ঘটে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার রাষ্ট্রিক, অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক বিধিব্যবস্থা। প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কোন দেশের রাষ্ট্রিক, অর্থ নৈতিক অথবা সামাজিক বিধি-বিধানের উপর কোন ক্ষমতা নাই। বিভিন্ন রাষ্ট্র বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদ পোষণ করিবেই। বিভিন্ন মতবাদ পোষণের ফলে, প্রত্যেক জাতির রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতি স্বতন্ত্র। তাহাদের স্ব স্ব শিল্প-বাণিজ্য রীতিনীতিও বিভিন্ন। সাধারণতঃ এই শিল্প-বাণিজ্য ব্যাপদেশে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। অথচ, শান্তিবৈঠক মাত্রই অর্থনৈতিক অপেক্ষা রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে অধিকতর মনোযোগী। স্বর্গত মনীষী ওয়েণ্ডেল উইলকী বর্ত্তমান জাতিসঙ্ঘের ব্যর্থতার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"মুখ্যতঃ ইঙ্গ-ফরাসী-মার্কিণ সমাধানরূপে পুরাতন ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদকে নূতন সৌখিন সংজ্ঞার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, ইহা সুদূর প্রাচ্যের অত্যাবশ্যক প্রয়োজনের প্রতি উপযুক্ত মনোযোগ প্রদান করে নাই, পক্ষান্তরে জগতের অর্থ-নৈতিক সমস্যাগুলির সমাধানের প্রতিও ইহা যথোপযুক্ত মনোযোগ প্রদান করে নাই। বিভিন্ন জাতির উৎপন্ন দ্রব্য যেমন সহজেই বিভিন্ন জাতির প্রাপনীয় হইবে, তদ্রূপ প্রত্যেক জাতির উৎপন্ন দ্রব্য অন্যান্য জাতির নিকট অনায়াসে পৌঁছাইবার ব্যবস্থাও প্রয়োজন।" অর্থাৎ, রাজনৈতিক সমস্যার সহিত অর্থ-নৈতিক সমস্যারও সমাধান প্রয়োজন। নতুবা সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষী অর্থনীতিবিদ্ লর্ড কীনেস্ তাঁহার শান্তির অর্থনৈতিক ফলাফল (Economic Consequence of the Peace) নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন,—"তাহাদের চক্ষুর সম্মুখে যে য়ুরোপ অন্নাভাবে ক্লিষ্ট এবং বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছিল, তাহার মুখ্য অর্থনৈতিক সমস্যা তদ্বিষয়ে সর্ব্বপ্রধান জাতি চতুষ্টয়ের মনোযোগ উদ্রিক্ত করিতে পারা যায় নাই।···য়ুরোপের ভবিষ্যৎ জীবন তাহাদের চিন্তার বিষয় ছিল না; ইহার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপায় সম্বন্ধে তাহাদের কোন ঔৎসুক্যই ছিল না। তাহাদের ভাল ও মন্দ উভয়বিধ চিন্তার বিষয় ছিল স্ব স্ব সীমান্ত এবং জাতীয়তা, বিভিন্ন জাতির শক্তির ভারসাম্য, সাম্রাজ্যবৃদ্ধি এবং শক্তিমান ও বিপত্তিকারী শত্রুকে ক্ষীণবল করিবার প্রচেষ্টা, প্রতিহিংসা চরিতার্থতা, এবং জেতৃবর্গের দুর্ব্বহ আর্থিক দায়িত্বকে বিজিত জাতির স্কন্ধে অর্পণ করিবার প্রচেষ্টা।" সৌভাগ্যের বিষয় যে, বর্ত্তমান যুদ্ধের ভূতপূর্ব্ব অধিনায়ক রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট যথা সময়ে এই তিনটি বিষয়ে অবহিত হইয়া সর্ব্ব প্রথমে হেলসিংফর্সে নিখিল জগতের যুদ্ধোত্তর খাদ্যাভাব সমস্যার সমাধানের নিমিত্ত একটি আন্তর্জ্জাতিক খাদ্যবৈঠক বসাইয়া ছিলেন, পরে সর্ব্বজাতির যুদ্ধোত্তর শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতির সুশৃঙ্খল পরিচালনের জন্য অর্থ সমস্যা সমাধান হেতু ব্রেণ্টন্ উডসে একটি আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক বৈঠকের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং বিভিন্ন যুদ্ধোত্তর প্রয়োজন সাধনার্থ আরও কয়েকটি আন্তর্জ্জাতিক বৈঠকের অন্তে, স্যান্‌ফ্রান্সিস্কো নগরে যুদ্ধান্তে জগতের সর্ব্বত্র স্থায়ী শান্তি সংস্থাপন উদ্দেশ্যে একটি সম্মিলিত জাতি সমুচ্চয়ের যুদ্ধোত্তর নিরাপত্তা বৈঠক আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহার দূরদৃষ্টি যথার্থই প্রশংসনীয়। গভীর পরিতাপের বিষয় আজ তিনি ইহজগতে নাই।

বিভিন্ন জাতির মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্কের উৎকর্ষাপকর্ষই শান্তির সম্ভাবনাকে দৃঢ় অথবা শিথিল করে। জগতে স্থায়ী শান্তি সংস্থাপনার্থ জগতের জাতি সমূহের মধ্যে যেমন রাজনৈতিক ও সামরিক সাম্য-মৈত্রীর প্রয়োজন, তদ্রূপ অর্থনৈতিক সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার সুশৃঙ্খলা সাধনের প্রয়োজন। সর্ব্বদেশের সর্ব্বত্র সর্ব্বলোকের আহার্য্য-ব্যবহার্য্যের সুব্যবস্থা ব্যতীত জগতে স্থায়ী শান্তি অসম্ভব। ধরাবক্ষ হইতে অভাব ও দারিদ্র্য চিরতরে বিদূরিত করিতে না পারিলে স্থায়ী শান্তি মরুভূমির মরীচিকার ন্যায় বিভ্রমপ্রদ। স্বর্গত সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের তাহাই অভিমত ছিল। কিন্তু তাহা কি সম্ভব? বৈষম্য লইয়াই জীবন ও জগৎ। প্রকৃতি বৈষম্যের আকর। বৈষম্যের মধ্যে ঐক্য কি ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার নহে? বিভিন্ন রীতি-নীতি, বিভিন্ন মতি-গতি কি যাদুকরের যাদুকদণ্ডের স্পর্শে তিরোহিত হইবে? মানুষ কি তাহার প্রকৃতিগত কাম-ক্রোধ লোভ-মোহ, মদ-মাৎসর্য্য পরিহার করিতে পারে? শক্তিমানের রাজ্যলিপ্সা কি সাম্যবাদে তিরোহিত হইবে? হিংসাই যে জীবের জীবন-বেদ। সুতরাং বিশ্বশান্তির প্রচেষ্টা চিরদিনই ব্যর্থ হইবে। ইতিহাস তাহার কালজয়ী সাক্ষী। মানুষের কর্ম্মে অধিকার-ফলে নহে। সুতরাং পুনঃ পুনঃ বিফলতা সত্ত্বেও শান্তিপ্রচেষ্টা অবশ্য কর্ত্তব্য মানবীয় ধর্ম্ম।

জাপানের কবলে গোয়েন্দা*

শ্রীপ্রফুল্লকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এন্,কে,আই (সুইডেন)

জাপানীরা যদি জান্‌ত, আমি এই বইটা লিখি—তা হ'লে বোধ হয় তারা আমায় তৎক্ষণাৎ গুলী করে মারত। তাই আমি আপনাদের অনুরোধ করছি এ বিষয় ঘুণাক্ষরে কেউ না জানতে পারে যে পর্যন্ত না আমি নির্ব্বিঘ্নে আমার পরিবারবর্গকে নিয়ে শাঙ্‌হাই (Shanghai) থেকে বার হ'তে পারি।—এ কথাগুলো কিছুদিন আগে উপরোক্ত রোমাঞ্চকর গোয়েন্দাক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধীয় বইয়ের লেখক আম্‌লেত্তো ভেস্পা (Amleto Vespa), ভূতপূর্ব্ব ইতালীয় গোয়েন্দা ও সংবাদপত্র-পরিচালক বলেন, যখন তিনি তাঁর এই বইয়ের হস্তলিপি ইংরাজি ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান্ কাগজের সংবাদদাতা এইচ, জে, টিম্পারলী (H. J. Timperley)কে পড়বার জন্ত দেন।

শাঙ্‌হাই (Shanghai)তে টিম্পারলীর সহিত ভেস্পার দেখা হয় ১৯৩২ সালের শেষের দিকে। শুধু বইটার হস্তলিপি পড়ে তিনি ক্ষান্ত হন্ নি; তিনি এটা প'ড়বার পর লেখকের সঙ্গে তাঁর এক বিশ্বাসী বন্ধুর—যিনি স্থানীয় ব্রিটিশ লিগেশনের (British Legation) কর্ম্মচারী ছিলেন ও জাপানীদের গোয়েন্দা বিভাগকে ভাল করে জানতেন, একটা সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করান, যাতে লেখকের বিবরণটা সত্য কি অতিরঞ্জিত ঠিক করা যায়। এই লিগেশনের কর্ম্মচারী ভেস্পাকে জেরা করে বুঝেন যে, লেখক মনগড়া কিছু লেখেন নি; সত্য ঘটনারই উল্লেখ করেছেন—যদিও তাঁর হস্তলিপি পড়লে হয় ত মনে হবে এতে অনেক কিছু অতিরঞ্জিত আছে। বইটা এখন এক ইংরাজ প্রকাশক ছাপিয়ে বার করেছেন ও এটার জাপানীদের সম্পূর্ণ নীতিবিরোধী ক্রিয়াকলাপ পড়লে সত্যই শরীরে রোমাঞ্চ হয়।

১৯২০ সালের কোনও সময় যখন লেখকের চীনে অনেক বছর থাকা হয়ে গেছে, মাঞ্চুরিয়ার (Manchuria) সামরিক নায়ক সেনাধ্যক্ষ চাঙ্ সো লিন্ (Chang Tso-lin) লেখককে গোয়েন্দা হিসেবে তাঁর অধীনে কাজ করবার জন্ত প্রস্তাব করেন। এ সময় মাঞ্চুরিয়া বৃহৎ চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত উত্তর-পূর্ব্বাংশ ছিল ও তাই জাপানীদের চক্ষুঃশূল হয়ে ছিল। স্বর্ণ, লৌহ ও কয়লা প্রভৃতি খনিজ পদার্থ-বহুল এই প্রদেশকে গ্রাস করবার একটা সুযোগ জাপানীরা এ সময় প্রতীক্ষা করছিল। এ সময় এ প্রদেশের রাজধানী ছিল মুকডেন্ (Mukden) ও এখানেই মাঞ্চুরিয়ার নেতা চাঙ্‌সোলিন্ অবস্থান করছিলেন। ভেস্পা গোয়েন্দা হিসেবে কাজ করতে রাজি হলেন বটে, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষকে এ বিষয় কাউকে জানাতে মানা করলেন, কারণ তিনি এখনও ইতালীয় প্রজা ও ভাণ করে ব'ললেন যে, অনেক সংবাদপত্রের সাংবাদিক হয়ে তাঁকে জীবিকা নির্ব্বাহ করতে হয়।

তাই আমাকে বাধ্য হয়ে চিনেদের পোষাক পরে ও চোখে রঙীন চশমা না এঁটে সেনাধ্যক্ষের সঙ্গে মুকডেনে তাঁর আপিসে রাত্রি বেলায় পা টিপে টিপে গিয়ে দেখা ক'রতে হত ও আমাকে নাম বদলে বদলে কাজ ক'রতে হ'ত ও সর্ব্বদাই কর্ত্তৃপক্ষের কাছ থেকে ছাড়পত্র নিয়ে বার হতে হ'ত। শুধু যে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক খবর যোগাড় করাটাই আমার কাজ ছিল তা মোটেই নয়; আমাকে এ ছাড়া অন্যান্য কাজও করতে হত, যেমন অন্যান্য শক্তিদের প্রতিনিধিদের পিছু নেওয়া, দস্যুদলের ও বিনা শুল্কে গুপ্তভাবে অস্ত্রাদি আমদানি-রপ্তানীকারীদের ও শ্বেতকায় দাস-ব্যবসায়ীদের (slave-dealers) খুঁজে বার করতে হ'ত। এই শ্বেতকায় দাস-ব্যবসায়ীরা হাজার হাজার অল্পবয়স্কা রুশ রমণীদের—যারা রুশ বিপ্লবের সময় দেশ ছেড়ে পালায়—অন্যত্র রপ্তানী ক'রত। আমার মনে হ'ত আমি একটা ভাল—যদিও বিপদসঙ্কুল—কাজে লেগেছি ও যখনই আমি এই দুর্ব্বৃত্তদের—দাস-ব্যবসায়ী (slave-dealers) ও গুপ্তভাবে অস্ত্রাদি আমদানি-রপ্তানীকারীদের) প্রচেষ্টায় বাধা দিতে সমর্থ হতাম, তখনই আমি অনুভব করতাম আমি সমাজের হয়ে একটা কিছু ভাল করতে পেরেছি। মাঞ্চুরিয় কর্ত্তৃপক্ষের অধীনে এই কাজে এক বছর থাকতে না থাকতেই ভেস্পা কম করে ৫ হাজার ইতালীয় বন্দুক, বহু-সংখ্যক পিস্তল, ১,৫০০ কিলোগ্রাম (Kilogram) আপিং ও ২০০ কিলোগ্রাম মরফিন্ ও হিরোয়িন্ (Heroin) বাজেয়াপ্ত করেন। ইতালীয় কর্ত্তৃপক্ষ—যারা গুপ্তভাবে অস্ত্রাদি আমদানির কাজে সহায়তা করত—ভেস্পাকে সন্দেহের চোখে দেখতে আরম্ভ করল ও যেহেতু তিনি তখনও ইতালীয় প্রজা ছিলেন, তাই স্থানীয় ইতালীয় কন্‌সাল্ জেনারেল (Consul General) তাকে ডেকে পাঠান।

—আপনি ঠিক করে বলুন ত আপনার প্রকৃত কাজটা কি? ভেস্পাকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

—ও, আমি ত শুধু একটু এদিক্-সেদিক্ ঘুরে বেড়াই ও সংবাদপত্র-পরিচালকদের হয়ে পাঁচ রকম খবর যোগাড় করে দি—ভেস্পা উত্তর দিলেন।

—দেখুন, বাজে কথা বলবেন না। আপনার কাজটা যদি বন্ধ না করেন ত আপনাকে ধরে দেশে পাঠিয়ে দেব।

ভেস্পা (Vespa) এই সতর্কবাণীর প্রত্যুত্তরে ৪,০০০ ইতালীয় বন্দুক পুনরায় বাজেয়াপ্ত ক'রলেন ও তাই একদিন একজন ইতালীয় পুলিশ কর্ম্মচারী অস্ত্রসজ্জিত রক্ষকের সাহায্যে তাঁকে ধরে একটা ইতালীয় যুদ্ধজাহাজে বন্দী করে চাপিয়ে দিল। জাহাজের পোতাধ্যক্ষ কিন্তু ন্যায়পরায়ণ লোক ছিলেন, তাই তিনি ইতালীয় কন্‌সাল্ (Consul)কে বলে পাঠালেন যে তিনি তাঁর জাহাজে বন্দী হিসেবে কোনও লোককে রাখতে প্রস্তুত ন'ন্—যতক্ষণ না তার প্রকৃত দোষটা প্রমাণিত হয়, সুতরাং তিনি যদি না বুঝেন যে, এ লোকটা ইতালীয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনও কাজ করেছে—তবে তাকে ছেড়ে দিবেন। প্রকৃতই এর ফলে ভেস্পা মুক্তিলাভ ক'রলেন, কিন্তু দু'দিন যেতে না যেতেই পুনরায় তাঁকে কন্‌সাল্ জেনারেলের আদেশ মত এই

---

* হুকুম মান, নচেৎ গুলী খেয়ে মর! সুইডীশ্ (Swedish) কাগজ "ফক্‌টে্ ই বিল্ড" (Folket i Bild) হইতে বাঙ্গলায় অনুবাদিত।

অভিযোগে ধরা হল যে, তিনি যুদ্ধ-জাহাজ থেকে পালিয়ে গেছেন। মাঞ্চুরির কর্তৃপক্ষ কিন্তু এবার এ ব্যাপারে মধ্যস্থতা না করে পা'রলেন না ও তাই ভেস্পাকে কনসাল্ জেনেরলের সঙ্গে আদালতে বিচারের জন্য খাড়া হ'তে হ'ল। মাঞ্চুরির কর্তৃপক্ষ ভেস্পাকে বিতাড়িত ক'রবার আগে ইতালীয় কর্তৃপক্ষকে তাঁর বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ ক'রতে ব'ললেন। এতে ইতালীয় কর্তৃপক্ষ সম্মত না হওয়ায় ও কনসাল্ এ ঘটনাটা ভুলবশতঃ সৃষ্ট হয়েছে বলায় ভেস্পা পুনরায় মুক্তিলাভ ক'রলেন। কয়েক দিন পরে ইতালীয় সচিব তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে ব'ললেন যে, ইতালীয় কর্তৃপক্ষ তাঁর মাঞ্চুরিয়াতে উপস্থিতি মোটেই পছন্দ করেন না, তবে তিনি যদি অনতিবিলম্বে স্থানত্যাগ ক'রতে প্রস্তুত হন ত ইতালীয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে ৫ হাজার ডলার (dollar) ক্ষতিপুরণ হিসেবে দিতে প্রস্তুত। ভেস্পা কিন্তু এ প্রস্তাবে রাজি হ'লেন না।

একদিন ভেস্পা নিজের কাজ শেষ করে যখন বাড়ী ফি'রছিলেন—খোলা রাস্তাতেই তাঁকে কেউ ছুরিকা দিয়ে আঘাত করে। আসামী পালায়, তবে চীনা কর্তৃপক্ষ পরে জানতে পারেন যে, একজন ভূতপূর্ব্ব ইতালীয় নাবিক এ কাজটা করে। এ ছাড়া আরও দু'বার তাঁকে হত্যা ক'রবার চেষ্টা ইতালীয় কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে করা হয় ও তাই চাঙ্গ শো লিন্ তাঁকে মুকডেন থেকে হারবিন (Harbin) পাঠাবার ব্যবস্থা করালেন ও তাঁকে মাঞ্চুরির অধিবাসী হ'বার অধিকার দিলেন। হারবিনেই ভেস্পা শ্বেতকায় দাস-ব্যবসা (slave-trade) নিরোধের কাযে হস্তক্ষেপ করেন ও এতে প্রাণপণ করে তাঁকে এই দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রতে হয়েছিল। সুদূর প্রাচ্যের শ্বেতকায় দাস-ব্যবসায়ীরা দৃঢ়ভাবে দলবদ্ধ হয়ে কাজ ক'রত ও বহুসংখ্যক রুশ যুবতী—যারা রুশ বিপ্লবের সময় দেশ ছেড়ে পালায়—মাঞ্চুরিয়াতে এসে বসবাস করত। তাদের উপর দাসব্যবসায়ীরা শকুনির মত ছোঁ মেরে লাফিয়ে প'ড়ল।

—আমার জীবনে গোয়েন্দা ও পুলিশ কর্মচারী হয়ে কাজ ক'রতে গিয়ে আমার যত রকম প্রতিদ্বন্দ্বীদের সম্মুখীন হ'তে হয়েছে; তাদের মধ্যে সব চেয়ে শক্তিশালী ও ধনী হচ্ছে এই দাস-ব্যবসায়ীরা। এদের সর্দ্দার আজ পর্য্যন্ত ঠিক সে রকমই আছে—যা সে ১০ বছর আগে ছিল—সে হচ্ছে একজন শ্বেত রুশ (White Russian), যে কম করে ২৩ বার গ্রেপ্তার হয় কিন্তু প্রত্যেক বারই যা হোক্ করে মুক্তিলাভ করে, যদিও হয়ত এই মুক্তিলাভের জন্য ২০ থেকে ২৫,০০০ ডলার পুলিশের কাছে জমা রাখতে হয়েছিল। আমি তাকে কখনও অবশ্য দেখি নি, তবে যারাই সুদূর প্রাচ্যে দাসব্যবসা নিয়ে আছে তারা সকলেই একে জানে।

চাঙ্গ-শো-লিনের অধীনে ভেস্পার যখন কয়েক বছর কাজ করা হয়েছে, তখন জাপানীরা মাঞ্চুরিয়ার দিকে তাদের সর্ব্বগ্রাসী দাড়া বাড়াতে আরম্ভ করল। ১৯২৬ সালে তারা কায়দা করে চাঙ্গ-শো-লিনকে মুকডেন্ ছাড়তে বাধ্য ক'রল, যাতে তারা নিশ্চিন্ত হয়ে নিজেদের "মুলভাডস আরবেটে" (Mullvadsarbete—ছুঁচোর মত গুপ্তভাবে ভিতর থেকে গর্ত্ত খননের কাজ) ক'রতে পারে। ১৯২৮ সালে মে মাসের শেষের দিকে যখন চাঙ্গ-শো-লিনের মুকডেনে অনুপস্থিতি প্রায় দু'বছর হয়ে গেছে ও যখন তিনি সেখানে তাঁর বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তনের ইচ্ছা ক'রলেন তখন জাপানীরা তাঁকে সাবধান করে দিয়ে ব'লল, তারা তাঁর মুকডেনে উপস্থিতি আর চায় না। জাপানীদের এ সতর্কবাণীতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ না করে তিনি যখন এ বিষয়টা একজন জাপানী কর্ণেলকে (Colonel) বলেন, যিনি জাপানী সামরিক হেড-কোয়ার্টাসে নিযুক্ত ছিলেন, তখন তিনি এক গাল হেসে চাঙ্গকে ব'ললেন, এতে কোনও বিপদের আশঙ্কা নাই ও যদি চাঙ্গ ইচ্ছা করেন ত তিনি নিজে চাঙ্গএর ট্রেণে চড়ে তাঁকে মুকডেন পর্য্যন্ত পৌঁছে দেবেন। এটা হচ্ছে ৪ঠা জুনের ঘটনা, চাঙ্গের ট্রেণটা যখন একটা সেতুর কাছাকাছি এল, জাপানী কর্ণেল চাঙ্গকে ব'ললেন যদি তাঁর অনুমতি হয় ত তিনি একবার একটু নেমে গিয়ে তাঁর নিজের অসি ও টুপীটা অন্য গাড়ী থেকে নিয়ে আসেন। কার্ণেলের চাঙ্গের কুপে (Coupe) থেকে নামবার মাত্র কয়েক মিনিট পরেই একটা জোর বিস্ফোরণের ফলে চাঙ্গের গাড়ীটা টুক্‌রা টুক্‌রা হয়ে উড়ে গেল এবং তিনি ও তাঁর চীনা সহকর্ম্মীরা যাঁরা সকলেই এক গাড়ীতেই অবস্থান করছিলেন প্রাণ হারালেন। জাপানী কর্ণেল ঠিক এ সময়টা ট্রেণের একেবারে শেষের একটা গাড়ীতে নির্ব্বিঘ্নে বসে। এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ড শুনে ভেস্পার জীবনের ধারা গেল একেবারে বদলে। ১৯৩১ সালে ১৮ই সেপ্টেম্বর রাত্রে জাপানীরা মুকডেন অধিকার ক'রল ও স্থানীয় চীনা দুর্গরক্ষণার্থ সৈন্যদলকে নৃশংস ভাবে হত্যা ক'রল। প্রায় সমস্ত মাঞ্চুরিয়াটাই এখন জাপানের কবলে এল। বেসামরিক চীনা কর্ম্মচারী যাঁরা মাঞ্চুরিয়া গভর্ণমেণ্টের অধীনে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁদের জাপানীরা না হটিয়ে নিজ নিজ পদে থাকতে দিল, কারণ তারা ইয়ুরোপ ও আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনকে (League of Nations) দেখাতে চাইলে যে, মাঞ্চুরিয়াতে যা সব ঘটনা আজ পর্য্যন্ত হয়েছে—এগুলো সবই আভ্যন্তরীণ গোলযোগের ফলে—যাতে জাপানীদের কোনও হাত ছিল না। ১৯৩২ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে জাপানীরা, হারবিন (Harbin) সহরটাকেও নিজেদের শাসনাধীনে আনল। এ সহরটা রুশরা তৈরী করে বলে এটা দেখতে ইয়ুরোপীয় সহরের মত ও এতে তখন ১ লক্ষ রুশ ও ২ লক্ষ চীনা অধিবাসী ছিল। এ সময় হারবিন একটা বেশ বড় রকমের রেলপথকেন্দ্র (Railway Centre) ছিল। ৫ই ফেব্রুয়ারি জাপানী যুদ্ধবিমান সহরের উপর খুব নীচুতে নেমে এসে "মেসীন-গান" (machine-gun) চালিয়ে অল্পসংখ্যক চীনা দুর্গরক্ষণকারী সৈন্যদলকে মেরে নিশ্চিহ্ন করে দিল। সহরে এ সময় জনসাধারণের তৎপরতা বলে কিছু রইল না—ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেল ও লক্ষাধিক পলাতক মাঞ্চুরিয়ার অন্যান্য সহরে এসে জাপানীদের নির্ম্মমতার রোমাঞ্চকর কাহিনী বলতে লাগল।

—প্রথমে আমি এ সব শুনে বিশ্বাস করি নি, কারণ আমার মনে হয়েছিল এসব একটু অতিরঞ্জিত, কিন্তু কিছুদিন অতিবাহিত হবার আগেই আমি দুঃখের বিষয় বুঝিতে পারলাম, এ সব ঘটনা সম্পূর্ণ সত্য। আমি এখন মনে ক'রলাম জাপানীরা এবার

আমায় তাদের অধীনে কাজ করতে তোষামোদি প্রস্তাব ক'রবে। কারণ, আমি জানতাম—তারা আমার বিষয় অনেক কিছু জানতে পেরে যায়—যখন আমি চাঙ্গ-শো-লিনের অধীনে কাজ করি ও তাই যখনই আমার জাপানীদের সঙ্গে দেখা হ'ত, তারা আমার প্রতি খুব সম্মান প্রদর্শন ক'রত। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে একজন জাপানী লেফ্‌টেনাণ্ট (Lieutenant) আমার বাড়ীতে এসে আমায় জানালেন যে, কর্ণেল দইহারা (Colonel Doihara) আমার সঙ্গে দেখা করতে চান।

—কর্ণেলকে গিয়ে বলুন, আমি এখনই প্রাতঃকালীন জলযোগ শেষ করে দেখা করতে যাচ্চি—আমি উত্তর দিলাম।—মাপ করবেন, কর্ণেল এই মুহূর্ত্তেই আপনার সঙ্গে দেখা ক'রতে চান ও তাই আমি একটা মটর গাড়ী নিয়ে উপস্থিত হয়েছি—লেফটেনাণ্ট বলল ও আমাকে সম্মান প্রদর্শন করবার উদ্দেশ্যে মাথাটা নীচু ক'রল।

কর্ণেল দইহারা সোজাসুজি আমায় ব'লল: মিষ্টার ভেস্পা, আমরা পরস্পরকে বোধ হয় ভাল করেই জানি! আমাদের সুনামের দ্বারা নয় কি? অনেকবারই আমার ইচ্ছে হয়েছে আপনি জাপানীদের হয়ে কাজ করেন। আপনাকে আমাদের বিশেষ দরকার আছে, যেহেতু আপনি মাঞ্চুরিয়া সম্বন্ধে অনেক কিছু জানেন। এখন যুদ্ধের সময় ও এখন থেকেই আপনি আমাদের হয়ে কাজ করুন; আমি জানি, আপনি ইচ্ছে ক'রলে বেশ ভাল ভাবেই আমাদের হয়ে কাজ করতে পারবেন! যদি আপনি রাজি না হন ত গুলী খেয়ে মরা হবে আপনার শাস্তি। আপনি অবশ্য মনে করতে পারেন কিছুদিন, আমাদের হয়ে কাজ করে পৃষ্ঠ, প্রদর্শন করবেন, কিন্তু মনে রাখবেন, আপনার পরিবারবর্গ এখানেই আছে ও আপনি নিশ্চয়ই চান না যে আপনার পত্নী বা মেয়ে বা ছেলেকে আমরা কষ্ট দিয়ে হত্যা করি।···

ভেস্পা এতে অসম্মতি প্রকাশ করলেন। তিনি এতদিন চীনাদের হয়ে কাজ করায় যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করেছেন ও তাই এখন তাঁর ইচ্ছে যে এ সব কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করে শান্তিতে সাধারণ নগরবাসীর মত জীবন যাপন করেন।

দইহারা রাগে ও ঘৃণায় নাক শিট্‌কে বললেন: আপনি অনন্যোপায়! কাল সকালেই ১১টার সময় আপনার সঙ্গে মাঞ্চুরিয়ার জাপানী সংবাদ-সরবরাহ বিভাগের কর্ত্তার পরিচয় করে দেবে। আমি নিশ্চয় জানি, আপনি তাঁর সঙ্গে ভাল করে কাজ করতে পারবেন ও ভবিষ্যতে যখন আপনি জাপানীদের সঙ্গে আস্তে আস্তে মিলে মিশে তাদের সঠিক বুঝতে পারবেন, তখন আপনি দেখবেন—আমরা চীনাদের (Chinese) চেয়ে সহস্রগুণ ভাল ও জগতের অন্যান্য জাতির এমন কি ইয়োরোপের ও আমেরিকার চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ। কোনও ইয়োরোপীয়ের জাপানীদের সঙ্গে কাজ করতে পাওয়ায় গৌরবান্বিত বোধ করা উচিত কিন্তু সাবধান আপনি কি করেন না করেন সেটা বেশ মনে করে রাখবেন ও আপনার প্রিয় বন্ধু সোয়াইন্‌হার্টের (Swine- heart) কি হয়েছিল তা ভু'লবেন না। তাঁর কথা আপনার মনে আছে ত, মিষ্টার ভেস্পা?—

সোয়াইন্‌হার্ট ছিলেন একজন আমেরিকান্। তিনি মাঞ্চুরিয়ায় চীনা কর্ত্তৃপক্ষদের অধীনে কাজ ক'রতেন। জাপানীরা তাঁকে হত্যা করে সমুদ্রের জলে ফেলে দেয়।

—তার পরের দিন সকাল বেলায় ১১টার সময় কর্ণেল দইহারার বাড়ীতে উপস্থিত হলুম। তাঁর দেখা পাবা মাত্রেই তিনি আমায় তাঁর সঙ্গে যেতে বললেন। আমরা একটা খোলা প্রাঙ্গণের ভিতর দিয়ে গিয়ে একটা রাজপ্রাসাদের মত বড় ও সুন্দর অট্টালিকায় এসে পৌঁছলাম। এটা একজন খুব ধনী পোলের (Pole) বাড়ী ছিল ও জাপানীরা এসে যখন হারবিন (Harbin) দখল করে, এ বাড়ীটা তাঁর কাছ থেকে তারা কেড়ে নেয়। প্রাঙ্গণের বাম দিকে একটা দরজার মধ্য দিয়ে আমরা ভিতরে প্রবেশ করলাম। একজন জাপানী পরিচারক এসে আমাদের একটা বড় ঘরে নিয়ে গেল। এখানে একজন লোক একটা টেবিলের পিছনে বসে ছিলেন। তাঁর বয়স প্রায় ৪৫ বছর হবে ও তিনি ইংরাজদের মত পোষাক পরেছিলেন। তিনি দেখতে মোটেই খারাপ ছিলেন না ও তাঁর চোখ দুটো দেখে মনে হল তা'র কি প্রখর বুদ্ধি। যতদিন আমি এঁর অধীনে কাজ করি, আমি কখনও জানতে পারি নি—ইনি কে বা এঁর প্রকৃত নাম কি বা ইনি কোথা থেকে এসেছেন। ইনি বড় একটা কখনও বাহিরে বার হতেন না, তবে যদি কখনও নিজের লিখবার টেবিলটা ছেড়ে কোথাও যেতেন ত শুধু রাত্রিকালে নিজের মটরে করে বা বিমানে—যেটাকে তাঁর জন্য সর্ব্বদাই উড়তে প্রস্তুত করে রাখা হত। একবার আমি যখন তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করি যে, ইহুদীরা ততটা খারাপ নয়—যতটা জাপানীরা প্রমাণ করবার চেষ্টা করে, তখন তিনি রেগে প্রায় উন্মত্ত হয়ে আমায় তৎক্ষণাৎ সেই জায়গাতেই গুলী করে মারতে গিয়েছিলেন; তবে তাঁর সঙ্গে যখন আমার এই প্রথম দেখাটা হয়, তিনি আমার প্রতি ভদ্র ইংরাজের মত ভাল আচরণ করেন। দইহারা তাঁকে জাপানীতে কি বললেন ও তারপর তিনি আমার দিকে চেয়ে ইংরাজিতে বললেন—মিষ্টার ভেস্পা, ইনি এখন থেকে আপনার নূতন কর্ত্তা হলেন ও আপনি এখন থেকে আমার চেহারাটা ভুলবার চেষ্টা করুন, এমন কি এটাও ভুলবার চেষ্টা করুন যে, আপনি আমায় কখনও দেখেছিলেন। যদি ভবিষ্যতে আমাদের মধ্যে দেখা হয় ত আপনি এমন ভাব করবেন যেন আপনি আমায় পূর্ব্বে কখনও দেখেন নি। Good luck!—এই না বলে তিনি মাথাটা নীচু করে বেরিয়ে গেলেন। আমি এখন একা আমার নূতন কর্ত্তার কাছে রইলাম। তিনি আমায় বেশ ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে বললেন—আপনি দয়া করে বসুন! তাঁর ইংরাজি ভাষার উপর অসাধারণ দখল ছিল। কোনও জাপানীকে এর পূর্ব্বে এত ভাল ইংরাজি বলতে আমি শুনি নি। মনে হয়, তিনি বহুদিন ইয়ুরোপে ছিলেন।—

—দেখুন, মিষ্টার ভেস্পা, আপনি কে তা আমায় আপনাকে প্রশ্ন করবার কোনও দরকার নেই। আমার সামনেই এই লেখবার টেবিলটায় আপনি চীন সরকারের হয়ে কি করেছেন না করেছেন তার পুরা তালিকা আছে। ১৯১২ সাল থেকে যতদূ

আপনি প্রথম চীনে পদার্পণ করেন, আপনার ক্রিয়াকলাপ আমি ভাল করেই জানি। গুপ্ত জাপানী সংবাদ-সরবরাহ বিভাগ অনেক বছর ধরে আপনার গতিবিধি অনুসরণ করে এসেছে······ এখন আমি সাটে আমাদের কি অভিপ্রায় তা বলছি। আপনি ত জানেন, ইংরাজদের একটা এই ক্ষমতা যে, অন্য দেশকে নিজের অধীনে এনে সেই দেশকে দিয়েই নিজেদের আধিপত্য স্থাপনের খরচটা পুষিয়ে নেয়। একবার শুধু ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ আফ্রিকার কথাটা ভেবে দেখুন। ফ্রান্স (France) ও আমেরিকার বিষয়েও একথা বলা যেতে পারে। এবার আমাদের সময় হয়ে এসেছে। আমরা জাপানীরা অত্যন্ত গরীব; আমাদের টাকার ও মালমশলার দরকার। তাই মাঞ্চুরিয়াকে দিয়ে আমাদের বৃহৎ চীন অভিযানের সোপান রচনার খরচটা পুষিয়ে নিতে চাই। আমাদের কিন্তু খুব সতর্ক হয়ে অগ্রসর হ'তে হবে। জগৎকে দেখাতে হবে—মাঞ্চুরিয়ার লোকেরাই বিপ্লব সৃষ্টি করেছে ও জাপানীদের পরামর্শদাতা হিসেবে সাহায্যে আসতে নিজেরাই অনুরোধ করেছে। এখন আমাদের কাজটা হচ্ছে এই দেশটাকে যতটা সম্ভব শোষণ করা; প্রথমে তাই ব্যবসাবাণিজ্যটা পুরোপুরি আমাদের নিজেদের হাতে আনতে হবে, দ্বিতীয়তঃ সমস্ত মাঞ্চুরিয়াকে "নারকটিক্" (Narcotic নেশার জিনিষ) সেবনের অভ্যাস করিয়ে নষ্ট করতে হবে; এ সব ছাড়া আমাদের কাজে যাতে ভাল রকম সাফল্য লাভ হয়, তাই সর্ব্বদাই মানুষহরণ (Kidnapping) করার কাজে লাগতে হবে ও রুশ ও চীনা ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে মিছামিছি নানারকম অভিযোগ এনে তাদের সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে দেশ থেকে একেবারে বার করে দিতে হবে; আর এই সঙ্গে জাপানী বেশ্যা আমদানী করে এখানে নিয়ে আসতে হবে। একমাত্র স্বর্গীয় জাতি এ জগতে হচ্ছে জাপানীরা। আমাদের আদৌ ইচ্ছে নয় যে, আমরা আমাদের সভ্যতা অন্যান্য জাতিকে গ্রহণ করতে বাধ্য করি, কারণ তাদের নষ্ট করাটাই যে আমাদের উদ্দেশ্য। কোনও জিনিষ আমাদের মত অহঙ্কারী জাতিকে পৃথিবীতে প্রভুত্ব বিস্তার করতে বাধা দিতে পারবে না।

মনে রাখবেন, একমাত্র আমি আপনাকে হুকুম করতে পারব। আপনার অধীনে যে সব কর্ম্মচারী থাকবেন তাঁদের বুঝতে দেওয়া হবে না যে, আপনি আমার হয়ে কাজ করছেন। এখন আপনি যেতে পারেন, কাল সকাল থেকে আমরা কাজে লাগব।

এই ভাবে ইতালীয় আমলেতো ভেস্পা জাপানী গোয়েন্দা বিভাগের বিশ্বাসী লোকেদের মধ্যে গণ্য হন্ ও তিনিই একমাত্র ইয়োরোপীয়—যিনি বহু বৎসর জাপানীদের হয়ে কাজ করেন ও তাই তাদের ক্রিয়াকলাপ ও মানসিক বৃত্তি কি রকম তা খুব ভাল করে জানতে পারেন। ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে জাপানীদের সঙ্গে সহযোগিতা করে সহস্র সহস্র বিপ্লব ও অন্যান্য খারাপ কাজ যথা—অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের হেতু প্রভৃতি হতে হয়েছিল। তাঁর "উরসেকুট্" (ওজর) হচ্ছে এই যে, তাঁর পরিবারবর্গকে বাঁচাবার জন্যই তাঁকে বাধ্য হয়ে জাপানীদের সহযোগিতা করতে হয়। অত্যন্ত ভালবাসায় তিনি তাদের ছেড়ে পালাতে পারেন নি। এখন তিনি এই রকম একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চকর বই লিখে নিজের মনটাকে কতকটা হালকা করতে পেরেছেন। কেউ যদি তাঁর বইটা পড়েন ত মনে হবে যেন একটা ভীষণ কষ্টকর স্বপ্ন বুঝি বা দেখলেন। যদি তাঁর বইয়ের অর্দ্ধেক বিবরণটাও সত্য হয় ত এটাকে "গ্যাস্‌ম্যাস্ক" (Gasmask) বা "ভাক্সিনের" (Vaccine) মত সভ্য জগতের লোকদের বিতরণ করা উচিত। জাপানীদের মানসিক প্রবৃত্তির যা বিবরণ তিনি দিয়েছেন, তা প'ড়লে আমাদের মনে ও প্রাণে একটা জোর ধাক্কা লাগে; যদিও এ ধরণের বিবরণ আমাদের কাছে কিছু নূতন নয়, যেহেতু এ রকম জিনিষ আমরা পূর্ব্বে প'ড়তে ও শু'নতে পেয়েছি। পূর্ব্বে আমি মনে ক'রতাম, জাপানীদের কতকগুলি বড় গুণও আছে; যেমন তারা খুব সাহসী ও ভদ্র; কিন্তু এখন তাদের মুখোস খুলে ভাল করে দেখে বুঝলাম—তারা ভেড়ার পোষাকে নেকড়েবাঘ বই আর কিছু নয়। তারা একেবারে নির্ম্মম ও নীতিবিরোধী কাজ ক'রতে কিছু মাত্র কুণ্ঠা বোধ করে না।

আমি আর কি করি? চীনা গরিলাদলের সঙ্গে যে ভিড়ি—যারা সর্ব্বদাই জাপানীদের বিরুদ্ধে লড়াই চালায়—তার উপায় ছিল না; কারণ, আমার পরিবারবর্গ···খালি একটা উপায় ছিল এই যে, বাহিরে দেখান কতই যেন তাদের হয়ে খুব কাজ ক'রছি, এদিকে ভিতরে ভিতরে একটা সুযোগের প্রতীক্ষা করা······কিন্তু তখন আমি যদি বুঝতাম ব্যাপারটা কি হবে, তা হ'লে বোধ হয় আমি সুযোগের প্রতীক্ষা নিয়ে থা'কতে পা'রতাম না। পুরা পাঁচটী বছর ধরে আমায় প্রায় প্রত্যেক দিনই রোমাঞ্চকর নৃশংসতা—যেমন নরহত্যা, মানুষের উপর পাশবিক অত্যাচার প্রভৃতি অন্যান্য ঘটনা—দে'খতে হয়েছে। আমার এটা সত্যসত্যই বড় কষ্টদায়ক বলে বোধ হ'ত যে, আমি, যে লোক পূর্ব্বে "নারকটিক্" (narcotio) ব্যবসার বিরুদ্ধে কাজ করি, সেই লোকই আজ জাপানীদের হয়ে এ কাজের সহায়তা ক'রতে বাধ্য হয়েছি।

পরের দিন নূতন কর্ত্তার সঙ্গে দেখা ক'রবার কথা ও কাজ আরম্ভ করা। খুব উত্তেজনা-পূর্ণ কাজই আমার ক'রতে হয়েছিল ও আমি অনেক কিছু দেখি যা আমি পূর্ব্বে কখনও বিশ্বাস ক'রতে পারি নি।—

জাতীয় মহাসমিতির ইতিহাস

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

বঙ্গভঙ্গ ও তৎপরবর্ত্তী ঘটনা

১৯০৫

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে স্বদেশী গ্রহণ এবং বঙ্গ ভঙ্গ হয়। সেই নব-জাগরণের সময়ে বাঙ্গলার জন-নায়ক সুরেন্দ্রনাথ ভিন্ন আর কেহই নহেন। বঙ্গভঙ্গের দিন (১৬ই অক্টোবর) স্থির হয় যে নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞাটি*, কলিকাতা, প্রতি সহর এবং যতদূর সম্ভব গ্রামে গ্রামে আগামী ১লা নবেম্বর হইতে সর্ব্বত্র পড়াইতে হইবে:

"যেহেতু বঙ্গবাসীর প্রতিবাদ সত্ত্বেও গভর্ণমেণ্ট বঙ্গবিভাগ করিয়াছেন, আমরা তাহার কুফল দূরীকরণার্থ সমগ্র জাতি সমষ্টিগত ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছি ও ঘোষণা করিতেছি যে জাতির ঐক্য বন্ধনের এবং প্রাদেশিক অখণ্ডতা রক্ষাকল্পে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। ভগবান আমাদের সহায় হউন।" স্বাক্ষর—এ, এম, বসু।

সুরেন্দ্রনাথই ছিলেন এই শপথ গ্রহণ করাইবার প্রধান পুরোহিত; কিন্তু ইহার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তাহার

তিলক

সহিত আর তাল রাখিয়া তিনি চলিতে পারিলেন না। সুতরাং নীতিগত মতভেদ ও দল সৃষ্টির সূত্রপাত এই সময় হইতেই আরম্ভ হইল। এই সময়কার বিস্তৃত ইতিহাস প্রদান না করিলে পাঠক তাৎকালীন অবস্থা বুঝিতে পারিবেন না।

৮ই আগষ্ট স্বদেশী গ্রহণ ও বিলাতী বর্জ্জনের তারিখ হইতে ১৬ অক্টোবর পর্য্যন্ত বাঙ্গলার নগরে, পল্লীতে, সহরে, গ্রামে প্রবল আন্দোলন চলিয়াছিল, ছাত্র শিক্ষক যুবক, বৃদ্ধ সকলেই পিকেটিং এ যোগদান করিত, আর বন্দেমাতরম্ সকলের মুখেই শ্রুত হইত। কিন্তু ইহা বিলাতী-প্রিয় ও খয়ের খাঁগণের ভাল লাগিলনা। তখন বিলাতী সাহেবগণকে ভোজ দেওয়া বড় লোকদের একটা কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত ছিল। বিলাতী আসবাব এবং সম্পর্কও তাঁহারা কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। সুতরাং এই আন্দোলন তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত বিরক্তিকর হইয়া উঠিল, সাহেবগণ রুষ্ট হইলেন, গভর্ণমেণ্টও আন্দোলন বন্ধ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

১০ই অক্টোবরই চীফ সেক্রেটারী মিঃ কার্লাইল স্বাক্ষরিত একটী সার্কুলার* প্রস্তুত হইল, কিন্তু প্রকাশ হয় ২২শে অক্টোবরের ষ্টেটসম্যান কাগজে। ইহার মর্ম্ম এই—

"সকলের জ্ঞাতার্থে—জানাইতেছি যে, ছাত্রগণকে যে ভাবে রাজনৈতিক ব্যাপারে নিয়োজিত করা হইতেছে, তাহাতে কোনরূপ শৃঙ্খলাই রক্ষিত হইতেছেনা, আর ইহাতে তাহাদেরও স্বার্থের বড়ই ক্ষতি হইতেছে। তাই বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ও শিক্ষকমণ্ডলী যদি তাহাদিগকে রাজনৈতিক ব্যাপারে যোগদান করিতে অথবা

---

*Whereas the Government has thought fit to effectuate the partition of Bengal inspite of the universal protest of the Bengali Nation, we hereby pledge and proclaim that we as a people shall do everything in our power to counteract the evil effects of the dismemberment of our province and to maintain the integrity of our race. So God help us. A.M. Bose

*Carlyle Circular runs as follows—

1. The use which has been recently made of school-boys and students for political purposes is absolutely subversive of discipline and injurious to the interests of the boys themselves It can not be tolerated in connection with educational institutions or countenanced by Government.

2. Unless school and college authorities and teachers prevent their political activities in connection with boycotting, picketting and other abuses associated with the so-called Swedeshi movement, stipends and privileges for competing scholarships will be withdrawn. Where they are unable they are to report to District Magistrate giving a list of boys who have disregarded their authority and stating the desciplinary action taken to punish them.

3. In case of disturbance it will be necessary to call on teachers and managers of the institutions concerned in keeping peace by enrolling them as special constables.

তথাকথিত স্বদেশী আন্দোলন সংসৃষ্ট বিদেশী বর্জ্জন ও বিদেশী ক্রয়বিক্রয় নিবারণ প্রভৃতি অপকার্য্য হইতে বিরত না করেন, তবে (১) বিদ্যালয় গভর্ণমেণ্টের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইবে। (২) তাহারা নিজেরা শাসন করিতে অপারগ হইলে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে রিপোর্ট করিতে হইবে। (৩) যদি তথাপি কোন গোলমাল বা হাঙ্গামা হয় তাহাদিগকে স্পেসল কনেষ্টবল নিযুক্ত করা হইবে। (৪) এই বিষয়ে জিলার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, তাঁহার অধীনস্থ থানার দারোগাগণকে নির্দ্দেশ দিবেন—তাঁহারা যেন ছাত্রদের অপকর্ম্ম সম্বন্ধে রিপোর্ট লিখিয়া জানান।"

এই সার্কুলারে ছাত্রদের বিরুদ্ধে শিক্ষকদের রিপোর্ট দেওয়ার কাজ নির্দ্ধারণ হইল, আর দারোগার রিপোর্ট সকলের উপরে বলবৎ হওয়ার কারণ হইল।

স্বদেশী আন্দোলনের বাক্‌রোধ করিবার জন্য এই প্রথম অস্ত্রের প্রয়োগ হইল। কিন্তু জাতি জাগিয়াছে। আর কোন বাধাই তাহার জয়যাত্রা প্রতিহত করিতে পারিলনা। এই সময়ে প্রধান প্রধান নেতারা সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ, ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতি কলিকাতায় ছিলেন না। ছাত্রগণ পরের দিনই ২৩শে অক্টোবর ৭ই কার্ত্তিক পান্তীর মাঠে (ফিল্ড অফ একাডেমি সংলগ্ন জমিতে, বর্ত্তমানে যেখানে বিদ্যাসাগর কলেজ হোষ্টেল), একটী বিরাট সভা করেন। পরোয়ানার কথা শুনিয়া ছাত্রগণ অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। সভাপতি হইলেন মিঃ এ. রসুল। আশুতোষ চৌধুরী (পরে হাই-কোর্টের জজ) প্রভৃতি বক্তৃতা দেন। সভাপতি মহাশয় বলেন—

"বিলাতে নয় বৎসর অধ্যয়নকালে ছাত্রদের সংসর্গে আসিয়া আমি জানি তাহারাও রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেয়। স্বদেশী আন্দোলনের মূলে কুঠারাঘাত জন্যই এই পরোয়ানার সৃষ্টি হইয়াছে। একমাত্র জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেই এই পরোয়ানার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করা যাইবে। মাহেন্দ্র সুযোগ উপস্থিত। আসুন আমরা সকলে সেই মহাকার্য্যে প্রবৃত্ত হই।"

এই সভায় মাদারীপুরের ছাত্রগণের উপরে বেত্রাঘাত আদেশের সংবাদ আসিলে আরও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ঘটনাটি এই : মিঃ ক্যাটেল নামক একজন পাটের সাহেব আশ্বিন মাসে (১৯শে সেপ্টেম্বর) রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন, সেই সময় একটী ছাত্র ছাতা মাথায় যাইতেছিল, সাহেবের রাগ হয়। বালকটিকে প্রহার করা হয়। আসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন তাহার জখম গুরুতর বলেন। ক্যাটেলের বিরুদ্ধে মামলা সদরে (ফরিদপুরে) স্থানান্তরিত হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট রায়ে বলেন, "বালকই ক্যাটেলকে উত্তেজিত করিয়াছে, তাই তাহাকে প্রহার করা হইয়াছে। সুতরাং বিচারে ক্যাটেল নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হয়।"

ইহার পরে ক্যাটেল অনন্তমোহন দাস প্রমুখ আরও কয়েকটি ছাত্র কর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়াছে বলিয়া নালিস করে। স্কুল সমূহের ইন্‌স্পেক্টর মিঃ ষ্টেপলটন তদন্ত করিতে আসেন। তিনি স্কুল সম্বন্ধে এই আদেশ দেন, যে-তিনজন ছাত্র হাঙ্গামায় নেতৃত্ব করিয়াছে, মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তাহাদিগের প্রত্যেককে ২৫ ঘা বেত মারিতে হইবে, কিম্বা তাহারা প্রত্যেকে দেড় শত

ফিরোজশা মেটা
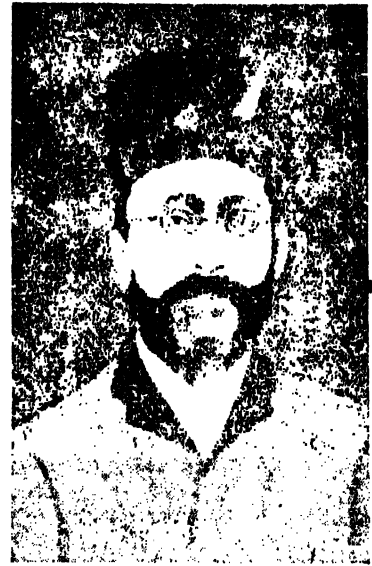
টাকা জরিমানা দিবে। নতুবা ঐ স্কুলে গভর্ণমেণ্ট সাহায্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। আরও হুকুম হয় যে, বেত মারিবেন স্কুলের হেড মাষ্টার। হেডমাষ্টার ছিলেন স্বর্গীয় ঔপন্যাসিক কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত মহাশয়। অবশ্য তিনি এই প্রকার ঘৃণ্য দণ্ড প্রদান করিতে রাজী হন নাই।

পান্তীর মাঠে ২৩শে অক্টোবরের ৭ই কার্ত্তিকের সভায় এই সংবাদটিতে গভীর উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং এই স্থানেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-সঙ্কল্প দৃঢ় হয়।

বঙ্গভঙ্গের সঙ্কল্প প্রকাশের পরেই নানাস্থানে ছাত্ররা যে উপবাস করিয়া নগ্নপদে বিদ্যালয়ে গমন করিয়াছিল, তাহাতেও ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের এবং অন্যান্য স্থানের ছাত্রদিগকেও জরিমানা করা হয় এবং ফলে তাহারা বিদ্যালয়ে যাইতে অস্বীকার করে। জাতীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তন ও জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই অনুভূত হইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে আরও কয়েকটি ঘটনায় দেশে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। একটি ঢাকায় বিপিন বাবুর বক্তৃতা, দ্বিতীয়টি লাট ফুলার সাহেবের বরিশালে আগমন। ৭ই নভেম্বর ঢাকায় বিপিন পাল যান, ফুলার সাহেবও আসাম হইতে প্রথমে সেইদিন সেখানে পদার্পণ করেন। নবপ্রতিষ্ঠিত প্রদেশের লাট সাহেবের মোট বহিবার জন্য কুলী পাওয়া গেল না, ষ্টেশনে আসিল কয়েকজন সরকারী বেতনভোগী ও খেতাবধারী লোক। আর বিপিন পালকে সমাদর করিয়া নিল ছয় হাজার দেশবাসী। তার মধ্যে ছাত্রের সংখ্যাই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। এ দৃশ্য লাটসাহেবের অসহনীয় হইল।

4. D. S. P. will please instruct his thana officers to report instances of unruly conduct on the part of boys of the institution.

অতঃপরে তিনি ১৫ই নভেম্বর বরিশালে পৌঁছেন। সেখানে স্বনামধন্য অশ্বিনীকুমার দত্ত জননায়ক। তাঁহার চরিত্রবল, ধর্ম্ম-প্রভাব ও সজ্ঞশক্তিগুণে বরিশাল জেলামধ্যে একখানি বিলাতী কাপড় পাওয়া যাইত না, বিলাতী লবণ, চিনি ও চুড়ী বিক্রয়ও বন্ধ হইল। কেহ বিলাতী মদ লইয়া বারাঙ্গণাগৃহে গেলেও সেখানে পর্য্যন্ত সম্মার্জ্জনী, অর্দ্ধচন্দ্র ও অকথ্য গালি ভিন্ন আর কিছুই জুটিত না। প্রতিযোগিতা করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট জ্যাক্ একখানি বিলাতী দোকানের বাজার বসাইলেন, কিন্তু সেখানে একজন মাত্র দোকান-দার হয়। আক্ষেপে সে গান ধরিত—

"এ বাজারে আমি একা দোকানদার ভাই।"

'রোটাসে' করিয়া লাট ফুলার বরিশাল গেলেন। অভ্যর্থনা হইল না। পরে তিনি খবর দিয়া অশ্বিনী বাবু, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান রজনীকান্ত দাশ, বার-লাইব্রেরীর সভাপতি দীনবন্ধু সেন, জমিদার কালীপ্রসন্ন সেন এবং উপেন্দ্রনাথ সেনকে ডাকাইয়া নিয়া একখানি বেত্র ঘুরাইতে ঘুরাইতে (যেন ছাত্রগণের প্রতি) বলিতে লাগিলেন, "সাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাঙ্গলা দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে ইহাতে আমি দুঃখিত—কিন্তু আমার প্রতি এরূপ দুর্ব্যবহার কেন? আমি ত কাহারও অনিষ্ট করি নাই। ঢাকার লোক আমার প্রতি যেরূপ অশিষ্ট ব্যবহার করিয়াছে, তাহা দেবতারও অসহ্য। এখানকার লোক বিদ্রোহী হইয়াছে। এখানকার সদাশয় কালেক্টারকে ঢিল মারিয়াছে। লোকের উত্তেজনা বৃদ্ধি করিবার জন্য আপনারা দায়ী। এখানে আমি সায়েস্তা খাঁর শাসন প্রবর্ত্তন করিব। ৩।৪ পুরুষ আপনারা সরকারী চাকুরী পাইবেন না। এই অবস্থা কিছুতেই চলিতে

অযোধ্যানাথ

পারে না, যেমন করিয়াই হউক ইহা আমাকে দমন করিতেই হইবে (I have to crush). এইজন্যই এখানে গুরখা সৈন্য আনা হইয়াছে। যদি এখানে কোনরূপ রক্তপাত হয়, আপনারা সেজন্য দায়ী (If there is bloodshed, you are responsible)। আপনাদের লোকেরাই তো বলিয়া বেড়াইতেছে হাড় দিয়া নুন পরিষ্কার হয়, মেলিন্সফুডে থুথু থাকে। বঙ্গভঙ্গ যাহা হইয়াছে সে ব্যবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হইতেই পারে না। পার্লামেণ্টে ২১৪টি বক্তৃতা হইবে মাত্র। আপনাদের ঘোষণাপত্রে মনে হয় ফরাসী বিদ্রোহের সময় যেরূপ আত্মরক্ষা কমিটি (Committee of Public Safety) ছিল, আপনারাও সেইরূপ করিয়াছেন।" তাঁহারা করিয়াছিলেন গ্রামে গ্রামে সালিসী সভা Arbitration Committee। ফুলার সাহেব বলেন, "What you call Arbitration Committee, I call Committee of Public Safety। লিখিয়াছেন—'দোকানদার ও ব্যবসাদারদের ঘরে যে মাল মজুত আছে তাহা ছাড়া তাহারা যেন আর বিদেশী মালের আমদানী করিতে না পারে সে জন্য সকলেরই দৃষ্টি রাখিতে হইবে।' অর্থাৎ আপনারা শান্তি ভঙ্গ করিবেন! You are playing with fire আপনারা আগুন লইয়া খেলিতেছেন। এই ঘোষণাপত্র আপনারা প্রত্যাহার করুন, নতুবা আমি শান্তিভঙ্গের জন্য আপনাদের জামিন মুচলেকা লইব, I shall bind you down for peace, আমার হুকুম শাসন সম্বন্ধীয়—হাইকোর্ট আপনাদের কোন উপায় করিতে পারিবে না, (High Court can't give redress)"।

ইহার পরে অশ্বিনীবাবু উঠিয়া বলেন, "জনসাধারণের সালিসি সভাসমিতিকে আত্মরক্ষা সমিতি বলেন কেন, আর আপনি যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়। কথিত ঘোষণাপত্রের স্থানান্তরে বলা হইয়াছে, 'ইহার জন্য তোমরা কেহ অবৈধ বল-প্রয়োগে উদ্যত হইও না।' শেষ না হইতেই লাট সাহেব বলিলেন, "থামুন, (Hold your tongue), আমি আপনাদের জবাব বা তর্ক শুনিতে এখানে আসি নাই, এ আদালত নহে।" অতঃপরে রজনীবাবুকে বলেন—

"এ প্রদেশের লেঃ গভর্ণরকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আপনি ঘাটে উপস্থিত ছিলেন না, এ আপনার ঔদ্ধত্য ও অসভ্যতার কাজ হইয়াছে জানেন?"

রজনীবাবু—তাহা ঠিক, কিন্তু আমি কি করিব! লেঃ গভর্ণরকে অভ্যর্থনা করিতে দেশের লোক প্রতিকূল।

লাট সাহেব—দেশের লোকের মতে কাজ করিয়া আপনি দৌর্ব্বল্যের পরিচয় দিয়াছেন। বেলা ৯টা পর্য্যন্ত আপনাদিগকে সময় দিতেছি। হাঁ, কি না, বলিবেন, এ ঘোষণাপত্র প্রত্যাহার করিবেন কিনা।

অগত্যা নেতারা সম্মত হইলেন। সম্মত না হইলে বরিশালে সেই সময়ে হয়তো রক্তগঙ্গা প্রবাহিত হইত। লাট সাহেব হঠাৎ দাঁড়াইলেন। অশ্বিনীবাবু কাগজপত্র গুছাইতেছিলেন। উঠিতে একটু দেরী হয়। লাট সাহেব বলেন, "দাঁড়ান, এটাও আপনার অশিষ্ট ব্যবহার!"

ইহার কিছুদিন মধ্যেই ম্যাজিষ্ট্রেট বরিশালে কারলাইল সার্কুলার অপেক্ষা এক কঠোর ঘোষণা জারী করেন—

"ছাত্ররা আর বিলাতী জিনিষের বিরুদ্ধে দালালী করিতে

পারিবে না। অন্যথা হইলে গভর্ণমেণ্টের কাছে রিপোর্ট করিব। ফলে এই সব বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা গভর্ণমেণ্ট-চাকুরী লাভে বঞ্চিত হইবে।"

"Students must not in future be allowed to act as touts for boycotting foreign goods....Result will be barring of the institutions from all Government employment."

যাহা হউক, এখন আমরা আবার সেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে আপনাদিগকে লইয়া যাইব। অতঃপরে ১লা নভেম্বর তারিখে যে বঙ্গভঙ্গের ঘোষণাপত্র পঠিত হয়, তাহাতে অনেক সহরেই ছাত্রদের সম্বন্ধে গোলযোগ উপস্থিত হয়। রংপুরের গোলমালের কথাই আপনাদের নিকট উপস্থিত করিব—

রঙ্গপুরের বিরাট সভায় ছাত্রগণ উপস্থিত হওয়ায় জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট টি, এমারসন সাহেব জেলা স্কুলের ৮৪জন ছাত্রকে ও টেক্‌নিক্যাল বিদ্যালয়ের ৫৭ জনকে ৫৲ করিয়া জরিমানা করেন। সমগ্র ছাত্রসমাজে বিক্ষোভ বৃদ্ধি হয় এবং কলিকাতার ছাত্র-সমাজ গোলদিঘীতে ৪ঠা নভেম্বর সভা করিয়া রংপুরের ছাত্র-মণ্ডলীকে সহানুভূতিসূচক বাণী প্রেরণ করেন। জাতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অভাব ক্রমেই অনুভূত হইতে লাগিল।

৪ঠা নভেম্বর ১৮ই কার্ত্তিক লায়ন্স সারকুলার জারী হইল। মিঃ পি, সি, লায়ন লাট ফুলারের প্রধান মন্ত্রী (চীফ সেক্রেটারী)। তাঁহার ঘোষণায় রাস্তাঘাট এবং পার্ক প্রভৃতিতে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনির নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হয়।

৫ই নভেম্বর ১৯শে কার্ত্তিক শ্যামপুকুরে রামধন মিত্রের গলির ময়দানে একটী বিরাট সভা হয়। সভাপতি হন বগুড়ার নবাব আবদুল শোভান চৌধুরী। চিত্তরঞ্জন দাশ খুব ওজস্বিনীভাষায় বক্তৃতা করেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে বুঝাইয়া বলিয়া ঔদাসীন্যের জন্য সুরেন্দ্রনাথের প্রতি বক্রোক্তি করায়, শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহাকে বসাইয়া দেন, কারণ তখনও সুরেন্দ্রনাথের প্রতি দেশবাসীর অগাধ শ্রদ্ধা অব্যাহত ছিল। ইহার পরে প্রায়ই গোলদিঘী বা পান্তীর মাঠে সভা হয়, আর প্রায়ই অগ্রগামীদলের দলগত বৈঠক (পার্টি মিটিং) হইতে থাকে, কখনও কুমার কৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের বাড়ী, (রামতনু বসু লেনে) কখনও চিত্তরঞ্জন দাশের বাড়ী।

৮ই নভেম্বর ২২শে কার্ত্তিক কুমার বাবুর বাড়ীতে পার্টি-মিটিংএ শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন যে, "মিষ্টার সুবোধ মল্লিক আমাকে বলেছেন যে, ছেলেদের জাতীয় শিক্ষা দেওয়ার এই সময়।" এই রকম কলেজ করিলে তিনি একলক্ষ টাকাও দিতে পারেন।

'বলেন কি'? বলিয়া তখনই চিত্তরঞ্জন সভার কার্য্য ফেলিয়া শ্যামবাবুর হাতে ধরিয়া গাড়ীতে সুবোধ বাবুর বাড়ী ক্রীক্ রোতে আসেন এবং দুই ঘণ্টা বসিয়া পাকা কথা লইয়া যান!

পরদিন ৯ই নভেম্বর ২৩ কার্ত্তিক পান্তীর মাঠে এক বিরাট সভা হয়। ছাত্ররা দলে দলে বন্দেমাতরম্ ও—

মোরা চাইনা তব শিক্ষা
মোরা পেয়েছি নব দীক্ষা

গাহিতে গাহিতে মাঠে সমবেত হইল। বক্তৃতার বিষয় জাতীয় শিক্ষা। চিত্তরঞ্জন, হীরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। পরে সভায় অধিনায়ক সুবোধ মল্লিক বক্তব্য শেষ করিয়া একলক্ষ টাকা

গোখেল

দান করিবেন ঘোষণা করিলেন। সমস্বরে দশ সহস্র কণ্ঠে বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে আকাশ মুখরিত হইল। মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা মহাশয় সেইখানেই সুবোধবাবুকে রাজা উপাধিতে ভূষিত করেন। এই সভায় আরও ১৫।২০ হাজার টাকার প্রতি-শ্রুতি পাওয়া যায়, এবং হীরেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয় এই শিক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে প্রতিশ্রুত হন।

ইহাই জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সূচনা। সভা ভঙ্গ হইলে ছাত্রগণ পান্তীর মাঠ হইতে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে রাজা সুবোধ মল্লিকের গাড়ী টানিয়া লইয়া পঁহুছাইয়া দেয়। সুবোধ চন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অনেকেই সহায়তা করিতে উদ্যত হইলেন। পরে বহু টাকা পাওয়া গিয়াছিল। ব্রজেন্দ্রকিশোরও অতঃপর পাঁচলক্ষ টাকার প্রতিশ্রুতি দেন।

কিন্তু যে নবগঠিত "অগ্রগামী দল" রাজনীতি ক্ষেত্রে গঠিত হইল, চিত্তরঞ্জন বুদ্ধি পরামর্শ, উৎসাহ এবং অর্থ সাহায্য দিয়া তাহা পুষ্ট করিতে কোনরূপ ত্রুটি করিলেন না, কিন্তু চিত্তরঞ্জনের তখন মাথার উপর বহু দায়িত্বভার, একেবারে ত্যাগ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হইলনা। কিন্তু তাঁহার সহযোগিতা সম্বন্ধে এই নবগঠিত দলের প্রধান প্রচারক রচনা-কুশল ও বাগ্মী বিপিন চন্দ্রের কথাগুলি খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন—

"আমি যখন প্রথমবার বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া 'New India, সম্পাদনে নিযুক্ত হই, তখন হইতেই চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্ম্মজীবনেও একটা ঘনিষ্ট সম্বন্ধের সূত্রপাত হয়। New India' যে নূতন স্বাদেশিকতার বীজ বপন করে, 'বন্দে মাতরমে' তাহাই উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠে। গত স্বদেশী আন্দোলনের সময় চিত্তরঞ্জনের দেশচর্য্যায় দীক্ষা হয়। তখন

চিত্তরঞ্জন নানা কারণে আত্মগোপন করিয়া চলিতেন, কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে তিনি যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন, একথা গোপন থাকে নাই। সেই সময় হইতে চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে আমার সাহচর্য্য আরও ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে। আমি একরূপ অনন্যকর্ম্মা হইয়া আকাশবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্ম সমাজের ও দেশের কাজ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতাম। চিত্তরঞ্জন ব্যারিষ্টারী করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। দেশচর্য্যায় আমি তাঁহার ভার বহন করিতাম। সংসার-ধর্ম্ম প্রতিপালনে তিনি আমার ভার বহন করিতেন। এইরূপে প্রায় ১০।১৫ বৎসর কাল আমার সাংসারিক দায়-অদায় কেবল প্রসন্নচিত্তে নহে, পরন্তু অনাবিল শ্রদ্ধা সহকারে চিত্তরঞ্জন বহন করিয়াছিলেন।"

দেশচর্য্যা চিত্তরঞ্জনের নিকট সংসার-ধর্ম্ম-প্রতিপালনের মতই জীবনের একটী অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। তাই প্রথম হইতেই তিনি

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও সর্ব্বগুণান্বিত প্রচারক ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে আচার্য্যের ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন। আত্মগোপন করিয়া থাকিলেও চিত্তরঞ্জন সমগ্র আন্দোলনেই প্রাণ সঞ্চার করিতেন।

কিন্তু খাঁটি ত্যাগের সন্ধান বাঙ্গালী তখন পায় অরবিন্দতে। ইনিই প্রথমে রাজনীতিতে সন্ন্যাস আনিলেন। ইনি বরোদা কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। এই সময়ে শুভক্ষণে কলিকাতায় ছিলেন। পাঁচ বৎসরের মধ্যে স্বল্পকালমাত্র (দুই বৎসরের কিঞ্চিদধিক সময়) বাঙ্গালার বাহিরে থাকিলেও অরবিন্দ ছিলেন তখন একটা শক্তির উৎস। ইনিই ন্যাসনাল কলেজের অধ্যক্ষ হইলেন, ইনিই বন্দে মাতরম্' সম্পাদনা করিয়াছিলেন, কর্ম্মযোগিন্ ও ধর্ম্মে—ধর্ম্মের উপর রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়া বঙ্কিম, বিবেকানন্দ ও নিবেদিতা নির্দ্দেশিত পথেই চলিতে লাগিলেন। 'বন্দেমাতরম' হিন্দুস্থানকে তোলপাড় করিয়া ফেলিল।

৯ই নভেম্বর গোলদিঘীতে কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে এন্টি সার্কুলার সোসাইটি গঠিত হয়। তাহাদের উদ্দেশ্য কার্লাইল কি রীজলীর সার্কুলারের আদেশ মানিয়া তাহারা চলিবে না।

১০ই নভেম্বর পান্তীর মাঠে আবার সভা হয়। ভগিনী নিবেদিতা ছাত্রগণকে জাতীয় শিক্ষার মর্ম্ম বুঝাইয়া গভর্ণমেণ্টের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিতে নিষেধ করেন।

১৩ই নভেম্বর ৭ই কার্ত্তিক রঙ্গপুরে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৪ই নভেম্বর ২৮শে কার্ত্তিক রঙ্গপুরে নিম্নলিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে স্পেসাল কনষ্টেবল করা হয়:

উমেশচন্দ্র গুহ উকীল, রাসবিহারী মুখার্জ্জী উকীল, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ব্যারিষ্টার, (প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক) রঙ্গপুর বার্ত্তাবহের সম্পাদক জয়চন্দ্র সরকার এবং মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন প্রমুখ ১৩।১৪ জন। ইহাতে সমগ্র বাঙ্গালাদেশে আরও বিক্ষোভ সঞ্চার হয়।* অবশ্য ইঁহারা কেহই কনেষ্টবল হইতে স্বীকৃত হন নাই।

এই সব ঘটনার পরে ১৭ই নভেম্বর ১লা অগ্রহায়ণ সুরেন্দ্রনাথ পান্তীর মাঠে আসিয়া জাতীয় বিদ্যালয় সমর্থন কল্পে সভাপতিরূপে যে বক্তৃতা দেন, তাহাতে জনমত তৃপ্ত হইতে পারে নাই। তিনি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পক্ষেও বলেন, আবার ছাত্রদিগকে এখন বিদ্যালয় ত্যাগ না করিতেও বলেন। তাঁহার বক্তৃতার শেষাংশ এই—

"আজ আমি কি স্বার্থের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে প্রতিবন্ধক হইতে পারি? আজ এই কর্ম্মক্লান্ত জীবনের সন্ধ্যায় লোকান্তরের আহ্বান আমার কর্ণে আসিয়া বাজিতেছে। আজও প্রতিরাত্রে উপাধানে মাথা রাখিবার সময় আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, হে ভগবান! দুর্ভাগ্য আমার দেশ, দুর্ব্বল আমার স্বদেশবাসিগণ; তাহাদের উপর অত্যাচার হইতেছে, তুমি তাহাদিগকে রক্ষা কর।" (কম্পিত কণ্ঠে শেষের এই কথা কয়টি বলিতে বলিতে তিনি ভাবাবেগে কাঁদিয়া ফেলেন)। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে হাত ধরিয়া বসাইয়া দেন। ডাক্তার সুন্দরীমোহন বাবু

* স্পেসাল কনেষ্টবল হইতে স্বীকার না হওয়ায় Police Actএর (Act V of 1861) ১৯ ও ২৯ ধারা অনুসারে শাস্তি হয়। হাইকোর্টে জষ্টিস্ ষ্টিফেন খালাস দিবার পক্ষে ছিলেন কিন্তু জষ্টিস ব্রেট ছিলেন ভিন্নমত। চীফজষ্টিস স্যার চার্লস ম্যাক্‌লিন যেরূপ মত পোষণ করেন, তাহাতে Advocate General মোকদ্দমাটি withdraw করিয়া লন।

বলেন, "একজন প্রতিপক্ষীয় নেতা আমার কানে কানে বলেন, 'বুঝলে কি না? প্রিয় রিপণ-কলেজের ভবিষ্য বিচ্ছেদ-সম্ভাবনার কল্পনায় শোক সম্বরণ করিতে পারেন নাই, তাই এত কান্না।'ক

সুরেন্দ্রনাথের প্রতি অতঃপরে ছাত্রগণের শ্রদ্ধা শিথিল হইয়া পড়িল।

২৪শে নভেম্বর, ৮ই অগ্রহায়ণ পান্তীর মাঠে আর এক সভায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

২৬শে নভেম্বর ১০ই অগ্রহায়ণ সভায় বরিশালে গুর্খার অত্যাচারে ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ বিক্ষোভ হয়। তাহারা স্থির করে যতদিন বরিশালে গুর্খা থাকিবে, ততদিন তাহারা কলেজে যাইবে না। সভাপতি হন রঙ্গপুরের জমিদার সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়।

২৭শে নভেম্বর সুরেন্দ্রনাথ অনুমোদন না করায় ২৮শে রাজা সুবোধ মল্লিকের গৃহে এক পরামর্শ-সভা হয়। পুরাতন নেতাদের ঔদাসীন্য বা মন্থর গতিতে অগ্রগামী দল ক্রমেই জনমতের সমর্থন লাভ করিতে লাগিল।

৩০শে নভেম্বর ময়মনসিংহের ছাত্র খগেন্দ্রজীবন রায়, শিক্ষক সুরেন্দ্রবাবু, মেঘনাদবাবু প্রভৃতি গ্রেপ্তার হন এবং ৫ই ডিসেম্বর সিরাজগঞ্জের ডাক্তার শশীধর নিয়োগী গুর্খা পুলিস কর্তৃক প্রহৃত হন।

৩রা ডিসেম্বর পান্তীর মাঠে জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়ের (ব্যারিষ্টার জে, এন, রায়) সভাপতিত্বে যে সভা হয়, তাহাতে বিপিন পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ও হেমেন্দ্রপ্রসাদ প্রভৃতির বক্তৃতা হয়। সভাপতি মহাশয় বলেন, অত্যাচারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দাঁড়াইয়াছে।

৮ই ডিসেম্বর ছাত্র এবং যুবক-সমিতি গঠিত হয়।

১০ই ডিসেম্বর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠনের সম্বন্ধে নিয়ম কানুন তৈয়ার করিবার জন্য একটি সভা হয়।

১৭ই হইতে ২৩শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত অনবরত পান্তীর মাঠে ও কুমার বাবুর বাড়ী আলোচনার পরে ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে চিত্তরঞ্জন দাশের গৃহে "স্বদেশী মণ্ডলীর" নিয়মাবলী গঠিত হইল। মণ্ডলীর উদ্দেশ্য স্বদেশী আন্দোলন যেন আত্ম নির্ভরতার পথে অগ্রসর হয়, কেননা ভিক্ষানীতিতে তাহা সুসম্পন্ন হওয়ার কোন আশা নাই। গ্রামে ও সহরে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠাও মণ্ডলীর অন্যতম উদ্দেশ্য নির্দ্ধারিত হয়।

ইহার পরেই কংগ্রেসের একবিংশতি অধিবেশন বারাণসী ধামে হয়, তাহাতে সভাপতি হন গোপালকৃষ্ণ গোখলে। এই অধিবেশন অগ্রগামীদলের আশা বা আকাঙ্ক্ষা কোনরূপে চরিতার্থ করিতে পারে নাই। তাই দুই দলের নীতি ক্রমেই স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হইতে লাগিল। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ (protest) করিলেও এবং বিদেশী দ্রব্যের বর্জ্জন সম্বন্ধে সামান্য সমর্থন থাকিলেও, তিলক এবং লাজপতরায়ের যথাসাধ্য চেষ্টাসত্ত্বেও তাঁহারা কংগ্রেসকে দিয়া বাঙ্গালার রাজনৈতিক কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করাইতে সফল হন নাই। সভাপতিও বয়কট সমর্থন না করিয়া 'স্বদেশী'র প্রশংসা করিলেন মাত্র। এই সময়ে যুবরাজ ভারতে সমাগত হইয়াছেন—বাঙ্গলার কয়েকজন প্রতিনিধি বলিলেন, যদি 'বয়কট' ন্যায়সঙ্গত রাজনৈতিক আন্দোলন বলিয়া স্বীকৃত না হয়, তবে তাঁহারা যুবরাজের অভিনন্দন প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা

নিবেদিতা

করিবেন। পরিশেষে একটা রফা হয়, প্রস্তাবে বলা হয়, বয়কট বোধ হয় বাঙ্গলীর শেষ ও ন্যায়ানুমোদিত অস্ত্র।

যাহা হউক, অগ্রগামী নূতন একটী দল প্রকট হইল বটে, কিন্তু মুসলমানদের দিক্ হইতে বাঙ্গলার আকাশে মেঘ সঞ্চারিত হইল। লর্ড কর্জ্জনের প্রিয় শিষ্যরূপে লাট ফুলার দিনাজপুরের অভিনন্দনের উত্তরে ২৭শে নভেম্বর মুসলমানদিগকে আখ্যা দিলেন, "সুয়ারাণী"।* নানাস্থানে গিয়া তাহারা এত অবহেলিত কেন, চাকুরী কম পায় কেন, হিন্দুদের দ্বারা লাঞ্ছিত হইতেছে—এই সব কথায় উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। সাবডিভিসনের সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেটরা চাষী মুসলমানকেও চেয়ার প্রভৃতি দিয়া সম্মানিত করিতে ব্যস্ত হয়, বর্জ্জন নীতি যাহাতে না চলিতে পারে সেজন্য স্থানে স্থানে নূতন নূতন হাট খুলিতে থাকে। ফলে সহরে কতিপয় মুসলমান স্বদেশী আন্দোলনে

ক সুন্দরীমোহন দাস মহাশয়ের পূর্ব্বস্মৃতি। আনন্দবাজার পত্রিকা ২৫শে চৈত্র ১৩৫১, ৮ এপ্রিল স্বদেশী তরঙ্গ ১৯৪৫,

* It is not true that he did not love the Bengalees but if the Hindu wife ill-treated him, he must turn his affections to the Muslim wife.

যোগদান করিলেও সাধারণ মুসলমানের মধ্যে হিন্দু-বিদ্বেষের বীজ ক্রমে ক্রমে প্রোথিত হইতে লাগিল। মুদ্রিত কাগজে বাহির হইতে লাগিল—"হিন্দুর দোকান লুঠ কর, হিন্দুকে মার, হিন্দুর বিধবাকে ধরিয়া সাদী কর"! অবশ্য অনেক মুসলমান এইরূপ অন্যায়ের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইলেন। ঢাকার সমদর্শী ম্যাজিষ্ট্রেট স্প, ময়মনসিংহের জনপ্রিয় টমসন্ বরিশালের ষ্টাটফিল্ড প্রভৃতিকে অপসারিত করিয়া আসাম হইতে ফুলার সাহেবের মনোমত ম্যাজিষ্ট্রেট জ্যাক্, এমারসন,ক্লার্ক প্রভৃতিকে আমদানী করা হইল। যাহা হউক লাট সাহেব চাকুরীর আশা দিলেও, অনেকেই ব্যর্থ-

অরবিন্দ ঘোষ

মনোরথ হইল। তাহাদের আশাভঙ্গ ও অবসাদ ময়মনসিংহের একজন সুরসিক মুসলমান লেখকের গানে আত্মপ্রকাশ করিল—

"কিবা হইল ওগো নানি!
বড় আশা দিছিল লাট বাহাদুর কৈরা মেহেরবাণী

* * *

দারগগীরি চাকরি দিবে, সাথে বৈসা খানা খাইবে
ওরে বিলাতী মেম সাদি দিবে মুই দেখামু কেরদানী
হুজুরেতে আর্জ্জি দিলাম, দারগগীরি না পাইলাম,
এত আশা কৈরা শেষে নছিবে হৈল
সান্কী ধোয়া পানি।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল তারিখে বরিশালে প্রাদেশিক সম্মেলনীর অধিবেশন এবং উহা কিরূপে বজ্রভঙ্গে পরিণত হয়, এবার তাহার আলোচনা করিব।

নরম দল এবং অগ্রগামী দল—যাহাদের নাম হয় মডারেট ও এক্সট্রীমিষ্ট—উভয় মতাবলম্বী প্রতিনিধি বরিশালে বিশেষ উৎসাহের সহিত সম্মিলিত হয়েন। তাঁহারা দুইটি ষ্টীমারে রওনা হন, কেহ কেহ যান খুলনা হইতে, কেহ কেহ যান ঢাকা হইতে। সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ, অম্বিকাচরণ, আনন্দ রায়, অনাথবন্ধু, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, বিপিন পাল, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি যান ঢাকা হইতে। অন্যান্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের মধ্যেও মতি ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়, সুরেশ সমাজপতি, সুবোধ মল্লিক, রজত রায়, বিজয় চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি মনোনীত হন মিঃ আবদুল রসুল বার-এট-ল। উভয় দলই নিজ নিজ নীতি যাহাতে সমর্থিত হয়, তৎপক্ষে বিশেষ উদ্যোগী হন। কিন্তু জাহাজ দুইখানি যখন ভোরে আসিয়া বরিশাল ষ্টেসন ঘাটে ভিড়িবার উপক্রম হইল, ষ্টীমার হইতে বন্দেমাতরম ধ্বনি উত্থিত হইল বটে, কিন্তু তীর হইতে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। জনমণ্ডলী নিস্তব্ধ রহিল। তীরে নামিয়া সকলেই ক্ষুণ্ণ মনে স্ব-স্ব স্থানে গেলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে লইয়া রাজাবাহাদুর হাবেলী হইতে মিছিল করিয়া সম্মিলনী মণ্ডপে লইয়া যাওয়া হইবে এবং তখন বন্দেমাতরম ধ্বনি হইবে বলিয়া সুরেন্দ্রনাথ, অশ্বিনী বাবু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ স্থির করেন। বরিশালে তখন অসংখ্য গুর্খা সৈন্য রহিয়াছে বন্দুক সহ তাহারা এবং রেগুলেশন লাঠি লইয়া পুলিশ হুকুম তামিল করিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত রহিয়াছে। পুলিশের সুপারিণ্টেডেণ্টও প্রস্তুত রহিয়াছেন, ধ্বনি হইলেই বল প্রয়োগ করিতে আদেশ করিবেন। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে কয়েকজন দেশীয় পুলিশ অফিসার আসিয়া নেতৃবৃন্দকে বলেন—

"আপনারা 'বন্দেমাতরম' চীৎকার করিয়া যাইবেন না, তাহা হইলে একটা প্রলয় কাণ্ড ঘটিবে। কারণ একটু বাধা পাইলেই পুলিশ ভয়ানক মারপিট করিবে। নেতৃবৃন্দ আমরা বন্দেমাতরম চীৎকার করিয়া যাইব এবং পুলিশ ধরিতে আসিলে বিনা আপত্তিতে ধরা দিব।"

উক্ত দেশীয় পুলিশ অফিসারগণ বোধ হয় সদিচ্ছাপ্রযুক্ত হইয়াই আসিয়াছিলেন; অন্যতম অগ্রগামী দল-নায়ক মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা তাঁহার পুত্র চিত্তরঞ্জনকে বন্দেমাতরম করিতে করিতে সকলের অগ্রগামী হইতে উৎসাহিত করেন। এণ্টিসার্কুলার সোসাইটির সভ্যগণ এবং সুলেখক ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলী প্রভৃতি স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ তাহার অগ্রবর্ত্তী হয়েন। সেই অবস্থায় পুলিশ আসিয়া তাহাদিগকে ভীষণভাবে প্রহার করিতে থাকে। লাঠি খাইতে খাইতে চিত্তরঞ্জন পুকুরে পড়িয়া যায়, সেখানেও অনবরত:

* XIII Resolved that this Congress records its earnest and emphatic protest against the repressive measures which have been adopted by the authorities after the people there had been compelled to resort to the boycott of foreign goods as a last protest and perhaps, the onjy constitutional and effective means left to them of drawing the attention of the British public to the action of the Government of India in persisting in their determination to partition Bengal in utter disregard of the universal prayers and protests of Bengal.

লাঠি চলিতে থাকে কিন্তু বন্দেমাতরম্ চীৎকার করিতে সে কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না। সে কেবল গাইতে থাকে—

"মাগো, যায় যাবে জীবন চলে বন্দেমাতরম্ বলে"—

পরে তাহাকে অজ্ঞান অবস্থায় উঠাইয়া কিছুক্ষণ বাদে সভামণ্ডপে ষ্ট্রেচারে করিয়া লইয়া যাওয়া হয়।

এদিকে মিছিলের সকলের পূর্ব্বে চলিতেছিলেন একখানা গাড়ীতে সস্ত্রীক আবদুল রসুল, তাহারই পশ্চাতে চলিয়াছেন—প্রথম সারিতে সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ ও মতিলাল ঘোষ। তিনজন তিনজন করিয়া সারি বাঁধিয়া খুব শৃঙ্খলার সহিত তাঁহাদিগের অনুসরণ করিতেছিলেন। এদিকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কেম্প আসিয়া সুরেন্দ্রনাথকে বলিলেন—"আপনাকে গ্রেপ্তার করিবার আদেশ আছে, গ্রেপ্তার করিলাম"।

মতিবাবু বলিলেন, "আমাকেও ধরুন, (Arrest me also") ভূপেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র প্রভৃতি অনেকেই এরূপ অগ্রসর হইলেন। কিন্তু মিঃ কেম্প বলিলেন—"আপনাদিগকে ধরিবার আদেশ নাই।" অচিরে সুরেন্দ্রনাথকে ম্যাজিষ্ট্রেট ইমারসনের কাছে লইয়া যাওয়া হয়। সঙ্গেসঙ্গেই বিচার। ২০০ টাকা জরিমানা হয় পুলিসের হুকুম অমান্য করিবার জন্য (দণ্ডবিধি ১৮৮), ২০০৲ আদালত অপমান করার জন্য (Contempt of Court).

প্রথম ধারার বিচার শেষ হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন "লজ্জার কথা This is disgraceful".

সুরেন্দ্রনাথ—আপনার মন্তব্যের প্রতিবাদ করি। বিচারাসনে বসিয়া কাহারও এরূপ উক্তি করা উচিত নয়—I protest against such a remark; a remark of this kind ought not to come from a court of justice.

এমারসন—Keep quiet. I draw up contempt proceedings against you চুপ করুন, আপনার বিরুদ্ধে আদালত অবজ্ঞা করার অভিযোগ আনিতেছি।

সুরেন্দ্রনাথ—যাহা ইচ্ছা করুন আমি তো কোন অন্যায় করি নাই, Do what you please. I have done nothing wrong.

আদালত জিজ্ঞাসা করেন, "I give you an opportunity to apologise.

সুরেন্দ্র নাথ—I respectfully decline to apologise. অবশ্য হাইকোর্ট এই আদেশ রদ করিয়া বলেন, there was no justification for contempt proceedings.

অদৃষ্টের এমনি পরিহাস, সুরেন্দ্রনাথ, মন্ত্রী (minister) হইলে, এই এমার্সনকেই তাঁহার সেক্রেটারীর কাজ করিতে হয়।

সকলে যখন সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলেন, চিত্তরঞ্জন গুহ প্রভৃতির প্রতি পুলিসের ভীষণ ভাবে প্রহারের কথা পঁহুছিল। অতঃপর রক্তাক্ত কলেবরে যখন মুমূর্ষু পুত্রকে মনোরঞ্জন দেখিলেন তাঁহার কণ্ঠ হইতে অলক্ষ্যে বাহির হইল—

'যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ কুমার
বীরকুল সাধ সমরে সদা'—

অতঃপরে সম্মিলনীতে উত্তেজনামূলক বক্তৃতা ও ধ্বনি হইল, আর ভূপেন্দ্রনাথ বলিয়া উঠিলেন—"আজ হইতে ব্রিটিস রাজত্বের অবসান সুরু হইল।" *

বক্তৃতাদির পরে প্রতিনিধিবর্গ আবার বন্দেমাতরম্ করিতে করিতে স্ব-স্ব আবাসস্থানে গেলেন, কিন্তু এবার তাঁহাদিগকে কেহ বাধা দিল না। পরদিন আবার যখন সম্মিলনী বসিল কেম্প সাহেব আসিয়া সভাপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাস্তায় বন্দেমাতরম চীৎকার হইবেনা এরূপ প্রতিশ্রুতি কি আপনি দিতে পারেন ?"

তিনি প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকার করায়, কেম্প সাহেব সম্মিলনী ভাঙ্গিয়া দেন এবং এইভাবে বরিশাল প্রাদেশিক সম্মিলনীর অধিবেশন ছত্রভঙ্গে পরিণত হইল।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

সুরেন্দ্রনাথ নেতার উপযোগী সাহস এবং তেজস্বিতা দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু 'বন্দে মাতরম্'ই জয়যুক্ত হওয়ায় অগ্রগামী দলের শক্তিই ক্রমে বাড়িতে লাগিল। ইহার মধ্যেই মতিবাবু প্রস্তাব করিলেন—

"গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতার এই শেষ। আমাদের চেষ্টায় যাহা পারি এমন সব প্রস্তাবই হইবে।"

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সমর্থন করেন। এইখানেই অসহযোগের প্রথম সূত্রপাত।

* This is the beginning of the end of the British rule in India.

বরিশালের সংবাদ সমগ্র বাঙ্গলায় প্রচারিত হইলে আত্মশক্তির প্রতি লোকের আরও আগ্রহ বাড়িল। ১৮ এপ্রিল, ২০শে, মিলনমন্দিরে,

শিবাজী

বাগবাজারে প্রকাশ্যে এবং অগ্রগামীদলের মধ্যে যথাওভাবে প্রায় প্রতিদিনই সভা, প্রতিবাদ ও কর্ম্মপন্থা-নির্দ্ধারণ হইতে লাগিল।

ইহার পরের ঘটনাই শিবাজী-উৎসব। বাঙ্গলা যখন অত্যাচারে উত্যক্ত ও উদ্বেলিত মহামতি তিলকের শুভাগমনে তাহারা যেন আলোকরশ্মি দেখিতে পাইল। অগ্রগামীদলের সহিত তিলকের সম্মিলন মণিকাঞ্চনের যোগ হইল। তাহারা কর্ণধার খুঁজিয়া পাইল। পান্তীর মাঠে উৎসব ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। আয়োজন করেন নবদলের পূর্ব্বোক্ত স্বদেশমণ্ডলী।

১৯০৬, ৪ঠা জুন খাপর্দ্দে ও মুঞ্জে সমভিব্যাহারে তিলক কলিকাতা পৌছেন এবং ৬ই জুন তিলক যে প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা করেন তাহাতে অগ্রগামীদলের জয়যাত্রা আরও সুগম হয়।

তিলকের বক্তৃতায় সর্ব্বত্র পরিস্ফুট হয়—"বাঙ্গলায় একজন সর্ব্বত্যাগী স্বদেশপ্রেমিক নেতার অভাব কবে পূর্ণ হইবে?"

তদানীন্তন রচিত গিরিশচন্দ্রের মিরকাশিম নাটকেও এইরূপ ভবিষ্য নেতার সমস্ত গুণ ও কর্ত্তব্য পরিস্ফুট হয়। ৯ই জুন তারিখে তিলক প্রভৃতি মহারাষ্ট্র নেতৃবৃন্দ মিনার্ভা থিয়েটারে "সিরাজদ্দৌলা" দেখিতে অনুরুদ্ধ হন। বাঙ্গলা থিয়েটারে যে জাতীয়তা ও দেশপ্রীতি বৃদ্ধি করিতেছে, তাহা দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হন। নাট্যকার গিরিশ ঘোষ করিমচাচা বেশে নতজানু হইয়া ইয়োজীতে তিলক প্রভৃতিকে সম্বর্দ্ধনা করেন তাঁহার মূল্যবান বাক্যগুলিতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হইল—

"আপনার দেশবাসী বর্গীদের অত্যাচারে বাঙ্গলা সমধিক প্রপীড়িত হয় বলিয়াই ইংরাজের শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল, আজ তাই মনে হয় প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আপনি যেন দেবদূতের মত বাঙ্গলার হিতসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।"

মহামান্য তিলক ইঙ্গিত বুঝিলেন—অতঃপরে বাঙ্গালীদের সেই দুঃসময়ে একেবারে প্রাণের নেতা হইয়া পড়িলেন। বাঙ্গালীরাও তিলকের নেতৃত্ব অবনত মস্তকে গ্রহণ করিল। তিলক নবশক্তির উন্মেষ দেখিলেন, আবার সুরেন্দ্র বাবুদের একটি সভায় (৮ই জুন) প্রাণহীনতা দেখিয়া ক্ষুণ্ণও হইলেন—১০ই জুন অগ্রগামীদল যখন তিলক প্রভৃতিকে লইয়া শোভাযাত্রা করিয়া গঙ্গাস্নানে যান, সে দৃশ্য দেখিয়া নরম দল অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। লর্ড কর্জ্জনের মতই মনে করিলেন, "If it is real, what does it mean?"

১১ই জুন সুবোধ মল্লিক তিলক প্রভৃতি এবং নূতন দলের লোক-দিগকে একটী প্রীতিভোজে আপ্যায়িত করেন। স্বেচ্ছাসেবকগণকে উৎসাহিত করিয়া তাঁহারা ১২ই জুন প্রত্যাগমন করেন।

তিলক মেলায়, সভায় ও অভিনয়ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর সঙ্গে এত একাত্মতা অনুভব করিলেন যে অতঃপরে অগ্রগামী দল ১৯০৬ সনের কংগ্রেসে তাঁহাকেই সভাপতি করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।*

২৯শে জুন কলিকাতার প্রধান প্রধান ব্যক্তি জাহাজে চড়িয়া বন্দেমাতরমের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভূমিতে গমন করিয়া নূতন উদ্দীপনা লইয়া আসেন।

ইতিপূর্ব্বে তিলক ঘোষণা করিয়াছেন "স্বরাজ ভারতবাসীর জন্মগত অধিকার Swaraj is the birth right of India" তাঁহাকে সভাপতি করিতে নরম দল প্রমাদ গণিলেন। স্থানীয় কংগ্রেসের কলকাঠি স্যর সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ পুরাতন বা নরম দলের হাতে। তাঁহারা বিলাত হইতে টেলিগ্রাফ করিয়া দাদাভাই নৌরজীকে সভাপতি করিবেন স্থির করিলেন। সেইবারের মত চাঞ্চল্য দূর হইল। সেই পক্ককেশ বৃদ্ধ পিতামহও সেই সময়ে সকলেরই মন ও মান রক্ষা করিলেন। তাঁহার অভিভাষণের যুক্তিতে এবং কার্য্য দক্ষতায় অগ্রগামী দলও সন্তুষ্টই হইয়াছিলেন। তিনি প্রায় তিলকের সঙ্গে সমানে সমানে জোরগলায় বলেন—

"Swaraj is the goal of the Congress. It is self Government as in the colonies or the United Kingdom. কংগ্রেসের উদ্দেশ্য স্বরাজ, অন্যান্য উপনিবেশ বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে যেমন স্বায়ত্তশাসন রহিয়াছে, ইহাও ঠিক সেইরূপই হইবে।

ইহাতে কোন দলেরই আপত্তির কোন কারণ হইল না। এই সম্বন্ধে কংগ্রেসের প্রস্তাবটিও হয় বেশ স্পষ্ট—

(১) ইংলণ্ড ও ভারতে চাকুরীর জন্য দুই স্থানেই সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা গৃহীত হইবে, Simultaneous Examinations.

* ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে কেশরী সম্পাদনকল্পে যে Sedition-এর জন্য দেড় বৎসর জেল হয় নরম দল ইহাতে আপত্তি ধরিলেন। কিন্তু মূল ভয় অগ্রনীতিতে।

(২) ভারত সচিব ও ভাইসরয়ের এবং মান্দ্রাজ ও বোম্বাই গভর্ণরের পরিষদে Executive Councils যথাসম্ভব ভারতীয়গণকে রাখিতে হইবে, Adequate Indian representatives.

(৩) আইনসভার যথাসাধ্য নির্ব্বাচনপ্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে এবং শাসন ও অর্থ সম্বন্ধীয় অধিকার বাড়াইতে হইবে। Expansion of Legislative Council and larger control over administration and finances.

(৪) মিউনিসিপ্যালিটী ও বোর্ডের (ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, লোকাল বোর্ড) ক্ষমতা বাড়াইতে হইবে Power of Local and Municipal bodies should be extended.

স্বরাজ প্রস্তাব ছাড়া আরও তিনটি প্রস্তাবে বিশেষ জোর দেওয়া হয়। একটি বয়কট, একটি স্বদেশী ও আর একটি জাতীয় শিক্ষা—

VII. That having regard to the fact that the people of this country have little or no voice in its administration and that their representations to the goverment donot receive due consideration, this Congress is of opinion that the boycott movement inaugurated in Bengal by way of protest against the Partition of that Province was and is legitimate,

এই প্রস্তাবটি কাশীর অধিবেশনের প্রস্তাব অপেক্ষা একটু স্বতন্ত্র। ইহার সঙ্গে স্বদেশী প্রস্তাবটিতে যে লোকসান হইলেও বা ত্যাগস্বীকার করিতে হইলেও স্বদেশীর পোষকতা করিতে হইবে, সেই কথা থাকায় বয়কট প্রস্তাব আরও জোরালো হইয়াছে—

VIII. That this Congress accords its most cordial support to the Swadeshi movement and calls upon the people of the country to labour for its success, by making earnest and sustained efforts to promote the growth of indigenous industries and to stimulate the production of indigenous articles by giving them preponderance over imported commodities even at some sacrifice.

জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধেও প্রস্তাব হয়—

That in the opinion of this Congress the time has arrived for the people all over the country earnestly to take up the question of National education both for boys and girls and organise a system of education, Literary, Scientific and Technical suited to the requirements of the country on National lines and under National control.

এই চারিটি প্রস্তাবে অগ্রগামী দল কথঞ্চিত সন্তুষ্ট হয় বটে। তিলকই উহার নেতা, সঙ্গে ছিলেন লাজপতরায়, বিপিন পাল, অশ্বিনী দত্ত, অরবিন্দ ঘোষ, প্রমুখ মনীষিগণ। বৃদ্ধ নৌরজীর বুদ্ধি এবং দৃঢ়তায়ই উভয় দলে কোন গোলমাল হয় না। এই সভার দুই একটা বিষয়ের একটু পরিচয় দিই। প্রস্তাবে 'স্বরাজ' কথা রাখিবার জন্য তিলক যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। অম্বিকাচরণ মজুমদার প্রস্তাবিত 'বয়কট' সমর্থন কালে বিপিনপাল বয়কটের আরও প্রসারতার কথা বলিয়া পূর্ব্ববঙ্গে গভর্ণমেন্টে সমস্ত অবৈতনিক চাকরী ছাড়িয়া দিতে লাট সাহেবের মন্ত্রী-সভার চাকুরীতে ইস্তফা দিতে অনুরোধ করেন।

বিপিন পাল

পণ্ডিত মদন মোহন বলেন—

Congress could never be committed to the view of Mr. Pal and the extension of Boycott as he described it. He hoped the other provinces would never be driven to the necessity of using it, but the reforms needed would be gained without it.

যাহা হউক প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

এই দ্বাবিংশতি অধিবেশনের পরে বিপিনবাবু চারিদিক ঘুরিয়া 'স্বরাজ' এর অর্থ বুঝাইতে থাকেন। সেই সময় বিপিনবাবু এতই সমাদৃত হন যে ছবি পর্য্যন্ত বাহির হইত, 'লাল, বাল, পাল', ভারতের তিন প্রধান নায়ক।

ইতিমধ্যে ১৯০৬ আগষ্ট হইতে 'বন্দে মাতরম্' ইংরাজী দৈনিক সংবাদ পত্ররূপে বাহির হয় 'বন্দেমাতরম'ই জাতীয় দলের মুখপত্ররূপে সকলের উপর প্রভাব প্রস্তাব করে। ইহার ইতিহাস এইরূপ—

প্রথমে হরিদাস হালদার মহাশয় ৩০০্ সংগ্রহ করিয়া চিত্তরঞ্জন দাশের হাতে দেন। সেই টাকায় ৫।৬ দিন মাত্র চলিয়া বন্ধ হইবে বলিয়া একটী জয়েণ্টষ্টক কোম্পানী করা হয়। অর্থ সাহায্য করেন চিত্তরঞ্জন দাশ, কুমারকৃষ্ণ মিত্র, সুবোধ মল্লিক, রজতরায় ও শরৎসেন। বিপিনবাবু হন প্রধান সম্পাদক—আর আর লেখকদের মধ্যে অরবিন্দ ঘোষ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বিজয় চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ছিলেন।

"India for Indians" ভারতবাসীর জন্যই ভারত* এই আদর্শলিপি মস্তকে ধারণ করিয়াই বাহির হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ

বন্দেমাতরম ব্যতীত বাঙ্গলা 'সন্ধ্যা' যেমন সাধারণ লোকের মধ্যে স্বদেশী ভাব প্রচার করে সে সময়ে এরূপ কাগজ ছিল না। ইহার ভাষা ছিল অতি সরস ও কৌতুকপূর্ণ, ছাত্র, কেরাণী, গৃহস্থ, দোকানদার সন্ধ্যাকালে গল্পগুজব করিতে করিতে পড়িতে যেন আমোদ পাইত। ইহার দুই একটী কথা নমুনা দিই।

"যুগান্তরের বক্তারক্তি, টিকৃটিকির ফাটিল পিড়ি,
আমি ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে" ইত্যাদি।

মনোরঞ্জন গুহ সম্পাদিত 'নবশক্তি'ও এই সময়ে নূতন ভাব প্রচার সহায়তা করে। সুরেশ সমাজপতি সম্পাদিত 'বসুমতী'তেও জাতীয়তার প্রচার হয়। 'যুগান্তর'ও এই সময় যুবকদের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। 'যুগান্তর' সম্পাদনা করিতেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (বিবেকানন্দ-সহোদর)। জাতীয় আন্দোলন যতই দমিত হইতে লাগিল, কতিপয় যুবার মধ্যে গুপ্ত সমিতি গঠন করিবার প্রবৃত্তি ততই অবাধ হইয়া উঠিল। পরিণাম সম্বন্ধে 'মিরার' সম্পাদক নরমপন্থী সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় যে ভবিষ্যদ্বাণী করেন—

The Press and the Platform are but safety valves of popular discontent. Whenever they have been suppressed, anarchy has intervened.

কার্য্যত: আমরাও দেখিলাম জ্বলন্ত দেশভক্তি হৃদয়ে টগবগ করিতে করিতে একদল যুবককে সত্যই বিপথ চালিত করিয়াছে। 'বন্দেমাতরম', 'যুগান্তর' প্রভৃতি কাগজের প্রতি রাজরোষ নিপতিত দেখিয়াই বোধ হয় তিনি এরূপ উক্তি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

১৯০৭ সনের কতকগুলি মামলাই চাঞ্চল্যকর, তন্মধ্যে দুইটী প্রধান। একটী 'সন্ধ্যা' সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আর একটী অরবিন্দর বিরুদ্ধে এবং সেই প্রসঙ্গে বিপিন পালের বিরুদ্ধে। উপাধ্যায় জবাবে বলেন—

I accept the entire responsibility of the paper. I don't want to take any part in the trial, because I don't believe that in carrying out my humble share of the God-appointed mission of Swaraj I am in any way accountable to the alien people who happen to rule over us and whose interest is and must necessarily be in the way of our national development.

রায় বাহির হইবার পূর্ব্বেই উপাধ্যায় হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করেন।

চিত্তরঞ্জন দাশ মোকদ্দমা পরিচালনা করেন। এখানেও সম্পূর্ণ অসহযোগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত পাই।

দ্বিতীয় মোকদ্দমা হয় অরবিন্দের বিরুদ্ধে। ১৯০৭ সনের ২৭শে জুন তারিখে লিখিত Politics for Indians and ২৮শে জুলাই লিখিত Jugantar case দুইটী প্রবন্ধের জন্য রাজদ্রোহের অপরাধে অরবিন্দ অভিযুক্ত হন। ম্যানেজিং ডিরেক্টার সুবোধ মল্লিকের সাক্ষ্য হওয়ার পরে সাক্ষীরূপে বিপিনবাবুরও তলব হয়।

এই সময়ে বিপিনবাবু ও তাঁহার অন্তরঙ্গ কয়েকজনের সঙ্গে অরবিন্দ বাবুদের একটু মতপার্থক্য দেখা দিয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। এ সম্বন্ধে বিপিনবাবু লিবার্টি কাগজে যে স্মৃতিকথা লিখিয়াছেন তাহার সারমর্ম্ম এই:—

"সোণার বাঙ্গলা" নামক একখানি পুস্তকে গুপ্ত হত্যাদির সমর্থন আছে। বিপিনবাবু তাহার তীব্র প্রতিবাদ 'বন্দেমাতরমে' করেন এই প্রতিবাদে নাকি অনেকেই বিপিনবাবুকে সমর্থন করে নাই। ইহার পরে নাকি অতঃপরে তাঁহার নাম সম্পাদক হিসাবে কাগজে স্থান পায় না, তবে তাঁহার প্রবন্ধ গৃহীত হইত।

আর একটী বিষয় উল্লেখযোগ্য। Capital-এর Max-এর কাছে কোন পদস্থ ব্যক্তি না কি বলিয়া আসিয়াছিলেন, "গরম গরম লেখা হয় পয়সা পাইবার জন্য।" তাই বিপিনবাবু অরবিন্দ প্রমুখ সমস্ত এডিটারদের পত্র লিখিয়াছিলেন। 'বন্দেমাতরম' আফিসে তল্লাসীতে এই পত্রখানি পাওয়া যায়। প্রমাণিত হইলে অরবিন্দবাবু সম্পাদক সাব্যস্ত হন। সুতরাং বিপিনবাবুর সাক্ষ্য হইলে অরবিন্দ জেলে যাইবেন, কাগজখানি উঠিয়া যাইবে এবং তাহাতে অগ্রগামী দল অত্যন্ত হীনবল হইয়া পড়িবে—এই আশঙ্কায় চিত্তরঞ্জনই বিপিন বাবুকে সাক্ষী স্বরূপে দণ্ডায়মান হইয়া হলপ লইতে নিষেধ করেন এবং যুক্তিতর্কে ইহাও সাব্যস্ত হয় যদি এই প্রথাবলম্বনে বিপিন বাবুর জেল হয়, দায়দাবী সমস্ত চিত্তরঞ্জনের।

* Quit India-র স্বরূপ এখানেও পাওয়া যায়।

যেদিন সাক্ষ্য দিতে যান (২৮শে আগষ্ট ১৯০৭) বিপিন পাল মহাশয়ের নির্ভীক উক্তিতে—I have conscientious objections to take part or swear in these proceedings and I refuse to answer any question in connection with the case আদালতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত সকলে নির্ব্বাক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। সাক্ষী না দেওয়ায় অরবিন্দ বাবু খালাস পান। কিন্তু আদালত অবমাননার মোকদ্দমায় বিপিন বাবুর ছয় মাস বিনাশ্রম জেল হয়।

এই ব্যাপারেও সমগ্র প্রদেশে একটা নবভাবধারা সঞ্চারিত হয়।

বিপিনবাবুর যেদিন জেলের হুকুম হয়, আদালতে অসম্ভব ভিড় হইয়াছিল। একজন শ্বেতাঙ্গ পুলিশ আসিয়া কয়েক জনকে ধাক্কা দিয়া ঘুষি মারে। সুশীলসেন নামে একটী পঞ্চদশবর্ষীয় বালক ঘুষি খাইয়া সেই মুহূর্ত্তেই তাহাকে ঘুষিটি ফেরত দেয় ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ডের আদেশে তাহার শাস্তি হয় পোনরটি বেত্রাঘাত। সে হাসিতে হাসিতে উহা দেহ পাতিয়া লয়—

আমায় বেত মেরে
কি মা ভুলাবে ?
আমি কি মা'র সেই ছেলে ?
আমার মান আপমান সবই সমান
দলুক না মোরে চরণ তলে।

১৯০৭ সনে রাওলপিণ্ডিতে দাঙ্গা হওয়ার দরুণ লাজপতরায় এবং সরদার অজিৎ সিংহকে স্থানান্তরিত করা হয় (deported) দেশের ভাবধারা যখন খুবই প্রচণ্ড, মডারেটরা নাগপুর হইতে সরাইয়া সুদূর সুরাটে অধিবেশনের স্থান নির্দ্ধারিত করিলেন, কেননা নাগপুরে তিলকের দল খুবই প্রবল। সুতরাং অগ্রগামী দলের ক্ষোভ ও উদ্দীপনা আরও বাড়িল। ইহার পরে জনশ্রুতিতে প্রকাশ পাইল কলিকাতা কংগ্রেসের 'স্বায়ত্ত শাসন, বয়কট, স্বদেশী ও জাতীয় শিক্ষা মূলক প্রস্তাব সেখানে উপস্থিত করিতে দেওয়া হইবেনা। ইতিমধ্যে সুরাটে যে স্থানীয় সম্মিলনীর অধিবেশন হয় তাহাতে বয়কট, স্বদেশী, জাতীয় শিক্ষা প্রভৃতি কোন প্রস্তাব উত্থাপিত হয় না, আর সেই সম্মেলন মেটার নেতৃত্বেই পরিচালিত হয়। বাঙ্গলার একদল লোক চাহেন একটী আলাদা কংগ্রেস করিতে, মাদ্রাজের চিদম্বরম পিলে খরচ বহন করিতেও প্রস্তুত হইলেন কিন্তু—তিলকজী কলিকাতা অগ্রগামীদলকে টেলিগ্রাম করিয়া শান্ত করিলেন "For Heaven's sake, No split". ভাঙ্গাভাঙ্গির কোন কাজ করিলে সর্ব্বনাশ হইবে।

যথা সময়ে অগ্রগামী দল সুরাটে গেলেন। অশ্বিনী দত্ত, অরবিন্দ ঘোষ, সুবোধ মল্লিক, সুরেন্দ্রনাথ, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতিও রওনা হইলেন।

কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশন পণ্ড হইয়া যায়। এই সম্বন্ধে একটু বিবরণ আবশ্যক।

৪ঠা ডিসেম্বর কলিকাতার জাতীয় দলের নেতাদের মধ্যে তিলকের উপদেশের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে একটী সভা হইল। চিত্তরঞ্জন, অরবিন্দ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, প্রভৃতি তিলকের সংগেই মত দিলেন। মফঃস্বলের সর্ব্বত্র কংগ্রেসে যাইতে অনুরোধ করিয়া চিত্তরঞ্জন, অরবিন্দ, কৃতান্ত বসু, কামিনীচন্দ্র ও সুন্দরী মোহন দাস-স্বাক্ষরিত পত্র প্রেরিত হইল।

ইহার পরের ঘটনা মেদিনীপুরের জিলা সমিতি। শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ও অরবিন্দ ঘোষ হথায় গিয়াছিলেন। উভয় দলে গোলমাল হয় এবং অগ্রগামীদল সভামণ্ডপ ছাড়িয়া অন্যত্র একটী সভা করেন, তাঁহারা সুরেন্দ্রনাথের ব্যবহারে অত্যন্ত উত্যক্ত, ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হন। সুরেন্দ্রনাথ পরে বলেন "লোকের মনে গভর্ণমেন্টের কার্য্যে যে অসন্তোষ উৎপাদিত হইয়াছে তাহাতে তারা আর নিয়মতান্ত্রিক উপায়ের পক্ষপাতী থাকিতে পারিতেছে না। তারা

রাসবিহারী ঘোষ

দেশের সেবায় অনুরাগী কিন্তু উপর্য্যুপরি নৈরাশ্যে এখন হাঙ্গাম-হুজ্জতি এবং বেআইনী কাজ করিতে তৎপর হইয়াছে। আর বয়স্ক উপরওয়ালাদের কথা শুনিতে আর তারা প্রস্তুত নয়—"

২৩শে ডিসেম্বর তিলক সুরাট পৌঁছিয়াই একটী বিরাট সভায় সুরাটবাসীর নিকট যাহাতে জাতীয়দলে সহায়তা পান ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন ২৪শে ডিসেম্বর সুরাটে জাতীয় দলের প্রতিনিধিগণকে লইয়া একটী পরামর্শ সভা হয়। অরবিন্দ ঘোষ হন সভাপতি। স্থির হয় যেন প্রস্তাব এমন না হয়, যাহাতে কংগ্রেস অগ্রগামী না হইয়া পশ্চাদপদ হইয়াছে এবং আবশ্যক হইলে সভাপতি নির্ব্বাচনের প্রস্তাবকে প্রতিবাদ করিতে

হইবে। ২৫শে ডিসেম্বর তিলক সকলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্থির করেন, যদি পূর্ব্ব বৎসরের মত স্বদেশী, বয়কট ও জাতীয় শিক্ষা বিষয়ে প্রস্তাব এবার হয় অর্থাৎ কংগ্রেসকে পশ্চাদ্‌গামী করা না হয় তবে সভাপতি নির্ব্বাচনে তাঁহারা বাধা দিবেন না। আর যদি তাহা না হয় তবে দিবেন। এই বিষয়ে লালা লাজপতরায় বিসম্বাদ মিটাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু কোন খবর না পাইয়া এবং প্রস্তাবের খসড়া কোনরূপে না পাইয়া ২৬শে প্রাতে তিলক, মতিলাল ঘোষ, অরবিন্দ প্রভৃতি সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করিলেন। তাঁহার অসম্মতি না থাকিলেও তিনি মালভী (অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি) ও গোখেলের সঙ্গে দেখা করিতে বলেন। কিন্তু তাঁহারা মালভীর সঙ্গে কিছুতেই দেখা করিতে পারিলেন না। মালভী নানা অজুহাতে তাঁহাদের সহিত দেখা করিতে বিরত রহিলেন। ২৬শে ডিসেম্বর কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। প্রতিনিধি ও দর্শকে প্রায় ৭০০০ লোকে মণ্ডপটি কানায় কানায় ভরিয়া গিয়াছিল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ত্রিভুবনদাস মালভী সকলকে অভিনন্দিত করিলে দেওয়ান বাহাদুর আম্বালাল সাকেরলাল দেশাই ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তাব করেন। মাদ্রাজের ডেলিগেটদের কেহ কেহ 'না, না' বলিলেও বিশেষ গোলমাল হয় না। অতঃপরে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সমর্থন করিতে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে জন ত্রিশেক লোক অত্যন্ত গোলমাল করিতে থাকে এবং অধিকাংশ লোক 'Order, Order' করিতে থাকায়, এত কোলাহল ও গোলমাল হয় যে সেদিনের মত অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অধিবেশন বন্ধ করিয়া দেন। এদিকে ২৬শে ডিসেম্বরই বৈকালে বেঙ্গলীর বিশেষ সংখ্যায় সভাপতির বক্তৃতা বাহির হয়। ইহাতে জাতীয় দলের আদর্শ সম্বন্ধে অনেক নিন্দাবাদ ছিল। কলিকাতা হইতে সেই পত্রেই টেলিগ্রাফে সুরাটে সেই কথা পৌঁছিলে অগ্রগামীদল আরও রুষ্ট ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠে।

এদিকে উভয় পক্ষের মধ্যে আপোষের চেষ্টা থাকিলেও, কার্য্যতঃ কিছুই হয় না। সুতরাং জাতীয়দলের নেতা তিলকই সভাপতি বরণে আপত্তি করিবেন স্থির হইল।

২৭শে ডিসেম্বর ১টার সময় আবার অধিবেশন আরম্ভ হইল। সুরেন্দ্রনাথ বিনা বাধায় বক্তৃতা করিলেন, মতিলাল নেহরু সমর্থন করিলেন, কিন্তু যাই ডাক্তার রাসবিহারী সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন তিলকজী অমনি প্লাটফরমের উপরে আসিয়া একটী সংশোধন প্রস্তাব (amendment) করিবেন বলিয়া বক্তৃতা করিতে লাগিলেন।

তিলক যতবারই কিছু বলিতে চান মালভী ও ডক্টর ঘোষ তাঁহাকে ততবারই বসিতে বলেন। অতঃপরে তাঁহাকে চলিয়া যাইতে বলা হয়, তিনি উত্তর করেন, আমার বলিবার অধিকার আছে। আমাকে জোর পূর্ব্বক সরাইয়া না দিলে আমি যাইবনা I won't move unless I am bodily removed" সেই সময় চারিদিক হইতে ভয়ানক গোলমাল সুরু হয়। তিলক যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন নিকটেই উপবিষ্ট ছিলেন, স্যার ফেরজশা মেটা ও সুরেন্দ্রনাথ। এমন সময়ে দূর হইতে একখানি পাদুকা নিক্ষিপ্ত হয়, উহা সুরেন্দ্রনাথকে ঘেঁসাইয়া মেটার উপরে গিয়া পড়ে। কে মারিল কোথা হইতে আসিল নির্দ্ধারণ করা কঠিন, অগ্রগামী দল বলে "প্রতিপক্ষ তিলকের দিকে উহা নিক্ষেপ করে। তাঁহার উপরে না পড়িয়া ঐ দুইজনের উপরে পড়িয়াছে।" মডারেটরা বলেন "ইচ্ছা করিয়া সুরেন্দ্রনাথের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। যে দলই করুক, কাজটি সমর্থনযোগ্য মোটেই নয়। সে সময়ে বহু পুলিশ উপস্থিত ছিল। শান্তি ভঙ্গের কারণ দেখিয়া তাহারা অধিবেশন বন্ধ করিয়া দেয়। তিলক যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা কংগ্রেসের ইতিহাসে অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু অন্য কোন উপায় আর ছিলনা। তবে যে সমস্ত বিশ্রী কাণ্ড অতঃপর অনুষ্ঠিত হয়, সে জন্য দুইদলই দায়ী, কিন্তু তিলকের উদ্দেশ্য ও কার্য্যে কোনরূপ দোষ দেওয়া যায় না। অতঃপর ১৯১৬ হইতে ১৯২১ পর্য্যন্ত যাবতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে তিলকই যে প্রধান ব্যক্তি ছিলেন তাহাতে মনে হয় ঐরূপ পন্থা অবলম্বিত না হইলে কংগ্রেসের পতাকা অবনমিত হইত।*

সমস্ত ঘটনা সুপ্রসিদ্ধ মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের বিবৃতি হইতে পাঠকের আরও ধারণা হইবে—

"The blame of the break-up of the Congress at Surat in December 1907 has been sought to be fastened on Mr. Tilak by his political opponents. But in this matter he did not take one step without consulting me. All that the Nationalists wanted the moderate leaders to do was either to withdraw some offensive expressions which the president elect had used towards them in one of his speeches at a meeting of the Viceregal Council * or to permit them to enter a protest against the same in the Congress. When this was propoeed the moderate leaders were furious. Sir Pherozeshah Mehta was specially intolerant in th's tone and behaviour when we made an attempt to compromise the matter and later on he refused to see Mr. Tilak when by appointment he went over to his place to have a further talk in this connection. The only course now left to the Nationalists was to record a formal protest against the election of a president who was not friendly to them at the time when he would be proposed to be elected. And Mr. Tilak gave a notice to the Chairman of the Reception Committee that he would move such a resolution.

If the legitimate request of the Nationalists were acceded to, everything could have passed peacefully for they were in a minoritly and the motion was bound to be defeated. But both party then lost the balance of their minds. Mr. Tilak was not permitted to move the resolution and he on his part was determined to do it and refused to leave the platform unless he was per-

* Memoirs of Motilal Ghose by Mr. Paramananda Dutt M.A, B.L. Page 17,

mitted to speak or removed by physical force. A number of men belonging to the Moderate Camp now lost all control over themselves, fell upon Mr. Tilak and began dragging him when a Marathi shoe meant some say for Mr. Tilak, while others aver, it was aimed at his enemies, struck Sir Pherozshah Metha and brushed Babu Surendranath Banerjee's face and added confusion to the scene. The more excited partisans of the rival parties then commenced to throw chairs at one another and the sitting of the Congress was suspended. The disturbance was over in ten or fifteen minutes.

Accompanied by Ray Yatindra Choudhry of Taki I then went to Tilak and made a request to take the whole responsibility on his shoulders. There was a sad smile in his face and he wrote a few lines to the effect, 'I undertake to take the responsibility of this unfortunate incident upon myself if the other party would agree to continue the Congress...Ponder the magnanimity and self-abnegation of the man. He cheerfully consented to humiliate himself between relentless enemies who would tear him to pieces if they could, though sincerely believing himself to be innocent

With this we ran to the moderate camp with a view to bring about a reconciliation, but we were simply howled out by the moderate leaders headed by Sir P. Mehta. They were all in high temper and it was impossible to reason with them.

রবীন্দ্রনাথ 'যজ্ঞভঙ্গ" প্রবন্ধে দুইপক্ষেরই দোষ সাব্যস্ত করিলেও বারবার বলিয়াছেন "বিরুদ্ধ পক্ষের সত্তাকে যথেষ্ট সত্য বলিয়া স্বীকার না করিবার চেষ্টাতেই এবার কংগ্রেস ভাঙ্গিয়াছে।...... চরমপন্থী বলিয়া যে একটা দল যে কারণেই হৌক দেশে জাগিয়া উঠিয়াছে একথা লইয়া আক্ষেপ করিতে পার কিন্তু ইহাকে অস্বীকার করিতে পারেনা। এই দলের ওজন কতটা তাহা বুঝিয়া তোমাকে চলিতেই হইবে কিন্তু যখন স্বয়ং সভাপতি মহাশয়ের মন্তব্যেও এই দলের প্রতি কটাক্ষপাত করা হইয়াছিল তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে তিনি নিজের বিরক্তি প্রকাশকেই*......

* ১৩১৪ প্রবাসী ১০ সংখ্যা মাঘ পৃঃ ৫৭০।

নূতন কেরাণী

শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত

সাপ্লাই অফিসের ঘড়িতে সাড়ে নটা বাজিয়া গেল। তখনও যে-সব কেরাণী অফিসে আসিয়া ঢুকিতেছিল তাহাদের চোখে মুখে আশঙ্কার চিহ্ন সুস্পষ্ট ভাবে জাগ্রত, বুঝিবা 'লেট' হইয়া গেল।

অফিস চার তলায়। নীচে সিঁড়ির কাছে ঘেঁসাঘেঁসি ভাবে দাঁড়াইয়া কয়েকটি কেরাণী 'লিফ্‌টে'র জন্য ব্যাকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিল। একটি যুবক কেরাণী হতাশ কণ্ঠে বলিল—"ইস্‌, আজকেও লেট হয়ে গেলুম দেখছি।"

দেয়াল ঘেঁসিয়া যে যুবকটি দাঁড়াইয়াছিল সে একবার অভ্যাসবশে হাত ঘড়িতে দৃষ্টি বুলাইয়া বলিল—কী যে মুস্কিল! ভোর না হতেই তো নটা বাজে। এর আগে আর আসা যায় কখনো?

ওধারের বয়স্ক কেরাণীটি চারদিকে একবার সতর্ক চক্ষু বুলাইয়া অপেক্ষাকৃত মৃদু কণ্ঠে বলিলেন—"যায় না বললেই শুনছে কে! নটায় 'এ্যাটেনডেনস্‌' হলেও না এসে উপায় ছিল না। দাসত্ব এমনি জিনিষ"!

'লিফ্‌ট' নামিতেই সকলে হুড়মুড় করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল।

একেবারে নটা পঁয়ত্রিশ পার হইয়া গিয়াছে। একজন আগাইয়া আসিয়া চাপা কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—'রেজিষ্টার কোথায়'?

—সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-এর ঘরে।

—এরি মধ্যে চলে গেছে। 'লেটমার্ক' হয়ে গেছে নিশ্চয়। উঃ! এত ছুটাছুটি করেও।—

কিছুক্ষণের মধ্যেই ত্রস্ত কেরাণীদের পদক্ষেপ, অভিযোগ ও প্রশ্নোত্তরের মৃদু গুঞ্জন আর ড্রয়ার টানা খোলার শব্দের মিলিত কোলাহল থামিয়া গেল এবং একটা প্রাণহীন নীরবতা আপনাকে চারিধারে ব্যাপ্ত করিয়া দিল। সকলে যন্ত্রচালিতের মত ড্রয়ার হইতে কাগজ কলম বাহির করিয়া এবং আলমারী হইতে ফাইল গুলি আনিয়া যথারীতি টেবিল সাজাইয়া বসিল।

ও পাশের সিনিয়র কেরাণীটি চশমার কাচ দুইটিকে বার দুই তিন রুমালে ঘসিয়া এবং তাহার নিম্নপদস্থ কেরাণীকুলের দিকে একবার অভিভাবকের দৃষ্টিতে তাকাইয়া একরাশ ফাইল পেপারের মধ্যে আপনাকে নিমজ্জিত করিয়া দিল।

দেয়ালের প্রকাণ্ড ঘড়িটা মৃদুশব্দে টিক্ টিক্ করিয়া

চলিতে লাগিল আর অতবড় ঘরের অতগুলি কেরাণী কেহ বা কাজ করিয়া এবং কেহ বা কাজের ভাণ করিয়া অফিস আওয়ারের সুদীর্ঘ সময়কে কোনোমতে হত্যা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

মাঝে মাঝে শুধু দুই চারিটি প্রয়োজনীয় 'অফিসিয়াল' কথা চলিতেছিল, একজন নিম্নপদস্থ কেরাণী একখানা কাগজ হাতে লইয়া 'সেকসনে'র তত্ত্বাবধায়ক মিঃ সেনের কাছে গিয়া সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিল—এ কাগজখানা কোন্ ফাইলে যাবে বলুন না।

মিঃ সেন কাগজপত্র হইতে মাথা না তুলিয়াই অতিশয় শুষ্ককণ্ঠে উত্তর করিলেন—ভাল করে দেখুন না কোন্ ফাইলে যাবে।

একটু থামিয়া কিছু দ্বিধা করিয়া ভয়ে ভয়ে প্রশ্নকর্ত্তা বলিল—ঠিক বুঝতে পারছি না।

অসীম বিরক্তিভরে মাথা তুলিয়া মিঃ সেন বলিলেন—দেখতে পাচ্ছেন না আমি ব্যস্ত আছি। পরে আসবেন।

মাথা নাড়িয়া সে চলিয়া গেল এবং ক্ষণবিলুপ্ত নীরবতা আবার সেই কক্ষমধ্যে আপনার অধিকার স্থাপন করিয়া নিল। টেলিফোন যন্ত্রের সাময়িক ধ্বনি এবং ব্যস্ত অফিসারদের দ্রুতগমনের ক্ষণিক শব্দ সে নীরবতার একটানা স্রোতকে কোন মতেই ব্যাহত করিতে পারিতেছিল না।

শরতের আকাশে লঘু মেঘমালা যেন পাখা মেলিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে আর তাহারই অন্তরাল হইতে সোনালী রোদের অনুগ্র আভা হাস্য-আকুল শিশুর মত ধরণীর বুকে আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। কিন্তু এখানে তাহাদের প্রবেশাধিকার নাই। শরতের সুষমা এখানে পথ খুঁজিয়া পায় না। বসন্তের আনন্দ এখান হইতে ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া যায়। এখানকার কেরাণীদের মন অসংখ্য ফাইল আর লেজার বুকের চাপে সূর্য্যালোকবঞ্চিত ঘাসের মত করুণ পাণ্ডুরতা ধারণ করিয়াছে।

একটি নবাগত যুবককে সঙ্গে লইয়া সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আসিয়া দেখা দিলেন। 'কেসিয়ার'কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—মিঃ ঘোষ, ইনি আজ থেকে মিঃ সামন্তের জায়গায় কাজ করবেন। চার্জ্জগুলো এঁকে সব বুঝিয়ে দিন। সকলেই একবার উদাসীনভাবে এই নূতন কেরাণীটির মুখের উপর দিয়া তাহাদের শীতল দৃষ্টি বুলাইয়া দিল। দীর্ঘ, কৃশ দেহাকৃতি দৃঢ়তায় গঠিত—কালো দুটি চোখের মাঝে যেন অজস্র খুসী জমাট বাঁধিয়া আছে।

অনতিবিলম্বেই 'এসটাব্লিসমেণ্ট' সেক্‌সন হইতে একটি কেরাণী কতগুলি 'ফরম' হাতে লইয়া তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। অভ্যস্ত ভঙ্গীতে বলিল, নিন্ এগুলো 'ফিল আপ' করে দিন 'কাইণ্ডলি'। নামটি কী আপনার?

সুদীপ গাঙ্গুলি।

এর আগে আপনি কোথায় কাজ করতেন মিঃ গাঙ্গুলি?

কোথাও নয়। কিন্তু আমাকে তো নাম ধরেই ডাকতে পারেন।

অফিসে তো কাউকেই নাম ধরে ডাকা হয় না।

ঈষৎ হাসিয়া সুদীপ বলিল—কেন, এ সম্বন্ধেও কি গভর্ণমেণ্টের কোন আইন আছে নাকি?

তা নয়, এ একটা ভদ্রতা।

নাম না বললেই ভদ্রতা বেশী করা হয়—এ আবার কী রকম ধারণা?

যাক্ গে ওসব কথা। আপনি একটু তাড়াতাড়ি এই ফরম্‌গুলোর কাজ সেরে দিন প্লিজ্। আমি খানিক পরে এসে নিয়ে যাচ্ছি।

ফরম লিখতে লিখতে নিজের অজান্তেই সুদীপ এক সময় গুণ গুণ করিয়া গান ধরিল। মনের অকারণ খুসীকে সে যেন আর ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিল না, নানাভাবে তাহা উপছাইয়া পড়িবার পথ খুঁজিতেছিল।

রকম দেখিয়া পাশের কেরাণীটী অবাক হইয়া গেল—পাগল না কি! চাপাকণ্ঠে বলিল—একি করছেন আপনি! থামুন।

চোখ তুলিয়া সুদীপ বলিল—আমি তো খুব আস্তে গাইছি। এতে তো আপনার ব্যাঘাত হবার কথা নয়।

—ব্যাঘাতের জন্যে কি বলছি! যদি কেউ শুনতে পায়! আপনি বুঝি এই প্রথম কেরাণীর কাজে ঢুকলেন?

—হ্যাঁ, তাই সব কিছুই কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকছে।

অফিসে গান গাওয়া যে আপত্তিজনক এটা বুঝি আপনার কাছে খুব অদ্ভুত বলে মনে হয়?

না তা নয়। আপত্তির যে কোনো কারণ ঘটে না এটাই অদ্ভুত মনে হয়।

আরও কিছুক্ষণ আলাপ চালাইবার আশা করিয়াছিল সুদীপ, কিন্তু অপরপক্ষ আর বেশী অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। কে কোথা হইতে শুনিতে পাইবে কে জানে! এখানকার চেয়ার টেবিলগুলিরও না কি কান আছে, তাই সে ফাইলগুলির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহাদের সঙ্গে অত্যধিক ঘনিষ্টতা স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিল।

একটু বাদেই মিঃ সেন আসিয়া সুদীপকে কাজ বুঝাইয়া দিয়া গেলেন। বলিলেন—এসব কাজের জন্যে কিন্তু এখন থেকে আপনিই responsible হবেন। যেটা না বুঝবেন জিজ্ঞেস করে নেবেন। প্রথমে একটা কাজ করুন আপনি। এ ফাইলটাতে 'পেজমার্ক' নেই। আগে তাই করে নিন।

সুদীপ অবাক্ হইয়া গেল। পেজমার্ক দিবার কাজের জন্য গ্রাজুয়েট কেরাণীর কি প্রয়োজন ছিল সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই নির্দ্দিষ্ট কাজ শেষ করিয়া সে মিঃ সেনের কাছে গিয়া অন্য কাজ চাহিল।

মিঃ সেন বিস্ময়াপন্ন হইলেন। কেরাণী যে আবার যাচিয়া কাজ করিতে চায় সে অভিজ্ঞতা তাঁহার এই প্রথম। অত্যন্ত গাম্ভীর্য্যের সহিত কতকগুলি পেপার তিনি সুদীপের দিকে আগাইয়া দিলেন, বলিলেন,—এগুলো ফাইল করুন গে। 'ডেট্' অনুযায়ী ফাইল করবেন আর 'পেজমার্ক' ও 'রেফারেন্‌স্'গুলো ঠিক করে দেবেন।'

সুদীপ স্পষ্ট কণ্ঠে বলিল,—'ভাল করে বুঝিয়ে না দিলে কিছুই বুঝতে পারছিনে। বিরক্তি প্রকাশ করিয়া মিঃ সেন বলিলেন—ফাইল করতে জানেন না? কী আশ্চর্য্য! বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া সুদীপ বলিল—কখনো কি করেছি যে জানব? আপনাদের মত অভিজ্ঞ কেরাণী তো আমি নই!

সুদীপের কথার প্রচ্ছন্ন শ্লেষটুকু মিঃ ঘোষ ধরিতে পারিলেন কি না বোঝা গেল না। তিনি শুধু বলিলেন—ভাল করে বুঝিয়ে দেবার সময় আমার এখন নেই। আপনি এই পেপারগুলো নিয়ে বসে নাড়াচাড়া করুন গে।

বিস্মিত সুদীপ বলিল—নাড়াচাড়া করলে কী কাজ হবে?

মিঃ সেন ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ধমকের সুরে বলিলেন—আপনি ভারী ছেলেমানুষ! কোনোমতে খানিকটা সময় কাটিয়ে দিন গে যান।

সুদীপ আর কিছু বলিল না। নিজের জায়গায় ফিরিয়া গিয়া কাগজগুলিকে চাপা দিয়া রাখিল, তারপর সামনের বারান্দায় বাহির হইয়া গেল।

বারান্দায় দাঁড়াইয়া একটী যুবক ধূমপান করিতেছিল। সুদীপ তাহার কাছেই আগাইয়া গেল। ছোট্ট একটী নমস্কার করিয়া বলিল—আমার নাম সুদীপ গাঙ্গুলি—এ অফিসের নতুন কেরাণী। আপনার পরিচয় জানতে পারি কি?

সুদীপের এই অভিনব আলাপের ভঙ্গিতে সে আকৃষ্ট হইল। বলিল—আমার নাম রামেন্দু মিত্র, আমি একজন টাইপিষ্ট এখানকার। আপনি বুঝি গ্রাজুয়েট?

সুদীপ বলিল—এম, এ-টাও পড়েছিলাম দু'বছর। টাকার অভাবে পরীক্ষাটা আর দেওয়া হয়নি।

—এত পড়াশুনো ক'রে শেষকালে কেরাণীর কাজে ঢুকলেন! রামেন্দুর কথায় কেমন একটা করুণার ছোঁয়াচ। সুদীপ স্বচ্ছন্দে বলিল—কেন, কেরাণীগিরিটা খারাপ কিসে?

—কী যে বলেন! এ রকম বিশ্রী কাজ আর আছে!

সুদীপ হাসিয়া ফেলিল, বলিল—দেখুন, কেরাণীগিরিকে খারাপ বলা আমাদের একটা সংস্কার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার তো মনে হয় পরাধীন জাতির পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ ও সুবিধাজনক কাজ হচ্ছে এই কেরাণীগিরি।

অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া রামেন্দু বলিল—কেরাণীগিরির প্রশংসা আপনার মুখেই প্রথম শুনলুম।

এমন সময় কেরাণীরা সব কাগজকলম ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। ঘড়িতে একটা বাজিয়াছে, এখন তাদের লাঞ্চের সময়। দু'তিনটী যুবক আসিয়া সুদীপ ও রামেন্দুকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। একটী সিনিয়র কেরাণী সুদীপকে লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিলেন—এখানকার কাজকর্ম্ম কেমন লাগছে আপনার?

—মন্দ কী! সুদীপ জবাব করিল।

—কয়েকটা দিন কাটুক আগে, তারপর বুঝবেন কেরাণীর কাজ কী ভয়ানক জিনিষ। এ কাজে না আছে আনন্দ—না আছে কোনো প্রাণ।

সুদীপ বলিল—কাজে আনন্দ থাকে না—কাজকেই আনন্দে ভরে তুলতে হয়। আমাদের মনেই নেই আনন্দ, কারণ কেরাণীগিরি সম্বন্ধে আমাদের একটা অহেতুক ভীতি আছে। কেরাণীগিরি করেও যে মানুষের জীবনে যথেষ্ট আনন্দের অবকাশ থাকা সম্ভব একথা আমরা ভাবতেও পারিনে।

রামেন্দু বলিল—কল্পনা করতে ভালই লাগে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে কোথায় সে অবকাশ?

সুদীপ বলিল—আচ্ছা, লাঞ্চের জন্যে আপনারা কতটা সময় পেয়ে থাকেন?

—এক ঘণ্টা।

—টিফিন করতে এক ঘণ্টা কারুই দরকার হয় না। বাকী সময়টা আপনারা কী করে কাটান?

—গল্পগুজব করে।

—সে গল্পও বোধ হয় অফিস আর ফাইল সম্পর্কেই। কিন্তু আমাদের যদি একটী recreation room থাকে—সেখানে যদি থাকে ছোটখাট একটী লাইব্রেরী—ক্যারম বা ঐ জাতীয় দু' একটী খেলার সরঞ্জাম—তা ছাড়া খানকয়েক খবরের কাগজ আর একটী রেডিও, তাহলে আমাদের এই এক ঘণ্টার সময়টুকু কেমন সুন্দর করে তোলা যায় বলুন তো!

কে একজন ঈষৎ শ্লেষের সুরে বলিল—কল্পনাটী মনোরম সন্দেহ নেই।

সুদীপ বলিল—কল্পনা নয়, আইডিয়া (Idea)। আইডিয়াকে কাজে পরিণত করতে না পারলেই তা কল্পনা

হয়ে দাঁড়ায়। আপনারা কি কখনো এজন্যে চেষ্টা করেছেন? কখনো কি আবেদন করেছেন গভর্ণমেণ্টের কাছে?

—আপনি বুঝি মনে করেন, গভর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন করেই আমরা সব কিছু পেয়ে যাব?

—কেনই বা মনে করব না। সাধারণ শ্রমিক ও মজুররা পর্যন্ত নিজেদের জন্যে যে সুবিধাটুকু ছিনিয়ে আনতে পেরেছে, আমরা শিক্ষিত কেরাণীরা কি সেটুকুও পারব না? আর যদিই বা তা সম্ভব না হয়, নিজেরা চাঁদা করেও তো অমনি একটা ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্তু কোথায় আমাদের উৎসাহ আর কোথায় বা আন্তরিকতা।

রামেন্দু বলিল—'প্ল্যান'টা তো খুবই সুন্দর। আপনি একবার চেষ্টা করে দেখুন না মিঃ গাঙ্গুলি।

সুদীপ উত্তর করিল,—এ সব বিষয়ে একার চেষ্টায় কোনোই ফল হয় না। সে যাই হোক, এবারে কিছু খেয়ে আসা যাক্ চলুন। তর্ক করায় লাভ কিছু নাই হোক্, ক্ষতি হয় ঢের, খিদেটা বড্ড বেশী পায়। কেরাণীর পক্ষে এটা কি কম বিপদের কথা!

পরদিন শনিবার, সুদীপ অফিসে আসিল প্রায় দশ মিনিট লেট করিয়া। উপরে আসিয়া সে দু'ধারের কেরাণীদের প্রতি সরবে নমস্কার বিতরণ করিতে করিতে অগ্রসর হইল। সকলের মুখেই একটা চাপা হাসির ঈষৎ আভা জাগিয়া উঠিল। কী অদ্ভুত এই ছেলেটী। অফিসকে সে স্বচ্ছন্দে মানিয়া নিয়াছে, কিন্তু অফিস ইহাকে মানিয়া লইতে পারে নাই। নিজে কেরাণী হইয়া এবং কেরাণীদের মধ্যে থাকিয়াও যেন এই মানুষটি তাহা হইতে কত স্বতন্ত্র।

হঠাৎ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। ভারিক্কী গলায় তিনি প্রশ্ন করিলেন—আপনার এত 'লেট' হল যে?

আশপাশের কেরাণীরা সুদীপের জন্য শঙ্কিত হইয়া উঠিল, কিন্তু সুদীপ অনায়াসে হাসিয়া বলিল—ট্রামের জন্যে পনেরো মিনিট রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। উঃ! আজকাল ট্রামবাসের কী অবস্থা দেখেছেন? আপনি তো বুঝি Car-এ আসেন।

সুদীপের কথার ধরনে সুপারিন্‌টেনডেণ্ট অবাক হইলেন। ভাবিলেন যে কেরাণীটি নিতান্ত নূতন বলিয়াই অফিসের হালচাল এখনো শেখে নাই। কাহার সাথে কোন্ সুরে কথা বলিতে হয়, তাহা ইহার নিতান্তই অজানা। যথাসম্ভব গম্ভীর কণ্ঠে তিনি বলিলেন—ওসব ওজর গভর্ণমেণ্ট শুনবে না।

সুদীপ তেমনি হাসিমুখে বলিল—শুনবে, যদি আপনারা আমাদের হ'য়ে শোনান।

মনে মনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সুপারিন্‌টেনডেণ্ট বলিলেন—বাজে কথা শুনবার আমার সময় নেই। আমি চাই, ভবিষ্যতে আপনি আর কখনো লেট হবেন না—বলিয়া কোন উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই তিনি নিজের ঘরের দিকে সবেগে প্রস্থান করিলেন।

কেরাণীরা এতক্ষণ তটস্থ হইয়া বসিয়াছিল। সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট দৃষ্টির অগোচর হইতেই আসিয়া সুদীপকে ঘিরিয়া ধরিল। বলিতে লাগিল—ছিঃ ছিঃ! কী কাণ্ড করলেন মিঃ গাঙ্গুলি! আপনার জন্যে না আমাদের শুদ্ধ চাকরী যায়।

সুদীপ বিস্মিত হইয়া বলিল—কেন, আমি অন্যায় কথা কী বলেছি?

রামেন্দু বলিল—আপনি সত্যি কথাই বলেছেন মিঃ গাঙ্গুলি। কিন্তু অফিস তো সত্য কথা চায় না, মিষ্টি কথা চায়।

সুদীপ তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল—এ জন্যে দায়ী কে? —আমরাই তো। অত্যধিক মিষ্টি দিয়ে আমরাই এদের লোলুপ করে তুলেছি।

ও-পাশের সিনিয়র কেরাণী মিঃ চন্দ উঠিয়া আসিয়া বলিলেন—দেখুন, আপনারা এমনিভাবে জটলা করবেন না। এক্ষুনি অফিসারদের কেউ ঘর থেকে বেরিয়ে পড়বে, —তাহলেই আবার মুস্কিল হবে।

কথাটা সত্য। তাই একে একে সকলেই সরিয়া পড়িল।

দুইটা বাজিবার দু'এক মিনিট আগে রামেন্দু আসিয়া সুদীপকে বলিল—এ কি মিঃ গাঙ্গুলি? আপনি এখনো ফাইল-টাইলগুলো গোছাননি যে! আজ শনিবার যে দুটোয় ছুটি।

আনন্দে ছিট্‌কাইয়া উঠিয়া সুদীপ বলিল—তাই না-কি? আমি তো জানতুমই না। কিন্তু ছুটির পরে কী করা যাবে?

রামেন্দু বলিল—আপনার বুঝি সেই ভাবনা হল। বাড়ী গিয়ে একটি লম্বা ঘুম দিন না। মৃদু হাসিয়া সুদীপ বলিল—ঘুমিয়ে সময় কাটানো যেন জল খেয়ে খিদে দূর করার মত। ওতে কী আনন্দ আছে! তার চেয়ে চলুন সিনেমায় যাওয়া যাক্।

রামেন্দু দ্বিধাপূর্ণ কণ্ঠে বলিল—যেতে তো পারতুম। কিন্তু আমার কাছে যে পয়সা নেই।

—আপনার কাছে নেই, আমার কাছে তো আছে। কিন্তু আরো কয়েকজনকে জোটাতে হবে। দল বেঁধে না গেলে কি আনন্দ হয়।

তারপর সুদীপ নিজেই তিন চারিটি কেরাণীকে এক রকম জোর করিয়া সঙ্গে লইয়া যখন ছোট একটি দল বাঁধিয়া হাসি হল্লা করিতে করিতে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিতে লাগিল, তখন বড় সাহেব অবধি কৌতূহলী হইয়া

একবার উঁকি না দিয়া পারিলেন না। অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—চল্লিশ টাকার কেরাণীরা এত আনন্দ পাইল কোথা হইতে!

অফিসের আবহাওয়ায় যে একটা বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন আসিয়াছে, তাহা কাহারই চক্ষু এড়াইল না। বহুদিনকার গুমোট ভাঙ্গিয়া সহসা যেন দক্ষিণ হইতে একটা মাতাল হাওয়া জাগিয়াছে। তাহার ছোঁয়াচে নিশ্চল বৃক্ষগুলি আজ পুলক-চঞ্চল।

কেরাণীকুলের মধ্যে একটা মধুচক্র গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার কেন্দ্রস্থল সুদীপ। সুদীপ যে শুধু নিজেই আনন্দ-ভরা তাহা নয়, তাহার পরিবেশকেও সে আনন্দমুখর করিয়া তোলে। টিফিনের ছুটিতে এক ঘণ্টার অবসরে তাহারা প্রায়ই দল বাঁধিয়া বাহির হইয়া পড়ে এবং একটা নির্জ্জন স্থান বাছিয়া লইয়া গল্প-গানে, হাস্য পরিহাসে মত্ত হইয়া ওঠে। মিঃ সান্যাল চমৎকার গান গায়, সুদীপের অনুরোধে তাহাকে রোজই গান শুনাইতে হয়। সুদীপ বলে—মিঃ সান্যালকে আমিই আবিষ্কার করেছি। এর মধ্যের কেরাণীটিকেই তোমরা চিনতে, আমি এর মাঝের শিল্পীকে চিনিয়েছি।

রবিবারে বা ছুটির দিনে সুদীপ সকলের নিকট হইতে চাঁদা তোলে এবং দল বাঁধিয়া কখনো ডায়মণ্ড হারবারে, কখনো বোটানিক্যাল গার্ডেনে, কখনো বা দক্ষিণেশ্বরে পিকনিক করিয়া বেড়ায়। অফিস আওয়ারের সুদীর্ঘ সময়ের মাঝেও সে আনন্দ দিবার ও নিবার প্রচুর অবসর করিয়া লয়। কখনো নিজে চা আনাইয়া সকলকে বিতরণ করে, কখনো বা অপরের চা জোর করিয়া খায়। কোনোদিন অপরের মানিব্যাগ বা রুমাল লুকাইয়া রাখিয়া তাহাকে অকারণে ব্যতিব্যস্ত করে, কখনো বা নিজের জিনিষ অপরের দেরাজে রাখিয়া তাহাকে চুরির অপরাধে অভিযুক্ত করে। সুদীপের নিতান্ত ছেলেমানুষীগুলিও সকলের কাছে উপভোগ্য হইয়া দাঁড়ায় এবং তাহাদের মনে হয়, কেরাণীগিরির হীনতাকে এই ছেলেটি যেন এক অপূর্ব্ব মর্য্যাদায় ভরাইয়া তুলিয়াছে। নিজেদের পানে চাহিয়াও তাহারা বিস্মিত হইয়া যায়। এতদিনকার একটানা কর্ম্মপাশ-জর্জ্জরিত কেরাণী-জীবন ছাপাইয়া তাহাদের মাঝে এই নূতন সুন্দর সুস্থ জীবন আত্মপ্রকাশ করিল কোথা হইতে?

কেরাণীদের মনের ভাব যাহাই হউক, অফিসারগণ কিন্তু শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন, ইদানীং অফিস-ষ্টাফ-এর মধ্যে এই প্রাণ-চাঞ্চল্যকে তাঁহারা মোটেই সুনজরে দেখিলেন না এবং ভবিষ্যতে অফিসের 'ডিসিপ্লিন' ভঙ্গ হইবার দুর্ভাবনায় তাঁহারা সুদীপের উপর মনে মনে নিতান্ত অপ্রসন্ন হইয়া উঠিলেন।

ক্রমে পূজা আসিয়া পড়িল। অফিস ছুটি হইবার আর তিন চারিদিন বাকী। সে দিন এস্টাব্লিস্‌মেণ্ট সেক্সন হইতে মিঃ পালিত একটা লম্বা ফর্দ্দ লইয়া সুদীপের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

কৌতূহলী সুদীপ জিজ্ঞাসা করিল—এ কিসের ফর্দ্দ?

আফিস ষ্টাফের নামের লিষ্ট। পূজোয় তো আমরা সকলেই পিয়নদের কিছু বক্‌শিস্ দিয়ে থাকি। তাই সেটা আলাদা আলাদা না দিয়ে আমরা প্রত্যেকবার এমনি করে সকলের কাছ থেকে 'কলেক্ট' করি। তারপর পিয়নদের মধ্যে সমান ভাগ করে দেই। এতে বক্‌শিসটা সবাই পায় এবং সমানভাবে পায়।

স্কীমটা ভালই। এই নিন, আমি দু'টাকা দিচ্ছি। কিন্তু আপনি একা একা কতক্ষণ ধরে এ কাজ করবেন। আমাকেও লিষ্টের একটা 'পোরসান' দিন না, আপনাকে সাহায্য করি।

সে তো ভালই হোতো, কিন্তু আপনি কাজ ফেলে গেলে মিঃ সেন যদি কিছু বলেন।

সুদীপ বলিল, বলবেন কী করে! আমাকে তো 'রুটীন ওয়ার্ক' দেওয়া হয় নি, কাজের 'রেস্‌পন্‌সিবিলিটি' (responsibility) দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এ কাজের দায় এখন আমার, মিঃ সেনের নয়।

কাগজপত্রগুলি চাপা দিয়া সুদীপ উঠিয়া পড়িল।

দু'দিনের মধ্যেই বক্‌শিসের টাকা সংগ্রহ করা শেষ হইল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের 'থ্রু'তেই পিয়নদের মধ্যে বক্‌শিস ভাগ করিয়া দেয়া হয়। তাই টাকাগুলি সব তাহার কাছেই জমা রাখা হইল।

পরদিন সকালে অফিসে আসিতেই সুদীপ অফিসের আবহাওয়ায় চাঞ্চল্যের আভাস অনুভব করিল। এক কোণে দাঁড়াইয়া তিন চারিটি কেরাণী জটলা করিতেছিল, সুদীপ কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ব্যাপার কি বলুন তো!

মিঃ বোস্ বলিলেন, ব্যাপার গুরুতর। বড় সাহেবের ঘর থেকে টেবিল-ক্লকটা চুরি গেছে।

মিঃ ব্যানার্জ্জি বলিলেন, এবারে দারোয়ান আর পিয়ন বেচারীদের নিয়ে মস্ত টানাটানি সুরু হবে।

বুঝিতে না পারিয়া সুদীপ বলিল, কেন? তাদের অপরাধটা কী?

—দারোয়ানেরা এখানে পাহারায় থাকে, আর উপরের ঘরে পিয়নগুলো সব ঘুমায়। সুতরাং কিছু চুরি গেলে তাদেরই সব ঝক্কি পোয়াতে হয়।

কথাটা খুবই সত্য। কিছুক্ষণের মধ্যেই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ঘরে পিয়নদের ঘন ঘন যাওয়া আসা এবং তাহাদের শঙ্কিত মুখের ছবি দেখিয়া সুদীপ তা অনায়াসে

বুঝিতে পারিল। একটু পরেই সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের ঘরে সবগুলি দারোয়ান ও পিয়নের এক সাথে ডাক প'ড়িল এবং ক্রুদ্ধ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের উত্তেজিত কণ্ঠ এবং মাঝে মাঝে অভিযুক্তদের করুণ আবেদনের সুর শোনা যাইতে লাগিল।

বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে পিয়নের দল যখন বাহিরে আসিল, তখন সুদীপ তাহাদের কয়েকজনকে একপাশে ডাকিয়া নিয়া জিজ্ঞাসা করিল—সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব কী বলছিলেন ?

সীতানাথ বলিল—তিনি বললেন, বড় সাহেব নাকি হুকুম দিয়েছেন যে, এই চুরি ধরিয়ে দিতে না পারলে তিনি আমাদের পুজোর বক্‌শিস বন্ধ করে দেবেন। এ কী রকম মরজি দেখুন তো!

রহমৎ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল—ওঁদের বিশ্বাস, আমাদের মধ্যেই কেউ এ কাজ করেছে। যদি করেও থাকে, সেটা সকলের দোষ নয়। একজনের দোষে সকলকে শাস্তি দেওয়া এই বা কী বিচার হল! আপনারা পাঁচজন এর একটা কিনারা করুন বাবু।

সুদীপ বলিল—আচ্ছা, তোমরা যাও, দেখি ব্যাপারটা কতদূর গড়ায়।

টিফিন আওয়ারেই ব্যাপারটা নিয়া কেরাণী-মহলে জোর আলোড়ন সুরু হইল। রামেন্দু ছুটিয়া আসিয়া সুদীপকে বলিল, দেখুন তো মিঃ গাঙ্গুলি, এ কী রকম অত্যাচার। বড় সাহেবের ঘড়ি চুরি হয়েছে বলে পিয়নদের বক্‌শিস বন্ধ। এ যে দস্তুর মত স্বেচ্ছাচার।

মিঃ সামন্ত বলিলেন, ঘড়ি চুরি হয়েছে, পুলিসে খবর দাও, আমাদের দেওয়া বক্‌শিসের টাকা বন্ধ করে দেবার কী অধিকার আছে ?

সকলের দিকে তাকাইয়া সুদীপ বলিল, আপনারা কী করতে চান বলুন।

এমন একটা প্রশ্ন যে উঠিতে পারে, তাহা কেহই কল্পনা করে নাই। বড় সাহেবের অন্যায় হুকুম লইয়া অপ্রকাশ্যে আলোচনা চলিতে পারে, কিন্তু প্রকাশ্যে তাহার বিরুদ্ধে কিছু করিবার স্বপ্নও কেহ দেখে না।

রামেন্দু বলিল, এ ব্যাপারের তীব্র প্রতিবাদ করা উচিত, কিন্তু সে জোর আমাদের কোথায়!

সুদীপ বলিল, আপনারা কেউ না করলে এ কাজ একা আমাকেই করতে হবে।

বড় সাহেব লাঞ্চ সারিয়া সবে তাঁহার কামরায় গিয়া ঢুকিয়াছেন, সুদীপ গিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল।

চোখ তুলিয়া সাহেব বলিলেন, কে তুমি? কী চাও ?

সুদীপ বলিল, আমি আপনার একজন নূতন কেরাণী, আমার কিছু বলবার আছে।

সংক্ষেপে বল।

শুনলুম আপনার ঘড়ি চুরি হয়েছে বলে আপনি দারোয়ান পিয়ন সকলের বক্‌শিস্ বন্ধ করে দিয়েছেন।

হ্যাঁ, তারপর।

কে চুরি করেছে তার যখন কোন প্রমাণ নেই, তখন বক্‌শিস্ বন্ধ করে দিলে গরীব লোকদেরই শুধু ক্ষতি করা হবে। আপনি দয়া করে এদের বকশিস্‌টা দিয়ে দেবার হুকুম দিন।

ভাল। দেখ্‌ছি তুমি আমাকে কাজের নির্দ্দেশ দিতে এসেছ।

---আপনাকে কাজের নির্দ্দেশ দেবার ধৃষ্টতা আমার নেই। তবে বক্‌শিসের টাকাগুলো যখন আমাদের, তখন সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করবার অধিকার আমাদের নিশ্চয়ই আছে।

কোনো লাভ নেই। আমি যখন হুকুম দিয়েছি তখন বক্‌শিস্ ওরা নিশ্চয়ই পাবে না। তুমি এবার যেতে পার।

সুদীপ চলিয়া গেল না, বলিল---আমার আর একটী মাত্র কথা বলবার আছে।

যদি এদের বকশিস্ না দেওয়াই স্থির হয়, তা'হলে আমাদের টাকাগুলো আমাদেরই ফিরিয়ে দেবার হুকুম দিন।

এক মিনিট কী ভাবিয়া সাহেব বলিলেন---তা' হ'তে পারে। ভাল, আমি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্‌কে এ বিষয়ে বলে দেব।

ধন্যবাদ জানাইয়া সুদীপ বাহির হইয়া আসিল।

কেরাণীরা সকলেই এতক্ষণ রুদ্ধনিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা করিতেছিল। সুদীপ আসিতেই বারান্দায় গিয়া সকলে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

সুদীপ বলিল---আমাদেরই জিত হয়েছে বলা চলে। টাকাটা আমাদের ফিরিয়ে দেবার আবেদন জানিয়েছিলুম, সাহেব তা মঞ্জুর করেছেন।

রামেন্দু বলিল—তাতে কী লাভ হ'ল ?

কৃতিত্বের হাসি হাসিয়া সুদীপ বলিল—বাঃ! এটুকু বুঝতে পারছেন না। টাকা ফিরে পেলে আমরা সেগুলো পিয়নদেরই ভাগ করে দেবো। বক্‌শিস্ ওরা যেমন পেতো তেমনি পেয়ে যাবে।

সকলে উল্লসিত হইয়া বলিল—সত্যিই তো। এ আইডিয়া যে আমাদের কারু মাথায়ই আসে নি। কিন্তু বড় সাহেব যদি জানতে পান।

মিঃ বোস্ বলিলেন—কী করে আর জানবেন। আমরা কেউ বলতে যাচ্ছি না। পিয়নরাও কেউ বলবে না নিশ্চয়।

টাকা ফিরিয়া পাওয়া গেল এবং সুদীপের অনুরোধে তাহা পিয়নদের বক্শিসের কাজেই ব্যয়িত হইল। গরীব বেচারীরা সকলেই খুসী হইয়া সুদীপকে বার বার কৃতজ্ঞতা জানাইল।

যেমন করিয়াই হউক কথাটা বড় সাহেবের কানে গেল এবং কেরাণীদের এই দুঃসাহসিকতায় তিনি যেমনি বিস্মিত তেমনি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন। সেদিনকার সেই নূতন কেরাণীটাই এই ব্যাপারের নায়ক এবং এজন্য শাস্তিও তাহারই পাওয়া উচিত।

সুদীপকে ডাকাইয়া গম্ভীরকণ্ঠে তিনি বলিলেন—তোমরা আমার হুকুম অমান্য করে পিয়নদের বক্শিস্ দিয়েছ?

সুদীপ নির্ভীককণ্ঠে বলিল—তারা গরীব বলে আমরা তাদের সাহায্য করেছি।

সাহেব বলিলেন—একই কথা, আমি শুনেছি তুমিই সকলকে একাজে উৎসাহিত করেছ।

সুদীপ বলিল—আপনি ঠিকই শুনেছেন।

সুদীপের নির্ভীকতায় সাহেব বিস্মিত হইলেন, বলিলেন—এ বিষয়ে তোমার কিছু কৈফিয়ৎ দেবার আছে?

সুদীপ স্পষ্টকণ্ঠে বলিল—কাউকে সাহায্য করাটা ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এ বিষয়ে কোনো কৈফিয়ৎ থাকতে পারে না।

সাহেব বলিলেন---আমি তোমায় পনেরো দিনের নোটিশে কাজ থেকে বরখাস্ত করলুম।

সুদীপ যেন এজন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল। ঈষৎ হাসিয়া বলিল – ধন্যবাদ। আমি আজই কাজ ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

সকলেই শোকাচ্ছন্ন মনে সুদীপকে বিদায় দিল। সকলের অপরাধকে সুদীপ নিজের ঘাড়ে টানিয়া নিয়াছে বলিয়া উহার প্রতি তাহাদের যেন আর কৃতজ্ঞতার শেষ নাই। ইহারা নিরুপায় কেরাণা। অন্যায়কে অন্যায় বলিয়া বুঝিলেও তাহার প্রতিবাদ করিবার শক্তি ইহাদের নাই, কিন্তু সে শক্তি যাহার আছে তাহাকে শ্রদ্ধা করিবার মত মহত্বটুকু ইহাদের জীবন হইতে আজও মুছিয়া যায় নাই।

রামেন্দু বলিল—আপনি কেরাণী-জীবনকে একটা নূতন দৃষ্টিতে দেখতে শিখিয়েছেন সুদীপবাবু। এই আমাদের সবচেয়ে বড় লাভ।

মিঃ বোস বলিল—আমাদের ক্ষমা করবেন মিঃ গাঙ্গুলি। আপনার দুর্ভাগ্যের জন্য তো আমরাও দায়ী।

সুদীপ হাসিমুখে বলিল—একে দুর্ভাগ্য বলে কেন ভাবছেন। এমনি একটা কাজ আবার আমি সংগ্রহ করে নিতে পারব।

সুদীপের পায়ের শব্দ সিঁড়ি বাহিয়া ধীরে ধীরে নীচে মিলাইয়া গেল। নিজের কামরায় বসিয়া বড়সাহেবের চোখ দুইটা জ্বালা করিতে লাগিল। তিনি আজ পরাজিত, সামান্য একজন কেরাণীর কাছে, অতি লজ্জাজনক ভাবেই পরাজিত। বিপক্ষের প্রতি নিষ্ঠুরতম শাস্তিও তাঁহার এ পরাজয়কে চাপা দিতে পারিবে না। চেয়ারটার উপর গা এলাইয়া দিয়া তাঁহার আজ স্পষ্টই মনে হইল, অধীনদের উপর বিচারহীন আধিপত্য স্থাপনের যুগ তাঁহাদের শেষ হইয়া আসিয়াছে। আসিতেছে নূতন যুগ, সে যুগের এরা নূতন কেরাণী, মানুষ কেরাণী।

অদ্বৈতাচার্য্য

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস, এম-এ, ব্যারিষ্টার-এট্-ল

জ্ঞানের নিগূঢ় তত্ত্বে চিত্ত তব ছিল অনুরাগী,
ভক্তির প্লাবন এসে মরাগাঙে জাগালো জোয়ার।
তব প্রার্থনার বলে প্রাণবৃন্তে পুষ্প ওঠে জাগি'
যুগের মোহন তুমি পাদপদ্মে রাখি নমস্কার।

গৌর নিত্যানন্দ সঙ্গে যুক্ত হ'ল তব শুভ নাম,
এই তিনে বঙ্গদেশে নবযুগ করিলে সূচনা।
জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে উচ্চ কণ্ঠে গাহে রাধা শ্যাম,
নামে প্রীতি নামে রতি গতিমাত্র গৌরাঙ্গ ভজনা।

এখনও বাঙ্গালী গাহে তোমাদেরই নিত্য জয়গান,
এখনও গলায় পরে তুলসীর পবিত্র মালিকা।
গাহিতে গাহিতে নেত্রে বিগলিত অশ্রু অফুরাণ,
ললাটে লেপিয়া লয় মৃত্তিকায় মৃত্যুঞ্জয় টিকা।

শাস্ত্র নহে—হরিনাম এ যুগের চরম সম্বল,
হে আচার্য্য, বাঙ্গালীরে তুমি দিলে ভক্তি-মুক্তি-ফল।

বিদুষী

বাণীকুমার

তিনশো বছর হয়েছে গত একদা ফরিদপুরে
কোটালিপাড়ায় গ্রামেতে বাস করিত শিবরাম,
সার্ব্বভৌম উপাধি তা'র, গোবিন্দ মধুরে
নিত্য সেবা করিত, তা'র হৃদয় পুণ্যধাম।
শিষ্য কত আসিত দূর দেশ হ'তে দলে দলে—
টোলেতে তা'র শাস্ত্র-পাঠের ইচ্ছা জানাতো আসি',
অধ্যাপনা শুনিত সবে বসিয়া কৌতূহলে,
পণ্ডিত বলি' যশের সুরভি যাইত সুদূরে ভাসি'।
ভাগ্যবানের ভাগ্য কখনো মন্দ হবার নয়,
শুভদিনে তা'র জন্ম নিলেন সুন্দরী এক মেয়ে,
প্রতিভাশালিনী বিদুষী রমণী কালে তা'র পরিচয়,—
পিতা দিল নাম প্রিয়ংবদা, সে স্মৃতিরে রয়েছে ছেয়ে।
প্রতিদিন এই শিশু-মেয়ে এসে বসিয়া থাকিত টোলে
অতি-মনোযোগী শিষ্যের মতো শুনি' পাঠ-আলোচনা,
রাত্রে পিতার সকাশে কন্যা শোনা শ্লোকগুলি ব'লে
অতুলনা স্মৃতি-শক্তির বরে জানাতো যে গুণপনা।
শিবরাম হোলো বিস্মিত অতি দুহিতার মেধা হেরি,'
ছিল তা'র মনে—হিন্দুমহিলা হবে সেবা-কাজে রত—
শুদ্ধ গৃহের কর্ম্ম তাহার জীবন রহিবে ঘেরি',
বিদ্যা-শিক্ষা নহে প্রয়োজন, নহে তা'র মনোমত।
নিগূঢ় তত্ত্ব সমাধান করি' শোনায় শিষ্যদলে,
জটিল প্রশ্ন তুলিল ছাত্র সোমনাথ একদিন,
শাস্ত্রগ্রন্থ-মন্থন-কালে সহসা ভাগ্য-বলে
মিলে উত্তর—"দোষী—যেবা নারী-শিক্ষায় উদাসীন।"
ব্রাহ্মণ তবে ভ্রান্ত ধারণা করিল বিসর্জ্জন,
'প্রিয় দুহিতা সে প্রিয়ংবদারে হইবে শিক্ষা দিতে'—
এই ভেবে দ্বিজ কন্যার পাঠে যুক্ত করিল মন,
কল্যাণী মেয়ে সমাহিত হ'য়ে পড়ে নন্দিত চিতে।
শিবরাম নিজ বুদ্ধিশালিনী দুহিতারে সযতনে
শিক্ষা দিল যে ব্যাকরণে—দেখে অপরূপ বোধ তার,
'সরস্বতী বা এসেছেন ভবে'—ভাবে পুলকিত মনে.
উৎসাহে মাতি' প্রিয়ংবদায় শিখালো কাব্য-সার।
অচিরেই বালা সাহিত্য-রস করিয়া আস্বাদন
অশেষ-জ্ঞানের অধিকার পেয়ে হোলো যে পণ্ডিতানী,
সংস্কৃত-ভাষা দ্বিধা-হত চিতে করিল উচ্চারণ,
টোলের বহেক ছাত্র রহিতো চাহি' বিস্ময় মানি'।
রসনায় তা'র নাচিত নিয়ত ছন্দঃ-সরস্বতী,
মধুর কবিতা রচনা করিতে হলেন সুকৌশলী,
প্রতিভার বলে লভিত প্রেরণা সতত শক্তিমতী,
শ্রবণে কে যেন গেয়ে যেত নিতি গোবিন্দ-গীতাবলী।

একদিন পিতা কহিল তাহারে—"সাধ আজি শুনিবারে—
মোর আরাধ্য কুলের দেবতা গোবিন্দদেবে স্মরি'
রচো মা একটি সুমধুর শ্লোক প্রণাম করিয়া তাঁরে।"
প্রিয়ংবদা যে রচিয়া সে শ্লোক শোনালো কণ্ঠ ভরিঃ'
..."যমুনা-পুলিনে কেলির-বিলাসে গোপালী-অভিষ্টুত,
ব্রজবধূদের নয়নোৎপলে অর্চ্চিত ভবহর।
শিখীপাখা-চূড় ত্রিভঙ্গ-তনু সুললিত প্রেম-পূত,
কংসাদি-অরি শ্যাম গোবিন্দ সুন্দর বেণুধর।"
কন্যার লেখা এই সুমধুর পদটি শুনিয়া কানে—
মহা আনন্দে ভক্ত পিতার চোখ হ'তে বহে ধারা,
কহিল—"হে মোর প্রিয়নন্দিনী, তব গান মম প্রাণে
বহালো রসের পুলক-প্রবাহ, হয়েছি আত্মহারা।"
কবিতা-রচনা ছাড়া সে বিদুষী গাহিত মোহন গান,
দৈবী করুণা ছিল তা'র 'পরে—কণ্ঠ সুরেতে সাধা,
মুগ্ধ সকলে, ধন্য যে পিতা, এ-মেয়ে বিভুর দান,
ধর্ম্ম ও নীতি-শাস্ত্রের জ্ঞানে ভারতী ছিল যে বাঁধা।
আরো বিদ্যায় পারদর্শিনী করিতে অভিপ্রায়
জাগিল পিতার অন্তরে, তাই কন্যারে ল'য়ে সাথে
চলিল পুণ্য বারাণসীধামে পূরিতে আকাঙ্ক্ষায়,
কিন্তু মেয়ের বিবাহ-চিন্তা জাগিত দিনে ও রাতে।
শিবরাম এক মঠে আশ্রয় লইল শান্ত মনে,
তীর্থকৃত্য সমাপন করি' পাত্রের খোঁজে চলে,
মনোমত কোনো যোগ্য পাত্র পেল না অন্বেষণে,
সকাতরে ডাকে বিশ্বেশ্বরে স্থিরমতি পলে পলে।
কিছুদিন পরে আসে সেই মঠে তরুণ জ্যোতির্ম্ময়
নির্ম্মল এক ব্রাহ্মণ যুবা রঘুনাথ নাম তা'র,
শিক্ষার আশে আসিল সেখানে, কোনো আশে আর নয়,
শিবরাম তা'রে হেরি' ভাবে—বুঝি শেষ হোলো নিরাশার।
রঘুনাথ-সনে আলাপনে হোলো প্রীত শিবরাম অতি,
অভিলাষ জাগে সঁপিবারে তা'র করে কন্যার পাণি,
তথাপি তাহার পরিচয় পেয়ে হোলো বিষণ্ণ-মতি,
কনৌজী ব্রাহ্মণ রঘুনাথ—মিলিবে কি কুলখানি!
অনেক চিন্তা করিয়া ভাবিল—কোথা' পাবো আমি আর
এমন দিব্যকান্তি মোহন পাত্রের সন্ধান?
স্থির করি মন কহে নিজে নিজে—নাহি হেতু ভাবনার,
বিধাতার কৃপা—গুণবতী-সনে মিলিবে যে গুণবান্।
রঘুনাথ প্রিয়ংবদারে নেহারি' প্রেম উপজিল প্রাণে,
রূপ হেরি' তা'র—গুণ জানি'—তার আকাঙ্ক্ষা জাগে চিতে;
বধূ-রূপে তা'রে লভিতে জীবনে মন তা'র সদা টানে,
গোপন কথাটি কহে তা'রে, পিতা নিজ মত প্রকাশিতে।

প্রিয়াংবদাও দেখিল যখন তেজঃপুঞ্জকায়া,
পতি-রূপে বালা বরিল যুবায় স'পিয়া পরাণখানি,
নারী-অন্তরে জাগিল তখন অপূর্ব্ব স্নেহ-মায়া,
নিবেদিল তা'র উদ্দেশে রচি' প্রেমের গোপন-বাণী।
শুভ দিনে দুই জনার মিলন সফল হইল শেষে,
দুইটি জীবন-ধারা প্রবাহিয়া হোলো যে যুক্তবেনী,
সকল বাসনা পূরিল সবার, শান্তি চিত্ত-দেশে,
প্রেম-নিবেদন করে রঘুনাথে নিভৃতে সে সুবদনী।
রঘুনাথ-পিতা ছিল ধনশালী বিখ্যাত জমিদার,
অনুমতি তা'র মিলিল যখন বাজিল বিবাহ-শাঁখ,
নবীন দম্পতীরে চাহে দিতে যৌতুক-উপহার
একখানি গ্রাম সন্তোষ মানি', বর-বধূ নির্ব্বাক্।
কহে দম্পতী—"কি করিব মোরা এ সম্পত্তি ল'য়ে,
তদ্‌বির তা'র করিতে যে দিন যাবে চলি' অনিবার,
শাস্ত্র-পঠনে মন দোবো কবে, কাল যাবে মিছে ব'য়ে,
গ্রাসাচ্ছাদন লাগি' যাহা চাই - সেইটুকু মাগিবার।'
অতি-সামান্য ভূমি ল'য়ে তা'রা দিল সাধনায় মন,
শাস্ত্রালোচনা, দেব-অর্চ্চনা হইল নিত্য-ব্রত,
কাশীধাম হ'তে রঘুনাথ আনে দু'টি শিলা-নারায়ণ,
পতি করে পূজা, প্রিয়ংবদা সে হোলো সেবা-কাজে রত

আনন্দ চির সাথী ছিল তা'র, ছিল না ক্লান্তি কোনো,
মহীয়সী নারী নিজ হাতে সব করিত গৃহের কাজ,
সমাদরে সবে ভোজন করাতো, অন্তর সুধা-ঘন,
দেবের সেবায় কাটাইত দিন, ছিল মহিমার সাজ।
সংসার-কাজ সারা করি' দেবী বসিত প'তির সনে,
কখনো লেখনী ধরিয়া সরস কবিতা রচিত বসি,
কত শত টীকা রচিল যে নারী—নাহি আজ কারো মনে,
কভু একান্তে কা'র গীতবাক্ মাতাতো শ্রবণে পশি'।
প্রতিদিন দেবী করিত রচনা বহু সুন্দর গীতি,
রঘুনাথ সেই মধুময় গানে হইত পুলকমতি,
সুর-তাল-লয়ে গঠন করিয়া গাহিত সে-গান নিতি,
রাগিণী যেন সে মূরতি ধরিয়া করিত তাহারে নতি।
প্রিয়ংবদার প্রতিভা বিরল দেখা যায় পৃথিবীতে,
প্রতিদিবসের নারায়ণ-পূজা করিবার কালে নিতি—
একটি করিয়া নূতন স্তোত্র রচিত পূণ্য চিতে,
সেই স্তব গাহি' দেবতার কাছে জানাতো ভকতি-প্রীতি।
প্রিয়ংবদা যে মহতী মহিলা চিরসতী বরণীয়া,
তাহার কাহিনী আনিবে পুণ্য যে জন শুনিবে কানে,
নারায়ণ তা'রে দানিলেন বর অমর সে মোহনিয়া,
সেই মহিমার গাথা শুনি' সবে লভো আনন্দ প্রাণে।

বীর

শ্রীনিরঞ্জন ভট্টাচার্য্য

ঐ ছুটেছে অগ্নিঘোড়া,
মাথার উপর সূর্য্য জ্বলে
জীবন দিতেও কুণ্ঠিত নয়
যায় ধেয়ে ঐ দলে দলে।
স্বাধীনতার মন্ত্র যখন
ছড়িয়ে পড়ে শিশুর মাঝে,
বুক ফুলিয়ে এগিয়ে চলে
দল বেঁধে সেই বিষম কাজে;
প্রাণটি দেওয়া? তুচ্ছ কথা,
বলছে সবাই সমস্বরে,
ঝাপিয়ে পড়ে হাসিমুখে
বীর শিশুদল অরির 'পরে।
'নাই হাতিয়ার' বলছে কেহ—
'মাথার উপর বিরাট ফণা,

দুঃখ কিসের? অস্ত্র মোদের
মায়ের বুকের ধূলিকণা।'
তিনটি রঙের নিশান লয়ে
ঐ চলেছে কাজের কাজী,
কদম্ কদম্ এগিয়ে চলে
ধ্বনি তোলে 'জয় নেতাজী'।
"দিল্লী চল, অস্ত্র ধর",
সবার মুখে একই কথা:
"শোষণ-জুলুম বন্ধ করে
ঘুচাও মোদের মায়ের ব্যথা।"
এম্‌নি করে এগিয়ে চলে
কেও তুলে নেয় মৃত্যু ধরে
ধন্য হল জীবন যাহার,
প্রাণ দিয়ে দেশ-মাতার তরে।

বিদ্যাপতি

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন

বাঙ্গালার প্রখ্যাতনামা সমালোচক, স্বনামধন্য অধ্যাপক, প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন ধরিয়া বঙ্গশ্রী পত্রিকায় মহাকবি বিদ্যাপতির পদাবলীখানি লইয়া আলোচনা করিতেছেন। সৌন্দর্য্যবোধ, রসানুভূতি, বিশ্লেষণ নিপুণতা এবং লিখনশৈলী এই আলোচনাকে অত্যন্ত মনোজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছে। যাহাদের হাতে কোন কাজ নাই বলিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনা করেন, অথবা নামের জন্য কিম্বা কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যাঁহারা পদাবলীর গহনে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছেন, ভগবান তাঁহাদের অত্যাচার ও অনাচার হইতে বৈষ্ণব সাহিত্যকে রক্ষা করুন। ডক্টর শ্রীকুমারের মত সহৃদয় সমালোচক এই পথে অগ্রসর হওয়ায় আশ্বস্ত হইয়াছি, তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইতেছি।

শ্রীকুমারের আলোচনার সমালোচনা অথবা প্রতিবাদ এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কোন কোন বিষয়ে মতপার্থক্য স্বাভাবিক, কিন্তু তাহা লইয়া বিতণ্ডারও কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। আমি দুই একটি বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই এই প্রবন্ধ লিখিতেছি। দুই একজন গদ্‌গদ চিত্তের তথাকথিত বৈষ্ণব সাহিত্যিক আছেন, যাঁহারা গতানুগতিকতাই সনাতনীর পরিচয় বলিয়া মনে করেন। ইঁহারা নৈষ্ঠীক ভক্তরূপেই পরিচিত হইতে ইচ্ছুক। গুরুজন নির্দ্দেশিত চণ্ডীনামধেয় কাষ্ঠ চাপের কবলবদ্ধ পুঁথির গ্রন্থি উন্মোচন পূর্ব্বক তাহা যে চণ্ডী নহে—মুগ্ধবোধ, ইহা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াও মানিয়া লইতে ইঁহারা তীব্রভাবে আপত্তি প্রকাশ করেন। যুক্তিতর্ক প্রমাণ প্রয়োগ ইঁহাদের অসহ্য। ডক্টর শ্রীকুমার শিক্ষিত হইয়াও ইঁহাদের দলভুক্ত নহেন, তাই ভরসা করিয়া তাঁহার নিকট বিদ্যাপতি প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য বিবৃত করিতেছি।

বিদ্যাপতি পদাবলীর প্রথম সঙ্কলনে ভূপতি, চম্পতি, শেখর, রায়শেখর প্রভৃতি বহু পদকর্ত্তার পদ নির্ব্বিচারে গৃহীত হইয়াছিল। স্বর্গগত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের অনুরোধে আমি সেগুলি চিহ্নিত করিয়া দিয়াছি। দ্বিতীয় সঙ্কলনে কোনরূপ সংশোধনের অবকাশ না থাকায় পুস্তকের প্রথম দিকে আমার চিহ্নিত পদকর্ত্তাগণের পদগুলিকে তিনি সন্দেহযুক্ত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কবিরঞ্জন একজন।

হয়তো সবেমাত্র সাহিত্যে আমার হাতেখড়ি হইয়াছে। সেই অদূর অতীতে সন ১৩১৬ সালে বাঙ্গালার অন্যতম বৈষ্ণব তীর্থ শ্রীখণ্ড হইতে অধুনা নিত্যধাম গত শ্রদ্ধাভাজন রাখালানন্দ ঠাকুর শাস্ত্রী মহাশয় "শাখানির্ণয়" নামক একখণ্ড ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করেন। শাখা নির্ণয়ের রচয়িতা শ্রীখণ্ডের অন্যতম কবি রামগোপাল দাস মহাশয়। ইনি "বাণ অঙ্গ শরব্রহ্ম নরপতিশাকে" রসকল্পবল্লী গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। সুতরাং লেখক প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনশত বৎসর পূর্ব্বে রচিত এবং ত্রিশবৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত পুস্তিকায় আমার কোন হস্তক্ষেপ থাকিবার কথা নহে। আমার দুর্ভাগ্য, এই শাখা নির্ণয়ে কবিরঞ্জনের পরিচয় আছে, আমি তাহা প্রকাশ করিয়া অপরাধী হইয়াছি। কবিরঞ্জন ভণিতায় অনেকগুলি পদ রামগোপাল রসকল্পবল্লীতে এবং তৎপুত্র পীতাম্বর রসমঞ্জরীতে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং কবিরঞ্জন ভনিতার এই সমস্ত পদ যে বিদ্যাপতির হইতে পারে না, পূর্ব্বোক্ত কোন কোন সাহিত্যিক তাহা মানিতে প্রস্তুত নহেন। বলিতে ভুলিয়াছি, শাখা নির্ণয়ে শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুরের শাখার পরিচয় আছে। রঘুনন্দন শাখা নির্ণয়ে কবিরঞ্জনের পরিচয় এইরূপ—

কবিরঞ্জন বৈদ্য আছিল খণ্ডবাসী।
যাহার কবিতা গীত ত্রিভুবন ভাসি।
তার হয় শ্রীরঘুনন্দনে ভক্তি বড় ?
প্রভুর সঙ্গীত পদ করিলেন দড় ॥
পদং যথা "শ্যাম গৌরবরণ একদেহ" ইত্যাদি।
গীতেষু বিদ্যাপতি বদ্ বিলাসঃ
শ্লোকেষু সাক্ষাৎ কবি কালিদাসঃ।
রূপেষু নির্ভৎসিত পঞ্চ বাণঃ
শ্রীরঞ্জনঃ সর্ব্ব কলা নিধানং ॥
ছোট বিদ্যাপতি বলি যাহার খেয়াতি।
যাহার কবিতা গানে ঘুচায় দুর্গতি ॥

রামগোপাল দাস যাঁহার এহেন প্রশংসা করিয়াছেন, তাঁহার কবিত্ব নিশ্চয়ই অবহেলার সামগ্রী নহে। সুতরাং বিদ্যাপতি ভনিতার বাঙ্গালা পদ, বাঙ্গালা ব্রজবুলি মিশ্রিত পদ মিথিলার বিদ্যাপতির রচিত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক। এ ক্ষেত্রে আমাদিগকে বিশেষ সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতে হইবে। এবং কবিরঞ্জন ভনিতার পদ নিঃসংশয়ে শ্রীখণ্ডের কবি রচিত বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে।

রামগোপাল দাস "পদং যথা" বলিয়া কবিরঞ্জনের যে পদের প্রথম পংক্তিটী লিখিয়া গিয়াছেন, সেই পদটী কোন কোন মুদ্রিত পদ-কল্পতরু গ্রন্থে এবং কোন হস্ত লিখিত পুঁথিতে রায়শেখর ভনিতায় পাওয়া যায়। তাই বলিয়াই কি এই পদ রায় শেখরেরর নামে গ্রহণ করিতে হইবে? তিনশত বৎসরের সাক্ষ্য উপলক্ষ্য করিয়া লিপিকর প্রমাদকেই গ্রাহ্য করিতে হইবে? ইহাকে নিতান্তই আবদার বলিয়া অভিহিত করা চলে। বহু পুঁথিতে আমরা এই পদের ভণিতা পাইয়াছি—

ত্রিপুরাচরণ কমল মধু পান।
সরস সঙ্গীত কবিরঞ্জন গান ॥

অনেকেই জানেন না যে তান্ত্রিকগণের মধ্যে "ত্রিপুরা সম্প্রদায়" নামে একটী পৃথক সম্প্রদায় আছে। এক সম্প্রদায় বৈষ্ণব যোগমায়ারূপিণী ত্রিপুরা দেবীর উপাসনা করেন। এই ত্রিপুরারই অপর নাম শ্রীবিদ্যা ও ললিতা।

বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধির পদগুলিও অত্যন্ত সন্দেহজনক। দুঃখের বিষয় বাঙ্গালায় প্রচলিত বিদ্যাপতি ভনিতার পদগুলিকে কেহ কেহ মৈথিল ভাষায় রূপান্তরিত করিয়াছেন। বয়ঃসন্ধির পদগুলি মিথিলায় অথবা নেপালের কোন্ পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে, তাহার প্রমাণ্য নিদর্শন আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। রঘুনন্দন শাখা নির্ণয় গ্রন্থে রামগোপাল দাস বলিতেছেন—

"রঘুনন্দনের শাখা নয়নানন্দ কবিরাজ।
যার শাখা উপশাখায় ভরিল ভবমাঝ ॥
বয়ঃসন্ধি রসে হয় যাহার বর্ণন।
ভাগ্যবান যেই সেই করায় স্মরণ" ॥

এই পয়ার চারি পংক্তি হইতে অনুমিত হয়, নয়নানন্দের বয়ঃসন্ধি বর্ণনাত্মক কতকগুলি উৎকৃষ্ট পদ ছিল। শ্রীকৃষ্ণের বয়ঃসন্ধির পদ পাওয়া যায় না। জ্ঞানদাসের শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধির কয়েকটী মাত্র পদ আছে। পদাবলী সাহিত্যে—বিদ্যাপতি ভণিতায় শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধির পদগুলিই প্রসিদ্ধ, এবং রসের দিক হইতেও উৎকৃষ্ট। এই সমস্ত পদের আলোচনা আবশ্যক। মিথিলায় বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধির পদ কোথায় কোন্ প্রামাণ্য পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে, অনুসন্ধান প্রয়োজন। যতদূর স্মরণ হয়, মহামতি গ্রীয়ার্সন সংগৃহীত পদের মধ্যে বয়ঃসন্ধি বর্ণনায় কোন পদ নাই। নয়নানন্দের পদ বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত হইয়াছিল কিনা কে জানে?

বিদ্যাপতি সংস্কৃত কবিদের নিকট সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা স্বাভাবিক। আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ কবিরাজ "তত্র প্রথমাবতীর্ণযৌবনা যথা মম তাতপাদানাং" বলিয়া সাহিত্যদর্পণ তৃতীয় পরিচ্ছেদে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"মধ্যস্য প্রথিমানমেতি জঘনং বক্ষোজয়োর্মন্দতাং
দূরং যাত্যুদরঞ্চ রোমলতিকা নেত্রার্জ্জবং ধাবতি।
কন্দর্পং পরিবীক্ষ্য নূতন মনোরাজ্যাভিষিক্তং ক্ষণা-
দঙ্গানীব পরস্পরং বিদধতে নির্লুণ্ঠনং সুভ্রুবঃ॥"

শ্লোকটীর সংক্ষিপ্তার্থ—সুন্দরীর মধ্যদেশের বিশালতা জঘন লুণ্ঠন করিয়া লইল, জঘনের ক্ষীণতা কটি লুণ্ঠন করিল, উদরের স্থূলতা লুণ্ঠন করিয়া স্তনযুগল স্থূলতর হইয়া উঠিল এবং রোমাবলীর কুটিলতা নয়ন কর্তৃক লুণ্ঠিত হইল। মনোরাজ্যে নবাভিষিক্ত কন্দর্পকে দেখিয়া অঙ্গগুলি ক্ষণকালের মধ্যে পরস্পরকে লুণ্ঠন করিল। বিদ্যাপতি ভণিতার একটী পদ এইরূপ—

শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহু পথ হেরইতে মনসিজ গেল॥
মদনক ভাব পহিল পরচার।
ভিন জনে দেল ভীন অধিকার॥
কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব।
একক খীন থওক অবলম্ব॥
প্রকট হাস অব গোপত ভেল।
উরজ প্রকট অব তন্হিক লেল॥
চরণ চপল গতি লোচন পাব।
লোচনক ধৈরজ পদতল যাব॥
নব কবিশেখর কি কহইত পার।
ভিন ভিন রাজ ভীন বেবহার॥

এই রসোত্তীর্ণ পদটীর সঙ্গে সাহিত্যদর্পণধৃত শ্লোকের তুলনা হয় না। উদ্ধৃত পদের রসমাধুর্য্য এক উদ্ভিন্নযৌবনা কিশোরীকে নয়ন সমক্ষে আনিয়া উপস্থিত করে। তথাপি সন্দেহ হয়, এই পদ বিদ্যাপতির রচিত নহে। এই পদ হয়তো শ্রীখণ্ডের রায়শেখরের রচিত, অথবা নয়নানন্দ কবিরাজই এই পদের রচয়িতা?

প্রসঙ্গতঃ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ পর্য্যায়ের একটী পদ উদ্ধৃত করিতেছি।

নাহই উঠল তীর রাই কমল মুখি
সমুখ হেরল বর কান।
গুরুজন সঙ্গ লাজ ধনি নত মুখি
কৈসন হেরব বয়ান॥
সখি হে অপুরব চাতুরি গোরি।
সবজন তেজি আগুসরি সঞ্চরি
আড় বদন তঁহি ফেরি॥
তঁহি পুন মতিহার তোরি ফেকল
কহইত হার টুটি গেল।
সবজন এক এক চুনি সঞ্চরু
শ্যাম দরস ধনি লেল॥
নয়ন চকোর কাহামুখ শশিবর
কএল অমিয় রস পান।
দুঁহু দুঁহু দরসন রসহু পসারল
কবি বিদ্যাপতি ভান॥

শ্রীপাদ রূপগোস্বামী প্রণীত বিদগ্ধমাধব নাটকের একটী শ্লোকের সঙ্গে উদ্ধৃত পদের ভাবসাম্য বিস্ময়জনক। বিদগ্ধমাধবের শ্লোকটীও পূর্ব্বরাগের শ্লোক, এবং শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

ছিন্নঃ প্রিয়ো মণিসরঃ সখি মৌক্তিকানি
বৃত্তাগুহং বিচিনুয়ামিতি কৈতবেন।
মুগ্ধং বিবৃত্য ময়ি হন্ত দৃগন্তভঙ্গীং
রাধা গুরোরপি পুরঃ প্রণয়াদ্বিতানীৎ॥

শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলকে বলিতেছেন, সখা সেই খঞ্জননয়নীর বিলাসমঞ্জরী আমার নয়ন-ভ্রমরকে মুগ্ধ করিতেছে। "হে সখি, আমার প্রিয় মণিহার ছিন্ন হইয়াছে, অতএব মুক্তাগুলি কুড়াইয়া দও। আহা, এই বলিয়া (শ্রীরাধা) ছলে গুরুজনের সম্মুখেও আমার দিকে ফিরিয়া প্রণয়ভরে মনোহর কটাক্ষ-ভঙ্গী বিস্তার করিয়াছিলেন"।

পদরচয়িতা ও শ্লোকরচয়িতা কে কাহার নিকট ঋণী? শ্রীপাদ রূপ-গোস্বামী বিদ্যাপতির পদের ভাব গ্রহণ করিয়াছেন, তর্কস্থলে একথা হয়তো বলা চলে। কিন্তু পদরচয়িতাই বিদগ্ধমাধবের শ্লোকের হুবহু অনুবাদ করিয়াছেন, এই কথা বলাই অধিকতর সঙ্গত।

ডক্টর শ্রীকুমার একটী পদে আমাদের "বিচারবিমূঢ়তার" পরিচয় পাইয়াছেন। গত (১৩৫১) ফাল্গুন সংখ্যা বঙ্গশ্রী পত্রিকায় বিদ্যাপতি প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন—"বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত যে সমস্ত পদ খাঁটি বাঙ্গালা ভাষায় রচিত, অথবা যাহাতে ব্রজবুলির অন্তরালে বাংলার বাক্যরীতি বৈশিষ্ট্য (idiom) আবিষ্কার করা যায়, সেগুলি সহজ কারণেই বিদ্যাপতির হইতে পারে না। মৈথিলী কবির অবিমিশ্র বাংলা ভাষায় এতখানি অধিকারের সম্ভাব্যতা বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত স্বীকার করা যায় না। আবার যে সমস্ত পদে চৈতন্যপ্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্ম ও তাঁহার শিষ্যবর্গপ্রচারিত বৈষ্ণব দর্শন ও অলঙ্কার শাস্ত্রের সুস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, সেগুলিও বিদ্যাপতির রচনা না হইবার সম্ভাবনা। অবশ্য দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহ হওয়া কঠিন। কেননা বিদ্যাপতির ন্যায় প্রতিভাশালী কবি গভীর ভক্তিপূর্ণ আবেগের মুহূর্ত্তে যে বর্ত্তমানের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া তাঁহার পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিদের ভক্তিবিহ্বলতা অনুভব করিবেন, তাহাতে অবিশ্বাস্য কিছুই নাই। একটী উদাহরণ দ্বারা ঐ বিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির দুরূহতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব। বিদ্যাপতির পদ সংগ্রহের মধ্যে সন্নিবিষ্ট সুবিখ্যাত পদ—"সখি কি পুছসি অনুভব মোর" এই বিচারবিমূঢ়তার জ্বলন্ত নিদর্শন।

বিদ্যাপতি-পদ বিচারের জন্য শ্রীকুমার যে দুইটী সূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, পদাবলী সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত স্বর্গগত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় এই দুইটী সূত্রের আবিষ্কারক। তিনিই সর্ব্বপ্রথম আলোচ্য পদটীর সম্বন্ধে আপত্তি প্রকাশ করেন। অতঃপর তাঁহার যুক্তিসঙ্গত আলোচনা সমর্থন করিয়া আমি কবিরঞ্জন বিদ্যাপতির পরিচয় প্রকাশ করি, এবং "কি পুছসি" পদের রচয়িতা কবিবল্লভের বিষয়ে প্রবন্ধ লিখি। সুতরাং আমাদের বিচারবিমূঢ়তার কারণ সংক্ষেপে বিবৃত করার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে।

"সখি কি পুছসি অনুভব মোর" পদটী পদকল্পতরু, পদরসসার প্রভৃতি হস্তলিখিত পুঁথির এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত সমস্ত পুঁথিতেই "কবিবল্লভ" ভণিতায় পাওয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে নেপাল বা মিথিলায় আবিষ্কৃত কোন তালপাতার পুঁথিতেই এই পদটী পাওয়া যায় নাই। স্বর্গগত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের বিদ্যাপতির সঙ্কলনেই এই পদটী বিদ্যাপতি ভণিতায় প্রথম প্রকাশিত হয়। তিনি কোন প্রমাণে এই পদ বিদ্যাপতির নামে গ্রহণ করিয়াছিলেন—বিদ্যাপতির ভূমিকায় তাহা প্রকাশ করেন নাই। অপিচ স্বর্গগত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বিদ্যাপতির ভূমিকায় পাঠ নির্ণয় ২।৵ পৃষ্ঠায় এই পদের এক মৈথিল পাঠ প্রকাশ করেন। নিম্নে নগেন্দ্রনাথের ধৃত পাঠ তুলিয়া দিলাম:

সখি হে কি পুছসি অনুভব মোর।
সোই পিরীতি অনুরাগ বখানইতে
তিলে তিলে নুতন হোর॥

জনম অবধি হম রূপ নিহারল
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনল
শ্রুতিপথে পরশন গেল ॥
কত মধুযামিনি রভসে গমাওল
ন বুঝল কৈসন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখল
তৈও হিয়ে জুড়ন ন গেল ॥
যত যত রসিকজন রসে অনুমগন
অনুভব কাহু ন পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইত
লাখে না মিলল এক ॥

পদকল্পতরুর পাঠের সঙ্গে উদ্ধৃত তথাকথিত মৈথিল পদের পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। নগেন্দ্রবাবুর "বথানইতে" পদকল্পতরুতে আছে "বাখানিতে" তৈও স্থলে আছে তউ এবং "যত যত রসিকজন রস অনুমগণ" স্থলে পদকল্পতরুর পাঠ—"কত বিদগধজন রস অনুমোদই"। পাঠকগণ বিচার করিবেন কোন্ পাঠ সঙ্গত। বিদ্যাপতির মত কবির পক্ষে এইরূপ ছন্দোদুষ্ট পদ রচনা সম্ভব কি না, যাঁহারা বিমূঢ় নহেন, তাঁহাদের উপরেই বিচার-ভার অর্পণ করিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয়—অমূল্য বিদ্যাভূষণ মহাশয় বিদ্যাপতির পদাবলী ২য় সংস্করণ সম্পাদনকালে এই পদ নিম্নলিখিত পাঠে মুদ্রিত করিয়াছেন—

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সেহো পিরিত অনুরাগ বথানিয়ে
তিলে তিলে নুতন হোয়।
জনম অবধি হম রূপ নিহারল
নয়ন ন তিরপিত ভেল।
সে হো মধু বোল শ্রবণহি শুনল
শ্রুতিপথ পরস ন ভেল।
কত মধুজামিনি রভস গমাওল
ন বুঝল কৈসন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখল
তইও হিয় জুড়ল ন গেল ॥
কত বিদগধজন রস আমোদই
অনুভব কাহু ন পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াএত
লাখে ন মিলল এক।

এইরূপ পাঠবিভ্রাটে আমাদের বিমূঢ় না হইয়া উপায় কি? নগেন গুপ্ত বলিয়াছেন—আমি প্রকৃত মিথিলার পাঠই ছাপিলাম। অমূল্য বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও তাঁহার উদ্ধৃত পাঠ আদি ও অকৃত্রিম বলিয়াই মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। অথচ উভয়েই কোন প্রামাণ্য আকরগ্রন্থের নাম উল্লেখ করেন নাই, অথবা বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ রাখিয়া যান নাই। অমূল্য বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সংস্করণে "সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে" অংশের অর্থ লেখা রহিয়াছে "সেই পিরীতির অনুরাগের কথা বলিতে"। পিরীতির অনুরাগ কি বস্তু শ্রীকুমার আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলে উপকৃত হইব। সতীশ রায় মহাশয় অর্থ করিয়াছেন—সেই পিরীতিকেই অনুরাগ ব্যাখ্যা (বাখান) করিতে (হয়) যাহা তিলে তিলে নূতন হয়। আমার মতে ব্যাখ্যা হইবে—"সেই পিরীতি ও অনুরাগের কথা তিলে তিলে নূতন"। এ সম্বন্ধে আর একটি কথা। শ্রীপাদ রূপগোস্বামী পিরীতি ও অনুরাগ শব্দের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, সে ব্যাখ্যা তাঁহার নিজস্ব। সাহিত্যদর্পণে অথবা মিথিলার আলঙ্কারিক ভানুদত্তের রসমঞ্জরীতে অনুরাগের বা পিরীতির ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

"প্রেমবিলাস" গ্রন্থটিকে অনেকেই বিশ্বাস করেন না। গোটা গ্রন্থখানিকেই অবিশ্বাস করিবার কারণ কি জানি না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্যালক মাধবাচার্য্যের পরিচয় প্রেমবিলাসে পাওয়া যায়। এই মাধব কৃষ্ণমঙ্গল গ্রন্থের রচয়িতা। কৃষ্ণমঙ্গল সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই। যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহার পাঠ শুদ্ধ নহে। তথাপি কৃষ্ণমঙ্গল কবিত্বপূর্ণ। এই গ্রন্থ মাধব শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। মাধব শ্রীধাম বৃন্দাবনে গিয়া গোস্বামিগণের নিকট সমাদৃত হন, এবং গোস্বামিগণ তাঁহাকে "কবিবল্লভ" উপাধি দান করেন। প্রেমবিলাসে আছে—

তবে মাধবের হৈল কবিবল্লভ খ্যাতি।
সবে বলে কলির ব্যাস এই মহামতি।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে "ক্ষণদাগীত চিন্তামণি" সম্পাদক অধুনা নিত্যধামগত শ্রীল কৃষ্ণপদ দাস বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে আলোচ্য পদ লইয়া আমি আলোচনা করিয়াছিলাম। তাঁহার পাণ্ডিত্য, সত্তা ও রসজ্ঞতা সম্বন্ধে শ্রীধামের সকলেই শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। তিনি প্রেমবিলাসের একখানি হস্তলিখিত পুঁথি হইতে উদ্ধৃত পাঠের পর মাধবাচার্য্য সম্বন্ধে নিম্নের কয়েক পংক্তি আমাকে লিখিয়া দেন।

কি পুছসি অনুভব মোয় এই পদ।
রচিল মাধব মধু কবিত্ব সম্পদ ॥
শ্রীরূপের করে পদ সমর্পণ কৈল।
ভক্তগণ কণ্ঠমণি করিয়া রাখিল।

সুতরাং সতীশ রায়ের সঙ্গে আমারও বিমূঢ় না হইয়া উপায় ছিল না। প্রয়োজন হইলে তজ্জন্য ত্রুটী স্বীকারে প্রস্তুত আছি। বলা বাহুল্য, বহুদিন পূর্ব্বে ভারতবর্ষ পত্রে "কবিবল্লভ" শীর্ষক প্রবন্ধে—এ সম্বন্ধে আমি আলোচনা করিয়াছি। ডক্টর শ্রীকুমার পদকল্পতরুর ভূমিকা এবং আমার প্রবন্ধ পাঠ করিলে আনন্দিত হইব। আগামী বারে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সম্বন্ধে শ্রীকুমারের উক্তির আলোচনা করিব।
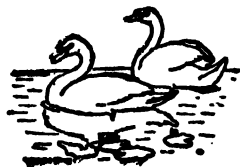
চৌকো চোয়াল

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া

নয়

টুপি তুলে নিয়ে দুয়ার পর্য্যন্ত গিয়ে শ্রীকান্ত বাবু ফিরে দাঁড়ালেন। তরুণের দিকে চেয়ে অত্যন্ত বাঁকা হাসির সঙ্গে বললেন "পোষ্ট মর্টমের রিপোর্ট পেয়েছেন? প্রবীর ডাক্তার কি বললে?"

তরুণ বিস্মিত হোল। প্রবীরের কাছে তার গমনসংবাদ উকিলবাবুর কানে এর মধ্যে উঠল কি করে? হাসপাতালে সে সময় এঁদের গুপ্তচর উপস্থিত ছিল না কি?

ধাঁ করে প্রবীরের উপদেশ মনে পড়ল!

সহসা কৌতুকোজ্জল মুখে তরুণ বললে "ডাক্তার খাপ্পা হয়ে আছে। কারুর সঙ্গে দেখা করবে না, কাউকে রিপোর্ট দেবে না। কোর্টের ব্যাপার কোর্টে মীমাংসা হবে!"

"সে ত হবেই। বড় দাম্ভিক, বড় উগ্র অহঙ্কারী লোক। তা অত রাগের কারণ কি?"

তরুণ কৌতুক-স্মিত মুখে ক্রমান্বয়ে সকলের মুখভাব পর্য্যবেক্ষণ করতে করতে বললে "রাজ-এষ্টেটের কোন্ কর্ম্মচারী না কি তাঁকে ঘুষ দেবার প্রস্তাব করেছে। তাতে নিজেকে অপমানিত জ্ঞান করে ক্ষুব্ধ হয়েছেন!

সুমিষ্ট হাসি হেসে নম্র বিনয়ের সঙ্গে শ্রীকান্তবাবু বললেন, "তাই না কি? তা তো জানি না। কে এমন ঠাট্টা করলে? কথাটা শুনে যাওয়া যাক তা হলে!"

ফিরে এসে তিনি পরিত্যক্ত চেয়ারে পুনশ্চ বসলেন।

বৃদ্ধ ম্যানেজার রুষ্ট স্বরে বললেন, "মিথ্যে কথা। প্রবীর ডাক্তারকে আমরা চিনি না? তিনি ষ্ট্রিক্ট, আপরাইট ম্যান! তাঁকে বলব আমরা ঘুষের কথা, অসম্ভব!"

তরুণ বললে, "কিন্তু আপনাদের নামেই কেউ সে প্রস্তাব করে পাঠিয়েছে, তার সন্দেহ নাই!"

উত্তেজিত হয়ে বৃদ্ধ ম্যানেজার বললেন, "আমরা জানলুম না, অথচ আমাদের নামে এমন অসঙ্গত প্রস্তাব তাঁর কাছে গেল? কেন? আমরা কেউ কি ক্ষিতীশকে ঠেঙিয়ে মেরেছি যে, ঘুষ দিয়ে পোষ্ট মর্টমের মিথ্যে রিপোর্ট লেখাবার গরজ আছে আমাদের? এ সব কি শুনছি হে শ্রীকান্ত?"

তীব্র তাচ্ছিল্যের সঙ্গে শ্রীকান্তবাবু বললেন, "কেন ও-সব ছোট কথায় কান দিচ্ছেন? বাজে ভাঁওতা! বুঝতে পারছেন না? নিজের দর বাড়াবার জন্যে প্রবীর ডাক্তার তিলকে তাল করছে! মৃত দেহের বুকে কি ছুরি বসানো ছিল? না মাথা ফাটানো ছিল? না গলা টিপে কেউ মেরেছিল? কিসের পোষ্টমর্টেম রে বাবা? তার আবার অত জাঁক? ক্ষিতীশবাবুর ছেলেগুলো যেমন আহাম্মক! তাই সিম্পলি জলে ডুবে মৃত্যু—সে কেস ছেড়ে দিলে পুলিশের হাতে! তুলে সদ্যঃ লাস জালিয়ে দিলেই ল্যাঠা চুকে যেত! এখন বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা—পুলিশ পেয়েছে মজা! সবতাতেই ওদের বাহাদুরী দেখানো চাই তো আমি জানি সব পুলিশের কীর্ত্তি!"

পুলিশ অফিসার হেসে বললেন, "গালাগালি দেন তো নাচার! কিন্তু এ সব ছরকোটে পুলিশেরও যে কি প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ, তা তো জানেন না।"

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বৃদ্ধ ম্যানেজার বললেন, "তা আমাদের নামে ঘুষ দেওয়ার কথা ওঠে কেন?"

অধিকতর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে শ্রীকান্তবাবু বললেন "বাজে কথায় কান দিতে গেলে কাজের লোকের চলে না। ছেড়ে দিন তুচ্ছ কথা! যত নষ্টের গোড়া—এই ক্ষিতীশ বাবুর ছেলে দুইটি, বুঝছেন না? একটা হৈ চৈ বাধিয়ে খেয়ালী রাজা বাহাদুরের কাছ থেকে দশ বিশ হাজার টাকা আদায় করাই ওদের আসল মতলব। অতি বিচ্ছু বদমাইস ছেলে সব।"

একটু থেমে পুনশ্চ চুরুট ধরাতে ধরাতে শ্রীকান্তবাবু সজোরে বলে উঠলেন, "ওরাই তা হলে এ সব খেলোয়াড়ি চাল চেলেছে! রং চড়াবার জন্যে, ওরাই হয় তো আপনাদের নামে এই প্রস্তাব করে পাঠিয়েছে!"

হতবুদ্ধি হয়ে তরুণ বললে, 'ওরা? তা হলে রাজ এষ্টেটের দলিলগুলি সরালে কে?"

তৎক্ষণাৎ শ্রীকান্তবাবু বললেন হলে ওরা ছাড়া সরাবে কে? কার গরজ?"

স্তম্ভিত হয়ে তরুণ কয়েক মুহূর্ত নির্ব্বাক্ রইল। তারপর বললে, "তাতে ওদের লাভ?"

"চাপ দিয়ে রাজএষ্টেট থেকে টাকা আদায় করা! আসুক রাজ-এষ্টেট টিকটিকির দল। তারা এসে নিক এ—ত টাকা!—" বলে শ্রীকান্ত বাবু ক্রোধভরে দু'হাত প্রসারিত করে টাকার পরিমাণের বিরাট দৈর্ঘ্য দেখালেন! শ্লেষভরে বললেন, "বিনা পয়সায় কেউ পরোপকার করতে আসবে না। চিনি সবাইকে! আসবে টাকার লোভে!"

অপমানে ক্রোধে তরুণের কান গরম হয়ে উঠল। তার ইচ্ছা হোল সেই মুহূর্ত্তে দায়িত্বে ইস্তফা দিয়ে স্থানত্যাগ করে! শুধু মিঃ সোমের আদেশ স্মরণ করে অতি কষ্টে ধৈর্য্য ধারণ করে চুপ-চাপ রইল। কিন্তু ক্ষিতীশবাবুর সেই অল্পবয়স্ক পুত্র দুটির উপর শ্রীকান্তবাবুর মত অতি সাবধানী, অতি সতর্ক উকিলের এতখানি অসম্বরণীয় ক্রোধের কারণ কি, তা বুঝতে পারলে না!

বৃদ্ধ ম্যানেজার ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বললেন. "টাকার জন্যে সবাই খাটতে এসেছে। তুমিও, আমিও খাটছি তাই। এক কথায় অন্য কথা পাড়ছ কেন? একটু বুঝে সুঝে কথা কও।"

জোরে জোরে চুরুটে কয়েকটা টান দিয়ে শ্রীকান্তবাবু বললেন, "ক্ষিতীশবাবুর ছেলেদের বজ্জাতির কথা মনে হলে আমার আপাদ-মস্তক জ্বলে যায়! কম গোঁয়ার গুণ্ডা ওরা? ওদের আপনারা চেনেন না। একবার একটা চাকরকে এমন মার মেরেছিল যে পুলিশ কেস হয় আর কি! ভাগ্যে আমরা ছিলাম, তাই বাঁচিয়ে দিই!"

শান্তিবাবু হতভম্ব হয়ে এতক্ষণ নির্ব্বাক্ ছিলেন। এবার সবিস্ময়ে বললেন, 'সেই সাইকেল চুরির ব্যাপার? সে তো চাকরটারই দোষ! সতীশের সখের জিনিস, নতুন সাইকেলটা চুরি করে পুকুরের জলে ডুবিয়ে রাখলে। কল-কব্জায় জং ধরে গেল! তাতে রাগ হবারই কথা! শাসনভারটা পুলিশের হাতে না দিয়ে সতীশ নিজের হাতে নিয়েছিল বটে, কিন্তু পুলিশ কেস—?''

ধমক দিয়ে শ্রীকান্তবাবু উগ্রভাবে বললেন, "তুমি থাম বাপু! ভেতরের খবর জানো কিছু? বাপের সঙ্গে ছেলেদের কতখানি সদ্ভাব ছিল তার সন্ধান রাখো? আমার কাছে ক্ষিতীশবাবুর কিছুই ছাপা ছিল না। ছেলেদের উদ্ধত চাল-চলন দেখে কত দিন দুঃখ করে বলছেন, 'পয়সার লোভে ওরাই কোনদিন আমাকে খুন করবে! ''পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ''—বুঝলে শ্রীকান্ত, ছেলেদের হাতেই আমি মরব!' এখন দেখছি হোলও ঠিক তাই! ঐ ছেলেই যে তাঁকে ষ্টেশন থেকে সে রাত্রে এনে বাড়ী ঢোকবার মুখে ধাক্কা মেরে পুকুরে ফেলে দেয় নি, তাই বা কে জানে? যা ওদের পিতৃভক্তি! ও সব গুণ্ডা ছেলে—ওরা সব পারে!"

তরুণ চমৎকৃত! বাকী সবাই স্তব্ধ!

অধিকতর ক্রুদ্ধ স্বরে, কদর্য্যভাবে ভেংচি কেটে শ্রীকান্তবাবু পুনশ্চ বলেন, "এখন সোহাগের কান্না হচ্ছে, আমাদের বাপকে —কে খুন করেছে!" কার গরজ খুন করবার তা দেখিয়ে দে রে বাপু! হাঁ, তবে বুঝি! নইলে বলতে হয়, বাপের মোটা টাকার লাইফ ইন্সিওর ছিল। সে টাকার ওয়ারিশ তোরা! টাকার লোভে তা হলে তোরাই খুন করেছিস! কেমন? কি বলুন মশাই? সে টাকার ওয়ারিশ রাজা বাহাদুরও ন'ন, চিফ ম্যানেজারও ন'ন। আর ইন্টেলিজেন্সি ডিপার্টমেণ্টও নয়! কেউ পাবে তার এক আধলা?"

কথাটা এমন দর্পের সঙ্গে, এমন ক্ষিপ্র তৎপরতায়, এমন ঐন্দ্রজালিক শক্তিসমন্বয়ে উচ্চারিত হোল যে—সকলেরই মনে হোল কেউ উক্ত "এক আধলা" পেলে খুন করাটা তাঁর পক্ষে কর্ত্তব্য ছিল! শ্রীকান্তবাবুর যুক্তির সারবত্তা যে কতখানি—তা হৃদয়ঙ্গম করবার শক্তিও যেন কিছুক্ষণের জন্য সকলের লোপ পেয়ে গেল। সবাই হতবুদ্ধি হয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলেন! প্রতিবাদের ভাষা পর্য্যন্ত কেউ খুঁজে পেলে না। সকলের বিচার-শক্তি যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল।

তরুণের মনে হোল কি একটা অদৃশ্য শক্তিপ্রভাবে তার চারদিকে মোহময় গোলোক ধাঁধার সৃষ্টি হয়েছে! তার মাথার মধ্যে সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে! সে অসহায় হয়ে অকূল সাগরে পড়েছে! এখন একমাত্র ভরসা শ্রীকান্তবাবুর কৃপা! তাঁর চেয়ে সঠিক সত্য সংবাদ দিতে পারে, এমন অদ্ভুত শক্তিশালী মানুষ এ পৃথিবীতে আজ কেউ নাই! ইনিই যা বলেছেন, তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য,—সাক্ষাৎ বেদবাক্য!

অদৃশ্য বন্ধন যন্ত্রণায় নিপীড়িত হয়ে, তরুণের অন্তরাত্মা আকুল হয়ে মর্ম্মে মর্ম্মে আর্ত্তনাদ করে উঠল—রক্ষা কর পরমেশ্বর! রক্ষা কর! আলো দাও, আরও আলো! প্রেতসিদ্ধ ঐন্দ্রজালিকদের বিদ্যাপ্রভাবে যদি সত্যই তার মোহ উৎপাদিত হয়ে থাকে, তবে সে মায়া ছিন্ন করে দাও। তাকে সত্যের পথে, ন্যায়ের পথে—পরিচালিত কর। জগতের মঙ্গলসাধনের জন্য শক্তি দাও, শক্তি দাও জগদীশ্বর! তার বিবেককে বাঁচাও!

"উদ্দেশ্য যার সাধু, ভগবান্ তার সহায়" কথাটা মিথ্যা নয়। তরুণ অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করলে—নূতন চেতনার উন্মেষ! সঙ্গে সঙ্গে মনে বিচারবুদ্ধির উদয় হোল—ইনি যা বললেন, ধ্রুব সত্য বলেই হঠাৎ তা মেনে নিলে বটে। কিন্তু তা-ই বা কি করে সত্য হয়? এই কিছুক্ষণ আগে সেই পিতৃ-শোকার্ত্ত সরল বালক দুটিকে তরুণ স্বচক্ষে দেখে এসেছে যে! তারা সে রকম নীচ, হীন, কুটিল প্রকৃতির ছেলে তো নয়! পিতার অপমৃত্যুকে ব্যবসায়ের মূলধন করে, অসদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করবে, সেই নিষ্কপট, সৎ, ভদ্র বালক দুটি? এমন পৈশাচিক প্রবৃত্তি,—এমন ঘৃণিত কৌশল উদ্ভাবন-শক্তি তাদের আছে? অসম্ভব!"

কিন্তু শ্রীকান্তবাবু ঠিক প্রত্যক্ষদর্শীর মত এত জোরের সঙ্গে এসব অদ্ভুত কথা কেন বলছেন? খিটখিটে মেজাজের বাপের সঙ্গে ছেলের সদ্ভাব না থাকতে পারে' সেজন্য ছেলেকে খুনী সাব্যস্ত করতে হবে?—অথবা পিতৃভক্তির অভাব হলেই, ছেলে বাপকে জলে ডুবিয়ে মারবে এমন কোনও আইন আছে নাকি? আর ক্ষিতীশবাবুর মৃত্যুতে আজ পিতৃহীন হোল কে? সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হোল—কারা? সতীশ, যতীশ না শ্রীকান্তবাবু?

শ্রীকান্তবাবুর ভাবভঙ্গী দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় যে—ক্ষতিটা সবচেয়ে বেশী হয়েছে তাঁর! বিশেষতঃ লাস পোষ্টমর্টেম হওয়ায় তাঁর যেন গাত্রদাহের সীমা নাই! এ রহস্যের মর্ম্ম নির্দ্ধারণ করা তো সোজা ব্যাপার নয়।

পোষ্টমর্টেমকারী প্রবীরকে সকলের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এতখানি উত্তেজনাপূর্ণ প্রচারকার্য্যই বা কেন? দীর্ঘকাল ধরে প্রবীরের সঙ্গে যদি তরুণের গভীর অন্তরঙ্গতা না থাকত, এবং প্রবীরের কঠোর ন্যায়পরায়ণ প্রকৃতির পরিচয় যদি সে না জানত—তবে আজ এই অপরূপ বাগ-বিভূতিসম্পন্ন ভদ্র-লোকটির বাক্-চাতুর্য্যে মুগ্ধ হয়ে, তরুণও নিঃসন্দেহে মেনে নিত, বাস্তবিকই প্রবীর ডাক্তার একটা মিথ্যাবাদী প্রতারক! কিন্তু নাঃ! প্রবীর সে পাত্রই নয়!

কিন্তু এ ভদ্রলোক অম্লান বদনে গুরুগম্ভীর ছন্দে বেশ বলে যাচ্ছেন ত!

তৎক্ষণাৎ আবার মনে পড়ল,—প্রবীরের উপদেশ!

এদিকে ততক্ষণে জিভ কেটে, ক্ষুব্ধ স্বরে শান্তিবাবু বললেন, "কচি বাচ্চা তারা! এত কূটনৈতিক বুদ্ধি তাদের মাথায় আসা অসম্ভব! নিজেদের লেখাপড়া খেলাধুলা ছাড়া জগতের কোন খবর তারা জানে না।"

শ্লেষভরে শ্রীকান্তবাবু বললেন, "জানে না? পুলিশের হাতে মড়া ছেড়ে দিয়ে রাজ-এষ্টেটকে ফাঁশাবার শয়তানিটুকু তো খুব জানে! ওদের মাও যে কিরকম হিন্দু-স্ত্রী, তাও তো বুঝলাম না। কোনও হিন্দু-স্ত্রী যে স্বামীর মৃতদেহ এমন করে মর্গে

পাঠাতে ছেড়ে দিতে পারে, আমার তা ধারণা ছিল না। দেখছি স্বামীর পয়সাই তাঁর কাছে বড় ছিল,—স্বামী নয়!"

তরুণের ইচ্ছা হোল প্রশ্ন করে যে ক্ষিতীশবাবুর মৃত্যুতে বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করতে বাধ্য হলেন কে? ক্ষিতীশবাবুর স্ত্রী? না, শ্রীকান্তবাবু স্বয়ং? হিন্দু-স্ত্রী হওয়ার অপরাধে স্বামীর সন্দেহ-জনক মৃত্যুর সত্যনিরূপণের অধিকার তাঁর থাকা উচিত নয়, এ বিধানই বা হিন্দু আইনের কোন্‌খানে লেখা আছে?

তিক্ত স্বরে প্রধান ম্যানেজার বললেন, "এটা ফৌজদারী কোর্টের মেছোহাট নয় শ্রীকান্ত! সদ্য: বিধবা, শোকার্ত্ত ভদ্র-মহিলার তখন যা অবস্থা—সে আমরা দেখেছি। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিও না। ভদ্রলোকের মেয়ের সম্বন্ধে সংযত হয়ে কথা কও। কি বাজে বক্‌ছ?"

কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে সমান তেজে শ্রীকান্তবাবু অনর্গল বলে চললেন—"মানলুম—না হয় তাঁর কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। কিন্তু ছেলেরা তো বল্‌তে পারত—'কারুর উপর আমাদের সন্দেহ নাই। যা হবার হয়েছে, মড়া ছেড়ে দাও। আমরা সদ্‌গতি করি!' তা বলতে পেরেছিল? ধিক্ পয়সার লোভকে! ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ! পয়সার লোভে সদ্‌ব্রাহ্মণের মৃতদেহ—বাপের মৃতদেহ ওরা যে মর্গে পাঠাতে রাজি হবে,—তা স্বপ্নেও ভাবি নি!"

তরুণের চোখের সামনে অকস্মাৎ যেন দু হাজার ক্যাণ্ডেল পাওয়ারের ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বলে উঠল!—এবং সঙ্গে সঙ্গে যেন তার মনশ্চক্ষের সামনে এক আশ্চর্য রহস্য-যবনিকা উদ্ঘাটিত হয়ে তার অনুধাবন-শক্তিকে সুদূরপ্রসারী করে দিলে!—এক মুহূর্ত্তে তরুণ যেন অনেক কিছু দেখ্‌তে পেলে,—অনেক-কিছু নিঃসংশয়ে জেনে নিলে!......মনে মনে বললে "অ! ইনি তা হলে নিজের ধারণায় স্বপ্নে পূর্ব্বাহ্ণেই অন্য রকম ভেবে চিন্তে রেখেছিলেন? ব্যাপারটা ওলট্‌-পালট্ হয়ে যাওয়ায় তাই এত ক্রুদ্ধ হয়েছেন!"

সবলে আত্মদমন করে তরুণ নিরীহ ভাবে বললে "বাপের মৃতদেহ যে অমন রহস্যজনক ভাবে পুকুর থেকে পাওয়া যাবে, সেটাও হয় তো তারা স্বপ্নে ভাবে নি। অবস্থা দেখেই ব্যবস্থা করেছে। এটা তো বুদ্ধিমানের মতই কায করেছে।"

পরম ঘৃণাভরে ঠোঁট-মুখ কুঁচকে শ্রীকান্তবাবু বললেন "টাকার লোভে অমন বুদ্ধিমান্ সবাই হয়! কিন্তু আমি হলে—হিন্দুর ছেলে হয়ে বাপের মৃতদেহ ডোম-মুদ্দফরাসকে দিয়ে কাঁটাছেঁড়া করতে কখনই দিতাম না!"

বিস্ময়ের আতিশয্যে সতর্কতা ভুলে গিয়ে তরুণ হঠাৎ বলে ফেললে—"খুন হলেও—না? খুনটাও গাফ্‌ করতেন?"

সদম্ভে শ্রীকান্তবাবু বললেন "আরে মশাই প্রমাণের অভাবে ধর্ম্মাবতাররা কত অধর্ম্ম করতে বাধ্য হন,—আমি ফৌজদারি কোর্টের উকিল, আমার চেয়ে সেটা কেউ বেশী জানে না! এ ক্ষেত্রে তো খুনের কোনও প্রমাণই নেই!"

উত্তেজিত হয়ে তরুণ বললে, "নেই কে বললে? লাঠি ছুরি গলাটেপা, ছাড়া কি অন্য উপায়ে হত্যাকাণ্ড সাধন করা যায় না? বিষাক্ত গ্যাস নেই? রকমারি ইঞ্জেক্‌সন্ নেই? বিষ খাইয়ে মারা যায় না?"

শ্রীকান্তবাবু সুমিষ্ট হাস্যে বললেন, "আন্দাজে বললে তো হবে না, প্রমাণ চাই। প্রবীর পচা মড়া কেটে প্রমাণ দেখাতে পারবে, এটা সে রকম হত্যাকাণ্ড? অসম্ভব!"

"সম্ভব কি অসম্ভব সেটা বিশেষজ্ঞদের বিবেচ্য।"

দম্ভভরা হাসির সঙ্গে শ্রীকান্তবাবু বললেন "আমিও এ্যাপ্লায়েড্‌ কেমেষ্ট্রিতে এম্ এস-সি! বহুৎ বিশেষজ্ঞকে জেরার চোটে তুলা-ধুনো করে ছেড়েছি। এই সেদিন বনৌলি রাজ-এষ্টেটের ব্যাপারে—"

বাধা দিয়ে তরুণ সসম্ভ্রমে বললে "আপনি এ্যাপ্লায়েড কেমেষ্ট্রিতে এম্ এস-সি? বাই জোভ্! ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির? কোন্ সালে পাশ করেছেন?"

দম্ভোৎফুল্ল মুখে শ্রীকান্তবাবু বললেন "১৯১৬ সালে পাশ করেছি। তারপর ল' পাশ করে কোর্টে ঢুকেছি। কেমিষ্ট্রির খবর আমিও সব জানি মশাই! যে যাই বলুক, আমি জানি, পচা মড়া থেকে বিষ আবিষ্কার করা অত সোজা নয়।"

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত প্রধান ম্যানেজার মাঝখান থেকে বলে উঠলেন—"আরে তাই যদি হয়! সত্যিই যদি কেউ ক্ষিতীশকে বিষ খাইয়েই মেরে থাকে এটা প্রমাণ হয়,—দিন না রাজা বাহাদুর ক্ষিতীশের ছেলেদের বিশ হাজার টাকা খেসারৎ! তাতে আমাদের বুক চড়্‌চড়ানি কিসের? বরঞ্চ তাতে আমাদের উৎসাহ বাড়বার কথা যে, হ্যাঁ—রাজার কায করতে করতে দৈবাৎ অপমৃত্যু ঘটলে, আমাদেরও বংশধরদের রাজা দেখবেন! এর জন্য ঘুষ দিয়ে ডাক্তারের মুখ বন্ধ করতে যাব? কেন? এর মানে কি?"

স্নিগ্ধ হাস্যে সান্ত্বনাদায়ক স্বরে শ্রীকান্তবাবু বললেন "বুঝতে পারছেন না? ও সব বাজে লোকের নষ্টামি! পাছে ক্ষিতীশবাবুর ছেলেরা কিছু মোটা টাকা পায়, তাই ক্ষিতীশবাবুর কোন জ্ঞাতি শত্রুই হয়ত হিংসে করে এই চাল চেলেছে। ক্ষিতীশবাবুর জ্ঞাতি শত্রু তো ঢের ছিল। তাদের জ্বালাতেই তো উনি দেশভুঁই ছেড়ে এই তেপান্তর মাঠে এসে ডেরা বেঁধেছিলেন, জানেন তো?"

ভদ্রলোকটির নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধিচাতুর্য্যে চমৎকৃত হয়ে তরুণ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল! একজন পরাক্রান্ত হাকিম, জ্ঞাতি শত্রুর উৎপাতে কাবু হয়ে দেশত্যাগ করে এসেছেন? স্বাস্থ্যকর জল-বায়ুর জন্য নয়? এষ্টেটের চাকরির সুবিধার জন্য নয়? শান্তিবাবু, জ্যাক্‌সন, মায় ক্ষিতীশবাবুর ছেলেরা পর্য্যন্ত অপরাধী তালিকাভুক্ত হয়েছেন, এবার ভিড় করে এল জ্ঞাতিশত্রুর দল!

ততক্ষণে অধৈর্য্যভাবে প্রধান ম্যানেজার বললেন "তা বলে তারা আমাদের নামে ঘুষের প্রস্তাব করবে? ডাহা মিথ্যে কথা বলবে?"

পুনশ্চ সান্ত্বনাদায়ক স্বরে উত্তর হোল "নইলে কার নামে করবে? অপরের নামে বললে প্রবীর কেন মানবে সে কথা? আচ্ছা, আমি প্রবীর ডাক্তারের সঙ্গে শীঘ্রই আলাপ করে, সত্যি মিথ্যা সব জেনে নিচ্ছি। সত্যি যদি কেউ আপনাদের নামে ঘুষের কথা বলে থাকে, তাকে ধরতে যদি পারি—তা হলে সদ্য: পুলিশে দিয়ে তবে অন্য কথা! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

প্রধান ম্যানেজার স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বললেন, ভাখো বাপু তুমি চেষ্টা করে। ডাক্তারকে বুঝিয়ে দিও—"

"সব ঠিক করে দিচ্ছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। কিছু ভাববেন না। কাল পশুর মধ্যেই আমি প্রবীরের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেলব।—হ্যাঁ হে শান্তি, এই শীতের রাত্রে আজ নেই বা গেলে? আমার বাড়ীতে আজ রাতটা কাটিয়ে যাবে চল। গুরুদেব এসেছেন, তোমার খোঁজ নিচ্ছিলেন। কত জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশ কমিশনার তাঁর শিষ্য আছে, তাদের নাম পর্য্যন্ত ভুলে যান। কিন্তু তোমায় ভোলেন নি দেখলুম। এসেই তোমার খোঁজ নিয়েছেন।"

ম্লান মুখে শান্তিবাবু বললেন "আমার সৌভাগ্য। প্রণাম জানাবেন। কিন্তু মাপ করবেন, আমি এখন বড় বিপদ্‌গ্রস্ত। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙ্গে পড়ছে। মা বড় ভাবছেন। আজ বাড়ী যেতেই হবে।"

"আরে, সিদ্ধপুরুষের কৃপা হলে বিপদ্-আপদ্ কি দাঁড়াতে পায়? চল, চল, আমি তোমার বাড়ীতে টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি যে কাল যাবে—। গুরুদেবও কাল সকালে চলে যাবেন।"

"না, শ্রীকান্তদা, মাপ করুন। মার হার্টের অসুখ। উৎকণ্ঠায় তিনি তাহলে মারা যাবেন!"

সহসা উঠে দাঁড়িয়ে তরুণ বললে "একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছি মিঃ চ্যাটার্জ্জি, মাপ করুন। ঘটনার দিন মাতৃনিবাস হোটেলের বামুনকে দিয়ে ক্ষিতীশবাবুর রাত্রের আহার্য্য হর্লিক্‌স্ তৈরী করিয়ে আপনি ফ্ল্যাস্কে পূরে নিয়ে ক্ষিতীশবাবুর সঙ্গে এনেছিলেন শুনলাম। বামুন সেটা আপনার সামনে তৈরী করেছিল?"

শ্রীকান্তবাবু আশ্চর্য্য হয়ে বললেন "হর্লিক্‌স্?"

"হাঁ। হোটেলের ম্যানেজার বললেন⋯"

"হোটেলের ম্যানেজার?"

"হাঁ।"

সহসা সবিদ্রূপ হাস্তে শ্রীকান্তবাবু বললেন "ওঃ! হোটেল-ম্যানেজার! যারা দিনরাত খদ্দেরের খাওয়ার চর্চ্চা নিয়ে ব্যস্ত থাকে! দুঃখের বিষয়, আমি হোটেল-ম্যানেজার নই, উকিল! বনৌলি, ডুমরাওন, ঝরিয়া, লোহাগড় রাজ-এষ্টেটের মামলার ব্যাপারেই সর্ব্বদা মাথা ঘামাই। রান্নাঘরের খবর মনে রাখি না। হর্লিক্‌স্ আমার সামনে কি পিছনে, ডাইনে কি বাঁয়ে—কে তৈরী করেছিল, তা আজ আমার মনে নাই। সুতরাং বাজে কথা বলতে পারব না। গুড্ বাই।"

তিনি হাসতে হাসতে প্রস্থান করলেন।

প্রধান ম্যানেজারের সঙ্গে কয়েকটা প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তার পর, অপহৃত পনর হাজার টাকার নোটের নম্বর ও রাজ-এষ্টেটের হারানো দলিলগুলির তালিকা গ্রহণ করে তরুণ সদলে প্রস্থান করলে।

দশ

গাড়ীতে উঠবার সময় নিম্নস্বরে ট্যাক্সিড্রাইভারকে কি দু'চারটা কথা বলে তরুণ এবার পিছনের সিটে উঠে বসল। ঘোলাটে জ্যোৎস্না-ঢাকা ধোঁয়াটে কুয়াসার আবরণ ছিন্ন করে গাড়ীর তীব্রোজ্জ্বল হেড লাইট সামনের পথ আলোকোদ্ভাসিত করে তুললে। গাড়ী তীরবেগে নির্জ্জন রাস্তা ধরে ছুটল।

কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে তরুণ বললে, "শান্তিবাবু, শ্রীকান্তবাবুর সঙ্গে আপনার পরিচয় তো বেশ ঘনিষ্ঠ। ভদ্রলোকের প্রকৃতি কেমন?"

শান্তিবাবু দুশ্চিন্তাভারে মুহ্যমান হয়ে নতশিরে বসেছিলেন। অন্যমনস্কভাবে বললেন, "মামলায় আর্গুমেণ্ট চমৎকার করতে পারেন, কিন্তু ষ্টেটমেণ্ট ভাল দিতে পারেন না।"

"সে কথা বলছি না। আমি জানতে চাইছি—ভদ্রলোকের নৈতিক চেতনা কি জাগ্রত? না নিদ্রিত? অনর্থ সাধন করবার কুপৌরুষটুকু বেশ জোরালো রকমেই আছে, নয় কি?"

শান্তিবাবু নীরবে ম্লান হাসি হাসিলেন।

তরুণ বললে ভদ্রলোক ক্রমাগতই "জানি না—মনে নাই" আউড়ে পাকা ওকালতি চালে সত্য গোপন করে গেলেন। চাতুরী বিদ্যায় খুব পরিপক্ক দেখলুম!"

নিশ্বাস ছেড়ে পুলিস অফিসার বললেন, "আমি যে কটা কেসে ওঁর ক্লোজ কণ্টাক্টে এসিছি, প্রত্যেকবার ঠকেছি। বঙ্কিম গড়াই একটা খুনে গুণ্ডা। একটা কেসে তাকে আমরা হাতে হাতে ধরলুম। উনি বে-পরোয়া হয়ে মিথ্যে সাক্ষী সাজিয়ে, তেড়ে আর্গুমেণ্ট ঝেড়ে, বে-কসুর আসামীকে খালাস করে নিয়ে গেলেন। হাকিমের কাছে গাল খেলাম আমরা! উনি ওকালতি ফি বাবদ টাকার দাবিতে বঙ্কিমের ঘর-বাড়ী জমি-জমা বিনা মূল্যে কিনে নিয়ে রাতারাতি হলেন বড়লোক! সে লোকটা সর্ব্বস্বান্ত হয়ে এখন বর্দ্ধমানে গিয়ে ফেরিওলার কাম করে খাচ্ছে। তবে শ্রীকান্ত বাবুর ধর্ম্মজ্ঞান বেশ আছে, তা মানতে হবে। তার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে, এখন মাঝে মাঝে দান করেন তাকে, মন্দ নয়।"

আবার বর্দ্ধমান!⋯চমকে উঠে তরুণ বললে খুনী গুণ্ডাকে দান! মানে, তাকে হাতে রাখা? হুঁ⋯বর্দ্ধমানে সে থাকে কোথায় জানেন?"

"জানি বৈ কি। পুলিশ-চিহ্নিত মহাপুরুষ! বর্দ্ধমানে রাণীর সায়ের না শ্যাম-সায়েরের পাড়ে ফেরিওয়ালা ক্লাসের লোকদের বস্তিতে থাকে। পুলিশ সেখানেও তার উপরে চোখ রেখেছে। কিন্তু বাহাদুর বটে ওই সব খুনী-খালাস-কারী উকিলরা!"

"হাঁ বাহাদুর বটে! একটা খুনীকে মিথ্যে বাক্‌চাতুরীর চোটে খালাস করে আর দশটা দুর্নীতিপরায়ণ লোকের মনে খুনের উৎসাহ জাগিয়ে তুললেন!"

"ওঁরা বলেন, তা'হলেও একটা প্রাণ তো বাঁচল!"

"হুঁ। আর দশটা নিরপরাধ মানুষের প্রাণ সংহারের সুব্যবস্থা করবার জন্য!"

"না। সে লোকটা এখন খুব ঠাণ্ডা মেরেছে। পুলিশ তার কোন খুঁৎ ধরতে পারে না।"

"তার নাম কি বললেন?"

"বঙ্কিমচন্দ্র গড়াই। তবে এখন বঙ্কিমত্বটুকু ছেঁটে শুধু চন্দর গড়াই বলেই পরিচয় দেয়।"

চিন্তামগ্ন চিত্তে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তরুণ বললে "শান্তি বাবু, শ্রীকান্তবাবুর গুরুকে আপনি কি খুব ভক্তি করেন?"

ভক্তি নয়, ভয় করি। সাক্ষাৎ হয়েছিল মাত্র একবার। যে টুকু পরিচয় পেয়েছি, তাতে এড়িয়ে চলতে পারলেই বাঁচি!"

"সে কি? তিনি যে বাৎসল্য-রসে আপ্লুত হয়ে আপনাকে স্মরণ করেছেন!"

"তার কারণ আমার পরিচয় দেবার সময় শ্রীকান্তদা অযথা অত্যুক্তি করে তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন যে আমার বাবা ব্যাঙ্কে বহুৎ টাকা রেখে গেছেন। তাঁরও বিশ্বাস হয়েছে, আমি খুব শাঁসালো মক্কেল! গুরুসেবায় সুপ্রচুর অর্থদানের ক্ষমতা আমার আছে মনে করে, তিনি আমায় শিষ্য করবার জন্য ব্যগ্র।

"কি করে তাঁর সঙ্গে আপনার পরিচয় হল?"

"গ্রহের ফেরে! একটা মামলা সম্পর্কে পরামর্শ নেবার জন্য শ্রীকান্তদার বাড়ী গিয়ে অকস্মাৎ তাঁর কবলে পড়ি! কিন্তু তাঁর চাল-চলন আমার ভাল লাগল না। শিষ্য হবার জন্য ঠারে ঠোরে লোভ দেখিয়ে, জেদ করতে লাগলেন। দেশ-বিদেশের অনেক উকিল না কি তাঁর শিষ্য হয়ে দৈব-শক্তি-বলে প্রভূত উপার্জ্জন করছে—ইত্যাদি অনেক আশ্চর্য্য খবর শোনালেন। কিন্তু ফাঁকি দিয়ে গুরুকৃপায় প্রভূত উপার্জ্জন করার চেয়ে নিজের সততা ও পরিশ্রমের জোরে ভদ্র সৎ উকিল হবার আগ্রহ আমার বেশী! তাতে অর্থ না হয় কম আসুক, তবু বিবেকের কাছে ত খাঁটি থাকব? তাই নমস্কার ঠুঁকে চম্পট দিয়েছি। অসদুপায়ে উন্নতি লাভ করা আমার প্রার্থনীয় নয়।

"তাঁর চাল-চলন ভাল লাগল না কেন?"

ইতস্ততঃ করে শান্তিবাবু বললেন "আপনারা পুলিশ-লাইনের লোক। সব কথা আপনাদের না শোনাই ভাল।"

হেসে পুলিশ অফিসার বলিলেন "পুলিশের লোক হলেও আমরা বন্ধুত্বের মর্য্যাদা রাখতে ভুলি না। অনেক অপ্রিয় সত্যও গোপন রাখতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য হই। যদিও জানি, ন্যায়তঃ সেটা উচিত নয়। তা'হলেও বিশ্বাসঘাতক হই না। টেবল টক্ হিসেবে আপনি স্বচ্ছন্দে মিঃ সিংহের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারেন। আর—সত্য কথাই বলছি মশাই, সাধু-সন্ন্যাসীদের গুপ্ত তত্ত্বকে—গুপ্ত শক্তিকে, আমরাও ভয় করে চলি। বে-আইনি কায, দেখে শুনেও ভয়ে ছেড়ে দিতে হয়। ওদের ভাল করবার শক্তি যত থাক, আর না থাক, অনিষ্ট করবার শক্তি অনেক সাধুর যে প্রচণ্ড ভাবে আছে, তা আমরা মানি। তাঁদের প্রতিহিংসা-সাধন-শক্তি বড় ভয়ানক! তার দু' চারটে প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত আমিও দেখেছি।"

গম্ভীর হয়ে তরুণ বললে, "সাধু কখনো কারুর অনিষ্ট সাধন করেন না। যদি করেন; তাহলে তাঁর সাধুত্ব ধ্বংস হয়ে পিশাচত্ব তিনি লাভ করতে বাধ্য হন। রামকৃষ্ণ, পরমহংস, বিবেকানন্দের মত নিষ্কপট ত্যাগী সাধু-সন্ন্যাসীদের জীবন্ত আদর্শ যাদের চোখের উপর জাজ্বল্যমান, সে দেশের লোক হয়ে সাধুর প্রতিহিংসায় বিশ্বাস করব? আমরা কি এতই নির্ব্বোধ!"

শান্তি বাবুর অবসাদগ্রস্ত দেহ-মনে সহসা যেন বিদ্যুতের ঝলক লাগল! গা ঝাড়া দিয়ে মাথা তুলে দৃঢ় স্বরে তিনি বলিলেন "ঠিক বলেছেন মশাই, আন্তরিক ধন্যবাদ আপনাকে! রামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, আমাদের মাথার উপর থাকতে,—হীনবুদ্ধি, ইতর-প্রকৃতি, কুহক-বিদ্যাদক্ষ অসাধুদের পূজা করব সাধু-ভ্রমে? ঠিক বলেছেন,—যে প্রতিহিংসাপরায়ণ, সে যত বড় সাধু সেজে থাক,—তার সাধুত্ব বৃথা। অবশ্য নিষ্কপট সদাচারী, সুনীতিপরায়ণ, প্রকৃত সাধু এখনও আমাদের দেশে নিশ্চয়ই আছেন। তাঁদের চরণে প্রণাম করি। অযথা ঈর্ষ্যা-বিদ্বেষ বশে যারা তাঁদের কুৎসা প্রচার করে—তারা নিজের সর্ব্বনাশকে নিজে ডেকে আনে। সাধু তাদের মূঢ়তা হেসে ক্ষমা করেন, কিন্তু ভগবানের বিচারে যথাকালে তাদের জন্য আসে মর্ম্মান্তিক শাস্তি! তাও স্বচক্ষে এই বয়সে কিছু কিছু দেখেছি।"

তরুণ সোৎসাহে সিগার-কেস বের করে বললে "ধন্যবাদ, ধন্যবাদ! এতক্ষণে আপনার আত্মবিস্মৃতির মোহ কেটেছে দেখে আমি খুশী হলুম!"

ট্যাক্সি ততক্ষণে থানার কাছে এসে পড়েছিল। পুলিশ অফিসারের দিকে চেয়ে তরুণ বললে "আপনি বাড়ী যান। রাত প্রায় এগারটা বাজে, আপনার বাড়ীর লোকেরা নিশ্চয়ই ভাবছেন। আমি শান্তিবাবুকে ট্রেণে চড়িয়ে দিয়ে আসি।"

শশব্যস্তে শান্তিবাবু বললেন—"এই শীতের রাত্রে কেন কষ্ট করবেন? আপনিও—"

মাথা নেড়ে তরুণ দৃঢ়স্বরে বললে, "না মশাই, যা-সব কুহক-বিদ্যাশীল আপনার চারপাশে ভিড় করে রয়েছে দেখছি, কে কখন অসতর্ক মুহূর্ত্তে আকর্ষণ-শক্তিতে আপনাকে টেনে নেবে, আশঙ্কা হচ্ছে। চলুন, আপনাকে আসানসোলের সীমা পার করে দিই, তবে নিশ্চিন্ত হব!"

পুলিশ অফিসার বললেন, "আপনার খাবার ব্যবস্থা যে আমার বাড়ীতে হয়েছে। আমি তাহলে আপনার অপেক্ষায় বসে রইলুম।"

"উহুঁ। আপনি খেয়ে শুয়ে পড়ুন। আমি ষ্টেশনের রিফ্রেশমেণ্ট রুমে শান্তিবাবুর সঙ্গে খেয়ে নেব। তার পর ফিরে এসে প্রবীরের বাসায় আড্ডা দেব।"

বিদায় সম্ভাষণ করে পুলিশ অফিসার নেমে গেলেন। গাড়ী বাজারের রাস্তা ধরে ষ্টেশনে গিয়ে পৌঁছাল। রিফ্রেশমেণ্ট রুম থেকে আহার সেরে, ধীরে সুস্থে এসে তরুণ আসানসোল-চক্রধরপুর শাখা লাইনের গাড়ীতে শান্তিবাবুকে তুলে দিয়ে চারিদিক দেখে শুনে নিজেও ট্রেণে উঠে শান্তিবাবুর পাশে বসল। মেন লাইনের গাড়ীর যাত্রী নেবার জন্য শাখা-লাইনের এই গাড়ীটা এখানে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে।

সে কামরাটা তখনও জনশূন্য। সিগার ধরিয়ে টানতে টানতে তরুণ বললে, শান্তিবাবু, আপনাদের মত সুশিক্ষিত ভদ্র যুবকদের কাছ থেকে দেশ অনেক সাহায্য পাবার দাবি রাখে। দেশের দশের অকল্যাণকর জঞ্জালগুলি ঝেঁটিয়ে সাফ করবার দায়িত্ব

আপনাদের। সে কাযের জন্য চাই—ঐকান্তিক ভগবৎ-নির্ভরতা, সৎসাহস এবং সত্যনিষ্ঠা। আমি গুজবে বিশ্বাস করি না। মিথ্যা কুৎসাকে ঘৃণা করি। আমি চাই খাঁটি সত্য। বন্ধুত্বের অনুরোধে ইতস্ততঃ না করে নিষ্কপটে বলুন দেখি—শ্রীকান্তবাবুর শ্রীশ্রীগুরুদেবটির চাল-চলন কেমন দেখলেন?"

ঈষৎ হেসে শান্তিবাবু বললেন, "কথাটা আমার মুখ থেকে না শুনলেই কি নয়?"

"না। আপনার মুখ থেকেই আমি শুনতে চাই। কারণ, আমি প্রমাণ পেয়েছি আপনি কপটাচারে অভ্যস্ত ন'ন।"

বেদনাক্লিষ্ট কণ্ঠে শান্তিবাবু বললেন, "কিন্তু শ্রীকান্তদা আমাকে এতদিন ধরে চিনেও আজ অবিশ্বাস করলেন! আমি আশ্চর্য্য হলাম তাঁর এ্যাটিচিউড্ দেখে!"

"আত্মবৎ মন্যতে জগৎ! খোঁজ নিলে জানতে পারবেন—ও শ্রেণীর লোকেরা নিজের স্ত্রী-পুত্রকেও বিশ্বাস করে না। তারা যতই সৎ, পবিত্র, আর নিরপরাধ হোক! ওঁদের পারিবারিক জীবন সর্ব্বদাই অশান্তি-বিক্ষুব্ধ! তা ওঁরা আর্থিক সৌভাগ্যের দিক দিয়ে যতই বড়লোক হোন!"

বিস্ময়-চমৎকৃত হয়ে শান্তিবাবু বললেন, "আরে! আপনি কি করে জানলেন সে সব গুপ্ত তথ্য? ওঁর অন্তঃপুরে আপনাদের গুপ্তচর পাঠিয়েছিলেন না কি এর মধ্যে?"

"নিষ্প্রয়োজন! মানব-চরিত্রের বিশেষত্ব অনুধ্যান করবার শক্তি ভগবান্ আমায় দিয়েছেন! না দেখে, না শুনেও সেখান থেকে অনেক খবর টের পাওয়া যায়। যেতে দিন ওঁর কথা, ওঁর গুরুদেবের খবর বলুন। তাঁর আশ্রম কোথা?"

"নৈহাটীর ওই দিকে কোথা গঙ্গাতীরে শুনেছি।"

"নাম কি?"

"কারণানন্দ স্বামী বুঝি—না, না, ত্বরিতানন্দ স্বামী। শুনেছি সিদ্ধ পুরুষ।"

"শ্রীকান্তবাবুও কপটাচারে সিদ্ধ পুরুষ! সিদ্ধ হলেই সে সাধু হয় না। বিশ্বামিত্র তপস্যা-বলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন, রামচন্দ্রও তাঁকে গুরু বলে মেনেছিলেন। কিন্তু শূদ্র তপস্বীর তামসিক-তপস্যা সত্ত্বগুণের নাগাল ধরতে পারলে না। ফলে জন-সমাজের অনিষ্ট সাধন হতে লাগল! সেই রামচন্দ্রই তাই, তাকে স্বয়ং বধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।"

সহর্ষে শান্তিবাবু বললেন, "নমস্কার মশাই! আমার বহুদিনের সংশয় আজ ঘোচালেন! শূদ্র তপস্বীর তপস্যা ছিল তামসিক? বাঁচলুম! প্রবাদ আছে, "সাধু চিনবে কানে"—অর্থাৎ সাধুর কথা শুনে। আপনার বিচারশক্তি দেখে সন্দেহ হচ্ছে—এসেছেন নৈমিষারণ্য থেকে না কি? এতদূর যখন কান ধরে টেনে আনলেন, তখন বলি সত্য কথা?"

"বলুন, নিষ্কপটে।"

"আপনি ঠিক বলেছেন যে প্রতিহিংসা-পরায়ণ, তার সাধুত্ব বৃথা। প্রথম সাক্ষাতেই উনি অর্থাৎ শ্রীকান্তবাবুর গুরু, নিজের অলৌকিক ঐশ্বরিক-ক্ষমতা সম্বন্ধে অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শোনাতে শোনাতে হঠাৎ বলে ফেললেন; "তিনি একদা নেশার ঝোঁকে প্রকাশ্য স্থানে কি কতকগুলো বে-আইনি কায করে ফেলেছিলেন। সেজন্য দুজন পুলিশ ইনেস্পেক্টার ওঁকে ধরে কয়েক টাকা জরিমানা করিয়ে দিয়েছিল। তাদের সে গোস্তাকির দণ্ডস্বরূপ উনি তাদের দুজনের কুষ্ঠব্যাধি ধরিয়ে দিয়েছেন—ঐশ্বরিক শক্তি বলে!"

"বটে! ত্বরিতানন্দ সার্থকনামা সিদ্ধ পুরুষ তা হলে?"

"অথচ সেই মুখেই তখনি বললেন, "আমি কখনো কারুর অনিষ্টচিন্তা করতে শিখি নি।" প্রতিহিংসা বশে কুষ্ঠব্যাধি ধরালেন, অথচ অনিষ্টচিন্তা করতে শেখেন নি! এ কি রকম কাপট্য?"

হেসে তরুণ বললেন, "আপনার প্রশ্নের মধ্যেই রয়েছে মীমাংসা! এরই নাম বিচার! ভগবান্ আপনাকে রক্ষা করেছেন শান্তিবাবু,—ভাগ্যে শিষ্যত্বের হাড়কাঠে মাথা দেন নি! দিলে আপনিও হাকিম বশ করবার তুকতাক্ শিখে বড় উকিল হতেন! কিন্তু যে বিবেককে জবাই করে—শয়তানের কাছে আত্ম-বিক্রয় করে, সে অভিশপ্ত বড়লোকিত্ব!"

সবিস্ময়ে শান্তিবাবু বললেন, "হাকিম বশ করার তুকতাক্ উনি চালনা করেন, এ খবর আপনাকে এর মধ্যে দিলে কে? থট্-রিডিং জানেন না কি?"

"অর্থাৎ—? এ খবরটা আপনারও অজ্ঞাত নয়?"

"না। কিন্তু আমি ওটা ভ্রান্ত কুসংস্কার বলে মনে করি।"

"মনোবিজ্ঞানবিদ্‌দের পরামর্শ নেবেন। তা হলে বুঝবেন—অনেক কুসংস্কার আছে যা দীর্ঘকালের—যুগ-যুগান্তরের অভিজ্ঞতার ফল! গুপ্ত বিজ্ঞান এ সব শক্তিকে স্বীকার করে। বিলিতি গল্পের বইতে কুহকী যাদুকরদের, Alchemistদের, দানবীয় শক্তি চালনার কথা, প্রেত পিশাচ বশ করার কথা, পড়েছেন নিশ্চয়? Demonologistদের মতবাদ জানেন বোধ হয়। তাঁরাও Demoniacism বা পৈশাচিক-শক্তি-ব্যবসায়ীদের অস্তিত্ব স্বীকার করেন।"

"সেগুলো গল্প বলেই মনে হয়, নেহাৎ ছেলেমানুষী।"

"গল্প হলেও তার পিছনে আছে প্রকাণ্ড সত্য। আমাদের দেশেও আত্মারাম সরকারের শিষ্যরা এখনো রয়েছেন তাঁরা খেলা দেখান। কারুর অনিষ্ট করা তাঁদের ব্যবসায় নয়।—তা ছাড়া সাধুবেশধারী, অসাধু প্রেতসিদ্ধ Demoniacismরা প্রেতশক্তির দ্বারা অলৌকিক কার্য্যসাধন করিয়ে জনসাধারণকে তাক লাগাচ্ছে! প্রেতশক্তিকে—খাঁটি ঐশ্বরিক শক্তি বলে প্রচার করে জনসাধারণকে প্রতারিত করে গুরুপূজা আদায় করছে। প্রেত চালনা করে তাদের মতবিরোধী,—বা অবাধ্য ব্যক্তিদের নিষ্ঠুরভাবে নির্য্যাতন করে, তাদের মতিভ্রান্ত করে—রোগ উৎপাদন করে—এমন কি অদৃশ্য উপায়ে হত্যা পর্য্যন্ত করছে—এরা সমাজের অনিষ্টসাধন-কারী, শোণিতশোষণকারী পিশাচ!"

হতভম্ব হয়ে শান্তিবাবু বলেন "আপনি কেমিষ্ট হয়ে এ সব বিশ্বাস করেন?"

"আপনি Advocate হয়ে Hypnotist গুণ্ডার পাল্লায় নির্ব্বিচারে আত্মসমর্পণ করেছিলেন কেন শান্তি বাবু?···কেন

মিথ্যা কথায় সম্মোহিত হয়েছিলেন ? কেন তাদের আড্ডায় গিয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের আদেশ পালনের জন্য বিষাক্ত চা খেয়েছিলেন ? আপনার মত একজন কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির এ রকম মতিভ্রমের কারণ কি, তার যুক্তিসঙ্গত কৈফিয়ৎ দিতে পারেন ?"

থতমত খেয়ে শান্তি বাবু বললেন, "না, পারি না। সে সব কথা মনে পড়লে আমার এখনো ধাঁধা লাগে ! মনে হয়, আমি তখন আমাতে ছিলাম না। বাস্তবিক আমি তখন কি হয়েছিলুম ?"

"এ সব অসাধারণ শক্তিশালী দুরাচারের কবলগ্রস্ত হলে, সাধারণ লোকের ওই রকম দুর্গতিই ঘটে—এ রকম দুর্ভোগগ্রস্ত আরও অনেক দুর্ভাগার খবর আমি জানি।"

"অসাধারণ শক্তি যার থাকবে, সে এমন হীন—এমন ইতর প্রকৃতির হবে কেন ?"

"বলেছি তো তপস্যার জোরে বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন কিন্তু হীন স্বার্থ সাধনে চিত্ত আসক্ত থাকায় শূদ্র তপস্বীর হাড়ে হাড়ে শূদ্রত্ব জমাট বেঁধে গিয়েছিল। সেই জন্য সে মানবতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, জনসমাজের অকল্যাণ ঘটাচ্ছিল। তাই প্রয়োজন হয়েছিল—তার শিরশ্ছেদ ! কোন রকম উৎকট সাধনার জোরে এরা অসাধারণ শক্তি লাভ করলেও এদের হাড়ে হাড়ে মজ্জায় মজ্জায় জমাট বেঁধে থাকে—পরস্বাপহারী দস্যুর মত হীনতা, নীচতা, লোভ, লালসা ! সেই লালসা চরিতার্থ করবার জন্যই এরা তখন কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়ে—সেই অসাধারণ শক্তি প্রয়োগ করতে থাকে।—ফলে জনসমাজ উৎপাতে অস্থির—ক্ষতিগ্রস্ত হয় !"

কি যেন ভাবতে ভাবতে শান্তিবাবু বললেন, "অসাধারণ শক্তি ? অসাধারণ শক্তি ? হাকিম বশ-টশ করা ছাড়াও—হাঁ হাঁ শুনেছি, শ্রীকান্ত দা'র গুরুদেবেরও অনেক অসাধারণ শক্তি আছে। উনি নাকি ইচ্ছা মাত্রেই, পাকা সিমেন্টের মেঝের ওপর বা কোনও কঠিন ধাতব পদার্থের ওপর, মুহূর্ত্তের জন্য পায়ের চাপ দিয়ে চিরস্থায়ী পদচিহ্ন এঁকে দিতে পারেন। ওঁর অন্তরঙ্গ শিষ্যরা কেউ দূরদূরান্তরে মাছ মাংস রেঁধে নির্জ্জন ঘরে মন্ত্রতন্ত্র প'ড়ে ওঁর উদ্দেশে ভোগ দিলে সে সব দূর থেকে খেয়ে নিতে পারেন। আবার কৌতুক করবার জন্য সে সব মাংসের হাড় ইতস্ততঃ ছড়িয়ে দিতে পারেন—"

সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তরুণ বললে, "আর অন্ধ বিশ্বাসে আত্মহারা—দুর্ব্বল-চেতা, ভগবৎ-বিমুখ নরনারীদের কালী, দুর্গা, শিব, জগন্নাথ প্রভৃতি দেবদেবী মূর্ত্তি নির্জ্জন ঘরে মন্ত্রবলে দৃশ্যমান করে দেখাতে পারেন, না ?"

হতবুদ্ধি হয়ে শান্তিবাবু ভয়ে ভয়ে বললেন, "ও বাবা ! সে খবরও আপনি জানেন ?"

উত্তেজনায় তরুণের চোখ-মুখ তখন লাল হয়ে উঠেছে ! ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ থেকে সে আত্মসম্বরণ ক'রে ধীরভাবে বললে, "আমি জানব কি ? এ তো ব্ল্যাক ম্যাজিক ! সাক্ষী স্বয়ং শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী দেব ! প্রবীরকে ধন্যবাদ, আজ দুপুর বেলা সে আমাকে শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ, ৩য় খণ্ড খুলে দেখালে। আপনারাও পড়ে দেখবেন—৫ থেকে ১০ পৃষ্ঠার মধ্যে পাবেন। এক প্রেত-সিদ্ধ সাধু এসে গোস্বামী মশাইকে বলে, "কাল সকালে আপনি একা আসবেন। আপনাকে বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন করাব।" তিনি নিষ্কপট, ভগবদ্ভক্ত। সরল বিশ্বাসে সাধুর আড্ডায় গেলেন। সাধু তাঁকে বসিয়ে, সামনের ঘরে দৃষ্টি রাখতে বলে, কাছে বসে জপ করতে লাগলেন। খানিক পরে গোস্বামী মশাই দেখতে পেলেন,—ঘরের মধ্যে দিব্য পরিষ্কার চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি ! কিন্তু বিষ্ণু বাবাজীর শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম কই ? প্রাণে ভাব-ভক্তিই বা আসে না কেন ? গোস্বামী মশাই অন্তরে অন্তরে সুরু করলেন—ইষ্টমন্ত্র জপ ! তখন বিষ্ণুমূর্ত্তির সুরু হোল থর-কম্পন ! সাধুর উদ্দেশে বিষ্ণু নালিশ করতে লাগল, "তুই আমাকে কার কাছে এনেছিস, আমি যে টিকতে পারছি না !" সঙ্গে সঙ্গে কদাকার প্রেত মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হয়ে বিষ্ণুর—ভূমে পতন ও আর্ত্তনাদ ! সাধু তখন ব্যতিব্যস্ত হয়ে কাকুতি মিনতি জুড়লে—"ছোড় দিজিয়ে,—আপ যো নাম করতে হায়, ওহিসে বান্ধা গিয়া ! আপ্ ভগবদ্ভক্ত হায়, হামরা মালুম নেহি থে। হামরা প্রেত, ভগবদ্ভক্ত-কি সামনেমে ঠাহারণে নেহি সেক্তে !" …বুঝলেন ? মূল তত্ত্বটি মনে রাখবেন—ভগবদ্ভক্ত, আত্মজ্ঞানীর কাছে প্রেত-শক্তির প্রতাপ চালানো যায় না। সেখানে প্রেত শক্তি—আর প্রেতসিদ্ধের দল কাবু। আমার আক্ষেপ হয় আমাদের পুলিশ লাইনে ভগবদ্ শক্তিতে শক্তিমান, প্রকৃত সাধু ব্যক্তি যদি জনকতক থাকতেন, তাহলে এই সব প্রেতসিদ্ধ বদমাইসের দলকে সায়েস্তা করা সোজা হোত। অনেক দুর্ব্বল চেতা, নির্ব্বোধ, এদের উৎপীড়ন থেকে পরিত্রাণ পেত ! শ্রীকান্ত-বাবুর গুরু তান্ত্রিক ?"

"আগে ছিলেন। এখন নাকি বৈষ্ণব হয়েছেন !"

"অহিংস বেশে শিকারের ঘাড়টি নিরাপদে মটকাবার জন্যে ?"

"শিকাররা ঘাড় বাড়িয়েই আছে অনেকে। কারণ তারা ভুতুরে ভেল্কির ভক্ত। ভালবাসে, ভক্তি করে তারা ভেল্কিকে,—ভগবানকে নয়। হীন স্বার্থসিদ্ধির জন্য যখন শ্রীকান্ত দা তাঁর শিষ্য, তখন অন্যে-পরে কা কথাঃ ?"

"তারা নিজের পথে চলুক। কিন্তু নিরপরাধকে রক্ষা করবার জন্য, এ শয়তানির বিরুদ্ধে লড়াই করে যাবার শক্তি ভগবান আমাদের দেন—এই প্রার্থনা। ভগবদ্-শক্তির পরে বিশ্বাস রাখবেন। সাধ্যপক্ষে সাবধানে থাকবেন। অন্তরে আত্ম-সমাহিত হয়ে জপ করুন—শিবোঽহম্।"

আপ ট্রেণ এসে প্লাটফরমের ও-পাশে দাঁড়াল। বহু যাত্রী ভিড় করে এসে শাখা লাইনের ট্রেণে উঠল। শান্তিবাবুর কামরায়ও কয়েকজন ভদ্রলোক উঠলেন। তরুণ বিদায় নিয়ে নেমে এল।

পথ চলতে চলতে নিজমনে বললে, "শূদ্র তপস্বীর শিরচ্ছেদ-কারী, হে সর্ব্বশক্তিমান ! শক্তি দাও !"

প্লাটফরমের অর্দ্ধেকটা পার হয়ে এসেছে, এমন সময় শশব্যস্তে

সামনে এসে দাঁড়ালেন পুলিশ অফিসার! তরুণ বিস্মিত হয়ে বললে, "আবার আপনি?"

নিম্ন স্বরে পুলিশ অফিসার বললেন, "আপনাকে ডাকতে এসেছি। আমরা পুলিশ ষ্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে যাবার পর মিঃ সোম কলকাতা থেকে তিনবার আপনাকে ফোনে ডেকেছেন। আবার এখন ডাকছেন। শীঘ্র আসুন।"

উর্দ্ধশ্বাসে ছুটাছুটি করে এসে তরুণ ফোন ধরলে। সাড়া পেয়ে মিঃ সোম সাঙ্কেতিক ভাষায় বললেন, "তদন্তে বিশেষভাবে প্রমাণ পাওয়া গেল, ক্লিনার ৩০শে নবেম্বর নিঃসন্দেহে দেশে গেছে। সুতরাং তার মারফৎ শ্রীকান্তবাবুর হাওড়া ষ্টেশনে চিঠি পাওয়া অসম্ভব। দ্বিতীয় কথা, শান্তিবাবুর কথিত সাধুর ট্যাক্সির সেই চাকা-মুখো ড্রাইভারকে পেয়েছি। তার জবানবন্দিতে প্রকাশ—১লা ডিসেম্বর বেলা ১টা থেকে তার ট্যাক্সি ভাড়া করে, এক সাধুবেশধারী ব্যক্তি, মাতৃসদন হোটেলের মোড়ে দাঁড় করিয়ে রাখে। বেলা ২টার সময় শান্তিবাবুর মত আকৃতি ও পরিচ্ছদধারী এক বাবু, মাতৃসদন হোটেল থেকে বেরিয়ে অন্যদিকের রাস্তা ধরে চলে যাচ্ছিলেন। তাঁকে দেখিয়ে সাধু ট্যাক্সি চালাতে বলে। ড্রাইভার আজ্ঞা পালন করে। হোটেল থেকে সওয়া ৩ ফার্লং দূরে গিয়ে ট্যাক্সি বাবুর কাছে থামে। সাধু নেমে বাবুর সঙ্গে কি বাৎচিৎ করেছিল, তা ড্রাইভার শুনতে পায় নি। তবে বাবুকে একটা চিঠি দিতে দেখেছে। তখনি বাবুকে তুলে নিয়ে সাধু তার ট্যাক্সিতে কালীঘাটে কাশীচক্রবর্ত্তীর যাত্রী নিবাসে যায়। সেখানে পৌছেই তৎক্ষণাৎ ভাড়া ও ওয়েটিং চার্জ মিটিয়ে তাকে বিদায় দেওয়া হয়। বাবুকে নিয়ে সাধু যাত্রী নিবাসে ঢুকেছে, সে দেখেছে। তারপর সে ওঁদের আর কোনও সংবাদ জানে না। তৃতীয় সংবাদ, শেষ রাত্রে ভাড়া-খাটিয়ে, সেই ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানকে পেয়েছি। ২রা ডিসেম্বর শেষরাত্রে সে কাশী চক্রবর্ত্তীর বাড়ীর নিকটস্থ রাস্তা দিয়ে গাড়ী নিয়ে যাচ্ছিল। এক সাধু এসে তার গাড়ী থামায়, এবং হাওড়া ময়দান পর্য্যন্ত যাওয়ার চুক্তি করে ভাড়া স্থির করে। তারপর গাড়ী সেইখানে দাঁড় করিয়ে রেখে সে গলির মধ্যে যায় এবং আর একজন সাধুর সঙ্গে এক মাতাল বাবুকে ধরাধরি করে এনে গাড়ীতে উঠায়। সে বাবু যুবক এবং ভদ্রবেশী এইটুকু তার মনে আছে। তারপর হাওড়া ময়দানের কাছে তাদের তিনজনকে নামিয়ে দিয়ে সে গাড়ী নিয়ে চলে যায়। সাধুরা বাবুকে ধরাধরি করে নিয়ে কোন দিকে গেল সেদিকে লক্ষ্য রাখার দরকার সে মনে করে নি। সুতরাং দেখে নি। গাড়োয়ান যেখানে তাদের নামিয়ে দিয়েছিল, পূরণ সিংহের সাক্ষ্যে প্রমাণ পাওয়া গেল, তার অদূরেই শান্তিবাবুকে অচৈতন্য অবস্থায় কয়েক ঘণ্টা পরে তিনি পেয়েছেন। এখন তোমার তদন্তের ফল কি হোল, বল।"

তরুণ সাঙ্কেতিক ভাষায় সংক্ষেপে জ্ঞাতব্য বিষয় জানালে।

মিঃ সোম বললেন, "হত্যাকারী যখন এঁদের তিনজনের প্রত্যেক বিষয় ভাল করে জানত, এবং কোথায় ক্ষিতীশবাবুর বাসভবন ও পুষ্করিণী তাও যখন তার অবিদিত নাই, তখন সে বা তারা ওইদিকের বাসিন্দা। কলিকাতার সাধারণ গুণ্ডা তারা নয়। তাদের দলের লোকেরা শান্তিবাবুকে জাল চিঠি দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে গুম করে রেখেছিল, তার আংশিক প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু শ্রীকান্তবাবুর জাল চিঠি পাওয়ার ব্যাপার সন্দেহ-জনক। ছদ্মবেশে কেউ তাঁকে প্রতারণা করেছে বলে, মনে হয় কি?"

তরুণ জবাব দিলে, "পরে বলব। ১লা ডিসেম্বর দিল্লি এক্সপ্রেসে হাওড়া ষ্টেশন থেকে মিঃ জ্যাকসন কি কাযের জন্য কোথা গেছলেন, আগে তার সবিশেষ তদন্ত করুন।"

আরও কয়েকটা বিষয়ের গুপ্ত সংবাদ সঙ্কেতে আদান প্রদান হোল। কিছু পরামর্শও হোল। তারপর ফোন ছেড়ে তরুণ সাহেবী পোষাক পরে হ্যাট ও ওভার কোট নিয়ে ছুটল প্রবীরের বাসায়। রাত তখন সাড়ে বারোটা।

কাযের চাপ পড়লে প্রবীর রাত দুটো তিনটে পর্য্যন্ত জেগে খাটে। আর রোগীর ভিড় বাড়লে অনাহারে অনিদ্রায় অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করে। তরুণ জানত, প্রবীর কর্ম্মদেবতার পূজায় আত্মোৎসর্গ করতে সর্ব্বদা প্রস্তুত।

উপস্থিত পোষ্ট মর্টমের রিপোর্ট নিয়ে সে ব্যস্ত। বাসার অফিসকক্ষে বসে কায করছিল। তরুণের আগমন-সংবাদ পেয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে বললে, "কিরে নিশাচর? এমন সময়ে?"

"তোর সঙ্গে দুটো কথা আছে। আগে তোর সেই ঘুষের বার্ত্তাবাহক কম্পাউণ্ডার বাবাজীকে এখুনি ডেকে পাঠাও, আমার সময় বড় কম, আজ রাত্রেই তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা শেষ করা দরকার। তোকেও এ সময় তার সামনে রাখতে চাই। সকালে তোর হাসপাতালের হট্টগোল, তখন স্থির হয়ে তুই এসব ব্যাপারে মনোযোগ দিতে পারবি না। কম্পাউণ্ডারও হাসপাতালের কাযে ব্যস্ত থাকবে, তার সময় নষ্ট করা তখন ঠিক নয়। কায নষ্ট করার চেয়ে, কিঞ্চিৎ ঘুম নষ্ট করাই মঙ্গল।"

"এই তো কর্ম্মীর যোগ্য কথা! আলস্যে সময় নষ্ট করার মত মহাপাপ আর নাই। দেশে যে এত দুঃখ, দারিদ্র্য, মূর্খতা, পাপ দেখছিস—এর মূলে রয়েছে আলস্য।"

"কিন্তু পরের সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য যারা সর্ব্বদা উদ্যমশীল, সে সব বদমাইস লোকেরা একটু আলস্য-প্রিয় হলে সমাজের মঙ্গল হয়।"

চাকরকে দিয়ে কম্পাউণ্ডারকে ডেকে পাঠিয়ে, তরুণকে নিয়ে প্রবীর এসে অফিস ঘরে বসল। ঘরে অন্য কেউ ছিল না। দুয়ার বন্ধ করে, তরুণ নিম্নস্বরে শ্রীকান্তবাবুর সঙ্গে তার সাক্ষাতের সংবাদ প্রথমে আদ্যোপান্ত শোনালে। তারপর দুজনে কিছুক্ষণ চুপি চুপি গোপন পরামর্শ করলে।

কিছুক্ষণ পরে চাকরের সঙ্গে কম্পাউণ্ডার এসে উপস্থিত হোল। আধা-বয়সী কিঞ্চিৎ নির্ব্বোধ, ভালমানুষ গোছের চেহারা। জামা কাপড় আধ ময়লা। লোকটিকে দেখে তরুণের কাশী চক্রবর্ত্তীকে মনে পড়ল। ধূর্ত্ত চতুর বদমাইস লোকেরা বেছে বেছে এই বোকার দলকেই তাদের উদ্দেশ্য সাধনের সিঁদকাঠি রূপে ব্যবহার করে সর্ব্বত্র! তাদের চক্রান্তে জড়িয়ে পড়ে এই নি [ক্রমশঃ]

দল কত স্থানে যে গুরুতর বিপদে পড়ে, তার সঠিক সংবাদ বাইরের লোক না জানলেও গোয়েন্দা বিভাগের লোকদের জানা ছিল। লোকটির জন্য তরুণের সহানুভূতি বোধ হল।

কম্পাউণ্ডারকে সামনের চেয়ারে বসিয়ে প্রবীর গম্ভীর ভাবে বললে, "শোন হরিপদ, যদি বাঁচতে চাও, তাহলে চালাকির চেষ্টা কোর না। মিথ্যে কথা বোল না। লোহাগড় রাজবাড়ীর কোন্ কর্ম্মচারী তোমার বাসায় এসে ঘুসের কথা বলে গেছে, তার নাম ধাম সমস্ত এঁকে বল।"

কম্পাউণ্ডার ভীত ভাবে বললে, "তার নাম ভজহরি সরকার। বাড়ী আগে ছিল—বার্ণপুরের ওই দিকে। এখন সে বাড়ী ঘর বেচে কোথায় চলে গেছে, কেউ জানে না। কখনো বলে শান্তিপুরে, কখনো বলে ঢাকায় বাড়ী করেছে। মাঝে মাঝে এ অঞ্চলে আসে। এর ওর বাড়ীতে খায়। কাল আমার বাড়ীতে রাত্রে এসে খেয়েছিল। সেই সময় কথায় কথায় বললে, সে লোহাগড় রাজ-এষ্টেটে ফের চাকরির জন্য চেষ্টা করছে—"

তরুণ বাধা দিয়ে বললে, 'ফের চেষ্টা করছে, মানে? সে কি আগে রাজ এষ্টেটে চাকরি করত?"

সঙ্কুচিত হয়ে কম্পাউণ্ডার বললে, "করত। তহশীলদার ছিল। কিন্তু"—

মুখের কথা লুফে নিয়ে তরুণ বললে, "তহবিল ভেঙেছিল তো?"

থতমত খেয়ে কম্পাউণ্ডার বললে, "আজ্ঞে, সবি তো জানেন! জেলে গিয়েছিল তাই। হাজার কতক টাকা ভেঙেছিল, কিন্তু রাখতে পারে নি। সব উড়ে গেছে। এখন দুর্দ্দশায় পড়ে ফের চাকরিতে ঢোকবার জন্য ওপরওলাদের খোসামোদ করে বেড়াচ্ছে। তাই না কি কোন-একজন ওপরওলা তাকে ডাক্তারবাবুর কাছে ঐ কথা বলবার জন্যে পাঠিয়েছিল। কিন্তু ওঁর কাছে যেতে তার সাহস হয় নি। তাই এসে আমাকে ধরেছিল।"

"কোন্ ওপরওলা তাকে পাঠিয়েছিল?"

"আজ্ঞে তাঁর নামটি সে কিছুতে বললে না। বললে—যদি ডাক্তারবাবু রাজি হন, আর জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে বলে যদি রিপোর্ট দেন, তাহলে সে নিজে টাকা বয়ে এনে দিয়ে যাবে। কিন্তু ওপরওলার নাম জান্তে দেবে না।"

"সে আজও তোমার বাড়ীতে এসেছিল?"

"বাড়ীতে? না।"

"হাসপাতালে? সকাল বেলা? যখন আমি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম? ভাল করে ভেবে ছাখ!"

অধিকতর সঙ্কুচিত হয়ে কম্পাউণ্ডার বললে, "আজ্ঞে এসেছিল। কম্পাউণ্ডের ভিতর ঢোকে নি। বাইরে ঘোরাঘুরি করছিল। ডাক্তারবাবু রেগে উঠে, আমায় বকাবকি করছেন শুনে দূর থেকেই সরে পড়ল। আমার সঙ্গে আর দেখা করলে না। কথা কইলে না।"

"সে এখানে কোথায় আড্ডা নিয়েছে?"

"আজ্ঞে, কিছুতেই সে কথা স্বীকার করলে না। মহা ধড়িবাজ, মিথ্যেবাদী। সব বিষয়েই লুকোচুরি, সব কথাতেই ফেরেপবাজি। তার ঘুষের কথাও হয়ত চালিয়াতি—"

কোপন-স্বভাব প্রবীর আর ধৈর্য্য রাখতে পারলে না। দাঁতে দাঁত পিষে বললে, "বলি এতখানি জেনে-শুনেও জেল-খালাসী দাগী আসামীর সঙ্গে তোমার এত অন্তরঙ্গতা কেন? বুড়ো বয়সে জেলে যাবার সখ হয়েছে কি?"

সভয়ে কম্পাউণ্ডার বললে, "কি করি? খেতে পাচ্ছি না"—বলে এসে দাঁড়াল। "ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করি। একমুঠো না দিয়ে করি কি?"

মুচকে হেসে তরুণ বললে, "আঃ বুঝতে পারছ না? 'খেতে পাচ্ছি না' কথাটা বাজে ছুতো। নইলে কাজের কথা পাড়ে কোন্ কৌশলে? আচ্ছা যাও কম্পাউণ্ডারবাবু, ঘুমোও গিয়ে। তবে চারিদিকে চোখ রেখ। সে এখানে এসে কোথায় আড্ডা নিয়েছে যদি খবরটা জানতে পারো, তাহলে ডাক্তারবাবুকে সেটা সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিও।"

কম্পাউণ্ডারকে বিদায় দিয়ে প্রবীরের সঙ্গে আরও দু'চারটা কথা কয়ে তরুণ সে রাত্রের মত বিশ্রাম গ্রহণ করলে।

পরদিন সকালে উঠে নানাবিধ যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি নিয়ে সে পুলিসের জিম্মায় রক্ষিত ক্ষিতীশবাবুর পোষাক-পরিচ্ছদ ও সেই ট্রাঙ্কটা নিয়ে গোপনে দীর্ঘকাল কি সব পরীক্ষা করলে। তারপর সাফল্যের আনন্দোজ্জ্বল মুখে বাইরে এসে, ফোনে মিঃ সোমকে ডেকে সাঙ্কেতিক ভাষায় কি কয়েকটা কথা বললে। খুসী হয়ে মিঃ সোম বললেন, "তোমার সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি!" [ক্রমশঃ

স্বাধীনতা

...আমাদের শিক্ষা বিকৃত হইয়াছে বলিয়াই ভারতবর্ষের রাজ্য-পরিচালনার ভার বিদেশীর হস্তে রহিয়াছে। যেদিন আমাদের শিক্ষা যথার্থ হইবে, সেইদিনই আমাদের রাজ্যপরিচালনার ভার আমাদের হাতে ফিরিয়া আসিবে, কাহারও বাধা দিবার সামর্থ্য থাকিবে না।...

বঙ্গশ্রী পৌষ—১৩৪২

শিক্ষার ক্ষেত্র হইতে সংস্কৃত বিতাড়নের অপপ্রচেষ্টা

ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী, এম-এ, ডি-ফিল্ (অক্সন) [অধ্যাপিকা, লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজ]

অতীব দুঃখের বিষয় যে, বর্ত্তমানে কতিপয় শিক্ষাতত্ত্ববিদ্ শিক্ষার ক্ষেত্র হইতে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যকে নির্ব্বাসিত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। বিশেষরূপে, বর্ত্তমানে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাঠ্য বিষয়ের সংখ্যা এবং পঠনীয় অংশের পরিমাণ হ্রাসের প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ায়, ইহারা সর্ব্বপ্রথমে সংস্কৃতের ১০০ নম্বরের বাধ্যতামূলক 'পেপার'টীর প্রতিই শ্যেন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন, এবং হয় ইহাকে মাত্র ৫০ নম্বরে পর্য্যবসিত করা নয় ইহাকে আর বাধ্যতামূলক না রাখিয়া, সমগ্র ভাবেই ইচ্ছামূলক করাই তাঁহাদের মনোগত ইচ্ছা। (১) বলা বাহুল্য যে এই শেষোক্ত পক্ষই তাঁহাদের প্রকৃত অভিপ্রায়; নিতান্ত তাহা সম্ভবপর না হইলে, সংস্কৃতকে ৫০এর অধিক সম্মান প্রদানে তাঁহারা সম্মত নহেন। প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্য তালিকা হইতে এইরূপে সংস্কৃতের কর্ত্তন বা বর্জ্জনের সপক্ষে তাঁহারা কি কি যুক্তি প্রদর্শন করেন, তাহার কিছু আলোচনা করা হইতেছে। (২)

প্রথম আপত্তি—বাংলা সংস্কৃতের কিঙ্করী নহে, কিন্তু কেবল ইংরাজীর উপরই নির্ভরশীল।

প্রথমতঃ, তাঁহাদের মতে ভাষা ও শিক্ষার দিক্ হইতে সংস্কৃত শিক্ষা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। তাঁহারা বলেন, "বাঙলা ভাষা যখন সংস্কৃতের কিঙ্করী ছিল, তখন সংস্কৃত ব্যাকারণ জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ছিল। বাঙলা ভাষা এখন কাহারও কিঙ্করী নহে, সে নিজের শক্তিতে স্বাধীনা, এখন আর সংস্কৃত জানিবার প্রয়োজন নাই। সংস্কৃত জ্ঞান কতকগুলি শব্দ যোগাইয়া দেয় এবং বর্ণাশুদ্ধি এড়াইবার সাহায্য করে মাত্র। ভাল করিয়া বাঙলা পড়িলেই এই দুইটী অভাবের পূরণ হইতে পারে। সাহিত্যের প্রধান অঙ্গ 'শব্দ' নয়, রচনা-চাতুর্য্য বা প্রকাশ ভঙ্গীর সরসতা। ইহা বরং ইংরাজি হইতে পাওয়া যায়, সংস্কৃত হইতে নহে। বর্ত্তমান যুগের বড় বড় সাহিত্যস্রষ্টারা কেহই সংস্কৃতজ্ঞ নহেন। কাহারও কাহারও 'গজ' বা 'মুনি' শব্দেরও রূপ জানা নাই। (পৃঃ ১০১)।

পুনরায়—"বলা বাহুল্য, মাতৃভাষা যে শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহাই আমাদের জাতীয় আত্ম-মর্য্যাদার অনুকূল। অথচ ইংরাজী না শিখিলেও চলিবে না। ইংরাজী ভাল না জানিলে বর্ত্তমান যুগে কেহ ভালো বাঙলা লিখিতে পারে না। বর্ত্তমান যুগের বাংলা রচনাভঙ্গী ইংরাজীরই অনুবর্ত্তী। বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যও ইংরাজি সাহিত্যের দ্বারা পরিপুষ্ট। প্রবন্ধ সাহিত্য বাঙলা হরপে ইংরাজিতে লেখা বলিলেও চলে। কথাসাহিত্য ইংরাজির মারফতে প্রাপ্ত ইয়োরোপীয় কথাসাহিত্যেরই বঙ্গীয় রূপ। এ ক্ষেত্রে মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন রূপে স্বীকার করিয়া কি করিয়া ইংরাজী শিক্ষার সুব্যবস্থা হইবে, তাহাই চিন্তনীয়।" (পৃঃ ৯৩)

কিন্তু বাংলা ভাষা যে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ও সংস্কৃত-নিরপেক্ষ, অথচ সর্ব্বপ্রকারেই ইংরাজীর উপর নির্ভরশীল, ইহা সত্যই অতি অপূর্ব্ব যুক্তি। (১) প্রথমতঃ, সংস্কৃতের সহিত বাংলা ভাষার প্রকৃত সম্বন্ধের কথা ধরা যাক। ভাষাতত্ত্ববিদ্গণ সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, সংস্কৃত ভাষাই বাংলা ভাষার মূল—আর্য্য প্রাকৃত ভাষা হইতে উদ্ভূত হইলেও, সংস্কৃতই চিরকাল বাংলার প্রাণশক্তি। বাংলা ভাষার ক্রমবিবর্ত্তনের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, বাংলা সর্ব্বদাই সংস্কৃতের আশ্রয়েই পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে। সেই জন্য সংস্কৃতকে বাংলা (এবং হিন্দী প্রভৃতি অন্যান্য ভাষার) মাতামহী স্থানীয়া বলিয়াই গ্রহণ করা হয়। বাংলার অধিকাংশ শব্দই সংস্কৃত ও সংস্কৃতের রূপ ভেদ মাত্র, বানানও তাহাই। সংস্কৃত ব্যাকরণের লিঙ্গ, সমাস, সন্ধি, সম্বোধন প্রভৃতির নিয়মাবলী বাংলা ব্যাকরণের বহু স্থলেই প্রযোজ্য। সে ক্ষেত্রে, বাংলাকে সম্পূর্ণ সংস্কৃতনিরপেক্ষ বলিয়া গ্রহণ করা যে কিরূপে সম্ভবপর, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। উত্তমরূপে বাংলা শিক্ষা করিতে হইলে যে অল্প বিস্তর সংস্কৃত জ্ঞান অত্যাবশ্যক—ইহা ত কোনো ক্রমেই অস্বীকার করা চলে না।

(২) যদি বলা হয় যে, বাংলা ভাষা অতীতে সংস্কৃতের "কিঙ্করী" ছিল সত্য, এবং সেই সময়ে বাঙলা শিক্ষার জন্য সংস্কৃত শিক্ষারও প্রয়োজন ছিল; কিন্তু বাংলা ভাষা এখন কাহারও কিঙ্করী নহে, নিজের শক্তিতে স্বাধীনা, এখন আর সংস্কৃত জানিবার প্রয়োজন নাই—তাহা হইলে, আমাদের প্রশ্ন এই যে, বাংলা কোন্ সময়ে এবং কাহার হস্তে এইরূপে "স্বাধীনতা" প্রাপ্ত হইল? কোন অসমসাহসী বাঙালী বীর এইরূপে বাংলাকে সুপ্রাচীন, "গলিত" সংস্কৃতের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া অসাধ্য-সাধন করিলেন? আমরা ত তাহার কোনো লক্ষণই দেখিতেছি না। কারণ বর্ত্তমানেও বিশুদ্ধ, প্রকৃত বাংলা ভাষার যে রূপটী আমরা দেখিতেছি, তাহাও ওতপ্রোতভাবে সংস্কৃতমূলক ও সংস্কৃতাশ্রয়ী। বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের স্তম্ভসমূহের স্কন্ধে বাংলা ভাষা যে রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহা আদ্যোপান্ত বা প্রধানতঃ সংস্কৃত-বহুল। রবীন্দ্র-সমসাময়িক ও প্রাক্ রবীন্দ্র-যুগের অত্যাধুনিক বাংলা ভাষাও অদ্যাপি সম্পূর্ণ সংস্কৃতমূলক।

যথা—

"প্রণমি সহস্রফণ অনন্তের রসঘন শিলাব্রহ্মরূপ,
পরিবৃত সংখ্যাহীন নগনাগে, যোগাসীন জয় নগভূপ।
শশি-সূর্য্য-করন্যস্ত ভালে তব হরহাস্যসংহত মুকুট,
তব পাদপীঠতলে শ্রিতাঞ্জলি কুবেরের ঐশ্বর্য্য সম্পুট।
অভ্রময় তনুত্রাণ অংস হতে লম্বমান ধরার ধূলায়।"
তব হেমজঙ্ঘা ঘেরি ঝঞ্ঝা শিশুসম তারে খেলায় দুলায়।

(কবিশেখর কালিদাস রায়)

---

(১) যথা, Teachers' Journal, August, 1495, কবিশেখর কালিদাস রায় লিখিত "প্রবেশিকার পাঠ্যসূচী। পৃঃ ১০১—২।

(২) এই সকল যুক্তি উক্ত প্রবন্ধ হইতে গৃহীত।

অথবা—

"পশ্চিমে পিঙ্গল জটা নীলাম্বরে মেঘপুঞ্জ স্তূপ
রোষ-ক্ষুব্ধ ঈশানের সর্ব্বধ্বংসী উদ্যত স্বরূপ—
বিদ্যুতের অট্টহাসি বিচ্ছুরিছে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
মৃত্যুর হুঙ্কার যেন কর্ণে বাজে বজ্রের গর্জ্জনে।"

(সুবোধ রায়

অথবা-

"জ্ঞান-গঙ্গা-বিরাজিত শির, প্রতিভা-ইন্দু শোভিছে ভাল
আশুতোষ নাম সার্থক তব, কীর্ত্তি-মহিমা ঘোষিছে কাল!
বিদ্যামঞ্চে নটরাজ তুমি, প্রাচীনে দিয়াছ নূতন রূপ,
বিশ্ববিদ্যা-দেউলে জ্বেলেছ, সাধন-প্রদীপ পূজার ধূপ।"

(মুনীন্দ্রনাথ সর্ব্বাধিকারী)

এমন কি, অত্যাধুনিক নবীনপন্থী "প্রগতিশীল" বাংলা কবি ও লেখকগণও শুদ্ধ অথবা অশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ, ছন্দঃ প্রভৃতির সাহায্যেই বাংলা কবি ও লেখকরূপে আসর দখলে সচেষ্ট হইয়াছেন। যথা—

"অনিশ্চিত প্রত্যাশার মিশ্মিরে চঞ্চল,
উন্মুখর বিনির্ম্মোক আত্মার মর্ম্মরে।
পলে পলে, প্রহরে প্রহরে
পশে এ অশেষ রন্ধ্রে অশরীরী মানুষের দল
শঠিত স্পৃহার কণা কুড়ায়ে যতনে
অনুপূর্ব্ব পিপীলিকাবৎ।" (সুধীন্দ্র দত্ত)

অথবা—

"বিতর্ক-বিরক্ত মন দ্বিখণ্ডিত দর্পণের মতো
বিড়ম্বিত প্রতিবিম্বে রাষ্ট্র করে বিশ্বের বিকৃতি
পরস্পরে হত্যা করে প্রতিদ্বন্দ্বী মুক্তির সেনানী।
আমার আকাঙ্ক্ষা তাই কবিত্বের অদ্বিতীয় ব্রত,
সংখ্যাহীন, সংজ্ঞাতীত এককের আদিম জ্যামিতি—
স্তব্ধতার নীলিমায় আত্ম-জাত পূর্ণতার বাণী।

(বুদ্ধদেব বসু)

অতএব তথাকথিত "স্বাধীনা" বাঙলা ভাষার কোনোরূপ স্বাধীনতার চিহ্নই ত আমরা বর্ত্তমানে দেখিতেছি না। মজা এই যে, যাঁহারা প্রকাশ্যে সংস্কৃতকে শিক্ষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্র হইতে চিরনির্ব্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত করিতে সমুৎসুক, তাঁহারাও কিন্তু পরিশেষে সেই চিরপুরাতনী, চির-নবীনা মাতামহী সংস্কৃতের উদার অঞ্চলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই সাহিত্যিক-যশঃপ্রার্থী হইতেছেন!

অবশ্য, কতিপয় মুসলমান লেখকের কৃপায় বর্ত্তমানে এক-শ্রেণীর তথাকথিত "বাংলা ভাষা" যে নবরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত-বিবর্জ্জিত।

যথা—

"খাঁদানে—রসুল আজি জেহাদের সেরা শহীদান
তাজা খুনে লাল হ'বে কার্ব্বালার বালু বিয়াবান
দিগন্ত জাহান ভরি কান্না উতরোল
রোনাজারি খিন্ন হায়! হায়!"

কিন্তু সংস্কৃতবিতাড়নেচ্ছুক অত্যুৎসাহী 'বঙ্গীয়গণ' কি ইহাকেই "স্বাধীন" বাংলা ভাষা বলিবেন? এরূপ স্বাধীনতা মৃত্যুরই নামান্তর মাত্র। অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত-পাশমুক্ত বাংলার ইংরাজী বা উর্দ্দু ফার্সীর অধীনতা অপরিহার্য্য। ইহাই কি উঁহাদের কামনা?

(৩) সংস্কৃত হইতে বাংলা কেবল কতকগুলি শব্দের যোগান এবং বর্ণাশুদ্ধি এড়াইবার সাহায্য মাত্র পায়, রচনাচাতুর্য্য ও প্রকাশভঙ্গী নহে, বলিয়া সংস্কৃত শিক্ষা নিষ্প্রয়োজন—এই যুক্তির অযৌক্তিকতা এরূপ সুপরিস্ফুট যে সে সম্বন্ধে অধিক বাগবিতণ্ডার প্রয়োজন নাই। প্রথমতঃ, সংস্কৃত হইতে যদি আমরা কেবল শব্দ-সম্ভার ও বর্ণাশুদ্ধি পরিহারের নিয়মাবলীই প্রাপ্ত হইতাম, তাহাই কি কম মূল্যবান্? এবং তাহার জন্যও কি সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজন হইত না? ভাষার অর্দ্ধাংশই হইল শব্দ ও বর্ণশুদ্ধি, অপর অর্দ্ধাংশ রচনাচাতুর্য্য ও প্রকাশভঙ্গী। মাল্য-গ্রথনে সূত্রই কি সবটুকু, পুষ্প কি সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন? সংস্কৃতের নিকট হইতে না হইলে কোথা হইতে আমরা এই পুষ্পই বা চয়ন করিব? ইংরাজী, আরবী, ফারসী হইতে নিশ্চয় নহে। কথ্য ভাষায় এইরূপ বিদেশী ভাষার সহিত সংমিশ্রণ কিয়দংশে অপরিহার্য্য হইলেও, উচ্চ কোটির লেখ্য ভাষায় বিদেশী শব্দের প্রাচুর্য্য জাতীয় ভাষার দুর্ব্বলতারই দ্যোতক। সুতরাং, শব্দ-সম্পদ্ কোনো ভাষার পক্ষেই অবহেলার বস্তু নহে। যদি কেবল এই শব্দ-সম্পদই আমরা আমাদের একান্ত নিজস্ব, আমাদের যুগ-যুগান্তব্যাপী সভ্যতার শাশ্বত বাহন সংস্কৃত ভাষা হইতে পাই, তাহা হইলে কেবল সেই কারণেই কি আমাদের সংস্কৃত শিক্ষায় অবহিত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য নহে? এতকাল আমরা ইংরাজী ভাষার সাহায্যেই বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতাম। এক্ষণে জাতীয় জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে, আমরা ইংরাজী শব্দ ভিক্ষা করিতে অনিচ্ছুক হইয়া বাঙলা পরিভাষা নির্ম্মাণে মনোযোগী হইয়াছি। এই সকল পারিভাষিক শব্দ সংস্কৃত হইতেই গৃহীত বা সংস্কৃত শব্দেরই রূপান্তর মাত্র। যথা, সরলী-করণ (simplification), সহসমীকরণ (simultaneous equation), সমবাহু (equilateral), কেন্দ্রবিভাগ (centripetal), ক্রান্তিলম্ব (celestial latitude) অন্তর্জ্জনিষ্ণু (endogenous), পরিশ্রুতি (filtration), সন্ধিবন্ধনী (ligament), বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থি (radius), একতত্ত্ববাদ (monism) ইত্যাদি। সংস্কৃত হইতে গ্রহণ না করিলে, এইরূপ বিজ্ঞানসম্মত পরিভাষা আমরা পাইব কি প্রকারে? "শুদ্ধ বাংলা", কেবল বাংলা, অর্থাৎ সংস্কৃতনিরপেক্ষ বাংলা— হাঁচা, কাশা, হাকা, ঘুম, ভাত, কাপড় প্রভৃতি হইতে ত এইরূপ বিজ্ঞান ও দর্শনের উচ্চ কোটীর শব্দ সংগ্রহ করা যায় না! অতএব, উত্তমরূপে বাংলা ভাষা শিক্ষা করিতে ইচ্ছুক ছাত্র ও সাধারণ ব্যক্তি, এবং পরিভাষা নির্ম্মাণেচ্ছুক বিশেষজ্ঞগণ সকলের পক্ষেই অল্প-বিস্তর সংস্কৃত জ্ঞান অত্যাবশ্যক—সন্দেহ নাই। সুতরাং সংস্কৃতকে পণ্ডিতমণ্ডলীর ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠেই আবদ্ধ করিয়া রাখিলে চলিবে না। কারণ, পণ্ডিতগণ সকলেই বিশেষজ্ঞ নহেন বলিয়া,

তাঁহাদের পক্ষে পারিভাষিক শব্দ নির্ম্মাণ করা সম্ভবপর নহে। এইরূপে, সংস্কৃত হইতে কেবল কতকগুলি শব্দ ও বর্ণশুদ্ধি লাভ হইলেও, তাহা বাঙ্গলার পক্ষে কম লাভ নহে। "ভাল করিয়া বাংলা পড়িলেই এই দুইটী অভাবের পূরণ হইতে পারে" কিরূপে তাহা বুঝিলাম না। যদি এস্থলে "বাঙলা" শব্দের অর্থ সংস্কৃত-নিরপেক্ষ, স্বাধীনা বাংলা হয়, তাহা হইলে, হাজার "ভাল করিয়া" বাংলা পড়িলেও, সাহিত্য রচনা ও পরিভাষা নির্ম্মাণের জন্য সুললিত, ভাবগর্ভ, বিজ্ঞানসম্মত ও উপযুক্ত উচ্চ কোটীর শব্দ সংগ্রহ করা সম্ভবপর নহে। অপর পক্ষে, যদি "বাঙলা" শব্দের অর্থ এক্ষেত্রে সংস্কৃতাশ্রয়ী বাংলাই হয়, তাহা হইলে "ভাল করিয়া" বাংলা পড়ার অর্থ, অল্প-বিস্তর সংস্কৃতও পাঠ করা।

(৪) কিন্তু সংস্কৃত কি সত্যই কেবল কতকগুলি শব্দই যোগাইয়া দেয়, এবং বর্ণাশুদ্ধি এড়াইবার সাহায্যই করে মাত্র, অপর কিছুই নহে? রচনাচাতুর্য্য ও প্রকাশভঙ্গীর সরসতার দিক্ হইতে কি ইহা আমাদের কোনো সাহায্যই করে না? ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, রচনাচাতুর্য্য ও প্রকাশভঙ্গীর সরসতার দিক হইতে সংস্কৃত ভাষার তুলনা জগতে নাই। এরূপ সংযত অথচ এরূপ ভাবগর্ভ, এরূপ সুকঠোর নিয়মবদ্ধ অথচ এরূপ সুমধুর ভাষা আর দ্বিতীয় নাই। সংস্কৃত রচনা-প্রণালীর বিশেষ গুণ এই যে, ইহার দ্বারা অতি সংক্ষেপে ভাব ব্যক্ত করা যায়, অথচ ভাষার দিক্ হইতে সরসতা ও মাধুর্য্য এবং ভাবের দিক্ হইতে গভীরতা ও সুস্পষ্টতার বিন্দুমাত্রও ব্যাঘাত হয় না। এইরূপ একটী অতি সমৃদ্ধ, অতি সুনিপুণ, অতি সরস ভাষার সাক্ষাৎ আশ্রয়ে আজন্ম বর্দ্ধিত হইয়াও বাংলা ভাষা সংস্কৃত হইতে রচনাচাতুর্য্য ও প্রকাশভঙ্গীর কিছুই শিক্ষা করিতেছে না, অথচ সম্পূর্ণ বিদেশী এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন ইংরাজী হইতেই তাহা পাইতেছে, এই যুক্তির অর্থ ত হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। ইংরাজী সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি হইতে আমরা ভাব আহরণ করিতেছি, সত্য। কবিতার ছন্দ ও ভঙ্গীও কিছু কিছু আমরা ইংরাজী হইতে পাইয়াছি, সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাষার দিক্ হইতে, সরসতার দিক্ হইতে ইংরাজী আমাদের সাহায্য করিতে পারে কিরূপে? ভাষা, অলঙ্কার, শব্দসংযোজন, ব্যাকরণ সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়মাবলী অবশ্য আমরা ইংরাজী হইতে জানিতে পারি; কিন্তু বাংলা রচনা ও শব্দসংযোজন-প্রণালী, সমাস, ব্যাকরণ প্রভৃতি ইংরাজী হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বলিয়া কেবল নিয়মাবলী জানিলেও, তাহা আমাদের কাজে লাগে অল্পই। সেইজন্য, ইংরাজী ভাষার রীতি অনুসারে ইংরাজী রচনায় যাহা সরস, সুমধুর ও সাবলীল, সম্পূর্ণ ভিন্ন বাংলা রচনায় তাহা সেরূপ ত নহেই, উপরন্তু অনেক ক্ষেত্রেই বিপরীত ফলপ্রসূ। যথা, সমাস, সন্ধি প্রভৃতি ইংরাজী রচনা-প্রণালীতে নাই, কিন্তু বাংলায় এই সকল বহু স্থানেই ব্যবহৃত হয়, এবং ভাষার দিক্ হইতে সংযম, সরসতা ও শ্রুতি-মাধুর্য্য, এবং ভাবের দিক্ হইতে গভীরতা প্রভৃতির কারণ হয়। যথা,—

"নীল-সিন্ধু-জল-ধৌত চরণতল
অনিল-বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল
অম্বরচুম্বিত-ভাল হিমাচল
শুভ্র-তুষার-কিরীটিনী।"

ইহা ত আদ্যোপান্ত সংস্কৃত, এবং অবাঙালী সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ যে কোনো ব্যক্তি অনায়াসে এক মুহূর্ত্তেই ইহার অর্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন। ইংরাজী রচনাশৈলীর কোনোরূপ প্রভাব বা চিহ্নই ত সকল ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় না। ইংরাজী রচনাপ্রণালী অনুকরণ করিয়া এই কবিতাটীকে সমাস-বিবর্জ্জিত রূপে লিখিবার চেষ্টা করিলে, ইহার সাবলীল ছন্দ ও মনোহারিণী মধুরতার কতটুকু অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

অতএব কেবল শব্দসম্ভার ও বর্ণশুদ্ধি নহে, রচনাচাতুর্য্য ও প্রকাশভঙ্গীর সরসতার জন্যও বাঙলা ভাষা বহুল পরিমাণে সংস্কৃত ভাষার নিকটই ঋণী, ইংরাজী অথবা অন্য ভাষার নিকট কদাপি সেইরূপ নহে। অবশ্য ইহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে যে, বাঙলা ও সংস্কৃত অভিন্ন, এবং সংস্কৃত রচনাশৈলী ও ব্যাকরণের প্রত্যেক নিয়মই নির্ব্বিচারে বাঙলাতেও প্রযোজ্য। কিন্তু অপর পক্ষে ইহাও সমান সত্য যে, সংস্কৃতই বাংলার প্রাণশক্তি—কেবল শব্দসম্ভার ও বর্ণশুদ্ধির দিক্ হইতে নহে, রচনাচাতুর্য্য, ভাষার মাধুর্য্য এবং অন্যান্য সকল দিক্ হইতেও সংস্কৃতই বাঙলার চিরন্তন মূল উৎস। সেইজন্য ভাষার দিক্ হইতে বাংলার পরিপুষ্টি সাধন হইতে পারে কেবল সংস্কৃতের আশ্রয়েই, সংস্কৃতনিরপেক্ষভাবে নহে। উপরিউক্ত কবিতাটীকে কে 'কটমট' 'পণ্ডিতী' 'কচকচি' বলিয়া উপেক্ষা করিতে সাহসী হইবেন?

(৫) কেবল ভাষা, অর্থাৎ রচনাচাতুর্য্য ও প্রকাশভঙ্গীর সরসতার দিক্ হইতেই নহে, উপরন্তু ভাবের দিক্ হইতেও যে বাঙলা ইংরাজীরই "কিঙ্করী", সংস্কৃতের নহে—এই মত যাঁহারা সগৌরবে ঘোষণা করিতেছেন, তাঁহাদের নিকট আমাদের জিজ্ঞাসা এই যে, ইহা যদি সত্যও হয়, তাহা হইলে তাহা কি আমাদের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার বিষয়ই নহে? প্রথমতঃ, ভাষার কথাই পুনরায় ধরা যাক্। "ইংরাজী ভাল না জানিলে বর্ত্তমান যুগে কেহ ভালো বাঙলা লিখিতে পারে না। বর্ত্তমান যুগের বাংলা রচনাভঙ্গী ইংরাজীরই অনুবর্ত্তী"—ইহা সত্য হইলে কিন্তু আমাদের লজ্জায় মস্তক অবনত করিতেই হয়। বিদেশিগণের যাহা কিছু ভাল, যাহা গ্রহণযোগ্য, তাহা আমরা অবশ্যই সাদরেই গ্রহণ করিব—কূপমণ্ডূকের জীবনে সুখও নাই, উন্নতিও নাই। কিন্তু যদি আমাদের একান্ত নিজস্ব জাতীয় ভাষা, আমাদের একান্ত নিজস্ব মাতৃভাষাও এইরূপে বিদেশী রাজভাষার এতদূর মুখাপেক্ষী হয় যে, ইংরাজী ভাল না জানিলে, আমরা বর্ত্তমানে ভাল বাংলা লিখিতে পর্য্যন্ত অসমর্থ হই, এবং যদি বাংলা রচনাভঙ্গী ইংরাজী রচনাভঙ্গীরই অনুকরণ মাত্র হয়—তাহা হইলে তাহা জাতির চরম দুর্গতিরই পরিচায়ক মাত্র; এবং সেক্ষেত্রে সেই তথ্যটী এরূপ সগৌরবে প্রচার না করিয়া, আমাদের প্রথম জাতীয় কর্ত্তব্য—এই শোচনীয় অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তনে প্রাণ পণ করিয়া ব্রতী হওয়া। মাতৃসমা মাতৃভাষাকে এইরূপে সর্ব্বপ্রকারে বিদেশী ভাষার উপর নির্ভরশীলা ও উহার অনুকরণকারিণীরূপে সহ্য করিতে পারে কেবল

দাসমনোভাবাপন্ন, পরাধীন জাতি—স্বদেশপ্রেমিক, স্বাধীন জাতি, কদাপি নহে। অবশ্য যদি ইংরাজীর সহিত বাংলার ভাষার দিক্ হইতে কোনোরূপ মূলগত সম্পর্ক থাকিত,—যেরূপ সংস্কৃতের সহিত বাংলার আছে—তাহা হইলে বিদেশী, রাজভাষা হইলেও ইংরাজীর সহিত বাংলার সকল সম্পর্ক ছিন্ন করা সম্ভবপর হইত না। কিন্তু বাংলা ও ইংরাজী দুইটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাষা—শব্দ, বর্ণ, ব্যাকরণ, রচনাপ্রণালী—কোনো বিষয়েই ইহাদের সাদৃশ্য নাই। সে ক্ষেত্রে, কেবল ইংরাজ রাজত্বে বাস করিয়াছে বলিয়াই যদি বাঙ্গালীর বাংলা ভাষা এইরূপে উপরিউক্তরূপে সর্ব্বপ্রকারে ইংরাজীর উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়া থাকে ত' তাহাকে পরাধীনতার অন্যতম কুফলরূপে পরিগণিত করিতে হইবে। এইরূপ ভাষা বাঙলা ভাষার কৃত্রিম রূপ মাত্র, চরম দুর্গতি মাত্র, স্বাভাবিক পরিণতি বা উন্নতি নহে। অতএব, যদি বাঙলা ভাষা সত্যই এইরূপে ইংরাজী ভাষার মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে এই জাতীয় জাগরণের দিনে, অন্যান্য শৃঙ্খলের সহিত মাতৃভাষার শৃঙ্খলও ছিন্ন করা দেশ-প্রেমিক মাত্রেরই প্রধান কর্ত্তব্য। যদি ক্রমাগত ইংরাজী পড়িতে পড়িতে আমরা এরূপ ইংরাজী ভাষার দাস হইয়া পড়িয়া থাকি যে, ইংরাজী ভাল না জানিলে ভাল বাঙলা লিখিতে অসমর্থ হই এবং বাঙলা লিখিবার সময়ে ইংরাজী রচনাভঙ্গীকেই সর্ব্বতোভাবে অনুসরণ করি,—তাহা হইলে কয়েক বৎসরের জন্য ইংরাজী পঠন-পাঠন বন্ধ করিয়া দিয়াও আমাদের স্বাধীন রচনাভঙ্গীর পুনঃ প্রবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। "নিজের শক্তিতে স্বাধীনা" বাংলা ভাষা এখন আর মাতামহীস্থানীয়া সংস্কৃতের "কিঙ্করী" নহে বলিয়া যাঁহারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন, তাঁহারাই বাংলা ভাষার সম্পূর্ণ অনাত্মীয় ইংরাজীর এইরূপ সর্ব্বতোভাবে অধীনতা ও কৈঙ্কর্য্য সহ্য করিতেছেন কিরূপে?

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, সাক্ষাৎ রাজভাষা ইংরাজীর প্রখর জ্যোতিতে পরিম্লান হইয়া পড়িলেও, দীনা, অনাদৃতা বাঙলা ভাষার এরূপ দুর্গতি কদাপি হয় নাই যে, ভাল করিয়া ইংরাজী না জানিলে ভাল করিয়া বাংলা লেখাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। শতাধিক বৎসরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের ফলে কতিপয় ইংরাজী শব্দ বাংলার কথ্য, এমন কি, লেখ্য ভাষাতেও স্থান পাইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাতে বাংলার স্বাতন্ত্র্য কদাপি এরূপ নষ্ট হয় নাই যে, ভাল করিয়া ইংরাজী না জানিলে ভাল করিয়া বাংলা লেখা যায় না, অথবা ইংরাজী রচনাভঙ্গী অনুসরণ না করিয়া বাংলা রচনা অসম্ভব।

"কৈঙ্কর্য্যই" যদি বলিতে হয় তাহা হইলে আমরা বলিব যে, বাংলা ভাষা চিরকালই, বর্ত্তমানেও, একমাত্র সংস্কৃত ভাষারই "কিঙ্করী", অপর কাহারও নহে। ইহা পূর্ব্বেই দর্শিত হইয়াছে। অবশ্য, সংস্কৃতের প্রতি বাংলার এই নির্ভরশীলতাকে আমরা "কৈঙ্কর্য্য" নামে অভিহিত করিতে প্রস্তুত নহি। মাতার উপর সন্তানের নির্ভরশীলতা যেরূপ কৈঙ্কর্য্য বা দাসত্ব নহে, সেইরূপ অধিকাংশ আর্য্য-ভাষার মাতামহীস্থানীয়া সংস্কৃতের উপর বাংলার নির্ভরশীলতাও কৈঙ্কর্য্য নহে—স্বাভাবিক, অবশ্যম্ভাবী, অতি মঙ্গল-প্রসূ পরিণতি মাত্র।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশে শিক্ষিত সমাজে ইংরাজী শিক্ষার এরূপ বহুল প্রসার হইয়াছে যে, ইংরাজী অনভিজ্ঞ সাহিত্যিক বা কবির সংখ্যা অল্প। কিন্তু তজ্জন্য যাঁহারাই বাংলা ভাল লেখেন তাঁহারাই ইংরাজী ভাল জানেন, এবং ইংরাজী ভাল জানেন বলিয়াই বাংলা ভাল লেখেন,—এই অনুমান-প্রণালী, "অগ্নি থাকিলেই সাধারণতঃ ধূম থাকে, অতএব যেখানেই অগ্নি আছে, সেই খানেই ধূম থাকিবে, এবং ধূমই অগ্নির কারণ"—এই অনুমান-প্রণালীর ন্যায়ই হাস্যকর। এরূপ বাংলা লেখকেরও অভাব নাই—যাঁহারা ইংরাজী একেবারেই না জানিয়াই, অন্ততঃ পক্ষে ভাল করিয়া না জানিয়াই, চমৎকার বাংলা লিখিতে পারেন।

ভাষার কথার পরে, এক্ষণে ভাবের বিষয় আলোচনা করা যাক্। "বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যও ইংরাজী সাহিত্যের দ্বারা পরিপুষ্ট। প্রবন্ধ-সাহিত্য বাংলা হরপে ইংরাজীতে লেখা বলিলেও চলে। কথা-সাহিত্য ইংরাজির মারফতে প্রাপ্ত ইউরোপীয় কথা-সাহিত্যেরই বঙ্গীয় রূপ"—ইহাও যদি সম্পূর্ণ সত্য হয়, তাহা হইলেও উহা আমাদের জাতীয় চিন্তাশক্তি দৈন্যেরই পরিচায়করূপে লজ্জারই বিষয়মাত্র। পুনরায় বলিতেছি যে, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রশংসনীয় অংশ আমাদের গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই। ইংরাজী সাহিত্যের এবং ইংরাজীর মারফতে অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ভাবধারায় আমরা অনুপ্রাণিত হইব নিশ্চয়ই। কিন্তু তজ্জন্য আমাদের প্রবন্ধ-সাহিত্য যদি "বাঙলা হরপে ইংরাজী লেখা" মাত্রই হয় এবং আমাদের কথাসাহিত্য যদি "ইংরাজির মারফতে প্রাপ্ত ইউরোপীয় কথাসাহিত্যেরই বঙ্গীয় রূপ" মাত্রই হয় (কবিতা-সাহিত্যকে বাদ দেওয়া হইল কেন?)—তাহা হইলে আমাদের লজ্জা রাখিবার ঠাঁই আর কোথায়? কারণ, ইহার অর্থ এই যে, প্রবন্ধ-সাহিত্যের প্রাণস্বরূপ উচ্চ ও জটিল চিন্তাধারার ও রচনা-প্রণালীর সবটুকুই আমরা বিদেশী শাসক-সম্প্রদায়ের নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়াই বাংলা হরপে লিখিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছি ও চিন্তাশীল লেখকরূপে নাম কিনিতেছি—আমাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র নূতন মৌলিক চিন্তাধারা বা রচনাপ্রণালী বলিয়া কিছুই নাই। একই ভাবে, আমাদের কথাসাহিত্যেও স্বাতন্ত্র্য, মৌলিকতা ও নূতনত্ব একেবারেই কিছু নাই—পাশ্চাত্ত্য কথাসাহিত্যেরই চরিত্র, ঘটনাবলী, ভাবধারা প্রভৃতি বেমালুম চুরি করিয়া আমরা তাহাদের নাম, ধাম, স্থান, কাল, খোল, নলচে বদলাইয়া দিব্য বাংলা কথা-সাহিত্য বলিয়া চালাইয়া দিতেছি। ইহাই যদি সত্য হয়, আমাদের আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সবটুকুই যদি ভিক্ষা অথবা চুরি হয়, তাহা হইলে এই অতি লজ্জার, অতি নিন্দার, অতি দুঃখের ব্যাপারের প্রতিকার কি অবিলম্বেই কর্ত্তব্য নয়? না, যে হেতু আমরা ভিক্ষা অথবা চুরি ব্যতীত সাহিত্য রচনা করিতেই পারি না বলিয়া ভাল করিয়া ভিক্ষা ও চুরির সুবিধার জন্য কেবল ভাল করিয়া ইংরাজী শিখিয়াই চলিব?

কিন্তু যিনি যাহাই বলুন না কেন, আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ ও কথাসাহিত্যের সবটুকুই যে হয় ভিক্ষা, না হয় চুরি—ইহা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। ইহা ঠিকই যে, ইংরাজীর মাধ্য-

মিকতায় আমরা পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার জ্ঞানবিজ্ঞানের সহিত যে পরিচয় লাভ করিয়াছি, তাহার ছাপ স্বভাবতঃই আমাদের সাহিত্যেও পড়িয়াছে। অপর পক্ষে পাশ্চাত্ত্য কথাসাহিত্যের প্রভাবও বাংলাসাহিত্যের উপর অল্প নহে। কিন্তু ইহাই বাংলা সাহিত্যের সবটুকু নহে, হওয়া উচিতও নহে। প্রবন্ধ-সাহিত্যের দিক্ হইতে ইংরাজী প্রবন্ধের অনুবাদ ও অনুকরণ ব্যতীতও স্বতন্ত্র ভাবধারাবিশিষ্ট প্রবন্ধ বাংলায় অসংখ্য। প্রথমতঃ, প্রবন্ধ-সাহিত্যের বিজ্ঞান বিভাগের কথা ধরা যাক। অবশ্য আধুনিক আণবিক বোমার দানবিক কলাকৌশলের বিষয় লিখিতে হইলে আমাদের পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানসাহিত্যের নিকট ভিক্ষাপাত্র হস্তে দণ্ডায়মান হইতেই হইবে, সন্দেহ নাই। তাহার কারণ আমরা অদ্যাপি বিজ্ঞান বিষয়ে অতি অজ্ঞ এবং আমাদের প্রাচীন বিজ্ঞান-রত্ন-খনির আবিষ্কারেও আমরা বিমুখ। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও, বিজ্ঞান সম্বন্ধেও বহু বাংলা প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে ও হইতেছে—যাহা কেবল বাংলা হরপে ইংরাজীতে লেখা নহে, কিন্তু মৌলিক গবেষণামূলক। আমাদের অতি নিজস্ব আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু মূল্যবান্ তথ্যাদি একমাত্র বাংলাতেই সন্নিবিষ্ট আছে। আধুনিক বাঙালী বৈজ্ঞানিকগণ সকলেই ইংরাজীতে সুপণ্ডিত বলিয়া এবং বাংলা অপেক্ষা ইংরাজী ভাষারই ভারতে শিক্ষিত সমাজে এবং জগতে সমধিক প্রসার আছে বলিয়া, তাঁহারা সাধারণতঃ তাঁহাদের আবিষ্কৃত তথ্যাদি ইংরাজী ভাষাতেই লিপিবদ্ধ করেন সত্য; কিন্তু তাহা হইলেও বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের বিজ্ঞান বিভাগ যে ভাব ও ভাষার দিক্ হইতে আগাগোড়া দেশী বিদেশী ইংরাজী প্রবন্ধেরই বাংলা সংস্করণ মাত্র—ইহা বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে। দ্বিতীয়তঃ, বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের দর্শন বিভাগের কথা ধরা যাক। এই বিভাগ যে কেবল ইংরাজীর অনুবাদ, অনুসরণ বা অনুকরণ মাত্র—ইহা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা নিশ্চয় বাংলায় ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি পাঠ করেন না, মাসিক পত্রিকা পড়িতে ধর্ম্ম ও দর্শনবিষয়ক প্রবন্ধাদি চক্ষে পড়িলে নিশ্চয়ই পাতা উল্টাইয়া যান—নতুবা তাঁহারা এরূপ হাস্যকর কথা নিশ্চয়ই বলিতেন না। বাংলা ধর্ম্ম ও দর্শন বিষয়ক প্রবন্ধাদিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের নিজস্ব প্রাচীন ধর্ম্ম, দর্শন, নীতিতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়েরই যে আলোচনা আছে, ইহা তাঁহারা না জানিলেও ইহাই হইল বাংলা দর্শন-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃত রূপ। যাঁহারা বেদ, বেদান্ত, গীতা, ন্যায়, হিন্দুধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতির সম্বন্ধে বাংলায় প্রবন্ধাদি লিখিতেছেন, তাঁহারা ভাব বা ভাষা কোনোদিক হইতেই ইংরাজী দর্শন-সাহিত্যের মুখাপেক্ষী নহেন। ভাবের দিক্ হইতে বেদ-বেদান্তাদির ভাবধারা আমাদেরই একান্ত নিজস্ব—জগতের কোনো দর্শন বা ধর্ম্মে ইহার তুলনা পাওয়া যায় না। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণই বরং কষ্ট করিয়া সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া এই সকল অপূর্ব্ব ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইতে উৎসুক। ভাষার দিক্ হইতেও আমাদের ইংরাজী হইতে ভিক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ প্রাচীন দর্শনাদিতেই অতি সুন্দর পারিভাষিক শব্দাদি পাওয়া যায় এবং বর্ত্তমানে যাঁহারা বাংলায় ধর্ম্মদর্শন সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি রচনা করেন, তাঁহারা ইংরাজী শব্দাদি ব্যবহার না করিয়া যথাসাধ্য সংস্কৃত হইতে গৃহীত বাংলা পরিভাষার সাহায্যেই উহা রচনা করেন। ক্রিশ্চিয়ান ধর্ম্ম ও ইংরাজ দার্শনিকগণের মতবাদ সম্বন্ধে প্রপঞ্চনা বাংলা সাহিত্যে অতি কমই আছে। অতএব বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ধর্ম্ম ও দর্শন-বিভাগ অন্ততঃ সম্পূর্ণ মৌলিক—ভাব ও ভাষা উভয় দিক্ হইতেই। ইংরাজীতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বহু বাঙ্গালী সুপণ্ডিতগণের দানে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ধর্ম্ম ও দর্শনবিভাগ সুসমৃদ্ধ হইয়াছে। সেক্ষেত্রে ইহাকে "বাংলা হরপে ইংরাজীতে লেখা" বলা চলে কিরূপে? তৃতীয়তঃ, বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের সমালোচনা-বিভাগের কথা কিঞ্চিন্মাত্র আলোচনা করিলেও সেই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। দেশী বিদেশী কবি, সাহিত্যিক, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, যুগ-প্রবর্ত্তক, রাষ্ট্রগুরু প্রভৃতির সমালোচনা বর্ত্তমানে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের এক বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছে। এক্ষেত্রে স্থল-বিশেষে, ইংরাজী সমালোচনাপ্রণালীর অনুকরণ দৃষ্ট হইলেও, প্রধানতঃ এই বিভাগও ভাবধারার দিক্ হইতে মৌলিক। এই বিভাগেও ইংরাজী অনভিজ্ঞ বাঙালী বিশেষজ্ঞগণের দান অল্প নহে। চতুর্থতঃ, বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের জীবনী বিভাগ। এই বিভাগ সুবিশাল এবং সম্পূর্ণরূপে আমাদের নিজস্ব। প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মাগণের পুণ্যজীবনী স্মরণ ও আলোচনা বাঙালী জনসাধারণের অতি আদরের জিনিস। "রামকৃষ্ণ-কথামৃত" হইতে আরম্ভ করিয়া শত শত রবীন্দ্রজীবনী প্রভৃতি পর্য্যন্ত ইংরাজীতে অভিজ্ঞ, অনভিজ্ঞ বহু ভক্ত ও জীবনীলেখকের দানে এই বিভাগ পরিপুষ্ট হইয়াছে—ইংরাজী ভাব ও ভাষার এস্থানে প্রবেশ নিষেধ। পঞ্চমতঃ, বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ইতিহাস, ভূগোল, শিল্প, ভ্রমণ প্রভৃতি বিভাগেও ভাব ও ভাষার দিক্ হইতে সম্পূর্ণ মৌলিক প্রবন্ধের সংখ্যা নির্ণয় ত' অসম্ভব। এই সকল বিভাগ ব্যতীতও, বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যে অন্যান্য বহু বিভাগ আছে, যাহা ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ, অন্ততঃ ইংরাজীতে সুপণ্ডিত নহেন, এরূপ বহু সুলেখকের রচনায় পরিপুষ্ট। বস্তুতঃ বাংলা "প্রবন্ধ-সাহিত্য বাঙলা হরপে ইংরাজীতে লেখা বলিলেও চলে"—ইহা এরূপ উদ্ভট কল্পনা যে, সে সম্বন্ধে অধিক বাগবিতণ্ডার প্রয়োজন নাই।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

প্রাচীন নাটকীয় কথামালা

ভাসের প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ-কথা

পূর্ব্বানুবৃত্তি

শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল

দুই

উজ্জয়িনী নগরে রাজা প্রদ্যোতের কঞ্চুকী আসিয়া একজন রাজভৃত্যকে ডাকিয়া বলিতেছেন, "ওরে আভীরক, আভীরক, যাও, মহাসেন প্রদ্যোত বলিয়াছেন বলিয়া প্রতিহারীকে গিয়া বল যে, কাশীরাজের উপাধ্যায় আর্য্য জৈবন্তি দূতরূপে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহাকে সামান্য দূতের ন্যায় সৎকার না করিয়া বিশিষ্ট সৎকারপূর্ব্বক সুখে থাকিবার ব্যবস্থা কর, যেন তিনি আমাদের অতিথিসৎকার ভালভাবে মনে রাখিতে পারেন।"

কঞ্চুকী আবার বলিতে লাগিলেন, "এই ত প্রতিদিনই উপযুক্ত রাজবংশ হইতে কন্যাগ্রহণের জন্য দূত পাঠান হইতেছে। কিন্তু মহাসেন কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করিতেছেন না, কাহাকেও অনুগ্রহ প্রদর্শনও করিতেছেন না। এ ব্যাপার কি? অথবা কন্যাসম্প্রদানে দৈবই অধিকারী। কারণ, দৈব আমাদের রাজপুত্রীকে যাহার বধূরূপে স্থির করিয়াছে, তাহার দূত এখনও আসে নাই; সেই দৈব-সঙ্কল্পিত বরের দূতের অপেক্ষা না করিয়া যে সমস্ত রাজগণ দূত প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের গুণাবলী আমাদের রাজা জানিয়াও পর্য্যাপ্ত মনে করিতেছেন না।" তখন দূর্ব্বাঙ্কুর-স্নিগ্ধ নীলরত্নাঙ্কুরযুক্ত স্বর্ণকেয়ূর-বিবর্দ্ধিতবাহুমূল মহাসেন, শরবণ হইতে কার্ত্তিকের ন্যায়, কনকতালবন হইতে বহির্গত হইলেন। রাজা বলিতেছেন,—"নরেন্দ্রগণ আমার অশ্বখুরোত্থিত মার্গরেণু ভৃত্যের ন্যায় মুকুটে ধারণ করে; কিন্তু তাহাতে আমার পরিতোষ জন্মিতেছে না, কারণ, কুঞ্জরজ্ঞানদৃপ্ত গুণশালী বৎসরাজ এখনও আমার নিকট প্রণত হন নাই।" রাজা কঞ্চুকীকে ডাকিলেন। কঞ্চুকী আসিয়া রাজার জয়কীর্ত্তন করিলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "জৈবন্তিকে ঠিকমত রাখা হইয়াছে ত?" কঞ্চুকী উত্তর করিলেন "হাঁ, ঠিকমত রাখিয়া উপযুক্ত সৎকারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।" রাজা বলিলেন, "কাশীরাজের গুণপক্ষপাতী আপনি যথার্থ কাজ করিয়াছেন। সমাগত ব্যক্তিগণকে পূজাপূর্ব্বক প্রতিগ্রহ করা কর্ত্তব্য। দেখ, কন্যাসম্প্রদানের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে সকলেই অপরের অভিপ্রায়ের অপেক্ষায় থাকে। কঞ্চুকিন্, তুমি যেন কিছু বলিবে বলিয়া মনে হইতেছে।"

কঞ্চুকী উত্তর করিলেন,—"না, এমন কিছু নহে, তবে কন্যা সম্প্রদান সম্বন্ধে কিছু বিচার করিতে ইচ্ছা করি।"

রাজা বলিলেন,—"যাহা বলার ইচ্ছা হইয়াছে তাহা পরিহারের প্রয়োজন নাই; এই কন্যা-প্রদানবিধি সর্ব্বসাধারণ। তোমার বক্তব্য বল।"

তখন কঞ্চুকী বলিলেন, "মহাসেন, আমার কথা হইতেছে এই যে, এই ত প্রতিদিনই উপযুক্ত রাজবংশ হইতে কন্যাগ্রহণের জন্য দূত পাঠান হইতেছে; কিন্তু মহাসেন কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করিতেছেন না, কাহাকেও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন না, এ ব্যাপার কি?"

রাজা উত্তর করিলেন,—"বাদরায়ণ, ঠিক কথাই বলিয়াছ; বরের গুণসমূহের অভিলোভে এবং বাসবদত্তার প্রতি অতি স্নেহে আমি কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। প্রথমে আমি শ্লাঘ্য কুলের কথা কামনা করি, তার পর আমি সদয় বংশের বিষয় চিন্তা করি; দয়াগুণ মৃদু হইলেও সারবান্। তার পর আমি বরের শরীরের কান্তির বিষয় কামনা করি, তাহা শুধু গুণের জন্য নহে, স্ত্রীলোকের ভয়েও বটে; তার পর বীর্য্যোন্নত বরের কথা ভাবি, কারণ তরুণীগণকে তাহারাই রক্ষা করিতে পারে।"

কঞ্চুকী বলিলেন—"এক মহাসেন ব্যতীত এ সব গুণ একাধারে আর কোথাও দেখা যায় না।"

রাজা বলিলেন, "এই জন্যই ত মত চিন্তা। প্রায় পিতার যত্নে কন্যার বরসম্পত্তি লাভ হয়। বাকী সব ভাগ্যাধীন। ইহার অন্যথা দেখা যায় না। কন্যাপ্রদানকালে মাতৃগণ দুঃখশীলা হন। তাই একবার দেবীকে ডাক।"

"মহাসেনের যে আজ্ঞা" বলিয়া কঞ্চুকী চলিয়া গেলেন। তখন রাজা নিজে নিজে বলিতে লাগিলেন, "কাশীরাজ দূত পাঠাইয়াছেন, এদিকে বৎসরাজকে ধরিবার জন্য শালঙ্কায়ন গিয়াছেন; সেই কথাই আমি ভাবিতেছি। সেই ব্রাহ্মণ আজ পর্য্যন্ত কোন সংবাদ পাঠাইতেছেন না কেন? বৎসরাজের মন হস্তিশিকারের লীলায় আসক্ত থাকে বটে কিন্তু তাহার সচিবেরা সর্ব্বদা উদ্যম অবলম্বন করিয়া অবস্থান করে।"

এই সময়ে মহিষী অঙ্গারবতী পরিজনের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি উপবিষ্টা হইলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাসবদত্তা কোথায়?"

দেবী উত্তর করিলেন, "বৈতালিকী উত্তরার নিকট নারদীয়া বীণা শিখিবার জন্য গিয়াছে।"

রাজা বলিলেন,—"তাহার সঙ্গীতকলায় অভিলাষ জন্মিল কি ভাবে?"

দেবী উত্তর দিলেন,"কোন কার্য্যব্যপদেশে সখী কাঞ্চনমালাকে বীণাভ্যাস করিতে দেখিয়া তাহার শিখিবার ইচ্ছা জন্মিয়াছে।"

"বাল্যোচিত বটে" বলিয়া মহাসেন চুপ করিলেন।

তখন দেবী রাজাকে বলিলেন, "বাসবদত্তার জন্য একজন আচার্য্য চাই।"

রাজা বলিলেন, "এখন বিবাহযোগ্য বয়সে আচার্য্যের কি প্রয়োজন? ইহার স্বামী ইহাকে শিক্ষা দিবেন।"

দেবী বলিলেন—"সে কি? আমার বাছার কি বিবাহের বয়স হইয়াছে?"

রাজা উত্তর করিলেন—"ওগো, রোজই আমাকে বল 'কন্যা সম্প্রদান কর'—আর এখন দুঃখ করছ কেন?"

দেবী উত্তর দিলেন—"কন্যা সম্প্রদান আমার অভিপ্রেত কিন্তু

তাহার বিয়োগ আমাকে ব্যথিত করিতেছে। আচ্ছা, কাহাকে কন্যা দেওয়া স্থির করিয়াছ ?"

রাজা বলিলেন—"এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসি নাই। কন্যা অদত্তা রহিয়াছে শুনিয়া লজ্জিত হইতে হয়, আবার দত্তা শুনিয়া মন ব্যথিত হয়; মাতৃগণ ধর্ম্ম ও স্নেহের মধ্যে পড়িয়া নিশ্চয়ই দুঃখিত হন। বাসবদত্তা এখন শ্বশুরের সেবার উপযুক্ত বয়সে পড়িয়াছে; আজ আবার কাশীরাজের উপাধ্যায় আর্য্য জৈবন্তি দূতরূপে উপস্থিত হইয়া কাশীরাজের সচ্চরিত্র কীর্ত্তন করিয়া আমাকে প্রলোভিত করিয়াছেন।" তখন দেবীর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি নিরুত্তরা থাকায় রাজা মনে মনে বলিলেন, "অশ্রুপূর্ণা ব্যাকুলা দেবী কি করিয়া স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিবেন ?" তখন দেবীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"শুনিতে পাইতেছি, যে আমাদের সম্বন্ধের জন্য রাজারা আসিতেছেন।"

দেবী উত্তর করিলেন—"বেশী কথার দরকার নাই, যেখানে দান করিলে আমাদিগকে পরে সন্তপ্ত হইতে হইবে না, সেখানে দান করুন।"

রাজা বলিলেন "এখন ত তুমি বেশ অনায়াসেই বল্লে; আমাকে কিন্তু বর স্থির করার দুঃখভার বইতে হবে, পরে যদি দৈববশে জামাতা দুহিতার উপর রুষ্ট হন—তবে আবার আমাকে তিরস্কার শুনতে হবে। এই জন্য বলিতেছি, দেবী মন স্থির করে একটা নিশ্চয় করে ফেল। শোন মগধের, কাশীর, বঙ্গের, সুরাষ্ট্রের, মিথিলার ও মথুরার রাজারা আমাকে নানা গুণে প্রলোভিত করিয়া আমার সহিত সম্বন্ধস্থাপনের ইচ্ছা করিতেছেন, ইহাদের মধ্যে তুমি কাহাকে পাত্র করিতে বল ?"

এই সময়ে কঞ্চুকী প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"আর্য্য শালঙ্কায়ন-কর্ত্তৃক বৎসরাজ ধৃত হইয়াছেন।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "সহস্রানীকের পৌত্র, শতানীকের পুত্র, গীতকলাভিজ্ঞ কৌশাম্বীর রাজা বৎসরাজ ?"

কঞ্চুকী উত্তর করিলেন,—"হাঁ, সেই বৎসরাজ।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাহা হইলে যৌগন্ধরায়ণ কি মারা গিয়াছেন ?"

কঞ্চুকী উত্তর করিলেন,—"না, তিনি কৌশাম্বীতে আছেন।"

রাজা বলিলেন,—"তবে বৎসরাজ ধৃত হন নাই। শত্রু সকল যুদ্ধে যাহার শৌর্য্যের প্রশংসা করে এবং যাহার মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের মন্ত্রণার ফলসমূহ আমাদের নিকট ধ্বনিত হইতেছে, সেই বৎসরাজ উদয়নের গ্রহণ, করতলে মন্দরপর্ব্বত ঘূর্ণনের ন্যায় বিশ্বাসের অযোগ্য।"

কঞ্চুকী উত্তর করিলেন, "মহারাজ প্রসন্ন হউন; এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কখনও পূর্ব্বে মহাসেনের সমীপে মিথ্যা কথা বলে নাই।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"শালঙ্কায়ন কি কোন প্রিয় দূত-মুখে এ বার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছেন ?"

কঞ্চুকী উত্তর করিলেন,—"না, তিনি নিজেই বেগগামী রথে আরোহণ করিয়া বৎসরাজকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন।"

তখন রাজা বলিলেন, "তাহা হইলে আজ আমার অক্ষৌহিণী সেনাদল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সুখে বিশ্রাম লাভ করুক; যে সব রাজারা বৎসরাজের ভয়ে গুপ্তভাবে আমার নিকট সাহায্যের জন্য দূত পাঠাইতেন, তাঁহারা নির্ভয়ে অবস্থান করুন; এক কথায় আজ আমি যথার্থই মহাসেন হইয়াছি।"

তখন দেবী বলিলেন,—"এই বৎসরাজের জন্য আমরা অপর কাহাকেও বাসবদত্তা সম্প্রদান করি নাই।"

তখন রাজা কঞ্চুকীকে আদেশ করিলেন যে, "প্রধান মন্ত্রী ভরতরোহককে গিয়া বলুন যে, বৎসরাজকে রাজোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক যেন এখানে আনয়ন করেন। আর বৎসরাজকে আনিবার সময় যেন তাহার দর্শনার্থী কোন লোককে বাধা দেওয়া না হয়। তাহারা পূর্ব্বে বৎসরাজের বীরত্বের কথা শুনিয়াছে, এখন যজ্ঞার্থে সংযত ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় তাহাকে স্বচক্ষে সকলে অবলোকন করুক।"

দেবী বলিলেন,—"এই রাজকুলে অনেক আনন্দময় ঘটনা ঘটিয়াছে, কিন্তু এরূপ প্রীতিপ্রদ ঘটনা পূর্ব্বে কখনও মহাসেনের ভাগ্যে ঘটে নাই। আচ্ছা, অনেক রাজারা ত বিবাহের সম্বন্ধের জন্য দূত পাঠিয়েছিলেন, ইনি কি কোন দূত প্রেরণ করেন নাই ?"

রাজা উত্তর করিলেন,—"দেবি, ইনি মহাসেনকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন না, সম্বন্ধের অভিলাষ ত' দূরের কথা।"

রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইঁহার এই ঔদ্ধত্যের কারণ কি ? বালক বলিয়া বা অপণ্ডিত বলিয়া ইহার এইরূপ ভাব ?"

রাজা উত্তর করিলেন—"বালক বটে কিন্তু ইনি অপণ্ডিত নন; ইঁহার গর্ব্বের কারণ এই যে, বেদে যে বংশের নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে সেই প্রসিদ্ধ রাজর্ষি ভরতের বংশে ইঁহার জন্ম। ইঁহার গর্ব্বের অপর কারণ ইঁহার বংশপরম্পরাগত গান্ধর্ব্ববেদ জ্ঞান। বয়সের সহজাত রূপ ইঁহাকে বিভ্রান্ত করিয়াছে এবং ইঁহার প্রজাগণের অনুরাগ ইঁহাকে বিশ্বাসবান্ করিয়াছে। দেবি, তৃণগুল্মে নিক্ষিপ্ত অগ্নি যেমন প্রসারিত হইয়া সমগ্র মেদিনী দগ্ধ করে, সেইরূপ আমার রাজশাসন সমস্ত নরপতিগণকে বশীভূত করিয়াছে, একমাত্র বৎসরাজ-রাজ্যে আমার শাসন প্রসার লাভ করে নাই।"

এই সময়ে কঞ্চুকী আসিয়া বলিলেন "শালঙ্কায়ন আসিয়া আপনাকে এই ঘোষবতী নামক বীণাটি পাঠাইয়া দিয়াছেন। ইহা ভরতকুলে ব্যবহৃত হইত ও বৎসরাজের প্রাসাদ সুশোভিত করিত; তিনি আপনাকে ইহা গ্রহণের অনুরোধ জানাইয়াছেন।"

রাজা সেই জয়মঙ্গল-স্বরূপা বীণা গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "এই সেই ঘোষবতী বীণা, এই সেই শ্রুতিসুখকরা ও স্বভাবানুরাগযুক্তা বীণা,যাহার তন্ত্রী নখাগ্রদ্বারা ঘৃষ্ট হইলেই,ঋষিগণের উচ্চারিতা মন্ত্র-বিদ্যার ন্যায়, অনায়াসে গজহৃদয় বশীভূত করে। সমরবিজয়লব্ধ রত্নরাজ প্রিয়জনে উপভোগ করিলে প্রীতি বর্দ্ধিত হয়। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র গোপালক অর্থশাস্ত্রানুরাগী, কনিষ্ঠ পুত্র অনুপালক গান্ধর্ব্বদ্বেষী ও ব্যায়ামশীল; তাহাদের মধ্যে কেহই ইহার আদর করিবে না। আমার কন্যা বাসবদত্তা বীণাবাদন-শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছে, তাহাকেই ইহা দেওয়া যাউক; শ্বশুরবাড়ী গিয়া বীণা-বাদন তাহার সুলভ হইবে না, এখানে সে বীণা লইয়া খেলা করুক।" অনন্তর 'বৎসরাজ এক্ষণে কোথায়' এই কথা রাজা জিজ্ঞাসা করিলে কঞ্চুকী উত্তর করিলেন, 'তাঁহার পদ শৃঙ্খল বদ্ধ

থাকায়ও অঙ্গ প্রহার জর্জ্জরিত থাকায় তাঁহাকে বহনযোগ্য শয্যার উপর শায়িত করাইয়া গৃহাভ্যন্তরে রাখা হইয়াছে।'

তখন রাজা বলিলেন, "অবিনীত লোকের এইরূপ ফল হইয়া থাকে; যাহা হউক, এ সময়ে ইহাকে উপেক্ষা করিলে নৃশংসতা প্রকাশ পাইবে; বাদরায়ণ, আপনি গিয়া ভরতরোহককে বলুন যে, তিনি যেন ইহার ব্রণ-প্রতীকারের ব্যবস্থা করেন। আর বৎসরাজের সৎকারের যেন সর্ব্ববিধ সুব্যবস্থা করা হয়; তাঁহার আকার দর্শনে তিনি প্রীত হইলেন কিনা জানিতে পারিবেন; অতীত যুদ্ধের কথা যেন তাঁহার নিকট উত্থাপিত করা না হয়। হাঁচি, কাসি প্রভৃতির সময়ে যেন মঙ্গলবাণী উচ্চারণ করা হয়; কালোচিত স্তুতিবাক্য দ্বারা যেন তাঁহার মনস্তুষ্টি বিধান করা হয়।"

"যে আজ্ঞা, মহাসেন" বলিয়া কঞ্চুকী প্রস্থান করিয়া পুনর্ব্বার আসিয়া নিবেদন করিলেন, "পথেই ইহার ব্রণের প্রতীকারের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এখন পুনর্ব্বার প্রতীকারের সময় উপস্থিত হয় নাই। এখন মধ্যাহ্নকাল।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"সেই বীরমানী বৎসরাজ এখন কোথায়?"

কঞ্চুকী উত্তর করিলেন,—"ময়ূরযষ্টি প্রাসাদের উপরিভাগের কক্ষে।"

রাজা বলিলেন—"তথায় সূর্য্যের খরতাপে তাঁহার কষ্ট হইবে, তাঁহাকে মণিময় কক্ষে স্থানান্তরিত করিতে বলুন।"

"যে আজ্ঞা, মহাসেন" বলিয়া কঞ্চুকী প্রস্থান করিয়া পুনরায় আসিয়া বলিলেন—"মহারাজের আদেশ পালন করা হইয়াছে; অমাত্য ভরতরোহক আপনাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।"

রাজা বলিলেন,—"এই ভরতরোহকের নীতি-কৌশলেই বৎসরাজ বন্দী হইয়াছেন; এক্ষণে আমার প্রবর্ত্তিত বৎসরাজ-সৎকার তাহার ভাল লাগিতেছে না, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি; আচ্ছা, আমি গিয়া তাহাকে বুঝাইয়া বলিতেছি।"

তখন দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সম্বন্ধ কি ঠিক করিয়া ফেলিলেন?"

রাজা উত্তর করিলেন,—"এখনও কিছু স্থির নিশ্চয় করি নাই।"

দেবী বলিলেন—"তাড়াতাড়ির দরকার নাই; বাছা আমার যে বালিকা।"

রাজা বলিলেন,—"তোমার যা অভিরুচি; এখন অভ্যন্তরে প্রস্থান কর।" "যে আজ্ঞা" বলিয়া রাণী সপরিবারে অভ্যন্তরে গমন করিলেন।

রাজা চিন্তা করিতে করিতে বলিলেন—"বৎসরাজের ঔদ্ধত্যের জন্য পূর্ব্বে তাহার সহিত আমার বৈরভাব ছিল; কিন্তু তাহাকে বন্দী করিয়া আনার পর তাহার প্রতি আমার উদাসীন ভাব উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে যুদ্ধক্লিষ্ট বিপন্ন বৎসরাজের জীবন বিপন্ন শুনিয়া আমি তাহার চিকিৎসার কথা চিন্তা করিতেছি।" অনন্তর তিনিও প্রস্থান করিলেন।

গ্রন্থাগারের ইতিহাস

শ্রীসুধীরকুমার মিত্র, বিদ্যাবিনোদ

যে স্থানে বহু গ্রন্থের একত্র সমাবেশ হয় তাহাকেই গ্রন্থাগার বলে। বিদ্যার মূল এই গ্রন্থসমূহ, সুতরাং এই মূলকেই আশ্রয় করিয়া বিদ্যা প্রচারিত এবং ইহার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। এই জন্য বিদ্যালয় অপেক্ষা গ্রন্থাগারের গৌরব যে অধিক তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র বালক-বালিকাগণই বিদ্যালাভ করিয়া থাকে, কিন্তু গ্রন্থাগারগুলিতে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই বিদ্যার্জ্জন করিতে সমর্থ হন।

গ্রন্থাগারের ইতিহাস আলোচনা করিয়া পণ্ডিতগণ জানিতে পারিয়াছেন যে অতীতকালে রাজপ্রাসাদে বা দেবমন্দিরে গ্রন্থাগার সংরক্ষিত হইত এবং তথায় রাজকীয় দলিল ও কাগজপত্রাদির সহিত পুরোহিতগণের প্রয়োজনীয় ধর্ম্মগ্রন্থ ও জ্যোতিষ-গ্রন্থাবলী স্থান পাইত। খৃষ্টপূর্ব্ব তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে ব্যাবিলন, আসিরিয়া প্রভৃতি স্থানে গ্রন্থাগার যে কি ভাবে পরিচালিত হইত, তাহার তালিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং উক্ত তালিকা বর্ত্তমানে বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

গ্রন্থাগারের দুইটী প্রধান উদ্দেশ্য আছে—একটী জনশিক্ষা এবং আর একটী গ্রন্থ-সংরক্ষণ। মিশর, ব্যাবিলন প্রভৃতি স্থানের গ্রন্থাগারের বিবরণ আমরা পাইলেও, সুদূর অতীতকালে ভারতবর্ষে গ্রন্থসংরক্ষণের জন্য স্বতন্ত্র উপায় অবলম্বন করা হইত। সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষের লিপির প্রচলন হইলেও, লিপির সাহায্যে পুঁথি লেখা তাহার বহু পরে আরম্ভ হয়। সুতরাং যে সমস্ত প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থ বর্ত্তমানে মুদ্রিতাকারে দেখিতে পাওয়া যায়, সেইগুলি পুরুষানুক্রমে পুরোহিত বা পণ্ডিতগণের স্মৃতি-ভাণ্ডারেই রক্ষিত হইত। বেদের আর একটী নাম শ্রুতি; শ্রুতির অর্থ শুনিয়া শুনিয়া শেখা। সুতরাং প্রাচীন ভারতবর্ষে একজন পুরোহিত বা পণ্ডিতের স্মৃতি-ভাণ্ডার যে এক একটী বৃহৎ গ্রন্থাগার-স্বরূপ ছিল, তাহা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হয় না। এই সংরক্ষণী শক্তির সাহায্যেই লিপির প্রচলনের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে সাঙ্গ-চতুর্ব্বেদ ও অন্যান্য গ্রন্থসমূহ কালের কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছিল।

ইহার পর লিপি-প্রচলনের যুগে তক্ষশীলা ভারতের বিদ্যা-শিক্ষার যে প্রধান কেন্দ্র ছিল তাহা কে না জানে? বৌদ্ধযুগে

ধর্ম্ম-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা-প্রচারও যথেষ্ট হইয়াছিল, তাহা বৌদ্ধ-মঠগুলির বিষয়ে পাঠ করিলে সম্যক্ জানিতে পারা যায়। নালান্দার বিশ্ববিদ্যালয় ও গ্রন্থাগারের খ্যাতি পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং হিউয়েনসাং, ফা-হিয়ান, ইংসিং প্রভৃতি পরিব্রাজকগণ নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। কেবল শিক্ষালাভ করিয়াই তাঁহারা সন্তুষ্ট হন নাই, অধিকন্তু স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় ভারতবর্ষ হইতে তাঁহারা বহু পুঁথির নকল করিয়া লইয়া যান এবং দেশে ফিরিয়া যাইয়া মাতৃভাষায় তাহাদের অনুদিত করেন। কথিত আছে যে হিউয়েন সাং কুড়িটী অশ্বপৃষ্ঠে বোঝাই করিয়া ৬৫৭ খানি পুঁথি ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশে লইয়া যান।

নালন্দার 'রত্নোদধি' নামক একটী নয়তলা প্রাসাদে যাবতীয় পুঁথি তৎকালে সংরক্ষিত হইত। এতদ্ব্যতীত ওদন্তপুরী ও বিক্রমশীলায় দুইটী শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। ১২০২ খৃষ্টাব্দে বখতিয়ার খিলজীর সৈনাধ্যক্ষ ওদন্তপুরীর গ্রন্থাগারে অগ্নি প্রদান করিয়া উহা বিনষ্ট করেন। আগ্রার দুর্গমধ্যে মুসলমান রাজত্বকালে একটী বৃহৎ গ্রন্থাগার ছিল। মুসলমান সম্রাটদিগের মধ্যে আকবর মহাভারত, রামায়ণ, হরিবংশ প্রভৃতি বহু সংস্কৃত গ্রন্থ পারস্য ও হিন্দীভাষায় অনুদিত করাইয়াছিলেন। মহাভারতের অনুবাদের নাম "রেজিন-নামা" (Razin Namah) এবং ইহা অনুবাদ করাইতে সম্রাট্ আকবরের ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। উক্ত গ্রন্থ বর্ত্তমানে জয়পুর মহারাজার গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে।

মুসলমান সম্রাটগণ হিন্দুদিগের মন্দিরের ন্যায় হিন্দুদিগের প্রাচীন গ্রন্থগুলিও বিনষ্ট করেন। তাহাদিগের হাত হইতে গ্রন্থাগারগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ নেপাল রাজ্যে বহু পুথি লইয়া পলায়ন করিয়া অনেক প্রাচীন গ্রন্থ রক্ষা করিতে সমর্থ হন। পরবর্ত্তীকালে বহু পুঁথি সেই জন্য নেপাল হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ভারতের বহু নরপতি গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করেন; উদাহরণ স্বরূপ জয়পুর, যোধপুর, কাশ্মীর, বিকানির, আলোয়ার প্রভৃতির অধিপতিগণের নাম এই স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ভারতের মধ্যে নেপালের "দরবার লাইব্রেরী" সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই গ্রন্থাগারে তালপত্রে লিখিত পাঁচ হাজার পুঁথি আছে। আধুনিক কালের গ্রন্থাগার আন্দোলন ভারতবর্ষে মাত্র চল্লিশ বৎসরের অনধিক কাল হইল আরম্ভ হইয়াছে এবং বরোদা রাজ্যেই এই আন্দোলনের জন্ম হয়। বলা বাহুল্য যে গায়কোয়াড় ইহার উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। বৃটিশ ভারতে ইহার প্রসার দ্রুতবেগে হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। আমাদের বাঙ্গলাদেশে হুগলী জেলায় বাঁশবেড়িয়াতে গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রথম শুরু হয়। গ্রন্থাগার আন্দোলন করিবার জন্য ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের অধিবেশন প্রতি বৎসর হইতেছে এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় প্রমুখ বঙ্গের মনীষিগণ উক্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। তাঁহাদের সাম্মিলিত আন্দোলনের ফলে দেশবাসীর দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে ইহাই গভীর আনন্দের বিষয়।

সমগ্র পৃথিবীতে পুস্তকের সংখ্যা প্রায় চার কোটী; জগতের সমগ্র পুস্তকরাজি সংগ্রহ করিয়া রক্ষা করা কোন গ্রন্থাগারের পক্ষে সম্ভব না হইলেও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুস্তকগুলি প্রত্যেক পাঠাগারেই রক্ষা করা কর্ত্তব্য। অসার তরল উপন্যাস না থাকিলেও গ্রন্থাগার চলিবে; কিন্তু জ্ঞানবিজ্ঞানের পৃথিবীর অমূল্য গ্রন্থগুলি না থাকিলে কোন গ্রন্থাগারই চলিতে পারে না।

আধুনিক সময়ে ইউরোপ ও আমেরিকায় বহু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগার বিদ্যমান আছে। উক্ত গ্রন্থাগারগুলি কোন কোন বিশেষ বিষয়ের গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া নিজেদের বৈশিষ্ট্য প্রকটিত করিয়াছে। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, নাট্যশাস্ত্র প্রভৃতি বিশেষ বিষয় সংক্রান্ত গ্রন্থাগার উল্লিখিত স্থানে অনেক আছে। কিন্তু ভারতবর্ষে ঐ রূপ গ্রন্থাগার একটীও ছিল না, সম্প্রতি কলিকাতায় বঙ্গীয় নাট্যশালার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তোফীর স্মৃতিরক্ষাকল্পে নাটক ও নাট্যশালা সংক্রান্ত পুস্তকাদি লইয়া অর্দ্ধেন্দু নাট্য পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে এবং উক্ত গ্রন্থাগারে প্রায় চারি হাজার পুস্তক আছে।

ইংলণ্ডের ব্রিটিশ মিউজিয়াম আধুনিক কাব্যের একটী প্রধান গ্রন্থাগার এবং ইহাতে পঞ্চাশ লক্ষ পুস্তক এবং ছাপান্ন হাজার পুঁথি আছে। অক্সফোর্ডের বডলিয়ান লাইব্রেরী ইহার পরেই উল্লেখযোগ্য; ইহাতে প্রায় পনের লক্ষ গ্রন্থ এবং বিভিন্ন ভাষার চল্লিশ হাজার পুঁথি আছে তন্মধ্যে দশ হাজার ভারতীয় পুঁথি উক্ত গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয় এবং ইহাই সর্ব্বপ্রাচীন গ্রন্থাগার, ইহাতে দশলক্ষের অধিক গ্রন্থ আছে। ইহার পর বার্লিনের রয়াল লাইব্রেরী ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়, ইহাতেও পনের লক্ষ পুস্তক এবং তিরিশ হাজার পুঁথি আছে। প্যারিসের ও মস্কোর গ্রন্থাগারও উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসে, ভিয়েনায় এবং ইউরোপের বহু স্থানে অসংখ্য ভারতীয় পুঁথি রক্ষিত আছে।

লর্ড কার্জ্জনের চেষ্টায় কলিকাতায় মেটকাফ হলে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতায় যত গ্রন্থাগার আছে ভারতের মধ্যে অন্য কোন সহরে এত গ্রন্থাগার আর কোথাও নাই। রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, রামমোহন লাইব্রেরী, আশুতোষ লাইব্রেরী প্রভৃতি গ্রন্থাগার তন্মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর মত গ্রন্থাগার ভারতে আর নাই এবং চারলক্ষের অধিক গ্রন্থ ইহাতে রক্ষিত আছে। কলিকাতার বাহিরে উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরী, শ্রীরামপুর লাইব্রেরী, চন্দননগর পুস্তকাগার, বাঁশবেড়িয়া লাইব্রেরী এবং রাজসাহী সাধারণ লাইব্রেরীর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসারের উপরই দেশের শিক্ষা-বিস্তার বহুল পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। গ্রন্থাগারগুলিকে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধনী-দরিদ্রের মিলনের কেন্দ্রস্থল বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। গ্রন্থাগারের প্রসার হইলে দেশের অজ্ঞতা দূর হইবে, জ্ঞানের প্রসার হইবে, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হইবে এবং আমাদের জাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি পূর্ণতার পথে অগ্রসর হইবে। গ্রন্থাগারের উন্নতি, পুষ্টি ও সংখ্যাবৃদ্ধির উপরই যে আমাদের মানসিক, আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক উন্নতি সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করিতেছে [illegible]

লেখক

শ্রীধর্ম্মদাস মুখোপাধ্যায়

জিতেনের মত ছেলে কেন যে সবিতাকে ভালবাসল এর কোন সঠিক কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে ছিল জিতেন। ছেলেবেলা থেকে বাবা আর মায়ের আদরে মানুষ হ'য়ে সারাদিন রাত হৈ চৈ ক'রে পাড়ার ছেলেদের সাথে মারামারি করে, কারণে অকারণে পাড়াপড়শীকে উত্যক্ত ক'রে যখন ও চৌদ্দ বছরে পড়ল তখনও কেউ কোনদিন ভাবতে পারে নি যে, এই দুরন্ত ছেলেটাই একদিন আবার কোন মেয়েকে ভালবাসতে পারে। অবশ্য সাধারণভাবে আজকালকার ছেলেমেয়েরা যেভাবে দিনরাত প্রেমে পড়ছে জিতেনের প্রীতির জগৎটা ঠিক সেরকম নয়। বৌদির সাথেই সবিতার সম্বন্ধ। হয়ত বোনের বাড়ী বেড়াতে এসেছে দুদিন, হঠাৎ জিতেনের চোখ পড়লো মেয়েটার ওপর : বাঃ বেশ সুন্দর মেয়েটি তো? হয় ত ওর শান্ত আর ভীরু লজ্জাটাই জিতেনকে আরো আকর্ষণ করলো, নইলে সব ছেলের কাছেই বয়সের মেয়েদের ঠিক একই রকম ভাল লাগে। হয় ত সেই নিয়মেই সবিতাকে জিতেনের ভাল লাগলো—নয়ত পাড়াগাঁয়ের শতকরা নিরানব্বইটা ছেলে যেমন ছেলেবেলায় পাঁচটা মেয়ের সঙ্গে বৌ-বৌ কিম্বা লুকোচুরী কিম্বা রাজারাণী খেলে একটু বড় হলেই ঐ বৌ-বৌ খেলার সাথীদেরই একজনকে ভালবাসে, নয় ত শুধুই কল্পনায় তার সাথে খালে বিলে আর মাঠের মাঝে দিনরাত ঘুরে বেড়ায়, হয় ত সেই রকমের কোন সঙ্গী জিতেনের ছেলেবেলায় না থাকায় বা সুযোগ না ঘটায় মেয়েদের সম্বন্ধে একটু দুর্ব্বলতা তার ছিল, আর শুধু দুর্ব্বলতাই নয় হয় ত মেয়েদের নিকটসান্নিধ্য না পাওয়াতে জিতেনের ঐ দিকটা একদম খালিই ছিল, তাই সবিতাকে দেখামাত্র ও তাকে ভালবেসে ফেলল—অবশ্য সবিতা তাকে ভালবাসল কি না, এ কথাটা কিন্তু জিতেন কোন দিনই জানতে পারল না।

ছেলেবেলা থেকেই জিতেন ছিল একটু ভাবপ্রবণ আর একটু গম্ভীর প্রকৃতির ছেলে। ছেলেবেলায় সে পড়াশুনায় ছিল ভালো, একেবারে ক্লাসের সেরা ছেলে। জিতেনের বড়দাদা ছিলেন একটু রাসভারী আর বদমেজাজী লোক, ঐ বড়দারই খানিকটা প্রভাব ওর মধ্যে আধিপত্য বিস্তার করেছিল—তাই ছেলেবেলা থেকেই ও ছিল একটু স্বতন্ত্র আর একটু ভাবুক। আর এই ভাবুকতা থেকেই ওর আসলো লেখার অনুপ্রেরণা। তাই স্কুলে পড়াকালেই ও অঙ্কের খাতায় লিখে ফেললো ছোট বড় অনেক কবিতা।

অবশ্য এটা ঠিকই যে, জিতেনের এই ধরণের কবিতা লেখার পরিসমাপ্তি ঘটতো অঙ্কুরেই যদি কোনদিন তার বড়দার চোখ পড়তো জিতেনের খাতায়। ভাগ্য ভাল অথবা খারাপ বড়দা ওর সম্বন্ধে ছিলেন নিশ্চিন্ত আর সেই সুযোগে ও ওর কলম চালাতে লাগল অপ্রতিহত ভাবে!

স্কুলের পণ্ডিত মশায় ছিলেন সত্যিকারের একজন রসজ্ঞ আর পণ্ডিত লোক, তাঁরই উৎসাহে জিতেন আরও বেশী কবি হয়ে উঠলো এবং অনেকের মতে তার পরকালটিও ঝরঝরে করে বসল।

জিতেনের এ ধরণের কবি হওয়া নিয়ে একটু ভাববার কথা ছিলো অনেকের—কেন না ওদের বংশের ওপর লক্ষ্মী আর সরস্বতী এঁদের দুজনেরই কেমন যেন একটা চিরকালের উদাস উদাস ভাব ছিল। তার পর একদিন কেমন ক'রে কোন অশুভ মুহূর্ত্তে জিতেনের এক ভাইপোর সাথে মা সরস্বতীর সন্ধি হয়ে গেল এবং সেই থেকেই জিতেনের ভাইপো ও জিতেন ওরা দুইজনেই লেখক হয়ে দাঁড়াল। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় যখন ওদের কিছু কিছু লেখা ছাপা হোল, তখন থেকে নানাজনের বিষদৃষ্টি গিয়ে পড়লো ওদের ওপরে। অন্য অনেকের এই লেখা নিয়ে একটা খারাপ ধারণা ওদের ওপরে থাকলেও আসলে এই লেখা থেকেই জিতেনের জীবনে দোলা দিল দখিণের মলয় বাতাস।

কোন একটা নামকরা সাপ্তাহিকে জিতেনের প্রথম গল্প বেরিয়েছে। বহুদিনের সাধনার এ যেন অসামান্য সাফল্য। বইটা যাতে পাঁচজনের চোখে পড়ে তাই জিতেন ওটাকে টেবলের ওপর রেখেছে। এমন সময় সবিতা এসে ঘরে ঢুকলো। জিতেনের ভাগ্য ভাল ও সে সময় ঘরে ছিল না, থাকলে নিশ্চয়ই সবিতা ঘরে ঢুকতও না আর ঘরে না ঢুকলে সবিতার বইটা হয় ত পড়তে দেরী হোত এবং হয় ত সেই জন্যই সবিতার ভালবাসা পেতে ওকে অনেকখানিই বেগ পেতে হোতো।

সবিতা বইটা খুলে একমনে দেখছে, এমন সময় জিতেন এসে দোরের কাছে দাঁড়ালো। চান সেরে এসে ঘরে ঢুকবে কিন্তু ঘরে সবিতা আপন মনে বই পড়ছে, জিতেনের মনে হোলো ও নিশ্চয়ই খুব আগ্রহের সঙ্গেই পড়ছে নইলে সে পিছনে এসে দাঁড়ান সত্ত্বেও সবিতার হুঁস নেই। তা হ'লে নিশ্চয়ই ও জিতেনের গল্পটাই পড়ছে—এক মনে পড়ছে—নিশ্চয়ই ভাল লেগেছে সবিতার। এ সময় ঘরের মধ্যে ঢুকলে ও নিশ্চয়ই বেরিয়ে যাবে ঘর থেকে—কেননা ঘরে ও ছাড়া আর কেউ নেই! অথচ ঘরে ওর না ঢুকলেই

নয়—অফিসের দেরী হয়ে যাচ্ছে—নূতন চাকরী। একবার দু'পা এগিয়ে যায় জিতেন আবার দু'পা পিছিয়ে শেষে মরি-বাঁচি করে গলা খাঁকারি দিয়ে জিতেন ঘরে ঢুকে পড়লো। তারপরে সবিতাকে ও দেখতেই পায় নি এমন ভাণ দেখিয়ে কাপড় জামা পরতে লাগলো। আশ্চর্য্য! ও ঘরে ঢোকার পরও সবিতা বেরিয়ে গেল না। ঠিক সেই রকম ভাবেই একান্ত মনোযোগের সহিত পড়ে যেতে লাগলো। এইবার জিতেন সবিতাকে ভাল করে দেখল,—সত্যই অদ্ভুত ভাল মেয়ে।

হঠাৎ সবিতা পড়া বন্ধ করে ওর দিকে চোখ তুলে চাইলো, জিতেনের মনে হোলো সবিতা নিশ্চয়ই বইটা চাইবে, হয় ত বলবে, "বইটা একটু দেবেন, পড়বো?" "ও—নিশ্চয় নিশ্চয়, তা নিন না," না নিন না নয় 'নাও' না—যেন কথাটা মুখের কাছে তৈরী করে রেখে দিলো। কিন্তু সবিতার দিক থেকে কোন কথাই এলো না; হয় ত সবিতার লজ্জা হয়েছে। জিতেনের মনে হোলো সে নিজেই বলে, "বইটা পড়বে, তা নিয়ে যাও না"—কিন্তু যেকারণে সবিতা ওর কাছে বইটা চাইতে পারলে না ঠিক সেই কারণেই জিতেনও ওকথা বলতে পারলো না। শুধু মনের মধ্যে একটা ছটফটানি যেন বেড়ে উঠলো—সারা মন যেন জোর করে মুখ ফুটে বলতে গেল কথাটা, পারলো না। এমন সময় সবিতাই সব দ্বন্দ্বের মীমাংসা ঘটিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সবিতা বেরিয়ে যেতেই জিতেনের হঠাৎ মনে হোলো সে ছুটে গিয়ে বইটা সবিতার হাতে গুঁজে দিয়ে আসে—জীবনে এই প্রথম একটা সুযোগ—কোন মেয়েকে তার লেখা পড়াতে—সে যে আর পাঁচজন ছেলের মত অতি সাধারণ নয় খানিকটা ব্যক্তিত্ব আর তারই সাথে প্রতিভা তার আছে—এ কথাটা সবিতাকে জানিয়ে দিয়ে আসে—বইটা হাতে নিয়ে জিতেন ভাবতে লাগলো—ভাবতে লাগলো অনেক দিনের একটা পুরাণো কথা।

ওর তখন বয়স নয় কি দশ। ওর দাদার তখন বিয়ের কথাবার্ত্তা চলেছে। শেষে ঠিক হয়ে গেল ওখানেই অর্থাৎ সবিতার দিদির সাথে। জিতেন চললো কোল বর হয়ে দাদার সাথে বিয়ে করতে। ভারী আনন্দ, বেশ বেড়িয়ে আসা হবে আর তার সঙ্গে খাওয়াটাও মন্দ হবে না।

চারিদিকে আলো আর বাজনার মাঝে হৈ চৈ করে বিয়ে হয়ে গেল। পরদিন সকালে বাসি বিয়ে হচ্ছে। দাদা আর বৌদি পাশাপাশি বসে মন্ত্র পড়ছেন, পাশেই একটা খাটে জিতেন বসে আর তার পাশে আর একটি মেয়ে জিতেনের নূতন বৌদির বৌদি ভারী আমুদে মেয়ে। জিতেন বসে বিয়ে দেখছে এমন সময় একটা ছোট মেয়ে এসে জিতেনের গলায় একটা ফুলের মালা পরিয়ে দিল।

জিতেনের ক্ষুদ্র মন যেন গর্ব্বে আর আনন্দে ভরে উঠলো। সবাই দেখুক সেও কম কিছু নয়, তাকেও মালা দিয়েছে। এমন সময় পাশের বৌটি বললে, তুমিও মালাটা খুলে আবার ওর গলায় পরিয়ে দাও। কথাটা কেমন যেন ওর মনঃপুত হোলো না, মালাটা তা' হ'লে হাতছাড়া হয়ে যাবে—না: থাক। কিন্তু মালাটা থাকলো না—পাশের বৌটি আবার খোঁচালো, দাও না মালাটা খুলে ওর গলায় আবার পরিয়ে, দাও না। কি জন্যে ওর মনটা যেন হঠাৎ কেমন হয়ে গেল। আচ্ছা বলছে যখন বারে বারে তবে তাই হোক। মালাটা জিতেন খুলে আবার সেই মেয়েটিকে পরিয়ে দিতেই চারিদিক থেকে একটা হাসির রব উঠলো। জিতেন অবাক হয়ে সকলের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইলো এমন সময় বৌটি মেয়েটিকে বললো—'যাও সবিতা মাকে দেখিয়ে এসো আর বলে এসো যে এই সঙ্গে তোমার বিয়েটাও হয়ে গেল'।

হঠাৎ জিতেনের যেন চমক ভাঙলো। অফিসের ঘড়িতে তখন দশটা দশ।

সেদিন থেকে জিতেন যেন বাঁচবার একটা নূতন প্রেরণা পেল, জীবনকে সার্থকরূপে উপভোগ করবার সার্থকতাও যেন খুঁজে পেল। তার লেখা সবিতা পড়েছে সবিতার ভাল লেগেছে—এ কথা ভাবতেও জিতেনের আনন্দ হচ্ছিল।

বন্ধুদের কাছে সব কথা খুলে বলতেই তারা লাফিয়ে উঠলো যেন এইতো চাই ফ্রেণ্ড, শেষে তোর মতো ছেলেও লভে পড়লো। মদনের প্রকোপ দেখেছি সর্ব্বঘটেই তাহলে আছে।

এই না, সত্যি বলছি তোরা ঠাট্টা করিসনে। মাইরি সবিতাকে না পেলে নিশ্চয়ই দেবদাস হয়ে যাব। এতো মেয়ে তো রাস্তায় আর এখানে ওখানে দেখা যায় কিন্তু সত্যি করে বলতে কি এরকম ভাল আর আমার কাউকে লাগে নি। তোরা বন্ধুবান্ধব থাকতে যদি আমার একটা উপায় না হয় তাহলে—

আরে নিশ্চয়ই উপায় হবে না তো কি! তোর মত ছেলে ওরা পাবে কোথায়—সবিতার সৌভাগ্য যে তোর মত ছেলের তাকে ভাল লেগেছে। এ কথা কোন মেয়ের ভাবতে না ভাল লাগে যে তার স্বামী সাহিত্যিক।

সত্যি তোরা ঠাট্টা করিসনে মাইরি—কোন জিনিষকেই তোরা সিরিয়াস্লি নিতে পারিসনে।

বা:, আমরা ঠাট্টা করলাম! কেন পাত্র হিসেবে তুমি কি অ-মন্দ? লেখাপড়া তুমি শিখেছ চাকরীও তুমি করছ, তার ওপরে তুমি সাহিত্যিক—দেখতেও এমন কিছু অমন্দ নও—বাড়ী-ঘর বা জমি জায়গাও তোমার আছে।

কিন্তু সবিতার মার কথা যা শুনলাম তাতে মাইরি

কোন ভরসাই পাইনে। তিনি বলেছেন তাঁর আর সব জামাই কাল হয়েছে—এবারে ঐটী তাঁর সর্ব্বশেষ মেয়ে, তিনি সুন্দর জামাই ছাড়া কিছুতেই মেয়ের বিয়ে দেবেন না—তাছাড়া সবিতার কয়েকটা সম্বন্ধও এসেছিল, পাত্র কাল ব'লে ওঁরা পিছিয়ে এসেছেন।

কিন্তু বন্ধু, ওঁদের জানা উচিত যে, পুরুষের সৌন্দর্য্য গায়ের রংএ নয়, মনের রংএ। যার মনের মধ্যে শত ফল্গুধারা পাষাণের মত চাপা প'ড়ে আছে একদিন যদি সেই পাষাণের মুখ খুলে দেওয়া যায়, তাহলে যে স্বচ্ছ বারিধারা নিয়ে সে ছুটবে যার প্রাবল্যে যত কালো সব ধুয়ে যাবে—তোমার ব্যক্তিত্ব, তোমার যোগ্যতা তোমার গুণ এটাই কি ছোট হ'য়ে গেল তোমার কালো রূপের কাছে।

শুধু কালো বলেই নয়, আমার মনে হয় যে আসলে ওরা আমাকে আমল দিতেই চায়না। আমি অতি সাধারণ ভাবে থাকি, যে চাকরী করি তাতে মোটা রকমের মাইনে পাইনে, তা' ছাড়া এত দীনভাবে থেকে মনে উচ্চ ধারণা পোষণ করাটা এযুগে পাগলেরই সামিল। আমার মনে হয় মেয়ে দিতে হলে যে রকম গুরুত্ব কোন পাত্রের থাকা উচিত আমার হয়ত তা নেই।

তুমি কি বলতে চাও, বাইরের গুরুত্ব দেখে, বাইরের চালচলনে আধুনিক ফ্যাসানদুরস্ত ছেলের হাতে মেয়ে দিলেই মেয়ে সুখী হবে বা মেয়ে সৎ পাত্রে পড়ল এমন মনে করতে হবে। বড়লোক বা জমিদার-বাড়ীর বউদের দুর্দ্দশা বা স্বামীর অত্যাচারে ওরকম কত শত বৌ এর জীবন ব্যর্থ হ'য়ে গিয়েছে তার নজীর কি আমাদের চোখের সুমুখে কম আছে! তা সত্ত্বেও যদি মেয়ের বাপ-মা সেই সব পাত্রে মেয়ে দিতে চান তাহলে এটা মনে করাটাই কি স্বাভাবিক হবেনা যে, তাঁরা চান মেয়েরা তাঁদের ঐশ্বর্য্যের মাঝে ডুবে থাক. তাদের সংসারের দৈন্য ঘুচে যাক—এদিকে তাঁদের মেয়েরা সত্যিকারের সুখ, স্বামীর ভালবাসা পাক আর না পাক তা দেখবার দরকারই নেই।

আজকাল তাই হচ্ছে বটে—সত্যিকারের গুণ যে ছেলের আছে, যে নিজে স্বাবলম্বী, হয় ত অতি সাধারণ ভাবে থাকে, কিন্তু শুধু তার বাড়ীঘর জমিজায়গা নেই বলে বা তার আত্মীয়স্বজন অভিভাবক কেউ নেই বলে সে পাত্রকে ছন্নছাড়া ভবঘুরে বলেই তারা মনে করে, পাত্র হিসাবে তাকে এক পয়সারও যোগ্যতা ওরা দেয় না।

আমার মনে হয় আজকালকার বাপ-মারা সেই জন্যই এত বেশী ঠকেন যে, শেষকালে তাঁদের আর অনুতাপ করারও সময় থাকে না, তাঁরা মেয়ের বিয়ে দিতে যান ছেলের সঙ্গে—টাকা-পয়সা ঘরবাড়ী বা জমিজায়গায় সঙ্গে নয় মিশতেই। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য্য এইখানে যে তাঁরা একথা জেনেও আবার ঐ সব গৌণ জিনিষগুলোরই খোঁজ করেন আগে।

বন্ধু-বান্ধবদের একথায় মন ভরে না, আলোচনাও শেষ হয় না—তবু যেন এরই মাঝে ফাঁক থেকে যায়। আজ-কালকার দিনে যে অবিবাহিত মেয়েদের সমস্যা তাকি শুধু ছেলেদেরই দোষে—মেয়েদের দিক থেকে বা তাদের বাপ-মার দিক থেকে কি কোন দোষই থাকে না? শুধু অর্থ আর সম্মানকে বড় ক'রে দেখার মধ্যে কিন্তু সত্যিকারের বলিষ্ঠ কোন কার্য্যকারিতাই থাকে না।

বন্ধুর দলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জিতেন বাসায় ফিরে আসে—সবিতারা এসেছে, জিতেন খুব খানিকটা উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে। সবিতাও বারকয়েক ওপরে নীচে ওঠানামা করে—দুবার চোখাচোখিও হয়, কিন্তু মন যেন ভরেনা, কোথায় যেন অতৃপ্তি কাঁটার মত খচ খচ ক'রে ক'রে বেঁধে, তবু সবিতার কথা ভাবতে ভাবতে ধন্য হ'য়ে ও আফিসে যায়।

কয়েকদিন পরে অফিস থেকে জিতেন ফিরে এলো জ্বর নিয়ে। ঘরে ঢুকেই শুনলো সবিতারা দুপুরে চ'লে গেছে। খুব খানিকটা হতাশ হ'য়ে পড়লো ও, যাবার সময় একবার শেষ দেখাও হোলোনা, হয়ত চিরদিনের জন্য ওর চোখের সুমুখ থেকে সে চলে গেল। হয় ত দেশে গিয়ে ওর একদিন বিয়ে হ'য়ে যাবে—স্বামী সংসার নিয়ে সুখেই থাকবে—কোনদিন ভুলেও হয় ত মনে পড়বেনা এই অভাগার কথা—আর যদি সবিতাও ওকে ভালবেসে থাকে তবে হয় ত কিছুদিনের জন্য একটা দাগ ওর মনের মাঝে থাকবে—হয় ত পুরোপুরী সুখী হ'তে পারবে না, নয় ত দুদিন পরে সব কোথায় মিলিয়ে একাকার হ'য়ে যাবে—ছেলেমেয়ের কলরোলে মনের কোন নিভৃত কোণেও তার কোন চিহ্নই থাকবে না।

আর জিতেনের—জিতেনের মনের আঙিনায় যে দাগ সবিতা রেখে গেল তা হয়ত কোনদিনই মুছবেনা, হয়ত চিরকালই ঐ একটা মেয়ের ধ্যান ক'রে কাটিয়ে দেবে. সংসারের মা বাপদের দাবীর কথাও মনে থাকবেনা, নয়ত গ্রাহ্য করবেনা। কেমন মনমরা আর উদাস হ'য়ে যাবে, একটা মেয়ের জন্য একটা জীবন কেমন ক'রে কোন দিন ফুলের মত টুপ ক'রে ঝরে পড়বে, এ খবরও কেউ কোনদিন রাখবে না। সবার অলক্ষ্যে কোনখানে তার দেহ পুড়ে ছাই হ'য়ে মাটীতে মিশিয়ে যাবে সবিতা অথবা তার বাপমায়ের চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল কোনদিন জিতেনের জন্য ঝ'রে পড়বেনা—একজন শুধু ভালবেসে তার জীবনপাত ক'রে গেল সভ্য মানুষ তার হিসাব রাখবেনা—শুধু কেউ কেউ বলবে, একটা মেয়ের জন্য জীবন দিলে এমন হতভাগা কেউ দেখেছ? কিন্তু কেন দিলো—সে প্রশ্নের উত্তর কি কেউ দেবে?

মহাভারত

শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

হিমাচল হ'তে কন্যাকুমারী,
গান্ধার হ'তে ব্রহ্ম
এ মহাদেশের সন্তান মোরা—
এক স্বদেশের ধর্ম ;
বিশ্বের সেরা এ বিপুল দেশে,
কত ইতিহাস কত রূপে এসে
ঢালিয়া দিয়াছে কত নব ধারা,
কত জীবনের মর্ম
পুঞ্জিত প্রাণে যুগ যুগ ধরি'
সঞ্চিত কত কর্ম !

মহামিলনের শক্তি লভিয়া
আমরা অমর সৈন্য,
—এক স্বদেশের সোনার ফসলে
অপগত সব দৈন্য ;
বঙ্গ, বিহার, ব্রহ্ম, আসাম
আরো কত দেশ, অগণিত গ্রাম
কত নদী মরু গিরি প্রান্তর
দুস্তর মহারণ্য—
একটি মাটিরে করিছে প্রণাম,
এক কোলে বসি' ধন্য !

আর্য্য, দ্রাবিড়, শক, মুঘলের
খুনে গড়া এই পৃথ্বী,
মাটিতে মাখানো হাজার যুগের
লাখো শহীদের কীর্ত্তি !
যুগ যুগ ধরি' কী অনুশাসন
বিভেদের বুকে পেতেছে আসন
একটি বিপুল বাণীতে রচিত
মহাজীবনের ভিত্তি
বহু বিচিত্র ইতিহাস ভরি'
রেখেছে অমর কীর্ত্তি !

অন্তর ভরা মোক্ষ পিপাসা,
মুক্তি-পথের যাত্রী
জীবনে মরণে পরমা শক্তি
হয়েছে জীবন-ধাত্রী ;
মনোমন্দিরে গড়ি যে দেবতা
দেব মন্দিরে তাহারই বারতা,
শঙ্খে, আজানে, তারই বন্দনা
ধ্বনিছে দিবস রাত্রি
ভিন্ন মতের ভিন্ন পথের
মিলিত স্বর্গ-যাত্রী !

অমৃত বিধির সৃষ্ট আমরা
অমৃত বাণীর শিষ্য,
শত আঘাতের শায়ক শয়নে
সঙ্কট জয়ী ভীষ্ম !
আমাদের দেশ বিশাল ভারত
পলাশী হইতে দূর পাণিপথ
বহু ভাষা-ভাষী জনপদভরা
চল্লিশ কোটি নিঃস্ব,
মৃত্যু মথিয়া চলেছি আমরা
বীর্য্যে জিনিতে বিশ্ব !

ভেদ বিরোধের আগুনে গলিয়া
আমরা হব অখণ্ড
মাথা পাতি' লব দুঃখ দহন,
ভাগ ক'রে লব দণ্ড ;
যারা জ্বেলেছিল হিংসা আগুন
ভেবেছিলো বুঝি পু'ড়ে হব খুন
চিরজীবনের মিলনে বিভেদ
এনেছিলো যারা, ভণ্ড!
তাদের গরল হেলায় গিলিয়া
চাতুরী করিব পণ্ড।

জয় ভারতের !—মহাভারতের
কৌরব জয় পর্ব্বে
হয় ত এখনো গর্জ্জন করে
দুঃশাসনেরা গর্ব্বে !
দেশের মাটিতে কি দিয়াছে বর!
সুপ্তি ভাঙিয়া এতদিন পর
নিঃস্ব ছেলেরা বিশ্ব ভরিয়া
জাগিয়া উঠেছে সর্ব্বে
ন্যায়ের মুষল জন্ম লভিছে
নির্য্যাতিতের গর্ভে !
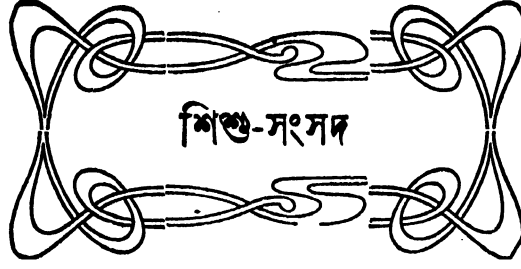
বাসবদত্তার স্বপ্ন

প্রিয়দর্শী

(পনর)

লাবাণকে রাজা-রাণীর শিবিরে আগুন লাগা থেকে করে আরুণির সঙ্গে উদয়নের যুদ্ধ পর্য্যন্ত সব খবরই এর মধ্যে উজ্জয়িনীনগরে মহারাজ প্রদ্যোতের কাছে গিয়ে পৌঁছেছে। আদরের মেয়ে বাসবদত্তার পুড়ে মরার ব্যাপার শুনে প্রদ্যোত আর তাঁর রাণী অঙ্গারবতী শোকে অধীর হয়ে উঠেছেন। কিন্তু উদয়ন যে তাঁর প্রবল শত্রু আরুণিকে এ হেন শোকের অবস্থার মধ্যেও যুদ্ধে হারাতে পেরেছেন—এ খবর পেয়েও প্রদ্যোত খুব সুখী—অবশ্য যতটা সুখ তাঁর মেয়ে মরার পরেও তাঁর পক্ষে আশা করা সম্ভব ছিল। প্রদ্যোতের রাণী অঙ্গারবতী কিন্তু মেয়ের শোক ভুলতে পারছিলেন না। তাই রাজা প্রদ্যোত পাঠালেন রৈভ্য-গোত্রের এক কঞ্চুকীকে আরুণির পরাজয়ে আনন্দ জানাতে ; আর অঙ্গারবতী পাঠিয়েছিলেন বাসবদত্তার ধাই-মা বসুন্ধরাকে বাসবদত্তার শোকে উদয়নকে একটু সান্ত্বনা দেবার জন্যে।

রৈভ্য আর বসুন্ধরা যখন উজ্জয়িনী থেকে এসে পৌঁছুলেন বৎসরাজের রাজধানীতে, উদয়ন তখন সূর্য্যামুখ প্রাসাদে বিশ্রাম করছিলেন। বৎসরাজের কঞ্চুকীর কাছে এসে তাঁরা জানালেন তাঁদের আসবার প্রয়োজনের কথা। তখন বৎসরাজের কঞ্চুকী দু'জন অতিথিকে সসম্মানে নিয়ে গেলেন রাজবাড়ীতে। গিয়ে রাজার খাস প্রতিহারী বিজয়াকে ডেকে কঞ্চুকী ম'শায় রাজাকে খবর দিতে বললেন যে, রাজার প্রথম পক্ষের শ্বশুর বাড়ী থেকে রৈভ্য কঞ্চুকী আর বড়রাণীর ধাই-মা বসুন্ধরা এসেছেন। বিজয়া শুনে উত্তর দিল—'কিন্তু, দাদা ঠাকুর! এখন ত মহারাজের সঙ্গে দেখা হবে না ?'

কঞ্চুকী অবাক্। জিজ্ঞাসা করলে, 'কি বলিস্ যে তুই! কেন দেখা হবে না।'

বিজয়া হাত-মুখ নেড়ে বলতে লাগল—'শুনুন তা হলে—রাজা ছিলেন সূর্য্যামুখ প্রাসাদে। দূরে কেউ বীণা বাজাচ্ছিল। শব্দ শুনেই তিনি বুঝতে পারেন যে, সে আওয়াজ তাঁরই ঘোষবতী বীণার—যা বাজাতে শিখিয়েছিলেন তিনি বড়-রাণীমাকে। বড়-রাণীমা পুড়ে মারা যাবার পর ঘোষবতী বীণাকেও খুঁজে পাওয়া যায় নি। রাজা ভেবেছিলেন—রাণীর সঙ্গে সঙ্গে বীণাও পুড়ে গেছে। হঠাৎ আজ সেই হারিয়ে যাওয়া বীণার সন্ধান পেয়ে তিনি ডাকিয়ে আনলেন যে লোকটা বীণা বাজাচ্ছিল তাকে। কাছে আসতে দেখলেন যে, এ তাঁর সেই ঘোষবতী বীণাই বটে! যা তিনি ভেবেছিলেন বড়-রাণীর সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। জিজ্ঞাসা করলেন লোকটাকে, কোথায় পেলে সে এ বীণা। সে লোকটা উত্তর দেয় যে—নর্ম্মদা নদীর তীরে এক গাছের ঝোপের মধ্যে সে বীণাটিকে লতায় আটকান দেখতে পেয়ে নিয়ে এসেছে—যদি মহারাজ বীণাটা চান সে দিতে রাজি আছে। তারপর রাজা ঘোষবতী বীণাটি কোলে নিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। এখন অবশ্য তাঁর মূর্চ্ছা ভেঙেছে—কিন্তু তিনি অধীর হয়ে কেবল পাগলের মত প্রলাপ বকছেন। বীণাকে উদ্দেশ করে কেবল বলছেন—ঘোষবতী, তোমায় ত পেলুম—তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না কেন। এই ত মহারাজের মনের অবস্থা, এ অবস্থায় তাঁকে কি কোন কথা বলা চলে ?'

সব শুনে কঞ্চুকী বললেন, 'বিজয়া, তুই গিয়ে বল—এঁদের কথা। এঁরাও বড়-রাণীমার বাপের বাড়ীর লোক কি না। এ সময়ে মহারাজ নিশ্চয় এঁদের সঙ্গে দেখা করতে চাইবেন। হয় ত এঁদের সঙ্গে একটু কথাবার্ত্তা কইলে তাঁর মন খানিকটা ভাল হ'তেও পারে।'

বিজয়া বুঝলে যে কথাটা ঠিক।

সে রাজাকে খবর দিতে ভিতরে গেল।

* * *

উদয়ন তখন ঘোষবতী বীণাকে বুকে নিয়ে বাসবদত্তার উদ্দেশে অনেক শোকপ্রকাশ করছিলেন, আর তাঁর প্রিয় সখা বসন্তক তাঁকে নানাভাবে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছিলেন 'দেখ, সখা! এতটা বাড়াবাড়ি ঠিক নয়।'

রাজা বিদূষকের কথায় বাধা দিলেন—'ও কথা বোলো না, সখা! আমি তাঁর কথা ভুলে ছিলুম। আজ এই বীণা সেই পুরাণ শোক আবার নতুন ক'রে জাগিয়ে তুললে। যাক্ সে কথা। অনেক দিন অযত্নে বনের মাঝে প'ড়ে থাকায় ঘোষবতীর বড় দুর্দ্দশা হয়েছে। তুমি একে নিয়ে যাও—শিল্পীর কাছে—তিনি যেন এর সংস্কার ক'রে দেন যত শীগ্‌গির পারেন।'

বসন্তক—'যা বল, সখা'—এই ব'লে বীণা নিয়ে তিনি রওনা হলেন শিল্পীর বাড়ী।

এই সময় প্রতিহারী বিজয়া এসে খবর জানালে যে—উজ্জয়িনী থেকে রৈভ্য কঞ্চুকী ও ধাই-মা বসুন্ধরা এসেছেন।

রাজা—'বেশ : ছোট-রাণীকে ডেকে নিয়ে এস। তাঁদেরও এখানে পাঠিয়ে দাও।'

বিজয়া প্রণাম ক'রে চলে গেল।

পদ্মাবতী আগেই এসে পৌঁছলেন বিজয়ার সঙ্গে।

রাজা তাঁকে অভ্যর্থনা ক'রে বল্লেন—'শুনেছ কি দেবি! উজ্জয়িনী থেকে কঞ্চুকী আর ধাত্রী এসেছেন!'

পদ্মাবতী হাসি মুখেই উত্তর দিলেন—'ভালই ত। কুটুম-বাড়ীর খবরাখবর নিতে আমার ভারী ভাল লাগে!'

উদয়ন ম্লান হাসি হাস্লেন—'কিন্তু, আমার প্রথম পক্ষের শ্বশুর-শাশুড়ী সব কথাই শুনেছেন—নিশ্চয়ই। এখন কি খবর তাঁরা পাঠিয়েছেন তাই ভেবেই আকুল হচ্ছি আমি '

পদ্মাবতী—'দেব! আপনার ত কোন দোষ নেই।'

উদয়ন—'তুমি যে ভাবে ব্যাপারটাকে দেখছ—তাঁরা হয়ত সেভাবে নাও দেখতে পারেন—তাঁদের যে মেয়ে!

পদ্মাবতী—'তাঁদের মেয়ে বটেন—আপনারও ত স্ত্রী!'

উদয়ন—'হুঁ! দেবি! দাঁড়িয়ে কেন? বোস এখানে।'

পদ্মাবতী—'তাঁরা এসে আমাদের পাশা-পাশি বসা দেখলে কি ভাববেন!—বুঝবেন যে আপনি এরই মধ্যে দিদিকে ভুলে গিয়ে আমাকে নিয়েই মেতে রয়েছেন।'

উদয়ন—'বিবাহই যখন আমাদের হ'য়ে গেছে—আর সে কথা লুকোনও নেই—তখন আর একসঙ্গে বস্লেই কি মস্ত দোষ হবে! তা ছাড়া, তাঁরা নিজের চোখে দেখে যান আমার ভাবগতিক—সত্যিই আমি হীন নিষ্ঠুর আর কেবল নিজের সুখে মত্ত কি না। দেবি! বোস।'

পদ্মাবতী 'যে আজ্ঞা, প্রভু!'—এই ব'লে বস্লেন রাজার পাশে।

কঞ্চুকী আর ধাই-মা রাজার কাছে আস্তে আস্তে বলাবলি করছিলেন—'কুটুমবাড়ী আস্ছি কতদিন বাদে—মনে কত আনন্দই না হ'ত অন্য সময় হ'লে! আর আজ! বুকটা ফেটে যাচ্ছে। যাকে নিয়ে এখানকার কুটুম্বিতে সেই নেই! হা বিধাতা! এ কি করলে! এর চেয়ে যদি এমন হ'ত—আমাদের রাজকন্যা বেঁচে থাক্তেন—রাজা বরং যুদ্ধে না জিতে হেরে যেতেন—সেও অনেক ভাল হ'ত।'

রাজার সামনে এসে রৈভ্য আর বসুন্ধরা হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করলেন—'মহারাজ উদয়নের জয় হোক।'

উদয়ন সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে উঠে বুড়ো বামুন কঞ্চুকী আর বুড়ী ধাই-মাকে নমস্কার ক'রে বল্লেন—'আপনাদের সব কুশল ত! পথে কোন কষ্ট পান নি।'

দু'জনে মুখ নীচু করে বললেন—'হাঁ, প্রাণে প্রাণে সব কুশল'।

উদয়ন এবার ব'সে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করলেন। রৈভ্য আর বসুন্ধরাও ততক্ষণ বসেছেন তাঁদের আসনে।

রাজা—'আমার পরম মাননীয় পিতৃতুল্য উজ্জয়িনীপতি কুশলে আছেন?'

রৈভ্য—'হাঁ, মহারাজ প্রদ্যোতের শরীরগতিক কুশল বটে! তিনিও এখানকার সব কুশল জিজ্ঞাসা করেছেন'।

রাজা সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন—'কি আদেশ করেছেন, বলুন'।

রৈভ্য—'এমন বিনয় আপনাতেই শোভা পায়, মহারাজ! আপনার দাঁড়িয়ে কষ্ট পাবার দরকার নেই। বসুন আপনি'।

'মহারাজের যেমন আদেশ'—এই ব'লে উদয়ন বস্লেন আবার তাঁর আসনে।

রৈভ্য—'আমাদের মহারাজ প্রদ্যোত আপনার বিজয়-সংবাদ পেয়ে আপনাকে অভিনন্দন ও আশীর্ব্বাদ জানিয়েছেন'।

উদয়ন মাথা নীচু ও হাত জোড় ক'রে বল্লেন—'আমার এ জয় তাঁরই প্রভাবে। আমার উপর তাঁর অশেষ কৃপা। আমি তাঁর ছেলেদের চেয়েও প্রিয়। তাঁর আদরের মেয়েকে চুরী ক'রে নিয়ে পালিয়ে এসেছিলুম—তবু তিনি আমার কোন শাস্তি দেন নি—আশীর্ব্বাদ পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সে চুরী-করা ঐশ্বর্য্য আমি বজায় রাখতে পারলুম না। অভাগা আমি! সে রত্ন আমি হারিয়ে ফেলেছি! তা জেনেও আজ মহারাজ প্রদ্যোত আমার এই তুচ্ছ জয়ের কথা শুনে আনন্দ জানিয়েছেন—এ কি তাঁর কম মহত্ত্বের কথা। তাঁর মেয়েটির দুর্গতির খবর পেয়েও আমায় একটা তিরস্কার করলেন না'। বল্তে বল্তে কান্নায় তাঁর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হ'য়ে এল।

রৈভ্য—'মহারাজ! শান্ত হ'ন। মহারাজ প্রদ্যোতের সংবাদ আমি দিলুম। এবার দেবী অঙ্গারবতীর সংবাদ জানাবেন ধাত্রী বসুন্ধরা।

উদয়ন—হায় মা জননী! উজ্জয়িনীর যিনি নগরদেবতা—আমার উপর যাঁর স্নেহ তাঁর দুই ছেলের চেয়েও বেশী—সেই মায়ের আমার কুশল ত'?

বসুন্ধরা আস্তে আস্তে বললেন—'হাঁ, শরীর তাঁর ভালই আছে। তিনিও আপনার সব রকমের কুশল জানতে পাঠিয়েছেন।'

রাজা—'আমার আবার সব রকমের কুশল! আমার কতদূর কুশল তা' ত তিনি সবই জানেন! রাজার গলার স্বর কথা বলতে বলতে ভেঙ্গে গেল।

বসুন্ধরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললেন—'আহা! মহারাজ! আপনার অত কাতর হলে চলবে কেন'?

রৈভ্যও বলতে লাগলেন—'মহারাজ! শান্ত হ'ন। আমরা বুঝতে পারছি আমাদের রাজকন্যা মরেন নি—আপনার অন্তরে তিনি অমর হয়ে রয়েছেন। তা ছাড়া, যার যখন সময় হয়, তখন তাকে কে ধরে রাখতে পারে'?

রাজা—'আর্য্য! অমন কথা বলবেন না। প্রদ্যোতের মেয়ে বটেন তিনি—কিন্তু আমার শিষ্যা—আমার রাণী—আমার প্রাণের প্রাণ যে তিনি। এ দেহ ছেড়ে গেলেও তাঁর স্মৃতিকে ছাড়তে পারব না'।

ধাত্রী বসুন্ধরা বলতে লাগলেন—'আমাদের রাণীমা বলে পাঠিয়েছেন—'আমার বাসবদত্তা নেই বটে, কিন্তু যেমন আমার গোপাল আর পালক, তেমনি তুমিও আমার আর এক ছেলে। আমিই জেদ করে মহারাজকে দিয়ে তোমায় বন্দী করে উজ্জয়িনীতে আনিয়েছিলুম। অগ্নি সাক্ষী হবার আগেই বীণার বাজনা শেখাবার ছলে মেয়েকে আমার তোমারই হাতে সঁপে দিয়েছিলুম। কিন্তু তুমি বিয়ের মঙ্গলকর্ম্ম না সেরেই চুপি চুপি

মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিলে। আমি কিন্তু তোমার একখানি ছবি আঁকিয়েছিলুম তোমার অজান্তে। সেই ছবির সঙ্গে আমার মেয়ের একখানি ছবির বিয়ে দিয়ে মঙ্গল-আচার সব আমি সেরে-ছিলুম যাতে কোন খুঁৎ না থাকে। সেই দু'খানি ছবি তোমায় পাঠালুম। তোমার কাছে বোধ হয় বাসবদত্তার কোন ছবি নেই। আমার ঘরে অনেক আছে। তুমি এই ছবি দেখে হয় ত খানিকটা শান্তি পাবে।'—এই বলে তিনি এই ছবি দু'খানি আমার হাত দিয়ে পাঠিয়েছেন।"

রাজা খুব আগ্রহে বললেন—'ওঃ! এ যে আমার একশ' রাজ্য লাভের চেয়েও বেশী হল'।

ছোটরাণী পদ্মাবতী এতক্ষণ পাথরের মূর্ত্তির মত চুপচাপ বসে দু'পক্ষের কথাবার্ত্তা শুনছিলেন। এবার কিন্তু আর তিনি স্থির থাকতে পারলেন না। ছবি দু'খানি পটে আঁকা—গোল করে পাকিয়ে জরির কাজ করা রেশমী কাপড়ে জড়ান ছিল বসুন্ধরার হাতে। কাপড়ের ঢাকনা খুলতেই তিনি বললেন—'মহারাজ! দিদিকে কখনও চোখে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয় নি। ছবিতেই তাঁর মত গুণবতী সৌভাগ্যবতী মেয়ের পায়ের ধুলো নিয়ে ধন্য হব এবার।' বসুন্ধরা এই শুনে ছবি দিলেন পদ্মাবতীর হাতে। কিন্তু তাঁর হাত থেকে একরকম কেড়ে নিয়ে রাজা ছবি খুলতে খুলতে বললেন—'এস, দেবি দু'জনে এক সঙ্গে দেখি।'

ছবি সামনে ধরতেই পদ্মাবতী চমকে উঠলেন—এ কি! এ যে হুবহু তাঁর সই সেই ব্রাহ্মণের মেয়ে আবন্তিকার ছবি!!

মনের ভাব চেপে তিনি রাজাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'আর্য্যপুত্র! এ ছবি কি ঠিক দিদির মতন?'

রাজা একদৃষ্টে দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন। রাণীর কথায় চমক ভেঙে তিনি বললেন—'কি বলছ, দেবি! তাঁর মত? তাঁর মত শুধু নয় এ যেন তিনিই আবার জীবন্ত হয়ে ফিরে এসেছেন'!

পদ্মাবতী—'আচ্ছা, আপনার ছবির সঙ্গে আপনার চেহারা মিলিয়ে দেখে বুঝে নেব—ঠিক ঠিক কতদূর হয়েছে'।

বসুন্ধরা এবার রাজার ছবিখানা পদ্মাবতীর হাতে দিলেন। পদ্মাবতী ছবি খুলেই বললেন—'বাঃ! হুবহু হয়েছে। এবার বুঝলুম দিদির ছবিখানিও ঠিক তাঁর মতই আঁকা হয়েছে'।

পদ্মাবতীর মুখের ভাব দেখে রাজার মনে কি যেন একটা অস্পষ্ট সন্দেহ জাগছিল। তিনি বললেন—'দেবি! তুমি এ ছবিতে কি এমন হারানিধি পেয়েছ বল ত যে এমন করে দেখছ'।

পদ্মাবতীর চোখে-মুখে বিস্ময়, আনন্দ, উৎকণ্ঠা—'দেব! এ ছবির মত মানুষ আমার দেখা—এই বাড়ীতেই এখন তিনি আছেন। তিনি আমার সই আবন্তিকা।' এবার রাজার মনে বিস্ময় লাগবার পালা। তাঁর মুখ দিয়ে শুধু বেরুল—'সে কি'! অবাক্ হয়ে পদ্মাবতীর মুখের দিকে তাকাতেই তাঁর মনে একটা সন্দেহ জন্মাল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রশ্ন 'দেবি! ক'দিন ধ'রে তোমায় জিজ্ঞাসা করব করব ভাবছি। তোমায় রোজ এ তিলক পরিয়ে দেন কে? তোমার গলার এ ফুলের মালা কার গাঁথা? আমাদের বিয়ের দিনই বা মালা গেঁথেছিলেন কে'?

পদ্মাবতী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনি কি ক'রে জানলেন'?

রাজা—'আমার অনুমান ঠিক বটে ত'? পদ্মাবতী ঘাড় নাড়লেন।

রাজা—'আমি এখনই একবার তোমার সইকে দেখতে চাই'।

পদ্মাবতী—'প্রভু! তা হবে না—হতে পারে না—বাধা

রাজা অধীর হ'য়ে উঠেছেন—'কেন? কি বাধা'?

পদ্মাবতী—'শুনুন, দেব! আমার যখন বিয়ে হয় নি, তখন একজন বুড়ো বামুন এসে তাঁর মেয়েকে আমার হাতে সঁপে দিয়ে যান তীর্থযাত্রায়। ব'লে যান—'এ মেয়েটি আমার বড় অভাগিনী—এর স্বামী নিরুদ্দেশ। আমি তোমার হাতে এঁকে রেখে গেলুম—নিরাপদ আশ্রয় ভেবে। আবার তীর্থ থেকে ফিরে এসে একে নিয়ে যাব'। সেই থেকে সে বামুনের মেয়ে আমার সই হ'য়ে সঙ্গে সঙ্গে আছেন। তাঁর নাম আবন্তিকা। এখন কথা হচ্ছে এই যে, আমি তাঁর বাপকে কথা দিয়েছি যে, মেয়েটিকে সাবধানে রাখব। আপনাকে দেখাতে গেলে আমার কথা থাকবে না—কারণ, সই আমার কোন পুরুষের মুখ দেখেন না। আপনিই বা কি ক'রে পরনারীর মুখ দেখবেন'?

রাজা ভাবতে ভাবতে বললেন—'বামুনের মেয়ে! তা হ'লে তিনি নিশ্চয়ই আর কেউ—আমার সন্দেহ অমূলক। যাক্, তাঁকে আর অপ্রস্তুত ক'রে কাজ নেই'।

এই সময় বিজয়া আবার এসে উপস্থিত—'মহারাজ! অপরাধ নেবেন না। আমি রাণীমার কাছে এসেছি একটু দরকারে। রাণীমা, উজ্জয়িনী থেকে এক বুড়ো বামুন এসেছেন—বলছেন তাঁর এক মেয়ে নাকি আপনার হাতে গচ্ছিত রাখা আছে। তিনি মেয়েকে নিয়ে যেতে এসেছেন'।

রাজা—'দেবি! এ বোধ হয় সেই বামুন'!

পদ্মাবতী—'মনে ত হচ্ছে—তাই বটে'!

রাজা—'বিজয়া! যাও, তুমি এখুনি ব্রাহ্মণকে সমাদরে নিয়ে এস এইখানে'।

'মহারাজের যেমন আদেশ' ব'লে বিজয়া চলে গেল।

* * *

এ কথা আর খুলে না বললেও ব'লে যে এ বুড়ো বামুন আর কেউ নয়—ছদ্মবেশে আমাদের প্রধান মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ। তিনি এই ছদ্মবেশ ধ'রেই মহারাণী বাসবদত্তাকে সঙ্গে নিয়ে মগধের রাজকন্যা পদ্মাবতীর কাছে গিয়েছিলেন কিছু দিন আগে। এখন সেই ছদ্মবেশ ধ'রেই তিনি এসেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। এবার বাসবদত্তার অজ্ঞাতবাস শেষ ক'রে তাঁকে প্রকাশ করাই তাঁর দরকার।

বিজয়ার পিছু পিছু আসতে আসতে তিনি ভাবছিলেন—'মহারাজের সামনে ত আমার ছদ্মবেশ ধরা পড়ে যাবে। অন্ততঃ গলার স্বর ত আর লুকাতে পারব না। অবশ্য মহারাণীকে লুকিয়ে রাখার দোষ আমারই। যদিও এ পাপ আমি করেছি মহারাজেরই কল্যাণের জন্যে—যদিও মহারাণীকে এমন নিরাপদ স্থানে রেখেছি

যেখানে কোন কলঙ্ক তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না—তবু মহারাজের অনুমতি না নিয়ে স্বাধীন ভাবে এসব করা ত আমার ঠিক হয় নি। জানি না—সব প্রকাশ হ'লে মহারাজ কি ভাববেন। যাই হোক্, আমি যদি দোষী সাব্যস্ত হই, উচিতমত সাজা নেব। তবু আর বড়রাণীকে লুকিয়ে রেখে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। রাজার রাণী তিনি—স্বামীর জন্যে—আমার অনুরোধে শরীর ও মনের অনেক কষ্টই এতদিন ধ'রে সয়েছেন'।

এমনই সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে তিনি রাজার সামনে এসে উপস্থিত। উদয়নকে দেখেই তিনি গলার স্বরটা একটু কাঁপিয়ে বল্লেন—'মহারাজের জয় হোক্'।

কিন্তু তিনি গলার স্বর যতই ঢাক্‌বার চেষ্টা করুন না কেন, উদয়নের কাছে তা চেনা-চেনা ঠেকল। তবে রাজা ঠিক ধরতে পারলেন না। সন্দেহ মনে চেপে রেখে উদয়ন বল্লেন—'আর্য্য। প্রণাম করি। আপনারই মেয়েটিকে কি দেবী পদ্মাবতীর কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন'?

ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে যৌগন্ধরায়ণ যতদূর সম্ভব চাপাগলায় বল্লেন—'হাঁ মহারাজ'!

এবার প্রতিহারীর দিকে চেয়ে উদয়ন বল্লেন—'বিজয়া! তুমি গিয়ে এঁর মেয়েটিকে সঙ্গে ক'রে এখানে নিয়ে এস'।

পদ্মাবতী এই সময় বল্লেন—'বিজয়া যাবে কেন, আমি নিজে গিয়ে আবন্তিকা দিদিকে নিয়ে আস্‌ছি'। ব'লে তিনি তাড়াতাড়ি অন্তঃপুরে চলে গেলেন। ক্ষণিকের মধ্যেই দেখা গেল, দেবী পদ্মাবতী আর একটি প্রায় তাঁরই সমবয়সী মেয়ের হাত ধ'রে এক রকম টান্‌তে টান্‌তে রাজসভায় নিয়ে আস্‌ছেন। মেয়েটি পদ্মাবতীর চেয়ে দু-চার বছরের বড় ব'লে মনে হয়—কিন্তু রূপে কোন অংশে পদ্মাবতীর চেয়ে খাটো নয়। বরং পদ্মাবতীর মধ্যে যে হাল্‌কা ছেলেমানুষী ভাব আছে—এ মেয়েটির মধ্যে তা মোটেই নাই—স্থির, ধীর, গম্ভীর—অনেকটা যেন বড় রাণীর মত। তবে তাঁর মুখটি ঘোমটায় ঢাকা—কেউ তা দেখতে পাচ্ছিলেন না।

পদ্মাবতী আস্‌তে আস্‌তে বল্‌ছিলেন—'দিদি! কতদিন বাদে আপনার বাবা এসেছেন ফিরে আপনাকে নিয়ে যেতে। কোথায় আপনি আগ্রহ ক'রে ছুটে আস্‌বেন তাঁর কাছে, তা নয়—একেবারে বিয়ের ক'নের মত লজ্জায় কুঁকড়ে যাচ্ছেন—সভায় ঢুক্‌তে পা যেন চাইছে না—এ কি! আসুন, আসুন—শীগগির'।

রাজার সামনে এনে পদ্মাবতী বল্লেন—'মহারাজ! গচ্ছিত ধন এনেছি'।

পরনারীর মুখ যাতে না দেখতে হয়—এমন ভাবে মুখ ফিরিয়ে বসেছিলেন রাজা উদয়ন। রাণীর কথায় উত্তর দিলেন—

'দেবি! যাঁর ধন তাঁকে ফেরত দাও। তবে সাক্ষী রেখে গচ্ছিত জিনিষ ফেরত দেওয়া উচিত। মাননীয় রৈভ্য আর—মাননীয়া বসুন্ধরা সাক্ষী থাকুন'।

পদ্মাবতী আবন্তিকাকে যৌগন্ধরায়ণের সামনে দাঁড় করিয়ে বল্লেন—'বাবা! এই নিন আপনার মেয়ে! ওঁকে ছেড়ে দিতে আমার খুবই কষ্ট হবে, তবু ওঁর দিক্‌টাও তো দেখতে হবে'।

এই সময়ে হঠাৎ একটা দম্‌কা হাওয়ায় আবন্তিকার মুখের ঘোমটা স'রে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বসুন্ধরা চেঁচিয়ে উঠলেন—'ও মা! এ যে আমাদের রাজকুমারী—বাসবদত্তা'!

রাজা চম্‌কে উঠলেন। যেন বিদ্যুৎ তাঁকে স্পর্শ করেছে। বল্লেন—'কৈ! প্রদ্যোতের মেয়ে! দেবি! যান অন্তঃপুরে। পদ্মাবতি! সঙ্গে যাও'।

ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে যৌগন্ধরায়ণ চেঁচিয়ে উঠলেন—'না—না—ও কি কথা—ও যে আমার মেয়ে—ও কোথায় যাবে অন্তঃপুরে। এস, মা, আমার সঙ্গে'।

উদয়ন—'কি বল্‌ছেন আপনি? ইনি যে মহারাজ প্রদ্যোতের মেয়ে আমার পাটরাণী'!

যৌগন্ধরায়ণ—'মহারাজ! আপনি ভরতবংশের কুলতিলক। আপনার কি উচিত জোর ক'রে পরের মেয়ে কেড়ে—'

এবার রাজা বললেন—'বেশ! আমি নিজে একবার দেখি—সত্যি বাসবদত্তা কিংবা তাঁর মত দেখতে আর কেউ। পদ্মাবতি! ওঁর মুখের ঘোমটা খুলে দাও'।

এবার বাসবদত্তা আর যৌগন্ধরায়ণ দু'জনেই এক সঙ্গে ব'লে উঠলেন, 'মহারাজ উদয়নের জয়'!

বাসবদত্তার মুখের ঘোমটা আর নেই—প্রধান মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের ছদ্মবেশও খ'সে পড়েছে।

রাজা উদয়ন একেবারে হতভম্ব—তাঁর মুখে রাটি পর্য্যন্ত নেই। অনেকক্ষণ বাদে তিনি শুধু বল্লেন—'এ্যাঁ! এ সব কি! ইনি সত্যিই দেবী বাসবদত্তা—আর ইনি মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ! এ কি সত্যি! না স্বপ্ন? এখন ত দেবীকে দেখতে পেয়েছি। কিন্তু ক'দিন আগে স্বপ্নের মাঝে এঁকে দেখতে পেয়েও ধরতে পারি নি'!

যৌগন্ধরায়ণ হাত জোড় ক'রে বল্লেন—'মহারাজ! দেবীকে লুকিয়ে রেখে মহা অপরাধ করেছি। সে দোষের কি শাস্তি হবে প্রভু'?

রাজা তাড়াতাড়ি সিংহাসন থেকে উঠে এসে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন—'মন্ত্রিবর! আপনি যে যৌগন্ধরায়ণ! পাগলার ছদ্মবেশে আপনিই ত দেবীর সঙ্গে আমার মিলন ঘটিয়েছিলেন। আবার আপনিই আগুনের গুজব তুলে রাণীকে লুকিয়ে বুড়ো বামুনের ছদ্মবেশে পদ্মাবতীর সঙ্গে আমার বিবাহ দিয়েছেন। আপনার দোষ ধরবার যোগ্যতা আছে কার'?

পদ্মাবতী এবার বাসবদত্তার পায়ের ধুলো নিতে নিতে বল্‌তে লাগলেন—'দিদি! সই ভেবে প্রাপ্য সম্মান ত' দিতে পারি নি এতদিন। ছোট বোনের সে অপরাধ ক্ষমা করুন'।

বাসবদত্তা পদ্মাবতীকে বুকে টেনে নিয়ে উত্তর করলেন—'পাগলি কোথাকার! তুই ত' আমায় দিদির মতই সম্মান দেখিয়ে এসেছিস বরাবর। তোরই কৃপায় ত আবার প্রভুকে ফিরে পেলুম'।

পদ্মাবতী—'সে আপনারই অনুগ্রহ'।

উদয়ন—'মন্ত্রিবর! দেবীকে সরালেন কেন'?

যৌগন্ধরায়ণ—'তা না হ'লে ত দর্শকের সঙ্গে কুটুম্বিতা করা সম্ভব হ'ত না। আবার দর্শকের সাহায্য না পেলে ও আপনার শত্রুজয় হ'ত না'।

উদয়ন—'আচ্ছা! পদ্মাবতীর হাতে দেবীকে গচ্ছিত রাখলেন কেন'?

যৌগন্ধরায়ণ—'পুষ্পকভদ্র ও অন্য জ্যোতিষীরা বলেছিলেন—দেবী পদ্মাবতীর সঙ্গে আপনারই বিবাহ হবে। তাই তাঁর কাছে দেবীকে রাখলে আর কোন দোষের কথা কেউ কইতে পারবে না'।

উদয়ন—'এ সব কথা রুমণ্বান্ জানত'?

যৌগন্ধরায়ণ ঘাড় নেড়ে হেসে বল্লেন—'সব—সব। কেবল রুমণ্বান্ কেন, আপনার প্রাণের সখা বসন্তক ঠাকুর ত আমাদের সঙ্গেই ছিলেন বরাবর'।

উদয়ন এবার হেসে বল্লেন—'ওঃ! কি শঠ এরা সকলে!'

যৌগন্ধরায়ণ—'প্রভু! আপনাদের কুশল সংবাদ নিয়ে বৈভ্য আর বসুন্ধরা এখনই উজ্জয়িনী ফিরে যান'।

উদয়ন এবার হেসে বল্লেন—'মন্ত্রিবর! আপনার এ পরামর্শটা নিতে পারলুম না—মাপ করুন। উজ্জয়িনী যাব আমি নিজে দুই রাণী সঙ্গে নিয়ে—মহারাজ প্রদ্যোত আর রাণী অঙ্গারবতীর পায়ের ধূলো নিতে হবে। আর সঙ্গে যাবেন অবশ্যই বৈভ্য আর বসুন্ধরা। কিন্তু আপনারও ছাড়ান নেই এবার—মন্ত্রিবর! নাটের গুরু আপনি! আপনি হবেন আমোদের পথপ্রদর্শক। আর সেই শঠ দু'জনকেও ডাক—আমার বিশ্বাসী সেনাপতি রুমণ্বান্—আর প্রাণের বন্ধু বসন্তক। বিজয়া যাও এদের খুঁজে নিয়ে এস। মন্ত্রিবর! শাস্তি চাইছিলেন না আপনি একটু আগে! চলুন, উজ্জয়িনীতে গিয়ে আপনাদের বিচার হবে। শ্বশুর ম'শায় বিচার ক'রে শাস্তির ব্যবস্থা করবেন'।

যৌগন্ধরায়ণ হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন—'এবার মহারাজ প্রদ্যোতের বীরত্ব বোঝা যাবে। শাস্তি দিতে হলে তাঁর বড় ছেলে আর আদরের মেয়েটিও বাদ পড়বেন না—ষড়যন্ত্রের তাঁরাই প্রধান পাণ্ডা যে'!

উদয়ন অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলেন। চারদিকে হাসির ধূম প'ড়ে গেল।

সমাপ্ত

এক যে ছিলো দেশ

শ্রীদিলীপ দে চৌধুরী

[শরতের আলোঝলমল সকাল! দূর থেকে খোকনদের ছোট্ট সাদা বাড়ীখানাকে যেন একটা ডানাওয়ালা পরীর মত মনে হয়। খোকন এসে দাঁড়াল দোতলার জানালায়। নীচে বাগানের মাধবীলতার গাছটা ছেয়ে গেছে ফুলে ফুলে। সবুজ হ'য়ে উঠেছে আরো শিশির ভেজা ঘাসের জমিটা, যেখানে খেলা করে তারা বিকেলবেলা: সে আর তার দিদি। দূরে সেই ছোট্ট নদীটার কোল ঘেঁসে অজস্র সাদা কাশের বন: হাওয়াতে উচ্ছল দুরন্ত খোকনেরই মতন। নদীর পাড়ের বিরাট বটগাছটার হেলে পড়া ডালের ওপর একটা মাছরাঙা পাখী ব'সে আছে কোন সকাল থেকে মাছের আশায়। সোনালী রোদে চিক্ চিক্ ক'রছে তার সুন্দর ছোট্ট দেহটা! খোকন ডাকলে:]

খোকন—দিদিভাই, ও দিদিভাই! ভাখ, ভাখ দেখে যা!

[ভিতর থেকে সাড়া দিলো খোকনের দিদি।]

দিদি—যাচ্ছি ভাই এই কাজটা শেষ করে।

খোকন—তোর খালি কাজ আর কাজ! কোন সময় কি একটু ছুটি নেই?

দিদি—লক্ষ্মী ভাইটি! একটু দাঁড়াও। ভীষণ দরকারী কাজ এটা। না করলেই নয়।

খোকন—বেশ, বেশ! দরকারী তো দরকারী। আমি যেন আর জানি না, কাটছো তো বসে বসে যতো রাজ্যের তরকারী। না এলে তো ভারী বয়েই গেল আমার। এই তোর সঙ্গে আড়ি…আড়ি…

[কথা শেষ করবার আগেই দৌড়ে এলো খোকনের দিদি। খোকনের চেয়ে অনেক বড় সে, তবু খোকনেরই খেলার সাথী। বুকের কাছে খোকনকে টেনে নিয়ে দিদি বললে।]

দিদি—ভারী দুষ্টু হ'য়েছো খোকন তুমি। কথায় কথায় খালি আজকাল আড়ি ক'রে দাও আমার সংগে।

খোকন—তা হ'লে ডাকলে তুমি আস না কেন শুনি?

দিদি—এই তো এসেছি, বলো কি ক'রতে হবে।

খোকন—কিচ্ছু ক'রতে হবে না। যাও তুমি। (রাগ ক'রে খোকন সরে গেল দিদির কাছ থেকে।)

দিদি—(ওর মাথায় সস্নেহে হাত বুলাতে বুলাতে) ছিঃ ভাই, রাগ ক'রতে আছে কখনো আজকের দিনে! আজ না পুজো! সবাই আজ আনন্দ ক'রছে। রাগ করো না তুমি বোকার মতো।

[খোকন দিদির কাছে সরে এলো আবার। বাইরে আকাশটাকে দেখিয়ে বললে]

খোকন—আকাশটা আজ কী সুন্দর দেখ দিদি। আমি যদি পাখী হতাম কিছুতেই তাহ'লে আজ এই ঘরের মধ্যে ব'সে থাকতাম না। উড়ে যেতাম ওই নীল আকাশের বুক চিরে, মেঘের রাজ্য ভেদ ক'রে কোন নাম-না-জানা দেশে, যেখানে মানুষ নেই একটাও! একটা গল্প বল না দিদি।

দিদি—গল্প? এই কি তোমার গল্প শোনার সময়? সকালবেলা বুঝি কেউ গল্প শোনে?

খোকন—তুই তো সেদিন বলেছিস, সবাই যা করে আমি তা করবো না। কেন তবে টানছিস সবাইকে এখানে? সত্যি দিদিভাই, বলনা একটা গল্প! (দু'হাতে দিদির গলা জড়িয়ে ধরে খোকন।)

দিদি—গল্প তো বলবো, কিন্তু তার জন্তে আমাকে তুমি কি দেবে আগে শুনি?

খোকন—এখন যে আমার কিছু নেই, কী দোব? আমি যখন বড় হ'য়ে চাকরী করবো তখন তোকে ওই আকাশী রঙের একখানা সুন্দর শাড়ী কিনে দোব, কেমন?

দিদি—বেশ তাই সই! মনে থাকে যেন, ভুলে গেলে কিন্তু চলবে না ভাই! আচ্ছা, কিসের গল্প শুনবে বলো; ভূত না পেত্নীর?

খোকন—না, না ওসব ভূতটুত আমার ভাল লাগে না। ওগুলো সব

বাজে। মিথ্যে মিথ্যে কেবল ভয় ধরিয়ে দেয় মনের মধ্যে। তুই বরং একটা রূপকথার গল্প বল।

দিদি—তাই বলি। সে এক দেশ! সেখানকার গাছে গাছে ফলে অজস্র ফল, মাঠে মাঠে ধান আর বনে বনে ফুল। লোকে বলে সোনার দেশ।

শান্তিতে আরামে দিন কাটায় সে দেশের মানুষ। হঠাৎ একদিন দেখা গেল নদীর ঘাটে এসে ভিড়েছে এক বিদেশী সওদাগরের নৌকা। সওদাগররা এসে ব'ললে সে দেশের রাজার কাছে: আমরা ব্যবসা ক'রবো আপনার রাজত্বে, দয়া করে আমাদের অনুমতি দিন আপনি। সে দেশের দয়াল রাজা নিঃসঙ্কোচে দিলেন তাদের অনুমতি। ব'ললেন, বেশ তো করুননা আপনারা আপনাদের ব্যবসা।

দিন যায়। ব্যবসা করে বিদেশী বণিকদল। এদিকে ভাঙন ধরে সোনার দেশের ভিতরে ভিতরে। দুর্বল হয়ে পড়ে দেশের রাজশক্তি! ধূর্ত্ত সওদাগররা সুযোগ বুঝে কৌশলে অধিকার করে বসলে সেই দেশ।

খোকন—বারে! অমনি একটা দেশকে অধিকার করে নিলে তারা?

দিদি—অমনি কী আর নিলে! রাজা হওয়ার লোভে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে সেই দেশেরই কতকগুলো শয়তান লোক নিজেরাই তুলে দিলে নিজেদের দেশকে পরের হাতে।

খোকন—(অধীর কণ্ঠে) তারপর ?

দিদি—তারপর? কিছুদিন তো রাজত্ব ক'রলে সেই বিশ্বাসঘাতকের দল। কিন্তু ধীরে ধীরে বিদেশী বণিকরা লোহার শেকলে বেঁধে দিলে সমস্ত দেশকে। অত্যাচার আরম্ভ ক'রলে দেশের মানুষদের ওপরে। ভারে ভারে ফসল হয়, অথচ খেতে পায় না সে দেশের মানুষ। দলে দলে মরে তারা অনাহারে, রোগে, অব্যবস্থায়, তবুও টুঁ শব্দটি করে না কেউ। নৌকা বোঝাই দেশের জিনিস সামনে দিয়ে চলে যায় বিদেশে তাকিয়ে দেখেও তারা কোন প্রতিবাদ করতে সাহস পায় না।

খোকন—আশ্চর্য্য লোক তো সব সে দেশের।

দিদি—ভারী আশ্চর্য্য লোক। কে যেন রূপোর কাঠি ছুঁইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে তাদের। কিছুতেই আর সে ঘুম ভাঙছে না। কেবল তারা ঘুমোয় পড়ে পড়ে।

মাঝে মাঝে ওরি মধ্যে হঠাৎ কেউ হয়তো জেগে ওঠে, আর অমনি বিদেশীরা তাকে ঠাণ্ডা ক'রে দেয় ছলে, বলে কিম্বা কৌশলে। যেমন ক'রে পারে।

খোকন—তারপর কি হ'লো সে দেশের ?

দিদি—তারপর একদিন সে দেশের এক কিশোর-বীরের ঘুম ভেঙ্গে গেল আচমকা। সে দেখলে তার দেশের অবস্থা, দেখলে তারা কিভাবে পড়ে রয়েছে হাত-পা বাঁধা।

সে জাগালে তার কিশোর বন্ধুদের। ব'ললে, 'ভাই, মুক্ত ক'রতে হবে আমাদের দেশকে। তোমরা এসো আমার সঙ্গে। ছোট্ট কিশোরের দল এগিয়ে চলে তার সঙ্গে। মুখে তাদের দৃঢ়তার ছাপ, রক্তে তাদের স্বাধীনতার স্বপ্ন। সোনার দেশের বীর কিশোররা ক'রে বিদ্রোহ। বলে, 'ফিরিয়ে দাও আমাদের দেশ আমাদের।' হেসে ওঠে বিদেশী রাজা। কান দেয় না ওদের কথায়।

খোকন—তারপর ?

দিদি—কিন্তু সত্যিই সেই কিশোররা একদিন মুক্তি দিলে তাদের দেশ মাতাকে। জাগিয়ে দিলে দেশের সমস্ত মানুষকে। জনতার কানে কানে শুনিয়ে দিলে মুক্তির ডাক। ফিরে এলো তাদের পুরোণ সুখের দিন। সোনার দেশের আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে পড়লো আবার সেই নিবিড় শান্তি!

খোকন—কি হলো সেই কিশোর বীরের যে ঘুম ভাঙ্গালে সকলের ?

দিদি—সে? সে তখন আর কিশোর নয়, সে একজন মস্তবড় গণ্যমান্য লোক! কতো দূরদেশে ছড়িয়ে পড়লো তার যশ। শ্রদ্ধায় মাথা নত করতো লোকে তার নাম শুনলে। সে তখন সেদেশের একজন প্রধান কর্ম্মকর্তা।

খোকন—দিদিভাই, আমি যদি তোর গল্পের নায়ক হ'তাম? আমি যদি হ'তাম ওই কিশোর বীর ?

দিদি—(খোকনকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে) তাই হ'য়ো ভাই, তাই হ'য়ো! আজকের এই আনন্দের দিনে সেই প্রার্থনাই আমি ক'রছি সমস্ত মনে প্রাণে!

[সকাল তখন গড়িয়ে গেছে অনেকখানি। বাইরে রোদ উঠেছে প্রখর হ'য়ে। মাছরাঙাটা তখনো বসে আছে ঠায় ডালের ওপর। আস্তে আস্তে উঠে যায় দিদি। একা বসে থাকে খোকন আনমনে ঘরের মধ্যে। সে ভাবে সেই কিশোর-বীরের কথা। হাজার হাজার ছেলে মেয়ে চলছে...উন্নত তাদের শির...দৃঢ়, সতেজ তাদের পদক্ষেপ—নতুন আলোর স্বপ্ন তাদের চোখে।]

রক্তকমল

রঞ্জিতভাই (পাটনা)

তিন গাঁয়ের দেশ, দেশের নাম রক্তকমল।

সাত পাহাড়ের পার আছে এক রক্তকমলের বন। সেই বনের মাঝ-বরাবর সবুজ ঘাসের মত একটি ছোট বাগান···স্ফটিক জল আর জল-ফোয়ারা···সেখানে ফুটে আছে হাজার হাজার রক্তকমল; ভোরের প্রথম সূর্য্যের আলো তাদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয়—সারাদিন সেই সব রক্তকমলের দল নরম চোখের পাতা মেলে দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। সন্ধ্যার অনেক আগেই তাদের ··· আড়ে শিশির-ভেজা ঘাসের আড়ালে ঘুম-পরীর পায়ের বাজে: ঝুমুরঝুম্! ঝুমুরঝুম্! রক্তকমলের দল ঘুমিয়া পড়ে! আকাশ তাদের ঘুমপাড়ানি গান শোনায় রাতের শেষে—কিন্তু তবু বাতাসে কাদের কান্নার সুর ভেসে আসে!

—কে যেন কাঁদে!

রাত যখন এক প্রহর, আকাশে একফালি চাঁদ, মাঠ বনে ভেসে বেড়ায় ঘুমতি-হাওয়ার সুর···দূরে—অনেক দূরে—মিটমিট করে হাসে তারার মালা, সেই সময় রক্তকমলের বনে কারা যেন কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়ে!

নিশুতি রাত! সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। কেউ কোথাও নেই। পৃথিবীর মানুষদের ঘুম পাড়াতে আকাশ থেকে নেমে এসেছে যত রাজ্যের ঘুম-পরী···সাত পাহাড় পেরিয়ে সেই রক্ত-কমলের বনে গিয়ে কি দেখবে? জল-ফোয়ারার পাশে ঘুমিয়ে আছে রক্তকমলের দল, কারা যেন দূরে গান গাইছে গুনগুনিয়ে। তাদের চোখে ঘুম নেই—সারা রাত জেগে থেকে রাত যখন শেষ প্রহরে গিয়ে পৌঁছয়, তখন তাদের ঘুম আসে। সমস্তক্ষণ তারা কাঁদে, চোখের জলে বুক ভেসে যায়।

—কে এই রক্তকমল? কেন তারা কাঁদে?

রক্তকমলের বনে প্রতিদিন রাত্রে সেই সব রক্তকমলের দল কেঁদে কেঁদে কাকে যেন ডাকে···অনেক দূর থেকে তাদের ডাক শোনা যায়। তবু কারো ঘুম ভাঙ্গেনা—স্বপ্নদেশের মাঝে কে যেন কানে কানে বলে: রক্তকমল! রক্তকমল!

দেশের নাম রক্তকমল—।

উজান বেয়ে সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে তবে সেই রক্তকমল দেশ। হাজার হাজার বছর আগে কবে এক রাজপুত্র বেরিয়েছিলেন দিগ্বিজয়ে। তাঁর সংগে ছিলো সাত শো দাঁড়ের ময়ূরপঙ্খী, আর সৈন্য-সামন্ত। দেশের পর দেশ পার হয়ে রাজপুত্র এসে থামলেন এক দেশে। মস্ত বড় দেশ। সেখানে ধূলো বালির ভেতর সোনা-মাণিক ছড়ানো। রাজপুত্র খুব খুশি হলেন। সেই দেশে অনেকদিন বাস করার পর তাঁর মনে পড়লো—এবার ফেরার পালা। বন্ধুরা বললেন, কি নিয়ে রাজপুত্র বাড়ী ফিরবেন? রাজপুত্র সে কথা শুনে হাসলেন একটু! তারপর বেরিয়ে পড়লেন একা।

যেদেশে এসে রাজপুত্রের সাতশো দাঁড়ের ময়ূরপঙ্খী দিক-বিদিক হারিয়ে শেষে আশ্রয় নিয়েছিলো এক পাহাড়ের ধারে—সেটা কুহকের দেশ! রাজপুত্র সেকথা জানতেন না—তাই ফেরার কথা তাঁর মনে ছিলো না—কুহকের স্বপ্নমায়ায় তিনি সব ভুলেছিলেন। রাজপুত্র বুঝতে পারেন নি যে, তিনি কুহকের দেশে বন্দী!

—বন্দী? কার হাতে বন্দী? রাজপুত্র বের হয়েছেন দিগ্বিজয়ে, কে তাকে বন্দী করে? রাজপুত্র হেসেই আকুল। তারপর একদিন গভীর রাতে রাজপুত্র হাতে নিলেন খোলা তলোয়ার, চললেন কুহকের দেশে। এইখানে তাঁর দিগ্বিজয় শেষ হবে।

খুব সুন্দর জ্যোছনা রাত। পৃথিবীতে যেন কেউ নেই। ঘুম আর ঘুম!

ধু-ধু করছে মাঠ······

তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে সাত পাহাড়ের দেশের বনের শিশির চিক্‌চিক্ করছে চাঁদের আলোয়—দূরের মহুয়া বন থেকে দক্ষিণা হাওয়া নিয়ে আসছে ফুলের সৌরভ......।

মাঠের পর মাঠ...

রাজপুত্র চলেছেন সেই মাঠ বন পার হয়ে, হাতের তলোয়ার ঝকঝক করছে চাঁদের আলো পড়ে.. খুব সুন্দর রাত।

রাজপুত্র চলেছেন কুহকের দেশে—

অনেক দূর গিয়ে রাজপুত্র চমকে দাঁড়ালেন। একটু দূরে এক মস্ত রাজপ্রাসাদ—আকাশের [illegible]কে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। তার আশেপাশে আর কিছু নেই· শুধু দিগন্ত জোড়া মাঠ চাঁদের আলোয় চিক্‌চিক্ করছে। এই কি কুহকের দেশ?

খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে এগিয়ে চললেন রাজপুত্র—

রাজপ্রাসাদের দেউড়ীর কাছে এসে রাজপুত্রের এলো নিবিড় ঘুম—কুহকের ছোঁয়া লেগে রাজপুত্রের হাতের তলোয়ার খসে পড়ে গেলো মাটিতে! দেউড়ীর পাশেই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। তারপর আর কিছু মনে নেই··

রাজপ্রাসাদের ফুলবাগানে ফুটে উঠলো একটি নীল গোলাপ ·· কুহকের দেশ।

দেশের মাটিতে গাছে লতায় পাতায় কুহকের মায়াজাল বোনা—যে তার কাছে আসবে, তার চোখে নেমে আসবে নিবিড় ঘুম। সে ঘুম আর ভাঙ্গবে না। এই পথে কত রাজপুত্র এসেছে আর কুহকের দেশে এসে ঘুমিয়ে পড়েছে। সেখানে আর কিছুই নেই—শুধু এক বিরাট রাজপ্রাসাদ আর ফুল-বাগান! যে সব রাজপুত্রেরা ঘুমিয়ে আছে সেই ফুলবাগানে, তাদের চিনতে হলে দেখতে পাবে এক একটি নীল গোলাপ পাপড়ি মেলে চেয়ে আছে আকাশের শুকতারার দিকে! কবে নাকি তারা শুনেছে ঐ আকাশের—যেখানে ভোর বেলাকার শুকতারা জ্বলছে ঐ দিক থেকে উড়ে আসবে এক অচিন্ পাখী তাদের ঘুম ভাঙ্গাতে। তারপর সব ক'টি নীল গোলাপ ছিঁড়ে নেবে সে ফুলবাগান থেকে—কুহকের দেশ পার হয়ে সে উড়ে চলে যাবে আর এক দেশে। সেখানে আছে এক সবুজ সরোবর—অচিন্ পাখী নীল গোলাপ ফেলে দেবে তার স্ফটিক জলে। তারপর দিন ভোর বেলা সেই সরোবরের ধারে ধারে জেগে উঠবে যত রাজ্যের হারানো রাজপুত্রেরা। ফিরে যাবে তারা আপন দেশে। কিন্তু অচিন পাখীর দেখা পাবে না!

যেখানে থাকে অচিন্ পাখী, ফিরে আসবে আবার কুহকের দেশে—।

সেই রাজপ্রাসাদের সাত মহলার এক ঘরে ঘুমিয়ে আছে রূপবতী রাজকন্যা আঙ্গুরলতা। অনেক দিন আগের কথা। তখন এদেশে কেউ আসেনি, কুহকের দেশে কোন মানুষের বাস ছিলো না। এক সুন্দর জ্যোছনা রাতে আঙ্গুরলতা বেরিয়ে পড়লেন জলবিহারে—সঙ্গে তাঁর সোনার ময়ূরপঙ্খী আর সখি-সঙ্গিনীরা। পথ ভুলে এসে পড়লেন কোন্ এক পাহাড়ের ধারে—আকাশে আর সমুদ্রে উঠলো ঝড়, দিক্-দিগন্ত গেলো হারিয়ে আঙ্গুরলতার ময়ূরপঙ্খী পাহাড়ের ধারে ভেঙ্গে পড়ে রইলো, আঙ্গুরলতা বেঁচে গেলেন সে যাত্রায়। সেই পথে আসছিলো আর এক দেশের সওদাগর-পুত্র, ভিন গাঁয়ের দেশে চলেছে! আঙ্গুরলতাকে সে বুকে তুলে নিলো, তারপর তু'জনা পাড়ি জমালো সমুদ্রে! সওদাগর-পুত্র ভাবলে আর কোথাও গিয়ে কাজ নেই—সে দেশে ফিরে যাবে; আঙ্গুরলতাকে বিয়ে করবে, সুখে থাকবে। আনন্দে সব কিছু ভুলে গিয়ে সওদাগর-পুত্র শুধু চেয়ে রইলো আঙ্গুরলতার মুখের পানে—কুহকের দেশে কখন

তারা এসে পড়েছে জানে না—সন্ধ্যা হয়ে আসছে,পশ্চিমে সূর্য্যাস্ত হয়ে গেলো—এদের চোখে নেমে এল আল্‌তো ঘুম! রাজ-প্রাসাদের ফুল-বাগানে ঘুমিয়ে রইল সওদাগর-পুত্র আর সাত-মহলার ঘরে আঙ্গুরলতা—!

তারপর কত যুগ কেটে গেছে—

কত সব রাজপুত্র এসেছে এদেশে. ফুলবাগানে ঝিল্‌মিলিয়ে উঠেছে নীল গোলাপের দল! সাত মহলার ঘরে ফুটে আছে একটি রক্তকমল, সে চেয়ে আছে আকাশের পানে—কখন আসবে সেই অচিন পাখী?

রাজপুত্র বন্দী রইলেন সাতরাত সাতদিন।

আট দিনের দিন গভীর রাতের শেষ প্রহরে সাত মহলার ঘরে জ্বলে উঠলো হাজার বাতির রংমশাল, সমস্ত রাজপ্রাসাদ আলোতে আলোময় হয়ে উঠলো। ফুলে ফুলে পাতায় সে-ছটা সবাইকে রাঙিয়ে দিয়ে গেলো কুহকের দেশে ঘুম-ভাঙ্গাবার গান শোনা গেলো—কে যেন গাইছে সেই সাত-মহলার ঘরে—

—ওগো আমার নীল গোলাপের দল!
তোমরা এখনো ঘুমিয়ে আছ,
সমস্ত পৃথিবী হয়ে গেছে অন্ধকার—
আমি এনেছি রং-মশাল
তোমাদের জীবনের অন্ধকার মুছে দিতে!
তোমরা কি জাগবে?

—কে গান গাইছে? নীল গোলাপের দলের মাঝে সাড়া পড়ে গেল। সাত মহলার ঘরে আছে ঘুমিয়ে শুধু রক্তকমল—সে কি তবে জেগেছে? আকাশের দিকে তারা চেয়ে থাকে—অচিন্ পাখীর তো দেখা নেই। তবে কেন তাদের ঘুম ভাঙ্গলো?

সাত-মহলার ঘরে আবার বেজে উঠলো কার পায়ের ঘুঙুর··· গানের সুর ভেসে আসছে সেই দিক থেকে—রাজপ্রাসাদের ফুল-বাগানের দিকেই তারা আসছে! নীল গোলাপের দল অধীর হয়ে ব'সে রইল, তাদের কি অচিন্ পাখী মুক্তি দেবে? কে তাদের ঘুম ভাঙ্গাবে? আবার তারা শুনতে পেলো সেই গানের সুর—

—জাগো ভাই, নীল গোলাপের দল!
অনেক দেশের পারে
তোমাদের স্বপ্ন খেলা।
কুহকের দেশ থেকে তোমাদের দেশে
ফিরে যাও ভাই—
আপন দেশের মাঝে···

নীল গোলাপের দল নতুন করে জেগে উঠলো। অনেক দিন পর আজ কি সেই অচিন্ পাখী এল তাদের ঘুম ভাঙ্গাতে? সত্যিই তাই। অচিন্ পাখী ফুল-বাগানে এসে গান শুরু করলে—ঘুম-ভাঙ্গাবার গান! মুখে তার সেই সাত-মহলার রক্তকমল! অচিন্ পাখী ফুল-বাগানের সব ক'টি নীল গোলাপ তুলে নিলো, এবং তার পর উড়ে চললো কোন্ এক সবুজ সরোবরের উদ্দেশে···

কুহকের দেশ পার হয়ে অচিন পাখী উড়ে চললো···

কতো মাঠ বন পাহাড় গিরি উপত্যকা পার হয়ে···উড়ে উড়ে—উড়ে শেষে ক্লান্ত হয়ে সেই অচিন পাখী নামলো এক বট-ছায়ার নীচে, মুখের রক্তকমল খসে পড়ে গেলো মাটিতে, অমনি ঘুম ভেঙ্গে গেলো আঙ্গুরলতার। অচিন পাখী আঙ্গুরলতাকে চিনতে পারলো, সেইখানে তারা বসে পড়লো। আঙ্গুরলতার ঘুম ভাঙ্গতেই খুব অবাক হয়ে গেলেন—এখানে তিনি এলেন কেমন করে? এই সুন্দর রঙিন পাখীই বা কে?

অচিন পাখী সব ক'টি নীল গোলাপ সেই বট ছায়ার নিচে রেখে একটি মাত্র নীল গোলাপ নিয়ে উড়ে চললো আকাশের পানে—যেখানে আছে সবুজ সরোবর!

কে সেই নীল গোলাপ?

সেই যে রাজপুত্র দিগ্বিজয়ে বের হয়ে কুহকের দেশে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, অচিন পাখী চলেছে তারই ঘুম ভাঙ্গাতে!

সবুজ-সরোবরের কাছে এসে অচিন পাখী থামলো। মুখের সেই নীল গোলাপ ছুঁড়ে দিলো সরোবরের দিকে। তখন শেষ প্রহর, পূবের আকাশ ক্রমে রক্তরাগ রঙের আবির ছড়িয়ে ভোরের আগমনী গাইছে, পশ্চিম আকাশে দপ দপ করছে শুকতারা—! নিশুতি রাত। জনমানবের চিহ্ন মাত্র নেই, আকাশে শুধু শেষ রাতের কয়েকটি তারা, আর ফিকে অন্ধকার··· নদী নেই, বন নেই, পাহার নেই,—শুধু মাঠ আর মাঠ—যতদূর চোখ মেলে চাও, শুধু দিগন্ত জোড়া মাঠের সমুদ্র—কদম জোড়ার মাঠ পেরিয়ে চলো—তেপান্তরের মাঠ বেয়ে চলো—ধূ ধূ করছে মরু বালির মত হলুদ রাঙা মাঠ—কোথায় তার শেষ, কে বলতে পারে?

সেই তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে অচিন পাখী আকাশে ডানা মেলে কোথায় যে উড়ে চললো, কেউ তার খোঁজ পেলে না!

পরদিন ভোর বেলা সবুজ সরোবরের ধারে রাজপুত্রের ঘুম ভাঙ্গলো। ভোর বেলাকার জোনাকি আলো তাঁর ললাটে এঁকে দিলো শুভ আশীষ, আর বুলিয়ে দিলো কমলা রঙের পরশ-কাঠি। রাজপুত্র জেগে উঠে চারদিকে চোখ মেলে দিলেন···সামনে সেই সবুজ সরোবর, আর ঠিক তার ওপারে এক ডালিম গাছ। আর সেখানে কিছুই নেই। ভোরের নরম আলো আর তেপান্তরের মাঠ···

রাজপুত্র হাতে নিলেন তলোয়ার, সূর্য্যের আলোয় ঝিক্‌মিক্ করে উঠলো সেই সোনার তলোয়ার! সবুজ সরোবরের মাঝে নেমে যেই জল পান করতে যাবেন এমন সময় হঠাৎ কে যেন বললে,—

—ডালিম দানা!
—ডালিম দানা!

রাজপুত্র চমকে উঠলেন! হাতের জল ঝরে গেলো সরো-বরের বুকে। সরোবরের ওপারে সেই ডালিম গাছ—সেখান থেকে কে যেন আবার বললে:

তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে কদম জোড়ার মাঠ—
বন-পাহাড়ের নদীর পারে শীতল ছায়ার ঘাট।

সেই দেশেরই উজান বেয়ে উধাও হতে নেই মানা—
সবুজ সরোবরের পারে ডাকছে কোথায় ডালিম দানা!

রাজপুত্র বুঝতে পারলেন সব। সরোবর থেকে উঠে সেই

"আশী-বনের হংস-মিথুন মেলেছে আজ পাখা"

[ফটো : বিষ্ণুপদ কর

ডালিম গাছের নিচে এসে দাঁড়ালেন। সবুজ পাতায় ভরা এক ডালিম গাছ—সেই গাছের সব চেয়ে উঁচু ডালে ফুটে আছে একটি ডালিম-ফুল। রাজপুত্র ভাবতে লাগলেন, কি করা যায়?

ডালিম গাছ থেকে কে যেন বললে আবার: আমায় মুক্ত করো, তাহলেই সব বিপদ থেকে উদ্ধার পাবে!

রাজপুত্র যেন হাতে চাঁদ পেলেন! এক লাফে গাছে উঠে ছিঁড়ে আনলেন সেই ডালিম ফুল। তারপর ফেলে দিলেন তার পাপড়ি সরোবরের স্ফটিক জলে। গাছ থেকে নেমে অবাক হয়ে রাজপুত্র দেখলেন সেই ডালিম ফুল আর নেই, তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক নীল পক্ষীরাজ! আকাশের মত গাঢ় নীল গায়ের রং, পাখায় মেঘের মত শুভ্র স্নিগ্ধতা—চোখের পাতায় তারার মত উজ্জ্বলতা, পায়ে হাওয়ার মত গতি! রাজপুত্র খুসি হয়ে পক্ষীরাজের পিঠে চড়ে বসলেন। আর অমনি সেই নীল পক্ষীরাজ আকাশের দিকে ডানা মেলে শাঁ শাঁ করে উড়ে চললো—!

এদিকে আঙুরলতার ঘুম ভাঙতেই খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। বটগাছের ছায়ার নিচে পড়ে আছে অজস্র নীল গোলাপ, ভোরের আলোয় ঝকমক্ করছে তার নরম পাপড়ি! এ কোন্ দেশ? এতদিন তিনি কোথায় ছিলেন? মনে পড়লো আগের কথা। সখি সঙ্গিনীদের সঙ্গে বের হয়েছিলেন জল-বিহারে…তারপর এলো ঝড়, পথ গেলো হারিয়ে। তারপর? তারপর সওদাগর-পুত্রের দেখা মিললো, আবার যাত্রা, কুহকের দেশের নিবিড় ঘুম। ঘুম কি আজ ভাঙলো?

বসে বসে ভাবছেন আঙুরলতা আর নীল গোলাপ নিয়ে খেলা করছেন আনমনা…সেই বট গাছের সব চেয়ে উঁচু ডালে বসে ছিল শুক আর শারী। রূপকথার বন্ধু তারা—তারা পথ যদি যায় হারিয়ে, কেউ যদি যায় মরে—তাদের কাছে আছে সোনার কাঠি, বলে দেবে পথের সন্ধান, আর ঘুম ভাঙাবার কথা!

শুক বললে: আচ্ছা ভাই, আমাদের বট-ছায়ার নীচে কোন্ দেশের রাজকন্যা বসে বসে মালা গাঁথছিল?

শারী বললে: জানিস না বুঝি? অচিনপুরের আঙুরলতা। পথ ভুলে এসেছিলেন কুহকের দেশে, এখন অচিন পাখী তাঁকে মুক্ত করে দিয়ে চলে গেছে কোথায় কে জানে! শুক বললে: আঙুরলতা দেশে ফিরে যাবে না?

শারী বললে: হ্যাঁ যাবে।

শুক বললে: কেমন করে যাবে?

শারী বললে: তিন গাঁয়ের পারে রক্তকমল দেশ। সেই দেশের রাজপুত্র বের হয়েছিলেন দিগ্বিজয়ে, কুহকের দেশে এসে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন রাজপ্রাসাদের ফুলবাগানে। কোন্ এক অচিন্ পাখী এসে মুক্ত করে দিলো রাজপুত্রকে—সবুজ সরোবরের পারে। রাজপুত্র জেগে উঠে দেখতে পেলেন এক নীল পক্ষীরাজ। সেই রাজপুত্র এসে আঙুরলতাকে নিয়ে যাবে তার দেশে।

শুক বললে: কিন্তু ফুলবাগানের আর সব নীল গোলাপের কি হবে?

শারী বললে: আর তারা জাগবে না! দেখছিস্ না—খেলা করতে করতে আঙুরলতা সব ক'টি নীল গোলাপ ছিঁড়ে ফেলেছেন—তারা সব আবার রক্ত কমল হয়ে গেছে!

শুক বললে: তাই তো!

শারী বললে: আঙুরলতা জানেন না, কুহকের দেশে এরা মায়াজালে ঘুমিয়ে ছিলো। অচিন্ পাখী এদের সবুজ সরোবরে না নিয়ে গেলে ঘুম ভাঙবে না। নিজের হাতে আঙুরলতা কত দেশবিদেশের রাজপুত্রদের জীবন একে একে মুছে দিলেন এই পৃথিবী থেকে! আবার অনেকদিন পর আঙুরলতা এদের বুক-ভাঙা আর্ত্তনাদ শুনতে পাবেন রক্ত কমলের দেশে…

কতো দেশ দেশান্তর পার হয়ে…মেঘের দেশ পেরিয়ে…ঘুরে ঘুরে সেই নীল পক্ষীরাজ এসে পড়লো সেই বট ছায়ার নিচে। রাজপুত্র নামলেন ঘোড়ার পিঠ থেকে, হাতে নিলেন তলোয়ার—সামনের দিকে চেয়ে দেখলেন—সেখানে বসে আছে এক পরমা-সুন্দরী রাজকন্যা…সাত রাজ্যের হীরা-মাণিকেও অমন রূপ পাওয়া যায় না। রাজপুত্র মুগ্ধ হয়ে গেলেন। আঙুরলতা কিন্তু অবাক হলেন না, তিনি শুনেছিলেন শুক আর শারীর কথা। রাজপুত্রের গায়ে রত্নমালার সাজ, মাথায় সোনালি উষ্ণীষ, গলায় মুক্তার মালা, হাতে তলোয়ার, আর দূরে নীল পক্ষীরাজ! আঙুরলতা অনিমেষ নয়নে চেয়ে রইলেন রাজপুত্রের দিকে…

—তুমি কে? একা বসে বসে মালা গাঁথছ?

—আমি কেউ নই।

—বলতে হবে আমাকে।

—কেন?

—আমি তোমার সাত রাজ্যের মাণিক।

—ইস্!

—আজ আমার দিগ্বিজয় শেষ হোলো এখানে। এবার তোমায় নিয়ে ফিরে যাবো আমার দেশে।

—কোথায় তোমার দেশ?

—রক্ত কমল!

•

তারপর অনেক যুগ কেটে গেছে।

রাজপুত্র আঙুরলতাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলেন দেশে। সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে বেজে উঠলো বাঁশী, জ্বলে উঠলো হাজার বাতির রং-মশাল…আঙুরলতা আনন্দে দিন কাটাতে লাগলেন সুখে রাজত্ব করতে লাগলেন রাজপুত্র!

কিন্তু সেই নীল গোলাপের দল?

—সাত পাহাড়ের পারে আছে এক রক্তকমলের বন…সেই বনের মাঝ-বরাবর সবুজ বাগানে ফুটে আছে অজস্র রক্তকমল। রাত যখন শেষ প্রহর, তখন প্রতিদিন তাদের কান্নার সুর শুনতে পাওয়া যায়। সেখানে আজো তারা জেগে আছে সেই অচিন পাখীর আশায়… আকাশের দিকে চোখ মেলে দিয়ে আজো তারাই প্রতীক্ষা করে: কখন ভোর হবে, আর অচিন্ পাখী আসবে তাদের ঘুম ভাঙিয়ে দিতে?

মদনকুমার

আনন্দবর্দ্ধন

(রূপকথা)

(গ)

সুষমপুরে মধুমালাকে নিয়ে পৌঁছুলো রাজকুমার। মধুমালা মুক্তির জন্যে রাজকুমারকে কত মিনতি করলে, কত চোখের জল ফেললে—কিন্তু রাজকুমার তা'র কোনো কথা কানে তুললো না, তা'কে চেড়ী দিয়ে ঘিরে রাখলে তা'র চিত্রপুরীতে, বাইরে রইলো পাহারা। কয়েকদিন পরে সুষম-রাজ্যে বেজে উঠলো ঢোল-ঢক্কা কাড়া-নাকাড়া। জনে জনে জেনে গেল—রাজকুমার বনে শিকার করতে গিয়ে পরী'র মতো এক দেবকন্যাকে ধ'রে এনেছে…তা'কে বিয়ে করবেন রাজা—সে হবে সুয়োরাণী। পাটরাণী এই কথা শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন—এই বিয়েতে বাধা দেবার কোনো উপায় রাণী দেখতে পেলেন না—রাজার ভয়ে কাউকে কোনো কথা মুখ ফুটে বলতেও পারলেন না। এমন সময় রাণীর ভাগ্যে একটা সুযোগ এসে গেল। সেই রাজপুরীর ছিল এক নাপিত,—সে ঘরে ফিরে নাপতিনীকে হাসতে হাসতে জানালে: "দেখ বউ, এবার আমাদের খুব পাওনা হবে। রাজা বন থেকে কুড়িয়ে পেয়েছে নাম-না-জানা এক পরীকন্যে। সেই কন্যের সঙ্গে রাজার বিয়ে—তাই রাজ্যি জুড়ে ভারী ধুমধাম।" নাপতিনী পরীর কথা কানেই শুনে এসেছে—তা'কে চোখে দেখবার জন্যে নাপতে-বউ আর দেরী সইতে পারলে না। পড়তি-বেলায় চললো সে খোঁজ নিয়ে যেখানে মধুমালা আছে। তা'কে সকলেই চিনতো—তাই চিত্রপুরীতে যাবার সময় কেউ তাকে আটকালো না। নাপতিনী সোজা গিয়ে উঠলো মধুমালার ঘরে। এমন পরমাসুন্দরী মেয়ে সে জীবনে দেখে নি—সত্যি পরী বটে। অবাক হয়ে একদৃষ্টে সে চেয়ে রয়েছে দেখে মধুমালা শুধুলে—"কি দেখছ, মেয়ে?" নাপতিনী ব'লে উঠলো—"তোমার রূপ।" বড় দুঃখের হাসি হেসে মধুমালা বললে—"এই রূপ আমার কপালে জ্বেলেছে আগুন।" এই কথায় নাপতিনী আশ্চর্য্য হ'য়ে ব'লে ফেললে—"কেন গা?" মধুমালা বললে—"সে অনেক কথা। এখন তুমি যদি কোনো কাজে এসে থাকো—তাই করোগে।" মধুমালার কথার ধরণ দেখে নাপতিনীর খটকা লাগলো—তা'র মনে হোলো, হয়তো কোনো রাজা-রাজড়ার মেয়েকে জোর ক'রে ধ'রে আনা হয়েছে। একে যদি কোনো রকমে রাজার হাত থেকে উদ্ধার করা যায়—তা'হ'লে খুব পুরস্কার পাওয়া যাবে।" এই ভেবে চতুরা নাপতিনী আসল কথা জানবার জন্যে মধুমালাকে একলা বাগে পায়—সেই সুযোগ খুঁজতে লাগলো—মুখে বললে—"রাজকন্যে, আমি নাপতে-বউ—তোমাকে সাজাবো-গোজাবো, তোমার রাঙা পায়ে আলতা পরাবো, গা' মেজে দোবো—তাই এসেচি।" এই ব'লে সে চেড়ীদের দিকে একবার চাইলে—চেড়ীরা ঘর ছেড়ে চ'লে গেল। তখন মধুমালাকে সে সাজাতে বসলো। মধুমালা বললে—"আমার ব্রত আছে—সাজ করতে নেই।" নাপতিনী সহজে ছেড়ে দেবার পাত্রীই নয়—কথায় কথায় সে মধুমালার মনে বিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে পারলে। একে একে সে মধুমালার সমস্ত দুঃখের কথা শুনে নিলে। তারপরে আর কিছুক্ষণ ব'সে নাপতিনী ছুটলো বড়রাণীর মহলে। রাণী তখন সোনার আরশীর সামনে দাঁড়িয়ে সীঁথিতে সিঁদুরের রেখা আঁকছিলেন। রাণী মুখ ফেরাতেই নাপতিনী একেবারে ব'লে বসলো: "রাণী মা, আমি একটা খুব দরকারী খবর নিয়ে এসিচি—যদি হুকুম দেন তো বলি।" রাণী ঘাড় নেড়ে জানালেন তা'কে বলতে। নাপতিনী শুরু করলে: আমার কথাটা মন দিয়ে শুনুন, রাণীমা! রাজাম'শায় যে কন্যেটিকে রাজপুরীতে এনেচেন—তা'র মতন সুন্দরী চোখে পড়ে না—ঠিক ডানাকাটা পরী। আমি এই দেখে আসচি। রাজাম'শায় যদি তাকে বিয়ে করেন—তবে আপনার কপাল ভাঙলো। এ-র একটা বিহিত করুন—নইলে এ রাজ্যে আর আপনার ঠাঁই হবে না।" রাণী নাপতিনীর কথা শুনে মনে মনে ভাবলেন: "এ খুব সত্যি—রাজা বিয়ের পরে আমার দিকে মুখ তুলেও চাইবে না।" তখন রাণী নাপতিনীকে কইলেন: "শোন্ নাপতে বউ, এই বিয়ে যে কোনো উপায়ে পণ্ড করতে হবে। কোনো রকমে যদি মেয়েটাকে এই পুরী থেকে চুপি চুপি সরিয়ে দিতে পারিস্—তা'হ'লে আমার গায়ের যত অলঙ্কার তোকে সব দোবো, আরো দোবো লক্ষ টাকা।" নাপতিনী ঢোক গিলে কইলে: "পারি কি-না দেখি—রাণী-মা। তবে ভগবানের ইচ্ছে।" অলঙ্কার পাবার আশায় তা'র বুক তখন আহ্লাদে ফেটে যাচ্ছে, আর তর সইলো না—চললো বাড়ী যেন বাতাসে ভেসে।

বাড়ীতে পা' দিয়েই নাপতিনী একঘটি জল ঢক্ ঢক্ ক'রে খেয়ে ফেললে—তারপর নাপিতকে ঘরের কোণে ডেকে এনে তা'র কাছে সমস্ত কথা ভেঙে ব'লে তবে নিশ্চিন্ত হোলো। হঠাৎ এই লাভের সম্ভাবনায় নাপিত তো লাফিয়ে উঠলো—কিন্তু কাজটা বড় ঝক্কির—তাই হোলো তা'র ভাবনা, ধরা পড়লে আর রক্ষে নেই। তবে সাতছালা বুদ্ধির নাপিত ভেবে ভেবে একটা মতলব ঠাওরালে, তারপর নাপতিনীকে পরামর্শ দিয়ে পাঠিয়ে দিলে রাণীর কাছে। নাপতিনী রাণীকে গিয়ে চুপি চুপি বললে সেই কথাটা—রাণী তা'তে মত দিলেন। মধুমালাকেও এই কথা জানানো হোলো—মধুমালা যেন অকূলে কূল দেখতে পেলে। তখন স্থির হোলো: বিয়ের রাতে চেলি প'রে ক'নের সাজে সেজে রাণী মধুমালার ঘরে গিয়ে থাকবেন, আর মধুমালা রাণীর কাপড়-গয়না প'রে রাণীর বেশ ধরবে। তারপর মধুমালা নাপতিনীকে রাণীর সহায়ে দু'একটা ব্যবস্থা ক'রে রাখতে ব'লে দিলে। এদিক ওদিক সব ঠিক হ'য়ে রইলো।

যথাসময়ে এলো বিয়ের দিন আনন্দ উৎসবে দেশ ভ'রে গেল। বিয়ের আর একদিন থাকতে মধুমালা রাজাকে ব'লে পাঠালে যে—বিয়ের আগে কেউ যেন না তা'র ঘরে আসে, কেননা রাজকন্যার একটা মানত আছে—বিয়ের রাতে সেই মানত রক্ষা

না কর্‌লে সব দিক থেকেই অশুভ। রাজা তখন নিজের আনন্দেই নিজে বিভোর—কোনো ছল-চাতুরীর কথা মনে জাগলো না। খুব সহজেই মধুমালার ইচ্ছা-পূরণ হোলো। এদিকে রাণী সাজ-গোজ কর্‌লেন। চিত্রপুরীর পিছন-দিকে একটি প্রমোদ-কানন ছিল—সেখানে যে সে ঢুকতে পেতো না। রাণী ঠিক সময়ে সেই বাগানের ভিতর দিয়ে লুকিয়ে গিয়ে পৌঁছুলেন চিত্রঘরে। নাপতিনীও ছিল সঙ্গে। রাণী লালচেলি প'রে ক'নে-বউ সাজলেন, আর মধুমালাকে সাজিয়ে দেওয়া হোলো রাণীর বেশে। তারপর বাগানের পথ দেখিয়ে নাপতিনী আগে আগে চল্‌লো—আর রাণীর ছদ্মবেশে মাথায় একটু ঘোম্‌টা টেনে চল্‌লো মধুমালা তা'র পিছু পিছু। শেষকালে তা'রা একটা নির্জ্জন যায়গায় এসে থামলো। নাপতিনীকে একটা পুরুষের পোষাক যোগাড় রাখতে মধুমালা আগেই ব'লে রেখেছিল। সেখানে মধুমালা রাণীর সাজ-সজ্জা গয়না সমস্ত গা'থেকে খুলে নাপতিনীকে দিলে, তারপরে পুরুষের বেশে সেই রাজ্য ছেড়ে পালালো। পথে পথে সকলের চোখ এ'ড়িয়ে সে এগিয়ে চল্‌লো, কারোর সন্দেহ জাগলো না। এমনি ক'রে পথের খোঁজ নিতে নিতে মধুমালা ছয়মাস পরে পৌঁছে গেল উজানি নগরে। সেখানে গিয়ে সকলকে জিজ্ঞেস ক'রে সে জান্‌লে যে সেই দেশের রাজপুত্র একদিন মধুমালা নামে এক কন্যাকে স্বপ্নে দেখে তা'র খোঁজে শিকার কর্‌তে বেরিয়ে গেছে, আর রাজপুরীতে ফেরে নি। লোকের কথা শুনে মধুমালা বুঝতে পার্‌লে: এ রাজপুত্র আর কেউ নয়—তা'র স্বামী মদনকুমার। তখন মধুমালা আর দেরী না ক'রে রাজপুরীতে গিয়ে অতিথি হোলো, সেখানে সে রটিয়ে দিলে যে, সে মদনকুমারের বন্ধু। রাণীমার কাণে এই খবর যেতেই অতিথির পড়লো ডাক অন্দরমহলে মধুমালা রাণীমার সাম্‌নে গিয়ে হাজির হোলো। রাণী একমাত্র পুত্রের শোকে দিনরাত কেঁদে কেঁদে একরকম অন্ধ হ'য়ে গিয়েছিলেন। তিনি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে শুধুলেন: "তুমি কি আমার মদনকুমারের খোঁজ নিয়ে এসেছ?" মধুমালা কইলে: "তা'তো জানিনা আমি, তার অনেকদিন দেখা পাইনি ব'লেই তা'কে দেখতে এসেছি এখানে। মদনকুমার আমায় যেমন ভালোবাসে, আমিও তা'কে তেমনি ভালোবাসি। আমি মদনকুমারের প্রাণের বন্ধু।" এই কথায় মদনকুমারের মা বললেন: "বাছা, আমার মদন কি আর আছে? আজ ক'বছর হোলো সে আমায় ছেড়ে কোথায় চ'লে গেছে—সে ছিল আমার নয়নের মণি—তা'কে হারিয়ে অবধি তা'র জন্যে কেঁদে কেঁদে আমার চোখের দৃষ্টি হারিয়েছি।" মধুমালা জোর ক'রে চোখের জল চেপে রেখে বল্‌লে: "মা, তুমি কেঁদো না। আমি যেমন ক'রে পারি আমার বন্ধুকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে আস্‌বো। তবে একটা কাজ কর্‌তে হবে···আমাকে ডিঙা সাজিয়ে দাও, আর সঙ্গে দাও কয়েকজন বিশ্বাসী অনুচর। মদনকুমার যেথায় থাকুক—আমি তা'র উদ্দেশের জন্যে ডিঙায় ক'রে ভেসে চল্‌বো—বন্দরে বন্দরে, নগরে নগরে, বনে পাহাড়ে, এমনকি সমুদ্রের তলেও যদি যেতে হয়—যাবো. প্রাণ যায়—সে-ও স্বীকার।"

রাণীমা মধুমালাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে বল্‌লেন: "ভগবান্ তোমার সহায় হোন্‌···তোমার ডিঙার পালে সুবাতাস লাগুক··· পথের বিঘ্ন কেটে যাক্‌।"

মধুমালার ডিঙা ভাস্‌লো। উজান ভাটিতে ছুটলো ডিঙার বহর।

মধুমালা ডিঙার ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে দিনরাত—তা'র চোখ দু'টি কা'র যেন নিশানা পাবার আশায় সব সময়েই শুক-তারার মত জ্বল্ জ্বল্ করে—এই ভাবে যেতে যেতে একদিন মধুমালা ক্লান্ত হ'য়ে ডিঙার ছাদের ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

ঠিক সেই সময়ে ইন্দ্রপুরীর দুই কন্যা ছোট বোনের খোঁজ নেবার জন্যে পাখী হ'য়ে মধুমালার ডিঙার মাস্তুলে এসে উড়ে বস্‌লো। তখন মেঝো বোন কথা পাড়লে: "আর কত দুঃখ সইবে মধুমালা?" বড়বোন বল্‌লে: "এই দুঃখই শেষ নয়, আরো দুঃখ আছে। সে কইবো তোমায় পরে।" মেঝো বোন মাস্তুলের নীচে একবার চেয়ে দেখলে মধুমালাকে—তারপর বল্‌লে: "চেয়ে দেখো: এই যে মধুমালা এতো কষ্ট স'য়ে তা'র স্বামীর খোঁজে বা'র হয়েছে—তা'র শেষ কোথায়? কোথায় গেলে স্বামীকে পাবে?" বড়বোন এই কথার উত্তরে কইলে: "মধুমালার স্বামী মদনকুমার এখন পরী-স্থানে বাঁধা পড়েছে। মধুমালা যদি পরীর দেশে যেতে পারে—তা'হ'লে মদনকুমারের খোঁজ পাবে।" মেঝো বোন ব'লে উঠলো: "পরীর দেশে যাওয়া তো সোজা কথা নয়—সে-রাস্তা কেই বা জানে—কেমন ক'রে সেখানে যাওয়া যায়?" বড়বোন বল্‌তে লাগলো: "এই যে নদী—এই নদী দিয়ে যেতে যেতে এক একটা বাঁকে এসে পড়তে হয়—একটা ক'রে বাঁক আসে আর সেই বাঁকের মুখে একটা ক'রে শাখা বেরিয়ে গেছে—এমনি এই নদীর চার বাঁকে চারটি শাখা—এই চার শাখার এক শাখায় চোখে পড়ে দুধের মতো স্রোত ব'য়ে যাচ্ছে—আর নানা রকম ফুল ভেসে চলেছে—সেই দুধ-শাখা দিয়ে এলোমেলো ঢেউ ঠেলে ডিঙি ভাসিয়ে যে ভরসা ক'রে এগিয়ে যেতে পারে—সেই দুঃসাহসী পৌঁছোয় পরীর মুল্লুকে। এই পরীর রাজ্যে পরীরা মদনকুমারকে তোতাপাখী বানিয়ে রেখেছে।" মেঝো বোন আবার জিজ্ঞেস কর্‌লে: তবে তা'কে উদ্ধার করা যায় কেমন ক'রে—সে যে পরীদের বশে রয়েছে?" বড়বোন উত্তর দিলে: "ইন্দ্রপুরীতে যে অমৃতসরোবর আছে—তা'র জল এনে কেউ যদি ঐ পাখীর গায়ে ছিটিয়ে দিতে পারে—তা'হ'লে বানানো পাখী আবার মানুষ হ'য়ে উঠবে। মেঝো বোন তখন জানতে চাইলে: "কোনো লোক পরীর দেশে গেলে—পরীরা তো তা'কে দেখবামাত্রই মেরে ফেল্‌তে পারে? এ যে মস্ত বিপদের কাজ!" বড় বোন হেসে বল্‌লে—"বিপদ তো আছেই। তবে বিপদ আছে ব'লে যে বিপদ এড়ানো যায় না—এমন তো নয়। সেখানে কোনো রকমে লুকিয়ে থেকে পরীদের চোখে ধুলো দিয়ে যে কাজ সারতে পারবে—সে-ই জিতবে, নইলে একবার ধরা পড়লেই তা'র সব শেষ। পরীরা রোজ সন্ধ্যেকালে ফুলের রথে চ'ড়ে ইন্দ্রপুরীতে যায়—সেই রথটাকে কোনো উপায়ে একবার তাদের নাগালের বাইরে নিয়ে যেতে পার্‌লেই তা'রা সে-রাত্রি দেবতাদের নাচ-গানের মজলিসে পৌঁছুবার সুবিধে

পাবে না। তা' যদি ঘটে—দেবতারা ইন্দ্রের কাছে গিয়ে তাদের নামে নালিশ জানাবেন—তখন ইন্দ্রের শাপে তা'রাও পাখী হ'য়ে যাবে। কিন্তু সতীকন্যা ছাড়া অন্য কোনো মানুষ এই রথে ক'রে স্বশরীরে স্বর্গে যেতে পারবে না, পরীর দেশে গিয়েও নিজেকে বাঁচানোর শক্তি হারিয়ে ফেলবে"। এই কথাবার্ত্তা শেষ ক'রে পাখী-সাজা দুই ই পুরীর কন্যা উড়ে গেল। মেঝো বোন ঠোঁটে ক'রে নদী থেকে জল নিয়ে মাস্তুলে ব'সে মধুমালার চোখেমুখে ছিটিয়ে দিতেই তা'র হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়—তখন সে শোনে মাথার ওপর কারা যেন কথা কইচে। মধুমালা শুয়ে শুয়ে সমস্ত কথা শুনতে পেলে। আর কি সে স্থির থাকতে পারে? মাঝি-মাল্লাদের হুকুম দিলে: "উজানে নৌকো চালাও"।

সনসন্ বেগে ডিঙা ছোটে। কত দেশ, কত নগর পিছনে প'ড়ে থাকে। এলো নদীর বাঁক—এক, দুই, তিন—পেরিয়ে চলে ডিঙা। শেষে এলো চারের বাঁক—সেথায় ব'য়ে যাচ্চে এক শাখানদী—তা'র বুকে দুধের স্রোত, আর ঢেউয়ে নাচে নানা-জাতির ফুল।

মধুমালা বললে: "এই দুধনদী দিয়ে ডিঙা চালাও"।

মাঝিরা বললে—"বড় তেজ কটাল—ডিঙা যাবে বানচাল হ'য়ে।

মধুমালা মাথা ঝেঁকে কইলে—"তেজ কটাল হোক মরা কটাল হোক্—ডিঙা চালাতেই হবে। হাল ধরো ক'সে।"

চললো ডিঙা ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলে দুলে—ঠিক সন্ধ্যের সময় লাগলো এসে পরীঘাটে। তখন লোকজনদের সেখানে থাকতে ব'লে মধুমালা একলা চললো পরীর রাজ্যে। সেখানে সবই মায়ার খেলা—মণিমাণিক্যের গাছ—তা'র আলোতেই রাস্তা আলো। অনেক দূর হাঁটতে হাঁটতে মধুমালা দেখতে পেলে এক সারি সোনা-রূপোর ঘর—কাছে গিয়ে কাউকে তা'র চোখে পড়লো না। ঘরগুলো খালি প'ড়ে রয়েছে—কারোর সাড়া-শব্দ নেই। চারিদিক ভালো ক'রে দেখে নিয়ে মধুমালা খুব সাবধানে ঢুকে পড়লো সেই পরীর রতনপুরীতে। এ-ঘরে যায়—সে-ঘরে যায়—দেখে: কোনো ঘরে থরে থরে সাজানো ফল—কোনো ঘরে ফুলের মেলা—কোনো ঘরে ভারে ভারে চিত্র-বিচিত্র দিক্‌বসন—কোনো ঘরে স্ফটিকের সিন্দুকে রামধনু-রঙের অদ্ভুত সব অলঙ্কার। এই সমস্ত দেখতে দেখতে মধুমালা এসে পড়লো সাতমহলা এক বাড়ীতে। একটা মহলে ঢুকে সে দেখতে পেলে হীরের ঘর—সেই ঘরের মাঝখানে সোনার পালঙ্ক—তার ওপরে পাতা দুধের মতো শাদা নরম পালকের বিছানা। ঘরটা গন্ধে যেন মেতে রয়েছে—পালঙ্কে ফুলের ঝালর—বিছানায় কত আশ্চর্য্য ফুলের বাহার—তা'র সীমা-সংখ্যা নেই। কিন্তু মধুমালা এসেছে যে খোঁজে—তা'র সন্ধান কই? ঘরের মধ্যে পাতি-পাতি ক'রে সে খুঁজতে লাগলো—নজরে পড়ে রকম রকম জিনিস, তবু রঙের ঢেউয়ে সব গুলিয়ে যায় এক নিমেষে। মধুমালা অনেক চেষ্টায় লক্ষ্য স্থির ক'রে চারিদিক একবার চেয়ে দেখলে—হঠাৎ তা'র দৃষ্টিতে পড়লো—ঘরের একটা কোণে হীরের দেওয়ালের রঙের সঙ্গে মিশে রয়েছে মহারজতের এক খাঁচা—সেই খাঁচার মধ্যে একটা শুকপাখী। এই না দেখে মধুমালা খাঁচার কাছে এগিয়ে গেল। তখুনি সেই শুক ব'লে উঠলো, "হায় মানুষ, তুমি কেন এখানে এলে? তুমি জানো না কি এটা পরীর মুলুক? রাত্রে তা'রা গেছে ইন্দ্রের পুরীতে নাচ-গান করতে—আকাশের গায়ে যেই শুকতারা উঠবে—অমনি বেজে উঠবে তাদের ছুটির ঘণ্টা—তখনি ভোরের হাওয়ায় ভেসে তা'রা ফিরে আসবে এই পুরীতে—তোমাকে দেখলেই আমার মতো পক্ষী বানিয়ে পিঁজরায় পুরে রেখে দেবে। এই রকম দশা হয়েছে আরো ছয় রাজপুত্রের; তা'রা আমারি মতন পরীর মায়ায় ভুলে মায়া-নৌকোয় এখানে এসে ঘরে ঘরে খাঁচায় বন্দী হ'য়ে আছে।

মধুমালা কোনো কথা বললে না—অপর ছয় মহলে গিয়ে ছ'টি ঘরে খাঁচায় রাখা ছ'টি শুকপাখী দেখতে পেলে—তাদের প্রত্যেকের মুখে ঐ একই আক্ষেপ তা'র কানে বাজলো। এই সমস্ত দেখে শুনে মধুমালা ভোর হবার আগেই একটা স্বর্ণ-চাঁপার কুঞ্জে গিয়ে লুকিয়ে রইলো। রাত্রি পুইয়ে যায় যায়—এমন সময় মধুমালা দেখলে: আকাশ থেকে উড়ে আসছে কি একটা বড় পাখীর মতো—একটু পরেই বুঝতে পারলে—সেটা পরীর রথ—সোনার ফুলে গাঁথা। রথ এসে থামলে—সেই কুঞ্জের একটা ঘন চাঁপাগাছের তলায়। সেই রথ থেকে বেরিয়ে এলো সাত বোন পরী—তা'রা এক একজন এক একটা মহলে চ'লে গেল। সকাল হোলো—তারপর দুপুর গড়িয়ে গিয়ে বিকাল বেলা এলো—তখন মধুমালা চাঁপাগাছের আড়াল থেকে চেয়ে দেখে: সাতবোন পরী সেই চাঁপাবনের পান্না-বাধানো বীথিতে বেড়াতে এসেছে—আর তাদের সঙ্গে সাতজন রাজকুমার। সকলের ছোট বোনের পাশে যে রাজকুমার—তা'কে মধুমালা চিনতে পারলে—সে-ই তা'র স্বামী মদনকুমার। পরীরা নেচে হেসে গেয়ে রাজপুত্রদের মন ভোলাতে লাগলো। এই ভাবে কিছুক্ষণ কাটবার পর গোধূলির ছায়া নেমে এলো—সন্ধ্যাতারা পুব আকাশের কোণে উঁকি মারলে—তখন পরীরা রাজকুমারদের নিয়ে যে যা'র মহলে ঢুকলো। সন্ধ্যা যখন ঘনিয়ে এলো—সাতবোন পরী সোনা-মণি-রত্নে সেজেগুজে সেই চাঁপাতলায় রথে এসে উঠলো। রথে উঠে তা'রা সকলে একসঙ্গে তিনবার হাততালি দিয়ে এক সুরে একটা মন্ত্র আওড়ালে:

"আমরা পরী সাতটি বোন
চরণ দিলাম রথে?
মন-মরালী বলি শোন্
চল্‌রে নীলার পথে!
পারিজাতের গন্ধময়
ইন্দ্রপুরী যেথায় রয়—
আকাশগঙ্গা-পারে,—
ছুঁয়ে ছুঁয়ে তারার দল
বায়ুর লহর কেটে চল্—
চল্ রে স্বর্গদ্বারে!"

এই ব'লে তা'রা আবার তিনবার হাততালি দিলে, সঙ্গে সঙ্গে রথ উঠলো আকাশে—চললো ইন্দ্রপুরীর দিকে। পরীরা রাত্রে

যায়, দিনে আসে···মধুমালা চাঁপার বনে থাকে। এমনি ক'রে দু'দিন কেটে গেল। একদিন মধুমালা করলে কি···সাহস ক'রে রথের নীচে গিয়ে লুকিয়ে রইলো। মধুমালাকে নিয়েই সে-দিন রথ ইন্দ্রপুরীতে গিয়ে পৌঁছুলো। সতীকন্যার পথ দেবতা বা মানুষ কেউ আট্‌কাতে পারে না—তাই মধুমালা ইন্দ্রপুরীতে সশরীরে ঢুকতে পারলে! সেখানে তা'র চোখে পড়লো—অপরূপ সব মণির আবাস···কোনোটা সোনার, কোনোটা পান্নার, কোনোটা চুনির, কোনোটা নীলমণির, কোনোটা সূর্য্যকান্তমণির, কোনোটা চন্দ্রকান্তমণির—এমনি কত বাড়ী—যেন এক একটি আলোর পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে···দেখলে দিকে দিকে পারিজাত-বন—তা'র গন্ধে স্বর্গরাজ্য ভরপুর হয়ে রয়েছে। দেবতারা চলেছেন দলে দলে ইন্দ্রভবনে নাচ-গানের সভায়। স্বর্গপুরীর এই শোভা দেখে মধুমালার মনে লাগলো একটা অজানা ভাবের ঘোর। কিন্তু সে নিজের কাজ ভুললো না! সাত পরীর পিছু পিছু সে-ও লুকিয়ে ঢুকে পড়লো ইন্দ্রের সভায়—সেখানে একটি কোণে এক দিক্‌বালার আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। স্বর্গে কেউ পিছনপানে ফিরে তাকায় না—তাই মধুমালা কারোর দৃষ্টিতে পড়লো না! সাত বোন পরীর নাচ-গানের পালা শেষ হ'তে তা'রা সভা ছেড়ে চললো ইন্দ্রের নন্দন-কাননে। মধুমালাও তাদের পিছু নিলে। সাতপরী নন্দনে এসে ঢুকলে—মধুমালাও সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে পড়লো। নন্দনকাননের পারিজাতের বাগান ছাড়িয়ে তা'রা এসে পৌঁছুলো অমৃতফলের বাগানের সামনে—তা'র পরেই অমৃত-সরোবর! সে-স্থানটি রয়েছে ইন্দ্রজালে ঘেরা—আর অমৃতদ্বারের সামনে ব'সে আছে ইন্দ্রের ভীষণ পাহারা ঋভুক্ষ হাতে চাবিকাটি নিয়ে। সাতপরী সেখানে এসে দাঁড়াতেই বজ্ররাজ ঋভুক্ষ হেঁকে উঠলো—"কোথায় যাও তোমরা?" পরীরা বললে—"অমৃত-সরোবরে স্নান করতে আর অমৃত-ফল খেতে।" ঋভুক্ষ তখন বললে—"অমৃত-ক্ষেত্রে ঢোকবার জন্যে দেবরাজের দেওয়া অধিকার-চিহ্ন কই? দেখাও সেই পারিজাতকলির ইন্দ্রনীলক আংটি।" এই কথায় প্রত্যেকেই তা'র আঙুল বাড়িয়ে আংটি দেখাতে—ঋভুক্ষ খুলে দিলে অমৃত-দ্বার। মধু-মালার হাতে আংটি ছিল না ব'লে অমৃত-ক্ষেত্রে ঢুকতে পেলে না। সে কিন্তু খোলা-দ্বার দিয়ে দেখলে—সাতবোন পরী অমৃত-সরোবরে স্নান সেরে খেলো অমৃত-ফল। সর্ব্বক্ষণই পিছনদিকে সে দাঁড়িয়েছিল—তাই সে সকলেরি চোখের আড়ালে র'য়ে গেল। এই সমস্ত দেখেশুনে মধুমালা আগেভাগেই রথের তলায় গিয়ে ব'সে রইলো। ভোর হয় হয়—রথ উড়ে এসে নামলো আবার পরীর রাজ্যে। প্রতিদিনকার মতো পরীরা আপন আপন ঘরে চলে গেল···তার পরে বিকেল হ'তে রাজকুমারদের সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরুলো। সন্ধ্যার সময়ে সাতবোন সাজ-সজ্জা ক'রে রথে উঠে চ'লে গেল ইন্দ্রপুরীতে। এই অবসরে মধুমালা চাঁপাবন থেকে বেরিয়ে এসে চললো মহলে মহলে খাঁচায় বন্দী শুক-বানানো রাজপুত্রদের কাছে···তাদের প্রত্যেককেই ডেকে বললে: "যদি তোমরা কেউ কোনো উপায়ে সাত পরীর একজনের হাত থেকে ইন্দ্রনীলের পারিজাত-কলির আংটিটা খুলে নিয়ে চাঁপাবনে ফেলে দিতে পারো—তা' হ'লে আমি তোমাদের মুক্তি এনে দিতে পারি"।

তা'র পরদিন পরীরা বেড়াতে বেরিয়েছে—সঙ্গে আছে রাজপুত্ররা। খুব আমোদে সকলে মেতে উঠেছে—এমন সময় মদনকুমার হঠাৎ মাটির ওপর প'ড়ে গেল। ছোট পরী ছুটে গিয়ে তা'কে আঁকড়ে ধরে তোল্‌বার চেষ্টা করতে লাগলো—এই সুযোগে পরীর হাতে আরো চাপ দিয়ে কৌশল ক'রে আস্তে আস্তে তা'র আংটিটা খুলে নিলে···তারপর উঠে দাঁড়িয়ে চাঁপাবনের দিকে লক্ষ্য ক'রে ছুঁড়ে দিলে সেই আংটিটি। ছোট পরী জানতেও পারলে না। আবার হাসি-গান শুরু হোল—ঠিক সন্ধ্যার আগে তা'রা ঘরে ফিরলো। রাজপুত্রদের তোতা বানিয়ে খাঁচায় ভালো ক'রে পুরে রেখে—পরীরা সাজ-পোষাক করতে ব্যস্ত হোল। ঘর থেকে বেরিয়ে আস্‌বার-সময়ে ছোট পরীর হঠাৎ চোখে পড়লো—তা'র আঙুলে পারিজাত কলি ইন্দ্রনীল-আংটিটি নেই—তখনি সে বোনেদের ডাকলে। তাদের মাথায় যেন বাজ পড়লো—চারদিকে খোঁজ খোঁজ রব প'ড়ে গেল। খুঁজতে খুঁজতে সন্ধ্যে গেল উত্তরে—এলো রাত্রি—বেজে উঠলো তা'র প্রথম প্রহর।

এদিকে মধুমালা চাঁপাবন থেকে খুব সহজেই ইন্দ্রনীলের আংটিটি কুড়িয়ে পেলে—কেননা সে-মণি অন্ধকারেও জ্বলতে থাকে। সেই আংটি আঙুলে প'রে মধুমালা রথে উঠে ব'সে তিনবার হাততালি দিয়ে রথ ওড়াবার মন্ত্রটি বলে উঠে তারপর আবার দিলে তিনবার হাততালি। উড়ে গিয়ে স্বর্গদ্বারে থামলো। অমৃত-সরোবর যে কোথায়—আগেই সে দেখে গিয়েছিল। সেখানে দ্বারী বজ্ররাজ ঋভুক্ষকে পারিজাতকলি ইন্দ্রনীল আংটি দেখাতে মধুমালা ঢোক্‌বার অধিকার পেলে। একটি সোনার ভাঁড়ে অমৃত-সরোবরের সুধা-জল ভ'রে নিয়ে সে পরের দিন ভোর বেলায় ফিরে এলো পরীরাজ্যে।

পরীরা সেদিন আর পৌঁছুতে পারলো না দেব-সভায়। দেবতারা এসে ফিরে গেলেন। ইন্দ্ররাজ অত্যন্ত রেগে গিয়ে ছাড়লেন অভিশাপ, আদেশ দিয়ে বললেন: "যাও তুমি যেখানে থাকে সেই পরীরা—তাদের দিয়েছিলুম মানুষকে গুণ করবার শক্তি—সেই শক্তি কেড়ে নিয়ে তাদের মধ্যে মিশে যাবে"। অভিশাপ ছুটলো হুহু ক'রে ঝোড়োবাতাসে—পরীরাজ্যে পৌঁছেই রাত্রি-শেষের আগে সাতবোন পরীর মধ্যে সাত টুকরো হয়ে ঢুকে পড়লো—সঙ্গে সঙ্গে তারা পরীর রূপ হারিয়ে বদলে গেল সাতটি শারী-পাখীতে।

মধুমালা ফিরে এসে নির্ভাবনায় সাত সাতটি মহলে গিয়ে খাঁচা খুলে সাতটি শুক পাখীকে মুক্ত ক'রে আনলে, তারপরে সুধাবারি ছিটিয়ে দিলে তাদের সকলের গায়ে—দেখতে দেখতে সাত রাজপুত্র দাঁড়িয়ে উঠলো। রাজপুত্রদের সঙ্গে ক'রে এনে মধুমালা তখন ডিঙা ভাসিয়ে দিলে। সাত রাজপুত্রকে নিজ নিজ দেশে পৌঁছে দিয়ে মধুমালা বারো বৎসর কাটিয়ে দেবার জন্যে অজ্ঞাতবাস করতে লাগলো।

•　　•　　•

মদনকুমার ঘরে ফিরতে উজানি-নগরে আবার হাসি ফিরে

এলো তা'র মা যেন হারানো প্রাণ ফিরে পেলেন। কিছুদিন এমনি ভাবেই যায়। মদনকুমারের মনে কিন্তু সুখ নাই—মধুমালার কথা সে ভুলতে পারে নি। আবার সে ডিঙা সাজিয়ে বেরিয়ে পড়লো। নানাদেশ ঘুরে ঘুরে শেষকালে সে নদীর এক চৌমাথায় এসে হাজির হোলো। সেথায় দেখে: একটা শাখা দিয়ে কালাপানি ব'য়ে যাচ্ছে—আর তা'র দুইধারে বড় বড় গাছের ডালে ব'সে ডাকছে কষ্টিপাথরের মতো মিশকালো সব কাক, অথচ সেগুলোকে দেখলে মনে হয় ঠিক যেন শিঙ-ওলা মাছমোড়ল পাখী। এই দেখে মদনকুমার সেই দিকেই নৌকা চালালো। অনেক দূর যাবার পর তা'র চোখে পড়লো একটা মস্ত বড় কালো পাষাণ-পুরী। সেখানে গাছের ফুল, ফল, পাতা—সমস্তই কুচকুচে কালো। কালো মাটির ঘাটে ডিঙা বাঁধা হোলো, মদনকুমার এগিয়ে চললো সেই পুরীর দিকে। সেই পুরীর মস্ত বড় ফটক দিয়ে সে ঢুকলো তা'র গণ্ডীর মধ্যে। খানিকটা রাস্তা চলবার পর মদনকুমার দেখতে পেলে একটা কালো বটগাছের গুঁড়ির ওপর পা' মেলে ব'সে আছে ভূতের মতো কালো এক বুড়ি—আর তা'র সামনে কালো ঘাস খেতে খেতে চরে বেড়াচ্চে কালো কালো সব ছাগল। মদনকুমার এই আজবপুরী দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে গিয়েছিল। সে এগিয়ে এসে বুড়ির কাছে সেই পুরীর বৃত্তান্ত জানতে চাইলে। ফোগলা কালো বুড়ি তা'র দিকে মিটিমিটি চেয়ে খনখনে গলায় ব'লে উঠলো:

"নিরেনব্বুয়ের ধাক্কা,
একে একশো পাক্কা।
এলে তুমি লাগধুম,
করবো তোমায় ছাগগুম।
একটা শুধু ফক্কা,
একশো একে টক্কা।

মদনকুমার কালো বুড়ির কথা কিছুই বুঝতে না পেরে বললে: তুমি কি বলছ—বুড়ি? আমি জিজ্ঞাসা করলুম এক—কইলে আর এক। এই আজবদেশের ব্যাপার বলো"।

বুড়ি কইলে: "হেথায় সব কালোয় কালো—তাই না যত দিশে হারালো"।

মদনকুমার একটু বিরক্ত হ'য়ে আবার বললে: "কালোবুড়ি, হেঁয়ালি রেখে আমাকে এই দেশের খবর কিছু দিতে পারো তো—দাও। আমি নতুন এসেছি এখানে—কিছুই জানি না! সমস্তই দেখছি কালো—ঘড়-বাড়ী, গাছ-পাতা, ফুল-ফল-নদীর জল কালো-রঙের—কেন?"

বুড়ি তা'র কথার জবাব দিলে এই ব'লে যে—যদি সে শুনতে চায়—তা' হলে তা'কে তা'র পাথর-কুচি ঘরে যেতে হবে। মদনকুমার তাইতেই রাজি হোলো। তখন বুড়ি উঠে দাঁড়িয়ে 'হাপু'-খেলার মতো হাতে হাতে থাবড়া দিয়ে হাঁকলো—

কেলো ছাগল—কেলো ছাগল—
হাত্তোর হোটর চল্—
ঘরকে ফিরে চল্—
বোম্‌বোকাটের ছাঁ—
রাক্ষসে ছুট ধাঁ—
যেথায় ছাঁদন-কল্—

এই কথা শুনে ছাগলের পাল ছুটলো দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে।—মদনকুমারকে হাতছানি দিয়ে আসতে ব'লে কালোবুড়িও চললো সেই দিকে। বুড়ি তা'র পাথর-কুচি ঘরে পৌঁছে দেওয়ালে টাঙানো একটা মালা হাতে নিয়ে বিড় বিড় ক'রে কি বকলে, তারপর চোখের পাতা ফেলতে না ফেলতেই মালাটা মদনকুমারের গলায় পরিয়ে দিলে। গলায় মালা যেমনি পরা—মদনকুমার ছাগল বনে গিয়ে সেই দলের সঙ্গে ভিড়ে গেল। তার পায়ে পড়ল ছাঁদন-দড়ি!

মদনকুমার ছাগল-বনার পর ছ'মাস পেরিয়ে গেল।

একদিন ইন্দ্রপুরীর দুই কন্যা বড় বোন আর মেঝো বোন আগের মতো পাখীর রূপ ধ'রে এসে কথাবার্ত্তার ছলে মধুমালাকে জানিয়ে দিয়ে গেল যে, তার স্বামী দানবপুরে বিপদে পড়েছে! মধুমালা আর স্থির থাকতে পারলে না। ডিঙায় ক'রে আবার সে ভাসলো স্বামীর উদ্ধারে। নদীর চৌমাথায় এসে মধুমালা কালা-পানির শাখা বইতে দেখতে পেলে। সেই শাখানদী বেয়ে সে ডিঙা লাগালো দানবপুরের ঘাটে। ডিঙায় ওঠবার সময় মধুমালা এক সুন্দর পুরুষের বেশ ধরেছিল। সেই বেশেই যেতে লাগলো কালো-পাথর বিছানো রাস্তায়। শেষে উপস্থিত হোলো কালো মায়াবুড়ির কাছে। মায়াবুড়ি আর কথাটি না ব'লে মধুমালার গলায় ছুঁড়ে দিলে একটা ফুলের মালা। এ পর্য্যন্ত বুড়ি যত রাজকুমারের গলায় এই ফুলের মালা দিয়েছিল—সকলেই দেখতে দেখতে ছাগল হ'য়ে গেছে। কিন্তু সেই মায়া-হার মধুমালার গলায় গিয়ে পড়তে কোনো ফল ফললো না। সে যেমন মানুষ—তেমনি রইলো। এই দেখে বুড়ি উঠলো চমকে। তার মনে মনে খুব ভয় হোলো—কেন না সে জানতো: যেদিন সেই দেশে এসে কোনো সতীকন্যা পা' দেবে—সেইদিন থেকে তার এই যাদু নষ্ট হ'য়ে যাবে। তখন বুড়ি এই বুঝে তাকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে খুব কাকুতি মিনতি ক'রে বললে: রাগ কোরো না সতীকন্যে—বোকা রাজপুত্তুরদের ছাগল বানানোই আমার কাজ—তুমি রাজ-পুত্তুর হ'লে এতক্ষণ ছাগল হ'য়ে যেতে। তুমি চলো আমার ঘরে—তোমাকে আমি অনেক মন্তর-তন্তর শেখাবো—আদর করবো, আত্তি করবো। আমায় যা' বলবে—তাই শুনবো। কেবল তুমি আমার আশা-পূরণে ছাই দিয়ো না।"

মধুমালা এই কথা শুনে একটুও টললো না বরং গলা উঁচিয়ে কইলে: "শোন্ মায়াবুড়ি, তুই কিসের জন্যে রাজকুমারদের ছাগল বানিয়ে কষ্ট দিস্? এ-র ঠিক উত্তর যদি না দিতে পারিস্—তা' হ'লে এই তলোয়ার দিয়ে তোকে কেটে ফেলবো।" বুড়ি থতমত খেয়ে গিয়ে বললে—"কন্যে, আমি বড় আশায় মানুষকে ছাগল করতে লেগেছি। এই দানবপুরের রাজকন্যার একটা ব্রত আছে—এই ব্রতের পারণের দিন একশো একটা মানুষ-ছাগল চাই। যে এই ছাগল যোগাড় ক'রে দিতে পারবে—তাকে দানব-রাজ দেবেন খুব বড় একটা পুরস্কার। আমি নিরানব্বইটা ছাগল বানানোর পর ছ'মাস আগে এক রাজপুত্তুর এদেশে হঠাৎ আসে—তাকেও ছাগল বানিয়ে একশো পুরো করেছি—এখন আর একটা মাত্র বাকি কিন্তু তুমি এসে আমার সর্ব্বনাশ করলে।

আমার একটি ছেলে—তা'র জন্তেই না এতো কাণ্ড।" এই ব'লে বুড়ি কাঁদতে লাগলো।

এই মায়াকান্নায় মধুমালা যে ভুলবে এমন পাত্রীই সে নয়। তবু তা'র মনে হোলো—বুড়িকে বশে আন্‌তে না পারলে—তা'র সব কাজ পণ্ড হবে। এই ভেবে-চিন্তে সে ব'লে উঠলো: "বুড়ি, তোর আশা যদি পূরণ করি—তা' হ'লে আমাকে কি দিবি?"

বুড়ি বললে: "যা' চাইবে—তাই দেবো।"

মধুমালা বললে "আমি কেবল শিখতে চাই তোর ঐ ছাগল-বানানো যাদুবিদ্যে। যদি আমাকে এটা শিখেয়ে দিস—তোর ছেলের সঙ্গে দানব-রাজকন্যার বিয়ে ঘটিয়ে দেবো। আর একটা কথা—কি করলে ছাগল আবার মানুষ হতে পারে।" বুড়ি আর উপায় না দেখে বললে: "আমার ঘরের দক্ষিণ দিকে যে আয়নার পাড়—তা'র ভেতর যে মায়া ফুলের গাছ আছে—তা'র ফুলে গাঁথা যে মালা—সেই মালা গলায় পরালে ছাগল বানানো যায় এই মন্তর বলে:—

'মায়াফুল মায়াফুল—
নাক-কান কাট চুল—
ওলটান পালটান্—
লটকান্ পটকান্
ভোল্-ছাড়্ বেভ্‌ভুল্—
কর্ ফট্ অজকুল।

—আর এই মায়াফুলের পাতা খাওয়ালে ছাগল আবার মানুষ হয়।"

মধুমালা বুড়িকে বললে—"এখন তুই যা চাস—তাই পাবি। তবে মুখ বুজে থাকতে হবে। এবার আয়নার পাড় কোথা' দেখিয়ে দিবি চল্।" বুড়ি মধুমালাকে দক্ষিণ দিকের একটা ঘুল্-ঘুলির ভিতর দিয়ে নিয়ে গেল যেখানে আয়নার পাড়ে মায়াফুল ফুটে রয়েছে। মধুমালা মায়াফুল তুলে একটা মালা গাঁথলে, আর সেই গাছ থেকে কিছু পাতা ছিঁড়ে নিলে। তারপর এক সন্ন্যাসীর বেশ ধ'রে সেই মালাটি হাতে মধুমালা গেল দানবরাজের দরবারে। সিংহাসনের ওপর অমাবস্যার মতো কালো বিকট চেহারার দানবরাজ ব'সে ছিল,—তা'কে আর এক মুহূর্ত্তও সময় না দিয়ে সন্ন্যাসী-রূপী মধুমালা সেই মালাটা তা'র গলায় ছুঁড়ে দিলে—দেওয়া মাত্রই দানব-রাজ রামছাগল হ'য়ে 'ব্যা-ব্যা' ক'রে চেঁচাতে চেঁচাতে দৌড় মারলে। এই বিষম কাণ্ড না দেখে—রাজ্যের সমস্ত পাত্র-মিত্র প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গেল।

তারপর মধুমালা মায়াফুলের পাতা খাইয়ে যাদুকরা ছাগল-গুলোকে মানুষের মূর্ত্তিতে ফিরিয়ে আনলে। এদের মধ্যে ছিল তা'র স্বামী মদনকুমার! কিন্তু বারো বৎসর কেটে না গেলে—সে পরিচয় দিতে পারে না, সেজন্যে অন্য রাজকুমারদের মতো মদনকুমারকেও বিদায় দিলে। সেই পুরী ছাড়বার আগে মধুমালা বুড়ির ছেলের সঙ্গে দানব-রাজকন্যার বিয়ে দিতে ভুললো না।

আর এক বছর কাটলো। ঘরে ব'সে থাকতে মদনকুমারের মন চায় না—সে চললো বাণিজ্যে। নৌকা ভেসে যায়—মদন-কুমার উদাস চোখে দিকে দিকে চায়—কেবল ভাবে—"এমনি ক'রে বৃথাই কি আমার জীবন যাবে?" তরী বাইতে বাইতে সেই মায়ানদীর চৌমাথায় সে এসে পড়লো—সেখানে চোখে পড়লো—একদিকে এক শাখা বেরিয়ে চলেছে—তা'র জল ঘন নীল। যতদূর দৃষ্টি যায়—চেয়ে দেখে', তা'র বোধ হোল—সেই নীল নদীর ধারে যত গাছ—সে গুলোর ডাল পালা, পাতা-ফল-ফুল—সমস্তই নীলরঙের, সেধারে উড়ছে যত নীলপাখী। এই নদীতীরের আশ্চর্য্য দেশ দেখবার জন্যে মদনকুমারের মনে খুব ইচ্ছে জাগলো। তখন সেই নীল নদীতে ফিরালো ডিঙ্গা। মাঝ বরাবর গিয়ে মদনকুমার একটা বড় ঘাট পেলে—সেখানে তরী বেঁধে সেই অজানা দেশের দিকে রওনা হোলো। কিছুদূর যেতেই সে দেখে—একটা বিশাল নীলপাথরের পুরী। সেই পুরীর মধ্যে সে গেল—জন-মানবের সাড়া শব্দ নেই—সব নিঝুম। তবুও সাহসে ভর ক'রে মদনকুমার এগিয়ে চললো—আশে-পাশে চোখে পড়লো কত বাগান—বাগানে সব পান্নার গাছ, ডালে ডালে ঝুলছে—পান্নার ফুল, পান্নার ফল। চারিদিকে সে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো—কেউ এসে তা'কে বাধা দিলে না। এই ভাবে সন্ধ্যা নেমে এলো—হঠাৎ চোখের সামনে পড়লো একটা মস্ত বড় নীলপাথরের বাড়ী—তা'র গম্বুজ গিয়ে ঠেকেছে নীল আকাশে—যেন একটা বিরাট দৈত্য নীল চোখ বা'র ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। সেই দিকে তা'কে কে যেন চুম্বকের মতো টানতে লাগলো—একটু এগিয়ে যেতেই দেখে একটা মানুষের সমান মূর্ত্তি যেন তার দিকেই আসছে। সেই নির্জ্জন যায়গায় তবু একটা মানুষমূর্ত্তির দেখা পেয়ে সে অনেকটা ভরসা পেলে। সেই মূর্ত্তি তা'র সম্মুখে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল—সুপুরুষ—চোখ দু'টি বিষাদে ভরা। সে অতি দুঃখের সঙ্গে কথা কইলে: "রাজকুমার, তুমি কেন এলে এই নীলদৈত্যের পুরীতে? আমার মতোই তুমি বন্দী হবে, কিন্তু তুমি এসেছ আর রক্ষে নেই, এবার আমার মানুষজন্ম ঘুচে যাবে।" আর কোনো কথা হোলো না—তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে—নীলদৈত্যের আসার আওয়াজ পাওয়া গেল। তারপরে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটলো—মদনকুমার সেই মানুষটিকে আর' দেখতে পেলে না। সে একলাই সেই পুরীতে দিনের পর দিন ঘুরে বেড়ায়—দৈত্যের গণ্ডী ছাড়িয়ে যাবার শক্তি তার নেই।

দিন যায়—মাস যায়—বছর যায়। একদিন সেই পাখী-সাজা ইন্দ্রপুরীর দুই কন্যার আলোচনা শুনে মধুমালা জানতে পারলে যে, তা'র স্বামী আবার বন্দী হয়েছে এক নীলদৈত্যের পুরীতে।

মধুমালা আর দেরী না ক'রে—ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো স্বামীর সন্ধানে।

কিছুদিন পরে সেই নীলনদী বেয়ে সে এলো নীলদৈত্যপুরীতে। সেখানে সে দেখলো—চারিদিকে নীল রঙের খেলা। সেখানে ঘুরতে ঘুরতে কাউকে দেখতে না পেয়ে এক সময় মধুমালা একটা গাছের নীচে গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বস্‌লো। একটু পরেই তা'র চোখে তন্দ্রা নেমে এলো। বেশীক্ষণ যায়নি—আধবোজা চোখে মধুমালা দেখতে পেলে কে এক সুন্দর পুরুষ তা'র দিকে এগিয়ে

আসছে। তা'কে ভালো ক'রে চোখ চেয়ে দেখতেই চিনতে পারলে—সে আর কেউ নয়—স্বয়ং মদনকুমার। মদনকুমার কাছে এসে তাকে বলতে লাগলো: "হায়—রাজকুমার—তুমি মানুষ হ'য়ে এই দৈত্যরাজ্যে কেন মরতে এলে? এখানে এক মায়াবী নীলদৈত্যের বাস। এই দৈত্য করে কি—কোনো নূতন রাজকুমার এই পুরীতে এসে পৌঁছুলেই—তার আগে বন্দী-করা রাজপুত্রকে পান্নার গাছ ক'রে দেয়। ঐ-যে সব পান্নার গাছ দেখছ—ও সমস্তই রাজকুমার। আজ তুমি এসেছ—কালকে আমায় মানুষ-জন্ম হারিয়ে গাছ হ'য়ে যেতে হবে। দিনে সে পুরীতে থাকে না—অপরের দেশে লুটে-পুটে খেতে যায়। বেলা ঢ'লে পড়েছে। এবার তার ফিরবার সময় ঘনিয়ে আসছে।

(আগামী বারে সমাপ্য)

আশীর্ব্বাদ

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

আসমুদ্র হিমাচল করিয়া ভ্রমণ
তীর্থে তীর্থে তীর্থবারি করি আহরণ
অন্তরের স্নেহ-শৈত্যে ঘনীভূত করি
মাতা তব তিলোত্তমা তুলেছেন গড়ি

পিতা তব জ্ঞানভিক্ষু পশ্চিমে পূরবে
বিদ্যাপীঠ পরিক্রমা করি সগৌরবে
লভেছেন যেই সত্য করেছেন দান
তাহারি মুরতি তুমি লভিয়াছ প্রাণ

কত আশা কত সাধ কত চিন্তা ভয়
আজিকার তরে ছিল কত না সংশয়
সব দ্বিধা বাধা-বন্ধ করিয়া নিঃশেষ
আসিয়াছে শুভদিন ধরি বর বেশ

যে প্রেম চিন্ময় চির-অম্লান ভাস্বর
বজ্রগীতি মাল্যদাম পবিত্র সুন্দর
পরি নিজ গলে অয়ি বাঙ্গালার বালা
কম করে তুমি বরে দেহ বরমালা

যে ছিল অপরিচিত চির পরিচয়ে
প্রতিষ্ঠিত কর তারে আপন হৃদয়ে
এই মার্গশীর্ষ যেন শত বর্ষ ধরি
ধন্য করে তোমা দোঁহে আনন্দ বিতরি

'দিল্লী চলো' দিকে দিকে উঠিয়াছে ধ্বনি
তুমি তো চলেছ দিল্লী বহুভাগ্য গণি
আশীর্ব্বাদ লহ মাতা তোমার সন্তান
স্বাধীন স্বদেশমাঝে হোক পুণ্যবান্।

টোডাদের দেশ

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

টোডাদের দেশ ভারতবর্ষের বিশেষ চিত্তাকর্ষক পার্ব্বত্য প্রদেশ-সমূহের অন্যতম। পরম মনোরম নীলগিরিশ্রেণীই টোডাদের দেশ। মাদ্রাজ সরকারের শৈলাবাস উটকামণ্ড বা উটি নীলাদ্রি-বক্ষে বিরাজিত, ইহা অনেকেই জানেন। এই 'মণ্ড' শব্দটি টোডা শব্দ। টোডারা গ্রাম বা বাসস্থানকে মণ্ড বলে। নীলগিরির জল-বাতাস অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর বলিয়া উটি প্রভৃতি এখানকার শৈলাবাসগুলি দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। ইউরোপীয়রা এই স্থানগুলিকে বিশেষ ভালবাসে। ইহার কারণ এই অঞ্চলের আবহাওয়া প্রায়ই ইউরোপসুলভ। পার্ব্বত্য প্রদেশ হইলেও নীলগিরি অন্যান্য পর্ব্বতাঞ্চলের মত দুর্গম নহে। নীলাদ্রি তেমন তুঙ্গ শৃঙ্গ না হইয়া তরঙ্গায়িত ভঙ্গীতে দূর দিগন্ত ব্যাপিয়া বিরাজিত। তরুতৃণমণ্ডিত সবুজ শৈলমালাকে সুনীল সিন্ধুর স্তম্ভিত তরঙ্গরাজির সহিত তুলনা করা চলে। যেন নীল সমুদ্রের ঢেউগুলি কোন বিস্ময়কর শক্তিশালী যাদুকরের মায়া-মন্ত্র-বলে অকস্মাৎ নীলাদ্রিতে পরিণতি পাইয়াছে।

ভারতের সমগ্র উত্তর সীমান্ত ব্যাপিয়া বিরাজিত পৃথিবীর প্রকাণ্ডতম পর্ব্বত নগাধিরাজ হিমাদ্রির রুদ্র গম্ভীর রূপ, অভ্রভেদী চিরতুষারশুভ্র মূর্ত্তি দর্শককে ভাষাতীত বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া ফেলে আর নীলাদ্রির নয়নাভিরাম শান্ত স্নিগ্ধ-শ্যাম-সুন্দর মূর্ত্তি মানুষের মনকে মুগ্ধ করে। হিমাদ্রি মহান্—ইংরেজীতে যাহাকে 'সাব্লাইম' বলে। নীলাদ্রি সুন্দর—ইংরেজীতে যাহা 'বিউটিফুল' আখ্যায় অভিহিত। নীলাদ্রির সৌন্দর্য্য—ঐশ্বর্য্য হিমাদ্রির ন্যায় বর্ণনাতীত নয়—নীলাদ্রির নেত্রতর্পণ শোভাকে ভাষায় অভিব্যক্ত করিয়া তোলা অসম্ভব নয়। নির্ম্মেঘ নভোনীলিমার নিম্নে দণ্ডায়মান বনানী-বিমণ্ডিত দিগন্তচুম্বিত নীলাদ্রি অধিকতর নয়নরঞ্জন।

রেলপথ প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে গো-শকট ও টোঙ্গা ব্যতিরেকে এই পার্ব্বত্য প্রদেশ পরিভ্রমণের অন্য কোন উপায় ছিল না। রেল ও মোটর প্রবর্ত্তিত হইবার পর হইতে যাতায়াতের সুবিধা হওয়ায় শৈলাবাসগুলি ক্রমশঃ বিশেষ উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। পাদশৈলমালায় বিরাজিত মেট্টুপালাই-ইয়াম হইতে ৭ হাজার ৫ শত ফিট উচ্চ উটকামণ্ড পর্য্যন্ত প্রসারিত ত্রিশ মাইল-ব্যাপী নীলগিরি রেলপথ ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশলের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে বলা চলে। পর্ব্বতশ্রেণীর পদতলে অবস্থিত কুন্নার নামক ষ্টেশনে ট্রেণে উঠিয়া মেট্টুপালাই-ইয়াম যাইতে হয়। ইহা সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ষ্ট্যাণ্ডার্ড গেজ লাইনের প্রান্তবর্ত্তী ষ্টেশন। নীলাদ্রির আদিবাসী টোডাদের জীবনযাপন-প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য বলিয়া আমরা ট্রেণের পরিবর্ত্তে মোটরযোগে এইস্থান হইতে উটিতে উঠিয়াছিলাম। পর্ব্বতশ্রেণীর পদতলে প্রসারিত প্রান্তর হইতে কুনুর পর্য্যন্ত প্রসারিত রেলপথটি নীলাদ্রিবক্ষে বিস্তৃত রেলপথসমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক। গিরিগাত্রের তুঙ্গতার জন্য ইঞ্জিনিয়ার-দিগের পক্ষে এই রেলপথ নির্ম্মাণে বিশেষ কৌশল প্রদর্শন প্রয়োজন হইয়াছে। এই রেলপথটি মাত্র ১৬½ মাইল দীর্ঘ। এইটুকুর মধ্যে ৯টি টানেল বা সুড়ঙ্গ। এই সুড়ঙ্গগুলির মধ্যে যেটি দীর্ঘতম, তাহার দৈর্ঘ্য ৩ শত ১৭ ফিট। পাদশৈলের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত ভবানী নদীর বক্ষস্থ সেতু এই রেলপথের অন্যতম দর্শনীয়। ইহা ছাড়া এই পার্ব্বত্য রেলপথে আরও ২৬টি সেতু রহিয়াছে। যখন ট্রেণখানি সুন্দর ও বন্ধুর গিরিগাত্রে প্রসারিত রেলরাস্তার উপর দিয়া ছুটিয়া চলে, তখন দর্শকদল দুইদিকে দণ্ডায়মান পরমপ্রীতিপ্রদ পার্ব্বত্য প্রকৃতির অপূর্ব্ব আকৃতি চমৎকৃতচিত্তে মুগ্ধনেত্রে দর্শন করিয়া থাকেন। গিরিগাত্রে

টোডাদের বেণুনির্ম্মিত কুটির

নির্ম্মিত বৃক্ষবল্লীবেষ্টিত টোডাপল্লীগুলি সুদক্ষ শিল্পীর অঙ্কিত চমৎকার চিত্রের মত মনে হয়। ক্বচিৎ কোথাও শস্যক্ষেত্র। স্থানে স্থানে রজতশুভ্র দীর্ঘদেহ ইউকালিপটাস বৃক্ষ গিরিগাত্রকে অধিকতর নেত্রতর্পণ করিয়া তুলিয়াছে। ইউকালিপটাসের মনোহর ও স্বাস্থ্যকর গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিয়া নাসিকায় প্রবেশপূর্ব্বক দর্শক মাত্রেরই অন্তরে এক প্রকার হর্ষানুভূতি সঞ্চারিত করে।

টোডারা দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য আর্য্যেতর জাতির ন্যায় নহে। অন্যান্য সম্প্রদায় হইতে তাহাদের আকৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

নীলাদ্রিকে মালভূমি বলিলেও চলে। এই মনোরম মাল-ভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭ হাজার ফিট উচ্চে অবস্থিত। চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলমালা। ইহারাই পাদ-শৈল। এই মালভূমির

সাধারণ বর্ণ স্বর্ণাভ বাদামী, কিন্তু চিরহরিৎ বনরাজি প্রায় প্রত্যেক স্তরে বিরাজিত বলিয়া নীলাদ্রি নামের সার্থকতা সম্পাদিত হইয়াছে। নীলাদ্রির নিম্নাংশে যে তৃণাচ্ছাদিত সবুজ মাঠ বা

মণ্ড বা গ্রামের বাহিরে বিরাজিত পবিত্র প্রস্তরাবলী

ময়দানের মত কিন্তু উন্নতাবনত ভূমিসমূহ রহিয়াছে, তাহাও অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। শুধু যে টোডারাই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সম্প্রদায় তাহা নহে, তাহাদের এই মায়াপুরীসম দেশটিও এই অঞ্চলের অন্যান্য অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করিতেছে বলা চলে। পাশ্চাত্য জাতিদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে অতি অল্প ভ্রমণকারীই এই শৈলসমাকীর্ণ স্বপ্নরাজ্যে প্রবেশ করিয়া ইহার বিবরণ সাধারণের নিকট বিবৃত করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব দক্ষিণভারত ভ্রমণের সময় নীলাচলে আসিয়া কুসুমিত কান্তারসমূহের অপরূপ রূপ দেখিতে দেখিতে ভগবদ্ভক্তিতে বিভোর হইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। শ্রীগোবিন্দদাসের করচায় শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নীলাদ্রি-ভ্রমণের অতি সুন্দর বর্ণনা আমরা দেখিতে পাই। এই গোবিন্দ পদকর্ত্তা প্রসিদ্ধনামা গোবিন্দদাস নহেন। ইনি দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময় শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে অনুচররূপে আসিয়াছিলেন।

টোডারা কতকাল এই নীলাদ্রিবক্ষে বাস করিতেছে, তাহা বলা সহজ নয়। তাহাদের মতে তাহারা সৃষ্টির আদিযুগ হইতে নীলাদ্রির অধিবাসী। তাহাদের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কাহিনী অদ্ভুত। ঈশ্বর নীলাদ্রির কোন পাহাড়ের উপর একটি মুক্তা ফেলিয়া দিলেন। সেই মুক্তার ভিতর হইতে বাহির হইলেন ঠাকৃকিরসি। ইনিই টোডাদের আদি দেবতা। এই আদিদেব তাহার হস্তস্থ বেত্রের দ্বারা ভূমিতে আঘাত করিলেন। এই আঘাতের ফলে ধূলি হইতে টোডাদের আদিপুরুষ বা প্রথম টোডা এবং টোডারা যাহাকে পরম পবিত্রপ্রাণী বলিয়া মনে করে সেই মহিষ জন্মগ্রহণ করিল। এই প্রথম মহিষটি কণ্ঠদেশে ঘণ্টা লইয়া জন্মিল বলিয়া কথিত। এই আদি মহিষের কণ্ঠলগ্ন ঘণ্টাটি টোডাদের মধ্যে আজিও সযত্নে রক্ষিত আছে। একটি মন্দিরে রক্ষিত এই ঘণ্টা আমাদিগকে দেখান হইয়াছিল। যেখানে ঈশ্বরের নিক্ষিপ্ত মুক্তা হইতে ঠাকৃকিরসি জন্মিয়াছিলেন, তথায় একটি মনোরম টোডাপল্লী গড়িয়া উঠিয়াছে।

টোডাদের মতে আদি দেবতা ঠাকৃকিরসি তাহাদিগকে যাহা শিখাইয়াছেন, তাহারা তাহাই শিখিয়াছে। কেমন করিয়া জীবন যাপন করিতে হইবে, তাহা এই দেবতাই তাহাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন। কিরূপে বাসগৃহ, মন্দির প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা তিনিই শিখাইয়াছেন। পূজায় অপরিহার্য্য পবিত্রতম প্রাণী মহিষ রাখিবার স্থান এবং দুগ্ধদোহন মন্দির প্রভৃতি নির্ম্মাণ করবার প্রণালী ঠাকৃকিরসিই শিক্ষা দিয়াছেন। প্রত্যেক টোডা-মণ্ড বা পল্লীর ভিতর সাধারণ অর্চ্চনাগারে বা উপাসনালয় ব্যতিরেকে দোহন-মন্দির ও মহিষখানাও বিদ্যমান আছে। মহিষবাদকে টোডা ধর্ম্মের বিশিষ্ট বস্তু বলিয়া অভিহিত করা চলে। ঠাকৃকিরসিই এই মতবাদের প্রবর্ত্তক বা আদি শিক্ষক। টোডা-সংস্কৃতির সহিত মহিষ ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট।

টোডা মণ্ডগুলি পর্ব্বত পার্শ্বের বিশেষ সুন্দর ও প্রীতিকর অংশগুলিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। যাতায়াতের পথ হইতে কিছুদূরে পার্ব্বত্য প্রকৃতির নিভৃত বক্ষে ইহারা বিরচিত। পার্ব্বত্য বাতাস প্রবল বেগে প্রায়ই বহিয়া যায় বলিয়া গ্রামখানিকে রক্ষা (বেগবান বাতাস হইতে) করিবার জন্য এক প্রকার উপায় প্রস্তুত করা হয়। এই উপায় 'শোলা' আখ্যায় অভিহিত। প্রত্যেক পল্লীর পশ্চাতে 'শোলা' দৃষ্ট হইয়া থাকে। শোলা কতকটা প্রাচীরের মত। প্রত্যেক টোডা গ্রামে কয়েকটি করিয়া কুটির থাকে। আমরা এক একটি মণ্ডে তিনটি হইতে ছয়টি পর্য্যন্ত কুটির দেখিয়াছি। কুটিরগুলির আকৃতি অনেকটা গরুর গাড়ীর ছপ্পর বা টপপরের ন্যায়। বাঁশ এবং বেত দিয়া বুনিয়া ইহারা প্রস্তুত, সুতরাং এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। এই প্রস্তুত-প্রণালীর প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। কুটিরের পুরোভাগে ও পশ্চাতে কাষ্ঠের দ্বারা এক প্রকার আচ্ছাদন রচনা করা হয়। দ্বারদেশের দুই দিকে কর্দ্দমের দ্বারা নির্ম্মিত অনুচ্চ দেওয়াল বা বেদী দৃষ্ট হয়। কুটিরের ভিতর ধূম্র নির্গমণ বা বাতাসের গমনাগমনের জন্য গবাক্ষাদি কিছুই প্রস্তুত করা হয় না।

টোডারা সম্পূর্ণরূপে পশুপালক জাতি। ইহারা কৃষিকার্য্য করাকে মর্য্যাদার হানিকারক বলিয়া মনে করে। সুদূর অতীতে যখন কৃষিকার্য্য প্রবর্ত্তিত হয় নাই, পশুপালন-ই মানুষের জীবিকার্জনের একমাত্র উপায় ছিল, টোডারা সেই অতি প্রাচীনকালের

কথা আমাদিগকে জানাইতেছে। ইহাদের অতি প্রাচীনতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না।

টোডাদের মধ্যে যে সকল কথা ও কাহিনী প্রচারিত রহিয়াছে, তাহাদের একটির মতে শ্রীরামচন্দ্র সীতা উদ্ধারের জন্য যে বানর-বাহিনী গঠন করিয়াছিলেন, টোডারা তাহাদের সন্তান। অবশ্য বানরদের বাসস্থান কিষ্কিন্ধ্যা টোডাদের দেশ হইতে অধিক দূরে অবস্থিত নহে। নৃতত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতরা টোডাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে একমত হইতে পারেন নাই। কেহ কেহ কহিয়াছেন, ইহারা আদি সিদীয়ান বা শক জাতির বংশধর। শকদিগের কোন উৎপীড়িত সম্প্রদায় এই নিভৃত পর্ব্বতাঞ্চলে আশ্রয় লয়, টোডারা তাহাদেরই সন্তান। কোন কোন পণ্ডিত ইহাদিগকে মালয় জাতির অন্তর্ভুক্ত কোন সম্প্রদায়ের বংশধর বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। কোন কোন জাতিতত্ত্ববেত্তা টোডাদের উদ্ভব-রহস্য সম্বন্ধে বিস্ময়কর বিচিত্র বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বাইবেলে কথিত আছে, ইস্রায়েলের একদল অধিবাসী পালিত-পশুপাল লইয়া পূর্ব্বদিকে যাত্রা করিয়াছিল। পরে ইহাদের আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। এই সকল পণ্ডিতের মতে ঐ পূর্ব্বদিকে অগ্রসর ইস্রায়েলী সম্প্রদায় বা ইহুদীরা অবশেষে নীল-গিরি শ্রেণীতে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। নীলাদ্রির তৃণাচ্ছাদিত গাত্র তাহাদের মত পশুপালক সম্প্রদায়কে আকৃষ্ট করা বিস্ময়ের বিষয় নহে। টোডারা ঐ নিরুদ্দিষ্ট ইস্রায়েলীদিগের বংশধর। শেষোক্ত পণ্ডিতেরা টোডাদের আকৃতি দেখিয়া এইরূপ বিচিত্র বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াছেন সন্দেহ নাই। প্রবীণ বা বয়োবৃদ্ধ টোডাদের দীর্ঘশ্মশ্রুমণ্ডিত গুরুগম্ভীর মূর্ত্তি বাইবেল-বর্ণিত ইহুদী গোষ্ঠীপতিদের স্মৃতি সত্য সত্যই উদ্রিক্ত করে। টোডা বয়স্ক ব্যক্তির ঋজু ও রমণীর দীর্ঘ দেহ দেখিলে স্বতঃই শ্রদ্ধার উদয় হয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির সামঞ্জস্যপূর্ণ সন্নিবেশ, শ্মশ্রুর প্রাচুর্য্য, পৃষ্ঠবিলম্বিত কুঞ্চিত কমনীয় কেশকলাপ টোডাপুরুষকে বিশেষ চিত্তাকর্ষক করিয়াছে। মস্তকের মধ্যস্থ সীঁথির দুইদিকে বিস্তৃত কেশরাশি গুচ্ছে গুচ্ছে ললাটে, পৃষ্ঠে স্কন্ধে লম্বিত হইয়া টোডা-

টোডাদের আশীষদান ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের বিচিত্রপ্রণালী

পুরুষের আকৃতিকে রমণীর মত রমণীয় করিয়াছে বলিলে ভুল হয় না। এই কেশ-প্রাচুর্য্যের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, প্রচুর দুগ্ধ পান করার জন্যই এইরূপ। একটা বড় কম্বলই টোডাদের প্রধান পরিচ্ছদ। প্রাচীন রোমানরা যেমন টোগা নামক লম্বিত পরিচ্ছদ পরিত, কম্বলখানিকে ঠিক তেমনই ইহারা সমগ্র শরীরে জড়াইয়া রাখে ও প্রায়ই পা পর্য্যন্ত ঝুলাইয়া দেয়। টোডা নারীও দেখিতে সুন্দরী বটে কিন্তু এই সৌন্দর্য্য বেশীদিন স্থায়ী হয় না। টোডা পুরুষের আকৃতির মনোহারিত্ব নারী অপেক্ষা দীর্ঘকাল থাকে—এই সত্য অস্বীকার করা যায় না।

টোডা নারীরা তিব্বতীয় নারীদের

টোডা উপাসনা-গৃহ

মত বহুবল্লভ। যখন কোন টোডা তরুণী কোন পুরুষকে বিবাহ করে, তখন সে সেই পতির ভ্রাতৃগণের সহিতও বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। শুধু ইহাই নহে। কোন কোন ক্ষেত্রে সেই নারী-পতির সমশ্রেণীর সকলের সঙ্গেই পরিণয়-পাশে আবদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়। অবশ্য শেষোক্ত ঘটনাকে অত্যন্ত বিরল বলিতে হইবে। সন্তানের জন্মের পর মাতা তাহার পিতৃপরিচয় শরীরের সহিত সংলগ্ন করিয়া রাখে। তবে সামাজিক ও আইন-সম্পর্কিত কর্ত্তব্য সাধনের জন্য ভ্রাতৃগণের মধ্যে যে জ্যেষ্ঠ, তাহাকেই প্রকৃত পতি বলিয়া পরিচয় দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে। তিব্বতেও ঠিক এইরূপ প্রথাই আমরা প্রবর্ত্তিত দেখিয়াছি।

টোডারা সম্পূর্ণ পশুপালক সম্প্রদায়, তাহা বলা হইয়াছে। পালিত পশুপালের মধ্যে এক শ্রেণীর দীর্ঘশৃঙ্গ মহিষই প্রধান। এই মহিষগুলি অর্দ্ধ-বন্য অর্দ্ধ-গ্রাম্য প্রকৃতির। প্রকৃতপক্ষে ইহারা আরণ্য মহিষই বটে। সাধারণ গ্রাম্য-মহিষ যাহা আমরা এদেশে দেখিতে পাই, তাহা নহে। এই সুদীর্ঘ শৃঙ্গবিশিষ্ট ভীমমূর্ত্তি মহিষগুলিকে এইরূপ অশিক্ষিত পার্ব্বত্য সম্প্রদায়ের পক্ষে অপ্রাকৃত প্রাণী বলিয়া মনে করা সেরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে। মহিষই টোডাদের জীবনধারণের একমাত্র উপায় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মহিষ-দুগ্ধ ইহাদের প্রধান পানীয় পদার্থ তো বটেই—প্রধান ভোজ্য বলিলেও চলে। মহিষের মাংস এবং মহিষের শরীর হইতে সঞ্জাত অন্যান্য পদার্থের সাহায্যেই ইহারা এই নিভৃত পর্ব্বত শ্রেণীর বক্ষে বাঁচিয়া থাকিতে সমর্থ হয়।

টোডা পুরোহিতরা 'পাল-আল' আখ্যায় অভিহিত। ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে ইহারা অত্যন্ত গোঁড়া বা রক্ষণশীল। ইহাদের উপাসনার সহিত মহিষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বলিয়া দুগ্ধ-দোহন মন্দির ও মহিষশালা পরম পবিত্র বলিয়া বিবেচিত। ইহাদের উপাসনাগৃহে কোন দেবমূর্ত্তি নাই। সুতরাং টোডাদের ধর্ম্মকে এক শ্রেণীর একেশ্বরবাদ বলা চলে। পরকাল বা পরলোক সম্বন্ধে ইহাদের ধারণা বিচিত্র। ইহাদের পরলোক যেন একটি বিশাল ও সুদৃশ্য দেশ। এই দিব্য দেশে যাহারা বাস করে, তাহারা আকৃতি ও প্রকৃতিতে টোডাদের মতই।

টোডাদের সর্ব্বপ্রকার উৎসব ও অনুষ্ঠানের সহিত মহিষ ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট। এমন কি পারলৌকিক ক্রিয়ার সঙ্গেও মহিষের বিশেষ সম্বন্ধ। অতি অল্প সম্প্রদায়ের মধ্যে আমরা এরূপ বিস্তৃত ও বিচিত্র পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদিত হইতে দেখিয়াছি। বিবাহাদি ব্যাপার অপেক্ষাও অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানগুলি বিচিত্রতর ও বিস্তৃততর।

শব সংকারের সময় মহিষ বলি দেওয়া টোডাদের চিরন্তন প্রথা। মহিষটি পরলোকের সঙ্গী হইবে বলিয়া এইরূপ করা হয়।

প্রাচীন মিশরেও সমাধি-মন্দিরে শবের সহিত সমস্ত প্রয়োজনীয় পদার্থ প্রদত্ত হওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। মিশরে একখানি ছোট নৌকাও শবের পাশে রাখা হইত। এই নৌকার সাহায্যে মৃত ব্যক্তির আত্মা বৈতরণী অতিক্রম করিবে। প্রত্যেক শবের পাশে একটি বেত্র রাখা হয়। বেত্র পবিত্র বলিয়া বিবেচিত, কারণ উহার দ্বারা আঘাত করিয়াই আদি দেবতা ঠাক্‌কিরসি টোডাদের আদিপুরুষকে সৃষ্টি করেন। একটি ছোট থলেতে কতকগুলি টাকা পয়সা পুরিয়া সেই থলেটি শবের পাশে রাখিয়া দেওয়াও নিয়ম। পরলোকের পথে অর্থের প্রয়োজন হইতে পারে। তদনন্তর চিতায় অগ্নিসংযোগ করা হয় এবং দোলাটিকে তিন বার চিতার চারিদিকে ঘুরান হয়। টোডাদের বিশ্বাস, এই সময় মৃতের আত্মা দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরলোকে প্রস্থান করে। ইহার পরে সকলে আর একবার উচ্চ কণ্ঠে

টোডা পুরুষ

ক্রন্দন করিয়া উঠে এবং মৃতের পিতামাতা শবের মস্তক ললাটে স্পর্শ করে। এইবার বাতাসের সাহায্যে অগ্নিশিখাকে প্রবলতর করিয়া তোলা হয় এবং দোলাটিকে সেই প্রজ্বলিত চিতায় স্থাপন করা হয়।

টোডা নারী

আমরা মুখেনাদ মণ্ড, কোত্থল মণ্ড প্রভৃতি পল্লীগুলি পরিভ্রমণ করিয়া টোডাদের আচার-ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি। প্রত্যেক মণ্ডই পরম প্রীতিকর প্রাকৃতিক পরিবেশের ভিতর বিরাজিত। মুখেনাদ মণ্ডের অবস্থান-স্থানেই ঠাক্‌কিরসি প্রথম টোডাকে ভূতলে বেত্রাঘাতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত। যেখানে ঘটনাটি ঘটে, সেখানে কতকগুলি বড় বড় প্রস্তর অবস্থিত। একটি প্রকাণ্ড প্রস্তর-গোলক এখানে দেখা যায়। এই গোলকটি তুলিতে হইলে বিশেষ বলশালী হওয়া প্রয়োজন। এইরূপ শিলাখণ্ড আমরা অন্যান্য মণ্ডেও দেখিয়াছি ' এই গোলকগুলি লইয়া ইহারা না কি ক্রীড়া করে এবং শক্তির পরীক্ষা ইহাদের সাহায্যেই হয়। প্রত্যেক মণ্ডের পাশেই এমন একটি প্রস্তর-প্রাচীর দেখা যায়, স্ত্রীলোকের পক্ষে যাহা অতিক্র। করিয়া অগ্রসর হওয়া নিষিদ্ধ। পবিত্র মহিষশালা ও দুগ্ধ-দোহন-মন্দিরে স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

ডিসেম্বর, ১৯৪৫

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

বিলেতি বর্ষ শেষ, শাসনেরও শেষ তবে এইখানে কি ?
সূর্য্য বুঝি অস্তে গেল, মিলালো কুচক্রি চোখ সভ্যতা মেকী !

বর্ষের শেষান্ত মাস, এবারে বিদায় নাও হে ডিসেম্বর,
আর যেন ফিরিও না, দিও না সমুদ্র-ঝড়ে বাসুকীর বর
আমার দেশের ভাগ্যে। আছে তো তোমারো দেশ, যা খুসী খেয়ালে
মিনারে মিনারে গিয়ে নহবতে হাঁক দাও দেয়ালে দেয়ালে।
এখানে সবুজ ঘাসে তুমি যে ফুরিয়ে গেছ, ম'রে গেছ কবে,
জানো না কি ? বিগত শতাব্দী দুই হেঁকে গেল মহা রুদ্র-রবে ;
বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে নিয়ে এল দুর্ভিক্ষ মড়ক,
অন্নপূর্ণা ধূলুণ্ঠিতা, তাজা রক্তে ভ'রে গেল সোণালী সড়ক
ইতিহাসে মানচিত্রে অশ্রুর স্বাক্ষর সেই ভোলাতে কি পারো
হে বিলেতি বর্ষ-বট ! সীমার শেষান্ত ছিল এই সভ্যতারো,
কিছু কি দলিলে আছে ? মানচিত্রে বিসর্পিত দেখি শুধু দাগ :
আন্দামান, কারাগার, কত না জ্বলন্ত গ্রাম, জালিয়ানাবাগ।

অনেক—অনেক হোলো, এবারে বাস্ত তোলো, সন্ধ্যা ঘনায়,
বহু তো বাড়া'লে ঋণ, এবারে যে ঋণশোধ-প্রণতি জানায়
আমার ভারতবর্ষ ; তুমি যে দ্বাদশ মাসের দাদামহাশয় !
হে বিলেতি বর্ষ-বট ! শেষ ক'রে দিয়ে যাও মিথ্যা অভিনয়।

এখানে তৃণের প্রাণ পৌষালী ধানের শীষে দুলে দুলে ওঠে,
অঘ্রাণের মেঘমুক্ত দূর নভে কলস্বরে বিহঙ্গ যে ছোটে
ফুলের গন্ধ ব'য়ে। তোমার বিমানে কেন পরিক্রমা মিছে ?
জানো না সূর্য্যের দেশ ? সূর্য্যতাপে পুড়ে যাবে, নেমে এস নীচে,
তারপরে যাত্রাপথে বিদায়-বাসরে রচো নিঃশব্দ প্রয়াণ,
ডাকে যে পিতৃভূমি, সমুদ্রের তটে জাগে জাহাজের গান।
এখানে সিরাজ কাঁদে, শহীদের তাজা রক্ত আর কত চাও ?
নিয়ে যাও মির্জ্জাফরে'—রাজচক্রবর্ত্তী ক'রে আনন্দ মিটাও।
এখানে বোধিদ্রুমে তক্ষশীলে তাম্রাসনে খুন সে তো নয়,
ভারতের জয়ে জাগে জীবনের···জগতের···আনন্দের জয়।
হে বিলেতি বর্ষ-বট ! রেখেছ কি একবিন্দু নিরীখে তারিখ,
কত ধান্তে কত চাল ক'রে দিলে বানচাল, হ'লে সাময়িক !
এবারে প্রসন্ন প্রাতে অখণ্ড বর্ষের দাদু হে ডিসেম্বর,
ভারতবর্ষ ছেড়ে যাও, ছেড়ে যাও মাঠ, বন, তৃণ, প্রস্তর।

মাটি ও মানুষ

সে এক অভাবিত দৃশ্য। পদপিষ্ট জাতির বুকে এত সাহস এল কি করে! মহাযুদ্ধে ভারতবর্ষ মানুষ দিয়েছে, অপরিমিত অর্থ দিয়েছে। ভারতের রক্তমোক্ষণ করে জিতল ইংরেজ। প্রত্যাশা ছিল, যুদ্ধ-বিজয়ের পর হাতের মুঠো আলগা করবে তারা, স্বাধীনতা দিয়ে দেবে। দিল রৌলট আইন, কৃতজ্ঞতার চরম পরিচয় দিল জালিয়ানওয়ালাবাগে। ১৩ই এপ্রিল, ১৯১৯। বিকাল বেলা হাজার হাজার মানুষ জমেছে জালিয়ানওয়ালাবাগের সভাক্ষেত্রে। চারিদিকে বড় বড় বাড়ি, একমাত্র ফটক। ডায়ার এল সৈন্য আর কামান-বন্দুক নিয়ে। গুলি চলল ফটকের দিকে তাক করে। রক্তস্রোত বইল আহতের আর্ত্তনাদে বিচলিত হল অন্ধকার। নিরস্ত্রের সামনে এদের বীরত্বের সত্যই তুলনা মেলা ভার। রণ-জয় করে বীরদাপে ডায়ার চলে গেল, ফিরেও তাকাল না একবার, কুকুর-বিড়াল মরেছে কতকগুলো—চেয়ে দেখবার কি আছে?

তারপর যথানিয়মে কারাগারের দরজা খুলল। ক্ষীণতম প্রতিবাদটিও চেপে মারা হল উঁচু পাঁচিলের আড়ালে, টুঁ শব্দটি বাইরে না বেরোয়। বেতের নির্ম্মম আস্ফালন, পাঁচ সাত বছরের অপোগণ্ড শিশু দিয়ে সরকারি পতাকা অভিবাদন, মানুষকে হামাগুড়ি দেওয়ানো প্রকাশ্য রাস্তায়, খোঁয়াড়ে মানুষ পুরে রাখা—ইংরেজ-শাসনের অক্ষয় কীর্ত্তি হয়ে রইল এ সব ইতিহাসে। ইংরেজ মেয়েরা তিন লক্ষ টাকা চাঁদা তুলে ডায়ারকে বক্শিস দিলেন অতুল বীরত্বের জন্য।

তারপর বিচিত্র ব্যাপার। হৃতমান ভারতবর্ষ নবমন্ত্রে জেগে উঠল। হিমালয়ের প্রান্ত থেকে বঙ্গের সমুদ্র-বিস্তার অবধি সকল মানুষ একাত্ম, এক অপমানবোধে জর্জ্জরিত, এক অমোঘ সংকল্পে দুর্ব্বার। সূর্য্য অস্ত যায় না এত বড় সাম্রাজ্য নিয়েও ইংরেজ দেউলে হয়ে গেছে, পলাশীর সময় দেশের মানুষ ধন-প্রাণ নিয়ে দলে দলে ইংরেজের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, সে আস্থা বিনষ্ট হয়েছে। ভারতবাসী প্রতারিত মনে করছে নিজেদের, সর্ব্বস্ব আহুতি দিয়ে পিতামহদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে। জবর-দস্তিতে কোটি কোটি মানুষ ঠেকানো যাবে না আর বেশি দিন—ইংরেজ বুঝতে পেরেছে। অদ্ভুত পন্থা—নূতন রীতির এক রকম সংগ্রাম। কোন রকম সহযোগ নেই তোমাদের সঙ্গে—কেমন করে শাসন চালাবে চালাও। ভয়কে যারা জয় করেছে তাদের সঙ্গে পারবে কি? লাঠি-ঠেঙার ব্যাপার হলে সুবিধে হত, আর কিছু না হোক—রাগটা চড়ে যায় তাতে; সবিনয় প্রতিরোধীদের কাঁহাতক পিটিয়ে পারা যায়, মনে বিরক্তি আসে—এমন কি পুলিশেরও।

হরগোবিন্দ ঘোষ কলকাতায় গিয়েছেন। সভয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে রাস্তার মিছিল দেখেন, 'বন্দেমাতরম্' ও 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনিতে বুকের মধ্যে গুর গুর শব্দ করে উঠে। গ্রামে থাকতে শুনতেন চাষাভুষার মুখে গান্ধীরাজার কথা। সে না কি বিষম রাজা—কোটি কোটি তার সৈন্য-সামন্ত। জার্ম্মানদের হারিয়ে এসে এই আর এক নূতন ফ্যাসাদে পড়েছে কোম্পানী বাহাদুর! ফ্যাসাদ সত্যিই। ছেলেরা ইস্কুল ছাড়ছে, উকিল-মোক্তার আদালত ছাড়ছে, বহ্ন্যুৎসব হচ্ছে বিদেশী কাপড়ের, এমন কি—তাজ্জব ব্যাপার—সাত সমুদ্র পার হয়ে বিলেত থেকে যুবরাজ এলেন, যেখানে পা ফেলেছেন, দেখতে পাচ্ছেন রূপকথার নির্জ্জন পাতালপুরী—সরকারী পুতুলদের সারিবন্দি সাজিয়েও জীবনের কল্লোল জাগান যাচ্ছে না।

হরগোবিন্দ একদিন এসে জ্যোৎস্নাকে দেখে গেলেন। ভাল মেয়ে, পছন্দ না হবার কিছু নেই। তার উপর অনাবাদি আগর-হাটির জলনিকাশের সুরাহা হয়ে যাচ্ছে, নতুন চর নিয়ে হাঙ্গামা চিরকালের মতো মিটে যাচ্ছে এবার। সমারোহে সদলবলে এসে হরগোবিন্দ জ্যোৎস্নাকে আশীর্ব্বাদ করে গেলেন। বিয়ের দিন স্থির হল।

অমূল্য ছটফট করছে। আর কেন, চলে যাবে সে এবার, অষ্টবেঁকীর কথা বড্ড মনে পড়ে। ঘাটে নৌকা না থাকলে কত-বার ঝাঁপিয়ে সে নদীর এপার ওপার করেছে। ভাদ্রের গভীর রাত অবধি লণ্ঠন জেলে আলোয় মাছ মেরে বেড়িয়েছে নদীর ধারে ধারে জলা জায়গায়। যমুনা নেই এখন, বিয়ের পর ঘোমটা টেনে সে গৃহস্থবাড়ির বউ হয়ে বসেছে। সে দিনকালও আর নেই। নতুন চরের দখল নিতে গিয়ে খোঁড়া হয়েছিল তার বাবা। ও অঞ্চলের নামকরা ঢালি নবমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছে আজ—মার খাবে, মারবে না। সে কালের লাঠি অচল এযুগে; বিচিত্র ভয়াবহ মারণ-অস্ত্রপুঞ্জের মুখে লাঠি কি করবে? এক নতুন অস্ত্র বের করেছে তাই এরা—ভাবী কালের অমোঘ অস্ত্র—যার কাছে মেসিন-গান আর বিষবাষ্প অকেজো একেবারে, ডায়ার ওডায়ার পঙ্গু, অসহায় কৃপার পাত্র।

জ্যোৎস্নার যেদিন বিয়ে, তার আগের দিন সকালে বনমালী ছাড়া পেল। যেন এক আলাদা মানুষ হয়ে গেছে সে, কোন বিদ্বেষ-অভিমান নেই, ছাড়া পেয়ে এদের এখানে চলে এল। প্রভাবতী সত্যি সত্যি খুশি হয়েছেন। বললেন, বেশ হয়েছে! নাতনীর বিয়ে-খাওয়া দাও এবার সর্দ্দার-শ্বশুর। আর কোথাও যেতে দিচ্ছিনে কিন্তু। দেখ তো কি এক কাণ্ড করে বসলে!

বনমালী হাসতে লাগল।

আবার পালাবার মতলব আছে না কি? ফটকে তালা দিয়ে আটকাব, এই বলে দিচ্ছি।

বনমালী বলে, চেষ্টা করে দেখলাম মা, এখানে আমাদের পোষাল না। গাঁয়ের মানুষ আমরা, কাজকর্ম্ম চুকে যাক্—আমি গাঁয়ে গিয়ে থাকব।

প্রভাবতী বলেন, বুড়ো হয়েছ, শরীর অপটু হচ্ছে দিন দিন—

গরজ কি আর ধুলোমাটী ঘেঁটে বেড়ানোর ? বলছি আমি এখানে থাক, শহর যায়গা, অসুবিধে নেই—আয়েসে থাকবে।

হেসে ফেলে বনমালী বলল, তা যদি বলো মা, যেখানে ছিলাম সেই তো সব চেয়ে ভাল জায়গা। শহরের ধুলোও এক-কণা সেখানে গায়ে লাগবার উপায় ছিল না।

সমারোহে বিয়ে হয়ে গেল। এর মধ্যে অমূল্যর সঙ্গে বনমালীর বিশেষ কথাবার্ত্তা হয় নি। সেই যে চলে গিয়েছিল, ছেলে যেন তার কাছে একেবারে পর হয়ে গেছে সেই থেকে। হঠাৎ একদিন অমূল্য বলল, আমিও তোমার সঙ্গে যাব কিন্তু বাবা—

বনমালী সবিস্ময়ে তাকাল। তুমি ?

রায়গ্রাম ছেড়ে আসবার দিন কোন রকমে এই ছেলেটাকে ভোলান যায় নি, জেদ করে নৌকায় উঠে বসল, তাদের সঙ্গে এসে উঠল কলকাতায়। বাপেরই সঙ্গে আবার সে ঘরে ফিরতে চায়। নাছোড়বান্দা—জ্যোৎস্নার বিয়ে হয়ে যাবার পর থেকে কি তার হয়েছে, এখানে থাকবে না কিছুতে, যাবেই। সন্ধ্যার রওনা হবার কথা—সারাদিন ধরে টিনের স্যুটকেশটা গোছগাছ করেছে, যাবার জন্ত উন্মুখ হয়ে আছে একেবারে।

জ্যোৎস্না দিন সাতেক বাদ এসেছে শ্বশুরবাড়ি থেকে। নীচের এদিকটায় বড় একটা সে আসে না, সাজ-গোজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে, প্রণব হরদম আসছে—তার সঙ্গে কখন বা বান্ধবীদের সঙ্গে দল জুটে মোটর নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। সাত দিনের মধ্যে বার দুই বড়জোর অমূল্য চোখের দেখা দেখেছে তাকে, চোখের সামনে দিয়ে বিদ্যুতের মতো ঝিলিক দিয়ে চলে গেছে। হঠাৎ সে এসে দাঁড়াল অমূল্যর সামনে। কোন সূত্রে খবর কাণে গেছে, কে জানে—প্রশ্ন করে, চলে যাচ্ছ তুমি ? অমূল্য তাকাতে ভরসা করে না তার দিকে। চোখে চোখ পড়লে জ্যোৎস্না যেন দৃষ্টি দিয়ে তাকে টেনে ধরচে। আপন মনে সে জিনিষপত্র গোছাতে লাগল। জ্যোৎস্না বলে, এদ্দিন শহরে থেকে আবার গাঁয়ে ফিরছ—হার মানা একে বলে। বিশ শতক থেকে পিছিয়ে উনিশ শতকে ফিরে যাওয়া—

অমূল্যর প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে, বিশ শতকে কোন দিন তারা পৌঁচেছে কি ? আধুনিকতম শহরে থেকে তো উনিশ শতকেই পচে পচে মরছে।

কিন্তু কিছুই সে বলল না। কথা বলতে গেলে বিপত্তি ঘটতে পারে, জ্যোৎস্না হয় তো মানা করে বসবে। এখন অবশ্য মানা করার কারণ নেই কিছু, কাশীপুরেই সে বেশির ভাগ সময় থাকে, এখানে থাকলেও দিনান্তে চোখের দেখা হয় না একবার। কিন্তু বলা যায় না, খেয়ালি মেয়ে—ছেলেবেলা পুতুল খেলত, তার একটা পুতুলও সে ফেলে নি, আলমারিতে পাশাপাশি সাজিয়ে রেখে দিয়েছে। অনাবশ্যক আবর্জ্জনাটুকুও সে ফেলে দিতে চায় না। এই তার স্বভাব।

জ্যোৎস্না বলল, যাবে তো সেই সন্ধ্যেবেলা ? এক কাজ করো, চল দিকি আমার সঙ্গে—

কোথায় ?

মুখ টিপে হেসে জ্যোৎস্না বলে, যমালয়ে। হুকুম এসেছে, জীবিত কি মৃত—সন্ধ্যার আগে কাশীপুর পৌঁছতে হবে। সেখান থেকে কোন্ পার্টিতে নিয়ে যাবেন। বাবা বাড়ি নেই, কে রেখে আসে ? বউ মানুষ একা একা গেলে ওঁদের আবার ইজ্জত মারা পড়ে।

দু-সীটার বেবী গাড়ীটা বের করল। এটা জ্যোৎস্নার—প্রণব উপহার দিয়েছে।

চালাচ্ছে জ্যোৎস্নাই—প্রণব শিখিয়েছে। ভবানীপুর থেকে যাচ্ছে কাশীপুর—হাওড়ার পুলের উপর উঠল কেন ?

জ্যোৎস্না বলে, শিবপুরে মেজমামার বাসায় একটা খবর দিয়ে যাব। ব্যস্ত হচ্ছ কেন, ঢের সময় আছে। কাশীপুর পৌঁছে দিয়ে ট্রামে উঠে তুমি ফিরে যেও। কতক্ষণ লাগবে ?

চলেছে, তীর বেগে চলেছে।

বোটানিক্যাল-গার্ডেনের সামনে এসে ঘ্যাস করে গাড়ি হঠাৎ থেমে গেল।

এখানে ?

জ্যোৎস্না বলে, গাড়ি বিগড়েছে। কি জানি কি হল। দেখতে হবে। কালও এমনি হয়েছিল একবার।

নামল। কিন্তু ইঞ্জিনের দিকে না গিয়ে চলল বাগানমুখো। অমূল্যকে ডাকে, এসো—কথা আছে তোমার সঙ্গে।

বিরক্ত হয়ে অমূল্য বলে, সে তো বাড়িতে বসেই হতে পারত। দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টাই তো হাজির আছি তোমাদের বাড়ি।

খিল খিল করে হেসে জ্যোৎস্না বলল, তা অবশ্যি হতে পারত—কিন্তু এতদূর একসঙ্গে আসা তো হত না। আর তা ছাড়া—

চুপ করল সে হঠাৎ। অমূল্য প্রশ্ন করে, তা ছাড়া আবার কি ?

মুশ্‌কিল হল! ফিরে গিয়ে গাড়ি ধরবে তুমি আর কখন ? ট্রামে যেতেও তো ঘণ্টা দেড়েক লাগবে। ষ্টিমার সন্ধ্যার আগে নেই।

অমূল্য বলে, বাবার সঙ্গে আমার গাঁয়ে ফেরা পণ্ড করে দিলে তুমি।

জ্যোৎস্না প্রতিবাদ করল না, হাসিমুখে চেয়ে রইল।

অমূল্য রাগ করে বলে, এখনও আটকাও কেন আমায় শুনি ? বিয়ে-থাওয়া হয়ে গেল, দিব্যি শ্বশুরবাড়ি ঘর করছ—

বিয়ে-থাওয়া পাছে না হয়, সেই ভয়ে আগে আটকাতাম বুঝি ? খিল খিল করে জ্যোৎস্না হেসে উঠল। বলে, এই বুঝি মনে মনে ভাবতে ? সেন্ট-ক্রীম মেখে গা থেকে গেঁয়ো গন্ধটা মুছে ফেলবার এত চেষ্টা তাই তোমার ?

পাখনা যে নেই—নইলে অমূল্য এই মুহূর্ত্তে এর সান্নিধ্য থেকে উড়ে চলে যেত নিজের গ্রামে। সে গুম হয়ে রইল। এক সময়ে বলে উঠল, কি একটা কথা আছে, বলছিলে—তোমার দেওয়া সেই আংটি হাতে রয়েছে, এই দেখ—

এই শুধু ?

জ্যোৎস্না বলে, রায়গ্রামের রায়-কর্ত্তার নাতনী, আগরহাটির ঘোষ-বাড়ীর বউর আঙুলে তোমার আংটি উঠেছে, তুচ্ছ ব্যাপার এ কি ?

সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। দীর্ঘশাখা বটের ছায়াতল থেকে তারা বেরিয়ে এল। জ্যোৎস্না বলে, গাড়ি কি করে এখন—দেখা যাক চেষ্টা-চরিত্র খোশামোদ করে—

অমূল্য বলে, চেষ্টার বেশি দরকার হবে না, ও চলবে।

চলবে? জানলে কি করে? কলকব্জার ব্যাপার বোঝ না কি তুমি?

গম্ভীর কণ্ঠে অমূল্য বলল, এদ্দিন শহরে আছি, একটু-আধটু বুদ্ধি হয়েছে বই কি! আর তোমারও বোঝা উচিত—বাবার সঙ্গে না হলেও রেলগাড়ি রোজই আছে—কালও আমি যেতে পারব।

জ্যোৎস্না বলে, তাই যেও। যাক্, দুর্ভাবনা কেটে গেল—

জ্যোৎস্না তারপর পাকাপাকি শ্বশুর-বাড়ি চলে গেল। বছর দু'য়েক কেটে গেল, অমূল্যর কিন্তু যাওয়া হয় নি এত দিনের মধ্যে। শহরের মেয়ে জ্যোৎস্নারই মতো শহর কি মায়ায় বেঁধে রেখেছিল তাকে। জ্যোৎস্না হাত পেতে আংটি নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চড় মেরেছিল গালে; শহরের সঙ্গেও সম্পর্কটা তার প্রায় ঐ রকম। থাকে সে নীচের তলার ঘরে। যথাসম্ভব বেশভূষা করে, কিন্তু উপরতলার মানুষেরা মুখ টিপে হাসেন সেই পোষাক দেখে। মোটরে চড়ে বটে, কিন্তু তার জায়গা ড্রাইভারের পাশটিতে। আড্ডা জমায় সে পানের দোকানে কিম্বা ফুটপাতের ধারে বসে; সে এবং তার মতো যারা আছে, বৈঠকখানা তাদের ঐ সব জায়গায়। শহর কোলে জায়গা দেয় নি, পদপ্রান্তে আশ্রয় দিয়েছে। তবু ছেড়ে চলে যাওয়া যায় না, রাস্তা বাড়ি গাড়ি মানুষের সমারোহে সমাচ্ছন্ন সহরের গোলক-ধাঁধা।

দু'বছর পরে অবশেষে রায়গ্রামে এসেছে। একা নয়, সদল-বলে। ভিতরের কথা আগে ইন্দ্রলাল কারও কাছে বলেন নি, সখ করে এসেছেন না এসেছেন—গ্রামে পৌঁছে অবস্থা প্রকাশ পেল। অর্থাৎ পিঁপড়ের পাখা উঠেছে,—থাপ্পড় মেরে জানিয়ে দেওয়া দরকার—তারা পিঁপড়ে মাত্র। সেই জন্যই এসেছেন তাঁরা।

জ্যোৎস্নার বিয়ের পর নতুন চর আর আগরহাটি এক চরের মধ্যে ঢুকে গেছে এখন। বাঁধ নিয়ে হাঙ্গামা নেই। হাঙ্গামা চুকিয়ে হরগোবিন্দ ও ইন্দ্রলাল সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেললেন। আগেকার দিনে স্বর্গীয় কর্তারা দেশে ভূঁয়ে প্রজাপাটকের মধ্যে বসবাস করতেন এ সমস্ত চালান যেত সেই সময়। এখন কলকাতা থেকে ছুটোছুটি করে দাঙ্গা হাঙ্গামা-লড়াই মামলা-মোকদ্দমা পোষায় না। কিছু কমও যদি হয়, নির্ব্বিঘ্নে উপস্বত্ব ভোগ করতে পারলে খুশি এঁরা। ইন্দ্রলালের ছেলে তো নেই, মেয়েরাই পরিণামে বিষয়-সম্পত্তি পাবে। তিনি ঠিক করেছেন, বিয়ের যৌতুকস্বরূপ প্রণব আর জ্যোৎস্নার নামে নতুন চর লেখাপড়া করে দেবেন।

হরগোবিন্দ শুনে হাসতে হাসতে বললেন, এ তো বেহাই, 'উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ'—সেই বৃত্তান্ত হচ্ছে! সিকি পয়সা আদায় নেই—আমাদের উপর চটে গিয়ে রায়কর্ত্তা চাষীদের সবই লাখেরাজ দিয়ে গেছেন। শুধু মাটির মালিক হয়ে লাভ কি আছে বলুন।

ইন্দ্রলাল বললেন, কিন্তু কি রকম মাটি দেখছেন তো! সে কথাটা বলুন।

হরগোবিন্দ বললেন, তা-ই তো সমঝে দিতে চাচ্ছি। নতুন চরের মাটি নয়—সোনা। বীজ ছড়াতে না ছড়াতে মেঘের মতো কালো ধানের গোছায় ক্ষেত ভরে যায়। দিব্যি জমিয়ে বসেছে চাষীরা। জামাই-মেয়েকে দিতে চাচ্ছেন—ভাল কথা, চমৎকার কথা—জমির আগাছা উপড়ে ফেলে দিয়ে তারপর দেবেন। আগে হাতীতে হাতীতে লড়াই চলছিল, ও বেটারা আপনার কাছে লাথি খেলে আমার দুয়োরে হুমড়ি খেয়ে পড়ত, আমার কাছে তাড়া খেয়ে ছুটত আপনার কাছে। তাঁতির হাতের মাকুর মতো। সে গোলমাল তো নেই, এখন কি করা যায়, একবার ভেবে দেখুন—

ইন্দ্রলাল বললেন, করা কিছু কঠিন হবে না। দলিল-পত্র নেই, মুখের কথার উপর চাষ করে খাচ্ছে। ন্যায্য একটা খাজনা ধরে দিলেই হল। না পোষায়, আবাদ ছেড়ে দিয়ে চলে যাক, অন্য জায়গায় গিয়ে ঘর বাঁধুক গে। তার জন্য দু'দশ টাকা ধরে দিতেও রাজি আছি আমি। বাবা বসত করিয়া গেছেন, তার একটা মর্য্যাদা আছে তো?

প্রস্তাব চলে গেল চাষীদের কাছে।

ন'কড়ি গোমস্তার বিষম উৎসাহ। প্রাপ্তিযোগ আছে এই ব্যাপারে। চরের মালিক ইন্দ্রলাল রায়। ইচ্ছে হয়, আগরহাটির ঘোষবাবুদেরও নাম করতে পার, আপত্তি নেই। আঁবে দুধে মিশে গেছে এখন, চাষীরা এখন আঁটির সামিল, আর কোন খাতির নেই তাদের। প্রথম চর ওঠার মুখে জমির সারমিত হত না, ধানের দাবি করা হয় নি সেই সময়। এখন সে কথা বললে কে শুনবে? রাজার রাজভাগ চাই। নূতন ঠিকা বন্দোবস্ত করে কবলুতি দিতে হবে সকলকে, আট টাকা নিরিখে খাজনা। ধানের ফলন হিসাবে অন্যায্য নয় খাজনার হার। যার না পোষাবে স্বচ্ছন্দে পথ দেখতে পারে। ওপারে মোল্লাপাড়ার মুসলমান চাষীরা মুখিয়ে বসে আছে। আগাম খাজনা ছাড়া সেলামিও দিতে চায় তারা।

চাষীরা এ-ওর মুখে তাকায়। কথাটা মিথ্যা নয়—অষ্ট-বেকির উপর নৌকায় যেতে যেতে অনেকেরই তাজ্জব লাগে নতুন চরের শস্যসমৃদ্ধি দেখে। চড়া খাজনা স্বীকার করে এ জমি বন্দোবস্ত নেওয়া অসম্ভব নয়। পরে হয় তো সর্ব্বস্ব খুইয়ে চোখের জলে বিদায় হয়ে যাবে, কিন্তু আগে ভাগে এত জমা-খরচের হিসাব করে কোন্ চাষী চাষ করতে নামে জলা?

রাখাল দাস না কি আইনের কথা তুলেছে। রাখাল নিজে এসে বলে নি, অন্যের মারফতে কথাটা নকড়ির কাণে এল। এতদিনের দখল—এর একটা বিচার হবে না কি সদরে?

শুনে খুব শাসাতে লাগল নকড়ি। যা না সদরে চলে, কেমন বুকের পাটা দেখা যাক। গিয়ে মজাটা টের পেয়ে আয়। কে বলেছে, দখল তোদের—সাক্ষী আছে? উকিলের জেরায় সাদা কালো হয়ে যাবে, ওয়াশিলাতের এক গাদা দেনা ঘাড়ে নিয়ে ফিরতে হবে, চটে থাকবেন রায় বাবু আর ঘোষ ম'শায়। বাস

তো ওঠাতে হবেই—খেসারত যা দেবেন বলেছেন, এক পয়সাও তার মিলবে না।

অভিলাষকে দেখতে পেয়ে নকড়ি বলে, শুনেছ তোমার জামাইয়ের কথা? আইনের ভয় দেখায়।

অভিলাষ বলে, ছেলেমানুষ—মাথা গরম। ভাবছে, সেই আগেকার দিন আছে, আগরহাটি গিয়ে পড়লেই ওঁরা অমনি লেজ করে ছুটবেন সদরে। ও কিছু নয় গোমস্তা মশায়, বুঝিয়ে-সুজিয়ে ঠাণ্ডা করব আমি ওদের।

চাষীরা সত্যি বড় অসহায় বোধ করছে নিজেদের। পায়ের নীচে যেন মাটি নেই। বড়লোকের ঝগড়া-বিবাদে সুবিধা ছিল তাদের। এখন রায়গ্রামের কাছারি এপারে আগরহাটির সদর-বাড়ি এসে উঠেছে, নতুন চর আর আগরহাটির সীমানার বাঁধ নিশ্চিহ্ন। উপযাচক হয়ে কেউ কেউ ইতিমধ্যে দিয়েও গেল ঠিকে কবলুতি। উল্লসিত নকড়ি চিঠি লিখে জানাল, আদায় অল্পস্বল্প সুরু হয়েছে। টিট হয়ে আসছে ক্রমশঃ। দু-এক মাসের মধ্যেই বিলি-বন্দোবস্ত শেষ হয়ে যাবে, ভাবনা নেই—

কিন্তু চৈত্রের আসল কিস্তির মুখে কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল—সবাই এক কাট্টা, খাজনা বাবদ একটা পয়সা দেবে না, এই সঙ্কল্প।

জমি থেকে উচ্ছেদের নালিশ করা হল, আদালতমুখো কেউ হল না। এক তরফা ডিক্রি হল, ঢোল শহরৎ হল, কিন্তু জমি ছেড়ে কেউ নড়ে না। ইন্দ্রলাল হুকুম পাঠালেন, পাইক-বরকন্দাজ পঁচিশ জন আরও বহাল কর, গায়ের জোরে নদী পার করে তাড়িয়ে দাও। কিন্তু বরকন্দাজ বাড়ানোর গরজ কি, বেদম পিটুনি খেয়েও হাতখানা কেউ উঁচু ক'রে তোলে না। মারের চোটে দু-এক ক্ষেত্রে চেতনা হারিয়ে পড়ে গেছে, কিন্তু তার নিজের জমির উপর। জমি থেকে তাড়ানো যাবে না এদের কাউকে জীবিত অবস্থায়।

রাগের বশে এর মধ্যে এক কাজ করে বসল নকড়ি। সন্ধ্যার পর বরকন্দাজ পাঠিয়ে রাখালকে ডেকে নিয়ে এল কাছারি-বাড়ি। রাত দুপুরে খুব চেঁচামেচি—কি ব্যাপার? ঘোষদের বাগানে নারিকেল গাছে রাখাল চুরি করে নারিকেল পাড়ছিল, তাকে ধরে ফেলেছে। ধরে এনে পিছমোড়া দিয়ে বেঁধেছে কাছারির বারান্দায়। সকালবেলা দারোগা-কনেষ্টবল এসে নিয়ে গেল থানায়। সারাদিন কি ব্যাপার সেখানে ঘটল প্রকাশ নেই। সন্ধ্যাবেলা খোঁড়াতে খোড়াতে রাখাল ফিরে এল, গ্রামেরই চার-পাঁচটা ছোকরা গিয়ে তাকে ধরে নিয়ে এল। দারোগা সদর অবধি চালান দিতে সাহস করে নি, ওখান থেকেই শাসন করে ছেড়ে দিয়েছে। ভরসা করেছিল, ওতেই কাজ হবে—কিন্তু উল্টো উৎপত্তি হল। চাষীদের ভয় ভেঙে গেছে, আরও ঐক্যবদ্ধ হয়েছে তারা। মোল্লাপাড়ায় বারম্বার লোক পাঠিয়েও একজন কাউকেও আনা গেল না সেখান থেকে। তারা এখন সাফ জবাব দিচ্ছে, না মশায়—ওর মধ্যে গিয়ে শাপ-মন্যির ভাগী হতে পারব না। আমাদের এদিকে মনিবও বেঁকে বসতে পারে—আমরা না গেলে ওরাও তখন এগুবে না এধারে।

জামাইএর উপর অভিলাষ খুশি নয়, তবু সে খুব বিরক্ত হয়েছে রাখালকে চোর অপবাদ দেওয়ায়। সে বলল, তোমার কর্ম্ম নয় গোমস্তা ম'শায়। সেকালে ঈশ্বর রায় ম'শায় গ্রামে থাকতেন, মেলামেশা করতেন, তাই সব কেঁচো হয়ে ছিল তাঁর কাছে। রায়বাবুকে আসতে লিখে দাও, তিনি এসে যদি কিছু করতে পারেন।

নকড়ির চৌদ্দপুরুষে এ ধরণের গোলযোগের সঙ্গে পরিচয় নেই। এ ব্যাধির ওষুধ সে খুঁজে পায় না। মনিবের মহালে এসে চেপে বসা গোমস্তার পক্ষে অবাঞ্ছনীয়, তবু বেগতিক বুঝে জরুরি করে লিখল ইন্দ্রলালকে আসতে। সাত-পাঁচ ভেবে ইন্দ্রলাল এসে পড়েছেন। সেই গিয়েছিলেন, পনের বছর পরে সপরিবারে গ্রামে ফিরলেন।

[ক্রমশঃ

আলো-ছায়া

শ্রীইন্দিরা দেবী

সুরুচির যখন ঘুম ভাঙলো তখন সকাল হয়ে গেছে। শীতের কুয়াসা চারিদিকে। চোখ না চেয়েই—সুরুচি বুঝতে পারলো আর শুয়ে থাকা ঠিক নয়। কিন্তু আলস্যে ও সুখাবেশে চোখ চাইতে তার ইচ্ছা হোল না। সকাল সকাল উঠেই বা কি হবে—সেই তো পুরাতন জীবনের পুনরাবৃত্তি। তার চেয়ে এই কোমল শয্যার ঈষদুষ্ণ আরামের ভিতর চোখ বুজে আর মনে মনে মালা গেঁথে যতক্ষণ থাকা যায়। ঘুম ঘুম চোখেই সে ডান দিকে হাত বাড়িয়ে দেখলো খুকু নেই, কখন উঠে পালিয়ে গেছে। বাঁ-হাতখানা বাড়িয়ে দিলো অন্যদিকে, সুরুচি অনুভব করলো সে জায়গাও খালি। রাগ অভিমান হোল তার। কখন এসেছে কাল রাতে তার ঠিক নেই আর পাশ থেকে সকালে কখন সরে গেছে, হলেই বা ডাক্তার, হলেই বা ডাক তার চারিদিকে। দু'দণ্ড আমায় ঘিরে বসতে পারে না? মনে অভিমান জমা হয়ে উঠলো সুরুচির। থেকে থেকে তার কাছে থেকে পালিয়ে যাবে সরে যাবে—এ-কি কথা। দিনরাত কেবল রুগী ঘাঁটা, ভালো লাগে দিনরাত এই কোরতে? একটুও ক্লান্তি নেই, একবারও 'না' বলে না?

—এই ওঠো। হিম-শীতল হাতের স্পর্শ, শীতের ভয়ে কুঁচকে [illegible] খ না চেয়েই শান্ত গলায় বললো, বলো কি বলবে, শুনছি

—আমি এখুনি বেরুবো—

—জানি, কেবল পালিয়ে বেড়ান—

—পালিয়ে বেড়ান? শ্যামল অবাক হয়ে বললে, কার কাছ থেকে?

—কেন? আমার থেকে, আমার স্পর্শ থেকে, আমার ভালোবাসা থেকে। সুরুচির কণ্ঠে অনেক অভিমান। শ্যামল হেসে উঠলো—প্রাণখোলা হাসি, উপলখণ্ডে আহত বেগবতী নদীর সুর হাসিতে, তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে উঠলো: দেবী রুষ্টা হইয়াছেন। সুরুচি চুপ করেই আছে চোখ না চেয়েই। মনের মাঝে অনেক গোপন ইচ্ছা আসা যাওয়া করছে। হঠাৎ মুখের উপর যেন বরফের একটা কুচি এসে পড়লো। সুরুচি চোখ চেয়ে কপট রাগে বললো, কি হচ্ছে, দেখছো না—

—হ্যাঁ পৃথিবী নির্জ্জন। শ্যামল তার কথায় বাধা দিয়ে বললে, শোনো পাঁচ মিনিট সময় দিলুম, তৈরী হয়ে এসো চায়ের টেবিলে।

শ্যামল চলে গেল। সুরুচি অলস চোখে তাকালো তার দিকে, কী সুন্দর ও, এত ছেলেমানুষ, এত প্রাণবন্ত। সুরুচির মনে হ'ল প্রথম যখন শ্যামল এসেছিল বাবার কাছে, কী ভালোই যে লেগেছিল। ভালো লাগা কি ভালোবাসার প্রথম ধাপ।

এই কথাটিও ভাবছে শ্যামল! ভালো লাগা কি ভালোবাসার প্রথম ধাপ। সুরুচিকেও তার ভাল লেগেছিল এবং সেই ভালো লাগাটাই মনে ভালোবাসার রং বুলিয়ে দিলো—সে ভালোবাসলো—বিয়ে করলো। অনেক বাধা আর বিপত্তিকে সে অতিক্রম করেছে, সুরুচিকে সে সুন্দর ঘর দিয়েছে, অপরিমিত ঐশ্বর্য্য দিয়েছে, সমস্যাহীন জীবন দিয়েছে। সুরুচির জীবনে কোন অভাব নেই, সুখে আছে—কিন্তু তার জীবনে আসছে সমস্যা। একদিনের পরিচয়ে প্রণতিকে কি জানি কেন ভালো লেগে গেলো—এও কি ভালোবাসার পূর্ব্বাভাস? শ্যামল প্রণতিকে একবার ভেবে নিলো, সুশিক্ষা, তেজ, কর্ত্তব্যে দৃঢ়সঙ্কল্প সব কিছু মিলিয়ে মিশিয়ে তৈরী করা বিধাতার এক সৃষ্টি—কিন্তু কি দুঃখী! বিত্তহীনা কিন্তু চিত্তহীনা নয়। কোথাও এতটুকু কাঙ্গালপনা, প্রার্থনা নেই। অদ্ভুত মেয়ে। এতদিন শ্যামল ডাক্তারী করছে, কিন্তু এমন সুন্দর মেয়ে দেখে নি।

শ্যামল ভাবছে। মুখের সিগারের আয়ুক্ষয় হচ্ছে পুড়ে পুড়ে, চোখের সামনে ধরে আছে আজকের ইংরাজী সংবাদপত্র কিন্তু মনটা চলে গেছে—ছোট্ট আসবাবহীন, আভরণহীন—পরিস্কার একটা ঘরে।

কখন স্নান প্রসাধন সেরে সুরুচি চায়ের টেবিলে এসেছে শ্যামল তা জানতে পারেনি এমনি তন্দ্রাচ্ছন্ন মন।

—দেবতা! প্রসন্ন হও—সুরুচি মিষ্ট গলায় হেসে বললে।

—দেবী প্রসন্না হইয়াছেন তো? শ্যামলের কণ্ঠে কৌতুক।

দু'জনের চা খাওয়া এবং চাপা কণ্ঠের গল্পের সুরু হলো। আশে পাশে ঘোরা ফেরা করছে খুকু। পাঁচ বৎসরের খুকু, চমৎকার একটা ডল।

সুন্দর সংসার। স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি তৃপ্তিতে ভরা, হৃদয়ে ওদের প্রেম, অপরিমিত ঐশ্বর্য্য। সকাল বেলার রোদ এসে ওদের অভিনন্দন দিচ্ছে। সুরুচি স্নাত, সুস্মিত মুখে শান্তি তৃপ্তি আর ভালোবাসার সোনালী রোদ। সুন্দর ছবি।

—কিন্তু দেবতা কাল তো সকাল সকাল ফেরার কথা ছিল।

—ছিল, কিন্তু ফিরতে পারিনি—স্তিমিত গলায় শ্যামল বল্লে।

—পারোনি এই যথেষ্ট—সুরুচি উষ্ণ হয়ে ওঠলো—কেবল রোগ আর রোগী নিয়ে তোমার কারবার। একবার বেরুলে আর ঘরে ফিরতে ইচ্ছা হয় না—এদিকে আমি একলা একলা হাঁফিয়ে উঠি।

—জানি সুরুচি, কিন্তু কাল তোমার জন্যই যখন সকাল সকাল ফিরছি তখন পথে দুর্ঘটনা।

—দুর্ঘটনা? সুরুচি আতঙ্কে শিউরে উঠলো।

—হাঁ, দোষ আমার ছিল। গাড়ীটার পাশে কেমন জানি ধাক্কা খেয়ে পড়ে যায়—পায়ে একটু লেগেছিল—গাড়ীতে তুলে হাসপাতালের দিকে যাচ্ছিলুম কিন্তু বললে, এত কষ্ট করার দরকার নেই, এখানেই নামিয়ে দিন বাড়ী চলে যাই। সত্যিই মেয়েটার লাগে নি কিছুই, ছড়ে গেছে এখানে ওখানে;

—মেয়ে? সুরুচি অবাক হলো। যেন সে হঠাৎ ধাক্কা খেয়েছে—তুমি গল্প তৈরী করছ না তো? সুরুচি হাসবার চেষ্টা করলো।

—সর্ব্বনাশ, ডাক্তারী ছেড়ে গল্প তৈরী করবো। অনশনে মারতে চাও না কি?

—সত্যি গল্প নয়, সুরুচির খুব ইচ্ছা এটা গল্প হোক। সুরুচি চায় না স্বামী তার এমনি দুর্ঘটনায় জড়িয়ে পড়ুক যেখানে মেয়ের সম্পর্ক আছে। সুরুচির একটা অহেতুক ভয় আছে। স্বামী সম্পর্কে সব মেয়েদেরই এমনি একটা অহেতুক ভয় আছে, পাছে কেউ তাকে কেড়ে নেয়, কেউ কাছে পাবার চেষ্টা করে, যদি সে হারিয়ে যায়—এইজন্যে সুরুচি স্বামীকে কাছে রাখে, ঘিরে রাখে।

—সত্যি বলছি, গল্প নয়—শ্যামল সহজ গলায় বল্লে।

—তারপর,

—তারপর তাকে বাড়ীতে দিয়ে এলাম। 'বাড়ী' বলতে গিয়ে শ্যামল হেসে ফেল্লে: একখানা ঘর, একফালি বারান্দা—তাতে আবার ফুলের বাগান—মানে টবে, বাঁ পাশে এক টুকরো জায়গায় রান্নাঘর।

—সব দেখা হয়ে গেছে এর মধ্যে? গম্ভীর গলায় সুরুচি বল্লে।

—সব আর কি? শ্যামল নিজেকে সমর্থন ক'রে বলে—ডাক্তারী সেরে এলুম। বুড়ো মা এলো বেরিয়ে, চা খাওয়ালে, দু'খানা নিমকীও।

—কত বয়স হবে? সুরুচি আক্রমণ হবার জন্যে তৈরী হচ্ছে।

—বয়েস? তুমি দেখছি নেহাৎ পাগল। বয়েস দেখেই কি আমি এ্যাক্সিডেন্ট ক'রে বসলুম?

—কে জানে বাপু! কোথায় তোমার পুলিশে যাবার কথা, তা নয় দিব্যি চা আর নিমকী খেয়ে এলে

—সুন্দর চেহারা কিনা—

—থাক আর জাঁক ক'রে দরকার নেই। মাকাল ফল!

—তা আকাল পড়লে মাকাল ফলের দিকেও নজর পড়ে। দু'জনের হাসির ফুলঝুরি ঝরে পড়তে লাগলো।

—ইস, ৯টায় ক্লাস নিতে হবে যে!

—তুমি তো দেরী করলে!

—আমি না তুমি?

শ্যামল কোটটা নিয়ে নীচে যাবার উদ্যোগ করতেই খুকু পাশে এসে হাজির। নিত্যকার একটা আদর শ্যামলের কাছে থেকে পাওয়া চাই। শ্যামল মুখ নীচু ক'রে তাকে আদর করতে যেতেই খুকু বললো না বাপি, আমায় নয় আজকে মাকে দাও। সুরুচির মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে লজ্জায়। সুরুচি কপট রাগে ভ্রূভঙ্গি করলো।

—তোমার মাকে পরে দেব, এখন তুমি নাও—ব'লে শ্যামল খুকুর মুখে চুমু দিয়ে বেরিয়ে গেলো। সুরুচি ছোট্ট একটা কোচে বসে বুনতে আরম্ভ করলো। শ্যামলের জন্যে সে একটা সোয়েটার বুনছে। এই নিয়ে শ্যামল তাকে কতবার ঠাট্টা করেছে: রক্ষা-কবচ না কি?

সুরুচি বলেছিল, হ্যাঁ, পেত্নীদের দৃষ্টি রোধ করবার জন্যে আধুনিক রক্ষা কবচ। কোন ফুলশর তোমার ও বুকে বিদ্ধ হবে না।

কিন্তু সত্যিই কি সুরুচি তাকে রক্ষা করতে পারবে?

সুনিপুণ হাতে সুরুচি বুনে চলেছে, নানা ভয় ভাবনার ঢেউ ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে তার মনের উপকূলে।

অনেকদিন কেটে গেছে।

শ্যামলের আজকাল যেন কি হয়েছে। তার মনে হচ্ছে তার সংসার থেকে সে যেন স'রে যাচ্ছে। স্ত্রীর সঙ্গে কথা, খেলা তেমনি জমে ওঠে, ঘর সংসার জমজমাট, তবু তার মনে হয় এত সমারোহের মাঝে আছে শূন্যতা: নিজের ঐশ্বর্য্য, নিজের সমারোহ সব তাকে ব্যথা দেয়। সব সময় মনে করিয়ে দেয় প্রণতির কথা। সেই দুর্ঘটনার পর প্রণতি সাতদিন কাজে যেতে পারেনি, অল্প জ্বরে ভুগছিল। শ্যামল কি ভেবে হঠাৎ গিয়েছিল, দেখে তার জ্বর। এরপর বহুদিন বহুবার সে এসেছে, কিনে এনেছে কত ফুল ফল—যা সে নিজের বাড়ীর জন্যে কোনও দিন আনে নি। সুরুচি কতদিন দুঃখ করেছে এর জন্যে, শ্যামল বলতো: চাকর বাকর আছে, আনিয়ে নাও না, অফিস ফেরৎ কেরাণীর মত কলাটা মূলোটা আনতে পারি না আমি।

প্রণতিকে হয় তো শ্যামল ক্ষতিপূরণ কোরতে চেয়েছিল।

প্রণতি শুধু বলেছিল: আমার সব দুঃখ তো দূর হবে না। আপনার কাছে আমার কিছু পাওনা থাক। পরের জন্মে শোধ করবার চেষ্টা করবেন।—অদ্ভুত মেয়ে।

এ কথার কি রহস্য আছে কি অর্থ আছে শ্যামল ঠিক করতে পারে না। ঐশ্বর্য্য আর অর্থকে যে অনায়াসে তুচ্ছ করতে পারে সে কি সাধারণ?

শ্যামলের চোখে প্রণতি অসাধারণ হয়ে ওঠে। প্রণতির ব্যক্তিত্বের কাছে সহজ সরল ব্যবহারের কাছে শ্যামল বন্দী হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে তার মনে হয়: ভাগ্য তাকে কোনদিকে টেনে নিয়ে যেতে চাচ্ছে। এ কি ভালোবাসা, না কামনা? অথচ শ্যামলের মনে পড়ে দুর্ঘটনার পর এক বছর হয়ে গেছে। প্রায় দিনই সন্ধ্যায় শ্যামল গেছে মিনিট পনেরোর জন্যে, দেখেছে প্রণতি অপেক্ষা ক'রে আছে তার জন্যে। একদিনও সে তাকে স্পর্শ করে নি। একদিনও অর্থহীন ভালোবাসার প্রলাপে মত্ত হয় নি দু'জন। কথা কয়েছে, গল্প কোরেছে। শুধু অনুভব আর অনুভূতিতে কি তৃপ্তি আছে, প্রণতির কাছেই শ্যামল তা প্রথম বুঝেছে। অদ্ভুত লাগে শ্যামলের, কিছু চায় না প্রণতি, কিছু প্রার্থনা করে না, কোন অভিলাষ নেই, অতি ইচ্ছা নেই। ভালো লাগে শ্যামলের। এই ভালো লাগাই কি ভালোবাসা?

একদিন সুরুচি শ্যামলের কোটটা বদলাতে গিয়ে চিঠির একটা টুকরো দেখলো:

—অনেক দিন দেখি নি, একবার আসবেন, আসন পাতা আছে।

এই ক'টি কথা মুক্তোর মত লেখা,

ওপরে বা নীচে নাম নেই।

সুরুচির কি হলো: মনের ভিতরটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে, দু' চোখের ধারায় মুখখানা ম্লান ক'রে উঠলো। সমস্ত পৃথিবী তার কাছে যেন শূন্য হয়ে এলো। এ কেমন ক'রে হোল, এ কি হোল, এত হাসি, এত কথা খেলা, এত অনুরাগ, এত ভালোবাসা, সব মিথ্যে হয়ে গেল: সব কি সাজানো?

সুরুচির মনে হোল শ্যামল যেন সরে যাচ্ছে, দূরে চলে যাচ্ছে, দশ বৎসরের বিবাহিত জীবন এক মুহূর্তে মিথ্যে হয়ে গেল।

হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়লো টেবিলের উপর আধ বোনা সোয়েটারটা, সুরুচি সেটাকে জানলা গলিয়ে ফেলে দিলো। যে বিদায় নিতে চাচ্ছে কি দিয়ে তাকে ধরে রাখবে সুরুচি?

একটা সোফায় বসে পড়লো সুরুচি।

ঠিক সেই মুহূর্তে স্নানের ঘর থেকে মৃদু গানের শব্দ ভেসে এল শ্যামলের। কান পেতে শুনতে লাগলো সুরুচি; তারপর উচ্ছল আবেগে সহসা বড় ধিক্কার দিল সে নিজেকে: ছিঃ, ছিঃ, কি ছাই-পাঁস সে ভাবছিল এতক্ষণ। তার ভালবাসাকে ছিনিয়ে নেবে কে?

অক্ষমা (উপন্যাস)

শ্রীঅবনীকান্ত ভট্টাচার্য্য

এক

পরিচিত অপরিচিত,আত্মীয়-স্বজন বারিদবরণ ঘোষালের হঠাৎ ভরাভর দেখিয়া বিস্মিত তো হইলই,উপরন্তু ঈর্ষ্যার প্রবল অনুভূতি অনেকেরই মনে অকারণ অস্বস্তির মাত্রা বাড়াইয়া তুলিল। কেহ বলিল—"একেই ক'য় স্ত্রী-ভাগ্যে ধন। হ্যাঁ—স্ত্রী পেয়েছে বটে। তারি কপালে একেবারে রাতারাতি বড়লোক,—হুঁ—আমাদের মতন তো আর নয়, স্ত্রীই আছে কিন্তু মাইনাস্ ভাগ্য"। কেহ মন্তব্য প্রকাশ করিল, "আরে ছাড়ো কথা, ও যাকে বলে যুদ্ধের বানে চোরাবাজারের ঢেউয়ে ভেসে-আসা পয়সা—হুস্ ক'রে আসতেও যেমনি, আবার ভুস্ ক'রে যেতেও তেমনি। দেখে নিয়ো। কেহবা—"মালক্ষীর অযোগ্য-কৃপা" বলিয়া মনকে শান্ত করিল। কেহ কেহ টিপ্পনীযোগে ইঙ্গিত করিল : "ওসব বাবা বাইরে যতটা দেখছ ভড়ঙের গর্জ্জন, আসলে কিন্তু ততখানি বর্ষায়নি।" এই রকম বহুলোকের অহেতুক মনোভাবের কারণ হইয়াও ভাগ্যদেবীর প্রসাদ-বাহুল্যে বারিদবরণের অর্থাগম আরো জোয়ারী হইতে লাগিল।—'লেকভিউ রোডের' উপর উঠিল বিশাল ইমারত, গ্যারেজে ভর্ত্তি হইল একজোড়া দামী মোটরযান। গৃহ-প্রবেশের দিনে নিন্দাবিলাসীরাও পূর্ব্ব মত পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইল—ভূরিভোজ ও আশাতীত আদর আপ্যায়ন পাইয়া। সময়ে অসময়ে ইহারাই বারিদবরণের নিকট হইতে টাকা ধার করিতে কিংবা কোনরূপ অনুগ্রহ লইতে কুণ্ঠাবোধ করিল না। নিন্দায় পঞ্চমুখ যাহারা ছিল—তাহারাই হইল প্রশংসায় মুখর। ইহাই সংসারের নিয়ম।

বারিদবরণের জন্ম হয় মধ্যবিত্ত সংসারে। তাহার পিতা সুহৃদকান্ত ঘোষাল মফঃস্বলে ওকালতি করিয়া এমন কিছু সংস্থান করিতে পারেন নাই—যাহার জোরে সকল দিক বজায় থাকিতে পারে। বারিদবরণ ব্যবসায়ী ধনী মামার তত্ত্বাবধানে থাকিয়া কলিকাতায় লেখাপড়া করিতে থাকে, কলেজে পড়িবার সময় স্নেহময়ী মাতার অকাল তিরোধান তাহার জীবনে একটা নির্ব্বেদ আনিয়া দেয়। কিন্তু মামার স্নেহ তাহার এই ক্ষতে প্রলেপের কাজ করে, এবং তাঁহার অর্থানুকূল্যে বারিদবরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ খাইয়া বিলাতে ব্যারিষ্টারি পাশ করিতে যায়। ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিয়া আসিয়া হাইকোর্টে বাহির হইয়া দিনকয়েক পরে বারিদবরণ উপলব্ধি করে যে—তাহার অদৃষ্টে 'ব্রিফের' বদলে 'ব্লাফ্-এরি' সাক্ষাৎ পরিচয়টা বেশী। তখন মামারি পরামর্শে তাঁহার সক্রিয় ব্যবসায়ে সে আইন-উপদেষ্টা হইয়া বসে। সেখানেও তাহার ভাগ্য চঞ্চল হইয়া ওঠে—মামাতো ভাই তাহাকে অবৈধ অংশীদার মনে করিয়া তাহার সঙ্গে খুঁটিনাটি ব্যাপারে কলহের সৃষ্টি করিতে থাকে। এই মনোমালিন্য বাহির হইতে ঘরে আসিয়া মাথা চাড়া দিতে আরম্ভ করে। তখন দূরদর্শী মামা অশান্তির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য প্রিয় ভাগিনেয়কে একদিন নিভৃতে ডাকিয়া চুপি চুপি তাহার হাতে মোটা টাকার একটি চেক্ গুঁজিয়া দিয়া বলেন—"বারিদ, তোমাকে আমি ছেলের মতই দেখি—আমাকে তুমি ভুল বুঝোনা। তোমার ভবিষ্যৎ ভেবে আমি তোমাকে এই ব্যবসা থেকে সরিয়ে দিতে চাই,—কেননা আমি চোখ বুজলেই আমার ছেলে হবে এর মালিক। এখন থেকেই তোমাদের দুজনের বনি-বনাও নেই দেখছি। আমি বেঁচে থাকতে থাকতে তুমি যদি দাঁড়িয়ে যাও—তা'হলে আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'তে পারি। তোমার পৈত্রিক সম্পত্তি বলতে কিছু নেই—যা একটা ছোট বাড়ী আর কয়েক বিঘে জমিজমা আছে। তাও তোমার বাবা দ্বিতীয়বার সংসার পেতে তোমার সৎমা আর সৎভায়েদের নামে লিখে দিয়ে গেছেন। তোমার পক্ষে সে ভাববার কথা নয়। তোমার ওপর তোমার বাবার চেয়ে আমার কর্ত্তব্য বেশী ব'লেই মনে করি, সেজন্যে তোমাকে আমি এই টাকাটার উপর নির্ভর ক'রে এখন একটা ছোটোখাটো ব্যবসা আরম্ভ করতে বলছি। আমার সহায় তুমি পাবে। একটা ব্যাঙ্কের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ করিয়ে দেবার ব্যবস্থা ক'রছি। সেখানে—কিছু মালিকানা স্বত্ব তোমার থাকবে—সে বন্দোবস্তও করেছি আমি। আমার খুব বিশ্বাস, এতে তুমি দুঃখিত হবে না, চেষ্টা ক'রলে বেশ ভালো ভাবেই দাঁড়িয়ে যেতে পারবে।" বারিদবরণ মামার এই উদার অনুগ্রহে, সজল চোখে তাহার কৃতজ্ঞতা জানাইল। তারপর মামার উদ্যোগে, বারিদবরণের বাঁধনহারা জীবনকে শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিল অতুল্য রূপযৌবন ও আশাতিরিক্ত যৌতুক লইয়া গৃহলক্ষ্মীসমা ক্ষমা প্রবেশ করিয়া।

বারিদবরণ মামার মূলধনে পাটের ব্যবসায় ও অন্যান্য দুই একটি কারবার আরম্ভ করিয়াছিল, এবং নির্দ্দিষ্ট ব্যাঙ্কের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট ছিল বটে, তবু ঢিলা-স্বভাবের জন্য সর্ব্বদিকে টাল খাইতে লাগিল, কিন্তু ক্ষমা তাহার ঘরে পা দিতে না দিতেই অদৃষ্টকে যেন তুড়ী মারিয়াই বারিদবরণ হঠাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইল। তাহার ভাটি-খাওয়া কারবারে লাগিল আওড়। মহাযুদ্ধ সাধারণ জনগণের সর্ব্বনাশ আনিয়া দিলেও ব্যবসাদারদের অচিন্তিত সৌভাগ্যের দ্বার খুলিয়া দিল। এই সুযোগ ধরিয়া বারিদবরণের বুদ্ধিবৃত্তি ও উৎসাহ সতেজ হইয়া উঠিল। চোরা বাজারের গুপ্তপথ দিয়া টাকার যে উজান বহিতে লাগিল, তাহার পলি ভারে ভারে থিতাইয়া পড়িল বারিদবরণের ভাণ্ডারে। মোটা অঙ্কপাতে ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স্ বাড়িয়াই চলিল।

মামা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া একদিন চক্ষু মুদিলেন।

চার বৎসর বারিদবরণের বিবাহ হইয়াছে কিন্তু কোনদিকে

নজর দিবার সে বিশেষ সময় পায় নাই,—অর্থ-উপার্জ্জনের নেশায় দিবা-রাত্র মাতিয়া থাকে। ক্ষমা একদিনের জন্যও স্বামীর এই দুর্নিবার গতির তাল-ভঙ্গ করিতে পারে নাই, তাহার শত অনুরোধ হার মানিয়াছে। বারিদবরণের আশ্চর্য্য কর্ম্মশক্তির পায়ে ক্ষমা মাথা নত করিয়াছে—দূরে দাঁড়াইয়া। কিন্তু সমস্ত গতিরই এক সময়ে বিরাম আসে। বারিদবরণেও তাহাই হইল, অর্থ উপার্জ্জনের পথ বেশ সুগম হইয়াছে দেখিয়া, এবার ঘরের দিকে ভালো করিয়া ফিরিয়া তাকাইল, যেন জীবন-সঙ্গিনী ক্ষমার সহিত তাহার এই প্রথম শুভদৃষ্টি হইল। হাসিতে-খুসিতে দিনগুলি ভরিয়া উঠিল, কাজও চলিল শৃঙ্খলিত মন্দগতিতে।

এমনি করিয়া চলিতে চলিতে স্বামী-স্ত্রীর জীবনে একটি সন্ধিক্ষণ দেখা দিল। পঁচিশে অগ্রহায়ণ তাহাদের বিবাহের দিন। বারিদবরণের আগ্রহে ক্ষমা এই বিবাহের দিনটিকে উভয়ের জীবনে স্মরণীয় করিয়া তুলিবার জন্য এক বিরাট্ উৎসবের আয়োজন করিয়া বসিল। নানা ভদ্র-বাচ্য মহলে নিমন্ত্রণ গেল—স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে।

পঁচিশে অগ্রহায়ণ প্রত্যুষেই শয্যা-ত্যাগের পর ক্ষমা তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া লইয়া ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিল। এই দুর্লভ দিনটিকে সে কালের পাতায় অক্ষয় করিয়া রাখিতে চায়—বিবাহের পর এত আপনার করিয়া কোনো দিনকেই সে পায় নাই। আজ যেন তাহার বধূজীবনের শ্রেষ্ঠ লগ্ন, আজ তাহার প্রকৃত ফুল-শয্যা। অন্তরের এই আনন্দটুকু নিবেদন করিবার জন্যই অন্তর্য্যামী সর্ব্বনিয়ন্তার কাছে ক্ষমার এই প্রার্থনা—"ঠাকুর আমি যা চাইনি, তার চেয়ে অনেক বেশী তুমি আমাকে দিয়েছ। নারীর যা কাম্য তা আমি পেয়েছি। কা'র পুণ্যে আমি এতো পেলুম—তা' জানি না, হয়তো আমার সতী মায়ের পুণ্যে! স্বামী-গর্ব্বে তুমি আমায় সুখী করেছ, সুকুমার ছেলে কোলে দিয়ে আমার মাতৃত্বে গৌরব এনে দিয়েছ। দত্তাপহরণ ক'রে আমায় কোনো দুঃখ দিয়ো না—মঙ্গলময়! আর এইটুকু তুমি কোরো—যত কঠিন পরীক্ষার মধ্যেই আমি পড়ি না কেন—আমার নারী-মর্য্যাদায় কোনদিন যেন ঘা' না লাগে।"

আনন্দাশ্রুর অর্ঘ্য দিয়া দেবতার কাছে এই আত্মনিবেদনে ক্ষমা মনে মনে অশেষ তৃপ্তি অনুভব করিল। এইবার স্বামীর খাস কামরাটিকে নিজ হাতে সাজাইবার জন্য নীচে নামিয়া গেল।

দেউড়িতে নহবতের মৃদুমন্দ রাগিণীর আলাপ ক্ষমার মনে যেন সুরের আল্পিনা আঁকিয়া দিতে লাগিল। কিছুতেই যেন তাহার মন উঠিতে চাহে না—তাহার জীবনের অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ এক হইয়া যদি এই আনন্দসুধা আকণ্ঠ পান করিয়া লইতে পারে, তবে যেন তাহার সকল জীবন সার্থক হইয়া উঠে। ক্ষমা প্রথমে সাটন ওয়াল পেপারে মোড়া দেওয়ালে টাঙানো স্বামীর ফটোটিকে খুলিয়া লইয়া ফুল দিয়া সাজাইয়া গড় করিল। তারপরে ঘরের সজ্জায় মন দিল। বুরোর উপর বই ও কাগজপত্র-গুলি গুছানো হইল। ডাইনে-বাঁয়ে দুই ধারে ফুলদানে ফুল সাজানো হইল। ঘরের সংলগ্ন বারান্দার- ড্রাগন-আঁকা বড় বড় চীনা 'ভাস' বিচিত্র ফুলের গুচ্ছে শোভা পাইল। সোফায় মুড়িয়া দেওয়া হইল দামী চীনাংশুক। সোফার সামনে একটী ছোট চায়ের টেবিলের উপর ক্ষমার লক্ষ্য পড়িল। একটি ট্রেতে এক গোছা চিঠি। ক্ষমা স্মিতমুখে সেই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনের চিঠি ও টেলিগ্রাম একে একে পড়িয়া রাখিয়া দিল। সেগুলি শেষ করিয়া ঘরের মাঝখানে মরকত-রঙের একটি টেবিলের উপর কারুকার্য্য-করা আসমানী নীল এক সুদৃশ্য পাত্রে একঝাড় গোলাপ সাজাইবার সময় ভৃত্য আসিয়া জানিতে চাহিল, বাইরের "কারোর সঙ্গে এখন দেখা ক'রবেন কি মা?" ক্ষমা মাথা না তুলিয়াই উত্তর দিল—"কেউ এসেছেন নাকি জনার্দ্দন?"

"হ্যা মা—বাবু বাড়ী নেই ব'লে বাইরে-ঘরে বসতে ব'লচি।"

"কে এসেছেন"?

"কুমার সাহেব"।

"কুমার কণাদ রায়"?

"আজ্ঞে, মা"।

ক্ষমা অল্পক্ষণ কোনো কথা কহিল না, সামান্য দ্বিধা জাগিল, কিন্তু আজিকার দিনে কোনো অতিথিকে বিমুখ করিতে তাহার ইচ্ছা হইল না। জনার্দ্দনের দিকে চাহিয়া বলিল, "তাঁকে এখানে নিয়ে এসো—আর কেউ যদি এসে পড়েন, এই ঘরেই ডেকে এনো"। জনার্দ্দন চলিয়া যাইতে ক্ষমা নিজে নিজেই কহিল—"আসুন কণাদ বাবু, ক্ষতি কি? রাত্রির ভিড়ের মধ্যে দেখা হওয়ার চেয়ে এখনি দেখা হওয়া একপক্ষে ভাল—অন্ততঃ আমার দিক থেকে। এ সময়েও আসাতে আমি সন্তুষ্টই হয়েছি।" কয়েক মিনিট পরে কণাদ রায় ঘরে ঢুকিয়াই সম্ভাষণ করিল, "কেমন আছেন ঘোষাল দেবী?"

সলজ্জ হাসিতে তাহাকে আপ্যায়িত করিয়া ক্ষমা কহিল—"আসুন, কুমারবাহাদুর। আমি একটু কাজে ব্যস্ত রয়েছি এই গোলাপ ফুলগুলো নিয়ে। কেমন দেখতে বলুন দেখি, গন্ধও ভারি মিষ্টি, আসল বসরাই গোলাপ—ব্ল্যাক্ প্রিন্স, আজ সকালেই এসে পৌচেছে। লাভ্‌লি নয়"?

কণাদ সকৌতুকে বলিল, "চমৎকার, সত্যিকারের কালবরণ রাজপুত্তুর। ঐ নীললোহিত রাজকুমারদের ঠেলে আমার সঙ্গে কথা কইবার কি এখন অবসর হবে দেবীর?"

ক্ষমা সহাস্য মুখে বলিয়া উঠিল, "কেন, সন্দেহ হ'চ্চে নাকি? চেতন অচেতনে পার্থক্য কি আমি হারিয়ে ফেলেছি মনে করেন?"

"তাহ'লে এই চেতন পদার্থটীর প্রতি একটু সচেতন হ'লে—ধন্য মনে ক'রবো।"

কথা কহিতে কহিতে টেবিলের উপর কলা-কৌশল-পূর্ণ একটি জিনিসের প্রতি কণাদের নজর পড়িল। সপ্রশংস দৃষ্টিতে সেই-দিকে চাহিয়া বলিয়া ফেলিল; "বাঃ সুন্দর জিনিসটি তো, হঠাৎ দেখলে একটা লম্বা বোঁটাশুদ্ধ ফুলের মঞ্জরী ব'লেই ভুল হয়। হাতে নিয়ে একবার জিনিসটা দেখতে ইচ্ছে ক'রছে। দেখবো? কোনো আপত্তি নেই তো?"

"দেখুন না। সাদাসিধের উপর কি সুন্দর কাজের বাহার

বেশ জিনিষটি, নয়? এইমাত্র আমি ভাল ক'রে দেখলুম। আমার নাম খোদাই রয়েছে, আর ফোটা ফুলের সঙ্গে লাগানো কুঁড়িটাতেও—"অ" লেখা, আমার ছেলের নাম অসীম কিনা, তারি গোড়ার অক্ষর। চন্দন কাঠের ব'লে মনে হ'চ্ছে, ভুর ভুর ক'রছে গন্ধ, পাপড়িগুলো চুনির কাজ, চমৎকার লাল রঙ খুলেছে। কে ব'লবে এটা সত্যিকারের ফুল নয়। এখন বুঝেছি—কাল উনি আমায় বলছিলেন বটে, এটা আমাকে আমার স্বামীর উপহার—মিলন-তিথি উপলক্ষে। জানেন না—আজ আমাদের বিয়ের দিন, তাইতো এই স্মৃতি-উৎসব।"

"না, তা তো শুনিনি। জানি একটা পার্টি দিচ্ছেন বারিদবাবু এই পর্যন্ত। সত্যিই আজকে বিবাহদিনের উৎসব নাকি?" ক্ষমা ফুলগুলি সাজাইতে সাজাইতে কহিল, "হ্যাঁ, আজকে পাঁচ বৎসর বয়েস হ'লো আমাদের বিয়ের। আমার জীবনে আজকের দিনটা খুব দামী, খুব মধুর, নয়? এই জন্যেই তো আজ রাত্রে প্রীতির আয়োজন। বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?"

কণাদ শোফায় বসিয়া অনুযোগের স্বরে বলিল, "আপনারা দেখছি আমার উপর অবিচার ক'রেছেন। এমনি ক'রে আমাকে ফাঁকি দিতে হয়? কি ভুলটা হ'য়ে গেল বলুন দেখি। বড্ড আফশোস হচ্ছে, আগে জানলে আপনার বাড়ীর সামনে সমস্ত রাস্তাটা ভরিয়ে দিতুম ফুলে ফুলে। ঐ নরম পা দু'খানি ফেলে সেই ফুল-বিছানো রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতেন, লোকে তাকিয়ে দেখতো—মাধুরীর ধ্যানে যেন বর্ণ, গন্ধ, স্পর্শ, রূপ, রস সব একসঙ্গে আত্মদান ক'রছে। সত্যি ব'লতে কি ও ফুলের সৃষ্টি আপনার জন্যেই।"

কণাদ চুপ করিলে ক্ষমা সঙ্গে সঙ্গে কোন উত্তর দিল না—কয়েক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধতার পর মুখে হাসির নিশানা রাখিয়া ধীরকণ্ঠে বলিল, "কুমার সাহেব, আপনি পরশুদিন অম্বুজবাবুর বাড়ী নিমন্ত্রণের আসরে আমাকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলেছিলেন। আজো আবার সেই পুরোণো পালা শুরু করলেন? দোহাই আপনার!"

"আমি—আমি, ক্ষমাদেবী?"

অপ্রতিভ কণাদের গলার স্বরে কিঞ্চিৎ বিস্ময় ও আশঙ্কার আভাস উঁকি মারিল। এই সময়ে জনার্দ্দন একটী রূপার ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম লইয়া ঢুকিল। টেবিলের উপর রাখিতে ইঙ্গিত করিয়া ক্ষমা জনার্দ্দনকে বিদায় দিল। আঁচলে হাত দু'টি মুছিয়া চা তৈরী করিতে করিতে ক্ষমা কণাদের অপ্রস্তুত ভাবটিকে সহজ করিয়া দিবার জন্য এক ঝলক হাসিয়া বলিল, "নিন্ নিন্ একেবারে আকাশ-পাতাল খুঁড়তে ব'সে গেলেন যে, আপনি দেখছি বেজায় ছেলেমানুষ। চা খাবেন, এগিয়ে আসুন।"

কণাদ উঠিয়া একটি চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল, তারপরে চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়া সকুণ্ঠ প্রশ্ন করিল, "কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না, ক্ষমা দেবী! আমার অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হ'চ্ছে, সেদিন আমি কি দোষ ক'রেছি আপনাকে ব'লতেই হবে।"

"দোষের মাত্রাটা একটু বেশী হ'য়ে গেছে—ভদ্রসমাজে তার চলন নেই—ক্ষমারও অযোগ্য।" এই বলিয়া ক্ষমার সুন্দর মুখখানি দুষ্টু হাসিতে ভরিয়া উঠিল।

কণাদ অস্থিরভাবে কহিল—"কিন্তু কি—তাই বলুন! দোষ ক'রে থাকি, তার শাস্তিও আছে—প্রায়শ্চিত্তও আছে।"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষমা কহিয়া উঠিল—"নিশ্চয় আছে! আপাততঃ প্রায়শ্চিত্তটা তোলা থাক, দোষের কথাটাই বলি। ভুঁইফোড় বক্তা কোনো ব্যক্তিবিশেষের প্রশংসায় যদি রাবণ হ'য়ে ওঠে—তা' হ'লে বেচারী ব্যক্তিটিকে বিপদে পড়তে হয়। এই হ'লো আপনার অশেষ দোষ। আচ্ছা মশায়, আপনি সেদিন সারা সন্ধ্যেটা লম্বা লম্বা কথায় আমাকে বাড়িয়ে তুলছিলেন কেন? আপনার সেদিনকার অযথা স্তুতিবাদ আমাকে অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছিল। এতোটা উচ্ছ্বাস ভাল নয়, বুঝলেন কুমার সাহেব?"

কণাদ এতক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া মৃদুহাস্যে বলিল: "ওহো—অধুনা এই দুষ্প্রাপ্যের যুগে কেবল একটী মনোমদ জিনিস সুলভ—সেটি হ'চ্ছে নিছক স্তুতিবাদ। ঐ একটি উপহারই আমরা দিতে পারি প্রাণ খুলে।"

ক্ষমা মাথা নাড়িয়া তাহার সহাস উক্তির প্রতিবাদ করিল।

"না না, কণাদবাবু, আমার কথাটা ঠাট্টা মনে ক'রে হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা ক'রবেন না। বাস্তবিক বলছি—এই আমার মনের খাঁটি কথা। আমি অমন স্তুতিবাদ পছন্দ করি না। পুরুষ জাতটা মেয়েদের মনে করে কি? যা আন্তরিক নয় এমন কতকগুলো প্রশংসার বোঝা চাপিয়ে দিলেই বুঝি মেয়েরা খুব খুসী হ'য়ে ওঠে? পুরুষদের এ-রকম ধারণার কোনো যুক্তি খুঁজে পাই না।"

"কিন্তু আপনাকে আমার প্রশংসায় একটুও ছলনা নেই। মুখে যা বলি মনের সঙ্গে তার কোনোখানে গরমিল খুজে পাবেন না।"

ক্ষমা গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল, "আমি বিশ্বাস করি না। আপনার সঙ্গে আমি ঝগড়া ক'রতে চাই না—কুমার সাহেব, বরং তা'হ'লে দুঃখিতই হব। আপনাকে আমি ভাল চোখেই দেখি—সে আপনি বেশ জানেন। কিন্তু আপনি যে আজকালকার ইঙ্গ-রীতিবিলাসীদের ভিড়ের সঙ্গেই মিশে যাবেন—সে আমি দেখতে পারব না। অনেকের চেয়ে আপনার মতি-গতি ভাল ব'লেই মনে করি। তবে সময়ে সময়ে শুনতে পাই নিজের ওপর অবিচার করেন—মন্দ হবার ভান্ ক'রে।"

"ক্ষমাদেবী, আমাদের সকলেরই ছোটখাটো খেয়াল আছে। তার তৃপ্তির জন্যে মানুষ ভুলও করে, সে-জন্যে তার বড়াই-এরও অন্ত নেই।"

"সেইটেই আপনি বড় ক'রে তুলতে চান নাকি?"

কণাদ শুধু একটু হাসিয়া চা-পানে মন দিল।

ক্ষমা এই নিস্তব্ধতার মুহূর্ত্তে উঠিয়া পড়িয়া পুনরায় ঘর সাজাইতে উদ্যত হইল।

কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিয়া গেল। কণাদ কথা কহিল: "দেখুন—ক্ষমাদেবী, আপনার কথাটা ভাবলুম। কি জানেন: আজকাল যে একটা নতুন সমাজ গ'ড়ে উঠেছে—সেখানে আত্ম-প্রবঞ্চনারি খেলা দেখি। অনেকেই এই সমাজে ঘুরে বেড়ায় ভালোমানুষির মুখোস্ প'রে, কিন্তু আসলে তা'রা আত্মম্ভরি, এরাই

ভদ্র-'লেবেলে' সৎলোক ব'লে চ'লে যাচ্ছে। কিন্তু আমার মধ্যে এ চাতুরী নেই, তাই আমার মনে হয়—এ-রকম সৎনামী হওয়ার চেয়ে বদনামী হবার অভিনয়ও আরো রুচিসুখকর নম্র প্রবৃত্তি। লোকে অভদ্র বলে বলুক। তা' ছাড়া এ-সম্বন্ধে এই বলা যায় যে —আপনি সৎ—এটুকু ভান্ করতে যদি পারেন, তা' হ'লে সকলের মনোযোগ আপনার ওপর এসে পড়বে—আর আপনি বদনামী—এই ছদ্মনামে যদি চল্‌তে পারেন, আপনাকে কেউ আমোলই দিতে চাইবে না। এই তো জগতের ভালো-মন্দ বিচার-বোধ, ভালো দেখবার চোখ সব ঘোলাটে, সাধুত্বাবাদের এইখানেই গলদ—একেবারে আশ্চর্য্যরকমের আহাম্মকী।"

"লোকে আপনাকে সুনজরে দেখুক্—এ আপনার মোটেই ইচ্ছে নয় তা' হ'লে ?"

"লোকের কথা বাদ দিন—তাদের সুনজর—কুনজরে আমার কি আসে যায়? সাধারণ মানুষ কাদের খাতির দেয়, কাদের ভালো চোখে দেখে, জানেন না? একবার ভেবে দেখলেই—বুঝতে পারবেন, যত সমস্ত পোষমানা জড়বুদ্ধি ভোঁতা লোকগুলোরি এ-সংসারে জয়জয়কার—তা' সে সব ক্ষেত্রেই। এখন মেকিরই আদর বেশী এ বাজারে। আমি চাই না ও রকম সুনজরে পড়তে, আমি চাই—এমন চোখ, যা'র দৃষ্টির দাম আছে। ক্ষমাদেবী, আমি চাই—আপনার সুনজরে প'ড়ে থাক্‌তে, আর কারোর নয়—কেবল আপনার।"

"কেন—কেবল আমার কেন? এর অর্থটা কি হোলো?"

কণাদ এই প্রশ্নের জন্ম প্রস্তুত ছিল না। কি সদুত্তর দিবে—তাহা সহসা ভাবিয়া পাইল না।

ক্ষমা কিঞ্চিৎ গলা চড়াইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল: "কি চুপ ক'রে রইলেন যে, বলুন!"

কণাদ একটু ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে কহিল: "আমি যে কথাটা বলেছি—অবশ্য তা'র একটা অর্থ আছে। কেননা আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনার সঙ্গে আমার মতের মিল, মনের মিল, এমন কি অনুভূতিরও মিল পর্য্যন্ত আছে—বিভিন্ন স্তরে আমরা দু'জনে দাঁড়িয়ে থাকলেও। বোধ করি আমাদের অন্তরঙ্গতায় কোনো বাধা নেই—এই অন্তরঙ্গতার ডোরে আমাদের দু'জনার মৈত্রীর রাখীবন্ধন হ'তে পারে। আমাদের বন্ধুতার পাকাসম্বন্ধ অক্ষয় হ'য়ে থাক্। জীবনে হয়তো এমন কোনোদিন আসতে পারে—যখন আপনার এক অকৃত্রিম সুহৃদকে দরকার হবে।"

ঈষৎ বিরক্তির রেশ দিয়া ক্ষমা বলিয়া উঠিল: "ও কথা বল্‌বার মানে?"

"কারণ—এটা নিছক সত্যি যে—আমরা সকলেই সময়ে সময়ে প্রকৃত হিতৈষী বন্ধুদের পাশে পেতে চাই": সহজভাবেই কণাদ এই মন্তব্যটি করিল।

অবরুদ্ধ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সুস্থ মনে ক্ষমা কহিল: "কেন—কণাদবাবু, আপনার সঙ্গে কি নতুন ক'রে আমাকে বন্ধুত্ব পাতাতে হবে? এখনি তো আমাদের বেশ মৈত্রী রয়েছে। দু'জনেই দু'জনার হিতৈষী। এ মৈত্রী চিরদিনই অটুট থাক্‌তে পারে—যদি না আপনি কখনো ভুল ক'রেও—"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ক্ষমার মুখের দিকে চাহিয়া কণাদ বলিল: "ভুল ক'রেও—সে কি?"

অত্যন্ত সংযত কণ্ঠে ক্ষমা উত্তর দিল: "ভুল ক'রেও আমার কাছে বেহিসেবী বাজে বিষয়ের তর্ক তুলে এই বন্ধুত্বের অপমান যতদিন না করেন—ততদিন এর কোনো মার নেই। আপনি বোধ হয় মনে করছেন—আমি একজন উৎকটনীতিবাগীশ মেয়ে? সত্যি কথা, আমার মধ্যে কিছু নীতি-বাই আছে। ঐ ভাবেই আমি ছেলেবেলা থেকে মানুষ হয়েছি। সে আমার গর্ব্ব—আমার সুখ। যখন আমি শিশু—তখন আমার মা-কে হারাই। আমার বড় পিসিমা বিধবা হবার পর থেকে বাবার কাছেই এসে থাকতেন, তিনিই আমাদের সব দেখাশোনা করতেন। তিনি ছাড়া আমার গতি ছিল না—তাঁর কাছে সদাসর্ব্বদাই আমাকে থাক্‌তে হোতো। তাঁর কি কড়া শাসন ছিল, উঠতে-বসতে আমাকে শিক্ষা দিতেন—কোন্‌টা ভালো, কোন্‌টা মন্দ, আর আজকাল যা' মেয়ে-পুরুষে ভুলে যেতে বসেছে—সেগুলোও তিনি বারবার আমার কানে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে শোনাতেন, শেখাতেন, বোঝাতেন। আমার চারধারে বড় পিসিমা একটা বিধানের বেড়া তুলে আমাকে ঘিরে রাখতেন। একালের বিষাক্ত হাওয়া আমার গায়ে যা'তে না লাগে—সেদিকে তাঁর কঠিন লক্ষ্য ছিল। কোনো রকম বিরুদ্ধ মতের সঙ্গে আপোষ করতে তিনি জানতেন না, কোনোকালে প্রশ্রয়ও দেন নি। আমিও একেবারেই প্রশ্রয় দিই না।"

কণাদ যেন হতভম্ব হইয়া গেল। তাহার বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখ দুটিতে নৈরাশ্যের ভাব ফুটিয়া উঠিল। দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে কহিল: "বলেন কি—ক্ষমা দেবী? আপনার এ সমস্ত কথা শুনে আমার এতোদিনের ধারণা যে বদলে ফেল্‌তে হয়!"

ক্ষমা সোফায় হেলান দিয়া বসিয়া শান্ত ভাবে বলিতে লাগিল: "সত্যের খাতিরে তাই করতে হবে। নিজের মনগড়া ধারণার অন্ধ গোলামী করাও তো মস্ত একটা ভুল। আপনার দুঃখু হ'চ্ছে, না, আমি বড় সেকেলে ব'লে? যুগ থেকে পিছিয়ে-পড়া আধুনিক সমাজে অচল এই মহিলাটিকে আপনারা কৃপার দৃষ্টিতে দেখতে পারেন—কিন্তু আমি সত্যিই তাই, এতে আমার এতটুকু লজ্জা নেই। আজকালকার মত সমাজের সমান স্তরে আমাকে ফেল্‌লে—আমি বরং মর্ম্মাহত হবো।"

"বর্ত্তমান কাল বা সমাজ আপনার মতে কি খুব খারাপ?"

"হাঁ: একালের অধিকাংশ মেয়ে-পুরুষ এই জীবন দু'কুড়ি-সাতের খেলা ব'লেই মনে করে, তা'রা আদিম-প্রবৃত্তিগুলোকে শানিয়ে তুল্‌তে উঠে-প'ড়ে লেগে গেছে। জীবন কি তাই—দোকানদারি? এই কি জীবনের উদ্দেশ্য? এর উদ্দেশ্য অনেক বড়—এ জীবন দেবানুগ্রহের একটা বহিঃপ্রকাশ। এর আদর্শ প্রেম। ত্যাগে তা'র শুদ্ধি।"

ক্ষমার তত্ত্বদর্শনে কণাদের মুখে মৃদু হাসি খেলিয়া গেল। সে কহিল: "মাপ করবেন, আপনার মতে সায় দিতে পারলুম না। ত্যাগের চেয়ে এই দুনিয়ায় আমি যে কোনো জিনিসকে ভালো ব'লে গ্রহণ করতে পারি।"

ক্ষমা সোজা উঠিয়া বসিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল : "ও কথা আর কোনোদিন উচ্চারণ করবেন না।"

"যাই বলুন—এই আমার মত। আমি জীবনে বৈরিগী সাজতে চাইনা। যা' আমি বলেছি—আমি জানি ব'লেই বলেছি—আমি এর সত্য অনুভব করি।"

এই তর্কের মধ্যে জনার্দ্দন আসিয়া দাঁড়াইতে ক্ষমা জিজ্ঞাসা করিল : "কি জনার্দ্দন ?" জনার্দ্দন কহিল : "বাইরে গাড়ীবারান্দায় আর দোতালার খোলা-ছাতে কারপেট পেতে দেওয়া হবে কি-না, তাই জিজ্ঞেস ক'ত্তে এসিচি, মা।"

ক্ষমা মৃদুহাস্যে কহিল : "এখন তো জল-কাদার দিন নয়, জনার্দ্দন! পেতে দিতে দোষ কি ? হ্যাঁ—দেখো! ওপরের হলঘরটা নিখুঁৎ ক'রে সকলকে সাজাতে ব'লে দিয়েছ তো ? এতটুকু কাজের ফাঁকি আমি সইবো না, ব'লে রাখছি। হলঘরের পশ্চিম কোণে পূব-মুখো ক'রে প্ল্যাটফর্মটা পেতে দেওয়া হয়েছে ?"

"হ্যাঁ মা : সেখানেই কাজ-কর্ম্ম সাজানো-গোছানো এখন্ চল্‌চে। তবে বাইরে ছাতে কারপেট পেতে দিইগে যাই ?"

"বৃষ্টির তো কোনো ভয় নেই—দাওগে। কি বলেন—কুমার সাহেব, আজকে আমার কপালে মেঘ ওঠবার কোনো সম্ভাবনা আছে নাকি ?"

"অকালে ? তবে প্রকৃতির খেয়াল—বলা যায় না। তবুও আমি জোরগলায় বলছি—মেঘ যদি নির্ম্মল আকাশে হঠাৎ দেখা দেয়—সে আপনারি প'য়ে কেটে যেতেও বেশী দেরী লাগবে না। কেননা—আপনার এই মিলন-তিথির উৎসব-বাসরকে পণ্ড করবার শক্তি কারোর নেই।"

"আপনি বড্ড বাজে বকেন কিন্তু,"—ক্ষমা কৃত্রিম তিরস্কারের ছলে কথাগুলি বলিয়া জনার্দ্দনকে বিদায় দিল—তারপর কণাদের দিকে চাহিয়া বলিল : "কি বলছিলেন কথাটা ?"

"বলছিলুম—ত্যাগের কথা. যা' আমাদের জীবনে অসার ব'লেই মনে করি।"

"এ মনে করবার কারণ কি ?"

"অবশ্য যুক্তি দেখাতে গেলে—অনেক কথাই বলতে হয়। তা' আমি চাই না। একটা ছোট দৃষ্টান্ত দিয়ে কথাটা বোঝাবার চেষ্টা করবো। গোড়াতেই ব'লে রাখছি—আমি যে দৃষ্টান্তটা দোবো—তা' নিছক্ কল্পনা কিন্তু।"

"বেশ তো—বলুন না : এতো ভণিতার বা 'কিন্তু'র দরকার নেই। স্পষ্ট কথা কইবার ভরসাটা অন্ততঃ মানুষের থাকা উচিত।"

কণাদ গলাটা একটু ঝাড়িয়া লইয়া আরম্ভ করিল : "আপনি কি মনে ভাববেন—জানি না—দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক্—এক তরুণপ্রাণ ভালোবাসলে এক তরুণী মেয়েকে, তরুণ কোনদিন সে মেয়েটির সংস্পর্শে আসেনি, তবু তার রূপ আর গুণের পরিচয় পেয়ে তা'র মুগ্ধমন সঁপে দিলে দয়িতার উদ্দেশে—সেই মনোহরাই হোলো তা'র একটিমাত্র ধ্যান, তা'র ভক্ত অন্তরের প্রেম-পূজা নিবেদন করতো দূরে দাঁড়িয়ে। কিন্তু তা'রা মিলতে পেলো না—মিথ্যা. সংস্কার মাঝে এসে সব ব্যর্থ ক'রে দিলে। সেই বঞ্চিত দুর্ভাগা জীবনে খুব আঘাত: পেলে—কিন্তু তা'র ভালোবাসাকে সাগ্নিকের আগুনের মত জ্বালিয়ে রাখলে তা'র গোপন প্রাণের ধ্যান-মন্দিরে। এরপরে তা'র নিঃসঙ্গ জীবনে কত সঙ্গীর আনাগোনা—কত বিকি-কিনি—তবু কিছুতেই তার মন উঠলো না। কত শিক্ষিতা সুন্দরী একালিনীর দুর্ল্লভ পাণির প্রলোভন এলো, একে একে এই অতি-লাভের আশা সে প্রত্যাখ্যান করলে—সে ত্যাগের দুঃখই সেধে নিলে তা'র একনিষ্ঠ ভালোবাসার মুখ চেয়ে। তা'র জীবনে সেই ভ্রষ্টলগ্নই দুরারোগ্য ক্ষতের মত জেগে রইলো। এই যে সে একজনের জন্যে ত্যাগ করলে—পেলে কি ? কেবল ব্যর্থতা—কেবল তিক্ততা—কেবল মমতা-হীন ব্যথাই তা'কে ব'য়ে বেড়াতে হোলো। তা'র ত্যাগের মূল্য সে পেল না। সংস্কার-ক্লিষ্ট সমাজের একচোখোমি—"

ক্ষমা তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল : "অমনি সমাজ সংস্কারের দোষ হয়ে গেল ? এমন পাগলও সংসারে আছে নাকি ? একটা মেয়ের জন্যে ত্যাগ—দেশের জন্যে নয়—ধর্ম্মের জন্যে নয়—কোনো সৎকাজের জন্যে নয়—এ শুধু নিজেকে ঠকানো ছাড়া আর কিছুই নয়। এই রকম একতরফা ভালোবাসার বালাই নিয়ে যে পুরুষ মেতে ওঠে—তাকে আমি প্রশংসা করতে পারি না। তারপর, সে মেয়েটির বরাতে কি হোলো—বলছেন না তো ?"

"সেই মেয়েটির কথাই এবার বলছি। মেয়েটির বিবাহ হোলো এমন এক ছেলের সঙ্গে—যাকে খুব উঁচুদর দেওয়া যায় না। স্ত্রী তাকে আদর্শস্বামী বলেই মনে করে। ধরুণ—তাদের এই দাম্পত্য জীবন প্রায় চার পাঁচ বৎসরের। যদি সেই স্বামী হঠাৎ নিন্দিত চরিত্রের কোনো স্ত্রীলোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাতিয়ে বসে, তার কাছে ঘন ঘন যাতায়াত করে, তা'র সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া—হাসি-গল্প, এমন কি তা'র সমস্ত খরচ-খরচা পর্য্যন্ত হয় তো যোগাতে থাকে, তা'হলে আপনি কি মনে করেন—সেই স্ত্রীর নিজেকে সান্ত্বনা দেবার মতো অবস্থা কি জেগে ওঠে না ?"

ক্ষমা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জবাব দিল : 'নিজেকে সান্ত্বনা দেবে ? এর চেয়ে দুর্ব্বলতা আর থাকতে পারে কি ?"

কণাদ আরো জোর দিয়া বলিল : "একে দুর্ব্বলতা বলেন আপনি ? সান্ত্বনার কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে আশ্রয় না করলে স্ত্রীর বাঁচবার উপায় কি ? আমার মতে এই তার করা উচিত ? আমার মনে হয়—তার যথেষ্ট অধিকার আছে। আপনি কি বলতে চান্—সেই স্ত্রী স্বামীভক্তিকে আঁকড়ে প'ড়ে থাকবে—লাঞ্ছনার পঙ্ক কপালে এঁকে, অশান্তিকে নিত্যসঙ্গী ক'[illegible]্যাগ আর সহ্যের বাহাদুরী দেখাবার জন্যে ?"

ক্ষমা ঝাঁকিয়া বলিয়া উঠিল : "যেহেতু স্বামী মন্দ—স্ত্রীকেও হ'তে হবে মন্দ—এই বলেন নাকি ? চমৎকার যুক্তি—বাঃ!"

কণাদ কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিল : "আমার কথার কদর্থ করবেন না, ক্ষমাদেবী! মন্দ শব্দটা ভয়ঙ্কর কানে বাজে।"

"কারণ—মন্দ জিনিষটাই যে ভয়ঙ্কর—কণাদবাবু! যাক্, আপনার অবাধ বক্তৃতা থামাতে হ'লে—আপনার মুখটা বোঝাই ক'রে দেওয়া নিতান্ত দরকার। অতএব একটু অপেক্ষা করুন—আমি আসছি।" ক্ষমা কোনো উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া ঘর হইতে ক্ষিপ্রপদে বাহির হইয়া গেল। (ক্রমশঃ)

মহাত্মা গান্ধী ও ভারতীয় নেতৃবৃন্দ

বাঙ্গলায় ভারতের প্রায় সমস্ত নেতৃবৃন্দই শুভাগমন করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি। মহাত্মা গান্ধী গত
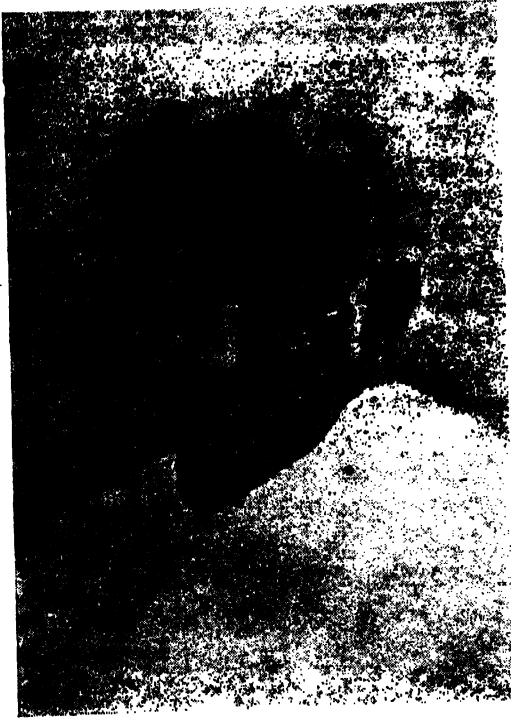
মহাত্মা গান্ধী

১লা ডিসেম্বর শনিবার কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াছেন। অসম্ভব জনতার জন্ম তাঁহাকে মৌরীগ্রাম ষ্টেসন হইতে অবতরণ করাইয়া সোদপুর আশ্রমে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে রাখা হইয়াছে। মহাত্মা পূর্ব্ব বন্দোবস্ত মত শনিবারই বাঙ্গলার গভর্ণর মিঃ কেসীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। ২রা, ৩রা এবং ৪ঠা তারিখেও দীর্ঘকাল উভয়ে আলোচনায় অতিবাহিত করেন। ৩রা তারিখে মহাত্মাজীর মৌনাবস্থায়ও তাঁহার সহিত লিখিত কাগজের সহায়তায় আলোচনা হয়।

গত ১০ই ডিসেম্বর সোমবার লর্ড ওয়াভেলের সঙ্গেও একঘণ্টা কাল আলোচনা করেন। তিনি বরাবর সোমবার সারাদিন মৌন থাকেন, কিন্তু বড়লাটের সঙ্গে দেখা করিবেন বলিয়া রবিবার ২টা হইতে সোমবার ২টা পর্য্যন্ত ব্রত রক্ষা করেন।

মহাত্মাজী প্রতিকাজই সময় মত করিয়া থাকেন এবং প্রত্যেক মিনিটটি তাঁহার নিয়ন্ত্রিত। প্রতিদিন বেলা ৫টার সময় যে জন-প্রার্থনায় পৌরোহিত্য করেন, সেটি বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। প্রার্থনা-ভিলাষীগণের সংখ্যা প্রথমে সহস্রাধিক হইত। এখন পঁচিশ হাজারে উঠিয়াছে। বিরাট জনতা একসঙ্গে নিঃশব্দে ভগবানের আরাধনায় নীরবে ১৫।২০ মিনিট ধ্যাননিমগ্ন থাকে, সে এক অপরূপ দৃশ্য। প্রার্থনায় যোগদানের জন্ম প্রতিদিন কাতারে কাতারে লোক সোদপুর আশ্রমে সমবেত হয়। তাহাদের মধ্যে আমেরিকাবাসী, ব্রিটিশ, চীনা প্রভৃতি সকলেই আসেন, এবং বিশেষভাবে ছাত্রছাত্রীও বহুসংখ্যক উপস্থিত হয়। সমবেত জনগণের মধ্যে প্রায় এক চতুর্থাংশ স্ত্রীলোকও প্রার্থনায় যোগদান

শরৎচন্দ্র বসু

করেন। মহাত্মাজীর প্রার্থনার মূল শৃঙ্খলা (discipline)। পূর্ব্বে সকলকে শান্ত, সমাহিত ও ভগবানে একাগ্র থাকিতে বলেন। আর পরে কখনও কিছু কিছু বলেন। গত ১০ই সোমবার—অর্থ ভগবানের দান বলিয়া সকলকে যথাকার্য্য সংকার্য্যে অর্পণ করিতে বলেন। যাহাতে চিত্তশুদ্ধি আসে, ভগবানের চরণে মাথা নত হয়, ইহাই তাঁহার উপদেশ।

রাষ্ট্রপতি মৌলানা আজাদ বিন্ধ্যাচলে কিছুদিন বাসের দরুণ স্বাস্থ্য কতকাংশে পুনরুদ্ধারে সক্ষম হইয়া আবার কলিকাতা আসিয়া গুরুতর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন; আচার্য্য কৃপালনী, পট্টভাই সিতারামীয়া, মিঃ আসফআলী, গোবিন্দবল্লভ পন্থ, আচার্য্য নরেন্দ্র দেব, শঙ্কররাও দেও, সীমান্তগান্ধী খাঁন আবদুল গফুর খাঁ, সর্দ্দার প্যাটেল, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি সকলেই আসিয়াছেন। আসেন নাই কেবল ডাক্তার রাজেন্দ্রপ্রসাদ। অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি চলাফেরা করিতে অশক্ত। তাঁহার অনুপস্থিতিতে আমরা সকলেই দুঃখিত, বিশেষতঃ মর্ম্মাহত তাঁহার সহকর্ম্মিগণ। ভগবানের নিকট আমরা তাঁহার আরোগ্য কামনা করি।

জওহরলাল নেহরু গত ৪ঠা ডিসেম্বর তুফান মেলে হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া পৌছেন। তাঁহার অভ্যর্থনার্থ কোনরূপ শোভাযাত্রার আয়োজন তিনি নিষেধ করিয়া দিলেও ষ্টেশন হইতে পুল পর্য্যন্ত, এবং পুল হইতে হ্যারিসন রোড হইয়া চিত্তরঞ্জন এভিনিউ পর্য্যন্ত এত অধিক লোক-সমাগম হয় যে ভিড়ের জন্য অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ট্রেণ হইতে অবতরণ করিতে তিনি সক্ষম হন নাই। তাঁহার জনপ্রিয়তা দেখিয়া সকলেরই বিস্ময় লাগিবার কথা। কোন কোন মহলে আতঙ্কেরও সঞ্চার হইয়াছে। ...
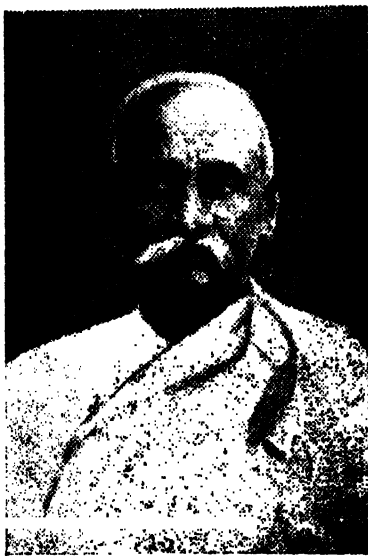
বল্লভভাই প্যাটেল

জওহরলালের জনপ্রিয়তা

জওহরলালের জনপ্রিয়তা এত বেশী যে, তিনি যেখানে উপস্থিত হন, সেখানেই অসম্ভব লোক সমাগম হয়। গত ৮ই
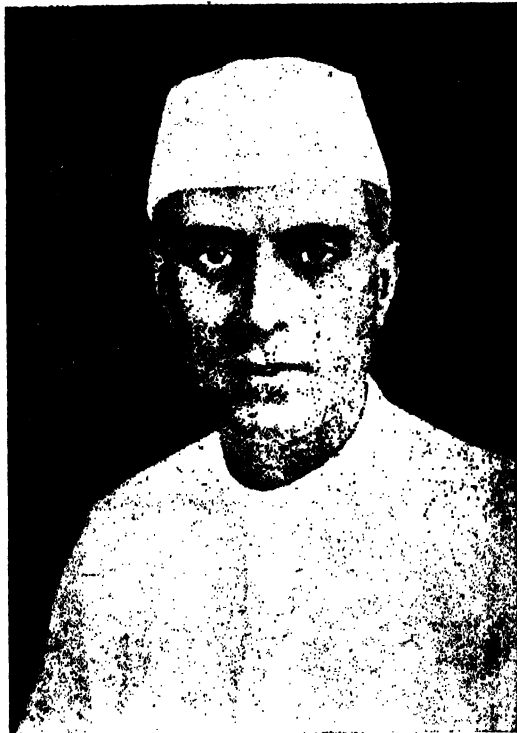
পণ্ডিত জওহরলাল

ডিসেম্বর শনিবার যে আজাদ হিন্দ ফৌজের (I. N. A.) পক্ষ সমর্থন ফণ্ডের (Defence) জন্য দেশপ্রিয় পার্কে সভা হয় তাহাতে প্রায় সাত লক্ষ লোক পার্কে ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহে উপস্থিত ছিলেন। সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলেন, "এরূপ জনসঙ্ঘ ইতিপূর্ব্বে তিনি কখনও দেখেন নাই!' ১০ই ডিসেম্বর বড়বাজার খেঙ্গরাপট্টির সভায়ও প্রায় দুইলক্ষ লোক হইয়াছিল। দেশের লোক জওহরলালকে দেখিতে যেন উন্মত্ত হইয়া উঠে! ভগবান তাঁহার স্বাস্থ্য অটুট রাখুন। আজাদ হিন্দ ফাণ্ডের জন্য অসংখ্য টাকা উঠিতেছে। জওহরলাল আসাম প্রদেশে যাইবার সময় ষ্টেশনে ষ্টেশনে অসংখ্য লোককে বাণী শুনাইতেছেন। গাড়ীতে মাইক্রোফোন লাগানোই আছে।

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের অভ্যর্থনা

[নিম্নলিখিত বিবরণটী আমাদের এক প্রত্যক্ষদর্শী (পুরাতন কংগ্রেস কর্ম্মী)র নিকট হইতে প্রাপ্ত]

গত ২৫শে অগ্রহায়ণ (১১ই নভেম্বর) অপরাহ্ন ৬টার সময় ভারতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে (ওয়ার্কিং কমিটীর সভ্যগণকে) বাঙ্গালার কংগ্রেস কমিটি কর্ত্তৃক জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। অভ্যর্থনাকারী ছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্র-সমিতির কার্য্যকরী

সমিতি। অভ্যর্থনা হয় ৪৬ ইণ্ডিয়ান্ মীরার ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত বিজয়সিং নাহারের বাটীতে 'কুমার সিং' হলে। এতদুপলক্ষে পুরাতন কংগ্রেস

সরোজিনী নাইডু

কর্ম্মী হিসাবে আমাদেরও আহ্বান হয়। নেতৃবৃন্দকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিবার সুযোগ পাইয়া, তাঁহাদের সম্বন্ধে যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম—

বাঙ্গলার কংগ্রেসের কর্ণধারগণের মধ্যে প্রায় সকলেই অভ্যর্থনায় যোগদান করেন—সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, সস্ত্রীক শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়, শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা দত্ত, শ্রীযুক্ত ভূপতি মজুমদার, কালীপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (সম্পাদক বঙ্গশ্রী), প্রতাপচন্দ্র গুহরায়, শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ সান্ন্যাল, বীণা দাস, কমলা দাশ, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার, মাখনলাল সেন, সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (উভয়ে), মনোমোহন ভট্টাচার্য্য, জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়,সোমেশ্বর চৌধুরী প্রভৃতিও আসিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দত্ত, সন্তোষকুমার বসু, সুকুমার দত্ত, ধীরেন্দ্রকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী, শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শৈল মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার মৈত্রেয়ী বসুও ছিলেন। আর ছিলেন সংবাদপত্রের প্রতিনিধি হিসাবে শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সেনগুপ্ত। এতদ্ব্যতীত কয়েকজন মহিলাও সমাগতা হন।

এই বাড়ীতে ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে আর একবার আজাদ সাহেব ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু কংগ্রেস কর্ম্মিগণকে কংগ্রেসের বাণী শুনাইয়াছিলেন। সেবার সভা হইয়াছিল একটী পরিসর গৃহে, এবার অভ্যর্থনা স্থান হয় দক্ষিণদিকের আঙ্গিনায়। প্রায় দুইশত লোক উপস্থিত হইয়া দুই ঘণ্টা বেশ আনন্দে কাটাইয়া দেন। একতান বাদ্য চলিতেছিল এবং এক এক টেবিলে চারিজন করিয়া নানা-প্রকার মিষ্ট, ফল ও চা-এর সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। মধ্যভাগে একটি প্রকাণ্ড টেবিল ও কতকগুলি চেয়ার নেতৃবৃন্দের জন্য সাজাইয়া রাখা হয়। নেতৃবৃন্দের এক একজন দ্বারদেশে উপস্থিত হইতেই বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করা হয়। প্রথমেই আসিলেন তেলেগুর ডাক্তার পট্টভাই সীতারামীয়া। ইনিই কংগ্রেসের ইতিহাস লিখিয়াছেন। বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্য ও নেতৃত্ব সম্বন্ধে বেশী কিছু না থাকিলেও, ইতিহাস খানিতে গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। গোঁফ পাকিলেও, স্বাস্থ্য অটুটই আছে। ইনি একপার্শ্বে আসিয়া নির্ব্বাক হইয়া বসিলেন। তারপরে আসিলেন সেক্রেটারী আচার্য্য কৃপালনী ও তৎপত্নী সুচেতা কৃপালনী আচার্য্যজী অনেকবার বাঙ্গলায় আসিয়াছেন আর ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে দেশবন্ধুর বাড়ীতে মহাত্মাজীর সঙ্গে তিনি ও মহাদেব দেশাই প্রায় দুই মাস কাল অবস্থান করিয়াছিলেন। সুচেতা বাঙ্গালী মেয়ে এবং কংগ্রেসের বাণী বাঙ্গালী মেয়েদের মধ্যে প্রচার করিতেছেন। ১২ই ডিসেম্বর তারিখেও ইনি শ্রদ্ধানন্দপার্কে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বাধীনে মহিলা সভায় বক্তৃতা করিয়াছেন। আচার্য্য কিছুদিন অসুস্থ ছিলেন কিন্তু যে অবস্থায়ই থাকুন, তাহার মুখে সর্ব্বদাই হাসিটি যেন লাগিয়াই আছে। তারপরে আসিলেন উড়িষ্যার হরেকৃষ্ণ মহাতাপ। খুব সুস্থদেহ, বয়স আন্দাজ ৪০ চল্লিশ, আর বেশ উৎসাহী দেখিলাম। তারপরে আসিলেন কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। আজাদ সাহেব সেই পূর্ব্বের ন্যায় ঋজুদেহেই চলেন।—তবে স্বাস্থ্য ও স্ফূর্ত্তি আর পূর্ব্বের ন্যায় নাই। তাঁহার বয়স এখনও ষাট হয় নাই, কিন্তু শ্বেত-শ্মশ্রু ও শ্বেতকেশ দেখিয়া বয়সের ধারণা কেহ করিতে পারিবেন না। ইদানীং শরীর ও মনের উপর এমন ঝড় বহিয়া গিয়াছে যে,গত তিন বৎসরে বিশ বৎসরের বেশী বয়স যেন অলক্ষ্যে বাড়িয়া গিয়াছে। তথাপি তাঁহার চক্ষু, নাসিকা ও মুখমণ্ডলে কত বুদ্ধি যে জমাট রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। হিন্দু-মুসলমানে সমদর্শী আজকাল তাঁহার ন্যায় খুব কম ভারতবাসী আছেন। ইনি যদি নিরপেক্ষ থাকিয়া পরিবর্ত্তন বিরোধী (No changer) ও স্বরাজীদলের সহিত মিল করাইয়া না দিতেন, তবে ১৯২৩ ও ১৯২৪এর কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান কাউন্সিল প্রোগ্রামটি—ইহার অন্তর্ভুক্ত করিয়া নিতে পারিত না। দেশবন্ধুর কার্য্য-সাফল্যে আজাদ সাহেবের সহযোগিতা অল্প কার্য্যকরী হয় নাই।

তার পরে আসিলেন মিসেস্ সরোজিনী নাইডু। বক্তৃতা পূর্ব্বের মত দিতে পারিলেও মুখে বার্দ্ধক্যের ছায়া পড়িয়াছে। দেহেও

জীর্ণতার চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। কাছে স্থিরভাবে বসিলেন ইন্দিরা গান্ধী। ইতিমধ্যে শরৎবাবু সহ কমিটির অন্যতম মেম্বর ডাক্তার প্রফুল্ল ঘোষ মহাশয়ও আসন গ্রহণ করেন। নিকটে ছিলেন নগেনদাস বাবু —অন্যদিকে সর্দ্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল সদুহিতা মণিবেন আসিয়া একদিকে বসিলেন। গম্ভীর বদন, ইনি কথা কহেন খুব কম। তৎপরেই দেখিলাম মিঃ আসফ আলীকে। ইনিও দিল্লীর কংগ্রেসে (১৯২৩) দেশবন্ধুকে বিশেষ সহায়তা করেন। বর্ত্তমানে আজাদ-হিন্দ-ফৌজের ডিফেন্সের ব্যারিষ্টাররূপে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতেছেন। আচার্য্য নরেন্দ্র দেব পূর্ব্বেই আসিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। দেখিলাম সকলেই অপেক্ষা করিতেছিল একজনের জন্যই সবার চেয়ে বেশী। সকলের চক্ষুগুলিই যেন বাহিরের দিকে তাঁহার প্রতীক্ষায় ঘুরিতেছিল। এতক্ষণে তিনি আসিলেন, আর দৃষ্টিগোচর হইতেই সকলে উৎসাহে স্ফীত হইয়া উঠিল। এবার খাঁন আবদুল গফুর খাঁ সহ ভিতরে প্রবেশ করিলেন পণ্ডিত জওহরলাল। জওহরলালের চুল সব পাকিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু স্বাস্থ্য যেন আরও ভাল হইয়াছে। বয়স, চলাফেরার শক্তি ও বুদ্ধি সমভাবেই বাড়িতেছে। একটা মূর্ত্তিমান জ্যোতির মত আসিয়া সকলের সঙ্গে আপ্যায়ন করিতে লাগিলেন। অক্লান্ত পরিশ্রমী, বিশ্রাম নাই, নিদ্রায় খুব অল্প সময়ই অতিবাহিত করেন, অনুক্ষণ কেবল মাথায় ঘুরিতেছে-ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী। নির্ভীক, অদম্য উৎসাহী, অমানুষিক ক্লান্তিবিমুখ, ভারতমাতা তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন। তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন অহিংসার অন্যতম

আব্দুল গফুর খাঁ (সীমান্ত গান্ধী)

প্রতীক সীমান্ত গান্ধী—মহাত্মা গান্ধীর প্রধান মন্ত্রঃপূত সখা ও শিষ্য। সকলকে দেখিয়া চক্ষু তৃপ্ত হইল। কিন্তু দেখিলাম না কেবল শঙ্কর রাও দেওকে, আর একজন অহিংস সেনাপতি ডাক্তার রাজেন্দ্র প্রসাদকে। শঙ্কর রাও দিল্লী চলিয়া গিয়াছেন, আর রাজেন্দ্র
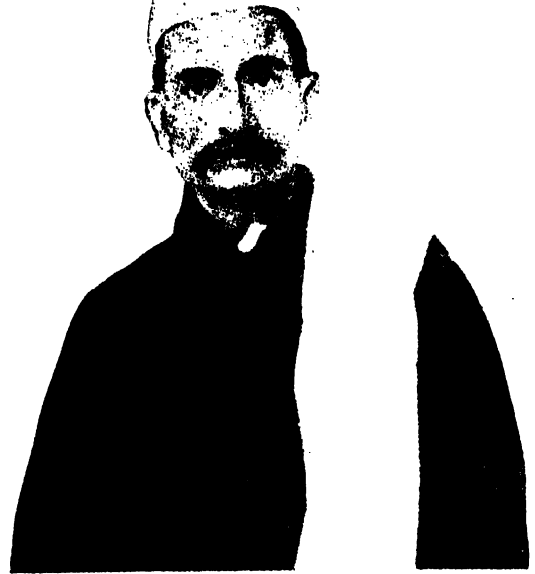
ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ

বাবু অসুস্থতানিবন্ধন কলিকাতা উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

দেশমাতৃকার ঐকান্তিক সেবায় উৎসর্গীকৃত এই বীরবৃন্দ বঙ্গবাসীর শ্রদ্ধা সাদরে গ্রহণ করুন।

ছাত্রগণ ও গুলিচালনা

গত ২১শে নভেম্বর কলিকাতায় ছাত্রদের শোভাযাত্রা উপলক্ষে পুলিসের সঙ্গে যে হাঙ্গামা হয়, তাহাতে কয়েকটি ছাত্র নিহত হয় এবং কয়েকজনের জখম খুব গুরুতর আকার ধারণ করে।

গোলমাল হয় আজাদ হিন্দ ফৌজ দিবস প্রতিপালন উপলক্ষে। এই ফৌজ সংক্রান্ত তিনজন নেতৃস্থানীয় সৈন্যাধ্যক্ষের বিচার যে দিল্লীর লাল কেল্লায় হইতেছে, তাহা আমরা অগ্রহায়ণ মাসের 'বঙ্গশ্রী'তে উল্লেখ করিয়াছি। এতদুপলক্ষে যে উত্তেজনা ও জাতীয়তার সঞ্চার হইয়াছে, তাহা একটা প্রবল ও দুর্ব্বার বন্যার মত সমস্ত ভারতভূমিকে প্লাবিত করিয়াছে। বিশেষতঃ পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল, মিঃ আসফ আলী প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের বক্তৃতায় ছাত্র ও যুবকগণ আরও উদ্বোধিত হইয়া উঠিয়াছে। গত ৯ই নভেম্বর তারিখের শরৎবাবুর দেশবন্ধু পার্কে বক্তৃতায় ছাত্রগণ খুবই উৎসাহশীল হইয়া উঠিয়াছে। লাক্ষ্ণৌ, দিল্লী প্রভৃতির ছাত্রগণও ইতিপূর্ব্বে ধর্ম্মঘট ও শোভাযাত্রায় নিজেদের উৎসাহের পরিচয় দিয়াছে। বাংলার ছাত্রগণও পশ্চাদপদ থাকা উপযুক্ত বোধ করে নাই।

মোকদ্দমার কয়েকদিন শুনানীর পরে উহা মুলতুবী হয় এবং

পরে ২১শে নভেম্বর মিঃ নাগের জেরা আরম্ভ হয়। সেই দিনই কলিকাতার ছাত্রগণ—ষ্টুডেন্টস্ কংগ্রেস, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র সংসদ, ও ষ্টুডেন্টস ফেডারেসন সংশ্লিষ্ট ছাত্রগণ, ওয়েলিংটন স্কোয়ারে একটী সভা করে। সভায় স্থির হয় যে, ছাত্রগণ একটী শোভাযাত্রা করিয়া ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, ওল্ডকোর্ট হাউস হইয়া তাহারা ডালহৌসী স্কোয়ার বৌবাজার দিয়া কলেজষ্ট্রীটে যাইবে। সভাতে তাহারা ধর্ম্মতলা হইয়া যখন ম্যাডানষ্ট্রীটের মোড়ে নিউসিনেমার সম্মুখে যায়, পুলিস তখন তাহাদিগকে বাধা দেয়! কারণ সরকারী ব্যবস্থায় লালদিঘী দিকটা নিষিদ্ধ স্থান (protected area) ছাত্রগণ অতঃপরে আর অগ্রসর না হইয়া ঐ স্থানেই বসিয়া পড়ে। তাহাদের পক্ষ হইতে কতিপয় ব্যক্তি প্রধান জননায়ক শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়কে সেই স্থানে আসিয়া যথোপযুক্ত উপদেশ দিতে ফোনের সহায়তায় অনুরোধ করেন। শরৎবাবু আসিতে না পারিয়া যখন লোক পাঠাইয়া ছাত্রদিগকে সেই স্থান হইতে চলিয়া যাইতে বলেন, তাহার পূর্ব্বেই ছাত্রদের মধ্যে অনেকে গুলির আঘাতে আহত হয়, কেহ কেহ (৩ জন) মৃত্যুমুখে পতিত হয়!

ছাত্রগণের শোভাযাত্রা যখন আটক হয়, তখন অপরাহ্ণ ৪টা। তাহারা ইহার পরেও ঘণ্টা দেড়েক ঐ অবস্থায়ই বসিয়া কাটাইয়া দেয়। তখন অফিসের ছুটির সময়! ফেরত যাত্রীরা অবস্থা দেখিয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া যায় এবং দর্শকবৃন্দও চারিদিক হইতে আসিয়া পুঞ্জীভূত হয়। সেই বিপুল লোকসমাগম থাকিলেও, গাড়ী ট্রাম বন্ধ হওয়ায়, ক্রমেই ভিড় বাড়িয়া ওঠে ও অন্যান্য পথযাত্রীর অসুবিধা হয়।

পুলিসের ডেপুটি কমিসনার উপস্থিত থাকিলেও গুলিবর্ষণের কোন হুকুম দেন না। কিছুক্ষণ বাদে শ্বেতাঙ্গ পুলিস শোভাযাত্রিগণের মধ্যে আসিয়া তাহাদিগকে দুই দলে বিভক্ত করিয়া ফেলে—একদল থাকে পশ্চিম দিকে—একদল থাকে পূর্ব্বদিকে। ইহারা আবার সম্মিলিত হইতে প্রয়াস পাইলেই তাহাদের উপর লাঠিচালনা করা হয়। অনেকে আহত হইলেও অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহারা আবার সম্মিলিত হইতে সমর্থ হয়।

ছাত্রগণকে এইরূপে লাঠিচালনায় ছত্রভঙ্গ করিবার সময় দূর হইতে কিছু ঢিল আসিয়া কোন কোন লোকের গায়ে পড়ে এবং কোন কোন পুলিশের লোকও আহত হয়! এই সময়েই পুলিশ দুইবার গুলিবর্ষণ করে এবং বহু ছাত্র হতাহত হয়।

গুলিবর্ষণের পরে শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়, অতুলকুমার, ইন্দুভূষণ বীদ্, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভাইস চ্যান্সেলার রাধাবিনোদ পাল, শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী প্রমুখ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ভদ্রমহিলাগণ আসিয়া হাঙ্গামা স্থলে উপস্থিত হন। রাত্রি ১১টার সময় গভর্ণর মিঃ কেসীও আসিয়াছিলেন। কিন্তু ছাত্রগণ তাহাদের সঙ্কল্পচ্যুত হয় নাই। বৃহস্পতিবার সকাল পর্য্যন্ত তাহারা সেই খানে একই ভাবে উপবিষ্ট ছিল।

ছাত্রগণ যে ধীর, শান্ত ও অহিংসাপূত অবস্থায় বেলা ৪টা হইতে ভোর ৮টা পর্য্যন্ত সেখানে ছিল, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। গভর্ণর সাহেবও, উপবিষ্ট শোভাযাত্রিগণ যে ঢিল ছুঁড়িয়াছে, কথা বলেন নাই। আর তাহাদের পক্ষে ঢিল সংগ্রহ করাও অসম্ভব ছিল। তবে ঢিল আসিল কোথা হইতে? ইহা বলা মুস্কিল,—কারণ ছাত্রগণ লাঠির আঘাতে প্রস্তুত হইয়াছে দেখিয়া সহানুভূতিবশতঃ দূর হইতে কেহ নিক্ষেপ করিতে পারে, কোন কুচক্রীর কার্য্যেও এরূপ হইতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ইহার কারণ নির্দ্দেশ করে। এমতাবস্থায় কোথা হইতে ঢিল আসিল, কেন বেপরোয়াভাবে প্রথমে লাঠি ও পরে গুলি—এই নিরীহ ছাত্রদের উপর চালনা করা হইল, কোন্ সময়ে এবং কোন্ অবস্থায় গুলি মারিবার দরকার, কেন শোভাযাত্রা ডালহৌসী স্কোয়ার দিয়া প্রথম দিনে যাইতে দেওয়া হইল না এবং গুলি মারিবার প্রয়োজনীয়তা আদৌ ছিল কিনা—ইত্যাদি নানা বিষয়ের সত্য নির্দ্ধারণের জন্য আমরা একটি স্বাধীন ভাবাপন্ন ব্যক্তির দ্বারা "অনুসন্ধান কমিটী" গঠিত করিতে গভর্ণর সাহেবকে অনুরোধ করি; আর সেই কমিটী যাহাতে হাইকোর্টের বিচারপতি এবং স্বাধীনচেতা বে-সরকারী ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিদ্বারা গঠিত হয়, ইহাও আমরা দাবী করি।

এ পর্য্যন্ত যেরূপ ঘটনা বিবৃত হইল এবং গভর্ণর সাহেব কর্তৃক যাহা সমর্থিত হইয়াছে, তাহাতে এমন কিছু হয় নাই যে কোন অবস্থায়ই গুলিচালনার আবশ্যকতা ছিল। এ বিষয়ে দেশীয় ব্যক্তিগণ এবং গভর্ণমেণ্ট হয় তো পরস্পরবিরোধী মত পোষণ করিতে পারেন, তাই তাহাদের যুক্তির অবতারণা করা নিষ্প্রয়োজনীয় মনে করি। সম্প্রতি ষ্টেটসম্যান কাগজ একখানি পত্র প্রকাশ করিয়া উহার সমর্থনকল্পে যে সম্পাদকীয় মন্তব্য করিয়াছেন, পাঠকবৃন্দের নিকট আমরা সেইখানি উপস্থিত করিতে চাই! ফ্রেণ্ডস এম্বুলেন্স ইউনিটি ও আমেরিকান ফ্রেণ্ডস সার্ভিস কমিটী তাহাদের চিঠিতে স্পষ্টভাবে মন্তব্য করিয়াছেন, নিরস্ত্র নিরীহ জনতার উপর গুলিবর্ষণের কোন যুক্তিই থাকিতে পারে না। ইহারই ফলে এতগুলি ব্যক্তির প্রাণনাশ ঘটিয়াছে"—we do not feel, the situation warranted the firing by the police on unarmed crowds which resulted in so many deaths"—এতদ্ব্যতীত ১লা ডিসেম্বরের ষ্টেটস্ম্যানে মিঃ বার্ণার নামক জনৈক ইংলণ্ডবাসীও জিজ্ঞাসু হইয়াছেন—

Is it permissible for the police to use firearms against an unarmed non-violent demonostration. নিরস্ত্র নিরীহ শোভাযাত্রিগণের প্রতি গুলিবর্ষণ কি কাহারও অনুমোদিত? আমেরিকান সেবা সমিতির ও পূর্ব্বোক্ত পত্র লেখকের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া আমরাও বলিতেছি এতগুলি প্রাণনাশ হওয়ায় গভর্ণর বাহাদুর কি অনুসন্ধান কমিটীর সহায়তায় সেই আততায়ী ব্যক্তিগণকে দণ্ডাই করিবেন না? আমাদের মনে হয় প্রত্যেক সদিচ্ছা-প্রণোদিত ব্যক্তিই অনুসন্ধান কমিটি চাহিবেন।

বুধবারের ঘটনা বিদ্যুৎগতিতে সহর ও নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে সঞ্চারিত হইয়া পড়ে। বৃহস্পতিবার সকালে শোভাযাত্রাটি সরিয়া পড়ে, কিন্তু সমস্ত স্থান ঘুরিয়া আবার বেলা ১টার সময় যখন ঐ স্থানে উহা আসে, তখন লোকসংখ্যা হয় অনুমান দেড়লক্ষ। দুই একবার গুলি হওয়ার পরে অজ্ঞাতিক্ষ কারণে পুলিশ-

বাহিনী অপসারিত হয়। সেই বিপুল জনতা ডালহৌসী হইয়া কলেজ ষ্ট্রীট যাইয়া নিজেদের প্রতিজ্ঞা অটুট রাখিতে সক্ষম হয়। ছেলেদের সঙ্কল্প জয়যুক্ত হয়, কিন্তু পুলিস বা সরকারী কর্ম্মচারীদের কাহারও কোনস্থানে বিন্দুমাত্র আঘাতও হয় না। সর্ব্বত্র শান্তি ও অহিংসা বিরাজ করে। পরে সেই জনতা রামেশ্বর বানার্জ্জি নামে এক ছাত্রের শবানুগমন করিয়া কেওড়াতলায় দাহকার্য্য সমাপন করে। বৃহস্পতিবারও যখন ছাত্রদের দ্বারা কোনরূপ অনর্থ সাধিত হয় নাই, তখন সমস্ত ঘটনাটিই যেন তিলকে তাল করার মত করা হইয়াছে। উৎসাহী ছাত্রগণকে বুধবার বাধা না দিলে ঐরূপ অনর্থ ঘটিত না। বিশেষতঃ গভর্ণর ইতিপূর্ব্বে সমস্ত রাস্তাই সাধারণের গম্যস্থান বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন। এই স্থানটি নিষিদ্ধ হইলেও ছাত্রগণের তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। আর তাহারা এখানে আসিবার জন্য কোনরূপ বলপ্রয়োগ বা হিংসার সহায়তা গ্রহণ করে নাই! বিশেষতঃ বৃহস্পতিবার যখন তাহাদিগকে গন্তব্যস্থানে যাইতে দেওয়া হইয়াছিল, তখন ঐ নিরস্ত্র ও নিরীহ শোভাযাত্রাকারিগণের প্রতি গুলিবর্ষণের কোন অর্থই হয় না। আমাদের এই মত অষ্টিন ডি অণ্ডারউড প্রমুখ কতিপয় ব্রিটিশ সৈনিকও সমর্থন করিতেছেন। (ষ্টেটস্‌ম্যান ২রা ডিসেম্বর)

যাহা হউক, ছাত্রদিগকে একদিকে যেমন আমরা তাহাদের অমানুষিক সাহসের জন্য অভিনন্দন করিব, অন্যদিকে আবার তাহাদিগকে দুই একটী সতর্ক বাণীও দিতে ইচ্ছা করি। প্রশংসা করি—তাহারা নির্ভীকভাবে হাসিমুখে গুলি খাওয়ার জন্য যে বুক পাতিয়া দিয়াছিল, সেই সাহস ও বেপরোয়া প্রাণের জন্য। প্রাণের ভয় তুচ্ছ করিয়া আজ নিরস্ত্র বাঙ্গলার ছাত্রগণ যে মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়াছে, তাহার তুলনা ভারতে কেন, জগতের ইতিহাসে নাই। আর তাহাদের কার্য্যে কোনরূপ ত্রুটিও হয় নাই বলিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করিতেছি। কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট মৌলানা আজাদ বলিয়াছেন, এরূপ শোভাযাত্রা করিয়া তাহারা কোনরূপ অন্যায় করে নাই—They were justified in taking procession as a protest against I. N. A. trial.

যদিও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তাহাদিগকে শোভাযাত্রা করিতে নির্দ্দেশ দেয় নাই, কিন্তু তাহারা যখন সভা ও শোভাযাত্রা আরম্ভ করিয়াছে, তখন কেহ নিষেধও করে নাই। বহুদূর আসিবার পরে ছাত্রগণ যখন পুলিশের সম্মুখীন হয়, তখন তাহারা সুবোধ ছেলের মত চলিয়া গেলে নিজেরা অপরের কাছে ভীরু প্রমাণিত হইত মনে করিয়া সম্ভবতঃ বিপদ-স্থান পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই। তবে তাহারা শরৎবাবুর বাণী ও উপদেশ চাহিয়াছিল। তিনি আসিয়া বলিলে হয়তো তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিত। কারণ একে শরৎবাবু নিজেই শ্রেষ্ঠ উপদেশক, তার উপরে আজাদ হিন্দ ফৌজের স্রষ্টা ও পরিচালক 'নেতাজীর' জ্যেষ্ঠ সহোদর আর বাঙ্গলার অবিসম্বাদী নেতা। কিন্তু শরৎবাবু আসিতে পারেন নাই বলিয়া তাহাদের অভিমানের উদ্রেক হওয়াও খুবই স্বাভাবিক। অবশ্য শরৎবাবু বিশেষ কারণে আসেন নাই। আমরা সেজন্য তাঁহার বিরুদ্ধে কোন মন্তব্য করা সমীচীন মনে করি না। তবে তিনি না আসিয়া ব্যক্তিগতভাবে যেমন অন্যায় করেন নাই, ছাত্রগণও তেমনি ভীরু অপবাদ না নিয়া নিজেদের সঙ্কল্প জয়যুক্ত করিতে সক্ষম হইয়া ছাত্র-সংহতির অসাধারণ সাফল্যই প্রমাণিত করিয়াছে। আমরা ছাত্রগণের অমানুষিক কার্য্যে, সঙ্কল্পের দৃঢ়তায় ও মৃত্যুভয়হীনতায় তাহাদিগকে অভিনন্দিত করি। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রগণের তথাকথিত বালক-সুলভ ত্রুটি ভুলিয়া ইহাদের কার্য্য নিজেদের বলিয়া দায়িত্ব গ্রহণ করিলে কতক সময়ের জন্য অন্ততঃ তাহারা নিজেদের নিঃসহায় মনে করিত না। আমাদের এ বিষয়ে নেতৃবৃন্দের সম্পূর্ণ দায়িত্ব সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অন্যদিকে ছাত্রগণকেও সর্ব্বাগ্রে পূর্ব্বের ন্যায় সংহত ও ভবিষ্যতে জাতীয় নেতার অধীনে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে অনুরোধ করি।

আরও একটি কথা ছাত্রগণকে বলিতে চাই এই যে, ভবিষ্যতে তাহাদিগকে আরও বিনয়ী এবং সংযমী হইতে হইবে। অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার ফলে তাহারা যে প্রকৃতই গৌরবের অধিকারী, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু গর্ব্বে যেন তাহারা স্ফীত না হয়, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। বিনয় জয়কে আরও মহিমামণ্ডিত করে। আর ভবিষ্যতে কার্য্যসম্পাদনে কর্ত্তৃত্বভার নিজেদের উপরে না রাখিয়া দেশের নেতৃবৃন্দের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিয়া অখণ্ড ভারতের মুক্তির জন্য যাহাতে তাহারা এবারের ন্যায় পরেও সংহত, শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং অহিংসাপূত মুক্তিফৌজের কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে, ইহাই হইবে তাহাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। শক্তি যাহাদের আছে এবং সেই শক্তি যাহাতে ক্ষয় না হইয়া বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহাদিগকে অনুরূপ সংযম ও নিয়মানুবর্ত্তিতার পথে চলিতে বলাই আমাদের মূল বক্তব্য।

পরবর্ত্তী ঘটনা ও নেতৃবৃন্দ

বুধবার রাত্রে যে সকল নেতৃবৃন্দ ছাত্রদিগের উপর বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করেন তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডক্টর রাধাবিনোদ পাল ভাইস্‌ চ্যানসেলার ও শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলীর নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। গভর্ণর মিঃ কেসিও ব্যক্তিগতভাবে ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া প্রায় ঘণ্টাখানেক যে তাহাদের সঙ্গে ছিলেন, ইহা তাঁহার হৃদয়ের উদারতারই পরিচায়ক। ইতিপূর্ব্বে অন্য কোন গভর্ণর-চ্যান্সেলারকে ছাত্রদের প্রতি এরূপ সমবেদনা প্রকাশ করিতে দেখা যায় নাই। তাঁহার উদার দৃষ্টিভঙ্গিতেই ছাত্রগণকে বিনা বাধায় বৃহস্পতিবারে শোভাযাত্রা করিয়া যাইতে দেওয়া হয়। অন্য কেহ হইলে হয়তো আফিস মহলে সেদিনও রক্তগঙ্গা প্রবাহিত হইত। অবশ্য বৃহস্পতিবার বেলা তিনটার সময় শ্রীযুক্ত শরৎ বসু মহাশয় গভর্ণরের সেক্রেটারী মিঃ টাইসনকে পুলিস বাহিনী সরাইয়া নিতে ফোনে অনুরোধ করেন। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ বুধবার অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গভর্ণর বাহাদুর ও ছাত্রদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। বৃহস্পতিবারও তিনি শোভাযাত্রার অগ্রে অগ্রে ছিলেন। তিনি যেরূপ বিচক্ষণ ও সহানুভূতি সম্পন্ন, তাহাতে মিঃ কেসিকে উদার মনোভাব লইয়া ছাত্রদের ব্যাপার

বিবেচনা করিতে নিশ্চয়ই বলিয়াছেন। শরৎবাবু এবং শ্যামা প্রসাদ বাবু উভয়েই ধন্যবাদার্হ, কিন্তু তাঁহারা যত চেষ্টাই করুন, গভর্ণর বাহাদুরের সহৃদয়তা ভিন্ন ছাত্রদের সঙ্কল্প সিদ্ধ হইত না।

অতঃপরে বৃহস্পতিবারে সমস্ত কলিকাতা ও সহরতলীতে যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত হরতাল হয়, এ সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। সঙ্গে সঙ্গে এরূপ হরতাল এত সুষ্ঠুভাবে পূর্ব্বে কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই। ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, গাড়ী, রিক্‌সা, সাইকেল সর্ব্বপ্রকার যানই বন্ধ হইয়া যায়। দোকান-পাট বন্ধ, স্কুল, আফিস থিয়েটার সিনেমা সবই বন্ধ থাকে। এই সমস্ত বুধবার রাত্রির অনাচারে স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিক্ষোভের অভিব্যক্তি। তবে পরিতাপের বিষয় এই যে কতকগুলি মিলিটারী লরী পোড়ান হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে বড় চীৎকার ও গোলমাল হইয়াছে। কেহ কেহ আক্রান্তও হইয়াছিল। এ সবই হিংসাত্মক এবং তজ্জন্য এ সবই যে কেবল সমর্থনযোগ্যই নয় তাহা নহে,—জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী!

গভর্ণর বাহাদুর সত্যই বলিয়াছেন, "এই সব কার্য্যে কোন সুফল হয় না, আর ইহাতে কাহারও উপকারও হয় না।" আমরা গভর্ণর বাহাদুরের সহিত একমত। কিন্তু এ জন্য দেশবাসীকেই উহার দায়িত্ব দিলে বিচার এক তরফা হইবে। বুধবার সন্ধ্যা ও রাত্রিতেও যেরূপ অমানুষিক পীড়ন ছাত্রগণের উপরে চলিয়াছিল, তাহাতে সমগ্র দেশবাসীর তিক্ততা যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। "ভূমিকম্প বা জলোচ্ছ্বাসের মত" আসিলেও এগুলিকে দমিত করা যায় এবং আমাদের মনে হয় বুধবার রাত্রিতে পুলিশ যদি হঠকারিতা না দেখাইয়া একটু ধৈর্য্য ও স্থির মস্তিষ্কের আশ্রয় নিতেন, তাহা হইলে এরূপ অনর্থ হইত না। তবে সুখের বিষয় এই যে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের চেষ্টায় এবং শরৎ বাবু, কিরণবাবু ও শ্যামাপ্রসাদ বাবু, ভূপতি বাবু প্রমুখ নেতৃবৃন্দের উপদেশে শুক্রবার বৈকাল হইতেই সহরে শান্তভাব ফিরিয়া আসে।

কংগ্রেস ও আই-এন-এ'র বিচার

আই-এ-এ সম্বন্ধে কংগ্রেস যে দুইটি ফাণ্ড গঠন করিয়াছেন এবং নেতাজী এবং অন্যান্য স্বদেশপ্রাণ বীরগণের সাহসিকতা ও জাতীয়তা বোধ যেরূপ উচ্ছ্বসিতভাবায় মুখরিত হয়, তাহাতে পাছে কংগ্রেস নীতি সম্বন্ধে কেহ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন, তজ্জন্য কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলির আলোচনা ইতিপূর্ব্বে আমরা করিয়াছি। এ সম্বন্ধে গত ১০ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় আর্য্য সমাজ হলে কংগ্রেসের মনোভাব সম্বন্ধে আচার্য্য কৃপালনী যে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়াছেন, পাঠকের অবগতির জন্য তাহা আমরা এখানে দিলাম—

"আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিক যে খুবই স্বদেশ-প্রেমিক, ইহারবিন্দুমাত্র সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। পোল্যাণ্ড, রুশিয়া, মহা চীনের লোকেরা যেমন নিজ নিজ দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল ইহারাও সেইরূপই করিয়াছে। তবে তাহাদের উপায় জাতীয় মহাসমিতির উপায় হইতে স্বতন্ত্র। তাহারা সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে, কিন্তু কংগ্রেসের প্রণালী অহিংসা। সুভাষবাবু অহিংসায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া পাশ্চাত্য আদর্শের দেশভক্তি ও রাজনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া

ক্যাপ্টেন শাহনওয়াজ

বিরাট ও অসীম সাহসিক উপায়ে পুলিশের চোখে ধূলি দিয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হন। তিনি যে অসাধারণ দেশপ্রেমিক বীর, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই. কিন্তু কংগ্রেসের দিক্ হইতে তাহার বীরকার্য্য সত্য ও অহিংসার অননুমোদিত। কংগ্রেসের নীতিতে একান্ত বিশ্বাসী গান্ধীজী এরূপ করিতে পারিতেন না, আর করিলেও কংগ্রেস তাঁহাকেও সমর্থন করিত না।"

ভরসা করি অতঃপরে কংগ্রেসের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ নীতি অনুধাবন করিতে কাহারও অসুবিধা হইবে না।

আই-এন-এ ফাণ্ড

সম্প্রতি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নেতৃত্বাধীনে দুই প্রকারের দুইটি ফাণ্ডই ন্যস্ত হইল। একটী ফাণ্ডের দ্বারা ডিফেন্সের অর্থাৎ আসামীগণের পক্ষ সমর্থনের জন্য পূর্ব্বেই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কোর্ট মার্সেল বিচারে যে সমস্ত আসামীরা পর পর আসিবেন, ইহাতে সকলের ডিফেন্সেরই ব্যবস্থা হইবে।

কিন্তু আই,এন,এ, সৈনিক বা অফিসারদের যাতায়াত বা থাকা খাওয়ার বা তাহাদের পরিবারবর্গের অর্থ সাহায্যের কোন ব্যবস্থা ইতিপূর্ব্বে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে করা হয় নাই। কয়েকজন বোম্বাইতে একটী বৃহতী সভা করিয়া অপর এক ফাণ্ড খোলেন। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় কার্সিয়াং-এ ছিলেন। তিনি আহূত হইয়া বোম্বাই গিয়া ঐ ফাণ্ড উদ্বোধন করেন। অতঃপরে কলিকাতারও একটী ফাণ্ড হয়। সম্পাদক হন শ্রীযুক্ত সীতারাম সাক্‌সেরিয়া এবং অমিয় বসু কোষাধ্যক্ষ, কুমার দেবেন্দ্রলাল

অমৃতবাজার পত্রিকা অফিসও একটা আই এন এ ফাণ্ড খুলিয়াছেন। আরও কেহ কেহ খুলিয়াছেন। দ্বিতীয় ব্যাপারের ফণ্ড অনুমোদিত হওয়ার জন্য সংবাদ পত্রে কিছু বাদানুবাদ হয়। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম যে, অতঃপরে সমস্ত ফণ্ডের সব টাকাই কংগ্রেস নির্দ্ধারিত ফণ্ডে যাইবে। আর এই ফণ্ডের প্রধানই হইতেছেন শ্রীযুক্ত বল্লভ ভাই প্যাটেল। সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রকাশ।

আই-এন-এর দ্বিতীয় দফা ও বারহানুদ্দিন

আমরা ইতিপূর্ব্বে জানাইয়াছি যে প্রথম দফার কাপ্তেন শা নওয়াজ, কাপ্তেন সেইগল ও লেঃ দিলনের বিচার এখনও চলিতেছে। সরকার পক্ষের সাক্ষী হইয়া গিয়াছে। আসামীদের উক্তির পরে এখন এই পক্ষের সাক্ষী জবানবন্দী হইতেছে। সওয়াল জবাব শীঘ্রই হইবে। সম্ভব হইলে আমরা আগামী মাসে বিচারের আইন ও ঘটনা সম্বন্ধে সাধ্যমত আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব।

দ্বিতীয় দফার আসামী কাপ্তেন বারহানুদ্দিনের বিচার আরম্ভ হয় অন্য একটা সামরিক আদালতে, আর বিচারক পক্ষের সভাপতি হন ব্রিগেডিয়ার করিয়াপ্পা। কিন্তু প্রথমেই মিঃ বুলাভাই দেশাই আইনের তর্ক উপস্থিত করেন যে, ভারতবর্ষের কোন আদালতে আসামীর বিচার হইতে পারে না। তিনি বলেন "stripped of all legal verbage, the simple position is that my client can not be prosecuted by you.

আইনের বাগাড়ম্বর না করিয়া সোজা কথায় বলি যে আমার মক্কেলের বিচার আপনাদের আদালতে হইতে পারে না। সকলে স্তম্ভিত, কিন্তু ভুলাভাই সকলের মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছেন। সমস্যার সমাধান এখনও হয় নাই।

বারহানুদ্দিন সীমান্ত প্রদেশ চিত্রলের সামন্তরাজের—চলিত ভাষায় চিত্রলের মহত্তরের সহোদর। মুসলিম লীগও তাহার ডিফেন্সের (পক্ষ সমর্থনের) ভার নিতে উৎসুক ছিলেন। কিন্তু তিনি উহার সাহায্য নিতে অস্বীকার করেন। চিত্রল ব্রিটিশ ভারতের বাহিরে। সেখানকার বাসিন্দার বিচার এখানে হইতে পারে না, এই অজুহাত টিকিবে কিনা পরে সিদ্ধান্ত হইবে। আমরা সিদ্ধান্তের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

আম্মা স্বামীনাথান

দশ হাজার আটশত তিপান্ন ভোট পাইয়া আজাদ হিন্দ ফৌজের নারী বাহিনীর নেত্রী লক্ষ্মীবাঈর মাতা আম্মা স্বামীনাথান জ

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তি কলিকাতা দেশপ্রিয় পার্কে অনুষ্ঠিত সভায় মঞ্চ-দৃশ্য

হিন্দ ধ্বনির মধ্যে মাদ্রাজ সহর হইতে কেন্দ্রীয় পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। নূতন পরিষদে তিনিই প্রথম শপথ গ্রহণ করিবেন, কারণ শ্রেণীভেদ অনুসারে মাদ্রাজের সভ্যগণই প্রথম

ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী

শপথ লইয়া থাকেন। সর্ব্বাগ্রে নেন যিনি মাদ্রাজ সহরের প্রতিনিধি হইয়া আসেন। মিঃ সত্যমূর্ত্তি, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের পূর্ব্বে এরূপ সম্মান লাভ হইয়াছিল। আমরা আম্মার এই সম্মানে আনন্দ প্রকাশ করিতেছি।

লর্ড ওয়াভেল ও জিন্নাজী

লর্ড ওয়াভেল এসোসিয়েটেড্ চেম্বার অব কমার্সে বক্তৃতার সময়ে কংগ্রেসকে সর্ব্বপ্রধান রাজনৈতিকদল বলাতে জিন্নাজী একটু উষ্মা প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—"মুসলমানরা কোন দলভুক্ত নয়। উহারা একটা স্বতন্ত্র জাতি; তাই তাহাদিগকে সংখ্যাল্প বলা উচিত নয়।"

জিন্নাজীর বলিবার পক্ষে আর একটু সুবিধা হইয়াছে। লর্ড ওয়াভেল ক্রীপসের কথার প্রতিধ্বনি করিয়াই এসোসিয়েটেড্ চেম্বার অব কমার্সে বলিয়াছেন "স্বাধীন একটী গভর্ণমেণ্ট বা একাধিক গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইবে।" হয়তো দেশীয় রাজ্যগুলির কথা চিন্তা করিয়া একাধিক গভর্ণমেণ্টের উল্লেখ তিনি করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে কেহ কেহ হয়তো পাকিস্তানের গন্ধ পাইতেছেন। অখণ্ড ভারতের পরিপন্থী আত্মঘাতী এরূপ কোন প্রস্তাবই আমরা অনুমোদন করিব না।

মুসলমানদের সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্বাপরই এককথা। ভারতবাসী, সে হিন্দুই হউক মুসলমানই হউক। কর্তৃত্ব থাকিলে কোন মুক্তিপ্রয়াসী ভারতবাসীর কোন কারণ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। বরং বুদ্ধি কর্তৃপক্ষের মধ্যে তদনুরূপ ভাবাপন্ন মুসলমানের সংখ্যা বেশী হয়, একতা ও মিলনের জন্য অ-মুসলমানগণ তাহা করিলে আমাদের আনন্দ ছাড়া নিরানন্দ হওয়ার কোন কারণ থাকে না এবং সেইরূপ হইলেই আমরা সুখী হইব। তবে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ঐক্য সম্বন্ধে লর্ড ওয়াভেল যাহা বলিয়াছেন অন্ততঃ মুসলমানদের সম্বন্ধে সেরূপ শঙ্কিত হইবার কোন কারণ নাই, তাহা কংগ্রেসের মতিগতি দেখিয়া আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। তবে বড়লাটের একটী কথায় আমরা বড় আনন্দিত হইয়াছি। তিনি সমগ্র মুসলমানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কোন দল বিশেষের সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবাবলী

গত ৭ই ডিসেম্বর হইতে ১১ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৫ দিন ব্যাপিয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন কলিকাতায় হয়। এই কয়দিনে ৯টি বৈঠক হয় এবং তন্মধ্যে ৭টি হয় প্রেসিডেণ্ট আজাদ সাহেবের বাড়ীতে, দুই বার হয় মহাত্মা গান্ধীর সকাশে সোদপুরে আশ্রমে। এতদ্ব্যতীত প্রথম দিনও কলিকাতায় আজাদ সাহেবের বাড়ী গভর্ণর বাহাদুরের সঙ্গে যে সমস্ত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল ও বড় লাটের সঙ্গে যেরূপ সূত্রে আলোচনা করিবেন, সেই বিষয়ে কথা-বার্ত্তা বলেন। এই কয়দিনে মোটামুটি নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়—

(১) ব্রহ্ম ও মালয়ের ভারতীয়গণকে সহায়তা করিবার জন্য পণ্ডিত জওহরলালকে প্রেরণ;

(২) জাতীয় বাহিনীর লোকদের ও তাহাদের পরিবারবর্গের সহায়তা কল্পে সর্দ্দারজীর নেতৃত্বে কমিটী গঠন, [অন্যান্য সভ্য জওহরলাল, শরৎ বসু, কৃপালনী প্রমুখ আরও ১১ জন—সেক্রেটারী শ্রীপ্রকাশ নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির কোষাধ্যক্ষ হইবেন।]

(৩) নানা প্রদেশের নির্ব্বাচন ব্যাপারে পরস্পরে যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিষ্পত্তির জন্য জওহরলালজী, মিঃ আসফালী ও পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ বিভিন্ন প্রদেশে যাইবেন।

(৪) কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন এপ্রিল মাসে দিল্লীতে করা স্বিরীকরণ;

(৫) অহিংস-নীতিতে দৃঢ় আস্থা রাখিবার প্রস্তাব—

(৬) নির্ব্বাচনী ইস্তাহার অনুমোদন ও প্রকাশ—

(৭) ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টিস্থ সদস্যগণের নির্ব্বাচনমূলক পদ গ্রহণে অক্ষমতা—

(৮) ছাত্রগণের নির্ভীকতার সাধুবাদ প্রদান;

(৯) ইন্দোনেশিয়ায় ভারতীয় সৈন্য প্রেরণের বিরুদ্ধে ও পণ্ডিত জওহরলালের জাভা যাত্রায় নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ,

(১০) মালয় ও ব্রহ্মদেশের জন্য ডাক্তার বিধান রায়ের কর্তৃত্বাধীনে একটি মেডিকেল মিশন গঠন করিতে তাঁহাকে অনুরোধ।

কংগ্রেসের অহিংস নীতি

গত ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের নীতি নির্দ্ধারিত হয় 'শান্তিপূর্ণ ও অহিংস'। ১৯২১-এ বাঙ্গলাদেশ ও অন্যান্য প্রদেশে যে স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গঠিত হয়, তাহা সম্পূর্ণ অহিংস ছিল। কিন্তু উক্ত বৎসরের ১৭ই নভেম্বর বোম্বাই নগরীতে ও ১৯২২এর ফেব্রুয়ারীতে চৌরীচৌরায় সংঘটিত হিংসামূলক অনাচারে গান্ধীজী এতই বিক্ষুব্ধ ও উদ্বেলিত হইয়া যান যে তিনি সত্যাগ্রহ করিবার পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেন। ইহার পরেও উপদেশে, রচনায় ও বক্তৃতায় মহাত্মাজী, এবং ভারতীয় কংগ্রেস বরাবর অহিংস নীতির আশ্রয়েই এ পর্য্যন্ত দেশের মুক্তিসংগ্রাম চালাইয়া আসিয়াছেন। তবে এবার কলিকাতার ওয়ার্কিং কমিটীর সভায় অহিংস নীতির উপর জোর দেওয়া হইল কেন, কেনইবা কংগ্রেসের সভাপতি মহাশয়ও মন্তব্য করেন যে এবারকার অধিবেশনে ইহাপেক্ষা আর অধিক প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব নাই! আর স্বয়ং মহাত্মাজীই বা কেন প্রস্তাবটির খসড়া রচনা করিয়াছেন?

ইহার কারণ দুইটী। ১৯৪২, আগষ্ট মাসে 'ভারত ছাড়িয়া যাও' প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাহার ফলে অনেক দিন পর্য্যন্ত এমন একটা বিরাট বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে যে বহুলোক হতাহত হয়, বহু সম্পত্তি, অর্থ ও প্রতিষ্ঠান নষ্ট হয়, টেলিগ্রাফের তারকাটা হয়, রেলগাড়ী লাইনচ্যুত করা হয় ও অনেক সাধারণের সম্পত্তি জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। এই বিদ্রোহের সহিত কংগ্রেসের কোনরূপ সংস্রব ছিল না বলিয়াই গান্ধীজী বলেন—"এই সমস্তের জন্য কংগ্রেস দায়ী নয়, বুরোক্রেসীর অবিমৃষ্যকারিতা দায়ী।" বস্তুত: যে ভাবে প্রস্তাব পাশ করিবার দুই এক ঘণ্টার মধ্যেই মহাত্মা গান্ধী, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু প্রমুখ সমস্ত নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং দুই একদিন মধ্যে সমস্ত প্রাদেশিক নেতাগণও তাহাদের অনুসরণ করিতে বাধ্য হন তাহাতে জনগণের প্রতি সংহত হইবার উপদেশ দান ও তাহাদিগকে পরিচালনা করিবার পক্ষে নেতৃবৃন্দের কোন অবকাশই ছিল না। কিন্তু জওহরলালজী ও পরে ডাক্তার রাজেন্দ্রপ্রসাদ ঐ নিরীহ লোকদের স্বতঃস্ফূর্ত্ত অনাচারমূলক কার্য্যাবলীর দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলেন—"ইহাই প্রকৃত বিপ্লবাত্মক অভ্যুত্থান। ইহা পুস্তকে পড়া যায় এবং জ্ঞানীলোকেরা হয়ত বলিতে পারেন ইহা ঠিক নয় কিন্তু ভূমিকম্প বা জলোচ্ছ্বাসের মত ইহা উঠিয়া খণ্ড বা বৃহৎ দেশ বিকম্পিত ও প্লাবিত করিয়া তোলে। আর এইরূপ হওয়াই ভারতের রূপ।" পণ্ডিত জওহরলালের বলিবার উদ্দেশ্য এই যে হিংসা ও অনাচারের ফলে এই অনর্থ সংঘটিত। অত্যাচারে ভারতীয় প্রাণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি হিংসার প্রশ্রয় দেন নাই। তথাপি সাধারণ লোক পণ্ডিতজীর কথাগুলি হিংসারই দ্যোতনা মনে করিয়া কংগ্রেস নীতির প্রতি শ্রদ্ধা হারাইতে পারেন। ইতিপূর্ব্বেই বিলাত ও আমেরিকা হইতে নূতন রকমের প্রচার-কার্য্য শুরু হইয়াছে। "সানডে টাইমস্" পত্রিকাই সর্ব্বাপেক্ষা মুখর। ইহা লিখিয়াছে—

"কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বিশেষতঃ পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু অধুনা যেরূপ হিংসার প্ররোচনা করিতেছেন, তাহাতে লর্ড পেথিকের সতর্কবাণী বেশ সময়োপযোগী হইয়াছে। কারণ উহাদের কথা ও কার্য্যে সামঞ্জস্য নাই। গান্ধীজী অবশ্য অহিংসাপন্থী কিন্তু জওহরলাল প্রভৃতির বক্তৃতা খুব গরম। ঐরূপ বক্তৃতার জোরে নির্ব্বাচনের সাফল্য আসিলে, উহার সুবিধা লইতে অহিংস গান্ধী কি আপত্তি করিবেন?"

দ্বিতীয়ত: আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যগণের পক্ষ সমর্থন করে সভাসমিতি শোভাযাত্রা বক্তৃতার কথা এবং সাক্ষীদের মুখে স্বাধীন ভারতীয় বাহিনীর রোমাঞ্চকর ইতিহাস শুনিয়া স্বতঃই লোকদের অহিংসার প্রতি বিরাগ বা অশ্রদ্ধা আসা অসম্ভব নয়। অথচ হিংসায় যে ভারতের স্বাধীনতা কখনও অর্জ্জিত হইতে পারেনা

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

একথা নেতাজীর গুরু এবং ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ত্যাগবীর দেশবন্ধু মন্ত্রের ন্যায় বিশ্বাস করিতেন। এমতাবস্থায় ওয়ার্কিং কমিটী যে খুব ক্ষিপ্রকারিতার সহিত প্রস্তাবটি গ্রহণ করিয়া দেশবাসীকে আবার সচকিত করিয়া দিয়াছেন ইহা খুব সময়োপযোগী হইয়াছে এবং ইহা আমরা সম্পূর্ণ সমর্থন করি। প্রস্তাবটি এই—"কংগ্রেস-সেবক ও কংগ্রেস-কর্ম্মিগণকে ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রামে সম্পূর্ণ অহিংসনীতিতে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করেন। [illegible] কংগ্রেস এপর্য্যন্ত আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যগণকে [illegible] জানাইতেছেন, তাহার অর্থ এই নয় যে-কংগ্রেস শান্তিপূর্ণ [illegible] পন্থাগুলির দ্বারা স্বরাজলাভ করার যে-নীতি সেই নীতি হইতে বিচ্যুত হইয়া সরিয়া গিয়াছে।

গত কলিকাতার ঘটনাও অনুরূপ। শোভাযাত্রী ছেলেদের প্রতি গুলিবর্ষণ এবং তাহাদের সহনশীলতা এক শ্রেণীর মধ্যে পড়ে, আর দ্বিতীয় দিনের গাড়ী পোড়ান প্রভৃতি অন্যশ্রেণীর হিংসাত্মক ব্যাপার। দ্বিতীয়টি প্রথমটীর স্বাভাবিক অভিব্যক্তি হইলেও উভয় ব্যাপার স্বতন্ত্র। তাই প্রথমটি ওয়ার্কিং কমিটি শতমুখে প্রশংসা করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন—"ছাত্রগণ গুলি-বৃষ্টির মধ্যে অবিচলিত থাকিয়া অহিংসার পথে অদম্য সাহসিকতা প্রদর্শন করিয়াছে।" অবিলম্বে বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক একটী নিরপেক্ষ ও প্রকাশ্য তদন্ত গঠনের দাবী জানান।

ভারত সচিবের উক্তি ও গভর্ণমেণ্ট

আমরা বহুদিন হইতে জানি, রক্ষণশীলই হৌক, উদার নৈতিকই হৌক কি শ্রমিক গভর্ণমেণ্টই হৌক ভারতের প্রতি সকলেরই একরূপ মনোভাব। সম্প্রতি ভারত সচিব লর্ড পেথিক লরেন্সের উক্তি হইতে আমাদের ধারণা আরও বদ্ধমূল হইয়াছে। সম্প্রতি তিনি লর্ড সভায় ও স্যর হার্ব্বার্ট মরিসন (লর্ড প্রেসিডেণ্ট) কমন্স সভায় যে তুল্যরূপ দুইটী উক্তি করিয়াছেন, আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া এই সত্য প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইব। তাঁহারা আশ্বাস দিয়াছেন যে, ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের একটী প্রতিনিধিদল শীঘ্রই ভারতে আসিতেছে। এই প্রতিনিধিদলে না কি সকল দলের সভ্যই থাকিবে। এই স্থানে এইটুকু বলিয়া রাখি যে, গত ১৯৪২এর মার্চ্চ মাসে স্যার ষ্টাফর্ড ক্রীপস্ আসিয়া কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তাহা শেষাশেষি পর্য্যন্ত কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ প্রভৃতি যাবতীয় রাজনৈতিক অনুষ্ঠান কর্ত্তৃকই বর্জ্জিত হয়। অতঃপরে নেতৃবৃন্দের মুক্তির পরে ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়াভেল বিলাতের গভর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনা করিয়া আসিয়া সিমলায় নেতৃবৃন্দকে আহ্বান করিয়া যে প্রস্তাব করেন, তাহাও ব্যর্থ হইয়া যায়। অতঃপরে শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে লর্ড ওয়াভেল আবার বিলাত যান এবং পরে আসিয়া বলেন—

"সাধারণ নির্ব্বাচন হওয়ার পরে সমস্ত প্রদেশস্থ নির্ব্বাচিত ব্যক্তিদিগের মধ্য হইতে একটী শাসনতন্ত্র গঠনকারী সমিতি (constituent assembly) গঠিত করিতে হইবে, তাহারা ক্রীপস্ প্রস্তাব অথবা অন্য কোন প্রস্তাবানুযায়ী শাসনতন্ত্র গঠন করিবেন। ভাইসরয়েরও একটী মন্ত্রিসভা থাকিবে। ইহা সকল দল হইতেই গঠিত করিতে হইবে।

সুতরাং ভাইসরয়ের উক্তির পরে যখন নির্ব্বাচনপর্ব্ব আরম্ভ হইয়াছে এবং কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্ব্বাচন প্রায় শেষ হইয়াছে, তখন প্রতিনিধি দল আসিবার কারণ আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে প্রেরিত সাইমন কমিসন ভারতে রাজনৈতিক কমিশনের ব্যর্থতাই প্রমাণিত করিয়া গিয়াছে। এই রাজনৈতিক দল না কি ভারতের প্রধান রাজনৈতিক নেতাদের সহিত আলাপালোচনা করিয়া শাসনতন্ত্র গঠন সম্বন্ধে তাহাদের মতামত জানিয়া যাইবেন। এই দলটির আসিবার কারণ যে, ভারতবর্ষকে দ্রুত পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান করিবার জন্য,—বড় লাট যে কার্য্য-পদ্ধতি বর্ণনা করিয়াছেন,—তাহার গুরুত্ব বুঝি ভারতের জনসাধারণ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। আমরা এই দলের আগমন ভারতের স্বার্থের দিক হইতে ভাল হইবে বলিয়া মনে করিনা। বরং ওয়াভেল যেরূপ আশ্বাস দিয়াছিলেন, তাহা আরও শিথিল হইবারই সম্ভাবনা। লর্ড পেথিক লরেন্স বলেন—

(১) পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন লাভ হইবে, তবে তাহা সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণভাবে অনেক কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়া [লর্ড ওয়াভেলের উক্তিতে তাহা ছিলনা]।

(২) যে পর্য্যন্ত পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন লাভ না হয়, কেহ জোর বা ভয়প্রদর্শন করিয়া (force or threat) উহা (ভাবী শাসনতন্ত্র) ছিনাইয়া নিতে পারিবেনা।

(৩) আইন ও শৃঙ্খলারক্ষা কল্পে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্ণ-মেণ্ট যথাক্রমে তাহাদের দায়িত্ব পালন করিবেই করিবে!

(৪) ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর বা শাসনকর্ম্মচারীদের বাধ্যতা বা আনুগত্য নষ্ট করিবার উন্মাদ প্রচেষ্টা ব্রিটিস গভর্ণমেণ্ট বরদাস্ত করিবেনা। এ বিষয়ে ভারত গভর্ণমেণ্ট যে ব্যবস্থা করিবেন, ব্রিটিস গভর্ণমেণ্ট তাহা সমর্থন করিবেন।

(৫) এই প্রতিনিধিদল কোন বিষয় প্রবর্ত্তন করিবে না, ইহার কোন মতামতে গভর্ণমেণ্ট আবদ্ধ হইবেনা।

আমরা লর্ড মর্লি, মিঃ মণ্টেগু, ম্যাকডোনেল্ড, এমেরি, প্রভৃতির নিকট যেরূপ কথা শুনিয়া আসিয়াছি, এও ঠিক সেই ধরণেরই কথা। সুতরাং এই বিষয়ের আলোচনায় কোন ফল নাই। হুমকি ও ভয় প্রদর্শন বরদাস্ত হইবেনা, তাও পুরাতন কথা। যখন ভারতীয় কংগ্রেসের কার্য্যপদ্ধতি অহিংসামূলক; ভারত নিজেও হিংসার পথে চলিতে চায় না। অপর পক্ষও বৃথা হিংস্র হইয়া উঠে, ইহা অভিপ্রেত মনে করে না। হিংসা যাহার দ্বারাই হউক—দণ্ডার্হ। তবে একটা কথায় যেন মনে হয়—ভারতের অবস্থায় শাসকদের মনে একটা ভীতির সঞ্চার হইয়াছে। সিপাহীবিদ্রোহের মত একটা অবস্থার আঁচ কি গভর্ণমেণ্ট পাইতেছেন? কোনরূপ বিদ্রোহ অভিপ্রেত নয়। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী। নিরস্ত্র ও অহিংস ভারতবাসীদ্বারা ভারতবর্ষের মধ্যে কোনরূপ বিদ্রোহ সম্ভবও নয়। তবে নিরস্ত্র ও মূক হইলেও অসন্তোষের বিষাক্ত আবহাওয়া সমগ্র জাতির মন এতই তিক্ত করিয়া ফেলে, এবং হাতে না পারিলেও সম্মিলিত দীর্ঘ নিঃশ্বাসও যে কোন লোক, যে কোন সম্প্রদায় এমন কি বিরাট প্রতিষ্ঠানের পক্ষেও সুখকর হয় না, গভর্ণমেণ্টকে আমরা এই কথাটি বিশেষভাবে অনুধাবন করিতে বলি।

ইন্দোনেসিয়া ও ইন্দোচীন

এই দুইটী স্থানের অর্থ ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে গতমাসে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। সম্প্রতি ইংলণ্ডেও শ্রমিক সভ্যগণ তাঁহাদের সম্বন্ধে যে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন এইবার তাহার আলোচনা করিব। ইন্দোনেসিয়া ছিল যুদ্ধের পূর্ব্বে ওলন্দাজ সরকারের কর্ত্তৃত্বাধীনে আর ইন্দোচীন ছিল ফরাসীর। অবস্থা এই যে, উভয় দেশবাসীই এখন পরের অধীন না থাকিয়া

স্বাধীনতার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছে। তাহাতে যথাক্রমে ওলন্দাজ ও ফরাসী তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ করিয়া স্ব স্ব রাজ্য করায়ত্ত করিতে চায় এবং উভয় দেশস্থ বৈদেশিক গভর্ণমেণ্টকে ইংরাজ সরকার সহায়তা করিতেছেন।

সম্প্রতি বড়লাট বাহাদুর ইন্দোনেসিয়ায় ভারতীয় সৈন্য নিয়োজিত করার সম্পর্কে বলিয়াছেন, "এই সৈন্যগণকে সেখানকার আন্দোলন দমন করিবার জন্য পাঠান হয় নাই। জাপ সৈন্যদের নিরস্ত্র করা, আমাদের পক্ষের যুদ্ধবন্দীদিগকে মুক্ত করা দয়া ধর্ম্মের কাজ, এই কাজেই তাহারা নিয়োজিত হইয়াছে! তবে তাহারা যুদ্ধ করিতেছে কেন? যুদ্ধ করিতেছে যে সমস্ত চরমপন্থীরা জাপ শত্রুর প্ররোচনায় ও সহায়তায় এই মহৎ কার্য্যে বাধা দিতেছে, তাহাদিগের বিরুদ্ধে!"

এই কথা বড়লাট বলেন গত ১০ই ডিসেম্বর। কিন্তু পরদিনই কংগ্রেস কমিটি ভারতীয় সৈন্যগণকে ইন্দোনেসিয়ায় প্রেরণ করিবার জন্য প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে।

সুতরাং কংগ্রেস বড়লাটের মতের পোষকতা করে নাই! ইতিমধ্যে সিঙ্গাপুরে একটি সম্মেলনে ইংরাজ, ওলন্দাজ ও ফরাসীরা আলোচনা করিয়া তাঁহাদের ইতিকর্ত্তব্য ঠিক করিয়াছেন। ইহাতে জাভার কেহ, এমন কি নরমদলের কেহই আহুত হন নাই, আর সম্মিলনীর সিদ্ধান্ত তাহাদের মনঃপুতও হয় নাই।

এই সম্মিলনীর সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে নরম দলের নেতা মিঃ শারীর বলেন, "কেবল মাত্র চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে লড়াই করিবার অজুহাত অর্থহীন, ইংরাজ বলিতেছে চরমপন্থীরা দমিত হইলেই ওলন্দাজ ও নরমপন্থীদের মধ্যে আপোষ আলোচনা হইবে। কিন্তু তাহা অসম্ভব, ইন্দোনেশিয়ায় রক্তগঙ্গা প্রবাহিত হইলে শান্তিপূর্ণ আলোচনার কোন আশা বা সম্ভাবনা নাই।"

সুলতান শারীরের আরও মত যে স্বাধীনতার আন্দোলনের যাহারা বাধা দিবে তাহারাই শত্রু।

দেখিতেছি কেবল সুকর্ণ বা হাট্যা নয়, নরমদলের লোকেরাও স্বাধীনতা লাভে একান্ত উদ্‌গ্রীব। তারা মনে করে শারীরের গভর্ণমেণ্ট স্বীকৃত হইলেই পূর্ণ শান্তি আসিবে। মিত্র পক্ষীয় অনেক বন্দী এবং নিরস্ত্রীকৃত জাপ সৈন্যদের তাহাদের অর্পণ করা হইবে এবং ইংরাজ যাহা চায় তাহাই হইলে ধর্ম্ম ও পুণ্য রক্ষিত হইবে। মিঃ শারীর আরও বলেন, "কেন ইংরাজ ও ভারতীয় সৈন্য জাভায় প্রেরিত হইতেছে? ইহারা যেখানে উপস্থিত হয় সেখানেই গোলোযোগের সূত্রপাত হয়।"

ইংরাজ ও জাভাস্থ নরমদলেরও দৃষ্টিভঙ্গি যখন সম্পূর্ণ পৃথক, তখন এ সম্বন্ধে ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টে সম্প্রতি যে সমস্ত আলাপালোচনা হইয়াছে পাঠকের নিকট উপস্থিত করিব। টম ড্রিবার্গ নামক একজন শ্রমিক সভ্য পূর্ব্বদেশগুলি পরিভ্রমণ করিয়া যে ছবি দিয়াছেন "তাহাতে মনে হয় ইন্দোনেসিয়াবাসিগণ নিজেদের স্বাধীনতা লাভেই অগ্রসর হইয়াছে। সেখানে অন্ততঃ ক্যানেডা বা অষ্ট্রেলিয়ার মত গভর্ণমেণ্ট দেওয়া উচিত। পূর্ব্বদেশ মাত্রই বিপজ্জনক হইয়া পড়িয়াছে।" তাঁহাকে সমর্থন করিয়া মেজর ওয়াট বলেন, "ভারতীয় সৈন্য ব্যবহার করায় সাধারণের মন তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এবং ভারতের জাতীয় কাগজগুলি এই বিষয়ে বিশেষ তেজোদৃপ্ত ভাষায় আমাদের নীতির প্রতিবাদ করিতেছে। ভারতীয়রা বলিতেছে (আর ন্যায্য ভাবেই বলিতেছে) ভারতেও এই নীতিই চলিবে। শীঘ্রই ভারতীয় সৈন্য অপসারিত করা বিধেয়।" উইলিয়াম গ্যালেমার বলিয়াছেন "আমরা সেখানে কেন গিয়াছি? আমেরিকানরা যেরূপ যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল, ইহারাও সেইরূপ করিতেছে। "They had as much right to fight for liberty as the Americans had in the War of Independence!"

সবই ওলন্দাজদের ভুল। ব্রিটিশদের সৈন্য—বিশেষতঃ ভারতীয় সৈন্য পাঠাইবার কোন কারণই ছিল না,—এই ভাবেই বহু সভ্য বক্তৃতা দিয়াছেন। কিন্তু একটি আঘাতেই রাজ্যসমূহের মন্ত্রী মিঃ ফিলিপ নোয়েল বেকার সকলকে স্তব্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহার বক্তৃতা অনেকটা আমাদের বড়লাট ওয়াভেল সাহেবেরই অনুরূপ। অধিকন্তু তিনি ওলন্দাজদের প্রতি কৃতজ্ঞতা খুবই প্রয়োজনীয় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন "সিঙ্গাপুর সম্মিলনী হয় সামরিক প্রশ্ন নির্দ্ধারণ জন্য। তাহাতে আবার স্থানীয় লোক পাঠানো হইবে কেন? ওলন্দাজরা মিটাইয়া ফেলিতেই চায়। তাহাদের যে মিটমাটের প্রস্তাব হইয়াছে সে বিষয়ে কি হয় আগে দেখা যাক, পরে অন্যকথা হইবে।" ব্যস্, ইহার পরেই সব ঠাণ্ডা। ইন্দোনেশিয়ার শেষ ফলাফল দেখিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া রহিলাম।

গভর্ণমেণ্টের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা

গত ১০ই ডিসেম্বর বড়লাট সাহেবের বক্তৃতা হইতে বুঝা যায় যে, যুদ্ধোত্তরকালের জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট দুইটী পরিকল্পনা করিয়াছেন—একটি স্বল্পকালের জন্য যেমন দুই একবৎসর, দ্বিতীয়টি দীর্ঘকাল মেয়াদী। প্রথমটি হইল যুদ্ধকাজে নিযুক্ত পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের পুনরায় নাগরিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন বন্দোবস্ত—যেমন শিক্ষাদান, কাজ দিয়া স্থিতু করা, কিরূপে শ্রমিকদিগকে কাজ দেওয়া যায় তজ্জন্য শিল্প, কৃষি ও স্বাস্থ্য বিষয়ে নানা পরিকল্পনা ইত্যাদি। এই অল্প সময় তাহাদিগকে খুব দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে।

দ্বিতীয়টিতে কৃষি ও শিল্প বিষয়ে যাবতীয় উন্নতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। চাষের উন্নতি বিধান কল্পে (১) উন্নত সেচ ব্যবস্থা (২) উন্নত ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ আবাদ এবং (৩) উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বীজ বপন করিয়া জমির ফসল বৃদ্ধি করিতে হইবে।

শিল্পের উন্নতির জন্য প্রচুর কাঁচা মাল রহিয়াছে। কলকারখানার সাহায্যে তাহা কাজে লাগাইতে হইবে। উহাতে যে সমস্ত শ্রমিক কাজ করিবে, তাহাতে তাহাদের সংসার চলিতে পারিবে।

কলকারখানা চালাইবার জন্য কেবল শ্রমিকের সাহায্যই লওয়া হইবে, জলতাড়িত বিদ্যুৎশক্তি দরকার হইবে, আর দক্ষ

কারিগর তৈয়ারের জন্য বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে।

কিরূপে ভারত গভর্ণমেণ্টের এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইবে এবিষয়ে সমস্ত প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। সম্প্রতি বাঙ্গলার গভর্ণর মিঃ কেসী গত ৮ই ডিসেম্বর যে বিবৃতিটি দিয়াছেন, তাহা হইতে কিছু আভাস পাওয়া যায়। তিনি বলেন—

"বাঙ্গলাদেশের শস্যের অবস্থা ভাবিলে দেখা যাইবে যদি কোন বৎসর ফসল খুব ভাল হয় তবেই সারাবৎসরের খাওয়ার বন্দোবস্ত হইতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ বৎসরই চাহিদা অপেক্ষা উৎপন্ন হয় খুব কম শস্য। জল পায় না বলিয়া চাষ হয় না। তাই কৃষিজীবিগণ বৎসরে ছয়মাস বসিয়া কাটাইয়া দেয়। ইহার কারণ জলসেচের বন্দোবস্ত খুব শোচনীয়। নদীগুলির মুখ বুজিয়া যাওয়ায় স্বল্পতোয়া হইয়া পড়িয়াছে, খাল-নালাগুলিও প্রায় তাই জলশূন্য থাকে। বর্ষা বা খড়ার সময়ে যদি তুল্যভাবে নদী-নালাগুলিতে জল-সরবরাহ হইয়া থাকে, তবে জলশেচ এবং চাষের পক্ষে খুবই সুবিধা হয়। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে তিস্তা ও দামোদর উপত্যকায় বাঁধ নিম্মাণ করাইয়া বার মাসের জন্য জল রাখা হইবে এবং তাহাতে সাড়ে সাত কোটি টাকা খরচ পড়িবে। বরাবর নদীতে প্রবাহ থাকিলে, শেচ ইচ্ছামত চলিবে, ৪০।৫০ মাইল ব্যাপী খালে সর্ব্বদা নৌকা যাতায়াত করিতে পারিবে এবং জলতাড়িত বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদিত হইবে। ইহাতে একদিকে হাওড়া, হুগলী, বর্দ্ধমান ও অন্যদিকে উত্তর-বঙ্গবাসীর বিশেষ সুবিধা হইবে।"

এই পরিকল্পনা কার্য্যে কতদূর পরিণত হইবে এবং জন-সাধারণের স্বাস্থ্যের পক্ষে উহা কিরূপ হইবে তাহা পরীক্ষা-সাপেক্ষ। তবে আমাদের মনে হয় গভর্ণর বাহাদুর নদীর মুখ হইতে ভরাট বালুরাশি সরাইবার যদি ব্যবস্থা করিতে পারিতেন এবং যে সমস্ত স্থানে পুল ও সাঁকো থাকার জন্য ঐ সমস্ত জায়গাও বালিতে ভরিয়া গিয়াছে প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয়ে সে সমস্ত স্থানের সংস্কার-ব্যবস্থা করেন তবেই প্রকৃত পক্ষে চাষের উপকার হইবে এবং ভারতবর্ষ আবার শস্যশালিনী হইয়া উঠিবে। প্রতিষ্ঠা হইবেই 'বঙ্গশ্রী'র এই মত।

নির্ব্বাচনে প্রকাশ্য হিংসা

জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ লীগপন্থীদের দ্বারা স্থানে স্থানে যেরূপ লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত হইয়াছেন, তাহাতে আইন ও শৃঙ্খলার মর্য্যাদা যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। জামালপুর, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, প্রভৃতি স্থানে স্যার আবদুল হালিম গজনভী ও মৌলানা ফজলুল হক্ সাহেবের উপর, খুলনা, বনগাঁও, বাগেরহাট প্রভৃতি স্থানে মৌলভী নৌশের আলী ও ওয়ালীওর রহমানের উপর, কুষ্টিয়া ষ্টেশনে শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর সান্যালের উপর, কতিপয় লীগপন্থী যেরূপ অশিষ্ট ব্যবহার ও বলপ্রয়োগ করিয়াছে, তাহাতে আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। আরও ক্ষোভের বিষয় স্থানীয় অফিসার ও নিরপেক্ষগণ নাকি বিনাবাক্যব্যয়ে এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়াও রাক্ষ্যস্ফুট করে নাই। গজনভী সাহেব, ক্ষিতীশচন্দ্র নীয়োগী প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ ও মৌঃ ফজলুল হক্ বাঙ্গালার গভর্ণর ও ভারতের গভর্ণর জেনারেলকেও জানাইয়াছেন। সম্প্রতি বাৎসরিক পুলিশ প্যারেডে মিঃ কেসি যে অভিভাষণ দিয়াছেন তাহাতে তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন—"কোন ব্যক্তি বা দল বলপ্রয়োগে অপর পক্ষের সঙ্গত প্রচার কার্য্যে বাধা দিবার চেষ্টা করিলে যাহাতে তাহা সহ্য করা না হয় তজ্জন্য তিনি শাসনকর্ম্মচারীদের উপর নির্দ্দেশ দিয়াছেন।" দুঃখের বিষয় তাঁহার এই নির্দ্দেশ সত্ত্বেও গুণ্ডামি সমভাবেই চলিতেছে। গভর্ণরের নিষেধ সত্ত্বেও গুণ্ডামির বাহুল্য গভর্ণমেণ্ট যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে কত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন তাহাই প্রমাণিত হয়। এবিষয়ে আমরা হাওড়া সহরে হিন্দুমহাসভার নির্ব্বাচন সভা যে কংগ্রেসমতাবলম্বী ব্যক্তিদের দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে, তাহাও তুল্যভাবে অন্যায় মনে করিতাম, যদি না হিন্দুমহাসভার প্রধান বক্তা, হিন্দুমহাসভার সম্পাদক মহাশয় গান্ধীপথের অহিংসা সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা করিতেন। অহিংসার পক্ষপাতী আমরা কোন সভায় অহিংসার প্রতি তীব্র সমালোচনা হয়, ইহা আমরা কিছুতেই প্রশ্রয় দিব না। সম্পাদক মহাশয়ের অহিংসা বিদ্বেষের জন্যই জনগণের বিদ্বেষের পাত্র হইতে তিনি বাধ্য হইয়াছিলেন।

লর্ড ওয়াভেল, ভারতীয় সমস্যা ও গান্ধীজী

সম্প্রতি আমাদের গভর্ণর জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল এসোসিয়েটেড্ চেম্বার অব কমার্সে গত ১০ই ডিসেম্বর তারিখে যে বক্তৃতাটি দিয়াছেন, তাহা ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকট ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতীয়মান হইবে। ভারত সচিবের কথায় যেমন হুমকি আছে, ভাইসরয়ের কথায় সেরূপ না থাকিলেও ভারতীয়গণকে শাসনসংযত রাখিতে যে কোন বিষয়ে ত্রুটি হইবে না, তাহা বেশ সুস্পষ্ট-ভাবে বলিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। তথাপি আমরা বলিব, তাঁহার বক্তৃতায় বেশ আন্তরিকতা আছে এবং ভারতকে স্বাধীনতা বা স্বরাজ দিতে তিনি উদ্গ্রীব—একথা তাঁহার বক্তৃতায় বেশ বুঝা যায়। তিনি বারবার বলেন—British Goverment and British people honestly and sincerely wish the Indian people to have their political freedom. তবে যেমন আন্তরিকতা আছে, ভবিষ্যত মর্ম্মান্তিক দৃশ্যের তমসাচ্ছন্ন ছবিও উক্ত উক্তিতে প্রতিভাত হইতেছে। তিনি চান 'ভারত ছাড়' একথা ছাড়িতে হইবে। তিনি বলেন, "গভর্ণমেণ্টকে বা আপনাদিগকে (ইংরাজ বণিককে) অগ্রাহ্য করিলে চলিবে না। 'ভারত ছাড়' কথায় আলিবাবার 'রত্নগুহদ্বার' উন্মুক্ত হইবে না। কথা আওড়াইলেই স্বাধীনতা লাভ হয় না। ভারতবাসিগণ যেন জাতিগত বা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে রাজনৈতিক আবর্ত্ত না ঘুরাইয়া দেয়—তাহা দেখিতে হইবে। রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হিংসা বা বিদ্বেষে সম্ভব নয়, উহা কেবল উন্নতির অন্তরায় মাত্র; উন্নতি আপোষেই সম্ভব।

"আগামী বৎসরে যে আলোচনা হইবে, তাহাতে উক্ত বিদ্বেষের প্রাধান্য থাকিলে সব গোলমাল হইবে। রক্তপাত হইতে পারে, আর তাহা হইলে কোন উন্নতিরই আশা নাই। কেবল ভারতের নয়, সে অবস্থা জগতের পক্ষেই মর্ম্মন্তুদ। প্রকৃতই প্রতি

বিশৃঙ্খলা হয়, তাহা দমন করিতে গভর্ণমেণ্ট তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে দ্বিধা বোধ করিবে না। আর যতদিন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ ও শান্তভাবে ভারত স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে না পারে, আমাদের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব আমরা কিছুতেই ছাড়িতে পারি না।"

কথাগুলি খুব দৃঢ়। আর এখানে 'রক্তারক্তি' মুসলমানদের প্রসঙ্গে বড়লাট প্রয়োগ করেন নাই—করিয়াছেন, বণিক সম্প্রদায় সমক্ষে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টকে উপলক্ষ করিয়া। এই হইল বড়লাটের কথা। এদিকে কংগ্রেস বলিতেছে, "আমরা সম্পূর্ণ অহিংসার উপাসক, হিংসাত্মক কার্য্য হইলে তোমাদের দ্বারাই হইবে। আর তোমাদের হুমকিতে আমরা 'ভারত ছাড়' ছাড়িব না। আমাদের দেশ—আমরা শাসন করিব—এই আমাদের দৃঢ় মনোরথ।"

এখন এই উভয় পক্ষের মধ্যে যখন এই মনোবৃত্তি এত পৃথক ভাবাপন্ন, তখন ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিয়াইতো মনে হয় তবে বড়লাট বাহাদুর যেদিন উক্ত চেম্বারে বক্তৃতা দিয়াছেন, সেদিনই মহাত্মাজীর সঙ্গে দেখা করেন। তাহাতে যে আলাপালোচনা হইয়াছে এবং তৎপূর্ব্বে গভর্ণর মিঃ কেসীর সঙ্গে মহাত্মাজীর ৪ দিন এবং মৌলনা আজাদ, পণ্ডিতজী ও সর্দার বল্লভাই প্যাটেলের সঙ্গে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছে (এবং তাহা নিশ্চয়ই লর্ড ওয়াভেলের ইঙ্গিত বা নির্দ্দেশানুক্রমেই হইয়াছে) তাহাতে মনে হয় ভারতের কতকটা পরিবর্ত্তন হওয়াও অসম্ভব নয়। উভয়ের মধ্যে আলোচনা কি হইয়াছে সবই অনুমান মাত্র, আমরা এই আনুমানিক কথাবার্ত্তার উপর নির্ভর করিয়াই এখানে পাঠককে যেরূপ আলোচনা সম্ভব, সেরূপ একটী বিবরণ দিতেছি। লর্ড ওয়াভেলের পক্ষে এই কথা বলা খুবই স্বাভাবিক—"দেখুন, আমি আপনাদের দেশের স্বাধীনতা আনয়ণ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছি, একবার বিলাত হইতে ভারত প্রসঙ্গে আলাপ করিয়া সিমলায় কত সাধ্য সাধনা করিয়া সম্মিলন ডাকিলাম; উহা ফাঁসিয়া গেলেও আমি হতাশ হই নাই। এবার আসিয়া ক্রীপস্ প্রস্তাবের উপরেও চলিয়া গিয়াছি। নির্ব্বাচনের অবসানেই আমি "শাসনতন্ত্র পরিষদ" গঠন করিব, এদিকে আপনাদের বুলি 'ভারত ছাড়'—আমি উভয় সঙ্কটে কি করিতে পারি?"

মহাত্মাজী ইহার উত্তরে নিশ্চয়ই বলিয়াছেন, "দেখুন দেশ আমাদের, এখন আমরা বুঝিতেছি আমাদের দেশ আমরা ছাড়িবনা। সুতরাং আপনার দেশবাসীর ভারত ছাড়িতেই হইবে। তবে আপোষ লড়াই উভয়ই আমাদের অস্ত্র। আপনি সদিচ্ছা প্রণোদিত হইয়া আসিয়াছেন; আপনার সঙ্গে আলাপালোচনা নিশ্চয়ই করিব"। বড়লাট—"তবে 'ভারত ছাড়' কথায় যে ১৯৪২ এর ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইবে। শান্ত আবহাওয়ার মধ্যে না থাকিলে আলাপালোচনায় কি কোন ফল সম্ভব?"

মহাত্মাজী—দেখুন 'ভারত ছাড়' প্রস্তাবটি অনাপত্তিকর। কিন্তু যদি ইহার জন্য direct action অর্থাৎ সত্যাগ্রহের ন্যায় কোন কার্য্য করি তবেই সংঘর্ষ সম্ভব। দুইটির মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রস্তাব আমাদের বলবৎই থাকিবে, তবে সংঘর্ষ আমরা বিলম্বেও করিতে পারি। যদি আলাপাপোষে প্রকৃতই কিছু ফল হয়, তবে সংঘর্ষের সাম্প্রতিক কোন আবশ্যকতা নাই।

লর্ড ওয়াভেল—বেশ, আপনার কথায় আমি এই আশ্বাস পাইলাম যে আলাপ আলোচনা বেশ শান্ত আবহাওয়ায়ই হইবে, কোন রক্তারক্তির মধ্যে হইবে না। কিন্তু দেখুন, সিভিল সার্ভিস, পুলিশ সৈন্যদল সকলকে গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী হইতে হইবে, কোন রাজনৈতিক দল হইলে তো চলিবে না। তাহাদের বিশ্বাস নষ্ট করা অথবা তাহাদিগকে রাজনীতির মধ্যে টানিয়া আনায় দেশে বিশৃঙ্খলা বাড়িবে। এর চেয়ে আর ধ্বংসাত্মক কার্য্য কি হইতে পারে?

মহাত্মাজী—দেখুন আমাদের কাজই অহিংসা। আমরা কেন ধ্বংসের দিকে যাইব?

লর্ড ওয়াভেল—আপনাদের প্রস্তাব তাই, কিন্তু কাজে দেখুন আজাদ হিন্দ নিয়ে কত হৈ চৈ হইতেছে। আর আপনি ১৯৪২

লর্ড ওয়াভেল

আগষ্টের ঘটনার সংস্রব চ্যুত হইয়াছেন, কিন্তু পণ্ডিত জহরলাল বলেন দায়িত্ব আপনাদেরই। যেরূপ দেখিতেছি—আপনার অহিংসার কথা লোকে ভুলিয়াই গিয়াছে।

মহাত্মাজী—দেখুন, কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট পণ্ডিত জওহরলাল প্রভৃতি সভ্যগণ ও আমি এক মত যে আমাদের অহিংসার প্রস্তাবটা আর একবার একটু ঝালাইয়া লওয়া দরকার। এবারকার কমিটির অধিবেশনেরও তাহাই উদ্দেশ্য। কারণ লোকের ভ্রান্ত ধারণা অপনোদন করাতো আপনাদেরই কর্ত্তব্য।

লর্ড ওয়াভেল—এই তো আপনার উপযুক্ত কথা। বেশ আমি বুঝলাম 'অহিংসার প্রস্তাব বলবৎ হইবে, আর এখন সত্যাগ্রহ অবলম্বন মুলতুবী রাখিবেন।

মহাত্মাজী—হ্যাঁ, সম্প্রতি তাই বটে, কিন্তু আপনার

লোক যেন বিনা কারণে হিংস না হয়। এই দেখুন নিরস্ত্র নিরীহ ছাত্রদের উপরে অকারণে গুলি বর্ষণ হইল, লর্ড হ্যাঁ—তজ্জন্য আমি দুঃখিত, একটা এনকোয়ারির বিষয় ভাবিতেছি।

মহাত্মাজী—আর রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি তো হোলনা, আর অনেক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এখনও আপনাদের আইনের কবলমুক্ত হয় নাই।

লর্ড—হ্যাঁ, সেইগুলি শীঘ্রই হইবে। অধিকাংশ রাজনৈতিক বন্দীই মুক্ত হইয়াছে, বাকী সব শীঘ্র হইবে।

মহাত্মা—এই বিষয়ে আপনার আন্তরিকতার আমি প্রশংসা করি। হরিদাস মিত্র প্রভৃতির ফাঁসি আপনি মোকুফ করিয়াছেন। প্রাণনাশ হিংসার চরম! আমার একান্ত অনুরোধ কাহাকেও ফাঁসি দিয়া কোন শাসন যেন কলঙ্কিত না হয়। মহেন্দ্র গোপের ফাঁসি বড়ই বেদনাদায়ক।

লর্ড—আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

আমাদের মনে হয় এইরূপ আলোচনা হইবার কথা। সুতরাং দেশবাসী যেন বৃথা জল্পনা কল্পনা করিয়া বিভ্রান্ত না হন আর মনে না করেন যে কংগ্রেস নিরর্থক রাজ প্রতিনিধিদের সহিত আনাগোনা করিতেছে।

বঙ্গভাষার রাষ্ট্রভাষা হইবার অধিকার

গত ২৬শে অগ্রহায়ণের আনন্দবাজার পত্রিকা বঙ্গভাষার প্রসার সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা দেশবাসীর বিশেষ ভাবে অনুধাবনযোগ্য। ইতিমধ্যে হিন্দুস্থানী-প্রচার সভার প্রধান সংগঠক কাকা কালেলকার মহাত্মাজীর সঙ্গে দেখা করিয়া বাঙ্গালা ভাষার প্রাধান্য সম্বন্ধে খুব দৃঢ়ভাবে বলিয়াছেন। তাঁহার মন্তব্য এই যে, বাঙ্গালা ভাষা যেরূপ সমৃদ্ধ, সরল ও সংস্কৃতি-প্রসারী তাহাতে বাঙ্গালাকেই সর্ব্বভারতীয় ভাষারূপে নির্দ্ধারিত করা যে যুক্তিযুক্ত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে তাঁহার মতে যাহাদের বাঙ্গালা হরফ বুঝিতে কষ্ট হইবে, নাগরী হরফ তাহাদের জন্য প্রবর্ত্তিত হওয়াও বাঞ্ছনীয়। এবং তাহা হইলে সমৃদ্ধ বাঙ্গালা ভাষাই ভারতবর্ষের সমগ্র সংস্কৃতির উপরে আধিপত্য করিতে পারে। আনন্দবাজার পত্রিকার এই মন্তব্য খুবই সমীচীন ও সময়োপযোগী হইয়াছে। আমাদেরও বিশ্বাস, বাঙ্গালা ভাষা নাগরীতে প্রচলিত হইলে বাঙ্গালার বাহিরে অন্য প্রদেশস্থ ভারতবাসীর মধ্যে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত হইবে। এবং বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃত রসাস্বাদ করিতে পারিলে পরে তাহারা আপনা হইতেই বাঙ্গলা হরফে লিখিত বাঙ্গালা রচনার পক্ষপাতী হইয়া পড়িবে। ভরসা করি বঙ্গভাষা-সংস্কৃতি সম্মেলনের প্রচারকগণ এই সুযোগ পরিত্যাগ না করিয়া সমগ্র ভারতে বাঙ্গালাভাষা প্রচারে ব্রতী হইবেন।

বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের পুনরাভাষ

সম্প্রতি বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিয়া পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু উক্ত অঞ্চলসমূহের খাদ্য ও বস্ত্রাভাবের যে শোচনীয় কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন, তাহার দিকে প্রত্যেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। বিবৃতিতে প্রকাশ: বিগত ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষের ছায়া কাটিয়া যাইতে না যাইতে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের নানা অঞ্চলে পুনরায় দুর্ভিক্ষ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। গত বর্ষাকাল হইতেই বাঁকুড়ায় অন্নাভাব দেখা দেয়। দীর্ঘকালের অনাবৃষ্টির ফলে জমিতে চাষ হইল না। গভর্ণমেণ্ট বাঁকুড়া জেলা হইতে প্রায় দুই তিনলক্ষ মণ চাউল রপ্তানী করিয়াছেন এবং আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উক্ত চাউল মাত্র ১২৲ টাকা মণ দরে ক্রয় করিয়া কলিকাতায় তাহা ২৫৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় করিয়া সুদে আসলে গভর্ণমেণ্ট স্ফীত হইতেছেন। বিনিময়ে যে চাউল বাঁকুড়াতে প্রেরিত হইল—তাহা নিকৃষ্ট হইতেও নিকৃষ্টতর। তাহাতে যে জীবনধারণ আদৌ সম্ভব নয়, তাহা কি গভর্ণমেণ্ট নিজেও জানেন না?

বিবৃতিতে শ্রীযুক্ত কুঞ্জরু বলিয়াছেন, সম্প্রতি নাকি গভর্ণমেণ্ট ষ্টেট্ রিলিফের কাজ সুরু করিয়াছেন। ভাল। কিন্তু হিসাব খতাইয়া দেখা যাইতেছে, উক্ত রিলিফ কার্য্যে মাত্র দুইলক্ষ টাকাও বরাদ্দ হয় নাই। যে হারে শ্রমজীবীদের মজুরী জুটিতেছে, তাহাতে দৈনন্দিন হিসাবে মাত্র এক সেরের মতো চাউলের সংস্থান হইতে পারে, এবং তাহা উপরোক্তরূপ চাউল। এতদ্ভিন্ন যে শ্রমের উপরে উক্ত চাউল সংগ্রহ বা অর্জ্জন নির্ভর করিতেছে, অনুরূপ শ্রম করিবার মতো শক্তিও আজ ঐসব শ্রমজীবীদের নাই। ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষ সেই শক্তি তাহাদের শুষিয়া নিয়াছে। মেদপুষ্ট গভর্ণমেণ্ট তাহাদের সেই চর্ম্মসার দেহের হাড়ের শব্দ শুনিতে পান নাই।

শ্রীযুক্ত কুঞ্জরুর মতে—অবিলম্বে ন্যূনপক্ষে ৯০ হাজার কাপড় যদি বাঁকুড়ায় বিলি করিবার ব্যবস্থা না হয়, তবে অবস্থা আরও চরমে উঠিবে। মনে করি, গভর্ণমেণ্ট এই৯০লক্ষ লক্ষ পীড়িত নরনারীকে মৃত্যুর মুখ হইতে ফিরাইয়া আনিয়া মহানুভবতার পরিচয় দি[illegible]।

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ, কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় ও শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী

বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ, অন্যতম কর্ম্মী কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় এবং টাঙ্গাইল কুমুদিনী কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষা শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলীর পরলোকগমন সমগ্র বাঙ্গালীর কাছেই নিতান্ত আকস্মিক। রজনীকান্ত গত পঞ্চাশ বৎসরাধিককাল শিক্ষাব্রতে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার সুশিক্ষায় ছাত্রগণের নৈতিক এবং শিক্ষা সম্বন্ধীয় জীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল। মুনীন্দ্র দেব বাংলার লাইব্রেরী আন্দোলনে প্রধান অগ্রণী ছিলেন। 'পূর্ণিমা' মাসিক পত্রিকা তাঁহার সম্পাদনাতেই আত্মপ্রকাশ করে। স্বদেশপ্রাণা জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর মৃত্যু ঘটে কলিকাতার গত ছাত্র-আন্দোলনের সময়ে একখানি মিলিটারী লরীর সংঘর্ষে। আমরা তাঁহাদের পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

প্রসিদ্ধ সাংবাদিক কালীনাথ রায়

আমরা ট্রিবিউনের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক কালীনাথ রায় মহাশয়ের মৃত্যু সংবাদে গভীর বেদনানুভব করিতেছি। সংবাদপত্রের সংস্রবে থাকিয়া অর্দ্ধ শতাব্দীকাল তিনি ভারতমাতার সেবা করিয়াছেন। পূর্ব্বে ইনি সুরেন্দ্রনাথের 'বেঙ্গলী'র সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং পরে পাঞ্জাবের একখানি কাগজের সম্পাদক হইয়া লাহোরে বাস করেন। পরে সেখানে থাকিতে থাকিতে প্রসিদ্ধ "ট্রিবিউন" কাগজখানিও তিনিই সৃষ্টি করেন। তাঁহার ন্যায় প্রসিদ্ধ স্বাধীনচেতা এবং জনপ্রিয় প্রবীণ সাংবাদিকের পরলোক-প্রাপ্তিতে ভারতীয় সাংবাদিকতার ক্ষেত্রের যে ক্ষতি হইল তাহার শীঘ্র পূরণ হইবে না।

শীতের বেলা যায় ব'য়ে যায় :
শূন্য খেয়ায় যাত্রী কোথায় ?

[শিল্পী : রবীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

ত্রয়োদশ বর্ষ } মাঘ—১৩৫২ { ২য় খণ্ড—২য় সংখ্যা

ময়নাডালে মহাপ্রভু ও মিত্রঠাকুর পরিবার

শ্রীগৌরীহর মিত্র

বীরভূম জেলার সদর সিউড়ীর ষোল মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অণ্ডাল-সাঁইথিয়া লাইনের পাঁচড়া একটী ষ্টেশন। ইহার তিন মাইল পশ্চিম-দক্ষিণে ময়নাডাল গ্রাম। এই গ্রামে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মূর্ত্তি ও মন্দির বিরাজমান। প্রথমতঃ মিত্রঠাকুরবংশীয় হরেকৃষ্ণ বল্লভ মিত্রঠাকুর মহাশয় ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে মহাপ্রভুর প্রস্তর-মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ক্রমে এই মন্দির ভগ্ন হইলে খয়রাশোল থানার অন্তর্গত ও ময়নাডালের আট মাইল পশ্চিমস্থ সুপ্রসিদ্ধ বড়রা গ্রাম নিবাসী শুকদেব মিত্র মহাশয় পুনরায় এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। শুকদেব মিত্র মহাশয় তদানীন্তন রাজনগর রাজের কর্ম্ম করিতেন। তিনি হঠাৎ কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হইলে ময়নাডালের মিত্রঠাকুর-পরিবারের শরণাপন্ন হন। ঠাকুর পরিবারের আদেশে তিনি মহাপ্রভুর নিকট ধরণা দিয়া অচিরেই ব্যাধিমুক্ত হন। ইহাতে মহাপ্রভুর প্রতি ভক্তিপরবশ হইয়া তিনি তাঁহার সঙ্কল্পমত প্রথম প্রাপ্ত আয়ের সাতশত টাকা দিয়া মহাপ্রভুর মন্দির নির্ম্মাণ ও গৌরাঙ্গ পুষ্করিণী খনন করাইয়া দেন। তৎপরে শুকদেবের প্রপৌত্র গুরুপ্রসাদ মিত্র মহাশয় একক ও পরে মিত্রবংশীয় শ্যামসুন্দর মিত্র মহাশয় সকল সরিকগণের সাহায্যে এবং শেষবারে ১৩১৯ সালে বনওয়ারিলাল মিত্র মহাশয়ও সরিকগণের সাহায্যে মহাপ্রভুর মন্দির সংস্কার করেন।

কাটোয়ার সাত আট মাইল পশ্চিমে আমোদপুর-কাটোয়া লাইনে রামজীবনপুর ষ্টেশনের অদূরে রাজুড় গ্রাম। গ্রামস্থ এবং অন্যান্য গ্রামের লোকজন প্রায়ই পূজাপার্ব্বণে দলবদ্ধ হইয়া গঙ্গাস্নানে যাইত। তখন এখনকারমত সুবিধাজনক যানাদির সুবন্দোবস্ত ছিল না। সকলকেই হাঁটিয়া যাইতে হইত। এই রাজুড় গ্রামের উত্তরপাড়ার কায়স্থ কালীচরণ মিত্র মহাশয়ের পত্নী মৃতবৎসা ছিলেন। তিনিও গঙ্গাস্নানে কাটোয়া যাইতেন। গঙ্গাস্নানে গিয়া যাত্রীরা যেমন একে অপরের সহিত আলাপ-আপ্যায়ন করিত—নিজ নিজ সুখ-দুঃখের কথা বলিত, এই রমণীও অপরাপর যাত্রীর নিকট আপন দুঃখ কাহিনী বিবৃত করিতেন। একদা এই রমণী একাকী গঙ্গাতীরে বসিয়া বিরস বদনে নিজ দুঃখকাহিনীর কথা স্মরণ করিতেছেন, এমন সময় রাজুড়ের নিকটবর্ত্তী কবি জ্ঞানদাসের জন্মভূমি বড়কান্দড়া পাটের শ্রীমঙ্গল ঠাকুর মহোদয় তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মঙ্গলঠাকুর তাঁহার ঐরূপ অবস্থা দর্শনে ব্যথিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রমণী স্বীয় দুঃখের সকল বৃত্তান্তই তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। মঙ্গল ঠাকুর রমণীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া বলিলেন—

'যাও মা, বাড়ী যাও। এবার থেকে তোমার পুত্র বেঁচে থাকবে, আর মরবে না, কিন্তু এক কথা, এবার প্রথমেই তোমার যে পুত্র হবে, তার নাম নৃসিংহবল্লভ রাখবে এবং তাকে আমার শিষ্য করবে।' এই বলিয়া ব্রাহ্মণ ঠাকুর তাঁহার মুখস্থিত চর্ব্বিত তাম্বূলের কতক অংশ রমণীকে খাইতে দিলেন এবং বলিয়া দিলেন—যেন সে একথা অপর কাহারও নিকট প্রকাশ না করে। রমণী ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

ইহার কিছুদিনের মধ্যেই রমণী অন্তঃসত্বা হইলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে রমণী এক পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন এবং মঙ্গল ঠাকুরের

আদেশানুযায়ী নৃসিংহবল্লভ নাম রাখিলেন। বলিতে কি, অন্যবারের মত এবার তাঁহার পুত্র বিনষ্ট হইল না। ইহাতে মাতা পিতা আত্মীয়-স্বজনের সুখের সীমা রহিল না। রমণী মনে মনে ব্রাহ্মণ ঠাকুরের উদ্দেশে কোটি কোটি প্রণাম জানাইলেন। রমণীর 'মৃত-

ময়নাডালের শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু

বৎসা' দোষ কাটিয়া গেল। তিনি পরে আরও কতকগুলি সন্তানের জননী হইলেন। তাঁহাদের এই অসীম সুখে কিন্তু একটু কালিমা পড়িল। নৃসিংহবল্লভ দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহার ভালরূপ বাক্যস্ফুরণ হইল না। বোবার মত হইয়া রহিল। দশ এগার বৎসর বয়স হইল, তথাপি পুত্রের কথা ফুটিল না দেখিয়া পরিবারস্থ সকলেই নিরাশ হইলেন। এই বালক অধিকাংশ সময় বাড়ীতে থাকিত না—পাগলের ন্যায় সর্ব্বদাই বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহাকে দেখিলে মনে হইত যে, সে যেন এক গভীর চিন্তায় বিভোর হইয়া রহিয়াছে। তাহার মুখমণ্ডলে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পরিস্ফুট রহিলেও কার্য্যতঃ তাহার ঐ সব বৃত্তির কিছুই কার্য্যকরী হইতে দেখা গেল না। ইহাতে বালকের পিতা মনঃস্থ করিলেন যে তাহাকে তাঁহাদের কুলগুরুর মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে হইবে। এই উপলক্ষে তিনি একটী নির্দ্দিষ্ট দিন ধার্য্য করিলেন। দীক্ষিত করিবার সমস্ত আয়োজন হইয়াছে এবং নৃসিংহবল্লভকে অনেক প্রকারে বুঝাইয়া বাড়ীতে রাখা হইয়াছে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে গুরুদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সময় এগার বৎসরের বালক নৃসিংহবল্লভ গোপনে মাকে ডাকিয়া বলিলেন—'মা, আজ দীক্ষিত হবার দিন নয়, আর মা, তোমার কি মনে নাই যে, আমি কান্দড়ার সেই মঙ্গল ঠাকুরের নিকট দীক্ষিত হব? তিনিই আমাকে দীক্ষা দিবেন এই ত কথা ছিল। আজই তাঁর এখানে আসবার কথা, তুমি কি তাঁর আদেশ এর মধ্যেই ভুলে গেলে?'

মা পুত্রের মুখে এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন। তাঁহার সমস্ত কথাই মনের মধ্যে গাঁথা ছিল। তিনি শ্রীমঙ্গল ঠাকুরের আদেশমত এ পর্য্যন্ত কোন কথাই কাহারও নিকট ব্যক্ত করেন নাই। আজ তিনি স্বামীকে ডাকিয়া বলিলেন—"তোমার এই হাবা ছেলের কথা শোন,—তার কথা ফুটেছে; আজ দীক্ষা দিবার ভাল দিন নয় সে বলছে; আর আমাদের কুলগুরুর নিকট দীক্ষা নিতে সে নারাজ। তুমি ভাল ক'রে একবার পাঁজিপুঁথি দেখ এবং গুরুদেবকে কোন প্রকারে ক্ষান্ত ক'রে বিদায় দাও।"

হাবা পুত্রের কথাই ঠিক হইল। পাঁজি দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইয়া গেলেন। সত্য সত্যই ত' আজ দিন ভাল নয়! এই হাবা ছেলে আজ হঠাৎ এত জ্ঞান ও বাক্যস্ফুরণ কোথায় পাইল!

এমন সময় কাষ্ঠপাদুকা সংযোগে কান্দড়া পাটের পূর্ব্ব-পরিচিত শ্রীমঙ্গল ঠাকুর মহাশয় রাজুড় গ্রামের নৃসিংহবল্লভদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলেই আনন্দে আত্মহারা হইলেন এবং ব্রাহ্মণ ঠাকুরের যথারীতি আদর অভ্যর্থনা করিলেন। কালীচরণ মিত্র মহাশয় গুরুদেবকে কোন প্রকারে বুঝাইয়া বাড়ী ফিরাইলেন। এগার বৎসরের নৃসিংহবল্লভ কান্দড়া পাটের শ্রীমঙ্গল ঠাকুরের নিকট দীক্ষিত হইলেন। পরে ব্রাহ্মণ ঠাকুর বাড়ী ফিরিয়া যাইতে চাহিলে নৃসিংহবল্লভও তাঁহার সহিত যাইতে চাহিলেন। কিন্তু তিনি ঐ অল্পবয়স্ক বালককে সহগামী করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। নৃসিংহবল্লভ ঠাকুরকে কিছুতেই ছাড়িলেন না। বলিলেন—'প্রভু, তুমি আমায় দীক্ষা দিয়েছো, এখন আমি তোমার দাস; সুতরাং গুরুর কাছে দাসের সর্ব্বদা থাকা বাঞ্ছনীয়।'

শ্রীমঙ্গল ঠাকুর বলিলেন—'শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুই সকলের প্রভু। আমি তোমার বা অপর কাহারও প্রভু নই; সুতরাং তুমি তাঁহারই শরণ লও।' এই বলিয়া ব্রাহ্মণ ঠাকুর বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

বালক নৃসিংহ প্রভুকে বনে বনে ডাকিতে লাগিলেন। দিবা-রাত্র প্রাণ ভরিয়া প্রভুকে ডাকিলে প্রভু কি নীরব থাকিতে পারেন? তিনি নৃসিংহবল্লভকে দেখা দিয়া বলিলেন—'তুমি বীরভূমের ময়নাডাল গ্রামে গিয়া তথায় আমার মূর্ত্তি স্থাপন কর। সেখানে একটী প্রকাণ্ড নিম্ববৃক্ষ দেখিতে পাইবে এবং তাহাতেই সুগড় গ্রামের স্বরূপ মিস্ত্রীর দ্বারা আমার শ্রীবিগ্রহ নির্ম্মাণ করিবে।'

মহাপ্রভুর আদেশে নৃসিংহবল্লভ বাপ মা ছাড়িয়া ময়নাডালে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং প্রাচীন নিম্ববৃক্ষের ও বোলপুর চৌকীর অন্তর্গত সুগড় গ্রামের স্বরূপ মিস্ত্রীর সন্ধান পাইলেন। কিন্তু স্বরূপ তখন বৃদ্ধ হইয়া দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছিল! নৃসিংহ স্বরূপকে মহাপ্রভুর ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে, সে বলিল—'আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি—দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছি—আমার অঙ্গ অবশ হইয়া পড়িয়াছে, আমি কি করিয়া তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব? তুমি অন্যত্র চেষ্টা দেখ।'

তখন নৃসিংহবল্লভ বিফলমনোরথ হইয়া বনে জঙ্গলে 'নিমাই' 'নিমাই' করিয়া ডাকিতে লাগিলেন এবং পরে প্রভুর কথায় আশাহীন হইয়া স্বগ্রাম রাজুড়েই ফিরিয়া আসিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে বৃদ্ধ স্বরূপ মিস্ত্রী তাহার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাত-পায়ের শৈথিল্যও দূর হইল। সে যুবার ন্যায় নবশক্তি প্রাপ্ত হইল। বৃদ্ধ স্বরূপ নৃসিংহবল্লভের অন্বেষণ করিতে করিতে রাজুড়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়া বলিল—'প্রভুর কৃপায় আমি এখন দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইয়াছি—আমার বার্দ্ধক্যদশা চলিয়া গিয়াছে—এখন আমি নব-জীবন লাভ করিয়াছি। চল, এবার আমি তোমার প্রভুর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া দিব।'

নৃসিংহবল্লভ আবার প্রভুর নামে পাগল হইয়া বৃদ্ধের সহিত ময়নাডালে আসিলেন এবং মহাপ্রভুর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া ধন্য হইলেন। বর্ত্তমানে ইহা সেই নৃসিংহবল্লভ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের মূর্ত্তি।

নৃসিংহবল্লভ মিত্র ঠাকুর মহোদয় মনোহরসাহী কীর্ত্তনের অনেক উন্নতি সাধন করেন। ইনি বহু পদাবলী রচনা করেন। সিউড়ীর 'রতন-লাইব্রেরীতে' ইঁহার রচিত প্রায় ত্রিশটি পদ সংরক্ষিত আছে। তন্মধ্যে এইস্থলে মাত্র একটী পদ প্রকাশিত হইল—

গৌরচন্দ্র

মধুর মধুর মধুর মঞ্জু, চারু বিমল কনককঞ্জ
ঝলমল বর উছলে জ্যোতি, গৌর বদন-ইন্দুয়া,
বদন ছদন বিম্বু কাঁতি নাশা তুঙ্গ সুভগ ভাঁতি
হেরি মুরছে মদন কোটি বদন অমৃত-সিন্ধুয়া।
অতি সুললিত বাহুগণ্ড কি গুণে তুল করভশুণ্ড
মহাভুজ তুলি হরি হরি বলি সতত নটন রঙ্গিয়া।
সোঙরি সে মুখ নিকুঞ্জ বাস ভকত নিকর গাওত রাস,
প্রেমসদন মাধবনন্দন ধীর গদাধর সঙ্গিয়া।
রাতুল নয়নে রহত লোর পুরল বিমল গণ্ডজোর,
চরকি চরকি সঘনে গিরত ভকত কণ্ঠ কম্বুয়া।
জনুমেরু পর পরম সার সুরধনী যনি ঝরত ধার।
বিবিধ লোক-তারণ-কারণ গত তৃণ ওর বিম্বুয়া।
অজ হৃদি ধ্যান করণ, দীন শরণ অরুণ চরণ;
উজোর নখর শোহত ভাল বরবিধু বর পাঁতিয়া।
প্রাণ পঁহু মোর গৌরসঙ্গ নরসিংহ সুখ পরম রঙ্গ;
সতত মিলএ সাধুসঙ্গ ফিরি গোরাগুণে মাতিয়া॥

নৃসিংহবল্লভ মিত্র ঠাকুর মহাশয়ের পুত্র হরেকৃষ্ণবল্লভ মিত্র ঠাকুর মহাশয়ের প্রতি মহাপ্রভুর স্বপ্নাদেশ হয় যে, নামসংকীর্ত্তনে তাঁহার যেরূপ প্রীতি, অন্য কিছুতেই সেরূপ প্রীতি নাই, অতএব তুমি তোমার পাঁচ পুত্রের সহিত নাম-সংকীর্ত্তন ও খোলবাদ্য শিক্ষা কর। ইহার জন্য তোমাদিগকেও কোথাও যাইতে হইবে না। মহাপ্রভু গোপনেই তোমাদিগকে এ-বিষয় শিক্ষা দিবেন। হইলও তাহাই। হরেকৃষ্ণবল্লভ মিত্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্রজবল্লভ মিত্র ঠাকুর মহাশয় প্রায়ই নির্জ্জনে বসিয়া মহাপ্রভুর ধ্যান করিতেন। প্রভুও ভক্তের প্রতি সদয় হইয়া তাঁহাকে গান শিখাইতেন। বলা বাহুল্য, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপা-পাত্ররূপে মিত্র ঠাকুরবংশীয়গণ মনোহরসাহী কীর্ত্তনে ও মৃদঙ্গ বাদনে অসাধারণ অধিকার ও কৃতিত্ব লাভ করেন। এমন কি, তাঁহাদের অবলম্বিত সঙ্গীত ও বাদ্যপ্রণালী মনোহরসাহী কীর্ত্তনের অন্যতম প্রধান শাখারূপে পরিগণিত হয়। ময়নাডালের মিত্র ঠাকুর পরিবারের এই সংকীর্ত্তন ও মৃদঙ্গ বাদনে দেশব্যাপী খ্যাতি কোথাও অজ্ঞাত নহে। বলিতে কি, নবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলেও ময়নাডালের সংকীর্ত্তন ও বাদ্য প্রধান স্থান লাভ করিয়া থাকে। অধুনা পরলোকগত নিকুঞ্জবিহারী মিত্রঠাকুর মহাশয় মৃদঙ্গ বাদনে যেরূপ অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। মিত্রঠাকুর পরিবারের আবালবৃদ্ধ সকলেই সঙ্গীত ও বাদ্য চর্চ্চায় অভিনিবিষ্ট থাকেন। ৬৪ রসের গায়ক সুলভ নহে, কিন্তু ময়নাডালের কীর্ত্তনীয়াগণের নিকট হইতে এই সকল রসের গান শ্রুত হওয়া যায়। এখানে সঙ্গীত শিক্ষা দিবার টোল আছে। সুদূর আসাম প্রদেশ হইতেও সঙ্গীতশিক্ষার্থিগণ এখানে আগমন করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, সকল সঙ্গীতশিক্ষার্থীই—যতদিন হউক না কেন—মহাপ্রভুর প্রসাদ ও আশ্রয় প্রাপ্ত হন। এখনও অনেক বড় বড় তালের গান এই মিত্রঠাকুর পরিবারের কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তির মধ্যেই অধিগত রহিয়াছে। উপযুক্ত শিক্ষার্থীর অভাবে তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গেই এই সকল তালের পরিচয় ও আলোচনা অচিরেই বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে।

ব্রজবল্লভ মিত্রঠাকুর মহাশয় মহাপ্রভুর দৈনিক ভোগের পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া যান। দিবসে ভোগের জন্য ।২ সের চাউল ও তদুপযোগী দুই প্রকার দাইল, শাক ও ভাজা, দুই তিন প্রকার,
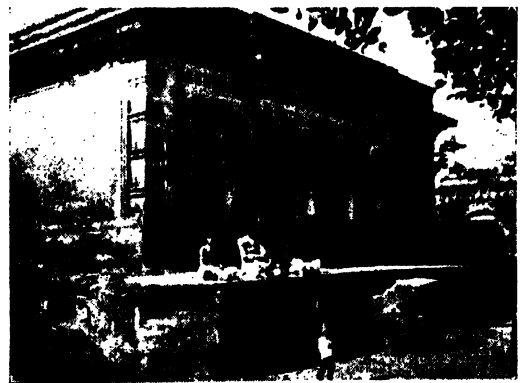
ময়নাডালের মহাপ্রভুর মন্দির পার্শ্বে ভোগ-মন্দির

শুক্ত, রসা, মোটা ঝাল, পোস্তদানার বড়া, অম্বল ও পায়স নির্দ্দিষ্ট আছে। রাত্রে ।৷৹ আধসের ময়দার লুচি, দুধ ।১ এক সের ও কিছু মিষ্টান্ন, প্রাতে দধি বা দুগ্ধসংযুক্ত চিড়া ও চিনি, ছোলা ভিজা এবং কিছু মিষ্টান্ন। ইহা ব্যতীত পর্ব্বাদি উপলক্ষে বিশেষ

ব্যবস্থা আছে। বলা বাহুল্য, অতিথিগণ মহাপ্রসাদ হইতে কখনই বঞ্চিত হন না।

পূর্ব্বোক্ত বড়রার মিত্রবংশীয়গণ মহাপ্রভুর সেবার জন্য অনেক সাহায্য করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত সন ১১৭২ সালে তদানীন্তন বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ তিলকচাঁদ বাহাদুর মহোদয় বর্দ্ধমান জেলাস্থিত সাপুর, বড়জুড়ি প্রভৃতি গ্রামের ২০০/০ দুইশত বিঘা জমি মহাপ্রভুকে দেবত্র দান করেন। ব্রজবল্লভ মিত্র ঠাকুর মহাশয়ের জীবিতকালে এতদঞ্চলে সাঁওতাল বিদ্রোহ ঘটিলে তিনি ভয়ে তাঁহার সমুদয় পরিবার সহ স্থানান্তরে পলাইয়া যান। ব্রজবল্লভ ও তাঁহার অনুজগণ একখানি ডুলি যোগে মহাপ্রভুকে লইয়া জয়দেব কেন্দুলির অপর দিকে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ঢেকুরে—যে স্থানে শ্যামারূপা দেবীর মন্দির, লাউসেনের গড় ও জঙ্গলের নিকট ইছাই ঘোষের দেউল আছে—তথায় উপস্থিত হন। এই জন্য এই স্থানের নাম হইয়াছে গৌরাঙ্গপুর। উক্ত গ্রামের তাদানীন্তন তালুকদার বীরভূম জেলার টিকরবেথা গ্রাম নিবাসী গুরুপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তথায় মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া উক্ত মৌজা তাঁহাকে দেবত্র দান করেন। মিত্র ঠাকুর মহাশয়গণ তথায় তিন চারিদিন অবস্থানের পর ই, আই, আর মানকর ষ্টেশনের ছয় মাইল উত্তর-পশ্চিমস্থ পদুমা (গেড়েপদুমো) গ্রামে উপস্থিত হন। ঐ গ্রামে নিমাই চরণ বাবাজীর আখড়া ছিল। তিনি গ্রামে মহাপ্রভুর আগমনবার্ত্তা শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং অচিরেই মিত্র ঠাকুর মহাশয়গণের নিকট গমন করিয়া স্বীয় আশ্রমে মহাপ্রভুকে লইয়া যাইবার জন্য সানুনয় প্রার্থনা জানাইলেন। ইহাতে মিত্র ঠাকুর মহাশয়গণ সন্তুষ্ট চিত্তে মহাপ্রভুকে তাঁহার আখড়ায় লইয়া আসিয়া একমাস অবস্থিতির পর পুনরায় মহাপ্রভু সহ ময়নাডালে ফিরিয়া আসিলেন। নিমাই চরণ বাবাজীর ১৫৯/০ বিঘা জমি ও কিছু বনভূমি জমিদারী স্বত্ব ছিল। তিনি ঐ সমস্ত সম্পত্তি মহাপ্রভুকে দেবত্র করিয়া দেন। এখনও উক্ত সম্পত্তি মহাপ্রভুর অধিকারেই রহিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এখানে সমস্ত অতিথি মহাপ্রভুর প্রসাদলাভে পরিতৃপ্ত হন। যদি কোন অতিথি স্বপাকে আহার করিতে ইচ্ছুক হন, তবে তাঁহাকে এখান হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ দেওয়া হয়। একবার কোন অতিথি ফিরিয়া গেলে মহাপ্রভু মিত্র ঠাকুরগণকে স্বপ্ন দেন। এইজন্য, পাছে কোন অতিথি ফিরিয়া যায়, সেই আশঙ্কায় তাঁহারা দরজা খুলিয়া রাখেন।

ময়না ডালে মহাপ্রভুর ভোগার্থ কেবল মাত্র আতপ তণ্ডুলই ব্যবহৃত হয় না, উষ্ণ চাউলও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এইরূপ হইবার হেতুনির্দ্দেশক প্রবাদ এই যে, পূর্ব্বে ভিক্ষালব্ধ চাউল দ্বারা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ভোগ হইত। সকল সময় ভিক্ষায় আতপ তণ্ডুল সংগ্রহ করা অসম্ভব বলিয়া কাঙ্গালের ঠাকুর ভিক্ষালব্ধ যে কোন চাউলের অন্নেই সন্তুষ্ট হইতেন। এখনও ইহার ব্যতিক্রম হইতে দেখা যায় না।

নৃসিংহবল্লভ মিত্র ঠাকুর ও তৎপুত্র হরেকৃষ্ণবল্লভ মিত্র ঠাকুর মহাশয়দ্বয় গীতবাদ্যাদিতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। অচলাভক্তি ও গীতবাদ্যাদির দ্বারা হরেকৃষ্ণবল্লভ মিত্র ঠাকুর মহাশয় মহাপ্রভুর এতদূর কৃপালাভ করিয়াছিলেন যে, এক দিবস তিনি ধূমপান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে নিকটে ভৃত্য না থাকায় ভক্তবৎসল মহাপ্রভু ভৃত্যবেশ ধারণ করতঃ তামাক সাজিয়া দিয়া ভক্তের তামাকুসেবনস্পৃহা প্রশমিত করিয়াছিলেন। পরে মিত্র ঠাকুর মহাশয় ধ্যানযোগে এই ব্যাপারের প্রকৃত তথ্য অবগত হইলে অতিশয় লজ্জিত হন এবং নিজে ধূমপান ত্যাগ করিয়া তাঁহার বংশের সকলকে ধূমপান করিতে নিষেধ করেন। এই জন্য তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে বহুকাল যাবৎ তাম্রকূট সেবন প্রচলিত ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি ইহার ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে।

শাস্ত্রানুসারে মসুর দাইল আমিষতুল্য ; কিন্তু ময়নাডালে মসুর দাইলও মহাপ্রভুর ভোগে ব্যবহৃত হয়। এতৎ সম্পর্কে প্রবাদ এই যে কোন মুসলমান কৃষকের ক্ষেত্রে ভালরূপে ফসল না হওয়ায় সে এই মহাপ্রভুর উদ্দেশে 'মানস' করিয়া মসুর বুনিয়াছিল। ফলে, তাহার ক্ষেত্রে অপর্য্যাপ্ত মসুর হয়। মুসলমান ঠাকুরের সেবার জন্য দুইবস্তা মসুর আনয়ন করিলে তাহা মহাপ্রভুর ভোগে ব্যবহার্য্য নহে বলিয়া ঠাকুর পরিবার উহা ফেরত দেন। কৃষক মনস্তাপে সেগুলি লইয়া বাটি ফিরিয়া আইসে।

এদিকে সেবাইতগণের সেই রাত্রেই স্বপ্নাদেশ হইল—'ভক্ত মুসলমান আমার ভোগের জন্য যে মসুর দিতে আসিয়াছিল তাহা ফেরত দেওয়ায় আমার ভোগ আজ অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। ঐ মসুর আনিয়া আমার ভোগ না দিলে ভোগ সম্পূর্ণ হইবে না।' এইরূপ স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া সেবাইতগণ পরদিন কৃষকের নিকট ঐ মসুর আনিয়া হেঞ্চাশাক ও আম্রসহ মসুর দাইল ভোগ দেন। তদবধি মহাপ্রভুর সেবাকার্য্যে মসুর দাইল ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

হরেকৃষ্ণবল্লভ মিত্র ঠাকুর মহাশয় অত্যন্ত স্থূলকায় ছিলেন বলিয়া তিনি ভিক্ষার্থ পদব্রজে গ্রামান্তরে যাইতে পারিতেন না। এইজন্য তিনি শিবিকারোহণে ভিক্ষার্থ বহির্গত হইতেন। এই সময় একদিন রাজনগররাজ ময়নাডালের অদূরবর্ত্তী স্থানে শিবির-সন্নিবেশ করেন। তখন তাঁহার সঙ্গের এক শিকারী পাখী হঠাৎ পলাইয়া গিয়া হরেকৃষ্ণবল্লভ মিত্র ঠাকুর মহাশয়ের জনৈক বাহক কর্ত্তৃক ধৃত হয়। বাহক পাখীটিকে মারিয়া খাইবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময় রাজকর্ম্মচারিগণ তাহা জানিতে পারিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হন। ফলে এক গোলমালের সৃষ্টি হইবার উপক্রম হইলে হরেকৃষ্ণবল্লভ মিত্র ঠাকুর মহাশয় আহ্নিক হইতে উঠিয়া আসিয়া মহাপ্রভুর মন্দিরপ্রাঙ্গণের ধূলা মাখাইয়া পাখীটিকে পুনর্জ্জীবিত করেন। কর্ম্মচারিগণের নিকট এই সংবাদ শুনিয়া রাজা সন্তুষ্টচিত্তে মহাপ্রভুর সেবার জন্য ৭০০/ সাতশত বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করেন।

মহাপ্রভুর একনিষ্ঠ সেবক ও পরম ভক্ত হরেকৃষ্ণবল্লভ মিত্র ঠাকুর মহাশয়ের সম্বন্ধে অনেক বিস্ময়কর কথা শুনা যায়।

আর একবার এক ব্যাধ একস্থানে কতকগুলি পক্ষী নিহত

করিয়া স্তূপীকৃত করিয়া রাখিয়াছিল। হরেকৃষ্ণবল্লভ মিত্র ঠাকুর মহাশয় ঐ মৃত পক্ষীগুলি দেখিয়া ব্যাধকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এইস্থানে এতগুলি জীবিত পক্ষী কেন?"

ব্যাধ বিরক্তভাবে কহিল—"আপনি কি অন্ধ যে মৃত পক্ষীকে জীবিত পক্ষী বলিতেছেন?"

ঠাকুরমহাশয় তদুত্তরে বলিলেন—"তুমি মিথ্যাকথা বলিতেছ কেন? আমি ত সমস্ত পক্ষীই জীবিত দেখিতেছি।"

ব্যাধ কহিল—"তবে ইহাদিগকে উড়াইয়া দেন দেখি।"

হরেকৃষ্ণবল্লভ মিত্র ঠাকুর মহাশয় হাসিতে হাসিতে 'জয় শ্রীমহাপ্রভুর জয়' 'জয় শ্রীমহাপ্রভুর জয়' বলিয়া অঙ্গুলি সঙ্কেত করিবা মাত্রই পাখীগুলি উড়িয়া গেল।

এই অসম্ভব কাণ্ড দেখিয়া ব্যাধ নতশিরে মিত্র ঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

ময়নাডালের চতুষ্পার্শ্বস্থ কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই মহাপ্রভুর ভক্ত। প্রত্যেক গৃহস্থই ক্ষেত্রের উৎপন্ন দ্রব্যের অগ্রভাগ মহাপ্রভুকে নিবেদন করিয়া থাকে। এতদঞ্চলের জনসাধারণ রোগে-শোকে বিপদে-আপদে মহাপ্রভুর শরণ লইয়া ভোগাদি মানস করে। এখনও কৃষকেরা কি হলকর্ষণে—কি বীজ বপনে সকল সময় দয়াল প্রভুকে স্মরণ করিয়া থাকে।

অতিথিসেবার সম্বন্ধে প্রবাদ যে, একসময় উলাগুপ্তিপাড়া নিবাসী সাতজন ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর আতিথেয়তা গ্রহণে ইচ্ছুক হইয়া রাত্রি দুই প্রহরের সময় ময়নাডালে আসিয়া উপস্থিত হন। তখন সকলেই গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। মহাপ্রভু স্বয়ং ঠাকুরবাড়ীর দ্বাররক্ষক দ্বারকানাথ ভাণ্ডারীর বেশ ধারণ পূর্ব্বক মুদীখানায় হাতের বালা বন্ধক দিয়া তাঁহাদের আহারের সুবন্দোবস্ত করেন এবং আহারাদির পর তিনি তাঁহাদিগকে বৈষ্ণবখণ্ডে সুখে নিদ্রা যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দেন।

পরদিন পূজারী ঠাকুর মহাপ্রভুর বলয়শূন্য হস্ত দেখিয়া অনুসন্ধানে জানিলেন যে, গত রাত্রে দ্বারকা ভাণ্ডারী মুদীখানায় বালা বন্ধক দিয়া কয়েকজন ব্রাহ্মণের আহারের আয়োজন করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু স্বয়ং দ্বারকা ভাণ্ডারী এই সমস্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করিলে ব্রাহ্মণ অতিথিগণের এবং মুদীর নিকট সন্ধানে সেবাইত ও পূজারী জানিতে পারিলেন যে, স্বয়ং মহাপ্রভুই দ্বারকা ভাণ্ডারীর বেশে গত রাত্রে বালা বন্ধক দিয়া অতিথিগণের আহারের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং পরদিন বালা ফেরৎ দিয়া তাহার প্রাপ্য মূল্য লইয়া আসিতে বলিয়াছিলেন। প্রভুর উত্তরীয় খোঁজ করা হইলে তাহাতে বেগুনের ক্ষেতের বেগুন গাছের কাটা জড়াইয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল।

ময়নাডাল গ্রামে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈষ্ণব, বেনে, নাপিত, সদগোপ, মাল, বাগ্দী, ডোম প্রভৃতি নানাজাতি প্রায় পাঁচ ছয় শত লোকের বাস। গ্রামের উত্তরে কন্দর এবং তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি ও গ্রামের দক্ষিণ পার্শ্বে একটী এই তিনটি সুবৃহৎ বাঁধ আছে। বাঁধগুলি দেখিতে যেমন সুন্দর ইহার জলও তেমনি সুস্বাদু। গৌরাঙ্গমন্দিরের অল্প উত্তরেই গৌরাঙ্গ সায়র। ইহা পূর্ব্বোক্ত বড়য়ার শুকদেব মিত্র মহাশয় খনন করাইয়া দেন। গৌরাঙ্গ সায়রের দক্ষিণ পাহাড়ে প্রায় চারিশত বৎসরের পুরাতন একটী বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়।

মিত্রঠাকুর বংশের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি বহু শিষ্য আছে। মিত্র ঠাকুরগণ অপর কাহারও বাড়ীতে আহার করেন না। কোথাও যাইতে হইলে তাঁহারা নিজেরাই রান্না করিয়া আহার করিয়া থাকেন।

ইহারা বংশগত প্রথামত ছেলেদের স্কুল-কলেজে পড়িতে বা অপরের চাকুরি করিতে দিতেন না; কিন্তু অধুনা ইহার ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হইতেছে।

গ্রামের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। এখানে শিক্ষিত লোকের অভাব অত্যন্ত বেশী। গ্রামের লোকের অবস্থা তাদৃশ স্বচ্ছল নহে।

এখানকার তৈয়ারি টালির যথেষ্ট সুখ্যাতি আছে। বার্ণ কোম্পানীর মত সুন্দর ও শক্ত টালি এখানে তৈয়ারি হয়। অথচ ইহা তদপেক্ষা দামে অনেক সস্তা।

দয়ালুর দান

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

দয়ালুর দান—সে যেন ফলের মত
দিবার লাগি' সে দিবানিশি জাগি রহে,
ঋণ লাগি নহে শিরে বহে ভার যত
উপহার তরে অনুরাগ ভ'রে বহে।

বৃক্ষের তলি কুতূহলে নর নারী
কুড়াইয়া খায়—কিছু লয়ে যায় ঘরে,
তাই আনাগোনা করে সবে সারি সারি
পরহিতব্রত, বিটপী সতত করে।

দয়ালুর দান তাহারি দানের মত,
অপকারে তবু মনে হয় নাকো ক্ষত।
আততায়ী তারে ছেদন যে জন করে,
ছায়া দেয় তরু অকৃপণ সমাদরে।

বন্দী

শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু

বজ্রনির্ঘোষে বলেন দারোগাবাবু—

—'ঠিক রোদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাক। মিঠু সিং! সূর্য্যের দিকে না চাইলেই মারবি জুতোর বাড়ি! উল্লুক কাঁহাকা!'

শাস্তিটা অপরাধের তুলনায় অনেক বেশীই দিয়ে বসেন দারোগাবাবু। বৈশাখের আমপাকা রোদ, লাল ডাঙ্গাটার বুকে ঠিকরে পড়ে। দূরে মৌল পাহাড়ীর মাথায় চিকমিক করে নীলাভ রোদ, একটু দাঁড়িয়ে ঘেমে যায় লোকটা, জিবটা শুকিয়ে আসে, চোখ দুটো যেন অন্ধ হয়ে গেছে। মাথাটা ঘোরে বোঁ বোঁ করে, জমাট অন্ধকারের মধ্যে অসংখ্য সাদা কালোর পুটুলি! দারোগাবাবু বাসার মধ্যে নির্ব্বিবাদে তখন নাক ডাকিয়ে চলেছেন!

—মিঠু সিং—!

ডাক শুনে আমতলায় মিঠু সিং-এর ঝিমুনি ছুটে যায়। শশব্যস্তে ফিরে চায়।

—মা জী—

চারিদিক চেয়ে এগিয়ে আসে প্রতিমা: সহরের মেয়ে, পাড়াগাঁয়ের আবহাওয়ায় এসে লজ্জাসঙ্কোচ ততখানি নাই, লোকটার দিকে এগিয়ে আসে! দরদর করে তার গা দিয়ে ঘাম ঝড়ছে, প্রতিমার ডাকে লোকটা ফিরে চায়! তবু সরে আসতে সাহস হয় না। পিঠ আর কপালের খানিকটা বুটের ঠোক্করে কেটে গেছে! দানাবেঁধে উঠেছে রক্ত সেখানে! লোকটা একেবারে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে—"কিছু করি নি মা! ছাগলজাত কখন কার ক্ষেতে গিয়ে ঢুকেছিল—তাই নিয়ে—"

প্রতিমাকে চুপ করাবার চেষ্টা করে! দারোগাবাবু জেগে উঠলেই বিপদ।

লোকটা তৃপ্তিভরে খেয়ে চলেছে। শাল পাতাটায় ডাল মাখান ভাতগুলো নিঃশেষ করে চেটে পুটে সেরে নেয়! বাঁ হাতে জলের ঘটিটা ধরে ঢালতে থাকে মুখের মধ্যে জলের ধারা। এতক্ষণ রোদে থেকে প্রতিটি তন্ত্রী তার শুষ্ক হয়ে উঠেছিল! খেয়ে দেয়ে লোকটা চলবার শক্তি ফিরে পায়! যাবার আগে প্রণামই করে বসে প্রতিমাকে। দারোগাবাবুর নাক তখনও ডাকছে।

বিকালে সারা থানাটা দারোগাবাবুর চীৎকারে মাথায় ওঠে! মিঠু সিং,—কাঁদ কাঁদ স্বরে জবাব দেয়, 'মাজীই—'

ধমকানির চোটে তার কণ্ঠতালু শুকিয়ে যায়, মনে মনে স্মরণ করে পবননন্দনকে! জমাদার কনেষ্টবল সকলেই দারোগাবাবুর বকুনির চোটে অস্থির। তাদের চোখের সামনে দিয়ে আসামী চলে গেল, তারা কিনা দেখল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

জেরটা প্রতিমার কাছ অবধি পৌঁছে! নিবারণবাবু স্ত্রীকেও শাসাতে ছাড়েন না—'সরকারী কাযে সর্দ্দারী করতে যেওনা তুমি!

চায়ের কাপটা সামনে নামিয়ে দিয়ে বলে প্রতিমা—

"বলেছিলে সূর্য্যের দিকে চেয়ে থাক, এখন ত সূর্য্য ডুবে গেছে, কোন দিকে চাইবে এবার বল? তাই বাড়ী চলে গেল।"

গজরান মনে মনে দারোগাবাবু! "বার বার তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি।"

—প্রতিমার এ সব ভাল লাগে না। দারোগার বৌ! সারা গাঁয়ের লোকের অবিশ্বাসের পাত্রী! কেন? সে কি অপরাধ করেছে? স্কুলের আর মেয়েরা কেমন স্বাধীন ভাবে রইল; মরতে বি'য়ে হল তার কোন তেপান্তরের মাঠে, এক কাঠখোট্টা সেপাই-এর সঙ্গে।

বাইরে থেকে প্রতিমা শুনতে পায় স্বামীর বাজখাঁই গলার স্বর! কাকে যেন তাড়াচ্ছেন! "যান যান এখান থেকে।"

একজন ভদ্রলোক কাকুতি-মিনতি করে হাত দুটো ধরে দারোগাবাবুর, চোখে মুখে তার অসহায় ভাব—"এই নিয়েই যা হয় করে দেন! ও ত করে নি।

মিথ্যে অভিযোগ!

"সবাই ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির মশায়। যান—যান!"—ঝটকা মেরে দূরে সরিয়ে দেন ভদ্রলোককে!

থানার ওপাশে কয়েকজন ছেলেকে এনে আটকান হয়েছে! বৃদ্ধ ভদ্রলোক ব্যাকুলভাবে বলেন—

"একটি মাত্র ছেলে আমার দারোগাবাবু! বিশ্বাস করুন—ও কিছু করেনি!"

কোন কথা কানে তোলেন না তিনি! ছেলেদিকে টেনে নিয়ে গিয়ে হাজতে পোরা হ'ল! দারোগাবাবু সরে যান অফিসের মধ্যে! বুড়ো থানার সান বাঁধান কোঠায় মাথা ঠুকে কাঁদতে থাকে! প্রতিমা জানলার ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে—সে যেন স্বপ্ন দেখে!

থানার কাজ খুব বেড়ে গেছে। ও অঞ্চলের সব গাঁ গুলোতেই অনেক বেকার মিলে তাণ্ডব নর্ত্তন সুরু করেছে। বহুদিনের সঞ্চিত বিক্ষোভ কোন দূরাগত বহ্নিশিখার সংস্পর্শে আজ রুদ্ররূপ ধারণ করে ওঠে। দলে দলে ছাত্র যুবক যোগ দিয়েছে অসহযোগ আন্দোলনে। দূরে গ্রামে গ্রামান্তরে খোল বাজিয়ে চাঁদা তুলে বেড়াচ্ছে।

মরীপুর নিদ্‌না আরও কয়েকটা গ্রামের মদের দোকানের সামনে সুরু হয়েছে জোর পিকেটিং! ছেলেদের জন্য মদ আর বিক্রী হবার উপায় নাই! দু'তিন জন দোকানদার এসে ধন্না দিয়েছে দারোগাবাবুর দরবারে! সঙ্গের ঝুড়িগুলোও বেশ মন্দ নয়! কারুর বাগানের কলা—মুলো! পুকুরের মাছ ইত্যাদি সবই ঘরের কেনা কিছু নয়।

বেলা তিনটে বাজে। দারোগাবাবু চায়ের জন্য বার বার মিঠুকে বাসায় পাঠিয়েও চা আনাতে পারেন নি! মেজাজ সপ্তমেই চড়ে যায়, বাধ্য হয়ে নিজেই বাড়ীর দিকে পা বাড়ান!

প্রতিমার সারাটা মন ঘৃণায় রি রি করছে! দেখছে জানলা দিয়ে লোকগুলো ভেট পাঠিয়েছে দারগাবাবুর ঘরে; তাদের দোকানের সামনের ভিড় হটাতে হবে। তাতে অমন দু'পাঁচটা ছেলের জীবন নষ্ট হয়ে যায় যাক! ক্ষতি নাই! ঝুড়ির প্রতিটি ফল-শাক শব্জীর সারা গায়ে মাখান স্বার্থপরতার তীব্র বিষ! অমানুষিকতার ছাপ! বুড়ো তখনও বসে। কাঁদবার ক্ষমতা তার নাই, চোখের জল জমাট বেঁধে গেছে দুঃখের তীব্র জ্বালায়।

অসহ্য! প্রতিমার সারা দেহ শিরশির করে ওঠে! রান্না-ঘরের রকে নামান বেগুন-কলা মাছ সবগুলো পা দিয়ে ঠেলে নীচের নর্দ্দমায় ফেলে দেয়! দু'হাত দিয়ে ছিটুতে থাকে কলা-গুলোকে! উন্মাদনায় হারিয়ে ফেলে নিজেকে। পা দিয়ে চটকাতে থাকে—এমনি করে ওদের মুখে লাথি মারতে পারত!

"ও-কি হচ্ছে?"

সামনের দরজা দিয়ে নিবারণ বাবুকে আসতে দেখেও থামে না প্রতিমা—'শ্রাদ্ধ করছি ওদের! লজ্জা করে না তোমার এসব নিতে!'

'কতকগুলো ছোট ছোট ছেলেকে আটকে সদরে পাঠাবে! মায়ের চোখের জল তোমার মাথায় আগুন হয়ে পড়বে—জাননা? কি এমন করেছে ওরা—?'

"কি করেছে না করেছে বুঝব আমি? তোমাকেও কি তার কৈফিয়ৎ দিতে হবে?"

"তা না দাও! ছেড়ে দিতে হবে ওদিকে!"

প্রতিমার দৃপ্তভঙ্গী দেখে নিবারণবাবু আর ঘাঁটাবার সাহস করেন না, গম্ভীর ভাবে মাথা নেড়ে বাড়ীর বার হয়ে আসেন।

আরও একদল সত্যাগ্রহীকে ধরে আনেন ছোট দারোগা আর জমাদার সুজন সিং! ওদের অনেকেই লাঠির ঘায়ে আহত হয়েছে! কারুর জামাটা ভিজে গেছে খানিকটা রক্তে! কারুর বা বাঁ হাতটা ফুলে উঠেছে খানিকটা! কারুর কপালের ব্যাণ্ডেজটা রক্তে লাল হয়ে আছে! তবুও মুখে তাদের জয়ের হাসি—বিষাদ মলিনতা একটুও তাতে নাই!

জানালা থেকে স্পষ্ট দেখতে পায় প্রতিমা—দারোগাবাবু বার হয়ে এসে ওদের দু' একজনকে ডেকে কাছে এনেই বসিয়ে দেন দু' একটা ঘুসি। অতর্কিত আক্রমণে ছেলেটা ছিটকে গিয়ে পড়ে—ওপাশে করবীফুলের গাছের কাছে! তার উপরেই আবার দু'একটা লাথি—!

সারাদেহ শিউরে ওঠে প্রতিমার! রক্তে জাগে চাঞ্চল্যের সাড়া। ছুটে যায় বাইরের দিকে? সবেগে টেনেও দরজাটা খুলতে পারে না। বাইরে থেকে কে তালাবন্ধ করে দিয়েছে তাকে! রুদ্ধ আক্রোশে জানলার শিকগুলো ধরে টানতে থাকে প্রাণপনে! চীৎকার করে: মিঠু—মিঠু সিং!"

কেউ তার চীৎকারে আজ সাড়া দেয় না! দারোগাবাবু বীর বিক্রমে চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁর বিজয়রথ! সমবেত ছেলেদের চীৎকারে সারা জায়গাটা ভরে গেছে—'বন্দেমাতরম্'!

শূন্য প্রান্তরে দিকদিগন্তরে ওঠে ধ্বনি প্রতিধ্বনি। চীৎকার ক'রে নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল প্রতিমা! মন্ত্রমুগ্ধের মত ওদের ডাকে সেও সাড়া দেয় গরাদের এপার থেকে—'বন্দেমাতরম্!'

পড়ন্ত বেলায়, দারোগাবাবু আরও কয়েকজন কনেষ্টবল নিয়ে সমস্ত ছেলের দলকে সদরে নিয়ে চলে গেছেন! শূন্য থানাটা খাঁ খাঁ করছে! সেই বুড়োর কান্না এখনও থামেনি! রুদ্ধ দরজার এপারে ভোসতার কান্নার শব্দ! প্রতিমার বুক দীর্ণ হয়ে আসে! দরজা তখনও বন্ধ! বাইরে যাবার উপায় নাই! সেও আজ বন্দী! বন্দী সে দুঃসহ বন্দীশালায়।

রাত্রির অন্ধকারে একা সে ভাবে! ভাবনার অন্ত নাই! বাড়ীর কথা। মা-বাবা! স্কুলের বন্ধুরা। লিলি- সুরমা! কত আশা! তাদের সংসার—আজ দু'জনে কোথায় কে জানে! ঘৃণায় লজ্জায় সারাটা মন ভরে ওঠে। রাতের তারা ওঠে শিউরে! নীরব সুপ্ত পৃথিবী-দূরের ক্রমনিম্ন আকাশে কি একটা জ্যোতিমান তারা দপ দপ করছে! চোখ দুটো যেন টেনে আসে! রগের কাছে শিরাটা টপ টপ করে যায় তালে তালে! দূর বৃক্ষ শাখায় শকুন-শিশুর আর্ত্তনাদ রাতের আকাশ ব্যথাতুর ক'রে তোলে! বার বার চোখের সামনে ভেসে ওঠে বৃদ্ধের অসহায় ব্যথাকাতর চাহনি! তার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল একমাত্র সন্তান; শুধু একা তাঁর নয়! কত মায়ের সন্তানকে আজ নিয়ে গেল, মায়ের অভিশাপ অশ্রুজল সে কি ব্যর্থ হবে!

ওদের রক্ত! ওদের তাজা টক্‌টকে রক্তের দাগ কি নিঃশেষে মুছে যাবে? রাত্রির ঘনতমিস্রা কি কখনও দিনের হাসিতে ঝলমল করে ওঠে না!

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল প্রতিমা জানে না! ভোরের ঠাণ্ডায় ঘুম ভেঙ্গে যায়! একটা দিন খাওয়া দাওয়া হয়নি, উত্তেজনার আবেগ তাকে অনেকখানি দুর্ব্বল করে দিয়েছে। হঠাৎ কানে আসে কা'র কণ্ঠস্বর—

"এসো দুঃসহ এসো এসো নির্দ্দয়
তোমারই হউক জয়!
প্রভাত সূর্য্য এসেছে রুদ্রসাজে
দুঃখের পথে তোমার তূর্য্য বাজে,
অরুণ বহ্নি জ্বালাও চিত্ত মাঝে···
তোমারই হউক জয়—!"

নোতুন দিনের জাগরণ! পূব আকাশ ফরসা হয়ে গেছে! আকাশ পথ ভরে ওঠে পাখীর কাকলিতে! মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনে যায় প্রতিমা! কে যেন সারা মন ঢেলে দিয়ে গাইছে!

প্রতিমা নীরবে চায়ের কাপটা নিবারণ বাবুর সামনে নামিয়ে দিয়ে চলে যায়! তিনি বাক্য ব্যয় না করে প্রাতরাশ সেরেই বার হয়ে যান বাড়ী থেকে।

বাইরের দিকে চাইতেই অবাক হয়ে যায় প্রতিমা! আগে যে বাসাটায় জমাদারবাবু থাকতেন, সেটা খালিই পড়েছিল অনেক দিন থেকে, কে যেন এসেছে সেখানে! বয়স বেশী নয়! দীর্ঘ দেহ—সারা চোখে মুখে বুদ্ধির দীপ্তি! একটা গেঞ্জী গায়ে বাইরে পায়চারী করছিলেন!

ওই নাকি নূতন নজরবন্দী বাবু! শুনেছিল আগে আসবার কথা! ওই সকালে গাইছিল গানটা। চেয়ে থেকে আশা মেটে না প্রতিমার—কি যেন অপূর্ব্ব সম্পদের অধিকারী সে, হঠাৎ চোখাচোখি হতেই চোখটা নামিয়ে নেয় প্রতিমা!

খড়ের চালের ছাউনি ঘেরা ঘর ক'খানায় বাস করেন কুমুদবাবু—যাকে ঘিরে প্রতিমা মনে রহস্যের জাল বোনে। মাঝে মাঝে দেখছে ওকে, দৃপ্তভঙ্গী, খদ্দরের পাঞ্জাবিতে ঋজুদেহ মানায় চমৎকার! প্রতিটি পদবিক্ষেপে ফুটে বার হয় চলার তি

থানায় সকালে হাজিরা দিতে এসেছেন কুমুদবাবু। দারোগা বাবুর কাগজখানায় চোখ বোলাচ্ছেন, এহেন সময় বাসা থেকে ভাইঝি অমুকে দু'কাপ চা আনতে দেখে একটু বিস্মিতই হয়ে যান দারোগাবাবু! এ সময় বাড়ী থেকে চা আসে না, বিস্মিত হবারই কথা! তবে আবার দু' কাপ চা! বাধ্য হয়েই তিনি বাকী কাপটা কুমুদবাবুর দিকে এগিয়ে দেন!

প্রতিমা মানদা ঝির কথায় বিশ্বাসই করতে পারে না! মানদা কিন্তু দমবার পাত্রী নয়!

তুমিও যেমন দিদিমনি, ওরা হ'ল ডেটিন্যু! ওদের আবার জাত বিজেত রইছে! বাগ্দীদের ছোঁড়াটাকে রেখেছে, সেই ঘরদোর ঝাঁট পাট দেয়, আবার রান্নাও করে!"

প্রতিমা প্রশ্ন করে—"ওই পেটকামারা ছেলেটা রাঁধতে জানে কি?"

"ওদের কাছে ঢেক্ জালে!"

পড়ন্ত রোদে কুমুদবাবুর নির্জ্জন বাড়ীটা লাল প্রান্তরের শেষে দাঁড়িয়ে আছে অভিশপ্তের মত! ওটার দিকে চাইতে সারাটা মন প্রতিমার ভরে ওঠে বিচিত্র সহানুভূতিতে! অমু ব্যস্তসমস্ত ভাবে তাগাদা দেয়—"বেড়াতে যাবে না কাকীমা! আজ কিন্তু পাহাড়ে উঠব।"

পাহাড় নয়! বাংলার সীমান্ত—বীরভূমের এক প্রান্ত মৃত্তিকা-প্রস্তরীভূত হতে সবে সুরু হয়েছে। মৌল পাহাড়ীর এদিকটায় আগে কোনকালে হয়ত লোহার খনি ছিল, সেসব প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা! লোহাকুঠী, ধ্বংসস্তূপের ওপাশে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছোট্ট একটা ন্যাড়া ঢিপি, কালো পাথরে ভরা! অস্ত সূর্য্যের আভায় সামনের পলাশবনে শত ফাগুনের বহ্নিমান জ্বালা, দূর লালাভ প্রান্তরের বুক ছুঁয়ে রাস্তাটা পালিয়েছে খয়রাকুড়ীর বনের মধ্যে! কালো জাম গুল্ম ভেদ করে চলেছে তারা! দূরে দুমকা পর্ব্বতশ্রেণীর নীলছায়া সন্ধ্যার অন্ধকারে অস্পষ্ট হয়ে আসে, অমু কখনও এদেশ দেখে নি, অবাক হয়ে চেয়ে থাকে সে—'চমৎকার!'

'খুব চমৎকার—না খুকী?'

অবাক হয়ে যায় প্রতিমা! সামনেই কুমুদবাবু। একটা অহেতুক সঙ্কোচে প্রতিমার মুখ রাঙা হয়ে যায়, অমুও বেড়াবার সঙ্গী পেয়ে যেন নেচে ওঠে! প্রশ্ন করে, "আপনার দেশও খুব সুন্দর না? কোথায় আপনার দেশ?"

হাসেন কুমুদবাবু—

> "সব ঠাঁই মোর ঘর আছে
> আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া—
> দেশে দেশে মোর দেশ আছে
> আমি সেই দেশ লব যুঝিয়া!"

অমু উৎকর্ণ হয়ে শোনে! প্রতিমা একটু পিছু পিছু আসছে তাদের। প্রতিটি কথায় যেন তার অন্তর প্রদীপ্ত হয়! তাঁর বন্দী জীবনের কথা! ছাত্রাবাস থেকে বাড়ী এসেছিল বাড়ীতে বেড়াতে আসতেন সেখানকার এক আত্মীয়, তাঁরই চক্রান্তে বন্দী হয়ে ঘরছাড়া হয়! সে আজ সাত বৎসর আগেকার কথা! তারপর কেটে গেল এতগুলো দিন! দেউলির মরু প্রান্তরে বন্দীজীবনের ইতিহাস! ঘূর্ণিঝড়ে সারা পশ্চিম দিগন্ত বাত্যাবিক্ষুব্ধ হয়ে উঠত! সবকিছুর মধ্যে ভুলতে পারে নি তার দেশকে! জন্মভূমিকে! আবার এসে পড়ল এইখানে, এরপর আর জানেনা সে ভবিষ্যৎ!

প্রতিমা যেন প্রস্তরীভূত হয়ে গেছে! এত দুঃসহ দুঃখ! বাবা-ভাই-মা-বাড়ী ছেড়ে দীর্ঘ সাতবৎসর কেটে গেছে! তবুও মুখের হাসি তার অমলিন হয় নি! যে অপূর্ব্ব সম্পদের পরিচয় ওরা পেয়েছে, জানে না সে!

মাঠের সরু রাস্তা পার হলেই লাল সড়কটা, কতকগুলো নিশিন্দে কুচাল গাছের জঙ্গলে ঘেরা রাস্তাটায় উঠতে যাবে, সামনে সাপ দেখার মত চমকে ওঠে প্রতিমা, দারোগাবাবু ঘোড়ায় করে মফঃস্বল থেকে ফিরছেন তার চোখের দিকে চাইতে পারে না প্রতিমা, দারোগাবাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন এদের দিকে! কুমুদবাবু হাতটা তুলে নমস্কার জানান! প্রত্যুত্তর দেবারও প্রবৃত্তি হয় না তার। ঘোড়াটার পিঠে ঘাকতক চাবুক কসে বেগে চালিয়ে দেন তাকে

রান্নাঘরের দাওয়ায় আসন পেতে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রতিমা, রান্না করতে একটু রাত্রি হয়ে গেছে! বেড়িয়ে এসে ভাল করে স্বামীর সঙ্গে কথা কইবার সুযোগ পর্য্যন্ত পায় নি! আজ নিজেরই লজ্জা করে প্রতিমার! অমু ফিরে এসে বলে—"কাকাবাবু আজ খাবে না!"

"খাবে না! প্রতিমার এত আয়োজন সবই পণ্ড হয়ে যায়! রান্নাঘরের দরজায় অমুকে বসিয়ে রেখে নিজেই যায়!

আলোর সামনে একগাদা কাগজপত্রের মধ্যে ডুবে রয়েছেন দারোগাবাবু, প্রতিমার পায়ের শব্দ পেয়ে আবার মুখ নামান—"খাবেনা কেন? শরীর খারাপ?"

গম্ভীরভাবে উত্তর দেন তিনি, ' কতবার বলেছি তোমায় ক্ষিদে নাই, অর্জ্জুনপুর গিয়েছিলাম, সেইখানেই খেয়ে এসেছি!"

আবার কাযে মন দেন তিনি, দেওয়ালের ঘড়িটা টিক টিক শব্দ করে চলেছে একতালে বিরামহীন গতিতে! ঘরের নীরবতা অসহ্য বোধ হয় প্রতিমার।

হ্যাঁ অসহ্য! সবকিছু এখানকার অসহ্য! প্রতিটি মানুষ এখানের ভিন্ন ধাতুতে তৈরী—একটু আঘাত করতে গেলে নিজের দিকেই তিনগুণ হয়ে ফিরে আসে

কতটা রাত হবে জানে না। আজ প্রতিমা খায় নি! সে খাবে না! বোঝে—স্বামীর অভিমানের কারণ, এটা যেন তাকে অপমানই করা ইচ্ছাকৃত ভাবে! রক্তাভ প্রান্তরের প্রান্তে কুমুদবাবুর ঘরটায় তখনও আলো জলছে! কে জানে পড়ছেন হয়ত! সারা গাঁ নিস্তব্ধ! রাতের আকাশ চিরে নিশাচর বিহঙ্গের ক্লান্ত পাখার বিধুনন তালীবনে ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে। অসঙ্গমে অন্ধকারে সারা পৃথিবী—মুখ লুকোয় দুরন্ত অভিমানে। ওপাশে অসাড়ে ঘুমুচ্ছে নিবারণবাবু! কত বিনিদ্র রজনী কেটে গেছে তার জানে না! জানে না কোনখানে তাদের দু'জনের জীবনতন্ত্রীর সুর-রেশ বারে বারে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়! যা

যাক! প্রতিমার আর দুঃখ নাই, সব সয়ে গেছে! কুমুদবাবুর ঘরের আলোটা জ্বলছে, ও যেন হাসছে ব্যঙ্গ ভরা চাহনিতে!

কালকের রাতের ঘটনাটা স্বপ্নের মত আবছা হয়ে রয়ে গেছে! ভাবতেও হাসি পায় মনে মনে! কি ছেলেমানুষী! রান্নায় মন দেয় প্রতিমা!

অনুর প্রবেশে ঘটনাটা সমস্ত বদলে যায়, ছুটতে ছুটতে এসে বলে অনু! বুঝলে কাকীমা—কালকের সেই কুমুদবাবু কি করেছে জান?

চাকরটা আসে নি, ভাত রাঁধতে গেছে আর ধাক্কা লেগে একহাঁড়ি ফেন হাতে পায়ে সব পড়ে গেছে! আহা কিছু জানেনা রাঁধতে।

"তাই নাকি রে!"

"হু! বললে কি জান! ভাত আর খাব না, চিড়ে ভিজেই ভাল।"

শোনে প্রতিমা। বাড়ীর পাশেই—অথচ একটা লোক না খেয়ে দিন কাটাবে। থালায় ভাত তরকারী সাজিয়ে অনুকে বলতেই সেও রাজী হয়ে যায় নিয়ে যাবে।

থালাটা নিয়ে অনু উঠোনে নামতে যাবে, পড়বি ত পড় একেবারে কাকাবাবুর সামনে! দেখেই আমতা আমতা করতে থাকে অনু। রান্নাঘর থেকে প্রতিমা বার হয়ে এসে সামলে নেয়!

"মানদা ঝি বলেছিল, চাট্টি ভাতের জন্যে!"

সামনেই ছিল মানদা—তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে—"কই আমি আবার কখন—"

প্রতিমা প্রতিবাদ না ক'রে ভাতের থালাটা তার সামনে নামিয়ে দেয়—"নে আর লজ্জা করতে হবে না! ভাত নিবি তার আবার লজ্জা।"

মানদা অবাক হয়ে যায়। দারোগাবাবু কথাটা ঠিক যেন বুঝতে পারেন না, ভাবতে ভাবতে বার হয়ে যান!···

কুমুদবাবু থানায় হাজিরা দিতে এসেছেন! দারোগাবাবুকে আসতে দেখেই কাগজ থেকে মুখ তুলে প্রশ্ন করেন, "চিড়ে কেমন খাদ্য দারোগাবাবু!"

উত্তর দেন ছোট দারোগা—"পুষ্টিকর খাদ্য!"

"তবুও ভাল! দুটো দিন এখন ওই খেয়েই থাকতে হবে কিনা! রান্নাটাও যদি শিখতাম—তা' হ'লে ভাবনা ছিল না।"

দারোগাবাবুর মনের মধ্যে বাড়ীর ঘটনাটা এসে যায়! চেয়ে থাকেন কুমুদবাবুর দিকে!

ক'দিন থেকে অনুর বেড়াতে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। প্রতিমা জিজ্ঞাসা করলে বলে—কাকাবাবু বকেছেন, অবাক হয়ে যায় প্রতিমা—সকাল থেকে ছোট মেয়েটাকেও বাড়ী থেকে বার হ'তে দেবে না!

থানায় আবার সুরু হয়েছে সেই গুপ্ত বহ্নিশিখার নবজাগরণ! গ্রামের কয়েকটা বখাটে ছেলেকে ধরে এনেছে। সকলকেই কি যেন ব'লে চলেছেন দারোগাবাবু!···তাদের সবাই ছাড়া পেয়ে যাবে, কোন ভয় নাই—শুধু তার কথা মত কাজ করতে হবে! বাধ্য হয়ে রাজী হয়, তাদের দু' একজন!

কুমুদবাবুর বাসায় নাকি ওদের ঘনিষ্ঠ যাতায়াত! রাত্রি দুপুরেও নিয়মিত যায়, একজন বলে ওঠে—"রাতে মরবার সময় নেই স্যার। দুটো বই-এর রিয়ার্সেল—এ্যা আঁক—।"

বিকট একটা ঘুসি পড়তেই তার কথা বন্ধ হ'য়ে যায় সহসা।

"এই যে দারোগাবাবু—এবার আর ইনসপেক্টার না হ'য়ে যাবেন না।"—কুমুদবাবু হাসতে থাকেন বিচিত্রভাবে।

কুমুদবাবুকে দেখেই দারোগাবাবুর মেজাজ মস্তকে চড়ে যায়। ওদিকে আটকে রাখবার হুকুম দেন তিনি।

'ছেড়ে দিন ওদিকে দারোগাবাবু!

"রাজনীতির—র'ও বোঝেনি ওরা!"

দারোগাবাবু কঠিন স্বরে বলেন—"এ সবের মূল আপনিই।" আপনার আসার পর থেকে আবার যেন বেড়ে উঠেছে। শুধু একটা নয়—আরও অভিযোগ আছে আপনার নামে! কাল সন্ধ্যার পরও অনেকে গ্রামের ওদিকে আপনাকে ঘুরতে দেখেছে— !"

"বলেছি ত! চাকরটার অসুখ! তাকে দেখতে গিয়েছিলাম! দু'দিন যে ডান হাত বন্ধ আছে—কই সে খবর ত পৌঁছেনি আপনার কানে?"

দারোগাবাবু অবিশ্বাসের সুরে বলেন—"সত্য বলছেন?"

"মিথ্যা কথা বলা অভ্যাস, সত্যকেও তাই অবিশ্বাস করেন! আচ্ছা আসি!"

চলে যান কুমুদবাবু! রাগে দারোগাবাবুর চোখ-মুখ লাল হয়ে যায়। একখানা লোকের সামনে এতবড় অপমান!··· খসখস ক'রে রিপোর্ট লিখতে থাকেন। হাজতের মধ্যে বখাটে ছেলেগুলো দারোগার কথায় ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়, দারোগা বাবু নিশ্চিন্তে রিপোর্ট সুরু করেন। ছেলে তিনটে মনের আনন্দে দেশলাইএর বাক্স বাজিয়ে টপ্পা গাইতে সুরু করে!···

প্রতিমা আজ মহাব্যস্ত।

তিন বৎসর মঙ্গলবার-ব্রত করে, আজ তার উদ্‌যাপন দিন! জনকয়েক ব্রাহ্মণ ভোজনও করান হবে! সহরের বাজার থেকে ফলমূল, তরিতরকারী আনা হয়েছে! অনু সকাল থেকে স্নান সেরে পূজোর জোগাড় করতে ব্যস্ত! দারোগাবাবুর মেজাজও আজ ভাল। উপর থেকে নাকি প্রমোশনের আশা এসেছে!

প্রতিমাকে বার বার দেখেও আজ আশা মেটে না, চমৎকার মানিয়েছে তাকে, স্নান সেরে পট্টবস্ত্রে একমাথা চুল যেন ওকে মহিয়সী মূর্ত্তিতে রূপায়িত করেছে!

ব্রাহ্মণ ভোজনের নিমন্ত্রণ করবার সময় একটা কথা বার বার তার মনে এসেছিল, কিন্তু বলতে পারেনি! আহা কুমুদবাবুও যদি আসতেন আজকের নিমন্ত্রণে, সার্থক হ'ত সব কিছু! একজনের জন্যে তার মনের খানিকটাও অপূর্ণ রয়ে গেল! সেও ব্রাহ্মণ! হয়ত তার চেয়েও আরও বড়।

পুরুত ঠাকুর পূজায় বসেন! ধূপধুনার গন্ধে সারা ঘরটা ভরে ওঠে! আজ যেন মনস্কাম তার পূর্ণ হয়—দেবতার প্রসাদে!

হঠাৎ মিঠু সিংএর ডাকে ফিরে চাইল। অমূও বাইরে গোলমাল শুনে গিয়েছিল, সেও ফিরে এসে খবরটা দেয়। প্রতিমা বিশ্বাসই করতে পারে না। এ কি সম্ভব। আজ যে তার অভীষ্ট সাধনের দিন—মহাদেবীর কাছে তার পূজা। এ কি হয়ে গেল। এ ত সে চায়নি। সারা মন হাহাকারে ভ'রে ওঠে।

স্বামীর পদোন্নতি হয়েছে, কিন্তু সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে আর একজনের; কুমুদবাবু এই মাসেই খালাস হয়ে যেতেন—না হয়ে আবার তাকে জেলে যেতে হবে কত দিনের জন্য জানে না। এখনও তিনি নাকি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

মুহূর্ত্তের মধ্যে সারা তন্ত্রী তার অবশ হয়ে যায়, সব পূজো আয়োজন—একি একজনকে বলি দেবার জন্যই? ছুটতে ছুটতে জানলার ধারে গিয়ে দেখতে যায়, তিনজন সেপাই সদর থেকে রাইফেল হাতে নিয়ে এসেছে। মালপত্র গাড়ীতে তোলা হয়ে গেছে, পিছু পিছু মাথা নীচু ক'রে হেটে চলেছেন কুমুদবাবু লাল রাস্তাটা দিয়ে কোন নিষ্ঠুর বিধাতার ইঙ্গিতে কোথায় জানেনা সে।

প্রতিমা চেপে ধ'রে থাকে শিকগুলো। দারোগাবাবুর বিজয়-দৃপ্ত কণ্ঠস্বর শোনা যায় ভিতর থেকে, "ঠাকুরদের আশীর্ব্বাদী নিয়ে যাও।"

প্রতিমার আশীর্ব্বাদ আজ চাই না। ও একাই থাক সব আশীষ। দর দর ধারে চোখের কোল বয়ে জল গড়িয়ে পড়ে, অস্ফুট কণ্ঠে যেন আর্ত্তনাদ ক'রে চলেছে—'এই কি তোমার মনে ছিল ঠাকুর?'

চোখ দুটো জলে ঝাপসা হয়ে আসে প্রতিমার। গাড়ীখানা আর দেখা যায় না, চড়াইএর বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

মরণ

শ্রীপ্রভাবতী দেবী, সরস্বতী

এসো তুমি এসো বন্ধু,—
মোর পাশে এসো চুপে চুপে,
দাও মোরে স্নিগ্ধ আলিঙ্গন।
হে চির সুন্দর শুভ্র,
এসো তুমি স্নিগ্ধ শান্ত রূপে,
পরিপূর্ণ করে তোল মোর এই নিখিল ভুবন
তোমার পরশ দিয়া;
ভুলে যাই—আমি ভুলে যাই
এ জগতে পূর্ণ তুমি, তুমি ছাড়া আর কিছু নাই।

শুনেছি লোকের মুখে
হতভাগ্য, যার কেহ নাই,
তুমি আছ প্রিয় বন্ধু তার।
"কে আছ আমার বন্ধু" দুনিয়ায় কে আসে সম্মুখে
তাহারে সুধাই,
দিল না উত্তর কেহ।
নেমে আসে ঘন অন্ধকার
নিঃশব্দে আমারে ঘেরি';
কোথা আলো, ওরে, কোথা আলো?
আমি ভাবি এত বড় পৃথিবীর
এক প্রান্তে ক্ষুদ্র বিন্দু মাঝে
আমার বিশাল বিশ্ব কি রকমে কখন ফুরালো!
কোথা হাসি, কোথা গান কোথা ফুটে ফুল
কোথা বাঁশী বাজে?
কোথা সত্য? শুধু ভুল, বিশ্বজোড়া ভুল,
ফুরাইয়া গেছে বেলা, রেখে গেছে রিক্তা দীনা সাঁঝে।—
রেখে গেছে গাঢ় অন্ধকার;
আলো দাও—আলো দাও, হে বিধাতা, যদি থাকো তুমি
আলোক ফুটায়ে তোল পরশে তোমার।

হে বন্ধু, তোমারে স্মরি' আজ এই রিক্ত অন্ধকারে
পূর্ণ করি, ধন্য কর পুণ্য কর স্পর্শ তব দানে।
বাঁচিতে চাহিনা আমি
বরণ করিয়া নিয়া ব্যর্থ দীনতারে।
আমি জানি—ওগো বন্ধু জানি
বিরাট ধ্বংসের মাঝে ক্ষুদ্র সৃষ্টি বীজ
রয়েছে নিহিত।
তবু ভ্রান্ত ভীত
কেন হয় বিশ্ববাসী, শুনে কাঁপে প্রাণ,
কেন ডাকে—কেন কাঁদে
রক্ষা কর ওগো ভগবান,
ফিরাইয়া লহ তব দান।
এসো তুমি এসো বন্ধু এসো ধীরে ধীরে;
বিশ্ব যার যায় ফুরাইয়া—
বেলা শেষে যেই জন ক্ষণ চাহি' রহে জাগি
সময়ের তীরে,
তারে ডাকো—লহ হাত ধরি'—;
তুমি এসো তরণী বাহিয়া
লয়ে চল বিস্মৃতির মাঝে।
অবসর নিয়ে এসো মহামান্য হে অতিথি মম,
মুক্তি দাও বন্ধু মোরে
মুক্তি দাও জগতের কাছে।

শিক্ষার ক্ষেত্র হইতে সংস্কৃত বিতাড়নের অপপ্রচেষ্টা

ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী, এম-এ, ডি-ফিল (অক্সন) [অধ্যাপিকা, লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এক্ষণে কথা-সাহিত্যের কথা আলোচনীয়। বাংলা "কথা-সাহিত্য ইংরাজীর মারফতে প্রাপ্ত ইয়োরোপীয় কথা-সাহিত্যেরই বঙ্গীয় রূপ"—ইহার তীব্র প্রতিবাদ নিশ্চয় বাঙালী কথা-সাহিত্যিক মাত্রেই করিবেন, আমাদের সে সম্বন্ধে এ স্থলে আর অধিক বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বাংলা গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি বিদেশী ভাবধারায় কিয়দংশে অনুপ্রাণিত হইয়াছে সত্য; বিদেশী গল্প, উপন্যাসের বাংলা অনুবাদও যথেষ্ট হইয়াছে, কেহ কেহ বিদেশী বিষয়বস্তু 'চুপিসাড়ে' চুরি করিয়া নিজের বলিয়া চালাইয়াছেনও। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও, বাংলা কথা-সাহিত্যের প্রকৃত রূপটি তাহারই একান্ত নিজস্ব—কাহারও নিকট হইতে ভিক্ষা, ঋণ বা চুরি নহে। প্রথমতঃ, বাংলা কথা-সাহিত্য অতি সমৃদ্ধ,—কবিতা প্রভৃতি সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগ অপেক্ষা, গল্প ও উপন্যাসেই বাঙালী লেখক-লেখিকাগণের দান সমধিক। বঙ্কিমচন্দ্র, শরচ্চন্দ্র, প্রভাতকুমার, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মহারথদের কথা ছাড়িয়া দিলেও, রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক ও পরবর্তী বহু বাঙালী কথা-সাহিত্যিকগণের মৌলিক দান চিরকাল বাংলার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যগুরু এবং এই সকল আধুনিক ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পলেখকদের সমবেত প্রচেষ্টায় বর্তমানে বাংলা কথা-সাহিত্য যে কেবল ভারতের শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্য-রূপেই পরিগণিত হয়, তাহাই নহে, সমগ্র জগতের কথা-সাহিত্যেই বাংলা কথা-সাহিত্য একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। সে ক্ষেত্রে বাংলা কথা-সাহিত্যকে "ইংরাজীর মারফতে প্রাপ্ত ইয়োরোপীয় কথাসাহিত্যেরই বঙ্গীয়রূপ" মাত্র বলিয়া পরিগণনা করা সম্ভবপর কি প্রকারে? দ্বিতীয়তঃ, বাংলা কথাসাহিত্য ওতপ্রোতভাবে আমাদেরই অতি নিজস্ব প্রাচীন সংস্কৃত সংস্কৃতিতে ভরপুর—বিদেশী প্রভাব ইহাতে তুলনায় অতি কম। সেই চির-পুরাতন, চিরনবীন রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, কথা, আখ্যায়িকা প্রভৃতি অদ্যাপি বংলা, তথা ভারতীয় কথা-সাহিত্যের মূল উৎস। অত্যাধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যিকগণের রচনাতেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ভারতীয় পরিবেশকেরই চিহ্ন সুস্পষ্ট। বাংলা কবিতায় যেরূপ, সেরূপ বাংলা গল্প-উপন্যাসাদিতেও ছত্রে ছত্রে শিব-দুর্গা, লক্ষ্মী-সরস্বতী, রাম-সীতা, যুধিষ্ঠির-দ্রৌপদী, তেত্রিশকোটী দেব-দেবী, সমুদ্রমন্থন, সূর্য্যগ্রহণ প্রভৃতি পৌরাণিক ঘটনা ইত্যাদির উল্লেখ ও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অতএব বাংলা কথাসাহিত্য যে ধুতিচাদর পরিহিত ইয়োরোপীয় সাহেবই মাত্র—ইহা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা কি কারণে জানি না, বাংলা কথাসাহিত্যের প্রকৃত রূপটীই দেখিতে পান নাই। তৃতীয়তঃ, বাংলা কথাসাহিত্যিক-গণের মধ্যেও কেহ কেহ ইংরাজীতে হয় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, না হয় অতি অল্পই ইংরাজী জানেন। অতএব অন্ততঃ তাঁহারা ত আর "ইংরাজীর মারফতে প্রাপ্ত ইয়োরোপীয় কথাসাহিত্য"কেই "বঙ্গীয়রূপ" প্রদান করিয়া সাহিত্য-যশঃপ্রার্থী হইতে পারেন না। অবশ্য, যাঁহারা ইংরাজী জানেন, তাঁহারাও যে এইরূপে স্বাতন্ত্র্য-বর্জ্জিত, পরমুখাপেক্ষী, পরানুসরণকারী জীব মাত্র নহেন, তাহা পূর্ব্বেই দর্শিত হইয়াছে। অতএব বাংলা "কথাসাহিত্য ইংরাজীর মারফতে প্রাপ্ত ইয়োরোপীয় কথাসাহিত্যেরই বঙ্গীয়রূপ" মাত্র—এই উক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

সুতরাং বাংলা রচনাভঙ্গী যে সর্ব্বপ্রকারে ইংরাজী রচনাভঙ্গীরই অনুরূপ, বাংলা সাহিত্য যে সর্ব্বতোভাবে ইংরাজী, তথা ইয়োরোপীয় সাহিত্যেরই অনুকরণ মাত্র—এই মতদ্বয়ই সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অজ্ঞতাপ্রসূত মাত্র। আমরা অবশ্য একবারও ইংরাজী শিক্ষার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করি না। কিন্তু সংস্কৃত বিতাড়নেচ্ছুকগণ যে যে কারণে সংস্কৃতকে তাড়াইয়া বা কমাইয়া ইংরাজীকে প্রাধান্য দিতে ইচ্ছুক, সেই কারণগুলিতেই আমাদের ঘোরতর আপত্তি। তাঁহারা বলেন যে, নিম্নলিখিত কারণে আমাদের পক্ষে ইংরাজীশিক্ষা অত্যাবশ্যক এবং সেই সকল কারণেই সংস্কৃত শিক্ষা অনাবশ্যক—

(ক) "ইংরাজী ভাল না জানিলে বর্ত্তমান যুগে কেহ ভালো বাংলা লিখিতে পারে না।" অথচ, "বাংলা ভাষা এখন কাহারও কিঙ্করী নয়, সে নিজের শক্তিতে স্বাধীনা, এখন আর সংস্কৃত জানিবার প্রয়োজন নাই।" অর্থাৎ, ভাষার দিক্ হইতে বাংলা ইংরাজীর কিঙ্করী বলিয়াই আমাদের ভাল করিয়া ইংরাজী শেখা অবশ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু বাংলা সংস্কৃতের কিঙ্করী নহে বলিয়া সংস্কৃত শেখা অনাবশ্যক।

(খ) "বর্ত্তমান যুগের বাংলা রচনাভঙ্গী ইংরাজীরই অনুবর্ত্তী।" "সাহিত্যের প্রধান অঙ্গ শব্দ নয়; রচনাচাতুর্য্য ও প্রকাশ-ভঙ্গীর সরসতা। ইহা বরং ইংরাজী হইতে পাওয়া যায়, সংস্কৃত হইতে নয়।" অর্থাৎ রচনাভঙ্গী ও সরসতার দিক্ হইতেও, বাংলা ইংরাজীরই সেবাদাসী বলিয়া, বাংলা রচনার জন্য ইংরাজী রচনাপ্রণালীও সরসতা সম্বন্ধে জ্ঞান অত্যাবশ্যক; কিন্তু এই সকল বিষয়ে কিছুই সাহায্য করে না বলিয়া, সংস্কৃত সমভাবে অনাবশ্যক।

(গ) "বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যও ইংরাজী সাহিত্যের দ্বারা পরিপুষ্ট" বলিয়াই ইংরাজী সাহিত্যের যথেষ্ট জ্ঞান বাঙালী সাহিত্যিকের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়; অর্থাৎ, বঙ্গসাহিত্য সংস্কৃত সাহিত্যের দ্বারা বিন্দুমাত্রও পরিপুষ্ট নহে বলিয়া সংস্কৃত পাঠ সমভাবে নিরর্থক।

(ঘ) "প্রবন্ধ সাহিত্য বাংলা রূপে ইংরাজীতে লেখা বলিলেও চলে" বলিয়াই প্রবন্ধ লেখকের পক্ষে ইংরাজী প্রবন্ধের জ্ঞান অত্যাবশ্যক; অর্থাৎ, প্রবন্ধ সাহিত্যে সংস্কৃতের প্রভাব একেবারেই নাই বলিয়া, সংস্কৃত সম্পূর্ণ বর্জ্জনীয়।

(ঙ) "কথাসাহিত্য ইংরাজীর মারফতে প্রাপ্ত ইউরোপীয় কথাসাহিত্যেরই বঙ্গীয় রূপ" বলিয়াই ইংরাজী, তথা ইয়োরোপীয়

(১) এই প্রবন্ধে খণ্ডিত যুক্তিসমূহ কবিশেখর কালিদাস রায় লিখিত "প্রবেশিকার পাঠ্যসূচী" নামক প্রবন্ধ হইতে গৃহীত।

কথাসাহিত্য অবশ্য পঠনীয়; অর্থাৎ, সংস্কৃত সাহিত্য সম্পূর্ণ অবহেলার যোগ্য।

অতএব, ইঁহাদের মতে উপরি-উক্ত পাঁচটী কারণের জন্যই "কি ভাবে ইংরাজী শিক্ষার জন্য সুব্যবস্থা করা যায়, তাহাই চিন্তনীয়। কিন্তু, আমাদের মতে, উপরি-উক্ত কারণগুলি বরং বহুলাংশে সংস্কৃতের পক্ষেই খাটে, ইংরাজীর পক্ষে নহে—ইংরাজী শিক্ষার অত্যাবশ্যকতার কারণ অন্য। ইহা উপরে দর্শিত হইয়াছে।

ইংরাজীর সহিত আমাদের স্বীয় মাতৃভাষার সম্পর্ক কি এবং কতটুকু হওয়া উচিত—এই প্রসঙ্গে আমাদের মহাত্মা গান্ধীর সাবধানবাণী স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। শোদপুরস্থ এক প্রার্থনা সভায় (১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৪৫) মহাত্মা বলিয়াছিলেন; "আমরা যদি ইংরাজী ভাষা হইতে মুক্তিলাভ করিতে না পারি ত আমাদের দাসত্ব শৃঙ্খলগুলির অন্যতম একটী শৃঙ্খল হইতেও মুক্তিলাভ করিতে পারিব না। অতএব আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য এই শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে সচেষ্ট হওয়া। আমরা সাধারণতঃ ইংরাজীতেই পরস্পরের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া থাকি, ইংরাজীতেই লিখি। কিন্তু ইহা যে আমাদের ও আমাদের দেশের পক্ষে কতদূর অনিষ্ট জনক তাহা বলা যায় না।" মহাত্মার এই বাণীর প্রতিধ্বনি করিয়া আমরাও পুনরায় বলি যে, যদি আমাদের এতদূর অধঃপতন হইয়া থাকে যে, "ইংরাজী ভাল না জানিলে বর্ত্তমান যুগে কেহ ভাল বাংলা লিখিতে পারে না", তাহা হইলে এই অতি শোচনীয় অবস্থার প্রতিকার অবিলম্বেই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। ইহা পূর্ব্ব সংখ্যায় বিশদভাবে বলা হইয়াছে।

(৬) "বর্ত্তমান যুগের বড় বড় সাহিত্যস্রষ্টারা কেহই সংস্কৃতজ্ঞ নহেন। কাহারও কাহারও গজ বা মুনি শব্দের রূপ জানা নাই"—এই আপত্তির উত্তরে আমরা বলিব যে, প্রথমতঃ, "বর্ত্তমান যুগের বড় বড় সাহিত্যস্রষ্টৃ" গণের সংস্কৃত বিদ্যা সম্বন্ধে আমাদের অবশ্য সাক্ষাৎ জ্ঞান নাই। কিন্তু আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের স্রষ্টা বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সাহিত্যরথিগণ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহাদের নিপুণ হস্তে, সংস্কৃতের প্রভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে যেরূপ দ্রুতোন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহাই বাংলার উপর সংস্কৃতের প্রভাবের মঙ্গলময়ত্ব প্রমাণ করে। দ্বিতীয়তঃ, অত্যাধুনিক সাহিত্যিকগণ যদি সংস্কৃত নাও জানেন, তাহা হইলেও তাঁহারা নিশ্চয় অভিধান খুলিয়াই হউক, অথবা পণ্ডিতের সাহায্যেই হউক, সংস্কৃত শব্দাদি আহরণ করেন, কারণ তাঁহারা প্রায়ই এরূপ শব্দাদি ব্যবহার করেন (বিশেষ রূপে তাঁহাদের কবিতায়) যাহা শুদ্ধ (বা অশুদ্ধ) সংস্কৃত, এবং সাধারণতঃ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃতও হয় না। এইরূপে, সংস্কৃত না জানিয়াও সংস্কৃত শব্দের প্রচুর ব্যবহার, 'হজম' না করিয়াই 'উদ্গারের' প্রচেষ্টার জন্যই আধুনিক লেখকগণের কাহারও কাহারও রচনা দুর্ব্বোধ্য ও শ্রুতিকটুরূপে নিন্দাভাজন হইতেছে। তৃতীয়তঃ, ভাষার দিক্ হইতে, সংস্কৃত নিরপেক্ষ, সরল কথ্য ভাষাতেও কেহ কেহ বাংলা রচনা করিতেছেন—কিন্তু সে মাত্র কথাসাহিত্যে কিছুদূর চলে, উচ্চ শ্রেণীর প্রবন্ধসাহিত্যে একেবারেই নহে, কারণ প্রবন্ধসাহিত্যে পারিভাষিক শব্দাদির প্রয়োজন, এবং এই সকল পরিভাষা যে সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার হইতেই আহৃত, তাহা উপরেই প্রদর্শিত হইয়াছে। চতুর্থতঃ, বর্ত্তমান্ যুগের "বড় বড় সাহিত্য স্রষ্টারা" সংস্কৃত না জানিয়াও যদি "ভাল" বাংলা লিখিতে সমর্থ হন, তাহার কারণ এই যে, এই ভাল বাংলার শব্দ সম্ভার, ব্যাকরণ, রচনাশৈলী প্রভৃতি তাঁহাদেরই পূর্ব্বাচার্য্যগণ অতি সযত্নে সংস্কৃত হইতেই প্রধানতঃ আহরণ করিয়া বাংলাকে একটী বিশিষ্টরূপ দান করিয়া গিয়াছেন—সেই শব্দসম্ভার, সেই ব্যাকরণ, সেই রচনাপ্রণালীর সাহায্যেই পরবর্ত্তী বাংলা-সাহিত্যিকগণ "বড় বড় সাহিত্যস্রষ্টা" রূপে খ্যাতি লাভ করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃতরূপে সাহিত্য "স্রষ্টা" হইতে হইলে পূর্ব্বাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক প্রপঞ্চিত ভাষার উন্নতিবিধানও করিতে হইবে; এবং এই উন্নতি সংস্কৃতভাষার আশ্রয়েই সম্ভবপর, সংস্কৃতনিরপেক্ষ ভাবে নহে। বঙ্গভাষার শব্দগরিমা বৃদ্ধি করিতে হইলে, সংস্কৃতই একমাত্র উপায়। বানান, ব্যাকরণ প্রভৃতি সম্বন্ধেও বাংলা ভাষায় অদ্যাপি স্থির, সর্ব্বজনীন নিয়মাদি সকল ক্ষেত্রে প্রচলিত হয় নাই। এইরূপ নিয়মাদি বহুক্ষেত্রেই সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মেরই রূপান্তর মাত্র। অল্প কথায় ভাব প্রকাশ, ভাষার মাধুর্য্য প্রভৃতি দিক্ হইতেও সংস্কৃতই বাংলার শিক্ষক। একথা পূর্ব্বেই বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব, আধুনিক বাঙালী সাহিত্যিকগণ যদি এক অক্ষরও সংস্কৃত না জানিয়াও "ভাল" বাংলা রচনা করিতে সমর্থ হন, ত তাহা তাঁহাদের কৃতিত্বেরই বিষয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু, যেহেতু এই "ভাল" বাংলার প্রাণশক্তি বা মূল উৎসই হইল সংস্কৃত, এবং যেহেতু জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁহারা এই সংস্কৃতের রীতি ও নিয়মাবলী বহু স্থলেই অনুসরণ করিতেছেন, সেহেতু সংস্কৃতকে পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক ইংরাজীর নিকটই রচনাপ্রণালী শিক্ষা ও ভাব আহরণের জন্য গমন করা বিধেয় কিনা, তাহা তাঁহারাই বিচার করুন। আমাদের কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস যে, বাংলা সংস্কৃত হইতে ভিন্ন ভাষা হইলেও, বাংলার নিজস্ব একটী বিশিষ্টরূপ থাকিলেও, সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রভৃতির নিয়মাদি বাংলায় নির্ব্বিচারে সর্ব্বত্র প্রযোজ্য না হইলেও, সকল বাংলা শব্দই সংস্কৃত না হইলেও, সংক্ষেপে, বাংলা সংস্কৃতের "কিঙ্করী" না হইলেও, বাংলার পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন, পরিপুষ্টি সম্ভবপর কেবল সংস্কৃতের মূল আধার, আবেষ্টনী বা 'কাঠামোর', মধ্যেই, সংস্কৃত নিরপেক্ষভাবে নহে। সে জন্য, "গজ বা মুনি শব্দের রূপ" জানা আবশ্যক না হইলেও, সংস্কৃত পরিভাষা, ব্যাকরণ, রচনাপ্রণালী, প্রভৃতি সম্বন্ধে অল্প বিস্তর জ্ঞান বাঙালী সাহিত্যিকগণের পক্ষে অত্যাবশ্যক, সন্দেহ নাই। শব্দপ্রয়োগ, বানান, ব্যাকরণ ইত্যাদি বিষয়ে সন্দেহ স্থলে সংস্কৃত ব্যাকরণই ত আমাদের একমাত্র "মুস্কিল আসান।"

দ্বিতীয় আপত্তি—স্কুলে সংস্কৃত ছাত্রবল্লভ নহে, অতএব বর্জ্জনীয়

প্রবেশিকার পাঠ্যসূচী হইতে সংস্কৃতবিতাড়নেচ্ছুকগণের দ্বিতীয় আপত্তি নিম্নলিখিত রূপ:—

"ম্যাট্রিকের সংস্কৃত সাহিত্যমূলক নয়, ব্যাকরণমূলক। ব্যাকরণের দৃষ্টান্ত স্বরূপ এবং ব্যাকরণের অনুশীলনের জন্যই গদ্যপদ্য সংকলন পড়ানো হয়। সংস্কৃত ব্যাকরণ অন্যান্য বিবিধ বিষয়ের সঙ্গে আয়ত্ত করা খুবই কঠিন। তবু ইহাতে পাশ করা আটকায় না। সংস্কৃতের কতকগুলি বাক্যের বাংলা অনুবাদ করিয়া ও ২১৪টী অন্ধকারে ঢিল মারিয়া পাশের মার্ক একরূপ থাকিয়া যায়। বুদ্ধিমান ছেলেরা ব্যাকরণের খুটিনাটি মুখস্থ করিয়া Test paper-এর প্রশ্নগুলির উত্তর তৈরী করিয়া অনেক বেশী মার্কও পায়। কিন্তু এই সব বুদ্ধিমান্ ছেলেরা শতকরা নব্বই জন I. Sc. পড়ে—নয়ত I. A.তে সংস্কৃত ছাড়িয়া দেয়। ক্রমে তাহারা সংস্কৃতের প্রত্যেক বর্ণ টী ভুলিয়া যায়। ম্যাট্রিকে অনেক মার্ক পাইয়া Division-এ উঠাটাই তাহাদের লাভ।"

(১) এই আপত্তির উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃত পাঠ্যসূচী কতটা ব্যাকরণমূলক এবং কতটাই বা সাহিত্যমূলক হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে অবশ্য মতভেদের অবকাশ আছে। কিন্তু ইহা অবিসংবাদি সত্য যে, ব্যাকরণ সংস্কৃতের একটী অপরিহার্য্য প্রধান অংশ। বিশেষরূপে, যাহারা প্রথম সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে সংস্কৃত ব্যাকরণের সাধারণ নিয়মাবলী না জানিলে সংস্কৃত পাঠই অসম্ভব। শব্দরূপ, সন্ধি, সমাস প্রভৃতি সম্বন্ধে 'মোটামুটী' জ্ঞান না থাকিলে, একটী অক্ষরও সংস্কৃত বোধগম্য হইতে পারে না। সুতরাং, সংস্কৃত পাঠ্যসূচীর একটী বৃহৎ অংশই ব্যাকরণমূলক হওয়া অনিবার্য্য, কারণ ব্যাকরণ ব্যতীত সাহিত্যের কোনোরূপ রসই ত ছাত্রছাত্রীগণ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে না।

(২) সংস্কৃত ব্যাকরণ আয়ত্ত করা কঠিন হইলেও, এরূপ কঠিন নহে যে ছাত্রছাত্রীগণের সাধনাতীত। প্রবেশিকা পরীক্ষাথিগণকে ইংরাজী, গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতি বহু কঠিন বিষয়ই শিক্ষা করিতে হয়, এবং এই সকল যদি তাহাদের সাধনাতীত না হয়, ত, সংস্কৃতও নহে। বস্তুতঃ, সংস্কৃত যে সাধারণতঃ ছাত্রছাত্রীগণের নিকট দুরূহ ও অপ্রীতিকর বলিয়া বোধ হয়, তাহার কারণ সংস্কৃত শিক্ষাদান প্রণালীর মূলগত দোষ। অধিকাংশ বিদ্যালয়েই সংস্কৃত শিক্ষাদানের জন্য কোনোরূপ সুব্যবস্থাই নাই। ইংরাজী, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় কিরূপে অধিকতর সহজ সরল ও চিত্তাকর্ষকভাবে ছাত্রছাত্রীগণকে শিক্ষা দেওয়া যায়, সে বিষয়ে আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ববিদ্‌গণ নানা প্রকার চিন্তা, আলোচনা, গবেষণা প্রভৃতি করিতেছেন; এবং ফলে অল্প দিনের মধ্যেই বিদ্যালয়সমূহে এই সকল বিষয়ের শিক্ষাপ্রণালীর বহুল উন্নতি সাধিত হইয়াছে, এবং এই সকল বিষয় ছাত্রছাত্রীগণের নিকট পূর্ব্বাপেক্ষা বহুল সহজ ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। কিন্তু সংস্কৃত শিক্ষাপ্রণালীর সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও চিন্তা করা কেহই প্রয়োজন বোধ করেন নাই। ফলে, অদ্যাপি ছাত্রছাত্রীগণের নিকট সংস্কৃত এক বিভীষিকারূপেই প্রতিভাত হইতেছে। এবং, হয় রক্তচক্ষু পণ্ডিতমহাশয়ের বেত্রাস্ফালন ও ছাত্রদের সভয়ে অবস্থান, না হয় তন্দ্রাবিষ্ট পণ্ডিত মহাশয়ের নাসিকাগর্জ্জন ও ছাত্রদের যথেচ্ছ প্রস্থান—ইহাই হইয়া দাঁড়াইয়াছে আমাদের বিদ্যালয়সমূহের সংস্কৃত ক্লাসের অতি সাধারণ দৃশ্য। এক্ষেত্রে, ছাত্রগণের নিকট সংস্কৃত হইয়া দাঁড়াইয়াছে হয় বিভীষিকা না হয় 'ফাঁকি'রই বস্তমাত্র—হয় বেত্রের ভয়ে না বুঝিয়া ব্যাকরণ মুখস্থ করা, না হয়, নাসিকাগর্জ্জনের সুযোগ লইয়া সংস্কৃত পাঠ মুখস্থে একেবারেই অবহেলা করা, ইহাই বর্ত্তমানে ছাত্রগণের সংস্কৃত বিষয়ে অনুসৃত পন্থা। সুতরাং, কোনোদিক্ হইতেই ছাত্রগণের প্রকৃত সংস্কৃত শিক্ষা বিন্দুমাত্রও হইতেছে না। অতএব প্রবেশিকা পরীক্ষায় যে সংস্কৃত সাধারণতঃ ছাত্রবল্লভ নহে, তাহার ত যথেষ্ট কারণই বিদ্যমান রহিয়াছে। তজ্জন্যই "অন্ধকারে ঢিল মারিয়া" পাশ করা ব্যতীত ছাত্রগণের আর উপায় কি? কিন্তু যদি অন্যান্য বিষয়ের ন্যায়, সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্যশিক্ষারও যথোচিত ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে সংস্কৃত যে নিশ্চয়ই ছাত্রবল্লভ হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্রও অবকাশ নাই। ইহা আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতেই সজোরে বলিতে পারি। সংস্কৃত সাহিত্যের ন্যায় সরস, সুমিষ্ট, ভাবগর্ভ সাহিত্য জগতে নাই। সুতরাং ভাল করিয়া পড়াইলে ইহা যে ইংরাজী ও বাংলা সাহিত্যের অপেক্ষা অল্প চিত্তাকর্ষক হইবে না, অধিকন্তু অধিকই হইবে, তাহা নিঃসন্দেহ। এমন কি, সংস্কৃত ব্যাকরণ পর্য্যন্ত ভাল করিয়া নানারূপ দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝাইয়া দিলে ছাত্রগণের নিকট বহুল পরিমাণে প্রীতিকর ও সুবোধ্য করা যাইতে পারে। ইংরাজী ব্যাকরণকে ছাত্রবল্লভ ও সহজায়ত্ত করিবার জন্য বিশেষজ্ঞগণ কত প্রকারই না উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। সেইরূপ সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষা প্রণালীর জন্যও উন্নততর উপায় অবলম্বন করিলে ব্যাকরণও ছাত্রগণের নিকট বিভীষিকারূপে প্রতীয়মান হইবে না।

বস্তুতঃ, একটী অধ্যেতব্য বিষয় কেবল ছাত্রপ্রিয় নহে বলিয়াই যে তাহাকে সমূলে পরিবর্জ্জন করিতে হইবে, অথবা বাধ্যতামূলক না রাখিয়া কেবল ইচ্ছামূলক বিষয়ে পরিণত করিতে হইবে, ইহা কিন্তু অতি অপূর্ব্ব যুক্তি। প্রকৃতকল্পে এস্থলে কোনো বিষয় ছাত্রগণের প্রিয় ও সুবোধ্য কিনা, ইহাই প্রশ্ন নহে। প্রশ্ন একমাত্র ইহাই যে, সেই বিষয়টী ছাত্রগণের অবশ্য পঠনীয় কি না। যদি অবশ্য পঠনীয় হয়, তাহা হইলে উহা ছাত্রপ্রিয় না হইলেও বর্জ্জনীয় ত নহেই, উপরন্তু উহাকে অবিলম্বে ছাত্রপ্রিয় করিবার জন্যই সকলের সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কিছু সংস্কৃত শিক্ষা প্রত্যেক হিন্দু ছাত্রছাত্রীর পক্ষে অত্যাবশ্যক হইলেও, কর্ত্তৃপক্ষগণ সংস্কৃতের উপর কোনোরূপই গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংস্কৃতের জন্য অতি অল্প বেতনে পণ্ডিত নিযুক্ত করা হয়, যিনি শিক্ষকতা করিতে, ছাত্র পরিচালনা করিতে, ছাত্রগণের নিকট সঠিক অথচ সরসভাবে বিষয়টী ব্যাখ্যা করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। অপর দিকে, যদিও বা উপযুক্ত ব্যক্তি নিযুক্ত করা হয়, তাহা হইলেও তাঁহাদের বেতন ও পদমর্য্যাদা সাধারণতঃ এরূপ শোচনীয় হইয়া থাকে যে, শিক্ষকতার ন্যায় সুমহৎ কার্য্যে তাঁহাদের ধৈর্য্য বা উৎসাহ অবশিষ্ট থাকে

অল্পই। আমাদের দেশের "ইস্কুল মাষ্টারদের" অবস্থা অবশ্য সকল ক্ষেত্রেই অল্প বিস্তর শোচনীয়। কিন্তু সংস্কৃতের ক্ষেত্রেই এই শোচনীয়তা চরমে উঠিয়া থাকে। যে ক্ষেত্রে ইংরাজী ও বিজ্ঞান শিক্ষকের জন্য ৯০।১০০৲ টাকা অনুমোদিত হয়, সেক্ষেত্রে সংস্কৃত শিক্ষকের জন্য ২০।৩০৲ টাকাই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। এইরূপে, অনুপযুক্ত অথবা অসন্তুষ্ট শিক্ষকের হস্তে ন্যস্ত সংস্কৃত যে কোনোক্রমেই ছাত্রপ্রিয় হইতে পারিবে না, তাহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? এইরূপে, সংস্কৃতের ক্ষেত্রে কর্ত্তৃপক্ষে, শিক্ষকে, ছাত্রে যেন 'ছেলেখেলাই' কেবল চলিতেছে, শিক্ষা নহে। সেক্ষেত্রে, "অন্ধকারে ২।৪টি ঢিল মারিয়া" পাশ করা এবং "ম্যাট্রিকে অনেক মার্ক পাইয়া Divisionএ উঠাটাই" ছাত্রগণ সংস্কৃত পাঠের একমাত্র লাভ বা উপকারিতা বলিয়া যদি ধরিয়া থাকে ত দোষ তাহাদের নহে, শিক্ষকমহাশয়গণেরও নহে,—দোষ সম্পূর্ণ কর্ত্তৃপক্ষের। সংস্কৃতের পক্ষে কর্ত্তৃপক্ষের এইরূপ নীরব অবহেলাভাব, অথবা সরব বৈরভাবের পরিবর্ত্তন না হইলে ছাত্রসমাজে সংস্কৃতের অনাদর সমধিক বর্দ্ধিতই হইবে। সুতরাং, সেই অনাদরকেই শিক্ষার ক্ষেত্র হইতে সংস্কৃত বিতাড়নের প্রধান 'অজুহাত' রূপে সমুপস্থিত করা, আর যাহাই হউক, ধর্ম্মযুদ্ধ নহে।

[আগামীবারে সমাপ্য

কাহিনীর মতো

শ্রীমণীন্দ্র গুপ্ত

ঠিক মনে পড়ে না কি কোরে সুরভিদির সঙ্গে সম্পর্কটা আমার শেষ হয়ে গেল। তবে যেটুকু কথার ইতিহাস নিয়ে সেদিনকার পৃথিবী আমার চোখের সামনে দুলে উঠেছিল—আমাকে পাগল কোরেছিল তার অস্থিরতার আলো, সেকথার স্মৃতি ভুলে যাওয়ার অন্ধকারে আজ এমন কোরে ডুবে আছে—খুব অস্পষ্ট বলেই মনে হয় না তার সবকিছু। খুবই আবছা নয় তা। স্মৃতির আলো যদিও হারিয়েছে বিস্মৃতির পৃথিবীতে, অতীতের স্বাক্ষরটুকু যদিও হোয়েছে পাণ্ডুর—তবু যেন আজ মনে পড়ে তার ঝিকিমিকি, মনে পড়ে তাই সেই দীপ্তি। কিন্তু এখন সে শুধু একটা বোবা স্বপ্ন—শুধু একটা অস্পষ্ট আবরণের তন্তুতে শিথিল কোরে জড়ানো।

সুরভি ছিল স্কুল মিসট্রেস। কী একটা কারণে প্রথম এসেছে আমাদের বাড়ীতে বেড়াতে। লম্বা ছিপছিপে ফর্সা চেহারার ওপর বড় বড় চোখ দুটোতে সত্যিই সেদিন ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিলো সুরভিকে। একটা কালো রংএর সাড়ী জড়িয়ে এসেছে সর্ব্বাঙ্গে। এতো সাধারণ সাড়ী কি কোরে ওর বয়সের কোনো মেয়ে পরতে পারে—সে কথা ভাবলেও আজ বেশ অবাক্ হোয়ে যাই।

আমি কবিতা লিখতুম। খুবই সাধারণ কবিতা। সন্ধ্যেবেলায় যখন টেবিল-ল্যাম্প জ্বেলে ঝুঁকে পড়তুম তার ওপর কলমটা নিয়ে—পৃথিবীতে আমিই যে একমাত্র কবি এবং আমার কবিতাই সব থেকে সুন্দর—এরকম অসংখ্য উপহাসের বন্যা ছুটে আসতো সবার মুখ থেকে। কিন্তু তবু আমি একটুও বিচলিত হই নি। প্রাণপণে লিখে চলেছিলুম। জানতুম—একদিন হয়তো সবার ভুলের ঘুম ভেঙে দেবে আমার অক্ষরের ঝংকার। সেদিন আমার কবিতা পৃথিবীর সব ঠোঁটের ভেতরে গুণ গুণ কোরে গান গেয়ে উঠবে।

এর ভেতরেই একদিন সুরভি এলো। এলো ও স্বপ্নের মতো। আমার উচ্ছ্বাসের সমুদ্র থেকে যেন উঠলো ঘুম-ভাঙার রাজকন্যা—আমার স্বপ্নের সুরভি নিয়ে হৃদয়ের শাখায় যেন ফুটলো ফুল। আকাশ ভরে আমার নেমে এলো গোধূলি। সে গোধূলির ভেতর সুরভির সেদিনকার খোলা চুলের গন্ধ আজও যেন বাতাসে স্পষ্ট অনুভব কোরতে পারছি। সুরভি আমাকে পাগল কোরে এসেছিল—ও এসেছিল ঘুমের মতো আমার তন্দ্রার গোধূলিতে।

সুরভির কথা সব থেকে যার কাছে বেশী শুনতুম—সম্পর্কে তিনি আমার ছোট কাকীমা। বছর কয়েকের বড় আমার থেকে। কিন্তু এত সহজ হোয়ে কথা বলতেন; মনেই হোতো না তিনি কাকীমা কিংবা ওজাতীয় কিছু। মাঝে মাঝে এতো সহজ হোয়ে পড়তেন—বেশ একটু অবাক্ হোয়ে যেতুম তাঁর কথাগুলো শুনে। লজ্জাও কোরতো, কিন্তু এড়ানোর বেলায় কেমন যেন একটু দুর্ব্বল বোধ করতুম।

ইতিমধ্যে সুরভি এলো। সমস্ত বাড়ীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রতিধ্বনি কোরে উঠলো ওর পদধ্বনি। ও যেন একটা ঘুমন্ত পুরীতে এসে নেমেছে! যে সমুদ্রের ঢেউ গ্যাছে হারিয়ে, ও যেন সেই সমুদ্রের হারানো ঢেউ। যে বাঁশীর সুর গ্যাছে ফুরিয়ে—ও যেন সেই বাঁশীরই পুরোনো কলতান।

বেশ একটু ভয় ভয় কোরতে লাগলো। সুরভির কথার দীপ্তির সামনে যদি নিভে যাই! যদি ফুরিয়ে যায় আমার উত্তরের স্রোত। একেবারে অচেনা হোলে জানি, সুরভিকে একটুও আমার ভয় কোরতো না সেদিন—কিন্তু ওর পরিচয়ের কুসুম নিয়ে যে স্মৃতির মালা আমি মনে মনে গেঁথেছিলুম তারই আলোয় আমি জ্বলে উঠেছিলুম আপাদ মস্তক।

ভাবছি উঠে পালাবো কি না—এমন সময়ে আমার ঘরের সামনে এলো সুরভি। উঃ কী সুন্দর ও! ওর মুখের জ্যোছনায়, ওর চোখের ঝিলি-মিলিতে আমার সমস্ত পৃথিবী জ্বলে উঠলো! আমি যেন অন্ধ হোয়ে গেলুম ওর অদ্ভুত দৃষ্টিপ্রদীপের সামনে। ঐ দুটো চোখে এতো দীপ্তি—ঐ ছোট্ট ললাটে এতো ঝিকিমিকি! ও কী পৃথিবীর সেই ইভ—ও কী সেই কলস্বনা, স্বর্গের হাসিমুখরা উর্ব্বশী?

ও এসে আমার টেবিলের পাশে দাঁড়ালো। চুলগুলো ওর ভেঙে ভেঙে পড়তে চাইছে—কিন্তু কী আশ্চর্য্য একটুও এলোমেলো হোয়ে পড়ছে না পিঠের ওপর। আঁচলের একটা কোণ কী সুন্দর কোরে ও আঙুলের সঙ্গে জড়াচ্ছে! ওর পায়ের এতো মৃদু ধ্বনি? এত নমনীয় তার ছন্দ?

কলমটা নিয়ে জোর কোরে কাগজের ওপর বাজে কথা লিখতে লাগলুম। জানি, তার কোনো মানেই হয় না—কিন্তু শুধু চুপ কোরে বসে থেকে সুরভিকে লজ্জা দিতে একটুও আমার ইচ্ছে হচ্ছিল না। সুরভির সামনে মাথাটা আমার আপন থেকেই নীচু হোয়ে এলো। মনে হোলো ও যেন সাপুড়ে—আর আমি সেই ভয়বিহ্বলা ফণিনী।

"দেখি কী কবিতা লেখা হোচ্ছে?" কোনো ভূমিকা না কোরেই ও ওর ফরসা হাতখানা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলো। তার কয়েকটা

আঙুলের স্পর্শ এসে লাগলো আমার আঙুলের গায়ে। উঃ সে কী শিহরণ! সে কী আলোড়ন! শিরায় শিরায় যেন অনুভব করলুম- আমি যেন তার অসামান্য প্রভাবে একটু একটু কোরে মিশে যাচ্ছি। ধমনীর স্পন্দনের ভেতরে সুরভির শুধু স্পর্শের করুণা রাগিণীর মতো উঠলো ঝিলমিলিয়ে।

উত্তর দিতে চেষ্টা করলুম। কিন্তু 'তুমি' 'আপনি'র মাঝখানে একটা বাধা এমনভাবে এসে দাঁড়ালো—তার একটাকে সরিয়ে দিতে পারলুম না। অথচ লক্ষ্য করলুম সুরভির ঠোঁটে একটু বিরক্তি। ও কী তবে আমার দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে এই অভিনয় কোরছে অভিমানের?

ভয়ে ভয়ে তাই উত্তর দিলুম—এটা কবিতা নয়। শেলীর সম্বন্ধে একটা ক্রিটিসিজ্‌ম্।

"কোন্ শেলী? লণ্ডনের সেই সুন্দর ছেলেটা?"—একটু হেসে উঠলো সুরভি। বেশ বুঝলুম শেলী ওকেও পাগল কোরেছে।

"হ্যাঁ": সংক্ষিপ্ততম উত্তরে রক্ষা করলুম সামাজিকতা।

"শুনলাম তুমি কবিতা লেখো? কই দেখি কী লেখো।"

"কে বললো লিখি? ও কী লেখা নাকি? ও কী দেখানো যায়? ভীষণ হাসি পাবে পড়ে।"

এতোগুলো কথা আমি বললুম? সুরভির সামনে? তবে কী ও খুসী হোয়েছে আমার অক্ষরের প্রতিদানে? ওর কী ভালো লেগেছে এই উত্তরটা?

"কিন্তু আমার কাছে তুমি লুকোতে পারবে না কিছু। জানো, তোমার চেয়ে আমি বয়সে বড়? এবার সুরভি সত্যিই হেসে উঠলো। একটুও লুকোলো না, একটুও আড়াল কোরলো না ওর উচ্ছ্বাস।

"বেশ, তোমাকে তা হলো সুরভিদি বলেই ডাকবো।" একসঙ্গে হেসে উঠলুম আমরা।

এর পর থেকে সুরভিদির সঙ্গে আলাপের স্রোত আমার অবিরাম ভাবে বয়ে চললো। কোথাও একটু বাধা পেলো না। সুরভিদি কাছে এসেছে, বসেছে, কতো রকমের কথা বলেছে। কথা যেন তার ফুরাতো না কিছুতেই। আমারো না। আমিও সমান তালে তালে চলছিলুম। হোঁচট খাবার ভয় করিনি একটুও। জানতুম—একটু স্খলন হোলে মার্জ্জনা নিশ্চয়ই ও কোরবে।

একদিন সুরভিদিকে ডাকলুম। চলে যাচ্ছিলো আমার ঘরের পাশ দিয়ে। সন্ধ্যে হয় হয়---এমনি সময়ে। এলো হাসতে হাসতে।

বললুম—"আমাকে তোমার কী রকম লাগছে?"

জীবনে প্রথম প্রশ্ন আমারই এটা। চিরদিন শুধু মুখ বুজে উত্তরই দিয়ে এসেছি। উত্তর শোনবার আর সৌভাগ্য হয়নি কোনোদিন।

"জানো সুরভিদি, তুমিই তো আমার কবিতা। আমার টেবিলে দু'বেলা তুমি এসে বসবে। আর তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে সে আলোর ছবি আঁকবো আমি কথার তুলি দিয়ে। একেই তো কবিতা বলে, না সুরভিদি?"

ও একটু হাসলে। চিবুকটা আমার একটু তুলে ধোরে তাতে কয়েকটা আঙুলের উষ্ণতা দিয়ে বললে—তুমি ভারী দুষ্টু দীপ। তোমার সাহসে আমি সত্যিই অবাক্ হোয়ে গেছি। নিশ্চয়ই আমি তোমার কবিতা।

ইতিমধ্যে আমাদের এই পরিচয়টা অনেকের কাছে সহ্য হোলো না। বেশ বুঝছিলুম—কেমন যেন একটা অস্বস্তিকর আবহাওয়ার ভেতরে এসে পড়ছি আমরা—যার অস্থিরতা থেকে মুক্তি হয়তো কোনদিন পাবো না। সবাই চোখ বাঁকালেন। অলক্ষ্যে শুনতে পেলুম বেশ স্পষ্ট তাঁদের বক্তব্য।

কিন্তু একদিন সুরভিদিকে ডাকলুম। কী একটা কারণে ও আমার দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। এলো আস্তে আস্তে ছায়ার মতো। থেমে থেমে।

জানো দীপ, আমরা শীঘ্র চলে যাচ্ছি। সুরভিদির স্বরে কাঁপুনি স্পষ্ট লক্ষ্য করলুম। কিছু একটা আঘাত কোন দিক থেকে এসেছে ভীষণ হোয়ে তার বুকে, জমেছে তার যন্ত্রণার তমিস্রা—এমনি অস্পষ্টতায় কথা ক'য়ে উঠলো ও।

"আচ্ছা, আমাকে ভুলে যাবে তো?" এবার কণ্ঠ হোয়ে এলো আরো করুণ। শোনালো সেতারের অন্তরার মতো।

"ছিঃ, তোমাকে মনে কোরে কত কষ্ট হয়, আর তোমাকে ভুলে যাবো? কী কোরে এমন কথা ভাবলে তুমি।" আমারও কণ্ঠ উদ্বেল হোয়ে উঠলো আশঙ্কায়।

"না, না, দীপ, তুমি জানো না। তুমি আমার সবটুকু জায়গা জুড়ে বসে আছো। তোমাকে আমার এতো ভালো লেগেছে—ভয় হয় তোমাকেই কোনোদিন ভুলে যাবো। যাক্ আমাকে নিয়ে কবিতা লিখবে তো? বই লিখবে? কাকে উৎসর্গ কোরবে প্রথম বইটা?" এতোগুলো কথা একসঙ্গে বলে গেল সুরভিদি। উঃ! যেন গান গেয়ে উঠলো ওর কথার ভীরু পাখী। এতো উচ্ছ্বসিত—এতো করুণ ওর কণ্ঠ!

"নিশ্চয়ই বই লিখবো—আর উৎসর্গের পাতায় দেখবে বড় বড় কোরে লেখা "সুরভিদিকে"—কথাগুলো আমি শেষ করতে পারলুম না।

তার আগেই আনন্দে আমাকে জড়িয়ে ধরলো সুরভিদি। আমার চুলের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে বললো—"না ভাই—আমার নামে নয়। তার চেয়ে বরং লিখো—'তোমাকে'—বুঝলে? আমি তো জানবো ওটা আমার? আমি ওকে মাথায় কোরে রাখবো।"

"বেশ"—চোখ দু'টো ওর চোখ থেকে নামিয়ে নিলুম। শেষে আস্তে আস্তে চলে এলুম ঘর ছেড়ে।

তারপর ওর এলো যাবার পালা। কত কথা বললো, কত গান শোনালো—রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে কতো কথা আবৃত্তি কোরে আমাকে শোনালো। বারোটায় বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে। তার আগে যতক্ষণ পেরেছে আমাকেই তো নিয়েছে কাছে টেনে।"

বেশ মনে পড়ে—আমি একটু অভিমান কোরেছিলুম। সেটা তার চলে যাবারই জন্যে। অনেক ক্ষণ ধ'রে পাগলের মতো ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। বেশ বুঝছিলুম কি এমন জিনিষ সুরভিদি শোনাতে চাইছে আমাকে। অথচ সুযোগ কিছুতেই মিলছে না। শেষে আর না পেরে হঠাৎ আমার কাছে এসে টেনে নিয়ে গেল ওর নিজের ঘরে। আমার মাথাটা কোলের ওপর টেনে নিয়ে বলতে লাগলো--"এমন কোরে যাবার দিন আমাকে দুঃখ দিলে কেন দীপ? বলো আমি কী কোরেছি? না, না, দীপ, তোমাকে বলতেই হবে। তোমার এ-কথা আমার চিরদিন মনে থাকিবে।" বলতে বলতে কথা তার হঠাৎ আটকে এলো।

আমারো চোখ দুটো তখন প্রায় ভরে এসেছিলো জলে। কোল থেকে তাড়াতাড়ি মাথাটা তুলে বললাম—"ছিঃ, তুমি কেন অন্যায় কোরতে যাবে সুরভিদি? তুমি তো লক্ষ্মী। আমিই তো তোমাকে মিছিমিছি দুঃখ দিলুম। কেন জানো? যাবার আগে শুধু তোমার চোখের একটু জল দেখতে চেয়েছিলুম। তাই দেখলুম। আঃ! তোমাকে সত্যি আজ কী সুন্দর দেখাচ্ছে!"

"কী দুষ্টু তুমি।" চুলের ওপর হাত বোলাতে বোলাতে বললো: "আচ্ছা এবারে আসি। চিঠি লিখো—কেমন?"

চলে গেল সিঁড়ি দিয়ে। তাড়াতাড়ি খুল বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালুম। দেখলুম, ওর ছলছল চোখ দুটো বারে বারে আমারই দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে। কিছুদূর যেতে তারপর আর দেখা গেল না।

এর পর এলো চিঠি লেখার উৎসব। অসংখ্য চিঠি লিখলো সুরভিদি—অসংখ্য তার ভাষা। কী সুন্দর হাতের লেখা! পড়তুম আর তাকিয়ে

উঠে বলতুম মনে মনে—একেবারে লক্ষ্মী সরস্বতী—দুটোরই প্রতিভা তোমার। কী চমৎকার ওর চিঠির ভাষা। তার কাছে মনে হোতো আমার সমস্ত শক্তি দিয়েও কিছুতেই আমি যেন ওর সঙ্গে পেরে উঠছি না। ও যেন আরো সুন্দর—আরো চমৎকার! সপ্তাহে দু'খানা কোরে আসতো চিঠি। দিন গুণে গুণে। আমিও যথাসাধ্য উত্তর দিতে চেষ্টা করতুম।

একটা চিঠির ভেতরে ওকে সম্বর্দ্ধনা করলুম 'জ্যোছনা' বলে। ও তাতে কী খুশী! তার পরের সবগুলো চিঠিতে ঐ খুশীর উচ্ছ্বাসকে প্রকাশ কোরেছে। প্রথমখানাতে লেখা ছিল—তুমি যে কতো বড় কবি হোয়েচো—তা তোমার জ্যোছনা নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে। এখানে স্কুল-পিরিয়ডের শেষে তোমাকে চিঠি লিখতে বসি। আর সবাই ঠাট্টা করে। বলে, কী মেয়ে তুই অভি—এতো পরিশ্রমেও সখ মেটে না? আমি কী উত্তর দি জানো? বলি—হুঃ হুঃ তোরা তো জানিস না ও আমার কে? কেমন, ঠিক না?

ইতিমধ্যে আমার কবিতা বেরুতে লাগলো হু হু কোরে। দেখতে দেখতে তা প্রায় সব মাসিক পত্রিকার শরীর ছেয়ে ফেললো। বলা বাহুল্য, তার বিষয়ই ছিল একমাত্র সুরভিদি। সুরভিদিকে নিয়েই আমি কল্পনা করতুম আমার কাব্য-জগৎ। কখনো এলোচুলে জ্যোছনার ভেতরে এসে স্তব্ধ হোয়ে দাঁড়ানো, কখনো নদীর জলে অনবগুণ্ঠিত স্নান, কখনো বৃষ্টির ভেতরে বসে বসে গুণ গুণ কোরে নিজের খেয়ালে গান করা—এ সবকেই আমি রূপ দিলুম কথার ভেতর দিয়ে। কাগজগুলো ওকে ঠিক সময়ে পাঠাতুম—আর তার চিঠির ভেতরে পেতুম অজস্র উচ্ছ্বাস। মনে মনে ভাবতুম—সুরভিদি কী সত্যিই আমাকে ভালোবেসেছে!

তারপর আমার মনের আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে হঠাৎ একদিন সুরভিদির বিয়ের খবর এলো। উঃ কী আনন্দ! সুরভিদির বিয়ে? সেদিনকার যে মেয়েটা আঁচলে জড়ানো লজ্জা নিয়ে আমার টেবিলের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, কথা বলেছে পাখীর মতো, চলে যাবার দিন ছলছল চোখে আমায় গান শুনিয়েছে অসংখ্য—সেই সুরভিদির বিয়ে? আমার চোখের সামনে থেকে এমন করে একটা মেয়ে পর হয়ে যাবে? কিন্তু দুঃখ সেদিন একটুও করিনি। আমার সমস্ত দুঃখকে সেদিন মুক্তি দিয়েছিল শুধু একটা কথা। সুরভিদির স্বামী না কি দেখতে খুব সুন্দর। সত্যিই তো—না হলে ওকে যে কিছুতেই মানাতো না। ও কত সুন্দর, আর কতো সুন্দর ওর আকাঙ্ক্ষা। ওকে কী মানায় একটা সাধারণের সঙ্গে? ও যে মণি—তাই তো মানায় কাঞ্চনের সঙ্গে। ও যে স্বপ্ন!

বেশ মনে পড়ে, সেদিন চিঠিখানা হাতে পেতেই কেন যেন হাতটা একটু কেঁপে উঠছিল। সেটা কী সুরভিকে ভালো লাগার নিদর্শন—না—আমার মনের নরম মাটিতে কারো পদধ্বনির বিভীষিকা? বেশ বুঝলুম আমার আদর যাবে কমে—এবং তার পরিণতি কোথায় এসে দাঁড়াবে—মনে মনে তারও কল্পনা কোরে শিউরে উঠলুম।

তবু খুললুম চিঠিটা। ভয়ে ভয়ে। কিন্তু এ কী! এ তো চিঠি নয়—এযে বিয়ের নিমন্ত্রণের আঘাত। সুরভিদিই পাঠিয়েছে। সঙ্গে আর একটুকরো নীল কাগজ। তাতে লেখা। 'এসো ভাই—না এলে কিন্তু ভীষণ দুঃখিত হবো।' 'সত্যি দুঃখিত হবে?' মনে মনে খুব একবার হাসলুম।

কিন্তু আমি কিছুতেই যেতে পারলুম না ওর বিয়েতে। জানি ও একটু সুখী হোতো—জানি ওর মনের অন্ধকার কুটিরে আমার সামান্য উপস্থিতি হয়তো দিতে পারতো একটু আলো—কিন্তু তবু আমি গেলুম না। সত্যিই খুব সুখী হতুম, যদি না ওর সঙ্গে আমার পরিচয় হোতো এমন কোরে—যদি ও থাকতো সম্পূর্ণ অচেনা—কিন্তু ওর আমার পরিচয়ের মাঝখানে আমি যে ওকে কিছুতেই দেখতে পারবো না এমন কোরে। ও চলে যাবে লাল কাপড় পরে, ও ফিরে দেখবে না আমাকে, ও আমাকে দুঃখ দিয়ে সরে যাবে—সেই কথাই বসে বসে ভাবতে লাগলুম।

ইতিমধ্যে কাকীমা এলেন। দেখলুম মুখে তাঁর অল্প অল্প হাসি। বুঝলুম, আমাকে আঘাত কোরতে এসেছেন ছদ্মবেশে।

বললেন—"কি হে কবি, তোমার সুরভি যে পর হোয়ে গেল!" জোর কোরে একটু হাসলুম। বললুম—"আমার সুরভি মানে? আর আমার হোলে কী পর হতে পারতো? ও আমার নয় বলেই তো পর হোতে চলেছে।"

এ রকম উত্তর বোধ হয় আশা করেন নি তিনি। অবাক্ হোয়ে তাই বললেন—"এত কবিতা, এত গান—সব কী তোমার এবার বন্ধ হোয়ে যাবে?"

আবার হাসলুম। এবারেও মৃদু। বললুম—"কবি মরে কিন্তু কবিতা মরে না।" বাঁশী ভাঙ্গে কাকীমা—"কিন্তু সুর কী তার বন্ধ হয়?"

এবারে সত্যিই অবাক্ হোয়ে গেলেন। এতো সুন্দর কোরে আমি যে উত্তর দেবো, মনের এরকম আবহাওয়ার ভেতরেও আমি যে প্রতিবাদ কোরে উঠবো এমন কোরে—একটুও তিনি তা বুঝতে পারেন নি।

হেসে বললেন—"যাক্, এবার থেকে আর ওকে নিয়ে কবিতা লিখো না। সেটা কিন্তু রমানাথবাবুর সহ্য হবে না।"

বেশ একটু অবাক্ হোয়ে গেলুম। জিজ্ঞাসা করলুম—রমানাথবাবু কে? উত্তর কোরলেন—"তোমার সুরভিদির একমাত্র অধিকারী। বুঝলে?"

"নিশ্চয়ই"—চলে গেলুম আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে।

এর ভেতরেই একদিন সুরভিদির চিঠি এলো। আমি অবাক্। ও যেতে লিখেছে আমায় অনেক অনেক কোরে। লিখেছে—না না, তুমি জানো না দীপ, আমি আর এক মুহূর্তও বাঁচবো না। আমার সমস্ত কিছু ফুরিয়ে গেছে! এতো পেয়েছি তবু মনে হয় যেন কিছুই পাই নি। আরো যেন পেতে পারতুম—আরো বেশী সুখী কোরতে পারতুম নিজেকে। কিন্তু তা-ই পারলুম না। এ দুঃখ আমার জীবনে যাবে না। মনের এ অবস্থায় তুমি যদি একবার আমাকে দেখতে আসো, বোধ হয় কেন, তাহ'লে সত্যিই খুব খুসী হবো। তোমার আসা চাই। জানি তুমি বড় অভিমানী। বিয়ের সময় অত কম কোরে লিখেছিলুম বলেই তুমি আসোনি। কিন্তু এবারে আর লক্ষ্মীটি রাগ কোরো না। অনেক কথা শোনবার ও শোনাবার আছে। ভুলে যেয়ো না, ভালোবাসা নিয়ো অনেক অনেক।

তোমার সুরভিদি

কতবার কোরে চিঠিটা পড়লুম। তবু যেন কিছুতেই ফুরোচ্ছিলো না পড়া। শেষে তাড়াতাড়ি কার পায়ের শব্দে বন্ধ কোরে ফেললুম। ছুটলুম সোজা ষ্টেশনের দিকে। রাত ন'টায় ট্রেণ।

পৌঁছলুম যখন, তখন ভোর ভোর। গাড়ী ঠিক কোরে বাড়ী চিনে আসতে কোনো কষ্টই হোলো না। মনে হোলো যেন সুরভিদিই রয়েছে সাথে, ও-ই যেন আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

দরজার সামনেই ওকে দাঁড়ানো দেখতে পেলুম। পরণে সাদা একটা সিল্কের সাড়ী, কপালে টকটকে সিঁদুর, হাতে অসংখ্য চুড়ী। কী সুন্দর ওকে দেখাচ্ছে। ও-যেন অরুণবরণা ঊষা, ও যেন রাত্রিশেষের মহামানবী। ওর আলো নিয়েই পৃথিবীর প্রভাতের পরিচয়, ওর নীরব উচ্ছ্বাসেই পৃথিবীর যতকিছু উচ্ছ্বাস।

ঢুকতেই হাত ধোরে টেনে নিয়ে গেল। নিজের শোবার ঘরে বসিয়ে বললো,—আসছি, একটু বোসো। ডাকলুম ওকে। বললুম—উনি

কোথায়? তোমার রমানাথবাবু? চিবুকটা আমার একটু নেড়ে দিয়ে বললো—দুষ্টু কোথাকার? জানি না ভাই। কোথায় যেন সকালে বেরিয়েছে। আচ্ছা তুমি বোসো, আমি আসছি। ও চলে গেল ঝড়ের মতো ঘর ছেড়ে।

এলো এক মিনিটে। তার পর কথা। কত কথা ও বললো, কত কথা ও-আমাকে শোনালো। আমি শুনলাম কিন্তু প্রশ্ন করলুম না। ও-করছিল প্রশ্ন, আমি করছিলুম তার সংক্ষিপ্ততম উত্তর। শেষে হঠাৎ আমার কোলের ওপর লুটিয়ে পড়ে বলতে লাগলো—"তুমি কী নিষ্ঠুর দীপ। আমাকে এখানে একলা ফেলে তুমি কী কোরে ওখানে বসে থাকো বলো ত'?

আমি উত্তর দিতে যাবো—ঠিক সেই সময়ে দরজার কাছ থেকে কার যেন খুব অস্বাভাবিক একটা আওয়াজ শুনলুম—

"বাঃ, চমৎকার; এই কী তোমার সেই কবি ভাই? তাই বলো—সব সময়ে অতো গম্ভীর কেন? এইবার বুঝলুম। তা বেশ। আচ্ছা চলি—তোমাদের প্রভাতী অনুষ্ঠানটা আর নষ্ট কোরে দিতে চাই না। আচ্ছা, নমস্কার কবিসম্রাট।"

বিস্ময়ে আমি একেবারে বিহ্বল হোয়ে গেলুম। সমস্ত মাথাটা আমার ঝিম্‌ঝিম্ কোরে উঠলো। চোখেমুখে দেখলুম অন্ধকার। আর সুরভিদি? ও-শুধু মুখ তুলে আমার দিকে একটু তাকিয়ে তারপর বিছানায় লুটিয়ে পড়লো। ওর অশ্রুকে সেদিন যারা দেখেছে, তারা অবাক্ হোয়েছে, তারা ভয় পেয়েছে, তারা অস্থির হোয়ে উঠেছে তার বিভীষিকায়। আমিও তার একজন। কোনো কথা না বলে চুপি চুপি চলে এলুম। সন্ধ্যের ট্রেণেই আবার ফিরলুম কোলকাতা।

কিন্তু কেন জানি না এর পর থেকেই আমার অসুখ। ভীষণ অসুখ। উঠতে পারতুম না। শুয়ে শুয়ে ভাবতুম—রোগটা সুন্দর। এসেছে ঠিক সময়ে। ও আমাকে খুব ভালোবাসে। আর মনে মনে হাসতুম—কী আশ্চর্য্য। সুরভিদি একেবারেই চিঠি লেখা বন্ধ কোরে দিলে। কিন্তু দুঃখ হোত না। ওর পুরোণো চিঠিগুলো নিয়ে নিয়ে নাড়াচাড়া করতুম—কতোবার কোরে তা পড়তুম—আর ওকে ভাবতুম—কী উপমা, কী সুন্দর ওর অভিব্যক্তি প্রতিটী অক্ষরের গায়ে। যেন এক একটী মুক্তো। নির্ভুল ভাবে সাজানো। মনে হোতো চিঠিগুলো এই মাত্র এসেছে। কিন্তু বেশীক্ষণ পড়বার উপায় ছিলো না। লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তুম। কেউ যদি দেখে ফেলে। তাছাড়া ডাক্তারেরও নিষেধ; বলেছে নাকি—ব্রেণ শক্ থেকে এ রোগ।

বেশ কিছুদিন সকলকে অস্থির কোরে ভালো হলুম। মাথাটা একটু ঠিক হোতে একদিন বসে বসে ভাবলুম—আমার কী মানায় এভাবে চুপ কোরে থাকা? ও খবর নেয় নি বলে আমি কী নির্ব্বাক্ হোয়ে থাকবো? আস্তে আস্তে একটা আয়নার কাছে এসে দাঁড়ালুম। দেখলুম নিজেকে। কী বিশ্রী হোয়ে গেছি দেখতে! সুরভিদি কী চিনতে পারবে আমাকে? কতো সুন্দর ও। ভয় হোলো।

আবার চাপলুম ট্রেণে। সেই আধো চেনা আধা-অচেনা পথের ওপর দিয়েই ছুটলো ট্রেণ। কতক্ষণে শেষ হবে পথের অস্থিরতা—কতক্ষণে দেখতে পাবো সুরভিদির মুখ—তারই জন্যে অস্থির হোয়ে উঠলুম মনে মনে। শেষে আমার মননশীলতার ওপর পূর্ণচ্ছেদ টেনে ট্রেণ এসে দাঁড়ালো ষ্টেশনে।

নাবলুম গাড়ী থেকে। ঠিক সেই পথ ধোরেই চললুম বাড়ীর দিকে। কিন্তু বাড়ীতে পৌঁছেই অবাক্ হোয়ে গেলুম। বাড়ীর দরজা বন্ধ। নীচে শুধু একটা মোটর দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞাসা কোরবো কিনা ড্রাইভারকে ভাবছি—এমন সময়ে আমার মুখের সামনে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো সুরভিদি। সঙ্গে রমানাথবাবু। আমি তাড়াতাড়ি একটু সরে দাঁড়ালুম। বুঝলুম, আমাকে ওরা চিনতে পারে নি। এতো বিশ্রী হোয়ে গেছি দেখতে?

ওরা আস্তে আস্তে এসে মোটরে বসলো। এইবার ছেড়ে দেবে? আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলুম না। তাড়াতাড়ি ছুটে এলুম রোগা পায়ে। দুর্ব্বল দেহে। কাছে আসতেই ভদ্রলোক গর্জ্জন কোরে উঠলেন:

"কী চাও তুমি এখানে? তখন থেকে ঘুরঘুর কোরে বেড়াচ্ছো।"

বিনিময়ে একটু তাকালুম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার দিক্ থেকে চোখটা ঘুরিয়ে সুরভিদির দিকে তাকিয়ে বললুম—"আপনার—মানে তোমার নাম কী সুরভি রায়? ঠিক চিনতে পারছি না কি না।" সমস্ত শরীর আমার কাঁপছিল বাতাসের মতো।

বোধহয় একটু করুণা হোলো ওর। বললে—"কে তুমি? কী দরকার তোমার সুরভি রায়কে?"

ঠিক সে রকম কাঁপতে কাঁপতেই বললুম, 'আমি, আমি দীপ।' নিজের নামটা যেন সেদিন আর উচ্চারণ কোরতে পারছিলুম না। খুব কষ্ট কোরে যেন মনে করছিলুম তার অক্ষরগুলোকে।

এবারে সুরভিদি একটু অবাক্ হওয়ার ভান কোরলে। বললে গম্ভীর হোয়ে—"ও, তুমি দীপ। হ্যাঁ, আমারই নাম সুরভি। আচ্ছা, আমরা এখন মধুপুর যাচ্ছি। ওঁর শরীর খারাপ কিনা।" বলতে বলতে গাড়ীটা ছেড়ে দিলে।

—আমি প্রণাম কোরতে যাচ্ছিলুম সুরভিদিকে পায়ে হাত দিয়ে—কিন্তু ততক্ষণে আমার দুর্ব্বল আঙুলের নাগাল ছাড়িয়ে অনেক দূরে সরে গ্যাছে গাড়ীটা। ধুলো-ধোঁয়ার ভেতরে আমি স্তব্ধ হোয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম—কিছুই দেখতে পেলুম না। তার নাগপাশ থেকে যখন মুক্ত করলুম আমার অসহায় দৃষ্টিকে—তখন একেবারেই মিলিয়ে গ্যাছে মটরটা। চাকার শুধু দুটো দাগ আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। পরিষ্কার চাকার দাগ। কী সুন্দর অম্লান! যেন সুরভিদিরই মতো।

বৈষয়িক শিক্ষা

[তৃতীয় পর্য্যায়]

অধ্যাপক শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্ত্তী

বাণিজ্যে বাস করেন লক্ষ্মী—একথা আমাদের দেশের সকলেই জানেন, ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির কথা বাদ দিয়ে, গত দেড়শ' বছরের ইতিহাস আলোচনা করলে আমাদের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির খুব উৎসাহজনক প্রমাণ পাইনে। এর একটা কারণ হয়ত বৈদেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থার হাতে আমাদের ভাগ্যবিড়ম্বনা; কিন্তু অন্যটা বিশেষ করে মনে হয় আমাদের বাণিজ্যিক প্রতিভার পশ্চাৎগামিতা, নূতনকে গ্রহণের অক্ষমতা। যাই হোক, নানারকম ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যদিয়ে আমাদের সে চেতনা ফিরে আসছে, ব্যবসা বাণিজ্যের সমৃদ্ধির কথা উপলব্ধি করেছি, নূতন কর্ম্মপ্রেরণা উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত যুবকগণও ব্যবসা বাণিজ্যের পথে ঝুঁকেছেন—এ মঙ্গল সূচনার আকাঙ্ক্ষা আসুক আরও বেশী করে, হিমালয়বাহিনী গঙ্গার মত এ আকাঙ্ক্ষা বয়ে যাক আমাদের অন্তরে অন্তরে, ভরে দিক আমাদের মন প্রাণ বাণিজ্যিক প্রেরণায়, হৃতসর্ব্বস্ব রিক্ত দেশের অধিবাসীর হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠুক স্বাচ্ছন্দ্যে ও সমৃদ্ধিতে। সাধারণতঃ ব্যবসা যখন আরম্ভ হয় তখন কোন ব্যক্তিবিশেষের দ্বারাই ব্যবসার গোড়াপত্তন হয় এবং সেই ব্যক্তিই হন ব্যবসার সর্ব্বময় কর্ত্তা, কারণ তিনিই ব্যবসার স্বত্বাধিকারী। এই ব্যক্তিগত ব্যবসা সব থেকে সুবিধাজনক, কারণ এর মধ্যে অপর কারও হস্তক্ষেপ করবার সুযোগ নেই। স্বত্বাধিকারী নিজেই ব্যবসার সংগঠন, মূলধন যোগান; কর্ম্মচারী নিয়োগ প্রভৃতি সমস্ত কাজ নিজেই দেখাশোনা করেন, ব্যবসায়ে লাভ হলে সমস্ত লাভ তাঁরই প্রাপ্য এবং ক্ষতি হলে তাঁরই লোকসান। তবে তিনি মাঝে মাঝে ইচ্ছা হলে তাঁর কর্ম্মচারীদিকে কিছু কিছু লভ্যাংশ দিতে পারেন। এরূপ ব্যবসায়ের সুবিধা এই যে স্বত্বাধিকারী নিজেই প্রত্যক্ষভাবে ব্যবসা চালান বলে কর্ম্মচারীদের সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্দ্য থাকে; তিনি ব্যক্তিগত ভাবে তাদের অভাব অভিযোগ জানেন এবং সেগুলি নিবারণ করবার সাধ্যমত ব্যবস্থাও করেন। ফলে তাঁর সঙ্গে কর্ম্মচারীদের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে, এবং কর্ম্মচারীরা নিজেদের কাজ মনে করে কাজ করে, ফলে মালপত্রের ক্ষয় ক্ষতি কম হয়; তার জন্যে ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে, কিন্তু এতে অসুবিধা এই যে, ব্যবসা বিস্তৃততর হতে পারে না এবং মূলধনের অভাবে মাঝে মাঝে ব্যবসার অনেক ক্ষতি হয়।

সেইজন্য ব্যবসা করতে গেলে পুঁজি বা মূলধনের প্রয়োজন, এটা নিশ্চিত কথা, কিন্তু সেই মূলধনের স্বল্পতার ফলে ব্যবসায়ে না হয় উন্নতি আর না হয় ব্যবসায়ীর লাভ। ব্যবসা হয়ত অল্প মূলধনে চলল, কিন্তু সুবিধে হোল না—যেমন মৃদু প্রদীপের আলোর মত জ্যোতিহীন হয়ে জলতে থাকে। সেই জন্যে একজনের অল্প অর্থে উপযুক্ত ভাবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠা হয় না বলে পাঁচজনের সঞ্চিত অর্থকে এক জায়গায় মিলিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করার প্রথা আরম্ভ হয়েছে, অংশীদারী কারবার, যৌথ কারবার প্রভৃতি এই জন্যেই গড়ে উঠেছে। অংশীদারী কারবারের প্রকৃতিগত মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে একই ব্যবসায়ে নিযুক্ত কয়েকজনের সেই ব্যবসা থেকে লাভ গ্রহণ করবার ইচ্ছা। ১৮৯০ সালের আইনে অংশীদারী কারবারের ঐ সূত্রই নির্দ্দেশিত হয়েছে যে—"A partnership is the relation which subsists between persons carrying on a business in common with a view to profit", কয়েকজন ব্যবসায়ীর সম্মিলিত ইচ্ছা যখন আইন অনুযায়ী চুক্তিপত্রে সম্পাদিত হয়, তখনই অংশীদারী কারবার কারবারের রূপ গ্রহণ করে। তাই বলে একই সংসারের পাঁচ সাত ভাই মিলে যে কারবার চালাবেন, তাকে অংশীদারী কারবার বলা চলবে না। কিম্বা চার পাঁচজন যখন একই নির্দ্দিষ্ট সম্পত্তি হতে আয়ের অংশ গ্রহণ করবেন, তখনও তাঁদিকে অংশীদার বলা চলবে না। সেই জন্য অংশীদারী কারবারের মূলকথা হচ্ছে অংশীদারগণের চুক্তি বা সর্ত্ত, কিন্তু তাদের সম্ভ্রম (status) কারবারের কোন বিষয়কে যেন প্রভাবান্বিত না করে—এটা হবে মূল লক্ষ্য। মোটের উপর, কয়েকজন ব্যক্তির একই ব্যবসায়ে লাভ বা আয় করবার উদ্দেশ্যই এর আসল কথা। অংশীদারী কারবারে সব সময়েই কারবারের একটা নাম দেওয়া হয় কিন্তু এর নামটাই আসল নয়, কারণ কয়েকজন ব্যক্তির সম্মিলিত ইচ্ছা ও কর্ম্মপ্রেরণাই যে এই কারবার—সেটা আমাদের বোঝবার জিনিষ। সাধারণ অংশীদারী কারবারে মাত্র একজন অংশীদারও কারবারের যেমন সমস্ত দায়িত্ব ভোগ করেন, তেমনি আবার কারবারের ক্ষুদ্রতম অব্যবস্থার জন্য অন্য অংশীদারগণকে দায়ী করা এবং তার কৈফিয়ৎ নেবারও ক্ষমতা রাখেন। প্রত্যেক অংশীদারী কারবারে একজন বা বহু অংশীদার একত্র সমানভাবে কারবারের সমস্ত ঝুঁকি ভোগ করতে পারেন, এমন কি অংশীদারের মৃত্যুর পরেও তাঁর সম্পত্তি হতে তিনি যে কারবারে লিপ্ত ছিলেন সেই কারবারের ঋণ শোধ করা যেতে পারে। এই কারবারের অংশীগণ সাধারণতঃ নিজেদের দেয় অর্থের দ্বারা কারবারের মূলধন গড়ে তোলেন। এই দেয় অর্থ যে সব সময়ে সকলের সমান হবে তারও যেমন প্রশ্ন নাই,

তেমনি অংশী সকলকে যে অর্থ দিতেই হবে এরও কোনও নির্দ্দেশ নাই। সেই জন্য হয়ত কোন কোন অংশী তাদের কারবারী অভিজ্ঞতার দ্বারা কারবার পরিচালনা করে অংশীদার হতে পারেন। পাঁচ সাতজন অংশীর ব্যবসায়ে মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে যখনই কোন অংশীদারী কারবার গড়ে উঠে তখনই সেই কারবারের ব্যবসা-জগতে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্যে একটা কারবারী নাম (Firm name) নিতে হয়, এবং এই নামে যদি অংশীদারদিগের কারও নাম জড়িত না থাকে তা হলেও চলতে পারে কিন্তু ভারত-সরকারের বিনা অনুমতিতে রাজকীয়, সাম্রাজ্যিক প্রভৃতি নাম বা অন্য কোন বহুদিন প্রতিষ্ঠিত, সুখ্যাতির সহিত পরিচালিত কারবারের নাম এর সঙ্গে জড়িত করা অন্যায় বলে বিবেচিত হয়।

এখন আমাদের জানা প্রয়োজন যে, কতজন অংশীদার নিয়ে এক একটী অংশীদারী কারবার গড়ে ওঠে। কোম্পানী-আইন অনুসারে সাধারণতঃ ব্যাঙ্কিং ব্যবসা ছাড়া অন্য ব্যবসায়ে খুব বেশী মোট কুড়িজন অংশীদার থাকতে পারে এবং ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে মোট দশ জনের বেশী থাকবে না। যদি এর বেশী অংশীদার থাকে এবং কোম্পানী আইন অনুযায়ী রেজেষ্ট্রী না হয়, তা হলে এই কারবারের মালিকরা অন্য কোন কারবারীর বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গ বা অন্য কোন প্রকারের মোকর্দ্দমা করলে তা বাতিল হয়ে যাবে।

অংশীদারী কারবার সাধারণতঃ দু' রকমের হয়—এক হচ্ছে সাধারণ, অন্যটী হচ্ছে সসীম (Limited)। অংশীদার-গণের দায়িত্বের বিভিন্নতার মধ্যেই দুয়ের বিভিন্নতা। সাধারণ অংশীদারী কারবারে একই সঙ্গে অন্য অংশীর দায়িত্বের ভাগী হতে হয় কিন্তু সীমাবদ্ধ দায়িত্বপূর্ণ অংশীদারী কারবারে সসীম দায়িত্ববদ্ধ অংশীদার (Limited partner) যতটুকু অংশ, বা মূলধন বিনিয়োগ করেন বা কারবারে যতটুকু ক্ষমতা রাখেন ততটুকু তাঁর দায়িত্ব, এর বেশী নয়। যে অংশীদার নিজেই কারবার দেখাশোনা করেন তাঁকে যেমন প্রত্যক্ষ অংশীদার (Active partner) বলা হয় ঠিক তেমনি ভাবে যে অংশীদার কেবলমাত্র তাঁর মূলধন কারবারে নিয়োগ করে আর কিছু দেখা শোনা করেন না, তাঁকে গৌণ অংশীদার (Sleeping বা Dormant partner) বলা হয়। গৌন অংশীদার কারবার দেখাশোনা না করলেও কারবারের দায়িত্ব কিন্তু প্রত্যক্ষ অংশীদারের মতই তার ওপরেও ন্যস্ত থাকে। আর একপ্রকারের অংশীদার আছেন—তাঁকে বলা হয় উপঅংশীদার (Quasi-partner)। তিনি ঋণ স্বরূপ কারবারে মূলধন বিনিয়োগ করেন, তার জন্যে সুদ বা মাঝে মাঝে কিছু লভ্যাংশ পেয়ে থাকেন কারবার থেকে।

অংশীদারী কারবার করতে গেলে প্রথমেই অংশদারী পত্র (partnership deed) রেজেষ্ট্রী করে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। যদিও অনেক সময়ে মৌখিক চুক্তি অনুসারে হয় তা হলেও ভবিষ্যতে কোন গণ্ডগোল বা মোকর্দ্দমা অংশীদার-দের মধ্যে অন্যায় ভাবে বেধে উঠবে না—সেইজন্যে গোড়া বেঁধে কাজ করাই ভাল। অংশীদারী পত্র একবার সম্পাদিত হলে ভবিষ্যতে কোন বিরোধের সূত্র বেরুবে না কারণ অংশাদারগণ অংশীদারীর নিয়ম-কানুন জেনেই এই দলিল রেজেষ্ট্রী করতে মত দিয়েছেন বলে। উন্মাদ, নাবালক বা দেউলিয়াকারী (Insolvent) কেউ এতে অংশ গ্রহণ করতে পারবে না। তবে নাবালক সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয়ে ছ' মাসের মধ্যে অংশীদারী কারবারে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিতে পারে কিম্বা নাবালক অংশীদারী পত্র সম্পাদনের ছ' মাসের মধ্যে সে অংশীদারী কারবারে নিজেকে নিযুক্ত রাখবে কি না তা স্থির করতে পারে। যদি কোন বৈদেশিক অংশীদারী কারবারে নিজেকে নিযুক্ত করে, এবং তার স্বদেশ যদি যে দেশে অংশীদারী পত্র সম্পাদন করেছে সেই দেশের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তা হলে সেই বৈদেশিকের অংশ সঙ্গে সঙ্গেই নষ্ট হয়ে যাবে। আর একরকমের অংশীদারী পত্র আছে, তাকে বলা হয় ইচ্ছাধীন অংশীদারী (partnership at will)। এতে চুক্তিপত্রে কোন স্থির নির্দ্দেশ থাকে না যে, অংশীদার কত দিন কারবারে নিযুক্ত থাকবে। আবার অনেক সময় যদিও মেয়াদের নির্দ্দেশ থাকে তা হলেও মেয়াদ ফুরিয়ে যাবার পরে অংশীদার নূতন কোন চুক্তি না করে কাজ চালিয়ে যান এবং তিনি আবার ইচ্ছা করলেই অন্য অংশীদারগণকে লিখিত নোটীশ দিয়ে তাঁর অংশীদারীত্ব ত্যাগ করতে পারেন।

অংশীদারী পত্র সম্পাদনের সময় সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লিখিত হয় এবং অংশীদারগণ যদি এগুলি ছাড়া আরও কিছু উল্লেখ করতে চান, তা হলে তাও পারেন :—

১। কারবারের নাম।

২। অংশীদারগণ কিসের ব্যবসা করবেন তার বিবরণ।

৩। কতদিনের জন্য অংশীদারী কারবার নির্দ্দিষ্ট হ'ল তার উল্লেখ।

৪। কারবারের মূলধন। কেমন করে এবং কোন্ সমানুপাতে (proportion) অংশীদারগণ তাঁদের দেয় অংশ (contribution) কারবারের সাধারণ ভাণ্ডারে নিয়োগ করবেন।

(৫) লাভ এবং লোকসান অংশীদারগণের মধ্যে কি ভাবে বিতরিত হবে তার নির্দ্দেশ।

(৬) ব্যবসা কেমন করে পরিচালিত হবে তার বিবরণ।

(৭) কোন্ ব্যাঙ্কে হিসাব-পত্র গচ্ছিত থাকবে তার উল্লেখ।

(৮) কোন্ অংশীদারের চেক বা দর্শনী হুণ্ডী (cheque) অথবা মূল্যবান্ দলিল-পত্রে সহি করার কর্ত্তৃত্ব থাকবে তার বিবরণ।

(৯) মূলধন বেশী সঞ্চয়ের জন্য যদি বাইরের অপর কোথা থেকে টাকা ঋণ করা হয়, তা হলে কত হারে (rate) সুদ দেওয়া হবে তার উল্লেখ।

(১০) কোন অংশীদার যদি অংশীদারী হতে অবসর নেন বা ছেড়ে দেন এবং কোন অংশীদারের যদি মৃত্যু হয় তা হলে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা।

(১১) নূতন অংশীদার গ্রহণ বা পুরাতন অংশীদারকে অংশীদারীচ্যুত করার নির্দ্দেশ।

(১২) অংশীদারগণের মধ্যে যদি কোন মোকর্দ্দমা বাধে, তা হলে তার মধ্যস্থতা (Arbitration) করবার জন্য উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষের উল্লেখ।

(১৩) সর্ব্বশেষে অংশীদারী কারবার যদি গুটিয়ে (dissolntion) নিতে হয়, তার উল্লেখ।

উপরোক্ত সমস্ত বিষয়গুলি বা কারবারের আরও যদি উল্লেখযোগ্য কোন কথা থাকে তা হলে তার উল্লেখ করে অংশীদারগণ সঙ্ঘবদ্ধভাবে চুক্তিপত্রে সহি করবেন এবং তাকে সরকারী যৌথ কারবারের ভারপ্রাপ্ত অনুমোদকের (Registrar) নিকটে রেজেষ্ট্রী করবেন। যদি অংশীদারী পত্র আইন অনুযায়ী সম্পাদিত না হয়, বা কোন বিষয়ের উল্লেখ না থাকে তা হ'লে অংশীদারগণ পরস্পর নিম্নবর্ণিত নির্দ্দেশগুলি মেনে চলেন।

(ক) প্রত্যেক অংশীদার লাভ-লোকসানের দায়ী সমানভাবে হবেন, এবং সমানভাবে মূলধন জোগাবেন।

(খ) কোন অংশীদার লাভের হিসাবের পূর্ব্বে তাঁর দেয় মূলধনের সুদ ধরতে পারবেন না।

(গ) প্রত্যেক অংশীদার ব্যবসা পরিচালনে প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত থাকতে পারেন কিন্তু তার জন্যে কারবার থেকে কোন পারিশ্রমিক দাবী করতে পারবেন না।

(ঘ) প্রত্যেক অংশীদার, কারবারে তাঁর অংশে দেয় মূলধনের উপর যেদিন থেকে টাকা দিয়েছেন সেইদিন থেকে বছরে শতকরা ছ টাকা হারে সুদ ধরতে পারেন।

(ঙ) কারবার প্রত্যেক অংশীদারকে তাঁদের দ্বারা অপর কাহাকেও দেয় টাকা বা তাঁদের নিজস্ব দায়িত্ব প্রভৃতি হতে রেহাই দিতে পারেন, যদি সেই অংশীদার কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে কারবারের সুনাম রক্ষার জন্য করে থাকেন। কিন্তু অংশীদার যদি কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়ে নিজের ভ্রমের জন্য কোন দায়িত্বে জড়িয়ে পড়েন, সেখানে তিনি রেহাই পাবেন না।

(চ) কারবারের সকল অংশীদারের অনুমতি ব্যতীত কোন নূতন অংশীদার গ্রহণ বা কোন বর্ত্তমান অংশীদারকে অংশীদারীত্ব হতে বিচ্যুত করা হবে না।

(ছ) কারবারের সাধারণ ব্যাপার নিয়ে যদি কোন মতভেদ হয় তা হলে সেই বিরোধ অধিকাংশ অংশীদারের মতের দ্বারা নিষ্পত্তি হবে। কিন্তু ব্যবসায়ের নীতিতে যদি কোন পরিবর্ত্তন করতে হয়, তা হলে সব অংশীদারের সম্পূর্ণ মত ছাড়া তা কার্য্যে পরিণত হবে না।

(জ) ব্যবসার যদি কোন শাখা অফিস থাকে তা হলে কেন্দ্রীয় প্রধান অফিসে কারবারের সমস্ত খাতাপত্র থাকবে এবং সকল অংশীদারের সেই সমস্ত খাতাপত্র দেখবার বা সেই খাতাপত্র হতে কোন অংশ নকল করে নেবার ক্ষমতা থাকবে।

অংশীদারগণের অধিকারগুলির কথা যেমন উল্লেখ করা গেল, তেমনি তাঁদের কর্ত্তব্যগুলির উল্লেখ করাও প্রয়োজন :—

(১) সকল অংশীদারের সমান স্বার্থের দিকে নজর রেখে ব্যবসা পরিচালন করা হবে।

(২) প্রত্যেক অংশীদার অপর অংশীদারের কাছে বিশ্বাসভাজন হবেন। প্রত্যেকেই সঠিক হিসাব ও কারবারের জ্ঞাতব্য তথ্য অপরের নিকট দাখিল করবেন। কোন অংশীদার নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কারবারের সুনাম নিয়ে কোন কাজ করবেন না বা কারবারের কেনা-বেচার ওপর কোন দস্তুরী ব্যক্তিগত ভাবে নেবেন না। প্রত্যেক অংশীদার কারবারের জন্য কারবারের সম্পত্তির ব্যবহার করবেন এবং প্রত্যেকেই কারবারের উন্নতির জন্য যথোপযুক্ত পরিশ্রম করবেন।

অংশীদারী পত্র যেমন রেজিষ্ট্রী করে নেওয়া ভাল, ঠিক তেমনি ভাবে ব্যবসার উদ্দেশ্যও রেজিষ্ট্রী করা প্রয়োজন। অংশীদারী ব্যবসা রেজিষ্ট্রী করবার সময় নিম্নলিখিত বিষয়-গুলির দিকে বিশেষ ভাবে নজর রাখা প্রয়োজন।

(ক) কারবারের নাম

(খ) কারবারের কেন্দ্রস্থান বা যদি কোন শাখা থাকে তা হলে যেখানে শাখা কারবার চলবে সেই সেই স্থানের নাম।

(গ) কোন্ কোন্ অংশীদার কোন্ সময়ে কারবারে যোগদান করেছেন এবং তাঁহাদের পূর্ণ নাম ও স্থায়ী ঠিকানার উল্লেখ থাকবে।

(ঘ) কারবারের স্থায়িত্ব কতদিন তাহারও উল্লেখ প্রয়োজন।

এই দলিল লিখে নিকটবর্ত্তী সরকারী যৌথ কারবার অনুমোদকের নিকট উপযুক্ত দর্শনী (fee) দিয়ে রেজিষ্ট্রি করিয়ে নিতে হবে এবং তার পরে উপরোক্ত সূত্রগুলির যদি কোন পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হয় তা হলে সেই অনুমোদকের নিকটে গিয়ে দলিলখানির পরিবর্ত্তন যোগ্য বিষয়গুলির পরিবর্ত্তন করে পুনরায় দলিলখানি অনুমোদিত করতে হবে। কারবার রেজিষ্ট্রি করা না থাকলে কোন অংশীদার বা কারবার অন্য কোন কারবার বা অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তির (Third party) বিরুদ্ধে কোন নালিশ রুজু করতে পারবে না। এই নানা কারণের জন্য কারবার রেজিষ্ট্রী করে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ।

সসীম দায়িত্ব-বদ্ধ অংশীদারী কারবার (Limited partnership) ইংল্যাণ্ডে ১৯০৭ খৃঃ অব্দ হ'তে প্রচলিত হয়। আমাদের দেশে এখনও ঐ রকমের কারবারের প্রচলন হয় নি। এই কারবারের সুবিধা এই যে, কারবারের সাধারণ অংশীদার ঋণ গ্রহণ ইত্যাদি কিছুই না করে মূলধনের প্রয়োজন হলে সসীম দায়িত্ব-বদ্ধ নূতন অংশীদার গ্রহণ করে মূলধন সংগ্রহ করতে পারেন। নূতন অংশীদার নেবার সময় বর্ত্তমান সকল অংশীদারের মত নেবার প্রয়োজন হয় না। এই অংশীদারগণ ব্যবসা পরিচালনে কোন রকমে হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। হঠাৎ কোন অংশীদারের মৃত্যুতে, দেউলিয়াতে বা অন্য কোন কারণেই অংশীদার কারবার হ'তে মূলধন তুলে নিতে পারবে না। আবার অন্য দিকে সসীম দায়িত্ব-বদ্ধ অংশীদারের অনেক সুবিধে আছে—সসীম দায়িত্ববদ্ধ অংশীদার নিজে যতটুকু অংশ গ্রহণ করবেন ততটুকু তাঁর দায়িত্ব; সাধারণ অংশীদারের মত সব ঝুঁকি তাঁকে নিতে হবে না; অথচ তিনি লাভের অংশ পাবেন। এই সুবিধেও যেমন আছে, তেমনি কিছু অসুবিধেও আছে—যেমন, ব্যবসা পরিচালনে তাঁর কোন ক্ষমতা থাকবে না, কারবারে নূতন অংশীদার গ্রহণের সময় তাঁর অনুমতি নেওয়া হবে না, তিনি তাঁর ইচ্ছামত তাঁর দেয় মূলধন তুলে নিতে বা তাঁর অংশীদারী বাতিল করতে পারবেন না। সসীম দায়িত্ববদ্ধ অংশীদারী কারবারে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মেনে চলা হয়:—

(ক) ইংলণ্ডীয় ১৯০৭ সালের আইন অনুসারে রচিত হবে, সাধারণতঃ কুড়ি জনের বেশী অংশীদার কারবারে থাকবে না এবং যদি ব্যাঙ্ক প্রভৃতি কারবার হয় তা হলে অংশীদারের উর্দ্ধতন সংখ্যা হবে মাত্র দশজন।

(খ) কারবারে একজন সাধারণ অংশীদার থাকবেন তাঁর উপর কারবারের সমস্ত দায়িত্ব, ঋণ পরিশোধ প্রভৃতির ঝুঁকি থাকবে এবং সসীম দায়িত্ববদ্ধ অংশীদারগণ যতটুকু অংশ গ্রহণ করবেন ততটুকুর দায়িত্ব তাঁদের থাকবে।

(গ) সসীম দায়িত্ববদ্ধ অংশীদার তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তাঁর দেয় অর্থ তুলে নিতে পারবেন না, ব্যবসা পরিচালনে তাঁর কোন ক্ষমতা থাকবে না, এবং তিনি নিজে কারবারের পক্ষ হয়ে কোন জিনিষ ক্রয়-বিক্রয় করে দস্তরী প্রভৃতি নিতে পারবেন না। যদি তিনি ঐরূপ কোন বিধিগর্হিত কাজ করেন তা হলে তাঁকে সাধারণ অংশীদারের মত কারবারের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

(ঘ) সসীম দায়িত্ববদ্ধ কারবারের চুক্তিপত্র সরকারী, যৌথ কারবারের অনুমোদকের নিকটে রেজিষ্ট্রী করে নিতে হবে এবং সেই চুক্তিপত্রে কারবারেব নাম, কি ধরণের ব্যবসা তার উল্লেখ, ব্যবসা যেখানে পরিচালিত হবে সেই স্থানের নাম, প্রত্যেক অংশীদারের পূর্ণ নাম এবং কতদিন পর্য্যন্ত প্রত্যেক অংশীদারের অংশের স্থায়িত্ব তার উল্লেখ এবং তাঁরা কতগুলি অংশ গ্রহণ করলেন তার বিবরণ থাকবে।

এতক্ষণ সাধারণ অংশীদারী কারবার এবং সসীম দায়িত্ব-বদ্ধ অংশীদারী কারবারের গঠন ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা গেল কিন্তু ঐ সমস্ত অংশীদারী কারবার কেমন করে বাতিল করা বা গুটিয়ে নেওয়া যায় তার আলোচনা করা দরকার।

সাধারণতঃ সমস্ত অংশীদারের সম্মিলিত মত অনুযায়ী চুক্তিপত্রের বলে কারবার গুটিয়ে নেওয়া যায়, কিম্বা নির্দ্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে বা অংশীদারের মৃত্যু বা দেউলিয়ার জন্যও অনেক সময় কারবার বন্ধ হয়। আবার অনেক সময় বাধ্য হয়ে এই কারবার বন্ধ করতে হয়—যদি কোন অংশীদার কারবারের নামে উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে মোকর্দ্দমা আনে এবং আদালত তাতে সন্তুষ্ট হয়ে কারবার বন্ধ করে দিতে পারেন। এই সমস্ত কারণের মধ্যে নিম্ন-লিখিত অঙ্গগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য:— বিকৃতমস্তিষ্ক অংশীদার বা কারবারের অংশীদারী চালাবার অনুপযুক্ত অংশীদার বা অংশীদারের অসচ্চরিত্রতা। কোন বিশেষ অংশীদার যদি তার অংশীদারী স্বত্ব অপর কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে দেয় বা কারবার পরিচালন ব্যাপারে গুরুতর অপরাধ করে অথবা কারবারে ক্ষতি ছাড়া লাভের আশা না থাকে, তা'হলে যে কোন কারণে সরকার সেই ব্যবসা বন্ধ করে দিতে পারেন।

চৌকো চোয়াল

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া

(এগার)

পূর্ব্ব দিনের সেই ড্রাইভার ট্যাক্সি নিয়ে বেলা সাড়ে তিনটের সময় উপস্থিত হোল। তরুণ জীর্ণ তালি-মারা হাফ সার্ট, হাফ প্যাণ্ট পরে ছেঁড়া জুতা পায়ে, নাকের ডগে বাটার ফ্লাই গোঁফ এঁটে, ছদ্মবেশে গাড়ীতে উঠল। সঙ্গে এক স্যুটকেস এবং মোটর মেরামতের যন্ত্রপাতিভরা তেল-কালিমাখা এক ক্যাম্বিশের থলি। তার হাত-পায়ে এবং পোষাকেও তেল-কালির দাগ বিদ্যমান। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, সে মোটর মেরামতকারী মিস্ত্রী। এই মাত্র কারখানা থেকে খেটেখুটে বেরিয়ে আসছে।

মোটর বর্দ্ধমানের পথে ছুটল। পথের দু'পাশে পান, সিগারেট, চা ও জলখাবারের যত দোকান পাওয়া গেল, প্রত্যেক স্থানে থলি হাতে করে নেমে সে জিজ্ঞাসাবাদ সুরু করলে। "১লা ডিসেম্বর রাত্রে তার এক ড্রাইভার বন্ধু ট্যাক্সিতে সওয়ারী নিয়ে রাণীগঞ্জ গিয়েছিল। বন্ধুর ট্যাক্সিতে মোটর মেরামতের নূতন যন্ত্রপাতিপূর্ণ একটা ট্রাঙ্ক সে নিজের বাড়ীতে পৌঁছে দেবার জন্য তুলে দিয়েছিল। কিন্তু ড্রাইভার-বন্ধু নেশার ঝোঁকে ভুল করে, রাস্তার মাঝে কোন দোকানে ট্রাঙ্কটা নামিয়ে দিয়ে, সটান পেশোয়ার চলে গেছে। কাযেই ট্রাঙ্কের খোঁজে এখন তাকে চারিদিকে ছুটাছুটি করতে হচ্ছে। যদি কেউ দয়া করে সে ট্রাঙ্কটার সন্ধান বলে দেয় তা'হলে…" ইত্যাদি।

প্রত্যেক দোকানদার জবাব দিলে, সে-রকম ট্রাঙ্কবহনকারী ট্যাক্সি তারা চক্ষে দেখে নি, তা ট্রাঙ্কের সন্ধান দেবে কি? তারা ট্রাঙ্কের খবর জানে না।

শেষে এক চায়ের দোকানে সন্ধান মিলে গেল!—দোকানের ছোকরা কর্ম্মচারীটি বললে "১লা ডিসেম্বর রাত ১টার সময়, ট্যাক্সি থামিয়ে এক ড্রাইভার তার দোকানে চা খেতে নেমেছিল। সে যখন চা পান করছিল, তখন ছোকরা কর্ম্মচারী লক্ষ্য করেছিল, তার ট্যাক্সির কেরিয়ারে নয়—পিছনের সিটে একটা বৃহদাকারের ট্রাঙ্ক রয়েছে বটে।"

তরুণ সোৎসাহে বললে, "হাঁ হাঁ, পিছনের সিটেই ট্রাঙ্কটা তুলে দিয়েছিলাম বটে। গাঢ় হলুদে রঙের ট্রাঙ্ক তো?"

"হাঁ। দড়ি দিয়ে গাড়ীর সঙ্গে বেঁধে দিয়েছিলেন তো?"

"হাঁ, হাঁ, বেঁধে দিয়েছিলাম বৈ কি। ভিতরে ভারি মাল ছিল। না বাঁধলে গাড়ীর ঝাঁকুনিতে ঠিক্‌রে পড়ে যাবে যে। যাক, তুমি ভাই দেখেছ তা'হলে? গাড়ীতে তখন সওয়ারী ক'জন ছিল বল দেখি?"

একটু ভেবে ছোকরা জবাব দিলে, "সেই তো পুরু লেপের মত শাদা লম্বা আলখাল্লা জামা গায়ে এক হোমরা-চোমরা বাবু:— আর কম্বল গায়ে জড়িয়ে একটা গ্যাট্টা গোট্টা যোয়ান? তারা তো ড্রাইভারের পাশে বসেছিল?"

"ঠিক ধরেছ! বাবুর রং ফর্সা, মাথায় মস্ত টাক?"

"টাক? তা' কি করে জানব? সে তো 'কম্ফার্ট' দিয়ে মাথা-মুখ ঢেকে রেখেছিল?"

"হুঁ, তা' হলে আর কি করে জানবে? তারা এখান থেকে কোন্ দিকে গেল?"

"বললে, মানকর না পানাগড় যাচ্ছে। পশ্চিমে গাড়ী হাঁকালে। আপনি ঐ দিকে খুঁজুন।"

"ফিরে এসে খুঁজছি।"

মোটর বর্দ্ধমানের পথে ছুটল। পেট্রোল ষ্টেশনে এসে দাঁড়াল। ১লা ডিসেম্বর রাত্রে যে-যে কর্ম্মচারী পেট্রোল ষ্টেশনে ছিল তরুণ তাদের খুঁজে বের করলে। গরীব মোটর-মিস্ত্রীর নূতন-কেনা যন্ত্রপাতিপূর্ণ ট্রাঙ্ক হারানোর ক্ষতির পরিমাণটা যে কত ভয়ানক দুঃসহ—মর্ম্মভেদী ভাষায় বক্তৃতা করে তা তাদের বুঝিয়ে দিলে। বুড়া হিন্দুস্থানী কর্ম্মচারীটি দয়ার্দ্র হয়ে বললে, "মৃত ড্রাইভার রাধাশ্যাম দাসকে সে চেনে। ঘটনার রাত্রে সে শহরের দু'জন আরোহী নিয়ে এসে পেট্রোল ষ্টেশনে গাড়ী থামায় এবং পাঁচ গ্যালোন তেল নেয়। গাড়ীর সামনের সিটে একজন সাহেবী পোষাকের উপর শাদা অলেষ্টার পরা হৃষ্টপুষ্ট চেহারার বাবু ছিলেন, তিনি নাকি ডাক্তার। পেট্রোল ষ্টেশনের কর্ম্মচারীরা তাকে চেনে না। তার পাশে আর একজন লোক ছিল…হাঁ তাকে তারা একটু একটু চেনে বৈ কি!…কিন্তু পিছনের সিটে যে ট্রাঙ্কটা ছিল সেটা তো ঐ ডাক্তারের দামি যন্ত্রপাতির বাক্স! সে তো মোটর-মিস্ত্রীর যন্ত্রের বাক্স তারা বললে না!…তবে?"

হেসে তরুণ বললে, "আরে দোস্ত, রাধাশ্যাম আমার এক গেলাসের ইয়ার ছিল! সে তামাসা করেছে! সে ট্রাঙ্কে আমারই মাল ছিল।"

বিস্মিত হয়ে কর্ম্মচারীটি বললে, "কেন? ফেরিওয়ালাটাও তো তাই বললে?"

"কে ফেরিওয়ালা?"

কর্ম্মচারীটি বললে, "এই—" সহসা কি যেন মনে পড়ায় ঢোক গিলে থেমে গেল! একটু ইতস্ততঃ করে বললে, "ঐ ডাক্তার গলগীর এইখানে ডেলিভারী কেসে 'কলে' যাচ্ছিলেন। তাঁর দামি দামি কাঁচের ডাক্তারী যন্তর-তন্তর সে-বাক্সে ছিল। হাঁ বাক্সটা তাঁরই। তোমার বাক্স বাবু সে-গাড়ীতে ছিল না, থাকলেও আমরা দেখি নি।"

ফেরিওয়ালা? হুঁ! ফেরিওয়ালা!--কে যেন সহসা সুইচ টিপে তরুণের মগজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বেলে দিলে!—হাঁ, হাঁ, একজন ফেরিওয়ালাকে যে তার চাই।"

ভীষণ উদ্বিগ্নভাব প্রকাশ করে তরুণ বললে, "তাই তো দোস্ত, এ-যে বড় গোলমেলে কথা হয়ে দাঁড়ালো! রাধাশ্যাম বেচারা মরেও গেল, আমায় মেরেও গেল! এখন আমার বাক্সটা পাই কোথা? তা সেই ফেরিওয়ালাটাও তো সে-গাড়ীতে ছিল,—ঐ কি গড়াই যেন তার নাম—"

সন্ত্রস্ত হয়ে কর্ম্মচারীটি বললে, "আর চুপ, চুপ, চুপ! তার নাম যেন পুলিশের কানে না ওঠে! সে গরীব নির্দ্দোষ নিরপরাধ! বিনাভাড়ায় বন্ধুর ট্যাক্সিতে চড়ে কাছেই নবাবের হাটে একটা কাযে গেছল, রাতারাতিই সেখান থেকে ফিরে এসেছে। রাধাশ্যাম কখন ফিরেছে, কখন মরেছে, সে কিছুই জানে না।

"নেই বা জানলে! কে জবরদস্তি করে তার ঘাড়ে সে অপবাদ চাপাচ্ছে? তবে রাধাশ্যামের মৃত্যুর পর পুলিশ এন্-কোয়ারীর সময় তোমরা খাম্‌কা তার নাম চেপে গেলে কেন?"

অসন্তুষ্ট হয়ে কর্ম্মচারীটি বললে "বেশ! তারপর পুলিশ তাকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া করুক। লোকটা ভয়ে দিশেহারা হয়ে তখুনি ছুটে এসে আমাদের হাতে পায়ে ধরতে লাগল। কেঁদে কেটে আকুল! সে বেচারা নির্দ্দোষ, তাকে খাম্‌কা ফাঁশিয়ে দেব? আর সত্যি তো রাধাশ্যামকে কেউ মেরে ফেলে নি! ঠাণ্ডার চোটে আপনি মরেছে, তাতে কার কি দোষ বাপু? লোভে পড়ে গেছল কেন ঠাণ্ডা লাগাতে?"

প্রাকৃত-জনোচিত বিজ্ঞতার সঙ্গে ঘাড় নেড়ে তরুণ বললে "ঠিক তো, লোভে পাপ, পাপে মিত্যু! এ তো ধরা কথা! আচ্ছা, দেখি সেই ডাক্তার আর গড়াই মশায়ের খোঁজ নিয়ে,—যদি আমার ট্রাঙ্কটার কোনও হদিশ পাই। গরীব লোক আমি, ট্রাঙ্কটা হারালে এক কাঁড়ি টাকার ফেরে পড়ব!"

সদয় হয়ে কর্ম্মচারীটি চুপি চুপি বললে "চন্দর গড়াইকে যদি ধরতে চাও তো এখুনি যাও। সে আজই রাত্রের গাড়ীতে বিন্দাবন চলে যাবে। ঘরভাড়া, হোটেল খরচা, সব চুকিয়ে দিয়ে মোট ঘাট বেঁধে তৈরী হয়ে বসে আছে—"

"এ্যাঁ! হঠাৎ বিন্দাবন! এত বৈরাগ্য? কেন?"

"পুলিশের জ্বালায়! তার দিগ্‌দারি ধরে গেছে। এবার ভেক নিয়ে বষ্টুম হবে ঠিক করেছে।"

"চল্লুম তা হলে। রাণীর সায়েরের বস্তিতেই তো তাকে পাব? নমস্কার দাদা, কি উপকার যে করলে, তা বলতে পারব না।"

তরুণ তৎক্ষণাৎ পুলিশ ষ্টেশনে উপস্থিত হয়ে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন কনেষ্টবল বেরিয়ে গিয়ে ছদ্মবেশে রাণীর সায়েরের বস্তিতে গড়াইএর বাসা প্রহরা দিতে নিযুক্ত হোল। ততক্ষণে পদস্থ কর্ম্মচারীরা বেরিয়ে গিয়ে—উক্ত বিশিষ্ট হৃষ্টপুষ্ট চেহারার ডাক্তার মহলে এবং ধাত্রী-বিদ্যা-বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনে এলেন—তাঁরা কেউ ১লা ডিসেম্বর রাত্রে ডেলিভারী কেস পান নি। কেউ সে রাত্রে গলসী দূরে থাক—শহরের মধ্যেও 'কলে' বেরোন নি!

তরুণ সোল্লাসে মিঃ সোমকে ফোনে আহ্বান করে খবর দিলে "যোগাযোগের ক্ষীণ সূত্র, ক্রমে জাহাজ-বাঁধা কাছির পরিপুষ্টতা লাভ করছে!"

মিঃ সোম উপদেশ দিলেন "সন্তর্পণে—কৌশলে হাতটি ধরো। মস্তিষ্ক যেন টের না পায়।"

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। চন্দর গড়াই মোট-ঘাট বেঁধে, জামা কাপড় পরে প্রস্তুত হয়ে—নিজের ঘরে কম্বল পেতে বসে গঞ্জিকা সেবন করছিল। তার মুখে চোখে একটা অস্বাচ্ছন্দ্যকর ভীতি-ত্রস্ত ভাব। ক'দিন ধরে ক্রমাগত অতিরিক্ত গঞ্জিকা সেবনের ফলে তাকে শুষ্ক, শীর্ণ, রুক্ষ-উদ্ধত মেজাজের মানুষের মত দেখাচ্ছিল।

দুয়ারে খিল বন্ধ ছিল। সহসা মৃদু করাঘাত-শব্দের সঙ্গে মোলায়েম সুরে কে বললে "গড়াই, দুয়ারটা খোলো।"

গঞ্জিকা-ধূম-বিকৃত কর্কশ স্বরে গড়াই জবাব দিলে "কে? কি দরকার?"

উত্তর এল "আসানসোল থেকে বাবু আমায় তোমার কাছে পাঠিয়েছেন।"

"কোন্ বাবু?—

"শ্রীকান্ত বাবু।"

দুয়ার উন্মুক্ত হোল। আগন্তুক ঘরে ঢুকল। পরণে হাঁটু পর্য্যন্ত খাটো কাপড়। গায়ে জীর্ণ মলিন কোট। জীর্ণ ময়লা আলোয়ানে মাথা মুখ ঢাকা। শুধু চোখ দুটি দেখা যাচ্ছে। মোট-ঘাটগুলার উপর সতর্ক দৃষ্টিক্ষেপ করে আগন্তুক বললে "তৈরী হয়ে বসে আছ? চল, টিকিট কেটে তোমায় ট্রেণে তুলে দিয়ে আসি।"

নিস্তেজ—স্তিমিত দৃষ্টিতে আগন্তুককে লক্ষ্য করতে করতে গড়াই বললে "তোমার নাম? ঠিক ঠাওরাতে পারছি না তো। কে তুমি?"

শীতার্ত্তের মত হি হি করতে করতে নাকে-মুখে আলোয়ান ঢাকা দিয়ে লোকটি অস্পষ্ট স্বরে বললে "আমি ভজহরি।"

"ভজা? অ!—" নিশ্চিন্ত হয়ে গড়াই ফের কম্বলে বসল। গাঁজার কল্কেটা তুলে নিয়ে বার দুই মৃদু মন্দ টানের পর প্রাণপণ শক্তিতে প্রচণ্ড এক টান দিয়ে, দম ধরে ঘাড় হেঁট করে কয়েক মিনিট স্তব্ধ রইল। তারপর তিন হাত লম্বা ধোঁয়া ছেড়ে, নিকটস্থ তৈলাক্ত মলিন বালিশটা টেনে নিয়ে কোলের উপর রেখে বললে "রাহা-খরচ পাঠিয়েছে কিছু?"

"পাঠিয়েছেন বৈকি। চল, টিকিট করে সব দিয়ে দিচ্ছি। দেরী কোর না। ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখেছি। ওঠো।"

"এর মধ্যে? গাড়ীর তো এখনো দু' ঘণ্টা দেরী।"

"ইষ্টিশানে গিয়ে বসে থাকাই মঙ্গল। গাড়ী ফেল হবার ভয় নেই।"

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সখেদে গড়াই বললে 'চ' তবে। ত্বরিতানন্দ ব্যাটা পেরেতসিদ্ধিটা যদি শিখিয়ে দিত, তা হলে যেখানেই যাই সসচ্ছন্দে দু পয়সা কামাতে পারতুম! বল্লে "দে পাঁচশো টাকা, তবে শেখাব!"—আরে মর্, তোর গব্ভোই যদি পাঁচশো ঢালব, তবে আমি খাব কি? অথচ বাবুকে পনের দিন ধরে রোজ রাত্তিরে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে কত কি শিখিয়ে দিলে! বাবু বড়লোক, টাকা ঢালতে পারে কি না? বুঝ্‌লি?"

"হুঁ। মোট-ঘাট গাড়ীতে তুলি?"

"তোল্।"—গড়াই বালিশটা বুকে চেপে বসে রইল। আগন্তুক অনুগত ভৃত্যের মত রংচটা টিনের ট্রাঙ্ক, বাসনের মোট, খাবারের ডালা, বিছানার বাণ্ডিল—সব বয়ে বয়ে অদূরে বড় রাস্তায় অবস্থিত

ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে এল। তার পর বিনীত ভাবে বললে "কম্বল আর বালিশটা দাও।"

অন্তে জবাব হোল "বালিশ? না না, ওটা আমি নিজের হাতে নেব।" কম্বল দিয়ে বালিশটা জড়িয়ে নিয়ে, কক্ষপুটে চেপে ধরে,—ডান্ হাতে গাঁজার সাজ-সরঞ্জামের ছোট পুঁটলিটি নিয়ে গড়াই উঠল। টলতে টলতে বেরিয়ে এসে কর্কশ কণ্ঠে হাঁক দিলে "ও কুণ্ডুমশাই, ঘর দোর দেখে নাও, আমি চললুম।"

দূর থেকে কে বললে "যাচ্ছি। তুমি যাও।"

সযত্নে গড়াইকে ট্যাক্সিতে বসিয়ে আগন্তুক তার পাশে বসল। ট্যাক্সি উল্কাবেগে ছুটল। নেশার ঝোঁকে গড়াই'এর মাথা ঘুরছিল, দৃষ্টি ঝাপ্সা হয়ে গিয়েছিল। গাড়ীটা কোনদিকে ছুটেছে কিছু বোঝবার আগেই হঠাৎ একটা ফটকওলা বাড়ীর মধ্যে ঢুকে ঝপ্ করে থেমে গেল! সঙ্গে সঙ্গে পিল্ পিল্ করে এক পাল লোক এসে গাড়ীর চারিপাশ ঘিরে ফেললে! তাদের অনেকের মাথায় লাল পাগড়ী!

চমকে সভয়ে গড়াই বললে "এ কি? কোথায় এলুম?"

ইনেস্পেক্টার বাবুর পরিচিত কণ্ঠ কাণে পৌঁছাল "শ্রীবৃন্দাবনে!"

গড়াই জেল হাজতে স্থানান্তরিত হোল। ভজহরির ছদ্মবেশ ত্যাগ করে তরুণ এসে গড়াইকে নিয়ে পড়ল! কিন্তু কিছুতেই প্রথমে স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারলে না। গড়াই উত্তরোত্তর উগ্র মূর্ত্তি ধরে পুলিশের যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে গালাগালি দিতে লাগল।

তার জিনিস-পত্র খানাতল্লাসী হোল। সেই বালিশের তুলার মধ্যে পাওয়া গেল ন্যাকড়া-জড়ানো পাঁচশো টাকার নম্বরি নোট! রাজ-এষ্টেটের হারানো নোটের নম্বরের সঙ্গে তার নম্বর মিলে গেল!

তরুণ হেসে বললে "ডাক্তার, ডেলিভারী কেস, ডাক্তারী যন্ত্র-পাতির ট্রাঙ্কের গল্প বলে পেট্রোল-ষ্টেশনকে দিব্য ঠকিয়েছ। তারা তোমার ধাপ্পাবাজীতে বোকা বনে, সাফ তোমায় সাধুপুরুষ ঠাউরেছে। পুলিশের কাছে মিথ্যে কথা বলে, তোমার নাম ঢেকে নিয়েছে। কিন্তু আমায় ঠকাতে পারবে না বন্ধু! আমি জানি সে ট্রাঙ্কে কি ছিল? আর সেই মহামান্য ডাক্তারটি কে?"

আতঙ্কপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে গড়াই বললে "কে?"

তরুণ নিম্নস্বরে তার কানে কানে কি বললে।—মুহূর্ত্তে গড়াইয়ের উগ্রতা অন্তর্হিত হোল! মুখ মড়ার মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল!

গড়াই বশ্যতা স্বীকার করলে। তরুণের জিজ্ঞাসার উত্তরে কাঁদতে কাঁদতে তখন অনেক কথা বললে।

পরদিন সকালে তরুণ সম্ভ্রান্ত ধনীর বেশে বর্দ্ধমান ষ্টেশনে উপস্থিত হোল। ষ্টেশন-মাষ্টারের সঙ্গে দেখা করে ১লা ডিসেম্বর যে সকল টিকিট-কালেক্টার রাত্রের ডিউটিতে ছিলেন, তাঁদের নামের তালিকা সংগ্রহ করে,—একে একে তাঁদের ধরলে। মোটা টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে জানালে ১লা ডিসেম্বর রাত্রে সে দিল্লী এক্সপ্রেসে গয়া যাচ্ছিল! সে সেকেণ্ড ক্লাসের যাত্রী ছিল এবং তার কামরায় আর একজন মাত্র বাঙালী ভদ্রলোক ছিলেন। ভদ্রলোকটির রং ফর্সা, মাথায় প্রকাণ্ড টাক এবং হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। তাঁর পরিধানে কোট্ প্যাণ্ট এবং ফিকে হলদে রঙের পট্টুর অলেষ্টার ছিল। তিনি বর্দ্ধমানে নামেন এবং ভুল করে তাঁর মালের সঙ্গে তরুণের একটা স্যুটকেস নামিয়ে নেন। তরুণ তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকায় ভুলটা তখন বুঝতে পারে নি। গাড়ী অনেক দূর চলে যাবার পর তার ভুল ভাঙে। তখন বর্দ্ধমান ষ্টেশনে ফোন করা নিস্ফল ভেবে আর ফোন করে নি। স্যুটকেসটায় তার বিস্তর জরুরি কাগজ-পত্র আছে, সুতরাং সেটা ফেরৎ পাবার জন্য সে উক্ত ভদ্রলোকের সন্ধান জানতে চায়।

মোটা পুরস্কারের নামে ষ্টেশনের কর্ম্মচারী মহলে উৎসাহ-চাঞ্চল্য জেগে উঠল। নিজেরা চারিদিকে ছুটে একে ওকে প্রশ্ন করে, কুলিদের ডেকে জিজ্ঞাসা করে, নানাবিধ বাচনিক তর্ক-বিতর্কের পর চূড়ান্ত মীমাংসা জানালে—১লা ডিসেম্বর রাত্রে আপ দিল্লী এক্স্প্রেস থেকে যারা বর্দ্ধমানে নেমেছিল, তাদের মধ্যে ওইরূপ পরিচ্ছদভূষিত একজন ভদ্রলোক নেমেছিলেন বটে। তাঁর সঙ্গে পাঁচ ছটা স্যুট্কেস ছিল, দুটো বেডিং ছিল এবং একটা বড় ট্রাঙ্ক ছিল। কুলিরা বললে ট্রাঙ্কটা অস্বাভাবিক ভারি ছিল। বাবু বলেছিলেন—তাতে 'বহুৎ রুপিয়াকা নয়া কিতাব' আছে। অতিরিক্ত পুরস্কার দিয়ে দু'জন বলিষ্ঠ কুলির দ্বারা সে ট্রাঙ্ক বহন করানো হয়। সমস্ত মাল ষ্টেশনে জমা রেখে শুধু ট্রাঙ্কটা নিয়ে তিনি গেট পার হয়ে যান! তিন চার ঘণ্টা পরে ফিরে আসেন। ...না, তখন তাঁর গায়ে পট্টুর অলেষ্টার ছিল না। শুধু সাহেবী পোষাক ছিল। ট্রাঙ্ক?...না, সে ট্রাঙ্ক আর সঙ্গে আনেন নি। সম্ভবতঃ সেটা শহরে কোন আত্মীয়-বন্ধুকে দিয়ে এসেছিলেন। ট্রাঙ্কের গায়ে কিছু লেখা ছিল কি না, ভিড়ের গোলমালে কেউ লক্ষ্য করে নি। ফিরে এসে তিনি নিজের মালগুলি নিয়ে শেষ রাত্রের ট্রেণে কলিকাতার দিকে পুনশ্চ চলে যান। সে সময় কোথাকার টিকিট করেছিলেন তা তাদের মনে নাই। শুধু মনে আছে, সে সময় আপ ট্রেণ ছিল না।"

রেল-কর্ম্মচারীদের পুরস্কার দিয়ে তরুণ ফোনে মিঃ সোমকে আহ্বান করে আনুপূর্ব্বিক সব সংবাদ জানালে। মিঃ সোম বললেন, "আমি গ্র্যাণ্ড হোটেলে গিয়ে মিঃ জ্যাক্সনের সঙ্গে দেখা করেছি এবং তাঁর বাক্যানুযায়ী ব্যাণ্ডেলের গির্জ্জায় গিয়ে গোপনে তদন্ত করে জেনেছি—যথার্থ-ই ঐ তারিখে মিঃ জ্যাক্সনের খুড়তুত ভাইয়ের সেখানে বিবাহ হয়। ঐ বিবাহের প্রীতিভোজে যোগ-দানের জন্যই ঘটনার দিন তিনি দিল্লী এক্সপ্রেসে ব্যাণ্ডেলে গিয়ে-ছিলেন। পরদিন সকালে কলিকাতায় ফিরেছেন। ভোজসভায় যে সকল পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন, সে রাত্রে মিঃ জ্যাক্সনের ব্যাণ্ডেলে উপস্থিত থাকার সম্বন্ধে তাঁরা এক বাক্যে সাক্ষ্য দিলেন। জেরায় মিঃ জ্যাক্সনের কাছে একটা অদ্ভুত খবর পাওয়া গেল। তিনি হাওড়া ও ব্যাণ্ডেল উভয় ষ্টেশনেই ক্ষিতীশ বাবুর কামরার সামনে দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলেন। সে সময় তিনি দেখেছেন যে, কামরায় ক্ষিতীশ বাবু একা ছিলেন না, আর একজন পরিচিত ব্যক্তি তাঁর কামরায় ছিলেন। ব্যাণ্ডেলে ট্রেণ থামবার পর নেমে ক্ষিতীশ বাবুর কামরার সামনে দিয়ে

যাবার সময় তিনি দেখেছেন—সে সময় উক্ত ব্যক্তি স্বহস্তে ফ্ল্যাস্ক থেকে দুধ বা তেমনি কোনও তরল খাদ্য কাঁচের গেলাসে ঢেলে ক্ষিতীশ বাবুকে খেতে দিলেন। বর্ত্তমানে মামলা-ঘটিত শক্রতার কারণ বর্ত্তমান থাকায় তিনি সে ব্যক্তির নাম আমাদের কাছে প্রকাশে অসম্মত।...হাঁ, পুরুলিয়ার শান্তি চক্রবর্ত্তী উকিলকে মিঃ জ্যাক্‌সন চেনেন। দু'বৎসর পূর্ব্বে তিনি কোল কোম্পানীর পক্ষে উকিল দাঁড়িয়ে পুরুলিয়া কোর্টে অন্য একটা মামলা চালিয়েছিলেন সত্য। বর্ত্তমানে তিনি লোহাগড় রাজ-এষ্টেটের ব্রিফ্ হাতে নিয়েছেন, তাও কোল কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা জানেন। সে জন্য শান্তি বাবুর উপর কোনও বিদ্বেষ পোষণ করা হাস্যোদ্দীপক মূঢ়তা বলেই তাঁরা মনে করেন। কারণ, তাঁরা জানেন ওকালতিই শান্তি বাবুর ব্যবসায়। শান্তি বাবুকে তিনি সৎ প্রকৃতির ভদ্রসন্তান বলেই জানেন। না—ঘটনার দিন ট্রেণের যে কামরায় ক্ষিতীশ বাবু ছিলেন, সে কামরায় শান্তি বাবুকে উপস্থিত থাকতে তিনি দেখেন নি।"

তরুণ জবাব দিলে,"ক্ষিতীশ বাবুর কামরায় যে ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, তাঁর নাম আমি সংগ্রহ করেছি এবং তাঁকে চিনেও নিয়েছি। আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান শেষ করবার জন্য আমি বাঁকা-বংশীতে গঙ্গাস্নান করতে চললুম। আহ্বান মাত্র আসবার জন্য প্রস্তুত থাকবেন।"

তরুণ বাঁকা-বংশী গ্রামে গিয়ে কয়দিন ধরে বিভিন্ন বেশে, বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে নানা সংবাদ সংগ্রহ করলে। তার পর সাধুর ছদ্মবেশে নানাস্থান ঘুরে নৈহাটীর কাছে গঙ্গাতীরে এক সাধুর আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করলে। ঐকান্তিক নিষ্ঠাভরে সেখানে দু'দিন ভজনানন্দী সাধুজীবন যাপন করে, গোপনে মিঃ সোমকে টেলিগ্রাম করলে: "মালের সন্ধান পেয়েছি। খানা-তল্লাসীর পরোয়ানা সহ ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদের নিয়ে আসুন।"

[ক্রমশঃ

বিষাদের অশ্রুলীলা—

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

প্রান্তরের মত মন, যৌবনের রামধনু
যেথা হতে দেখা যায় অশ্রুহাসি বরিষণ পরে—
রমণীর রমণীয় রূপভরা সুকোমল তনু
অতনুর অভিসারে যেথা এসে নৃত্য করে,
সে মনে কণ্টক বন রচে কামনার অণু
সৌন্দর্য্য হারায়ে যায় কালের দুরন্ত মহা ঝড়ে।

সন্ধ্যায় বধূর দ্বারে চপল চঞ্চল বায়ু
প্রদীপ নিভায়ে দিতে নিত্য আসে অলক্ষ্য ইঙ্গিতে,
ক্ষণিক সুখের আশা না মিটিতে উড়িতেছে আয়ু
শুধু দু'দিনের খেলা চির স্বপন সঙ্গীতে;
রজনীতে যে প্রণয়-পুষ্প ফোটে সে যে রতি-স্নায়ু
করিছে বিকল মৃত্যু তরে এই অবনীতে।

তুচ্ছতার সাথে মিথ্যা বসন্তের আয়োজন,
ঐশ্বর্য্য বৈরাগ্য সবই অতৃপ্তির আনন্দ-আশ্রয়।
বিষাদের অশ্রুলীলা বিরহের করে উদ্বোধন
জাগরণ-সুষুপ্তির যত জয়-পরাজয়—
বারে বারে দুঃখ দেয় দুরাশার পথে অনুক্ষণ।
যে কথা ভাবিনি কভু শেষে দেখি তাহা হয়,
যে কথা ভেবেছি তাহা মিছে করি নিবেদন।

সহস্র বিপদ আসে সহস্র ভাবনা লয়ে
স্মরণের মাঝে জাগে হৃদয়ের উদ্দীপনা শত।
জটিল রহস্য ভরা সংসারের সর্ব্ব দুঃখ বয়ে
অজ্ঞাত বেদনা নিয়ে কাঁদে মূঢ় চিত্ত কত।
কালচক্র আবর্ত্তনে ক্রম পরি-বর্ত্তমান
ধরণীর মানব-জীবন অসংখ্য বন্ধন স'য়ে
অনন্তের অনুভূতি প্রতিদিন করিছে সন্ধান
নিখিলের দেবালয়ে শির করি' অবনত।

মুস্‌লিম্ চিত্রশিল্পের মূল ভিত্তি

শ্রীগুরুদাস সরকার

মুস্‌লিম ধর্ম্মমত অনুসারে নরদেহের আলেখ্য অঙ্কন নিষিদ্ধ হইলেও দামাস্কাস, বোগদাদ, ও কায়রোর বিভিন্ন চিত্রশালায় সম্পাদিত যে সকল চারুচিত্র অদ্যাপি বিদ্যমান তাহা হইতে স্পষ্টই

সামার্‌রার দেওয়াল-চিত্র

প্রতিভাত হয় যে, মুসলমান শিল্পী এ সম্বন্ধে কোন বিধি-নিষেধই মানিয়া চলিতে পারেন নাই। মুসিল (Musil) নামক অষ্ট্রীয়াবাসী ভ্রমণকারী, সিরিয়ার মরুভূমে, মানব-প্রতিকৃতি সম্বলিত যে সকল চিত্র আবিষ্কার করেন, তাহা খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর বলিয়াই স্থিরীকৃত হইয়াছে। ইহারই একখানি সুবৃহৎ চিত্রপটে বাইজান্টাইন সম্রাট (প্রাচ্য রোমক সম্রাট), আরবদিগের খলিফা, এবং পারস্যরাজ খসরু পারভেজ—এই তিনজনের প্রতিকৃতি একত্রে চিত্রিত দেখা যায়। মেসোপটেমীয় শিল্পের নিদর্শন, সামার্‌রায় প্রাপ্ত মানবমূর্ত্তি সন্নিবিষ্ট চিত্রগুলি, ওমাইয়া বংশীয় খলিফাদিগের রাজত্বকালে খ্রী: অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের মধ্যে রচিত হইয়াছিল বলিয়াই অনুমিত হইয়াছে। মতান্তরে এ-গুলির অঙ্কনকাল খ্রী: নবম শতাব্দী (খ্রী: অ: ৮৩৬-৮৮৩)। এই শেষোক্ত মতটিই অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণীয়। সামার্‌রা (Samarrah) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ৮৩৮ (৮৩৬?) খ্রী: অব্দে, খলিফা মুত্তাসিমের বিচিত্র খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য এবং উহা পরিত্যক্ত হয় খ্রী: ৮৮৩ অব্দে, সুতরাং সামার্‌রার চিত্রগুলি নবম শতাব্দীর বাহিরে যাইতে পারে না। খ্রী: সপ্তম শতাব্দীর প্রাথমিক মুস্‌লীম (proto-Muslim) মৃৎশিল্পে ইহা অপেক্ষা প্রাচীন চিত্রকলার পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু সে চিত্রের সহিত সাসানীয় শিল্পের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ রকমের। নিউইয়র্ক মেট্রোপলিটান মিউজিয়মে রক্ষিত এই প্রকার মৃৎশিল্পের নমুনা একখানি তস্‌তরির, (প্লেটের) উপর যে একটি অশ্বারোহী অঙ্কিত আছে (১) তাহার শিরোদেশ ও মুখাবয়ব সাসানীয় মুদ্রায় এবং গিরিগাত্রে উৎকীর্ণ সাসানীয় ভাস্কর্য্যে সন্নিবিষ্ট কোনও কোনও নৃপতির প্রতিকৃতির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এ চিত্রে বাইজান্টাইন্ প্রভাব দৃষ্ট হয় না, সাসানীয় ছাপই সুস্পষ্ট।

সামার্‌রার চিত্রে প্রাচ্য রোমরাজ্যে বিকাশপ্রাপ্ত বাইজান্টাইন্ শিল্পপ্রভাব সুস্পষ্ট হইলেও এ শিল্পধারা প্রাচ্যভাব-বিবর্জ্জিত নয়। কোনও কোনও চিত্রে শিল্পীর নামোল্লেখও দৃষ্ট হয়। যাঁহারা এ চিত্রগুলি রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে ন শিল্পীও ছিলেন বটে, কিন্তু এ চিত্রনিচয়ের মূল্য—উহা চিত্রীর জাতি বা ধর্ম্ম সূচিত করিতেছে বলিয়া ততটা নয়, যতটা আব্বাসীয় শৈলীর সহিত ইহার সত্যকার নিকট সম্পর্ক প্রমাণিত করিতেছে বলিয়া। অনুমান হয় চিত্রকর্ম্মে অভিজ্ঞ এই সকল খ্রীষ্টিয়ানেরা জাকোবাইট (Jacobite) অথবা নেষ্টোরীয় সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন। আমরা সামার্‌রার একটি খ্রী: নবম শতাব্দীর প্রাসাদের ভিত্তিগাত্রস্থ খণ্ডিত ফ্রেস্কো চিত্রের যে দুইখানি প্রতিলিপি (চিত্র নং ১ ও চিত্র নং ২) প্রকাশিত করিলাম তাহার একখানিতে এক সারি শুকপক্ষী, আর অপরখানিতে সারস পক্ষীর ন্যায় দীর্ঘগ্রীব একটি পক্ষীর মস্তক ও একটি রমণীর মুখচ্ছবি বিন্যস্ত রহিয়াছে। সামার্‌রার এই প্রাসাদের প্রসাধক ভিত্তিচিত্রগুলি আব্বাসীয় শৈলীরই অন্তর্গত। বিহগগুলির চিত্র বাস্তবধর্ম্মী বলিয়া সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কুসের আম্‌রার (Kuseir Amra'র) ধ্বংসাবশেষমধ্যে (২) যে সকল নগ্না বা নৃত্যপরা নারীর চিত্র ও যুদ্ধের চিত্র ভিত্তিগাত্রে অঙ্কিত দেখা যায়, সেগুলি বাইজান্টাইন্ সাম্রাজ্যের অধিবাসী গ্রীক চিত্রশিল্পীদিগের মধ্যে কাহারও, অথবা সিরিয়া কিম্বা মেসোপটেমিয়ার অধিবাসী কোনও শিল্পনিপুণ আরমাইক্ (Armaic) প্রজার তুলিকাসম্ভূত বলিয়া অনুমিত। সামার্‌রার চিত্রাবলীর ন্যায় এ সকল চিত্রেও গ্রীক প্রভাব বিদ্যমান বটে কিন্তু প্রাচ্য উপাদানেরও অভাব নাই। ষ্ট্রজী গোষ্কি-সম্পাদিত এসিয়া খণ্ডের ক্ষুদ্রক চিত্র-শিল্প-বিষয়ক গ্রন্থের ৬২নং চিত্রে (৩) কুসের আম্‌রার ফ্রেস্কো চিত্রের সামান্য কয়েকটি নমুনা প্রদর্শিত হইয়াছে।

আসল পারসীক ক্ষুদ্রক চিত্রের যে প্রাচীনতম নমুনা পাওয়া গিয়াছে তাহা আব্বাসীয় শৈলীর। এ চিত্রখানি খ্রী: ১২২২ অব্দের এবং ইহাতে প্রবল বাইজান্টাইন্ প্রভাব বিদ্যমান (৪)। কিতাব-অল্-তানবিহ্ গ্রন্থে মাস্‌উদি (Masudi) লিখিয়াছেন যে, ফারস্ প্রদেশের অন্তর্গত ইস্তাখার্ নামক স্থানে তিনি পেহ্‌লভি (পহ্লভি) নামক প্রাচীন পারসীক ভাষা হইতে অনূদিত, ৭৩ হিজিরাব্দে লিখিত একখানি পুঁথি দেখিয়াছিলেন। পুঁথিখানি চিত্র-সম্বলিত এবং উহাতে পারস্যের পূর্ব্বতন যুগের দুইজন রাজ্ঞীর এবং পঞ্চবিংশতি জন নৃপতির চিত্র সন্নিবিষ্ট ছিল। ইঁহারা প্রত্যেকেই রাজ-পরিচ্ছদে ভূষিত এবং প্রত্যেকেরই মস্তকে একটি করিয়া স্বর্ণমুকুট। মাস্‌উদি'র গ্রন্থ ৯১৫ খ্রী: অব্দে প্রকাশিত হয়। ৯৬১ খ্রী: অব্দে 'হাম্‌জ-অল্-ইস্‌ফানি'ও পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের অনুরূপ একখানি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। পাওয়া গেলে, এই রাজকীয় প্রতিকৃতিগুলিকেই পারসীক ক্ষুদ্রক চিত্রের আদি নমুনা বলিয়া

(১) Rupam No. 24, October 1925, fig. 1.

(২) এই স্থানটি মরুসান্নিধ্যে, একরূপ মরুপ্রান্তরেই অবস্থিত। ইহার অনতিদূরেই মরুসাগর (Dead Sea) ও জর্দ্দন নদী।

(৩) Asiatische Miniaturen Malerei, Tafel 63.

(৪) Syke's History of Persia, Vol II, p. 606

গ্রহণ করা চলিত। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত সাসানীয় শিল্প যে ধারায় প্রচলিত ছিল তাহার সহিত, খ্রীঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগের নমুনা হইতে পরিচিত পারসীক চিত্রণ-পদ্ধতির যোগাযোগের সন্ধান মিলে চীনা মাটির বাসন হইতেই। মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করার পর পারসীকদিগের মধ্যে পূর্ব্বকালীন চিত্রশিল্পের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহা প্রধানতঃ তেহরণের নিকটবর্ত্তী রায়ী অথবা ঢাগেস্ নামক নগরীর চীনা মাটির চিত্রিত পাত্রসমূহেই সংরক্ষিত হইয়াছে। এই সকল পাত্রগুলির নির্ম্মাণকাল খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ, এমন কি, তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্তও ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। দুর্দ্ধর্ষ মোঙ্গলগণ খ্রীঃ ১২২০ অব্দে রায়ী নগরী ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে।

ঢাগেসের চিত্রিত পাত্রাদির কথা উল্লেখ না থাকিলে পারসীক চারুশিল্পের ইতিহাস অপাঙ্‌ক্তেয় হইয়া পড়ে। ইউরোপ ও মার্কিনের যাদুঘরগুলিতে এ শিল্পের নমুনা সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে অনুসন্ধিৎসু কলারসিক সেগুলি চাক্ষুষ করিতে পারেন। আমাদের কিন্তু এতদ্‌বিষয়ক গ্রন্থাদির উল্লেখ ব্যতীত অন্য উপায় নাই। কুহ্‌নেলের "মুস্‌লিম ক্ষুদ্র শিল্প" নামক গ্রন্থে (৫) ঢাগেস্ মৃৎপাত্রের নমুনাস্বরূপ একটি জলের গ্লাস (fig. 54), একটি জলের জ'গ (fig. 55), ও একটি থালার (তস্তের) চিত্র (fig. 56), এবং চীনা ভাবাপন্ন একটি মাতৃমূর্ত্তির চিত্র (fig. 52) প্রদত্ত হইয়াছে। নিউইয়র্ক হইতে প্রকাশিত ষ্টুডিও (আন্তর্জ্জাতিক) পত্রিকার ১৯৩০ খ্রীষ্টমাস সংখ্যায় দুইটি স্ত্রীমূর্ত্তি-সম্বলিত একটি তস্তের, এবং টাইলের উপর চিত্রিত স্ত্রীজন-পরিবেষ্টিত বাদসাহের রঙীন প্রতিলিপিতে ঢাগেস্ শিল্পের বৈশিষ্ট্য সুষ্ঠুরূপে প্রকটিত হইয়াছে। রূপম্ পত্রের সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ

সামার্‌রার দেয়াল-চিত্র

শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় রায়ী ও ঢাগেস্ মৃৎ-শিল্প-বিষয়ক নানা তথ্যপূর্ণ যে প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন (৬) তাহাতে ঢাগেস্ মৃৎপাত্রের কয়েকখানি চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। একখানিতে বাহ্‌রাম গোরের মৃগয়াকালীন লক্ষ্যভেদ-কৌশলের

সপ্তম শতাব্দীর ঢাগেস মৃৎপাত্রের চিত্র

(fig. 11) এবং অপর একখানিতে সিংহাসনে আসীন পুরনারী-পরিবৃত নরপতির (fig. 13) চিত্র বড়ই কৌতূহল উদ্রিক্ত করে। প্রথমোক্ত পরিকল্পনাটির সুদূর অতীতেই উদ্ভব হইয়াছিল—যেহেতু সাসানীয় যুগের রৌপ্য তস্তে এইরূপ নক্সা উৎকীর্ণ রহিয়াছে দেখা যায়। অপর দুইটি চিত্র জ'গের (jugএর) গায়ে নিষণ্ণ কতকটা বাঁধা ছাঁদের অশ্বারোহিবৃন্দের (fig.-18-19)। ইহাতেও শিল্পীর সম্পাদন-কৌশলের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। ঢাগেস হইতেও রাকার মৃৎপাত্রগুলি প্রাচীনতর, আনুমানিক খ্রীঃ একাদশ শতাব্দের, কিন্তু জীবাদির মূর্ত্তি-সন্নিবেশের স্বল্পতা হইতে এগুলি যে ভিন্নপর্য্যায়-ভুক্ত তাহা বিশেষজ্ঞ না হইলেও বুঝিতে বিলম্ব হয় না। পারসীক শিল্পকলা প্রসঙ্গে সাসানীয় যুগের উল্লেখ বাধ্য হইয়াই করিতে হয়। পারস্যের মুস্‌লীম চিত্র-শিল্পের আদি অন্বেষণ করিতে হইলে সাসানীয় যুগে না গিয়া উপায় নাই। সাসানীয় শিল্পকলার বিশেষ করিয়া মাজদীয় (জোরোয়স্ত্রীয়) ও মানিচীয় চিত্রধারার ভিত্তির উপর পরবর্ত্তী মুস্‌লীম যুগের পারসীক শিল্প যে কতকাংশে প্রতিষ্ঠিত, তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। মানিচীয় তথা মাজদীয় শিল্পে যে ভারতের বৌদ্ধ চিত্রপদ্ধতির ছাপ আসিয়া পড়িয়াছিল তাহা সার অরেল ষ্টাইন কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত খোটানের দেওয়াল-চিত্রগুলির অনুশীলনফলে জানা গিয়াছে। হের্টস্ ফেলডের প্রত্নানুসন্ধান প্রাচীন মুদ্রার দিক দিয়া এ উক্তির সমর্থন করে। পূর্ব্ব ইরাণে যে ভারতীয় শিল্পিগণ বাস করিতেন এবং মুসলমান আক্রমণের মুখেই যে তাঁহারা পারস্যের এ অংশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এ কথা এখন ঐতিহাসিক সত্য বলিয়াই পরিগণিত। খ্রীঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম তৃতীয়াংশে রাজা বুদ্ধশ্রী মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণ ইহার

(৫) Islamische Klein Kunst von Ernest Kuhnel,
(৬) Rupam, October. 1925,

পরেও অনেকদিন পর্য্যন্ত পূর্ব্ব তুর্কিস্থানে বাস করিয়াছিলেন (৭)। সুতরাং প্রাচ্য ইরাণের শিল্প ও সংস্কৃতি যে বৌদ্ধ শিল্প ও সংস্কৃতির সহিত সম্মিলিত হইবে বা তদ্দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সুযোগ পাইবে তাহা স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। খোটানের বৌদ্ধ সংস্কৃতি অল্প দিনের নয়। খ্রীঃ ৪র্থ শতাব্দীর শেষ কিম্বা ৫ম শতাব্দীর প্রথম ভাগে এতদংশে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচার পুরা মাত্রায় চলিতেছিল। সুবিখ্যাত বৌদ্ধ গ্রন্থকার আচার্য্য কুমারজীব খোটানের এক রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই কথিত আছে। কুমারজীব হরিবর্ম্মণের একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ এবং শতশাস্ত্র ও বুদ্ধ-চিত্তোৎপাদন-শাস্ত্র নামক বৌদ্ধ গ্রন্থদ্বয়ের অনুবাদ করেন। হরিবর্ম্মণের গ্রন্থ অনূদিত হয় খ্রীঃ ৩৮৩-৪১২ অব্দের মধ্যে। শেষোক্ত গ্রন্থ দুইখানির অনুবাদকাল যথাক্রমে ৪০৪ ও ৪০৭ খ্রীঃ অব্দ। ঐতিহাসিক ফিহ্‌রিস্তের মতে খলিফা মামুন ও তাঁহার বার্ম্মেক বংশীয় (Barmecide) অমাত্যগণ মানিচীয় ভাবাপন্ন ছিলেন। সুতরাং মানিচীয় ভাবধারা যে উন্মুক্ত দ্বারপথেই বোগ্দাদে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নয়। খলিফা হারুণ-অল্-রসিদ (খ্রীঃ অঃ ৭৮৬—৮০৯) জাফরের প্রাণদণ্ড বিধান করিয়া অপর বার্ম্মেক বংশীয়দিগকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ফিহ্‌রিস্তের কথা সত্য হইলে বার্ম্মেকীয়েরা মামুনের রাজত্বকালে (খ্রীঃ অঃ ৮১৩-৮৩২) পুনরায় প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—এইরূপই ধারণা জন্মে।

বাহির হইতে মুস্‌লিম শিল্পে আর এক শক্তিমান্ প্রভাব আসিয়া পৌঁছে চীনা শিল্প হইতে। অনেকের মতে চেঙ্গিজের পুত্র

বীণাবাদিনী আজাদা ও বাহ্‌রাম গোর

হুলাগুখাঁ কর্ত্তৃক খ্রীঃ ১২৫৮ অব্দে বোগ্দাদ নগরী লুণ্ঠিত হওয়ার ফলে বোগ্দাদ শৈলী অথবা আব্বাসীয় শৈলী নামে প্রখ্যাত শিল্প-পদ্ধতি একেবারে বিনষ্ট হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত পারসীক শিল্পের জন্মলাভ হয় তখন হইতেই। এই নূতন পারসীক শৈলীর একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল তুর্কিস্থানে (৮)। সেখানকার সুবিদ্বান্ ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ চীনা চিত্রকরদিগের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া ললিতকলায় শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষের অধিকারী হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তখনকার কালে মোঙ্গল শৈলীর এই সকল চীনা মোঙ্গোলীয় চিত্রগুলিই সমগ্র পারস্যে আদর্শস্থানীয় বলিয়া বিবেচিত হইত।

দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ শতাব্দের পারসীক ক্ষুদ্রক চিত্রের নিদর্শন খুব কমই পাওয়া যায়। কলিকাতার কলা-কোবিদ শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ মহাশয়ের সংগ্রহের অন্তর্গত একখানি খণ্ডিত সাহ্‌নামা পুঁথির চিত্রগুলি যে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অঙ্কিত ফরাসী বিশেষজ্ঞ মঁসিয়ে ব্লশে এইরূপ মতই প্রকাশ করিয়াছেন। পুঁথিখানি যে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদের কিম্বা মধ্যভাগের—এ মতটি সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে স্বীকৃত না হইলেও ইহা যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর অধিক পিছাইয়া লওয়া ন্যায়সঙ্গত নয়—এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। অপর পক্ষে, ইহা যে দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী এ, মতবাদও বিদ্যমান। ১৯৩১ খ্রীঃ অব্দের বার্লিংটন হাউস (Burlington House) প্রদর্শনীতে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছিল। ইহার একটি চিত্রের নমুনা প্রদর্শনীর ক্যাটালগ্ গ্রন্থে (প্রিয়দর্শিকায়) প্রদত্ত হইয়াছে। এই ক্যাটালগে ঘোষ সাহ্‌নামা নামে পরিচিত এই পুঁথিখানি খ্রীঃ একাদশ শতাব্দীর বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এ অনুমান অযৌক্তিক মনে হয় না। এই পুঁথিরই ক্ষুদ্রতর অংশটি চেষ্টার-বিয়েটি সংগ্রহের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। শ্রীযুক্ত জে, ভি, এস্, উইলকিন্‌সন্ এই সাহনামাখানি হিজিরা ষষ্ঠ শতাব্দীর কিম্বা সাতশত হিজিরাব্দের বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। দেখা যাইতেছে, গ্রন্থখানির বয়স সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত মতবাদ কয়টি তাঁহার এই অনুমানের মধ্যেই পড়িয়া যায়। সন তারিখ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞেরা কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারুন বা না পারুন, পুঁথিখানি যে খুব প্রাচীন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহা নস্ক্ নামক পুরাতন আরবী হরফে লিখিত, পাতাগুলির পরিমাপ ৭ ইঞ্চি × ৬৪ ইঞ্চি। শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয়ের সৌজন্যে ইহার চিত্র-সম্বলিত একটি পাতা আমাদিগের দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল। না চিত্রখানিতে, না লিখিতাংশে, কালের প্রভাব ইহার কোথাও কিছু স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় নাই। বার্লিংটন হাউস প্রদর্শনীর ক্যাটালগে যে চিত্রখানির প্রতিলিপি প্রদত্ত হইয়াছে, আমরা সংক্ষেপে তাহা বর্ণনা করার চেষ্টা করিব।

তুরাণরাজ আফ্রাসিয়াবের আদেশে রাজ-জামাতা সিয়াওয়াস্ বধার্থে নীত হইতেছেন—ইহাই হইল এ চিত্রের বিষয়বস্তু। তাঁহার দুইটি হাত পিছনদিকে পিঠমোড়া করিয়া বাঁধা—দেহের উপরার্দ্ধ অনাবৃত। সর্ব্বাগ্রে একব্যক্তি উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে অগ্রসর হইতেছে, সেই বোধ হয় ঘাতক গিরুইজারা। বন্দী সিয়াওয়াসের পিছনেই দুইজন অশ্বারোহী—একজন হাতদিয়া দুর্ভাগ্য রাজ-জামাতাকে

(9) E. Blochet, Masulman Painting, 16th 97th Century (translated by Cicly M, Binyon) p, 83,

(৮) মঁসিয়ে ব্লশের এই মত কোনও কোনও বিশেষজ্ঞ সমর্থন করেন নাই।

নির্দ্দেশ করিয়া কি যেন বলিতেছে। ইহারই পরে একজন অশ্বারূঢ় তীরন্দাজ, আর তাহার পশ্চাতে এক শোকবিহ্বলা রমণী স্খলিতপদে অগ্রসর হইতেছেন। ইনিই হয়তো সিয়াওয়াস পত্নী রাজকুমারী ফারাঙ্গিস্ হইবেন। সমগ্র চিত্রখানিতে চীনা প্রভাব সুপরিস্ফুট। হঠাৎ দেখিলে মনে হয় এ পরিকল্পনা হয়তো কোনও খাঁটি চীনা চিত্রকরের, অথবা ইহা চীনদেশীয় পদ্ধতিতে সুশিক্ষিত কোন দেশীয় চিত্রীরই চিত্রকর্ম্মের নমুনা। চিত্রখানি দেখিলেই কেমন যেন ব্যর্থতার আর্ত্তনাদ হৃদয়ে অনুরণিত হইতে থাকে। তাঁহার জামাতা হইতে তাঁহার বিপদ্ ঘটিবে ভবিষ্যদ্বক্তার এই বাণীতে যদি আফ্রাসিয়াব বিশ্বাস স্থাপন না করিতেন, স্বনির্ম্মিত সিয়াওয়াস-গড়ে বাসকালে শান্তিকামী সিয়াওয়াসের বিরুদ্ধে যদি ক্রূরমতি গার্সিবাজ মিথ্যা করিয়া রাজদ্রোহের অভিযোগ আনয়ন না করিত, শ্বশুরের সৈন্যকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াও সিয়াওয়াস্ যদি অহিংসনীতি অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত না করিতেন, আবার গার্সিবাজের কুপরামর্শে তুরাণরাজ যদি জামাতার প্রাণদণ্ডই আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া স্থির না করিতেন, তাহা হইলে এই আসন্ন পতিবিয়োগ-বিধুরা রাজবালার হৃদয়বিদারক হাহাকার বৃথাই গগনতলে বিলীন হইত না। হউক না এ চিত্র চীনাভাবাপন্ন, তবুও ইহাকে পারসীক চিত্রকলারই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরিতে হইবে। এ শৈলীর চিত্রবিশেষে বিদেশীয় পদ্ধতি যতটুকুই প্রকাশ পাউক না কেন, মূল পারসীক উপাদানের কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। পারসীক চিত্রের পারসীকত্ব এই দেশীয় উপাদান হইতেই; উহাই ছিল মুস্লিম পারসীক শিল্পের মূল ভিত্তি—

১৩শ শতাব্দের রাগেস মৃৎপাত্রের চিত্র

বাইজান্টাইন, বৌদ্ধ, বা চীনা শিল্পধারার সাময়িক সংমিশ্রণ ইহার কাছে কিছুই নয়।

পাট চাষ ও পাট শিল্প

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

জাপানের সহিত যুদ্ধের অকস্মাৎ নিবৃত্তির ফলে, প্রাচ্য ভূখণ্ডে যে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিপ্লবের উৎপত্তি ঘটিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালার গরিষ্ঠ-পণ্য পাটের বাজারে বিষম বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, এবং পাটশিল্প ও পাট ব্যবসায়ে কয়েকটি জটিল সমস্যার আবির্ভাব ঘটিয়াছে। জাপান কর্ত্তৃক অধিকারের পূর্ব্বে "সুদূর প্রাচ্যের" দেশগুলি বাঙ্গালা হইতে প্রচুর পাটশিল্পোৎপন্ন দ্রব্যাদি ক্রয় করিত। যুদ্ধের অবসানে, শান্তি সংস্থাপিত হইলে, ঐ সকল দেশে আমাদের পাট-শিল্পোৎপন্ন দ্রব্যাদির চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে, এবং পাট-ব্যবসায় ও পাট শিল্পের উন্নতি ঘটিবে, এইরূপ আশা জন্মিয়াছিল; কিন্তু আশানুরূপ পরিস্থিতির ব্যতিক্রম হেতু পাট ব্যবসায়ে মন্দা ঘটিয়াছে। শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা কম হওয়ার ফলে কাঁচা পাটের বিক্রয় কমিয়া গিয়াছে; এবং কাঁচা পাটের মূল্য সম্প্রতি সরকার-নির্দ্ধারিত সর্ব্বনিম্ন মূল্য-নিরিখ অপেক্ষা এত কমিয়া গিয়াছিল যে, বঙ্গীয় জাতীয় বণিক্ সমিতির (Bengal National Chamber of Commerce) গত ত্রৈমাসিক অধিবেশনে সভাপতি মিঃ আই, বি, সেন তৎপ্রতি সরকারের আশু মনোযোগ আকর্ষণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কাঁচা পাটের মূল্য সরকার-নির্দ্ধারিত সর্ব্বনিম্ন নিরিখ অপেক্ষা অধোগতি লাভ করিলে, কৃষকের দুর্গতির সীমা থাকে না। এই নিমিত্ত, কিছুদিন পূর্ব্বে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, কাঁচা পাটের মূল্য ঐরূপ অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া অর্থনৈতিক অনর্থ সৃষ্টি করিলে কেন্দ্রীয় সরকারই যথোপযুক্ত মূল্যে সমস্ত কাঁচা পাট কিনিয়া লইবেন। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার ৫৮,০০০ গাঁইট বি—টুইল চটের ক্রয়-চুক্তি করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে কাঁচা কিম্বা পাকা কোন মালের বাজারেই কিছুমাত্র উন্নতি ঘটে নাই। পাটের মূল্য-শাসননির্দ্দেশ (Jute Price Control Order) আগামী মার্চ্চ মাসে শেষ হইবে। ততদিন পর্য্যন্ত কলওয়ালারা তাহাদের অবশ্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাঁচা মাল কখনই খরিদ করিবে না। সুতরাং কাঁচা পাটের বাজারের আশু স্থায়ী উন্নতি সম্ভবপর নহে।

পাট বাঙ্গালার প্রকৃষ্ট পণ্য। বাঙ্গালার অর্থনীতিতে ইহার স্থান, মূল্য ও মর্য্যাদা অতুলনীয়। বাঙ্গালার আর্থিক উন্নতি ও অবনতি এই পাটের উৎপাদন, উৎকর্ষ ও অপকর্ষের উপর একান্ত নির্ভরশীল। অন্যান্য ফসলের উৎপাদন যেমন শ্রমসাপেক্ষ, তাহাদের বিনিময়ে অর্থাগমও তেমনই বিলম্বিত ও অনিশ্চিত। পাটের চাষে পরিশ্রম যেমন কম, অর্থাগমও তেমনই ত্বরিত ও

সহজেই লভ্য। এই নিমিত্ত পাটকে "নগদ ফসল" (Cash crop) আখ্যা দেওয়া হয়। পাটের উৎপাদনে দরিদ্র কৃষক অনায়াসে প্রচুর অর্থ লাভ করে, এই হেতু পাট চাষের প্রতি তাহার মোহ জন্মিয়াছিল প্রচুর। ফলে অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য্য খাদ্য শস্যের উৎপাদন সঙ্কোচ করিয়া চাষী পাটের চাষ অযথা বৃদ্ধি করিতেছিল। তাহার ফলে, চাহিদার তুলনায় উৎপাদন অত্যধিক হওয়াতে ইহার মূল্য মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত কমিয়া যাইত। পাটের মূল্য.বৃদ্ধি হইলে চাষীর সাচ্ছল্য স্বল্প কালের নিমিত্ত বাড়িত, আবার ইহার মূল্য হ্রাস পাইলে, তাহার নিঃস্ব অবস্থা রিক্ততার প্রান্ত সীমায় পৌছিত। পক্ষান্তরে, খাদ্য শস্যের উৎপাদন-হ্রাসের ফলে, আমাদিগকে বর্ম্মার মুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছিল। পাট-শিল্প শেতাঙ্গ ধনিক ও বণিকদিগের সম্পূর্ণ করায়ত্ত ছিল এবং মোটা মুনাফায় তাহাদের ধনভাণ্ডার দ্রুত বৃদ্ধি করিত; সুতরাং শ্বেতাঙ্গ-শাসনাধীন বাঙ্গালা সরকার, খাদ্য শস্যের ক্রমবর্দ্ধমান অভাবের প্রতি বিন্দুমাত্র লক্ষ্য প্রদান না করিয়া পাটের উৎপাদনবৃদ্ধির প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল ছিল। বর্ম্মা হইতে আনীত চাউলের উপর আমরা উদরান্নের জন্য এরূপ অসহায় ভাবে নির্ভরশীল হইয়াছিলাম যে, ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে জাপান কর্তৃক বর্ম্মা অধিকারের ফলে আমরা চাউলের তীব্র অভাব অনুভব করিয়া ১৯৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষের কবলে নিপতিত হইয়াছিলাম।

এই দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ নরনারী ও বালবৃদ্ধের অকালমৃত্যুতে বাঙ্গালার পল্লী অঞ্চল শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। এই লোক-ক্ষয়পূরণ দীর্ঘ সময়-সাপেক্ষ। এই নিমিত্ত কৃষক ও শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস হেতু পাট চাষের বিলক্ষণ সঙ্কোচ ঘটিবে, এই আশঙ্কায় শ্বেতাঙ্গ পাট-শিল্পী ও বণিক সম্প্রদায় অতিমাত্রায় বিচলিত হইয়াছিল। পুনশ্চ দুর্ভিক্ষের শোচনীয় পরিণামে, খাদ্যশস্যের চাষ বৃদ্ধি করিবার যে তীক্ষ্ণ প্রয়োজন সরকার অনুভব করিয়াছিলেন, তাহার ফলে খাদ্য শস্যের চাষ বৃদ্ধির সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইলে পাটের চাষ স্বভাবতই কমিয়া যাইবে, এ আশঙ্কাও প্রবল ছিল। এই দুই জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইয়া শ্বেতাঙ্গ পাটশিল্পী ও বণিক সম্প্রদায় ছলে বলে ও কৌশলে অসহায় কৃষকের প্রতি যৎকিঞ্চিৎ সহানুভূতিশীল হক্ মন্ত্রিমণ্ডলীকে অপসৃত করিয়া তাহার স্থলে শ্বেতাঙ্গের আজ্ঞানুবর্ত্তী ও অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিমণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিমণ্ডলীও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন দেখাইতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করে নাই। দরিদ্র কৃষকের সুবিধার্থে যে-পরিমাণ পাট-চাষ সঙ্কোচ করা উচিত ছিল, শ্বেতাঙ্গ পাটশিল্পপতিদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহা তাহারা করিতে পারে নাই। কাঁচা পাটের দর যথোপযুক্ত না হইলে, কৃষকদের অন্ন-বস্ত্রের অভাবের কিঞ্চিৎ মাত্র প্রশমনও সম্ভব পর হয় না। পক্ষান্তরে, কাঁচা পাটের মূল্য যথাসম্ভব কম রাখিতে পারিলেই শিল্পপতিদের সুবিধা হয়। তাহারা অতি কম মূল্যে পাট কিনিয়া তদুৎপন্ন দ্রব্য-সামগ্রী অতি উচ্চমূল্যে সাগরপারের বাজারে বিক্রয় করিয়া কোটি কোটি টাকা লাভ করিতে পারে। চাহিদা ও যোগানের অনুপাতে দ্রব্যমূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। সুতরাং প্রয়োজনের অতিরিক্ত পাট জন্মিলেই পাট-কলওয়ালাদের সুবিধা। পক্ষান্তরে, প্রয়োজনের অনধিক উৎপাদন হইলে, প্রাথমিক উৎপাদক চাষী যথোপযুক্ত না হউক, তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন মূল্যও পাইতে পারে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদন হইলেই কৃষকের সর্ব্বনাশ। কৃষকদিগের অধিকাংশই মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী; তথাপি, মুসলমানপ্রধান সাম্প্রদায়িকতার চরম পরিপোষক নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিমণ্ডলী শ্বেতাঙ্গ বণিক সম্প্রদায়ের ভোটের সাহায্যে মন্ত্রিত্ব বজায় রাখিবার নিমিত্ত পাটের চাষ সঙ্গত পরিমাণে কমাইতে সাহসী হয় নাই, পরন্তু পাটের সর্ব্বনিম্ন ও সর্ব্বোচ্চ যে দুইটি দর বাঁধিয়া দিয়াছে তাহা দুঃস্থ কৃষকের আদৌ অনুকূল নহে, বরং প্রতিকূল।

এইরূপ একদেশদর্শী ব্যবস্থায় শ্বেতাঙ্গ বণিক, সম্প্রদায় যে বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছেন, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। শ্বেতাঙ্গ-বণিক্‌প্রধান ভারতীয় পাটকল সভার গত বাৎসরিক অধিবেশনে সভাপতি মিঃ ডবলিউ, এ, এম ওয়াকার এই নিমিত্ত মুক্তকণ্ঠে বাঙ্গালা সরকারের জয় ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, ১৯৪৫-খৃষ্টাব্দের মরশুমে নূতন পাটের চাষ ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ফসলের আট আনা অর্থাৎ অর্দ্ধাংশে নির্দ্ধারিত করিয়া এবং পাটের সর্ব্বনিম্নতম মূল্য পনের টাকায় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দৃঢ়-নিষ্ঠ প্রচারের ফলে বাঙ্গলা সরকার অসাধারণ সাফল্য (Signal Victory) লাভ করিয়াছিল, কিন্তু ফসল পূরা আট আনার স্থলে মাত্র সাড়ে পাঁচ আনা হইয়াছিল। তিনি পাটের দুর্ভিক্ষ আশঙ্কা করিয়াছিলেন। তাঁহার এ আশঙ্কা নিরর্থক হইয়াছে। পাটের কারবারে লিপ্ত ব্যক্তিমাত্রই জানেন যে, বাঙ্গলা সরকারের নির্দ্ধারণ ছিল যে, ১৯৪৪-৪৫ খৃষ্টাব্দের ফসলের পরিমাণ হইবে পঞ্চান্ন লক্ষ গাঁইট। কিন্তু গত জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ৪,৯৭,০০০ গাঁইট পাট মফঃস্বল হইতে সহরে আসিয়াছিল। সুতরাং পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত মজুত জমা লইয়া মোট পাটের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৫৯, ৬০,০০০ গাঁইট। বর্ত্তমান বর্ষে সরকারী পূর্ব্বাভাষের নির্দ্ধারণ ৬৩ লক্ষ গাঁইট। কিন্তু বর্ত্তমান বৎসরের উৎকৃষ্ট উৎপাদনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের মনে হয়, এই সমষ্টি ৬৫ লক্ষে উন্নীত হইবে। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এ বৎসর ফসলের পরিমাণ অধিকতর হইবে অর্থাৎ গত বৎসরের ফসলকে ষোল আনা ধরিলে এ বৎসরের ফসল হইবে অন্ততঃ আঠার আনা। এতএব প্রাকৃতিক অবস্থা অনুকূল হইলে এ বৎসরের ফসল ৭৪ লক্ষ গাঁইটে দাঁড়াইতে পারে। এই অঙ্কের সাহায্যে গত বৎসরের পাটের সরকারী ব্যয় বিতরণের হিসাবের তুলনা করা যায়। এই হিসাব অনুযায়ী ১৯৪৪-৪৫ খৃষ্টাব্দের উৎপাদন ও পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত পাট লইয়া সমষ্টি দাঁড়ায় ৯৬,৫৫,৩৭৯ গাঁইটে। ইহার মধ্যে ৭৫ লক্ষ গাঁইট স্থানীয় ব্যয় (Local consumption) ও রপ্তানী-খাতে নির্দ্ধারণ করিলে বর্ষশেষে ২১,৫৫,৩৭৯, গাঁইট উদ্বৃত্ত জমা থাকিবে। ১৯৪৪-৪৫ খৃষ্টাব্দের সরকারী ব্যয়-বিতরণের হিসাব হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, ভারতীয় পাট-কলসভার সদস্য-কলগুলি ব্যবহারে লাগাইবে ৫৬ লক্ষ গাঁইট। এই সভায় সদস্য নহে যে কলগুলি

তাহারা ব্যবহার করিবে ৩ লক্ষ গাঁইট। গৃহস্থালী প্রয়োজনে লাগিবে ৬ লক্ষ গাঁইট এবং রপ্তানী হইবে ১০ লক্ষ গাঁইট। যদিও বর্ষশেষে ২১।০ লক্ষ গাঁইট উদ্বৃত্ত ধরা হইয়াছে, তথাপি আমাদের অনুমান যে, যথার্থ উদ্বৃত্ত ইহা অপেক্ষা অধিকতর হইবে'। কিন্তু এই বৃদ্ধি, অধিকতর-পরিমাণে রপ্তানী এবং অধিকতর-পরিমাণে কয়লা সরবরাহের ফলে, কলগুলি কর্তৃক অধিকতর পরিমাণে পাট ব্যবহারে ব্যয়িত হইবে। শ্রমিকের সংখ্যা-বৃদ্ধিও কলগুলির কর্ম্ম-বৃদ্ধির সহায়তা করিবে। সুতরাং ১৯৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দের ফসল যে অন্যূন ৭৪ লক্ষ গাঁইট হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহা অপেক্ষা অধিক হইবারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

ইতিমধ্যে ভারতীয় কেন্দ্রীয় পাটসমিতির পরিকল্পনা-উপসমিতি ১৯৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দের মরশুম হইতে ৩৪ লক্ষ একর (একশত সাড়ে দশ লক্ষ বিঘা) জমিতে ১০০ লক্ষ গাঁইট পাট উৎপাদনের নির্দ্ধারণ দিয়াছেন। যথোপযুক্ত প্রামাণিক সংখ্যা ও তথ্যের অভাবে উপসমিতি মাত্র পাঁচ বৎসরের নিমিত্ত এই নির্দ্ধারণ স্থির করিয়াছেন। আগামী পাঁচ বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা রচিত হইতে পারিবে। এই নির্দ্ধারিত সমষ্টি ১০০ লক্ষ গাঁইটের মধ্যে ৬৬ লক্ষ গাঁইট আভ্যন্তরীণ ব্যয়, ৬ লক্ষ গাঁইট গ্রামাঞ্চলের ব্যবহার এবং বাকী ২৮ লক্ষ গাঁইট রপ্তানীর নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পাট উৎপাদনকারী চারিটি প্রদেশের পাট-চাষের ক্ষেত্র এবং উৎপাদন-পরিমাণ অনুযায়ী নির্দ্ধারিত-সমষ্টি বাঙ্গালা, বিহার, আসাম এবং উড়িষ্যার মধ্যে বিতরিত হইবে। প্রথম তিনটি প্রদেশের গত পনর বৎসরের হিসাব আছে, কিন্তু উড়িষ্যায় নয় বৎসরের অধিক হিসাব-পত্র পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান যুদ্ধের অবসানে শত্রু-মিত্র সকল দেশেই শান্তিকালীন স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিলে, বর্ত্তমান নির্দ্ধারণের পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হইবে। সুতরাং অধুনা যে শীর্ষ-সমষ্টি নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যেই উচ্চতর করিবার প্রয়োজন ঘটিবে। এই নিমিত্ত পরিকল্পনা-উপসমিতি ব্যবস্থা দিয়াছেন যে, প্রতি বৎসরেই অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে, এবং এই অবস্থা প্রতি বৎসর নবেম্বর মাসে আলোচিত হইলে, পাটচাষ মরশুমের যথাসম্ভব পূর্ব্বেই অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা করিতে পারা যাইবে। উপসমিতির নির্দ্ধারণ বিভিন্ন প্রদেশকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাদের মতামত এবং মন্তব্য সম্প্রতি শ্রাবণ মাসের কেন্দ্রীয় সমিতির অধিবেশনে বিবেচিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সমিতির সিদ্ধান্ত যথাসময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের গোচরে আনা হইবে। তাহা হইলে কেন্দ্রীয় সরকার তাহাদের সর্ব্বপ্রকার ফসল-পরিকল্পনার মধ্যে অনায়াসে পাট ফসলের পরিমাণেরও নির্দ্দেশ দিতে পারিবে। এই পরিকল্পনাকে অচিরে কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত পরিকল্পনা-উপসমিতি প্রদেশগুলির প্রতি কয়েকটি প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশ দিয়াছেন। প্রথম, প্রাদেশিক সরকারগুলি উৎপাদকদিগকে তাহাদের উৎপাদিত ফসলের কাট্‌তি সম্বন্ধে একটি নিশ্চিত আশ্বাস দিবেন এবং তাহারা যাহাতে লাভজনক দৃঢ় দরে পাট বিক্রয় করিতে পারে সে ব্যবস্থাও করিবেন। দ্বিতীয়, পাটের মূল্যের দৃঢ়তা সংরক্ষণ হেতু চাহিদার অতিরিক্ত পাটগুলিকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিতে হইবে এবং যখনই পাটের দর একটি নির্দ্ধারিত নিম্নতম পর্য্যায়ে পৌঁছিবে, তখনই সেগুলি সংগ্রহ করিতে হইবে। পাটের বাজারের সমতা রক্ষার নিমিত্ত যখনই বাজারের চাহিদার অনুপাতে পাটের যোগান হ্রাস পাওয়ার নিমিত্ত পাটের মূল্য নির্দ্ধারিত ঊর্দ্ধতম সীমায় পৌঁছিবে, তখনই সেই সঞ্চিত পাটকে বাজারে ছাড়িতে হইবে। তৃতীয়, উৎপাদক যাহাতে যথাসম্ভব সর্ব্বোচ্চ মূল্য পায়, তন্নিমিত্ত সমবায় কিংবা অন্য কোন-বিধ-প্রথানুযায়ী বিক্রয় সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। চতুর্থ, পাটের আঁশের গুণানুযায়ী তাহাকে কয়েকটি বিভিন্ন মান কিংবা পর্য্যায় বিভক্ত করিতে হইবে; এবং কেবলমাত্র সেই নির্দ্দিষ্ট মান অথবা শ্রেণী অনুযায়ী তাহাদের বিক্রয়ের নিশ্চিত ব্যবস্থা করিতে হইবে। পঞ্চম, প্রয়োজন হইলেই সরকারকে আইন প্রণয়ন করিয়া এই সকল বিষয়ে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা করিতে হইবে। অর্থাৎ পাটচাষ-ক্ষেত্রের প্রয়োজনানুযায়ী পরিমাপ নির্দ্ধারণ, গুণানুযায়ী পাটের বিভিন্ন মান ও মর্য্যাদা নির্ণয় এবং পাট বিক্রয়ের সুনিয়ন্ত্রিত বাজার অক্ষুন্ন রাখিবার নিমিত্ত আবশ্যকানুযায়ী আইন বিধিবদ্ধ করিতে হইবে।

পাটচাষীর স্বার্থের সহিত পাটশিল্পীর স্বার্থের বিরোধের কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। চাষের সঙ্কোচে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। চাহিদা অপেক্ষা উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ অধিক হইলে কাঁচা মালের মূল্য কম হয়। সুতরাং শিল্পী সুলভে কাঁচামাল ক্রয় করিয়া তদুৎপন্ন পরিণত পণ্য বিক্রয় করিয়া অধিকতর লাভবান্ হয়। এই নিমিত্ত পাটশিল্পীর একান্ত চেষ্টা যাহাতে পাটের চাষ বৃদ্ধি পায়। ৩৪ লক্ষ একর জমি হইতে ১০০ লক্ষ গাঁইট পাট লাভ করিতে হইলে, প্রতি একরে (৩ বিঘা ৫ কাঠা) উৎপাদন দাঁড়ায় ২,৯৪ গাঁইটে। পাট-শিল্পীর অভিমত এই যে, এই নিরিখ অত্যন্ত উচ্চ। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, ১৯৪১, ১৯৪২ এবং ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে প্রতি একর পাটক্ষেত্রের উৎপাদন দাঁড়াইয়াছিল যথাক্রমে ২,৭৭, ২,৯৭ এবং ২,৮৩ গাঁইটে। সুতরাং পরিকল্পনা-সমিতির নিরিখ নির্দ্ধারণের ভিত্তি অসঙ্গত নহে। তাঁহারা গত ত্রিশ বৎসরের উৎপাদন এবং ব্যবহার-ব্যয়ের অঙ্ক এবং ১৯৪৪-৪৫ ও ১৯৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দের মজুত জমা এবং সম্ভাব্য উদ্বৃত্তের অঙ্কসংখ্যা পর্য্যালোচনা করিয়া নিরিখ-নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। পাটশিল্পী সম্প্রদায়ের যুক্তি এই যে, একর প্রতি উৎপাদনের নিরিখ অপেক্ষাকৃত কম অঙ্কে নির্দ্ধারিত করিয়া পাট-চাষক্ষেত্রের পরিসর বৃদ্ধি করিলেই অভাব-অনটনের সম্ভাবনা বিদূরিত হইয়া, নিশ্চিত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। পরিকল্পনা-উপসমিতি পাটের উৎপাদন ১০০ লক্ষ গাঁইটে নির্দ্ধারণ করিয়া, অনুমান করিয়াছেন যে, পাটকলগুলি এই সমষ্টির ৬৬ লক্ষ গাঁইট ব্যবহার বা ব্যয় (consumption) করিবে; ২৮ লক্ষ গাঁইট দেশান্তরে রপ্তানী হইবে এবং বিবিধ স্থানীয় ব্যাপারে ৬ লক্ষ গাঁইট খরচ হইবে। পাট কলগুলির ব্যবহার-ব্যয়ের অনুমান প্রায় নির্ভুল। যদি কয়লার যোগান

নিয়মিত হয়, তাহা হইলে প্রতি মাসে তাহাদের নির্দ্ধারিত শীর্ষে সমষ্টি একলক্ষ টন পরিণত-পণ্য উৎপাদন করিতে পাট-কলসভার সদস্য কলগুলির ১৯৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দে প্রয়োজন হইবে; ৬৬,৩৬,০০০ গাঁইট পাট। বিবিধ স্থানীয় ব্যবহারের নিমিত্ত নির্দ্ধারিত ৬ লক্ষ গাঁইটও, শিল্পের মতে প্রায় নির্ভুল; কিন্তু নিরাপত্তার খাতিরে পাট-শিল্পী সম্প্রদায় আরও ২ লক্ষ গাঁইটের বরাদ্দ করিতে উৎসুক। রপ্তানী বাণিজ্যের নিমিত্ত নির্দ্ধারিত অঙ্ক সম্বন্ধে মতদ্বৈধের অবকাশ আছে। যুদ্ধের নিবৃত্তি এবং শান্তির প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাগরপারে পাটের রপ্তানীর পরিমাণ ক্রমে বৃদ্ধি পাইবে। পাট-শিল্পী সম্প্রদায়ের অনুমান এই যে, ১৯৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দে সাগরপারের রপ্তানীর পরিমাণ ১৬ হইতে ২০ লক্ষ গাঁইট হইবে এবং ১৯৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দে ২৮ লক্ষ গাঁইটে উর্দ্ধগতি লাভ করিবে। শান্তি প্রতিষ্ঠাহেতু ব্যবসায়বৃদ্ধির ফলে আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যেই রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ এই অঙ্ককে অতিক্রম করিতে পারে; কিন্তু বর্ত্তমান পরিস্থিতি লক্ষ্যে রাখিয়া সকল সম্প্রদায়কে স্বীকার করিতে হইবে যে, পরিকল্পনা-উপসমিতির সুপারিশগুলি সমীচীন হইয়াছে। সুবিধাজনক কেন্দ্রে বিক্রয়বাজার প্রতিষ্ঠিত এবং মজুত মাল নিরাপদে রক্ষা করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত গুদাম প্রভৃতি আয়ত্ত করিতে যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন হইবে। এই সকল কর্ম্মে নিযুক্ত কর্ম্মচারীবৃন্দের বেতন-ব্যয়ও লঘু হইবে না। কিন্তু অর্থ ব্যতীত কোন কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না; তবে সে অর্থ কিরূপে সরবরাহ হইবে সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র।

সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণের মুখ্য উদ্দেশ্য দরিদ্র কৃষকের কঠোর পরিশ্রমের উপযুক্ত মূল্য প্রদান। কাঁচা পাটের ন্যায়সঙ্গত মূল্য নিয়ন্ত্রণের উপর যেমন চাষীর অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান ও স্বাচ্ছল্য নির্ভর করে, তেমনই পাটকলওয়ালাদেরও পাটজাত দ্রব্যাদির বিক্রয়-প্রসূত লাভ-লোকসানও নির্ভর করে। পাটের কয়েকটি প্রতিদ্বন্দ্বী সাগরপারের বাজারে দেখা দিয়েছে। পাটের দ্বারা বর্ত্তমানে যে-সকল দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়, অনুরূপ আঁশ-(fibre) যুক্ত পদার্থ দ্বারা ঐ সকল দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার প্রচেষ্টাও কিয়দংশে সফল হইয়াছে। সুতরাং পাটের একচেটিয়া প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিলোপের সম্ভাবনায় পাট-শিল্পী কারিকরগণ বিচলিত হইয়াছে। পাটের মূল্য নির্দ্ধারণের নিমিত্ত গত বৎসর দিল্লীতে পাট-চাষ ও পাট-শিল্পে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিনিধিদের সহিত প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি-গণের এক বৈঠক বসে। ঐ বৈঠকে নির্দ্ধারিত বন্দোবস্ত অনুযায়ী গত খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে পাট-মূল্য শাসন নির্দ্দেশ প্রবর্ত্তিত হয়। ভারতীয় পাটকলসভার সভাপতি তাঁহার বার্ষিক অভিভাষণে বলিয়াছেন যে, গত বৎসর এই নির্দ্দেশ অনুযায়ী কার্য্য সন্তোষজনক ভাবেই চলিয়াছিল এবং সামান্য সময়ের জন্য ব্যতীত পাটের মূল্য দৃঢ় ছিল। সভাপতি মিঃ ওয়াকারের বিশ্বাস এই যে, বহুবর্ষ পরে কৃষক তাহার পাটের নিমিত্ত দৃঢ় এবং সঙ্গত মূল্য পাইয়াছিল। অন্যান্য দু'বৎসরের তুলনায় পাট চাষী কিঞ্চিৎ অধিক মূল্য পাইয়াছিল, সন্দেহ নাই কিন্তু যথো-পযুক্ত, অথবা প্রয়োজনের অনুরূপ, অর্থাৎ তাঁহার অন্নবস্ত্রের অভাব দূর হয় এরূপ অর্থ পায় নাই। পক্ষান্তরে, অন্নবস্ত্রের অভাবে এবং দুর্ভিক্ষের পশ্চাতে আগত মহামারীর প্রকোপে তাহাদের সংখ্যা প্রচুর হ্রাস পাইয়াছে। অথচ কাঁচা পাটের সরকারী নিরিখ নির্দ্ধারিত সর্ব্বোচ্চ মূল্যের তুলনায় পাট-শিল্পজাত দ্রব্যাদির বিক্রয়-লব্ধ মুনাফা ছিল প্রচুর। পাট-কলসভার সভাপতি অবশ্য এ কথা স্বীকার করেন নাই। তিনি বলেন, কলগুলির প্রকাশিত লাভ-লোকসানের হিসাব পরীক্ষা করিলে এই ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বলিয়াছেন যে, অনেকে মনে করেন যে, একশত গজ হেসিয়ান অর্থাৎ চট প্রস্তুত করিতে সত্তর টাকা মণের পঁয়ত্রিশ সের মধ্যম (middle) পাট লাগে এবং এই এক শত গজ উৎপাদনের ব্যয় দুই হইতে তিন টাকামাত্র এবং ইহা সাড়ে আটাশ টাকার বিক্রয়ের ফলে অন্ততঃ এগার টাকা লাভ হয়। মিঃ ওয়াকার বলেন, তাই যদি হইত, তাহা হইলে তাঁহা-দের আয় হইতে অর্থসচিবের ভাণ্ডারে প্রচুর অর্থাগম ঘটিত; এবং অর্থ-সচিব জনসাধারণের করের মাত্রা কিছু কমাইতে পারিতেন। কারণ এই হিসাবে কলগুলি বৎসরে বত্রিশ কোটি টাকা লাভ করিতে পারিত। সরকারের সহিত সরাসরি কারবারে পাট সরবরাহের উপদেষ্টার মারফতে কারবার চলে। সরকার পাটজাত দ্রব্যাদির নিমিত্ত উৎপাদন খরচের উপর শতকরা সাড়ে সাত অংশ লাভ দেন। চট, থলে প্রভৃতির উৎপাদন-ব্যয় অবশ্য সরকারের হিসাবপরীক্ষকগণ অতি সূক্ষ্মভাবে অঙ্ক কষিয়া নির্দ্ধারণ করেন। সরকারের এই সূক্ষ্ম এবং সুদক্ষ পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে, সত্তর টাকা মণদরে "মধ্যম" পাট কিনিয়া একশত গজ চট তৈয়ারী করিতে পনর টাকা ছয় আনা মূল্যের পাট ব্যবহৃত হয়। এবং উৎপাদনব্যয় পড়ে সাড়ে দশ টাকা। কলওয়ালারা যদি চটের সর্ব্বোচ্চ মূল্য উনত্রিশ টাকা পায়, তাহা হইলে মাত্র তিন টাকা দুই আনা লাভ হয়। অনেকেই হয়ত জানেন না যে, কলওয়ালারা প্রায় চটের সমান পরিমাণ থলে প্রস্তুত করে এবং থলের চাদর বিক্রয়ে লাভ হয় আরও কম। কিন্তু কলওয়ালারা শিক্ষিত, বিচক্ষণ ও অর্থবান্, তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কার্য্য করে। প্রয়োজন অনুযায়ী উৎপাদনের হ্রাস-বৃদ্ধি দ্বারা তাহারা উৎপন্ন পাকা মালের দর দৃঢ় রাখে; এবং কাঁচা মালের বাজার একটু গরম হইলেই, মাল-খরিদ বন্ধ রাখিয়া মন্দার সৃষ্টি করে। নিঃস্ব ও নিরক্ষর কৃষকের পক্ষে এরূপ কূট কৌশল অবলম্বন অসম্ভব। ফলে, উৎপাদন আধিক্য হেতু কাঁচা মালের বাজার যেরূপ নিম্নগামী হয় এবং দীর্ঘকাল মন্দাক্রান্ত থাকে, পাকা মালের ক্ষেত্রে, সঙ্ঘবদ্ধ নিয়ন্ত্রণের প্রভাবে তাহা ঘটে না। চাহিদার প্রতি তীব্র লক্ষ্য রাখিয়া উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ দুঃস্থ ও মূর্খ কৃষকের আয়ত্তের বহির্ভূত। গতবৎসর পাট-কলওয়ালারা সরকারের পাটশিল্প-উপদেষ্টার মারফতে সাড়ে এগার কোটি টাকা মূল্যের পাট-শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়াছিল।

কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধারম্ভের ফলে, পাটশিল্পের যেমন উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছে, বিঘ্ন-বিপত্তিও ঘটিয়াছে তেমনই প্রচুর। তন্মধ্যে পাথুরিয়া কয়লার অভাব-অনটন, শ্রমিকের অপ্রাচুর্য্য এবং সাময়িক

প্রয়োজনে সরকার কর্তৃক কলবাড়ীগুলির তলপ-দখলই প্রধান। অনেক গুলি কলবাড়ী দখল করিয়া সরকার কলওয়ালাদের কর্মশক্তি প্রচুর পরিমাণে খর্ব্ব করিয়াও সামরিক দাবী মিটাইবার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন শ্রমিক দলের দ্বারা পর্য্যায়ক্রমে দ্বিগুণ কার্য্য করাইয়া কলওয়ালাদের উৎপাদনের একটি সীমা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু কাগজে কলমে অঙ্ক কষিয়া যাহা সম্ভব মনে হয়, বাস্তবক্ষেত্রে তাহা সম্ভবপর নহে। তথাপি এই সকল অসুবিধা সত্ত্বেও কলওয়ালারা গত বর্ষে সাড়ে দশ লক্ষ টন পাট-শিল্পজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন করিয়াছিল। সরকারের আদেশ যে প্রতিমাসে অন্ততঃ এক লক্ষ টন চট, থলে প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে হইবে। সুতরাং এই হিসাবে উৎপাদন দেড় লক্ষ টন কম হইয়াছিল। গত বর্ষে মোট বিক্রয় হইয়াছিল এগার লক্ষ দুই হাজার টন। সরকারের পাট-সরবরাহের উপদেষ্টা মারফতে বিক্রয়ের মূল্য সমষ্টি হইয়াছিল সাড়ে এগার কোটি টাকা। সরকারের এই উপদেষ্টা আর কেহ নহেন—পাট কল সভার সভাপতি মিঃ ওয়াকার স্বয়ং। কয়লার অভাব অনটন পূর্ব্ববৎসরের তুলনায় গত বৎসর আরও তীব্র হইয়াছিল। কাপড়ের কলের ন্যায় চট কলগুলিকেও মধ্যে মধ্যে কার্য্য বন্ধ রাখিতে এবং নির্দ্ধারিত সময় অপেক্ষা স্বল্পতর সময় কল চালাইতে হইয়াছিল। এ অভাব এখনও বেশ তীব্র আছে। সরবরাহ মন্ত্রীর সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া মিষ্ট কথা এবং বৃথা আশ্বাস ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় নাই। মিঃ ওয়াকার বলিয়াছেন,—"We were once again lulled into a state of false optimism by the honeyed words of Sir Ramaswami." পাটকলগুলির নির্দ্ধারিত হিস্যা (Quota) মাসিক ৫২,৩৫৪ টন, কিন্তু সংস্থান সমিতি সমস্ত যুদ্ধ শিল্পের প্রয়োজনের সূক্ষ্ম বিচার বিবেচনা করিয়া তাহাকে শতকরা ৩৭।০ অংশ কমাইয়া মাসিক ৩২,৮৫৭ টনে পরিণত করিয়াছিল এবং তাহাও লইতে হইবে আলিটে ভিন্ন ভিন্ন খনি হইতে। পরিবহন সঙ্কট হেতু এই সংখ্যাকে কমাইবার প্রার্থনা পুনঃ পুনঃ পেশ করিয়াও কোন ফলোদয় হয় নাই। সামরিক প্রয়োজনে কয়েকটি কল বাড়ী তলপ-দখলের ফলে বাকী কলগুলি যুদ্ধের নিমিত্ত আবশ্যক মাল পূর্ণমাত্রায় যোগাইবার জন্য আপনাদের মধ্যে পরস্পরের সহযোগিতা মূলক যে কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করিয়াছিল, এবং ক্ষতিগ্রস্ত কলগুলির ক্ষতি, লাভবান কলগুলির সাহায্যে পূরণ করিবার নিমিত্ত যে সমষ্টিগত অর্থ-ভাণ্ডারের ব্যবস্থা করিয়াছিল, কয়লার অভাবে কার্য্যহানি হেতু, তাহাতে ঘাটতি ঘটিয়াছে। কয়লার যোগান আশু বৃদ্ধি না করিলে, সে ক্ষতি পূরণ অসম্ভব। কলবাড়ী তলপ দখলের ফলে বহু শ্রমিককে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রাখিয়া তাহাদের আহার ও বেতনের একটি সঙ্গত অংশ যোগাইতে হইয়াছে। সরকারের সত্বর এবিষয়ে অবহিত ও তৎপর হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সামরিক তলপ দখলের আয়তন সাড়ে সাত মিলিয়ন বর্গফুট—পাকা ইমারৎ এবং এগার মিলিয়ন বর্গফুট খোলা জমি। সমস্ত কলগুলির সমগ্র আয়তনের ইহা প্রায় অর্দ্ধাংশ। সরকার প্রতি বর্গ ফুটের নিমিত্ত মাত্র মাসে তিনটি টাকা ভাড়া দেন। বর্ষ শেষে সরকারের নিকট প্রাপ্য হইয়াছিল, ১১০ লক্ষ টাকা ; কিন্তু তখনও একটি পয়সা আদায় হয় নাই। এই প্রাপ্যের বিরুদ্ধে শিল্পের সমষ্টিগত অর্থভাণ্ডারের দায় দায়িত্ব ছিল ১৭৫ লক্ষ টাকা এই সমবায় প্রচেষ্টা পাটশিল্পের সঙ্ঘবদ্ধ একতা ও দৃঢ়তার প্রকৃষ্ট পরিচয়। অন্য কোন শৃঙ্খলাবদ্ধ শিল্পের পক্ষে এরূপ অদ্ভুত কৃতিত্ব অসম্ভব হইত। কিন্তু দরিদ্র কৃষকের দুঃখের অন্ত নাই!

ভট্টিকাব্য হইতে

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ সান্যাল

তরঙ্গচঞ্চলপত্রে হুতাশনদ্যুতি
শোভা পায় তাম্রবর্ণ উৎপলনিকর,
আকুল করিছে তার মধুকরকুল,—
ধূম যেন সদ্যোদীপ্ত অনল উপর।

নিরখি' বিম্বিত স্বচ্ছ সলিলের মাঝে
অপহৃত সৌন্দর্য্যের রাশি আপনার,
তীরভূমি ক্রোধভরে করিল তখন
স্থলপথে সরসিজ সুষমা বিথার!

পত্রপ্রান্ত হ'তে ঝরে স্বচ্ছজলকণা—
নিশার তুষারে—যেন নয়নের নীর,
কাঁদিছে প্রভাত-কালে তটতরুবর
কুমুদ্বতীর তরে—কূজনে পক্ষীর!

হেরিছে নিলীনভৃঙ্গ কুসুমে কমলে
বিস্ময়বিমূঢ়—যেন আঁখি আপনার,
সাদরে মাধুরীপুঞ্জ যত পরস্পর
সলিলের রাশি আর অরণ্য-কান্তার।

কুমুদিনীরেণুমাখা পিঙ্গল মধুপে
ঊষানিলকম্প্রকায়া কুপিতা পদ্মিনী,
প্রত্যাখ্যান করি' হায়, ঠেলি' দিল দূরে,—
অপর সঙ্গম কভু সহে না মানিনী!

ভ্রমরগুঞ্জনগীতিশ্রবণ-উন্মুখ
নিথর নিশ্চল যেই কুরঙ্গপ্রবর,
লক্ষ্যহীন হয় ব্যাধ বধিতে তাহারে,—
উৎসুক হইয়া শোনে কলহংসস্বর।

গ্রহের ফের

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দাস

বিনোদ দত্ত রেঙ্গুন বেড়াইতে গিয়াছিল। উহার খুড়তুতো ভাই নীরোদ দত্তের বাসায় উঠিয়াছিল। য্যাডভোকেট অনিল মিত্রের মেয়ে মায়ার সঙ্গে পূর্ব্বেই বিনোদের পরিচয় ছিল। এখন সেই পরিচয় গাঢ়তর হইয়া বিবাহের প্রস্তাবে পরিণত হইয়াছে। মায়া সুন্দরী ও বিদুষী। বিনোদও সুশিক্ষিত, স্বাস্থ্যবান, সচ্চরিত্র যুবক। সুতরাং আগামী মাঘমাসে বিবাহের কোন বাধা কোন পক্ষেই ছিল না।

কিন্তু গ্রহের ফের। বিনোদের ছিল শনির দশা এবং রাহুর অন্তর্দ্দশা, নতুবা এরূপ অঘটন ঘটিবে কেন?

রবিবার প্রাতে বিনোদ সর্ট ও সার্ট পরিয়া, সোলা-হ্যাট মাথায় দিয়া লুইস্ ষ্ট্রীট দিয়া যাইতেছিল। দেখিতে পাইল—একটী ছিটের গাউন পরিহিত রমণী রিক্স হইতে অবতরণ করিল। তাহার সঙ্গে ২৪ ইঞ্চি লম্বা একটী চামড়ার সুটকেস। রমণী রিক্স-ওয়ালাকে সুটকেসটী তাহার সহিত চারতলাতে নিয়া যাইতে বলিল। রিক্স-ওয়ালা অস্বীকৃত হইল। তখন উহার সহিত রমণীর বচসা আরম্ভ হইল, এমন সময় বিনোদ রমণীর পশ্চাদ্‌ভাগে উপস্থিত হইল। বিনোদ বরাবরই Chivalrous ও দয়ার্দ্রচিত্ত। সে রমণীকে রিক্স-ওয়ালাকে তাহার প্রাপ্য দিয়া বিদায় করিয়া দিতে বলিল। প্রথমতঃ কুলীর জন্য চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিল। কুলী পাওয়া গেল না। তখন বিনোদ বলিল, "আপনি চলুন, আমিই নিজে আপনার ব্যাগটী আপনার ঘরে পৌঁছে দিব।"

রমণী সহাস্যে বলিলেন, "So kind of you."

কিন্তু রমণীকে ভাল করিয়া দেখিয়া বিনোদের মনটা একটু বিমর্ষ হইল। রমণীর বর্ণ ময়লা, Anglo-Burman নহে, বোধ হয়, Anglo-Indian—মাদ্রাজী রক্তের সংমিশ্রণ আছে। বেজায় মোটা এবং মুখ বদখদ্—বয়স ত্রিশের উপর। যাহা হউক, যখন কথা দিয়া ফেলিয়াছে, তখন কার্য্য করিতেই হইবে।

রেঙ্গুনের খাড়া ৯ ইঞ্চি ধাপবিশিষ্ট ৩×২১=৬৩টী সিঁড়ি বহিয়া ২৪ ইঞ্চি সুটকেস্ নিয়া চতুর্থতলে উঠা যে কত কষ্টকর ও শ্রমসাধ্য, তাহা যাঁহারা উঠিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। চতুর্থতলে যখন বিনোদ অবশেষে পৌঁছিল, তখন তাহার ললাট ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছে এবং দ্রুত নিশ্বাস বহিতেছে।

রমণী চাবি দিয়া Flat-এর দরজা খুলিল। চতুর্থতলে সিঁড়ি হইতে প্রথমেই রান্না ঘর ও তৎসংলগ্ন বাথরুম। তারপর শুইবার ঘর। তারপর সম্মুখে বসিবার ঘর। বিনোদ পাকের ঘর ও শুইবার ঘরের মধ্য দিয়া বসিবার ঘরে পৌঁছিল। তথায় ব্যাগটী নামাইয়া ধপ করিয়া একটী চেয়ারে বসিয়া পড়িল। রমণীরও ললাট স্বেদাক্ত। দ্রুত শ্বাস বহিতেছে এবং তাহার বিপুল বক্ষ ঘন ঘন উদ্বেলিত হইতেছে। রমণীও চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

দুই মিনিট উভয়েই দম লইবার জন্য চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তারপর রমণী বলিল, "Thank you, so much. can I offer you a drink?" (ধন্যবাদ, আপনাকে কোন পানীয় দিতে পারি কি?) বলিয়া ইলেক্‌ট্রিক্ ফ্যান্ খুলিয়া দিল।

বিনোদ। একটু লেমনেড দিলে আপত্তি নেই।

রমণী। আমার ঘরে লেমনেড ও বরফ আছে। আপনি বসুন। আমি বরফ দিয়ে লেমনেড আনছি।

রমণী এই বলিয়া রান্না ঘরের দিকে গেল।

এমন সময় সিঁড়ির মাথায় পাকের ঘরের দরজার কড়া নড়িতে লাগিল। রমণী তখন বরফ ধুইতেছিল। কড়া নাড়ার শব্দ ক্রমশঃ তীব্রতর হইতে লাগিল। রমণী ধীরে সুস্থে বরফ লেমনেডের গ্লাসে রাখিয়া সিক্ত হস্তে দরজা খুলিয়া দিল। প্রবেশ করিল একটী প্রকাণ্ড গোঁফযুক্ত দীর্ঘকায় Anglo-Indian সাহেব এবং তৎপশ্চাতে একজন চুলিয়া (মালাবারী) মুসলমান এবং পাগড়ীওয়ালা এক মাদ্রাজী।

রমণী কাহাকেও চিনিতে পারিল না। মনে মনে রুষ্ট হইয়া রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের কি চাই।"

সাহেব। চলুন, বসবার ঘরে চলুন, সব বলব।—বলিয়া রমণীর অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া বসিবার ঘরে উপস্থিত হইল। চুলিয়া ও মাদ্রাজীও সঙ্গে গেল।

লেমনেডের গ্লাস হাতে নিয়া বিনোদের সম্মুখে টেপয়ের উপর রাখিল। তারপর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিল,—

Now, what is the matter? (তারপর, কি ব্যাপার?)

সাহেব বিনোদকে দেখিয়া উল্লসিত হইয়া উঠিল। চুলিয়া এবং মাদ্রাজীর দিকে চাহিয়া বলিল, "দেখা, সব হ্যায়! যেয়সা হাম বোলা থা। মরদকো ভি মিল গিয়া। দেখো, ক্যায়সা দরদ, ক্যায়সা তোয়াজ? লেমনেড্ বরফ, ফ্যান্‌কা হাওয়া—

চুলিয়া ও মাদ্রাজী উভয়ে বলিল, জী হুজুর, সব ঠিক হ্যায়?

রমণীর ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। বলিল, "ক্যা ঠিক হ্যায়? হোয়াট্ ডু ইউ মিন্? হোয়াই দিস্ ইনট্রুশন্? (তোমাদের কথার অর্থ কি? কেন অনধিকার প্রবেশ করেছ?)

সাহেব। স্থির হ'য়ে শুনুন, মিসেস্ মুর। অত চট্‌বেন না। আপনাকে ও আপনার পেয়ারাকে একত্রেই পেয়েছি।

রমণী। আমার নাম মিসেস্ মুর নয়। মিস্ বেকার। আর কি বল্লি, পেয়ারের লোক! রসো!

বলিয়া—ঘরে ছিল একটী লম্বা বাঁশের ডাঁটওয়ালা বর্ম্মা ছাতা; রমণী রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি ধরিয়া, বাঁশের বাঁট দিয়া সাহেবের মস্তকে আঘাত করিল। ভাগ্যে পুরু সোলা হ্যাট মাথায় ছিল! মাথা বাঁচিল, কিন্তু হ্যাট টী মস্তকচ্যুত হইয়া পড়িল। তখন রমণী "ডার্টি নেটিভ" বলিয়া চুলিয়া ও মাদ্রাজীকে আক্রমণ করিল এবং দুই তিন ঘা করিয়া ছাতির বাড়ী মারিল। তখন সকলে প্রাণভয়ে দরজা খুলিয়া সিঁড়ির মুখে গেল। রমণীও ছাতা হাতে সেখানে উপস্থিত হইল। উহারা প্রমাদ গণিল। তাড়াতাড়ি খাড়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে উহাদের পদস্খলন হইল এবং গড়াইতে গড়াইতে নীচে গিয়া পড়িল।

রমণী। (উপর হইতে) Rightly served (ঠিক হয়েছে)। ফের যদি কখনো এখানে আসিস্, ফৌজদারী মামলা করব।

সিঁড়ির সম্মুখে কাপড় হইতে ধুলা মাটি ঝারিতে ঝারিতে চুলিয়া বলিল, "টিক্‌টিকী সাব! এ ক্যায়সী বাৎ! ঘরকা নম্বরকা গলতি হুয়া মালুম হোত্তা।

সাহেব। ঘর কা নম্বর ১৯৭। নম্বর তো ঠিক হ্যায়! ফ্ল্যাট্ কা নম্বর ১৫।

মাদ্রাজী। লেকেন, হামলোক যো ঘুষা, ও কামরা কা নম্বর ১৬। হাম আপ্‌না আঁখসে দেখা হ্যায়।

সাহেব। ব্যাকুব! আগাড়ি কাহে নেই বোলা হ্যায়? তব এইসা তকলিফ আর বেইজ্জতি নেহি হোতা থা। চলো মাতৃ-ভাণ্ডারমে, থোড়া রসগোল্লা খা লেও আউর চা পি লেও।

বলিয়া উহারা মাতৃভাণ্ডার নামক বাঙ্গালী মিঠায়ের দোকানের দিকে চলিয়া গেল।

রমণী ফিরিয়া আসিল। ক্রোধহেতু মুখ তামাটে বর্ণ, বক্ষ আন্দোলিত। প্যারাসোল্ যথাস্থানে রাখিয়া রমণী পুনরায় উপবেশন করিল। বিনোদের চোখে প্রশংসাসূচক দৃষ্টি। সে হাসিয়া বলিল, "You are a brave lady. I admire your presence of mind and quick action." (আপনি সাহসী রমণী! আপনার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং দ্রুত কার্য্যের তারিফ করি।) আমি এখন আসি।

রমণী বিনোদের সঙ্গে তাহার মোটা থল্‌থলে হাত দিয়া করমর্দ্দন করিল। বিনোদ খানিক ঘুরিয়া ফিরিয়া বাসায় গেল।

দুই

সে-দিন অনিল মিত্রের বাসায় বিনোদের চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল। প্রতি রবিবারেই থাকে। বৈকাল ৫টায় বিনোদ হাজির হইল, অনিল মিত্রের বাগানযুক্ত গোটা দ্বিতল বাসা—নীচতলা পাকা, উপরতলা কাঠের। চায়ের টেবিলে চারিজন, মিঃ মিত্র, তাঁহার স্ত্রী, মায়া এবং বিনোদ। মায়া মিঃ ও মিসেস্ মিত্রের একমাত্র সন্তান।

চা-পান করিতে করিতে বিনোদ সরলমনে সবিস্তারে সপল্লবে প্রাতের ঘটনা ও মিস্ বেকারের কাহিনী ও তাহার বীরোচিত কার্য্যের বর্ণনা করিল। শুনিয়া মায়ার মুখ প্রাবৃটকালীন আকাশের ন্যায় মেঘাচ্ছন্ন হইল। মিঃ মিত্রের ভ্রূকুটী কুঞ্চিত হইল। কেবল হাস্যময়ী মিসেস্ মিত্রের মুখভাবের পরিবর্ত্তন হইল না—তিনি বিনোদের সরস বর্ণনা শুনিয়া খুব একচোট হাসিয়া নিলেন। মিঃ মিত্র গম্ভীরভাবে স্ত্রীকে হাসি থামাইতে বলিয়া বিনোদকে বলিলেন,

Damsel in distress-এর সাহায্যে knight-এর কায করা বোধ হয় তোমার বহুকালের অভ্যাস?

বিনোদ। আজ্ঞে, আপনার কথার মানে ঠিক বুঝতে পারলুম না।

মিঃ মিত্র। মানে—যদি কোন রমণী বিপদে পড়ে অথবা তার অসুবিধা হয়, অমনিই তুমি সাহায্য করতে ব্যগ্র হও।

বিনোদ। আজ্ঞে, এ-ক্ষেত্রে রমণীটি বিপদে পড়ে নাই সত্য, তবে খুব অসুবিধায় পড়েছিল।

মিঃ মিত্র। নিশ্চয়ই, কিন্তু তোমার মত বহুলোক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তোমার মত কুলীর কাজ করতে কেউ অগ্রসর হয় নাই! থাক্, এ-বিষয়ে তোমার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা।

বলিয়া মিসেস মিত্রকে ডাকিয়া লইয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন। রহিল শুধু বিনোদ আর মায়া। মায়া কঠিন স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—

মেয়েটী কোন্ জাতীয়া?

বিনোদ। বোধ হয় ফিরিঙ্গী।

মায়া। হুঁ, রেঙ্গুন শহরে অনেকে ফিরিঙ্গী রমণীর মোহ এড়াতে পারে না।

বিনোদ। এ-ক্ষেত্রে মোহের কোন কথাই উঠে না। রমণীটির বয়স ত্রিশের উপরে, রং কালো, মুখ অত্যন্ত বদ্‌খদ্, বেজায় মোটা! শুধু ওর অবস্থা দেখে মনে একটু দয়া হ'ল।

মায়া। আপনি বলছেন, কালো, মোটা, বদ্‌খদ্, বুড়ী! কিন্তু আমি কি এতই বোকা যে আপনার সব কথা বিশ্বাস করব? তা'ছাড়া এ-সংসারে যতকিছু গোলমাল, তার মূলে দয়া।

বিনোদ। তুমি এবং তোমার বাবা এ-সামান্য ব্যাপারটী বিশ্রীভাবে নিবে, বুঝতে পারি নাই।

মায়া। লোকে যখন মোহান্ধ হয়, নিজের দোষ দেখতে পায় না। আচ্ছা, আপনি আসুন, আমাকে এখনই বেরুতে হবে। বলিয়া বিনোদের যাওয়ার অপেক্ষা না করিয়াই কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

বিনোদ প্রমাদ গণিল! উহাদের মনে যে সন্দেহের ছায়া পড়িয়াছে, তাহা দূর করা যায় কিসে? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বিনোদ স্থির করিল—ঐ রমণীটিকে ডাকিয়া আনাইয়া মায়াকে দেখাইলেই চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন হইবে, সব গোলমাল চুকিয়া যাইবে। বিনোদ স্থির করিল—পরদিন প্রাতে রমণীটিকে নিমন্ত্রণ করিয়া মিঃ মিত্রের বাড়ী নিয়া যাইবে এবং মায়াকে দেখাইবে।

পরদিন প্রাতে বিনোদ লঙ্ প্যাণ্ট্, কলার, টাই ও কোট পরিয়া মিস্ বেকারের ফ্ল্যাটের সম্মুখে উপস্থিত হইল! উঠিয়া দেখিল ১৬নং ফ্ল্যাটের দরজায় তালা বন্ধ! বোধ হয় গৃহস্বামিনী প্রাতে বাজার করিতে বাহির হইয়া গিয়াছেন।

একে ৬৩টী সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া চারিতলায় উঠিবার শ্রম, তদুপরি যে উদ্দেশ্যে আসা তাহার ব্যর্থতা, বিনোদকে তিক্ত করিয়া তুলিল। সে দম নিবার জন্য মিস্ বেকারের দরজায় পিঠের ঠেকান দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পাঁচ মিনিট মিস্ বেকারের জন্য অপেক্ষা করিবে, এর মধ্যে ফিরিয়া না আসিলে নামিয়া চলিয়া যাইবে।

এমন সময় ১৫নং ফ্ল্যাটের দরজাটী খুলিয়া গেল এবং একটী Anglo-Indian তরুণী দরজার চৌকাঠে দাঁড়াইল। এই তরুণীর বয়স ২৫ বৎসর হইবে, গৌরী, তন্বী, সুশ্রী! পরিধানে নাইট

গাউনের উপর সুচিত্রিত কিমোনো। তরুণী কিয়ৎকাল বিনোদের দিকে চাহিয়া রহিল, পরে অতি মিষ্টি সুরে বলিল,—

Gentleman, may I ask you to help me a little.

(ভদ্র, আপনি আমাকে একটু সাহায্য করিতে পারেন।)

বিনোদ। নিশ্চয়ই, কি করতে হবে ?

তরুণী। আমার শোবার ঘর ও বস্‌বার ঘরের মধ্যে যে দরজা, তার ছিটকিনিটি প'ড়ে গিয়েছে। কিছুতেই খুলতে পারছি না। অনুগ্রহ ক'রে খুলে দিবেন কি ?

বিনোদ। নিশ্চয়ই। আমাকে দেখিয়ে দিন।

তরুণী বিনোদকে নিয়া রান্নাঘর পার হইয়া শোবার ঘরে প্রবেশ করিল। বিনোদ ছিটকিনীটি ধরিয়া অনেক টানাটানি করিল। খুলতে পারিল না—ছিটকিনীটি বহু উচ্চে এবং মরিচা-ধরা। বিনোদের ললাট ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল। তরুণী বিনোদের অবস্থা দেখিয়া বলিল—আপনি একটু বিশ্রাম করুন। এই চেয়ারটীর উপর বসুন।

বিনা বাক্যব্যয়ে বিনোদ বসিয়া পড়িল।

তরুণী। বড্ড গরম। আপনার কলার ও টাইটা খুলে ফেলুন। কোটটা র‍্যাকের উপর টাঙিয়ে রাখুন। আমিও কিমোনোটা খুলে ফেলছি। খুলিয়া খাটের প্রান্তে উপবেশন করিল।

বিনোদ সুবোধ বালকের মত কলার, টাই এবং কোট খুলিয়া ফেলিল। তরুণী তখন বলিল, "আপনার নিশ্চয়ই খুব পিপাসা পেয়েছে।"

বিনোদ মাথা নাড়িল।

তরুণী টিপয়ের উপর রক্ষিত একটী বোতল ও দুইটী গ্লাস বাহির করিল। বলিল, "আমার ঘরে এরেটেড ওয়াটার নাই। এমন কি, ভাল জলও নাই। একটু দেশী জিনিষ চলবে কি ?"

বিনোদ মধ্যে মধ্যে এক আধটুকু বিয়ার খাইত। ব্রহ্মদেশীয় দেশী মদ কখনও স্পর্শ করে নাই। সুতরাং ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

তরুণী। কোন শঙ্কা নেই। অত্যন্ত মাইল্ড (মৃদু) ও সুস্বাদু জিনিস। মিঃ মূরের নিজ হাতের তৈরী। যদিও ডাইভোর্সের মামলা রুজু করেছেন, তথাপি প্রতি সপ্তাহে ছয় বোতল পাঠিয়ে দেন।

বিনোদ। মিঃ মূর! তিনি কে ?

তরুণী। আমার স্বামী।

বিনোদ। তিনি কোথায় ?

তরুণী। টাঙ্গুতে থাকেন। মদের দোকান আছে। তার উপর গোপনে দেশী মদ চোলাই করেন। এ জিনিষ তাঁরই তৈরী।

বিনোদ। বিবাহবিচ্ছেদের মামলা করলেন কেন ?

তরুণী। আমি তাঁর আশ্রয় ত্যাগ করে রেঙ্গুনে একা থাকি বলে।

বিনোদ। আপনি একা থাকেন কেন ?

তরুণী। একত্র থাকা কালে আমার উপর ভারী অত্যাচার করতেন।

বিনোদ। কে অত্যাচার করতেন ?

তরুণী। আমার স্বামী আমার উপর অত্যাচার করতেন, কারণ আমি মদ চোলাই করতে মানা করতুম, কখনও বা বাধা দিতুম। যাক্, এখন একটু চেখে দেখুন।

বলিয়া তরুণী দুইটী ক্ষুদ্র গ্লাসে পানীয় ঢালিল। নিজের গ্লাসটী এক চুমুকে শেষ করিল। বিনোদ ভয়ে ভয়ে অল্প অল্প করিয়া পান করিতে আরম্ভ করিল। অল্প পান করিয়াই বুঝিতে পারিল, এ ভয়ানক কড়া জিনিস, বেশী খাইলেই মাথায় চড়িবে।

এমন সময় সিঁড়ির দরজার কড়া নড়িল। তরুণী ভুলে সিঁড়ির দরজা বন্ধ করে নাই। দরজা খুলিয়া গেল। তখন পূর্ব্বদিনের সেই প্রকাণ্ড গোঁফযুক্ত দীর্ঘকায় Anglo-Indian সাহেব এবং তাহার সহিত সেই পূর্ব্বদিনের চুলিয়া ও মাদ্রাজী রান্নাঘরের ভিতরে প্রবেশ করিল এবং কোন প্রকার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া তরুণীর শুইবার ঘরে প্রবেশ করিল এবং চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—

"দেখো! সব ঠিক হ্যায়। মিষ্টার, যিধার যাতা, আপকা সাথ মোলাকাৎ হোতা। কাল ফজরমে হামলোককো বহুৎ ধোকা দিয়া। হামলোককো দেখকে ১৬ নং মে ঘুষ গিয়া। আজ একদম পাকাড় লিয়া।"

বিনোদের মুখ ক্রোধে আরক্ত হইল। বলিল, কি হয়েছে ?

সাহেব। এখনই শুনবেন। দেখো, গাওয়াই লোক, মরদ আর আউরৎ কো হাল দেখ। মরদকো কলার, টাই, কোট, কুছ বদন পর নেহি হ্যায়। ঔরৎভি খালি নাইট-গাউন পিন্‌হকে খাটকা উপর বৈঠী হ্যায়। সরাব ভি চলতা থা। সব, আচ্ছা করকে দেখ্‌কে রাখো। হাইকোর্টমে গাওয়াই দেনে হোগা!

তরুণী তখন বাঘিনীর মূর্ত্তি ধরিল। বলিল—

"You dirty scoundrel! I asked this gentleman to open the bolt of the door to my sitting room. He tried but failed. He felt tired and I asked him to take a little rest and a little drink. Just then, you trespassed with these dirty natives."

(অসভ্য পাজি, এই ভদ্রলোককে আমার বসবার ঘরের দরজার ছিটকিনী খুলতে অনুরোধ করেছিলুম। তিনি চেষ্টা করেও খুলতে পারলেন না। তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। আমি তাঁকে একটু বিশ্রাম ও তৃষ্ণা নিবারণ করতে অনুরোধ করলুম। এমন সময় তুমি তোমার এই দুইটী দেশী অনুচর সহ আমার শোবার ঘরে অনধিকার প্রবেশ করলে।)

সাহেব। But we found you two in a very compromising situation (কিন্তু আমরা আপনাদের দু'জনকে অত্যন্ত বিশ্রী অবস্থায় দেখতে পেলাম।)

বিনোদ এতক্ষণ হতভম্ব হইয়াছিল। "বিশ্রী অবস্থা" কথা দুটী শুনিয়া তাহার মাথা গরম হইয়া উঠিল! গর্জ্জন করিয়া বলিল, "বিশ্রী অবস্থা! এস, বিশ্রী অবস্থা কাকে বলে দেখিয়ে

দিই" বলিয়া সাহেবের মস্তক লক্ষ্য করিয়া ঘুষি মারিল। পূর্ব্ব দিনের মত তাহার ভারী সোলার টুপী মেজেতে পড়িয়া গেল। তরুণীও তাহার ব্যাড্‌মিণ্টন ব্যাট দিয়া চুলিয়া ও মাদ্রাজীকে আক্রমণ করিল। আজ উহারা সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিল না! ঘরের মধ্যে থাকিয়া মার খাইতে এবং চীৎকার করিতে লাগিল!

চীৎকার শুনিয়া একজন ইউরোপীয়ান সার্জ্জেণ্ট উপরে উঠিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। তরুণী উচ্চৈঃস্বরে তাহার নিকট অনধিকার প্রবেশের অভিযোগ করিল। দীর্ঘকায় সাহেব কর্ত্তব্য কর্ম্মে বাধা দেওয়ার অভিযোগ করিল। সার্জ্জেণ্ট বিনোদের নাম, বিনোদ কি কাজ করে এবং তাহার বাসার ঠিকানা লিখিয়া, দীর্ঘকায় সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে? কোন সরকারী কর্ম্মচারী?"

সাহেব। আমি একজন প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ। এই রমণীর স্বামী মিঃ মুর কর্ত্তৃক নিযুক্ত—প্রমাণ সংগ্রহ করবার জন্য।

সার্জ্জেণ্ট। Private detective! To hell with you. Unless you go out at once, I shall arrest you all for trespass.

তখন বিনা বাক্যব্যয়ে দীর্ঘাকৃতি সাহেব, চুলিয়া ও মাদ্রাজী গৃহ পরিত্যাগ করিল। সার্জ্জেণ্ট্ এক গ্লাস দেশী মাল গলাধঃকরণ করিয়া নীচে নামিয়া গেলেন। তরুণী দুঃখিত ভাবে বিনোদকে বলিল,—"আমাকে সাহায্য করতে এসেই আপনি গোলমালে পড়লেন।"

বিনোদ "কিছু মনে করবেন না" বলিয়া বাসায় চলিয়া গেল। তার পরদিন মঙ্গলবারে রেঙ্গুন টাইম্‌সে মিসেস মুর এবং মিঃ বি, বি, দত্তের নাম-ঠিকানাসহ আজকার ঘটনার সুদীর্ঘ বিবরণ বাহির হইল। ইহা সেই ডিটেক্‌টিভের কার্য্য।

পুলিশ তদন্তে বিনোদের বিরুদ্ধে অভিযোগ টিকিল না। তখন ডিটেকটিভ সাহেব মিসেস মুরের অন্য প্রণয়ী বা প্রণয়িগণের অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইল।

পুলিশ তদন্তের পরই বিনোদ জাহাজে চড়িয়া কলিকাতা রওনা হইল। মায়ার সহিত বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল।

বিনোদ প্রতিজ্ঞা করিল—আর কোন রমণীর সাহায্য করিবে না। কলিকাতায় জাহাজ হইতে নামিবার সময় এক তরুণীর হস্তচ্যুত হ্যাণ্ডব্যাগটী মাড়াইয়া চলিয়া গেল—কুড়াইয়া উহার হাতে তুলিয়া দিল না।*

* ইংরেজীর ছায়া অবলম্বনে।

বাপুজী, পাণিহাটি—

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস, এম্-এ, ব্যারিষ্টার-এট্-ল

সোদপুরে এসে একদিনও তুমি এলে নাকো পাণিহাটি,
আমার প্রভুর পায়ের পরশে সোনা হ'ল যার মাটী।
হোথায় রাঘব-ভবনে নিত্য প্রভুর আবির্ভাব,
এত কাছে এসে সেথা কি যাবে না? এ-বড় মনস্তাপ।

সুদীর্ঘকাল পথ চেয়ে আছে সে কি গো আসিবে ফিরে,
অতীতের স্মৃতি মনে করি' ভাসে পাণিহাটি আঁখি-নীরে।
সে-মোহন তনু, আলুথালু বেশ নয়নে আবেশ আঁকা,
মাধবী-কুঞ্জ প্রহর গুণিছে, কবে সে উদিবে রাকা?

মনের পরশে ভোলে না মাধবী চায় সে পাগল চাঁদে,
নিত্য-নিতুই আসে আর যায়, প্রাণ তাই আরো কাঁদে।
গোটা সে-মানুষ, সুঠাম সুতনু, দেবে না আলিঙ্গন?
ঘন-সুনিবিড় পাতাগুলি কাঁপে রহি' রহি' অনুখন।

অদূরে পতিতপাবনী গঙ্গা বয়ে যায় ধীরে ধীরে,
এই বাঁধাঘাট, এই সেই বট, দাঁড়ায়ে নদীর তীরে।
এই ঘাটে প্রভু নেমেছিল আসি' নিতাই-এ সঙ্গে করি',
চরণ পরশে ধন্য এ-ঘাট—হেথা বেঁধেছিল তরী।

রাজার কুমারে বাঁধিতে নারিল রমণী, রাজ্যসুখ,
দড়ির বাঁধনে বাঁধিতে চাহিল স্নেহাতুর মার বুক।
ইন্দ্রের মত ঐশ্বর্য্য ও অপ্সরা সম জায়া,
এ-সব ফেলিয়া রঘুনাথ শুধু চাহিল চরণছায়া।

বাপুজী, বাপুজী, আমাদের এই একান্ত নিবেদন,
ক্ষণতরে তুমি পাণিহাটি যেয়ো জুড়াইতে তনু মন।
দেখিও কাঙ্গাল দরিদ্র এক ভক্ত নিভৃতকোণে,
প্রভুর পাদুকা বুকে করি' নাম জপিতেছে মনে মনে

কুড়ায়ে রেখেছে পরম যতনে ছিন্ন কন্থাখানি,
সন্ন্যাসীবেশে শ্রীঅঙ্গে যাহা গোরা নিয়েছিল টানি'!
এর পথঘাট, প্রতি ধূলিকণা মুক্তার চেয়ে দামী,
এই ধূলিতেই আমার প্রাণের দেবতা এলেন নামি'।

সোদপুর হ'তে বেশী দূরে নয়—এই পথ গেছে গাঁয়ে,
একদিন তুমি অতি প্রত্যুষে দাঁড়াইয়া বটছায়ে।
বাঙ্গালীর এই পরমতীর্থে ভরাগঙ্গার কূলে,
বাঙ্গালীর প্রাণ-শতদলটিরে যতনে লইয়ো তুলে।

তুমি ভারতের মহান্ আত্মা, শক্তির মূলাধার,
অকপটে তাই করিনু জ্ঞাপন যাহা ছিল বলিবার।
তোমারে স্মরণ করানু বলিয়া আমারে করিও ক্ষমা,
করিও পরশ মাধবীকুঞ্জ, বটেরে পরিক্রমা।

জাতীয় মহাসমিতির ইতিহাস

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

সুরাটে কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া যাইবার পরে সভাপতি ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ, শ্রীযুক্ত মেটা, ওয়াচা, গোখেল, সুরেন্দ্র নাথ, নরেন্দ্র নাথ, মালভী, আম্বালাল, এন, দেশাই, পণ্ডিত মালব্যজী ও কৃষ্ণস্বামী আয়ার প্রভৃতির স্বাক্ষরে ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯০৭, একটী কনভেন্সন্ আহুত হয়, এবং কংগ্রেসের জন্য নিম্নলিখিত বিধি নির্দ্দেশ হয়—

(১) কংগ্রেসের উদ্দেশ্য উপনিবেশগুলির ন্যায় স্বায়ত্তশাসন লাভ—

(২) আর উহা লাভ হইবে—আইন সঙ্গত উপায়ে অর্থাৎ বর্ত্তমান শাসন প্রথায় বাধ্য থাকিয়া ক্রমিক সংস্কারের সহায়তায় (Strictly constitutional methods.)

১৯০৮ হইতে ১৯১৬ পর্য্যন্ত এইভাবে কংগ্রেসের অস্তিত্বটুকু মাত্র বজায় থাকে। তথাপি স্বীকার করিতেই হইবে কংগ্রেসকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য নরম দল জাতির কৃতজ্ঞতাই।

সৈয়দ হাসান ইমাম

১৯০৮-এ কংগ্রেস অধিবেশন হয় মান্দ্রাজে এবং ডাঃ রাসবিহারী ঘোষই সভাপতি হন। সুরাটের অধিবেশন হয় নাই বলিয়া ইহাই কংগ্রেসের ত্রয়োবিংশতি অধিবেশন। আর নরমপন্থীদের অধিবেশন বলিয়া জাতীয় শিক্ষা ও বয়কট সম্বন্ধে কোন প্রস্তাবই হয় নাই। বঙ্গভঙ্গ বন্ধ হইলেই লোকের সন্তোষ ফিরিয়া আসিবে, আর ত্যাগ স্বীকার ও বিলাতী অপেক্ষা স্বদেশী দ্রব্যেই অনুরাগ প্রদর্শন কর্ত্তব্য—খুব নরমভাবে এই দুইটী প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কংগ্রেসের চতুর্ব্বিংশতি অধিবেশন হয় লাহোরে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে। স্যার ফিরোজ শা মেটার সভাপতি হওয়ার কথা ছিল। অধিবেশনের ছয় দিন পূর্ব্বে অক্ষমতা জ্ঞাপন করায় পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যকে সভাপতি পদে বৃত করা হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন লালা হরকিশন লাল। তিনি তাঁহার অভিভাষণে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান, হিন্দু সম্মিলনী ও মুসলীম লীগের প্রতি কটাক্ষ করেন। স্বর্গীয় লালমোহন ঘোষ, রমেশ দত্ত এবং মার্কুইস অব রীপনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়।

এই অধিবেশনের অপর নাম "রিফর্ম্স্ অধিবেশন।" বঙ্গভঙ্গের পরেই লর্ড মর্লি হন ভারত সচিব আর লর্ড মিণ্টো ভাইসরয় হইয়া এদেশে আসেন। উভয়ের চেষ্টায় কতকগুলি সংস্কার প্রবর্ত্তিত হয়। এই সংস্কারই মর্লি মিণ্টো রিফর্ম্স্ নামে অভিহিত (Morley-Minto Reforms of 1909.)

এই রিফর্ম্স্ সম্বন্ধে সম্যক বুঝিতে হইলে একটু পূর্ব্ব ইতিহাস প্রয়োজন। তাই পাঠককে একটু পুরাতন কাহিনীর পটভূমিকায় লইয়া যাইতে ইচ্ছা করি।

পলাসীর যুদ্ধ ও নবাব সিরাজের তিরোধানের পরে নবাবী কথার অর্থই ছিল ইংরাজের তাঁবেদারী। নবাব কাশিমালি, গোলাম বা তাঁবেদার না হইয়া খাঁটি নবাব হইতে চাহিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে গদিচ্যুত হইতে হয়। তৎপরবর্ত্তী নবাবগণের* উত্থান পতনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজদের বহু অর্থ লাভ হইত, তবে শাসন এবং রাজস্ব নবাবের কর্ত্তৃত্বে ছিল। কিছুদিন মধ্যেই সর্ব্ব প্রথমে ১৭৬৫ খৃঃ ক্লাইভ দুইটী জিলা উপঢৌকন ও বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা দিবার প্রতিশ্রুতিতে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ করেন। এইখানে একটু গোল হইল। কারণ আইন ও শৃঙ্খলা ব্যাপারে কর্ত্তা রহিলেন অকর্ম্মণ্য নবাব। তাহার অধীনে বঙ্গ ও বিহারে দুইজন সুবেদার ছিলেন। কিন্তু রাজস্ব আদায় করিতে লাগিল ইংরাজ। নবাব নিজেও কোন কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না, তাহার ক্ষমতাও ছিল না। এমন কি সুবেদার নিয়োগ পর্য্যন্ত ইংরাজের সম্মতি ভিন্ন হইতে পারিত না। ফলে এই দ্বৈত শাসন ঘোর অমঙ্গল, মন্বন্তর ও ভয়ানক অরাজকতার সৃষ্টির কারণ হইয়া উঠিল। এই অবস্থাই সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দ মঠে" প্রতিফলিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—

---

* নবাবগণের তালিকা

১৭৫৭—সিরাজ—পরে মিরজাফর

১৭৬০-১৭৬৩—মিরকাশিম

১৭৬৩-১৭৬৫—মিরজাফর

১৭৬৫—নাজিমদ্দৌলা—ইংরাজের দেওয়ানী লাভ

১৭৬৬-১৭৭০—সেফাউদ্দৌলা ও মুবারকউদ্দৌলা পেনসন প্রাপ্ত হইয়া শাসনভার ও ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীকে অর্পণ করে।

শেষোক্ত তিনজন নবাব মিরজাফরের পুত্র।

"১১৭৬ সালে (১৭৬৯ খৃঃ) বাঙ্গলা প্রদেশ ইংরেজের শাসনাধীন হয় নাই। ইংরেজ তখন বাঙ্গালার দেওয়ান। তাঁহারা খাজানার টাকা আদায় করিয়া লন, কিন্তু তখনও বাঙ্গালীর প্রাণ সম্পত্তি প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের কোন ভার লয়েন নাই। তখন টাকা লইবার ভার ইংরাজের। আর প্রাণ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাপিষ্ট নবাবের উপর। নবাব আত্মরক্ষায় অক্ষম, বাঙ্গালা রক্ষা করিবে কি প্রকারে ?"

"অতএব বাঙ্গালার কর ইংরেজের প্রাপ্য। কিন্তু শাসনের ভার নবাবের উপর। যেখানে যেখানে ইংরেজেরা আপনাদের প্রাপ্য কর আপনারা আদায় করিতেন, সেখানে তাঁহারা এক এক কালেক্টর নিযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু খাজানা আদায় হইয়া কলিকাতা যায়। লোক না খাইয়া মরুক, খাজানা আদায় বন্ধ হয় না।"

দুর্ভিক্ষ, অরাজকতা ও প্রজাপীড়নের কাহিনী ইংলণ্ডের দায়িত্ব-সম্পন্নব্যক্তিগণের কর্ণগোচর হইল। পার্লেমেণ্ট ভারত-শাসন সুনিয়ন্ত্রিত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। লর্ড নর্থ তখন প্রধান মন্ত্রী (Prime Minister)। তিনি ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে রেগুলেটিং য়্যাক্ট প্রবর্তিত করিলেন। ইহার পরই ইংরাজ শাসনতন্ত্রের সূত্রপাত হইল। ইহার ধারাগুলি এই—

প্রথম—বাঙ্গালা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ—এই তিনটি প্রদেশ তিনটী প্রেসিডেন্সিতে পরিণত হইল। এক একটিতে-এক একজন গভর্ণর থাকিবেন এবং তাহার একটী কাউন্সিল থাকিবে; ইহাদের কার্য্যের জন্ত ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জবাবদিহী হইবেন।

বাঙ্গলায় কোম্পানীর রাজত্বকালে গভর্ণর ছিলেন ড্রেক, ক্লাইভ ভান্সিটার্ট, ক্লাইভ (পুনর্ব্বার), বেরেলষ্ট, কার্টিয়ার, হেষ্টিংস (১৭৭২-৩)। এখন হইতে গভর্ণর নাম আর থাকিবেনা, নাম হইল গভর্ণর জেনারেল। তাঁহার কার্য্যকাল ৫ বৎসর। ওয়ারেন হেষ্টিংসই ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রথম গভর্ণর জেনারেল হইলেন।

দ্বিতীয়—একটি কাউন্সিল (শাসন পরিষদ)ও গঠিত হইল, তাহাতে হেষ্টিংস ছাড়া আরও চারিজন সভ্য বিলাত হইতে আসিলেন। ইহাদের নাম ফিলিপ, ফ্রান্সিস, ক্লেভারিং, মনসন ও বারওয়েল। সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলের উপরই বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার যাবতীয় সামরিক, দেওয়ানী এবং রাজস্ব ব্যাপারের কর্ত্তৃত্বভার পড়িল। আর তিনি বোম্বাই এবং মাদ্রাজের উপরও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ক্ষমতা লাভ করিলেন।

তৃতীয়—বিচার-সংস্কারকল্পে কলিকাতায় একটী সুপ্রিমকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহাতে একজন প্রধান বিচারপতি ও তাহার অধীনে ৩ জন সাধারণ বিচারপতি নিযুক্ত হয়। ইহাতে সমস্ত দেওয়ানী ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার হইত। কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে আনীত মামলার বিচার করিবারও উক্ত কোর্টের অধিকার রহিল। স্যার ইলাইজা ইম্পে হইলেন প্রধান বিচারপতি।

চতুর্থ—পার্লেমেণ্টের অবগতির জন্ত সমস্ত কাগজ পত্র ইংলণ্ডে পাঠাইবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইল।

রেগুলেটিং য়্যাক্টের উদ্দেশ্য ছিল কোম্পানীর স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করা এবং ভারত-শাসন সুনিয়ন্ত্রিত করা। কিন্তু প্রথম চেষ্টা বিধায় ইহাতে দুই একটী ত্রুটীও রহিয়া গেল। গভর্ণর জেনারেলকেও ভোটাধিক্যে বাধ্য থাকিতে হইত। নিজে ইচ্ছা করিলেই তিনি কর্ত্তৃত্ব খাটাইতে পারিতেন না। সুপ্রিম কোর্টের সহিত স-পরিষদ গভর্ণর জেনারেলের সম্বন্ধ সুস্পষ্ট ভাবে নির্দ্ধারিত না হওয়ায় বিরোধের আশঙ্কা রহিল।

রেগুলেটিং অ্যাক্ট-এর উপরোক্ত ত্রুটি সংশোধন কল্পে প্রধানমন্ত্রী পিটের ভারতশাসন আইন (Pitt's India Act 1784) প্রণীত হয়।

কাউন্সিলের চারিজন সদস্যস্থানে হইলেন ৩ জন। তাঁহাদের একজন থাকিবেন জঙ্গীলাট (কোম্পানীর সৈন্যাধ্যক্ষ); গভর্ণর জেনারেলকে এখন হইতে আর কাউন্সিলের সিদ্ধান্তে বাধ্য

মিঃ ওয়েডার বার্ণ

থাকিতে হইত না। আবশ্যকমত তিনি উহার সিদ্ধান্ত নাকচ করিয়া নিজের অভিমত মত কার্য্য করিতে পারিতেন।

একটী "বোর্ড অব্ কন্ট্রোল" (পর্য্যবেক্ষণ সমিতি) গঠিত হইল। ইহার ছয়জন মেম্বর ইংলণ্ডেশ্বর কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন।

সুতরাং ইহাতে কোম্পানীর হাতে প্রকৃতভাবে আর শাসন-কর্ত্তৃত্ব রহিল না। কার্য্যতঃ পার্লেমেণ্টের হাতেই শাসন হস্তান্তরিত হইল! গভর্ণর জেনারেলের আর একটী ক্ষমতা বাড়িল। অর্থনৈতিক, পররাষ্ট্র এবং যুদ্ধাদি ব্যাপারে বোম্বাই এবং মাদ্রাজের উপরও তিনি কর্ত্তৃত্ব পাইলেন।

অতঃপরে পরবর্ত্তী সংস্কার সম্বন্ধে বুঝিতে হইলে সনন্দপত্র-গুলির উপর একটু লক্ষ্য করিতে হইবে। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী

যখন প্রথমে বাণিজ্য করিতে আসে, কুড়ি বৎসরের জন্য সনন্দ লইয়া আসে। পরে প্রত্যেক কুড়ি বৎসরে উহা পরিবর্ত্তন করিতে হইবে স্থির হয়। ১৭৯৩, ১৮১৩, ১৮৩৩ ও ১৮৫৩তে সনন্দ পরিবর্ত্তিত হয়, তন্মধ্যে ১৮৩৩ সালের সনন্দটী বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহাতে দেওয়া আছে—

(১) বাঙ্গালার গভর্ণর জেনারেল ভারতের গভর্ণর জেনারেল হইলেন। তাঁহার ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি হইল। (২) তিনি বাংলাদেশের শাসনভারও গ্রহণ করিবেন।

(৩) প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রহিল না। ভারতীয় পরিষদে একজন আইন সচিব নিযুক্ত হইলেন। লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক প্রথম ভারতীয় গভর্ণর জেনারেল এবং লর্ড মেকলে প্রথম আইন-সচিব।

(৪) কোম্পানীর অধীনে কাজে নিযুক্ত হইতে জাতি, ধর্ম্ম বা বর্ণ অন্তরায় হইবে না।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের সনন্দ :—

আইন প্রণয়ণ সভা গঠন (Legislative Council of India)। ইহাতে ১২ জন সভ্য নির্ব্বাচিত হয়।

(১) গভর্ণর জেনারেল

(২) ঐ কাউন্সিলের কার্য্যকরী পরিষদের ৪ জন সদস্য

(৩) প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ

(৪) সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি

(৫) তাঁহার একজন সাধারণ বিচারপতি

(৬) বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট মনোনীত ৪ জন সরকারী কর্ম্মচারী।

প্রতিনিধি এই বারজনই সরকারী কর্ম্মচারী। অতঃপরে বাংলার শাসনভার একজন লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণরের উপর স্থাপিত হইল এবং ভারতীয়গণকে সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিবার অধিকার প্রদান করা হয়।

ইহার পরের ঘটনা সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭) রোমাঞ্চকর কাহিনী। পার্লেমেণ্ট এখন হইতে আর কোম্পানীর উপর কোন ভার না রাখিয়া নিজহস্তে ভারতের প্রকাশ্যে যাবতীয় শাসনভার গ্রহণ করিলেন। প্রথমে সেই ভারত শাসন সম্পর্কে একটী আইন প্রণয়ণ করিলেন (An Act for the better Government of India) আর স্বয়ং মহারাণী ভিক্টোরিয়া ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর তারিখে ভারতশাসনভার নিজহস্তে লইবার সময় উক্ত আইন অনুযায়ী শাসন-পদ্ধতি ঘোষণা করেন। মহারাণীর এই ঘোষণাপত্রই কুইনস্ প্রক্লেমেশন বা ম্যাগনাচার্টা অব ইণ্ডিয়া নামে খ্যাত। আর তাহার প্রধান বিষয়ই এই—

(১) কোম্পানীর আমলে দেশীয় রাজাদের সহিত যে সমস্ত সন্ধি হয়, সেই সবই মানিয়া লওয়া হইবে। আর রাজ্যগ্রাসের নীতি (Annexation policy) পরিত্যক্ত হইবে।

(২) কোম্পানীর তদানীন্তন কর্ম্মচারিগণ সবই গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী বলিয়া স্বীকৃত হইলেন, যোগ্যতা থাকিলে জাতিধর্ম্মভেদে ভারতবাসীর কোনরূপ উচ্চ রাজকার্য্য প্রাপ্তিতেও বাধা হইবে না।

শাসন ব্যাপারে ভারতীয় প্রজা বা অন্যান্য প্রজার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিবে না। ব্রিটিস প্রজার হত্যাকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্যান্য বিদ্রোহীদিগকে শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হইল।

পার্লামেণ্ট শাসনভার গ্রহণ করার পর গভর্ণর জেনারেল, ভাইসরয় বা রাজপ্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত হন। লর্ড ক্যানিংই প্রথম ভাইসরয়।

এই ম্যাগনাচার্টা সম্বন্ধে লর্ড কার্জ্জনই প্রথমে বলেন, "আপনারা ইহার উপর অতো জোর দিবেন না। আমরা যতদূর পারিব, ততদূর ইহা করিব 'So far as it may be.' এই সম্বন্ধে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সমালোচনা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি (বঙ্গশ্রী, অগ্রহায়ণ পৃঃ ৬১৩)।

সিপাহী বিদ্রোহের এবং নীলকর আন্দোলনের পরে দেশ শান্ত হইলে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের জন্য আরও শাসনমূলক সংস্কার সাধিত হয়। এই সব সংস্কারই ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অ্যাক্টে (Indian Council Act) এ বিধিবদ্ধ হয়।

১৮৫৩ সালের সনন্দ অনুসারে কেন্দ্রীয় পরিষদের ১২ জন সভ্যই ছিল সরকারী। বর্ত্তমান অ্যাক্ট অনুসারে হইবে—

(১) প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট যে ৪ জন মনোনীত সভ্য পাঠাইতেন, তাহা এখন পারিবেন না, সুপ্রিম কোর্টের ২ জন বিচারপতিও সভ্য থাকিবেন না।

(২) গভর্ণর জেনারেলের কার্য্যকরী সভার সদস্যগণ ব্যবস্থাপক সভার সভ্য থাকিবেন। ইহা ছাড়া আরও ৬ হইতে ১২ জন অতিরিক্ত মনোনীত সভ্য থাকিবেন। ইহার অন্ততঃ অর্দ্ধেক বেসরকারী হইবেন এবং কার্য্যকাল ২ বৎসর হইতে ৫ বৎসর; বেসরকারীদেরও অধিকাংশ হইবেন ভারতবাসী। অতিরিক্ত সভ্যগণ কেবল আইন প্রণয়ণে সাহায্য করিবেন, শাসন ব্যাপারে যোগদান করিতে পারিবেন না।

বিশেষ অবস্থার উদ্ভব হইলে গভর্ণর জেনারেল ব্যবস্থাপক সভার সহিত পরামর্শ না করিয়াও জরুরী আইন (Ordinance) প্রণয়ণ করিতে পারিবেন, উহা ৬ মাস মাত্র বলবৎ থাকিবে।

পার্লামেণ্টের ব্যবস্থাপক সভার আইন বাতিল করা বা নূতন আইন প্রবর্ত্তন করার ক্ষমতা থাকিবে।

প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা রহিল। তবে আইন প্রণয়নের পূর্ব্বে গভর্ণর জেনারেলের অনুমতি লইতে হইবে। এবং কতকগুলিতে অনুমোদনও আবশ্যক হইত। সর্ব্ব-ভারতীয় বিষয়ে উহা আইন করিতে পারিবে না।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের শাসন সংস্কারেও ভারতের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইল না। বেসরকারী সদস্য কয়েকজন থাকিলেও, সরকারী সদস্যের সংখ্যাই অধিক রহিয়া গেল।

বেসরকারী সদস্যগণ সরকার কর্তৃক মনোনীত হওয়ায় জনসাধারণের স্বার্থ সম্বন্ধে কোনরূপ সংরক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা রহিল না।

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা গভর্ণর জেনারেলকে আইন প্রণয়ণ সম্বন্ধে উপদেশ দিতে মাত্র পারিতেন। কার্য্যতঃ আইন প্রণয়নের ক্ষমতা বিশেষ কিছু ছিল না।

ইহার পরে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের কাউন্সিল অ্যাক্টই উল্লেখযোগ্য আইন সংস্কার। ইহার মধ্যে একটী পরিস্থিতি হইল, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে সংস্কারের জন্য জনমত প্রবল হয়। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে পার্লামেন্টের অন্যতম সভ্য মিঃ ব্রাডল যে ভারতে আসিয়া জনমন আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই অ্যাক্ট হওয়ার মুখে চিত্তরঞ্জন দাশ, ওল্ডহাম ও Exeter-এ Legislative Council সম্বন্ধে বিলাতে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাও পূর্ব্বেই বলিয়াছি—এইখানে উহার আবার পুনরাবৃত্তি করিলাম—

'Our legislative councils are only guilded shams, splendid lies magnificent do-nothings. We have men in those Councils who have no business to be there and others are studiously excluded without whom no legislature in any country can be perfect···we want Indians of the right sort but His Excellency the Viceroy takes precious good care to nominate only men whom you gentlemen in this country call aristocratic models.

লর্ড ক্লাইভ্

১৮৯২ সনের কাউন্সিল অ্যাক্টে নিম্নলিখিত সংস্কার সাধিত হয়—

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া ১২ জন স্থানে ১৬ জন হইল। সদস্যগণ ইচ্ছা করিলে সরকারী কার্য্যের সমালোচনা করিতে পারিতেন এবং শাসনকার্য্য সম্বন্ধে প্রশ্নাদি করা অথবা কোন বিষয়ে প্রতিবাদ করা বা অনুসন্ধান করার ক্ষমতা লাভ করেন।

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্যসংখ্যা বাড়ান হইল। বড় বড় সহর, বিশ্ববিদ্যালয় ও বণিকসভা প্রভৃতি কর্তৃক সভ্যগণ নির্ব্বাচিত হইতে পারিতেন, কিন্তু সেই নির্ব্বাচন গভর্ণমেন্টের অনুমোদন সাপেক্ষ ছিল। এইসব অনুমোদিত ব্যক্তিদের মধ্যে কাহাকেও প্রাদেশিক কাউন্সিল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় পাঠাইতে পারিত। আর মনোনীত বেসরকারী সভ্যগণ কর্তৃক প্রতি প্রদেশের একজন ভারতীয় সংসদে যাইত। মোটের উপর কেন্দ্রীয় পরিষদে যাইবার জন্য নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। আর প্রাদেশিক সভার নির্ব্বাচন থাকিলেও বাজেট আলোচনা আলোচনায়ই পর্য্যবসিত হইত, আর নির্দ্ধারিত টাকা মঞ্জুরের পক্ষে কোনও প্রকার হ্রাস বৃদ্ধি হইত না। সরকার যাহা নির্দ্ধারণ করিতেন তাহাই হইত।

লর্ড মিণ্টো

অতঃপরে যে শাসন সংস্কার হয় তাহাই এখন আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। ইহাই মর্লিমিণ্টো সংস্কার। ইহার ধারাগুলি এই :—

কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের কার্য্যকরী পরিষদে একজন ভারতবাসী নিযুক্ত হইল। লর্ড সিংহ প্রথম ভারতীয় সভ্য নিযুক্ত হইলেন।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য-সংখ্যা পূর্ব্বে ছিল ১৬ জন, এখন ৬০ জন। কিন্তু সরকারী কর্মচারীর সংখ্যাই হয় বেশী। মনোনীত ও নির্ব্বাচিত হইবেন ৫২ জন আর ৮ জন নিযুক্ত হইবেন পদাধিকার বলে (ex-officio)—৬ জন কার্য্যকরী পরিষদের সভ্য, একজন সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি, একজন প্রদেশ বিশেষের শাসনকর্ত্তা। কার্য্যকরী পরিষদের সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। পূর্ব্বে কেবল বোম্বাই ও মাদ্রাজের কার্য্যকরী পরিষদ ছিল, এখন বাংলা এবং অন্যান্য প্রদেশেও একটী করিয়া হইল। সভ্য নির্দ্ধারিত হয় ৪ জন, তন্মধ্যে একজন হইবেন ভারতবাসী।

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বাংলা বোম্বাই, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশের ৫০, আর পাঞ্জাব ও ব্রহ্মদেশের ৩০ জন। তাহার মধ্যে কতক হইল মনোনীত বে-সরকারী আর কতক হইল নির্ব্বাচিত।

সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইল। অ-মুসলমান প্রতিনিধিরা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক নির্ব্বাচিত হয়, আর মুসলমান প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবার নিয়ম হয় কয়েকটি মুসলমান প্রতিষ্ঠানের কর্তৃক। নির্ব্বাচন তিন বছরের জন্য বহাল থাকিবে। এবং সদস্যগণের অতিরিক্ত ক্ষমতা লাভ হইল—

(১) গভর্ণমেন্টকে শাসন কার্য্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে পারিবে।

(২) বাজেট সম্বন্ধে প্রশ্ন করা ও মন্তব্য পাশ করিবার অধিকার থাকিবে।

(৩) প্রস্তাব বিশেষে ভোট হইতে পারিবে, তবে গবর্ণমেন্ট কোন সিদ্ধান্তে বাধ্য হইবে না।

সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন পদ্ধতির প্রবর্ত্তনের বিষময় ফলে নব-সংস্কার হিত না করিয়া বরং অহিতই করিল বেশী। এই সংস্কারে কেবল আলোচনা ও মতামত প্রকাশেই সুবিধা হইল, কিন্তু কোন

সুফল হইল না। গভর্ণর জেনারেল এবং প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তাদের উপরেই সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব রহিল। কেবল আলোচনার ক্ষমতা ছাড়া জনসাধারণের হাতে প্রকৃত কোন ক্ষমতা প্রদান মর্লির উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন :—

If it could be said that this chapter of reforms led directly or indirectly to the establishment of a parliamentary system in India, I, for one would have nothing at all to do with it.

এই রিফরম্‌স সম্বন্ধে কংগ্রেসের চতুর্বিংশতি অধিবেশনের সভাপতি পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য বলেন—

"এই অধিবেশনের পাঁচ সপ্তাহ পূর্ব্বে শাসন সংস্কার প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে আমাদের আনন্দ করিবার কিছুই নাই।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য

ভাইসরয়ের কাউন্সিলে এবং মাদ্রাজ এবং বোম্বাই গভর্ণরের পরিষদে ভারতীয়গণের নির্ব্বাচনের কথা থাকিলেও নির্ব্বাচনক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। মুসলমানদিগকে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনে (Separate Electorates) সুবিধা দিয়াও আবার সাধারণ নির্ব্বাচন ক্ষেত্রেও দাঁড়াইবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। পাঞ্জাব ও "পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ" এই দুইপ্রদেশে হিন্দুর সংখ্যা কম থাকিলেও তাহাকে সেরূপ সুবিধা দেওয়া হয় নাই। তিন হাজার টাকা বার্ষিক আয়ের উপর যে মুসলমান আয়কর (Income-tax) দেয়, তারই ভোট দেওয়ার ক্ষমতা আছে, কিন্তু অ-মুসলমান ত্রিশলক্ষ টাকার উপর ট্যাক্স দিলেও তাহার সে অধিকার নাই। পাঁচবৎসর পূর্ব্বে যে মুসলমান ছাত্র গ্রেজুয়েট হইয়াছে, তাহার ভোট আছে, ত্রিশবৎসরেরও অমুসলমানের তাহা নাই। মনোনয়নের (Nomination)-এর উপরই বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে। কেবল মিউনিসিপ্যালিটী ও ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের মেম্বরদিগকে নির্ব্বাচিত হইবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে।"

পাটনার সৈয়দ হাসান ইমাম সাহেব স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন প্রথার বিরুদ্ধে বিশেষ আন্দোলন করেন।

পাঞ্জাবের সুন্দর সিং ভাটিয়া বলেন —

"For the first time a barrier was raised between Mohomedans and Non-Mohomedans. Under Mohomedan rule the highest offices were open to Hindus. Now they were sent to a back seat."

বঙ্গভঙ্গ, কর্জ্জন-নীতি, ফুলারের প্রকাশ্যোক্তির পরে এইরূপ পরিণতি অপ্রত্যাশিত ছিল না। ১৯০৪ হইতেই হিন্দু-মুসলমান প্রীতিতে বিধাতাই বাদ সাধেন। কবে আবার ভারতবাসী সেই পার্থক্য ভুলিয়া ভাই ভাই এক হইবে—তিনিই জানেন।

পঞ্চবিংশতি অধিবেশন হয় এলাহাবাদে ১৯১০-এর ২৬শে হইতে ২৯শে ডিসেম্বর। সভাপতি হন স্যার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ।

সম্রাট ৭ম এডওয়ার্ডের মৃত্যুতে গভীর বেদনা প্রকাশ এবং পঞ্চম জর্জ্জের সিংহাসনারোহণে তাহাকে বিনীত অভিবাদন জ্ঞাপন করা হয়। ভারতের পরবর্ত্তী ভাইসরয় লর্ড হার্ডিংকেও সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়।

পঞ্চদশ প্রস্তাবটিতে আবার ১৯০৯ ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল য়্যাক্ট সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া ইহার সংশোধনকল্পে গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হয়, নতুবা অসামঞ্জস্য থাকার দরুণ সাম্প্রদায়িকতা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইবে। ডাক্তার সতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—

"এই ধারাগুলিতে সংস্কারের উপকারিতা ব্যর্থ হইয়াছে। তেজ বাহাদুর বলেন: 'সকল সম্প্রদায়কে সমভাবে দেখা কর্ত্তব্য। নবাব সাদিক আলি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তীব্রমত প্রকাশ করিয়া সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়কে ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মানের জন্য অনুরোধ করেন—

Made a strong appeal to his fellow Muslims to be united and patriotic. He said; "for the sake of certain paltry gains in the Services or in the Councils donot sacrifice the larger hopes of an ampler day,"

সেইখ্ ফইজ এবং ইউসুফ হোসেন তাঁহাকে সমর্থন করেন। মিঃ হোসেন স্পষ্টভাবে বলেন, "It was not honest of the Muslim League to demand an unfair amount of representation."

"মুসলিম লীগ যে এরূপ অসমান নির্ব্বাচন সুবিধার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা তাহাদের পক্ষে খুবই অন্যায় হইয়াছে।"

অবশ্য প্রেসিডেণ্ট তাঁহাকে এইরূপ উক্তিতে বাধা দেন এবং সুরেন্দ্রনাথ এই কথা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত এবং কংগ্রেসের সহিত ইহার বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ নাই বলিয়া ওজস্বিনী ভাষায় এইভাবে বুঝাইয়া দেন।

শ্রীবোধায়ন-কবি-কৃত ভগবদজ্জুকীয়

(প্রহসন : পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

শাণ্ডিল্য। নোংরা, (অতি) নোংরা!

পরিব্রাজক। বন পবিত্র—ভূমি অদূষ্য।

শা। যখন পরিশ্রান্ত হ'য়ে বস্‌তে চান তখন অপবিত্রকেও পবিত্র (মনে) করেন!

প। (আরে!) এবিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ—আমি নই? কেন?—

অভিমানে যারা উন্মত্ত, অস্থিতকে স্থিত ব'লে যাদের নিশ্চয়, নিজের মনের মত প্রমাণ যারা গড়ে—তাদের পরম (তত্ত্ব লাভ হয় না।

শা। অনেক কথা বললেন আপনি, আপনার এ (কথা) অপ্রমাণ (অর্থাৎ আপনি নানা ভাবে নানা কথা বলেন ব'লে শ্রুতির অর্থ আমার হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে না।)

প। না-না—তা নয়!—

জগতে পণ্ডিতেরা যাকে প্রমাণ বলেন, তাকেই প্রমাণ কর। প্রমাণজ্ঞ (শাস্ত্র-প্রবর্ত্তক) পুরুষেরা অপ্রমাণকে প্রমাণ করেন—এ নিশ্চয়।

শা। আপনার প্রমাণ আমি জানি না।

প। এস বৎস! অধ্যয়ন কর ত এখন।

শা। এখন পড়্‌ব না।

প। কেন—কি হেতু?

শা। পাঠের অর্থ (আগে) শুনতে চাই।

প। যাঁরা শাস্ত্র পাঠ করেন, তাঁদেরও কালান্তরে পাঠের অর্থ বোধ হয় (অর্থাৎ পাঠ করবার আগে অর্থ বোঝা দূরের কথা, পাঠ করবার সময়ও পাঠকেরা অর্থ বোঝেন না—আগে তাঁরা পাঠ আরম্ভ করেন, পরে পঠিত অংশের অর্থ বোঝার চেষ্টা করেন ও ক্রমে ক্রমে তা বোঝেন)। তাই (বলি) এখন পড় ত!

শা। পড়লে হবে কি?

প। শোন—জ্ঞান হতে জন্মে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হতে সংযম, সংযম হতে তপঃ, তপঃ হতে যোগপ্রবৃত্তি, যোগপ্রবৃত্তি হতে অতীত, অনাগত, বর্ত্তমান তত্ত্বদর্শন হ'য়ে থাকে। এদের থেকে অষ্টগুণ ঐশ্বর্য্য লাভ হয় (জ্ঞান—বেদের বিষয়ে সাধারণ পরোক্ষ জ্ঞান; বিজ্ঞান—অসন্দিগ্ধ অবিপর্য্যস্ত যথার্থ অনুভব, সংযম—অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ; তপঃ—স্বধর্ম্মে স্থিতি পরধর্ম্মবর্জ্জন; যোগপ্রবৃত্তি—আত্মনিশ্চয়, মননশীলতা; অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য—অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিতা ও কামাবসায়িতা।)

শা। ভো ভগবন্! অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে আমার বুদ্ধি গুলিয়ে দিয়ে ত যা খুসী বলছেন, কিন্তু ভগবান্ (আপনাকে কেউ) দেখতে পাবে না—এমন ভাবে পরের ঘরে ঢুকতে পারেন কি?

প। তোমার অভিপ্রায়টা কি?

শা। আমার মতলব হচ্ছে—শাক্যশ্রমণদের জন্তে সঙ্ঘের দেওয়া সুন্দর তৈরী খাবারগুলি খাওয়া।

প। অকালে লোভ!

শা। এই কারণেই ত ম'শায়ও মাথা মুড়িয়েছেন! আর ত অন্য কোন দরকার দেখি না।

প। না—না—তা নয়—

মহাত্মা দ্বিজগণ কর্ত্তৃক সেবিত ও পূজিত, সুরাসুরগণেরও বুদ্ধিসম্মত, আবরণীয়, অক্ষোভ্য, অব্যয় ও মহৎ যোগফলের সেবা আমি ক'রে থাকি।

শা। ভো ভগবন্! সন্ন্যাসীরা ত 'যোগ যোগ' (এই কথা) বহু বলে থাকেন। এই যোগ (জিনিষটা) কি?

প। শোন—

যা জ্ঞানের মূল, তপস্যার সার, সত্ত্বে স্থিত, দ্বন্দ্বের নাশক, রাগ ও দ্বেষ হতে মুক্ত, তাকেই বলা হয় 'যোগ'।

শা! যিনি বলেন—'আহারনাশই সর্ব্বনাশ' সেই ভগবান্ বুদ্ধকে নমস্কার!

প। শাণ্ডিল্য! এ কি (ব্যাপার)!

শা। ভগবন্! জানেন না কি! প্রথমেই প্রাতরাশের লোভে আমি শাক্যশ্রমণ হ'য়ে প্রব্রজ্যা নিয়েছিলুম!

প। (তাদের তত্ত্বকথা) কিঞ্চিৎও কি জানা আছে?

শা। আছে—আছে। বিস্তরই আছে।

প। আচ্ছা, শোনাই যাক।

শা। শুনুন, প্রভু! আটটি প্রকৃতি, ষোলটি বিকার, আত্মা, পঞ্চ বায়ু, তিন গুণ, মন, সঞ্চর ও প্রতিসঞ্চর—ভগবান্ জিনদেব পিঠক পুস্তকে এই ভাবে বলেছেন—

আট প্রকৃতি—মূল প্রকৃতি এক, সাতটি প্রকৃতি বিকৃতি—মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ তন্মাত্র) ষোল বিকার—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূত আর একাদশ ইন্দ্রিয় (কর্ণ, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা, নাসিকা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু উপস্থ—পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়—অন্তরিন্দ্রিয় এক —মোট এগারটি); পঞ্চবায়ু—প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান; তিন গুণ—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ; সঞ্চর—সৃষ্টি; প্রতিসঞ্চর প্রলয় এই ছত্রিশটি তত্ত্ব—সাংখ্যের সিদ্ধান্ত—এর বিস্তৃত বিবরণ এ প্রসঙ্গে আলোচনার যোগ্য নয়।

পরিব্রাজক। শাণ্ডিল্য! (এ যে) সাংখ্যমত, শাক্যমত ত (এ) নয়!

শা। ক্ষুধায়—অন্নের চিন্তায় এক ভেবেছি আর বলেছি। এবার শুনুন, প্রভু!—

প্রাণাতিপাত হ'তে বিরাম শিক্ষাপদ।

অদত্তাদান হ'তে বিরাম শিক্ষাপদ।

অব্রহ্মচর্য্য হ'তে বিরাম শিক্ষাপদ।

মৃষাবাদ হ'তে বিরাম শিক্ষাপদ।
অকাল ভোজন হ'তে বিরাম শিক্ষাপদ।
আমাদের বুদ্ধধর্ম্ম ও সঙ্ঘের শরণ নিলুম।

[প্রাণাতিপাত—প্রাণিহিংসা; অদত্তাদান—পরস্বাপহরণ; অব্রহ্মচর্য্য—ইন্দ্রিয়চাপল্য; মৃষাবাদ—মিথ্যাবচন; অকালভোজন (বা বিকাল ভোজন) হ'তে বিরাম—প্রতিদিন একবার ভোজন।*]

প। শাণ্ডিল্য! নিজমত পরিত্যাগ ক'রে পরমত বলা তোমার উচিত নয়।

তমোগুণ ত্যাগ ক'রে রজোগুণ জয় ক'রে, সত্ত্বে অবস্থান ক'রে, সুসমাহিত হ'য়ে তুমি শীঘ্র ধ্যেয়ের ধ্যান কর—এই হ'ল জ্ঞানের প্রয়োজন (অর্থাৎ বেদ-পাঠজনিত জ্ঞানের ফল হচ্ছে ধ্যান।)

শা। ভগবন্, আপনি সুসমাহিত হ'য়ে যোগচিন্তা করুন—পরে আমি একাগ্র হ'য়ে অন্নের চিন্তা করি।

প। ছাড় এ সব কথা।—

সকল জগৎ দেহবন্ধে সংক্ষিপ্ত কর; ইন্দ্রিয়গুলিকে যথাবিধি মনেতে সংযুক্ত কর; জ্ঞানের দ্বারা সত্ত্বকে তুমি আশ্রয় কর; সকল আত্মাকে দেহাত্মক-রূপে দর্শন কর।

[এই শ্লোকটির অর্থ অতি দুরূহ। সকল জগৎ নিজদেহে অবস্থিত—এই ভাবনা করিতে হইবে। নিখিল প্রপঞ্চ যদি নিজদেহ-মধ্যে অবস্থিত—ইহা ভাবা যায়, তাহা হইলে নিজদেহ বিরাড়াত্মক—ইহাই ভাবিতে হইবে। টীকাকার একটি বচন তুলিয়াছেন—নাভির অধোভাগ পাতাল; কণ্ঠ পর্য্যন্ত দ্যুলোক; আর কণ্ঠের ঊর্দ্ধভাগে সত্যলোক পর্য্যন্ত সকল লোকই বিদ্যমান। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত মনের সংযোগ করার অর্থ—বহির্ম্মুখ বাহেন্দ্রিয়গুলিকে অন্তর্ম্মুখ করিতে হইবে। ইহাই 'প্রত্যাহার' নামক অষ্টবিধ যোগাঙ্গের অন্যতম অঙ্গ। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে—কি উপায়ে বিষয় হইতে বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রত্যাহৃত করা যায়? তাহারই উত্তর জ্ঞানদ্বারা সত্ত্বাশ্রয় করাই বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়বর্গের প্রত্যাহারের উপায়। জ্ঞান এ ক্ষেত্রে—শাস্ত্রার্থ-চিন্তাজনিত জ্ঞান। সত্ত্ব সত্ত্বগুণ—যাহার লক্ষণ জ্ঞান, প্রকাশ, লঘুতা ইত্যাদি। শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা সত্ত্বগুণ আশ্রয় করার তাৎপর্য্য—নিখিল বিষয়ে রাগ, দ্বেষ ত্যাগ করিয়া ঔদাসীন্য অবলম্বন করা। আর সকল আত্মাকে নিজদেহস্বরূপে ভাবনা করিতে হইবে। সকল আত্মা—স্থূল-সূক্ষ্ম দেহধারী সকল জীব—ব্রহ্ম হইতে স্তম্ব (তৃণ) পর্য্যন্ত নিখিল চরাচর। এ সকলকে নিজদেহাত্মক ভাবনা করিলেই সকল জগৎ নিজদেহে সংক্ষিপ্ত হইবে। অতএব প্রথম চরণ ও চতুর্থ চরণ একার্থক। প্রথম চরণে যাহা প্রতিপাদ্য, চতুর্থ চরণে তাহাই প্রতিপাদিত হইল। এই প্রকার যোগের অনুশীলন নিজ স্বরূপাববোধের নিমিত্ত অবশ্য কর্ত্তব্য—ইহাই পরিব্রাজকের শিষ্যের প্রতি উপদেশ।]

[গণিকা ও চেটীদ্বয়ের প্রবেশ]

গণিকা। ওলো মধুকরিকে! মধুকরিকে! কোথায় কোথায় রামিলক?

প্রথম চেটী (মধুকরিকা)। অজ্জুকে! 'আমি আসছি' ব'লে বোনাই নগরেই ঢুকেছে [অজ্জুকা—গণিকা। বোনাই—মূলে আছে 'আবুত্ত'। আবুত্ত ভগিনীপতি, বোনাই। চেটী দুইটী গণিকাকে ভগিনীর ন্যায় স্নেহ করিত; তাই ভগিনীস্থানীয়া গণিকার কান্ত রামিলককে তাহারা ভগিনীপতি বলিত।]

গণিকা। হ্যাঁলো! কি না জানি হবে?

মধু। কি আর—আড্ডা তাড়াতাড়ি সারতে (গিয়েছেন)।

গণিকা। এখনও আড্ডা শেষ হয় নি?

মধু। অজ্জুকা বেশ বলছেন!—আসবই ত আড্ডা—যা লজ্জায় ধীর মেয়েদের পর্য্যন্ত মাতিয়ে দেয়—হাসিয়ে দেয়। [আসব মদ্য। মদ খেলে স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা ধীর প্রকৃতি নারীগণ পর্য্যন্ত মাতাল হয়—বেহায়ার মত হাসে। এই মদই ত আড্ডার প্রাণ। আড্ডায় যাওয়া মানে মদ খেতে যাওয়া। সে আড্ডা কি শীঘ্র শেষ হ'তে চায়!]

গণিকা। যা, তাকে তাড়া দিগে।

মধু। অজ্জুকে! তাই হবে।

[নিষ্ক্রান্ত]

গণিকা। ওলো পরভৃতিকে! পরভৃতিকে! কোথায় বসি আমরা দু'জনে?

দ্বিতীয়া চেটী। (পরভৃতিকা)। অজ্জুকে! এই ফুলন্ত আম আর বকুলে শোভা পাচ্ছে যে পাথরের চাবড়াটি তার ওপর এক মুহূর্ত্ত ব'সে একটি পদ গান অজ্জুকা। [মূলে আছে—'বস্তু'—মনের কথা প্রকাশ পায় এমন শ্লোক বা গানের পদের নাম 'বস্তু'।]

গণিকা। তাই হোক।

[দু'জনে বসিয়া গাহিতে লাগিলেন]

কোকিল ও মধুকরের ধ্বনি যাঁর ধনুর্জ্যার শব্দ, সেই কামদেব এই উদ্যানে বর্ত্তমান। সহকার (মুকুল) তাঁর শর! মুনির মনও (এতে) নিশ্চয় মুগ্ধ হয়।

শা। (শুনিয়া) আরে! কোকিলের ডাক! (পুনরায় মন দিয়া শুনিয়া) না—এ ত কোকিলের ডাক নয়! পায়সে ঘিয়ের ছিটের মত এ যে অতি মধুর কোন গীতধ্বনি! যাই হোক! দেখা যাক। (দেখিয়া) আহাহা! না জানি এ কে তরুণী—দেখতে অতি সুন্দরী—গায়ে যেখানে যা মানায় সেই সব গয়নায় গা-সাজান—এই বাগানের অলঙ্কারের মতই যেন ব'সে।

পরভৃতিকা। অজ্জুকে!

শা। আ! এ যে গণিকা! যারা ধনবান্ তারাই ধন্য!

পর। দ্বিতীয় আর একটি পদ গান অজ্জুকা।

গণিকা। আচ্ছা! [গাহিলেন]

মধুমাসে যাঁর দর্প জন্মেছে—কামিনীর কটাক্ষ যাঁর সখা—সেই কন্দর্প প্রফুল্ল অশোকফুলের শরে এখানে বুঝি যোগিগণেরও মন বিঁধছেন।

শা। অতি মধুর গড়িয়ে পড়ছে কণ্ঠ থেকে। শুনুন (এক-বার), প্রভু।

* এই পাঁচটি শিক্ষাপদ বা উপদেশের নাম—'পঞ্চ-শীল'।

পরি। কানের প্রয়োজন শব্দ (গ্রহণ)। (কিন্তু) এতে আমি আসক্তি রাখি না। [শব্দ কান দিয়া শুনিতে হয়; তাই গীত-শব্দ শুনিতেছি বটে; কিন্তু মধুর বলিয়া উহাতে কোন আসক্তি আমার নাই।]

শা। আসক্তিও এখনই করতেন যদি কড়ি থাকৃত!

পরি। আঃ! যোগ্য ব্যবহার কর। (যাঁহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার যোগ্য তাঁহাকে সেইরূপ ব্যবহার প্রদর্শন কর। মানীকে অপমানকর বাক্য বলিও না—ইহাই তাৎপর্য্য।]

শা। চট্‌বেন না! সন্ন্যাসীর পক্ষে চটা ঠিক নয়।

পরি। এই যে আমি কোনরূপ ব্যবহার করৃছি না (অর্থাৎ কোপ করছি না—অর্থাৎ আমি সর্ব্ব ব্যাপারে উদাসীন)!

শা। এইবার আপনি পণ্ডিত হলেন বটে! [ক্রমশঃ

চর্য্যাপদের ছন্দোবৈচিত্র্য

শ্রীকালিদাস রায়

চর্য্যা পদগুলি ধর্ম্মতত্ত্বের গণ্ডীতে পড়ে—সাহিত্যের গণ্ডীতে পড়ে না। তবু ইহাকে এক শ্রেণীর সাহিত্য বলা যায়। প্রথমতঃ ইহা ছন্দে রচিত—সুরে গীত হইত। প্রধানতঃ পজ্ঝটিকা,দোহা ও মরহট্টা তিন শ্রেণীর ছন্দ পদগুলিতে গ্রহণ করা হইয়াছে। অধিকাংশ পদ পজ্ঝটিকা ছন্দে রচিত। সংস্কৃত ও প্রাকৃতে প্রত্যেক দীর্ঘস্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ স্বীকার করা হয়। বর্ত্তমান বাংলায় ঐকার ঔকার ছাড়া কোন দীর্ঘস্বরের উচ্চারণ করা হয় না। ভাষার যে স্তরে চর্য্যাপদগুলি রচিত—সে স্তরে দীর্ঘস্বরের কোনটির দীর্ঘ উচ্চারণ স্বীকার করা হইত—কোনটির হইত না। দীর্ঘ উচ্চারণ প্রয়োজনের অনুগামী ছিল। এই পদ্ধতি ব্রজবুলি ও প্রাচীন বাংলায় বহুদিন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। এখানে একটির উদাহরণ দিই। পজ্ঝটিকার মাত্রা বিন্যাস—

৪+৪+৪+৩ কিংবা ৪

৪+৪+৪+৪ অপণে। রচি রচি। ভব নির্। বাণা

৮+৪+৪ মিছেঁ লো অ বন্। ধাবএ। অপণা।

৪+৪+৪+৩ অম্হে ন। জাণহুঁ। অচিন্ত। জোই

৪+৪+৪+৩ জাম ম। রণ ভব। কইসন। হোই

৪+৩+৪+৪ জইসো। জাম। মারণ বি। তইসো।

৪+৪+৪+৪ জীবন্তে। মইলেঁ। নাহি বি। শেসো।

৪+৩+৪+৪ জা এথু। জাম মারণে বি। শঙ্কা

৪+৪+৪+৪ সো কর। উ রস র-। সানেরে। কঙ্খা

৪+৪+৪+৩ জে সচ। রাচর। তিঅস ভ। মন্তি

৪+৪+৪+৩ তে অজ। রা মর। কিমপি ন। হোন্তি।

৪+৪+৪+৩ জামে। কাম কি। কামে। জাম

৪+৪+৪+৩ সরহ ভ। ণন্তি অ। চিন্ত সো। ধাম॥

কোন কোন দীর্ঘস্বরকে হ্রস্ব উচ্চারণ করা হইয়াছে—কোন কোন পর্ব্বে একটি মাত্রা কম আছে। বাংলার মাটীতে পদস্পর্শের ফলে পিঙ্গলের ছন্দ এই স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে।

স্থলে স্থলে প্রত্যেক দীর্ঘস্বরটির দীর্ঘ উচ্চারণ করা হইয়াছে।

ছাআ। মাআ। কায় স। মাণা

বেণী। পাখেঁ। সোই বি। ণাণা।

প্রাকৃতের ত্রিপদী বা মরহট্টার অনুহৃতি।

৮+৮+৮+৪ কিন্তো মন্তে। কিন্তো তন্তে। কিন্তোরে ঝাণ ব। খাণে

অপই ঠাণ ম-। হাসুহ লীলেঁ। দুলক্খ পরম নি। বাণে।

দুঃখেঁ সুখেঁ। একু করিআ। ভুঞ্জই ইন্দী। জাণী

স্বপরাপর ন। চিছ। চেবই তাড়িক। সরঅপাদুঅল। বাণী।

কোন কোন্ পর্ব্বে একটি করিয়া মাত্রা কম আছে।

এই ছন্দের চরণের সঙ্গে দোহার চরণ, পজ্ঝটিকার চরণ ও উনপর্ব্ব মরহট্টা ছন্দের চরণের একত্র মিশ্রণও আছে। অনেক হ্রস্ব স্বরকে দীর্ঘ উচ্চারণও করিতে হইবে।

৮+৮+৩ গঙ্গা জউনা। মাঝেঁরে বহই। নাই।

৮+৮+৮+৩ তহিঁ বুড়িলী মা। তঙ্গী জোইআ। লীলে পার ক। রেই।

৮+৮+৮+৪ বাহতু ডোম্বী। বাহলো ডোম্বী। বাটত ভইল উ। ছারা

৮+৮+৪ সদ্‌গুরু পাঅপ এ। × ×। জাইব পুন জিন। উরা।

৮+৮+৮+৪ পাঞ্চকেড়ু আল। পড়ন্তেঁ মাঙ্গে। পীঠত কাচ্ছী। বান্ধী।

৮+৪+৮+৩ গ অণ দু খোলেঁ। সিঞ্চহু × ×। পাণিন পই সই। সান্ধি।

৮+৪+৮+৪ চন্দ সুবজ দুই। চক্কা × ×। সিটি সংহার পু। লিন্দা।

৮+৮+৮+৪ বাম দাহিন দুই। মাগন × ×। চেবই বাহতু। ছন্দা।

৮+৮+৮+৩ কবড়ী ন লেই। বোড়ী ন লেই। সুচ্ছড়ে পার। করই

৮×৮+৮×৩ জো রথে চড়িলা। বাহবা ন জাই। কূলে কূলে। বুলই।

দ্বিতীয় পর্ব্বে যে যে চরণগুলিতে মাত্রা কম আছে সেগুলি দোহা ছন্দের চরণ। পিঠত না হইয়া পীঠত, পাণী না হইয়া পাণি এবং চকা না হইয়া চক্কা হইবে। নতুবা, ছন্দে দোষ হয়।

নিম্নলিখিত পদটি আগাগোড়া দোহা-ছন্দেই রচিত—

৮+৬+৮+৪—তিনিএঁ পাটেঁ। লাগেলি রে। অনহ কসন ঘণ। গাজই

৮+৬+৮+৪ তা সুনি মার ভ। য়ঙ্কর রে। বিসঅ মণ্ডল। ভাগ্গই।

৮+৬+৮+৪ পাপ পুন্ন বেণি। তোড়িঅ (সিকল)। মোড়িঅ খম্ভা। ঠানা

গমণ টাকলি। লাগেলি রে। চিত্তা পইঠ নি। বাণী।

মহারস পানে। মাতেল রে। তিহুঅন সঅল উ। পেখি।

পঞ্চ বিসঅ × ×। নায়ক'রে। বিপখ কোনি ন'। দেখি

খর রবি কিরণ ×। সন্তাপে রে। গঅণাঙ্গণ গই। পইঠা।

ভণন্তি মহিত্তা। মই এথু। বুড়ন্তে কিম্পি ন। দিঠ্‌ঠা।

কোন কোন পর্ব্বে দুই এক মাত্রা কমবেশী থাকিলেও এ পদ দোহাছন্দেই লিখিত।

দ্বিতীয় চরণে একটা 'স অল' আসিয়া ছন্দোভঙ্গ করাইতেছে। ইহা প্রক্ষিপ্ত মনে হয়। ৩য় চরণ সম্ভবতঃ মরহট্টা ছন্দের। সিকল—সীকল হইলে ছন্দ থাকে। ৪র্থ চরণে 'লাগিরে' না হইয়া 'লাগেলিরে' হইবে না কেন? ৬ষ্ঠ চরণে 'বিসঅ' শব্দের পর দুটি মাত্রা অনুসন্ধেয়? ৭ম চরণে কিরণ কর হইলে আর গোল থাকে না।

প্রাকৃত পিঙ্গল হইতে দোহার দৃষ্টান্ত এখানে দিই—

৮+৫+৮+৩ রেখি মত্ত সিয়। টাবি কহ। কলআ অংতেট। দেহ।

নব চউ কল পণ। মজ্ঝ থবি। মঅণ হোই ক। রেহ।

দ্বিতীয় পর্ব্বে ৪, ৬, ৩, ২ মাত্রা থাকিলেও এই দোহাছন্দেরই অধিকারে পড়ে। শেষ পর্ব্বে ৩ কিম্বা ৪ মাত্রা দুইই চলিতে পারে।

নিম্নলিখিত অংশে মরহট্টা ছন্দের মাত্রা অনেকটা যথাযথই আছে।

আই এ অনু। অনাএ জগরে। ভাংতিএ জোপড়ি। আই
রাজসাপ দেখি। জো চমকিউ সাঁ। চোকতা বোড়ো। খাই।
রাউতু ভণহি কট। ভুসুকু ভণই কট। সঅলা অইস স। হাব
জইতো মূঢ়া। অচ্ছসি ভাম্তী। পুচ্ছতু সদ্‌গুরু। পাব॥

৪০নং চর্য্যাপদটির কতকগুলি চরণ দোহা, কতকগুলি চরণে প্রাকৃত পিঙ্গলের ধবলাঙ্গ, বর্ত্তমান লঘু ত্রিপদী ছন্দের সহিত মিশাইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। অথবা এমন সব শব্দের গোলমাল হইয়াছে যে সমস্ত পদটিকে একটি ছন্দের বলিয়া ধরিবার যো নাই।

দোহার চরণ—

৮+৪+৮+৪

গঅণত গঅণত। তইলা × । বাড়ী হিএ' কু। বাড়ী
কণ্ঠে নৈরা মণি। বালী × । জাগন্তে উ। পাড়ী।
তইলা বাড়ির। পাসের × । জোহ্ণা বাড়ী উ। এলা।

ধবলাঙ্গের চরণ—

৬+৬+৬+৩ কিংবা ৪

মহাসুহে বিল। সন্তি শবরো। লইয়া সুণমে। হেলী
হেরিসে মোর। তইলা বাড়ী। খসমে সম। তুলা
মারিল ভব। মত্তারে দহ। দিহে দি ধলী। বলী।

পজ্ঝটিকার নিম্নলিখিত রূপ প্রায় পয়ারের মত—অন্ততঃ পয়ারের পূর্ব্বাভাস।

নগর বাহিরি ডোম্বী তোহোরি কুড়িআ
ছোই ছোই জাহ সোই ব্রাহ্মণ নাড়িআ।
আলো ডোম্বি তোএ সম করিব ম সাঙ্গ।
নিঘিন কাহ্ন কাপালি জোই লাঙ্গ
একসো পদ্ম মা চৌষঠি পাখুড়ী
তঁহি চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী।
হালো ডোম্বী তো পুছসি সদ্‌ভাবে,
আইসসি যাসি ডোম্বী কাহারি নাবেঁ।

বারো মাত্রার চরণে গঠিত একাবলী ছন্দের মত ছন্দও আছে—

৬+৬— পেখু সুইনে। অদশ জইসা ৩
অন্তরালে। মোহ তইসা।
মোহ বিমুক্ক। কা জই মনা।
তবেঁ টুটই। অবনা গমনা।

খুব টানিয়া পড়িলে এবং হ্রস্বস্বরগুলিকেও দীর্ঘ উচ্চারণ করিলে পজ্ঝটিকারই রূপ ধরে। এইরূপ ন্যূনমাত্রিক পজ্ঝটিকা বা একাবলী হইতেই ডাক ও খনার বচনের ছন্দের উৎপত্তি।

অক্ষর সংখ্যা কম হইলেই—দশাক্ষরা কিংবা ঐরূপ অন্য ছন্দ হয় না। অক্ষর গণনার ছন্দই এগুলি নয়। যেমন—

আজি ভুসু বং। গালী ভইলী
নিঅ ঘারিণী চণ্ডালী লেলী

চরণ দশাক্ষরে গঠিত হইলেও ইহা পজ্ঝটিকা।

মরহট্টার একটি পর্ব্ব বাদ দিলে যে ছন্দ হয়, নিম্নলিখিত পদটি সেই ছন্দে লিখিত—

৮+৮+৩ সহজ মহা তরু। ফারিঅ এতে। লোএ।
খসমসভাবে। রে বা ণ মুকা। কোএ।
জিম জলে পাণিআ। টলিআ ভেড় ন। জাঅ।
তিণ মণ রঅণা। সমরসে গঅণ স। মাঅ

জাসু নাহি অপ্পা। তাসু পরে লা। কাহি
আই অণু অণায়ে। জাম মরণ ভাব। নাহি
ভুসুকু ভণই কট। সঅলা এহ স। হাব।
জাই ন আবই। রে ণ তহি ভাবা। ভাব।

ছন্দের দিক হইতে বিচার করিলে মনে হয় কোন কোন পদে ভিন্ন ভিন্ন পদের চরণ মিশিয়া গিয়াছে। একই পদে ভিন্ন ভিন্ন ছন্দ থাকিবার কথা নয়। কোন কোন পদে শব্দ পড়িয়া গিয়াছে বলিয়া ছন্দ পতন হইতেছে—অনেক শব্দের বানান ঠিক না থাকায় ছন্দ মিলিতেছে না। কোন কোন শব্দে ২।১টি অক্ষর পড়িয়া যাওয়ার ছন্দে গোলমাল হইতেছে—অর্থেরও বিপর্য্যয় ঘটিতেছে। কতকগুলি পংক্তিতে অযথা শব্দবাহুল্য ঘটিয়া ছন্দে দোষ হইতেছে। প্রথম পদে—এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস— স্থলে এড়ি এউ ছান্দক পাটের আস কিংবা এড়ি এউ করণক পাটের আস হইলে ছন্দ ঠিক থাকে। ৪৩নং পদে ভুসুকু ভণই কট ও রাউতু ভণই কট—এই দুইটির একটিকে বাদ দিলে ছন্দ ঠিক থাকে।

উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী। এখানে দুইবার উঁচা না থাকিলে ছন্দ ঠিক থাকে। ৮—৮—৪ বা ৩ মাত্রার চরণ মরহট্টার চরণের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে। যেমন—

গঙ্গা জউনা। মাঝেঁরে বহই। নাই
অকট জোইআ। রে মা কর হথা। লোহ্ণা।

সেইরূপ— উঁচা পাবত তঁহি। বসই সবরী। বালী। উঁচা উঁচা পাবত বলিলে উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত অর্থাৎ বহু উচ্চ পর্ব্বত বুঝায়। এখানে বহু উচ্চ পর্ব্বতের কথাই নয়—উঁচা পাবতের কঙ্কালরূপ মেরুগিরি, "কঙ্কাল দণ্ডরূপোহহি সুমেরু গিরিরাট তথা।" এই পদেই এইরূপ মাত্রাসমাবেশের আরো চরণ রহিয়াছে।

৮+৮+৩

হিঅ ভাঁবোলা ম। হা সুহে কাপুর। খাই
গুরুবাক পুচ্ছিআ। বিন্ধহ বিঅমণ। বাণে।

কাজেই দুইবার উঁচা প্রকৃত পাঠ না হইতে পারে। এই পদেই বিন্ধ না হইয়া বিন্ধহ হইবে।

একেলী সবরী এবণ হিণ্ডই কর্ণ কুণ্ডলবজ্রধারী।

চরণটিতে কিছু গোলমাল ঘটিয়াছে মনে হয়। কর্ণ কথাটা বাদ দিলে কতকটা ছন্দের মর্য্যাদা থাকে—কুণ্ডল কর্ণেই থাকে। কর্ণ শব্দটা না থাকিলে ক্ষতি ছিল না।

একেলা সবরী। এবণ হিণ্ডই। কর্ণে কুণ্ডল। ধারী

এইরূপ হইলে ছন্দের কোন দোষ থাকে না। ইহার সহিত মিল দেওয়া চরণ—

নানা তরু বর। মোউ লিল রে। গঅণত লাগেলি। ডালা

ল ও র-এ যখন ভেদ নাই, তখন ডারী হইলে মিল ভালই হয়।

১৮নং পদে—

বিদুজন লোঅ তোরে কণ্ঠ না মেলই—

পজ্ঝটিকার চরণ। এখানে বিদুজন লোঅ তোরে—এই অংশের তিনটি দীর্ঘস্বরের হ্রস্ব উচ্চারণ করিতে হইতেছে। ইহা চর্য্যাপদের পজ্ঝটিকার পক্ষে অস্বাভাবিক। 'বিদুজ্জন লোক' এখানে জন ও লোক একার্থবোধক। এখানে 'লোঅ' শব্দের প্রয়োগ অযথা ও অযথার্থ। লোঅ বাদ দিলে ছন্দের মর্য্যাদা বাড়ে বই কমে না।

৪+৪+৪+৪ বিদুজন। তোরে। কণ্ঠ ন। মেলই।

ছন্দের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য পীঠা, পীরহ, চড়া, রুক্খের, রাতী, বাক'লে, দি চুবি, জুজ্ঝ, ভুলা কিংবা সুজ, পক্খা, উজিল (উর্দ্ধ হইতে) নির্ভর—ইত্যাদি বানান অযথা।

অইসন চর্য্যা। কুক্কুরী। পাএঁ। গাইড়।
কোড়ি মা। ঝে একু হিঅহি। মাইড়।

এখানে চর্য্যা কথাটি চরণে অতিরিক্ত। হওয়া উচিত—

অইসন। কুক্কুরী। পাএঁ। গাইড়। কুক্কুরীপাদ এইরূপই গায়। চর্য্যা কথাটির উল্লেখ থাকিবার কথাই নয়।

জই তুমহে লোঅ হে হোইব পারগামী

এই চরণে মাত্রাধিক্যে ছন্দঃপতন হইতেছে। লোঅ হে কিংবা হোইব এই দুইটির একটি বাদ গেলে ছন্দ ঠিক থাকে।

তুমহে লোঅ হে জই পারগামী কিংবা তুমহে হোইব জই পারগামী হইলে ছন্দটি থাকে। গামী কথাতেই ভবিষ্যৎ ভাব বর্ত্তমান আছে।

৭নং চর্য্যা পদটির প্রায় প্রত্যেক চরণেই ছন্দোদোষ। তাহাতে মনে হয় ইহার বিশুদ্ধ পাঠ পাওয়া যায় নাই।

১১নং চর্য্যায় ধরিঅ ঘট্টে ইত্যাদির সহিত বীর নাদে মিল দেওয়া হইয়াছে। বলা বাহুল্য মিল হয় নাই। পাঠান্তরে আছে—ধরিঅ ঘাটে এর সহিত বীর নাটে মিল ইহাই যথার্থ পাঠ মনে হয়। বীরনৃত্যের সহিত অনহা ডমরু বাজে—ইহাই ত সঙ্গত।

ছন্দের দিক হইতে বিচার করিলে ১৩ সংখ্যক পদে তার জলধি বাদ যাইবে। ভব শব্দেই ভবসমুদ্র বুঝাইবে। গন্ধপরসর—গন্ধপরশরস হইবে এবং চিঅ কল্লহার শূণত মাঙ্গে হইবে---চীঅ কল্লহার শূণত মাঙ্গে।

তরিত্তা ভবজলধি জিম করি মাঅ সুইনা

তরিত্তা ভব জিম করি মাঅ সুইনা। হইলে ঠিক হয়। এখানে জিম শব্দের সার্থকতা নাই। জিম করি (জয় করি) কথার সার্থকতা আছে।

এইভাবে ছন্দো বিচার করিতে গেলে কতকটা পাঠোদ্ধার হইতে পারে। লিপিকরগণের ছন্দোজ্ঞান না থাকায় কোন কোন স্থলে অক্ষরের গোলমাল হইয়াছে। কোথাও কোথাও একই শব্দের প্রতিশব্দ শব্দের সঙ্গে রহিয়া গিয়াছে। একটিকে বাদ দিলে ছন্দ ঠিক থাকে। লিপিকরেরা বানান ভুলও করিয়াছে। সেও সংশোধন করিয়া লইলে অনেক স্থলে ঠিক থাকে।

অধ্যাপক মনীন্দ্রমোহন বসু প্রাকৃত মরহট্টা ছন্দের চর্য্যাগুলিকে ত্রিপদী বলিয়াছেন----ত্রিপদী সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা প্রাকৃত ত্রিপদী। ইহা হইতে বাংলার দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দের উদ্ভব হইয়াছে---লঘু ত্রিপদীর নয়; ৫—৬—৭ অক্ষরে এক একটি পর্ব্ব বটে, কিন্তু দীর্ঘস্বরের উচ্চারণে হওয়ায় প্রত্যেক পর্ব্বে আটটি করিয়া মাত্রা আছে—অতএব উহাকে লঘু ত্রিপদীর প্রাথমিক রূপ মনে করায় তাঁহার ভুলই হইয়াছে। এই ছন্দের চর্য্যাপদ-গুলিকে তিনি লঘু ত্রিপদীতে অনুবাদ করিয়াছেন—তাহা তো দোষ কিছু নাই। তবে দীর্ঘ ত্রিপদীতে অনুবাদ করিলেই শোভনতর হইত।

পদ্মাটিকার পদগুলিকে পয়ারে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা ঠিকই হইয়াছে। ১০নং ও ৫০নং চর্য্যাপদের চরণ সংখ্যা ১৪। অন্যগুলির ১০।১২।১৬ এইরূপ। ঐ দুটি পদ ১৪ চরণে গঠিত বলিয়া অধ্যাপক মহাশয় ঐ দুটিকে সনেটের প্রাথমিক রূপ বলিয়াছেন। এ কথা সঙ্গত নয়; সনেটের গঠনে বিশিষ্ট নিয়ম পদ্ধতি আছে—জোড়াযোড়া মিল দেওয়া ১৪ চরণ হইলেই সনেট হয় না। ইহা অধ্যাপক মহাশয়ের অবিদিত নয়। এ হিসাবে রবীন্দ্রনাথের নৈবেদ্যের চৌদ্দ চরণের কবিতাগুলি আদৌ সনেট নয়। এদেশে মাইকেলের আগে সনেট কেহ রচনা করেন নাই—তাহার পূর্ব্বাভাসও ছিল না।

বিজয়ী ভিখারী

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

কে কেড়ে নিয়েছে মুখের অন্ন ?
কে করেছে আজ ভিখারী সবে ?
কার ভাণ্ডারে উঠিছে প্রচুর ?
লুণ্ঠন করে কে আজি ভবে ?
তাই ভেবে ভেবে কাঁদিও না ভাই,
পাতিও না হাত দ্বারে ও দ্বারে।
পশুর সমান হীন নহি মোরা,
ভাঙিব না মোরা ক্ষুধার ভারে।
আমরা লুটিব যেথা সঞ্চয়
যেথায় জমেছে দেশের সোনা,
কেড়ে এনে মোরা ভাগ ক'রে নেবো
যে ধান সবার জন্ম বোনা।
ভগবানে আর জানাব না মোরা
মোদের দৈন্য-দুখের কথা

মানুষের দ্বারে কাঙালের মত
জানাব না আর ক্ষুধার ব্যথা।
মরণে বিলীন হবার আগেই
শেষ শকতির অগ্নি দিয়া
অন্যায় আর অবিচার ভরা
ধরণীরে যাব জর্জ্জরিয়া।
সেই সে দাহনে জ্বলিয়া পুড়িয়া
পাপ হবে ছাই, জাগিবে ধরা,
নবরূপে আর নবীন শোভায়
প্রচুর বিভবে দুঃখ হরা।
জাগো ভাই জাগো হাজার হাজার,
ক্ষুধিত বাঙ্গালী, দৈন্য নাশি'
রুদ্রের মত প্রলয়-নৃত্যে
মুখে ভয়ঙ্করী অট্টহাসি'।

মধুরেণ

নাটিকা

শ্রীঅমরঞ্জন রায়

চরিত্র-পরিচিতি :

পুরুষগণ

শিব।

ইন্দ্রনাথ সেন আই-সি-এস,
—অবসরপ্রাপ্ত সেসন জজ।

রায় বাহাদুর দুর্গাদাস সেনাপতি
অবসরপ্রাপ্ত রেভেনিউ অফিসার।

অনারেব্‌ল রসিকনাথ ভোস
সি-আই-ই,
—কলেজের ট্রাষ্টিবোর্ডের
প্রেসিডেণ্ট,

হরিদাস ঘোষ, ট্রি্পল্‌ এম-এ,
—রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ—
কলেজের প্রিন্সিপ্যাল।

কার্ত্তিক সেনাপতি—দুর্গাদাস-
সেনাপতির পুত্র, পোষ্টগ্রাজুয়েট-
ছাত্র।

প্রভাতকুমার লাহিড়ী এম-এ
(কলিকাতা ও এডিনবরা)
নাট্যকার ও অভিনেতা।

দেবেন্দ্রনাথ দত্ত এম-এ,
খগেন্দ্রচন্দপটী এম-এসসি,
ডঃ নেলসন, ডাঃ ঠাকুরচরণ দাস,
নির্ম্মলচন্দ্র সরকার এম-এ,বি-টি,
হরিব্রহ্ম সাহিত্যবল্লভ এম-এ,
শ্যামাচরণ রাহা এম-এস্‌ সি—
(অধ্যাপকগণ।)

সার আচ্ছালাল যোনারকিয়া, কে-টি,
রায় বাহাদুর কোটীশ্বর সাহা,
রায় সাহেব কুশধ্বজ চৌধুরী,
ধরমলাল চাহেলিয়া,
পুটেশ্বর শঙ্খনিধি,
হরগৌরী নসরৎ,
কুশলধর তরফদার—(ট্রাষ্টিগণ)।
কলেজের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট ও
ছাত্রগণ, প্রভৃতি।

স্ত্রীগণ

পার্ব্বতী।

দেবসেনা সেন
ওরফে ডোভা-ইন্দ্রনাথ
সেনের কন্যা।

লেডি ভোস বি-এ (অক্সন)

অনারেব্‌ল রসিকনাথ
ভোসের স্ত্রী।

মিলনবালা দাশ (মিন্ধ)।

বকুলরাণী সেন (বোকে)।

দৌলতেন্নেসা খাতুন।
(ডি'লট্‌),

নবনলিনী
সোম (নোভা)।

শোভনা ব্যানার্জ্জি
(শোভি),

মিসেস্‌ লীলাবতী সুইফট্‌
প্রভৃতি কলেজের ছাত্রীগণ।

মিসেস্‌ সেন—
মিঃ ইন্দ্রনাথ সেনের স্ত্রী।

মিসেস্‌ সেনাপতি—
দুর্গাদাস সেনাপতির স্ত্রী—
প্রভৃতি।

১ম দৃশ্য

কলেজের ভিতর বারান্দা

কলেজ বসিবার পূর্ব্বাহ্ণ

(ছাত্রগণ বারান্দায়—প্রায় সকলের হাতেই 'ইংরাজী-বাজার' বা 'বাঙলা-বাজার, খবরের কাগজ—কাগজে মিস্‌ ডোভা ও কার্ত্তিক সেনাপতির ছবি—গতকাল একক-টেনিস প্রতিযোগিতা ফাইনাল খেলায় ডোভার প্রশংসার হুড়াহুড়ি—কার্ত্তিক ভাল খেলিয়াও ডোভার হাতে কেন হারিল তজ্জন্য বিস্ময় প্রকাশ।—ছাত্রগণ প্রত্যেকেই যেন এই পরাজয়ের জন্য গুমরাইতেছে।)

(ছাত্রীগণ সকলেই নীচের প্রাঙ্গণে—ডোভার জন্য অপেক্ষা করিতেছে—অধিকাংশের হাতেই ছোটখাটো উপহার—ছবিশুদ্ধ ফটোগ্রাফ, বই, রুমাল বা ফুলের তোড়া। কলেজ বসিবার ঠিক পাঁচ মিনিট আগে ডোভা সাইকেল চড়িয়া আসিল—ছাত্রীগণ এক সঙ্গে 'থ্রি-চিয়ার্স' ধ্বনি করিল। ছাত্রীগণের প্রত্যেকেরই চোখে-মুখে বিজয়োল্লাস।)

বারান্দাস্থিত একটি ছাত্র।—একেবারে যে ওয়াটার্লু জয়ের ওভেসন্‌ (ovation)!

অন্য ছাত্র।—কার্ত্তিক হারবে ডোভার হাতে, স্বপ্নেও কেউ ভেবেছিল কি?

আর একটি ছাত্র।—ভাল খেলেও কেন যে কার্ত্তিক হারলো—কাগজওয়ালারাও আশ্চর্য্য হয়ে গেছে!

(কার্ত্তিককে সম্মুখ দিয়া যাইতে দেখিয়া)

অপর একটি ছাত্র।—আমি জানি কেন কার্ত্তিক হারলো—ডোভার প্রতি কার্ত্তিকের যথেষ্ট দুর্ব্বলতা আছে!

(কার্ত্তিক মুখ টিপিয়া হাসিল।)

(নীচের প্রাঙ্গণে আবার থ্রি চিয়ার্স ধ্বনি—ডোভা তার খদ্দরের সাড়ির আঁচলে এক একটি উপহার নিতেছে—হাসিমুখে উপহারদাতাদের করমর্দ্দন করিতেছে।)

কার্ত্তিকের একটি অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সতীর্থ।—তুই যে আমাদের মুখ ডোবাবি তা কিন্তু কোনদিন ভাবি নি' ভাই।

একটি ছাত্র।—আজকে দেখছি ডোভার প্লেন্‌ অল্‌ (plain-all) খদ্দর—সেরেফ সাড়ি সেমিজ স্যাণ্ডেল।

অন্য ছাত্র।—কাল তো খেলতে নামলো কেড্‌-স্যু আর বডিস্‌ সর্টস্‌ (shorts) পরে।

আর একটি ছাত্র।—ওর সাজ-গোজের টেষ্টও (taste) অপূর্ব্ব—কোনো দিন শুধু ফ্রক আর স্যু পরেই এলো।—রঙিন জিনিষ পরে না—হিল উঁচু জুতোও পরে না।

অপর একটি ছাত্র।—কার্ত্তিক হয়েছে ডোভার টার্গেট (target)—চাঁদমারির নিশানা—কার্ত্তিককে আউট-ডু (outdo) করাটাই ওর প্রধান কাজের মধ্যে দাঁড়িয়েছে।

কার্ত্তিকের বন্ধু-ছাত্র।—আচ্ছা আমরা দেখে নেবো এই কলেজ-ইউনিয়নে।

(ডোভা তার সাইকেল খানি সাইকেল-ষ্ট্যাণ্ডে রাখিয়া—চাকার সঙ্গে শিকল-কুলুপটা লাগাইল—তারপর হাত ঘুরাইয়া

ছাদের আনন্দ

হাত-ঘড়িটা দেখিল।—সিঁড়ি বাহিয়া কলেজের বারান্দায় উঠিতেছে।—বারান্দায় ছাত্রগণের ভীড়।)

একটি ছাত্র।—কারদা দেখ—হাতঘড়িতে দেখা হোলো যে, কলেজ বসতে আর এক মিনিট বাকি।

অন্য ছাত্র।—ঠিক এক মিনিট থাকতে কলেজে ঢোকে।

আর একটি ছাত্র।—যেমন 'স্মার্ট' (smart) তেমনি 'ডেয়ার-ডেভিল্' (dare devil) দেখো না 'এলবো' (elbow) কোরতে কোরতে চলেছে—আমাদের সবও যেমন হ্যাংলা—রাস্তার ভীড় করে থাকা কেন?

অপর একটি ছাত্র।—তা' ছাড়া জানিয়ে দিচ্ছে তার রূপ আছে—আই-সি-এস'এর মেয়ে।

(অন্যান্য ছাত্রীগণ ডোভার পশ্চাৎ অনুসরণ করিল—তারা আবার থ্রি চিয়ার্স ধ্বনি করিল।)

কার্ত্তিকের বন্ধু-ছাত্র। আমরা দেখে নেবো এই কলেজ-ইউনিয়নে—চ্যালেঞ্জ (challange) করছি।

(ছাত্রীগণ যেন এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিল এরূপ ভাবেই 'থোড়া-কেয়ার-করি' ভঙ্গী দেখাইয়া খট্‌খট্ শব্দে কলেজে ঢুকিল।)

২য় দৃশ্য

কলেজের একতলার হল ঘর

২৬শে জুলাই—অপরাহ্ণ

(কলেজের সম্মুখে লাল সালুতে বড় বড় হরফে লেখা—'আগামী ২৭শে জুলাই শুক্রবার ফাউণ্ডার্সডে (Founder's day) উৎসব ও কলেজ ইউনিয়ন' (College union) কলেজ গেট পার হইলেই একটি নোটিশ বোর্ডে লেখা আছে ২৪শে হইতে ৩০শে জুলাই কলেজ বন্ধ—কলেজ হলে বিভিন্ন নোটিশ বোর্ডে লেখা আছে—দ্বিতলের হলে একজিবিশন, এক তলার হলে নাট্যোৎসব—নিত্য অপরাহ্ণ ৩টায় রিহার্সল—২৬শে জুলাই ড্রেস্-রিহার্সল।—অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের নামসহ প্রোগ্রাম ঝুলিতেছে।)

(ছাত্র ছাত্রীগণ ব্যস্ততার সহিত ঘোরাঘুরি করিতেছে—)

(পাঁচজন ছাত্র প্রোগ্রাম দেখিতে দেখিতে কথাবার্ত্তা কহিতেছে)

একটি ছাত্র।—মেয়েদের সব নাম বদলানোর ঢঙ দেখ—মিলনবালা হোলেন 'মিল্ল', বকুলরাণী 'বোকে', দৌলতেন্নেসা 'ডি'লট', নবনলিনী 'নোভা', শোভনা 'শোভি'—যেন সব বিলেত থেকে আসছেন!

অন্য ছাত্র।—আর তাঁদের লিডারের নামটা ভুলে গেলে নাকি?—যিনি দেবসেনা থেকে হয়েছেন 'ডোভা'।—সবাই যেন মিলটারী—এঁদের যুদ্ধে যাওয়াই উচিৎ ছিল।

আর একটি ছাত্র—আমাদের মতো কালাবোবাদের দেশে এই নারী সৈন্যই যুদ্ধ করবে—নইলে গার্ল্‌ষ্টুডেন্টরা যা' ধরছে তাই করছে।—তাদের কথামতো বয়েজদের প্রবন্ধ পাঠ, রেসিটেশন (recitation) সব বন্ধ হোলো, তাদের কথামতো' কার্ত্তিকের ওরিয়েণ্টাল ডান্স (oriental dance), ভেণ্ট্রিলোকুইজম্ (ventriloquism), মিমিক্ (mimic) বন্ধ হোলো। তারাই বলে প্রোগ্রামের শেষে "মধুরেণ সমাপনং" শুধু চা-মিষ্টি দিয়ে নয়, তার সঙ্গে তাদের নাচ-গান হওয়া চাই।—তাদেরই সব কথা থাকচে তো—।

অপর একটি ছাত্র।—কিন্তু মেয়েদের এই আইডিয়াটা ভারি নভেল—আমি এর তারিফ করছি।—অর্থাৎ নাটক অভিনয় মিষ্টিমুখ উভয়তঃ 'মধুরেণ সমাপনং'।—

কার্ত্তিকের বন্ধু-ছাত্র।—আর তার সঙ্গে ডোভার যে নাচ হবে তার নাম হয়েছে 'দেবসেনা ডান্স'।—কি সেল্‌ফ-এডভারটাইজ-মেণ্ট (self-advertisement) মেয়েদের—!

একটি ছাত্র।—তাতে এই সব সেকেণ্ডইয়ার আর থার্ড ইয়ারের মেয়েগুলো লাইম লাইটে (lime light) এসে গেল—আর কার্ত্তিকের মতো পোষ্ট গ্রাজুয়েট (post graduate) ছেলেও ব্যাক গ্রাউণ্ডে (back ground) পড়ে গেল—আমরা তো আমরা।

অন্য ছাত্র।—কিন্তু বাহাদুরি আছে এই মিস্ ডোভার—খোদ লাহিড়ী মশাইকে ধরে নাটকের পরিকল্পনা সায় কোচিং (coaching) সব করাচ্ছে—হলই বা সে থার্ড ইয়ারের মেয়ে।

আর একটি ছাত্র।—নাটকের হিরো হিরোইন্ (hero-heroine) কার্ত্তিক আর ডোভা—দু'দলের দু'জন ফেবারিট্ favourite)।

অপর একটি ছাত্র।—প্রোডিউসারের আর্টই তো ঐখানে—দেখছ তো পার্ট সিলেকসনে লাহিড়ী মশায়ের মাথা—বইটা উৎরোবে খুব—।

কার্ত্তিকের বন্ধু।—দেখাই যাক্—আজই ড্রেস্ রিহার্সল—বিকেলে তিনটে থেকেই তো আরম্ভ হবার কথা।—ট্রাষ্টীরা, বিশিষ্ট ইনভাইটীরা (invitees) সব প্রায় আসবেন—কিন্তু মূল পাণ্ডারা কৈ?—প্রিন্সিপ্যাল, সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট সায় আমাদের কার্ত্তিকের দলবল সব উধাও যে!

একটি ছাত্র।—চল্ না বাইরে একটু দেখা যাক্।

(সে বাহিরের গাড়ি-বারান্দায় গিয়া চীৎকার করিতেছে—)

—এস ত্বরা—শীগ্‌গির এস—অশ্বপৃষ্ঠে আসে হের সুলতানা রিজিয়া।

সকলে।—বাঁধো বুক বাঁধো হিয়া—চলেছে তাতার সেনা শুধু হাত দিয়া।

(সকলে গাড়ি-বারান্দায় আসিয়া—)

—ব্যাপার কি—কি দেখে ভয় পেলে?

(ঐ ছাত্রটি দেখাইল একটি সাদা ঘোড়া দাবড়াইয়া ব্রিচেস্-পরা ডোভা কলেজ অভিমুখে আসিতেছে)

(ডোভা আসিয়া কলেজের সম্মুখস্থ বাগানে ঘোড়াটিকে দাঁড় করাইয়া কলেজের ভিতরে ঢুকিল—ছাত্রী-বন্ধুগণ ছুটিয়া আসিয়া তার হাত চাপিয়া ধরিল—সকলে হল ঘরের দিকে চলিল।)

অন্য ছাত্র। ঘোড়া না বেঁধে রাখাও একটা ফ্যাসান্ না'কি?

কার্ত্তিকের বন্ধু-ছাত্র। কাঁটা লাগাম লাগিয়েছে ঘোড়ার

মুখে—ঘোড়া জানে বাঁশের সঙ্গে কাঁটা লাগাম বাঁধা আছে—লাফালে কাঁটা কষে ধরবে মুখে—কৌশল আছে ঐখানে।

(তাহারা ভিতরে আসিয়া দেখিল কলেজের ট্রাষ্টী বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ভোস সাহেবের কাছে দাঁড়াইয়া মিঃ সেন বলিতেছেন)

মিঃ সেন। আমি আপনাদের মধ্যে নতুন এসেছি।—পরিচয় কোরে দেবার কেউ নেই—তাই নিজেই পরিচিত হ'তে এসেছি।—আমি আই, এন্, সেন।

(মিঃ সেন হাত বাড়াইলেন—কিন্তু ভোস সাহেব যেন কিছু উপেক্ষার সহিত করমর্দ্দন করিলেন।]

লাহিড়ী। ইনি কুমারী ডোভার পিতা রিটায়ার্ড সেসন জজ মিঃ ইন্দ্রনাথ সেন, আই-সি-এস্।

(পরিচয় শুনিয়া ভোস সাহেব তাঁর অবিনীত ব্যবহারের জন্য বলিতে লাগিলেন)

ভোস। ওঃ সরি সরি—তা' আপনাকে চিনতে পারি নি।

(এবার তিনি গভীরভাবে বার বার সেনের করমর্দ্দন করিতে লাগিলেন।)

লাহিড়ী। ইনি অনারেবল রসিকনাথ বোস, সি-আই-ই, এই কলেজের ট্রাষ্টী বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট।

লেডি ভোস। আপনার মেয়ে ডোভা? চমৎকার ট্রেনিং দিয়েছেন মেয়েকে।

(সেন মৃদুহাস্যসহ একটু ঘাড় নামাইলেন।)

ভোস। আসুন, আমি ট্রাষ্টী বোর্ডের সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।

(কানে মুক্তার মাকড়ী পরা এক মাড়োয়ারীর নিকট গিয়া) ইনি ট্রাষ্টী সার আচ্ছালাল ঘোনারকিয়া, কে-টি, দারভাঙ্গার বাড়ী, দোতলার বিল্ডিং করিয়ে দিয়েছেন।

(আচ্ছালাল আসন হইতে উঠিয়া বলিলেন)

আচ্ছালাল। নমস্তে মিঃ সেন।—হামি লোটা কম্বল লিয়ে বাঙলামে এসেছিলো—আভি যো কুছু পারলো বাঙলাকো দিলো।

সেন। আপকা নাম আচ্ছা—কামভি আচ্ছা।

(আচ্ছালাল আবার অভিবাদন করিলেন)

(কোটীশ্বর সাহার নিকটে আসিয়া)

ভোস। ইনি রায় বাহাদুর কোটীশ্বর সাহা—আমাদের বিল্ডিংয়ের ফ্রণ্ট পোর্সন [front portion] করিয়ে দিয়েছেন—আমাদের একজন ট্রাষ্টী—প্রাচীন বহুদর্শী ব্যক্তি।

(কোটীশ্বর মাথার শালের টুপিটি খুলিয়া দুই হাতে নমস্কার করিলেন।)

(রায় সাহেব কুশধ্বজ চৌধুরীর নিকট আসিয়া)

ভোস। ইনিও আমাদের একজন ট্রাষ্টী—রায় সাহেব কুশধ্বজ চৌধুরী—আহিরীটোলার আদি পাটের ব্যবসায়ী—আমাদের প্রথম বিল্ডিং সম্পূর্ণ এঁর দানে তৈরী হয়।—পূর্ব্ববঙ্গের বনিয়াদী জমিদার।

(কুশধ্বজ সবিনয়ে নমস্কার করিয়া রূপার সিগারেট কেসটি খুলিয়া ধরিলেন। ভোস ও সেন ধন্যবাদ দিয়া একটি করিয়া সিগারেট লইলেন।)

(ধরমলাল চাহেলিয়ার নিকটে আসিয়া)

ভোস। ইনি বাবু ধরমলাল চাহেলিয়া—প্রসিদ্ধ ঘি-এর ব্যবসায়ী—আমাদের একজন ডোনার ও ট্রাষ্টী।

('রাম রাম' বলিয়া ধরমলাল বার বার অভিবাদন করিলেন)

(পুটেশ্বর শঙ্খনিধির নিকটে আসিয়া)

ভোস। ইনি বাবু পুটেশ্বর শঙ্খনিধি—পূর্ব্ববঙ্গ হ'তে এসে ঠিকাদারীতে সৌভাগ্য লাভ করেন—আমাদের বোর্ডিং ইনিই তৈরী ক'রে দেন—মাল মশলার দাম ছাড়া কিছু নেন নি।—আমাদের ট্রাষ্টী এবং একজন সত্যিকারের অভিভাবক।—নিজে থেকে কত যে সাবানো খরচ করেন বলা যায় না।

(পুটেশ্বর নমস্কার করিয়া তাঁর ব্যবসায়ের ছাপা 'পরিচয়-পত্র' ও বিবরণীর কাগজ কয়েকখানি ভোস ও সেনকে দিলেন।)

(হরগৌরী নসরতের নিকটে আসিয়া)

ভোস। ইনি বাবু হরগৌরী নসরৎ, এম্-কম্—নসরৎ ব্যাঙ্কের প্রধান পার্টনার ও ম্যানেজিং ডিরেক্টার। আজমীরের একজন বড় রাইস্। এঁর বাবা গৌরীশঙ্কর আমাদের ফাউণ্ডার মশাইয়ের একজন বন্ধু ছিলেন—এই কলেজ বিল্ডিংএর সব জমিটা তাঁর দান।—এঁর বাবার জায়গায় ইনি এখন ট্রাষ্টী আর আমাদের ব্যাঙ্কার।

হরগৌরী। বন্দেগি ভোস সাব—সেন সাব।—এহি থোড়া বহুত সুভনীর (Souvenir)। দেতেহেঁ, 'কিপ-সেক্' (keep-sake) হোগা।

(তিনি দু'জনকে ব্যাঙ্কের নাম মিনে-করা দু'টি ছোট ছোট রৌপ্যাধার দিলেন।)

(তৎপরে কুশলধর তরফদারের নিকট আসিয়া)

ভোস। ইনি বাবু কুশলধর তরফদার—প্রসিদ্ধ কাঠের ব্যবসায়ী—আসাম প্রদেশে বাড়ী।—একটা মোকদ্দমায় আমাদের ফাউণ্ডারের সঙ্গে পরিচয় হয়।—আসবাব-পত্র থেকে বিল্ডিং-এর সব কাঠ এখনও দিচ্ছেন।—খুব গৌরভক্ত—আমাদের একজন ট্রাষ্টী।

কুশলধর। গরদের চাদরে ঢাকিয়া মালা জপ করিতেছিলেন—থলে শুদ্ধ মালা মাথায় ঠেকাইয়া বলিলেন—'হরে কৃষ্ণ' 'হরে কৃষ্ণ'—আত্মপ্রশংসা শ্রবণ কদাচ উচিত না—হরে কৃষ্ণ—হরে কৃষ্ণ'।

(ছাত্রীরা বিশিষ্ট অতিথিদের বৈকালিক-চা বিতরণ করিতেছে)

(পাশাপাশি চেয়ারে বসিয়া দুর্গাদাস সেনাপতি এবং প্রসিদ্ধ নাট্যকার-অভিনেতা প্রভাত কুমার লাহিড়ী গল্প করিতেছিলেন—তাঁদের পাশ দিয়া ভোস ও সেন আসিতেছিলেন। ভোসকে লাহিড়ী বলিলেন)

লাহিড়ী। একজন বিশিষ্ট অতিথির সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই।—ইনি রায় বাহাদুর দুর্গাদাস সেনাপতি—যাঁর ছেলে পোষ্ট গ্রাজুয়েটের (Post Graduate) প্রধান ছাত্র কার্ত্তিক।—ইনি বিহারে রেভেনিউ বিভাগের বড় চাকরী করতেন।—সেন মশাইদেরই স্বশ্রেণী—বৈদ্য।

(সেনাপতি উঠিয়া উভয়কে নমস্কার করিলেন—উভয়ে প্রতি-নমস্কার করিলেন।)

(ভোতা ও ছাত্রীরা তাঁদের সম্মুখ দিয়া বলিতে বলিতে চলিয়াছে—'চা—আর চা দেবো কি ?—চা'।—সঙ্গে সঙ্গে ট্রেতে চা, বিস্কুট, কেক নিয়া খানসামা চলিয়াছে।)

লাহিড়ী। তোমরা যা' হোক একটু চা খাইয়ে অতিথি সংকার করলে—কিন্তু যিনি ডেকে আনলেন তাঁর কাণ্ডখানা কি ?—তিন কোয়ার্টার চলে গেল এদিকে।

ডোভা। কোন্ এলো—ফাউণ্ডারের বাড়ীতে আটকে পড়েছিলেন—একজিবিশনের মাল সঙ্গে নিয়ে আস্‌ছেন।

লাহিড়ী! প্রিন্সিপ্যাল ঘোষ মনিব খুসী রাখতে যা' করছেন তাতে আর্ট নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—ওজন না থাকলে আর্ট নষ্ট হয়।

লেডি ভোস। আর্ট না থাক্‌লে নিজেকে লুকান্ যায় না—বন্ধু ঘোষ আমাদেরই ডাহার-বাঙাল—আমরা লুকোচুরি জানি না—হো-হো-হো!

(গেট দিয়া প্রকাণ্ড লরী প্রবেশ করিল।—তাহার পশ্চাতে আসিল একখানি মোটর গাড়ী। সেই গাড়ী হইতে নামিলেন কার্ত্তিক, প্রিন্সিপ্যাল ঘোষ, সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট প্রভৃতি।—সকলেরই মুখ যেন কালো হাঁড়ির মতো।)

ঘোষ। (শিষ্টাচার দেখাইয়া) নমস্কার—নমস্কার।—ভদ্রতা রক্ষা আগে—কার্ত্তিক বার বার বল্‌ছিল—টেনে নিয়ে এল সে তার গাড়ীতে।—(ঘাম মুছিতে মুছিতে) চা-চা—চা দিয়েছে? (হাত ঘড়ি দেখিয়া) ওঃ প্রায় চারটে!—কার্ত্তিক কার্ত্তিক?—ক্ষমা করবেন—জীবন শেষ হয়ে গেছে—(ঘাম মুছিতেছিলেন)।

লেডি ভোস। আপনাকে বড় টায়ার্ড (tired) বোধ হচ্ছে—আসুন আসুন—পাখার তলে এখানে।

(তিনি তাঁর নিজের চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন)

ঘোষ। (সঙ্কুচিত হইয়া) করেন কি—করেন কি?—ইসে, আপনি ওঠেন কি কারণ—কার্ত্তিক কার্ত্তিক—অর্ডার (order)—অর্ডার।

(বাহিরে দারুণ হট্টগোল হইতেছে)

(লেডি ভোস প্রিন্সিপ্যালকে ঐ চেয়ারখানায় জোর করিয়া বসাইয়া দিলেন।—বাহিরে হট্টগোলের শব্দ বাড়িতেছে।—প্রিন্সিপ্যাল চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া)

ঘোষ। ইসে অর্ডার অর্ডার—কার্ত্তিক কার্ত্তিক?

(কতকগুলো ছেঁড়া জুতা, জামা, চোগা-চাপকান, শটকার নল, ছাতা-ছড়ি, গড়গড়া-হুঁকা, বৈ-খাতা, ফটো-ছবি নিয়া কার্ত্তিক, অন্যান্য ছাত্র ও পিছনে দারোয়ানগণ প্রবেশ করিল।)

কার্ত্তিক। ফাউণ্ডারের ব্যবহার করা এই সব মেমেণ্টোগুলো (memento) একজিবিশন হলে রেখে আস্‌তে যাচ্ছি।

(সকলে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়াছে।—ঠেলাঠেলি—চীৎকার—এইসব বিচিত্র জিনিষ দেখিতে সকলে ঝুঁকিয়া পড়িল)

লেডি ভোস। (সকৌতুকে) এই গন্ধমাদন আনতে গেছিলেন না কি ঘোষ সাহেব! এ সব কি কাযে লাগবে?

(একটা হাসির হল্লোড় উঠিল)

(লেডি ভোসের কথা শেষ হইতে না হইতে)

লাহিড়ী। প্রিন্সিপ্যাল ঘোষ ভারি ক্লান্ত—লেডি ভোসের কথার জবাব আমিই দিচ্ছি—(সকলের সম্মুখে আসিয়া নাটকীয় ভঙ্গীতে—) কেন গন্ধমাদন পাহাড় আনলেন ঘোষ সায়েব?—তাঁর দলের হাহা-হুহু'দের বাঁচাতে তা' আনলেন।—রামায়ণে আছে—

"শ্রীরাম বলেন বাছা পবননন্দন।
পর্ব্বত লয়া যাহ বাছা গন্ধমাদন।
দেবের পর্ব্বত হয় দেবপ্রিয় ভোগে।
পর্ব্বত না গেলে দেবের পাবে অনুযোগে।
পর্ব্বত লইয়া বীর করিলেক মাথে।
রামকে প্রণাম করি চলিলেক পথে।
রামনাম অমৃত-সুধা কৈল বরিষণ।
হাহা-হুহু রাজা আদি পাইল জীবন।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব শীতল।
লঙ্কাকাণ্ড গাইল গীত হরি হরি বল।"

ইতি সাহিত্য পরিষদের বাঙলা পুঁথি ৯২ নম্বর।

(লাহিড়ীর আবৃত্তির ভঙ্গী ও কৌটিল্য সকলকে হাসাইয়া তুলিল। নধর দেহ প্রিন্সিপাল দারুণ রাগিয়া টাকের ঘাম মুছিতে মুছিতে)

ঘোষ। ইসে ইসে—আপনি ইডিয়েট—(idiot) ভদ্রসমাজের না—হিরো ওয়ারসিপ নিয়া ছড়া কেটে হাসছেন—আপনি বফুন উপযুক্ত (buffoon) ভাণ্ড! (রাগান্ধভাবে একবার উঠিতেছেন আবার বসিতেছেন)।

(তাহা শুনিয়া অতি বিনীতভাবে হাত জোড় করিয়া—)

লাহিড়ী। দেখুন—আমরা হচ্ছি ধুলোচাটা দুর্গা টুনটুনি—আপনাদের মতো হয়েল শঙ্খ-চিলের মর্ম্ম কি বুঝব বলুন?

(লাহিড়ীকে আক্রমণের ভঙ্গীতে ছুটিয়া আসিয়া চীৎকার স্বরে শ্যামাচরণ রায়)।

প্রো: রায়। চালবাজিটি খাটবেক নি—চালবাজিটি খাটবেক নি। ধূলোচেটা—যার বৈজ্ঞানিক নাম পিরহুলণ্ডা গ্রিসিয়া (Pyrrhulanda Grisea) সেটা এক রকম চড়ুই পাখি—গলা থেকে তলপেটটা শুধু কালো।—আর দুর্গা টুনটুনি আর্ক-নেকথ্রা এসিয়াটিকা (Arachnecthra Asiatica) তার গোটা দেহটাই কালো—সে দুইটাকে এক কোঠায় ফেলা চলবেক নি। আবার সবুজ রঙের হরিয়াল—আর সাদা শঙ্খচিল। এরাও কি এক কোঠায় পড়বেক? মশায় এ পক্ষীতত্ত্ব—নাটক্ নয়।

(পক্ষীতত্ত্ববিদ্ চলিয়া যাইতে না যাইতে নিজের চেয়ার হইতে উঠিয়া কলেজ ম্যাগাজিনের এডিটার হরিব্রহ্ম সাহিত্যবল্লভ চোখ বুঁজিয়া বলিতে লাগিলেন—)

এডিটার সাহিত্যবল্লভ। হে পরমকারুণিক! এ আমি আজ কি দেখলেম—কি শুনলেম? প্রবীণ প্রবীণারা—নবীন-নবীনারা হেয়োর প্রতি সম্মান সবাই ভুলে গেলেন! তিনি ছেলেন য়ুনিভার্সিটীর কর্ণধার—এই কলেজের ফাউণ্ডার-নিঠার

পারাবার—দয়ার অবতার! আজ তাঁরই কৃপায় কত নরনারী কুসংস্কারমুক্ত হয়ে আলোকে আসতে পেরেছে —বর্ব্বর যুগের সব প্রথাকেই তিনি করতেন অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা—পুতুল পূজার প্রতি তাঁর ছেলো দারুণ অবজ্ঞা।—প্রকৃত হেরো বলতে আমরা যা বুঝি তিনি ছেলেন সেইরূপ আদর্শ পুরুষ। তিনি ছেলেন প্রকৃত ব্রহ্মবিৎ—ওঁ ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্!—

(তাঁর পাকা দাড়ি বহিয়া জল গড়াইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া নিখিলচন্দ্র সরকার)

প্রোঃ সরকার। (স্নেহযুক্ত স্বরে) ব্রাহ্ম বন্ধুগণ দুঃখিত হবেন না। আমরা শুনে থাকি আপনারা সত্যের অপলাপ করেন না। তাঁকে হিরো সাজাতে আমাদের আপত্তি নেই। তবে তাঁকে ব্রাহ্ম বললে সত্যের অপলাপ হবে। তিনি আমাদের চাকরি দিয়েছিলেন সত্যি—তাই আজও তাঁর জুতো জামা বয়ে এনে একজিবিসন সাজাচ্ছি। এত দিন তাঁর খেয়ালে উঠেছি বসেছি—তাঁর হুকুমে হাত তুলেছি—তাঁর ছেলে জামাইকে মুনিব বলে মানছি—এর চেয়ে আর কি ভাবে হিরো-ওয়ার্শিপ হতে পারে ব্রাহ্ম-বন্ধুরা বলে দিন।

(একটা গম্ভীর চাপা হাসির শব্দ উঠিল। এমন সময় অত্যন্ত ঠোঁটকাটা বিলাত-ফেরত নমঃশূদ্র প্রোফেসার উঠিয়া বলিলেন)

ডক্টর ঠাকুরচরণ দাস। আমরা যে চাকর—মিঃ ম্যাগাজিন এডিটার চোখের জলে তা ভাল কোরে বুঝিয়ে দিলেন। নিছক চাকর উইথ্ এবসোলিউট স্লেভ মেণ্টালিটি (with absolute slave mentality) হোসেন সা'র মন্ত্রীকে ডোম ডোমনীও বিদ্রূপ করেছেন, নির্ব্বিচারে হুকুম তামিল করতে দেখে।—আমরা তার চেয়ে অধম পা-চাটা মীন্ হিউম্যান চ্যাটেল (mean human chattel)।

(উপহাসের গুঞ্জন শোনা গেল)।

(জীবাণুতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ দেশী খ্রীষ্টান প্রফেসার।—তাঁর সর্ব্বাঙ্গ পোষাকে ঢাকা। জুতা, মোজা, প্যাণ্ট, লংকোট, কান ঢাকা ক্যাপ ছাড়া নাকে কানে তুলা গোঁজা। একখানি প্লেটের উপর একটি কাঁচের গ্লাসে খানিকটা ঝোল ঢাকিয়া নিয়া ছাত্রদের বক্তৃতা দিবার ভঙ্গীতে সম্মুখে আসিলেন।

ডক্টর জেকসন—হিরো-ওয়ার্শিপ মানে জীবের পূজা নয়—জীবাণুর পূজা।—কারণ জীব মরে জীবাণু মরে না—এক ডেক মাংসের ঠাণ্ডা কারিতে (curry) এক কণা জীবাণু দিন—দুদিনে দেখবেন সেই ঝোল জীবাণুপূর্ণ সজীব হয়ে উঠেছে। দেখুন, মানুষ অনায়াসে দু'তিনশো বছর বাঁচতে পারে—কিন্তু তার ডেথ (death) হয় অপঘাতে। আমাদের ফাউণ্ডারও অপঘাতে মারা গেছেন। কিন্তু তাঁর অদৃশ্য জীবাণু—ঐ তাঁর শু, টোবাকো পাইপ, ছাতা ছড়িতে অমর হয়ে লেগে রয়েছে। সেই সব নিয়ে এসে প্রিন্সিপ্যাল বৈজ্ঞানিকের মতো কাজ করেছেন। আমরা চোখে দেখতে পাব না—কিন্তু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখতে পাব সেই সব মলিকিউলস-এ (molucules) আজ এই বিষ্ণুৎ পূর্ণ হয়ে উঠেছে। আমার হাতের এই এক গ্লাস গোলের সরবতের মধ্যে ফাউণ্ডার হিরোর অনেকগুলি জীবাণু এতক্ষণে এসে গিয়েছে।—খ্রীষ্টের অপূর্ব্ব কৃপায় তার একটিও যদি না মরে—তাহলে পাঁচ-ছ' দিন পরে দেখবেন এই পৃথিবীর সব জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে আমাদের হিরোর জীবাণু! এই সত্য পরীক্ষার জন্ম এই ঘোলের গ্লাসটি আমি এই অল্টারের (altar) ওপর রাখছি।—আমেন্ আমেন্—আমেন্ (amen)।

(রেকাব শুদ্ধ গ্লাসটি তিনি মাথায় ছোঁয়াইতে তুলিলেন—হাত পিছলাইয়া তাহা সশব্দে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। প্রিন্সিপ্যাল লেডি ভোস প্রভৃতি সরি সরি (sorry) করিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন—চারি দিকে খেদোক্তি)

লাহিড়ী। (ব্যস্ততার ভাণ করিয়া) হরি আপ্—হরি আপ্ (hurry up)—একটা বোতল একটা ফনেল—একটা বোতল একটা ফনেল—।

ল্যাবরেটরি হইতে ছাত্রগণ তাহা দৌড়িয়া আনিয়া দিল—ফনেল পরানো বোতলটা নিয়া তিনি ছুটিয়া গিয়া ধরিলেন নেলসনের চোখের কাছে—তারপর অনারেবল ভোসের চোখের কাছে)।

ভোস। (উচ্চহাস্যে) মিষ্টার লাহড়ী—আপনার এই অভিনয়ের অর্থ-টা শীঘ্র ক'ন্—হাসতে হাসতে গলা চোকড্ chocked হয়ে গেল যে!

লাহড়ী। আপনাদের চোখের ঐ দামী জল এই বোতলে ফেলুন এই প্রার্থনা—মাটিতে ফেলে নষ্ট করবেন না। সুসভ্য পারসীকেরা এই জল বোতলে ভরে রাখতো। কোনো ওষুধে যে রোগ সারে না তা দিয়ে তাই সারতো।—সেরেফ পরোপকার বাসনায় আমি তা সংগ্রহ করছি।

(ভোস, ভোস-গৃহিণী প্রভৃতি দারুণ হাসিতেছেন)

(একটু হাসি সামলাইয়া)

ভোস। কি রোগে দেবেন কন্তো?

লাহড়ী। আপাততঃ মস্তিষ্ক-বিকারে—ভদ্র ব্যক্তিদের মধ্যে সেটা সংক্রামক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

ভোস। খুব নভেল প্রেসকৃপসন্—কিন্তু দাওয়াই কৈ?

(জবাবটা যেন মুখস্থই ছিল। বলিলেন)

লাহিড়ী। দেখুন, বাতিক থাকলে চোখে জল আসে না—এইযে আপনাদের চোখেও জল এলো না!—কত কাঁদলেন—কিন্তু চোখ সব শুকনো!

(সকলেই খুব হাসিলেন।)

ঘোষ। ইসে—ইসে—আপনার অনেষ্ট মিস্‌চিফ (honest mischief) সব কাম পণ্ড করছে!—ইউ মাষ্ট সাট আপ (you must shut up) মিষ্টার লাহিড়ী।

(কিন্তু লাহিড়ীর দুষ্টবুদ্ধি যেন বাড়িয়া গেল।—মুহূর্ত্ত মধ্যে পাশের সাজঘর হইতে তিনি কাছা-কোঁচাহীন বেশে এবং মাথায় ফেজের আকৃতি একটা টুপি পরিয়া আসিলেন। তৎপরে—)

লাহিড়ী। দেখুন আমরা বর্ণগুরু—পূজোটুজো আমরাই ক'রে এসেছি।—কিন্তু এখন ঢং বদলেছে। নৈষ্ঠিকভাবে পূজো করতে গেলে পোষাকও ঠিক রাখতে হবে; তাই আমি এই পোষাক পরেছি। (সকলের হাসি শুনিয়া) আফশোস্—

আফছোস্—ফাউণ্ডার ওয়ায়ছিপের ভাবাই আপনারা জানেন না! শুনুন আলাল কবি কি বলেছেন—

'অনেক অপার অতি করতার করণ।
কহিতে অপূর্ব্ব কথা না যায় বর্ণন॥
সপ্ত মহী সপ্ত স্বর্গ বৃক্ষপত্র পুঞ্জ।
সপ্ত শূন্ত ভরি যদি হইত কাগজ॥
এ সপ্ত সাগরে আর যত নদ নদী।
দীঘি পুষ্করিণী কূপ মসী হ'ত যদি॥
পৃথিবীর যত রেণু স্বর্গে যত তারা।
জীব জন্তু শ্বাস আর বরিষার ধারা॥
যুগে যুগে বসি যদি তাঁর স্তুতি করে।
সহস্রের এক ভাগ লিখিতে না পারে॥'

আসুন বন্ধুগণ, আকাশের দিকে মুখ তুলে দু' হাতে আমাদের ফাউণ্ডার ছায়েবকে কোর্নিশ করি।—কুরআন্ শরীফের এই বাণী।—তবে 'স্তুতি' স্থানে হিন্দীতে 'অস্তুতি' হয়—'এ-এস্-বি' সংস্করণ দেখবেন।

(বলিতে বলিতে লাহিড়ী কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন)

(হাসি করতালির হুল্লোড় পড়িয়া গেল)

লেডি ভোস। আর যে হাসতে পারতেছি না!

(এইবার দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক বলিষ্ঠ চেহারা দীর্ঘাকৃতি খগেন্দ্র চম্পটী মহাশয় উঠিলেন। তাঁর লাল ভাঁটার মতো চোখ সকলের ত্রাস। তিনি উঠিতেই সব হাসি থামিয়া গেল। জোর মোটা গলায় তিনি বলিতে লাগিলেন)

চম্পটী। লাহিড়ী মশাই, আপনি বিশিষ্ট আর্টিষ্ট!—আপনাকে ডেকে এনেছি আমরা আমাদের কাজে সাহায্য করতে!—আপনি কিন্তু কাজটা পণ্ড করতেই চান?—কোথায় গেল ড্রেস রিহার্সেল?—বেলা তো প্রায় পাঁচটা বাজালেন মস্করা কোরে!—কাল আমাদের এন্নুয়েল।—সেটা সুসম্পন্ন না হ'লে প্রিন্সিপ্যালেরই বেশী অপমান, আপনার নয়!

ঘোষ। (টাকের ঘাম মুছিতে মুছিতে উঠিয়া) হাঁ আমি খুব সচেতন আছি!—দেখুন এখনো আমার আহার হয় নাই, আর কি করবার ক'ন্?—ফাউণ্ডার মহাশয়ের আজ মৃত্যু উৎসব!—সকালে কলেজ গার্ডেনে তাঁর মূর্ত্তিতে মাল্যদান ও প্রার্থনা ক'রে আমরা দয়াময়ীর শ্মশানে যাই। সেখানে তাঁর স্মৃতি-স্তম্ভ পরিক্রমা করে—সেখানকার পবিত্র মাটি জিহ্বায় দিয়ে, ফাউণ্ডার মহাশয় দেহ রেখেছেন যে ঘরে সেই পুণ্যতীর্থে গড়াগড়ি পাড়বার জন্ত বাহির হচ্ছি—সব তিক্তা কোরে দিলেন ডক্টর কমলাক্ষ ভাদুড়ী!—তিনি স্মৃতিরক্ষা কমিটীর সেক্রেটারী।—সেই হিসাবে ব'লে ফেললেন যে—স্মৃতিরক্ষা তহবিলে ফাউণ্ডার মহাশয়ের ছেলেরা এক পয়সাও চাঁদা দিবেন না—তাঁ'রা খালি বাপের জুতো-মোজা একজিবিট করিয়েই ছেলের ডিউটি (duty) শেষ করতে চান!—এই কটু কথা শুনে তাঁর ছেলেরা একজি-বিটের কোনো জিনিষই দিতে চান না।—কত হাতে-পায়ে ধরে আনতে হোলো এ-সব।—এখন কাল কি ক'রে ভালয় ভালয় কাটে, আপনারা চিন্তা করুন।

(সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক দেবেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয় বিরক্তিভরে আরম্ভ করিলেন—)

প্রোঃ দত্ত। দেখুন ভগবানকে উপেক্ষা করলে—ভগবৎ পরিবারকে নিন্দা করলে তাঁদের কিছুই আসে যায় না—অপরাধ হয় যারা বলে তাদের—যারা শোনে তাদেরও!—তাই আমার প্রতিবাদ করতে আসতে হ'ল—এটা অত্যন্ত কুরুচি—অত্যন্ত অপরাধ। লাহিড়ী মশায়ের ব্যবহার কুরুচির পরিচয় দেয়।

লাহিড়ী। বলিহারি আমার পাকা আম দাদুরে!—ফাউণ্ডার শেষে সগোষ্ঠী হয়ে গেলেন ভগবান?—কি সুরুচি!—দাদু আমার সুরুচির খাতিরে তাঁর পাকা চুলে বহুত বহুত কলপ দিয়ে কাঁচা করতে থাকুন—তাঁর আদ্দির পাঞ্জাবী, 'কাঁচি' ধুতির লম্বা কোঁচা বজায় থাক্—আমার কোনো হিংসে নেই। বাঙলা দেশে যখনই কোনো গৌরী সেন এসেছেন, তিনিই রাঙকে রূপো ক'রে গেছেন।—নিতাই নাম দিয়ে অনেক হাঙলা-কাঙলাকে উদ্ধার করে গেছেন!—কিন্তু যারা সে নাম নেবে না তাদের হবে কি?

"পৃথিবীতে বহু জীব স্থাবর জঙ্গম—
ইহা সবাকার কি প্রকারে হইব মোচন?"

ভোস। (সহাস্যে) আজ এই আসরে আপনিই তো কবিরাজ গোঁসাই!—বলুন দেখি আমাদের কি হবে?

লাহিড়ী। (দু' হাত তুলিয়া) উপায় নেই—উপায় নেই—নিতেই হবে—নাম নিতেই হবে।—জ্যাড়া হরিদাস ভাই বলেছেন—আজ তাই বলছেন আমাদের ন্যাড়া প্রিন্সিপ্যাল হরিদাস ঘোষ।—ফাউণ্ডারের নাম নিয়ে নাচতেই হবে—নাচতেই হবে—

"তুমি যে করিয়াছ উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্ত্তন,
স্থাবর জঙ্গমের সেই হয়ত শ্রাবণ।
শুনিয়াই জঙ্গমের হয় সংস্কার ক্ষয়,
স্থাবরের শব্দ লাগি প্রতিধ্বনি হয়।
সকল জগতে হয় উচ্চ সংকীর্ত্তন,
শুনি প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর জঙ্গম।"

(উদ্দণ্ড নৃত্যসহ) নাচো সবে নাচো—আমার সঙ্গে নাচো—সব বাঙালী নাচো—নইলে গতি নাইরে আর!—চৈঃ চঃ—চৈঃ চঃ—চৈঃ চঃ

(নাচিতে নাচিতে লাহিড়ী বাহির হইয়া যাইতেছিলেন। ছাত্র-ছাত্রীগণ ডাকাডাকি শুরু করিল—)

ছাত্র-ছাত্রীগণ। আজ যে ড্রামার শেষ রিহার্সেল—আমরা সবাই অপেক্ষা করছি।

(সেই নৃত্য ভঙ্গীতেই লাহিড়ী উত্তর দিলেন—)

লাহিড়ী। দড়বড়ি বাসে চড়ি মাঠে যেতে হবে রে,
রাত্রে হবে রিহার্সেল এবে না ফিরাও রে।

সকলে। ঠিক ঠিক—এ ম্যাচ মিস্ করা চলবে না।

ছাত্র-ছাত্রীরা। সন্ধ্যার পর কিন্তু আসা চাই।

ভোন্তা বিরক্তিভরে তার সাদা ঘোটকীতে উঠিয়া খেলার মাঠের দিকে ছুটাইয়া চলিল।

কার্ত্তিক তার মোটরে উঠিয়া চালককে বলিল—বাগান মাঠ।

[ক্রমশঃ

আগ্রার স্মৃতি

শ্রীসুধীরকুমার মিত্র, বিদ্যাবিনোদ

নয় বৎসর পূর্ব্বে প্রথম যখন মর্ম্মরে গঠিত স্বপ্নদৃশ্য তাজমহল দর্শন করিতে আগ্রা গিয়াছিলাম, তখন সময়া-ভাবে পাঁচদিনের অধিক ঐ স্থানে অবস্থান করা সম্ভব হয় নাই। সেইজন্য আগ্রার প্রসিদ্ধ ডাক্তার, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট পুনরায় আগ্রায় আসিয়া কয়েকদিবস অবস্থান করিব প্রতিজ্ঞা করায়, তিনি সে-বারের মত আমাদের রেহাই দিয়াছিলেন। তার পর দীর্ঘ নয় বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে—তুণ্ডলার উপর দিয়া দিল্লী গিয়াছি, সিমলায় গিয়াছি কিন্তু দুঃখের বিষয় বন্ধুবরের আমন্ত্রণ এবং আমাদের প্রতিজ্ঞা কোনটাই রক্ষা করিতে সমর্থ হই নাই। তাই এই বৎসর প্রতিজ্ঞারক্ষার উদ্দেশ্যে পুনরায় আগ্রা যাইতে হইয়াছিল, সাথী ছিলেন সে-বারের দুইজন বন্ধু শ্রীযুক্ত নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী। ভারতবর্ষের ঐতি-হাসিক স্থানগুলির মধ্যে আগ্রা অন্যতম এবং আগ্রার অট্টালিকা পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি করা হয় না। মুসলমান রাজত্বকালের আগ্রার বক্ষে যে-সমস্ত সমাধি, দুর্গ, মসজিদ ও প্রাসাদাদির চিহ্ন আজও ভ্রমণকারীকে উদ্‌ভ্রান্ত ও বিষাদিত করিয়া তোলে, সেই পুরাতন স্মৃতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করিবার জন্যই এই কাহিনীর অবতারণা।

সম্রাট আকবরের সমাধি মন্দির

প্রাচীনকালে আগ্রা 'অগ্রবন' নামে পরিচিত ছিল, লোদী বংশীয় মুসলমান সম্রাটদিগের সময় হইতে ইহা আগ্রা নামে খ্যাত হয়। আগ্রা সহর যমুনা নদীর দক্ষিণ দিকে অবস্থিত এবং ইহার উত্তরে মথুরা, পূর্ব্বদিকে এটোয়া, দক্ষিণে ঢোলপুর ও গোয়ালিয়র এবং পশ্চিমে ভরতপুর রাজ্য। ইহা অক্ষাংশ ২৬'২৪' ও ২৭'২৫' উত্তর এবং দ্রাঘিমাংশ ৭৭'২৬' ও ৭৮'৩২' পূর্ব্বে অবস্থিত। মিউনিসিপাল সীমা বেষ্টিত স্থানের পরিমাণ এক হাজার চারিশত পাঁচ বর্গ মাইল। যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত আগ্রা একটী জেলা এবং আগ্রা সহর উক্ত জেলার প্রধান নগর; জেলার পরিমাণ এক হাজার আটশত তিপ্পান্ন বর্গ মাইল। সমগ্র জেলার বর্ত্তমান লোকসংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ।

ষোড়শ শতাব্দীতে ভারতসম্রাট্ আকবর ক্ষুদ্র গ্রাম হইতে আগ্রাকে বিরাট নগরীতে রূপান্তরিত করেন। আকবরের পূর্ব্বে লোদীবংশীয় মুসলমান সম্রাট্‌গণ এই স্থানে অবস্থান করিতেন। ইব্রাহিম লোদী ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে বাবরের কাছে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আগ্রা পরিত্যাগ করেন। ইহার এক বৎসর পরে বাবর ফতেপুর সিক্রিতে রাজপুত সৈন্যদিগকে পরাভূত করেন এবং তাহার পর আগ্রায় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে বাবর পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্র হুমায়ুন রাজা হন কিন্তু তিনি শের সা কর্ত্তৃক পরাস্ত ও দূরীভূত হন। অতঃপর আগ্রা যোধপুরাধিপতির হস্তগত হয়। পরিশেষে হুমায়ুনের পুত্র আকবর শত্রুদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া দিল্লী হইতে ফতেপুর-সিক্রিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন কিন্তু জলাভাবে উক্ত সহর তিনি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। অতঃপর ফতেপুর সিক্রি হইতে রাজধানী স্থানা-ন্তরিত করিয়া তিনি আগ্রায় রাজধানী সংস্থাপিত করেন।

সম্রাট্ আকবরের রাজত্বকালে কেল্লা এবং কয়েকটী সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল; তন্মধ্যে সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধিমন্দির বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্বে আগ্রাজেলার অন্তর্গত ইহা একটী প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম ছিল। জৌনপুররাজ সেকেন্দার লোদী এই নগর স্থাপন করিয়া এইস্থানে একটী মনোরম প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন এবং তাঁহার নামানুসারে এই স্থান 'সেকেন্দ্রা' বলিয়া পরিচিত হয়। ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে এই নগর স্থাপিত হয়। স্থাপত্যশিল্পে ও পাথরের কারুকার্য্যে এই অট্টালিকা ভারতবর্ষে একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ১৫৮৪খৃষ্টাব্দে ইহার নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয় এবং ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মাণ সমাপ্ত হয়। ইহার স্থাপত্যশিল্পে প্রাচীন হিন্দু বা বৌদ্ধস্থাপত্যের অনুকরণে গঠিত। এই অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে আকবর পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীর উক্ত অট্টালিকার মধ্যেই তাঁহাকে সমাহিত করেন এবং সমাধির চতুষ্পার্শ্বস্থ উদ্যানের সম্মুখে একটী বিরাট প্রবেশপথ নির্ম্মাণ করেন। সম্রাট্ আকবর আর যে-সকল অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা হইতে ইহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। লাল এবং সাদা কারুকার্য্যখচিত প্রস্তরে

ইহা নির্ম্মিত ; ইহার ছাদের চারি কোণে ছিয়াশী ফিট উচ্চ চারিটী শ্বেত-প্রস্তরের স্তম্ভ আছে। পারস্য ভাষায় উৎকীর্ণ লিপি পাঠে জানা যায় যে, ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে এই বিরাট প্রবেশপথ নির্ম্মিত হইয়াছিল। আকবরের গুরুর নাম ছিল সেখ্ সেলিম চিষ্টি ফতেপুর সিক্রি, ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি লোকান্তরিত হইলে তাঁহার নামানুসারে তাঁহার রাজধানীর নাম "ফতেপুর সিক্রি" বলিয়া অভিহিত করা হয় এবং উক্ত স্থানের জুম্মা মসজিদের মধ্যে তাঁহাকে সমাহিত করিয়া তদুপর ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে আকবর শ্বেত প্রস্তরের একটী সমাধি-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। জলাভাবে ফতেপুর-সিক্রি পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

আগ্রার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দুর্গ লাল পাথরের দ্বারা সম্রাট্ আকবর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল ; ইহার পাঁচিল উর্দ্ধে ছচল্লিশ হাত এবং পরিধি দেড় মাইল। জনশ্রুতি এইরূপ যে,সম্রাট্ আকবর একবার রাজা মানসিংহের প্রতি রুষ্ট হইয়াছিলেন, তজ্জন্য মানসিংহ কেল্লার উপর হইতে ঘোড়ায় চড়িয়া তলায় লাফাইয়া পড়েন। ঘোড়াটি নিম্নে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলেও রাজা মানসিংহের কিছুই হয় নাই। তাঁহার এই বীরত্বের স্মরণার্থে অদ্যাবধি দুর্গের পার্শ্বে একটী পাথরের ঘোড়ার মতো পোতা আছে দেখিতে পাওয়া যায়। কেল্লার ভিতরে বহু সুন্দর সুন্দর বাড়ী

সম্রাট আকবরের সমাধি-মন্দিরের তোরণ দ্বার

আছে এবং বর্ত্তমানে কেল্লার নিকটেই 'আগ্রা ফোর্ট' রেলওয়ে ষ্টেশন হইয়াছে।

আগ্রার দুর্গস্থিত অট্টালিকাসমূহ সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ সম্রাট্ জাহাঙ্গীর তাঁহার শ্বশুরের স্মরণার্থে দুর্গমধ্যে একটী কবর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার নাম "জাহাঙ্গীর

আকবরের সমাধির উপরিভাগের একাংশ

মহল"। এই অট্টালিকা সুন্দর শ্বেতপ্রস্তরে নির্ম্মিত। ইহার উত্তরে খাসমহল সম্রাট্ সাজাহানের সময় নির্ম্মিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত তাঁহার সময়ে দেওয়ানী খাস, আঙ্গুরীবাগ্, শিস্‌মহল, মতি মস্‌জিদ প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছিল। দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিলে সর্ব্বপ্রথম 'দেওয়ানী-আম' দৃষ্ট হয়, ইহা সম্রাট্ সাজাহানের পুত্র আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। দেওয়ানীখাসের পার্শ্বে 'সমন বুরুজ' অথবা জেসমিন-টাওয়ার সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের পরিকল্পনানুযায়ী নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং ইহার গাত্রে অসংখ্য বহুমূল্য প্রস্তরাদি ছিল। ইহা যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত। আঙ্গুরীবাগ ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট সাজাহান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ; ছিয়ানব্বই ফিট লম্বা একটী গ্যালারী, একটী সুবৃহৎ চাতাল (৮৮ ফিট × ৬২ ফিট) এবং একটী জলের চৌবাচ্চা ইহার মধ্যে আছে। চৌবাচ্চা হইতে জল প্রস্তরনির্ম্মিত পাইপের দ্বারা আঙ্গুরীবাগের মধ্যস্থিত চাতালে চলিয়া যায়। ইহা দেখিতে অতীব সুন্দর। বঙ্গদেশের দুর্গাপূজার দালানের ন্যায় ইহার পাঁচটী সুন্দর খিলান আছে। ছাদের উপর সম্মুখদিকের দুইটী গম্বুজ আঙ্গুরীবাগের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়। 'শিস্-মহল'কে ধাঁধার ঘর বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হয় না ; ঘরখানির চতুর্দ্দিকে এমন কি উপরে পর্য্যন্ত শত শত আরসী লাগান আছে। শিস্‌মহলে প্রবেশ করিবামাত্র চতুর্দ্দিকে নিজের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইতে দেখিয়া দর্শকগণ প্রথমেই হতভম্ব হইয়া যায়। একটী দিয়াশালায়ের কাঠি জ্বালিলে চতুর্দ্দিকে আলো জ্বলিয়া উঠে, এবং পরিশেষে বাহির হইবার সময় বহু দরজা দেখিতে

পাইলেও সত্যিকারের দরজাটী আবিষ্কার করিতে প্রত্যেককেই বেশ বেগ পাইতে হয়।

এতমাদ্দোল্লা সম্রাট সাজাহানের 'ওয়াজির' অর্থাৎ গুরু ছিলেন। তিনি পরলোক গমন করিলে যমুনা নদীর বামতীরে ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে সাজাহান তাঁহার স্মরণার্থে একটী সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং উক্ত সমাধি "এতমাদ্দোল্লা" নামে প্রসিদ্ধ। উহার নির্ম্মাণকার্য্য শেষ করিতে পাঁচ বৎসর লাগিয়াছিল। পাথরের খোদাই-কৌশলে এবং কারুকার্য্যে এই অট্টালিকা ভারতের মধ্যে অদ্বিতীয় বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি করা হয় না। ইহার ছাদের চার কোণে বিভিন্ন প্রস্তরের নির্ম্মিত চারিটী গম্বুজ এবং মধ্যস্থলে একটি সুন্দর ছাউনী আছে। ইহার পাথরের জাফরীগুলি ও পাথরের কারুকার্য্যসমূহ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহার কারুকার্য্য তাজমহলের কারুকার্য্য অপেক্ষা সুন্দর; কিন্তু ইহা তাজমহল অপেক্ষা ক্ষুদ্র বলিয়া কেহ ইহাকে তাজমহলের সহিত তুলনা করে না। ইহা নির্ম্মাণ করিতে প্রায় সাত লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছিল।

সম্রাট সাজাহানের গুরুদেব এতমাদ্দোলার সমাধি

জুম্মা মসজিদ অর্থাৎ বৃহৎ মসজিদ আগ্রার আর একটি দ্রষ্টব্য অট্টালিকা। সাজাহানের প্রিয়তমা কন্যা জাহানারা বেগম কর্ত্তৃক শ্বেত ও রক্তবর্ণ প্রস্তরে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহা নির্ম্মাণ করিতে পাঁচ বৎসর সময় লাগিয়াছিল এবং ব্যয় হইয়াছিল পাঁচলক্ষ টাকা। এই মসজিদের গাত্রে উৎকীর্ণ লিপি পাঠে জানা যায় যে হিজরী ১০৫৮ সনে (অর্থাৎ ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে) ইহার নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইয়াছিল। ভূমি হইতে এগার ফিট উচ্চে মসজিদের সম্মুখে একটী বিস্তীর্ণ চত্বর (৩২০ ফিট×২৭০ ফিট) নামাজ পড়িবার জন্য রক্ষিত আছে। রক্তবর্ণ প্রস্তরের অট্টালিকা আগ্রায় ইহা ব্যতীত আর নাই এবং ভারতের মধ্যে বৃহৎ মসজিদগুলির মধ্যে ইহা অন্যতম। সম্রাট্ আওরঙ্গজেব তাঁহার ভগ্নী জাহানারা বেগমকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং তিনি লোকান্তরিতা হইলে দিল্লীর নিকটে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়।

সম্রাট্ সাজাহানের প্রিয়তমা মহিষী মমতাজ বেগম ১৬২৯ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন; মমতাজের স্মরণার্থে এই ভুবনবিখ্যাত সমাধিমন্দির 'তাজমহল' নির্ম্মিত হয়। বিচিত্র উদ্যানের মধ্যে এই মনোহর সমাধিমন্দির আগাগোড়া শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং কথিত আছে যে, বিশ হাজার কারিগর বিশ বৎসর একাদিক্রমে কার্য্য করিয়া এই মর্ম্মর-মন্দির ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত করিয়াছিল। কত শত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আজও ইহা নূতন বলিয়া ভ্রম হয়। মনে হয়, যেন অল্পদিন পূর্ব্বে কেহ ইহার নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত করিয়াছে। সাজাহানের 'মর্ম্মরে গঠিত স্বপ্নপুঞ্জ' নির্ম্মাণ করাইতে ছয় কোটী টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

আগ্রার দুর্গ হইতে এক মাইল দক্ষিণে যমুনা নদীর উপরে তাজমহল অবস্থিত। বাহির হইতে প্রবেশ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে বিরাট তোরণ-দ্বারের মধ্য দিয়া বিস্তৃত উদ্যান অতিক্রম করিলে তবে তাজমহলের নিকট পৌঁছান যাইবে উদ্যানের সম্মুখস্থ প্রবেশপথটী একটী সুবৃহৎ ত্রিতল অট্টালিকা, এবং উহার উচ্চতা দেড় শত ফিটের অধিক। দুইশত এগার ফিট প্রশস্ত চতুষ্কোণ শ্বেতপ্রস্তরের পিঠের উপর এই প্রবেশপথ প্রতিষ্ঠিত। অট্টালিকার দৈর্ঘ্য একশত সতের ফিট এবং প্রস্থ একশত ফিট। ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে এই প্রবেশপথের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয় এবং ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত হয়। তোরণ-দ্বারটী রক্তবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মাণ করিতে দশ লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় হইয়াছিল।

তাজমহলের প্রবেশপথ অতিক্রম করিলেই সম্মুখে বিরাট পুষ্পোদ্যান; তাহার যে কি শোভা ভাষায় তাহা ব্যক্ত করা যায় না। সম্মুখে প্রশস্ত বাঁধা রাস্তা, দুই ধারে জলপ্রণালী—তাহার মধ্যস্থলে শ্বেত প্রস্তরের চুয়াল্লিশ ফিট একটী চৌবাচ্চা, তন্মধ্যস্থিত পাঁচটী ফোয়ারা হইতে

জল অবিরাম নির্গত হইতেছে। তাহার চতুষ্পার্শ্বে মল্লিকা, যুথী, ঝাঁতি, গোলাপ, চামেলি, গাঁদা, বেল প্রভৃতি কত শত সুগন্ধযুক্ত ফুলের দ্বারা যে পুষ্পোদ্যান সুশোভিত, তাহা লিখিয়া বুঝান অসম্ভব। এতদ্ব্যতীত স্থানে স্থানে মেরাপ বাঁধিয়া রাধালতা, ঝুমকালতা, মালতীলতা, কলমীলতা, লবঙ্গলতা, মাধবীলতার কুঞ্জ উদ্যানকে যেন নন্দনকাননে পরিণত করিয়াছে। সুরম্য সুগন্ধযুক্ত উদ্যানের চারিদিকের পথগুলি প্রস্তর দিয়া বাঁধান, তাহার দুই ধারের নালাগুলি জলপূর্ণ থাকায় সকল সময়েতেই পুষ্পোদ্যানটী সুশীতল হইয়া আছে। উৎকণ্ঠিত, বিরহান্বিত এবং শোকাতুর ব্যক্তিগণের মনপ্রাণ সুশীতল করিবার ইহা যে একটী মনোরম স্থান—তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

সাজাহানের কন্যা জাহানারা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত জুম্মা মসজিদ
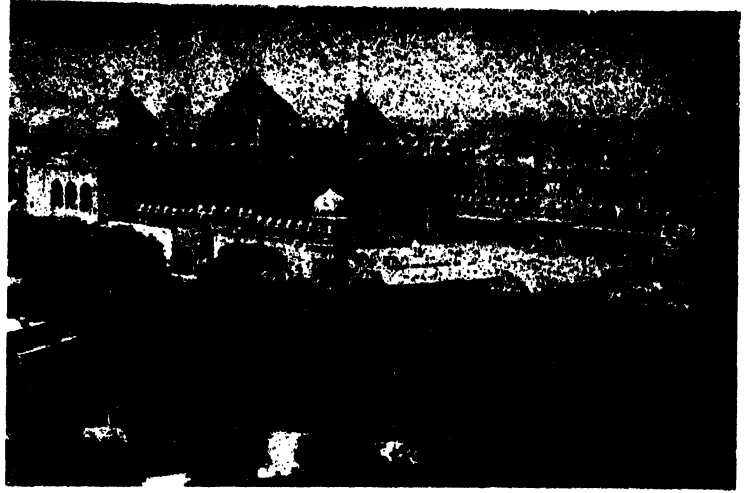
পুষ্পোদ্যানের দুই পার্শ্বে আম, তাল, খেজুর, তেঁতুল, আমড়া, চালতা, বট, অশ্বত্থ, বকুল, চন্দন, পেঁপে, বাদাম, নাসপাতি, আতা, পেয়ারা, আঙ্গুর, বেদানা, লেবু প্রভৃতি কত শত পুরাতন বৃক্ষ যে উদ্যানের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। প্রত্যেকটী ফল ও ফুলের বৃক্ষ এরূপ যত্ন সহকারে সাজান হইয়াছে যে দেখিলে বিস্মিত হইয়া যাইতে হয়, মনে হয় যেন কোন চিত্রকর উদ্যানের উপর তুলি দিয়া এইগুলি আঁকিয়া পরে তাহাদের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

উল্লিখিত বিচিত্র উদ্যানের মধ্যে মমতাজ বেগমের পৃথিবীখ্যাত সমাধি-মন্দির "তাজমহল" অবস্থিত। ভূমি হইতে দশ ফিট উচ্চ শ্বেত-প্রস্তরে বাঁধান একটী প্রশস্ত চতুষ্কোণ পীঠ: তাহার চারি কোণে চারিটী উচ্চ স্তম্ভ এবং পীঠের মধ্যস্থলে তাজমহলের অপূর্ব্ব গম্বুজ নীরব নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া আছে। প্রস্তরের ফল, পাতা, শিকড় যাহার যেরূপ রং ঠিক সেইরূপ খোদিত প্রস্তরের অপূর্ব্ব কারুকার্য্য কেবল যে তাজমহলের শোভা-বর্দ্ধন করিয়াছে তাহা নহে, ভারতের ভাস্কর্য্য-শিল্প সপ্তদশ শতাব্দীতে যে কিরূপ উন্নত ছিল এইগুলিই তাহার জলন্ত নিদর্শন। সমাধির চতুর্দ্দিকের দেওয়ালে শ্বেত প্রস্তরের উপর লাল, নীল, গোলাপী, আশমানী, পীত, সবুজ প্রভৃতি বিভিন্ন রঙ্গের প্রস্তর দিয়া বৃক্ষ, লতা, পাতা, ফুল, ফল খোদিত করিয়া যাহার সত্যিকারের যে রং, ঠিক সেই রঙ্গের পাথর ভিতরে বসাইয়া, এরূপ ভাবে মিলান হইয়াছে, যে মনে হয় যেন একখানি পাথরের উপর রঙ্গের খেলা হইতেছে। যে সমস্ত ভারতীয় নিপুণ ভাস্করবৃন্দ এই কোমল, লীলায়িত চিত্রগুলি অঙ্কন করিয়াছেন তাঁহারা যে ভাস্কর্য-শিল্পে কিরূপ পটু ছিলেন তাহা চিন্তা করিলে আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে হয়।

আগ্রা দুর্গের মধ্যস্থিত-আঙ্গুরীবাগের দৃশ্য

তাজমহলের গম্বুজ দুইশত কুড়ি ফিট উচ্চ; গম্বুজের নীচের দেউলে বহুমূল্য রত্ন বসান আছে। মধ্যস্থলে উজ্জ্বল শ্বেত-প্রস্তরের সমাধি পাথরের রেলিং দিয়া ঘেরা নিস্তব্ধতার

আগ্রা দুর্গের মধ্যস্থিত 'সমন-রুজ'

মধ্যে বিরাজ করিতেছে। উপরের সমাধিটী কৃত্রিম; সম্মুখদ্বারের পাশ দিয়া নিম্নে নামিয়া প্রকৃত সমাধিটী দেখিতে হয়। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ সাজাহান পরলোকগমন করিলে, তাঁহাকেও মমতাজের পার্শ্বে সমাহিত করা
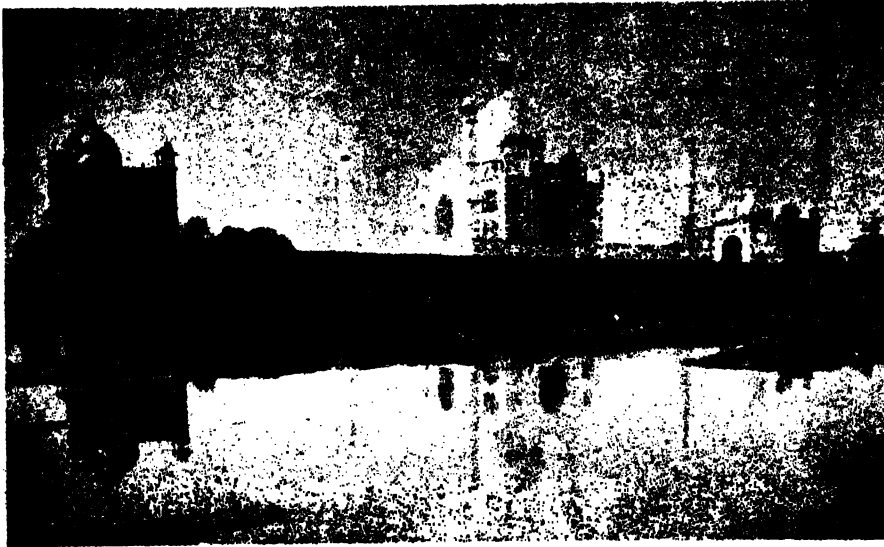
যমুনা হইতে ভুবন-বিখ্যাত তাজমহলের দৃশ্য

হয়। নিম্নে দুইটী সমাধি পাশাপাশি একত্র দেখিয়া মনে হয়, সম্রাট্ যেন প্রণয়সিন্ধুতে ডুবিয়া, প্রাণের সঙ্গে প্রাণ দিয়া, দুই জনে এক ঘুমে ঘুমাইয়া আছেন। কঠিন শ্বেত প্রস্তরের গাত্রে যন্ত্রের প্রতি আঘাতে ভাবুক শিল্পী তাঁহার লীলায়িত রেখাপাতে এই ভাবটী যেন মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছে। ভাস্কর সম্রাটের মর্ম্মের বিরহ-স্পর্শ তাজমহলের গাত্রে এরূপভাবে লেপিয়া দিয়াছে যে আজও তাহা দর্শন করিলে দর্শককে উদ্‌ভ্রান্ত ও বিষাদিত হইতে হয়।

তাজমহলের চারি কোণে শ্বেত প্রস্তরের চারিটী স্তম্ভ আছে, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সম্মুখের দুইটী স্তম্ভের মধ্যস্থিত সোপান দ্বারা উপরে উঠিলে সমগ্র আগ্রা সহরটিকে বেশ সুন্দরভাবে দেখিতে পাওয়া যায়।

সম্রাট্ সাজাহানের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত আগ্রা খুবই সমৃদ্ধ ও জনাকীর্ণ ছিল, কিন্তু তাঁহার পরলোকগমনের পর তাঁহার পুত্র সম্রাট্ আওরঙ্গজেব দিল্লীতে অবস্থান করিবার ফলে আগ্রার পতন হইতে আরম্ভ হয়। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে আগ্রা গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়ার হস্তগত হয়, কিন্তু পরশেষে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড লেক আগ্রাকে ইংরাজদের অধিকারভুক্ত করিয়া লন।

প্রাচীনকাল হইতে বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণ বৃন্দাবনে তীর্থ করিবার পথে এই স্থানে আসিতেন এবং বহু বাঙ্গালী সেইজন্য এই স্থানে বসবাস করেন। ১২৬৩ সালে স্বর্গীয় যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় ভারতের যাবতীয় তীর্থগুলি পর্য্যটন করিয়া 'তীর্থ-ভ্রমণ' শীর্ষক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের এক বৎসর পূর্ব্বে তিনি আগ্রা দর্শন করিয়া উক্ত পুস্তকে লিখিয়াছেন—

"আগরা সহরে বাঙ্গালী প্রায় পাঁচ শত আছে, সকলেই বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে আছে, বেকার কেহ নাই। আগরা

কলেজে লিখনপঠন হইতেছে, কিন্তু হিন্দু কলেজ কি হুগলী কলেজের তুল্য কোন কলেজ নাই। এখানে সাহেব লোক আছে।"

সিপাহী বিদ্রোহের পর আগ্রাতে বহু বাঙ্গালীর আবির্ভাব হয়। মহাত্মা কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারীর প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ী এবং আগ্রা বেঙ্গলী লাইব্রেরী বাঙ্গালীর বিশেষ আদরের জিনিষ। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী হুগলী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চিরকুমার ছিলেন। শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভারতের শক্তি-উপাসনার প্রধান প্রধান স্থানসমূহে পরিভ্রমণ ও তপঃসাধনা করেন। আরাবল্লী পর্ব্বতশিখরে এবং বারাণসী ধামে তাঁহার আশ্রম ছিল। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া পাঞ্জাব, রাজপুতানা, হিমালয়, আগ্রা, অযোধ্যা ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে তিনি বত্রিশটি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কালীবাড়ী নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় পাঞ্জাব প্রদেশে কালীভক্তি বিশেষ প্রসার লাভ করে। তাঁহার চেষ্টায় বাঙ্গালীর প্রবাসবাস বিশেষ সুগম হয়। পরিব্রাজক কৃষ্ণানন্দ বলিয়া তিনি ভারতের সর্ব্বত্র পরিচিত ছিলেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে এই মহাত্মা দেহরক্ষা করেন।

ডাক্তার নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী চিকিৎসাবিদ্যায় আগ্রায় এরূপ পারদর্শিতা ও সুনাম অর্জ্জন করেন যে, রাজপুতানার সমস্ত রাজন্যবর্গ তাঁহার চিকিৎসাধীন হইতে বিশেষ উৎসুক হইতেন। তাঁহার এরূপ বাঙ্গালীপ্রীতি ছিল যে কখনও কোন বাঙ্গালীর নিকট হইতে তিনি পারিশ্রমিক বা ঔষধের দাম লইতেন না। তাঁহার পরেই ডাক্তার দয়ালচন্দ্র সোমের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, নেপাল, পাটনা তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র ছিল। প্রবাসে থাকিয়া তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করেন। তিনি ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে চুঁচড়ার প্রসিদ্ধ সোমবংশে জন্মগ্রহণ করেন। গৃহে অধ্যয়ন করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং পরে কলিকাতার মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া এম্-বি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ধাত্রীবিদ্যায় তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। আগ্রা মেডিকেল স্কুলে তিনি অধ্যাপনা করিতেন, পরে কলিকাতা ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে যোগদান করেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি 'রায় বাহাদুর' উপাধি পাইয়াছিলেন। তাঁহার পর ডাক্তার গিরিশচন্দ্র মিত্র আগ্রায় আসিয়া বিশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন।

আন্দুলের যমুনাদাস বিশ্বাস মহাশয় আগ্রায় একজন সর্ব্বজনমান্য ও সমাজে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি "আগ্রা নসীম" নামে একখানি উর্দ্দু সংবাদপত্র বাহির করিয়াছিলেন। তিনিও বাঙ্গালীপ্রীতির জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এতদ্ভিন্ন "যমুনালহরীর" কবি গোবিন্দচন্দ্র একসময় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হিসাবে খুব প্রতিপত্তি লাভ করেন। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার হিসাবে কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়ও বিশেষ সুনাম অর্জ্জন
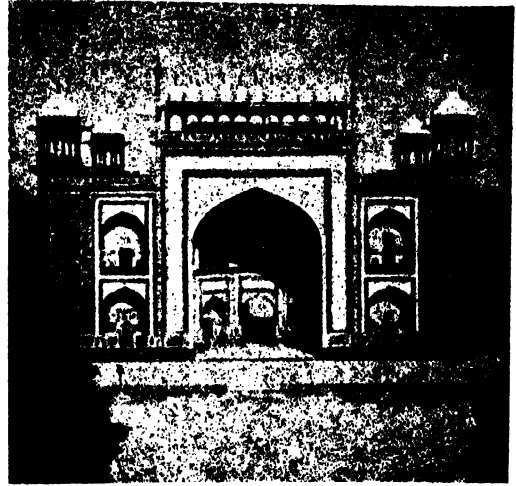
তাজমহলের প্রবেশপথের সম্মুখস্থ তোরণদ্বার

করেন; রাজপুতানার বহু রাজন্যবৃন্দের তিনি চিকিৎসা করিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনের পর তাঁহার পুত্র ডাঃ সুকুমার বন্দোপাধ্যায়ও পিতার ব্যবসায় গ্রহণ করিয়া আগ্রায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি অবিনাশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার জীবনের বহু সময় এইস্থানে অতিবাহিত করেন; উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে আর কোন

তাজমহলের সম্মুখস্থ পুষ্পোদ্যান

বাঙ্গালী বোধ হয় তাঁহার মত এত সর্ব্বজনপ্রিয় ও সর্ব্বশ্রেণীর শ্রদ্ধাভাজন হন নাই।

সৈনিক

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

ভোরের আকাশে তখনও রাত্রির মোহাঞ্জন লাগিয়া আছে। উদয় সূর্য্যের রক্তিম আভায় ধীরে ধীরে নিদ্রা ভাঙিতেছে পৃথিবীর। ক্ষুধিত পৃথিবী। জাগিয়া উঠিয়াছে কুলী, মজুর, ঘুঁটেওয়ালী আর মাসোহারী জলওয়ালা। নিদ্রিত পৃথিবীর দুয়ারে প্রতিদিন প্রত্যাসন্ন প্রভাতীর সুর শোনায় তাহারাই। উপরে দেবদারুর উচ্চ শাখায় পক্ষবিধূননে কলরব করিয়া ওঠে ঘুম-কাতর পাখীগুলো।

পশ্চিমের ইতিহাস প্রসিদ্ধ একটি সহর।

সেণ্ট্রাল জেলের সদর দুয়ারে হাবিলদারের হাতে বেল বাজিয়া ওঠে—এক, দুই, তিন, চার, তারপর আরও জোরে, আরও কর্ণবিদারী শব্দে—পাঁচ। সেই মুহূর্ত্তে জেলের আরও নিভৃত অন্দরে ফাঁসিমঞ্চে স্থির দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া আছেন পরাধীন ভারতের একজন মুক্তিসেনা। ভারতের ভাগ্যবিধাতার কাছে একবার শেষবারের মতো প্রার্থনা জানাইলেন: হে সত্যদ্রষ্টা, হে নিপীড়িত চল্লিশ কোটি মানবের পরম পিতা, স্বাধীন ভারতের বাণী শোনাও, অগ্নিমন্ত্র দীক্ষা দাও ভারতের কোটি কোটি নির্যাতিত প্রাণকে।

পাশে ডাক্তার, সার্জেন্ট আর ডোম। আত্মীয়দের অপেক্ষা নাই, অপেক্ষা নাই কোনো প্রাণের দাবীর।—হঠাৎ পায়ের নিচে হইতে জোড়া কাঠ সরিয়া গেল। ফাঁসির ধারালো দড়িতে মুহূর্ত্তে সমস্ত দেহটা ঝুলিয়া গেল বায়বীয় শূন্যতায়। ভারতের মুক্তিসেনার জন্ম প্রস্তুত ছিল এই মৃত্যু—সভ্যতার অগস্ত্য প্রতীক এই ফাঁসির দড়ি।

পরদিন কাগজে কাগজে ইউ. পি. সংবাদ দিল:

আগষ্ট বিপ্লব সম্পর্কে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত শ্রীযুক্ত গণপতি পাণ্ডের গত ১০ই নভেম্বর সকাল পাঁচ ঘটিকায় ফাঁসি হইয়া গিয়াছে।...

চোখ দুইটি একবার ঝল্‌সিয়া উঠিল শ্রীমন্তের, দুর দুর করিয়া উঠিল বুকের ভিতরটা। সামনের টেবিলে খোলা পড়িয়া আছে কাগজখানা: দুই আনায় আট পৃষ্ঠার কাগজ। তিনের পৃষ্ঠায় রৌদ্রদগ্ধ মরুভূমির মতো জ্বালাময় হেড্‌-এ মৃত্যু ঘোষণা গণপতি পাণ্ডের। সেইদিকে দৃষ্টি রাখিয়াই সহসা একবার ব্যথাদীর্ণ কণ্ঠে শ্রীমন্ত উচ্চারণ করিয়া উঠিল: 'হাউ টেরিব্‌ল কিলিং'।

সাথে সাথে দুই তিন জোড়া চোখ সচকিত হইয়া উঠিল শ্রীমন্তের দিকে। বাঁপাশের 'কাউণ্টার'-এ বসিয়া ক্যাস মিলাইতেছিল এ্যাকাউণ্টেণ্ট, সামনে উইথড্রয়াল ফর্ম্ম হাতে পাটগুদামের আধা বয়সী কর্ম্মচারী; দক্ষিণের চেয়ারে বসিয়া সিগারেট টানিতেছিল ম্যানেজার। মাস কয়েক হইল কলিকাতার কি একটা নতুন ব্যাঙ্কের এই ব্রাঞ্চ বসিয়াছে এইখানে, চন্দ্রগড়িয়ার এই অন্দরে। ম্যানেজার, ক্যাস-এ্যাকাউণ্টেণ্ট, সাধারণ ক্লার্ক একজন আর দরোয়ান। ব্যাঙ্কের উপরে বিশেষ কোনো বিপদ আসিলে লাঠি ঠুকিয়া আসিয়া দাঁড়াইতে পারে মাদারীপুরের সদর পুলিশ।

কণ্ঠের উপরে বিশেষ রকম জোর দিয়া আর একবার উচ্চারণ করিল শ্রীমন্ত: "হাউ টেরিব্‌ল্—"

আপটুডেট সাজসরঞ্জামী ম্যানেজার নিখিল ব্রহ্ম, সচকিত দৃষ্টিতে সহসা কতকটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়া বসিল: "কি, কি ব্যাপার, আই-এন-এর নতুন কিছু হোলো?"

বিষয়টা নিখিল ব্রহ্মের পক্ষে ভাবা কিছু অস্বাভাবিক নয়। কাগজপত্র-গুলিতে আজাদ-হিন্দ্‌ ফৌজের মুক্তিসৈন্যদের বিচার লইয়া আজকাল যে-ভাবে আন্দোলন চলিয়াছে, মুক্তিপ্রয়াসী ভারতবাসী প্রত্যেকের মনেই তাহা প্রতিমুহূর্ত্তের আতঙ্ক, প্রতিমুহূর্ত্তের দুঃসহ চিন্তা।

কিন্তু শ্রীমন্তের মন শুধু আতঙ্কে আলোড়িত নয়, অনবদমিত কঠিন বিদ্রোহে জ্বলন্ত। গণপতির মতই তো লক্ষ লক্ষ আত্মত্যাগী সেনার অসাম্প্রদায়িক ঐক্যসাধনায় গড়িয়া উঠিয়াছিল এই আজাদ-হিন্দ দল। হিন্দুস্থানের সেই আজাদ, সেই মুক্তির দিন কবে?

কাগজখানি আগাইয়া ধরিল শ্রীমন্ত নিখিল ব্রহ্মের দিকে: "মিথ্যা কি, সুদূর প্রাচ্যে না গিয়েও বাংলার গভীর প্রত্যন্তে থেকেও যে জাতীয় সৈন্যের ব্রত পালন করেছে, সেই বা আই-এন-এ-র না কেন? কিন্তু শেষ হয়ে গেল, তার জন্যে বাংলার জনমতের অপেক্ষা রইল না, প্রীভিকাউন্সিলে আপিল উঠল, সাথে সাথে রায় বেরিয়ে গেল—শেষ নির্ব্বাচন ফাঁসী। হাউ টেরিব্‌ল, ইউ সি।"

এ্যাস্ট্রের মুখে বার কয়েক হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা ঠুকিয়া নিল নিখিল ব্রহ্ম: "কিন্তু সরকারী রিপোর্ট তো সে কথা বলে না। বড় রকমের কালপ্রিট ছিলেন মিঃ পাণ্ডে। তাঁর বিরুদ্ধে রীতিমত গুণ্ডামির চার্জ্জ আনা হয়েছে।"

কথা শুনিয়া অস্বাভাবিক জোরে অদ্ভুত রকমের একবার বিকৃত হাসি হাসিয়া উঠিল শ্রীমন্ত, তারপর মুষ্টিবদ্ধ হাতে সজোরে একবার টেবিলের উপর আঘাত করিয়া দৃপ্ত কণ্ঠে বলিল, "জানেন, এই নীতির উপরেই আমরা আজ বাসা বেঁধে আছি। দেশের মুক্তি-সংগ্রামে যারা অসহযোগ করলো, যারা মানলো না প্রচলিত আইনকে, তারাই হোলো গুণ্ডা, প্রাণদণ্ড তাদেরই জন্যে, আর—"

হঠাৎ বাধা দিল নিখিল ব্রহ্ম: "আপনি অকারণে উত্তেজিত হ'য়ে প'ড়ছেন। বুঝতে পারছি, মিঃ পাণ্ডের মৃত্যু আপনার মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করেছে কিন্তু তার জন্যে উত্তেজিত হ'লে তো চলবে না। আর ধরুণ, আমরা কিই বা করতে পারি? চক্রব্যূহের মধ্যে দাঁড়িয়ে এমন কি শক্তি আছে আমাদের, যার জোরে অন্ততঃ কিছুটাও আমরা এগিয়ে যেতে পারি! বিধাতার বর নিয়ে যার রক্ষা ক'রছেন শক্তিধর জয়দ্রথ।"

চোখের গাঢ় দৃষ্টিকে ঈষৎ সঙ্কুচিত করিয়া আনিল শ্রীমন্ত, তারপর ম্যানেজারের দিকে আরও খানিকটা ঝুঁকিয়া বসিল: "একটা জিনিষ জানবেন মিঃ ব্রহ্ম, ক্ষয় এবং সৃষ্টি—এর বাইরে পৃথিবীর বিজ্ঞান আজও নতুন কিছু দেখাতে পারে নি। অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতে দিতে বিধাতার ক্ষমার পাত্রও একদিন নিঃশেষ হয়ে যায়। চিরদিনই অভিমন্যুরা মরে না, জয়দ্রথেরও ক্ষয় আছে। ক্ষয়শীল পতনমুখী সভ্যতার উপরে তাই নতুন সৃষ্টির অঙ্কুর দেখা দেয় অচিরেই; কিন্তু সেটাও ভুল। একদিন দেখবেন—তারও উপরে নতুন উষার বন্দনা গেয়ে এসেছে ক্ষুধাতুর নরকায় জনগণ। এই হচ্ছে

মিঃ অব্ ইন্তলিউশন। মানুষের সমাজ, কোনো একটি মানুষেরও স্বাধীন সত্তাকে অস্বীকার ক'রে কখনো সামাজিক অনুশাসন চল্‌তে পারে না। এই অন্যায় অনুশাসনের জন্যেই আজ প্রত্যেকটি দেশে কেমন ক'রে জনগণ নড়ে উঠেছে, চেয়ে দেখুন। আপনি কি ব'ল্‌তে চান মিঃ ব্রহ্ম, যে, লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন-বিনিময়েও আমরা এই চক্রব্যূহের দ্বার ঠেলে বেরুতে পারবো না? পাণ্ডের মত নিঃশব্দে যারা শুধু প্রাণ দিয়ে গেল, তার কি কোনো ফলই ফল্‌বে না ব'লে আপনি বিশ্বাস করেন?" ম্যানেজারের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া একবার দম নিল শ্রীমন্ত।

কিন্তু নিখিল ব্রহ্ম সহসা এ কথার কিছু একটা জবাব দিয়া উঠিতে পারিল না। বিমুগ্ধ বিস্ময়ে এতক্ষণ সে নানাভাবে লক্ষ্য করিতেছিল শ্রীমন্তকে। বাস্তবিকই যে আলোচনা এতদূর গড়াইয়া আসিবে, আর শ্রীমন্তের মতো বাহির-হইতে-দেখা নির্বিকার মানুষটির মধ্যে এমন প্রাণবন্ত মতবাদের আভাস পাইবে, কিছুক্ষণ আগে পর্য্যন্তও নিখিল ব্রহ্ম এতটা কল্পনা করিতে পারে নাই। হঠাৎ যেন নিজের কাছেই তার সিগারেটের কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়াকে বড় বিকৃত বলিয়া মনে হইল। অর্দ্ধশূন্য সস্তা সিগারের প্যাকেটটাকে এবারে সে সামনের ড্রয়ারের মধ্যে চাপিয়া দিয়া কতকটা সহজ হইতে চেষ্টা করিল প্রথমে, তারপর ধীরকণ্ঠে কহিল, "এক্স্‌কিউজ্ মিঃ শ্রীমন্ত বাবু, আমার হয়ত মনে করা ভুল হবে না যে, আপনি কংগ্রেসের লোক। যে স্পিরিট আপনার মধ্যে আছে, তাকে বিকাশের পথ দেবার দরকার। এ কথা ব'ল্‌বো না যে, আমিও দেশের পূর্ণ স্বাধীনতাকামী নই, কিন্তু নিজের মেরিটের উপরে আমার বিশ্বাস নেই। এত দিন আমাদের ব্যাঙ্কের শুধু শুভার্থী ব'লেই আপনাকে জানতুম, কিন্তু সদাকারের গোটা মানুষটার প্রকৃত পরিচয় পেতে আরম্ভ করলাম আজ। এতদিন ছিল প্রীতির সম্বন্ধ, আজ তার সাথে শ্রদ্ধাও না জানিয়ে পারছি না।"

"শ্রদ্ধার কথা থাক।" অনুকূল অবস্থার মধ্যে শ্রীমন্ত আবার সুরু করিল, "কিন্তু সত্যিই কি আমি কংগ্রেসের লোক হলে আপনি বেশী খুসী হন। দেশের দিকে একবার যদি ভাল করে লক্ষ্য করেন, তবে দেখবেন, কংগ্রেসের টিকিট না নিয়েও মনে প্রাণে আজ সবাই-ই কংগ্রেসী। কংগ্রেসের এই দীর্ঘ জীবনের আদর্শ, নিষ্ঠা আর ত্যাগের কাছে নতশির প্রত্যেকেই। দল স্বাতন্ত্র্য যারা আজ চারপাশে ছড়িয়ে আছে, বড় বেশী পৃথক সত্ত্বায় তারা বিচ্ছিন্ন নয়, শুধু নামে।"

ও পাশের 'কাউণ্টার' হইতে এতক্ষণ ক্যাস ফেলিয়া হা করিয়া কথা গিলিতেছিল এ্যাকাউণ্টেণ্ট ব্রজবিহারী, এবারে সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "একজ্যাক্ট্‌লি সো, খাঁটি কথা বলেছেন শ্রীমন্ত বাবু।"

আরও অনেকটা ঘন হইয়া বসিল শ্রীমন্ত, ব্রজবিহারীর দিকে একবার দৃষ্টি ঘুরাইয়া লইয়া কহিল, "আমি লজ্জিত মিঃ ব্রহ্ম যে, আজও আমি কংগ্রেসে নাম লেখাবার সুযোগ পাই নি। কিন্তু সেইটেই বড় কথা নয়। সমস্ত দেশটাই আজ কংগ্রেস, তাকে অনুসরণ ক'রে যাওয়াই তার কাজ করা। বৃহত্তর বল্‌শেভিক দলের কাছে ক্ষীণকায় মেনশেভিষ্টদের অস্তিত্ব একদিন লোপ পেয়েছিল। আমাদের মুক্তিসাধক জাতীয় কংগ্রেসের সাথেও ধীরে ধীরে একদিন ক্ষীণসম্প্রদায়গুলি এসে মিলে যাবে। সেই জন-সমুদ্রের ঢেউকে কি কল্পনা করতে পারেন মিঃ ব্রহ্ম? আজাদ-হিন্দ আজ এক নতুন জীবন-স্রোত এনে দিয়েছে কংগ্রেসকে।"

"কিন্তু আমার কথার তো জবাব পেলাম না শ্রীমন্ত বাবু?" ক্ষীণ একটা হাসির আভাস দেখা দিল এতক্ষণে নিখিল ব্রহ্মের ঠোঁটে: 'জীবন অনিশ্চিত, হেড আপিস থেকে ট্রান্সফার নোটিশ এলেই কবে না জানি ছুটতে হবে আবার ক'লকাতায়! পরিচয়ের আভাস দিয়েই কি ঔৎসুক্য বন্ধ করে দেবেন? আমাদের এই বন্ধুত্বকে আরও খানিকটা পাকা করতে বাধা কি?"

স্বর অনেকখানি নামিয়া আসিয়াছিল এতক্ষণে শ্রীমন্তের। গভীর উত্তেজনার সাথে আকস্মিক একটা বিনয়ের সংমিশ্রণে এবারে অদ্ভুত এক-রকমের আভা ফুটিয়া উঠিল শ্রীমন্তের মুখে। বলিল: "জীবনে এমন কোনো বড় কাজ করিনি—যার পরিচয়ে মানুষের সামনে মুখ তুলে দাঁড়াতে পারি। এই তো বড় পরিচয়, আপনার ব্যাঙ্কের জন্যে ডিপোজিটারদের হাত ক'রছি, খেতে পারছি দু'বেলা পেট ভ'রে, বেঁচে থাক্‌বার মতো এর চাইতে বড় পরিচয় আর কি আছে?"

কিন্তু নিখিল ব্রহ্ম এইটুকুতেই খুসী নয়। ইতিমধ্যেই সে যেন গভীর অথচ অজ্ঞাত কি একটা বিচিত্র জীবন-স্রোত লক্ষ্য করিয়াছে শ্রীমন্তের মধ্যে। মাস কয়েকের পরিচয় মাত্র। নিখিল ব্রহ্ম কচিৎ কখনও অন্যমনস্কতার মধ্যেও স্পষ্ট লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছে—কোনো এক ক্ষেত্রেও বস্তুবিমুখতায় স্থির নয় শ্রীমন্ত। কখনও পুরানো কাগজের কাটিং লইয়া গভীর মনযোগে কি সব নোট করিতেছে, কখনও বা দুপুরের ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্রের মধ্যেই ছুটিয়া যাইতেছে চষা মাটির পথ ধরিয়া দূর চাষী-পাড়ার দিকে। শ্রীমন্তই জানে, তার কাজের সমুদ্র কোথায় যাইয়া কুল পায়; নিখিল ব্রহ্ম সে-সমুদ্র মন্থন করিয়া কিছু একটা জলজ ইতিহাসও আবিষ্কার করিতে পারে নাই। আজ যেন অনুসন্ধিৎসা তার একটু বড় বেশীই দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে।

অথচ শ্রীমন্ত স্পষ্ট একথা বলিতে পারে না যে, সে পলাতক; এখানে পুলিশ আর চৌকিদারের চোখের সামনে দিয়া অনবরতঃ এই সারা বন্দরটা প্রদক্ষিণ করিলেও নিজের স্বরূপের কাছে সে একেবারে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। যখনই এই নামের উপর হইতে আবরণ সরিয়া যাইবে, এক মুহূর্ত্তের জন্যও সে ক্ষমা পাইবে না পুলিসের কাছে; সোজা মাদারীপুর থানা, তারপর সদর। তারপর প্রেসিডেন্সী, দমদম, আলিপুর কিম্বা মধ্য ভারতের আরও হয়ত কোনো সুরক্ষিত জেল।

কতকটা গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সাথে ভাসা ভাসা দৃষ্টি তুলিয়া ধরিল নিখিল ব্রহ্ম শ্রীমন্তের চোখের 'পরে: "আপনি কোথায় যেন সত্যিই নিজেকে লুকিয়ে যাচ্ছেন! এটা ঠিক আশাপ্রদ নয়।"

ক্ষীণ একবার হাসিল শ্রীমন্ত: "কিন্তু আশা মানুষকে মরীচিকায় দগ্ধ করে, জানেন তো? ইংরেজের এই জড় সভ্যতা মানুষকে দেখাতে শিখিয়েছে বাইরের থেকে, অন্দর মহল সেখানে একেবারে ঢাকা। কবাট একবার খুলে দিলে কি শেষটায় ঘরে আর স্থান দেবেন?"

সহসা জিহ্বায় একবার কামড় দিল নিখিল ব্রহ্ম: ছিঃ, ছিঃ, কি যে বলেন,—একথা আপনার মনে কেন আসে? চরমুগরিয়ার মতো এই বন্দরে যেখানে শুধু পাটের গুদামী কারবার, চালের ট্রান্‌স্‌পোর্টেশন ভিন্ন স্বাভাবিক সৌজন্যতার এতটুকুও পরিবেশ নেই, সেখানে আপনি যে আমাদের কতবড় বন্ধু হ'য়ে আছেন, তা আপনি জানতে পারছেন না।"

উত্তর দিতে গিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল শ্রীমন্ত। জড়বাদে আত্মসুখবোধ—মানুষের বস্তু-মনুসংহিতার কথাই তো! কিন্তু সেই দিকে মন যেন বড় বেশী সাড়া দিল না শ্রীমন্তের। একটা খণ্ডকালের জ্বলন্ত ইতিহাস যেন প্রতি-মুহূর্ত্তের মতই আর একবার বড় স্পষ্ট ভাবে জাগিয়া উঠিল তার চোখের সামনে!

উনিশ শ' বিয়াল্লিশ।—দাউ দাউ করিয়া আগুন উঠিয়াছে; পাশে বি, এ রেলওয়ের ডব্‌ল্ লাইন পূব-পশ্চিমে প্রসারিত, এপাশে ওপাশে বিস্তৃত ছাড়া-মাঠের মধ্যে ছোট্ট ষ্টেশন। সরকারী পরওয়ানায় দপ্তর আছে জমিদারী সেরেস্তার সাথে আরও অনেকটা ভিতরে—বাজারের দিকে। রাত্রের শেষ ট্রেণ ষ্টেশন ছাড়িয়া গিয়াছে দশটায়। ওপাশে ষ্টেশন মাষ্টারের খড়ের চালায় সঙ্কীর্ণ বাংলো। বাহির হইতেও কান পাতিয়া শোনা যায়—বড় ষ্টেশন ঘরের বড় ঘড়িটার টিক্ টিক্ শব্দ। অদৃশ্য চোখে মিনিটের পর মিনিটের কাঁটা ঘুরিয়া আসে, ক্রমিক সংখ্যায় যেন বাজে—এগারো, বারো, এক—।

আগষ্টের নিশুতি নিস্তব্ধ রাত্রি। ষ্টেশন মাষ্টারের বাংলোয় ঘুমের গাঢ়তা। ওদিকটায় আধোঅন্ধকারে একেবারে খাঁ খাঁ করিতেছে জমিদার-সেরেস্তায় গায়ে সরকারী পরওয়ানার দপ্তর। গুপ্ত ঘাতকের মতো একদল অশরীরী ছায়া শব্দহীন পদসঞ্চারে একবার সেই ভূমি-সীমা প্রদক্ষিণ করিয়া গেল। ঘুমন্ত নিথর কালো রাত্রি। তার প্রতিটি পর্দ্দায় যেন এক একবার ধমনীর রক্তচাপের মত কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে প্রহরগুলি।—বড় ক্লকটায় আর একবার বেলের শব্দ শোনা গেল: দেড়টা—ঘুমন্ত গ্রামের নিস্তব্ধ রাত্রির দেড়টা।—হঠাৎ দেখা গেল দাউ দাউ করিয়া আগুন উঠিয়াছে, সহস্র শিখায় ঠেলিয়া উঠিয়াছে আগুন আকাশের দিকে। দেখিতে দেখিতে ঘুমভাঙা সচকিত চীৎকারে আবার ভরিয়া উঠিল বাংলোটা। ওদিক হইতে সারা বাজারের লোক মোটঘাট জিনিষ-পত্র সরাইতে সরাইতে সারা গ্রামখানিই একরকম অগ্নিকাণ্ডের সামনে আসিয়া ভাঙিয়া পড়িল।—এর প্রধান হোতা মথুর দত্ত তাহার দল লইয়া তৎক্ষণে পায়ে হাঁটিয়া একেবারে গা ঢাকা দিয়াছে পাশের গ্রামে।...

কিন্তু ঘটনার প্রায় মাঝের স্তর এটা। মথুর দত্তের আরও কিছুটা বিশেষ রকমের মরমী ইতিহাস আছে গোড়ার দিকে। কোনো একটা মুহূর্ত্তকেও মনে করিতে ভুল করিল না শ্রীমন্ত।—

ষ্টেশনের পিছনে বিস্তৃত কাঁচা সড়ক ক্রোশখানেক উত্তরে যাইয়া খালের সঙ্গে মিশিয়াছে। সেইখানেই সঙ্কীর্ণ 'হাউলি' পাড়া বারোখাদা। এককালে হাঁটা-পথে খাদ ছিল বারোটাই, এখন অবিশ্রান্ত বর্ষায় ধ্বসিয়া খাদের সংখ্যা আরও বাড়িয়াছে। গ্রামের বুদ্ধিজীবী বানিয়াদিদের এই পাড়াতেই বাস। পাল-পার্ব্বণ এটা ওটা আছেই।—সেবার রথের মেলার দিনে হঠাৎ মথুর দত্তের সঙ্গে কি একটা সূত্রে পরিচয় হইয়া গেল সৌদামিনীর। সুন্দর ঝকঝকে সহরে ভাব, পরিচ্ছন্ন রুচি। হাসে যখন সৌদামিনী—তার চঞ্চল স্বপ্নাতুর আবেগের মধ্যেও বিশেষভাবে লক্ষ্যে পড়ে সচকিত একটা বিদ্যুতাভা।—ভাল লাগিল মথুর দত্তের।

এমনিতর একটা হাসির মুহূর্ত্তেই অতর্কিতে একদিন অদ্ভুত রকমের একটা প্রশ্ন তুলিয়া ধরিল সে সৌদামিনীর কাছে।—"তোমার কি মনে হয় এ সম্বন্ধে ?"

সৌদামিনীর চোখে দৃঢ়তা ও বিস্ময়।—"সম্বন্ধ কিছু একটা জানতে পারি, তবে তো মনে ক'রবো ?

"এই যে দেশ জুড়ে এত অনাসৃষ্টি, হাহাকার, দারিদ্র্য।" কিছুটা জোর দিল কণ্ঠস্বরের উপর মথুর দত্ত: "কেন ভারতবর্ষের এমনিতর মৃত্যু, বলতে পারো সৌদামিনী ?"

পাতলা ঠোঁটে স্বাভাবিক হাসি টানিয়াই সৌদামিনী অত্যন্ত সংক্ষেপে জবাব দিল: "পরাধীনতা ?"

অনেকখানি কাছাকাছি আসিয়া বসিল এবারে মথুর দত্ত।—"এই মরা হাড়ে আমরা কি আর স্বাধীন সূর্য্যের তাপ ফিরে পাবো না ? সুখের অন্ন কি আর স্বস্তির সাথে মুখে নিতে পারবো না সৌদামিনী ?"

"এত আশাহীন, দুর্ব্বল আর কাপুরুষ তুমি, তা তো জানতুম না ?" হাসিতে যেন একবার বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল সৌদামিনীর।—"শ্রীকৃষ্ণের দেশ এটা জানতো ? দুর্য্যোধনের কুরু-রাজত্ব খুব বেশী দিন স্থায়ী ছিল ব'লে কি মহাভারতকার কোথাও ইঙ্গিত ক'রেছেন ? জানো না, কবি সেই যে গেয়ে গেছেন—'ভারত আবার জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে'; আজ হোক কাল হোক্, এ আসন সে নেবেই।"

নতুন প্রশ্ন তুলিতে যেন হঠাৎ ভুলিয়া গেল মথুর দত্ত। ভাল লাগিতেছিল তার সৌদামিনীর কথাগুলিকে, ভাল লাগিতেছিল তার গভীর মতবাদকে এমন সহজভাবে প্রকাশ করিবার ভঙ্গিটাকে।

কথা তুলিল সৌদামিনী: "এমন নিরাশার বালুচরে বাসা বেঁধে জীবন-যুদ্ধে নামবে কি ক'রে ? সাধারণ কেরাণীর কাজ ক'রতে গেলেও মনের জোর চাই।"

সহসা যেন পৌরুষে কোথায় আঘাত লাগিল, একটু নাড়িয়া বসিল এবারে মথুর দত্ত: "দেখছি, বিষয়গুলি বড় সুন্দরভাবে প'ড়ে মুখস্থ ক'রেছ তুমি।"—কথাটা সৌদামিনীকে একরকম চটাইবার জন্যই যেন।

উচ্ছল গতিতে হঠাৎ বাধা পড়িল সৌদামিনীর। খানিকটা অভিমান যেন মনের কোথায় একবার উঁকি দিল।—"মুখস্থ ? বেশ, এবার থেকে তাকে আর তবে প্রকাশের সুযোগ দেব না।"

আত্মস্বাতন্ত্র্যে দুইজনের মধ্যেই মুহূর্ত্ত মধ্যে যেন একটা অগ্নিপরীক্ষা হইয়া গেল কোথা দিয়া। সৌদামিনীর অভিমানটা ধরিয়া ফেলিল মথুর দত্ত। হো হো করিয়া স্বাচ্ছন্দ্য শব্দে সে হাসিয়া উঠিল এইবারে।—"দুর্ব্বল ব'লছো আমাকে, কিন্তু যে-অভিমান মনের পর্দ্দায় পর্দ্দায় তোমার বড় বেশী সহজেই নাড়া দিয়ে ওঠে, তাকে নিয়ে তুমিই কি বিশেষ কিছু জয়ের রাজ্যে পৌঁছতে পারবে, মনে করো ?"

সৌদামিনীও যেন কি মনে করিয়া এবারে আর কথা না কাটিয়া হাসিয়া ফেলিল: সেই চঞ্চল স্বপ্নাতুর হাসি।—"আচ্ছা, তুমি কী বলতো ? কি দুষ্টু, কি অসভ্য ! ঝগড়া ক'রবার ইচ্ছে ছিল তো আগে থেকে বললেই পারতে, কোমর বাঁধতুম।"

কিন্তু কৌতুকচ্ছলে এ কথারও যথাযথ কিছু একটা উত্তর করিল না মথুর দত্ত। হাসিতে হাসিতেই স্থান ত্যাগ করিয়া সে কোথায় একদিকে উঠিয়া গেল

ইহার পর একটি সুন্দর পূর্ণিমার সন্ধ্যা। নির্জ্জন বাতায়নে বসিয়া সৌদামিনী গুণ গুণ করিয়া কি একটা গান গাহিতেছিল। আড়াল হইতে আসিয়া কখন এক সময় নিঃশব্দে কাছে দাঁড়াইয়া সুরে মিল দিল মথুর দত্ত। তারপর থামিয়া কহিল, "গান তো খুব হোলো, ওদিকে যে আমাদের মেসিনগান উঠছে সিঙাপুরের আকাশে, খবর কিছু রাখো ?'

অপ্রস্তুত হইবার মতো এতটুকুও লক্ষণ দেখা গেল না সৌদামিনীর মধ্যে, বরংচ সহজ ভাবেই কহিল, "জানি, খবরটা সকাল বেলাই কাগজে পেয়েছি।"

"তা হ'লে ?" স্বর তুলিল মথুর দত্ত: "এখন কি ক'রবে ব'লে ঠিক করেছ ?"

"কিসের ?" দৃঢ় নেত্রে তাকাইল সৌদামিনী।

"এই—দু'দিন পরে আগুন যখন এমনি সমস্ত গ্রামে এসেও ছড়িয়ে পড়বে ! এদিকে তো চালের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে চড়ছে; বাজার একেবারে ফর্সা। এরপর ধরো জাপান যেমন ক'রে হা করেছে—বোম্ এদিকে পড়লে কি দেশের লোক সত্যিই বাঁচবে ?"

"আসুক না জাপান, ভয় কি ? বরণ-কুলো সাজিয়ে রাখবো।" মিট্ মিট্ দৃষ্টিতে চাহিয়া মৃদু হাসিতে লাগিল সৌদামিনী।

কিন্তু মথুর দত্ত মুখের ভাব এতটুকুও পরিবর্ত্তন না করিয়া কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য অটুট রাখিয়াই কহিল, "একথা শুনলে ফিপথ কলামনিষ্ট ব'লে আজই পুলিশে নিয়ে তোমাকে জেলে পুরবে।"

কথা শুনিয়া আরও জোরে এবারে হাসিয়া উঠিল সৌদামিনী: "তুমিও সঙ্গে যাবে তো ? একা গিয়ে কিন্তু সত্যিই ভাল লাগবে না, যাই বলো !" একটু থামিল, তারপর পুনরায় কহিল, "কি বলো, বেশ হয় কিন্তু, একটা চান্স,—চলোই না ঘুরে আসি কিছুদিন জেল থেকে ! নাম হ'লে দেশের নেতৃত্ব করবার সুযোগ পাবে।"

মথুর দত্ত স্পষ্ট বুঝিল যে, সৌদামিনী ঠাট্টা করিতেছে, কিন্তু তবু ভাল লাগিয়াছে সৌদামিনীকে মথুর দত্তের। ভিতরে আগুন আছে, যৌবন আছে

সৌদামিনীর। আর সব মেয়ের মতো ও এই বয়সেই ফুরাইয়া যায় নাই। বলিল, "জেলে যাওয়াটাই বড় কথা নয়। প্রকৃত কাজ চাই। দেশের জন্যে তুমি আমি শুধু কারা-বরণ ক'রলেই কি এতবড় জাতটা একদিনেই মুক্তি পেয়ে যাবে? চারদিক থেকে লোক পালাচ্ছে, তালাবন্ধ দরজায় প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ লোক ট্রেণে ছুটছে প্রাণ নিয়ে। মালয়, সিঙ্গাপুর—এদিকে ব্রহ্ম দেশও যায় যায়। আত্মরক্ষা এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম—যথেষ্ট কাজ এখন আমাদের সামনে। ঠাট্টা রেখে আর একটুখানি এগিয়ে আসতে পারো না সৌদামিনী?"

"কেন পারবো না, এগিয়ে তো আছিই।" দৃষ্টি তুলিয়া ধরিল সৌদামিনী মথুর দত্তের মুখের দিকে। "বলো, কি করতে হবে?"

"বেশী কিছু নয়, গ্রামের সামনে একটুখানি শুধু মাথা বলে দাঁড়াবে। বাকী যেটুকু, তার জন্যে আমি আছি।" কর্ম্মদৃঢ়তায় একবার জল্ জল্ করিয়া উঠিল মথুর দত্তের চোখ দুইটি।

"বেশ, অঙ্গীকার করছি।" বলিয়া ধীরে ধীরে নিজের আঙুল হইতে সরু মিনা করা আংটিটা খুলিয়া সহসা মথুর দত্তের আঙুলে পরাইয়া দিল সৌদামিনী।

চকিত আবেগে হঠাৎ যেন নড়িয়া উঠিল মথুর দত্ত।—"এ কি, এ কেন ক'রলে তুমি?"

কিন্তু উত্তর দেওয়ার আগে নিতান্ত আকস্মিক ভাবেই উপুড় হইয়া একবার গড় করিল সৌদামিনী মথুর দত্তের পায়ে, তারপর কহিল, "প্রতিজ্ঞাতে দস্তখতের প্রয়োজন হয়; এ-ই আমার অঙ্গীকারের চিরকালের স্বাক্ষর হ'য়ে রইল।"

আকাশে পূর্ণিমার চাঁদে তখন গাঢ়তর দীপ্তি। জাগ্রত যৌবন যেন খাঁ খাঁ করে বাহিরে।

এতদিন এ আংটিটার দিকে বড় একটা দৃষ্টি যায় নাই মথুর দত্তের, এবারে মিনাটার দিকে একবার চাহিয়া লইয়া কহিল, "তাই বলো, তোমার আর একটাও তবে পোষাকী নাম আছে?"

মাথা অপেক্ষাকৃত কিছুটা নত করিয়া লইল সৌদামিনী, লজ্জায় নয়, একটা ইতিহাসমুখর দুঃখের স্মৃতিতে। কহিল, "হ্যাঁ, মা ঐ 'শ্রীময়ী' নামেই চিরকাল আমাকে আদর ক'রে ডাকতেন; মারা যাবার আগে তাই নামটা পাকা ক'রে রেখে গিয়েছিলেন মিনাতে।"

সহসা সমস্ত কথার উৎস যেন এবারে হারাইয়া ফেলিল মথুর দত্ত। কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল, তারপর কহিল, "তাকে এমনি ক'রে অমর্য্যাদা করা উচিৎ নয় তোমার সৌদামিনী। এ আংটি তুমি ফিরিয়ে নাও।"

কিন্তু মথুর দত্ত ভাবিতে পারে নাই যে, কথাটা আঘাত করিবে সৌদামিনীকে।—হঠাৎ যেন কেমন একটা অদ্ভুত পরিবর্ত্তন খেলিয়া গেল সৌদামিনীর সমস্ত মুখখানির উপর দিয়া। কহিল, "এ হাতে আর ও হাতে এখনও কি কিছু পার্থক্য আছে? মা আমাকে আদর ক'রে ডাকতেন শ্রীমতী ব'লে, তুমি না হয় আজ তার সম্পূর্ণ ভাগটাই নিলে! অঙ্গীকারে নইলে যে আমার ফাঁকী থেকে যাবে।"

বিস্ময়ে, আনন্দে আর রোমাঞ্চিত আবেগে যেন মথুর দত্ত একটা নূতনতর শক্তির উৎস খুঁজিয়া পাইল নিজের মধ্যে। কহিল, "সত্যিই তুমি শ্রীময়ী, শ্রী ফিরিয়ে আনো তুমি দেশের আর বৈদেশিক শাসনকলুষ এই জাতের।"

সৌদামিনীও যেন এতক্ষণে একটা দ্বিধা হইতে মুক্ত হইবার পথ খুঁজিতেছিল মনে মনে। কহিল, "আর তুমি হ'লে আজ থেকে শ্রীমন্ত। তুমি না হ'লে আমি কি এ কঠিন সাধনায় সত্যিই পূর্ণ হ'তে পারবো? শ্রী'র যোগেই না শ্রী'র বিকাশ! তুমি যেন চিরকাল অন্যায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে হাসিমুখে আমাকে এগিয়ে নিয়ে যেয়ো। কোনোদিনই তোমার সে ডাকে আমি পিছিয়ে থাকবো না। আত্মরক্ষা আর স্বাধীনতা-সংগ্রাম—তুমিই তো ব'লেছো।—এস এ পথে যাই।"

খুসীর হাসি হাসিল একবার মথুর দত্ত। কহিল, "তার উদ্বোধন করো আজ তবে এইখানেই। ফ্রান্সে, কোরিয়ায়, মাঞ্চুরিয়ায়, চীনে, সিঙ্গাপুরে যখন অনন্ত বোমা আর মেসিনগানের শব্দ উঠছে, ঘুমপাড়ানি দুর্ব্বলতার গান তখন নয়, গাও বন্দেমাতরম্।"

বাহিরে জ্যোৎস্না যেন আরও মদিরবিহ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সৌদামিনী আর কোনো কথা তুলিল না; স্বভাবসুন্দর কণ্ঠে এবারে সে অপেক্ষাকৃত উঁচুগলায় গাহিয়া উঠিল---'বন্দেমাতরম্'।---

ধীরে ধীরে পাশ কাটাইয়া উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল মথুর দত্ত, তারপর কাঁচামাটির পথে কোথায় একদিকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

[আগামী বারে সমাপ্য

পরিচয়

শামসুদ্দীন

তোমারে দেখেছি কবে এইখানে এই বন ছায়ে
যেখানে নেমেছে সন্ধ্যা ধীরে ধীরে শিশিরের মত,
যেখানে ফুটেছে হাসি প্রকৃতির লাজনম্র নত
পুঞ্জ পুঞ্জ তারকার নীল বুকে ধরণীর গায়ে।
কত যুগ যুগান্তর দেখিয়াছে স্বপ্ন সুষমার—
কত কী যে জন্ম নেছে মৃত্তিকার পত্রপুষ্প মাঝে,
কত যে এনেছে ঢল জোয়ারের মাণিক্যের সাজে
ভরেছে বালুকা বেলা মায়াময় দীপ্ত আকাঙ্ক্ষার।

তুমি কবে গেছ চলে দূরে দূরে দূর স্মৃতি পারে
কাঁকরে পথে পথে নীড়ভাঙা মানুষের ভিড়ে,
রাখিয়া পায়ের চিহ্ন রক্ত লেখা প্রান্তরের বুকে;
শাণিত সাপেরা তাই দীর্ঘশ্বাসে মৌনতার ভারে-
সেই সুরে আজো এই রক্তচ্ছটা গোধূলীর তীরে
জীবন মরণ যেথা বন্ধ ছেঁড়া দৃষ্টির সমুখে।

বাঙলার নদ-নদী

বৈ—না—ভ

(আট)

দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত খরস্রোতা নদীগুলির বিষয়-আলোচনায় মোটের ওপর সমস্ত সমস্যা ও তা'র ব্যবস্থা-সমাধানের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

এর পরে তৃতীয় শ্রেণীর জোয়ার ভাঁটা-খেলা নদীগুলির প্রকৃতি ও কার্য্যকারিতা আলোচ্য বস্তু।

জোয়ারভাঁটা-খেলা নদীগুলি : 'ব'-দ্বীপ-গঠনে সহায়ক-রূপে কার্য্য ক'রে থাকে। প্রথম (সদাস্রোতা) ও দ্বিতীয় শ্রেণীর (খরস্রোতা) নদীসমূহের জোয়ারভাঁটা খেলার সীমান্ত অবধি প্রধানতঃ নিম্নবাঁকের শাখাগুলিই তৃতীয় পর্য্যায়ে পড়ে। এই সকল নদী 'ব'-দ্বীপের অধোভাগ উন্নীত করতে, উর্ব্বর করতে ও তা'র জল-নিকাশ করতে সারা বৎসর কার্য্যকরী থাকে, তা' ছাড়াও দেশের উৎপন্ন দ্রব্য স্থানান্তর-প্রেরণে সহায় হয়।

পূর্ব্ব-আলোচিত সদাস্রোতা ও খরস্রোতা প্রকৃতির প্রবাহিনীগুলির নিম্নবাঁকে জোয়ার-ভাটা খেলে থাকে। কিন্তু যেখানে অকাল পতিত-শোধন কার্য্য দ্বারা এই সমস্ত নদীর প্রবাহিকা-অঞ্চলগুলিতে জোয়ার-ভাঁটার মুক্ত আবেগ-সঞ্চার বাধাগ্রস্ত হয়েছে— সেই স্থান ভিন্ন এই সকল নদীর নিম্নবাঁকের অবস্থা বিশেষ মন্দ নয়,—কেননা – এখনো তাদের হিতকর ক্রিয়াশীলতা পূর্ব্ববৎ স্থায়ী রয়েছে, তদুপরি জলপথে অল্প খরচায় মাল চালান দেবার সুবিধাও মিলছে এই প্রকৃতি-দত্ত সুব্যবস্থাকে সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করা উচিত। অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্যে কোনো নদীকে বাঁ'চয়ে রাখতে গেলে উচ্চভূমি বা অধিত্যকাদেশের জল-সরবরাহ দ্বারা প্রবাহ-পুষ্ট করা দরকার, কেবল জোয়ার-ভাঁটার ওপর নির্ভর ক'রে নদী চিরজীবী হ'তে পারে না। নদীর নিম্নবাকগুলিতে জোয়ার-ভাঁটা বহু পরিমাণে যে পলিপঙ্ক বহন ক'রে আনে —তা'র দ্বারা প্রকৃতি অধুনা গঙ্গার প্রবাহ-প্লাবন পরিত্যক্ত 'ব'-দ্বীপের নিম্নাংশটিকে উন্নীত করতে সচেষ্ট। কিন্তু কালক্রমে যখন প্রবাহিকা অঞ্চলগুলি জোয়ার-ভাঁটার পৃষ্ঠ-সমান উচ্চ হ'য়ে উঠবে—তখন এই পলিমাটি ভূমিতে সঞ্চারিত না হ'য়ে নদী-গর্ভে ভারে ভারে সঞ্চিত হবে, শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াবে নদীর পঙ্ক রুদ্ধ অবস্থা। এই প্রবাহিণী গুলি সঙ্কীর্ণ খালে পরিণত হ'য়ে হয়তো স্থানীয় বারিপাত নিকাশ করতে থাকবে, কিন্তু নৌচালনের পক্ষে একেবারে অযোগ্য হ'য়ে যাবে। এতদ্ভিন্ন উর্দ্ধদিক্ থেকে যদি মিষ্টজলের প্রবাহ-চাপ হ্রাস-প্রাপ্ত হয়, আর এই সকল নদীতে লোনা জলের বিস্তারসীমা আরো এগিয়ে চলে, তা' হ'লে একটী গুরুতর অবস্থা-উদ্ভবের সবিশেষ সম্ভাবনা। নদীর উর্দ্ধধারার ক্রমাবনতি ও মিষ্টজল-ভারের অধিকতর অল্পতা ঘটলেই এই দারুণ সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হবে। এইজাতীয় নদীগুলি বাঙলার নদ-নদী-সমস্যাকে তীব্রতর ক'রে তুলেছে। এই নদী-শ্রেণীতে বৎসরের প্রায় সাত মাসেরও অধিককাল উচ্চভূমি-নিঃসৃত অতিরিক্ত মিঠা জলের প্রবাহ সঙ্কুচিত থাকে, এমন কি পানযোগ্য মিঠা জলের সরবরাহের সম্পূর্ণ অভাব পরিলক্ষিত হয়। বৎসরের বাকি পাঁচ মাস অধিত্যকা-বহিত অতিরিক্ত মিঠা-জল-প্রবাহে এই নদী সকল পুষ্ট হয় বটে, কিন্তু জল এতো বেশী কর্দ্দমাক্ত থাকে যে —এই জলধারা যত নীচের দিকে নেমে আসে—নদীগুলি ততই পঙ্কভারে কানায় কানায় ভ'রে ওঠে। এই পঙ্ক-ভার মোহানার কাছে যখন পৌঁছে যায়—তখন জোয়ার-ভাঁটা প্রবাহের অধীন হ'য়ে পড়ে, —এই অধীনতার পরে একমাত্র উর্দ্ধাগত জলস্রোতের বেগবান্ প্রবাহ-ব্যতিরেকে পলি-পঙ্ক আর নীচের দিকে অগ্রসর হ'তে পারে না। এর পরে সমুদ্র-নিয়ন্ত্রিত জোয়ার-ভাঁটার সঙ্গে উর্দ্ধভূমি-প্রেরিত মিঠা জল-প্রবাহের প্রতিনিয়ত সংঘাত লাগে। এই সম্পর্কে হুগলীনদীকে একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত রূপে ধরা যায় কেননা হুগলীতে এই রকম অবিরত যোঝাযুঝির পালা চলেছে। এটা সুবিদিত যে—বৎসরের মাত্র পাঁচমাস হুগলীনদী উত্তর থেকে তা'র মিঠাজলের যোগান পেয়ে থাকে, আর বাকি কয়মাস এই নদীকে অসমান প্রতিযোগিতা করতে হয় সমুদ্রের সঙ্গে,— কারণ, সমুদ্র এক দিনের জন্যও বিরাম না দিয়ে জোয়ার-ভাঁটার অভিঘাত প্রেরণ করে। এর ফলে হয়তো এর জল-নালী পঙ্করুদ্ধ হ'য়ে যেতো, কিন্তু কলিকাতা বন্দরের কর্ত্তৃপক্ষের ব্যয়বহুল হস্তক্ষেপ এই দুর্বিপাক থেকে এই নদীকে রক্ষা করছে।

প্রকৃত প্রস্তাবে—কলিকাতার কাছ বরাবর অবৃষ্টি-ঋতুতে হুগলী নদীর লাবণিক জলের বৃদ্ধি-প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বস্তুতঃ এই বৃহৎ শহরের নির্ভর এই নদীর জল-সরবরাহের উপর। মধ্য বাঙলায় অন্যান্য জল-নির্গম-প্রবাহিণীর জোয়ার-ভাঁটা খেলা অংশগুলির অবস্থা সম্ভবতঃ একই প্রকার, অথবা আরো খারাপ বলা যায়। তা'র হেতু এই যে – এই সকল প্রবাহিণীর পক্ষে মিঠাজল পাবার একমাত্র সংস্থান গঙ্গা। কিন্তু পৌষ থেকে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত এই ছয় মাস এই নদীগুলি উক্ত উৎসের সংস্পর্শ হ'তে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যায়, কেবল এদের বিযুক্ত অধঃসঞ্চিত জলকুণ্ড থেকে বালুগর্ভের মধ্য-গতি প্রস্রবণ-

প্রবাহ দ্বারা নদীগুলি স্বল্পপরিমাণ জল সরবরাহ পেয়ে থাকে।

যে-স্থলে বরাবর বাঁধ তুলে প্রবাহিকা-অঞ্চলগুলির অকাল-পতিত-শোধন করা হয়েছে—সেখানে জোয়ার-ভাঁটার অব্যাহত পরিপ্লাবন বাধা পেয়ে আসছে। জোয়ার-ভাঁটা-খেলা প্রবাহিণীর ক্ষয়শীলতার জন্য বহুস্থানে এরি মধ্যেই অবস্থা সঙ্কটজনক হ'য়ে উঠেছে, আর তা'র সঙ্গে জল-নিকাশের অসুবিধা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হ'চ্চে।

বাঙ্‌লার অনেক অঞ্চলে এর কুফল ফলেছে। কত জেলা ক্ষয়প্রাপ্ত হ'চ্ছে, কত জেলার উৎপাদিকা শক্তি ও স্বাস্থ্য-সম্পদ্ বিলীয়মান—তা' প্রণিধান করুলে করগ্রাহী সরকারের দায়িত্বের প্রশ্নই ওঠে। যে মধ্যবাঙ্‌লা মুঘল-রাজত্বকালে ও ইংরেজ-শাসনের প্রথমদিকে স্বাস্থ্য-ধনে ধন্য ছিল, সেই সমৃদ্ধ অঞ্চল এখন দ্রুতগতিতে ধ্বংসের মুখে এগিয়ে চলেছে। এই শোচনীয় অবস্থার কারণ এই যে—বালুর তলছাট দ্বারা এই অঞ্চলের উক্ত প্রকৃতি-বিশিষ্ট নদীসমূহের (ভাগীরথী, জলাঙ্গী, ভৈরব প্রভৃতি) উৰ্দ্ধস্রোতের অবরোধ, এবং রেল্‌ওয়ে, বাঁধ ও সেতু-নির্ম্মাণে অন্তর্দেশের জলস্রোতের প্রতিবন্ধ। মধ্য-বাঙ্‌লার ন্যায় পশ্চিমবঙ্গও ১৮৫০ পর্য্যন্ত স্বাস্থ্য ও সম্পদে ঐশ্বর্য্যশালী ছিল, কিন্তু রেল্‌ওয়ে-বাঁধ উত্তোলন এবং দামোদর ও তা'র উপনদীগুলির উজান স্রোতোধারা প্রতিরোধ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে।

বালি জমে' নদীর স্রোত যদি বন্ধ হ'য়ে যায়, সেজন্য দায়ী কে? সরকারী অনবধানতা ও অবহেলার ফলেই এই বিপৎপাত। রেলওয়ে-বাঁধ ও সেতু যা' নির্ম্মিত হয়েছে, সর্ব্বত্রই সরকারের জ্ঞাতসারে, কোথাও-বা সরকারের অনুমতি অনুসারে এ নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পন্ন হয়েছে, আবার কোথাও-বা সরকার নিজেই উদ্যোগী।

বর্দ্ধমান প্রভৃতি অঞ্চল পূর্ব্বে ভারতবর্ষের একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট উর্ব্বর ভূখণ্ড ছিল। মাদ্রাজের অন্তর্ভুক্ত তাঞ্জোর জেলার ন্যায় এখনো পূর্ব্ব অবস্থায় এই স্থান শস্য-সম্পদে ও স্বাস্থ্য-ধনে সমৃদ্ধ থাকতে পারতো। কিন্তু দেশের ভাগ্য-নিয়ন্তার বিধান একেবারে প্রতিকূল। বিশেষজ্ঞ মনীষীর প্রমাণ-প্রয়োগ এই উক্তির যাথার্থ্য সম্পাদন করে।*

পশ্চিমবঙ্গের সমস্যাগুলি অবহেলিত হ'য়ে চোখের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বৈদেশিক বিশেষজ্ঞগণ (সার উইলিয়াম উইল্‌কক্স ও ডক্টর বেণ্ট্‌লে) নিশ্চায়কভাবে দেখিয়েছেন যে—ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-রেল্‌ওয়ের নিরাপত্তার জন্য বাঁধ তুলে ও খাল কেটে দামোদর ও তা'র শাখাগুলিকে নিরুদ্ধ করা হয়েছে, এর ফলে বাঙ্‌লার এই অংশের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির অধঃপাত ঘটেছে। উইল্‌কক্স—পুরাতন দামোদর শাখাগুলির (পাখার আকারে) বিচিত্র সমাবেশের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে তাঞ্জোর জেলায় কাবেরী-নদীশ্রেণীর সমাবেশ-রেখার আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন।…যে কোনো অবস্থায়—বর্দ্ধমান ও তাঞ্জোর—১৮১৫-তে ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী জেলা ছিল। এই জেলাদ্বয়ের তুলনা ক'রে ১৮১৫-তে আর এক বিশেষজ্ঞ (হ্যামিল্টন্) মত প্রকাশ করেছেন এই ব'লে যে—কৃষি-সংক্রান্ত উৎপাদিকা-শক্তিতে বর্দ্ধমান প্রথম এবং তাঞ্জোর দ্বিতীয়।…

এক্ষণে এইটুকুই লক্ষ্য করবার বিষয়: যে ভূভাগ তাঞ্জোরের চেয়ে অনেকাংশে সুসমৃদ্ধ ছিল—আজ তা'র অবস্থার এরূপ তারতম্য হোলো কেন? সেই তাঞ্জোর আজকেও তা'র পূর্ব্বাবস্থায় বিরাজ করছে, অথচ তদপেক্ষা সমৃদ্ধতর বর্দ্ধমান প্রভৃতি ফলপ্রসূ স্থান আজ কোন্ অভিশাপে দুর্দ্দশার চরমে গিয়ে পৌঁছেছে? তাঞ্জোরে প্রাচীন হিন্দুরাজগণ-কর্তৃক উত্তোলিত কাবেরী-নদীর বাঁধ ধ্বংসপ্রায় হ'তে পূর্ত্তবিশারদ (সার এ. কটন) সেই বাঁধটিকে পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ ক'রে দেন, আর কাবেরীর 'ব' দ্বীপে সমভাবে নদীর জল বণ্টন যা'তে সুনিয়ন্ত্রিত হ'তে পারে—তা'র সুব্যবস্থা ক'রে দিতেও ভোলেন নাই। সেইজন্য কাবেরীর-'ব'-দ্বীপের শ্রী-সম্পদ্ আজো অক্ষুণ্ণ রয়েছে। বর্ত্তমানে এই তাঞ্জোর বর্দ্ধমান অপেক্ষা সর্ব্বাংশে ঐশ্বর্য্যশালী ও ম্যালেরিয়ার দৌরাত্ম্য থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাঞ্জোরে যে উপায় গৃহীত হয়েছিল, বর্দ্ধমানে পূর্ত্তবিদ্‌গণকর্তৃক তার বিপরীত পন্থা অবলম্বিত হওয়ায় আজকের এই দুর্গতির উৎপত্তি। তাঁদের দামোদর-ভীতিই এই বিরুদ্ধ উপায় অবলম্বন করার কারণ। ত্রিশ থেকে চল্লিশ বৎসর অন্তর সংঘটিত ধ্বংস-শীল দামোদর-বন্যার আশঙ্কায় প্রতিজনই আতঙ্কিত ছিল। কিন্তু দীর্ঘ সময়-ব্যবধানে ঘটিত এই প্রকার বন্যা-উপপ্লব ধ্বংস এনে দিলেও—পরিমিত বন্যা-প্লাবনের নিয়মিত সঞ্চার হিতকর ভিন্ন একেবারেই অনিষ্টজনক ছিল না। এই বন্যা-প্লাবনে ভূমি উর্ব্বর হোতো, উপরন্তু ম্যালেরিয়ার শূক ('লার্ভা') একেবারে ধুয়ে-মুছে যেতো। প্রায় ১৮৫০-এ যখন সরকার ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলওয়ে খুলতে মনঃস্থ করলেন—কর্তৃপক্ষ তখন রেলওয়ে নিরাপদ করবার জন্য দামোদরকে বশীভূত করতে বদ্ধপরিকর হলেন। এই নদকে জলাভেদ্য কক্ষ-বিভাগে আবদ্ধ করা হোলো, আর তা'র কয়েকটী শাখানদীর উজান স্রোতোধারার গতি-রোধ করা হোলো,—তদুপরি এমন একটি দুষ্কর্ম্ম করা

* "Need for a Hydraulic Research Laboratory" (by Dr. Meghnad Saha)—প্রবন্ধ থেকে গৃহীত।

হোলো—যা' অপরাধের কোঠায় গিয়ে পড়ে: জমিতে জল-সেচের জন্য তৎস্বার্থজড়িত লোকেদের দ্বারা বাঁধের স্থানে স্থানে রন্ধ্র বা ফাটল ধরানো হোলো। যদিচ এর ফলে ভারতের অন্য প্রদেশে যাতায়াতের সুগম নিরাপদ-পথ খোলা হোলো এবং কলিকাতার বাণিজ্য ব্যবসায়ের অতি-বৃদ্ধি ঘটলো, পরন্তু পদপ্রার্থী ও ভাগ্যান্বেষী পশ্চিমাবাসীদের ভিড়ের জোয়ার লেগে গেল বটে, কিন্তু বিদেশীর ও ভারতের অন্য দেশবাসীর এই স্বার্থ-সুবিধার জন্য বর্দ্ধমানবিভাগকে নিদারুণ মূল্য দিতে হোলো। ১৮৫৯-এ রেলওয়ে খোলবার দুই বৎসর পরেই ভীষণ ম্যালেরিয়ার মড়ক লাগলো। কেবল হুগলীতেই বিশ লক্ষের মধ্যে দশ লক্ষ অর্থাৎ অর্দ্ধেক অধিবাসী দশ বৎসরের মধ্যে হোলো বিনষ্ট। প্রতি বর্গমাইল পিছু ৭৫০ জনের মধ্যে ৫০০ জন লোকসংখ্যা নেমে গেল। এই সম্বন্ধে কর্ম্মকুশলী যোগ্যতম প্রামাণিক ব্যক্তিগণ (বেণ্টলে প্রভৃতি) কারণ নির্দ্দেশ ক'রে এই অভিমত দিয়েছেন যে: রেলওয়ে-বাঁধের ক্রটী-পূর্ণ দুষ্ট ব্যবস্থাই দেশ-মধ্যে এই ভীষণ মারী-প্রকোপের জন্য দায়ী। এর বিষময় ফল আজ পর্য্যন্ত এই ভূভাগ ক্রমান্বয়ে ভোগ ক'রে আসছে—ম্যালেরিয়ার কবল থেকে আজও এ দেশ নিস্তার পায় নাই। দিনে দিনে জনগণপূর্ণ সমৃদ্ধিশালী দেশ শ্মশানে পরিণত হ'য়ে যাচ্ছে। আর ডাঙ্গাভূমি নদীবাহিত পলিথেকে বঞ্চিত হওয়াতে—শতকরা প্রায় পঞ্চাশ ভাগ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে জমির উর্ব্বরতা।

রেলওয়ে-বাঁধই যত অনিষ্টের মূলে—বাঁধের পৃষ্ঠ-পোষকতায় ম্যালেরিয়া প্রবল—আর ম্যালেরিয়ার প্রচণ্ড নৃত্যে বর্দ্ধমান বিভাগ মুমূর্ষু। তার স্বাস্থ্যনাশ ও ভীষণ লোকক্ষয় রক্ষক-বেশী ভক্ষকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে নাই। কৃষিক্ষেত্রগুলি নদীর পলিতে পুষ্ট হ'তে না পেয়ে এদের উর্ব্বরা-শক্তির অর্দ্ধেক হ্রাস হয়েছে—সেইজন্য ন্যায়ধর্ম্ম অনুসারে দায়ী পক্ষদিগের কাছ থেকে এই সকল দুঃস্থ অঞ্চলের পক্ষে ক্ষতিপূরণস্বরূপ মাসুল দাবী করা অযৌক্তিক নয়। (এই মত পোষণ করেন ডক্টর মেঘনাদ সাহা)। তাঁ'র প্রাপ্তি-নির্দ্দেশ তিনি দিয়েছেন এই যে—ন্যায়-বিচার ব'লে কোনো বস্তু যদি এ পৃথিবীতে থাকে, তা' হ'লে বর্দ্ধমানবিভাগের অধিবাসীরা তাদের উপর এই সমস্ত ভয়ঙ্কর দুর্গতি-বিধান-সম্পর্কিত নিয়ন্তৃগণের নিকট হ'তে হানি-মূল্য পাবার অধিকারী। রেলওয়ে-যাত্রীদের ওপর অন্তঃসীমান্ত বা সরাসরি রাস্তার একটা কর ধার্য্য ক'রে যে অর্থ পাওয়া যাবে—সেই সংগৃহীত অর্থের আনুকূল্যে দেশের হারানো সমৃদ্ধি পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে। এই সঞ্জীবন-কার্য্য-সাধনের জন্য সুবিন্যস্ত ও সুচিন্তিত পরিকল্পনার নিতান্ত প্রয়োজন। এই ভাবেই দেশবাসিগণকে তাদের অপহৃত সম্পদ্ ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব। বর্দ্ধমান বিভাগীয় অধিবাসিগণের পক্ষসমর্থনকারী এই ক্ষতি পূরণ করবার প্রস্তাব কেউ পরিহাস ব'লে গ্রহণ না করেন। এই রকম ক্ষতিপূরণের দাবী সম্বন্ধে বহু পূর্ত্ত-বিশারদের সমর্থিত উক্তির অভাব নাই। ('সারা ব্রীজ' সম্পর্কিত আলোচনায়) সার জন্ বেণ্টন্ সারাব্রীজের নির্ব্বিঘ্নতার জন্য উত্তর-বঙ্গে রেলওয়ে-বাঁধ নির্ম্মাণ-প্রস্তাবে বলেন: "এই পরিকল্পিত নূতন রেলবর্ত্মের কারণে স্রোতো-ধারার কোনোরূপ অবরোধ যদি ঘটে, তা' হ'লে শস্য-হানি বেড়ে উঠবে। অন্যান্য স্থানে অনুরূপ কার্য্যাবলীর অভিজ্ঞতার সাহায্যে বলা যায় যে, এই কাজ কৃষকগণকে ক্ষতিপূরণের দাবী করতে প্ররোচিত করে, কিংবা বন্যা-ধারা-প্রবহণের উপযোগী জলপথ বৃদ্ধি করার দাবী জানানো হয়। রেলওয়ে বিভাগের সবিশেষ চেষ্টা থাকবে—বন্যার জল-নির্গম-প্রবাহিকা রুদ্ধ না করা, আর এই চেষ্টা যদি নিষ্ফল হয়—তা' হ'লে রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষগণ বর্দ্ধিত জল-প্রণালী-পথ কেটে দিতে বাধ্য হবেন।"

বঙ্গের এই স্বাস্থ্যহীনতা ও ক্ষয়িষ্ণুতা দেশের দারিদ্র্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। সমগ্র দেশটির আর্থিক ও স্বাস্থ্যবিষয়ক উন্নতির উপায় স্থির করবার ক্ষমতা রয়েছে সরকারের হাতে। উপায়হীন দেশবাসী একমাত্র তাঁ'দেরই মুখাপেক্ষী—যাঁ'রা ভিন্ন স্বার্থের খাতিরে এই দেশের স্বার্থকে বলিদান দিতেও দ্বিরুক্তি করছে না। ইংরেজ ব্যবসায়ী বণিক-বুদ্ধিতে চালিত হ'য়ে অপরের ইষ্ট দেখতে জানে না। দেশের ওপর প্রভুত্ব অধিকার সাব্যস্ত থাকলেও—দেশকে মারবার অধিকার কারোর নেই। পদানত পরাভূত দেশের সকল ইষ্টানিষ্টের জন্য অধিকারীই দায়ী। আজ এই বিজ্ঞানের যুগে আমেরিকা, জার্ম্মানী প্রভৃতি কোনো কোনো সভ্যদেশে মানুষ বিজ্ঞান ও অর্থের সহায়ে বন্যাকে আয়ত্তাধীন করেছে, কিন্তু বাঙলায় বন্যার প্রতিকার করা বা ক্ষয়িষ্ণু নদী ও তত্তীরবর্ত্তী ক্ষয়িষ্ণু অঞ্চলসমূহকে পুনরুজ্জীবিত করা এই দেশ পরাধীন ব'লে কি অসম্ভব?

প্রায়শ্চিত্ত ও ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বঙ্গের ক্ষয়িষ্ণু অঞ্চল-গুলির স্বাস্থ্যের ও উৎপাদিকা-শক্তির উন্নতি-সাধন ভারত সরকারের নিজ-ব্যয়ে করা কর্ত্তব্য। এর বেশী বলবার ক্ষমতা দেশবাসীর নাই। কিন্তু এই হোলো ন্যায়সঙ্গত কার্য্য। সরকার মূল্য আদায় ক'রেও যদি বাঙলার স্বাস্থ্য ও উৎপাদিকা-শক্তি বাড়িয়ে দিতে সচেষ্ট হয়----তা' হ'লে দেশের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসে তার কল্যাণ হ'তে পারে, দেশবাসী বিলয়ভূয়িষ্ঠ না হ'য়ে নিস্তার পেতে পারে।

দেশের জীবন রস সঞ্চার করে নদী। নদীর ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রাণ-স্পন্দনও ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হ'য়ে আসে। তাই নদীর ক্ষয়-সাধনে বাঙলায় কত ক্ষতি সেই বিষয়টি আলোচিত হোলো। এর পরে জোয়ার-ভাটা-খেলা নদী 'ব'-দ্বীপ গঠনে—কতখানি সহায়----তাই আলোচনা করা হবে।

অক্ষমা (উপন্যাস)

শ্রীঅবনীকান্ত ভট্টাচার্য্য

দুই

কথার মাঝখানে হঠাৎ ছেদ টানিয়া দিয়া ক্ষমা ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে কণাদ অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। বক্তব্যে যে নিগূঢ় ইঙ্গিত ছিল—তাহা কি ক্ষমার মনে বিরক্তি সঞ্চার করিয়াছে ? এই সংশয়ে কণাদের হৃদয় দুলিয়া উঠিল। কিন্তু একলা বসিয়া কথাগুলি পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিতে করিতে তাহার এই কুণ্ঠিতভাব খানিকটা কাটিয়া গেল। তাহার মনে তখন তর্ক জাগিল : অন্যায়ের সমালোচনা করা কি অপরাধ ? দুইটি জীবন মিলিবার জন্য উন্মুখ হইয়াছিল ; সংস্কার মতবাদ প্রভৃতি কুটিল বাধা মধ্যে আসিয়া সমস্ত আকাঙ্ক্ষা চূর্ণ করিয়া দিয়াছে, গড়িয়া তুলিয়াছে একটি সামাজিক বিষম ব্যবধান। হয়তো এই দুই জীবনের মিলনে একটি সুখের নীড় বাঁধিয়া উঠিত ! পুরুষ ও নারীর সৃষ্টি হইয়াছে—তাহাদের কামনার রাজ্যে কি কোন মানুষের রচিত বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিবার জন্য ? যদি কখনো ভুল হয় তাহা কি শোধরাইবার কোনো উপায় নাই, এমনি কি অচলায়তন বিধান ? কণাদ নিজে নিজেই উত্তেজিত হইয়া উঠিল, মনে মনে স্থির করিল, শেষকথা সে ক্ষমাকে বলিবেই। ক্ষমার বিবেকে আঘাতের পর আঘাত করিতে ছাড়িবে না। ক্ষমাকে সচেতন করিয়া তুলিতে হইবে। জীবন-ভোর এই ব্যর্থতার বোঝা, এই গ্লানির দুর্ভোগ সে কেমন করিয়া, কেনই বা, বহিয়া বেড়াইবে ? কণাদ যেন একেবারে মরীয়া হইয়া উঠিল : সে জীবনকে ভালো করিয়া দেখিয়া লইতে চায়, সতেজ সম্ভোগ করিতে চায়, এই স্বার্থান্বেষী দুনিয়ায় সে একাই বঞ্চিত হইয়া থাকিবে কেন ? চাওয়া ও পাওয়ার সফলতায় তাহার দিন-গুলিতে সার্থক সরস করিয়া তুলিতে চায়। ইহার মধ্যে কোনো চাতুরী নাই, ইহা মানুষের আদিম প্রবৃত্তির সহজ সত্যের চিরন্তন আবেদন।

এই কাহিনীর পূর্ব্বেরও একটা কাহিনী আছে।

ক্ষমার পিতা মহিমারঞ্জন চক্রবর্ত্তী আপনার ভাগ্য আপনিই গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। নবাবী আমল হইতে পুরুষানুক্রমে তাঁহারা কয়েকটি এলাকার আধা-পত্তনিদার হইতে পত্তনিদার ছিলেন, কিন্তু মহিমারঞ্জনের পূর্ব্বের দুই পুরুষ নীলকর ও রেশম-কুঠিয়ালদের অত্যাচারের হাত এড়াইবার জন্য স্থানীয় ইংরেজ-কর্ম্মচারীদের প্রতিনিয়ত মনোরঞ্জনের আয়োজন করিতে করিতে ভাণ্ডার ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতে থাকে। এই ক্ষীণ সূত্রকে মহিমারঞ্জন জোড়া লাগাইয়া গ্রন্থির পর গ্রন্থি বাঁধিয়া আরো দৃঢ় করিয়া তুলিলেন। জাহাজের কারবার করিবার সময় লক্ষ্মীর সুপ্রসন্ন দৃষ্টি পড়িল তাঁহার উপর। বাংলার বহুস্থানে সম্পত্তি ক্রয় করিয়া আবার তিনি পূর্ব্ব অবস্থা-গৌরবেরও অধিক করিয়া তুলিলেন। কিন্তু একদিকে লক্ষ্মী যেমন বাঁধা পড়িলেন, অন্যদিকে গৃহলক্ষ্মী হইলেন চঞ্চলা। মহিমারঞ্জনের সুকৃতি দুষ্কৃতির চাপে পড়িয়া তলাইয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার মন ছিল বহির্মুখী। তাঁহার অনুপমা রূপ-গুণবতী সাধ্বী স্ত্রী শমিতা বহুদিন শূন্যকক্ষে স্বামীর আগমন-প্রতীক্ষায় বিনিদ্র রজনী যাপন করিত। শমিতার মন ছিল বাসনার আগ্নেয়গিরি। শমিতার উগ্ররূপ মহিমারঞ্জনকে ঘরের মধ্যে স্থায়ীভাবে বাঁধিতে পারিল না। শত চোখের জল, শত অভিমান, শত মনোমালিন্য, শত অনুরোধ মহিমারঞ্জনের আমোদ-প্রিয় রীতির বিশেষ কিছু ব্যতিক্রম ঘটাইতে পারিল না। অথচ স্ত্রীর প্রতি তাঁহার স্নেহ-মমতারও কৃপণতা ছিল না। মহিমারঞ্জনের পিতা শমিতাকে চৌদ্দ বৎসর বয়সে বধূরূপে ঘরে লইয়া আসেন। পর বৎসরই তাঁহার মৃত্যু হয়। পিতৃবিয়োগের পর হইতেই মহিমারঞ্জন একদিকে যেমন অশেষ অধ্যবসায় ও ব্যবসায়-বুদ্ধিকে সঙ্গী করিয়াছিলেন ; অন্যদিকে, সেই সঙ্গে প্রবাসে সুরা ও রমণী তাঁহার অবসর-বিনোদনের শাশ্বত-সাথী হইয়া ওঠে। শেষে ইহা তাঁহার অপরিত্যাগ্য অভ্যাসে পর্য্যবসিত হয়। শমিতা প্রথম প্রথম স্বামীর বানানো-বুনানী-বুলিতে বিশ্বাস করিত, কিন্তু সে ছিল তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিমতী আধুনিক হিসাবে অশিক্ষিতাও বলা চলে না—পরন্তু প্রকৃত-শিক্ষিতা, তদুপরি রমণীর দাবী ছাড়িয়া দিবার মত প্রবৃত্তি বা প্রকৃতিও তাহার ছিল না। তাহার উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বাসনার ছন্দধারায় অবিরত ঘাতপাত হইতে লাগিল। দিনে দিনে স্বামীর বিরুদ্ধে তাহার মনে নিষ্ফল আক্রোশ ধোঁয়াইয়া ধোঁয়াইয়া একদিন আগুনের মূর্ত্তিতে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। এই আগুন মহিমারঞ্জনের দাম্পত্য-জীবন পোড়াইয়া দিল। শমিতার একটিমাত্র সান্ত্বনা ছিল—তাহার শিশুকন্যা। এই ছিল তাহার জীবনের অবলম্বন, তাহাকে নাড়িয়া-চাড়িয়া খাওয়াইয়া-শোয়াইয়া আদর করিয়া কথা কহিয়া কোনও রকমে সময় কাটাইয়া দিত শমিতা। মেয়ে যখন তিন বৎসরের—সেই সময়ে মহিমারঞ্জনের আচরণ শমিতার কাছে এমনি কটু হইয়া বাজিল যে, তাহার সহ্যের সীমা ছাড়াইয়া গেল। সাতদিন সাত রাত্রি মহিমারঞ্জন কাজের অজুহাতে বাহিরে রহিলেন। হঠাৎ অর্থের প্রয়োজন হওয়াতে মহিমারঞ্জন এক ব্যক্তির হাতে টাকা দিবার হুকুমপত্র পাঠাইয়া দেন—দেওয়ানের কাছে। বৃদ্ধ দেওয়ান শমিতার বাপের বাড়ীর লোক, তাহার পিতৃবন্ধু, কাজেই সমিতার শুভানুধ্যায়ী। মনিবের এই অবিমৃষ্যকারিতায় মনে মনে সে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, মাঝে মাঝে নম্র প্রতিবাদ করিলেও মুখ ফুটিয়া সে কোনোদিন কিছু বলিতে পারে নাই। দেওয়ান এই চিঠি পাইয়া আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিল না, রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে সোজা শমিতার সামনে

গিয়া উপস্থিত হইল। শমিতা তখন মেয়েকে কোলে করিয়া আদর করিতেছিল। এই সময়ে দেওয়ানের হঠাৎ আবির্ভাবে শমিতা চমকাইয়া উঠিল। মেয়েকে নামাইয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া শমিতা জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেওয়ান কাকা, কিছু খবর আছে নাকি?"

দেওয়ান গম্ভীর স্বরে কহিল, "আছে বৈকি মা! নইলে তোমার কাছে এই অসময়ে আসতে যাবো কেন?"

"কোনো খারাপ খবর নয় তো?"

"তা ছাড়া আর কি বল্‌বো—তাতো জানি না।"

"কেন, কি হয়েছে? ওঁর কাছ থেকে কোনো খবর এসেছে না কি? ওঁর শরীর ভালো তো?"

"শরীরের খবর কেমন ক'রে জানবো—বলো? তিনি লোক মারফত্ চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছেন, এখুনি থোক্ চার হাজার টাকা চাই। আমি এখন কোথা থেকে দিই বলো দেখি? কুল্লে হাজার দেড়েক টাকা তহবিলে মজুত রয়েছে, টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে না আন্‌লে আর উপায় নাই। কিন্তু এখন কি ক'রে তা হবে? পরশুর আগে যে এতগুলো টাকা যোগাড় কত্তে পারবো —তাতো মনে হয় না।"

"এমন তো টাকা চাইয়ে পাঠান না কখনো?"

"পাঠান বই কি, মা! সমস্ত কথা কি তোমার কাণে আসতে দিই! এমন ক'রে দু'হাতে বাজে খরচ করলে—বিষয়-পত্তর বাঁচানো শক্ত হয়ে উঠবে। কালেক্টরী খাজনা পাঠিয়েছি তিনদিন আগে। প্রতিদিনকার এদিক-ওদিকের খরচের টাকাটা কেবল পড়ে রয়েছে। বেশীদিন আর নয়—এম্‌নি করলে সমস্তই একে একে নিলেমে উঠবে।"

"ওঠে উঠুক, সে জন্য আপনি-আমি ভেবে কি করবো? যার বিষয় সে বুঝুক্।"

"সে তো বটেই মা! কিন্তু সব ডুবে যাক্—সত্যিকারের তো তুমি তা' চাও না। তুমি বিশ্বাস করবে না: আদায় যা' হয়—তার তিনভাগের একভাগ তো বটেই—তার বেশীও মাসে মাসে খরচ ক'চ্ছেন উনি।"

"যাক্ ও-কথা, যার টাকা তিনি খরচ করেন, আমাদের বলবার কি অধিকার আছে? এখন এই টাকাটা কিসের জন্যে দরকার—জেনেছেন? আপনি কোনো কথা লুকোবেন না, চার-পাঁচ বছর বিয়ে হয়েছে—কিন্তু এই ক'বছরের ভেতরেই নিজেকে এম্‌নি ভাবে তৈরী ক'রে ফেলেছি যে, যে কোনো অবস্থার মুখোমুখি গিয়ে আমি দাঁড়াতে পারি।"

"মুখে কিছু বলতে পারবো না-মা! তুমি চিঠিটা পড়ো।"

চিঠিতে লেখা ছিল:—

—"দেওয়ান মহাশয়,

এই পত্র-বাহক আমার বিশ্বাসী। ইহার হাতে, আমাকে পত্রপাঠ পাঁচ হাজার টাকা, না হইলে, অন্ততঃ চার হাজার টাকা অতি অবশ্য পাঠাইয়া দিবেন। নগদ টাকা তহবিলে যদি না থাকে, আমার স্ত্রীর কাছে চাহিবেন, তাঁহার গহনা বাঁধা দিয়াও যদি টাকা সংগ্রহ করিতে হয়—তাহা করিবেন। অন্যথা করিলে, এক বিদেশী রমণীর কাছে আমার মর্য্যাদা হানি হইবে। তাহাকে আমি চার হাজার টাকা উপহার দিতে প্রতিশ্রুত আছি। বাকি টাকা দেওয়া যদি না সম্ভব হয়, আমি আপাততঃ ধার করিয়া চালাইয়া লইব, পরে শোধ করিলে চলিবে। ইতি—

শ্রীমহিমারঞ্জন চক্রবর্ত্তী।

পুঃ—আমার স্ত্রীকে আসল ব্যাপার জানাইবেন না। বলিবেন —ব্যবসায়-সংক্রান্ত কোনো বিশেষ ঠেকায় পড়িয়া টাকা চাহিয়া পাঠাইয়াছি।"

চিঠি-পড়া শেষ করিয়া শমিতা পাষাণের মতো কঠিন, মৌন-মূক স্তব্ধ হইয়া রহিল। যেন দুর্য্যোগের আগের বোবা প্রকৃতি!

দেওয়ান শমিতার মুখ-ভাব দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিল—বুঝি বা হিতে বিপরীত হয়। শমিতাকে প্রবোধ-প্রলেপ দিবার ভাষা দেওয়ান-কাকার মগজে জোগাইল না। শমিতার তীব্র-তিক্ত স্বর হঠাৎ যেন চাবুক মারিয়া দেওয়ান-কাকার চমক ভাঙ্গিয়া দিল।

"আপনি কি মনে করেছেন, দেওয়ানজী? টাকা পাঠাবেন?"

দেওয়ান থত-মত খাইয়া তোতলা স্বরে বলিল: "তা, তাঁর মান-মর্য্যাদায়...আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত নয় কি—মা!"

শমিতা ভ্রূ-কুটি করিয়া কহিল:—"বটেই তো! তাঁর মান-মর্য্যাদা রাখতেই হবে, বেশ্যার পেট ভরিয়ে, তাঁর বিয়ে করা স্ত্রীর গয়না বেচেও, তাঁর সন্তানের মায়ের—তাঁর সহধর্ম্মিণীর মান-মর্য্যাদা ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েও...কি বলেন?"

"না, মা! সে-কথা নয়...তবে—"

"তবে—কথাটা কি? টাকা চাই—ব'লে দিন্—আপনার মনিবের মোসাহেবকে, টাকা হবে না। তারপর যা' হয়—আমি বুঝবো।"

দেওয়ান ভয় পাইয়া মিনতির স্বরে বলিল, "মা, ভাল ক'রে বুঝে দ্যাখো! বাইরের লোকের কাছে মাথা-হেঁট করা কি সুবুদ্ধির কাজ হবে মা! তিনি ফিরুন, তার পরে একটা বোঝা-পড়া ক'রে নেবার অনেক সময় পাবে।"

"বোঝা-পড়া-করার অতীত এখন তিনি। আর সে ইচ্ছেও আমার নেই। মদ আর বারনারী যাঁর জীবনের স্বর্গ—তাঁকে কি সেই আনন্দের স্বর্গ থেকে নামিয়ে আনতে কেউ পারে?—না, —তাঁকে স্বর্গ-চ্যুত করা উচিত হবে না। তিনি বাঁচবার খোরাক পান্ ঐ থেকে, আমি কেন তাঁর বাধা হয়ে দাঁড়াবো?—আর সে ক্ষমতাও আমার নেই।"

"কিন্তু মা, রাগ ক'রো না, একটু কড়া যদি হ'তে—তা হলে আর এতটা বাড়াবাড়ি হতো না।"

"অনেক চেষ্টা করেছি, পদে পদে হার মেনেছি। যে শুনবে না—তাকে শোনাবে কে?"

"তবে এখন কি করবো—বলো? একটা পরামর্শ দাও।"

"পরামর্শ? আচ্ছা, দাঁড়ান।" এই বলিয়া শমিতা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে একটি বাক্স আনিয়া দেওয়ানের

পায়ের কাছে রাখিয়া দিল। দেওয়ান বুঝিয়াও কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, "এ কি, মা!"

"গয়নার বাক্স—বুঝেও বুঝতে পাচ্ছেন না দেওয়ানজী! এই নিন—তাঁর দেওয়া আমার সমস্ত গয়না। আর এক কাজ করুন, আমি দাদার কাছে আজকেই চ'লে যাবো, তার বন্দোবস্ত এখুনি করা চাই।"

"বলো কি? রাগের মাথায় এতোটা কি করা ভালো হবে, মা! আমি বুড়ো লোক, তোমার বাপের বন্ধু, তুমি আমাকে কাকা বলো,—হাত ধরে অনুরোধ কচ্ছি মা! এ কাজ ক'রো না।—হঠাৎ কোনো কাজ ক'রে বসা কর্ত্তব্য নয়।"

"আপনার কথা রাখবার মতো মনের অবস্থা আজ আর আমার নেই—কাকা বাবু! আপনাকে যা' বল্লাম—তাই করুন, নইলে আমি নিজেই আমার ব্যবস্থা ক'রে নেবো। এ বাড়ীতে আমি আর জলগ্রহণ করবো না। এখান থেকে আমার বাস উঠলো।"

বৃদ্ধ দেওয়ান সজল চোখে শমিতার দিকে চাহিয়া কি যেন বলিবার জন্য ইতস্ততঃ করিতেছিল। শমিতা দলিতা ফণিনীর মতো ফুঁসিয়া উঠিল···"ওঃ, আপনিও আমাকে এইটুকু সাহায্য দিতে নারাজ—আপনার মনিবের ভয়ে—নয়? বেশ, আমাকে মনে করবেন না—আমি সেই অবলা মেয়ে—যারা শুধু কাঁদতে জানে—আঘাত খেলে আঘাত ঘুরিয়ে দিতে জানে না! আমি নিজেই ব্যবস্থা ক'রে নিচ্ছি—আপনাকে কিছু করতে হবে না!··· তার চেয়ে আপনি যান, আপনার মনিবকে টাকা পাঠাবার যোগাড় দেখুন···তিনি হয়ত দেরী হ'লে আপনার উপর চ'টে যাবেন!"

শমিতা মেয়েকে কোলে তুলিয়া লইয়া সে-স্থান ত্যাগ করিল।

মহিমারঞ্জন ফিরিলেন আরো তিন দিন পরে—এই কয়দিনের অত্যাচারক্লিষ্ট রুক্ষ চেহারা লইয়া—যেন পূর্ব্বরাত্রের ঝড়ের উপদ্রবে শ্রীহীন বনভূমি। অবসাদ-দিগ্ধ অন্তরে তিনি বাইরের ঘরে আশ্রয় লইলেন। তাঁহার স্ত্রীর মৌন তিরস্কারের সামনে গিয়া দাঁড়াইতে তখনই ভরসা হইল না। তিনি আসিয়াছেন জানিলে তাহার বিরূপভাব কাটিতে বেশী সময় লাগে না, আগে এরূপ ঘটিয়াছে—কিন্তু এবার মাত্রা অধিক ছাড়াইয়া গিয়াছে বলিয়া তাঁহার মনের অন্ধকারে নানা রকম সন্দেহের ঝলক উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল। মহিমারঞ্জন মনে মনে ঠিক করিলেন: "এ ভুল শোধরাইতেই হইবে।" তিনি ইজিচেয়ারে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় চোখ বুজিয়া বহুক্ষণ পড়িয়া রহিলেন। স্ত্রীর পক্ষ থেকে অসম্ভব সম্ভব কত রকমের প্রশ্নই না মনে জাগিল। হাজার কৈফিয়তের ভাঙ্গা-গড়া চলিতে লাগিল; তবু কিছুতেই যেন তাঁহার এবারকার আচরণের সদুত্তর তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না। ফকির খানসামা আসিয়া আলবোলায় তামাক দিয়া গেল—তামাক অনাদরে পুড়িয়া পুড়িয়া আপনার সুগন্ধে আপনি গুমরাইয়া ঘরের বাতাসকে ভারী করিয়া তুলিল। ফকির ফিরিয়া দেখিল কর্ত্তাবাবু যেন নিদ্রালু, ধ্যানগত। সাহস করিয়া ডাকিল: "কর্ত্তাবাবু, নাওয়া খাওয়া করবেন তো—বেলা যে অনেক হয়েছে!"

মহিমারঞ্জন গৃহস্বামী হইয়া নিজের বাড়ীতেই যেন অনাহূত অতিথি বা কুটুম্বের মতো অপ্রতিভ ভাবে ব্যবহার করিতেছিলেন, নিজ ভৃত্যকেও হুকুম করিবার মতো জোরটুকু পর্য্যন্ত যেন তিনি হারাইয়া ফেলিয়াছেন। ফকিরের আহ্বানে মহিমারঞ্জন চোখ খুলিয়া ধীর-কণ্ঠে বলিলেন: "হ্যাঁ, চানের ব্যবস্থাটা ক'রে দে। খাওয়া দাওয়ার বিশেষ ঝঞ্ঝাট করবার দরকার নেই। সামান্য ফল টল আর এক গ্লাস বাদামের সরবৎ হ'লেই এ-বেলা চ'লে যাবে।"

"জী আজ্ঞে"—বলিয়া ফকির বাহির হইয়া যাইতেছিল; পুনরায় ডাক পড়িল: "আর ছাখ্, এই ঘরেই খাবারটা এনে দিস্, ভেতর বাড়ীতে এসব হাঙ্গামা করবার কাজ নেই।" ফকির মনিবের কথায় ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া চলিয়া গেল।

স্নান সারিয়া মহিমারঞ্জন নীরবে আহারাদি শেষ করিয়া শারীরিক খানিকটা প্রকৃতিস্থ হইলেন, কিন্তু তাঁহার মনের গুমোট তখনও পুরোটা কাটিল না। তামাক টানিতে টানিতে ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখিতে লাগিলেন, মনের ধোঁয়ার কুণ্ডলীও পাকের পর পাক খাইতে লাগিল। ভাবিতে লাগিলেন—কি অছিলায় যাইয়া স্ত্রীর কাছে উপস্থিত হইবেন। কাহাকেও স্ত্রীর সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে যেন তাঁহার গলা বন্ধ হইয়া আসিতেছিল; ঠোঁটে বাধিতেছিল। অনুতপ্ত অপরাধীর ন্যায় কোনো মতে আত্মগোপন করিয়া একধারে থাকিতে পারিলেই যেন তিনি এ-যাত্রা বাঁচিয়া যান। বারংবার স্ত্রীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার জন্য তাঁহার মন উদগ্রীব হইয়া উঠিল—প্রতিবারেই ভৃত্যের কাছেও অহেতুকী লজ্জা আসিয়া তাঁহার কণ্ঠরোধ করিল। কথাটা পাড়িবার মতো ছুতা তিনি খুঁজিতে লাগিলেন—ফকিরের একটি প্রশ্নে তাহা সহজেই মিলিয়া গেল।

ফকির পাশেই দাঁড়াইয়া ছিল, অবসর বুঝিয়া প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিল: "ও-বেলা কি খাবেন, কত্তাবাবু, যদি বলেন তো ঠাকুরকে তার যোগাড়-যন্তর করতে বলি।"

মহিমারঞ্জন ফকিরের দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে কহিলেন, "কেন বল্ দেখি! সে ব্যবস্থা করবার লোক তো বাড়ীর ভেতরেই রয়েছেন। তোরা এতোদিন আমায় জিজ্ঞেস্ ক'রেই কি আমার খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত ক'রে আস্‌ছিস্? তোদের রাণী মা—আমি এসেছি—খবর পান্ নি?"

ফকির মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "রাণী মা থাকলে আমাদের ভাববার কথা তো নয় কত্তাবাবু! তিনি এখন—"

মহিমারঞ্জন সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন। ভৃত্যের অর্দ্ধসমাপ্ত কথার উপরেই উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে বলিলেন, "তিনি এখন—কি? কি হ'য়েছে তাঁর? তিনি অসুস্থ ন'ন তো?—আমায় বলিস্ নি কেন, এতক্ষণ হতভাগা!"

"আজ্ঞে, কত্তাবাবু, রাণী মা এ-বাড়ীতে আজ চারদিন হোলো নেই—তিনি দিদিমণিকে নিয়ে বহরমপুরে চ'লে গেছেন।"··· ফকির থতমত খাইয়া এমনভাবে কথাগুলি বলিল—যেন সে-ই নিজে দোষী।

মহিমারঞ্জন একটা কিছু অনাগত ভয়ের আশঙ্কা করিতেছিলেন : কিন্তু সে ভয়ের পরিধি-বিস্তৃতি এতোদূর এ-কথা তাঁর কল্পনায় আসে নাই। তিনি বুঝিলেন, তাঁর জীবন-যাত্রার পরিচিত স্রোতোধারা আজ অকস্মাৎ অচেনা বিপরীত-অভিমুখী হইতে চলিয়াছে ; হয়তো ইহার আবেগ-সঞ্চারে তাঁহার সংসারে প্লাবন আনিতে পারে। স্বামীর বিনানুমতিতে স্ত্রী স্বেচ্ছাচারিণীর মতো ঘর ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে—এই সংবাদে মহিমারঞ্জনের পৌরুষে আঘাত লাগিল। ক্রোধে, অভিমানে, ঘৃণায়, লজ্জায় তাঁহার সারা শরীর-মন রি-রি করিয়া উঠিল। তবু নিজেকে সংযত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন : "উনি এ সংসারের ভার কা'র হাতে দিয়ে চ'লে গেছেন বহরমপুরে ? সেখানে হঠাৎ তাঁর যাবার তাগিদ এলো কিসের জন্যে ?"

"তা তো জানিনে, কর্ত্তাবাবু—"

"কেন জানিস্ নে ?—তোরা এতগুলো লোক বাড়ীতে কি কত্তে রয়েছিস তা হ'লে ? এর ব্যবস্থা হয়—তোদের সবগুলোকে ঘাড় ধ'রে দূর ক'রে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে !"

"বাবু, অন্ন আমাদের উঠে গেছে সে জানি, রাণী মা যে দিন থেকে চ'লে গেছেন। তিনি চ'লে গেছেন, তাঁর দাদার বাড়ী—এইটুকুনই জানি। কেন, কি বিত্তান্ত সে জিজ্ঞেস্ করবার আস্পর্দ্ধা আমার নেই—কেমন ক'রেই বা জিজ্ঞেস করবো কর্ত্তাবাবু! আমার অন্নপূর্ণা মা বাড়ী ছেড়ে চ'লে গেছেন—সেইদিন থেকেই আর এখানে মন টিকতে চাইছে না। আমায় সত্যিই ছুটি দিন্ কর্ত্তাবাবু !"

"দ্যাখ্, ফকির, আমার মনের অবস্থা বুঝে তবে আমার সঙ্গে কথা বলিস। বড্ড বুকের পাটা হ'য়েছে যে দেখছি। আচ্ছা—একেবারেই ছুটি পাবি। কিন্তু তিনি তাঁর বাড়ী ছেড়ে চ'লে গেছেন—এত বড় কথা তুই বলিস্ কি ক'রে ?"

"বাবু, আমায় মাপ করবেন। সত্যি কথা বলবো—তাতে আমায় যা শাস্তি দিতে হয় দেবেন। মা' যখন গেলেন, আমরা পায়ে ধরে কত মিনুতি করিচি—তিনি বল্লেন—তোরা আমায় আটকাবার চেষ্টা করিস্ নি। উপায় নেই বাবা। চোখের জলে আমায় বিদায় নিতে হচ্ছে—বোধ হয় আর ফিরতে হবে না।" বলিতে বলিতে ফকিরের কণ্ঠ ধরিয়া আসিল ; দুইটি চোখ জলে টলটল করিতেছিল।

মহিমারঞ্জন গুরুতর পরিস্থিতির সঙ্কেত পাইয়া গলার সুর নামাইয়া কহিলেন : "কে তাঁকে পৌঁছে দিয়ে এল রে ফকির !"

"দেওয়ান-মশাই।"

"ডাক্ তাঁকে।"

ফকির দেওয়ানকে ডাকিবার আদেশ পাইয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। নিমিষের মধ্যে সে ঘর হইতে সে অদৃশ্য হইয়া গেল।

দেওয়ান গোবিন্দরাম প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন। মহিমারঞ্জন পিতার আমলের এই বিচক্ষণ বিশ্বস্ত প্রবীণ কর্ম্মচারীটির প্রতি যে-রূপ শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন—তদতিরিক্ত নির্ভর করিয়া থাকিতেন তাঁহার সুনিয়ন্ত্রিত কার্য্যপরিচালনা-কৌশলের জন্য। তাঁহারই রক্ষণশীল ও সুনিয়মিত তত্ত্বাবধানের ফলে তরুণ মনিবের মধ্যে মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতার দমকা অপব্যয় সত্ত্বেও বড় বড় টাল্ সামলাইয়া যাইত। সেই কারণে দেওয়ানের সতর্ক নির্দ্দেশ এ বাড়ীতে কোনোদিন উপেক্ষিত হয় নাই। এই দেওয়ানই মহিমারঞ্জনকে অশেষ ক্ষয়-ক্ষতি ও পতনের নিশ্চিত সম্ভাবনা হইতে কয়েকবার রক্ষা করিয়াছেন। এই সমস্ত কারণে—মনিব হইয়াও বিষয়-কর্ম্মে গোবিন্দরামের সিদ্ধান্তের উপর, মহিমারঞ্জন স্বকীয় কোন মত জাহির করিতেন না। জমিদারী সম্পত্তির আয়ের হিসাব লইয়া মাথা-ঘামানো মহিমারঞ্জনের অভ্যাস ছিল না ; তিনি ব্যবসায়ের আয়-ব্যয় সম্পর্কে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। জমিদারী এবং ব্যবসায় উভয়েরই উদ্বৃত্ত অর্থ মহিমারঞ্জন গোবিন্দরামের মারফত ব্যাঙ্কে জমা দেওয়াইতেন। আর প্রমোদ-বিলাসের আতিশয্যে খরচের হুল্লো যখন লাগিয়া যাইত—সে তালও দেওয়ান-মশাইকেই সামলাইতে হইত ; তখন হিসেব-নিকেশের সকল যুক্তিই মহিমারঞ্জনের কাছে নিষ্ফল হইয়া উঠিত। মহিমারঞ্জন ছিলেন সেই প্রকৃতির লোক—যিনি কর্ম্মকাণ্ডে যখন ঝাঁপাইয়া পড়িতেন, তখন তাঁহার সম্মুখে সমস্ত আমোদ প্রলোভন চূর্ণ হইয়া যাইত ; কিন্তু কাজের ফাঁকে অবসর আসিলেই—তাঁহাকে দুর্জ্জয় নেশার মতো চাপিয়া ধরিত মদ ও রঙ-করা স্ত্রীলোক। সে সময়ে, মহিমারঞ্জনের কোনো হিতাহিত-জ্ঞান থাকিত না !… 'Drink deep or Taste not'—জলের ওপরে সাঁতার কাটা তাঁহার রীতি ছিল না—ভরা ডুব দিয়া আমোদের স্রোতের ঘূর্ণিজলে তলাইয়া পাঁক ছুঁইয়া তিনি পাঁক খাইতেন, আর মশগুল থাকিতেন—এই রীতির স্বপক্ষে তাঁহার সকল ইন্দ্রিয়-মন সম্মতি জানাইত। তার পরে আমোদের ঘোর যখন কাটিত, তখন তিনি আমোদের কথা একেবারে ভুলিয়া যাইতেন—কাজের পিছনে কাজ-পাগলা হইয়া ছুটিতেন। তখনকার মহিমারঞ্জন এক সম্পূর্ণ রকমের ভিন্ন মহিমারঞ্জন।

এতক্ষণ দেওয়ানের প্রতীক্ষায় গুম হইয়া বসিয়াছিলেন মহিমারঞ্জন। দেওয়ান আসিতে তাহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়াই তীব্র-স্বরে বলিয়া উঠিলেন : "এ সমস্ত ব্যাপার কি, দেওয়ান মশাই ! বাড়ীর মধ্যে যথেচ্ছাচার সুরু হয়ে গেল, কার পরামর্শে ? এর উত্তর কিছু ভেবে রেখেছেন ?"

গোবিন্দরাম বুঝিলেন, কথাগুলি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইতেছে। মনে মনে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেও ধীরভাবে উত্তর দিলেন, "উত্তর তোপ'ড়েই রয়েছে—ভাববার আর কি আছে ? শমিতা-মা নিজের মতেই কাজ ক'রেছেন—কারোর পরামর্শের অপেক্ষা তিনি রাখেন নি।"

মহিমারঞ্জনের কণ্ঠ আরও তীব্র হইয়া উঠিল : "তার মানে ? আপনি বল্‌তে চান্ তা' হলে—তিনি অকারণেই চ'লে গেছেন ?"

"ঠিক অকারণে নয়, কারণ একটা অবশ্য আছে বৈ-কি ?"

"কারণ-টা কি শুনি।"

"কথাটা বড়ই অপ্রিয়।"

"আমার মুখের ওপর বল্‌তে লজ্জা পাচ্ছেন্ ?—আমার সম্পর্কেই তো ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আপনি তা'হলে কোনো কথাই গোপন রাখেন নি! মনিবের হুকুম, তাঁর কর্ম্মচারীর কাছে অনুরোধের আকারেই এসে পৌঁছেছিল—তবু তা' অগ্রাহ্য করতে, কর্ম্মচারীর সাধুতায় বাধলো না! অতি-বিশ্বাসের খুব প্রতিদান আমায় দিয়েছেন, দেওয়ান-ম'শাই! ...আমার স্ত্রী সমস্ত কথাই জেনেছেন নিশ্চয়।"

"তিনি নির্ব্বোধ নন্...অল্পবয়স হ'লেও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী। আপনার টাকার জন্যে আপনারই আদেশে, তাঁরই শরণাপন্ন হ'তে হ'য়েছিল আমাকে। দমকা-দরকারের রহস্য-ভেদ ক'র্‌বার কৌতূহল তাঁর মনকে আলোড়িত ক'রেছিল। তাঁর প্রশ্ন-বাণে বিদ্ধ হ'য়ে আমাকে হার মানতে হ'য়েছিল..."

"সেই জন্যে তাঁকে সমস্ত কথা খুলে ব'লে নিজের টন্‌-টনে কর্ত্তব্য-জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন আপনি—এই তো আমাকে বোঝাতে চাইছেন? বুড়ো হ'য়ে মর্‌তে যাচ্ছেন—একটা সংসার-অনভিজ্ঞা উনিশ-বিশ বছরের মেয়ের চোখে ধুলো দেবার মতো বুদ্ধি যোগালো না আপনার?"

"সে-জাতের মেয়ে নন তিনি। আপনি তা'হলে ঠিক চেনবার চেষ্টা করেন নি তাঁকে। বাঙলাদেশে এমন অনেক মেয়ে আছে—যারা শুধু কাঁদতে জানে...উনি সে-রকম মেয়ে নন্।... সে-দিন আমাকে যে-সমস্যার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হ'য়েছিল—তা' আজ পর্য্যন্ত জীবনে কোনোদিন ঘটে নি। একদিক্ রাখতে গেলে আর একদিক্ থাকে না—এম্‌নি অবস্থা দাঁড়িয়েছিল। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ—সেখানে আমি কতটুকু কর্‌তে পারি—বলুন?—কর্ত্তাবাবুর সময় থেকে আমি আপনাদের জমিদারিতে কাজ করছি, আমাকে আপনি ভালোরকমই জানেন। আপনাদের দু'জনের উপরেই আমার স্নেহ রয়েছে—তাই এ-সংসারের কল্যাণই আমার কাম্য। স্বামী-স্ত্রীর ভেতরে বিবাদ-মনোমালিন্য ঘটুক—সে-অভিপ্রায় আমার থাক্‌তেই পারে না—আর নেই-ও। তাতে আমার নিজের স্বার্থেরই হানি—এ-টুকুন্ বুদ্ধি আমার আছে। রাণী-মার সে-দিনকার জিদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত শক্তি কারো ছিল না। অনেক মিনতি করেছি—কোনো ফল হয় নি। সন্দেহের বাষ্পে তাঁর মন ভ'রে ছিল—সে-দিন দেখলাম—তার উচ্ছ্বাস! যখন এক গণ্ডুষ জলও মুখে তুলবেন না ব'লে পণ কর্‌লেন, তখন বাধ্য হ'য়েই, কেবল নারী-হত্যার ভয়ে তাঁকে তাঁর ভাইয়ের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসতে হ'ল।... তা' ছাড়া, আমার..."

মহিমারঞ্জন হুঙ্কার দিয়া, কথায় বিষ ঢালিয়া বলিয়া উঠিলেন: "থামুন আপনি। সকলে মিলে আমার মাথা নীচু কর্‌বার জন্যে ষড়্‌যন্ত্র ক'রেছেন আপনারা। আমার স্ত্রীর সন্দেহকে নিশ্চিত ধারণায় এনে দিয়েছেন আপনি। পুরুষের বাইরের জীবনের সঙ্গে ঘরের স্ত্রীর কি সম্পর্ক? মেয়েরা ভাব-প্রবণ জাত—তা'রা আবেগের মাথায় যা' তা' ক'রে বসে—যুক্তি বা বিবেচনার কোনো ধার ধারে না তা'রা। সেজন্য তাদের জগতের একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিয়ে একটা আড়াল তুলে দেওয়া হ'য়েছে। সেই আড়ালটি আপনি সরিয়ে নিয়ে এই বিপত্তির সৃষ্টি ক'রেছেন। এখন আপনার মুখে 'সাফাই-গাওনা' হচ্ছে—'আমি নিরুপায়' ব'লে। এর জন্যে দায়ী আপনি। এই কাজের প্রায়শ্চিত্ত-ভোগ আপনাকে কর্‌তে হবে—না আমাকে কর্‌তে হবে? আপনি তো এখন সাফাই-বুলি গাইবেনই! বাপের আমলের কর্ম্মচারী—তাই ব'লে আমার ঘর ভাঙাতে সাহস করবেন, আপনি?...এ'টা আমার কাছে নেহাৎ আস্পর্দ্ধার মতনই ঠেকছে—দেওয়ান ম'শাই!!

গোবিন্দরামের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। প্রতিবাদ করিয়া মহিমারঞ্জনকে বলিয়া বসিলেন: "দেখুন, আমার সাধ্যমত চেষ্টা কর্‌তে আমি কসুর করিনি—এ-ক্ষেত্রে আমার সাধ্যে আর কুলোয়নি। যে মন তলে তলে বিষিয়ে উঠেছিল—তা'কে কোনো রকম ছলনায় চাপা দিয়ে রাখা যায় না—একদিন না একদিন সে ফেনিয়ে উঠবেই।...আমার আর এ অশান্তির মধ্যে থাক্‌বার ইচ্ছে নেই...। আপনি সত্যটা যেদিন ধর্‌তে পারবেন—আমার কথা সে-দিন আপনার মনে পড়বে।—অতো ছেলেমানুষ ভাববেন না আপনার স্ত্রীকে। ছেলেবেলা থেকে মা-কে আমার দেখে আস্‌ছি—কিন্তু সে-দিনকার মতো মূর্ত্তি—তাঁর আমি আর কখনও দেখিনি। আপনি আমার উপর অযথা রাগ না ক'রে, শর্মিতা-মাকে নিজে গিয়ে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করুন—নইলে, এ আগুন নিভবার নয়। বুড়োর কথাটা আজ যদি তুচ্ছ করেন, আপনি মনিব, করতে পারেন; কিন্তু, এ আমি জানি, আপনি নিজেই পরে এ ব্যাপার নিয়ে আফ্‌শোষ করবেন।"

যে প্রকৃত দোষী, সে নিজের দোষকে সমর্থন ক'রবার জন্যে অপরের দোষ অনুসন্ধান ক'রতে প্রবৃত্ত হয়; অবশেষে যখন নিজের দোষ 'সাফাই-সাবুত-সমর্থন'এর পারং-গত হইয়া দাঁড়ায়, তখন আত্ম-প্রবঞ্চনার পথ বাছিয়া লয়। মহিমারঞ্জনেরও তাহাই হইল। গর্জ্জন করিয়া বলিলেন: "অবাধ্য যে স্ত্রী—তার পায়ে মাথা খোঁড়ার মত দুর্ব্বলতা আমার নেই। মনে ভাববেন না—আমি সে-রকমের স্ত্রৈণ। যিনি স্বেচ্ছায় গেছেন—স্বেচ্ছায় ফিরতে চান, ফিরবেন—আমি বাধা দোব না। কিন্তু...। আচ্ছা, আপনিও এখন যেতে পারেন।"

গোবিন্দরাম যাইবার উপক্রম করিল—একটু ইতস্ততঃ করিয়া, আবার মুখ ফিরাইয়া বলিল, "রাণী-মার গয়নার বাক্সটা আমার কাছে আছে। আপনি রেখে দিলে আমার বোঝাটা হাল্‌কা হ'য়ে যায়।"

মহিমারঞ্জন চড়িয়া উঠিল: "গয়নার বাক্স?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তিনি আপনার দেওয়া সমস্ত অলঙ্কার আপনাকেই ফিরিয়ে দিয়ে গেছেন।"

"আচ্ছা, আপনি যান্—যখন দরকার বোধ করবো, চেয়ে পাঠাবো।"

চীৎকার করিয়া, খানসামা ফকিরকে হাঁক দিলেন। ফকির খানসামা আসিয়া দাঁড়াইতে ঝাঁঝাইয়া উঠিলেন, "উজবুকের মত দাঁড়িয়ে দেখছিস কি? বড় মজা পেয়েছিস্, না? পাজি, হতভাগা, গাধা! যাও জল্‌দি, হুইস্কি লে' আও। নাঃ, সুরাই এখন আমার একমাত্র সাথী! স্ত্রীলোকে আমার ঘেন্না ধ'রে গেছে। এই ফকির, লে আও পেগ্, জল্‌দি উল্লুক।" (ক্রমশঃ)

বিক্রমপুরের কথা

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বৎসরে দুইবার দেশে যাই, এবারও গিয়াছিলাম। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর গিয়াছি মনের মধ্যে আনন্দ লইয়া—এবার গিয়াছিলাম মনের মধ্যে নানা আশঙ্কা লইয়া। ১৩৫০ সালে দেশের শত শত লোক মরিয়াছে ও মরিতেছে, খাদ্যাভাবে, ম্যালেরিয়া, কলেরা, নানা সংক্রামক ব্যাধি দেশে স্থায়ী ভাবে বাসা বাঁধিয়াছে। তবু দেশের দিকে ১৯৪৪ সালের ১২ই অক্টোবর, ২৫শে আশ্বিন রওয়ানা হইলাম—১১-৩০ মিনিটের গোয়ালন্দ প্যাসেঞ্জারে। রাত্রির ইষ্টবেঙ্গল এক্সপ্রেসে উঠিবার মত সাধ্য অনেকেরই থাকে না, বিশেষ আমাদের মত প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদের। এ-গাড়ীতে তেমন ভিড় ছিল না। যে দু'চার জন উঠিলেন তাঁহারাও বেশ সজ্জন, কাজেই মনে ভাবিলাম সময়টা কাটিবে ভাল আর রাত্রিতেও বেশ আরামে বিছানা পাতিয়া ষ্টীমারে শুইয়া থাকিতে পারিব—কেন না এ-গাড়ীর ৭-৩০ মিনিটে গোয়ালন্দ পৌঁছিবার কথা, কিন্তু ঘটিল অন্যরূপ।

রাণাঘাট পর্য্যন্ত গাড়ী বেশ নির্দ্দিষ্ট সময়ে চলিতেছিল, কিন্তু হঠাৎ আড়ংঘাটা ষ্টেশনের কাছাকাছি আসিয়া গাড়ী থামিয়া গেল, কেন এইরূপ হইল আমরা সহসা বুঝিতে পারিলাম না। প্রায় আধঘণ্টা পরে জানা গেল—আড়ংঘাটা ষ্টেশনের মাইল দেড়েক আগে একটা মালগাড়ীর কয়েকটা গাড়ী রেল লাইনে উল্টাইয়া পড়িয়া গিয়াছে। তখন আমাদের মনে দুশ্চিন্তা আসিল। আড়ংঘাটা ছোট ষ্টেশন, কাছে ছোট একটি বাজার। চায়ের দোকানে ভিড় জমিল—চা-ওয়ালা শেষটায় আর চা যোগাইতে পারিল না। দুধও নাই চিনিও নাই, চায়েরও অভাব। দোকানীরাও কল্পনা করে নাই যে, এমন একটা অঘটন ঘটিবে। আমরা নিরুপায় হইয়া পড়িলাম। মিষ্টি বা খাদ্য মিলে না, যা কিছু ছিল যাত্রীরা দলে দলে বাজারে গিয়া তাহা নিঃশেষ করিয়া ফেলিল। সকলের চেয়ে কষ্ট হইতেছিল মহিলা-দের, তাঁহাদের ছোট ছোট শিশুদের জন্য, না মিলিতেছিল দুধ, না পাইতেছিলেন তাহাদিগকে খাওয়াইবার মত কোন কিছু জিনিষ। সঙ্গে যাঁহাদের দুধ কিছু সম্বল ছিল তাঁহারাই শিশুদের খানিকটা শান্ত রাখিতে পারিতেছিলেন। তার পর গাড়ীতে আলো ছিল না। আমার সঙ্গে কিছু বাতি ছিল, একটা বাতি জ্বালিয়া আমাদের ছোট কামরাটিকে খানিকক্ষণ আলো-কিত করিয়া রাখিলাম। সঙ্গে দু'খানি রুটি ও কিছু আলুসিদ্ধ ছিল, তাহা দিয়া একটি যুবকের সাহায্যে এক পেয়ালা চা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম—তাহাই খাইলাম। আর দুঃসময় যেন কাটে না—এমনই অবস্থা, আমি সহযাত্রীদের সঙ্গে নানারূপ গল্প-কৌতুক সময়টা কাটাইতেছিলাম।

রাত্রি যখন প্রায় দশটা তখন গাড়ী চলিল। সব গাড়ী হইতে মহিলারা করিলেন উলুধ্বনি। সেই সন্ধ্যার নিবিড় অন্ধকারে—গাড়ীর ভিতর অন্ধকারে বসিয়া থাকা, সে-ছিল এক মস্ত বিড়ম্বনা। আমরা গাড়ীতে বসিয়া রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত শুনিতে-ছিলাম শৃগালের হুক্কাহুয়া রব।

বেলা ১১-৩০ মিনিটে কলিকাতা ছাড়িয়া গোয়ালন্দ যখন পৌঁছিলাম, তখন রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে। অন্ধকারের মধ্য দিয়া হোঁচট খাইতে খাইতে চলিলাম—গোয়ালন্দ হইতে নারায়ণগঞ্জগামী মিক্সড্ ষ্টীমারের সন্ধানে। কেন না, ঢাকা মেল-ষ্টীমার আমাদের গ্রামের নিকটবর্ত্তী বহর ষ্টেশনে ভিড়ে না। আর তারপাশা হইতে নৌকা করিয়া যাইতে কেহ পরামর্শ দিলেন না। দিনে দুপুরে হয় এখন ডাকাতি, রাহাজানি, আর নৌকাভাড়াও আট টাকা, দশ টাকা মাঝিরা চাহিয়া বসে। তাহাদের আব্দার না রাখিলে চলে না।

মেল ষ্টীমার ছাড়িবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের যাত্রী ষ্টীমারও ছাড়িয়া দিল। আমি বিছানা পাতিয়া শুইয়া পড়িলাম। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টার ক্লান্তি ও অবসাদ এবং একান্ত আড়ষ্টভাবে বসিয়া থাকা যে কি ক্লেশদায়ক তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। এখন লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলাম এবং দু' পেয়ালা চা পান করিয়া অনেকটা সুস্থ হইলাম।

পথে ছোট ছোট ষ্টেশন। ষ্টেশনের কাছে নানা বেসাতি লইয়া বসিয়াছে চাষারা ও জেলেরা। কাঞ্চনপুরে ষ্টেশনে দেখিলাম মাছও খুব সুলভ, আর বেগুন চার পয়সা ছয় পয়সা মাত্র সের। কলিকাতাতে তখন বিক্রয় হইতেছিল বেগুন প্রতি সের ।০ ।৴০ আনা। কলা মর্ত্তমান (সবরী), চাঁপা, আখ, সবই বেশ সস্তা। আমি কতগুলি মর্ত্তমান কলা কিনিলাম। যে কলা কলিকাতায় এক টাকা, সে কলা কিনিলাম চার আনা পয়সায়। ক্রমে রৌদ্র উঠিল। চারিদিক প্রদীপ্ত হইয়া যেন হাসিতে লাগিল। শরতের প্রসন্ন শ্রী, শান্ত পদ্মার বুকে, পদ্মার চড়ায় কাশবনের শুভ্র শ্রীতে দূর পল্লীগ্রামের রৌদ্র-পুলকিত তরুশ্রেণীকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। মাঠের জল তখনও শুকায় নাই। খালের জল বেগে আসিয়া নদীর বুকে পড়িতেছে। ক্ষেতে ক্ষেতে তখনও ধান রহিয়াছে। জেলে ডিঙ্গি লাল 'বাদাম' (পাল) খাটাইয়া বেগে চলিয়াছে। আর গ্রামের তরুশ্রেণীর মাথার উপর দিয়া দেখা যাইতেছে—কোন কোন পল্লীর মঠের উচ্চ চূড়া। এক সময় বিক্রমপুরের প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই মঠ দেখা যাইত। সে মঠের অনেকগুলিই পদ্মার কল-কল্লোলের সহিত চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ষ্টীমার চলিল—পদ্মাগর্ভে নিমজ্জিতপ্রায় তেলিরবাগ গ্রামের পাশ দিয়া। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের, দুর্গামোহন, কালীমোহন, ভুবনমোহনের বাড়ীর চিহ্ন নাই। সেই স্মরণীয় পুণ্যতীর্থস্বরূপ দেশবন্ধুর বাড়ী পদ্মাগর্ভে বিলীন হইবার পূর্ব্বে যে ফটোগ্রাফ তুলিয়াছিলাম, এখানে তাহা মুদ্রিত হইল।

কখনও শুইয়া, কখনও গল্প করিয়া বহর ষ্টেশনে যখন আসিলাম, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। চাঁদ রায় কেদার রায়ের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি কেশার মার দীঘির মধ্যে পদ্মা আসিয়া পড়িয়াছে। ছেলে বেলা কেশার মার দীঘির বুকে দেখিয়াছি কালো জলে কালো ঢেউয়ের নৃত্য, দেখিয়াছি, দক্ষিণ পাড়ে ছিল এক বিরাট স্তূপ—বিস্তৃত সোপানশ্রেণী ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। চারি পাড়ে

পদ্মাতীরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বাড়ী (পদ্মাগর্ভে নিমজ্জিত)

জঙ্গল ও মাঝে মাঝে বসতি। পদ্মা সেখান হইতে প্রায় পাঁচ, ছয় মাইল দূর দিয়া ছিল প্রবাহিত। দীঘির দক্ষিণ পাড়ের কালাপাহাড় তলার সেই বিরাট গাছ, জঙ্গল—যে পথে লোকে রাত্রিতে চলাফেরা করিতে ভয় পাইত। লোকেরা বলিত—কালাপাহাড় তলায় আসিলেই প্রজ্জলিত মশাল বা লণ্ঠন সব নিবিয়া যায়। কোথায় গেল সেই কালাপাহাড় তলা! কোথায় গেল সে ভূতের ভয়! কেশার মার দীঘিটি দৈর্ঘ্যে ছিল আধ মাইল, আর প্রস্থে ছিল সোয়া মাইলেরও উপর। রাজবাড়ীর বিখ্যাত মঠটি ছিল বিক্রমপুরের একটি প্রকাণ্ড ল্যাণ্ড মার্ক। প্রাচীনের স্মরণীয় কীর্ত্তি। আমরা শৈশবে রাজবাড়ীর খালে বিজয়াদশমীর দশহরা দেখিয়াছি, কি ছিল আমোদ-প্রমোদ, উৎসব ও আনন্দ, সে খালের মধ্য দিয়া ষ্টীমার চলিতে দেখিয়াছি, চাঁচরতলার কালীবাড়ীতে শনি মঙ্গলবারের ঢাকের তুমুল শব্দে বুঝিতে পারিয়াছি হতভাগ্য ছাগকুলের জীবনান্তের ঘোষণা-রব। রাক্ষসী পদ্মা সে সকলের চিহ্ন চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে। তাহাদের নাম থাকিবে শুধু ইতিহাসের পৃষ্ঠায়। আমাদের চোখের কাছে সে সব ফুটিয়া উঠে—স্বপ্নের মত। মনে পড়ে কহেরক, বেহার পাড়া, দীঘির পাড়, সালকে প্রভৃতি নানা গ্রামের উৎসব-স্মৃতি! কোথায় বিলীন হইল সে সব!

ষ্টীমার ভিড়িল। আমাদের গ্রামের নাম মূলচর। ছোট গ্রাম। ষ্টেশন হইতে এখন আধ মাইলও দূর নহে। কিন্তু নৌকায় মাঝি হাঁকিয়া বসিল দু'টাকা ভাড়া। আগে এক আনা দু' আনাতেই ছিল তারা সন্তুষ্ট। অবশেষে এক টাকায় রফা করিয়া রওনা হইলাম। নৌকার মাঝি সবই মুসলমান! প্রতি দিন তাহারা এখন চার পাঁচ টাকা রোজগার করে। মাঝি বলিল, গেল মাসে সে দেড়শত টাকা রোজগার করিয়াছে। একদিন যেখানে দুই আনা ভাড়া দিতে হইত এখন সেখানে হইয়াছে দুই টাকা, আর একটু দূর পল্লীতে যাইতে হইলে ৫।৬৲ টাকার কম তাহারা যায় না। মাঝিরা বলিল, তবু তাহাদের দুর্দ্দশার অবসান হয় নাই। চাউল, তেল, নুন, খড়ি, মাছ, দুধ, খাদ্যসামগ্রী সকলই হইয়াছে দুর্ম্মূল্য! দুঃখ করিয়া বলিল, আগে কম রোজগার ছিল কিন্তু কষ্ট ছিল না, এখন রোজগার বেশী, কিন্তু খাবার মিলে না।—হিন্দু, শূদ্র, মাঝি এখন মানের বালাই লইয়া এই নৌকা চালনার ব্যবসায় ছাড়িয়া দিয়াছে। দেখিলাম

নৌকার মাঝি মুসলমান, ফেরিওয়ালা মুসলমান, শ্রমজীবী মুসলমান, ঘরামি মুসলমান, জনমজুর মুসলমান, মৎস্যবিক্রেতা মুসলমান।—হিন্দু সেখানে নাই। এজন্য সাহসী, নির্ভীক এবং শ্রমপটু মুসলমানেরা এই দুর্দ্দিনেও বাঁচিয়া আছে, মরে নাই। আর হিন্দু না খাইয়া মরিতেছে, পীড়ায় ভুগিতেছে, তবু তাহারা শ্রমসাধ্য কাজ করিতে পরাঙ্মুখ! অলস, দুর্ব্বল ও ভিখারী।

গ্রামে আসিলাম। একদিন যে গ্রামের শোভা ছিল, শ্রী ছিল, সে গ্রাম এখন শ্রীহীন! নদীর পার ছিল বেড়াইবার উপযুক্ত স্থান—কিন্তু সেখানে এখন নানা শ্রেণীর লোকেরা বাড়ী করিয়াছে, ঝিষি-মুচিরা বিনা বাধায় চামড়া শুকাইতেছে, দুর্গন্ধে প্রাণ অতিষ্ঠ। নদীর কূলে হইয়াছে পায়খানা। স্যানিটারি ইন্‌স্পেক্টার আছেন, কি দেখেন তিনিই জানেন। দূষিত নদীর জলই অজ্ঞ পল্লীবাসীরা নিশ্চিন্তে পান করিতেছে। স্বাস্থ্য বা সৌন্দর্য্য কোন দিকেই তাহাদের কোন খেয়াল নাই। আরো আশ্চর্য্যের কথা এই যে,

কেশার মার দীঘি

গ্রামের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষিত, তাঁহারাও এ বিষয়ে উদাসীন। এ দুর্দ্দিনেও তাস-পাশার আসর বসে।

নদী ভাঙ্গার দরুণ আমাদের পল্লীতে যে গ্রামে এক সময় মাত্র ২০০০।২৫০০ হাজার লোক ছিল, এখন সেখানে হইয়াছে প্রায় ৬০০০।৭০০০, দ্বিগুণেরও উপর। পথ নাই, ঘাট নাই, কোনরূপ সুযোগ-সুবিধাই নাই। আবর্জ্জনাজনিত দুর্গন্ধে গ্রামের অবস্থা শোচনীয়—বসন্তে লোক মরিতেছে, টীকা লইতেও অনেকে চাহে না। টীকা লওয়াও যেন একটা ভীষণ সঙ্কট। যিনি স্যানিটারী ইন্‌স্পেক্টার, তাঁহারও অবসর কম, তাড়াও তেমন নাই। অন্য দিকে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, তাঁহার এসব দিকে মন দিবার সময় বা অবসরই বা কোথায়! নানা কাজ তাঁহার কাঁধে। তারপর দৈনন্দিন অভাব-অভিযোগ, তেল, নুন, খড়ি জোগাড় করে কে? ফুড-কমিটি হইয়াছে গ্রামে গ্রামে, কমিটির সভ্য যাঁরা তাঁহাদের এই অবৈতনিক কাজে তেমন উৎসাহ কোথায়? তবু তাঁহারা কাজ করেন। সকল গ্রামে অবশ্য সমান নহে। অনেকে গ্রামের এই দুর্দ্দিনে গ্রামের অবস্থার কথা ভাবেন, কিন্তু প্রতিকারের পথ খুঁজিয়া পান না। গ্রামের ডাক্তারখানাগুলিতে ঔষধের অভাব। কুইনিন কোথায়? সার দিয়া ২০০।৩০০ শত লোক দাঁড়াইয়া থাকে শিশি হাতে ঔষধের জন্য। জ্বরে ধুঁকিতেছে, শিশুরা কাঁদিতেছে—স্ত্রীলোকেরা জীর্ণ বস্ত্রখানি পরিয়া কোন রকমে লজ্জা নিবারণ করিতেছে। হাসপাতালের একজন ডাক্তার ও কম্পাউণ্ডার কেমন করিয়া এত লোককে ঔষধ যোগাইবে? তারপর ডাক্তারবাবুর এমারজেন্সি হাসপাতাল আছে—সে সব রোগীদেরও ঔষধপথ্য যোগাইতে হইবে। বাহিরের কল আছে, কিন্তু এখন সময় কোথায়? এমারজেন্সি হাসপাতালে নার্স হইয়াছে, মিনিয়েল, সুইপার, পাচক ব্রাহ্মণ সবই আছে; কাজেই অনেক দুঃস্থ, নিরন্ন ব্যক্তির কিছু কিছু উপার্জ্জনের পথ হইয়াছে।

বিক্রমপুর ছিল পাঁচ সাত বৎসর আগেও সুখ, স্বাস্থ্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের পীঠস্থান। অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত জিনিসপত্র থাকিত আশাতিরিক্ত সুলভ। মাছ, তরি-তরকারির ত' কথাই ছিল না। কিন্তু এবার দেখিলাম দুধের সের ।০, ৷৵০, পূজা-পার্ব্বণের সময় ১৲ টাকাও হইতেছে। শিশুরা, সন্তানবতী জননীরা বাঁচিবে কিরূপে? সে কথা কেহ ভাবেন না। গ্রামের কথা কে চিন্তা করিবে?

তারপর শিশুমৃত্যুর সংখ্যা অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া চলিয়াছে। জ্বরে—যে ম্যালেরিয়া জ্বরের নাম বিক্রমপুরবাসী কোনদিন শোনে নাই, সেই জ্বরে বিক্রমপুরে সকলের চেয়ে বেশী মৃত্যু হইয়াছে ও হইতেছে। গ্রামগুলি স্ফূর্ত্তিহীন, নির্জ্জীব, উৎসাহহীন, বিমর্ষ এবং গ্রামের লোক মানসিক ও দৈহিক শ্রম করিতে অক্ষম হইয়া পড়িতেছে। বিক্রমপুর বন্যাপ্লাবিত দেশ, প্রতি বৎসর বর্ষাকালে—মাঠ, ঘাট ডুবিয়া যায়, সমুদয় আবর্জ্জনা ধুইয়া মুছিয়া যায়—তবে ম্যালেরিয়া আসিল কোথা হইতে? সে বিষয়ে কেহ কি অনুসন্ধান করেন? আমার মনে হয়, অপুষ্টিকর খাদ্য, খাল, বিল প্রভৃতির জলনিকাশের অভাব এবং কচুরিপানার প্রাদুর্ভাব হইতেছে তাহার প্রধান কারণ। দেশে বড় বড় ধনী আছেন, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড আছে, তবু খাল, বিল প্রভৃতির কচুরিপানা পরিষ্কার হয় না। দেখিলাম গ্রামের পুকুর, দীঘি, পানায় ভরা, জল সমল,—সংস্কার নাই, মাছ বাড়িবে কিরূপে? আর মৎস্য রক্ষণের ব্যবস্থাই বা করে কে? তার উপর দলাদলি, সরিকি মামলা ত রোজকার ঘটনা। [আগামী বারে সমাপ্য

মাটি ও মানুষ

শ্রীমনোজ বসু

(চার)

কথামালার একচক্ষু হরিণ তার একমাত্র চোখটি সতর্ক রেখেছিল ডাঙার দিকে, কিন্তু নদীপথে ব্যাধের তীর এসে বিঁধল, স্বপ্নেও সে এ আশঙ্কা করে নি। সাগরহাটির সঙ্গে বিরোধ মিটলে নতুন চর সম্পর্কে নিঃশঙ্ক হয়েছিলেন ইন্দ্রলাল, কিন্তু বিপদ বাধাল চাষাভুষোরা—মেষের মতো চিরদিন যারা নিরীহ ও আজ্ঞাবহ। এদের মধ্যে এসে জুটেছে বুড়ো বনমালী, সাহস জোগাচ্ছে সে-ই। চিরদিন একনিষ্ঠ ভাবে প্রাণ অবধি তুচ্ছ করে সে রায়দের শ্রী-সম্পদ বাড়িয়েছে, খোঁড়া পা অতীত কাজকর্মের সাক্ষ্য দিচ্ছে, বুড়া বয়সে সেই মানুষের এই মতিগতি হয়েছে এখন। চাষাদের মধ্যে সে মাতব্বর, প্রায় দেবতা-গোঁসাই বললেই হয়। জেলে যাওয়া আগে ছিল ঘৃণ্য ব্যাপার, যে জেলে গিয়েছে তার সঙ্গে মেলামেশা করতে সঙ্কোচ করত সাধারণ মানুষ। এখন চোর-ডাকাত অবধি বুকে থাবা মেরে বলে বেড়ায়, বেড়িয়ে এলাম জেল থেকে; বলে অবশ্য, স্বদেশী করে গিয়েছিলাম। জেল থেকে মানুষ নূতন ইজ্জত নিয়ে ফিরে আসে, জেল যেন সাধনাক্ষেত্র, নিছক ভাবোন্মাদনায় জেলে ঢুকে সেখান থেকে পুরোপুরি শিক্ষা নিয়ে বেরিয়ে আসে। সত্যসন্ধ সর্বত্যাগী কঠোর কর্মী বহুজন উদ্ধত কারা-প্রাচীরের আড়ালে, বিদেশী সরকার তাঁদের বাইরে ছাড়তে ভরসা পায় না। ছ' মাস ছ'মাস কি ছ' এক বছরের জন্য যারা জেলে ঢোকে, ওদেরই কাছ থেকে স্ফুলিঙ্গ নিয়ে বেরিয়ে আসে। বেরিয়ে আসে আর এক মানুষ, সকলের নমস্য—সকলের চেয়ে মাথা যেন তার উঁচু, সকলের চেয়ে গলায় তার জোর বেশি, সকলে শোনে তার কথা তন্ময় হয়ে, নূতন মহিমায় যেন ঝলসিত হয় তার মুখ। সদরে একের পর এক উচ্ছেদের মামলা চলছিল, চাষারা অসহায় এ-ওর মুখে তাকাচ্ছিল, এমন সময় বনমালী কলকাতা থেকে এসে পৌঁছল নতুন চরে।

বুদ্ধি একটা বাতলাও সর্দার। নয় তো মারা পড়ি। ক্ষেতখামার ঘরদোর ছেড়ে গাঙ্ পাড়ি দিতে হবে এবার।

বনমালী চেপে বসল রাখাল দাসের বাড়ি, কাজ পেয়ে সে বেঁচে গেল, আর কোথাও নড়ছে না সে আপাতত। কাজের মতো কাজ পেয়েছে। ঢালিদলের সর্দারি করত, লাঠিবাজি করে বেড়াত অষ্টবেঁকির এপারে-ওপারে। নূতন সংগ্রামের এই যে পাঠ নিয়ে এসেছে, লাঠির কাজ বাতিল একেবারে—জীবনান্তের আগে এ-ও সে শিখিয়ে যাবে সে-আমলের শিষ্য-প্রশিষ্যদের, তাদের পুত্র-পৌত্র পরম্পরায়, নিজেদের বাঁচা-মরায় কর্তৃত্ব থাকবে সম্পূর্ণ নিজেদের এই বিচিত্র বলীয়ান শিক্ষা।

প্রণব ইঞ্জিনিয়ার মানুষ, তাজা বয়স, রক্ত যেন টগবগ করে ফুটছে, চুপচাপ থাকতে পারে না। রোদ না উঠতেই ধনুক নিয়ে তৈরি শিকারের জন্য। জ্যোৎস্না শুনবে না, সে-ও যাবে। মোটর চালানোর মতো বন্দুক ছুড়তেও শিখেছে সে প্রণবের কাছে। বরঞ্চ সে স্থির তীক্ষ্ণ সতর্ক-দৃষ্টি, প্রণবের চেয়েও ভাল শিকারী, প্রায় অব্যর্থ তার টিপ। ডায়মণ্ড হারবার রোড বেয়ে মোটরে দূর দূরান্তর গিয়ে অনেক দিন এ সবের পরীক্ষা ও প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে। গ্রামে আসবার সময় দুটো রাইফেল ও তাই নিয়ে এসেছে। অভিলাষের মুখে কাল শোনা গেছে বিস্তর কাঁক পাখী পড়ছে নতুন চরে। শিকারে চলল তারা।

প্রকাণ্ড দল হয়ে পড়ল। প্রণব, জ্যোৎস্না, অমূল্য, নকড়ি আর রায়-বাড়ির পাইক দরোয়ান প্রভৃতিতে জন দশেক। ফটকের বাইরে যেতে ছোট বড় নানা বয়সি পাড়ার বিস্তর মানুষ পিছু নিল। এ এক নূতন ব্যাপার এ অঞ্চলে, বিশেষ করে মেয়ে মানুষ চলেছে বন্দুক নিয়ে ব্রীচেস্ পরে।

অমূল্য হুমকি দিয়ে ওঠে। একি—একি ব্যাপার। নেমন্তন্নে চলেছে নাকি? মথুরাসিং মানা করো। এত মানুষ দেখে বাঘ-সিংহ ভয় পেয়ে যায়, এ তো পাখী—

পরণে খাকি হাফ প্যান্ট, খাকি কোট, পায়ে ভারি জুতো—অমূল্যরও বীরমূর্তি। মনের দেমাক প্রতিপদক্ষেপে যেন রূঢ় আঘাত দিচ্ছে মাটির গায়ে।

তাড়িয়ে দাও মথুরাসিং—

লাঠি উঁচিয়ে মথুরাসিং তাড়া করল। মানুষগুলো সরে যায়, পিছন ফিরলে আবার এসে ভিড় করে। নদীর ধারে এসে পৌঁছল। সেইখানে মথুরাসিং পাঁচ হাতি লাঠির এক প্রান্ত মাটিতে আর একপ্রান্ত দু'-হাতের দৃঢ় মুষ্টির মধ্যে ধরে বীরভঙ্গিমায় রাস্তা আগলে দাঁড়াল। জনতা থমকে গেল, আর এগোবার ভরসা পায় না।

খেয়ানৌকা ঘাটে লাগল। একে একে সবাই নৌকায় উঠল। মথুরা সিং লাঠি বাগিয়ে তেমনি দাঁড়িয়ে। সকলের

শেষে সে হাসতে হাসতে উঠে পড়ল। অষ্টবেঁকির উপর দুলে দুলে নৌকা যাচ্ছে। এ-পারের লোক হাঁ করে ঘাটে দাঁড়িয়ে দেখছে।

নতুন চর। কচি নধর ধানচারা দিগন্ত অবধি সবুজ করেছে। উঁচু জমিতে লাঙল চষছে কেউ কেউ এখনো। বৃষ্টির অবস্থা বেশ ভাল এবার। জায়গায় জায়গায় জল বেধেছে এরই মধ্যে। চষা ক্ষেতে পা ফেললে জুতোর সঙ্গে ভিজে মাটি লেপটে যায়, দু-চার পা গিয়ে পা তোলা দুষ্কর হয়ে ওঠে। সকলের আগে বীরদাপে চলেছে প্রণব। জ্যোৎস্না ক্ষেতে নামল না, গ্রামের দিকে যায়—চাষীপাড়ার ভিতর।

অমূল্য এসো তুমি আমার সঙ্গে এদিকে—

প্রণব বলে, পাখী কোথায় ওদিকে? শুধু হাতে ফিরতে হবে বলে রাখছি।

জ্যোৎস্না বলে, তা বলে ঐ কাদায় নেমে চিতে-বাঘ সাজা পোষাবে না আমার।

পাড়ায় ঢুকবার আগেই বাবলাবনে একটা ঘুঘু শিকার করল জ্যোৎস্না। ডান চোখ বুজে ভ্রূ কুঁচকে অদ্ভুত ভঙ্গিতে তাক করে; মজা লাগে দেখতে। বন্দুকের কুঁদো থাকে বুকের ডাইনের দিকে ভর দেওয়া। আনাড়ি লোক হলে বন্দুকের উল্টো ঝাঁকিতে বুকে চোট লাগা সম্ভব ছিল। কিন্তু তা হল না, একটু পিছু হঠে সুকৌশলে সে সামলে নেয়। ফর্সা মুখে রোদ পড়ে লাল টুকটুক করছে, যেন আগুন লেগেছে মুখের উপর। খানিকটা পথ গিয়ে হঠাৎ আবার জ্যোৎস্না থমকে দাঁড়ায়, আওয়াজ ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ—টুপ করে পাকা ফলের মতো জটিল শাখাপ্রশাখার ভিতর দিয়ে পাখী একটা পড়লো উলুঘাসের ভিতর।

অমূল্য! বলবার আগেই অমূল্য ছুটেছে কুড়িয়ে আনতে। ঝিঙল গাছে বাখারি বেঁধে বেড়া দেওয়া, লাফিয়ে সে ভিতরে পড়ল। বীজ-পাতা তুলে আঁটি বাঁধছে ক'জন সেখানে।

দড়ি জোটে না?

ওদের ভিতর থেকে কথাটা এল। পিছন ফিরে কাজ করছে, মুখ দেখা যায় না। অমূল্য বলে, কাকে কি বলছ?

তোমাকে। বনমালী সর্দারের ছেলে খানসামা বৃত্তি কর শহরে ছিলে, বেশ তো ছিলে। বুড়োর মুখ পোড়াতে এখানে এসেছ কেন?

আর একজন মন্তব্য করে, গলায় দড়ি দিয়ে মরোগে তুমি।

অমূল্যর রাগের সীমা রইল না। সঙ্গে লোকজন আছে, এই ক'টাকে উচিত মতো শিক্ষা দেওয়া যায় এই মুহূর্তে। কিন্তু কিছু করল না, শুনতেই পায় নি এমনি ভাবে মুখ কালো করে বেড়া পার হয়ে বেরিয়ে এল। পায়ে দড়ি বেঁধে মরা পাখীগুলো এই যে ঝুলিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে জ্যোৎস্নার পিছু-পিছু, খানসামার কাজই তো প্রায় এটা। এর অপমান সহসা অমূল্য প্রত্যক্ষ করল। হৈ-চৈ করলে ওদের কথাগুলো ছড়িয়ে পড়বে আরও। রায়বাড়ির পাইক-বরকন্দাজ অবধি নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করবে এই নিয়ে।

জ্যোৎস্না অনেকটা এগিয়ে গেছে এর মধ্যে। চাষাপাড়া সামনে। কত রকম পাখী ডাকছে, সেদিকে লক্ষ্য নেই তার এখন। দেখছে—লাউমাচা, ঝিঙেফুল ফুটে আছে কেমন সুপারি গাছ জড়িয়ে, নূতন ছাওয়া খোড়ো-চাল প্রভাত-রোদ্রে ঝিকমিক করছে। মুগ্ধ চোখে দেখতে দেখতে সে যাচ্ছে।

গরুর গাড়ির চাকায় গর্ত মতো হয়েছে, বৃষ্টির জল জমে আছে সেখানে। অন্যমনস্ক জ্যোৎস্নার জুতো সমেত পা পড়ল তার মধ্যে। আছাড় খেতে খেতে সামলে নিল, জল-কাদা ছিটকে এসে পড়ল প্রসাধন-মার্জিত মুখে চোখে। অবস্থাটা ভাল করে অনুধাবনের আগে—

হি-হিহি হো-হো-হো—

সে কি হাসি আর হাততালি তার সঙ্গে।

বিবক্ত বিরত ভাবে তাকিয়ে দেখল কতকগুলো চাষী মেয়ে-বৌ, কয়েকটা শিশুও আছে তাদের সঙ্গে। কলকাতার মেয়ের কাণ্ড দেখতে তারা জুটেছে এসে পুকুর-ধারে, মনে মনে সম্ভ্রম আর আতঙ্কের মিশ্র অনুভূতি। এর মধ্যে জ্যোৎস্নার এই অবস্থা দেখে কৌতুকের হাসি রোধ করতে পারে নি।

বন্দুকটা ছিটকে প'ড়েছিল, তুলে ধরতে মেয়েগুলো অনেক দূরে গিয়ে দাঁড়াল। অপমানে জ্বলছে জ্যোৎস্না, বন্দুক লক্ষ্য করল তাদের দিকে। কি করত বলা যায় না, ফাঁকা আওয়াজ করত হয়তো ভয় দেখাবার জন্য। কিন্তু ততদূর আবশ্যক হল না, এবার চোঁচা দৌড় দিল তারা। নানান বয়সী তাদের মধ্যে—থপথপে মোটা পাকা চুল একটা মেয়ের দৌড় দেখে রাগ জল হয়ে গিয়ে জ্যোৎস্নার কৌতুক লাগল। হাসছে না, কিন্তু চোখে হাসি নাচছে যেন। মা পিসিদের ছোটরাও দৌড়চ্ছে।

বছর দশেকের একটা মেয়ে কেবল চুপচাপ তাকিয়ে আছে জ্যোৎস্নার দিকে। সে ভয় পায় নি। যে জঙ্গলে কখনো শিকারি ঢোকেনি, সেখানকার হরিণের মতো নিরীহ নির্ভীক দৃষ্টি। জ্যোৎস্না বিরক্ত হল, বন্দুক ফেরালে তার দিকে। কলাবাগানের দিক থেকে চীৎকার আসে, পালিয়ে যা রে নিমি, ছুটে পালা—

মেয়েটী একবার তাকাল সে দিকে। তাদের কথা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে যেমন ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে রইল।

কোমল কণ্ঠে জ্যোৎস্না তখন ডাকল, নাম তোমার নাম? ওরা বলছে তা পালাচ্ছ না কেন?

নিমি জবাব দেয়, দেখ্‌ছি—

আমাকে?

উঁহু, তোমাকে কেন? ঐ যে—

আঙুল তুলে নিমি জ্যোৎস্নার হাতের বন্দুক দেখিয়ে দিল।

কাছে এস, এসে ভাল করে দেখ -

শুধু বলার অপেক্ষা। ছুটে এসে নিমি বন্দুক জড়িয়ে ধরল। বলে, মারো দিকি—

কি মারব, বলে দাও।

উ-ই যে পাখী—

আকাশের অনেক উপরে উড়ন্ত একঝাঁক বালিহাঁস দেখিয়ে দিল। উৎসাহের আবেগে বলে, আমি মারব। দাও—দাও—

জ্যোৎস্না হেসে উঠে বলে, কই খুকি, উড়ে পালিয়ে গেল। বন্দুক মোটে তুলতেই পারলে না—

নিমি কালো চোখ দুটি তার দিকে মেলে বলল, তুমি দেখিয়ে দিলে না যে! দেখিয়ে দাও, পাখী আবার এলে মারব।

ছোট্ট মানুষ যে তুমি! দেখাই কি করে?

বোসো এখানে, বসে দেখিয়ে দাও—

জ্যোৎস্নার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে নিমি ছোট দুটি হাতে তার কোমর বেষ্টন করে ধরেছে। ছাড়বে না। বলে, বোসো -

জ্যোৎস্না বলে, কাদার মধ্যে ঝাপটে বসলে আবার যে হাসবেন কলাবাগানের ঐ ওঁরা।

তবে এসো আমাদের বাড়ী। উঠোনে বসে দেখিয়ে দেবে।

হাত ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নিমি। যেন গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে চলেছে। জ্যোৎস্না প্রতিবাদ করে না, কৌতুক লাগছে তার। কাঁঠাল খাচ্ছিল বুঝি মেয়েটা একটু আগে, হাতে কাঁঠালের রস মাখা। জ্যোৎস্নার গায়ে রস লেগে চটচট করছে, হাসতে হাসতে সে চলেছে নিমির সঙ্গে।

পিছন ফিরে একবার দেখল, অমূল্য আসছে না, স্থাণু হয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার উপর।

জ্যোৎস্না ডাকে, কি---হ'ল কি তোমার?

অমূল্য ঘাড় নেড়ে বলে, আমি আর কোথায় যাব? দাঁড়াই এখানে।

কিসে যেন অমূল্যর পা আটকে ধরেছে। এই পাড়ায় আছে তারই আপনজনেরা, একটু আগে যারা গালি-গালাজ করল। দুঃখী- সূর্য্যোদয় থেকে এক প্রহর রাত্রি অবধি খাটে, তবু ন্যায্য পাওনা-গণ্ডা পায় না। তবু ইজ্জত নিয়ে আছে, লড়ছে রায়গ্রাম আর সাগরহাটির মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে। জ্যোৎস্নার পিছু পিছু ওদের মধ্যে যেতে অমূল্যর সরমে বাধল। বিশেষতঃ বনমালী এখানে, এ বেশে বাপের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে সে কেমন ক'রে? শিকারে বেরুবার সময় জুতার দাপটে সে মাটি কাঁপিয়ে আসছিল, সে বিক্রম নিঃশেষিত একেবারে। এখন ভাবছে, না এলেই হ'ত এদের সাথে। জ্যোৎস্না ছাড়তে চাইবে না, কিন্তু সে ক্ষেত্রে অসুখ-বিসুখের একটা অজুহাত তোলা হ'ত। রাত্রে যমুনার বাড়ী নিমন্ত্রণ—পনের বৎসর পরে সম্মানিত অতিথি হ'য়ে যেন তখনই প্রথম আসা উচিত ছিল পাড়ার মধ্যে। দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতেও তার সাহস হয় না এখানে—আবার কে দেখে ফেলবে, কটু মন্তব্য করবে।

একাকী ফিরে চলল রায় গ্রামে। অষ্টবেঁকীর কূলে এসে দেখল, ভাঁটা সরছে, জল ইতিমধ্যে দূরবর্ত্তী হয়ে গেছে। আগেকার দিনের সে তরঙ্গোচ্ছ্বাসও নেই অষ্টবেঁকীর, বাঁকে বাঁকে চড়া প'ড়ে আসছে। জুতা খুলে এতটা কাদা ভেঙে খেয়ায় উঠতে তার প্রবৃত্তি হ'ল না। এই চরটা যেখানে শেষ হয়েছে, খাড়া পাড়—জেলে নৌকা ডেকে পার হবে সে সেখানে। একাকী অন্যমনস্ক ভাবে সে চলল।

ছবির মতো একটা ঘটনা মনে পড়ল হঠাৎ। অমূল্য তখন খুব ছোট—তারই সমবয়সী একটা ছেলেকে সে এই নদীকূলে দেখেছিল। বাবা কোন কাজে গ্রামের মধ্যে গিয়েছিল, খেয়াঘাটে বসিয়ে রেখে গিয়েছিল ছেলেটাকে। সন্ধ্যা হল, আঁধার হয়ে এল চারিদিক, লোকটা তবু ফেরে না। চেঁচিয়ে গলা ফাটাচ্ছিল ছেলেটা, বাবা—বাবাগো—

অনেককাল আগেকার কথা। ঢালিপাড়ায় তাদের ঘরের দাওয়ায় ব'সে শুনেছিল সে ছেলেটার কান্না। তারও যেন গলা ফাটিয়ে কাঁদতে ইচ্ছে ক'রছে, কিন্তু পেরে ওঠে কই?

জ্যোৎস্নাকে নিয়ে নিমি পাড়ার মধ্যে ঢুকল। এ উঠোন ছাড়িয়ে ও উঠোন, এ-ঘরের কানাচে ও-ঘর। এখানে চালের নীচে দিয়ে মাথা নীচু ক'রে ওখানে সুঁড়িপথ বেয়ে চলেছে তো চলেইছে। কাজে ব্যস্ত বউ-ঝিরা থমকে দাঁড়াচ্ছে, বাঁ হাতে তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় ভাল ক'রে তুলে দিচ্ছে, দিয়ে আবার ঘোমটার নিচে থেকে উঁকি-ঝুঁকি মারছে তার দিকে। ফিসফিস কথাবার্ত্তা, নথ নড়ছে—যেন অপরূপ দ্রষ্টব্য কি এসেছে, তাই দেখছে তা'রা চোখ মেলে।

জ্যোৎস্না হেসে বলে, এ যে দেখছি গোলক-ধাঁধাঁ। সাত জন্মেও বেরুতে পারব না নিজের ক্ষমতায়।

মা, ওমা!

নিমি ডাক দিতে রান্নাঘর থেকে কমবয়সী বউ একটি বেরিয়ে উঠানে এল। গোবর মাটি দিয়ে উনুন নিকাচ্ছিল, কাপড়চোপড় তবু অপরিচ্ছন্ন নয়।

জ্যোৎস্না বলে, খাসা মেয়ে কিন্তু তোমার। খুব সাহসী। ভাব জমিয়ে ফেলেছি এর মধ্যে।

বউটি ভাল মন্দ কিছু বলে না; স্থির দৃষ্টিতে জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে আছে।

তার চেহারা ও বেশভূষা দেখেই আড়ষ্ট হয়ে আছে, এমনি অনুমান ক'রে জ্যোৎস্না অমায়িক হাসি হেসে বলল, এখানকারই মানুষ আমরা ভাই—ঐ ওপারের। আসা-যাওয়া নেই ব'লে চিন্‌তে পারছ না।

বউটি বলে, রায় বাবুর মেয়ে তো আপনি, ঘোষ বাড়ীর বউ? আমার বাবা অভিলাষ মোড়লের খুব দহরম-মহরম আপনার শ্বশুরের সঙ্গে। আমার নাম যমুনা।

জ্যোৎস্না অভিলাষকে জানে, যমুনারও নাম শুনেছে মনে হচ্ছে। এত বড় অঞ্চলের মধ্যে অভিলাষই একমাত্র তাদের পক্ষে, এদের গুণগান ক'রে প্রজাদের সে জপাবার চেষ্টায় আছে।

খুব আশ্চর্য্য লাগছে জ্যোৎস্নার। চাষার ঘরের বউ—কিন্তু সংযত চালচলন, কথাবার্ত্তায় বিশেষত্ব আছে। সে কলকাতায় মানুষ, চাষাদের ঘর-গৃহস্থালী দেখেনি কখনো, এদের জীবনের কিছুই জানে না। আধুনিক লেখকেরা কোমর বেঁধে চাষাভুষোর কথা লিখতে সুরু করেছেন, তাঁদের লেখায় এবং সিনেমা-ছবি কৃপায় এদের জীবনযাত্রার মোটামুটি একরকম আন্দাজ ক'রে নিয়েছে সে। শিক্ষিত সুসভ্য মানুষ দেখে তা'রা তাজ্জব হয়ে যায়, বড়লোক ও জমিদারের শত হস্তের মধ্যে এগোবার ভরসা পায় না, শান্ত সত্যবাদী ও সরল—ছেঁড়া কাপড় পরে এর অর্দ্ধ উপবাসী থেকে হাতজোড় ক'রে তটস্থ হয়ে বেড়ায় সমাজের আস্তাকুড়ে অলি-গলিতে—এমনি সব ধারণা। কিন্তু যমুনা এবং আর দু-চারজন যাদের দেখেছে, এবং যাদের কাহিনী কাল থেকে অবিরত শুনছে, কল্পনার সঙ্গে তাদের একতিল মিল নেই। বইয়ে বা সিনেমায় যাদের ছায়া দেখা যায়, একদা সত্যিসত্যি হয়ত তারা ছিল, কিন্তু এখন সেকালের পরম বশম্বদ ভারবাহী নিঃশব্দ গর্দ্দভের দল প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে এসেছে। এই যমুনাকে দেখে কথাটা বিশেষ করে মনে উঠল জ্যোৎস্নার।

জ্যোৎস্না বলে, বাড়িতে এসেছি—বসতে বলছ না তো আমায়!

আপনি শিকারে বেরিয়েছেন, বসতে তো আসেন নি।

বলেই দেখ না, বসি কি না বসি।

এমন স্পষ্ট অনুরোধের পরও মৌখিক একটা ভদ্রতার কথা বলল না যমুনা। বলে, এই ধুলো-মাটি নোংরা চারিদিকে, বসবার মতো জায়গা কোথায় আপনাদের?

তার মানে আলাদা করে অস্পৃশ্য করে রাখতে চাও। হাত বাড়ালেও আলিঙ্গন দেবে না?

আলাদা তো আছেনই আপনারা; হাত বাড়িয়ে হাতে ধুলোমাটি লাগবে শুধু, আর কিছু লাভ হবে না। বলে যমুনা উচ্চহাসি হেসে উঠল।

জ্যোৎস্না বলে, যাই বলো ভাই, তোমার মেয়ে কিন্তু ভাল তোমাদের চেয়ে। সে ঝগড়াঝাঁটি বোঝে না।

ছেলেমানুষ কি না!

ছেলেমানুষ থাকাই ভাল। প্যাঁচঘোঁচের মধ্যে না গিয়ে সবাইকে আপনার মতো দেখা যায়।

যমুনা গম্ভীর হয়ে বলে, আমরাও তো ছিলাম ছেলেমানুষই। ভাল তাতে কি হয়েছে বলুন দিকি।

মথুরা সিং হন্তদন্ত হয়ে এল এই সময়। ফিরতে হবে। এর মধ্যে!

হাঁ, ঘাটে দাঁড়িয়ে জামাই বাবু, অপেক্ষা করছেন।

জ্যোৎস্না বলল, বাঁকা-বাঁকা অনেকগুলো কথা শোনালে যমুনা, কিন্তু আমি ছাড়ব না—আর একদিন আসব, জোর করে তোমার দাওয়ায় বসে খাবার কেড়ে খাব, ভাব করে যাব তোমার সঙ্গে।

যমুনার হাত ধরে ছিল, কৃত্রিমরূপে ছুঁড়ে দিয়ে নিমির দু-গাল টিপে দিয়ে হাসতে হাসতে জ্যোৎস্না পাড়া থেকে বেরুল। মনে মনে নিঃসংশয়ে বুঝে গেল, অভিলাষ যা মনে করেছে—তেমন সহজে বিবাদের শান্তি হবে না। ঘৃণা মূল নামিয়েছে এদের অন্তরের অনেকদূর অবধি—আগাছা উপড়াতে হলে অনেক ভাঙাচোরা করতে হবে, তালি দিয়ে কাজ চালাবার দিনকাল আর নেই।

প্রণব ঘাটে দাঁড়িয়ে। ফর্সা মুখের উপর যেন অগ্নিকাণ্ড। জ্যোৎস্নাকে দেখে অধীর ভাবে মাটিতে সে বন্দুক ঠুকল। বলে, উঃ—কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি। কি গল্পগুজব শুরু করেছিলে ছোটলোকের পাড়ার ভিতর গিয়ে?

জ্যোৎস্না বলে, কি পেলে দেখি? ওমা, একেবারে যে খালি ব্যাগ। আমার তবু যাই হোক নিস্ফলা যায় নি—

উষ্ণকণ্ঠে প্রণব বলে, শিকার করে বসতাম হয় তো ওদেরই দু-চারটাকে। নকড়ি হতে দিল না, টেনে বের করে নিয়ে এল।

নদী পার হতে হতে শোনা গেল বৃত্তান্ত। ধানবন দিয়ে যাচ্ছিল তারা, চাষারা মানা করল।

জুতো পায়ে মা-লক্ষ্মীর ক্ষেত মাড়িয়ে চলেছ বাবু—

ঝগড়া জমে উঠল এরই পাল্টা নকড়ি গোমস্তার কথায়। দাঁত খিঁচিয়ে সে বলে উঠল, তোদের মাথায় কি ঘোল ঢালা যাচ্ছে রে বাপু? খাস জমি—সরকারি ক্ষেত। বাঁশগাড়ি করে দস্তুর মতো দখল নেওয়া হয়েছে—

একজন দু'জন করে লোক জমেছে ক্রমশঃ।

চাষীরা বলে, তোমাদের যা ক্ষমতা, তোমরা করেছ। আমাদের কাজ আমরা করে যাচ্ছি, কারকিত করেছি, বীজফল পুঁতছি, নিড়াচ্ছি গাঁথা বেধে—

আর একজন পিছন থেকে বলে উঠল, আর এই পথ আটকে দাঁড়িয়েছি—যেতে দেব না নতুন-রোয়া ধান ভাঙতে।

লোকটা রাখাল দাস, অভিলাষের জামাই—নকড়ি পরিচয় দিয়েছে। পালের গোদা সে-ও একজন।

ছাড় পথ—

একটু দূরে ছিল মথুরা সিং। ছুটে এসে লাঠি উঁচিয়ে বলল, পথ ছাড় বলছি—

মার লাঠি সিং জি। মেরেই ফেল। একটা কথাও বলব না আমরা, পথও ছাড়ব না—

রাগের বশে একটা খোঁচা মথুরা সিং দিয়েছিল বুঝি কাকে। উল্টো উৎপত্তি হল, নানা দিক দিয়ে ছুটে এল অনেক মানুষ। জন পঞ্চাশেক দাঁড়িয়ে গেল দেখতে দেখতে। প্রণবের হাতে বন্দুক, কিন্তু আগ্নেয়াস্ত্র নিতান্ত অকেজো নিরস্ত্র জনতার সামনে। বন্দুক তুলে ভয় দেখাতেও প্রণবের প্রবৃত্তি হল না। সম্ভ্রম আর আতঙ্কের ভার মুক্ত হয়ে এরা মাথা তুলেছে, আঘাতে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু উঁচু মাথা নিচু হবে না আর কিছুতে।

[ক্রমশঃ

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য নারী

শ্রীবিশ্বনাথ সেন

নারীর উৎপত্তি ও তাহার পদমর্য্যাদা সম্বন্ধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতে এমন কি সৃষ্টির প্রথম হইতেই বিভিন্ন মত। প্রতীচ্য জগতে নারী বহু পুরাকাল হইতে অবজ্ঞা ও অবহেলার বস্তু ও সংসারের যাবতীয় পাপ ও দুঃখের কারণ। বাইবেলের ওল্ড টেষ্টামেণ্টে কথিত আছে যে আদিম মানব Adam স্বর্গে থাকিয়া দিব্য সুখ ভোগ করিতেছিলেন; তাঁহার সঙ্গীর প্রয়োজন হইলে ঈশ্বর Eveকে পাঠাইলেন। ইনিই শয়তানের কুহকে ভুলিয়া ঈশ্বরের নিষেধ সত্বেও Adamকে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়াইলেন, তাহার ফলে হইল Adam-এর স্বর্গবিচ্যুতি এবং ঈশ্বরও এই কারণে নারীকে অভিশাপ দিলেন(১)। New Testament-এর সর্ব্বপ্রধান প্রচারক Paul-এর মতে আদামের এই স্বর্গবিচ্যুতিই সংসারের যাবতীয় পাপ, দুঃখ-যন্ত্রণা প্রভৃতির কারণ(২)। কাজে কাজেই নারী প্রতীচ্য জগতে সৃষ্টির প্রথম হইতেই পাপভ্রষ্টা। প্রাচ্য জগতে, বিশেষতঃ, ভারতবর্ষে নারী সম্বন্ধে ধারণা সম্পূর্ণ বিপরীত; এ-দেশের অধিবাসিগণের মতে পাপ কখনই স্বর্গ হইতে আসে নাই, উহা মানুষের দুষ্কর্ম্মের ফল—নারীর সহিত পাপের কোন সংস্পর্শ নাই (৩)।

নারীর উৎপত্তি সম্বন্ধে ঋকবেদে যাহা বর্ণিত আছে, তাহার মর্ম্মার্থ এই যে—সৃষ্টির প্রথমে ছিলেন একজন বিরাট্ পুরুষ—তিনি ব্রহ্মা বা স্বয়ং প্রজাপতি। ইনি স্বেচ্ছায় নিজকে দুইভাগে বিভক্ত করিলেন—এক ভাগ পুরুষ অপর ভাগটি হইল নারী (৪)। একটি ফলকে দুই ভাগ করিলে প্রতি অংশের মধ্যে যেমন একই স্বাদ ও গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ একই বিরাট পুরুষ হইতে উৎপন্ন পুরুষ ও নারীর মধ্যে সমগুণ থাকার জন্য তাহারা উভয়েই সমভাবে পূজ্য—ইহাই প্রাচ্য জগতের বিশেষত্ব।

প্রাচীন জগতের Sociologyর বিষয় আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, Economics-এ যাহাকে State বা রাষ্ট্র বলে, প্রতীচ্য জগতে সেরূপ কিছু একদিন ছিল না; তাহার বদলে ছিল প্রথমে Matriarchal Society ও পরে Patriarchal Society(৫) এবং প্রাচ্য জগতে ছিল Village Republic. প্রতীচ্য জগতে Matriarchal Societyর সময় একপ্রকার জননীবিধি শাসিত প্রথা প্রচলিত ছিল। মানব জাতির তখন

(১) Holy Bible—Old Testament, Genesis 2 clause 18.

"unto the woman he said, I shall greatly multiply thy sorrow and thy conception in sorrow thou shall bring forth children and thy desire shall be to the husband and he shall rule over thee."

(২) Philosophy of Religion—Dr. H. Hoffdeng, 1932—Pages 174-75.

(৩) হিন্দুনারী—স্বামী অভেদানন্দ—১০

(৪) দ্বিধা কৃত্বাত্মনোদেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ।
—মনু ১ম অ ৩২

(৫) The State—Wodrow Wilson, pages 3 to 6.

অতি শৈশব অবস্থা ; পুরুষের বহু বিবাহ ও নারীর বহুপতিত্বে সমান অধিকার ছিল, এবং নরনারীর মধ্যে অবাধ যৌনসংযম ছিল, তাহার ফলে তৎকালীন সন্তানের পিতৃপরিচয় অজ্ঞাত ছিল —ছেলেমেয়ে সর্ব্বজনীন হিসাবে গণ্য হইত(৬)। এই জননীবিধি শাসিত সমাজে নারীর প্রভুত্ব যথেষ্ট ছিল কিন্তু কোন সম্মান ছিল না ; তাহার কারণ কিছু Biological ও কিছু Sociological (৭)। সুতরাং শত প্রভুত্ব থাকা সত্ত্বেও প্রাচীন জগতে প্রতীচ্য নারীর সম্মান ছিল না।

প্রাচ্য জগতের বিশেষতঃ, ভারতবর্ষের ব্যাপার সম্পূর্ণ অন্যরূপ ছিল। এখানে Theory of Divine origin অনুযায়ী state বা রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছিল (৭)। প্রাচীন ভারতে দশগ্রামী, বিশগ্রামী প্রভৃতি গ্রামের সমষ্টি লইয়া এক একটি কেন্দ্র ছিল এবং কয়েকটি কেন্দ্র মিলিয়া একটি রাজ্য (state) গঠিত হইত। উপযুক্ত একজন ব্যক্তিকে রাজা নির্ব্বাচন করা হইত এবং প্রজারা সকলে তাঁহাকে ঈশ্বরের ন্যায় ভক্তি করিত(৮)। বৈদিক যুগে এক প্রকার সমিতি (national assembly) প্রচলন ছিল। তাহার কাজ ছিল রাজা নির্ব্বাচন করা ও রাষ্ট্র সম্পর্কীয় সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধান করা(৯)। বৈদিক সমিতিতে নারীর প্রভুত্ব ছিল না বলিয়াই ধরিয়া লইতে হয়, কিন্তু প্রতীচ্য জগতের ন্যায় নারীর প্রতি কোন বিকৃতভাব এ-দেশে কোনদিন ছিল না।

প্রতীচ্য নারীর দুর্গতির শেষ এখানেই নহে। কি Continental Europe কি ইংলণ্ড কোথাও প্রাচীনকালে নারীর কোন মর্য্যাদা এমন কি স্বতন্ত্রতা ছিল না ; প্রাচীন আইন-কানুনে যে period of tutelege ও patria potesta-র পরিচয় পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা পুরুষ ছিলেন নারীর দণ্ডমুণ্ডের মালিক। নারী যতদিন অবিবাহিতা থাকিত, ততদিন সে ছিল পিতা বা পিতৃস্থানীয় ব্যক্তির গণ্ডীর মধ্যে বন্দিনী এবং তাঁহাদের ইচ্ছামত তাহাকে কলের পুতুলের মত চলিতে হইত ; বিবাহের পর সে স্বামী ও তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের সম্পূর্ণ অধীন। Archic সমাজে নারীকে কোন পৃথক অঙ্গ (unit) বলিয়া ধরা হইত না। এমন কি তাহার সম্পর্কিত ব্যক্তিগণকে আত্মীয় বলিয়া ধরা হইত না(১০)। প্রাচীন সমাজে Continental Europe-এ নারী এতই অবহেলার বস্তু ছিল যে পিতা ইচ্ছা করিলে কন্যাকে আপন মনোনীত পাত্র বিবাহ করিতে বাধ্য করিতে পারিতেন এবং স্বামী স্ত্রীকে বলপূর্ব্বক তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দত্তকপুত্র লওয়াইতে পারিতেন, এখানে এ-কথা বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, কবি Homer-এর সময়েও গ্রীসে বিবাহের প্রয়োজনীয়তা মাত্র দুই কারণে হইত ; যথা (ক) জাতির রক্ষা ও (খ) পারিবারিক সম্পত্তি রক্ষা ; নারী আজীবন পুরুষের হস্তে পুত্তলিকার ন্যায় থাকিত (১১)। রোমে নারীর অবস্থা কোন অংশে উন্নত ছিল না। গ্রীস রমণীর মত তাহাদেরও অন্তঃপুরের মধ্যে দিন কাটাইতে হইত। বহু প্রাচীনকালে রোমে তিন প্রকার বিবাহরীতি প্রচলিত ছিল যথা:—

(১) ধর্ম্মবিবাহ (Confureation) (২) চুক্তি বিবাহ বা Civil Marriage (Coemption) ও দেশাচারজনিত বিবাহ অর্থাৎ Customary Marriage (usus)। প্রত্যেকটিতে স্বামী স্ত্রীর দেহ ও সম্পত্তির উপর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব ও অধিকার পাইতেন ;(১২) ; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহার কোনটিতে স্বামী হিসাবে নহে—পিতা হিসাবে ; অর্থাৎ প্রাচীন আইনে রোমে স্ত্রীকে স্বামীর দত্তক কন্যা হিসাবে গণ্য করা হইত। রোমে নারীর দুর্গতির শেষ এইখানেই নহে। উক্ত তিন প্রকার বিবাহ-পদ্ধতি ক্রমে লোপ পাইল এবং তাহাদের পরিবর্ত্তে এক প্রকার অধিকতর জঘন্য পদ্ধতি প্রচলিত হইল—উহাকে "a little more than temporary deposit of the women by the family" বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অল্প কথায় বলিতে গেলে, রোমে এককালে বিবাহিত নারী (wife in manu) সামান্য ক্রীতদাসীর ন্যায় দিন কাটাইত বলিতে হয়। স্বামীর বিরুদ্ধে তাহার কোন অধিকার

---

(৬) পরিবার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি
—শ্রীমন্মথনাথ সরকার—২৫ পৃষ্ঠা
Research in Early History of Mankind
E B. Talyor (1865)

(৭) The Biological formation of the woman and her subjection to preganancy and delivery brings in their train a state of helplessness leading to dependence.
—Mother—Robert Briffault
Vol. 1 Page 442.

(৮) Principles of Political Science
—Gilchrist—Chapter IV, Page 72.

(৯) Constitutional Law—Sarbadhicary.
Pages 6.

(১০) A woman is the terminus of the family. None of the descendants of a female were included in the primitive notion of family relationship—Primitive Society and Ancient Law—Sir Henry Maine—Page 128.

(১১) Greek Woman—Dr. Mitchel Correl.
It was generally expected of the Athenean that she led an impracticable life. Generally she was married when young and lived in a retired part of the house, never attended public spectacles, received no male visitors except in the presence of her husband and did not even sit at their own tables when male guests were there.

(১২) The husband acquired a lot of rights over the persons and property of the wife—not as a husband but as a father. She becomes the daughter of the husband.

Ancient Roman Marriage—Maine Ancient Law, page 165.

ছিল না। তাহার ফলে বিবাহ ব্যাপারটি একদিন Continental Europe-এ বিশেষতঃ গ্রীস ও রোমে সদ্য সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় রূপে গণ্য হইত। সেজন্য প্রতি বিবাহে স্বামীকে স্ত্রীর অভিভাবকগণকে উপযুক্ত মূল্য দিতে হইত; ইহা purchase of tutelege ব্যতীত আর কি হইতে পারে? (১৩) প্রতীচ্য দেশে নারীর মর্য্যাদা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা বৃদ্ধি করিয়া নারীকে পুরুষের সমকক্ষ বা সন্নিকটস্থ করিবার চেষ্টা সর্ব্বপ্রথমে তৎকালীন রাজনৈতিক অধ্যক্ষ প্লেটো প্রথমে করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে নারীর সর্ব্ববিষয়ে পুরুষের সমান অধিকার থাকা উচিত (১৪)।

তাহার পরে প্রতীচ্য জগতে বিশেষতঃ গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশে খৃষ্টধর্ম্ম (Christianity) প্রতিপত্তি লাভ করার ফলে Canon Law-এর উৎপত্তি হয়। যীশুমাতা মেরী ও অন্যান্য পবিত্রচেতা নারীর পূজা প্রচলনের ফলে খৃষ্টানদিগের সমাজ ও ব্যক্তিগত জীবনের অনেক উন্নতি হয় ও সেই উপলক্ষে নারীজাতির প্রতি পূর্ব্বের বিকৃত মনোভাব দূর হয়। পূর্ব্বোক্ত archaic guardianship ক্রমশঃ লোপ পায় ও নারী tuletege হইতে মুক্তি পায়।

ইহা ত গেল Continental Europe-এর কথা। ইংলণ্ডেও নারীর অবস্থা কোন অংশে উন্নত ছিল না। প্রাচীনকালের দেশাচার অর্থাৎ English Common Law অনুযায়ী যে Doctrine of Identity প্রচলিত ছিল, তদ্দ্বারা বিবাহের পর স্ত্রীর আর পৃথক অস্তিত্ব থাকিত না (১৫)। তাহার ফলে স্ত্রীকে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইত, যথা, প্রথমতঃ, স্ত্রী তাহার নিজ দায়িত্বে কোন প্রকার চুক্তিবদ্ধ হইতে পারিত না। এখানে একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে ট্রাষ্টীর সহায়তা ব্যতীত স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যেও কোন প্রকার চুক্তি সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু এখানেই ইহার শেষ নহে। Doctrine of Identityর ফলে স্বামী ইচ্ছা করিলে স্ত্রীকে আইনতঃ ভাবে কোন কিছু দান করিতে পারিতেন না এবং তাহাদের মধ্যে বিবাহের পূর্ব্বের সকল চুক্তি ও অঙ্গীকার নাকচ হইয়া যাইত, দ্বিতীয়তঃ, স্ত্রীর অনূঢ়া অবস্থার সকল সম্পত্তি বিনা ক্লেশে ও বিনা দ্বিধায় স্বামীর সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত হইত(১৬)। স্ত্রীর কোন সম্পত্তির উদ্ধারের জন্য কোন নালিশের প্রয়োজন হইলে স্বামীকে পক্ষ করা ব্যতীত অন্য কোন উপায় ছিল না। এতদ্ব্যতীত ইংলণ্ডে কোন বিবাহিত নারী স্বামীর সম্পত্তি ব্যতীত কোন সম্পত্তির ট্রাষ্টী হিসাবে কার্য্যভার গ্রহণ করিতে পারিতেন না এবং ট্রাষ্ট সম্পত্তির হস্তান্তর ব্যাপারে স্বামীর সম্মতি ও অনুমোদন তাঁহার পক্ষে অত্যাবশ্যক ছিল(১৭)।

প্রতীচ্য জগতের নারীর এই দুর্গতি Equityর উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ লাঘব হয়, যথা, প্রথমতঃ, স্বামী যখন স্ত্রীর কোন সম্পত্তি উদ্ধার বা তৎসম্পর্কে অন্য কোন বিষয়ের প্রতীকারের জন্য Equity courtএর নিকট কোন আবেদন বা অভিযোগ (Bill of complaint দাখিল করিতেন তখন যতদিন না তিনি স্ত্রীর ভরণ-পোষণের নিমিত্ত উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতেন ততদিন তাহার কোন প্রার্থনা মঞ্জুর হইত না; দ্বিতীয়তঃ, Equityর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে marriage settlementএর প্রচলন হয়। ইহার উদ্দেশ্য বিবাহের পূর্ব্বে যাহাতে স্বামী স্ত্রীর ভরণ-পোষণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন সেই বিষয় লক্ষ্য করা। যাহাতে দলিলের লিখিত সকল সর্ত্ত পালন হয় সেজন্য Equity একজন ট্রাষ্টী নিযুক্ত করার প্রথা করিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং যে ক্ষেত্রে স্বামী ইচ্ছাপূর্ব্বক বা ভুল বশতঃ ট্রাষ্টী নিযুক্ত করিতে অন্যথা করিতেন Equity সে সকল ক্ষেত্রে স্বামীকে ট্রাষ্টীর কাজ করিতে বাধ্য করিত। [আগামীবারে সমাপ্য

(১৩) The lady remained in the tutelege of guardians whom her parents had appointed and whose privileges override in many respects the authority of her husband—Maine, Ancient Law.

(১৪) Social Life in Rome—Professor. W. W. Folower.

(১৫) Halsbury—Husband and Wife, Vol. 16, page 821.

The legal existence of the wife during marriage being regarded as merged into that of the husband.

(১৬) The effect of marriage was wife's incapacity to contract consequent on the merger of her person in that of her husband.

No contract can be made without the intervension of a trustee even between husband aud wife.

A man therefore cannot grant anything to his wife nor enter into any covenant with her ... ... All contracts made between husband and wife when single are avoided by intermarriage—Commentaries on The Common Law—H. Broom, page 575.

(১৭) Principles of Equity—S. C. Bagchi—page 121.

(১৮) Married Women's Property Act, 1870, 1882, and 1893.

পুস্তক ও আলোচনা

মহাভারতের কথাঃ—শ্রীমতী সুজাতা ঘটক, বি-এ, বি-টি। শ্রীহর্ষ পুস্তক বিভাগ, ৫৭, হ্যারিসন রোড্, কলিকাতা। মূল্য—ছয় আনা মাত্র।

আলোচ্য গ্রন্থে লেখিকা কবিতায় সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় শিশুদের উপযোগি করিয়া মহাভারতের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রাজা বিচিত্রবীর্য্যের পুত্র ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু। এই ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু হইতেই কুরু ও পাণ্ডব বংশের উদ্ভব। গ্রন্থখানি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হইলেও সুরু হইতে আরম্ভ করিয়া অভিমন্যু-পুত্র পরীক্ষিতের রাজ্যভার গ্রহণ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনাকেই উজ্জ্বল ও জীবন্ত করিয়া তুলিতে লেখিকা যথেষ্টতর শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। বিশেষভাবে কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ ও বাণী যে-ভাবে রূপ পাইয়াছে, তাহাতে লেখিকার প্রকৃত শিল্পী-মনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। আজ আর শিশু বা কিশোরদের মধ্যে মহাভারত বা রামায়ণ পড়িবার উৎসাহ বড় একটা দেখা যায় না। অথচ মহাভারতের শিক্ষা জাতির পক্ষে যে কত গৌরবের, তাহা বর্ণনাতীত। আলোচ্য গ্রন্থটি পড়িয়া শিশু ও কিশোরেরা বৃহত্তর জ্ঞান ও আনন্দের পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে পারিবে, ইহাই মনে করি।

অমৃতের সন্ধানেঃ—কাহিনী ও গল্প। শ্রীপ্রতুলচন্দ্র ঘোষ। টোয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরি পাব্লিকেশনস্, পাটনা। মূল্য—দেড়টাকা মাত্র।

লেখক বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত নবাগত হইলেও আলোচ্য গ্রন্থের কাহিনী ও গল্পগুলিতে যে অসাধারণ শক্তি ও শিল্পবোধের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা তাঁহার ভবিষ্যৎ যশের প্রথম সোপান বলিয়াই প্রশংসার্হ। কোথাও বিহার সরীফের কোলঘেষা হাজারীবাগ রেঞ্জ, পলাশ-মহুয়ার গন্ধমদির বনানী, কোথাও অপ্রশস্ত বন্ধুর পার্ব্বত্য চড়াই, রাণী ক্ষেতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য—এম্নিতর নানা পটভূমিকায় কাহিনীগুলি সজীব হইয়া উঠিয়াছে। সুখলতা সুপ্রকাশ, সুনন্দা, মঞ্জরী, মণিলাল, সুদক্ষিণা প্রভৃতি চরিত্রগুলি প্রসাদগুণে মনোরম। গ্রন্থের প্রচ্ছদপট যাযাবর-মনে যথার্থই অমৃতের স্বপ্ন আনিয়া দেয়।

তমসাবৃতাঃ—গল্পগ্রন্থ। প্রশান্তি দেবী। বাসন্তী পাব্লিশার্স : ২৪।এ আমহার্ষ্ট রো, কলিকাতা। মূল্য—দুইটাকা মাত্র।

লেখিকা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সাময়িক পত্রে কবিতা ও গল্প লিখিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। তমসাবৃতা যদিও লেখিকার প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ—কিন্তু অপটুতা দোষে কোথাও রচনার অসঙ্গতি ধরা পড়ে না। সাবলীল গতিতে কাহিনী নিজেই নিজের পরিণতি পাইয়াছে। কোথাও আলঙ্কারিক শব্দ-ঝঙ্কারের বাহুল্য নাই। সাধারণ গল্পকে সাধারণ করিয়া বলা কৃতিত্বের প্রয়োজন। লেখিকা সেই কৃতিত্ব লাভের অধিকারিণী।

স্বাক্ষরঃ—কবিতাগ্রন্থ। গোপাল ভৌমিক। পূর্ব্বাশা লিমিটেড্, পি-১৩, গনেশচন্দ্র এভিন্যু, কলিকাতা। দাম—একটাকা মাত্র।

আধুনিক কবিদের মধ্যে কবি গোপাল ভৌমিক স্বপ্রতিষ্ঠিত। বৈজ্ঞানিক বিচারশীল দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে বাস্তবমুখী মননশীলতা—ইহাই হইল আধুনিকতার মূল ধর্ম্ম। তাহারই পূর্ণ অভিব্যক্তি—

> "প্রয়োজন হ'ল শেষ আকাশ ফানুসে,
> শুভদৃষ্টি হ'ল আজ মাটি ও মানুষে।"

স্বপ্নময় অলীক মূর্চ্ছনা মানুষের সমাজকে আদর্শের চাইতে মরমী করিয়াই তুলিয়াছে অধিক। কঠিন বস্তু-জগতের সাথে প্রত্যক্ষ সংঘাতে বার বার তাই সে আঘাত পাইয়াছে, 'তার' ছিঁড়িয়া গিয়াছে বাঁধা বীণায়। মাটিকে অস্বীকার করিয়া মানুষ কোথাও শুধু নিশ্চিন্ত ভাববাদিতায় স্থির আশ্রয় খুঁজিয়া পায় নাই। এই সংগ্রামমুখী জীবনের অভিজ্ঞতার লেখন—স্বাক্ষর। সমাজ-সচেতন শিল্পী গোপালবাবু। তাঁহার লেখনী জয়যুক্ত হউক। স্বাক্ষরের সার্থক প্রচার কামনা করি।

আজাদ-হিন্দ্ ফৌজঃ—সতীকুমার নাগ সম্পাদিত। চয়নিকা পাব্লিশিং হাউস, ৪২, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। মূল্য—১৷৹ মাত্র।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজ সম্পর্কে আজ পর্য্যন্ত যে-কয়খানি গ্রন্থ বাংলায় বাহির হইয়াছে, সতী নাগ-সম্পাদিত আলোচ্য গ্রন্থখানি ঘটনা সম্পর্কে তাহার মধ্যে বিশেষ নির্ভরযোগ্য। গ্রন্থখানি জনসাধারণের অনুসন্ধিৎসা-ক্ষুধা মিটাইবে মনে করি।

মস্কো সম্মেলন ও সম্মিলিত শক্তির রাজনীতি

প্রায় দুই সপ্তাহ অতীত হইতে চলিল, বহুঘোষিত ত্রিশক্তি পররাষ্ট্র সম্মেলন মস্কো সহরে শেষ হইয়াছে। গত অক্টোবর মাসে লণ্ডনে এই সম্মেলনের প্রথম পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু সে সময়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিতে বা পরস্পরে আপোষে আসিতে পারেন নাই। তাই উহা ব্যর্থতায়ই পর্য্যবসিত হয়। কথান্তর, বাগবিতণ্ডা, টেবিল চাপড়াচাপড়ির পর মাঝখানে আসিয়া উহা ভাঙ্গিয়া যায়। এই মত-পার্থক্যের কারণ কি, এ পর্য্যন্ত ত্রিশক্তিই সাধারণের নিকট গোপন রাখিয়াছিল, কেবল বৃটেনের পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ বেভিনের কমন্স সভার উক্তিতে কতকটা আভাষ পাওয়া গিয়াছিল। তিনি বলেন যে, স্ব স্ব সীমান্তের নিরাপত্তা ও ঔপনিবেশিক সীমান্তের হিসাব লইয়া রাশিয়া এবং ইংলণ্ড দেশের মতভেদ যেন বিরোধের আকারে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছে। এবারও সেইরূপ আশঙ্কা মনে জাগিয়াছিল, তবে কতকটা সুখের বিষয় যে মস্কোতে লণ্ডনের দৃশ্যাবলীর পুনরভিনয় হয় নাই। শক্তি নিচয় আপোষমীমাংসায় আসিতে সক্ষম হইয়াছেন, একাধিক আন্তর্জ্জাতিক বিষয়ে বৃটেন ও রাশিয়া একমত হইতে পারিয়াছেন। মীমাংসাগুলি মূলতঃ এইরূপ—

(১) সুদূর প্রাচ্যের উপদেষ্টা-কমিশন পুনর্গঠিত হইয়াছে। জাপানের শাসন ব্যাপারে এই কমিশন নীতি ও আদর্শের দিক দিয়া উপদেশ দিবেন। কিন্তু আভ্যন্তরিক শাসন কার্য্যে আমেরিকারই পূর্ণ দায়িত্ব বহাল থাকিবে।

(২) কোরিয়া গণতান্ত্রিক স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার লাভ করিবে। কিন্তু তাহা এখন সম্ভব হইবে না। উহার কৃষি শিল্প ও আর্থিক ব্যাপারে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ পাঁচ বৎসরকাল অভিভাবকত্ব করিবেন।

(৩) রুমানিয়ার রাজতন্ত্র লোপ পাইয়া গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(৪) বুলগেরিয়ার শাসনব্যবস্থা সোভিয়েটের নির্দ্দেশে চালিত হইবে।

(৫) আণবিক বোমার ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

এবারকার সম্মেলনে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জ্জাতিক সমস্যার সমাধান হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। আণবিক বোমার সমস্যাটির যে ব্যবস্থা হইয়াছে, ইহাই বিশেষ স্বস্তির বিষয়। ইহা লইয়া প্রধান শক্তিদের মধ্যে যে মন কষাকষি চলিতেছিল তাহা অনেকটা মিটিয়া গিয়াছে। তথাপি আমরা বলিতে বাধ্য যে, সম্মেলন সাফল্য লাভে সমর্থ হয় নাই। সম্মেলনের অব্যবহিত পূর্ব্বে যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীর শান্তিকামীরা যে যে বিষয়ের নিষ্পত্তির আশা করিয়াছিলেন, সেই বিষয়গুলি এই বৈঠকেও কিন্তু অস্পষ্ট ও অমীমাংসিতই রহিয়াছে। তাহারা আশা করিয়াছিলেন ভিন্ন ভিন্ন দিকে তৃতীয় মহাসমরের ভাবী সুযোগের আশঙ্কা যে সূচিত হইতেছে, সেই আশঙ্কার কারণ মূলোৎপাটিত হইবে, আশা করিয়াছিলেন, ইরাণ ও তুরস্কের প্রশ্নের সন্তোষজনক মীমাংসা হইবে, আরব পেলেষ্টাইনের গোলযোগ মিটিয়া যাইবে, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়ার ইঙ্গ-ওলন্দাজ অনুষ্ঠিত যজ্ঞের অবসান হইবে। কিন্তু তাহাদের সকল আশায় জলাঞ্জলি পড়িয়াছে। বৈঠকের সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ এই সব প্রশ্নের ছায়াও মাড়ান নাই, তাহারা আপোষে যে যাঁর নিজের ঝোল নিজের কোলে মাখিবার ব্যবস্থা করিয়া নিয়াছেন। মীমাংসার নামে যে সব আন্তর্জ্জাতিক সমস্যার তাঁহারা রফা করিয়াছেন তাহা সম্পাদিত হইয়াছে তাহাদের স্ব স্ব স্বার্থের মুখ চাহিয়া, পৃথিবীর শান্তির মুখ চাহিয়া নয়। আমরা উদাহরণ দিয়া পাঠককে বুঝাইতে চাই।

প্রথমেই ধরা যাক ইরাণ ও তুরস্কের কথা:—

ইরাণ ও তুরস্ক ইউরোপের নিকট প্রাচ্যের প্রবেশ দ্বার। এই দুইটি দেশ যে শক্তির অধীন বা প্রভাবাধীন থাকিবে সমগ্র মধ্য-প্রাচ্যে—এবং ভারতের উপরে সেই শক্তিই প্রাধান্য বিস্তার করিতে পারিবে, কেবল তাহাই নয়, এই দেশ দুইটীকে আয়ত্তাধীনে রাখিতে পারিলে কালক্রমে আরবসাগর এবং ভারত মহাসাগরের কিছুটা অংশও আয়ত্ত করা যায়। ফলে মধ্যপ্রাচ্যে স্বীয় প্রভাবকে বহির্শক্তির আক্রমণ হইতে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ রাখা সহজ হয়। এ-পর্য্যন্ত বৃটেনই একা আরব সাগর সমেত এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের উপর আধিপত্য করিতেছিল, এবং ইহারই দরুণ সে ভারতকে নিজের কবলে রাখিতে সমর্থ হইয়াছে এবং প্রয়োজন হইলে পশ্চিম ইউরোপের সুদৃঢ় পশ্চাৎঘাঁটী হিসাবেও ইহাকে ব্যবহার করিতে পারিয়াছে। কিন্তু গত কয়েক মাস হইতে রাশিয়াও এই অঞ্চলের প্রতি তাহার বহু আকাঙ্ক্ষিত শ্যেনদৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। রাশিয়ার সীমান্ত এই দুইটি দেশের সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই দুইটি দেশকে হাত করিতে পারিলে প্রয়োজন হইলে রাশিয়ার এই দিককার সীমান্তকে এই দুই দেশের মধ্যে দিয়া আঘাত করা চলে। রাশিয়া নিজের এই দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে বহুদিন হইতেই এমন

কি সেই রুশ-জার নৃপতিগণের আমল হইতে সচেতন ছিল, কিন্তু বৃটেনের যুদ্ধ-পূর্ব্ব পরিপূর্ণ শক্তির সহিত বিবাদ করিতে সাহস না পাইয়া এপর্য্যন্ত নীরবই ছিল। এখন চাকা ঘুরিয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে বৃটেন ক্ষত বিক্ষত, পক্ষান্তরে রাশিয়া প্রবল শক্তিমান। কাজেই সে এখন ঝোপ বুঝিয়া বেশ একটি বড় রকমের কোপ মারিয়া বসিয়াছে। কোপটা আবার প্রত্যক্ষ অস্ত্রেরও নয়—সূক্ষ্ম কূটনীতির। রাশিয়া ইরাণ এবং তুরস্কের অধিবাসীদের দিয়াই এই কাজটা সারিয়া লইতেছে। ইরাণেই এই শিখণ্ডী-নীতি সফল হইয়াছে খুব বেশী। আজেরবাইজানের জাতীয়তাবাদীরা জয়ী হইবার পর গোটা ইরাণ দেশটাই সোভিয়েট-পন্থী হইয়া পড়িতেছে। গতিক দেখিয়া বর্ত্তমান মন্ত্রী-মণ্ডলীর তিনজন মন্ত্রী ইতিমধ্যেই পদত্যাগ করিয়াছেন, এবং ভবিষ্যতে অবস্থা আরও ঘোরালো হইয়া উঠিলে স্বয়ং প্রধান মন্ত্রীও হয়তো যে-কোন একদিন পদত্যাগ করিয়া বসিবেন। ইহার পর রাস্তা অতি সোজা। ইরাণে বিনা-প্রতিরোধেই পোল্যাণ্ডের মত একটী সোভিয়েট সুহৃদ গভর্ণমেণ্ট নির্ব্বাচিত হইবে।

তুরস্কেও রাশিয়া ঠিক একই চাল চালিয়াছে। এখানেও একদল বিদেশস্থ আর্ম্মেনিয়ান 'আর্ম্মেনিয়া আর্ম্মেনিয়াবাসীদের জন্য' এই ধ্বনি তুলিয়া তুরস্কের এক অংশ—কারস্ ও আর্দেহান অঞ্চল সোভিয়েট আর্ম্মেনিয়ার অন্তর্ভুক্ত করিবার দাবী জানাইয়াছে, এবং তাহাদের দাবীর সমর্থন কল্পে সোভিয়েট-আর্ম্মেনিয়া তথা খোদ সোভিয়েট-রাশিয়াকে সংগ্রাম চালাইতে অনুরোধ করিয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়াও সঙ্গে সঙ্গে পরহিতে সেই অনুরোধ রক্ষা করিতে কোমর আঁটিয়াছে। কিন্তু তুরস্কের ব্যাপারটা ইরাণের মত এত সহজছন্দে মিটিতেছে না। তুরস্ক গভর্ণমেণ্ট একেবারে বাঁকিয়া বসিয়া সোজাসুজি ঘোষণা করিয়াছেন, 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী।' অর্থাৎ ঘটনার গতি সেখানে এমন অবস্থায় গিয়া পৌঁছিতেছে যে, সময়টা এ-যুদ্ধের পূর্ব্বাবস্থা হইলে তুরস্ককেই কেন্দ্র করিয়া একটা বড় রকমের আন্তর্জাতিক হেস্তনেস্ত হইয়া যাইত। কিন্তু এটা যুদ্ধের পূর্ব্বাবস্থা নয়, কাজেই হেস্তনেস্তটা আর ঘটিয়া উঠিতেছে না। কেননা রাশিয়ার হস্তক্ষেপে বাধা দিতে গিয়া যে-শক্তি এই হেস্তনেস্তের প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিত সে-শক্তি বৃটেন। কিন্তু বৃটেন একেবারে নীরব হইয়া আছে। মস্কোর অধিবেশনেও সে নীরব হইয়াছিল। ইহার প্রধান কারণ অবশ্য তাহার যুদ্ধ-জনিত নষ্ট-শক্তি, কিন্তু তাহাছাড়াও তাহার নীরবতার আরও একটা কারণ রহিয়াছে। সে কারণটা হইল দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়ায় (ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন ও শ্যামে) বৃটিশের স্বার্থ।

এখন জিজ্ঞাস্য, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়ায় আবার বৃটেনের কী স্বার্থ? শ্যামের সঙ্গে না হয় সে একটা প্রত্যক্ষ স্বার্থসূচক সম্পর্ক বানাইয়া লইয়াছে। এবং সেদিনকার সন্ধি চুক্তিতে শ্যামের উদ্বৃত্ত চালের সবটা গ্রাস করিবার অভিসন্ধিও তাহার পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু ইন্দোনেশিয়া এবং ইন্দোচীনে সে কী স্বার্থে চণ্ডলীলা চালাইতেছে? উক্ত দেশ দুইটি তো পুরাপুরি ফ্রান্স আর নেদারল্যাণ্ডেরই ঘরোয়া ব্যাপার। বৃটেনের কী মাথা ব্যথা ঘটিল এই নিরীহ দেশে পাশ্চাত্য রণনীতির আস্ফালন করিবার? ইহা কি শুধু ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডের প্রতি তাহার নৈতিক দায়িত্ব বজায় রাখিবার জন্যই? না এব্যাপারের মূলে আরও কোন বিশেষ গূঢ় কারণ আছে? এই প্রশ্নের উত্তরে ঔপনিবেশিক রাজনীতি-বিশেষজ্ঞরা কী বলেন তাহা দেখা যাক্।

বিশেষজ্ঞরা বলেন,—নৈতিক দায়িত্বের অজুহাতটা সম্পূর্ণ ধাপ্পা। বৃটেন দক্ষিণ পূর্ব্ব এসিয়ায় শ্বেতজাতির সাম্রাজ্য-প্রাধান্য অব্যাহত রাখিবার জন্যই সাম্রাজ্য-ফরাসী ও ডাচ্ শক্তির সহায়তা করিতেছে। কারণ দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়ায় শ্বেতপ্রাধান্য একবার বিসর্জ্জিত হইলে নিকটবর্ত্তী ব্রহ্ম ও ভারতের ক্রম-বর্দ্ধমান গণ-অভ্যুত্থানকেও আর চাপিয়া রাখা সম্ভব হইবে না। সাম্রাজ্য রক্ষার খাতিরে বৃটেনের কাছে এটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। অতএব ছলে বলে ও কৌশলে ভারত ও ব্রহ্মের এই সম্ভাবিত গণ-অভ্যুত্থানের অঙ্কুরকেই তাহার বিনষ্ট করিয়া ফেলা আবশ্যক। কিন্তু এদিকে এটা আবার নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করিতে গেলে মধ্য প্রাচ্যে সোভিয়েটের কার্য্য সম্বন্ধেও তাহার কিছু বলা সাজে না। বলিলে রাশিয়াও এই সীমান্তের কথা উল্লেখ করিয়া বসিবে। ওদিকে রাশিয়াও আবার দক্ষিণ পূর্ব্ব এসিয়ায় বৃটিশের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে মুখ খুলিতে পারে না, কেননা মধ্য প্রাচ্যে সে নিজেই বৃটেনের মত ভূমিকা অভিনয় করিয়া চলিয়াছে। এই ভাবেই বৃটেন ও রাশিয়া যে-যার নিজের ঘা লুকাইবার চেষ্টায় ব্যস্ত থাকায় অপরের ঘায়ের দিকে কেহ আর নজর দিতে পারে নাই। ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের সকল সমস্যাই মস্কোর বৈঠকে পুরাপুরি ধামা-চাপা পড়িয়াছে।

এইখানে আবার একটা প্রশ্ন পাঠকের মনে উদয় হইবে। প্রশ্নটী এই যে, বৃটেন ও রাশিয়া না হয় স্ব স্ব স্বার্থের খাতিরে উক্ত বিষয় দুটি এড়াইয়া গিয়াছে, কিন্তু 'চার-স্বাধীনতার' উকীল আমেরিকা কেন এই ব্যাপারে নীরব ছিল? উক্ত দুই অঞ্চলে তাহার তো কোন স্বার্থ সাধিত হয় নাই!

এই প্রশ্নের উত্তরে বিশেষজ্ঞগণ বলিলেন—তা হয় নাই বটে, কিন্তু অন্যত্র হইয়াছে। চীনের আভ্যন্তরীন প্রশ্নটাও আন্তর্জাতিক। ও দেশটাও বহির্শক্তি দ্বারা না হোক, অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত হইতেছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দায়িত্ব ছিল সেই দ্বন্দ্ব মিটাইয়া দেওয়া। কিন্তু জাতিপুঞ্জ সে-দায়িত্ব এড়াইয়া গিয়াছেন। একা আমেরিকাই চীনের ব্যাপারের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। এবং এটা সে নিছক "বৈষ্ণব ধর্ম্ম" প্রচার উদ্দেশ্যেই করে নাই, করিয়াছে চীনে তাহার বাণিজ্য স্বার্থ অটুট রাখিবার জন্য। এতদ্ব্যতীত জাপানের আভ্যন্তরীণ শাসনেও যে সে একনায়কত্ব গ্রহণ করিতে পারিয়াছে সে-ও কতকটা এই বাণিজ্য স্বার্থেরই খাতিরে। কাজেই এই স্বার্থ নিরঙ্কুশভাবে অটুট রাখিতে গিয়া সে-ও অন্যের স্বার্থের কাঁটা হইতে পারে না। অন্যের স্বার্থসিদ্ধির সময় তাহাকেও চুপ করিয়া থাকিতে হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মস্কো বৈঠকে শেষ পর্য্যন্ত সকলেই চুপ করিয়াছিলেন। তিনপ্রধানের বৈঠকে তিনের প্রাধান্যই পুরামাত্রায় বজায় আছে। মরিয়াছে শুধু নিরীহ দুর্ব্বল উলুখড়ের দল—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসমূহ। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বৃটেনের

কার্য্যতঃ কতদূর সুবিধা হইল তাহাই দেখিবার প্রতীক্ষায় আমরা উন্মুখ হইয়া রহিলাম!

কংগ্রেসের হীরক-জয়ন্তী

গত ২৮শে ডিসেম্বর কংগ্রেসের হীরক-জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই যে ষষ্টিতম বর্ষ ভারতের জাতীয়তার প্রতিষ্ঠানের উপর দিয়া অতিবাহিত হইয়া গেল, ইহার লাভালাভের হিসাব লওয়া একান্ত আবশ্যকীয় হইয়া পড়িয়াছে।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়, বাঙ্গালী উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে। প্রায় কুড়ি বৎসর পর্য্যন্ত কংগ্রেসের ইতিহাস আবেদন-নিবেদনের মধ্য দিয়া বাৎসরিক একটা মিলন সভারই কাহিনী। কিন্তু লর্ড কর্জ্জন আসিয়া ভারতবাসীর ঘুম ভাঙিয়া দিলেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা দেশ দ্বিখণ্ডিত করিয়া বাঙ্গালীকে জাগ্রত এবং উত্তেজিত করিয়া দিলেন। বাঙ্গালার জনজাগরণে ভারতও সচকিত হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নরমদল ও অগ্রগামী দলের গোলমালে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে সুরাটে কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া যায়। পরে দুই দলে মিলিত হয় ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে। অতঃপরে মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার প্রকাশিত হইবার পরে, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম সরকারের বিরোধী হইয়া বাধা প্রদানের প্রস্তাব হয়। অগ্রগামী হন চিত্তরঞ্জন, সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার পক্ষে থাকেন গান্ধীজী। পরে ১৯২০ হইতে অসহযোগ প্রবর্ত্তিত হয়। প্রথমে ইহা একটা আদর্শের মত থাকে, কিন্তু বাস্তবে পরিণত হয় যখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া সব্যসাচীর মত ইহার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, আর স্বেচ্ছা-সেবক বাহিনী পরিচালনা করিয়া পঞ্চবিংশতি সহস্র সহকর্ম্মী সহ তিনি কারাবরণ করেন। ইহার পরে তিনি কাউন্সিল প্রবেশরূপ কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। অনেক বাদানুবাদের পরে তাহা পাশ হয় এবং 'সত্যাগ্রহ'ই হউক, 'ভারত-ত্যাগ করাই' হউক, আজও তাঁহার কর্ম্মপন্থার ঊর্দ্ধে কংগ্রেস অগ্রসর হইতে পারে নাই। তবে তাঁহার মহাপ্রস্থানের পরে কুড়ি বৎসরে জনজাগরণ আরও প্রসারতা লাভ করিয়াছে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে সভাসমিতিতে যে লোক হইত, এখন তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী হয়। দেখিয়া আশা হয় যে, লোকের রাজনৈতিক বোধ জাগিতেছে। তবে এই চেতনা খুব বেশী স্থায়ী বলিয়া মনে হয় না। যাহারা সভায় ভিড় করে তাহারাই আবার পরক্ষণেই খেলার মাঠে, বায়োস্কোপে, তামাসায়; থিয়েটার হলে গিয়া সমবেত হয়। ইতিপূর্ব্বে এই কলিকাতায় নেতৃবৃন্দের সমাগমে কত ভিড়, কত উদ্দীপনা উত্তেজনা পরিলক্ষিত হইত, কিন্তু এখন আবার আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরে। ১৯২০ হইতে ১৯৪৫ পর্য্যন্ত রাজনীতি 'আত্মনির্ভরতামূলক' হইলেও—জনসাধারণের মধ্যে কেবল মতবাদ ছাড়া বেশী কিছু উন্নতি হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। গঠনমূলক কার্য্যও প্রসার লাভ করিয়াছে বলা যায় না। গান্ধীজী যে চরকা ও খদ্দরের কথা বিশেষভাবে গত ২৫ বৎসর হইতে খুব জোরের সহিত বলিয়া আসিতেছেন, তাহারও কোনরূপ উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই। এখন সাধারণ লোক দূরে থাকুক, নেতাদের মধ্যেও অনেকে খদ্দর ছাড়িয়াছেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে জেল হইতে আসিবার পরে চিত্তরঞ্জন ভাঙ্গা ও অকেজো চরকা দেখিয়া দুঃখ করিয়াছিলেন, কিন্তু আজও সেই অবস্থা। অনেকে হয়তো মনে করিতে পারেন—বাঙ্গালী ভাবপ্রবণ জাতি, চরকায় তাহার মন বসে না, কিন্তু পঞ্জাব, সিন্ধু, মহারাষ্ট্র, মদ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, যেখানেই যান, চরকার এই দৃশ্যই চক্ষু পীড়িত হইবে। এই যদি গঠনমূলক কার্য্যের অবস্থা ও পরিণতি হয় আর ইহাতেই যদি স্বরাজ আসিবে বলিয়া স্থির হয়, তবে কত হাজার বৎসরে

মহাত্মা গান্ধী

ভারতের স্বরাজ সম্ভব হইবে ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। এবং কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ আবার কার্য্যকরী পন্থার নির্দ্দেশ করিবেন কি না, এ বিষয়েও আগামী অধিবেশনে তাহারা উপায় উদ্ভাবন করুন—ইহা আমাদের একান্ত অনুরোধ।

তবে এই ষাট বৎসরে দেশের কি কোন উন্নতিই হয় নাই? কিছু হইয়াছে। কিন্তু তাহা অতি সামান্য। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলা প্রতিজ্ঞা করিল—বিদেশী বস্ত্র পরিধান করিবে না, সুবিধা হইল বোম্বাই এবং আমেদাবাদের। সে সমস্ত স্থানে অসংখ্য মিলের উৎপত্তি হইল। বাঙ্গলায়ও একটি হইল,—"বঙ্গলক্ষ্মী কটনমিল", সেই একটি—সবে ধন নীলমণি। সেই একটিও গিয়াছিল, তবে রক্ষা পাইয়াছে ভগবানের কৃপায়। কিন্তু একটিতে বাঙ্গালার কি হইতে পারে? বাঙ্গালীর আরও দুই একটী যেমন, মোহিনী মিল ঢাকেশ্বরী কটন মিল, বঙ্গশ্রী কটন মিল, মহালক্ষ্মী কটন মিল, এবং অবাঙ্গালীর কেশোরাম কটন মিল প্রভৃতি হইয়াছে। এগুলি

প্রয়োজনের পক্ষে নিতান্ত কম। এখনও কেন যে লোকের এদিকে অধিকতর দৃষ্টি নিবদ্ধ হইতেছে না ইহা খুবই বিস্ময়ের বিষয়।

পণ্ডিত জওহরলাল

দ্বিতীয়তঃ—কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী ইতিপূর্ব্বে আইনের সহায়তায় যে পানদোষ-নিবারণরূপ সামাজিক নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, ইহার উদ্দেশ্য ভাল হইলেও আইনের সহায়তায় মদ্যপান নিবারণের পক্ষপাতী আমরা নই। তথাপি শ্রামিক কৃষকদের মধ্যে মদ্যপান নিবারণের চেষ্টা করিয়া কংগ্রেস একটি মহৎকার্য্যের আভাস দিয়াছেন।

তৃতীয়তঃ—কংগ্রেসের প্রসারে স্ত্রীলোকদের মধ্যে অস্বাভাবিক লজ্জা এবং পর্দ্দার আধিক্য অনেকটা নিবারিত হইয়াছে। ইহাতে জাতীয় অনুষ্ঠানের সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয়। জাতীয় ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারেও অনাবশ্যক পর্দা অন্তর্হিত হওয়া উন্নতির পরিচায়ক। তবে এদিকে যুবক-যুবতীর একসঙ্গে কার্য্য করিতে দেওয়া একদিকে যেমন আবশ্যক হইয়া পড়ে, নেতৃবৃন্দের সর্ব্বদা সতর্ক এবং সাবাহিত হওয়া দরকার যে নৈতিক দিক্ হইতে দেশের কোন প্রতিষ্ঠানে কোনরূপ কলঙ্ক স্পর্শ না করে।

চতুর্থ—কংগ্রেসের অহিংস নীতিতে দেশের অনেকের অন্যায় বা অযথা হিংসা প্রবৃত্তি নিবারিত হইয়াছে। ইহা বিশেষ উন্নতি সন্দেহ নাই, কিন্তু এদিকে আবার এই অহিংসা যাহাতে জড়তা বা শক্তিহীনতায় পরিণত না হয় সকলের তাহা দেখা একান্ত কর্ত্তব্য।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা কংগ্রেসের ত্রুটি, শ্রমিক ও কৃষিজীবীদিগকে কংগ্রেস আপনার করিতে পারে নাই। তাই আজ সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান এবং কমিউনিষ্ট প্রবল। এজন্য দোষ এসব প্রতিষ্ঠানের নয়। ইহার দায়িত্ব সম্পূর্ণ কংগ্রেসের। গত পাঁচ বৎসর মধ্যে কোন কংগ্রেস নেতা ও কর্ম্মী গ্রামের মধ্যে গিয়া গ্রামবাসীর সুখ-দুঃখের হিসাব নিয়া শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগে সহানুভূতি করিয়া দিবসের কতকটা সময়ও অন্ততঃ অতিবাহিত করিয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কর্ত্তব্য ছিল পরিষদের প্রতিনিধিদের। দেশবন্ধু ইহাই বুঝিয়াছিলেন; পরিষদ-প্রতিনিধিগণ দেশের সমস্ত ভোটদাতা ও করদাতাগণের সহিত যোগসূত্র রাখিয়া তাঁহাদের অভাব অভিযোগ পরিষদে উপস্থিত করিবেন এবং সরকার কিছু না করিলে দুর্ব্বার আন্দোলন উত্থাপন করিবেন। সমগ্র দেশ এইভাবে আন্দোলিত করিবার জন্যই তিনি কাউন্সিল প্রবেশ প্রোগ্রাম প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু গত দুর্ভিক্ষের সময় এই সমস্ত পরিষদ নেতৃবৃন্দ দেশের জনসাধারণের দুঃখ, ক্লেশ, অনাহার, মৃত্যু নিবারণে কেন কর্ত্তব্য পরাঙ্মুখ হইয়াছেন কে বলিতে পারে? এই সময় হিন্দু মহাসভা এবং কমিউনিষ্টরা কিছু কিছু জনসেবা করিতে সক্ষম হওয়ায়ই মাথাচাড়া দিয়া উঠিতে সক্ষম হয়। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ গত পাঁচ বৎসরে

আবুল কালাম আজাদ

শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত এবং নিরন্ন ও বস্ত্রহীন দেশবাসীর প্রতি অমার্জনীয় কর্ত্তব্য-পরাঙ্মুখতার পরিচয় দিয়াছেন। গণ-আন্দোলনে আত্মনিয়োগ না করিলে, জনসাধারণের সুখ দুঃখের

খবরাখবর না লইলে আরও শত বৎসরেও কোন ফলাশা নাই, নিঃসংশয়ে আমরা ইহা বলিতে পারি। যাহারা জেল হইতে আসিয়াছেন, কংগ্রেসের ছাপে নিজ সুবিধার ও প্রতিষ্ঠার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া তাহাদের মধ্যেও অনেকেই কি জনসাধারণের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন? একথা কি বারবার বলিতে হইবে, এই সমস্ত উপেক্ষিত লোকদিগকে সঙ্গে না লইলে কেবল ভস্মে ঘি ঢালাই হইবে। অতঃপর কংগ্রেসের কর্ম্মপন্থা জনসাধারণের জন্যই যেন ষোলআনা ভাবে নিয়োগ হয়, ইহা আমাদের প্রার্থনা। আমরা ভারতের এই প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠানের হিতকামী বলিয়াই কর্ত্তব্যবোধে কিন্তু বড় দুঃখে এই অপ্রিয় সত্য প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।

রুজভেল্ট-দূত ফিলিপ্‌সের বিবরণী

মার্কিণ রাজ্যের পরলোকগত প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট-প্রেরিত মিঃ উইলিয়াম ফিলিপ্‌স্ নামে তাঁহার ব্যক্তিগত দূত যে ভারত পরিভ্রমণ করিয়া তাঁহার অবগতির জন্য একটী বিবরণী উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় পাঠকবর্গের মনে থাকিতে পারে। এই বিবরণী লইয়া ব্রিটিস দূত লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের সহিত তাঁহার মতভেদ হয়। এই প্রসঙ্গে আমরা তাঁহার পদত্যাগ বা পদচ্যুতির কথাও শুনিয়াছিলাম। ইহা তিন বৎসরের কথা। সম্প্রতি এই বিবরণীটি লাহোরের অন্যতম উর্দ্দু দৈনিক 'মিলাপ' কাগজে প্রকাশিত হওয়ায় প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িয়াছে। মিঃ ফিলিপ্‌সের বিবরণীর সারমর্ম্ম নিম্ন দশটি দফায় প্রদত্ত হইল :—

১। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস পূর্ব্বের ন্যায় গত তিন বৎসর যাবৎ স্বাধীনতায় জন্যই সংগ্রাম করিতেছে।

২। কংগ্রেস যে আইন-সভায় প্রবেশ করিয়াছিল এবং শাসনতন্ত্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে, তাহা কেবল স্বাধীনতা সংগ্রাম আরও দ্রুতগামী করিবার জন্য।

৩। কংগ্রেস ভারতবর্ষকে এক করিতেই চাহিয়াছে।

৪। কংগ্রেস ফাসিষ্ট নীতি অবলম্বন করে নাই, নিজ শাসনতন্ত্র প্রণয়ণ করিবার অধিকারই চাহিতেছে।

৫। কংগ্রেস মন্ত্রিসভা যে কয়বৎসর কাজ করিয়াছিল, তখন যাহাতে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সহিত প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডলীর সহযোগিতা থাকে, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান তাহাই লক্ষ্য করিত।

৬। সরকার ও দায়িত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী সুষ্ঠুভাবে ও বিশেষ যোগ্যতার সহিত তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন।

৭। কংগ্রেসের নেতৃত্বে মুসলমান-স্বার্থহানি হইয়াছে, এরূপ অভিযোগের কোন প্রমাণ নাই।

৮। কংগ্রেস মন্ত্রিত্বের সময় সাম্প্রদায়িক বিপদ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এরূপ অভিযোগও ভিত্তিহীন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে—

'বাঙ্গালা ও পঞ্জাব প্রদেশ কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী কর্ত্তৃক শাসিত না হইলেও এই দুইটী প্রদেশেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা খুব বেশী হইয়াছে। পক্ষান্তরে কংগ্রেস-শাসিত অন্যান্য প্রদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও বিবাদ অনেক কম। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ক্রমবিবর্দ্ধমান বিদ্বেষের ফলেই দাঙ্গা ও গোলযোগ হইয়া থাকে।

৯। প্রাদেশিক কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলীর শাসনে মুসলীম-সংস্কৃতি ধ্বংস হওয়ার অভিযোগ ভিত্তিহীন।

ওয়ার্দ্ধা বা অন্য কোন শিক্ষাপদ্ধতি অনুযায়ী বিদ্যালয় বিশেষ হইতে উর্দ্দু ভাষার অপসারণে ও উক্ত শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্ত্তনায় এই অভিযোগের উদ্ভব হইয়াছে।

১০। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করিয়া ফেলাই কংগ্রেসের একমাত্র উদ্দেশ্য—এই অভিযোগও ভিত্তিহীন।

মিঃ ফিনিক্স বলেন, "কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি স্বতঃই হীনবল হইয়া পড়িবে। সুতরাং কংগ্রেসের তাহাতে দোষ কি?"

এই সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলিয়াই মিঃ ফিনিক্স ক্ষান্ত হন নাই। কেন তবে মুসলিম লীগ গোলযোগ সৃষ্টি করিয়াছে? এ সম্বন্ধেও তিনি বলিয়াছেন, "মুসলিম লীগ দুই একটি প্রদেশ ছাড়া প্রায় প্রদেশেই সংখ্যালঘিষ্ঠ কেন্দ্রীয় পরিষদেও তাহার সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়। ইহাতেই জিন্নাজী ও তাঁহার সহযোগীগণের খেদ এবং পাকীস্থান দাবী ও কংগ্রেসের প্রতি বিরূপ মনোভাবের ইহাই প্রকৃত কারণ। বস্তুতঃ রাজনৈতিক দল হিসাবে মুসলমান অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় মুসলমানদের মধ্যেও বিভিন্ন শ্রেণী ও বিভাগ বিদ্যমান রহিয়াছে। সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রথায় কতকটা মিল দেখা যায় বটে, কিন্তু উহা খুবই ক্ষণস্থায়ী। অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম লীগের অভ্যন্তরেও পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী।

মিঃ ফিনিক্স বলেন, "সকল শ্রেণীর ও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী কৃষক ও শ্রমিকগণ শীঘ্রই এক যোগে কাজ করিতে আরম্ভ করিবে। এই অবস্থায় দেশের অধিকাংশ মুসলমানই তাহাদের সহিত সম্প্রীতিতে আবদ্ধ হইবে। আর হিন্দু-মুসলমান সমস্যাও অচিরেই তিরোহিত হইবে।

উইলিয়াম ফিলিপ্‌সের উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ভারতীয় হিন্দু মুসলমান মিলন বা বিরোধে আমেরিকার বিশেষ স্বার্থ নাই। সুতরাং তাঁহার সিদ্ধান্ত নিরপেক্ষ বলিয়া ইহার মূল্য খুবই বেশী। তবে এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী হইতে পারে যদি কংগ্রেস সেবীগণ জাতি-ধর্ম্ম বর্ণ ভুলিয়া আপামর সাধারণের সেবা করিতে প্রবৃত্ত হয়। কতিপয় হিন্দু কতিপয় মুসলমানের সহিত একত্র খানাপিনা করিয়া হিন্দু মুসলমান মিলনের প্রচারেই প্রকৃত ঐক্য হইবে না। কেবল রাজনৈতিক সভা, শোভাযাত্রা, বক্তৃতা ও প্রবন্ধেও মিলন সংঘটিত হইবে না। মিলন সম্ভব হইবে প্রেমে, সেবায় ও উদার ধর্ম্মাচরণে। জীবে সেবা আর সকল দেহেই ভগবান বিদ্যমান আছেন—রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের এই মহাবাক্য যেন আমরা কখনও বিস্মৃত না হই।

দ্বিতীয় কথা হিন্দু মুসলমান মিলন তখনই সম্ভব হইবে, যখন উভয়ে মনে করিবে, "আমরা সর্ব্বাগ্রে ভারতবাসী তার পরে হিন্দু মুসলমান"; এই মনোভাব ভিন্ন প্রকৃত ঐক্য কখনও সম্ভব হইবে না—ইহা ধ্রুব সত্য।

সাপ্রু কমিটির সুপারিশ

দেশবাসী অবগত আছেন যে ভারতবর্ষেই নানাবিধ সাম্প্রতিক সমস্যার সমাধানকল্পে সর্ব্বজন সমর্থনযোগ্য একটি শাসনতন্ত্র-রচনার দায়িত্বগ্রহণ করিবার জন্য স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু প্রমুখ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ কর্ত্তৃক একটি কমিটি গঠিত হইয়াছিল। এই কমিটির অন্যতম সভ্য ছিলেন মিঃ এম, আর, জয়াকর, কোয়ুয়ার স্যার জগদীশ প্রসাদ এবং স্যার গোপাল স্বামী আয়েঙ্গার। উপরোক্ত যে-সমস্ত ব্যক্তি শাসনতন্ত্র রচনার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই বহুদর্শী, রাজসরকারের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মসচিব, বিজ্ঞ এবং বর্ত্তমানে নিরপেক্ষ। ইহারা কোন রাজনৈতিক দলেরই বশবর্ত্তী নহেন এবং ভারতবর্ষের মধ্যে ইহাদের অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। তাই যে-সময়ে একটি অনুসন্ধাননিরত ব্রিটিশদৌত্য অবস্থা জানিবার ও বুঝিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া বেড়াইতেছেন, সেই সময়ে এই সাপ্রু কমিটির সুপারিশ তাহাদের মতামত নির্দ্ধারণে যে খুব সুবিধা হইবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। তবে ভারতের দিক্ হইতে এই সুপারিশগুলি শ্রুতিমধুর ভিন্ন আর কিছুই নয়। পরীক্ষা করিয়া আমরা কিন্তু ইহার বিশেষ সারত্ব পাইলাম না। মোটামুটি সুপারিশগুলি এই :—

(১) ভারতবর্ষ বলিতে একটী অখণ্ড যুক্তরাজ্য বুঝায়।

(২) পাকিস্তান অসম্ভব। শ্রীরাজাগোপালাচারী যে ভারতের নির্দ্দিষ্ট অংশে হিন্দু-মুসলমানের থাকিবার পৃথক্ ব্যবস্থার প্রস্তাব করেন অথবা স্যার রেজিনাল্ড কুপল্যাণ্ড যে ভারতকে বিভক্ত করিয়া দুইটি ভূখণ্ড হিন্দুর জন্য ও দুইটি ভাগ মুসলমানের জন্য নির্দ্ধারিত করিতে চাহেন তাহাও অগ্রাহ্য।

(৩) সাম্প্রদায়িক স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা উঠাইয়া যুক্ত নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবে। ইহার মূল্যস্বরূপ কেন্দ্রীয় পরিষদে তপশীল ব্যতীত ২৫ কোটি হিন্দুর যতজন প্রতিনিধি থাকিবে, নয়কোটী মুসলমানদেরও ততজনই থাকিবে।

(৪) প্রাপ্তবয়স্ক সকলেরই ভোট অর্থাৎ নির্ব্বাচনাধিকার থাকিবে।

(৫) সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বত্বরক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে।

(৬) চাকুরী গুণানুযায়ী হইবে।

(৭) ইউনিয়নে সমস্ত প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যগুলি অন্তর্ভুক্ত হইবে, ইহার উপরওয়ালা ব্রিটিশশক্তি থাকিবেনা, থাকিবে দেশীয় ফেডারেশন কেবিনেট।

(৮) সমস্ত দেশীয় রাজ্যগুলিকেও ইউনিয়নে আসিতে হইবে। তবে তাহাদের একটি ফেডারেশন থাকিবে, তাহাতে আসা না আসা তাহাদের ইচ্ছা। কিন্তু আসিলে আর বাহিরে যাইতে পারিবে না।

(৯) একটী শাসনতন্ত্র গঠন পরিষদ ১৯৪৬-এর এপ্রিলের পূর্ব্বেই গঠিত হইবে। ইহার সভ্য থাকিবে সমস্ত প্রাদেশিক সভ্যগণের ১৬০ জন। ইহাতেও তপঃশীল ব্যতীত সমান সংখ্যক হিন্দু-মুসলমান থাকিবে।

(১০) এই সভ্যগণের যদি ৪ ভাগের ৩ ভাগ সভ্য কোন প্রস্তাব অনুমোদন করেন, তবে তাহা কাহারও বিনা সম্মতিতে পাশ হইবে। তাহা না হইলে গভর্ণমেণ্ট যেরূপ অভিরুচি সেরূপ করিবেন।

এই সমস্ত সুপারিশগুলি বেশ শ্রুতিমধুর। তবে ইহার সারত্ব ও অসারতা সাধারণের পরীক্ষা সাপেক্ষ। পাকিস্তানের অসম্ভাব্যতার আশার বাণী দিয়া কমিটি আমাদের ধন্যবাদার্হ, কেন না আমরা অখণ্ড ভারতের পক্ষপাতী। কংগ্রেসের আত্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে কমিটি কোনরূপ মন্তব্য করেন নাই—কেন না ইহাও এক ইউনিয়ন চায়, কংগ্রেসও তাহাই চায়। তবে সঙ্গে সঙ্গে এই কমিটি সংস্কৃতি ও ভাষার ঐক্যে আত্মনিয়ন্ত্রণ যে খুবই সুব্যবস্থা, এরূপ মত প্রকাশ করিলে বোধ হয় ভালই করিতেন।

যাহাহউক, তাহাতে কিছুই আসে যায় না। কারণ ইহার পরের সিদ্ধান্তগুলি খুব বিজ্ঞতার পরিচায়ক নহে। এই কমিটি কেন্দ্রীয় পরিষদে যুক্ত নির্ব্বাচনের মূল্য স্বরূপ যে হিন্দু মুসলমানের সমান সংখ্যক সভ্য রাখিবার সুপারিস করিয়াছেন—ইহা সর্ব্বতোভাবে গণতন্ত্রবিরোধী। ২৫ কোটি হিন্দুর যে সংখ্যার প্রতিনিধি থাকিবে, ৯ কোটিরও তাহাই থাকিবে—এরূপ সিদ্ধান্ত ন্যায়ানুমোদিত হইতে পারেনা। আমাদের মতে মুসলমানের জন্য সংখ্যানুসারে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা রাখিয়াও তাহাদিগকে অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া কর্ত্তব্য। যেমন—যদি ৩৪ জন সভ্য থাকে, তবে ৯ জন মুসলমানের কম না হয়। বেশীও হইতে পারে—যদি যুক্ত নির্ব্বাচন, প্রার্থীদের ন্যায়নিষ্ঠা, অপক্ষপাতিত্ব ও উদারতা প্রভৃতি বিবেচনায় বেশী সংখ্যক লোককে পাঠাইতে ইচ্ছা করে। এরূপ জ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তি সমস্ত মুসলমান বা সমস্ত হিন্দু হইলেও কোন সম্প্রদায়ের আশঙ্কা নাই। নতুবা যেরূপ গুণ বিশিষ্টই হৌক না কেন, ৯ কোটি মুসলমানের প্রতিনিধি ও ২৫ কোটি হিন্দুর প্রতিনিধি সমান—এরূপ সিদ্ধান্ত যেমন শ্রুতিকটু সেরূপ অসঙ্গত ও কতকটা জবরদস্তিমূলকও বটে।

দ্বিতীয়টি আরও মারাত্মক। ধরুন যদি মুসলমানেরা পাকিস্তান চায়, হিন্দুরা ইহার বিরোধী হইল। ভোটে সমান সমান হইল, বা পাকিস্তানের পক্ষেই বেশী ভোট হইল, কিন্তু শতকরা ৭৫ হইল না এক্ষেত্রে গভর্ণমেণ্ট মতামত না দিলে কোন ব্যবস্থা হইবে না। এরূপ অবস্থায় বিলাতে র‍্যামসে ম্যাকডোনেল্ড্ যেমন সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের প্রবর্ত্তন করেন, এক্ষেত্রেও গভর্ণমেণ্ট যদি সুপারিস করে, তবে ঐ পাকিস্তান প্রস্তাবই কার্য্যতঃ হইয়া যাইবে। সুতরাং কমিটির সভ্যগণ যতই সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত হৌন না কেন—এই চারিভাগের তিনভাগের সুপারিসেই তাহাদের সমস্ত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা। তবে এক কথা, ফেডারেল কেবিনেট ব্রিটিস গভর্ণমেণ্টের স্থান অধিকার করিবে! তাহাদের স্বরূপ কি হইবে! কবে তাহাদের কার্য্য আরম্ভ হইবে, এসব কিছু না জানিলে কিছুই বুঝা যায় না। আমাদের মনে হয়, আর কিছু হৌক না হৌক, সাপ্রু কমিটির সমান সমান সুপারিস এবং চারিভাগের তিনভাগ না হইলে গভর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ, সুপারিস, এই দুইটির ফল অচিরেই পাইবার সম্ভাবনা

রহিল। মনে হয় যেন সাপ্রু কমিটির দোহাই দিয়া গভর্ণমেণ্ট আর কিছু মঞ্জুর করুন কি না করুন, এই দুইটী ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিবেন।

এতদ্ব্যতীত ইউনিয়নের কথাটি অভিনব কল্পনা। এরূপ পরিকল্পনা কার্য্যতঃ হইলে খুবই ভাল। দেখা যাক্ কি হয়।

উপসংহারে সাপ্রু কমিটির সভ্যগণের সদিচ্ছা ও বিপুল অধ্যবসায়ের জন্য আমরা তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করি।

লালকেল্লায় আজাদ-হিন্দ ফৌজের বিচার

আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রথম দফা বিচারের অবসান হইয়াছে। বিচারাধীনে সেনানায়ক শা নওয়াজ খান, পি, কে, সায়গল ও গুরবক্স সিং ধীলনকে শেষ পর্য্যন্ত আর দণ্ডভোগ করিতে হয় নাই। ভারতের মুক্তির জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধের বীরত্রয় আবার জনসাধারণের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

পাঠকবর্গ জানেন যে, সামরিক আদালতে এই অফিসারত্রয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, রাষ্ট্রের আনুগত্য অস্বীকার করিয়া সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার এবং হত্যা ও নরহত্যার সহায়তা করার। বিচারকর্ত্তা ছিলেন স্যার র‍্যাক্সলাণ্ড প্রমুখ নয় জন সামরিক অফিসার। সরকার পক্ষে কৌন্সিলি ছিলেন স্যার নোশীরণ ইঞ্জিনিয়ার এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিত্রয়ের পক্ষে ছিলেন শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই, স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু, মিঃ আসফালি, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, মিঃ পি. কে. সেন, মিঃ কাটজু প্রভৃতি প্রখ্যাতনামা কৌন্সিলিগণ। এতদ্ব্যতীত কর্ণেল কেরেন ছিলেন জজ এড্‌ভোকেট।

সাধারণতঃ দায়রার বিচারে (Sessions Court) বিচারক যেমন আইনের নির্দ্দেশ দেন, ঘটনা (Facts) ও অবস্থা সম্বন্ধে

শাহ নওয়াজ

সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব থাকে জুরীর উপরে, এক্ষেত্রেও আইনের নির্দ্দেশ এই জজ এডভোকেটই দিয়াছেন। আর ঘটনা বা বৃত্তান্ত সম্বন্ধে কর্ত্তৃত্ব ছিল সামরিক বিচারকগণের। তবে দায়রায়
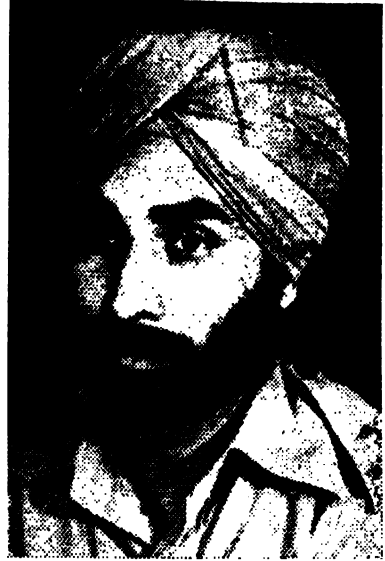
ধীলন

আদালতে বিচারকই দণ্ড দেন, কিন্তু এক্ষেত্রে দণ্ড দেওয়ার ভার ছিল সামরিক বিচারকগণের উপরে। আর একটী নিয়ম, ইহাদের প্রদত্ত দণ্ড ভারতীয় জঙ্গীলাটের (Commander in Chief) সমর্থন ব্যতীত কার্য্যকরী হয় না।

কথিত মোকদ্দমার অনেক সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরা হয়। বিভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া আসামীর পক্ষেও কয়েকজন সাক্ষ্য দেন। প্রথমে শ্রীযুক্ত ভুলাভাই পরে স্যার নোশীরণ বক্তৃতা করেন। সাক্ষী দেওয়ার ফলে, আইনের নির্দ্দেশে উত্তর দেওয়ার অধিকার (Right of Reply) হইতে শ্রীযুক্ত ভুলাভাই বঞ্চিত হন।

এই প্রমাণিত ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া শ্রীযুক্ত ভুলাভাই বলেন, "যেই গভর্ণমেণ্ট স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ নির্ব্বাহ করে, যুদ্ধ নির্ব্বাহ যে করিয়াছিল এবং যাহা অন্য বিশিষ্ট গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক স্বীকৃত, সাময়িক ভাবে (Provinsional) হইলেও স্বাধীন জাতীয়ত্ব অর্জ্জিত হইয়াছে। সুতরাং আন্তর্জ্জাতিক আইনানুসারে (International Law) তাহার যোদ্ধৃগণের বিচার হইতে পারে, দেশবিদেশের কোন ঘরোয়া আইনের সহায়তায় নয়। প্রমাণ (১) ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগালের রাণী ডনার বিরুদ্ধে ডন মিওয়েনের অনুষ্ঠিত যুদ্ধ (২) ইটালী শাসনশক্তির বিরুদ্ধে গ্যারিবল্ডির যুদ্ধ।

স্যার নোশীরণ বলেন, "ইহারা ভারতীয় সৈনিক। ভারতীয় সৈন্য আইনের অপরাধ আন্তর্জ্জাতিকের মধ্যে পড়ে না। যেখানে কোন রাজ্য এবং সেই রাজ্যের প্রজাসম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে এবং যেখানে সেই প্রজা সম্রাটের আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য, সেখানে ভারতীয় আইনই প্রযোজ্য।"

সাক্ষ্য প্রমাণে সাব্যস্ত হইয়াছে যে আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট গঠিত ও ঘোষিত হওয়ার পরে, সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে ইহার কার্য্য-নির্ব্বাহ হয় আর অক্ষশক্তিত্রয় উহার অস্তিত্ব মানিয়া লয়। এই গভর্ণমেণ্টের অধীনে সুগঠিত সৈন্যবাহিনী ও সৈন্যাধ্যক্ষ ছিল, আর ইহার উদ্দেশ্য মুখ্যভাবে ছিল ভারতের স্বাধীনতা লাভ এবং গৌণভাবে ছিল বর্ম্মা ও মালয়ের ভারতীয় অধিবাসিগণের রক্ষা বিধান। এই গভর্ণমেণ্টের অধীনে বিশেষ বিশেষ স্থান অন্তর্ভুক্ত ছিল, আর সেনাবাহিনী পরিচালনার জন্য অর্থ সামর্থ্যেরও অভাব হয় নাই।

সায়গল

শ্রীযুক্ত ভুলাভাই বলেন, "ভারতে থাকিলে সে কথা খাটে। কিন্তু ইহারা ছিল বিদেশে, যখন যুদ্ধবন্দী হয়, ইংরাজ তাহাদিগকে জাপানের করে সমর্পণ করিয়া যায়। এই নিঃসহায় অবস্থায় জাপানীরা যাহাতে ভারত অধিকার করিতে না পারে, তাই দেশের মুক্তির জন্য ইহারা সেনাবাহিনী গঠন করিয়া অবস্থার তাড়নে রাজার প্রতি কর্ত্তব্য ছাড়িয়া দেশের প্রতি কর্ত্তব্য করিতেই সঙ্কল্প করিয়াছিল। যদি ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে আমেরিকানগণ ব্রিটেনের কবল মুক্ত হইবার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া নিজদেশ স্বাধীন করিতে পারে, তবে ইহারা ভারতের বাহির হইতে যুদ্ধ করিয়া কি অপরাধ করিয়াছে?

উভয় পক্ষের সওয়াল-জবাবের পর জজ এডভোকেট কর্ণেল কেরেল আইন ও বৃত্তান্ত বুঝাইয়া দিলে সামরিক আদালত, বন্দিত্রয়কে রাজার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১ ধারানুসারে দণ্ডার্হ মনে করেন। অতঃপরে তাঁহাদের চরিত্র নিখুঁত প্রমাণিত হয়। অবশেষে সামরিক বিচারাদালতের সিদ্ধান্ত অনুসারে তিনজনের প্রতিই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়। কিন্তু প্রধান সেনাপতি (C. in C.), তাঁহাদের একেবারে মৌকুফ করিয়া মুক্তির আদেশ দিয়াছেন। মুক্তি-সংগ্রামী বীরত্রয় আবার মুক্তিকামী জনসাধারণের নিকট মুক্তির বার্ত্তা পৌঁছাইতেছেন।

এই বিচার সম্বন্ধে সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া আমাদের মনে হয় যে বিচারকগণ একটী বিষয়ে বোধহয় লক্ষ্য করেন নাই। অধিকাংশ সাক্ষীই আজাদ-হিন্দ-ফৌজ অন্তর্গত ছিল। সুতরাং তাহারাও সমভাবে অভিযোগ-যোগ্য। ইংরাজীতে ইহাদিগকে বলে accomplices. ইহাদের সাক্ষ্য সমর্থনসূচক প্রমাণ ব্যতীত গ্রহণীয় নয়। এ সম্বন্ধে সার নৌশীরণ সমুচিত উত্তরদানে ব্যর্থ-কাম হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। এ-দিক হইতে বিবেচনা করিলে ইহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে কিনা বিশেষ ভাবিবার বিষয়।

দ্বিতীয়তঃ সুগঠিত, সুনিয়ন্ত্রিত ও অক্ষশক্তি-সমর্থিত গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধ ঘোষণা করিলে, অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার আন্তর্জ্জাতিক আইন ভিন্ন ঘরোয়া আইনে হইতে পারে না বলিয়াই আমাদের মত। বিশেষতঃ, তাহারা তখন বিদেশে বিপাকে পড়িয়া জাপানের হাত হইতেই ভারতরক্ষা করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল।

তৃতীয়তঃ, আইনগত আনুগত্যও যে চিরস্থায়ী হইতে পারে না, ইংলণ্ডের বিশেষজ্ঞ রাজনৈতিক মহলও এই মত পোষণ করেন। কিছুদিন পূর্ব্বে স্বতন্ত্র শ্রমিকদলের মনোনীত পার্লামেণ্টের সদস্য মিঃ ফেনার ব্রকওয়েও বলিয়াছিলেন—

"বিদেশী শক্তির অধীন এবং স্বায়ত্তশাসনহীন কোন দেশের অধিবাসিবৃন্দের পক্ষে দমনকারী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য অথবা নিজেদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সুবিধা হইবে এই ভাবিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্য-শক্তির সহিত যুদ্ধে নিরস্ত হইবার জন্য কোনরূপ নৈতিক আনুগত্যমূলক বাধ্যবাধকতা নাই।"

এ সম্বন্ধে আমাদের কয়েকটি দৃষ্টান্ত মনে পড়িতেছে। গত যুদ্ধের শেষাবস্থায় লেনিন রাশিয়া হইতে নির্ব্বাসিত ছিলেন। যখন তিনি বুঝিলেন যে, বিপ্লব পরিচালনার জন্য তাঁহার স্বদেশে (রাশিয়া) প্রত্যাবর্ত্তন আবশ্যক, তিনি তাঁহার নিজদেশ রাশিয়ার সহিত যুদ্ধরত জার্ম্মানীর সহায়তায় সেই দেশের মধ্য দিয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। জার্ম্মান কাইজার এই ভাবিয়াই অনুমতি দিয়াছিলেন যে, লেনিনসংঘটিত বিপ্লবে রাশিয়ার সামরিক শক্তি খর্ব্ব হইবে। যদি লেনিনসংঘটিত রুশবিপ্লব সাফল্য লাভ না করিত, তবে নিশ্চয়ই সামরিক আদালতে তাহার বিচার হইত আর তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতেন। জেনারেল ডগলও আইনসঙ্গত ফরাসী গভর্ণমেণ্টের আদেশ অমান্য করিয়া উহার বিদ্রোহী হন। এখন তিনি ফরাসীর প্রধান ব্যক্তি, অবস্থান্তরে হয় তো চরম দণ্ড হইতে পারিত। এই সমস্ত নজির বর্ত্তমান অবস্থায় প্রযোজ্য হৌক কি না হৌক, এ বিষয়ে আমাদের মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। আজ আমরা সর্ব্বাগ্রে ভারতের জঙ্গীলাট স্যার ক্লড অচিনলেক ও বর্ত্তমান বড়লাট লর্ড ওয়াভেলকে সাধুবাদ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। স্থির মস্তিষ্কে দণ্ডিত ব্যক্তিত্রয়কে ক্ষমা করিয়া তাঁহারা যেরূপ মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন তাহা সিপাহী বিদ্রোহের সময়কার লর্ড ক্যানিংকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। দয়ালু ক্যানিংএর ন্যায় বর্ত্তমান লাটদ্বয়ের নামও ইতিহাসে চিরস্মরণীয়

হইয়া থাকিবে। অবশ্য তাঁহারা ভারতব্যাপী আন্দোলনের দাবী উপেক্ষা করিতে পারেন নাই, আর দণ্ড বহাল রাখিলে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অন্ততঃ শতকরা ৭৮ জনের অনুমোদিত হইত না, এরূপ আশঙ্কারও সূচনা হইয়াছিল। সব দিক হইতেই উভয় লাট বাহাদুরের নিকট তাঁহাদের সুবুদ্ধি ও ধীরতার জন্য আমাদের সাধুবাদ ও অভিনন্দন দেয়।

শুনিতে পাইলাম, এই বীরত্রয় অহিংসনীতি আশ্রয় করিয়া দেশব্রতে ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহাদের দেশপ্রেম, নির্ভীকতা, শৃঙ্খলাশক্তির সহিত অহিংসা ও প্রেম সংমিশ্রিত হইয়া মণিকাঞ্চন যোগ সৃষ্টি করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আমরা আরও মনে করি ইহাতে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের পথ আরও সুগম ও সহজ হইবে। স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্রতোদ্যাপনও এই সংযোগের ফলে ত্বরান্বিত হইবে।

ইঙ্গ-মার্কিণ ঋণ-প্রসঙ্গ

অনেক দিন মহড়ার পরে গত ৬ই ডিসেম্বর তারিখে বহু-বিঘোষিত ইঙ্গ-মার্কিণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তি অনুসারে বৃটেন ঋণবাবদ আমেরিকার নিকট হইতে ৪৪৪০ কোটি ডলার পাইবে। উক্ত ঋণের একাংশ বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে যে আমেরিকার পণ্য জমিয়া আছে, এবং পূর্ব্বেও ঋণ ও ইজারা (Lend & Lease) বাবদ যাহা দেওয়া হইয়াছিল, তাহার মূল্য হিসাবে গণ্য হইবে, বক্রী ৩৭৫ কোটি ডলার নগদ দেওয়া হইবে। এই টাকা ছয় বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে যে কোন সময় যে কোন অংশে ইংলণ্ড চাহিবা মাত্রই পাইবে। সুদের হার শতকরা ১'৬২ ডলার। ছয় বৎসর পরে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে কিস্তি অথবা এককালীন এই টাকা পরিশোধ হইবে।

এই ঋণের ব্যাপার কেবল ইংলণ্ড ও আমেরিকার ঘরোয়া ব্যাপারই নয়, ভারতীয় অর্থনীতি এবং লাভালাভের উপর ইহার পরিস্থিতি বড় সামান্য নয়। যুদ্ধের সময় ভারতবাসিগণ না খাইয়া না পরিয়া ইংলণ্ডকে দ্রব্যসম্ভার সরবরাহ করে, তাহার দরুণ ইংলণ্ডের নিকট ভারতের বিপুল ষ্টার্লিং পাওনা আছে। অনেকেই ভাবিয়াছিল এই ঋণের অর্থ হইতে বৃটেন ভারতকে উহার নিকট দেয় ঋণের কতকটা অংশ হয়তো ফিরাইয়া দিবে। কিন্তু চুক্তির শেষদিকের সর্ত্তগুলি পরীক্ষা করিলে সেরূপ আশার নিষ্ফলতাই প্রতিপন্ন হইবে।

এই চুক্তিপত্রে বৃটেনের ঋণকে তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীর ঋণ অবিলম্বে পরিশোধ করা হইবে এবং যে কোন রাষ্ট্রের মুদ্রায় উহা পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর ঋণ ১৯৫১ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া বার্ষিক কতকগুলি কিস্তিতে পরিশোধ হইবে। যদিও এই দুইশ্রেণীতে ভারতীয় প্রাপ্য ঋণের বিষয় সুনির্দ্দিষ্টভাবে উল্লিখিত হয় নাই, তথাপি আশঙ্কারও কোন কারণ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর ঋণ যে ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে ভারতের বিশেষউদ্বেগের কারণ হইয়াছে। এই শ্রেণী সম্পর্কে বলা হইয়াছে বৃটেনের অবশিষ্ট ঋণ চূড়ান্ত হিসাব নিকাশে ভারত, মিশর প্রভৃতি দেশের দেয় সাহায্য বলিয়া গণ্য হইবে অথবা দীর্ঘ-মেয়াদি বলিয়াও ধরা যাইতে পারে"। বৃটেনের বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়াই বোধ হয় এইরূপ সর্ত্তের অবতারণা করা হইয়াছে, আর এ সুযোগের সদ্ব্যবহার বৃটেন পুরোপুরিভাবে করিবে, তাহারও যথেষ্ট আভাস পাওয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যেই হাউস অব কমন্সের বিতর্ক-সভায় মিঃ চার্চ্চিলের বক্তৃতায় বুঝা গিয়াছে যে, বৃহৎ ভারতের প্রাপ্য অর্থের খুব একটা অংশ ভারত যেন খারিজ করিয়া দেয়। অতঃপরে ব্রেটনউড্‌সের অর্থ-নৈতিক সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে প্রকারান্তরে ভারতীয় প্রতিনিধিকে দিয়া স্বীকারই করিয়া লওয়া হইয়াছে যে, প্রাপ্য অর্থের একটা অংশ যেন দিতে না হয়। অথচ এরূপ পরোক্ষ স্বীকৃতিতে ভারতীয় আইন-পরিষদের কোনরূপ সম্মতিই লওয়া হয় নাই। ফলে অবস্থা এই দাঁড়াইল যে, যে ঋণ ভারতবাসীর দুর্দ্দিনে—যখন লক্ষ লক্ষ লোক অনশনে দিন কাটাইয়াছে, লজ্জা নিবারণের উপযোগী বস্ত্র-পরিধানেও অক্ষম রহিয়াছে, দুর্ভিক্ষে কাতারে কাতারে লোক মৃত্যু-মুখে প্রবেশ করিয়াছে—সেই সময় পঞ্চাশ লক্ষ জীবনের বিনিময়ে উপেক্ষা করিয়াও ভারত ইংল্যাণ্ডকে দ্রব্যসম্ভার দিয়া তাহার অভাব (মিটাইতে তাহার অনিচ্ছায় বাধ্যতামূলকভাবে, যুদ্ধের অজুহাতে) পরাঙ্মুখ হয় নাই। আর আজ তাহার অভাবের বিকটাবস্থা বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও, ইংলণ্ডকে সেই ঋণভার হইতে মুক্তি দিতে হইবে। অতিদানে বলির্বদ্ধ—সুতরাং পরদুঃখকাতর ভারতকে আজও উদারতা দেখাইয়া দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসীর দংশনবিষে কোটি কোটি প্রাণীকে প্রেরণ করিতেই হইবে। আবার ভারতীয় প্রাপ্য ষ্টার্লিং ন্যায্য প্রাপ্য নয়—তাহারও আভাস দেওয়া হইয়াছে। বলা হইতেছে, ভারত ও ইংলণ্ড ও উহার মিত্রদেশসমূহের কাছে অত্যন্ত চড়াদামে উহার পণ্য বিক্রয় করিয়াছেন। ইহা যে নিছক মিথ্যা কথা, তাহা একটি পার্লামেণ্টারী কমিটির রিপোর্টেও পাওয়া যায়। উহার মত—"মিত্রদেশসমূহ ভারতের কাছ হইতে উচিত মূল্যে এবং সাধারণতঃ খুব কম দামেই আবশ্যকীয় দ্রব্যসম্ভার কিনিয়াছে।" কেবল তাহাই নহে ইংলণ্ড ও মিত্রদেশ হইতে যে সমস্ত কাঁচা, বা শিক্ষিত অশিক্ষিত সৈন্য ভারত ভূমিতে প্রেরণ করা হয়, সে সকলের অধিকাংশ খরচও ভারতকেই বহন করিতে হইয়াছে।

ভারতের জনসাধারণ যাহাতে এই অর্থ-নৈতিক অবস্থা বুঝিতে সক্ষম হয়, তজ্জন্য দেশনায়কগণের কি কোনই দায়িত্ব নাই?

সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের অধিবেশন

গত ১০ই জানুয়ারী তারিখে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের অধিবেশন সুরু হইয়াছে। ৫১টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগ দিয়াছেন। অধিবেশনের উদ্দেশ্য ঘোষণানুযায়ী অতি মহৎ—তৃতীয় মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা দূর করিয়া পৃথিবীতে চিরস্থায়ী শান্তি স্থাপিত করা। অবশ্য উদ্দেশ্যানুযায়ী কোনরূপ কার্য্যপদ্ধতি রচিত হইবার সংবাদ এতাবৎ আমরা পাই নাই। তবে অধি-

বেশনের সুরুতে যে একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, সে খবর আমরা পাইয়াছি এবং নরওয়েজীয়ান প্রার্থী মঃ ট্রিগ্‌ভ লাইকে গোপন ভোটে হারাইয়া বেলজিয়ান্ প্রার্থী ডাঃ স্পাক যে সাধারণ অধিবেশনের সভাপতি-নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, সে খবরও আমাদের কাছে আসিয়াছে। বর্ত্তমান সভাপতি নির্ব্বাচন সমর্থন করেন ব্রিটেন ও রাশিয়া আর আমেরিকা সমর্থন করেন মিঃ লাইকে। আরও শুনিলাম, রাশিয়া সম্মিলনী এক সপ্তাহের জন্য মুলতুবী রাখিতে চাহিয়াছেন কিন্তু আমেরিকা ও ইংলণ্ড বিরোধী হন। ইহা ছাড়া এই অধিবেশন সম্পর্কে প্রতিনিধিদের সম্বর্দ্ধনায় স্বয়ং ইংল্যণ্ডেশ্বরে বক্তৃতা আর অধিবেশনের উদ্বোধনে ব্রিটীশ পররাষ্ট্রসচিব মিঃ বেভিনের বক্তৃতা উল্লেখযোগ্য বিষয়, তবে উভয়েরই বক্তৃতার ভাষা সমান অলঙ্কৃত, এবং উভয় বক্তৃতারই প্রতিটি বাক্য সমান আবেগ-উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ। পড়িয়া মনে হয়—যেন তাঁহারা তাঁহাদের ভাষণে উভয়ে কে কত আবেগ ও অলঙ্কার প্রয়োগ করিতে পারেন, তাহারই প্রতিযোগিতা করিয়াছেন। এবম্বিধ ভাষিক প্রতিযোগিতা আরও চলিবে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা স্ব স্ব বক্তৃতায় আরও আবেগ ও অধিকতর উচ্ছ্বাসের নিদর্শন প্রদর্শন করিবেন, গত যুদ্ধের লীগ অব নেশনের অধিবেশনগুলি হইতে সুরু করিয়া সেদিনকার সানফ্রান্সিস্কো সম্মেলনেও আমরা এই ভাষা-প্রতিযোগিতাই লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু সত্যকার কোন কাজের কাজ দেখি নাই। পৃথিবীর সমস্যা তেমনি অমীমাংসিত রহিয়াছে। অতীতের অভিজ্ঞতা যদি ভবিষ্যতের যুক্তি হিসাবে গ্রাহ্য হয়, তবে আমরা ধরিয়া নিতে পারি যে, এবারকার লণ্ডনের অধিবেশনেও ইহার কোনও ব্যতিক্রম হইবে না। শান্তি প্রতিষ্ঠার যাহা প্রতিবন্ধক, সেই সাম্রাজ্যবাদ এবং প্রাধান্য নীতিই সকল মীমাংসার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইবে। অধিবেশনের সম্মিলিত আলোচনায় শক্তিশালী পক্ষরাই যে-যার নিজের সুবিধামত ব্যবস্থা করিয়া নিবেন, দুর্ব্বল রাষ্ট্রেরা বাধ্য হইয়া শক্তিশালীদের মতে মত দিবেন। আর কোটি কোটি নিপীড়িত মানবগোষ্ঠীর আকাঙ্ক্ষা তেমনি অন্যান্যবারের মত প্রধান শক্তিগুলির স্ব স্ব ঘরোয়া সমস্যা হইয়া রহিবে। এই সম্পর্কে একটি ব্যাপারেই কিন্তু সম্মিলনীর অসারত্ব সূচিত হইতেছে। সম্মেলনীর প্রারম্ভে প্রধান মন্ত্রী এটলি বলিয়াছেন—

"যদি জগতের আন্তর্জ্জাতিক নিরাপত্তা চাও, কেবল গভর্ণমেণ্টসমূহের সমর্থনই যথেষ্ট নয়। পৃথিবীর যাবতীয় অধিবাসিগণের অকুণ্ঠ সমর্থন আবশ্যক।"

একটা কথা জিজ্ঞাস্য এই—ভারতের কথা বলিবার এই অধিবেশনে কে আছেন? সানফ্রান্সিস্কো কনফারেন্সের মত এখানেও ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার, কিন্তু তিনি কি যথার্থ-ই ভারতের জনগণের প্রতিনিধি? অথচ পৃথিবীর যাবতীয় লোকের এক-পঞ্চমাংশ ভারতবাসী। কিন্তু যদি ভারতবর্ষের শক্তি ও নিরাপত্তার কথা বলিবার ভারতীয় লোকদের প্রকৃত প্রতিনিধি সেখানে প্রেরিত না হইয়া থাকে, যদি জগতের এক বৃহদংশের (অন্ততঃ পঞ্চমাংশের) জনগণের অকুণ্ঠ ও আন্তরিক সমর্থন লাভ করিতে এই প্রতিষ্ঠান না গড়িয়া থাকে, তবে এ সম্মিলনী কি প্রকৃতই কার্য্যকরী অনুষ্ঠান, না, একটা প্রহসনের মত হাস্যজনক ব্যাপার? খবর আসিয়াছে যে, তাঁহারা মনগড়া একজন লোককে ভারতের প্রতিনিধি করিয়া একটা আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনে পাঠাইয়াছেন, তাঁহারা ভবিষ্যতে যেন এরূপ দায়িত্বশূন্য কাজ করিয়া ভারতবাসীর মন আহত না করেন।

চীনের গৃহযুদ্ধের অবসান

আমরা বিশেষ আনন্দিত হইলাম যে, চীনের গৃহযুদ্ধের অবসান হইবার উপক্রম হইয়াছে। নিম্নলিখিত সর্ত্তে কু-ওমিনট্যাঙ্গ এবং কমিউনিষ্টদের মধ্যে আবার ঐক্যবন্ধন হইবার কথা হইয়াছে। এই ঐক্যবন্ধন যাহাতে স্থায়ী ও দৃঢ় হয়, তজ্জন্য নিম্নলিখিত বিষয় স্থিরীকৃত হইয়াছে—

(১) রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের মীমাংসা হইবে রাজনৈতিক উপায়ে, সশস্ত্র যুদ্ধের সহায়তায় নয়।

(২) সামরিক বিষয় অনুসন্ধান জন্য সামরিক কমিটি গঠন।

(৩) চীন হইতে জাপানী সৈন্য নিরস্ত্র করিবার জন্য সময় নির্দ্ধারণ।

(৪) গৃহযুদ্ধে যে সমস্ত তাঁবেদার সৈন্যগণ অস্ত্রধারণ করে, তাহাদের নিরস্ত্র করণ ও শাস্তিপ্রদান।

(৫) রাজনৈতিক উপদেষ্টা কাউন্সিলের দ্বারা চীনাবাহিনীর পুনর্গঠন।

আরও শুনিতেছি গণতন্ত্র শাসনও নাকি চীনে শীঘ্রই সংস্থাপিত হইবে। এই বিষয়ে আইনপরিষদ প্রতিষ্ঠানের সভাপতি মহাচীনে শান্তি সংস্থাপিত হইলে, ভারতবর্ষ অপেক্ষা অপর কেহ বেশী খুসী হইবে না। ডক্টর স্যান ফো আভাস দিয়াছেন। ইনি চীনের ভূতপূর্ব্ব প্রসিদ্ধ নায়ক ডক্টর সান ইয়েট সেনের সুযোগ্য পুত্র।

কেন্দ্রীয় নির্ব্বাচনের ফলাফল

কেন্দ্রীয় আইন-পরিষদের নির্ব্বাচন শেষ হইয়াছে। বিভিন্ন পার্টির সংখ্যাগত শক্তির দিক দিয়া ইহার ফল হইয়াছে এইরূপ: কংগ্রেস ৫৮; মুসলীম লীগ ৩০; স্বতন্ত্র দল ৬; ইয়োরোপীয় ৮; সর্ব্বসাকুল্যে ১০২টি আসন। পরিষদের মোট ১৪১টি আসনের মধ্যে মাত্র এই কয়টিই গণনির্ব্বাচনের মর্য্যাদা পায়। অবশিষ্ট ৩৯টি আসন নির্দ্ধারিত আছে ভারতগভর্ণমেণ্টের মনোনীত সদস্যদের জন্য। তন্মধ্যে আবার ২৬ জনই থাকেন খাস সরকারী কর্ম্মচারী অর্থাৎ গভর্ণমেণ্টের প্রত্যক্ষ তাঁবেদার লোক; বাকী ১৩জন প্রত্যক্ষভাবে সরকারের প্রসাদপুষ্ট নন বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহারাও গভর্ণমেণ্টের প্রভাবাচ্ছন্ন। অর্থাৎ বাহ্য পরিচয়ে তাঁহাদের পার্থক্য যাহাই থাক্, মূল উপাদানটা তাঁহাদের অভিন্ন।

সাধারণ রাজনৈতিক বুদ্ধি দিয়া এই বিধানের ফলাফল বিচার করিলে মনে হইবে যে, যে হেতু কংগ্রেস দলগত শক্তির দিক দিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেই হেতু কংগ্রেসই কেন্দ্রীয় আইন-পরিষদের নেতৃত্ব করিবেন এবং মন্ত্রিত্ব গঠনের ক্ষমতা থাকিলে সে ক্ষমতাও

তাহাদের হস্তেই ন্যস্ত হইত। অন্ততঃ ভারতের বাহিরে গণতান্ত্রিক অধিবাসীরা সেই কথাই মনে করিত। কিন্তু ভারতের বেলায় পৃথিবীর কোন দেশের নিয়ম খাটে না। এখানকার শাসন-ব্যবস্থার নীতি-তত্ত্ব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সেই কারণে এখানকার গণতান্ত্রিক নির্ব্বাচনে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ দল লইয়াও সংখ্যালঘিষ্ঠ দলে পরিণত হইবে। পরিষদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন স্বয়ং গভর্ণমেণ্ট।

কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অন্য সকল দলগুলি কংগ্রেসের বিপক্ষতা করিবে, ফলে আইন প্রণয়নে গভর্ণমেণ্টই থাকিবেন একক নায়ক। দুই এক ক্ষেত্রে হয়তো মুসলিম লীগ অথবা কতিপয় স্বতন্ত্র ও বে-সরকারী মনোনীত সদস্য কংগ্রেসের মতে মত দিতে পারেন, কিন্তু তাতেও বিশেষ কিছু লাভ হইবে না। ভাইসরয়ের সর্ব্বশক্তিমান 'ভিটো' ক্ষমতা বিরোধী পক্ষের সকল আপত্তি ধূলিসাৎ করিয়া দিবে।

এখন প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক যে, এই যদি হয় সাম্রাজ্যবাদ-প্রণীত গণতন্ত্রের নমুনা, তবে কেন কংগ্রেস এই প্রহসনে যোগ দিতে গেলেন? কংগ্রেস কি এই উপায়ে সত্যই জাতীয় জীবনের কোন মীমাংসা করিতে পারিবেন? না তা পারিবেন না স্বীকার করি। কিন্তু কংগ্রেস তো ঠিক এই উদ্দেশ্যেই পরিষদে প্রবেশ করেন নাই। কংগ্রেস পরিষদে যোগ দিয়াছেন মূলতঃ এই তিনটি উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া।

(১) সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী গভর্ণমেণ্ট যখনই গণতন্ত্রের নামে কোন গণস্বার্থবিরোধী কাজে উদ্যত হইবেন, তখনই কংগ্রেসে গভর্ণমেণ্টের আসল উদ্দেশ্য উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেশবাসীকে সচেতন করিয়া দিবেন এবং প্রতিপদে প্রমাণ করিবেন যে ভারতের শাসন-ব্যবস্থার ভার পরিপূর্ণভাবে ভারতীয় জনগণের হস্তে ন্যস্ত না হইলে ভারতের গণস্বার্থ এইভাবেই বরাবর বিপন্ন হইবে।

(২) উপরোক্ত উপায়ে কংগ্রেস ভারতীয় জনগণকে তাহাদের স্বার্থের প্রকৃত স্বরূপ চিনাইয়া দিবেন। এবং এইভাবে প্রমাণিত হইবে, যে একমাত্র কংগ্রেসই জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধি।

তৃতীয় উদ্দেশ্যটা আন্তর্জ্জাতিক। কংগ্রেস বর্ত্তমান ঘটনার গতিপ্রবাহ অনুসরণ করিয়া বুঝিয়াছেন যে, পৃথিবীর সকল দেশের জনগণ আজ এক অখণ্ড পরিবারভুক্ত। সাম্রাজ্যবাদের হস্তে একদেশের গণস্বার্থ এইভাবে বিপন্ন হইতে থাকিলে, অন্যান্য দেশের গণস্বার্থও খুব বেশীদিন নিরাপদ থাকিবে না। একদিন না একদিন এই সাম্রাজ্যবাদ এক তৃতীয় মহাসমরের রূপ নিয়া সমগ্র পৃথিবীর জনগণকে পীড়িত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে। পৃথিবীর জনগণকে স্বীয় স্বার্থেরই খাতিরে ভারতীয় জনগণের বিষয় জানিতে হইবে এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থাও করিতে হইবে। আবার ভারতীয় জনগণেরও স্বীয় স্বার্থের খাতিরে এই বিষয় পৃথিবীবাসীকে জানানো কর্ত্তব্য। ভারতীয় জনগণের তরফে এই জানানোর ভারটা গ্রহণ করিবেন কংগ্রেস, আবশ্যকমত সাম্রাজ্যবাদের সহিত বিপক্ষতা করিয়াও।

মোটামুটি এই ত্রিবিধ উদ্দেশ্য সামনে রাখিয়াই কংগ্রেস আইন পরিষদে যোগদান করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্য সাধিত হইলে বাহিরের বৃহত্তর সংগ্রাম ক্ষেত্রের সহিত পরিষদের ভিতরকার সংগ্রামের এক যোগসূত্র (হারমনি) প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহা ছাড়া অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের ন্যায় পরিষদগৃহে বসিয়াই ইংরাজদের হস্ত হইতে ভারতবাসীর জন্য স্বাধীনতা ছিনাইয়া লওয়ার মত বাক-সর্ব্বস্ব উদ্দেশ্য কংগ্রেসের নাই। দেশবন্ধুর সময় হইতেই তাহা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইতেছে।

পার্লামেণ্টারি দৌত্য

কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে বৃটেনের শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ভারতের বর্ত্তমান সমস্যার সহিত প্রত্যক্ষভাবে পরিচয় লাভের জন্য একটি সর্ব্বদলীয় প্রতিনিধিমণ্ডলী প্রেরণ করা হইবে। ঘোষণাটি বেশ সাড়ম্বরেই করা হইয়াছিল, এবং এই দৌত্যের উদ্দেশ্য নিয়া বিলাতের রাজনৈতিক মহলেও রীতিমত একটু চাঞ্চল্যকর আলোচনা হইয়াছিল। সেই বহুআলোচিত প্রতিনিধিমণ্ডলী আসিয়া গত ৫ই জানুয়ারী ভারতে পৌঁছিয়াছেন। প্রকাশ, ছয় সপ্তাহকাল তাহারা ভারতবাসীর নানাবিধ সমস্যা বুঝিবার জন্য এইদেশ সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইবেন, তাহার পরে বিলাতে পৌঁছিয়া তাহারা ভারতের ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস প্রাপ্তি বা স্বাধীনতা লাভ ত্বরান্বিত করিবেন।

ভারতে বিলাতী প্রতিনিধি এইবার প্রথম আসিলেন না। ইতিপূর্ব্বে বিলাত হইতে সরকারী বহু প্রতিনিধি আসিয়াছেন এবং গিয়াছেন এবং তাহার ফলে কি হইয়াছে তাহাও আমরা জানিতে পারিয়াছি। সেদিন স্বয়ং লর্ড ওয়াভেলও দুই দুইবার ভারতের তথ্য সঙ্গে নিয়া বিলাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এত করিয়াও বিলাতী শাসনচক্র নাকি ভারতের নাড়িনক্ষত্রের সন্ধান পাইলেন না। তাই এবারে 'নিঃশব্দ বিপ্লবে নির্ব্বাচিত' শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট আরেক দফা চেষ্টা করিয়া দেখিতেছেন।

তা চেষ্টা তাঁহারা যত খুসী করুন, ভারতবাসী তার জন্য মাথা ঘামাইবে না। কিন্তু মাথা তাহারা ঘামাইবে এই চেষ্টায় খরচটার জন্য। কারণ বিলাতের এই ধরণের চেষ্টার জন্য যে খরচটা হয় সেই খরচটার বড় অংশটাই বহন করিতে হয় ভারত-সরকারকে অর্থাৎ ভারতীয় করদাতাগণকে। এইবারেও তার ব্যতিক্রম ঘটিতেছে না। এবারেও বিলাত হইতে আসিবার প্যাসেজটা বাদে অবশিষ্ট সমুদয় খরচ,—এখানে থাকার খরচ, এখানে ওখানে যাইবার খরচ, মায় প্রতিনিধিদের বিলাতে ফিরাইয়া দিবার খরচটা পর্য্যন্ত—ভারতকেই বহন করিতে হইবে। এই খরচটার জন্যই ভারতবাসীর মাথাব্যথা। এই মাথাব্যথা লইয়াই ভারতবাসী পণ্ডিত জওহরলালজীর মন্তব্যের সহিত সুর মিলাইয়া কহিবে—১৫০ বৎসর কাল ধরিয়া ইংরাজ ভারতের স্কন্ধে ভর করিয়া রহিয়াছেন। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যেও তিনি ভারতের সমস্যা জানিবার সুযোগ পাইলেন না। তাহা যদি না পাইয়া থাকেন তবে আর ছয়সপ্তাহের মধ্যে কী বেশী জানিবেন? তদন্তের সময় অনেক দিন আগেই ফুরাইয়াছে। এখন পুরাপুরি নিষ্পত্তির পালা। তাহা যদি পারো তো স্বাগত, নতুবা আর কি বলিব?

সম্প্রতি এই সভ্যগণ দিল্লী থাকিয়া অনেক বিশিষ্টলোকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তাহারা নাকি অনেক গ্রামেও গিয়াছেন ও চাষীমজুরের সঙ্গেও কথা বলিয়াছেন। মিঃ জিন্না, মিঃ আসফালি ও পণ্ডিত জওহরলালের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করিয়াছেন। পাকিস্তান সম্বন্ধে নাকি সুস্পষ্ট ধারণা হইয়াছে। একজন বলিয়াছেন পাকিস্তান যদি দেশরক্ষার হিসাবেই বিবেচনা করা যায়, তবে ইহা সমর্থন করা যায় না। মিঃ সোরেন সেন নাকি বলিয়াছেন, "পণ্ডিতজীর মধ্যে নাকি এখনও মানসিক শক্তি ও জীবনীশক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। অত্যধিক ক্লান্ত থাকিয়াও তিনি তাঁহার মতামত খুব স্পষ্টভাবে বুঝাইতে পারেন।" মিসেস মুরিয়াল নিকল মন্তব্য করেন—কোন প্রকার বিদ্বেষ বা তিক্ততার সৃষ্টি না করিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিয়া, সরল অথচ দৃঢ়ভাবে পণ্ডিতজী ভারতের স্বাধীনতার জন্ম কংগ্রেসের কার্য্য-পদ্ধতি বর্ণনা করিয়া বলেন: "আমার আশা ব্যর্থ হয় নাই। সত্যই আমি একজন মহান ব্যক্তির সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি"। ইহার পর ইহারা কিরূপ মতামত প্রকাশ করিবেন তাহাই দেখিবার প্রতীক্ষায় আমরা রহিলাম।

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন

গত ২৫শে ডিসেম্বর মীরাট কলেজের সুপ্রশস্ত সেণ্ট্রাল হলে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের ত্রয়োবিংশতিতম অধিবেশন আরম্ভ হয়। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী মহাশয় মূল সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন ও বিভিন্ন শাখার সভাপতিত্ব করেন শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সাহিত্য), শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত (বৃহত্তর বঙ্গ), শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (শিল্প ও বাণিজ্য), রায় নিশিকান্ত সেন বাহাদুর (ধর্ম্ম দর্শন), শ্রীমতী প্রভা সেনগুপ্তা (মহিলা শাখা)। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন স্যার সীতারাম।

এবার হইতে এই সম্মেলন "ভারতীয় বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন" নাম পরিগ্রহ করিয়াছে। পূর্ব্বে ছিলেন তাঁহারা প্রবাসী, এবার হইলেন বাঙ্গলা ভাষার দিক দিয়া সমগ্র ভারতের প্রতীক! এবার এই সম্মেলনকে বাঙ্গালা দেশ আর প্রবাসী মনে করিতে পারিবে না, আপনার জন ভাবিয়া সমভাবে ইহার ভালমন্দ নির্ভীকভাবে বিচার করিবে।

সাহিত্যে জাতির উদ্দেশ্য আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট হয়। তাই—প্রবাসী বাঙ্গালীদিগকে মনে রাখিতে হইবে, তাঁহারা বাঙ্গালা দেশের প্রতিনিধি। তাঁহারা কেবল বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্যই প্রবাসে প্রতিপালন করিবেন না, পরন্তু তাঁহাদের কার্য্যে, বাক্যে এবং আদর্শেও কোনরূপ ক্ষুদ্রতা যেন প্রকাশ পাইয়া বাঙ্গালীর মস্তক অবনত না করে, সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে সচকিত হইতে হইবে। এই এক দিক্—আর দ্বিতীয়তঃ তাহাদের মনে রাখিতে হইবে, তাঁহারা প্রবাস হইতে কেবল সংগ্রহ করিতেই যান নাই, সেখানকার প্রতিবেশীদিগকেও যথেষ্ট আপনার মত করিয়া দেখিতে পারিয়াছেন। এই দুইটী উদ্দেশ্য প্রবল না হইলে প্রবাস বাস নিরর্থক হইবে প্রবাসের দিক্ দিয়াও, বাঙ্গালীর দিকদিয়াও। যে গুণে গুরুপ্রসাদ, পূর্ণেন্দুনারায়ণ, সংসারচন্দ্র, অতুলপ্রসাদ, প্রমদাচরণ, গঙ্গাধর প্রবাসে থাকিয়াও উহার অশেষ উন্নতি সাধনে ব্রতী হইয়া স্বদেশের কথা বিন্দুমাত্র বিস্মৃত হন নাই, প্রবাসী বাঙ্গালীরা সেগুণে বিভূষিত হইলে আগামী বৎসরে রজত সম্মেলনে তাঁহারা যথার্থই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন।

ক্ষিতিমোহন সত্যই বলিয়াছেন—

"বাঙ্গলা দেশ ও অবাঙ্গালীর মধ্যে প্রেমের যোগ স্থাপন করতে হবে।"

আমরা কিন্তু বড়ই দুঃখিত হইলাম যে, এই সাহিত্য সম্মেলনে জাতীয়তার বিশেষ কোনরূপ উদ্দীপনা পাইলাম না। রাজনৈতিক নেতা অপেক্ষা সাহিত্যের দায়িত্বও দেশ এবং জাতির প্রতি যে কম নয় এবং জাতীয় সাহিত্য ব্যতীত অন্য কোন সাহিত্যই যে চিরস্থায়ী হইবে না, একথা যেন আমরা কখনও বিস্মৃত না হই। জাতীয়তার ঋষি বলিয়াই সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের আসন চিরকাল অক্ষুন্ন থাকিবে। এমন দিন ছিল যখন লোকে স্বাদেশিকতা জাতীয়তা বোধ, স্বজাতিপ্রেম প্রভৃতি কথায় বড় কর্ণপাত করিতনা, কিন্তু আজ স্রোত ফিরিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে যদি সাহিত্যের সুপবনের সহায়তা হইতে আমরা বঞ্চিত হই, তবে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে অনেকটা বিলম্ব হইবে। ভরসা করি সাহিত্যিকগণ একথা বিস্মৃত হইবেন না, তাঁহারা দেশের প্রাণের সন্ধান লইবেন।

সম্মেলনের আরও একটি প্রধানতম আকর্ষণীয় বিষয় হইতেছে—সংবাদ-পত্র প্রদর্শনী। গত বৎসর হইতে এই ব্যবস্থা প্রচলন করিয়া সম্মেলন সংবাদ ও সাহিত্য প্রচারের যে অপূর্ব্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন—তাহা অভূতপূর্ব্ব এবং প্রশংসার্হ। স্যার উষানাথ সেন সংবাদপত্র-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিয়া বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন: "আপনারা যে ধরণের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়াছেন, এই ধরণের প্রদর্শনী এই সর্ব্বপ্রথম হইল। ইহাদ্বারা বুঝা যায় যে, জাতীয় জীবনে সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা কম নহে। কোনো আন্দোলনই সংবাদপত্রের সাহায্য ব্যতীত অগ্রসর হইতে পারে না। সংবাদপত্র প্রকাশের ব্যাপারে বাংলাই সর্ব্বপ্রথম অগ্রসর হইয়াছিল। আইনের দাসত্ব হইতে মুক্তির জন্ম বঙ্গ সাংবাদিক সারা জীবন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।"

বঙ্গ সাংবাদিকগণ আইনের দাসত্ব হইতে মুক্তির জন্ম সারা জীবন চেষ্টা করিয়াছেন, এ-কথা যে খুবই সত্য তাহার প্রমাণ দ্বারকানাথ, শিশিরকুমার, মতিলাল, শ্যামসুন্দর, ভূপেন্দ্র নাথ, ব্রহ্মবান্ধব, মনোরঞ্জন এবং বসুমতী, আনন্দবাজার, যুগান্তর, ভারত প্রভৃতির সম্পাদকবর্গ। যে সমস্ত বাঙ্গালী ইংরাজী সংবাদ-পত্র পরিচালনা করিয়া অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়াও নিজ আদর্শভ্রষ্ট হন নাই, তাহারও ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে। আর সাপ্তাহিক, দৈনিক ও মাসিক পত্রে যে প্রকৃতভাবে জাতি গঠিত হয় তাহারও জলন্ত নিদর্শন বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, ভারতী, নবজীবন, প্রচার প্রভৃতি কাগজ। এইরূপ সংবাদ ও সাহিত্য-পত্র প্রদর্শনীর মূল্য দেশ ও জাতি গঠনের দিক হইতে যথেষ্ট বেশী, এ বিষয়ে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন। আমরা শতমুখে ইহার প্রশংসা করি।

শ্রীমতী প্রভা সেনগুপ্তা নারী-জীবনের কর্ত্তব্য সম্পর্কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন: "সমাজ ও পরিবারকে দূরে রাখিয়া চলা নারীর আদর্শ নহে। নারী পুরুষের সহ রী হইবে। সে মাতারূপে,

ভগ্নীরূপে, স্ত্রীরূপে বা কন্যারূপে জীবনকে সুন্দর করিবে।" নারী-প্রগতির গড্ডালিকা প্রবাহে যাহারা ভাসিয়া গিয়াছেন, শ্রীমতী সেনগুপ্তার অভিভাষণ তাঁহাদিগকে প্রকৃত সত্যের পথের নির্দ্দেশ দিবে বলিয়াই আমরা মনে করি। আমরা শ্রীমতী সেনগুপ্তার অভিভাষণে প্রকৃতই আনন্দিত হইয়াছি।

সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোগী ও প্রতিষ্ঠাতা কাণপুরের প্রবীণ ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন, দীর্ঘকাল কঠিন রোগে শয্যাশায়ী থাকায় সম্মেলনে বাণী প্রেরণ করিয়া বলেন: "সকল প্রিয়ভাই ও ভগিনীকে আমার নমস্কার জানাই। আরব্ধ কার্য্যের পূর্ণতা দেখিবার সৌভাগ্য আমার নাই। তত্রাপি এই বিশ্ব-জাগরণের দিনে জাতীয় সমস্যার কার্য্যভার অবিচলিত চিত্তে পরিশুদ্ধভাবে গ্রহণ করিও। বিশ্বের দরবারে উপযুক্ত স্থান সংগ্রহ করিতে পশ্চাদপদ্ হইবে না। সহকর্ম্মী ও বন্ধুগণের নিকট ইহাই আমার শেষ নিবেদন। ইহার সাফল্যেই আমার আত্মা পরিতৃপ্ত হইবে।" —দুঃখের বিষয়, আজ আর তিনি ইহজগতে নাই। গত ৩১শে ডিসেম্বর তিনি পরলোক গমন করেন। স্মরণার্থে জানা আবশ্যক যে, ১৯২২ সালে তিনি এই সম্মেলনের প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রসঙ্গে আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ ও শান্তি কামনা করি।

বিভিন্ন প্রদেশে বাঙ্গালী ছেলেমেয়েরা যাহাতে বাংলাভাষা লইয়া পড়াশুনা করিবার সুবিধা পাইতে পারে, এই সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনগুলি সংশোধনের জন্য সম্মেলন অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছে। এই প্রস্তাবটি আমরা বিশেষ অনুমোদন করি। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ইহাও অনুরোধ, প্রবাসে বাঙ্গালী গৃহস্থ এবং ছেলেমেয়েরা কথাবার্ত্তা, আচার ব্যবহারে বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলার আচার প্রণালী যত বেশী ব্যবহার করিতে পারিবে এবং বাঙ্গলা দেশের সহিত যোগসূত্র রাখিয়া সেখানেও একতাবদ্ধ হইবে, ততই বঙ্গভাষা সংস্কৃতি ও বাঙ্গালীর ঐক্য প্রসার লাভ করিবে। প্রবাসী বাঙ্গালী বাঙ্গালার প্রতীক হইয়া বাঙ্গলাদেশের সহিত একযোগে বৃহত্তর বাঙ্গলা গঠন করিয়া বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্য বৃদ্ধি করুক, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

আগামী বৎসর স্বদেশ উন্নতিকামী অতুলপ্রসাদের লক্ষ্ণৌতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হইবে। আমরা এখন হইতেই ইহার সাফল্য কামনা করি।

নারীজাতির অধিকার

"না জাগিলে ভারত ললনা
এ ভারত কভু জাগে না, জাগে না।"

বঙ্গকবির এই বাণী অতিশয় পুরাতন। এত পুরাতন যে, ইহা আজি শুধু প্রবাদবাক্য মাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। তথাপি আজ পর্য্যন্ত ভারতীয় নারীজাতির জাগরণের কোন উল্লেখযোগ্য সূচনা পরিলক্ষিত হইল না। অবশ্য নগর কেন্দ্রে নাগরিক শিক্ষার প্রসাদে কিছু কিছু স্ত্রীশিক্ষার প্রসার হইয়াছে বটে, এবং সেই শিক্ষার কোন কোন মহিলা প্রাতঃস্মরণীয় খ্যাতিও লাভ করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গকবির বাণীতে নারীজাগরণের যে-অর্থ নিহিত, সে অর্থ আজও কবি-কল্পনার সামগ্রীই হইয়া আছে।

সম্প্রতি সিন্ধু প্রদেশ হইতে আমরা নারীজাগরণের কিছুটা উজ্জ্বলতর আলোক পাইয়াছি। এই আলোক-সম্পাত করিয়াছেন নিখিল ভারত নারীসম্মেলনের অষ্টাদশ অধিবেশনের সভানেত্রীরূপে শ্রীযুক্তা হংস মেটা। তাঁহার অভিভাষণে তিনি বলিয়াছেন— "ভারতের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনাকে ভারতের জাতীয় জীবনের সম্পূর্ণ পুনর্গঠনের কাজে লাগাইতে হইবে এবং এই পরিকল্পনায় রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতি প্রভৃতি জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে মহিলাদের স্থান সুনির্দ্ধারিত করিতে হইবে। সেই স্থান হইবে পুরুষের সমান। নারী জাতির মধ্যে শিক্ষার প্রসার করিতে হইবে। ভোটদান ব্যাপারেও ভারতের নারী পুরুষের সমানাধিকার দাবী করে এবং উপযুক্ত হইলে দেশের শাসনব্যাপারে দায়িত্ব গ্রহণের সুযোগ তাহাকেও দিতে হইবে। অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে সরকারী চাকরী এবং ব্যবসা ও বাণিজ্যতে পুরুষের সহিত নারীর সমকক্ষতা অগ্রাহ্য করা চলিবে না। উত্তরাধিকার নির্ণয়েও নারীর সমমর্য্যাদা স্বীকার্য্য। এই সকল দাবী এবং অধিকারের সহিত আবার নারীজাতির স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রশ্নটিও অবিচ্ছেদ্য। ভারতে প্রসূতি ও শিশু-মৃত্যু নিবারণকল্পে প্রচুর সংখ্যায় স্বাস্থ্য-প্রতিষ্ঠান গঠন করা আবশ্যক। প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতির কঠোরতা অনেক ক্ষেত্রেই নারীর মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করে। সেই কারণে বিবাহিত জীবনে স্বামী ও স্ত্রীর সমানাধিকার থাকা বাঞ্ছনীয়। বাল্য-বিবাহ প্রথা এখনও ভারতীয় সমাজকে পঙ্গু করিতেছে। এই প্রথাও কঠোর হস্তে রহিত করিতে হইবে।"

সবচেয়ে মূল্যবান কথাটি শ্রীযুক্তা মেটা বলিয়াছেন অভিভাষণের উপসংহারে। তিনি বলেন—'স্ত্রীজাতির এবং তাহাদের মারফতে দেশের বন্ধন মোচনই যে মহিলাদের লক্ষ্য, তাহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। জাতি, ধর্ম্ম, শ্রেণী ও বর্ণ নির্ব্বিশেষে একযোগে সেই লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য সকলেরই চেষ্টা করা উচিত।'

নারী সম্মেলনের মত প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, ভারতের নারীও আজ জাগতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে গভীর ভাবে চিন্তা করিতে সুরু করিয়াছেন। এটা খুবই আশার কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু একটি বিষয় তবু আমাদের বলিবার রহিয়া যায়। নারী-সম্মেলন জীবনের সকল ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকার দাবী করিয়াছেন। কিন্তু ভবিষ্যতের নূতন সমাজের সেটাই কি সবচেয়ে শেষ কথা? উনবিংশ শতকের শেষপাদ হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত ইয়োরোপ এবং আমেরিকার নারীরা ব্যবহারিব জীবনের সর্ব্বত্র এই সমানাধিকার পাইয়া আসিতেছেন, কিন্তু তবু কি সেখানকার নারী-সমস্যার কোন সুষ্ঠু সমাধান হইয়াছে? আমরা জানি, তাহা হয় নাই; সমস্যা বরং অধিকতর জটিল হইয়াছে, অনেকক্ষেত্রে মোটা সমাজ-দেহটাই বিকলাঙ্গ হইয়াছে। অথচ সমাজ-দেহকে অন্তঃপুর এবং বহির্দ্বার এই দুই অংশে পৃথক করিয়া যদি নারী ও পুরুষকে সমপরিমাণ সামাজিক দায়িত্ব অর্পণ করা হইত এবং সমাজের সামগ্রিক ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষের সমমূল্যতা স্বীকার করা যাইত, তবে হয় তো বা সত্যকার সুস্থ সমাজ গঠন অসম্ভব হইত না। একথা কুসংস্কারের নয়, ইয়োরোপীয় সমাজ নীতিবিদেরা স্বয়ং এই কথাই বলিতেছেন আজ। একটা কথা

আরও খুলিয়া বলা দরকার। অন্তঃপুরের দায়িত্বের সম্বন্ধ শুধু—রান্নাঘর বা ভাঁড়ার ঘরের দায়িত্বের সঙ্গে নয়। আরও বৃহত্তর দায়িত্বের সঙ্গে। ব্যক্তির পারিবারিক পরিবেশের সবটুকু স্থানই এই অন্তঃপুর—ভবিষ্যতের সামাজিক জীবন ও সমাজ গঠনের ভাণ্ডার (ল্যাবরেটারী)। এবং কেবল ব্যক্তিগত পরিবারেই এই অন্তঃপুর সীমাবদ্ধ নয়, সমাজের সমষ্টির মধ্যেও ইহার পরিধি পরিব্যাপ্ত। এই বিরাট ল্যাবরেটারীরই ভার নিতে হইবে নারীকে। পূর্ণাঙ্গ সমাজ গঠনের কাজে ইহার দায়িত্ব ও মর্য্যাদা জীবিকা-সন্ধানরত পুরুষের দায়িত্ব ও মর্য্যাদা হইতে কোন অংশেই অল্প নয়। পৃথিবীর সবচেয়ে প্রগতিশীল দেশ রাশিয়াতে আজ অনেকটা এই ভাবেই নারীর মর্য্যাদা স্বীকৃত হইয়াছে। আর আমাদের দেশের কবি এই অর্থেই নারীজাগরণের কথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন। এই অর্থ বুঝিলে প্রগতিশীলা নারীগণকে আর সমান উত্তরাধিকারিত্বের দাবী করিয়া আন্দোলন উপস্থিত করিতে হইবে না। অনেক বড় সম্পদ লাভে তাঁহারা সমর্থ হইবেন—দেশের বন্ধনমোচন রূপ লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারিবেন।

বাংলার তৈল-সমস্যা

সম্প্রতি বাংলার তৈল-সমস্যা লইয়া সংবাদপত্রে এবং জনসাধারণের মধ্যে আলোচনা গভীর হইয়া উঠিয়াছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য নাকি যুক্ত প্রদেশের গভর্ণমেণ্ট এবং বাংলার গভর্ণমেণ্টের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিতেছে। যুক্ত প্রদেশের গভর্ণমেণ্ট প্রসঙ্গতঃ এইরূপ জানাইয়াছেন বলিয়া সংবাদে প্রকাশ যে, বাংলার কলওয়ালা বহুল সংখ্যায় যাইয়া যুক্ত প্রদেশের সরিষার বাজারে অবাধে কারবার করে, ইহা যুক্তপ্রদেশের গভর্ণমেণ্টের মনঃপুত নহে। কলওয়ালারা যদি সম্মিলিতভাবে কাজ করে, তবে তাহাদিগকে যুক্তপ্রদেশের গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধভাবে কারবার করিতে দেওয়া যাইতে পারে। আরও জানা গিয়াছে যে, বাংলার খাদ্যনিয়ামক কলিকাতা ও হাওড়ায় কল হইতে বিক্রেতব্য তৈলের একটা দর বাঁধিয়া দেওয়ার কথাও আলোচনা করিয়াছেন।

কিন্তু দর বাঁধিয়া দেওয়া তো অত্যন্তই সহজতম পদ্ধতি, যাহা লইয়া দর বাঁধা হইবে—তাহার গলদ মিটাইবে কে? সম্প্রতি র‍্যাশন-কার্ডে বরাদ্দমত যে আধ সের করিয়া সরিষার তৈল দেওয়া হয়, তাহা শুধু ভেজাল নয়, অখাদ্য এবং দূষিত। উৎকট গন্ধে পেটের নাড়ী দুমড়াইয়া আনে। ইহা আশু পরিবর্ত্তন না করিলে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে অচিরেই যে বেরিবেরি, উদরাময় প্রভৃতি কঠিন পীড়া দেখা দিবে, তাহা নিশ্চিত। গভর্ণমেণ্ট হয়ত ওজর তুলিবেন যে, যথোপযুক্তভাবে উক্ত তৈল পরীক্ষা করিয়া তবে বাজারে পাঠান হয়, কিন্তু সে কথার কোনো যৌক্তিকতা নাই। জনসাধারণকে আশু রোগের হাত হইতে অবিলম্বে রক্ষা করিতে আমরা গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। শুধু দর বাঁধিয়াই সরকারী কার্য্যনীতির কিছু একটা ফলপ্রসূতা দেখা দিবে না।

অক্ষয়-জন্ম-শতবার্ষিকী

বিগত ২৫শে ও ২৬শে ডিসেম্বর যথাক্রমে শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ ও শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের পৌরোহিত্যে চুঁচুড়া মহসীন কলেজে সাহিত্য ও সাংবাদিকাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের জন্ম-শত-বার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অক্ষয়চন্দ্রের নাম আজ বিস্মৃতপ্রায়। বঙ্কিম যুগে সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াও সাহিত্যে ও সাংবাদিকতায় অক্ষয়চন্দ্র যে অতুল প্রতিভা ও স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন—তাহার তুলনা হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে' নিয়মিত প্রবন্ধ লিখিতে লিখিতে ১২৮০ সালে বঙ্গদর্শন মুদ্রণালয় হইতেই অক্ষয়চন্দ্র প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সাধারণী' প্রকাশ করেন। জনকল্যাণের দাবীতেই 'সাধারণী' দিনে দিনে জনসাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করে। অতঃপর ১২৯১ সালে তিনি মাসিক পত্রিকা 'নবজীবন' প্রকাশ করেন। নির্জ্জীব হিন্দুসমাজের সংস্কৃতিগত জাগরণ, বাঙ্গালীচিত্তে প্রকৃত ধর্ম্মভাবের স্ফুরণ ও জাতিকে এক নবজীবনে উদ্বুদ্ধ করিবার প্রয়াসই 'নবজীবন'-এর মূল সাধনা ও উদ্দেশ্য ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রও অক্ষয়চন্দ্রের 'নবজীবনের' সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার 'ধর্ম্মতত্ত্ব' ও 'অনুশীলন' এই নবজীবনেই প্রকাশিত হয়। জাতীয় কংগ্রেসের কথাও নবজীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। এই আদর্শের দিক হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়—

কতবড় জাতীয়তাবাদী সাধকপুরুষ ছিলেন অক্ষয়চন্দ্র। সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জনকল্যাণই ছিল তাঁহার ধ্যান, জ্ঞান ও জীবনের প্রধানতম উপাস্য কার্য্য। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, শ্রীযুক্ত নলিনী কুমার ভদ্র (প্রবাসী), শ্রীযুক্ত গোপাল ভৌমিক (কৃষক), শ্রীযুক্ত রণজিৎ কুমার সেন (বঙ্গশ্রী), শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও পণ্ডিতবৃন্দ সভায় উপস্থিত থাকিয়া লোকোত্তর পুরুষ অক্ষয়চন্দ্রের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সুবোধ রায় এই সাধু উদ্যোগ-প্রয়াসের জন্য দেশের পক্ষ হইতে ধন্যবাদার্হ। যাহাতে অক্ষয়চন্দ্রের সম্পূর্ণ রচনা উদ্ধার করিয়া একখানি ভাল গ্রন্থ প্রকাশ করা যায়, সেইদিকে কার্য্যকরী দৃষ্টি দিলে এই অনুষ্ঠানের কর্ম্মিবৃন্দ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য তথা দেশ ও জাতির মহোপকার সাধন করিবেন। এইদিকে আমরা তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্বর্দ্ধনা

গত ১৯শে পৌষ কলিকাতা মহাবোধি সোসাইটি হলে মিত্র-ঘোষ প্রকাশনীর পক্ষে কবিশেখর শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় মহাশয়ের উদ্যোগে ও কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের সভাপতিত্বে বাংলার বরেণ্য সুধাকর কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এক সম্বর্দ্ধনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার পক্ষ হইতে কবি মোহিতলাল মজুমদার মানপত্র পাঠ করেন।

কবি করুণানিধান রবীন্দ্র-শিষ্যদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। কোনোদিন তিনি যশঃপ্রার্থী হইয়া কাহারও দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি নামান নাই। নিভৃত পল্লীর বুকে থাকিয়া আত্মলীলায় যাহা কিছু লিখিয়াছেন, 'শতনরী' হার হইয়া তাহাই বঙ্গভারতীর শোভাবর্দ্ধন করিয়াছে

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেহের জড়তা তাঁহাকে আজ নিস্পৃহ করিয়া তুলিয়াছে। সুদীর্ঘ কাল তিনি রচনাকার্য্যে হাত দেন না। সাময়িক পত্রের পাঠকবৃন্দ তাই কবি করুণানিধানকে কোথাও খুঁজিয়া পাইবার অবকাশ পান না। কিন্তু বাঙ্গালীর মনে যে উঁচু আসনে কবি বসিয়া আছেন—সে-আসন কখনও বিস্মৃতির ঝড়ে ভাঙ্গিয়া পড়িবার নয়। আজ তাঁহার ৮৭ বৎসর বয়স পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

সভায়—শ্রীযুক্ত সরোজকুমার রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত প্যারী মোহন সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীযুক্ত মনোজ বসু, শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুরেশ বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী প্রভৃতি বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাংবাদিকগণ উপস্থিত থাকিয়া কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

অভিভাষণে প্রসঙ্গতঃ কবি করুণানিধান বলেন: "বাণীর এই দীনতম সেবকের প্রতি অযাচিত প্রীতির নিদর্শন আপনাদের এই চারু চন্দনমাল্য; এর উপযুক্ত পাত্র আমি নই। এই বরণমালার গৌরবে আমি গৌরবান্বিত। সংসারের নানা দুঃখ-কষ্টের মাঝখানে আমি বাণীসেবার অবসর পেয়েছি যৎসামান্য, তবে আপ্রাণ চেষ্টা ক'রেছি তাঁর প্রসাদ লাভের জন্য।... কবিতা লেখায় খেলায় আমি আনন্দ পেতাম সব চেয়ে বেশী। স্বপ্নময় জীবনের সেই দিনগুলি আজ স্মৃতির জগতে লুকিয়েছে। এখন জীবন-গোধূলির আলোটুকু আসচে ম্লান হ'য়ে। আজ এই সভায় দাঁড়িয়ে হারানো দিনের কত পুরাণো কথাই না মনে প'ড়ছে; কত অপরাহ্নে, কত সন্ধ্যালোকে আমাদের সে কালের সাহিত্য-আসরে আমরা মিলিত হ'তাম। কাব্যরসের ধারামুখর সেই অমূল্য মুহূর্ত্তগুলি, সেই আনন্দময় দিনগুলির সব কথা গুছিয়ে ব'লবার শক্তি আমার আর নেই।··· আপনাদের প্রীতিসুমধুর সঙ্গসুখে বঞ্চিত হ'য়ে এখন আমি প'ড়ে আছি দূরে। তবে মনের মিলন যে আজো ঘোচে নি, এইটুকু সকলের চেয়ে বড় কথা। এখন কালো প্রজাপতি এসে বসেছে আমার সাদা গোলাপের পাপড়িতে। মনও নিথর হ'য়ে আসছে। আর কি বলবো! এই তো মানুষের জীবন, ফুল ফোটে, ফুল ঝরে। 'সময় হ'য়েছে নিকট এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে,' তাই বলি—

লও গো সবে আমার নমস্কার,
হৃদয় ভরা প্রীতির ফুলহার।
লিখিব এই ছত্রগুলির মাঝে,
অলিখিত ভাবের বীণা বাজে।
মনের কথা রইল মনে বন্ধু মোর,
নয়ন-কোণেই রইল জ'মে নয়ন-লোর।

চন্দননগর অঞ্জলি সমিতির অষ্টম বার্ষিক অধিবেশন

গত ৮ই পৌষ চন্দননগর অঞ্জলি সমিতির অষ্টম বার্ষিক অধিবেশনোপলক্ষে স্থানীয় নৃত্যগোপাল স্মৃতি-মন্দিরে এক সাহিত্য-সভার অধিবেশন হয়। 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় সভায় পৌরোহিত্য করেন এবং বঙ্গভাষা ও সংস্কৃতি সম্মেলনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার মিত্র মহাশয় সভার উদ্বোধন করেন। 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীতের দ্বারা সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। অঞ্জলি সমিতির সম্পাদক সভায় অষ্টম বর্ষের কার্য্যবিবরণী পাঠ করিবার পর আবৃত্তি প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হয় এবং সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক বিজয়িবৃন্দকে পারিতোষিক দেওয়া হয়।

প্রধান অতিথি শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার মিত্র হুগলী জেলার কীর্ত্তি-সম্বলিত একটি স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া উপস্থিত সর্ব্বসাধারণকে মুগ্ধ করেন। সভাপতি মহাশয় সাহিত্যের দ্বারা কি ভাবে জাতি গঠিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাবধি যে সমস্ত বিশিষ্ট সাহিত্যিক তাঁহাদের রচনা দ্বারা বাংলা-ভাষাকে সমৃদ্ধ ও জাতিকে গঠন করিয়া গিয়াছেন, তদ্বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। পরিশেষে সমিতির সভ্যগণ কর্ত্তৃক বাংলার দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় রচিত নাটক 'রূপায়ন' অভিনীত হয়।

সভায় প্রায় সহস্রাধিক নরনারী উপস্থিত ছিলেন।

সচ্চিদানন্দ

আবির্ভাব—৭ই কার্ত্তিক, ১২৯৬ সাল তিরোভাব—৭ই ফাল্গুন, ১৩৫১ সাল

"লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"

ত্রয়োদশ বর্ষ } ফাল্গুন—১৩৫২ { ২য় খণ্ড—৩য় সংখ্যা

রবীন্দ্রনাথের ড্রইংশিক্ষক

শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষভাগে চিত্রাঙ্কন কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন বলিয়া সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন। কিন্তু বাল্যকালে যে তাঁহার ড্রইংশিক্ষক ছিলেন তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। সম্প্রতি আমাদের পারিবারিক পুরাতন কাগজের মধ্যে রক্ষিত পারিবারিক হিসাবের ৩১ আষাঢ় ১২৮২ তারিখের রোকড়ের পৃষ্ঠা হইতে সেই তথ্যটি পাওয়া যাইতেছে। রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ জীবনীলেখকগণের অবগতির জন্য এবং ইহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে বিবেচনায় রোকড়ের উক্ত অংশটি অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। মদীয় স্নেহাস্পদ ভাগিনেয় শ্রীমান্ অমৃতময় মুখোপাধ্যায় বি, এস্-সি এই তথ্যটি প্রথমে আমার দৃষ্টিতে আনয়ন করেন বলিয়া তিনি আমার ও ভবিষ্যৎ জীবনীকারগণের ধন্যবাদের পাত্র।

উক্ত অংশের রোকড়ের নকল।

বিতারিখ—৩১ আষাঢ়—১২৮২

বুধবার—১৪জুলাই—১৮৭৫

জমা—

বাজে খাতে জমা—৩০৲

মাঃ সরকারি তহবিল

দঃ সোম রবি বাবুদিগের

ড্রইংশিক্ষক মাষ্টারের

সাবেক বেতন ৫৲ হিঃ ৩০৲ টাকা

পাওয়া গেল।

কোং—৩০৲

৩০৲

পাটচাষে বিপত্তি

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

নারায়ণগঞ্জ হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ যে পাটকলের য়ুরোপীয় কর্ম্মকর্ত্তারা আর দেশীয় বেলারদিগের নিকট হইতে পাট কিনিতেছেন না। সেই জন্য দেশীয় বেলারগণও আর ক্ষেতোয়ান এবং মহাজনদিগের নিকট হইতে পাট খরিদ করিতেছেন না। ফলে খরিদদারের অভাবে পাটের দর অত্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। সম্প্রতি সরকার অনেক হিসাব করিয়া পাটের সর্ব্বনিম্ন দর প্রতি মণ বার টাকা ধার্য্য করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ঐ দর দিয়া আর কেহ এখন পাট কিনিতে সম্মত নহেন বলিয়া পাটের দর প্রতি মণ ৮ টাকা ৯ টাকায় নামিয়া গিয়াছে। ভারতীয় বেলারগণই কৃষকদিগের নিকট হইতে পাট কিনিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহারা আর পাট না কিনিলে কৃষকেরা পাট বেচিবে কোথায়? এখন পাট-চাষীদের ঘরেই পাট অবিক্রীত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। পূর্ব্ব এবং মধ্যবঙ্গে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের তীরভূক্ত ভূমিতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাট জন্মে। ইহা বাঙ্গালার নিজস্ব সম্পদ্। এই পাটচাষী-দিগের অধিকাংশ মুসলমান। পাটকলের সংখ্যা একশত সাতটি। তন্মধ্যে শতাধিক কলের পরিচালকই য়ুরোপীয়। সুতরাং য়ুরোপীয় কলওয়ালারা যদি দলবদ্ধ হইয়া দেশীয় বেলারদিগের নিকট হইতে পাট ক্রয় না করেন, তাহা হইলে পাট আর বিকাইবে কোথায়? ভারতে প্রায় সাড়ে দশ লক্ষ এগার লক্ষ টন পাট জন্মে। তাহার অধিকাংশই জন্মে পূর্ব্ববঙ্গে এবং আসামে। এখন পাটের মূল্য যদি প্রতি মণ ২৲ টাকা হারে ও কমে তাহা হইলে প্রতি টন পাটের মূল্য কমিয়া যাইবে ৫৪৲ টাকা। ১০ লক্ষ টনের মূল্য কমিবে ৫ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। পাটকলের মালিক ও অংশীদারর৷ ঐ টাকা লাভ করিবেন, আর চাষীদের উহা ক্ষতি হইবে। অর্থাৎ এই কৌশলে প্রত্যেক বাঙ্গালীর বার্ষিক ১টি করিয়া টাকা ক্ষতি হইল। সমস্ত বাঙ্গালায় ৪ কোটি লোক কৃষির উপর নির্ভর করে। তাহাদের গড়ে আয় কমিবে প্রায় বার্ষিক ১।৵০, মণ করা ৩ টাকা দর কমিলে প্রত্যেক চাষীকে ২৲ টাকারও কিছু অধিক ক্ষতি সহ্য করিতে হইবে বা হইতেছে।

• যে দেশে প্রত্যেক কৃষকের যোতের জমি গড়ে দশ বিঘার অধিক নহে, এবং কৃষিও পশ্চাৎপদ, সে দেশে কৃষিজ পণ্যের মূল্য অকারণ হ্রাস পাওয়াতে লোকের যে ইচ্ছাপূর্ব্বক বিশেষ ক্ষতি করা হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাতে পাটচাষীদিগেরই অত্যন্ত অধিক ক্ষতি করা হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে মজুরীর হার যেরূপ অধিক, তাহাতে ৯৲ টাকা ১০৲ টাকা মণ পাট বেচিলে পাট চাষীদের খরচা পোষায় কিনা সন্দেহ। এই ক্ষতির পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। বাঙ্গালায় গড়ে প্রতি বিঘা ভূমিতে ৫ মণ করিয়া পাট জন্মে। অথচ পূর্ব্ব বঙ্গের পদ্মা, যমুনা এবং ব্রহ্মপুত্রের চর ভূমিতে কিছু অধিক পাট জন্মে। মধ্যবঙ্গে বিঘা করা ৫ মণের কিছু কমও জন্মে। এখন পাটের দর মণ করা ১২৲ টাকার স্থলে ৯৲ টাকা এইরূপ হারে কমিয়া যাওয়াতে যে দরিদ্র কৃষক ৬ বিঘা জমিতে পাট বুনিয়াছিল, ৩ শত ৬০৲ টাকার স্থলে ২ শত ৭০৲ টাকা পাইবে। অর্থাৎ সে বার্ষিক ৯০৲ টাকা হারাইবে। এ ক্ষতিজনিত দুঃখের তীব্রতা কত অধিক তাহা ভুক্তভোগী না হইলে কেহই বুঝিবে না।

য়ুরোপীয় পাটকল এজেন্টরা ইন্‌ডিয়ান জুট মিলস্ এসোসিয়েশন দ্বারা চক্রবদ্ধ। তাঁহারা সম্মিলিত ভাবে কাজ করিতে পারেন। কিন্তু অশিক্ষিত, অজ্ঞ, দরিদ্র চাষীরা পরস্পর সংযোগবিহীন বলিয়া আত্মরক্ষায় সম্পূর্ণ অশক্ত। কাজেই তাহারা অসহায় অবস্থায় পড়িয়া মার খাইতেছে। ভারত সরকার অবশ্য ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল জুট কমিটী নামক পাটকারবারকারী সকল পক্ষের স্বার্থ সমভাবে দেখিবার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান রচনা করিয়াছেন। কিন্তু ঐ প্রতিষ্ঠান যে কৃষকদিগের এবং ভারতীয় বেলারদিগের স্বার্থ এবং কলওয়ালা-দিগের স্বার্থ সমভাবে দেখেন বা দেখিতে পারেন, তাহা মনে হয় না। অন্ততঃ কার্য্যক্ষেত্রে আমরা তাঁহাদের সমদর্শিতার সম্যকরূপ পরিচয় পাই না। ফলে য়ুরোপীয় এজেন্টরা ভারতীয় কৃষকদিগের স্বার্থ হানি করিয়া কলওয়ালাদের স্বার্থ সাধন করিবার সুবিধা পাইতেছেন। এবার ভারতে দশ লক্ষ টন পাট জন্মিয়াছে যদি ধরা যায় এবং প্রতি মণ যদি গড়ে ৩৲ টাকা হিসাবে দাম কমান হয়, তাহা হইলে সমস্ত পাটের মূল্য বাবদ ৮ কোটি সাড়ে ১৭ লক্ষ টাকা ভারতের পাটচাষীদের ক্ষতি হইতে বসিয়াছে। ইহা অসহ্য।

এদেশের পাটকলগুলির প্রায় সমস্ত গুলিই য়ুরোপীয় পরিচালক দ্বারা পরিচালিত। বিরলা, হুকুমচাঁদ জুটমিলস্ প্রভৃতি কয়েকটি পাটকল কেবল মাত্র দেশীয় এজেন্সির দ্বারা পরিচালিত হয়। একশত সাতটি পাটকলের মধ্যে যেখানে শতাধিক কল বিদেশীয় দ্বারা পরিচালিত, সেখানে বিদেশী প্রভাব যে অতি প্রবল হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্ এসোসিয়েসনই পাট কলগুলির পরিচালনার ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করেন। এই সমিতির ৯ জন সদস্য সম্পাদিত একটি কমিটী আছে। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ হইতে এই পাটকল কমিটীর সদস্যগণ ভারতীয় পাট শিল্পের উপর রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন। এই সমিতিতে কোন ভারতবাসী আছেন বলিয়া আমার জানা নাই। সুতরাং পাটখরিদের এই সঙ্কীর্ণতা সাধনের জন্য দায়ী প্রধানতঃ ভারতীয় পাটকল সমিতির কমিটী বা কার্য্য পরিচালন পরিষদ।

ভারতের কলজাত পাটশিল্পের বয়স এখনও শতবর্ষপূর্ণ হয় নাই। ইহার মধ্যে ইহার নানারূপ সুবিধা এবং অসুবিধা ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে, তাহা স্বীকার্য্য। পাটকলগুলির পরিচালন পরিষদে ভারতবাসীর বিশেষ কোন হাত না থাকিলেও উহার অংশীদার অনেক ভারতবাসী আছেন। সুতরাং ভারতীয় পাট-শিল্পের সহিত ভারতবাসীর যে স্বার্থ সম্বন্ধ নাই তাহা নহে। অধিকন্তু এই পাট কলগুলিতে প্রায় পৌনে তিন লক্ষ হইতে ৩ লক্ষ ভারতীয় শ্রমিকের অন্নসংস্থান করে। উহার অর্থ প্রায় সাড়ে ১২ লক্ষ হইতে ১৫ লক্ষ ভারতীয় নরনারী এই পাট শিল্পের উপর নির্ভরশীল। ইহার মধ্যে বিহারবাসী এবং উড়িষ্যাবাসী লোকই অধিক। বাঙ্গালায় ৪ কোটি লোক কৃষির উপর নির্ভর করে। তন্মধ্যে পাটচাষের উপর নির্ভরশীল লোকের হিসাব পাওয়া যায় না। প্রায় ১০ হইতে ৯০ লক্ষ বিঘা ভূমিতে পাটের চাষ হয়। সুতরাং অনুমান হয় যে প্রায় ১৫—২০ লক্ষ কৃষকই এর বিস্তর

পাট চাষ করে। পাট উৎপাদন দ্বারা ভারতের ৭০ হইতে ৮০ লক্ষ লোকের অন্নসংস্থান হয়। ইহার মধ্যে অধিকাংশই বাঙ্গালী।

সম্পদ হিসাবে পাটের উপর বিশেষ নির্ভর করা উচিত নহে। পাটের চাহিদার যেমন স্থিরতা নাই, দরেরও তেমনই স্থিরতা নাই। পাট হইতে সাধারণতঃ বস্তা, চট, দড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। উহা এক বৎসরেই ক্ষয় পায় না। থলিয়া প্রভৃতি দুই তিন বৎসর টিকে। বাণিজ্য ও মাল চলাচলের উপর ইহার চাহিদা বিশেষ ভাবে নির্ভর করে। কাজেই ইহার চাহিদা সকল বৎসর সমান থাকেনা। সেই জন্য আমরা দেখিতে পাই যে নবালির মুখে (অর্থাৎ যে সময়ে নূতন পাট উঠে) পাটের দরের বিশেষ তারতম্য ঘটে। আমরা মুদ্রাস্ফীতি হালামের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের পাটের মূল্য কিরূপ হ্রাস বৃদ্ধি হইয়াছে নিম্নে তাহার হিসাব দিলাম :—

খৃষ্টাব্দ	গড়ে মণকরা পাটের দর
১৯০০ হইতে ১৯০৪	৪ টাকা ১ আনা
১৯০৫ হইতে ১৯০৯	৫ টাকা ২ আনা
১৯১০ হইতে ১৯১৪	৬ টাকা ৮ আনা
১৯১৫ হইতে ১৯১৯	৬ টাকা ১৫ আনা
১৯২০ হইতে ১৯২৪	৮ টাকা ৮ আনা
১৯২৫ হইতে ১৯২৯	১০ টাকা ৪ আনা
১৯৩০ হইতে ৩১	৩ টাকা ৮ আনা
১৯৩১ হইতে ৩২	৩ টাকা ৪ আনা
১৯৩২ হইতে ৩৩	৩ টাকা ১২ আনা

বলা বাহুল্য ইহাতে সমস্ত খতাইয়া দেখিলে ৪ টাকা মণ বা ৫ টাকা মণ পাট বেচিলে পাট উৎপাদনের খরচা পোষাইতনা। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে টাকার মূল্য দোয়ানীর মূল্যে পরিণত হয় নাই—মফঃস্বলে সাড়ে তিন টাকা মণ দরে নাগরা ও পাটনাই চাউল মিলিত, এক আনা সের দরে আলু মিলিত, নয় আনা সের দরে খাঁটি সরিষার তৈল যথেষ্ট পাওয়া যাইত। তখনকার কথা বলিতেছি। এখন দশ আনা সের বেগুন, চাষী তাহার ম্যালেরিয়ায় মুমূর্ষু পুত্রের জন্য একটিও কুইনাইনের বড়ি মিলাইতে পারিল না বলিয়া হাপুস নয়নে কাঁদিয়া বুক ভাসায় নাই। সে অধিক দিনের কথা নহে। এবারকার এই সর্ব্বশোষক যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের কথা। ১৯৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দে বিশেষজ্ঞগণ হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে প্রতিমণ পাট উৎপাদন করিতে চাষীদিগের গড়ে ৪ টাকা হইতে ৫ টাকা পর্য্যন্ত খরচ পড়িত। তখন রোগীর পথ্য দাদখানি, সরু বাকতুলসী প্রভৃতি চাউল বাজার হইতে অন্তর্ধান করে নাই, কেশুয়া দানাও বাজারে যথেষ্ট দেখা দিত। কাজেই এখন পাটের সর্ব্বনিম্নদর ১২ টাকা মণ সরকার বাঁধিয়া দিলেও তাহাতে চাষীর খরচা পোষাইতেছে না। তাহার উপর যদি পাটকলের ইয়োরোপীয় পরিচালকবর্গ কেবল দেশীয় বেলারদিগের নিকট হইতে পাট খরিদ বন্ধ করিয়া দিয়া পাটের মূল্য অযথা কমাইয়া দেন, তাহা হইলে চাষীদিগকে গর্ভ লোকসান দিতে হইবে অর্থাৎ যাহা খরচ হইবে তাহা পাট বেচিয়া তুলিতে পারিবে না।

তবে এ কথা সত্য যে, পাটের চাহিদা বা টান সকল বৎসর সমান থাকে না। পূর্ব্ব বৎসরের প্রস্তুত থলিয়া, চট প্রভৃতি অধিক থাকিলে পাটের চাহিদা কম হয়। বাণিজ্যের বাজার মন্দা থাকিলে পাট অধিক বিকায় না। এরূপে পাটের উদ্বৃত্তি হইয়াছে অনেক পর। ১৯১৩ হইতে ১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পাট গড়ে প্রতি বৎসর ১ লক্ষ ৭৭ হাজার গাঁইট উদ্বৃত্ত হইয়াছিল। তাহার পরবর্ত্তী ৪ বৎসর হয় ৩ লক্ষ ১৫ হাজার গাঁইট ঘাটতি। তাহার পর আবার কয়েক বৎসর পাট উদ্বৃত্ত হইতে থাকে। ১৯৩০-৩১ খৃষ্টাব্দে ১৭ লক্ষ ৮৯ হাজার গাঁইট পাট উদ্বৃত্ত হয়। পাটচাষী মহলে হাহাকার পড়িয়া যায়। ১৯৩০-৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় ৩ লক্ষ ১৬ হাজার গাঁইট পাট অবিক্রীত ছিল। পাটের বাজারের এইরূপ অস্থির যোগান ও টান ইদানীং বরাবরই হইয়া আসিতেছে। টান সমান থাকে না বলিয়াই এই কাণ্ড ঘটে।

কিন্তু তথাপি আমাদের দেশের পাটচাষীদের চৈতন্য হয় না। তাহারা সুবিধা পাইলেই পুরাদমে অতিরিক্ত পাট উৎপাদন করে। তাহার কারণ পাট উৎপাদনের জন্য বেশী সময় লাগে না, পরিশ্রমও খুব অধিক করিতে হয় না। বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে পাট বুনিয়া শ্রাবণের শেষ ও ভাদ্র মাসে উহা কাটিতে হয়। প্রায় ৩ মাস, সাড়ে তিনমাস উহা ক্ষেতে থাকে; ইহার মধ্যে প্রথম আমলে পাটের জমিতে কিছু পরিশ্রম করিতে হয়। যাহারা কিছু বেশী জমিতে পাট বপন করে, তাহাদিগকে মজুরী খরচ করিয়া জমিতে দুইবার নিড়ানি দিতে হয়। পাটের জমিতে যাহাতে জল না বাধে যে দিক সেদিক একটু দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। ভাদ্র মাসে পাট কাটিবার সময় মজুরী খরচ করিতেই হয়। কারণ জলে অধিক দিন ঝাঁক্ দিয়া রাখিলে পাট খারাপ হইয়া যায়। ধান যেমন দুই চারিদিন অধিক মাঠে থাকিলে ক্ষতি হয় না, পাট সেরূপ নহে। উহা অধিক দিন ঝাঁক্ থাকিলে নষ্ট হয়। সেই জন্য পাটচাষে কাটিবার খরচ কিছু বেশী পড়ে। মোটের উপর পাটচাষে চাষীর মেহন্নত কম করিতে হয়। তবে কিছু খরচা করিতে হয়। চাষীর খোরাক প্রভৃতি ধরিলে পাটে তাহার বিশেষ লাভ থাকে না। বরং ইক্ষু বা তামাক চাষ করিলে লাভ অধিক হয়। কিন্তু আখ চাষে পরিশ্রম অধিক। ইহা প্রায় এক বৎসর মাঠে থাকে। ভাল করিয়া জমিতে চাষ এবং সার না দিতে পারিলে আখ ভাল হয় না। উহার ফলপ্রাপ্তির আশায় প্রায় এক বৎসর অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। সম্বৎসর ধরিয়া আখের উপর নজর রাখিতে হয়। কাজেই অধিক লাভ হইলেও বাঙ্গালায়, বিশেষতঃ পূর্ব্ব এবং মধ্য বাঙ্গালায় চাষীরা আখের চাষ করিতে চাহে না। তামাকের চাষেও পরিশ্রম অধিক। বাঙ্গালায় তামাকের মধ্যে হিঙ্গলী ও মতিহারীই ভাল, কিন্তু উহা প্রস্তুত করা অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য। সেই জন্যই বাঙ্গালী চাষীরা তামাক চাষের দিকে অধিক দৃষ্টি দেয় না। অধিকাংশ তামাকচাষী বাঙ্গালী কৃষকরা ভেঙ্গী প্রভৃতি অপকৃষ্ট তামাক প্রস্তুত করে। উহাতে তেমন লাভ হয় না। বাঙ্গালায় রংপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি অঞ্চলেই অধিক তামাক জন্মে। ঐ সকল জিলায় পাট ভাল হয় না। পূর্ব্বেবঙ্গেই পাট অধিক জন্মে। ঐ অঞ্চলে কৃষকরা তামাক চাষ করে না।

কিন্তু পাটের উপর নির্ভর করিতে হইলে লাভের আশা করিয়া বসিয়া থাকিলে আর চলিবে না। কারণ পাটের চাহিদায় কোন স্থিরতা নাই। বাণিজ্যের তেজী-মন্দার উপরই উহার টানের (demand) ইতর বিশেষ ঘটে। ইহা ভিন্ন পাটের থলিয়া চট প্রভৃতির মূল্য অধিক বলিয়া অনেক দেশের লোক পাটের বস্তা প্রভৃতির পরিবর্ত্তে শণ (hemp), মসিনার আঁশ (flax), ঘৃতকুমারীর আঁশ (sisal) কার্পাস, শক্ত কাগজ, টেঁরসের আঁশ প্রভৃতির আধার প্রস্তুত করিতেছে। ঐ সকল উদ্ভিজ্জাংশু পাটের সহিত তুল্য ভাবে প্রতিযোগিতা করিতে না পারিলেও যে সকল দেশের লোকের মনে জাতীয় ভাব প্রবল সেই দেশের লোক স্বদেশী পণ্য হীন হইলেও যথাসম্ভব দেশীয় পণ্যের দ্বারা নিজ নিজ আভ্যন্তরিক প্রয়োজন মিটাইবার চেষ্টা করিতেছে। কাজেই ভারতীয় পাটের চাহিদা দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দে ভারতের জনজাত পাটপণ্য সর্ব্বসাকল্যে ১০ লক্ষ ১৮ হাজার টন বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পর ঐ চাহিদা ক্রমশঃ অল্প হইয়া গিয়াছে; ১৯৪৩-৪৪ অব্দে ৬ লক্ষ ৩৪ হাজার টনে দাঁড়াইয়াছিল। যুদ্ধের সময় পরিখায় বালির বস্তা প্রভৃতির জন্য অতিরিক্ত 'গণি ব্যাগ' বা থলের প্রয়োজন হইলেও চাহিদা মোটের উপর বৃদ্ধি পায় নাই। যুক্তরাজ্যে, জার্ম্মাণী এবং মার্কিণ রাজ্যেই পাটের চাহিদা অধিক। কিন্তু কি কাঁচা পাট, কি পাটজাত শিল্পজ ব্যবহার্য্য সকলেরই টান সমানভাবে কমিয়া আসিতেছে। ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে বিদেশে ৭ লক্ষ ৪১ হাজার টন কাঁচা পাট চালান যায়, আর তাহার স্থানে ১৯৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দে ১ লক্ষ ৭৭ হাজার মাত্র চালান গিয়াছে। যুদ্ধের সময় জাহাজের অসুবিধা এবং বাণিজ্য সঙ্কোচের জন্যই যে পাটের চাহিদা কমিয়াছে তাহা নহে, অন্যান্য দেশে পাটজাত আধার প্রস্তুতের পরিবর্ত্তে অন্য বস্তুজাত আধার ব্যবহারের আতিশয্যও এই হ্রাসের কারণ। অধিকন্তু ভারতের পাকা খরিদ্দার জার্ম্মাণী একেবারে উজার হইয়া গিয়াছে। ফ্রান্স অনেক ক্ষতিগ্রস্ত। মার্কিণ কার্পাসতূলা হইতে এবং মসিনার আঁশ হইতে প্রস্তুত থলিয়া ব্যবহার করিবার জন্য ব্যস্ত। সুতরাং পাটের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল নহে। আমাদের দেশের কৃষকদিগের তাহা বুঝা এবং বুঝান আবশ্যক। নতুবা তাহাদিগকে বার বার এইরূপ ক্ষতি সহ্য করিতেই হইবে।

পাট যে কেবল ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা এবং গঙ্গাতীরেই জন্মিতে পারে, তাহা নহে। উষ্ণ কটীবন্ধের অনেক স্থানে উহা উৎপাদন করা যায়। কিন্তু ইহার উৎপাদনে অনেক বিঘ্ন বিদ্যমান, সেই জন্য অন্য দেশে উহা চাষের তেমন সুবিধা হয় না। বিশেষতঃ পাটের চাহিদার কোন স্থিরতা নাই,—উহার প্রয়োজন অতি অল্প, সেইজন্য অন্য দেশে ও প্রদেশে উহার চাষের বিশেষ প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছিল যে মান্দ্রাজ অঞ্চলে পাট উৎপন্ন করা যায়, কিন্তু তাহার পর এ-সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য শুনা যায় নাই। পাটের চাষ করিলে জমির উৎপাদিকাশক্তির হ্রাস হয়, তাহাও পাটের চাষ না করিবার অন্যতম কারণ হইতে পারে। উহা ম্যালেরিয়া বর্দ্ধক ও জল নষ্টকারক। আসল কথা উহার চাহিদা যদি অধিক হইবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে অন্যত্রও উহার চাষ হইত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যদি নিরপেক্ষ ভাবে হিসাব করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায় যে পাট-চাষে কৃষকদিগের বিশেষ লাভ হয় না, বরং কিছু গর্ভ লোকসানও হইয়া থাকে। তবে চাষীরা সাধারণতঃ এইরূপ হিসাব করিয়া থাকে। মনে করুন একজন চাষীর যোতে ৭ বিঘা জমি আছে। সে যদি তাহার মধ্যে ৪ বিঘা জমিতে ধান বুনে, তাহা হইলে হয় ত তাহার সংসার কতক চলে। বাঙ্গালার জমিতে বিঘা করা ৪ মণ চাউল প্রায় জন্মে। সুতরাং চাষী ১৬ মণ চাউল পায়। তাহাতে তাহার ৮ মাস খোরাকী চলে। বাকী ৩ বিঘাতে সে পাট বুনিল। পূর্ব্ব এবং মধ্য বাঙ্গালার নদীতীরবর্ত্তী জমিতে পাট কিছু অধিক জন্মে। মোটামুটি জমি ভাল হইলে ৮ মণ পর্য্যন্ত পাট জন্মিতে পারে। তবে সাধারণতঃ কৃষকরা ৬ মণ পাট আশা করে। পাটের মূল্য যদি ১০৲ মণ হয়, তাহা হইলে তাহার ১ শত ৮০৲ টাকা বাৎসরিক আয় হয়। অর্থাৎ মাসে সে গড়ে ১৫৲ টাকা পায়। এই টাকায় সে তাহার সংসার চালায়। তাহার পর জমি হইতে পাট উঠিলে অনেক কৃষক পাটের জমিতে লঙ্কা ও আউস ধানের জমিতে কপির চাষ করে। কেহ কেহ অগ্রহায়ণ মাসে পটলের চাষ করে। কেহ দুগ্ধ বিক্রয় করে, কেহ গাড়ি চালায়—এইরূপে সে সংসার চালায়। তাহার সংসারের অত্যাবশ্যক জিনিষ ব্যতীত আর স্বচ্ছন্দে অতিরিক্ত জিনিষ কিনিবার সামর্থ্য থাকে না। বঙ্গীয় অধিকাংশ কৃষকই কোন রকমে কায়ক্লেশে জীবন ধারণ করে মাত্র। এরূপ ক্ষেত্রে অন্যায় ভাবে কৃষিজ পণ্যের মূল্য কমাইলে তাহা যে অত্যন্ত অমানুষিক অত্যাচার হয়, তাহা বলাই বাহুল্য।

নারায়ণগঞ্জ হইতে প্রাপ্ত সংবাদ পড়িলে মনে হয় যে য়ুরোপীয় পাট কলওয়ালারা দেশীয় বেলারদিগের নিকট হইতেই পাট কেনা বন্ধ করিয়াছেন, য়ুরোপীয় বেলারদিগের নিকট হইতে পাট কেনা বন্ধ করেন নাই। তাহাদের নিকট হইতে পাট কিনিতেছেন। বেলারদিগের মধ্যে এইরূপ অসূয়াসূচক ব্যবস্থা করিবার কারণ কি? ইহার পাল্টা জবাবে ভারতীয় লোকরা যদি তাঁহাদের দেশের পণ্য বর্জ্জন করে তাহা হইলে তাঁহারা ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হন কেন? এ দেশীয় লোকরা যদি অত্যন্ত দরিদ্র, অশিক্ষিত এবং অদূরদর্শী না হইত, তাহা হইলে তাঁহারা কখনই দেশীয় এবং য়ুরোপীয় বেলারদিগের মধ্যে এরূপ বিসদৃশ ব্যবহার করিতে পারিতেন না। এ পর্য্যন্ত ঐ সংবাদটির প্রতিকূল কোন সংবাদ আমরা পাই নাই।

যাহা হউক, আমরা আমাদের দেশবাসী চাষীদের একটি কথা বলিতে চাহি। তাঁহারা জানিয়া রাখুন যে পাটের চাহিদা বর্দ্ধমান নহে—উহা ক্ষীয়মাণ। সুতরাং লাভের লোভে বেপরোয়া হইয়া পাট চাষ করা কখনই সঙ্গত নহে। এবার অথবা আগামী দুই বৎসর পাটের চাহিদা কম হইতে পারে। কারণ বিগত যুদ্ধে পরিখার জন্য যে সকল বালির বস্তা প্রস্তুত হইয়াছিল তাহার কিছু অবশেষ যে এই যুদ্ধান্তে আছে, তাহা অনুমান করা যাইতে

পারে। সুলভ পণ্যাধার নির্মাণের জন্ত এখন বহু দেশে চেষ্টা চলিতেছে। ভারতে বা বাঙ্গালায় প্রতি বৎসর কত বিঘা ভূমিতে পাট চাষ হয়, তাহার স্থিরতা নাই। নিখিল ভারতে ৬৩ লক্ষ বিঘা হইতে ৯৩ লক্ষ বিঘা জমিতে পাট জন্মে। বাঙ্গালায় প্রায় ৭৫ লক্ষ বিঘা পর্য্যন্ত ভূমিতে পাট উৎপাদন করা হইয়াছিল, এখন কিছু কম হইতেছে। অল্পদিন পূর্ব্বে কেবল বাঙ্গালায় ৪ কোটি ১০ লক্ষ মণ পাট উৎপন্ন হইয়াছে। এত পাট পৃথিবীর লোকের দরকার না হইতেও পারে। সকল জাতিই নিজ নিজ বাণিজ্য বিস্তার কল্পে মাল চালনার বস্তা প্রভৃতি সুলভ মূল্যে প্রস্তুত করিতে চাহিতেছে। কাজেই পাটের উপর আর অধিক নির্ভর করা কর্ত্তব্য নহে। একই ক্ষেত্রে বার বার পাট উৎপাদনের ফলে পাটের আঁশগুলির অবনতি ঘটিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, পাট চাষের বাহুল্য ফলে খাদ্যশস্যেরও উৎপত্তি কমিতেছে। খাদ্য শস্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইলে দেশের অশেষ অনিষ্ট ঘটে। উহাতে কেবল সাধারণ লোকের কষ্ট হয় না,—শিল্প বাণিজ্য সংগঠনেরও বাধা ঘটে। শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি না হইলে কৃষির আবশ্যিক উন্নতি ঘটিবে না। কারণ কৃষকের যোতের জমির পরিমাণ যত অল্প হইবে, তাহাদের দারিদ্র্যও তত বৃদ্ধি পাইবে। শ্রমশিল্পের বিস্তার ঘটিলে লোক আর অনন্যগতি হইয়া জমির উপর অধিক চাপ দিবে না। সেইজন্য সকল সভ্য এবং শিক্ষিত দেশের লোকই দেশের খাদ্য শস্যের মূল্য সুলভ করিবার জন্য ব্যস্ত। যে দেশের কৃষকরা শিক্ষিত এবং দূরদর্শী, তাহারা ইহা বুঝে। মূর্খতা বুদ্ধির সঙ্কীর্ণতা জন্মাইয়া দেয় বলিয়া আমাদের দেশের কৃষকরা ইহা বুঝেন না। বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, আমাদের দেশের চাষীদিগের মধ্যে শত করা ৯৫ জন বর্ণজ্ঞান-বিহীন মূর্খ। যাহাদের বর্ণজ্ঞান আছে বলিয়া কথিত, তাহাদের জ্ঞানের পরিধি বর্ণজ্ঞান বিহীনদিগের জ্ঞানের পরিধি অপেক্ষা অধিক বিস্তীর্ণ নহে। ইহা পৌণে দুই শত বর্ষব্যাপী ইংরাজ রাজত্বের কলঙ্ক এবং আমাদের দুর্ভাগ্য।

পাট চাষে বাঙ্গালার কৃষক ২২ হইতে ৩২ কোটি টাকা লাভ করে। ভারত হইতে যত টাকার জিনিষ বিদেশে চালান যায় তাহার শত করা ২০ হইতে ২৫ ভাগ পাট। ১৯৪২—৪৩ খৃষ্টাব্দে ভারত হইতে ৩৬ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকার পাট চালান গিয়াছিল সুতরাং ইহার চাষ উপেক্ষণীয় নহে। কিন্তু ইহার অপর দিক যে নাই, তাহা নহে। যে ম্যালেরিয়া প্রভাবে প্রতি বৎসর বঙ্গদেশে ৭৮ লক্ষ লোক শমন-ভবনে যায়, শত করা ৮০ জন বাঙ্গালী বর্ষা ও শরৎকালে রোগ শয্যা গ্রহণ করে, পাট সেই ম্যালেরিয়ার বর্দ্ধক। ম্যালেরিয়া প্রতি বৎসর ভারতবাসীর ১ শত ১০ কোটি টাকা ক্ষতির কারণ। বাঙ্গালা হইতেও আনুমানিক লোকের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ক্ষতির পরিমাণ বার্ষিক ১৮ কোটি টাকা অনুমান করিতে পারা যায়। এ দেশের চাষীরা সাধারণতঃ জমিতে সার দিতে পারে না। ফলে শীঘ্র শীঘ্র জমির ফসল হ্রাস পায়। পূর্ব্ববঙ্গে ব্রহ্মপুত্র এবং পদ্মার পলি মাটিতে জমির উর্ব্বরতা বিশেষ হ্রাস না পাইলেও কিছু হ্রাস পায়। অধিক লাভের লোভে চাষীরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাল জমিতে পাট বুনে। সেজন্য গোধূম ধান প্রভৃতির ফসল কম হয়। ইহা জাতীয় ক্ষতি। এই সকল দিক নিরপেক্ষভাবে ভাবিয়া দেখিলে পাট-চাষের সঙ্কোচ হইলে দেশের লোকের বিশেষ ক্ষতি হইবে বলা যায় না। অন্ততঃ বিষয়টি বিশেষভাবে নিরপেক্ষ বিচারসাপেক্ষ।

একটী গীতি কবিতা

শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী

তুমি গো মহাসাগর!
তুফানে তোমার ভেসে ভেসে যায়
কতনা পাতার ঘর!

তোমার বুকেতে বাসুকি ঘুমায়
মুকুতা আমার বুকে,
আমি নাগের মাথায় মণিদীপ করি'
তাহারে বিলাব সুখে,

তুমি সদাই ভাঙিছ শুনি:
আমি গড়ার স্বপন বুনি,
ক্ষণেক ভুলিয়া এস মোহনায়
রচি প্রবালের চর।

তুমি বাজাও বিষের বাঁশী:
আমি সুধা যে ঢালিব হাসি,
মাটীর বিজনে এসো গড়ে' তুলি
স্বরগ সে মনোহর।
হে সাগর! হে সাগর!!

উল্টা তুলসী

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

(১)

তুলসীচরণ বহু সামাজিক গুণে সম্পন্ন। সে সব গুণ বিকসিত হয়, যখন সে স্ব-ইচ্ছায়, বিনা অনুরোধে কাজ করে। কিন্তু অনুরুদ্ধ হলেই তার প্রকৃতির নিন্দনীয় হীনতার আত্ম-প্রকাশ অনিবার্য্য। উত্তর দিকে যাবার সংকল্প করে বাড়ীর বার হ'লে, কেহ তাকে উত্তরেই যেতে ব'ল্‌লে শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ নায়কের গন্তব্য দিক হ'ত দক্ষিণ। ময়দানে বন্ধু-বান্ধব তাকে চীনা-বাদাম কিন্‌তে বললে, তুলসী খরিদ করত গোলাবী গাণ্ডেরী। কেবল অনুরোধের বিরোধিতা ক'রে সে ক্ষান্ত হ'ত না। শান্ত-গম্ভীর ভাবে তার কৃতকর্ম্মের স্বপক্ষে যুক্তির অবতারণা করত। তাই বন্ধুমহলে তার নাম ছিল—উল্টা তুলসী।

বাঙ্গালোরে লালবাগের কেম্পে গৌড়ার বিস্তৃত শিলার উপর এক বন্ধু যখন মাদ্রাজী নামের শ্রুতিকঠোরতার উল্লেখ করলে, তুলসী বললে—বাঙ্গালার সহর বা গ্রামের নামও কিছু মধুমাখা নয়।

ছত্রপতি বিনয় রুষ্ট হল। সাহিত্যে তার খ্যাতি অসাধারণ, বিশেষ রবীন্দ্র-সাহিত্যে। তাই এদের দলের তরুণেরা তাকে বলত—সাহিত্য-সম্রাট্‌। কিন্তু তুলসী বলত—সম্রাট্‌ বটে, তবে ছত্রপতি। কারণ সকল কাব্যের মাত্র এক এক ছত্র মুখস্থ করে ও নাম কিনেছে। এদের অন্তরের কথা ছিল অন্তর্যামীর জ্ঞানগম্য। বাহিরে তুলসী-বিনয়ের পরস্পরের সম্বন্ধ ছিল অহি-নকুলের।

বিনয় বল্লে—তুমি বাঙ্‌লার কিছুই জানো না। আর মাদ্রাজ ভ্রমণ করছ কানে তুলো দিয়ে, আর চোখে ফ্যাটা বেঁধে। মধুপুর, মধুমতী নদী মধুমাখা।

তুলসী বিজয়ী বীরের মত বললে—মধুপুর বেহারে। খাস বাঙলার অন্তর্গত—ঝাপোড়দা, মাকড়দা, ঝিকড়গাছা, মুনটে-বাঁটুল্‌ এবং কৈকালা।

বিনয় চোট্‌টা সামলে নিয়ে বললে—তব বাক্যে ইচ্ছে মরিবারে। কী মধু বাঙলা গানে—

বাধা দিয়ে তুলসী বললে—ছত্র ছাড় ছত্রপতি, বাস্তবে এসো।

বিনয় বললে—বেশ। মাত্র মাদ্রাজ থেকে বাঙ্গালোরের মধ্যে বিরাজিত—বিল্লীভক্কম, তিরুভেলাঙ্‌গাড়ু। উত্তর মাদ্রাজের ইয়াল্লামাঞ্চিলী, বিডাডাভোলু, কোরুকুপেট্টির উল্লেখ না হয় না করলাম।

নরেশ নিজেকে তর্কের বাহিরে রাখতে পারলে না। সে স্পষ্টবাদী অথচ নির্ব্বিরোধ। ব'ল্‌লে—ঐ সব ষ্টেশনে কিন্তু মাই-ডিয়ার তুলসীর মুখে বিদ্রূপের বাণী শোনা গিয়েছিল। অবশ্য তখন সে ছিল বাদী, এখন প্রতিবাদী।

মিঃ নায়ক বললে—আমার বাণী মহাত্মাজীর কিম্বা নেতাজীর বাণী নয়। সাধারণ লোকের কাছে মত বদলানো সৎসাহসের পরিচায়ক। আচ্ছা বিনয়, এই বাঙ্গালোর তো তোমার ছত্র-স্মৃতি-ভাণ্ডার হ'তে উদ্বুদ্ধ করতে পারে—বঙ্গ আমার জননী আমার, কিম্বা সোনার বাঙলা আমি তোমায় ভালবাসি।

এবার বিনয় আহত যোদ্ধার মত কাতর দৃষ্টিতে ইতস্ততঃ দেখলে। তার দৃষ্টির ফলে এক অপ্রত্যাশিত কাণ্ড ঘটলো।

তাদের অনতিদূরে এক মাদ্রাজী দম্পতি ডুবন্ত রবির শিল্প-নিপুণতা দেখছিল পশ্চিম আকাশে। সূর্য্য আকাশে বর্ণ লেপে-ছিল লাল। তার ছায়া রাঙিয়ে তুলেছিল উপবনের পশ্চিমে বিস্তৃত সরসীর জল এবং পদ্মপাতা। তিন বন্ধু সে মনোরম চিত্র দেখলে। কিন্তু তুলসীর দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে তারা সন্ধান পেলে মাদ্রাজী ভদ্রলোক এবং মহিলার। সত্যই তো যদি তারা বোঝে তাদের সমালোচনা, ব্যাপারটা হবে লজ্জার। কিন্তু তারা ছিল নিজের খেয়ালে।

সাহিত্য-প্রিয় বিনয় প্রবোধ দিলে কবিতায়।

আনমনে গান গেয়ে দূর শূন্যপানে চেয়ে
ঘুমায়ে পড়িতে চায় দোঁহে।

নরেশের চক্ষে কিন্তু মহিলাটি আনমনা বা নিদ্রালু প্রতীয়মান হ'ল না। তাঁর মুখে চাপা হাসি। সর্ব্বনাশ। সে ক্ষীণ স্বরে বললে, কী রসিকতা বিদেশীর কাছে

বক্র তুলসী এবার সোজা হল। বললে—বাঙলা দেশের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে মাদ্রাজী ভায়েরা এই সহরের বাঙ্গালোর নাম দিয়ে।

অতঃপর প্রতিবেশীর তুষ্টির জন্য প্রতিযোগিতা আরম্ভ হল।

বিনয় বললে—মাদ্রাজ এবং বাঙলা এক মায়ের দুই সন্তান। মাদ্রাজ রাখলে নাম বাঙ্গালোর, বাঙলা তার পাল্টা শ্রদ্ধা দেখালে সহরের নাম রেখে মাদারীপুর। কারণ, মাদ্রাজ ইংরাজি। এ প্রদেশের আসল নাম—মদ্ররাজ্য। মদ্রের অপভ্রংশ মাদারী।

এ পাল্টা জবাবে উল্টা তুলসীও হাস্‌লেন, আর হাসলেন অস্তাচলচূড়াবলম্বী মরীচিমালীর রক্ত-কিরণের মূক উপাসক—সেই মহীলা।

সুতরাং বন্ধুত্রয়ের পক্ষে ব্যাপারটা হল সঙ্গীন। কলকাতার অনেক বিলাস নামক ভবনে দক্ষিণ ভারতের বহু লোক বাস করে। তাদের পক্ষে বাঙলার জ্ঞান স্বাভাবিক। রুচির দিক হ'তে কথাবার্ত্তাগুলা উচ্চাঙ্গের হয়নি।

ভদ্রলোকটি কিন্তু স্থির, ধীর, গম্ভীর। লাল মেঘের অন্তর ভেদ করে, সূর্য্যদেব ধূমকেতুর আকারের একটা অতি উপভোগ্য কিরণ-স্তম্ভ প্রক্ষেপ করেছিলেন আকাশে। অপ্রস্তুত হয়ে যুবকেরা সেই সুষমার উপাসনায় আত্মনিবেদন করলে।

একজন বললে—আঃ! অন্যে বললে—কী চমৎকার! ছত্র-পতি একটু সুর করে বললে—

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে,
এ জীবন পুণ্য করো দহন দানে।

কিন্তু তাতে আশানুরূপ ফল হল না। মহিলা উঠে দাঁড়ালেন। দৃষ্টি তাঁদের দিকে।

নরেশ বললে—বিনয়, কবিতাটা চালিয়ে যাও। তাতে প্রমাণ হবে তুমি মাত্র ছত্রপতি নও। আর আগন্তুক ভাববে—অর্থাৎ যা' হক একটা কিছু ভাববে।

কাজেই বিনয় বললে—

আমার এই দেহখানি তুলে ধরো
তোমার এ দেবালয়ের প্রদীপ করো।

কিন্তু সাড়ির ধূলা ঝেড়ে, বেতের বোনা ভ্যানিটি ব্যাগ তুলে নিয়ে, যখন মহিলা তাদের দিকে অগ্রসর হ'লেন, বিনয় কুমারকে অগত্যা বলতে হল—

সাগর উদ্দেশে যবে বাহিরায় নদী
কার সাধ্য রোধে তার গতি।

—'নমস্কার'—বললেন আগন্তুক।

তারা সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালো। তিনটি মুণ্ড হেঁট হ'ল। তিন জোড়া হাত কপাল ছুঁয়ে অভিবাদন করলে মহিলাকে।

তিনি বললেন—ক্ষমা করবেন। একটা ভুল শোধরাবার জন্য উপযাচক হয়ে আলাপ করছি।

তুলসী বললে—বিলক্ষণ। সেটা আপনার মহত্ব। প্রত্যেকের ভাষা তার জননী। তামিল ভাষার একটা প্রাণ আছে, একেবারে তরল নয়।

বিনয় বললে—এর দ্যোতনা যেন গারসোপ্পা প্রপাতের গভীর রোল। যেমন কল-কল্লোলিনী গঙ্গে।

নরেশ বললে—মানে, পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করে ভাষার ছন্দ এবং শব্দ-সম্পদ।

মহিলা হেসে বললেন—না, সে কথা বলছি না। বলছিলাম—বাঙ্গালোর বাঙলার অপভ্রংশ বা শ্রদ্ধা-নিবেদন নয়।

বিনয় বললে—উল্টা বুঝলি রাম!

কিন্তু উল্টা তুলসী আশাতীত উদারতা দেখিয়ে বললে—সম্ভব। তবে মাদারীপুর—

মহিলার প্রকাশ্য হাসিতে বাধা পড়লো গবেষণা। তিনি বললেন—কনোড়ী শব্দ বেঙ্গা এবং লুরু যোগ ক'রে হয়েছে বাঙ্গালোর। মানে সিম্ সেদ্ধ।

বিনয় বলে ফেললে—সীমার মাঝে অসীম তুমি—

তুলসী এবং নরেশ সমস্বরে বললে—চুপ।

মহিলা মিসেস্ পার্থসারথি। তিনি অমায়িক। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। কিন্তু সুগঠিত সুরক্ষিত দেহে প্রৌঢ়ত্বের কোনো লক্ষণ নাই।

তিনি বললেন—সীমা নয়—সীম বীণ্। পুরাকালে স্থানটা ছিল জঙ্গল। এক রাজা শিকার করতে এসে পথ ভুলে যান। এখানে এক গরীব বিধবার কুটীর ছিল। রাত্রির ভয়, তীব্র খাওয়া বাঘের প্রতিহিংসার আতঙ্ক; তার উপর দারুণ শ্রান্তি, ক্ষুধা।

বিনয় চুপি চুপি বললে—শুধু ক্ষুধা, চীন ক্ষুধা, দরিদ্রের ক্ষুধা।

এবার নরেশ তার জুল্পীর চুল টেনে তাকে নীরব করলে।

শ্রীমতী পার্থসারথি বললেন—কাতর রাজা বৃদ্ধার দুয়ারে করাঘাত করলেন।

ছত্র ... মনে গুমরে উঠলো—বাহির হ'তে দুয়ারে কর কেহ তো হানে না। কিন্তু কপোলের চুল-টানার ব্যথা কবিতার ছত্রকে অব্যক্ত রাখলে।

শ্রীমতী বললেন—গরীব স্ত্রীলোকটি সসন্দেহে দরজা খুললে। দ্বারে যুবা অতিথি। ক্লান্ত, কিন্তু মুখে আভিজাত্যের চিহ্ন। আগন্তুক আশ্রয় ভিক্ষা করলে। পথভোলা—

এবার বিনয়ের পক্ষে নীরব থাকা অসম্ভব হ'ল। সে বললে—বুঝেছি, পথভোলা এক পথিক এসেছি, এই ভাব।

মহিলা উদার। বললেন—ঠিক কথা। মোট কথা, কাঠুরিয়া রমণী বললে—বাবা, কুটীরে আশ্রয় পেতে পার। কিন্তু তোমার শ্রীমুখে দেবার মত অন্ন-ব্যঞ্জন তো আমার কুটীরে নাই। রাজা বললেন—জল আছে তো মা? তা হ'লেই আমি সুস্থ হ'ব।

গল্প জমেছিল। ওরা বাধা দিল না, শেষটা শোনবার কুতূহলে।

শ্রীমতী বললেন—কাঠুরিয়া স্ত্রীলোক বললে, আমার কাছে আছে সীম্ সিদ্ধ। তাতে বাবা তোমার ক্ষুধা কমবে। বেচারা তার নিজের জন্যে রাখা 'বেঙ্গা লুরু' খেতে দিল। পরে যখন প্রকাশ পেলে যে অতিথি ছদ্মবেশী রাজা, তিনি গরীবের ঘরে বেঙ্গা লুরু খেয়েছেন, তখন দেশের নাম হ'ল বেঙ্গালুরু। তা থেকে অভিনব আকার হয়েছে—বাঙ্গালোর।

এবার তুলসীর চিন্তা-কেন্দ্রে হিল্লোল উঠলো। প্রেরণা এলো। নিজের সিদ্ধান্ত বজায় রাখবার জন্য বললে—তাই তো বলছিলাম, আপনাদের আর আমাদের কৃষ্টির সাদৃশ্য আছে। আমাদেরও কুচবিহারের রাজা ঐ রকম ভাবে ভাত খেয়েছিলেন, তাই একটি জায়গার নাম হয়েছে—রাজা-ভাত-খাওয়া।

নরেশের চিন্তাশীল মনের সমস্যা প্রকটিত হ'ল।

আপনি এমন সুন্দর বাঙলা বলেন কেমন করে?

তিনি হেসে বললেন—যে কারণে আপনি বাঙলা বলেন। ও আমার মাতৃভাষা।

বিস্মিত বিনয় বললে—আঃ মরি বাঙলা ভাষা। মোদের গরব মোদের আশা।

মহিলা বললেন—নিশ্চয়।

নিজের মনে বিস্মিত বিনয় বললে—

অয়ি সখি, হেরি যেন স্বদেশের প্রতিবেশী
হেরি যেন আপনার ভাই
প্রাণের প্রবাসে মোর দিশা হারাইয়া
বেড়ায় সদাই।

(২)

কাব্বন পার্কের চাতালে বসে তারা সিদ্ধান্ত করলে যে, বাক্-সংযম আবশ্যক। তাদের সর্বদা স্মরণ করতে হবে যে, তারা বঙ্গদেশের প্রতিনিধি। তাদের দোষ-গুণের পরিমাপে তরুণ বাঙলার পরীক্ষা হবে। অতএব খবরদার।

কিন্তু বন্ধুদের প্রাণের অন্তঃস্থল হ'তে আনন্দ উথলে উঠছিল। শাস্ত্রী হোটেলের ঘর ভালো, বাগান বড়, যত্ন মিষ্ট কিন্তু ভোজ্য

ভীষণ ঝাল এবং টক্। রাত্রে মিসেস পার্থসারথির গৃহে তাদের নিমন্ত্রণ। তিনি বাঙলা খাবার খাওয়াবেন। রসনার সুখের আগন্তুক ছায়া যুবকদের আনন্দিত করলে, মনের সুখের তো কথা নাই।

তারা সাড়ে বারো মিনিট শান্তশিষ্ট রইল পার্থসারথিদের বাড়ি। শ্রীমতী বিজয়া পার্থসারথি যখন তাদের পরিচিত আত্মীয়ার মত ব্যবহারে তুষ্ট করলেন, তখন তারা নিজ নিজ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করলে। কাব্বন উপবন সম্বন্ধে যখন নরেশচন্দ্র তুলসী চরণের নিজের অভিমত আবৃত্তি করলে, শেষোক্ত ভদ্রলোক ব'ল্লে— ইডেন গার্ডেনের সৌন্দর্য্য অপরিমেয় ?

—কেন ?

তুলসী বল্লে—কেন ? তার মাঝখান দিয়ে জলের খাল চলে গেছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের আয়োজনে জলের মূল্য খুব বেশী।

বিনয় শিশুপাঠ্য ভূগোল হ'তে আবৃত্তি করে ব'ল্লে—পৃথিবীর তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থল। আরও নজীর আছে—যৌবন-সরসীনীরে—ইত্যাদি।

স্বামী-স্ত্রী হাসিমুখে শুনছিল তাদের তর্ক। পরে বোধগম্য হ'ল যে পার্থসারথি এক অক্ষর বোঝেন নি, কারণ তিনি ওদের মাতৃভাষায় অনভিজ্ঞ। এদের কন্যা, কুমারী কমললক্ষ্মী নীরবে প্রতি বক্তার মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। তার দৃষ্টি ছিল সরল। কিন্তু বন্ধুত্রয়ের প্রত্যেকের সে-চাহনী হ'ল প্রেরণা। কথার স্রোত বইল।

শ্রীমতী বিজয়ার খুব আনন্দ। দেশের ছেলে, নির্দোষ আমোদ করছে, প্রাণের স্ফূর্ত্তি মুখ ফুটে মজার কথায় অনর্গল নির্গত হচ্ছে, এ যোগাযোগ তাঁর এ জীবনে অভিনব। তাঁর প্রতি স্বদেশের ব্যবহার ছিল নিষ্ঠুর। দেশের নীতির মূলে তিনি ভণ্ডামী ও প্রাণহীনতার লক্ষণ দেখেছিলেন। কিন্তু তবু মাতৃ-ভাষার মোহ এবং জন্মভূমির স্বপ্ন তাঁর মনের নিভৃতে বর্ত্তমান, এ কথা শ্রীমতী বিজয়া আজ উপলব্ধি করলেন। তা না হ'লে দেশের এ তিনজন যুবকের প্রলাপ তাঁর কানে কেন মধু-বর্ষণ করছিল ? তাদের অন্তরের নিবিড় ঘনিষ্ঠতাকে ফুটিয়ে তুলছিল তাদের মুখের তর্ক।

ব্যাঙ্গালোরের ইংরাজি-অধিকৃত অংশ ভালো কি মহীশূর-রাজ্যাধীন ভাগ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সে তর্ক সমাধানের জন্য হঠাৎ বিনয় মিস্ কমললক্ষ্মীর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো—কহ বাণী, তোমার কি মত।

কিন্তু তারা তিনজনে তখনই এ কথার অশিষ্টতা বুঝে সমস্বরে ব'ল্লে—ক্ষমা করবেন।

নরেশ ব'ল্লে—অর্থাৎ, মিস্ পার্থসারথি, আপনার এ বিষয়ের মতামত মূল্যবান।

তার জননী পাশের ঘরে গিয়েছিলেন কার্য্য-গতিকে। শ্রীযুক্ত পার্থসারথি ব্যাপারটা বুঝলে না। কমললক্ষ্মী গম্ভীর হ'ল, কোনো কথা ব'ল্‌ল না। নরেশ বিনয়ের ধৃষ্টতার জন্য তার প্রতি চাইল ক্রোধ-কষায়িত নেত্রে। অতএব তুলসী পক্ষ সমর্থন করলে বিনয়ের।

সে কুমারীকে বল্লে—আপনি বিনয়বাবুর অপরাধ নিবেন না। বোধ হয় লক্ষ্য করেছেন ও আমাদের দেশের বড় বড় কবিদের কাব্য হ'তে ছত্র আওড়ে কথা কয়। যে ছত্রে সে আপনার অভিমত জানতে চাইল, সেটা নবীন সেনের প্রসিদ্ধ লাইন। আপনাকে বাণী ব'লে ও একটু অযথা আত্মীয়তা দেখিয়েছে। কিন্তু ওর মনোভাব উচ্চ।

বক্তৃতার পরিণাম যখন হ'ল কুমারীর নীরবে গৃহত্যাগ, তখন তিন বন্ধু অপ্রতিভ হ'ল। নরেশ গালি দিল বিনয়কে।

তুলসী ব'ল্লে—একটা নয় এম্পার নয় ওম্পার হবে। যদি ওর মাকে ডেকে এনে গালাগালি দেয়, বোঝা যাবে ও বে-রসিক। আর যদি ফিরে এসে হাসে, বোঝা যাবে ও রসিকা, আমাদের বানর নাচাচ্ছে।

এ কথার উপর তর্ক হবার পূর্ব্বে তার মা এলেন ঘরে। মুখে এক মুখ হাসি।

তুলসী ব'ল্লে—মিস্ ওর নাম কি—গেলেন কোথা ?

শ্রীমতী এবার খুব হাসলেন। তার পর স্বামীর দিকে তাকিয়ে কি বল্লেন, যার ফলে ভদ্রলোক বই ফেলে খুব হাসলেন, বন্ধুত্রয় হ'ল হতভম্ব। ওরা আশা করছিল যে এবার তুলসী একটা কিছু বলবে। কিন্তু যেহেতু ওরা যা ভাবে, তুলসী তার উল্টা কাজ করে, তুলসী তাই নীরব রহিল।

শ্রীমতী বিজয়া বল্লেন—কমল বড় লজ্জিত হয়েছে। আপনারা ওকে কিছু জিজ্ঞাসা করেছেন ?

তুলসী বল্লে—ওঁকে আমরা মধ্যস্থ মেনেছিলাম একটা বিষয়ে।

—বাঙলা ভাষায় ?

বিনয় ব'ল্লে—আজ্ঞে হ্যাঁ। একটু ক্ল্যাসিকাল বাঙলায়, অর্থাৎ পলাশীযুদ্ধের ভাষায়।

ইংরাজিতে গৃহস্বামী মিঃ পার্থসারথি বল্লেন—আমার পক্ষে তথা আমার কন্যার পক্ষে আপনাদের শ্রুতি-মধুর ভাষাটা গ্রীক্।

তারা আশ্বস্ত হ'ল এবং বিস্মিত হ'ল। মনের একটা বোঝা নামলো। সত্যই তো অযথা-ঘনিষ্ঠতার দোষে শ্রীযুক্ত বিনয় ভূষণ সেন দুষ্ট।

জবাব-দীহি ক'রে কমল-লক্ষ্মীর জননী বিজয়া বল্লেন—এক মুখে বাঙলা শুনে কেমন করে ও আমাদের ভাষা শিখবে। ওর জন্মের সময় আমি নিজে তামিল ভাষা যথেষ্ট শিখেছিলাম, তাই ও তামিল বলে।

তারপর যখন মাতৃ-আজ্ঞায় চাঁপার কলির মত আঙুলে দু'টি চোখ ঢেকে স্মিতা কমল-লক্ষ্মী কক্ষে পুনঃ প্রবেশ করলে, বন্ধুত্রয়ের দেশভ্রমণের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হ'ল।

কমল দক্ষিণ দেশের মেয়ে, অনাড়ম্বর, লজ্জাশীলা, শুষ্ক অথচ নিঃসঙ্কোচ। সে মাত্র বি, এ, পড়ে সেণ্ট জোসেফে। কিন্তু সকল বিষয়ে সমানে তর্ক-আলোচনা কর্ত্ত বন্ধু তিনজনের সাথে। এই কুমারীর অবাধ মেলামেশা তাদের বাক্য এবং ব্যবহার সংযত করেছিল। কিন্তু যৌবনে মন এবং দেহ ক্রীড়াশীল। বন্ধুরা পরস্পরকে পরিহাস কর্ত্ত সুষ্ঠু ভাবে। কুমারী কমললক্ষ্মী সে সময় বাগ্-যুদ্ধে পুরাতন মিত্রের মত এক দিক্ সমর্থন ক'রতো।

কমল ওয়াই, এম, সি, এর সভ্য। সে প্রতিষ্ঠান পার্থসারথীর বাঙলার সন্নিকটে। এক সপ্তাহে কলিকাতার যুবকেরা দুই তিনটি দক্ষিণের যুবক এবং একটি মালাবারী যুবতীর সঙ্গে পরিচিত হ'ল। কাজেই তাদের বাঙালোর পরিত্যাগ ক'রে মহীশূর যাবার সংকল্পে শৈথিল্য প্রতীয়মান হ'ল।

কুমারী কমল এবং কুমারী বঞ্জুনীর সঙ্গে নরেশ এবং তুলসী এক দিন টেনিস খেললে। তার পূর্ব্বে ক'দিন রাঘবন এবং নরসিংহমের সঙ্গে ঐ ক্রীড়ায় নরেশ এবং তুলসী আনন্দ লাভ করেছিল—কারণ, জয়-পরাজয়ের সম্ভাবনা ছিল সমান। এদিন নরেশ-বঞ্জুনী বনাম তুলসী-কমল প্রতিযোগিতায় নরেশ জয়ী হ'ল।

সেদিন শাস্ত্রী হোটেল একটা তুমুল রণক্ষেত্রে পরিণত হ'ল। তুলসী নরেশকে বল্লে অ-খেলোয়াড়, কেঁউচে এবং অভদ্র। নরেশ তুলসীকে বল্লে, বাঁকা, উল্টো, মোসাহেব এবং কুলাঙ্গার। বিনয় গিরিশ ঘোষ এবং ক্ষীরোদ প্রসাদের প্রহসন হ'তে লাগ-সই ছত্র আবৃত্তি ক'রে বাগ্-যুদ্ধটাকে প্রবল এবং প্রাণ-বন্ত করলে।

তুলসী বল্লে—কেবল জয়-পরাজয় খেলা নয়। বিপক্ষের সামর্থ্য বুঝে, তাকে আনন্দ দেওয়া সুষ্ঠু ক্রীড়া-জগতের নীতি। কেবল মহিলার দিকে বল মেরে জেতা অভদ্রতা এবং আন্-স্পোর্টস্‌ম্যান-লাইক।

বিনয় বল্লে—তু ক্যায়সা দাগাবাজ!

রসিকতা উপেক্ষা ক'রে নরেশ বল্লে—অ-খেলোয়াড় কিসে? প্রতিযোগিতা হার-জিতের জন্য। যদি মিস্ কমল খেলা শিখতে চাইত—

—তোমার কাছে? ধৃষ্টতার একটা সীমা আছে!

বিনয় বল্লে—কবে শেষ করেছি আলেফ বে। এলেম শিখে ইনাম নিয়ে তাক করেছি সবাইকে।

নরেশ কবিতা উপেক্ষা করে বল্লে—সে কেন? তার উপাসকও বোধ হয় পারে। আজ এক পাল্লা হবে এখন।

তুলসীর স্বরে বিরক্তি এবং ভর্ৎসনা ছিল, যখন সে বল্লে—উপাসক? কে কার উপাসক?

বিনয় বল্লে—যার তরে সদাই তোমার চমকিত মন, চকিত শ্রবণ, তৃষিত ব্যাকুল আঁখি।

তুলসী বল্লে—নন্‌সেন্স্, ঠাকুরদাদার আমলের কবিতা। ছিঃ, ভদ্রলোকের মেয়ে—

বাধা দিয়ে নরেশ বল্লে—যে বৃত্তি সম্বন্ধে ও কবিতা, সে বহু বহু পুরাতন। এ আদিম বৃত্তি ভদ্রলোকের মেয়েই জাগায় ভদ্রলোকের ছেলের প্রাণে।

বিনয় বল্লে—প্রেমপাশে ধরা পড়েছে দু'জনে

দেখো দেখো সখি চাহিয়া,
দুটি ফুল খসে ভেসে গেল ওই
প্রণয়ের স্রোত বাহিয়া।

উল্টা তুলসীর আবেগের উলটি-পালটি নিয়ে এরা পরিহাস করলে। বীরের মত তুলসী প্রতিবাদ করলে তাদের নিন্দার। সে কুমারী কমললক্ষ্মীর সঙ্গে ছুটে কাব্বন পার্কের খাদে নেমে বেঞ্চে বসেছিল, স্বভাবের সৌন্দর্য্য উপভোগের বাসনায়। সেদিন সে তার সামনে একটি ভিখারিণীকে চার আনা ভিক্ষা দিয়েছিল মাত্র কর্ত্তব্যের অনুরোধে।

বিনয় বল্লে যখন—তার কারণ—

অভদ্র অসভ্য যত বর্ব্বরের দল
মরিছে চীৎকার করি ক্ষুধার তাড়নে
কর্কশ ভাষায়।

তুলসী তাকে বল্লে—গোপাল ভাঁড়।

নরেশ ছাড়বার পাত্র নয়। সে বল্লে—বেশ, আজ আমরা কাব্বন পার্কে যাবো না। তার সঙ্গে মিলন যখন একটা আকস্মিক ব্যাপার, তখন সাক্ষাৎ না হলে কোনো কথা উঠতে পারবে না।

তুলসী বল্লে—স্বাস্থ্য নষ্ট করব ভয়ে?

বিনয় বল্লে: লজ্জিত কর কুৎসিৎ ভীরুতারে,

মন্দ্রিত কর বন্দীশালার দ্বারে
মুক্তির জাগরণী।

—বেশ, অন্যত্র চল। লালবাগ কিম্বা বড় লেকের ধারে।

তুলসী বল্লে—কেন? ভয়ে আমরা গন্তব্য-পথে যাব না কেন? বিশেষ, যখন আর ক'দিন পরে চলে যেতে হবে এ দেশ ছেড়ে।

বিনয় বল্লে—ওকে বলতে হবে, তখন বাঙলা শিখিয়ে—

প্রবাসীরে মনে ক'রো এই উপবনে
এই নির্ঝরিণীতীরে, এই লতা-গৃহে,
এই সন্ধ্যালোকে, পশ্চিম গগনপ্রান্তে
ওই সন্ধ্যাতারা পানে চেয়ে।

(৪)

এ সব আলোচনার ফলে উল্টা তুলসী গেল সোজা পথে উপবনের দিকে, অন্য দু'জন গেল উল্টা দিকে। কিন্তু পরে তার অলক্ষ্যে বাগানে গিয়ে দেখলে একটা প্রকাণ্ড মাটির সিংহের পরে বসে পার্থসারথি-কন্যা, শ্রীযুক্ত তুলসী চরণ নায়ক সিংহের কেশরে হাত বুলিয়ে মাটির সিংহকে আদর করছে।

তাদের পিছনে প্রাচীরের অন্তরালে ছিল নরেশ ও বিনয়। বিনয় বল্লে—দেখা দাও।

দুই মূর্ত্তি যখন সম্মুখীন হ'ল, বিনয় হাত জোড় ক'রে বল্লে—ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী—

নরেশ বল্লে—আর তুলসী যেন মহিষাসুর, অবশ্য দেশটা মহীশূর।

এর পর হাসি হ'ল ব্যাপক। রসিকতাটা কি জানবার জন্য ব্যস্ত হ'ল কুমারী কমললক্ষ্মী। তিন বন্ধুতে যথাসাধ্য বোঝালে। মহীশূরে সিংহবাহিনী দেখেছিল কুমারী, চামুণ্ডা-পাহাড়ে এবং অন্যত্র। যে এদের সঙ্গে মিশে তুলসীকে মহিষাসুর বল্লে।

তুলসী বল্লে—দুর্গামূর্ত্তির রচনা-নৈপুণ্য দেখবে কলকাতায়, যখন তুমি সেখানে আসবে।

কমল গম্ভীর হ'য়ে বল্লে—তা হ'লে আমার আর দেখা হবে না। কারণ, মা বাঙ্গালাদেশে যেতে চান না। তাঁকে এ-কথা বলবেন না।

মিটা তুলসী! তা হ'লে স্বামীর সঙ্গে যাবে। আর যদি বাঙ্গালী স্বামী হয়, হয় তো চিরদিন ওখানেই থাকবে।

কমললক্ষ্মী গম্ভীর হ'ল। তুলসী ক্ষমা প্রার্থনা করলে।

তারুণ্যের চিরাচরিত অভ্যাস। তরুণী হাসলে। বললে—আমার মার কথা যদি ঠিক হয়, বাঙ্গালী বাক্-পটু। কিন্তু তাদের কাজে ও কথায় সামঞ্জস্যের অভাব। নারী-নিগ্রহ এদের—যাক্, আমি পরিহাস করছি। মাকে বলবেন না।

নরেশ বাঙ্লায় বললে—মেয়েটি চালাক! বুঝেছে—তুলসীর নারী-শ্রদ্ধা অন্তঃসারশূন্য।

বিনয় বললে—তুলসী ভালো অবস্থা পাবে—বিরহ। বাঙ্গালোর স্মরণ করবে, আর বলবে—

আমি তোমার বিরহে রহিব বিলীন
তোমাতে করিব বাস,
দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী,
দীর্ঘ বরষ মাস!

বন্ধুরা নিজেদের খেয়ালে মগ্ন ছিল। দেখে নাই, অনতিদূরে শ্রীমতী বিজয়া তাদের লক্ষ্য করছিলেন।

পাঁচ

তিন দিন বাদে চায়ের নিমন্ত্রণে তারা স্বয়ং শ্রীমতী পার্থসারথির মুখে শুনলে বাঙ্গালী-বিদ্বেষ।

ভরসা ক'রে পরেশ বললে—আপনি বাঙ্লাদেশের মেয়ে, আপনি যদি আমাদের স্বজাতিকে না ভালোবাসেন তো—মানে ক্ষমা করবেন। অবশ্য প্রত্যেকের নিজের নিজের মতামত তার নিজস্ব।

এবার শ্রীমতী বিজয়া প্রকৃত বাঙ্গালীর মেয়ের মত ব্যবহার করলেন। তাঁর মাতৃত্ব ফুটে উঠলো। বিলাতী সমাজের অনুকরণে অনুষ্ঠিত চায়ের আসর বাঙ্গালীগৃহে পরিণত হ'ল। ভাষাতেও বাঙ্গালীত্ব ফুটে উঠলো।

তিনি বললেন—শুনবে বাবা, আমার নিজের কথা? বাঙ্গালীর মধ্যে দেবতা আছে, দৈত্য আছে। ওপর নীচে সব জাতির মাঝে অমন সব লোক থাকে। কিন্তু সাধারণ বাঙ্গালীর কথায় কাজে কোনো মিল নেই।

এ-কথার কেহ প্রতিবাদ করলে না।

তিনি বললেন—ধর পণপ্রথা, সবাই এর বিপক্ষে কথা বলে, কিন্তু শুনেছি, সুবিধা পেলেই আমাদের দেশের লোক ছেলের বিয়েতে টাকার থলি নিয়ে বসে, মেয়ের বাপও টাকা দেবার জন্যে সর্ব্বস্বান্ত হন। আমার বিয়েতে আমার বাবার সামান্য যা কিছু ছিল, আমার শ্বশুর দুহে নিয়েছিলেন।

সে-দিন মিঃ পার্থসারথি ঘরে ছিলেন না। বিনয় বললে—সে-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে মাদ্রাজ। বেচারা বাঙ্গালী—

বাধা দিয়ে শ্রীমতী বিজয়া বললেন—ওঃ! ভুলে গেছি। লজ্জাই বা কি? তোমরা ছেলের মত। আমার বাঙ্গালীর ঘরে বিয়ে হ'য়েছিল। বিধবা হ'লাম অল্প বয়সে। সবাই স্থির করলে আমার মন্দ ভাগ্যই আমার স্বামীর মৃত্যুর কারণ। আমার উপর নির্য্যাতন সুরু হ'ল। শ্বশুর উকীল। ছোটো সহরে কংগ্রেসের নেতা। স্ত্রী-শিক্ষার প্রধান উদ্যোগী। কিন্তু ঘরে বধূ-নির্য্যাতন বন্ধ করবার ক্ষমতা ছিল না। আমার শাশুড়ীর প্ররোচনায় আমার মুখ অবধি দেখতেন না। হ্যাঁ বাবা! তোমরা ভদ্র-সন্তান, এ-সব কথা কমল যেন না শোনে।

বিনয় বল্লে—আমাদেরই বা শোনবার কারণ কি।

তুলসীর দিকে তাকিয়ে কমলের মা বল্লেন—শোনা ভাল।

অগত্যা শুনতে হ'ল।

তিনি বললেন—আমার মূল্য নির্দ্ধারিত হ'ল শ্বশুরের বিচারে যেদিন আমি পাশের বাড়ীর এক যুবকের সঙ্গে পালালাম। পালালাম—কুল ত্যাগ ক'রে, কুলে কালি দিয়ে। কিন্তু পালিয়েছিলাম—পেটের দায়ে, প্রাণের দায়ে, স্বাধীনতার লোভে। লোকটা ভালবাসে, সে কথাও বিশ্বাস ক'রেছিলাম। কিন্তু সেও ছিল বাঙ্গালী। সেদিন আমি হ'লাম শ্বশুর ম'শায়ের প্রসঙ্গের উপযোগী। কারণ, নিশ্চয়ই তিনি হিন্দু-ধর্ম্ম, কলি কাল, নারীজাতি দেবী এবং মন্দানারী রাক্ষসী—এ কথা আলোচনা করলেন সবার সঙ্গে।

নরেশ বললে—আপনি মার মত। এ-সব কথা শুনে আমাদের কি লাভ?

তিনি আবার তুলসীর দিকে তাকিয়ে বললেন—সত্য বলতেই বা কি ভয়? কমল জানে না। কিন্তু সে কোন্ কুলের মেয়ে তা' জানাচ্ছি। আমার আজ লজ্জা নাই। কারণ, সত্য লজ্জার ধার ধারে না।

মহিলা উত্তেজিত হ'য়েছিলেন। বন্ধুরা উঠতে পারলে না। তিনি সংক্ষেপে বললেন জীবনকথা। তাঁর গৃহত্যাগের পর শ্বশুর পুলিশে খবর দিলেন। যে বাড়ীতে তিনি সেই লোকটির সঙ্গে বাস ক'রছিলেন সেখানে যখন পুলিশ এলো, বন্ধু বিজয়াকে ফেলে পালালো। পুলিশ পলাতকাকে ধরলে, একটা আশ্রমে রাখলে। কিন্তু তার বয়স ১৮ বছরের কিছুদিন বেশী, তাই মোকদ্দমা চললো না।

শ্রীমতী বললেন—এইবার আসল কথা। যখন আমার প্রেমিক, জেলে গেল না, আমার শ্বশুরের কোনো স্বার্থ রইল না আমার সম্পর্কে, আমার কেরাণী দাদা ব'লে পাঠালেন, তাঁর গরীবের ঘরে আমার স্থান নাই, তাঁর ছেলেপিলের ভবিষ্যত আছে আমার প্রেমিকের উক্তি হ'তে বুঝেছিলাম যে, তিনি আমার জন্য ছাদ থেকে তে-কাঁটা মনসার ঝোপে লাফাতে পারতেন, এবং আমার আজ্ঞায় গোখরো সাপের লেজ দিয়ে কান চুলকাতে পারতেন। তিনি এখন বুঝলেন যে, একটা পতিতার জন্য নিজের বংশের মান-ইজ্জত নষ্ট করা অবিধেয়। রাগ কোরো না বাবা। আমায় ঘৃণা ক'রো না। হয়তো কুলে থেকে, নির্য্যাতিত হ'য়ে বৈধব্যের সম্ভ্রম বাড়ানো আমার ধর্ম্ম ছিল। কিন্তু আমার মন চাচ্ছিল স্বাধীনতা। ঘৃণা করতে পার—সমাজের চোখে আমি ঘৃণিত, কিন্তু সমাজ মানুষ নিয়ে। সে ব্যভিচারীকে সহ্য করে। কিন্তু ব্যভিচারিণীর ব্যবস্থা, মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢালা।

নরেশ বললে—আপনি অমন কথা কেন বলছেন?

বিনয়ের কবিতার উৎস শুকিয়ে গিয়েছিল। সে গম্ভে বললে—

সমাজের নিরর্থক বিধানের চেয়ে মানুষ বড়। বিধবা-বিবাহ শাস্ত্র-সম্মত। অপর সমাজের সেইটাই ব্যবস্থা।

তিনি বল্‌লেন—ওঃ! শেষ কথাটা বলি। বিধবা-বিবাহের কথা। সেই আশ্রমে একদিন দেশের এক প্রসিদ্ধ নেতা এলেন। তিনি অনেককে প্রশ্ন করলেন। আমাকে বললেন—তুমি কি করতে চাও? যে কোনো বিদ্যা শিখতে চাও আশ্রম শেখাবে। আমি কিন্তু চাই সংসার করতে। তাঁকে বল্‌লাম—বিদ্যা শিখবো, কাজ করবো, আর লোকে আমার পতি হবার সংসাহস না দেখিয়ে, আমার প্রেমিক হবার জন্য জ্বালাতন করবে। আমি এই অল্পদিনে অনেক শিখেছি। আপনি দেবতা, তাই লজ্জার মাথা খেয়ে বলছি—আমি বিবাহ ক'রে গৃহস্থালী করতে চাই। তাতে আমার ব্যক্তিত্ব ফুটবে, হয়তো সম্ভ্রান্ত হব। কিন্তু আমি বুঝি যে, আমার সমাজে আমায় নেবার লোক নাই বৈধভাবে।

বোধ হয়, মহিলার একটু লজ্জা হ'ল। তিনি ম্লান হাসি হাসলেন। বল্লেন—আজ আমি পাগল। কিন্তু কেন পাগল শুনবে। রাগ করবে না বাবারা? তোমরা দেশের ছেলে—বিবেকানন্দের, দেশবন্ধুর দেশের ছেলে, বিদ্যাসাগরের দেশের ছেলে। যদি বোনের মত না দেখতে পার কমলকে, তবে ওর সঙ্গে খেলা ক'রো না। ওকে বাঁচাবার জন্য তোমাদের কাছে এ কলঙ্ক-কথা বলছি। ও মানুষ, খেলার পুতুল নয়।

বিনয় কথা পাল্‌টাবার জন্য বললে—মিঃ পার্থসারথির সঙ্গে—

তিনি বাধা দিয়ে বললেন—তিন দিন পরে আশ্রমের অধ্যক্ষ আমাকে সেই মহাপ্রাণের বাড়ী নিয়ে গেলেন। সেখানে উনি ব'সে ছিলেন। দেশনায়ক বললেন—বিজয়া, এই মাদ্রাজী ভদ্রলোক সম্প্রতি বিলাত থেকে এসেছেন। ইনি বিধবা-বিবাহে সম্মত। ব্রাহ্ম মতে বিবাহ হ'তে পারে রেজিষ্ট্রি ক'রে। ইনি হিন্দী বল্‌তে পারেন। তুমি কথা কও। আমাদের আলাপের কথা তোমরা ছেলে না শুনলে। সেই দেবতার চরণধূলা নিয়ে আমরা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েছি, তাঁর আশীর্ব্বাদে বুঝেছি পৃথিবী স্বর্গ।

যখন এই গল্পের আবর্ত্তে নরেশ এবং বিনয় দিশাহারা, হঠাৎ উল্‌টা তুলসী এক কাণ্ড করলে। সে শ্রীমতীর পায়ে হাত দিলে। তারপর আবেগের সাথে বললে—মা, আমি সেই মহামানবের নাম নিয়ে বলছি—আমি কমলকে ভালবাসি। আমি দেখাতে চাই বাঙালীর মধ্যে মানুষ আছে। আমার মা-বাপ উদার। তাঁরাও তাকে বুকে নেবেন প্রকৃত ধর্ম্মের মুখ চেয়ে, সমাজের আসল উন্নতির জ্য। আমি তাকে রাণীর সম্মান দেবো। মা, আমায় জামাই কর। কমলের সম্মতি পাব নিশ্চয়।

এবার নরেশ আর বিনয় বুঝলে শ্রীমতী বিজয়ার দূরদৃষ্টির আয়তন। তা'রা আরও বুঝলে যে, সত্যই তুলসী উল্টা পথের পথিক।

গান

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

তুমি কোথায়, তুমি কোথায়?
বুকের বীণাতে দুখের রাগিণী
বাজে শুধু নিরাশায়!
আম্রমুকুল-গন্ধে ভ'রেছে দিক্,
কুঞ্জকাননে গাহিতেছে ঐ পিক,
তোমারি বারতা বহিয়া বাতাস
অঙ্গে বুলায়ে যায়।
তুমি কোথায়?

তোমার আশায় কেটে গেছে কত দিন;
(কত) দীর্ঘ রজনী কেটেছে নিদ্রাহীন!
ফুলে-ফুলে সাজি গাঁথিল তোমার মালা,
প্রকৃতি সাজালো তোমার বরণডালা;
তব পথ আজি ঢেকে দিল তরু
নব পল্লব ছায়।
তুমি কোথায়?

শিক্ষার ক্ষেত্র হইতে সংস্কৃত বিতাড়নের অপপ্রচেষ্টা

ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী, এম-এ, ডি-ফিল (অক্সন) [অধ্যাপিকা, লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজ]

(শেষাংশ)

তৃতীয় আপত্তি—কলেজে সংস্কৃত ছাত্রবল্লভ নহে, অতএব স্কুলে ইহা বাধ্যতামূলক করিবার প্রয়োজন কি ?

প্রবেশিকা পরীক্ষা হইতে বাধ্যতামূলক সংস্কৃত উঠাইয়া দিবার পক্ষপাতিগণের তৃতীয় আপত্তি এই যে,"প্রবেশিকা পরীক্ষায় যে সকল ছাত্র সংস্কৃতে উচ্চ নম্বর পায়, তাহারাও অধিকাংশই ইণ্টারমিডিয়েটে সংস্কৃত: ছাড়িয়া দেয়।" তাঁহারা বলেন, "এই সব বুদ্ধিমান্ ছেলেদের শতকরা নব্বই জন I. Sc. পড়ে—নয় ত I. A.-তে সংস্কৃত ছাড়িয়া দেয়। ক্রমে তাহারা সংস্কৃতের প্রত্যেক বর্ণ-টী ভুলিয়া যায়। ম্যাট্রিকে অনেক মার্ক পাইয়া Division এ উঠাটাই তাহাদের লাভ। এজন্য অন্যান্য প্রদেশে হয় সংস্কৃতকে optional, additional subject অথবা বিজ্ঞানের বিকল্প স্বরূপ রাখা হইয়াছে। যে ছাত্র কলেজে গিয়া বিজ্ঞানকেই প্রধান অধ্যেতব্য করিয়া তুলিবে, তাহার পক্ষে গণিত যেমন অপরিহার্য্য, সংস্কৃত তেমনি পরিহার্য্য। ম্যাট্রিকে সংস্কৃতে অনেক মার্ক পাইয়াও যে সকল ছাত্র কলেজে গিয়া সংস্কৃত ছাড়িয়া দেয়, তাহাদের যুক্তি এই—"অন্যান্য পাঠ্য বিষয়গুলির সঙ্গে সংস্কৃতের অঙ্গাঙ্গি যোগ নাই।" অর্থাৎ, এই মতানুসারে, ম্যাট্রিকে সংস্কৃত বাধ্যতামূলক বলিয়া ছাত্রগণ নিরুপায় হইয়া 'যেন তেন প্রকারেণ' "অন্ধকারে ঢিল মারিয়াই" হউক, অথবা "ব্যাকরণের খুটিনাটি মুখস্থ এবং Test Paper এর প্রশ্নগুলির উত্তর তৈরী করিয়াই" হউক, 'পাশের মার্ক ও উচ্চ 'ডিভিসন' লাভ করে। কিন্তু কলেজে আসিয়া এই বিষয়ে স্বাধীনতা লাভ করিয়াই অধিকাংশ ছাত্রই সংস্কৃত ছাড়িয়া 'হাঁপ' ছাড়িয়া বাঁচে, এবং জোর করিয়া গেলান সংস্কৃতের সবটুকুই নিঃশেষে ভুলিতে পারিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। অতএব, ছাত্রগণকে ম্যাট্রিকে এইরূপে জোর করিয়া ধরিয়া সংস্কৃত শেখান কেবলই পণ্ডশ্রম, কেবলই অযথা সময়, শক্তি ও অর্থব্যয় নহে কি ? অতএব, ছাত্রদের এই সাধারণ মতিগতি অনুসারে প্রবেশিকাতেও সংস্কৃতকে বাধ্যতামূলক না করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

(১) এস্থলে আমাদের প্রথম বক্তব্য এই যে, প্রবেশিকা (অথবা অন্যান্য পরীক্ষার) পাঠ্যসূচী ছাত্রগণের বর্ত্তমান ইচ্ছা বা ভবিষ্যৎ মতিগতি অনুসারে স্থিরীকৃত হয় না, কিন্তু শিক্ষাতত্ত্ববিদ্‌গণ যে সকল বিষয় ছাত্রগণের সর্ব্বাঙ্গীণ মানসিক উন্নতির জন্য অবশ্য প্রয়োজন মনে করেন, তাহাই বাধ্যতামূলক করা হয়, ছাত্রগণ তাহা বর্ত্তমানে পছন্দ, অথবা ভবিষ্যতে কলেজে গ্রহণ করুক বা নাই করুক। যথা, যে ছাত্র কলেজে গিয়া কেবল বিজ্ঞানই পড়িবে, তাহার - পক্ষে বাংলাসাহিত্য বা ইতিহাস পড়িবার ত বিশেষ কোনই প্রয়োজন নাই, এবং বিজ্ঞানানুরাগী বহু ছাত্র বাংলা ও শুষ্ক ইতিহাস পাঠ করিতে বিশেষ উৎসাহী বা ইচ্ছুকও নহে।' তথাপি, ইতিহাসকে ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত এবং বাংলাকে ইণ্টারমিডিয়েট পর্য্যন্ত বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে কেবল এই সকল বিষয়ের অবশ্য প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই। সেই একই কারণে সংস্কৃত ম্যাট্রিকে ছাত্রবল্লভ না হইলেও (ইহার প্রকৃত কারণ উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে), এবং অল্পসংখ্যক ছাত্রই 'ইণ্টারমিডিয়েট' সংস্কৃত গ্রহণ করিলেও, সংস্কৃত পাঠের অবশ্য-প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই সংস্কৃতকেও অন্ততঃ প্রবেশিকা পরীক্ষাতে বাধ্যতামূলক রাখা অত্যাবশ্যক। এ স্থলে প্রধান প্রশ্ন এই যে, সংস্কৃত শিক্ষা সত্যই ছাত্রগণের পক্ষে অত্যাবশ্যক কি না ? বর্ত্তমানে একদল শিক্ষা-তত্ত্ববিদ্‌গণ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, বাংলা, ইতিহাস প্রভৃতি সম্বন্ধে অল্পবিস্তর জ্ঞান সকলের পক্ষেই অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া ইহাদের জন্য উন্নত শিক্ষাপ্রণালী উদ্ভাবন, উচ্চবেতনে উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ প্রভৃতি নানারূপ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু "মৃতা" সংস্কৃত ভাষার জন্য সেরূপ কিছুরই বিন্দুমাত্রও প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই মত যে কতদূর ভ্রান্ত ও অনিষ্টজনক, তাহা বলা অসম্ভব। শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যে সংস্কৃত ভাষা সমগ্র ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার সাক্ষাৎ বাহন, তাহাকেই নিষ্প্রয়োজন বলিয়া অবহেলা ও পরিবর্জ্জন করার ন্যায় আত্ম-বিধ্বংসী দুর্ম্মতি ও অপপ্রচেষ্টা জাতির চরম দুর্গতিরই হেতু। বাংলা-ভাষা-শিক্ষার দিক্ হইতে, আমাদের প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপের দিক্ হইতে, উচ্চ ধর্ম্ম ও দর্শনের দিক্ হইতে, এমন কি বিজ্ঞান ও কার্য্যকর শিল্পের দিক্ হইতেও যে সংস্কৃতশিক্ষা সকলের পক্ষেই অপরিহার্য্য, তাহা পূর্ব্বেই বিশদভাবে দর্শিত হইয়াছে।২ সে-স্থলে ছাত্রগণ সংস্কৃতপাঠে অনিচ্ছুক বলিয়াই যে সংস্কৃতকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাধ্যতামূলক না করিয়া ইচ্ছামূলক করিতে হইবে, ইহা যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের বুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না।

(২) অন্যান্য সকল প্রদেশে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃতকে Optional, additional subject অথবা বিজ্ঞানের বিকল্পস্বরূপ রাখা হইয়াছে কি না, তাহা আমাদের জানা নাই। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে ইহা যে অতীব দুঃখেরই বিষয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কাজেই এ-বিষয়ে অন্যান্য প্রদেশের অনুকরণ করা বাংলাদেশের কোনোক্রমেই উচিত নহে।

(৩) "যে ছাত্র কলেজে গিয়া বিজ্ঞানকেই প্রধান অধ্যেতব্য করিবে, তাহার পক্ষে গণিত যেমন অপরিহার্য্য, সংস্কৃত তেমনি পরিহার্য্য"—এই কথার সত্যতা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। গণিত অবশ্য তাহার পক্ষে কেন, সকলের পক্ষেই অবশ্য পাঠ্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু বিজ্ঞানশিক্ষার্থী ছাত্রের পক্ষেও সংস্কৃত "তেমনি পরিহার্য্য" হইবে কেন ? আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত অবশ্য সংস্কৃতের সাক্ষাৎ কোনো সম্বন্ধ নাই, সত্য। কিন্তু সম্বন্ধ নাই বলিয়াই যে সংস্কৃত সম্পূর্ণ পরিহার্য্য সেরূপ ত' কোনোরূপেই বলা চলে না। উপরন্তু, সম্বন্ধ নাই বলিয়াই বিশেষভাবে সংস্কৃত পাঠের আবশ্যকতা আছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে, যন্ত্র-

(১) এই প্রবন্ধে খণ্ডিত যুক্তিসমূহ কবিশেখর কালিদাস রায় লিখিত "প্রবেশিকার পাঠ্যসূচী নামক প্রবন্ধ হইতে গৃহীত। [illegible]' Journal, August 1945, (২) "সংস্কৃতের যোগ"; প্রবাসী, কার্ত্তিক ১৩৫২।

প্রধান, জড়বাদের যুগে অবশ্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অত্যাবশ্যক, সন্দেহ নাই। কিন্তু বিজ্ঞান ও বাণিজ্যের খাতিরে সংস্কৃতি ও সভ্যতায় জলাঞ্জলি নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় নহে। তজ্জন্য, বিজ্ঞান-পাঠেচ্ছু ছাত্রকে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার বাহন দেবভাষা সংস্কৃতের সহিত কিছু পরিচয় করাইয়া দেওয়া বিশেষভাবে বাঞ্ছনীয়। ছাত্রছাত্রীগণকে কেবল বিজ্ঞানশিক্ষার জন্য প্রস্তুত করিলে আমাদের শিক্ষা নিশ্চয়ই অসম্পূর্ণই থাকিয়া যাইবে। দেশের নিজস্ব কৃষ্টির বিষয়ে সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভও শিক্ষার অন্যতম প্রধান অঙ্গ।

(৪) কেহ কেহ এস্থলে আপত্তি উত্থাপিত করিতে পারেন যে, প্রবেশিকাপরীক্ষার বাধ্যতামূলকভাবে, 'ধরিয়া বাঁধিয়া' সকলকেই সংস্কৃত শিখাইবার চেষ্টা করিলে লাভ কিছুই হয় না, যে-হেতু পরে কলেজে প্রবেশ করিয়াই অধিকাংশ ছাত্রই সংস্কৃত ছাড়িয়া দেয় এবং ক্রমে সংস্কৃতের প্রত্যেক বর্ণটীও ভুলিয়া যায়। ইহার উত্তরে আমরা বলিব যে, অবশ্য ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, অধিকাংশ ছাত্রই সংস্কৃত অনেকটা ভুলিয়া যায়। কিন্তু পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ছাত্রেরা পরে কোন্ বিষয় ভুলিয়া যাইবে, সেই অনুসারে ত প্রবেশিকার পাঠ্যসূচী প্রস্তুত করা হয় না। যাহা অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয়, তাহাই অবশ্য পাঠ্য করা হয়, ভবিষ্যতে সেই সকল বিষয় ছাত্রগণ যেরূপভাবেই ব্যবহার করুক না কেন। বিজ্ঞানের ছাত্রগণ ইতিহাস প্রভৃতির প্রায় সবটুকুই বিস্মৃত হয়। অপর পক্ষে, কলাবিভাগের অনেকেই গণিত পরিত্যাগ করিয়া বীজগণিত ও জ্যামিতির প্রতি অক্ষর ভুলিয়া যায়। কিন্তু সেজন্য ত কেহ ইতিহাস, গণিত প্রভৃতিকে বাধ্যতামূলক স্তর হইতে ইচ্ছামূলক স্তরে অবনত করিতে উৎসুক ন'ন। আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির বাহন সংস্কৃতের জ্ঞান ছাত্রগণের পক্ষে অত্যাবশ্যক বলিয়াই অন্ততঃ প্রবেশিকা পর্য্যন্ত ইহাকে বাধ্যতামূলক রাখিতেই হয়, ভবিষ্যতে যাহাই ঘটুক না কেন। পুত্র বড় হইয়া পরে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে বলিয়াই যে পিতা শাসনাধীন পুত্রকেও শাসন করিবেন না, অথবা মনোমত শিক্ষা দিবেন না—তাহার ত কোনই কথা নাই। ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

(৫) বস্তুতঃ স্কুল-কলেজের ছাত্রগণের সংস্কৃতের প্রতি বিরাগের কারণ অনেক। একটা প্রধান কারণ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে—অর্থাৎ সংস্কৃতশিক্ষাপ্রণালীর দোষ। কলেজে অবশ্য স্কুল অপেক্ষা এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ উন্নতি সাধিত হয় বলিয়াই বিশ্বাস। কিন্তু তথাপি যে ছাত্র প্রবেশিকাতে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রণালীর অভাবে সংস্কৃতের প্রতি সকল অনুরাগ হারাইয়াছে, সাধারণতঃই সে পুনরায় সংস্কৃতে কোনো 'রসকস' খুঁজিয়া পায় না। যাহারাও বা সংস্কৃতের প্রতি যথার্থই অনুরাগী, তাহারাও অর্থনৈতিক কারণের জন্য সংস্কৃত পাঠে আগ্রহশীল হয় না। বর্ত্তমানে দেশে সংস্কৃতের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষ ও জনসাধারণের অবহেলা এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, চাকুরীক্ষেত্রে ও সমাজে সংস্কৃতাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের কোনোরূপ আশা বা সম্মান নাই। ইংরাজী, গণিত, অর্থনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি পাঠ করিলে উচ্চ পদপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে বলিয়া, এবং সং স্কৃত পাঠ করিলে সে সকলের কিছুরই আশা নাই বলিয়া, অনেকে ইচ্ছা থাকিলেও সংস্কৃত পাঠ করিতে পশ্চাৎপদ হয়। অপরপক্ষে, সমাজে সংস্কৃতাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ "টুলো পণ্ডিত" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া উপহাসাস্পদ হন মাত্র। এইরূপে, সর্ব্বদিক্ হইতেই সংস্কৃতের চর্চ্চা ও পঠন-পাঠন নানাভাবে ধ্বস্তবিধ্বস্ত হইতেছে। সে-ক্ষেত্রে ছাত্রগণ স্বভাবতঃই সংস্কৃতের প্রতি সকল শ্রদ্ধা ও অনুরাগ হারাইয়াছে।

(৬) "ম্যাট্রিকে সংস্কৃতে অনেক মার্ক পাইয়াও যে-সকল ছাত্র কলেজে গিয়া সংস্কৃত ছাড়িয়া দেয়, তাহাদের যুক্তি এই যে, অন্যান্য পাঠ্য বিষয়গুলির সঙ্গে সংস্কৃতের অঙ্গাঙ্গী যোগ নাই"—এই যুক্তির তো কোনো অর্থ হয় না। প্রথমতঃ সংস্কৃতের সহিত অন্যান্য, বিষয়গুলির অঙ্গাঙ্গী যোগ না থাকিলেও তাহাই ছাত্রগণের সংস্কৃত বর্জ্জনের কারণ, ইহা তো বলা যায় না। কারণ, এমন অনেক বিষয় বহু ছাত্রই গ্রহণ করে, যাহাদের ভিতর অঙ্গাঙ্গী কোনোই যোগ নাই। যথা, বহু কলাবিভাগের ছাত্রই গণিত, ন্যায়শাস্ত্র (লজিক), ইতিহাস ও উদ্ভিদ্‌বিদ্যা একত্রে গ্রহণ করে। এই বিষয়গুলির মধ্যে অঙ্গাঙ্গী তো দূরে থাকুক, কোনরূপ যোগসূত্রই নাই—অথচ এই বিষয়গুলি অতি ছাত্রপ্রিয়। অতএব সংস্কৃতের সহিত অপর পাঠ্য বিষয়গুলির অঙ্গাঙ্গী যোগ নাই বলিয়াই যে ছাত্রগণ সংস্কৃত পরিবর্জ্জন করে, ইহা বলা ভুল। দ্বিতীয়তঃ, যদি অঙ্গাঙ্গী যোগের কথাই বলা যায়, তাহা হইলেও মাতৃভাষা বাংলার সহিত সংস্কৃত যে অতি নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ তাহা পূর্ব্বেই বহুবার বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ সংস্কৃত ছাত্রবল্লভ না হওয়ার প্রধান দুইটি কারণ—সংস্কৃত শিক্ষাপ্রণালীর অসম্পূর্ণতা এবং সমাজে সংস্কৃত ডিগ্রির মূল্যহীনতা। এই দুই কারণই বিদূরিত করিবার জন্য সমাজসেবী মাত্রেরই অবিলম্বে অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য।

চতুর্থ আপত্তি—অল্প সংস্কৃতজ্ঞান মূল্যহীন

প্রবেশিকা পাঠ্যসূচী হইতে সংস্কৃতের পরিবর্জ্জন বা পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতিগণের চতুর্থ আপত্তি—"সংস্কৃত এমনি বিষয় যে উহাতে ভাসা ভাসা পল্লবগ্রাহিতার বা যৎসামান্য পরিচয়ের কোনো মূল্য নাই। Pope-এর কথায় Drink deep or taste not the Pierian spring." অর্থাৎ ছাত্রগণকে প্রবেশিকা পর্য্যন্ত যে সংস্কৃত শিক্ষা করিতে হয়, তাহা যৎসামান্য। অতএব, সংস্কৃতকে বাধ্যতামূলক করিবার কোনোই অর্থ নাই।

(১) প্রথমতঃ, এস্থলে আমাদের প্রশ্ন এই যে, সংস্কৃত ব্যতীত অন্যান্য কোনো বিষয়েই কি "ভাসা ভাসা পল্লবগ্রাহিতার" কোনরূপ মূল্য আছে যে, "সংস্কৃত এমনি বিষয়" বলিয়া বিশেষভাবে কেবল সংস্কৃতেরই উল্লেখ করা হইল? A little learning is a dangerous thing. Drink deep or taste not the Pierian spring"—কবির এই সাবধান বাক্য সকল বিষয় সম্পর্কেই প্রযোজ্য, কেবল সংস্কৃত সম্বন্ধে নিশ্চয়ই নহে।

(২) দ্বিতীয়তঃ, প্রবেশিকা স্তরে সুকুমারমতি বালক-বালিকাগণকে অল্পের মধ্যে, সংক্ষেপে, সহজ সরলভাবে, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম

প্রপঞ্চনা বর্জ্জন করিয়া 'মোটামুটী' সাধারণ জ্ঞান দানের যে প্রচেষ্টা করা হয়, তাহাকে তো little learning"-রূপে "dangerous" বা মূল্যহীন বলা কোনোক্রমেই চলে না। সংক্ষিপ্ত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশেষবর্জ্জিত হইলেই যে "ভাসা ভাসা পল্লবগ্রাহিতা" হইয়া পড়ে, এরূপ কোনোও কথা নাই। বস্তুতঃ, প্রবেশিকা-পরীক্ষার্থিগণের পক্ষে ইহার অপেক্ষা অধিক "learning" সম্ভবপরই নহে। প্রবেশিকায় ১০০ নম্বরের গণিত, ইতিহাস ও ভূগোল পাঠ করিয়া পরে এই সকল বিষয় সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিলে যদি সেই সকল ছাত্রের গণিত, ইতিহাস ও ভূগোল জ্ঞানকে "ভাসা ভাসা পল্লবগ্রাহিতা" বা "যৎসামান্য পরিচয়" বলিয়া নাসিকাকুঞ্চন করা না হয়, তাহা হইলে ১০০ নম্বরের সংস্কৃত পাঠের পর কলেজে সংস্কৃত ছাড়িয়া দিলে, পূর্ব্বলব্ধ সংস্কৃত জ্ঞান কেন "ভাসা ভাসা পল্লবগ্রাহিতা" বা "যৎসামান্য পরিচয়" বা "dangerous thing" বলিয়া অবজ্ঞেয় হইবে, তাহা বুঝা দুষ্কর।

(৩) বস্তুতঃ, সংস্কৃত ভাষা সুকঠিন হইলেও, সংস্কৃত সাহিত্য অতি বিশাল হইলেও, প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১০০ নম্বরের পেপারের মধ্য দিয়াও এরূপ সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব, যাহা "ভাসা ভাসা পল্লবগ্রাহিতা" একেবারেই নহে। প্রথমতঃ, সংস্কৃত ব্যাকরণের কথা ধরা যাক। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রণীত "ব্যাকরণ-কৌমুদীর" মূল নিয়মাবলী প্রবেশিকা পরীক্ষার ছাত্রেরা পড়িয়া থাকে। এই নিয়মগুলি একবার ভাল করিয়া বুঝিয়া কণ্ঠস্থ করিলে, বহু ক্ষেত্রে যথেষ্ট উপকারে লাগিবে। দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃত সাহিত্যের সুবিশাল রত্নখনি হইতে উপযুক্ত নির্ব্বাচন করিয়া কয়েকজন কবি ও লেখকগণের সরল রচনার সহিত ছাত্রগণকে পরিচিত করিয়া দিলে তাহারা সংস্কৃতের রচনাভঙ্গীর সম্বন্ধে সাধারণভাবে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে। এইরূপে, প্রবেশিকা পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত সংস্কৃত সীমাবদ্ধ হইলেও, "ভাসা ভাসা" হইবার কোনই কারণ নাই।

(৪) প্রকৃতপক্ষে, প্রবেশিকায় উত্তমরূপে সংস্কৃত চর্চ্চা না করিলেও, সেই অধীত বিদ্যা সম্পূর্ণ নিষ্ফলা হয় না বলিয়াই আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস। ছাত্রগণ ভবিষ্যৎ জীবনে সংস্কৃত শব্দরূপ, ধাতুরূপ বিস্মৃত হইলেও, তাহাদের পূর্ব্বার্জ্জিত সংস্কৃত জ্ঞান জ্ঞাতে অজ্ঞাতে তাহাদের ভাষার দিক্ হইতে বহু সাহায্যই করে, নিঃসন্দেহ।

পুনরায়, বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, যৌবনে ছাত্রজীবনে সংস্কৃতের প্রতি সম্পূর্ণ বীতশ্রদ্ধ হইলেও, পরে পরিণত বয়সে অনেকেই সংস্কৃত চর্চ্চার সমধিক আগ্রহশীল হন, এবং জাতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা জানিতে সমুৎসুক হন। সেক্ষেত্রে, প্রবেশিকায় উত্তমরূপে সংস্কৃত জ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হইলে, পরবর্ত্তী জীবনে বহুল উপকার সাধিত হয়। সেই জন্য, প্রবেশিকাতেও যে সংস্কৃতজ্ঞান লাভ হয়, তাহা "যৎসামান্য" হইলেও "ভাসা ভাসা" এবং সেই হেতু মূল্যহীন হইবার কোনই কারণ নাই। "ভাসা ভাসা" ও মূল্যহীনতার অজুহাতে সংস্কৃত বিতাড়নের প্রচেষ্টা না করিয়া যাহাতে প্রবেশিকায় সংস্কৃত শিক্ষা এইরূপে "ভাসা ভাসা" না হয়, তাহার জন্যই চেষ্টা করা উচিত।

পঞ্চম আপত্তি—সংস্কৃত শিক্ষায় অধিকার ভেদ

প্রবেশিকা পরীক্ষার অবশ্যপাঠ্য-তালিকা হইতে সংস্কৃতের নাম-গন্ধ বর্জ্জনাভিলাষিগণের পঞ্চম আপত্তি এইরূপ—"যাহাই হউক, আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির পরিচয় পাইতে হইলে সংস্কৃত জ্ঞানের প্রয়োজন আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কেবল পরীক্ষা পাশের একটী বিষয়রূপে ইহার স্থান কি হওয়া উচিত, সুধীগণের বিবেচ্য। অনেকেই ইহাকে optional subject রূপে স্বীকার করিতে রাজী। ইঁহারা একটা অদ্ভুত বা বিজাতীয় ধরণের কথা বলিতেছেন না। সংস্কৃত শিক্ষা সম্বন্ধে যে অধিকারিভেদ এদেশে চিরপ্রচলিত ছিল, সেই অধিকারিভেদের কথাই প্রকারান্তরে বলিতেছেন।"

(১) আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির পরিচয় পাইতে হইলে সংস্কৃত জ্ঞানের প্রয়োজন যদি নিঃসন্দিগ্ধরূপে সত্যই হয়, তাহা হইলে সেই সংস্কৃতকেই পুনরায় শিক্ষার ক্ষেত্র হইতে পরিবর্জ্জন বা পরিবর্ত্তনের প্রচেষ্টা কি ঘোরতর অন্যায় মাত্রই নহে? জাতীয় সংস্কৃতির পরিচয় আমাদের অন্যতম প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় হওয়া নিশ্চয়ই কর্ত্তব্য। "ওরে বাছা! মাতৃকোষে রতনের রাজি, এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি?"—এই হইয়াছে আমাদের বর্ত্তমানে দুর্দ্দশা! দেশ-বিদেশের মহাপণ্ডিতগণ আমাদের অতি নিজস্ব সংস্কৃত রত্নখনির মুক্তাসমূহ সযত্নে আহরণ করিয়া নিজেদের ধন্য মনে করিতেছেন। আমরা কিন্তু ভিক্ষাপাত্র হস্তে পরের দুয়ারেই বৃথা ঘুরিয়া মরিতেছি—এমন কি, ইংরাজী ভাল করিয়া না জানিলে মাতৃভাষা পর্য্যন্ত ভাল লিখিতে পারিব না তাহা পর্য্যন্ত মনে করিতেছি। হায় রে কপাল! এইরূপে দাস-মনোভাবের চরম শিখরে আরোহণ করিয়া আমরা ইংরাজীপূজার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির বাহন দেবভাষা সংস্কৃতেরও চিরনির্ব্বাসন-দণ্ড বিধান করিতেছি।

(২) যদি বলা হয় যে, সংস্কৃতকে প্রকৃত শিক্ষার ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত না করিয়া কেবল প্রবেশিকা প্রভৃতি পরীক্ষার ক্ষেত্র হইতেই অবশ্যপাঠ্যরূপে নির্ব্বাসিত করা হইতেছে—তাহার উত্তর এই যে, কোনোদেশেই প্রকৃত শিক্ষার ক্ষেত্রকে পরীক্ষার ক্ষেত্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিয়া রাখা অদ্যাপি সম্ভবপর হয় নাই—আমাদের দেশে ত কথাই নাই। সকল দেশেই অদ্যাপি বাধ্যতা-মূলক পরীক্ষার মধ্য দিয়াই শিক্ষাদান-প্রণালী প্রচলিত আছে। 'ধরাবাঁধা' লিখিত বা মৌখিক পরীক্ষার দোষ অনেক, সন্দেহ নাই। কিন্তু একত্রে শিক্ষালাভকারী বহুসংখ্যক ছাত্রছাত্রীগণকে পাঠে নিয়োজিত করা, তাহাদের জ্ঞানের পরিমাপ করা, তাহাদের চাকুরীতে নিয়োগ করা, প্রভৃতি বিষয়ে অদ্যাপি পরীক্ষা অপেক্ষা শ্রেয়ান্ উপায় আবিষ্কৃত হয় নাই। সে ক্ষেত্রে, জনসাধারণের পক্ষে অন্ততঃ প্রথম জীবনে শিক্ষার ক্ষেত্র ও পরীক্ষার ক্ষেত্র একই। মৌখিক ও লিখিত পরীক্ষার ভিতর দিয়াই শিশু হইতে বালক, বালক হইতে যুবক ক্রমান্বয়ে অবশ্য-শিক্ষণীয় বিষয়ে ব্যুৎপত্তি

লাভ করে। সুতরাং, অন্যান্য সকল বিষয়েই যে নিয়ম সর্ব্বত্র প্রচলিত, সংস্কৃতের ক্ষেত্রেই তাহার ব্যতিক্রম হইবে কেন? অর্থাৎ সংস্কৃতের ক্ষেত্রেই কেবল শিক্ষা ও পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রভেদ করা প্রয়োজন কেন? বস্তুতঃ, জাতীয় সংস্কৃতির পরিচয়জ্ঞাপক রূপে সংস্কৃত আমাদের অবশ্যশিক্ষণীয় হইলেও, উহাকে বাধ্যতামূলক না করিয়া ইচ্ছামূলক করার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ত খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। সেই একই যুক্তিবলে কি সমভাবে বলা চলে না যে, গণিত বা বিজ্ঞান অবশ্যশিক্ষণীয় হইলেও ইচ্ছামূলকই না হয় থাক, বাধ্যতামূলক করার প্রয়োজনটা আর কি?

(৩) "কেবল পরীক্ষা পাশের একটী বিষয়রূপে" অবশ্য সংস্কৃতকে কেহই দেখিতে চাহে না। "কেবল পরীক্ষা পাশ" সংস্কৃতে কেন, অন্য কোনো বিষয়েই যে অবাঞ্ছনীয়, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু "কেবল পরীক্ষা পাশের" জন্যই সংস্কৃতপাঠ বাঞ্ছনীয় না হইলেও, পরীক্ষা পাশই যে সংস্কৃত হইতে উঠাইয়া দিতে হইবে—ইহাও ত' গ্রহণযোগ্য নহে। ইংরাজী, গণিত ও অন্যান্য সকল বিষয়ে বাধ্যতামূলক পরীক্ষাভীত ছাত্রছাত্রীগণ যে স্বেচ্ছায় কেবল জ্ঞানলাভের জন্যই সংস্কৃতপাঠে মনঃসংযোগ করিবে, এরূপ আশা এই মরজগতে যে কেহ করিতে পারেন, তাহা জানিতাম না। অতএব, অন্যান্য অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয়ের ন্যায়, সংস্কৃতের ক্ষেত্রেও বাধ্যতামূলক পাঠন ও পরীক্ষার ভিতর দিয়াই শিক্ষার্থিগণ প্রথম শিক্ষালাভ করে। এইরূপ বাধ্যতামূলক পাঠ বন্ধ করিয়া দিলেই স্বভাবতঃই সংস্কৃতজ্ঞানের প্রসার বহুল হ্রাস পাইবে এবং দেশে সংস্কৃতশিক্ষার যেরূপ দুরবস্থা, তাতে জননী দেবভাষা যে কেবল পরীক্ষার নহে, সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র শিক্ষার ক্ষেত্র হইতেই বিতাড়িতা হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

(৪) অধিকারিভেদের প্রশ্ন এস্থলে উত্থাপিত হয় কিরূপে, তাহাও ত' বুঝা দুষ্কর। সংস্কৃতকে ইচ্ছামূলক বিষয়ে পরিণত করার সঙ্গে এই অধিকারিভেদের সম্পর্কটাই বা কোথায়? প্রথমতঃ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাসম্বন্ধে যে আমাদের দেশে কোনোকালে অধিকারিভেদ ছিল, তাহা ত জানিতাম না। অধিকারিভেদ ছিল কেবল বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা সম্বন্ধেই, ভাষাশিক্ষা সম্বন্ধে নহে। সেই একই সার্ব্বজনীন সংস্কৃতভাষার মাধ্যমিকতায় ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতিগণ জ্ঞান, বিগ্রহ, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে জাতিধর্ম্ম অনুসারে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতেন।

দ্বিতীয়তঃ যদি "এদেশে চিরপ্রচলিত অধিকারভেদ"ই স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ত' "optional subject"-এর কোনো প্রশ্নই উঠে না। কারণ, অধিকারভেদে কোনোরূপ option বা ইচ্ছামূলক গ্রহণের স্থানই নাই: যাহার যে অধিকার তাহা শাশ্বত, জাতিগত ও জন্মগত বলিয়াই সাধারণতঃ গৃহীত হইত—ইচ্ছাগত, বা গুণগতরূপে নহে। ইচ্ছা করিলেই ব্রাহ্মণেতর জাতি ব্রাহ্মণের নিজস্ব অধিকার দাবী করিতে পারিতেন না। অতএব, "সংস্কৃত শিক্ষা সম্বন্ধে যে অধিকারিভেদ আমাদের দেশে চিরপ্রচলিত ছিল" সেই অধিকারিভেদের 'নজিরে' সংস্কৃতকে ইচ্ছামূলক বিষয়ে পরিণত করিলে ইহাই হইয়া দাঁড়াইবে যে, জাতি অনুসারে কোনো কোনো ছাত্রকে ইচ্ছা থাকুক বা নাই থাকুক, সংস্কৃত লইতেই হইবে; অপর পক্ষে, কোনো কোনো ছাত্রকে জাতি অনুসারে ইচ্ছা থাকিলেও সংস্কৃত পরিবর্জ্জন করিতেই হইবে। সুতরাং এদেশে চিরপ্রচলিত অধিকারিভেদের কথা এস্থলে উত্থাপন করাই ভ্রম।

তৃতীয়তঃ, যদি বলা হয় যে, এ-ক্ষেত্রে অধিকারিভেদের অর্থ কেবল ইহাই যে, যাহার সংস্কৃতের প্রতি অনুরাগ ও সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি আছে, যে কলেজেও সংস্কৃতকেই প্রধান অধ্যেতব্য করিবে, প্রবেশিকাতেও সেই কেবল সংস্কৃত গ্রহণ করিবার অধিকারী বা উপযুক্ত, অপরে নহে—তাহার উত্তর এই যে, সে ক্ষেত্রে এ-দেশে চিরপ্রচলিত অধিকারিভেদের কথা উল্লেখ করাই অন্যায়—কারণ এই চিরপ্রচলিত অধিকারিভেদ এবং এই অধিকারিভেদে আকাশ-পাতাল তফাৎ। পুনরায়, অধিকারিভেদের উপরিউক্ত নবসংজ্ঞা অনুসারে কেবল সংস্কৃত কেন, অন্যান্য বিষয়কেও ত' সমান ইচ্ছামূলক করা উচিত। যথা, যাহার গণিতের প্রতি অনুরাগ ও গণিতে ব্যুৎপত্তি আছে, যে কলেজেব গণিতকেই প্রধান অধ্যেতব্য করিবে, প্রবেশিকাতেও সেই কেবল গণিত গ্রহণ করিবার অধিকারী বা উপযুক্ত, অপরে নহে—ইহাও ত' বলা উচিত। কিন্তু কেহই তাহা বলিবেন না। অন্যান্য বিষয় হইতে সংস্কৃতকে এইরূপে 'একঘরে' করিয়া পৃথক্ করা যায় কেবল গায়ের বা গলার জোরেই, যুক্তির জোরে নহে। সুতরাং যাহারা সংস্কৃতকে কেবল "optional subject"-রূপেই মাত্র স্বীকার করিতে রাজী, তাঁহারা নিশ্চয়ই 'একটা অদ্ভুত বিজাতীয় ধরণের কথাই' বলিতেছেন মাত্র। দেশের ভবিষ্যৎ ভরসাস্থল ছাত্রছাত্রীগণ ইচ্ছামত দেশের কৃষ্টির একমাত্র বাহন সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা নাই করুক, দেশের যুবশক্তি কেবল জড় বিজ্ঞানের আদর্শেই বাধ্যতামূলকভাবে উদ্বুদ্ধ হউক, অথচ নিজস্ব সংস্কৃতি সম্বন্ধে ইচ্ছানুসারে অজ্ঞই থাকিয়া যাউক—ইহার অপেক্ষা "অদ্ভুত বিজাতীয় কথা" আর কি কিছু কল্পনা করা সম্ভব? এমন কি, বহু বিজাতীয় পণ্ডিত পর্য্যন্ত ভারতে সংস্কৃত শিক্ষা সার্ব্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করিতে পরামর্শ দিতেছেন। যথা, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃতের প্রধানাধ্যক্ষ বিশ্ববিশ্রুত এফ. ডাব্লিউ. টমাস্ মহোদয়ের নিকট পড়িবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছিল। তিনি প্রত্যেক ভারতবাসীর পক্ষেই যে সংস্কৃতজ্ঞান অত্যাবশ্যক—এই কথা বারংবার বলিতেন। এমন কি, তাঁহার মতে, একমাত্র সংস্কৃতই ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবার উপযুক্ত। এই বিদেশী, বিজাতীয় পণ্ডিতগণের সংস্কৃতপ্রীতি, ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ, ও সংস্কৃতপ্রচারের জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টার সহিত আমাদের স্বদেশী, স্বজাতীয় কতিপয় তথাকথিত শিক্ষাতত্ত্ববিদ্‌গণের সংস্কৃতের প্রতি বিরাগ, দেশের প্রাচীন সভ্যতার প্রতি নাসিকা-কুঞ্চন, এবং এমন কি, মাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত সংস্কৃতকে সার্ব্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করিতেও ঘোরতর আপত্তি, এক কথায়, সর্ব্বপ্রকারে সংস্কৃতের ধ্বংসসাধনের অপপ্রচেষ্টা, তুলনা করিলে কি লজ্জায় মস্তক অবনত করিতে হয় না?

উপসংহার

শিক্ষার ক্ষেত্র হইতে, এমন কি, প্রবেশিকান্তর হইতে পর্য্যন্ত সংস্কৃতবিতাড়নের যে অপপ্রচেষ্টা অধুনা দৃষ্ট হইতেছে, তাহার কিছু সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপরে করা হইল। এই আত্মবিধ্বংসী কুচেষ্টার বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক মাত্রেরই খড়্গহস্তে দণ্ডায়মান হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। ভারতের সুদীর্ঘ পরাধীনতার ইতিহাসে এরূপ বহু সময়ই আসিয়াছে, যখন বিদেশী ও বিধর্ম্মী শাসক-সম্প্রদায়ের অত্যাচারে তাহার নিজস্ব সংস্কৃতি ও সভ্যতা নানাভাবে ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত হইয়াছে, বহু অমূল্য পুঁথি ভস্মীভূত হইয়াছে। কিন্তু অদ্য যে আমরা ভারতবাসী হইয়াও, হিন্দু হইয়াও, নিজেরাই নিজেদের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে খড়্গ ধারণ করিয়াছি, নিজেরাই নিজেদের সংস্কৃতভাষার আমূল উচ্ছেদ সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছি—ইহার অপেক্ষা শোচনীয়, ইহার অপেক্ষা দূষণীয়, ইহার অপেক্ষা লজ্জাকর দৃশ্য জগতে আর কি কিছু হইতে পারে? যাহা হউক, ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয় যে, নানা অবস্থাবিপর্য্যয়ের মধ্যেও ভারতের সনাতন সভ্যতা, ভারতের শাশ্বতী দেবভাষা কদাপি বিনষ্ট হয় নাই। আজও কতিপয় অদূরদর্শী সংস্কৃত বিতাড়নেচ্ছুক ব্যক্তিগণের সংস্কৃতের বিরুদ্ধে এই আত্মপ্রলয়ঙ্কর অভিযানও যে আমাদের কালবিজয়িনী "গীর্ব্বাণবাণী"র অম্লান জ্যোতিঃ পরিম্লান করিতে পারিবে না, এই বিশ্বাস আমরা রাখি। তথাপি জাতির এই চরম দুর্গতির দিনে দেশের যুবশক্তি যাহাতে স্বদেশের শাশ্বত কৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়া বিপথগামী হইয়া না পড়ে, তজ্জন্য দেশপ্রেমিক মাত্রেরই এক মনপ্রাণে অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য।

মনশ্চক্ষু

শ্রীবীরু সরকার

'না বাবা আর পারিনে। তুই যখন বিয়ে-থা করবি না, তবে ভাইটার জন্য একটা ভাল মেয়ে দেখে শুনে দে'—মায়ের কথা শুনিয়া আশুতোষ এতদিন পর যেন ভাবিতে বসিল।

সংসারের মধ্যে শুধু ওই ভাই সন্তোষ ও মা। সে আজ প্রায় বার বৎসর পূর্ব্বের কাহিনী। আশুতোষ তখন কলিকাতার বোর্ডিংয়ে থাকিয়া বি-এ ক্লাশে পড়ে। আর সন্তোষ সবে মাত্র সহরের স্কুলের নীচের শ্রেণীতে বসিতেছে। ছেলেদের ভবিষ্যৎকে তাহাদের নিজেদের হস্তে সমর্পণ করিয়া বিনয়ভূষণ স্বর্গধামে যাত্রা করিলেন। মহাযাত্রার প্রাক্‌কালে শোকাকুলা পত্নীর হস্তে এক গোছা কোম্পানীর কাগজ ও সহরের সংলগ্নস্থিত দুই বিঘা জমিসহ টিনের ঘরের দলিল রাখিয়া গেলেন।

পিতার সঙ্গে সঙ্গে আশুতোষের নিকট হইতে সরস্বতী দেবী বিদায় চাহিলেন। বন্ধুরা বলিল, আশু, আর মাত্র তিন মাস পর ফাইনেল, পরীক্ষা দিয়ে তারপর সংসারে প্রবেশ কর।

আশুতোষ গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যখন গৃহকার্য্যে মনোনিবেশ করিল—সন্তোষ তখন বার বৎসরের বালক।

তারপর আশুতোষের অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য বাক্সবন্দী কোম্পানীর কাগজের বিনিময়ে আসিল দুইটি ধানের কল। বার মাইলের মধ্যে অবস্থান করিয়া ধান কলের বোল অশ্বশক্তি ভীম-বিক্রমে ধ্বনি করিয়া এক বৎসরের মধ্যে কয়েক বিঘা চরের ধানের জমি উপহার দিল। এই সময় হইতে মেয়ের পিতার লোলুপ দৃষ্টি পড়িল আশুতোষের উপর।

বহুবার তাঁহারা আশুতোষের অজানায় শৈবলিনীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া একরূপ স্থির করিয়াছেন। এমন কি শৈবলিনী লোক মারফৎ পাত্রী দেখিয়াছেন পর্য্যন্ত, কিন্তু আশুতোষ তাহাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া মায়ের উদ্দীপ্ত আশার নিস্ফলের জন্য মার্জ্জনা প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছে, আমাদের এই যৎসামান্য আয়—এর মধ্যে আবার খরচ বাড়িয়ে লাভ কি।

পুত্রের নির্ম্মম কথা শুনিয়া মা যখন দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন—আশুতোষ তখন বলিয়াছে, সন্তোষের পড়া আগে শেষ হোক—তারপর দেখা যাবে।

এইভাবে বছর ঘুরিয়া ঘুরিয়া যখন সন্তোষের বি-এ পাশের খবর আসিল, তখন মা ধরিয়া বসিলেন যে, এইবার পাত্রীপক্ষকে পাকা কথা দান করিতে হইবে।

আশুতোষ তখন বলিয়াছে, মা—এই ত আমার বন্ধুরা সকলে পাশ করে সামান্য টাকার চাকরী করছে। তোমার ছেলে বি-এ পাশ করে আর বেশী কি করবে! ভাল একটা ব্যবসা খুলে না দিতে পারলে কি অন্য কোন বিষয়ে মন দিতে পারি!

শৈবলিনী কহিয়াছেন, ভগবান আমাদের যা দিয়েছেন—এর চেয়ে বেশী আমাদের আর কি লাগতে পারে!

আশুতোষ হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া বলিয়াছে, আমাদের দুই ভাই কি শেষ মা!

পুত্রের ইঙ্গিত বুঝিয়া মা চুপ করিয়া রহিয়াছেন।—এইরূপ নীরবে তাঁহার আরও দুই বৎসর কাটিল। অবশেষে সন্তোষের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আশুতোষকে ধরিয়া বসিলেন। আশুতোষ তখনই ভাবিতে বসিল। মায়ের উদ্‌গ্রীবতারও একটা খণ্ড ইতিহাস রহিয়াছে।…

২

বি-এ পাশ করিয়া সন্তোষ যখন সহরের এম্-ই স্কুলের মাষ্টারী পদ গ্রহণ করে—আশুতোষ তখন গোপনে দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়াছে। তাহার সম্মুখে ছিল একটা বিরাট আদর্শ। যাহা সে নিজে সম্পন্ন করিতে পারে নাই—ভাইয়ের দ্বারা তাহা

সম্পন্ন করিবার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু তাহার বড় উদ্দেশ্য জীবনের গতিপথে ইঞ্জিন চালাইবার সিগনাল পাইল না।

দেশের শিল্পকে বিজ্ঞানের সাহায্যে পুনরুজ্জীবিত করিবার যে প্রেরণা লাভ করিয়াছিল তাহার ছাত্র জীবনে—ইহারই সার্থকতার স্বপ্ন দেখিয়াছিল ভাইয়ের জীবনে।

তাহার আয়ের পূর্ণ অঙ্ককে যতই সে উদ্দেশ্যের পথে চালিত করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে—ততই যেন কে তাহাকে টানিয়া রাখিয়াছে। জমিদারের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে যখন সে নমঃপাড়ার বৃদ্ধ ভৈরবের পক্ষ অবলম্বন করিয়া কোর্টে উপস্থিত হইয়াছে,—তখন তাহার খদ্দরের ফতুয়ার ছোট পকেট হইতে কাগজের নোট খসিয়া উকীল মোক্তারের কোটের বৃহৎ পকেটে অন্তর্ধান করিয়াছে।

আড়াই ক্রোস পথ হাঁটিয়া গ্রামের ছোট ছেলেমেয়েরা সহরের স্কুলে যাইতে পারে না,—ফলে অধিক বয়সে তাহাদের স্কন্ধে সরস্বতী দেবী দাঁড়াইতে চাহেন না। সেইজন্য আশুতোষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় হাটখোলায় পাঠশালার ঘর উঠিয়াছে। যাবতীয় খরচ ধানের কল বহন করিয়াছে। স্কুলের মাষ্টারীপদের জন্য দরখাস্ত লিখিয়া এবং স্কুল কমিটির মেম্বরগণের বসিবার ঘর পর্য্যন্ত হানা দিয়া সন্তোষ আসিয়া বলিয়াছে, দাদা—শীঘ্র যখন আর টাকার জোগাড় হচ্ছে না—মিথ্যে বসে থেকে লাভ কি? যদি ঘরে বসেও মাস গেলে গোটা ত্রিশেক টাকা আসে—।

তাহার কথার সমাপ্তির পূর্ব্বেই আশুতোষ সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বলিয়াছে টাকার জোগাড় হ'বে—যতদিন না হয় ততদিন চাকরী করবি,—এতে আর তেমন বলবার মত কি থাকতে পারে!

সন্তোষ চলিয়া গেলে আশুতোষ নিজের মধ্যে দীর্ঘ শ্বাস চাপিয়াছে। সে চাহিয়াছিল ভাইকে একটা মহৎ আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে।

সন্তোষ যখন প্রথম মাসের বেতনের এক তৃতীয়াংশ মায়ের জন্য দিয়াছে, আশুতোষ সেই পরিমাণ টাকা পৃথক স্থানে তুলিয়া রাখিয়াছে। তারপর মাসের শেষ সপ্তাহের প্রথমে সন্তোষের হাতে পূর্ব্বের একখানা নোট তুলিয়া দিয়া বলিয়ছে, বাড়ীর ভার যখন আমার ওপর—তোকে আর বেশী কিছু ভাবতে হবে না।

সন্তোষ আশুতোষের নিকট হইতে ছুটিয়া পলাইয়া গিয়াছে। সে বারে বারে ভাবিয়াছে যে, তাহার দাদা কিরূপে জানিল যে তাহার বাক্সে খরচের পকেট আর বাজিতেছে না।

বছর ঘুরিল। আশুতোষের উদ্দেশ্য সফল হইবার মত একরূপ প্রস্তুত হইয়াছে—এমন সময় হঠাৎ খবর আসিল যে ইউরোপে যুদ্ধ বাধিয়াছে।

যুদ্ধের খবর শুনিয়া আশুতোষ বিন্দুমাত্র দমিল না। বরং সে এক মাসের মধ্যে জমি পর্য্যন্ত বাঁধা রাখিয়া কলিকাতা, বোম্বাই ঘুরিয়া আসিল যখন, তখন তাহার উদ্দেশ্য উধাও হইয়াছে। উচিৎ মূল্যে লৌহকল ক্রয় করিতে তাহার যে পরিমাণ সময় লাগিয়াছে—চারগুণ দামে তাহা বিক্রয় করিতে তাহাকে আবার ততগুণ সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষায় থাকিতে হইবে।

দেখিতে দেখিতে ইউরোপখণ্ডের যুদ্ধ এশিয়ায় সংক্রামিত হইল। এই সঙ্গে ছুটীর দিনে সন্তোষের ঘরে সহরের জনকয়েক যুবা বসিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কি সব বলাবলি করিতে আরম্ভ করিল।

আশুতোষ সমস্ত দেখিত। সময় থাকিলে তাহাদিগকে ডাকিয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যের কথা তুলিত, কিন্তু যুবাদের এ বিষয়ে কোন আগ্রহ থাকিত না। তাহারা কোনক্রমে যুদ্ধকে তুলিয়া লইয়া কথার পর নীতি কথা বলিত। আশুতোষ তাহাদের কথার প্রতিবাদ করা দূরে থাকুক—টুঁ শব্দ পর্য্যন্ত করে নাই। তাহাকে নীরবে শ্রবণ করিতে দেখিয়া তাহাদের উৎসাহ যেন নতুন জীবন লাভ করিত।

ছেলেদের জন্ত আশুতোষের ব্যগ্রতার সীমা ছিল না। বৃদ্ধা মাতার কষ্ট হইবে—এইজন্য সে একজন বাচ্চা ভৃত্য পর্য্যন্ত রাখিয়া দিল, সময়মত চা ও চিড়া-মুড়ি পরিবেশনের জন্য। সন্তোষের দাদার আতিথ্যের মনোমুগ্ধকর ব্যবস্থা দেখিয়া তাহারা জাঁকিয়া বসিল!

শৈবালিনী ছিলেন শান্তিপ্রিয়। নতুন ছেলেদের গলার দৌরাত্ম্য যখন বাড়িয়া উঠিল—তখন তিনি আশুতোষকে ডাকিয়া প্রতিকারের জন্য বলিলেন। মায়ের কথা শুনিয়া সে বলিল, তোমার ছেলে যখন দেশের ও দশের উপকারের জন্য কাজ করছে—ওদের তাড়িয়ে দেব কেমন ক'রে! আর যদি হাঙ্গামা বল—তবে আমাদের দু' ভায়ের বিয়ে হ'লে তোমার বাড়ীতে কি কুটুম আস্‌তো না?

ছেলের বৌয়ের জন্য শৈবলিনীর মন অনেক আশা লইয়া অধীর হইয়া ছিল। সেই ব্যর্থ আশার ভবিষ্যৎ ছেলের নিকট হইতে শুনিয়া তাঁহার চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। অশ্রু গোপন করিবার জন্য তিনি ত্রস্তে অন্যত্র উঠিয়া গেলেন।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন সহর হইতে কয়েক দল ছেলে আসিয়া আশুতোষের গৃহ-প্রাঙ্গণ সজাগ করিয়া তুলিল। আশে-পাশের গ্রামগুলির হাটে তাহারা পোষ্টার লইয়া হানা দিতে আরম্ভ করিল। আশুতোষের নীরবতার জন্য গ্রামে এইরূপ অনাসৃষ্টি কাণ্ড আরম্ভ হইয়াছে—এই মত পোষণ করিয়া গ্রামের বারোয়ারী খোলায়—খেলার মাঠে জটলা হইতে লাগিল। এক-দিন আশুতোষ জটলার মধ্যে বসিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, দেশের কাজ যখন করছে—বাধা দেব কেন! তবে কি জানেন বোস ম'শায়—ছেলেরা জাপান—ফ্যাসিষ্ট ব'লে যে চীৎকার করছে—চাবা কেন, আমি নিজে পর্য্যন্ত বুঝি না।

গ্রীষ্মের বন্ধের ছুটীটা সন্তোষ গ্রামে বসিয়া কাটাইয়া ছিল। স্কুল খুলিয়া গেলে স্কুলে যাওয়ার তেমন গরজ দেখা গেল না। চাকুরী ছাড়িয়া দিল। শৈবলিনী দুঃখিত হইলেন। আশুতোষ নিজেকে অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া সন্তোষকে বলিল, তোর যদি চাকরী করতে ইচ্ছে না হয়—তবে ধানের কলগুলো তদারক কর। পরের হাতেই সব—নিজেরা দেখলে আয়ও একটু বেশী হয়।

মাথা দুলাইয়া সন্তোষ পলাইয়া গেল। আশুতোষ মনে মনে ভাবিল, যদি সন্তোষকে কৃষি কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইত—তবে তাহার অর্জ্জিত বিদ্যা তাহাকে কাজের মধ্যে টানিয়া আনিত।

হঠাৎ একদিন সন্তোষের বন্ধুদের সঙ্গে জনকয়েক মেয়ে আসিয়া সন্তোষের ঘরে বসিয়া তর্ক ও নীতি লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিল।

শৈবলিনী অশিক্ষিত না হইলেও সংস্কার হইতে মুক্তি লাভ করেন নাই। অপরিচিত মেয়েদের এই বেহায়াপনা মোটেই বরদাস্ত করিতে না পারিয়া আশুতোষকে পাশের গ্রাম হইতে ডাকিয়া আনিবার জন্ম দ্রুত লোক পাঠাইলেন।

পাশের গ্রামে কাজে ব্যাপৃত ছিল আশুতোষ। ফিরিয়া আসিয়া প্রথমে আগতাদিগকে তাহার মায়ের ঘরে ডাকিয়া আনিল। তাহারা আশুতোষকে নমস্কার করিয়া দাওয়ার উপরের পাটিতে উপবেশন করিল। তাহাদের হঠাৎ আগমনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল যে, এই গ্রামে একটা মহিলাদের আত্মরক্ষার সমিতি গঠন করিতে হইবে। তাহারা ইহাও কথার ফাঁকে বলিল যে, আশুতোষ কমরেড সন্তোষের দাদা হিসাবে তাদের একটা স্বতন্ত্র দাবী রহিয়াছে।

আশুতোষ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে থাকিয়া বলিল, আমাদের গ্রামে আজ পর্য্যন্ত পুরুষদের আত্মরক্ষার কোন সমিতি হয়নি। পুরুষদের হ'লে—তারপর মেয়েদের হবে।

দেখুনতো কি ব্যাকওয়ার্ড আপনি আইডিয়ায়, মেয়েদের ভিতর হইতে একজন বলিতে লাগিল, পুরুষ সে মুক্ত—সে স্বাধীন। কিন্তু নারী চিরদিন গৃহাঙ্গনে বন্দী। আজ যদি তাদের শক্তি তা'রা নিজেরা না সঞ্চয় করে—তবে অদূর বিপদের দিনে তাদের সম্মান কে রক্ষা করবে!

আশুতোষ কহিল, তোমরা কি করতে চাও?

অন্য একজন মেয়ে বলিতে লাগিল, আমাদের সমিতি গড়তে হবে। আর এ সমিতির মেম্বর হ'তে হবে গ্রামের সমস্ত মহিলাকে।

তারপর,—আশুতোষ বলিল, তারপর কি কাজ।

তারপর আবার কি—সংঘবদ্ধতাই হোল আমাদের শক্তি। একতাই হোল আমাদের হাতিয়ার।

পূর্ব্ব বক্তার কথা শুনিয়া আশুতোষ অন্য কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। আগতাবৃন্দ ভাবিল যে তাহাদের বাক্যবাণ নিশ্চয়ই অব্যর্থ সন্ধান লাভ করিয়াছে।

চা পানের শেষে আশুতোষ তাহাদের কথা ভাবিয়া দেখিবে বলিয়া তাহাদিগকে নৌকায় তুলিয়া দিল। শৈবলিনী এতক্ষণ অলক্ষ্যে সমস্ত দেখিয়া অতঃপর আশুতোষকে ধরিয়া বসিলেন যে ছোট ছেলের জন্য একটা ভাল মেয়ে দেখিয়া দিতে হইবে। আশুতোষের চিন্তাসূত্র তখন আরও অধিকদূর গড়াইয়া গেল।

অবশেষে একদিন আশুতোষ পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের মণীন্দ্র ঘোষের মেয়েকে দেখিতে আসিল দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল গ্রামের লোকের।

মধ্যাহ্নে ঘোষেদের বাড়ীর মেয়েরা ঢেঁকীঘরে ঢেঁকীর ধপ্—ধপ্ শব্দের ফাঁকে ফাঁকে দু' একটা কথা বলিতেছিলেন,—আশুতোষ তখন ছাতামুড়ি দিয়া 'মেজকাকা' বলিয়া বাড়ীর উঠানে দাঁড়াইল। যাহার জন্ম তাহার আগমন—ষোড়শ বর্ষীয়া রেণুকা আসিয়া বলিল, বাবা বাড়ীতে নেই বড়দা।

এই দুই পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বহু পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান ছিল। কোন একটা সূত্র হইতে হঠাৎ একদিন আবিষ্কার হইল যে বিধুভূষণ ও মণীন্দ্রের পিতামহ পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন। রেণুকা আশুতোষকে বড়দা এবং বিধুভূষণকে কাকা বলিয়া ডাকিয়া আসিতেছে।

আশুতোষ রেণুকার হাত ধরিয়া ঢেঁকী ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, ভালই হয়েছে—কথাটা পাকাপাকি করে যাই। অতঃপর সে রেণুকার হাত ছাড়িয়া এবং তাহাকে ধাক্কা দিয়া বলিল, শোন্ রেণু—দূরে দূরে থাকবি।

রেণুকা তাহার বড়দার এই মিষ্ট ইঙ্গিত বুঝিয়া এমন ভাব করিয়া স্থান পরিত্যাগ করিল যে, সে যেন কিছুই বুঝিতে পারে নাই।

রেণুকা চলিয়া গেলে তাহার মা কহিলেন, তোমার ভাই কি গ্রামের মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি হবে ভাইপো?

রেণুকার মা আশুতোষের একরকম সমবয়সীই ছিলেন। তাহাতে এই সম্বন্ধে প্রবল আগ্রহ ছিল এবং একবার তিনি কথার ফাঁকে আশুতোষকে বলিয়াছিলেন।

আশুতোষ ভ্রাতৃত্বের গর্ব্বে হাসিয়া কহিল, জানেন না কাকীমা, সে আমার ভাই। তা ছাড়া হতভাগাটার যে বিয়ে দিচ্ছি—এটাই হোল বেশী।

শৈবলিনীর কানে যখন এই সংবাদ পৌছিল, তখন তিনি নিজে এক ক্রোশ পথ হাঁটিয়া আসিয়া রেণুকাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন। রেণুকার স্বাস্থ্য-রূপ ও গৃহকর্ম্মের সুপরিচয় তিনি ইতি-মধ্যে পাইয়াছিলেন। গ্রামের বর্ষীয়ান মহিলারা যখন এই বিবাহে দাবী নাই বলিয়া নিজেদের পুত্রের বিবাহের সময় কে কত কি পাইয়াছেন তাহার মোটা রকম ফর্দ্দ লইয়া শৈবলিনীকে আক্রমণ করিল, শৈবলিনী জ্যেষ্ঠপুত্রের নীতিতে গর্ব্ব বোধ করিয়া কহিলেন, আমার আশু-সন্তু বেঁচে থাকলে অমন ঢের ঢের জিনিষ ওরা নিজেরা করতে পারবে।

আশুতোষ সন্তোষের মতামত লইবার আবশ্যক বোধ করিল না। দেড় মাস পর কার্ত্তিক মাসের বিশে তারিখ বিবাহের দিন ধার্য্য হইল এবং বিবাহের পত্রে আশুতোষ ও মণীন্দ্রের স্বাক্ষর পর্য্যন্ত হইয়া গেল।

৪

এই সময় একদিন বিদ্রোহের দাবানল ভারতবর্ষের বুকে জ্বলিয়া উঠিল। ইহার কয়েকটা স্ফুলিঙ্গ গোপালপুর গ্রামে আসিয়া পড়িতে মোটেও বিলম্ব হইল না। গ্রামের যুবক সম্প্রদায় হাটে হাটে ঘুরিতে লাগিল। তাহারা চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, অচল অবস্থার অবসান চাই।

কিন্তু নিজেদের অচল অবস্থা অবসানকল্পে সরকারকে অচল করিতে চাহিয়া তাহারা নিজেরা পাইকারী জরিমানা ও পুলিশি আক্রমণে একরকম অচল হইয়া উঠিল এবং অবশেষে তাহাদের স্থান হইল আশুতোষের কাছারী ঘরে।

উদ্দেশ্য সফল করিবার নিমিত্ত, আশুতোষ যে অর্থ সহরের ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিয়াছিল—যুবকদের হাতে অনবরতঃ চেক্ কাটিয়া দিতে দিতে অতি অল্প দিনের মধ্যে তাহা শেষ হইয়া গেল। শৈবলিনীর পুত্রের অমঙ্গলের আশঙ্কা করিয়া কহিলেন যে, এই পথ ছাড়িয়া দেওয়া ভাল। এমন কি সন্তদের মত দেশের কাজ যে অধিক নির্ভরশীল—ইহা বলিতে তিনি কুণ্ঠিত হইলেন না। কে যেন তাঁহাকে বলিয়াছিল যে বড়বাবুকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিতে পারে।

পুলিশ আসিবার পূর্ব্বে একদিন সন্তোষের বন্ধুগণ অনেকদিন পর উপস্থিত হইল। আশুতোষ তাহাদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিতে ত্রুটী করিলনা।

ইহা যেন আগন্তুকদের নিকট বিরক্তিকর বলিয়া বোধ হইল। তাহারা কহিল, আপনার ঘরে চোব্যচোস্য খেয়ে আমরা দেশের কাজ করতে আসিনি।

আশুতোষ বিরক্ত হইয়া কহিল, তোমরা যেন উত্তেজিত হয়ে উঠেছ। তোমরা আমার ছোট ভায়ের বন্ধু—।

আশুতোষের কথা শেষ না হইতেই তাহারা বলিল, কমরেড্ সন্তোষের দাদা হলেও আপনার অন্যায়কে আমরা প্রশ্রয় দেব না।

আমার অন্যায়টা কি, আশুতোষ বলিল।

আপনি পঞ্চম বাহিনীর দলকে সাহায্য করেছেন, তাহারা বলিতে লাগিল, আপনার সমর্থন না পেলে তারা এতদিন জনগণের বিরুদ্ধ মতে এমন ধংসাত্মক কার্য্যে লিপ্ত হতে পারতোনা। আমরা খবর পেলুম—আপনার ঘরে তাদের বড় ঘাঁটি হ'য়েছে।

আশুতোষ বুঝিল যে, কে তাহাদিগকে এরূপ অনুসন্ধানী খবর দান করিয়াছে।

আশুতোষ অপরাধীর মত বলিল, সত্যি যদি আমি অপরাধ করে থাকি—সে অপরাধের জন্য দায়ী তোমরা। তোমাদের মতেই এদের ঘরে স্থান দিয়েছি!

ছেলেরা বলিল, আপনার ব্যাঙ্কের সমস্ত টাকা দেশের নামে এরা আত্মসাৎ করেছে?

সে-কথা ঠিক, আশুতোষ কহিতে লাগিল, তবে তোমাদের চেয়ে আমি আমার গ্রামের ছেলেদের বেশী জানি। দেশের নামে কোন টাকা আমি এদের হাতে দেইনি। আর যা' দিয়েছি—তা' শুধুমাত্র এদের কর্ম্মময় জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। এ যদি তোমাদের মনঃপুত না হয় -তবে দেশের মুক্তি সাধন করবে কি করে?

ছেলেরা বলিল, মুক্তির কথা হচ্ছে না। আপনি ফ্যাসিষ্ট জাপানের অনুচরকে সাহায্য করেছেন—এই প্রথম স্বীকার করুন।

ধীরে ধীরে আশুতোষ কহিল, স্বীকার অস্বীকারের কোন প্রশ্ন উঠছে না, আমি শুধু জানি আমার দেশের মুক্তি-সাধন, কোন নীতি আমি এর চেয়ে ভাল বুঝি না। মুক্তিকামী সৈনিককে ঘরে আশ্রয় দিয়ে যদি আমি অপরাধ করে থাকি—তবে তোমরাও তো মুক্তিকামী তোমাদের আশ্রয় দিচ্ছেন তোমাদের অভিভাবকগণ—তাঁদের কি অপরাধ হচ্ছে না?

হুঁ, বলিয়া শব্দ করিয়া একজন বলিল, জানেন, এর জন্য আপনাকে ভাই হারাতে হবে। আপনি কমরেড্ সন্তোষের জন্য পাত্রী ঠিক করেছেন—

থাম, বিরক্ত এবং ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া আশুতোষ কহিল, পারিবারিক কোন কথা ওঠেনি, তোমরা এখন যেতে পার।

ছেলেরা চলিয়া যাইবার সময় বলিয়া গেল যে, পঞ্চম বাহিনীকে তাহারা ধ্বংস করিতে জানে।

সন্তোষ সেইদিন হইতে আর গ্রামে আসিল না। আশুতোষ অনুসন্ধান করিয়া জানিল যে, সন্তোষ তাহাদের দলে অফিস ঘরে বাস করিতেছে। আশুতোষ সন্তোষ সম্বন্ধে কোন কথা কাহারো নিকটে কিছু বলিল না। শৈবলিনীকে সান্ত্বনা প্রদানের জন্য বলিয়াছিল, সব ঠিক হ'য়ে যাবে মা। কোন্‌টা কাঁচা আর কোন্‌টা খাঁটি ঠিক বুঝতে পারছে না।

পঞ্চম বাহিনীকে ধ্বংস করিবার উদ্দেশে হঠাৎ একদিন ভোর রাত্রে পুলিশ আসিয়া গোপালপুর গ্রামে প্রবেশ করিল। আশুতোষের গৃহ খানাতল্লাস করিয়া একজন পলাতক আসামীর সঙ্গে কিছু বে-আইনী কাগজপত্র হস্তগত করিল। তারপর গ্রামের সাত জন ছেলের সঙ্গে আশুতোষকে গ্রেপ্তার করিয়া সহরে লইয়া গেল।

সন্তোষ শুনিল যে, তাহাদের গৃহ খানাতল্লাস করিয়া আশুতোষকে হাজতে চালান দেওয়া হইয়াছে। তবুও সে গৃহে পদার্পণ করিল না বা দাদাকে দেখিতে আসিল না।

স্পেশাল কোর্টে আশুতোষের বিচার আরম্ভ হইল। সাক্ষীর জবানবন্দী লইতে দুইদিন সময় লাগিল। তৃতীয় দিবসে সন্তোষ গোপনে কোর্টের এককোণের বেঞ্চির উপর বসিয়া রহিল।

আশুতোষ কোর্টের সম্মুখে বসিয়া ছিল। সাক্ষীর জবানবন্দীর পরে তাহাকে আবার অভিযুক্ত করিয়া কোর্ট জানিতে চাহিল যে, সে দোষ স্বীকার করিবে কি না এবং তাহার পক্ষের সাক্ষীকে কোর্টে উপস্থিত করিবে কি না!

কোর্টের কোন কথারই উত্তর না দিয়া আশুতোষ অতি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রদান করিয়া বলিল যে, যাহাদের বিরুদ্ধে তাহার জাতির নালিশ, তাহাদের নিকট সে বিচার চাহে না!

আশুতোষের এই নির্ভীক প্রত্যুত্তরের জন্য কোর্ট হইতে তৎক্ষণাৎ রায় দেওয়া হইল—এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড—যাহার বিরুদ্ধে আপীল চলিবে না।

কোর্ট হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে আশুতোষ মণীন্দ্রকে কাছে ডাকিয়া হাসিমুখে বলিল যে, যতদিন পর্য্যন্ত সে মুক্তি না পায়—ততদিনের মধ্যে রেণুকার বিবাহ যেন তাহারা অন্যত্র স্থির না করে। ধানের কল এবং তাদের বাড়ী যেন মণীন্দ্র দেখাশুনা করে।

দাদার কথা সন্তোষের কানে পৌঁছিল। আর অপেক্ষা না করিয়া এবারে সে ভিড় ঠেলিয়া আশুতোষের পায়ের উপর লাফাইয়া পড়িল, বলিল, আমি আর তোমার অবাধ্য হব না দাদা।

বিক্রমপুরের কথা

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

গ্রামের যারা ধনী সঙ্গতিশালী, তাঁরা প্রবাসী। তাঁহাদের সম্পত্তি বাড়ীঘর দেখিবার জন্য শনিরূপী এক একজন কুগ্রহকে সর্ব্ববিধ ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন—নিজেরা বিদেশে থাকেন, কাজেই বিনা ঝঞ্ঝাটে সেই গোমস্তা প্রভৃতির নিকট হইতে যাহা কিছু পান তাহাতেই সন্তুষ্ট হন, গ্রামের হিতৈষী ব্যক্তিরা শনিগ্রহরূপী সয়তানের অত্যাচার, অবিচার, মোকদ্দমার সৃষ্টি—এ সকল বিষয় জানাইয়া প্রতিকারপ্রার্থী হইলেও প্রতিকার পান না—অপরপক্ষে সেই সব লোকদেরই করেন সমর্থন। ফলে নিরীহ নির্জ্জীব, নির্বীর্য্য গ্রামবাসীরা নীরবে অত্যাচার সহ্য করে। দারিদ্র্যে নিপীড়িত হইয়া জীবন যাপন করে। কে তাহাদের সহায় হইবে? নিজেদের পায়ে দাঁড়াইবার মত শক্তি কোথায়?

Grow more food বা খাদ্যশস্য বাড়াও বা ফলাও-সরকারের সে কি মস্ত বড় Propaganda, কত Poster, কত ছবি, কত ছড়া কত বক্তৃতা, কত বীজ ছড়ান—কত গল্প বাহির হইতেছে, কত ছবি দেখিতেছি কৃষি বিভাগের কত কি পরিকল্পনা! উদ্দেশ্য সাধু-তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই কিন্তু ফল কোথায়? পূর্ব্বে গ্রামে দেখিয়াছি—প্রত্যেক বাড়ীতেই লাউ, কুমড়া, ঝিঙে, শশা প্রভৃতির মাচা। ফলেভরা শ্রীসম্পন্ন সে দৃশ্য, বেগুন, সীম, লঙ্কা, এসব নিত্য ব্যবহার্য্য শাক-শব্জী। কিছুই কিনিতে হইত না—কিন্তু এখন কোন গৃহস্থের পতিত জমিতেও তাহা দেখিলামনা। গ্রামের লোকদের জিজ্ঞাসা করিলাম-আপনারা Grow more food এর মধ্যে বাস করিয়াও সেদিকে কেন মন দেন না? বাজারে বহু মূল্য দিয়া তরিতরকারী শাকশব্জী কেনেন কেন? আমার এক বাল্য-বন্ধু বলিলেন, "ভায়া হে, দুদিন গেলেই বুঝবে কেন আমরা নির্ব্বিকার!" বুঝিতে বেশী বিলম্ব হইল না। হঠাৎ শুনিলাম আমার টিনের ছাওয়া ঘরের চাল দুলিতেছে—ঝম্ ঝম্ শব্দ হইতেছে—গাছে গাছে ডালে ডালে তুমুল দোলাদুলি—চীৎকার অদ্ভুত কিচিমিচি রব। বন্ধু তাড়াতাড়ি বাড়ী যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন—হাতের লাঠি শক্ত করিয়া ধরিয়া বলিলেন, বাড়ী যাই। ব্রাহ্মণী বহুযত্নে একটা লাউ গাছ বাচাইয়া তুলিয়াছেন। লাউ গাছটা বোধ হয় শ্রীরামচন্দ্রের অনুচরেরা এতক্ষণে শেষ করিতেছে। তিনি চলিয়া গেলেন। এদিকে একটি রামানুচর সহসা আমার ঘরে ঢুকিয়া খাটের পাশে আসিল এবং নির্ভীক ভাবে আমাকে মুখ ভ্যাংচাইয়া তাহার বীরত্বের পরিচয় দিয়া বাহির হইয়া গেল। বুঝিলাম শ্রীরামচন্দ্র বানর-সেনা লইয়া লঙ্কা বিজয় করেন, জাপানীরা বানরের হাতে নারিকেলের বোমা দিয়াছেন, আর আমাদের কৃষি বিভাগ বাঁদরের উপর Grow more food সংরক্ষণের ভার দিয়াছেন! তাহাদের বীরত্বে তৃণটুকু রাখিবার জো নাই। শুনিয়াছিলাম, শ্রীরামচন্দ্রের অনুচরেরা নিরামিষ ভোজী—ফলমূলছাড়া সবতাতেই বিতৃষ্ণা! কিন্তু এইবার এক নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম, তাহা হইতে বুঝিলাম যে সে আমাদের ভ্রান্ত ধারণা! তাহারা সংসর্গ দোষে আমাদেরই ন্যায় যাগ, যজ্ঞ, বিধি নিষেধের সীমা হারাইয়াছে—এখন তাহারা নির্ব্বিকার ভাবে হাসের ডিম মৎস্য মাংস. কবুতরের খোপে ঢুকিয়া কবুতরের ডিম সবই সুবোধ বালকের মত গলায় ফেলিয়া দেয় এবং আনন্দে কিচিমিচি করে মর্কট-ভাষায়—দুর্ভিক্ষের তাড়না যে শুধু মানুষেরই না তাহা বেশ বুঝিলাম।

আমাদের কৃষি-বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে একটা অনুরোধ করিতেছি—যদি তাঁহারা Grow more food Campaignকে সর্ব্বতোভাবে বিক্রমপুর অঞ্চলে সাফল্য মণ্ডিত করিয়া দেশবাসীর কল্যাণ করিতে চাহেন—তবে একটি নূতন বিভাগের সৃষ্টি করুন এবং ভবিষ্যত কাউন্সিলে তাহা লইয়া তুমুল আন্দোলন করুন—সে বিভাগটির নাম হইবে—'বানর বিতাড়নী বিভাগ'। এই বিভাগ সৃষ্টি করিয়া উচ্চবেতনে কয়েক জন Special Officer নিযুক্ত করুন—নতুবা অক্ষম ও অকর্ম্মণ্য গ্রামবাসীরা বিনা অস্ত্রে কোনরূপেই এই বানর ব্যূহের আক্রমনবেগ প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। বানরের বীরবিক্রম যদি কেহ উপলব্ধি করিতে চাহেন, তবে একবার বিক্রমপুর আসুন। সত্য সত্যই বিক্রমপুরে বানরের অত্যাচার অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। গ্রামের লোকেরাও এমনি অকর্ম্মণ্য যে তাহারা দলবদ্ধ হইয়া বানর তাঁড়াইবার জন্য উদ্যোগী হয় না। অত্যাচার সহিয়াও প্রতিকারে মনোযোগী হয় না!

সন্ধ্যার পর অনেকেরই ঘরে আলো জ্বলে না। কেরোসিন কোথায়? রাত্রি সাতটা বড়জোর আটটার মধ্যে গ্রাম সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করে। দু'একজন ভাগ্যবানের গৃহাভ্যন্তর হইতে আলোকরশ্মির ক্ষীণ দীপ্তি বাহিরে প্রকাশ পায় মাত্র, তাছাড়া অসীম অন্ধকারেরই রাজত্ব। লোকে ভাবে কৃষ্ণপক্ষীয় তামসীর আবির্ভাব না হইয়া কেবলই শুক্লপক্ষ হইল না কেন? কিন্তু বিধাতার সৃষ্টির রাজ্যে সবই যে বৈষম্যপূর্ণ।

আবার রাত্রিতেও অনেকের বিশেষতঃ ধনীদের নিদ্রা হয় না—কখন ডাকাত পড়ে, চুরি হয়,. এ ভয়ে সকলে

সতর্ক থাকেন। আমি একা এক বড় ঘরে শুইয়া থাকিতাম আলোও জ্বালিতাম না, কিন্তু ঘুম হইত না, নানা আশঙ্কায়। মাঝে মাঝে কুকুরের বিকট চীৎকার, শৃগালের হুক্কাহুয়া রব সচকিত করিয়া তুলিত।

বিক্রমপুরের কোন হাটেই ছানার কোনও জিনিষ মিলে না। ১৪ই অক্টোবর ২৮শে আশ্বিন প্রত্যুষে কেশার মায়ের দীঘির ছবি তুলিলাম। হাটে দেখিলাম মাছ বেশ সস্তা, অন্যান্য জিনিষের দাম কলিকাতাকেও হার মানাইয়াছে।

এইখানে একজন মহাপুরুষ মুসলমানের কথা শুনিলাম। তাঁহার নামটি আমার স্মরণ নাই। তিনি পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের অধিবাসী। সাধারণতঃ হাজীসাহেব নামেই পরিচিত। কলিকাতাতে নানা ব্যবসায় করিয়া ধনী হইয়াছেন। স্থানীয় বিখ্যাত দীঘির পাড়ের হাটেও তাঁহার দোকান আছে। এই দুর্দ্দিনে তিনি হিন্দু মুসলমান জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে অসহায় দুঃস্থ দরিদ্রগণকে নূতন বস্ত্র দান করিয়াছেন। তাঁহার কাছে হিন্দু মুসলমান কোনই ভেদ নাই। আমাদের গ্রামবাসী শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এ বলিলেন যে—হাজীসাহেব যেমন বিনয়ী তেমনি ধর্ম্মভীরু। তাঁহাকে কেহ ধন্যবাদ দিতে গেলে বলেন—"খোদার দয়ায় আমি যে ধন পাইয়াছি, সে ধন দশ জনের, আমার একার নহে। আমাকে ধন্যবাদ দিবেন না তাতে আমার গুণা হইবে।" দুর্দ্দিনে অন্নদান করিয়াছেন, বস্ত্র দান করিয়াছেন, রোগীকে আশ্রয় দান ও সেবা করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে দেখিতে গেলাম, তিনি বাড়ী ছিলেন না, তাই দেখা হ'ল না। ইঁহারাই দেবতা, কৃপণ ধনীরা দেশের কলঙ্ক।

মূলচর গ্রাম—পুরাতন ব্রহ্মপুত্রনদের পশ্চিমতীরে ও পদ্মানদীর সংযোগস্থল

২৩শে অক্টোবর, ৬ই কার্ত্তিক বাড়ীতে কয়েক দিন কাটাইয়া বিক্রমপুরের বিভিন্ন গ্রাম পর্যটনে বাহির হইলাম। একদিন খুব সকালে বাড়ী ছাড়িলাম। একা ভাল লাগিতেছিল না। তার উপর গ্রামের নেতৃস্থানীয় আমার মাতুল ভ্রাতা বিক্রমপুরের বিখ্যাত কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার সেন শর্ম্মা মহাশয় বাতে পঙ্গু হইয়া পড়িয়া আছেন। কথা বলিতে পারেন না। যিনি এক সময়ে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া কত দীনদরিদ্রের বন্ধু ছিলেন, আজ তিনি অক্ষম—ইহার চেয়ে দুঃখ আর কি হইতে পারে? আমরা দুইজনে ছিলাম বাল্যবন্ধু। যিনি কত কথা বলিতেন, কত কাজ করিতেন, আজ তাঁহার

এই শোচনীয় রোগপীড়িত অবস্থার জন্তও বড়ই নিঃসঙ্গ লাগিতেছিল।

গ্রাম ছাড়িয়া নৌকা চলিল। নদীর পথে—সম্মুখেই পড়িল সেরাজাবাদের নীলকুঠির বাড়ীটি। বাঘিয়ার খালটি বেশ প্রশস্ত। একসময়ে এই গ্রামটী ছিল জঙ্গলা-কীর্ণ—এখন পদ্মার প্রকোপে বিধ্বস্ত ধনী পল্লীবাসীরা আসিয়া বাড়ীঘর করায় গ্রামের উন্নতি হইয়াছে অনেক। কিন্তু এখন গ্রামে জনসংখ্যা বিরল হইয়া উঠিয়াছে। দুর্দ্দিনের দরুণ অনেকে গ্রাম ছাড়িয়াছে। বাজারে উঠিলাম অতি বিশ্রী তেলে ভাজা জিনিস ও মোওা ছাড়া কিছুই মিলিল না। খাল খানিকটা দূরে গিয়া অল্পপরিসর হইয়াছে এবং মাঠের মধ্যে পড়িয়া একেবারে হইয়াছে সংকীর্ণ। সেই খালের জলে নৌকা চলাচলের দারা (বোধহয় দ্বার শব্দ হইতে দারা হইয়াছে, অর্থাৎ নৌকা চলাচলের দ্বার স্বরূপ) কচুরিপানায় ভর্ত্তি, জলে ভীষণ দুর্গন্ধ। শরতের রৌদ্র তেমনি স্বর্ণাভ ও উজ্জ্বল, কিন্তু মাঠের মধ্য দিয়া নৌকা বাহিয়া নিতে আমার বলিষ্ঠ মুসলমান মাঝি বিব্রত হইতেছিল, সে বার বার বলিতে-ছিল—ভাল দিন হইলে কচুরিপানা আর টানা জল না হইলে কখন পৌঁছাতাম। বেলাবেলি পৌঁছিতেই হইবে। পথঘাট ভাল না। সে একটুও বিশ্রাম করিল না। তাহার শিশুপুত্র সাত আট বৎসরের বালক, সে পিতার সঙ্গে নাস্তা করিল, একসঙ্গে তামাক টানিল, আবার কচুরি-পানাও বৈঠার সাহায্যে সরাইতে লাগিল। অতটুকু ছেলে তার কষ্টসহিষ্ণুতা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

দূরে সহসা চোখে পড়িল আউটসাহী গ্রামের মঠ

পথে পড়িল অনেক বড় বড় গ্রাম, বাজার, হাট। কোন সজীবতা নাই। লোকেরা জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে বাজার করিতে আসিয়াছে। এইসব নিরীহ পল্লীবাসী শ্রমজীবিরাও আজ 'ব্ল্যাকমার্কেট' কথাটি শিখিয়াছে। পথের একস্থানে দেখিলাম একটু উঁচু জমিতে পাশাপাশি শ্মশান ও কবর। কত লোক মরিয়াছে তাহাদিগকে দাহ করিবার কিংবা কবর দিবার পর্য্যন্ত ব্যবস্থাও হইতে পারে নাই। দেশের কত লোক যে বিদেশে গিয়াছে, কত লোক যে মরিয়াছে তাহার সংখ্যা সরকারি হিসাবেও প্রায় দেড় লক্ষ। বিক্রমপুরের কয়েকটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় উঠিয়া গিয়াছে, অনেক শিক্ষক অন্নাভাবে পীড়ার যন্ত্রণায় কাতর হইয়া মরিয়াছেন, কিংবা দেশ ছাড়িয়া পালাইয়াছেন। গাছপালাগুলোও যেন বিষণ্ন ম্লান—একটা অন্ধকারের সৃষ্টি করি-য়াছে। দূরে সহসা চোখে পড়িল—আউটসাহী গ্রামের মঠ। মঠটি পুরাতন। এই মঠটির কথা অনেকবার লিখিয়াছি—তাই আর লিখিলাম না।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় জৈনসার গ্রামে আসিলাম। এই গ্রামটি ছোট। কিন্তু বহু উচ্চশিক্ষিত রাজকর্ম্মচারী ও ধনী-সন্তানের বাস। এ গ্রামের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন স্বর্গত অক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদি আছে—কিন্তু তাঁহার নির্ম্মিত বৃহৎ

ও সুন্দর বাড়ীখানি পরিত্যক্ত, ভগ্ন ও জরাজীর্ণ—প্রাঙ্গণে জঙ্গল ও চোরকাঁটা—সুন্দর দীঘিটির জল অপরিচ্ছন্ন, পানা ও কচুরিতে ঢাকা। তাঁহার পুত্রেরা সকলেই ছিলেন কৃতী। ডক্টর নলিনীকান্ত দত্ত গুপ্তের নাম এক সময়ে ছিল সর্ব্বত্র পরিচিত। আজ সে ঘরে প্রদীপও জ্বলে না। এ গ্রামের শুধু নয়—বিক্রমপুরের বিবিধ উন্নতির মূলে ছিলেন- অভয়বাবু।

অভয়কুমার দেশের ও পল্লীর ছিলেন একজন সংস্কারপন্থী। তিনি বিক্রমপুরের উন্নতিকল্পে জনসমাজের মধ্যে শিক্ষা প্রচারের জন্য ও বিবিধ কুরীতি ও সামাজিক দুর্নীতি দূর করিবার জন্য "পল্লী বিজ্ঞান" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতেন। ঐ পত্রিকাখানি প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল বাংলা ১২৭৩, মাঘ। ইংরাজী ১৮৬৭ জানুয়ারী। বার্ষিক মূল্য ৬০ আনা মাত্র। প্রায় ৭৮ বৎসর পূর্ব্বে ইহা প্রকাশিত হয়। জৈনসার বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত রাজমোহন চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ইহার সম্পাদক। কিন্তু সম্পাদক শব্দটি কোথাও উল্লিখিত ছিল না। এই মাসিক পত্রিকাখানি মুদ্রিত হইত ঢাকা মোগলটুলির সুলভ যন্ত্রে। সুলভ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া ঢাকা জৈনসার বিদ্যালয় হইতে শ্রীরাজমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রতি মাসে প্রকাশিত হইত। সে সময়ে বিক্রমপুরে প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়সমূহ ছিল—কালীপাড়া, শ্রীনগর, বহর, মুন্সীগঞ্জ, মাইজপাড়া, কুকুটিয়া, হাঁসারা, মালখানগর, জৈনসার, জলসা, কাচাদিয়া, কুমারভোগ, কনকসার, তারপাশা, ভোলা, বেতকা, ব্রাহ্মণগাঁও ও বজ্রযোগিনী।

সেই আশী বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত 'পল্লী বিজ্ঞান' মাসিক পত্রিকা হইতে আমরা সে কালের সমাজ, শিক্ষা, কৌলীন্য, কন্যাপণ, পথঘাট, আমোদ-প্রমোদ ও বিবিধ সভাসমিতির কথা জানিতে পারি।

আমরা তিন-চারি দিন জৈনসার গ্রামে ছিলাম। নির্জ্জন পল্লী, কলিকাতা-প্রবাসী শ্রীযুক্ত করুণাকুমার দত্ত গুপ্ত, বি, ই, ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়দের বাড়ীতে এখন এমারজেন্সী হসপিটেল বসিয়াছে। হাসপাতালে বহু রোগী—পুরুষ ও স্ত্রীলোক—আছে। স্থানীয় ডাক্তার কম্পাউণ্ডার মহোদয়েরা বিশেষ যত্ন সহকারে রোগীর ঔষধ পত্র ও সেবা শুশ্রূষার দিকে লক্ষ্য রাখিতেছেন।

আউটসাহী মঠ

কিন্তু দেশে যে পরিমাণ রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে, তাহাতে ভয় হয়, না জানি দেশে এক মহামারীর উদ্ভব হয়। আমার গৃহিণীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বিনোদিনীকান্ত সেন জৈনসার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট। দিবারাত্রি রোগীদের ঔষধ পথ্য যোগাইতেছেন। দেখিলাম তাঁহার অবসর মাত্রও নাই। জৈনসার গ্রাম আমার শ্বশুরালয়। ২৪শে অক্টোবর, ৯ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, আজ জগদ্ধাত্রী পূজা। ঢাকের শব্দ দুই একটি গ্রাম হইতে শুনিতে পাইতেছিলাম। ইছাপুরা হইতে তালতলা সাড়ে তিন মাইলের বেশী নহে। বাঁধান সড়ক আছে, দুইদিকে খাল, কিন্তু কচুরিপানা

ভর্ত্তি—সেজন্য নৌকা ছাড়িয়া হাঁটিয়া চলিলাম। কিছুদূর যাইতেই দেখিতে পাইলাম—কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়ায় আকাশের একটা দিক্ অন্ধকার করিয়া ফেলিতেছে। যেন কালো মেঘের জটলা। পথে যাঁহাদের সঙ্গে দেখা হইতেছিল তাঁহারা সকলেই বলিতেছিলেন কমলা ঘাটের বন্দরে আগুন লাগিয়াছে। চমকিয়া উঠিলাম! কমলা ঘাটের বন্দরে আগুন লাগা অর্থে বিক্রমপুরের শুধু নয়, ঢাকা, ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহ প্রভৃতি বহু জেলার লোকের সর্ব্বনাশ! কি করিয়া কি ভাবে আগুন লাগিল, সে কথা কেহই বলিতে পারিলেন না। আমরা নানারূপ জনরব শুনিলাম। শুনিলাম—বন্দরের প্রায় এককোটী টাকার মজুত মাল অগ্নিসাৎ হইয়াছে।

আমরা ২৭শে তারিখ মালখানগর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের হেড মাষ্টার শ্রীযুত প্রমথপ্রসন্ন সেন, এম-এ, বি-টি, মহোদয়ের বাড়ী আতিথ্য স্বীকার করিলাম। রাত্রিতে বেশ গল্প গুজবে কাটিয়া গেল। মালখানগরের বহু পুরাতন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আলাপ হইল। বন্ধুবর, জগদীশচন্দ্র বসু সুরেশচন্দ্র বসু, প্রভৃতির সহিত দেখা হওয়ায় বেশ আনন্দিত হইলাম। দেশের কথা, সমাজের কথা—১৩৫০ সালের মন্বন্তরের কাহিনী শুনিলাম। এ গ্রাম বিক্রমপুরের একটি প্রসিদ্ধ পল্লী। বহু কৃতবিদ্য খ্যাতনামা ব্যক্তির বাস। গ্রামে এখন কেহ বড় একটা থাকেন না। বড় বড়

জৈনসার অভয়কুমার দত্ত গুপ্তর (রাজবাবুর) বাড়ী

বাড়ী, প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা তালাবদ্ধ। স্কুলের-ছাত্র সংখ্যাও হ্রাস পাইতেছে। এ গ্রামখানি অয়েলক্লথ তৈয়ারীর একটি প্রধান কেন্দ্রস্থল। শ্রীযুক্ত ভূপতিমোহন বসু সর্ব্বপ্রথম অয়েলক্লথ তৈয়ারী করিতে আরম্ভ করেন। দেশে বিদেশে তাঁহার খ্যাতি প্রচারিত হয়। গ্রামবাসী দরিদ্র গৃহস্থেরাও বর্ত্তমানে অয়েলক্লথের ব্যবসায় করিয়া অর্থশালী হইতেছে। ফেগুনাসার গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত হীরা লাল পাল নামে একজন ধনী ব্যক্তির সহিত আলাপ হইল, তিনি দেশের দরিদ্রনারায়ণের সেবার জন্য গত বৎসর বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন।

২৮শে অক্টোবর, শনিবার। আজ বেলা দশটার মধ্যে স্নানাহার সারিয়া কমলা ঘাট বন্দরে লঞ্চ সহযোগে এক ঘণ্টার মধ্যেই পৌছিলাম, কি ভীষণ অগ্নিকাণ্ড। এখনও আগুন জ্বলিতেছে। আটার বিরাট গুদাম, ময়দার, চালের বিরাট গুদাম—ডালের গুদাম, সব পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইয়াছে। অতি কষ্টে কোনরূপে কয়েকখানি ছবি তুলিলাম। বর্ত্তমানে কেন, বিগত শত বৎসরের মধ্যে বিক্রমপুরে এইরূপ অগ্নিকাণ্ড হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই, পুলিশ পাহারা রহিয়াছে, পাছে, দুঃখী কাঙালেরা চাল, ডাল, কিছু কুড়াইয়া লয়। লবণ, চিনি সব পুড়িয়া এক অদ্ভুত আকার ধারণ করিয়াছে। সংকীর্ণ গলি পথে বাজারের ধ্বংস-লীলা দেখিতে দেখিতে চলিলাম, অতি সন্তর্পণে চলিতে হইল। গায়ে আগুনের উত্তাপটা বেশ অনুভব করিতেছিলাম।

আমার সঙ্গে ছিলেন মালখানগর স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দাশগুপ্ত। শ্রীশবাবু এ অঞ্চলের বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি। আমরা ছোট একখানি ডিঙ্গি নৌকা ভাড়া করিয়া আবদুল্লাপুরের দিকে চলিলাম। আধ ঘণ্টার মধ্যেই আবদুল্লাপুর গ্রামের সীমান্তে আসিয়া পৌছিলাম। ইছামতী নদী পূর্ব্বে এ গ্রামের প্রান্তদেশ দিয়া প্রবাহিত হইত, এখন অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে। প্রথমে আসিলাম আবদুল্লাপুরের বড় আখড়ায়। আমি কয়েকবার এই আখড়া দেখিতে আসিয়াছিলাম। দেখিলাম পূর্ব্বের সেই শ্রী কিছুই নাই। আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত মোহান্তের খোঁজ করিলাম—শুনিলাম কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার স্থানে এখন হরেকৃষ্ণ দাস নামে এক অজ্ঞ যুবক এই আখড়ার মোহান্ত হইয়াছে। মূল মন্দিরটির পশ্চিম-দিকে তাহার থাকিবার দুই তিনখানি ঘর। হরেকৃষ্ণের একটি বৈষ্ণবী আছে। সে এখন গ্রামে ছিল। অতি শৈশবে এই পিতৃমাতৃহীন বালককে মৃত মোহন্ত রাখালদাস বাবাজী দত্তকরূপে গ্রহণ করেন।

আমরা এই আখড়ার যে কয়জন মোহন্তের পরিচয় পাই, তাঁহাদের মধ্যে মোহন্ত জগন্নাথ দাস, হরিদাস, রাখাল দাস বাবাজী ইঁহারা সকলেই পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। এই মন্দিরে বিগ্রহ আছেন—গিরিধারী, জগন্নন্ধু, বলরাম, সুভদ্রা, গৌরনিতাই, রাধাবিনোদ, এক সময়ে এই মন্দির গাত্রে ও বাহিরে বিখ্যাত রামপাল হইতে সংগৃহীত বহু হিন্দুদেবদেবীর মূর্ত্তি সংরক্ষিত ছিল—তাহার কয়েকটি ঢাকা যাদুঘরে স্থানান্তরিত হইয়াছে। অনেকগুলি প্রাচীন পুঁথি ছিল, আজ তাহার সন্ধান মিলিল না। মন্দিরের সম্মুখের বিরাট নাটমন্দিরটিরও জীর্ণ অবস্থা।

মন্দিরের বাহিরের স্নানবেদীর মধ্যস্থলে নৃসিংহ, তাহার বামে বিষ্ণু, দক্ষিণে সূর্য্যমূর্ত্তি আছে। মন্দিরের প্রাচীর গাত্রে রহিয়াছেন বামদিকে নৃসিংহ, দক্ষিণে বিষ্ণু, ভিতরে বামন্, কার্ত্তিকেয়, বিষ্ণু। আমরা বৃহৎ নাটমন্দিরের মেজে মাদুর পাতিয়া বসিলাম। একে একে গ্রামের কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ও ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট আসিলেন।

এই আখড়ায় থাকিয়াই মহামতি বৈষ্ণব সাধক কৃষ্ণকমল গোস্বামী তাঁহার 'স্বপ্নবিলাস', 'দিব্যোন্মাদ' বা 'রাই উন্মাদিনী' প্রভৃতি রচনা করেন। পূর্ব্ববঙ্গে এমন লোক নাই, বিক্রমপুরে এমন কেহ নাই যাঁহারা কৃষ্ণকমল গোস্বামী মহাশয়ের নাম না জানেন। তিনি নদীয়া জেলার ভাজনঘাট গ্রামের অধিবাসী হইলেও তাঁহার কর্ম্মভূমি ছিল পূর্ব্ববঙ্গ, বিক্রমপুর ও ঢাকা। তাঁহার বিখ্যাত 'স্বপ্নবিলাস', 'দিব্যোন্মাদ', 'বিচিত্র বিলাস' যথাক্রমে ১৮৬০ ও ১৮৬২ সালে বিরচিত হয় এবং ঢাকা ও মুন্সীগঞ্জের নিকটবর্ত্তী আবদুল্লাপুরবাসীদের গঠিত সখের যাত্রা দলে উহা সর্ব্বপ্রথম অভিনীত হইয়াছিল। আম অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম, সেই যাত্রাদলের অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন রাধানাথ গোপ, নগরবাসী কর্ম্মকার, আনন্দ কর্ম্মকার, রেবতী বসাক, ব্রজবাসী গোপ, মদন গোপ, রাজকিশোর গোপ প্রভৃতি! এখনও তাহাদের কাহারও কাহারও বংশধরেরা জীবিত আছেন।

বিক্রমপুরের ও বাংলার অন্যতম সুসন্তান ডক্টর নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় ইউরোপে অবস্থান কালে ইংরাজীতে 'The yatras or the popular Dramas of Bengal—বঙ্গদেশীয় যাত্রাগান বিষয়ে আলোচনা করেন। ঐ আলোচনায় কৃষ্ণকমলের 'স্বপ্নবিলাস' যাত্রার অনেক গান ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। ঐ গ্রন্থখানা ১৮৮২ সনে লণ্ডনে প্রকাশিত হইয়াছিল, দাম ছিল মাত্র দুই শিলিং। কৃষ্ণকমলের 'স্বপ্নবিলাস', 'দিব্যোন্মাদ' যখন মুদ্রিত হইল, তখন প্রায় ২০০০০ সংখ্যক পুস্তক অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়াছিল। ডক্টর নিশিকান্ত সে-কালের যাত্রার অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সাজসজ্জা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—The whole apparatus of a Yatra—Adhikari is packed up in a small bag, and consists of a few shepherd's cloth of printed Calico, and sometimes, though rarely,

আবদুল্লাপুরের বড় আখড়া

of the world known Dacca Muslin." শৈশবে গ্রামের বৃদ্ধদের মুখে শুনিতাম :—

শুন ব্রজরাজ স্বপনেতে আজ,
দেখা দিয়ে গোপাল কোথা লুকালে ?
'যেন' সে চঞ্চল চাঁদে, অঞ্চল ধ'রে কাঁদে
জননী, দে ননী, দে ননী ব'লে।
নীল কলেবর, ধূলায় ধূসর,
বিধুমুখে যেন কতই মধুর স্বর,
যত কাঁদে বাছা বলি সর, সর,
নাহি অবসর কেবা দিবে সর,
সর, সর, ব'লে আনিলেম ঠেলে।

ধূলা ঝেড়ে কোলে তুলে নিলেম চাঁদ,
অঞ্চলে মুছালেন চাঁদের বদন-চাঁদ,
পুনঃ কাঁদে চাঁদ চাঁদ ব'লে,
যে চাঁদ নিছনি কোটি কোটি চাঁদ,
সে কেন কাঁদিবে বলি চাঁদ চাঁদ,
(বল্লেম) চাঁদের মাঝে তুই চাঁদ, চাঁদ আছে তোর চরণতলে।

কৃষ্ণকমলের বিরচিত শত শত গান এখনও বিক্রমপুরবাসীর ও ঢাকাবাসীর কণ্ঠে কণ্ঠে প্রতিদিন শুনিতে পাওয়া যায়। এখনও মহিলারা গান করেন, "চল্ নাগরী, নিয়ে গাগরী, যমুনায় বারি আনতে যাব।" বাংলা সন ১২১৭ সাল, ইংরাজী ১৮১০ খৃষ্টাব্দ আষাঢ় মাসে রথযাত্রার দিন

শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে কৃষ্ণকমলের জন্ম এবং বাংলা সন ১২৯৪, ১২ই মাঘ, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ বুধবার কৃষ্ণকমলের মৃত্যু হয়। আজিও আবদুল্লাপুরবাসী প্রৌঢ় ও যুবকেরা তাঁহার কথা ভোলে নাই। গ্রামবাসীদের মুখে আবার সেই সুমধুর সঙ্গীত শুনিতে পাইয়া ধন্য হইলাম।

আবদুল্লাপুর গ্রামটি পরগণে জাহাঙ্গীরনগর, মালিক মহম্মদ সৈয়দ আলি খাঁ। জনশ্রুতি সৈয়দ আলি খাঁর পুত্র আবদুল আলির নাম অনুসারে গ্রামের নাম হইয়াছে আবদুল্লাপুর। কাজেই বর্ত্তমানে ইহা আবদুল্লাপুর নামে পরিচিত হইলেও মুসলমান আমলের পূর্ব্বে অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমান প্রভাব বিস্তারের পূর্ব্বে এই গ্রামের নাম কি ছিল তাহা অনুসন্ধানের যোগ্য। আমাদের মনে হয় আবদুল্লাপুর, রিকাবী বাজার, নগরকস্‌বা, ফিরিঙ্গি বাজার, রামপাল, বজ্রযোগিনী, সুবাসপুর প্রভৃতি গ্রামসমূহ লইয়া ছিল বিরাট বিক্রমপুর রাজধানী। এইসব কথা আমি মৎপ্রণীত 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' প্রথম খণ্ডে আলোচনা করিয়াছি। এই গ্রামগুলি মুসলমান আমলের পূর্ব্বে কি নামে অভিহিত হইত, পুরাতন কাগজপত্র হইতে তাহার সন্ধান পাইতে পারি। আমরা যতদূর অনুসন্ধান দ্বারা পুরাতন কাগজপত্র হইতে জানিতে পারি তাহাতে মনে হয়, রিকাবী বাজারের মস্‌জিদ নির্ম্মাতা আবদুল্লা মিঞার নামানুসারেই আবদুল্লাপুর গ্রামের নাম হইয়াছে। পাঠান শাসনের কালে রিকাবী বাজার, কাজি কস্‌বা প্রভৃতি স্থানে কয়েকটি মস্‌জিদ্ নির্ম্মিত হয়, পাঠান শাসনকালে কররাণী বংশীয় সুলেমান কররাণীর রাজত্ব সময়ে ৯৭৬ হিজরায় (১৫৬৯ খৃঃ অঃ) আবদুল্লা মিঞা ছিলেন বিক্রমপুরের একজন কাজী। কাজীকস্‌বা গ্রামটি এখনও প্রাচীন কাজীদের বাসস্থানের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই কাজী আবদুল্লার নাম হইতেই গ্রামের নাম হইয়াছে আবদুল্লাপুর—আমি এই সিদ্ধান্তই সঠিক বলিয়া গ্রহণ করি। রিকাবী বাজার গ্রামে তাঁহার নির্ম্মিত একটি মস্‌জিদ আছে। মসজিদটি ইষ্টকনির্ম্মিত। বাহ্যাকৃতি ৩৬×৩৪ ফুট, উপরে একটি মাত্র গুম্বজ; ৪ ফিট পুরু। আমি যখন প্রথম এই মসজিদটি দেখি সে প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে; তখন উহা ছিল ভগ্ন ও জীর্ণ অবস্থায়। চারিদিক বেড়িয়া ছিল বন জঙ্গল। দু' চারিজন ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান অধিবাসী মাত্র তখন ঐখানে নমাজ পড়িতে আসিতেন। বর্ত্তমানে উহা সুসংস্কৃত হইয়াছে। এই মসজিদের গায়ে যে শিলালিপিটি আছে তাহার পাঠ এইরূপ :

God Almighty says, "The mosques belongs to God, worship no one else with Him. The Prophet says, "He who builds a mosque in the world will have seventy castles built for him by God in paradise," These mosques together with what there is of other buildings (were built) during the … … … of the age, his angust majesty Miyan, during the month of Xilquadh (Zilkaidesh)।

এই মস্‌জিদটি সাধারণতঃ "কাজী মস্‌জিদ" নামে পরিচিত। কাজেই আবদুল্লা মিঞা পাঠান শাসনকালে বিক্রমপুরের কাজী ছিলেন এবং আবদুল্লাপুর গ্রামের নাম তাঁহার নাম হইতেই হইয়াছিল। অর্থাৎ তিনিই প্রাচীন রাজধানী বিক্রমপুরের পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত একভাগকে নিজ নামে অভিহিত করিয়াছিলেন, ইহাই সত্য বলিয়া গ্রহণযোগ্য।

আবদুল্লাপুর গ্রাম বিক্রমপুরের একটি প্রসিদ্ধ পল্লী। এই পল্লীর বর্ত্তমান জনসংখ্যা ৮৬৭৪। এক সময় আবদুল্লাপুর গ্রামটি ছিল বস্ত্র-শিল্পের প্রধানতম কেন্দ্র। ঢাকার বস্ত্র বিক্রেতারা অনেকে আবদুল্লাপুর গ্রামের কাপড় —ঢাকাই তাঁতের কাপড় বলিয়া বাজারে বিক্রয় করে। এখনও এ গ্রামে ১০০ শত তন্তুবায়ের বাস। এখানকার বিখ্যাত কারিকরদের মধ্যে রেবতী বসাক, মধু বসাক, দেবেন্দ্র বসাক ছিলেন প্রধান। আবদুল্লাপুরের গোপ পল্লীতে প্রায় ১৫০ শত ঘর গোপের বাস। এখানকার ঘৃত, মিষ্টি, দধি, ক্ষীর খুব বিখ্যাত ছিল। বর্ত্তমান সময়ে একদিকে যেমন সূতার অভাবে বস্ত্রশিল্পিগণ নিজ ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া অন্যরূপ ব্যবসায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতেছেন, তেমনি গোপ পল্লীর অনেকেই দুধের অভাবে নিজ নিজ পৈত্রিক ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতেছেন। এ গ্রামের প্রেসিডেণ্ট শ্রীমান কৃষ্ণদাস গোপ, ও স্থানীয় মতিলাল গোপ, আবদুল্লাপুর স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত প্রাণবল্লভ নাথ আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া গ্রামের সব কিছু দর্শনীয় দ্রব্যাদি দেখাইতে ছিলেন।

আমরা গ্রামের পথ ধরিয়া চলিলাম। অতীতকালের অনেক স্মৃতি এখানকার সর্ব্বত্র এখনও বিদ্যমান আছে। একটি বাঁশবনের মধ্যে রাস্তার ধারে একটি ছোট মসজিদ দেখিলাম; মসজিদটির এখন জরাজীর্ণ অবস্থা। আবদুল্লাপুর স্কুলের নিকটবর্ত্তী একটি মাঠ—'কানাই চন্দের মাঠ' নামে প্রসিদ্ধ। এই মাঠে একটা যুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে।

আবদুল্লাপুরের দীঘির অপর তীরে একটি কাছারী বাড়ী। কাছারী বাড়ীর পাশে একটি বকুল গাছ। বকুল গাছের নিকটেই ছিল সৈয়দ আলীর সমাধি। হিন্দু-মুসলমান সকলে এই খ্যাতিমান মহাপুরুষের সমাধির

কাছে মানত দেয়,সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালাইয়া দেয়। এখানকার মানত সফল হয় বলিয়াই স্থানীয় লোকের বিশ্বাস।

আবদুল্লাপুরে একটি বিখ্যাত দোলমঞ্চ আছে—এই মঞ্চটি বিশেষ ভাগে উল্লেখযোগ্য। দোলমঞ্চের বর্ত্তমান মালিক হইতেছেন গোষ্ঠবিহারী পাল। পূর্ব্বে মালিক ছিলেন—যদুচরণ সাহা। মঠটি ন্যূন পক্ষেও ৩০০ শত ৩৫০ (সাড়ে তিন শত) বৎসরের পুরাতন। ইহার দৈর্ঘ্য পূর্ব্ব-পশ্চিম ২০ ফুট, উত্তর-দক্ষিণ ২০ ফুট, উচ্চতায় ৩৬ ফুট হইবে।

এক সময়ে ইছামতী নদী এই গ্রামের প্রান্তবাহিনী ছিল। এখনও সেই নদীর গতি প্রতিরোধ করে এক সময়ে যে ইহার পাকা বাঁধ প্রস্তুত ছিল তাহার ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। আমি সেই সব ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলাম। দোলমঞ্চটি একটি দেখিবার জিনিষ—এখানে প্রতি বৎসর যদি গ্রামবাসীরা মিলিত হইয়া—দোলের সময় উৎসব করেন তাহা হইলে এই সুন্দর প্রাচীন কীর্ত্তি মন্দিরটি সুসংস্কৃত হইতে পারে, কিন্তু জানিলাম পরস্পর বিদ্বেষকলহ ও মাম্‌লা মোকদ্দমার দরুণ তাহা আর হয় না। এই মঞ্চটির ছবি গাছপালার আবেষ্টনীর দরুণ তোলা সম্ভবপর হইল না—চমৎকার এই মঞ্চটির গঠননৈপুণ্য! মঞ্চটির বিপরীত দিকে একটি ভগ্ন মন্দির পড়িয়া আছে। এইটি লইয়া মোকদ্দমাও হইয়াছিল। পরে উহার গোলযোগ নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে।

সেই পথ দিয়া একটু অগ্রসর হইলেই একজন ভদ্রলোকের একখানি পুরাণো বাড়ী দেখিতে পাইলাম। বাড়ীখানি ঠিক্ যেন শাঁখারী বাজারের একটি পুরাণো বাড়ী। এইরূপ অনেক বাড়ীঘর এখনও আবদুল্লাপুর গ্রামে দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা আবদুল্লাপুর গ্রামের চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিলাম।—দেখিলাম পূর্ব্বের অপেক্ষা অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে—তাঁতশালায় তাঁতিরা সূতার অভাবে তাঁত চালাইতে পারিতেছেনা.—গোয়ালারা অনেকে আগের ব্যবসা ত্যাগ করিয়া অন্যবিধ বৈষয়িক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। কত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। এক সময়ে যাঁহারা ছিলেন, আজ তাঁহাদের পুত্র ও পৌত্রেরা জীবিত। আমার এই গ্রামবাসী পুরাতন বন্ধুদের মধ্যে দুই একজনের মাত্র সাক্ষাৎ পাইলাম—তাঁহারাও জরাজীর্ণ, অক্ষম ও দুর্ব্বল।

আবদুল্লা মিঞা কাজী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত মসজিদ (রিকাবী বাজার)

সেখান হইতে চলিলাম সুধারাম বাউলের আখড়ার দিকে। সুধারাম বাউলের নাম সর্ব্বত্র পরিচিত। তাঁহার মধুর সঙ্গীত ধারা এক সময়ে পূর্ব্ব বাঙ্গালার ঘরে ঘরে বাউলদের দ্বারা গীত হইয়া প্রচারিত হইয়াছিল; এখন তাঁহার কথা লোকে ভুলিয়াছে। সুধারামের বিরচিত গানও আর কেহ গাহে না।

আমরা বাল্যকালে কৈশোরে ও যৌবনে সুধারামের সঙ্গীত শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তাঁহার সম্বন্ধে 'প্রতিভা' পত্রিকার প্রথম বর্ষ (১৩০৮ শ্রাবণ—প্রতিভা ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ১৮৫-১৯১) বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। আমার মনে হয় উহার পূর্ব্বে কেহ সুধারাম বাউল সম্বন্ধে কোন আলোচনা করেন নাই। আমি বহু কষ্টে সেকালের একজন প্রাচীন বাউলের নিকট হইতে জীবনী সংগ্রহ করিয়াছিলাম এবং বহুবার সেরাজাবাদ গ্রামবাসী বাউলদের আখড়ায় গিয়াছি সুধারাম বাউল ও অন্যান্য বাউলদের নিকট হইতে উহাদের সাম্প্রদায়িক বিবরণ জানিবার জন্য। সুধারাম বিক্রমপুরের অন্তর্গত মাটিভাঙ্গা নামক একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে নমঃশূদ্র বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যকালে তাঁহার আচরণ ছিল অস্বাভাবিক, সেজন্য লোকে তাঁহাকে "পাগলা" বলিত। দৈবক্রমে সেই পাগল সুধারামই সাধক সুধারাম হইলেন।* সুধারাম যে মত প্রচার করিলেন তাহাতে কোনও বিভেদ রহিল না। জাতিভেদ, হিন্দু-মুসলমানে পার্থক্য কিছুই রহিল না, ছোট বড় সবই এক—

* 'প্রতিভা'তে বিস্তারিত ভাবে জীবনচরিত লিখিয়াছি। এখানে

প্রেম ও ভালবাসাই হইল তাঁহার ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব। তাঁহার মত 'সহজমত' নামে পরিচিত। সুধারামের সুধাচাঁদ বিরচিত বাউল সুরের সরল অথচ আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ সঙ্গীত সমূহ এক সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এখন বিক্রমপুর ও পূর্ব্ববঙ্গের বাউলেরা সুধারামের গান আর বড় একটা গাহে না, আমরা এখানে সুধারামের বিরচিত কয়েকটি গান উদ্ধৃত করিলাম।

ওরে ডুবছে নাও (১) ডুবাইয়া বাও
ওরে রসিক নাইয়া (২)
ওরে ভাঙ্গা নাও যে বাইতে পারে
তারে বলি নাইয়া!
ওরে হাল ছেড় না ভয় কর না
পারবারে যাইতে বাইয়া
ও তোর ভাঙ্গা নাও লোণা পানি
ছাইড়া দিছে থাইয়া!
ওরে পথের মাঝে ফাঁদ পেতেছে
বাজীকরের মাইয়া!

আবার সুধারাম গাহিয়াছেন:

চেতন থাক্‌তে চিনে ল মন,
কার কোন বাড়ী রে!
চেতন মানুষ দেখ বিরাজে।
তার আট কুঠুরী ষোলা চাকী মধ্যে হীরার থাক্
দেহের মধ্যে আছেন গুরু শিষ্য হইবে কার?
ওরে সাক্ষাৎ মানুষ ছাইড়া তুমি
নাম জপ কার?

* * *

দেহের মধ্যে আছেরে মন তীর্থ বারানসী,
বাউল সুধারামে বলে গুরু আজ্ঞা মূল,
সাক্ষাৎ থাকিতে গুরু কেন হইল ভুল?

নিরক্ষর সুধারাম ভক্তিবিগলিত কণ্ঠে গাহিলেন:

স্বজনি গো! স্বভাব দোষ আমার গেল না!
মানব জনম সফল হইল না!
আমি আমার স্বভাব দোষে হইলাম গো দোষী
সে দোষ দিব কার?
বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার সাধ্য কি আমার?
ওগো! স্বাতি নক্ষত্রেরি জলে গজ মুক্তা হয়
পাত্র বিশেষে ফলাফল ফলিবে নিশ্চয়,
সে জল বাঁশে যদি পড়ে তবে বাঁশ কাফুর নাম ধরে
সিংহের দুধ ওরে মাইটা ভাণ্ডে টিকে না,
ওরে যোগ্য ভাণ্ড না হইলে টিকে না!
ওগো! পাণিকাউড়ের মত জলে ডুবছে কত,
আদার ব্যাপারী কি গো জানে জাহাজের খবর?

এই কথা যে বিশ্বাস করে সে বড় বর্ব্বর!
বাউল সুধারামে কয় চিরকাল জীবে রয়
এই বিশ্বাসে দিন কাটায়রে মনের মানুষ চিনে না!

আমরা এখানে সুধারাম বাউলের আর দুইটি সঙ্গীত উদ্ধৃত করিতেছি—

সহজ মানুষ আছে ঢাকাতে
একবার গিয়া আর্জ্জি দাও আদালতে॥
ঢাকার উপরে ঢাকা মধ্যে চক্‌বাজার
মাইয়ায় মাইয়ায় বেচা কেনা নাহি পুরুষ তায়
যদি লইয়া বাঁচতে পার তবে মইয়ার সঙ্গ ধর।
সেই সহরে সাধ্য নাই পুরুষ যাইতে।
ঢাকার সহর নিগম্য স্থান অতি সে গোপন॥
সে স্থানেতে বিরাজ করে মানুষ রতন।
কর শ্রীগুরুর চরণ সার—দুপুরের মুক্তাকার।
এবার যাইয়া যোগ রাখ মন তাঁর সাথে।
পাথর কাটা পার হইয়া যাও বুড়ী গঙ্গার পার।
সেই খানে নাই জন্ম মৃত্যু যমের অধিকার।
দেহে আছে দুই রতি—সুমতি কুমতি॥
সুমতিকে সহায় করে নাও সাথে॥

আর একটি সঙ্গীতে সুধারাম বলিতেছেন:—

মন তুই ফিরে আয়
ঐ পথে বাঘের ভয়
সহায় থাইকো ফাকে ফুকে
ওরে যেও না মন উল্টা টাকে
টাট্‌কা বাস আট্‌কা আছে
মট্‌কা বাড়ীতে।
বাঘের নাম মনেশ্বরী
চাইর দিকে জঙ্গল বাড়ী
ওরে কাটে মানুষ যারে পায় কাছে।
গেরামের দশজনকে সহায় কইরে
সুপথে মন চল্‌রে ধেয়ে
ও পথে তুই গেলে মরবি প্রাণে
ওরে মন পারবি রে যেতে হুশিয়ার হোলে।
হস্তপদ দন্তহীনে আহার জোগায় সেই জন
সেই জনেরে সহায় করে চলে আয়!
গুণী জ্ঞানী যত ছিল বাঘের হাতে প্রাণ সঁপিল
সুধারাম কি হ'লরে, সহায় করি আয়।
এই খানে যে তন্ত্র মন্ত্র খাটে না রে
চলে না মন জারি জুরি
এ যে জাত্যা বল নয়রে মন, দেহের মধ্যে
বাসা বাইন্ধা মড়া বাঘে খায়।

এই সকল সঙ্গীতের প্রকৃত অর্থও অনেক সুময় জনয়ঙ্গম

করা সুকঠিন। বাউলেরা যখন সারেঙ্গের মধুর শব্দের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া গাহিতে থাকে তখন এ সকল সঙ্গীত অতীব মনোরম শুনায়।

বিক্রমপুরে এখনও অনেক বাউলের আখড়া আছে আমি তাহাদের অনেকের পরিচয় ও গান সংগ্রহ করিয়াছি। ঐ সঙ্গীতগুলি হইতে বাউলদের আচরিত ধর্ম্মের নিগূঢ় তথ্যসমূহের পরিচয় পাওয়া যায়।

আমরা সকলে সুধারামের আশ্রমে আসিলাম। স্থানটি বড় সুন্দর ঠিক যেন পুণ্য তপোবন। পূর্ব্বদিকে রাজপথ --তারপর নদী। অতি মনোরম স্থান। একটি মাত্র কুটির। কুটির বা মন্দির মধ্যে সুধারামের খড়ম। মন্দিরের পশ্চিমে একটি বকুল গাছ, বট ও আমলকী আর উত্তর দিকে একটি তমাল গাছ। আমরা এখানে বসিয়া সুধারামের গান শুনিলাম সুমধুর সুরে। পথে লোক জড় হইয়া গেল। প্রত্যেক বছর আবদুল্লাপুর গ্রামে গোপাল নাচ হয়। সেই গোপাল নাচে কৃষ্ণকমল গোস্বামীর বিরচিত সঙ্গীত গীত হয়। সে গানগুলি এখনও ছাপা হয় নাই। কবির এই সঙ্গীতগুলি মুদ্রিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। একখানি জীর্ণ খাতায় লেখা রহিয়াছে। প্রতি বৎসর মাঘী সপ্তমী তিথিতে সূর্য্যব্রত উপলক্ষ্যে এখানে একটি মেলা হইয়া থাকে। সে মেলায় বহু পুরুষ ও স্ত্রীলোক সমবেত হইয়া থাকেন।

নদী সরিয়া গিয়াছে—কাজেই একটা মস্ত চরা পড়িয়াছে সেখানেও সুধারামের একটি আখড়া আছে। এই চর—'সুধার চর' নামে পরিচিত। স্থানীয় মতিলাল গোপ মহাশয় বলিলেন যে, আবদুল্লাপুর আখড়ার নিষ্কর তালুক এবং সুধারামের এই আশ্রম ও তৎসংলগ্ন বিস্তৃত ভূমি সৈয়দ আলী খাঁ আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দান করিয়াছিলেন। সে সমুদয় পুরাণো কাগজপত্র এখানে কারোর কাছে নাই। সেটেলমেণ্ট রেকর্ড এবং জমিদারী সেরেস্তার কাগজ পত্র দেখিলে এ বিষয়ে প্রকৃত তথ্য জানা যাইতে পারে। তবে, সুধারাম যে সৈয়দ আলী খাঁর সমসাময়িক ছিলেন না, তাহা আমরা জানি, কাজেই গ্রাম্য জনসাধারণের কথার মধ্যে কতটা সত্য আছে জানি না—কেননা পুরাণো কাগজপত্র দেখিবার সুযোগ আমাদের হয় নাই।

একটা কথা বলিতে ইচ্ছা হয়। কথাটি কঠোর হইলেও সত্য। বিক্রমপুরের অবনতির কারণ যদি বলিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, সেজন্য সম্পূর্ণভাবে অপরাধী বিক্রমপুরের শিক্ষিত ও ধনী সম্প্রদায়। প্রত্যেক গ্রামবাসী, ধনী ব্যক্তিরা যদি গ্রামের উন্নতির জন্য সামান্য ভাবেও মনোযোগী হন, তাহা হইলে গ্রামের অনেকখানি উপকার হইতে পারে। শিক্ষিত লোকেরা প্রবাসী। অবসরপ্রাপ্ত রাজপুরুষেরা কলিকাতা সহরে বাড়ী করিয়া বাস করিতেছেন, অনেকে বিক্রমপুরবাসী বলিয়া পরিচয় দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন। এরূপ স্থলে গ্রামবাসীদের কাঁধে দোষ চাপাইলে চলিবে কেন?

আর একটা বিষয় লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। গ্রামের মুসলমান কৃষক, শ্রমজীবী, ব্যবসায়ী যাহারা—তাহারা অশিক্ষিত হইলেও দেশবিদেশের সংবাদ জানিতে উৎসাহ প্রকাশ করে। আগ্রহ দেখায় এই যে জানিবার ও শিখিবার কৌতূহলটা এখন তাহাদের মধ্যে খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। হিন্দুরা যেখানে কলহ করে, মুসলমানেরা সেখানে মিলিতভাবে কাজ করে। হিন্দুদের মধ্যে হুজুগ-প্রিয়তা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। কাজ অপেক্ষা কথাই ইহাদের বেশী। হিন্দুর গো-সেবা ধর্ম্ম—কিন্তু কয়জন হিন্দু গো-পালন করেন? বাড়ী বাড়ী দুধ যোগান দেয় কাহারা? মুসলমান। গোশালার যত্ন ও সেবা তাহারাই করে। এ সকল কথা হিন্দুদের ভাবিবার বিষয়। বক্তৃতার দ্বারা দেশের কল্যাণ হয় না। মনুষ্যত্ব ও কর্ত্তব্য-সাধন হইতেছে তাহার প্রধান অঙ্গ।

আমার মনে হয়, এ-সব বিষয় হিন্দুদের বিচার করিবার সময় আসিয়াছে। বিক্রমপুরে হিন্দু মুসলমান বরাবরই ভ্রাতৃভাবে বাস করিয়া আসিয়াছে ও আসিতেছে এবং আসিবে, এ বিশ্বাস আমি করি। তবে সে-দিকে লক্ষ্য করিতে হইলে—চাই শিক্ষা-বিস্তার। সেই শিক্ষা-বিস্তারের পন্থা নির্দেশ শুধু সরকারী সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। গ্রামের আর্থিক উন্নতির জন্য, সংস্কারের জন্য সুনির্দ্দিষ্ট পন্থা নির্দ্দেশও যেমন কর্ত্তব্য তেমনি কর্ম্মী চাই—কর্ম্মী না পাইলে কাজ চলিবে না।

বিক্রমপুরের যে অবস্থা বাঙলাদেশের সর্ব্বত্রই সেই অবস্থা। কাজেই এদিকে বাঙালী হিন্দু-মুসলমান সকলে চিন্তা করুন কাজ করিতে প্রবৃত্ত হউন—ফল ফলিবে। রামপ্রসাদের কথায় বলিতে হয়—

"মনরে কৃষি কাজ জান না!
এমন মানব জনম রইল পতিত
আবাদ করলে ফলত সোনা।"

সৈনিক

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

কয়েক দিনের মধ্যেই একটা নতুন চেতনা দেখা দিল যেন সারা গ্রামে। তার মূল উৎস বারোখাদা।

রবিবারে বুধবারে প্রকাণ্ড হাট বসে বাজারের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে। গৃহস্থ ব্যাপারী, ফড়িয়া, পাটচাষীরা দুই তিন দিনের পাকা সওদা করিয়া লয় লঙ্কা-মরিচ, 'ছোবার' দড়ি, আঁখের পাটালি, মুসুরী-কালাই এমন কি চুণ, তামাকপাতা আর সুপারী পর্য্যন্ত। কিন্তু সেদিন বুধবারের হাটে সওদা ফেলিয়া সকলে আগুন হইয়া উঠিল। তিনগুণ দাম বাড়িয়াছে চাউলের। আট টাকা নয় টাকার কম মণপ্রতি চাউল ছাড়ে না মহাজন বাজারে। জমিদার আর তালুকদারের গুদাম তালাবন্ধ। সরকারের লোক আছে গ্রামে, কিন্তু কথা বলে না। পেয়াদা পুলিশেরা বিড়ি ফুঁকিতে ফুঁকিতে অন্যপথ দিয়া হাঁটে।—মথুর দত্ত আড়াল হইতে শুধু টীকা ধরাইয়া দিল, নল দিয়া ধোঁয়া বাহির করিতে লাগিল ঐ ব্যাপারী, ফড়িয়া আর পাটচাষীরাই। মাঝে মাঝে গোপনে ডাকিয়া নিয়া উস্কাইয়া দিল মথুর দত্ত: "বলো, পাট ধুয়ে কি আমরা জল খাবো? জমিতে এবার থেকে আমরা পাট বোনা বন্ধ ক'রলাম। ধান চাই আমরা। অতিরিক্ত এক পয়সা দামেও যদি আমাদের কাছে চাউল বিক্রী করা হয়, তবে আমরা আন্দোলন ক'রে জমির চাষ বন্ধ ক'রবো, বাধা দেবো সমস্ত চাষীকে।"

জমিদারী সেরেস্তা আর সরকারী দপ্তরের সাম্‌নে রীতিমত ঝাঁকিয়া দাঁড়াইল আসিয়া সকলে।

ভিতর হইতে উত্তর হইল: "মিথ্যে পাগ্‌লামী ক'রলে কে শুনবে তোমাদের কথা? সরকারী ব্যবস্থা, যেতে দাও দুটো দিন, উপরে লিখেপ'ড়ে দেখি যদি কিছু সুবিধে ক'রতে পারি।"

কিন্তু তেমন কোনো সুবিধার কথায় কাহারও বিশ্বাস নাই। প্রতিবাদ করিয়া সমস্বরে এবারে চীৎকার করিয়া উঠিল সকলে। তাহারা জানে, সরকারী ব্যবস্থার চাইতে জমিদারী ব্যবস্থাই এখানে বড়। সরকারের আঁচলধরা লোক জমিদার আর তালুকদার।

ইতিমধ্যে কখন্ একসময় সৌদামিনীকে আসিয়া সমস্ত অবস্থাটা বিবৃত করিয়া কাছে দাঁড়াইল মথুর দত্ত, কহিল, 'যাবে একবার দেখ্‌তে?"

কিছুক্ষণ ভাবিয়া লইল সৌদামিনী।—"হঠাৎ আজ ঐ অবস্থায় আমার পক্ষে হাটের মধ্যে যাওয়া কি শোভন হবে?"

—"তা না হয় না-ই গেলে, তবু দূর থেকে একবার—"

—"কেউ দেখ্‌তে পাবে না তো?"

—"পেলোই বা দেখ্‌তে!" একটু ক্ষিপ্র কণ্ঠেই জবাব দিল মথুর দত্ত: "ভয় ক'রতে যাবে কাকে, আর লজ্জাই বা কি?"

"আছে, আছে, মেয়ে মানুষের সব্বুর পায়ে পায়ে।" উত্তর দিল সৌদামিনী: "কিন্তু তা নয়, একটু বরং ধীরেসুস্থে সইয়ে নেওয়া ভাল নয় কি আমাকে দিয়ে? মেয়ে মানুষকে এটুকু কনসেশন দেওয়া তোমার উচিৎ। সত্যিই তো এ কিছু একটা আর প্রকাশ্য আন্দোলনে নামা নয়।" তারপর কিছুটা থামিয়া বলিল, "চলো, একটু আড়াল থেকে দেখাবে কিন্তু।"

হাসিয়া ফেলিল এবারে মথুর দত্ত: "সাধে কি বলি, জয়ের রাজ্যে পৌছ্‌তে তোমার সহজে হ—বে না। লজ্জা, অভিমান, ভয়—এই তিন থাক্‌তে নয়। নিজেকে নতুন ক'রে সৃষ্টি করো শ্রীময়ী, দামিনীর মত একবার গ'র্জ্জে ওঠ দেখি সৌদামিনী।"

এদিককার গর্জ্জনও ততক্ষণে কম নয়।

গম গম করিতেছে হাটের মানুষ। ভিতরের কথা শুনিয়া সকলে হৈ হৈ করিয়া উঠিল—"ওসব ফাঁকি কথায় আমরা ভুলবো না।"

ভিতরের গলা এবারে অনেকটা উগ্র শোনা গেল।—"বাজে হল্লা ক'রলে পুলিশ ডাক্‌তে বাধ্য হব, এই ব'লে দিচ্ছি।"

কিন্তু হল্লা আদৌ থামিল না, এবং অপর পক্ষ হইতেও যে তেমন কিছু একটা পুলিশে খবর গেল—এমনও বোঝা গেল না। অধিক রাত্রে সকলে বাড়ী ফিরিল।

সকালে আবার বাজার। শান্ত আবহাওয়া অনেকটা চারি-পাশে। গত দিনের ব্যাপারে সত্যিই কিছু ফল হইয়াছে। দুই টাকা নামিয়া গিয়াছে চাউলের মণ। কেহ কেহ বলিল, "সাময়িক একটা ফাঁদ মাত্র। দু'দিন পরে আবার দু'গুণ না বাড়ে, তাই দেখ।"

কিন্তু দেখিবার অর্থে দৃষ্টিটা আসলে এখন মথুর দত্তেরই। অনেক কিছু এখন নির্ভর করে তাহার উপর। ব্যাপারী, ফড়িয়া আর পাটচাষীরা এখন সব কাজে আসিয়া বুদ্ধি নিয়া যায় মথুর দত্তের নিকট হইতেই।

আর একদিন নির্জ্জন সন্ধ্যায় বসিয়া বসিয়া ইহাদের লইয়াই কথা হইতেছিল সৌদামিনীর সঙ্গে মথুর দত্তের।

মথুর দত্ত বলিল, "পৃথিবীর যত কিছু আন্দোলনকে সার্থক ক'রে তুলেছে এই এরাই। ফ্রান্স, রাশিয়া—যে দেশই যখন স্বাধীনতা অর্জ্জন ক'রেছে, এই নিরন্ন চাষী, ক'ড়ে আর ব্যাপারীরাই সবার আগে বুলেটের সাম্‌নে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে। ওদের আন্দোলনই খাঁটি বেদনার বিদ্রোহ। গ্রামে আজ সবে নতুন জাগরণ ওদের শুরু হোলো। ভাব্‌না নেই সৌদামিনী, আমাদের একটু শুধু এগিয়ে গেলেই চ'লবে।"

গ্রাম বটে, কিন্তু গ্রামের মেয়েই নয় যেন আসলে সৌদামিনী। নিজের সংস্কৃতিতে সহর আর গ্রামকে সে নিজের অলক্ষ্যেই কখন্ এক করিয়া নিয়াছে। ঘরে বইয়ের সেল্‌ফ্ আছে; পরম শিক্ষায়তন গড়িয়া তুলিয়াছে সে তাহারই মধ্যে। বলিল, "এগিয়ে যাবো বটে, কিন্তু সত্যিকারের আন্দোলনের দিনে যেন শুধুই হাট দেখিয়ো না, টেনে নিয়ো সত্যিকার প্রতিকারের কাজে, জনতার সেবায় লাগিয়ে জীবনটাকে সার্থক ক'রে তুলবার সুযোগ দিয়ো আমাকে।"

মথুর দত্তের দক্ষিণ হাতের অনামিকায় তখনও শক্ত হইয়া আঁটিয়া আছে সৌদামিনীর [illegible] আংটি। চৌদিকে

একবার লক্ষ্য করিয়া উত্তর করিল মথুর দত্ত : "অঙ্গীকারের স্বাক্ষর রেখেছ বটে আমার কাছে, কিন্তু এও জানি, প্রয়োজনের দিনে তোমাকে ডেকে নিতে হবে না, তোমার কর্ত্তব্যবুদ্ধিই তোমাকে কঠিন বন্ধুর পথে টেনে আনবে।"

"তাই যেন হয়। পা বাড়িয়েই আছি। অপেক্ষায় রইলুম সেই কঠিন দিনের।" বলিয়া একবার থামিল সৌদামিনী। তারপর কহিল, "আজ যেন আর অম্নি অম্নি চ'লে যেয়ো না। যাই, উঠি, উনুনে এতক্ষণে নিশ্চয়ই আঁচ উঠেছে, নিজের হাতে রাঁধ্‌বো, তুমি খেয়ে দেয়ে তবে যাবে।"

একবার আপত্তি তুলিতে গেল মথুর দত্ত, কিন্তু পারিল না, প্রীতিধর্ম্মে হয়ত আঘাত লাগিল। তেম্নি ভাবেই সে বসিয়া রহিল একান্তে। পাশ কাটাইয়া ভিতরের দিকে উঠিয়া গেল সৌদামিনী।

পত্রিকার পাতায় পাতায় প্রতিদিন যুদ্ধের গরম গরম খবর। জার্ম্মানীর দিনের পর দিন ক্রমঃঅপ্রগতি, মিত্রশক্তির সাফল্যজনক পশ্চাদপসরণ, জাপানের নতুন নতুন সহর দখল, চীনের জীবন-জয়ী স্বাধীনতা সংগ্রাম।...দুই তিনখানি কাগজ আসে মাত্র গ্রামে। সারা গ্রাম ভাঙ্গিয়া পড়ে আসিয়া তাহাতেই!—ইতিমধ্যে একদিন খবরে দেখা গেল—বৃটিশ রাজদূত ক্রীপ্‌স্ সাহেব সরকারী বার্ত্তা বহিয়া নিয়া আসিয়াছেন ভারতবর্ষে। ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা চলিতেছে তাঁর। ভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য বেশ্ একটা আগ্রহ জাগিয়াছে যেন সরকার পক্ষের। কংগ্রেস যুদ্ধে সাহায্য করিতে স্বীকৃত নয়। কিন্তু ইহারই উপরে জোর দিয়া নতুন শাসনতন্ত্র প্রনয়ণের অযুহাতে ক্রীপস্ সাহেব পাঁচ ছয় দফা অনুশাসন মেলিয়া ধরিলেন নেতৃবৃন্দের কাছে। কংগ্রেস জানাইয়া দিল : "দুঃখিত, ইহা আমরা গ্রহণ করিতে পারিলাম না।"—ফাঁসিয়া গেল ক্রীপস্-দৌত্য।

মথুর দত্ত প্রকাশ্যে সেদিন গ্রামবাসীকে বিষয়টা আরও সহজ করিয়া বুঝাইয়া দিল : "আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা যদি কখনও অসাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে গ'ড়ে ওঠে, তবেই সরকার অবস্থা বিশেষে বিবেচনা ক'রে দেখবেন—আমাদের হাতে আমাদের শাসন-ক্ষমতা ছেড়ে দিতে পারেন কিনা। যুদ্ধের এই আকস্মিক দুর্যোগের মধ্যে তাঁরা শাসন-ব্যবস্থার তেমন কোনো পরিবর্ত্তনের কথা ভাবতে পারেন না—কারণ তাতে ভারতের নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটবার সম্ভাবনা থাকবে।"

কথা শুনিয়া কয়েকজন বুদ্ধিমান লোক একসঙ্গে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, কহিল, "ভারতের নিরাপত্তার কথা প্রতি মুহূর্ত্তেই তবে সরকার ভাবছেন! আমাদের সুখী হওয়া উচিৎ, সন্দেহ নেই। কিন্তু, আজ অব্যবস্থার ফলে আমাদের ক'বাড়ীতে যে উনুনে হাঁড়ী চ'ড়ছে না, সে-কথা কি সরকারের খাতায় টোকা আছে!"

মথুর দত্ত কিন্তু হাসিতে পারিল না, বরংচ আশু একটা দারুণ দুর্ভিক্ষের ছায়া যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার চোখের উপর দিয়া ভাসিয়া গেল। লোকজনেরা সেদিন একেবারে মিথ্যা অনুমান করে নাই। মাত্র দুই দিনেই চা'উলের দামটা বাজারে একটু নামিয়াছিল, আবার যেই—সে-ই হইল। উত্তরে মথুর দত্ত কহিল, "আপনারা যদি আন্দোলন ক'রে সরকারের সেই খাতা একবার দেখতে পারেন, তবেই তো বুঝতে পারবেন সব। চেষ্টা করুন্ না একবার!"

হঠাৎ যেন আবার একটা নিস্তব্ধ গাম্ভীর্য্য ফুটিয়া উঠিল সকলের মুখে। কহিল, "চেষ্টা শুধু এ গ্রাম থেকে ক'রলে কী হবে? থামুন না, দেখ্‌বেন—কংগ্রেসই সে ব্যবস্থা ক'রবে।"

এবারে একটু স্বর উঁচুতে তুলিল মথুর দত্ত : "আমার আপনার পাঁচজনকে নিয়েই তো কংগ্রেস। ওয়ার্কিং কমিটিরই কি শুধু দায়িত্ব, আমার আপনার নেই? আমরা যদি নানা সহর থেকে গ্রাম থেকে না এগিয়ে দাঁড়াবো, তবে কংগ্রেস ল'ড়বে কাকে নিয়ে? উনুনে হাঁড়ী চড়ে না আপনার, আপনার ক্ষুধা আপনার পেটে, আর ব'লে দেবে আর একজনে?"

একেবারে যেন আগুনে জল দিবার মত সহসা নিভিয়া গেল সকলে। প্রকাশ্যে কোনো দিন কেউ এমন জোয়ালো মতবাদের পরিচয় পায় নাই মথুর দত্তের মধ্যে। বিস্ময়ের দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল সকলে মথুর দত্তের প্রতিভায় উজ্জ্বল ও তেজোদৃপ্ত মুখখানির পানে, তারপর এ-কথা সে-কথায় একে একে যে যাহার মতো পত্রিকার খবর সংগ্রহ করিয়া সরিয়া পড়িল।

এতক্ষণে যেন একবার হাসিবার সুযোগ মিলিল মথুর দত্তের। মানুষের মজ্জায় মজ্জায় এখনও যে কতবড় ভীরু পাপ আর পলায়নী মনোবৃত্তি বাসা বাঁধিয়া আছে—ভাবিলে হাসি পায় বৈ কি? তারপর সেই নির্জ্জন পরিবেশেই একবার বজ্রমুষ্টিতে দুই হাত সাম্‌নে প্রসারিত করিয়া স্বগত উচ্চারণ করিল মথুর দত্ত—

'পাপের এ সঞ্চয়
সর্ব্বনাশের পাগলের হাতে
আগে হ'য়ে যাক্ ক্ষয়।
বিষম দুঃখে ব্রণের পিণ্ড
বিদীর্ণ হ'য়ে, তার
কলুষ পুঞ্জ ক'রে দিক্ উদ্গার।
ধরার বক্ষ চিরিয়া চলুক্
বিজ্ঞানী হারগিলা,
রক্তসিক্ত লুব্ধ নখর
একদিন হবে ঢিলা।'......

ইহার পর বেশ কিছুদিন কাটিয়া গেল। নিয়মিত আলাপ আলোচনা চলিল সৌদামিনীর সঙ্গে। দুঃখে, অভাবে, দারিদ্র্যে গ্রামের 'ফড়িয়া', ব্যাপারী আর চাষীরাও ক্রমান্বয়ে জাগিয়া উঠিয়াছে এদিকে। ইন্ধন জোগাইয়াছে তাহাদের মথুর দত্ত। সৌদামিনীও যেন অনেকখানি লজ্জা ভয় বিসর্জ্জন দিয়া মুক্ত ও সহজ হইয়া উঠিয়াছে ইতিমধ্যে। কথায় কথায় একসময় কহিল, "চলো না বেরিয়ে পড়ি গ্রামে গ্রামে! কংগ্রেসের নাকি শীগ্‌গিরই অধিবেশন ব'সবে বোম্বাইতে! এদিকে যুদ্ধ, তারপর ক্রীপ্‌স্-প্রস্তাবের ব্যর্থতা, নতুন কিছু একটা কর্ম্মসূচী রূপ নেবে এবারে নিশ্চয়ই আগামী অধিবেশনে। কাগজপত্র প'ড়ে অন্ততঃ

তাইতো মনে হয়। জনমত গঠন ক'রবার কাজ—সে কি কিছু একটা কম ?"

কথা শুনিয়া মথুর দত্ত প্রথমটা অবাক হইয়া গেল। ভাবিল—স্বতঃপ্রণোদিত কি অদ্ভুত জাগরণ আসিয়াছে সৌদামিনীর মধ্যে! কহিল, "আগে নিজের গ্রামকে দাঁড় করাও, তবেই দেখ্‌বে—পাশাপাশি আর গ্রামগুলিও পিছনে প'ড়ে নেই। 'চ্যারিটি বিগিন্‌স্ এ্যাট হোম্', এইখানেই প্রথম উদ্বোধন, পরিণতিও এইখানেই হোক্ আগে।"

কিন্তু তেমন কিছু একটা অনিশ্চিত পরিণতির মধ্যে যে সহসা জীবনের এই দুর্ব্বার স্রোত একসময় আরও দুর্ব্বার গতিতে বহু দূরে ছুটিয়া যাইবে, এ কথা ভাবিতে পারে নাই মথুর দত্ত।—কাগজপত্রের আভাসানুযায়ী সৌদামিনী অনুমান করিয়াছিল মিথ্যা নয়।

বহু বিজ্ঞাপিত সংবাদের মধ্যে সত্যিই একদিন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন বসিল বোম্বাইতে। উনিশ শ' বিয়াল্লিশ সালের ৮ই আগষ্ট,—অধিবেশনে প্রস্তাব গৃহীত হইল: ভারতীয় দাবীর সমস্তগুলি সর্ত্ত মানিয়া লইয়া গভর্ণমেণ্ট যদি ভারতবাসীকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন, তবে অচিরেই সেই স্বাধীন ভারত মুক্তি সংগ্রামে ও নাজীবাদ, ফ্যাসিবাদ এবং এমন কি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিতে পারিবে। আর ইহার দ্বারা শুধু যে যুদ্ধের জয়পরাজয়ই মাত্র প্রভাবিত হইবে তাহা নয়, পরন্তু সমস্ত পরাধীন ও নিপীড়িত মানব সমাজকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পক্ষে আনয়ন করিবে। অথচ দেখা যায়—ভারত সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের যে উদ্দেশ্য ও নীতি—তাহা স্বাধীনতা অপেক্ষা পরাধীন ও ঔপনিবেশিক দেশগুলির উপর আধিপত্য স্থাপন ও ধনতান্ত্রিক প্রথা এবং উপায়কে কায়েম করিবার চেষ্টার উপরেই মূলতঃ প্রতিষ্ঠিত।...দীর্ঘতর প্রস্তাবে কাগজের এপাশ ওপাশ সম্পূর্ণ। শেষের দিকে স্পষ্টই ইঙ্গিত আছে: আজকের দিনের সঙ্কটত্রাণের জন্য ভারতের স্বাধীনতা এবং বৃটিশ শাসনের অবসান অবশ্য প্রয়োজনীয়।—এ, আই, সি, সি, সমস্ত গুরুত্বের সহিত তাই বৃটিশ শক্তির ভারত হইতে অপসারণের দাবী জানায়।...দেখিতে দেখিতে চারিদিকে প্রাণ-চাঞ্চল্যে জাগিয়া উঠিল ভারতবর্ষ। হিমালয় হইতে কণ্যা কুমারিকা পর্য্যন্ত দিকে দিকে মহাত্মার বাণী বিঘোষিত হইল—'ভারত ত্যাগ কর'। ভারতের চল্লিশ কোটী জনগণকে প্রকাশ্যে এবারে আহ্বান জানাইয়া বাণী দিলেন মহাত্মাজী: "আজ থেকে প্রত্যেক নরনারী প্রত্যেক মুহূর্ত্ত এই চেতনায় কাটাক্—'স্বাধীনতা লাভের জন্যই অন্ন গ্রহণ করিতেছি ও জীবনযাপন করিতেছি এবং প্রয়োজন হইলে সেই গন্তব্যে পৌছিবার জন্য জীবন দান করিব।"

সৌদামিনীর কথা মিথ্যা নয়। সত্যিই একটা অভিনব কর্ম্ম-সূচীর পরিস্ফূরণ ভিন্ন কি! কিন্তু নেতৃবৃন্দের সমস্ত কাজের পথ বন্ধ করিয়া দিলেন গভর্ণমেণ্ট। কারাগারে আবদ্ধ হইলেন মহাত্মা গান্ধী, ধরা পড়িলেন প্রেসিডেণ্ট আজাদ, জওহরলাল, রাজা কস্তুরবা, আর কমিটির সমস্ত সদস্য। কিন্তু সঙ্কীর্ণ কারাগারের বাহিরে বৃহত্তর ভারতের বাতাসে বাতাসে যে অমোঘ বাণী ছড়াইয়া গেলেন মহাত্মাজী আর নেতৃবৃন্দ, তা যেন দেখিতে দেখিতে অঙ্গারস্পর্শে বিষবাষ্পে পরিণত হইল। ক্ষেপিয়া উঠিল জনগণ। গত পঁচিশ বৎসরে যে ইতিহাস রচনা হয় নাই, মহাত্মাজীর এই আগষ্ট-আহ্বান যেন তাকে একদিনের রেখাঙ্কনে পূর্ণভাবে রূপায়িত করিয়া তুলিল।

চারিদিকে মুক্তির দাবী নেতৃবৃন্দের। প্রকাশ্য আন্দোলন সাম্রাজ্যবিরোধিতার। পাঞ্জাব, অস্তিচিমুর, বালুরঘাট, তমলুক—সর্ব্বত্র ধরপাকড়, পুলিশের রাইফেলের শব্দ। লুঠপাট চারিদিকে: থানা, ট্রেজারী, ডাকঘর; কোথাও রেল-লাইন উধাও, কোথাও দগ্ধ অঙ্গার। শান্তিকামী ভারত অশান্তির দুঃসহ দহনে দাহিকা শক্তিতে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। একমাত্র দাবী: মুক্তি চাই নেতৃবৃন্দের, মুক্তি চাই ভারতের,...বন্দে মাতরম...জিন্দাবাদ।

মথুর দত্ত কহিল, "আহ্বান এসেছে, আমাদের চুপ ক'রে থাক্‌বার সময় নেই আর। ষ্টেশনের পাশের খোলা মাঠে জায়গা কম নেই। মিটিং-এর একটা ব্যবস্থা ক'রে কাগজে রিপোর্ট পাঠিয়ে দেই। কি বলো ?"

সৌদামিনীও কিছুমাত্র দ্বিধা করিল না, বলিল, "তাই করো।"

সেইদিনই নেতৃবৃন্দের আশু মুক্তির দাবীতে ঢোল দিয়া সারা গ্রামে ডেরা পিটাইয়া দিল মথুর দত্ত; গ্রামবাসীকে সনির্ব্বন্ধ উপস্থিতি জানাইল মিটিং-এ।

কিন্তু তাহার প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইলেন ষ্টেশন মাষ্টার কৈলাস চক্রবর্ত্তী। বলিলেন, "রেলকর্ত্তৃপক্ষের কাছে না জিজ্ঞেস ক'রে এ-জমিতে এ-রকম মিটিং হ'তে দিতে পারি না।"

আসলে এমন কিছু আইন হয়ত নাও থাকিতে পারে রেল-কর্ত্তৃপক্ষের, কিন্তু দেখা গেল—একরকম নিজের নিরাপত্তার জন্যেই সহরে পাঁচ রকম সাজাইয়া গুছাইয়া লিখিয়া পূর্ব্বাহ্নেই যথাস্থানে পুলিশ মোতায়েন করিলেন কৈলাস চক্রবর্ত্তী। অবস্থা বুঝিয়া মিটিং সরাইয়া আনিল মথুর দত্ত খালের দক্ষিণ পারে ধান ক্ষেতের ধারে। অধিক রাত্রিতে 'বন্দে মাতরম' ধ্বনির মধ্যে প্রস্তাব পাশ হইয়া গেল, পরদিন কাগজে কাগজে রিপোর্ট গেল রেজেষ্ট্রী খামে। গ্রামের জমিদারী অব্যবস্থার সংবাদটি পর্য্যন্ত বাদ গেল না তাহাতে।

সাধারণ জীবনে অসাধারণ হইয়া উঠিল মথুর দত্ত গ্রামে।

সৌদামিনী কহিল, "বিজয়ী বীর হও, শক্তিময়ীর আশীর্ব্বাদ যেন সর্ব্বক্ষণের জন্যে তোমার উন্নত শিরে বর্ষিত হয়, এই প্রার্থনা শুধু।"

মথুর দত্ত কহিল, "প্রার্থনা আপাততঃ রাখো। তেমন অবসর মুহূর্ত্ত অনেক পাবে। চারদিকে যে অবস্থা, কখন্ কি ক'রে বসি, কিছুই তো ব'ল্‌তে পারি না! কৈলাস চক্কত্তি যে অপমান ক'রলো, দেখ্‌লে তো ? এম্‌নি ক'রেই প্রতি মুহূর্ত্তে সাম্রাজ্যবাদ থেকে শুরু ক'রে গ্রামের নায়েব পেয়াদা প্রত্যেকের কাছে আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে অপমানিত হ'চ্ছি। কিন্তু দেখ্‌ছো না সৌদামিনী, নতুন সূর্য্যোদয় আমাদের সাম্‌নে! কী বিপুল তরঙ্গে নেচে

'অস্ত দুয়ারে খেয়া
খুঁজে ফেরে যাত্রী'

ফটো—শ্রীবিষ্ণুপদ কর
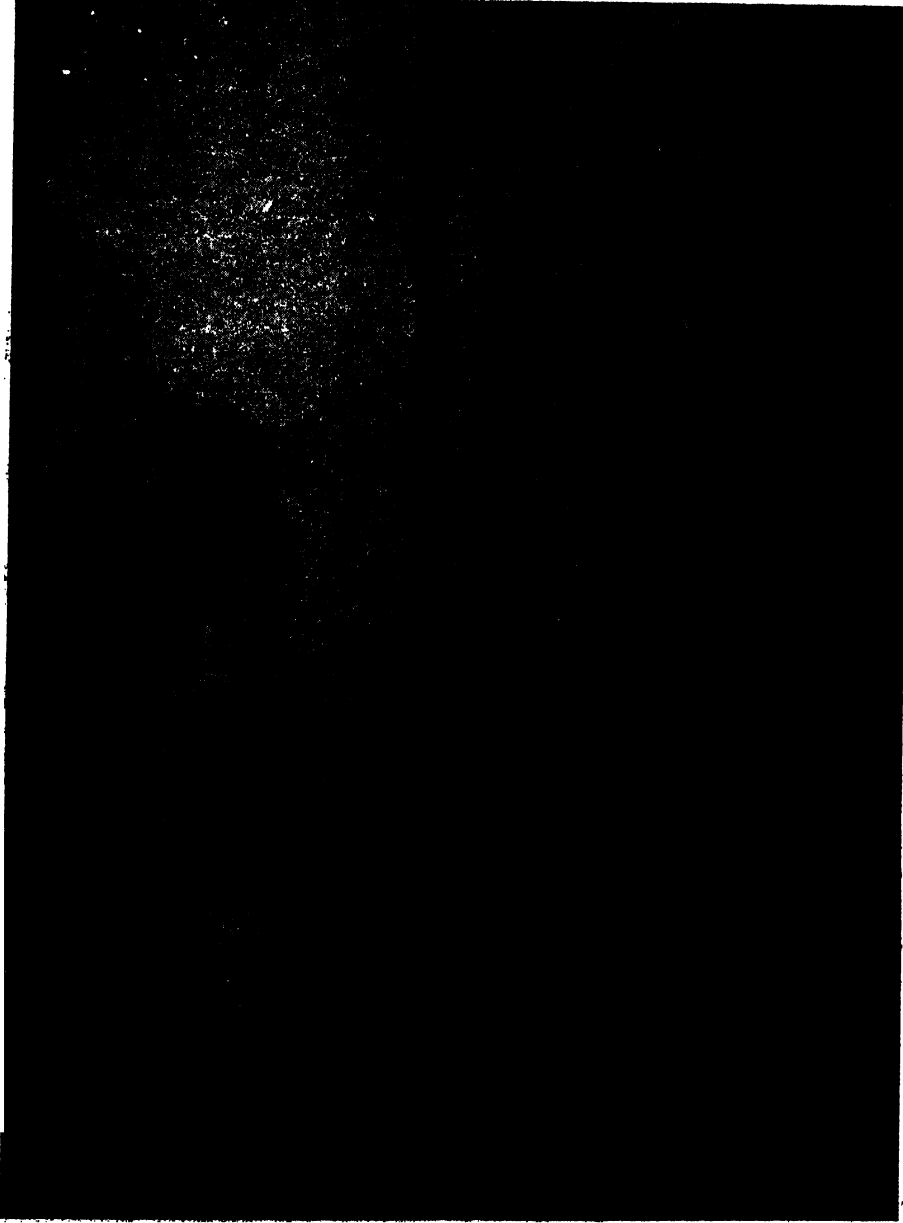
উঠেছে জন-সমুদ্র, কি দারুণ ঝড় উঠেছে সারা ভারতে। এই কাল-রাত্রির সিংহ-দরজা ভেঙে আমাদের প্রবেশ ক'রবার সময় এসেছে নতুন সূর্য্যকরোজ্জল পৃথিবীতে। আজকের এই ঝড়ের রাত্রে তোমাকে বাইরে টান্‌বোনা। ঘরে থেকেও কাজ আছে। কর্ত্তব্যের দায়িত্বে আর প্রাণের ইঙ্গিতে সেই কাজ তুমি ক'রে যেয়ো। আমাকে নাম্‌তে হবে বাইরের কাজে, হয়ত আরও কোনো দুঃসহ পথে। সে পথ যেন বাইরে প্রকাশ না পায়, দেখো।—"

অনর্গল বলিয়া গেল মথুর দত্ত। নিজের কাছেই যেন একটা প্রকাণ্ড বিবৃতি বলিয়া মনে হইল তার। কিন্তু উপায় নাই। প্রয়োজনের তাগিদে কথা বলিবার সময় বহিয়া যায়। সৌদামিনীকে ভিন্ন কাহাকে সে এ কথা বলিবে?

সৌদামিনীও তাহা জানে। বলিল, "এমন কথা কেন তোমার মনে আসে যে, আমাদের কথাগুলি বাইরেও প্রকাশ পেতে পারে।"

মথুর দত্ত কিছুমাত্র দ্বিধা করিল না, কহিল, "তোমার কথা নয় সৌদামিনী; কিন্তু মেয়েদের মন বড় দুর্ব্বল জানো তো, কখন্ যে সে নিজেকে প্রকাশ ক'রে ফেলে, তা সে নিজেই জানে না। তুমি আমার জীবনের উৎস, কর্ম্মের উন্মাদনা। সংগ্রামের পথে তোমাকে কোনো কথা এড়িয়ে যাওয়া কি আমারই উচিত? জাতীয় মুক্তির পথে পা বাড়িয়ে আছ তুমি, যথাসময়ে তোমাকে তোমার যোগ্য কাজে ডেকে নেব। শুধু মুহূর্ত্তের জন্যে এখন একটু বিশ্রাম চাই, দেবে?"

অভিভূত নেত্রে চাহিয়া ছিল এতক্ষণ সৌদামিনী মথুর দত্তের মুখের পানে, কহিল, "নিজের বিশ্রাম নিজে সৃষ্টি ক'রে নাও, এতে দেবার কি আছে!"

সত্যিই বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল মথুর দত্ত কয়েক দিনের দৌড়াদৌড়িতে। কিন্তু সে জানে, এখন থামিলেই সে একেবারে নিভিয়া যাইবে। সমস্ত কাজ পণ্ড হইয়া যাইবে এ-চলায় বাধা দিলে। তবু একবার মুহূর্ত্তের জন্য কাঁৎ হইয়া লইল, কহিল, "বাইরে বেশ হাওয়া দিচ্ছে আজ, না?"

সৌদামিনী কহিল, "মেঘ-মেঘ দেখাচ্ছে আকাশ, সম্ভবতঃ তাই খুব হাওয়া বইছে। তা—একটু না হয় ঘুমিয়েই নাও না!"

মথুর দত্ত কথাটাকে ঘুরাইয়া লইল, কহিল, "দিনটা মেঘলা হ'লেই কি ঘুমুতে হবে? সব ঘুম আজ তোমার হাতে জমা থাক; স্বাধীন ভারতে এই সবগুলি ঘুম জড়ো ক'রে পরম স্বস্তিতে কিছুদিন আগে ঘুমিয়ে নেব। আজ আর একবার গাও না—"বন্দে মাতরম্।"

সৌদামিনী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিল, পরে কহিল, "যখন উঠবে, তখন গাইব; শুয়ে শুয়ে 'বন্দে মাতরম' শুনতে পারবে না। অন্য কিছু গাই শোনো।"

বাস্তবিকই তখন যেন আর উঠিয়া বসিতে ইচ্ছা করিতেছিল না মথুর দত্তের। কহিল, "তাই তবে গাও।"

সৌদামিনীও সেই যে একদিন ভাবালু গান গাওয়া ত্যাগ করিয়াছে, আর গলায় কখনও ভাজে নাই। মৃদুস্বরে এবারে সে গাহিল— জাগো গো বিপ্লবী, যুগের সারথী জাগো,

বাজে দুন্দুভি উষার উদয় দ্বারে।...

অনেকটা যেন ঘুমের জড়তাই আসিয়াছিল মথুর দত্তের চোখে। কিন্তু আর বিলম্ব করিল না, উঠিয়া বসিয়া কিছুক্ষণ সে একই দৃষ্টিতে সৌদামিনীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তারপর গান শেষ হইতেই দ্বিতীয় গানের আর অপেক্ষায় না থাকিয়া ধীরে ধীরে সে দুয়ারের বাহিরে সামনের পথে বাহির হইয়া পড়িল। সৌদামিনী কতক্ষণ যে সেইদিকে আনমনে চাহিয়া বসিয়া রহিল, তাহা বলা কঠিন।

ইহার পরের ইতিহাসটা খানিকটা দ্রুত। কাগজে পত্রে, টেলিগ্রামে, গুপ্ত খবরে অনবরত ধরপাকড়, গুলী...লাঠি, আগুন আর নানাজাতীয় সন্ত্রাস। 'সিভিল ডিস্-ওবিডিয়েন্স' চারিদিকে। কারাগারের বাহিরে এমন নেতা নাই যে, এই উন্মত্ত গণ-আন্দোলনকে আজ নিয়ন্ত্রণ করিবে। জনগণের দিন: দ্রুত সঞ্চরমাণ মুহূর্ত্তগুলি।—দিন দুই তিন বড় একটা দেখতে পাওয়া গেল না মথুর দত্তকে হাটে বাজারে! হনুমানের লেজে নেকড়া বাঁধিবার প্রকাণ্ড একটা অবকাশ যেন। তারপর কোথা দিয়া কি হইয়া গেল, তাহা সৌদামিনীও যেন হঠাৎ কিছু একটা বুঝিয়া উঠিল না।—দুপুর রাত্রে একসময় দাউ দাউ করিয়া আগুন উঠিল রেল ষ্টেশনঘর আর জমিদারী সেরেস্তায়। নিশীথ রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া গ্রাম ছাড়িয়া দূর সীমান্তের পথ ধরিল মথুর দত্ত। তারপর দিনের পর দিন একে একে গত হইয়াছে, চলিয়া গিয়াছে ৪২, ৪৩, ৪৪—তারপর ১৯৪৫-এর এই চলা পথ। দুঃস্বপ্নের মত কাটিয়া গিয়াছে মুহূর্ত্তগুলি, মাসগুলি, বৎসরগুলি অযোধ্যার চরে, তালমা হাটে সদানন্দ বৈরাগীর আখ্‌ড়ায়, মাণিকদহের হোটেলে, তারপর ঘুরিয়া ফিরিয়া এই চরমুগুরিয়ার বন্দরে আসিয়া নৌকা ভিড়িয়াছে। সামনে প্রশস্ত কলমুখর নদী আড়িয়াল খাঁ। ঢেউয়ের দোলায় দুলিয়া ওঠে একএকবার বড় বড় মাল-নৌকা-গুলি, কাছে দূরে ভাসিয়া ভাসিয়া ওঠে মোটর লঞ্চ আর ষ্টীমারের ধোঁয়া। এ-পাশে লম্বা পাট গুদাম: আটচালা—বাহাত্তুর বন্দরী ঘর। চারিদিকে পুলিশের সশস্ত্র চোখ,—তাহারই মধ্য দিয়া অনবরত পাশ কাটাইয়া চলিয়াছে মথুর দত্ত। সৌদামিনীর প্রীতি ধুলা দিয়া রাখিয়াছে তাহাকে প্রত্যেকের চোখে। মথুর দত্ত রূপ নিয়াছে শ্রীমন্ত রায়ে। পদবীটা একেবারে মিথ্যা নয়, বংশ-কৌলিন্যে মথুর দত্ত শুধু দত্ত নয়, দত্ত-রায়।—ফুটফুটে কামানো মুখখানি কালো মিস্‌মিসে লম্বা দাড়িতে ভরিয়া উঠিয়াছে, লম্বা বাব্‌রি নামিয়া গিয়াছে ছোট চুলে। রীতিমত সিদ্ধ পুরুষ যোগীর বেশ। আর চিনিবার উপায় কি তাহাকে মথুর দত্ত নামে! সৌদামিনীর শ্রীমন্ত আজ জন-সমুদ্রে, ভূমি-সমুদ্রে নামিয়া আসিয়াছে বিজয়-গৌরবে। কিন্তু তবু সে যেন আজ নিজের মধ্যে একেবারে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। এও একটা নির্ব্বেদ-মুহূর্ত্ত বৈ কি!

পর্দ্দায় ছবির মতো যেন চোখের উপর দিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে কাটা কাটা ঘটনাগুলি ভাসিয়া গেল শ্রীমন্তের। আজ যদি তার

এই প্রচ্ছন্ন আবরণ খসিয়া যায়, তবে পুলিশের সুরক্ষিত পাহারায় কত দীর্ঘকাল যে কারাপ্রাচীরের নিভৃতে কাটিয়া যাইবে, তাহা চিন্তার অতীত। আর সত্যিই যদি জেলে যাইতে হয়, তবে একা-মনে কেমন করিয়া সে সেই কারাগারের জীবন সহ্য করিবে! প্রতি মুহূর্ত্তে সৌদামিনীর দীর্ঘশ্বাস আসিয়া যে তাহার সমস্ত সত্তাকে স্পর্শ করিয়া যাইবে। তাহার সমস্ত কাজের উৎস, সমস্ত চিন্তার প্রেরণা যে সৌদামিনী। সৌদামিনীই যে জেলে যাইতে চাহিয়াছিল একদিন নিজে হইতে!—কিন্তু এই-খানেই কি পরিণতি! সামনের টেবিলে রক্ষিত কাগজখানির দিকে আর একবার চাহিতে গিয়া আর একটি বড় প্রশ্নও সহসা সমস্ত মনখানিকে তাহার তিক্ত করিয়া তুলিল। আজ তো কারাপ্রাচীরই শুধু তার জন্য অপেক্ষায় নাই, অপেক্ষা করিয়া আছে যে ঐ ধারালো ফাঁসীর দড়িও। গণপতি পাণ্ডে এমন কিছু একটা বেশী কি অপরাধী তাহার চাইতে? কিন্তু তাহা হইলে দেশমাতৃকার সেবার জন্য তাহাকে কি তবে আর মা বসুমতীর প্রয়োজন হইবে না? যারা তিলে তিলে অনাহারে দেশের বুকে শেষ নিঃশ্বাস রাখিয়া গেল, তাহাদের সেই শোণিত-প্লাবনে তবে কি শেষ প্রায়শ্চিত্তটুকুরও সে অধিকার পাইবে না?—ব্রহ্ম-তালুটা একবার যেন ঘুরিয়া উঠিল। কথা বলিবার মতো একটুও ভাষা পাইল না নিজের মধ্যে। অভিভূতের মত বহুক্ষণ ধরিয়া মাথা নত করিয়া একই অবস্থায় নীরবে বসিয়া রহিল শ্রীমন্ত।

কিন্তু ক্রমশঃই যেন বড় বেশী উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে নিখিল ব্রহ্ম। কিছু একটা জবাব না পাইয়া পুনরায় কহিল, "আমার অবিশ্যি জোর করা ধৃষ্টতা শ্রীমন্ত বাবু, কিন্তু জানেন তো লোকের স্বভাব, একবার আশ্রয় পেলে, নির্ব্বিবাদে সেই পরিবেশকেই শক্তহাতে আঁকড়িয়ে ধ'রতে চায়। এ-ও ঠিক তাই; আপনাকে অত্যন্ত বেশী আত্মীয় মনে করি ব'লেই আপনার সম্বন্ধে একটুকুও না জেনে থাকতে মন চাইছে না।"

দীর্ঘ সময় পরে এবারে একবার মুখ তুলিল শ্রীমন্ত। চোখে যেন একটা অন্যরকমের জ্যোতি। কহিল, "আমাদের সমাজের রূপ যেমন ক'রে ধীরে ধীরে বদলাচ্ছে, তেমনি পরিচয়ের সূত্রটাও ধীরে ধীরে নতুন রূপ গ্রহণ ক'রছে মিঃ ব্রহ্ম। আজ এ-কথা ব'ললে কারুর পরিচয় পূর্ণ হয় না যে, অমুক ব্যক্তি অমুকের ছেলে, অমুকের মেয়েকে বিয়ে ক'রে বহু স্থাবর সম্পত্তির সে অধিকারী হ'য়েছে। যে বিবর্ত্তনশীল পৃথিবীর সীমায় এসে আমরা আজ দাঁড়িয়েছি সেখানে ঘরের পরিচয় আজ একেবারেই গৌণ হ'য়ে গেছে। আজাদ-হিন্দ্ যখন মালয়ে, সিঙ্গাপুরে, ব্রহ্মফ্রন্টে গিয়ে দাঁড়ালো, তখন তাদের শ্রেষ্ঠ পরিচয় হোলো—ভারতের মুক্তিকামী সৈনিক। গৃহ তাদের তখন বিস্মৃত। মুক্তির উপাসক আমরা আজ প্রত্যেকেই। আমাকেই বা এই দুর্ভাগা দেশের একজন দীনতম সৈনিক ব'লেই ভেবে নিতে বাধা কি?"

উত্তর দিতে এবারে কিছুটা সময় লাগিল নিখিল ব্রহ্মের।

ও-পাশের 'কাউন্টার' হইতে ব্রজবিহারী কহিল, "আপনাকে দেখে কিন্তু তা ঠিক মনে হয় না, যাই বলুন। জীবনে আপনি হয় ত' নিশ্চয়ই কোন সাধুর দীক্ষা নিয়েছেন, নইলে এ-বয়সেই এই বেশ—"

কথাটা শেষ হইল না। শ্রীমন্ত এবারে কণ্ঠস্বরে একটু যেন বেশ জোর দিল,—"হ্যাঁ দীক্ষা নিয়েছি বৈ কি, তবে সাধুর কাছে নয়, সাধ্বী এই মাটির মায়ের কাছে। আপনারাও নিন্ না!"

অনেকটা যেন বোকার মতই হঠাৎ আবার চুপ করিয়া গেল ব্রজবিহারী।

কথা বলিল নিখিল ব্রহ্ম, কহিল, "অনেকটা আঁচ ক'রতে পেরেছি আপনাকে আগে থেকেই, কিন্তু ব'লেছি না, মেরিটের উপরে বিশ্বাস চাই। আসলে কি জানেন, সাধারণ ক্ষুদে চাকরী করি, পেটের দায়েই র'য়ে আছি, কন্সান্স ব'লতে যা—সব হারিয়ে ফেলেছি। কথা দিয়ে শ্রদ্ধা ঢাকতে চেয়েছিলেন, কিন্তু জানেন না শ্রীমন্ত বাবু, নিজেরা ঠিক যেমনটা হ'তে চেয়েও হ'তে পারলুম না, চোখের সামনে আর কাউকে তেমন পেলে—তাকে কি সত্যিই শ্রদ্ধা না জানিয়ে থাকা যায়! আপনার মত এমন 'সেল্ফ্-মেড্, স্পিরিট' আজ ঘরে ঘরে জন্মাবার দরকার। আপনারা এগিয়ে গিয়েই তো নির্দ্দেশ দেবেন, আমাদের জন্যে থাকবে তার অনুসরণী। আপনার মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের যে সৈনিক জেগে আছে, তাকে আজ যুক্ত করে নমস্কার করি।"

ভাবোচ্ছ্বাসে শ্রীমন্ত সহসা বলিয়া উঠিল, "তবে বলুন—'বন্দেমাতরম্'। প্রার্থনা করুন ভগবানের কাছে—মৃত শহীদের পবিত্র আত্মার কল্যাণ হোক্।"—তার পর পুনরায় কাগজখানি হাতে লইয়া কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল সে গণপতি পাণ্ডের অস্পষ্ট ছাপা ছবিখানির দিকে।

এ-দিকে ততক্ষণে প্রায় সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে। নিখিল ব্রহ্ম উঠিবার উদ্যোগ করিয়া কহিল, "এতদিন কম ডিপজিটার তো দিলেন না ব্যাঙ্কে! সে-দিকেও আমার ঋণ আপনার কাছে কম নয়। আমার সাধ্য ছিল কি এই পাটের কারবারী আর চাষীদের হাত ক'রবার!" তারপর কিছুটা থামিয়া কহিল, "চলুন, আজ আর আপনাকে মোটেই ছুটি দিচ্ছি না, রাত্রে আমার ওখানে খেয়ে দেয়ে তারপরে যাবেন। ব্রজবিহারী বাবুও সঙ্গে থাকবেন'খন। দরকার হ'লে আলো নিয়ে আপনার আস্তানা পর্য্যন্ত সঙ্গে যাবে দরোয়ান।"

শ্রীমন্ত কিছুমাত্র আপত্তি তুলিল না। ব্রজবিহারীর বহুপূর্ব্বেই ক্যাসের কাজ শেষ হইয়াছিল। হারিকেন জ্বালাইয়া বাহিরে আড়ালে দাঁড়াইয়া ততক্ষণে দুইটান বিড়ি খাইয়া লইতেছিল দরোয়ান সিন্ধুরাম। বাবুদের সহসা উঠিবার আভাষ পাইয়া জ্বলন্ত বিড়িটা সে এবারে হাতের চেটোয় আড়াল করিয়া একবার আড়মোড়া ভাঙিবার ভঙ্গিতেই স্বভাবসিদ্ধ কণ্ঠে একবার বলিয়া উঠিল, "জয় সীতারাম।"

বাধা দিয়া শ্রীমন্ত বলিল, "উঁহু, বলো—জয় ভারতমাতা কি জয়, গান্ধী মহারাজ কি জয়, নেতা জী কি জয়।" তার পর ধীরপদে সামনের পথে পা বাড়াইল শ্রীমন্ত। [প্রথম পর্য্যায় সমাপ্ত

দুই বোন

শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর

বঙ্কিম যে সময়ে বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল লিখিয়াছিলেন, তারপর অনেক দিন অতীত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে সাহিত্যের নৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে মনোভাবেরও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। বঙ্কিম নরনারীর চরিত্রের অধঃপতনের জন্য প্রধানতঃ তাহাদিগকেই দায়ী করিয়াছেন। বঙ্কিমের মতে যে বিধাতা মানবচরিত্রে দুর্ব্বলতা দিয়াছেন—তিনিই মানুষকে সংযমশক্তিও দিয়াছেন। মানুষ যদি সে সংযমশক্তির প্রয়োগ না করে তবে তাহার পতনের জন্য সেই দায়ী। সে সহানুভূতির পাত্র নয়।

বর্ত্তমান যুগের বিচারপদ্ধতি তাহা নয়। নরনারীর অধঃপতনের জন্য প্রধানতঃ দায়ী ঘটনাচক্র, যোগাযোগ এবং যে প্রাকৃতিক শক্তি মানুষের দেহ ও মনকে শাসন করিতেছে সেই প্রাকৃতিক শক্তি। মানুষ দুর্বল, অপূর্ণাঙ্গ জীব। তাহার মধ্যে চিত্ত-সংযম করিবার শক্তি আছে বটে, কিন্তু বিরুদ্ধ শক্তিসংঘের ষড়্‌যন্ত্র ও সমবেত অভিযানের বিরুদ্ধে তাহা যৎসামান্য। মানুষ যদি সে সংগ্রামে পরাভূত হয়, সে যদি ব্যথা পায় তাহা হইলে সে ব্যথায় সে আমাদের সহানুভূতি হারাইতে পারে না। বরং সে আমাদের দরদেরই পাত্র। 'দুই বোনের' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—"ব্যথা যারা পায় তাদেরই উপরে আমরা জজিয়তি করি, কিন্তু ব্যথা ঘটাবার দায়িক কি সব সময়ে তারাই নিজে? বজ্রাঘাতে ম'ল মানুষটা, তুমি বল্‌লে কি না পূর্বজন্মের পাপের ফল। এটাতে কেবল দোষ দেওয়ার অন্ধ ইচ্ছারই প্রমাণ হয়, দোষের প্রমাণ হয় না।"

বঙ্কিমচন্দ্র নরনারীর অধঃপতনের মূলে ঘটনাচক্র ও প্রাকৃতিক ষড়্‌যন্ত্রকেও স্বীকার করিয়াছেন। মানবচরিত্রের প্রতি তাঁহার এমনই শ্রদ্ধা যে পতনের বহিরঙ্গীয় কারণগুলিকে খুব প্রবল করিয়া ফলাও করিয়াই দেখাইয়াছেন। গোবিন্দলালের পতন ঘটাইবার জন্য কত বিচিত্র আয়োজন, তাহা সত্ত্বেও তিনি নরনারীকেই প্রধানতঃ দায়ী করিয়াছেন। তাহারও কারণ মানব-চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা। তিনি মানুষের কাছে অনেক বেশী প্রত্যাশা করেন। তাঁহার মতে বিরুদ্ধ শক্তি যতই প্রবল হউক তবু মানুষের আত্মসংযমের দ্বারা আত্মরক্ষা করা উচিত, চেষ্টা করিলে সে তাহা পারে।

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার অনুবর্ত্তী শরৎচন্দ্র পতনের বহিরঙ্গীয় কারণগুলিকে খুব প্রবল বা ফলাও করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। কিন্তু প্রধানতঃ দায়ী করিয়াছেন ঐগুলিকে। কারণ, মানব-চরিত্রের কাছে তাঁহারা বেশী কিছু প্রত্যাশা করেন না। মানুষমাত্রেই তপস্বী নয়। মানুষ দুর্ব্বল বলিয়া স্বভাবতঃ সে তাঁহাদের কৃপার পাত্র—সহানুভূতির পাত্র। সে যেন অনেকটা প্রকৃতির হাতের ক্রীড়নক। তাহার আত্মশক্তির প্রয়োগ দুর্বার স্রোতোবেগের মুখে বালির বাঁধের মত। নরনারীর পতনের বিচারে তাহাদের পক্ষে ঔচিত্য-অনৌচিত্যের বিচার তাঁহারা করেন না। তাঁহারা বলেন,—প্রাকৃতিক ষড়্‌যন্ত্র ও ঘটনাচক্রে মানুষের এইরূপ শোচনীয় দশা হয়। সেই দশার চিত্র দেখাইয়াই তাঁহাদের শিল্পকৃত্য সমাপ্ত। মানব-চরিত্রের নৈতিক শুভাশুভ সম্বন্ধে বঙ্কিমের উৎকণ্ঠার অন্ত ছিল না। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের সে সম্বন্ধে দৃষ্টি উদাসীন, শিল্পিজনোচিত। তবে মানুষ দুর্ব্বল বলিয়া কোন অবস্থাতেই সে তাঁহাদের দরদ হইতে বঞ্চিত হয় নাই।

গোবিন্দলাল আদর্শ যুবক, সুপুরুষ, ধনীর সন্তান—তাহার রুচি মার্জ্জিত, সৌন্দর্য্যবোধের দ্বারা পরিমণ্ডিত। যাহার সহিত তাহার পিতৃব্য-তন্ত্র শাসনে বিবাহ হইল সে গুণবতী, কিন্তু সে কালো। যৌবনের প্রথম পিপাসার মুখে নবোদ্ভিন্নযৌবনা ভ্রমর কালো হইলেও গোবিন্দলালের সাময়িক তৃপ্তিদান করিয়াছিল। কিন্তু তাহার সহজাত ও স্বাভাবিক রূপতৃষ্ণা মিটে নাই। রূপ তাহাকে ভুলাইল,—তাহার পতন হইল। গোবিন্দলাল যদি রূপতৃষ্ণা দমন করিয়া ভ্রমরের গুণেই সমস্ত প্রাণ-মন নিবেশ করিতে পারিত, তাহা হইলে ট্র্যাজেডি হইত না। গোবিন্দলালের নিকট বঙ্কিম এ প্রত্যাশা করিয়াছেন।

নগেন্দ্রনাথ গোবিন্দলালের চেয়েও নীতিনিষ্ঠ পুরুষ। রূপ-তৃষ্ণা তাঁহারও প্রবল। কিন্তু সে তৃষ্ণা তাঁহার মিটিয়াছিল সূর্য্য-মুখীতে। কিন্তু সূর্যমুখীর রূপযৌবনে ভাটা পড়িল—নগেন্দ্র নাথের রূপতৃষ্ণার বহ্নি-শিখা তখনও নিস্তেজ হয় নাই। নূতনের আকর্ষণ, বৈচিত্র্যের আকর্ষণ, পুরাতনীর প্রতি উপেক্ষা, অতি সহজলভ্যা সাধ্বীসতীর মধ্যে অভিনবতার অভাব, কুন্দের অসহায়তা,—অনেক কিছু মিলিয়াছে নগেন্দ্রনাথের 'রূপজমোহে'র পরিপুষ্টি-সাধনে। নগেন্দ্রনাথ যদি রূপজমোহ দমন করিয়া প্রবীণা সাধ্বী সতী সূর্য্যমুখীর দেহে গৃহলক্ষ্মীর গৌরবশ্রী দেখিতে পারিতেন তবে অনর্থ ঘটিত না। নগেন্দ্রনাথের কাছে বঙ্কিম এ প্রত্যাশা করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্র তাঁহাদের পথভ্রষ্ট নায়ক-নায়িকার কাছে এরূপ কোন প্রত্যাশা করেন নাই। প্রকৃতির হাতে যাহারা পুতুলের মত তাহাদের কাছে কি প্রত্যাশা করিবেন? তাঁহারা প্রকৃতির লীলা তাহার সঙ্গে ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে নাগর-নাগরীর নাগরদোলার দোলন-বিলাস দেখিয়াছেন আর তাহাই দেখাইয়াছেন। সন্তানের বন্ধন দাম্পত্য জীবনের অনেক সমস্যারই সমাধান করিয়া দেয়। বঙ্কিম, রবীন্দ্র, শরৎচন্দ্র তিনজনেই দাম্পত্য জীবনের রসসাহিত্যে সন্তানকে একেবারেই এড়াইয়া গিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'দুই বোন' উপন্যাস ইহার একটি নিদর্শন। বঙ্কিমচন্দ্রের বিচারাদর্শ অনুসরণ করিয়া একজন পাঠক দুই বোনের নায়ক শশাঙ্ককেই সমস্ত অনর্থের দায়ী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে কবি বলিয়াছিলেন—

"দুই বোনের ভাগ্যবিভ্রাটের যত দোষ চাপিয়েছেন শশাঙ্কের ঘাড়ে। তিনি লক্ষ্য করেননি সে দোষটা মায়াবিনী প্রকৃতির। মানুষের চলবার বাঁধা রাস্তায় সে এই নিষ্ঠুর চোরা ফাঁদ পেতে রাখে। অসন্দিগ্ধ মনে চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ পথিক এমন জায়গায় পা

ফেলে যেখানটাতে ঢাকা গর্ত্ত। শশাঙ্কের সংসারযাত্রার রাস্তাটা ছিল মজবুত, কিন্তু শশাঙ্কের চলনের পক্ষে ছিল পিছল। হতভাগা (ঈরদের বিশেষণ ?) হাড়গোড় ভেঙ্গে পড়বার পূর্ব্বে সে কথাটা তার আপনার কাছেও যথেষ্ট গোচর হয়নি। দিনগুলো চলছিল ভালোই। কিন্তু যে সাঁকো বেয়ে চলছিল তার বাঁধনে ছিল ফাঁক। কেন না শশাঙ্ক শর্ম্মিলার ভিতরে ভিতরে জোড় মেলেনি অথচ ফাটলটা উপর থেকে ধরা পড়েনি চোখে। হঠাৎ বাইরে থেকে মড়মড় করে চাড় লাগবার আগে সে কথা কি ওরা কেউ জানতে পেরেছিল ? যখন জানা গেছে তখন ত কপাল ভেঙ্গেছে।

সাধারণতঃ মেয়েরা পুরুষের সম্বন্ধে কেউ বা মা, কেউ বা প্রিয়া, কেউ বা দুই-এর মিশাল। বাংলা দেশে অনেক পুরুষ আছে যারা বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত মাতৃ অঙ্কের আবহাওয়ায় সুরক্ষিত। তারা স্ত্রীর কাছে মায়ের লালনটাই উপভোগ্য ব'লে জানে। ছেলে মায়ের কাছ থেকে আশৈশব যে সকল সেবায় অভ্যস্ত, বধূ এসে তারই অনুবৃত্তিতে দীক্ষিত হয়। অল্প স্ত্রীই এমন সুযোগ পায় যাতে নিজের স্বতন্ত্র রীতিতে স্বামীর পূর্ণতা সাধন করতে পারে, সংসারকে সম্পূর্ণ আপন প্রতিভায় নূতন ক'রে তুলতে পারে।

আবার এমন পুরুষও নিশ্চয় আছে আর্দ্র আদরের আবেশে আপাদমস্তক আচ্ছন্ন থাকতে ভালোই বাসে না। তারা স্ত্রীকে চায় স্ত্রীরূপেই, তারা চায় যুগলের অনুষঙ্গ। তারা জানে স্ত্রী যেখানে যথার্থ স্ত্রী, পুরুষ সেখানেই যথার্থ পৌরুষের অবকাশ পায়। নইলে তাকে লালনরস-লালায়িত শিশুগিরি করতে হয়। মায়ের দাসীকে নিয়ে থাকার মতো এমন দৌর্বল্য পুরুষের জীবনে আর কিছু নেই। শশাঙ্ক স্ত্রীর মধ্যে নিত্যস্নেহ-সতর্কা মাকে পেয়েছিল। তাই তার অন্তর ছিল অপরিতৃপ্ত। এমন অবস্থায় ঊর্ম্মি তার কক্ষ-পথে এসে পড়ায় সংঘাত বাধল, ট্র্যাজেডি ঘটল।

অপর পক্ষে অতি নির্ভর লোলুপ মেয়ে সংসারে অনেক আছে। তারা এমন পুরুষকে চায় যারা হবে তাদের মোটর-রথের শোফার। তারা চায় পতিগুরুকে, পদধূলির কাঙালিনী তারা। কিন্তু তার বিপরীত-জাতীয় মেয়েও নিশ্চয় আছে, যারা অতি লালন-অসহিষ্ণু প্রকৃত পুরুষকেই চায়, যাকে পেলে তার নারীত্ব প্রতিপূর্ণ হয়। দৈবক্রমে ঊর্ম্মি সেই পুরুষকেই চায়। সে এমন পুরুষকে পেলে যার চিত্ত নিজের অজ্ঞাতসারে খুঁজছিল স্ত্রীকেই, যার সঙ্গে তার লীলা সম্ভব আপন জীবনের সমভূমিতেই—যে তার যথার্থ জুড়ি।"

শর্ম্মিলা সাধ্বীসতী পতিসেবা-পরায়ণা, জীবনে পতির মঙ্গল ছাড়া তাহার কিছুই কাম্য নাই। এইরূপ পত্নীই আদর্শ পত্নী—সেকালের বিচারে। এ সমাজের কোন পুরুষই ইহার চেয়ে বেশী কিছু কামনা করিত না। ইহার উপর শর্ম্মিলা রূপবতী, ধনবান পিতার ধনবতী কন্যা, গুণবতী এবং বিদুষী না হইলেও শিক্ষিতা—তবু সে শশাঙ্কের উপযুক্তা সহধর্ম্মিণী নয়। কালকল্প সব বদলাইয়া গিয়াছে—শশাঙ্ক এ যুগের উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত পুরুষ—দেশবিদেশের আদর্শ দাম্পত্যজীবনের খবর জানে—সাহিত্যেও অনেক কথা পড়িয়াছে। সে শর্ম্মিলার মধ্যে পাইল মাতৃধর্ম্মিণী অভিভাবিকাকে, জীবনসঙ্গিনী সহধর্ম্মিণীকে পাইল না। তায় হতভাগিনী শর্ম্মিলা! তুমি যে স্বামীর চরণে প্রাণমন সমস্ত উৎসর্গ করিয়াও স্বামীকে সুখী করিতে পারিলে না, ইহা তোমার দোষ নয়। কবি বলেন,—"শশাঙ্কেরও দোষ নাই—দোষ নিয়তির—দোষ প্রকৃতির।" নিয়তি তোমাকে লালন-পালনাতুর পতির সহিত মিলিত করায় নাই—প্রকৃতি তোমার সেবাক্লান্ত স্বামীকে তাহার সমভূমিতে প্রেমানন্দ লোকের দিকে টানিয়া লইয়া গেল।

রবীন্দ্রনাথের মতে অনর্থের জন্য দায়ী মায়াবিনী প্রকৃতি, শশাঙ্ক নিজে নয়, বরং শর্ম্মিলা নিজে কতকটা অপরাধিনী, কারণ, সে মাতৃধর্ম্মিণী নারী। দুই বোনের আসল সমালোচনা কবি নিজেই করিয়াছেন।

এখানে আর একটি কথা মনে রাখিতে হইবে—বঙ্কিমের নায়ক দুইটি ন্যায়, অন্যায়, ধর্ম্মাধর্ম্ম-পাপপুণ্য সম্বন্ধে রীতিমত সচেতন; তাহারা তাহাদের রূপান্তরিত মনোভাবের বিশ্লেষণ করিয়াছে। দুই বিরুদ্ধ শক্তির মধ্যে তাহাদের মনে বিচার-বিতর্ক বাদানুবাদ ও সংগ্রামও চলিয়াছে—সকল দায়িত্ব তাহারা স্বীকার করিয়া লইয়াছে। তাহারা জ্ঞান-পাপী। বঙ্কিম তাই তাহাদের কাছে মনুষ্যত্বের দিক হইতে অনেক কিছু প্রত্যাশা করিয়াছেন।

মায়াবিনী প্রকৃতি যে-দিকে চালাইয়াছে শশাঙ্ক সেই দিকেই গিয়াছে। রাস্তাটা যে পিছল ছিল রাস্তার সাঁকোয় যে ফাটল ছিল তাহা সে জানিতও না। কাজেই বিচার বিশ্লেষণ সে কিছুই করে নাই। তাহার কল্পলোকের অগ্রজদের মত তাহার সে-সমস্তের অবসরও ছিল না। কাজেই তাহার গতি-পরিণতির অনুসরণ করা ছাড়া কবির অন্য কোন কর্ত্তব্য ছিল না।

বঙ্কিমের যুগে দাম্পত্যজীবনের সার্থকতা বা অসার্থকতার নিয়ন্তা ছিল প্রধানতঃ রূপ-যৌবন। ভ্রমরের ছিল রূপের অভাব। আর সূর্য্যমুখীর যৌবনের অভাবই দাম্পত্য-জীবনে ফাটল ধরাইয়াছে। সে যুগে সতীসাধ্বী হইলেই যথেষ্ট—নারীর চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের কথাই উঠে নাই। রবীন্দ্রনাথের যুগে—নারীর রূপ-যৌবন গৌণ হইয়া পড়িয়াছে—প্রকৃত সহধর্ম্মিণীত্বের সন্ধান হইয়াছে অগ্রত্র। নরনারীর চরিত্রে চরিত্রে মিল না হইলে দাম্পত্য-বন্ধন সম্পূর্ণাঙ্গ নয়। শশাঙ্কের সম্বন্ধে রূপতৃষ্ণার কথাই উঠে নাই, উঠিয়াছে লীলাতৃষ্ণার কথা। সংসার- সম্পর্ক হইতে বহু দূরে একটি অকারণ পুলকের প্রেমলোক আছে। সেই প্রেমলোকে শশাঙ্কের যৌবন তাহার লীলাসঙ্গিনী পায় নাই শর্ম্মিলার মধ্যে। শশাঙ্কের যৌবন বিদায়ের পথে, কিন্তু সে-তৃষ্ণা তাহার অন্তরে কুসুমে কীটের ন্যায় প্রতীক্ষা করিতেছিল। কি-যে তাহার অন্তরে প্রতীক্ষা করিতেছিল শশাঙ্ক তাহা জানিতও না—কাজেই তাহা লইয়া শশাঙ্ক বিচার-বিশ্লেষণ করে নাই। সে সম্মুখে একটা স্রোত পাইয়া তাহাতে গা ঢালিয়া দিয়াছিল নিতান্ত সহজভাবে, একান্ত অকপট নিশ্চিন্ততার সহিত।

এযুগে দাম্পত্যজীবনের জোড়-বাঁধায় মূলে রূপযৌবন, শিক্ষা, দীক্ষা গৌণ—চরিত্রের মিলটাই মুখ্য। দম্পতীর চরিত্রের বৈষম্যটাই বর্ত্তমান সময়ের কথাসাহিত্যের মস্ত বড় সমস্যামূলক উপজীব্য

হইয়া উঠিয়াছে। মাতৃভাবপ্রবলা ও প্রিয়াভাবপ্রবলা দুই শ্রেণীর নারী এবং শিশুভাবপ্রবল এবং পৌরুষভাবপ্রবল দুইশ্রেণীর পুরুষের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়া রবীন্দ্রনাথ 'দুইবোনে' দাম্পত্য জীবনের সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছেন। নূতন অবশ্য জীবনে নয়,—সাহিত্যে। এই সমস্যার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া রবীন্দ্রনাথ নিজেই 'দুই বোনে'র সমালোচনা করিয়াছেন—

"গ্রন্থের প্রারম্ভেই কবি গদ্যকবিতার ভঙ্গীতে বলিয়াছেন—একজাত প্রধানতঃ মা, আর একজাত প্রিয়া। ঋতুর সঙ্গে তুলনা করা যায় যদি, মা হলেন বর্ষা ঋতু—জল দান করেন, ফল দান করেন, নিবারণ করেন তাপ, উর্দ্ধলোকে থেকে আপনাকে দেন বিগলিত ক'রে। দূর করেন শুষ্কতা, তাড়িয়ে দেন অভাব। আর প্রিয়া বসন্ত ঋতু। গভীর তার রহস্য, মধুর তার মায়ামন্ত্র। তার চাঞ্চল্য রক্তে তোলে তরঙ্গ, পৌঁছয় চিত্তের সেই মণিকোঠায়। সেখানে সোণার বীণায় একটি নিভৃত তার রয়েছে নীরবে ঝংকারের অপেক্ষায়। সে ঝংকারে বেজে উঠে সর্বদেহে মনে অনির্বচনীয়ের বাণী।"

রবীন্দ্রনাথ 'দুইবোনে' যে সত্যটিকে বাণীরূপ দিয়াছেন—সে সত্যের সন্ধান তিনি তাঁহার চারিপাশের সমাজেই পাইয়াছেন। কিন্তু এ-সত্য বঙ্কিমচন্দ্রেরও অজ্ঞাত ছিল না! নারীর পক্ষ হইতে শৈবলিনীর দাম্পত্যজীবনের ব্যর্থতার সত্যের সন্ধান হয়ত তিনি তাঁহার সমাজের মধ্যেই পাইয়াছিলেন—কিন্তু সীতারামের সহধর্ম্মিণী লাভের জন্য ব্যর্থ প্রয়াসের সত্যটি তিনি ধ্যানযোগেই লাভ করিয়াছিলেন। শর্ম্মিলার মত গুণবতী রূপবতী সাধ্বীসতী নন্দা বিশেষতঃ মাতৃ-ধর্ম্মিণী রমা তাঁহার প্রেমতৃষ্ণা মিটাইতে পারে নাই। সীতারাম আবিষ্কার করিলেন—তাঁহার জীবনের সমভূমিতে অবস্থিতা শ্রীই তাঁহার উপযুক্তা রাজমহিষী। Romance হইতে ঐ সত্য আজ উপন্যাসে নামিয়াছে! বঙ্কিমের আবিষ্কৃত সত্যই বর্ত্তমান যুগোপ-যোগী সাজসজ্জায় একদিকে 'চন্দ্রশেখর' হইতে 'নষ্টনীড়ে', অন্যদিকে 'সীতারাম' হইতে 'দুইবোনে' অবতীর্ণ হইয়াছে এ-কথা বলিলে কি বিশেষ অসঙ্গত বলা হয়?

প্রাচীন সাহিত্যে প্রেমের যথার্থ রূপ ফুটাইয়া তোলা হইত নরনারীর প্রকৃতিগত ও জীবনযাত্রাগত বৈষম্যকে অবলম্বন করিয়া। এই বৈষম্যই যে দূরত্বের সৃষ্টি করিত তাহাই একটা Romance-এর ইন্দ্রজাল বয়ন করিয়া তুলিত। রবীন্দ্রনাথ শর্ম্মিলার চিন্তার মারফতে তাহাও বলিয়াছেন—পুরুষ মানুষ রাজার জাত। দুঃসাধ্য কর্ম্মের অধিকার ওদের নিয়তই প্রশস্ত করতে হবে। নইলে তারা মেয়েদের চেয়েও নীচু হয়ে যায়। কেন না মেয়েরা আপন স্বাভাবিক মাধুর্য্যে ভালোবাসার জন্মগত ঐশ্বর্য্যেই সংসারে প্রতিদিন আপন আসনকেই সহজেই সার্থক করে। কিন্তু পুরুষের নিজেকে সার্থক করতে হয় প্রত্যহ যুদ্ধের দ্বারা। সে-কালে রাজারা বিনা প্রয়োজনেই রাজ্যবিস্তার করতে বেরোত। রাজ্যলোভের জন্য নয়, নূতন ক'রে পৌরুষের গৌরব প্রমাণ করবার জন্য। এই গৌরবে যেন মেয়েরা বাধা না দেয়।"

এখন ত' আর সেই Romantic যুগ নাই, এ-যুগে নরনারীর চরিত্রগত ও জীবনযাত্রাগত সাম্যকে অবলম্বন করিয়াই প্রেমের সঞ্চার ও অভিব্যক্তি। শর্ম্মিলা যুগধর্ম্মের সঙ্গে পরিচিত ছিল না। সে নিজের প্রকৃতি ও কর্ম্মজীবনে একটা সশ্রদ্ধ ব্যবধান রাখিয়াই চলিত। সে বিশ্রামের অবকাশে পৌরুষের শিথিল সংবৃত মুহূর্ত্তগুলিতে স্বামীকে দ্বিগুণিত আগ্রহে আপনার করিয়া পাইত। সে স্বামীর গৌরবের সমুচ্চতাকে দূর হইতে উপভোগ করিত—সে স্বামিগৌরবের অংশভাগিনী হইতে চায় নাই। বর্ত্তমান কালের দাম্পত্যজীবনের যুগধর্ম্ম তাহা নয়। কবি 'দুই বোনে' ইহাই দেখাইতে চাহিয়াছেন।

শর্ম্মিলা রুক্মিণী বা চন্দ্রাবলী-জাতীয়া রমণী। সত্যভামার বা রাধার মত প্রকৃতি তাহার নয়। পতির যাহাতে মঙ্গল হয়, পতি যাহাতে সুখী হয় তাহার নারীজীবনের তাহাই কাম্য। তাহার অন্তরে অসূয়া নাই। পতি যদি অন্য রমণীতে আসক্ত হইয়া সুখী হয়—তাহাতেও তাহার ক্ষোভ নাই। কারণ, পতির পরিতৃপ্তিই তাহার কাম্য। এই শ্রেণীর দয়িতাসক্তা রমণী পতির অন্য নারীর সহিত সংসর্গ ঘটাইবার সহায়তা করিতেও প্রস্তুত। শর্ম্মিলা প্রকারান্তরে তাহাই করিয়াছে। এই শ্রেণীর নারী সেবাসহচরী, সেবার দ্বারা পতির তৃপ্তি সাধন করে, সে লীলাসহচরী বা নর্ম্মসখী নয়, সে পুরুষের লীলাতৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারে না। তাহার অন্তরে অসূয়া যেমন নাই—তেমনি, অভিমান করিতে বা মানিনী হইতেও সে জানে না। নিজের নারীত্ব ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে যে সচেতনা—তাহারই মানবোধ আছে, সেই মানিনী হইতে পারে। যে নিজের নারীত্ব বা ব্যক্তিত্ব স্বামিত্বে বিসর্জ্জন দিয়াছে সে মানিনী হইতেও পারে না। এ-সব বৈষ্ণব রসতত্ত্বেরই কথা। বৈষ্ণবরসতত্ত্বে চন্দ্রাবলীর চেয়ে রাধা উপরের স্তরের নায়িকা। যে মধুর রসে দাস্যভাব মিশ্রিত আছে—তাহা অবিমিশ্র মধুর রসের তুলনায় নিম্নস্তরের সামগ্রী। পুরুষোত্তমের মত কোন প্রেমিক পুরুষই দাস্যভাবমিশ্র মধুররসে তৃপ্ত নয়—তাহার চিত্ত বলে—'এহো বাহ্য আগে কহ আর।' 'দুইবোন' পড়িতে গিয়া এ-সব কথা মনে পড়ে।

শশাঙ্ক উর্ম্মির হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিয়াছে—"তুমি নিশ্চয় জান তোমাকে আমি ভালবাসি। আর তোমার দিদি তিনি ত দেবী। তাঁকে যত ভক্তি করি জীবনে আর কাউকে তেমন করিনে। তিনি পৃথিবীর মানুষ ন'ন্। তিনি আমাদের অনেক উপরে।" শর্ম্মিলা ভক্তির বদলে ভক্তিই পাইয়াছে। দেবীর সঙ্গে মানবের আসল প্রেম হয় না, মানবীর সঙ্গেই তাহার প্রেম সম্ভব।

ভক্তির মধ্যে হিসাববোধ থাকে—ভক্তিমূলক পাতিব্রত্য। প্রিয়জনের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল চিন্তা করে, কাজেই তাহাকে হিসাবী হইতে হয়—দূর ভবিষ্যৎ দেখিতে হয়—প্রিয়জনের স্বাস্থ্য ও স্বস্তির কথা তাহাকে চিন্তা করিতে হয়। আর প্রেমের মোহে বাহ্যজ্ঞান থাকে না—তাহাতে হিসাববোধ একেবারে বিলুপ্ত। তাই উর্ম্মিমালার প্রেমমোহ শশাঙ্কের মঙ্গল চিন্তা করিবার অবসর পায় নাই বরং তাহার জীবিকাশ্রয় ব্যবসায়টিকে ধ্বংসই করিয়াছে, শশাঙ্কের স্বাস্থ্য, স্বস্তি ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও সে ছিল উদাসীন—

সেবা তাহার দ্বারা সম্ভবও হয় নাই। সেবাজালে বিজড়িত শশাঙ্ক সেবার ত্রুটির মধ্যেই যেন মুক্তি পাইয়াছে।

ঊর্ম্মি ও শশাঙ্কের প্রেম যে কল্যাণের পরিপন্থী কবি তাহা অস্বীকার করেন নাই। তবে কল্যাণপ্রসূ হউক আর অকল্যাণকর হউক, প্রেমিক পুরুষের চিত্ত দুর্লভ প্রেমের আস্বাদ পাইলে যে সেবাপরায়ণা পতিব্রতা পত্নীর সুলভ ভক্তিকে উপেক্ষা করিতে পারে—কবি শুধু তাহাই বর্ণাঢ্য করিয়া দেখাইয়াছেন।

শর্ম্মিলা পতিগতপ্রাণা, সর্ব্বস্ব দিয়া সে পতিসেবা করিয়া আসিয়াছে, শশাঙ্কও কর্ম্মগতপ্রাণ—অন্যদিকে তাহার দৃষ্টি নাই। নিজের পৌরুষশক্তির দ্বারা বহু লক্ষ টাকার মালিক হইবার সাধনায় সে তদ্গত। এইরূপ ক্ষেত্রে শর্ম্মিলা স্বতঃই প্রত্যাশা করিয়াছে—শশাঙ্ক তাহার সেবাভক্তি ও পাতিব্রত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিবে এবং বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিয়া তাহার ব্রতভঙ্গ করিবে না। তাই সরল বিশ্বাসে ও অটল নির্ভরে সে ঊর্ম্মির সঙ্গে শশাঙ্ককে ছাড়িয়া দিয়াছে। শর্ম্মিলার প্রত্যাশা অসঙ্গত নয়। অভাবের সংসারে আদর্শ গৃহলক্ষ্মী শর্ম্মিলার মত রমণীর অটল পতিভক্তিই স্বামীকে অটল ও কর্ম্মনিষ্ঠ রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট। সচ্ছলতার সংসারে লীলাবিলাসের অবসর ঘটে প্রচুর—তৃপ্তি অতৃপ্তির প্রশ্ন উঠে। শর্ম্মিলা তাই দৈন্যকে ভয় করে নাই। সে বুঝিয়াছিল অভাবের দিনে স্বামীর সংসারে তাহার স্থান আরও বাড়িয়া যাইবে।

পুরুষের মধ্যে একটা আদিম যুগের পরুষতা আজিও বিদ্যমান আছে। দৈন্য তাহাকে বাড়ায় বটে, কিন্তু মধ্যবিত্ততা তাহাকে কমাইয়া দেয়। শশাঙ্কের ধনাতিশয্য তাহার অন্তর্নিহিত পরুষতাকে কমায় নাই—শর্ম্মিলার পক্ষে তাহা বাড়াইয়াই দিয়াছিল। সে পত্নীর সেবাতিশয্যে বিরক্ত—পত্নীর আত্মহারা ভক্তির মর্য্যাদা সে রাখিল না, পত্নীর অর্থেই সে ধনবান্ হইয়াছিল, তাহাও সে ভুলিল, পত্নী যখন মৃত্যুর পথে চলিয়াছে, তখন সে অনায়াসে তাহারই ভগিনীর সহিত লীলারঙ্গে মাতিয়াছে। ইহা শশাঙ্কের পক্ষে হৃদয়হীনতারই পরিচয়। মনের মধ্যে বাসনা অতৃপ্ত থাকিলে এবং দুর্লভ বাঞ্ছিত বস্তুকে না পাইলে পুরুষের অন্তর্নিহিত পরুষতা এইভাবে আত্মপ্রকাশ করে। বঙ্কিমচন্দ্র 'সীতারামে' তাহা চমৎকার করিয়াই দেখাইয়াছেন। এইরূপ দুর্লভ বস্তু লাভ করিলে তাহার জীবনের ব্রতভঙ্গও ঘটিয়া যায়। শশাঙ্ক চাহিয়াছিল টাকার পিরামিড্ গড়িতে। একদিন ইহাকেই জীবনের ব্রত বলিয়া সে গ্রহণ করিয়াছিল। এই ব্রতটা খুব মহৎ নয় সত্য, কিন্তু সে তাহার পৌরুষধর্ম্মকে, অন্য কোন উচ্চতর ব্রতের সন্ধান না পাইয়া, ইহাতেই নিয়োগ করিয়াছিল। এই ব্রতের জন্যই যৌবনে সে শর্ম্মিলার দিকে ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিবার অবসরও পায় নাই। এই ব্রত তাহার ছিল প্রাণাধিক। সুলভ পত্নীভক্তিতে উদাসীন শশাঙ্ক দুর্লভ লীলা-বিলসিত প্রেমের আস্বাদ পাইয়া এই ব্রতকেও বিসর্জ্জন দিল। ইহাই তাহার জীবনের ট্র্যাজেডি। শর্ম্মিলাকে সে হারায় নাই। ঊর্ম্মিলাকেও সে হারায় নাই। কিন্তু ঊর্ম্মি ঊর্ম্মির মতই উদ্বেলিত হইয়া নামিয়া বহিয়া গেল। শশাঙ্কের জীবনে সেটা একটা দুঃস্বপ্নের মতই থাকিয়া গেল।

ঊর্ম্মির সহিত শশাঙ্কের বিবাহ দিয়া কবি শশাঙ্ককে সপরিবারে নেপাল পাঠাইতে চাহিয়াছিলেন। তাহা হইলে উপন্যাসের কলাসঙ্গত পরিসমাপ্তি হইত না—নূতন করিয়া উপন্যাসের উত্তরাংশ লিখিতে হইত। সেজন্য ঊর্ম্মিকে একেবারে বিলাত পাঠাইলেন। বিধবা হইলে হয়ত কাশী পাঠাইবেন। ঊর্ম্মির বিলাতযাত্রা নিরুপায়ের শেষ অবলম্বনবৎ উপকরণ হইলেও পরিসমাপ্তি কলাসঙ্গত। সূর্য্যমুখীর মত শর্ম্মিলা স্বামীকে ফিরিয়া পাইল—স্বাস্থ্য, যৌবন ও ধনসম্পদ্ হারাইয়া সর্ব্বাঙ্গীণ দৈন্যের মধ্যে ফিরিয়া পাওয়া বলিলে যাহা বুঝায় তাহাই। অবশ্য সেবাপরায়ণা নারীর পক্ষে এ অবস্থায় ফিরিয়া পাওয়ার মধ্যে ক্ষোভ কিছু নাই। কারণ, সে এইবার প্রাণ ভরিয়া সেবা করিবার সুযোগ পাইল—এ সেবায় স্বামীর বিরক্তি আর জন্মিবে না—শশাঙ্ক সেবার কাঙাল হইয়াই এবার শর্ম্মিলার কাছে ফিরিয়া আসিল। শর্ম্মিলা আগাগোড়াই নিরপরাধা, স্বামীর অপ্রীতিকর কিছুই সে কোনদিন করে নাই। ট্র্যাজেডির জন্য শর্ম্মিলাকে কোন প্রকারে শশাঙ্কের দায়ী করিবার উপায় নাই। নিয়তির ঘাড়ে দোষ চাপাইবার অথবা শর্ম্মিলার মাতৃভাবপ্রবলতাকে দায়ী করিবার মত সূক্ষ্ম বিদ্যাবুদ্ধি তাহার ছিল না। সে লজ্জানত মস্তকে সসঙ্কোচে শর্ম্মিলার শয়নগৃহে প্রবেশ করিল। শর্ম্মিলা তাহাকে এতদিন পরে সত্য করিয়াই পাইল।

শশাঙ্ক একটা মহাপুরুষ নয়, তাহার ব্রতও মহৎ কিছুই নয়। সে অতিসাধারণ মানুষ। তাহার পক্ষে লীলাময়ী বিদুষী ঊর্ম্মির মোহে মুগ্ধ হইয়া কর্ত্তব্য বিস্মরণ অস্বাভাবিকও নয়, অসঙ্গতও নয়। তাহার প্রেমতৃষ্ণা মিটে নাই। এমন কত তৃষ্ণাই জীবনে মিটে না, মানুষ যাহা চায় সবই কি পায়? বিবেচক দৃঢ়চরিত্র লোকে আত্মসংবরণ করিয়া সংসারের শ্রী, শান্তি ও শুচিতা রক্ষা করে। সে তাহা করিতে পারে নাই, তাহার দণ্ড সে ভোগ করিল। তাহার অপরাধ গোবিন্দলালের মত গুরুতর নয় তাই সে শেষ পর্য্যন্ত কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীর অঞ্চল ছায়ায় আশ্রয় পাইল।

ঊর্ম্মি নীরদকে শ্রদ্ধা করিত কিন্তু তাহার সহিত তাহার সম্পর্ক হইয়াছিল অনেকটা গুরু-শিষ্যার। তাহা প্রেম নয়। সে শশাঙ্কের আশ্রয়ে আসিয়া প্রেমের আস্বাদ পাইল—কঠোর আশ্রম-জীবন হইতে সে মুক্তি পাইল, পিতৃবিহিত বন্ধন হইতে নীরদই তাহাকে মুক্তি দিল। তাহার পক্ষে শশাঙ্কের হাতে ধরা পড়া ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। তাহার জীবনের স্বাভাবিক পরিণতিই ইহা। কাহার যদি কোন ভুল হইয়া থাকে তবে সেজন্য দায়ী তাহার অভিভাবকহীনতা। নীরদ, শশাঙ্ক এবং বেশি করিয়া দায়ী তাহার দিদি শর্ম্মিলা। সে যে তাহার দিদির জন্য নিজে আত্মত্যাগ করিল, এইখানেই তাহার চরিত্রের নিজস্বতা।

'দুই বোন' উপন্যাস রবীন্দ্রনাথের 'নষ্ট নীড়' 'চোখের বালির' মত প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস নয়। গ্রন্থের প্রথমে কবি যে সত্যটির আভাস দিয়াছেন প্রধানতঃ তাহাকেই গ্রন্থখানিতে বাণীরূপ

দিয়াছেন। রচনার মধ্যে জীবনের স্পর্শ সর্ব্বত্র নাই। আখ্যান-বস্তুর ঘটনাপরম্পরায় ও ভিন্ন ভিন্ন অঙ্কের মধ্যে অনেকস্থলে বাঁধন ও গাঁথনি শিথিল। মনে হয়—যেন তেমন জোড় বাঁধে নাই, যে পারিবারিক ও প্রাকৃতিক আবেষ্টনী সৃষ্টির চমৎকারিতা রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যের বিশেষত্ব—সে আবেষ্টনীও ইহাতে পাওয়া যায় না। কল্পিত চরিত্রগুলি অধিকাংশ স্থলে নিজের ব্যক্তিত্বের পক্ষে স্বাভাবিক ভাষায় কথা বলে নাই, সকলেই কবির মুখের ধার-করা কথাই বলিয়াছে। উর্ম্মির যৎসামান্য ম্যানেজার কাকাবাবুটি অতি সাধারণ লোক, এমন কি সেও কবির ভাষায় কথা বলিয়াছে। অনেক স্থলে যাহা আচরণ, ঘটনা বা দৃশ্যের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হওয়ার কথা, কবি তাহা মুখের কথায় বিবৃত করিয়াছেন। শশাঙ্কের ব্যবসায়ের আকস্মিক বিধ্বংস, উর্ম্মির রাতারাতি বিলাত যাত্রা ইত্যাদি ব্যাপার যে স্বাভাবিক মন্থরতার সহিত সম্পন্ন হইবার কথা, এই দ্রুতসঞ্চারী উপন্যাসে সেভাবে দেখানো হয় নাই—অনেক স্থলে উপন্যাসের রীতি ও ধর্ম্মের স্থলে Romanceএর রীতি ও ধর্ম্ম অনুসৃত হইয়াছে।

কবি যেরূপ গার্হস্থ্য জীবন নিজের চোখে দেখিয়াছেন—সেইরূপ গার্হস্থ্য জীবনই অঙ্কিত করিয়াছেন—তাহাতে কোন অঙ্গহানি নাই। কিন্তু সবই দ্রুতসঞ্চারী। মনস্তত্ত্বের দিকটা কবি যতদূর সম্ভব এড়াইয়া গিয়াছেন। শশাঙ্ক-উর্ম্মির প্রেম-লীলাও নব নব দৃশ্যে ফুটিয়া উঠে নাই—সে জন্য কবির মুখের বার্ত্তাবিবৃতির উপরই নির্ভর করিতে হইতেছে। এই সকল কারণে মনে হয় 'চোখের বালি' 'নষ্ট নীড়ের' তুলনায় ইহা নিম্ন স্তরের রচনা। যে জীবনের স্পর্শ আমরা ঐ বই দুইখানিতে পাইয়াছি ইহাতে তাহা নাই। চরিত্রগুলি পরিপূর্ণ ভাবে জীবন্ত হইয়া উঠে নাই বলিয়া ইহারা কবির অন্তরের দরদ লাভ করে নাই। উপন্যাসখানি আগাগোড়া একটা পরিহাস-বিজড়িত শ্লেষাত্মক (ironical) ভঙ্গীতে রচিত। দরদের ভাবা বা ভঙ্গীতে রচিত নয়।

সাঁইবনা

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস, এম-এ, বার-এট্-ল

নীলগঞ্জ হ'য়ে পার, করো দিবা অভিসার—
ধূলায় ধূসর হোক্ দেহ,
লাবণ্যবতীর তীরে, চিনে নিয়ো গ্রামটিরে
স্বামীবন চিনিবে না কেহ।

সাঁইবনা ডাক নাম বিরলবসতি গ্রাম,
দুটি শিবালয় পাশাপাশি,
প্রকাণ্ড বকুলগাছে ঘনছায়া রচিয়াছে,
পথশ্রান্তি দেবে সব নাশি'।

শীতল সমীর বয়, নাতিদীর্ঘ জলাশয়,
দোলমঞ্চ প্রান্তরের মাঝে,
চলো যাই শ্রীমন্দিরে, প্রবেশিব ধীরে ধীরে
শ্রীনন্দদুলাল যেথা রাজে।

অদূরে বল্লভপুরে বাজে বাঁশী মঞ্জু সুরে,
খড়দহে শ্রীশ্যামসুন্দর,
সাঁইবনা বহুকাল বিরাজে নন্দদুলাল,
প্রাণারাম মূর্ত্তি মনোহর।

নাহি জানি সত্যাসত্য লিখি শুধু পুরাতত্ত্ব
নেহারিলে এ তিন ঠাকুরে,
ঘুচে যায় ভবভয় পুনর্জন্ম নাহি হয়,
জরা মৃত্যু সবই যায় দূরে।

আজো তাই নরনারী বক্ষে লয়ে প্রীতিঝারি
আকুল আবেগে বাহিরায়,
শ্রীরাধাবল্লভে নমি' খড়দহ পরিক্রমি'
সাঁইবনা অভিমুখে ধায়।

শুভ মাঘী পৌর্ণমাসী যত নরনারী আসি'
প্রণমিয়া তিনটি বিগ্রহ,
কি ভিক্ষা মাগিয়া লয়, কি কামনা মনোময়
কে জানে সে কাহার বিরহ।

বহু শত বর্ষ আগে যে বিরহ হৃদে জাগে,
সে বিরহে ব্যাকুল হৃদয়,
নন্দদুলাল প্রভু, যোগ্য আমি নহি তবু,
কৃপা করি দেহ পদাশ্রয়।

চৌকো চোয়াল

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া

বারো

কয়েক দিন পরের কথা।

সকালে পুলিশ-অফিসার কি একটা জরুরি কাযের জন্য ধড়াচূড়া পরিধান করে বাইরে যাবার উদ্যোগ করছেন, এমন সময় শ্রীকান্ত বাবু উৎকৃষ্ট সাহেবী পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হয়ে মোটর হাঁকিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। প্রবল উল্লাসে করমর্দ্দন করে হর্ষোৎফুল্ল মুখে বললেন "আমার পরম সৌভাগ্য যে, এসেই আপনাকে ধরতে পেরেছি। আজ রাত্রে গরীবের কুটীরে পায়ের ধূলো দিতে হবে। কোর্টের আমলা উকিলরা ধরেছেন, তাই যৎসামান্য খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। শুনে সুখী হবেন, আমি লোহাগড় রাজ-এষ্টেটের মামলা বিভাগের ম্যানেজার নিযুক্ত হলাম।"

পুলিশ-অফিসার সানন্দে বললেন "ক্ষিতীশ বাবুর স্থানে? শুনে সুখী হলাম। Hearty congratulations!"

দুঃখিত ভাবে শ্রীকান্ত বাবু বললেন, "সবাই এ খবরে আনন্দ করছেন বটে, কিন্তু আমি এতে বিন্দুমাত্র সুখী হই নি। ক্ষিতীশ বাবু শোচনীয় ভাবে জলে ডুবে মারা গেলেন, সেটা ভগবানের হাত। নিরুপায় মানুষ আমরা, সহ্য করতে বাধ্য। কিন্তু তাঁর মৃত্যুতে প্রাণে বড় আঘাত পেয়েছি। এদিকে এষ্টেটের দলিল-গুলো চুরি যাওয়ায় অবস্থা যা সঙ্গীন হয়েছে, আমি না দাঁড়ালে সব ডুবে যাবে! পুরোণো ঘর, কাজেই বাধ্য হয়ে—"

পুলিশ-অফিসার বললেন, "ভালই করেছেন। আপনার মত কর্ম্মতৎপর, বুদ্ধিমান্ লোক পেয়ে এষ্টেট উপকৃত হবে। শান্তি বাবুর খবর কি?"

প্রবল বিরক্তির সঙ্গে শ্রীকান্ত বাবু বললেন, "কে জানে মশাই! বাপ প্রচুর সম্পত্তি করে রেখে গেছেন, ব্যাঙ্কে ঢের টাকা আছে, কাজেই নিশ্চিন্ত হয়ে পুরুলিয়ায় গিয়ে বাড়ীতে বসে আছে! অতগুলো জরুরি দলিল যে হারালো, সে সম্বন্ধে দায়িত্ববোধ নেই, ভ্রূক্ষেপ নেই। সন্ধান জানা না থাকলে এমন অবস্থায় কেউ অত নিশ্চিন্ত থাকতে পারে, আমার তো ধারণাই হয় না! আপনার হয়?"

পুলিশ অফিসার সসঙ্কোচে ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। কারণ, অসতর্ক মুহূর্ত্তে তুচ্ছ মতামত ব্যক্ত করে, এই জাহাঁবাজ উকিলটির দ্বারা তিনি ও তাঁর অধীনস্থ ব্যক্তিরা প্রকাশ্য কোর্টে বহুবার লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয়েছেন। তাঁদের ক্ষুদ্র অসাবধানতার সুযোগ নিয়ে, বহু মিথ্যার দ্বারা সেটা অলঙ্কৃত করে ইনি এমন বাকচাতুরীর খেলা দেখিয়েছেন,—চমৎকার প্রচার কার্য্যের দ্বারা, এমন সাক্ষী তৈরী করেছেন যে, তাঁরা নিজের কাছে নিজে মিথ্যাবাদী বলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়েছেন। শ্রীকান্ত বাবুর চাতুরী বিদ্যাকে তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে ভয় করে চলতেন। অকুতোভয়ে সত্য কথা বলে, তাঁকে চটাতেও সাহস করতেন না। প্রশ্নটা একবার হাত দুপিটো

নাড়াচাড়া করতে করতে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, "ব্যারিষ্টারদের টাকা প্রাপ্তির রসিদ তো হারিয়েছে। তার ডুপ্লিকেট-কপি আনিয়ে দিতেও পারেন নি?"

কিঞ্চিৎ বিমর্ষ হয়ে শ্রীকান্ত বাবু বললেন, "ব্যারিষ্টাররা লোক ভাল বলতে হবে। শান্তি বাবুর রিপ্লাই প্রী-পেড্ টেলিগ্রামের জবাবে তাঁরা টাকার প্রাপ্তিস্বীকার জানিয়েছেন। শান্তি সেগুলি রেজিষ্ট্রি ডাকে চীফ্ ম্যানেজারের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। তবু নিজে আসে নি।"

তিনি নিজে না আসায় কার কি ক্ষতি হোল, ঠিক বোঝা গেল না। পুলিশ অফিসার কি বলবেন খুঁজে না পেয়ে, অযথা প্রতিধ্বনি করলেন "নিজে আসেন নি?"

"নাঃ! তার মতলব বোঝা ভার! আমি তো আজ ফিষ্টে যোগ দেবার জন্যে টেলিগ্রাম করেছি। দেখি আসে কি না? আপনার আর সব সাঙ্গোপাঙ্গরা কোথা? সাব ইনেস্পেক্টার বাবুরা? সেই ছোকরা গোয়েন্দা, কি নাম তার? তরুণ বুঝি? কোথা তাঁরা?"

"সাব ইনেস্পেক্টার একটা চুরির তদন্তে দূরে গেছেন। বৈকাল নাগাদ ফিরবেন।"

"বেশ, তা হলে আপনার উপর ভার দিয়ে যাচ্ছি, তাঁকে, জমাদারকে, সঙ্গে নিয়ে অতি অবশ্য অবশ্য যাবেন। সন্ধ্যার সময় মোটর আপনাদের জন্য আসবে। হ্যাঁ, সেই তরুণ বাবু কই?"

"তিনি তো তার পরদিনই চলে গেছেন।"

"চলে গেছেন? বাঃ, রাজ-এষ্টেটকে কিছু জানিয়ে গেলেন না? কোথা গেছেন?

"তা তো জানি না।"

উত্তেজিত-বিস্ময়ে শ্রীকান্ত বাবু বললেন, "আপনাকেও বলে যান নি? সে কি? এ রকম লুকোচুরির মানে কি? তদন্তের কি কতদূর হোল? জিজ্ঞাসা করেছিলেন?"

সবিনয়ে পুলিশ অফিসার বললেন "তিনি গোয়েন্দা। তাঁর কার্য্য-ধারা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করা আমাদের পক্ষে রীতি-বিরুদ্ধ।"

গম্ভীর হয়ে শ্রীকান্ত বাবু বললেন, "আমাদের চারদিকেই শত্রুপক্ষের যে রকম বিরাট ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল, তাতে আশঙ্কা হচ্ছে, সে ভদ্রলোককে কেউ ধরে নিয়ে গিয়ে গুম্ করে রাখলে না তো? যেমন শান্তি দাবী করে যে, তাকে গুম্ করে রাখা হয়েছিল! অবশ্য যে বিশ্বাস করে করুক, আমি ও কথা বিশ্বাস করতে চাই না। আপনার কি মনে হয়?"

ইতস্ততঃ করে পুলিশ অফিসার বললেন, "বলা শক্ত। তবে মিঃ পূরণ সিংহের সাক্ষ্য, হাসপাতালের রিপোর্ট—সে গুলোই ব মিথ্যা মনে করি কোন্ যুক্তিতে?"

ঠোঁটের একপ্রান্ত চেপে [illegible] হাসি হেসে শ্রীকা

বাবু বললেন "রেখে দিন মশাই! মিঃ জ্যাক্‌সনের মত মুরুব্বি পিছনে থাকলে, আমি লাটসাহেবের সার্টিফিকেট এনে আপনাকে দেখাতে পারি যে আমিও অতিশয় গুড্ বয়! শান্তির বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। খোসামোদ করে করে বেশ বড় বড় মুরুব্বি-গুলি যোগাড় করেছে! গোয়েন্দা মশাই চালিয়াতি করতে গিয়ে কার ফাঁদে পড়লেন খোঁজ নিন মশাই। তিনি এতটা নিখোঁজ হলে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে আমাদেরও যে প্রাণান্ত!"

"কেন?"

"এষ্টেটের কাযে তিনি যখন নিযুক্ত হয়েছেন, তখন তাঁকে আমরা এষ্টেটের লোক বলেই গণ্য করব। রাজা বাহাদুর, চিফ্ ম্যানেজার, সবাই তাঁর খবর জানতে চাইছেন। তাঁদের কি বলব বলুন? আমাকে উত্তর দিতে হবে তো?"

বিপন্নভাবে পুলিশ অফিসার বললেন, "বলবেন—তিনি তদন্ত ব্যাপারেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন।"

সাগ্রহে শ্রীকান্ত বাবু বললেন, "কোথায় ঘুরছেন? পুরুলিয়ায়? না—কলকাতায় মিঃ জ্যাক্‌সনের পিছনে? জ্যাক্‌সন আবার দারুণ শয়তান! মিথ্যে করে অন্য কারুর ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে, তাঁকে ভুল পথে না পাঠায় সেটা দেখবেন। বন্ধুলোক আপনারা, তাই সতর্ক করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, ভাল কথা, পোষ্ট মর্টেমের রিপোর্টে কি সাব্যস্ত হোল? আমি তো তিন দিন গিয়ে ডাক্তারের দেখাই পেলাম না। কলে বেরিয়ে গেছল, শুনলাম। রিপোর্ট—?"

"মাপ করুন। রিপোর্ট এখনও আমারও হাতে পৌঁছে নি। আমি বড় ব্যস্ত রয়েছি। এখন—"

"ক'টার সময় গাড়ী পাঠাব বলুন? আচ্ছা, ঠিক সাড়ে আটটার সময় আমি নিজেই মোটর নিয়ে আসব। তৈরী থাকবেন। সবাইকে ধরে নিয়ে যাব। কারুর কোনও ওজর শুনব না। আহা, তরুণ বাবুকে পেলাম না! রাজবাড়ীর বড় কর্ম্মচারীরা সবাই আসবেন। ইচ্ছে ছিল সবাইকে নিয়ে আমোদ-প্রমোদ করা যাবে! যাক,—যাবেন নিশ্চয়।"

বার বার ব্যগ্র অনুরোধ জানিয়ে শ্রীকান্ত বাবু প্রস্থান করলেন। শ্রীকান্ত বাবুর অমায়িক ভদ্র ব্যবহারে এবং সাদর নিমন্ত্রণে, আপ্যায়িত পুলিশ-অফিসার মুগ্ধ হলেন! বঙ্কিম গড়াই'এর মামলায় সাক্ষাৎ কলির মত কপটাচারী উকিল যে কালক্রমে আদর্শ শিষ্টাচারী, মহা-সামাজিক শ্রীকান্ত বাবুতে পরিবর্ত্তিত হয়েছেন এবং সেই শ্রীকান্ত বাবু যে নিজ কৃতিত্বগুণে রাজ এষ্টেটের উচ্চপদ লাভ করে, ফৌজদারী কোর্ট থেকে সরে গেলেন, এতে তিনি আনন্দের সঙ্গে স্বস্তি বোধ করলেন। আরামের নিশ্বাস ছেড়ে তিনি কার্য্যান্তরে মন দিলেন।

রাত্রি আটটা বাজল।

সহসা শশব্যস্তে শান্তি বাবু এসে থানার প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলেন। প্রহরীর হাতে নিজের কার্ড দিয়ে পুলিশ-অফিসারের সাক্ষাৎ প্রার্থনা জানালেন।

প্রহরী ভিতরে গেল এবং ক্ষণপরে ফিরে এসে তাঁকে সসম্মানে সঙ্গে নিয়ে একটা প্রশস্ত ঘরে গেল। শান্তি বাবু ঘরে ঢুকে বিস্মিত হয়ে দেখলেন টেবিলের কাছে তিনখানা চেয়ারে মুখোমুখি হয়ে বসে কথা কইছেন তিনজন—পুলিশ অফিসার, মিঃ সোম এবং তরুণ।

নমস্কার করে শান্তি বাবু সবিস্ময়ে বললেন,"এ কি! আপনারা কখন এলেন?"

শান্তিবাবুর দিকে আর একখানা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে তরুণ স্মিত মুখে বললে—"সন্ধ্যার অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করে, অত্যল্প কাল পূর্ব্বে এসেছি। আপনার খবর কি? শ্রীকান্তবাবুর টেলিগ্রাম পেয়ে ভোজ-পর্ব্বে যোগ দিতে এসেছেন?"

ম্লান হাস্যে শান্তিবাবু বললেন—"তাই এসেছি বটে। কিন্তু ভোজের মাছ এখনো পুকুরে! টক্ রাঁধবার তেঁতুল এখনো গাছে! কজন ভদ্রলোকের উপর সে সব তদ্বিরের ভার দিয়ে নিমন্ত্রণ-কর্ত্তা কোথা বেরিয়ে গেছেন। আমার সঙ্গেও দেখা হয় নি। স্থানীয় ক'জন নিমন্ত্রিত উকিল নিজেরা না এসে, ছেলেদের প্রতিনিধি-স্বরূপ নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পাঠিয়েছেন। সিনেমা দেখতে যাবে বলে, সে ছোকরাগুলি তাড়াতাড়ি খেয়ে গেল। তাদের খাওয়া দেখেই এখানে চলে এলাম। আপনাদেরও আজ ওখানে নিমন্ত্রণ হয়েছে শুনলাম, সত্য না কি?"

পুলিশ অফিসার গম্ভীর হয়ে বললেন "বিশেষ ভাবে তরুণ বাবুর! মোণ্ডা মিঠাই ঠুসে দিয়ে সর্ব্বাগ্রে ওঁর মুখ বন্ধ করাই প্রয়োজন!"

সহাস্যে তরুণ বললে, "স্থানীয় পুলিশ কর্ম্মচারীদের আপ্যায়িত করে মুঠোর মধ্যে রাখার প্রয়োজন তার চেয়েও বেশী। বিশেষতঃ নরহত্যার পাপটা নিমন্ত্রণ খাইয়ে দশ জনের স্কন্ধে চুপি চুপি বণ্টন করে দেওয়ার পলিসিটাও ধর্ম্মভীরু ব্যক্তিদের পক্ষে স্বাভাবিক। বসুন শান্তিবাবু, দাঁড়িয়ে কেন? ঢের চেষ্টা করলুম, কিন্তু আপনার সেই ভূতানন্দ স্বামীটা মশাই—সটান ভূত হয়ে হাওয়ায় মিশে গেছে! তার পাত্তা কোথাও পেলুম না—"

বাধা দিয়ে ব্যগ্র উত্তেজনায় শান্তিবাবু বললেন, "আমি সেই জন্যেই ছুটে এসেছি! কিন্তু বলতে সাহস হচ্ছে না। নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে ভরসা হচ্ছে না। আপনাদের বিশ্বাস হবে কি? আমি এই মাত্র সেই দু'জনকে স্বচক্ষে দেখে এলাম।"

মিঃ সোম ধীরভাবে বললেন, "কি রকম?"

শান্তিবাবু কুণ্ঠিত ভাবে বললেন, "বলতেও আমার ভয় হচ্ছে! সে সাধুবেশ তাদের এখন নাই। দাঁড়ি গোঁফের জঙ্গল সমূলে সাফ করে ফেলেছে। দিব্যি জামাজোড়া পরে ভদ্রলোক সেজেছে। মদের নেশাটা বোধহয় একটু বেশী মাত্রায় হয়ে গেছে। প্রবল উত্তেজনায় লম্বা লম্বা পা ফেলে,চেঁচামেচি করে, লম্ফ ঝম্ফ করে, মহা উৎসাহে খাটছে। সেই চলন দেখে, আর গলার আওয়াজ শুনে মনে পড়ল—এই সেই লোক! অবাক হয়ে ঠাওর করে দেখলাম—এসে একে একে পরিবেশন করতে লাগল সেই ছেলেদের—সেই দুজন লোক!"

মিঃ সোম অধিকতর ধীরভাবে বললেন, "পরিবেশন করছে? শ্রীকান্তবাবুর বাড়ীতে?"

শান্তিবাবু সসঙ্কোচে বললেন, "হাঁ। শ্রীকান্ত দা ভদ্রলোক,—নিশ্চয়ই না জেনে শুনে ওদের বাড়ীতে ঢুকতে দিয়েছেন। এখন

তাঁকে সতর্ক করা উচিত কি না, আপনারা পরামর্শ দিন। এখানে শুনলাম ওদের নামও পাল্টে গেছে। একজন ভূতানন্দের বদলে হয়েছে ভজা, আর একজন ন . ২ ৫৯৩।"

এবার পুলিশ অফিসারের ধৈর্য্য লোপ হোল। লাফিয়ে উঠে উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, "এঁ্যা? ভজা? ভজহরি সরকার? রাজ এষ্টেটের তহবিল তছরূপের কীর্ত্তিধর? মশাই, কম্পাউণ্ডারের মার্ফৎ প্রবীর বাবুকে ঘুষের কথা বলে পাঠিয়েছিলেন এই মহাত্মা! আর বেচা? হ্যাঁ চিনেছি! শ্রীমান বেচারাম কর্ম্মকার! কুলুপ ভাঙার ওস্তাদ,—দাগী চোর! আড়াই বচ্ছর জেল খেটে এই সেদিন বেরিয়েছে। ছ' মাসও হয় নি এখনো! এদের শ্রীকান্ত বাবু জানেন না? খুব ভাল রকমে জানেন! ওদের দুজনের মামলাতেই তিনি ওদের বিপক্ষে উকিল দাঁড়িয়েছিলেন। তলে-তলে ঘুষ খেয়ে মামলা ফাঁশিয়ে দেবার যোগাড় করেছিলেন। কিন্তু ঠেকাতে পারেন নি। শেষ রক্ষে হয় নি। ওদের নাড়ী-নক্ষত্র তিনি সব জানেন। সব জানেন! এরাই সাধু সেজে শান্তিবাবুকে নিয়ে গিয়ে গুম্ করেছিল। এরাই শান্তিবাবুর ঘড়ি আংটি চুরি করেছিল। সাবাস্!"

তরুণ তৎক্ষণাৎ উঠে ওভার-কোট গায়ে দিতে দিতে বললে, "ওয়ারেণ্ট দেন!"

তের

রাত্রি ন'টা বাজল।

শ্রীকান্ত বাবুর মোটর তীর বেগে ছুটে এসে থানার প্রাঙ্গণে ঢুকল। শ্রীকান্তবাবু শশব্যস্তে গাড়ী থেকে নেমে বারেন্দার সিঁড়িতে উঠতে উঠতে মুরুব্বিয়ানা সুরে হাঁক দিলেন, "কই কর্ত্তারা সব কোথা? তাঁরা কি আমার বাড়ীতে গেছেন? না, এখনো যান নি?"

দুজন প্রহরী সামনে এসে সসম্মানে অভিবাদন করে দাঁড়াল। সবিনয়ে একজন বললে, "তাঁরা আপনার অপেক্ষায় বসে আছেন। ঘরের ভিতর চলুন।"

"ঘরের ভিতর যাব? না না এখন সময় নাই। ডাক তাঁদের। বলো, লোহাগড়ের বড় ম্যানেজারবাবু আমার সঙ্গে এসেছেন, তাঁদের নিয়ে যাবার জন্য। চট্‌পট্ সবাই চলে আসুন।"

মুহূর্ত্তে বারেন্দার শেষ প্রান্তের একটা ঘরের দুয়ার খুলে গেল। একজন অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে পুলিশ অফিসার বেরিয়ে এসে বললেন, "আসুন মিঃ চ্যাটার্জ্জি, কই বড় ম্যানেজার বাবু কোথা?"

গর্ব্বোৎফুল্ল মুখে শ্রীকান্তবাবু বললেন, "ঐ যে, তিনি মোটরে বসে আছেন—শীগ্‌গীর চলুন।"

"যাচ্ছি। আমি তাঁকে নামিয়ে আনছি। আপনি এই ভদ্রলোকের সঙ্গে গিয়ে ঘরে বসুন। একটা বিশেষ জরুরি সংবাদ আছে।"—বলে দীর্ঘ দ্রুত পদক্ষেপে পুলিশ অফিসার মোটরের দিকে চলে গেলেন।

অপরিচিত ব্যক্তি স্থির দৃষ্টিতে শ্রীকান্ত বাবুর দিকে চেয়ে স্তব্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। শ্রীকান্তবাবু কেমন যেন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলেন। মানসিক উৎকণ্ঠার চিহ্ন তাঁর চোখে মুখে ফুটে উঠল। আত্মগোপনের জন্য পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছতে মুছতে নিজমনে অর্দ্ধ-স্বগতোক্তির মত বললেন, "এত রাত্রে আবার বস্‌তে হবে? কি এমন জরুরি খবর? না না, আমার এখন বস্‌লে চলবে না। বাড়ীতে কোর্টের ভদ্রলোকেরা সব এসে বসে রয়েছেন। বড় ম্যানেজারবাবু বুড়ো মানুষ, শীতের রাত্রে কোথাও বেরোন না। বহু কষ্টে ওঁকে ধরে এনেছি। এখুনি ফের ওঁকে পৌঁছে দিয়ে আস্‌তে হবে। উনি এখন নাম্‌তে পারবেন না।"

অপরিচিত ব্যক্তি গম্ভীর স্বরে বললেন, "ওই দেখুন—উনি নেমেছেন। আপনি ঘরে আসুন।"

মোটরের দিকে চেয়ে শ্রীকান্ত বাবু দেখলেন সত্যাই বৃদ্ধ ম্যানেজার নামলেন। উৎকণ্ঠা-ত্রস্ত স্বরে তিনি বললেন, "তাইত!" ওঁর উপর বড় অন্যায় জুলুম হচ্ছে তো তাহলে! কি এমন মহামারী ব্যাপার? ঠাণ্ডা লেগে উনি কাল অসুস্থ হলে, তার জন্য পুলিশ অফিসার দায়ী হবেন?"

ততক্ষণে কাছে এসে প্রধান ম্যানেজার উত্তেজিত স্বরে বললেন, "ঘরে চল শ্রীকান্ত, ঘরে চল। গুরুতর সংবাদ আছে।"

অপ্রসন্ন মুখে শ্রীকান্তবাবু কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন, "পুলিশের কাণ্ডই আলাদা! কিন্তু সংক্ষেপে কথা শেষ করে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ছেড়ে দেবেন মশাই, দাদার ঠাণ্ডা লাগলে আপনারা দায়ী হবেন, তা মনে রাখবেন।—"

সকলকে অগ্রবর্ত্তী করে, অপরিচিত ব্যক্তি শ্রীকান্তবাবুর পিছু পিছু ঘরে ঢুকলেন।

স্বহস্তে চেয়ার দিয়ে, বৃদ্ধ ম্যানেজারকে বসিয়ে, পুলিশ অফিসার ঘুরে দাঁড়ালেন। শ্রীকান্তবাবুকে ধরে পরম সৌহার্দ্দ্য ভরে আর একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে, তাঁর সামনে চেয়ার দিয়ে সেই অপরিচিত ব্যক্তিকে বসালেন। তাঁর পাশে আর একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে নিজে বসলেন।

অপরিচিত ভদ্রলোকটির দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিক্ষেপ করে শ্রীকান্ত বাবু বললেন, "ইনি কে?"

পুলিশ অফিসার স্মিত মুখে বললেন, "ইনি গোয়েন্দা ইনেস্‌পেক্টার মিঃ সোম। আজই সদল বলে এখানে পৌঁছেছেন। রাজ এষ্টেটের হারাণো দলিল আর টাকা উদ্ধারের জন্য তদন্ত কার্য্য কি রকম চল্‌ছে, সেটা জানবার জন্য রাজা বাহাদুর এবং চিফ ম্যানেজার না কি আপনাকে ভার দিয়েছেন। কিন্তু তদন্তের সঙ্গে সঙ্গে, সব খবর inform করলে তদন্ত কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে, সেটা বোধ হয় আপনারা ভুলে গেছেন—"

প্রতিবাদের স্বরে প্রধান ম্যানেজার বললেন, "কেন ভুলব? তদন্ত গোপনে হওয়াই উচিত, সে তো আমরা জানি। কই শ্রীকান্তকে তো আমরা কেউ তদন্তের খবর নিতে বলি নি। হ্যাঁ হে শ্রীকান্ত, বলেছি?"

পুলিশ অফিসার আশ্চর্য্য হয়ে বললেন "সে কি? শ্রীকান্ত বাবু যে আজই সকালে এসে তদন্তের খবর জানবার জন্য, আপনাদের তাগাদা জানিয়ে [illegible] করছিলেন।"

বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে প্রধান ম্যানেজার বললেন, "আগাগোড়া ভুল! শ্রীকান্তর কি আজকাল মাথা খারাপ হয়ে গেছে? এর নামে ওকে এক কথা বলছে—ওর নামে তাকে এক ব্লাফ দিচ্ছে, এর মানে কি? আমাকে জেদাজেদি ক'রে টেনে নিয়ে এল, নিমন্ত্রণ-সভায় পাঁচ মিনিটের জন্য সভাস্থ হ'তে। যজ্ঞি-বাড়ীর খাওয়া আমার সহ্য হয় না। খাব না, এসেছি শুধু সভাস্থ হয়ে ওর সম্মান রক্ষা করতে। বলা নেই, কওয়া নেই, গাড়ী সটান এনে দাঁড় করালে থানায়! আমার মতামতের কোনও তোয়াক্কা না রেখে, অকুতোভয়ে আপনাদের ব্লাফ দিচ্ছে—যে লোহাগড়ের বড় ম্যানেজার আপনাদের নিয়ে যেতে, নিজে এসেছেন! অথচ আমি এর কিছুই জানি না।"

সঙ্গে সঙ্গে তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টিতে শ্রীকান্ত বাবুর দিকে চেয়ে বললেন, "তুমি তো বড় সাংঘাতিক লোক হে! রাজা বাহাদুরের নামে কি উদ্দেশ্যে এ রকম মিথ্যে ধাপ্পাবাজি করেছ? কলকাতা থেকে ফিরে এসে তুমি তাঁর দেখা পেয়েছ একদিন? অথচ তিনি তোমার তদন্তের খবর জানতে পাঠালেন! বড় মিথ্যেবাদী তো তুমি! মামলার গরজে আমিই তাঁকে ব'লে-কয়ে তোমায় ক্ষিতীশ বাবুর স্থানে ম্যানেজার ক'রে বসালুম, কারণ এ মামলা খড়ে-বড়ে জড়িয়ে দাঁড় করিয়েছ তুমিই! এ মামলার মাথা মুণ্ডু কিছুই আমরা বুঝতে পারছি না, ক্ষিতীশবাবুও কিছু বোঝেন নি। তুমিই বাক্‌চাতুরীর চোটে উস্কে উস্কে তাঁর ঘাড় ধ'রে মত আদায় করেছ! নইলে এ মামলা আন্‌তে আমাদের কারুর মত ছিল না।"

শুষ্ক হাস্যে শ্রীকান্তবাবু বললেন, "হ্যাঁ আমারি জিদে মামলাটা হয়েছে বটে। জিতলে রাজ এষ্টেটেরই লাখ লাখ টাকা আয় বাড়বে, আমার নয়! পয়সা খরচ হয়েছে বটে, কিন্তু নীচু কোর্টে কি জিতি নি?"

ক্রুদ্ধ হয়ে প্রধান ম্যানেজার বললেন, "সে জিতের মাথায় মারি ঝাড়ু! ঢাকের দায়ে মনসা বিকিয়ে গেল! অসঙ্গত দাবিতে মামলা ফেঁদে, ক্ষিতীশের প্রাণটা গেল! দলিল হারিয়ে এষ্টেট ডুবতে বসল! আর বে-দরদে হাজার হাজার টাকা তো উড়ে গেলই! কেবল শুন্‌ছি—ঘুষ, আর ঘুষ! আবার হাইকোর্টে হাতীর খরচ!"

সপ্রতিভ হাস্যে শ্রীকান্তবাবু বললেন, "হাতী পুষলেই তার খরচ জোটাতে হয়, সম্পত্তি রাখলেই তার মামলা খরচ চালাতে হয়। ছেড়ে দিন না সব সম্পত্তি!—খরচও থাকবে না! ছাড়ুন?"

পরাস্ত হয়ে প্রধান ম্যানেজার নিজেকে যেন একান্ত অসহায় বোধ করলেন! নিরুপায়ভাবে বললেন, "এখন 'দয়ে' মজিয়ে চমৎকার কথা বলছ! এ কথা শুধু তুমিই বলতে পারো! গরজে আর ক'াদুড়ে তো সমান!"

জয়ের গর্বে উৎফুল্ল হাস্যে শ্রীকান্তবাবু বললেন, "তা' হ'লে হারলেন তো আপনি! শুধু রাগ্‌লে চলবে কেন? তর্কে জিৎতে তো পারলেন না!—" ব'লে দরাজ গলায় হো হো ক'রে এমন হেসে উঠলেন যে, প্রধান ম্যানেজারের তিরস্কার ও ঘুষ বাবদ অযথা মামলা খরচ, অসঙ্গত দাবির মামলা সংঘটন,—ইত্যাদি অভিযোগগুলা একটা হাস্যোদ্দীপক প্রহসন মাত্র! বাস্তবের সঙ্গে তার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নাই! সম্পর্ক থাকাও সম্ভব নয়!

হাসির সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমর্থনের আশায় পুলিশ অফিসার ও মিঃ সোমের মুখপানে চাইলেন। যেন এত বড় সরস কৌতুকে যোগ না দেওয়া তাঁদের পক্ষেও অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা!

কিন্তু দু'জনের কেউ হাসলেন না। মিঃ সোম শান্ত স্বরে বললেন, "কলেজে পড়বার সময় সখের থিয়েটারে আপনি খুব চমৎকার অভিনয় করতেন শুনেছি। এখনো দেখছি আপনার সে দক্ষতা পুরো দস্তুর রয়েছে! ধন্যবাদ! যাক, এখন গোটাকতক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব। সরলভাবে সত্য উত্তর দেবেন কি?"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে ক্রুদ্ধস্বরে শ্রীকান্তবাবু বললেন—"তার মানে? আমি কি কোনও মিথ্যা কথা বলেছি? বলেছি এ পর্য্যন্ত?"

"বলেছেন কি না আপনিই জানেন! তদন্তের খবর জানতে চেয়েছিলেন, এবার শুনুন। আমরা তদন্তে প্রমাণ পেলুম, ৩৭৫৬৯নং ট্যাক্সির ক্লিনার ঘটনার পূর্ব্বদিন দেশে গেছে। তার দেশে যাওয়ার খবরও সে কথাচ্ছলে দু'দিন পূর্ব্বে আপনাকে জানিয়েছিল। ড্রাইভারও সেদিন দুপুর থেকে রাত আটটা পর্য্যন্ত রিষড়ায় ভাড়া খাটতে গেছল। সুতরাং ১লা ডিসেম্বর হাওড়া ষ্টেশনে তা'রা কেউ আপনাকে শান্তিবাবুর নামিত জাল চিঠি দেয় নি। তা'রা চিঠির কথা কিছুই জানে না।"

আশ্চর্য্যভাবে দু' চোখ কপালে তুলে শ্রীকান্তবাবু বললেন, "তা'রা চিঠির কথা জানে না বলেছে? তা' হ'লে তাদের মত চেহারার কোনও লোক আমায় সে চিঠি দিয়েছিল। আমিই হয়ত ভুল ক'রে ভেবেছিলাম তা'রাই কেউ!"

মিঃ সোম ঈষৎ হেসে বললেন, "কিন্তু ১লা ডিসেম্বর দিল্লী এক্সপ্রেসে ক্ষিতীশবাবুর কামরায় হাওড়া থেকে কেউ ওঠে নি, বলেছিলেন কেন?"

অধিকতর আশ্চর্য্য হয়ে শ্রীকান্তবাবু বললেন, "কেউ উঠে-ছিল না কি? কই আমি তো দেখিনি!"

মিঃ সোম বললেন, "আমরা তদন্তে প্রমাণ পেলাম, আপনি ইচ্ছাপূর্ব্বক সত্য গোপন করেছেন। আপনি সুনিশ্চিতভাবে জানতেন ক্ষিতীশবাবু একা আসেন নি। হাওড়া ষ্টেশন থেকে আর একব্যক্তি তাঁর সহযাত্রীরূপে এসেছিল। একজন মাননীয় ভদ্রলোক সে ব্যাপার লক্ষ্য ক'রেছিলেন এবং তিনি আরও লক্ষ্য ক'রেছিলেন যে ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে যখন ট্রেণ দাঁড়িয়েছিল, তখন ক্ষিতীশবাবুর সহযাত্রী স্বহস্তে ফ্লাস্ক থেকে কাঁচের গ্লাসে হর্লিকস্ ঢেলে ক্ষিতীশবাবুকে খাওয়ায়। তারপর ক্ষিতীশবাবুকে আর কেউ জীবিত দেখেনি। বর্দ্ধমান ষ্টেশনে যখন সে ট্রেণ পৌঁছায়, তখন দেখা যায় ক্ষিতীশবাবু অদৃশ্য হয়েছেন! ক্ষিতীশবাবুর ব্যবহৃত পট্টুর আলেষ্টার গায়ে দিয়ে সেই লোক পাঁচ ছ'টা স্যুটকেশ, রাজ এষ্টেটের দলিলের সেই ট্রাঙ্ক এবং দুটো বেডিং নিয়ে বর্দ্ধমান ষ্টেশনে নামে। সমস্ত মাল ষ্টেশনে জমা রেখে, শুধু ট্রাঙ্কটি নিয়ে সে বেরিয়ে যায়। ট্রাঙ্কটা অস্বাভাবিক ভারি ছিল, সেজন্য অতিরিক্ত পুরস্কার দিয়ে দু'জন বলিষ্ঠ কুলির দ্বারা

তা বহন করানো হয়। তারপর রাধাশ্যাম দাস নামক এক ড্রাইভারের ট্যাক্সি ভাড়া করে, ট্যাক্সির পিছনের সিটে ট্রাঙ্কটি বসিয়ে নিয়ে, লোকটি রাণীর সায়েরের পাড় নামক স্থানে যায়। সেখানকার বস্তি থেকে আর একটি লোককে ডেকে চুপি চুপি কি বলে এবং তাকে ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে লম্বা দৌড়ের জন্য প্রস্তুত হয়। রাণীর সায়ের থেকে ঘুর-পথে চক্র দিয়ে, শহরের ভিতর থেকে ট্যাক্সি এসে পেট্রোল ষ্টেশনে দাঁড়ায়, এবং পাঁচ গ্যালন তেল নেয়। এইখানে সেই ধূর্ত্ত লোকটি একটি মারাত্মক ভুল করেছিল। রাণীর সায়েরের সে লোকটিকে নিয়ে পেট্রোল ষ্টেশনে যাওয়া তার উচিত হয়নি। কারণ সেখানকার কর্ম্মচারীদের কাছে সে ব্যক্তি পরিচিত ছিল।"

পুলিশ অফিসার মন্তব্য করলেন—"অপরাধী মাত্রেই মানসিক উৎকণ্ঠার উত্তেজনায় বিচারশক্তি হারিয়ে এমন দু' একটা ভুল করে থাকে, তার বহু প্রমাণ আমরা পেয়েছি।"

মিঃ সোম বললেন, 'তারপর সে ট্যাক্সি গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধ'রে সটান লক্ষ্মীপুরে আসে। আরোহীর আপত্তি অগ্রাহ্য করে অতিরিক্ত শীতের জন্য—পথে দু' একটা চায়ের দোকানে চা খেতে ড্রাইভার নেমেছিল। বর্দ্ধমানের পেট্রোল ষ্টেশনে এবং এইসব দোকানে তা'রা পরিচয় দিয়েছিল, একজন ডাক্তার ডেলিভারী কেস দেখতে যাচ্ছেন। তাঁর মূল্যবান কাঁচের যন্ত্রপাতির ট্রাঙ্কটা পাছে কেরিয়ার থেকে দৈবাৎ প'ড়ে যায়, সেজন্য গাড়ীর ভিতর পিছনের সিটে বসিয়ে নেওয়া হয়েছে। হাঁ দড়ি দিয়ে বাঁধাও হয়েছিল। সেটা লোক-চক্ষুর অন্তরালবর্ত্তী ক'রে আনার চেষ্টা সত্ত্বেও পেট্রোল ষ্টেশন এবং চায়ের দোকানের দু' একজন দেখেছিল। লক্ষ্মীপুরে রাত দেড়টা দুটো নাগাদ পৌঁছে, ক্ষিতীশ বাবুর পুকুরের কাছে রাস্তায় মোটর দাঁড় করিয়ে; সেই দু জন ট্রাঙ্কটা ধরাধরি করে, পুকুর-পাড়ে নিয়ে যায়। ট্রাঙ্ক খুলে তার ভিতর থেকে হাত পা মুড়ে প্যাক করা ক্ষিতীশবাবুর মৃতদেহ বের করে। জুতো, মোজা, কোট, প্যাণ্ট সমেত ক্ষিতীশবাবুর মৃতদেহ ট্রাঙ্কে পোরা হয়েছিল। ভারি মোটা আলেষ্টারটা তার মধ্যে ধরে নি বলেই হোক বা লোক-চক্ষে ধাঁধাঁ লাগাবার জন্যেই হোক—লোকটি নিজেই সেটা পরেছিল। পুকুর-পাড়ে মৃতদেহে টানা হ্যাঁচড়া ক'রে আলেষ্টারটা পরায়। কিন্তু সেই সময় সেখানকার শিয়ালকাঁটার গাছে যে অলেষ্টারের ফেঁসো ছিঁড়ে আটকে গেল, তা' তা'রা জানতে পারে নি! স্থানীয় পুলিশও সাদা চোখে তা' দেখতে পান নি। গোয়েন্দা তরুণ সিং প্রথমে সেটা আবিষ্কার করেন। তারপর চীফ ম্যানেজার মশাইয়ের অনুগ্রহে খবর পান যে তাঁর এবং ক্ষিতীশবাবুর পটুর অলেষ্টার গত বৎসর এক সঙ্গে এই এক কাপড়ে তৈরী হয়েছিল। তখন সে অলেষ্টার পরীক্ষা করে তরুণ ওর অজ্ঞাতসারে তা থেকে কিঞ্চিৎ ফেঁসো সংগ্রহ করেন। দুই ফেঁসো মিলিয়ে দেখা গেল এক জাতীয় সূক্ষ্ম তন্তু! তখন ক্ষিতীশবাবুর মৃতদেহে যে সব পরিচ্ছদ ছিল সেগুলি পরীক্ষা করে দেখলেন অলেষ্টারের পিঠের দিকে কয়েক স্থানে ফেঁসো উঠে গেছে, এবং তাতে শিয়াল কাঁটার কাঁটা ভেঙে, বিঁধে, রয়েছে। বোঝা গেল অলেষ্টারটা মাটিতে বিছিয়ে তার উপর মৃতদেহ নামিয়ে, হাতগুলা টেনে জামার হাতায় ঢুকিয়ে বোতাম এঁটে দেওয়া হয়েছিল। তারপর সেই দলিলের ট্রাঙ্কের দৈর্ঘ্য প্রস্থ গভীরতা মেপে সন্দেহ রইল না যে—সেই ট্রাঙ্কে ক্ষিতিশ বাবুর মৃতদেহ প্যাক করে আনা হয়েছিল।

কাষ্ঠ হাসি হেসে শুষ্ক স্বরে শ্রীকান্তবাবু বললেন "বলেন কি? ট্রাঙ্কে মৃতদেহ প্যাক করে আনা হয়েছিল? এটা যে, রোমান্টিক উপন্যাসের মত শোনাচ্ছে! তরুণবাবুর কল্পনাশক্তির দৌড় তো খুব প্রবল!"

প্রশান্ত মুখে মিঃ সোম বললেন, "আপনি গায়ের জোরে কল্পনা বলে উড়িয়ে দিলেও জেনে রাখুন শব ব্যবচ্ছেদের রিপোর্ট সহ, সমস্ত প্রমাণ ভারত গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বোচ্চ গবেষণাগারে প্যাক করে পাঠানো হয়েছিল। সেখান থেকে বিশেষ ভাবে পরীক্ষিত হয়ে বিশেষজ্ঞদের অভ্রান্ত রিপোর্টে এসেছে যে,—১লা ডিসেম্বর রাত্রি সাড়ে ন'টার মধ্যে ক্ষিতীশবাবুকে হর্লিক্সের সঙ্গে পটাসিয়াম সায়োনাইড খাইয়ে হত্যা করা হয়েছে। তারপর অন্যূন ৪ ঘণ্টা তাঁর মৃতদেহ কোনও বাক্সে বা বেডিং-এর মধ্যে হাত পা মুড়ে প্যাক করে রাখা হয়েছিল। তারপর জলে ফেলা হয়েছিল। বিনা-রোগে, অকস্মাৎ মৃত্যু হলে সে মৃতদেহ সহজে পচে না, বিশেষতঃ এই ডিসেম্বরের শীতে। কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ঐ চার ঘণ্টা বাক্সে বন্দী থাকায়, মৃতদেহ—এই শীতে জলের নীচে যতটা বিকৃত হওয়া উচিত, তার চেয়ে বেশী বিকৃত হয়েছিল। সেই জন্যেই বিশেষজ্ঞগণ ট্রাঙ্কে প্যাক করার ব্যাপারটা ধরতে পেরেছেন!"

পুলিশ অফিসার মন্তব্য করলেন, "পটাসিয়াম সায়েনাইড্ খাইয়ে হত্যা করে, এরোপ্লেনে মৃতদেহ বহন করে এনে, শূন্য থেকে পুকুরে ফেলে দিলে, শিয়াল কাঁটার ফ্যাচাং থাকত না। পন্থাটাও নূতন হোত! কিন্তু ট্রাঙ্কে পুরে লাস চালান দেওয়া তো আমাদের দেশের একটা পুরাণো পন্থা! বড় স্যুটকেসেও আপত্তি নাই! পৃথিবীর বহু স্থানে এ রকম ঘটনা বহুবার ঘটেছে!"

শ্রীকান্ত বাবুর কপালে ঘর্ম্মবিন্দু ফুটে উঠল। রুমালে ঘাম মুছতে মুছতে শুষ্ক হাস্যে বললেন "তাই নাকি? আমি তো জানতাম না।"

উত্তেজনা-বিকৃত কণ্ঠে প্রধান ম্যানেজার বললেন, "এ্যাঁ! সত্যিই তা হলে ক্ষিতীশকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছিল! কে এমন কাজ করলে? দলিল গুলো তা হলে সেই সরিয়েছে?"

মিঃ সোম বলেন, "হাঁ। একে একে বলছি, শুনুন। মৃতদেহ জলে ডুবিয়ে দিয়ে হত্যাকারী ও তাঁর সঙ্গী সেই ট্যাক্সিতে বর্দ্ধমানে ফিরে যান। ড্রাইভারকে পেট্রোলের দাম ছাড়া নগদ ত্রিশ টাকা ও এক বোতল মদ পুরস্কার দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, প্রকৃত ব্যাপার গোপন করা সত্ত্বেও এদের ভাবভঙ্গি দেখে ড্রাইভার বেচারা কিছু সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিল। তাই তার মুখ বন্ধ করবার জন্য, সে ব্যক্তি স্বহস্তে পটাসিয়াম সায়েনাইড দিয়ে এক পাত্র মদ পরমসৌহার্দ্দ্যভরে তাকে খাইয়ে দেয়। হতভাগ্য ড্রাইভার তৎক্ষণাৎ মারা যায়। তারপর গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ধারে মৃতদেহ

সমেত মোটর ফেলে রেখে তাঁরা নামেন। ৬০০৲ টাকার নোট পুরস্কার নিয়ে রাণীর সায়েরের লোকটি স্বস্থানে যায়। হত্যাকারী ষ্টেশনে গিয়ে ডাউন ট্রেণে রাতারাতি বর্দ্ধমান ত্যাগ করেন। মগরা জংসনে নেমে, বি, পি, রেলে পরদিন সকালে তিনি বাঁকা-বংশী নামক এক গ্রামে যান। দীর্ঘকাল যক্ষ্মা রোগে ভুগে তাঁর এক আত্মীয়ের সেই ভোরে মৃত্যু হয়েছিল। ইনি যখন সেখানে গিয়ে পৌছেন. তখন স্থানীয় শ্মশানে সেই আত্মীয়ের শব দাহ করা হচ্ছিল। ইনি তৎক্ষণাৎ সেই চিতায় ক্ষিতীশবাবুর স্যুটকেশ আর বেডিংটি পুড়িয়ে দেন। চমৎকার নিপুণতাসহ শোকাভিনয় করে বিস্মিত বিমূঢ় শববাহকদের বুঝিয়ে দেন—মৃতের ব্যবহারের জন্য তিনি বিছানা আর জামা কাপড় এনেছিলেন। তার যখন ভোগে লাগল না, তখন এ গুলো তার শবদেহের সঙ্গে দগ্ধ হোক। নচেৎ তাঁর মর্ম্ম-যন্ত্রণার সীমা থাকবে না—ইত্যাদি—! না না, শ্রীকান্তবাবু পকেটে হাত দেবেন না! হাত নামান নইলে—"

অকস্মাৎ রিভলভার উদ্যত করে মিঃ সোম তীব্র স্বরে বলেন, "নইলে গুলি করে হাত ভেঙে দেব! নামান হাত।"

গৃহস্থিত সকলে চমকে উঠলেন! দেখলেন, শ্রীকান্তবাবু হাসি হাসি মুখে বাঁ হাতে ওয়েষ্ট কোটের বোতাম খুলে, তার ভিতর দিকের গুপ্ত পকেট থেকে ডান হাতে সন্তর্পণে কি একটা জিনিষ বের করতে উদ্যত হয়েছিলেন। মিঃ সোমের আকস্মিক গর্জনে থতমত খেয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ হাত নামালেন!

[আগামী বারে সমাপ্য

দোল

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বাতাসেতে দোল, জলে হিল্লোল,
হ'ল চঞ্চল বন,
অন্তরীক্ষে শোণিতে বক্ষে
চলেছে আন্দোলন।
এই ধরণীর কিছু নাই থির,
সকলি মদির, সকলি অধীর,
সবই উত্তরোল ঝুলনের দোল
রাঙাইয়া দিল মন।

নীহারিকা বুকে চলে আলোড়ন
পরমাণু আর দোল,
স্বরগে মরতে গতায়তি করে
সোহাগের হিন্দোল,
জড়তায় কোনো আনন্দ নেই,
উঠে অমৃত আন্দোল নেই,
এক সাথে বাজে বংশী ডমরু
বীণা ও শঙ্খ রোল।

দোল নিঃশ্বাস মহাসাগরের।
জীবাণুর স্পন্দন,
দোল আনন্দ, বিশ্বনৃত্য
এ জীবন যৌবন।
নিত্য দোহন মোদের বসুধা,
তাই এত আশা, তাই এত ক্ষুধা,
তাই চলিতেছে ভাব-পারাবারে
অনিবার মন্থন।

দোল দিয়ে যায় দিগ্বিজয়ীরা
দোল দিয়ে যায় বীর,
দোল দিয়ে যায় মহাপুরুষেরা
ভাগ্যে এ ধরণীর।
কবি ও শিল্পী ভাবেতে বিভোল,
সবাকার বুকে দিয়ে যায় দোল,
রেখে দিয়ে যায় ত্রিদিব আবেশ
পারিজাত সুরভির।

এই দোল এই রঙ্গের লীলা
নিত্য মুগ্ধকরী
পিপাসু হৃদয়ে বারবার চায়
দেখিতে নয়ন ভরি।
হয়েছে এ দোলে সৃষ্টির ধারা
ছন্দে গন্ধে রূপে রসে হারা
দিতেছে নিতুই নব অনুরাগে
নূতন ভুবন গড়ি!

আমরা মানুষ আকাশস্পর্শী
বুকে আকাঙ্ক্ষা তাই,
বিশ্বকে যিনি দোলান তাঁহারে
মোরা দোলাইতে চাই;
হেরেছি কোথায় তাঁর ইঙ্গিত,
শুনিতে পেয়েছি দূর সঙ্গীত,
কোন দেশে আর কোন সে জনমে
তার কিছু ঠিক নাই।

জাতীয় মহাসমিতির ইতিহাস

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

কংগ্রেসের পঞ্চবিংশতি অধিবেশন হয় এলাহাবাদে ১৯১০ সনের ২৬শে ডিসেম্বর হইতে ২৯শে পর্য্যন্ত। সভাপতি হন স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণ। রিফর্ম্ম সম্বন্ধে হিন্দু মুসলমানের বৈষম্যের একটা মীমাংসা করিতে ইংলণ্ড হইতে তিনি ভারতে আসিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহার চেষ্টায় কোন ফল হয় নাই।

সম্রাট্ সপ্তম এড্‌ওয়ার্ডের মৃত্যুতে গভীর দুঃখ প্রকাশ এবং পঞ্চম জর্জ্জের সিংহাসনারোহণে সম্রাটের প্রতি ঐকান্তিক আনুগত্য জ্ঞাপন করা হয়। ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জকেও সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়।*

লর্ড হার্ডিঞ্জ

এই সময় সাধারণ সভাসমিতি প্রায় বন্ধই থাকে। তাই সিডিসাস্ মিটিংস্ য়্যাক্টের কার্য্যকাল ফুরাইলে আর যেন উহার পুনর্প্রবর্ত্তন না হয়, সে সম্বন্ধে মিঃ যোগেশ চৌধুরী প্রস্তাব করেন। ১৯১০ সনের এই প্রেস আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, বৈপ্লবিক আন্দোলনের দমন-কল্পে।† প্রারম্ভে ইহার ধারাগুলি এত কঠোর ছিল যে লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্নও (তখন স্যার) পদত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। পরে কিছু অদল বদল হয়।

ইতিমধ্যে ১৯০৮ সনের শেষ দিকে স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, রাজা সুবোধ মল্লিক, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, পুলিন বিহারী দাস ও ভূপেশচন্দ্র নাগকে ১৯০৮ সনের সংশোধিত আইন অনুসারে যে আটক করা হয়, ১৯১০ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে পুনরায় তাঁহাদিগকে মুক্তিপ্রদান করা হয়। এই আইন অনুসারেই ১৯০৮ সনের শেষ দিকে কলিকাতা ও ঢাকায় অনুশীলন সমিতি, ময়মনসিংহের সুহৃদ্ সমিতি ও সাধনা সমিতি প্রভৃতিকে বিপ্লবী সন্দেহে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

কংগ্রেসের ষড়্‌বিংশতি অধিবেশন হয় কলিকাতায় ১৯১১ খৃষ্টাব্দে। লক্ষ্ণৌর উকীল পণ্ডিত বিষণ নারায়ণ দর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এইবার ইংলণ্ডের শ্রমিক সভ্য রামজে ম্যাকডোনাল্ডকে [পরবর্ত্তী প্রধান মন্ত্রী (Prime Minister)] সভাপতি করিবার কথা হয়। কিন্তু স্ত্রীবিয়োগে কাতর থাকায় তিনি আসিতে সক্ষম হন নাই।

এই সময় সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরী দিল্লী হইয়া কলিকাতায় শুভাগমন করেন। ভারতের প্রদেশগুলির শাসন সংক্রান্ত ব্যবস্থা সম্বন্ধে তিনি কতকগুলি ঘোষণা করেন যথা,—

(১) ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইল;

(২) বঙ্গভঙ্গ রহিত হইয়া যুক্ত বাঙ্গালা গঠিত হয়। এবং একজন গভর্ণরের দ্বারা শাসিত হইবে স্থির হয়;

(৩) আসাম প্রদেশের চীফ কমিসনারের স্থানে একজন লেফটেনাণ্ট গভর্ণর নিযুক্ত হন;

(৪) বিহার ও উড়িষ্যা স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হয়।

এই সম্বন্ধে কংগ্রেসের অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি পাশ হয়—

"That this Congress respectfully begs leave to tender to His Imperial Majesty the King Emperor an honourable Expression of its profound gratitude for his gracious announcement modifying the Partition of Bengal. The Congress also places on record its sense of gratitude to the

---

*Begs to convey to H. E. an earliest assurance of its desire to co-operate loyally with the Government in promoting the welfare of the people of the country.

† রৌলট বা সিডিসাস কমিটির রিপোর্ট হইতে পাওয়া যায় যে ১৯০৬ সন হইতে ১৯১৬ সন পর্য্যন্ত এক বাঙ্গলা দেশেই ২১০টি বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা হয়। প্রায় দেড় হাজার লোক এই প্রচেষ্টায় সংশ্লিষ্ট বলিয়া অনুমিত হয়। মামলা হয় ৩৯টি এবং ৮৪ জন অপরাধী প্রমাণিত হয়। দশটি যুদ্ধ-ষড়যন্ত্রের (ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২১ক ধারা) মোকদ্দমা হয়, তাহাতে অভিযুক্ত হয় ১৯২ জন, দণ্ড পায় ৬৩ জন। অস্ত্র ও বিস্ফোরক আইন অনুসারেও (Arms Act and Explosive substances Act ৫৩টি মোকদ্দমা হয়।

Government of India for recommending the modification and to the Secretary of State for sanctioning it. In the opinion of this Session of the Congress, this administrative measure will have a far-reaching effect in helping forward the policy of conciliation with which the honoured names of Lord Hardinge and Lord Crewe will ever be associated in the public mind.

That this Congress desires to place on record its sense of profound gratitude to His Majesty the King Emperor for the creation of a separate province of Behar and Orissa under a Lieutenant Governor in Council and prays that in re-adjusting the provincial boundaries, the Government will be pleased to place all the Bengali speaking districts under one and the same administration."

যুক্তপ্রদেশও পাঞ্জাবে কার্য্যকরী পরিষদ এবং মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে যেন ব্যবস্থাপক সভা হয়—এই সম্বন্ধে প্রস্তাব হয়। ভূপেন্দ্র নাথ ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। তিনি বলেন, "সম্রাট্ এখন ভারতে রহিয়াছেন, তাঁহাকে আমরা সাদরাভ্যর্থনা করি কেবল সম্রাট্ বলিয়া নহে, ত্রাণকর্ত্তারূপেও—"Not only as our King and Emperor but our deliverer !" ভারতসচিব লর্ড ক্রুকেও অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয় ও লর্ড হার্ডিঞ্জকে প্রশংসাবাদ করা হয়—That statesman lonely and serene who saw the wrong and did the right.

সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে গত বৎসরের প্রস্তাবটি [illegible] হয় এবং প্রস্তাব হয়—That the Congress strongly deprecates the extension of the princip[illegible] of separate Communal electorates to Municip[illegible] District Boards or other Local Bodies.

বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ায় বাঙ্গালার ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের আন্দোলন শেষ পর্য্যন্ত জয়যুক্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই, তবে ভারতের রাজধানী পরিবর্ত্তিত হইয়া দিল্লীতে স্থানান্তরিত হওয়ায় যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার পূরণ হয় নাই। তথাপি আমরা সভাপতি পণ্ডিত বিষন নারায়ণের কথার প্রতিধ্বনি করিতেছি—"ঘোরতর অন্যায়ের প্রতিকার কল্পে বাঙ্গালাদেশ যে বিরাট সংগ্রামে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল, তাহা জয়যুক্ত হইয়া বাঙ্গালীকে আরও গৌরবান্বিত করিয়াছে।"

দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজির নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে কংগ্রেসের সমর্থন ছিল এবং তাহাতে ফলও হইয়াছিল।

১৯১২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরের শেষ দিকে একটী দুর্ঘটনা ঘটে। অজ্ঞাত ব্যক্তির* নিক্ষিপ্ত বোমায় ভাইসরয় আহত হন। ইহাতে দেশবাসী বিশেষ দুঃখিত হয়।

সপ্তবিংশতি অধিবেশন হয় বাঁকীপুরে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে। সভাপতি হন আর এন মুধলকার ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মৌলনা মজরুল হক। বেহারে হিন্দু-মুসলমানে কোন ঝগড়া যে ছিলনা, তিনি তাহা উল্লেখ করেন এবং দিল্লীতে ভাইসরয়ের উপর যে আক্রমণ হইয়াছে সে সম্বন্ধেও তিনি গভীর বিক্ষোভ প্রকাশ করেন। জেনারেল সেক্রেটারী ও কংগ্রেসের স্থষ্টি ও গঠনকর্ত্তা এ.ও. হিউমের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়।

এইবার প্রতিনিধি-সংখ্যা কমিয়া ২০০তে নামে।
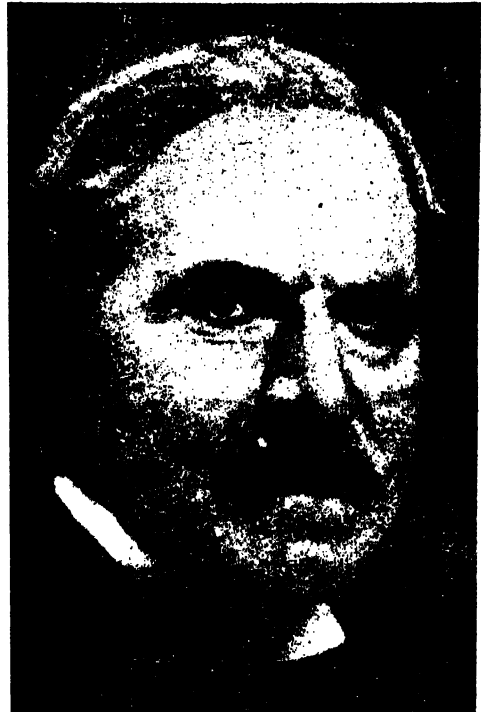
ম্যাক্ডোনাল্ড্

অষ্টবিংশতি অধিবেশন হয় করাচীতে (সিন্ধুদেশে) ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে। কংগ্রেসের অন্যতম কর্ণধার, জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ জে ঘোষালের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করা হয়।

এই সময়ে কংগ্রেস মুসলমানদের সহানুভূতি লাভে সমর্থ হয়। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের অধিবেশনে নবাব সৈয়দ মহম্মদ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তুরস্ক সম্বন্ধে ব্রিটিশের রাজনীতি মুসলমানদিগকে যে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই, পাটনা অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মৌলানা মজরুলহক তাহা প্রকাশ করিতে দ্বিধা করেন নাই। এবারকার সভাপতিও অটোমান শক্তি ইউরোপ হইতে বিতাড়িত হওয়ায় গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করেন। পারস্যের ব্যাপারেও মুসলমানরা তৃপ্ত হইতে পারে নাই।

অধিবেশনে হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে যাহাতে স্বায়ত্তশাসন লাভে সমর্থ হয়, এই রকমের প্রস্তাব পাশ হয়। মুসলীম লীগও

---

* রাসবিহারী বসু নাকি ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন।

এবারকার অধিবেশনে স্বায়ত্তশাসনই উদ্দেশ্য বলিয়া মন্তব্য পাশ করেন।

এইবার ডিনশা ওয়াচা সেক্রেটারীর পদে ইস্তফা দেন। তিনি ১৮ বৎসর সেক্রেটারীর কাজ করিয়াছিলেন।

ইহার পরেই ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইউরোপের মহাসমর আরম্ভ হয় এবং ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ইহার অবসান ঘটে।

উনত্রিংশতি অধিবেশন হয় ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে আবার মাদ্রাজে; সভাপতি হন ভূপেন্দ্র নাথ বসু আর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্যার এস্ সুব্রহ্মণ্য আয়ার। মিসেস্ বেসান্টও অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। বেসান্ট এই বৎসরে কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং উভয় দল সম্মিলিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। মহামতি তিলকও
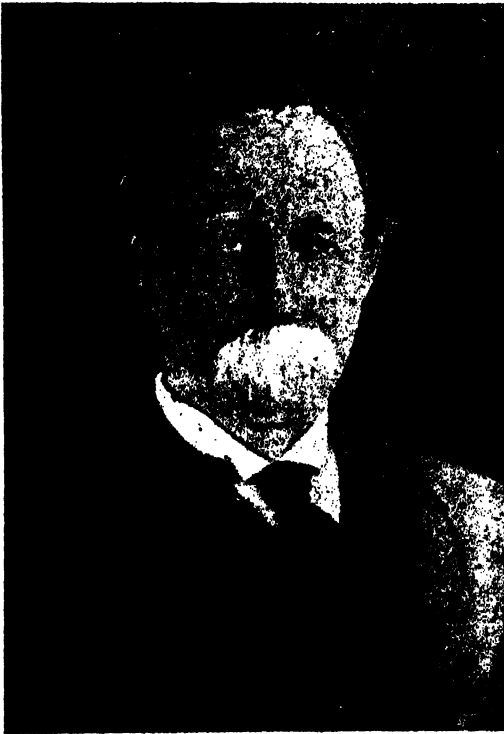
হিউম

জুন (১৯১৪) মুক্তিলাভ করিয়া সম্মানজনক সর্ত্তে মিটমাটের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন, কিন্তু সফল হইতে পারেন না, স্যার ফিরোজশা মেটা এবং মিঃ গোখেলের আপত্তির জন্য। তিলক আসিলেই আবার কংগ্রেসের একচ্ছত্রতা গ্রহণ করিবেন, এ ভয় তাঁহাদের ছিল। সুতরাং উভয় দল সম্মেলনের জন্য আনি বেসান্ট যে সংশোধন প্রস্তাব আনিয়াছিলেন, তাহা গৃহীত হইলনা।

সভাপতি মহাশয় এবং গান্ধীজী প্রমুখ অনেকেই ইংলণ্ডের এই দুর্যোগের সময় সংস্কার সম্বন্ধে দেশীয় লোকের তরফ হইতে যাহাতে পীড়াপীড়ি করা না হয়, সেরূপ মন্তব্য করেন। সভাপতি মহাশয় সম্মানজনক সর্ত্তে ঔপনিবেশিক স্বত্বলাভ যেন হয়, ভারতীয়দিগকে যুদ্ধে যেন সৈন্য শ্রেণীভুক্ত করা হয় এবং দেশরক্ষা কল্পে স্বেচ্ছাসেবক (ভলাণ্টিয়ার) করা হয়, এই ভাবের বক্তৃতাই দিয়াছিলেন। ভূপেন্দ্রনাথ 'রাজভক্তির এমন গভীর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন যে লোকে আশ্চর্য্য হয় যে, ইনি কি বরিশাল কনফারেন্সের (১৯০৬) সময়কার সেই ভূপেন্দ্রনাথ! মাদ্রাজের গভর্ণর বাহাদুরও কংগ্রেস মণ্ডপ পরিদর্শন করিয়া তৃপ্ত হন। সর্ব্বোপরি মুসলিম লীগের সহিত একটা বুঝাপড়ার ভাব বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠে।

ত্রিংশ অধিবেশন হয় ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে। লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ সভাপতি বরিত হন আর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি থাকেন ডিনসা ওয়াচা। লর্ড সিংহ পূর্ব্বে বড়লাটের সদস্যরূপে তিন বৎসর কার্য্য করেন, উহা ছাড়িয়া আবার ব্যারিষ্টারি করিতে প্রবৃত্ত হন। পরেও আবার বেহার প্রদেশের গভর্ণর হইয়া পাটনা যান। রাজনৈতিক ব্যাপারের সহিত তাঁহার সংস্রবও ছিলনা। তবে একজন গভর্ণমেণ্টের বিশ্বস্ত লোক যদি স্বায়ত্ত-শাসন সম্বন্ধে কিছু মতামত প্রকাশ করেন, গভর্ণমেণ্ট তাহা শুনিতে পারে, এই জন্যই নাকি তাঁহাকে সভাপতি প্রস্তাব করা হয়। চীফ জাষ্টিস্ স্যার লরেন্স জেঙ্কিন্সও নাকি সত্যেন্দ্র প্রসন্নকে সভাপতি হইতে অনুরোধ করেন, তবে নর্টন সাহেব মনে করেন—'ইহাতে কংগ্রেসের আদর্শ খুবই ক্ষুণ্ণ হইবে'। আইনজ্ঞের বিশ্লেষণে লর্ড সিংহ স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে Lincoln-এর সংজ্ঞা উদ্ধৃত করিয়া বলেন, "Self Government -এর অর্থ Government of the people, for the people, by the people." তবে বক্তৃতায় রাজভক্তির বড় বেশী বাড়াবাড়ি হইয়াছিল।

যেমন তিনি বলেন—

"ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট আমাদিগকে যে-সব সুখস্বাচ্ছন্দ্যে অনুগৃহীত করিয়াছেন তার তুলনা নাই, তবে তাহা তো স্বায়ত্তশাসনের কাছে কিছুই নয়। তবে সেই শাসন আমরা তিন রকমে পেতে পারি—(১) গভর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাকৃত দানে (২) জোর পূর্ব্বক আদায় করিয়া, wresting it from them, or (৩) আস্তে আস্তে মানসিক, নৈতিক ও অর্থসম্বন্ধীয় বিষয়ে উন্নতি করিয়া, By such progressive improvement in their mental moral and material condition as would render the Indians worthy of it and make it impossible for their rulers to withold it. প্রথমটি দিলেও নোব না, দ্বিতীয়টি অগ্রাহ্য, তৃতীয় উপায়ে হ'তে পারে যদি বৃটেনের অভিভাবকত্বে থাকি। শীঘ্র হয় তো তা হবে না, তবে কল্পনাতীত কাল পর্য্যন্তও অপেক্ষা ক'রতে হবে না।"

মানসিক উপায়ে সংস্কার-অর্জ্জন আমাদের শতবর্ষেও সম্ভব হয় কি না সন্দেহ। সুতরাং তাহার অভিভাষণ অতিশয় নৈরাশ্যব্যঞ্জক হয়। যাহা হউক এইরূপ বক্তৃতার এই শেষ।

এই অধিবেশনে মিসেস্ আনি বেসান্ট উপস্থিত ছিলেন। স্বায়ত্ত-শাসন প্রস্তাব সমর্থন করিয়া তিনি যে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা

দেন, তখন সেই মন্থরগতি সম্মিলনেও যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ সঞ্চার হইল। তিনি বলেন—

"স্বায়ত্তশাসনই একমাত্র আলোচনা করিবার বিষয়। ইহা পাইলে অস্ত্র আইন অন্তর্হিত হইবে। রাজদ্রোহ অপরাধে সভা সমিতি বন্ধ হইবে না। বিনা বিচারে কাহাকেও আটক করিবার ভয় থাকিবে না। ভারত রুগ্ন ব্যক্তির মত অকর্ম্মণ্য নয়, তার শক্তি অসীম, বীরোচিত। এতদিন সে নিদ্রাভিভূত ছিল, কিন্তু এখন সে জাগ্রত। তোমরা সেই সব বীরের সন্তান, যদি আত্মবিশ্বাস থাকে, তবে তোমরা যা চাহিবে তাই পাবে।"

This is the largest and most momentous step, the Congress had ever taken. If they had self-Government it would sweep away the Arms Act the Press and Seditious Meetings Act and get rid of the right to intern without trial. India was not a sick man but was a giant who had hitherto been asleep but was now awake. They, the children of the warriors were worthy to govern the country and if they believed more in their power they would get what they wanted.

এখন পণ্ডিত জওহরলালের বক্তৃতায় যেরূপ প্রাণসঞ্চার হয়, তখন বেসান্টের বক্তৃতায়ও সেরূপ হইত। বোম্বাইতে এই সময় মুসলীম লীগের অধিবেশনও হয়। উহার সভাপতি হন মৌলানা মজরুল হক সাহেব। আন্তর্জাতিক কারণের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আরও একটা আকস্মিক কারণে মুসলমানগণ কংগ্রেসের সহিত সম্মিলিত হইতে প্রবৃত্ত হন। বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট মুসলিম লীগের কার্য্যাবলীর উপর হস্তক্ষেপ করায় উহার সভাগণ উত্তেজিত হন, আর ইহাতেই কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মিলনের পথ সুগম হইয়া উঠে।

ত্রিংশ অধিবেশনেরই সম্মেলনীতে মডারেট দল আর তেমনি শক্তিশালী দেখা গেল না। ইতিমধ্যে গোখেল ১৯১৫-এর ১৯শে ফেব্রুয়ারী এবং মেটা ইহারই কয়েক মাস পরে নবেম্বর মাসে মানবলীলা সম্বরণ করেন। ওয়াচারও পূর্ব্বশক্তি ছিল না, বিশেষতঃ তিনি তো রাজনৈতিক সংস্রব এক রকম পরিত্যাগই করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিলক একটী হোমরুল লীগপার্টি গঠন করিয়া অগ্রগামিগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া ফেলিতে লাগিলেন। পুণা প্রাদেশিক সম্মেলনীতে (৪ঠা মে, ১৯১৫) তিনি অনেকটা সাফল্যমণ্ডিতও হইয়াছিলেন। ইহারই কয়েকমাস পরে বোম্বাই নগরীতে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। আর তাহাতে প্রায় আড়াই হাজার প্রতিনিধি উপস্থিত থাকেন। পূর্ব্বোক্ত প্রাদেশিক সম্মেলনীর সভায় মিটমাটের কোন সূত্র না থাকিলেও দুইটী মন্তব্য বেশ আশাপ্রদ ও সুবিধাজনক হয়:—

(১) এই কংগ্রেসের অধিবেশনে XIX Resolution এ নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি (অল্ ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটী)-কে মুসলিম লীগের কর্ম্মকর্ত্তৃগণের (Executive)-এর সহিত স্বায়ত্তশাসনের একটী গঠন প্রণালী (Scheme) নির্দ্ধারণ করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়।

(২) এই অধিবেশনে কংগ্রেস গঠনপ্রণালীর (Constitution) নিয়মাবলী একটু সংশোধিত হয়। যেমন—

"১৯১৫ সনের ৩১শে ডিসেম্বরের অন্ততঃ দুই বৎসর পূর্ব্বে যে সমস্ত সমিতি গঠিত হইয়াছে আর সে সমস্ত সমিতির উদ্দেশ্য যদি

বিষণ নারায়ণ দর্
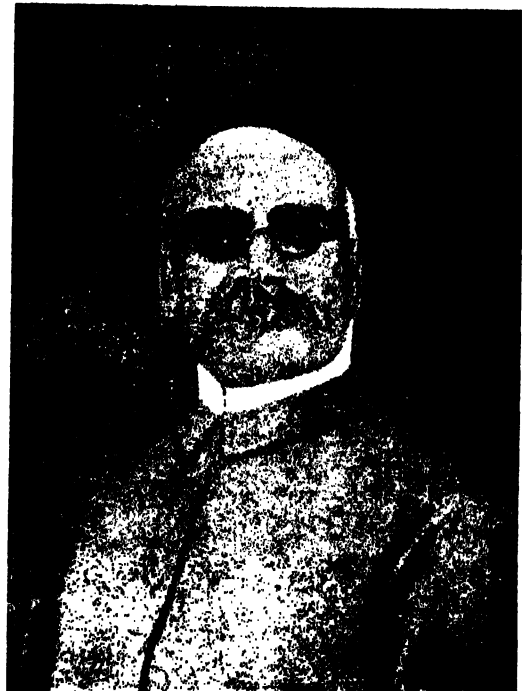
কংগ্রেসের উদ্দেশ্যানুরূপ হয় (attainment of Self Government within the British Empire by constitutional means), তবে এই সব সমিতি কর্ত্তৃক আহূত সাধারণ সভা কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিতে পারিবে।"

এই পরিবর্ত্তনেই জাতীয় বা অগ্রগামী দলের কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদানের পথ সুগম হয়। এই নিয়মটি প্রবর্ত্তিত হওয়ায় তিলক যে খুবই আনন্দিত হইলেন, তাহা বলাই বাহুল্য।

গান্ধীজীও অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন।

সংস্কার সম্বন্ধে এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি পাশ হয়—

That this Congress is of opinion that the time has arrived to introduce further substantial measures of reform towards the attainment of Self-Government as defined in Article I of its constitution, namely, reforming and liberalisin the system of Government in this country so a

to secure to the people an effective control over it amongst others by—

(a) The introduction of Provincial autonomy including financial independence.
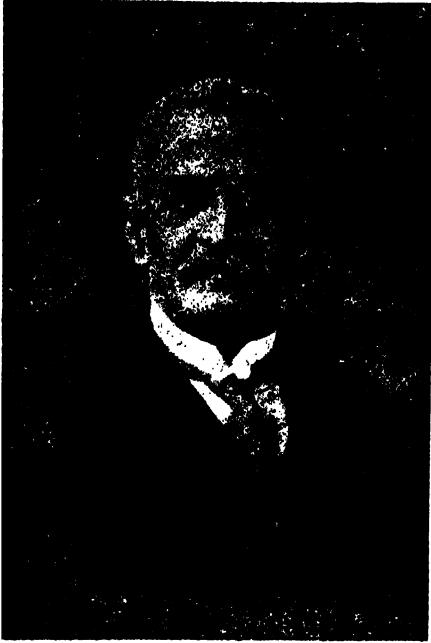
সার এস, পি, সিংহ

(b) Expansion and reform in the Legislative Councils so as to make them truly and adequately representative of all sections of the people and to give them an effective control over the acts of the Executive Government.

(c) The re-construction of the various existing Executive Councils and the establishment of similar Executive Councils in provinces where they do not exist.

(d) The reform or the abolition of the Council of the Secretary of State for India.

(e) Establishment of Legislative Councils in provinces where they do not now exist.

(f) The re-adjustment of the relations between the Secretary of State for India and the Government of India.

(g) A liberal measure of Self-Government.

That this Congress authorises A. I. C. C. to frame a scheme of reform and a programme of continuous work educative and propagandistic having regard to the principles embodied in this resolution and further authorises the said Committee to confer with the Committee that may be appointed by the All India Moslem League for the same propose and to take further measures as may be necessary; the said Committee to submit its report on or before the 1st September to the General Secretaries who shall circulate to the different provincial Congress Committees as early as possible.

অতঃপর দেশবাসীও কংগ্রেসকে আর সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে রাখিতে ইচ্ছুক রহিল না। নূতন পুরাতন, নরম গরম, ধীরপন্থী অগ্রগামী সকলে সম্মিলিত হইয়া ১৯১৬ সন হইতে আবার তথাকথিত কংগ্রেসকে জাতীয় কংগ্রেসে পরিণত করে। হিন্দু মুসলমানও সম্মিলিত হয়। এই ঐতিহ্যের গৌরব লক্ষ্ণৌ সহরের। সেখানেই একত্রিংশতি অধিবেশন হয়,আর সভাপতি হন বৃদ্ধ নেতা অম্বিকাচরণ মজুমদার। এখানেই কংগ্রেস-লীগ-স্কীম নির্দ্ধারিত হয়। ইতিপূর্ব্বে কমিটী গঠিত হইয়া লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে সাধারণ নিয়মগুলি সব ঠিক হয়।

কংগ্রেসের উভয় পক্ষের মিলনের জন্য ১৯০৮ সন হইতেই বাঙ্গলা হইতে চেষ্টা হয় আর সেই মিলনের সুর বাজিয়া উঠে পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথের মাতৃভাষায় পঠিত অভিভাষণে। তিনি স্পষ্টই বলেন† —

"কংগ্রেস কন্‌ফারেন্‌সের কার্য্যপ্রণালীরও বিধি সুনির্দ্দিষ্ট হওয়ার সময় আসিয়াছে। এমন না করিয়া কেবল বিপদ বাঁচাইয়া চলিবার জন্য দেশের এক এক দল যদি এক একটা সাম্প্রদায়িক কংগ্রেসের সৃষ্টি করেন, তবে কংগ্রেসের কোন অর্থই থাকিবেনা। কংগ্রেস সমগ্র দেশের অখণ্ড সভা—বিঘ্ন ঘটিবামাত্রই সেই সমগ্রতাকেই যদি বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হই, তবে কেবলমাত্র সভার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া আমাদের এমনি কি লাভ হইবে?"

কিন্তু অগ্রগামী দল মিলিত হইতে চাহিলেও নরমদল চাহিবে কেন? বৎসরান্তে তাহাদের একটী যেমন সভা হইত, এখন হইতেও তাহা হইবে। সেই সভার মারফতে দেশে নেতৃত্ব সমভাবে চালিত হইবে। তাই ১৯১৪ সন পর্য্যন্ত সেদিক হইতে বিশেষ কোনরূপ চেষ্টা হয় নাই। বাঙ্গলার নেতৃবৃন্দকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন—মেটার অমত। মেটাই যেন একচ্ছত্র সম্রাট্! ১৯১৪ সনের অধিবেশনে ভূপেন্দ্রনাথ চেষ্টা করিবেন বলিয়াছিলেন। কিন্তু একখানি চিঠি লেখা ছাড়া খুব যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ নাই। সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সকলেই অতঃপর সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত হন, তাঁহারা নবোদ্ভূত নবশক্তি সম্বন্ধে খুব জাগরুক ছিলেন কিনা সন্দেহ, আর থাকিলেও উহার বিকাশ সম্বন্ধে খুব উৎসুক ছিলেন না। বিশেষতঃ সাহেবদিগকে সভাপতি করিবার আগ্রহও তাহাদের

† প্রবাসী ১১ সংখ্যা ১৩১৪ ফাল্গুন, পৃঃ ৬৪২

কম নয়, তাঁহাদের মতে চলিলে সাতমণ তেল পুড়িবার আর সম্ভাবনাও ছিল না। তথাপি কংগ্রেসের দ্বার কাহারও নিকট রুদ্ধ থাকা উচিত নয়। আর অগ্রগামী দলের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ত্যাগী, কর্ম্মী, বিপদের সম্মুখে অটল— কাজ হইলে তাঁহাদের দ্বারাই কাজ হওয়া সম্ভব। এদিকে তাঁহাদের নেতা মহামান্য তিলক ১৯০৮ হইতে কেশরীর প্রবন্ধের জন্য আবার ছয় বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। অরবিন্দ প্রথমে কারারুদ্ধ, পরে দেশত্যাগী। চিত্তরঞ্জন দাশ, অরবিন্দ, বারীন্দ্র প্রভৃতি বিপ্লবিগণের আদালতে পক্ষ সমর্থনে ব্যস্ত, বিপিন পাল দেশ ছাড়িয়াছেন, অশ্বিনীবাবু, মনোরঞ্জনবাবু, শ্যামসুন্দর, সুবোধ মল্লিক প্রভৃতি অন্তরীণাবদ্ধ হইয়াছিলেন। অগ্রগামীদলের তরুণগণ কর্ণধারবিহীন—কিন্তু তথাপি যে নবশক্তির সঞ্চার হইয়াছে, তাহা কিছুতেই ধ্বংসের দিকে যায় নাই। তাই একজন পরিচালকেরই অভাব হইয়াছিল। সেই সময়ে আনি বেসাণ্টই যেন পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন। শুভক্ষণে তিনি "হোমরুল লীগ" গঠন করিলেন। পন্থা পূর্ব্ববৎ হইলেও তাঁহার বক্তৃতায় আগুন ছুটিত। তিনি হোমরুলের জন্য এত বেশী উদ্দীপনা সঞ্চার করিতে লাগিলেন, তখন ইহাই হইল সংঘের প্রধান অস্ত্র fighting programme। আর বেরার ও বোম্বাই প্রদেশে প্রবেশাধিকারে সরকার কর্ত্তৃক বাধা পাওয়ায় সকলে তাঁহার পক্ষপাতী হইয়া উঠিল। তরুণ যাহা চাহিয়াছিল তাহা তাঁহার নিকট পাইল আর সাগ্রহে সকলে তাঁহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিল। সেই মিলনের আগ্রহ সেদিন তরুণগণের মধ্যে মডারেট কংগ্রেসের এত পরিলক্ষিত হইল যে পুরাতন সুরেন্দ্রবাবুই হৌন, ভূপেনবাবুই হৌন, কাহারও সেই জলতরঙ্গ রোধ করিবার সাধ্য রহিল না। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে যে মিলন সম্ভব হইয়াছিল এই নব শক্তির প্রভাবই তাহার একমাত্র কারণ। আর বেসাণ্টই তাহার মূলে। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে গিয়াও তিনি তাঁহার নবভাব প্রচার করিয়া আসিয়াছেন। ১৯১৫ সনে বেসাণ্ট যখন ভারতের জন্য হোমরুল লীগ করেন, দাদাভাই নৌরজী তাঁহার সহিত একমত হন। মতিলাল ঘোষ, উপেন্দ্রনাথও যোগদান করেন। ইতিপূর্ব্বে তিলকও একটি হোমরুল লীগ গঠন করিয়াছেন। আর কংগ্রেসের সহিত এক সঙ্গে কাজ করিয়া হোমরুলের প্রচার করিতে অগ্রসর হইলে সমগ্র কংগ্রেসই এক রকম তাঁহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। লক্ষ্ণৌতে মডারেট অগ্রগামী সকলেই গেলেন। রাসবিহারী, ভূপেন্দ্রনাথ প্রভৃতিও ছিলেন, তিলক, খাপর্দ্দে বেসাণ্ট, গান্ধী ও পোলক্ ছিলেন, আবার রাজা অব মাহমুদাবাদ, মজরুল হক, জিন্না, রসুল প্রভৃতিও ছিলেন। আবার তিলকও ২০০ শত সেচ্ছাসেবকসহ সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাসবিহারী ও তিলক পরস্পর করমর্দ্দন ও প্রীতিবন্ধনে সেইখানেই মিলিত হন। কংগ্রেসের পদ্ধতি লীগও মানিয়া লইল। অধিবেশনে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা, প্রাদেশিক সরকার, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতি বিষয়ে নানারূপ নিয়ম কানুনের খসড়া গঠিত হয়। ইতিপূর্ব্বে কংগ্রেস কমিটী এবং লীগের কার্য্যকরী সভা একসঙ্গে বসিয়া সমস্ত বিষয়ে একমত হইয়াছিলেন।

সভাপতি অম্বিকাবাবু বলেন -

After nearly ten years of painful separation and wanderings through the wilderness of misunderstanding and the mazes of unpleasant controversies —both the wings of the Indian National Party have come to realise the fact that united they stand but divided they fall and brothers
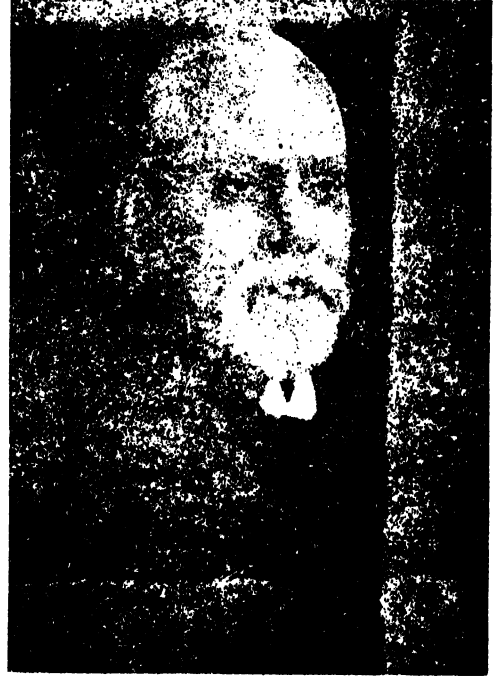
ভূপেন্দ্রনাথ বসু

have at last met brothers and embraced each other with the gush and ardour, peculiar to reconciliation after a long separation. Blessed are the peace-makers.

"দশ বৎসর বিচ্ছেদের পরে আবার আমাদের মিলন হইল। ভাই ভাই-এর হাতে হাত মিলাইল। শান্তিপ্রয়াসীরা দীর্ঘজীবী হউন।"

এই সভায় অম্বিকাচরণ অপেক্ষা যোগ্যতর সভাপতি ছিলেন না বলিয়াই প্রতীতি হয়। কারণ নবভাবধারার গতি তিনি যেরূপ লক্ষ্য করিয়াছিলেন, অন্য কোন নরমপন্থী নেতার সেরূপ করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। তিনি সত্যই বলেন, "দেশে এক নবজীবনের উন্মেষ হইয়াছে, তাহা আকাশ-কুসুম নয়, হুজুগও নয়, ইহার মূলে রহিয়াছে গণতান্ত্রিক অন্তঃপ্রবণা। ইহা উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। আর ইহারই প্রভাবে পুরাতন ও জীর্ণ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, আর নূতন ফলফুলে গড়িয়া উঠে"

কংগ্রেস-লীগ স্কীম

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে] কংগ্রেসের অধিবেশনে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস অল ইণ্ডিয়া মুসলীম লীগের সহিত একত্র হইয়া যে, একটী খসড়া করেন তাহাতে কংগ্রেস আশা করেন যে সরকার আমাদিগকে নিম্নলিখিত সংস্কার (Reforms) দিয়া স্বায়ত্তশাসনের দিকে লইয়া যাইবেন।*—বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলি নিম্নে দেওয়া হইল—

অম্বিকাচরণ মজুমদার

প্রাদেশিক আইন-সংসদ

(Provincial Legislative Councils.)

(১) ইহার ৫ ভাগের চারিভাগ হইবে নির্ব্বাচিত, একভাগ মনোনীত। বৃহদায়তন প্রদেশে ১২৫এর কম সভ্য থাকিবে না, আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুলিতে ৫০ হইতে ৭৫ জন নির্ব্বাচিত হইবে; বিস্তৃত (broad franchise) নির্ব্বাচনের দ্বারা মাইনরিটিরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার থাকিবে।

মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্ব্বাচণের অধিকার থাকিবে। নিম্নলিখি ত ভাবে তাহারা নির্ব্বাচন করিবে—

পাঞ্জাবে, নির্ব্বাচিত মধ্যে অর্দ্ধেক থাকিবে মুসলমান—

বাঙ্গালায়	শতকরা	৪০	জন
বোম্বাই	,,	৩৩১/৩	,,
যুক্তপ্রদেশ	,,	৩০	,,
বেহারে	,,	২৫	,,
মাদ্রাজে ও মধ্যপ্রদেশে	,,	১৫	,,

কোন সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন উঠিলে, সেই সম্প্রদায়ের ৩।৪ চতুর্থাংশ মত লইতে হইবে। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা পরিষদের সভাপতি হইতে পারিবেন না, ভিন্ন একজন নির্ব্বাচিত হইবেন। পরিষদের স্থায়ীকাল ৫ বৎসর। কোন বিল পাশ হইলে গভর্ণর জেনারেলের সম্মতি ছাড়া হইবেনা। তিনি উহা নাকচ করিতেও পারেন। সম্মতিদানের পর সরকারের কার্য্যকরী কমিটি Executive Government তাহা মানিতে বাধ্য হইবে।

ভারত সাম্রাজ্য (India and the Empire) সমগ্র সাম্রাজ্য সম্পর্কে অন্যান্য উপনিবেশের যেরূপ প্রতিনিধি থাকে, ভারতেরও সেইরূপ থাকিবে। অন্যান্য উপনিবেশের প্রজা যেমন সুখ ও সুবিধা পায়, ভারতীয়গণও তাহা লইবে।

সামরিক ও অন্যান্য বিষয় (Military and other matters) উচ্চ বা নিম্ন পদে সামরিক ও নৌবিভাগে প্রবেশের অধিকার থাকিবে, স্বেচ্ছাসেবক সৈন্য শ্রেণীতে প্রবেশ করিতে দেওয়ার শিক্ষার বন্দোবস্ত ভারতেই থাকিবে।

শাসন ও বিচার বিভাগের স্বতন্ত্রতা

শাসন বিভাগের লোকদের বিচার করিবার ক্ষমতা থাকিবেনা। প্রত্যেক প্রদেশের বিচার বিভাগ সেই প্রদেশের প্রধান বিচারালয়ের অধীন থাকিবে।

প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট

প্রাদেশিক সরকারের কর্ত্তা গভর্ণর। তাহার একটী শাসন পরিষদ থাকিবে, সেই পরিষদের অন্ততঃ অর্দ্ধেক সভ্য ব্যবস্থাপক সভা নির্ব্বাচিত সভ্যের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবে।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার (Imperial Legislative Council) ১৫০ জন সভ্য থাকিবে। তন্মধ্যে ১২০ জন নির্ব্বাচিত থাকিবে। নির্ব্বাচিত ভারতীয়দের মধ্যে ১/৩ থাকিবে মুসলমান। প্রেসিডেণ্ট হইবেন স্বতন্ত্র একজন নির্ব্বাচিত সভ্য। বিল পাশ হইতে গভর্ণর জেনারেলের অনুমোদন আবশ্যক। এই গভর্ণমেণ্ট ৫ বৎসর স্থায়ী থাকিবে। গভর্ণর নাকচ না করিয়া অনুমোদন করিলে Executive Government প্রস্তাবে বাধ্য হইবে।

Government of India : ভারত সরকার

গভর্ণর জেনারেলই প্রধান। তাঁহার একটী শাসন পরিষদ হইবে, অর্দ্ধেক হইবে ভারতবাসী, তাহারা ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচিত সভ্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবে না। সাধারণতঃ সিভিল সার্ভিসের লোক শাসন পরিষদে আসিবেন না. সাধারণতঃ প্রাদেশিক ব্যাপারে ভারত সরকার হস্তক্ষেপ করিবেন না। আইন ও শাসন কার্য্য বিষয়ে গভর্ণর জেনারেল ভারত সচিবের অধীন থাকিবেন না।

*That the Congress demands that a definite step should be taken towards self-government by granting the reform contained in the scheme prepared by All India Congress Committee in concert with the Reform Committee appointed by the All India Moslem League.

ভারত সচিবের কাউন্সিল উঠাইয়া দেওয়া হইবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষ হইতে তাঁহার বেতন দেওয়া হইবে। উপনিবেশ-সচিবের উপনিবেশের সহিত যে সম্বন্ধ, তাহারও ভারত সম্বন্ধে সেই সম্বন্ধ থাকিবে। তাঁহার ২ জন সহকারী থাকিবে, অন্ততঃ একজন ভারতবাসী হইবেন।

বাঙ্গালার বিপ্লব পন্থা

১৯০১ খৃষ্টাব্দ হইতে বাঙ্গলা দেশে নব ভাবধারা ক্রমে ক্রমে যুবক সম্প্রদায়ের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা এই পুস্তকে বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করিয়াছি। একটী বিষয়ের ইতিহাস বলা হয় নাই। ইতিমধ্যে অগ্রগামী দলের মধ্য হইতে কতিপয় যুবকের চেষ্টায় দেশে আবার কয়েকটি বৈপ্লবিক দলও গঠিত হইতে লাগিল। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল বর্ত্তমান শাসন প্রণালীর উচ্ছেদ এবং দেশীয়দের হাতে শাসনপ্রণালী যাহাতে হস্তান্তরিত হয়, তজ্জন্য চেষ্টা। বিপ্লবপন্থীদের কার্য্যপ্রণালী ছিল গুপ্ত সমিতির সহায়তায় অর্থসংগ্রহ করা এবং তাহা করিতে ডাকাতি অন্যতম কর্ম্মপন্থা ছিল। কেহ গুপ্ত সংবাদ প্রকাশ করিলে তাহাকে খুন করিয়া প্রতিহিংসা সাধনও সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া অনুমান হয়। কলিকাতায় যে সমিতির সভ্যগণ মুরারী পুকুর উদ্যানে ধরা পড়েন, তাঁহাদের নেতা ছিলেন বারীন্দ্র ঘোষ। উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র দাস কানুনগু, উল্লাস কর দত্ত প্রভৃতিও উহার সভ্য ছিলেন। চরমপন্থী ছাড়া নরমপন্থীও অনেকে ভিতরে ভিতরে গুপ্ত সমিতির অন্তর্ভুক্ত হয়।

শ্রীযুক্ত বারীন্দ্র ঘোষ, ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত, দেবব্রত বসু, উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি "যুগান্তর" কাগজের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই কাগজখানি ছিল বিপ্লববাদীদের মুখপত্র। ইহার রচনায় আগুন ছুটিত, আর গ্রাহক সংখ্যাও হু হু করিয়া বাড়িয়াছিল—অল্প সময় মধ্যেই পাঁচ হাজার হইতে বিশ হাজারে গিয়া পরিণত হয়। যত অত্যাচার পীড়ন বাড়িত, ছাত্রগণ ধরা পড়িত, কড়া শাসনের কথা হইত—যুগান্তরে খুব জোর প্রবন্ধ চলিত। আর সেইরূপ প্রবন্ধে যুবকমণ্ডলী উদ্দীপিত হইয়া উঠিত।

যাহা হউক ১৯০৮, মে মাসে উক্ত সমিতির বাড়ীতে খানাতল্লাস হয় এবং অনেকে ধরা পড়েন। ইহার পূর্ব্বে ৩০শে এপ্রিল ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকী নামক দুইটি যুবক ভূতপূর্ব্ব প্রেসেডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ড সাহেবকে মজঃফরপুরে মারিতে গিয়া ভ্রমক্রমে দুইটি মহিলাকে (মিসেস কেনেডি ও মিস্ কেনেডিকে) বোমার আঘাতে মারিয়া ফেলেন। ক্ষুদিরাম ধরা পড়ে এবং প্রফুল্ল মোকামা ষ্টেসনে ধরা পড়িবামাত্র আত্মহত্যা করে। ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। যুবকদ্বয় প্রাণ ভয়ে ভীত নয়, তাহাদের উদ্দেশ্য মহৎ ছিল—এইরূপ তখন অনেককেই বলিতে শুনিয়াছি। বস্তুতঃ সে সময়ে দেখিয়াছি যে যদিও নির্দ্দোষী স্ত্রীলোকদ্বয় বিনা দোষে খুন হইয়াছে, তথাপি যে কারণেই হউক দেশের পল্লীগ্রামস্থ স্ত্রীলোকগণেরও সহানুভূতি এই নির্ভীক যুবকদ্বয়ের দিকেই আসিয়া পড়িত। ইহার পরেই মুরারী পুকুর বাগানটির খানাতল্লাস হয়, এবং অনেকে ধৃত হন।

উক্ত আসামীদের মধ্যেও শ্রীরামপুরের গোস্বামী বংশসম্ভূত নরেন গোঁসাই নামে একটি যুবক যখন একরার বা স্বীকারোক্তি করিয়া উক্ত আসামিগণ এবং শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়কে ষড়যন্ত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট করে। অল্পদিন মধ্যেই কানাইলাল দত্ত এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাহাকে (নরেন্দ্র গোঁসাইকে) হাসপাতালে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলে। কানাই এবং সত্যেন্দ্র দুইজনই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয় এবং উভয়েই নির্ভীকভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। কানাই-এর ফাঁসির পর বিপুল সমারোহে তাহার দেহ কেওড়াতলায় সৎকার করা হয় এবং কলিকাতা সহরময় একটা

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ

তুমুল আন্দোলন ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এই জন্য সত্যেনের দেহ আর জেল হইতে বাহিরে আনিবার অনুমতি দেওয়া হয় নাই; সেই খানেই সৎকার করা হয়। বহুলোক কানাইএর চিতাভস্ম বহন করিয়াও নিয়া গিয়াছিল।

অনেক পুস্তক ও প্রবন্ধ পাঠ করিয়া মনে হয় গুপ্ত সমিতির সহিত অরবিন্দবাবুও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। নরেন গোঁসাই-এর স্বীকারোক্তিতেও তাহার সংস্রব প্রমাণিত হইত। এতদ্ব্যতীত "বন্দেমাতরমের" ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক স্বর্গীয় বিপিন পাল মহাশয়ও "সোনার বাঙ্গলা" সম্বন্ধে যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ বাড়ে। এদিকে আদালত কর্ত্তৃক অরবিন্দ বাবু নির্দ্দোষ প্রমাণিত হইয়াছেন। সুতরাং এত বৎসর পরে অরবিন্দবাবুর গুপ্ত সমিতির সংস্রব সম্বন্ধে কোন কথা উঠিলেই, আমরা সন্দেহের উপর কোন আস্থা স্থাপন না করিয়া, তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন না বলিয়াই ধরিয়া লইব।

কিন্তু সে সময়ে অরবিন্দবাবুর দেশের লোকের প্রতি প্রভাব ছিল অতিশয় বেশী। একে তিনি যে ৭০০৲ বেতনের অধ্যাপনার কার্য্য ছাড়িয়া মাত্র একশত টাকা বেতনে আসিয়া জাতীয় বিদ্যালয়ের ভার লইয়াছেন, ইহাতে লোকে তাঁহার প্রতি স্বভাবতঃই শ্রদ্ধানত হইয়া উঠিয়াছিল। তারপরে তিনি ছিলেন খুব বিজ্ঞ, স্বল্পভাষী এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ। তৃতীয়তঃ "বন্দেমাতরমে" যে সমস্ত প্রবন্ধ লিখিতেন তাহার অর্থ ছিল ব্রিটিশ আয়ত্তহীন পূর্ণ-স্বায়ত্ত শাসন—'absolute autonomy free from British Control"—সুতরাং তিনি যাহা করিতেন বলিয়া লোকের ধারণা

ডাঃ এস, সুব্রহ্মণ্য আয়ার

হইত, তাহাতেও লোকের সহানুভূতি স্বভাবতঃই আসিয়া পড়িত। তাই কার্য্যতঃ না থাকিলেও তিনিই গুপ্ত সমিতির প্রকৃত নেতা, লোকের এরূপ বিশ্বাস হওয়ায় গুপ্ত সমিতি তখন সাধারণে আরও জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। শুনিতে পাওয়া যায়, ১৯০২।১৯০৩ হইতেই গুপ্ত সমিতি গঠনের চেষ্টা হয়। বঙ্গবিভাগ, বরিশালের সম্মিলনী বন্ধ করণ, মেদিনীপুর জেলার সম্মিলনীতে চরম পন্থিগণের পৃথক সম্মিলনীকরণ, সুরাটে দক্ষযজ্ঞ ব্যাপারের সুবিধা লইয়া গুপ্ত সমিতি আরও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মেদিনীপুরে এবং সুরাটে যাহারা বিঘ্ন ঘটাইয়াছিল, তাহাদের কেহ কেহও এই গুপ্ত সমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। মেদিনীপুরের জিলা কনফারেন্সে (১৯০৭ ডিসেম্বর) সত্যেন বসু প্রধান ছিলেন, আর সুরাটে অরবিন্দ ও বারীন বাবু উভয়েই গিয়াছিলেন। সুরাট হইতে আসিয়া বারীন নাকি অন্যান্য স্থানের গুপ্ত সমিতি সম্বন্ধে নিরাশ হন এবং কলিকাতায়ই একটী স্থায়ী সমিতি করিতে সঙ্কল্প করেন। তবে মজঃফরপুরের ব্যাপার ছাড়া আর কোন কাজই যে বিশেষ করিতে পারিয়াছিলেন তাহা মনে হয় না। পক্ষ সমর্থন কালে সওয়ালজবাবে চিত্তরঞ্জন দাশ যে বলিতেন—ইহা একটী খেলনা বিদ্রোহ মাত্র—It is a toy revolution, তাহাই ঠিক বলিয়া মনে হয়। তবে গুপ্ত সমিতির কার্য্য কতিপয় চরম পন্থীর লোকের মধ্যে প্রসার লাভ করিলেও দেশের অন্যান্য অগ্রগামী বা চরমপন্থী ব্যক্তিগণের উহার সহিত সংস্রব বা সহানুভূতি ছিল বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয়। গুপ্ত সমিতির পন্থা অনেক সময়েই যে কার্য্যহন্তারক তাহা কাহারও বুঝিতে বাকী নাই। অনেকেই বুঝিয়াছেন—এবং চিত্তরঞ্জন দাশ বরাবর বলিতেন, Non-violence may but violence will never bring about Swaraj—অহিংসায় স্বরাজ হইতে পারে, কিন্তু হিংসায় উহা কখনও সম্ভব নয়। বস্তুতঃ ক্ষাত্রশক্তি বা রজোশক্তিতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যে অপরাজেয়, এই যুদ্ধেও সকলে তাহা বুঝিয়াছে। এমতাবস্থায় হিংসার ফল যে খুবই মারাত্মক, তাহা বুঝিতে আর কাহারও বাকী নাই। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির গত অগ্রহায়ণের (১৩৫২) কলিকাতার অধিবেশনেও নেতৃবৃন্দ তাহাই স্থির বুঝিয়াছেন।

তথাপি এই যুবকদের অনেকেরই দেশপ্রীতি যে প্রবল ছিল এবং মুক্তির জন্যই যে ভ্রান্তপথ অবলম্বন করিয়াও আত্মত্যাগে পরাঙ্মুখ হয় নাই, এই দৃষ্টান্তও দেশের কর্ম্মপ্রাণ যুবকের পক্ষে কম প্রতিক্রিয়া করে নাই। যুবকগণ ইতিপূর্ব্বেই বিবেকানন্দের কথা শুনিয়াছে, এবং গিরিশচন্দ্রের 'ভ্রান্তি'তে পড়িয়াছিল—"এক মৃত্যুভয় গেলেই সব গেল।" বস্তুতঃ এই যুবকগণের দেশভক্তি এবং আত্মত্যাগ সহায় করিয়া দেশের মুক্তির জন্য বহু যুবক অতঃপরে ছুটিয়া গিয়া কংগ্রেসের অহিংসনীতি গ্রহণ করিয়াছে, তখনই মনে হয়, ভ্রান্তপথে চালিত হইয়াও এই মরণভোলা যুবকগণ কি রত্ন দেশকে দিয়া গিয়াছেন! স্বাধীনতালাভই তাহাদের কাম্য ছিল। স্বাধীনতার জন্যই তাহারা ভ্রান্তপথ গ্রহণ করিয়াছিল। পরে এতদিনে আবার প্রকৃষ্ট পন্থা খুঁজিয়া পাইয়াছে, সে-পন্থা নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

ঢাকায় অনুশীলন সমিতির কার্য্য কলিকাতা হইতেও অনেক বেশী ব্যাপক। ইহার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা প্রমথনাথ মিত্র,(ব্যারিষ্টার পি, মিত্র) তাঁহার উদ্দীপনায় পুলিন বিহারী দাস পূর্ব্ববঙ্গের প্রায় সব জেলায়ই লাঠিখেলার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন ও 'কালচারের' উপর নির্ভর করিয়া আত্মোন্নতিমূলক সমিতির প্রসার করিয়া যুবকবৃন্দকে স্বাবলম্বী করিয়া তোলেন। বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনে তাঁহার কাজের খুব সহায়তা হয় এবং পূর্ব্ববঙ্গে লাঠির প্রাবল্যে কতিপয় মুসলমান উৎসাহিত হইয়াও বিশেষ কিছু সুবিধা করিতে পারে না। পুলিন বাবুর সংগঠিত যুবকেরদল না থাকিলে সে-সময় দুর্বৃত্তগণ কেবল জামালপুরের বাসন্তী মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া এবং কুমিল্লায় অত্যাচার করিয়াই ক্ষান্ত হইত না। পূর্ব্ববঙ্গে

অরাজকতা নিবারণ কল্পে ঢাকা অনুশীলন সমিতির সভ্যগণ বহুদিন পর্য্যন্ত বঙ্কিম বর্ণিত লাঠির মর্য্যাদা খুবই রক্ষা করিয়াছিল।

কিন্তু এই সমিতিও ক্রমে ঘোর বিপ্লবী হইয়া উঠে! বাবরা ডাকাতি, নরিয়া ডাকাতি সন্দেহে সুকুমারের বিনাশ সাধন, এপ্রুভার গনেশ চ্যাটার্জ্জিকে সন্দেহ করিয়া তাহার সহোদর প্রিয়মোহনকে ফতেজঙ্গপুরে হত্যা প্রভৃতি গর্হিত ও জঘন্য ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। অতঃপর ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুলাই পুলিন বিহারী দাস, আশুতোষ দাশগুপ্ত, জ্যোতির্ম্ময়, দীনেশ গুহ, ললিত রায়, বঙ্কিম রায়, অমরেন্দ্র ঘোষ, নলিনী কিশোর গুহ প্রভৃতি ৪৫ জন ধৃত হন এবং জজ মিঃ কুটসের বিচারে অনেকের দ্বীপান্তরের আদেশ হয়। পুলিন বাবু ও আশু বাবুর প্রথম হইয়াছিল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, পরে হাইকোর্টের বিচারে হয় ছয় বৎসরের জন্য।

বিপ্লবীকার্য্য সংঘটিত হওয়ায় অনুশীলন সমিতি পূর্ব্বের জনপ্রিয়তা ও সাধুবাদলাভে বঞ্চিত হয় এবং পুলিনবাবু প্রভৃতির মোকদ্দমার পরেও তাঁহার দলস্থ ব্যক্তিগণ আরও বিপ্লবী ও হিংস্র হইয়া উঠে। এই সব কারণে ১৯১৫ পর্য্যন্ত যুদ্ধারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে কেবলমাত্র সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া কত সংখ্যাতীত যুবককে এবং বহু নির্দ্দোষকে গৃহহীন করিয়া অন্তরীণাবদ্ধ করা হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই।

১৯১৪ সনে ইউরোপে মহাযুদ্ধ শুরু হয়। ১৯১৫ সনে শিবপুর ডাকাতি মোকদ্দমা এবং সে-বৎসর ও পরবর্ত্তী বৎসরে অনেকগুলি ডাকাতি হয়। গভর্ণমেণ্ট জার্ম্মাণীর সঙ্গে বিপ্লবীদের সংস্রবও সন্দেহ করিয়াছিল।

ভূপেন্দ্র ঘোষ, নরেন ঘোষ চৌধুরী, সত্য বসু, যতীন্দ্র নন্দী, সানুকূল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকের শিবপুর ডাকাতি মোকদ্দমায় বহু বৎসরের জন্য জেল হয়।

অতঃপরে পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের বহু অন্তরীণাবদ্ধ যুবক ১৯২০ খৃষ্টাব্দে মুক্তিলাভ করিয়া গৃহাগত হন। শ্রীযুক্ত পুলিন দাস, বারীণ ঘোষ, উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিও ইতিপূর্ব্বেই খালাস পান। এই সময়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বাঙ্গলার অবিসম্বাদী জননায়ক। ইতিপূর্ব্বে বহু বিপ্লবীর পক্ষ সমর্থন করিয়া (আলিপুর বোমার মামলা, ঢাকার ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা, রাজেন্দ্রপুর ট্রেণ ডাকাতি মামলা, বরিশাল ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমা, দিল্লী ষড়যন্ত্রের মামলা প্রভৃতিতে) তিনি তাহাদের ও আত্মীয়গণের হৃদয় জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অন্তরীণাবদ্ধ যুবকগণের দুঃস্থ আত্মীয়-স্বজন তাঁহার সহানুভূতি এবং কেহ কেহ অন্যান্য প্রকারের সাহায্য লাভেও বঞ্চিত হয় নাই। সদ্যমুক্ত যুবক ও কর্ম্মিগণ এখন তাঁহার পতাকাতলে সম্মিলিত হইয়া, তাঁহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে ছুটিয়া আসে। অহিংস পথাবলম্বী মহাপ্রাণ দেশবন্ধুও তাঁহাদিগকে বর্জ্জন না করিয়া প্রেমে বশীভূত করেন। অনেকেই আসেন, কিন্তু নেতৃযুগল বারীন্দ্র ও পুলিন আসেন নাই। বারীন কিছুদিন দেশবন্ধু প্রতিষ্ঠিত 'নারায়ণ' পত্রিকার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষাশেষি থাকেন নাই। পুলিনবিহারীও অতঃপরে দেশবন্ধুর কর্ম্মপ্রভাবে ১৯২০ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে ভলান্টিয়ার বাহিনী পরিচালনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৯২১-এর আন্দোলনে অনুরুদ্ধ হইয়াও যোগদান করেন নাই। তাঁহারা উভয়ে সরকারী নীতি সমর্থন করেন। বারীন্দ্র ষ্টেটস্‌ম্যান কাগজে একটি বিবৃতি দেন আর পুলিন অ্যাডভোকেট জেনারেল মিঃ এস, আর, দাশের অসহযোগ বিরোধী (Anti-Non-Co-operation) দলে যোগদান করেন। বর্ত্তমানে তাঁহাদের কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে আমরা কিছুই অবগত নহি।

বাঙ্গলার মাটী হইতে কিছুদিনের জন্য বিপ্লববাদ অন্তর্হিত হয় বটে, কিন্তু দেশবন্ধুর মহাপ্রস্থানের পরে আবার অলক্ষ্যে কখন যে আত্ম প্রকাশ করে, তাহা বলা সুকঠিন। তবে সেই ইতিহাস আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। কেবল ইহাই বলিতে চাই, বিপ্লবী যুগেরও বহু বিশিষ্ট কর্ম্মী মনেপ্রাণে এখন অহিংস-নীতি গ্রহণ করিয়াছেন।

চরিত্র হিসাবে পুরাতন বিপ্লবীদের অনেকে অতুলনীয়। সকলের কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক। তবে একজনের কথা না বলিলে এ অধ্যায় অসম্পূর্ণ থাকিবে। সেবাধর্ম্মে শ্রীমান ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তীর ন্যায় দ্বিতীয় ব্যক্তি এ পর্য্যন্ত দেখি নাই। তাঁহার সেবাগুণের প্রশংসায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রসঙ্গ মাত্রেই ভাব গদগদ হইয়া উঠিতেন। এখনও শ্রীমানের কারাবাস চলিতেছে।

আজকাল রাজনৈতিক বন্দিগণের মুক্তি কামনা সকলেই করেন। ইহা খুবই জরুরী সন্দেহ নাই। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় ত্রৈলোক্যের নাম কাহারও কণ্ঠ বা লেখনী শোভিত করেনা। আইন সংসদের প্রার্থীদের প্রসঙ্গেও ত্যাগ ও দুঃখভোগের কথা খুবই প্রকাশিত হয়। বিনা বিচারে যাঁহারা দুঃখ ভোগ করেন, তাঁহাদের জন্য কাহারও সমবেদনা প্রকাশ পায়না, সে হৃদয়হীন। কিন্তু আমার ধ্রুব বিশ্বাস যদি একাধারে দুঃখভোগ পরোপকার বৃত্তি ও চরিত্রের নিষ্কলঙ্কতা আইন-পরিষদে যাওয়ার জন্য প্রধান গুণ বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে দেশবন্ধুর পরম স্নেহাস্পদ ত্রৈলোক্যের সহিত কাহারও তুলনা হয় না। আমরা ত্রৈলোক্য প্রমুখ যাবতীয় বন্দীরই মুক্তি কামনা ও প্রার্থনা করি।

সাঁঝের পিদীম ভাসায় জলে—

শ্রীহাসিরাশি দেবী

"হেঁ—হেঁ—! কি আমার কুটুম রে! কুনকাল্যে' ভাই-বল্যাছিলাম তো আমার মাথাটা কিন্তা লিয়েছে, লয়! ফেল্যা দিগা তুদের উসব! আমি উসবের ধার ধারিক্তা!"

যে লোকটির আসবার খবর পেয়ে ত্রিনয়নী ওরফে তিনু ঘাট থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরলো, সন্ধ্যার ম্লান আলোয় দেখলে, সেই মানুষটিই দাওয়ার ওপোর পিঁড়ি পেতে ব'সে হাতের টর্চ লাইটটাকে নাড়াচাড়া ক'রছে।

আর ওরই খানিকটা তফাতে ব'সে সন্ধ্যার প্রদীপ সাজ ক'রছে ছোট ননদ তুফান।

কোমরের জলভরা কলসীটাকে সিমতলায় নামিয়ে, সর্ব্বাঙ্গের ভিজে কাপড়টার আঁচল চিপে জল নিংড়াতে নিংড়াতে তিনু ব'ললে—বলি, কিহে! ওশক্তা ভাই যে! কখুন আসা হ'লো? য়্যাদ্দিন পরে যে?—

অশ্বিনী চ'মকে এইদিকে মুখ ফিরালো।

পানের ছোপে ওর দাঁত ক'টা লাল থেকে কালোয় দাঁড়িয়েছে; মুখ চোখ আর সমস্ত দেহেই যেন অত্যাচারের চিহ্ন সুস্পষ্ট! গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবী, আর পায়ে পালিস করা পাম্প শু। সন্ধ্যার হাওয়া,—ওর পকেটের সিগারেট আর গায়ের সেন্টের উগ্র গন্ধে মাতাল হ'য়ে উঠেছিল যেন!

মুখ ফিরিয়ে অশ্বিনী একবার তিনুর ভিজে কাপড়ে জড়ানো স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহের ওপোর প্রদীপ্ত দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে, তারপরে একটু হেসে জবাব দিলে:

তা-যা ব'লেছ' তিনুদিদি: নইলে এতবড় পুজোটা চ'লে গেল,—পুজো ব'লে পুজো নয়, মহাপুজো; সেই পুজোর সময়েও আমায় ছুটী দিলেনা: এবার কপাল ঠুকে ব'ল্লাম, বলি সায়েব! ছুটী আমায় দেবে তো দাও দিন কতকের,—তা নইলে এই রইল পড়ে তোমার আপিস আর কাজ, আমি চল্লুম! তা দিদি, বলবো কি, সায়েব কি আর আসতে দেয় গো! একেবারে যাকে বলে হাতে পায়ে ধরা। বলে, তুমি গেলে আমার আপিসই বন্ধ হ'য়ে যাবে অশ্বিনীবাবু! তারই লেগে তো—"

তিনু শুধোলে—

আপিসের কাজে লেগ্যাছ' বুঝি? কুন সহরে? মাইন্তা কত?

তুফানী ততক্ষণ চারিদিকে সন্ধ্যা দেখিয়ে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রদীপের আলোয় আলোকিত ওর বিস্মিত চোখ দুটো জ্বলতে দেখা গেল।

অশ্বিনী তিনুর কথা শুনে হেসে উঠলো!—

এ-হে—তুমি এখনো সেই তিনুদিদিই আছো লাগছে! তা নইলে ক'লকেতা শহরের নাম জানোনা! ক'লকেতা গো ক'লকেতা! যেখানে জাল টিপ্‌লে আলো জলে গো, বিজ্‌লী আলো; আর কল টিপ্‌লে পড়ে জল ছড়্‌ছড়্‌ ক'রে। বুঝ্‌লে? সেই ক'লকেতা।—

স্মিত হাস্যে মাথা নাড়লে তিনু, অশ্বিনী ব'লে চ'ললো—সেইখেনে এক সায়েবের আপিসে কাজে লেগেছি, মাইনে হ'চ্ছে পঁয়তাল্লিশ টাকা; মানে দু' কুড়ি পাঁচ টাকা; বুঝেছ?

"দু' কুড়ি পাঁচ টাকা?—"

হাত গুণে গুণে টাকার হিসেব ক'রে তিনু শিউরে উঠলো—

"এত্তো টাকা?—কি ক'রব্যা অত টাকা?—"

অশ্বিনী হেসে যেন গড়িয়ে প'ড়লো—

"কি আর ক'রবো?—ঘর নেই সংসার নেই—কে আমার টাকা খাবে। ঐ লাগবে দেখছি পরের ভোগে; আর কি?—

তিনু এবার প্রতিবাদ ক'রলো দৃঢ় কণ্ঠে—

"ক্যানহে? পরের ভোগে লাগাবা ক্যানহে—চিরকাল কি মা বাপ থাকে নাকি কারো? বিহা ক'রব্যা, ঘরসংসার আপ্‌নি।"

"হুঁ,—তুমিও যেমন দিদি, বিয়ে আর আমার হবে! য়্যাদ্দিন হ'লোনা, আর এখন? আর বিয়ের বয়োসও পার হ'য়ে গেলাম, তোমার চেয়ে বড় হব বই ছোট হব না।—"

"ব্যাটা ছেলের আবার বিহার বয়েস? সোন্নার আবার ব্যাঁক! কি বুলছো কি গো ওশক্তা ভাই!—বাংলা দেশে বিহা হয় না, কার শুনি?—একবার মুখ্যের কথাটাই খসাও ক্যানে, খসিয়ে দ্যাখো—তারপরে···

অশ্বিনী হাসছিল; ব'ললে—

"আর যদি বলি ক'নেই আমার পছন্দ হয় না; তা হ'লে?—

"উঁ, তুমার এক ঢপের কথা, ফারাকে ফেল্যা দাওগা?"

তিনু যেন কতকটা বিরক্তি না চাপতে পেরেই ঘরে চ'লে গেল কাপড় ছাড়বার ছুতোয়।

খানিকটা পরে বাইরে এসে তুফানকে আদেশ ক'রলে: "চাহা বানা দিনি দু'বাটি; হোই থাখ—হোই কোনার হাঁড়িতে চাহা এন্যা রেখ্যাছি দু'পয়সার।"

রণগাঁয়ের যে নদীটা মাঝে মাঝে ক্ষেপে উঠে এদিকের ওদিকের জায়গাগুলো কোলের মধ্যে টেনে নেয়, তার নাম দ্বারকা। দ্বারকা এবারও শেষ। ভাদ্দরে ক্ষেপেছে, ক্ষেপে এবার আর কোনও ঘরবাড়ী নষ্ট করেনি বটে, কিন্তু ক্ষেত-খামারের বেশীর ভাগই টেনে নিয়েছে বুকের নিচে।

এবারে দ্বারকার জল এসেছে রাজবংশী পাড়ার কোল পর্য্যন্ত। পাড়ার শেষ ঘরখানা তিনুর।

জায়গায় জায়গায় চালের খড় খসে গেছে, দুই একটা গাছও উঠেছে ওর দেওয়ালে, একোঁড় ওফোঁড় হ'য়ে; তবু সেই দেওয়ালেই লাল মাটির প্রলেপ দিয়ে তিনুর আলপনা দেবার বিরক্তি নেই, তুফানীও আঁকে ফুল লতা, পাতা পাখী কত কী! এই দুইজনে মিলেই সংসার চালায়, জীবনও কেটে চলে ওদের। কিন্তু পাড়ার লোকে বলে তিনু পয়সা জমিয়েছে।

উত্তরে তিনু বলে—"মুয়ে আগুন তুদের,—পয়সা পাব কুত্থেকে রে, প্যাট-প্যাট ক'রে সাতবাড়ী ধান ভেনে বেড়াচ্ছি, দেখতে পেছে না? চোখে ঢ্যালা বেরিয়েছে লাকিন্ উদের?—

"চাহা একটুকুন খাও ক্যানে!—"

ব'লতে ব'লতে তিনু ডাক দিল—"তুফান্! হেই তুফান্! হ'লো তুজোর? ক'রবি তো একটুকুন চাহা, তা কখুন থেকে!—

সামনেই রান্নার চালা, চালের খড় থেকে কুণ্ডলাকার ধোঁয়ার রেখা দেখা যাচ্ছে, আর দেখা যাচ্ছে তুফানীকে, সে ব'সে চা ক'রছে;

ল্যাম্পের আলোয় দেখা যায় ওর মুখে কপালে এসে পড়া অসংযত চুলের গোছা,—অনাবৃত পিঠের মধ্যে উঁচু শিরদাঁড়ার হাড় কয়খানা, পাঁজর কয়খানাও বোধ হয় গোনা যায় চেষ্টা ক'রলে।

অশ্বিনী তুফানের দিকে তাকিয়ে ব'ললে:—উখে' ইস্কুলে দাও না কেন তিনু দিদি, লেখাপড়া শিখবে, মাষ্টারী করবে, খাবে। শহরে কত্তো বড় বড় মেয়েরা লেখাপড়া করে জানো? ও, সে সব তোমার মত।—

তুফানী এর মধ্যে চা ছেঁকে এনে দু'বাটি রেখে গেল দু'জনের সামনে। তিনু একবাটি তুলে নিয়ে একটু হাসলে,—চাপা অর্থপূর্ণ হাসি। ব'ললে:—কি জানো ওশ্ক্যা ভাই, আমাদের রাজবংশীর ঘরে তো বিটা ছেল্যা লেখ্যাপড়া শিখ্যা রেলেষ্টারী ক'রবে লাখ, খেতে হবে আমাদের মত ধান ভেন্যা, বাসন মেজে। তবু একখোন পেথম্ ভাগ কিন্যা দিয়্যাছি; ভেব্যাছি, জী, উয়োর মা গেল, বাপ গেল, ভাইটে বিহা কর্যা এনে যখন আমার হাতে উ'রে সঁপে দিয়ে গেল, তখন উ তিন বছরের। তা আবার শোন কেমুন! প্যাট্ থেকে প'ড়তে না প'ড়তে ভায়ে বিহা দিলে, তা রাঁড় হ'য়ে ফির্যা এলো সেই ভেয়ের ঘরেই। বরাত দেখ্যাছ? তাই ভাবি ওশক্যা ভাই, শহরে বাজারে আজকাল কত্তো বিবরা ছোট বিটাছেল্যার বিহা হচ্ছে, উর এই বয়েস, কাঁচা ছেল্যা, হাত পা ধ'রে ফেলবো ক'তি? তার চেয়া উ'র আবার বিহা হব।...কি বল ওশক্যা ভাই...?

অশ্বিনী একটু কি ভাবলো, তারপরে চায়ের বাটীটা শেষ অবস্থায় নামিয়ে রেখে একটা সিগারেট ধরিয়ে ব'ললে:—সে কথা তো নেহ্য। অনেহ্য তো নয়।

তিনুর চা খাওয়া হ'য়ে গিয়েছিল, চায়ের বাটী নামিয়ে রেখেছিল অনেকক্ষণ। এইবার একটু এগিয়ে এলো, অনুরোধপূর্ণ স্বরে ব'ললে:—আমার একটা কথা রাখব্যা ওশক্যা ভাই?—রাখো তো বুলি।

"কোন্‌দিন রাখিনি বলো?—"

তিনু যেন না-জানা কোন মনের পরিচয় পেয়ে চ'মকে উঠলো একটু, তারপরে ব'ললে:—কথাটা হ'চ্ছে, আমার ঐ মেয্যাটার একটা বিহার উপায়। দুধের ছেল্যা বুলতে গেলে, আমারই প্যাটের ছেল্যা হ'লে কি ফেলতে পারত্যাম?

এবার অশ্বিনী একটু বিমনা হয়ে পড়লো, কিন্তু তিনু ওর কথার খেই হারালো না। হঠাৎ নিচু হ'য়ে প'ড়ে অশ্বিনীর হাত দু'খানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলে:—তুমারও আপন বুলতে কোনও কুলে কেউ লেইখ ওশক্যা ভাই,—ঐ সব্বনাশীরও লেইখ। তুমি উখে বিহা করো ওশনি, আমি নিশ্চিন্দি হই। করব্যা?

অশ্বিনী এ প্রত্যাশায় ভরা দৃষ্টির সামনে মুখ তুলতে পারলো না, [illegible] উত্তর দিলে—বেশ।

তিনু অশ্বিনীর হাত দু'খানা ছেড়ে দিয়ে ব'ললে:—ঘরে, উখে আমার মতন ক'রে রাখবো না, উ সুখী হবে আমার বড় আশা! একখোন কাপুড় দিতে পেছি'ন্যাখ,—মাথায় একটা বাস্‌না ত্যাল এন্যা দিলাম নাখ' কখুনও! আমার দুঃখু কি জানাবার আছে ওশক্যা ভাই!

অশ্বিনী উত্তর দিল না কিছু।

আড়ালে থেকেও তুফানীর যেন মনে হ'লো—তিনুর গলার স্বর কাঁপছে।

তিনু উঠলো, অশ্বিনীও উঠলো জুতো পায়ে দিয়ে, তারপরে টর্চের আলোয় পথ দেখে এগিয়ে চললো ধীরে ধীরে।

পরের দিন। সকালের রৌদ্র অনেকক্ষণ চারিদিকে ছড়িয়ে প'ড়েছে। ধান ভানা শেষে বাড়ী ফিরেই তিনু হাঁক দিল:—তুফন্যা, বলি হা রে! ক'তি গেলি? গোহাল কাড়িস্‌নি, ছাই পাঁশ সব ইদিকে উদিকে ছড়াছড়ি যেছে কি আমার লেগে? আমি এস্যা বাসি আগার ছাই কাড়বো, গোহাল কাড়বো, তারি লেগে নাকিন?

উত্তরে ঘরের ভেতর থেকে তুফানীর কম্প্র কণ্ঠস্বর শোনা গেল:—বড্ডা জ্বর এয়াছে ভাজ-বৌ,—উঠতে পেছিনেক।"

তিনু হাঁটুর ওপোর কাপড় উঠিয়ে এসে দেখলো ঘরের মধ্যে তুফানী,—আলনার মত কাঁথা কাপড় পেড়ে, গায়ে জড়িয়ে ব'সে ব'সে কাঁপছে।

তিনু বিরক্তিতে চেঁচিয়ে উঠলো:—শু,—শু, ক্যানে লো! কেঁপে মলি জী।"

তারপর নিজের মনেই ব'কতে ব'কতে বাইরে এলো বাসি কাজে হাত দিতে।

—সাধে বুলি ক্যানে, স-ব আমার ক'পাল! বরাত ক'র্যাছি ইয়্যারই! তার কি?

বাসি কাজ তখনও শেষ হয় নাই—একখানা তাঁতের রঙীন সাড়ী আর একটা সুগন্ধ তেলের শিশি নিয়ে দেখা দিল অশ্বিনী। উঠোনের ওপাশ থেকে ডাক দিল:

"তিনু দিদি, কি ক'রছো গো—"

"আর কি ক'রছি,—আপোদের জ্বর এস্যাছে, তাই ঢেঁকি ঠেলিয়ে এস্যা আবার বাসি পাটে—"

ব'লতে ব'লতে ফিরে দেখলে—অশ্বিনী ওর পায়ের কাছে কাপড়খানা আর তেলের শিশিটা নামিয়ে রাখছে।

বিস্ময়লুব্ধ চোখে চেয়ে তিনু ব'ললে—

"ই আবার কি গো?—"

"কেন, কাল যে ব'লেছিলে—তুফ্‌নার কাপড় নাই,—ই নাই—

ও তাই ক্যান্‌ছো।—

মুখ টিপে একটু হেসে তিনু জিনিষ দুটো তুলে নিলে সাগ্রহে; তারপরে শুধোলে:

"তা' হ'লে ঠাকুর মশাইকে ডাকিয়্যা বিহার দিন ঠিক করি?—

অশ্বিনী একটু হাসলে—! একটা সিগারেট ধরিয়ে দু'চার টান দিয়ে ব'ললে—

"তুমিও যেমন! এ গাঁয়ের পুরুত দেবে বিধবা বিয়ে? ও আশা ছাড়ো তুমি।"

"তবে?—"

কথাটা মনে লাগলো তিমুর।—তা' ছাড়া আত্মীয়-স্বজনের তিরস্কার, বিদ্রূপ! হাঁপিয়ে উঠে তিমু ব'ললে—

"তা' হ'লে তুমিই ইয়্যার একটা ব্যবস্থা করো ক্যানহে, যা টাকা কড়ি লাগে আমি দু'ব—

"যেতে হবে নবদ্বীপে;—"

অশ্বিনী আবার সিগারেট টানে।

তিমু ব'ললে—

"বেশ, তাই যাবো—।—কবে যেত্যা হবে বটে, সেইট্যা কেবল ঠিক করো ও মাল্যা ভাই।

"কাল; কালই যাবো; দেরী ক'রে লাভ কি?—"

তিমু ঘাড় নেড়ে ব'ললে—

"ঠিক কথা—কিন্তু একটা কথা,—তুমি আজ রাত্তিরে এই-খ্যানেই ভাত খাবা, কাল আমরা একসঙ্গেই রওনা হব নবদ্বীপ।"

অশ্বিনী বা'র হ'য়ে গেল বাড়ী ছেড়ে; তিমু উঠে এলো ঘরে, তারপরে হাতের কাপড়খানা আর তেলটা তুফানীর সামনে রেখে ব'ললে—দেখ্ ছিস্,—কত্তো টাকা খরচ ক'র‍্যাছে তুয়োর লেগে! ইয়োর হাতে দিয়্যা তবে আমার শান্তি! দু' কুড়ি টাকা মাইগ্যা পায়! ওমনি কথা!—

তুফানী জবাব দিল না সে কথার, মুখখানা একটু নিচু ক'রলে ব'লে মনে হ'লো তিমুর। কিন্তু সে দাঁড়াল না, হাত দু'খানা ধুয়ে পা টিপে টিপে উঠে এলো ওপোরের কোঠায়, তারপরে দেয়ালের ফাটল থেকে সে জীর্ণ কাপড়ের পুঁটুলীটা বা'র ক'রে খুলে এক এক ক'রে গুণতে লাগলো; সেগুলো অন্য কিছুই নয়, কতকগুলো সোনারূপোর অলঙ্কার আর কতকগুলো রূপোর টাকা।—

সকালের আলোয় সেগুলো ঝকমকিয়ে উঠলো।—

রাত্রি শেষ হ'য়ে গেল বুঝি!—

ওপোরে,—কোঠার ঘরে তিমুর নিজের হাতে পাতা সযত্ন রচিত বিছানায় ঘুম ভেঙ্গে অশ্বিনী ধড়ফড়িয়ে উঠে ব'সলো, তারপরে বাইরে এসে তাকালো সামনের তালবন, আর ওর নিচে এসে পড়া বানের জলের দিকে। সকলের ওপোরে,—অন্ধকার আকাশে এখনও তারা জ্বলছে, নিষ্প্রভ হ'য়ে যায়নি ওরা,—এখনও রাত আছে—।—জোর পায়ে হেঁটে গেলে চিরুটির ইষ্টিশান্ বোধ হয় পৌঁছানো যাবে—।

অশ্বিনী নিঃশব্দে বা'র হ'য়ে প'ড়লো বাড়ী ছেড়ে।—

অন্ধকার! সামনে, পিছনে, সব দিকেই অন্ধকার! অন্ধকারেই যেন ওর সমস্ত ভুবন ভ'রে গেছে; আর সামনে—আকাশের তারায় যেন জ্ব'লছে তিমুর প্রত্যাশায় ভরা সেই চোখ দুটো!— মুছে যাক্ অশ্বিনীর সামনে থেকে—ও চোখ দু'টো মুছে যাক্—।

চ'লতে চ'লতে সে একবার পেছন ফিরে তাকালো;—

বহুদূরে মিশে এখনও দাঁড়িয়ে আছে তিমুর সেই খড়ের চাল ক'রখানা, সকালে উঠে ওরা নবদ্বীপ আসবে তার সঙ্গে, সেই সুখের স্বপ্ন দেখতে দেখতে তিমু ঘুমোচ্ছে, তুফান ঘুমোচ্ছে—; কিন্তু ঘুম ভেঙ্গে?—একবার শিউরে উঠে অশ্বিনী আরো তাড়াতাড়ি পথ চ'লতে সুরু ক'রলে;

পাশের আখ ক্ষেতে কি একটা ন'ড়ছে বুঝি!—না, ও ভুল।

অশ্বিনী চলে।—

ভোরের রোদ চোখে এসে লাগতেই তিমু উঠে ব'সলো—

"তুফন্যা, হেই তুফন্যা, উঠবিন্যাথ! মনে নেই, নবদ্বীপ যেত্যা হবে জী, আজকে বেলা দু'ট্যার গাড়ী থে,—

বিদ্যুৎপৃষ্ঠের মত তুফানীও উঠে প'ড়লো বিছানা ছেড়ে; তাড়াতাড়িই একবাটি চা ক'রে ওপোরে উঠতে উঠতে তিমু ডাক দিল—

"ও ওশ্‌ন্যা, ওশ্‌ন্যা ভাই, ঘুম ভাঙছ্যানা ক্যানহে!— কি স্বপন দেখছো বটে।—

নিজের রসিকতায় নিজেই উৎফুল্ল হয়ে হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকেই ও চমকে উঠলো।—

অশ্বিনী কই? জামা কাপড়ই বা কই তার?—

কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তিমু,—তারপরে নিচে এসে ডাক দিলে "তুফান।"

নতুন আনা অশ্বিনীর তাঁতের শাড়ীখানা পরতে পরতে তুফান চমকে উঠলো। এ কণ্ঠস্বর যেন তার পক্ষে এই নতুন শোনা।

উত্তর তার জিহ্বায় এলো না, নির্ব্বাকে বাইরে এসে দাঁড়াতে তিমু তাকিয়ে দেখলে—আজকের সযত্ন প্রসাধন ওর কিশোর দেহ ঘিরে বেশ একটা কমনীয় সৌন্দর্য্যের ঢেউ বইয়ে দিচ্ছে।—মাথার চুলের সেই সুগন্ধ বহন ক'রে সকালের বাতাসও হ'য়ে উঠেছে উতল, আকুল।—

তিমু কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ওর দিকে, তারপরে ব'ললে—

নবদ্বীপ যাবনা, তুফান, ঘরে তালা দিয়ে ও গাঁয়ে যাবো চল্, দিন কতক্যার মতুন—"

তুফানের চোখ দুটো বিস্ময়ে বড় হ'য়ে উঠলো—

"ক্যানহে, তুমার ভাই—?"

অসম্পূর্ণ ওর এ প্রশ্নের উত্তরে তিমু কেঁদে উঠলো ককিয়ে—"

"পালিয়্যাছে, পালিয়্যাছে, আমার যা ছিল সব লিয়্যা—"

কিন্তু কান্না ওর মুখ থেকে বাইরে এলো না, তুফানের হাত-খানা ধ'রে ফেলে নিঃশব্দে জলহীন চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইল, যেন যা কিছু ব'লে ওকে বোঝাবার আশা সে ক'রেছিল, সমস্ত বুঝবার বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে তুফান একা, সেখানে তিমুর যাবার অধিকার নেই, অশ্বিনীরও নয়। বাইরে তালের বনে তখন বাতাস কাঁপছে—মরাবানের জলে সকালের রোদ উঠছে চিক্ চিক্ ক'রে।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য নারী

শ্রীবিশ্বনাথ সেন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

Married Women's Property Act পাশ হওয়ার ফলে প্রতীচ্য নারীর অবস্থা অনেক উন্নত হইয়াছিল(১৮)। প্রথমে অর্থাৎ ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে বিবাহিত নারী তাহার নিজস্ব সকল সম্পত্তি সম্পর্কে সকল প্রকার চুক্তিবদ্ধ হইবার সম্পূর্ণ অধিকার পাইলেন ও আপন স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি, ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত ও অপরের নিকট হইতে প্রাপ্ত ধনসম্পত্তির উপর সম্পূর্ণ ভোগ-দখলের অধিকার পাইলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে উক্ত আইনের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হয় যদ্দ্বারা বিবাহিত নারী আপন সম্পত্তির উপর যথেচ্ছা ভোগদখল ও হস্তান্তরের অধিকার পাইলেন। সর্ব্বশেষে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে উক্ত আইনের আমূল পরিবর্ত্তনের ফলে English Common Law এর Doctrine of Identity সম্পূর্ণ লোপ পায় এবং বিবাহিত নারী তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তির উপর সম্পূর্ণ মালিকানা স্বত্ব পাইলেন(১৯)। কিন্তু তখনও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজনের অবর্ত্তমানে তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে পরস্পরের অধিকার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পার্থক্য ছিল—যথা মৃতা স্ত্রীর সম্পত্তির উপর স্বামীর right of courtesy ছিল। ইহা একপ্রকার জীবন-স্বত্ব কিন্তু মৃত স্বামীর সম্পত্তির উপর স্ত্রীর সেইরূপ কোন স্বত্ব বা অধিকার ছিল না। পরে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে Law of Property Act ও Administration of Estate Act পাশ হইবার ফলে right of courtesy সম্পূর্ণ লোপ পায় এবং মৃত স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রী সমঅধিকার পান। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্ত্রী কোন সম্পত্তির ট্রাষ্টী হইতে পারিতেন না এবং স্বামীর অনুমোদন ব্যতীত কোন ট্রাষ্ট সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার অধিকারিণী ছিলেন না, কিন্তু Law of Property Act পাশ হইবার পর আর সে বিষয়ে কোন বাধাবিঘ্ন রহিল না(২০)।

ইহা ত গেল প্রতীচ্য নারীর কথা। প্রাচ্য নারীর কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এদেশে নারী বহু পুরাকাল হইতে পূজিত। ধর্ম্মের দিক দিয়া আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে ভারতবর্ষের ন্যায় অসংখ্য নারীমূর্ত্তির অর্থাৎ নারীদেবতার কোথায় পূজা হয় না। এদেশে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কালী, দুর্গা প্রভৃতি অসংখ্য দেবীমূর্ত্তির ঘরে ঘরে পূজা হইয়া থাকে। নারীদেহের মধ্যে ঈশ্বরের অবতার দর্শন করা ভারতবর্ষের বিশেষত্ব(২২)। ইহা কি নারীজাতির প্রতি সম্মান নহে? আমাদের দৈনিক পাঠ্যপুস্তকে আমরা পড়ি "স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতা" "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"—"সহস্রন্তু পিতৃর্মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে" ইত্যাদি ইত্যাদি—এই সকল বাক্যরীতির প্রাচুর্য্যে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে এদেশে নারী বহু পুরাকাল হইতে পূজিত। আমাদের দৈনিক পূজাপাঠের মধ্যে আমরা প্রতিদিন পাঠ করি—

"অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং সর্ব্বপাপবিনাশনম্॥

উক্ত পাঁচজন রমণী জনসাধারণের হৃদয়ে দেবীর স্থান অধিকার করিয়াছেন। ভারতবর্ষে বহু স্থানে সীতা, সাবিত্রী, মেনকা প্রভৃতি বহু পুণ্যবতী রমণীর মূর্ত্তি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পূজা পাইতেছে। ভারতবর্ষে নারী কেবল জনসাধারণ কর্ত্তৃক পূজিত নহে; মুনিঋষিগণও নারীজাতির প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখাইয়াছেন। মনুসংহিতায় উল্লিখিত আছে:—

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥ (২৩)

অর্থাৎ যেখানে নারীরা সম্মানিত হন সেখানে দেবতাগণও সন্তুষ্ট থাকেন। যেখানে নারীদিগের অসম্মান হয় সেখানে সকল পুণ্যকার্য্য নিষ্ফল হয়। মনু এ কথাও বলিয়াছেন—

"শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎকুলম্।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা॥ (২৩)

অর্থাৎ যে সংসারে নারীরা দুঃখে জীবনযাপন করেন সে পরিবার সমূলে বিনষ্ট হয়। যে সংসারে নারীরা কষ্ট না পান সেখানে শ্রীবৃদ্ধি হয়। ভারতবর্ষে নারীর এই সম্মানের কারণ (১) নারীর সহিত এদেশে ধর্ম্মের অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক অর্থাৎ ধর্ম্ম-কার্য্যে নারীর সাহায্য ও সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজনীয়তা (২) দ্বিতীয়তঃ, এদেশের রমণীগণের শৌর্য্য-বীর্য্যে পুরুষের সমকক্ষতা।

ধর্ম্মের দিক দিয়া আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, কি যজ্ঞবেদীতে, কি উপাসনায়, নারীর প্রয়োজন সর্ব্বত্র। শাস্ত্রে কথিত আছে "স্ত্রী হি ব্রহ্মা বভূবিথ" "শ্রাদ্ধে যজ্ঞে বিবাহে চ পত্নী দক্ষিণতঃ সদা" ইত্যাদি ইত্যাদি (২৪)। স্ত্রীকে এদেশে ধর্ম্মকার্য্যের জন্য দরকার হয় বলিয়া সহধর্ম্মিণী বলে। রামায়ণে কথিত আছে যে, সীতার পাতালপ্রবেশের পরে রামচন্দ্রকে যজ্ঞার্থে স্বর্ণসীতা নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছিল। আজিও প্রায় প্রতি পূজার সঙ্গে সঙ্গে এদেশে সধবা ও কুমারীর পূজার প্রথা আছে। উহা কি নারী-জাতির প্রতি সম্মানের চিহ্ন নহে?

প্রাচীন যুগে এদেশে নারীগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন; যথা—ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যোবধূ। প্রথম শ্রেণীর নারী উপনয়ন, বেদাধ্যয়ন ও অন্যান্য ধর্ম্মকার্য্যের অধিকারী ছিলেন; দ্বিতীয়

(১৮) Married Women's Property Act 1870, 1882 and 1893.

(১৯) English Law relating to Persons—Sen Gupta, page 92.

(২০) Law of Property Act, 1925, sec. 20.

(২২) India and her People—Swami Avananda pages 61 to 70.

(২৩) মনুসংহিতা ৩ অ ৫৬ ও ৫৭ পৃষ্ঠা

(২৪) ঋক ৪।৩৩।১৯ ও অত্রিসংহিতা ১৩৮.

শ্রেণীর নারী সংসার-ধর্ম্ম করিতেন (২৫)। কাজেই পুরুষের মত নারীর ধর্ম্মকার্য্যে সমান অধিকার ছিল।

নারীর শৌর্য্যবীর্য্যের বিষয় আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, নারী বহুক্ষেত্রে এদেশে অসামান্য বীরত্বের ও সাহসের পরিচয় দিয়াছেন। খনা, জ্যোতিষশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির জন্য, সংযুক্তা, পদ্মিনী, তারাবাই, পান্না, রাণী ভবানী, লক্ষ্মীবাই প্রভৃতি রমণী নিজ নিজ অসীম শক্তি ও বীরত্বের জন্য আজিও প্রতিঘরে শ্রদ্ধা পাইতেছেন! সম্পত্তির দিক দিয়া লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাই যে এ-দেশে Continental Europe-এর ন্যায় কোন Law of Patria Potesta বা England-এর Law of Coverture বা Doctrine of Identity ছিল না। পরন্তু স্ত্রীধন শব্দটি অতি প্রাচীন। উহার অর্থ নারীর নিজস্ব সম্পত্তি। স্ত্রীধনের উপর নারীর সম্পূর্ণ অধিকার এবং কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট কারণ ব্যতীত স্বামীরও কোন মতামত প্রকাশ বা ওজর আপত্তি করা চলে না। স্ত্রীধন সম্পর্কে কোন প্রকার চুক্তি ব্যাপারে ভারত-নারীর পক্ষেও কোন বাধাবিঘ্ন নাই।(২৭)

এতক্ষণ ত ধর্ম্ম ও শৌর্য্যবীর্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভারত-নারীর বিষয় আলোচনা করা গেল। সমাজের দিক্ দিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, বৈদিক যুগে নারী শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ঋগ্‌বেদে আমরা নারীঋষি, ব্রহ্মবাদিনী প্রভৃতি বাক্য-রীতির প্রাচুর্য্য দেখিতে পাই। তাহাতে প্রমাণ হয় যে, শিক্ষা ব্যাপারে নারী কোন অংশে পশ্চাৎপদ ছিলেন না(২৮)। পুরুষের মত নারীরও একদিন উপনয়ন-সংস্কারে পূর্ণ অধিকার ছিল(২৯)। বৈদিক যুগ ছিল নারীস্বাধীনতার সুবর্ণযুগ। কি গুরুগৃহ, কি তর্কসভা, কি আমোদ-উৎসব, কি রাজদ্বার—নারীর গতি সর্ব্বত্র অবিরুদ্ধ ছিল। সহশিক্ষা প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয় কিন্তু বাল্যবিবাহ ছিল না(২৮)

বৈদিক যুগের পর মহাকাব্যের যুগ। এই যুগে ভারতবর্ষে রাষ্ট্র বা State-এর উৎপত্তি হয় এবং সেই সঙ্গে নারীর মর্য্যাদা ক্ষুণ্ন হইল অর্থাৎ ভারতবর্ষে Political ideaর development সঙ্গে সঙ্গে নারীর পূর্ব্বগৌরব অনেক পরিমাণে নষ্ট হইল। এ-কথা সত্য যে, এ-দেশে কোনদিন Law of Patria Protessa, বা Doctrine of Identity প্রচলিত ছিল না কিন্তু নারীর উপর পুরুষের অধিকার এত অত্যধিক জন্মে যে, নারীকে সম্পত্তির সহিত তুলনা করা হইত। রামায়ণে কথিত আছে—হরিশ্চন্দ্র মহর্ষি বিশ্বামিত্রের দানের দক্ষিণা সংগ্রহের নিমিত্ত নিজ পত্নী শৈব্যাকে বিক্রয় করিয়াছিলেন(৩০)। সেইরূপ মহাভারতে কথিত আছে যে, মহারাজ যুধিষ্ঠির কৌরবদিগের সঙ্গে পাশা খেলিতে খেলিতে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া নিজ স্ত্রী দ্রৌপদীকে পণ করিয়াছিলেন(৩১)! কিন্তু নারীর দুঃখের শেষ এইখানে নহে। সমাজে ভারতনারীর অবস্থা ক্রমশঃ এত হীন হইয়াছিল যে, নারী একদিন অতিথিসাহচর্য্যের বস্তু হিসাবে ব্যবহৃত হইত। মহাভারতে কথিত আছে যে, অগ্নিপুত্র সুদর্শন একদা তাহার ভার্য্যাকে উপদেশ দিতেছেন, "প্রিয়ে তুমি কোনদিন অতিথিসেবায় পরাঙ্মুখ হইও না, অতিথি যাহাতে সন্তুষ্ট হয় তুমি অবিচারিত চিত্তে তাহা করিবে।" সেইহেতু ধর্ম্মদেব যখন তাঁহার গৃহে অতিথি হইয়া তাহার পত্নী অম্বাবতীর দৈহিক সাহচর্য্য দাবী করিলেন তখন তিনি ব্যর্থকাম হয়েন নাই এবং সুদর্শনও পরে উহা জানিতে পারিয়া কোন আপত্তি বা অভিযোগ করেন নাই(৩২)। প্রাচীন ভারতে প্রতীচ্য জগতের ন্যায় কোন Matriarchal society বা জননী-বিধিশাসিত সমাজ ছিল না সত্য; কিন্তু নারীর উপর পুরুষের যে অসীম ক্ষমতা ছিল—একথা অস্বীকার করা যায় না। বিবাহ এদেশে বহু প্রাচীন কাল হইতেই সংস্কার,—প্রতীচ্য দেশের ন্যায় চুক্তি নহে। কিন্তু পুরুষের স্ত্রী বর্ত্তমান ও স্বাস্থ্যবতী থাকা সত্ত্বেও একাধিক বিবাহের অধিকার ও প্রথা শাস্ত্রমনোনীত। ইহা ব্যতীত পথে-ঘাটে বিবাহ করা ভারত-বাসীর পক্ষে অন্যান্য সুসভ্য জাতির চক্ষে অদ্ভুত বৈচিত্র্য (৩৩)। প্রতীচ্য দেশে বিবাহ-বিচ্ছেদ-প্রথা বহু পুরাকাল হইতে প্রচলিত; কিন্তু প্রাচ্য দেশে বিশেষ কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্র ব্যতীত নারীর দ্বিতীয় বিবাহ সম্ভব ছিল না (৩৫); তাহার উপর সমাজ ছিল আবার তাহার বিপক্ষে। সমাজ বরাবর চাহিয়াছে ও আজিও চাহে যে হিন্দুবিধবা কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করুক; এমন কি জীবনধারণের নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুও অনেক প্রতিহার করুক।

(২৫) সংস্কাররত্নমালা—১-৬-৭।

(২৬) আর্য্যনারী—শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন

(২৭)—Mulla—Hindu Law—Chapter X

(২৮)—প্রাচীনযুগে নারী—ডাঃ শ্রীমতী রমা চৌধুরী—১৩৫২, শারদীয়া যুগান্তর

(২৯) উপনিষদ—বৃহদারণ্যক—(২-৪-১)

(৩০) রামায়ণ—শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, আদিকাণ্ড—১১ পৃষ্ঠা

(৩১) মহাভারত—কালীপ্রসন্ন সিংহ, সভাপর্ব্ব—১১১ পৃঃ।

(৩২) মহাভারত—শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ
অনুশাসনিক পর্ব্ব ১১৮৭ পৃষ্ঠা—শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন
অনুশাসনিক পর্ব্ব ১৮৪০ পৃষ্ঠা

"Not only there was an exchange of women but husbands enjoined upon wives the duty to respect guest in all possible ways—one of the ways recommended being to give sexual satisfaction. Rights of women under Hindu Law—Gharpure page 8.

(৩৩) মহাভারতে কথিত আছে, ভীম জঙ্গলের মধ্যে হিড়িম্বা নামক রাক্ষসীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, অর্জ্জুনও মণিপুরে গিয়া সেখানকার রাজকন্যা উলুপীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সেইরূপ কালিদাসের 'শকুন্তলা'য় কথিত আছে যে, দুষ্মন্ত মৃগয়া করিতে আসিয়া শকুন্তলাকে বিবাহ করেন।

(৩৫) নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।
—Narad XII, 97 and Parasara IV, 27

হিন্দুবিধবার দ্বিতীয় বিবাহের কথা দূরে থাকুক, কোন বয়োজ্যেষ্ঠ কুমারী কন্যা ঘরে থাকে ইহাও সমাজ সহিতে পারিত না। ইহার ফলে অনেক সময়ে অনেক কন্যার অবিভাবককে সমাজের তাড়নায় বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্ত ব্যক্তির হস্তে কন্যা দান করিতে হইত। এখানে একথা বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, সমাজের এই উৎপীড়নের ফলে অনেক পুরুষের বিশেষতঃ কুলীন-সন্তানদিগের সাধারণতঃ দশ-বারটি এমন কি বিশ-বাইশটি পর্য্যন্ত বিবাহ থাকিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, হিন্দুবিবাহ সংস্কার—সেইহেতু ইহার বিচ্ছেদ নাই। তাহার ফলে অনেক ক্ষেত্রে অনেক রমণীকে যথেচ্ছা লাঞ্ছনা এমন কি পাশবিক অত্যাচার সহ্য করিয়াও স্বামীর সাহচর্য্যে থাকিতে হইত—উপায় নাই; এমন কি কখনও কখনও ব্যাধিগ্রস্ত স্বামীকে লইয়া স্ত্রীকে দিন কাটাইতে হইত।

এখন দেখা যাক যে, হিন্দু নারীর দুরবস্থা কি পরিমাণে লাঘব হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রচলিত আইন অনুযায়ী অত্যাচারী, ব্যধিগ্রস্ত স্বামী স্ত্রীর সাহচর্য্য দাবী করিতে পারে না; অর্থাৎ ইংরাজিতে যাহাকে judicial separation বলে হিন্দুনারী সেইরূপ অধিকার দাবী করিতে পারে (৩৬)। বর্ত্তমানে যে সকল বিবাহ Special Marriage Act (Act III of 1872) অনুযায়ী সম্পাদিত হইয়া থাকে English Law of Divorceএর principles অনুযায়ী সে সকল ক্ষেত্রে হিন্দু-দম্পতির বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার আছে(৩৭)। পূর্ব্বে কোন স্বামী স্ত্রীকে বিনা কারণে ভরণপোষণ করিতে অন্যথা করিলে আদালতে রীতিমত মামলা-মোকদ্দমা করিয়া তাহার প্রতিকার করিতে হইত। বর্ত্তমানকালে ঐরূপ কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে Code of Criminal Procedureএর ৪৪৮ ধারা অনুযায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার বিচার করিতে পারেন। বিধবাবিবাহ আইন পাশ হইবার ফলে ভারতবর্ষে স্থানে স্থানে বিধবাবিবাহ-সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে(৩৮) এবং প্রতি বৎসর বহু পতিহীন নারী বিশেষতঃ বাল্য-বিধবার পুনর্ব্বিবাহ হইয়া থাকে। স্ত্রীধন এদেশে বহু পুরাকাল হইতে প্রচলিত; কিন্তু স্বামীর জীবিত অবস্থায় তাহার উপার্জ্জিত সম্পত্তিতে স্ত্রীর কোন বিশেষ স্বত্ব ছিল না; যদি কোন কারণে স্বামী দুরবস্থায় পড়িলে কোন মহাজন তাহার উপর নালিশ রুজু করিতেন, তাহা হইলে সমস্ত সম্পত্তি নিলামে চড়িত। Married Women's Property Act(৩৯) সর্ব্ব প্রথমে হিন্দু নারীদিগের উপর কার্য্যকারী ছিল না। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের পরিবর্ত্তনের ফলে যে কোন জীবনবীমার Policy স্ত্রীর নামে nominee করা থাকিলে কোন মহাজন তাহার উপর ক্রোক দিতে পারে না(৪০)। এখানে একথা বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, Provident Fund আইন অনুযায়ী মৃত স্বামীর সঞ্চিত অর্থের উপর স্ত্রীর দাবী সর্ব্বপ্রধান। Transfer of Property Act অনুযায়ী যদি কোন স্ত্রীর কোন সম্পত্তির উপর ভরণপোষণের অধিকার থাকে, তাহা হইলে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় হইলেও ক্রেতাকে উক্ত দায় সহিত সম্পত্তি লইতে হয়।

(৩৬) Dular Kuari—vs—Dwarin 34 Cal 971 See also 5 w. R 235, 27 All 96. 6 All 78

(৩৭) Hindu Law—Mullah, page 510.

(৩৮) Hindu Widows' Re-marriage Act, Act XV of 1856.

(৩৯) Act III of 1874.

(৪০) Sec. 60 of the Civil Procedure Code Act V of 1 08).

স্মরণে*

শ্রীরমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মানুষ মরিয়া যায় লোকে ভোলে তারে।
মাটির মানুষ যেবা তার আয়ু কত?
পঞ্চাশ ষষ্টিতে শেষ, যতনা যাহারে
মৃত্যুরে এড়াতে চাও, চেষ্টা কর কত।
কিন্তু আছে হেন জন মরিয়া না মরে,
দেহ বটে হয় লীন পঞ্চভূত মাঝে।
স্মৃতিখানি তার কেহ রাখে প্রীতিভরে
সাদরে বাঁচায়ে গৃহে সন্ধ্যা দেয় সাঁঝে।
সেজন অমর হয় এ মর জগতে।
সেইরূপ অমরতা লভিয়াছ তুমি
কর্ম্মযোগে জ্ঞানযোগে জীবনের পথে;
মৃত্যুদিনে স্মরি তাই, স্মরে জন্মভূমি।
কর্ম্মী ছিলে ধর্ম্মী ছিলে নম্র ব্যবহারে
শাস্ত্রবিদ্ ভট্টাচার্য্য আচারে বিচারে।

* [illegible] বার্ষিকী উপলক্ষে।

পরাজয়

আশা দেবী

জীবনের সাথে বার বার যুঝে
আজ বুঝি পরাজয়
চেন নাই তুমি নিজেরে আজিও
শক্তি করেছ ক্ষয়।
তোমার আকাশে এলো না মাধবী
ব্যর্থ বাসর নিশি,
মধু গুঞ্জনে হোল না মুখর
স্তব্ধ সকল দিশি।
শ্রাবণ-ধারায় হোল না সরস
তোমার ঊষর মরু,
মুকুলিত শাখা করে হাহাকার
নীরব শুষ্ক তরু।
মহাকাল আঁকে সুদূর নভেতে
প্রলয় রক্তলিখা,
আলোহীন পথে জ্বালাও হে রথী
আশার প্রদীপশিখা।

বিন্ধ্যগিরি-শিরে

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

কে যেন একটি অজ্ঞাতকুলশীল লোক রাতারাতি পৃথিবীময় পরিচিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার কাহিনী প্রবাদের মত প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। যুক্ত প্রদেশান্তর্গত ক্ষুদ্র বিন্ধ্যাচল একদিনের একটি ঘটনায় সমগ্র ভারতবর্ষের লোকের চোখে দেদীপ্য হইয়া উঠিয়াছে। কংগ্রেসের সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারমানসে বিন্ধ্যাচলে গিয়াছেন এবং বিন্ধ্যাচল পর্ব্বতের শিরোদেশে সুনির্জ্জন একটি পর্ব্বত-বাটিকায় অবস্থিতি করিতেছেন। রাষ্ট্রপতির উদ্দেশে প্রেরিত শত সহস্র পত্র, টেলিগ্রাম ক্ষুদ্র বিন্ধ্যাচলের অতি-ক্ষুদ্র পোষ্টাফিসকে হিমসিম করিয়া ফেলিতেছে। রাষ্ট্রপতির নির্দ্দেশ ও আদেশ গ্রহণ জন্য ভারতের সমস্ত প্রদেশের কংগ্রেসকর্ম্মীকে অবজ্ঞাত ও অখ্যাত বিন্ধ্যাচলে ছুটিতে হইতেছে। কর্ম্ম-চাঞ্চল্যহীন, অলস ও শান্ত বিন্ধ্যাচল আজ অকস্মাৎ অত্যন্ত সজীব ও কর্ম্ম-চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

বসিয়া (বাম দিক্ হইতে) রাষ্ট্রপতি ; শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার। দাঁড়াইয়া (বাম দিক্ হইতে) পণ্ডিত ব্রহ্মদত্ত দীক্ষিত ; ডক্টর মজুমদার এবং শ্রীকুন্দা প্রসাদ।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলের মেন্ লাইনের মানচিত্র ও গাড়ীর সময়পঞ্জী খুলিলে বিন্ধ্যাচলের অবস্থিতি জানা যাইবে। মোগলসরাই অতিক্রম করিয়া দিল্লীর দিকে যে রেলপথ বিস্তৃত, মোগল-সরাইয়ের পর ডাক গাড়ী থামে যে ষ্টেশনে, সেই ষ্টেশনের নাম মির্জ্জাপুর, হাওড়া হইতে ৪৫৮ মাইল। ইহার পরের ষ্টেশন, বিন্ধ্যাচল, ৪৬২ মাইল। বিন্ধ্যাচলে ডাকগাড়ী ও দ্রুতগামী এক্সপ্রেস ট্রেণ থামে না, তাই বিন্ধ্যাচল-যাত্রী মির্জ্জাপুরে নামিয়া একা, টঙ্গা, ঘোড়ার গাড়ী বা মোটর লইয়া থাকেন। দূরত্ব ৫ মাইল মাত্র, একা আধঘণ্টায় পৌঁছাইয়া দিতে পারে। রেল মির্জ্জাপুর অতিক্রম করিবার পরেই সুষ্ঠু সেতু-স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন একটি সেতু দেখিতে পাওয়া যায়, ওজলা সেতু তাহার নাম ; ক্ষীণাঙ্গী ওজলা নদী যেখানে পুণ্যসলিলা উত্তরবাহিনী ভাগীরথীর বক্ষে আত্মসমর্পণ করিয়া তটিনীজীবন সার্থক করিয়াছে, ব্রিজটি সেই স্থানে অবস্থিত। এই ব্রিজের উপর দিয়া যাত্রীকে বিন্ধ্যাচলে যাইতে হয়। ট্রেণযাত্রী এই সেতুটির সৌন্দর্য্য যতখানি চাক্ষুষ করিতে পারেন, [illegible] যাত্রীকে তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। রেলের সেতু আর ওজলা ব্রীজ, দুইটি পাশাপাশি দাঁড়াইয়া

আছে। একটি বৈচিত্র্যহীন 'সাদা মাটা,' অপরটি কারুশিল্পের শোভায় বিমণ্ডিত। কথিত আছে, এক ব্যক্তি তুলার জুয়ায় একদিনে বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়া, জুয়াপাপের খণ্ডন মানসে সমুদয় অর্থব্যয়ে এই সুদৃশ্য সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিল। জুয়ার সঙ্গে পাপের সংস্রব অনেকেই স্বীকার করিতে চাহিবেন না, ইহা আমি জানি; কিন্তু বিশ্বের লোকের নীতিজ্ঞান সর্ব্বকালে অথবা সর্ব্বদেশে জড়বৎ স্থির ও নিশ্চল নহে। দেশভেদে, কালভেদে, পাত্রপাত্রীভেদে তারতম্য ঘটিয়া থাকে। জুয়ায় লক্ষাধিক মুদ্রা লাভ করিয়াও সেই ব্যক্তির পাপের ভয় ঘুচে নাই, প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হইয়াছিল।

বিন্ধ্যাচলকে অজ্ঞাত, অখ্যাত স্থানের পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া আমি ভুল করিয়াছি। তীর্থকামী হিন্দু নর-নারীর নিকট বিন্ধ্যাচল যথেষ্ট সুপরিচিত। কোন্ হিন্দু না জানেন যে, দক্ষযজ্ঞান্তে বহুধাবিখণ্ডিত সতীদেহের একাংশ এই বিন্ধ্যাচলে পতিত হইয়াছিল এবং তদবধি বিন্ধ্যাচল পীঠস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ! শতাব্দীর পর শতাব্দী আসিয়াছে গিয়াছে, তীর্থযাত্রী বিন্ধ্যবাসিনীকে রক্তবস্ত্র ও সতীর সিন্দুর দান করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছেন, হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী কোন্ ব্যক্তি তাহা না জানেন?

বিন্ধ্যগিরির ঐতিহাসিকতা আমাদের পুরাণাদি প্রাচীন গ্রন্থাদিতে সপ্রমাণ রহিয়াছে। আমাদের অধুনালুপ্ত 'ানদি' ঠাকুরমা'রা অগস্ত্যমুনির সমুদ্রযাত্রার অছিলায় বিন্ধ্যপর্ব্বতের শিরোনমনের গল্প বলিতেন, অনেকের তাহা মনে থাকিতেও পারে। উপকথাটি অতি মনোমদ। বিন্ধ্য বড় দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে: তাহার চূড়া স্বর্গের দ্বারদেশে আসিয়া ঠেকিতেছে, আর একটু বাড়িলে স্বর্গের দেবতারা সূর্য্যের আলো ও মলয়ের অনিল হইতে চির-বঞ্চিত হইয়া পড়িবেন, এমন আশঙ্কা দেখা গিয়াছে। তাঁহাদের দুশ্চিন্তার অন্ত নাই। আলোবাতাসহীন স্বর্গলোকে বাস করিতে হইলে দেবদেবীগণ রোগাক্রান্ত হইবেন, স্বর্গ নরকতুল্য হইয়া পড়িবে, দেবসমাজ ভীত, বিচলিত। পরামর্শ করিয়া দেবতারা বিন্ধ্য-গিরির গুরু অগস্ত্যমুনির শরণ লইলেন; বিন্ধ্য যাহাতে আর না বাড়িতে পারে তাহা করিতে বলিলেন। অগস্ত্য বিন্ধ্যাচলের উদ্দেশে গমন করিলেন। দেব-দ্বিজ-গুরু পুরোহিতে ভক্তিমান্ বিন্ধ্য গুরুদর্শনে অবনতমস্তকে প্রণত হইবামাত্র, গুরু অগস্ত্য 'সমুদ্র দর্শন করিয়া আসি' বলিয়া অকস্মাৎ প্রস্থিত হইলেন। গুরু আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করেন নাই, সমুদ্রদর্শনান্তর ফিরিয়া আসিয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন—এই ভরসায় বেচারা বিন্ধ্য মাথা নত করিয়াই রহিল। কিন্তু গুরু আর ফিরিলেন না, বিন্ধ্যও আর মাথা তুলিতে পারিল না। অগস্ত্যযাত্রার ইতিবৃত্ত এই। বোধ করি, সেদিনটা মাস-পয়লা ছিল, তাই আজও মাসের প্রথম দিনটি হিন্দুমতে অগস্ত্যযাত্রা—যাত্রা নিষিদ্ধ। বিন্ধ্য-গিরির বৃদ্ধি অবরুদ্ধ হইল, দেবতারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। ইত্যবসরে, হিমালয় উচ্চতায়, শোভায়, সৌন্দর্য্যে বিন্ধ্যকে হারাইয়া টেক্কা দিয়াছে। আমাদের ভূ-বিদ্যাবিশারদগণ বলিয়া থাকেন, সৃষ্টি যে-দিন জল ও স্থলের সংস্পর্শ লাভ করিয়াছে, বিন্ধ্য তখনও পর্ব্বত ছিল, আজও আছে, অথচ আজিকার হিমালয় এই কোটী কোটী বর্ষ মধ্যে অন্ততঃ তিনবার সাগরগর্ভে সলিল-সমাধি লাভ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীমাতা আনন্দময়ী।

পীঠস্থান বিন্ধ্যাচলে দুইটি মন্দির দেখা যায়। একটি বিন্ধ্যগিরির উপরে, অপরটি সমতলভূমিতে, গ্রামাভ্যন্তরে। পাণ্ডাকুল বলেন, পূর্ব্বে দেবী বিন্ধ্যবাসিনী গিরিশিরেই অবস্থিতি করিতেন, হিন্দুবিদ্বেষী মুঘল সম্রাট্ ঔরঙ্গজীবের রাজত্বকালে, বিন্ধ্যবাসিনী দেবীকে গিরি-শির হইতে নামাইয়া আনিয়া গ্রামের ভিতরে মন্দিরে লুকাইয়া রাখিতে হয়; তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণই দেবীর বাসস্থান পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিলেন। মুঘল সম্রাট্ ঔরঙ্গজীব মথুরার কিষণজীর মন্দিরের দুর্দ্দশা করিয়াছিলেন। পুণ্য বারাণসীর বিশ্বনাথের মন্দিরও তাঁহার রোষানলে ভস্মীভূত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। সম্পূর্ণরূপে সফল-মনোরথ না হইতে পারিয়া ঔরঙ্গজীব বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের পার্শ্বে এক বিরাট গগনচুম্বী মসজিদ বানাইয়া বিশ্বেশ্বরের দর্প চূর্ণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন উত্তরকালে এই মসজিদ সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান হিন্দুদের কল্যাণে 'বেণীমাধবের

ধ্বজা' নাম পরিগ্রহ করিয়াছে); বিন্ধ্যবাসিনীর বিলোপ সাধনেরও আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল। বিন্ধ্যদেবীর 'প্রত্যক্ষ সন্তান' পাণ্ডারা দেবীকে পাহাড়ের মন্দির হইতে আনিয়া গ্রামের ভিতরে জাহ্নবীর সন্নিকটে এক মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ঔরঙ্গজীব এই নূতন মন্দিরের সন্ধান পান নাই বলিয়া দেবী অক্ষত-কলেবরে থাকিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পাহাড়ের মন্দিরটি শূন্য থাকে—ইহাও পাণ্ডাদের পক্ষে ক্ষতিকর। তাহারা সেই মন্দিরে অষ্টভুজা দেবীকে স্থাপিত করিয়াছে। অষ্টভুজা পাণ্ডাদের মতে দুর্গাদেবীর নামান্তর এবং রূপান্তর। পার্থক্য, দুর্গাঠাকুরাণীর দশ হাত, অষ্টভুজার হস্ত আটটি। পাণ্ডারা এই অসাম্যের অনেকরকম অর্থ ও কৈফিয়ৎ দিয়া থাকে। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে তাহা একান্ত অপ্রাসঙ্গিক।

জঙ্গীলাল-কি বৈঠক

আরও এক কারণে অপ্রাসঙ্গিক। এখানকার পাণ্ডাদের ভক্তি বা শ্রদ্ধার চোখে কয়জন দেখিতে পারেন—আমি জানি না; তবে তেমন লোক কেহ যদি থাকিয়াও থাকেন (নিশ্চয়ই আছেন, নতুবা যুগ যুগান্তর ধরিয়া ইহারা তীর্থ-গুরুগিরি ফলাইল কাহার উপরে ?) তাঁহাদের দৃষ্টি ভক্তির প্রগাঢ় কাজলে নিশ্চয়ই আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা পুণ্যবান্ ও পুণ্যবতী, তাহাতে সন্দেহ নাই; তাঁহাদের অক্ষয় ও অব্যয় স্বর্গবাস কামনা করিতে আমি বাধ্য। সেই সঙ্গে, লেখকের চিত্ত ভক্তিরসলেশশূন্য এ-কথা না বলিলেও সত্যের অপলাপ হয়। ব্যবসায়ের নীতি-শাস্ত্রে ব্যবসায় বিস্তৃতি ব্যবসায়িক উন্নতির উদাহরণ, ইহা বোধ করি না বলিলেও চলে। একটি মন্দির—বিশেষ করিয়া পুণ্যতোয়া ভাগীরথির উপকূলবর্ত্তী পবিত্র-অঙ্গ বিন্ধ্য পর্ব্বতোপরি সুদৃশ্য মন্দিরটি খালি পড়িয়া থাকা ব্যবসায়ের পক্ষে ক্ষতিকর। ব্যবসায়ী লোক ব্যবসার ক্ষতি বরদাস্ত করিতে পারে না; ব্যবসায়ের প্রসারতা বর্দ্ধনই তাহার কাম্য। শূন্য মন্দিরে অষ্টভুজা দেবীর অধিষ্ঠান ব্যবসা সম্প্রসারণের নীতি-প্রসূত বলিয়াই লেখকের বিশ্বাস। আর সত্য কথা বলিতে হইলে ইহাও বলিতে হয়, ইহাতে দোষই বা কি ? ব্যবসা বাড়াইতে না চাহে কে ?

একবার এক মিউনিসিপ্যাল বাই-ইলেক্‌সানে একটি পাণ্ডা মহাশয় দিনে-দুপুরে একটি লোকের মাথা একটি নিমিষে দাঁড়াসার একটি আঘাতে ধাঁ করিয়া কাঁধ হইতে নামাইয়া দিলেন, আমি তখন সেই দেশে ছিলাম। স্কন্ধচ্যুত লোকটার অপরাধ ছিল না, এমন কথা আমি বলি না। তবে অপরাধের তুলনায় সাজাটা কিঞ্চিৎ গুরুতর হইয়াছিল, আমার ক্ষুদ্র বাঙ্গালী-বুদ্ধিতে এইটুকু ভাল রূপেই বুঝিয়াছিলাম। স্থানীয় লোকেরা আমার সঙ্গে তুমুল তর্ক করিয়া আমার মতপরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়াছিল, পারে নাই। মাথা-কাটা লোকটার অপরাধ এই যে, সে নাকি ইলেক্‌সানের আগে বংশীধারীকে ভোট দিবে না বলিয়াছিল কিন্তু ভোটের দিনে অসিধারীর পরিবর্ত্তে সেই বংশীধারীকে ভোট দিয়া, ফুলের মালা গলায় পরিয়া, প্যাঁড়া চিবাইতে চিবাইতে ফিরিতেছিল, এমন সময় অসিধারীর জনৈক সাকরেদ একখানি দাঁড়াসা দিয়া তাহার মাথাটা কচাং করিয়া কাটিয়া দিল। গলার গাঁদার মালা গলাতেই র'হল, প্যাঁড়াগুলাও বুঁঝ বা হাতেই থাকিয়া গেল, মাথাটা কেবল স্থানচ্যুত হইয়া গিয়াছিল। এই ঘটনার ফলে একটা যে খুব হৈ চৈ পড়িয়া গেল, তা'ও নহে। মন্দিরে একটা পাঁঠা বলি পড়িলে যতটুকু গণ্ডগোল হয়, তার বেশী কিছুতেই নহে। অতীতকালের তীর্থযাত্রীদের তিক্ত অভিজ্ঞতার বিবরণ যতটুকু পাওয়া যায়, তাহাতেও দেখা যায় যে, অত্যুগ্র স্বর্গকামী ব্যতিরেকে বিন্ধ্যাচলে বিশেষ কেহ আসিত না। আসিত তাহারা—বরং দলে দলে ও কাতারে কাতারে আসিত তাহারা, যাহারা কাপড়ের এক খুঁটে চানা, অপর খুঁটে ফুল ও পাবলা এবং কচ্ছদেশে রেলের টিকিটের টানাটানি-দরের ভাড়াটা লইয়া চিরদিন তীর্থক্ষেত্র ধন্য করিতে আসে, তাহাদের ভয়ের কোন কারণ ছিল না। তাহারা না আসিবে কেন ?

আমরা শুনিয়াছি, বঙ্গদেশাগত দুইটি বঙ্গসন্তান—তন্মধ্যে একজন পালোয়ান, লাঠিয়াল, ভাগ্যান্বেষণে এই দেশে আসিয়া ছলে-বলে কৌশলে কিঞ্চিৎ শান্তিস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমরা যে-কালের কথা বলিতেছি, সে-কালে বাঙ্গালী ভারতবর্ষের কোনও প্রদেশে কাহারও চক্ষুঃশূল ছিল না। রাজা (অর্থে গভর্ণমেন্ট)ও শূলে চড়াইতেন না, দেশোয়ালীও পিঠমোড়ায় বাঁধিয়া মশানে লইয়া যাইতে উদ্যত হইত না। 'শক্তের ভিজ্যুৎ মুক্ত' বলিয়া একটা কথা আছে,

বঙ্গভ্রাতৃদ্বয় সে মর্য্যাদাও পাইয়াছিল বলিয়া শোনা যায়। তাহাদের একজনের লাঠির মোহড়া ধরিবার সাধ্য তল্লাটের লোকের ছিল না।

এ পর্য্যন্ত দোষের কথাই বলিয়াছি, গুণের কথা কিছু বলা দরকার। বিন্ধ্যাচলের কূপ ও কুণ্ডের জল অমৃত। সমুদ্রমন্থনে সুধা ও গরল দুইই উঠিয়াছিল এবং সেইখানেই ভাগ বাঁটোয়ারা হইয়া গিয়াছিল, এইরূপ জনপ্রবাদ। আমার মনে হয় দিগন্তবিস্তৃত বিন্ধ্যপর্ব্বতের অধিবাসী কোন দেবতা বা মুনি-ঋষি খানিকটা সুধা কাহাকেও না বলিয়া চুপে চুপে সংগ্রহ করিয়া আনিয়া বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী কূপ-কুণ্ডাদিতে জমা রাখিয়াছিলেন। হোমিওপ্যাথী-বিজ্ঞানের প্রক্রিয়ায় ডাইলিউসনে ক্রম পর্য্যায়ে অমৃতের গুণ হ্রাস না পাইয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং আজও, কল্পান্তকালেও অব্যাহত রহিয়াছে। পনেরো কুড়ি বৎসর আগে প্রবন্ধ-লেখক ভারত ভ্রমণ প্রায়শঃ সমাপন করতঃ যখন ভবঘুরের মত ঘুরিতে ঘুরিতে বিন্ধ্যাচলে আসিয়া অচল হইয়াছিলেন তখন ডক্টারবাবুর সহযোগিতায় কূপ কুণ্ডের বারি বিশ্লেষণে যথেষ্ট যত্ন লওয়ার ফলে প্রমাণিত হইয়াছিল যে (১) লাঙ্গা-বাবার জল বহুমূত্রে; (২) কালি কুয়ার জল অজীর্ণ রোগে; (৩) সীতাকুণ্ড উদরাময়ে; (৪) ব্রহ্মকুণ্ড হৃদ্রোগে বিশেষ উপকারী। দুঃখের বিষয়, প্রসিদ্ধ ডক্টার বাবু (শ্রীযুক্ত কুমুদ কান্ত) আজ পরলোকে, তাঁহার সহকারী সন্তোষ ঘোষ জঠরাগ্নির সমিধান্বেষণে স্থানত্যাগী, জলপরীক্ষার ফল বিন্ধ্যাচলে দেখিতে পাওয়া যায় না বটে; তবে কলিকাতার ট্রপিক্যাল স্কুল অফ মেডিসিনের খাতাপত্রে নকল থাকিলেও থাকিতে পারে। ১৯২৫ সালে লেখকের পরিবারে বেরিবেরির একটা প্রবল বন্যা আসিয়াছিল। তাহার দুর্নিবার বেগে পক্ষকাল মধ্যে তিনটী প্রাণী ভাসিয়া যায়। বাকাগুলির অবস্থাও সঙ্গেমিরে হইয়া উঠে। লেখকের পত্নী, লেখকের দুই ভ্রাতা ও লেখক স্বয়ং যমরাজার সঙ্গে বাঁও কসাকষি করিতে করিতে, কবিরাজশিরোমণি (এক্ষণে স্বর্গীয়) শ্যামাদাস বাচস্পতির পরামর্শে বিন্ধ্যাচলে গিয়া সে যাত্রা মহিষবাহন শমনের আহ্বান নিষ্ফল করিতে পারিয়াছিলেন। লেখকের গৃহিণীকে আরামকেদারায় বসাইয়া ট্রেণে তুলিতে হইয়াছিল। তিন দিনের দিন তিনি হাঁটিয়া এক মাইল দূরবর্ত্তী পাহাড়ে উঠিতেও পারিয়াছিলেন। তদবধি বিন্ধ্যাচলকে আমরা প্রণয় বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলাম।

এবারকার ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসের "কুইট্ ইণ্ডিয়া" প্রস্তাবের অব্যবহিত পরে যে কারাবাস, প্রায় তিন বৎসর পরে যখন তাহার অবসান হইল, তখন দেখা গেল—নেতৃবৃন্দের লোহার দেহও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এবারকার মত কঠোরতা ইতঃপূর্ব্বে কদাচিৎ দৃষ্ট হইয়াছিল। সে-কথা পরে বলিব। আমেদনগর ফোর্ট হইতে বাঁকুড়া হইয়া রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ যখন কলিকাতায় আসিলেন তখন যাহা দেখা গেল, তাহাকে কায়ার পরিবর্ত্তে ছায়া বলাই সঙ্গত। বিধানচন্দ্র রায় মহাশয় চিকিৎসা করিয়া খাড়া করিলেন বটে কিন্তু ভাঙ্গা মন্দির ভাঙ্গিতেই চলিল।

১৯৪২ হইতে ১৯৪৫-এর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত আমেদনগর ফোর্টে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রায় সমস্ত সদস্যই আবদ্ধ ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে এই কারাভ্যন্তরে একটির পর একটি করিয়া মর্ম্মন্তুদ বিয়োগবার্ত্তা আসিয়া পৌছিতে থাকে। প্রথমে আসিল, গান্ধীজীর দক্ষিণ হস্ত সুস্থদেহ মহাদেও দেশাইয়ের মৃত্যুসংবাদ। তাহার পরই কস্তুরবা গান্ধীর আগাখাঁর প্রাসাদাভ্যন্তরে বন্ধদশায় শেষ নিঃশ্বাসত্যাগের সংবাদ আসিয়া পৌছিল। মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ কর্ম্মী সত্যমূর্ত্তির মৃত্যু, সিন্ধুর জনপ্রিয় প্রধান মন্ত্রী আল্লাবক্সের অপমৃত্যু; এ-যেন একটির পর একটি অঙ্গের বিলোপ ঘটিতেছে। রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সহধর্ম্মিণীর বিয়োগবার্ত্তাও এই আমেদনগর ফোর্টের ভিতরে সংবাদপত্র মারফৎ আসিয়া পৌছে। শুনা গিয়াছিল, বেগম আজাদ একবার, জীবনের সাধ—শেষবার তাঁহার পৃথ্বীবিখ্যাত স্বামীর দর্শন কামনায় সরকার বাহাদুরের নিকট করুণ আবেদন করিয়াছিলেন। বেগম সাহেবা অপরাধী স্বামীর
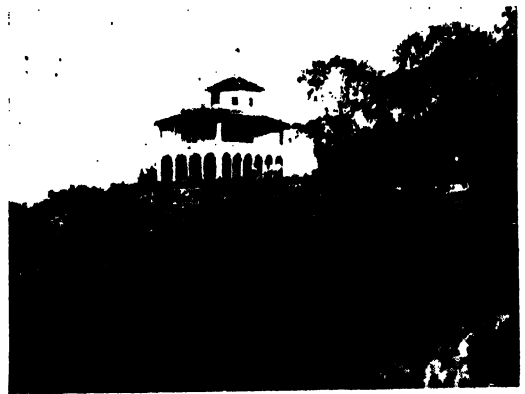
মাতা আনন্দময়ী আশ্রম

মুক্তি যাচ্ঞা করেন নাই—কেনই বা করিবেন?—সারাজীবনই ত' অবিচ্ছিন্ন বিচ্ছেদ যাতনা সহিয়াছেন, আজ অকস্মাৎ বিরহ-কাতরহৃদয়ে পতির মুক্তি চাহিবেন কেন? একবার, শেষবার, ইহকালের ও ইহলোকের ইষ্টদেবতাকে চিরবিদায় লইবার পূর্ব্বে শেষ দেখা দেখিতে চাহিয়াছিলেন।

হায়, পরাধীন দেশের হতভাগিনী নারী, শেষ কামনাটি বুকে লইয়া, অতৃপ্ত বক্ষের শেষ নিঃশ্বাস মোচন করিতে হইল। অনেক দিন পরে দিল্লীর আইন সভায় সরকার বাহাদুর একটি বিবৃতি দান করিয়া শ্রোতৃবর্গের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করতঃ বলিয়াছিলেন, আমরা একখানি এরোপ্লেন খাড়া

মির্জ্জাপুরী পাণ্ডা।

রাখিয়াছিলাম, মৌলানা সাহেবকে আমেদনগর হইতে কলিকাতায় লইয়া যাইবার জন্য। দুঃখের বিষয় বেগম আজাদ তৎপূর্ব্বেই দেহরক্ষা করিলেন। মধুর এই কথাগুলি! শুনিতে বেশ লাগিল। কিন্তু বিচারে টিঁকিবে কি? আমাদের যতদূর মনে আছে বেগম সাহেবা মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি (১৯৪৩) অসুস্থ হইয়া পড়েন। প্রথম দিকে তিনি কাহাকেও খবর দিতে চাহেন নাই; মৌলানা সাহেব যাহাতে না জানিতে পারেন তজ্জন্য আত্মীয়স্বজন সকলকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধও করিয়াছিলেন। কিন্তু অবস্থা যখন দ্রুতগতিতে মন্দের দিকেই ধাবিত হইল, তখন ভারতবর্ষীয় সরকার বাহাদুরের নিকট একখানি অশ্রুসজল লিপি না পাঠাইয়া আর পারিলেন না। আমরা শুনিয়াছিলাম, এমন প্রস্তাবও করা হইয়াছিল যে, কলিকাতায় ত কারাগারের অভাব নাই, মৌলানাকে কলিকাতার কোন কারাগারে স্থানান্তরিত করা হউক। আমরা আরও শুনিয়াছিলাম, বেগমের চিকিৎসকও ভারত সরকার বাহাদুরকে বেগম সাহেবার দুরারোগ্য অবস্থার কথা জানাইতে ত্রুটী করেন নাই। এই চিকিৎসকও যে-সে লোক নহেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁহার তুল্য যশঃস্বী ব্যক্তি ভারতবর্ষে ত নহেই, অধুনা অন্য কোনও দেশে আছেন কি না সন্দেহ। বিধানবাবুর মত সর্ব্বস্তরে ও সর্ব্বাবস্থায় আস্থাভাজন ব্যক্তির কথাতেও সরকার বাহাদুর আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। পারিলে, মার্চ্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ অন্ত পর্য্যন্ত একখানি এরোপ্লেন জুটিল না, রেলের গাড়ীর ভিতরে একটি সিট মিলিল না, আর মিলিল তখন, যখন এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ অন্তে বেগমের প্রাণবায়ু অনন্তে বিলীন হইল, তখন! এই উপকথায় বিশ্বাস করিয়া সরকার বাহাদুরের বদান্যতার তারিফ করিবে, বড়লাট সাহেবের শাসন পরিষদের সদস্য ব্যতিরেকে এমন লোক এই বুদ্ধিহীন ভারতবর্ষেও বিরলাধিক বিরল।

পত্নী বিয়োগের পরে মৌলানা সাহেবের এক ভগ্নী-বিয়োগের সংবাদও ঐ আমেদনগরেই পাওয়া যায়। তারপর, যে কথা বলিতেছিলাম, কিছু কম তিন বৎসর পরে মৌলানা সাহেব যখন জরাজীর্ণ দেহে জীবনসঙ্গিনীবিহীন, শূন্য, অন্ধ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখনই ভগ্ন মন্দির সংস্কারের বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার সুযোগ ছিল না, সিমলা নাটকের অভিনয় অত্যাসন্ন। বড়লাট লর্ড ওয়াভেল প্রথমে শিবহীন দক্ষযজ্ঞের আয়োজনই করিয়াছিলেন; পরে, গান্ধীজীর পরামর্শে ভ্রম সংশোধন না করিয়া পারিলেন না। রাষ্ট্রপতিকে জীর্ণদেহ টানিয়া সিমলা শৈলে আরোহণ করিতে হইল। সিমলার পর, বিশ্রাম লাভাশায় কয়েকদিন ভূস্বর্গ কাশ্মীরে অবস্থান করিতে না করিতে বোম্বাইয়ে ওয়ার্কিং কমিটি ও এ-আই-সি-সির আহ্বান আসিল। বোম্বাই হইতে যখন কলিকাতায় ফিরিলেন, তখন ভাঙ্গা আরও ভাঙ্গিয়াছে। বিশ্রাম না লইলে নয়।

রাষ্ট্রপতি বিশ্রামলাভার্থ কলিকাতার বাহিরে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে গমনাভিলাষ করিয়াছেন, সংবাদ প্রচার হইতে বিলম্ব হইল না। ভারতবর্ষে যতগুলি স্বাস্থ্যপ্রদ স্থান আছে, সেই সমস্ত স্থান হইতে তারে, পত্রে, ফোনে ক্রমাগত আহ্বান আসিতে লাগিল। কে না কামনা করে, কে না চাহে যে রাষ্ট্রপতি তাহার আতিথ্য স্বীকার করিয়া ধন্য করেন? এ বিষয়ে কংগ্রেসী অকংগ্রেসী ভেদ নাই— সরকারী চাকুরীর অত্যুচ্চ স্থানাধিকারী এক ভদ্রলোক তাঁহার পার্ব্বত্য কুঞ্জ-ভবনটি রাষ্ট্রপতির ব্যবহারার্থ উৎসৃষ্ট করিবার জন্য যে আকুতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতেই বুঝা গিয়াছিল, মানুষ হিসাবে এই মানুষটি মানুষের মনের মণি-কোঠায় আসন বিস্তার করিয়া আছেন। আমি এক-দিন সন্ধ্যায় সবিনয় নিবেদন করিলাম, বিন্ধ্যাচল। আমার গর্ব্ব ও গৌরবের কথা এই যে, স্নেহময় দাদা আমার

প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া আমাকে মহোচ্চ সম্মানে সম্মানিত করিলেন।

কিন্তু বিন্ধ্যাচল খবরটা হাসিয়া উড়াইয়া দিল। বিশ্বাস করা কঠিন বটে। কাশ্মীর আছে, সিমলা আছে, মহাবালেশ্বর, মুশুরী, নৈনিতাল, ভিমতাল আছে, দার্জ্জিলিং, শিলং, কার্শিয়ং রম্যস্থান কতই ত আছে। সে-সব থাকিতে রাষ্ট্রপতি পল্লী-বিন্ধ্যাচলে আসিবেন কেন! আমার পত্রের উত্তরে তাহারা আমাকে ট্রাঙ্ক কল করিয়া বলিল, এ কি সত্য? আমি বলিলাম, দ্বিতীয় ভাগে পড় নাই, সদা সত্য কথা বলিবে? সত্য—সত্য—সত্য।

তারপর কথাটা যখন সত্য ও প্রত্যক্ষের রূপ ধরিল, তখন আনন্দের একটা প্লাবন প্রবল বেগে ছুটিয়া আসিয়া স্তব্ধ ও নিশ্চল হইয়া গেল। এমন হয়। প্রবল বারির মহোচ্ছ্বাস একটা সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া সেই-খানেই মৃদুমন্দ বায়ুভরে খেলা করিতে থাকে। সে যে তাহার উচ্ছ্বাস সর্ব্বত্র সমানভাবে ছড়াইয়া দিতে পারিয়াছে, সেই আনন্দে মশগুল হইয়া আর ছুটিবার আগ্রহ তাহার থাকে না। ৮ই নভেম্বর ১৯৪৫—মির্জ্জাপুর ষ্টেশন যেন বিবাহের বধূবেশ ধারণ করিল। ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকায়, ফুলে, পাতায়, কার্পেটে, কল কোলাহলে অভাবনীয় সৌভাগ্যের শুভাগমনে গর্ব্বিত আনন্দিত চিত্তে বোম্বাই মেলের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সাধারণতঃ এইরূপ হয়, তাহা জানিতাম; মোগলসরাই ষ্টেশনে কিঞ্চিৎ নমুনাও দেখিয়াছি। অন্ততঃ তিন চার হাজার লোক মোগলসরাইয়ে আমাদের প্রথম শ্রেণীর কামরা 'রেড' করিয়াছিল। মির্জ্জাপুরে দুর্ভাগ্য (!) যে কঠোরতর রূপ পরিগ্রহ করিয়া আছে, তাহা অন্ততঃ আমার আশঙ্কার বহির্ভূত ছিল না। সেইজন্যই আমি পূর্ব্বদিন ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের সর্ব্বাধ্যক্ষ শ্রদ্ধাভাজন সুহৃৎ মিঃ এন, সি, ঘোষকে ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করিয়াছিলাম যে, বোম্বাই ডাক গাড়ীটা দু' মিনিটের জন্য বিন্ধ্যাচলে থামাইয়া দিলে মওলানা সাহেবকে অক্ষতদেহে বিন্ধ্যাচলে পৌঁছাইয়া দিতে পারি। মোগলসরাইয়ের ইয়োরোপীয় ষ্টেশন মাষ্টার কে-এক্ মিঃ মজুমদারকে খুঁজিতে খুঁজিতে ভিড়ে হয়রাণ ও গলদঘর্ম্ম হইয়া আমাদের কামরার নিকট আসিয়া জানাইল যে, জি, এম্, (জেনারল ম্যানেজার) বিন্ধ্যাচলে মেল থামাইতে আদেশ দিয়াছেন। তিনিও তদনুযায়ী নির্দ্দেশ দিতেছেন। মওলানা সাহেব আমাকে বলিলেন, মির্জ্জাপুরের লোকদের নিরাশ করিবে কেন? তাহারা অনর্থক দুঃখ পাইবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি ভিড়ের কষ্ট সহিতে পারিবেন? মওলানা সাহেব কহিলেন, আরে ভেইয়া, যাহারা প্রেমভরে ভিড় করিবে, তাহাদের দুঃখ দিও না।

অগত্যা, ষ্টেশন মাষ্টারকে ধন্যবাদ দিয়া জানাইয়া দিলাম যে, বরাতে দুঃখ থাকিলে খণ্ডন-ক্ষমতা কাহারও নাই।

কথা তাই বটে! মির্জ্জাপুর ষ্টেশন হইতে বাহিরে আসিতে কম করিয়া পঁচিশ মিনিট সময় লাগিল। তাহাতেও হইত কি না সন্দেহ। ডাক্তার বিমলাকান্ত গুটি কয়েক বাছা বাছা গুণ্ডাজাতীয় পাণ্ডা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহারাই বহুবিধ কল-কৌশল অপকৌশল অবলম্বন করিয়া রাস্তা না করিলে, সে বেলা বাহির হওয়া যাইত বলিয়া আমি ত ভরসা রাখি নাই। তারপর মালা পরাইবার ধূম। পূজা বলিব কিম্বা পীড়া বলিব তাহাও ভাবিয়া পাইতেছি না। বৃদ্ধের কণ্ঠে আর স্থান নাই, হাত দু'টিতেও ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই কিন্তু যাহারা বুকে করিয়া এত যত্ন সহকারে মালা আনিয়াছে তাহারা নিরস্ত হইবে কেন! বলা সঙ্গত, দু'চার গাছা আমার অদৃষ্টেও জুটিয়াছিল। "পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভাবে আমি" কি বলেন পাঠিকা ও পাঠক?
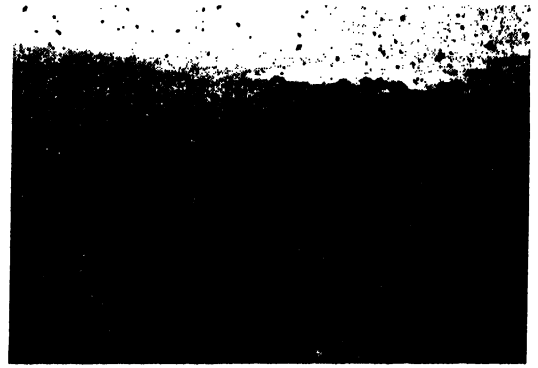
গঙ্গাতীর।

সেই যে কুড়ি পঁচিশ মিনিট সময় আমরা আমাদের ফার্ষ্ট ক্লাশ কামরার দ্বারে দাঁড়াইয়া এই সমারোহ, এই উল্লাস, এই কোলাহল, পূজার্ঘ্য দিবার জন্য এই প্রবল প্রতিযোগিতা দেখিতেছিলাম, এই সকলে চিরাভ্যস্ত মৌলানা সাহেবের মনের কথা কি তাহা বলিতে পারি না বটে, আমার নিজের কথাটা বলিতে পারি; বলিয়া নিন্দা আহরণের জন্য প্রস্তুত থাকিতেও পারি।

বেলা ১১টা বাজিয়া গিয়াছে, ষ্টেশনের টিনের চাল হইতে বাহিরে অগ্নি, ভিতরে তাপ ছুটিতেছে, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিবার উপক্রম! সত্যই আমার মনে হইতেছিল, বিন্ধ্যাচলে চুপিসাড়ে নামাই সঙ্গত ছিল। বিপদকাল যখন

নয় তখন বৃদ্ধের বচন অগ্রাহ্য করিলে কি ক্ষতি হইত? মহা ভুল করিয়াছি। কিন্তু এ বস্তুটা কি? এ কি কেবলমাত্র বীর-পূজা? একটা মানুষকে দেখিবার জন্য, অভ্যর্থনা করিবার জন্য, আতিথ্যে বরণ করিবার জন্য এই বিপুলায়োজন? তা নিশ্চয়ই নয়। এ সেই কংগ্রেসের উদ্দেশে শ্রদ্ধা তর্পণ! যে কংগ্রেস পরাধীন ভারতকে স্বাধীনতার আস্বাদ জানাইয়াছে; যে কংগ্রেসের নামে লোক কামানের মুখে বুক খুলিয়া দিয়াছে; যে কংগ্রেস সারাজীবন আত্মত্যাগ, স্বার্থত্যাগ, সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিলাসব্যসন বিসর্জ্জন করিয়া, ঘরসংসার স্ত্রী-পুত্র বিষয়সম্পত্তি পরিহার করিয়া ইংরাজের জেলখানাকে ঘরবাড়ী করিয়াছে; যে কংগ্রেস ভয়কাতর বুকে সাহস, ভয়ম্লান মুখে ভাষা দিয়াছে, সেই কংগ্রেসের আকর্ষণ! আর সেই কংগ্রেসের সর্ব্বাধিনায়ক তাহাদের সম্মুখে।

স্বাধীনতা বস্তু বা পদার্থটা কি তাহা এই বিংশ সহস্রের জনতার মধ্যে হয়ত বিশ জনও জানে না; জানিলেও কেতাবে পড়িয়া বা বক্তৃতায় শুনিয়া আবছায়া একটি ধারণা গড়িয়া লইয়াছে, হয়ত তাহাও পারে নাই। স্বাধীনতা পাইলে তাহার আর দুইটা হাত গজাইবে কিম্বা দ্বিপদ হইতে চতুষ্পদে উন্নতি হইবে তাহাও জানে না; জমিদারকে রাজস্ব দিতে হইবে না, যাবতীয় ট্যাক্সের বিলোপ ঘটিবে; চাষ না করিয়াও ভূমিতে সুবর্ণ উৎপন্ন করা যাইবে; দেহের রোগ নির্ম্মূল হইবে; বয়সে জরার প্রকোপ থাকিবে না; গৃহে কলহ থাকিবে না; রাস্তায় পাহারাওয়ালা থাকিবে না; থানায় দারোগা থাকিবে না; জেলখানা বিলুপ্ত হইবে; লাট সাহেবের বাড়ীর ভিতরে গিয়া অবুরে সবুরে তাস পাশা খেলিতে বাধা থাকিবে না—সত্য কথা বলিতে হইলে স্বাধীনতার মর্ম্মকথা কাহারও জ্ঞাত নয়, তবু সেই অজ্ঞাত, অদৃষ্ট, অভূতপূর্ব্ব, অনাস্বাদিতপূর্ব্ব স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা কেমন করিয়া, কি ভাবে, কে তাহাদের চিত্ততলে জাগরুক করিল? এই কংগ্রেস! সব কথা খুলিয়া বলে নাই; সব চিত্র সম্পূর্ণ করিয়া আঁকে নাই; বুঝি তাহার প্রয়োজনও ছিল না। নবোঢ়া বধূর অব্যক্ত অস্ফুট, কভু বা নীরব ভাষার অন্তরালে যেমন একটা অজানা জগৎ কোলাহল করে, একটা অদেখা নীল সমুদ্র তরঙ্গায়িত হয়, কোন ভাবুকের ভাবনা, কোন শিল্পীর ব্যঞ্জনার যেমন প্রয়োজন হয় না, অতীব সঙ্গোপনে হৃদয়তন্ত্রীর তারে তারে প্রেমের সঙ্গীত গুঞ্জরিতে থাকে; পরাধীন জাতির নরনারীর চিত্তগুহায় স্বাধীনতার সুমধুর ঝঙ্কার তেমনই নীরবে, গোপনে, অজানা মাধুর্য্যে, আকুল আবেদনে ভরা অবিশ্রান্ত ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত হইতে থাকে। এই ঝঙ্কারের সূচনা কে করিল? অনাদৃত সুষুপ্ত সপ্ত তারে কে অঙ্গুলি পরিচালনা করিয়া এই সুর জাগাইল? কংগ্রেস। কোনও মানুষকে সম্বর্দ্ধনা নয়, কংগ্রেসের সভাপতিকেও নয়, খোদ কংগ্রেসকেও নয়, এই সম্বর্দ্ধনা, এই অভিনন্দন সেই অনাগত অনাস্বাদিত শুদ্ধমাত্র বাসনায় বসতি আকাঙ্ক্ষিত ধন স্বাধীনতার সাধনার উদ্দেশে এই মঙ্গলাচরণ। এ সেই স্বাধীনতার বোধন সমারোহ। উচ্চ শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও রাজনৈতিক নেতৃবর্গের মধ্যেই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, দেশের আপামর সাধারণ স্বাধীনতা অথবা অধীনতা সম্বন্ধে শিরঃপীড়ায় আদৌ আক্রান্ত নয়, এ-কথা যাঁহারা বলেন অথবা ভাবেন, তাঁহারা সত্যের অপলাপ করেন অথবা প্রত্যক্ষকেও অস্বীকার করিতে চাহেন। মনকে আঁখি ঠারেন।

আমি ভিড় সহ্য করিতে পারি না, আমার ধাতে সহে না, আধঘণ্টার অধিককাল ঠুঁটো জগন্নাথের মত দাঁড়াইয়া থাকিতে ভালও লাগিতেছিল না সবই সত্য; তবুও ত' এ-কথা না ভাবিয়া পারি না যে, এই যে এতগুলি মানুষ আজ তাহাদের সর্ব্বকর্ম্ম ফেলিয়া রাখিয়া এইখানে—এই ষ্টেশনে, মানব মনের একটি অতি সূক্ষ্ম অতি উচ্চ কামনার বহির্বিকাশকে পূজা করিতে আসিয়াছে তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশের কি অধিকার আমার থাকিতে পারে? হরিদ্বারে কুম্ভযোগে গঙ্গাস্নান করিলে মোক্ষ হয় ধারণা আছে বলিয়াই না কোটী কোটী হিন্দু নরনারী যুগে যুগে শতাব্দীতে শতাব্দীতে কুম্ভের সময়ে হরিদ্বারে ছুটিতেছে। মোক্ষ কি, কোথায় তাহার অবস্থিতি, কি সেখানে সুখ, কেহ জানে কি? জানে না, তথাপি সেই অজ্ঞাত মোক্ষের জন্য কালে কালে যুগে যুগে, শতাব্দীতে শতাব্দীতে কত না উন্মাদনা!

আমার যত খারাপই লাগিতে থাকুক না কেন, আশ্চর্য্য লোক আমাদের এই মৌলানা সাহেব। দীর্ঘোন্নত গৌরবর্ণ ঋজুদেহ, প্রসন্ন আনন প্রসন্ন হাস্যে মাধুর্য্য যেন ঝরিয়া পড়িতেছে। কে বলিবে দেহ অসুস্থ, রোগভার-নমিত, অবসন্ন? কোথায় শ্রান্তি, কোথায় ক্লান্তি, কোথায় অবসাদ? অতি কষ্টে মোটরে উঠিয়া বসিতে শত সহস্র কণ্ঠের জয়ধ্বনির মধ্যে মোটর যখন অতি ধীর মন্থর বেগে জনতার মধ্য দিয়া প্রতিকূল স্রোতোবেগ ঠেলিয়া মাল বোঝাই নৌকার মত অগ্রসর হইতে পারিল, তখন প্রথম কথা আমিই বলিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, দাদা খুব কষ্ট হইতেছে ত? প্রসন্ন-মধুর-স্মিত হাস্যে কহিলেন, এ মেরে ভেইয়া, প্রেমে কষ্টের স্থান কোথায়?

পরমাশ্চর্য্য ব্যক্তি আমাদের গান্ধীজী। সহকর্ম্মী ও সহচর সংগ্রহে অসাধারণ মনীষা তাঁহার। প্রেমকে যাঁহারা সর্ব্বোচ্চ আসনে স্থাপিত করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই

তাঁহার সহচর, সহকর্ম্মী, দুর্গম পথে সহযাত্রী হইতে সমর্থ। প্রেমের অঞ্জন যাঁহারা চোখে পরিয়াছেন, প্রেমের প্রলেপে যাঁহারা হৃদয়কে সঞ্জীবিত করিয়াছেন, তাঁহাদের কাছে উচ্চ নীচ ধনী দরিদ্র বিচার বিভেদ যেমন অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, আত্মসুখ, নিজের সুবিধা, শরীরের চিন্তাও তাঁহারা জীর্ণ বসনের মত কবে কোন্ সুদূর পথে ফেলিয়া আসিয়াছেন। মৌলানা সাহেব শ্রান্তি ক্লান্তির ভাব বার বার অস্বীকার করিলেও আমার দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। কত যে দ্বিধা, কত যে সঙ্কোচ, কত সতর্কতা, কত সাবধানতার সঙ্গে তাঁহাকে যে সারারাত এই দীর্ঘ পথ লইয়া আসিয়াছি, তাহা আমিই জানি; কত নামকরা ভাল ভাল স্বাস্থ্যকর স্থানের আহ্বান বরখাস্ত করিয়া বিন্ধ্যাচলে আনিয়াছি, আসিয়াই অসুস্থতা বৃদ্ধি পাইলে মনস্তাপের অন্ত থাকিবে না, বড় ভয়ে ভয়েই রহিয়াছি; কিন্তু মানসিক শক্তির নিকট শারীরিক দুঃখ কষ্ট অবহেলে পরাস্ত হইতে দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া পারি কৈ? প্রেম যে সর্ব্বজয়ী।

হায়! এই অসীম, অনন্ত প্রেম-প্রবাহের একটি বিন্দু যদি আমরা পাইতাম!

এবারকার মত ভাঙ্গন্ ইহার পূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই। তাহার অনেক কারণের মধ্যে একটির কথা আগে বলিয়াছি। উপর্য্যুপরি আত্মীয় ও স্বজন বিয়োগ-বার্ত্তা যেন একটির পর একটি অঙ্গচ্ছেদ করিয়া দিয়াছিল। তাহার উপর—বোধ করি সর্ব্বাপেক্ষা বড়, অন্য কারণও ছিল। রাষ্ট্রপতি মৌলানা সাহেব সমেত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ এবারকার কারাধ্যক্ষগণের বিচারে নরঘাতক, পরস্বাপহারী দস্যুরও অধম বিবেচিত হইয়াছিলেন। এই কয় ব্যক্তি এবার—অর্থাৎ "কুইট্ ইণ্ডিয়া" উচ্চারণকারী পামরগণ আমেদনগরে যে ব্যবহার পাইয়াছিলেন, নরঘাতক আসামীও তাহার অপেক্ষা ভাল ব্যবহার পায় বলিয়া মনে হয়। আমরা শুনিয়াছি, ভারতবর্ষের কোন স্থানে (?) আগাখাঁর প্রাসাদাভ্যন্তরে গান্ধী-পত্নী কস্তুরবা'র মৃত্যু সংবাদ পৌঁছিলে কংগ্রেসের পাষণ্ডগণ গান্ধীজীর নিকট সমবেদনা জ্ঞাপক একখানি টেলিগ্রাফ পাঠাইতে চাহিয়াছিলেন, তাহারও অনুমতি পাওয়া যায় নাই। কারাগার শিষ্টাচার সৌজন্য প্রকাশের স্থান নহে! গান্ধীজীর শোকে সান্ত্বনাবার্ত্তা প্রেরণের অনুমতি যখন মিলিল না, তখন সিন্ধুর ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী আল্লাবক্সের শোচনীয় হত্যাকাণ্ডে ব্যথিতহৃদয় মৌলানা সাহেব আল্লাবক্সের পুত্রকে সান্ত্বনা জ্ঞাপন করিয়া যে 'তার' প্রেরণ করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাও যে প্রত্যাহৃত হইবে তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি! গান্ধীজী বিশ্ববন্দিত মহামানব। বৃদ্ধবয়সে, বন্দদশায় তাঁহার আকৈশোরের সঙ্গিনী, চিরদিনের দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনার সহযাত্রিনী কস্তুরবার বিয়োগে গান্ধীজীর বন্ধু, শিষ্য, সহকর্ম্মী ও অন্তরঙ্গ সহচর ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের হৃদয় বিচলিত হওয়ারই কথা। কারাপ্রাচীরের বাহিরে থাকিলে সকলেই সেই দুর্দ্দিনে গান্ধীজীর পার্শ্বে থাকিয়া গান্ধীজীর শোকের অংশ গ্রহণ করিতেন। কারাবদ্ধদশায় তাহা সম্ভব নয়; তাই একখানি টেলিগ্রাম প্রেরণের ব্যগ্র বাসনা, কিন্তু কারাগারের নিয়মে ইহা অনিয়ম। টেলিগ্রাম প্রেরকও কারারুদ্ধ আসামী, টেলিগ্রামের প্রাপকও তাহাই; আবার যে নারীটির মৃত্যু হইয়াছে, কারাপ্রাচীরের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। সুতরাং এ একেবারে অনিয়মের ত্র্যহস্পর্শ।

মাদাম চিয়াংকাইশেকের কথা পাঠক পাঠিকাগণের মনে থাকিতেও পারে। ১৯৪২ সালে, মহাচীনের রাষ্ট্র-পরিচালক জেনেরালিসিমো চিয়াংকাইশেক তাঁহার সুন্দরী বিদুষী পত্নীকে লইয়া ভারতবর্ষে—কলিকাতাতেও আসিয়াছিলেন। আমাদের মধ্যে অনেকে তাঁহাদিগের সহিত পরিচয়ের সৌভাগ্যও অর্জ্জন করিয়াছিলেন। পণ্ডিত জওহরলালকে এই রাষ্ট্রনায়কদম্পতী অত্যন্ত প্রীতি ও শ্রদ্ধার চক্ষুতে দেখিয়া থাকেন এবং পণ্ডিতজীও ইঁহাদিগকে ব্যক্তিগত বন্ধুমধ্যে পরিগণিত করেন (বর্ত্তমান কালের পৃথিবীতে কেই বা তাহা না করে?)। পণ্ডিতজী যখন আমেদনগর দুর্গমধ্যে কারারুদ্ধ, সেই সময়ে সংবাদপত্রস্তম্ভে সংবাদ বাহির হয় যে, মাদাম গুরুতর পীড়াক্রান্ত; চিকিৎসার জন্য অতলান্তিক মহাসমুদ্র অতিক্রম করিয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরিত হইতেছেন। বন্ধুর পীড়ার সংবাদে বন্ধুর উৎকণ্ঠাবশতঃই বোধ করি জওহরলালজী পূর্ব্ব পূর্ব্ববারের অবমাননা বিস্মৃত হইয়া মাদাম চিয়াঙের উদ্দেশে একখানি 'কেব্ল' লিখিয়া কারাধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করিলেন। কেব্লে রাজনীতির ধোঁয়া বা গন্ধ কিছুই ছিল না, থাকিবার কথাও নয়। পীড়ার বিবরণ এবং শরীরের অবস্থা জ্ঞাপনের অনুরোধ মাত্র। 'কেব্ল', প্রেরক সকাশে ফিরিয়া আসিল। 'সামান্য একজন কারাবাসী' (ইনডিভিডুয়্যাল—পার্লিয়ামেণ্টে এই ব্যক্তির সম্বন্ধে ঠিক এই অভিধানটিই ব্যবহৃত হইয়াছিল) এতখানি স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিবার ধৃষ্টতা রাখে, ইহা কি সহ্যাতীত নহে?

আমি আরও একটা 'গল্প' শুনিয়াছি এবং 'গল্প' হইলেও তাহার সত্যতা সম্বন্ধে হলফ লইতেও পারি। 'গল্প'টি এই: আগাখাঁর প্রাসাদে রোগাক্রান্ত হইয়া মহাত্মা-পত্নী কস্তুরবা ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় কর্তৃক চিকিৎসিত, অন্ততঃ পক্ষে একবার পরীক্ষিত হইবার বাসনা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, কর্তৃপক্ষ তাহাতে সম্মত হইতে পারেন নাই। সম্মত না হইবার সঙ্গত কারণও যে না ছিল এমন নহে। 'কুইট্ ইণ্ডিয়া'র পরবর্ত্তী অধ্যায় (আগষ্ট আন্দোলন) নাকি ভারত মহাসাম্রাজ্যের নাড়ী

টলাইয়া দিয়াছিল। পৌনে সাত ফুট লম্বা ডাক্তার রায় যদি তাঁহার ফরমায়েসী এক-আধারে পাঞ্জাবী-কামেজের অগণিত পকেট ভরিয়া 'কুইট্ ইণ্ডিয়া' জীবাণু আনিয়া দেশমধ্যে ছড়াইয়া দেয়, সে মহামারী, মড়কের ধাক্কা সামলাইবে কে? গভর্ণমেণ্ট সে ঝুঁকি লইতে নারাজ হইলে গভর্ণমেণ্টের নিন্দা করা যায় কি?

১৯৪২ সালের ৯ই আগষ্ট পরবর্ত্তী নাটকাভিনয়ের প্রযোজনা ও পরিচালনা লর্ড লিনলিথগো নিখুঁত, ও অনিন্দনীয় ভাবেই সম্পন্ন করিয়াছিলেন। একতিলসম ছিদ্র বা কণা পরিমাণ ত্রুটীও কেহ ধরিতে পারে নাই। বিলাতের পার্লিয়ামেণ্ট প্রেক্ষাগৃহে বিমুগ্ধ ও কৃতজ্ঞ চার্চ্চিলগোষ্ঠীর করতালিধ্বনিতে সপ্ত সমুদ্র প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। সাত সমুদ্রের পারে থাকিয়াও কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস আমাদের কর্ণকুহর বারবার পরিতৃপ্ত করিয়াছে। প্রধান পরিচালকের যোগ্য সহকারী হিসাবে রেজিন্যাল্ড ম্যাক্সওয়েল ও রিচার্ড টটেনহামের নামোল্লেখ না করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে। নাটকাভিনয়ের শেষে রাষ্ট্রপতিসহ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ যখন কারাপ্রাচীরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন সকলেরই দৈহিক অবস্থা শোচনীয়। সাধারণতঃ পণ্ডিতজী তাঁহার লৌহ-দেহের শ্লাঘা করিতেন, এবারে দেখা গেল, লোহাতেও মরিচা ধরিয়াছে।

বিন্ধ্যাচল পর্ব্বতমালার যেখানে সুরু, সেইখানে, পাহাড়ের উপরে "জঙ্গীলালকী বৈঠক" নামে একটি সুন্দর বাঙলোয় রাষ্ট্রপতি অবস্থিতি করিতেছেন। পাহাড় সেখানে খুব উঁচু নয়, দু' হাজার ফুট হয়তো খুব, কিন্তু বৈঠকের পরিস্থিতি মুনিজনমনোহারী। বহু দূরে দূরে দু' একখানি সুদৃশ্য বাঙলো-গৃহ ছাড়া দূরে বা নিকটে জনমানবের বাস নাই; দিগন্তবিস্তৃত বিন্ধ্য পর্ব্বত আর পর্ব্বতগাত্রপর্য্যশোভিত ঘনবনরাজি। পাহাড় আর বনের দৃশ্যে নয়ন যখন শ্রান্তি ও ক্লান্তি বোধ করিবে, তখন আর এক দিকে চাহিলে নয়ন-মন জুড়াইবার জন্য স্বচ্ছসলিলা ভাগীরথী তাঁহার বালুপূর্ণ বক্ষ বিস্তার করিয়া দিকচক্রবাল স্পর্শ করিয়া সাগরের উদ্দেশে যাত্রা করিতেছেন দেখা যাইবে। গঙ্গাবক্ষে জলের চেয়ে বালুস্তরই বেশী; অতি ধীর মন্থরগতিতে দুই একখানি নৌকা কদাচিৎ উত্তরাভিমুখে চলিতে দেখা যায়। গাংশালিক ঝাঁক বাঁধিয়া জড় বালুকারাজ্যের অচেতন প্রজাবর্গকে অবিরাম গান শুনাইয়া বেড়াইতেছে, দেখা যায়। কদাচিৎ শুব্ধ নিশীথে বিরহসন্তপ্ত চক্রবাক বরবধূর বিরামবিহীন ব্যাকুল আবাহন নিদ্রাহীনের কর্ণে পশিয়া থাকে। দূর গ্রামের অভ্যন্তরে কখনও কখনও কলহপ্রিয় সারমেয়-চীৎকার সুখ নিদ্রায় বিঘ্ন ঘটাইতেও পারে। নতুবা শ্রান্ত প্রকৃতি দেবী যেন শান্তির আশাতেই এই জনহীন পর্ব্বতপ্রান্তে আসিয়া ক্লান্ত পা দু'খানি ছড়াইয়া দিয়া বিরামদায়িনী সন্তাপহারিণী নিদ্রার কোলে এলাইয়া পড়িয়াছেন। দূর পাহাড়ের গায়ে কীটপতঙ্গের মত ছাগল, ভেড়া, গরু, মহিষ চরিতে দেখা যায়; কখনও বা দীর্ঘ যষ্ঠি স্কন্ধে দুই একটি রাখাল বালককে বামনশিশুর মত স্তূপ হইতে স্তূপ উল্লঙ্ঘন করিতে দেখিতে পাওয়া যায়; কখনও বা তাহাদেরই বাঁশের বাঁশীর মেঠো সুর শুনিতে শুনিতে শুব্ধ মধ্যাহ্নে অলসে-আবেশে ক্লান্ত নয়ন মুদিয়া আসিতে থাকে। ক্বচিৎ কোন হৃষ্টপুষ্টকায়া আহিরিণী দুধের পশরার উপরে রাশিকৃত 'উপরি' (ঘুঁটে) চাপাইয়া তাহার যৌবনান্দোলিত তনুখানি হিল্লোলিত করিয়া দুধের যোগান দিতে এই পথে যায় আসে। কখনও কখনও কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জদেহ উষ্ট্র সার বাঁধিয়া পৃষ্ঠে মীরজাপুরী গালিচার বাণ্ডিল বহিয়া গলার ঘণ্টা বাজাইয়া রাজপথ অতিক্রম করে, ঐ পর্য্যন্ত। কখনও কখনও আনন্দময়ী মাতার আশ্রম হইতে সান্ধ্য আরতির ঘনগম্ভীর শব্দ উত্থিত হইয়া পাহাড়ের স্তব্ধতা ভঙ্গ করে। এই মাত্র! নতুবা নির্জ্জনতা, নিস্তব্ধতা, শান্তি পরিপূর্ণ মাত্রায় বিরাজিত। রাষ্ট্রপতি এইরূপ জনহীন বিজন প্রদেশই পছন্দ করেন। আরও নির্জ্জন স্থান হইলে আরও খুসী হইতেন। আমি ডাক্তার বিমলাকান্তকে টাণ্ডাপ্রপাতের বাঙলো ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছিলাম। টাণ্ডায় জলস্রোত নাই, কলঃস্বিনী নির্ঝরিণী আজ একটা ডোবায় পরিণত হইয়াছে, ডোবায় ম্যালেরিয়ার বীজাণুর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে; বিমলাকান্ত রাষ্ট্রপতিকে তথায় লইয়া যাইতে সাহস করিলেন না। অগত্যা বিন্ধ্যাচলেই বাসা বাঁধিতে হইল। জগজ্জননী বিন্ধ্যবাসিনীর অনুগ্রহ আর বিন্ধ্যাচলের ভাগ্য—ভারতের রাষ্ট্রপতি বিন্ধ্যগিরিশিরে বিন্ধ্যাচলবাসীর অতিথি!—বন্দেমাতরম্—জয় হিন্দ্!

অনিবার্য্য কারণে শ্রীযুক্ত জনরঞ্জন রায়ের "বধুরেণ" নাটিকার প্রকাশ বর্ত্তমান সংখ্যায় বন্ধ রহিল। শেষাংশ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।—বঃ সঃ

মাটি ও মানুষ

শ্রীমনোজ বসু

পাঁচ

লোকের মুখে মুখে আশ্চর্য্য রটনা। ইংরেজ জার্ম্মানীকে হারিয়েছে বটে, কিন্তু আর এক বিষম মুশ্‌কিলে পড়েছে সম্প্রতি। বাপেরও বাপ থাকে, এ যেন সেই রকম ব্যাপার। লড়াই বেঁধে গেছে আর এক জনের সঙ্গে, নাস্তানাবুদ হতে হচ্ছে তাঁর হাতে—তিনি গান্ধীরাজা। অজেয় তিনি, তাঁর নাকি কোটি কোটি সৈন্য—অমোঘ অস্ত্র তাদের হাতে।

ভদ্রগোছের নূতন কেউ গ্রামে গেলে চাষীরা ঘিরে ধরে, গান্ধী-রাজার খবর বলো। কেউ বিশ্বাস করে না যে, রাজা নগ্নগাত্র, নেংটি পরা। এত যার হাঁকডাক, কোন্ দুঃখে তিনি সাজ পোষাক ছেড়েছেন, হাতী-ঘোড়া, লোক-লস্কর, সম্পদ্ ঐশ্বর্য্যের যার অন্ত নেই, কোন্ খেয়ালে গরিবানা চালে বেড়ান তিনি সর্ব্বত্র?

এ দিকেও এসে পড়বেন সেই রাজা, সকল দুঃখের অবসান হবে—এই প্রত্যাশায় সকলে আছে। দুঃখ কি একরকম? প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েতের উপর আক্রোশ—অন্যায় রকম ট্যাক্স ধরে। হাটের ইজারাদারের উপর আক্রোশ, তোলা হিসেবে ধান কেড়ে নেয় প্রতি শলিতে অন্তত পক্ষে এক পালি। আক্রোশ তুলসী মাড়োয়ারির উপর—ধানের দর নেই, কাপড়ের অথচ গলা-কাটা দাম নিচ্ছে। আর ইন্দ্রলাল ও গোমস্তা নকড়ির উপর আক্রোশের তো সীমা পরিসীমা নেই—উচ্ছেদ করে একেবারে তাড়িয়ে দিচ্ছে বসতি থেকে। সবাই যেন ওরা এক গোত্রের—পরামর্শ করে ষড়যন্ত্র এঁটেছে। গান্ধীরাজা এখন দলবল নিয়ে এসে পড়লে হয়, সমস্ত ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। এ আশ্বাস তারা কোথায় পেল কে জানে, কিন্তু সবাই যেন উন্মুখ প্রতীক্ষায় আছে।

অবশেষে এসে পড়ল এ অঞ্চলে গান্ধী রাজার সৈন্য—খালি পা, গায়ে মোটা খদ্দর, মাথায় সাদা টুপী। মুখে অমায়িক মানুষ-পাগল-করা হাসি, চোখে সঙ্কল্পদৃঢ় আগুন—এ ছাড়া কোন অস্ত্র নেই কারও কাছে। সাকুল্যে জন পাঁচ ছয় এল, তাদের সঙ্গে। রাখাল দাসের বৈঠক ঘরে ক'দিন থাকবার পর খুব ঘটা করে একদিন গান্ধী রাজার তিন-রঙা নিশান উড়িয়ে দিয়ে তারা চলে গেল, থাকল বনমালী। ঐ ঘরেই একটা মাদুর বিছিয়ে সে শোয়। যমুনা রেঁধে বেড়ে খাইয়ে দিয়ে যায় তাকে দু বেলা। গান্ধী রাজার বিজয়বার্ত্তা বনমালী চাষীদের শোনায়। ইংরেজ-সরকার ক্রমেই মাথা নিচু করছে তাঁর কাছে। ধরো, এই নুনের ব্যাপার, নুন কিনে খেতে হবে না আর কারো। ভাঁটা সরে গেলে অষ্টবেঁকীর পলিমাটির উপর নুনের প্রলেপ পড়ে থাকে, যে নোনা মাটি জলে গুলে জ্বালিয়ে স্বচ্ছন্দে ঘরে ঘরে নুন তৈরী করবে—নিমকির দারোগা আর হুমকি দিয়ে এসে পড়বে না।

নতুন চরের গণ্ডগোল জমে উঠল এই সময়টা। ইংরেজের সঙ্গে বোঝাপড়া দু-দশ মাস মুলতুবি থাকতে পারে, কিন্তু এদের এখন শিরে সংক্রান্তি। এই জীবন-মরণের ব্যাপারে কোনদিকে ভরসার আলো দেখতে পাচ্ছে না কেউ। অভিলাষ দু-তিন বার কলকাতায় গিয়েছে মিটমাটের চেষ্টায়। তার স্বার্থ আছে, তার জামাই রাখালের জমি আছে নতুন চরে। পাড়ার মধ্যে রাখাল মাতব্বর বিশেষ, মানুষটাও গোঁয়ার গোছের। সেই জন্য আরও ভয় অভিলাষের। কিন্তু ইন্দ্রলাল কিছুতে নরম হলেন না, বরুণ ডাঙার সঙ্গে হাতে হাত মিলে গেছে তখন আর পরোয়া কিসের? হতাশ হয়ে অভিলাষ ফিরে এল। মুখ শুকানো ঢালী পাড়ার সকল চাষীর—বাস ওঠাতে হবে, নয় তো রায় গ্রামের মজুর বৃত্তি করে দিন গুজরাণ করতে হবে এবার থেকে।

ভরসা দিল কেবল বনমালী। রাখালের পিঠ ঠুকে বলে, গান্ধী মহারাজ কি জয়! ভাবনা কি বাবা, এত বড় কোম্পানী বাহাদুর নাজেহাল হয়ে যাচ্ছে, এরা কোন ছার?

রাখাল বলে, দাঁড়িয়ে মার খাওয়া আমার ধাতে পোষায় না সর্দ্দার মশায়।

হো-হো করে হেসে ওঠে বনমালী। বলে, ভয়ে না দৌড়ালে কেউ মারবে না রে বাবা। মারবে হয় তো দু-এক ঘা, তারপর হাত অবশ হয়ে আসবে। আর এ ছাড়া উপায়ই বা কি বলো? নতুন চরের জমি তোমাদের, সেটা মনে প্রাণে জান তো তোমরা?

অনেক চাষী জুটেছিল। প্রবীণদের স্পষ্ট মনে পড়ছে, ঈশ্বর রায়ের কথাবার্ত্তা, জেল থেকে বেরিয়ে এসে ঢালীদের যখন তিনি ইনাম দিতে ডেকেছিলেন। হাঁ—ঈশ্বর রায়ের দেওয়া জমি—তারাই তো মালিক এর। নোনা-ওঠা উষর সাদা মাটি চকচক করত—কোদাল পেড়ে ডিঙা বোঝাই দূর দূরান্তর থেকে সার এনে ঢেলে ঢেলে বছরের পর বছর প্রায় নিষ্ফল চাষের পর এখন অবশেষে সেখানে আবাদ হচ্ছে, আর অমনি কিনা কলকাতা অবধি খবর হয়ে গেল, শ্যেন দৃষ্টি পড়ে গেল রায় আর ঘোষেদের।

বনমালী বলে, তোমাদেরই হকের জমি। কাগজপত্র থাক বা না থাক, নোনা-চরে সোনা ফলাচ্ছ সেই তো সকলের বড় দলিল। বলো সবাই, গান্ধী মহারাজের জয়। যত লাফালাফিই করুক, কেউ তোমাদের তাড়াতে পারবে না নতুন চর থেকে।

হয়েছেও তাই। আইনতঃ ওদের উচ্ছেদ হয়েছে, জমিতে বাঁশগাড়ি অবধি হয়ে গেছে। কিন্তু চাষীদের তাড়ানো যায় নি।

জোয়ার এসেছে। অমূল্য বসে চরের উপর। ছল ছল করে জল প্রহত হচ্ছে। পাঁচ সাত খানা নৌকা বাঁকের মুখে একসঙ্গে দেখা গেল। গুড়ের নৌকা, পাটের নৌকা, খড়ের সাঙড় ডিঙিও দেখা যাচ্ছে ওর মধ্যে। ওরই একটা ডেকে পার হয়ে যাবে সে এবার।

ডাকতে হল না, একটু দূরে বনঝাউয়ের ঝুপসি মতো জঙ্গল—তারই ধারে একখানা ডিঙি লাগল। উঠে কাছে গিয়ে অমূল্য

দেখে, বনমালী এবং আর ক'জন নেমে আসছে। লোকগুলো বনমালীকে ধরে পরম যত্নে নামিয়ে দিচ্ছে। নৌকা না নড়ে যায়, জলের মধ্যে বনমালীর পা না পড়ে—সে জন্ম কাছি টেনে ধরেছে জন দুই। বনমালী আপত্তি করছে, অত সব কি করছ? আমি কি নবাব-বাদশা না নৌকা-ডিঙায় এই নতুন চড়ছি? পদে পদে অমন করিস তো বলে রাখছি, পালিয়ে যাব একদিন।

অমূল্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল। একটু আগে গালি খেয়ে এসেছে, তার কথাগুলো ছুরির ফলার মতো বুকের ভিতরটা চিরে দিয়ে যাচ্ছে। বনমালী আগে তাকে দেখতে পায় নি, দেখে বিশেষ আশ্চর্য্য হোল না। বলল, শুনেছি বটে, ওদের সঙ্গে তুই এসেছিস—

অমূল্য বলে, আমায় নিয়ে এলে না কেন বাবা? এত করে বললাম।

তুই আসতিস্ নে। মাঝে থেকে আসা হত না আমারও—

দেখ, এসেছি কি না। আমার তো আসবার দরকারই ছিল না, রায়বাবুরও না আনার ইচ্ছে ছিল—কলকাতার বাসার ভার চাপিয়ে দিয়ে আসছিলেন! আমিই জেদ করে চলে এলাম।

মৃদু হেসে বনমালী বলল, এসে তো ওপারে রয়ে গেলি।

অমূল্য বলে, তোমার সঙ্গে আসতে চাইলাম, তা হলে এপারে এসে উঠতাম। এপারে নিয়ে এলে না, ওপারে থাকলে গালি-গালাজ করবে—তা'হলে যাই আমি কোন চুলোয়?

সহসা গলা ভারি হয়ে এল। চোখে জল আসে বুঝি বা। অকারণে হঠাৎ অতি শৈশবে মরা মায়ের কথা মনে পড়ল। মা নেই, তার কেউ নেই। রাজা ত্রিশঙ্কুর কাহিনী সে শুনেছে—না স্বর্গে, না মর্ত্ত্যে তার বসতি। তার অবস্থাও তাই। শুনেছে, মৃত্যুর পর প্রেত বাতাসে নিরালম্ব ভেসে বেড়ায়। সেও তেমনি। মন তার দুর্ভাগ্যক্রমে অসাড় নয়—বড় লোকের বারদুয়ারে থাকার যে অপমান তার বেদনা উপলব্ধি করে সে প্রতিমুহূর্ত্ত। আবার এদিকেও সে জ হারিয়েছে, নিজের জাতের মধ্যে তার জায়গা নেই।

আশ্রয় এক যমুনা। বছর পনের আগে এইখানেই এই নদীর ধারে ছোট্ট একটা মেয়ে আড়ি দিয়েছিল। তোমার সঙ্গে আড়ি—জন্মের মতো আড়ি। যাও কলকাতা—এ জন্মে আর দেখা হবে না। এসে দেখবে মরে আছি আমি।

সেই মেয়ে বড় হয়ে আর এক ছোট্ট মেয়ের মা হয়েছে। আড়ি ভেঙেছে—রাখালকে পাঠিয়ে সে রাত্রিবেলার খাবার নিমন্ত্রণ করেছে। অমূল্য এসেছে শুনতে পেয়ে যমুনা তাকে ঘর-গৃহস্থালীর মাঝখানে ডেকে পাঠিয়েছে।

সন্ধ্যার পর অমূল্য কাপড়-চোপড় পরছে। জ্যোৎস্না জিজ্ঞাসা করে, কোথায়?

সগর্ব্বে অমূল্য নিমন্ত্রণের বিবরণ শোনাল। বলে, তখন যে তোমার পিছু পিছু ঢুকলাম না, কেন যাব বল বিনা নিমন্ত্রণে? এখন এই দেমাক করে যাচ্ছি।

জ্যোৎস্না ঘাড় নাড়ল। তীক্ষকণ্ঠে বলে, যেও না। অমানুষ ওরা—আভিথেয়তা নেই, সৌজন্য নেই। আমরা এগুলে কি হয়, ... মিলমিশ চায় না ওরা। গরীব বলেই দেমাক আরো বেশি যেন ওদের। মানুষকে মানুষ বলে মানে না।

ইন্দ্রলাল ঐদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। শুনতে পেয়ে বললেন, না জ্যোৎস্না, এ তোমার অন্যায় কথা। নিজের জ্ঞাতভাই আপন লোক—নেমন্তন্ন করেছে; তাদের ছাড়বে কেমন করে? ছাড়বেই বা কেন? তুমি তো যাবেই অমূল্য, আমাদের যে বলে না—তা হলে যেতে রাজী ছিলাম আমরাও—

হেসে উঠলেন। তার পর বলতে লাগলেন, যাতায়াত কেন ছাড়বে? বরঞ্চ ফাঁক বুঝে একদিন এদিককার কথাবার্ত্তা পেড়ে দেখো তো। ক্রমশঃ একটা জট পাকিয়া উঠছে—খাজনা স্বীকার করে এক একখানা কবুলতি দিলেই গোল চুকে যায়। যেমন করছিল ওরাই করবে—ধানজমি কি আমি তুলে নিয়ে যাচ্ছি কলকাতায়?

অষ্টবেঁকি পার হয়ে অমূল্য পাড়ার মধ্যে ঢুকল, ঠিক কোন্ বাড়ি, সে বুঝতে পারে না। অন্ধকার—চারিদিক নিশুতি হয়ে গেছে এরই মধ্যে। একটা খেঁকি কুকুর শুধু ঘেউ ঘেউ করে সাড়া দিল। ঢিল উঁচাতে পালিয়ে দূরে গেল কুকুরটা—দূরে গিয়ে আবার ঘেউ ঘেউ করে। এর উঠান তার উঠান পার হয়ে যাচ্ছে, ঘরে ঘরে কবাট বন্ধ। এক বাড়ির দাওয়ায় কেবল টেমি জ্বলছে, আলোর চেয়ে ধোঁয়া বেশি। আবছা রকম দেখা গেল, দুটি মানুষ ছ্যাঁচা-বেড়া ঠেস দিয়ে চুপচাপ বসে। অতএব নিঃসন্দেহ নিমন্ত্রণ-বাড়ি এটা—এবং অমূল্য ছাড়া আরও নিমন্ত্রিত আছে, দেখা যাচ্ছে।

রাখালদাসের বাড়ি এটা তো?

মুখে কেউ কিছু বলল না, একজনে ঘাড় নাড়ল।

নূতন জুতার মস মস আওয়াজ করে অমূল্য দাওয়ায় উঠল। তাকাল একবার ওদের দিকে, মুখ দেখা যাচ্ছে না। একজনে হুঁকো টানছে, তারই ঘড়ঘড় আওয়াজ।

তক্তাপোষ একদিকে। তার উপর বসে অমূল্য সাড়া দেয়—কই হে? এরা কোথায় সব? রাখাল কোথা?

বাড়ি নেই এখন—

অমূল্য বলে—ভালরে ভাল। অতিথ ডেকে গৃহস্থ পালায় এমন তো শুনি নি কখনো।

এমন সময় সেই মেয়েটা—নিমি এসে ডাকল, মা ডাকছে, এসো—পনের বছর পরে যমুনা তার মেয়ে পাঠিয়ে ডাকছে। দাওয়া থেকে ঘরের ভিতর গেল। ওদিককার দরজা দিয়ে বেরিয়ে আর একটা দাওয়া, ভিতরে উঠান। পেঁপেতলায় মাথায় কাপড় দেওয়া একজন। যমুনাই তার অপেক্ষা করছে—আঁধারে চেহারা দেখা গেল না, কেমন হয়েছে সে পনের বছর পরে।

মৃদু কণ্ঠে যমুনা বলল, চলো—

সঙ্গে সঙ্গে অতি দ্রুত চলল। পাখীর মতো যেন উড়ে চলেছে। এ কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? উঠান পেরিয়ে ক্রমশঃ পাড়ার সীমানা ছাড়িয়ে তাকে নিয়ে চলল। অমূল্যর ইচ্ছা হচ্ছে জিজ্ঞাসা করে—কিন্তু এক মুহূর্ত্ত থামছে না সে। প্রশ্ন করার সুযোগ হয় না। এ কি রহস্য—টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে যেন—অদৃশ্য রজ্জু দিয়ে বেঁধে।

[ক্রমশঃ

সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

দুঃখদগ্ধ জগতের শান্তি কামনায়
কালজয়ী কর্ম্মবীর মগ্ন সাধনায়—
বর্ষ পরে আজি সেই মহামানবের
প্রজ্ঞাদীপ্ত মূর্ত্তি ভাসে মানসে দেশের।

—কর্ম্মিবৃন্দ

এম. পি. পি. হাউস লিঃ

শ্রীবোধায়ন কবি-কৃত ভগবদজ্জুকীয়

(প্রহসন : পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীঅশোক নাথ শাস্ত্রী

[যমপুরুষের প্রবেশ]

যমপুরুষ। ইহলোকে প্রাণিগণের (প্রারব্ধ) কর্ম্মা-বসানে যিনি তাঁহাদিগকে (নিজলোকে) নিয়ে যান, যিনি প্রাণিগণের সুকৃত-দুষ্কৃত কর্ম্মের সাক্ষী—সেই পাপ-শাসন যম আমাকে বলেছেন—'প্রজাগণের প্রারব্ধ কর্ম্মের অবসানে প্রাণগুলি পৃথক্ ক'রে দাও। [প্রাণগুলি—সূক্ষ্ম শরীরের সপ্তদশ অবয়ব—পঞ্চপ্রাণ,দশ ইন্দ্রিয়,মন ও বুদ্ধি।]

তাই—

যম-কর্তৃক আমি যথায় নিযুক্ত হয়েছি, সেই নগরীতে মনোগত ইচ্ছার মত (দ্রুতবেগে) এসে উপস্থিত হয়েছি। নানা রাষ্ট্র-নদী-বন-পর্ব্বতযুক্ত ভূমি দেখতে দেখতে—জলভরা বনও মেঘসমূহ দ্বারা আচ্ছাদিত হ'য়ে—চারণ-সিদ্ধ-কিন্নরযুক্ত ও বায়ুবেগে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত মেঘ-বিশিষ্ট নভোমণ্ডল অতিক্রম ক'রে এসে পড়েছি।

তা—কোথায় বা সে নারী ! আ ! এই ত সেই রমণী !

পল্লবযুক্ত তপ্তকাঞ্চনবর্ণ মনোজ্ঞ অশোক-কুসুমস্তবকে অন্তর্হিতা এই বরাঙ্গণা সন্ধ্যাকালীন মেঘজালে আবৃতা চন্দ্রলেখার মতই শোভমানা !

যাক্ ! এর এখনও একটু (প্রারব্ধ) কর্ম্ম বাকী আছে ! এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা ক'রে প্রাণ হরণ ক'রব।

চেড়ী। অজ্জুকে ! কি সুন্দর দেখতে এই অশোক-কিসলয় ! আমি নিই (এটি) !

গণিকা। –না—না—ও রকম নয়। আমিই নোব (ওটি)।

যমপুরুষ।—এই ত (উপযুক্ত) দেশ-কাল ! যাক্ ! এখন সর্পরূপ ধারণ ক'রে অশোকশাখায় থেকে এই নারীর প্রাণ হরণ করি। (তাহাই করিয়া)—

এখন আমি—

শ্যামা, প্রসন্নবদনা, মধুরালাপকারিণী, মত্তা, বিশাল-জঘনা, উত্তম চন্দনে আর্দ্রদেহা, রক্তোৎপলাভনয়না, নয়নাভিরামা এই বালাকে অতি শীঘ্র যমপুরীতে নিয়ে যাই। [শ্যামা—যৌবনমধ্যস্থা—ইহাতে বুঝায় মরণের কাল তাহার আসে নাই। প্রসন্নবদনা—মুখবৈবর্ণ্য মৃত্যু-লক্ষণ—তাহা নাই। মধুরালাপনী—মৃত্যু আসন্ন হইলে কণ্ঠস্বর বিকৃত হয়—তাহা ইহার হয় নাই। মত্তা—কামোন্মত্তা, ভয়লেশহীনা—ভয় আসন্ন মৃত্যুর লক্ষণ ইহার নাই। বিশালজঘনা—ক্ষীণ কটিতট মৃত্যুর লক্ষণ। শ্রেষ্ঠ চন্দনার্দ্রা—আসন্ন মৃত্যুর পূর্ব্বে চন্দন দেহে প্রলেপ দিলে উহা দেহশোষ বশতঃ শুকাইয়া যায়—ইহার সে লক্ষণ নাই। সকল বিশেষণই আসন্ন মৃত্যুর কোন সূচনা দেয় না—বরং তাহার প্রতিবাদ করে।]

[গণিকা অশোকপল্লব তুলিতে লাগিল]

যমপুরুষ। এই ত দংশনের উপযুক্ত সময়।* [তথা করণ]।

গণিকা। হম্ ! কিছু আমায় কামড়েছে !

চেড়ী। ওগো ! এই যে সেই অশোকগাছের কোটরে লুকিয়ে থাকা সাপটা !

গণিকা। হুঁ ! সাপ ! (পতন)

শাণ্ডিল্য। (নিকটে আসিয়া), ভদ্রে ! এ কি !

চেড়ী। আর্য্য ! এই গণিকাকে সাপে কামড়েছে !

শাণ্ডিল্য। হায় ! হে প্রভু ! এই গণিকা-কন্যাটিকে সাপে কামড়েছে !

পরিব্রাজক। নিশ্চয় এই নারীর কর্ম্ম ক্ষয় হয়েছে। কেন না –

জন্তুগণ নিজ কর্ম্ম (ফল) ভোগ করতে প্রায়ই জন্ম গ্রহণ করে। আর দেহিগণ (প্রারব্ধ) কর্ম্ম ক্ষীণ হ'লে পুনরায় অন্যত্র গিয়ে থাকেন।

চেড়ী। অজ্জুকে ! কি কষ্ট হচ্ছে ?

গণিকা। আমার শরীর যেন এলিয়ে পড়ছে—চোখের দৃষ্টি যেন গুলিয়ে যাচ্ছে—হৃদয় যেন আকুল হ'য়ে উঠছে—প্রাণ যেন বেরিয়ে যেতে চাইছে। শুতে চাই আমি !

চেড়ী। সুখে শুয়ে পড়ুন—অজ্জুকা !

গণিকা। মাকে প্রণাম দিও।

চেড়ী।—না—ও কথা বলবেন না ! আপনি নিজেই মাকে প্রণাম করবেন 'খন !

গণিকা। রামিলককে আলিঙ্গন দিও। [মূর্চ্ছাগতা]

চেড়ী। হায় ! মারা গেলেন অজ্জুকা !

যমপুরুষ। হায় ! প্রাণ হরণ করেছি ! এই যে !—

গঙ্গা উত্তীর্ণ হ'য়ে—বিন্ধ্য, শুভ সলিলবহা নর্ম্মদা, সহ্য, গোলেয়ী কৃষ্ণবেণ্ণা, পশুপতিভবন, সুপ্রয়োগা কাঞ্চী, কাবেরী, তাম্রপর্ণী, তারপর মলয় পর্ব্বত, সাগর লঙ্ঘন ক'রে—সবেগে লঙ্কা অতিক্রম ক'রে বায়ুসমগতিতে এই ধর্ম্মদেশ প্রাপ্ত হলুম !

এই যে বিশালশাখ বটবৃক্ষ ! এখানে সমাসীন চিত্রগুপ্তের কাছে নিয়ে যাই। [নিষ্ক্রান্ত]

চেড়ী।—হা অজ্জুকে !

শাণ্ডিল্য। প্রভু ! এই গণিকাকন্যা নিজের প্রাণ পরিত্যাগ করছে !

পরিব্রাজক।—মূর্খ ! প্রাণিগণের প্রাণ পরম প্রিয় ! প্রাণই শরীরকে ছাড়ছে—এই কথাই বলা উচিত।

শাণ্ডিল্য। আঃ ! দূর হ'—। অকরুণ ! নিঃস্নেহ !

কর্কশহৃদয়! দুষ্টবুদ্ধ! দুশ্চরিত্র! কূরশকট! মুধামণ্ড!

[মুধামুণ্ড—যার মুণ্ডনই বৃথা, ভণ্ড তপস্বী।]

পরিব্রাজক। তোমার মতলব কি।

শাণ্ডিল্য।—এক শ' আট নাম তোমার পূরণ করব!

পরি। স্বচ্ছন্দে।

শা। প্রভু! দুঃখিত হয়েছি।

পরি। কেন?

শা। এই নারী আমাদের আপনার জন!

পরি। কি রকম! স্বজন কি রকম!

শা।—এই নারী প্রব্রাজকদের মত কাকেও স্নেহ করে না।

পরি। স্নেহশূন্য হ'লেও পুনরায় অর্থযোগবশতঃ স্নেহ করে—এও খুব যুক্তিযুক্ত। [অর্থাৎ—কোন ব্যক্তি গণিকাসক্ত হইয়া অর্থ ব্যয় করিতে করিতে যদি নির্ধন হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহার প্রতি গণিকা অনুরাগশূন্যা হয়। পরে ঐ ব্যক্তি যদি আবার অর্থোপার্জ্জন করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে পুনরায় উহার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করে।]

কেন না—

যাঁহারা মমতাশূন্য, মোক্ষপ্রাপ্ত (জীবন্মুক্ত)—(উপনিষৎ) শাস্ত্রোপদিষ্ট পথে গমন ক'রে থাকেন, প্রীতিরহিত সেই সকল ব্যক্তির হৃদয়ও গুণের অপেক্ষা ক'রে থাকে। [গণিকাপক্ষে ব্যাখ্যা—যাহারা অতি নিঃস্নেহ অর্থাৎ কৃতঘ্ন, অনুরক্তনায়কের ধন-মোচন-পরায়ণ, বাৎস্যায়নোক্ত কামশাস্ত্র-পথে যাহারা গমন করে, স্বতঃ অনুরাগ-রহিত সেই সকল গণিকার হৃদয়ও স্বভাবতঃ অর্থলিপ্সু হইলেও নায়কের রূপ-শীলাদি গুণের অপেক্ষা করিয়া থাকে—কারণ, উহাতে তাহাদিগের উৎকর্ষ খ্যাপিত হয় যে, অমুক নায়ক অমুকী গণিকার অনুরাগী।]

শা। প্রভু হে! আর অন্তরকে ধ'রে রাখতে পারছি নি। কাছে গিয়ে (একটু) কাঁদি।

পরি। না—না—যাওয়া উচিত নয়।

শা। আহা! চটবেন না। পরিব্রাজকদের চটা উচিত নয়। (গণিকার নিকটে যাইয়া) হা অজ্জুকে! হা প্রিয়দ্রব্যসম্পন্নে! হা মধুরগায়িনি!

চেড়ী। আর্য্য! এ কি ব্যাপার?

শা। ভদ্রে! স্নেহ!

চেড়ী। (স্বগত) সাধু পুরুষ সকলের প্রতি দয়ালু—এ খুবই যুক্তিযুক্ত বটে!

শা। ভদ্রে! আমি এঁকে স্পর্শ করি?

চেড়ী। আর্য্য! তা পারেন।

শা। হা ভদ্রে! (পাদযুগল স্পর্শ করিলেন)

চেড়ী। না—না—পা ছোঁবেন না!

শা। আ! আকুল হয়েছি। মাথা বা পা—কিছুই বুঝছি নি। এঁর দুটি তালফলের মত পীন কালেয়চন্দনানুলিপ্ত অনধোমুখ স্তন জীবদ্দশায় কখন পাই নি।

চেড়ী। (স্বগত) আচ্ছা, এই রকম তা হ'লে করি! (প্রকাশ্যে) আর্য্য! অজ্জুকাকে এক মুহূর্ত্ত রক্ষা করুন—যতক্ষণে আমি মাকে ডেকে আনি।

শা।—যাও শীগ্গির! যাদের মা নেই—আমিই তাদের মা!

চেড়ী। (স্বগত) দয়ালু এ ব্রাহ্মণ অজ্জুকাকে কখনও ছেড়ে যাবে না! যাওয়া যাক্। (নিষ্ক্রান্তা)

শা। এ বেটী গেছে। (এইবার) মনের সুখে কাঁদি—হা অজ্জুকে। হা মধুরগায়িনি!

পরি।—শাণ্ডিল্য! এ (তোমার) কর্ত্তব্য নয়।

শা।—আঃ! দূর হও নিঃস্নেহ! আমাকেও তোমার মতই ঠাওরাও না কি!

পরি।—এস বৎস! অধ্যয়ন কর এখন।

শা।—প্রভু! কেন? বরং এই অনাথা হতভাগীর চিকিৎসা করুন।

পরি।—তোমার কি ঔষধ-শাস্ত্র? (তুমি ঔষধশাস্ত্র পড়ছ যে চিকিৎসা নিয়ে এত ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছ?)

শা। তোমার যোগের ফল পাপময়।

পরি। আহা। এই বেচারী কর্ত্তব্য দুর্ব্বোধ্য ব'লে আশ্রমের আচার কি তাও জানে না *। মহেশ্বরাদি যোগাচার্য্যগণের নিকট হ'তে শুনেছি—কিছু কিছু শিষ্যের প্রতি কৃপা আসক্তিকে বাধা দেয় না (অর্থাৎ—শিষ্যের প্রতি দয়া অনেক সময় আসক্তি জন্মাইয়া দেয়—কিন্তু গতি কি?) তাই এর বিশ্বাস উৎপন্ন করব—'এই রকম হচ্ছে যোগ'। এই গণিকার দেহে নিজেকে যুক্ত ক'রে দিই।

(যোগে উপবেশন করিলেন)

গণিকা।—(উঠিয়া) শাণ্ডিল্য! শাণ্ডিল্য!

শা। (সহর্ষে) আরে! এ নারীর ত প্রাণ ফিরে এসেছে! (প্রকাশ্যে) ভদ্রে! এই যে আমি!

গণিকা। হাত-পা না ধুয়ে আমায় ছুঁয়ো না!

শা। দূর! এ মাগী ত বড় শুচিবেয়ে!

গণিকা। এস বৎস! অধ্যয়ন কর দেখি!

শা। এখানেও অধ্যয়ন! (তা হলে বরং) প্রভুর

* মূলে পাঠ আছে 'আশ্রমপদং'—আশ্রম-সময়—আশ্রমের আচার। যোগাশ্রমের আচার যোগবিভূতি প্রদর্শন না করা। পাঠান্তর—আশ্রমাপবাদঃ—আশ্রমবিরোধী যোগসিদ্ধিপ্রকটন। যোগবিভূতি দেখান আশ্রমাচারের বিরোধী। শাণ্ডিল্য ইহা বুঝে না বলিয়াই যোগবলে গণিকার চিকিৎসা করাইতে চাহে।

কাছে যাই। (নিকটে যাইয়া) প্রভু হে! আরে! প্রভু যে মরেছেন! হা বাচাল! হা! অতিযোগবিত্তক! হা উপাধ্যায়! হায়! হায়! এই রকম বহু বিষয়ে অভিজ্ঞ লোকেরাও ম'রে থাকেন।

[গণিকার মাতা ও চেড়ীর প্রবেশ]

চেড়ী। আসুন আসুন, মা।

মাতা। কোথায়? কোথায় আমার মেয়ে?

(আগামী বারে সমাপ্য)

মদনকুমার*

(রূপকথা)

আনন্দবর্দ্ধন

ঘ

দিনের আলো নিভে গেল। সন্ধ্যার ছায়া নামলো দৈত্য-পুরীতে কালিমার মতো। ঠিক সেই সময়েই পূব-দক্ষিণ দিকে উঠলো ধুলোর ঝড়। দূর থেকে শোনা যেতে লাগলো একটা ভয় গোঁ-গোঁ শব্দ—যেন দমকা আঁধি ছুটে আসছে. এই শব্দ যত এগিয়ে আসতে থাকে—বাড়ী-ঘর, গাছ-পালা কেঁপে কেঁপে ওঠে। মদনকুমার কেঁপে উঠলো চমক খেয়ে। মধুমালা সেই দিকে চেয়ে দেখে: আবছায়া অন্ধকার চিরে নীল পাহাড়ের মতো একটি ভয়ঙ্কর চেহারা শূন্য থেকে শোঁ-শোঁ ক'রে নামছে—যেন পক্ষীরাজ গরুড়। দেখতে না দেখতেই নীলদৈত্য সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো। বিরাট তা'র দেহ, বিরাট মুণ্ড, দু'টো চাকা চাকা মধুর মতো লাল লাল চোখ, লাঙলের মতো লম্বা নাক, নোড়ার মতো দাঁত, বড় কড়ার মতো চোয়ালটা ঝুলে-পড়া, হাত-পা-গুলো গাছের গুঁড়ির মতো, আর গা-ময় ঘাসের মতো চুল। মধুমালা এই বিকট মূর্ত্তি দেখে তো প্রথমটা আঁতকে উঠলো, কিন্তু তখুনি সামলে নিয়ে সাহসে ভর ক'রে দৈত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইলো। দৈত্য তা'র দিকে খানিকক্ষণ কট্-মটিয়ে তাকিয়ে থেকে বাজ-হাঁকা গলায় ব'লে উঠলো: "কে তুমি এখানে?"

মধুমালা বল্‌লে: "আমি অতিথ্—অচিনপুরের রাজপুত্তুর।" আবার দৈত্য জিজ্ঞেস করলে: "তুমি এই পুরীতে কি ক'রে এলে?" মধুমালা—ভালোমানুষের মতো যেন কিছু জানে না—এই ভাবে উত্তর দিলে: "আমি নানানদেশ ঘুরতে বেরিয়েছি। ঘুরতে ঘুরতে এই নীলপুরী চোখে পড়লো, আমার কেমন অদ্ভুত ঠেক্‌লো...তাই এই আশ্চর্য্য দেশ দেখতে সাধ হয়েছে ব'লেই এখানে এসেছি।" এই কথা শুনে নীলদৈত্য বোয়াল মাছের মতো কান পর্য্যন্ত চেরা বিষম হাঁ বার ক'রে বেদম হাসতে আরম্ভ করলে। হাসির ধমকে মদনকুমার আর মধুমালার কানে তালা লেগে গেল, চোখে যেন ধোঁয়া দেখতে লাগলো। হাসি থামিয়ে মধুমালাকে দৈত্য বললে: "এসেছ—বেশ করেছ, আমার লাভ বই লোকসান নেই। খাও-দাও, ঘুরে বেড়াও। এ-পুরী একবার যা'র চোখে পড়ে তা'কে চুম্বকের মতন টানে, তোমাকে আসতেই হবে। তাহ'লে তোমরা এসো আমার পুরীতে। এখন আমি ভোজনে বসবো। তোমার আদরের যোগাড় তা'র প'রে।"

এই ব'লে দৈত্য হন্ হন্ ক'রে তা'র পুরীর মধ্যে ঢুকে পড়লো। মদনকুমারের মুখে আর কথা নেই, মুখ তার শুকিয়ে গেছে, ভয়ে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে চল্‌লো। মধুমালাও পিছু নিলে। পুরীর কাছাকাছি এসে তারা দু'জনেই খোলা জানালা দিয়ে দেখতে পেলে দৈত্যটা মাথা গুঁজে হরদম গিলে যাচ্চে... গোটা-গোটা আগুনে ঝলসানো হাঁস, সারসপাখী, বাদুড় একটা ত্রিশূলের মতো খোঁচা দিয়ে গিঁতে ধরে টপটপ মুখে পুরছে—তার পর এদিক-ওদিক দু'বার চিবিয়ে কোঁৎ ক'রে গিলে ফেলছে—যেন আলুর দম। যখন তারা দেখলে সেই দৈত্য একটা বড় আস্পোড়া বাছুর মড়্মড়্ ক'রে চিবুতে শুরু করেছে আর সেখানে দাঁড়াতে পারলে না। যেমনি ফেরা অমনি তারা শুনতে পেলে কে যেন তাদের ডাকছে: "এদিকে এসো তোমরা।" চেয়ে দেখে এক পরমা সুন্দরী কন্যা ঝলমল্ করছে তার গায়ে সোনার চেলি—তাতে নীল চওড়া পাড়, গলায় ঝুলছে নীলপদ্মের মালা। এই জনমানবহীন দৈত্যপুরীতে সেই রূপসী মেয়ে দেখে তারা আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। মেয়েটি এগিয়ে এসে বল্‌লে: "আমার সঙ্গে মোড়-মন্দির ঘরে এসো।" তার কথাগুলি যেন কানে গিয়ে মধুর কিঙ্কিনীর সুর তুল্‌লে। তারা কোনো কথা না ব'লে কন্যার সঙ্গে মন্দিরে গেল। সেখানে কন্যাটি মধুমালাকে খুব ভালো ভালো খাবার জিনিস দিলে। তার পর হেসে বল্‌লে: "তুমি এই মন্দির-ঘরেই থাকো। আর কোথাও যেয়ো না। আমি এবার যাই, আমার কাজ আছে।" মধুমালা ব'লে উঠলো: "কোথায় যাবে আমায় একলা ফেলে?" সেই সুন্দরী কন্যা এক মুহূর্ত্তে হেসে উত্তর দিলে: "এই পাশের মন্দির-ঘরে গিয়ে এই রাজ-পুত্তুরকে নীল যোড়ে সাজাতে হবে, সাধ মিটিয়ে খাওয়াতে হবে। ওর সঙ্গে আজ যে আমার বিয়ে-বিয়ে খেলা।" মদনকুমারকে ডেকে বল্‌লে: "এসো গো কুমার, আর দেরী করলে দৈত্যরাজ ক্ষেপে যাবে। ভয় তার—পাছে সুসময় ব'য়ে যায়!"

মধুমালা আর থাকতে না পেরে ব'লে উঠলো: "এই রাজকুমারের সঙ্গে 'বিয়ে-বিয়ে' খেলা আবার কি? তুমি কি দৈত্যকন্যা? তোমার নাম কি?"

এ-রকম ক'রে এর আগে কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করে নি, সকল রাজপুত্র তার মুখের দিকে চেয়ে সব ভুলে গিয়ে তার কথামত এক রাত্রির জন্যে উঠেছে-বসেছে, শেষকালে হয়েছে দৈত্যের বলি। মধুমালার কথা শুনে কন্যার আশ্চর্য্য লাগলো—

* গত পৌষ সংখ্যার পর।

কইলে: "নতুন কুমার, এ-কথা আমায় কেউ শুধোয় নি! তুমিই কেবল জানতে চাইলে। কিন্তু তোমাকে আমার বিষয় কোনো কথা আমি বলতে পারি না। দৈত্যরাজ শুনতে পেলে —আমার কি তোমার রক্ষা থাকবে না।" মধুমালা এই কথায় ভোল্‌বার পাত্রী নয়, মাথা ঝেঁকে বল্‌লে: "তাতে আমি ডরাই না। নিশ্চয় তুমি রূপসী মায়াবিনী। আমাকে বল্‌তেই হবে, নইলে এই কুমারকে অন্য যায়গায় যেতে দোবো না।"

সেই কন্যা তখন ফ্যাসাদে পড়লো। চারিদিকে ভয়ে ভয়ে চেয়ে দেখে চুপি চুপি বল্‌লে: "ওকে আটকাবে এমন শক্তি তোমার নেই—বিপদ্ হবে। যদি নিতান্তই আমার কথা জানতে তোমার ইচ্ছা হয়, তা'হ'লে যা' বল্‌বো—তা' কি কর্‌তে পারবে? সে-কাজ কর্‌বার মতো আজ পর্য্যন্ত কারোর মনের জোর দেখি নি।

মধুমালা কইলে: "বলো তুমি, সে যত বড়ই শক্ত কাজ হোক্ —আমি করবো।"

কন্যা আর দোমনা না হ'য়ে কানে কানে বল্‌লে: "এই পুরীর ঈশান কোণে একটা নীল সরোবর আছে। সরোবরে নেমেছে ছোট একটি ঘাট—নীল-পাথরে বাধানো। তারি এক পাশে অনেককালের একটা পোড়োমন্দির। মন্দিরের দেবতা—নীলকণ্ঠ। ঘাটে বাঁধা আছে একটা নীলপাথরের ভেলা। সেই ভেলায় যে-সে চড়তে পারে না। নীলকণ্ঠের মন্দিরে ঢুকে যে তাঁর পূজো করে অক্ষয় বিষ-কবচ পায়—সেই ঐ ভেলায় ভেসে সায়রের মাঝখানে যেতে পারে। সেখানে ফুটে আছে সাপে-জড়ানো নীলপদ্ম। সেই নীলপদ্ম যে আন্‌তে পারবে—সেই আমার মায়ার ঘোর কাটিয়ে আমার পরিচয় পাবে। কিন্তু মনে রেখো: মন্দিরে ঢুকতে হ'লে বুক চিরে রক্ত দিয়ে চৌকাটে আল্‌পনা এঁকে দিতে হবে।" ঢং ক'রে একটা ঘণ্টা পড়লো। কন্যা চম্‌কে উঠলো—আর বলা হোলো না, মদনকুমারকে টান্‌তে টান্‌তে পাশের যোড়মন্দিরে চ'লে গেল। মধুমালা সেই ঘরে একলা প'ড়ে রইলো। মধুমালা মনে মনে বুঝলে—এ-সমস্ত দৈত্যের ছল। তবু কন্যার কথার উপর বিশ্বাস ক'রে ছুটলো ঈশান কোণে নীলসায়রের ধারে নীলকণ্ঠের মন্দিরে। সেখানে পৌঁছে কোমরে-বাঁধা তলোয়ার দিয়ে বুক চিরে রক্তের আল্‌পনা আঁকলে মন্দিরের চৌকাঠের। মন্দিরের দ্বার খুলে গেল, মধুমালা যেই ঢোকা—অমনি দরজা হ'য়ে গেল বন্ধ:— সে-দিকে খেয়াল না ক'রে সে এগিয়ে গেল দেবতার কাছে—চোখের জলে তাঁকে অঞ্জলি দিলে, ভক্তি দিয়ে করলে পূজো। প্রণাম ক'রে উঠে হঠাৎ খুঁজতে খুঁজতে তার চোখে পড়লো—নীলকণ্ঠের হাতে-জড়ানো ফণির ফণার ওপর একটা কি জল্‌জল্ করছে। ভরসা ক'রে মধুমালা এগিয়ে এসে দেখে—সেটি বিষ-কবচ। তখুনি তুলে নিলে। যেই পিছন ফিরেছে—ঠিক সেই সময়ে তার কানে একটা ভারি আওয়াজ ভেসে এলো, আর সরোবরের জলে যেন একটা ছপ্ ছপ্ শব্দ। মধুমালা ব্যাপার কি জান্‌বার জন্যে সেই মন্দিরের একটা ঘুলঘুলি দিয়ে যা' দেখলে—তাইতে সে অবাক্ হ'য়ে গেল। দেখলে: সেই নীলদৈত্য সরোবরের ঘাটে নেমে হাত বাড়িয়ে বল্‌ছে—

"বোদাল বোদাল—ভূস্:
পেটের খোড়ল—খুস্:
গোলক আগ-ভাঁটা:
খোন্‌তো তোর হাঁ-টা।"

বল্‌তে না বল্‌তে একটা মস্ত বড় বোয়াল মাছ ল্যাজ ঝাপটানিতে জল তোলপাড় করতে করতে ঘাটে এসে পৌঁছুলো। দৈত্য তা'র মুখের ভিতর হাত পুরে' দিয়ে তা'র পেট থেকে বা'র করলে আগুনের মতো জলন্ত একটা গোল পাথর। সেই পাথরটা নিয়ে সে চ'লে গেল তা'র পুরীর দিকে। মধুমালা আর দেরী না ক'রে কবচ-হাতে বন্ধ-কবাট ছুঁতেই খুলে গেল। মন্দির থেকে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি তা'র ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লো। ভোরের আলো ফুটে ওঠবার সঙ্গেই নীলদৈত্য নীল ধ্বজা উড়িয়ে ঝাউ-এর মাথা কাঁপিয়ে দিয়ে, শাল তমালের বনে নাড়া দিয়ে চল্‌লো অপরের রাজ্যে দৌরাত্ম্য করতে। আকাশের নীচে পান্নার গাছগুলি যেন কান্নায় গুম্‌রে উঠলো। এই শব্দ শুনে মধুমালা বুঝলে যে—দৈত্য নীলপুরী ছেড়ে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে রাত পুইয়ে যেতে মধুমালা জেগে উঠে জোড়মন্দির ঘরে গেল। সেখানে এসে দেখে—মদনকুমারও নেই, সেই কন্যাও নেই। তখন এদিক-ওদিক খুঁজতে খুঁজতে একটা ঘরের সামনে এসে পৌঁছুলো। ঘরটি সোনার শিকলে আঁটা। বিষ-কবচ ছুঁইয়ে দিতেই ঝন্‌ঝন্ ক'রে শিকল গেল টুটে, তখন সেই ঘরের মধ্যে গিয়ে মধুমালা দেখলে সেই কন্যা নিশ্চল হ'য়ে একটা পালঙ্কে শুয়ে ঘুমোচ্চে, তা'র কোনো সাড়া-শব্দ নেই, ঘন-নীল মায়ার কাজল তা'র চোখের পাতায় লেগে রয়েছে। তখন মধুমালার মনে পড়লো নীল পদ্মের কথা, আর মনে হোলো—সেই বোয়াল মাছের পেটের ভিতরকার অগ্নি-পাথরটার নিশ্চয় কোনো গুণ আছে। এই ভেবে মধুমালা নীল-সরোবরের ঘাটে-বাঁধা নীল পাথরের ভেলা বেয়ে নীলপদ্ম তুলে আন্‌লে। ঘাটে ফিরে এসে দৈত্যের কাছে শোনা সেই বোয়াল-ডাকা মন্ত্রটা যেই বলা—অমনি বোয়াল মাছটা ভেসে এলো, তারপর তা'র পেটের ভিতর থেকে অগ্নি-পাথরটা বা'র ক'রে নিয়ে চল্‌লো মধুমালা কন্যার সেই বন্দী-ঘরে। নীলপদ্ম ঘুমন্ত কন্যার সমস্ত অঙ্গে বুলিয়ে দিলে, সেই অগ্নি পাথর ঠেকালে তার মাথায়, কন্যা হাই তুলে চোখ মুছে উঠে বস্‌লো। সামনে রাজপুত্রবেশী মধুমালাকে দেখে বুঝতে পারলে—সেই তাকে নীলপদ্ম আর পরশ পাথরের স্পর্শ দিয়ে জাগিয়েছে।

এবার মধুমালা কন্যাকে বল্‌লে, "তুমি যা বলেছিলে তাই করেছি। এখন দাও তোমার পরিচয়। বলো কোথায় গেল সেই রাজকুমার?

[ক্রমশঃ

শ্রীঅবনীকান্ত ভট্টাচার্য্য

তিন

মহিমারঞ্জন উন্নত আবেগে দিনগুলি লইয়া ছিনিমিনি খেলিতে লাগিলেন। বাহিরের কাজের প্রতি তাঁহার আর আকর্ষণ রহিল না। ঘরের মধ্যে একান্তবাসী থাকিয়া মদ আর বইকে করিলেন অপ্রত্যাশিত আঘাত ও অবমাননা ভুলিবার সহায়। কিন্তু তাহাতেও শান্তি মিলিল না। আত্মঘাতী পন্থা হইল তাঁহার একমাত্র অবলম্বন। স্ত্রীর 'পরে দুর্জ্জয় অভিমান কেন্দ্রাতিসারী হইয়া তাঁহাকে মারিতে লাগিল। দিন যত যায়—মনের বিকারটা তত বাড়িতে থাকে। বাড়ী-শুদ্ধ লোক মহিমারঞ্জনের এই অস্বাভাবিক আচরণে চিন্তান্বিত হইয়াও কোনো প্রতিকার করিতে পারিল না। সকলে দর্শকের ন্যায় দূরে দাঁড়াইয়া একটা আসন্ন বিপদের দুর্ভাবনায় কণ্টকিত হইয়া রহিল। অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে মহিমারঞ্জনের সর্ব্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। অনিদ্রারোগ দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রলাপও সুরু হইল। ডাক্তার আসিয়া বলিয়া গেলেন—'ডিলিরিয়াম ট্রেমেন্স—ভয়ের বিশেষ কোনো কারণ নেই—তবে, খুব সাবধানে কয়েকটা দিন কাটিয়ে দিতে হবে। অত্যন্ত মাদক জিনিষ সেবনের এই পরিণতি।'

প্রায় তিন সপ্তাহ পরে মহিমারঞ্জন সারিয়া উঠিলেন।

দেওয়ান গোবিন্দরাম, সময় বুঝিয়া, সজলচোখে ব'লল, "মা'র আমার সীঁথের সিঁদূরের পয় আছে বলেই আপনাকে আবার ফিরে পেলুম। আমি আপনার বাপের বয়সী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, হাত জোড় ক'রে অনুরোধ করছি—আর ও বিষগুলো খেয়ে নিজেকে মারবেন না।"

ডাক্তার বলিলেন, "আর মদ্যপান করা আপনার পক্ষে আত্ম-হত্যারই সমান হবে।"

মহিমারঞ্জন ক্লান্তদৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কোনো উত্তর দিলেন না। ডাক্তার বিদায় লইলে—দেওয়ানকে ক্ষীণ-স্বরে কহিলেন, "আমি কি নিয়ে বাঁচবো তা হ'লে?" গোবিন্দরাম বুঝিল, মহিমারঞ্জনের কোন্ খানে ক্ষত; ধীরে ধীরে উত্তর দিল:—"ঐ নিয়ে কি মানুষ কোনো দিন বেঁচেছে—স্যার! মানুষ বাঁচে তার স্ত্রী-ছেলে-মেয়ের ভালবাসার রাজ্যে—কেননা, তাঁদেরি মধ্যে সে দেখতে পায়—ভগবানের প্রেমের রূপ।—আর, মানুষ বাঁচে তার কীর্ত্তির মধ্যে, তার মনুষ্যত্বের মধ্যে।"

মহিমারঞ্জন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আমার তো কোনটাই নেই—দেওয়ান মশাই,—যা' ছিল—সমস্তই একে একে হারিয়েছি।"

"একটিও হারাননি। যা' ঘটেছে—সে ক্ষণেকের প্রতিক্রিয়া। মেঘ কি চিরকাল আকাশ ছেয়ে থাকে—সূর্য্যই চিরদিনের।" গোবিন্দরামের গলায় সহানুভূতি ঝরিয়া পড়িল।

মহিমারঞ্জন কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া দেওয়ালের দিকে শূন্য দৃষ্টি ফেলিলেন, হঠাৎ চোখে পড়িল—একটী সুদর্শন রঙীন-পক্ষ প্রজাপতি সদ্য-বোনা সূতার জালে জড়াইয়া গিয়াছে—আর লোলুপ মাকড়শাটী সেটিকে ধরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু পাখা ঝাপটাইয়া সেই ক্ষুদ্র পতঙ্গটি জাল-মুক্ত হইয়া উড়িয়া গেল—জালে আটকাইয়া রহিল তাহার রঙীন্ পাখার ছিন্নাবশেষ, যেন স্মৃতির বেদনা। মহিমারঞ্জন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন: "দেওয়ান মশাই, আপনার কথায় অসুস্থ মনকে সান্ত্বনার অবস্থায় টেনে আনবার প্রচেষ্টা রয়েছে বটে; কিন্তু, সান্ত্বনা আমার জগতে মিথ্যা মরীচিকা হ'য়ে গেছে। মনে হয়, আলো নিভ-নিভ—অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। চোখের জলে যে অভিমানিনী বিদেয় নিয়েছে—আর কি সে হাসিমুখে ফিরে আসতে পারবে? আমার মনে হচ্ছে, দেওয়ান মশাই, আপনার শমিতা-মা আর ফিরে আসবে না?"

গোবিন্দরাম উদ্বিগ্ন-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কেন ফিরবেন না মা-আমার? সম্পর্ক কি একটা ছোট আঘাতে শেষ হ'য়ে গেল—মনে করেন? ও কিছু নয়—কেবল সংশয়ের প্রশ্ন। এই সংসার গড়ে ওঠে—দুটী জীবনকে অবলম্বন ক'রে। দু'জনাকেই কিছু কিছু ত্যাগ করতে হয়—তবেই তো ঘর বাঁধে। শমিতা-মা ফিরে আসবেন বৈকি? স্বামীকে স্ত্রী পুরোপুরী অধিকার ক'রবার আকাঙ্ক্ষা রাখে—সে অধিকারের ভেতরে এতটুকুন্ পর্য্যন্ত ফাঁক রাখতে তার মন ওঠে না—সইতেও পারে না। তার এই আকাঙ্ক্ষার পথে যদি কোনো রকম বাধা আসে—তার সারা শরীর-মন বিকল হ'য়ে ওঠে, তবে সাময়িক। এ তো প্রায়ই দেখা যায়—ঘরে ঘরে।—এই সনাতন কারণটা কি সারাজীবন স্বামীস্ত্রীতে বিচ্ছেদ এনে দেয়?"

মহিমারঞ্জন একটু গলা চড়াইয়া কহিলেন, "আপনি যা বললেন,—স্ত্রী স্বামীর পুরো অধিকার চায়, না পেলেই গণ্ডগোল।—একে বলি—স্ত্রীলোকের মন-গড়া দর্শন—কল্পনার খাদ্য, বাস্তব-ক্ষেত্রে এ কস্মিন্ কালে সম্ভব হ'তে পারে না। আপনি কি বলতে চান্—স্বামী তাঁর স্ত্রীর আঁচল ধ'রে তাঁরই শুধু মনস্তুষ্টির জন্যে নিরীহ বেচারী সেজে থাকলেই—স্বামীর জীবন কৃতার্থ হয়ে উঠবে?—স্ত্রীর সকল আকাঙ্ক্ষায় সায় দেওয়া স্বামীর পক্ষে সম্ভব নয়। এম্নি ক'রেই স্ত্রী তার স্বার্থ আর জিদ্ বজায় রাখতে গিয়ে মনটাকে ক'রে তোলে সঙ্কীর্ণ। সেই জন্যেই আরম্ভ হয় ভুল বোঝার পালা।—আচ্ছা, দেওয়ান মশাই, আপনি ত্যাগের কথা বললেন, আমার স্ত্রী কি আমার এই আচরণটাকে ক্ষমা ক'রে নিতে পারতেন না? মানুষের দোষ আছে, ত্রুটী আছে, অন্যায়ও অনেক করে,—তার কি প্রতিবিধানের প্রণালী এই?—আর কি কোনো উপায় ছিল না?—আমি সমস্ত তিরস্কার গঞ্জনা মাথায় পেতে নিতে প্রস্তুত হ'য়েই এসেছিলাম।" এতগুলি কথা এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিয়া মহিমারঞ্জন হাঁফাইতে লাগিলেন—অবশ হইয়া বিছানায় পড়িয়া রহিলেন।

গোবিন্দরাম ধীরে ধীরে বলিল, "থাক্‌,—আপনি দুর্ব্বল, আর উত্তেজনা ভাল নয়। এ-কথার মীমাংসা করবার অনেক সময় আছে। আগে ভালো ক'রে সেরে উঠুন। তাঁর যতই অভিমান হোক, আপনি নিজে গিয়ে একবার যদি সেখানে দাঁড়ান, তিনি কি আর থাকতে পারবেন - হয়তো একটু লজ্জাও পাবেন, হঠাৎ রাগের মাথায় আবেগের ঝোঁকে একটা কাজ ক'রে ফেলার জন্যে অনুতাপও জাগতে পারে। আপনি একটু সুস্থ হ'য়ে ঘুমোবার চেষ্টা করুন দেখি। ও আর ভাববেন না।"

"আমার অসুখ করেছিল—সে খবর তিনি পেয়েছেন ?"

গোবিন্দরাম এইবার মুস্কিলে পড়িল। সামান্য দ্বিধা করিয়া তাহাকে বলিতে হইল যে টেলিগ্রাম্ করা হইয়াছিল, কিন্তু কোনো উত্তর আসিয়া পৌছায় নাই।

মহিমারঞ্জন মুখে শুকনো হাসি টানিয়া আনিয়া বলিলেন—"তবেই বুঝুন, অসুখের খবর পেয়েও যখন আসেন নি, তখন ও-দিক থেকে আর সাড়া পাবেন না।"

দেওয়ান আর কথা খুঁজিয়া পাইল না। দুই চারিটি অন্য কথা পাড়িয়া কোনো রকমে অব্যাহতি পাইল।

* * *

মহিমারঞ্জন কয়েকদিনের মধ্যেই সারিয়া উঠিলেন। কিন্তু শূন্য ঘরে তাহার মন টিকিতে চাহিল না। শমিতা ও শিশুকন্যার জন্য মন সময়ে সময়ে হাহাকার করিয়া উঠিলেও তাহাদের কোনো খোঁজ নিতে তাঁহার আহত গর্ব্বে বাধিল। স্বামী স্ত্রীর মাঝখানে দুর্জ্জয় অভিমানের পাহাড় উঠিয়া উভয়ের মধ্যে দূরত্ব গড়িয়া তুলিল। যেন অন্ধকার রাত্রে আকাশ ও মাটির মাঝখানে অনন্ত বিরহের ব্যবধান। মহিমারঞ্জন দেওয়ানের উপর সমস্ত ভার বোঝা চাপাইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। নানা দেশ ঘুরিয়া বেড়াইলেন। কিন্তু মনে যেন সহজ আনন্দ কিছুতেই আর ফিরিয়া আসিতে চাহে না। তবু তিন মাস কাটিয়া গেল। তখন তিনি এলাহাবাদে—হঠাৎ দেওয়ানের নিকট হইতে তার পাইলেন—"Situation Serious. Come Sharp."

টেলিগ্রামের ভাষা পড়িয়া মহিমারঞ্জনের মন আকুল হইয়া উঠিল—স্ত্রী-কন্যার কথাটাই সর্ব্বাগ্রে আসিয়া তীরের ফলার মত মনকে বিঁধিল। পরক্ষণেই, বিষয়-সম্পত্তি ও ব্যবসায়ের ব্যাপার বিষ ছড়াইল। কিন্তু তারের ভাষা এতো অস্পষ্ট যে, প্রকৃত অবস্থা কি হইতে পারে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, দেওয়ানের উপরই মহিমারঞ্জনের রাগ বাড়িতে লাগিল। কিন্তু রাগ বাড়িয়া চলিলে বিদেশে বসিয়া মনের অশান্তির অন্য কোনো আশু প্রতিকার নাই বুঝিয়া পরের দিনই বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

গেটের ভিতরে নিশব্দে ট্যাক্সি ঢুকিল। মহিমারঞ্জনকে কেহ অভ্যর্থনা করিতে আসিল না। চারিদিক একবার সশঙ্ক দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন...তাঁহার বিরাট অট্টালিকা যেন নিরুদ্ধ কান্নায় গুমরিয়া রহিয়াছে।

দেওয়ান গোবিন্দরাম তার করিয়া দিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে মহিমারঞ্জনের আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছিল; খবর কানে যাইতেই সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

দেওয়ানের দিকে তাকাইয়া মহিমারঞ্জন অজ্ঞাত আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিলেন। তাহাকে বিষাদের ঘনছায়া যেন ঘিরিয়া রহিয়াছে। মহিমারঞ্জনের মুখ হইতে কেবল একটি কথা বাহির হইল: "দেওয়ান মশাই।"—ইহার মধ্যে তাঁহার সকল উৎকণ্ঠা, সকল জিজ্ঞাসা-প্রশ্ন ছিল। দেওয়ান কোনো কথা বলিতে পারিল না... তাহার ঠোঁট কাঁপিয়া উঠিল, চোখে জল টল্‌টল্‌ করিতে লাগিল। এই বিশ্রী নিস্তব্ধতা মহিমারঞ্জনকে আরো বিচলিত করিয়া তুলিল।

অশান্ত কণ্ঠে কহিলেন: "কিসের জন্যে এমন জরুরী তার করেছেন আমাকে দেওয়ান মশাই তাতো বললেন না। এমনি ক'রে আমাকে দুর্ভাবনার মধ্যে ফেলে রেখে, আপনি কি আমার ধৈর্য্যের পরীক্ষা করছেন? বলুন আমাকে, এখুনি বলুন—কি হয়েছে?"

দেওয়ান আপনাকে আর বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না, বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিল। ধরা-গলায় কোনো রকমে বুঝাইয়া দিল যে: "সর্ব্বনাশ হইয়াছে, এতোদিনে ঘরের লক্ষ্মী সত্যই বিদায় হইয়াছেন—" কথাটা ঠিক উপলব্ধি করিতে না পারিয়া মহিমারঞ্জন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় তিক্তস্বরে কহিলেন:—"কান্নাটা এখন রাখুন—আগে আমাকে বুঝতে দিন—সঠিক খবরটা কি!" দেওয়ান কোঁচার খুঁট দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল: "শমিতা-মা চিরদিনের জন্য আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন কর্ত্তাবাবু।"

মহিমারঞ্জন বিকৃতস্বরে চেঁচাইয়া উঠিলেন: -"কি বললেন?"

দেওয়ান বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "হ্যাঁ, মা আপনার অবহেলা আর সইতে পারবেন না বোধ হয়, তাই আপনাকে শাস্তি দেবার জন্যে তাঁর সমস্ত সংসার ফেলে রেখে পালিয়ে গেলেন। এতো অভিমান।"

মহিমারঞ্জন কোনো মতে টলিতে টলিতে ঘরের মধ্যে গিয়া বসিয়া পড়িলেন, কোনো কথা কহিলেন না।—যেন তাঁহার বলিবার সমস্ত কথা ফুরাইয়া গিয়াছে। -এতো বড় আঘাত তাঁহাকে পাইতে হইবে- এ যেন তাঁহার কল্পনারও অতীত। দেওয়ান তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেছে। মৌন-পরিবেশ বিদীর্ণ করিয়া হঠাৎ মহিমারঞ্জনের কণ্ঠ মুখর হইয়া উঠিল:—"আচ্ছা, দেওয়ান মশাই, তাঁর পক্ষে কি এটা ঠিক কাজ করা হ'ল?...মানুষের জীবন ভুলে ভরা একটা ভুলের জন্যে তিনি আমার উপর এতোখানি নির্ম্মম হ'তে পারেন—তা ভাবতেও পারিনি। চিরদিনের তরে আমাকে অপরাধী ক'রে রেখে গেলেন।" চোখ দিয়া টল্‌ টল্‌ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল—আর কথা কহিতে পারিলেন না।...কিছুক্ষণ পরে আবার কহিতে লাগিলেন: "ভুল করেছি—জানি, কিন্তু ভুলের কি মার্জ্জনা নেই? প্রতিশোধ নেবার অন্য কোনো উপায় কি তাঁর জানা .. না: — ঠিকই করেছেন। আমার এই যোগ্য পাওনা।—সতীর দেওয়া এ-অভিশাপ আমাকে বইতেই হবে। মধ্যদিনে সূর্য্যাস্তের শোক।

"...সতী? যে স্বামীর একটা ত্রুটীর জন্যে প্রাণশূন্য করতে পারে—ভুলটাই বড় কাছে হ'য়ে উঠলো সবার চেয়ে, বড়—আর

সব কিছু ছোটো হ'য়ে গেল—অভিমান ছাপিয়ে উঠে যায় সমস্ত ভালবাসা স্নেহ মমতাকে ডুবিয়ে দিল—তা'কে সতী-গরবিণী বল্‌বো না, তা'কে বলি, নিজের দাবী মেটাতে না পেরে অন্ধ-আক্রোশে আত্ম-বলির অভিমানে অভিমানিনী—। হায়! দুর্জ্জয় অভিমানই কাল্ হ'লো—একবার ক্ষমা চাইবারও অবসর পেলুম না...হায় নারী !!"

দেওয়ানের এবার মুখ ফুটিল,..."তিন মাস তিনি ব'সে ছিলেন আপনার প্রতীক্ষায়...আপনি একদিনের তরেও তো খোঁজ খবর করলেন না !...জীবনে বীতশ্রদ্ধ না হ'লে কি কেউ জীবন নষ্ট করে ?...রাগের কথা নয় কর্ত্তাবাবু, ভুল, অভিমান দু' তরফেরই আছে...কিন্তু, ভুল শোধরাবার দায়িত্ব ছিল আপনারই বেশী। এই রকম ভুলের জন্যেই তো সংসারে বিপর্যয় ঘটে।"

সনিশ্বাসে মহিমারঞ্জন উত্তর দিলেন, "আজ সমস্তই আমি মেনে নিচ্ছি। কিন্তু আরও আগে যদি আমার চোখে আঙুল দিয়ে এ ভুলটা দেখিয়ে দিতে পারতেন, দেওয়ান ম'শাই! বড় দেরী হ'য়ে গেল—এখন তো শোধরাবার সীমানার ওপারে...। যাক্, সব চুকে-বুকে নেন, এখন আমি মুক্ত—আর এ বোঝা বইবো কিসের জোরে—কা'র জন্যে ? —আজ থেকে আমার লম্বা ছুটি—ব্যস্ !"

দেওয়ান শশব্যস্তে কহিয়া উঠিল : "সে কি কথা কর্ত্তাবাবু—আপনার মা-হারা মেয়েটার কথা ভুলে গেলে তো চলবে না···আপনি ছাড়া তার আর কে আছে কর্ত্তাবাবু !"

অতি দুঃখের হাসি হাসিয়া মহিমারঞ্জন কহিলেন,—"একেই বলে মতিভ্রম,—একমাত্র সন্তান—তা'র কথাটাও ভুলে গিয়ে-ছিলুম! আমাকে সংসারে বেঁধে রাখবার জন্যে ঐ শেকল গ'ড়ে রেখে গেছেন তিনি—এই তো মানুষের জীবন! কিন্তু তিনি আমাকে যত বড় দুঃখই দিন···আমার চোখের সামনে থেকে তিনি স'রে গেছেন বটে ;—তিনি আমায় এড়িয়ে যেতে পারবেন না কিছুতেই—স্মৃতির তাজমহলে আমি তাঁকে বন্দী ক'রে রাখবো।—তবে শেষ কথা-কওয়া হ'ল না—এ দুঃখ আমি কিছুতেই ভুলতে পাচ্ছি না।"

দেওয়ান এই কথায় কিঞ্চিৎ ভরসা পাইয়া—একটা খাম বাহির করিয়া মহিমারঞ্জনের হাতে দিয়া কহিল, "এই আমার শমিতা-মার শেষ বিদায় বক্তব্য। একটা চিঠি লিখে এটি পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁর দাদা শচীনবাবু, এরি সঙ্গে আছে।"

মহিমারঞ্জন গভীর ব্যথায় দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া প্রথমে স্ত্রীর পত্রটী খুলিলেন। পত্রে লেখা ছিল :—

"শ্রীচরণেষু,—

দাদা, স্বামী-সুখ-বঞ্চিতা—ছোটো বোনকে ক্ষমা ক'রো। তোমরা আমাকে খুসী করবার জন্যে অনেক চেষ্টা ক'রে রাজার বৌ—ক'রে দিয়েছিলে—সে জন্যে প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজনের ঈর্ষ্যার অবধি ছিল না। কিন্তু তাদের অভিপ্রায়ই শেষকালে জয়ী হ'লো। বিধাতাপুরুষ আমার কপালে জন্মের সঙ্গে এমন আঁক ক'রে দিয়েছেন—তা' আর গাই বলা যাক্—সুখের ভাগ্য বলা যায় না। এই ক্ষুদ্র নারী জীবনেই আমার বিকার এসে গেছে। এ-ভাবে জীবনের ভাবী দিনগুলো কাটিয়ে দেওয়া আমার মত মেয়ের পক্ষে সম্ভব নয় ? স্বামীর হীন চিত্তবৃত্তিকে মেনে নিয়ে পুরাণের সতীদের মতো জাড়্ বোট হ'য়ে বাঁচা আমার ধাতে সয় না। স্ত্রীর মর্য্যাদার মূল্যে তিনি এক বিদেশিনী বারাঙ্গণার মান রাখতেও দ্বিধাগ্রস্ত নন্। বার-নারীই যদি তাঁর জীবনের মুখ্য-কল্প হয়, তা' হ'লে আমাকে লোক-দেখান ঘরে-রাখা বিয়ে-করা গৃহিণী ক'রে রেখে আমার নারীত্বকে বারংবার লাঞ্ছিত করার কি প্রয়োজন ছিল ? তিনি কি মনে করেন,—স্ত্রীকে কেবল ঐশ্বর্য্যের মোহে ভুলিয়ে রাখলেই স্ত্রীর জীবন সার্থক হ'য়ে গেল ? হিন্দু ঘরের বাঙালী মেয়েরা আমার মতো অবস্থায় পড়লে, শুধু আড়ালে ব'সে কেঁদে ভগবানকে জানায় মনের দুঃখ আর স্বামী অবসর-সুযোগে বাড়ী ফিরলে শাড়ীর আঁচলে গোপনে চোখের জল মুছতে মুছতে, স্বামীর মনোরঞ্জনের হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দেয়। আমি তো তা' পারি না। এমন-ধারা মুখোস-পরা মেকী জীবন-ধারণের প্রণালীকে আমি মনেপ্রাণে ঘৃণা করি। যে সমস্ত পুরুষ স্ত্রীকে কেবল বিলাস-ব্যসনের সামগ্রী ব'লে মনে করে, বিবাহ-বন্ধনের অধিকারে স্ত্রী-দেহে কতগুলো অবাঞ্ছিত সন্তানের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে স্বামীত্বের বড়াই জাহির করে তা'রা ভুলে যায় ঐ দেহের অন্তরালে আছে—বাসা বেঁধে আছে—স্ত্রীর মন। এই মনকে যে নারী গলা টিপে চেপে রেখে স্বামীর প্রবৃত্তির দাসত্ব করাতে পারে—সে-ই জীবনভার কোনও রকমে খানিকটা দূর টেনে নিয়ে যায়। আমার তা সয় না। আমার মনের শিকড়ে শিকড়ে প্রাণের চাঞ্চল্য জেগে আছে স্বামীর দুষ্ট আচরণ তাকে আরও চঞ্চল ক'রে তুলেছে। তাই যেদিন আমার স্বামীর দুর্ব্যবহার চরমে উঠলো, আমার আর সইবার শক্তি রইল না, আমি তাঁর যথা-সর্ব্বস্ব ফেলে দিয়ে, একমাত্র সন্তানকে বুকে ক'রে, তোমার কাছে এসে উঠেছিলুম—একটু সান্ত্বনা পাব ব'লে। কিন্তু, কই, শান্তি তো পেলুম না। যে আগুন আমার বুকের মধ্যে জ্বলছিল,—সেই ধিকি ধিকি আগুন, দ্বিগুণ হ'য়ে উঠলো! ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে গেল। কাঁটার উপর শুয়ে মানুষ আর ক'দিন বাঁচতে পারে ? সে-জন্যে আমি এই অসম্পূর্ণ জীবনের শেষ টেনে আনতে চাই। আমি এখন নিরুদ্দেশের যাত্রী। শত চেষ্টাতেও এখন আর কেউই আমাকে ফেরাতে পারবে না। মনে পড়ে যম একদিন আমার মাথার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছিল, সে-দিন যদি আমার মরণ হ'তো, তা' হ'লে এমন ক'রে আর এই চেনা জীবনের পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিতে হ'তো না। এখন আমি নতুন জীবনের খোঁজে চললুম। কিন্তু আমার বিষম দুঃখ, আমার জঠরে আর একটি অসহায় প্রাণ অনুভব করছি—আমার স্বামীরই আর এক সন্তান। তার জন্যই এতদিন অপেক্ষা করছিলুম—যদি স্বামীর আমার লুপ্ত-চেতনা ফিরে আসে! সে-দিক থেকে কোনও সাড়া তো আজও পেলুম না। তাঁর পক্ষাঘাতগ্রস্ত মনে কোনো ব্যথা বাজে না। যেখানে মায়া-মমতা-স্নেহ বা গৌরবের কোনও ঠাঁই নেই, সেখানে বেঁচে থাকা শুধু বালাই আর বিড়ম্বনা। এক একবার মনে হয়—আমাকে হারালে যদি বা আমার স্বামীর স্ব-ভাব, তাঁর চেতনা আবার ফিরে আসে।

তোমার কাছে দাদা, আমার একটি শেষ অনুরোধ, আমার এই শেষ কথাটি তাঁকে জানিয়ে দিও :—তিনি যেন মনুষ্যত্বের কোঠায় ফিরে এসে, আমার এই ফেলে যাওয়া সন্তানটীকে মানুষ ক'রে তোলেন, বড় হ'লে তাকে যেন পুরুষের মতো পুরুষের সঙ্গে বিয়ে দেন—তা' হ'লেই, আমার আত্মা তৃপ্ত হবে। আর একটি অনুরোধ, যদি তিনি রাখেন, তিনি ব্যভিচারে আর টাকা খরচা না ক'রে, দীন-দুঃখীর দিকে যেন চোখ তুলে তাকান্—সেবা-কাজে যেন ব্রতী হন্—তা হলেই, আমার প্রতি তাঁর কর্ত্তব্য করা হবে।

ইতি—তোমার হতভাগিনী বোন—শমিতা।

পুনঃ—আমাকে তুমি বৃথা খুঁজে পণ্ডশ্রম ক'রোনা। আমাকে আর ফিরে পাবে না। আমি দুর্ভাগিনী। তোমায় জ্বালাতেই জন্মেছিলাম; সুখ দিতে পারলাম না। আত্মঘাতিনী পাপিষ্ঠার কথা মনে ক'রে দুঃখ পেয়োনা। আমার শেষ সভক্তি প্রণতি নিও। ইতি—শমিতা—তোমার বোন্।

শচীনাথবাবু একমাত্র বোনের এই বিদায়-করুণ লিপিকাখানি পাঠাইয়া দিলেন মহিমারঞ্জনের কাছে—দুই-চারি লাইন নিজে লিখিয়া—।

"মহিমারঞ্জন,

তোমার হাতে তুলে দিয়েছিলাম সোণার প্রতিমা গৌরীকে। তুমি তাঁর সম্মান রাখতে পারলে না। তোমার চরিত্রের সংশোধন হ'লো না। আমার ভগিনীর জীবন দুর্ব্বহ হ'য়ে উঠেছিল, তাই মৃত্যু-মূল্যে সে তোমার মনুষ্যত্ব ফিরিয়ে আন্তে দাবী জানিয়েছে। তুমি কি তাঁর অন্তিম মিনতি রাখবে? তোমার শিশু-কন্যা আমার কাছেই আছে। তার মার শেষ ইচ্ছা—তুমি তাকে মানুষ ক'রে তোলো। ৺ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তোমার সুমতি হোক্। ইতি—শচীনাথ।"

এই পত্র দুইখানি পড়া শেষ করিয়া মহিমারঞ্জন নিশ্চল নীরব হইয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, চারিদিকের যত-কিছু সমস্ত চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিয়া—এই বিপুলা ধরণীতে পায়ে-চলা পথিকের মতো, জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত শুধু চলিতেই থাকেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "দেওয়ান মশাই আজ থেকে আমার জীবনের সুর বদ্‌লে গেল। আমার দিদিকে আন্তে পাঠান্। বিধবা হ'বার পর থেকে তিনি এখানে এসে থাক্‌তে রাজী আছেন, এ-কথা তিনি আমার স্ত্রীকে জানিয়েছিলেন—আমার স্ত্রীরও আগ্রহ ছিল, আমিই এতদিন গরজ করিনি। আর, আমার মেয়েকে আপনি নিজে গিয়ে আনুন্।—আমার একটি সন্তানকে শমিতা হরণ করলে—ক্ষমাহীনা! একটি সন্তান দিয়ে গেছে—একমাত্র ক্ষমা। এই টুকুই আমার অবশিষ্ট জীবনের সম্বল—আমার নির্ভর। শমিতার ক্ষমা—ঐ নামেই আমার সন্তানের পরিচয়।"

এমন শোকে মানুষ কাঁদা-কাটি করে, কিন্তু শোক যেখানে গভীর, ক্ষত যেখানে ব্যাপক ও অন্তঃসারী, মানুষ সেখানে পাথরের মতো নিঃসাড় হইয়া পড়ে। মহিমারঞ্জনেরও তাহাই হইল।

দিন চলিতে লাগিল। মহিমারঞ্জনের বিধবা জ্যেষ্ঠা ভগিনী বরদাসুন্দরী আসিয়া সংসারের ভার ঘাড়ে লইলেন—কন্যা ক্ষমা হইল তাঁহার নয়নের মণি। কিন্তু মহিমারঞ্জনের দিনগুলি একেবারে বদলাইয়া গেল। একের পর এক করিয়া ভোগ-বিলাস তিনি ছাড়িতে লাগিলেন। বেশের আর পারিপাট্য রহিল না। তাঁহার সকল কার্য্যে, বাক্যে, ব্যবহারে দেখা দিল অসীম সংযম—যেন অখিল-বিরাগী বৈরাগীর সিদ্ধি-কাম চেলা।

দেওয়ান এই সু-সংযত ব্যবহারে প্রথমটায় আশ্বস্ত হইল। কিন্তু মহিমারঞ্জনের কার্য্যের ধারা ক্রমে দেওয়ান মশাইকে বিচলিত করিয়া তুলিল। মহিমারঞ্জন জাহাজের কারবার নাম-মাত্র টাকায় বেচিয়া দিবার নির্দ্দেশ দিলেন; দেওয়ান অনেক বাঁধিয়া-কষিয়া মূলধনের উপর কয়েক হাজার টাকা লাভ লইতে ছাড়িল না। জমিদারীর এক একটী করিয়া তালুক মধ্য-স্বত্বাধিকারীর হাত-মুক্ত করিয়া চাষীদের নিজস্ব রায়তি স্থিতিবান্ ভোগদখলাধিকারী কায়েমী স্বত্বে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিলেন—দেওয়ানের শত অনুনয়-বিনয়-অনুরোধ-উপরোধ-আপত্তি টিকিল না। জমিদারী এলাকার বিভিন্ন মৌজায় হাসপাতাল খুলিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। যেখানে বিদ্যায়তন নাই, সেখানে শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন হইল, বিশেষ করিয়া, নারী-শিক্ষা ও অনাথ-আশ্রম সংগঠনের দিকে সাময়িক এবং শাশ্বতভাবে অর্থ-পরিবেশন করা হইল। তাঁহার বাস-ভবনের সুবিশাল ইমারত স্ত্রী শমিতার নামে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল। এবার সেই দিকে তাঁহার লক্ষ্য পড়িল। দেওয়ানকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেওয়ান মশাই, একটা অত্যন্ত গুরুতর কাজে আমার মতি হ'য়ে গেছে। এই বাড়ীটা শমিতার নামে তৈরী ক'রছিলুম—তাঁরই নামে সংকল্প ক'রে মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে এ বাড়ীর প্রস্তর-প্রতিষ্ঠা হ'য়েছিল—তাঁরই স্মৃতি-উদ্দেশ্যে এ বাড়ী আমি উৎসর্গ করতে চাই।" দেওয়ান, চোখ কপালে তুলিয়া আশ্চর্য্যে বলিয়া উঠিল,—সে কি! বসত-বাড়ীটিও বাদ যাবেনা?"

মহিমারঞ্জন ম্লান হাসি হাসিয়া কহিলেন, "কেন, পুরুষানুক্রমে আমরা যে ভদ্রাসন বাড়ীতে বাস ক'রে এসেছি, সেই বাড়ীটিকে ভাল ক'রে মেরামত ক'রে নিয়ে তাতেই বেশ বাস করা চলবে এখন। আর, এ বাড়ী যাঁর, তাঁরই স্মৃতি-তীর্থ হোক্—এই আমার ইচ্ছা। যে-ঘরটী ছিল, শমিতার নিজস্ব—সেটী হবে তাঁর স্মৃতি-মন্দির। নারী-কল্যাণে উৎসর্গীকৃত হবে এ বাড়ী। এর ঘরে ঘরে নবজাতকের চিরজীবিতের মধুর ধ্বনি প্রতিধ্বনি হোক্—এ বাড়ী হোক্—পুণ্য শিশু-তীর্থ। যথাসম্ভব এর ব্যবস্থা করুন। —আর দেরী করা চলবে না।"

দেওয়ান আড়ালে চোখের জল মুছিয়া নিজে নিজেই কহিল, "শমিতা-মা, একবার এসে দেখে যাও, তোমার জন্য তোমার স্বামী আজ সর্ব্ব-ত্যাগী সন্ন্যাসী। তাঁর অন্তরে যে মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেম ঘুমিয়ে ছিল, তোমাকে হারিয়ে, আজ সে প্রেম মূর্চ্ছনায় ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠেছে।"

মহিমারঞ্জনের ইচ্ছা-রোধ কেহ করিতে পারিল না। অবশেষে, মহিমারঞ্জন নর-নারায়ণের সেবা-সংকল্প সম্বল করিয়া কর্ম্মকাণ্ডে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। (ক্রমশঃ)

বিশ্ব-নৃত্য

(দুই)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

কম্পন-গতি

কম্পন ও ঘূর্ণন গতির মধ্যে সাদৃশ্যের কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। উভয় শ্রেণীর গতিই নর্তন গতির অন্তর্গত এবং উভয় ক্ষেত্রেই একটা নির্দিষ্টকালের ব্যবধানে পুনঃ পুনঃ একই স্থানের ভেতর দিয়ে এবং একই গতিভঙ্গী নিয়ে যাওয়া আসা ঘটে। একমাত্র পার্থক্য এই যে, ঘূর্ণন গতিতে স'রে যাবার ও ফিরে আসার পথ ভিন্ন ভিন্ন আর কম্পন গতিতে এই পথ দু'টা মিলে গিয়ে একটা সরল (বা বক্র) পথের আকার ধারণ করে।

আবার ঘূর্ণন ও কম্পন গতিকে চিহ্নিত করার প্রণালীও অবিকল এক। ঘূর্ণন গতির পূর্ণ বিবরণ দানের জন্য যেমন তিনটা বিষয়ের উল্লেখের প্রয়োজন—ঘূর্ণনকাল (বা ঘূর্ণন সংখ্যা), বৃত্ত-পথের ব্যাসার্ধ এবং ঘূর্ণন ভঙ্গী, সেইরূপ কম্পন গতিকে চিহ্নিত করার জন্যও ঠিক অনুরূপ তিনটা বিষয়েরই উল্লেখের প্রয়োজন—কম্পন-কাল (বা কম্পন-সংখ্যা), কম্পনের প্রসার এবং কম্পন ভঙ্গী। বৃত্তপথে ঘূর্ণনগতির পক্ষে বৃত্তের ব্যাসার্ধ এবং ঘূর্ণন-কাল যা নির্দেশ করে সরল পথে কম্পন গতির পক্ষে কম্পনের প্রসার এবং কম্পন-কালও যথাক্রমে তাই নির্দেশ ক'রে থাকে। ফলে, কম্পন-গতি মাত্রকেই আমরা ওর সমান তালের ও সমান প্রসারের একটা ঘূর্ণন-গতির ছায়ারূপে গ্রহণ করতে পারি। জ্যামিতির ভাষায় এই ছায়াকে বলা হয় Projection বা অভিক্ষেপ। ঢিলে দড়ি বেঁধে রোদের ভেতর ঘোরাতে থাকলে মাটির ওপর ঢিলের যে ছায়াটা পড়ে তা' ঢিলটার সঙ্গে সঙ্গে, সমান তালে ঘুরতে থাকে বা কাঁপতে থাকে। সূর্য যদি তখন ঠিক মাথার ওপর থাকে এবং ঢিলের বৃত্তপথটা ঊর্ধ্বাধঃ রেখা বরাবর অবস্থিত হয় তবে ছায়ার ঘূর্ণন গতিটা একটা সরল রেখা পথে অবস্থিত হয়ে সরল কম্পনের আকার ধারণ করে, যার কম্পন-কাল ও কম্পনের প্রসার যথাক্রমে ঢিলটার ঘূর্ণন কাল এবং ওর বৃত্তপথের ব্যাসার্ধের সমান হয়ে থাকে। ফলে ঢিলের ঘূর্ণন গতি সম্পর্কীয় খুঁটিনাটিগুলি জানা থাকলে ওর ছায়ার কম্পন-গতি সম্পর্কীয় সকল তথ্যই আমরা অনায়াসে হিসাব ক'রে বের করতে পারি। কম্পন গতির আলোচনায় এইটাই হলো সহজ পথ। বৃত্তপথে সমবেগে ঘূর্ণনগতির আলোচনা আমরা পূর্বেই করেছি এবং তার থেকে ঘূর্ণমান পদার্থের বেগ ও ত্বরণ এবং ওর ওপর প্রযুক্ত বলের দিক ও পরিমাণ নিরূপণের প্রণালী জানতে পেরেছি; সুতরাং কম্পন-গতিকে উক্ত ঘূর্ণন-গতির অভিক্ষেপ বা ছায়ারূপে গ্রহণ ক'রে কম্পমান পদার্থটার বেগ ও ত্বরণ এবং ওর ওপর প্রযুক্ত বলের দিক ও পরিমাণও আমরা সহজেই নিরূপণ করতে পারি।

১নং চিত্রের বৃত্তের পরিধিকে আমরা উক্ত ঢিলের গতিপথরূপে কল্পনা করবো এবং অনুমান করবো যে, এই বৃত্তের তলটা ঊর্ধ্বাধঃ রেখাক্রমে অবস্থিত এবং সূর্য রয়েছে 'মধ' দিক বরাবর ও বহুদূরে। 'ক খ'-রেখাটা হলো ক্ষিতিরেখা (horizontal line) এবং 'ধম' 'দচ' 'নছ' প্রভৃতি রেখাগুলি সূর্যরশ্মির দিক নির্দেশ করছে। ঢিলটা ঘুরছে বৃত্তপথে 'ল' বিন্দুকে কেন্দ্র ক'রে, আর ওর ছায়াটা কাঁপছে সরল পথে ('কখ—রেখা বরাবর) 'ম' বিন্দুকে মধ্যবিন্দু ক'রে। ঢিলের ঘূর্ণন-কাল ছায়ার কম্পন-কালের সমান এবং ঢিলের

১নং চিত্র

বৃত্তপথের ব্যাসার্ধ ছায়ার কম্পন-প্রসারের ('মক' বা 'মখ' রেখার) সমান।
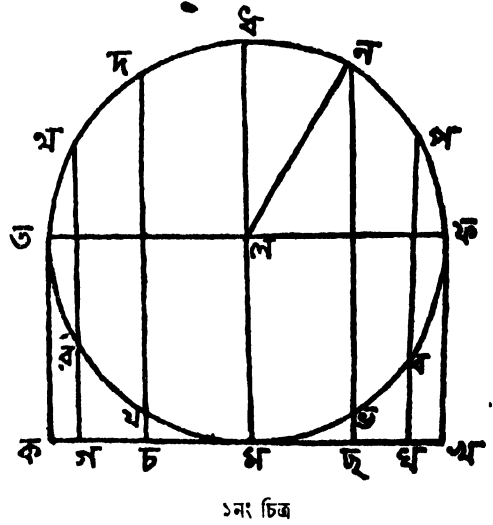
ঘুরতে গিয়ে ঢিলটা যখন ওর বৃত্তপথের ধ, ন, প, য, ব, ভ, ম প্রভৃতি স্থানে উপস্থিত হয় ওর ছায়াটাকে তখন মাটির ওপর যথাক্রমে ম, ছ, ঘ, খ, ঘ, ছ, ম প্রভৃতি স্থানে উপস্থিত হতে হয়। ঢিলটা যতক্ষণে ওর বৃত্তপথের 'ধ' থেকে 'ফ' তে, 'ফ' থেকে 'ম' তে, 'ম' থেকে 'ত' তে গিয়ে আবার 'ধ' স্থানে ফিরে আসে এবং এইরূপে একটা পূর্ণ আবর্তন সম্পন্ন করে, ওর ছায়াটা ততক্ষণে 'ম' থেকে 'খ' তে, 'খ' থেকে 'ম' তে এবং 'ম' থেকে 'ক' তে গিয়ে আবার 'ম' স্থানে ফিরে এসে অবস্থান বেগ ও ত্বরণ সম্পর্কে অবিকল পূর্বেকার কম্পন-ভঙ্গী ফিরে পায় এবং এইরূপে একটা গোটা কম্পন সম্পন্ন করে। ফলে, ঢিলের ঘূর্ণন-কাল ও ঘূর্ণন-সংখ্যার সঙ্গে ওর ছায়ার কম্পন-কাল ও কম্পন-সংখ্যা মিলে যায়, ওর বৃত্তপথের ব্যাসার্ধ ছায়াটার কম্পনের প্রসারের সমান হয় এবং ঢিলটার প্রতি মুহূর্তের গতিভঙ্গীও অভিক্ষেপরূপে ক্ষিতিরেখার ওপর পতিত হয়ে ছায়ার গতিভঙ্গী-রূপে আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং ঘূর্ণমান ঢিলটার বেগ ও ত্বরণের দিক ও পরিমাণ চিহ্নিত ক'রে এবং ক্ষিতিরেখার ওপর এই সকল রাশির অভিক্ষেপ নিরূপণ ক'রে আমরা কম্পমান ছায়াটার বেগ, ও ত্বরণ প্রভৃতির দিক ও পরিমাণ নির্দেশ করতে পারি।

বেগ সম্পর্কে আমরা দেখতে পাই যে, ঘূর্ণমান ঢিলের বেগে দিকটা ক্রমাগত বদলে গেলেও ওর পরিমাণটা ঠিক থাকছে এবং পর পর মুহূর্ত্তে বেগের দিক ও পরিমাণ চিহ্নিত হচ্ছে ওর বৃত্তপথে 'ধন' 'নপ' 'পফ' 'ফব' প্রভৃতি সমান সমান টুক্‌রা অংশের দিক দৈর্ঘ্য দ্বারা। সুতরাং পর পর মুহূর্ত্তে ওর ছায়াটার বেগ চিহ্নি হবে 'কখ' রেখার ওপর পতিত এই সকল টুক্‌রা অংশের অভিক্ষে দ্বারা অর্থাৎ যথাক্রমে 'মছ' 'ছঘ' 'ঘথ' 'থঘ' প্রভৃতি রেখার দিক ও দৈর্ঘ্য দ্বারা। ৩নং চিত্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, শেষোক্ত রেখাগুলির দৈর্ঘ্য 'কখ' রেখার উভয় প্রান্তের দিকে যেতে ক্রমে কমে আসছে এবং ওর মধ্যস্থানের ('ম' বিন্দুর) অভিমুখে যেতে ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে, ফলে কম্পমান ছায়াটার বেগের দিক ও পরিমাণ উভয়েরই পরিবর্ত্তন ঘটছে। ছায়াটা যখন ওর পথের উভয়প্রান্তে ('ক' বা 'খ' স্থানে) উপস্থিত হয় তখন ওর বেগের দিকটা উল্টে যায়, সুতরাং মুহূর্ত্তের জন্য তখন ওকে স্থির হয়ে দাঁড়াতে হয়, এবং ফলে ওর বেগটা হয় তখন একেবারে শূন্য পরিমিত। আরো দেখা যাবে যে, ছায়ার বেগটা বৃহত্তম হয় এবং ঢিলের বেগের ঠিক সমান হয়ে দাঁড়ায় যখন ওকে ওর সরল পথের মধ্য বিন্দুর ভেতর দিয়ে চলে যেতে হয়। মোটের ওপর দেখা যায় যে আলোচ্য ঘূর্ণন গতিতে বেগের পরিমাণ ঠিক থাকলেও ওর ছায়ারূপে উৎপন্ন কম্পন গতিতে বেগের উক্তরূপ হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে থাকে।

ত্বরণ সম্পর্কে আমরা দেখতে পাই যে, ঘূর্ণন গতিতে ঢিলটার ত্বরণ উৎপন্ন হয় সর্বদাই ওর বৃত্তপথের কেন্দ্রের দিকে —যেমন 'ন' স্থান দিয়ে যাবার সময় 'নঙ' রেখাক্রমে (৩নং চিত্র)। এর থেকে আমরা দেখতে পাই যে, ঢিলের ছায়াটার ত্বরণ ঘটে সর্বদাই ওর গতিপথের মধ্য বিন্দুর ('ম' বিন্দুর) অভিমুখে—যেমন 'ছ' স্থান দিয়ে যাবার সময় 'ছম' রেখাক্রমে। আমরা এও জানি যে, ঢিলের বৃত্তপথের ব্যাসার্ধকে 'ব্যা' এবং ওর ঘূর্ণন-সংখ্যাকে 'ন' বললে ২নং সমীকরণ অনুসারে ঢিলের ত্বরণটা হবে (৪০ ব্যা × $ন^{২}$) পরিমিত; সুতরাং ওর ছায়ার ত্বরণ নির্দিষ্ট হবে 'কখ' রেখার ওপর পাতিত এই রাশিটার অভিক্ষেপ দ্বারা। এখন 'কখ'-রেখার ওপর বৃত্তের 'নল' ব্যাসার্ধটার অভিক্ষেপ হচ্ছে 'মছ' পরিমিত অর্থাৎ ছায়াটা তখন ওর পথের মধ্যবিন্দু থেকে যতটা সরে গেছে ঐ পরিমিত। এই সরলকে সাধারণভাবে আমরা 'ত' অক্ষর দ্বারা নির্দেশ করবো। আরো দেখা যাবে যে, উক্ত রাশির অন্তর্গত 'ন' চিহ্নটা যেমন ঘূর্ণমান ঢিলের ঘূর্ণন-সংখ্যা নির্দেশ করে সেইরূপ কম্পমান ছায়াটার কম্পন-সংখ্যাও নির্দেশ করে থাকে। সুতরাং কম্পমান ছায়াটার প্রতি মুহূর্তের ত্বরণের মাত্রা—যাকে আমরা 'ত্ব' বলবো —নিম্নোক্ত সমীকরণ দ্বারা নির্দিষ্ট হবে :

$$ত্ব = ৪০ত \times ন^{২} \quad \cdots(৭)$$

সুতরাং সিদ্ধান্ত দাঁড়ালো এই যে, কম্পন-গতিতে কম্পমান পদার্থের ত্বরণের দিকটা হবে সর্বদাই ওর গতিপথের মধ্যবিন্দুর অভিমুখে এবং ওর মাত্রা নির্দিষ্ট হবে মধ্যবিন্দু থেকে ওর সরন (ত) এবং ওর কম্পন-সংখ্যার ('ন'-এর) বর্গের পূরণ ফল দ্বারা। মোটের ওপর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কম্পন-গতি সম্পন্ন করতে গিয়ে কম্পমান পদার্থটা ওর মধ্যবিন্দু থেকে যতই সরতে থাকে ঐ মধ্যবিন্দুর অভিমুখে ওর ত্বরণটাও সেই অনুপাতে বাড়তে থাকে। ঢিলটা ঘোরে একটা নির্দিষ্ট মাত্রার ত্বরণ নিয়ে কিন্তু ছায়াটা কাঁপে সরনের সঙ্গে সঙ্গে ওর ত্বরণের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়ে। ৭নং সমীকরণ থেকে দেখা যায় যে, কম্পন-গতিতে ত্বরণটা বৃহত্তম হয় গতিপথের উভয় প্রান্তে ('ক' ও 'খ' স্থানে) অর্থাৎ যখন সরনের মাত্রা (ত) বৃহত্তম হয়ে দাঁড়ায়; আর ত্বরণটা ক্ষুদ্রতম বা শূন্য পরিমিত হয় যখন ছায়াটা ওর গতিপথের মধ্য বিন্দুর ('ম' স্থানের) ভেতর দিয়ে পূর্ণ বেগে চলে যায়। ৩নং চিত্রের অন্তর্গত টুক্‌রা রেখাগুলির ('খঘ', 'ঘছ', 'ছম', 'মচ' প্রভৃতির) দৈর্ঘ্যের তুলনা করলেও দেখা যাবে যে, দু'টা পর পর মুহূর্ত্তের বেগের মাত্রার পার্থক্য, সুতরাং কম্পমান পদার্থের ত্বরণের মাত্রা, শূন্য পরিমিত হয় ঠিক মাঝখান দিয়ে যাবার সময় এবং বৃহত্তম হয় পথের উভয় প্রান্তে ('ক' ও 'খ' স্থানে)। মধ্যপথে বেগটা বৃহত্তম হলেও ত্বরণের মাত্রা বা বেগ-পরিবর্তনের হারটা হয় শূন্য পরিমিত, আর পথপ্রান্তে উপস্থিত হতে বেগটা শূন্য পরিমিত হলেও বেগের পরিবর্ত্তনের হারটা (অর্থাৎ ত্বরণটা) বৃহত্তম হয়ে দাঁড়ায়।

তারপর Force বা বলের কথা। আমরা জানি জড়-দ্রব্যের ত্বরণ উৎপাদনের জন্য বল প্রয়োগের প্রয়োজন। কম্পমান ছায়াটা অবশ্য জড়ত্বহীন পদার্থ সুতরাং ওর ত্বরণটা কোনরূপ বলপ্রয়োগের অপেক্ষাই রাখে না এবং তা' উৎপন্ন হয়ে থাকে ছায়ারূপে ওকে ঢিলের গতির অনুসরণ করতে হয় ব'লে কিন্তু আমাদের সত্যকার কারবার নিছক ছায়া নিয়ে নয়—বাস্তব পদার্থ নিয়ে; সুতরাং বলের প্রসঙ্গে আমাদের কম্পমান ছায়াতে 'বস্তু' আরোপ ক'রে ওকে কম্পমান জড়দ্রব্যরূপে কল্পনা করতে হবে এবং গতির দ্বিতীয় নিয়ম অনুসারে সিদ্ধান্ত করতে হবে যে, কম্পমান পদার্থটার ওপর ওর ত্বরণের অভিমুখে, সুতরাং ওর গতিপথের কেন্দ্রের অভিমুখে, সর্বদা একটা 'বল' প্রযুক্ত হয়ে থাকে এবং কেন্দ্র থেকে পদার্থটা যতই দূরে সরতে থাকে এই বলটাও ততই—ওর ত্বরণের সমানুপাতে—বাড়তে থাকে। বস্তুতঃ কম্পমান পদার্থের বস্তুমানকে ১ সংখ্যা দ্বারা নির্দেশ করলে ৭নং সমীকরণটা যেমন কম্পমান পদার্থের ত্বরণের মাত্রা সেইরূপ ওর ওপর প্রযুক্ত বলের মাত্রাও নির্দেশ ক'রে থাকে। ফলে ত্বরণের মত প্রযুক্ত বলটাও বৃহত্তম হয় পথের উভয় প্রান্তে ('ক' ও 'খ' স্থানে) এবং কেন্দ্রস্থলের ('ম' বিন্দুর) ভেতর দিয়ে যাবার সময় পদার্থটার ওপর কোন বলের ক্রিয়া থাকে না। সুতরাং কেন্দ্রস্থলটাই হলো, আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি, কম্পমান পদার্থটার স্থির হয়ে দাঁড়াবার জায়গা বা স্বাভাবিক বিরামস্থান (position of rest)—যদিও কম্পনগতি সম্পন্ন করতে, আমরা দেখেছি, এইস্থানেই ওর বেগটা বৃহত্তম হয়ে দাঁড়ায়। বলতে পারা যায়, লক্ষ্যটা থাকে সর্বদাই বিরামস্থানে স্থির হয়ে দাঁড়াবার দিকে কিন্তু বিরামটা আর ঘটে ওঠে না, ঘটে

শুধু নিবৃত্তিহীন কম্পন-গতি। এখন যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, কি হলে পদার্থ বিশেষের পক্ষে কম্পন-গতি সম্পন্ন করা সম্ভব হবে তবে তার উত্তর হবে এইরূপ :—যদি ঐ পদার্থের বিশিষ্ট একটা বিরামস্থান থাকে এবং কোন কারণে সেখান থেকে স্থানচ্যুত হলে ওর ওপর ঐ বিরামস্থানের অভিমুখে এবং ওর সরনের সমানুপাতে একটা 'বল' প্রযুক্ত হতে থাকে তবে ঐ স্থানকে কেন্দ্র ক'রে পদার্থটা ক্রমাগত একটা কম্পন-গতি সম্পন্ন করতে থাকবে।

সমগ্র ব্যাপারটাকে এইভাবে কল্পনা করা যেতে পারে। একটা জড়কণা একটা বিশিষ্ট স্থানে—মনে করা যাক্ ৩নং চিত্রের 'ম' বিন্দুতে স্থির হয়ে রয়েছে, যা'কে বলা যায় ওর বিরাম স্থান। একটা আকস্মিক ধাক্কার ফলে বা অনুরূপ কোন কারণে কণাটা স্থানচ্যুত হলো অর্থাৎ একটা বিশিষ্ট মাত্রার বেগ নিয়ে কোন দিকে—ধরা যাক্ ডান দিকে—ছুটে চললো। এখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা যদি এমন হয় যে, স্থানচ্যুত হবামাত্র আর সবাই মিলে কণাটাকে ওর বিরামস্থানের ('ম' বিন্দুর) অভিমুখে টানতে থাকে এবং এই টানটা ওর সরনের সমানুপাতে বাড়তে থাকে তবে ঐ স্থানের প্রতি লক্ষ্য রেখে কণাটা ক্রমাগত কাঁপতে থাকবে বা দুলতে থাকবে। যদি কেন্দ্রমুখ টানটা প্রযুক্ত না হতো তবে প্রাথমিক ধাক্কার ফলে কণাটা যে বেগ অর্জন করেছিল জড়ত্ব ধর্ম বশতঃ ওকে ঐ বেগ নিয়ে ক্রমাগত ডানদিকে ('মখ' দিকে) অগ্রসর হতে হতো এবং ফলে ওর গতিটা হতো সমবেগে ধাবন-গতি। ঐ ঘরমুখো পিছুটা নটা ওকে তা করতে দিল না—ওর প্রাথমিক বেগটাকে ক্রমে কমিয়ে এনে একটা বিশিষ্ট স্থানে ('খ' স্থানে) পৌঁছিতেই শূন্যে পরিণত করলো! কণাটা তখন মুহূর্ত্তের জন্য স্থির হয়ে দাঁড়ালো। মাত্র মুহূর্তের জন্য, কারণ, ঐ টানটা তখনো 'ম' বিন্দুর অভিমুখে প্রযুক্ত হতে থাকে এবং তখনি ওর মাত্রাটা বৃহত্তম হয়ে দাঁড়ায়। ফলে ক্রমবর্দ্ধমান বেগে কণাটা বাঁ দিকে—ওর বিরামস্থানের অভিমুখে—ছুটে চলে। ঐ স্থানে পৌঁছিলে ওর ওপর টানটা হয় শূন্য পরিমিত কিন্তু ওর বেগটা তখন ঠিক পূর্ব্বেকার মাত্রা—যাত্রাকালীন মাত্রা ফিরে পায় ও বৃহত্তম হয়ে দাঁড়ায়। ফলে বিরামস্থানে পৌঁছেও ওর বিরাম ঘটেনা, জড়ত্ব ধর্ম বশতঃই ওকে বেগের মুখে, বাঁ দিকে, ছুটে চলতে হয়। এবারও একটু সরে যেতেই আবার পিছুটান, আবার বেগের হ্রাস এবং পথের বাঁ প্রান্তে ('ক' স্থানে) পৌঁছে মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্রাম ঘটে এবং কেন্দ্রমুখ টানের ফলে সেখান থেকে ক্রমবর্ধমান বেগে কেন্দ্রস্থলে প্রত্যাবর্ত্তন ঘটে। এই সমগ্র ব্যাপারটা হলো একটা গোটা কম্পনের প্রতীক। এজন্য যে সময়টা অতিবাহিত হলো ঐ হলো কণাটার কম্পনকাল এবং প্রতি সেকেণ্ডে কণাটা এইরূপ যতগুলি কম্পন সম্পন্ন করে ঐ হলো ওর কম্পন-সংখ্যা। [ক্রমশঃ

নিষ্কাম বেদনা

শ্রীমন্মথ নাথ সরকার

হৃদয় নিঙাড়ি যা দিতে সে চায় নিতে নিতে হায় পারি না যে নিতে,
দুখ সই বলে' পারি কি কাঁদাতে বাহুডোরে তাই পারি না বাঁধিতে।

দিয়ে যাবো তারে সেই উপহার
থেকে যেন নাই প্রতিদান যার,
হেন উপহার যে দিয়েছে আগে সেই চিরজয়ী হাসিতে খেলিতে।
মেঘের সন্ধ্যা নেমে এল ওই
জীবন-আকাশ মাঝে,

মল্লার সাথে পূরবী মিশিয়া
বরিষণ তারে বাজে।
অকূল সাগরে ভাসিতে দু'জনে
নিতে গিয়ে দিতে সাধ হ'ল মনে,
আমি প্রাণে মরি' শব ভেলা করি সেই ভেলা তারে দিবগো বাঁচিতে।

সচ্চিদানন্দ স্মরণে

দেখিতে দেখিতে শ্রীসচ্চিদানন্দের মহাপ্রস্থানের পরে এক বৎসর অতীত হইয়া গেল। গত বৎসর এই ফাল্গুন মাসেই গঙ্গাতীরে তাঁহার নশ্বর দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া গিয়াছে।

যেদিন তিনি মহানিদ্রামগ্ন হন, তাঁহার বয়স হইয়াছিল মাত্র ৫৬ বৎসর। কিন্তু পাঠ্যাবস্থা হইতেই নিজের পায়ে নির্ভর করিবেন, ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত। এই উদ্দেশ্য লইয়াই অবিরত সাধনায় বাণিজ্য ক্ষেত্রে তিনি যে বিরাট সৌধ গঠন করিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব হইতেও অপূর্ব্ব। ব্যবসায়ী মহলে এই কর্ম্মবীরের গৌরবময় জীবন বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সবার উপরে সচ্চিদানন্দ ছিলেন পরম ধর্ম্মনিষ্ঠ। তিনি জপতপ ধ্যান-ধারণায় অনেক সময়াতিবাহিত করিতেন। তিনি নিষ্ঠাবান সৎকর্ম্মান্বিত ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের সীমা নির্দ্ধারণ করা যায় না। কত বেদ, পুরাণ, গীতা, উপনিষদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, সাংখ্য, বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। বহু যত্ন-সংরক্ষিত তাঁহার সঞ্চিত গ্রন্থরাজি সর্ব্বদা তাঁহার আলোচনার বিষয় ছিল। তিনি সামাজিক ও পরদুঃখকাতর ছিলেন। দান তাঁহার অসীম ছিল; কিন্তু পুরুষকার বা মনীষা, পাণ্ডিত্য ও বদান্যতার জন্যই কি তিনি বঙ্গশ্রীর শিরোভূষণ করিতেছেন? তিনি ছিলেন মহাপ্রাণ। ভারতের দুঃখক্লিষ্ট নরনারীর অভাব, দৈন্য, স্বাস্থ্যাভাব, অশান্তি, পীড়া ও অকালমৃত্যু নিবারণকল্পে সমগ্র শাস্ত্ররাজি মন্থন করিয়া, কত বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিয়া, কত অজস্র কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া, তিনি যে অতুল মন্ত্র উদ্ধার করিয়াছেন, তাঁহার জীবদ্দশায় বুঝিয়া লইলে আজ আর আমাদিগকে এই মুখব্যাদানোদ্যত ভীষণা দুর্ভিক্ষরাক্ষসীর সম্মুখীন হইতে হইত না, মন্বন্তর ও মহামারীর করাল ছায়া সকলের চক্ষের উপরে উদ্ভাসিত হইত না। হায়, কবে আমরা সেই মন্ত্র উদ্ধারে যত্নবান হইব, আমাদের দুঃখ দৈন্য বিদূরিত হইবে, ঋষি সচ্চিদানন্দের সাধনাও সার্থক হইবে?

ভারতের খাদ্যসঙ্কট

ভারতের খাদ্যসঙ্কট আবার ভীষণতর আকার ধারণ করিবে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ মনে করিতেছেন। ১৯৪৩-এর মন্বন্তরের ধাক্কা এখনও আমাদের অস্থিপঞ্জর নিষ্পেষিত করিতেছে। বাঙ্গালার সেই ভয়াবহ অবস্থা স্মরণ করিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়। কিন্তু বরাবর গভর্ণমেন্ট আমাদিগকে আশ্বাস দিয়াই রাখিয়াছিলেন। সেই আশ্বাসের ফলে অভুক্ত বাঙ্গালীর মুখের অন্ন অন্যত্রও কিছু কিছু স্থানান্তরিত হয়। এবারেও আশ্বাস দিতে কসুর না করিলেও আসল কথা ক্রমেই বাহির হইয়া পড়িতেছে—দুষ্ট বিড়ালটিকে আর থলের ভিতরে লুকাইয়া রাখিতে পারা গেল না! প্রকৃত অবস্থাটি পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

করাচি হইতে গত ১৬ই জানুয়ারী প্রচারিত একটি সংবাদে পড়িয়াছিলাম যে, ভারতের খাদ্যসচিব স্যার জওয়ালাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব একটি সাংবাদিক অধিবেশনে ভারতের বর্ত্তমান খাদ্য-পরিস্থিতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "উপস্থিত মুহূর্ত্তে ভারতের খাদ্যের অবস্থা বিশেষ সুবিধার নয় বটে, তবে তাহাতে শঙ্কিত হইবার কিছু নাই। ভারতগবর্ণমেণ্ট সুবিধাজনক ব্যবস্থার জন্য কোনরূপ ত্রুটিই করিতেছেন না। শ্যামদেশ হইতে প্রাপ্ত পোনেরো লক্ষ টন চাউলের খবর আনিবার জন্য খাদ্য-সেক্রেটারী স্যার রবার্ট হাচিংস ইতিমধ্যেই ওয়াসিংটনে রওনা হইয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়া হইতেও পঞ্চাশ হাজার টন পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং মাভৈঃ।"

ইহার দুইদিন পরেই ১৮ই জানুয়ারী—নয়াদিল্লী হইতে আর একটি সংবাদ প্রচারিত হইল। এটি একটি সরকারী বিবৃতি। উহার সারমর্ম্ম এই—

"গভর্ণমেণ্ট ভারতের খাদ্য পরিস্থিতির উন্নতি বিধানের জন্য সর্ব্বপ্রকার ফলপ্রসূ ব্যবস্থাই করিতেছেন। আর তাহাতে আশা করা যায় যে সেই ব্যবস্থায় ভারতের সকলেই প্রয়োজন মত পেট ভরিয়া খাইতে পাইবে।"

গত ১৯৪৩ সালে কলিকাতার রাজপথে যখন মরণযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতেছিল, দেখিয়াছিলাম—রাস্তায়, ফুটপাতে, প্রান্তরে মানুষের মত দেখিতেই একজাতীয় প্রাণীর কাতারে কাতারে মৃত্যুপথগামী শোভাযাত্রা, রাশি রাশি শবদেহ, শুনিতাম—আকাশে বাতাসে 'দুটি ভাত, একটু ফ্যান' প্রার্থনার কাতর আর্ত্তনাদের মুহুর্মুহুঃ প্রতিধ্বনি;—অন্যদিকে আবার চাউল, গম ও টাকা লইয়া ছিনিমিনি। তখনও আমরা এরূপ অভয়বাণীই সরকারী বিবৃতিতে পাইতাম—"বাঙ্গলায় সামান্য খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে বটে, কিন্তু শীঘ্রই সব ঠিক হয়ে যাবে।" কিন্তু কিরূপে যে ঠিক হইয়াছে সে কথা স্মরণ হইলে ভারতবাসী আরও অন্ততঃ একশত বৎসর আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিবে। তাই পূর্ব্বোক্ত দুইটি বিবৃতি পাঠেও এবারেও দেশবাসী রীতিমতই শঙ্কিত হইয়া পড়ে। তবে ব্যাপারটা কিছু আন্দাজ করিয়া উঠিতে পারে নাই। কেবল কম্পিত হৃদয়ে একটা বৃহত্তর অশুভ সংবাদের আশঙ্কায় প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

অতঃপরে পনেরো দিন পরে আশঙ্কা বাস্তবেই পরিণত হইল। সংবাদটি কিন্তু আসিয়াছে ভিন্ন দিক্ হইতে। বাঙ্গলা সরকার, ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট, এমন কি বিলাতের শাসকসম্প্রদায়ও এ বিষয়ে কোন আভাস দেয় নাই। সংবাদটি দিয়াছেন "নিউইয়র্ক টাইম্‌সের" নূতন দিল্লীস্থ প্রতিনিধি। ইনি নাকি কতিপয় দায়িত্বশীল সরকারী কর্ম্মচারীর নিকট ইহা পাইয়াছেন। তিনি জানিতে পারিয়াছেন, "ভারতের ভাবী খাদ্যসঙ্কট নাকি এমন অবস্থায় উপনীত হইবে—যাহার কাছে ১৩৫০-এর মন্বন্তর ছেলে-খেলা বই আর কিছুই মনে হইবে না। বোম্বাই, মাদ্রাজ, এবং দাক্ষিণাত্যের সমতল ভূমি এবং দশ কোটি লোক, এই খাদ্য-সঙ্কটের কবলে পড়িবে।" এই ভয়াবহ খবরে ভারতবাসীর হাত পা পেটের ভিতর সেঁধিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয়—এতবড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ভারত-সরকার এ পর্য্যন্ত ভারতবাসীকে জানাইবার প্রয়োজন মোটেই বোধ করেন নাই। এমন কি, ওয়াশিংটনে প্রেরিত দিল্লীর সংবাদদাতার খবরটিও সমর্থন করেন নাই, কোন উচ্চবাচ্যও করেন নাই। কিন্তু খাদ্য-বিভাগ শেষাশেষি আর আগুন চাপা দিয়া রাখিতে পারিলেন না। সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠানের প্রথম সাধারণ অধিবেশনে খবরটি প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। সেখানেও আবার আমাদের পক্ষ হইতে নহে, নিউজিল্যাণ্ডের প্রতিনিধি মিঃ ফ্রেজার বক্তৃতায় বলিয়া ফেলিয়াছেন—

"ভারতবর্ষ ব্যাপক দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হইয়াছে, আর ইহা বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষের মত কেবল একটি মাত্র এলাকাতেই আবদ্ধ থাকিবে না—বহুস্থানে ইহা প্রসার হইয়া পড়িবে।"

ইহার পরে খাদ্যবিভাগ অনন্যোপায় হইয়াই কেন্দ্রীয় পরিষদের বিতর্কে এই আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষের কথা কিছু কিছু বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, কিন্তু তাহাও খোলাখুলি ভাবে নয়, ভাসা ভাসা ভাবে। ভাবী দুর্ভিক্ষের একটি সম্পূর্ণচিত্র আমরা পাইয়াছি কেন্দ্রীয় পরিষদে বিভিন্ন সদস্যের বক্তৃতায় এবং কতিপয় বে-সরকারী খাদ্যবিশেষজ্ঞের বিবৃতিতে। এই চিত্রে ভারতের ভাবী খাদ্যসঙ্কটের রূপ অতি ভয়াবহ। ইহাতে আমরা জানিতে পারি—

"ভারতবর্ষে সাধারণতঃ যে পরিমাণ চাউল উৎপন্ন হয়, এবারে তাহা অপেক্ষা নাকি ৪০ লক্ষ টন কম পড়িবে। অর্থাৎ প্রায় ছয় কোটি লোকের চারি মাসের আহারের ঘাট্‌তি হইবে। বৃষ্টির অভাবে বোম্বাই এবং মাদ্রাজের যেরূপ শস্যহানি হইয়াছে, সেরূপ বহু বৎসরের মধ্যে হয় নাই। এক মাদ্রাজেই ২০ লক্ষ টন কম পড়িবে।"

বাঙ্গলা সম্বন্ধে গত ১৮ই জানুয়ারীর বিবৃতিতে কিন্তু স্যার জওলাপ্রসাদ বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গলার কোন ভয় নাই, বাঙ্গলা এ বৎসর খাদ্যপূর্ণ থাকিবে।"

ইহাও নিতান্তই ভিত্তিহীন উক্তি। কারণ, ইতিমধ্যেই মেদিনী-পুর, চট্টগ্রাম ও বাঁকুড়ার কয়েকটি স্থানে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। ডাক্তার প্রফুল্ল ঘোষ বলেন, মার্চ্চ মাস হইতেই অধিকাংশ পরিবারকে অনশনে দিনাতিপাত করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত আর একটি উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। গত ডিসেম্বর মাসে লাহোরে যে অর্থনৈতিক সম্মেলন হইয়াছিল, তাহাতে অধ্যাপক এস, সি, ঘোষ প্রমাণ-প্রয়োগে দেখাইয়াছেন "বাঙ্গলায় এবারেও দশ লক্ষ ষাট হাজার টন চাউল কম পড়িবার সম্ভাবনা।"

কিন্তু সরকারের ঐ 'ভয় নাই' কথায় ভরসা তো নাই-ই, আরও ভয় বরং বেশীই হয়। ভয়,—কবে আবার আমাদের (পর্য্যাপ্ত) খাদ্য কোথায় উধাও হইয়া যায়। যাহা হউক এতদিন পরে সরকার ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। গত ৩০শে জানুয়ারী কেন্দ্রীয় পরিষদে খাদ্যবিভাগের সেক্রেটারী মিঃ বি, আর, সেন বলিয়াছেন—

"সম্প্রতি যে সকল প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ ঘটিয়াছে, তাহার ফলে খাদ্যপরিস্থিতি বিশেষ শোচনীয় হইবে। ওয়াসিংটনে সম্মিলিত খাদ্যবোর্ডের সহিত আলোচনা করিয়া জানা গিয়াছে, ন্যূনতম প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্যও তাহাদের নিকটে পাওয়া যাইবে না। মিঃ হাচিংসের আমেরিকা গমনের পর অবস্থা আরও খারাপ হইয়াছে।"

এদিকে কমন্স সভায় বৃটিশ খাদ্যসচিব ঘোষণা করিয়াছেন, "পৃথিবীব্যাপী খাদ্যসঙ্কট দেখা দিয়াছে, তন্মধ্যে ভারত দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হইয়াছে।"

সুতরাং অবস্থা যাহা হইয়াছে,—দুর্ভিক্ষ, মহামারী, মহা-মন্বন্তরের সম্মুখীন আমাদিগকে হইতেই হইবে। ঘাট্‌তির পরিমাণ ৬০ লক্ষ টন। বাহির হইতে খাদ্য পাওয়ার কোন আশা নাই।

আমাদের কেন্দ্রীয় পরিষদেও এই প্রসঙ্গে অনেক তর্কবিতর্ক হইয়াছে। যে শ্রীবাস্তব মহাশয় শঙ্কিত হইবার কোন কারণ নাই বলিয়া মাসখানেক পূর্ব্বে আশা দিয়াছিলেন বটে এবং যদিচ মিঃ হাচিংস্ আমেরিকায় গিয়া কিছু করিতে পারেন নাই সত্য, তথাপি তিনিই এখন আবার বলিতেছেন, "আমি ওয়াশিংটন ও লণ্ডনে গিয়া অধিক খাদ্যশস্য যাহাতে পাইতে পারি, তজ্জন্য চেষ্টা করিব। আপনারা ভারতের বেসরকারী কয়েকজন আমার সঙ্গে গেলে খুবই ভাল হইবে। আপনাদের দ্বারাই জনমতের অভিব্যক্তি হইতে পারিবে।" ইহার উত্তরে মিঃ আসফ আলি বলিয়াছেন, "ভারতশাসনের দায়িত্ব যাহারা লইয়াছেন, সকলকে খাদ্য সরবরাহ করিবার ভারও তাঁহাদের। আজ ভিক্ষার ঝুলি লইয়া বিদেশে প্রার্থনা জানাইতে আমরা প্রস্তুত নহি।"

কেন্দ্রীয় পরিষদের অন্যতম সভ্য ম্যাসানিও বলিয়াছেন, "ভারতের কোটি কোটি লোক মরিবে কি না সে দায়িত্ব গভর্ণর জেনারেলের নিজের। কোন রাজনৈতিক পরিণতির অপেক্ষা করিয়া দেশবাসী অনাহারে থাকিতে পারে না।"

স্যার শ্রীবাস্তব আরও বলেন,—"আমরা আর যাহাই করি, অনাবৃষ্টির উপর আমাদের হাত নাই।"

মোটকথা, অবস্থা দাঁড়াইল—ভারতে ত্রিশ লক্ষ টন খাদ্যের ঘাট্‌তি হইয়াছে, বিদেশ হইতে পাওয়ার আশা নাই। গভর্ণ-মেণ্টও বলিতেছেন—"আমরা কি করিব, অনাবৃষ্টিতে হইতেছে,

তোমরা পূর্ব্বে মরিয়াছ হাজারে হাজারে লাখে লাখে, এবার মর লাখে লাখে, কোটিতে কোটিতে।"

এই অবস্থায় অর্থাৎ সরকারী ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের দায়িত্ব-বিহীন উক্তির মুখে এখন সব পক্ষের কি কর্ত্তব্য, তাহাই দেশবাসী এবং গভর্ণমেণ্টকে স্থির মস্তিষ্কে ভাবিতে হইবে। গভর্ণমেণ্টের মোটা মাহিয়ানার কর্ম্মকর্ত্তাগণ যে সমস্ত যুক্তি দিয়াছেন, তাহা একান্তই অপরিণতমস্তিষ্ক বালক-বুদ্ধি-প্রসূত বলিয়া মনে হয়। আমরা একটি একটি করিয়া আলোচনা করিতেছি—

যাহারা খাদ্যশস্য আটকাইয়া রাখিয়াছিল এবং এক এক হাজার টাকা অসদুপায়ে লাভ করিয়া এক একটি মনুষ্য হত্যার কারণ হইয়াছে এবং এই নরহত্যা অনুষ্ঠিত করিয়া ধন-কুবের হইয়া বড় বড় বাড়ী ইমারত, ব্যাঙ্ক বেলেন্স, বড় বড় প্রতিষ্ঠানের অধিকারী হইয়াছে, তাহাদের দমনকল্পে গভর্ণমেণ্ট কি কোনরূপ ক্ষিপ্রকারিতা দেখাইয়াছেন? সে-দিনও শুনিয়া-ছিলাম, কয়েকজন নামজাদা সরকারী ও বে-সরকারী লোক অতিরিক্ত লাভে সন্দেহভাজন হইয়াছে এবং তাহারা নাকি শীঘ্রই বিচারার্থ আদালতে প্রেরিত হইবে? সেই সব কথা ধামাচাপা পড়িল কেন? যদি তাহাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ থাকে, কেন তাহারা প্রকাশ্যভাবে আদালতে অভিযুক্ত হয় না? যদি প্রমাণ না থাকে, কেন সে সম্বন্ধে কোন যুক্তিমূলক বিবৃতি বাহির হয় না? দ্বিতীয়তঃ, উডহেড্ রিপোর্টের উক্তির উপর নির্ভর করিয়া উপরোক্ত নরহত্যায় যাহারা লিপ্ত ছিল তাহাদের সম্বন্ধে প্রকাশ্যভাবে কেন প্রতিবিধান করা হইতেছে না? আমাদের বিশ্বাস, এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের অমার্জ্জনীয় ঔদাসীন্য লোকের মনে গভীর সন্দেহ ও ভীতির সঞ্চার করিতেছে।

আমাদের মনে হয়, গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে বরং আসল দোষী-গণের প্রতি অত্যধিক অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন। সকলেই জানেন ও বুঝিয়াছেন—বাঙ্গালার গত দুর্ভিক্ষ মনুষ্যকৃত গাফি-লতি, স্বার্থসাধন ও অনাচারের ফলেই হইয়াছে। অজুহাত দেওয়া হয় কেবল যুদ্ধকালে অনিবার্য্য কারণে উহা হইয়াছে। আমরা মনে করিয়াছিলাম, এজন্য গভর্ণমেণ্ট সত্যই প্রতিবিধান করিবেন। কিন্তু উহা যে উক্ত রিপোর্টের উপর চূণকাম করিবার চেষ্টা করিতেছে, ইহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ জন্মিয়াছে। একটী উদাহরণ দিতেছি—

সকলেই জানেন, গভর্ণর বাহাদুর মিঃ কেসীর সঙ্গে মহাত্মাজীর ৫।৬ বার সাক্ষাৎ হইয়াছে। কিরূপ ও কোন্ বিষয়ে সংলাপাদি হইয়াছে, তাহা অনুমান ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু একটী বিষয়ে আমাদের সন্দেহ হইয়াছে। পার্লেমেণ্টারী দল যখন কলিকাতায় আসেন তখন ডাক্তার বিধান রায় ও ডাক্তার নলিনাক্ষ সান্যালের বিবৃতি পাইয়াও জনৈক পার্লেমেণ্টারী সভ্য কিঞ্চিৎ উষ্মা প্রকাশ করিয়া বলেন, "গত দুর্ভিক্ষ মানুষের কৃত নহে, ঈশ্বরের কৃত— আপনাদের গান্ধীজীই তো গভর্ণরের কাছে এই কথা বলিয়াছেন!"

পার্লেমেণ্টের সভ্যের নিশ্চয়ই দায়িত্ববোধ আছে, এ কথা মনে করা খুবই স্বাভাবিক। সেই সভ্যটি নিশ্চয়ই এবিষয়ে মহাত্মাজী অথবা মিঃ কেসীর কাছে শুনিয়াছেন। কিন্তু মহাত্মাজী স্পষ্টভাবে প্রকাশ্য ঘোষণায় জানাইয়াছেন—"মানুষের কৃত নহে —এরূপ কথা আমি বলি নাই।"

সুতরাং উক্ত সভ্যটি হয় মনগড়া কথা বলিয়াছেন, নতুবা মিঃ কেসীর কাছে শুনিয়াছেন। কিন্তু মনগড়া কথা বলিয়াছেন এরূপ মনে করার কোন কারণ নাই, বিশ্বাসযোগ্যও নয়। সুতরাং মিঃ কেসীই হয়তো এরূপ কথা বলিয়া থাকিবেন। যদি মিঃ কেসী কোনরূপ বিবৃতি দিতেন, আমরা সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতাম। এমতাবস্থায় মিঃ কেসীই ঐরূপ বলিয়াছেন, এরূপ সিদ্ধান্ত করিলে অসমীচীন হইবে না। সুতরাং স্বয়ং গভর্ণমেণ্ট যদি উডহেড কমিটির রিপোর্টের উপরও চূণকাম করিতে প্রয়াসী হন, তবে আর দুর্ব্বৃত্তের দমনই বা হইবে কিরূপে, মহামারী নিবারণেরই বা সম্ভাবনা কোথায়?

তবে কি উপায় অবলম্বন করিলে আশু বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাওয়া যাইতে পারে? রেশনিং? গত রেশনিংএর ফল তো আমরা হাতে হাতে দেখিয়াছি। লোকে খাইতে পায় না অথচ কত চাউল নষ্ট হইয়া গেল, গম পচিয়া গেল, তাহার ইয়ত্তা নাই। বস্তুতঃ রেশনিং ব্যাপার সামগ্রিকভাবে ভারতের যাবতীয় অঞ্চলেই অসন্তোষের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রতিদিন কত অভিযোগ আমাদের কাছে আসিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সেদিনও শুনিলাম— প্রফুল্ল ভৌমিক নামক এক ব্যক্তি তাঁহার চিররুগ্না স্ত্রী চারুবালাকে ভাল চাউল সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন নাই বলিয়া অখাদ্য চাউল খাওয়ার চেয়ে স্ত্রী অভিমানে মৃত্যুবরণই করিয়াছে। এইরূপ কত চারুবালা রেশনিংএর নিষ্পেষণে আত্মহত্যা করিয়া মরিতেছে ও মরিয়াছে তাহার কি সংখ্যা আছে? ভাল চাউল যে নাই তাহা নহে, অধিক মূল্যে যে তাহাও এহাতে ওহাতে যাইতেছে না তাহাও নয়; তবে তাহা সাধারণের প্রাপ্তির বাইরে। মোট কথা, গভর্ণমেণ্ট রেশনিং করিয়া এযাবৎ কেবল বলিয়াই আসিয়াছেন 'আমরা লোকদের খাওয়াইতেছি, খাওয়াইব।' কিন্তু এখন না পারিয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট রেশনিংএর প্রচলন-কর্ত্তৃত্ব ছাড়িবেন না, মূল্য বাড়াইবেন, আর প্রত্যেককে পূর্ব্বাপেক্ষা কম খাদ্য দিবেন, এই তো কথা! এরূপ ব্যবস্থাই যদি বলবৎ থাকে, লোকের অসন্তোষ আরও দিন দিন বৃদ্ধিই পাইবে। আমাদের মতে গভর্ণমেণ্টের উচিত—রেশনিং তুলিয়া দেওয়া। তবে উহার কর্ত্তব্য হইবে—মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া এবং সেই মূল্যের বেশী কেহ নিলে উপযুক্ত প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করা, আর কেহ মাল আটকাইয়া রাখিলে বা অন্যায়ভাবে লাভ করিতে চাহিলেও তাহার সমুচিত প্রতিবিধান করা। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তাহা করিবেন কি?

শ্রীবাস্তব যে নাবালক ভারতবাসীকে সঙ্গে লইয়া ভিক্ষুক-ছেলেগুলির জন্য তাহাদের দেখাইয়া অন্য দাতাদের কাছে কিছু ভিক্ষা চাহিবেন, এরূপ প্রস্তাব কোন দায়িত্ববোধসম্পন্ন ভারতবাসী যে করিতে পারে—তাহা ভাবনারও অতীত। ভারতবাসী নিজ-বাস-ভূমে পরবাসী, তাহাকে অনাহারে রাখিয়া তাহার খাদ্য অন্যত্র পাঠানো হইয়াছে, তাই আজ সে এই সঙ্কটের মুখে। আর

তাহাকে কোনরূপে বিশ্বাস করা হইতেছে না, কোন ক্ষমতা দেওয়া হইতেছে না, অথচ কঙ্কালসার মূর্ত্তিটি দেখাইয়া তাহার জন্য শ্রীবাস্তব ভিক্ষার জন্য অভিভাবকের কাজ করিবেন! ইহা ভারতবাসী কখনও সহ্য করিতে পারে না।

"অনাবৃষ্টির দরুণ এরূপ হইতেছে, মানুষের হাত নাই" এরূপ ওকালতিও এখন হইতেই বেশ চলিতেছে। পূর্ব্বকালে ভারত-ভূমে জলাভাব, অতিবৃষ্টি, জলপ্লাবনাদির পূর্ব্ব হইতেই কল্পনা করিয়াই চাষের ব্যবস্থা ও উৎপন্ন শস্যের সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণের ব্যবস্থা করা হইত। কিন্তু এখন মোটা বেতনে কত বড় বড় রাজকর্ম্মচারী রহিয়াছেন, তাঁহারা এসব বিষয়ে কিছু ভাবিয়াছেন বা ব্যবস্থা করিয়াছেন—শ্রীবাস্তবের উক্তি হইতে তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। কি করিলে নদী, খাল প্রভৃতিতে জলের চলাচল হইতে পারে, কি করিলে জলাভাবের ভয় থাকে না, অনাবৃষ্টি কৃষিকার্য্য ব্যাহত না করিতে পারে, অতিবৃষ্টি বা জলপ্লাবন হইলেও শীঘ্র শীঘ্র জল নিকাশের ব্যবস্থা হইতে পারে, সেদিন পর্য্যন্তও সে সম্বন্ধে ভারতীয় বিশেষজ্ঞগণ কত উপদেশ, পরামর্শ ও পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার প্রতিই কি কেহ কর্ণপাত করিয়াছে?

এখন এক পথ আছে। এবারে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের যে-সমস্ত প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন, যদি তাঁহারা সুবোধ হন, যদি পূর্ব্ব হইতে তাঁহারা এ-বিষয়ে বদ্ধমূল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কাজ না করেন, যদি প্রকৃতই অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে তাঁহারা আসিয়া থাকেন, তবে বড়লাট ওয়াভেলের সঙ্গে যুক্তি পরামর্শ করিয়া শীঘ্রই তাঁহারা ভারতবাসীর সুনিপুণ হস্তে সম্পূর্ণ ভার প্রদান করার বিষয়ে ভারত ও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে দৃঢ়ভাবে বলুন। ভারতবাসীও হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান অগণিত সেবকবাহিনীর সহায়তায় দিন রাত্রি খাটিয়া যে ব্যবস্থা করিবে, আমাদের বিশ্বাস আছে, তাহাতেই অচিরে দুর্ভিক্ষ ও মারীভয় হইতে ভারতবাসী রক্ষা পাইবে। নতুবা অব্যবস্থামূলক পরিকল্পনায় রেশনিং-এর ব্যবস্থায়, লোভী ব্যক্তিগণের দণ্ডবিধান না করায় অবস্থা যে ক্রমেই জটিল হইতে জটিলতর হইবার উপক্রম হইয়াছে, কাহারও সাধ্য নাই তাহা দমন করিতে পারে। আর সে অবস্থায় ক্রমবিবর্দ্ধমান অশান্তি আরও বৃদ্ধি পাইবে ও তাহাদের অবস্থা আরও জটিলতর হইবে। একমাত্র দায়িত্বমূলক গণায়ত্ত শাসনভার ভারতবাসীর হাতে অর্পণ করিলেই ভারতবাসীর শান্তি ফিরিয়া আসিবে, নতুবা আর কিছুতেই নয়। ইতিমধ্যেই লর্ড ওয়াভেল যে দক্ষিণ-ভারত পরিদর্শনে গিয়াছেন, এজন্য আমরা তাঁহার শুভেচ্ছা এবং ঐকান্তিকতার প্রশংসা করি। কিন্তু যে-সমস্ত অকর্ম্মণ্য ও হৃদয়হীন কর্ম্মকর্ত্তার তত্ত্বাবধানে খাদ্যশস্য গুদামজাত রহিয়া পচিয়াছে, দিনের পর দিন নদীবক্ষে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, লোকের ক্ষুন্নিবৃত্তির সাহায্যকল্পে ব্যয়িত হয় নাই, খাদ্যদ্রব্যের যথাযথ সংগ্রহের ব্যবস্থা হয় নাই, বিতরণের বেলায় 'বাহন পাওয়া যায় না', 'জাহাজের অভাবে যেখানে সেখানে প্রেরণ করা যায় না' প্রভৃতি অজুহাত যাহাদের মুখস্থ, যাহাদের নিকট মানুষের প্রাণ শৃগাল, কুক্কুর, মার্জ্জার ও সারমেয়ের মত হেলার সামগ্রী হইতে পারে, তাহাদের হাতে কর্ম্মভার রাখিলে ভারতের দুর্ভিক্ষ প্রতি বৎসরই ভীষণ হইতে ভীষণতর আকার ধারণ করিবে। বড়লাট ও পার্লেমেন্টের সভ্যগণকে আমরা সময় থাকিতে সতর্ক করিয়া দিতেছি।

প্রেসিডেণ্ট্ ট্রুম্যানের ঘোষণা

১৯৪৬ সাল পৃথিবীর পক্ষে একটি সঙ্কটাপন্ন বৎসর। ব্যাপক খাদ্য-সঙ্কটের বিভীষিকা প্রায় সমস্ত পৃথিবীকেই গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই সঙ্কট হইতে পৃথিবীবাসীকে রক্ষা করিবার জন্য সবদেশেরই শাসকমণ্ডল সবিশেষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ওয়াশিংটনের নব প্রতিষ্ঠিত সম্মিলিত খাদ্য-বোর্ডে এই পৃথিবীব্যাপী সঙ্কটের সমাধানকল্পে বহু পরিকল্পনা রচিত হইতেছে। সম্প্রতি ওয়াশিংটন হইতে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানও এমনি ধরণের একটি স্বরচিত পরিকল্পনা ঘোষণা করিয়াছেন। উক্ত পরিকল্পনায় পৃথিবীর সকল সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রকে নয় দফা কর্ম্মসূচীর নির্দ্দেশ দিয়াছেন। নির্দ্দেশগুলি যথাক্রমে এইরূপ:

(১) সর্ব্বপ্রকারের খাদ্যবস্তু বিশেষতঃ রুটি সংরক্ষণে গভর্ণমেণ্ট-সমূহকে জনসাধারণের সহযোগিতা লাভের জন্য প্রবল আন্দোলন করিতে হইবে।

(২) যে পরিমাণ গম বা গমজাতীয় খাদ্যশস্য হইতে এ্যাল্‌কোহল প্রস্তুত হইয়া থাকে, সেই পরিমাণ খাদ্যশস্যসমূহকে মাসিক নয় দিনের বরাদ্দে কমাইয়া ফেলিতে হইবে। বিয়ার প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে যে-সব খাদ্যশস্য ব্যবহৃত হয়, তাহার পরিমাণ ১৯৪০ সালের নিয়ন্ত্রিত বরাদ্দ অনুযায়ী স্থির করিতে হইবে। এই ব্যবস্থার ফলে আগামী জুনমাসের মধ্যেই দুই কোটী 'বুশেল' পরিমিত খাদ্য-শস্য সঞ্চিত হইতে পারিবে।

(৩) কাঁচা গম হইতে বর্ত্তমানে যে-পরিমাণ 'আটা' তৈয়ারী হইতেছে—এবারে সেই পরিমাণের উপর শতকরা আশীভাগ বেশী পরিমাণ আটা বাহির করিতে হইবে। বর্ত্তমানে যে-পরিমাণ আটা বে-সামরিক প্রয়োজনের পক্ষে অপরিহার্য্য, আটা বণ্টনের ব্যবস্থাকে সেই পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

(৪) মিল ও 'ডিলার' মালিকদিগকে এবং মধ্যবর্ত্তী বণ্টন-প্রতিষ্ঠানগুলিকে কৃষিবিভাগ সমূহের প্রত্যক্ষ ব্যবস্থার অধীনে রাখিতে হইবে।

(৫) দুঃস্থ অঞ্চলে যথাসম্ভব শীঘ্র লইয়া যাইবার জন্য গম প্রভৃতি খাদ্যশস্যের অবাধ রেল রপ্তানির সুবিধা করিতে হইবে।

(৬) গম ও আটার রপ্তানি-ব্যবস্থাকে কৃষিবিভাগ সমূহের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে আনয়ন করিতে হইবে।

(৭) এ বৎসরে চর্ব্বিজাত তৈলবস্তু এবং মাংস প্রস্তুতের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে।

(৮) বিমানবহর ও নৌবহরের ভারবহনোপযোগী যানগুলিকে যথাসম্ভব অধিক সংখ্যায় বে-সামরিক ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দিতে হইবে।

(৯) যে-সব খাদ্যশস্য বর্ত্তমানে গৃহপালিত পশুদিগের আহারে ব্যবহৃত হইতেছে, সেই সব খাদ্যশস্যকে (বৈজ্ঞানিক প্রথায়) মানুষের ব্যবহারের উপযুক্ত করিয়া তুলিতে হইবে।

সর্ব্বপ্রকার মাদক দ্রব্য প্রস্তুতের জন্ম যে সকল খাদ্যশস্য ব্যবহৃত হয়, তাহা নিষিদ্ধ করিতে হইবে।

সর্ব্বশেষে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান সকল সংশ্লিষ্ট দেশের জনসাধারণকে সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন যে, এই ব্যবস্থা জনসাধারণের পূর্ব্বতন অভ্যস্ত জীবনের পক্ষে কিছু কিছু অসুবিধার সৃষ্টি করিলেও তাহাদিগকে এই ব্যবস্থা মানিয়া লইতে হইবে। দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য্য প্রয়োজনগুলি ব্যতীত বাড়তি সুবিধালাভের অজুহাতে ক্ষুধার্ত্ত জীবনগুলিকে বিপন্ন করা চলিবে না।

মিঃ ট্রুম্যানের পরিকল্পনাটি পড়িতে এবং পড়িয়াই আরও পাঁচজনকে শুনাইতে বেশ ভালই লাগে। কিন্তু এতখানি ভাল লাগিবার পরও প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে ইহা কতদূর সাফল্য লাভ করিবে—সেবিষয়ে প্রচুর সন্দেহ আছে। কেন, বলিতেছি। কিছু দিন পূর্ব্বে প্রেসিডেন্ট মহোদয় নিপীড়িত মানবজাতির সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণবিধায় এমনই একটি মহৎ পরিকল্পনা আন্তর্জাতিক মহলে প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেইটি ছিল 'চার স্বাধীনতার' পরিকল্পনা। পরিকল্পনাটি পড়িয়া আমরা নিজেরাও আশায় অতিমাত্রায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলাম এবং আর পাঁচজনকেও শুনাইয়া তাহাদের উৎফুল্ল করিয়াছিলাম। কিন্তু ব্যস, ঐ পর্য্যন্তই—এর চেয়ে বেশী কার্য্যকারিতা আর উক্ত পরিকল্পনা হইতে সাধিত হয় নাই। এশিয়া ও আফ্রিকার অগণন জনসাধারণ আজও পূর্ব্বেরই মত পাশ্চাত্ত্য প্রভুশক্তির সাম্রাজ্য জাঁতাশের তলায় আর্ত্তনাদ করিতেছে। উৎপীড়ক প্রভুশক্তিরা মিঃ ট্রুম্যানের উপদেশে কর্ণপাত করে নাই। এবারকার খাদ্যসঙ্কটের সমাধানের প্রস্তাবও উক্ত প্রভুশক্তিরা মাথা পাতিয়া লইবেন—সে কথা মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ এখনও পর্য্যন্ত আমাদের লক্ষ্য গোচর হয় নাই। ভারতের প্রভুশক্তির আচরণেই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিদ্যমান। ভারতের খাদ্য-সঙ্কটের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে, ভারতের খাদ্যবিভাগ দেশের ভয়ঙ্কর খাদ্যাভাবের সম্ভাবনা উপলব্ধি করিয়াও সেই খাদ্যাভাবের মীমাংসাসাধনে যথাযোগ্য তৎপরতা প্রদর্শন করিতেছেন না। উপযুক্ত আন্তরিকতার সহিত ভারতের সমস্যা বিবৃত করিতে পারিলে সম্ভবতঃ সম্মিলিত খাদ্যবোর্ড ভারতের সহায়তা কল্পে কিছুটা বদান্যতা দেখাইতে পারিতেন। কিন্তু সে কাজটাও ভারতীয় খাদ্যবিভাগ সুসম্পন্ন করিতে পারেন নাই। আমলাতান্ত্রিক চালে যে-সুপারিশ তাঁহারা ওয়াশিংটনে প্রেরণ করিয়াছিলেন, উক্ত সুপারিশ ভারতের সমস্যা যথাযোগ্য-আন্তরিকতার সহিত সম্মিলিত খাদ্যবোর্ডের দরবারে উপস্থিত হয় নাই বলিয়াই একপ্রকার প্রত্যাখ্যাত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। কেন্দ্রীয় আইন-পরিষদের বিতর্কে আমরা এ তথ্য জানিতে পারিয়াছি। অথচ যোগ্যতা সম্পন্ন একজন জননেতাকে এই কার্য্যে প্রেরণ করিলে হয় তো বা কিছু ফলপ্রাপ্তি সম্ভব হইত। এবার যে আবার কয়েকটী ব্যক্তিকে পাঠাইয়াছেন, ভাবগতিক দেখিলে তাঁহাদের চেষ্টাও সাফল্য লাভ করিবে মনে হয় না। এই কারণেই মিঃ ট্রুম্যানের পরিকল্পনা আমাদের শুধু সুপাঠ্য সংবাদ-পাঠেরই তৃপ্তি দান করিয়াছে, আহারদানের প্রকৃত আশ্বাস কিছু দেয় নাই।

কেন্দ্রীয় পরিষদ্‌ ও প্রস্তাবাবলী

এইবার নবগঠিত কেন্দ্রীয় পরিষদের কংগ্রেসদলই সংখ্যাগরিষ্ঠ, এবং শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু লীডার (নায়ক) নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, সহকারী নায়ক হইয়াছেন মিঃ আসফালী এবং সম্পাদক হইয়াছেন প্রফেসার রঙ্গ (এন, জি, রঙ্গ), গাড্‌গিল ও মোহনলাল সাক্সেনা। পরিষদ সভাপতি (Speaker) হইয়াছেন কংগ্রেসের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত মভলঙ্কার। স্পীকার নির্ব্বাচনে লীগের সহিত বিরোধিতা হইয়াছিল। তাঁহারা চাহিয়াছিলেন স্যার কাউয়াসজী জাহাঙ্গীরকে। এই বিষয়ে ইউরোপীয়ানরা এবং কয়েকজন মনোনীত সভ্য লীগের সঙ্গে যোগ দিয়াছিল। ইউরোপীয়গণের দলগত ভাবে বিরোধিতা করা সমীচীন হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না। আমাদের মতে এখন দেশবাসী মাত্রই যখন বিদেশীর উপস্থিতি আর বরদাস্ত করিতে ইচ্ছুক নয়, এমতাবস্থায় ইউরোপীয় সভ্যগণ এই দেশবাসীর আশা আকাঙ্খার প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতিসম্পন্ন—এইভাব প্রদর্শন করাই তাহাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

যাহা হউক কয়টি প্রস্তাবেই কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ একসঙ্গে মত দিয়াছেন প্রথম ইন্দোনেশিয়া ও ইন্দোচীনে কেন ভারতীয় সৈন্যগণকে প্রেরণ করা হইয়াছে, দ্বিতীয় খাদ্য সমস্যায়, তৃতীয় আজাদহিন্দ ফৌজের সৈন্যগণকে মুক্তি দেওয়া বিষয়ে, চতুর্থ রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তির প্রসঙ্গে (Detenues under Ordinance III of 1944) এবং পঞ্চম জাভার ব্যাপারে ভারতীয় বিক্ষোভ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় প্রতিনিধির মারফত উপস্থিত না করা। এই কয়টি প্রস্তাবেই কংগ্রেস ও লীগ একসঙ্গে ভোট দিয়া গভর্ণমেন্টকে পর্য্যুদস্ত করিয়াছে। কেন্দ্রীয় পরিষদে বড়লাট সাহেবের কাউন্সিলের কর্ম্মকর্ত্তাগণকে প্রতিপদেই দেশের সম্মিলিত শক্তির সম্মুখীন হইতে হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রস্তাবাদির ফলাফল চিন্তা করিয়া বড়লাট বাহাদুরকে আমরা একটি বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত হইতে বলি।—কি কংগ্রেস, কি মুসলীম লীগ, কি উলেমা, কি জাতীয়বাদী মুসলমান যে কোন দলকর্ত্তৃক ভারতবাসী যে কেহই মনোনীত হোন না কেন, তিনি অখণ্ড ভারতেরই প্রতিনিধি এবং এই অখণ্ড ভারতের সমস্ত বিষয়ে একসঙ্গে তাহারা মত না দিয়া পারে না। যেমন খাদ্য-সমস্যার প্রায় সকল বিষয়েই হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থ এক। সেইরূপ আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তির প্রস্তাবেও জিন্নাসাহেব পাকিস্থানের বাহিনীর সুখস্বপ্ন দেখুন না কেন, ভোট দেওয়ার বা বিতর্ক করবার সময়ে কংগ্রেস এবং জাতীয়দলের সঙ্গে তাহার দলই আবার হাতে হাতে না মিলাইয়া পারেন নাই ও পারিবেন না। কারণ স্বদেশের বিভিন্ন সমস্যায় সকলেরই স্বার্থ অভিন্ন। আমাদের মনে হয় একমাত্র কল্পিত পাকিস্থানরূপ প্রস্তাব ব্যতীত আর কোন প্রস্তাবেই সমস্ত ভারতবাসী একমত না হইয়া পারিবেন না। তাহাদের পৃথক হইবার কোন কারণই নাই। ভারতের হিত যেমন হিন্দু চাহিবেন, তেমন মুসলমান চাহিবেন, তেমন ভারতীয় খৃষ্টান চাহিবেন, সুতরাং ভারতে থাকিতে হইলে ইউরোপীয়দিগেরও ভারতীয়গণের স্বার্থরক্ষা করাই উচিত, আর গভর্ণমেন্টেরও বুঝা

উচিত যে প্রায়-সব বিষয়েই যখন ভারতবাসী একমত, তখন দলবিশেষ আপত্তি করে করুক, কিন্তু কালবিলম্ব না করিয়া জাতীয়ভাববিশিষ্ট ভারতীয়গণকে দিয়াই কার্য্যকরী সংসদ (Executive Council) অবিলম্বে গঠন করা উচিত। সিমলায় ঐরূপ করাই সমীচীন ছিল। তবে লর্ড ওয়াভেলের উদ্দেশ্যের প্রতি আমরা কখনও সন্দিহান নই এবং তাঁহাকে অনুরোধ করি যে অতীতের অভিজ্ঞতায় নিশ্চয়ই তিনি বুঝিয়াছেন আর কালবিলম্ব করা কেবল অনুচিত নয়,—ঘোরতর অবিচার; আর গভর্ণমেণ্টের দিক দিয়াও ভবিষ্যৎ শান্তিকল্পে উহা করাই একমাত্র পরামর্শ সঙ্গত। আমরা লর্ড ওয়াভেলকে অবিচারের কলঙ্কের হাত হইতে মুক্ত হইতে এবং ভারতে শান্তি-প্রতিষ্ঠায়, অবিলম্বে গণতন্ত্রপরায়ণ জাতীয়-গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিবার উপদেশ দিতেছি।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠান

দুই-দুইটা মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা হইতে পৃথিবীর সাধারণ অধিবাসীরা অর্থাৎ আন্তর্জ্জাতিক ও আভ্যন্তরিক সব রকম রাজনীতিরই মধ্যে যাহারা উলুখড় হিসাবে গণ্য এবং উলুখড় হিসাবেই 'রাজায় রাজায় যুদ্ধে' সবচেয়ে বেশী প্রাণ ও সম্পত্তি বেশী হারায়, তাহারা একটা ব্যাপারে বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া ফেলিয়াছে! সেই ব্যাপারটি হইল এই যে, এই ধরণের যুদ্ধগুলি শেষ হইবার উপক্রম হইলেই বিজয়ী পক্ষরা আর একটি এমনি ভবিষ্য ভয়াবহ যুদ্ধ দূর করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যান। অনেক রকম সব সুখশ্রাব্য প্রস্তাব—মানুষের চারি স্বাধীনতার কথা (অভাব, আক্রমণ, বুভুক্ষা, ত্রাস), ঔপনিবেশিক অধিবাসীদের ইচ্ছামত শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা, পৃথিবীর শোষণকারীদের আমূল উচ্ছেদের উপায়, আক্রমণকারী শক্তিদের দমনের কথা-- নানা রকম মহৎ কল্পনা নিয়া তাঁহারা একটি সম্মিলিত অধিবেশনে সমবেত হন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদের সেই দেবতা-সুলভ পরিকল্পনা ও প্রস্তাবগুলি আর কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। নিরাপত্তা (সিকিউরিটি) বৃদ্ধির অজুহাতে, ঘরোয়া সমস্যার ওজরে এবং নৈতিক দায়িত্বের ধাপ্পায় সবগুলি সাধু মতলবই একে একে ফাঁসিয়া যায় এবং অবশেষে সব অধিবেশনগুলিই শেষ হয় সেই পূর্ব্বেরই মত বড় বড় 'রাজ'-শক্তিদের পরস্পর পিঠ-চুলকানিতে। পৃথিবীর নিপীড়িত উলুখড়দের স্কন্ধে আবার সেই আগেরই মত শাসানের খড়্গ উদ্যত হইয়া থাকে। বিগত প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই প্রতিষ্ঠিত লীগ অফ্ নেসন্স্ হইতে সেই দিনকার মস্কোর তিন-প্রধানের বৈঠকে পর্য্যন্ত আমরা সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি দেখিয়াছি।

গত জানুয়ারী মাস হইতে এখনও পর্য্যন্ত লণ্ডনে এমনি একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইতেছে। অধিবেশনটি নব প্রতিষ্ঠিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের প্রথম সাধারণ অধিবেশন। পৃথিবীর একান্নটি বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা এখানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের তরফেও একজন সাক্ষী-গোপাল প্রতিনিধি উপস্থিত আছেন। প্রভু-শক্তিকে ভোট দিয়া বাধিত করিবার জন্যই তিনি 'হাজির'; নতুবা ভারতের সহিত তাঁহার আর কোন সম্পর্ক নাই। অধিবেশনটি এখনও প্রচুর সাহিত্য ও কাব্যরসাত্মক বক্তৃতার মধ্যদিয়া এবং তদধিক টেবিল চাপড়া-চাপড়ি ও আস্তিন গুটানো সমন্বিত বিতণ্ডার মধ্য দিয়া পূর্ণদমে চলিতেছে: বক্তৃতা এবং বিতণ্ডার শেষ সিদ্ধান্তগুলি এখনও বিবেচনাধীন। ফল প্রায় এক রকমেরই, সবই যেন চাপা রহিল,বোধ হয় বাগবিতণ্ডায়ই উহার পরিসমাপ্তি হইবে।

অধিবেশনে এ পর্য্যন্ত প্রধানতঃ তিনটি বিষয়ের জটিল আলোচনা হইতেছে। একটি রুশ-ইরাণ সমস্যা এবং অন্য দুইটি গ্রীস ও ইন্দোনেশিয়ার সম্বন্ধে।

গ্রীস ও পারস্যের কথাই আমরা পূর্ব্বে ধরিব। কারণ এই দুইটীর সহিত ইউরোপীয় স্বার্থের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। সকলেই জানেন, ইরাণের অগ্রগামী দল সম্প্রতি উহার উত্তর প্রদেশ আজার-বাইজানে আধিপত্য করিতেছে। আর তাহারা ইরাণের আয়ত্তাধীন নাই এবং সেখানে শাসনতন্ত্রও কতকটা সোভিয়েটের ডৌলে গঠিত হইয়াছে। রুশিয়ার দক্ষিণ সীমানায় অবস্থিত এই স্থানের প্রতি স্বতঃই তাহাদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি গভীরভাবে নিবদ্ধ আছে। পারস্যে ইংরাজেরও স্বার্থ আছে—ব্যবসা সম্পর্কে এবং তৈল সংগ্রহার্থে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা বৈঠকে পারস্য প্রতিনিধি পারস্য ব্যাপারে সোভিয়েট হস্তক্ষেপ সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া একটা নির্দ্দেশ চাহেন। ইংলণ্ডের প্রতিনিধি মিঃ বেভিন তাহাকে সমর্থন করিয়া বলেন, "পারস্যে অন্য দেশের দরকার কি, আমরা চলিয়া যাইব, সোভিয়েটও চলিয়া যাউক।"

ইংলণ্ডের উপস্থিতি এখন মধ্যপ্রাচ্যের কোন দেশের লোকই আর চাহিতেছে না। এদিকে রুশিয়া চায় সমগ্র পারস্যে যেন গণতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং ইংলণ্ডকে চলিয়া যাইতেই হইবে, আর সোভিয়েটও থাকিতেই চাহিবে। ইরাণের সমস্যা লইয়া স্বস্তি পরিষদে প্রথমতঃ কিছু তর্কবিতর্কও হয়।

দ্বিতীয়টি গ্রীসে ইংরাজ সৈন্যের উপস্থিতি সম্পর্কে। গ্রীস সম্পর্কে বাদানুবাদের কারণ এই যে, সেখানে ইংরাজ সৈন্যের অবস্থিতি ঘোরতর আপত্তিজনক বলিয়া রুশিয়ার প্রতিনিধি ভিসিনিস্ক উহা সরাইয়া লইতে বলিতেছেন। গ্রীসের বামপন্থীরা বরাবর ইংরাজ সৈন্যের অত্যাচার সম্বন্ধে অভিযোগ করিয়াছে, কিন্তু তখন রুশিয়া কর্ণপাত করে নাই। কারণ তখন রুমানিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি বলকান রাজ্যের সীমান্ত সমস্যা মিটিয়া যায় নাই। সেই সমস্যার অবসান হওয়া মাত্রই এই আপত্তি আরও প্রকট হইয়াছে। ভূমধ্যসাগর, গ্রীস ও দার্দ্দানেলিসে রুশিয়ার পক্ষে আপত্তিকর বাহিনী থাকিলে প্রাচ্যদেশ সম্পর্কে উহার কোন-রূপ প্রভুত্ব জন্মিবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া গ্রীসের সৈন্য সরাইয়া লইতে ভিসিনিস্কের এত পীড়াপিড়ি ও আপত্তি। তিনি বলেন,"যখন জার্ম্মান ছিল, তোমাদের আবশ্যকতা হইয়াছিল তাদের তাড়াবার জন্য। এখন থাকবার দরকার কি?" কিন্তু বেভিন টেবিল চাপড়াইয়া উগ্রকণ্ঠে বলেন, "আমরা আপত্তিজনক বাহিনী রাখিয়াছি? হায়, এই অভিযোগ শুনিবার পূর্ব্বে আমি কেন এস্থান পরিত্যাগ

করিলাম না।" আমরা চাই শান্তি। সরাইব কি ? শান্তির জন্য আবার সৈন্য সেখানে পাঠাইব। গ্রীসে শান্তিরক্ষার জন্য আমাদের সেখানে যে সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টা করা উচিত।" অবশেষে 'গর্জ্জে তো বর্ষে না', এই বাক্যই সার্থক হইল। স্থির হইল, পারস্য ব্যাপারে স্বস্তি সমিতির হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নাই। পারস্য গভর্ণমেণ্ট তাহার আপত্তি উঠাইয়া নিয়াছেন, কেন না রুশিয়া এবং পারস্য তাহাদের নিজেদের ব্যাপার আপোষে মিটাইয়া লইবে। সুতরাং ভিসিনিস্কও গ্রীসে ইংরাজ-সৈন্য অবস্থান সম্বন্ধে আর কোন পীড়াপীড়ি করিলেন না। তবে তাঁহার অভিযোগও কিন্তু তিনি প্রত্যাহার করিলেন না। মোটকথা, যেখানকার জল সেখানেই রহিল, স্বস্তি সংসদ সব বিষয়টিই খামা চাপা দিলেন। আমরা কেবল বলিতে চাই, এই কূটনীতির যুদ্ধে জিতিল কে—রুশিয়া না ইংলণ্ড?

অবশ্য বেভিন বলেন বটে, "যা হইল খুব ভাল হইল, ইংরাজ ও রুশিয়ার মধ্যে মিত্রতা থাকাই বড় কথা", তবে রাজনৈতিক মিত্রতা হইল বটে, কিন্তু তর্ক-বিতর্কের পরে উভয় প্রতিনিধি না কি এপর্য্যন্ত আলাপও করেন নাই—পরস্পরের প্রতি সহাস্য দৃষ্টিও নিক্ষেপ করেন নাই।

স্থির হইল যে, গ্রীসে আগামী নির্ব্বাচন পর্য্যন্ত ইংরাজ বাহিনী সেখানে থাকিবে। ইংরাজ পৃষ্ঠপোষিত গ্রীসের নূতন গভর্ণমেণ্টও তাহাই চায়। কিন্তু আমাদের মনে হয়, গ্রীসের সম্পর্কেই হয়তো বা তৃতীয় মহাযুদ্ধের শঙ্খরোল বাজিয়া উঠিবে। কারণ ইরাণে ও বলকান সীমান্তে সোভিয়েট প্রভুত্ব কিছুই খর্ব্ব হয় নাই। এবং অচিরেই গ্রীসের ব্যাপার তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিবে।

তৃতীয়টি ইন্দোনেশিয়ার ব্যাপার। সেখানে যে ইংরাজসৈন্য ও ভারতীয় বাহিনী জাভার অধিবাসীদিগের দমনকল্পে পাঠানো হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বেভিনও বলিতে-ছেন, "সেখানকার লোক উত্তেজিত হইবে, মারপিট করিবে, আর আমাদের সৈন্যরা চুপ করিয়া থাকিবে?"

জাভার ঘটনা এই যে, পূর্ব্বে উহা ছিল ওলন্দাজের অধীনে। কিন্তু জাপান কয়েকবৎসর উহা দখল করিয়া রাখে। পরে জাপান চলিয়া গেলে জাভার অধিবাসিগণ, স্বাধীনতাকামী সুকর্ণ ও হাত্তার অধীনে স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীয়মান করিল। আর ওলন্দাজ তাহাদিগকে দমন করিয়া নিজ শাসন বজায় রাখিতে উদ্যত হইল। এদিকে ইংরাজও নিজ শ্বেত সৈন্য ও ভারতীয় সৈন্য লইয়া ওলন্দাজকে সহায়তা করিতেছে। অজুহাত, ইংরাজ সেনাপতি ব্রিগেডিয়ার মেলেবি নাকি নিহত হইয়াছে। কে মারিয়াছে, কি অবস্থায় মারা হইয়াছে কোন প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও, ইহা লইয়া ভারতে এবং বিভিন্ন স্থানে কত আন্দোলন হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। পণ্ডিত জওহরলালকে তাহারা তাহাদের কাছে চাহিয়া-ছিল, কিন্তু তিনিও যাইবার ছাড়পত্র পান নাই। ইতিমধ্যে ওলন্দাজ গভর্ণর ভ্যানমুক হল্যাণ্ডে গিয়া সেখানকার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শালোচনা করিয়া আসিয়া পনের দফা সর্ত্ত দিয়াছেন। কথাবার্ত্তা চলিতেছে, একটি ওলন্দাজ পার্লামেণ্টারী দলও সেখানে প্রেরিত হইতেছে। তাহারা নাকি কেবল দেখিবেন শুনিবেন মাত্র, কোন অনুসন্ধান করিবেন না। এদিকে ইংরাজ-সরকার ও সার আর্চিবল্ড ক্লার্ক কেয়ুকে অনুসন্ধানার্থ পাঠাইয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে আলোচনা করিয়া জাভার জাতীয় গভর্ণমেণ্টের নেতা ডাঃ সারিয়ার নাকি তাঁহাকে কূটনীতিবিশারদ 'diplomat' বলিয়া সার্টিফিকেট দিয়াছেন। এই জাভার প্রশ্নও স্বস্তি পরিষদে সেদিন উঠিয়াছিল। ইউক্রেণের প্রতিনিধি ডাঃ ম্যানুইলিস্কি বলেন "আটল্যাণ্টিক সনন্দের মর্য্যাদা রক্ষিত হইতেছে না---ইংরাজ ও ভারতের সৈন্য সেখানে পাঠাইয়া ইংলণ্ড সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়াছেন। ইহাতে এসিয়া এবং ইউরোপে যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিবে, তাহার আর বিচিত্র কি? স্বস্তি পরিষদ হইতে একটি অনুসন্ধান কমিটী পাঠানো একান্ত কর্ত্তব্য"।

এবারও বেভিন পূর্ব্বের মতই মুখর হইলেন, ডাক্তার ম্যানুইলিস্কিকে খবরের কাগজ-উদ্ধৃত কথা বলার জন্য উপহাস করিলেন এবং বুঝাইয়া দিলেন "জাভার নিরাপত্তার জন্যই সেখানে ইংরাজ ও ভারতীয় সৈন্য থাকিবেই।" ওলন্দাজ প্রতিনিধি ফন ক্লেফেন বেভিনকে পুরামাত্রায় সহায়তা করিলেন ও সেই একই মামুলি সুরে।

মুলতুবীর পরে সোভিয়েট প্রতিনিধি ভিসিনিস্কও জাভার ব্রিটিশ আচরণের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। বেভিনের উত্তর দিবার দ্বিতীয় পালা এখনও আসে নাই। আবারও কি গ্রীস প্রসঙ্গের পুনরভিনয় হইবে? অবশ্য এবার তিনি হাসিয়া কথা বলিয়াছেন।

এদিকে আবার একটি নূতন কথা উঠিল, অষ্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধি মেকিন বলেন—ম্যানুইলিস্কির প্রস্তাব করিবার অধিকার নাই। চীন, মিসর, পোলেণ্ড, ফ্রান্স ও রুশিয়া বলেন, "তাহার অধিকার আছে।" এখনও তর্ক-বিতর্ক চলিতেছে।

আমাদের বিশ্বাস, স্বস্তি সম্মিলন কোনরূপ অনুসন্ধান কমিটি পাঠাইবার উদ্যোগ করিবেন না; আর মনে হয়, জাভার কিছু করিবেনও না বা সেখান হইতে ইংরাজ সৈন্য সরাইবারও কোন নমুনা পাইতেছি না। দ্বিতীয়তঃ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান কেবল যে বহ্বারম্ভেই পরিণত হইয়া, মধ্যপ্রাচ্যে রুশিয়ার শক্তিবৃদ্ধির অবসর দিয়া ইংলণ্ডের ক্ষমতাই কেবল খর্ব্ব করিল মাত্র, কিন্তু ইংলণ্ডের লাভ বেশী হইল না।

অতঃপরে শুনিতেছি ভ্যানমুকের সহিত আলোচনার ফলে জাভায় একটি গণতন্ত্রমূলক শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ওলন্দাজ সাম্রাজ্যে ইন্দোনেশিয়ার অংশীদারত্ব চলিবে। ডাচ্ গভর্ণমেণ্ট কতকগুলি সর্ত্ত দিয়াছে বটে, কিন্তু এ-গুলি বিচার করিবার সময় এখনও আসে নাই। গণজাগরণের ফলে জাভার স্বত্ব স্বীকার সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ নাই—তবে তাহা স্বস্তি সম্মেলনের দৌলতে হইবে না। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

প্রাদেশিক নির্ব্বাচন

পূর্ব্বে আমরা কেন্দ্রীয় পরিষদ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এবার প্রাদেশিক নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কোন

কোন স্থানে নির্ব্বাচন শেষ হইয়াছে, কোন কোন স্থানে আরম্ভ হইবার উপক্রম হইয়াছে।

আসাম—কংগ্রেসের নির্ব্বাচন শেষ হইয়াছে এবং সংখ্যাধিক্য-রূপে আসামে শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বরদলৈর নেতৃত্বে মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হইয়াছে। আসামের সদস্য সংখ্যা ১০৮ জন, তন্মধ্যে কংগ্রেসী ও কংগ্রেসীদল সমর্থিত প্রতিনিধি লইয়া ৬২ জন হইয়াছে। সুতরাং ভারতের পূর্ব্বোত্তর সীমান্তপ্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলই গঠিত হইয়াছে। স্যার সাদুল্লা প্রমুখ লীগপন্থী মুসলমানগণকে পরিষদে বামপন্থীভাবে কার্য্য করিতে হইবে। নিম্নলিখিতভাবে দপ্তর বিতরিত হইয়াছে :

(১) শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বরদলৈ, প্রধান মন্ত্রী, শিক্ষা ও প্রচার।
(২) „ বৈদ্যনাথ মুখার্জ্জি, সরবরাহ, যানবাহন, জেল ও যুদ্ধোত্তর গঠন।
(৩) „ বসন্তকুমার দাস, স্বরাষ্ট্র বিচার ও সাধারণ বিভাগ, আইন-সভা ও রেজিষ্ট্রেসন।
(৪) „ বিষ্ণুরাম মেধী, অর্থ ও রাজস্ব।
(৫) „ রেভারেণ্ড নিকলস্ রায়, বন, পূর্ত্ত ও শিল্প সংযোগ।
(৬) „ রামনাথ দাস, আবগারী, শ্রম, চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য।
(৭) „ আবদুল মতলিব মজুমদার, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, কৃষি ও পশু-চিকিৎসা।
(৮) (৯) মুসলমান মন্ত্রী।

আমরা এইরূপ বণ্টনে খুব খুসী হইয়াছি, কারণ ইহাতে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, অনুন্নত জাতি এবং খাসিয়া সবশ্রেণী হইতেই মন্ত্রী গ্রহণ করা হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, যে দুইজন মুসলমান মন্ত্রী গৃহীত হইতে বাকী আছেন, তাঁহারা যে মতবাদবিশিষ্টই হউন না কেন, উপযুক্ত এবং সাম্প্রদায়িক-দোষমুক্ত ব্যক্তিকেই গ্রহণ করা উচিত হইবে। আর যে কয়জন অমুসলমান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন, আশা করা যায়, তাঁহারাও আসামের হিতকল্পে (কেবল সম্প্রদায়বিশেষের হিতকল্পে নহে) তাঁহাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিবেন। শ্রীযুক্ত বরদলৈ যেরূপ ক্ষিপ্রকারিতা, বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সহিত মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহাতে আমাদের মনে হয়, সমস্ত ভারতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তিনি নিশ্চয়ই আসামকে একটি অসাম্প্রদায়িক এবং আদর্শ প্রদেশে পরিণত করিবেন। মুসলমান নির্ব্বাচন-প্রার্থীদের মধ্যে ৪ জন জাতীয়তাবাদী মুসলমান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সুতরাং জিন্না সাহেবের দাবী যে তাঁহার অনুবর্ত্তিগণই মুসলমান সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধি, এই দাবী অমূলক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। তবে প্রদেশস্থ সমগ্র মুসলমানদের প্রতি নিরপেক্ষ এবং ন্যায়ানুমোদিত আচরণ প্রদর্শিত হইতেছে দেখিলেই আমরা সবিশেষ আনন্দিত হইব। এ বিষয়ে আমাদের কোনরূপ সন্দেহ নাই সত্য, তবে এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত বরদলৈকে আরও অবহিত ও সচকিত থাকিতে আমরা সর্ব্বদা অনুরোধ করি। আসামের শাসন-পরিষদে কয় বৎসর যে সমস্ত পক্ষপাত বা অনাচারমূলক আচরণের কথা আমাদের কর্ণগোচর হইয়াছিল, এবার আমাদের ভরসা আছে যে সেই অধ্যায়ের শেষ হইবে।

সিন্ধুদেশ—পশ্চিম সীমান্ত অর্থাৎ সিন্ধুদেশে লীগ মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হইয়াছে। এখানকার সভ্য-সংখ্যা ৬০ জন—তন্মধ্যে কংগ্রেস পাইয়াছে ২২, লীগ ২৭, ইউরোপীয় ৩, জাতীয়তাবাদী মুসলমান ৪, সৈয়দ সাহেবের পার্টি ৪—কিন্তু সৈয়দ সাহেবের দল, জাতীয়তাবাদী মুসলমান এবং কংগ্রেসীদল একত্রিত হইয়া যে একটি সম্মিলিত দল গঠন করিয়াছেন তাহাতে এই দলের সংখ্যা হয় ৩০। ইউরোপীয়রা মন্ত্রিমণ্ডল গঠন সম্বন্ধে নিরপেক্ষ থাকিবেন ঘোষণা করিয়াছেন, সুতরাং বৃহত্তর দলই এই সম্মিলিত দল। কিন্তু গভর্ণর বাহাদুর সম্মিলিত দলকে মন্ত্রিমণ্ডল গঠনে সুযোগ না দিয়া শুধু লীগদলের নেতা স্যার গোলাম হুসেন হিদায়েতুল্লাকে মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের অধিকার দিয়াছেন, ইহা নিয়মতন্ত্র-বিরোধী বলিয়া আমরা মনে করি। অন্যদিকে আবার যাঁহারা ভোট দিয়াছেন, তাহাদের সংখ্যা যদি ধরা যায় তবে লীগপ্রাধান্যের আরও অভাব পরিলক্ষিত হইবে। সুতরাং সম্মিলিত দলকে উপেক্ষা করিয়া গভর্ণর সাহেব সিন্ধু প্রদেশের শান্তি সংস্থাপনের ব্যবস্থা না করিয়া কর্ত্তব্যবিমুখতার কাজ করিয়াছেন।

সিন্ধু নেতা ডাক্তার চৈতরাম গিদওয়ানী বলেন, সিন্ধুর গবর্ণর ইতিপূর্ব্বে ব্যবহারে লীগের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছেন। এই অভিযোগের প্রমাণ আছে কি না জানি না তবে সম্মিলিত দল ৩০ জন হওয়ায় অন্য একটি দলের প্রাধান্য দেওয়ায় পক্ষপাতিত্ব প্রমাণিত হয়। ইহার পরে ইউরোপীয়ানরা লীগের সঙ্গে যোগ দিলেও মন্ত্রিত্ব স্থায়ী হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। গভর্ণর বাহাদুর যদি সম্মিলিত দল এবং লীগকে যুক্ত এবং অধিকতর সম্মিলিত ভাবে মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের সুযোগ দিতেন, তাহা হইলে সিন্ধু প্রদেশে মন্ত্রিত্বের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ হইতাম। প্রায়ই এ দল হইতে ও দলে এবং ও দল হইতে এ দলের সভ্য স্বার্থের খাতিরে মত পরিবর্ত্তন করিবেনই। যেমন জাতীয় মুসলমান একজন লীগে যোগদান করিয়াছেন, আবার লীগেরও গাজদার সাহেব প্রেসিডেন্ট পদের জন্য সৈয়দ সাহেবের দর্শনপ্রার্থী হইয়া ছিলেন।

সুতরাং সকল দল লইয়া মন্ত্রিত্ব গঠন সিন্ধুপ্রদেশের না করায় খুবই অন্যায় হইয়াছে এবং গবর্ণর বাহাদুরের এই অদূরদৃষ্টি এবং নিয়মতন্ত্র-বিরোধিতার জন্য আমরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। ... করিবার তিনি একটা প্রকাণ্ড সুযোগ পাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা নষ্ট করিলেন।

সৈয়দ সাহেবের সম্মিলিত দলে কংগ্রেস বাদেও ৮ জন মেম্বর রহিয়াছেন, সুতরাং এ ক্ষেত্রেও লীগ সমগ্র মুসলমানের একমাত্র প্রতিনিধি—এইরূপ দাবী করিবার তাহার আর অধিকার নাই। তৃতীয়তঃ, লীগ আরও বলে যে কংগ্রেস একমাত্র হিন্দুদের প্রতিনিধি, তাই সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের দুইজন হিন্দু মন্ত্রীর নাম করিবার জন্য কংগ্রেসনেতার কাছে চিঠি লিখিয়াছিলেন। কংগ্রেস নেতা ঐ পত্র সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করিয়া সম্মিলিত দলের মর্য্যাদা ও কংগ্রেসের আদর্শ রক্ষা করিয়াছেন। এইরূপ ভাবে আঘাত

করায় মিলনের পথ আরও কণ্টকাকীর্ণ হয়। সুতরাং সৈয়দ গোলাম হোসেনের এইরূপ উক্তিতে আমরা খুব মনঃক্ষুণ্ন হইয়াছি।

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ—এ পর্য্যন্ত ডাক্তার খাঁ সাহেব প্রমুখ কংগ্রেসের পক্ষ হইতে ১৮ জন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তন্মধ্যে ৮ জন মুসলমান এবং বাকী কয় জন হিন্দু, এতদ্ব্যতীত একজন জাতীয়তাবাদী মুসলমানও লীগ পদপ্রার্থীকে পরাজিত করিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ৭ জন লীগপন্থী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সুতরাং সেখানে কংগ্রেস ও লীগের অনুপাত ২ : ১। শেষাশেষি সেখানেও কংগ্রেসই বৃহত্তম প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান বলিয়াই পরিগণিত হইবে। আরও সুখের বিষয় সেখানে কংগ্রেসের মুসলমানগণই খুব প্রভাবশালী!

পাঞ্জাব—পাঞ্জাবে বহু ইউনিয়ানদলের সভ্য লীগদলকে পরাজিত করিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, সুতরাং সেখানেও লীগের একপ্রতিনিধিত্ব ভূয়া কথা বলিয়া প্রমাণিত হইল। যুক্তপ্রদেশ, বেহার, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, বোম্বাই—এই পাঁচটি প্রদেশ তো কংগ্রেসগরিষ্ঠই। একমাত্র বাকী রহিল বাঙ্গলা। এখানকার সভ্য-সংখ্যা ২৫০, তন্মধ্যে ১১৯ মুসলমান, ৮০ অমুসলমান, ২৫ ইউরোপীয়, ৪ এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, ২ দেশীয় খৃষ্টান, ৫ ভারতীয় চেম্বার অব কমার্স, ২ বিশ্ববিদ্যালয় ও ৫ জমিদার।

যদি সব মুসলমান সভ্যই লীগপন্থী হয়, তবে এখানে লীগ মন্ত্রিত্ব সম্ভব, কিন্তু এখন অনেকের এ বিষয়ে সন্দেহের কারণ হইয়াছে। কারণ মৌলানা আসরাফউদ্দিন চৌধুরী সাহেব কুমিল্লায় যে উলেমা সম্মিলন করিয়াছেন, তাহাতে ঐ সমস্ত অঞ্চলে লীগের প্রাধান্য আছে বলিয়া মনে হয় না। দ্বিতীয়তঃ, লীগপন্থীদের মধ্যেই ঢাকার দল লীগের মনোনয়ন ব্যাপারে খুব মর্ম্মাহত হইয়াছেন, কেহ কেহ প্রায়োপবেশন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত দরদী নেতা মৌঃ ফজলল হক সাহেবের প্রাধান্যও ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আমরা আশা করি, কেবল বাঙ্গালায় নয়, সর্ব্বত্র অখণ্ড-ভারত-অভিলাষী মুসলমান সভ্য দলে দলে নির্ব্বাচিত হন। গত ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে লীগনেতা মিঃ সাবওয়ার্দ্দি যে হিন্দুমুসলমান একত্র হইতে উৎসাহিত করিয়াছেন, আমরা তাঁহাকে সমর্থন করি এবং আশা করি বাঙ্গালার শাসন পরিষদ যাহাতে হিন্দুমুসলমানের সমবেত চেষ্টায় গঠিত হয়, তিনি যেন সেরূপ চেষ্টা করেন।

এ সম্পর্কে কংগ্রেস-সভ্যগণকেও আমাদের কিছু বলিবার আছে। পার্লামেণ্টারী বোর্ড নিশ্চয়ই সাম্প্রদায়িকভাবশূন্য, কর্ম্মঠ এবং নিঃস্বার্থ ব্যক্তিগণকে মনোনীত করিতে শৈথিল্য করেন নাই। ভরসা করি, তাঁহারা দোষ ও পাপশূন্য হইয়া নিঃস্বার্থভাবে কোয়ালিশন মন্ত্রিত্ব গঠন করিয়া হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে বাঙ্গলার সেবা করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না। তাঁহাদের উপরই সমধিকভাবে ঐক্য নির্ভর করিতেছে।

রাজনৈতিক বন্দী

গত ২৩শে জানুয়ারী তারিখের কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রস্তাবটি বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। বিনা ভোট-গ্রহণে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। গত জরুরি ১৯৪৪এর তিন আইন অনুসারে ভারতের প্রদেশসমূহে ধৃত ব্যক্তির সংখ্যা ৩১১৩ এবং তন্মধ্যে ২৫০৬ জনই ছিল হুর। ভারত-সরকারের নির্দ্দেশ-ক্রমে জয়প্রকাশ নারায়ণ, রামমনোহর সার্দ্দুল সিং, সর্দ্দার লোহিত এবং কৃষ্ণ নায়ার ধৃত হইয়া বন্দীজীবন যাপন করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত ১৯৪২ এবং ১৯৪৩ সালে অনেক ব্যক্তি সন্দেহে ধৃত হন। এখন যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, হুরদের বাদ দিলেও ছয় শতেরও ঊর্দ্ধে ভারতীয় যুবক কঠোর বন্দিজীবন যাপন করিতেছে; তাহাদের একমাত্র অপরাধ দেশভক্তি। যাহা হউক রাজনৈতিক বন্দিগণের মুক্তির প্রস্তাব পরিষদের সর্ব্বদল কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে।

এই বিষয়ে হোম মিনিষ্টার (স্বরাষ্ট্র সচিব) স্যার জন মন বলেন, 'প্রাদেশিক সরকারের দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করিব না, কারণ প্রত্যেক প্রদেশে স্বতন্ত্র গভর্ণমেণ্ট রহিয়াছে।' এই উক্তিটি খুবই হাস্যজনক। কারণ বাঙ্গলার ডেটিনিউই বেশী এবং বাঙ্গলার গভর্ণমেণ্ট কাউন্সিল আইনের ৯৩ ধারানুসারে একতন্ত্র, অর্থাৎ সিভিলিয়ান শাসনই প্রবল। এমতাবস্থায় ইহার 'অটোনোমি' কথার উল্লেখ হাস্যকর ভিন্ন আর কি।

কিন্তু এই রাজনৈতিক বন্দী সম্বন্ধে—আমরা মনে করি গভর্ণমেণ্টের দায়িত্বও কম নয়। তাঁহারা বিবৃতি ও অভিভাষণ ছাড়া এই বন্দিগণের জন্য কি করিতেছেন? বিনা বিচারে বাড়ীঘর ছাড়িয়া, দেশ সমাজ হইতে বিচ্যুত হইয়া, জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিয়া বহুদিন যাবৎ নির্ব্বাসিত থাকিয়া ইহারা বন্দীজীবন যাপন করিতেছে, আর আমরা মনে করি দুইটা কড়া কথা বলিলে, পরিষদে দুই একটা প্রশ্ন করিলে বড় বড় লেকচার দিলেই কাজ হইল। তাঁহারা বলিবেন, পরিষদে প্রস্তাব পাশ হইয়াছে—সরকার কিছু করিবেনা, এখন আমরা কি করিতে পারি? আমরা উত্তর করিব, তবে আর আপনাদের সঙ্গে ভিক্ষানীতি অবলম্বনকারী মডারেট নেতাদের পার্থক্য কি? তাহারাও বক্তৃতা দিত, আপনারাও দিতেছেন, তাহারাও ওকালতি ব্যারিষ্টারি করিত, আপনারাও করিতেছেন, তাহারাও সভা করিত আপনারাও করিতেছেন। বস্তুতঃ দেশের লোকের এবং নেতৃবৃন্দের ঔদাসীন্যেই তাহারা মরিয়া হইয়া উঠিতেছে। তাই দুর্ব্বিসহ কষ্টেই কাকোরি ষড়্‌যন্ত্রের মামলার, বড়বাঁকি ষড়্‌যন্ত্র মামলার কারাভোগী যোগেশ চট্টোপাধ্যায় অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। একটা বহুমূল্য জীবন চলিয়া যাইত। তবে যায় নাই নেতাদের বাক্য লঙ্ঘন করে নাই বলিয়া। তাহার প্রদর্শিত নিয়মানুবর্ত্তিতায় আমরা খুবই আনন্দিত, কিন্তু নেতৃবৃন্দের কি অতঃপর আর কোন কর্ত্তব্য নাই? মহাত্মাজীর সঙ্গে গভর্ণর জেনারেল ও বাঙ্গলার গভর্ণরের কি বাক্যালাপ হইয়াছে, আমরা তাহা অবগত নাহি। কিন্তু যদি এই সব সোনার প্রাণদের শীঘ্র মুক্তিলাভের কোন সম্ভাবনা না থাকে, তবে নেতৃবৃন্দ কি উপায় উদ্ভাবন করিবেন আমরা তাহাই জানিতে চাই।

আমাদের একটি কথা মনে হইতেছে। যখন রৌলট আইন পাশ হয়, তখন মহাত্মাজী সত্যাগ্রহ করিয়া গভর্ণমেণ্টকে উক্ত আইন প্রত্যাহার করিতে বাধ্য করেন। কারণ রৌলট আইনে কতকগুলি ধারা ছিল, তাহাতে কাহাকেও সন্দেহে ধৃত হইলেও

সাজা দেওয়া যাইতে পারিত। প্রমাণ-আইনের ২৫ ধারানুসারে পুলিসের নিকট অপরাধের স্বীকৃতি করিলে তাহা প্রমাণ স্বরূপ গণ্য হয় না। কিন্তু রৌলট আইনে তাহাই প্রমাণ বলিয়া বিহিত হইয়াছিল। যদি এই আইন কার্য্যকরী হইত, তবে বিনাবিচারে আটক রাখিয়াছেন, এই অপরাধ হইতে গভর্ণমেণ্ট মুক্ত হইত, কিন্তু ধৃতব্যক্তি মাত্রই ঐধারা এবং উহার অনুরূপ আরও কয়েকটি ধারার সহায়তায় নিশ্চয়ই শাস্তি পাইত। রৌলট য়্যাক্ট উঠিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু উহার তীব্রতা ঠিকই রহিয়াছে, কারণ অনেকে কেবল পুলিসের সন্দেহে এবং দ্বিতীয়তঃ ধৃতব্যক্তির মধ্যে অনেকে পীড়নে অসহিষ্ণু হইয়া পুলিসের নিকট একবার করিয়া ডেটিনিও হইয়া কারাভোগ করিতেছে। এখন কত সত্যাগ্রহ ও বিভিন্ন আন্দোলন তো হইল, কিন্তু রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি কামনায় কোনরূপ আন্দোলনই হয় নাই। দেশবন্ধু চাহিয়াছিলেন, কাউন্সিল প্রবেশের উদ্দেশ্য এই যে, যদি প্রস্তাবানুযায়ী কাজ করিতে গভর্ণমেণ্ট স্বীকৃত না হয় তবে নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে আমরা অবস্থাটি সম্যক বিবৃত করিয়া আন্দোলন উপস্থিত করিব। কিন্তু তাহা হইতেছে কৈ? অথচ রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ভারতের ছাত্র যুবক ব্যবসায়ী মধ্যবিত্ত এবং ভোটদাতা সকলেই আছেন। আমাদের মতে বিনাবিচারে আটক বন্দীদের মুক্তির জন্য দেশের আবাল বৃদ্ধ বণিতার আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত। এবং অহিংস থাকিয়া কি করা কর্ত্তব্য তাহারও অবিলম্বে ব্যবস্থাবলম্বন করা উচিত।

সম্প্রতি শ্রীমতী অরুণা আসফআলী বলেন, "বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন"—এই ব্রত গ্রহণ করিব। আমাদের মতে দেশের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান যেরূপ নির্দ্দেশ দেন, আবালবৃদ্ধবনিতার তাহাই মানিয়া লওয়া উচিত। শ্রীযুক্ত কামাত বলেন, আপোসহীন সংগ্রাম। এই দুইটিই আমাদের মনঃপূত হয় না। কারণ বিলাতী বস্ত্র বর্জ্জন করিলে ইংরাজদের কোনও অনিষ্ট হইবে না। প্রথমতঃ, ইংরাজরা এখনও বস্ত্রাদি পাঠাইতেছে না। দ্বিতীয়তঃ—অন্য জায়গার নামে ছাপসহ বিলাতী দ্রব্যে বাজার ছাইয়া যাইতে পারে। আমাদের মতে বর্জ্জন প্রস্তাব হইলে ভারতের ছাড়া সমস্ত দেশের জিনিসই বর্জ্জন করা উচিত, তাহাতে ভারতীয় লোকদের উপকার হইবে। নতুবা কেবল এক স্থানের দ্রব্য বর্জ্জনে হইবে না। কিন্তু কোন্ কোন্ দ্রব্য প্রথমে বর্জ্জন করা উচিত, নেতৃবৃন্দের তাহাও সিদ্ধান্ত করা কর্ত্তব্য। তৃতীয়তঃ আপোষহীন সংগ্রামে ভারতের কোন লাভ হইবে না। আর অহিংস সংগ্রামের পক্ষপাতী দেশবাসী ইংরাজের সহিত যাহা করিবে, আপোষেই করিবে। মোটকথা কোন্ প্রথা অবলম্বন করা উচিত, নেতৃবৃন্দ কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত কর্ম্মপন্থাই সকলের গ্রহণ করা উচিত। নতুবা যাহার যাহা ইচ্ছা বলায় শৃঙ্খল অপসারিত হইবে না। আমরা রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি সম্বন্ধে দেশবাসীকে বিশেষভাবে অবহিত হইতে বলিতেছি।

'বন্দেমাতরম' ও মহাত্মাজী

মহাত্মা গান্ধীকে অনেকেই প্রশ্ন করিয়াছিল যে, 'বন্দেমাতরম' ধ্বনির অপসারণ করিয়া 'জয়হিন্দ' জাতীয় ধ্বনিরূপে ব্যবহার করা উচিত কি না? উত্তরে তিনি বলিয়াছেন, "বন্দেমাতরম্ ধ্বনি কিছুতেই বিদায় দেওয়া যায় না। ইহার লোপের অর্থই এই হইবে যে, মাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য আশ্রয় গ্রহণ করা।" সম্প্রতি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত আচার্য্য কৃপালনীও 'বন্দেমাতরমের' শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। আমরা এ বিষয়ে আলোচনা সমীচীন বোধ করিতেছি।

"বন্দেমাতরম্"—এই শব্দে জন্মভূমির প্রতি ভক্তি, অনুরাগ এবং ভবিষ্যতের একটা আশা-আকাঙ্ক্ষাই উদ্দীপিত হয়। 'বন্দেমাতরম্' কেবল ধ্বনি নয়, ইহা মন্ত্র। এবং ভক্তিভাবে এই মন্ত্র উচ্চারণ ও ধ্যান করিলেই জন্মভূমির প্রকৃত সাধক হওয়া যায়। সাধক বুঝিতে পারে যে, তাহার জন্মভূমি এখন প্রধূমিতা, শৃঙ্খলিতা ধূলি-বিলুণ্ঠিতা, শৃঙ্খল-নিষ্পেষণে দীনা, শীর্ণা, মৃতকল্পা—আর মায়ের সন্তানগণ অনাহারক্লিষ্ট, লাঞ্ছিত ও আত্মবিস্মৃত। এই 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে মাকে শৃঙ্খলমুক্ত করিবার দায়িত্ব সে গ্রহণ করে, আর অচিরেই দেখিতে পায়, মা শীঘ্রই হইবেন—"রত্ন মণ্ডিত দশভুজা দশদিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি বিরাজিত, পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরেন্দ্র কেশরী শত্রু নিপীড়নে নিযুক্ত।" এই মন্ত্র আশা উদ্দীপিত করে, মন্ত্রে শক্তির বিকাশ হয়, আর মন্ত্রগুণে জন্মভূমির শৃঙ্খল-মুক্তি সূচিত হয়। "বন্দেমাতরমে" দীক্ষিত হইয়াই বাঙ্গলার দধীচি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সর্ব্বস্বত্যাগ করিয়া মাতৃভূমির সেবায় আত্মবলিদান করিয়াছিলেন।

গত চল্লিশ বৎসর যাবৎ যে মন্ত্র বাঙ্গালী জাতিকে এত উন্নত ও শক্তিশালী করিয়াছে, এই আত্মবিস্মৃত জাতি সেই মন্ত্র বিসর্জ্জন দিতে চায়, ইহা কল্পনা করাও যে মহাপাপ। 'বন্দেমাতরম' গাহিতে গাহিতেই বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশীর দিনে বাঙ্গালী ছাত্র ও যুবক মৃত্যু-ভয় উপেক্ষা করিয়াছিল। এমন দিন ছিল যখন কেহ বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করিলেই পুলিস তাহাকে ধরিয়া লাঞ্ছিত করিত, ধ্বনি শুনিয়া পুলিস বিনা বাধায় অন্তঃপুর হইতে ধরিয়া নিয়া আসিত; 'বন্দেমাতরম' বিনাশ কল্পে কত লাঠি চলিল, কত আইন জারী হইল, কত নিষেধাজ্ঞা ঘোষিত হইল! কিন্তু কোন রাজশক্তিই এই মন্ত্রের শক্তিরোধ করিতে পারে নাই। ১৯০৫ সাল হইতেই বাঙ্গালীর 'এই সত্যাগ্রহ' সমস্ত ভারতবর্ষকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি করিয়া ছাত্রগণ বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলনীতে (১৯০৬) প্রহৃত হয়। ছাত্রশোণিতে রাজপথ অভিসিক্তিত হইয়া যায়, সরোবর রুধিরে রঞ্জিত হয়। সম্মেলনী ভাঙ্গিয়া যায়, বৃদ্ধ নেতাও অনাচার দমনকল্পে বদ্ধপরিকর হন, সর্ব্বত্র বাঙ্গলার জয় ঘোষিত হয়। "বন্দেমাতরমে" উদ্বুদ্ধ চিত্তরঞ্জন পরিচালিত ২৫ হাজার বাঙ্গালী ১৯২১ খৃষ্টাব্দে হাসিতে হাসিতে জেলে গিয়া কারাগারও স্বরাজাশ্রমে পরিণত করিয়াছিল। 'বন্দেমাতরম' গাহিতে গাহিতে ১৯৩০ হইতে আজ পর্য্যন্ত কত যুবক নৃশংস ভাবে প্রহৃত হইয়াছে, কত সোণার প্রাণ কারারুদ্ধ হইয়াছে! আজ সেই

সিদ্ধমন্ত্র ছাড়িয়া নূতন আর একটা চমকপ্রদ ধ্বনির আশ্রয় গ্রহণ করিব! অনুকরণকারী ব্যক্তি করে করুক, জন্মভূমি উদ্ধারে দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণাসহনপটু বাঙ্গালী তাহা করিবে না, মাতৃহত্যা অপরাধে ললাটে কলঙ্ক বহন করিতে সে পারিবে না।

কিন্তু 'জয়হিন্দ' তবে কি ধ্বনিতই হইবে না? ভারতের জয়—ইহাতো সুখেরই ও আনন্দেরই কথা। গর্ব্বভরে যদি সে চায়, নিশ্চয়ই 'জয়হিন্দ'ও গাহিবে—কিন্তু মাতৃহত্যা করিয়া নহে, মাকে বন্দনা করিয়া। একদিন এই নাম জপ করিয়াই বাঙ্গলা ভারতের পথপ্রদর্শক হইয়াছিল, এখনও এই মন্ত্র জপ করিয়াই সমগ্র ভারতে সে নিজ প্রাধান্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে।

পার্লামেণ্টারী দৌত্য (Delegation)

যদিচ বাঙ্গলায় ২১ জন সভ্যের অব্যবস্থিতচিত্ততায় আমরা ক্ষুব্ধ হইয়াছি, তথাপি প্রফেসার রবার্ট রিচার্ডস্ প্রমুখ সভ্যবৃন্দকে আমরা অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। মিঃ সোরেনসেন মহাত্মাজীর দেবচরিত্রে মুগ্ধ হইয়াছেন। তিনি পণ্ডিত জওহরলালের যুক্তিগুলি অকাট্য মনে করেন এবং ধর্ম্মের দোহাইতে ভারতের দ্বিখণ্ডিত প্রস্তাব বিপজ্জনক মনে করেন। ইঁহারা ইংলণ্ডে গিয়া কিরূপ-ভাবে ভারতবর্ষের শৃঙ্খলমুক্তি সম্বন্ধে সহযোগীদের কাছে নিবেদন করেন, তাহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়। এদিকে বোধ হয় তাহাদের প্রধানমন্ত্রী এটলির সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে।

ক্যাপ্টেন রসিদের বিচার

আমরা শুনিয়া বিশেষ দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হইলাম যে, আজাদ-হিন্দ ফৌজের অন্যতম সৈনিক ক্যাপ্টেন রসিদের ৭ বৎসর কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। সামরিক আদালত যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু জঙ্গীলাট লর্ড অকিনলেক তাহা হ্রাস করিয়া দিয়াছেন ৭ বৎসরে। আমরা আশা করিয়াছিলাম যে, প্রথম দফার আসামী ক্যাপ্টেন শা নওয়াজ, ধীলন ও সায়গলের দ্বীপান্তরের শাস্তি হইলেও জঙ্গীলাট যেমন দণ্ড একেবারে মৌকুফ্ করিয়াছেন, এ-ক্ষেত্রেও তাহাই হইবে। কিন্তু সেরূপ না হওয়ায় আমরা বিশেষ মর্ম্মাহত হইলাম। অবশ্য প্রথম দফার আসামী-দের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন ভারতের প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী সম্প্রদায় এবং আমরা এ-কথাও বলিতে পারি, আন্তর্জ্জাতিক আইনের বিশ্লেষণ ও ভিত্তি করিয়া মিঃ ভুলাভাই দেশাই যে-ভাবে মোকদ্দমা পরিচালনা করিয়াছিলেন, তাহা মনীষা, প্রতিভা ও কৃতিত্বের দিক্ হইতে অপূর্ব্ব ও অভাবনীয়। এ-ক্ষেত্রে সেরূপ হইয়াছে কি না ঠিক বলা যায় না। আর প্রত্যেক মোকদ্দমা বিচার স্ব স্ব নথির বিষয়ের উপরই নির্ভর করে। তথাপি জঙ্গীলাট বাহাদুর জানেন, একই ব্যাপারে শা নওয়াজ প্রভৃতির মতই ক্যাপ্টেন রসিদও উক্ত ফৌজে জড়িত ছিলেন। আর তিনি জানিতেন, ভারতের স্বাধীনতাই সকলের কাম্য ছিল এবং জাপান যখন সাহায্য করিল না, ইংরাজ তাহাদিগকে জাপানের আনুগত্য করিতে নির্দ্দেশ দিয়া চলিয়া গেল, তখন সেই অবস্থায় তাহারা আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈন্তশ্রেণীভুক্ত উচ্চবৃত্তির বলেই হইয়াছিল। এই অবস্থায় সকলকে এক শ্রেণীর পর্য্যায়ে রাখিলেই জঙ্গীলাট সুবুদ্ধির পরিচয় দিতেন। এইরূপ অসম ব্যবহারে ভারতবাসী মাত্রেই ক্ষুব্ধ হইবেন, এবং তাহাতে যে অসন্তুষ্টি জন্মিতে পারে, তাহা খুবই সম্ভব। লর্ড অকিনলেককে স্থির মস্তিষ্ক, বুদ্ধিমান ও ন্যায়পরায়ণ বলিয়াই আমরা জানিতাম। ভরসা করি, তিনি অচিরে ক্যাপ্টেন রসিদের কারামুক্তির আদেশ দিয়া মহত্ত্বের পরিচয় দিবেন এবং এই সম্পর্কে ভারতবাসীর মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ বা অসন্তোষ যাহাতে না থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিবেন। বীরের সম্মান বীরই করিয়া থাকে। পুরুকে স্বাধীনতা দিয়া যেমন আলেকজাণ্ডার তৎক্ষণাৎ তাহার হৃতরাজ্য প্রত্যর্পণ করেন, এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ করিতে আমরা জঙ্গীলাটকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।

রক্তস্নাত বোম্বাই

১৯৪৬ সালের ২৩শে জানুয়ারী ভারতের বর্ত্তমান ইতিহাসে একটী স্মরণীয় দিন হইয়া থাকিবে। কেবল নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মতিথি উপলক্ষ করিয়া নহে, এই দিনে ভারতবাসীকে পুলিশী জুলুমের এক মর্ম্মন্তুদ নিদর্শনের সাক্ষী হইতে হইয়াছে। কিন্তু এই ২৩শে জানুয়ারী বোম্বাই সহরে পুলিশ বিনা উত্তেজনায়, সুস্থ মস্তিষ্কে যে চণ্ডনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা ২১শে নবেম্বরের কলিকাতার ঘটনার অনুরূপ। এখানেও একটা বিরাট নৃশংস হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছে কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দয় হঠকারিতার জন্য। সময় থাকিতে যথোচিত বিবেচনার সহিত চেষ্টা করিলে ব্যাপারটি অতি সহজেই মিটিয়া যাইতে পারিত। এতগুলি মূল্যবান জীবনও বলি দিতে হইত না। কিন্তু বোম্বাইয়ের পুলিশ-কর্ত্তৃপক্ষ সেই সহজ পথে পা বাড়ান নাই।

ঘটনাটি সংঘটিত হয় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিবস উপলক্ষে একটি শোভাযাত্রা লইয়া। কলিকাতা সহরের মত বোম্বাই সহরের অধিবাসীরাও তাহাদের প্রিয় নেতার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন মানসে একটি দীর্ঘ শোভাযাত্রার বন্দোবস্ত করিয়াছিল। পুলিশের অনুপস্থিতে জনসাধারণ কিরূপ শৃঙ্খলার সহিত তাহাদের কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে পারে, তাহার প্রমাণ আমরা পাইয়াছি কলিকাতায় গত নভেম্বর মাসে ছাত্রদের শোভাযাত্রায়। কতিপয় সঙ্গীর অপমৃত্যুর পরও ছাত্ররা ডালহৌসি স্কোয়ারে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ভাবেই তাহাদের শোভাযাত্রা নিয়া গিয়াছিল। যান-বাহন নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিশ না থাকাতেও সেই শোভাযাত্রায় কোনরূপ বিশৃঙ্খলার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। কর্ত্তৃপক্ষকে ছাত্ররা বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, পুলিশ অন্যায় ভাবে হস্তক্ষেপ না করিলে জনসাধারণের স্বাভাবিক আচরণটাই হয় এইরূপ শান্তিপূর্ণ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ। সৌভাগ্যবশতঃ নেতাজীর জন্মদিবস উপলক্ষে কলিকাতার পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের এই শিক্ষা কাজে লাগাইয়াছিলেন। এবং ফলে কি ঘটিয়াছে, তাহাও আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বিনা বাধায় অতি সুষ্ঠু গতিতে দশ হাজার মানুষের একটি বিরাট শোভাযাত্রা কলিকাতা সহরের সবচেয়ে যানসঙ্কুল আট মাইল পথ অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। এতটুকু দুর্ঘটনা বা শৃঙ্খলার সামান্যতম ব্যতিক্রমের চিহ্নও সেখানে কেহ দেখে নাই। কলিকাতার ঘটনা হইতে স্থানীয় পুলিশ বিভাগ যে শিক্ষা লাভ

করিয়াছে, বোম্বাইয়ের পুলিশও সেই শিক্ষা অনায়াসে লাভ করিতে পারিতেন, কিন্তু করেন নাই। তাহারা মিথ্যা এক অজুহাতে বোম্বাইবাসীদের ন্যায্য দাবী উপেক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহাদের অজুহাত ছিল যে, শোভাযাত্রা যদি মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলের মধ্য দিয়া যাইতে দেওয়া হয় তবে মুসলমান জনসাধারণ হিন্দু জননেতার জন্মদিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত শোভাযাত্রা দর্শনে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবে। অথচ বিশেষ কৌতুকের সহিত লক্ষ্য করিবার বিষয়, স্থানীয় মুসলমান সম্প্রদায় স্বয়ং এ সম্বন্ধে কোন কথাই উচ্চারণ করেন নাই। কিন্তু তাহাতে কি? মায়ের চেয়ে মাসীর দরদের ওজনটা কি কম? বহুগুণ বেশী। মুসলমানগণ নিজেরা না বলুন, বোম্বাইয়ের পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ যখন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মুসলমানেরা শোভাযাত্রা দর্শনে ক্ষিপ্ত হইবেন, তখন মুসলমানেরা না হোন, পুলিস কর্ত্তৃপক্ষের ক্ষিপ্ত হইতে বাধা কী? অতএব তাঁহাদের পরিকল্পনামত মুসলমানেরা ক্ষিপ্ত না হওয়াতে তাহারাই মেজাজ হারাইয়া ফেলিলেন এবং ক্ষিপ্ত মেজাজে নিরস্ত্র শান্ত জনতার উপরে তাহারা নৃশংসভাবে লাঠি ও টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করিলেন; পরিশেষে তিনদিন ধরিয়া তাহাদের উপর উন্মত্ত চিত্তে অবিরল গুলিবর্ষণ করিতেও কসুর করিলেন না।

আমরা এই ব্যাপারে আর অধিক বেশী মন্তব্য করিয়া পূর্ব্বকথারই পুনরুক্তি করিতে চাই না। আমরা কেবল দেশবাসীকে শান্ত সমাহিত এবং অহিংসাপূত থাকিতেই অনুরোধ করি। হিংসাবৃত্তি উদ্দীপিত করিতে লোকের অভাব নাই, এ কথা আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর সদামুক্ত বীর ধীলন বোম্বাইতে আমাদিগকে বলিয়াছেন। আমরা তাঁহার মূল্যবান কথাগুলি সকলকে হৃদয়ঙ্গম করিতে অনুরোধ করি।

রক্তস্নাত কলিকাতা

কলিকাতায়ও বোম্বাইএর ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইয়াছে। গত ১১ই ফেব্রুয়ারী কয়েকটি হিন্দু-মুসলমান যুবক ডালহৌসী স্কোয়ার দিয়া ভিন্ন ভিন্ন পতাকাসহ একটি শোভাযাত্রা করিয়া যাইতেছিল। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল ক্যাপ্টেন রসিদের কারাদণ্ডের আদেশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন। জেনারেল পোষ্টাফিসের সম্মুখে তাহাদিগকে ধরা হয় এবং তাহারা নিরাপত্তিতে পুলিশের সহগমন করে। অতঃপর উক্ত শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ করিয়া দেওয়া হয়। সহস্রাধিক হিন্দু-মুসলমান ছাত্র একত্র পুনরায় শোভাযাত্রা করে। এবার পুলিশ লাঠিচালনা করে ও গুলী চালায়। ফলে একটী যুবক মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং ১৮।১৯ জন আহত হয়। অতঃপরে মধ্য-কলিকাতায় ট্রাম, বাস, দোকান প্রভৃতি বন্ধ হইয়া যায়।

১২ই ফেব্রুয়ারী সমস্ত সহরে হরতাল অনুষ্ঠিত হয়, ট্রাম, বাস বন্ধ হইয়া যায়, এবং বেলা ১টার সময়ে মিঃ সারওয়ার্দ্দির সভাপতিত্বে একটি বিরাট সভা হয়। অতঃপরে মিঃ সারওয়ার্দ্দি ও খাদি প্রতিষ্ঠানের পরিচালক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের অধিনায়কত্বে চারি পাঁচ লক্ষ লোকসহ একটি বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হইয়া বিনা বাধায় ডালহৌসী স্কোয়ার ঘুরিয়া আসে। এতৎসত্ত্বেও পূর্ব্ব দিনের ঘটনার জন্য সহরে এত বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয় যে, একদিকে বহু মিলিটারী লরী জ্বালাইয়া দেওয়া হয়, সকলের টুপী, নেকটাই খুলিয়া লওয়া হয়, কারকর্ম্ম অফিস বন্ধ হয়, অন্যদিকে আবার এত গুলীচালনা বৃদ্ধি পায় যে (অনূ্যন ২৫টি স্থানে, তাহাতে এ-পর্যান্ত যাহা খবর পাওয়া গিয়াছে), তাহাতে ১৮ জন নিহত হয় আর দুই শতেরও অধিক ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হয়। এদিকে ৬০টি স্থানে অগ্নিকাণ্ড হয় এবং কালীঘাট ট্রাম ডিপোটি ভস্মীভূত হয়। ১৩ই তারিখ হইতে কলিকাতার গোলযোগ বন্ধ করিতে গভর্ণর বাহাদুর সৈন্যবাহিনীর সাহায্য লইয়াছেন এবং সমস্ত কলিকাতা নগরীতে ১৪৪ ধারা জারী করিয়াছেন।

আমরা কেবল দেখিতেছি, কর্ত্তৃপক্ষের অবিমৃষ্যকারিতার ফলেই তিল তাল হইয়া যাইতেছে! সামান্য স্ফুলিঙ্গে বৃহদাকার অগ্নিকাণ্ড হইবার উপক্রম হইয়াছে! যখন ১২ই ফেব্রুয়ারী লক্ষ লোকসহ মিঃ সারওয়ার্দ্দিকে লইয়া শোভাযাত্রা বিনা বাধায় যাইতে দেওয়া হইল, পূর্ব্বদিন কতিপয় যুবককে ধরিয়া মারপিট না করিলে কোন গোলই হইত না। গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিগণের নির্ব্বুদ্ধিতায় কত যে অনর্থ হইয়াছে এবং হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরা নব নিয়োজিত গভর্ণর মিঃ বারোজকে লর্ড ক্যানিংয়ের অবস্থা স্মরণ করিতে অনুরোধ করি। তিনি বড় দুর্দ্দিনে কলিকাতা আসিয়া পৌঁছিবেন। সিপাহী বিদ্রোহের অবসানেই লর্ড ক্যানিংকে আর একটি নিরুপদ্রব হিন্দু-মুসলমান কৃষককুলের অহিংস আন্দোলনের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। তিনি সর্ব্বদা নীলকর সাহেবগণকে সতর্ক করিয়া দেন "যেন ভুলক্রমেও কোন শ্বেতাঙ্গ বণিক অত্যাচার প্রপীড়িত দেশীয় কৃষকের প্রতি কখনও গুলীবর্ষণ না করে। করিলে, আমাকে সিপাহী বিদ্রোহ হইতেও দশগুণ অধিক সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে।" যে ধৈর্য্য ও করুণায় লর্ড ক্যানিং-ক্লিমেন্সি ক্যানিং, আজ স্যার বারোজ, লর্ড ওয়াভেল এবং লর্ড অচিনলেককেও সেই নীতি অবলম্বন করিতে আমরা শতবার অনুরোধ করি এবং অবিলম্বে তাঁহারা যেন এইরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি না করেন এবং ক্যাপ্টেন রসিদ সহ সমস্ত আজাদ হিন্দ বাহিনীকে মুক্ত করিয়া দেন।

এদিকে কলিকাতাবাসিগণকে সবিনয়ে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন সর্ব্বদা অহিংস ও শান্তিপূর্ণ থাকিয়া ভবিষ্যতের জন্য কেবল ভগবানে বিশ্বাস রাখেন ও শক্তিসঞ্চয় করেন। ঘর জ্বালান, লরী পোড়ান, কাহারও প্রতি আক্রমণ—কংগ্রেসের নীতির ঘোরতর বিরোধী। আমরা সকল দেশবাসীকে অহিংস নীতি অবলম্বন করিতে অনুরোধ করি। বাঙ্গালী যেন দেশবন্ধুর বাণী কখনও বিস্মৃত না হয়:—Non-violence may, but violence will never bring about Swaraj (অহিংসায় হইতে পারে কিন্তু এ-কথা নিশ্চিত যে হিংসায় কখনও স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইতে পারে না)।

আমরা শুনিয়া খুবই শঙ্কান্বিত হইলাম যে, ১৩ই ফেব্রুয়ারী বুধবারও সমভাবে লাঠি ও গুলী চালনা হইয়াছে। টেলিগ্রাফের সংস্রব ছিন্ন হইয়াছে, পোষ্ট অফিস বন্ধ এবং সকাল ৬টা হইতে অপরাহ্ণ ১টা পর্য্যন্ত ৩৬ জন লোক হাসপাতালে ভর্ত্তি হইয়াছে। হাসপাতালে কয়েকটি লোকের মৃত্যুও হইয়াছে এবং এইখানেই ঘটনার শেষ নয়।

স্বাগত

শা নওয়াজ বাঙ্গলায় পদার্পণ করিয়া বঙ্গবাসীকে কৃতজ্ঞতাসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছেন। শৃঙ্খলা এবং কংগ্রেসের নীতি সম্বন্ধে তিনি যে যুক্তিপূর্ণ উপদেশ দিয়াছেন, আমরা তাহার সহিত একমত, আমরা তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

শ্রীযুক্তা অরুণা আসফ আলীর প্রতি ওয়ারেন্ট প্রত্যাহৃত হওয়ায় তিনি যে বাঙ্গলার লোকের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেজন্ত আমরা আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। দেশবন্ধু পার্কে সহীদদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া এবং প্রাণস্পর্শী অভিভাষণ দিয়াও তিনি আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

প্রফেসার রঙ্গ ও শ্রীযুক্ত কামাতকেও আমাদের অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি।

বাঙ্গলার নবনিযুক্ত গভর্ণর স্যার বারোজ বাহাদুরকে আমরা অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। তিনি নিজে কোন বিষয়েই কোন কথা বলেন নাই। আমরাও এবার কিছু বলিব না। আগামী মাসে বাঙ্গলার সমস্যাগুলি তাঁহার নিকট উপস্থিত করিব। তবে সহরের শান্তিরক্ষা এবং আগামী খাদ্য সমস্যা বিষয়ে তাঁহাকে বিশেষভাবে চিন্তা করিতে বলি। এবার শোভা-যাত্রা সম্পর্কীয় গোলমালে যেমন হিন্দু-মুসলমান একত্র হইয়াছে, খাদ্য সমস্যারও হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থ এক। সুতরাং এবার গত-বারের মত জড়ের মত হিন্দু-মুসলমান অনাহারে মরিতে চাহিবে না। এবার তাঁহার একান্ত কর্ত্তব্য হইবে, অচিরে দায়িত্বসম্পন্ন জাতীয়তাবাদী নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র হিন্দু-মুসলমান সভ্য লইয়া একটী কোয়ালিসন মন্ত্রিত্ব গঠন করা। দলভেদে মন্ত্রিত্ব গঠন করিলে বাঙ্গলার সমস্যা কিছুতেই পূর্ণ হইবে না।

মহাত্মাজীর মাদ্রাজ ভ্রমণ

মহাত্মাজী মাদ্রাজের পরিভ্রমণে সত্য, অহিংসা, হিন্দুস্থানী শিক্ষা-প্রচার ব্যতীত আরও একটি বিষয়ে বিশেষভাবে জোর দিয়াছেন। সেটি শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা। মাদ্রাজের বহু স্থানে প্রার্থনাকালে এক এক সময়ে পঞ্চাশ হাজার লোকও সমবেত হয়। মহাত্মাজীর প্রার্থনার সময়ে যে শৃঙ্খলা তিনি দেখিতেছেন, ব্যক্তিগত জীবনে বা সভাতে বা জনমণ্ডলীতে তাহা একান্ত দরকার। বিদ্যালয় প্রভৃতিতেও এরূপ শৃঙ্খলাপূর্ণ প্রার্থনার রীতি প্রবর্ত্তিত হইলে দেশবাসীর একটা প্রধান শিক্ষা হইবে। জাতীয় জীবনে শৃঙ্খলা একান্ত আবশ্যকীয়। আজাদ হিন্দ ফৌজের শোভাযাত্রার সময় (গত ২৩শে জানুয়ারী) কলিকাতায় যেরূপ শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তাহাতে খুবই আনন্দ হইয়াছিল। শৃঙ্খলার প্রভাবে পণ্ডিত জওহরলালের বক্তৃতার সময় দেশবন্ধু পার্কে অপূর্ব্ব নীরবতা ও শান্তি রক্ষিত হয়। শৃঙ্খলার অভাবে কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে ঐ পার্কেই তিনটি লোক মারা যায়।

মহাত্মাজী যে অনুন্নত জাতি, শ্রমিক ও কৃষককুলের উন্নতি বিষয়ে খুবই অবহিত, সেইজন্যও তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতার্হ। তিনি শ্রমিক ও কৃষকদিগকে বলিয়াছেন, "জমি এবং মিল তোমাদের। ধনিক উহার স্বত্বাধিকারী নয়। ধনিক, তোমাদের হইয়া পরিচালনা করিবেন এবং তজ্জন্য তাহার মূল্য তিনি পাইবেন। কিন্তু তোমাদের পরিশ্রম ও যত্নে যে জিনিষ গড়িয়াছে, তাহাতে তোমাদের আর্থিক, নৈতিক ও সামাজিক উন্নতির দিকে লক্ষ্য করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে জমিদার ও ধনিক ন্যায়তঃ, ধর্ম্মতঃ বাধ্য। জমি এবং মিলের অধিকার তোমাদের আছে, তাই বলিয়া একদিকে যেমন তোমরা নিজের আয়ত্তে উহা আনিতে পার না, আবার অন্যদিকে তেমনি জমিদারও উহার ট্রাষ্টি মাত্র। যথেচ্ছাচার করিবার তাহার অধিকার নাই।"

শ্রমিক ও কৃষিকুলের উন্নতির জন্য মহাত্মাজী যে প্রকৃতই কামনা করিতেছেন, তাহাতে আমরা তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। আমরা আশা করি কংগ্রেস যদি এতদিনের এই নিস্ক্রিয় প্রচেষ্টার প্রায়শ্চিত্ত করে, তবে একদিকে যেমন দায়িত্বহীন প্রতিষ্ঠানগুলির সভ্যগণ অযথা ও অকারণে শ্রমিকবৃন্দকে ধনিকের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে পারিবে না, তেমনি শ্রমিক ও কৃষক-গণেরও প্রকৃত পক্ষেই অবস্থার উন্নতি হইতে পারিবে, এবং তাহারা অখণ্ড ভারতের নিঃস্বার্থ মুক্তি-সৈনিকরূপেই পরিণত হইবে।

উচ্চমূল্যের নোটপ্রসঙ্গ

সম্প্রতি গভর্ণমেণ্ট ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে যে কয়টি জরুরী আইন জারি করিয়াছেন, তাহাতে উচ্চমূল্য নোট (High Denomination Notes) ৫০০৲, হাজার ও দশ হাজার টাকার নোটের হিসাব নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে জমা দিয়া উহার মূল্য গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে নিতে আদেশ করিয়াছিলেন এবং সমগ্র ব্যাঙ্কদের উচ্চ নোটের তালিকা দাখিল করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। যাহারা চোরাই বাজারে লাভ করিয়া নোট জমাইয়া রাখিয়াছে, তাহারা অনেকে জমা দিয়া টাকা আনে নাই। কারণ ইতিপূর্ব্বে ইন্‌কমট্যাক্স ফাঁকি দিয়াছে। ফলে গভর্ণমেণ্টের দেনা "I promise to pay on demand" অনেক কমিয়া গিয়াছে। আর একটি আইনে যাবতীয় ব্যাঙ্কগুলিকে পরিদর্শন করিবার ভার রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে দেওয়া হয়। ইহাতে যদি কোন ব্যাঙ্ক, যে নোট জমা আছে, তাহার অতিরিক্ত তালিকা দিয়া থাকে, তবে সেগুলি সম্বন্ধে প্রতারণামূলক বিবৃতি ধরা পড়িবে। এখানেও নোটগুলির চোরাই বাজার বন্ধ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট এরূপ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

আপাততঃ চোরাইবাজার বন্ধ হওয়ার লোভনীয় কথাটিতে এই জরুরী আইনের জন্য গভর্ণমেণ্টকে অনেকে প্রশংসাবাদ করিবেন, কিন্তু আমাদের কয়েকটি বিষয়ে খট্‌কা লাগিতেছে। বহুপূর্ব্বে উচ্চমূল্যের নোটের চলাচলে কড়াকড়ি বন্দোবস্ত থাকিলে জিনিষপত্রের মূল্য এত হু হু করিয়া বৃদ্ধি পাইত না। গভর্ণমেণ্ট কেন তাহা করেন নাই, তাহা জানিবার সকলের আগ্রহ হইবে। দ্বিতীয়তঃ কাগজের নোটের মূল্যস্বরূপ গভর্ণমেণ্ট একটা ধাতবীয় মুদ্রা (সোণারূপা) জমা এইবার যুদ্ধের ডামাডোলে নোটের সংখ্যা এত

বাড়িয়াছে, সেরূপ মূল্যের মুদ্রা (ধাতু) জমা রাখে নাই। কারণ এত মুদ্রা গভর্ণমেণ্টের হাতে নাই। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিবরণী হইতে আমরা সেইরূপই পাইয়াছি। এইবার যে কাগজের বহু নোট এইরূপে অকেজো হইয়া গেল, তাহাতে গভর্ণমেণ্টের ঋণের বোঝা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইল। ইহাও একটি কৌশল কিনা বিশেষজ্ঞরা সত্যানুসন্ধান করিবেন।

শরৎস্মৃতি-বার্ষিকী

গত ১৩ই মাঘ রবিবার শরৎস্মৃতি সমিতির উদ্যোগে হুগলী জেলার দেবানন্দপুরে সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের অষ্টম স্মৃতি-বার্ষিকী সভা ও শরৎস্মৃতি-মন্দিরের ভিত্তি-স্থাপন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন সুকবি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথিরূপে যোগদান করেন কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত প্রবোধ-কুমার সান্যাল, শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় ঘোষ (ভাস্কর), শ্রীযুক্ত সুধীর-কুমার মিত্র প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও কবি সভায় উপস্থিত থাকিয়া দরদী শরৎচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

সেদিন সমগ্র বাঙ্গালী-জীবনে এমন এক প্রাণস্পর্শী আবেদন লইয়া সহসা একদিন আবির্ভূত হইলেন শরৎচন্দ্র যে, স্তম্ভিত বিস্ময়ে বাঙ্গালী জাতি সেদিনে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। তখন দেশের আভ্যন্তরীণ জীবনে যে সমস্যা ও ভাঙ্গন সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিল, শরৎচন্দ্র তাঁহার প্রাঞ্জল কথা-সাহিত্যের মধ্য দিয়া সহজভাবে তাহাই ব্যক্ত করিলেন। বাঙ্গালী-জীবনের জীবন্ত মূর্ত্তি লইয়া দেখা দিল শরৎ-সাহিত্যের চরিত্রগুলি। এতদ্ব্যতীত প্রবন্ধ-সাহিত্যও শরৎচন্দ্রের হাতে এক নূতন রূপ লইয়া শিল্পসমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। শুধু যে সাহিত্যিক জীবনই তিনি যাপন করিয়াছিলেন তাহা নয়, প্রত্যক্ষভাবে জাতীয় কংগ্রেসের সহিতও তিনি সাময়িক-ভাবে জড়িত ছিলেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, শরৎচন্দ্রের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনীও আজ পর্য্যন্ত কেহ প্রকাশ করিতে অগ্রসর হন নাই।

দেশ আজ বহুদূরে অগ্রসরমান। বাংলা কথা-সাহিত্যে আজ আন্তর্জ্জাতিক আবহাওয়া আসিয়াছে। আমাদের সাহিত্য ক্রমশঃ আজ মোড় ঘুরিতেছে নূতন এক সমস্যামুখর পৃথিবীর দিকে। এতদ্‌সত্ত্বেও বাংলাসাহিত্য ও ভাষার উপর এখনও শরৎচন্দ্রের প্রভাব পূর্ণভাবে বিরাজিত। বাঙ্গালীচিত্তে শরৎচন্দ্রের এই রেখা সহজে মুছিয়া যাইবার নয়। আমরা তাঁহার লোকোত্তর প্রতিভার প্রতি আমাদের মনের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

শ্রীযুক্ত হুমায়ুন কবীর ও মেজর জেনারেল শা নওয়াজ

শ্রীযুক্ত হুমায়ুন কবীর-যে গুণ্ডাদের দ্বারা গুরুতরভাবে আহত হইয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত শা নওয়াজ যে প্রার্থনার স্থান হইতে চলিয়া আসিবার সময় আক্রান্ত হইয়াছেন, ইহাতে আমরা অত্যন্ত ক্ষুন্ন হইয়াছি। আমরা তাঁহাদিগকে আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। আমরা সকল লেখকদিগকে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন, অহিংস ও সাম্প্রদায়িকতাশূন্য হইতে অনুরোধ করি।

জাগ্রত এশিয়া

গত জানুয়ারী মাসের মধ্যভাগে ব্রহ্মদেশীয় ফ্যাসি-বিরোধী লীগের আহ্বানে অনুষ্ঠিত নিখিল-ব্রহ্ম কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের সভাপতি জেনারেল আউঙ্ সান্ যাহা ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক স্বাধীনতাকামী এশিয়াবাসীর অন্তরের কথা। তিনি বলিয়াছেন—"সাম্রাজ্যবাদী প্রতীচ্য জানিয়া রাখুক যে এশিয়ায় শ্বেত সাম্রাজ্যবাদের দিন ফুরাইয়াছে। পুনঃপ্রতিষ্ঠিত এশিয়া আজ নবযৌবনের আস্বাদ পাইয়াছে। আজ তাহার উচ্চকণ্ঠের দাবী উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে ধ্বনিত হইতেছে। এই উচ্চকিত ধ্বনি শোনা যাইতেছে ইন্দোনেশিয়ায়, ইন্দোচীনে, ব্রহ্মদেশে, ভারতবর্ষে এবং চীনে। সকল স্থান হইতেই কানে আসিতেছে এশিয়ার জাগ্রত গণশক্তির অগ্রগামী পদধ্বনি। সমগ্র এশিয়া আজ পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একক শক্তিরূপে পরিণত হইতেছে।"

নবজাগ্রত এশিয়ার আত্মার বাণী এত সহজ ভাষায় খুব কম লোকই উচ্চারণ করিয়াছেন। দীর্ঘ তিন শতাব্দী ধরিয়া এশিয়ার অগণন গণশক্তি প্রতীচ্যের সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা নিপীড়িত। জীবন-ধারণের সাধারণ মৌলিক অধিকারগুলি হইতে পর্য্যন্ত তাহারা বঞ্চিত রহিয়াছে। ভারতবর্ষের এবং কিয়দাংশে ব্রহ্মের এই নিপীড়ন ও বঞ্চনার কাহিনী আমাদের স্বকীয় অভিজ্ঞতা; প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রায় আমরা এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি। গৃহযুদ্ধের সুযোগে শ্বেত-প্রাধান্য চীনের জাতীয়-সম্পদ কিভাবে অপহরণ করিয়াছে, এবং সেই অপহরণ-কার্য্যে চীনেরই কুওমিনটাঙ্-দল স্বপ্রাধান্যের লালসায় কিভাবে সহায়তা করিয়াছে—সেই তথ্যও কিছু কিছু জানিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছে। কিন্তু যে মালয়-জাতি এশিয়ার বিস্তীর্ণ দক্ষিণ-পূর্ব্ব অংশে চীন ও ভারতেরই মত এক-স্বপ্রতিষ্ঠাকামী জাতি,—যাহারা ফরাসী, ডাচ্ এবং ইংরাজের অধীনে আজ তিনশত বৎসর ধরিয়া সভ্য-জীবনের অতিসাধারণ ও অপরিহার্য্য উপাদানগুলি হইতে বঞ্চিত—সেই মালয়জাতির বিষয় আমরা—সাধারণ ভারতবাসীরা বিশেষ-কিছু অবগত ছিলাম না। তিন শতাব্দীর পরাধীনতার মধ্যে থাকিয়াও যে তাহারা জাতীয় স্বাধীনতার জন্য এমনি এক বিরাট অথচ ফল্গুবাহী সংগ্রামশীলতা অর্জ্জন করিয়াছে, একথাও বর্ত্তমান যুদ্ধের শেষ পরিণতির পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত আমাদের অজ্ঞাত ছিল। ইহার প্রধান কারণ ছিল, মালয়-খণ্ডের প্রভুশক্তিরা মালয়জাতি সম্বন্ধে কোন বিষয় বিশ্ববাসীকে জানাইতেন না। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধের পটভূমিতে ঘটনাচক্র বিপরীত-মুখে আবর্ত্তিত হইতেছে। যুদ্ধ শেষ হইতেই সমস্ত পৃথিবী তাহাদের তূর্য্যধ্বনি শুনিতে পাইয়াছে। সাম্রাজ্যশক্তির জোয়ালের তলায় যাহারা ছিল অজ্ঞাতকুলশীল, নূতন পরিস্থিতিতে তাহারাই এশিয়ার মুক্তি-সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছে।

নিরপেক্ষ হইয়া ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করিতে গেলে স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই অপরাজেয় সংগ্রামমুখিতায় জন্ত

তাহারা কিছুটা জাপশক্তির নিকট ঋণী। অবশ্য এই সঙ্গে এই কথাও স্বীকার্য্য যে, জাপশক্তি কোনরূপ মানবতার আদর্শের অনুপ্রেরণায় এই ঋণ দেয় নাই ; দিয়াছিল স্বীয় স্বার্থেরই খাতিরে। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্য শক্তির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতায় সে পাশ্চাত্য প্রভু-শক্তি দ্বারা নিপীড়িত মালয় অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে একটা রাজনৈতিক চাল চালিয়াছিল। সেই চালটি হইল কো-প্রস্‌পারিটি স্ফিয়ারের (Co-prosperity sphere)। এই চালে তাহারা মালয় অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে বুঝাইতে চাহিল যে, একটি নির্দ্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যে সমুদয় অধিবাসীদের গোত্র ও ঐতিহ্যের মূল যদি অভিন্ন হয় এবং তাহাদের জীবনযাত্রার প্রকরণের মধ্যেও যদি এই অভিন্নতা বিদ্যমান থাকে, তবে উক্ত ভৌগোলিক অংশের অধিবাসীদিগের সার্ব্বজনীন কল্যাণকল্পে একই রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। এক কথায় তাহারা বুঝাইল যে, এশিয়া এশিয়াবাসীদেরই জন্য ; আরও স্পষ্টতর ব্যাখ্যায়—পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের নবোদ্গত প্রতিদ্বন্দ্বী জাপ সাম্রাজ্যবাদ সমগ্র এশিয়া ভূখণ্ডকে করায়ত্ব করিয়া উহার বিপুল গণশক্তিকে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের কার্য্যে নিযুক্ত করিতে চাহিল এবং এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে স্থানীয় অধিবাসী-দিগকে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র দিয়া আধুনিক পাশ্চাত্য যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতেও প্রস্তুত হইল। বহু শতাব্দী ধরিয়া শ্বেত জাতির উৎপীড়নে জর্জ্জরিত মালয়খণ্ড সম্ভবতঃ জাপানের এই নূতন চালে ভুলিয়াছিল ; হয়তো উহার অধিবাসিগণ সত্য-সত্যই বিশ্বাস করিয়াছিল যে, অন্ততঃ আর যাহাই হোক, এইভাবে শ্বেত-জাতির পীড়নের জোয়াল হইতে তো মুক্তি পাওয়া যাইবে! অথবা তাহারা সম্ভবতঃ প্রকৃত কূটনীতিরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া-ছিল। সাক্ষাৎ শ্বেত সাম্রাজ্যবাদকে তাড়াইবার জন্য তাহারা স্বেচ্ছায়ই স্ববর্ণ সাম্রাজ্যবাদকে বরণ করিয়াছিল। কূটনীতির দিক দিয়া 'কণ্টকেনৈব কণ্টকম্'—নীতিটা তো আজও অচল হইয়া যায় নাই। এই নীতিরই আশ্রয় লইয়াই তাহারা হয়তো সিদ্ধান্ত করিয়াছিল যে, আপাততঃ পুরাতন শত্রুকে তো বিতাড়িত করা হোক ; পরে আবার নবলব্ধ উপযুক্ত মুহূর্ত্ত আসিলেই নূতন শত্রুকেও ঘড়ছাড়া করিবার ব্যবস্থা করা যাইবে।

আমাদের মনে হয় মালয়খণ্ডের অধিবাসীরা প্রথম হইতেই একমাত্র শেষোক্ত উদ্দেশ্যটি নিয়াই জাপানের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। অন্ততঃ বর্ত্তমান ইতিহাসের নূতন অধ্যায়ে তাহারা যে নূতন ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে অন্যকিছু মনে করিবার উপায় নাই। ব্রহ্মে, ইন্দোনেশিয়ায়, ইন্দোচীনে নূতন শত্রু জাপানকে তাহারা সত্যসত্যই বিতাড়িত করিয়াছে। কিন্তু জাপানকে তাড়াইবার পর আর কোন শত্রুকে তাহারা ঘরে ঠাঁই দিতে প্রস্তুত নয়। পূর্ব্বতন প্রভুশক্তির পুরাতন সম্পর্কটা আর তাহারা মানিয়া লইবে না। এই অনিচ্ছার অভিব্যক্তি আমরা আজ দেখিতেছি ইন্দোনেশিয়ায়, দেখিতেছি ইন্দোচীনে ও ব্রহ্মে। পশ্চিমী প্রাধান্য অস্বীকার করিবার জন্য এই সব দেশের অধিবাসীরা সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছে। 'আধুনিক 'সমর-শক্তি'র আড়ম্বরেও তাহাদের সেই পণ ভঙ্গ করা সম্ভব হইতেছে না।

এশিয়ার ইতিহাসের এই নব অধ্যায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছে ইন্দোনেশিয়া। অভিজ্ঞতার দিক দিয়া এবং সংখ্যাগত ও আয়তনগত শক্তির দিক দিয়া অবশ্য ভারত বা চীনেরই এই নেতৃত্ব গ্রহণ করা উচিত ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ উভয়ের কেহই এ কার্য্যে সক্ষম হয় নাই। চীন তো নিজের গৃহযুদ্ধ নিয়াই ব্যস্ত ছিল ; এত ব্যস্ত ছিল যে, প্রতিবেশীর দিকে তাহার দৃকপাত করিবার পর্য্যন্ত অবসর হয় নাই। কেবল তাহাই নহে, তাহার এই একচোখা ঘর সামলানোর অবসরে প্রতি-বেশীর শত্রু যে তাহাকেও শোষণ করিতেছিল, সেদিকেও তাহার কোন দৃষ্টি ছিল না। সুখের বিষয় এবারে চীনেও না কি নূতন ইতিহাস রচিত হইতেছে। চুংকিং-এর এক সাম্প্রতিক খবরে প্রকাশ, জেনারেলিসিমো চিয়াং কাইশেক চীনের একদলীয় গভর্ণমেণ্টের অবসান ঘটাইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ; এবং এই অনুসারে তিনি কুওমিনটাঙ দলের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিকে একটি সর্ব্বদলীয় পরামর্শ বৈঠকের সুপারিশ মানিয়া লইবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন! প্রত্যেক এশিয়াবাসীরই পক্ষে ইহা অতীব শুভ সংবাদ সন্দেহ নাই। তথাপি এই শুভ কেবল সুসম্ভাবনার। কার্য্যতঃ চীন আজিও এশিয়ার নব জাগরণের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে পারে নাই। এই দিক দিয়া সর্ব্বস্বের বিনিময়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করিয়া ইন্দোনেশিয়াই সর্ব্বপ্রথম এশিয়াকে আলো দেখাইতেছে। ইন্দোনেশিয়ার এই সংগ্রাম আজ শুধু এশিয়াবাসীর সমস্যা নয়, ইহা পৃথিবীর সমস্যা। সম্ভবতঃ সমস্যার এই গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াই ডাচ সরকার কিছুদিন পূর্ব্বে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার পরামর্শে ইন্দোনেশিয়দের সহিত একটি আপোষ-সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ডাচ সরকারের সেই চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। পৃথিবীর সমস্যা আজ পৃথিবীর দরবারেই বিচারাধীন রহিয়াছে। সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের অধিবেশনে ইন্দোনেশিয়া-প্রশ্ন উপস্থাপিত হইয়াছে। তবে ইতিপূর্ব্বেই প্রসঙ্গান্তরে আমরা বলিয়াছি যে, জাতিপুঞ্জের এই সব অধিবেশনগুলিতে প্রধান শক্তিগুলির স্ব স্ব স্বার্থসিদ্ধি ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের সত্যকার কোন মীমাংসা হয় না। সুতরাং এদিক দিয়া আমরা খুব সুফলের প্রত্যাশা করি না। ইন্দোনেশিয় সমস্যার সমাধান ইন্দোনেশিয়াকেই করিতে হইবে। এশিয়ার সমগ্র নিপীড়িত জনের নৈতিক সমর্থন তাহার সংগ্রামের সহিত সংযুক্ত হইয়া আছে। আর শুধু মাত্র নৈতিক সমর্থনই বা বলি কেন? ইন্দোচীনে, ব্রহ্মে, ভারতবর্ষে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হইয়াছে, সেই আন্দোলন তো ইন্দোনেশিয়দের স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রত্যক্ষ সহযোগী! আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, শেষ পর্য্যন্ত ইন্দোনেশিয়া তাহার সংগ্রামে জয়ী হইবেই। আর তাহার সহিত জয়ী হইবে সমগ্র এশিয়া। 'নবমন্ত্রে দীক্ষিত' এশিয়াবাসীকে পাশ্চাত্য জাতিগুলি আর তাহাদের প্রভুত্ব কায়েম রাখার কোন ষড়যন্ত্র, কোন কূটনৈতিক চাতুরীর সাহায্যে দাবাইয়া রাখিতে পারিবে না। পরাধীনের স্বাধীনতা-সংকল্প সিদ্ধিলাভ করিবেই। আণবিক বোমার ভীতিকে তুচ্ছ করিয়াই তাহাদের সাধনা জয়যুক্ত হইবে।

ইরাণ, ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, প্যালেষ্টাইন, মিশর, আরব প্রভৃতি দেশেও জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে। যে বিদেশীয় কূটনীতি এতদিন তাহাদিগকে মোহান্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে। আরব-জগতে ব্রিটিশ কূটনীতি ব্যর্থ হইয়াছে, এশিয়া মাইনরের পশ্চিমপ্রান্ত, পূর্ব্বে জাভা পর্য্যন্ত সমগ্র এশিয়ার একই ধ্বনি আজ আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হইতেছে "সাম্রাজ্যবাদী, বিদায় গ্রহণ কর, সসম্মানে অপসারিত হও।" এশিয়ার ঘুম ভাঙিয়াছে. নব যুগের নূতন সূর্য্যোদয় আজ তাহার সাম্‌নে।

যতীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ

আমরা মাঘ মাসে বাঙ্গলার তিনজন প্রখ্যাত ব্যক্তির মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছি। তাঁহাদের নাম—যতীন্দ্রনাথ বসু, স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী ও সুরেন্দ্রনাথ হালদার। যতীন্দ্র বাবু প্রসিদ্ধ এটর্ণি ছিলেন, কিন্তু সৌজন্যে, পরোপকারে, দানশীলতায় ও সংস্কৃতিতে তাঁহার ন্যায় বাঙ্গালী সমাজে বিরল। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অনেক দিন পর্য্যন্ত সম্পাদক ও পরে সভাপতি ছিলেন।

স্যার ব্রহ্মচারী একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন এবং কালাজ্বর সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করিয়া কেবল ভারতে নয়, সমগ্র জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথও স্বদেশসেবায় অগ্রগণ্য ছিলেন। ইনি গত চল্লিশ বৎসর যাবৎ স্বদেশী ও শ্রমিক আন্দোলনে বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথমেই ভারত যে নবজাগ্রত আত্মনির্ভরতায় জাগিয়া উঠে, তাহাতেও তাঁহার অবদান কম ছিল না। ইনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের, সিষ্টার নিবেদিতা ও জাপানের প্রসিদ্ধ কবি ও লেখক ওকাকুরার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। দেশবন্ধুর নেতৃত্বাধীনে দক্ষিণ কলিকাতার জননায়ক নরমপন্থী সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়কে পরাস্ত করিয়া ইনিই মেম্বর নির্ব্বাচিত হন। দলের প্রতি তাঁহার আনুগত্য ও নিয়মানুবর্ত্তিতা অপূর্ব্ব ছিল। আমরা এই তিনজন মহানুভব বাঙ্গালীর পরলোকগত আত্মার তৃপ্তি কামনা করিতেছি ও তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

বীর শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরা

মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে বিগত ১৯৪২ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতের কত নিঃস্বার্থ স্ত্রী-পুরুষ যে আত্মাহুতি দিয়াছে, তাহার সামান্যই আজ পর্য্যন্ত কাগজে-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতের স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে আজ সকলে শুধু মুক্তিসচেতন হইয়াই উঠে নাই, বয়স এবং সামর্থ্যও ছাপাইয়া উঠিয়াছে। মেদিনীপুর আগষ্ট-বিপ্লবের শহীদ বয়োবৃদ্ধা শ্রীযুক্তা মাতঙ্গিনী হাজরার নির্ভীক তেজস্বিতায় তাহারই পরিচয় পাই। ১৯৪২ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর সহস্র সহস্র নর-নারী, বালক-বালিকার বিরাট শোভাযাত্রা চলিয়াছে—তাহার পুরোভাগে মহাশক্তির অংশসম্ভূতা বীর-নারী মাতঙ্গিনী; এক হাতে তাঁহার শঙ্খ, অন্য হাতে ৪০ কোটী ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত জাতীয়-পতাকা। পুলিশ ও সৈন্যদলের গুলিতে তাঁহার বাম হাতের কনুই বিদ্ধ হয়, হাতের শঙ্খ পড়িয়া যায়। তথাপি—বাম হস্ত বিদ্ধ হইয়াছে হউক, দক্ষিণ হস্তে জাতীয়-পতাকা উত্তোলন করিয়াই তিনি শোভাযাত্রাসহ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পরমুহূর্ত্তে আবার গুলি, গুলি আসিয়া বিদ্ধ হইল এবারে দক্ষিণ হাতের কনুইয়ে; এবং সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার ললাট লক্ষ্য করিয়া পুনরায় গুলি নিক্ষিপ্ত হইল। গুলিবিদ্ধ হইয়া ৭৩ বৎসরের বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী দেবী পড়িয়া গেলেন, তথাপি জাতীয়-পতাকা তাঁহার হস্তচ্যুত হইল না। বীর নারী আত্মবলি দিয়াও পতাকার সম্মান রক্ষা করিলেন। তাঁহার এই নিঃস্বার্থ আত্মাহুতি ভারতীয়-নারী-সমাজকে যে কত বড় আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া গেল, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তাঁহার পবিত্র আত্মার প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

প্রথম গ্রন্থে লিখিয়াছেন

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীদিলীপকুমার রায়
শ্রীনরেশ সেনগুপ্ত
শ্রীনরেন দেব
শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
শ্রীপরিমল গোস্বামী
শ্রীসজনীকান্ত দাস
শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
'বনফুল'
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী
শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী
শ্রীআশালতা সিংহ

দ্বিতীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীনরেন দেব
শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য
শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীপাচুগোপাল মুখোপাধ্যায়
শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়
শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

তৃতীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন

শ্রীবিভূতি মুখোপাধ্যায়
শ্রীহিরণ্ময় ঘোষাল
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীআশালতা সিংহ
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীসুবোধ বসু
শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়
শ্রীকপিল ভট্টাচার্য্য
শ্রীনমিতা মজুমদার
শ্রীপরিমল গোস্বামী
শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়
শ্রীপ্রমথনাথ বিশি
'বনফুল'

চতুর্থ গ্রন্থে লিখিয়াছেন

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী
শ্রীপ্রবোধ মজুমদার
শ্রীঅমলা দেবী
শ্রীআশালতা সিংহ
শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীপাচুগোপাল মুখোপাধ্যায়
শ্রীবাদল চট্টোপাধ্যায়
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
শ্রীসীতা দেবী
শ্রীমিহির মৈত্র

পঞ্চম গ্রন্থে লিখিয়াছেন

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীহিরন্ময় ঘোষাল
শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য
শ্রীঅনুরূপা দেবী
শ্রীআশাপূর্ণা দেবী
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র
শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীপরিমল গোস্বামী
'বনফুল'
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

পূজার বিশেষ সংখ্যা

আমরা নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় বলিতে পারি, ইহার প্রত্যেক পাতা সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে। প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ—মূল্য ৩৲ টাকা। সামান্য কয়েকখানি অবশিষ্ট আছে।

শীতের অর্ঘ্য

প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ—মূল ২৷৷০, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

প্রথম গ্রন্থ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে; গ্রাহকগণের বিশেষ অনুরোধে পুনরায় মুদ্রিত হইতেছে। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম গ্রন্থের মাত্র কয়েকখানি অবশিষ্ট আছে। প্রত্যেক গ্রন্থের মূল্য—১৷৷০ টাকা, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র। ষষ্ঠ গ্রন্থ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। সমস্ত সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

ভারতী সাহিত্য-ভবন

সন্ধ্যা সমাগমে

[ফোটো : শ্রীনীরেন ভাদুড়ী

ত্রয়োদশ বর্ষ } চৈত্র—১৩৫২ { ২য় খণ্ড—৪র্থ সংখ্যা
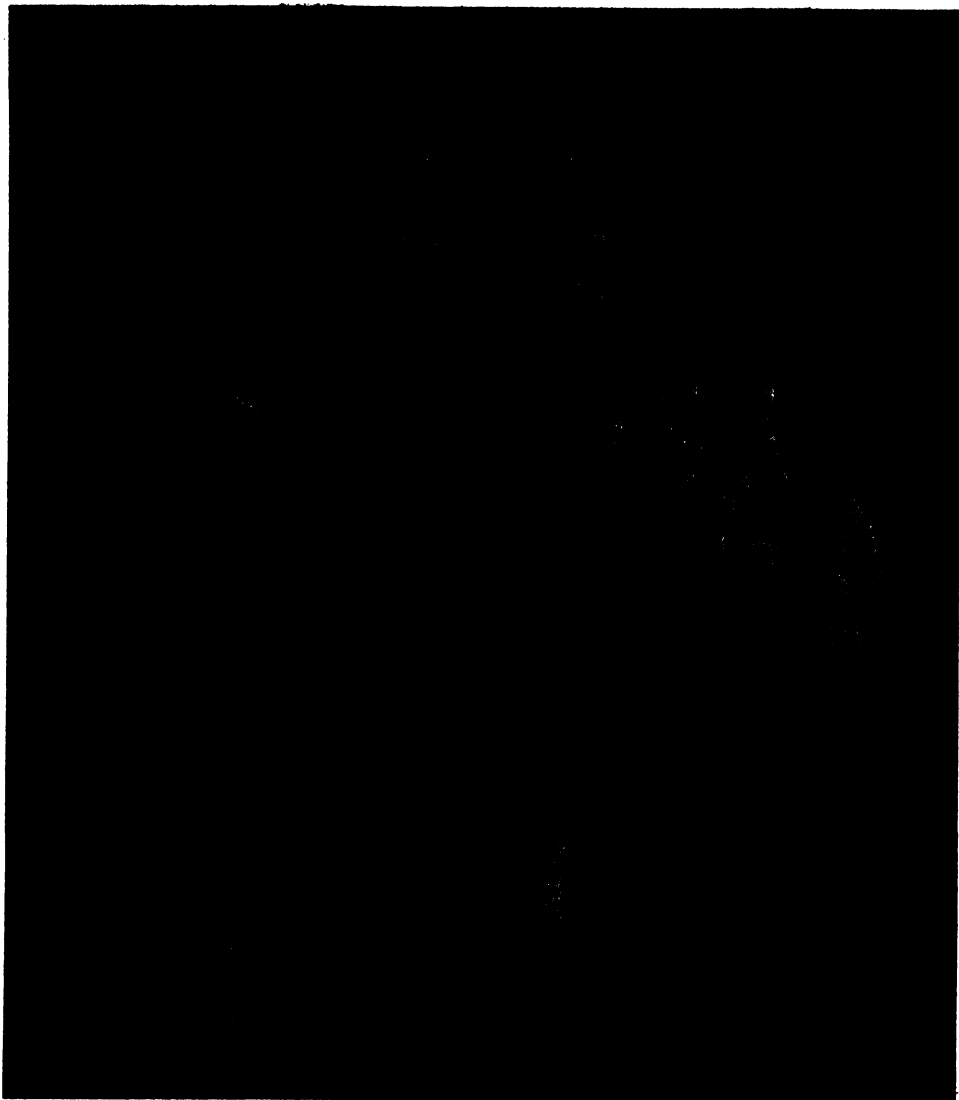
গিরিশচন্দ্রের নবাবিষ্কৃত রঙ্গনাট্য

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নটগুরু গিরিশচন্দ্র তাঁহার প্রাথমিক রচনাগুলিতে যে-কোন কারণেই হউক নিজের নাম প্রকাশ করেন নাই। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত দুইখানি নাট্যরাসক 'আগমনী' ও 'অকাল-বোধনে' গ্রন্থকার হিসাবে "মুকুটাচরণ মিত্র" এই নাম আছে। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত নাট্যগীতি 'দোল-লীলা'য় গ্রন্থকারের নাম নাই, আছে কেবল "শ্রীকেদারনাথ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত"। এই আত্ম-গোপনের ফলে একটা গুরুতর অনিষ্ট ঘটিয়াছে; অজ্ঞাত-অখ্যাত লেখকের রচনা-বোধে অনেকেই এগুলি সযত্নে রক্ষা করেন নাই, ফলে গিরিশচন্দ্রের প্রাথমিক রচনাগুলি বর্ত্তমানে অতীব দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে।

সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রথম যুগে ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য গিরিশচন্দ্র কয়েকখানি ছোটখাট রঙ্গনাট্য রচনা করিয়াছিলেন। অনেকের ধারণা, এগুলি কখনও মুদ্রিত হয় নাই, এমন কি গিরিশচন্দ্রের দক্ষিণ-হস্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ১৩২০ সালে প্রকাশিত তাঁহার 'গিরিশচন্দ্র' পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

"১। মাউসি। ২। Charitable Dispensary. ৩। ধীবর ও দৈত্য। ৪। আলিবাবা। ৫। দুর্গাপূজার পঞ্চ রং। ৬। Circus Pantomime. ৭। যামিনী চন্দ্রমাহীনা—গোপন চুম্বন (A Kiss in the Dark)। ৮। সহিস হইল আজি কবি-চূড়ামণি।

এই কয়েকখানি ক্ষুদ্র রঙ্গনাট্য আদি বঙ্গ-নাট্যশালা-স্থাপয়িতা শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন নিয়োগীর ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে, কলিকাতা বিডন ষ্ট্রীটে স্থাপিত স্থায়ী ন্যাশনাল রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল। ইহাদের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নাই এবং অভিনয় কালও নির্দ্দিষ্টরূপে নির্ণয় করা যায় নাই।" পৃঃ ১৯৪

অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় যে কয়খানি রঙ্গনাট্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার অন্ততঃ একখানি যে ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার জানা ছিল না। এই রঙ্গনাট্য—'যামিনী চন্দ্রমাহীনা গোপন চুম্বন—A Kiss in the Dark' বেলগাছিয়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত সনৎকুমার গুপ্তের গ্রন্থ-সংগ্রহে আমি ইহার একখণ্ড আবিষ্কার করিয়াছি। গিরিশচন্দ্রের অন্যান্য প্রাথমিক নাট্যগ্রন্থের ন্যায় এখানিতেও গ্রন্থকার-হিসাবে তাঁহার নাম নাই; ইহা "শ্রীকিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।" বেঙ্গল লাইব্রেরীর মুদ্রিত-পুস্তক-তালিকা মতে—পুস্তিকাখানির প্রকাশ-কাল—৬ জুলাই, ১৮৭৮; পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৬। আখ্যা পত্রটি এইরূপ :—

যামিনী চন্দ্রমা হীনা / গোপন চুম্বন। /
A Kiss in the Dark / শ্রীকিরণচন্দ্র
বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক / প্রকাশিত: / কলিকাতা,
৬৬ নং বীডন ষ্ট্রীট। / বীডন যন্ত্রে / ১২৮৫
শ্রীহরচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত। /

গিরিশচন্দ্রের অধুনা-বিস্মৃত এই রঙ্গনাট্যখানির নবাবিষ্কারে অনেকেই—বিশেষতঃ তাঁহার অনুরাগী ভক্তবৃন্দ পুলকিত হইবেন সন্দেহ নাই। এই ভরসায় আমরা পুস্তিকাখানি 'বঙ্গশ্রী'র পৃষ্ঠায় পুনর্মুদ্রিত করিতেছি। ভবিষ্যতে ইহা 'গিরিশ-গ্রন্থাবলী'তে স্থান পাইলে আনন্দের বিষয় হইবে।

যামিনী চন্দ্রমাহীনা

গোপন চুম্বন।

A KISS IN THE DARK

শ্রীকিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা,—৬৬ নং বীডন ষ্ট্রীট।

বীডন যন্ত্রে

শ্রীহরচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

১২৮৫

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

মুরারি বাবু	...	...	জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।
মথুর বাবু	...	...	মুরারি বাবুর বন্ধু।
গদা	...	...	মুরারি বাবুর ভৃত্য।

স্ত্রী।

বসন্তকুমারী	...	...	মুরারি বাবুর স্ত্রী।

যামিনী চন্দ্রমাহীনা—গোপন চুম্বন।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(মুরারি, মথুর ও বসন্তকুমারী আসীন।)

মু। (স্বগত) আবার এসেছে বেটা, (প্রকাশ্যে) মথুর বাবু আসতে আজ্ঞা হয়।

ম। আজ্ঞে, আজ্ঞে—

(নেপ)। দেখগা, সমাজে যদি যাও, তো তাড়াতাড়ি যাও, না হয় এখন কার সঙ্গে কথা কয়ে দেরি করে রাত ১২টার সময়—

মু। আমি আজ যাব না।

ব। আমার উপর রাগ করে বোল্‌চো, যদি না যাও, তবে আমি আজ খাব না।

মু। বুঝেছি বুঝেছি গো।

ব। যা বুঝে থাক, আমার কাছে এসো না !!

[২]

মু। (যাইতে উপক্রম)

ব। একটা কথা শুনে যাও ;—

মু। তুমি ত তাড়াতে পাল্লেই বাঁচ, আর কেন আমায় ডাক্‌চো।

ব। আমার ঐ অপরাধে কি একটা কথা শুন্‌তে পার না ?

মু। আচ্ছা, শুনেই যাই, তুমি কি বল।

(গদার প্রবেশ)

গ। (স্বগত) তোর কথা শুনবে, তুই কোন্ ছার।

ব। দেখ একটা কথা বলে যাও—তুমি শীগ্‌গির শীগ্‌গির আসবে ? না এস, নেই-নেই, আমি আর একজনকে বসে রাখ্‌ব।

মু। আর এক জনকে খুঁজতে হবে না, মথুর এসেছে।

ব। মথুর বাবু এয়েছেন, (মথুরের প্রতি) আপনি অমন করে দাঁড়িয়ে আছেন! দেখ্‌তে পাইনে, আসুন না ? (স্বামীর প্রতি) তুমি যাও—(স্বামীর গমনোদ্যম) শোনো, একটা কথা বলি, শীগ্‌গির শীগ্‌গির আস্‌বে কি না ? না—তুমি আস্‌বে না, এসোনা—

মু। রাগ কচ্চ কেন ?

ব। রাগ কিসের, তোমার যা ইচ্ছে তাই কোর্‌বে, আমার রাগ কিসের, কিন্তু যাবে যদি মথুরকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও—

[৩]

মু। ভদ্দর লোক এসেছে !!—তার ওপোর আমি বার বার বোলেছি—আমি ঘরে না থাকি, আমার মাগ তোমায় Receive কোরবে।

ব। (স্বগত) তুমি বল্লে তাই !! (প্রকাশ্যে) নাথ! তুমি কি জান না, যে তোমা ভিন্ন অন্য পুরুষের মুখ দেখতে পাইনে, তোমার অনুরোধে আমি অনেক কোরেছি, আরও বলতো মথুরকে আমি মাতায় করে রাখবো, কিন্তু আর তোমার কথা শুনবো না—

মু। আমার ওপোর রাগ কচ্চ ?

ব। না, তুমি বোলচো। আর তোমার আমি কোন কথা শুনবো না—তুমি যাও,—এক্ষুনি যাও,—

মু। আমায় তাড়াচ্চ কেন ?

ব। না, তুমি যাও,—এখনি যাও।

মু। আচ্ছা আমি যাচ্ছি, কিন্তু তুমি মথুরকে অনাদর করো না।

ব। (স্বগত) শেখাসে বাড়ার ভাগ !! (মৌনাবলম্বন)

মু। দেখ আমি কথা দিয়ে এসেছি, সমাজে যাব।

ব। আমি বলছি, তুমি যাও না।

মু। তবে চল্লেম।

ব। যাও, এস! (স্বামীর প্রস্থান)।

[৪]

মথুরবাবু জানো ত, ও বোকা, ওকে শিগ্গীর তাড়ান যায় না।

ম। জানি! কিন্তু অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি।

গ। (স্বগত) দাঁড়িয়ে যদি আমার পা ধরে যেতো কোন শালা কইতো।

ব। গদা কথা শুনছিস্ নি, চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছিস।

গ। (স্বগত) শুনেছি, কিন্তু গদার মতন বুঝতে কোন শালা নেই।

[গদার প্রস্থান।

ম। দেখ, গদা বেটা কি মনে করে?

ব। মনে কে না করে?

ম। আমি দিন কতক আসা বন্ধ করি।

ব। লাভের মধ্যে আমার প্রাণে ব্যথা নিন্দেতো ঘুচবে না।

(স্বামীর পুনঃ প্রবেশ।)

মু। (স্বগত) দেখ; বাবা, দুজনে খুব কাছাকাছি বসেছে।

ব। মথুরবাবু চৌকি সরিয়ে নিয়ে আসুন না, কাছে এসে একটু বসুন না।

ব। সমাজ শেষ হইয়াছে, এসেছ?

[৫]

মু। না, আমি এখনও যাই নি।

ব। দেখে যাও, তোমার ইয়ারের খাতির হচ্চে কি না?

মু। (স্বগত) তবে যাই, কিন্তু বাবা প্রাণটাকু গাচ্চে; গতিক ভাল নয়, সমাজের বাপের মুখে হাগি, আজ যাব না। আমি বিবি মুদিনীর ওখান থেকে তামাক খেয়ে ফের আসছি।

[প্রস্থান]

ম। দেখ তোমার স্বামী বড় শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর আসছে, কিছু সন্দেহ করে থাকবে।

ব। সন্দেহ ওর মনে; তাতে তোমার ক্ষতি কি?

(স্বামীর পুনঃ প্রবেশ।)

ব। কিগো আজ রাত তিনটে করবে, আমি বুঝতে পেরেছি; আমি কিন্তু আজ অতক্ষণ—আমি কিছু একলা থাকবো না, বাপের বাড়ি চলে যাব!!

মু। (স্বগত) বেটী! আমি কিছু বুঝতে পারি। তোর বাবার সাধ্য বাপের বাড়ী যায়!! একেবারে হাঁটুতে হাঁটুতে ঠেকিয়ে আছে।

ব। দেখুন মথুরবাবু ব্রহ্ম ধর্ম্ম ভাল, কি হিন্দুধর্ম্ম ভাল, আমি একবার দেখাই, আপনারে দেখাই, আপনার কোলে একবার শুই।

ম। (জনান্তিকে) ওরে এ কি কচ্চিস্?

[৬]

ব। (জনান্তিকে) দেখ না! (স্বামীর প্রতি) হ্যাগা ব্রহ্মধর্ম্মে চুমোয় দোষ আছে?

মু। (স্বগত) এখন ঠেকাঠেকি? আগে জানলে ব্রহ্ম ধর্ম্মের চোদ্দ পুরুষের মুখে হাগতুম; কোন্ শালা জানে এমন হিড়িক, সামনে কোলে শোয়ে, আবার জিজ্ঞাসা কচ্চে চুমো খাবে কি না? আমি যদি কোন কথা কই, তবে বদরসিক হলেম।

ব। মথুরবাবু চলো না গা, ঐ কৌচের উপর একটু বসিগে

মু। (স্বগত) বুঝেছি বাবা, জায়গা একটু কায়াক হবে বটে!!

ব। হ্যাগা তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন, বসো না।

মু। দেখে শুনে বসে গেছি, আর বাড়াবাড়ি কাজ নাই।

ব। ও কি কথা গা, কখনও কি তুমি বসোনি।

মু। বসেছি, কিন্তু এমন বসা বসিনে।

ব। বসেছি বসেছি কচ্চো, দাঁড়িয়ে থেকে বসাটা কি তোমার বাই হইয়াছে না কি?

মু। কোন শালা ভাঁড়ায়, আমার চোদ্দ পুরুষ থাকলে বোসে যেত। (স্বগত) আমি কি সাধে বসি, এই মথয়ো শালা যে আমার বসায় (উপবেশন)।

[৭]

ব। দেখ তোমার মিছে কথার চেয়ে তোমার সত্তি কথা মিষ্টি।

মু। কেন?

ব। ওত করে ধরলেম, তুমি বললে সমাজে যাব, কিন্তু গেলে না এর চেয়ে মিষ্টি আর কি? মথুরবাবু আমার মাথা ধ'রেছে তোমার কোলে মাথা দিয়ে শুই।

মু। বাবারে এ যে কিছু বুঝতে পাচ্ছি নি, বড় ঝামেলায় প'ড়ে গেলেম।

ব। হ্যাগা, আমি মথুরবাবুকে বললেম তা তুমি কি কোল পাত্তে পারলে না।

মু। (স্বগত) দেখ বেটীর মায়াকান্না দেখ, (প্রকাশ্যে) বলি দোল গোবিন্দের দোল। ওমন কোল পাবে কোথায়?

ব। গোবিন্দ কি তোমাদের সমাজে আছে? দেখ দেখ হিন্দু ভাল, কি ব্রাহ্ম ভাল?

মু। বাপের সঙ্গে—ঝকমারি; করেছিলেম, বাবা বেটী খালি ঐ বেটার আড়ালে গিয়ে লুকুচ্চে।

ব। কি গা তুমি কি বলচো?

ম। (জনান্তিকে) আজ আসি দেখছো বাড়াবাড়ি।

মু। বলচি কি জান, আমার গুষ্টির একটী পিণ্ডি।

ব (জনান্তিকে) দাঁড়াও না, বেটার দৌড়খানা দেখি?

[৮]

(প্রকাশ্যে) হাঁগা, তুমি পিণ্ডি পিণ্ডি কেন কচ্চ গা? আমার পিণ্ডি চটকাবে!! তা বুঝেছি। মথুরবাবু আপনি বাড়ী যান?

মু। গদা তামাক দে, মথুরবাবু তামাক খেয়ে যাবেন।

গ। হ্যাঁ, হ্যাঁ যাচ্চি—যাচ্চি।

ব। না, আপনি কখন যেতে পাবেন না, আপনি বসুন।

ম। '(তামাক লইয়া) তামাক খেয়ে যাবেন। তোর সাত গুষ্টির জাত কুল খেয়ে যাবেন হতভাগা, তুই বুঝেচিস্ কি?

ব। মথুরবাবু, কথা শুনবেন না।

গ। (স্বগত) ওর বাবা শুনবে, ও ত' ছেলেমানুষ।

মু। আচ্ছা মথুরবাবু, তুমি বোস আমি সমাজে যাব।

ব। এত রাত্রে আর সমাজে যেতে হয় না?

গ। (স্বগত) বলি, আপনি যাচ্চ যাও না কেন—আবার ঝাঁটা

ব। মুখ গোঁজ করে রয়েছ যে, যাও, তোমার সঙ্গে আর—আর কথা নেই।

মু। (স্বগত) হে ভগবান্, গলাধাক্কাটা দিলে গা, যাই—চলে—যাই—

[প্রস্থান।

ব। গদা দাঁড়িয়ে কেন রে ?

গ। (স্বগত) না, আর দাঁড়াব কেন ? (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে এই ছুট মাচ্ছি।

[৯]

ব। ছুট মারবি কেন ? আমি কি তাই বোল্‌চি।

গ। না বলেন নি,—(স্বগত) আমার ত আর তোমার কর্ত্তার মত ঝাঁটা খাবার সাধ নেই, আমি পালাচ্ছি।

ব। আচ্ছা গদা তুই এতদিন আছিস্, আমার কাছে ত কিছু চাইলিনি—

গ। (স্বগত) (হিঃ হিঃ হি) ইচ্ছে কচ্চে, ছুটে গিয়ে দোরটা বন্ধ করে দশটা মোথ্‌রো ঘরে আনি। (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে চাইনি, আপনি কি তা দেবেন না ?

ব। এই নে যা, এই ১০টা টাকা নিয়ে যা—

গ। (স্বগত) মথুর বাবু চিরজীবী হোন। (প্রকাশ্যে) বলি সদর দোরটা কি দিয়ে আস্‌বো ?

ব। না রে।

গ। (স্বগত) কর্ত্তা শালা বার পাঁচ ছয় আনাগোনা কোর্‌বে, এ বেশ জানে।

(স্বামীর পুনঃ প্রবেশ)

মু। আমার লাঠিগাছটা কোথায় ?

গ। (স্বগত) তোমার মাথায়।

ব। তোমার লাঠি কোথায় ? আমি কি জানি ? আমি কি তোমার লাঠির খবর রাখি ?

[১০]

মু। (স্বগত) একটু তফাৎ তফাৎ হয়ে বসেছে। একবার সমাজটা না বেড়িয়ে এলেও ত নয়। (প্রকাশ্যে) আমি চললুম। (গমনোদ্যম)

গ। (স্বগত) বলি ঝাঁটা গাছটা আন্‌বো নাকি ? কর্ত্তা না মার খেলে যাবে না।

[মুরারির প্রস্থান।

ম। দেখ আজ অনেকবার আসা যাওয়া কচ্ছে, আমি যাই—

ব। আজ একটা হেস্তনেস্ত হোগ্ না—

ম। না, বোধ হয় ফের আস্‌বে।

ব। তা ত আস্‌বেই, চল ছাতে যাই।

ম। না—না, এইখানে বোসো, জান্‌তে পাল্লে আমার কড্ড নিতে হবে,—নেহাৎ যদি বস্‌তে হয়, বেটা এখনও আসা যাওয়া কর্চে, তুমি একটা মজা কর।

ব। ও নেই থাকুক, তুমি [illegible] কোণে মূর্চ্ছা যেও ?

গ। (স্বগত) ভ্যালা মোর বাবা রে, তা নইলে কি তোর সঙ্গে মিল খায়।

ম। দেখ আমিও অমনি ও বেটাকে দেখে হাঁউ, মাউ, খাঁউ, করে উঠবো ; দেখ গদা সব জানে, ওকেও বলে দেওয়া যাক, যাতে ও বেটা ঐ রকম করে, (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে গদা !

[১১]

গ। আজ্ঞে—

ম। তুই বোক্‌সিস পেয়েচিস্।

গ। আজ্ঞা হাঁ (স্বগত) আবার—যেন কিছু পাব ? বোধ হচ্চে।

ম। আমরা কি বোলচি বুঝতে পেরেচিস।

গ। আজ্ঞা হ্যা, মোণ্ডা খাব—কলা খাবো।

ম। তুই একটু পাবি না ?

গ। না তেমন বরাৎ নয়।

ম। শোন ? বেটা কি বলে।

ব। তুমি সে বান্দা আমার তাতে যে লাঞ্ছনা হবে তা আমি জানি।

ম। চাকরের খোসামোদে বুঝি সোদ গেল না।

ব। কখন যদি মথুর হতে পারে,—শোধ যায়।

ম। পিরীত রাখ, এখন কাজের কথা কও ? (প্রকাশ্যে) দেখ গদা, হাঁউ মাউ খাঁউ কত্তে পারবি।

গ। না বাবু আপনি কোরবেন হাঁউ মাউ খাঁউ, আমি দোরে দাঁড়িয়ে বোল্‌বো "মনিষ্যির গন্ধ পাঁউ।"

ব। গদা তুই যে বাড়িয়ে উঠচিস।

গ। বাড়িয়ে তুল্লে যে !!

ম। আহা চুপ করনা।

[১২]

নেপথ্যে—স্বামীর গলাধ্বনি।

ম। গদা দেখিস্।

গ। আমায় শেখাতে হবে না।

(স্বামীর প্রবেশ।)

ব। বাবারে মারে গেলুমরে (মূর্চ্ছা) ও গো কে গো, এমন বিকটমূর্ত্তি মানুষ কখন ত' দেখিনে গো।

গ। ওরে হাঁউ, মাউ, খাঁউ, দশ দশ টাকা পাঁউ।

মু। কি রে গদা, দশ দশ টাকা পাঁউ কি রে ?

গ। তবে রে শালা সব কথা তোমায় বলি, আর আমার বোক্‌সিস ফাঁক যাগ। ধর শালাকে চেপে, মার লেঙি।

(উভয়ের পতন)

মু। ওরে ছেড়ে দে গদা ছেড়ে দে।

গ। তোর বাবাকে ছাড়িনে। ওগো এখন তোমরাও টেনো আমি বেটাকে চেপে ধোরেছি, তিন তিন মাস মাইনে দাও নি, দশ দশ টাকা !! ধর শালাকে চেপে, জোর কোরে চেপে ধ'রেচি ওগো ওঠো না ; আমি যখন লেঙি দিয়ে ফেলেছি ওর বাবাও হাত ছাড়াতে পারবে না, জোস্ ত শালার চোক দুটো চেপে ধরি।

ব। কিরে গদা, কিরে গদা ও কে-ও !—কেও !—কেও !

গ। ওগো শালা বউ কামড় দিয়েছে গো। (ক্রন্দন)

[১৩]

ব। ছেড়ে দে ছেড়ে দে কে-ও, গদা কি করিস্ সর্ব্বনাশ কোরেচিস কর্ত্তা যে—

মু। আর কর্ত্তার নেই বাবা, একবার ছেড়ে দিতে বল—

ব। ওরে গদা ছেড়ে দে।

মু। (উঠিয়া) তোমার মনে এই ছিল—

ব। (স্বগত) আর দের—আছে—(প্রকাশ্যে) কি গা—আমায় ধর—বলি এ-সব কি,—আমায় ধর গো, আমার গা কাঁপচে।

মু। আর ধরাধরি কাজ নেই বাবা আমি নাকখত দিয়ে চলে যাচ্চি—

ম। মশাই করেন কি, মশাই করেন কি, এ-আলোটার কেমন দোষ !! বোধ হয় তেলে কি আছে—আমি দেখলেম যেন আপনি বিভীষণ এলেন, আর আমি ভয়ে কাঁপতে লাগলেম।

মু। বলি বাবা কেমন হনুমানটা লেলিয়ে দিয়েছো।

ম। আমার অপরাধ কি বলেন—

মু। তবে রে শালা তোমার অপরাধ কি ?

ব। আমার আবার গা কাঁপছে।

মু। বলি—ও-শালা গদা, ও-বেটীর গা কাঁপছে, তুই শালা আবার লেঙ্গি মারবি নাকি।

[১৪]

ম। না মশাই ও আলোর দোষ ও গদা তুই—আলোটা বাইরে নেযা—

মু। বাবা ! তুমি এখানকার কর্ত্তা তোমার যা ইচ্ছে তাই কর—

ম। মশাই ইচ্ছে আর কি, দেখতে পাচ্ছেন মেয়ে মানুষটী অস্থির হোয়েছেন।

মু। বাবা তুমিও অস্থির হয়েছ, তা নৈলে আলো নিয়ে যেতে বল, গদা তুই দশটা লেঙ্গি মার, আলো নিয়ে যাস্‌নি, ও লেঙ্গির চোদ্দ পুরুষ, ওগো এই জানলা দিয়ে যে চাঁদের আলো আস্‌তো গা, আজ কি চাঁদটাও লুকিয়েছে—

ব। (স্বগত) সহস্র চাঁদ উদয়, তুমি চাঁদ লুকিয়েছে বল—

গ। (আলো লইতে যাওন)

মু। ও গদা তোর পায়ে পড়ি, আলো নিস্‌নি, লেঙ্গি মাত্তে হয় ত মার, আচ্ছা আলো থাক, আমি বেরিয়ে যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

ব। দেখ কের আস্‌বে।

গ। আর দুটো টাকা দেও, আমি ঝাঁটা পিট্‌বো—

ম। গদা আলোটা নিয়ে যা। [প্রস্থান।

নেপ। ওরে বাবারে। ওরে যে চক্ চক্ শব্দ হচ্চে, ওরে চুমোর ডাকে যে প্রাণ বাঁচে না রে।

[১৫]

ব। ওখানে মর না।

(স্বামীর প্রবেশ)

মু। ওরে আলোটা আল্ না, চক্ষু-কর্ণের বিবাদ মেটাই।

(গদার ঝেটা লইয়া প্রবেশ।)

গ। বলি ও শালা চোর, এখনও তোমার বিবাদ মেটেনি (প্রহার।)

ব। ও গদা করিস্ কি।

গ। খুব কোরবো, শালার আকেলকে মারি ঝেঁটা, দাঁত ছিরকুটে পোড়লো, আলো নেবালে, আমার দশ টাকা বখসিস্ দিলে, তবু ও বলে চক্ষু কর্ণের বিবাদ মেটাই—তবে রে শালা (প্রহার।)

মু। ও গদা ঝেঁটা থামা আমি আকেল পেয়েছি।—

গ। আলো নিবিয়ে আকেল দিতে পারলে না, ঝেঁটার চোটে আকেল হোলো, সব মিছে।

মু। ওরে আকেল হোয়েছে।

ম। মশাই কি বোক্‌চেন।

গ। আকেল পাচ্চে পাগ্‌ না, তোমার এত তাড়া কিসে পল্লো।

ব। গদা চুপ কর না।

গ। আরে না না বোঝ না, আকেল পাবে।

[১৬]

মু। ঝেঁটায় ছেড়েছে বিষ ওরে বাপ ধন।

ম। যামিনী চন্দ্রমাহীনা গোপন চুম্বন।*

(যবনিকা পতন।)

---

*মহাকবি গিরিশচন্দ্র ১৮৭৩ সাল হইতে ১৯১২ সাল পর্য্যন্ত দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরকাল যাবৎ রাশি রাশি নাটক রচনা করিয়া অমরকীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার প্রাথমিক রচনা সম্বন্ধে অনেকেরই আজ জানিবার কৌতূহল আছে। তাঁহার প্রথম উদ্যম পঞ্চরং (Pantomime) রচনা। কোনো কোনো রাত্রে মুখে মুখে তিনি পঞ্চরং রচনা করিয়া বেঙ্গল থিয়েটারের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতেন। এই রচনাটি অপেক্ষাকৃত কাঁচা বয়সের রচনা বলিয়া প্রকাশিত হওয়ায় জনসাধারণের কাছে মহাকবি গিরিশচন্দ্রের নাট্য-রচনার ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক ধারা উপলব্ধি হইবে।—বঙ্গশ্রী-সম্পাদক—

গৌতমের গীতা-পাঠ

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

গতিবাবুকে না-চেনে, কাশীতে এমন কেহই ছিল না। কাশীর ছেলে বুড়ো সকলে গতিবাবুকে যেমন চিনিত, তেমনি—'হাতী-ফটকা'র পথের উপরকার তাঁর ষ্টেশনারী দোকানখানাকেও সকলে সেইরূপ চিনিত। বাঙ্গালীটোলার অধিকাংশ খদ্দেরই তাঁর বাঁধা ছিল। স্ত্রী ও দুইটি কন্যা লইয়াই তাঁহার সংসার। তাঁহার ছোট দোকানখানাই তাঁহার ছোট সংসারটিকে বেশ ভালোভাবে চালাইয়া দিত। কিন্তু চিরকালের স্বচ্ছন্দ-ধারায় কিছু ব্যাগ্‌ড়া আসিয়া দেখা দিল, বড় মেয়েটির বিবাহের পর; অর্থাৎ দোকানের পুঁজি ভাঙ্গিয়া কিছু তাঁহাকে খসাইতে হইল। মাস ছয় পরে ছোট মেয়েটির জন্ত আর এক সৎ-পাত্রের সন্ধান আসিয়া জুটিল। গতিবাবু এ-সুযোগও ছাড়িতে পারিলেন না। পাত্রটি এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটির তিনটি ছাপ মারা; তার উপর মস্ত কুলীন। সুতরাং এ-হেন 'সম্বন্ধ' কিছুতেই গতিবাবু হাতছাড়া করিতে পারিলেন না। কিন্তু এই সৎপাত্র হাত-গত করিতে তাঁহার দোকানের অবশিষ্ট যাহা পুঁজি ছিল, তাহাতেও কুলাইল না; কিছু টাকা তাঁহাকে ঋণ করিতে হইল।

দোকানের পুঁজি গিয়াছে; মাল-পত্রও তেমন নাই। চিরকালের নিয়ম-মত সকাল-সন্ধ্যায় দোকান খোলা হয় বটে, কিন্তু খরিদ্দার আর বড় আসে না। বিরল মালপত্রযুক্ত দোকানের খালি আলমারি আর খালি শো-কেসে দিনে-দিনে শুধু ধূলিই জমিয়া উঠিতে লাগিল। ওদিকে সুদ জড়ো হইয়া ঋণের ধূলিও মাসে-মাসে বেশ জমিয়া উঠিতেছিল। সুতরাং এতদিনের পর গতিবাবুকে বেশ-একটু চিন্তায় পড়িতে হইল। দোকানে বেচা-কেনা না থাকাতে একলা বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিবার অবসরও তাঁহার বেশ মিলিল।

আগেকার দিনের মত ধরা-বাঁধা নিয়মের কিন্তু কোন ব্যতিক্রম ঘটিল না। সেই প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান, তারপর কিছু জলযোগান্তে চা ও ধূমপান, তারপর আসিয়া দোকান খোলা। দোকানে বেলা বারোটা পর্য্যন্ত থাকিয়া বাসায় ফেরা; তারপর আহার এবং বিশ্রাম। আবার বৈকালে দোকানে গিয়া, রাত দশটা স'দশটায় বাসায় ফেরা; ঠিক পূর্ব্বের মতই এ-সব চলিতে লাগিল। কিন্তু ভিতরে-ভিতরে যে ভাঙ্গন ধরিয়াছে, তাহা ভাঙিয়াই চলিল।

স্ত্রী আভা বলে—"ঋণের জন্তে তুমি এত ভাব কেন? ঋণ কার না-থাকে, আর কারই বা শোধ না হয়? তা'ছাড়া, ধার ত মোটে আড়াই হাজার টাকা! সুদ নিয়ে ধল্লুম তিন হাজার। তিন হাজার টাকা আবার টাকা!"

হতাশভাবে গতিবাবু বলেন—"তা ঠিকই বটে; কিন্তু আমার ঋণ শোধবার যে আর কোন উপায় নেই! ছিল একটা ভরসা—দোকানখানা; কিন্তু এখন দোকান বলতে আছে শুধু উনিশ বছরের পুরোনো ছাতা-পড়া সাইনবোর্ডখানা, আর ধুলো-জমা খালি শো-কেস, আলমারী আর র‍্যাক্ ক'টা।"

"তা হোক; ঐ খালি আলমারি আবার তুমি মাল-পত্তরে ভরিয়ে তোল; আমার দু'চারখানা গয়না ত আছে, তাই বিক্রী কোরে আবার দোকান কিছু-কিছু সাজিয়ে ফেল। বুঝেছ? পাঁচশো টাকা নগদ দিলে হাজার টাকার মাল আসবে এখন; আসবে না?"

বিমর্ষ মুখে গতিবাবু বলিলেন—"হুঁ।"

"তা হোলে ত দোকান তোমার আগের মত চলবে?"

"হুঁ"।

"তাহোলে ত আর ঋণের জন্তে ভাবনা-চিন্তে কিছু থাকবে না?"

"হুঁ।"

"হুঁ কি গো! তা হোলেও ভাবনা-চিন্তে থাকবে?"

"না; তা হোলে আর থাকবে কেন।"

মনে-মনে গতিবাবু ভাবিলেন, গতিও এ ছাড়া আর কিছু নাই। তিনি শীঘ্রই গহনাগুলা বিক্রয় করিতে মনস্থ করিলেন।

বুধবার রাত্রে গতিবাবু স্থির করিলেন, কাল সকালেই 'চৌখাম্বা'র গনেশ সোনারের দোকানে গিয়া আভার হার আর চুড়ী কয়গাছা বিক্রয় করিয়া আসিবেন। কিন্তু সকালে উঠিয়া মনে পড়িয়া গেল—সেদিন লক্ষীবার, সুতরাং সেদিন সোনা বেচিতে গণেশ সোনারের দোকানে আর যাওয়া হইল না। পরের দিন শুক্রবার ছিল সংক্রান্তি এবং তার পরের দিন—মাস পয়লা; সুতরাং ঐ দুইদিনও ঘরের সোনা বিক্রয় করা চলিবে না। রবিবার সকালে উঠিয়াই গতিবাবু আভাকে বলিলেন—"আজ তোমার হার আর চুড়ী ক'গাছা বার কোরে দিও; বেচতেই যখন হবে, তখন আর দেরী কোরে ফল কি।" আভা কহিল—"আজ অমাবস্তে, আজকের দিনটা থাক, কাল নিয়ে যেও।"

আভার কথায় একজন চুপ করিয়া রহিলেন, আর একজন হাসিলেন। চুপ করিয়া যিনি রহিলেন, তিনি—গতিবাবু; আর যিনি হাসিলেন, তিনি—ভাগ্য-বিধাতা।

সেই রবিবারের রাত থেকেই হঠাৎ আভা অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িল এবং সে-অসুস্থতা দেখিতে দেখিতে এমন গুরুতর হইয়া পড়িল যে, প্রায় আড়াই মাস কাল কাশীর নাম-করা হোমিওপ্যাথ, য়্যালোপ্যাথ, ও কবিরাজদের সর্ব্ববিধ বিফল চেষ্টার মধ্যে একদিন সে চিরকালের মত চক্ষু মুদিয়া বিশ্বেশ্বরের পায়ের তলায় বিশ্রাম লাভ করিল। তাহার গহনাগুলি বিক্রয় করা হইয়াছিল এবং টাকাগুলি দোকানের পিছনে ব্যয় হওয়ার পরিবর্ত্তে, তাহার পরপার-যাত্রাপথের ব্যয়স্বরূপ চিকিৎসক ও ঔষধ-পথ্যাদির পিছনে নিঃশেষে ব্যয় হইয়া গিয়াছিল; উপরন্তু আরো কিছু নূতন ঋণ গতিবাবুর পূর্ব্বঋণের ভার বাড়াইয়া দিয়াছিল। সহসা এই অভাবনীয় জীবনধারার নব আবর্ত্তে পড়িয়া গতিবাবু হইলেন—ধীর, স্থির, গম্ভীর; যেন সচল একখানা পাথর, কোন সাড় নাই, কোন অনুভূতি নাই; যেন সকল সুখ-দুঃখের অতীত, যেন সংসারবিরাগী নিষ্কাম নির্ব্বাক্ সন্ন্যাসী।

আভার অসুখে পড়া হইতে প্রায় তিনমাস দোকান বন্ধ ছিল। তিনমাস পরে একদিন সকালে দোকান খুলিয়া, ধূলা ঝাড়িয়া, ধূনা-গঙ্গাজল দিয়া গতিবাবু তাঁহার সেই পুরাতন স্থানটিতে বসিলেন। তীর্থযাত্রী-ভিন্ন, কাশীর অধিবাসীরা—যারা প্রতিদিন সেই অপরিসর গলি-পথে যাতায়াত করে, গতিবাবু তাদের প্রায় সকলেরই সুপরিচিত। দোকান যখন দোকানের মত ছিল, তখন তা'দেরই অধিকাংশ ছিল তাঁর খদ্দের। এখন আর সেদিন নাই; তবু তাদের মধ্যে অনেকেই দোকানের সামনে আসিয়া, গতিবাবুকে দেখিয়া হয়-ত-বা একবার দাঁড়ায় ও তাঁহার সঙ্গে দুই-চারিটা কথা কহিয়া চলিয়া যায়; আবার কেহ-বা হয়ত দাঁড়ায়ও না, শুধু ছোট্ট একটা নমস্কার করিয়াই চলিয়া যায়।

বৈকালের দিকে গতিবাবু আর দোকান খোলেন না; হয় গঙ্গার ঘাটে বসিয়া দু'পাঁচজন পরিচিতের সঙ্গে গাল-গল্প করেন, নয়ত-বা ভেলু-পুরার তুলসী মুখুজ্যের বৈঠকখানায় গিয়া দাবা-বোড়েতে মাতেন। কেহ তাঁহাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন—"বিকালে আর দোকান খোলেন না কেন?" তাহাতে তিনি বলেন—"এখন ত আর 'দুই' অর্থাৎ 'দো'-কাণ নেই, এক কাণ ত হারিয়েছি, একটা কাণ শুধু পড়ে আছি; তাই ঐ একবেলা কোরেই খুলি।"

এই ভাবে আরো মাস-দুই কাটিবার পর গতিবাবু দোকানের এক খরিদ্দার জুটাইয়া, যাবতীয় এষ্টেট-পত্তর তাহাকে বিক্রয় করিয়া দিলেন। ঘরখানা ছাড়িলেন না। মনে মনে ভাবিলেন, দশটা কোরে টাকা ঘরভাড়া মাসে মাসে কোন রকম কোরে দিয়ে যাব। যদি ভগবান দিন দেন, চিরকালের দোকানখানা আবার সাজিয়ে বসবো।"

দোকানের এষ্টেট-পত্র বেচিয়া তিনচারি শ টাকা তাঁহার হাতে আসিল। এই টাকাটা হাতে আসায়, তিনি পাওনাদার-দের সুদের কড়া তাগিদ হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। তাঁহার ঋণের সুদটা হাত-নাগাদ পরিশোধ করিয়া তিনি পাওনাদারদের বিরক্ত মুখকে অনেকটা শান্ত করিলেন। বাসার ভাড়া ও দোকানঘরের ভাড়া কয়েক মাসের জমিয়া গিয়াছিল; তাহাও তিনি কড়ায়-গণ্ডায় পরিশোধ করিয়া দিলেন। জামা কাপড় জুতা ইত্যাদি ছিঁড়িয়া আসিয়াছিল; নূতন কিনিয়া সে-গুলির স্থান পূরণ করিলেন। যে সব সখ ইতিপূর্ব্বে তাঁহার ছিল না, হঠাৎ সেই সব সখ তাঁহাকে পাইয়া বসিল। চিরকালের হুঁকাটাকে কুলুঙ্গীর কোণায় অবসর দিয়া তিনি মোরাদাবাদী উৎকৃষ্ট গড়গড়া কিনিয়া আনিলেন। বাজারের সাধারণ চায়ের বদলে 'লিপটনে'র এক নম্বর চা ও উৎকৃষ্ট ক্রীম-ক্র্যাকার বিস্কুটের টীন কিনিলেন। চশমার পুরাতন ফ্রেমটাকে বাতিল করিয়া, তাহার জায়গায় নূতন ফ্যাশানের আমেরিকান ফ্রেম লাগাইয়া লইলেন। এ সব ছাড়া, বুদ্ধিমানের মত আর একটি কাজ যাহা তিনি করিলেন, তাহা প্রশংসার যোগ্য;—প্রত্যহ সকাল এবং সন্ধ্যায় একটু করিয়া আফিং খাইতে সুরু করিলেন।

বাড়ীওলা নেপাল বাবু মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, হঠাৎ গতিবাবু কোনও গুপ্ত ধন-টন পেয়ে গেলেন না কি! তিনি দোকান বিক্রীর কথা জানিতেন না। ভেলুপুরার তুলসী মুখুজ্যে বলিলেন—"আজকাল দেখছি, আপনার সঙ্গে খেলায় বেশীর ভাগ আমিই হেরে যাই!"

কয়েকদিন হইতে রান্না-বান্নার পাঠ তুলিয়া দিয়া, গতিবাবু 'রাজরাজেশ্বরী ছত্র' হইতে খাইয়া আসেন। সুন্দর আহার! আলো-চালের ভাত, ঘি, সুক্ত, দুই রকম ডাল, ভাজা, চড়-চড়ি, অম্বল, পায়েস, দই এবং চিনি; আহারান্তে এক খিলি করিয়া পান। যে সময়টা বাজার করা এবং রান্না করায় যাইত, সে সময়টা তিনি এখন গীতাপাঠে নিজেকে মগ্ন রাখেন। একখানি গীতা তিনি কিনিয়াছেন।

যতই দিন যাইতে লাগিল, গতিবাবুর গীতা-পাঠের সময়ও ততই বাড়িতে লাগিল। ক্রমে তিনি ভেলুপুরার পথ ছাড়িয়া দিয়া প্রতিদিন অপরাহ্নে দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়া নিয়মিত বসিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার অনেক পরে বাসায় ফিরিয়া, কিছু জল-যোগের পর, গীতাখানিকে পাশে রাখিয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি আত্ম এবং অধ্যাত্ম চিন্তা করিবার পর যখন শয়ন করিতেন তখন সমস্ত মহল্লা নিস্তব্ধতার মধ্যে ডুবিয়া যাইত এবং তাঁহার প্রফুল্ল অন্তর আফিংয়ের প্রভাবে সেই নৈশ নিস্তব্ধতার মধ্যে কোলাহল-ময় স্বর্গরাজ্যের সৃষ্টি করিত।

এই ভাবে কয়েকদিন কাটিবার পর, সহসা একদিন অপরাহ্নে দশাশ্বমেধ ঘাটের পরিবর্ত্তে গতিবাবু সিকরোল ষ্টেশনে আসিয়া কলিকাতার একখানা টিকিট কিনিয়া গাড়ীতে চাপিয়া বসিলেন।

'ধর্ম্ম্যাণি দেবি সকলানি সদৈব কর্ম্মা-
ণ্যত্যাদৃতঃ প্রতিদিনং সুকৃতী করোতি।
স্বর্গং প্রয়াতি চ ততো ভবতীপ্রসাদা-
ল্লোকত্রয়েঽপি ফলদা ননু দেবি তেন।'

দক্ষিণ কলিকাতার কোন ক্ষুদ্র দ্বিতল বাটীর নিম্নতলস্থ একখানি ঘরের মধ্যে বসিয়া গতিবাবু সকালবেলায় চণ্ডীপাঠ করিতেছিলেন। বাড়ীটি যাহার, তাহার নাম অধর; সম্পর্কে গতিবাবুর জ্ঞাতি ভাইপো। অধরের একটি ছোট ভাই আছে—ভূধর। ভূধরের বয়স বছর চব্বিশ; এখনো বিবাহ হয় নাই। সুতরাং দুই ভাই ও একটি বধূ—এই তিনটী মাত্র প্রাণীকে লইয়াই ইহাদের সংসার। একটা ঠিকা ঝি আছে, সে সকাল-সন্ধ্যা ঘণ্টাখানেক করিয়া তোলা-কাজ সারিয়া চলিয়া যায়।

বাল্যে পিতৃবিয়োগ হওয়াতে অধরের লেখাপড়া তেমন হয় নাই। আঠারো বছর বয়সেই বিদ্যার ভার মাথা হইতে নামাইয়া ফেলিয়া তাহাকে সংসারের ভার বহন করিতে হয়। পরে ভূধরকে বি, এ, পাশ করাইয়া সে নিজের লেখাপড়া না হওয়ার দুঃখটা মিটাইয়াছিল।

কিছু আগেই অধর স্নানাহার করিয়া তাহার কর্ম্মস্থলে চলিয়া গিয়াছিল। বৌবাজারে একখানা বড় কাপড়-পোষাকের দোকানে সে চাকুরী করে। ভূধর কাজের চেষ্টা করিতেছে; বহুস্থানে দরখাস্ত দিয়াছে ও দিতেছে।

গতিবাবু পনেরো-কুড়ি দিন হইল এখানে আসিয়াছেন। অধরকে ও ভূধরকে তিনি নিজের ছেলের মতোই জ্ঞান করেন ও সেই রকম স্নেহ করেন। দশ বৎসর পরে আসিয়া তিনি প্রথমেই দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন—"দূরে থাকি, বহুকাল খোঁজ-খবর নিতে পারি নি। সংসারের মধ্যে আছি বটে, তবে আমার মধ্যে সংসার নেই। নশ্বর এই জীবন—সবই—

'নলিনীদলগতজলমতিতরলং
তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্।'

—এতদিন তবু একটা কর্তব্যের বাঁধন ছিল, সে-বাঁধনও—নারায়ণ!—নারায়ণ!"

প্রত্যহ সকাল বেলাটায় গতিবাবু নীচের ঘরখানায় একলা বসিয়া চণ্ডীপাঠ করেন; সন্ধ্যার পর অধরকে ডাকিয়া গীতাপাঠ করিয়া শোনান। কোনদিন বা অধরের স্ত্রী নির্মলা আসিয়া এক পাশে বসে। গতিবাবু গীতার বিচিত্র আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ইহাদের বুঝাইয়া দেন। ভূধর কোনও দিনই এ-সব শুনিতে বা বুঝিতে সময় পায় না।

সেদিন গীতাপাঠ শেষ হইলে অধর বলিল—"কাকাবাবু যখন চিরকাল কাশীতেই থাকলেন, তখন ভাড়াটে ঘরে না থেকে, ছোটখাটো একটা বাড়ী কিনে ফেললেই ত সুবিধে হত।"

গতিবাবু বুকের উপর লম্বমান রুদ্রাক্ষের মালাটা হাত দিয়া নাড়িতে নাড়িতে কহিলেন—"না বাবা, যে টাকাটায় বাড়ী কিনবো, তাতে কত দরিদ্রের, কত আতুরের, কত উপকার করা যায়। আর তা ছাড়া, গীতার মধ্যেই ভগবান বলচেন যে, প্রকৃত সাধকের পক্ষে কোন নির্দিষ্ট বাসস্থানে থাকা বিধেয় নয়। সুতরাং—"

"আচ্ছা কাকাবাবু, আমাদের মত সংসারীর পক্ষে কি ভাবে চলা উচিত?"

"সংসারীর পক্ষে 'সং'য়ের 'সার' না হোয়ে, সংসারের যা প্রকৃত কর্তব্য, একনিষ্ঠ হোয়ে তাই কোরে যাবে; তবে কিনা, তাঁরই আবার শ্রেষ্ঠ উপদেশ—'মা ফলেষু কদাচন।'"

এমনি ভাবেই গতিবাবু আসার পর হইতে, অধরের সংসার গীতা, চণ্ডী, নশ্বরতা, নারায়ণ, 'মা-ফলেষু' প্রভৃতি জড়িত হইয়া পরমানন্দে ও পরম শান্তিতে চলিতে লাগিল।

দিন পাঁচ-সাত পরে একদিন অধর একটা রেডিও-সেট কিনিয়া আনিয়া গতিবাবুকে বলিল—"আপনার বউমার অনেক দিনের সখ ছিল কাকাবাবু, আজ মেটালাম। আমার নিজের কোনও সখ-টখ্ নেই। জীবনে খেটেই এসেছি শুধু। জানেন ত, অল্প বয়সেই সংসার মাথায় পড়লো। মাকে আর ভাইটিকে নিয়ে সেই বয়স থেকেই সংসারের যত ঝক্কি সব মাথায় কোরেছি। বাবা যখন মারা যান, তখন মার হাতে শুধু দু'গাছা বালা আর তাঁর বাক্সটিতে ১৩।৵০ পুঁজি ছিল।"

"তোমার বাহাদুরী আছে বাবা, খুবই বাহাদুরী আছে।—আচ্ছা অধর, কিছু টাকা জমাতে পেরেছ কি? সংসার করতে হোলে কিছু সঞ্চয় আবশ্যক।"

"না কাকাবাবু, বেশী কিছু জমাতে পারি নি; তবে আপনাদের আশীর্বাদে হাজার বারো টাকা কোন রকমে—"

"বেশ—বেশ। ভারি খুসী হলুম।—হ্যাঁ, ভাল কথা, হাজার টাকার নোট-কোট রাখনি ত বাবা? আজকাল ত ওই নিয়ে একটা হুলস্থুল ব্যাপার চলচে। আজকের কাগজে দেখছিলুম—"

"না কাকাবাবু, হাজার টাকার নোট আমার নেই। আমার ত আর হঠাৎ-পাওয়া টাকা নয়। চিরকাল ধরে সামান্য কিছু কিছু জমিয়ে ঐ ক' হাজার টাকা—তাও কাকাবাবু, ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে রাখতেও ভয় হয়, যা দিনকাল পড়েচে—"

"ব্যাঙ্কে রাখনি? তবে কোথায় রেখেছ বাবা? দেখো সাবধান! যেখানে-সেখানে যার-তার কাছে বিশ্বাস কোরে—"

"ব্যাঙ্কে হাজার চারেক রেখেছি; খুব ভালো ব্যাঙ্ক। আর বাকী আট হাজার—" অধর গতিবাবুর কাছের দিকে একটু সরিয়া আসিয়া কানে কানে কি বলিল।

গতিবাবু খুব সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"খুব বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছ বাবা। সব চেয়ে ভাল ব্যবস্থা। চোর এলে শোবার ঘরের বাক্স-তোরঙ্গই ভাঙে, ও জায়গায় আর ভুলা যায় না, খোঁজেও না। তুমি খুবই বুদ্ধিমান ছেলে বাবা—ন'টা বাজলো না? এইবার ত নাইতে হবে তোমার? যাও। আমিও চণ্ডীপাঠে বসি।"

স্নানাহার করিয়া বেলা দশটায় অধর কাজে বাহির হইয়া গেলে, চণ্ডীপড়া শেষ করিয়া গতিবাবু নির্মলাকে ডাকিলেন। নির্মলা সামনে আসিয়া দাঁড়াইলে কহিলেন—"মা আমার যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা! আমি এক অন্নপূর্ণার কাছ থেকে চলে এসে আর এক অন্নপূর্ণার কাছে এসে পড়েছি। তা হ্যাঁ মা, আজ এমনদিনে কেউ তোমরা দক্ষিণেশ্বরে গেলে না? আজ যে কত লোক সেখানে যাবে। আমার শরীরটা আজ তেমন সুবিধের নেই, নইলে আমিই—

"আজ সেখানে কি কাকাবাবু?"

"আদ্যাপীঠে আজ আদ্যা মায়ের উৎসব। আজ আদ্যা মাকে দর্শন করলে কোটি অশ্বমেধের ফল। যাওনা মা; এই ত—কত দূরই বা! যাতায়াতে বড়জোর ৩।৪ ঘণ্টা। ভূধর একবার যাক না তোমাকে নিয়ে;—সে গেল কোথায়?"

ভূধর বাড়ীতেই ছিল। বৌদিকে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে যাইবার কথায় সে লাফাইয়া উঠিল এবং তাড়াতাড়ি মাথায় খানিকটা তেল ঘসিয়া কলতলার দিকে ছুটিল।

অধরের শরীরটা সেদিন ভালো ছিল না বলিয়া সন্ধ্যার আগেই গৃহে ফিরিল। আসিয়া দেখিল, বাড়ীতে কেহই নাই। মনে ভাবিল, বোধ হয় তিনজনে মিলিয়া সরকারদের ঠাকুরবাড়ীতে ঠাকুর দর্শনে গিয়াছে। কিন্তু সদর দরজায় একটা তালা দিয়ে যাওয়া উচিত ছিল; বোধ হয় তাড়াতাড়িতে ভুলে গেছে। কিন্তু রান্নাঘরে তালা দিতে ভোলে নি ত! রান্নাঘরের মেঝের মাটির তেতলেই যে তার এতদিনকার জমানো যথাসর্বস্ব—

কিন্তু—এ কি! অধরের মাথা ঘুরিয়া গেল। রান্নাঘরের তালা যে ভাঙ্গা! পাগলের মত রান্নাঘরে ঢুকিয়া অধর যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার মাথায় সমস্ত রান্নাঘরের চালটা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল! চালের জালাটা যেখানে বসানো ছিল, সেখান থেকে সেটা সরানো রহিয়াছে। আর জালার তলাকার মাটী একপাশে স্তূপাকার হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে; তারি এক ধারে পড়িয়া আছে পিতলের শূন্য কলসীটা, যার মধ্যে তার সারা জীবনের সঞ্চিত ৮০ খানা একশো টাকার নোট—উঃ!—অধর অর্দ্ধমৃতবৎ অসাড় হইয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল এবং কখনো অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায়, কখনো বা অর্দ্ধ-প্রকৃতিস্থ অবস্থায় বার বার সেই শূন্য কলসীটার মধ্যে হাত পুরিয়া দেখিতে লাগিল, যদি নোটের বাণ্ডিলটা কোন রকমে তাহার হাতে ঠেকে। কিন্তু—কিন্তু—কিন্তু কিছুতেই আর তাহা তাহার হাতে ঠেকিল না; যাহা ঠেকিল তাহা একখণ্ড হাতে-লেখা চিরকুট। তাহাতে দু'টি মাত্র লাইন লেখা ছিল—'বাবাজী, এখানে আমার গীতা-পাঠের ব্যাঘাত হোচ্চে, তাই এখানে আর থাকা চলল না, সুতরাং এখান থেকে হরিদ্বার চললুম। ভগবান্ তোমাদের মঙ্গল করুন। ইতি; কাকাবাবু।'

দিন পনর কুড়ি পরে, একদিন সকালবেলা অধর সারা হরিদ্বার তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া আসিবার পর কাশীতে 'হাতী-ফটকা'র পথের উপর আসিয়া পড়িল ও অগ্রসর হইতে হইতে 'গৌতম-ভাণ্ডার' নামক ষ্টেশনারী দোকানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সাইনবোর্ডখানা নূতন; গোলাপী, ফিকে-সবুজ ও সোনালী রংয়ে মিশিয়া ঝক্-ঝক্ করিতেছিল। দোকানের শো-কেস্, আলমারী, র‍্যাক্ প্রভৃতি আসবাবপত্রগুলিও নূতনরূপে ঝক্-ঝক্ করিতেছে। হরেক রকমের হরেক দ্রব্যে দোকান ঠাসা। খরিদ্দারের ভীড়ও তেমনি ঠাসা। তারই ফাঁকে দোকানের মধ্যে ঢুকিয়া অধর দেখিল, গতিবাবু পরমোৎসাহে ও সহাস্য বদনে ক্রেতাদের সহিত আলাপ করিতেছেন। তাঁহার বসিবার আসনের এক পার্শ্বে সযত্নে রক্ষিত—গীতা; অপর পার্শ্বে—চণ্ডী। অধরকে দেখিয়া সাদর অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন—"এস বাবাজী!"

যাত্রা-পথে

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

জীবন-পথে যাত্রা কর যাত্রা কর বীরের দল
তীরের মতো হানো তূনীর হ'তে,
একমুখী যে চিত্তখানি লক্ষ্য কর নিশ্চপল,
ভীরুর লাগি নয় সে কোনো মতে।

অর্ঘ্য বলি কৃতাঞ্জলি দাও সকলি জীবন দাও
আর কিছু যা' আছে তোমার কিছু,
সবার আগে সকল দিয়ে সমুৎসুকে সব হারাও
কর্ম্মভীরু চলে সবার পিছু।

জীবন বীণার দুইটী তারে যত্নে বাঁধো একটী সুর
একটী শুধু একটী শুধু নাম;
মনকে বাঁধো, মনকে সাধো, বক্ষ বাঁধো, নয় সে দূর—
চলার পথে মন্ত্র শুধু নাম।

আঁজলা ভরি হায় জহুরী মুক্তাঝুরি তুলিতে চাও
কাহার পানে দৃষ্টি হানো পিছে?
সিন্ধুতলে অর্থে জলে ডুব্‌তে হলে ভয় কি পাও
রত্নাকরে ভিক্ষা করা মিছে।

মৃত্যু সে তো আছেই সখা সেই তো ধ্রুব সত্যসার
করুণা তা'র নেইকো ভীরু জনে,
তোষামোদের খোস দরদে মন ভোলে না হায় তাহার
সয়না বাধা বজ্রবাঁধা মনে।

ভয় তরাসে হায় হুতাশে মিথ্যা ব'সে ভাবনা ভাই
ভয় বা কোথা ভাবনা কোথা শুনি,
আজ না হ'লে কাল না হ'লে হবেই মাটী নয়তো ছাই
মৃত্যু লাগি মিথ্যা গোণাগুণি।

প্রেম মেলে না কিন্‌তে দেনা পাওনাদারে পায় না রে
প্রেম সে মিলে মৃত্যু-পণে শুধু,
ইচ্ছা-সুখে সেই মরণে দুখের পণে পায় তা'রে
যে-ই জীবনে অগ্নি জ্বালে ধূ-ধূ।

সতীর মতো, সীতার মতো বাক্যে কায়ে মন দিয়ে
পূর্ণ কর পূর্ণাহুতি দান,
অগ্নি-ভীরু যে-জন তা'রে ফিরান্ প্রভু নকিয়ে
বিলায় নাকো বিকায় যারা প্রাণ।

ঐ বাজেরে তাহার বাঁশী কাজের মাঝে ডাক শুনে
মন-উদাসী পূজার অভিসারে,
যে-জন শুধু চলতে পথে পিছন ফিরে পথ গুণে
ডুবায় তারে তিমির-পারাবারে।

যে-জন ডাকে—"বন্ধু কোথা কোথায় দীন-বন্ধু হে—"
যাহার কেহ নাহিক তোমা বিনা,
সমুখে নাহি, পিছনে নাহি পরম প্রেমসিন্ধু হে—
তাহারি তরে বাজাও বেণ-বীণা।

ভারতের অর্থ-নৈতিক প্রগতি-পথে বিঘ্ন-বিপত্তি

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে সুদীর্ঘ অষ্টবর্ষব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে জগতে পুনরায় শান্তি সংস্থাপনের শুভ সুযোগ সমুপস্থিত হইয়াছে। জার্মানীর সহিত যুদ্ধের অবসান ঘটিলেও, জাপানের সহিত যুদ্ধ যে এরূপ অপ্রত্যাশিত রূপে অকস্মাৎ নিবৃত্ত হইবে, তাহা যুদ্ধাবসানের অব্যবহিত পূর্ব্বেও কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই। ভীষণ মারণাস্ত্র আণবিক বোমার প্রচণ্ড সর্ববিধ্বংসী শক্তির বিভীষিকা, অথবা আভ্যন্তরীণ সর্ব্বপ্রকার ক্লান্তি অবসাদ ও দুর্ব্বলতার আতিশয্যহেতু, যে কোন কারণেই হউক, জাপানের অকস্মাৎ আত্মসমর্পণের ফলে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা প্রচেষ্টার যে সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বজাতির সমবায়ে তাহার সম্যক্ সদ্ব্যবহার আশু অপরিহার্য্য প্রয়োজন। প্রথম মহাযুদ্ধ অপেক্ষা বহুল পরিমাণে ব্যাপকতর ও প্রচণ্ডতর এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভীষণতর ধ্বংস ও নাশের তীব্র ও তীক্ষ্ণ অভিজ্ঞতা হইতে নিখিল জগতের জাতি সমূহের সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে যে, তৃতীয়বার এইরূপ সার্ব্বত্রিক যুদ্ধের সংঘর্ষণ ঘটিলে, সমগ্র জগতের অস্তিত্বের সহিত তাহার সংস্কৃতি ও সভ্যতারও বিলোপ সাধন ঘটিবে। যাহাদের অজস্র অর্থ ও অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং অপরিসীম আত্মোৎসর্গের ফলে এই প্রলয়ঙ্করী মহাযুদ্ধের নিবৃত্তি ঘটিয়াছে, তাহারাও সর্ব্বান্তঃকরণে আকাঙ্ক্ষা করে যে, তাহাদের ভবিষ্যদ্বংশীয়গণকে কখনই যেন পুনরায় এরূপ সর্ব্বনাশকরী যুদ্ধের সম্মুখীন হইতে না হয়। যুদ্ধান্তে যাহারা এখনও বাঁচিয়া আছে, তাহারা সকলেই ঐকান্তিক ভাবে দীর্ঘস্থায়ী শান্তির রাজ্যে সাংসারিক ও পারিবারিক জীবনের স্নিগ্ধ আবহাওয়ায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে সমুৎসুক। সুতরাং যুদ্ধে জয়ী ও বিজিত সর্ব্বজাতির আন্তরিক অকপট সহযোগিতা দ্বারা জগতে এরূপ শান্তি ও শৃঙ্খলার সৃষ্টি করিতে হইবে, যাহাতে ভবিষ্যতে পৃথিবী হইতে যুদ্ধের সম্ভাবনা চিরতরে বিলুপ্ত হয়। এরূপ প্রচেষ্টার সাফল্য সম্ভবপর কিনা তাহা বিশ্ববিধাতাই বলিতে পারেন। মানুষ গড়ে কিন্তু বিধাতা ভাঙ্গেন; সুতরাং আমরা সে প্রশ্ন পরিহার করিয়া, বর্ত্তমানে সমুপস্থিত সমস্যা-সঙ্কুল অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পর্য্যালোচনা করিব।

রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান বলিয়াছেন যে, "এই যুদ্ধে বিজয়লাভ, অস্ত্রবলের বিজয়লাভ অপেক্ষাও অধিক। এই বিজয়লাভ হইতেছে, অত্যাচারের উপর স্বাধীনতার বিজয়লাভ। কিন্তু স্বাধীনতা সকল লোককে সর্ব্বগুণসম্পন্ন, কিংবা সর্ব্বসমাজকে নিরাপদ করে না। ইহা মানুষকে অন্য কোন প্রকার শাসন-বিজ্ঞান অপেক্ষা অধিকতর নির্বিঘ্ন উন্নতি এবং সুখ এবং শিষ্টাচার উপভোগের সুযোগ প্রদান করে। বিজয়লাভ যথার্থই প্রচুর আনন্দের অবকাশ দেয়, কিন্তু ইহার অপরিহার্য্য আনুষঙ্গিক গুরু দায় ও দায়িত্বও প্রচুর। পরন্তু আমরা সকলেই ঐকমত্য অবলম্বনপূর্ব্বক সুবিচার, ন্যায়-ব্যবহার এবং সহনশীলতার সাহায্যে সুপ্রতিষ্ঠিত শান্তিরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে পারি।" যুদ্ধের নিবৃত্তিই রাজনৈতিক শান্তিপ্রদান করে না; কারণ রাজনৈতিক শান্তির যথার্থ ভিত্তি, অর্থনৈতিক সাম্য। লোকের নিদারুণ দুঃখ এবং অভাব মোচন করিতে পারিলেই বহুল পরিমাণে শান্তিরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে পারা যায়; কিন্তু লোভের প্রচণ্ড ক্রূর লালসা তাহাতে প্রশমিত হয় না। যাহা হউক, জনসাধারণের সর্ব্ববিধ দুঃখ-ক্লেশ ও অভাব অভিযোগ যথাশীঘ্র যথাসম্ভব যথাসঙ্গতভাবে প্রশমিত করিতে প্রযত্নশীল প্রচেষ্টাই রাষ্ট্রমাত্রেরই মুখ্য কর্ত্তব্য; এবং এই কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হইলে অর্থনৈতিক উন্নতিবিধানই প্রকৃষ্ট পন্থা। এই নিমিত্ত রাজনীতির সহিত অর্থনীতির এখন ঘনিষ্ঠ ও দুশ্ছেদ্য সম্পর্ক। ফলতঃ, বর্ত্তমান যুদ্ধের অপ্রত্যাশিত আকস্মিক বিরতিতে সর্ব্বদেশেই রাজনৈতিক অপেক্ষা অর্থনৈতিক সমস্যারই এখন প্রবলতর আশুসমাধান-সাপেক্ষ প্রশ্ন। স্বাধীন এবং স্বায়ত্তশাসনশীল দেশ অপেক্ষা পরাধীন দেশ সমূহে এই সমস্যা অধিকতর জটিল। কারণ পরাধীন দেশমাত্রেই রাষ্ট্রনিয়ন্তা-পরদেশী শক্তির স্বজাতীয় স্বার্থের কুটিলপ্রভাবে অধীনস্থদেশের জাতীয় স্বার্থ প্রভূত পরিমাণে বিধ্বস্ত হয়। এই হেতু অধিকাংশ পরদেশী-নিয়ন্ত্রিত প্রাচ্যদেশের ন্যায়, ভারতের যুদ্ধকালীন কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের জাতীয় স্বার্থের সম্যক অনুকূল শান্তিকালীন প্রকৃষ্ট পরিবর্ত্তন ও পরিণতি প্রচেষ্টা বিপুল বাধাবিঘ্ন সঙ্কুল। ভারতের বর্ত্তমান বড়লাট লর্ড ওয়াভেল যখন বিলাতে শ্রমিক মন্ত্রিমণ্ডলীর আহ্বানে ভারতের শাসনসংস্কার সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করিয়াছিলেন, তখন তিনি যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম সমুত্থিত অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির প্রতি মন্ত্রিমণ্ডলীর অধিকতর মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়া তৎপ্রশমনের আলোচনা করিয়াছিলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ব্যবধান, এবং বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের নিয়ন্ত্রণকালে স্বদেশীয় কৃষি-শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি ও বিস্তার দ্বারা নিখিল ভারতের অতি শোচনীয় অর্থনৈতিক পরিস্থিতির আশু দ্রুত উন্নতি বিষয়ে ভারতের জনসাধারণের আগ্রহ এবং ঐকান্তিকতা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারা আর পরের বাণিজ্য-তরীর গুণ টানিয়া যৎকিঞ্চিৎ উদরান্নের সংস্থানে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেছে না। তাহারাও অন্যান্য স্বাধীন অভ্যুদয়শীল ও অত্যুন্নত জাতির ন্যায় স্বাধীনভাবে স্বদেশের কৃষি-শিল্প ও বাণিজ্যসম্পদকে স্বদেশের কল্যাণ ও স্বজাতীয়ের উন্নতিকল্পে ব্যবহার করিতে কৃতসঙ্কল্প। যুদ্ধের অভিঘাতে স্বদেশের অসহায় অবস্থার তিক্ত অভিজ্ঞতা তাহাদিগকে স্বাধীন ও সমুন্নত দেশসমূহের আত্মনির্ভরশীল সর্ব্বতোমুখী দৃঢ় ও দ্রুত শক্তি-সামর্থ্য-সম্পন্ন কর্ম্ম-প্রচেষ্টার অসামান্য সাফল্য-গৌরবে সচেতন করিয়া নব-জীবনের নব-কর্ম্ম-প্রেরণার আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। আর তাহারা অসহায় শিশুর ন্যায় পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে প্রস্তুত নহে। এই প্রবল আগ্রহের স্রোতকে প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিলে, দুকূল প্লাবন করিয়া বিপরীত ফলের সৃষ্টি করিবে। এই নব-জাগরণের, নব-শক্তির উন্মেষকে যথোপযুক্ত কর্ম্ম-প্রবাহে পরিচালিত করিতে না পারিলে, দীর্ঘ-ত্রিশতবর্ষের দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত স্বার্থের ভিত্তিমূল শিথিল হইয়া

বন্যার স্রোতে ভাসিয়া যাইবে। সুধী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রই এই তথ্য এবং সত্য এখন সম্পূর্ণরূপে আবিষ্কার করিয়া তৎপ্রতি অবহিত হইয়াছেন।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত কোন দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সম্ভবপর নহে। স্বদেশের অর্থনীতিকে সম্পূর্ণরূপে স্বদেশের প্রকৃষ্ট স্বার্থের অনুকূলে পরিচালন করিতে হইলে, অকুণ্ঠিত রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রথম প্রয়োজন। আধুনিক যুগে দ্রুতগতিশীল যানবাহনের সাহায্যে জগতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ইরম্মদ গতিতে যাতায়াতের এবং সর্ব্ব বিষয়ের আদান-প্রদানের এমন সুযোগ-সুবিধা ঘটিয়াছে যে, এখন উভয় মেরুর মধ্যস্থিত সুদীর্ঘ ব্যবধানও সঙ্কীর্ণ হইয়াছে। পরস্পর হইতে বহু বহু দূরবর্ত্তী দেশসমূহও অধুনা পরস্পরের অতি নিকটবর্ত্তী প্রতিবেশী রূপে পরিগণিত হইয়াছে। ফলে, আন্তর্জ্জাতিক রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইয়া সকলে যেন এক পরিবারভুক্ত জাতিসঙ্ঘে পরিণত হইয়াছে। এখন কোন দেশের উত্থান অথবা পতনে, বহু বহু প্রতিবেশী ও দূরবর্ত্তী দেশসমূহের আন্তর্জ্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ উভয়বিধ পরিস্থিতি সহজেই বিক্ষুব্ধ হয়। প্রায় সকল দেশের সহিত সকল দেশের এখন কিছু না কিছু ঘনিষ্ঠ অথবা পরোক্ষ বাণিজ্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান এবং বাণিজ্য সম্বন্ধের মূলে যে অর্থনীতি তাহার সহিত রাজনীতির অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। ওলন্দাজ, পর্ত্তুগীজ, ফরাসী ও ইংরাজ বণিকগণ ভারতের সহিত বাণিজ্যব্যপদেশে যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক লইয়া এদেশে আসিয়াছিল, অদূর ভবিষ্যতে তাহাই রাজনৈতিক সম্পর্কে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। সুতরাং কি স্বাধীন, কি পরাধীন,—কোন দেশের পক্ষেই এখন রাজনৈতিক, অথবা অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন সম্ভবপর ও শুভকর নহে। তবে কোন স্বাধীন দেশ, যেরূপ শক্তি-সামর্থ্যের সহিত উভয় ক্ষেত্রে আত্মস্বার্থ সংরক্ষণ করিতে পারে, কোন পরাধীন দেশের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে। আজ ইংলণ্ডের ন্যায় প্রথম শ্রেণীর পরাক্রমশালী দেশের রাজনীতি, বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রচণ্ড অভিঘাতে, আন্তর্জ্জাতিক অর্থনীতির বশতাপন্ন। যুক্তরাজ্যকেও আজ ঘটনাচক্রে যুক্তরাষ্ট্রের নিকট বহু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে নতি স্বীকার করিতে হইতেছে। পক্ষান্তরে প্রভূত পরিমাণে অর্থ-সামর্থ্যসম্পন্ন হইলেও যুক্তরাষ্ট্রও অধুনা যুক্তরাজ্যকে কিম্বা বর্ত্তমানে তদপেক্ষা হীনবল ফরাসী কিংবা ইতালীকে অতিক্রম করিতে পারে না।

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের অভিঘাতে, এবং বিশেষতঃ এশিয়া খণ্ডে যুদ্ধের অকস্মাৎ নিবৃত্তিতে ভারতে রাজনীতির তুলনায় অর্থনৈতিক সমস্যাগুলিও প্রচণ্ড আকার ধারণ করিয়াছে। রাজনীতি-ক্ষেত্রে আজ যাহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, ঘটনাচক্রে কাল তাহা সম্পূর্ণরূপে সম্ভবযোগ্য হইয়া বাস্তবে পরিণত হয়। অধিক দিনের কথা নহে। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কারের ফলে স্বর্গত লর্ড সিংহের বড়লাটের শাসন-পরিষদে নিয়োগের প্রস্তাবে শান্তিপ্রিয় সপ্তম এডওয়ার্ড, মাত্র বিস্মিত নহেন, রীতিমত বিচলিত হইয়াছিলেন। তৎপরে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে কোন সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে একটি কৌতুককর রঙ্গচিত্র (Cartoon) প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই চিত্রে, মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বর্ণসিংহাসনে উপবিষ্টা এবং তাঁহার আদেশে সপ্তম এডওয়ার্ড সিংহাসন হইতে দুই ধাপ নামিয়া আসিয়া নিম্নস্থিত ভারতের মানচিত্রের প্রতি নিবদ্ধ-দৃষ্টি। ভিক্টোরিয়া বলিতেছেন, Teddy, step down and see if India is still in my Empire? "টেডি, দেখত ভারত এখনও আমার সাম্রাজ্যান্তর্গত কিনা?" তখন পঞ্চম জর্জ্জ সিংহাসনে উপবিষ্ট এবং সম্প্রতি মণ্টাগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ভারতের তদানীন্তন রাজনৈতিক পরিস্থিতির তুলনায় বর্ত্তমান পরিস্থিতির কত পার্থক্য! অধুনা ভারতকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সংস্রব বর্জ্জন করিবার অধিকার সমন্বিত স্বাধীন রাষ্ট্রের চরম স্বায়ত্ত-শাসনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে এবং একদিন পরাধীন ভারত স্বাধীন হওয়ার দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে! রাজনীতির ন্যায় সমাজনীতি ও অর্থনীতিও যুগে যুগে পরিবর্ত্তনশীল। বিগত মহাযুদ্ধের অবসানে তাহার তীব্রতা এবং ব্যাপকতা এবং ধ্বংসের পরিমাণ অনুযায়ী যে রাষ্ট্রনৈতিক, সমাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল, তদপেক্ষা বহুগুণে তীব্রতর, ব্যাপকতর এবং প্রচণ্ডতর ধনজন ও সম্পদ-সম্পত্তি-ধ্বংসকারী, বর্ত্তমান যুদ্ধের অবসানে উদ্ভূত পরিস্থিতি, বহুল পরিমাণে জটিল ও বিভিন্ন। বিগত মহাযুদ্ধের অবসানে যুদ্ধোপকরণ যোগাইয়া বিলাতের নিকট ভারতের যে দেড়শত কোটি টাকার ষ্টার্লিং সংস্থিতি সঞ্চিত হইয়াছিল, আমরা তাহা খয়রাৎ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। কিন্তু এবারে এই ষ্টার্লিং-সংস্থিতির পরিমাণ বহুল পরিমাণে অধিকতর,—সহস্র কোটি টাকারও কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে। বহুল দুঃখ-কষ্ট এবং এমন কি লক্ষ লক্ষ অনশন-মৃত্যুর বিনিময়ে আমরা এই অর্থরাশি সঞ্চিত করিতে সমর্থ হইয়াছি। ইহা আমাদের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক উন্নতির একমাত্র সম্বল;—আমাদের যুদ্ধোত্তর অত্যাবশ্যক সংস্কার সংগঠনের মূলধন। এই সংস্থান হইতে কোন প্রকারে বঞ্চিত হইলে আমরা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া অধঃপতনের অতল তলে নিমজ্জিত হইব; আমাদের অনুন্নত কৃষি-শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি এবং আমাদের অতি হীন ও ক্ষীণ জীবনযাত্রার ধারার অতি প্রয়োজনীয় উন্নয়ন-প্রচেষ্টা চিরতরে ব্যাহত হইবে। অথচ এই অবাঞ্ছিত সঙ্কয়ের সমষ্টির গুরুত্বে বিচলিত হইয়া বিলাতের কোন কোন শক্তিশালী সম্প্রদায় ইহাকে কোন অজুহাতে নাকচ করিবার,—অথবা অন্ততঃ কোন ফিকিরে ইহার পরিমাণ প্রভূত পরিমাণে হ্রাস করিয়া লইবার অন্যায় অভিপ্রায়ে দৃঢ়ভাবে সলা-পরামর্শ করিতেছেন। সৌভাগ্যক্রমে, ব্রেটন্ উড্‌সের আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক বৈঠকে এই সংস্থিতির সুসঙ্গত পরিশোধ পরিকল্পে যুক্তিসঙ্গত আলোচনায় অখণ্ডনীয় সমীচীনতায় নিঃসন্দেহ হইয়া বৃটেনের প্রতিনিধি সঙ্ঘের নায়ক সুপ্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ্ লর্ড কীনেস্ দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, বৃটেন এই ঋণ কখন অস্বীকার কিংবা খর্ব্ব করিবে না। এই ঋণের যথাসত্বর যথাসঙ্গত-ভাবে পরিশোধ ভারতের জীবন-মরণ সমস্যা। এই ঋণকে সঙ্গত

পরিমাণে প্রধানতঃ যুক্তরাষ্ট্রের ডলারে এবং অন্যান্য কয়েকটি যন্ত্রপাতিশিল্পে সমুন্নত দেশের চল্‌তি মুদ্রায় রূপান্তরিত করিবার প্রচেষ্টা এ-পর্য্যন্ত ফলপ্রসূ হয় নাই। ব্রেট্‌ন্ উড্‌সের বৈঠকে পরিকল্পিত আন্তর্জ্জাতিক অর্থভাণ্ডার ইহার বিপুলতা এবং জটিলতায় বিভ্রান্ত হইয়া এইরূপ যুদ্ধ-ঋণের পরিশোধ-সমস্যার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছে। ব্রেট্‌ন উড্‌সের পরিকল্পিত অর্থভাণ্ডার মুখ্যতঃ বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রচলিত মুদ্রা প্রকরণের বিনিময় হারের সুদৃঢ় সমন্বয় রক্ষা করিয়া আন্তর্জ্জাতিক অবাধ বাণিজ্যের ক্ষেত্র বাধাবিঘ্ন ও বিপত্তিশূন্য রাখিবে। আর একটি আন্তর্জ্জাতিক ধনপ্রতিষ্ঠান (Bank) অনুন্নত দেশসমূহকে দীর্ঘ মেয়াদে ঋণ দান করিয়া কৃষি-শিল্প ও বাণিজ্য সমুন্নয়নে সাহায্য করিবে। ব্রেট্‌ন উড্‌সের পরিকল্পনা যুক্তরাজ্যকে সম্পূর্ণ খুশী করিতে পারে নাই। সে বিষয়ে পরে আলোচনা করিব। ইতিমধ্যে ভারতের ষ্টার্লিং সংস্থিতির বিপুলতা এবং বিলাতে ইহার অবরুদ্ধ অবস্থার প্রতি মার্কিণের তীব্র দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। বৃটেনের যুদ্ধ-ঋণের একটি প্রকৃষ্ট অংশ এই ভারতের ষ্টার্লিং সংস্থিতি। ভারতের যুদ্ধোত্তর কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য বিস্তারের ইহাই একমাত্র সংস্থান। এই সংস্থান সাহায্যে ভারত বহু যন্ত্রপাতি, কলকব্জা সাজ-সরঞ্জাম এবং অধুনা ভারতে প্রাপ্তব্য নহে এরূপ বহু উপাদান উপকরণ বিদেশ হইতে আমদানী করিবে। সুতরাং মার্কিণ প্রভৃতি যন্ত্রশিল্পে-সমুন্নত দেশগুলি এই বিপুল অর্থরাশির বিনিময়ে ভারতের বিবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী যোগাইয়া লাভবান্ হইতে সমুৎসুক। বৃটেনের মুদ্রা ষ্টার্লিং-এ সঞ্চিত, এই অর্থসমষ্টিকে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রচলিত মুদ্রায় কিয়দংশে রূপান্তরিত করিতে না পারিলে, তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। বৃটেনের বজ্র মুষ্টি হইতে এই বিপুল অর্থরাশিকে দ্রুত উদ্ধার করিবার নিমিত্ত তাহাদের আগ্রহের অন্ত নাই। শিল্পে সমুন্নত জার্ম্মানী ও জাপানের অধঃপতনের পর, মার্কিণ, ক্যানাডা ও অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশই এখন বৃটেনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু বৃটেন তাহার সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন অর্থরাশিকে স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণ সাধন ব্যতীত অন্য কোন প্রয়োজনে পরিশোধ করিতে প্রস্তুত নহে। এই অর্থে, ভারতে নিজের দৃঢ় অধিকৃত বিক্রয়ক্ষেত্র ব্যতীত, যুদ্ধ পূর্ব্বে জার্ম্মানী ও জাপান প্রচুর পরিমাণে যে-সকল পণ্য ভারতে যোগান দিত, বৃটেন এখন স্বভাবতঃই সেই সকল ক্ষেত্র অধিকৃত করিতে কৃতসঙ্কল্প। অর্থাৎ ভারতের নিকট বৃটেনের এই যুদ্ধ জনিত বিপুল ঋণ বৃটেন পরিশোধ করিতে চাহে, স্বদেশের শিল্পজাত দ্রব্য সামগ্রীর দ্বারা। তাহাতে দুইটি মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। প্রথম, ঋণ-পরিশোধ; দ্বিতীয়, এই ঋণের প্রতি কপর্দ্দকের সাহায্যে স্বদেশের শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ও প্রতিপত্তি সাধন। ভারত ইংরাজের কর্ত্তৃত্বাধীন। সুতরাং যুদ্ধান্তে ভারতে যে বিপুল কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য সমুন্নয়ন ঘটিবে, তাহার সম্পূর্ণ আর্থিক সুযোগ সুবিধা বৃটেন প্রতিদ্বন্দ্বীহীন ভাবে ভোগ করিতে সচেষ্ট। কিন্তু যুদ্ধ সম্পর্কে মার্কিণের নিকট তাহার ঋণ ও বাধ্যবাধকতা অপরিসীম। এখনও অধিকতর পরিমাণে মার্কিণের নিকট হইতে অর্থ-সাহায্য ব্যতীত, বৃটেনের পুনর্গঠন ও পুনরুত্থান আদৌ সম্ভব নহে। পক্ষান্তরে, মার্কিণও এখন ভারতের সহিত যুদ্ধ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে বাণিজ্য-সম্পর্ক সংস্থাপনে সমুৎসুক। দ্বন্দ্ব এই খানে।

সকলেই জানেন যে, যুদ্ধ শেষ হইতে না হইতেই মার্কিণ তাহার ইজারা ঋণ বন্দোবস্ত (Lease-Lend Arrangement) নাকোচ করিয়া দিয়াছে। যুদ্ধের প্রারম্ভে বৃটেন মার্কিন হইতে বিবিধ যুদ্ধোপকরণ ক্রয় করিতেছিল, নগদ মূল্যে। কিন্তু এই পৃথিবীব্যাপী বিরাট যুদ্ধের বিপুল ব্যয়ভার এরূপ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছিল যে, বৃটেনের ন্যায় বিশাল ধনশালী দেশের পক্ষেও নগদ কারবার অধিক দিনের জন্য সম্ভবপর ছিল না। এই নিমিত্ত মার্কিণের তদানীন্তন সহৃদয় রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট তাঁহার অর্থ বিষয়ক উপদেষ্টাদের সহিত পরামর্শ করিয়া সমস্ত মিত্রশক্তির সহিত ইজারা ঋণ বন্দোবস্তে সাহায্য আদান প্রদানে সুব্যবস্থা করেন। এইরূপ পরস্পরের সাহায্যকারী আদান প্রদানের বিহিত ব্যবস্থা ব্যতীত, মিত্রশক্তিদের কাহারও পক্ষে নির্ব্বিঘ্নে সঙ্গতভাবে যুদ্ধ পরিচালনা সম্ভবপর হইত না। অকস্মাৎ এই বন্দোবস্তের প্রত্যাহারে বৃটেনে অভাব অনটন প্রচণ্ড মূর্ত্তিতে উপস্থিত হইয়া তথাকার জনসাধারণের জীবনযাত্রার ধারা বিপন্ন করিত। অধুনা তন্নিবারনার্থ বৃটেন মার্কিণের নিকট হইতে বিপুল ঋণ লইতেছে।

এই যুদ্ধে বৃটেনের দায়-দায়িত্ব ও সঙ্কট ছিল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ফরাসীর আত্ম-সমর্পণের পর বৃটেনকে একাকী অপরিমিত পরাক্রমশালী সর্ব্বগ্রাসী জার্ম্মানীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছিল। জার্ম্মানী কর্ত্তৃক রুশিয়া আক্রমণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, বৃটেনের অবস্থা ছিল অতীব সঙ্কটজনক। সুতরাং তাহার যুদ্ধ ব্যয়ও ছিল বিপুল। এই চরম সঙ্কটকালে মার্কিণ তাহাকে ইজারা-ঋণ প্রথায় সর্ব্ববিধ সাহায্য প্রদান না করিলে, বৃটেনের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারিত। যুদ্ধের অপরিমিত ব্যয়ের ফলে, তাহার ঋণের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে এত অধিক, এবং তদানুসঙ্গিক অর্থকৃচ্ছ্রতা এত প্রবল, যে, এখনও বেশ কিছু দীর্ঘকাল এই ইজারা-ঋণ অথবা তৎপরিবর্ত্তে উপযুক্ত পরিমাণে যথাসম্ভব সাধ্যায়ত্ত কম সুদে বেশ মোটা রকম নগদ ঋণ না পাইলে, তাহার চল্‌তি দৈনিক সর্ব্ববিধ দায়-দায়িত্ব নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করা অসম্ভব। বৃটেনের বিস্তৃত সাম্রাজ্য; এবং বৃটেন নিজেও বিপুল ধন-সম্পদ্‌শালী দেশ; তথাপি বর্ত্তমান যুদ্ধজনিত আর্থিক পরিস্থিতিতে নিমগ্ন হইলে. যে কোন প্রথম শ্রেণীর শক্তি ও বিত্তশালী জাতির পক্ষে একমাত্র আত্মশক্তি সামর্থ্যের উপর নির্ভর করিয়া, জাতীয় স্বার্থ ও মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখা অসম্ভব হইত। যাহা হউক, বৃটিশ সরকারের অর্থ নৈতিক উপদেষ্টা মনীষী লর্ড. কীনেস্ এবং মার্কিণের বৃটিশ রাজদূত লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের বিচক্ষণ দৌত্য এবং আপ্রাণ প্রচেষ্টার ফলে মার্কিণ সদাসয়তার সহিত যথাসম্ভব সঙ্গত ও সাধ্যায়ত্তভাবে বৃটেনকে ঋণ দ্বারা সাহায্য করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধের অবসানে বৃটেনের যুদ্ধ-ব্যয়ের সমষ্টির তুলনায়, বর্ত্তমান যুদ্ধের অবসানে, একুন যুদ্ধ-ব্যয়ের পরিমাণ অন্ততঃ চতুর্গুণ অধিক। মার্কিণের নিকট বিপুল ঋণ ব্যতীত সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশসমূহের নিকট বৃটেনের ঋণের পরিমাণ ৩,৫০০ মিলিয়ন ষ্টার্লিং অর্থাৎ চৌদ্দ সহস্র কোটি টাকা। তন্মধ্যে

ভারতের নিকট ষ্টার্লিং সংস্থিতিতে সঞ্চিত ঋণের পরিমাণ ১,০০০,০০০,০০০ বিলিয়ন ষ্টার্লিং অর্থাৎ দেড় হাজার কোটী টাকা।

তিনটি প্রধান সর্ত্তে মার্কিণ বৃটেনকে ঋণ প্রদান করিতেছে। সকলেই জানেন, জগতে এখন দুইটি প্রচলিত মুদ্রা প্রধান। বৃটেনের ষ্টার্লিং এবং মার্কিণের ডলার। বৃটেনের আয় এবং আয়ত্তান্তর্গত দেশসমূহের মুদ্রামান ষ্টার্লিং-এ নিবদ্ধ। ইহাকে "ষ্টার্লিং এলাকা" বলে এবং মার্কিণের প্রভাবে প্রভাবান্বিত দেশসমূহ "ডলার এলাকা"র অন্তর্ভুক্ত। এখন এই ষ্টার্লিং-ডলারের একটি দৃঢ় বিনিময়-ভিত্তিতে অবাধ আদান-প্রদান ব্যতীত আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য অচল হয়। কিন্তু স্ব স্ব জাতীয় স্বতন্ত্র কৃষি-শিল্প ও বাণিজ্য-স্বার্থ-সংরক্ষণার্থ অধুনা প্রায় কোন দেশই অবাধ আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের পক্ষপাতী নহে। সকলেই নিজের নিজের দেশ ও এলাকার মধ্যে স্ব স্ব কৃষি ও শিল্পোৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে বিক্রয় করিয়া স্বদেশী কৃষি-শিল্পের এবং স্বজাতীয় শিল্পী-বণিকের সমৃদ্ধিসাধন করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প। সুতরাং প্রত্যেক স্বাধীন দেশই বিবিধ উৎপাদন ও আমদানী-রপ্তানী শুল্কের ব্যূহ রচনা করিয়া স্বদেশী কৃষিশিল্প ও বাণিজ্যকে বিদেশী কৃষিশিল্প ও বাণিজ্যের কবল হইতে রক্ষা করে। ভারতের কৃষিশিল্প বাণিজ্যের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে এই শুল্ক-নীতি বিশদ হইবে। কৃষি-প্রধান হইলেও ভারতের কৃষি এখনও প্রাচীন যুগের ন্যায় বারিবর্ষণের উপর নির্ভরশীল। ভারতের সর্ব্বত্র সেচ-ব্যবস্থা নাই এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সার ব্যবহার এবং আধুনিক যন্ত্র-পরিচালিত হলকর্ষণের কোন ঐকত্রিক প্রচেষ্টা নাই। শিল্প-বাণিজ্যেও ভারত অনুন্নত। যুদ্ধের অভিঘাতে কয়েকটি ক্ষুদ্র মধ্যম শিল্পের প্রসার ঘটিয়াছে বটে; কিন্তু এখন যুদ্ধান্তে বৈদেশিক প্রতিযোগিতার প্রচণ্ডতায় তাহারা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে কিনা, সন্দেহের বিষয়। ভারত সরকার অবশ্য যুদ্ধান্তে কোন কোন যুদ্ধ-শিল্পকে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে; কিন্তু আমলাতান্ত্রিক শাসন-যন্ত্রকে জাতীয় শাসনতন্ত্রে পরিণত করিতে না পারিলে, শাসক ও শোষক সম্প্রদায়ের স্বার্থের কুটিল আবর্ত্তে জাতীয়-স্বার্থ অতলতলে নিমজ্জিত হইবে। পক্ষান্তরে, নাম করিবার উপযুক্ত কোন গুরু অথবা বৃহৎ শিল্প আমাদের নাই। আমাদের প্রচুর কাঁচামাল সম্পদের প্রতি শিল্পে সমুন্নত জাতিদের বিশেষতঃ, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের শ্যেন-দৃষ্টি রহিয়াছে। আমাদের কাঁচামাল সস্তায় কিনিয়া স্বদেশের বিবিধ শিল্পে তাহাদের পাকামালে রূপান্তরিত করিয়া আমাদিগের নিকটেই অতি উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিবার অভিসন্ধি তাহাদের প্রয়োজনের তাগিদে পূর্ব্বাপেক্ষাও দৃঢ়তর ও কুটিলতর হইয়াছে। সুতরাং বিভিন্ন আমদানী-রপ্তানী শুল্কের ও সরকারী সংরক্ষণ সাহায্যের সহায়তা ব্যতীত আমাদের দেশের প্রভূত কাঁচামালকে আমরা আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত বিভিন্ন শিল্পের সাহায্যে পরিণত পণ্যে পরিবর্ত্তিত করিতে না পারিলে আমাদের অভাব ও দারিদ্র্য ঘুচিবে না। মার্কিণের ন্যায় শিল্পে সমুন্নত এবং ধনী দেশও উচ্চ শুল্ক প্রাচীর রচনা করিয়া স্বদেশীয় শিল্প-বাণিজ্যকে পুষ্ট করিয়াছে ও করিতেছে। যুক্তরাজ্যও সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশসমূহের মধ্যে পক্ষপাতমূলক শুল্ক প্রশমন-নীতি (Imperial Preferance) প্রবর্ত্তিত করিয়া আত্মস্বার্থ সংরক্ষণ করিয়াছে। মার্কিণ এখন অবাধ বাণিজ্য চাহে। মার্কিণ এতদিন আত্মদেশ ও কয়েকটি নিকটবর্ত্তী দেশে বাণিজ্য করিয়া সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে বৃটেনকে সাহায্য করিবার প্রচেষ্টায় বহু লোভনীয় ও লাভজনক সুযোগ-সুবিধার হদিস সে পাইয়াছে। এখন সে বৃটেনকে প্রদত্ত ঋণের পরিশোধ প্রচেষ্টায় বিশাল বাণিজ্য ক্ষেত্র ভারত প্রভৃতি পূর্ব্বদেশীয় বিক্রয় ক্ষেত্রে সরাসরি বাণিজ্য সম্বন্ধ সংস্থাপনে কৃতসঙ্কল্প। মার্কিণ এখন পূর্ব্ব গোলার্দ্ধস্থিত দেশ-সমূহের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে বাণিজ্য করিতে সমুৎসুক। বৃটেনকে অর্থ সাহায্যের ব্যাপদেশে মার্কিণ সাম্রাজ্যিক শুল্ক প্রশমন নীতির মূলোচ্ছেদ পূর্ব্বক, অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রতিষ্ঠা করিতে বদ্ধপরিকর। ষ্টার্লিং এলাকার সহিত ডলার এলাকার পার্থক্য বিদূরিত করিয়া, বৃটেন যাহাতে তাহার ষ্টার্লিং এর মূল্য দৃঢ় রাখে, এবং সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশসমূহের নিকট তাহার যে-প্রচুর ঋণ জমিয়াছে, তাহাকে আংশিক অথবা সম্পূর্ণ রূপে নাকোচ করিয়া একমাত্র মার্কিণের নিকট ঋণ রাখে, মার্কিণের এখন তাহাই অভিপ্রেত। বিলাতে ভারতের যে বিপুল ষ্টার্লিং সংস্থিতি সঞ্চিত হইয়াছে, তাহার কিয়দংশকে ডলারে পরিণত করিয়া মার্কিণ সেই ডলারের বিনিময়ে ভারতে যন্ত্রপাতি কলকব্জা সাজ-সরঞ্জাম এবং বিবিধ উপাদান-উপকরণ যোগাইতে অভিলাষী। আমরাও সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি যে, আমাদের ষ্টার্লিং সংস্থিতিকে বিভিন্ন দেশের প্রচলিত মুদ্রা প্রকরণে রূপান্তরিত করিয়া আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী সুলভে সেই-সেই দেশের বাজার হইতে সত্বর ক্রয় করিয়া আমাদের দেশের পুরাতন ও নূতন-নূতন শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করি। আমাদের যে ডলার সংস্থিতি সাম্রাজ্যিক ঐকত্রিক ডলার সংস্থিতিতে আবদ্ধ আছে, আমরা তাহারও আশু মুক্তি প্রার্থনা করি। আমরা আমাদের এই যৎকিঞ্চিৎ ডলার সংস্থিতি আমাদের অত্যাবশ্যক প্রয়োজনে লাগাইতে পারিতেছি না; ইহার সুযোগ সুবিধা ভোগ করিতেছে শাসনশক্তি। বিগত মহাযুদ্ধের অবসানে বৃটেন মার্কিণের নিকট তাহার ৬৫০ মিলিয়ন ডলার ঋণ নানা কারণে পরিশোধ করিতে পারে নাই। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে ইজারা-ঋণের মারফতে মার্কিণের নিকট বৃটেনের ঋণের পরিমাণ ২৯,৫০০ মিলিয়ন ডলার। সুতরাং মার্কিণ এখন বৃটেনকে উপযুক্ত বন্ধক কিংবা জামিন ব্যতীত অধিক ঋণ দিতে আশঙ্কান্বিত হইয়াছিল। তথাপি যুদ্ধোত্তর নিরাপত্তা ও শান্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, সে তাহার জ্ঞাতি বৃটেনকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ রাখিবার নিমিত্ত যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিয়াছে। এই ঋণ প্রদানের ফলে ভারতের ষ্টার্লিং সংস্থিতির বিপুল ক্ষতি হইবে, তবে তাহার কিঞ্চিৎ ডলারে রূপান্তরিত হইতে পারিবে।

ভারতের সহিত মার্কিণের ইজার' ঋণ বন্দোবস্ত সরাসরি নহে, বৃটেনের মারফতে। যুদ্ধারম্ভ হইতে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত মার্কিণের রপ্তানীর পরিমাণ ২,০৩৩ মিলিয়ন ডলারেরও

ঊর্দ্ধে। যুদ্ধোপকরণই অবশ্য ইহার প্রকৃষ্ট অংশ, তথাপি শিল্প সংক্রান্ত দ্রব্য সামগ্রীর পরিমাণও কম নহে, ৪৭১ মিলিয়ন ডলার। ভারতও ঐ সময়ে বিপরীতমুখী ইজারা ঋণ (Reverse Lease-lend) প্রক্রিয়া দ্বারা মার্কিণে প্রেরণ করিয়াছে ৫১৭ মিলিয়ন ডলার মূল্যের দ্রব্য-সামগ্রী। ইহার মধ্যে ভারতে অধিষ্ঠিত মার্কিণ সৈন্যের খাদ্য সামগ্রী সরবরাহের পরিমাণ ৩৬॥ মিলিয়ন ডলার। এই বিপুল আদান-প্রদানের সূত্রে ভারতের সহিত মার্কিণের ভবিষ্যৎ বাণিজ্য-সম্পর্কে যে বিরাট সম্ভাবনা প্রকটিত হইয়াছে, মার্কিণের পক্ষে তাহার প্রলোভন পরিত্যাগ দুঃসাধ্য। বিশেষতঃ যুদ্ধের কয়েক বৎসরে মার্কিণের শিল্প-বাণিজ্যের কোন ক্ষতি হওয়া দূরে থাকুক, তাহার প্রভূত প্রসার ও প্রবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। যুদ্ধান্তে যুদ্ধবিমুক্ত জনসমূহের কর্ম্মসংস্থান নিমিত্ত শিল্পবাণিজ্যের অধিকতর প্রসার ও পরিবর্দ্ধন প্রয়োজন। সুতরাং মার্কিণের স্বার্থের গতি কোন পথে, তাহা সুস্পষ্ট এবং বৃটেনের স্বার্থের তাহা পরিপোষক নহে, বরং পরিপন্থী। এই উভয় সঙ্কটের মধ্যে ভারতের গতিপথ বহু বাধাবিঘ্নবিপত্তিসঙ্কুল হইবে। সুতরাং আমাদের প্রকৃষ্ট অর্থনৈতিক জাতীয় স্বার্থের প্রতি দৃঢ় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে আমাদের কৃষিশিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিতে হইলে, সর্ব্বতোভাবে তন্নিমিত্ত প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা।

চৌকো-চোয়াল

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া

(চৌদ্দ)

বিস্ময়বিমূঢ়ভাবে প্রধান ম্যানেজার বললেন, "এর মানে কি ?"

কাষ্ঠহাসি হেসে শুষ্ককণ্ঠে শ্রীকান্তবাবু বললেন, "কিছুই বুঝতে পারছি না। জ্যাক্‌সনের আর শান্তি চক্রবর্ত্তীর ঘুষ খেয়ে, ওয়ার্থলেস পুলিশগুলো সাজিয়েছে—ডাহা মিথ্যে গল্প! শুনতে আর ধৈর্য্য থাকছে না। গলা শুকিয়ে গেছে, তাই একটা চুরুট ধরাতে যাচ্ছিলাম। এতে বাধা দিয়ে কি বাহাদুরী হোল, উনিই জানেন।"

আত্মসম্বরণ ক'রে শান্তকণ্ঠে মিঃ সোম বললেন, "হুঁ, আমিও জানি—অপদার্থ পুলিশদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে, সসম্মানে প্রতিষ্ঠা-ভাজন হ'য়ে, ঐশ্বর্য্য প্রতাপ ও উচ্চপদ লাভ ক'রে নিরাপদে সমাজের বুকে বিচরণ করছেন, এমন ধূর্ত্ত, ধড়িবাজ, চতুর ব্যক্তি আমাদের আশেপাশে অনেক আছেন! দুর্নীতিমূলক উপায়ে তাঁরা আইন ব্যবসায়ে সাফল্যলাভ করলেও, আমি তাঁদের ইতর, জোচ্চোর, ফেরেপ্‌বাজ বলব। সদাচারী ভদ্রলোক বা প্রকৃত বুদ্ধিমান্ বলব না।"

সহসা অমানুষিক শক্তি প্রয়োগে শ্রীকান্তবাবু নিজেকে যেন প্রকৃতিস্থ ক'রে নিলেন। দানবীয় ঔদ্ধত্যে চক্ষু রক্তবর্ণ ক'রে প্রচণ্ড অবজ্ঞায় সুরে বললেন, "রাখুন, রাখুন! নীতিজ্ঞানের লেক্‌চার আমার ঢের শোনা আছে। পারেন, আমার নামে কেস রুজু করুন। আমিও যখন কোর্টে দাঁড়িয়ে এর কাটান্ জবাব দেব, তখন টের পাবেন,—আমি কে ? আমিও অনেক গোয়েন্দা, অনেক পুলিশের হাতে হাতকড়া লাগিয়ে ছেড়েছি! উঠুন দাদা, চলুন আমরা যাই—"

বাধা দিয়ে প্রধান ম্যানেজার বললেন, "থামো, থামো। বোসো একটু। হ্যাঁ মশাই, রাজ এষ্টেটের দলিল আর টাকা কি হোল ?"

মিঃ সোম শ্রীকান্ত বাবুর দিকে রিভলভার উদ্যত রেখে, তাঁর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে ধীরভাবে বললেন, "সব উদ্ধার হয়েছে। সব নম্বরী নোট, সব দলিল পাওয়া গেছে। শুধু খুচরো ১২০০্ টাকা পাওয়া যায় নি। ১লা ডিসেম্বর কলকাতা থেকে আসবার সময় সেই পৈশাচিক শক্তিশালী, ক্ষিপ্র কর্ম্মতৎপর হত্যাকারী দুটো নূতন স্যুটকেশ কিনে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। ট্রেণে ক্ষিতীশবাবুকে হত্যা করে, সেই নির্জ্জন কামরায় নির্ব্বিঘ্নে স্যুটকেশ দুটায় দলিলগুলি পাত্রান্তর করেন আর ট্রাঙ্কে প্যাক করেন মৃতদেহ। লাস চালান দেওয়া হয় ক্ষিতীশবাবুর পুকুরে,—সেই দলিলপূর্ণ স্যুটকেশ দুটি, আর শান্তিবাবুকে জব্দ করবার জন্য তাঁরও স্যুটকেশটি চালান দেওয়া হয়—বাঁকাবংশী গ্রাম প্রদক্ষিণ ক'রে নৌকাযোগে গঙ্গাপার করে নৈহাটীতে এক তথাকথিত সাধুর আশ্রমে। সাধুটি বহু অসাধু-কার্য্যদক্ষ,—হাকিমবশকারী, পরস্ত্রী-বশকারী, সাংঘাতিক বিদ্যেওলা পিশাচসিদ্ধ ব্যক্তি।"

"তাঁর নাম ?"

"দুরিতানন্দ স্বামী।"

"কে তার আশ্রমে সেগুলো রেখে এসেছিল ?"

তাঁর এক বশীকরণবিদ্যায় ওস্তাদ, প্রেতসিদ্ধ শিষ্য। গুরু-ভক্তির আতিশয্যে তিনি গুরুদেবকে তাঁর চোরাই মালের, "মাল-সামালদার" ক'রেছিলেন। দুরিতানন্দকে প্রচুর উপঢৌকন উপহার দিয়ে প্রসন্ন করে, বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল, স্যুটকেশগুলায় আইনের কেতাব আছে। এখন গুরুর আশ্রমে সেগুলা সাধন-ভজন করুক, পরে তিনি নিয়ে যাবেন। তরুণ বহু অনুসন্ধানের পর পুলিশের সাহায্যে সেগুলি উদ্ধার ক'রেছেন।

উত্তেজিত হ'য়ে প্রধান ম্যানেজার বললেন, "কে সে শিষ্য ? কি নাম তার ?"

"নাম তাঁর শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্রীকান্ত চ্যাটার্জ্জি!"

চক্ষের পলকে শ্রীকান্ত বাবুর হাতে হাতকড়া এঁটে দিয়ে

পুলিশ অফিসার বললেন, "শ্রীকান্তবাবু, অপ্রিয় কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য আমি দুঃখিত। শান্তিবাবুকে গুম্ করা, তাঁর স্যুটকেশ চুরি করা, রাজ-এষ্টেটের টাকা আর দলিল চুরি করা এবং ক্ষিতীশবাবু আর রাধাশ্যাম দাসের হত্যাপরাধে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হোল।"

সঙ্গে সঙ্গে তিনি ওয়ারেণ্ট বের ক'রে দেখালেন।

রুদ্ধকণ্ঠে শ্রীকান্তবাবু বললেন, "এ সমস্তই পুলিশের সাজানো গল্প! আমাকে অনর্থক হয়রান করবার জন্য মিথ্যা ষড়যন্ত্র! আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ কই? সাক্ষী কই?"

দু'জন কনেষ্টবল হাতকড়িবদ্ধ, গঞ্জিকারক্তচক্ষু, বিহ্বল, বিভ্রান্ত বঙ্কিম গড়াইকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। কটমট চক্ষে তার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ ক'রে শ্রীকান্তবাবু সক্ষোভে বললেন, "ওঃ! তুই? নিমকহারাম! শয়তান! আমি না দিনকে রাত ক'রে তোকে খুনের দায় থেকে বাঁচিয়েছিলাম?"

সরোদনে বঙ্কিম বললে, "আমি কিছুই বলিনি বাবু! পুলিশ নিজেই খুঁজে খুঁজে সব বের করেছে! ছ'শো টাকা দিয়েছিলেন, সব ছারে গোল্লায় গেল। পুলিশ সেই পাঁচশো টাকার নোট কেড়ে নিয়েছে। আপনি ভূত-পেরেত-সেদ্ধ উকিল, সবেতে 'উত্তোর-পার' হবেন জানতুম। এখন আমাকে শুদ্ধু মারলেন।"

হাতকড়ি-বদ্ধ বেচারাম ও ভজহরিকে টেনে নিয়ে জমাদার, সাব্‌ইন্‌স্পেক্টার ও কয়েকজন কনেষ্টবল ঘরে ঢুকল। পিছনে শান্তিবাবু ও তরুণ। তরুণ বললে, "এই যে শ্রীকান্তবাবু, আপনি প্রস্তুত! এই নিন আপনার দুই গুরুভাই, ত্বরিতানন্দের বশীকরণবিদ্যার শিষ্য রামানন্দ আর ভূতানন্দকে! এরা স্বীকার করেছে—আপনার স্বহস্তলিখিত চিঠি নিয়ে গিয়ে, আপনার আদেশ মতই এরা শান্তিবাবুকে যাত্রীনিবাসে এনে ক'রে রেখেছিল। শান্তিবাবুর ঘড়ি আংটি চুরি ক'রে এরা তো আপনাকেই দিয়েছে। সেগুলো কোথা?"

উদ্ধতভাবে শ্রীকান্তবাবু বললেন, "আমি জানি না।"

তরুণ বললে, "তাতে পরিত্রাণ নাই। যে কোন কঠিন উপায়ে হোক, সে আমি জেনে নেবই! শ্রীকান্তবাবু, গোয়েন্দা মাত্রেই হাঁদা গর্দ্দভ, আর আসামী মাত্রেই অসাধারণ বুদ্ধিমান,—এ ধারণা সাধারণ ঔপন্যাসিকদের মত আপনারও খুব দৃঢ় ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আপনার ঐ ঠেলে বের হওয়া চওড়া চৌকো চোয়ালই আমার প্রথম পথপ্রদর্শক হোল! দ্বিতীয় দফা আমায় পথ দেখালে—ক্ষিতীশবাবুর শব-ব্যবচ্ছেদে কর্ত্তব্যজ্ঞান-হীন হিন্দু স্ত্রী, ও হিন্দু সন্তানের দুরভিসন্ধিপূর্ণ সম্মতিদানে, আপনার সেই অগ্নিবর্ষী বক্তৃতায়! হিন্দুশাস্ত্রে আপনার প্রবল অনুরাগ দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম! রাজা বিক্রমাদিত্যও তাল-বেতাল-সিদ্ধ—অর্থাৎ এক বিশেষ প্রকারের পিশাচসিদ্ধ ছিলেন, কিন্তু তিনি কখনো এমন—'আত্ম নরকস্থায়, জগৎ অহিতায় চ' পৈশাচিক শক্তি চালনা করেন নি। বলিহারি আপনার অসম সাহসকে! শান্তিবাবুকে আজ নিমন্ত্রণ করেছেন, আর বেচা-ভজাকে দিয়ে পরিবেশন করাচ্ছেন!"

রাগে ফোঁস ফোঁস ক'রে শ্বাস ফেলতে ফেলতে শ্রীকান্তবাবু বললেন, "এদের identification করলে কে? শান্তি তো?"

সহাস্যে তরুণ বললে, "না, ওরা নিজেরাই! আপনার দরাজ হাতের উপহার, মদের বোতলগুলো পার করে, কারণানন্দে বিভোর হয়ে নিজেরাই আত্মপ্রকাশ করেছে! বশীকরণের মন্ত্র-তন্ত্রগুলো আওড়াতে তখন ভুলে গেছল। কাজেই শান্তিবাবুর আজ ধাঁধা লাগে নি। তিনিও চিনতে পেরেছিলেন।"

তারপর আর একটু হেসে বললে, "আপনার শ্রীশ্রীগুরুদেবকে চিনে নেবার সৌভাগ্যও আমি লাভ করেছি। বৈষ্ণব সাধুবেশে তাঁর আশ্রমে ঢুকে মোটা প্রণামী দিয়ে আতিথ্য প্রার্থনা করতেই তিনি আমার কপাল লক্ষ্য ক'রে বললেন, "তোর মধ্যে সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞান রয়েছে।" শুনে কৃতার্থ হলুম! কারণ, চোরাই মালের সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞান অন্বেষণে তখন জীবন উৎসর্গ করতে আমি প্রস্তুত। এমন সময় দূর দেশ থেকে তাঁর এক ধনী ভক্তের এলো টেলিগ্রাম!—সংবাদ,"তিনি অকস্মাৎ পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়েছেন, গুরুদেব দয়া করে প্রতিকার করুন।" খবর শুনেই তিনি দু'হাতে তুড়ি দিয়ে আহ্লাদে নৃত্য শুরু করলেন! অনুগত ভক্ত ও শিষ্য-শিষ্যাদের বলতে লাগলেন, "আমি বলেছিলাম—ওর রোগ ধরাব, তাও ধরিয়েছি! এখন অগ্নি ভাল করব? নাকের জলে, চোখের জলে করব, মুখে রক্ত ওঠাব, হাজার হাজার টাকা নেব, তবে ভাল করব—"ইত্যাদি ইত্যাদি। সঙ্গে সঙ্গে সত্যই টাকা নিয়ে লোক এলো। তিনিও সিন্দুকে টাকা তুলে চাবিবদ্ধ করে, পৈশাচিক চিকিৎসায় পিশাচ ছাড়াতে গেলেন। ছোট বেলায় রূপকথার গল্প শুনেছিলাম—এক শ্রেণীর লোক ভূত,প্রেত, পিশাচ, বশ করে তাদের সঙ্গে প্যাক্ট করে,—রাজকন্যা রাজপুত্রদের ঘাড়ে পিশাচের আবেশ ঘটাত, এবং নিজেরা ওঝা সেজে গিয়ে অর্দ্ধরাজ্য ও রাজ-কন্যা নিয়ে তাদের আরোগ্য করত। এখানেও দেখলুম সেই ব্যাপার!"

রুদ্ধশ্বাসে প্রধান ম্যানেজার বললেন, "আর—আর কি দেখলেন?"

"অনেক—অনেক ব্যাপার! পুরুষের চরিত্রনিষ্ঠা এবং নারীর সতীত্ব বলে কোনও কুসংস্কার ওঁদের মত উচ্চশ্রেণীর অসাধারণ ব্যক্তিদের মধ্যে থাকা না কি অধর্ম্ম। তাই ওঁরা সদম্ভে অনেক রকম মহাধর্ম্ম পালন করছেন, তাও দেখলাম। শাস্ত্রবাক্য ও মহাজনদের আচারের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলুম—ওঁরা "নষ্টপ্রজ্ঞঃ, পরস্ত্রী, পরধনহরণে সর্ব্বদা সাভিলাষী"—ভয়াবহ পিশাচ-প্রকৃতির জীব। অনেক খবর আমি টের পেয়েছি। প্রত্যক্ষ প্রমাণও পেয়েছি। এখন তা বলবার সময় নাই। আবশ্যক হয় তো ভবিষ্যতে প্রকাশ করব। এঁরা পৈশাচিক শক্তির ব্যবসায়ে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করছেন, হাজার হাজার লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করছেন। আর শ্রীকান্ত বাবুর মত পিশাচ-শক্তির উপাসক শিষ্য-শিষ্যাদের দল তৈরী করে পৃথিবীর মহা অনিষ্ট সাধন করছেন। এঁরা Alchemist, বিষাক্ত জড়িবুটি দ্রব্যগুণের অপরসায়ণ প্রয়োগেও ওস্তাদ! তার সাহায্যেও অনেকের মস্তক চর্ব্বণ করছেন!"

মিঃ সোম বললেন, "কিন্তু সেই পিশাচ-সিদ্ধদের আশ্রমে হানা দিয়ে তরুণ যখন মাল আবিষ্কার করলে, পুলিশ যখন মাল উদ্ধার করলে, তখন পিশাচ বাবাজীরা কেউ তাদের সঙ্গে পাল্লা লড়তে এলো না, এটাও আশ্চর্য্য! পিশাচদেরও জানা আছে, তাদের শক্তির অনেক—অনেক ঊর্দ্ধে ভগবৎ-শক্তির স্থান! দুর্ব্বলচেতাঃ নরনারীদের উপর পিশাচ উৎপীড়ন চালাতে পারে, কিন্তু পিশাচও ভয় করে ভগবদ্‌ভক্ত আত্মজ্ঞানীকে! তরুণের তত্ত্বজ্ঞানের তাড়ায় শ্রীমৎ স্বরিতানন্দও সম্প্রতি ফেরার!—সতর্ক সশঙ্কিত হয়ে তিনি গা-ঢাকা দিয়েছেন।"

তরুণ বললে, "ধরা পড়ে ভজহরি একটা ভয়ানক সংবাদ স্বীকার করেছে। আজকের এই ভোজ মহোৎসবের অন্তরালে শ্রীকান্ত বাবুর একটি চমৎকার শয়তানি-মতলব প্রচ্ছন্ন ছিল। চিফ ম্যানেজার মশাই, পুলিশ অফিসার মশাই শুনে রাখুন!—শ্রীকান্ত বাবুর বাড়ীতে যদি আপনারা আজ ভজা, বেচার, স্পর্শিত,—বশীকরণমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত, খাবার খেতেন, তা হলে আপনাদের কারুর আর নিষ্কৃতি ছিল না। হয়ত বশীকরণমন্ত্র-প্রভাবে আপনাদের বুদ্ধি-বৃত্তি স্তম্ভিত হোত, হিতাহিত-বিবেক লুপ্ত হোত, শ্রীকান্ত বাবুর ইচ্ছাশক্তির ক্রীতদাস হয়ে, আপনারাও তাঁর দুষ্ক্রিয়া সাধনের সাহায্যকারী—ভজা, বেচা, বঙ্কিম গড়াইয়ের দলে ভর্ত্তি হতেন; নয়ত কেউ কেউ তীব্র বিষের প্রভাবে স্বর্গলাভ করতেন। সাবাস শ্রীকান্ত বাবুর পৈশাচিক প্রতিভাকে"।

চক্ষু বিস্ফারিত করে পুলিশ অফিসার বললেন, "তাই আমাদের খাওয়াবার জন্ত এত আগ্রহ! কিন্তু বিষের প্রভাবটা না হয় বুঝলাম! বশীকরণটা কি? হিপ্‌নটিজম্?"

তরুণ বললে—"ভিন্ন প্রণালীর। তন্ত্রোক্ত ইন্দ্রজালবিদ্যার অন্তর্গত শয়তানি! সাধারণের অবিশ্বাস্য হলেও সত্যের অনুরোধে স্বীকার করছি,—স্বরিতানন্দের আশ্রমে ঢুকে এদের তুকতাক্ বশীকরণ কৌশলের কতকগুলি রহস্য টের পেয়েছি! এরা সেই শয়তানি বিদ্যার কৌশলেই শান্তিবাবুকে মোহাচ্ছন্ন করেছিল! আপনাদেরও আজ সেই কৌশলে মুঠায় পুরত!"

হতবুদ্ধি চিফ ম্যানেজার বললেন, "নারায়ণ, নারায়ণ! শ্রীকান্ত, তুমি পিশাচ-সিদ্ধ! বশীকরণ দক্ষ!. তাই আমাদের কায়েল করে রেখেছিলে? অন্তরে অন্তরে তোমায় ঘৃণা করতুম, তবু তোমার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারতুম না! ক্ষিতীশ তাই তোমার হুকুমে কলের পুতুলের মত উঠত, বসত? শেষে তুমিই তাকে খুন করলে?"

শ্রীকান্ত বাবু জবাব দিলেন, "মিথ্যা অভিযোগ! আমি কি করে খুন করলুম? কোথা পাব আমি পটাসিয়াম সায়োনাইড?"

মিঃ সোম বললেন "ভেবেছেন, আমরা ঘাসে মুখ দিয়ে চলি? আপনি জানতেন না, এবার জেনে নিন্। ১৯১৬ সালে পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসের বিজ্ঞান-বিভাগে যাঁরা অধ্যাপক ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন—আমার নিকট-আত্মীয়। আর কয়েকজন ছিলেন, তাঁর সতীর্থ। তাঁদের সাহায্যে আপনার কলেজ জীবনের সব ইতিহাস সংগ্রহ করেছি। আপনার মত কীর্ত্তিমান্ ছাত্রকে তাঁরা আজও ভোলেন নি। কলেজের দরোয়ানগুলো থেকে, ল্যাবরেট্যারির বেয়ারা, যার হোষ্টেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পর্য্যন্ত কাউকে বাদ রাখি নি। আপনার ঘুষ খেয়ে যে যা দুষ্কার্য্য করেছে,—সব খবর বের করে এনেছি!"

ক্রুর দৃষ্টিতে একবার মিঃ সোমের পানে চেয়ে, শ্রীকান্ত বাবু নতমুখে স্তব্ধ রইলেন। এবার আর প্রতিবাদ করলেন না।

প্রধান ম্যানেজার বললেন, "বুঝলাম না। ব্যাপারটা কি?"

ক্ষুব্ধ স্বরে মিঃ সোম বললেন, "ঘুস আর চুরির কৌশলে বরাবর পাশ করেছেন। খেটে খুটে শিখে পড়ে নয়। এম, এস-সি, পড়বার সময় কলেজ ল্যাবরেটারি থেকে প্রচুর পরিমাণে পটাসিয়াম সায়োনাইড উনি চুরি করেন। তারপর দুর্দ্ধর্ষ চাতুরী-কৌশলে দু'জন নিরপরাধ ছাত্রকে সেই অপরাধে ফাঁশিয়ে দেন। উনি নিষ্কৃতি লাভ করে আসেন—সসম্মানে! সে পটাসিয়াম সায়োনাইড এখনো সর্ব্বদা ওঁর সঙ্গে সঙ্গে ফেরে! তরুণ, সার্চ্চ কর।"

তরুণ অগ্রসর হয়ে শ্রীকান্ত বাবুর প্রত্যেক পকেট খুঁজে কাগজ-পত্র, সিগার কেস, দেশলাই, রুমাল ইত্যাদি নানা জিনিস বের করে টেবিলে রাখলে। শেষে ওয়েষ্ট কোটের ভিতর গুপ্ত পকেট হাতড়ে বের করলে একটি চামড়ার চুরুট কেস। তা থেকে বের করলে একটি চুরুট।

চুরুটটা দেখে বঙ্কিম গড়াই আর্ত্তনাদ করে বললে, "আমি তো বলি নি! কিছুতে বলি নি! পুলিশ ধাপ্পা দিয়ে সন্ধান বের করে নিলে! বললে, রাধাশ্যামের মদে যখন বিষ মিশিয়ে দেন, তখন সেখানকার গাছে একজন বসে ছিল, সে দেখেছে! আমি কি করি, কাযেই স্বীকার করেছি! আপনার মত এত বুদ্ধি কারুর নেই জানতুম, কিন্তু ওদের বুদ্ধি,—আরো—আরো বেশী! হায় হায় বাবু—আপনি এত বোকা?

তরুণ আলোর সামনে চুরুটটার দুইপ্রান্ত ধরে টান দিতেই, সেটা পিস বোর্ডের খাপের মত দু'খণ্ড হয়ে খুলে গেল! ভিতর থেকে বেরুলো ছোট একটি শিশি। শিশির অর্দ্ধাংশ পটাসিয়াম সায়োনাইডে পূর্ণ।"

মিঃ সোম প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, "শ্রীকান্ত বাবু, এর পরেও কি অস্বীকার করবেন?"

শ্রান্ত কণ্ঠে শ্রীকান্তবাবু বললেন, "নিশ্চয় করতুম, যদি পকেটে হাত দিতে বাধা না দিতেন! চুরুটটা মুখে ঠেকাতে পেলে প্রাণ থাকতে সত্য স্বীকার করতুম না। এখন নিরুপায়! স্বীকার করছি, সব সত্য! মানছি—এবার হারলুম!"

মিঃ সোম বললেন, "Education does not make a man good. It only makes him clever—usually for mischief—" এ মতবাদের জীবন্ত আদর্শ, আপনারা গুরু-শিষ্যের দল! অনেক বিদ্যা শিখেছেন, শুধু নিজকে সৎ—আর পবিত্র করতে শেখেন নি!"

তরুণ বললে, "কর্ম্মফল কাউকে রেহাই দেয় না। রাগ করবেন না শ্রীকান্তবাবু,—আমরা নিমিত্ত মাত্র! স্বেচ্ছাচার মহাপাপ, শুধু জীবনী-শক্তি শোষণ করে মৃত্যুকেই ডেকে আনতে জানে, —আর কিছু পারে না। চোখা ধর্ম্মের কাহিনী শুনবে না জানি, তবু আপনাদের সবাইকেই অনুরোধ জানাচ্ছি, পারেন তো বিচার করে

দেখবেন—পুরাণো যুগের ঐতিহাসিক তথ্য!—তাড়কা রাক্ষসী ভয়াবহ শক্তি-সম্পন্না স্ত্রীলোক ছিল! শূদ্র তপস্বীও তীব্র তপস্যার জোরে অসাধারণ শক্তি লাভ করেছিল। কিন্তু রাক্ষসী লালসা এবং হিংস্র মনোবৃত্তি তাদের—সেই অলৌকিক-শক্তিকে, মানব-সমাজের কল্যাণ-ধ্বংসে, নিযুক্ত করেছিল! সে জন্য অবধ্য স্ত্রীলোক—অবধ্য তপস্বীকেও ভগবান রামচন্দ্র স্বহস্তে বধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আপনাদের গুরু-শিষ্যদলের দুর্মতি, দুর্ব্বুদ্ধি সংহার ক'রে, তিনি বিবেক জাগ্রত করুন। শাস্তির আঘাতে আপনাদের অন্তরে চৈতন্য উদ্বোধিত হোক, আপনাদের আত্মা মঙ্গলের পথে পরিচালিত হোক—জন-সমাজেরও কল্যাণ হোক!"

সমাপ্ত

বাংলা ও হিন্দী সাহিত্যের পারস্পরিক তুলনা ও প্রগতি

শ্রীউমানাথ সিংহ

হিন্দী সাহিত্যের সঙ্গে আমার সুগভীর পরিচয় না থাকলেও কিছু-কিঞ্চিৎ পরিচয় ক'রে নিতে বাধ্য হয়েছি এবং সে-পরিচয় ঘটেছে কয়েকটি হিন্দী মাসিক-ত্রৈমাসিক পত্রিকা নিয়মিত-পাঠে এবং কয়েকটি উপন্যাস, কবিতার ভিতরে। সাহিত্যের ধারা এবং গতিপথ কোন্‌দিকে এবং কতদূর এগিয়েছে তা সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা নিয়মিত পাঠ করলেই কিঞ্চিৎ উপলব্ধিতে আসে।

এই প্রবন্ধ লিখতে প্রবৃত্ত হওয়ার ছোট্ট একটি ইতিহাস আছে, সেটি বলা দরকার। একদিন কোন এক সংবাদ-পত্রের অফিসে ব'সে রয়েছি। সামনের টেবিলের উপর বই এবং পত্রিকা সমালোচনা-প্রতীক্ষায় বহু জায়গা থেকে এসে স্তূপাকার হ'য়ে পড়ে রয়েছে। সেইগুলো একটা একটা ক'রে উল্টে উল্টে দেখছি। চোখে পড়ল একটা বই—তার নাম "আঁখকে কিরকিরি"—গ্রন্থকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রথমে একটু হতভম্বই হ'য়ে পড়লাম—রবি ঠাকুরের এই বই? ভিতরে খুলে দেখলাম এবং বুঝলাম যে রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাসের অনুবাদ এই বইটি। তৎক্ষণাৎ সমস্ত হিন্দী-সাহিত্য ও সাহিত্যিকের উপর থেকে আমার শ্রদ্ধা যেন সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ল? এই কি অনুবাদ!—'চোখের বালির' অনুবাদ 'আঁখকে কিরকিরি'? Dust of eyes? যিনি অনুবাদ করেছেন তাঁর বাংলাভাষা ও সাহিত্যে কতটুকু দখল তা বুঝতে এতটুকু বিলম্ব হ'ল না। এই ঘটনা থেকেই আমার মনে জাগল যে, এই দুই সাহিত্য পারস্পরিক তুলনায় কে কতখানি এগিয়েছে তা একবার সমালোচকের চোখে দেখতে দোষ কি—এই দুই সাহিত্যের ইতিহাসে কারা কতখানি বিপ্লব আনতে পেরেছে এবং সেই বিপ্লবকে কারা কতখানি সাফল্যমণ্ডিত করতে পেরেছে নবতর সাহিত্যের বিকাশনায়, সেটা একবার বিচারের প্রয়োজন।

বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ এতই দ্রুত ঘটেছে যে, পৃথিবীর কোন সাহিত্যের ইতিহাসে তা দেখতে পাওয়া যায় না। বাংলার প্রথম গদ্য-সাহিত্য রামরাম বসুর, প্রতাপাদিত্য-চরিত্র। তার প্রথম প্রকাশ ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে—এক শ' বছর আগে। এই এক শ' বছরের পর আজকের সাহিত্য পড়লে একটা ভৌতিক ঘটনা বলেই বোধ হয়। এত অল্প সময়ের ভেতর একটা সাহিত্য তার সমস্ত রূপ বদলে নতুন রূপে প্রকাশমান হ'তে পারে—তা কল্পনাতীত। হিন্দী সাহিত্যের এই এক শ' বছরের বিগত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে খুব-বেশী পার্থক্য বোধ হবে না—যেটুকু পার্থক্য চোখে পড়বে তা নগণ্য। অবশ্য এর কারণ আছে। এই অল্প দিনের মধ্যে বাংলা-সাহিত্যক্ষেত্রে যে সব মহামনীষীর আবির্ভাব ঘটেছে তা পৃথিবীর কোন সাহিত্যক্ষেত্রেই সম্ভব হয়নি। রামমোহন, বঙ্কিম, মাইকেল, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সত্যেন দত্ত, নজরুল—পর পর এতগুলো অলোক-সামান্য প্রতিভার উদয় হয়েছিল ব'লেই এতখানি অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে বাংলা সাহিত্যের পক্ষে। কিন্তু হিন্দী-সাহিত্যে সে রকম যুগান্তকারী প্রতিভার সাক্ষাৎ পাই না। হিন্দী-সাহিত্যের প্রগতিবাদে এইটিই প্রধান কারণ। বড় বড় প্রতিভার কথা বাদ দিলেও দেখতে পাই যে, যে ছোট প্রতিভার উদয় হয়েছে তাতে পরিবর্ত্তনের শক্তি বা চেষ্টা ছিল না—এখনও নেই। সেই গতানুগতিক পথেই তাদের সাহিত্য-সৃষ্টি চালিয়ে গেছে।

এই সাহিত্যের প্রথম দিক্‌কার সংক্ষিপ্ত একটা ইতিবৃত্ত দেবার চেষ্টা করা যাক।

শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র শুক্লের 'হিন্দী সাহিত্যকা ইতিহাস' থেকে জানা যায় যে, বাংলা ও ভারতীয় অন্যান্য ভাষার মত হিন্দী ভাষাও প্রকৃত ভাষা থেকে নিঃসৃত হয়েছে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমদিকে দিল্লীর দরবারের রাজকবি পারসিক বংশজাত আমীর খসরো বলে গেছেন যে, হিন্দুদের একটা স্বতন্ত্র ভাষা আছে—তা হিন্দী। এই খসরৌ প্রথমে হিন্দী ও ফার্সী মিলিয়ে কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। হিন্দীর অনেক উপভাষাও আছে—মগাইয়া বোলী, মৈথিলী, মাগধী, খাড়বোলী, ব্রজভাষা, রাজস্থানী, বুন্দেলখণ্ডী, বাগেলখণ্ডী, ভোজপুরিয়া ইত্যাদি। বর্ত্তমান হিন্দীভাষা ও সাহিত্য আধুনিক। এখন হিন্দী সাহিত্যিকেরা হিন্দীভাষাকে সপ্তম বা অষ্টম সম্বৎ থেকে আরম্ভ হয়েছে বলে অনুমান করেন। আবার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে 'বৌদ্ধ গান ও দোঁহা' নামে যে-তিনটি পুস্তক আবিষ্কার ক'রে এনেছিলেন, তা অপভ্রংশ ভাষাতে লিখিত ব'লে স্বীকৃত হয়েছে। হিন্দী সাহিত্যকেরা একেও হিন্দীভাষা ও সাহিত্যের অন্তর্গত ব'লে দাবী করেছেন। কিন্তু বাংলা ভাষাতত্ত্ববিদেরা বলেন বাংলা-ভাষাই প্রাচীন। এই থেকে বুঝা যায় যে, বর্ত্তমানের হিন্দী ও বাংলা-

ভাষা উপরের দিকে গিয়ে এমন এক জায়গায় উপস্থিত হয়েছে, যাতে উভয় ভাষাই মৌলিকত্ব দাবী করতে পারে।

এর পর থেকেই দু'টি সাহিত্যই স্ব স্ব ইতিহাস রচনা ক'রে চলতে থাকল। মধ্যবর্তী কোন সময়ের আলোচনায় লিপ্ত হ'য়ে এই প্রবন্ধকে ভারাক্রান্ত করব না। একেবারে বর্তমান যুগের সাহিত্য এবং তাদের পারস্পরিক প্রগতি সম্বন্ধে দু'চারটে কথা বলব।

আজকাল সাহিত্যের ভিতর যে-নতুন বিষয়বস্তুর আগমন দেখতে পাওয়া যায়—সেটাকে বিদ্রোহীর দুঃসাহসিক প্রচেষ্টাই বলা চলে। শুধু ভাবালুতা ও কল্পনার রাজ্য আর ত' নেই—শুধু রাজ-রাজড়া জমীদার-সামন্ত নিয়েই সাহিত্যের ক্ষেত্র ব্যস্ত থাকে না—সমাজের প্রত্যেকটি কোণ থেকে আজকের সাহিত্য তার বিষয়বস্তু আহরণ করছে। সমাজ-চেতনার গভীর স্পর্শ—সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর মনের কথা আজকের সাহিত্যের প্রাণ। সমাজের শোষণকারীদের প্রতি শোষিতের যে-বিদ্রোহের বাণী, তাকে বয়ে বেড়াচ্ছে আধুনিক সাহিত্য। ভারতীয় সমস্ত সাহিত্যের মধ্যে প্রগতির অগ্রদূত বাংলা-সাহিত্য। প্রত্যেক দিন নতুন নতুন রূপ নিয়ে বাংলা সাহিত্যের প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা ব'য়ে চলেছে—পাঠকরা বেসামাল হয়ে পড়ে তার অর্থ উপলব্ধি করতে —তাকে হৃদয়ঙ্গম করতে। বঙ্কিম-সাহিত্য থেকেই সমাজ-চেতনার স্পর্শ আমরা পাই। তারপর রবীন্দ্রনাথ—তারপর শরৎচন্দ্র। বর্তমানে বাংলার প্রায় সকল আধুনিক কবি-সাহিত্যিকই তাঁদের কলম ধরেছেন দৃঢ় মুষ্টিতে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহুমুখী প্রতিভায়—বাংলা কাব্য-সাহিত্যকে এমনভাবেই রূপে-রসে-রঙে—নূতনতম আঙ্গিকে সৃষ্টি ক'রে গেছেন, যা বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে একটা বিশিষ্ট আসন দখল করেছে।

সে-দিক থেকে হিন্দী-সাহিত্য আজ অনেক পিছনে পড়ে রয়েছে। হিন্দী সাহিত্যে প্রগতিবাদের স্পর্শ পাই প্রেমচাঁদের গল্প ও উপন্যাস থেকে। প্রেমচাঁদের 'গোদান'এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই উপন্যাসখানি হিন্দী-সাহিত্যকে অনেক সমৃদ্ধ ক'রে তুলেছে। এই 'গোদান' বাংলায় অনূদিত হবার কথা শুনেছি। হিন্দী সাহিত্যের পক্ষে এটা গৌরব যে, বাংলা-সাহিত্য তার মর্য্যাদা স্বীকার করছে—এবং হিন্দী-সাহিত্যের ভিতর থেকে এইটিই বোধ হয় প্রথম গ্রন্থ—যা নেয়া হ'চ্ছে। তারপর মৈথিলী শরণ গুপ্তের কতকগুলো কবিতায় কিছুটা অগ্রগতির চিহ্ন বিদ্যমান। এর পর যে-সকল হিন্দী-সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে তা' প্রায়ই বাংলা এবং ইংরেজী থেকে ধার করা—কোন মৌলিকতার দাবী তার নেই। উচ্চশ্রেণীর জীবন এবং চরিত্র-চিত্রণ নিয়েই কল্পনার শূন্য ভাব-মার্গে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে। কঠোর বাস্তবের নিষ্পেষণকে সাহিত্যের ভিতর আজও ফুটিয়ে তুলতে পারেনি। প্রকৃতিবাদ, ছায়াবাদ, রহস্যবাদ প্রভৃতি নিয়েই মশগুল। আজকাল দু'চার জায়গায় রুশ সাহিত্যের সাম্যবাদ তথা প্রগতিবাদের ছায়াপাত চোখে পড়ে। পুঁজিবাদীদের উপর সাহিত্যের যে বিজয় অভিযান—তাদের নতুন যে প্রকাশভঙ্গী, নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর যে রূপ-দ্যোতনা, তার রস গ্রহণ করতে হিন্দী সাহিত্যের এত দেরী কেন হ'ল তা ঠিক বুঝে উঠা যায় না।

হিন্দী কবিতার ভিতর পন্থজীর 'যুগবাণী' কবিতায় কিছুটা আশার লক্ষণ দেখতে পাই। তিনি তাতে লিখছেন :

"আত্মা হী বন জায় দেহ নব,
জ্ঞান-জ্যোতি হী বিশ্ব-স্নেহ নব,
হাস-অশ্রু, আশা-আকাঙ্ক্ষা
বন মাবে খাদ্য, মধু, পানী!
যুগকী বাণী!
স্বপ্ন বস্তু বন যায় সত্য নব,
স্বর্গ-মানসী হী ভৌতিক ভব,
অন্তর্জগ হী বহির্জগৎ
বন জাবে বীণাপাণী,
যুগকী বাণী!

পন্থজীর কবিতার মধ্যে নবীনতার ইঙ্গিত, সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্তির আশ্বাস পাই। 'সিনকর' ও ভগবতী চরণ বর্ম্মার নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। 'সিনকর' আধুনিক হিন্দী কাব্যে বেশী লোকপ্রিয়। তাঁর ভাষাও বেশ তেজস্বিনী এবং হৃদয়স্পর্শী। যেমন :—

শানোকো মিলতা দুধ-বস্ত্র, ভুখে বালক অকুলাতেঁ হয়
মাকি হড্ডী সে চিপক, ঠিঁঠুর জারোকী রাত বিতাতে হয়।
যুবতীকে লজ্জা বসন বেচ যব ব্যজ চুকায়ে জাতে হয়,
মালিক যব তেল ফুলে লোঁপর, পানী সা দ্রব্য হোতেঁ হয়।
পাজী মহলোঁকা অহঙ্কার দেতা মুঝকো তব আমন্ত্রণ।

বাংলা কাব্য থেকে একটি মাত্র উদ্ধৃত করে আর করলাম না। কারণ এতই বিচিত্র অজস্রতা যে, দু'চারটে উদ্ধৃতিতে কিছুই প্রকাশ করা যায় না।

হিন্দীভাষা খুব প্রকাশময় (expressive)। কিন্তু এমন একটা জড়ত্ব তার পায়ে পায়ে জড়িয়ে রয়েছে যে, হিন্দী কাব্যে ছন্দ-বৈচিত্র্যের লীলা দেখান যায় না। এমন কোন শক্তিশালী কবির জন্ম এখনও হয়নি, যার লেখনী হিন্দী ভাষাকে নানা বন্ধন-মুক্ত ক'রে ছন্দের অজস্র দোলনায় দুলিয়ে দিতে পারে। সে-দিক থেকে বাংলা ভাষা রাজ-সিংহাসন অধিকার করেছে।

রবীন্দ্রনাথের একটা প্রসিদ্ধ কবিতা "প্রশ্নের" অনুবাদ প'ড়েছিলাম। হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী সম্পাদিত হিন্দী বিশ্ব-ভারতী পত্রিকায়। অত সুন্দর কবিতা যেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। অনুবাদই হয়েছে—প্রাণ সঞ্চার করতে পারেনি। প্রাণ সঞ্চার করাই তো অনুবাদকের কৃতিত্ব। এখানে আমি প্রথমে হিন্দী অনুবাদ দিয়ে পরে মূল বাংলা কবিতাটিও উল্লেখ করছি। আপনারা নিরপেক্ষ বিচার ক'রে দেখবেন হিন্দী ও বাংলা কাব্য-সাহিত্যের পার্থক্য কোনখানে, আর কেনই বা এত সঙ্কোচময় তার পাদবিক্ষেপ!

ভগবান্, তুমনে যুগ যুগমে বার বার ইস্ দয়াহীন সংসারমে,
অপনে দূত ভেজে হৈঁ,
যে কহ গয়ে হৈঁ, ক্ষমা করো,

কহ গয়ে হয়, প্রেম করো—অন্তর সে বিদ্বেষকা বিষ
নষ্ট কর দো।

বরণীয় হয় বে, স্মরণীয় হয় বে.
তৌভি আজ দুর্দিনকে সময়
উন্‌হে নিরর্থক নমস্কারকে সাথ বাহরকে দ্বার সে
হী লৌটায়ে দে রহা হুঁ।
ম্যয়নে দেখা হয়—গোপন হিংসা নে
কপট-রাত্রিকা ছায়ামে নিঃসহায়কো আহত
কিয়া হয়।
ম্যয়নে দেখা হয়—প্রতিকারবিহীন জবরদস্তকে
অপরাধ সে
বিচার কী বাণী চুপচাপ একান্ত মে রো রহী হয়,
ম্যয়নে দেখা হয়—তরুণ বালক উন্মত্ত হো কর দৌড়
পড়া হয়,
বেকার হী পত্থর পর শির পটক্‌কর মর গয়া হয়—
ক্যয়সী ঘোর যন্ত্রণা হয় উসকী!
আজ মেরা গলা রুঁধ গয়া হয়,
মেরী বাঁশরী কা সঙ্গীত লো গয়া হায়,
অমাবস্যা কী কারা নে মেরে সংসারকো দুঃস্বপ্নোকে নীচে
লুপ্ত কর দিয়া হয়:
ইসীলিয়ে তো আঁসুভরী আঁখো সে
তুমসে পুছ রহা হুঁ—
জো লোগ তুমহারী হওয়া কো বিষাক্ত বনা রহে হুঁয়,
উন্‌হে ক্যয়া তুমনে ক্ষমা কর দিয়া হয়?
উন্‌হে ক্যয়া তুমনে প্যার কিয়া হয়?

এরপর মূল বাংলা-কবিতাটি দিলাম:—

ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত, পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে,
তারা বলে গেল 'ক্ষমা করো সবে,' বলে গেল 'ভালোবাসো-
অন্তর হ'তে বিদ্বেষ বিষ নাশো'।
বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির-দ্বারে
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে।
আমি-যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রিছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে,
আমি-যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি-যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রনায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে।
কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সংগীতহারা,
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে,
তাইতো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে—
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো।

এই দুটোকে বিচার ক'রে দেখলে দেখতে পাবেন বাংলার প্রত্যেক শব্দটি রাখা হয়েছে বেঁকিয়ে চুরিয়ে। ছন্দকে হত্যা করে নিষ্প্রাণ একটা কাঠামো খাড়া করে দেয়া হয়েছে।

লক্ষ্য করলে বেশ বুঝা যায় যে, একদল রক্ষণশীল মনোবৃত্তি নিয়ে নতুনের সম্ভাবনাকে অভ্যর্থনা জানাতে দ্বিধা বোধ করেছে। কিন্তু তা করলে চলবে না। ইতিহাস বদলায়—সমাজ বদলায়—মানুষের মনোবৃত্তি বদলায়, আর তার সঙ্গে বদলায় তার সাহিত্য। তবে সাহিত্য ছাড়া সবগুলো বদল হয় একটা অর্থনৈতিক কারণে, কিন্তু সাহিত্যের পরিবর্তন করতে হ'লে চাই প্রতিভার শক্তি। হিন্দী ভাষার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে তাকে এমনভাবে রূপ দিতে হবে —যাতে ভাব-ছন্দ নিয়ে ভারতের অন্যতম গৌরবময় সাহিত্য ব'লে পরিগণিত হ'তে পারে। রবীন্দ্রনাথ ভাষা তৈরী করেছেন আগে, তারপর সেই ভাষা দিয়ে রচনা করেছেন তাঁর সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ একটি ইতিহাস—ইতিহাসের মতোই তাঁর আবির্ভাব এবং তিরোভাব। হিন্দী সাহিত্যে এখন প্রয়োজন সেই শক্তিধর ইতিহাসের। সে ইতিহাসের সৃষ্টি হয় পাঠক ও লেখকের সাধন-সমন্বয়ে, গভীর পর্য্যালোচনায়—কঠোর অনুশীলনে। হিন্দী-সাহিত্যে তারই অভাব—এখন সেইটি দূর করাই হিন্দী-সাহিত্যের অগ্রগতির প্রথম সোপান॥

সচ্চিদানন্দ-তর্পণ

শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর

বৎসরান্তে হে কর্ম্মবীর তোমারে স্মরি,
মরদেহ ত্যজি' বিরাজ করিছ তোমারি কর্ম্মক্ষেত্র ভরি'।
করিতে তোমার স্মৃতিরক্ষণ
করিনিক মোরা কোন আয়োজন,
বিশ্বকর্ম্মা তব অক্ষয় স্মৃতিমন্দির গিয়াছ গড়ি'।
জীবন ভরিয়া করেছ কর্ম্ম ব্রহ্মে স'পেছ কর্ম্মফল।
তব সাধনারে করে জীবন্ত তোমার অসীম ধর্ম্মবল।
পূজিলে সত্য শিবসুন্দর,
কর্ম্ম ভক্তি জ্ঞানের সাগর,
কর্ম্মের পথে ধর্ম্মের পথে তোমারি আশিষ কামনা করি।

নাটিকা

শ্রীজনরঞ্জন রায়

তৃতীয় দৃশ্য

কমলবাগান খেলার মাঠ। চ্যারিটি ম্যাচ।

বৈকাল

(বাহিরে বিপুল জনতা...হাজার হাজার লোক টিকিট পায় নাই।...বাছাই দেশী দলের বারোজন একদিকে...মিলিত দলের বাছাই বারোজন অন্য দিকে।)

(কাঁটা লাগাম মুখে ডোভার ঘোড়া একটি গাছতলায়—ছোট বড় বহু মোটরগাড়ী শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজানো আছে... কার্ত্তিকের গাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। গাড়ী হইতে নামিয়া সে মেম্বারদের গেট দিয়া খেলার মাঠে ঢুকিল। দেখিল একটি বাইনোকিউলার হাতে ডোভা গ্যালারিতে বসিয়া আছে।)

(খেলা আরম্ভ হইয়াছে। দর্শকের মধ্যে দুই দলের সমর্থকদের পরস্পরবিরোধী হর্ষধ্বনি, উৎসাহবাক্য, চীৎকার, শ্লেষ ও গালি বর্ষণ। যারা খেলিতেছে তাহাদের অপেক্ষা যারা দর্শক তাহাদেরই যেন বেশী মাথাব্যথা।)

(প্রথমার্দ্ধে কোন গোল হইল না।)

(দ্বিতীয়ার্দ্ধে দেশী দলকে বেপরোয়াভাবে অন্যদল ফাউল্ করিতে লাগিল। অথচ তাদের স্বপক্ষ দর্শকেরা 'নো ফাউল... নো ফাউল' করিয়া চীৎকার করিতেছে। বারে বারে ফাউল করিতেছে যে লোকটি, তাকে রেফারি মাঠের বাহির করিয়া দিতে চাহিল। সে বাহির হইল না। দর্শকদের মধ্যে একদল নামিয়া রেফারিকে প্রহার করিতে লাগিল। বেড়া ডিঙ্গাইয়া বাহিরের লোক আসিয়া রেফারির প্রহারে যোগদান করিল। দুইদলে রক্তারক্তি সুরু হইয়াছে। এদিকে ঝড় উঠিয়াছে। কড় কড় শব্দে মেঘ ডাকিতেছে! শ্রাবণের ধারা পড়িতে লাগিল। চীৎকার—হর্ষের বহুবিধ নিনাদ—যেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাভিনয়! কোঁচায় পা জড়াইয়া লট্‌পট্ খাইতেছে কত বাবু!)

নিরুপায় জনসমুদ্রের আর্ত্তনাদ।

(ডোভা, কার্ত্তিক প্রভৃতি সব বাহিরে।)

কার্ত্তিক। (ডোভাকে) আমি কি আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারি?

ডোভা। না—ধন্যবাদ।

(বৃষ্টি প্রবলভাবে নামিল। মেম্বারদের ত্রিপলঢাকা ঘরে কার্ত্তিক আশ্রয় লইল। ভীড় ও গুমটে সেখানে তিষ্টিতে না পারিয়া সে বাহিরে আসিল। বৃষ্টি কমিয়াছে। সে নিজের গাড়ীর কাছে আসিয়া ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করিল—)

কার্ত্তিক। সাদা ঘোড়ার সওয়ার?

ড্রাইভার। মিসি সাব্ বহুত আগে চল্ গেয়ি।

কার্ত্তিক। পুরা দমসে চলো।

(রাস্তার মোড় ঘুরিতেই দেখা গেল ডোভার জিনশূন্য ঘোড়াটি হ্রেষাধ্বনি করিতেছে।)

(তাহা দেখিয়া চীৎকার করিল)

কার্ত্তিক। কিড্‌ন্যাপড্—কিড্‌ন্যাপড্—গুম্ হয়ে গেছে— দৌড়ো—

(বিদ্যুৎ বেগে কার্ত্তিকের গাড়ী চলিতেছিল। ঘোড়-সওয়ার পুলিশ হাত তুলিয়া তাহার গাড়ীর গতিবেগ কমাইতে বলিল। রাস্তার মুখে লাল আলো জ্বলিতেছে। সব গাড়ি থামিয়া আছে। ঝড়ের সময় রাস্তার ধারের বড় একটা গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া একটি মোটর গাড়ী চাপা দিয়াছে। গাড়ীর আরোহীরা জখম হইয়াছে। বহুলোক নিজের গাড়ি ছাড়িয়া সেখানে দেখিতে গিয়া জটলা করিতেছে।)

(কার্ত্তিক তার গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িল। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে সে দুদিকের সব গাড়ী দেখিতে দেখিতে চলিল। পর্দা ঢাকা একখানি মোটর হইতে যেন একটা ক্ষীণ কাতরধ্বনি তার কাণে গেল। গাড়ীখানায় তখন কোন লোক ছিল না। ক্ষিপ্র হস্তে কার্ত্তিক গাড়ীটা খুলিল—তার পা-দানিটা গদিচাপা— সে গদিখানা উঠাইয়া ফেলিল।—দেখিল হাতমুখ-বাঁধা ডোভা তাহার তলায় চাপা দেওয়া। নিমেষের মধ্যে সে পাঁজাকোলা করিয়া ডোভাকে উঠাইল...দ্রুতপদে নিজের গাড়ীতে তাহাকে নিয়া গিয়া ভিতরের গদিতে বসাইল...নিজের বর্ষাতি টুপিটা তার মাথায় পরাইয়া দিল)।

(রাস্তার মুখে হলদে আলো জ্বলিয়াছে। সব গাড়ী গতিশীল হইয়া উঠিল। সে লাফাইয়া ড্রাইভারের পাশে গিয়া বসিল)।

কার্ত্তিক। (নিজের গগল্‌স্ ও বর্ষাতি জামা ডোভাকে দিয়া) এটাও পরে' ফেলুন...এখনো যেন চেনা যাচ্ছে।

(ড্রাইভারকে) ইস্‌প্লানেড...।

(রাস্তার মুখে সবুজ আলো জ্বলিল। গাড়ী দ্রুতবেগে চলিয়াছে, শীতে ডোভা কাঁপিতেছে।)

কার্ত্তিক। (ডোভাকে) আপনার পাশে ঝোলানো ফ্ল্যাস্ক [flask] চা আছে...ঢেলে নিয়ে খান।

(চৌরঙ্গির কাছে গাড়ী আসিলে ড্রাইভারকে)—বাঁয়ে—

ডোভা। (দুর্ব্বল কণ্ঠে) মোড় ফেরালেন কেন?... ঘোড়াটার খোঁজে?

কার্ত্তিক। প্রধানতঃ তাই...আর যদি কোনো দুর্বৃত্ত [illegible] নিয়ে থাকে তার হাত এড়াতে।

(নিকটে পৌঁছিলে দেখা গেল কাদামাখা ঘোড়াটি [illegible] সেখানে দাঁড়াইয়া আছে।)

ডোভা। (সানন্দে) হোয়াইট্ ষ্টার...হোয়াইট্ ষ্টার?

(মনিবের ডাক শুনিয়া ঘোড়াটি ঘাড় দুলাইয়া হ্রেষাধ্বনি করিতে লাগিল।)

(কার্ত্তিকের আদেশে তাহার ড্রাইভার নামিয়া গিয়া [illegible] গদি প্রভৃতি খুঁজিতে লাগিল।)

কার্ত্তিক। (ডোভাকে) আপনার কি মনে হো?

ডোভা। তখন প্রবল ঝাপটা…জলের ধারা পড়ছে তীরের মতো…তাকাতে পারছি না।…পিছন থেকে ঘোড়ার পায়ে ধাক্কা মারলে একখানা মোটর।—জিন-গদি ছিঁড়ে ছিট্‌কে প'ড়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে কে এসে হাত-পা-মুখ বেঁধে ঐ মোটরে তুললে। আমার দম্ বন্ধ হয়ে আসছিল—আপনি তখন উদ্ধার করলেন।

(তাহারা দুইজনেই নামিল।…ঘোড়ার পিঠে জিনগদি লাগানো হইল।)

ডোভা। এবার আমি ঘোড়ার পিঠে উঠি (সে ঘোড়ায় উঠিল)।

কার্তিক। দুষ্ট লোকগুলো ফলো (follow) করবে না তো?

ডোভা। লাট সাহেবের বাড়ীর কাছে, ভয় কি?

কার্তিক। বেশ…আমার গাড়ীর আগে আগে ধীরে ধীরে চলুন।…আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আমি কলেজে যাবো।

(পার্ক ষ্ট্রীটে ডোভার পিতার বাড়ীর কাছে তাহারা আসিল, দারোয়ান দ্বার খুলিল…সহিস ঘোড়ার লাগাম ধরিল…অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে ডোভা বলিল—)

ডোভা। আপনি দয়া কোরে একটু অপেক্ষা করুন—আমি শীগ্‌গির আসছি।

(ডোভা ঘোড়ায় চড়িয়া গেটের মধ্যে প্রবেশ করিল। গেটে একখানি পিতলের ফলকে লেখা আছে—আই, এন, সেন, আই-সি-এস্।)

(অল্পক্ষণ পরে আসিয়া)

ডোভা। কিছু মনে করবেন না—কাল ষ্টেজে আমার ডান্সের পর এই কৌটোটা আপনি আমায় দেবেন। যেন ভুলবেন না। বিশেষ অনুরোধ। না দিলে আমার পোজটা নষ্ট হয়ে যাবে, বুঝলেন। (মৃদুহাস্যে) ধন্যবাদ—নমস্কার। (ডোভার গণ্ডদ্বয় লাল হইয়া উঠিল)।

কার্তিক। নমস্কার।

(ড্রাইভারকে) কালিজ।

(কার্তিকের গাড়ী ছাড়িল—গাড়ীখানি যতক্ষণ দেখা গেল ডোভা চাহিয়া থাকিল। তারপর নিজের বসিবার ঘরে আসিয়া কি সব লিখিল—হাসিল—গান ধরিল।)

কার্তিক তাহার গাড়ীতে যাইতে যাইতে দেখিল, ডোভা কি জিনিষটা তাহাকে দিল। দেখিল, হলদে রেশমী রুমালে জড়ানো, লালসুতা-বাঁধা একটা কৌটার মতো জিনিষ। তাহার উপর গালামোহরে—ডোভার পিতার নাম—আই, এন, এস।)

৪র্থ দৃশ্য

কলেজ হল্

রাত্রি

(প্রিন্সিপ্যাল ঘোষ আসন জমায়েৎ করিয়া বসিয়া আছেন… ছাত্রছাত্রীগণ কর্ম্মব্যস্ত…প্রোগ্রাম লইয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রিন্সিপ্যালকে দিলেন। তাহাতে লেখা আছে—২৭শে জুলাই অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৬টা দোতলায় সমাবর্ত্তন-উৎসব, বক্তৃতা ও প্রদর্শনী। তারপর একতলায় চা পানান্তে ৭টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত মিলনোৎসব। মিলনোৎসবের ১ম দফা—উদ্বোধন-সঙ্গীত (মিস্ দেবসেনা সেন ও কার্ত্তিক সেনাপতি কর্ত্তৃক), ২য় দফা—ঐক্যতান বাদন (মিস্ বকুল সেন, মিলন দাশ, দৌলত খাতুন, নবনলিনী সোম, শোভনা ব্যানার্জ্জী ও মিসেস্ লীলাবতী স্থইফ্‌ট কর্ত্তৃক। তৎপরে 'মধুরেণ সমাপনং', নাটিকা (ছাত্রছাত্রীগণ কর্ত্তৃক), শেষে আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে জলযোগান্তে উৎসব সমাধা। কার্ত্তিক ভিতরে আসিল ও প্রোগ্রাম দেখিল।)

(আফিস ঘরে টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিতেছে . সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গিয়া তাহা ধরিলেন।)

সুপার।—মিস্ দেবসেনা ফোন্ করছেন—তিনি অসুস্থ, নাট্যকার লাহিড়ীকে তিনি তাঁর কাছে একবার যাবার জন্য অনুরোধ করছেন।

ঘোষ।—উৎসবটা পণ্ড হয়ে যায় দেখছি।

লাহিড়ী।—উৎসব পণ্ড করা হবে না…আমি আগে দেখে আসি। (সুপারকে) আপনি ডোভাকে বলুন তাদের গাড়ীখানা শীঘ্র পাঠাতে। (প্রিন্সিপ্যালকে) উৎসব পণ্ড হবে না—মাধুর্য্য হয় তো কিছু কমবে…কার্ত্তিকের ওরিয়েণ্টাল ডান্স আমাদের হাতের পাঁচ তো আছেই।

৫ম দৃশ্য

পার্কষ্ট্রীটে ডোভার পিতৃগৃহ

রাত্রি

(ডোভার ড্রইং রুম…সে ফোন যন্ত্রটি রাখিল…বারান্দায় আসিয়া মোটর-ড্রাইভারকে ডাকিয়া বলিল—)

ডোভা।—এখনি লাহিড়ীবাবুজী আসবেন…কলেজে যাও।

(খানসামাকে ডাকিয়া) ডিনারের জন্য ড্রাইখানা যা হয়েছে এক প্লেট ঠিক রাখো…তার সঙ্গে কোকো দু' পেয়ালা আনবে।

(একখানা খাতা লইয়া পড়িয়া ডোভা দেরাজের ভিতর রাখিল।)

(হর্ণ দিয়া ডোভার গাড়ী ভিতরে প্রবেশ করিল…লাহিড়ী গাড়ী হইতে নামিলেন। বারান্দায় ডোভা তাঁর পায়ের ধূলা লইল।)

লাহিড়ী।—(উৎকণ্ঠিত ভাবে) কি অসুখ বেটী।

(খানসামা ট্রে-তে করিয়া কোকো ও চপকাটলেটাদি আনিল)

ডোভা।—আগে কিছু খান, তারপর বলছি।

লাহিড়ী।—তা বেশ—তুমি ভাল আছ তো?

ডোভা।—আপনি খান—আমিও খেতে খেতে বলছি।

(লাহিড়ী আহারে বসিলেন—ডোভা কোকো ঢালিয়া দি[illegible] একটু একটু খাইতে লাগিল।

ফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল…ডোভা ফোন ধরিল)

ডোভা।—(লাহিড়ীকে) আপনাকে ডাকছে…বোধ হ[illegible] কলেজ থেকে।

লাহিড়ী।—তোমার কথা জানতে ব্যস্ত হয়েছে নিশ্চয়…বা[illegible] খেতে খেতে শুনি। (ডোভা ফোনটি লাহিড়ীকে দিল)

লাহিড়ী।—হ্যালো...হাঁ, বলুন।...মিস্ ডোভা?...খুব অসুস্থ নয়।...সম্ভব আজ খেলা দেখতে গিয়ে জলবৃষ্টিতে।... আমার মুখ ভারি কেন?...এক ডিস্ সেরে ফেলে আর এক ডিসে হাত দিয়েছি কি না।...না-না এখানে জমে যাবো না।—হাঃ হাঃ হাঃ। দেরী? তা একটু হবে—ডোভার পার্টটা একটু তালিম কোরে দিয়ে যাই। কলেজে গিয়ে কতক্ষণ থাকবো?—সারা রাতই থাকতে পারি--ডিনার তো শেষ কোরলাম।—নমস্কার।

(ফোন-যন্ত্র রাখিয়া ডোভাকে) থাওয়া তো হোলো ভাল-রকমই—এখন তোমার কথাটা বল শুনি।

ডোভা।—সব লেখা আছে—পড়ুন (এতক্ষণ ধরিয়া ডোভা যাহা লিখিয়াছিল লাহিড়ীকে তাহা পড়িতে দিল)।

(ডোভা একটু একটু কোকো ঢালিতেছে ও খাইতেছে—তার মুখ মাঝে মাঝে লাল হইয়া উঠিতেছে।—লাহিড়ী কখন উচ্চ হাসিতেছেন—কখন চোখ বিস্ফারিত করিয়া পড়িতেছেন। পড়া শেষ করিয়া—)

লাহিড়ী।—নভেল!—রোমান্টিক (romantic)—!

ডোভা।—বিশ্বাস কোরে বলতে পারি মনে কোরে একমাত্র আপনাকেই জানালাম।—তা' হলে শেষের ডান্সটা—আর ঐ খবরটাও—যদি ভাল মনে করেন।

লাহিড়ী।—শেষ সিনটাই বদলে যাবে।—এখন এডিটারদের কাছেই আগে চ'ললাম।—তোমার গাড়ীখানা দাও।

(লাহিড়ী বাহির হইতেছেন—ডোভা তাঁর পায়ের ধূলা লইল।)

লাহিড়ী।—এখন থেকেই আশীর্ব্বাদ করছি।—চলি বেটী।

(ডোভার মোটরে উঠিয়া বাহির হইয়া গেলেন)।

(ডোভা তখন নিজের ড্রইং রুমে ঢুকিল।—কি ভাবিয়া মেঝের কার্পেটের গোলাপফুলটি পা দিয়া খুঁটিল—একটু দুলিল—একটু হাসিল।—খানসামাকে ডাকিল—চিনির ফুল দেওয়া ভাল ভাল বিস্কুট এক ট্রে নিয়া বারান্দায় আসিল।—সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া টিয়া, কোকিল, কাকাতুয়াদের খাচা খুলিয়া বিস্কুট-গুলি উজাড় করিয়া খাওয়াইল।—খানসামা আবার এক ট্রে রকমারি কেক আনিয়া দিল।—কুকুর, হরিণ, খরগোসগুলিকে তাহা খাওয়াইল।—তারপর নাচিতে-নাচিতে গাহিতে-গাহিতে আসিয়া নিজের ড্রেসিংঘরে ঢুকিল।—যে সব রঙিন কাপড় কখন সে পরে নাই, সেইগুলি বাছিয়া বাছিয়া বাহির করিল।—খুব ফুলদার কাজকরা শাড়ী-ব্লাউজ পরিল। তারপর অঙ্গরাগ করিল।—গহনার বাক্স খুলিয়া দামী-দামী অলঙ্কারগুলি পরিল।—বৃহৎ আর্শির কাছে আসিয়া আপন রূপ দেখিল।—কার উদ্দেশে যেন মাথা নত করিল।)

(আয়া আসিয়া খবর দিল—সায়েব ও মেম-সায়েব ডিনার টেবিলে অপেক্ষা করিতেছেন। ডোভা হাসিতে হাসিতে তার বাপ-মার চেয়ার দু'খানির মাঝে তার চেয়ারে গিয়া বসিল। তার বাপ-মা তো ডোভার সাজ-গোজ দেখিয়া অবাক্! তার আল্‌তা-পরা পায়ে রূপার তোড়া, মাথায় মাথায় হাঁসের পালক-দেওয়া টায়রা! তার বাবা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে বলিলেন—)

সেন।—হ্যালো—দেবী ভিনাসের মতো দেখাচ্ছে তোমার ডোভি!

মিসেস সেন।—আমার বঙ্গীকে সাজলে কেমন মানায় দেখো দেখি।

(ডোভা পা দুলাইয়া ঘাড় দুলাইয়া আপন-মনে কত কথা বলিতেছে। আদরিণী কন্যার আনন্দোচ্ছ্বাসে প্রফুল্ল হইয়া সেন-দম্পতি পরস্পরের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিতেছেন।)

৬ষ্ঠ দৃশ্য

ডোভার ড্রইং রুম

২৭শে জুলাই—প্রাতে

(ডোভা তাড়াতাড়ি সকালের কাগজ খুলিয়া পড়িতেছে। তাহাতে লেখা আছে—লোমহর্ষণ!—লোমহর্ষণ!! কাল বৈকালে খেলার মাঠ হইতে তরুণী কলেজ-ছাত্রীকে লইয়া উধাও—অপূর্ব্ব-ভাবে তাহাকে উদ্ধার। শেষে লেখা আছে—'কে উদ্ধার করিল—কাহাকে উদ্ধার করিল—নিষেধ থাকায় আমরা তাহা জানাইতে পারিলাম না—আজ তাহা সবিশেষ জানিতে পারিবেন।—মিলনোৎসব মধুরেণ সমাপন হোক।)

(হঠাৎ ফোনযন্ত্র বাজিয়া উঠিল। ডোভা কানের কাছে যন্ত্রটি ধরিল।)

ডোভা।—হ্যালো?—ও: আপনি—প্রণাম।—হ্যাঁ—হ্যাঁ—ঠিক হয়েছে।—প্রণাম।—হ্যাঁ ঠিক সময়ে যাবো।

(সে ফোনযন্ত্র রাখিল।—তার মুখমণ্ডল রক্তিমাভ হইয়া উঠিতেছে।)

৭ম দৃশ্য

কলেজ

২৭শে জুলাই রাত্রি

(সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে কলেজের দ্বিতলে সমাবর্ত্তন ও প্রদর্শনীর পালা শেষ করিয়া সকলে নীচে নামিতেছেন। জোড় বিজোড় সাদা কালোর ভিড়।)

একটি সাদা মেম।—এস্‌প্লেনডিড ওরেসন (Splendid oration!)

(সঙ্গের) সাদা সায়েব।—(প্রিন্সিপ্যাল ঘোষকে জিজ্ঞাসা করিল) হু ইজ হি? (who is he?)

ঘোষ।—ডক্টর চ্যাটার্জ্জি—সন্ অফ্ দি ফাউণ্ডার।

(একতলায় সকলে নামিলেন। প্রকাণ্ড হলে বিশ-পঁচিশ খানা ইলেকট্রিক পাখা ঘুরিতেছে। সুসজ্জিত হলের একপ্রান্তে ছোট একটি ষ্টেজ। ৭টা বাজিতেই পর্দ্দা উঠিল।)

পরবর্ত্তী দৃশ্য—একটি হ্রদের ধারে স্বপ্নপুরী

(হ্রদের ধারে একটি কল্পবৃক্ষের ডালে কার্ত্তিক আধশোয়া অবস্থায় মৃদু বাঁশী বাজাইতেছে—হ্রদের মধ্যে বৃহৎ একটি পদ্মফুলের উপরে কাৎ হইয়া শুইয়া ডোভা—তার উপাধান একটি রাজহংস—সর্ব্বপশ্চাতে কলেজের সম্মুখভাগের একটি ছবি পিছনের উজ্জ্বল সাদা আলোর আভায় উজ্জ্বল।—ষ্টেজের উপরে মৃদু নীল আলো।

—কল্পবৃক্ষে জড়ানো লতায় রকম-বকম আলোভরা ফলের স্তবক-গুলি দুলিতেছে।)

(কার্ত্তিকের বাঁশীর সুরে সুর মিলাইয়া ডোভা
আবাহন-সঙ্গীত ধরিল)

আজ কিসের দোলা লাগল ওরে—
লাগল সবার প্রাণে।
কেউ বোঝে কেউ বোঝে না তা'
এল কিসের টানে ?
ও-যে, তারে আপন জেনে—
বড়ই নিজের বলে' মেনে।
সবাই আদর করে তারে
আপন ধনে যেমন করে।
গৌরবে তার হৃদয়-দ্বারে
—গরব ওঠে ভরে॥

এ-বিদ্যায়তন মাঝে—
জীবন গড়ার কাজে
সফল-করা তোমার পরশ
—বাজে যেন বাজে।
বাণীর চরণ মরাল মতো
আছে সে যে সেবায় রত,
আপন গোপন কোরে!
সবে জয়ধ্বনি দে রে
(তার জয়ধ্বনি দে রে)॥

(পর্দা নামিতে লাগিল। সকলে করতালি দিয়া আনন্দ প্রকাশ করিল। পর্দা পড়িল।)

(অতি অল্পক্ষণ পরে আবার পর্দা উঠিল।)

তৎপরবর্ত্তী দৃশ্য—একটি বাগান
সুরের মেলা

(মনোহর বেশধারিণী ছাত্রীগণ ঐক্যতানবাদনরত। পীতাভ আলোকে মেলাটি রঞ্জিত। পর্দা নামিতে লাগিল। সকলে করতালি দিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলে, পর্দা পড়িল।)

(কিছু পরে পর্দা উঠিল। 'মধুরেণ সমাপনং' নাটিকা আরম্ভ হইল।)

"মধুরেণ সমাপনং"
আরম্ভ দৃশ্য
মানস-শৈল

(শৈলনিম্নে সাগরকন্যাগণ—অর্দ্ধমানবী অর্দ্ধমৎস্যের আকার। হস্তে তাদের বাদ্যযন্ত্র। সৈকতের বালি ফুঁড়িয়া কয়েকটি নাগ-কন্যা উঠিল। হস্তে সুদৃশ্য বীণা। আকাশপথে অপ্সরা কন্যাগণ উঠিতেছে। হস্তে বাঁশী। সৈকতের পাশে ছোট পাহাড়ে যক্ষকন্যাগণ। হস্তে মৃদঙ্গাদি বাদ্যযন্ত্র।

(মানস শৈলের পাদদেশে পুষ্পকরথ নামিল। তাহা হইতে দেবরাজ-কন্যাবেশে ডোভা ও তাহার সখীগণ অবতরণ করিল। দেবনাগ-সাগর ও নাগকন্যারা তাহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া গান আরম্ভ করিল।)

সুখ-সায়রে—
আজ বুঝি বান এল রে।
অথির তনুয়া হরষিত চিত
মধুর সব মধুরে॥
একি এ রঙ্গ রূপ-তরঙ্গ
দেখি না কোথায় কূল।
মোরা ভাসিব তাহাতে, ডুবিব তাহাতে,
খেলিব গোকুল দুল।
কহ সখি শুনি কানে কানে—
কি কহিছ তুমি দু' নয়ানে।
কাহার পরশ ব্যাকুল ভেল
আজি এ মানস-বিহারে ?

(অন্তরীক্ষে যেন কামানশ্রেণীর গর্জ্জন শোনা যাইতে লাগিল—গগনমণ্ডল ধূমাচ্ছন্ন—কোলাহল নিকটবর্ত্তী—দেব-নাগ-অপ্সরা কন্যাগণ অন্তর্হিত হইল—ইন্দ্রকন্যা রথে উঠিতে যাইবেন এমন সময় কেশী দৈত্য রথের গতিরোধ করিল।)

(পর্দা পড়িল। আবার উঠিল।)

পরবর্ত্তী ২য় দৃশ্য
কৈলাস পাহাড়ের উঠিবার পথ

(উপরে উঠিবার পথের ধারে থাবা তুলিয়া হাঁ করিয়া ভগবতীর বাহন সিংহরাজ বসিয়া আছে—তলদেশ হইতে ভূতপ্রেত সর্ব্বহারা শীর্ণ বুভুক্ষুগণ গান গাহিতে গাহিতে সেই পথ বাহিয়া আসিতেছে—)

(সেই সব নাতখোয়ারা হাঘরেদের গান—)

ওরে শিবের চেলা, ভূতের দল আজ—
দে সাড়া রে, দে সাড়া।
আয় যত সব মুখচোরা,
নাতখোয়ারা আধমড়া,
আয় অভাগা হাঘরে
জোট বেঁধেছিস কে তোরা ?
পরের বোঝা বয়ে সারা,
যুগে যুগে লক্ষ্মীছাড়া,
মরণ যা'দের তুলে আছে,
দেবতা যা'দের সবহারা।
তার দুয়ারে ধর্ণা দিতে
কে যাবি রে আয় তোরা।

(এই সব সবহারাগণ তাদের দেবতার কাছে কৈলাস পাহাড়ে যাইতে চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু দুর্দ্দান্ত সিংহের গর্জ্জনে ভয় পাইয়া পিছাইয়া গেল।)

(পর্দা পড়িল আবার উঠিল।)

পরবর্ত্তী ৩য় দৃশ্য।
শিবের কৈলাস-প্রাসাদ

(শিব-পার্ব্বতী আসনে উপবিষ্ট—পথের ধারে সিংহ শুইয়া আছে।)

শিব।—দেবি, আর কতদিন তুমি ধনী আর্য্যদের প্রতি পক্ষপাত করবে? আর্য্য প্রজাপতিরা ভূতের মতো খাটিয়ে নিচ্ছেন আমার অনাথ ভক্তদের।—তাদের সব-কিছু কেড়ে নিচ্ছেন।—তবু তুমি বর দিচ্ছ ঐ সব তোমার আত্মীয় আর্য্যদের! কেন এই পক্ষপাত কোরছো? আমিও যেমন সব-হারা, আমার ভক্তরাও সবহারা। সব দিয়ে আমরা সবহারা। যা নিয়ে তারা মারামারি কোরে মরছে আমরা তা চাই নে! তোমার নখদন্তহীন ঐ সিংহের স্পর্দ্ধা দেখ—আমার ভক্তদের আমার কাছে আসতে দিতে চায় না!—কতদিন তাদের আটকাবে ঐ বৃদ্ধ পশুরাজ!… ও কি?—আমার পরম ভক্ত কেশীরাজকে আসতে দিচ্ছে না! তোমার সিংহ?—কার হুকুমে পথরোধ করছে?—কার হুকুমে? আমি যাবো—কেশীকে নিয়ে আসবো।

(শিব উঠিতে উদ্যত—পার্ব্বতী তাঁর হাত ধরিয়া বসাইয়া দিলেন।)

পার্ব্বতী।—আমার হুকুমে—আমার হুকুমে কে দৈত্যকে আসতে দেওয়া হবে না এখানে।

শিব।—(সখেদে) কেশীকে আসতে দেওয়া হবে না—আমার পরম ভক্ত কেশীকে? ওঃ! রূপের মোহে সমাজ ছেড়ে দু'-দু'বার আর্য্যকন্যাকে বিয়ে করেছি! 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা—' আটকাবে কে?—কেউ যেন আর সমাজ ছেড়ে বিয়ে না করে!

(কার্ত্তিক রণসাজে উপস্থিত হইল।)

শিব।—এ কি।—কুমার রণবেশে? শত্রু কে?—কার আহ্বানে যাচ্ছ?

পার্ব্বতী।—কে দেবসেনাপতি!—যাচ্ছে আমার আদেশে।—দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে যোগ দিয়ে কেশীকে তুরস্ত করতে যাচ্ছে—তোমার স্পর্দ্ধা পেয়ে যত সব দৈত্যদানো ইন্দ্রপুরী দখল করতে চায়—দেবতার ভয় করে না এই সব অসভ্য অনার্য্যদল! তোমার এই অনাসৃষ্টি আর চলবে না বুড়োরাজ। অনার্য্যদের ঝাঁটাপেটা কোরে আমি স্বর্গছাড়া কোরবো। কার্ত্তিককে আমি বিয়ে দেবো আর্য্যকন্যার সঙ্গে—সে যাকে ভালবাসে তার সঙ্গে।

শিব।—তা বিয়ে কবে হবে?

পার্ব্বতী।—মনে কর আজ-কালের মধ্যেই।

শিব।—(সানন্দে) নন্দী ভৃঙ্গী, কই তোমরা?—শীগ্‌গির এসো—শীগ্‌গির এসো।—আমার ষাঁড়ের গলায় সেই ঘণ্টাবাঁধা বগলসটা পরিয়ে দাও।—কেমন ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে যাবে।—কুমারের বিয়ে—কুমারের বিয়ে।

পার্ব্বতী।—সে সব আর্য্যদের দেশ—সভ্য জায়গা—তোমাদের যাওয়া হবে না সেখানে। দিগম্বর দেখলে পুলিশে ধরে নেবে। ওঃ ভুলে গেছি—তোমার জন্যে যে পায়েস বেঁধে রেখেছি—ঘনাবৃত দুধের পায়েস।—পেট ভরে খাবে এসো।

শিব।—পার্ব্বতী, পার্ব্বতী—পায়েস—এ্যাঃ পায়েস?—তুমি বেঁধে রেখেছো—কত ভালবাসো তুমি!

(পর্দ্দা পড়িল। আবার উঠিল।)

পরবর্ত্তী ৪র্থ দৃশ্য

নন্দন-কানন

(হরিণ-হরিণী, ময়ূর-ময়ূরী, অপূর্ব্ব পুষ্পদাম ও নানাবর্ণের আলোকমালায় সে কাননকে মাধুর্য্যমণ্ডিত করিয়াছে—দেবকন্যাগণ পুষ্পচয়নরত—অদূরে নূপুরধ্বনি শোনা গেল। মনোরম ভঙ্গীতে নৃত্য করিতে করিতে আসিল ইন্দ্রকন্যাবেশে ডোভা। কেশী দৈত্যের কবল হইতে রক্ষা পাইয়া সে আনন্দে নৃত্য করিতেছে। দর্শকগণ তাহাকে করতালি দিয়া অভিনন্দিত করিল। উদ্ধারকারী দেবসেনাপতির উদ্দেশে সে সর্ব্ব অঙ্গ দিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে। শতমুখে তাহার নৃত্যের প্রশংসা হইতে লাগিল।)

লেডি ভোস।—(ডোভার পিতাকে লক্ষ্য করিয়া) এ নাচ বিলাতে দেখানোর উপযুক্ত—নাচনের ভঙ্গিমা এত নিখুঁত—আর মেয়েটির কি অঙ্গ-সৌষ্ঠব।

মিঃ সেন।—বিলিতী নাচে আপনাদের আমলে আপনিই তো শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ডোভা আপনার প্রশংসা পেয়েছে—এ তার গুড্ ফর্চুন।

(লাহিড়ী ষ্টেজের ভিতর আলোর সুইচ-বোর্ডের কাছে বসিয়া বিভিন্ন সুইচ টিপিয়া বিভিন্ন রকমের আলোকসম্পাতে ডোভার নাচকে অধিকতর মুগ্ধকর করিয়া তুলিতেছিলেন। কার্ত্তিক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিল তার নৃত্য হইবে কি-না? কার্ত্তিক দেব-সেনাপতির বেশে সজ্জিত। লাহিড়ী তাহাকে বলিলেন—তুমি সেই কৌটাটি মিস্ ডোভাকে দিয়ে এসো—আমি অন্ধকার কোরে দিলাম। ষ্টেজ মুহূর্ত্তের জন্য অন্ধকার হইতেই কার্ত্তিক সেই কৌটাটি ডোভাকে দিতে ষ্টেজে প্রবেশ করিল—সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আলো জ্বলিয়া উঠিল।—দোয়েলের শিস্ আর কোকিলের কুহুরবে মুখরিত হইল রঙ্গমঞ্চের আকাশ-বাতাস।—পুষ্পচয়নরত দেববালার বেশধারিণী কলেজের মেয়েরা ডোভা ও কার্ত্তিককে ঘিরিয়া ফেলিল।—ব্রীড়ানত-চক্ষু ডোভা কার্ত্তিকের গলায় তার মালাগাছটি পরাইয়া দিয়া তার পায়ের কাছে নত হইয়া বসিল।—দেববালাগণ গান ধরিল—)

মধুময়, হে মধুময়—
মধুময় করলে তুমি আজকে হেন।
কে বুঝিবে প্রজাপতি,
তোমার রীতি তুমিই জান—তুমিই জান।
খেলার মাঠের রোমাণ্ট (romant),
হলো মিলনেতে ফুলমিনাণ্ট (fulminant),
প্রথম কলেজ-ইউনিয়নে
সত্যিকারের ইউনিয়ন।
চিষ্টি যা হোক করলে ভাল
এ সয়ম্বরা রেকর্ড হোলো!
আশিস করো, আশিস করো
মধুরেণ সমাপন।

(গান শেষ হইলে মেয়েরা বলিল—)

মেয়েরা। আর লজ্জা কেন কার্ত্তিক বাবু, ক'নের মাথায় সিঁদুরটা ঢেলে দিন—পোজ নষ্ট হয় যে।

(শেষে লাহিড়ী স্বয়ং যখন একটি কাঁচের বোয়েম্ হইতে শান্তিবারি ছিটাইতে ছিটাইতে প্রবেশ করিলেন, তখন একটা হাসির রোল পড়িয়া গেল। তাঁর পায়ে খড়ম, গায়ে নামাবলী। তিনি বলিতে বলিতে ঢুকিলেন—)

লাহিড়ী। অগর ফারদোস বররূয়ে জমিনস্ত,
হামিনস্ত—হামিনস্ত—হামিনস্ত।
—যদি পৃথিবীতে স্বর্গ থাকে—সে এইখানে—এইখানে এইখানে।

(এই বলিয়া তিনি কার্ত্তিকের বামে ডোভাকে বসাইয়া দিলেন। কলেজের মেয়েরা গা টেপাটিপি করিতে লাগিল।)

লাহিড়ী। দেখুন, শ্রীমতী ডোভার এটা আত্মনিবেদন—আপনারা এটাকে অভিনয় ভেবে ভুল করবেন না। এটা বাস্তব খাঁটি সত্য। আর এটাও খাঁটি সত্য যে আমি আর এখন নাট্যকার নই—বিচিত্রকর্মা আমি এখন পুরুত। কিসের পুরুত তাই বলবার জন্যই আমার আবির্ভাব। দেখুন, সব নাটকে যা আগে হয় আমার নাটকে তা পরে হচ্ছে—শান্তিপুরে আমার মাতুল বংশের ধারামতো 'পরাহে'। সব নাটকেই কুশীলব আগে এসে গায় মুখবন্ধ, আমার নাটকে তা হচ্ছে পরে আর বলছেন খোদ নাট্যকার। কারণ নাটকের প্রধান পাত্র-পাত্রী সত্যিকার পাত্র-পাত্রী হয়ে দাঁড়াতে চাইলেন। ব্যাপারটা ঘটল কেমন করে বলি—আপনারা আজ কাগজে পড়েছেন—কাল খেলার মাঠে দুর্বৃত্তদের হাত থেকে একটি কলেজের ছাত্রীকে কি কোরে সেই কলেজেরই একটি ছাত্র উদ্ধার করেন—আজ তা সবিশেষ জানতে পারবেন।

দর্শকগণ। ওঃ সেটা আপনারই লেখা—এখন বুঝলাম।

লাহিড়ী। খেলার মাঠ হতে কাল দুঃসাহসিক ভাবে কার্ত্তিক উদ্ধার করেন ডোভাকে। ডোভা মনে মনে তখনিই কার্ত্তিককে পতিত্বে বরণ করেন। এবং কাল রাত্রেই কার্ত্তিককে একটি সিন্দুরকৌটা দেন এবং অনুরোধ করেন—আজ নিজে কার্ত্তিক যেন ডোভার নৃত্য শেষে সেই কৌটাটি দিতে না ভোলেন। কার্ত্তিক কিন্তু এখনো জানেন না এটি সিন্দুর-কৌটা। শ্রীমতী দেবসেনা ওরফে ডোভা ওরফে ষষ্ঠীমাতা স্বামীর হাত থেকে এই শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ নেবার জন্য অনেকক্ষণ থেকে মাথানত কোরে রয়েছেন। আমায় তাই আসতে হোলো তাঁদের উভয়ের বাপ-মা'র অনুমতি নিয়ে এই উৎসবটি সমাধা করতে।

কার্ত্তিক ও ডোভার পিতা-মাতা—আমাদের সম্পূর্ণ মত আছে।

(লাহিড়ী কার্ত্তিকের হাত ধরিয়া ডোভার সীমন্তে সিন্দুর পরাইয়া দিলেন। ছাত্রীগণ হুলুধ্বনি করিতে লাগিল।)

লাহিড়ী। শুনুন তবে—নাটকটি যখন আমি লিখতে আরম্ভ করি, তখন ডোভার এই নৃত্যটিকেই কেন্দ্র কোরে তা আরম্ভ হয়। কার্ত্তিক ও ডোভাকে নিয়েই প্রধান ভাবে নাটকের চরিত্র চিত্রণ হবে—কলেজের ছাত্রছাত্রীরা বলেন। ক্রমে আমি জানতে পারি কার্ত্তিকের উপাধি সেনাপতি আর ডোভার পিতার নাম ইন্দ্র। তাই থেকে কেশী দৈত্যের দ্বারা ইন্দ্র-কন্যা হরণ উপাখ্যানটি নিয়ে নাটিকাটি লিখি। সত্যিই দেবসেনা মানস-শৈলে বেড়াতে যান—কেশী তাঁকে হরণ করে এবং কার্ত্তিক তাঁকে উদ্ধার করেন—পরে দেবসেনা বা ষষ্ঠীর সঙ্গে কার্ত্তিকের বিবাহ হয়। আমি কিন্তু এই বিবাহের নামগন্ধও নাটকে দিতে পারি নি। দিয়েছিলাম দেবসেনার উদ্ধার-কাহিনী আর উদ্ধার পাওয়ায় আনন্দে তা'র নৃত্য। কিন্তু কাল রাত্রে শ্রীমতী দেবসেনা আমায় ডেকে নিয়ে গিয়ে অতি গোপনে তাঁর মনের কথা বল্লেন। কার্ত্তিকের এই সৎসাহস এবং দেবসেনার এই আত্মদান আজ এই ক্ষুদ্র নাটকটিকে সত্যিকার জিনিষে পরিণত করলে। আপনারা আগ্রহ উত্তেজনা নিয়ে এই নাটকের পরিসমাপ্তির জন্যে অপেক্ষা করছেন নিশ্চয় কিন্তু এর পরিসমাপ্তি আজ তো এখানে হবে না। এটা কেউ আমায় বলবার ওকালতনামা না দিলেও আমি আপনাদেরও আমার যৌথ স্বার্থেব খাতিরে বলছি। অর্থাৎ শেষের সীনটা—ভূরিভোজনের সীনটা অভিনীত হবে ডোভার পিতা মিঃ ইন্দ্রনাথ সেনের পার্ক ষ্ট্রীটের বাড়িতে কাল অপরাহ্ণে। ঐ যে সেন মশাই আপনাদের আমন্ত্রণ করতে দাঁড়ালেন।

সেন। (সবিনয়ে) আমি আমার একমাত্র মেয়ের জন্য এমন সিভালরস (chivalrous) সৎপাত্র সহজে খুঁজে পেতাম না। আপনারা কাল বৈকালে আমার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ কোরে আপ্যায়িত করুন।

সকলে। সানন্দে—সানন্দে।

(নীচে দর্শকদের মধ্যে চা মিষ্টান্ন প্রভৃতি বিতরিত হইতেছে)

লেডী ভোস। এখানে কপির সিঙ্গাড়া ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে।

লাহিড়ী। আমিও শেষ করেছি—মাত্র দুটো কথা বাকি। একটা হচ্ছে আপনারা এই গরীব ব্রাহ্মণের একটু উপকার কোরবেন। অর্থাৎ সেন মশাইকে বলে পুরুত বিদেয়টা যেন মারা না যায় দেখবেন। পুরুত বামুনদের ব্যবসা আর কত দিন থাকবে এমনতর স্বয়ম্বরা হতে থাকলে? আর এক কথা, আপনারা ধৈর্য্য ধরুন—এই যেমন সেন মশাইয়ের বাড়িতে নেমন্তন্নটা জুটিয়ে দিলাম—তেমনি আরও দেবো—একা খাব না। তবে শুনুন—এই যে বোয়েমের মধ্যে জল দেখছেন—এটা ফার্থ-অব-ফোর্থের (Firth of Forth) জল। কোনো বোমার ভয় ছিল না, তখন সেই আট বছর আগে এডিনবরার ডাক্তারী ডিগ্রী যখন আমার ভাগ্যে জুটলো না তখন, তার বদলে নিয়ে এলাম সেখানকার এই জল। যা আমার আহরণ করতে হয়েছে ৩১শে ডিসেম্বর রাত দুপুর পেরুবার এক সেকেণ্ড আগে পাঁজি পুঁথি ঘড়ি ধরে। এর গুণ কি শুনুন—যে কুমারীর গায়ে এক ছিটে পড়বে, তার বছর না ঘুরতে মনের মতো পতি লাভ হবে।—কিশোরী ছাত্রীরা সব এইজল মাথা পেতে নাও—মাথা পেতে নাও। আর কেউ যেন আমাকে বিয়ের নিমন্ত্রণ দিতে ভুলো না—তার সঙ্গে এঁদেরও সবাইকে (দর্শকদের দেখাইয়া) ওঁ প্রজাপতি—প্রজাপতি—প্রজাপতি (লাহিড়ী বোয়েম হইতে এই অভিনব শান্তি-বারি ছিটাইতে লাগিলেন)।

(খুব হাসির ধুম পড়িয়া গেল।)

(যবনিকা পড়িল।)*

মনীষার শ্রীক্ষেত্র হুগলী জেলা

শ্রীসুধীর কুমার মিত্র

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন—

"মুক্ত-বেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে
আমরা বাঙ্গালী বাস করি সেই তীর্থে—বরদ বঙ্গে ;
বাম হাতে যার কমলার ফুল, ডাহিনে মধুক-মালা,
ভালে কাঞ্চন-শৃঙ্গ-মুকুট, কিরণে ভুবন আলা,
কোলভরা যার কনক ধান্য, বুক-ভরা যার স্নেহ,
চরণে পদ্ম, অতসী অপরাজিতায় ভূষিত দেহ,
সাগর যাহার বন্দনা রচে—শত তরঙ্গ ভঙ্গে
আমরা বাঙ্গালী বাস করি সেই বাঞ্ছিত ভূমি বঙ্গে।"

ভারতের মধ্যে বাঙ্গালীজাতি যে বড় হইয়াছিল, অন্যান্য প্রদেশের পথ-নির্দ্দেশক হইয়াছিল, তাহার কয়েকটী প্রধান কারণ

শ্রীসুধীর কুমার মিত্রের "হুগলী জেলার ইতিহাসের" জন্য অঙ্কিত।

১ ইঞ্চি=১৬ মাইল

আছে। প্রথম কারণ, বাঙ্গলাদেশ অনাদিকাল হইতে ভারতের দ্বারস্বরূপ ছিল ; উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে বৈদেশিক আক্রমণ আসিতে পারে, কিন্তু বৈদেশিক সম্পদ্ ও সভ্যতা চিরকালই সমুদ্রপথে আসিয়াছে। তাই বাঙ্গলার সপ্তগ্রাম, গৌড়, বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানগুলিতে সুদূর অতীতকাল হইতে বিদেশী বণিকগণ তাহাদের পণ্যসম্ভার ও জাতীয় সংস্কৃতি লইয়া ব্যবসা করিতে আসিত। আর দ্বিতীয় কারণ, নূতন ভাবধারাকে নিজস্ব চিন্তাধারার সহিত সামঞ্জস্য করিয়া লইবার অপরাজেয় শক্তি বাঙ্গালীর চিরকালই আছে ; তাই একদিন বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডবিরোধী কপিলের সাংখ্যদর্শনকে যেমন বাঙ্গালী সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল, সেইরূপ স্পেনসার ও ষ্টুয়ার্ট মিলের প্রগতিমূলক চিন্তাধারাকেও বাঙ্গালী সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছিল ; সেইজন্যই 'বাঙ্গালীরা আজ যাহা ভাবে পরদিবস সমগ্র ভারতবাসী সেই ভাবধারা গ্রহণ করে।'

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—"যদি কোন আধুনিক ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বিত ইউরোপীয় আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের আবার ভরসা কি ? বাঙ্গালীর মধ্যে মনুষ্য জন্মিয়াছে কে ? আমরা বলিব ধর্ম্মোপদেশের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেব, দার্শনিকের মধ্যে রঘুনাথ, কবির মধ্যে শ্রীজয়দেব ও মধুসূদন। স্মরণীয় বাঙ্গালীর অভাব নাই—কুল্লুকভট্ট, রঘুনন্দন, জগন্নাথ, গদাধর, জগদীশ, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, মুকুন্দদাস, ভারতচন্দ্র, রামমোহন রায় প্রভৃতি অনেক নাম করিতে পারি ; অবনতাবস্থায়ও বঙ্গমাতা রত্ন-প্রসবিনী।"
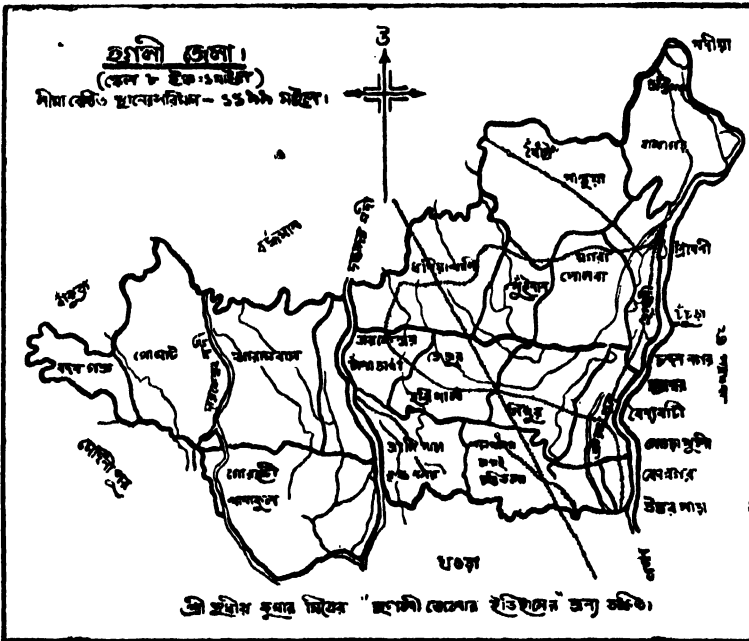
ভারতের মধ্যে বঙ্গদেশ যেরূপ রত্নপ্রসবিনী, বঙ্গদেশের মধ্যে হুগলী জেলাও যে সেইরূপ মনীষার আকর তাহা কে অস্বীকার করিবে ? শুধু অতীতকাল হইতে এই 'মুক্ত-বেণী' তীর্থে কেবল সাহিত্য ও বিদ্যাসাধনায় নয়—ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি মানব-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সমস্ত মনীষী তাঁহাদের কিরণ-জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া, শুধু বাঙ্গলার নয়, সমগ্র ভারতের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন ; আজ তাঁহাদের পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া আমি আমার প্রণতি জানাইব।

ইংরাজ যুগের প্রারম্ভে ত্রিবেণী তীর্থেই পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের দেব-কণ্ঠে "হিন্দু-আইন" স্ফুট হইয়া বঙ্গের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত সমগ্র বাঙ্গালীকে স্পন্দিত ও সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছিল—সেই হিন্দু আইন অনুসারে আজও আমরা শাসিত হইতেছি। তারপর উনবিংশ শতাব্দীতে এই স্থানের কিছু দূরে কোনা নামক গ্রামে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর প্রতিষ্ঠাত্রী দেবী রাণী রাসমণি জন্ম গ্রহণ করিয়া এই স্থানকে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গলার সমাজ-সংস্কারক রাজা রামমোহন কেবল যে বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্যকে দৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপন করেন তাহা নহে, প্রাচীন শাস্ত্রকেও সু-সংস্কৃত ও নববেশে সজ্জিত করিয়া বাঙ্গালীর চিন্তাশীলতা, মনস্বিতা ও বিচার-শক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। গুপ্তিপাড়ার পণ্ডিত মথুরানাথ ভট্টাচার্য্য 'শ্যামাকান্ত লতিকা' নামক সংস্কৃত গ্রন্থ ও পণ্ডিত চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য 'বিদ্বন্মোদ তরঙ্গিনী' নামক প্রসিদ্ধ দর্শন-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ভারতের বিদ্বৎসমাজে যে কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহাতে শুধু হুগলী

জেলা নয়, সমগ্র বঙ্গবাসী যে গৌরবান্বিত তাহা কে না জানে? তারপর সোমড়ার স্বনামধন্য পরিব্রাজক কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন—আধ্যাত্মিকতায় এবং মহাত্মা কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভারতের বিভিন্ন স্থানে বত্রিশটী কালীবাড়ি নির্ম্মাণ করিয়া যে কল্যাণকর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহা অসামান্য বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না।

সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়কারী যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব পৃথিবীতে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন এবং রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী হইতে ধর্ম্মবিষয়ে নিরপেক্ষতা ও নূতন পথ নির্দ্ধারণ করিয়া বাঙ্গালী মস্তিষ্কের ধীশক্তি ও কর্ম্মশক্তি সমগ্র জগতকে দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার জন্মে এই জেলা ধন্য এবং জননী কৃতার্থ হইয়াছেন, এই কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হইবে না!

রাজনীতিক্ষেত্রে কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Bonerjee) এই জেলার বাগাণ্ডা গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া রাজনৈতিক গগনে হুগলী জেলাকে শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। তিনি যখন বিলাতে গিয়াছিলেন তখন ইংরাজগণ তাঁহাকে মূর্ত্তিপূজা করিবার জন্য শ্লেষ করিয়া কয়েকটী কথা বলিয়াছিল, তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—"তোমরা যদি ট্রিনিটী (Trinity) পূজা কর, আমি তাহা হইলে তেত্রিশকোটী দেবতার পূজা করিব না কেন?"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের আদি নিবাস এই জেলার দেশমুখো গ্রামে; তাঁহার প্র-পিতামহ রামহরি চট্টোপাধ্যায় মাতামহের বিষয় পাইয়া কাঁটালপাড়ায় বাস করেন। কাঁটালপাড়ায় বাস করিলেও তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষা আনন্দমঠের মহামন্ত্র রচনায় যাহা জাতীয় জীবনে নব-জাগরণের সাড়া জাগাইয়াছিল এবং যে জাগরণের জন্য ভারতবাসী স্বাধীনতার পথের সন্ধান পাইয়া অনায়াসে বিপ্লবীরূপ লইতে পারিয়াছিল ও তাঁহার উত্তরকালের কর্ম্মক্ষেত্র যে এই জেলায় ছিল, তাহা কে না জানে?

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

তারপর বাংলা ভাষায় প্রথম মুদ্রিত পুস্তক, প্রথম সাময়িক পত্র প্রথম মুদ্রাযন্ত্র, প্রথম সংবাদপত্র সমস্তই যে এই জেলা হইতে আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। প্রথম গদ্য পুস্তক 'প্রতাপাদিত্য চরিত' রচয়িতা রামরাম বসু এই জেলার চুঁচুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা ভাষায় প্রথম ঔপন্যাসিক টেকচাঁদ ঠাকুর (প্যারীচাঁদ মিত্র) তাঁহার 'আলালের ঘরের দুলাল' বৈদ্যবাটী গ্রামে বসিয়া রচনা করেন ও এই জেলার পানিশেওলায় তাঁহার আদি নিবাস ছিল। বঙ্গভাষায় মহাভারত অনুবাদক মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের আদি নিবাস এই জেলার বাক্‌সা গ্রামে। বাঙ্গলা ভাষার উৎকর্ষ সাধনে যত্নবান্ পুরুষসিংহ স্যার আশুতোষ ও দানবীর মতিলাল শীলের আদি নিবাস এই স্থানের জিরাট ও সপ্তগ্রামে। বঙ্কিম-যুগের অন্যতম জ্যোতিষ্ক অক্ষয়চন্দ্র সরকার চুঁচুড়ায় জন্মগ্রহণ করিয়া এই জেলাকে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন; রাজা হৃষীকেশ লাহারও আদি নিবাস এই চুঁচুড়ায় ছিল। আমি কত নামের উল্লেখ করিব। এই জেলার মধ্যে এমন সব শক্তিধর মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—যাঁহারা যে কোন দেশের পক্ষে শ্লাঘা ও গৌরবের কারণ হইতে পারেন।

চিন্তাবীর ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই জেলার চুঁচুড়ায় বসিয়া মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে ভারতবাসীকে কর্ম্মযোগের দীক্ষামন্ত্র দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছিলেন—'প্রত্যেক বিষয়ে ইংরাজের অন্ধ অনুকরণ পরিত্যাগ করিতে হইবে; ইংরাজের প্রকৃতির একতা নাই। ইংরেজ কার্য্যকুশল, অহঙ্কারী ও লোভী। হিন্দু শ্রমশীল, সুবোধ, নম্রস্বভাব ও সন্তুষ্টচিত্ত। ইংরেজের নিকট হিন্দুকে কেবল কার্য্যকুশলতা শিখিতে হইবে; আর কিছু শিখিবার প্রয়োজন হয় না। ভারতবাসীকে সর্ব্বতোভাবে স্বজাতিবিদ্বেষরূপ মহাপাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইবে এবং স্বজাতির সহানুভূতিকেই পরম ধন ভাবিয়া ভোগ করিতে হইবে।"

সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ও নট মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষের আদি নিবাস এই জেলার হরিপাল গ্রামে, কলিকাতার প্রথম শেরিফ দানবীর রাজা দিগম্বর মিত্র এই জেলার কোন্নগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। লে: কর্ণেল ডাঃ সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এই জেলার বামুনপাড়া গ্রামে এবং গোবিন্দরাম মিত্র জেজুর গ্রামে জন্মগ্রহণ

করেন। পানশেওলার কিশোরীচাদ মিত্র, পটলডাঙ্গার সুবিখ্যাত তারিণীচরণ বসু (বাঘা বাবু), কোন্নগরের শিবচন্দ্র দেব, ত্রৈলোক্য নাথ মিত্র, কুমার মন্মথনাথ মিত্র, উখিদপুরের প্রসিদ্ধ চাউল-

শ্রীঅরবিন্দ

ব্যবসায়ী গোবিন্দচন্দ্র আঢ্য, বড়ার পল্লীকবি রসিকচন্দ্র রায় এই জেলায় জন্মগ্রহণ করিয়া এই স্থানকে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন।

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়...
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায়...।"

রচয়িতা কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এই জেলার সাগরদিয়া গ্রামে এবং

"অসভ্য চীন অসভ্য জাপান
তারাও স্বাধীন তারাও প্রধান,
দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।"

রচয়িতা কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই জেলার গুলিটা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন —"আমাদিগের সৌভাগ্যক্রমে ইংরাজের সঙ্গে আমাদের জাতি-বৈরী ঘটিয়াছে; এই জাতি-বৈর ভাব হেমচন্দ্রের পূর্ব্বে রঙ্গলালই সর্ব্বপ্রথম প্রচার করিয়াছেন। ভারতের স্বাধীনতা উপাসনার মঙ্গলঘট তিনিই সর্ব্বপ্রথম স্থাপন করেন।"

'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন' 'ধরা পড়েছে জয় মিত্র' ও 'নবাব খানজা খাঁ' বলিয়া যে তিনটি প্রবাদ আজও সমগ্র বঙ্গদেশে প্রচলিত, সেই তিনজন ব্যক্তিই এই জেলার অধিবাসী ছিলেন। মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হইলে প্রথম যিনি শব-ব্যবচ্ছেদ করেন সেই ডাঃ মধুসূদন গুপ্ত এই জেলার বৈদ্যবাটী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

বাঙ্গলার প্রাচীন শ্রেষ্ঠকবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর দেবানন্দপুর গ্রামে তাঁহার প্রথম কাব্যরচনা করেন; এই গ্রামের ঈশানচন্দ্র দাশ সিপাহীবিদ্রোহের পূর্ব্বে এলাহাবাদে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের প্রধান হিসাবরক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন; প্রবাসে তাঁহার মত সুনাম খুব অল্প বাঙ্গালীই অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি এলাহাবাদ ষ্টেশনে বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে, কোন নবাগত বাঙ্গালী আসিলেই যেন তাঁহাকে, তাঁহার বাড়িতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। আজও এলাহাবাদে এই প্রবাদ প্রচলিত আছে— "বাবু তো ঈশান বাবু থে, এ্যায়সা বাবু ঔর নেহি হোয়েগা।" এই দেবানন্দপুর গ্রামেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ বহুস্রষ্টা ও কথাশিল্পী ডক্টর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গ-সাহিত্যের উদয়শিখরে স্বীয় কিরণ-জ্যোতি বিকীরণ করিয়া এই জেলাকে ধন্য ও পবিত্র করিয়া গিয়াছেন।

ইংরাজী ভাষায় অদ্ভুত প্রতিভাশালী রাষ্ট্রনৈতিক বক্তা রামগোপাল ঘোষ, দেওয়ান শান্তিরাম সিংহ, হাইকোর্টের সর্ব্বপ্রথম বিচারপতি রমাপ্রসাদ রায়, বিচারপতি ডক্টর দ্বারকানাথ মিত্র, বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র, হুগলী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা দানবীর হাজি মহম্মদ মহসীন, কারমাইকেল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা রাধাগোবিন্দ কর (R. G. KAR), কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রথম ভারতীয় চেয়ারম্যান দানবীর সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, পটলডাঙ্গার রাধানাথ মল্লিক, যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক, বংশবাটীর রাজা নৃসিংহ দেব রায়, তেজুরের দেবব্রত বসু, বিশ্বম্ভর মিত্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস চ্যান্সেলার ভূপেন্দ্রনাথ বসু, তর্জ্জার অন্যতম আদি প্রবর্ত্তক রাসু, নিত্যানন্দ, মহেশ চক্রবর্ত্তী, কবি অক্ষয় কুমার বড়াল, দানবীর তারকনাথ পালিত, এলাহাবাদের বিচারপতি স্যার প্রমোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এলাহাবাদের এ্যাডভোকেট যোগীন্দ্র-নাথ চৌধুরী, স্যার লালগোপাল মুখোপাধ্যায়, বিচারপতি স্যার আমির আলী, গৌহাটির প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী হাজী শেখ শরিফুদ্দিন (যশাড় গ্রাম), শিলস ফ্রি কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক কবি রাধামাধব মিত্র, সুখড়িয়ার কবি ও সুলেখিকা নগেন্দ্রবালা সরস্বতী, তেজুরের কবি আভাদেবী মিত্র, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, ত্রিবেণীর ডাঃ বিপিন বিহারী ব্রহ্মচারী, রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী, প্রসিদ্ধ কণ্ট্রাক্টার পি-সি-কুমার, ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ, প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু, আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ অঘোর নাথ চ্যাটার্জ্জি, ডাঃ চারুচন্দ্র ঘোষ, (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত), ডাঃ দয়ালচন্দ্র সোম, বেনীমাধব গঙ্গোপাধ্যায়, অখিলচন্দ্র পালিত, (কুচবিহার), কুমার মুনীন্দ্রদেব রায়, ডাঃ আশুতোষ মিত্র (কাশ্মীর), বসুমতীর উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির আদি নিবাস বা জন্মস্থান হিসাবে এই জেলা গৌরব অনুভব করিয়া থাকে।

বাঙ্গলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গভাষাকে ভারতের

রাষ্ট্রভাষা করিবার আন্দোলন এই জেলা হইতেই সর্ব্বপ্রথম আরম্ভ হয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় স্বদেশীযুগের প্রথম শহীদ বীর কানাইলাল দত্ত আত্মোৎসর্গের অতুল্য দৃষ্টান্ত দেখাইয়া এই জেলাকে ধন্য করিয়াছেন।

তারপর আজিকার জীবিত যাহারা, তাঁহাদিগের মধ্যে বরেণ্যগণেরও বরণীয় শ্রীশ্রীঅরবিন্দ এই জেলায় জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, বিচারপতি রূপেন্দ্র কুমার মিত্র, বিচারপতি চারুচন্দ্র বিশ্বাস, ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি ডাঃ দ্বারিকানাথ মিত্র, প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়, বৈজ্ঞানিক ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী, আবদুলগণি সরকার, শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক নৃপেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অতুল্যচরণ ঘোষ, ভারত

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

সরকারের সলিসিটার শ্রীযুক্ত সুশীল চন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী অনুরূপা দেবী, ডক্টর নরেন্দ্র নাথ লাহা, কুমার শরৎচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কানাইলাল গোস্বামী, শ্রীযুক্ত অমরনাথ মুখোপাধ্যায়, রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ যোগীপ্রসাদ চৌধুরী, শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা মল্লিক, ডক্টর অচ্যুতকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (উনপঞ্চাশী) স্যার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, মোহিতলাল মজুমদার, মিঃ এস, ওয়াজেদ আলী, জাম্মুর প্রিন্স-অফ-ওয়েলস্ কলেজের অধ্যক্ষ ভদ্রেশ্বরের শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমুখ এই জেলার সুসন্তানদিগের নাম বঙ্গের সর্ব্বত্র পরিচিত।

ো

দাস

হুগলী জেলার সত্যপুর গ্রাম হইতে স্ত্রী পুরুষ ২১ জন পদব্রজে ৺জগন্নাথদেবের রথযাত্রা দেখিতে গিয়াছিল। তখন রেলপথ তৈরী হয় নাই। প্রায় দুইমাস পরে ২০জন গ্রামে ফিরিয়া আসিল। নন্দ ফিরিল না। নন্দের বৃদ্ধা মাতা ও যুবতী স্ত্রী আছাড়ি পিছাড়ি করিয়া কান্না আরম্ভ করিল।

দলের সর্দ্দার রামলোচন তর্কালঙ্কার উহাদিগকে নানা-প্রকারে প্রবোধ দিতে আরম্ভ করিলেন, বলিলেন—

"ভবিতব্য, দিদি, ভবিতব্য, তা না হলে পথে নন্দ দারুণ বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হবে কেন? আমরা সকলে ওর কি সেবাটাই করেছি; ভিন্ন গ্রামের যাত্রীদের মধ্যে একজন প্রবীণ ডাক্তার ছিলেন, তিনি কত উত্তম ঔষধ দিলেন। কিন্তু যার কাল পূর্ণ হয়েছে, তাহাকে কে রাখবে বল? আমাদের সকল সেবা-যত্ন, ডাক্তারের ঔষধ ব্যর্থ ক'রে, নন্দ চলে গেল। চক্ষু বুজবার পূর্ব্বে বলে গেল—আমি যেন তার মা ও স্ত্রীর নিকটে সেবা, যত্ন চিকিৎসার কথা বলি। রাজা, জমিদারও এরূপ সেবা-যত্ন পায় না।"

বৃদ্ধ অক্ষয় সরকার বলিলেন, "তারপর কি সৎকার! একজন রাজা সদলবলে পুরী যাচ্ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল অনেক ঘি আর চন্দন কাঠ। আমরা চাইবা মাত্র তিনি নন্দের সৎকারের জন্য আধমণ ঘৃত ও দশ সের চন্দন-কাঠ দিলেন। আমরা ওর সৎকার শেষ ক'রে, দুঃখিতচিত্তে পুরীর দিকে অগ্রসর হ'লেম।"

পাঠশালার পণ্ডিত মহিম ঠাকুর বলিলেন, "একেই বলে ভাগ্য! যেখানে নন্দ দেহরক্ষা করল, তার নিকটেই ছিল এক প্রবীণ আম্রবৃক্ষ। একদল কাঠুরিয়া কাঠ কাটতে বনে যাচ্ছিল। তাদের নিকট ছিল দুটী বৃহৎ শাণিত ।। তা'দিকে অনুরোধ করা মাত্র দুজন জোয়ান াঠুরিয়া অকস্মাৎ প্রবীণ আম্রবৃক্ষকে ধরাশায়ী ক'রে দিল এবং নন্দের দাহের জন্য পবিত্র আম্রকাষ্ঠের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ইন্ধনরাশি প্রস্তুত ক'রে দিল। ঘৃত সংযোগে পবিত্র আম্র ও চন্দনকাঠ ধূ ধূ ক'রে জ্বলে উঠলো এবং দেখতে দেখতে র পঞ্চভূতাত্মক দেহকে ভস্মীভূত ক'রলো। নন্দ বড় বান্—বড় ভাগ্যবান্ ছিল।" বলিয়া কোঁচার খুঁটে াটরগত চক্ষুপ্রান্ত মার্জ্জনা করিলেন।

নন্দের স্ত্রী আড়াল হইতে সব শুনিল। কেন জানি া, তাহার মনে হ'ল—সেবা যত্ন, চিকিৎসা ও সৎকারের কথা অলীক এবং অতিরঞ্জিত। শাশুড়ী এবং গ্রামের বৃদ্ধেরা পুনঃপুনঃ বলা সত্ত্বেও সে হাতের শাঁখা ভাঙ্গিল না। থান কাপড়ও পরিল না। লুকাইয়া মাছও খাইত। তা ছাড়া, কয়েক দিন পূর্ব্বে সে স্বপ্ন দেখিয়াছিল—নন্দ যেন সুস্থ শরীরে, হাসিমুখে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াছে!

দলের প্রত্যাবর্ত্তনের ঠিক একমাস পরে একদিন বেলা দশটার সময় নন্দ গ্রামে প্রবেশ করিল। শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা কৃশ, কিন্তু সুস্থ। গ্রামের যাহারা নন্দের মৃত্যু ও সৎকারের সংবাদ পাইয়াছিল, তাহারা তো রামনাম জপ করিয়া দৌড়াইয়া গৃহে প্রবেশ করিল। নন্দ উহাদের আচরণে বিস্মিত হইল। যাহা হউক, সে বাড়ী পৌঁছিল। তাহার স্ত্রী তাহাকে দেখিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল এবং শাশুড়ীকে বলিল, "দেখুন মা, আপনার ছেলে ফিরে এসেছে।" নন্দের মা নন্দকে জড়াইয়া ধরিয়া একবার কাঁদে, একবার হাসে, একবার নন্দের মাথায় পিঠে হাত বুলায়। তারপর নন্দকে ঘরে বসাইয়া গাছকোমর বাঁধিয়া তর্কালঙ্কার, অক্ষয় সরকার ও মহিম ঠাকুরের চৌদ্দ গোষ্ঠীর শ্রাদ্ধ করিতে পাড়ায় ছুটিয়া গেল।

নন্দের প্রত্যাবর্ত্তনের তিন দিন পরে, Health unit (স্বাস্থ্যকেন্দ্র) স্থাপন উপলক্ষে সত্যপুর গ্রামে নানাপ্রকার চিকিৎসা-ব্যবসায়ী বহু চিকিৎসকের সমাগম হইল। এই সুযোগে গ্রামের মাতব্বর ঘোষাল মহাশয় তাঁহার চণ্ডী-মণ্ডপে এক সভা আহ্বান করিলেন। তিনি সেই সভায় নন্দকে, শহর হইতে আগত চিকিৎসকবর্গকে, গ্রামের কবিরাজ এবং ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিলেন। পণ্ডিতগণের দীর্ঘ আর্কফলায় রক্তজবা শোভা পাইতে লা গল। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দর্শক ও শ্রোতারূপে চণ্ডীমণ্ডপের চতুর্দ্দিকে সমবেত হইল।

তখন ঘোষাল মহাশয় সমবেত চিকিৎসক-মণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কি প্রকারে নন্দ দারুণ বিসূচিকা রোগ থেকে আরোগ্যলাভ ক'রে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করল, তৎসম্বন্ধে আপনারা নন্দকে প্রশ্ন করতে পারেন।"

প্রথমেই এ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার ননীলাল ভট্টাচার্য্য M. B. নন্দকে প্রশ্ন করিলেন :

ননী। আচ্ছা নন্দ, কলেরা হওয়ার পর তুমি কি করলে?

নন্দ। আমার ভেদ-বমি আরম্ভ হওয়া মাত্রই গ্রামের লোক আমাকে পথের পার্শ্বে ফেলে পালিয়ে গেল। তখন আমার দারুণ তৃষ্ণা। জল জল বলে চীৎকার করলাম। কেউ একটু জল দিল না। আমি তখন অতি-কষ্টে গড়িয়ে গড়িয়ে একটা জলার পাশে গেলাম

এবং সেই জলায় মুখ ডুবিয়ে যত ইচ্ছে জল পান করলাম। আমার তৃষ্ণার ক্ষণিক নিবৃত্তি হল।

ননী। তুমি বোধ হয় শুনেছ, উড়িষ্যার চিল্কা হ্রদের সঙ্গে সমুদ্রের যোগ আছে। তোমার এই জলাশয়টীর সাথে সমুদ্রের যোগ ছিল কি?

নন্দ। থাকতেও পারে, না থাকতেও পারে। মাথা তুলে যোগাযোগ দেখার অবস্থা তখন আমার ছিল না।

ননী। নিশ্চয় সমুদ্রের যোগ ছিল এবং তুমি যে জল পান করেছ, তা লবণাক্ত ছিল। শুনুন ঘোষাল ম'শায়, শুনুন সভাস্থ ব্যক্তিবর্গ, নন্দ এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার গুণে আরোগ্যলাভ ক'রেছে। আপনারা জানেন, কলেরা হলে আমাদের মতে সেলাইন্ ইন্‌জেক্‌সন্ দেওয়া হয়। সেলাইন্ আমরা প্রস্তুত করি। শত হলেও ভগবান্ কর্ত্তৃক প্রস্তুত সেলাইন্ মনুষ্যকৃত সেলাইন্ হতে বহু সহস্র গুণে উপকারী। নন্দের system অর্থাৎ পাকস্থলীতে ভগবানকৃত সেলাইন্ প্রবেশ ক'রে এত সহজে তার রোগবীজ নির্ম্মূল করিয়াছে। কমা ব্যাসিলি নষ্ট করবার একমাত্র উপায় লবণজল। এ-জন্যই জ্ঞানিগণের মতে এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসাকে একমাত্র র‍্যাসনেল সিষ্টেম্ বলা হয়। যেমন দুয়ে দুয়ে চার হয়, আমাদের চিকিৎসাও—

এমন সময়ে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার নটবর রায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন, বলিলেন—

হাঁ, ওঁদের চিকিৎসাও তেমনি যৌগিক, কিন্তু বিয়োগান্ত, আসুরিক, অবিদ্যাপ্রসূত। বাবা নন্দ! তুমি ননীচোরার কথা কাণে তু'ল না। আমি তোমাকে যা জিজ্ঞাসা করি, তার জবাব দেও।

নন্দ। আজ্ঞে, বলুন।

নট। আচ্ছা বাবা নন্দ! হোমিওপ্যাথিক ঔষধ কখনও খেয়েচ?

নন্দ। আজ্ঞে হাঁ, বহুবার।

নট। খেলে পর একটু স্পিরিটের গন্ধ পাওয়া যায়?

নন্দ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

নট। আচ্ছা, তুমি জলার যে জল খেয়েছিলে, তাতে এমন কোন গন্ধ পেয়েছিলে কি?

নন্দ। তখন আমার নাকের গন্ধ শুঁকবার অবস্থা নয়।

নট। নিশ্চয় তুমি পেয়েছিলে, আর না পেলেও ক্ষতি নাই। শুনুন ঘোষাল মশায় এবং উপস্থিত ভদ্র-মহোদয়গণ, আপনাদের অনেকের স্মরণ থাকতে পারে, কলকাতা হতে পুরীর পথে চাঁদবালি নামক জাহাজ ডুবে যায় এবং বহুলোক প্রাণে মরে। সেই জাহাজে ছিলেন এক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার এবং সঙ্গে ছিল একটী হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্স। সেই বাক্সের ঔষধ সমুদ্রজলে মিশে গেল। এখন মনে ক'রে দেখুন, সমুদ্রজলে Pulsatilla, Camomilla. Carbo প্রভৃতির কত Billionth (বিলিয়নথ) ডাইলিউশন হয়ে গেছে। সেই ঊর্দ্ধ ডাইলিউসনের ঔষধ খেলে কলেরা আরোগ্য না হয়ে যায় কোথায়? তোমাকে যে আরাম করেছে, যৌগিক উদ্ধত এ্যালোপ্যাথিক নয়—তোমাকে আরাম করেছে—শান্ত শীতল স্নিগ্ধ হোমিওপ্যাথি—যার মূল মন্ত্র "সমে সমে"—সেই অভাবনীয়, অতুলনীয়—"

ইলেক্‌ট্রোপ্যাথ ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় কথাটা পূর্ণ করিলেন, বলিলেন, "faith cure নামক চিকিৎসাপ্রণালী, যার নাম হোমিওপ্যাথি। যার মূলমন্ত্র 'বিশ্বাসে মিলায় হরি, আরোগ্য প্রভৃতি'। আচ্ছা, বাবা নন্দ, এতক্ষণ অনেক বাতুলের প্রলাপ শুনেছ। এখন চটপট আমার প্রশ্নের জবাব দেও দেখি।"

নন্দ। আজ্ঞে, বলুন।

ফণী। তুমি যে জায়গায় শুয়ে পড়েছিলে, তার উপর টেলিগ্রাফের তার ছিল কি?

নন্দ। থাকতে পারে, আমার চক্ষু তখন দৃষ্টিহীন।

ফণী। নিশ্চয় ছিল। তখন ৺জগন্নাথদেবের রথযাত্রা। কলকাতা ও পুরীর মধ্যে কত সহস্র সহস্র টেলিগ্রামের আদান-প্রদান হচ্ছিল। টেলিগ্রাফের তারগুলি বিদ্যুতপূর্ণ ছিল এবং তার নীচের মাটীতে বিরুদ্ধ বিদ্যুতের সৃষ্টি ক'রেছিল। সেই বিদ্যুৎ তোমার শরীরে প্রবেশ ক'রে তোমাকে আরাম ক'রেছে। তোমার আরোগ্য ইলেক্‌ট্রোপ্যাথিক চিকিৎসাপ্রণালীর বিজয়-বার্ত্তা ঘোষণা কর্চ্ছে।"

এ সময় ক্রোমোপ্যাথ হরিশ গাঙ্গুলী চীৎকার করিয়া বলিলেন, "বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা কর্চ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বলছে 'ভাগ যাও, ভাগ যাও সব ঝুটা হ্যায়।' মশাই, শিশু চিকিৎসা শাস্ত্রকে পরিণতবয়স্ক বলে পরিচয় দিতে মুখে বাঁধে না? আঁতুড়ের শিশুকে মায়ের দুধ খেতে দেন। বাত,বেদনা প্রভৃতি পুতুল নিয়ে খেলা করতে দেন। শোন, বাবা নন্দ, আমার কথার জবাব ঠিক ঠিক দেও দেখি।"

নন্দ। আদেশ করুন।

হরিশ। বাবা নন্দ, তুমি যে জল পান ক'রেছিলে, তা কি নীলাভ সবুজ বর্ণের ছিল?

নন্দ। শেওলা পড়া জল। তা নীলাভ সবুজ কি না, ঠিক বলতে পারি না।

হরিশ। শেওলা পড়া হলেই হল সবুজ, আর তার মধ্যে নিশ্চয়ই নীলবর্ণের মিশ্রণ ছিল, অন্ততঃ নীল আকাশের প্রতিবিম্ব নিশ্চয়ই সেই জলের উপর পড়েছিল। আমাদের সুপ্রসিদ্ধ ক্রোমোপ্যাথি মতে নীলাভ সবুজ জল বিসূচিকার প্রধান ঔষধ। আমার ডিস্পেন্সেরীতে গেলে দেখতে পাবে—ওলাউঠার এপিডেমিকের সময় আমি কত ডজন ডজন নীলাভ সবুজ বোতলে জল পুরে রৌদ্রে দিয়ে রাখি। শুনুন সকলে, অত্যাশ্চর্য্য চিকিৎসা-প্রণালী ক্রোমোপ্যাথির দ্বারাই নন্দের রোগ সেরেছে।

এমন সময় হাইড্রোপ্যাথিক্ ডাক্তার নবীন ঘোষাল তীব্রস্বরে বলিলেন—

"আরে রেখে দাও তোমার বোতলের বুজরুকি। আসল প্রণালীটা হচ্ছে হাইড্রোপ্যাথি বা জলপান বা জল প্রয়োগের দ্বারা ব্যামো সারান। তোমরাও তাই কর; মাঝখান থেকে রং-বেরংএর বোতলে জল ভরে রোদে রেখে দাও। হাইড্রোপ্যাথি বা জলের গুণ স্বীকার করতে চাও না। শুনুন মশাইরা—নন্দ বলেছে, জলাতে মুখ ডুবায়ে অনেক জল খেয়েছিল। অর্থাৎ হাইড্রোপ্যাথি মতে ওর চিকিৎসা ও আরোগ্য হয়েছিল।"

তখন ত্রিলোচন কবিরাজ মহাশয় বলিলেন—

'আজ্ঞে, ডাক্তার বাবুরা তো পাঁচ জনে পাঁচ রকমের বড় বড় বক্তৃতা দিলেন। এখন আমাদের হিন্দুর শাস্ত্রীয় চিকিৎসার কথা কিঞ্চিৎ শুনুন। আচ্ছা বাবা নন্দ, তুমি যে জল পান করেছিলে, তা শৈবালমিশ্রিত ছিল, তুমি নিজেই স্বীকার করেছ। শুনুন মহাশয়গণ, জলজ শৈবালের রস যে বিসূচিকার অমোঘ ঔষধ, আপনারা বোধ হয় অবগত নহেন - বাবা নন্দ, তুমি শাস্ত্রীয় ঔষধেই আরোগ্য লাভ ক'রেছ। সুশ্রুতে লেখা আছে—"

ঠিক এই সময়ে তর্কবাচস্পতি মহাশয় রক্তজবা-শীর্ষ শিখা আন্দোলন করিয়া বলিলেন, "ডাক্তার-কবিরাজের অনেক কথা শোনা গেছে। এখন ধর্ম্মের কথা একটু শুনুন। শাস্ত্রে বলে "রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।" বাবা নন্দ, তুমি রথস্থ বামন দেখেছ, তোমাকে মারে কে?"

ন্যায়পঞ্চানন বলিলেন, "এ অতি অদ্ভুত ব্যাখ্যা। নন্দ তো পথেই বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হলো। সে রথস্থ বামন দেখল কি করে?

তর্কবাচস্পতি। শাস্ত্রের নিগূঢ় অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা তোমার কর্ম্ম নয়। দৃষ্ট্বা মানে চক্ষু দিয়ে দেখা নয়, অন্তঃশ্চক্ষুতে দর্শন করা। মৃত্যুপথযাত্রী যেমন অন্তরে জগন্নাথ দেবকে দেখতে পায়, চক্ষুষ্মান্ জীবিত ব্যক্তি কখনও তদ্রূপ পায় না।

ন্যায়পঞ্চানন। অতি অদ্ভুত ব্যাখ্যা---তর্কবাচস্পতিরই উপযুক্ত। তা যেন হলো, কিন্তু নন্দ মলোই না, আর আবার পুনর্জ্জন্মের কথা কোত্থেকে আসে?

তর্কবাচস্পতি। তোমার মতন বেল্লিকের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। আরে মলে তো পুনর্জ্জন্ম হতোই---জান না, 'ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ'। মলো না বলেই তো পুনর্জ্জন্ম হলো না।

ন্যায়পঞ্চানন। কি আমাকে বেল্লিক বল্লি---আহাম্মুখ, অর্ব্বাচীন।

এর পরে সভামধ্যে যে তুমুল কোলাহল, তর্ক বিতর্ক ও হাতাহাতি ধ্বস্তাধ্বস্তি আরম্ভ হইল, তাহা পাঠকবর্গকে অনুমান করিতে অনুরোধ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

নন্দ অলক্ষিতে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শয্যাগ্রহণ করিয়া আপন-মনে হাসিতে লাগিল---হাসির চোটে তাহার পেট ফাটিয়া যাওয়ার উপক্রম হইল। নন্দের স্ত্রী অবশেষে তাহার নিজস্ব অমোঘ উপায়ে তাহার হাসির নিরসন করিল।

সৌখীনের সুখ

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার ঘোষ

মূল একদিন বিকচ ফুলেরে
কহিল দারুণ রোষে,
তুমি সৌখীন সবার উপরে
মহাসুখে আছ বসে।
ফুল কেঁদে কয় "তাই বুঝি হায়
সব আগে যাব খ'সে"॥

বৈষ্ণব সাহিত্য

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

মধ্যে বাম হইতে পণ্ডিত আশুতোষ শাস্ত্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে যে 'বিরাট্ পুরুষের লীলা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে, যাঁহাকে বলা হইয়াছে—

ন নামরূপে গুণ জন্ম কর্ম্মভি-
র্নিরূপিতব্যে তব তস্য সাক্ষিণঃ
মনোবচোভ্যামনুমেয়বর্ত্মনো
দেবক্রিয়ায়াং প্রতিযন্ত্যথাপি হি।

—শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ ২৮ অধ্যায় ৩৬ শ্লোক।

[যাঁহাকে নাম, রূপ, জন্ম ও কর্ম্ম প্রভৃতির দ্বারা নিরূপিত করা যায় না; যিনি কেবল প্রেম ও ভক্তি রূপ মার্গ এবং মন ও বাক্য দ্বারাই অনুমেয় এবং যিনি সাক্ষিস্বরূপ, তাঁহাকে উপাসকগণ কেবল উপাসনা দ্বারাই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।]

— যিনি অবাঙ্মনসগোচর অথচ "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" (গীতা), তাঁহার উপাসনাই বৈষ্ণব ধর্ম্ম; এবং এই ধর্ম্মের পরিপোষক ও অভিপ্রকাশক সাহিত্যই বৈষ্ণব সাহিত্য।

বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে আমার বক্তব্যের প্রারম্ভেই একটি কথার উল্লেখ এখানে বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করি। সেটি বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে এক শ্রেণীর লোকের মনোভাব। বৈষ্ণব সাহিত্যকে ইঁহারা একটা লৌকিক তথা সাম্প্রদায়িক সাহিত্য মনে করিয়া ইহাকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখেন না, এবং উক্ত কারণে এ সাহিত্যের উপর তাঁহারা আন্তরিক ভাবে শ্রদ্ধাশীলও নহেন। আমাদের দেশে বহু সাম্প্রদায়িক সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে সত্য, এবং সেগুলি জনসমাজে নিতান্ত অজ্ঞাতও নয়। কাজেই, উল্লিখিত এই শ্রেণীর মনে "বৈষ্ণব" পদটির জন্যই হয়তো এরূপ ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হইয়াছে, ইহা বেশ স্পষ্টই বুঝা যায়। আর, ঈদৃশ বদ্ধমূল ধারণার জন্যই হয়ত তাঁহারা বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে কোনও অনুসন্ধানও করা প্রয়োজন মনে করেন না। কেহ কেহ দুই চারিটি পদ পড়িয়াই সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে একটা বিরুদ্ধ মত সংগঠন করিয়া ফেলেন, কেহ কেহ রাধাকৃষ্ণ নামেই নাসিকা কুঞ্চিত করেন, কেহ কেহ অশ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করিয়া ইহার মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতে অক্ষম হইয়া ইহার নিন্দা করেন। কেহ কেহ এইটুকু কষ্টও স্বীকার না করিয়া, কেবল নিন্দুকের কথা শুনিয়াই নিন্দা করিতে সমুদ্যত হন।

এ শ্রেণীর লোকেরাও আমাদের দেশের নেতৃস্থানীয়, চিন্তা ও ভাবধারার অগ্রণী, বিদ্বন্মণ্ডলের মধ্যমণি। আমরা তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি, অভিবাদন করি—সে জন্য তাঁহাদের ঈদৃশ উক্তি পাঠে শুধু বিস্মিত নয় আহতও হই। কারণ—তাঁহাদের নিকট আমরা এমন একদেশদর্শী অসম্পূর্ণ অজ্ঞানসুলভ এবং অশ্রদ্ধেয় মত প্রকাশের হঠকারিতা আশা করি না। বিশ্বাস ও ভক্তি সকলের জন্মে না, জ্ঞান সকলের শুদ্ধ নয়, বুদ্ধিও সকলের কুশাগ্র হয় না, তাই বলিয়া যাহা জানা নাই, সে বিষয়ে মতপ্রকাশের স্পর্দ্ধাও অনুচিত। আণবিক বোমা তৈরি করিতে জানি না, বা তাহার ক্রিয়া সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ অজ্ঞ বলিয়া সে বোমাকে অস্বীকার করা আর চলে না। বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে না জানিয়া স্বপক্ষাচরণও যেমন নিরাপদ নয় বিপক্ষাচরণও তেমন অনুচিত।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম অতি প্রাচীন, ঋগ্বেদেও তাহার পরিচয় আছে। লৌকিক ধর্ম্মগুলি গত ৫০০ বৎসরের মধ্যে তৎকালীন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে সৃষ্ট হইয়াছে। অনেকে এমনও মনে করেন যে, বৈষ্ণব ধর্ম্ম শ্রীমন্মহাপ্রভুই প্রথম প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, সুতরাং আধুনিক। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় স্মরণীয়। বৈষ্ণবধর্ম্ম ও বৈষ্ণব সাহিত্য আলো ও ছায়ার ন্যায় অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। একটিকে বাদ দিলে অন্যটির অস্তিত্ব থাকিবে না। বৈষ্ণব সাহিত্য শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা-কীর্ত্তনকে কেন্দ্র করিয়া ভাবিত ও লিখিত বলিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক যে কোনও রচনাই বৈষ্ণব কাব্য বা বৈষ্ণব সাহিত্য নয়। আধুনিক কালে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বেনামীতে যে সব উৎকট কামকলা মাঝে মাঝে দেখা যায়, সেগুলিকে অনেকে

বৈষ্ণব কবিতার লেবেল মারিয়া বৈষ্ণব কবিতা বলিয়া চালাইতে চাহেন, তাহাতে সরল অনভিজ্ঞ ব্যক্তির হয়ত ভ্রম ঘটিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত বৈষ্ণবেরা জানেন যে, সেগুলি বৈষ্ণব কবিতা হওয়া দূরে থাকুক, সাধারণ কাব্য পদবাচ্য কি না, তাহাতেও যথেষ্ট সন্দেহ বিদ্যমান। আমাদের মধ্যে অনেকে আছেন—যাঁহারা মূল্যবান্ ইংরাজী পোষাকে সুসজ্জিত হইয়া নির্ভুল ইংরাজী বলিয়া সাহেব নামে প্রচারিত হইতে চাহেন, কিন্তু সাহেবকে যাঁহারা চিনেন, তাঁহারা বুঝেন ইঁহারা সাহেব ত নহেনই, পরন্তু ইঁহারা যে কি—তাহাই ভাবিতে আরম্ভ করেন।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্ব লীলাকীর্ত্তন এবং বেদোত্তার প্রচারণের কথা পাই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে। ঐ গ্রন্থও বহু প্রাচীন।

শ্রীকৃষ্ণ নিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন—

ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

যুগে যুগে তিনি আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইবেন। তাই সর্ব্বজগন্নিবাস শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি 'অনাদিমধ্যান্ত অচিন্ত্যরূপ'। মহাভারতের উদ্যোগ-পর্ব্বে আছে—

সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণঃ সত্যমত্র প্রতিষ্ঠিতম্।
সত্যাৎ সত্যো হি গোবিন্দস্তস্মাৎ সত্যো হি নামতঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতেও মহর্ষি বেদব্যাস ব্রহ্মাদি দেবগণের শ্রীকৃষ্ণস্তবে বলিতেছেন—

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং
সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং
সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ॥ ১০ম স্কন্ধ ২য় অ। ২৬।

শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সত্য, কারণ শ্রীকৃষ্ণই ভগবান্—কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ-কথাই ভগবৎ-কথা, ভাগবত।

শ্রীকৃষ্ণই বিষ্ণু:

রূপং যত্তৎ প্রাহুরব্যক্তমাদ্যং
ব্রহ্মজ্যোতির্নির্গুণং নির্ব্বিকারম্।
সত্তামাত্রং নির্ব্বিশেষং নিরীহং
স ত্বং সাক্ষাদ্বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ॥

—১০।৩।২৪

যেহেতু শ্রীকৃষ্ণই বিষ্ণু, সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার ধর্ম্মই বৈষ্ণবধর্ম্ম এবং যেহেতু শ্রীকৃষ্ণই ভগবান্ সেইজন্য বৈষ্ণব ধর্ম্মই একমাত্র ভাগবত ধর্ম্ম। বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও ভাগবত ধর্ম্ম একার্থক। সুতরাং বৈষ্ণব ধর্ম্ম ভগবানের উপাসনার ধর্ম্ম। সব ধর্ম্মেই ভগবানের এক একটি বিভিন্নরূপের উপাসনা হয়, কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম্ম উপাসনা করেন সমগ্র অখণ্ড ভগবৎসত্তাকে, পূর্ণ ভগবানকে। এই জন্য বৈষ্ণব ধর্ম্ম সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম ত নহেই, বরং জো[র] করিয়াই বলা যাইতে পারে যে, বৈষ্ণব ধর্ম্ম সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয়ে পরম ধর্ম্ম। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এ[ই] ভাগবত ধর্ম্ম বঙ্গদেশে তথা সমগ্র ভারতে যুগোপযো[গী] করিয়া প্রচার করিয়াছেন, প্রথম প্রবর্ত্তন করেন না[ই]। বৈষ্ণব ধর্ম্ম বা ভাগবত ধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম। ইহাতে বিদ্[বেষ] নাই, সংঘাত নাই, কোথাও কোনও সংঘর্ষ নাই—মিলনের ধর্ম্ম, সাম্যের ধর্ম্ম। বৈষ্ণবতা ও প্রেম এক[ার্থ]বাচক। বৈষ্ণবতা প্রেম ও প্রিয়কে এক করিয়া দে[য়]। এ ধর্ম্মে উচ্চ-নীচ, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, হিন্দু-মুসলমান নাই, ধনী নির্ধন নাই, দেশী-বিদেশী নাই, বৈষ্ণব ধর্ম্ম সর্ব্বজনের, সর্ব্ব দেশের এবং সর্ব্বকালের, কারণ ইহা ভাগবত ধর্ম্ম। ভগবদুপাসনা মানবজাতির যেমন সনাতন, বৈষ্ণব ধর্ম্ম তেমনি চিরন্তন।

রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন—

শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান?
... ... এ কি শুধু দেবতার?
... ... এ গীত উৎসব মাঝে
শুধু তিনি আর ভক্ত নির্জ্জনে বিরাজে।
দাঁড়ায়ে বাহির দ্বারে মোরা নরনারী—
উৎসুক শ্রবণ পাতি শুনি যদি তারি
দু' একটি তান ... ...
সহসা দেখিতে পাই দ্বিগুণ মধুর
আমাদের ধরা; ... ...
সত্য করি কহো মোরে হে বৈষ্ণব কবি
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহ-তাপিত? ... ...
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে চাই
তাই দিই দেবতারে; আর পাব কোথা?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

—সোনার তরী।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধে পূজনীয় এই বৈষ্ণব-বিদগ্ধ স[ভায়] আমি কিছু বলিতে আসি নাই, কারণ, সে স্পর্দ্ধা আ[মার] নাই। আমি বৈষ্ণবও নই, কারণ বৈষ্ণব হইতে হ[ইলে] যে সব গুণাবলীর প্রয়োজন, তাহার একটিও আমার [মধ্যে] নাই, এটি আমার সৌজন্য বা বিনয় মনে করিয়া আ[মার] উপর কেহ যেন অনুচিত [illegible] হইয়া আমার [illegible] [illegible] না করেন। আমি একজন নগণ্য সাহিত্য-সেবী, [illegible] [illegible]

বৈষ্ণব-সাহিত্য লইয়াও আমি অল্প স্বল্প নাড়াচাড়া করি, মন আরও পাঁচটা বিষয় লইয়া অনধিকারচর্চা করিয়া কি। পল্লব-গ্রাহিতা বলিলেও ভুল হইবে, আমি বৈষ্ণব সাহিত্যের ক্ষীরোদসমুদ্রতটে দাঁড়াইয়া উপলখণ্ড গ্রহ করি মাত্র। কাজেই আমার উপর আপনারা গুরুভার ন্যস্ত করিয়াছেন. প্রথমেই বলিয়া রাখি তাহার সম্পাদন আমার পক্ষে অসম্ভব। আপনাদের আশীর্বাদ আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে ও ক্ষুদ্র জ্ঞানে যে স্বল্প সঞ্চয় করিয়াছি, তাহার এই ক্ষুদ্র পরিচয় নিবেদন করিতে কুণ্ঠিত হইতেছি। কারণ—

কাহাঁ তুমি সূর্য্যোপম ভাস।
মুঞি কোন্ ক্ষুদ্র—যেন খদ্যোত প্রকাশ।
—চৈ. চ. অন্ত্য।১ম।১৭৩।

মহর্ষি বেদব্যাসের পর সুদীর্ঘ কাল বৈষ্ণব সাহিত্যে আর কিছুই রচিত হয় নাই। ভাগবতের বহু পরে ১২শ শতাব্দীতে বাংলায় সেন রাজত্বকালে শ্রীজয়দেব কবির আবির্ভাব ঘটে। ব্যাসের পর জয়দেব দ্বিতীয় বৈষ্ণব কবি, আর বাংলায় বলিতে গেলে তিনিই বৈষ্ণব সাহিত্যের আদি কবি। তাঁহার শ্রীগীতগোবিন্দম্ গ্রন্থ সংস্কৃতে রচিত হইলেও, বঙ্গদেশে বৈষ্ণব ধর্ম্মের নবজাগরণে যেমন অদ্ভুত সহায়তা করিয়াছে, তেমনি অভিনব বিষয়বস্তুতে, অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনায়, মধুর-কোমলকান্ত পদাবলীতে এবং অনির্ব্বচনীয় ছন্দঝঙ্কারে বাংলার কাব্যেও এক নবযুগ প্রবর্ত্তন করিয়া দিয়াছে। আজিও বাংলার কাব্যসাহিত্য জয়দেবের প্রভাবে বিশেষ প্রভাবান্বিত।

আমার মনে হয়, জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যই বাংলায় চণ্ডীদাস এবং মিথিলায় বিদ্যাপতিকে রাধাকৃষ্ণের লীলামৃত বর্ণনায় অনুপ্রাণিত করে। বিদ্যাপতির কাব্য আমরা বহুদিন পূর্ব্বেই বাংলা কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছি, কাজেই বাংলার বৈষ্ণব কাব্যসাহিত্যের আলোচনায় তাঁহাকে বাদ দেওয়া চলে না।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি বাংলায় খাঁটি প্রেমকাব্যের তথা বৈষ্ণব-সাহিত্যের যুগল বাল্মীকি। কিন্তু দুই জনের দৃষ্টি ছিল দুইটি বিভিন্ন প্রকারের। দুই জনেই ভাগবত লীলা কীর্ত্তন করিয়াছেন বটে, কিন্তু দুইটি বিভিন্ন পাদপীঠের উপর দাঁড়াইয়া।

চণ্ডীদাস ছিলেন দুঃখবাদী।—বিরহই তাঁহার কাব্যের প্রাণ, দুঃখ বেদনাই তাঁহার কাব্যকে অমৃতময় করিয়া রাখিয়াছে:

চণ্ডীদাস কহে শুন বিনোদিনী
পিরীতি না কহে কথা।
পিরীতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে
পিরীতি মিলয়ে তথা॥

সুখের বিলীয়মান রোমাঞ্চ শিহরণ এবং পলায়মান মুহূর্ত্তগুলিকে লইয়া তিনি ইন্দ্রধনু রচনা করেন নাই, তিনি ধ্যান করিয়াছেন অনাগত সুখের প্রতীক্ষায় বেদনার শরশয্যা। প্রেমমিলনের লাগিয়া তিনি বাছিয়া লইয়াছিলেন কর্কশ কণ্টকাকীর্ণ ব্যথাসঙ্কুল বর্ত্ম, পেলব পুষ্পপল্লবাস্তীর্ণ কোমল কুঞ্জপথ নয়! এইজন্য চণ্ডীদাসের কাব্য সহজ মানবমনের স্বাভাবিকতা ও সরলতায় সাবলীল এবং বেগবান্।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম; ইহাতে মানুষে মানুষে কৃত্রিম প্রভেদ কল্পনা করিয়া কোথাও বিরোধ নাই। বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি সত্যই এই নিগূঢ় তত্ত্বটি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই সগৌরবে তারস্বরে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন—

শুন রে মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

চণ্ডীদাস ছিলেন মানুষের কবি। মানুষকে তিনি তাই প্রাণ দিয়া ভাল বাসিয়াছিলেন। জগতে আর কোনও কবি অদ্যাপি মানুষের এমন প্রশস্তি আর কখনও রচনা করেন নাই।

বিদ্যাপতি ছিলেন সুখের কবি। মিলনের ও আনন্দের কথাই তাঁহার কাব্যের বৈশিষ্ট্য। বিদ্যাপতির কাব্য উপমায়, অলঙ্কারে, ছন্দোবৈচিত্র্যে ও ভাষার ঐশ্বর্য্যে সুসমৃদ্ধ এবং উৎসবময়। চণ্ডীদাসের কাব্য প্রিয়তমের বিরহে কুটীরবাসিনীর মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদ আর বিদ্যাপতির কাব্য ঐশ্বর্য্যভারাবনম্রা প্রাসাদপুরাঙ্গনা ললিত বনিতার মদনোৎসব এবং কচিৎ বিনাইয়া বিনাইয়া শুনাইয়া শুনাইয়া শ্রবণসুভগ বিলাপ-গীতা।

বিদ্যাপতি সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন বলিয়া তাঁহার কাব্যে যেমন বৈদগ্ধ্যের প্রমাণ প্রচুর, তেমনি জয়দেব ও কালিদাসের প্রভাবও বড় কম নয়। স্থানে স্থানে জয়দেব-কালিদাসের হুবহু অনুবাদ পর্য্যন্ত তাঁহার পদাবলীতে পাওয়া যায়। বোধ করি, এই দুই মহাকবির প্রভাবেই বিদ্যাপতির পদাবলীতে আদিরসেরও বাহুল্য পরিদৃষ্ট হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিদ্যাপতির কাব্য উপমায়, অলঙ্কারে, বৈচিত্র্যে ও ঐশ্বর্য্যে উৎসবময় ও মধুর। ইহার প্রমাণ বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রত্যেকটি পদে। তবু কবির অসাধারণ প্রকাশভঙ্গী ও অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনার উদাহরণ স্বরূপ দুই একটি পদাংশ উদ্ধৃত করিতেছি। এ সবের তুলনা জগতের আর কোনও সাহিত্যে মিলে কি না সন্দেহ।

শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধির বর্ণনায় কবি বলিতেছেন—

কৈশোর যৌবন দুঁহু মিলি গেল।
বচনক চাতুরী লোচন লেল॥
কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব।
একক ক্ষীণ আওকে অবলম্ব॥
* * *
ক্ষণে ক্ষণে দশন ছটাছ টহাস।
ক্ষণে ক্ষণে অধর আগে করু বাস॥
চৌঙ্কি চলয়ে ক্ষণে ক্ষণে চলু মন্দ।
মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ॥

শ্রীরাধার বিরহবর্ণনায় কবি বলিতেছেন—

হিমকর করণে নলিনী যদি জারব
কি করব মাধবী মাহে।
অঙ্কুর তপনতাপে যদি শুকায়ব
কি করব বারিদ মেহে॥
* * *
হরি হরি কো ইহ দৈব দুরাশা।
সিন্ধু নিকট যব কণ্ঠ সুখায়ব
কো দূর করব পিয়াসা॥
চন্দনতরু যব সৌরভ ছোড়ব
শশধর বরিখব আগি।
চিন্তামণি যব নিজগুণ ছোড়ব
কি মোর করম অভাগি॥

শ্রীরাধার মিলনানন্দ বর্ণনায়;—

আজু রজনী হম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়া-মুখচন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সব সন্দেহা॥
সোহি-কোকিল অব লাখলাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বাণ অব লাখবাণ হুউ
মলয়পবন বহু মন্দা॥

বিদ্যাপতির এই পদের শেষ চারি ছত্রের অনুরূপ চারিটি ছত্র রমণী মোহন মল্লিকের চণ্ডীদাস গ্রন্থেরও ২২ পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়:

এখন কোকিল আসিয়া করুক গান।
ভ্রমর ধরুক তাহার তান॥
মলয় পবন বহুক মন্দ।
গগনে উদয় হউক চন্দ॥

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ইংরাজী চতুর্দশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বাংলায় ইঁহারা শুধু বিশুদ্ধ প্রেম-কাব্য বা খাঁটি বৈষ্ণব কবিতার প্রবর্তনই করিয়া যান নাই, অদ্যাপি বাংলার কাব্য এই দুই মহাকবির প্রভাবে প্রভাবিত। ইহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বহু কবি অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। বঙ্গ সাহিত্যে ইঁহারা যুগপ্রবর্ত্তক।

চণ্ডীদাসের তিরোধানের বহু পরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও দর্শন প্রচার করিয়া, সমগ্র ভারতবর্ষের চিন্তা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে অভিনব ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন, চণ্ডীদাস যেন সেই লোকোত্তর মহামানবের অগ্রদূত, তাঁহারই বৈতালিক এবং নকীবরূপে তাঁহার শুভাগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

আজু কে গো মুরলী বাজায়।
এ ত কভু নহে শ্যামরায়॥
ইহার গৌরবরণে করে আলো।
চূড়াটি বাঁধিয়া কেবা দিল॥
তাহার ইন্দ্রনীলকান্ত তনু।
এ ত নহে নন্দসুত কানু॥
* * *
চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে।
এ রূপ হইবে কোন্ দেশে।

এ পদটি "সম্ভোগ মিলন" অধ্যায়ের অন্তর্গত। ব্যাখ্যাকারেরা ইহার যে অর্থই করুন, আমি ব্যক্তিগত ভাবে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি, মহাকবির এটি ভবিষ্যৎ দর্শন। প্রতিভার তৃতীয় নয়নে তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন, 'গৌরবরণে আলো করতে' একজন আসিতেছেন। সাধারণ লোকের দৃষ্টিপথের বহু দূরে চণ্ডীদাস এই দুনিরীক্ষ্যকে সমীক্ষণ করিয়াছিলেন। সাধক মহাকবির ইহা অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, অন্তর্বোধী অনাগত দর্শন। কথিত আছে, অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্রের জন্মের বহু পূর্ব্বে বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। বঙ্গের বাল্মীকি শ্রীচণ্ডীদাস তেমনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে তাঁহাকে ধ্যানে সন্দর্শন করিয়া তাঁহার শুভাগমনবার্ত্তার সন্ধান পাইয়াছিলেন বলিয়াই তিনি লিখিয়াছেন—"এরূপ হইবে কোন্ দেশে।"

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বাংলাদেশের ধর্ম্মে চিন্তায় সমাজে সংস্কারে সংস্কৃতিতে এবং সাহিত্যে যে মহা বিপ্লব ঘটিয়াছিল, শুধু বঙ্গদেশে নয়, সমগ্র ভারতে সেরূপ ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও কেহ দেখে নাই।

শ্রীচৈতন্যদেব আপনি আচরণ করিয়া জীবকে যে প্রেমের ধর্ম্ম শিখাইয়া গিয়াছেন, তাহাই শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত

ভাগবত বা বৈষ্ণবধর্ম্ম সকলেই অবগত আছেন যে মহাপ্রভুর এই প্রেমধর্ম্মে ব্রাহ্মণ-শূদ্র হিন্দু মুসলমান উচ্চ নীচের কোনও প্রভেদ ছিল না। এই জন্য তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার প্রচারিত এই প্রেমের ধর্ম্মকে জনসাধারণের সুবোধ্য করিবার জন্য নানাদেশ হইতে আগত একটী বিরাট ভক্ত প্রেমিক দার্শনিক এবং কবির গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছিল। বাংলার কাব্যসাহিত্যেও মহাপ্রভু যে প্রেমকল্পদ্রুম রোপণ করিলেন, তাহাতে জল সিঞ্চন করিবার জন্য দেখিতে দেখিতে অগণিত কবি ও পদকর্ত্তার আবির্ভাব হইল—যে সব মহাজনের অপূর্ব্ব পদাবলীতে বঙ্গসরস্বতী আজিও মহিমাসমুজ্জ্বল।

এই সময়ে মহামতি হুসেন শাহ গৌড়ের নরপতি ছিলেন। বাংলা সাহিত্যেরই তিনি যে শুধু একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাহা নয়, তিনি মহাপ্রভুকেও যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের রাজসভাতে রূপ ও সনাতন গোস্বামী দুই ভ্রাতা রাজ অমাত্য ছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের এযাবৎ ভাষায় অর্থাৎ বাংলা ভাষায় কোনও অনুবাদ হয় নাই—সে জন্য ভাগবত ধর্ম্মের কথা জনসাধারণের নিকট তেমন পরিচিত ছিল না। ১৪০০ সালে হুসেন শাহের পূর্ববর্ত্তী গৌড়েশ্বরের দরবারে এবং তাঁহার আদেশে মালাধর বসু—রাজসরকার যাঁহাকে গুণরাজ খাঁ উপাধিতে পরিভূষিত করেন—"শ্রীকৃষ্ণবিজয়" নামে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের কিয়দংশ বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। এইভাবে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'ই ভাগবতের প্রথম বাংলা রূপ * [ক্রমশঃ

* কলিকাতায় অনুষ্ঠিত বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলনে কাব্যশাখার সভাপতির অভিভাষণ।

প্রেম ও মৃত্যু

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ সান্যাল, এম্-এ

হেথা তোর নহে স্থান নশ্বর ধরায়;—
এ যে দুঃখ-নিকেতন—বেদনায় ভরা!
যৌবন বুদ্বুদসম হেথা লয়মান
জীবন—পশ্চাতে তার ছুটে আসে জরা!
হায় প্রেম, কেন তুই বেঁধেছিস্ নীড়
ক্ষীণ-আয়ু, মৃত্যু-ভীত মানুষের বুকে?
এ যে অশ্রু-পারাবার ফেনিল উচ্ছল
কূজন করিবি হেথা বসি' কোন সুখে?
প্রভাতের পিছে হেথা সন্ধ্যার তিমির,
হাস্যসাথে ওতপ্রোত নয়নের লোর;
দুঃসহ নিদাঘজ্বালা দাবদাহপ্রায়—
না টুটিতে ফাল্গুনের পুষ্প-স্বপ্নঘোর।
ব্যর্থ প্রাণ-বিনিময়!—পরিণাম তার
সুচির বিরহ-ব্যথা—নিষ্ফল ক্রন্দন
দীর্ঘশ্বাস - হাহুতাশ - তীব্র মর্ম্মজ্বালা—
উচাটন আকুলতা—ত্রাস অনুক্ষণ!
বাহুপাশে বাঁধি' যারে হিয়া না জুড়ায়,
হিয়ায় রাখিয়া যারে মিটে না পিয়াস,
ক্ষণপরে মৃত্যু এসে কেড়ে নেয় তারে—
ছিন্ন করি' প্রেমিকের ক্ষীণ ভুজপাশ!
বাসর শয়ন আর শ্মশান-পাথর,—
মাঝে তার কতটুকু স্বল্প ব্যবধান?
ভাঙনের কূলে বসি' উন্মাদের মত
এ-যেন বাঁশীতে সাধা উৎসবের তান!
না—না ভুল। ভালো এই আবেশ বিভ্রম—
মদির রঙিন মোহ—ক্ষণিক স্বপন?
মুহূর্ত্তের—তাই বুঝি আঁকড়িয়া ধরি
কৃপণের মত সদা হৃদয়ের ধন!
ওরে প্রেম, মৃত্যু তোরে ক'রেছে মহান্,
লোভনীয়, কান্তোজ্জ্বল, স্নিগ্ধ মধুময়!
মরণের পিছে থাকে নিয়ত স্মরণ,—
স্মৃতি তোরে ধ্বংসমাঝে দেয় বরাভয়!
মৃত্যু তোর অমরতা দিয়েছে ধরায়,
অঙ্গ তোর প্রেমিকের নয়নাশ্রুজল;
মরণ বিজয়ী ওরে, জীবনের শেষে
নবদেশে আছে তোর সঞ্চিত সম্বল?

ডাকাত পড়েছে। যেমন উপলব্ধি করা, তেমন তাদের বাক্‌শক্তি রহিত হয়ে গেল, গলা শুকিয়ে গেল, কথা সরে না। বাহিরে বেরিয়ে পালাবে কি? হাত পায়ে যা কাঁপুনি ধরেছে। পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে তারা খানিকক্ষণ বসেই রইল। এদিকে ডাকাতরা ত আর বসে থাকতে আসে নি। তারা সংঘবদ্ধ ভাবে বাড়ী ঘেরাও করে, বিশেষ বিশেষ স্থানে গিয়ে দাঁড়াল এবং বাড়ীতে প্রবেশের একটা উপায় খুঁজতে লাগল। বেশী বিলম্ব করবার তাদের সময় ছিল না, অথচ ডাকাতের হাত হতে পরিত্রাণের একটা উপায় তাদের খুঁজে বার করতে হবেই।

এই দারুণ বিপদে বুদ্ধিশক্তি সৌভাগ্যক্রমে তাদের তিরোহিত হয় নি। বামুনটা একটা উপায় বার ক'রে নিল। তারা দুজনে শুয়েছিল নীচের তলার বৈঠকখানায়। সেখানে গ্রামাঞ্চলে যেমন হয়ে থাকে, চেয়ার টেবিলের কোন ব্যবস্থা ছিল না। ছিল অনেকগুলি নীচু তক্তপোষ পাতা, আর তার ওপরে ছিল ফরাস ও তাকিয়া। তক্তপোষগুলি ভূমি হতে বড়জোর বোধ হয় এক ফুট উঁচু ছিল। বামুন ঠাকুর তার দেহটি যতদূর সম্ভব সংকুচিত ক'রে তক্তপোষগুলির তলায় গিয়ে অবলীলাক্রমে আশ্রয় নিল। এমন সহজে ও দ্রুত সেই কাজটি সম্পাদিত হল যে আশ্চর্য্য লাগে। কিন্তু প্রাণের দায়ের মত ত আর দায় নাই, কাজেই বিশেষ আশ্চর্য্য হবার মত সংগত কারণ কোন ছিল না। বলা বাহুল্য, এ হেন মহাজনের প্রদর্শিত উদাহরণ চাকরের মনে তখনি গভীর রেখাপাত করল এবং প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে তার প্রদর্শিত পথ বিনা দ্বিধায় তখনই অবলম্বন ক'রে মহাভারতের নীতি বচন পালন করেছিল।

ওদিকে ডাকাতরা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করবার শীঘ্রই একটা উপায় উদ্ভাবন করে ফেলল। বাহিরের বাড়ীতে গ্রাম্য গৃহস্থদের প্রায়ই একটা ঢেঁকি ঘর থাকে। অনুসন্ধান করে এখানেও তেমনি একটা ঢেঁকি ঘর মিলে গেল। সে ঘর পাকা নয়, কাজেই তার ভিতর প্রবেশ করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল না। সেখান হতে তারা ঢেঁকিখানা বার করে আনল। তারপর কয়েকজন মিলে সেটা ধরে এক সাথে সদর দরজার ওপর ঠুকতে লাগল; তার ফল ফলতে বেশী দেরী হল না। সেই ভারী ঢেঁকির মারফত সবল আঘাতগুলি দরজার দেহকে কাঁপিয়ে তুলল। দেখতে দেখতে তার কব্জাগুলো আলগা হয়ে গেল, ছিটকিনি ও হুড়কোর ইস্ক্রুপগুলো নড়ে গেল। আর কিছুক্ষণ পরে দরজা আর আঘাত সহ্য করতে পারল না, ভেঙে পড়ে গেল।

ডাকাতদের একটা দল তখনি ভিতরে ঢুকে পড়ল। নীচের তলায় তারা সময় নষ্ট করল না। তারা সোজা ওপরে উঠে গেল। গিয়ে যে ঘরে তারাপদ ও তার স্ত্রী ছিল, তার দরজায় আঘাত করে বলতে লাগল, দরজা খোল, দরজা খোল।

ভিতরে নবীন দম্পতির দুরবস্থা বেশ সহজেই কল্পনা করে নেওয়া যায়। তারাপদর স্ত্রী ভয়ে আড়ষ্ট, তারাপদ নিজে হতবুদ্ধি ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কিন্তু ডাকাতরা ত ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করবার পাত্র নয়। মুখের কথায় সাড়া না পেয়ে তারা দরজার ওপর বলপ্রয়োগ করতে সুরু করে দিল এবং অল্প চেষ্টাতেই দেখতে দেখতে দরজা ভেঙে খুলে পড়ল।

তারাপদ তখন ঝাড়া দিয়ে উঠল এবং কি করবে ঠিক ভেবে না পেয়ে দরজার সামনে গিয়ে পথ রোধ করে দাঁড়াল। কিন্তু পথ রোধ করবার শক্তি কি তার ছিল? একদিকে নিরস্ত্র সে, অপর দিকে অনেকগুলি সশস্ত্র ডাকাত। একজন ডাকাত ত তার স্পর্দ্ধা দেখে তার হাতের লোহার ডাণ্ডা দিয়ে দিলে এক আঘাত তার গালে। তার গাল কেটে রক্ত ঝরে পড়ল।

বাঙ্গালীর মেয়ে বিপদের সম্মুখে ভয়ে যেমন অভিভূত হয়ে পড়ে, তেমনি স্বামীর বিপদ দেখলে ভয়কে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করতেও জানে। তারাপদর স্ত্রী ছেলেমানুষ মেয়ে। এতক্ষণ ভয়ে অস্থির হয়ে প্রায় নির্জ্জীবের মতই পড়ে ছিল। এখন কিন্তু স্বামীকে ডাকাতদের হাতে আক্রান্ত দেখে কি এক অভিনব বলে সঞ্জীবিত হয়ে উঠল। সে উঠে এসে দাঁড়াল সেই ডাকাতের দল আর তারাপদর মাঝখানে। মা যেমন শিশুকে আগলায়, তেমনি সে স্বামীকে আগলিয়ে ডাকাতদের বলল—দোহাই তোমাদের, ওকে মেরো না। তোমাদের যা খুসী নিয়ে যাও, আমরা কোন বাধা দেব না।

এ ভিন্ন ত এখানে আর কিছু করবার ছিল না। ডাকাতরা সে সর্ত্ত মেনে নিতে আপত্তি দেখলে না। এই ভাবে এক অল্পবয়সী নারীর সহজ বোধশক্তি দলাদলি দৈহিক বিপদ হতে তাদের রক্ষা করল।

বাধার আশঙ্কা এইভাবে নির্ম্মূল হয়ে গেলে, তখন ডাকাতদের সুরু হল লুটের পালা। তারা সেই ঘরের বাক্স, আলমারি, ট্রাঙ্ক ভাঙল, তা হতে মূল্যবান যা কিছু সামগ্রী পেল সংগ্রহ করে নিল। পাশে যে ঘরে তারাপদর মা ছিল, সেখানেও ঢুকল এবং সেখানে বাক্স আলমারি প্রভৃতি ভেঙে আরও মাল সংগ্রহ করল। কিন্তু তাতেও তারা পরিতৃপ্ত নয়।

... তখন তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল তারাপর স্ত্রীর গায়ে সন্নিবেশিত অলঙ্কারগুলির ... সে নব পরিণীত বধূ। ... অলঙ্কারের বাহুল্য থাকবারই কথা তবে ডাকাতের নিকট অভদ্র নয় ... বলল যে, তারা সেই অলঙ্কারগুলি চায় এবং সেগুলি খুলে দিতে হবে। না খুলে দিলে, নিজেরা বল প্রয়োগ করে খুলে নেবে। মেয়েটি ... সেই অলঙ্কারগুলি স্বহস্তেই খুলে দিতে রাজী হল। তা না করে ত উপায় ছিল না।

তখন সুরু হল অলঙ্কার অপহরণের পর্ব্ব ... হাতের আংটি হতে আরম্ভ করে চুড়ি গেল, তারপর বালা, তারপর গলার হার তারপর মাথার সোণার কাঁটা। দেখতে দেখতে সকল আভরণই তার হস্তচ্যুত হল ... বাকী রইল একটি সামান্য জিনিষ ... হিন্দু সধবা মেয়েদের বাম হস্তে একখণ্ড লোহা থাকেই। অনেকক্ষেত্রে আবার সেই লোহ খণ্ড সোণার পাতা দিয়ে মোড়া হয়ে থাকে। এখানেও তা সোণার পাত দিয়ে মোড়া ছিল। সোণা তাতে ছিল যৎসামান্যই। তবু ডাকাতদের শ্যেনদৃষ্টি তাকে এড়ায় নি।

মেয়েটি সেটা খুলে দেবার কোন ইচ্ছাই প্রকাশ করলে না। তার কারণ তার সংস্কার তাকে সে কাজে প্রবল বাধা দেয়। ডাকাতেরা কিন্তু পরিত্রাণ করবার লোক নয়। তাদের লোভের সীমা নাই। যেখানে লুণ্ঠন করতে এসেছে, সেস্থান নিঃশেষে লুণ্ঠন না করলে তাদের তৃপ্তি নাই।

একজন ডাকাত বলল, ওটা যে রেখে দিলে! মেয়েটি বলল, তোমরা ত আমার সর্ব্বস্বই নিয়েছ। ওটা নিও না, ওটা ছেড়ে দাও।

আর একজন ডাকাত তর্জ্জন ক'রে প্রতিবাদ ক'রে বলল, তা হবে না, ওটাও তোমার দিতে হবে।

মেয়ে ... কিন্তু তবু তা ছাড়তে নারাজ এবং ডাকাতেরা প্রায় জোর ক'রেই সেটা তার হস্তচ্যুত করতে উদ্যত। এমন সময় অভাবনীয়ভাবে তার পরিত্রাণ এল এক অপ্রত্যাশিত দিক হ'তে।

ডাকাতদের যে দলপতি ছিল, সে ছিল একটু দূরে। সে সাধারণভাবে সকলের কাজ পর্য্যবেক্ষণ করতে ব্যস্ত। মেয়েটির প্রতি ডাকাতদের তর্জ্জন গর্জ্জন তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সে কাছে গিয়ে ব্যাপারটা বুঝে নিল। সে তখন ডাকাতদের সরিয়ে দিয়ে মেয়েটির কাছে গিয়ে বলল, দেখ মা, ওরা কি তোমার সব গয়নাই নিয়ে নিয়েছে?

তারপর যে ডাকাতের জিম্মায় সংগৃহীত গহনাগুলি ছিল, তাকে কাছে ডাকল এবং তার হাত হ'তে চুড়িগুলি নিয়ে নিল। নিয়ে সেগুলি মেয়েটিকে প্রত্যর্পণ ক'রে বলল, এই নাও মা, এগুলো পর। তোমার কি হাত খালি রাখতে আছে? এই লোহা তোমার হাতেই থাক।

তার এ অডাকাতো চিত আচরণে অন্য ডাকাতদের মধ্যে একটা মৃদু প্রতিবাদের ধ্বনি শোনা গেল। কিন্তু দলপতির ভৎসনা তখনি তাদের সম্পূর্ণ নীরব ক'রে দিল। তারা তখন তার নির্দ্দেশমত লুণ্ঠন দ্রব্য নিয়ে নিঃশব্দে সে বাড়ী পরিত্যাগ করল।

ডাকাতি ক'রে হাত পাকানো কঠিনহৃদয় দস্যু সর্দ্দারের মনেও যে অন্তঃশীলা হ'য়ে করুণা ধারা প্রবাহিত ছিল—কে জানত?

সৈনিকের স্বপ্ন

শ্রীকরুণাময় বসু

ঝরণার জলে মুখখানি দেখে শেষ রজনীর চাঁদ,
সৈনিক এক এখনো রয়েছে জেগে;
দূর গ্রামান্তে ফেলিয়া এসেছে জীবনের সুখ সাধ,
মন উন্মন স্মৃতির পরশ লেগে।

সরিষার ক্ষেতে হয়তো ধরেছে সোণার বরণ ফুল,
প্রজাপতিগুলি এখানে ওখানে ওড়ে;
প্রেয়সীর মুখ বুঝি মনে পড়ে, না-না সে মনের ভুল,
সুদূর দুরাশা, বাসা ভেঙে গেছে ঝড়ে।

গোলার আঘাতে ক্ষত হয়ে গেছে জীবনের পাঁজরায়,
শূন্য পৃথিবী স্বপ্নের মতো লাগে;
আর কি ফুটিবে গোলাপ কুসুম, পৃথিবী, দাও বিদায়!
প্রণাম জানাই যাবার বেলার আগে।

উঠেছিল চাঁদ, আমার জীবনে জেগেছিল মধুমাস,
কুঞ্জলতায় ফুটেছিল রাঙাফুল;
শেষ হয়ে গেল, সব সুখে থাকো, রেখে যাই আশ্বাস,
প্রেয়সীরে দিও মাথার একটি চুল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

[গত সংখ্যার পর]

আমরা দেখলাম যে, একটা গোটা কম্পন সম্পন্ন ক'রে কণাটা যখন ওর বিরামস্থানে ফিরে আসে, তখন ওর বেগটাকে দিকে ও পরিমাণে পূর্ণমাত্রাতেই ফিরে পায়, সুতরাং ওকে দ্বিতীয় কম্পন সুরু করতে হয়। স্পষ্ট বোঝা যায় যে, যদি নূতন কিছু না ঘটে—যদি অন্য কোন পদার্থের সঙ্গে ঘর্ষণ বা ঠোকাঠুকি রূপ কোন ব্যাপার না ঘটে—তবে এই কম্পনগুলি হবে নিবৃত্তিহীন। আরো বোঝা যায় যে, সরণের ফলে যে কেন্দ্রমুখ টানটা উৎপন্ন হয় তার মাত্রা যেক্ষেত্রে বেশী হবে সে ক্ষেত্রে কম্পন-কালটা কম হবে ও কম্পন-সংখ্যা বেশী হবে অর্থাৎ কম্পনগুলি হবে দ্রুত কম্পন। ৭ নং সমীকরণ থেকে দেখা যায় যে, বিরামস্থান থেকে এক ধাপ সরে যেতে কেন্দ্রমুখ টানের মাত্রা যতটা দাঁড়ায় কণাটার কম্পন-সংখ্যা তার বর্গমূলের সমানুপাতিক হয়ে থাকে। ক্ষেত্রভেদে এই টানের মাত্রা ছোট বড় হয়ে থাকে, এরি জন্য আমরা কোথাও বা মৃদু কম্পনের কোথাও বা দ্রুত কম্পনের সাক্ষাৎ পাই। সাধারণ পেণ্ডুলমের দোলন ঘটে প্রতি সেকেণ্ডে একবার কি দু'বার, কিন্তু যে সকল কম্পনের ফলে শব্দের উৎপত্তি হয়, ঐ সকল কম্পন সম্পন্ন হয়ে থাকে প্রতি সেকেণ্ডে পাঁচশো বা হাজার বার করে। আমরা এও বুঝতে পারি যে, কতটা ধাক্কা খেয়ে বা কতটা বেগ নিয়ে কণাটার যাত্রা সুরু হয়েছিল, ওর কম্পনের প্রসার নির্ভর করবে তারই ওপর। হিসাবের ফল এই যে, যাত্রাকালীন বেগটা যত বেশী হবে, আর সব ঠিক থাকলে কম্পনের প্রসার ততই বেড়ে যাবে।

কম্পনগতির প্রাচুর্য্যের কথা আমরা প্রথমেই উল্লেখ করেছি। এর কারণ আমরা এখন স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারছি। যেখানে যেখানে জড়দ্রব্যের স্থির হয়ে দাঁড়াবার মত এক একটা বিশিষ্ট স্থান রয়েছে এবং স্থানচ্যুতি ঘটলেই ওর ওপর ঐ স্থানের অভিমুখে ওর সরণের সমানুপাতে বলের ক্রিয়া হতে থাকে, সেখানে সেখানেই ঐস্থানকে কেন্দ্র ক'রে পদার্থটার কম্পনগতি সম্পন্ন করার সম্ভাবনা বিদ্যমান এবং এই সম্ভাবনা কার্য্যে পরিণত হয়—যদি কোন কারণে ওর স্থানচ্যুতি ঘটে। প্রযুক্ত বলটা দড়ির টানের মত একটা টানই হোক বা আকর্ষণ-বিকর্ষণজাতীয় হোক বা পাঁচটা বলের সমন্বয়ে গঠিত একটা মিশ্রবলই হোক এবং ওর প্রয়োগকর্ত্তা একটা মাত্র পদার্থ হোক বা একাধিক পদার্থ জোট পাকিয়ে ঐ বল প্রয়োগ করুক—তাতে কিছু আসে যায় না,—ফল-বলটা (Resultant Force) সরণের সমানুপাতিক হলেই হলো। এইরূপ বল প্রযুক্ত হয়ে থাকে স্থিতিস্থাপক পদার্থমাত্রেরই প্রত্যেক কণার ওপর যখন আঘাতের ফলে বা অপর কোন কারণে ঐ সকল জড়কণার স্থানচ্যুতি ঘটে। নিউটনের সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক হুক প্রতিপন্ন করেন যে, কোন স্থিতিস্থাপক পদার্থের কণাবিশেষ অল্পমাত্রায় স্থানচ্যুত হলে আশে-পাশের কণাগুলি ওকে ওর সরণের সমানুপাতে পূর্বস্থানের অভিমুখে টানতে থাকে। ফলে কোন স্থিতিস্থাপক পদার্থকে আঘাত করলে ওর কণাগুলি কম্পন-গতি সম্পন্ন করতে থাকে। আমরা জানি, স্থিতিস্থাপকতা জড়দ্রব্য মাত্রেরই একটা সাধারণ ধর্ম্ম, সুতরাং আঘাতের ফলে কম্পনের উৎপত্তিও জড়জগতের একান্ত সাধারণ ঘটনা-শ্রেণীর অন্তর্গত।

কিন্তু স্থিতিস্থাপকতার সঙ্গে কিছুমাত্র সম্বন্ধ নেই—এইরূপ বহু ক্ষেত্রেও জড়দ্রব্যের ওপর একটা নির্দিষ্ট স্থানের অভিমুখে এবং ওর সরণের সমানুপাতে বলের ক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায়। প্রমাণ করা যেতে পারে যে, পদার্থবিশেষের ওপর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-বলটা—যতক্ষণ ঐ পদার্থ পৃথিবীর অভ্যন্তরদেশে অবস্থিত হয়—ভূকেন্দ্র থেকে ওর দূরত্বের সমানুপাতিক হয়ে থাকে। সুতরাং পৃথিবীর কেন্দ্রের ভেতর দিয়ে আট হাজার মাইল দীর্ঘ একটা সুড়ঙ্গ কেটে ওর ভেতর একটা ঢিল ছেড়ে দিলে ঢিলটা সুড়ঙ্গের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ক্রমাগত যাওয়া আসা করতে থাকবে এবং এইরূপে চার হাজার মাইল প্রসার-বিশিষ্ট একটা কম্পন-গতি সম্পন্ন করতে থাকবে। এই ঢিলের কম্পন-সংখ্যা ও কম্পনকাল ৭নং সমীকরণ থেকে হিসাব ক'রে বের করা যায়। মাধ্যাকর্ষণের ফলে ভূপৃষ্ঠে ঢিলের ত্বরণের মাত্রা জানা আছে—সেকেণ্ড প্রতি প্রতিসেকেণ্ডে ৩২ ফুট। ভূকেন্দ্র থেকে ভূপৃষ্ঠের দূরত্বও (পৃথিবীর ব্যাসার্ধ) জানা আছে—প্রায় চার হাজার মাইল বা দু'কোটি এগার লক্ষ ফুট। এখন ৭নং সমীকরণের 'ত্ব' স্থানে ৩২ এবং 'ত' স্থানে দু' কোটী এগার লক্ষ বসিয়ে দিলে দেখা যাবে যে—'ন'-এর মূল্য দাঁড়ায় দিনে প্রায় ১৭ বার। এর অর্থ এই যে, সুড়ঙ্গপথে ঢিলটা দিনে ১৭ বার করে দুলতে থাকবে বা কাঁপতে থাকবে এবং ওর কম্পন-কালটা হবে দেড়ঘণ্টার কিছু কম। পেণ্ডুলমের দোলনও নিয়মিত হয় পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-বলের দ্বারা, কিন্তু এখানে আরো একটা বলের ক্রিয়া হতে থাকে—সেটা হলো দড়ির টান। এই বল দু'টা মিলে-মিশে যে ফল-বল উৎপন্ন করে, তা' প্রযুক্ত হয়, আমরা পরে দেখবো, ওর বিরাম-স্থানের অভিমুখে এবং তার মাত্রাটাও ওর সরণের সমানুপাতিক হয়ে থাকে। ফলে ওর বিরামস্থানকে কেন্দ্র করে পেণ্ডুলম ক্রমাগত দুলতে থাকে বা কাঁপতে থাকে।

পেণ্ডুলমের দোলন

কম্পন-গতির বিশিষ্ট উদাহারণস্বরূপ পেণ্ডুলমের দোলনের কথা আমরা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করেছি। পেণ্ডুলমের গতির সঙ্গে আমাদের নিত্য পরিচয় ঘটছে, এর বিশ্লেষণ অপেক্ষাকৃত সহজ এবং এই গতিকে সর্বশ্রেণীর কম্পন-গতির প্রতীকরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে; সুতরাং পেণ্ডুলম-গতির কতকটা বিস্তৃত আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

কোন একটা ভারী জিনিসকে সুতা দিয়ে ঝুলিয়ে দিলে 'তা' নাম গ্রহণ করে পেণ্ডুলম [৪নং চিত্র]। পেণ্ডুলম যখন ওর আলম্ব ('ল' বিন্দু) থেকে স্থির ভাবে ঝুলতে থাকে, তখন ওর সুতাটা ঠিক খাড়াভাবে—উর্ধাধঃ রেখাক্রমে—অবস্থান করে এবং পেণ্ডুলমটা অবস্থিত হয় 'ম' স্থানে—ওর আলম্ব-স্থানের ঠিক নীচে। এই স্থানটাই হলো পেণ্ডুলমের স্বাভাবিক বিরামস্থান। এই অবস্থায়

পেণ্ডুলমের ওপর মোটের ওপর কোন বলের ক্রিয়া থাকে না। পৃথিবী অবশ্য ওকে নীচমুখে আকর্ষণ করতে থাকে এবং এই আকর্ষণ-বল একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় হয়ে থাকে—যাকে বলা যায় পেণ্ডুলমের ভার বা গুরুত্ব, কিন্তু এই অবস্থায় ওর ওপর সুতার ভেতর দিয়ে ঊর্দ্ধদিকে একটা সমান টান পড়ে, সুতরাং পেণ্ডুলমের ওপর ফল-বলটা (Resultant force) হয় শূন্য-পরিমিত। ৪নং চিত্রে পেণ্ডুলমের ভারকে 'ভ' দ্বারা এবং ওর ওপর সুতার টানকে

৪ নং চিত্র

'ট' চিহ্নদ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। পেণ্ডুলম যখন স্থিরভাবে ঝুলতে থাকে তখন এই বল দুটা পরস্পরের সমান ও বিপরীত-মুখী হয়ে থাকে, সুতরাং পরস্পরে কাটাকাটি ক'রে লোপ পায় এবং ফলে, পেণ্ডুলমটা ওর বিরামস্থানে স্থির হয়ে দাঁড়াবার অবসর পায়।

এখন পেণ্ডুলমকে ছোট একটা ধাক্কা দিয়ে—ধরা যাক্ বাঁ দিকে একটা ধাক্কা দিয়ে—ছোট একটা বেগ অর্পণ করলে দেখা যায় যে, পেণ্ডুলমটা প্রথমে বাঁ দিকে খানিকদূর ('ক' স্থান পর্যান্ত) অগ্রসর হয়, তার পর বিরামস্থানে ('ম' বিন্দুতে) ফিরে এসে ডানদিকে অগ্রসর হয় এবং সমান দূরে ('খ' স্থান পর্যান্ত) যাবার পর আবার বিরামস্থানে ফিরে আসে এবং এইরূপে একটা পূর্ণদোলন সম্পন্ন করে। আরো দেখা যায় যে, একবার দোল খেয়ে পেণ্ডুলমটা যখন পূর্বস্থানে ফিরে আসে তখন ওর যাত্রাকালীন বেগটাকে দিকে ও পরিমাণে পূর্ণমাত্রাতেই ফিরে পায় এবং ফলে ওকে এক এক করে বহুসংখ্যক দোলন গতি সম্পন্ন করতে হয়। এখানে দোলনটা ঘটে একটা বৃত্তাকার রেখার একটা টুকরা অংশ ('ক-ম-খ' অংশ) বরাবর, যার কেন্দ্র হচ্ছে 'ল' বিন্দুটা; কিন্তু আমরা ধরে নিচ্ছি যে, এই টুকরা অংশটা পেণ্ডুলমের দৈর্ঘ্যের (ওর সুতাটার দৈর্ঘ্যের) তুলনায় অত্যন্ত ছোট; সুতরাং এই রেখাটাকে একটুকরা সরল-রেখারূপে গ্রহণ করলে বিশেষ দোষের হবে না। মোটের ওপর আমরা বলতে পারি যে, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে পেণ্ডুলমটা দুলছে একটা প্রায় সরল পথে, যার মধ্যবিন্দু হচ্ছে 'ম' এবং যার কম্পনের প্রসার অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং 'মক' বা 'মখ'-পরিমিত।

প্রশ্ন এই, পেণ্ডুলম দোলে কেন? দোলন-গতির জন্য যে দাবি মেটাবার প্রয়োজন এখানে তা মিটছে কি,—বিরামস্থান থেকে সরে যেতেই পেণ্ডুলমের ওপর ঐ স্থানের অভিমুখে ওর সরণের সমানুপাতে একটা বল প্রযুক্ত হচ্ছে কি? পেণ্ডুলমের গতি বিশ্লেষণ করলে বস্তুতঃ আমরা তাই দেখতে পাই। পেণ্ডুলমটা যখন ওর বিরামস্থান থেকে সরে গিয়ে 'ক' স্থানে উপস্থিত হয়, তখনও ওর পর আগেকার মতই দু'টা বল প্রযুক্ত হতে থাকে, যার একটা হচ্ছে ওর ভার (ভ) এবং অপরটা হচ্ছে ওর ওপর সুতোর টান (ট); কিন্তু পার্থক্য এই যে, ওর ভারটার দিক ও পরিমাণে কোন পরিবর্ত্তন না ঘটলেও ওর ওপর সুতার টানটা এখন আগেকার তুলনায় কিছু কম হয়ে থাকে এবং ঐ টানটা এখন কতকটা হেলাভাবে ('কল' দিক বরাবর) অবস্থান করে; সুতরাং এই বল দু'টা মিলে-মিশে যে ফল-বল উৎপন্ন করে তা' আগেকার মত আর শূন্য-পরিমিত হয় না। বল সংযোজনের নিয়ম অনুসারে হিসাব করলে দেখা যায় যে, পেণ্ডুলমের ওপর ফল-বলটা প্রযুক্ত হয় এখন 'কম' রেখাক্রমে অর্থাৎ ওর বিরামস্থানের অভিমুখে। আরো দেখা যায় যে, এই ফল-বলটা—যাকে আমরা 'ব' চিহ্নদ্বারা নির্দ্দেশ করবো—পেণ্ডুলমের ওজনের ('ভ-এর') একটা বিশিষ্ট ভগ্নাংশ হয়ে থাকে, অর্থাৎ পেণ্ডুলমের সরণটা পেণ্ডুলমের দৈর্ঘ্যের (ওর সুতাটার দৈর্ঘ্যের) যতটুকু ভগ্নাংশ নির্দেশ করে, ততটুকু অংশ হয়ে থাকে। সুতরাং পেণ্ডুলমের সরণকে ('ক-ম' দূরত্বকে) 'ত' এবং পেণ্ডুলমের দৈর্ঘ্যকে 'দ' বললে আমরা লিখতে পারি:

$$\frac{ব}{ভ} = -\frac{ত}{দ} \qquad (৮)$$

এই সমীকরণের 'ভ' ও 'দ'—পেণ্ডুলমের ভার এবং ওর দৈর্ঘ্য—এক একটা নির্দিষ্ট রাশি; সুতরাং 'ব' রাশিটা 'ত'-এর সমানুপাতিক। এর অর্থ এই যে, পেণ্ডুলমের সরণের সঙ্গে সঙ্গে ওর ওপর 'ম'-বিন্দুর অভিমুখে যে ফল-বলটা প্রযুক্ত হয়, তা' একই অনুপাতে বাড়তে থাকে। সুতরাং কম্পন-গতির জন্য যে দাবি মেটাবার প্রয়োজন এখানে তা' মিটছে এবং তা'র জন্যই, আমরা বলবো, পেণ্ডুলম ওর দোলন-গতি সম্পন্ন করছে।

৮নং সমীকরণ থেকে আমরা পেণ্ডুলমের কম্পন-কাল (বা কম্পন-সংখ্যা) নির্দেশক একটা সূত্র অনায়াসেই পেতে পারি। এজন্য আমাদের স্মরণ রাখা দরকার যে, যে ত্বরণের ফলে পেণ্ডুলম দুলতে থাকে এবং যা'কে আমরা পূর্ব্বে (৭নং সমীকরণে) 'ত্ব' চিহ্নদ্বারা প্রকাশ করেছি, এ ক্ষেত্রে তা' উৎপন্ন হয় উক্ত ফল-বলের ('ব'-এর) প্রভাবে, সুতরাং, গতির দ্বিতীয় নিয়ম অনুসারে 'ব' ও 'ত্ব' রাশি দুটা পরস্পরের সমানুপাতিক এবং একটাকে অপরটার প্রতীকরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। আর উক্ত সমীকরণের অন্তর্গত পেণ্ডুলমের ওজন নির্দেশক 'ভ' চিহ্ন সম্পর্কেও ঠিক

অনুরূপ কথা খাটে। এই চিহ্নটা, পেণ্ডুলমের ওপর নিছক মাধ্যাকর্ষণ-বলের মাত্রা নির্দেশ করে। শুধু এই বলের প্রভাবে পেণ্ডুলমে (বা অপর কোন পদার্থে) যে ত্বরণ উৎপন্ন হয়—যা'কে বলা যায় মাধ্যাকর্ষণ-জনিত ত্বরণ—তাকে আমরা 'ম' অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করবো। সুতরাং গতির দ্বিতীয় নিয়ম অনুসারে 'ভ' ও 'ম' রাশি দু'টাও পরস্পরের সমানুপাতিক এবং একটাকে অপরটার প্রতীকরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। সুতরাং ৮নং সমীকরণের 'ব' স্থানে 'ত্ব' এবং 'ভ' স্থানে 'ম' বসিয়ে নিয়ে আমরা নিম্নোক্ত সম্বন্ধটাকে সত্য ব'লে গ্রহণ করতে পারি :

$$ত্ব \quad = \quad \left(\frac{ম}{দ}\right) ত ....(৯)$$

এই সূত্র থেকে দেখা যায় যে, আমরা দোলায়মান পেণ্ডুলমের সরণ (ত) পরিমাপ ক'রে ওর প্রতি মুহূর্তের ত্বরণ (ত্ব) নিরূপণ করতে পারি। কিন্তু এই ত্বরণ, আমরা জানি, ৭নং সমীকরণ অনুসারে পেণ্ডুলমের কম্পন-সংখ্যা (ন) নির্দিষ্ট করে দেয়। সুতরাং ৭নং ও ৯নং সমীকরণের ডান দিককার রাশিদু'টাকে সমান ব'লে গ্রহণ করে আমরা লিখতে পারি :

$$ন^{২} = \frac{১}{৪০}\left(\frac{ম}{দ}\right).........(১০)$$

এটা হলো পেণ্ডুলমের কম্পন-সংখ্যা-নির্দেশক সূত্র। আমরা এও জানি যে, কম্পন-সংখ্যাকে উল্টে লিখলেই কম্পন-কাল পাওয়া যায়। সুতরাং পেণ্ডুলমের কম্পন-কালকে 'স' বললে আমরা লিখতে পারি :

$$স^{২} = ৪০\left(\frac{দ}{ম}\right).........(১১)$$

এই সমীকরণ দু'টা আমাদের জানিয়ে দেয় যে, পেণ্ডুলমের দোলন-সংখ্যা ও দোলন-কাল নিয়মিত হয় শুধু পেণ্ডুলমের দৈর্ঘ্য (দ) এবং যে প্রদেশে পেণ্ডুলমটা দুলতে থাকে, ঐ প্রদেশে মাধ্যাকর্ষণ-জনিত ত্বরণের মাত্রা (ম) দ্বারা। একটা বিশিষ্ট পেণ্ডুলম ও বিশিষ্ট স্থানের পক্ষে এই রাশি দু'টো অবশ্য নির্দিষ্ট পরিমাণের হয়ে থাকে, সুতরাং পেণ্ডুলমের দোলন-সংখ্যা ও দোলন-কালও ('ন' ও 'স') এক একটা নির্দিষ্ট রাশি হয়ে থাকে। এর অর্থ এই যে, একই পেণ্ডুলমের পর পর দোলনগুলি একটা নির্দিষ্ট কালের ব্যবধানে সম্পন্ন হয়ে থাকে, অথবা সংক্ষেপে বলতে পারা যায়, পেণ্ডুলম তাল ঠিক রেখে দুলতে থাকে। এই নিয়ম, যাকে বলা যেতে পারে তালের সংগতির নিয়ম (Law of Isochronism), প্রথম আবিষ্কার করেন গ্যালিলিও প্রায় তিন শতাব্দী পূর্ব্বে—যখন তিনি প্রার্থনা উপলক্ষে পিসা নগরীর গির্জায় উপস্থিত হয়ে একদিন ওর দোদুল্যমান প্রকাণ্ড আলোকাধারের গতিবিধি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ওর দোলন-কাল পরিমাপ করছিলেন নিজের নাড়ির স্পন্দনের সঙ্গে ওর তালের সংগতি লক্ষ্য ক'রে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গ্যালিলিওর সময় উন্নত ধরণের কোন ঘড়ির আবিষ্কার হয় নি এবং জড়জগৎ সম্পর্কে যে অনুসন্ধিৎসা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে তিন শতাব্দী কালের ভেতর উন্নতির এই উচ্চ শিখরে টেনে আনতে সক্ষম হয়েছে তা' বাস্তব রূপ গ্রহণ করেছিল প্রথমে এই বিজ্ঞান-বীরের ভেতর দিয়েই। কেবল পেণ্ডুলমের প্রথম নিয়মের আবিষ্কারকরূপেই নয়, নিউটনীয় গতিবিজ্ঞানের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠাতা রূপে, পতন্ত দ্রব্যের ত্বরণ নিরূপণে প্রাথমিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষকরূপে, স্বহস্ত-নির্মিত দূরবীক্ষণ-যন্ত্রযোগে বৃহস্পতি গ্রহের চন্দ্র-চতুষ্টয়ের গ্রহ প্রদক্ষিণ কার্য্যের প্রথম দ্রষ্টা ও কোপনিকস-প্রবর্ত্তিত সৌর-কেন্দ্রিক মতবাদের প্রথম সাক্ষীরূপে, এবং গগনবেষ্টনকারী ছায়াপথ যে কুয়াশা মাত্র নয়, পরন্তু পরস্পর থেকে কোটি কোটি যোজনের ব্যবধানে অবস্থিত অসংখ্য তারকার সমষ্টি, জড়বিশ্বের প্রকাণ্ডত্বের এই সুস্পষ্ট ধারণার প্রথম জন্মদাতা রূপে গ্যালিলিওর নাম বিজ্ঞান-জগতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এখন পেণ্ডুলমের কথায় ফিরে আসলে আমরা দেখতে পাই যে, পেণ্ডুলমের দোলন-সংখ্যা এবং দোলন-কাল ওর বস্তুমান বা উপাদানের ওপর কিম্বা ওর কম্পনের প্রসারের ওপর আদৌ নির্ভর করে না; কারণ ১০ এবং ১১ নং সমীকরণের নির্দেশ এই যে, এই সকল রাশির মূল্য যাই হোক না কেন, যতক্ষণ পেণ্ডুলমের দৈর্ঘ্য (দ) ঠিক থাকবে এবং পরীক্ষাকার্য্য একই স্থানে নিষ্পন্ন হবে ততক্ষণ 'ন' বা 'স'এর মূল্যের ইতর-বিশেষ ঘটবে না। পেণ্ডুলমের বস্তুপিণ্ড লোহা বা সোনার হোক, ওর বস্তুমান এক-সের বা এক ছটাক হোক কিম্বা ওর কম্পনের প্রসার এক ইঞ্চ বা দেড় ইঞ্চ হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। পেণ্ডুলমের দৈর্ঘ্যের তুলনায় কম্পনের প্রসারটা ক্ষুদ্র হলেই হলো। যতক্ষণ এই দাবি মিটবে ততক্ষণ ওর পর পর দোলনগুলি একটা নির্দিষ্ট কালের ব্যবধানে সম্পন্ন হতে থাকবে।

১১ নং সমীকরণ থেকে দেখা যায় যে, পেণ্ডুলমের দৈর্ঘ্য (দ) এবং ওর কম্পন-কাল (স) পরিমাপ করে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রদেশে মাধ্যাকর্ষণ জনিত ত্বরণের মাত্রা ('ম' এর মূল্য) অনায়াসে নিরূপণ করতে পারা যায়। এই ত্বরণটা, একটা বিশিষ্ট স্থানের পক্ষে, সকল পদার্থের পক্ষেই সমান, সুতরাং 'ম' একটা গুরুত্বপূর্ণ রাশি এবং নির্ভুলরূপে এর মূল্যনিরূপণ বৈজ্ঞানিক গবেষক মাত্রেরই একটা প্রধান লক্ষ্যের বিষয়। কিন্তু সোজাসুজি এই ত্বরণ নিরূপণ নির্ভুলরূপে সম্পন্ন করা সহজ কার্য্য নয়। একটা পতন্ত দ্রব্যের পতনের মাত্রা ও পতন-কাল পরিমাপ ক'রে এই ত্বরণ অবশ্যই নিরূপণ করা যেতে পারে, কিন্তু এই পতন ঘটে এত তাড়াতাড়ি যে, প্রচলিত পদ্ধতিতে পতন-কাল নিরূপণে উল্লেখযোগ্য ভুল থেকেই যায়। অল্পপক্ষে পেণ্ডুলমের সাহায্যে এ কার্য্য সহজেই সম্পন্ন হতে পারে; কারণ এজন্য একমাত্র প্রয়োজন পেণ্ডুলমের দৈর্ঘ্য (দ) এবং ওর কম্পন-কাল (স) নিরূপণ এবং এই উভয় পরিমাপই সহজে এবং প্রায় নির্ভুলরূপে সম্পন্ন হতে পারে।

পেণ্ডুলমের পরীক্ষা থেকে জানতে পারা গেছে যে, মাধ্যাকর্ষণ-জনিত ত্বরণের মাত্রা মেরুপ্রদেশের তুলনায় পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্তের কাছাকাছি কিছুটা কম। এর দু'টা কারণ নির্দেশ করা হয়ে থাকে:—(১) পৃথিবী কমলালেবুর মত মেরুদেশে কিঞ্চিৎ চেপ্টা বলে ভূ-কেন্দ্র থেকে মেরুদেশের দূরত্বের তুলনায় নিরক্ষদেশের

দূরত্ব একটু বেশী ; (২) পৃথিবী লাটিমের মত ঘুরছে ব'লে এবং এই ঘূর্ণন-জনিত বেগটা নিরক্ষদেশেই সব চেয়ে বেশী ব'লে ঘোরবার ফলে যে কেন্দ্র-বিমুখ বলটা উৎপন্ন হয়, তা পৃথিবীর উত্তর মেরুর তুলনায় নিরক্ষদেশে অপেক্ষাকৃত বেশী হয়ে থাকে, সুতরাং এর জন্যও মাধ্যাকর্ষণ-জনিত ত্বরণের মাত্রা নিরক্ষদেশে কিছু কম হয়ে থাকে।

পাহাড়ে চড়ে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, সেখানে পেণ্ডুলমের কম্পন-সংখ্যা ভূপৃষ্ঠের তুলনায় কিছু কম হয়ে থাকে ; সুতরাং ১০নং সমীকরণ থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, সেখানে মাধ্যাকর্ষণ-জনিত ত্বরণের মাত্রা ('ম' এর মূল্য) ভূপৃষ্ঠের তুলনায় কিছুটা কমে যায়। কেন কমে তা' আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। ভূকেন্দ্র থেকে পর্ব্বত-শৃঙ্গের দূরত্ব, ভূ-পৃষ্ঠের দূরত্বের তুলনায় একটু বেশী এবং মহাকর্ষের নিয়ম অনুসারে পৃথিবীর আকর্ষণ বলের প্রভাব, সুতরাং মাধ্যাকর্ষণ-জনিত ত্বরণের মাত্রা, দূরত্বের বর্গের অনুপাতে কমে যায়। পাহাড়ে চড়লে এই ত্বরণ কতটুকু কমে তা' পেণ্ডুলমের পরীক্ষা থেকে সহজেই নিরূপণ করা যায় ; সুতরাং তা'র থেকে এবং পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধের পরিমাপলব্ধ মূল্য থেকে পাহাড়ের উচ্চতাও সহজেই নিরূপণ করা যায়।

দোলন-ব্যাপারে শক্তির লীলা

শক্তির দিক্ থেকেও সাধারণ ভাবে পেণ্ডুলমের গতির এবং কম্পন-গতিমাত্রেরই আলোচনা করা চলে। পেণ্ডুলম যখন 'ম' স্থানে [৪০নং চিত্র] স্থিরভাবে ঝুলতে থাকে, তখন ওর গতিশক্তি ও স্থিতিশক্তি উভয়েরই মাত্রা নির্দেশ করতে হয় শূন্য সংখ্যা দ্বারা। বাঁ দিকে একটু ধাক্কা খেতেই পেণ্ডুলমটা একটা নির্দিষ্ট বেগ, সুতরাং একটা নির্দিষ্ট মাত্রার গতি-শক্তি অর্জন করে। এই বেগ নিয়ে পেণ্ডুলম বাঁ দিকে ছুটে চলে। একটু উঁচুতে উঠতেই ওর বেগ এবং ফলে ওর গতিশক্তি একটু-খানি কমে যায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে ওর স্থিতিশক্তি ঠিক ঐ পরিমাণে বেড়ে যায় ;—গতিশক্তি স্থিতিশক্তিতে পরিণত হয়। এই পরিণতি পূর্ণতা লাভ করে পথের বাঁ প্রান্তে ('ক' স্থানে) পৌঁছে। তখন ওর গতিশক্তি লোপ পায় এবং সবটা শক্তিই স্থিতিমূর্তি গ্রহণ করে। এই ব্যাপারে শক্তির মোট পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না, ঘটে শুধু রূপান্তর গ্রহণ। কিন্তু স্থিতিশক্তির স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হচ্ছে গতিশক্তিতে পরিণত হওয়া। ফলে পেণ্ডুলমকে ক্রমবর্দ্ধমান বেগে নেমে আসতে হয়—এবং যখন বিরামস্থানে ('ম' বিন্দুতে) প্রত্যাবর্তন ঘটে তখন স্থিতিশক্তির রূপান্তর গ্রহণ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়—পেণ্ডুলমের সবটা শক্তিই আবার গতি-শক্তির আকার ধারণ করে। এইরূপে পেণ্ডুলমের অর্দ্ধ কম্পন সম্পন্ন হয়। বাকি অর্দ্ধেক সম্পন্ন হয় যখন পেণ্ডুলমটা ওর গতি-পথের ডান প্রান্ত পর্য্যন্ত গিয়ে আবার বিরামস্থানে ফিরে আসে। এই ব্যাপারেও, ঠিক আগেকার মতই, গতিশক্তির স্থিতিশক্তিতে এবং স্থিতিশক্তির গতিশক্তির পরিণতি ঘটে। সুতরাং দেখা যায়, দোলন-ব্যাপারটাকে পেণ্ডুলমের দোলন না বলে শক্তির দোলন বলেও বর্ণনা করা যেতে পারে। শক্তির এই দোল-লীলার পরিচয় পাই আমরা কেবল পেণ্ডুলমের নর্তন প্রবৃত্তিতেই নয়, পরন্তু বিশ্বের প্রায় সকল ব্যাপারের ভেতরেই ; এবং এতেই নিহিত রয়েছে, বলতে পারা যায়, জগতের যত বৈচিত্র্য।

উদাহরণ স্বরূপ শব্দ, তাপ ও আলোর শক্তির উল্লেখ করা যেতে পারে। শব্দের উৎপত্তি কম্পন-গতি থেকে। শব্দের সুর নির্ভর করে কম্পমান পদার্থের কম্পন-সংখ্যার (বা কম্পন-কালের) ওপর আর শব্দের উচ্চতা (Loudness) নির্ভর করে কম্পনের প্রসারের ওপর। ঢাকে কাঠি দিলে, তবলায় চাঁটি দিলে, বেহালায় ছড়ি দিলে, বীণার তারে অঙ্গুলি সঞ্চালন করলে ওদের কণাগুলি স্থানচ্যুত হয় ; সুতরাং স্থিতিস্থাপকতা ধর্ম্ম বশতঃ কণাগুলির ওপর, ওদের বিরামস্থানের অভিমুখে এবং সরণের সমানুপাতে বিশিষ্ট ধরণের বল প্রযুক্ত হতে থাকে। ফলে বিশিষ্ট কম্পন-সংখ্যা নিয়ে কণাগুলি কাঁপতে থাকে। এই সকল ক্ষেত্রেও গতিশক্তির স্থিতিশক্তিতে এবং স্থিতিশক্তির গতিশক্তিতে পুনঃ পুনঃ রূপান্তর ঘটতে থাকে। এই কম্পনগতি চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ুমণ্ডলকে কাঁপিয়ে তুলে ওর স্তর হ'তে স্তরান্তরে সঞ্চালিত হতে থাকে এবং ফলে এই স্তরগুলির সঙ্কোচন প্রসারণ সাধন ক'রে শব্দ-তরঙ্গের আকারে মিনিটে প্রায় বারো মাইল বেগে সর্বদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং শেষ পর্য্যন্ত আমাদের কর্ণপটহকে সমান তালে কাঁপিয়ে তুলে এক একটা বিশিষ্ট সুরের ও বিশিষ্ট উচ্চতার শব্দজ্ঞান জন্মায়। ঢাকে জোরে কাঠি দিলে ওর কণাগুলির কম্পনের প্রসার বেড়ে যায়, ফলে প্রবলতর শব্দ উৎপন্ন হয়, কিন্তু তাতে ক'রে ওদের কম্পন-সংখ্যার বিশেষ হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে না, শব্দের সুরেরও উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হয় না।

তাপ এবং আলোর উৎপত্তি হয় পদার্থের অন্তর্গত অণু ও পরমাণুগুলির কম্পন-গতি থেকে। শব্দের সুর এবং উচ্চতা যেমন যথাক্রমে শব্দায়মান পদার্থের কণাগুলির কম্পন-সংখ্যা ও কম্পনের প্রসারের ওপর নির্ভর করে, তাপ ও আলোকের বর্ণ এবং তীব্রতাও নির্ভর করে সেইরূপ' যথাক্রমে তাপালোক-বিকিরণকারী পদার্থের পরমাণুগুলির কম্পন-সংখ্যা এবং কম্পনের প্রসারের ওপর। পদার্থবিজ্ঞানের একটা সিদ্ধান্ত এই যে, পদার্থ-বিশেষের উষ্ণতা নির্দিষ্ট হয়ে থাকে ওর অণুগুলির গড় কম্পন-শক্তিদ্বারা। তাপ প্রয়োগে পদার্থের অণুগুলি আগের চেয়ে প্রবলতর বেগে কাঁপতে থাকে ; ফলে অণুগুলির কম্পনের প্রসার ও কম্পন-শক্তি ক্রমে বাড়তে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে পদার্থটার উষ্ণতাও ক্রমে বেড়ে যায়। উষ্ণতা ক্রমাগত বাড়তে থাকলে কতগুলি নূতন কম্পনও উৎপন্ন হতে থাকে যাদের কম্পন-সংখ্যা আগের চেয়ে বেশী। পদার্থটা তখন কেবল তাপরশ্মিই নয়, সঙ্গে সঙ্গে আলোকরশ্মিও বিকিরণ করতে থাকে—প্রথমে মেটে লাল, তারপর ঘোর লাল, তারপর সবুজ ও নীল রঙের—আলো, যারা মিলে মিশে শ্বেত আলোর রূপ গ্রহণ করে। কোন্ রশ্মিতে কি কি রঙের আলো মিশে রয়েছে, তা বর্ণবীক্ষণ (spectroscope)-যন্ত্রের সাহায্যে ঐ সকল রঙকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে অনায়াসেই জানতে পারা যায় এবং তার থেকে আলো-বিকিরণকারী পদার্থের ভেতর কোন্ কোন্ কম্পন-সংখ্যার এবং কতটা প্রসারের কম্পনগতি সম্পন্ন হচ্ছে, তা' নিরূপণ করতে পারা যায়। সূর্য থেকে [illegible] প্রত্যেক

উজ্জ্বল পদার্থ থেকে ওর পরমাণুগুলির কম্পন-শক্তি ইথরনামক * এক সর্বব্যাপী স্থিতিস্থাপক পদার্থের ভেতর একটা বিশিষ্ট ধরণের তরঙ্গ তুলে এবং সেকেণ্ডে প্রায় লক্ষ ক্রোশ বেগে ছুটে এসে আমাদের ত্বগিন্দ্রিয়ে এবং চক্ষুরিন্দ্রিয়ে আঘাত করছে এবং এই রূপে আমাদের তাপালোকের অনুভূতি জাগিয়ে তুলছে—যার বর্ণবৈচিত্র্য ও ঔজ্জ্বল্য নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কোটি কোটি যোজন দূরবর্তী ঐ সকল উষ্ণ ও উজ্জ্বল পদার্থের পরমাণুগুলির কম্পন-সংখ্যা ও কম্পনের প্রসার দ্বারা। এইরূপে বিশ্বের প্রতিটি অণু ও পরমাণুর সঙ্গে অহরহঃ আমাদের সংযোগ ঘটছে ওদের নর্তন-গতির ভেতর দিয়ে, যার তাল-মান-সম্পর্কীয় খুঁটিনাটি নিরূপণের ভার বৈজ্ঞানিকের স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়ে জন-সাধারণ উপভোগ করেন শুধু এর অপরূপ বিশ্বসৌন্দর্য এবং অনুভব করেন শুধু নানা সুর ও নানা রঙ – যার কেউ বা কত মৃদু-মধুর কেউ বা কত তীব্র। আর কোন কোন মহাজন হয়ত সকল সৌন্দর্যের অন্তরালে এক মূল সুন্দরের অস্তিত্ব স্পষ্ট উপলব্ধি ক'রে কান্ত কবি রজনীকান্তের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে মুগ্ধনেত্রে গাইতে থাকেন:

> "তুমি সুন্দর তাই তোমারি বিশ্ব
> সুন্দর শোভাময়।"

*বর্তমান কালে ইথর-কল্পনা বিজ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে অপসারিত হ'তে চলেছে।

সৈনিক

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

[দ্বিতীয় পর্য্যায়]

নানা ব্যঞ্জনে পরম পরিচ্ছন্ন রুচিতে কাছে বসিয়া যথেষ্ট আদর আপ্যায়ণ করিয়া খাওয়াইল মালতি: নিখিল ব্রহ্মের বোন। বয়স বেশী নয়, ষোলো ছাড়িয়া সবে সতেরোয় পড়িয়াছে; ঘরে বসিয়া প্রাইভেট্‌ ম্যাট্রিক্‌-সিলেকশন্‌ মুখস্ত করে। চমৎকার রাঁধে। বেশ লাগিল শ্রীমন্তের! সেই যে কবে সৌদামিনী নিজের হাতে রাঁধিয়া কাছে বসিয়া কত আদর করিয়াই না খাওয়াইয়াছিল, মালতির ব্যঞ্জন-স্বাদে সৌদামিনীর আদা-পেঁয়াজের সম্ভারের গন্ধই যেন শ্রীমন্তের জিহ্বায় আর নাকে আর একবার বড় স্পষ্ট হইয়া জাগিয়া উঠিল। এইখানেই মেয়েদের সঙ্গে মেয়েদের কেমন যেন একটা অবিচ্ছিন্ন আত্মিক যোগ! হেঁসেলের দরজায় যেন তাহারা একসত্তায় একমূর্তি নারায়ণী।

"আপনি তো বেশ লোক, কিছুই তো মুখে তুল্‌ছেন না?" পাতলা ঠোঁটের কোণে একবার মৃদু হাসির রেখা টানিল মালতি।

"না, না, এই তো খাচ্চি, মানে—রান্না যা হ'য়েছে, তা একটু সময় নিয়ে খাওয়াই প্রয়োজন। নইলে নিজেই যে ঠ'কবো! এদিকেও আশঙ্কা আছে তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাবার, ওদিকেও ভয় আছে পাকস্থলি ভ'রে যাবার। দু'টোর সমতা রক্ষা ক'রে চ'লতে গিয়েই যা একটু—" আধো লজ্জায় অসম্পূর্ণ কথার মধ্যেই মাথা নিচু করিয়া নিল শ্রীমন্ত।

"কিন্তু এ আপনি ঠাট্টা ক'রছেন।" মালতি কহিল, "দাদার মুখে একটি বেলাও যদি আমার রান্না ভাল লেগে থাকে! আমিও জানি, রাঁধতে আমি সত্যিই পারি না।"

কৃত্রিম ভঙ্গিতে চাহিতে গিয়া এবারে শ্রীমন্তের দৃষ্টি পড়িল ঘরের আর একটি কোণে। প্রৌঢ়া এক বিধবা নীরবে বসিয়া মৃদু হাসিতেছেন। ইনিই এ বাড়ীর মা: বিমলা দেবী। নিতান্ত সেকালের মা হইলেও একালের ন'ন। মাঝামাঝি একটা আধা-[illegible]।

সেইদিকে দৃষ্টি তুলিয়াই নিখিল ব্রহ্ম কহিল, "শুন্‌লে তো মা, তোমার মেয়ের কথা? রাঁধাটা বেশ একটু শিখেছে ব'লে মুখে আর বিনয়ের অহঙ্কার ধরে না। শ্বশুরবাড়ীতে গেলে তোর যদি তেমন কোনো দেওর-কুটুমই জোটে, তবে যে কথায় কথায় তুই কি ক'রবি, তাই ভাবছি।" বলিয়া অপাঙ্গে একবার মালতির দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিতে লাগিল।

এবারে সত্যিই যেন লজ্জায় মাটিতে মিশিয়া যাইতে চাহিল মালতি; মাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "দাদার কিন্তু ভাল হবে না মা, ব'লে রাখছি।"

এতক্ষণে কথা বলিলেন বিমলা দেবী: "রাঁধা নিয়ে শেষ পর্যন্ত কি ভাই-বোনে ঝগড়া ক'রতে চাস তোরা? কি মনে ক'রবে ওরা, বল্‌তো?"

সত্যি সত্যিই একটা জটিলতর কিছু ব্যাপার যেন। হো-হো করিয়া সমস্বরে এবারে হাসিয়া উঠিল সকলে। কিন্তু অসুবিধা হইতেছিল ব্রজবিহারীর। ম্যানেজারের পাশে বসিয়া তাঁহার পারিবারিক এই রসিকতায় ঠিক সহজভাবে যোগ দিতে পারিতেছিল না সে। শ্রীমন্ত ব্যাঙ্কের শুভার্থী, বহু ডিপজিটার দিয়া মানের বৃত্তটা অনেকদূর বাড়াইয়া নিয়াছে। ম্যানেজারের আড়ালে অগোচরে ব্রজবিহারী যে দুই একটান বিড়ি-সিগারেট না টানিয়াছে শ্রীমন্তের সামনে, এমন নয়, কিন্তু এখানে সে যেন অনেকটা খাপছাড়া, অন্ততঃ নিজের কাছে নিজেকে তার কেমন একটা অসংলগ্ন বলিয়াই মনে হইল। বার কতক এদিক ওদিক চাহিয়া নীরবে আবার চোখ নামাইয়া থালার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল।

শ্রীমন্ত কহিল, "আপনিও যেমন মা, এতে আবার কিছু একটা মনে ক'রবার আছে নাকি?"

সুন্দর আবহাওয়া। আরও যেন অনেকখানি স্বাচ্ছন্দ্য-

সৌন্দর্য্যে সহসা মনের কোন্ এক গোপন স্থান ভরিয়া উঠিল বিমলা দেবীর। অচেনা নতুন ছেলের মুখে 'মা'-ডাক যেন মধু বর্ষণ করিল তাঁহার কানে। মুগ্ধ বিস্ময়ে অনেকক্ষণ তিনি শ্রীমন্তের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

হাসিয়া নিখিল ব্রহ্ম কহিল, "ওঁর তো পরিচয় এখনও তোমাকে দিই নি মা, আজ আমার ব্যাঙ্ক যতটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, তার মূলে এই শ্রীমন্ত বাবু। আর এইটুকুতেই শেষ নয়। বিপ্লবী রক্ত র'য়েছে ওঁর শিরায় শিরায়। ওঁর কাছে সত্যিই আমাদের লজ্জায় ধিক্কার আসে। আমরা যে কত দুর্ব্বল, আর সমাজের কত নিচে পড়ে আছি—শ্রীমন্ত বাবুর দিকে চাইলে ত' স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করি।"

কিন্তু কেমন যেন খট্ করিয়া একটু লাগিল এবারে বিমলা দেবীর মনে। বলিলেন, "তা' বাবা বিপ্লব টিপ্লব ভালো নয়। যেমন সব শুনতে পাই, শেষে পুলিশি হাঙ্গামায় প'ড়বে!"

নিজেকে অনেকখানি চাপিয়া যাইয়া শ্রীমন্ত উত্তর করিল, "জীবনে তো হাঙ্গামার অন্ত নেই, চিরকাল তো সারাটা জাতি আমরা বিশাল অগ্নিকুণ্ড আগ্লেই আছি, তাতে ক'রে সত্যিকারের দেশের মুক্তির জন্যে আর একটু বেশী হাঙ্গামায় যদি প'ড়তেই হয়, পড়ি না কেন, ক্ষতি কি? তিলে তিলে দগ্ধ হবার চাইতে একদিনে একটা কিছু নিষ্পত্তি হ'য়ে যাওয়াই ভালো নয় কি, মা?'

সাধারণ ধর্ম্মভীরু মানুষ বিমলা দেবী। কথাটার সহসা ঠিক যথাযথ উত্তর দিয়া উঠিতে পারিলেন না।

অনেকখানি আধুনিক আলোকপ্রাপ্তা মালতি। শিক্ষাব্রতের পিছনে খণ্ড-খণ্ড যুক্তিবাদ উঁকি দেয় মনের পর্দ্দায়। স্বর তুলিল এবারে মালতি: "সে নিষ্পত্তিই বা হ'চ্ছে কোথায়? ধরুন খুব দৌড়ঝাঁপ ক'রলেন, পুলিশে বাধা দিল, তাও যদি না মানতে চাইলেন, তবে ধরা প'ড়লেন হাজতে, আটক প'ড়লেন জেলখানার লোহার শিকলে, তিলে তিলে ডেকে আনলেন মৃত্যু; কি লাভটা হোলো?"

মৃদু হাসিয়া শ্রীমন্ত বলিল, "ছোট বোন তুমি, তোমাকে আপনি না ব'লে তুমিই ব'লছি; রাগ কোরো না। কিন্তু জান তো লক্ষপতি ব্যবসায়ীও অতিরিক্ত লাভের মুখে প'ড়তে গিয়ে অনেক সময়ে লোকসানের ঘাড়ে গিয়েই পড়ে। অতিবড় লাভটাই সব সময় বড় কথা নয়, মন্দা বাজারে লোকসানটা পুষিয়ে যাওয়াও বড় ব্যবসায়ীর কৃতিত্বেরই লক্ষণ। যে লোকসানের মুখে প'ড়ে আজ আমরা মন, প্রাণ, জাতীয় সম্পদ আর স্বাধীন চিন্তাধারাকে দিনের পর দিন পরের হাতে বিকিয়ে দিয়ে চ'লেছি, তাকে যদি নিজেদের গৌরবে আবার ফিরিয়েই নিতে না পারলুম, তবে তার থেকে নিষ্ক্রিয় জীবনে মৃত্যুই ভাল নয় কি?"

মালতি কিছু একটা বলিবার পূর্ব্বেই, নিখিল ব্রহ্ম কহিল, "ঋষির কথা হ'চ্ছে, আহারে অতি-কথন নিষিদ্ধ। খেয়ে দেয়ে উঠুন, তারপর আর পা না বাড়িয়ে সারা রাত বরং জেগে ব'সে আলোচনা ক'রবেন।"

পাতের ভাত সত্যিই বড় বেশী মুখে উঠিতেছিল না। কিন্তু তথাপি বড় একটা কান দিল না শ্রীমন্ত নিখিল ব্রহ্মের কথায়। মালতিকে লক্ষ্য করিয়াই পুনরায় কহিল, "তুমি কেন ওকথা ব'লবে মালতি? আজ দেশের যে চেতনা এসেছে, তাতে তোমার দাদা হয়ত সংসার প্রতিপালনের দায়িত্বে এগিয়ে আসতে না পারেন, কিন্তু তুমি কেন অন্ধ কুসংস্কার নিয়ে থাকবে? তোমাদের হাতে কতখানি শক্তি, তা যথার্থ দৃষ্টি দিয়ে তোমরা দেখতে পাও না। সরোজিনী নাইডু সারা জীবন কেমন দেশের জন্যে নিঃস্বার্থ চিত্তে নিজেকে বিলিয়ে যাচ্ছেন, মাতা কস্তুরবা কেমন ক'রে কারারুদ্ধ জীবনে মৃত্যু বরণ ক'রলেন, আর কাগজে পাচ্ছ আজ ক্যাপ্টেন লক্ষ্মীর ইতিহাস, চোখের 'পরে আজ দেখতে পাচ্ছ সব। এমনি ক'রেই গ্রামে গ্রামে আজ মেয়েদের গ'ড়ে তুলবার দরকার ঝাঁসীর রাণীবাহিনী।" একবার থামিল শ্রীমন্ত। শ্রীমন্তের চিরদিনের স্বভাবই এই, একবার কথার সূত্র পাইলে অনর্গল অবিশ্রান্ত বলিয়া যায়, কোথাও বিচ্ছেদ নাই, তাল বা ধ্বনির অসঙ্গতি নাই।

অভিভূতের মত জানুর উপরে হাতের তেলোয় গাল পাতিয়া একদৃষ্টে শুনিয়া চলিয়াছেন বিমলা দেবী। এপাশে ওপাশে ব্রজবিহারী আর নিখিল ব্রহ্ম। কথা তুলিবার অবকাশ নাই কাহারও মুখে। সিন্ধুরাম ইতিপূর্ব্বেই পুনরায় ব্যাঙ্কে ফিরিয়া গিয়াছিল। নতুবা হয়ত বাহিরের দুয়ারে বসিয়া বসিয়া বিড়ির পর বিড়ি টানিয়া টানিয়া অলক্ষ্যে যায়গাটাকে একেবারে নোংরা করিয়া তুলিত, আর মাঝে মাঝে হাই তুলিয়া তর্জ্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে তুড়ী বাজাইয়া মুখে হয়ত চিরাচরিত ধ্বনি তুলিত: 'জয় সীতারাম'।

মালতি কিছু একটা বলিল না।

শ্রীমন্ত কহিল, "জালিয়ান্‌ওয়ালাবাগের কথা নিশ্চয়ই শুনেছ মালতি। ডায়ার গুলি চালালো, শুধু বিপ্লবী ছেলেরাই ম'রলো না, প্রাণ দিল কত বিপ্লবী মেয়েরাও। পুলিশের নির্ম্মম অত্যাচার আর ডায়ারের গুলি মেয়েদের ব্রতভঙ্গ ক'রতে পারে নি সেদিন। আজকালকার মেয়ে তুমি, সেই রক্ত যে তোমারও মধ্যে র'য়েছে বোন, চেষ্টা করো না একবার মাথা তুলে দাঁড়াতে!"

এবারে রীতিমত হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল নিখিল ব্রহ্ম, কহিল, "তবেই হ'য়েছে। আমিই যথেষ্ট দেশ উদ্ধার ক'রেছি, এবারে বাকী আছে মালতী। তার চাইতে বলুন, যাতে আর একটু মন দিয়ে প'ড়ে আগামী বছরে এপিয়ার হ'তে পারে একজামিনে।"

বিমলা দেবীও ছেলের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ বাবা, তাই একবারটি ওকে বরং বলো। সাধারণ গেরস্ত ঘরের মেয়ে আমরা, দিনরাত উনুনের আগুনের পাশেই কাটাতে শিখেছি, অমন সব মস্ত ভারিক্কি আগুনে-কথা শুনে কি আমাদের দিন চলতে পারে! দু'দিন বাদে চোখ বুঁজবো, তার আগে কোনো ঘরে যদি মেয়েটাকে গতি ক'রে দিয়ে যেতে পারি, তবেই মনে করবো—শান্তিমনে গেলাম।" বলিয়া একটা ভারী নিঃশ্বাস চাপিলেন বিমলা দেবী।

বস্তুতঃ, আপাতদর্শনে শ্রীমন্তের প্রতি অনেকখানি মমতা আসিলেও কথাবার্ত্তা শুনিয়া নিজেদের সংসার সম্বন্ধে অনেকখানিই যেন প্রমাদ গণিলেন বিমলা দেবী। এমন সব কথা চৌকিদার

পুলিশের কানে গেলে এক্ষুণি আসিয়া যে বাড়ী ঘেড়াও করিবে। আর তেমন একটা কিছু করিলে তখন উপায় ?

মায়ের কথার শেষের দিকে মালতি যেন নিজের সম্বন্ধে বিশেষ একটা ইঙ্গিত পাইয়াই লজ্জায় সেখানে আর বসিয়া থাকিতে পারিল না। ত্রস্তে উঠিয়া সে আড়ালে একদিকে সরিয়া পড়িল। শ্রীমন্ত যেন এতক্ষণে কথা দিয়া রীতিমত যাদু করিয়াছে মালতিকে। ধীরে ধীরে মাটির সমতল ক্ষেত্র হইতে কঠিন কোনো গিরিগাত্রে উঠিবার মতই সহনশীল অথচ দুস্তর সমস্যা-কঠিন কথাগুলি। সারা মনের উপর দিয়া যেন কেমন একটা প্রলেপ আঁকিয়া গেল! একান্তে দাঁড়াইয়া যতই কথাগুলিকে বিশ্লেষণ করিতে লাগিল, ততই যেন মুগ্ধ হইয়া গেল মালতি; লজ্জাও হইল বড় কম নয়! কী মূর্খের মতো এতক্ষণ নির্লজ্জভাবে সে তর্ক করিয়াছে! আত্ম-বিকাশের অনবদমিত ইচ্ছা বড় গভীরভাবে মুহূর্ত্তে তার সমস্ত মনে একবার সাড়া দিয়া উঠিল। ঘুরিয়া ফিরিয়া শ্রীমন্তের একটি মাত্র কথাই বার বার তার কানে ধ্বনিত হইতে লাগিল: 'আজ-কালকার মেয়ে তুমি সেই রক্ত যে তোমারও মধ্যে রয়েছে বোন, চেষ্টা করো না একবার মাথা তুলে দাঁড়াতে!' যতটুকু জ্ঞান পাইয়াছে আজ পর্য্যন্ত মালতী, তাহা দ্বারা নিজের সম্বন্ধে কিছু একটা বুঝিয়া লইবার মত যথেষ্ট আলোকসম্পাত হইয়াছে মনে। যেটুকু বুঝিতে পারে নাই বলিয়া বোকার মত কথা কাটিয়াছে সে, সেইটুকুও পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে শ্রীমন্তের কথায়। দেশের জন্য জীবন না দিলে বাস্তবিকই এ জীবনের মূল্য কি, লাভের কারবার কোথায় ?

বিমলা দেবীর কথার উত্তরে শ্রীমন্ত বলিল, "বিয়েটাই কি জীবনে সব চাইতে বড় কাজ? আপনি কি পারেন না মালতীকে দেশের জন্যে উৎসর্গ করতে? ইতিহাসে অন্ততঃ একটা দাগ রেখে যাক্। তারপর যদি বিয়েই দিতে হয়, তবে সে ভার আমার উপরে দিন; দেশে আজ সত্যিকারের নিঃস্বার্থ কর্ম্মীর অভাব নেই, তাদের কাউকে যদি আপনি জামাই পান, তবে কি সুখী হ'ন না?"

"তা বাবা এ কিন্তু সুখী অসুখীর কথা নয়।" মনে মনে যথেষ্ট আতঙ্ক থাকিলেও মুখে মৃদু হাসি টানিয়া বিমলা দেবী কহিলেন, "জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ—এ নিতান্তই দৈব; মালতির জন্যে কি রকম বর জুটবে, সে কি বাবা তুমিই কিছু একটা ভবিষ্যৎ বলতে পারো? আর দেশের কাজের কথা বলছো, দেশের কাজ কি সবাই-ই করতে পারে? আসলে মালতি কোনো দিন সে-ভাবেই গড়ে ওঠে নি; হাড় শক্ত চাই বাবা, নইলে কি দেশের কাজে কেউ নামতে পারে?"

খাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছিল।

আর একবার মালতি আসিয়া ছোট্ট একটি রেকাবীতে পান এবং মসলা সাজাইয়া দিয়া গেল।

ব্রজবিহারী এতক্ষণে যেন রীতিমত ঘামিয়া উঠিল নিজের মধ্যে। ম্যানেজারের কথা ঠেলিতে পারে নাই, অথচ আসিয়া একেবারে বোবা বনিয়া গিয়াছে সে। শ্রীমন্তের কানের কাছে মুখ আনিয়া একবার ফিসফিস করিয়া বলিল, "উঠবেন নাকি?"

কিন্তু শ্রীমন্ত সে কথায় বিশেষ মন না দিয়া বিমলা দেবীকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "হাড় কেউ শক্ত নিয়ে পৃথিবীতে আসে না মা। পুড়িয়ে পিটিয়ে তবেই সোনাকে আরও পাকা শক্ত করতে হয়। প্রয়োজনের তাগিদে তেমনি ক'রেই সবাই শক্ত হ'য়েছে। আপনাদের বিরুদ্ধে আমার কি কম নালিশ মা! শুধু মালতির বয়সী মেয়েরাই কেন, আপনার মত মা মাসীমারও যে যথেষ্ট কাজ আছে। জনমতের দাবীতে আপনারাই কি কম কিছু? চূড়ামণি, অর্দ্ধোদয় আর গ্রহণে দেখেছি লক্ষ লক্ষ মা মাসীমারা শত বিপদ মাথায় নিয়েও ট্রেণ, ষ্টীমার আর নৌকো-বোঝাই হ'য়ে শীত গ্রীষ্ম ভুলে গঙ্গায় গিয়ে ঝাঁপিয়ে প'ড়েছেন। পুণ্যের সেতু আরও সাত জন্ম এগিয়ে গেছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু নালিশ আমার সেইখানেই, যেখানে দেখি, দেশের স্বাধীনতার পুণ্যে আপনারা একেবারে নীরব।" থামিয়া একবার ঢোক গিলিল শ্রীমন্ত, তারপর হাসিয়া পুনরায় কহিল, "একথা ব'ললে শুধু আপনি কেন, কোনো সংসারের মা মাসীরাই যে আমাকে ক্ষমা করবেন না, তা জানি। তবু এ আমার একটা বাতিক, না বলে থাকতে পারি না। যে ভাবে ঐ যোগ, গ্রহণ আর তিথিগুলিতে গঙ্গার স্নানের মহড়া দেখেছি, ঠিক সেই ঐক্যবদ্ধ পথে যদি আপনাদের একবার সম্মিলিত ধ্বনি উঠ্‌তো—'মা হ'য়ে সন্তানকে যদি রক্ষা করতে পারি, তবে দেশকেও পারবো; বিদেশীর স্থান এখানে নেই, হিন্দুস্থান—স্বাধীন হিন্দুস্থান, বিদেশী দূর হ'য়ে যাও', তবে সেই ধ্বনি দিল্লীর লালকেল্লা থেকে বাকিংহাম প্যালেস্ পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি ইঁট আর পাথরখণ্ডকে কাঁপিয়ে তুলতো।—শুধু ইংরেজ নয়, সমস্ত পৃথিবী তবে স্তম্ভিত হ'য়ে চেয়ে দেখতো—হ্যাঁ, এ একটা জাত বটে, এদেশের ছেলেরা আস্ত গোখ্‌রো আর মায়েরা তাজা বাঘিনী, বেশী ঘাঁটাতে গিয়ে কামড় খেতে হবে, অতএব—।"

বিমলা দেবী এবারে যেন কেমন হইয়া গেলেন। কথা বলিবার উৎসাহ নাই, হাসির আভাসও দেখা গেল না এতটুকু মুখে। একবার চক্‌চক্ করিয়া উঠিল চোখ দুইটি, তারপর মুহূর্ত্ত মধ্যেই আবার শান্ত হইয়া আসিল দৃষ্টি। সেই দৃষ্টি যেন কত অনুতাপের, কত অপরাধের আর অনুরাগের। মনের আতঙ্ক হইতে এতটুকুও যে তিনি মুক্ত হইতে পারিলেন, তাহা নয়; কিন্তু সেই আতঙ্ক ছাপাইয়াও এবারে যে-ভাবটা জাগিয়া উঠিল, তাহা যেন তিনিও কিছু একটা বুঝিলেন না। স্বীকার করিয়া নিতে পারিলেন যে তিনি শ্রীমন্তকে, তাহা নয়; অপমান-বাচক বলিয়াও কথাটা একবার মনে হইল বটে। অপমান নয় তো কী, বাড়ী বহিয়া আসিয়া তিথি-পুণ্যের ওজর তুলিয়া ইহার চাইতে আর বেশী কে কি আঘাত দিয়া যাইতে পারে? কিন্তু বড় স্পষ্ট আর উচিৎ-বক্তা বটে ছেলেটি। স্বীকার না করিয়া পারা যায় না; মিথ্যা তর্ক তুলিয়া কথা কাটিতে যাইয়া যেন নিজের জালেই নিজে জড়াইয়া যাইতে হয়। ভাষাহীন মুখে অপলক দৃষ্টিতে তিনি শুধু শ্রীমন্তের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

একটা উত্তেজনার মুখে আসিয়া শ্রীমন্ত এমনভাবে থামিয়া পড়িয়াছিল যে, সহসা কেহ আবার কথা তুলিয়া তাহাকে আর

অধিকদূর অগ্রসর হইবার সুযোগ দিল না। ব্রজবিহারী একই ভাবে স্থাণুর মত বসিয়া ছিল। মালতিও ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার আসিয়া ঘরের এক পাশে খুঁটি ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া একান্ত মনে শ্রীমন্তের কথাই শুনিতেছিল। প্রথম যৌবনের রক্তে যেন তাহার আগুন ধরিয়া উঠিতে চাহিতেছিল। বিস্মৃতির পথ বাহিয়া সহসা একবার মনে পড়িল তার প্রিয়তোষের কথা। মালতিরা ছিল তখন মাদারীপুর সদরে। পাশের বাড়ীর ছেলে ছিল প্রিয়তোষ। একদিন অতর্কিতে আসিয়াই পাশে বসিয়া বলিল, "মালতি তো ফুলের নাম, ফুল তুমি নিশ্চয়ই ভালবাসো, এসো খোঁপায় পরিয়ে দিই।" বলিয়া আর কথার অপেক্ষা না রাখিয়াই হাতে-আনা কী একটা সুন্দর সুগন্ধি ফুল একরকম জোর করিয়াই তাহার খোঁপায় পরাইয়া দিল; তারপর কেমন একরকম অদ্ভুত হাসিয়া কহিল, "বেড়াতে যাবে মালতি নদীর ধারে? মাঝিরা দলে দলে সারেঙ্গ বাজিয়ে কি চমৎকার ভাটিয়ালী গায়, শুনলে আর আসতে চাইবে না।"—এমনি করিয়া সত্যিই একসময় তার গভীর ভাব জমিয়া উঠিয়াছিল প্রিয়তোষের সাথে। নামে আর চেহারায় মিলাইয়া কেমন যেন এক অদ্ভুত রকমের ভাল লাগিয়াছিল প্রিয়তোষকে। তারপর মালতিরা চলিয়া আসে এইখানে। কিন্তু এই মুহূর্তে তার মনে হইল—জাতীয় চেতনা আর সমাজ-বোধের দিক দিয়া সত্যিই কত ছোট ছিল প্রিয়তোষ। প্রতিদিন সে প্রায় ঐ একই আবেদন লইয়া আসিয়া কাছে দাঁড়াইত, এতটুকুও নতুন রসমাধুর্য্যের অবকাশ ছিল না; যেটুকু ছিল—তা' তার ঐ কথা বলার ভঙ্গীটুকুর মধ্যেই। আজ শ্রীমন্তের সামনে দাঁড়াইয়া মনে হইতেছে—পৌরুষের মানদণ্ডে কত নীচ আর হীন প্রিয়তোষ। সে কি আবার পুরুষ!

স্ত্রীপুত্র নিয়া থাকে ব্রজবিহারী। কথায় আলোচনায় অধিক রাত্রি হইয়া যাইতেছে দেখিয়া নিখিল ব্রহ্মই এবারে ফাঁক বুঝিয়া উপযাচক হইয়া কহিল, "আপনার অসুবিধে হচ্ছে, অনেকটা পথ হেঁটে যেতে হবে, আপনি বরঞ্চ আসুন।"

খাঁচা হইতে মুক্তি পাইয়া পাখী যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। কৃতার্থ হইয়া গেল ব্রজবিহারী! শ্রীমন্তকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "আপনি বসুন, আমি তবে উঠি, বাসায় ওরা আবার একা র'য়েছে।"

ঘাড় নাড়িয়া শ্রীমন্ত কহিল, "আমিই বা আর কতক্ষণ ব'সবো। রাত অনেক হোলো। মাকে তো একরকম চটিয়েই দিয়েছি, এর পর আর বায়ু চড়ে গেলে বাকী রাতটুকু ঘুমোতে পারবেন না!"

এতক্ষণে কথা বলিতে পারিলেন বিমলা দেবী।—"ঘুম আমার এমনিই বেশী হয় না বাবা। অসুবিধে না হ'লে তুমি বরঞ্চ আর খানিকক্ষণ ব'সে যাও।"

ব্রজবিহারী চলিয়া গেল।

শ্রীমন্ত কহিল, "তা হ'লে আর দু'এক খিলি পান খাওয়াও বরঞ্চ মালতি!"

আরও একটু কাছে আগাইয়া বসিল এবারে নিখিল ব্রহ্ম। কহিল, "আজ একটা স্মরণীয় দিন গেল আমাদের এই ১১ই নভেম্বর। আন্এক্সপেক্টেড্লি ইট্ হ্যাজ কাম্ আউট ইন্ আওয়ার ফেভার। ভাগ্যিস্ বেরিয়েছিল গণপতি পাণ্ডের সংবাদটা কাগজে, নইলে এমন ক'রে কি পেতে পারতুম আপনাকে শ্রীমন্ত বাবু?"

ঈষৎ মুখ তুলিয়া শ্রীমন্ত কহিল, "কি রকম?"

"এভ্রি এফেক্ট্ হ্যাজ্ সাম্ কজ্।" নিখিল ব্রহ্ম কহিল, "অন্ততঃ লজিকে তাই বলে। আপনাকে এত সহজ করে পাবার পেছনে যে ঘটনার ক্রিয়া ঘটেছে, তাকে অস্বীকার করি কি করে?"

উত্তরে কথা না বলিয়া মৃদু হাসিল একবার শ্রীমন্ত।

বিমলা দেবী দ্বিপ্রাহরিক ঘটনার আদ্যোপান্ত কিছু জানিতেন না, কাগজপত্রের সঙ্গেও বিশেষ কোনোদিন সম্পর্ক নাই। কহিলেন, "গণপতি না কার নাম ক'রলি বাবা, সে কে?"

আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনাটা মা'কে বিস্তৃত ভাবে বিবরণ দিয়া নিখিল ব্রহ্ম কহিল, "স্বদেশপ্রাণ লোক ব'লেই শ্রীমন্ত বাবুকে তাঁর মৃত্যু এমন ক'রে আঘাত দিয়েছে।"

শ্রীমন্ত কহিল, "কিন্তু জানেন না মিঃ ব্রহ্ম, জাতীয় মুক্তি-শহীদদের এমনিতর মৃত্যুই তিলে তিলে অমরতা দান ক'রছে দেশকে। নভেম্বর বিপ্লবে রাশিয়াতেও এমনিই হ'য়েছিল। কত কৃষক, মজুর আর শ্রমিকের তাজা রক্তে লাল হ'য়ে গেল সেদিন সারা পথ, কিন্তু ব্যর্থ গেল না, ভেঙে গেল জার-শাসনতন্ত্র!"

"আপনি কি বিশ্বাস করেন—তেমন আন্দোলন এদেশেও সম্ভব?" নিখিল ব্রহ্ম কহিল, "গণ-আন্দোলন আর জনযুদ্ধ নিয়ে আজ যারা দিনের পর দিন শ্লোগান দিচ্ছে, তারা তো কংগ্রেসী ব'লে মনে হয় না! কৃষক আর শ্রমিক-জাগরণের স্কীম আছে বটে কংগ্রেসের, কিন্তু আপোষ আর সৌহার্দ্য তার অনেকখানি কৃষক-শ্রমিকের মালিকের সঙ্গেই নয় কি? অবশ্য আমার কোনো নিজস্ব মত নেই। লোকে বলে, শুনি; তবে বিষয়টা ভাববার বটে,—দু'দিক রক্ষা ক'রে কখনো আন্দোলন হয় না, আর যা হয় —তা অন্ততঃ স্বাধীনতা লাভের পথ যে নয়, এ তো মানবেনই! আর এই কারণেই সম্ভবত মার্ক্সবাদের উপরে আজ পার্টি গড়ে উঠেছে এই দেশে! একবারে যে ভুঁইফোড় অবাস্তব তারা, তাই বা বলি কি ক'রে?"

কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া কি যেন চিন্তা করিল শ্রীমন্ত, তারপর কহিল, "এ কথার জবাবে আমাকে যদি সত্যিই কিছু বলতে হয়, তবে তা পুনরাবৃত্তিই হবে মাত্র। ব্যাঙ্কে বসে এ-কথার ইঙ্গিত আপনাকে দিয়েছি! তা ছাড়া কৃষক-মজুর আন্দোলন এদেশে সম্ভব নয়, তাই বা বলেন কি করে? কী দারুণ বিক্ষোভে আজ দেশ জুড়ে তাদের ধর্ম্মঘট সুরু হয়েছে, দেখেছেন? চরমতম নির্য্যাতনের মুখে এক'দিন তারা বিসুবিয়াসের মতো লক্ষ লাভায় জ্বলে উঠবে! পরাজয় কোনোদিন তাদের ললাটে কলঙ্কের দাগ এঁকে দেবে না, এ কথা ধ্রুব জানবেন।" তারপর পুনরায় থামিয়া কহিল, "আর—কংগ্রেসের কথা ব'লছেন? কংগ্রেসের মধ্যে যে আজ কত গলদ রয়েছে, সে কথা কি আমিই অস্বীকার

করবো? কিন্তু সেটাকে সামগ্রিক ভাবে না দেখে খণ্ডাংশে বিচার করবার দরকার! দু' একজন নেতাকেই মাত্র সমগ্র কংগ্রেস বলে আমি বিশ্বাস করি না, তাই নিন্দাও করতে পারি না তাকে! ক্রটী বিচ্যুতি তা একান্তই নেতৃত্ব বা সংখ্যাবাচক, কংগ্রেস সমগ্র জাতীর; সমগ্র জাতি যদি তাকে নতুনভাবে গড়ে তোলে, তবে যে কোনো গলদই থাকে না। যদি বুঝতুম, কংগ্রেস কোনো বিশেষ দল তবে স্বতন্ত্র কথা ছিল; কিন্তু এ তো দল নয়, এ যে এক রক্তে এক জাত—অখণ্ড ভারতবর্ষ! এখানে নায়কত্বের প্রশ্নই বড় নয়, প্রধান নয় কোনো ক্রটি বিচ্ছেদ। এক-জাতিত্বই তো ন্যাশনাল কংগ্রেস; প্রত্যেকের এখানে জন্মগত অধিকার এবং সেই অধিকার এক এবং অচ্ছেদ্য। আপনি আমি যদি সেই অধিকার নিয়ে তার সংস্কার না করি, তবে সে ক্রটী যে আমাদেরই, মিঃ ব্রহ্ম।"

বক্তৃতার মত ঝর ঝর করিয়া বলিয়া গেল শ্রীমন্ত। নিখিল ব্রহ্ম সবটাই যে পরিষ্কার বুঝিল, এমন মনে হইল না। কথা শেষ হইয়া গেলেও বহুক্ষণ ধরিয়া নীরব দৃষ্টিতে সে শ্রীমন্তের মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

বিমলা দেবী আদৌ গোড়া হইতে এই তিক্ত আলোচনার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া নিতে পারিতেছিলেন না। এবারে আবহাওয়াটাকে অনেকখানি খাদে নামাইয়া আনিবার প্রয়াসেই কহিলেন, "আমার কিন্তু একটা ক্রটী হয়ে গেছে বাবা; কিছু মনে ক'রো না যেন!"

"সে আবার কি?" শ্রীমন্ত কহিল, "এমন আবার কি ক্রটী ক'রে ব'স্‌লেন, মা?"

"তোমার বাড়ী-ঘরের কারুর কুশলই জিজ্ঞেস্ করতে পারি নি।" মুখে মৃদু হাসির রেখা টানিয়া বিমলা দেবী কহিলেন, "এতখানিটা বয়স হোলো, সংসারী হ'য়েছ নিশ্চয়ই। বাড়ীতে আর কে কে আছেন?"

প্রশ্ন শুনিয়া শুধু শ্রীমন্ত নয়, নিখিল ব্রহ্ম এমন কি মালতী পর্য্যন্ত উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল।

শ্রীমন্ত কহিল, "এবারে সত্যিই কিন্তু ভাবিয়ে তুললেন মা। তা—প্রথম প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, সংসারী হবার খুব বিশেষ একটা অনুকূল সুযোগই পাইনি এ পর্য্যন্ত। এখন ভাবছি, আপনার মত মা পেলে এতদিনে লক্ষ্মীমন্ত সব ছেলেপুলে নিয়ে দি'ব্যি নিশ্চিন্তে সংসার-সমুদ্র পাড়ি দিয়ে চ'লতে পারতুম। কিন্তু অদৃষ্ট! যিনি গর্ভে ধরেছিলেন, তিনি নিশ্চিন্তে চলে গেলেন আমার জ্ঞান হবার আগেই। আপনার মত মা পেলাম, তাও এত দেরীতে—যখন বিয়ের আদৌ বয়স রইল না। আর—আত্মীয় পরিজনের কথা জিজ্ঞেস ক'রছেন? সবার স্মৃতি ধারণ ক'রে ঘরে আছেন এক বুড়ী ঠাকুরমা, বাবার সৎমা। স্ত্রী বলতেও তিনি, অভিভাবিকা বলতেও তিনি। ঠাকুর্দা সম্ভবতঃ 'তালাক' দিয়ে আমার ঘাড়েই পাঠিয়েছিলেন বুড়ীকে। দেখলাম—বেচারা,—আর সত্যি কথা বলতে কি মা, এখন যেন বুড়ীর ওপর রীতিমত মায়াসক্তই হয়ে প'ড়েছি। এই যে কাছে নেই, দিনরাত কত না যেন চোখের জল ফেলছে!"

এত রসিক যে শ্রীমন্ত—তাহা বিমলা দেবী কিম্বা মালতী তো দূরের কথা, কিছুকালের-পরিচয়-সূত্রে নিখিল ব্রহ্ম পর্য্যন্ত তাহা বুঝিতে পারে নাই। কথা শুনিয়া প্রত্যেকেই তাই বেশ রস উপভোগ করিয়া হাসিতেছিল।

থামিয়া বিমলা দেবী কহিলেন, "কিন্তু বুড়ো মানুষ তো আর চিরকাল থাক্‌বেন না! তখন অন্ততঃ ঘর রক্ষা করবার জন্যেও তো লোকের দরকার!"

শ্রীমন্ত কহিল, "চিরকাল না হোক্ অন্ততঃ কিছুকাল তো আছেনই! তারপর ঘর যদি রক্ষা হয় হোলো, না হ'লে পথ তো আছেই। জীবনকে চালিয়ে নিতে পারলে কোথাও ঠেকে যায় না। ঠিক যেন রোলারের মত, ঘোরালেই ঘোরে, থামালেই আবার ঠেলতে গিয়ে নতুন শক্তিব্যয়ের দীনতা তাসে।"

"বাঃ!" সোৎসাহে নিখিলব্রহ্ম বলিয়া উঠিল, "চমৎকার 'এক্সপ্রেশন' পেলাম আজ আপনার মুখে। 'এ্যাবসলিউট্‌লি নিউ ইণ্টারপ্রিটেশন অব লাইফ'। আপনি ডিভাইন জিনিয়াস শ্রীমন্ত বাবু। এমন কাছের করে পেয়ে সত্যিই আপনাকে ঠিক উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে পার্‌ছি না। আমার অনুরোধ, আপনি বই লিখুন, আমি আপনাকে পাবলিকেশনে হেল্‌প করবো।"

কিছু একটা উত্তর না দিয়া অদ্ভুতরকম একবার হাসিল শ্রীমন্ত।

নিখিল ব্রহ্ম কহিল, "হাসলেন যে বড়?"

"হাসির কথা ব'ললেন কি না, তাই।" একটু নড়িয়া বসিল শ্রীমন্ত। কহিল, "দুঃখবাদী বাঙালী আমরা, দার্শনিক হয়ে নিজেদের সত্তা যেন অনেকটা সান্ত্বনা পায়। আপনার কথা থেকে অন্ততঃ তাই মনে হচ্ছে।"

নিখিল ব্রহ্ম এবারে অনেকখানি লজ্জিত হইল। মনে হইল, কথাটা বলা ঠিক যেন হঠাৎই খানিকটা পরিবেশবিভ্রমে ঔচিত্য ছাড়াইয়া গিয়াছে। দ্বিরুক্তি না করিয়া অতি উচ্ছ্বাসের মুখেও তাই চুপ করিয়া গেল সে।

শ্রীমন্ত কহিল, "বই লিখ্‌বার ইচ্ছে যে আমারও নেই মিঃ ব্রহ্ম, তা নয়। কিন্তু আমার কি মনে হয় জানেন? কিছুকাল যদি দেশের লোকেরা শুধু অন্ততঃ স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখ্‌তে শিখ্‌তো, আর সাহিত্যিকেরা অনবরত জ্বলন্ত বারুদ ঢেলে দিতে পারতেন তাঁদের লেখায়, তবে হয়ত এই পৌনে দু'শ' বছরের শৃঙ্খলিত জাতির জীবনে বাঁধন ছেঁড়ার একটা দুর্জ্জয় গতি আস্‌তো! এদেশে দার্শনিক রবীন্দ্রনাথকে যত বড় ক'রে খুঁজে পাই, বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথকে তত বড় ক'রে পাইনা।"

ধীরে ধীরে আবার একটু সহজ হইতে চেষ্টা করিল নিখিল ব্রহ্ম। কহিল, "তাও সেই জেল আর হাত-কড়ির ভয়েই। জানেন তো, আই. বি'র লোক এ-দেশের চৌদ্দ আনি বাঙালী হ'লেও চাকরী-জীবনে তারা অত্যন্ত লয়্যাল। প্রয়োজন হ'লে বাপকে পর্য্যন্ত তারা ছেড়ে দেয় না।"

"কিন্তু আমার কথা হ'চ্ছে, সেই প্রয়োজনের খাতিরেই এই বিরাট দেশকে এক সাথে সেই উত্তাল সমুদ্রের বুকে ঝাঁপিয়ে

পড়বার দরকার ছিল এর অনেক আগেই। আজও তো সমগ্র জাতির ঐক্যবদ্ধ দুঃখ স্বীকারের তেমন প্রতিশ্রুতি নেই!" শ্রীমন্ত কহিল: "সাহিত্যিকেরা আজ বস্তুতান্ত্রিক হ'চ্ছেন যতখানি, সংগ্রামমুখী ততখানি ন'ন্। নিস্‌পিস্ ক'রে ওঠে তাই এক-একবার আঙুলগুলি, ভাবি—এমন কিছু লিখি, যাতে ক'রে এই পরাধীনতার দুর্জ্জয় বন্ধনপাশই নয়, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নতুন ক'রে গ'ড়ে তুলি সবকিছুকে। আর, তখনই মনে পড়ে মহাকবি হুইট্‌ম্যানকে—

> O to struggle against great odds, to meet
> enemies undaunted !
> To be entirely alone with them, to find how
> much one can stand !
> To look strife, torture, prison, popular odium,
> face to face !
> To mount the scaffold, to advance to the
> muzzles of Guns with perfect nonchalance !
> To be indeed a God !...'

ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই হঠাৎ শোনা গেল—বাহিরের পথে লাঠি ঠুকিয়া হাঁক দিয়া গেল চৌকিদারেরা: "ঘুম না সজাগ!"

ঘড়ির কাঁটার দিকে কাহারই লক্ষ্য ছিল না। প্রতিদিন ইহার বহু পূর্ব্বেই মালতি ঘুমাইয়া পড়ে; কিন্তু আজ তাহারও চোখে যেন বড় একটা ঘুমের জড়তা নাই। স্থাণুর মত নীরবে বসিয়া থাকিলেও আলোচনায় মনে মনে সে যেন অনেকখানিই অনুপ্রেরণা পাইতেছিল। কিন্তু বিমলা দেবী আর বড় বেশী বসিয়া থাকিতে পারিতেছিলেন না। নীরবে উঠিয়া যাইয়া নিজের বিছানায় এক সময় এলাইয়া পড়িলেন।

দূরে কোথায় ঢং করিয়া একবার ঘড়ির শব্দ হইল: একটা।

নিখিল ব্রহ্ম কহিল, "বাব্বাঃ, এরই মধ্যে একরাত হ'য়ে গেল!"—ভাবটা সম্ভবত, এই যে, ইহার পর বিছানায় গেলে শুধু হয়ত শোওয়াই হইবে, ঘুম হইবে না, সুতরাং—।

শ্রীমন্তেরও উঠিবার তাগিদ একেবারে কম ছিল না। বাধা না পাইলে ব্রহ্মবিহারীর সঙ্গেই বহু পূর্ব্বে সে উঠিয়া যাইতে পারিত। কিন্তু তর্কের খাতিরে আলোচনা তাহাকে একেবারে সময়-বিস্মৃত করিয়া ফেলিল। বুকের জ্বালা মুখে বলিয়া কি শেষ করিবার জো আছে! নিজের বক্তব্য শেষ করিয়া নিজেই যেন সে কেমন একটা ঘূর্ণিচক্রে দোলা খাইয়া উঠিল। যতখানি সে বলিয়া ফেলিল, ঠিক সেই স্তরে যাইয়া সেই-ই কি পৌঁছিতে পারিয়াছে? আজও তো সে রাজকীয় আইনের কবলে প্রতি-মুহূর্ত্তে পলাতক আসামীর মতো ছদ্মবেশে ঘুরিয়া মরিতেছে। কেন সে বীরের মত উন্নত শিরে সেই আইনের সামনে যাইয়া দাঁড়াইয়া বলিতে পারে না—'এ দেশ, এ নগর আমার, নাগরিক অধিকারে আমি ভাঙ্‌বো গ'ড়বো, যা ইচ্ছে তাই ক'রবো, তোমার অনুশাসন তাতে কেন?'—কিন্তু কাজ, অন্তরে প্রেরণা পাইয়াছে সে কাজের। সেই কাজ করিয়া যাইতে হইবে তাহাকে দিনের পর দিন। ঘরে ঘরে একবার যদি চারণ-শঙ্খ বাজাইয়া সে গৃহবাসীর নিদ্রা ভাঙাইতে পারে, তবেই যে তার ব্রত সার্থক। তবেই যে প্রতি-জীবনের মধ্য দিয়া তার ব্যক্তি-জীবনেরও সেই advance to the muzzles of guns with perfect nonchalance. আর সেই আত্মাহুত শহীদ-যজ্ঞেই যে নব-ভারতের প্রাণ-অঙ্কুর নিহিত।

অনাবিল অথচ উদ্দীপ্ত কণ্ঠে হুইট্‌ম্যানকে আবৃত্তি করিয়া একরকম অভিভূতের মতই কিছুক্ষণ ব'সিয়া রহিল শ্রীমন্ত। ঘড়ির সময় সম্পর্কে নিখিল ব্রহ্মের কথাটা যে তাহার কানে না গেল, তাহা নয় কিন্তু বড় বেশী খেয়াল করিল না। পরে কহিল, "অত্যন্ত বেশী সময় ব্যয় ক'রলুম। ব'কে ব'কে এতক্ষণে আবার নতুন ক'রে খাবার অবস্থা হ'য়েছে। কিন্তু এত রাত্রে আবার উনুনে হাঁড়ি চড়াবার মত কষ্ট নিশ্চয়ই মালতি স্বীকার ক'রে নেবে না।"

কথা শুনিয়া এবারে ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল মালতি। —"আবার বুঝি ঠাট্টা আরম্ভ ক'রলেন, না? হঠাৎ শক্ত কথার মধ্যে এমন ক'রেও আপনি ব'লতে পারেন যে, না হেসে সত্যিই থাকতে পারি না।"

নিখিল ব্রহ্ম কহিল, "ঐটেই তো ওঁর প্রধান গুণ। দেশ্ তো দূরের কথা, আমরা যে আজ পর্য্যন্ত কথা ব'লতেই শিখ্‌লুম না রে মালতি। শ্রীমন্ত বাবুকে কি হিংসে হয় সাধে!"

"হয়েছে যথেষ্ট হ'য়েছে, এবারে থামুন, আমি উঠি!" বলিয়া স্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়া শ্রীমন্ত কহিল, "বাঃ, মা তো বেশ মানুষ, আমাকে নির্ব্বিবাদে বসিয়ে দিয়ে নিজে গিয়ে বেশ নাক ডাকাচ্ছেন।"

নিখিল ব্রহ্ম কহিল, "কিন্তু কথায় কথায় ভুলে গিয়ে সিন্ধুরামকেও তো আট্‌কিয়ে রাখিনি, সেও হয়ত ব্যাঙ্কে গিয়ে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে! পথঘাট তো ভাল নয়! যাবেনই যদি, হ্যারিকেনটা তবে নিয়ে যান, মালতি বরঞ্চ আর একটা ঘরে জ্বেলে নিচ্ছে।"

আপত্তি তুলিয়া শ্রীমন্ত কহিল, "অন্ধকারের সাথে পরিচয় আছে আমার, তার জন্যে কিছু অসুবিধে নেই; আলো আর আপনাদের জ্বালাতে হবে না।"

"না, না, তা হয় না।" বাধা দিয়া নিখিল ব্রহ্ম কহিল, "আর একটা অনুরোধ আছে আপনার কাছে। যদি দয়া ক'রে এক-আধ সময় এসে মালতিকে ইংরেজি বাংলাটা অন্ততঃ একটু শিখিয়ে প'ড়িয়ে দিয়ে যেতেন, তবে বড্ড উপকার হোতো ওর। বোন ব'লে যখন নিয়েছেন, জ্ঞানের দিকেই বা ওকে ফাঁকি দিয়ে যাবেন কেমন ক'রে!" কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে ঠোঁটের ফাঁকে মৃদু হাসির রেখা টানিল নিখিল ব্রহ্ম।

কিন্তু শ্রীমন্ত রীতিমত রসিকতার ছলেই উত্তর করিল: "বুঝেছি, ওকে পাশ হ'তে দেবেন না আপনি। এমন মাষ্টারের হাতে প'ড়লে ফেল অবধারিত।"

কথা শুনিয়া রীতিমত খিল-খিল করিয়াই হাসিয়া উঠিল এবারে মালতি, কহিল, 'বেশ তো, ফেল যদি করিই, অপবশটা আপনি না হয় নেবেনই শ্রীমন্তদা।"

"তা হ'লে আমার আপত্তি নেই।" থামিয়া শ্রীমন্ত কহিল, "তবে হ্যাঁ, এক সর্ত্তে। এমন ক'রে চমৎকার রান্না খাওয়াতে হবে কিন্তু রোজ। কেমন, রাজী?"

"সে তো আমার সৌভাগ্য।" বলিয়া হঠাৎ ঢিপ্‌ করিয়া একবার প্রণাম করিল মালতি শ্রীমন্তের পায়ে। কিন্তু শ্রীমন্ত সহসা ইহার কিছু একটা অর্থ বুঝিলনা। শুধু মালতির অন্তর্দেবতা জানিল—আত্ম-পরিবৃত্তের মধ্যে এতটুকু স্বীকৃতি আর খ্যাতির জন্য কতবড় কাঙাল ছিল মালতি!

বন্দরের বুকে নিস্তব্ধ রাত্রির শান্ত আলিঙ্গন। ঘর বলিতে এখানে শ্রীমন্তের কীই বা আছে! সাহাদের গুদামবাড়ীর ছোট্ট একটি খোপে নিতান্ত অলসমুহূর্ত্তগুলি কাটাইয়া দেয়; কোনোদিন বা এখানে ওখানে। খাওয়া-পরা যা কিছু—উহারই মধ্যে সব; চিন্তাপ্রসূতা, কর্ম্মসূচী—সব কিছু ঐ খোপটুকুর মধ্যেই নিহিত।

পাশে আড়িয়াল-খাঁর কালো জল মন্থর বাতাসে টলমল করিতেছে। কাছে দূরে অস্পষ্ট ভাবে দুলিতে দেখা যাইতেছে বিক্ষিপ্ত দুইএকখানি ছোটবড় নৌকার ছই। মাঝিরা কেরোসিনের কুপি নিভাইয়া কখন্ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে! পাট-গুদামের কেহ পর্য্যন্ত জাগিয়া নাই। দুই একটা নিশাচর পাখী কেবল মাঝে মাঝে অদ্ভুত স্বরে ডাকিয়া উঠিতেছে। কলমুখর সারা বন্দরটা এমন করিয়াও ঘুমাইয়া পড়িতে পারে! এমন করিয়া আর যেন কোনোদিন চরমুগড়িয়ার এই নিক্রিয় কালো দৃশ্য দেখিবার সুযোগ পায় নাই শ্রীমন্ত।

আর একবার ঘড়ির শব্দ কাণে আসিল: এবারেও একটা। হয়ত দেড়টার বেল পড়িল তবে! মুহূর্ত্তে পা দুইটায় যেন একটু ক্ষীপ্র গতি আসিল শ্রীমন্তের। মনে পড়িল আর একটি রাত্রির কথা। সেদিনও এমনই নিস্তব্ধ ঘুমন্ত রাত্রির দেড়টা। সৌদামিনীও হয়ত ভাল করিয়া বুঝিলনা—কোথা দিয়া কি হইয়া গেল! দাউ দাউ করিয়া আগুন উঠিল জমিদারী সেরেস্তা আর সংকারী দপ্তরের বুক ঠেলিয়া। গা ঢাকা দিয়া সরিয়া পড়িল মথুর দত্ত। কিন্তু আরও দুইটি প্রাণীর জন্য বড় মায়া হয় আজ শ্রীমন্তের। ঘটনার কয়েক দিন পরেই একদিন কাগজে বাহির হইল: "বারোখাদা অঞ্চলের অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে সন্দেহক্রমে পুলিশ হরেন চাকী ও হারাণ ঘটক নামক দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।" অনুশোচনা হইল একবার শ্রীমন্তের। হরেন চাকী ও হারান ঘটক সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। আগুন দিয়েছিল শ্রীমন্ত নিজের হাতে। হয়ত একটা প্রাণান্তকর কাতর শব্দও উঠিয়াছিল ষ্টেশন ঘরের মধ্যে। চৌকিদার ছটু মান্না সারারাত্র ঘুমাইয়া পাহারা দিত ষ্টেশন ঘরে। সে কি তবে রক্ষা পাইয়াছে সেই আগুনের মুখে? সাথে সাথে কাগজে প্রকাশিত সংবাদের আরও খানিকটা অংশ মনে পড়িল শ্রীমন্তের, শুধু মনে পড়িল কেন, প্রত্যক্ষ ভাবে যেন কাটা কাটা অক্ষরগুলি আসিয়া তীব্রবেগে বিঁধিতে লাগিল তার দুই চোখে: "পুলিশের সিদ্ধান্তে মূল অভিযুক্ত আসামী মথুর দত্ত সম্প্রতি নিখোঁজ। তাহার প্রতি আই. ডি.-এর গ্রেপ্তারি পরওয়ানা জারী করা হইল।"

ভাবিতে যাইয়া একবার বাতি পাইল বড় কম নয় শ্রীমন্তের। গ্রেপ্তারি পরওয়ানা শুধু তাহারই ভাগ্যে কেন? সারাটা দেশই যে আজ কঠিন পরওয়ানায় গ্রেপ্তার হইয়া আছে! এই বিরাট গ্রেপ্তারি যজ্ঞে একা সে আজ কতটুকু অংশভাগী?

ঠিক যেন কানের কাছেই কি একটা পাখী সেই মুহূর্ত্তে ডাকিয়া উঠিল: কুপ—কুপ-কুপ।

ঘরে আসিয়া আধপোড়া একটা মোম পাইল শ্রীমন্ত হাতের কাছে। তাহাই জ্বালিয়া নিয়া চারিপাশ একবার সতর্ক দৃষ্টিতে দেখিয়া নিল। তারপর অলস-শয্যায় হাত-পা ছড়াইয়া দিয়া অনেকখানি নিশ্চিন্ত হইতে চেষ্টা করিল রাত্রের মত।

[আগামী সংখ্যায়—তৃতীয় পর্য্যায়

কিছু নয়

শ্রীবীরেন্দ্র মল্লিক

কিছু নয়,
এরা কিছু নয়।
মালঞ্চের কুসুমিত
নম্র শ্যাম এই বনভূমি,
নব দূর্ব্বাদলে মোড়া
আঁকাবাঁকা এই পথ-রেখা,
জোনাকী-ঝিলিক-বসা
সন্ধ্যার দিগন্ত-ঢাকা
স্নিগ্ধ এই পিঙ্গল অঞ্চল,
হেমন্তের বিকালের শিশিরের
ভাঙা-ভাঙা আধো-আধো কথা,
পতঙ্গ পাগল হওয়া
সুলিখিত অর্ধখানি কোনো মানবীর,

নির্জ্জন নিরালা রাতে
ঘুমমাখা অপরূপ সুখস্পর্শটুকু
প্রিয়ার ওষ্ঠের,
সূর্য্যের তরঙ্গ শেষে
হৃদয়ের গহন গোপন বিনিময়
জানি কিছু নয়!

সত্য শুধু জেগে আছে
একান্ত গোপনে
শিয়রের কাছে।
মর্ম্ম-কাটা কোনো এক দুঃস্থ রাত্রি শেষে
হয়তো আধেক কথা হয় নাই সারা,
হয়তো আধেক প্রেম

তখনও ফুটি-ফুটি করি
পারেনি মেলিতে তার সব ক'টি দল,
হয়তো উদয় শিরে
নির্ব্বাক নিস্তব্ধ হ'য়ে
তখনো বসিয়া আছে
কোনো এক গান-গাওয়া সারি,
সে আসিয়া চকিতে হঠাৎ
আমার নয়নতীরে নামি'
মুছে দেবে আজিকার
রূপে রঙ্গে রসে মোড়া
অদ্ভুত পৃথিবী,
আজিকার অবাক আকাশ!

জাতীয় মহাসমিতির ইতিহাস

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

১৯১৭ : অগ্রগামী দল :

কলিকাতা—সভানেত্রী—এ্যানিবেসান্ত

১৯১৬ সালের কংগ্রেস সিদ্ধান্তের পরে, কংগ্রেস-লীগ স্কীম দেশের লোকে অধিকাংশ সুরেন্দ্রনাথ, মজহরুল হক, মহম্মদআলি

মিঃ জিন্না

জিন্না প্রমুখ উনিশ জন ব্যক্তি যে সহি করিয়া বিলাতে পার্লেমেণ্টের নিকট পাঠান, তাহার উল্লেখ করিয়া লর্ডসভায় সিডেনহাম বলেন যে, ভারতীয়রা বোধহয় জার্মাণীর প্রভাব এড়াইতে পারে নাই। সুতরাং সেখানে দমননীতির একান্ত প্রয়োজন। Self Government এর জন্য আন্দোলন সম্বন্ধে কিরূপ নীতি অবলম্বিত হওয়া উচিত, তাহাও একখানা সার্কুলারের সহায়তায় গভর্ণর জেনারেল লর্ড চেমস্ ফোর্ড জানাইয়া দেন। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ১২ই মে তারিখে ঘোষণা করেন: "Empire is founded not only upon the freedom of the individual but upon the autonomy of its parts. বিভিন্ন অংশের স্ব-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতার উপরেই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বেসান্তের হোমরুল লীগই তখন বিশেষ অগ্রগামী দল। তাহাদের স্বায়ত্তশাসনের উদ্দেশ্য কেবল কাগজপত্রেই নিবদ্ধ নয়, মাদ্রাজে বিশেষ জাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল। বেসান্ত হিন্দুধর্ম্মানুরাগিণী মহিলা, তাঁহার অদ্ভুত বক্তৃতাপ্রবাহ, কর্ম্মশক্তি এবং ইতিহাস ও পুরাণ বর্ণিত মহিলাগণের উজ্জ্বলদৃষ্টান্তে মাদ্রাজের মহিলারা হোমরুল লীগে দলে দলে যোগ দিতে লাগল। সাধু সন্ন্যাসীরাও তাঁহার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিতে আরম্ভ করেন, গ্রাম্যনেতাগণের মধ্যে ভাব ছড়াইয়া পড়ে এবং ভাষাগত ও সংস্কৃতমূলক নীতিতে প্রদেশ গঠিত হউক এই ভাব প্রচারে—কংগ্রেস অপেক্ষাও তাঁহার হোম-রুল লীগ অধিক জনপ্রিয় হইয়া উঠে। তাঁহার বক্তৃতার তীব্রভাষায় গভর্ণমেণ্টও তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইয়া উঠিল।

মাদ্রাজের হোমরুল লীগের অনারেরী প্রেসিডেণ্ট হ'ন স্যার সুব্রহ্মণ্য আয়ার এবং সি,পি, রামস্বামী আয়ার, আরণ্ডেল, ওয়াডিয়া প্রভৃতি ইহার জন্য বিশেষ পরিশ্রম করেন। সংবাদপত্রের সহায়তায়ও লীগের কার্য্য বেশ প্রসার লাভ করে। মাদ্রাজের গভর্ণর লর্ড পেণ্টলাণ্ড প্রথমেই ছাত্রদিগকে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিতে বাধা দেওয়ার জন্য আদেশ প্রচার করেন এবং তৎপরেই মিসেস্ বেসান্ত্ প্রতিষ্ঠিত 'নিউ ইণ্ডিয়া' এবং 'কমন উইল' (Common Weal) কাগজ দুইখানির জন্য জমানত (security) স্বরূপ ২০,০০০৲ টাকা দাখিল করিতে (deposit) বাধ্য করেন এবং পরে উহা বাজেয়াপ্ত করেন ও বক্তৃতা করিয়া মিসেস বেসান্তকে সতর্ক করিয়া দেন। কেবল তাহাই নহে, ১৯১৭ সনের ১৬ই জুন তারিখে গভর্ণমেণ্ট মিসেস্ বেসান্ত ও তাঁহার দুই
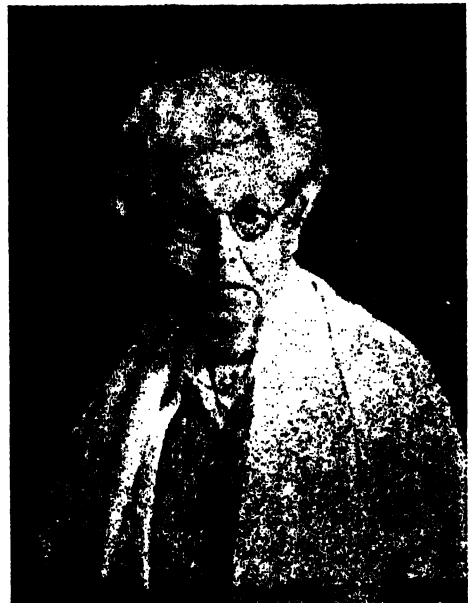
এ্যানি বেসান্ত

সহকর্মী ওয়াডিয়া ও আরণ্ডেলকে (B. P. Wadia & G. S. Arundale) মাদ্রাজের উট্কামণ্ডে অন্তরীণাবদ্ধ করেন। ইহাতে মাদ্রাজে ভয়ানক বিক্ষোভ হয়। 'হিন্দু' প্রমুখ যাবতীয় সংবাদপত্র প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করে এবং স্যার সুব্রহ্মণ্য আয়ার ২৪শে জুন তারিখে মার্কিণ যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রপতি মিষ্টার উড্রো উইলসনকে একখানি দীর্ঘপত্র লিখিয়া এ্যানি বেসান্তের অন্তরীণ দণ্ডের এবং স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে বহু ভারতবাসী স্বেচ্ছায় যুদ্ধে যাইতে অগ্রসর হইত ইত্যাদি বিষয়ের অবতারণা করিয়া একটী স্পষ্ট ছবি দেন।

মাদ্রাজ প্রদেশে যখন বিক্ষোভ ও জাগরণ বাঙ্গলায়ও নব-পবন প্রবাহিত হয়। বাঙ্গলার নেতৃত্ব তখনও সুরেন্দ্রনাথের হাতে। বাঙ্গালার কেন, সুরেন্দ্রনাথ তখন ভারতেরও অবিসম্বাদী নেতা। ইতিপূর্ব্বে তিনি দুইবার কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছেন। কংগ্রেস কার্য্যের জন্য বার বার বিলাত গিয়াছেন, বরিশালে নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছেন বঙ্গভঙ্গ যখন রহিত হয়, তিনিই নেতা, আর তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে আগ্রহে লোক ছুটিয়া আসে। কিন্তু তিনি এবং তাঁহার সহকর্ম্মিগণ যতবড় নেতাই হৌন, সময়ের সহিত তাল রাখিয়া চলিতে সমর্থ না হওয়ায় ক্রমেই পুরাতন ও নরমপন্থী

নিবেদিতা

হইতে লাগিলেন। এদিকে নূতন দলেও তেমন লোক তখন কেহ উদ্ভূত হন নাই, যিনি এই নবপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করিয়া নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু নেতা তৈয়ার হয় না, নেতা ভগবানের দান, (Leaders are born, not made), তাই ভগবানের কৃপায় শীঘ্রই এক সর্ব্বগুণসম্পন্ন নেতার আবির্ভাব হইল। সেই সর্ব্বজনপ্রিয় নেতাই বাঙ্গলার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

সুরেন্দ্রনাথ

চিত্তরঞ্জন সিভিল সার্ভিস পড়িতে পড়িতে জাতীয় সম্মান রক্ষা করিবার জন্য Exeter এ বক্তৃতা দিয়া যে কভেনেন্টেড সার্ভিস লাভে বঞ্চিত হন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেবাব্রত পরায়ণা নিবেদিতার সহিত তাঁহার সংস্রবের কথাও পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। বঙ্গভঙ্গের দিনে চিত্তরঞ্জনই বঙ্কিমের "আত্মনির্ভর" প্রচার করিয়া বাঙ্গলাকে নূতন বাণী প্রদান করেন। বরিশাল কনফারেন্সে ও জাতীয় শিক্ষাপরিষদে তাঁহার সহযোগিতাও কম নয়, কিন্তু অতঃপরে ১৯১৬ পর্য্যন্ত তাঁহার রাজনীতির সহিত কাহারও সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচিত হইবার বড় সুযোগ হয় নাই। তবে তিনি অন্যদিকে জাতীয়তামূলক ব্যাপারেই লিপ্ত ছিলেন।

১৯০৭ সনে কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পরে ১৯১৬ সন পর্য্যন্ত কংগ্রেসে কিছু করিবারও ছিল না। তবে তাঁহার দেশভক্তির পরিচয় বাঙ্গালী পাইয়াছে। ১৯০৮ সনে অরবিন্দের মোকদ্দমায় যে ঐকান্তিক সাধনায় তিনি অরবিন্দকে রাজদ্বার হইতে মুক্ত করিয়া আনেন, তাহাতে তাঁহার জাতীয়তা ও স্বদেশপ্রীতির পরিচয় দেশবাসী সম্যক্ভাবে পায়। ১৯১১ সালে ঢাকা ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমায় আবার যে বঙ্কিমের 'অনুশীলন' বিশ্লেষণ করেন, তাহাতেও তাঁহার গভীর রাজনীতির জ্ঞান সম্যক্ উপলব্ধি হয়। ১৯১৪তে দিল্লী ষড়যন্ত্রে যে অকুতোভয়ের পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন,

তাহাও দুর্লভ বলা যায়। এইরূপ কত মোকদ্দমার পরিচয় দিব? —সর্ব্বত্র তাঁহার স্বদেশপ্রীতি, সাহস ও জাতীয়তাবোধ সম্যক্ ফুটিয়া উঠিত এবং তাহাতেই দেশবাসীর হৃদয়ে তাঁহার আসন দৃঢ়ীভূত হয়। ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন রাজনৈতিক চিত্তরঞ্জনেরই

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

পূর্ব্বাধ্যায়। তাই স্বদেশ প্রেমিক, অকুতোভয়, স্বাধীনচেতা কর্ম্মী চিত্তরঞ্জন রাজনীতিক্ষেত্রে আসিবামাত্রই তিনি—প্রথমে বাঙ্গালার পরে ভারতের অবিসম্বাদীত নেতা হইয়া পড়েন আর জাতীয় মহাসভার ইতিহাসে তাহাই এক উজ্জ্বলতম ও গৌরবময় ইতিহাস। কিন্তু উভয়ের মূলেই ছিল দেশাত্মবোধ। গভীর দেশাত্মবোধ লইয়াই তিনি অসংখ্য ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জনের স্বদেশপ্রেম, সাহস, অক্লান্ত খাটুনি ও জাতীয়তাবোধ রাজনৈতিক চিত্তরঞ্জনের কর্ম্মপটুতা ও দুর্ব্বার নির্ভীকতায় পরিণত হইল। যে দেশপ্রেম এতদিন সাহিত্য ও আইন ব্যবসায়ে আত্মপ্রকাশ করিত, তাহাই এখন রাজনৈতিক চিত্তরঞ্জনকে সর্ব্বাগ্রগণ্য করিয়া ফেলিল। তাই আবির্ভাব মাত্রেই তাঁহার গভীর দেশপ্রেম সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আর প্রদীপ্ত ভাস্করের তেজোপ্রভায় সমগ্র গ্রহ-নক্ষত্র তারকারাজি নিষ্প্রভ হইয়া যায়।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ২১শে এপ্রিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলন হয় কলিকাতার দক্ষিণাংশে ভবানীপুরে, আর তাহার সভাপতি হন চিত্তরঞ্জন। তিনি বলিলেন, "আমার বাঙ্গলা আমি আশৈশব সমস্ত প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছি, যৌবনে সকল চেষ্টার মধ্যে আমার সকল দৈন্য সকল অযোগ্যতা, অক্ষমতা সত্ত্বেও আমার বাঙ্গালার যে মূর্ত্তি প্রাণে প্রাণে জাগাইয়া রাখিয়াছি, আজ এই পরিণত বয়সে আমার মানসমন্দিরে সেই মহান্ মূর্ত্তি আরও জাগ্রত জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। সকলের হৃদয় পুলকে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।" তাঁহার প্রথমোক্তি—"বঙ্কিম সর্ব্বপ্রথম মাতৃমূর্ত্তি গড়িলেন, প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন; মাকে চিনিলাম, বঙ্কিমের গান কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল"; লোকেরও কানের ভিতর দিয়া মরমেই পশিয়াছিল। বাঙ্গলার সেই সম্মিলনক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জন আসিয়া দাঁড়াইলেন বাঙ্গালীর বেশে, কথা কহিলেন বাঙ্গালীর ভাষায়—তাঁহার প্রশান্ত ও মুখমণ্ডলে উদ্ভাসিত হইল বাঙ্গালার প্রাণের খাটি কথা, বাঙ্গলার পল্লীর ব্যথার কথা, বঙ্গলার কৃষক মজুর মুটে ভৃত্যের সুখদুঃখের কথা। বাঙ্গালী সসম্ভ্রমে মস্তক নত করিয়া সেই দিন হইতেই তাঁহাদের প্রাণের দেশবন্ধুকে হৃদয়-সিংহাসনে চিরপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিল।

[দ্বিতীয় পর্য্যায় সমাপ্ত

ভাগবতাচার্য্য

[শ্রীপাট বরাহনগরে ভাগবতাচার্য্যের মন্দির দর্শনে]

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস এম-এ, ব্যারিষ্টার-এট-ল-

তুমি ভাগবত পাঠ, নিমাই পণ্ডিতে,
মুগ্ধ করেছিলে কবে বরাহনগরে,
প্রেমাবেশে ভাবাবেগে তব সুধা গীতে,
নাচিল কাঁদিল প্রভু বহুক্ষণ ধরে।

ভগবান নিজে শোনে ভাগবত-পাঠ,
দীর্ঘ রাত্রি ব্যাপি চলে শ্রবণ নর্ত্তন,
ভক্তির মহিমা শ্লোকে হৃদয় কবাট—
খুলিল অপূর্ব্ব-রসে সঞ্জীবিত মন।

প্রভুর কৃপায় আজি বরাহনগর,
ধরিয়াছে সৌধরাজি রম্য মনোহর।
বিরাজিছে গ্রন্থশালা, পূজার মন্দির,
বৈষ্ণবের আকাঙ্ক্ষিত ধ্যানে সুগম্ভীর।

নামুক ভক্তির ধারা এ মরুজগতে,
মগ্ন হোক মুগ্ধ হোক চিত্ত ভাগবতে।

মদনকুমার

আনন্দবর্দ্ধন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি

মধুমালা কন্যা চন্দ্রকলার সঙ্গে গেল পান্নাগাছের উপবনে··· সেখানে সারি সারি একশো একটা পান্নাগাছ দাঁড়িয়ে আছে। অগ্নি-পাথর ছুঁইয়ে সেই গাছগুলোকে মানুষ ক'রে তুললে মধুমালা। মদনকুমারও তাদের মধ্যে ছিল: রাজপুত্রেরা মুক্তি পেয়ে মধুমালাকে ধন্য ধন্য করতে লাগলো। কিন্তু গোলমাল বাধলো কন্যা চন্দ্রকলাকে নিয়ে—সকলেই তা'কে পেতে চায়। মধুমালা এই কাণ্ড দেখে ব'লে উঠলো: "এই কন্যাকে মুক্তি দিয়েছি আমি, ও এখন আমার। আমি আমার সেরা বন্ধুর হাতে ওকে সঁপে দেবো।" এই বলে মদনকুমারের হাতে চন্দ্রকলার হাত মিলিয়ে দিলে। রাজপুত্ররা আর কোনো কথা কইতে পারলে না।

তারপর সকলে দিনের আলো থাকতেই সেই দৈত্যপুরী থেকে পালিয়ে স্বদেশে যাত্রা করলে। দৈত্যপুরী শূন্য—খাঁ খাঁ করতে লাগলো।

*

মদনকুমার চন্দ্রকলাকে নিয়ে ঘরে ফিরলো। তারপর একটা শুভলগ্নে সুন্দরী কন্যাকে বিয়ে ক'রে সুখে রাজ্য-ভোগ করতে লাগলো। এমনি ক'রে দিন যায়। ঠিক এক বৎসর পরে মদনকুমার একদিন চন্দ্রকলাকে ডেকে বললে: "আমি বাণিজ্যে যাবো···আর ঘরে ব'সে থাকতে ভালো লাগে না। ভালো মনে তোমার মত দাও, মা-র সম্মতি আমি চেয়ে নোবো।" স্বামীর এই বিদায়ের কথা শুনে চন্দ্রকলার চোখ উঠলো ছলছলিয়ে, রাজকুমারের হাত চেপে ধ'রে বললে: "এই রাজ্যের সুখ ছেড়ে কোন্ বিদেশে কষ্ট সইতে যাবে? পথে যে অনেক বিপদ্! মদনকুমার হাসতে হাসতে বললে: "কত বিপদে পড়েছি—আবার আশ্চর্য্য উপায়ে মুক্তিও পেয়েছি। তোমার ভাগ্যের জোর যদি থাকে—এবারেও শত বিপদ এড়িয়ে ঘরে ফিরবো। চোখের জল ফেলে আমাকে বাধা দিয়ো না, চন্দ্রকলা। আমি বাণিজ্যে যাবোই—ঘরে থাকতে আর আমার মন টিকছে না বাইরের ডাকে আমার মন চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে।"

চন্দ্রকলা কি আর করে—মদনকুমারকে যেতে দিতে হোলো। মদনকুমার ময়ূরপঙ্খী ভাসিয়ে উজান বেয়ে চললো, শেষে এসে ঠেকলো এক রাক্ষসপুরীতে।

এদিকে মধুমালা একটা নির্জ্জন বনে কুটীর বেঁধে থাকে, আর দিন গোণে ব'সে ব'সে—বারো বছর কাটতে আর কত বাকি। একদিন দুপুর বেলা কুটীরের আঙিনায় একটী গাছের নীচে শুয়ে শুয়ে তা'র জীবনের কথা ভাবছে· এমন সময় শুনতে পেলে সেই গাছের ডালে ব'সে দুই পাখীতে কি কথা কইছে। এই দুই পাখী—ইন্দ্রপুরীর দুই কন্যা। মধুমালা কান পেতে শুনতে লাগলো। শুনে জানতে পারলে যে—তা'র স্বামী মদনকুমার আবার কোন্ এক রক্তমুখী রাক্ষসীর ফাঁদে পড়েছে। সেই রক্তমুখী রাক্ষসী সুন্দরী মেয়ের রূপ ধ'রে সুন্দর সুন্দর রাজপুত্রদের মাথা ঘুরিয়ে দেয়, শেষ পর্য্যন্ত তা'র কবলে প'ড়ে মরে তা'রা। কোন নতুন রাজপুত্র রাক্ষস-পুরীতে পৌছলে—পুরানো রাজপুত্রকে পেটে পুরে রাক্ষসী নতুন কুমারকে বিয়ে ক'রে জীইয়ে রেখে দেয়। রাক্ষসীকে না মারলে মদনকুমারের উদ্ধারের আশা নেই। কিন্তু রাক্ষসীর মরণ ঘটানও খুব সহজ ব্যাপার নয়। রাক্ষসপুরীর দক্ষিণ দিকে রক্তের নদী আর হাড়ের পাহাড়ের মাঝখানে একটা ভীষণ অজগর সাপ থাকে—এই অজগরেই রক্তমুখী রাক্ষসীর গচ্ছিত প্রাণ। অজগর মরলে—রাক্ষসীও মরবে। অজগরকে মেরে ফেলা যেমন কঠিন—তেমনি তা'তে অনেক বিপদ্। এক পলকে প্রাণ যেতে পারে। অজগরের এক ফোঁটা রক্ত মাটিতে পড়লে সেখানে হাজার হাজার অজগর ফণা তুলে জেগে উঠবে। এক সতীকন্যা ছাড়া এ অজগরকে কেউ মারতে পারবে না। তারপর মধুমালা শুনলে: যে রাক্ষসপুরীতে পৌছলেই রক্তমুখী রাক্ষসী বারো ঘণ্টার মধ্যে মদনকুমারকে খেয়ে ফেলবে। কিন্তু অজগরের মাথার মণি এনে সেই হাড়ের পাহাড়ে ঠেকিয়ে দিতে পারলে মরা রাজপুত্তুররা বেঁচে উঠবে আবার মানুষ হ'য়ে। মদনকুমারও এইভাবে বাঁচবে। মধুমালা আরো জেনে নিলে যে—রক্তনদী বেয়ে যেতে হবে রাক্ষসপুরীতে!

মধুমালা পুরুষের বেশ ধ'রে আবার ডিঙার খোঁজে বেরিয়ে পড়লো। লোকজন, ডিঙা যোগাড় ক'রে পাড়ি দিলে নদী-পথে। নদীর চৌমাথায় উপস্থিত হ'য়ে সে দেখতে পেলে—একটা শাখা দিয়ে রক্তনদীর স্রোত ব'য়ে আসছে—তা'র সঙ্গে মানুষের হাড় আর মাথা আসছে ভেসে। সেই রক্তনদীর ঢেউ ঠেলে গিয়ে মধুমালা রাক্ষসপুরীর লাল প্রবালের ঘাটে ডিঙা বাঁধলে, তখন রাক্ষসী-বেলা গোধূলির সময়। সেই পুরীতে যেতে যেতে নজরে পড়লো—সব লালে লাল, রাস্তা-মাঠ-ঘাট-গাছপালা। জনমানব, পশুপক্ষীর নাম-গন্ধ নেই, কেমন একটা থমথমে ভাব। মধুমালা এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। চোখে পড়লো—একটা লালপ্রবালের খুব বড় বাড়ীর সামনে বেড়াচ্ছে এক আশ্চর্য্য সুন্দরী কন্যা মদনকুমারের হাত ধ'রে। মদনকুমারকে যেদিকে সে ফেরাচ্চে—সেইদিকেই ফিরছে। মধুমালা চিনতে পারলে—সেই রূপসী কন্যাই রক্তমুখী রাক্ষসী। তাদের একেবারে সুমুখে গিয়ে উপস্থিত হোলো মধুমালা। রক্তমুখী তা'কে দেখেই মদনকুমারের হাত ছেড়ে দিয়ে তা'র দিকে চেয়ে হেসে বললে: "এসেছ তুমি অজানা কুমার? জানি—একদিন আসবে তুমি। এসো ঘরে যাই। তোমার আদর-অভ্যর্থনা করিগে—চলো।"

মুখী মধুমালাকে খুব যত্ন ক'রে খাওয়াবার পর শোবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে বললে, "কুমার, আজ আর রাত্রে আমার দেখা পাবে না। কালকে আবার আমি তোমার সঙ্গে মিলবো। রোজই আমাকে কাছে পাবে, কেবল বেস্পতিবার আর শনিবার দিনের বেলায় আমি বাইরে যাই আমার মাসীকে দেখতে বাতাসী বনে, ফিরি গোধূলিতে। তুমি ভেব না কিছু, কোনো ভয়

নেই। যেখানে খুসি বেড়াতে পারো, শুধু পুরীর দক্ষিণদিকে যেয়ো না।"

মধুমালা রাক্ষসীর কথায় একটু দুষ্টহাসি হাসলে। রক্তমুখী সে হাসির মানে না বুঝতে পেরে আহ্লাদে আটখানা হয়ে দেখন-হাসির মতো হাস্‌তে হাস্‌তে বেরিয়ে গেল।

মধুমালা সারারাত আধো-জাগা আধো-তন্দ্রায় কাটিয়ে দিলে। সকাল হ'তে হঠাৎ শুন্‌তে পেলে—কে যেন কাঁদছে। কান্নার স্বরে মনে হোলো কোনো মেয়ের গলা। সেই স্বর লক্ষ্য করে মধুমালা ছুটে চল্‌লো, গিয়ে ছাখে—সেই রূপসী কন্যা একটা গাছের তলায় আঁচল এলিয়ে দিয়ে মাথার চুল ছিঁড়্‌তে ছিঁড়্‌তে কাঁদ্‌ছে। মধুমালা জিজ্ঞেস কর্‌লে, "কাঁদচো কেন?" সে বল্‌লে: "ওগো কুমার, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে। কালকে আমার সঙ্গে যে রাজকুমারকে দেখেছিলে—সে আমায় ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেছে। এখন আমি থাকবো কা'কে নিয়ে? আমি সতী মেয়ে—পতিবিহনে আমার এ পুরী ফাঁকা। তুমি যদি না আমাকে বিয়ে করে বাঁচাও, তবে আমি এইখানে ব'সে না খেয়ে না দেয়ে কেঁদে কেঁদে ম'রে যাবো।" মধুমালা কপট দুঃখ দেখিয়ে তাকে বল্‌লে: "তোমাকে আমি তিন দিন তিন রাত্রি পরে বিয়ে করতে পারি, এই ক'দিন আমার একটা বাধা আছে।" সঙ্গে সঙ্গে রক্তমুখীর শোক কোথায় চ'লে গেল, হাসিতে খুসীতে একেবারে গড়িয়ে পড়লো। শেষে কইলে: "যা বলো তাই। ভালোই হোলো। কাল বেস্পতিবার, আমার মাসী বাতাসীকে নেমন্তন্ন করে আস্‌বো, শনিবারের শেষ রাতে আমাদের বিয়ে হবে।"

মধুমালার সন্দেহ হোলো...মদনকুমারকে খুঁজে খুঁজে কোথাও দেখতে পেলে না। তখন বুঝতে বাকি রইলো না—রাত্রেই তা'কে রক্তমুখী রাক্ষসী খেয়ে ফেলেছে। পরের দিন বৃহস্পতিবারের জন্যে সে অপেক্ষা ক'রে রইলো। রাক্ষসী নিয়মমতো সেই পুরীর বাইরে যখন চর্‌তে গেল, তখন মধুমালা 'জয়পত্র' তলোয়ার আর তীর-ধনুক নিয়ে চল্‌লো দক্ষিণ দিকে—যেখানে রক্তের নদী আর হাড়ের পাহাড় আছে। অনেক কষ্টে মধুমালা সেখানে গিয়ে দেখতে পেলে—রক্তনদী আর হাড়ের পাহাড়ের মাঝখানটিতে একটা বিরাট মাটির ঢিপির মতো অজগর সাপ ফোঁস ফোঁস ক'রে ঘুমোচ্চে, আর রোদ্দুরে তা'র মাথার মণির আলো যেন চারদিকে ঠিক্‌রে পড়ছে। মধুমালা তাক্ ক'রে পিছন দিক থেকে অজগরকে 'জয়পত্র'-তলোয়ার দিয়ে মারলে এক কোপ। মস্তবড় ফণাটা কেটে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো,—আর রক্ত ছুটলো ফিনিক্ দিয়ে। মধুমালা বুদ্ধি ক'রে একটা বড় গামলা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল, গামলাটা পেতে দিলে রক্তের মুখে। তবু দু'চার ফোটা রক্ত মাটিতে পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার অজগর ফণা তুলে গর্জ্জন ক'রে উঠলো। মধুমালা ভয় না পেয়ে মরীয়া হ'য়ে তীরের পর তীর ছুঁড়তে লাগলো। অনেক মোলো—আবার অনেক জাগলো। তখন মধুমালা কর্‌লে কি: সেই তলোয়ার হাতে নিয়ে ডাইনে কেটে বাঁয়ে মুছ্‌লো, বাঁয়ে কেটে ডাইনে মুছলো। এই সময়ে মধুমালা শুন্‌লে একটা বিকট গোঁ গোঁ আওয়াজ এগিয়ে আস্‌ছে! দেখলে: সেই রক্তমুখী রাক্ষসী নিজমূর্ত্তি ধরে তার দিকে ছুটছে আর চেঁচাচ্ছে:

'ওরে তোর মুণ্ডু চিবুই কড়মড়িয়ে—
আ'মার পেটের ভেতর মর্‌বি রে তুই ধড়ফড়িয়ে—
তোর ঘাড় মুটকে রক্ত শুষে নোবো আ'মি—
হাতের মুঠোয় পেলে রে তোর জারিজুরি দোবো ভাঙি'...

মধুমালার নাগালের মধ্যে রাক্ষসীটা এসে পড়ে পড়ে—তখন শেষ অজগরটাকে সে মেরে ফেললে। অজগরের বংশ ধ্বংস হোলো—রাক্ষসীর গোঙানিও থাম্‌লো, যেখানে ছিল সেইখানেই সে ধড়াস করে পড়লো আর মোলো। তারপরে মধুমালা হাতে তুলে নিলে অজগরের মাথার সূর্য্যের মতো জ্বলন্ত মণিটা—

সেই সাপের মাথার মণি পেয়ে আনন্দে আত্মহারা মধুমালা রাক্ষসীর রক্তপুরীতে গিয়ে খুঁজতে লাগলো কোথায় হাড় জড়ো করা আছে। অনেক সন্ধান করে শেষকালে দেখতে পেলে একটা মস্তবড় চৌবাচ্ছায় অনেক হাড় জমে রয়েছে। মধুমালা তখুনি সেই মণি ছুঁইয়ে দিলে সেই সমস্ত হাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে খটাখট হাড়গুলো জোড়া লেগে গেল—আবার একবার মণি ছোঁয়াতেই সেই হাড়ে লাগলো মাংস, আর একবার ছোঁয়াতে একে একে প্রাণ পেয়ে সমস্ত রাজকুমার দাঁড়িয়ে উঠলো। মদন-কুমার আর অন্য সকলে পুরুষবেশী মধুমালার সাহস ও বুদ্ধির গুণ-গান করতে লাগলো। তারপর মদনকুমার আর আর রাজকুমারদের তা'র রাজ্যে যাবার জন্যে নিমন্ত্রণ জানালে। সকলে মহানন্দে মদন-কুমারের নিমন্ত্রণ মাথায় পেতে নিলে। তারা মধুমালাকে ছাড়তে চাইলে না, তাই বাধ্য হয়ে তা:কেও তাদের সঙ্গে আস্‌তে হোলো।

(৬)

মদনকুমার শত বন্ধু নিয়ে বহুদিন পরে দেশে ফিরে আস্‌তে উজানিনগরে লাগলো উৎসবের খুব ধূমধাম। দিকে দিকে জাগলো হাসি-উল্লাসের বান। মদনকুমার রাণীমহলে গিয়ে চন্দ্রকলার গলায় দুলিয়ে দিলে প্রবালের মালা, মাথার খোঁপায় পরিয়ে দিলে শুকতারার মতো বড় হীরে-বসানো সোনার ফুল। চন্দ্রকলার আনন্দ আর ধরে না, বললে: "তোমার বাণিজ্য থেকে ফির্‌তে এতো দেরী হোলো যে...অনেক দূরদেশে গিয়েছিলে বুঝি?" মদনকুমার সত্য কথা বলবে কি বলবে না—একবার ভাবলে, কিন্তু কোনো কথা না লুকিয়ে ব'লে ফেললে: "আগেরই মতন পথে বিপদ্ ঘটেছিল। এক রাক্ষসীর মায়া-শিকলে বাঁধা পড়ে-ছিলুম, প্রাণও গিয়েছিল..."

চন্দ্রকলা চম্‌কে উঠে বল্‌লে: "কি করে উদ্ধার পেলে? প্রাণ-দান দিলে কে?"

মদনকুমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে এক অজানা অতি তরুণ রাজকুমারের সকল বৃত্তান্ত বলে গেল, শুধু তার পরিচয় দিতে পার্‌লে না। "যখনি আমি বারে বারে বিপদে পড়েছি, তখনি দেখেছি একজন না একজন তরুণ রাজকুমার এসে কেবল আমাকেই রক্ষা করে নি—যে সমস্ত রাজকুমার আমার মতো বিপদে পড়েছিল—তাদেরও বাঁচিয়ে দিয়েছে। এমনি অদ্ভুত রাজকুমার। যেমন তার ভরসা তেমনি তার বুদ্ধি, তেমনি তার

...। একই রাজকুমার নানাবেশে এসে আমাদের উদ্ধার করেছে কি-না, জানি না। কোনোবারেই কোনো নাম-ধামের খবর পাই নি।"

চন্দ্রকলা তখন উৎসুক হ'য়ে তাকে দেখবার ইচ্ছা জানালে।

রাজকুমার-বেশী মধুমালার পড়লো ডাক রাজপ্রাসাদের অন্দর মহলে। চন্দ্রকলা মধুমালাকে অনেকক্ষণ লক্ষ্য করে চিনতে পারলে—এই সেই রাজকুমার, যে তাদের বাঁচিয়েছে নীল দৈত্যের শক্ত মুঠি থেকে। তখন আর কি সে স্থির থাকতে পারে, তাকে সখী বলে গলা জড়িয়ে ধরলে। মধুমালা তার হাত সরিয়ে দিয়ে ব'লে উঠলো: "করো কি চন্দ্রকলা! তোমার স্বামী যে রাগ করবে।"

চন্দ্রকলা মধুর হাসি হেসে উত্তর দিলে: রাগের কোনো কাজ তো করিনি। তুমি আমায় স্বামী দিয়েছ, তুমি আমার স্বামীর প্রাণ বাঁচিয়েছ—তোমার চেয়ে আপনার কে আছে? তুমি নিজের জন্যে কিছু করো নি—তুমি কত বড়। তোমার কি তুলনা আছে? তোমার দেনা সারাজীবনে শোধ করবার নয়।"

মধুমালার চোখে জল ভ'রে এলো, আজ তারি প্রাণাধিক ধনের হাতে প্রাণ সঁপে দিয়ে সে নিজে সেজে রয়েছে ভিখারিণী। কিন্তু মন দুর্ব্বল করবার এ সময় নয়, পাছে এতদিন পরে সব পণ্ড হয়—এই ভয়ে সে মুখে হাসি টেনে এনে কান্না চাপলে। কিছুক্ষণ ধ'রে এ কথা সে কথা কইবার পর মধুমালা বিদায় নিলে।

মদনকুমার এদিকে রাজকুমারদের নিয়ে এক সভা ডাকলে, সেই সভায় রাজপুত্র-বেশে মধুমালাও এসে বসলো। এ-সভা তারি সম্মানে। সকলে মিলে হেঁকে উঠলো: "যে বীরকুমার কত কষ্ট ক'রে আমাদের মরণের মুখ থেকে ছিনিয়ে এনে আবার নতুন জীবনের পারে পৌঁছে দিয়েছেন—তিনি বয়সে ছোট হ'লেও, তাঁ'র কাছে আমরা মাথা নোয়াচ্ছি। হাজার সুখ্যাতিতেও তাঁ'র মহা উপকারের কথা ব'লে শেষ করা যায় না। এতো বিপদ, এতো কষ্ট পরের জন্যে কে মাথা পেতে নেয়?"

এই কথা শুনে মধুমালা কইলে: "এ আর এমন কি কষ্টের কাজ! এক রাজকন্যা তা'র স্বামীর মঙ্গলের জন্যে সমস্ত সুখ বলি দিয়ে, তারপর কত কষ্ট স'য়ে বিপদের মুখ থেকে স্বামীকে বার বার ফিরিয়ে এনেছে, সে কথা যদি শোনেন আপনারা—তা'হলে সকলকে আশ্চর্য্য হ'য়ে যেতে হবে। সে কষ্টের তুলনা মেলে না এই পৃথিবীতে।" তখন মধুমালার কথায়, রাজপুত্রেরা অনুরোধ ক'রে বসলো, 'সেই রাজকন্যার গল্প শোনাতেই হবে'।

মধুমালা কইলে: "বলতে পারি সে-কথা, তবে আমার একটা সর্ত্ত আছে। আমি গল্প শুরু করলে—কেউ যদি মাঝখানে বাধা দেয়, তা'হ'লে আর আমি কথাও বলবো না, তা'র সঙ্গে আমার আর এ জন্মে দেখাও হবে না।" তখন সকলে প্রতিজ্ঞা করলে যে—মাথা নেড়ে সায় দেওয়া ছাড়া তা'রা কোনো শব্দ করবে না।

মধুমালা আরম্ভ করলে তা'র কথা।...

...গোপন করে মধুমালা নামের পরিচয়।
পরের ছায়া বলতে দিয়ে আপের কথা কয়।
খাট-পালঙ্ক বদল হোলো—কয় সে কথার ছলে।
স্বয়ংবরের, বনবাসের কাহিনী যে বলে।
রাজপুত্র অন্ধ হোলো কি ক'রে—জানায়:
রাজকন্যা স্বামী ছাড়ি দেশ-বিদেশে যায়।
ভিনদেশী এক রাজকুমারের হাতে পড়ে বাঁধা।
কেমন ক'রে মুক্তি পেলো কইলে—সে এক ধাঁধা।
রাজকন্যা খবর পেয়ে পরীর মুলুক চলে—
বাঁচায়ে আনিতে তা'র স্বামীরে কৌশলে।—

এই কথা যেই শোনা—অমনি মদনকুমার চেঁচিয়ে উঠলো, বললে: "থামো-থামো! বন থেকে পরীর মুলুকে আমি কেমন ক'রে গেলুম—সেই বৃত্তান্ত জানো না তুমি। আমি বলছি—শোনো।" মদনকুমার কথার মাঝে কথা তুলতে মধুমালা সভার সকলকে সাক্ষী ক'রে কইলে: "আমার কথা এইখানে শেষ। আমার সঙ্গে তোমাদের দেখা-সাক্ষাৎ—তারো শেষ।" এই ব'লে মধুমালা সভা ছেড়ে যায়—তখন মদনকুমার তা'র পথ আটকে অনুনয় করে: "কুমার, যেয়ো না। ব'লে যাও আমার রাজকন্যার শেষ কথা।" মধুমালা শান্ত সুরে বললে: "সেই কন্যার শেষ কথা এখনো তৈরী হয় নি। আমাকে যেতে দাও।" মদনকুমারের মনের মণিকোঠায় যে মধুমালার কথা লুকিয়েছিল, আবার তা' একে একে সমস্তই তা'র চোখের সামনে ভেসে উঠলো। বহুদিন পরে ফিরেবার সে পাগলের মতো—'হায় মধুমালা, হায় মধুমালা' ব'লে হা-হুতাশ করতে লাগলো। মদনকুমারের দুঃখ চোখে দেখেও মধুমালা পরিচয় দিলে না, কেননা, তখনো বারো বৎসর পূর্ণ হয় নি—আরো ছ'-মাস বাকি। মধুমালা আর কোনো কথা না ক'য়ে জলভরা চোখে সেখান থেকে বিদায় নিলে।—

•

মধুমালা তা'র কুটীরে ফিরে এসে ডোমনীর সাজে সাজলো। মাথায় বাঁধলে উবু খোঁপা—তা'তে পরিয়ে দিলে রঙন ফুল—চোখে আঁকলে কাজল, গলায় দুলিয়ে দিলে নাগদন্তের হার—দুই কানে ঝোলালে রঙীন কড়ি—কপালে আঁকলে সূর্য্যমুখী টিপ—পরলে নীলাম্বরী, বাঁধলে গাছ-কোমর ক'রে—দু'হাতে পরলে আস্ত শাঁখের শাঁখা, বাজুর মতো ক'রে অপরাজিতার লতা জড়িয়ে নিলে ওপর-হাতে সাপের আকারে—ব'সে ব'সে তৈরী করলে বেতের ঝাঁপি আর তালপাতার বুননি হাতপাখা। বেতের বুননের সঙ্গে এমন ভাবে ময়ূরের পাখা মিলিয়ে দিলে—ঝাঁপি যখন তৈরী হোলো, তখন দু'টি মুখ তাতে ফুটে বেরুলো—মদনকুমার আর মধুমালা—তা'র নাম দিলে থারী। আর তাল-পাতার পাখার গায়ে মহুয়া-ফুলের রঙ দিয়ে আঁকলে ছবি—একটিতে মধুমালার, আর একটিতে মদনকুমারের। তা'র নাম দিলে বিউনি। শেষবেশ আঁকলে একটা ফুলকরী পাথরে মধুমালা-মদনকুমারের চিত্র। ডোমনী সেজে বেতের ঝাঁপি, ময়ূর তোলা চিত্র-করা পাখা আর ফুলকরী পাথর বেচবার ছলে মধুমালা তা'র বাপের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হোলো। সে সোজা চ'লে গেলো মেয়েমহলে। সেখানে তা'র মা-র সঙ্গে দেখা ক'রে বললে: "রাণী-মা, কিনবে আমার হাতের তৈরী থারী-বিউনি?"

রাণী বল্লেন : "কই দেখি ডোমের মেয়ে।"

মধুমালা থারী-বিউনি মেলে ধর্‌লে। রাণী সেই বেতের ঝাঁপিতে দেখেন কা'র মুখ আঁকা—যেন খুব চেনা-চেনা, আবার দেখেন তাল-পাখায় সেই একই মুখ আঁকা রয়েছে। রাণী ভালো ক'রে দেখতেই চিন্‌তে পার্‌লেন—এ মুখ তাঁর হারানো কন্যা মধুমালার মুখ। তখন রাণী কাঁদ্‌তে কাঁদতে কইলেন : "ডোমনী, তুমি এই ছবি পেলে কোথায়?" মধুমালা মায়ের কান্না দেখে ব'লে উঠলো : "মা ঠাকরুণ, কাঁদ্‌চো কেন? আমার থারী-বিউনিতে কি এমন দেখলে—যে জন্যে তোমার এতো দুঃখু?" রাণী তা'র কথায় বল্লেন : "ডোমের মেয়ে, আমার এক কন্যা ছিল—নাম তা'র মধুমালা। তোমার ঝাঁপিতে-পাখাতে তারি মুখের ছবি। পাঁচ ভায়ের আদরের বোন ছিল সে—তা'কে বনবাসে দিয়েছে তা'র বাপ আর ভাই। বারো বছর হোলো—তা'র কোনো খোঁজ-খবর না পেয়ে কেঁদে কেঁদে আমার দিন কাটে।" মধুমালা কইলে : "ইচ্ছে ক'রে চোখের জলে যা'কে বনে বিদায় দিয়েছ, তা'র জন্যে আর কান্না মিছে।" রাণী আর স্থির থাক্‌তে না পেরে ডোমনীকে বুকে জড়িয়ে ধর্‌লেন, বল্‌তে লাগলেন : "মা-গো, তুমি নিশ্চয় মধুমালার খবর জানো। সে কোথায় এখন, কেমন আছে—বলো! নইলে তোমায় ছাড়বো না।" ডোমনী উত্তর দিলে : "আমি তোমার মধুমালাকে জানিও না, চিনিও না। আর বারো বছর যা'কে বনে তাড়িয়ে দিয়েছ, সে কি আজো বেঁচে আছে?"—রাণীর চোখের জল অঝোরে ঝর্‌তে লাগলো। কোনো রকমে কান্না চেপে তিনি বল্লেন : "আমার মেয়ে ঠিক তোমার মতই দেখতে ছিল। তোমাকে চিনি-চিনি ক'রেও যেন চিন্‌তে পার্‌ছি না, তবু তোমাকে যত দেখছি—আমার মন ততই ব্যাকুল হ'য়ে উঠছে। তোমায় ধ'রে রাখতে পার্‌লে—আমি যেন বেঁচে যাই। ডোমনী, তুমি থাকো আমার কাছে। তোমার ঐ মুখ দেখে আমি মধুমালার দুঃখ ভোলবার চেষ্টা করবো।" তখন ডোমনী-সাজা মধুমালা ঝেঁঝ দিয়ে ব'লে উঠলো : "যে মা তা'র মেয়ের খোঁজ নেয় না, যে মা হ'য়ে নিজের মেয়েকে চিন্‌তে পারে না, এমন মায়ের কাছে থেকে কি হবে?"

এই কথা না শুনে রাণী মধুমালাকে বুকে চেপে ধ'রে বার বার বল্‌তে লাগলেন : "তবে তুমিই আমার মধুমালা—আমার হারানো ধন মধুমালা?"

মায়ে-ঝিয়ে তখন চেনাচিনি হ'য়ে গেল। মেয়ে তখন মা-র চোখের জল মুছে দিতে গিয়ে কাঁদে, মা মেয়ের চোখের জল মুছতে গিয়ে কাঁদে।

মা মেয়ের হাত ধ'রে অনেক অনুরোধ করলেন : "মধুমালা, মা আমার, যখন তোমাকে আবার ফিরে পেয়েছি—তখন আর যেতে দোবো না। কত কষ্ট সয়েছ মা, আর কষ্ট সইবে কেন?" মধুমালার চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়লো—কইলে : "মা, যত-দিন না আমার স্বামীর সঙ্গে মিলতে পারছি—ততদিন আমি শান্তি পাবো না। তবে—মা'র কথা ঠেল্‌তে নেই, আমি তোমার কাছে লুকিয়ে কয়েক দিন থাকবো। আমার কথা কাউকে বল্‌তে পাবে না।" তাই হোলো।

তার পর। বারো বৎসর পূর্ণ হ'তে যখন আর তিন দিন বাকী—মধুমালা আবার ডোমনীর বেশ কর্‌লে...বেতের ঝাঁপি, ছবি-তোলা পাখা আর ফুলকরী চিত্র-পাথর সঙ্গে নিলে...তারপর মদনকুমারের রাজপুরীর দিকে রওনা হোলো। যেদিন বারো বছরের শেষ, সেই দিনই মদনকুমারের রাজবাড়ীতে গিয়ে পৌছুলো মধুমালা। সেখানে পৌঁছেই জান্‌তে পার্‌লে যে—ছ' মাস হোলো মদনকুমার কেমন উদাস হ'য়ে গেছে, তার কোনো কাজে—কোনো আমোদ-প্রমোদে—খাওয়া-দাওয়ার পর্যান্ত মতি নেই—আজ সাত দিন ধ'রে রাজপুত্র অন্ন-জল ছেড়ে জোড়-মন্দির ঘরের কপাট বন্ধ ক'রে ব'সে রয়েছে! সকলের মন উতলা—মা কাঁদেন, চন্দ্রকলা কাঁদে, মন্ত্রী, পাত্র মিত্র দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেন, রাজ্যের প্রজা হা-হুতাশ করে। তবু কোনো ফল হয়নি! তখন মধুমালা চন্দ্রকলার মহলে যেতে চাইতে তাকে সেই মহলে নিয়ে যাওয়া হোলো। মধুমালা চন্দ্রকলাকে ডেকে বল্লে : "তোমার পতির অসুখ ভারী...সেই জেনেই তো এসেছি এই পুরীতে।" চন্দ্রকলা ম্লান মুখে কেঁদে ফেলে কইলে : "ডোমনী, হয়তো তুমি জানো গুরুর শেখা অনেক মন্তর-তন্তর। আমার স্বামীর মন ভালো ক'রে দাও, তাঁকে বাঁচাও। এ কথা শুনে মধুমালা ভুরু বেঁকিয়ে বল্লে : "তা' আমি পারি। তন্তর-মন্তর জানি কিছু-কিছু। যদি তোমার পতির মন জিতে নিতে পারি—সে মন কি আমার হবে?" চন্দ্রকলা তার হাত ধ'রে অনুনয় কর্‌লে : "তুমি যা চাও—তাই নাও, ডোমনী! কেবল আমার স্বামীর মন ফেরাও—ওকে আবার সহজ মানুষ ক'রে তোলো।"

মধুমালা যেন জানে না কিছু—এই ভাব দেখিয়ে কইলে : "রাজকুমারের কেন এমন হোলো?" চন্দ্রকলা বল্লে : "আমার স্বামীকে বাঁচিয়েছিল যে অজানা তরুণ রাজপুত্র—সে রাজসভায় ব'সে ছ' মাস আগে কোন্ এক রাজকন্যার গল্প বলে—সেই গল্প শুনেই তাঁর মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে সেইদিন থেকে। কোনো কথা শোনেন না—'মধুমালা' ছাড়া তাঁর মুখে আর অন্য কথা নেই।"

মধুমালা মনে মনে খুব তৃপ্তি পেলে—চোখের কোণে জল ঠেলে উঠলো। কিছু ধরা না দিয়ে চন্দ্রকলাকে বল্লে : "এ রোগের ওষুধ আমার ভালো জানা আছে। জোড়মন্দির ঘরটা আমায় একবার দেখিয়ে দেবে—চলো। তবে—তুমি সেখানে থাক্‌তে পাবে না, তা' হ'লে মন্তরের সব গুণ নষ্ট হ'য়ে যাবে।" চন্দ্রকলা তাতেই রাজি হ'য়ে গেল, মধুমালাকে জোড়মন্দির দেখিয়ে দিয়ে চ'লে এলো।

মধুমালা গিয়ে জোড়মন্দির ঘরের বন্ধ কপাটে হাত দিলে। সতী কন্যার হাত যেমনি লাগা—অমনি কপাট খুলে গেল। তখন মধুমালা মন্দিরে ঢুকে কোনো কথা না ব'লে মদনকুমারের পালঙ্কের ওপর একখানি পাখা রাখলে—তার পাশে রাখলে ফুলকরী পাথরটা, বেতের ঝাঁপি রেখে দিলে এমন এক জায়গায়, মদনকুমারের যে দিকে চোখ পড়বে।

মদনকুমার চোখ বুজে মাথা নীচু ক'রে শুয়েছিল।

মধুমালা ডাকলে: "রাজকুমার!"

সাড়া এলো না।

আবার ডাকলে: "মদনকুমার!"

তবু সাড়া নেই।

আবার গলায় দরদ ঢেলে ডাকলে: "মধুমালার মদনকুমার!"

এবার মদনকুমার চোখ ফিরিয়ে চাইলে, তাকে দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে বললে:

এ নাম শোনালে কে তুমি—সাধু ডোমের নারী? এখানে কি কারণে এসেছ? কোথায় তোমার বাড়ী?"

মধুমালা উত্তর দিলে:—

"কাঞ্চননগরে ঘর, মদন ডোমের নারী আমি—
মদন ডোমের নারী।
খারী-বিউনি ফেরি ক'রে দেশে দেশে ফির আমি
ফিরি বাড়ী বাড়ী।"

তখন মদনকুমার কইলে:

নানান্ দেশে ফেরো তুমি ডোমনী পসারিণী—
তুমি শোনাও মধু-নাম।
কন্যা মধুমালার কথা এসেছ কি শুনি—
বলো কোথায় সে কোন্ ধাম্?"

মধুমালা বললে:

"জানি নাকো কি কথা কও—কন্যারে না জানি।
কিসের লাগ' হ'লে এমন—ছাড়লে দানাপানি?"

এই কথা বলতে বলতে মধুমালা করলে কি? না—একটা ছবি-তোলা পাখা মদনকুমারের চোখের সামনে তুলে ধরলে। মদনকুমার চোখ মেলে চেয়ে দেখে—পাখার ওপর চিত্র-আঁকা যেন মধুমালার মুখ। এই না দেখে মদনকুমার মেঝের ওপর কেঁদে ব'সে পড়লো—অমনি চোখে প'ড়ে গেল—বেতের ঝাঁপিতে ঐ মধুমালার মুখ। আর ধৈর্য্য ধরতে না পেরে মদনকুমার ব'লে উঠলো: "ও ডোমের নারী, আর চাতুরী কোরো না। আমি প্রাণে মরি। বলো তুমি: এই যে ছাবতে আঁকা কন্যার মতো কাউকে তুমি কি কারোর ঘরে দেখেছ?

সেই কন্যা আমার চোখের কাজল, কন্যা মাথার মাণ।
আমি হারিয়ে তারে মণিহারা, সুখ নাহি আর গণি।"

মধুমালা তবু পরিচয় দেয় না—বলে:

"কেমন তোমার মধুমালা কি বা রূপ তার—
যার লাগিয়া পাগল তুমি সুন্দর কুমার?"

মদনকুমার তপ্ত নিঃশ্বাস ফেলে বললে: "এক যুগ কেটে গেছে—আমি মধুমালাকে হারিয়েছি। তার নাক, মুখ, চোখ আমার মনে যে আবছায়া হ'য়ে এসেছে। তবু মনে করি—এক একবার মনে পড়ে সেই সোনার মধুমালাকে। কিন্তু তোমার চেহারা যেন ঠিক তারি মতন—ঐ তিলফুলের মতো নাক, ঐ কালো হরিণ-চোখ, ঐ লাল কমলের মতো মুখ, ঐ পদ্মের পাপড়ীর মতো ঠোঁট, ঐ বাঁকা ছুরির মতো ভুরু, ঐ মেঘে থাকা বর্ণার মতো চুলের গোছা, ঐ কনকচাঁপার মতো গায়ের রঙ, সবই তোমার মতন। বারো বছর পরে আমি চিনেও যেন চিনতে পারছি না।

স্বপ্নের মতো মধুমালা মনে জেগে আছে।
সুন্দরী গো ডোমের নারী, থাকো আমার কাছে।
তোমার মুখটি দেখে আমার যাইবে আধো দুখ।
তোমায় দেখে পাশরিব মধুমালার মুখ।"

মধুমালা তখন ফুলকরী চিত্র-পাখাটি মদনকুমারের চোখের ওপর তুলে ধ'রে ব'লে উঠলো: "দেখো তো কুমার! চিনতে পারো কি না?"

মদনকুমার লাফিয়ে উঠে বললে: "এ যে মধুমালার ছবি, আমার ছবি—পাশাপাশি দু'জনে। হায় রে—এই মিলনের ছবি কি পাষাণেই আঁকা থাকবে? এ কি আর সত্যি হ'য়ে উঠবে না?"

ছদ্মবেশিনী ডোমনী এই কথা শুনে মুখ টিপে হেসে ব'লে ফেললে—

"স্বামী হ'য়ে চিনতে নারে যে-জন আপন নারী,
তাহার কাছে রইতে আমি কেমন করে পারি।
একবার চোখ তুলে চেয়ে দেখো দেখ—রাজকুমার!"

তা'র কথায় মদনকুমারের চমক ভাঙলো, চোখের ভুল গেল কেটে, তখন ডোমনী-রূপী মধুমালাকে চিনতে পেরে কাছে টেনে নিলে। শুধু দু'টি কথা মুখ থেকে বেরিয়ে এলো: "মধুমালা—তুমি!"

বারো বৎসর পূর্ণ হয়েছে—আর দু'জনের মিলনে বাধা রইলো না। চন্দ্রকলা এ খবর পেয়ে তা'র মহল থেকে ছুটতে ছুটতে এলো।

সেই রাজকুমার যে ছদ্মবেশে মধুমালা জানতে পেলে—তাকে আনন্দে বুকে জড়িয়ে ধরলে। তারপর পায়ের ধুলো নিয়ে বললে: "দিদি, স্বামীর মুখ চেয়ে অনেক দুঃখ সয়েছ! এসো—এবার স্বামীর পাশে, সিংহাসনে বোসো, আমি তোমাদের দু'জনকে সেবা ক'রে সুখী হই।"

মধুমালা চন্দ্রকলাকে বুকে ধ'রে বললে: "তা' কি হয়? আমরা দু'বোনে স্বামী-সুখে গরবিনী থাকবো, আমরা দু' বোনে একই সিংহাসনে এক সঙ্গে একপ্রাণ একমন হ'য়ে পাশাপাশি বসবো।

আবার রাজপুরীতে আনন্দ ফিরে এলো। উজানিনগরে সুখের উজান বইতে লাগলো।

কিন্তু স্বামী-সুখ মধুমালার কপালে বিধাতাপুরুষ লিখে দেন নি।

মধুমালাকে মদনকুমার কবে, কোথায় বিয়ে করেছিল—তা' রাজ্যের কেউ জানে না। শুধু শুনেছে তা'র নাম—শুনেছে স্বপ্ন-দেখা কন্যা। আজ সেই অলীক-কন্যা সত্য হ'য়ে উঠলো কি ক'রে? যদিই বা হয়—বারো বৎসর সে ঘর-ছাড়া। অনেকের মনে সন্দেহ জাগলো। রাজ্যের পাকা পাকা মাতব্বর

মাথা ঘেমে উঠলো। সকলে বল্লে: "মধুমালা যদি সত্যিই সতী হয়—তা হ'লে তা'র পরীক্ষা হোক।" মদনকুমারের কোন কথা টিক্‌লো না। মধুমালা কইলে: "আমি সতী কি অসতী—তা'র প্রমাণ আমি দোবো রাজ্যের লোকের সামনে। কিন্তু পরীক্ষা দেবার পর আমি চিরদিনের জন্যে বিদায় নোবো।" মদনকুমার অস্থির হ'য়ে উঠলো, চন্দ্রকলা কাঁদতে লাগলো। তবু রাজ্যের যারা মাথা—তাদের ঠেকায় কে? সব গর্জ্জে উঠলো: "পরীক্ষা চাই—নইলে ও কন্যার ঠাঁই নেই এ রাজ্যে।" তাদের সঙ্গে প্রজারাও হেঁকে উঠলো: "হ্যাঁ—চাই পরীক্ষা, নইলে ও কন্যা থাক্‌লে এ রাজ্যে আমরা থাক্‌বো না।" অগত্যা মধুমালাকে পরীক্ষা দিতেই হোলো।

এদিকে ইন্দ্রপুরীর দুই কন্যার টনক নড়ে উঠলো। মেঝো বোন জিজ্ঞেস করলে বড়-কে: "দিদি, বারো বছর তো শেষ হ'য়ে গেছে...এখন তো মধুমালার দুঃখের দিন কেটেছে। চলো, আমরা তা'র সুখের দিন দেখে আসি।"

বড় বোন বল্লে: "ইন্দ্রলোকের কন্যা কি কখনো মর্ত্ত্যে গিয়ে সুখ পায়? স্বর্গ থেকে বিদায়-অভিশাপের বোঝা তা'কে মানুষ হ'য়ে সারা জীবন ব'য়ে বেড়াতে হয়।"

মেঝো বোন তখন করুণ স্বরে বল্লে: "এমন সতী মেয়ের মর্ত্ত্যে কোনো আদর নেই? সে কোনো সুখ পায় না?" বড় বোন ব'লে উঠলো: "পায় কি না পায়—দেখবি চল্। মানুষের দৃষ্টি ছোট—মনে সন্দেহের বিষ...তাই মধুমালা সতী না অসতী—লোকে এবার তা'র পরীক্ষা নেবে।" মেঝো বোন রেগে গেল—কইলে: "এমন সতী সুন্দরীকেও চিন্‌লে না পৃথিবীর লোক? তা'র অভিশাপের দিন তো ফুরিয়েছে...চলো—আমরা আকাশ-রথ নিয়ে যাই, তা'কে আবার ফিরিয়ে আনি স্বর্গলোকে।" বড় বোন রাজি হ'তে—তখন মন্দার-ফুলে রথ সাজিয়ে শঙ্খ দিয়ে উড়ে চল্লো ইন্দ্রপুরীর দুই কন্যা।

মস্ত বড় পরীক্ষা-সভা...রাজ্যের লোকের ভিড়।

মধুমালা এলো...তার রূপের আলোয় সকলের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। ভিড়ের মধ্যে উঠলো গুণ গুণ রব।

মদনকুমার চন্দ্রকলাকে বামে নিয়ে সিংহাসনে এসে বস্‌লো।

পরীক্ষা আরম্ভ হোলো।

বড় মন্ত্রী উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে ব'লে উঠলো: "প্রথম পরীক্ষা হবে এই—আমাদের এই রাজ্যের রাজা আর রাজমালী গাছ হ'য়ে আছে...মধুমালা সতীকন্যা যদি হয়—সে তাদের আবার মানুষ ক'রে তুলুক্।"

তখন মধুমালা সেই দুই গাছে দৈত্যপুরীর আগুন-পাথর ছোঁয়াতে রাজা আর মালী মানুষ হ'য়ে দাঁড়িয়ে উঠলো। চারদিকে হৈ হৈ প'ড়ে গেল। সকলে বল্লে: "ধন্য—ধন্য। আর পরীক্ষা চাই না।" কিন্তু পাকা মাথাগুলো নড়ে' উঠলো। হেঁকে বল্লে: "আরো পরীক্ষা বাকি আছে।"

মধুমালা সকলকে লক্ষ্য ক'রে কইলে: "আমি সব পরীক্ষাই দিতে চাই। কারোর মনে কোনো সন্দেহ রাখবো না। কতদিন কত দুঃখ, কত বিপদ্, কত কঠিন পরীক্ষার মধ্যে প'ড়ে আমার স্বামীকে প্রতি ধাপে ধাপে ধরা না দিয়ে ধ্বংসের মুখ থেকে বাঁচিয়েছি। কে রাখে খোঁজ তার? কায়-মনে আমি সতী—এই সত্যটা সকলকে বুঝিয়ে দিয়ে—আমি স্বামীর কাছ থেকে শেষ বিদায় নোবো।"

তারপরে হোলো তুলা-পরীক্ষা। একটা বড় দাঁড়িপাল্লার একদিকে রাখা হোলো এক টুকরো তুলো—আর একদিকে বস্‌লো মধুমালা। মধুমালা যদি সতী কন্যা হয়—তবে ওজন হবে সমান। তাই হোলো। মধুমালার জয় জয়কার প'ড়ে গেল এবার শেষ পরীক্ষা।

মধুমালার অগ্নিপরীক্ষা আরম্ভ হোলো। আগুনের কুণ্ডের মধ্যে মধুমালা ঝাঁপ দিলে।

ইন্দ্রপুরীর দুইকন্যা সকলের চোখের আড়ালে অদৃশ্য হ'য়ে অপেক্ষা করছিল। তা'রা আর থাক্‌তে পার্‌লে না। মন্দার-রথ নিয়ে আগুনের মধ্যে এগিয়ে গেল। তখন সকলে দেখতে পেলে আগুনের কুণ্ড থেকে একটা রথ শূন্যের দিকে উঠছে। সেই আলো-ঝল্‌মল্ রথে তিনটি অপরূপ সুন্দরী কন্যা। সকলে অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইলো।

মদনকুমার ধৈর্য্য হারিয়ে সিংহাসন থেকে লাফিয়ে পড়লো ছুটে গিয়ে ধর্‌লো চেপে মধুমালার উড়ে-পড়া শাড়ীর আঁচল, বল্লে কেঁদে, "মধুমালা, আমি তোমায় প্রাণ থাক্‌তে যেতে দোবো না।"

রথ থাম্‌লো। মধুমালা বল্‌লে, "রাজকুমার, তুমি আমার মর্ত্ত্যের স্বামী—স্বামীর কথা ঠেল্‌লে কোনো মেয়ে সতী-নামে গৌরব পায় না। কিন্তু আমার অভিশাপ কেটে গেছে, ইন্দ্রপুরীর কন্যা আমি, মর্ত্ত্যে তো আর থাক্‌তে পারি না। তবে দিনে আস্‌বো তোমার কাছে—রাতে নোবো বিদায়। তুমি রাজকন্যা চন্দ্রকলাকে নিয়ে সুখে রাজ্য-ভোগ করো।"

ইন্দ্রপুরীর মন্দার-রথ উঠলো শূন্য থেকে শূন্যে—শেষে মিলিয়ে গেল দূর আকাশের নীলে। মধুমালা যেন একটা স্বর্গের ছবি দেখিয়ে হঠাৎ নিভে গেল।

রাজ্য জুড়ে আবার উঠলো উৎসবের কলরোল। সতী-নামে মধুমালার মন্দির তৈরী হোলো—কেউ তা'কে আর ভুলতে পারবে না। মধুর স্মৃতির মতো মধুমালা সকলের মন ছেয়ে রইলো।

*

দেবলোকের দুর্ল্লভ সে কন্যা মধুমালা—
সে যে মর্ত্ত্যের কামনা।
সেই আকাঙ্ক্ষা দিয়ে ভুবন সাজায় বরণ-ডালা—
সে যে কাব্যের সুমনা॥

—সমাপ্ত—

শ্রীবোধায়ন-কবিকৃত ভগবদজ্জুকীয়

[প্রহসন : পূর্ব্বানুবৃত্তি]

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

(৫)

(মাতা ও চেটীর প্রবেশ)

চেটী। আসুন, আসুন, মা!

মাতা। কোথায়, কোথায় আমার মেয়ে?

চেটী। এই যে অজ্জুকা বাগানে সাপে কামড়ে প'ড়ে রয়েছেন!

মা। হায়! মলাম হতভাগিনী আমি!

চে। শান্ত হোন—শান্ত হোন, মা! এই যে অজ্জুকা সুস্থ হ'য়ে উঠেছেন।

মা। আগের মত স্বাভাবিক ত? (নিকটে যাইয়া) বাছা বসন্তসেনা! এ কি (ব্যাপার)?

গণিকা। বৃষলবৃদ্ধে। স্পর্শ করিস্ নি।

মা। হা ধিক! এ কি (ব্যাপার)!

চে। এঁর বিষবেগ খুব চড়েছে।

মা। শীগ্‌গির ব'—বৈদ্য নিয়ে আয়।

চে। মা! তাই করি [নিষ্ক্রান্তা]

[রামিলক ও অন্য চেটীর প্রবেশ]

চে। আসুন, আসুন জামাই বাবু! জামাই বাবুর অপেক্ষায় থেকে অজ্জুকা বড় কষ্ট পাচ্ছেন।

রামিলক। মধুপব্রত আমি বিকশিত কোমল কমলের মত এই বিশালাক্ষীর কোমলমধুর বাক্যযুক্ত বদন পান করতে ইচ্ছা করি।

[নিকটে যাইয়া]

এ কি! আমাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে রইল!

সুন্দরগাত্রি! তরঙ্গদ্বারা পর্য্যাবর্ত্তিত অরবিন্দের ন্যায় তোমার এই মুখারবিন্দ ঈষৎ ফিরাও। পাণিপুটে অল্প অল্প পীত জলের ন্যায় তোমার একাংশ দৃষ্ট বদনও প্রীতি প্রদান করে। [অঞ্চল গ্রহণ]

গণিকা। ওহে তমোময় পুরুষ! আমার বস্ত্রপ্রান্ত ত্যাগ কর।

রামি। [মাতার প্রতি] ভবতি! এ কি (ব্যাপার)?

মা। যখন থেকে সাপে কামড়েছে তখন থেকেই অসম্বন্ধ প্রলাপ বক্‌ছে।

রামি। ওঃ! তাই—

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এর চিত্ত চ'লে গেছে। তার পর বেচারীর শূন্য শরীরে অন্য কোন সত্ত্বযুক্ত প্রাণী বলপূর্ব্বক প্রবেশ করেছে [অর্থাৎ সর্পাঘাতে প্রাণ যাবার পর নিশ্চয়ই ভূত এ বেচারীর নিষ্প্রাণ দেহকে আশ্রয় করেছে।]

[বৈদ্য ও চেটীর প্রবেশ]

চে। আসুন, আসুন, মশায়!

বৈদ্য। কোথায় সে মেয়েটি?

চে। এই যে (দেখছি) অজ্জুকা সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

বৈদ্য। নিশ্চয় মহাসর্পের দ্বারা আক্রান্ত বা খাদিত হয়ে থাকবেন। [মহাসর্প—অলৌকিক শক্তিযুক্ত সর্প।]

চে। আপনি কি করে জান্‌লেন?

বৈ। ভয়ানক বিকার করছে বলে। (বিষ ঝাড়াবার) সব উপকরণ নিয়ে এস—যাতে বিষ ঝাড়াবার ক্রিয়া আরম্ভ করতে পারি।

[বসিয়া মণ্ডল অঙ্কন] *

কুণ্ডল কুটিল গামিনি! মণ্ডলে প্রবেশ কর—মণ্ডলে! বাসুকি পুত্র! দাঁড়াও দাঁড়াও। শূ-শূ! আচ্ছা এবার শিরাবেধ করি। কোথায় কুঠারিকা?

গণিকা। মূর্খ বৈদ্য! (বৃথা) পরিশ্রমে কি ফল।

বৈদ্য। আরে! পিত্তও যে আছে (দেখছি)। এই তোমার পিত্ত বায়ু শ্লেষ্মা সব নাশ করছি।

রামিলক। যত্ন করুন। আমরা ত অকৃতজ্ঞ নই।

বৈদ্য। সুন্দরগুলিকা সর্পবৈদ্যকে নিয়ে আসি। [নিষ্ক্রান্ত]+

[যমপুরুষের প্রবেশ]

যমপুরুষ। ওঃ। যমকর্ত্তৃক ভর্ৎসিত হয়েছি এই বলে—'এ ত সে বসন্তসেনা নয়—(একে) শীঘ্র তথায় নিয়ে যাও। অন্য যে বসন্তসেনা সেই ক্ষীণায়ু—তাকে এখানে নিয়ে এস।'

যতক্ষণে এর শরীরে আগুন দেওয়া না হয়, তার আগেই একে সপ্রাণ করে দিই। [দেখিয়া] আরে! এ যে (দেখি) উঠেছে! ওহো! এ কি (ব্যাপার)!

*মণ্ডল – সর্প উচ্চাটনের উপযোগী বিষতন্ত্রোক্ত যন্ত্র। টীকাকার সাঙ্কেতিক ভাষায় সর্পোচ্চাটনের একটি মন্ত্র এস্থলে দিয়াছেন—'শিখিপুরপুট যুক্ত ভাবযুক্তং চ নাম। কুরুকুল ইতি মন্ত্রং স্বাহয়া কোণষট্‌কে। প্লবনপুরপরীতং দক্ষিণং বায়ুবীজং জয়বিজয়পরীতং পন্নগোচ্চাটনায়" কোথা হইতে এই মন্ত্রটি উদ্ধৃত করিয়াছেন সে গ্রন্থের নাম টীকাকার দেন নাই। ইহার অর্থোদ্ধারও আমাদের সাধ্যে কুলাইল না। টীকাকার বলিয়াছেন—বৈদ্য যন্ত্র আঁকিয়া তাহার নিকটে একটি পদ্মও আঁকিলেন—ঐ পদ্মের মধ্যে নাগযক্ষিণীর মূর্ত্তি আঁকা হইল। উহাতে নাগযক্ষিণীর আবাহন বৈদ্য করিতেছেন—হে কুণ্ডলাকারে কুটিলগতিতে গমন কারিণি! মণ্ডলে প্রবেশ কর। নাগযক্ষিণী মাথা তুলিয়াছেন দেখিয়া ভস্মনিক্ষেপে তাহার বিষ দূর করিবার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—বাসুকিপুত্র! স্থির থাক। সাধারণ একটি সর্পকেও বাসুকিপুত্র বলার উদ্দেশ্য তাহাকে সন্তুষ্ট করা। শূ শূ—ভস্ম প্রক্ষেপ করার মাঝে মাঝে মুখে হাওয়া টানার শব্দ, উহাতে যেন বিষ সাম্য হইতেছে এই ভাব। এ প্রক্রিয়ায় বিষ প্রশমন না হওয়ায় শিরাবেধ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন।

+ এই বাক্যটী দুর্ব্বোধ্য। মূলে আছে—"সুন্দরগুলিঅং বালবেজ্জং আণে মি'। উহার সংস্কৃত রূপান্তর—সুন্দরগুলিকাং ব্যালবৈদ্যমানয়ামি। গুলিকা—ঔষধের বড়ি। ব্যালবৈদ্য সর্পবৈদ্য। হয়ত এরূপ অর্থ হইতে পারে—সর্পবৈদ্যের নিকট হইতে সুন্দরগুলিকা নিয়ে আসি।

এই মেয়েটির জীবাত্মা আমার হাতে (অথচ) এই বরাঙ্গনা উঠে পড়েছে ইহলোকে এ অতি আশ্চর্য্য! পৃথিবীতে পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নি। [চারিদিক দেখিয়া]

আঃ! এই পূজনীয় যোগী পরিব্রাজক ক্রীড়া করছেন। কি করি এখন? আচ্ছা, বোঝা গেছে। এই গণিকার জীবাত্মা পরিব্রাজকের শরীরে প্রবেশ করিয়ে দিই। পরে কর্ম্ম শেষ হলে যথাস্থানে যোজিত করব। [তথাকরণ]

এই বিপ্রশরীরে এই স্ত্রীপ্রাণ যোজিত হ'ল—প্রায় ইহা সত্ত্ব ও শীলের অনুরূপ বিকার প্রাপ্ত হবে।ꣳ

পরিব্রাজক। [উঠিয়া] পরভৃতিকে! পরভৃতিকে!

শাণ্ডিল্য! ওহো! প্রভুর প্রাণ যে ফিরে এসেছে! ওঃ! বেশ বুঝছি—দুঃখভাগীরা কখনও মরে না!

পরি। কোথায়, কোথায় রামিলক?

রামি। প্রভু! এই যে আমি।

শাণ্ডিল্য। প্রভু! এ কি ব্যাপার। কুণ্ডিকাগ্রহণে অভ্যস্ত আপনার বামহস্ত যেন শঙ্খবলয়পূরিত ব'লে আমার মনে হচ্ছে। ঠিক যেন ভগবানও নন—আবার ঠিক যেন অজ্জুকাও নয়। এ যে 'ভগবদজ্জুকীয়' হয়ে উঠেছে।*

পরি। রামিলক! আমায় আলিঙ্গন কর।

শাণ্ডিল্য। কিংশুক গাছকে আলিঙ্গন কর।

পরি। রামিলক! আমি মত্তা হয়েছি।

শাণ্ডিল্য। না না! তুমি হয়েছ উন্মত্ত।

রামি। প্রভু! সন্ন্যাসাশ্রমের বিরুদ্ধ এইরূপ আলাপ।

পরি। সুরা পান করব।

শা। বিষ পান কর। যাক্ পরিহাসের সীমা কতদূর তাই জানব (এবার)!

পরি। পরভৃতিকে! পরভৃতিকে। আমায় আলিঙ্গন কর।

চেটী। দূর হ'!

মাতা। বাছা! বসন্তসেনে!

পরি। এই যে আমি। মা, প্রণাম।

মাতা। প্রভু! এ কি (ব্যাপার)!

পরি। মা! চিনতে পারেন ত আমায়?

রামিলক। আজ তুমি বড় দেরী করেছ।

রামি। প্রভু! আমি ত স্বাধীন নই।

[বৈদ্যের প্রবেশ]

বৈদ্য। আমি, আমি আটটি নিয়ে এসেছি। ঔষধও এনেছি। ক্ষণে ক্ষণে বাঁচবে মরবে।* [নিকটে যাইয়া] জল-জল!

চেটী। এই যে জল!

বৈদ্য। গুলটা মাড়ি। আরে রে! এ মেয়েকে ত সাপে কাটে নি—একে যে ভূতে পেয়েছে!

গণিকা। মূর্খ বৈদ্য! বৃথাবৃদ্ধ। প্রাণিগণের মরণও বুঝতে পার না। কোন জাতির সাপে একে মেরেছে বল দেখি।

বৈদ্য। এ আর কোন্ আশ্চর্য্য?

গণিকা। শাস্ত্রও আছে না কি? †

বৈদ্য। শত সহস্র আছে।

গণিকা। বল বল, বৈদ্য শাস্ত্র।

বৈদ্য। শুনুন, ঠাকরুণ!—

বাতিক আর পৈত্তিক—আর শ্লে শ্লে আহা হা! পুস্তক—পুস্তক।

শা। অহো! বৈদ্যের কি পাণ্ডিত্য কি মেধা! একেবারে গোড়াতেই ভুলে মেরে দিয়েছে।* যাক্ এত দেখছি—আমারই সখা! এই যে পুঁথি।

বৈদ্য। শুনুন ঠাকরুণ!—

বাতিক, পৈত্তিক আর শ্লৈষ্মিক মহাবিষ—এই তিন জাতির সর্প হয়ে থাকে—চতুর্থ প্রকার পাওয়া যায় না।ꣳ

ꣳ সত্ত্ব—জীবের সারাংশ—বুদ্ধিসত্ত্ব। শীল স্বভাব। বসন্তসেনার প্রাণ সন্ন্যাসীর শরীরে সংক্রান্ত হইল; কিন্তু সন্ন্যাসীর ন্যায় আচরণ না করিয়া এই জীবিত সন্ন্যাসিশরীর বসন্তসেনার বুদ্ধি ও স্বভাবের অনুযায়ী কার্য্য করিবে।

* পরিব্রাজকের বামহস্তে কুণ্ডিকা (তাম্রকুণ্ড বা কমণ্ডলু) থাকিত। কিন্তু এখন তিনি হস্তটি একরূপভাবে উঠাইয়া রাখিয়াছেন যেন মনে হইতেছে তাঁর বামপ্রকোষ্ঠে শঙ্খবলয় ভরা রহিয়াছে। দেহটি পরিব্রাজকের অথচ ভাবভাষা গণিকার—তাই পুরাপুরি পরিব্রাজক (ভগবানও নহেন, আবার পুরাদস্তুর গণিকা (অজ্জুকা)ও নহেন—এ যেন উভয়ের মিশ্রভাব—"ভগবদজ্জুকীয়" [illegible]। ইহিতেই প্রহসনের নামকরণ।

* গুলিকা—গুল, বড়, বিষের প্রতিষেধক—এই বড় আনতেই বৈদ্য গিয়াছিলেন সম্ভবতঃ সাপুরিয়ার বাড়ী। ঔষধ—শঙ্কর পত্রাদি গুলের অনুপান—ইহাই টীকাকারের মত। ক্ষণে ক্ষণে বাঁচবে মরবে—ঔষধ দিলে একবার হয়ত বাঁচিয়া উঠিবার ভাব দেখা যাইবে—ঔষধের শক্তি কমিলে যাইলে অন্তঃস্থ বিষের প্রকোপে পুনরায় মৃত্যুভাব দেখা দিবে। এই কারণে পুনঃ পুনঃ ঔষধ দিতে হইবে—যাহাতে ধীরে ধীরে বিষবেগ নিঃশেষে কাটিয়া যায়। তাই আটটি গুল বৈদ্য আনিয়াছেন। এক আধটিতে সম্পূর্ণ বিষবেগ কাটিবার নয়।

† কোন্ জাতির সর্প তাহা বিষবিক্রিয়াদি দর্শনে অনুমানেও বুঝা যাইতে পারে—আবার শাস্ত্রীয় পরীক্ষা দ্বারাও বুঝা যাইতে পারে। তাই এই প্রশ্ন শাস্ত্রানুসারে সর্প নির্ণয় হইবে নাকি?

* মূলে আছে—'একপদে বীসরিদো'—একপদে বিস্মৃতঃ। এক পদে—শাস্ত্রের প্রারম্ভে; অথবা—পদের একদেশে—একটা পদ বলিতে আরম্ভ করিয়া তাহার একাংশে যে ভুলিয়া যায়—সে ত আমারই বন্ধু জুরদার ইহাই শাণ্ডিল্যের উক্তির তাৎপর্য্য।

ꣳ মূল শ্লোক—

বাতিকাঃ পৈত্তিকাশ্চৈব শ্লৈষ্মিকাশ্চ মহাবিষাঃ।
ত্রীণি সর্পা ভবন্ত্যেতে চতুর্থো নাধিগম্যতে॥

সর্প শব্দ পুংলিঙ্গ অতএব সর্পা পদের বিশেষণ হওয়া উচিত 'ত্রয়ঃ'—'ত্রীণি' বিশেষণে লিঙ্গদোষ হয়; কারণ ত্রীণি পদটি ক্লীবলিঙ্গ। পুংলিঙ্গ পদের বিশেষণ ক্লীবলিঙ্গ—ব্যাকরণের দোষ ত্রয়ঃ সর্পা ভবন্ত্যেতে বলিলেই নির্দোষ হয়।

গণিকা। এত দুষ্ট শব্দ। সর্পাঃ শব্দের বিশেষণ দাও 'ত্রয়ঃ' 'ত্রীণি' যে ক্লীবলিঙ্গ।

বৈদ্য। আরে বাপ! এ নিশ্চয় বৈয়াকরণ সর্পে খেয়েছে!

গণিকা। ক' রকম বিষবেগ।

বৈদ্য। বিষবেগ—শত!

গণিকা। না, না, সাত রকম বিষবেগ। যেমন—রোমাঞ্চ, মুখশোষ, বৈবর্ণ্য, বেপথু, হিক্কা, শ্বাস সম্মোহ—এই সাতপ্রকার বিষবিকার। এই সপ্তবিষবেগ অতিক্রম করে যায় (যে রোগী) তার চিকিৎসা অশ্বিনীকুমার দুজনের দ্বারাও করা সম্ভব নয়। এখন (তোমার) বক্তব্য কিছু থাকে ত বল। ক

বৈদ্য। না, এ আমাদের কর্ম নয়। ঠাকরুণ! নমস্কার। চলি আমি এখন। [নিক্রান্ত]

[যমপুরুষের প্রবেশ]

যমপুরুষ। ওঃ।
এইক্ষণে গর্ভস্রাব পিটক জ্বর কর্ণরোগ, গুল্মপীড়া শূল হৃদয়নেত্র শিরোরোগাদি দ্বারা আর নানাবিধ উপদ্রব দ্বারাও জীবগণের অতি শীঘ্র যমপুরের অভিমুখে নীত হয়ে থাকে।*

যাক্! আমিও প্রভুর নির্দেশ পালন করি।

[গণিকার নিকট যাইয়া]

সন্ন্যাসিন্! শূদ্রার শরীর ত্যাগ করুন।

গণিকা। স্বচ্ছন্দে।

যম পুরুষ। যথাবিধি উভয়ের জীবাত্মার বিনিময় করে নিজের কার্য্য সাধন করি।

[জীব-বিনিময় করিয়া নিষ্ক্রান্ত]

ক. সপ্ত বিষবেগ—(১) রোমাঞ্চ—গায়ে কাঁটা দেওয়া—এই বিষবেগের প্রথম অবস্থা। (২) মুখশোষ—মুখ শুকিয়ে যাওয়া তৃষ্ণা, দাহ। (৩) বৈবর্ণ—ফেকাসে হয়ে যাওয়া। (৪) বেপথু—কম্প (৫) হিক্কা—হেঁচকী। (৬) শ্বাস—নাভিশ্বাস। (৭) সম্মোহ—মূর্চ্ছা, এই সাত প্রকার বিষবেগের মধ্যে চিকিৎসা চলে। যে রোগী এই সপ্তবিষবিকারাবস্থা ছাড়াইয়া গিয়াছেন, তাঁহার মৃত্যু অবধারিত। দেবচিকিৎসক অশ্বিনীকুমারদ্বয় আসিলেও তাঁহার চিকিৎসা সম্ভব হয় না।

*গর্ভস্রাব—ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই গর্ভস্থ জীব এই ভাবে যমপুরে যায়। পিটক—ফোড়া, বসন্ত ইত্যাদি। পিটক জ্বর কর্ণরোগ এই সকল রোগে শিশুগণ যমপুরে যায়। গুল্ম শূল হৃদরোগ নেত্ররোগ শিরোরোগ যুবক প্রৌঢ় বৃদ্ধগণ যথাক্রমে এই সকল রোগে যম ভবনে যান। বিদ্রব উপদ্রব দৈব দুর্বিপাক যথা বজ্রপাত, নৌকাডুবি ইত্যাদি।

বৃষল্যাঃ শরীরম্ (মূল) শূদ্রার শরীর। বৃষলী শূদ্রা বা শূদ্রী গণিকাকে পতিতা বলিয়া শূদ্র শ্রেণীতে ফেলা হইয়াছে।

পরি। শাণ্ডিল্য! শাণ্ডিল্য!

শা। এইবার প্রভু স্বভাবে অবস্থিত হয়েছেন!

গণিকা। পরভৃতিকে! পরভৃতিকে!

চেটী। এই বার অজ্জুকা স্বাভাবিক কথা কইছেন!

মাতা। বাছা বসন্তসেনে!

রামিলক। প্রিয়ে বসন্তসেনে! এই দিকে এই দিকে!

[গণিকা, মাতা, রামিলক ও চেটীদ্বয়ের প্রস্থান]

শাণ্ডিল্য। প্রভু! এ কি (ব্যাপার)?

পরিব্রাজক। সে অনেক কথা। আশ্রমে গিয়ে বলব।

[চারিদিক্ দেখিয়া]

দিন চলে গেছে। এখন—

মূষামুখস্থ তপ্ত স্বর্ণরাশির ন্যায় (রক্তবর্ণ) গগনপ্রান্তলম্বী দিনকর অস্ত গিয়াছেন—তাঁহার প্রভায় মেঘবৃন্দ অনুরঞ্জিত হওয়ায় অন্তরিক্ষকে অগ্নিগর্ভ বলিয়া বোধ হইতেছে।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত]

ভগবদজ্জুকীয় নামক প্রহসন সমাপ্ত

মূষা—ধাতু গালাইবার মাটীর পাত্র।

এই প্রহসনখানি সংস্কৃত ভাষায় রচিত অন্য প্রহসনের তুলনায় অতি উচ্চ শ্রেণীর বোধ হয়। অশ্লীলতা দোষ ইহাতে প্রায় নাই বলিলেই চলে। টীকাকার ইহার আদ্যন্ত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও করিয়াছেন—তাঁহার মতে ইহা "হাস্যগুপ্ত তত্ত্বার্থ" যুক্ত। আমরা অনুবাদে রসহানির আশঙ্কায় সে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার সূচনা প্রদান করি নাই। তবে পরিশিষ্টরূপে কোন কোন চরিত্র অধ্যাত্ম ব্যাপারে কোন্ কোন্ ভাবের প্রতীক তাহা সংক্ষেপে নিম্নে বলা যাইতেছে—"অস্মিন্ নাটারসে নিসর্গগহনে যোগীপ্র-শিষ্যাবুভাবাত্মানৌ পরজীবশব্দকথিতাবথো তথৈবাজ্জুকা। মূলাধার-সমুদ্গতা সশুষিরা নাড়ী সুষুম্ণা পরে চেট্যৌ চোভয়পার্শ্বগে সশুষিরে নাড্যাবিড়াপিঙ্গলে॥"

"অবিদ্যা গণিকামাতা মহান্ রামিলকো মতঃ। বৈদ্যো বিকল্পসঙ্কল্পৌ কালস্তু যমপূরুষঃ॥ এবং প্রেক্ষাময়ং যোগং যুঞ্জন্ নর্ত্তকতাপসঃ। প্রত্যক্চৈতন্যং সদ্যঃ সাক্ষাৎকৃত্য সুখী ভবেৎ॥"

এই প্রহসনে—পরিব্রাজক পরমাত্মা শাণ্ডিল্য জীবাত্মা; অজ্জুকা—মূলাধার হইতে উদ্গতা সচ্ছিদ্রা সুষুম্ণা নাড়ী; চেটীদ্বয় সুষুম্ণার দুই পার্শ্বস্থিতা সচ্ছিদ্রা ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী; গণিকামাতা অবিদ্যা; রামিলক—মহত্তত্ত্ব (সমষ্টি বুদ্ধিতত্ত্ব); যমপুরুষ কাল; নর্ত্তকরূপী তাপস এইরূপ নাট্যাকৃত যোগের অনুষ্ঠান করিলে হৃদ্গত প্রত্যগাত্মরূপী নারায়ণের সাক্ষাৎকার লাভে পরমানন্দ লাভ করিতে পারেন।

[সমাপ্ত]

কৃষকের সঙ্কট !

খানবাহাদুর আতাওর রহমান

পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থায় কৃষকগণকে যে দুঃখ-দুরবস্থায় পতিত হইতে হইয়াছে, তাহাই নেতাগণের চোখের সম্মুখে ধরিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধ লিখিবার বাসনা হওয়ায় লেখনী ধারণ করিলাম। আশা করি, বর্ত্তমানে নেতা বলিয়া যাঁহারা আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন, তাঁহারা ইহা একবার পাঠ করিবেন ও চিন্তা করিবেন।

লিখিতে গিয়া একটী পুরাতন কথা মনে পড়িয়া গেল। যখন আমি বাখরগঞ্জ সুন্দরবনের অফিসার ছিলাম, সেই সময় কোন এক স্থানে খাজনা ধার্য্য করার কালে খাসমহালের একটী প্রজা বলিয়াছিল, "আমরা গরু—আমরা জন্মাইলে আমাদেরকে উপবাসে রাখিয়া আমাদের মার দুধ তোমরা খাও। বড় হইলে আমাদের জীবনের উপভোগ নষ্ট করিয়া আমাদিগকে বলদ কর ও হাল চাষ করাও। যখন বৃদ্ধ হইয়া অপারগ হই, তখন গলায় ছুরি বসাইয়া মাংস ভক্ষণ কর ও চামড়াখানি বিক্রয় ক'রে ওর পয়সাটী লও।"

আজ কৃষকদের অবস্থা ঠিক এইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কৃষকদের কি দুরবস্থা হইয়াছে তাহা বর্ত্তমানের নেতাগণের বোধগম্য হওয়া সম্ভব নহে; কারণ—তাঁহাদের চিন্তাধারা অন্যরূপ। তাঁহারা নিজেদের দেশের কথা অন্য দেশের বিজ্ঞান ও ধনশাস্ত্র পড়িয়া কিরূপে জানিতে পারিবেন। যাঁহারা আপনাকে বড় বড় বৈজ্ঞানিক, ধনতাত্ত্বিক ও নানাবিধ আখ্যায় গৌরবান্বিত মনে করেন, তাঁহারা যদি একটু চিন্তা করেন, বুঝিতে পারিবেন, তাঁহাদের নিজ দেশের অবস্থা কি? আমার অনুরোধ, তাঁহারা সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য যাহা ধারাবাহিকরূপে বঙ্গশ্রী পত্রিকায় লিখিয়া গিয়াছেন তাহা যেন একটু মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন।

বড়ই আক্ষেপের বিষয়—তিনি তাঁহার উপসংহারে পৌঁছানর পূর্ব্বেই এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে আমার মিশিবার সৌভাগ্য হইয়াছে ও বহুদিন তাঁহার সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। তিনি উচ্চকণ্ঠে বলিতেন—"অপেক্ষা করুন, দেখিতে পাইবেন, সারা পৃথিবীতে খাদ্যাভাবে লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইবে ও এই খাদ্যের অভাবই পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধের কারণ এবং খাদ্যের সংস্থান না করিতে পারিলে যুদ্ধ কখনই মিটিবে না।" তাঁহার আত্মা এখন দেখিতেছে—তাঁহার ভবিষ্যৎ বাণী বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছে।

কি উপায়ে ইহার প্রতিকার হয়, ইহা লইয়া অনেক গবেষণা চলিতেছে। ভারত হইতে কতকগুলি প্রতিনিধি লইয়া খাদ্যসচিব ভিক্ষার ঝুলি হাতে লইয়া ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার দ্বারে যাইতেছেন। এদিকে বড়লাট সাহেব বলিতেছেন—চাউল-গম সর্ব্বত্র রেশন করিতে হইবে। স্যার ফিরোজ খাঁ নুন বলিতেছেন—গ্রামে গ্রামে রেশন করিতে হইবে। দেখা যাইতেছে রেশনের বরাদ্দ হইবে দৈনিক ছয় ছটাক ভদ্রলোকদের জন্য ও শ্রমিকদের জন্য /।০ অর্দ্ধ সের। সকলেই খাইয়া বাঁচিয়া থাকুক—কেহ বেশী খাইবে এবং কেহ না খাইয়া মরিয়া যাইবে ইহা কোনও জ্ঞানী ব্যক্তি বলিতে পারে না। কিন্তু কৃষকগণকে পেট ভরিয়া দু'মুটো ভাত না দিলে তাহারা কি প্রকারে চাষ করিবে! বাঙ্গলা দেশে কয়েক বৎসরের অজন্মা হেতু অর্দ্ধাহারে ও ম্যালেরিয়া জ্বরে কৃষকগণের মধ্যে অনেকেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। যাহারা অর্দ্ধমৃত অবস্থায় বাঁচিয়া আছে, তাহাদেরকে যদি আরও খাদ্যের অভাবের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হয়, তবে খাদ্যশস্য উৎপাদন যে একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে—এ কথা কি কেহ ভাবিয়া দেখিতেছেন? কিছুদিন পূর্ব্বে খাদ্য-সচিব উচ্চকণ্ঠে বলিয়া বেড়াইয়াছেন: দেশে খাদ্যের অভাব হইবে না। ধন্য তাঁর চিন্তাধারা ও বহুদর্শিতা। এই অবস্থা দেখিয়া কৃষিজীবীদের মধ্যে যেরূপ আতঙ্ক হইয়াছে—মনে হয় যে, তাহারা কৃষিকার্য্যে তাহাদের উদ্যম ছাড়িয়া দিবে। যদি কিছু উৎপাদন চাও, তাহাদিগকে নির্ব্বিবাদে তাহাদের কায়িক কঠোর পরিশ্রমলব্ধ খাদ্য হইতে বঞ্চিত করিও না। বরাদ্দ (রেশন্) সম্বন্ধে আমাদের যে শিক্ষা হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট। গ্রামে খাদ্য-কামাট করা হইয়াছে ও লবণ, কেরোসিন তৈল ও কাপড় বিলি করা হইতেছে, ইহাই এক ঝঞ্ঝাট; তার উপর তাদেরকে যদি পেটের অন্নের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইতে হয়, তাহা হইলে তাহাদের কষ্টের সীমা আর থাকিবে না।

কৃষিকার্য্য বর্ত্তমানে যে কিরূপ কষ্টকর ও কিরূপ লাভবান্ তাহা অনেকেরই ধারণা নাই। কৃষকগণ সামান্য একটু লোহার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমি নিজে মিনিষ্টার ও কৃষি-বিভাগের ডাইরেক্টার পর্য্যন্ত দরবার করিয়া কিছু লোহার যোগাড় করিয়া উঠিতে পারি নাই। সাধারণ লোকের অবস্থা একটু ভাবিয়া দেখুন। তাহাদের ব্ল্যাক মার্কেট ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

যে গরু যুদ্ধের পূর্ব্বে ১০০৲ টাকায় পাওয়া গিয়াছে, তাহার বর্ত্তমান মূল্য ৪০০-৫০০৲ টাকা, যে খইল ২৲ টাকা মণ দরে পাওয়া গিয়াছে তাহা এখন ৮.৯ টাকা, যে তৈল ।৵০ আনা সের পাওয়া গিয়াছে, তাহা এখন দৃষ্টিগোচর হয় না। অখাদ্য তৈল ১।০ টাকা সের। যে মাটির হাঁড়ী এক আনায় পাওয়া গিয়াছে, তাহার মূল্য আজ ।০ আনা। আমরা কৃষকগণ—হ্যাজলীন, পোমেটাম, আইকোলন বা সুবাসিত তৈল চিনি না। আমাদের স্ত্রীলোকেরা একটু নারিকেল তৈল মাথায় দিয়া থাকে, তাহার মূল্য বর্ত্তমানে ৩.৪ টাকা সের এবং চোরাবাজার ভিন্ন কোথাও পাওয়া যায় না। পুরুষেরা সমস্ত দিন কাজ করিয়া একটু তৈল মাখে, তাহাও তাদের ভাগ্যে ঘটে না। কাপড় বরাদ্দ-প্রথা হওয়ার পর হইতে অদ্যাবধি জনপ্রতি ৫ গজও জোটে নাই। দারুণ শীতে তাহারা অগ্নির সাহায্যে শীত কাটাইয়াছে—কয়লার অভাবে গোবর যাহা জমিতে সাররূপে ব্যবহার হইতেছিল তাহাও জ্বালানী হইতেছে। দেশের পুষ্করিণীগুলি বুজিয়া গিয়াছে; পূর্ব্বে বৃষ্টির জলের অভাব হইলে তাহা সেচন করিয়া ফসল রক্ষা হইত। তাহার উদ্ধারের জন্য গভর্ণমেণ্ট বহু অফিসার নিযুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু পুষ্করিণীর

পর্য্যোপ্তার হইতেছে না। পূর্ব্বে বিনা সারে জমিতে অল্প পরিশ্রমে যে পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হইত, তাহা এখন হইতেছে না, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি; ইহার কারণ সম্বন্ধে লিখিতে গেলে এই প্রবন্ধ অত্যন্ত বৃহদাকার হইবে; এ সম্বন্ধে আমি স্বর্গীয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের লেখনীপ্রসূত প্রবন্ধগুলি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

পূর্ব্বে অনেক কম ব্যয়ে ও অল্প পরিশ্রমে বর্ত্তমান অপেক্ষা অনেক বেশী শস্য উৎপন্ন হইত। কৃষিকার্য্য সহজ ছিল বলিয়া কৃষকেরা জনপ্রতি ১৫।১৬ বিঘা জমি আবাদ করিয়া লইত ও অবসর সময়ে অন্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া উপায় করিয়া অন্যান্য ব্যয় নির্ব্বাহ করিত।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ তাহাদের সেই অন্য উপায় নাই। তাহারা টাকা-পয়সা চিনিত না। আমি এমন লোকও দেখিয়াছি, সে বলিয়াছে, টাকা দেখার জন্য ৫০।৬০ মাইল দূরবর্ত্তী স্থান হইতে গিয়া টাকা দেখিয়া আসিয়াছে। তাহাদিগকে অল্প জিনিষ ক্রয় করিতে হইত। কাপড় তাহারা নিজে বুনাইয়া লইত। অন্যান্য দ্রব্য বিনিময় করিত। তাহাদের স্বাস্থ্য ছিল—বেশী পরিশ্রম করিতে পারিত। বর্ত্তমানে তাহাদের উৎপন্ন শস্য যে-ভাবে গভর্ণমেণ্ট ক্রয় করিতেছে, তাহাতে কৃষিকার্য্যে লাভ হইতেছে কিনা তাহা বিবেচ্য। বাঙ্গলাদেশে একটা কথা আছে "খাটাসে মাছ ধরে—উদবিড়ালে ভাগ করে", কৃষিজীবীর অবস্থা তাহাই হইয়াছে—তার উৎপন্ন শস্য যথেচ্ছ মূল্যে গভর্ণমেণ্ট খরিদ করিবেন। কেন এই মূল্যনির্দ্ধারণ-কালে কৃষকের প্রতিনিধি লওয়া হয় না? যাঁহারা তাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা জানেন না, তাঁহারা তাদের প্রতিনিধি কিরূপে হইতে পারেন? সহরবাসী বড় লোকেরা চায়—যত কম মূল্যে পারে, কৃষকের অর্জ্জিত ধন লুট করিতে। ইহা কি যথার্থ ই ন্যায়সঙ্গত হইতেছে! আমরা নির্জ্জীব, রাজনীতি জানি না, আইন-কানুনকে খুব ভয় করিয়া চলি—আমরা চীৎকার করিয়া শোভাযাত্রা করিতে জানি না—"ব্রিটিশ ধ্বংস হউক" বলিতে শিখি নাই—আমরা নিরাশ্রয়, তাই বলিয়া সব বোঝা আমাদের ঘাড়ে চাপাইতে হইবে, ইহাই কি ন্যায়সঙ্গত। তবে দেশে যে বাতাস বহিতেছে, তাহাতে বুঝা যায়—এই অত্যাচার আর বেশী দিন সহ্য হইবে না। কথায় আছে, চাষার রাগ নাই, তবে যখন রাগে, তখন পাগলা কুকুর, সেই পাগলা কুকুরে কামড় দিলে আর রক্ষা নাই।

সুতরাং এখনও সময় আছে। কৃষককুল যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে খাইয়া-পরিয়া, মনের আনন্দে চাষ করিয়া দেশের খাদ্য উৎপাদন করিতে পারে, তাহার প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান করিয়া বাহির কর ও তাহা কার্য্যে পরিণত কর। কেবল রাইটার্স বিল্ডিংএর মধ্যে উহা সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিলে কোনও ফল হইবে না। সময়ে সকল কাজ করিতে হইবে। কাল-বিলম্বে সব নষ্ট করিও না। অল্পদিনে উৎপন্ন হয়—একপ শস্যের চাষ কর বলিয়া বেড়ান হইতেছে। যদি এক মাস পূর্ব্ব হইতে চেষ্টা হইত, তাহা হইলে অনেক স্থানে অনেক বেশী বোরোধান উৎপন্ন হইতে পারিত।

বহু বিল জমি জলে ডুবিয়া আছে, জল কতক পরিমাণে নিকাষ করিয়া দিবার উপায় করিয়া দিলে বোরোধানের চাষ অনেক বৃদ্ধি করা যাইত। এখন আর সময় নাই।

যদি অক্টোবর, নভেম্বর মাসে খাদ্যাভাবের কথা ভালরূপে প্রচার করিয়া অন্যান্য শস্য উৎপাদনের চেষ্টা হইত, তাহা হইলে লোকে চীনা বাদাম, মিষ্টি আলু, গম প্রভৃতি ফসল উৎপন্ন করিতে পারিত।

স্যার নাজিমুদ্দিন করাচীতে বলিয়াছেন, মিষ্টি আলুর চাষ কর।—জানি না, ঢাকা জিলার এই সময় মিষ্টি আলুর চাষ করিলে হইবে কিনা, আমাদের জেলাসমূহে আর সময় নাই। এইরূপ ফাঁকা আওয়াজ দিতে সকলেই পারে। আমার মনে আছে, জনৈক মিনিষ্টার বলিয়াছিলেন, বিলে ধানের বীজ ছড়াইয়া দাও, ধান পাইবে। দুঃখের বিষয় সংগঠনমূলক কথা এইসব তথাকথিত নেতৃবৃন্দের মুখ হইতে বাহির হয় না।

আজকাল সর্ব্বদা শুনিতেছি—কংগ্রেস জিন্দাবাদ; পাকিস্থান জিন্দাবাদ, ও অনেকেই পাগল হইয়া বেড়াইতেছেন, ইহারা আমাদের হাতে আকাশের চাঁদ আনিয়া দিবেন নাকি, তাহাও বুঝিতে পারি না। আমরা অখণ্ড ভারত বুঝি না, পাকিস্থান বুঝি না, আমরা বুঝি আমাদের পেটে অন্ন নাই, আবার যে অন্নের যোগাড় বহু কষ্টে করি, তাহাও কতক টুকরা কাগজের পরিবর্ত্তে বিলাইয়া দিয়া পুত্রকন্যাকে লইয়া উপবাসে থাকি, পরণের কাপড়ের জন্য নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াও স্ত্রী-কন্যার লজ্জা নিবারণ করিতে পারিতেছি না। পূর্ব্বে ম্যালেরিয়া নামক হিংস্র জন্তুকে চিনিতাম না, এখন তাহারই সেবা করিবার জন্য রোজ কাঁড়ী কাঁড়ী তিক্তদ্রব্য গলাধঃকরণ করি, তবুও তাহার যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইতে পারি না। পিতা-পিতামহের আমলে বা আমাদের বাল্যকালে এত ডাক্তারখানা, হাসপাতাল বা ডাক্তার ও ডাক্তারী ঔষধ দেখি নাই এবং এত ম্যালেরিয়ারও সেবা করি নাই। এখন জেলা স্বাস্থ্য-অফিসার, সাবডিভিশনের স্বাস্থ্য-অফিসার, স্যানিটারী ইন্‌সপেক্টার প্রভৃতি বহু হাফ প্যাণ্ট, কোট ও হ্যাটধারী অফিসার জিপ নামক যন্ত্রে হাওয়া খাইয়া বেড়াইতেছেন ও হ-জ-ব-র-ল বুঝাইতেছেন কিন্তু ম্যালেরিয়া কমিতেছে না। ইহার কারণ কি? ৺ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিয়া গিয়াছেন, "ইহার প্রকৃত তথ্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে পাওয়া যাইবে না। ইহার গবেষণা প্রাচ্য মণি-ঋষিদের লিখিত বৈজ্ঞানিক পুঁথি যাঁহারা ঠিকমত ব্যাখ্যা করিতে পারিবেন তাঁহাদের দ্বারাই হইবে।"

ধরিয়া লইলাম এ বৎসর দৈবদুর্ব্বিপাকের জন্য কিছু কম ফসল হইয়াছে। যদি এক বৎসরের আংশিক অনাবাদ হেতু দেশে দুর্ভিক্ষ হয়, তাহাহইলে আমাদের আর্থিক অবস্থা কি তাহা সহজেই অনুমেয়। পূর্ব্বে কৃষকগণের খাদ্যশস্য ধরিয়া রাখার ক্ষমতা ছিল। তাহারা আগামী ফসলের অবস্থা না দেখিয়া তাহাদের ফসল বিক্রয় করিত না। এখন সে অবস্থা নাই। মাঠ হইতে শস্য বাড়ীতে আসার পূর্ব্বেই অগ্রিম টাকা লইয়া বিক্রয় করিতে হয়। ফসলও কম হয়। এই কারণে কিছুই সঞ্চয় থাকে না। যতদিন পর্য্যন্ত এই-রূপ সঞ্চয় (Reserve) না থাকিবে, ততদিন এই দুর্দ্দশা হইবে।

গভর্ণমেণ্ট শস্য ক্রয় করিয়া সঞ্চয় করিতে জানে না। তাহাদের গুদামে মাল নষ্ট হইবে। ব্যবসায়ীরা ক্রয় করিলে তাহারা অতি যত্নে মাল রাখে, নষ্ট হয় না। যদি গবর্ণমেণ্ট ধান-চাউল খরিদ না করিয়া ব্যবসায়ীদের দ্বারা এই মাল সঞ্চয় করাইয়া মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন ও তাহারা গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে থাকিত, তাহা হইলে হাজার হাজার মণ ধান-চাউল নদীগর্ভে যাইত না। চোরাবাজার ধ্বংস হউক—ইহা সকলেরই ইচ্ছা কিন্তু এই চোরাবাজার নষ্ট করিতে গিয়া দেশের খাদ্য নষ্ট করা কোনও ক্রমে উচিত হয় না।

আশা করি, সব দিক বিবেচনা করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ কার্য্য করিবেন এবং জনসাধারণ সচেতন হইবেন।

ধরণীর ধূলিতলে

শ্রীঅমিতা দেবী

একটু অসময়েই সন্ধ্যেটা পড়ে গেল।

জানলার ধারে দাঁড়াল লিপিকা—ওর চোখ বিহ্বল। হঠাৎ কোথা থেকে স্মৃতির সৌরভ এসে ধাক্কা দিয়েছে ওর বুকে! দৃষ্টির কালো মেঘ এনে দিয়েছে সে সৌরভের ঢেউ;—লিপিকার বুকে ঝড় উঠলো!···বাইরে বৃষ্টি পড়ছে অবিশ্রান্ত—চারদিক যেন তলিয়ে দেবার উপক্রম করছে! কি তার তোড়···কি তার লাফালাফি। যেন কোন বুদ্ধিহীন গোঁয়ার চাষা তার স্ত্রীর ওপোর রণমূর্ত্তি হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো!···ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি! সামনের ঐ একতলা বাড়িটার ছাতের ওপোর দৌরাত্ম্যটা যেন আরো বেশি, অসম্ভব বেয়াড়াপনা! কোন অতি-আদুরে শিশুর হাত-পা ছোঁড়া আব্দার মনে হয়!···লাফাচ্ছে বৃষ্টি···আছড়ে আছড়ে পড়ছে—সাদা হয়ে যাচ্ছে সেখানটা অজস্র বৃষ্টির ধোঁয়ায় ধোঁয়ায়!···আরো একটু সরে এলো লিপিকা, একেবারে রেলিং ঘেঁসে দাঁড়ালো।

ও কি ভাবছে—ওর ভাবনার বুকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে—ভাবনার অন্ত নেই! অত্যন্ত এলোমেলো ধরণের ভাবনা···কোন কিছুকে আঁকড়ে ধরে ভাবনাকে সংযত করা কঠিন হয়ে পড়ছে। শুধু মেঘলা আকাশের বুকে ওর কাঙাল মন, আর ওর মনের আকাশে মেঘলার প্রতিচ্ছায়া!···দু'জন দু'জনকে সমবেদনার হাহাকারে আলিঙ্গন করছে!···সামনে ধোঁয়াটে বৃষ্টির গায়ে ধূসর ছবির আল্পনা!···লিপিকা শিউরে উঠলো—রেলিং-এ ঠেকলো ওর উষ্ণ-নরম গা'···কি কড়া ঠাণ্ডা রেলিং!" লিপিকাকে আটকে রেখেছে যেন অক্টোপাসের মতো জড়িয়ে;' পালাতে দেবে না, বিপর্য্যস্ত হতে দেবে না,—মজবুত চৌকিদার! কেঁপে উঠলো ওর ঠোঁট—বাতাসের ধাক্কায় কম্পমান শিখার মত!···রেলিংএর ঠাণ্ডা শক্ত স্পর্শ—কি অনির্ব্বচনীয়, কি অনুভূতি-ভরা দরদ! সকালবেলার আকাশ ছিল মেঘে মেঘে আচ্ছন্ন, ভেঙে পড়ার পূর্ব্বাভাসে থরো থরো! কাঁপছে ওর ঠোঁট—কিন্তু ও তো পারছে না ঐ অজস্র বৃষ্টির মত এলোমেলো ভাবে ভেঙে পড়তে! পাগলা বৃষ্টি মারছে—নিজেকে বেপরোয়া ভাবে চৌচির করে দিচ্ছে একটা অস্থির বেদনার বিভ্রান্তিতে—একটা উন্মাদ বিকৃত আনন্দে!···সামনে একটা প্রকাণ্ড চাঁপা গাছ—বৃষ্টির ঝাপটায় কম্পমান পাতাগুলি—কি অসহায় ভাবে ভিজছে, ক্রমাগতই ভিজছে; লিপিকার বুক থেকে বেরুলো একটা গভীর নিঃশ্বাস!.. ওর বুকেও যেন পালিয়ে যাবার নেশা, বিশৃঙ্খলে ছত্রভঙ্গ হবার তীব্র কামনা—অথচ ভেতর থেকে টানছে একটা সংযত শৃঙ্খলের আবহাওয়া—বড় অসহায় হয়ে নিজেকে স্তব্ধ করে নিলো ও।···

একটা ছোট ছেলে মাছ ধরছে।

রাস্তার ধারের নালাটায় তোড়ে জল যাচ্ছে. তারি মুখে একটা ঘুনি পেতে—কি উৎসুক ক্ষুধার্ত্ত মুখে মাছের অপেক্ষা করছে। লিপিকার চোখ গিয়ে পড়ল ঐ ছেলেটার দিকে হঠাৎ—কি শীর্ণ চেহারা!·· আহা, ও হয়ত কাল থেকে কিছুই খায়নি!···ওর বুক ধ্বক্ করে উঠল বেদনার ধাক্কায়! চিন্তার মোড় ফিরে গেল এক নিমেষে। ওকে কি ডাকবে? কিছু খেতে দেবে?···কিন্তু!·· সামনে ধোঁয়ায় কার যেন স্পষ্ট প্রতিমূর্ত্তি ভেসে উঠলো—ওর মনের কোণে ফুটে উঠলো জ্বল্ জ্বল্ করে:

···"হয়তো কোনো বর্ষাঘন সন্ধ্যায় সহসা তোমার বিস্মৃত আকাশের অন্ধকার বুকে প্রদীপের মতো জ্বলে উঠবো দপ্ করে—তারপর আবার নিভে যাবো—নিভে যাবার আগে প্রদীপের শিখা যেমন দপ্ করে একবার জ্বলে উঠে নিভে যায়! দীর্ঘদিনের ভুলে থাকার পর স্মৃতির আকাশে আমাদের এ ক্ষণিক মিলন, কি সুন্দর—মধুর হবে লিপি!"···অলসভাবে জানলার মাথা রেখে লিপিকা বুকের স্পন্দন সংযত করবার চেষ্টা করছে—

ছেলেটাকে ডাকতে পারলো না, কে যেন ওর কণ্ঠের স্বরকে চেপে ধরলো !···বৃষ্টির বেগ একটু কমে এসেছিল, আবার দ্বিগুণ চেপে এলো। লিপিকা জানলা থেকে সরে এলো না—জানলা দিয়ে জলের ঝাট্ আসছে! সমস্ত সন্ধ্যেটা ভরে 'মলয়ে'র সৌরভ—কোথা থেকে, কেমন করে ঝলক দিয়ে এলো। লিপিকা আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে—ওর বুকে স্বপ্ন—একটির পর একটি কঙ্কালের মতো ফ্যাকাসে ছবি।···সিনেমার ছবির মতো ফুটে উঠে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে!···

কতদিন আগেকার স্পষ্ট ছবিগুলি। লিপিকা আবার নিশ্বাস ফেললো!

ওর বিয়ে হবার তখন কোথায় কি!—যেদিন ও 'মলয়'কে দেখেছিল প্রথম সেদিন ভোরের আলোর মত স্নিগ্ধ চোখে সে এক বিস্ময় নিয়ে ওর মনের কোণে লেগে গিয়েছিল সত্যিকার ভাললাগা; তারপর থেকে সবসময় ওর দেহে মান মলয়ের একটা স্নিগ্ধ সৌরভ মিলিয়ে থাকতো আর নিজেকে মহিমান্বিত করে তুলতো মনে মনে।···তারপর, কোথা দিয়ে কি যে হয়ে গেল,···লিপিকা আর ভাবতে পারে না—সিঁদুরের ছল-করা-মহিমা তার কাছে অসহ্য! হঠাৎ উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে লিপিকা রেলিং শক্ত করে আঁকড়ে ধরলো—ওর চোখের সামনে অপরিমেয় কুয়াসা।···অনেক দিন ঘুমিয়ে থাকার পর আজ যেন সে জেগে উঠছে; ঘুমিয়ে থাকার ক্লান্তিতে চোখে মুখে বিহ্বলতা—অবসন্নতায় ওর বুক ভরা!···ওর মনে পড়লো,—সেদিন রাতে ও কি যে চঞ্চল হয়ে প'ড়েছিলো, সেদিন তার বিয়ের পাকাপাকি খবর এল! কম্পিত বুকে এসেছিল সে মলয়ের কাছে একটা শান্ত আশ্রয়ের আশায়! কিন্তু এসেই একটা প্রচণ্ড ধাক্কা পেলো—ওর যেন বলবার কিছুই নেই! হঠাৎ এই মুহূর্ত্তে এসে পড়লো মলয়; অনেকটা আশ্চর্য্য হয়ে কাছে সরে এসে বল্ল:

"অনেক ভাবনা মুখে নিয়ে, আর হঠাৎ এ-সময়ে তোমার আসা কেন লিপি?"

ও উত্তর দিতে পারেনি—শুধু মুখের চঞ্চলতা বুঝি আর একটু বেড়ে গিয়েছিল! আরো কাছে সরে এসে মলয় বলেছিল,—"আমি হয়তো বুঝতে পারছি তোমার আজকের অবস্থা, কিন্তু লিপি, আমাদের ভাললাগার মধ্যে ছিল না কি এমন পবিত্রতা—যাতে করে এ বিয়ের জন্যে আমাদের—"

"ভাল লাগেনা"—কথার মধ্যে শক্ত হয়ে বাধা দিয়ে উঠেছিল লিপিকা—"ঠিক এ সময়েই আপনাদের কবিত্ব! এত কষ্টের মধ্যেও আমার হাসি পায়—আপনাদের নিয়ম করা এ মহৎ উদাসীনতা দেখে।···এই ধরণের নানারকম উপদেশ দিয়ে পিঠ চাপড়ানো প্রত্যাখ্যান—জানেন না আপনারা হয়তো, কত অসহ্য হয়ে ওঠে শুনতে একথা! তাই এসেই বুঝেছিলুম, ভুল করেছি এসে।" কথাগুলো বলেই সে পেছন ফিরেছিল ফিরে যাবার জন্যে। হঠাৎ উদ্‌ভ্রান্তের মত মলয় ওর হাত ধরে ফেল্ল! সে কি স্পর্শ! লিপিকা শিউরে উঠেছিল—সেদিন ওর হাত অবশ হয়ে এসেছিল বুঝি! সেদিন কি ও কেঁদেছিল? মলয়ের সেই স্পর্শ প্রথম আর শেষ—এখনো হাতের মধ্যে সে-স্পর্শের শ্রী মাখানো—লিপিকার বুক ভরে ওঠে।

"লিপি!" তখন মলয়ের মধ্যে যেন একটু অস্থিরতা দেখা গিয়েছিল—তারপর আবার অবিচল, স্থির, প্রশান্ত দৃষ্টি। নিজেকে সহজে সহজ করে ফেলতে মলয়ের কি বিশাল ক্ষমতা।—"তোমাকে বোঝাতে আমি এখন কিছুতেই পারব না হয় তো—কিন্তু জানো তো, বাইরের দিক দিয়ে অনেক আপত্তি আসবে আমাদের মিলনে,—সে-সব আপত্তি একান্তভাবে না মেনে যদি যথেষ্ট সংগ্রাম করে তোমায় কাছে টেনে নিই—তখন দেখবে, অবসন্নতায় আমাদের জীবন ভরে উঠেছে,—আমাদের জীবনে মাধুর্য্য নেই, স্বপ্ন নেই—কেবল হয় তো একটা বিরক্তিকর নেশায় আমাদের জীবন-যাত্রা একঘেয়ে ক্লান্তিতে ভরে উঠেছে! নিজেকে শান্ত করে ভাবতে হবে লিপি, আমার প্রার্থনা, ভগবান যেন তোমায় এখন সে-ধৈর্য্য দেন।" সহসা তার বুকে এ-কথায় যেন একটা ধাক্কা লেগেছিল, ও যেন মরে গিয়েছিল লজ্জায়—সত্যি এ সে কি করেছে! মলয়ের কাছে এত অসংযতভাবে লোভীর মত কেন সে ভিক্ষা জানালো! অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে ও উত্তর দিয়েছিলো,—"হয় ত কোন দিনই আপনাকে খুব কাছে পাবার সাহস আমিও করি নি; কিন্তু আমি তো মাত্র সাধারণ নারীই—ঠিক এ' মুহূর্ত্তে আমাদের নিজেকে শান্ত করা কত কঠিন হয়ে পড়ে, এ কথা কেন জানেন না মলয়-দা?"

'জানি লিপি!'—কত আদরের সুরে বলেছিল মলয়, "কিন্তু তোমার জন্যে যে আজ নতুন ব্যবস্থা হতে চলেছে, এই আমাদের দু'জনকে আড়াল করে দেবে—আর আড়াল না থাকলে আমাদের মিলন সার্থক হতে পারে না লিপি!" একটু থেমে মুখে জোর করে একটু বেদনার হাসি তুলে নিয়ে মলয় আবার বলেছিলো,—"তোমার সংসার সংগ্রাম আমাকে ছুঁড়ে দেবে কালো অতল জলের মধ্যে, কেন না সংসারের মধ্যে তোমার আমার তো কোন প্রয়োজন বলেই বোধ হবে না! কাজেই একটু একটু করে ক্রমেই আমার ভুলতে বসবে—

তোমা[illegible]নন্যার এই ভোলাটাই তোমায় এত বেশী বিহ্বল [illegible] কিন্তু সেই জীবনযাত্রার মাঝে হয় তো সহসা ঘুম ভেঙে একদিন সকাল বেলার একগুচ্ছ লবঙ্গলতিকা তোমায় মনে করিয়ে দিল আমার কথা—হঠাৎ বিস্ময়ে তোমার বুক ধ্বক্ করে উঠলো!—এই তো মিলন। আবার কোনো দিন হয় ত বর্ষাঘন সন্ধ্যায়, সহসা তোমার বিস্মৃত অন্ধকার আকাশের বুকে প্রদীপের মতো জ্বলে উঠবো দপ করে—তারপর আবার নিভে যাবো—নিভে যাবার আগে প্রদীপের শিখা যেমন দপ করে জ্বলে উঠে নিভে যায়! দীর্ঘ দিনের ভুলে থাকার পর স্মৃতির আকাশে আমাদের এ ক্ষণিক মিলন কি সুন্দর মধুর হবে লিপি!"

"লিপি"—

ধাক্কা লাগলো ওর ভাবনায়! পেছনে ওর স্বামীর ডাক! কি যে হলো, লিপিকা সহসা স্থির করে উঠতে পারলো না—সামনে দাঁড়িয়ে 'মলয়'—মলয়-ভরা সন্ধ্যা—কেমন করে ফেলে যাবে!...

"আশা করেছিলুম, মনুয়াকে দিয়ে অন্তত: ছাতাটাও পাঠাতে ভুলবে না।" ভেতর থেকে বিরক্তির অনুযোগ মিশিয়ে ওর স্বামীর প্রশ্ন এলো!

"তাই তো"—ছুটে এলো প্রায় লিপিকা। স্বামীর দিকে ফিরে ও চমকে উঠলো—সর্বাঙ্গ সিক্ত ওর স্বামীর, যেন এইমাত্র চান করে ঘরে ফেরা! অনুশোচনায় লিপিকা ম্লান হয়ে ওঠে—ষ্টেশন থেকে এতটা পথ ভিজে আসা—যদি অসুখ হয়ে পড়ে! মনুয়াকে দিয়ে কেন সে ছাতা পাঠাতে ভুলে গেল! তাড়াতাড়ি কাপড় জামা এনে স্বামীর হাতে তুলে দিল।—"আগে জামা-কাপড় ছাড়ো, কাঁপছো যে-রকম—কেন যে এমন অন্যায় ভুল হোলো! কিন্তু সকাল থেকেই তো আকাশটা খারাপ ছিলো—রেন্ কোটটাও যদি হাতে করে নিয়ে যেতে!"

লিপিকা নিজেকে সহজ করে আনবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। কিন্তু কার ধূসর ছায়া যেন এখনো জানলায়—অস্পষ্ট ধোঁয়ায় কি যেন খোঁজবার চেষ্টা লিপিকার!...

ইজিচেয়ারে শুয়ে স্বামী—এক পেয়ালা চা লিপিকা স্বামীর হাতে তুলে দিলো। "বাস্তবিক এতক্ষণে নিজেকে প্রকৃতিস্থ করতে পারলুম লিপি—শীত করছিলো বেশ।" পেয়ালায় কয়েক চুমুক দিয়ে স্বামী হাল্কা আরামের নিঃশ্বাস ফেলে বললে। লিপিকা হঠাৎ বুঝে উঠতে পারলোনা কি কথা বলে সে ঘরের আবহাওয়াটাকে স্বাভাবিক করে তোলে। এ কঠিন নিস্তব্ধতার মধ্যে শুধু সময়ের বুদ্বুদ একটির পর একটি ফুটছে আর এগিয়ে ভেঙে পড়ছে...ও চঞ্চল হয়ে উঠল—কোন কথাই ওর মনে জোগান দিচ্ছে না। কেবল বুকের মধ্যে যেন অস্থিরতার ঢেউ। কে যেন জানলায় অস্পষ্ট ছায়ামূর্ত্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে! কাছাকাছি কোন দীঘি থেকে হিরণ আলোর ছেলে কত আদরে কুঁচবরণী ছায়ার মেয়েকে বুকে তুলে নিয়েছে! তাদের ছলছল সজল চোখের নিবিড় পল্লব স্পর্শ লিপিকারও মুখে যেন লাগে!...

"তোমার শরীরটা কি ভাল নেই?" ঘরের সমস্ত গুমোট্‌কে হঠাৎ সচকিত করে ওর স্বামীর প্রশ্নের আক্রমণ,—"যেন কেমন তুমি অন্যমনস্ক! কি হোলো তোমার?"

"কি আবার!"...একটু হাসি মুখে তুলে আনলো লিপিকা—শ্রাবণের শেষ বেলায় অস্তাভ সূর্য্যের ম্লান চাওয়ার মত!

লিপিকা অনেকটা স্বাভাবিক ভাবে হাসবার চেষ্টা করেও বুঝলো, অভিনয়টা বিকৃত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাড়াতাড়ি মুখ নিচু করে শূন্য চায়ের পেয়ালাটার ওপোর হাল্কা করে চামচ্ ঠুকতে লাগলো।

"এই যে মনুয়াকে পাঠাতে ভুল,—জানলায় এমন উদাসীন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা, এর কি কোন কারণ নেই?" ভ্রূ-কুঁচ্‌কে দৃষ্টি ফেললো লিপিকার মুখে ওর স্বামী। লিপিকা চমকে উঠলো, স্বামীর স্বরে কি সন্দেহের অভিমান? অনুযোগ ওর ব্যর্থ হোলো স্বামীর হাসির সঙ্গে সঙ্গেই।

"আজ বোধ হয় তিন বছর হোলো আমার গারদে তোমায় এনেছি—এর মধ্যে একবারো তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হয় নি—এর জন্যে মনে মনে আমার ওপোর খড়্গহস্ত হয়ে ছিলে, আজ বৃষ্টির ছোঁয়াচ লেগে একেবারে" ...মুখে কৌতুকের ছাপ এনে লিপিকা কথাটাকে সম্পূর্ণ করে দিয়ে বলল,—"হ্যাঁ, একেবারে বৃষ্টির মত ছিঁচকাঁদুনে বায়না ধরেছি।"

"নয়তো কি, যেরকম মুখ গম্ভীর! মনে তো হয় না কথা কইতে গেলে আর তার উত্তর পাবো!"

হেসে উঠলো দু'জনেই।

হঠাৎ বিচলিত হয়ে উঠলো লিপিকা—স্বামীকে কি সে প্রতারিত করছে!...নির্লজ্জের মত হাসি দিয়ে ভুলিয়ে? ও কি স্বামীর পাশে ছলনার মায়াবিনী?—অস্থির হয়ে উঠে পড়লো লিপিকা—পেছন ফিরে নিজেকে সাম্‌লে নেবার চেষ্টা করলো।

"ও কি, উঠলে যে!" উৎসুক হয়ে স্বামী প্রশ্ন করলো।

"বা রে, এখানে বসে থাকলেই বুঝি হোল—সেই খেয়ে গেছ সকাল আটটায়, মনে নেই বুঝি? রাতের রান্নাগুলো..."

"আমি কিন্তু আজ কিছু খাবোনা"···কথায় বাধা দিয়ে ওর স্বামী চুপ করলো। লিপিকা বুঝলো, কথার মধ্যে গোপন অভিমান—ফিরতে তাই বাধ্য হোল। কিন্তু আজকের মত ওর স্বামী ওকে নিষ্কৃতি দিক্—ওর মুখে নীরব কাতর প্রার্থনা।

"ভেবেছিলুম এমনি একটি সন্ধ্যায় তোমার গান শুনতে পাবো! কেমন লাগবে!"···

"আজ থাক!"···লিপিকার নম্র অনুনয়।···"কাল আমি প্রস্তুত থাকব—গান শোনাবো কাল, আজ নয়—রাত হয়ে যাবে অনেক, আজ আমায় ছুটী দাও!"···

রাতে শুতে এলো লিপিকা। মাথার কাছের জানলাটা খুলে দিতেই একটা জোলো ঠাণ্ডা হাওয়া ঝলকে এলো ঘরের ভেতর।

"ওটা খুললে কেন—এ বাতাসটা বড় খারাপ করে।"

লিপিকা কথা বল্ল না কিছু—নীরবে স্বামীর পাশে শুলো।

"এখনো ছেলেমানুষী,—সারাদিন বৃষ্টি দেখেও সখ মিটলো না বুঝি!" ওর স্বামী সৌখীন তিরস্কার করে হাতটা ওর কাছে টেনে নিলো। চম্‌কে উঠলো লিপিকা—এ যেন মলয়ের পুরোণো স্পর্শ!···ওর সারা দেহে রোমাঞ্চ!···স্বামীর প্রশস্ত বুকে ও লুটিয়ে পড়লো গভীর আরামে,—জানলা দিয়ে জোলো বাতাসে ঘুমপাড়ানী গান আর স্বপ্নে ওর মলয়ের বুকে আত্মসমর্পণের বন্যা!।· ঘুমিয়ে পড়লো লিপিকা—কল্পিত মলয়ের বুকের ওপোর, মুখে হাসি টেনে।

* * * *

হঠাৎ রাতে ঘুম ভেঙে গেল লিপিকার। ওর বিস্মিত চোখ মেনে নিতে চায়না এতো চাঁদের আলো—প্রকৃতির কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! ওদের বিছানায় অজস্র চাঁদের আলো—আর ওর স্বামীর ঘুমন্ত মুখে কি সুস্থ সুন্দর হাসির রেখা টানা! লিপিকা নিঃশব্দ শ্লথ পায়ে জানলার কাছে এসে দাঁড়ালো,—একটা সরু সাদা পথ চলে গেছে এঁকেবেঁকে—তারি ওপোর একটির পর একটি পায়ের চিহ্ন···লিপিকা শিউরে উঠ্‌লো! ধুলো ক্রমশঃ মুছিয়ে নিচ্ছে সে পায়ের চিহ্নকে,—হয়তো কোনদিন আর দেখা যাবেনা এই পায়ের চিহ্নকে!···

লিপিকা শক্ত করে রেলিং আঁকড়ে ধরলো; চোখের সামনে কুয়াসা—অপরিমেয় কুয়াসা।

তন্দ্রা কাননে তুমি কি স্বপনে অনিন্দিতা !

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

বসন্ত দিনে ফুল্লকুসুম সম
রহস্যময়ী হৃদয়েশ্বরী মম!
অবগুণ্ঠিত রজনী সুপ্ত হোলো,
গুণ্ঠন খোলো হিন্দোলে দোলো
পুষ্পিত লীলাচঞ্চল রঙ্গে।

প্রণয় প্রদীপ জ্বলে, আসে পতঙ্গ
নিভৃত গোপনে প্রিয়া পেয়েছি সঙ্গ
মণিকুন্তলা! রাখো এ অঙ্গে
অঙ্গ তব
কুন্তল হ'তে গন্ধ বিলায়ে নব।

কৃষ্ণ-চিকুর চিক্কণে-জ্যোতি ঢালা
চম্পকবনে যৌবন ফুলমালা
পল্লবছায়ে পরাবো তোমারে
মনোহরণের রূপসম্ভারে
লঘুহৃদয়ের কম্পিতক্ষণে।

ক্লান্ত আঁখির দৃষ্টিমোহন সুধা
পান করিবারে মোর জাগিয়াছে ক্ষুধা,
তন্দ্রাকাননে তুমি কি স্বপনে
অনিন্দিতা!
মদিরকান্তি-বিহ্বল পুলকিতা!

শ্রীমনোজ বসু

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যে খালের মুখে বাঁধ বসানো আছে, নতুন চরের জল নিকাশ হয় যে খাল দিয়ে—তারই ধারে এসে যমুনা হঠাৎ থামল। মুখ তুলে বলে, মরতে এসেছ কেন এখানে ?

পনের বছর পরে প্রথম এই সম্ভাষণ।

ঝাঁঝাল সুরে অমূল্য বলে, নেমন্তন্ন করে পাঠালে—আসব না ?

নেমন্তন্ন ? সবিস্ময়ে যমুনা তার দিকে তাকাল। ওঃ, নেমন্তন্ন করে এসেছিল বুঝি ?

রহস্যময় যমুনার ভাবভঙ্গি। অমূল্য জিজ্ঞাসা করে, ব্যাপার কি বলো তো ?

পালাও—

উদ্ধত অবাধ্য ভঙ্গিতে অমূল্য কাছে এগিয়ে এল।

কখনো নয়। কার ভয়ে পালাতে যাব ?

যমুনার স্বর হঠাৎ যেন অশ্রুসিক্ত হ'য়ে উঠল। বলে, পালিয়ে যাও অমূল্য-দা, পায়ে পড়ি তোমার—

অমূল্য স্তম্ভিত হয়ে তাকাল তার দিকে। মুখ দেখা গেল না। বলল, তুমি ডেকেছ, চাট্টি ভাত বেড়ে দিয়ে তুমি সামনে বসে খাওয়াতে চাও—এই বলে নিমন্ত্রণ করে এল। আর তুমি তাড়িয়ে দিচ্ছ বাড়ীর সীমানা পার করে এনে ?

তা-ই—

খালের ধারে ধারে সরু পথ চলে গেছে। আঙুল তুলে যমুনা সেদিকটা দেখিয়ে দিল।

আর দ্বিরুক্তি না করে অমূল্য হন হন করে চলল। অনেক দূরে গিয়ে একবার তাকিয়ে দেখে, যমুনার ছায়ামূর্ত্তি তখনও দাঁড়িয়ে আছে।

যমুনা বাড়ি এসে দেখে, রাখাল ফিরেছে। রাগে দাওয়ার উপর পায়চারি করছে আর হাঁকডাক করছে সেই দুটি লোক—ত্রিলোচন আর অতুলের সঙ্গে।

মুঠোর ভিতর পেয়েছিলাম, সরিয়ে দিয়ে এলে তো ?

যমুনা শান্ত কণ্ঠে বলল, আমার নাম করে কেন নেমন্তন্ন করে এসেছিলে ?

নইলে আসত না। ছেলেবেলা ভাব-সাব ছিল তোমাদের মধ্যে। তুমি ডেকেছ শুনে সে যেন বর্ত্তে গেল।

অথচ একটা মুখের কথাও আমাকে জানাও নি এ সম্পর্কে—

ত্রিলোচন বলল, এ সব পুরুষালি ব্যাপার মা, তোমায় আবার কি জানাতে যাবে ?

যমুনা রাখালের দিকে সোজা চেয়ে প্রশ্ন করল, তার মানে অবিশ্বাস করো তো আমাকে ?

রাখাল থাবড়ে গেল, জবাব দেয় না। জবাব দিল অতুল। তিক্তকণ্ঠে বলল, তা বড় মিথ্যেও বলো নি। অভিলাষ খুড়োর মেয়ে তুমি তো ! বিবাদ-বিসম্বাদ যত বাড়ছে, রায়বাড়ি খুড়োর যাতায়াতও বেড়ে যাচ্ছে ততই।

ত্রিলোচন বলে, আমরা অমূল্যর বিশেষ কিছু করতাম না, নিয়ে গিয়ে তে-ঘরার দিকে দিয়ে আসতাম। বলতাম, তোর বাপকে সবাই মানে-গণে, সকলের চোখের সামনে গোলাম-বৃত্তি করে মুখটা তার এমন করে পোড়াস নে। তাতে যদি হৈ-চৈ করত ; কানের নেতি দুটো কেটে দিতাম। এইটুকু শলাপরামর্শ হ'য়েছিল আমাদের, ওর অবস্থা দেখে শিক্ষা হত আর সকলের। কিন্তু সবই তুমি ভেস্তে দিয়ে এলে মা, একেবারে ওপারে পাঠিয়ে দিয়ে এলে।

যমুনা বলল, কিন্তু ওপারে সরিয়ে দিলাম ওদের বাঁচাবার জন্য নয়—কানের নেতি কাটার চেয়ে আরও বেশি শাস্তি দেওয়া যাবে বলে। মারধোর করে আর কতটুকু শাস্তি হয়, আর ওরা তো চাচ্ছেই এমনি একটা অজুহাত।

প্রণবের অপমান, তার উপর অমূল্যকে ফাঁদে ফেলবার এই রকম ষড়যন্ত্র। যারা এমন মরীয়া, তাদের সঙ্গে মিটমাট অসম্ভব—এ কথা নিঃসংশয়ে বোঝা যাচ্ছে এখন।

ইন্দ্রলাল ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে-চিন্তে কাজ-কর্ম্ম করেন। কিন্তু জামাইকে আহ্বান করে গ্রামে এনেছেন—চাষীদের কাছে তার এই লাঞ্ছনার কঠোরতম শোধ না নিলে কুটুম্বর সামনে মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না। আর এ-ও জানেন, এই ব্যাপারে পরাজয় মানলে আর কখনো রায়গ্রাম অঞ্চলে আসা চলবে না তাঁদের পক্ষে। খুব শলা-পরামর্শ হচ্ছে, ন'কড়ির মারফতে দু'হাতে অর্থবৃষ্টি করছেন।

একদিন হারু সর্দ্দারকে দেখা গেল রায়বাড়ি। নামকরা লেঠেল হারু, খুন-খারাবি করতে পিছপাও নয়। আইনের মারপ্যাঁচে অনেকবার ফাঁসির দড়ি থেকে পিছলে বেরিয়ে এসেছে। বড় বড় ব্যাপারে তার ডাক পড়ে। তাকে দেখে আঁৎকে উঠল অভিলাষ। তার বুদ্ধিতে এতদূর অবধি ঘটেছে। সে ভেবেছিল, ইন্দ্রলাল রায় গাঁয়ে এসে বসলেই তাঁর আভিজাত্য ও ঐশ্বর্য্যের জৌলসে, স্বর্গীয় রায়কর্ত্তা ও পূর্ব্ববর্ত্তীদের প্রতি আনুগত্যের স্মৃতিতে একদিনে ওরা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে—দুটো-একটা মিষ্টি বুলিতে কুকুরের মতো পায়ে পড়ে গড়াবে। কিন্তু উল্টে এখন যে দস্তুরমতো সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। ব্যাকুল হয়ে অভিলাষ দু-পক্ষেই ছুটোছুটি করে। ইন্দ্রলাল অবিবেচক নন। বলেন, তোমার কথায় কি হচ্ছে বলো ? ঝোঁকের মাথায় একটা খারাপ কাজ করে বসল—আসুক ওরা, এসে প্রণবের হাত-পা ধরাধরি করুক, সত্যি কি দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিতে পারব তখন ?

সঙ্গত প্রস্তাব। কিন্তু রাখালের কাছে গিয়ে বললে সে হাসে—যেন কত বড় একটা হাসির কথা, জবাব দেবারই কিছু নেই। তাদের মাথা খেয়েছে ঐ খোঁড়া বনমালী এসে।

একদিন সকালবেলা দেখা গেল, হারুর সঙ্গে অনেক লেঠেল টাপুরে নৌকোয় করে রায়গ্রামের ঘাটে নামল। ও-পারে নতুন চরের চাষীদের দেখিয়ে দেখিয়ে কিনা বলা যায় না—ঘাটে অনেকক্ষণ ধরে তারা হৈ-হৈ করল—নৌকো কোনখানটায় বাঁধা যায়, দাঁড়গুলো কাঁধে কাঁধে নিয়ে চলবে, না নৌকোয় থাকবে, লাঠি-সোঁটা সব নেমেছে কি না—এমনি সব বিলি-ব্যবস্থায়। তারপর সারবন্দি হয়ে রায়বাড়ি চলল।

অথচ নতুন চরে চঞ্চলতা নেই, চাষীদের চোখ-কান যেন বন্ধ—রায়গ্রামের সমারোহ কিছুই যেন টের পাচ্ছে না। নিজেদের ভিতর চুপি চুপি যুক্তি-পরামর্শ হয়েছে হয় তো—কিন্তু বাইরের ভাবভঙ্গিতে কিছু টের পাবার কথা নেই, অন্তত অভিলাষ তো পাচ্ছে না।

প্রহর খানেক বেলায় লেঠেলেরা হল্লা করে এপারে এসে পড়ল। কচি ধান-চারায় সমস্ত মাঠ ভরে গেছে। একটা ক্ষেতে নিড়ানি দিচ্ছিল দু-জন চাষী—সেইখানে এসে পড়ল।

ওঠ্ বলছি। চলে যা ক্ষেত থেকে।

ঘাড় তুলে তাকিয়ে পর্যান্ত দেখল না তারা। নিড়ানি চালিয়ে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই—ঘাস তুলে পাশে জমা করছে।

নকড়ি হাঁক দিয়ে উঠল—কথা কানে যায় না? খাস জমি—রায়বাবুদের দখল—

হারু হাতের লাঠি ধাঁ করে মেরে বসল একটির কাঁধে। হাতের নিড়ানি ছিটকে পড়ল, ভিজে মাটির উপর লোকটা মুখ গুঁজে পড়ল।

রণজয় করে তামাক খাচ্ছে তারা আলের উপর তালগাছের তলায় ঘিরে বসে। হাসি-মস্করা হচ্ছে। নকড়ি হেসে হেসে হারু আর মথুরা সিং-এর দিকে চেয়ে বলছে, রায়বাবুর কাণ্ড! খুব চটে-মটে গিয়ে মশা মারার জন্য কামান সাজিয়ে এনেছেন। ঐ তো রোগা ডিগডিগে ক'টি মানুষ—তাদের জব্দ করতে খবরা-খবর করে হারু সর্দ্দারের দলবল আনতে হল। ও কি! দেখ কাণ্ড—

পাড়া থেকে আবার দুজন বেরিয়ে, নিড়ানি দেওয়া যে-অর্দ্ধ হয়ে গেছে, ঠিক সেইখানে এসে বসেছে। নকড়ি বলে, ওঠো আর একবার হারু সর্দ্দার হুঁকো রেখে—

হারুর এবার নড়বার গরজ দেখা যাচ্ছে না। অলস ভাবে ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি তো পিটে এলাম একবার। যাও না তোমরা আর কেউ।

কারও বিশেষ আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। নকড়ি চটে গিয়ে বলে, এই রকম ঠেলাঠেলি করো তোমরা বসে বসে। ওদিকে ভুঁই নিড়িয়ে দখল সাব্যস্ত করে ওরা বাড়ী চলে যাক। অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট—বলে থাকে মিথ্যে নয়।

হারু বিরক্তভাবে দলের এক ছোকরাকে বলল, যা তো। মিছে-মিছি রায়বোয় করিসনে। মশা দুটোকে তাড়িয়ে দিয়ে আয়।

কিন্তু মশা হোক আর যাই হোক, তাড়ান সহজে হয়ে ওঠে না। কিছু ধাক্কাধাক্কিও করতে হলো শেষ পর্য্যন্ত। হিড় হিড় ক'রে টেনে তাদের তালতলায় এনে বসিয়ে রাখল নিজেদের মধ্যে।

একটু পরেই আবার দু'জন।

বেশ মশা তো! যেন তেঁতুলতলার বৃষ্টি—থামবে না, সমস্ত দিনই চলবে নাকি এই রকম?

ব্যাপার তা-ই বটে! দু'-দু'জনে এক একটা দল। দলের পর দল আসছে। দুপুর গড়িয়ে গেল।

হারু বলে, তা খামোকা মাথা গরম করছ কেন নায়েব মশায়? জমি নিড়োচ্ছে, ঘাস তুলে সাফ-সাফাই করে দিচ্ছে—ভালই তো, মানুষগুলোকে নাহক নাজেহাল করে লাভটা কি বলো?

নকড়ি একমুহূর্ত্ত তাকিয়ে থাকে তার দিকে। তার পর বলে, তার মানে তোমার আর গা নেই এই কর্ম্মে? তোমার যেন ইচ্ছে হচ্ছে, তামাক টামাক খেয়ে পাওনা-গণ্ডা বুঝে নিয়ে এখন বাড়ী চলে যেতে।

হারু বলল, কথা তো মিথ্যে নয়। লাঠিবাজি করতে পারি—দু'-ঘা বাড়ি খেয়ে রক্ত চনমনিয়ে ওঠে, তখন খুনখারাবি করতেও আটকায় না। কিন্তু মানুষগুলোকে গরু-ছাগলের মতো এমন একটানা পিটে পিটে কাঁহাতক পারা যায়? সত্যি ভাল লাগছে না মশায়, আমরা উঠলাম—দুপুর গড়িয়ে যায়।

তোমাদের আনা হয়েছিল কি—

দাঙ্গা করতে। কিন্তু কি করা যাবে, এক লাঠি যে বাজে না! বরঞ্চ ধান কাটার সময় ডেকো। তখন দৈবিধানে কাস্তে চালালে যদি রুখে এসে পড়ে ওরা।

নকড়ি তখন নরম হয়ে বলে, উঠছ সত্যি সত্যি? তা এসেছি যখন, পাড়ার ভিতরে ওদের ঘাঁটিটা দেখে যাওয়া যাক। কি বলো?

মথুরা সিং মাথা নাড়ল। কাজ নেই। বেকুবি হবে শেষটা। কত মানুষ জমেছে ঠিক কি?

হারু কিন্তু বিষম কৌতূহলী। যাদের ধরে ধরে এনে বসিয়ে রেখেছে তাদের দিকে ব্যঙ্গদৃষ্টিতে চেয়ে বলে, মানুষ—মানুষ এর কোনটা! ক্ষেতে মাটি ভাঙতে ভাঙতে এরাও সব মাটি বনে গেছে। অনেক দিন অনেক জায়গায় ডাক পড়েছে, কিন্তু এ-কর্ম্মে ঘেন্না ধরে গেল আজকে এই জায়গায় এসে।

পাড়ার ভিতর গিয়ে দেখবার লোভ সকলেরই—যেখান থেকে দু-দু'জন করে জোয়ারের জলের মতো অফুরন্ত মানুষ আসছে। আর একটা জিনিষ জানাও যাবে, কত লোক আছে এদের ভাণ্ডারে, কতক্ষণ ধরে চলবে এই প্রহসন। ভাণ্ডার ফুরিয়ে এসে থাকে তো দেখবে না হয় আরও দু-একঘণ্টা বসে।

দেখে এরা অবাক্। রাখালের উঠানে সব জমায়েত হয়েছে। ধামা ভরতি মুড়ি আর নারিকেল-কুচি। যমুনা মালায় করে ঢেলে দিচ্ছে একমালা দু'মালা। পরিতুষ্ট হয়ে সব খাচ্ছে। এই যে এত মানুষকে মেরে মেরে আটকে রেখেছে, তা বলে উদ্বেগের ছায়ামাত্র নেই কারো মুখে। অসংখ্য লোক—কেবল নতুন

চরের নয়, আশেপাশের গ্রাম থেকে আসছে দলে দলে। উঠানে স্থান সঙ্কুলান হওয়া দুর্ঘট হয়ে উঠেছে।

বনমালী এক প্রান্তে। নকড়ি কাছে গিয়ে বলল, রায় বাবু তোমায় ডাকছেন, ওপারে যেতে হবে।

রাখালদাস ভিড়ের ভিতর থেকে বলল,রায় বাবুই তো এপারে এলে পারতেন। বুড়োমানুষকে টেনে ওপারে নিয়ে যাওয়া—

মথুরা সিং ধরে নিয়ে যাবে! কাঁধে উঠে যেতে চায় তো তাও রাজি—বলে নকড়ি বিদ্রূপের হাসি হেসে উঠল।

এগিয়ে মথুরা সিং হাত ধরল। জনতা ঘিরে দাঁড়াল অমনি। ধানক্ষেতে যাচ্ছে এরাই—কিন্তু এখানে ভিন্নমূর্ত্তি। সুপুষ্ট পেশী-বহুল নগ্নগাত্র যোয়ান মরদেরা—সংখ্যায় হয় তো পঞ্চাশ ছাড়িয়ে যাবে। যে ক'জন এরা এসেছে, মনে মনে প্রমাদ গণল।

বনমালী মৃদু হেসে বলল, উঠে দাঁড়ালি কেনরে তোরা? মুড়ি-টুড়ি যেমন খাচ্ছিলি খা না। রায় বাবু ডেকেছেন—শুনে আসি। হয়তো সদ্বুদ্ধি জেগেছে তাঁর—আপোষ হয়ে যাবে।

অবিশ্বাসের ভাবে চাষীরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। তবু সকলে বসে পড়ল। বনমালী বলছে, না বসে উপায় কি?

[ক্রমশঃ

"সত্যেন্দ্র-কাব্যে স্বদেশপ্রেম"

শ্রীগোপালচন্দ্র সাধু

আজ সুদীর্ঘ ২৩ বছর হোল ছন্দ-সম্রাট সত্যেন্দ্রনাথের কণ্ঠের ভাষা নীরবতা লাভ করেছে। রবীন্দ্র-যুগে জন্মগ্রহণ করে লোকোত্তর প্রতিভাগুণে যে এক আধজন কবি রবীন্দ্রপ্রভাকে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন, সত্যেন্দ্র-নাথ সেই দুর্লভ বাণী-পূজারীদেরই একজন। সত্যেন্দ্রনাথ 'ছন্দসম্রাট' রূপেই সর্ব্বাধিক পরিচিত; কিন্তু ছন্দ ছাড়াও কাব্য সাহিত্যের বহুদিক তিনি অলঙ্কৃত করেছিলেন, বহু সুর, বহু ভাব, বহু বাণী তিনি দিয়ে গেছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি "কাব্যে সত্যেন্দ্রনাথের স্বদেশ প্রেম' সম্বন্ধে আলোচনা করব।

সতেন্দ্রনাথ কবিতার মধ্য দিয়ে দেশের মনীষীদের প্রায় সকলেরই বন্দনা গান করেছেন। তিনি দেশপ্রেম-মূলক সঙ্গীত রচনা করেছেন; বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী কবিতায় রূপান্তরিত করেছেন, সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে অনেক কবিতা লিখেছেন, ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে আমাদের চেতনা জাগিয়েছেন; দেশের আশা ভরসার স্থল ছাত্র ও যুব-সমাজর চরকা, খদ্দর—তাদেরও বন্দনা করেছেন।

সত্যেন্দ্রনাথ স্বদেশকে ভাল বেসেছিলেন, মাতৃভূমিকে চিনতে পেরেছিলেন। বাংলাদশ, তার প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য মনীষিবৃন্দের সাধনা, তার অতীত কীর্ত্তি-কাহিনী কবিকে অনুপ্রাণিত করেছিল। কবি ছেলে-বেলাতেই বাংলা দেশকে স্মরণ করে বাউলের সুরে গীত 'কোন দেশে' কবিতা লিখেছিলেন—

"কোন দেশেতে তরুলতা—
সকল দেশের চাইতে শ্যামল?
কোন দেশেতে চলতে গেলেই
দলতে হয় রে দূর্ব্বা কোমল?
কোথায় ফলে সোনার ফসল,—
সোনার কমল ফোটে রে?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরি বাংলা রে।"

কোন্ দেশে দোয়েল, শ্যামা, ফিঙে, বাবুই, চাতক পাখী কূজন করে? কোন ভাবায় মন প্রাণ আকুল হোয়ে ওঠে? কোন দেশের দুঃখ-গৌরবে আমরা হর্ষ-বিষাদ অনুভব করে?—কবি বলেছেন, সে আমাদের এই সোনার বাংলা দেশ।

তাঁর 'গান' নামক কবিতাতেও তিনি বলেছেন—

"মধুর চেয়েও আছে মধুর—
সে এই আমার দেশের মাটি,
আমার দেশের পথের ধূলা
খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি!
চন্দনেরি গন্ধ ভরা,
শীতল করা, ক্লান্তি হারা,
যেখানে তার অংগ রাখি,
সেখানটিতেই শীতল পাটি।"

আবার বাংলা দেশের দুঃখ-দুর্দ্দশায় তাঁহার বুক ফেটে গিয়েছে। তিনি বলেছেন—বাংলার ক্ষেতের ধান সব জাহাজ বোঝাই হয়ে বিদেশে যায়, দেশের লোক খেতে পায় না, 'অন্ন-সুধা বংগে ফেরে গরল হয়ে সর্ব্বনেশে', বনের কাপাস বনেই মিলিয়ে যায়, দেশে দারুন বস্ত্র-কষ্ট হয়। তাই কবি ব্যথিতা বংগজননীকে ডেকে বলেছেন—

'কে মা তুই বাঘের পিঠে ব'সে আছিস বিরস মুখে?'

কিন্তু বংগ জননীকে যে জাগাইতেই হবে! তাই তিনি মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছেন—

"ত্রিশূল তুলে নে মা আবার রূপের জ্যোতি পরকাশি,
ভয় ভাবনা ভাসিয়ে দিয়ে হাস আবার তেমনি হাসি।
চরণ তলে সপ্ত কোটি সন্তানে তোর মাগেরে
বাঘেরে তোর জাগিয়ে দে গো, রাগিয়ে দে তোর নাগেরে।
সোনার কাঠি, রূপার কাঠি—ছুঁইয়ে আবার দাওগো তুমি,
গৌরবিণী মূর্ত্তি ধর—শ্যামাঙ্গিনী বংগভূমি!

'স্বর্গাদপি গরীয়সী' কবিতাতেও তিনি ঠিক এই ভাবই ব্যক্ত করেছেন। বংগভূমি অতিশয় উর্ব্বরা, বিদেশীরা একে শোষণ করার সুযোগ পেয়ে এ দেশবাসীকে পরাধীন করে রেখেছে। কবি দুঃখ করে বলেছেন—

"অসুরে ঘিরেছে, হায়, কল্প-তরুবরে
দেবতার কামধেনু দানবে দুহিছে!
আজি হ'তে অন্বেষি 'ফিরিব ঘরে ঘরে,
কোথা ইন্দ্র?—ব'লে দেগো, কাঁদিসনে মিছে।
সে যে তোরে অস্থি দিয়ে গড়ে দিবে আসি,
অয়ি বংগ! অয়ি স্বর্গ! অয়ি গরীয়সি।"

গংগাহৃদি বংগভূমি' কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ নিখিল বংগের বন্দনা গান করেছেন। তিনি বলেছেন—

"ধ্যানে তোমার রূপ দেখি গো স্বপ্নে তোমার চরণ চুমি,
মূর্তিমন্ত মায়ের স্নেহ! গংগাহৃদি বংগভূমি!
তুমি জগৎধাত্রীরূপা পালন কর পীযূষ দানে,
মমতা তোর মেদুর হোল, মধুর হোল নবীন ধানে।
পদ্ম তোমার পায়ের অংক ছড়িয়ে আছে জলে স্থলে,
কেয়া ফুলের স্নিগ্ধ গন্ধ—নিশাস সে তোর,—হৃদয় বলে।
সাগরে তোর শংখ বাজে—শুনতে যে পাই রাত্রি দিবা,
হিমাচলের তুষার চিরে চক্র তোমার চলছে কিবা!
দেখছি গো রাজ-রাজেশ্বরী মূর্তি তোমার প্রাণের মাঝে,
বিদ্যুতে তোর খড়্গ জলে, বজ্রে তোমার ডংকা বাজে।"

বংগমাতা অন্নদাতা, তার শস্যের গোলায় ধানের অভাব নেই। ভাঁটফুল, বকুল, নাগকেশরেরা চারিদিকে ফুটে থাকে। শালিক, চাতক, কোয়েল গান গেয়ে বেড়ায়, প্রজাপতি রেশম যোগায়, কাপাস, পশম সৃষ্টি করে। বাংলা মায়ের ভাণ্ডারে চাবি দেওয়া থাকেনা, তার সোনা সব বাইরে ছড়িয়ে আছে। সে সোনা মাটিতেই ফলে। 'মুক্তা' তার ঝিলেই ফলে, 'সোনা' তার নদীতেই থিতিয়ে থাকে। ব্রহ্মপুত্র, গংগা, তিস্তা, কর্ণফুলী নদী বাংলার চারদিকে প্রসারিত। প্রাচীন বাংলায় দুর্জ্জয় সৈন্যবাহিনী ছিল, এমন কি বিজয়সিংহ সিংহলদেশ জয় করেছিল। বাঙালীর সিদ্ধসাধক নেপাল, ভুটান, তিব্বত, চীন, জাপান—চতুর্দ্দিকে সিদ্ধিবর্ত্তিকা হাতে জ্ঞানের মশাল জালিয়ে এসেছে। বাংলার নদ-নদী পলিমাটি দিয়ে দেশকে সরস করে তুলেছে। কে বলে বাংলার কিছুই নেই? বাংলা যে চিরগৌরবিণী।

সত্যেন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের বন্দনা-গান করেছেন অপরূপ 'ছালিক্য ছন্দে' 'ভারতের আরতি' কবিতায়—

"জয় জয় ভারত! বিশ্বের স্তুতা!
পৃথ্বীর তিলক! তীর্থভূতা!
মন্দার-মুকুল! নন্দন চ্যুতা! জয় জয়!"

সাগর ভারতবর্ষের পায়ে লুটিয়ে প'ড়ে তার বন্দনা গান করে। গান্ধার, ইরাণ, মিস্রাম, মিতান, চীন, শ্যাম, জাপান চারদিকে ভারতের কীর্ত্তি লুটিয়ে আছে। ছয় ঋতু ভারতবর্ষকে ফলে-ফুলে শস্য-সম্পদে ভরিয়ে তোলে। ঋক্, সাম প্রভৃতি বেদধ্বনি ভারতেই উচ্চারিত হয়। বিক্রমা'দত্য, প্রতাপসিংহের বীরত্ব, বুদ্ধের মুক্তির বাণী সারা জগতে প্রচারিত। তাই—

"অর্হ‍ৎ শ্রমণ তীর্থঙ্করে
গৌরব তোমার কীর্ত্তন করে,
সৌরভ তোমার অম্বর ভরে! জয়! জয়!"

গঙ্গা-যমুনা ভারতবর্ষের সমস্ত গ্লানি ধুয়ে নিয়ে যায়। ভীম পর্ব্বত প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে। ভারতবর্ষের জয় হোক!

"জয় জয় ভারত! আত্মার দাতা
আকবর—অশোক—ভীষ্মের মাতা।
অক্ষয় তোমার কল্যাণ-গাথা! জয়! জয়!

কবি সত্যেন্দ্রনাথের অনন্ত স্বদেশপ্রেমের নিদর্শন পাই আমরা তাঁর 'ফরিয়াদ', 'দাবীর চিঠি' এবং 'ইজ্জতের জন্য' এই তিনটি বিখ্যাত কবিতায়। জালিয়ান ওয়ালাবাগে জেনারেল মাইকেল ও ডায়ারের বর্ব্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের মর্ম্মব্যথায় কবি 'ফরিয়াদ' কবিতায় লিখেছেন—

"ধূলির অধম নালিশ জানায় তোমার পায়ে
ত্রিভুবনের রাজা!
তৃণের চেয়েও নম্র যারা, কেন প্রভু এত তাদের সাজা?
কোন্ অপরাধ প্রমাণ হতে ধাক্কা দিয়ে
অন্ধ প্রমাদ-মাঝে
যাচ্ছে নিয়ে ত্রিশ কোটিরে ডুবিয়ে মুহু
ধিক্কারে আর লাজে!
নিরেট নিতাজ অবজ্ঞাতে জ্যান্তে মরে
আছি অগৌরবে!

মড়ার পরে মারবে খাঁড়া—সয় ব'লে কি
সত্যি সবই সবে ?
আপীল-শূন্য পুলিশ-জুলুম আইন নামে
কায়েম হ'ল দেশে,
রদ হোল না রৌলট—পালট, তিরিশ কোটির
আর্জি গেল ভেসে !
ভুয়ো জেনেও ডায়ার্কি হায় ডায়ার কুলের
চোখ টাটালো ভারি,
আমলাতন্ত্র মারণ-মন্ত্র আগে ভাগেই রাখল করে জারি।
নিষ্কলঙ্ক স্বদেশ-নিষ্ঠ, নির্ব্বাসনে সইলে সে নিগ্রহ,
সিভিলিয়ান মা শীতলার অতি শীতল হ'ল অনুগ্রহ !
ছুটল প্রজা করতে নালিশ, ছুটল গুলি
ফরিয়াদীদের পরে,
লিগাড় সব বিগড়ে দিলে, দেখলে জুজু
আঁৎকে না-হক্ ডরে।"

এরপর কবি জালিয়ানওয়ালাবাগে হত্যাকাণ্ডের যে মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্য এঁকেছেন, তা পাঠ করতে গিয়ে শোকে, দুঃখে, পরাধীনতার মর্ম্মজ্বালায় মানুষ স্থির থাকতে পারে না—

"মূর্ত্তিমন্ত দম্ভ এলেন অমৃতসরে মৃত্যু মশাল জ্বেলে,
ইতিহাসের পৃষ্ঠা 'পরে ধৃষ্টতারি নিবিড় পংক ঢেলে।
চিঁড়িয়া গাড়ী, শাঁজোয়া-গাড়ী সাজিয়ে এলেন
মারতে নিরস্ত্রেরে,
'বেবিকিলার' জাঁদরেল এলেন জাঁলিয়াবাগে,
জবর ফৌজ ঘেরে,
ভাঙতে সভা বললে নাকো, বললে নাকো,
'নইলে সাজা হবে,'
হঠাৎ সুরু মৃত্যু-বৃষ্টি। আকাশ বধির আর্ত্ত-কলরবে !
দুষ্প্রবেশের সব আকাশ আটক করে বর্ব্বরতার গুরু,
মানুষ নামের কলঙ্ক, হায়, করে দিলে
থামকা খুন সুরু !
বিশ হাজারের নিবিড় ভিড়ে চালিয়ে গুলি
ফুরিয়ে টোটার পুঁজি
খুন-জখমের খানজা খাঁ শেষে ঘরে ফিরে
গেলেন সোজাসুজি—
চলে গেলেন ফৌজ নিয়ে, খোস মেজাজে
বাহাল তবিয়তে,
দেখলে নাকো ফিরেও বারেক মরছে কারা
ধুলার পরে, পথে !
পেলে না জল-গণ্ডূষও হায় শুষ্ক তালু জখম মানুষগুলো,
বাঁচতো যারা ওষুধ পেলে, ওষুধ বিনা হ'ল
পথের ধুলো।
বৃদ্ধ ও নিরপরাধ কত পড়ল মারা বাচ্চা নিয়ে বুকে,
গুলির ঘায়েল জোয়ান ছেলে সারাটা রাত
কাৎরে ম'ল ধুঁকে।
ময়দানেতে খেলতে এসে ভিড় দেখে হায়
গি'ছল জ'মে যারা,
দুধের ছেলে মায়ের দুলাল মায়ের কোলে
ফিরল না আর তারা।
অজ্ঞ কৃষাণ গ্রাম ছেড়ে যে এসেছিল
বৈশাখী মেলাতে,
না-হক তারা প্রাণ খোয়ালে স্বেচ্ছাচারীর
বীভৎস উৎপাতে!
ঘরে ঘরে পুত্রহারা, ভর্ত্তৃহারা, ভ্রাতৃহারা নারী
গুমরে কাঁদে, পঞ্চনদে মুলুক-জোড়া
ফৌজী আইন জারী !
আসামী বুক ফুলিয়ে বেড়ায়,—স্বর্গে মর্ত্ত্যে কেউ
দিতে নেই সাজা,
'সিমলাওলা সামলে নেছেন,' জুলুম বলে,
'বাজা রে বুক বাজা !'

ভারতবর্ষ নীরবে এ দুঃখ সইল না; 'নন্‌কো-বাদের শঙ্খ হঠাৎ উঠল বেজে ভারত গগন ব্যেপে,' 'চিত্তরঞ্জন সব কিছু ত্যাগ করে তার পিছনে ছুটে এলেন,' 'গান্ধী দিলেন পুণ্য গন্ধে ভ'রে,' 'নেহরু দিলেন নহর কেটে,' আলি ভাইরা যোগ দিলেন, দেশাত্মবোধে সারা ভারত জাগ্রত হয়ে উঠল। ডায়ার তখন সাগরপারে সাধুর পোষাক পরে প্রচার করছেন 'মিউটিনিটা বাঁচিয়ে দিলাম' বলে। কবি বলেছেন—

"হাট হাতে ফের বেরিয়েছে কে, মরি মরি
ভারত-প্রেমী-ই বটে।
মেহেরবাণী করলে ডায়ার ! ভারত জুড়ে
তাড়িৎ বার্ত্তা রটে !
খুন করেছে কালকে যাদের, স্ত্রী-পুত্রদের
তাদের কিছু দেবে,
বক্তৃতাতে কুড়িয়ে কড়ি এমনি কাঙাল
রেখেছে হায় ভেবে !
ভারত-প্রজায় ; এমনি ঘৃণ্য এমনি মনুষ্যত্ব শূন্য তারা,
ক্ষুধার তাড়ায় পুত্রঘাতীর 'খুন'মাখা হাত
চাটবে কুকুর পারা,—
তাইতে কড়ি করছে জমা, ভিক্ষা দেবে শুনছি
ঘৃণার বাণী,
অমৃতসরে নারী-নরে ডায়ার শেষে করবে মেহেরবাণী !
"কে নিবি আয় শোণিতমূল্য" হাজার
[illegible] আর্ত্তনাদে,

জালিয়ানবাগের রক্ত-কাদায়, শব কোলে ওই
রতন-দেবী কাঁদে !
সে কি নেবে স্বামীর মূল্য ? সে প্রথা তো
নেই এ দেশে, প্রভু !—
ভারত-নারী মরবে ক্ষুধায়, স্বামীর মাথার
দান নেবে না কভু।
খৃষ্টজনের মেহেরবাণী হারাম বলে জানে
মুসলমানে,
হিন্দু-শিখের গোরক্ত সে, কে ছোঁবে তায়,
নেবে সে কোন্ প্রাণে ?"

'দাবীর চিঠি' কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন—

'চক্রধরের চক্র যখন ঘুরছে বেগে মর্ত লোকে,—
অধঃপাতের তলায় মানুষ উঠছে ঊর্ধ্বে সূর্য্যালোকে—
পোলাণ্ড্ হচ্ছে স্বয়ম্ভু,—পাচ্ছে ইরিণ পাকা পাটা,
তখন যে হোমরুল চেয়েছে খুব বেশী কি তার চাওয়াটা' ?

কবি বলেছেন—বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তির বনিয়াদ শুধু ইংরাজরাই গড়েনি, এদেশবাসীও তাতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল ; এরা বৃটিশের জন্য ভারতের বাইরেও রাজ্য স্থাপন করিয়ে দিয়ে এসেছে। এই সেদিনও মহাযুদ্ধের সময় ভারতবাসী ইউরোপের রণক্ষেত্রে শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিয়ে এসেছে। ভারতবাসী কিসে আজ অযোগ্য ? বাগ্মিতায়, শিল্পে, রাজনীতিতে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, ভারতবাসী আজ জগতের সমস্ত স্বাধীন ও উন্নতিশীল দেশের সমতুল্য। তাই বলেছেন—

"ন্যায়ের দাঁড়িপাল্লা দিয়ে করলে ওজন দেখতে পাবে,
আমরা নেহাৎ কম যাব না, যদিও আছি পরের তাঁবে !

ভারতবাসীর 'যোগ্যতা' নেই ? কবি বলেছেন—

"···দেখ চেয়ে মানব-ইতিবৃত্তময়
কালার দানের অংকগুলি গোরার চাইতে মলিন নয়।'

(গোরা) ইংরাজদের 'মিলটন' আছে, আমাদের (কালাদের) কবি বাল্মীকি ব্যাস। ওদের রাজা 'জন', আমাদের রাজা বুদ্ধ, অশোক। ওদের ঋষি মার্টিনো, আমাদের ঋষি জনক, যাজ্ঞবল্ক্য। ওদের যোদ্ধা ক্লাইভ, মারলব্রো—আমাদের যোদ্ধা রঘু, রাজেন্দ্রচোল। গোরাদের পণ্ডিত নিউটন, কালাদের পণ্ডিত আর্যভট্ট। ওদের ধর্ম্মপ্রচারের জন্য 'খৃষ্টীয় মিশন' আছে, আমাদেরও বৌদ্ধ মিশন আছে। ওদের হিউম, মিলের মত আমাদেরও কণাদ, কপিল আছেন। এমন কি, ওদের ওষুধ বীচমস্ পীলের মত, আমাদেরও 'অমৃত প্রাশ' আছে। ইংরেজদের কূটনীতিবিদ্ যদি 'ডিজরেলী' হয়, তবে আমাদেরও চাণক্য আছেন। সেই আমাদের গোরাদের মত 'ম্যাগ্‌নাকার্টা' কিন্তু Bill of Rightsই ত জীবনের শেষ কথা নয় ! কবি ওদের তীব্র শ্লেষ করে এবার বলেছেন—

"কালার কীর্ত্তি মিশর-দ্রাবিড় আরব-চীনের সভ্যতা,
গোরার কীর্ত্তি ?—ডাইনামাইট—সভ্য করার দ্রব্য তা !
গোরা যারে ভব্যতা কয় তিন্‌শো বছর বয়স তার,
কালার যা' গৌরবের জিনিষ—তার অন্ততঃ তিন হাজার"।

আমরা নয় রংয়েই কালো, তাই বলে কি আমাদের স্বাধীনতা দেবে না ? তবে কেন—'দাবীর কথা' পাড়তে গেলেই কুঁচকে ভুরু দাবড়ি দাও ?' কবি আবার শ্লেষ করে বলেছেন—

'বোয়ার পেলে, চোয়াড় পেলে, পেলে তাদের দোহারগণ,
মোদের ভাগ্যে খোঁয়াড় শুধু, বুঝতে নারি এ কেমন।"

কবি বলেছেন—

"ঘর শাসনের দাও অধিকার, হোমরুলে কি এতই দোষ ?"

আফ্রিকার ভারতীয়দের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে কবি "ইজ্জতের জন্য" নামে এমনই আর একটি দেশাত্মবোধক কবিতা লেখেন—

"অপমানের মৌন দাহে চিত্ত দহে তুষানলে ;
জাতীয় এই প্রায়শ্চিত্ত না জানি কোন্ পাপের ফলে !
ক্ষুব্ধ সাগর আন্‌ল খবর হাল আইনে আফ্রিকাতে
রঙের দায়ে ভারত-প্রজা নিগৃহীত নিগ্রো মারে !
ফুটপাথে তার উঠ্‌তে মানা, জরিমানা উঠলে ভুলে,
নাই অধিকার কিছুতে তার কেনা-বেচার লাভে···মূলে।
মাথার উপর মাথট আছে আঘাত দিতে অসম্মানে,
'জিজিয়া কর' দিচ্ছে আজি হিন্দু এবং মুসলমানে।"

শস্তের মজুরীতে ভারতবাসীরা খনির কাজে, আখের চাষে ওদেশবাসী ইংরাজদের ধনী করে দিয়েছে ; কিন্তু তারাই যখন অল্পলাভে ব্যবসা জমিয়ে প্রতিযোগী দোকানদার হয়েছে, তখনই গোরা বোয়ার মুদী মাকাল ক্ষেপে উঠেছে। অমনি তখনই নূতন নূতন আইন জারী হয়েছে —'ভারতবাসী কাল', 'ভারতবাসী দুষ্ট', 'তাদের বিয়ে সিদ্ধ নয়, কারণ তারা বহুপত্নীর স্বামী বলে দুশ্চরিত্র' ইত্যাদি ইত্যাদি। অথচ এই ভারতবাসীই ইংরাজদের হয়ে—

'আফ্রিকায় সে ফসল ফলায়, হংকংএ সে শান্তি রাখে,
অর্থে তাহার রক্তে তাহার ব্রিটিশ-প্রতাপ বর্ধমান,
তিব্বতে সে দৌত্য করে, শ্রেষ্ঠ কবি তাহার দান।'

কবি এবারে বিধান করতে চেয়ে বলেছেন—

"রাজা শুধু বিরাজ করেন, রাজ্য করে কিংকরে,
দশের উচিত শুধ্‌রে দেওয়া ভৃত্য যদি ভুল করে,—
রাজার ভৃত্য ভুল করেছে, আমরা সে ভুল কাটতে চাই,
বোয়ার-বিধির বর্বরতা আমরা ঈষৎ ছাঁটতে চাই।"

সবাই এবার মহাত্মা গান্ধীর-নেতৃত্বে অহিংস আন্দোলনে

যোগ দিয়েছে, তারা প্রতিবাদে বুক বেঁধেছে, তারা অত্যাচার সহ্য করেছে, তারা স্ত্রী-পুত্রে দলে দলে জেলে যাচ্ছে, তবুও এ অপমানকর আইন মাথা পেতে নিচ্ছে না। দূরপ্রবাসী সেই-সব ভারতবাসীরা আজ নিজেদের মর্য্যাদা-রক্ষায় বীরত্বের সংগে লড়াই করছে। কবি বলেছেন—

"আজকে তাদের বন্ধ সারং, মাদল মৃদং মৌন হায়,
সবাই যদি মন কর তো আবার তারা সাহস পায়।"

তাই এদের ইজ্জত বাঁচাবার জন্য কবি তাঁর বীণা বাজিয়ে দেশবাসীর কাছে সাহায্য চাইছেন—

"ইজ্জতে হাত পড়ল জাতির, 'জোৎ' বেচে সে
রাখতে হবে—
সাহায্য দাও সাহায্য দাও সাহায্য আজ দাও গো সবে।
দাও সাহায্য দেশের পুরুষ! পৌরুষের আজ জন্মতিথি,
দশের সংগে যোগ যে তোমার মনে তাহা
জাগুক নিতি।
দাও গো কিছু ভারত-নারী! ভারত-নারীর অমর্যাদায়,
নিজের অমর্যাদা তোমার, ঘুচাও নারী!
নারীর এদায়।
দাও জমিদার! দাও অফিসার! লাটসাহেবের
হুকুম আছে.
দাও কিছু দাও স্কুলের বালক! কিছুও যদি
থাকে কাছে!"

ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক 'চরকা'র গান কবি অনেকগুলি কবিতাতেই করেছেন। তাঁর 'চরকার গান' নামক কবিতায় আছে—

'চরকায় সম্পদ্, চরকায় অন্ন,
বাংলায় চরকায় ঝল্‌কায় স্বর্ণ!
বাংলার মস্‌লিন্, বোগদাদ্ রোম চীন
কাঞ্চন তৌলেই কিনতেন একদিন।
চরকার ঘর্ঘর শ্রেষ্ঠীর ঘর-ঘর।
ঘর-ঘর সম্পদ্—আপনায় নির্ভর।
সুপ্তের রাজ্যে দৈবের সাড়া,—
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া!
চরকাই লজ্জার সজ্জার বস্ত্র।
চরকাই দৈন্যের সংহার-অস্ত্র।
চরকাই সম্মান চরকাই সম্মান।
চরকায় দুঃখীর দুঃখের শেষ ত্রাণ।"

তাঁর 'চরকার আরতি' নামক কবিতাতেও তিনি চরকার বন্দনা করেছেন—

"এস এস চির-চারু চির-চেনা চরকা!
এস ঘরে শ্রীর পাদপদ্মের ভোমরা!
অপলক চক্ষের জেলে কোটি দেউটি
তোমায় আরতি করি ত্রিশকোটি আমরা।"

শিবের কপালে যে চাঁদ আছে, সে চাঁদের বুকে চরকার স্বস্তিক মূর্ত্তি আঁকা আছে। চরকা ঘরে ঘরে বস্ত্রের সংস্থান ক'রে আনন্দ দান করে। কবি বলেছেন—

"যে দেশে বানাত টুপি নিজ হাতে বাদ্‌শা,
পদতলে ছিল যার দিল্লীর তক্ত,
চরকার চর্চায় সেথা কার লজ্জা?
হিন্দু ও মোস্‌লেম চরকার ভক্ত।"

[২]

সত্যেন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমান মিলনের পক্ষপাতী ছিলেন। তাই তিনি 'ফুল শির্ণি' কবিতায় গেয়েছেন—

"পূর্ণিমা রাতি! পূর্ণ করিয়া
দাও গো হৃদয় প্রাণ;
সত্যপীরের হুকুমে মিলেছে
হিন্দু মুসলমান!
বীর পুরাতন,— নূর নারায়ণ,—
সত্য সে সনাতন;
হিন্দু মুসলমানের মিলনে
তিনি প্রসন্ন হন।"

শিশুদের মধ্যে ভাবী কালের মহাপুরুষ লুকিয়ে আছে; কবি সেই ভবিষ্যতের মহাপুরুষদের বন্দনা গান করেছেন তাঁর 'ছেলের দল' কবিতায়—

"সকল দেশে সকল কালে উৎসাহ-তেজ অচঞ্চল
ওই আমাদের আশার প্রদীপ, ওই আমাদের
ছেলের দল।"

কবি ছেলের দলের উপর পরম ভরসা করে আছেন। কারণ ওরাই দেশের শিক্ষা-জীবনকে পুষ্ট রাখে, অন্নহীনে অন্ন দেয়, পুরাতনে শ্রদ্ধা করে, দেশ-বিদেশ থেকে বিদ্যা আহরণ ক'রে আনে। কবি বলেছেন—তাদের মাঝে দোষ ত্রুটি থাকতে পারে, তবে তারা শিশু; তারা দেবতাও নয়। কিন্তু—

"তবু ওরাই আশার খনি,—
সবার আগে ওদের গণি,
পদ্মকোষের বজ্রমণি ওরাই ধ্রুব সুমঙ্গল;
আলাদিনের মায়ার প্রদীপ
ওই আমাদের ছেলের দল।"

সত্যেন্দ্রনাথ জাগ্রত ভারতের চিত্র এঁকেছেন তাঁর 'নবজীবনের গান' কবিতায়। তিনি আহ্বান করেছেন—

"বাজায়ে শঙ্খ, সাজা দীপমালা,
হাতে হাতে আজি মিলা রে ভাই!
ভারতে উদয় হয় মহাজাতি,
এসেছে সময় দেরী তো নাই।"

নিশান উড়িয়ে যুবনপ্রাণ আজ স্বাধীনতার গান গেয়ে চলেছে। কবি বলেছেন—আজ সব ক্ষুদ্রতা বিরোধ ভুলে, উচ্চনীচ-ভেদাভেদ ভুলে, সবাই একজাতি হয়ে মিলে যাও। 'নেশন' গড়ার জন্যে জাপান যদি দাবী ছেড়ে এক হবার ব্রতে সফল হোয়ে উঠ্‌তে পারে, তবে আমরাও কি তা পারব না? নয়ত বৃথাই আমরা ক্ষত্রিয় ও ঋষির বংশ বলে আত্মপরিচয় দেই। আমরা সূর্য্যবংশের লোক বলি, কিন্তু বিজাতিরে খাজনা দিই। রক্ত আজ উচ্চ জাতির মস্তকে সঞ্চিত হয়ে বিকারগ্রস্ত হয়েছে; তা সকল দেহের ও লোকের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে স্বাস্থ্য ফিরাক, শক্তি ফিরাক। এক ব্রহ্মগানে আমাদের ভেদ-বিভাগ সব দূরে চলে যাক; আমরা প্রেমের সূত্রে এক মহাজাতি গড়ে তুলি। আজ যদি আমরা এক মহাজাতি হয়ে মিলতে পারি, তবে গ্রীকরাণী সহ চন্দ্রগুপ্ত আমাদের শিরে পুষ্পবৃষ্টি করবে, কণাদ এবং মহীদাস-মাতা আশীর্ব্বাদ করবে, তপতী এবং সত্যবতী কল্যাণ কামনা করবে, বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ শুভাশীষ দান করবে, বিষ্ণু ও রমা, রুদ্র ও উমা সে মহামিলন দেখে অমোঘ বর দান করবে। ভারতে বিভিন্ন দেশের লোকের ও বিভিন্ন জাতির রক্তের সংমিশ্রণ ঘটে গেছে। সুতরাং আজ আমরা বাহান্ন পীঠ এক হয়ে মিলে যাই। আজ—

"মহাজীবনের বার্তা এসেছে,
মহামিলনের লয়ে নিশান,
ডাকে ভবিষ্য, ডাকিছে বিশ্ব,
করিছে ইসারা বর্তমান।"

ঠিক এই ভাবই স্বদেশী আন্দোলনের সময় কবি 'সন্ধিক্ষণ' নামক কবিতায় প্রকাশ করেছিলেন—

"বৎসরান্তে ভাদ্রশেষে শুধু একবার
কূল প্লাবি' আসে যে জোয়ার,
তাহার তুলনা নাই; সমস্ত বৎসরে
সে জোয়ার আসে একবার।
সে জোয়ার এসেছে রে
আমাদের ঘরে ঘরে
এসেছে রে নূতন জীবন,
বাঙ্গালী পেয়েছে আজ সামর্থ্য নূতন।"

'আশার কথা' নামক আর একটি কবিতাতে সত্যেন্দ্রনাথ ঐ ধরণেরই আনন্দ প্রকাশ করেছেন—

"জননী গো আজি ফিরে—
জাগিতেছে তব সন্তান সব
গঙ্গার উভতীরে!
বাড়িতেছে তব কুটীরে,
[illegible]
সন্তান কোটি কোটি গো,
দৃঢ় উন্নত শিরে!
আর নহে কেহ অসুখী,
জননীর ভার শিরে আপনার
তুলে নেছে নব বাসুকি,—
শত সহস্র শিরে।"

সত্যেন্দ্রনাথ সমাজ-সংস্কারক ছিলেন; তাই তাঁর কাব্য-সাহিত্যে সমাজ-সংস্কার-মূলক কয়েকটি কবিতাও দেখতে পাই। 'নির্জলা একাদশী'কে তিনি ব্যঙ্গ করে বলেছেন—

"সুজলা এই বাংলাতে হায়, কে করেছে সৃষ্টি রে—
নির্জলা ওই একাদশী—কোন্ দানবের দৃষ্টি রে!
শুকিয়ে গেল, শুকিয়ে গেল, জ্বলে গেল বাংলা দেশ,
মায়ের জাতির নিশ্বাসে হয়—সকল শুভ ভস্মশেষ!"

'মৃত্যু-স্বয়ম্বর' নামক কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ পণপ্রথার বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন। বাবা পণের টাকা যোগাড় করতে পারছে না, সেই কষ্ট দেখে মেয়ে আগুনে পুড়ে আত্মহত্যা করে মরল। কিন্তু তাতেও পুরুষ জাতির পৌরুষ নষ্ট হোল না! দেশ জুড়ে আজ অর্থপিশাচ হৃদয়হীন বরের বাপরা রাজত্ব করছে। কবি তাদের শ্লেষ করে বলেছেন—

'পুত্রবস্ত বেহাই ঠাকুর বেহায়-জায়া বেহায়া,
বামন অবতারের মত যার করেছে তে-পায়া।
ধার করেছেন পুত্রবস্ত, উদ্ধারিবে মেয়ের বাপ,
অকর্ম্মণ্য অহল্যাদের নইলে মোচন হয় কি শাপ!
এদের নিশ্বাস লাগ্‌লে গায়ে বুকের রক্ত যায় থামি;
চোখ রাঙিয়ে ভিক্ষা করে সমাজ-মান্য গুণ্ডামি।"

পুরুষেরাও কি কম?—

"ভদ্র ধাওড় আছেন দেশে করেন যাঁরা সদ্গতি,
কামড় তাদের অর্দ্ধরাজ্য,—পরের ধনে লাখ-পতি!"

কবি চরম ক্ষোভে ও হতাশায় বলেছেন—

'হায় অভাগ্য! বাংলা দেশের সমাজ-বিধির তুল্য নাই,
কুলটাদের মূল্য আছে, কুলবালার মূল্য নাই।
বিয়ে করে কিন্‌বে মাথা—তাতেও হবে ঘুষ দিতে,
জামাই যেন জড় পদার্থ,—শ্বশুরকে চাই 'পুশ' দিতে।"

কবি এবার তরুণ-সম্প্রদায়কে আহ্বান করে এরই প্রতিকারের আশায় বলেছেন—

"বাংলা দেশের আশার জিনিষ! ওগো তরুণ-সম্প্রদায়!
জগৎ আজি তোমা সবার উজল মুখের পানে চায়;
হাতে তোমার রাখীর সূতা, কণ্ঠে তোমার নূতন গান,
জগৎ জুড়ে নাম বেজেছে, রাখ গো সেই নামের মান;
অপৌরুষের শেষ রেখাটি নিজের হাতে মুছতে হবে,
কন্যা-বলি-র এই কলংক দূর কর তোমরা সবে।

সকল প্রজার প্রজাপতি পরিণয়ে প্রসন্ন,
তার আসনে কদাচারী কুবের কেন নিষণ্ণ ?
তোমরা তরুণ ! হৃদয় করুণ, তোমরা বারেক মিলাও হাত,
জাতির জীবন গঠন কর, কর নূতন অংকপাত।"

কবি ভালবেসেছিলেন এই দেশকে, এই দেশের মাটি, তার জলবায়ু, তার নরনারীকে। বাংলা দেশের বিভিন্ন ঋতুর প্রতি কবি তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, তাকে ছন্দে গেঁথে রেখেছেন। সেখানে বর্ণনার সংগে ছন্দের লীলা-খেলা চলেছে! বাতাস যখন খর রৌদ্রে মূর্চ্ছা যায়, চারদিকে ধূলা ওড়ে, যেন আগুন জ্বলতে থাকে, তখন—

"ভালে সূর্য, ঝরে বহ্নি, মরে পাখী,
মেলে জিহ্বা মরু-তৃষা মোছে আঁখি,
ছায়া কাঁপে খর তাপে, বুকে চাপে মরীচি রে!
ধীরে! ধীরে! ধীরে!

তারপরেই বর্ষা আসে—

"ভাসছে বিল-খাল ভাসছে বিলকুল!
ঝাপসা ঝাপ্‌টায় হাসছে জুঁইফুল!
ধান্য শীষ্‌ তার করছে বিস্তার—
তলিয়ে বন্যায় জাগছে জুলজুল্‌!"

শরৎকাল এল তার মাধুরী নিয়ে—

এই শীতল আলোকে শরতেরি হাওয়া ফিরিছে সঞ্চরি,
তবু তালবীথি দোলে যে তালে,—না দোলে
সে-তালে বল্লরী!
তরল কাঞ্চনে
বিহরি আনমনে;
হায়! কার হিয়া দোলে কি তালে এখন,কে জানে সুন্দরী!
কি সুরে সুর ধরি!"

আবার শীতঋতু আসে—

"পৌষের রাতে কংকালসম বিথারি রিক্ত শাখা
ভেদি মরুপথ গি'র দুর্জয় ভস্ম-কুহেলি মাখা।
কুক্কুর তোলে হুক্কন-ধ্বনি
খুংকার করে উলূক অমনি
শীতের বাতাস প্রচারে ভূমণ্ডলে।

আবার বসন্তে—

'পুলক উষার কিরণরাগে
পুলক পাখীর আকুল গানে।
... ...
নূতন ফুলের গন্ধ ওঠে
দিক্‌-বিদিকে যায়রে লুটে;
... ...
আধেক পথে তারার আলো,—
ফুলের গন্ধে মিশিয়ে গেল।"

ভারতীয় সংস্কৃতির রূপ মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে নিম্নোক্ত শ্লোকটীর মধ্যে,—

"গোঃ গীর্ব্বাণগিরা গংগা গীতা ভারতগৌরবম্‌"

ভারতের সমস্ত কবি ঋষিরাই এদের বন্দনা করে গেছেন। সত্যেন্দ্রনাথও ঐ ধরণের প্রচুর বন্দনাগীতি লিখেছেন। 'যুক্ত বেণী' কবিতায় তিনি গংগা-যমুনার বন্দনা গেয়েছেন—

"দেহপ্রাণ একতান গাহে গান বিশ্ব!
অমা চুমে পূর্ণিমা! অপরূপ দৃশ্য!
চুয়া মিলে চন্দনে। বর্ণ ও গন্ধ!
চির চুপে চাপে বুকে শতরূপা ছন্দ!
অঞ্জন-ধারা সাথে চলে অকলংকা
জয়তু যমুনা জয়, জয় জয় গংগা!"

সত্যেন্দ্রনাথের 'ঝর্ণা' কবিতাটি বর্ণনাভংগী ও ছন্দ-মাধুর্যে বাংলা কাব্য-সাহিত্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে:

"ঝর্ণা! ঝর্ণা! সুন্দরী ঝর্ণা!
তরলিত চন্দ্রিকা! চন্দন-বর্ণা!
অঞ্চল সিঞ্চিত গৈরিকে স্বর্ণে,
গি'র-মল্লিকা দোলে কুন্তলে কর্ণে,
তনু ভরি' যৌবন, তাপসী অপর্ণা!
ঝর্ণা!"

'সিন্ধুতাণ্ডবের' মাঝখানে তিনি সাগরের বর্ণনা করেছেন—

"ধবল ফেনায় ফুটুক তোমার
পাগল হাসির আভাস ফেনিল,
আলাপ তোমার প্রলাপ তোমার
বিলাপ তোমার শোনাও, হে নীল!"

সমুদ্র সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথের বহু কবিতা আছে। নগাধিরাজ হিমালয়কে তিনি 'হিমালয়ার্ঘক' কবিতায় বন্দনা করেছেন।

বাংলা দেশের ফল, ফুল, পাখীপাখালী কবির মনে স্বপ্নের জাল বুনেছিল! তাই তিনি এমনি গভীর ভাবে তাঁর দেশকে ভালবাসতে শিখেছিলেন। 'ফুলের ফসল' নামক কাব্যগ্রন্থে সত্যেন্দ্রনাথ কেবল বিভিন্ন ফুলেরই বর্ণনা করেছেন সুমধুর ভাবে ভাষায়।

'চম্প' এসে বলে—

"আমারে ফুটিতে হোক বসন্তের অন্তিম নিশ্বাসে।
... ...
চম্প আমি,—খর তাপে আমি কভু ঝরিব না মরি;"

কবির 'মহুয়া' ফুল বলে—

"যায় যে বয়ে ফাগুন-রাতি, কই গো রাজবালা!
আমায় দিয়ে গাঁথবে না আর স্বয়ম্বরের মালা?"

'আকন্দ ফুল' তার ব্যথা নিবেদন করে—

"স্ফটিকের মত শুভ্র ছিলাম
আদিম পুষ্পবনে,
নীল হয়ে গেছি নীলকণ্ঠের
কণ্ঠ আলিংগনে।"

শিউলি তার করুণ সুরে বলে—

'নমি গো নীরবে একে একে যবে তারা ঝরে যায় নভে,
ভ'রে তুলি বন মৃদুল পবন সুকুমার সৌরভে।
থেকে থেকে মোরা ঝরে ঝরে পড়ি শরতের ফুলঝুরি
বিথারি' অমল ধবল পক্ষ, অরুণ-বদন ছুরী।"

সত্যেন্দ্রনাথ বহু প্রাকৃতিক বস্তুকে ছন্দে লীলায়িত করে তাদের সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর 'ভোরাই' 'সাঁঝাই', 'সন্ধ্যামণি', 'লালপরী', 'নীলপরী', 'সবুজপরী' প্রভৃতি কবিতা পড়লেই এগুলি বুঝতে পারা যায়।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দেশের মনীষীদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন বিভিন্ন কবিতা রচনা করে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন দিক্ নিয়ে বিভিন্ন ছন্দে ও ভাবে তিনি এত কবিতা রচনা করেছেন যে, তাই নিয়ে একটি ক্ষুদ্রকাব্য রচিত হয়েছে। স্থানাভাবে আমি তার ২।৪টী মাত্র উদাহরণ দেব :

'বাজাও তুমি সোনার বীণা হে কবি! নব বংগে ;
মাতাও তুমি, কাঁদাও তুমি, হাসাও তুমি রংগে।
তোমার গানে তোমার সুরে
উঠিছে ধ্বনি ভুবন জুড়ে,
লক্ষ হিয়া গাহিয়া আজি উঠিছে তব সংগে।"

'অর্ঘ্য' নামক আর একটি কবিতায় বলেছেন—

"ব্রহ্মবিদের তুমি বরেণ্য,—
কাব্য-লোকের লোচন রবি!
স্বর্গে বসিয়া আশীষিছে তোমা,
ব্রহ্মবাদিনী 'বাচক্নবী'!"

আবার 'মালা-চন্দন' কবিতায় দেখি—

"বাংলা দেশের হৃদ্-কমলে গন্ধরূপে নিলীন হয়েছিলে,
মূর্ত্তি কখন নিলে
কোন্ মাহেন্দ্র ক্ষণে!
ওগো কবি! তোমার আগমনে
নিখিল হৃদয় উঠ্‌ল দুলে নূতন স্ফূর্তিভরে ;
কাননে ফুল ফুটল থরে থরে
চাঁপার কলি হ'ল তড়িৎকান্তি
অশোক যেন আলোর আলো করে।
ওগো চমৎকার!
উঠ্‌ল ভরে কানায় কানায় আনন্দে সংসার!"

'গৌড়ী গায়ত্রী' ছন্দে রচিত 'শ্রদ্ধাহোম' কবিতায় তি বলেছেন—

'জয় কবি! জয় জগৎপ্রিয়
বরেণ্য হে বন্দনীয়!
অগম শ্রুতির শ্রোত্রিয়! জয়! জয়!

আবার 'নমস্কার' কবিতায় দেখি—

নমস্কার! করি নমস্কার!
কবিতা-কমল-কুঞ্জ উল্লসিত আবির্ভাবে যার,
আনন্দের ইন্দ্রধনু মোহে মন যাহার ইংগিতে,
আত্মার সৌরভে যার স্বর্গনদী বহে তরংগিতে,
কূজনে গুঞ্জনে গানে মত্ত হোল স্ফূর্তি-পারাবার,
অন্তরের মূর্তিমন্ত ঋতুরাজ বসন্ত সাকার.—
নমস্কার! করি নমস্কার!"

রবীন্দ্রনাথ ছাড়া সত্যেন্দ্রনাথ—বিদ্যাসাগর, গোবিন্দদাস, দেবেন্দ্রনাথ, দীনবন্ধু, দ্বিজেন্দ্রলাল, প্যারীচাঁদ, তিলক, গোখেল, গান্ধীজী প্রভৃতি মনীষীদের নামে কবিতা রচনা করেছেন। 'গান্ধীজী' নামক কবিতাটির বাংলা সাহিত্যে তুলনা হয় না।

এ ছাড়া কবি অনেক পৌরাণিক কাহিনীকে কবিতায় রূপ দান করেছেন। তার মধ্যে 'কয়াধু', 'কৃষ্ণধাত্রী', 'অরুন্ধতী', 'বুদ্ধশরণ', 'জন্মাষ্টমী,' 'ভূতচতুর্দ্দশী' প্রভৃতি কবিতা উল্লেখযোগ্য।

আর একটিমাত্র কবিতার উল্লেখ ক'রে আমি এই প্রসঙ্গের আলোচনা শেষ করব। এটি সত্যেন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা 'আমরা'। বাংলা দেশ ও বাংলা জাতিকে কবি কি গভীরভাবে ভালবাসতেন, কবিতাটির প্রতি শব্দে তার ছাপ পড়েছে। বাঙ্গালীর অতীত গৌরবের কথায় কবি উদ্বেল হয়ে উঠেছেন—

"আমাদের ছেলে বিজয়সিংহ লংকা করিয়া জয়
সিংহল নামে রেখে গেছে নিজ শৌর্যের পরিচয়।
এক হাতে মোরা মগেরে রুখেছি, মোগলেরে আর হাতে,
চাঁদ-প্রতাপের হুকুমে হঠিতে হয়েছে দিল্লীনাথে।
বাঙ্গালী অতীশ লংঘিল গিরি তুষারে ভয়ংকর,
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙ্গালী দীপংকর।
বাঙলার রবি জয়দেব কবি কান্ত কোমল পদে
করেছে সুরভি সংস্কৃতের কাঞ্চন-কোকনদে।
স্থপতি মোদের স্থাপনা করেছে 'বরভূধরের' ভিত্তি,
শ্যাম-কাম্বোজে 'ওংকার ধাম'—মোদেরি প্রাচীন কীর্ত্তি।
ধেয়ানের ধনে মূর্ত্তি দিয়েছে আমাদের ভাস্কর
বিটপাল আর ধীমান,—যাদের নাম অবিনশ্বর।
ঘরের ছেলের চক্ষে দেখেছি বিশ্বভূপের ছায়া,
বাঙ্গালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া!"

হঠাৎ দৃশ্যপট পরিবর্ত্তন হয়ে গেল। কবির সামনে ভেসে উঠ্‌ল বর্ত্তমান বাংলা ও তাঁর গৌরব-রবিদের। তিনি আবার গাইলেন—

"তপের প্রভাবে বাঙ্গালী সাধক জড়ের
পেয়েছে সাড়া,
আমাদের এই নবীন সাধনা শব সাধনার বাড়া।
বিষম ধাতুর মিলন ঘটায়ে বাঙালী দিয়াছে বিয়া,
মোদের নব্য রসায়ন শুধু গরমিলে মিলাইয়া।
বাঙালীর কবি গাহিছে জগতে মহামিলনের গান,
বিফল নহে এ বাঙ্গালী জনম বিফল নহে এ প্রাণ।
বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়,
বাঙ্গালীর ছেলে ব্যাঘ্রে বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়;"

কবি সত্যেন্দ্রনাথও এই মনীষীদের স্বগোত্র। তাঁর দেশপ্রেম, তাঁর স্বদেশকাব্য বাঙ্গালীর মনে চিরজাগরূক থাকবে। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যসাহিত্য সত্যেন্দ্রনাথের মতই অক্ষয় অমর।

হায় রে লেখা!

শ্রীমোহিনী চৌধুরী

সন্ধ্যা নামে-নামে
নাম-না-জানা গ্রামে!
আমার হাতে গানের খাতা
গান লিখেছি দু'টি,
শেষ হ'য়েছে কল্পলোকের খানিক ছুটোছুটি;
ছুটীর দিনের শেষে
ফিরছি তখন গাঁয়ের পথে সহরতলীর 'মেসে'।

আমার চেয়ে বয়সে-বড়ো গাঁয়ের ছেলে কোনো
ব'ললে ডেকে: 'শোনো—
ক্ষেত নিড়ানীর কাযে ব'সে গেলাম কেবল দেখে
কাগজ-কলম নিয়ে কী-যে ক'র্‌ছো তখন থেকে?'
চোখের ওপর মেলে দিলেম খাতা,
খাতার পাতা কাঁপলো হাওয়ায়,
কাঁপলো চোখের পাতা।

মনে হোল ভুল ক'রেছি, আমার লেখাপড়া
ওদের কাছে গোষ্পদে চাঁদ ধরা!
মুখের কথা বুঝবে ভেবে ব'লে গেলাম মুখে
যে-গান দু'টি কালির টানে লেখা খাতার বুকে।
তবুও যেন বুঝলো না সে কিছু,
ফিরে গেল আপন ঘরে মুখটি ক'রে নিচু।
হায় রে লেখা; হায় রে বড়াই, হায় রে কবির আশা!
একই দেশের মানুষ তবু ব্যর্থ আমার ভাষা।

মুক্তি চাহে ভগবান

শ্রীনকুলেশ্বর পাল

পাষাণ-প্রাচীর দিয়ে দেবতারে রাখিয়াছ ঘিরে;
বাহিরে যে অগণন ভক্তজন ভাসে আঁখিনীরে।

মন্দিরে প্রবেশ করে সাধ্য নাই, অছুৎ যে তারা;
শতাব্দীর ঘৃণাহত অভিশপ্ত মূক কণ্ঠে যারা—
যুগ যুগ সহিয়াছে মানুষের নিত্য অপমান;
আপনারে বলি দিয়া লভিয়াছে পাদুকা-সম্মান।

ব্যথা রক্ত ঢালি দিয়া মন্দির যাহারা হায় গড়ে;
তাদের প্রবেশ নাই—রুদ্ধ দ্বার তাহাদের তরে।
এ বিধান দিল কেবা কোন্ যুগে কোন শাস্ত্রবীর?
মানুষের মাঝখানে গ'ড়ে দিল দুর্ভেদ্য প্রাচীর।

ভাঙ্ ওরে ভাঙ্ কারা,—কর্ ওরে বন্ধন মোচন;
তোদের পরশ লাগি ব্যাকুল যে আজি নারায়ণ।
তোদের নিকট হ'তে যারা তারে রাখিয়াছে দূরে,
সোনার দেউল রচি পাষাণ কারার মাঝে পূরে,—

প্রতিটি সকালে আর সন্ধ্যায় দীপালোক জ্বালি,
আরতি করিছে নিত্য উপচারে সাজাইয়া থালি।
ভক্ত নহে তারা ওরে?—দেবতারে চাহে বাঁধিবারে,
মুক্তি চাহি' ভগবান তাই আজি ডাকে বারে বারে।

শত কোটি মানুষের মাঝখানে সিংহাসন গড়ি',
শুচি ও অশুচি এস দেবতারে অভিষেক করি।
আলোকে আঁধারে আর দুঃখে শোকে বন্ধনে ক্রন্দনে,
বেদনার অর্ঘ্য দিয়ে করি পূজা নব নারায়ণে।

স্মৃতি-লিপি

[সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত রবি ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সচ্চিদানন্দের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক ও বঙ্গশ্রীর বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে লিখিত পত্র]

দাদু,

আজ আমার পূজনীয় জ্যাঠামশায়ের প্রথম মৃত্যুতিথি। তাঁর স্মরণে আমায় কিছু লিখ্‌তে বলেছেন। যা-ই লিখি, তাঁকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করা অসম্ভব। তাঁর প্রতিভা ছিল বহুমুখী, আর চরিত্রের বিভিন্নতা অপরিমেয়; এক এক সময় তাঁকে তো প্রায় দুর্ব্বোধ্যই মনে হ'য়েছে।

আজ থেকে ছাপ্পান্ন বছর আগে এক অমাবস্যা তিথিতে কোটালিপাড়ার হরিণাহাটী গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। বাবা-মা তাঁর ছিলেন গরীব। নিজের পরিশ্রমে বাবা-মা সংসারের সমস্ত অভাবই একরকম পূর্ণ ক'রে রেখেছিলেন। সে-সময় কোটালিপাড়ার প্রসন্নকুমার ছিলেন এক ব্যতিক্রম। সেই বিল-গাঁয়ে ঘড়ি ধ'রে সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রতেন। ঢাকায় বেদান্তের পরীক্ষায় প্রথম হন; সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ ছিলেন তিনি। বাড়ীতে টোল, ছেলেরা থাকতো। বাড়ীর চারিপাশে যে জায়গা, সেখানে ফসল ফলাতেন এই পণ্ডিত; আবার জমি ক'খানার জন্য পায়ে হেঁটে মহকুমায় গিয়ে মামলা পাকাতেও তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। সেই সুপুরুষ শাস্ত্রানুরাগী তেজস্বী ব্রাহ্মণকে না জানলে সচ্চিদানন্দকে পুরোপুরি বোঝা যায় না। এই ব্রাহ্মণের জীবনে এমন একটি দিনও ছিল না যেদিন না তিনি পড়াশুনো ক'রেছেন কিছু। সচ্চিদানন্দের কর্ম্মনিষ্ঠা কিছুটা পৈত্রিক।

সচ্চিদানন্দ

গ্রামের পড়াশুনো শেষ ক'রে সচ্চিদানন্দ বোধ হয় অষ্টম শ্রেণীতে এসে ডায়মণ্ড-হারবার মহকুমার সরিষা স্কুলে ভর্ত্তি হন। এখানে তাঁর কাকা তখন প্রধান পণ্ডিত। এই পণ্ডিতটির কথা বোধ হয় সরিষার লোকদের স্মরণ আছে এখনো। ইস্কুলের প্রাণই ছিলেন তিনি।

এই সরিষা ইস্কুল থেকেই এন্‌ট্রান্স পাশ ক'রে এফ-এ পড়বার জন্যে ক'লকাতায় এসে তিনি কলেজে ভর্ত্তি হন। বাস আর ট্রামের এমন প্রচলন তখনো হয়নি; আজকের ক'লকাতার কাছে সে ক'লকাতা অনেক আলাদা, চেনা কঠিন। প্রতিদিন পায়ে হেঁটে অনেকটা পথ অতিক্রম ক'রতে হ'তো, তারপর ছেলে প'ড়িয়ে, এক জায়গায় খেয়ে, আর এক জায়গায় থেকে, তাঁকে পড়াশুনা ক'রতে হ'য়েছে। ফলে এফ-এ পরীক্ষায় আর পাশ ক'রে উঠতে পারলেন না। এদিকে এর কিছু আগেই তাঁর বিয়ে হ'য়েছে। সংসারের অভাব তাঁকে পরীক্ষা পাশের দিক থেকে কর্ম্মের পথে টেনে আনে। কিন্তু যখন ঠিকাদারি ক'রছেন, তখনো [illegible] হ'লেন। [illegible] পরমার দিক থেকে সংসার একটু সচল হ'লেই ডিগ্রীগুলো নিয়ে রাখবেন। শেষে অবশ্য কর্ম্মক্ষেত্রের সাফল্যে পাশ হবার মোহ গেছে কমে; ডিগ্রীগুলোকে তখন বাহুল্যই মনে ক'রেছেন। তাঁর বঙ্গশ্রীতে লেখা প্রবন্ধগুলো প'ড়লেই বোঝা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীগুলো না থাকলেও কত বড় পণ্ডিত ছিলেন তিনি!

এর কিছুদিন পরে কোন ভদ্রলোকের মারফত তিনি খবর পান, ই, আই, আর-এ ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ট্রেনিং দিয়ে চাকরী দেবার জন্য লোক চায়—আর এই চাকরীতে ভারতীয় নিয়োগ সেই-বারই প্রথম আরম্ভ হয়। সচ্চিদানন্দ তদ্বির ক'রে এরই একজন ট্রেনী হ'লেন। প্রসঙ্গত ব'লে রাখি, যে-ভদ্রলোক লোক নেবার এই সংবাদটুকু মাত্র দিয়েছিলেন, তাঁর পরিবারকে তিনি চিরদিন সাহায্য ক'রে এসেছেন—এমনি কৃতজ্ঞ ছিলেন তিনি। টাকা কাউকে দিয়ে তার জন্যে কোর্টে যেতে তাঁকে কোনদিন দেখিনি, অথচ একটি পয়সা অন্যের পাওনা তাঁর অসহ্য ছিল।

ই, আই, আর-এ এই পরীক্ষায় তিনি সর্ব্বোচ্চস্থান দখল করেন আর তাঁর চাকরী হয়। এই পরীক্ষা পাশ ও চাকরীই তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে তাঁকে নতুন পথের সন্ধান দেয়।—শিষ্য-যজমান দিয়ে ঘেরা যে জগৎ তিনি এতকাল দেখে এসেছেন, এ তা থেকে অনেক আলাদা। এই চাকরীতে ছ' মাসের মধ্যে তাঁর হোলো ডবল প্রমোশন। সাহেব তাঁর কাজে খুবই সন্তুষ্ট। ভালোও বাসেন খুব, কিন্তু তিনি তাঁর অবস্থায় সন্তুষ্ট নন। এই চাকরীর সঙ্গে সঙ্গেই মিস্ত্রীদের সঙ্গে বন্দোবস্ত ক'রে বেনামা ঠিকে নিতে থাকেন। তাতেও তাঁর কিছু কিছু রোজগার হ'তে থাকে আর তাঁর স্বাধীনভাবে ঠিকেদারী ক'রবার ইচ্ছে জেগে ওঠে। তার সুযোগও অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর মিলে গেল একটি ঘটনায়।

লাইন বসাবার জন্য একটা স্কেচ ক'রছেন একদিন সেই জায়গারই পাশে দাঁড়িয়ে। লাইনটা সেখানে বেঁকে একটু উঁচু হ'য়ে চ'লে যাবে। সকালে আরম্ভ ক'রেছেন, দুপুরও ছাড়িয়ে যায়। ওঁর ইচ্ছে কাজটা একেবারে শেষ ক'রে ফেলবেন। সাহেব এসে একবার দেখে গেছেন, ধ্যানমগ্ন সচ্চিদানন্দকে বিরক্ত করেন নি। দ্বিতীয়বার লাঞ্চের পরেও এসে দেখলেন তিনি নিবিষ্ট মনে সেইখানে দাঁড়িয়েই কাজ ক'রছেন। সাহেব একটু সস্নেহ মৃদু তিরস্কার ক'রলেন। সচ্চিদানন্দের মন বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠলো। পরদিন সাহেব তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে বোঝালেন, শরীরটাকে অবহেলা ক'রে কোন কাজ নয়। ক্রুদ্ধ সচ্চিদানন্দ উত্তর দিলেন, "তোমার উপদেশ আমার মনে থাকবে, কিন্তু তোমার চাকরী

আমি আর ক'রবো না।" সাহেব তাঁকে অনেকভাবে বোঝাতে চাইলেন, কিন্তু তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, চাকরী আর নয়। যাবার সময় সাহেব বললেন, "যাবে যাও, আমি ব'লচি, তুমি বড় হবে।" পরবর্ত্তী জীবনে সেই সাহেবের উৎসাহবাণী বহুদিন তাঁর মুখে শুনেছি।

সচ্চিদানন্দ এখন রীতিমত ঠিকাদারী আরম্ভ ক'রলেন। মধ্যে কিছুদিনের জন্য বুল লিমিটেডের ম্যানেজার হওয়া ছাড়া আর চাকরী করেন নি। কাজ ক'রতে ক'রতে খুব ভাল ড্রাফ্‌ট্‌স-ম্যান হ'য়েছিলেন। সস্তার উপরে এমন সুন্দর ডিজাইন ক'রতেন যে সাহেবরা ডেকে তাঁকে কাজ দিয়েছেন। কর্ম্মদক্ষতা আর সততার জন্য অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ভালো ঠিকাদার হ'য়ে উঠলেন। ওই সময় তিনি আরও বহু ব্যবসায়ে হাত দেন: ইটের, কাঠের, কাঁচের আর মোটর মেরামতের। এটাকে তাঁর কর্ম্মজীবনের প্রথম অধ্যায় বলা যায়। এখন তিনি লক্ষপতি হ'য়েছেন, কিন্তু কেউ তা জানে না।

টাকা রোজগার আর বেশী সাহেবদের সঙ্গে মেলামেশার দরুণ তিনি অনেক সাহেবী আচার-ব্যবহারের অনুরক্ত হ'য়ে পড়েন। পণ্ডিতের ছেলে সাহেব হ'য়েছেন! সে-দিক থেকেও একটি আঘাত তাঁর আসে। কাশীপুরে (বোধহয় কোন জুট্‌মিলে) একটি বাড়ী তৈরী করবার সময় একটা ঢালাই বিম ফেটে যায়। অনুসন্ধিৎসু মনে তখন খটকা লাগে: তা' হ'লে নিউটনের গতির ল' কি ভুল? এই সন্দেহ নিয়ে তিনি বহু বই ঘাঁটাঘাঁটি ক'রলেন। শেষে তাঁর বিশ্বাস হ'লো—নিউটন ভুল। তাঁর ধারণা হ'ল, যে দেশের এত বড় মনীষীর এই ভুল, সে দেশ আমাকে কিছু দিতে পারবে না। সেই থেকে সংস্কৃত চর্চ্চা রীতিমত আরম্ভ ক'রলেন যার ফলে শেষ জীবনে ঋষি প্রণীত গ্রন্থের 'পরে তাঁর অগাধ বিশ্বাস আসে। আর তাঁদের অভ্রান্ত ব'লে বুঝতে পারেন। দাদু, আপনি জানেন, কি গভীর ছিল তাঁর ঋষিদের প্রতি শ্রদ্ধা।

এর পর থেকে ব্যবসায়ক্ষেত্রে তাঁর ক্রমোন্নতি। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের শেষে রায় শ্রীসতীশচন্দ্র চৌধুরী বাহাদুরের সঙ্গে একযোগে তিনি কমার্শিয়াল ক্যারিয়িং কোম্পানী লিমিটেডের অংশীদার হন। আসামের প্ল্যান্টার্স এজেন্সীর সাহেবদের হাত থেকে সেই সর্ব্ব-প্রথম ভারতীয়ের হাতে পাণ্ডু, গৌহাটী, শিলং সড়কের মোটর চালনার ভার ওঁদের হাতে আসে। আজও পর্য্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে চ'লে আসচে সে সার্ভিস। এই থেকে আস্তে আস্তে তাঁর কর্ম্মচালনার বিরাট প্রতিভা প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রেই প্রকাশ পেয়েছে। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলসকে এই বন্ধুদ্বয় লিকুইডেশনের হাত থেকে রক্ষা ক'রে সগৌরবে চালিয়ে এসেছেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গলক্ষ্মী সোপ ওয়ার্কস্‌ ও মেট্রোপলিটান ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড; ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে দি ক্যালকাটা ফ্রেণ্ডস্‌ সোসাইটী লিঃ, মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস ও 'বঙ্গশ্রী' মাসিক পত্র; ১৯৩৪-এ দি ইউনাইটেড মোটর ট্রান্সপোর্ট কোঃ লিঃ গঠিত হয়। ১৯৪০-এ এই কোম্পানী শিলং-শ্রীহট্ট মোটর চালনার ভার গ্রহণ করেন। ১৯৩৭-এ বঙ্গলক্ষ্মী আয়ুর্ব্বেদ ওয়ার্কস্‌; ১৯৪২-এ বঙ্গলক্ষ্মী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌ ও ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন-এর পুনরুজ্জীবন; ১৯৪৪-এ বঙ্গলক্ষ্মী অয়েল মিলস্‌-এর প্রতিষ্ঠা হয়। তাঁর এই বিরাট কর্ম্ম-সাধনার সহচর বরাবরই সতীশবাবু।

এখানে একটা কথা ব'লে রাখি: পুরনো অচল কোম্পানী-গুলো নতুন ক'রে গড়ে তোলবার তাঁর অসীম দক্ষতা ছিল। যে-ক'টি কোম্পানীর কথা বললুম এর প্রায় সব কটাই পুরণো কোম্পানীকে গড়ে তোলা। আর ক্যাপিট্যাল তিনি সামান্যই লাগিয়েছেন; ওভারড্রাফ্‌টও তাঁর ছিল না। কি অসীম দক্ষতা থাকলে এটা সম্ভব হয়, তা আপনারা বুঝতে পারেন!

কি অদ্ভুত পরিশ্রমী ছিলেন তিনি তা শুনলে গল্পের মত মনে হয়। চোদ্দ থেকে বিশ ঘণ্টা কাজ তিনি সারাজীবন করেছেন। কাজের নেশায় এমনি পাগল ছিলেন তিনি! সারাদিনের হাড়-ভাঙা খাটুনির পরে তিন ঘণ্টা ঘুমিয়ে রাতভোর কাজ ক'রতে তাঁকে দেখেছি। ক্লান্তির কথা বলতে গেলে বলতেন, "কাজের মধ্যেই যে বিশ্রাম হ'তে পারে, তা বুঝতে পারিস?" অবিশ্যি কোনদিনই এ-কথার অর্থ বুঝিনি।

কি বিরাট ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব! আমরা তাঁকে চিরকাল বাঘের মত ভয় করতাম। বাঘের সামনে কখনো প'ড়িনি, কিন্তু তাঁর সামনে পড়বার দুঃসাহসের কথা কল্পনাও ক'রতে পারতাম না। বাইরের অন্য প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তারা, তাঁর সহকর্ম্মীরা কিম্বা অন্য কেউ তাঁর সামনে এসে যখন দাঁড়াতেন, তখন তাঁদের বুকের ঢিপ-ঢাপ শব্দ পাশের লোকের কানেও পৌঁছত। ওঁর তীব্র চোখের গভীর অন্তর্দৃষ্টির সামনে চোখ তুলে কথা বলাও এক ভয়ানক ব্যাপার ছিল।

লোকটা তিনি রাগী ছিলেন, কিন্তু ভালোও বাসতেন সবাইকে। সাধারণ সহকর্ম্মীরা তাঁর দৃঢ়সংবদ্ধ অর্গানাইজেশনটাই দেখেন ক্ষুব্ধ মনে কিন্তু তার পিছনে যে ছিল সস্নেহ সহানুভূতিশীল একখানা প্রকাণ্ড প্রাণ, তা তাঁরা জানেন নি। তিনি কারো উপর কোন কারণে ক্রুদ্ধ হ'লে অফিসের প্রত্যেকটি লোক তাঁর উন্নত স্বর শুনে ভীত হ'য়েছে। কিন্তু কতদিন তারপরে নিভৃতে তিনি অশ্রুবর্ষণ ক'রেছেন, তার খবর দু-একজন ছাড়া একটি প্রাণীও রাখে না। কতো দরদ ছিল তাঁর সহকর্ম্মীদের 'পরে! কতদিন বলতেন, "আপিসটা আমাদের একটা যৌথ পরিবার।" এই বোধ ক'টা ব্যবসায়ীর দেখতে পান?

সাধারণতই মানুষের পরে কত গভীর সহানুভূতি ও ভালবাসা তাঁর ছিল, তা তাঁর প্রবন্ধগুলো থেকেও বোঝা যায়। উন্মার্গগামী ধর্ম্মের বদলে মানবধর্ম্মের পুনরুত্থান তিনি চেয়েছিলেন। উপরের দিক না চেয়ে, ফুল-বেলপাতা না ছুঁড়ে মানুষ কবে তার দেহকে বুঝতে শিখবে? তাঁর দুনিয়ায় হিংসা-দ্বেষ-কলহ থাকবে না, যেখানে প্রত্যেকেই তার প্রয়োজনীয় খাদ্য-বস্ত্র পাবে তার পরিশ্রমের বদলে আর প্রত্যেকটি লোক সুস্থ মনে ও দেহে দীর্ঘ জীবন লাভ করে পুত্র-পৌত্র নিয়ে ঘর ক'রবে। সে দুনিয়ায় অকালবার্দ্ধক্য, অকালমৃত্যু থাকবে না; থাকবে দেহে স্বাস্থ্যের

আনন্দ আর অন্তরে কর্মের অদম্য উৎসাহ। যে সমাজে পিতার অর্থ-ই হয় পুত্রের একমাত্র ভবিষ্যৎ, সে সমাজ তিনি চাননি; যে সমাজে অর্থ-ই মানুষের বিচারের একমাত্র মাপকাঠি, তাকে তিনি চূর্ণ ক'রতে চেয়েছেন। বিত্ত-অর্থ-বৈভবের অহঙ্কারে যে মানুষ দুনিয়াকে ভুলে যায়, তাকে তিনি অভিশাপ দিয়েছেন। দাদু, তাঁর এই দুনিয়া একদিন আসবেই। আজ পৃথিবী জোড়া তার সূচনা দেখছি।

আর একটা কথা উল্লেখ করেই আজকের এ চিঠি শেষ করবো। সাধারণত বড়লোকদের খোসামোদ করার একটা দল থাকে, তা যত ছোট আর যত পণ্ডিতপূর্ণ-ই হোক না। তাঁরও স্তাবক ছিল বহু। কিন্তু তাদের খোসামোদ তিনি বুঝতেন। গরিব যে অর্থের জন্য খোসামোদ ক'রতে আসতো, তাকে তিনি ক্ষমা করতে পারতেন, কিন্তু অন্য কোন কারণের খোসামোদকেই তিনি ঘৃণা করতেন। তাঁর খোসামুদেদের তিনি জানতেন আর বুঝতেন। তাঁর অগোচরে খোসামোদ করে গেছে এমন একটা লোকও ছিল না। একটা ঘটনা বলি: তাঁর কোন অনুগত ব্যক্তি তাঁকে দেখলেই বুদ্ধিহারিয়ে বার বার প্রণাম করতো। দিনের মধ্যে সাতবার দেখা হ'লেও সাতবারই সে পায়ের ধুলো নিতো। একদিন তিনি তাঁর ঘরে বসে কাজ করছেন, উক্ত ব্যক্তি এসে পায়েরধুলো নিয়ে প্রণাম করলেন। উঠে তিনি ভদ্রলোককে ডেকে নিয়ে গেলেন একদিকে। সিন্দুক একটা দেখিয়ে বললেন, "আমার পায়ে নয়, মশাই, ঐখানে করুন, কাজ হবে।" ভদ্রলোক একেবারে অপ্রস্তুত। তাঁর অলক্ষ্যে এ কাজ হতো না।

কিন্তু তাঁকে সন্তুষ্ট করার একটা উপায় কয়েকজন আবিষ্কার ক'রেছিল। কেউ খেতে চাইলে ভারি আনন্দ হ'তো তাঁর। খাওয়ায় ভারি উৎসাহ ছিল। খেতে যারা পারতো, তাদের খুব উৎসাহিত ক'রতেন; নিজে বসে থেকে তাদের পরিবেশন করাতেন। দেখেছি, না পারলেও অনেকেই তাঁকে খুসি করবার জন্যে চেয়ে চেয়ে খেয়েছেন। অসময়ে দেখা করতে এসেও অনেকে উৎপাত করতেন। এতে তাঁর ভারি আনন্দ। বাড়ীর মেয়েদের এ সব ব্যাপারে তাঁর যথেষ্ট অত্যাচার নির্ব্বিবাদে হুকুম করতে হয়েছে।

বড় হয়ে কাজের মধ্য দিয়ে যখন তাঁর কিছুটা নিকটবর্ত্তি হ'তে পেরেছি, তখন অনেকদিন বসে ছেলেবেলাকার কথা সব বলতেন। দেশের বাড়ীর অভাব, অনটনের কথা; অমনি আরও পারিবারিক কথা। প্রথম ক'লকাতায় এসে বহুদিন তাঁকে বাড়ীর রকে না হয় ময়দানগুলিতে রাত কাটাতে হয়েছে। শুনতে শুনতে আমার মুখে বেদনার ছায়া পড়ছে, লক্ষ্য করেছেন, তখন বলতেন, "দুঃখ্ করবার কিছু নেই রে। সেই দিনগুলোর কথা যখন ভাবি, দুঃখ্ হয় না মোটেই বরং আনন্দ হয়, এই ভেবে যে, সেই দিনগুলো এসেছিল বলেইতো আজকের দিনগুলো হ'তে পেরেছে।" ব'লতে ব'লতে বুকখানা তাঁর আনন্দে সত্যাই উঁচু হয়ে উঠতো।

কতদিন ভেবেছি, এমন হয় কেন? যে লোক ভবিষ্যতে নিজের বুদ্ধি আর চেষ্টার বলে বহু সহস্র লোকের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারেন, তাঁর জীবনে পাক থেকে পুলিশের তাড়া খেয়ে বাড়ীর রকে শুয়ে রাত কাটানো—এ কল্পনার বস্তু। কিন্তু ব্যাপারটা সত্যই। তাই তাঁর জীবনীর দরকার আছে। তাঁর এই প্রথম মৃত্যুবাসরে আপনাদের সঙ্গে এই মহাকর্ম্মীর উদ্দেশ্যে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানিয়ে আজকের মত বিদায় নিচ্ছি। ইতি—

স্নেহার্থী

রবি ভট্টাচার্য্য

নব-প্রভাত

শ্রীঅনিলরঞ্জন রায়

অন্ধকারের বক্ষ ভেদিয়া বাজিল নবীন তূর্য্য।
আলোর ঊর্ম্মি ছড়ায়ে ছড়ায়ে
আঁধারের স্তর নিমেষে সরায়ে
পূরবদিগন্তে আপন হরষে উদিল প্রভাত-সূর্য্য।
বিস্ময়ে হেরি ওরে—
তিমির ভেদিয়া উঠিল সূর্য্য যেন রে নূতন ক'রে।

জাগে তরু-লোক—গাহে পাখী গান,
বাতাসের প্রাণ করে আনচান,
ফুলের গন্ধ বহিতে পারে না আর—
মনে হয় যেন হয় নি প্রভাত কখনও এমন আর।
ভয় নাই—নির্ভয়,
জাগাতে জগৎ এই বুঝি তার প্রথম অভ্যুদয়।

এ যে রে সু-প্রভাত,
ছিঁড়ি' পরাজয় আনিবে রে জয় নূতনের 'সওগাত'

পুস্তক ও আলোচনা

পূর্ব্বাচল: বিশেষ সংখ্যা। ৫, মল্লিক লেন, কলিকাতা। মূল্য—১১০ মাত্র।

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রমথনাথ বিশী, জসীমউদ্দীন, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রভৃতির কবিতা, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গজেন্দ্র মিত্র, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, তারাপদ রাহা প্রভৃতির গল্প এবং শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়, অশোকনাথ শাস্ত্রী, গুরুদাস সরকার, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, রামনাথ বিশ্বাস, যোগেশচন্দ্র বাগল প্রভৃতির প্রবন্ধে সংখ্যাটি বিশেষ সমৃদ্ধ। প্রতিটি রচনাই রসোত্তীর্ণ এবং মননশীলতার পরিচায়ক।

বাঁশী: শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্ত্তৃক গল্প গ্রন্থ। এস্. সি. সরকার এ্যাণ্ড সন্স লিঃ, ১ সি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা আট আনা মাত্র।

সাংবাদিক হিসাবে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের আসন শীর্ষস্থানে। তাঁহার ভাষানুশীলন ও চিন্তাশীলতা বাংলায় নব যুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছে। প্রধানতঃ জীবনীকার ও প্রাবন্ধিক হইলেও স্বনামে এবং নক্সীভৃঙ্গী নামে লিখিত সত্যেন্দ্র বাবুর বহু গল্প ইতিপূর্ব্বে আমরা পড়িয়া আনন্দ পাইয়াছি। 'বাঁশী' সত্যেন্দ্র বাবুর প্রথম গল্পগ্রন্থ। প্রত্যেকটি গল্পই অনাবিল, সরল ও অফুরন্ত প্রাণসম্পদে পূর্ণ। প্রত্যেকটি গল্পই মনের উপর রেখাপাত করিয়া যায়। 'আগমনী', 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' প্রভৃতি গল্পগুলি খাঁটি বাংলার মরমী চিত্র। নবযুগের বাংলা কথাসাহিত্য 'বাঁশী'র কাছে বহুলাংশে ঋণী থাকিবে। আমরা গ্রন্থখানির সার্থক প্রচার কামনা করি।

জয়শ্রী: শ্রীহেরম্বনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত কাব্যগ্রন্থ। "প্রকাশনী"—১।১৭ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—১৷৷০ (বাঁধাই)—২৲ মাত্র।

ইতিপূর্ব্বে 'ছন্দশ্রী' লিখিয়া লেখক কবি-খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। 'জয়শ্রী' কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। প্রধানতঃ কবি রোমান্টিকধর্ম্মী। প্রতিটি কবিতার মধ্যেই সেই মরমী সুর স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুজগতের সঙ্ঘাতময় দুঃখ-তাপ-যন্ত্রণার মধ্যে কবিতাগুলি স্বভাবতঃই তাই মনকে আনন্দ দেয়। ভাষা স্বচ্ছ ও প্রকাশভঙ্গী সাবলীল। 'জয়শ্রী' পাঠক-মনকে যে আনন্দ দিবে—তাহা নিশ্চিত।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র: কর্ম্মজীবনী। শ্রীশচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। প্রবর্ত্তক পাব্লিশার্স, ৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—১।০ মাত্র।

আলোচ্য গ্রন্থে ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলন হইতে সুরু করিয়া নেতাজীর আজাদ-হিন্দ ফৌজ গঠন পর্য্যন্ত তাঁহার কর্ম্মমুখী জীবনের সমস্ত স্তরকে গল্পাকারে বর্ণিত করা হইয়াছে। নেতাজীর জীবনী আজ দেশবাসীর কাছে বিশেষ আকর্ষণীয়। তাঁহার সংগঠনশীল কর্ম্মক্ষমতা ও অগ্নিময় স্বাধীনতা-সংগ্রাম ভারতের জাতীয় ইতিহাসে এক জলন্ত অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছে। লেখকের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী মনোরম। যদিও আলোচ্য গ্রন্থটি সুভাষচন্দ্রের ব্যাপকতর সংগ্রামমুখী জীবনের পূর্ণ ইতিহাসের দিক হইতে পর্য্যাপ্ত নয়, তবুও বইখানি বহুলাংশে পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্ত করিবে।

(ক) কল-কারখানার কথা—শ্রীসত্যেন্দ্র চক্রবর্ত্তী

(খ) নানা দেশের মেয়েদের কথা—মায়া গুপ্ত

(গ) বাজারের কথা—শ্রীসুবোধ দাসগুপ্ত

(ঘ) অভাব মিটবে কেমন করে—নির্ম্মলা চট্টোপাধ্যায়

বিহার জনশিক্ষা সমিতি। কদমকুঁয়া : পাটনা।

পাটনার প্রভাতী-ক্রোড়পত্র দীর্ঘকাল যাবৎ জনশিক্ষা প্রচারের প্রচেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। জনশিক্ষা অর্থে বাংলাভাষা প্রচারের বৈশিষ্ট্যই প্রধান। আলোচ্য পুস্তকাগুলি এই প্রচার-সাহিত্যের তৃতীয় পর্য্যায়। অশিক্ষিত তথা স্বল্পশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে এই জাতীয় প্রচার-প্রচলন সমাজতান্ত্রিক শিক্ষিত বাঙালী কর্ত্তৃক ইহার বহু পূর্ব্বেই করা কর্ত্তব্য ছিল। কারণ, একটা দেশের সংস্কৃতি নির্ভর করে তাহার জনশিক্ষার উর্দ্ধতন সংখ্যাপাতের উপরেই। রাষ্ট্রিক উন্নতিও তাহারই সঙ্গে একান্তভাবে বিজড়িত। বিহার জনশিক্ষা সমিতি এই কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া দেশের শিক্ষোন্নতি ও বাংলাভাষার যে মহৎ উপকার সাধনে ব্রতী হইয়াছেন—তাহার জন্য উক্ত সমিতিকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। পুস্তিকাগুলির প্রত্যেকটিই মননশীল লেখক লেখিকার রচনা। সাধারণ সামাজিক ইতিহাস ও ভাষা-শিক্ষার্থীরা ইহার দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হইবেন।

মনীষী সচ্চিদানন্দের শ্রাদ্ধ-বার্ষিকী

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্, মেট্রোপলিটন ইনসিওরেন্স কোম্পানী, কমার্সিয়াল ক্যারিং কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধ গত ২৭শে ফাল্গুন সোমবার তাঁহার বরাহনগর ভবন লক্ষ্মীনিবাসে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ তাঁহার পুত্রগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে। লৌকিক অনুষ্ঠান এবং আনুসঙ্গিক কার্য্যাদি খুব সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হইয়াছে; সে-বিষয়ে ঘোষণা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা এই শ্রাদ্ধবাসরে কেবল ভগবানের নিকট এই প্রার্থনাই করি, যে অপরিসীম সাধনায় তিনি ভারতের তথা জগতের ভাবী খাদ্যসমস্যার সমাধানে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, এবং যে সাধনায় তিনি স্বাস্থ্য, বিরাম, দীর্ঘায়ু সবই বিসর্জ্জন দিয়াছেন, দেশবাসী একবার যেন কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার অমূল্য রচনাবলীর সন্ধান করিয়া তাহার মর্ম্মগ্রহণ করেন এবং ভারতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ও সরকার বাহাদুর (স্বদেশীই হৌক্ কি বিদেশীই হৌক্) একত্র হইয়া সেই পথে অগ্রসর হইয়া ঐ সমস্যার সমাধান করেন। আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস, তাহা হইলে জগতের অন্নাভাব বিদূরীত হইবে, পরস্পর ঈর্ষা, হিংসা, কলহ, দ্বেষ, তজ্জনিত হানাহানি, কাটাকাটি, কাড়াকাড়ি, মারামারি দূরীভূত হইবে এবং জগতে অপরিমেয় শান্তি বিরাজ করিবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসব

গত ৯ই মার্চ্চ শনিবার বিজ্ঞান কলেজ প্রাঙ্গনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন (convocation) উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পৌরোহিত্য করেন বাঙ্গালার নব নিয়োজিত গভর্ণরবিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার স্যার ফ্রেডারিক ব্যারোজ।

প্যাণ্ডেলটী খুব বড় করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল; ছাত্র, অধ্যাপক সমাগত ভদ্রমণ্ডলীতে উহাতে তিলধারণের স্থান ছিল না। বিশেষ বিশেষ উপাধিদানের পরে চারিসহস্র ছাত্রছাত্রীকে ডিগ্রি দেওয়া হয়। চ্যান্সেলার মহোদয় সুন্দর ও সরল ভাষায় একটি সংক্ষিপ্ত অভিভাষণে তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন।

এবারকার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণীয় বিষয়—অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথিরূপে পণ্ডিত জওহরলালের যোগদান ও অভিভাষণ। গত পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আর একটি সমাবর্ত্তন উৎসবে স্যার মির্জ্জা মহম্মদ ইসমাইল অভিভাষণ দিয়াছিলেন। তবে মির্জ্জা সাহেব রাজনীতির সহিত সংশ্লিষ্ট নহেন, আর পণ্ডিতজী বর্ত্তমান জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ ও ভারতের শ্রেষ্ঠ জননায়ক। তাই লোকে খুব আগ্রহ সহকারে তাঁহার কথা শুনিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন।

শ্রেষ্ঠ উকীল, ব্যারিষ্টার, হাকিম বা রাজকর্ম্মচারীকে না ডাকিয়া আন্তর্জ্জাতিক বিষয়াভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে আহ্বান করিবার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। কিন্তু বড়ই আক্ষেপের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি, কতিপয় ব্যক্তি জওহরলালের উপস্থিতিতে বিরুদ্ধভাব অবলম্বন করিয়া মনের যে সঙ্কীর্ণতা দেখাইয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিবার আমরা ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। পণ্ডিত জওহরলাল কোনরূপ সাম্প্রদায়িক ভাবের একটি কথাও বলেন নাই। তিনি গোটা ভারতের কথা, এসিয়ার অভ্যুত্থানের কথা ও এসিয়ার জনপ্রতিষ্ঠার কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ইন্দোনেসিয়ার মুসলমান জননায়ক স্বকর্ণ ও হাট্টা ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে একমাত্র পণ্ডিত জওহরলাল ভিন্ন অন্য কাহাকেও না চাহিলেও ভারতের কতিপয় মুসলমান জননায়ক তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। পণ্ডিতজী ভারতের অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতভূমি আজ রাশি রাশি শবদেহে আচ্ছন্ন, কিন্তু মা শীঘ্রই হইবেন 'রত্নমণ্ডিতা, দশভুজা, দশদিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি বিরাজিত।' মায়ের সন্তান এই শিক্ষিত যুবকগণকেই জন্মভূমি রক্ষা ও প্রতিপালনে নিয়োজিত হইতে হইবে। ৪০ কোটি লোকের খাওয়ান, পরান, বাসস্থানের যোগাড় করা ভারতীয় যুবকগণকেই করিতে হইবে। নব ভারত গড়িয়া উঠিবে এবং এই নব সৃষ্টির বীজ ভারতকে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত এসিয়া খণ্ড এক মহামহীরুহে পরিণত হইবে।

পণ্ডিতজী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবকগণকে আজ যে মন্ত্রে অনুপ্রাণিত করিলেন, তাহাতে আমাদেরও মনে হয়, নবভারত গড়িয়া উঠিবে। এই জন্য আমাদের দেশে ইঞ্জিনিয়ার গঠনকারী এবং উদ্ভাবনশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির দরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়ে চেষ্টিত হইবেন বলিয়া আশা করা যায়।

আমরা মনে করি, পণ্ডিতজীর অভিভাষণটির যুক্তি এবং যাবতীয় জাতিসমূহের মনস্তত্ত্বমূলক বিশ্লেষণযুক্ত ব্যাখ্যায় সমাগত ছাত্রগণ ও অভ্যাগতগণ বিশেষ উপকৃত হইবেন।

প্রসঙ্গক্রমে পণ্ডিতজী কেন আইন ব্যবসারের আবশ্যকতা

স্বীকার করেন না, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সত্য বটে, উকীলরা নিজ নিজ কাজ এবং অবসর মুহূর্তে গল্প-আড্ডায়ই সাধারণত সময়াতিবাহিত করেন। যদি তাঁহাদিগকে আবশ্যকীয় কাজের লোক হইতে উপদেশ দিয়া সমাজের হিত করিতে তিনি ইঙ্গিত করিয়া থাকেন, আমরা তাহা সমর্থন করি; কিন্তু আইন শিক্ষা করিতে নিষেধ করিলে আমরা তাহাতে একমত নই। ব্যবহার শাস্ত্রে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ব্যতীত শাসনতন্ত্র গঠন অসম্ভব। আমাদের দেশের প্রধান প্রধান লোক উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, পণ্ডিত জওহরলাল প্রভৃতি সকলেই ছিলেন আইনজ্ঞ। এ বিষয়ে পণ্ডিতজী আইন ব্যবসায়ে তাঁহার স্বাভাবিক বিতৃষ্ণার অভিব্যক্তি দেখাইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক তাঁহার অমূল্য অভিভাষণের জন্য আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করি।

এবার ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ রাধাবিনোদ পালের অভিভাষণও নূতন একটি ধারার সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাতে নির্ভীকতা এবং জ্বলন্ত দেশপ্রেম ছত্রে ছত্রে প্রকটিত দেখিয়া সকলেই আনন্দে গদগদ হইয়াছিল। যে ছাত্রগণ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য গুলির ভয় করে নাই, তাহাদের প্রতি অজস্র শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়া ছাত্রগণকে যে তিনি শৃঙ্খলাসংযত হইতে বলিয়াছেন, ইহা তাঁহারই উপযুক্ত কথা। উপাধিধারী যুবকগণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তিনি যখন একটী অমূল্য বাণী প্রদান প্রসঙ্গে বলেন—

"বিশ্ববিদ্যালয়ের পাদপীঠে দাঁড়াইয়া যুবকগণ, তোমরা শপথ গ্রহণ কর যে, মাতৃভূমি শৃঙ্খলমুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তোমাদের বিশ্রাম নাই, শান্তি নাই, বিরাম নাই"—তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সর্ব্বাগ্রে মুক্তির সন্ধান দিতেছে বলিয়া আমাদের মনে হইল। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও মনে করি, আজ এই বাণী সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজে স্কুলে হোষ্টেলে মেসে প্রতিধ্বনিত হউক, আবার নব ভাবের অণুপ্রেরণায় যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সমস্বরে বলিয়া উঠে, বীরবৃন্দ, দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ কর, সঙ্ঘবদ্ধ হও, শৃঙ্খলা সংযত হও আর—

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গম্ জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম।

আমরা নবনিয়োজিত ভাইস চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে এবং সিনেটের সভ্যবৃন্দকে ডাঃ পাল প্রদর্শিত পন্থানুসরণ করিতে অনুরোধ করি।

মহাকবি গিরিশচন্দ্রের ১০৩তম জন্মতিথি

গত ২৮শে ফাল্গুন রবিবার শুক্লা অষ্টমী তিথিতে গিরিশ পার্কে মহাকবি গিরিশচন্দ্রের জন্মতিথি অনুষ্ঠান বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। গিরিশচন্দ্রের গুরুভ্রাতা বিবেকানন্দ-সহোদর ডাঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত সভাপতির আসন হইতে গিরিশচন্দ্রের জাতীয়তা বোধ, নিপীড়িত কর্ম্মীর প্রতি তাঁহার অনাবিল সহানুভূতি ও দেশপ্রেমের একটি প্রকৃষ্ট ছবি প্রদান করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বক্তৃতা, আবৃত্তি, গান এবং শ্রদ্ধা নিবেদনে স্থানটি আনন্দক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। আমরা গিরিশ-স্মৃতির অনুষ্ঠাতাগণকে এই আয়োজনের জন্য প্রশংসা করি।

কিন্তু বড়ই আক্ষেপের সহিত বলিতে হইতেছে যে, মহাকবির অমূল্য নাটকরাজির মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে এবং অভিনয় করিবার মত অভিনেতা এখন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শ্রেষ্ঠ কলাবিদ সুধী শিশিরকুমারের এখন আর পূর্ব্ব স্বাস্থ্য নাই। গিরিশচন্দ্রের নাটকরাজি অভিনয় করিবার জন্য প্রসিদ্ধ নট অধুনা স্বর্গত ক্ষেত্রমোহন মিত্রের চেষ্টা ও সাধনায় 'গিরিশ পরিষদ' প্রতিষ্ঠিত হয়। মিঃ এন, সি গুপ্ত প্রমুখ মিনার্ভা থিয়েটারের ডিরেক্টরগণের সৌজন্যে এখানে নাটক অভিনয় হয় বলিয়া মাঝে মাঝে আমরা এ যুগেও গিরিশ-নাটকের কতকটা রস আস্বাদন করিতে সমর্থ হই। নতুবা বর্ত্তমান থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ এবং অভিনেতাগণ রঙ্গমঞ্চ স্রষ্টা প্রসিদ্ধ নাট্যকার অমিত প্রতিভাশালী অভিনেতা গিরিশচন্দ্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতে একান্তই পরাঙ্মুখ। তবে একটী আশা আছে। এখন সমগ্র বাঙ্গলাদেশে যেরূপ অসংখ্য অবৈতনিক নাট্য-সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাতে উক্ত সম্প্রদায়গুলি যদি একটি সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত হয়, আর যদি উহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের নাটকাবলী অভিনয়ে কৃতসঙ্কল্প হয় এবং জাতি ও সমাজের হিতকর নাটকের অভিনয় না হইলে সাধারণ থিয়েটার দেখিতে পরাঙ্মুখ হয়, তবে দেশের একটা বড় কাজ হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র জাতিগঠনের শ্রেষ্ঠ উপাদান উপন্যাসবলী, এবং গিরিশচন্দ্র আজন্ম সাধনায় নাট্যশালা গঠন ও পুষ্ট করিয়া সৎনাম, জনা, ভ্রান্তি, সিরাজদ্দৌলা, মিরকাশিম, ছত্রপতি শিবাজী, অশোক, শঙ্করাচার্য্য, তপোবল, বলিদান, গৃহলক্ষ্মী, প্রফুল্ল, বিল্বমঙ্গল প্রভৃতি নাটকের সহায়তায় নাট্যশালাকে এক মহা শিক্ষায়তনে পরিণত করিয়াছিলেন। এমন কি স্বয়ং রামকৃষ্ণদেবও তাঁহাকে লোকশিক্ষার জন্য থিয়েটারে থাকিতেই উপদেশ দেন। কিন্তু আজ পাশ্চাত্যানুসরণে আমরা সেই আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছি। জাতির মহাসন্ধিক্ষণে আমরা সমাসীন, জাতি-গঠন ভিন্ন অন্য কোন চিন্তাই আমাদের হৃদয়ে স্থান পাওয়া উচিত নয়, অপর উদ্দেশ্যে রঙ্গশালার ব্যবহার নিষিদ্ধ। ভরসা করি, দেশবাসী কদর্য্য নাটক এবং কদর্য্য সাহিত্য পরিহার করিয়া সাহিত্য ও নাটকের সহায়তায় সমাজ ও জাতি-গঠন করিতে তৎপর হইবেন, তবেই গিরিশচন্দ্রের স্মৃতি-পূজা সার্থক হইবে।

কলিকাতার হাঙ্গামা ও মূল্যবান শিক্ষা

গত নভেম্বর মাসে কলিকাতায় এবং গত জানুয়ারী মাসে বোম্বাইতে জনগণের সাধারণ অধিকারগুলি পুলিশের হঠকারিতায় কত জঘন্যরূপে বাধাপ্রাপ্ত হইতে পারে, তাহা আমরা সকলেই বিশেষ বেদনার সহিত লক্ষ্য করিয়াছি। অন্তঃসারশূন্য কর্ত্তৃত্বের জেদকে বজায় রাখিবার জন্য বার বার সামান্যতম অজুহাতে শতাধিক অমূল্য জীবন নিয়া ছেলেখেলা করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ যে নৃশংস অবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন, তাহা আর কোন দেশের কোন কর্ত্তৃপক্ষেরই পক্ষে সম্ভব নয়। সভ্যতার ইতিহাসে অন্ধকারতম যুগেও ইহার তুলনা বিরল।

প্রচলিত আইনের বিরুদ্ধতা না করিয়া শান্তভাবে সরকার-অনুষ্ঠিত অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার অধিকার জগতের সকল দেশের জনসাধারণের আছে। কেবল এককভাবে নহে, সভা-সমিতি এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ শোভাযাত্রার সাহায্যে জনসাধারণ সমবেত ভাবেও এই প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতে পারে। ক্ষেত্র-বিশেষে কর্তৃপক্ষের বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা পূর্ব্বাহ্ণে ঘোষিত না হইলে জনসাধারণের এবম্বিধ অধিকার কোন কারণেই ব্যাহত হইবার যোগ্য নয়। অধিকন্তু যে ব্যক্তি এই অধিকারে হস্তক্ষেপ করে, সভ্যতার আইনে সে-ই আইন-অমান্যকারী অপরাধী বলিয়া গণ্য হয়। গত নভেম্বর ও ফেব্রুয়ারী মাসে অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে ভারতের বিদেশী শাসনচক্র দুই-দুইবার এই অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। জনগণের ন্যায়-সঙ্গত অধিকারকে তাঁহারা দুই-দুইবার সামান্য কয়েকটা মনগড়া অজুহাতে—একবার রক্ষিত এলাকার নিরাপত্তা রক্ষায়, একবার দ্বিতীয় পক্ষের কল্পিত আপত্তির ভয়ে—নির্দ্দয়ভাবে আঘাত করিয়াছেন। অবশ্য এ-কথা স্বীকার্য্য যে, দীর্ঘ পৌনে দুইশত বৎসরের শাসনকালে কর্তৃপক্ষ এমনিতর বহু আঘাত জনগণের দেহে ইতিপূর্ব্বে বহুবার হানিয়াছেন। কিন্তু এখন পৃথিবীতে মহাকালের নব-ইঙ্গিতের সূচনা হইয়াছে। কালের এই নূতন ইঙ্গিতে জনগণের ন্যায্য প্রতিবাদ রুদ্ধ করিবার চেষ্টা কারলে, সেই প্রতিবাদ রুদ্ধ তো হয়ই না, অধিকন্তু প্রতিবাদীর স্বর উচ্চতর গ্রামে ধ্বনিত হইয়া উঠে। এক স্থানের রুদ্ধ প্রতিবাদের সহানুভূতিতে সকল স্থানের জনপ্রতিবাদ বিক্ষুব্ধ প্রকাশে চঞ্চল হয়।

কিন্তু তবু লক্ষ্য করিবার বিষয়, এই চঞ্চলতা শুধু প্রতিবাদেরই চঞ্চলতা। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের অথবা কর্তৃপক্ষকে গদিচ্যুত করিবার সঙ্কল্পের কোন লক্ষণ এই চঞ্চলতায় প্রকট থাকে না। কিন্তু অপরাধ-প্রবণ ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃপক্ষ ইহাতে সন্ত্রস্ত হইয়া পড়েন; ভাবেন, এই বুঝি তাঁহাদের এতদিনের সাধের গদি হাতছাড়া হইয়া প্রকৃত অধিকারীর হস্তগত হইয়া যাইবে। আতঙ্কে তাঁরা এই প্রতিবাদকে স্তব্ধ করাইবার জন্য মশা মারিতে কামান দাগিবার আয়োজন করেন। শশব্যস্ত হইয়া ডাকেন লাঠি-ব্যাটনধারী দেশী পুলিশকে আর রিভলভারধারী ফিরিঙ্গি সার্জেন্টকে। ইহারা সাম্রাজ্যবাদের কল্কি, সুতরাং বাঁশের চেয়ে ইহারা দড় হইবেন—ইহা স্বাভাবিক। কর্ত্তাদের এতটুকু অঙ্গুলি-হেলনেই ইহারা ক্ষিপ্ত হইয়া শান্ত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ জনতার উপর লাঠি ও গুলি চালাইতে লাগিয়া যায়। ফলে এই অন্যায় দমননীতির বিরুদ্ধে জনগণ অধিকতর বিক্ষুব্ধ হইয়া ওঠে এবং এই বিক্ষুব্ধতর প্রতিবাদের প্রকাশের কোন কোন অংশে হয়তো সামান্য একটু হিংসার আভাস সূচিত হইয়া পড়ে। ঐ জনতাকে শান্ত করা তখন পুলিশের সাধ্যাতীত হইয়া পড়ে। তখন দিশাহারা কর্তৃপক্ষ পূর্ব্বের চেয়ে অধিকতর অবিবেচনার বশে ডাকেন সাম্রাজ্যরক্ষী সেনাবাহিনীকে। সেনা-বাহিনী পুলিশের চেয়ে অনেক বেশী দড় কাজ। অতুলনীয় ইহাদের প্রভুভক্তি; আর সুস্থ মস্তিষ্কে শান্ত নিরস্ত্র জনসাধারণের প্রাণ হরণ করিবার যোগ্যতাও ইহাদের অসাধারণ। শিশু-বৃদ্ধ পর্য্যন্ত ইহাদের প্রভুভক্তি হইতে রেহাই পায় না। এমন কি, দরজা জানালা বন্ধ করিয়া ঘরের ভিতর ভয়ে লুকাইয়া থাকিলেও তাহাদের অব্যর্থ গুলি খাইয়া আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিতে হয়। দয়া-মায়া বা ন্যায়-অন্যায় বিচার করিবার বালাই নাই ইহাদের। কাহাকে কী অপরাধে গুলী করিতে হইবে, সে-সব প্রশ্ন নিতান্ত অবান্তর বলিয়া মনে করে। এগুলি হইল সভ্য সমাজের বড়মানুষী—ইহা দেখাইতে গেলে প্রভুভক্তি অটুট রাখা সম্ভব নয়। তাহাদের আছে শুধু "there is not to reason why"—ইংরেজ কবি বর্ণিত একটি মাত্র অনুভূতি ও একবার হুকুম পাইলেই হইল। শান্ত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ জনতাকে তাহারা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নরককুণ্ডে পরিণত করিয়া ফেলিবে। কিন্তু এতখানি শক্তির দাপট দেখাইয়াও তাহারা আহত জনমতকে ঠাণ্ডা করিতে পারে না। অতঃপরে তিন চারি দিন ধরিয়া অগণন কর্ম্মব্যস্ত জনসঙ্কুল সহরের মধ্যে অরাজকতা আসিয়া তাণ্ডব-লীলা শুরু করে। ইহার পর বিমূঢ় কর্তৃপক্ষকে জনতার মধ্যে শান্তি ফিরাইয়া আনিবার জন্য শেষ পর্য্যন্ত জনতার শুভ বুদ্ধির কাছেই আবেদন জানাইতে হয়। পুলিশবাহিনী এবং সেনাবাহিনী সরাইয়া লওয়া হয়; যে 'রক্ষিত' বা নিষিদ্ধ এলাকার সতীত্ব রক্ষায় কর্তৃপক্ষ মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সেই সতীত্বেরও আর কোন বালাই থাকে না, জনতাও তাহাদের দাবী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিয়া পুনরায় পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে।

গত নভেম্বর মাসে কলিকাতায় আজাদ-হিন্দ ফৌজের বিচারের প্রতিবাদে এবং গত ২৩শে জানুয়ারী বোম্বাইয়ে নেতাজী-জয়ন্তী উপলক্ষে এই ঘটনা দুই দুইবার একই রূপে প্রকাশ পাইতে দেখিয়াছিলাম এবং ভাবিয়াছিলাম যে, দুইবারের এই দুইটী মূল্য-বান্ শিক্ষা হইতে কর্তৃপক্ষ সম্ভবতঃ তাঁহাদের মূঢ়তা সম্বন্ধে কিছুটা সচেতন হইবেন। কলিকাতার কর্তৃপক্ষ যেন এই সচেতনতার সামান্য আভাস দিয়াছিলেন বলিয়াও মনে হইয়া-ছিল। নেতাজী-জয়ন্তী দিবসে জনতার শোভাযাত্রাকে বাধা দিবার জন্য তাঁহারা কোন পুলিশবাহিনী মোতায়েন রাখেন নাই। এই সুবুদ্ধির ফল আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বিনা বাধায় অতি ছন্দিত গতিতে দশ হাজার মানুষের এক বিরাট শোভাযাত্রা কলিকাতা সহরের সবচেয়ে যান-সঙ্কুল আট মাইল পথ অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। এতটুকু দুর্ঘটনার বা শৃঙ্খলার সামান্য ব্যতি-ক্রমের চিহ্নও সেখানে কেহ দেখে নাই। বোম্বাইয়ের কর্তৃপক্ষ সেই শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই বলিয়া সেখানে কী নারকীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার কিছু পরিচয় গতবারে আমরা দিয়াছি। কিন্তু মেকি কর্তৃত্বে গর্ব্বস্ফীত কলিকাতার কর্তৃপক্ষের কাছে এই মূল্যবান্ শিক্ষা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। জনতার ন্যায্য দাবীর সম্মানরক্ষাকে সম্ভবতঃ কর্তৃত্বরক্ষার পক্ষে অপমান-জনক মনে করিয়া আবার তাঁহারা জনতার অধিকারের উপরে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। গত ১১ই ফেব্রুয়ারী হইতে চারদিন ধরিয়া কলিকাতায় আমলাচক্রের মূঢ়তা নারকীয়রূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল। সে-রূপের অধিকাংশ বিষয়বস্তু আমরা গতবারে

লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এবারে সেই ঘটনা সম্বন্ধে অতিরিক্ত বিশেষ কিছু বলিবার নাই। কেবল তথ্যকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে যে-টুকু বাকি থাকে, তাহা হইল এই যে, এবারের জনবিক্ষোভ শুধু কলিকাতার মধ্যেই আবদ্ধ রহে নাই, কলিকাতার উপকণ্ঠেও বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। কলিকাতাভিমুখী বহু ট্রেনের চলাচল বন্ধ হইয়াছিল। আর কলিকাতার মৃত ও আহতের সংখ্যা শেষপর্য্যন্ত দাঁড়াইয়াছিল—মৃত ৭৫ এবং আহত ৫০০ শতেরও অধিক। সৌভাগ্য বশতঃ বিভিন্ন দলের নেতৃ-স্থানীয়দের চেষ্টায় এবং কর্ত্তৃপক্ষের সুবুদ্ধির উদয়ে প্রায় পঞ্চম দিনেই এই নারকীয় ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটে। ষষ্ঠ দিবসে অর্থাৎ ১৬ই ফেব্রুয়ারী আবার কলিকাতায় প্রায় পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া আসে।

কিন্তু এটুকু হইল কেবল ঘটনার বর্ণনা, এই ব্যাপারে ইহাই একমাত্র বক্তব্য নয়। শুনিতে বিস্ময় বোধ হইলেও এই ব্যাপারের আসল বক্তব্যটা বলিয়াছেন বাংলার তদানীন্তন গভর্ণর মিঃ আর, জি, কেসি। কলিকাতার ঘটনা সম্পর্কে তিনি এক বেতার বক্তৃতায় বলেন :

"The lesson to be learnt—for the second time within a few months—is that political processions, however well-intentioned, prove nothing; they inevitably lead to public disturbances and casualties...this costly experience will have lesson for more responsible for demonstration in November and now."

অর্থাৎ গত কয়েক মাসের মধ্যে এই দ্বিতীয়বার এই শিক্ষা লাভ করা উচিত যে, উদ্দেশ্য যতই ভাল হোক না কেন, রাজনৈতিক শোভাযাত্রাগুলিতে কোন অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় না, বরং উহার ফলে অনিবার্য্যরূপে হাঙ্গামার সৃষ্টি হয় এবং লোকে হতাহত হয়। যাহারা নভেম্বর মাসে ও বর্ত্তমানে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য দায়ী তাহাদের কাছে এই মূল্যবান অভিজ্ঞতাটুকু শিক্ষার বিষয় হওয়ার যোগ্য।

মানব-চরিত্র-বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, সময় সময় ভূতেরা ইচ্ছার বিরুদ্ধেও রামনাম উচ্চারণ করিয়া ফেলে। অর্থাৎ অপরাধী মানুষ স্বীয় অপরাধ অস্বীকার করিতে গিয়া অবচেতনার তাড়নায় প্রকারান্তরে আসল অপরাধকেই স্বীকার করিয়া ফেলে। গভর্ণর মিঃ কেসি এক্ষেত্রে অনেকটা তাই করিয়া ফেলিয়াছেন। যে-কথা তিনি ন্যায়সঙ্গত বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী উদ্দেশ্যে বলিতে চাহিয়াছেন, সে-কথা বেফাঁস হইয়া তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার নিজের ও তাঁহার উপরওয়ালা সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্দেশেই উচ্চারিত হইয়াছে। কেন, বলিতেছি :

মিঃ কেসি বলিয়াছেন যে, রাজনৈতিক শোভাযাত্রার ফলে অনিবার্য্যরূপে হাঙ্গামার সৃষ্টি হয় এবং লোকে হতাহত হয়। কিন্তু জিজ্ঞাস্য—হাঙ্গামা করে কাহারা? এ প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমরা একবার সংবাদপত্রে প্রকাশিত এতদুক্ত হাঙ্গামার বিশেষ রূপটা দেখিয়া লইতে চাই। আমরা নিম্নে অতি সংক্ষেপে এই রূপের একটা তালিকা উদ্ধৃত করিতেছি :

(১) হত ও আহতদের মধ্যে অনেকগুলি চৌদ্দ বৎসরের নিম্নবয়স্ক বালক আছে।

(২) উত্তর কলিকাতায় জনৈক ব্যবসায়ীর গৃহের দ্বিতলে ১টি চৌদ্দ বৎসরের বালিকা ও একটি ১২ বৎসরের বালক খেলা করিতেছিল—সৈন্যদের গুলিতে তাহারা দুইজনেই নিহত হয়।

(৩) চক্রবেড়িয়া রোডস্থ একটি বাটিতে সৈন্যগণ বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া গৃহস্থদের প্রহার করে। প্রহৃতদের মধ্যে একটি ৭০ বৎসরের বৃদ্ধা ছিলেন।

(৪) বিদ্যাসাগর স্ট্রীটে এবং গড়পার রোডের বহু গৃহের মধ্যে সৈন্যদল গুণ্ডাদের পাকড়াও করিবার জন্য জোর করিয়া ঢুকিয়া পড়ে। ধর্ম্মতলা স্ট্রীটে একটি চায়ের দোকানে চা-পানরত বহু নিরীহ ব্যক্তি সৈন্যদের হাতে নির্দ্দয় ভাবে প্রহৃত হন।

(৫) জয়দেব বর্ম্ম নামক একটি দশ বৎসরের বালক বুলেটের আঘাতে আহত হয়। সৈন্যদল তাহার বাটিতে ত্রিতলে উঠিয়া গৃহাভ্যন্তরস্থ অধিবাসীদের উপর মারপিট করে।

(৬) ওয়েলিংটন স্কোয়ারের নিকট সৈন্যদল একটি আহত ব্যক্তিকে একটি জ্বলন্ত লরীর অভ্যন্তরে নিক্ষেপ করিয়াছিল।

(৭) সৈন্যদল হোটেল ও দোকানপাট লুঠ করিয়াছিল, ফলাদি ও সিগারেট প্রভৃতি ছিনাইয়া লইয়াছিল। বহু রাস্তায় নিরীহ পথচারীদের নির্দ্দয়ভাবে প্রহার ও আটক করা হইয়াছিল এবং তাহাদের দিয়া রাস্তা পরিষ্কার করানো হইয়াছিল। সংবাদ-পত্রের রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফারদের প্রতি নিদারুণ দুর্ব্ব্যবহার করা হয়। কোন কোন স্থানে ঘটনাসমূহের গৃহীত ফটোগ্রাফ ছিনাইয়া লওয়া হয়।

(৮) অধিকাংশ আহত ব্যক্তির আঘাতস্থান পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, আঘাতগুলি হইয়াছে সাধারণতঃ কোমরের উপরিভাগে। ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, নিছক হত্যার উদ্দেশ্যেই সৈন্যগণ গুলি ছুঁড়িয়াছিল। সহরতলীর সংবাদগুলিও ইহার পরিপূরক। (Forward—22nd February)

উপরোক্ত সব ঘটনাগুলিই প্রভুভক্ত পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর অনুষ্ঠিত। হাঙ্গামা বলিতে কলিকাতায় ইহার অধিক উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটে নাই—এক লরী ও কিছু গৃহ পোড়ানো ছাড়া। সুতরাং আমরা নিঃসন্দেহে ধরিয়া লইতে পারি—মিঃ কেসি ধর্ম্মের কলে পড়িয়া স্বানুরাগপুষ্ট পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীকেই হাঙ্গামার জন্য চোখ রাঙাইয়া ফেলিয়াছেন। তারপর মিঃ কেসি বলিয়াছেন যে, এইসব হাঙ্গামার উৎস অর্থাৎ রাজনৈতিক শোভাযাত্রার জন্য যাহারা দায়ী, তাহাদের কাছে এই ঘটনা শিক্ষার বিষয় হওয়ার যোগ্য। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, জনগণ-অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক শোভাযাত্রাগুলির জন্য দায়ী কাহারা? যাহারা বিক্ষোভ দেখায় তাহারা—না, যে বিদেশী শাসনের অত্যাচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন অনিবার্য্য হইয়া পড়ে—সেই শাসন? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অবচেতনার তাড়নায় মানুষ সময় সময় অপরাধকে অস্বীকার করিতে গিয়া স্বীকার করিয়া ফেলে। মিঃ কেসিও হাঙ্গামার অপরাধ জনগণের স্কন্ধে চাপাইতে

চেষ্টা করিয়া সে অপরাধ স্বকীয় শাসনের উপরেই আরোপ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার উল্লিখিত শিক্ষা যদি কাহাকেও লাভ করিতে হয়, তাহা করিতে হইবে বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদ এবং তাহার অনুচর আমলাচক্রীকে। মনে করিয়াছিলাম, এই শিক্ষা তাঁহারা গত নভেম্বরের ঘটনা হইতেই লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা যখন তাঁহাদের মূঢ়তাবশতঃ সম্ভব হয় নাই, তখন দ্বিতীয় বারের অভিজ্ঞতা যেন ব্যর্থ না হয়। স্বভাব-ক্ষমাশীল ভারতবর্ষ অতীতে বৃটীশ সাম্রাজ্যচক্রের এবম্বিধ দুরাচার বহুবার ক্ষমা করিয়াছে, কিন্তু ভবিষ্যতে ইহার অধিক পুনরাবর্ত্তন ঘটিলে ভারতবাসী তাহা ক্ষমা নাও করিতে পারে। পৃথিবীর সর্ব্বাঙ্গীণ শান্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমরা কর্তৃপক্ষকে সাবধান করিয়া দিতে চাই।

ভারতীয় জনসাধারণকে উপরোক্ত ঘটনা হইতে কিছু শিক্ষা-লাভ করিতে হইবে। জনতার মধ্যে একদল কুচক্রী ও সাধারণের শত্রু বরাবরই আত্মগোপন করিয়া থাকে। ইহাদের স্বভাব নীতিপাঠের 'উই আর ইঁদুরের' মত; সাধারণের সম্পত্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট করিয়াই ইহাদের তৃপ্তি। শিক্ষা প্রভৃতি ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান আক্রমণ—এইসব দুর্ব্বৃত্তদের অপকীর্ত্তি। জনসাধারণকে সর্ব্বদা এইসব কুচক্রীদের ছোঁয়াচ হইতে মুক্ত থাকিতে হইবে। তাছাড়া, প্রতিবাদকে এতখানি চরমে তুলিবার মত অবস্থাও দেশে এখনও আসে নাই। এখন ভারতীয় জনগণ-ইতিহাসের গতি অতি গুরুত্বপূর্ণ পথে চলিতেছে। এই পথে জনগণকে সর্ব্বদা নেতৃবৃন্দের নির্দেশ মানিয়া চলিতে হইবে।

এই সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতি আজাদ যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। লাহোরে ২রা মার্চ্চ এসোসিয়েটেড্ প্রেস মারফৎ একটি বিবৃতিতে তিনি বলিয়াছেন—"দেশের বর্ত্তমান অবস্থা এইরূপ হইয়া উঠিয়াছে যে, প্রত্যেকেরই এখন সংযত হওয়া প্রয়োজন। ধর্ম্মঘট, হরতাল এবং সাময়িক ভাবে শাসনকর্ত্তাদের অমান্য করার সময় ইহা নহে। আমাদের রক্ষক হিসাবে যে বিদেশী শাসকগণ এদেশে রহিয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্যের বিরোধিতা করার মত এমন কোন জরুরী ব্যাপার বর্ত্তমানে ঘটে নাই। যাহাই হোক না কেন, ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে অস্বীকার করা না পর্য্যন্ত আমাদের শান্ত থাকিতে হইবে এবং তাহাও খুব বেশী দিন নহে। সময় হইলেই কংগ্রেস সংগ্রামের জন্য আহ্বান করিতে এতটুকুও দেরী করিবে না। কিন্তু এই সময় না আসা পর্য্যন্ত আমাদের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হইবে এবং সর্ব্বপ্রকারে সংঘর্ষকে বিশেষ সতর্কতার সহিত এড়াইয়া চলিতে হইবে।"

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের সমস্যা

ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ হইতে ভারতের ইতিহাস সাম্রাজ্যবাদের নিষ্পেষণের নীচে এক কালিমাময় পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। সিপাহী বিদ্রোহের পর হইতে এই নিষ্পেষণের শুরু। তখন হইতে বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদ নানা হীন চক্রান্তের আশ্রয়ে ভারতীয় জনগণের ভাগ্যকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সব দিক দিয়া শোষণ করিতেছে। শুধু ভারতের অভ্যন্তরেই যে এই শোষণ চলিয়াছে, তাহা নয়। ভারতের জনসাধারণের বিরাট এক অংশকে ভারতের বাহিরে লইয়া গিয়া সেখানেও তাহাদের দুঃখের মাত্রাকে বাড়াইয়া তোলা হইয়াছে। সেই সময় বৃটেন পূর্ব্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকায় নূতন সাম্রাজ্যের পত্তন করিতেছিল। সাম্রাজ্য-বাদী অর্থনীতির এক বিশেষ লক্ষণ হইল যে, অল্প মজুরিতে সাম্রাজ্যস্থ দরিদ্র শ্রমিককে নিযুক্ত করিয়া মুনাফার অঙ্ককে ফাঁপাইয়া তোলা। সাধারণতঃ সাম্রাজ্যের স্থানীয় শ্রমিককেই এই মুনাফাবৃদ্ধির কাজে যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু বন্য আফ্রিকাকে সেই সময় শ্রমিক হিসাবে ব্যবহার করা দুর্ঘট ছিল। তাই বৃটিশ সাম্রাজ্যচক্র অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত ভারতীয়গণকেই এই কাজে নিয়োগ করিতে মনস্থ করিলেন। এবং এই উদ্দেশ্যে ভারত হইতে বহু শ্রমিককে তাঁহারা নানা রকমের লোভ দেখাইয়া পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় চালান করিতে লাগিলেন। ভারতীয় শ্রমিকগণ সেখানে গেল, গায়ের রক্ত জল করিয়া বৃটীশ বাণিজ্য-স্বার্থকে প্রভূত উন্নত করিয়া তুলিল, নিজেদের ভাগ্যের কোন পরিবর্ত্তন ঘটাইতে সক্ষম হইল না। বরঞ্চ কায়েমী স্বার্থ ও অসম ব্যবহারের নিষ্পেষণ আরও দৃঢ়তর হইল।

এই দিক দিয়া দক্ষিণ আফ্রিকাই সবিশেষ অগ্রণী। শুধু অর্থনৈতিক শোষণ নয়।—একাধিক অসম সামাজিক আইনের প্রবর্ত্তন করিয়াও দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেত অধিবাসীরা ভারতীয় অধিবাসীদের পায়ের নীচে ফেলিয়া দলিতেছে। সম্প্রতি পূর্ব্ব আফ্রিকা, কেনিয়া, উগাণ্ডা এবং টাঙ্গানাইকার সহিত সংযুক্ত করিয়া যে সম্মিলিত ইউনিয়ন গঠনের পরিকল্পনা হইতেছে, উহা উক্ত হীন শ্বেতপ্রাধান্যের একটি জলন্ত নিদর্শন। এতদ্ব্যতীত আছে, পেগিং অ্যাক্ট, এশিয়াটিক ল্যাণ্ড টেনিওর এ্যাক্ট, এরিয়াজ্ রিসার্ভেশন বিল ইত্যাদি। সবগুলি আইনেরই উদ্দেশ্য ভারতবাসী তথা সমগ্র এশিয়াবাসী শ্রমিকদের বঞ্চিত করিয়া সম্পদযুক্ত অংশগুলিতে শ্বেত বা 'বুয়র' অধিকার স্থাপন। শুনিতে হয় তো বিস্ময় লাগিবে যে, এই সমস্ত আইন ও বিলেরই প্রবর্ত্তক হইলেন স্বনামধন্য ফিল্ড মার্শাল স্মাট্স্—যিনি গত সান্-ফ্রান্সিস্কো সর্ব্বজাতি-সম্মেলনে প্রচণ্ড আবেগময়ী ভাষায় 'মানুষের অধিকারের' কথা পৃথিবীবাসীকে শুনাইয়াছিলেন।

অন্য কোন দেশের সরকার হইলে বিদেশে স্বদেশবাসীর এই দুর্দ্দশায় বিচলিত হইতেন। কিন্তু ভারত সরকার অন্য দেশের সরকার নহেন—বৃটিশ সাম্রাজ্যশক্তির অন্যতর শোষণ-যন্ত্র মাত্র। সেই কারণে দক্ষিণ আফ্রিকায় অথবা অন্য কোন চুলায় ভারতবাসীরা পচিতেছে না মরিতেছে, তাহার সন্ধান রাখার দায় ভারত-সরকারের নাই। সর্ত্তানুযায়ী বর্ত্তমান বৎসরের ৩১শে মার্চ্চ পেগিং এ্যাক্টের মেয়াদ শেষ হইবার কথা। ফিল্ড মার্শাল এই মেয়াদ ফুরানো এ্যাক্টকে পুনর্জীবন-দানের মনস্থ করিতেছেন। সে-জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় মহল বিশেষ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। এখানকার ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধি দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় কংগ্রেস এই সর্ব্বনাশা প্যাক্টের পরিসমাপ্তি ঘটাইবার জন্য বিশেষভাবে আন্দোলন চালাইতেছেন। উক্ত কংগ্রেসের অনুমোদিত একটি

প্রতিনিধিদল ভারতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তাঁহারা ভারতের নেতৃস্থানীয়দের এবং কংগ্রেসের মধ্যস্থতায় ভারত গভর্ণমেণ্টের সহিত এ-বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন। মার্চ্চ মাসেই তাঁহাদের বড়লাট বাহাদুরের সহিত দেখা করিবার কথা। ভারতের সমগ্র জনমত তাঁহাদের প্রতি বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু ভারত সরকারের স্থবির আমলাচক্রের কি তাহাতে কেমন ভ্রংশ হইয়াছে? দেখিয়া শুনিয়া তো মনে হয়, তাঁহারা ভারতের অন্যান্য সমস্যার যে-ভাবে মীমাংসা করেন সেইভাবেই ইহাদেরও সমস্যা মিটাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, এই সঙ্গে নিশ্চিন্ত নীরবে তাঁহারা মুখে শুধু ভারতের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া চলিয়াছেন।

বিক্রয়করকে নিষ্কর করার প্রয়াস

বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া কলিকাতাবাসীদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় এক অদ্ভুত অচলাবস্থার উদয় ঘটিয়াছিল। বিপণি-কণ্টকিত কলিকাতা কার্য্যতঃ নির্বিপণি কলিকাতায় পরিণত হইয়াছিল! বিক্রয়করের প্রতিবাদে সহরের প্রায় সমস্ত ছোট-বড় দোকান বন্ধ ছিল। ফলে সহরের ব্যবসা-বাণিজ্য, লেন-দেন একেবারে শিকায় উঠিবার জোগাড় হইয়াছিল।

বিক্রয়কর ব্যাপারটি বর্ত্তমান সময়ের অবদান। ১৯৪১ সালে সরকারী আয়ের মাত্রা বৃদ্ধি করিবার সদুদ্দেশ্যে গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণের বিনা সম্মতিতেই এই করটির প্রবর্ত্তন করিয়া জনসাধারণকে নির্দেশ দিলেন যে, প্রায় যে কোন দ্রব্যের ক্রয়-কালে সরকারকে একটি করিয়া পয়সা প্রতি টাকায় গভর্ণমেণ্টের তহবিলে জমা দিতে হইবে। জনসাধারণের প্রতিনিধিস্থানীয়রা এই অসৎ করপ্রথার বিরুদ্ধে তখনই তীব্রভাবে প্রতিবাদ জানান। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তখন তাঁহাদের এই বলিয়া আশ্বস্ত করেন যে, এই কর শুধু যুদ্ধকাল পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে, ইহা একটি সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র। জনসাধারণ গভর্ণমেণ্টের মিথ্যা আশ্বাসে ভুলেন। মনস্তাত্ত্বিকেরা বলেন যে, জনসাধারণের ভুলটা বড় দীর্ঘকালস্থায়ী। কোন একটা বিষয় একবার কোন রকমে ভুলিয়া বসিলে, তাহা আর সহজে স্মরণে আসে না। বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণের এই দুর্ব্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিতে ছাড়িলেন না। তাঁহারা বিস্মরণশীল জনসাধারণের উপর টাকায় এক পয়সা হইতে দুই পয়সা, দুই পয়সা হইতে তিন পয়সা পর্য্যন্ত সেই সাময়িক করের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া চলিলেন। এ বৎসরে সেই তিন পয়সাকে চার পয়সা করিবার মৎলব করিয়াছিলেন গভর্ণমেণ্ট, কিন্তু তাঁহাদের সেই মৎলবটা বিনা প্রতিবাদে হাসিল হইতে পারিল না। যুদ্ধোত্তর আর্থিক দুর্গতির মুখে দাঁড়াইয়া জনসাধারণ এবারে যেন হঠাৎ সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। কেনা-বেচার ভূমিকায় জনসাধরণের মধ্যে ব্যবসায়ী মহল বেশী সক্রিয় এবং সঙ্ঘবদ্ধ, এই কারণে এই সচেতনতায় তাহাদের অংশটাই ছিল বৃহৎ। এই বৃহত্বের সুযোগে ব্যবসায়ী মহল গভর্ণমেণ্টের এই কার্য্যের বিরুদ্ধে প্রথমে মৌখিক প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই প্রতিবাদ উপেক্ষিত হওয়ায় আরও সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন—একজোট হইয়া কলিকাতায় প্রায় সমস্ত দোকানপাট বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা দাবী করিয়াছিলেন যে, গভর্ণমেণ্টকে এই অসং জনস্বার্থ-বিরোধী করের সমস্তটাই তুলিয়া দিতে হইবে।

গভর্ণমেণ্ট কিন্তু এই প্রতিবাদে এতটুকুও বিচলিত হন নাই। না হইবারই কথা। তাঁহারা হইলেন পুরুষকারের মূর্ত্ত প্রকাশ। তাঁহাদের হাতে রহিয়াছে পুলিশ, সার্জ্জেণ্ট ও সেনাবাহিনী, আর রহিয়াছে সাম্রাজ্যবাদী নৃশংসতা। তাঁহাদের কি আর এত সহজে বিচলিত হইলে চলে! দীর্ঘ পাঁচ বৎসর ধরিয়া অসদুপায়ের যে আদায়টা প্রায় মৌরশী হইবার উপক্রম হইয়াছে, সেটা যদি এত সহজেই ত্যাগ করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে তো কালক্রমে জনমতের খাতিরে গভর্ণমেণ্টকে এই পৌনে দুইশত বৎসরের গদিটাও একদিন ছাড়িয়া দিতে হইবে! তাই যদি করিবেন, তবে তাঁহারা এত কষ্ট করিয়া এই গণতান্ত্রিক যুদ্ধটা জিতিলেন কেন? কিন্তু পুরুষকার হইয়াও নিখুঁত সাম্রাজ্যবাদকে বজায় রাখিতে তাঁহাদের মাঝে মাঝে জনমতকে একটু খাতির করিতে হয়। এই মহৎ উদ্দেশ্যে সিদ্ধিলাভ করিতে জনমতকে মাঝে মাঝে একটু আশ্বস্ত রাখার প্রয়োজন। এই কারণেই তাঁহারা তিন পয়সার মাত্রাটাকে আগামী মন্ত্রিসভার গঠন না হওয়া পর্য্যন্ত আপাততঃ আর বাড়াইবেন না বলিয়া রাজী হইয়াছেন। মন্ত্রিসভা বিহনে নিজের দায়িত্বে তাঁহারা যে নির্দ্দেশ দিয়াছেন 'ভারতীয় গণতন্ত্রের' আইন অনুসারে তাঁহারা নাকি কেবল সেটুকুই রহিত করিতে পারেন। উহার বাহিরে অন্য কিছু করার এক্তিয়ার তাঁহাদের নাই।

ব্যবসায়ী মহল শেষ পর্য্যন্ত জননায়কদের উপদেশানুসারে গভর্ণমেণ্টের এই সিদ্ধান্তটাই মানিয়া লইয়াছেন। ৭৫ হাজার বন্ধ দোকানের দরজা আবার উন্মুক্ত হইয়াছে। কলিকাতায় আবার সেই বিপণি-কণ্টকিত অবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে। সুতরাং প্রতিবাদটা এখন সাময়িক ভাবে চাপা পড়িয়াছে। কিন্তু এখানে একটা কথা আমরা সরকার বাহাদুরকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। দুই পয়সা হইতে তিন পয়সার রেওয়াজটা তাঁহারা করিয়াছেন মন্ত্রিসভা বিহনে নিজের দায়িত্বে। সুতরাং আইনগত এক্তিয়ার অনুসারে তাঁহারা তো সেই 'তিরানব্বই'-এর দায়িত্বটা হইতেও মুক্ত হইতে পারিতেন! তাহাতে তাঁহাদের কর্ত্তব্যের দিকটাও বজায় থাকিত, জনগণও সরকারী শোষণ হইতে কিছু মুক্ত হইতে পারিত। কিন্তু মেকি কর্ত্তৃত্বগর্ব্বী সরকার আমাদের এই প্রস্তাবে কি কর্ণপাত করিবেন?

ক্ষুধিত ডাক-কর্ম্মচারী

গতমাসের প্রথম দিকে কলিকাতাবাসিগণ বিক্রয়কর-প্রতিবাদ-প্রদর্শনী ছাড়া আরও একটি সম্পূর্ণ নূতন প্রদর্শনী প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—সেটা হইল ডাক-কর্ম্মচারীদের 'ভুখা ব্যাজ প্রদর্শনী'। কলিকাতায় এই ঘটনাটাও অভূতপূর্ব্ব। কর্ত্তৃপক্ষের 'রা...' ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য, নিজেদের অভুক্ত অবস্থার প্রতি দেশবাসীর সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিবা...

জন্য, ডাককর্ম্মচারীরা সত্যই এক অভিনব উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন।

১৯৩৯ সালে সরকার-প্রবর্ত্তিত স্বল্প-পরিমাণ বেতনের হার ডাককর্ম্মচারীদের জীবন ধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনটুকু পর্য্যন্ত মিটাইবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত ছিল না। এই বেতনের হার বৃদ্ধি করা হোক, না করিলে ডাককর্ম্মচারীদের জীবন দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠিবে—এই কথাটা ডাকবিভাগের কর্ম্মচারীরা সকল সংশ্লিষ্ট পক্ষকে জানাইবার প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন। তাহাদের সেই প্রয়োজন সাধিত হইয়াছে, তাঁহাদের দাবী জ্ঞাপনটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই। কর্ত্তৃপক্ষ ডাক-কর্ম্মচারীদের অভিযোগ সম্বন্ধে অবহিত হইয়াছেন এবং হইয়া তাঁহাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বভাবানুযায়ী রুষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু নিতান্ত আশার বিষয়, কর্ম্মচারীরা কর্ত্তৃপক্ষের এই রোষে বিচলিত হন না। অভাবের তাড়নায় তাহাদের মধ্যে যে সংহতি ও ঐক্য আসিয়াছে, সেই ঐক্য ও সংহতির উপর নির্ভর করিয়া এই নীরব বিক্ষোভ প্রদর্শনের পরেও তাঁহারা গত ২৫শে ফেব্রুয়ারীতে একটি বিজ্ঞপ্তি মারফৎ কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, ইতিমধ্যে ডাক-কর্ম্মচারীদের দাবী পূর্ণ না করিলে অথবা পূর্ণ করিবার সন্তোষজনক প্রতিশ্রুতি না দিলে তাঁহারা ১১ই মার্চ্চ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট একটি ধর্ম্মঘট-নোটিস্ জারী করিয়া ২৪শে মার্চ্চ হইতে একযোগে ধর্ম্মঘট সুরু করিবেন।

ডাক-কর্ম্মচারীদের এই অভাব-অভিযোগ জ্ঞাপনের ব্যাপারটা নূতন নয়। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, গত ১৯৪৪ সালেও ডাক-কর্ম্মচারীরা কর্ত্তৃপক্ষের কাছে কয়েকটি এই ধরণের দাবী জানাইয়া একটি ধর্ম্মঘটের নোটিশ দাখিল করিয়াছিলেন। সে সময় বর্ত্তমান যুদ্ধ পুরাদমে চলিতেছিল। যুদ্ধের কাজে ডাক-বিভাগটি ছাড়া কোন দেশের কোন সরকারেরই একটি পা' চলিবার উপায় নাই। সুতরাং সেই সময় গভর্ণমেণ্ট ডাককর্ম্মচারীদের উক্ত আচরণের ফলে ডাক বিভাগের কাজ ব্যাহত হইবে এই আশঙ্কা করিলেন, এবং কোন গতিকে ব্যাপারটা চাপা দিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। সরকারের সেই সচেষ্টতার ফল আত্মপ্রকাশ করিল 'কৃষ্ণপ্রসাদ তদন্ত কমিটি' নামক এক কমিটির রূপ নিয়া। গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিলেন যে, এই কমিটি প্রথমে তদন্ত করিয়া দেখিবে ডাকর্ম্মচারীদের দাবী সত্যই ন্যায়সঙ্গত কিনা। তদন্তের ফলে যদি কর্ম্মচারীদের অভিযোগ যথার্থ বলিয়া পরিলক্ষিত হয় তবে কর্ত্তৃপক্ষ কর্ম্মচারীদের দাবী যথাসাধ্য মিটাইবার চেষ্টা করিবেন। ডাককর্ম্মচারীরা সরকারের এই ঘোষণা সরল চিত্তেই বিশ্বাস করিলেন এবং এই সরল বিশ্বাসে ধর্ম্মঘট-নোটিশ প্রত্যাহার করিয়া লইলেন। কিন্তু হৃদয়হীন কর্ত্তৃপক্ষ কর্ম্মচারীদের এই বিশ্বাসের মর্য্যাদা রাখিলেন না। কর্ম্মচারীদের দাবী মিটানো দূরের কথা, কৃষ্ণপ্রসাদ কমিটির রিপোর্ট পর্য্যন্ত তাঁহারা চাপা দিয়া রাখিলেন। উক্ত রিপোর্ট অদ্যাবধি অপ্রকাশিত রহিয়াছে। ডাককর্ম্মচারীরা তাঁহাদের অন্যান্য দাবীর সহিত এই রিপোর্ট-টি প্রকাশ করিবার দাবীও সংযুক্ত করিয়াছেন।

গত ৬ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত ডাককর্ম্মচারীদের ধর্ম্মঘটের আশঙ্কা দেশবাসীকে সবিশেষ উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল। এই উদ্বেগ কেবলমাত্র সংবাদ-সরবরাহ ব্যাপারে নিজেদের অসুবিধার আশঙ্কা-প্রণোদিত নয়, সমব্যথীর প্রতি স্বাভাবিক সহানুভূতিও এই উদ্বেগের কারণ ছিল। বিদেশী সাম্রাজ্য-শোষণের যন্ত্রে যে প্রত্যেক ভারতবাসীরই ভাগ্য একই ছাঁচে ঢালাই হয়, সেকথা আজ ভারতবাসী মাত্রেই বুঝিতে শিখিয়াছে। এই নব বোধোদয়ে ভারতবাসী তাই আজ আর প্রতিবেশী স্বদেশবাসীর দুরবস্থাকে পরের ব্যাপার বলিয়া দূরে সরাইয়া রাখিতে পারে না, সেই দুরবস্থাকে পরোক্ষভাবে নিজেরও দুরবস্থা বলিয়া বরণ করিয়া লয়। আজ তাই সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারের বিরুদ্ধে যখন অপর কোন ভারতবাসী প্রতিবাদ করিয়া উঠে, তখন সেই প্রতিবাদে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে না পারিলেও নীরব সহানুভূতিতে সেই প্রতিবাদকে সকলে সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করে। ডাককর্ম্মচারীদের দুরবস্থার প্রতি এই সহানুভূতিবশেই দেশবাসী তাহাদের প্রদর্শিত বিক্ষোভে উদ্বিগ্ন হইয়াছিল। গত ৬ই মার্চ্চ তারিখে এসোসিয়েটেড্ প্রেস কর্ত্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে তাহাদের উদ্বেগ কিছুটা প্রশমিত হইয়াছে। এই সংবাদে বলা হইয়াছে যে, ডাক ও তার বিভাগ এবং বিভাগের কর্ম্মচারীদের এক মীমাংসা হইয়াছে। যে-ধর্ম্মঘটের নোটীশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা আর হইবে না, আশা করা যাইতেছে।—উভয় পক্ষ বিরোধের বিষয়টি 'এড্‌জুডিকেশনে' পাঠাইতে সম্মত হইয়াছেন।'

খাদ্যনীতি বনাম রাজনীতি

"এই বৎসর ভারতে মোট ৬০ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের ঘাটতি পড়িবে।"

"দুর্ভিক্ষের করাল প্রকাশ ইতিমধ্যেই বোম্বাইয়ের পাঁচটি জেলায় ও মহীশূরের চারটি জেলায় প্রকট হইতে সুরু হইয়াছে রাজপুতানার দেশীয় রাজ্যগুলিতে এবং কাথিওয়ার ও দাক্ষিণাত্যের কতকগুলি দেশীয় রাজ্যেও খাদ্যের অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে

সংবাদটি কোন বিশেষ সংবাদ-পত্রের নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র নয়। নয়া দিল্লী হইতে গত ২রা মার্চ্চ ভারতীয় খাদ্য-বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ বি, আর, সেন এই সংবাদটি ঘোষণা করেন। সম্পূর্ণ এই খবরটি আমরা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। মিঃ সেনের ঘোষণায় আরও কথা লক্ষ্য করিবার আছে। তিনি একস্থানে বলিয়াছেন, "গত ১৯৪৩ সনের দুর্ভিক্ষে ও ১৯৪৬ সনের আগামী দুর্ভিক্ষের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে।—এবারকার দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি সম্বন্ধে ভারত সরকার প্রথম হইতে রীতিমত সচেতন রহিয়াছেন।" অর্থাৎ উল্লেখ না করিয়াও তিনি এই উক্তির সহিত একপ্রকার স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে, ১৯৪৩ সনের দুর্ভিক্ষে গভর্ণমেণ্ট তেমন সচেতন ছিলেন না এই অনিচ্ছাকৃত স্বীকৃতির জন্য আমরা মিঃ সেনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ৩৫ লক্ষ মানুষের মৃত্যুতেও কোন দেশের সরকার সচেতন হওয়ার প্রয়োজন মনে করেন না—একথা নিশ্চিন্ত-চিত্তে স্বীকার করার সাহস আছে বলিয়াই ভারতসরকার এইবার দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনাকে নিরুদ্বেগ চিত্তে স্বীকার করিয়াছেন এবং

বজ্রকণ্ঠে নির্দেশ দিয়াছেন যে, সাবধান, খাদ্যনীতিকে লইয়া অ যাই কর, উহাকে রাজনীতির সহিত মিলাইতে পারিবে না।

খাদ্যকে রাজনীতির সহিত মিলাইবার অপচেষ্টা নাকি করি ছিলেন স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী। ভারতের দুর্ভিক্ষ-দানবের আবির্ভাবের সম্ভাবনার আভাস পাইয়া গতমাসে ভারত গভর্ণমেণ্ট যখন মুক্তকচ্ছ হইয়া পৃথিবীর খাদ্য-মহাজনদের এবং বিশেষজ্ঞদের দ্বারে ধর্ণা দিবার জন্য তোড়জোড় করিতেছেন, তখন বড়লাট বাহাদুর অনুগ্রহ করিয়া মহাত্মা গান্ধীকে তাঁহার বক্তব্য শুনিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধী ব্যক্তিগত ভাবে সেই আমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি বড়লাট বাহাদুরকে পত্রযোগে আসন্ন দুর্ভিক্ষ নিবারণের কয়েকটি উপায় নিবেদন করিয়াছিলেন। আর সেই সময় সেই উপায়গুলির উল্লেখ কালে একটি কথা বলিয়াছিলেন যে, "বর্ত্তমান সরকারের আমলাচক্র এতাবৎকাল কোনদিনই জনসাধারণের বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে পারে নাই। সুতরাং দুর্ভিক্ষ নিবারণের অভিপ্রায় যদি আপনাদের সত্য হয় তবে এই আমলাচক্রের লোপ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে কেন্দ্রে ও প্রদেশে জনসাধারণের আস্থাভাজন সরকার নিয়োজিত করুন। ইহা হইলে নূতন সরকার জনসাধারণের দুর্দ্দশা নিজের বলিয়া গ্রহণ করিয়া উহার উপশমকল্পে প্রাণান্ত চেষ্টা করিতে সক্ষম হইবে। ভারতে স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হইলে সেই সরকার ভারতের আসন্ন দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব ঘটিতে দিবে না।"

কিন্তু চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী। বরঞ্চ ধর্ম্মের কাহিনী শুনিলে তাহারা ক্রুদ্ধ হয়। সাম্রাজ্যবাদী এবং তার অনুরাগপুষ্ট সম্প্রদায়বাদীরাও গান্ধীজী বর্ণিত ধর্ম্মকথা শুনিয়া অত্যন্ত গোসা করিয়াছেন। বড়লাট বাহাদুর সেই কারণেই গান্ধিজীর উল্লেখকে কটাক্ষ করিয়া নির্দেশ দিয়াছেন—খাদ্যকে রাজনীতির পঙ্কিলতার মধ্যে না মিলাইতে। মিঃ জিন্না উত্তম আলঙ্কারিক; তিনি খাদ্যকে নিয়া রাজনীতির ফুটবল' খেলিতে নিষেধ করিয়াছেন। এবং স্যার নাজিমুদ্দিন—যাঁহার মন্ত্রিত্বকে আর কেহ নয়, গভর্ণমেণ্ট-নিযুক্ত দুর্ভিক্ষ কমিশন স্বয়ং ১৯৪৩-এর বাংলার দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী করিয়াছেন—সেই স্যার নাজিমুদ্দিন পর্য্যন্ত ওয়াশিংটনে যাইবার কালে গান্ধিজীর উক্ত অপচেষ্টায় হৃদয়ে আঘাত পাইয়াছেন। সব চেয়ে মর্ম্মাহত হইয়াছেন বিলাতের টোরী-চক্র। তাঁহাদের মুখপাত্র 'সান্-ডে অবজার্ভার' গান্ধিজীর এই নির্দ্দেশকে রীতিমত 'পলিটিক্যাল ব্ল্যাক মেইল' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

আমাদের মত যাঁহারা সাধারণ ছা-পোষা মানুষ তাঁহারা মনে করিতে পারেন, এতগুলি জনদরদী লোক যখন খাদ্যকে রাজনীতি হইতে জাতিচ্যুত করিতে চাহিতেছেন, তখন নিশ্চয়ই ভারতের খাদ্যনীতি ভারতীয় শাসন ব্যাপার হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। তাহা হইলে কি গান্ধিজী সহসা একটা বেফাঁস কথা বলিয়া ফেলিলেন? কিন্তু তাহাই বা কি করিয়া সম্ভব? গান্ধিজী হইলেন বিংশ শতকের সর্ব্বোত্তম মানব—তিনি কি না চিন্তা করিয়াই এমন একটি নিরর্থক কথা বলিয়া ফেলিবেন! অগত্যা এই জটিল সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের অর্থনীতি-বিদের শরণ লইতে হয়। তিনি আমাদের প্রশ্নটি ভালো করিয়া শোনেন, তার উত্তর দেন।

গান্ধিজী ভূয়োদর্শী মহামানব, তিনি তাই সমস্যার সমাধানটা সমস্যার মূল হইতে শুরু করিতে চাহিয়াছেন। এই কারণেই বিষবৃক্ষের বিষ নষ্ট করিতে গিয়া তিনি শুধু বিষফল নষ্ট করিয়াই সন্তুষ্ট নন, গোটা বিষবৃক্ষটাকেই মূলশুদ্ধ উপড়াইয়া ফেলিতে চান। ভারতের আর্থিক ব্যবস্থার কাঠামোটার প্রতি সামান্য একটু দৃষ্টিপাত করিলেই এই সাধারণ কথাটা বুঝা যাইবে। এই কাঠামোটা দেখিলেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন যে - ভারতের অন্নাভাবটা প্রতি বৎসরের ব্যাপার। পরিপূর্ণ উৎপাদন সত্ত্বেও ভারতের এক-তৃতীয়াংশ লোককে সংবৎসর অর্দ্ধাহারে কাটাইতে হয়। সুতরাং অসময়ের ঘাটতি পূরণের জন্য যে উদ্বৃত্ত খাদ্যের প্রয়োজন, সেই খাদ্যের বালাই ভারতবর্ষে নাই। আপনারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তবে খাদ্যসচিব স্যার জওয়ালা প্রসাদ ভারতকে পেটুক বলিয়া গাল দেন কেন? সে প্রশ্নের উত্তর আপনারা নিজেই জানেন—জওয়ালাপ্রসাদ ভারত সরকারের কর্ম্মচারী, আর ভারত সরকারের সত্যকে অস্বীকার করিবার অসম-সংসাহস আছে, কর্ম্মোত্তরাধিকার-সূত্রে স্যার জওয়ালাপ্রসাদ এই সাহস লাভ করিয়াছেন। আরও একটা প্রশ্ন আপনারা করিতে পারেন যে, শস্যশ্যামলী ভারতে কেন এই খাদ্যের অভাব; ভারতে কি চাষের উপযুক্ত জমির টান পড়িয়াছে? এই প্রশ্নের উত্তর শুনিলে আপনারা স্তম্ভিত হইবেন। ভারতে আজও পনেরো কোটি একর উৎপাদনক্ষম জমি উপযুক্ত হস্তক্ষেপের অভাবে উপেক্ষিত হইয়া পতিত আছে। তাহা ছাড়া, জমিকে রেহাই দিবার জন্য যে বাড়তি শিল্পজীবিকা জনসাধারণকে বাঁচাইয়া রাখিবার পক্ষে অপরিহার্য্য, সেই গ্রামশিল্প বিদেশী যন্ত্রশিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় বহুদিন হইতে গতায়ু হইয়াছে। ফলে জনসাধারণের জীবিকা-অর্জ্জনের সমস্ত ভারটা গিয়া পড়িয়াছে জমির উপর। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে ইহা গুরুতর হইয়াছে এবং তাহার ফলস্বরূপ ধর্ষিতা ধরণী কোন কোন স্থানে শস্য-প্রসাদদানে একেবারেই বিমুখ হইয়াছেন। এই কাঠামোর উপরে গোদের উপরে বিষ-ফোড়া রূপে ভারতীয়দের আজব উত্তরাধিকার-ব্যবস্থা এবং অধিকন্তু জমিদারী ব্যবস্থা তো আছেই। কিন্তু মনে রাখিবেন, একক হিসাবে এগুলির কোনটাই বিষবৃক্ষ নয়, এগুলি সব বিষবৃক্ষের শাখা-প্রশাখা। বিষবৃক্ষ হইল সমস্ত কাঠামো, যেটাকে বিদেশী শাসন গত পৌনে দুই শত বৎসরের সশস্ত্র সাধনায় অতি যত্নের সহিত জিয়াইয়া রাখিয়াছেন। বিদেশী শাসন উক্ত বিষবৃক্ষটাকে কত যত্নের সহিত রক্ষা করে, সে কথা আপনারা গত তিন বৎসরের অর্থনৈতিক ইতিহাস লক্ষ্য করিলেই কিছুটা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

তাছাড়া—অর্থনীতিবিদ্ আমাদের প্রশ্নের উত্তরে আরও বলিতে থাকেন,—তাছাড়া গান্ধিজী শাসন-ব্যবস্থার অযোগ্যতার কথা বলিয়াছেন, সেটারও তো একটা বড় প্রমাণ চোখের সামনেই রহিয়াছে। আপনাদের বোধ করি স্মরণ আছে যে, বড়লাট বাহাদুর গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী দিল্লী হইতে এক বক্তৃতায়

ঘোষণা করেন যে, ভারতে এবার প্রায় ৩০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য টান পড়িবে। এই ঘোষণার তিন সপ্তাহ পরে ৩রা মার্চ তারিখের সংবাদপত্র দেখুন, নয়া দিল্লী হইতে খাদ্যদপ্তরের সেক্রেটারী ঘোষণা করিতেছেন—"ভারতে এবার ৬০ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের ঘাটতি হইবে।" মাত্র তিন সপ্তাহের ব্যবধানে যাহাদের হিসাবে—সেও আবার যে সে দ্রব্যের হিসাব নয়, সারা পৃথিবী যাহার এককণা অপচয় নিবারণে উদ্ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে—সেই খাদ্যশস্যের হিসাবে যদি ৩০ লক্ষ টন অর্থাৎ ছয় কোটি দশ লক্ষ মণের অমিল হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের শাসনকে একমাত্র উন্মাদ অথবা স্বার্থান্ধ ব্যক্তি ভিন্ন আর কেহ কি যোগ্য বলিয়া অভিহিত করিতে পারেন!

এতদ্ব্যতীত ১৯৪৫ সালে খাদ্যরপ্তানির হিসাবটা দেখুন। বড়লাট বাহাদুর এবং তাহার কিছুদিন পরেই সম্পাদক সম্মেলনে খাদ্য সেক্রেটারী মিঃ বি, আর, সেন দেশবাসীকে জানান যে, ১৯৪৫ সালে ভারত হইতে কোন খাদ্যশস্য রপ্তানী হয় নাই। কিন্তু সরকারী রিপোর্টকেই উদ্ধৃত করিয়া দুই জন বিশিষ্ট ব্যক্তি দেখাইয়াছেন যে, কথাটা ভিত্তিহীন। কেন্দ্রীয় পরিষদের ভূতপূর্ব সদস্য স্বামী বেঙ্কট চালম্ চেটি সরকারী রিপোর্ট উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, ১৯৪৫ সালের এপ্রিল হইতে নভেম্বর পর্য্যন্ত মোট ৪০ হাজার টন খাদ্যশস্য বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে, কলিকাতার মাড়োয়ারী বণিক সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত এম্, এল্, খেমকা এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন: "১৯৪৫ সালের জুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে একটী মাত্র অ-ভারতীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কলিকাতা বন্দর হইতে মোট ২২ হাজার ৫ শত ৪ টন চাউল বিদেশে রপ্তানী করিয়াছে।" বরিশাল হইতে এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, সেখান হইতে লক্ষ লক্ষ মণ চাউল নৌকাযোগে অজ্ঞাতস্থানে প্রেরণ করা হইতেছে।

এই গেল খাদ্যশস্য রপ্তানীর কথা। এবার খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের সরকারী ব্যবস্থার নমুনা একটুখানি শুনুন। সরকারী গুদামে সংরক্ষণের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। কারণ, তাঁহাদের এই ব্যবস্থায় যে খাদ্যশস্য প্রভূত পরিমাণে নষ্ট হয় সে কথা গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের চালখেকো লোকের বিরুদ্ধে বিজ্ঞাপন-সংগ্রামের মধ্যেই স্বীকার করেন। কিন্তু ইহা বাদ দিয়াও উল্লেখ করিবার মত আরও একাধিক বিষয় আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে দিনাজপুর জেলা কংগ্রেস-কমিটির সহসম্পাদক মহাত্মা গান্ধী এবং পণ্ডিত নেহেরু-প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে জানাইয়াছেন যে, দিনাজপুরের মিলে প্রায় ৩০ হাজার মণ চাউল পচিতেছে। তাহা না গভর্ণমেণ্ট কিনিতেছেন, না সাধারণকে কিনিতে দিতেছেন। সম্ভবতঃ উক্ত চাউল সম্পূর্ণ পচিয়া নদীনালায় ভাসাইয়া দিবার উপযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্ট কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবেন না।

সর্ব্বশেষে চাউলের দামের কথা। বাঙলাগভর্ণমেণ্টের খাদ্য-দপ্তর একটী সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, মফঃস্বলে চাউলের মূল্যবৃদ্ধির কথা শোনা গিয়াছে বটে, কিন্তু তাতে চিন্তিত হইবার কিছু নাই। কারণ, এই মূল্যবৃদ্ধি মণকরা তিন চার আনার বেশী নহে।' অথচ কিছুদিন পরেই তাঁহাদের আশ্বাসকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া সংবাদপত্রে প্রকাশ পাইতেছে যে, মফঃস্বলের নানাস্থানে চাউলের মূল্য বাড়িয়া ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। ঢাকার পল্লী-অঞ্চলে কয়েকদিনের মধ্যেই চাউলের দর মণকরা ১১ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ময়মনসিংহ জিলার মুক্তাগাছায় চাউলের মণ ১০৲ টাকা হইতে ১৩৲ টাকায় এবং কিশোরগঞ্জে ১৬৲ টাকা হইতে কুড়ি টাকায় উঠিয়াছে।

সরকার আগাগোড়া এই ভাবেই তাঁহাদের অবলম্বিত খাদ্য-নীতিতে হৃদয়হীন শিথিলতা প্রদর্শন করিতেছেন। ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরও ঠিক এইরূপ শিথিলতা ও অযোগ্যতার ফল। এই অযোগ্যতার লোপ না করিয়া কেবল নেতৃবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আন্তরিকতার ভাব দেখাইলে, বা খাদ্যরেশনের বরাদ্দ কমাইলে অথবা ওয়াশিংটনের খাদ্যবোর্ডের কাছে মায়াকান্না কাঁদিলে দুর্ভিক্ষ নিবারিত হইবে না। সরকারী খাদ্যনীতির এই সব দুর্নীতির কথা চিন্তা করিয়া গান্ধীজী বলিয়াছেন—বর্ত্তমান অকর্ম্মণ্য সরকারকে সরাইয়া জনসাধারণের আস্থাভাজন সরকার প্রতিষ্ঠা করিতে। নতুবা অন্য কোন উদ্দেশ্য তাঁহার ছিল না। গান্ধীজীর পথ সত্যকার জনকল্যাণের জন্য। তাই তিনি কেবল দুর্ভিক্ষনিবারণ কল্পে আরও আটদফা কার্য্যকরী নির্দেশ দিয়াই স্থির থাকেন নাই, সমুদয় দেশবাসীকে এবং তাঁহার আশ্রমবাসীকে আসন্ন সঙ্কটের নিবারণকল্পে ব্যক্তিগত ভাবে গভর্ণমেণ্টের কার্য্যে সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করিবার উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার কথায় রাজনৈতিক কূটবন্ধের আতঙ্ক দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিতেছেন শুধু গর্ভগর্ভ নির্বাচন-বক্তৃতা দিয়া, আর পাকিস্থান-অর্থাভাবে তা দিয়া।

সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘে আন্তর্জাতিক তামাসা (U.N.O.)

গত মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যায় যথাক্রমে মস্কোর তিন প্রধানের বৈঠকের এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা মন্তব্য করিয়াছিলাম যে, পৃথিবীব্যাপী এক একটা যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলেই বিজয়ী পক্ষের শক্তিমানেরা পৃথিবীকে যুদ্ধাশঙ্কা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করিয়া তথায় চিরশান্তি স্থাপনের জন্য একটি সার্ব্বজাতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া নানারকম সুখশ্রাব্য প্রস্তাব ও পরিকল্পনা রচনা করিতে লাগিয়া যান। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সেই প্রস্তাব ও পরিকল্পনাগুলি মাঠে মারা যায়। শক্তিমানেরা সেই আগেরই মত সে-বার নিজের কোলে ঝোল মাখিতে সুরু করেন এবং নিজের নিজের স্বার্থ সামলাইতে পরের ত্রুটিকে মার্জ্জনা করিতে লাগিয়া যান। অবশেষে এই পারস্পরিক স্বার্থপোষণের পরিণাম গিয়া উপস্থিত হয়—অন্য এক বৃহত্তর যুদ্ধে।

মন্তব্যটীর সুরে সম্ভবতঃ পরিহাসের সুরটা একটু চড়াই ছিল, কিন্তু তত্রাচ কথাটা আমরা ঠিক হাল্কা ভাবে বলি নাই। প্রথম মহাযুদ্ধের পর যে লীগ অব্ নেশনস্-এর প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, আমরা তাহার কার্য্যকলাপের অভিজ্ঞতা হইতেই উক্ত মন্তব্য করিয়াছিলাম। লীগ অব্ নেশনস্-এর সনদ ছিল কার্য্যতঃ ভার্সাই সন্ধির সনদ। সেই সনদের প্রথম পাদে নিম্নলিখিত সর্ত্তটি উল্লিখিত ছিল:

"The High Contracting Parties

In order to promote international co-operation and to achieve international place and security by the acceptance of obligations not to resort to war; by the prescription of open, just and honourable relations between nations; by the firm establishment of the understandings of international law as the actual rule of conduct among governments; and by the maintenance of justice and a scrupulous respect for all treaty obligations in the dealings of organised peoples with one another...agree to this conventant of the League of Nations.

(Opening clause of the treaty of Versailles signed on June 28, 1919)

অর্থাৎ প্রধান প্রধান পক্ষগণ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা উন্নয়নকল্পে এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপনের মানসে লীগ অব্ নেশনস্-এর এই এই সর্ত্তগুলি মানিয়া চলিবেন —(১) যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়ার জন্য পরস্পরের মধ্যে সকল প্রকার বাধ্য-বাধকতা স্বীকার করিয়া লওয়া; (২) জাতিপুঞ্জকর্ত্তৃক পরস্পরের মধ্যে অকপট, ন্যায়সঙ্গত এবং সম্মানজনক সম্বন্ধ স্থাপন করা; (৩) সকলপ্রকার আন্তর্জাতিক আইন মানিয়া চলার চেষ্টা প্রতিষ্ঠা করা; কারণ, সকল জাতির চরম শাসনকার্য্য এই আইনানুযায়ী পরিচালিত হইবে; (৪) সুপরিচালিত জাতিগুলির শাসন-পরিচালনার ব্যাপারে সতর্কতার সহিত সকলপ্রকার সন্ধির সর্ত্তগুলি মান্য করিতে হইবে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর প্রধান শক্তিগুলি যদি লীগ অব নেশনস্-এর সনদের এই প্রথম সর্ত্তটি সম্পূর্ণ সততার সহিত মানিয়া চলিতেন তবে আর পৃথিবীতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবতারণা হইত না। কিন্তু সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ কোন সর্ত্তই মানিয়া চলেন নাই। বরঞ্চ কায়েমী স্বার্থের পোষণ করিয়া, সাম্রাজ্যবাদের পীড়নকে তোষণ করিয়া এবং সর্ব্বশেষে ফ্যাসি-দানবের সৃষ্টি করিয়া পৃথিবীকে আবার সর্ব্বনাশের যজ্ঞভূমিতে পরিণত করিয়াছিলেন। এবং পৃথিবী সেই পূর্ব্বেরই মত জঙ্গী নিয়মে চালিত হইতেছিল। সুতরাং লীগ অব নেশনস্ শুধু একটি আন্তর্জাতিক তামাসা হিসাবে দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর টিকিয়া ছিল।

বর্ত্তমানে প্রতিষ্ঠিত 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ' প্রতিষ্ঠান পূর্ব্বতন লীগ অব নেশনস্-এরই সগোত্র। সেই লীগেরই মত এখানেও শুধু মাত্র প্রধান শক্তিদের স্বার্থের মুদ্রাযন্ত্রে শান্তির পরিকল্পনাগুলি ছাপা হইতেছে। প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শাখায় এ পর্য্যন্ত পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। পাঁচটি বিষয়ই পাঁচটি দেশের জীবন-মরণের সমস্যার বিষয়—ইহাদের একজনেরও সমস্যা যদি অমীমাংসিত থাকে, তাহা হইলে পৃথিবীর শান্তি প্রতিবন্ধকহীন হইয়া থাকিতে পারে না। ইহার কারণ, বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে পৃথিবীর অভিন্নতা। পৃথিবীর এক অংশের শান্তি আঘাতপ্রাপ্ত হইলে, সেই আঘাত কালক্রমে সকল অংশেরই উপর গিয়া পড়িবে। কিন্তু পাঁচটি বিষয়ের একটিরও সন্তোষজনক মীমাংসা হয় নাই। ইরাণে সোভিয়েট সৈন্যের উপস্থিতির সমস্যা, গ্রীসে আর ইন্দোনেশিয়ায় ডাচ ও ইংরাজের হস্তক্ষেপের বিষয় উক্ত সম্মেলনের আলোচনায় কি সদ্‌গতি লাভ করিয়াছিল—সে কথা আমরা ফাল্গুন সংখ্যার আলোচনায় বলিয়াছি। তিনটা বিষয়কেই হস্তক্ষেপকারীদের ঘরোয়া ব্যাপারের অজুহাতে ধামা-চাপা দেওয়া হইয়াছিল। ফলে শক্তিমান্ হস্তক্ষেপকারীরা আরও দৃঢ়তার সহিত উৎপীড়িত জনগণকে নিষ্পেষণের মাত্রা বাড়াইয়া দিয়াছে।

এই তিন স্থানের মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার ভবিষ্যৎ ভারতের ভবিষ্যতের সহিত বিশেষ সংযুক্ত বলিয়া আমরা উহার পরবর্ত্তী ঘটনাগুলি বিশেষ মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিতেছি। লক্ষ্য করিতেছি, আর উদ্বিগ্ন হইতেছি। ডাচ শক্তি ইন্দোনেশিয়াকে এক পনেরো দফা সন্ধি-সর্ত্ত দিয়াছিল আমরা জানি। সন্ধি-সর্ত্তগুলি ইন্দোনেশিয়ার পরিপূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে খুব অনুকূল ছিল না। ডাচ শক্তি তাহাদের সাম্রাজ্যিক ভ্রাতা বৃটেনেরই মত একটি অস্ত্রোপচার করিয়া ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা-ব্যাধি নিরাময় করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদীরা ডাচদের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। ইংরাজও জাভা হইতে বৃটীশ ও ভারতীয় সৈন্য সরাইয়া লইবে বলিয়া রাজী হইয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি জানা গেল যে, বৃটীশ সৈন্য সরাইয়া লইলেও ডাচ সৈন্যদের নূতন করিয়া সেখানে নিয়া যাওয়া হইবে। এবং কিছু ডাচ সৈন্য শোনা গেল জাভায় ইতিমধ্যেই অবতরণ করিয়াছে। জাতীয়তাবাদীরা ডাচদের এই কার্য্যে প্রতিবাদ জানাইয়াছে। এখন সেখানে আবার সংঘর্ষ ঘনাইয়া উঠিবে কি না কে জানে? এদিকে ইংরাজও এখন পর্য্যন্ত তাহার সৈন্য সরাইয়া লয় নাই।

ইরাণ, ইন্দোনেশিয়া এবং গ্রীস ব্যতীত আন্তর্জাতিক জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সিকিউরিটি কাউন্সিলে গত মাসে আরও একটি দেশের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এই দেশটি হইল লেভাঁ। লেভাঁর সমস্যা হইল তথায় বৃটীশ ও ফরাসী সৈন্যের উপস্থিতি, এবং উহার দরুণ স্থানীয় সার্ব্বভৌমত্বের পীড়িত পরিস্থিতি। সিরিয়া ও লেবাননের প্রতিনিধিমণ্ডলের নায়কদ্বয় মঃ ক্রুভ্‌গি এবং মঃ খেইনি সিকিউরিটি কাউন্সিলের দরবারে তাঁহাদের মামলাটি উত্থাপিত করিয়া প্রস্তাব করেন যে, অবিলম্বে উক্ত রাষ্ট্রদ্বয় হইতে বৃটীশ ও ফরাসী সৈন্য সরাইয়া লওয়া হোক্। এই প্রসঙ্গে ১৯৪৫ সালের ১৩ই ডিসেম্বর সিরিয়া ও লেবাননের অজ্ঞাতসারে বৃটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে এতদ্দেশদ্বয়ের কোন কোন বিশিষ্ট এলাকায় বৃটীশ ও ফরাসী সৈন্যের পুর্ণনিয়োগে যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, লেভাঁর প্রতিনিধিদ্বয় সেই সন্ধির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। প্রতিনিধিদ্বয় জানান যে, এই সন্ধির প্রকৃত অভিসন্ধি সম্বন্ধে তাঁহারা অবহিত নন বটে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও পরিষ্কার ভাবে তাঁহাদের এই ধারণাটুকু জন্মিয়াছে যে, বিদেশী সৈন্যবাহিনী খুব শীঘ্র তাঁহাদের দেশ ছাড়িয়া যাইবার নাম করিবে না। কারণ, সন্ধিতে সৈন্যাপসারণের

সর্ত্তটা অস্বচ্ছ—সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রদ্বয়ের মতানুযায়ী এই সর্ত্ত কার্য্যকরী হইতে পারে না, পারে বহির্রাষ্ট্রীয় কোন অনুকূল অবস্থার বৈগুণ্যে। লেভাঁর প্রতিনিধিদ্বয় আরও জানান যে, সিরিয় এবং লেবানীজদের আপত্তি সত্ত্বেও বৃটেন ও ফ্রান্স লেভাঁয় তাহাদের এই সৈন্য মজুত রাখার উদ্দেশ্যটাকে স্বস্তি রক্ষণেরই উদ্দেশ্য বলিয়া প্রচার করে। কিন্তু প্রতিনিধিদ্বয়ের দৃঢ় বিশ্বাস, কোন রাষ্ট্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তথায় বিদেশী সৈন্য মজুত রাখিলে সে রাষ্ট্রের তথা সমগ্র বিশ্বেরই শান্তি ক্ষুণ্ণ হয়। সুতরাং আটলান্টিক সনদানুসারে রাষ্ট্রদ্বয়কে বিদেশী সৈন্য-মুক্ত করিতে হইবে।

সিরিয়া এবং লেবাননের প্রতিনিধিদ্বয়ের এই প্রস্তাব রুশীয় প্রতিনিধি মঃ ভিসিনস্কি খুব আন্তরিকতার সহিত সমর্থন করেন। কিন্তু ফ্রান্সের প্রতিনিধি মঃ বিদো লেভাঁর অভিযোগের উত্তরে শুধু ধর্ম্মোপদেশ আওড়াইয়াছেন। তিনি সিরিয়া ও লেবাননকে চোখ-কান বুঁজিয়া শুধু ফরাসী ও বৃটিশের সদিচ্ছার উপরে নির্ভর করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। তাহা হইলেই নাকি সকল সমস্যার মীমাংসা হইয়া যাইবে। কিন্তু নাছোড়বান্দা সিরিয়া ও লেবানন অত সহজ সমাধানে সন্তুষ্ট না হওয়ায়, অধিকন্তু রাশিয়া এবারেও তাহাদিগকে সমর্থন করায় ব্যাপারটার অন্য প্রকার মীমাংসার জন্য একাধিক প্রস্তাব উত্থাপিত হয় এবং মার্কিন প্রতিনিধি মিঃ ষ্টেটিনাসের প্রস্তাবটির স্বপক্ষে ও বিপক্ষে ভোট গ্রহণ করা হয়। মিঃ ষ্টেটিনাস্ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, বিদেশী সৈন্য সম্ভবমত এবং সাধ্যমত তৎপরতার সহিত সরাইয়া লওয়া হোক এবং সে কার্য্যের সুবিধার জন্য সিকিউরিটী কাউন্সিলে যথোপযুক্ত আলাপ-আলোচনা চলুক। প্রস্তাবটি প্রায় পাশ হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু কাউন্সিলের পূর্ব্বকৃত আইনের মারপ্যাঁচে উহাও ধামাচাপা পড়িয়াছে। সাধারণ আইনানুযায়ী স্বপক্ষে ৭ ভোট পাওয়া গেলেই যে কোন প্রস্তাব গৃহীত হইতে পারে। সেই আইনানুসারে আমেরিকার প্রস্তাব ৭ ভোট লাভ করিয়াছিল, কিন্তু এই আইনেরই ২৭ ধারার তৃতীয় দফায় আর একটি সর্ত্ত উল্লিখিত আছে যে, এই ৭ ভোটের মধ্যে ৫টী ভোট সমিতির পাঁচজন স্থায়ী মেম্বারের অর্থাৎ আমেরিকার, রাশিয়ার, বৃটেনের, ফ্রান্সের এবং চীনের ভোট দ্বারা সমর্থিত হওয়া চাই, নতুবা কোন প্রস্তাব পাশ হইবে না। এক্ষেত্রে স্থায়ী সভ্যদের ২ জন স্বয়ং অভিযুক্ত হওয়ায় ভোট দিতে পারেন নাই। তদুপরি রাশিয়াও আমেরিকার প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করিয়াছিল, কারণ তাহার নিজেরই প্রস্তাব ছিল অবিলম্বে সৈন্য সরাইয়া লইবার। তা যাহাই হোক—প্রস্তাবটি শেষ পর্য্যন্ত ফাঁসিয়া গিয়াছে এবং লেভাঁর সমস্যার কোন মীমাংসা হয় নাই। ইহার পরই এই আন্তর্জাতিক তামাসা আগামী ২১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত স্থগিত রহিয়াছে।

সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠানের পাঁচ নম্বরের তামাসা অভিনীত হইয়াছে, ট্রাষ্টিসিপ কাউন্সিলের প্রতিষ্ঠার আলোচনায়। বিশ্বশান্তি স্থাপন মানসে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা ছিল—মূল প্রতিষ্ঠানকে চারিটি বিশেষ বিভাগে ভাগ করিয়া প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্য্যবিধি পরিচালিত হইবে। উক্ত চারিটি বিভাগের নাম হইল জেনারেল এসেম্‌ব্লি, সিকিউরিটি কাউন্সিল, ইকনমিক এণ্ড সোস্যাল কাউন্সিল, এবং ট্রাষ্টিসিপ কাউন্সিল। প্রথম তিনটি বিভাগের কার্য্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ট্রাষ্টিসিপ কাউন্সিল এখনও শুধু জাতিপুঞ্জের পরিকল্পনা-গর্ভে অবস্থান করিতেছে। রুশীয় প্রতিনিধি অবিলম্বে ইহার প্রতিষ্ঠার জন্য আবেগময়ী ভাষায় ওকালতি করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ওকালতি না-মঞ্জুর হইয়াছে। ইহার পর ২৯শে জানুয়ারী মার্কিন ডেলিগেট মিঃ ডিউলেস্ এক প্রস্তাব করিয়া বলেন যে, ট্রাষ্টিসিপ কাউন্সিলে পৃথিবীর সকল পরাধীন, অর্দ্ধ-অধীন এবং ঔপনিবেশিক দেশগুলির স্বাধীনতার দাবী সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে; এবং ম্যানডেট প্রথা-জাতীয় সর্ব্বপ্রকার বিদেশী সালিশী-প্রথা রহিত করিতে হইবে। এই প্রস্তাবটিও রুশীয় প্রস্তাবটির দশা প্রাপ্ত হইতে চলিয়াছে। ফলে ভারী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্ররা এই প্রস্তাবটিকেও ধামাচাপা দিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। সর্ব্বাপেক্ষা তীব্রভাবে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন বেলজিয়াম আর ফ্রান্স। বলা বাহুল্য, উভয়েরই বিরোধিতার কারণ কায়েমী স্বার্থ। ফ্রান্সের বর্ত্তমান কার্য্যধারাতেই কারণটা প্রমাণিত। বর্ত্তমানে ঔপনিবেশিক প্রজাদের সে ফরাসী জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া শাসন করিবার যে পরিকল্পনা করিয়াছে, সেই পরিকল্পনাটি বাহ্যতঃ জনকরাজ্যের প্রজাদের সহিত সমানাধিকারের ন্যায় মনে হইলেও কার্য্যতঃ উহা শোষণেরই নামান্তর। এতদ্ব্যতীত ঔপনিবেশিক বিষয়গুলিকে ফরাসী কেন্দ্রীয় পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করিবার নূতন যে আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহারও মূলে রহিয়াছে উক্ত সাম্রাজ্য স্বার্থের নব রূপ। সম্প্রতি ইন্দোচীনের আনামীদের স্বায়ত্ত শাসন দিবার ব্যবস্থাতেও এই সাম্রাজ্য স্বার্থটা চাপা পড়ে নাই। সংগ্রামশীল আনামীদের উপর ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ এক নূতন চাল চালিয়াছে। কিন্তু তাহাদের সে চাল সম্ভবতঃ শীঘ্রই ব্যর্থ হইবে। ৯ই মার্চ্চ তারিখে চুংকিং হইতে প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ যে, ৮ই মার্চ্চ রাত্রিতে উত্তর ইন্দোচীনে ১০ হাজার ফরাসী সৈন্য কর্ত্তব্যভার গ্রহণের জন্য অবতরণ করিয়াছে। অনামীরা সম্ভবতঃ এই ব্যাপারটি খুব প্রীতির চোখে দেখিবে না। উপস্থিত মুহূর্ত্তে নবচুক্তির ফলে তাহারা কিছুদিন চুপচাপ থাকিলেও যে কোন মুহূর্ত্তে তাহারা ফরাসীদের সহিত প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হইতে পারে। বিলাতের 'সানডে অবজার্ভারের' নিজস্ব সংবাদদাতা মন্তব্য করিয়াছেন যে, অনামীরা আধুনিক গেরিলা যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী এবং তাহাদের সমর-বলও বিশেষ তুচ্ছ করিবার নয়। সুতরাং সংঘর্ষ বাধিলে সেটা রীতিমত এলাহি ব্যাপারেই পরিণত হইবে। যাহাই হোক, ট্রাষ্টিশিপ কাউন্সিলে অনেকটা ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের প্রতিবাদের ফলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়ের আর আলোচনা হয় নাই। ট্রাষ্টিশিপ কাউন্সিলের ভবিষ্যৎ কি হইবে, তাহা এখনও নিশ্চিত করিয়া বলিবার সময় আসে নাই বটে, তবে এ কথাটা মনে করা বিশেষ অসঙ্গত নয় যে, আলোচনার প্রথমেই সাম্রাজ্যবাদের যে নগ্নরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ভবিষ্যতের মীমাংসা সম্পর্কে বিশেষ আশান্বিত হওয়া যায় না।

সুতরাং সব মিলাইয়া দেখা যাইতেছে যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ

প্রতিষ্ঠানে এখনও পর্য্যন্ত সর্ব্বদিক দিয়া শুধু তামাসাই অভিনীত হইয়াছে। আগামী ২০শে মার্চ্চ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক সহরে এই তামাসার দ্বিতীয় অঙ্কের অভিনয় শুরু হইবে। দ্বিতীয় অঙ্কে ঠিক কোন বিষয়ের আলোচনা হইবে, সে সম্পর্কে কোন পূর্ব্বনির্দ্ধারিত স্মারকলিপি এখনও পাওয়া যায় নাই। তবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে :

প্রথমেই সম্ভবতঃ উত্থাপিত হইবে উত্তর ইরাণে সোভিয়েট-সৈন্যের অবস্থিতি সম্পর্কে। প্রথমে বৈঠকে এই প্রসঙ্গটা চাপা পড়িয়াছিল। ১৯৪২ সালে বৃটেন, রাশিয়া ও ইরাণের মধ্যে যে সন্ধি হইয়াছিল, সেই সন্ধির এক সর্ত্ত ছিল যে, ১৯৫৬ সালের ২রা মার্চ্চের মধ্যে সোভিয়েটের সৈন্য-বাহিনী ইরাণ ত্যাগ করিবে। ২রা মার্চ্চ অতিবাহিত হইয়াছে, কিন্তু সোভিয়েট সৈন্য এখনও তেমন ভাবে ইরাণ ত্যাগ করিয়া যায় নাই। বৃটেনের পক্ষে ইহা নিতান্ত গাত্রদাহের বিষয়। আগামী বৈঠকে তাই সে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ আনয়ন করিবে। কিন্তু বৃটেনের গাত্রদাহের কারণ শুধু এইটুকুই নয়; আসল কারণ হইল ইরাণে তথা প্রায় সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে সোভিয়েটের ক্রমপ্রসারী প্রভাব। ইরাণের নব-নির্ব্বাচিত মন্ত্রিসভায় সোভিয়েট সৌহার্দ্দ্যের প্রত্যক্ষ আভাস পাওয়া যায়। গত মাসে এই মন্ত্রিসভার প্রধান মন্ত্রী মঃ গাভাম্ সুলতানেরই উক্ত সৌহার্দ্দ্যকে দৃঢ়তর করিবার জন্য মস্কো রওনা হইয়াছিলেন এবং সেখানে পৌঁছিয়া বেশ জামাই-আদরে আপ্যায়িত হইতেছিলেন। দেখিয়া শুনিয়া মনে হইতেছিল, এবারে বুঝি ইরাণে সোভিয়েটের বহু আকাঙ্ক্ষিত সুবিধাও মিলিয়া যাইবে। কিন্তু ২০শে মার্চ্চের "সানডে অবজার্ভার" পত্রিকার কূটনৈতিক সংবাদদাতা যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে আবার মনে হইবে, ঘটনা অন্যপথ ধরিয়াছে। উক্ত সংবাদদাতা বলেন যে, রুশফৌজ ইরাণ ত্যাগ না করায় তথায় গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হইতেছে। রুশরা নাকি সুলতানের আমেরবাইজানে স্বায়ত্ত শাসনের দাবী জানাইয়াছে, অধিকন্তু ইরাণে রুশসৈন্যের অবস্থানের মেয়াদ বৃদ্ধি সম্বন্ধে তাহারা এক নূতন চুক্তি দাবী করিয়াছে। বলা বাহুল্য, বৃটেনের কাছে ইহা মোটেই সুখদ ব্যাপার নয়। ইরাণে সোভিয়েটের উক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে, মধ্যপ্রাচ্যে বৃটিশ প্রভাব ক্ষীণতর হইতে থাকিবে। সুতরাং যে কোন ছুতায় সোভিয়েটের মতলব ভেস্তাইয়া দিতেই হইবে। ছুতা একটা আছেও—১৯৪২ সালের চুক্তিভঙ্গের ছুতা। বৃটেন এই ছুতায় আগামী বৈঠকে রাশিয়ার উক্ত কার্য্যের বিরোধিতা করিবে, এবং সম্ভবতঃ আমেরিকাও বৃটেনের সহযোগিতা করিবে। আমেরিকার অবশ্য নিজের বিশেষ কিছু অভিযোগ নাই; বৃটেনের অভিযোগেই তাহার অভিযোগ! পররাষ্ট্র-নীতিতে আমেরিকার এহেন মূঢ় বৃটেন-প্রেমটা নূতন ব্যাপার নয়। বিগত প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতেই দেখা যাইতেছে যে, একমাত্র বাণিজ্যস্বার্থ ভিন্ন আর সকল আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারেই সে বৃটেনের ছায়া-সহচরী।

ইরাণ সম্পর্কে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে বৃটেনের অভিযোগের আরও একটি কারণ আছে। সে-কারণ মিশর। গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া মিশরের ঘটনা সংবাদপত্রের অতি গরম সংবাদ। সেখানে ছাত্ররা এবং জনসাধারণ ধর্ম্মঘট করিয়া পুলিশের সহিত সম্মুখ সংঘর্ষে অবতীর্ণ হইয়াছে, বৃটীশ-বিদ্বেষের শ্লোগানে আকাশ বাতাস কম্পিত করিয়াছে, সর্ব্বশেষে বৃটীশ সৈন্যদের উপরে টুকরা টুকরা ভাবে আক্রমণও চালাইয়াছে। বৃটীশ সৈন্যরা অতি সহিষ্ণু জাতি,—তাহারা এই আক্রমণের উত্তরে আর সব স্থানের মত সেখানেও শুধুমাত্র রাইফেল ও মেসিনগানের সাহায্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেছে। মিশরীদের দাবী ভারতের মত—'কুইট মিশর'। সংবাদপত্রের সাধারণ পাঠকের নিকট মিশরের এই দাবী কিছুটা আকস্মিক মনে হইলেও প্রকৃত পক্ষে এই দাবী ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করিয়াই বর্ত্তমান রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। আলোচনাকে সহজবোধ্য করিতে সেই ইতিহাসের একটি অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক।

১৮৪১ হইতে ১৯১৬ পর্য্যন্ত মিশর তুরস্কের নিযুক্ত একজন বংশানুক্রমিক রাজ-প্রতিনিধির অধীনে একটি অর্দ্ধ-স্বাধীন রাজ্য-রূপে পরিচালিত হইত। এই রাজ-প্রতিনিধির উপাধি ছিল 'খেদিভ্'। ১৮৮২ সন হইতে বৃটেন মিশর অধিকার করিয়া তথাকার শাসন-ব্যবস্থা বৃটীশ পররাষ্ট্রনীতি অনুযায়ী পরিচালনা করে। ১৯১৪ সনের ১৮ই ডিসেম্বর বৃটেন সরাসরি মিশরের রক্ষক 'বলিয়া' ঘোষিত হয়। ফলে তদনীন্তন জার্ম্মান-সুহৃদ খেদিভ্ আব্বাস হিল্মি পদচ্যুত হন এবং তাহার স্থলে হুসেন কামাল সুলতান উপাধি গ্রহণ করিয়া মিশরের রাষ্ট্রশাসনভার গ্রহণ করেন। ১৯১৭ সনে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা ফুয়াদ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। ১৯২২ সনে ফুয়াদ রাজা উপাধি গ্রহণ করেন। ইহার কিছুদিন পরেই মিশরে নব ইতিহাসের সূচনা হয়। সারা দেশে ব্যাপক ভাবে জাতীয় আন্দোলন চলিতে থাকে, বৃটীশ-বিদ্বেষ তীব্র আকার ধারণ করে এবং মিশরী জনগণ কর্ত্তৃক পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ঘোষণা করা হয়। বৃটীশ সেই সময় তাহার সেই পুরাতন devide and rule-এর নীতি দিয়া মিশরকে সায়েস্তা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু স্বর্গত জগলুল পাশার বিচক্ষণতার জন্য বৃটেনের সে চেষ্টা ধোপে টেকে নাই। অবশেষে ১৯৩৬ সনে বৃটেন মিশরের সহিত একটি মিত্রতামূলক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হয়। মিশরের বর্ত্তমান বিক্ষোভটা প্রধানতঃ এই সন্ধিকে কেন্দ্র করিয়াই হইতেছে।

সন্ধির সর্ত্ত ছিল যে, বৃটেন মিশর হইতে পূর্ব্বেকার সকল সম্পর্ক তুলিয়া লইবে এবং মিশরের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী স্বীকার করিয়া লইবে। তবে বহিঃশত্রুর হাত হইতে শিশুরাষ্ট্র মিশরকে রক্ষা করিবার জন্য এবং মধ্যপ্রাচ্যে বৃটীশ প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সুয়েজখালের উপরে বৃটেনের ১০,০০০ হাজার সৈন্যের একটি গ্যারিসন এবং ৪০০ বিমানের একটি ঘাঁটি থাকিবে। ইহা ছাড়া যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা উপস্থিত হইলে বৃটেন আলেকজান্দ্রিয়া এবং পোর্ট সৈয়দকে নৌ-ঘাঁটি হিসাবেও ব্যবহার করিতে পারিবে। ১০ বৎসর পর্য্যন্ত এই সর্ত্ত বলবৎ থাকিবে। দশ বৎসর পরে এই চুক্তি প্রয়োজন হইলে উভয়ের সম্মতিক্রমে পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে—কিন্তু একত্রে উভয়পক্ষের সম্মতি ব্যতীত এই পরিবর্ত্তন

সম্ভব হইবে না। মাত্র এক পক্ষের সম্মতিতে চুক্তির পরিবর্ত্তন করিতে হইলে আরও দশবৎসর অর্থাৎ ১৯৫৬ সন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে।

মিশরীদের বিক্ষোভের কারণ চুক্তির এই সর্ত্তটা। তাহারা আর বৃটীশ-উপস্থিতি সহ্য করিতে রাজী নয়। তাহারা উক্ত চুক্তির সংশোধন দাবী করিতেছে—এই দাবী বৃটেনের পক্ষে বিশেষ উদ্বেগের বিষয়। কারণ, মিশর হাতছাড়া হইয়া গেলে মধ্যপ্রাচ্যে বৃটীশ প্রভাবের অর্দ্ধেকটাই চলিয়া যায়। সুতরাং মিশরকে সে সহজে হাতছাড়া করিতে পারিবে না। কিন্তু এদিকে আবার মিশরের দাবীকে উপেক্ষা করিতেও তাহাকে নাজেহাল হইতে হইতেছে। একা মিশরীদের দাবীটাই উপেক্ষনীয় নয়, ইহার উপরে আবার আছে মিশরের প্রতি রাশিয়ার সম্ভাবিত সহানুভূতি। সিকিউরিটী কাউন্সিলের আগামী বৈঠকে মিশরের ব্যাপার নিয়া রাশিয়া নিশ্চয়ই তুমুল হৈ-চৈ করিবে। বৃটেন সেই আন্তর্জ্জাতিক প্রশ্নের হৈ-চৈ-টাকে এড়াইয়া যাইতে পারে কেবল রাশিয়ার এই ধরণের একটি খুঁত প্রদর্শন করিয়া। আর রাশিয়ার এই খুঁত কোথায় রহিয়াছে, সে কথা আমরা ইরাণের প্রসঙ্গেই দেখিয়াছি।

ইরাণ ও মিশর ব্যতীত আরও দুইটি রাষ্ট্রের ভাগ্য আগামী বৈঠকে আলোচিত হইতে পারে। তন্মধ্যে একটি হইল ইন্দোচীন, তাহার কথা আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি। দ্বিতীয়, যে রাষ্ট্রটি সিকিউরিটি কাউন্সিলে ভর্ত্তি হইবার মত পরিস্থিতি তৈয়ারী করিয়া ফেলিয়াছে—সেটি স্পেন। স্পেন ইয়োরোপের বর্ত্তমান ইতিহাসে অনেকদিন হইতেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। উহার ফ্যাসিষ্ট নেতা ফ্রাঙ্কো আন্তর্জ্জাতিক টাল-বাহানার মধ্যে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। এই ফ্রাঙ্কোকে স্পেনের গদি হইতে সরাইয়া ইয়োরোপকে সম্পূর্ণ ফ্যাসি-কণ্টকমুক্ত করিবার জন্য সম্প্রতি বৃটেন ও আমেরিকা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। এমন কি ইতিমধ্যে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি ফ্রাঙ্কোকে স্পেনের রাজনীতি হইতে মানে মানে সরিয়া পড়িবার জন্য নাকি একটি চরম নির্দ্দেশপত্রও প্রেরণ করিয়াছে। কিন্তু বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয়, ফ্রাঙ্কো সেই নির্দ্দেশ গ্রাহ্য করেন নাই এবং সবিনয়ে পত্রপ্রেরকদের জানাইয়াছেন যে, স্পেনের শাসনক্ষমতা ছাড়িয়া দিবার মত সদুদ্দেশ্য এখনও তাঁহার হয় নাই। ফ্রাঙ্কোর কূটনীতিজ্ঞান প্রশংসা করিবার মত। তিনি পরিষ্কার বুঝিতে পারিয়াছেন যে, মুখে এখন ভয় দেখাইলেও ফ্রাঙ্কোকে স্পেন হইতে সরাইয়া দিতে বৃটেন শেষ পর্য্যন্ত স্বীকৃত হইবে না। কেননা, ফ্রাঙ্কো-বিরোধী যে দল ফ্রাঙ্কোর পদচ্যুতির পর স্পেনের ভাগ্যবিধাতা হইবে, সেই দল হইল রিপাব্লিকান্ দল—তাঁহাদের মধ্যে কমিউনিষ্ট্-প্রাধান্য থাকায় সোভিয়েটপ্রীতির পরিমাণটা একটু বেশী। আর এদিকে স্পেনের ভৌগোলিক অবস্থান অতি গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর মানচিত্রে যে-অংশ মধ্যপ্রাচ্যকে ইয়োরোপের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে, সেই অংশের উপর স্পেন হইতে সাফল্যের সহিত সামরিক প্রাধান্য বিস্তার করা সম্ভব হয়। এমন সঙ্গীন জায়গায় সোভিয়েট সৌহার্দ্দ্যকে ক্ষমতা ছাড়িয়া দিলে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য অনেকখানি বিপন্ন হইয়া পড়িবে। কাজেই বৃটেন স্পেনকে রুশ-সতীনের হাতে তুলিয়া দিতে পারে না। এই কারণেই মনে হয় যে, এখন হুমকি দেখাইলেও সিকিউরিটি কাউন্সিলে স্পেনের কথা উত্থাপিত হইবার উপক্রম হইলে বৃটেনই হয় তো কোন ছুতায় সে কাজে বিরোধিতা করিবে। কিন্তু এদিকে রাশিয়াও আবার চুপ করিয়া থাকিবে না, স্পেনীয় প্রসঙ্গ সম্ভবতঃ আগামী বৈঠকে সে-ই উপস্থাপিত করিবে।

সিকিউরিটি কাউন্সিলের আগামী অধিবেশনের আলোচনা পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলিতে কেন্দ্রীভূত হইতে পারে। এই আলোচনার ফল কী হইবে, সেটা এখন হইতে অনুমান করা দুঃসাধ্য হইলেও একেবারে অসম্ভব নয়। কারণ, এই ধরণের আলোচনার ফল কি হয়, তাহা আমরা বৈঠকের প্রথম অঙ্কেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কিন্তু আমরা আশা করি, আমাদের ঐ সমস্ত নৈরাশ্যবাদী অনুমানকে ব্যর্থ করিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় প্রয়াস সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিণতি লাভ করিবে।

ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন

১২ই মার্চ্চ হইতে তিন দিন ব্যাপী ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন বোম্বাইতে হইতেছে। রাষ্ট্রপতি আজাদ উপস্থিত হইয়াছেন এবং মহাত্মা গান্ধীও আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। পণ্ডিত জওহরলালজীও সমাগত হইয়াছেন। এবারকার আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

প্রথমেই হইবে খাদ্য সমস্যা সম্পর্কিত আলোচনা। মহাত্মা গান্ধী পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছেন, গণতন্ত্রমূলক শাসন-পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হইলেই জাতির যাবতীয় সেবকমণ্ডলীর সহযোগিতায় অন্নাভাব দূর করা যাইবে। আমরা মনে করি, ইহা খুবই সমীচীন পরামর্শ এবং এ বিষয়ে সকল সভ্য একমত হইয়া গভর্ণমেণ্টের কাছে দাবী পেশ করিবেন। এ বিষয়ে রাষ্ট্রপতির সহিত বড়লাট সাহেবের যে আলোচনা হইয়াছে, তাহাও তিনি সকলের গোচরীভূত করেন।

দ্বিতীয়তঃ, পার্লামেণ্টের যে ভারতসচিব-প্রমুখ তিনজন প্রতিনিধি আসিয়া পেশোয়ার, লাহোর ও কলিকাতায় দেশবাসীর মতামত গ্রহণ করিবেন, এই বিষয়েও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের কি ভাবে তাঁহাদের মন্তব্য উপস্থিত করা কর্ত্তব্য, তাহার আলোচনা হইবে। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, অন্যান্যবার তাহাদের উক্তি-অনুরূপ কাজ হয় নাই বলিয়া এ-বারেও হইবে না, এইরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। এ বিষয়ে যদিও আমাদের ভরসা নাই, তথাপি মহাত্মাজীর কথায় সকলকে আশান্বিত হইয়া থাকিতে অনুরোধ করি।

তৃতীয় বিষয়ে আলোচনা হইবে—কংগ্রেসের ক্রীড্ (উদ্দেশ্য) লইয়া। বর্ত্তমানে বোম্বাই, দিল্লী, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে যে সমস্ত অনাচার সংঘটিত হইয়াছে, তাহাতে কংগ্রেসের পথ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কাহারও যাহাতে কোন সন্দেহ না থাকে, তজ্জন্য অহিংসা ও শৃঙ্খলা সম্বন্ধে পুনরায় ভালরূপে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইবে। আমরা এ বিষয়ে ওয়ার্কিং কমিটির এই সিদ্ধান্ত খুব সমীচীন মনে করি। নানাভাবে ভারতীয়গণের হৃদয়ে স্বাধীনতা জাগিয়া উঠিতেছে, তাহা দুর্ব্বার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই জাতীয়তাবোধ খুবই স্বাভাবিক এবং জাতির একান্ত কল্যাণকর। কিন্তু যদি ইহা সুসংযত না হয়, তবে এই কল্যাণই ভয়ানক অনর্থে

পরিণত হইবে। ধর্ম্ম-জগতে ঈশ্বরলাভ যেমন যে পথে যাওয়া যায়, তাহাতেই সম্ভব হইতে পারে, পার্থিব বিষয়ে সে নিয়ম চলে না। কোন বিষয়ের লাভ যেমন সব উপায়েই হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়, আমাদের স্বরাজ বা স্বাধীনতালাভও বর্ত্তমান জগতের পরিস্থিতি অনুসারে এক উপায়েই হইতে পারে, তাহা অহিংসনীতি এবং সুসংযত ব্যবহার। যদিও পণ্ডিত জওহরলাল স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন, বন্দুক রিভলভারের কাছে কিছুই নয়, রিভলভারই বল আর যে-কোন প্রকারের আগ্নেয়াস্ত্রই বল, আণবিক বোমার কাছে কিছু নয়; তথাপি আমাদের মধ্যে হিংসানীতির কল্পনাও যদি কেহ করে, তাহা বাতুলতা প্রকাশ করাই হইবে। কিন্তু আজকাল আনাড়ী চিকিৎসকের অভাব হইবে না বলিয়াই ওয়ার্কিং কমিটি হইতে কংগ্রেস নীতি ন্যায্য প্রকাশ্য এবং অহিংস (open, straight and non-violence) ভাবে সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য, কংগ্রেস-শক্তি আরও বর্দ্ধিত হওয়া দরকার। এ ক্ষমতা পাইতেছে না, ওখানে সমদর্শিতা নাই, ওখানে কংগ্রেস দলগত—এরূপ অভিযোগ প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। এ সমস্ত অভিযোগের অবসান হইবে। যদি অষ্টাদশ বর্ষ ও তদুর্দ্ধবয়স্ক ব্যক্তিমাত্রই জাতি-বর্ণ-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে কংগ্রেসের সভ্য বলিয়া গৃহীত হয়, তবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে কংগ্রেস-নীতি (ন্যায্য, প্রকাশ্য ও অহিংস ভাবে) স্বাক্ষর করিতেই হইবে। আর কংগ্রেস-নীতির বিরোধী হইলেই অপসারিত হইবেন, এইরূপ সর্ত্তও থাকা চাই। কংগ্রেস যাহাতে সার্ব্বজনীন হয়, আর ভারতবাসীমাত্রই ইহাকে আপনার জিনিষ মনে করিতে পারে, ওয়ার্কিং কমিটি যাহাতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, আমরা সেরূপ করিতে কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করি।

এবার শীঘ্র যে জাতীয় মহাসম্মেলন হওয়ার সম্ভাবনা নাই, তাহাতে আমরা খুশী হইলাম। ছেচল্লিশ সালে রাষ্ট্রপতিপদ পরিবর্ত্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় বলিয়াই আমরা মনে করি।

প্রাদেশিক নির্ব্বাচন

কোন কোন প্রদেশে নির্ব্বাচনের পালা শেষ হইয়াছে এবং মন্ত্রিত্ব-গঠনকার্য্যও সুসম্পন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলীর উপরে কার্য্যভার পড়িয়াছে এবং সেখানে মুসলমান মন্ত্রীর সংখ্যাই বেশী। আমরা বরাবর বলিতেছি, ভারতবাসী—ভারতবাসী, এখানে হিন্দু-মুসলমানের বিচার সঙ্কীর্ণতা ও জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী। কংগ্রেস-মন্ত্রিমণ্ডলী সাধারণ হিতের দিকে লক্ষ্য করিয়া হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টাননির্ব্বিশেষে কত অধিক সুশাসন করিতে সক্ষম, স্বার্থশূন্য সীমান্ত গান্ধী-অনুপ্রাণিত পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে। এই দৃষ্টান্ত গত দুইশত বৎসরের মধ্যে এইস্থানে এই প্রথম। আমরা আশা করি, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ আদর্শ সাম্প্রদায়িকতা-শূন্য প্রদেশে পরিণত হইবে। ইহার পরেই উল্লেখ করিতে হয় —উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত বা আসাম প্রদেশের। এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেসমন্ত্রী গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বরদলৈর নেতৃত্বে আমাদের আস্থা আছে, এবং আমরা মনে করি, এখানে পূর্ব্ব অনাচার বিদূরিত এবং হিন্দু-মুসলমান অপক্ষপাতে আদর্শ শাসন-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত জিন্নাসাহেব আসাম প্রদেশ সফর করিয়া স্থানীয় ব্যক্তিগণের নিকটে পাকিস্থানের চমকপ্রদ ছবি উপস্থিত করিয়া আসিয়াছেন। এবং মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অনাস্থাও প্রকাশিত হইতেছে। আমরা পাকিস্থান সম্বন্ধে ইহার সত্যতা বা অসারত্ব বিষয়ে কোন মন্তব্য করিতে চাহি না, আমরা কেবল মন্ত্রিমণ্ডলীকে ইহাই উপদেশ দিব যে, এখানে এমনভাবে যেন শাসনতন্ত্র পরিচালিত হয়, যাহাতে মুসলমানদের সত্যিকার কোনরূপ অভাব বিদ্যমান না থাকে। কল্পিত অভিযোগে তাঁহাদের হাত থাকিবে না, কিন্তু সাধারণ ব্যবহারে ও কার্য্যে যদি প্রমাণ করা যায় যে, হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থ এক, অন্নাভাব হইলে হিন্দুকেও মরিতে হইবে, মুসলমানকেও মরিতে হইবে, আসামের সব অধিবাসীই কি অসমীয়া, কি খাসিয়া, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান পরস্পরে ভ্রাতা—তবে সেই কল্পিত অভিযোগও বিদূরীত হইবে।

পঞ্চনদে সম্মিলিত মন্ত্রী গঠিত হওয়ায় আমরা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, মিঃ খিজির হায়াত খাঁন ও স্যার গ্লানসীকে অভিনন্দিত করি। ছয়জন মন্ত্রীর মধ্যে তিন জনই মুসলমান, ইহাও বিশেষ আনন্দের বিষয়। দলবিশেষের মধ্যে ভুক্ত না থাকিলে সে প্রকৃত হিন্দু বা মুসলমান নয়, এরূপ যুক্তি আমরা বুঝি না। আশা করি, মালিক খিজির হায়াত খাঁ সমানভাবে কংগ্রেস, লীগ, আকালী, শিখদের প্রতি ব্যবহার করিয়া আদর্শ শাসনতন্ত্র স্থাপনে সমর্থ হইবেন। তাঁহার অভিজ্ঞতা ও সৎসাহস আছে এবং খাদ্যনীতি, সাম্প্রদায়িক ঐক্য এবং যাহারা সরকারী চাকুরী হইতে সম্প্রতি চ্যুত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের পুনর্ব্যবস্থা করার বিষয়ে যদি ক্ষিপ্রকারিতা দেখাইতে পারেন, তবে বিভিন্ন দলের লোকও সম্মিলিত দলে আসিয়া পড়িবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। সত্য বটে, পাঞ্জাব পরিষদের ১৭৫ জন সভ্যের মধ্যে, কংগ্রেস সভ্য সংখ্যা ৫১, আকালী ২৩ জন, ইউনিয়নিষ্ট ১৪ জন, স্বতন্ত্রমতাবলম্বী ৯ জন, লীগ ৭৮ এবং এ-ক্ষেত্রে লীগ ও কংগ্রেস অন্যান্য দলের সহিত সম্মিলিত হইয়া একটি সর্ব্বজাতীয় দল সংগঠন করিলেই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইত। কিন্তু যাহা হয় নাই, তাহাতে আক্ষেপ করিয়া লাভ নাই। বর্ত্তমান স্বতন্ত্র দলটি নিরপেক্ষভাবে কাজ করিলেই পাঞ্জাবের হিত হইবে। এবং ৯৩ ধারা প্রয়োগের অপেক্ষা বহু গুণে কল্যাণজনক হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি। মিনিষ্ট্রীর স্থায়িত্ব নির্ভর করে সংখ্যায় নয়, নীতিমূলক আচরণে। স্বার্থশূন্য নিরপেক্ষতা থাকিলে স্থায়িত্ব অবশ্যম্ভাবী। ইহা ভাঙ্গিবার জন্য নিজের মাথায় নিজে শতবার কুঠারাঘাত করিলেও সে চেষ্টার কোন ফলই হইবার সম্ভাবনা নাই।

অবশিষ্ট রহিল সিন্ধু প্রদেশ। সংখ্যাধিক্য না হওয়া সত্ত্বেও শ্রীযুক্ত গভর্ণর বাহাদুর যে পক্ষপাতিত্বের পরিচয় দিয়া দল-বিশেষের স্কন্ধে কর্ম্মভার প্রদান করিয়াছেন, ইহাতে আমরা

মর্ম্মাহত হইয়াছি। ৬০ জন সভ্যের মধ্যে যখন সম্মিলিত দলের সভ্যসংখ্যা ছিল অন্যূন ২৯ এবং লীগের সংখ্যা ছিল সর্ব্বোচ্চ ২১ জন, তখন সম্মিলিত মন্ত্রিসভাই গঠিত হইলে শোভন হইত। তবে ইতিমধ্যে লীগ দলে ভাঙ্গন ধরিয়াছে। সেখানে সভাপতি (speaker) নির্ব্বাচন লইয়াই গোলমাল হইবে। মিঃ সৈয়দ প্রমুখ সম্মিলিত দল তখন যদি ঠিক ঠিক ভাবে কার্য্য করিতে পারে, তবেই মন্ত্রিত্ব স্থায়ী হইবে, নতুবা নয়। বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা দেশে কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলীই স্থায়ী হইবে। তাঁহাদের নিকটও আমাদের পূর্ব্বোক্ত স্বার্থশূন্য নিরপেক্ষতামূলক সতর্ক বাণীই প্রযোজ্য। বাকী থাকিবে কেবল বাঙ্গলা দেশ। যদি ১৯৪৩এর দুর্ভিক্ষ, অনাচার, মৃত্যুর করাল ছায়া, চোরা বাজারের পুনঃ ব্যভিচার দেখিতে না হয়, তবে এখানেও সম্মিলিত মন্ত্রিমণ্ডলীই গঠিত হইবে।

কাপ্তেন রসিদের প্রতি কারাবাসের আদেশ প্রদত্ত হইলে লীগনেতা শ্রীযুক্ত সারওয়ার্দ্দি যে বলিয়াছিলেন, "আগে স্বাধীনতা তারপরে পাকিস্তান বা হিন্দুস্থান", যদি সেই উক্তিই তাঁহার প্রাণের কথা হয়, তবে বোধহয় বাঙ্গলায়ও সম্মিলিত মন্ত্রিমণ্ডলীই গঠিত হইবে। দেখি, শেষ পর্য্যন্ত সকলের সুবুদ্ধি রক্ষা পায় কিনা ?

সাম্রাজ্যবাদের অস্ত্রোপচার

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী বৃটীশ কমন্স সভায় প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী ভারত-সাম্রাজ্য সম্পর্কে একটি ঘোষণা করেন। ঘোষণাটির সার মর্ম্ম হইল এই যে, আগামী ২৪শে মার্চ্চ তাঁহার মন্ত্রিসভার তিনজন মন্ত্রী শ্রমিক গভর্ণমেণ্টের তরফে একটি মিশন লইয়া ভারতের সঙ্গে একটি বোঝাপড়া করার জন্য রওনা হইবেন। ভারত-সচিব লর্ড পেথিক লরেন্স, বাণিজ্য বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রীপস এবং এ্যাডমিরালটির প্রথম লর্ড স্যার এ. ভি আলেকজাণ্ডার—এই তিনজনকে লইয়া উক্ত মিশন গঠিত হইবে। এই প্রস্তাবিত মিশনের বিশেষত্ব হইবে এই যে, শ্রমিক মন্ত্রিসভার শতকরা ১০০ ভাগ প্রতিনিধিত্ব-ক্ষমতা ইঁহাদের হস্তে অর্পিত থাকিবে।

স্বীকার করিতেই হইবে, শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট এতদিনে সত্যকারের একটা উঁচু দরের চমক দেখাইতে পারিয়াছেন। মন্ত্রিত্ব গ্রহণ ইস্তকই বক্তৃতায় বক্তৃতায় তাঁহারা পৃথিবীবাসীকে সদুদ্দেশ্যের বহুবিধ চমক প্রদর্শন করিতেছেন। কিন্তু নির্ব্বোধ পৃথিবীবাসী না বুঝিয়া এতদিন তাঁহাদের এই 'চমকিত সদুদ্দেশ্যের' কেবল ভুল অর্থ করিয়াছে। এই সব নির্ব্বোধের দল তাঁহাদের 'বৃটীশ সিংহ' মার্কা সোস্যালিজমের অর্থ করিয়াছে 'টোরী'-ইজমেরই এক নবরূপ হিসাবে, ইন্দোনেশিয়ায় ডাচদের প্রতি তাঁহাদের নৈতিক দায়িত্ব পালনের ব্যাখ্যা করিয়াছে সাম্রাজ্যরক্ষার প্রচেষ্টা হিসাবে, এমন কি, ভারতে তাঁহারা যে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য অকৃপণ ভাবে টিয়ার গ্যাস ও বুলেট ব্যবহার করিয়াছেন, সেই মহান্ উদ্দেশ্যকে পর্য্যন্ত ভারতের অকৃতজ্ঞ জনগণ দমননীতি রূপেই গ্রহণ করিয়াছে। মহান উদ্দেশ্যের এই বিকৃত ব্যাখ্যায় শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট অত্যন্ত মর্ম্মাহত এই কারণেই সম্ভবতঃ এইবার উপযুক্ত সুযোগ পাইয়া তাঁহারা পৃথিবীবাসীর ওই ভুল ধারণাটি ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য একটি বৃহত্তর চমকের আয়োজন করিয়াছেন। এতদিন তাঁহারা না কি শুধু সুযোগের অভাবেই তাঁহাদের সদভিপ্রায়কে সক্রিয় করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এইবার সুযোগ যখন মিলিয়াছে, তখন যথাযোগ্য কেরামতি না দেখাইয়া তাঁহারা ছাড়িবেন না।

কিন্তু নির্ব্বোধ ভারতবাসী তথাপি শ্রমিক গভর্ণমেণ্টের এই কেরামতির প্রতি আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছে না। দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরাও এই সব নির্ব্বোধের দলভুক্ত। তাঁহারা পর্য্যন্ত শ্রমিক গভর্ণমেণ্টের এই মিশনকে ভারতের দেহে সাম্রাজ্যবাদের চিরাচরিত আর এক দফা অস্ত্রোপচার বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন।

এই সব চিন্তাশীল ভারতীয়গণ বলিতেছেন যে, "বৃটেনের প্রতিশ্রুতি এবং সেই প্রতিশ্রুতিরক্ষার স্বরূপ আমরা হাড়ে হাড়ে চিনি। উমিচাঁদের প্রতি ক্লাইভের প্রতিশ্রুতি, দিল্লীশ্বরের প্রতি ওয়ারেন হেষ্টিংসের প্রতিশ্রুতি, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার বিখ্যাত ঘোষণানুযায়ী সাম্রাজ্যের সকল প্রজাকে জাতি, ধর্ম্ম ও গাত্রবর্ণ-নির্ব্বিশেষে একই শাসনের আশ্রয়ছত্রের নীচে আনিবার প্রতিশ্রুতি —এই সকল প্রতিশ্রুতিগুলি কি ভাবে রক্ষিত হইয়াছে তাহা তো বৃটেনের তৈয়ারী ভারতের ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয়। তথাপি এইগুলির কথাও না হয় আমরা 'গতস্য শোচনা' বলিয়াই ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু এই সেদিন পর্য্যন্ত ১৯১৪ সালের যুদ্ধে বৃটেন যখন ভারতকে স্বায়ত্ত শাসন দিবার প্রতিশ্রুতি দান করিয়া ভারতের নেতৃবৃন্দের সহায়তায় ভারত হইতে দুইহাতে অর্থ, রসদ ও সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিল—তখনকার সেই প্রতিশ্রুতিরক্ষার বহরটা তো আর আমরা চট করিয়া ভুলিয়া যাইতে পারি না! ভুলিতে পারি না—বৃটেন সেই প্রতিশ্রুতি পালন করিয়াছিল অমৃতসরের হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত করিয়া। কিন্তু এই সব হইল বৃটীশ সততার প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ। এই সব দেখিয়া ও ঠেকিয়া আমরা বৃটীশের ঔপনিবেশিক রাজনীতিরও কিছু পরিচয় পাইয়াছি। সেই পরিচয় হইতে আমরা আরও বুঝিতে সক্ষম হইয়াছি যে, ভারতের জনশক্তি যখনই শোষণের জ্বালায় অতিষ্ঠ হইয়া বিক্ষোভে উদ্বেল হইয়া উঠে, তখনই সাম্রাজ্য-শক্তি ভারতের বিক্ষুব্ধ দেহে এক ধরণের রাজনৈতিক অস্ত্রোপচার করে। গোল টেবিল বৈঠক, রয়াল কমিশন, ডেলিগেশন ও মিশন প্রভৃতির চমক হইল বৃটীশ সাম্রাজ্য-বাদের সেই অস্ত্রোপচার।

এইবারের মহাযুদ্ধ শেষ হইবার পরই পৃথিবীর বর্ত্তমান ইতিহাসে কতকগুলি প্রত্যক্ষ পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যাইতেছে। শ্বেত-প্রাধান্য হইতে অশ্বেত জাতির মুক্তিপ্রয়াস এই জাগরুক পরিবর্ত্তনের মধ্যে অন্যতম। ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন, ভারতবর্ষ, মিশর—ইহারা হইল এই বিরাট মুক্তিপ্রয়াসের এক একটি বিশিষ্ট যোদ্ধা। ইহাদের সম্মিলিত প্রয়াস আজ পৃথিবীর সামগ্রিক ঘটনাচক্রকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে। ইহাদের প্রস্তুত-শক্তিদের মধ্যে যাঁহারা একটি

গোঁয়ার ধরণের, তাঁহারাই রীতিমত শক্তহস্তে এই অনিবার্য্য প্রয়াসকে মূর্খের মত দাবাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন। আর যাঁহারা বেশ ঝানু সাম্রাজ্যবাদী তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন কুশলী কূটনীতির পথ। অস্থির জনমতের দেহে তাঁহারা অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদ নিঃসন্দেহে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদের চেয়ে কুশলীতম; অতএব তাঁহারা যে দ্বিতীয় পথেই পা বাড়াইবেন—ইহা স্বতঃপ্রমাণিত তথ্য। তাঁহারা ভারতের বর্ত্তমান অসন্তোষকে তাই একটি ক্যাবিনেট মিশনের সাহায্যে নিরাময় করিবেন।

কিন্তু ভারত অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতায় চালাক হইয়া উঠিয়াছে। এই কারণে পুরাতন কাসুন্দি না ঘাঁটিয়াও সাম্রাজ্যবাদের আধুনিক সমস্ত কার্য্যকলাপ হইতেই ইঁদুরের গন্ধের আভাস পাইতেছে। সাম্রাজ্যবাদের কোন ছদ্মবেশই আর ভারতকে পূর্ব্বের মত ভুলাইতে পারে না। সেই জন্য ভারত আজ বৃটেনকে সরাসরি এক প্রশ্ন করিতেছে—এতই যদি তোমাদের ভারতের জন্য টান, তবে তোমরা ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়া হইবে বলিয়া সোজাসুজি ঘোষণা কর না কেন? কেন মিশনের উদ্দেশ্যকে এই বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছ না যে, ভারতে তোমরা আসিতেছ ভারতকে স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট গঠনে সহায়তা করিতে? কিন্তু একথা তোমরা ভাল করিয়া জান এবং অধুনা আমরাও জানি যে, সেরূপ ঘোষণা করা তোমাদের সাধ্যাতীত। কারণ, তোমরা বৃটীশ শাসকশ্রেণী হইলে খাঁটি আষ্টে-পৃষ্ঠে সাম্রাজ্যবাদী—তা তোমরা টোরীই হও আর সোসালিষ্টই হও। তাই তোমরা একচোখে পৃথিবীর শান্তির জন্য কুম্ভীরাশ্রু পাত করিয়া আর এক চোখ রাঙা করিয়া বল —"I am not prepared to sacrifice the British Empire, because I know, if the British Empire fell, the greatest collection of nations will go into a limbo of the past and it would create disaster." (Mr. Berin's speech at Foreign Affairs debate in the House of Commons in 1946)। এই সাম্রাজ্যবাদী স্বরূপের জন্যই আমরা তোমাদের মিশনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আশান্বিত নই।

কলিকাতা কর্পোরেশন ও কলেরার প্রকোপ

কলিকাতায় সম্প্রতি কলেরার প্রকোপ হইয়াছে এবং ব্যাপকভাবে উহা প্রকট হইতে পারে বলিয়া কর্পোরেশনের হেল্থ্ অফিসার মহাশয় সকলকে কলেরার টীকা লইতে উপদেশ দিতেছেন। আমরা এই নির্দ্দেশের অনুমোদন করিতেছি।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। কলিকাতার অলিগলি নয়, বড় বড় রাস্তায়ও যেরূপ আবর্জ্জনা ও দুর্গন্ধ বিরাজ করিতেছে, তাহাতে কর্পোরেশনের কর্ম্মচারিগণের কার্য্য খুব নিয়মানুবর্ত্তিতার সহিত পরিচালিত হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। চৌরঙ্গির নিকটবর্ত্তী স্থানেও দুর্গন্ধের জন্য নাক টিপিয়া আসিতে হয়। ট্রামের আরোহিবর্গের কাহাকেও এই তিক্ত অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে স্মরণ করাইতে হইবে না। বিবাহ শ্রাদ্ধাদির পরে, দিন পর্য্যন্ত পাতা, আবর্জ্জনা, ময়লা জিনিষ স্থানান্তরিত হয় না। নর্দ্দমা যথাসময়ে পরিষ্কার হয় না, পায়খানা পরিষ্কারের জন্য দোতালা, তেতালায় যায় না। আমরা কেবল কর্পোরেশনের গোলমাল ও ধর্ম্মঘটের আতঙ্কের কথাই শুনিতে পাই, কিন্তু এই সমস্ত স্বাস্থ্যের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলির প্রতি কেহই মনোযোগী নহেন। এদিকে করভারে গৃহস্থ একান্তই প্রপীড়িত। এই সমস্ত বিষয়ে করদাতাগণের প্রতিনিধি কাউন্সিলারগণের ঔদাসীন্য একান্ত অমার্জ্জনীয়। আমরা কাউন্সিলারগণকে অবিলম্বে কলিকাতার স্বাস্থ্যের যাহাতে উন্নতি হয়, এবং কলেরার প্রকোপ যাহাতে প্রসার না পায়, সেইদিকে অবহিত হইতে একান্ত অনুরোধ করি।

ভাইস্‌চ্যান্সেলার ও ছাত্রগণ

আমরা শুনিয়া গভীর বেদনা পাইলাম যে, কতিপয় পরীক্ষার্থী ইণ্টারমিডিয়েট ছাত্র পরীক্ষার তারিখ পরিবর্ত্তন না করিবার জন্য ভাইস্ চ্যান্সেলারকে আক্রমণ করিয়াছিল। ভাইস্ চ্যান্সেলারের প্রতি বিনা কারণে এইরূপ আক্রমণ কেবল অসঙ্গত নয়, এইরূপ আচরণ অতিশয় গর্হিত ও হেয়। কিন্তু শরীরের কোন অঙ্গ যখন ব্যাধিগ্রস্ত হয়, তখন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ইহা পরিস্ফুট হইয়া থাকে। আজকাল ছাত্রগণের মধ্যে শৃঙ্খলার এত অভাব হইয়া পড়িয়াছে যে, এইরূপ অভিযোগ এখন প্রায়ই শুনিতে হইতেছে। যে-ছাত্রগণের নিকট জাতি অনেক আশা করে, যে-ছাত্রগণ জাতির আহ্বানে কম ত্যাগ স্বীকার করে না, যে ছাত্রগণ সেদিনও শান্ত, সংযত ও সমাহিতভাবে হাসিতে হাসিতে পুলিশের আগ্নেয়াস্ত্র উপেক্ষা করিয়াছিল, তাহাদের উদ্ধত ও অসংযত আচরণের কথা শুনিলে বিস্ময়ে ও দুঃখে স্তব্ধ হইয়া যাইতে হয়। কিন্তু খুঁজিলে ইহার কারণ বাহির করা যায়। আমাদের মনে হয়, শৃঙ্খলার (Discipline) অভাবই একমাত্র কারণ। ভিন্ন ভিন্ন দলসৃষ্টি, কেবল ধর্ম্মঘট আয়োজন, শিক্ষক ও পিতামাতার প্রতি অসৌজন্য প্রকাশ, বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও প্রকারান্তরে অনুমোদন—সবই ব্যাধিগ্রস্ত সমাজের ভিতরের অবস্থা প্রকট করে। ইহার প্রতিকারও ছাত্রগণই করিতে পারে। আমরা তাহাদের নিকট হইতে অনেক আশা করি, তাই আমরা ছাত্রগণকে শক্তিশালী অথচ অনুদ্ধত, সংযত ও বিনয়ী দেখিলেই তৃপ্ত হইব। মহাত্মা গান্ধী যে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে কলেজে কলেজে মকতবে মকতবে প্রার্থনার পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিতে বলিয়াছেন, আমরা ইহার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করি। যে যুবকগণকে অচিরে দেশবাসীকে খাওয়াইবার পরাইবার ও বাসস্থান সংস্থানের উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে, তাহাদিগকে কত শৃঙ্খলা-সংযত হইতে হইবে, দেশের হিতকামী ব্যক্তিগণই একবার ভাবিয়া দেখুন।

যুগান্তরের দুয়ারে দিল যে হাঁক
মহা কাল বৈশাখ।

[শিল্পী : শ্রীমুকুন্দ মজুমদার

"লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"
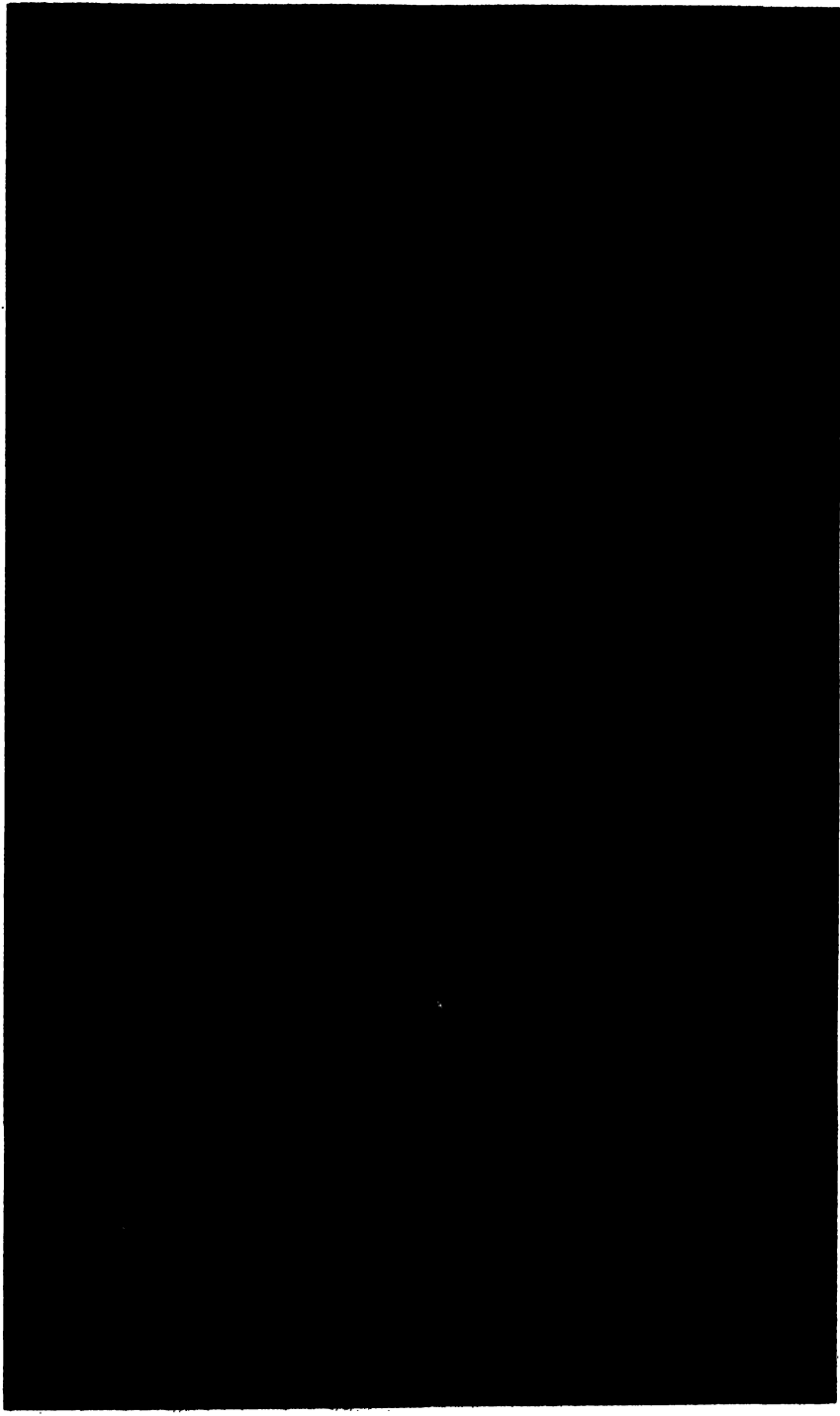
ত্রয়োদশ বর্ষ | বৈশাখ-১৩৫৩ | ২য় খণ্ড-৫ম সংখ্যা

আবার দুর্ভিক্ষ

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

তিন বৎসর যাইতে না যাইতে ভারতে আবার দুর্ভিক্ষ ভীষণ মূর্ত্তিতে দেখা দিল। নিউজিল্যাণ্ডের প্রধান সচিব মিষ্টার পিটার ফ্রেজার সম্মিলিত জাতির সাধারণ সমিতিতে স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন—"ভারতবর্ষ আবার দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হইয়াছে। যুদ্ধে যত লোক মরিয়াছে, ভারতবর্ষে এবার এই দুর্ভিক্ষে তদপেক্ষা অনেক অধিক লোক মরিবে।" সার জওলা প্রসাদ শ্রীবাস্তব বলিয়াছেন যে"এবার ভারতে ত্রিশ লক্ষ টন অর্থাৎ ৮ কোটি সাড়ে ১৭ লক্ষ মণ খাদ্যশস্যের অকুলান পড়িবে।" যে বৎসর ভাল ফসল হয়, দুর্ভিক্ষ না ঘটে, সে বৎসরও ভারতে ১৩ হইতে ১৪ কোটি মণ খাদ্যশস্যের অভাব ঘটে। বর্ত্তমান সময়ে ভারতে প্রায় ৩৬ কোটি একর বা ১০৮ কোটি ৯০ লক্ষ বিঘা ভূমিতে (১ একর=৩⅓ বিঘা) চাষ হইয়া থাকে; তন্মধ্যে প্রায় ৮৭ কোটি ১২ লক্ষ বিঘাতে খাদ্যশস্যের চাষ হয়। কৃষি-কৌশলে অত্যন্ত পশ্চাৎপদ বলিয়া এ দেশের উৎপন্ন খাদ্যশস্য অন্যান্য সভ্যদেশের তুলনায় অত্যন্ত অল্পই হইয়া থাকে। উৎপন্ন খাদ্যশস্যের পরিমাণ আন্দাজ ১ শত ৩৬ কোটি ২৫ লক্ষ মণই হয়। তবে যেবার অধিক খাদ্য জন্মে সেবার বড় জোর আর পৌণে ৩ কোটি মণ অধিক খাদ্যশস্য ফলে। ভারতের প্রত্যেক লোক যদি গড়ে অর্দ্ধ সের করিয়া খাদ্যশস্য খায় তাহা হইলে ১৪ কোটি মণ খাদ্যদ্রব্যের ঘাট্‌তি ঘটে। ফলে ভারতের বহু লোক সাধারণতঃ পর্য্যাপ্ত খাদ্য পায় না। এই অল্প ভোজনের ফলে তাহাদের কর্ম্মশক্তি কমিয়া যাইতেছে। কৃষিবলের কর্ম্মশক্তি কমিয়া যাইলে জমির কর্ষণ ভাল হয় না, ফসল কম জন্মে। ইহার ফলে ভারতের আর্থিক পরিস্থিতির মধ্যে একটা বিষম গোলক-ধাঁধাঁর উদ্ভব হইয়াছে। মিষ্টার কে. টি. সাহা তাঁহার Wealth and Taxable Capacity of India গ্রন্থে সে কথা বিশেষ ভাবে বিবৃত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"ভারতের লোক পর্য্যাপ্ত খাদ্য খাইতে পায় না; ইহার ফল প্রত্যক্ষ এবং অপরিহার্য্য। হয় তিনজনের মধ্যে একজন ভারতবাসীকে উপবাসী থাকিতে হইবে অথবা গড়ে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার আবশ্যক খাদ্যের তিনভাগের এক ভাগ কমাইতে হইবে। ইহার ফল অত্যন্ত অনিষ্টকর এবং গূঢ়। শেষোক্ত ব্যবস্থাই সাধারণ ব্যবস্থা হইয়াছে। এই কারণে দেশের লোকের কর্ম্মশক্তি ও উদ্যম কমিয়া যাইতেছে। কাজেই তাহাদের পক্ষে অধিক শস্যের উৎপাদন কঠিন। এই জটিল অবস্থা একেবারে চরম সীমায় আসিয়াছে। ভারতবাসীরা দুর্ব্বল এবং কর্ম্ম করিতে অক্ষম। শক্তি এবং উদ্যমের অভাব ঘটিতেছে বলিয়া তাহারা তাহাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যের সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন পরিমাণ খাদ্যও প্রস্তুত করিতে অসমর্থ।"

মিষ্টার সাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। আকবর বাদশাহের আমলে যে ভারতবর্ষ প্রাচুর্য্যের প্রশস্ত ক্ষেত্র ছিল,—যে ভারতে প্রায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিত না;—পৌনে দুই শত বৎসর-ব্যাপী ইংরাজ শাসনের ফলে সেই ভারতের অবস্থা কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা সকলে প্রণিধান করুন। সার বিশ্বেশ্বরও তাঁহার Planned Economy of India নামক গ্রন্থে হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ভারতের প্রত্যেক

ব্যক্তির গড়ে আয় বাৎসরিক ৭১টি টাকা অর্থাৎ মাসিক ৬টি টাকারও কম। গড় আয় অর্থে সকলের সমবেত আয় এক করিয়া তাহারই বিভক্ত অংশ। ইহা হইতে ভারতের ধনী লোকদিগকে বাদ দিলে সাধারণ লোকের গড় আয় প্রতি ব্যক্তির মোট হয়, মাসিক ৪ টাকার অধিক হইবে না। আর নিম্নতম অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের আয় গড়ে ২টি টাকার অধিক নহে। এই শ্রেণীর তাহাদের দিন চলা যে কত কঠিন—তাহা অনুমান নিতান্ত মূর্খেও করিতে পারে।

এখন এই ভারতে অবস্থাপন্ন লোকের এবং অতি দরিদ্রের সংখ্যা কত তাহার একটা মোটামুটি হিসাব করা আবশ্যক। ভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী সার্জন জেনারল সার জন মেগ হিসাব করিয়া দিয়াছেন যে ভারতের প্রায় শতকরা ৩৯ জন পর্য্যাপ্ত আহার্য্য পায় এবং তাহাদের দেহ পুষ্ট। অবশিষ্ট শতকরা ৬১ জনের মধ্যে শতকরা ৪১ জন পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাইতে পায় না, তাহাদের দেহও সম্পূর্ণ পুষ্টিলাভ করে না। তবে তাহারা এক রকমে দিন কাটাইতে পারে। অবশিষ্ট শতকরা ২০ জন, অর্থাৎ সমস্ত ভারতবাসীর পাঁচভাগের এক ভাগ লোক নিত্য অনশনক্লিষ্ট এবং জঠরজ্বালায় অহর্নিশি দহ্যমান। সাধারণ অবস্থায়ই এই ভারতে ৪০ কোটি লোকের মধ্যে ৮ কোটি কেবল ক্ষুধায় দগ্ধ হইয়া পলে পলে মরিতে থাকে। এক জন মার্কিণী সৈনিকপুরুষ কয়েকদিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন যে, তিনি ভারতের সর্ব্বত্রই কেবল বুভুক্ষিতের কঙ্কালসার মূর্ত্তির বাহুল্যই দেখিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় যাঁহারা ভারতের শাসন-তরণীর সুপরিচালনার গর্ব্ব করিয়া থাকেন তাঁহাদের সে গর্ব্ব কতটা লজ্জাহীনতার দ্যোতক, তাহা সুধীসমাজ চিন্তা করিয়া দেখিবেন। যে দেশের এক-পঞ্চমাংশ লোক নিত্য-দুর্ভিক্ষপীড়িত, সে দেশে অতি সামান্য কারণেই যে দুর্ভিক্ষ হইতে পারে তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।

বিগত মনুষ্যকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত দুর্ভিক্ষে কত লোক মরিয়া গিয়াছে, ভারত সরকার তাহার বিশ্বাসযোগ্য কোন হিসাব রাখিবার ব্যবস্থা করেন নাই। বরং তাঁহারা দুর্ভিক্ষের আপাতনের প্রসঙ্গ উঠিলে উহার অস্তিত্ব অত্যন্ত দম্ভভরে অস্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করিতেন না। কিন্তু অগ্নিকে কখনই বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া রাখা সম্ভব নহে। ক্রমে সহরে সহরে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, কাতারে কাতারে লোক অনাহারে "হা অন্ন, হা অন্ন" করিয়া মরিতে লাগিল। কলিকাতা সহরে শত শত শবে রাজপথ ও পথিপার্শ্ব পূর্ণ হইতে থাকিল। হিন্দুসভার সমিতি বঙ্গীয় দুর্ভিক্ষে যে লক্ষ লক্ষ লোক জীবন হারাইয়াছিল তাহা বলিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। সাড়ে পাঁচ কোটি মরণযন্ত্রণা-কাতর পল্লীবাসীর মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদে ভারতের আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ হইয়া গেল। বাঙ্গালার অর্দ্ধকোটি সহর-বা নগরবাসী রাজপথে শবসংখ্যা দেখিয়া বিভীষিকায় শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। লীগ-মন্ত্রিমণ্ডলী তথাপি,—কাহার জোরে জানি না—দুর্ভিক্ষের অস্তিত্ব স্বীকারে সম্মত হইলেন না। এই নিদারুণ দুর্ভিক্ষে কেবল যে বর্ণহিন্দু মরিল তাহা নহে,—কেবল নিম্নস্তরের হিন্দু মরিল, তাহাও নহে,—প্রকৃতির প্রকোপ কেহই এড়াইতে পারে নাই। লীগ যে মুসলমানদিগের মুরুব্বি বলিয়া ঢাক বাজান, সেই মুসলমানদিগের মধ্যে সহস্র সহস্র লোক ক্ষুধানলে জীবন আহুতি দিল। ইংরেজ-সম্পাদিত সাম্রাজ্যনীতির সমর্থক কলিকাতার "ষ্টেট্স্‌ম্যান" পত্র ব্যাপার দেখিয়া ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট তারিখে লিখিয়াছিলেন—"যে বাঙ্গলা প্রদেশ যুদ্ধ-ক্ষেত্রের এলাকার মধ্যে অবস্থিত; সেই বাঙ্গালার বর্ত্তমান উৎকট আর্থিক দুর্গত অবস্থাকে যে এরূপ ভীতিজনক সঙ্কটে উপনীত হইতে দেওয়া হইয়াছে, ইহা কেবল ভারতীয় সাধারণ নাগরিক জীবনের কলঙ্ক ঘোষণা করে না, বৃটিশ শাসনের অবদানেরও কলঙ্ক ঘোষণা করে। বিলাতের "নিউ ষ্টেট্স্‌ম্যান" এই ব্যাপার সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে "কলিকাতায় মানবজীবনের অবস্থা পাঠ করিলে উহা মধ্যযুগের ভীষণ মহামারীর ঐতিহাসিক কাহিনী বলিয়া মনে হয়।" কিন্তু তখনও বাঙ্গালার নাজিমুদ্দীনী মন্ত্রিমণ্ডলী এবং ভারতসচিব মিঃ এমেরী এই সর্ব্বলোকভয়াবহ ব্যাপারটাকে ধামাচাপা দিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে কোনরূপ কুণ্ঠা বা লজ্জা করেন নাই। তাঁহারা যেন দম্ভভরে একমাত্র লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক ত্রিভুবনবিজয়ী হইবার স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন।

বিগত পঞ্চাশের মানবসৃষ্ট মহামন্বন্তরে কত লোক মরিয়াছিল সরকার-পক্ষ ত তাহার কোন হিসাব রাখিবার ব্যবস্থা করেন নাই। অধিকন্তু কংগ্রেস ও হিন্দুসভাও তাহা করেন নাই। যে বৃটিশ সরকার এই দুর্ভিক্ষের জন্য সাক্ষাৎভাবে দায়ী, সেই বৃটিশ সরকার (বাঙ্গালার মন্ত্রিমণ্ডলী এবং স্থায়ী শাসকদল) কর্ণধার মিঃ এমেরী এই মৃত্যুসংখ্যা অত্যন্ত লজ্জা-জনকভাবে চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি একবার এমন কথাও বলিয়াছিলেন যে, কলিকাতায় মৃতের সংখ্যা সপ্তাহে এক হাজার করিয়া,—হয়ত ইহা অপেক্ষা অধিক হইতেও পারে। ইহার উপর মন্তব্য প্রকাশ করিয়া কলিকাতার ষ্টেটস্‌ম্যান বলিয়াছেন,—"এখানে এবং হোয়াইট হলে মৃত্যুসংখ্যা কম করিয়া বলা, গোপন করা, বিকৃত করা, এবং চাপা দেওয়া হইতেছে বলিয়া বাঙ্গালায় বৃটিশরাজের সুনাম অনাবশ্যকভাবে অবনত হইয়া পড়িতেছে"—ভারত সরকারের খাদ্য-কমিশনারও একবার বঙ্গীয় সরকারের প্রদত্ত হিসাবের কথা বলিয়াছিলেন যে, তিনি ঐ সংখ্যার সমর্থন করিতেছেন না। সরকারের নিযুক্ত গ্রেগরী কমিটীও বলিয়াছেন যে, মৃতের সংখ্যা সাব্যস্ত করিবার কোন হিসাব নাই,—তবে আন্দাজ, কেবল অনাহারে মৃতের সংখ্যা ১০ লক্ষ হইতে ১৫ লক্ষ হইবেই, হয়ত বা ২০ লক্ষও হইতে পারে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বলিয়াছেন—ঐ দুর্ভিক্ষ (১৩৫০ সনে) ৩৫ লক্ষ লোক মরিয়াছিল। এ-হিসাবও অত্যন্ত অল্প বলিয়া অনেকের ধারণা। প্রবাসী বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সাধারণ সভাপতি সুপণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন অনুমান করিয়াছেন যে, পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষে প্রায় ৫০ লক্ষ লোক না খাইতে পাইয়া হাহাকার করিয়া মরিয়াছিল। বাঙ্গালার বহুলোকের ধারণায় এই শেষোক্ত সংখ্যাই অনেকটা প্রকৃত সংখ্যার কাছাকাছি

ঐ দুর্ভিক্ষেই বহুপ্রদেশে মনুষ্যজীবনকে পশুর জীবন অপেক্ষাও যেন হেয় মনে করা হইয়াছিল

যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। যাহারা এই ব্যাপারে জন্য দায়ী, তাহাদিগকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইলেও আর তাহা প্রতিকার হইবে না। তবে শাসনব্যবস্থার বিশুদ্ধতা রক্ষ করিতে হইলে এইরূপ অপরাধীর শাস্তি দেওয়া অবশ্য কর্তব্য সে বিবেচনা শাসনকর্তাদের। আমাদের কথা, যাহাতে এইরূপ কাণ্ড আর না ঘটে তাহার ব্যবস্থা করা। ভারতে যে চাউলের অভাব রহিয়াছে তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ চাউলের অত্যধিক মূল্য। মূল্যবৃদ্ধিই অভাবসূচক। সত্য বটে, মুদ্রাস্ফীতির জন্য দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে: কিন্তু সবক্ষেত্রে ঐরূপ মূল্য একরূপ বৃদ্ধি পায় নাই। জমির খাজনা বৃদ্ধি পায় নাই। বৃত্তির পরিমাণ বাড়ে নাই, পেন্সন বা দানের পরিমাণ অধিক হয় নাই লেখকদিগের পারিশ্রমিক বর্দ্ধিত হয় নাই। শিক্ষক, ভৃত্য, চাঁদা কোম্পানীর কাগজের সুদ, ভিক্ষুককে দান এবং কতকগুলি শিল্প জীবীদিগের পারিশ্রমিকের মূল্য বাড়ে নাই, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে কমিয়া গিয়াছে। শ্রমিকদিগের মজুরী বৃদ্ধি হইয়াছে সত্য কিন্তু সকল ক্ষেত্রে সে-মজুরী আনুপাতিক হিসাবে বাড়ে নাই. দিনমজুরদিগের মজুরী বৃদ্ধি পাইলেও আশানুরূপ মজুরী মিলিতেছে না। দীর্ঘকাল মেয়াদে যাহারা টাকা কর্জ্জ দিয়াছে এই মুদ্রাস্ফীতির ফলে তাহাদের সুদের হার অধিক হয় নাই। কোম্পানীর কাগজের সুদের হার বৃদ্ধি পায় নাই। কাজেই এই তণ্ডুলের ও তরিতরকারীর মূল্যবৃদ্ধিতে দুর্ভিক্ষের শঙ্কা ষোল আনা বিদ্যমান মিঃ এমেরীর ন্যায় এখনকার ভারত-সচিবও ভরসা দিয়েছেন "মা ভৈঃ দুর্ভিক্ষ হইতে দিব না।" কিন্তু সহকারী ভারতসচিব মিঃ আর্থার হেণ্ডার্সন কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে কমন্স সভায় বলিয়াছেন,—"ভারতে যে তণ্ডুলের অভাব রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। ভারতে তণ্ডুলের আমদানী ব্যবস্থা থাকিলেও ভারত সরকার যেন উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন।" কথাগুলি শঙ্কাজনক। ইতিমধ্যে মফঃস্বলে তণ্ডুল, কলাই, মুগ প্রভৃতির মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে। পুরাতন তণ্ডুল অনেক স্থলে দুষ্প্রাপ্য, অথচ যাহাদের পরিপাকশক্তি হীন, যাহারা অজীর্ণরোগগ্রস্ত, পীড়িত, বালক-বালিকা, বৃদ্ধ, তাহারা নূতন তণ্ডুল খাইয়া পীড়িত হইয়া পড়িতেছে। ছায়া পূর্ব্বগামী। এই অবস্থা যে দুর্ভিক্ষের সূচক তাহা অস্বীকার করা যায় না। হয়ত পুরাতন তণ্ডুল, ডাইল, প্রভৃতি চোরাবাজারে বিলুপ্ত হইতেছে। সেজন্য আবশ্যক ব্যবস্থা যে সম্যক্‌ভাবে অবলম্বিত হইতেছে তাহা মনে হইতেছে না। অথচ সময় থাকিতে সে-ব্যবস্থা বিশেষভাবে অবলম্বিত না হইলে বিপদ্‌ অবশ্যম্ভাবী। পূর্ব্ববারেও কৃষিবিদ্যাবিশারদ ও ভারতীয় কৃষিকমিশনের প্রেসিডেন্ট লর্ড লিনলিথগো সাবধান করিয়া বলিয়াছিলেন, "ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক ও সমাধানের পক্ষে অতীব কঠিন বটে, কিন্তু ভারতের ভবিষ্যৎ খাদ্যসংস্থান-সমস্যার তুলনায় তাহা দাঁড়িপাল্লায় এক কণা ধূলার ন্যায় লঘু। (১) এই খাদ্যের অভাব হইতেই বঙ্গদেশে বেরিবেরি, ক্ষয়কাশ প্রভৃতি রোগের প্রকোপ ইদানীং অতিশয় বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু লর্ড লিনলিথগোর ন্যায় সরকারের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তির সাবধান-বাণী লীগ মন্ত্রিমণ্ডলী এবং ভারতের অচল শাসক-বর্গ নিশ্চয় হইতে বিস্মৃত হন নাই। এ-সমস্যা সমাধানের অতীত নহে। সে-সমাধানের উপায় কি, তাহাও ভারত সরকার ইচ্ছা করিলে অতি সহজে জানিতে পারিবেন। The World Population Problems নামক গ্রন্থের প্রণেতা মিঃ উইলকিন্স বলিয়াছেন,—"ভারতবাসীদিগের শস্য উৎপাদনের যেরূপ অন্তর্নিহিত সম্পদ্‌ আছে তাহাতে, শত বৎসর ধরিয়া যতই লোকবৃদ্ধি হউক, তাহাদিগের পোষণ হইতে পারিবে। (২) কথাটা একজন বিশেষজ্ঞের। সুতরাং উহা অবহেলা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু কি উপায়ে সেই ব্যবস্থা করা যায় তাহাই চিন্তনীয়। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারির সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সে-কথা ১৫ বৎসর পূর্ব্বে বলিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, কর্ষণযোগ্য ভূমির এখন শতকরা ৬৭ অংশ কর্ষিত হইতেছে। কিন্তু যদি উহার অবশিষ্ট শতকরা ৩৩ ভাগ জমিতে চাষ করা হয় এবং উন্নত কৃষিপদ্ধতি অবলম্বনপূর্ব্বক চাষের ফসল শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি করা যায় তাহা হইলে আমরা সামান্য ত্রৈরাশিক হিসাব দ্বারা বুঝিতে পারি যে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় যত লোক হইয়াছে তাহার দ্বিগুণ লোক হইলেও বাঙ্গালা দেশের উৎপন্ন ফসলেই বাঙ্গালী প্রতিপালিত হইতে পারে। যদি বাঙ্গালার কৃষিসম্পদ্‌ সম্পূর্ণরূপে ব্যবহারে আনা যায় তাহা হইলে এই প্রদেশে লোকসংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে মনে করিয়া দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইবার সময় এখনও আসে নাই (৩)

আমাদের এই প্রদেশে বর্তমান লোকসংখ্যা কত তাহা স্থির করা সহজসাধ্য নহে। আমাদের এই বঙ্গদেশে গত ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ৬ কোটি সাড়ে ১৪ লক্ষের কিছু অধিক লোক ছিল। কিন্তু এইবার এই যুদ্ধের ফলে বাঙ্গালায় বহুলক্ষ লোক অনশনে, ব্যাধিতে এবং পথ্যের অভাবে মরিয়া গিয়াছে। এখনও অবিশ্রাম মরিতেছে। এখনও কলিকাতার হাসপাতাল হইতে তাহাদের মৃত্যুসংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এরূপ অবস্থায় সেই ৬ কোটির স্থানে ৫ কোটি লোক হওয়া বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নয়। কাজেই এ সম্বন্ধে অনুমান

(১) India's political problems anxious and baffling as they are, are as dust when weighed against the problem the future food supply of India's ever growing millions.

(২) The Indian people have in their agricultural resources alone, sufficient potential power of production to support any increase of population which is like to take place within the next hundred years.

(৩) If the total cultivable area, only 67 per cent of which is now actually under cultivation, yielding an increase of 30 per cent over the present yield, were adopted, it is clear from a simple rule of three calculation that Bengal could support at the present standard of living a population twice as large as recorded in 1931 etc.

ভিন্ন উপায় নাই। ইদানীং সরকারী হিসাব এতই ভ্রান্ত বলিয়া দেখা গিয়াছে যে উহার উপর নির্ভর করা যায় না।

যাহা হউক, এখনও বঙ্গদেশে প্রায় ৬০ লক্ষ একর অর্থাৎ ১ কোটি ৮৬ লক্ষ বিঘা কর্ষণ-যোগ্য ভূমি অনাবাদী অবস্থায় পতিত আছে। এই জমির মধ্যে বনভূমি, উপস্থিত অকর্ষিত আবাদী জমি বা আবাদের অযোগ্য ভূমি ধরা হয় নাই। ইহাতে আবাদ করিলে সোনা ফলে। বাঙ্গালা দেশে প্রতি বিঘা জমিতে অন্ততঃ ৩ মণ চাউল জন্মে; অনেক স্থানে উহার অধিক ধান জন্মিয়া থাকে। সুতরাং ১ কোটি ৮৬ লক্ষ বিঘা জমিতে ৫ কোটি ৬৪ লক্ষ মণ চাউল অধিক উৎপন্ন হইতে পারে—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহার উপর যদি জমিতে ভাল করিয়া সার দিয়া আবাদ করা যায়, তাহা হইলে সমস্ত জমিতে শতকরা ৩০ ভাগ অধিক ফসল পাওয়া যাইবেই যাইবে—ইহা মিষ্টার পোর্টারের মত। আমাদের বিশ্বাস, ভাল করিয়া সার দিয়া চাষ করিলে দ্বিগুণ ফসল পাওয়া যায়। সরকারের বিভিন্ন কৃষিপরীক্ষা-ক্ষেত্রে তাহার পরীক্ষাও হইয়াছে। জমিতে গোময়-সার খাওয়াইয়া এবং ক্ষেত্রবিশেষে ধঞ্চে বুনিয়া উহা মাটির সহিত মিশাইয়া দিতে হয়, তাহার পরে ধানে থোড় বাঁধিবার পূর্ব্বে ধান্যক্ষেত্রে খোল সার দিতে হয়, তাহা হইলেই ধানের ফলন অনেক বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সরকার এবং নাজিমুদ্দীনী মন্ত্রিমণ্ডলী সেদিকে কিছু করিয়াছেন—ইহা আমরা শুনি নাই। তাঁহারা কেবল "অধিক খাদ্য উৎপাদন কর" এই ধুয়া ধরিয়া আপনাদের কর্ত্তব্যের শেষ করিয়াছেন এবং সরকারী তহবিল হইতে টাকা মঞ্জুর করিয়া লইয়াছেন। অকর্ম্মণ্যতার এমন অপরূপ দৃষ্টান্ত ব্রহ্মাণ্ডে বিরল। ঐ ১ লক্ষ ৯৫ বিঘা কর্ষণ-যোগ্য ভূমিতে চাষ হইয়াছে এমন কথা আমাদের জানা নাই। বাঙ্গালায় কিছু পাটের জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে। তাহাও গতানুগতিক ন্যায়। এরূপ ক্ষেত্রে দুর্ভিক্ষ যে আমাদের নিত্যসহচর হইবে তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে!

এখন জিজ্ঞাস্য, আবার বাঙ্গালায় এবং ভারতের অন্যান্য দেশে দুর্ভিক্ষে ভীষণ লোকক্ষয় হইবে কি না। এবার বাঙ্গালার খাদ্য-পরিস্থিতি অত্যন্ত শঙ্কাজনক। বহু জিলায় আশানুরূপ খাদ্য-শস্য জন্মে নাই। কর্ত্তৃপক্ষ মুখে যতই 'মা ভৈঃ' রব তুলুন, তাঁহাদের উক্তিতে কেমন একটা নৈরাশ্যের সুরও যে বাজিতেছে না, তাহা নহে। গত ১৮ই জানুয়ারী ভারত সরকারের খাদ্য-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য সার জওলা প্রসাদ শ্রীবাস্তব বলিয়াছেন যে—"চাউলের জন্য ওয়াশিংটনে লড়াই করিতেছি।" তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন,—"বর্ত্তমানে এদেশে চাউলের অবস্থা ভাল নহে। কিন্তু ইহার প্রতিকার করিবার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি। আমরা আশা করি যে সকল উপায় আছে তাহা অবলম্বন করিলে সম্ভবতঃ আমরা উহার প্রতিকার করিতে পারিব।" এরূপ কথা আমরা নাজিমুদ্দীনী মন্ত্রিমণ্ডলীর মুখেও বিগত দুর্ভিক্ষের সময় শুনিয়াছিলাম। সে আশা নৈরাশ্যের অকূল পাথারে ডুবিয়াছিল। ব্রহ্মদেশ হইতে বাঙ্গলা কিছু চাউল পাইবার আশা করে। কিন্তু সার জওলা প্রসাদ বলেন "তথাকার অবস্থাও অনিশ্চিত। চাউল সংগ্রহ করিবার এবং সরবরাহ করিবার অবস্থাও সুবিধাজনক নহে।" আবার তাঁহার মুখেই প্রকাশ—খাদ্যবিভাগের সেক্রেটারী সার রিচার্ড হাচিন্স ভারতের নিমিত্ত খাদ্যসংগ্রহের জন্য মার্কিনে গিয়াছিলেন।' সে দেশ হইতে কিছু চাউল পাওয়া যাইবে বটে, কিন্তু আবশ্যক পরিমাণ চাউল মিলিবে না বলিয়া শুনা যাইতেছে। এদিকে দাক্ষিণাত্যের কোন কোন দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। সম্মিলিত খাদ্যবোর্ড ১৫ লক্ষ টন চাউল এবং ৫ লক্ষ টন গম দিতে অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা বড় জোর সাড়ে ৭ লক্ষ টন চাউল এবং পৌনে ৪ লক্ষ টন গম দিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। সার রিচার্ড হাচিন্স সে জন্য এখনও মার্কিণে ধর্ণা দিতেছেন। গত ৩০শে জানুয়ারী কেন্দ্রীয় পরিষদে খাদ্য-বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ বি, আর, সেন স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন যে, ভারতের প্রায় সর্ব্বপ্রদেশেই খাদ্যাভাব ঘটিতে পারে। দক্ষিণ ভারতে উত্তরপূর্ব্ব এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে ও যুক্তপ্রদেশে আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। বাঙ্গালায় ত দুর্ভিক্ষ রহিয়াই গিয়াছে। বাঙ্গালার বহুস্থানে রেশনিং ব্যবস্থার দ্বারা যে চাউল লোককে দেওয়া হইতেছে, তাহা অনেক স্থলেই অখাদ্য—ইহার দৃষ্টান্ত নানাস্থান হইতে পাওয়া যাইতেছে। কুমিল্লার একজন ঘড়ি-মেরামতকারীর বিংশতিবর্ষীয়া পত্নী প্রিয়বালা ভৌমিক রেশনের চাউল খাইয়া যন্ত্রণাদায়ক উদরাময়রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার দরিদ্র স্বামী ভাল চাউল সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হওয়াতে সে আত্মহত্যা করিয়া নিজ যন্ত্রণার অবসান করিয়াছে। বাঙ্গালায় এরূপ দুর্ঘটনা কত ঘটিতেছে তাহার তথ্য কেহই সংগ্রহ করিতেছে না। রেশনের বণ্টিত চাউল যে ধান্য কঙ্করমিশ্রিত তাহা বঙ্গে বিদিত। কাজেই খাদ্যের পরিবর্ত্তে এই অখাদ্য বণ্টন করিলে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ হ্রাস পাইবে না। লোক একেবারে অখাদ্য না খাইয়া কুখাদ্য খাইয়াই মরিবে। সরকার তাহার কোন প্রতিকার করিতেছেন না বা করিতে পারিতেছেন না। এখানেও "খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি" ধুয়ার ন্যায় সরকারের সর্ব্ব প্রযত্ন ব্যর্থ হইতেছে। কেন্দ্রীয় পরিষদে কংগ্রেসী সদস্য বলিয়াছেন যে গ্রাম্য অঞ্চলের নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীরা যেভাবে খাদ্য সংগ্রহ করে, তাহা একটা কেলেঙ্কারী কাণ্ড। তাহারা চোরাবাজারের লুটের মালের অংশীদার। এই চোরাবাজার দমন করিতে বৃটিশ সরকারের অপ্রমেয় শক্তি কেন লজ্জাজনক ভাবে কুণ্ঠিত হইল, তাহা সাধারণে জানে না। ফলে এবারও দুর্ভিক্ষের ভীষণ ছায়া ভারতের কতকগুলি প্রদেশের উপর, বিশেষতঃ, বঙ্গদেশের উপর পড়িয়াছে। সাবধান না হইলে আবার লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মরিয়া শ্রমিক-সম্প্রদায়ের শাসনবৈজয়ন্তীর জয় ঘোষণা করিবে। অতএব সাবধান, এখনও সাবধান !!

ভারত হইতে খাদ্যশস্য রপ্তানী একেবারে বন্ধ করা হইয়াছে কি? ভারতে আহার্য্যের বিশেষ অপ্রতুল আছে—ইহা এদেশের শ্বেতকায় শাসক এবং সওদাগরদিগের সম্পূর্ণ জানা থাকিলেও যখন ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আমদানী বন্ধ হইয়া গেল বা বন্ধ হইবার সম্ভাবনা জন্মিল তখনও সরকার বেপরোয়া হইয়া এদেশ হইতে বাহিরে খাদ্যদ্রব্য চালান দিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দে ভারত হইতে ৩৭ কোটি ৪৩

লক্ষ টাকা মূল্যের খাদ্যদ্রব্য বিদেশে চালান যায়। ইহাই যুদ্ধের পূর্ব্ববৎসর। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখ যুদ্ধ বাধে। যখন জার্ম্মানীর ইউবোটগুলি সাগরপথে জাহাজ-যাতায়াত বিঘ্ন-বহুল করে তখনও (১৯৪১-৪২ খৃষ্টাব্দে) এই ভারত হইতে ৬০ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকার খাদ্য চালান দেওয়া হইয়াছিল। দুই বৎসরে এই রপ্তানীর পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইহারই ফলে প্রধানতঃ ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় অনাহারে কাতারে কাতারে লোক মরিয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও শাসনকর্ত্তাদের চৈতন্য জন্মে নাই। তাঁহারা এই দেশের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া এদেশ হইতে খাদ্য রপ্তানী করিতে থাকেন। ১৯৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দেও এই ভারত হইতে ৪৮ কোটী ৬১ লক্ষ টাকার এবং ১৯৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দে ৪৮ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার খাদ্যবস্তু বিদেশে পাঠান হইয়াছিল। লক্ষ লক্ষ লোক জঠরজ্বালায় দগ্ধ হইয়া 'হা অন্ন হা অন্ন' করিয়া মরিতে থাকিল, কলিকাতার রাজপথ ক্ষুধিতের শবে আকীর্ণ হইতে থাকিল, তথাপি বৃটিশ শাসকমণ্ডলী এবং সওদাগরদিগের সেদিকে দৃষ্টি দিবার অবসর হইল না, তাঁহাদের পোঁ-ধরা মন্ত্রিমণ্ডলীও মোটা বেতনের পদগুলি নিতান্ত নির্লজ্জভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিলেন। আর য়ুরোপীয় দলের সমর্থন লাভ করিয়া বীরবিক্রমে বসুন্ধরার বক্ষে পদবিক্ষেপ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ইহারা বিদেশ হইতে ভারতে অন্ন আমদানীর কোন ব্যবস্থাই করেন নাই। যুদ্ধের পূর্ব্ব বৎসর ভারতে বিদেশ হইতে ২৪ কোটি টাকা মূল্যের খাদ্য আমদানী হইয়াছিল কিন্তু দুর্ভিক্ষের বৎসর (১৯৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দে) কেবলমাত্র ৭ কোটি ৪২ লক্ষ টাকার এবং তাহার পর বৎসর ৮ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকার খাদ্য বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছিল। সাগরপথ যতই বিঘ্নবহুল হউক অন্য ব্যবহার্য্য পণ্য কিন্তু যুদ্ধপূর্ব্বের তুলনায় তত অল্প আসে নাই। ইহাই আমেরী-চার্চ্চিল মন্ত্রিমণ্ডলীর ভারত শাসনের নমুনা। ইহাই নাজিমুদ্দিন-গোস্বামী-গঠিত বঙ্গীয় লীগপন্থী মন্ত্রিমণ্ডলীর কৃতিত্বের রক্তাক্ষরে লিখিত সার্টিফিকেট।

এবার আবার শ্রমিক মন্ত্রিমণ্ডলীর পালা পড়িয়াছে। এবার ইহারা ধুয়া ধরিয়াছেন—লক্ষণ ভাল নয়। মার্কিণের খাদ্যবোর্ডের খেয়াল অনুসারে ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতে আবশ্যক চাউল আমদানী করা সম্ভব হইবে। কিন্তু শত মণ তেলও পুড়িবে না, রাধাও নাচিবে না। মার্কিণ তত চাউল দিতে পারিবে না বলিয়া কবুল জবাব দিয়াছে। ইতিমধ্যে এদেশে স্থানে স্থানে ঘোর অন্নকষ্ট দেখা দিয়াছে। রেশনের পচা চাউল খাইয়া অনেকে অম্ল, অজীর্ণ, উদরাময়, আমাশয় প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া ধীরে ধীরে মরিতেছে। এদিকে দিল্লীর নিউইয়র্ক টাইমসের সংবাদদাতা কয়েকজন দায়িত্বশীল সরকারী কর্ম্মচারীর নিকট হইতে অবগত হইয়াছেন যে, এবার ভারতের নানাস্থানে যে দুর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবনা জন্মিয়াছে তাহার ভীষণতা ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের (বাঙ্গালা ১৩৫০ সালের) দুর্ভিক্ষ অপেক্ষা অনেক অধিক হইবে। ভারতের অন্য প্রদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তাহার তরঙ্গ আসিয়া বাঙ্গালা দেশে পড়িবেই পড়িবে। সরকার খাদ্য-সরবরাহ করিতে না পারিলে কঠোর রেশন দ্বারা লোককে অর্দ্ধাশনে রাখিবার ব্যবস্থা করিবেন—একথা ভারত সরকারের খাদ্যবিভাগের সেক্রেটারী মিঃ বি, আর, সেনের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে উক্তি হইতেই বুঝা গিয়াছে। এবার য়ুরোপে এবং অন্যান্য দেশে খাদ্যসঙ্কট উপস্থিত হইবে। কিন্তু তাহা কোন মতেই এই দুর্ভাগ্য ভারতের খাদ্যসঙ্কটের সমান হইবে না। শঙ্কা হইতেছে যে, সরকার ভারত হইতে খাদ্যদ্রব্য রপ্তানী বন্ধ করিবেন না। এ সম্বন্ধে সরকার কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন নাই। যে দেশের বহুলোক নিত্য অনশনক্লিষ্ট, সে দেশে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি যেরূপ ভীষণ লোকক্ষয় করে, অন্যদেশে—যেখানে নিত্য বুভুক্ষু লোক নাই, সেখানে সেরূপ করিতে পারে না। মেদিনীপুরে হয়ত কয়েক সপ্তাহ পরেই দুর্ভিক্ষ উৎকট ভাবে প্রকট হইতে পারে। দিল্লীস্থ উক্ত সংবাদদাতা স্পষ্টই বলিয়াছেন যে ভারতে খাদ্যপরিস্থিতির অবস্থা যেরূপ শোচনীয় তাহা মার্কিণ প্রভৃতি দেশের লোক জানে না। তাহাদিগকে তাহা জানাইবার চেষ্টাও হয় নাই। সার রবার্ট হাচিংস তাহা কি বিশদ ভাবে বলিবেন না? এই ভাবে কাজ করিলে ঘোর অনর্থ উপস্থিত হইবে। বহু ভারতবাসী হয় ত হাহাকার করিয়া মরিবে কিন্তু তাহার ফল শাসকদিগের এবং বিদেশী বণিকদিগের পক্ষে ভাল হইবে না। ইহার ফলে যে অশান্তির অনল জ্বলিয়া উঠিবে তাহার ফলে আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক এবং বাণিজ্যিক সমিতির (ব্রেটন উড্‌স্ চুক্তি) কৌশল দগ্ধ হইয়া যাইবে কি না কে বলিতে পারে? ভারতবাসীর সহিষ্ণুতা অনেক। কিন্তু তাহারও একটা সীমা আছে। আমরা সেইজন্য এখনও সাবধান হইতে সরকারকে পরামর্শ দেই। দৃঢ় হস্তে খাদ্যবস্তুর রপ্তানী বন্ধ করিতে হইবে খাদ্যের উৎপাদন বাড়াইতে হইবে। চোরা বাজার ধ্বংশ করিতে হইবে, নতুবা উপায় নাই। অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ লইতে হইবে। কিন্তু সরকার তাহা করিবেন কি?

দেখিতে দেখিতে দুর্ভিক্ষ আমাদের স্কন্ধে আসিয়া চাপিয়া বসিয়াছে। মেদিনীপুরে উহা দেখা দিয়াছে, বাঁকুড়া জেলায় ইহার ছায়া পড়িয়াছে, আর অন্যান্য কয়েকটি জেলায় উহার হুঙ্কার শুনা যাইতেছে। বোম্বাই সরকার গত ২৮শে মাঘ সোমবার হইতে ২২৫ খানি গ্রামে অন্নকষ্ট দেখা দিয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। মাদ্রাজের বহু জিলা হইতেই খাদ্যাভাবের অভিযোগ আসিতেছে। মহীশূরেও অন্নাভাব ঘটিয়াছে! যখন সরকারী সদস্যের মুখে ঐ রব ফুটিয়াছে, তখন অবস্থা সঙ্গীন বলিয়াই শঙ্কা হইতেছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্টকর চোরা বাজারে ত' সরকার হস্তক্ষেপ করিতেছেন না। তাঁহারা অলিম্পাসবিহারী গ্রীক দেবগণের মত সাধারণের সর্ব্বনাশকারীদিগের দিকে ফিরিয়াও চাহিতেছেন না। ইহা একটা রহস্যজনক ব্যাপার।

লছমি চাহিতে

শ্রীকাশীনাথ চন্দ্র

রক্তে নেশা ধরিয়াছে দীনেশের। পঁয়ত্রিশ বৎসরের রূপ-রস-গন্ধ-সুরভিত পঁয়ত্রিশটি ব্যর্থ বসন্তের জোয়ার আসিয়াছে তার শিরা-উপশিরায়। নিস্তেজ অচেতন রক্ত-কণিকাসমূহ সহসা যেন তাহাদের চেতনা ফিরিয়া পাইয়া দেহের প্রতি শিরামুখে খুঁজিতেছে মুক্তি-পথ। মুক্তি-কামনায় অসংখ্য জীবাণু কাঁদিতেছে দেহের কারাগারে।

দীনেশের জীবনে আজ আসিয়াছে বসন্ত—আসিবারই কথা। জীবনের প্রথম প্রভাত হইতে যে দিনের পর দিন অতিবাহিত করিয়াছে আলগোর যোড়শোপচার পূজায় আর বেকার যুবকের ক্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া, সে আজ সহসা বেকারের বদলে হইয়া উঠিয়াছে সাকার যুদ্ধ-দেবতার কল্যাণে। যুদ্ধে কোথায় উঠিয়াছে হাহাকার, কোন্ মহানগরী পরিণত হইয়াছে ভস্মস্তূপে, জবরদস্ত খুনীয়ার সেনানী কোথায় মাতার কোল হইতে নিরীহ অসহায় শিশুকে ছিনাইয়া লইয়া রক্তাক্ত করিয়াছে তাহার শাণিত কৃপাণ—সে সংবাদ থাকুক সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়—এখানে কে তাহার সন্ধান রাখে! এখানে যুদ্ধ আনিয়াছে নব-জীবনের প্রবাহ—করিয়াছে বেকার-সমস্যার সমাধান। বেকার দেবতার সাধনারত কুব্জপৃষ্ঠ ম্লানদেহ জীবন্মৃত তরুণদলের মুখের লালিমা ফিরিয়া আসিয়াছে যুদ্ধ-দেবতার কল্যাণে,—হইয়া উঠিয়াছে সতেজ জীবন্ত। অতি বড় মূর্খ ও অকর্ম্মণ্য যে, সেও একটা চাকুরী জুটাইয়া লইয়া সংসার ও সমাজে লাভ করিয়াছে প্রতিষ্ঠা। দীনেশও তাহার নিরর্থক জীবন সার্থক করিতে চলিয়াছে, পাইয়াছে একটা চাকুরী। তাই সে বার বার প্রণাম করে যুদ্ধ-দেবতাকে। চলুক যুদ্ধ বৎসরের পর বৎসর, সৃষ্টির প্রতি ধূলিকণা হইয়া উঠুক রক্তসিক্ত—আসুক দুর্ভিক্ষ, মহামারী, মড়ক...তাহাতে দীনেশের কি ক্ষতি তাহার চাকুরী বজায় থাকিলেই হইল। দুর্ভিক্ষে খাদ্য সংগ্রহ করিবে অফিসের দেওয়া 'রেশন কার্ডের' মারফতে। কিন্তু কোথা হইতে আসিল চঞ্চলা অনিলা, দীনেশের জীবনে আনিয়া দিল চাঞ্চল্য। হাসি পায় দীনেশের। এতকাল সব ছিল কোথায়! যে সময় কোন তরুণীর সহিত আলাপ-পরিচয় করা তো দূরের কথা, একটি মুখের কথা বলিতে পারিলেই নিজেকে মনে করিত ভাগ্যবন্ত, সে সময় কোথায় ছিল এইসব রঙীন প্রজাপতির দল?

অনিলার হাতেই সম্পূর্ণরূপে নিজেকে সমর্পণ করিয়াছে দীনেশ। বিবাহ, ঘর-সংসার, পুত্র, কন্যা, যে সমস্তর কল্পনাও সে জীবনে করে নাই, সেই সবেরই ছবি দেখিতে সুরু করিয়াছে অনিলার মধ্যে।

অনিলা অভিভাবকহীনা আধুনিকা শিক্ষিতা তরুণী... এ, আর, পি-তে করে চাকুরী। সে দীনেশের মাসিক আশী টাকা মাহিয়ানাতেই সন্তুষ্ট নয়। সে চায় আরও অনেক কিছু। চায় শাড়ী, বাড়ী, গাড়ী। বাড়ী তো একখানা চাই-ই। নয়তো কপোত-কপোতী কোথায় বাঁধিবে তাহাদের নিরালা সুখের কুলায়, কোথায় হইবে তাহাদের মধু-চন্দ্রমা যামিনীর প্রথম নিশা উদ্‌যাপন। দীনেশ অনিলার মনোরঞ্জনের জন্য কোমর বাঁধে। সময় সময় হাসি পায় দীনেশের। এই বয়সে তরুণীর মনোরঞ্জনের চেষ্টা শোভা পায় তো! পনর বৎসর আগে হইলেই যেন ভাল মানাইত। শিক্ষিতা, আধুনিকা তরুণী অনিলা—সারা দেহে তাহার যৌবনের লাবণ্য-বিলাস...তাহার সহিত দীনেশকে মানাইবে তো! কাণের পাশে দু' এক গাছি চুলে যেন পাক ধরিয়াছে দীনেশের।

ফ্যাক্টরীতে চাকুরী করে দীনেশ—

গোডাউন ক্লার্ক। গভর্ণমেন্টের অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরী। কত হাজার হাজার টাকার কাজ হয় সেখানে, কত হাজার হাজার টাকার জিনিষ-পত্র, যন্ত্রপাতি আসিয়া হাজির হয় সেখানে... তৈয়ারী হয় ওয়ার-মেটিরিয়ালস্। দীনেশ, সে সবের হিসাব রাখে। নিজ হাতে বাহির করিয়া দেয় মারণাস্ত্রনির্ম্মাণের উপচার-সম্ভার।

কাজে মন লাগে না দীনেশের। মাথার ভিতর একদল ফুটবল-খেলোয়াড় যেন সুরু করিয়াছে ফাইন্যাল খেলা। দীনেশ হিসাব লেখে—আর মাঝে মাঝে অন্যমনস্কভাবে চাহিয়া থাকে কর্ম্ম-ব্যস্ত লোকগুলার দিকে।

অর্থোপার্জ্জনের একটা মস্ত সুযোগ আসিয়াছে দীনেশের। সে সুযোগ দিয়াছে পাশের কারখানার স্মিথ সাহেব। স্মিথ সাহেবের ফ্যাক্টরী সরকারী ফ্যাক্টরী নয়। কয়েকটা দুষ্প্রাপ্য বিদেশী 'পার্টসের' অভাবে তাহার কারখানার ইঞ্জিন হইয়াছে অচল। তাহার কাছে যাহা দুষ্প্রাপ্য, সরকারের কারখানায় তাহাই সুলভ। তাই সে সাহায্য চায় গোডাউন ক্লার্ক দীনেশের। বলে—"এমনি চাই না—আমি ক্যানেডিয়ান, নিমক-হারামি করি না! ইউ স্যাটিসফাই মি বাবু এণ্ড আই শ্যাল স্যাটিসফাই ইউ—হাজার টাকা দেব—পার্টস্ ক'টা এনে দিলে।" দীনেশ ভাবিতে থাকে। অনিলাকে গাড়ী উপহার দেওয়া তাহার ভাগ্যে আছে কিনা বলা যায় না, কিন্তু বাড়ী আসিয়া পড়িয়াছে নাগালের মধ্যে। ম্যানেজার আসিয়া দেখা দেয়। দীনেশেরই সমবয়সী লোকটা—খাস ইংরেজ-বাচ্চা, সুরসিক এবং দয়ালু। ঘরে ঢুকিতেই তাহার সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টি পড়ে দীনেশের উপর। দাঁতে সিগার চাপিয়া বলে,"হ্যালো দীনেশবাবু, তোমায় যেন কিছু অন্যমনস্ক মনে হচ্ছে"—

দীনেশ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই, দীনেশের কাঁধে থাবা মারিয়া ম্যানেজার বলে, "আরে বৈঠ বৈঠ, কিন্তু সত্যই তোমায় অন্যমনস্ক বোধ হচ্ছে, ব্যাপার কি বল ত"। দীনেশ চুপ করিয়া থাকে। সাহেব হাসিয়া বলে—"বুঝেছি, যাও বাড়ী থেকে বউ-এর সঙ্গে দেখা ক'রে এস।" দীনেশ মুখ নীচু করিয়া বলে, "আই অ্যাম আনম্যারেড্ স্যার"—

—"আন্‌ম্যারেড্‌"—সাহেব আশ্চর্য্য হইয়া যায়; বলে "ষ্ট্রেঞ্জ—কিন্তু তোমাদের দেশে মেয়ে-মানুষ ড্যাম চীপ"—

—"মেয়েদের অসম্মান করা উচিৎ কি স্যার?"—

রূঢ় কাঠিন্যে সাহেবের হাস্যময় মুখ ভরিয়া ওঠে। গম্ভীর স্বরে বলে—"ইউ নীড নট মেনশন ইট—মেয়েদের সম্মান করতে আমি জানি। আমি শুধু বল্‌তে চেয়েছিলাম যে, তোমাদের দেশে মেয়ের সংখ্যা খুব বেশী"—গট গট করিয়া সাহেব চলিয়া যায়। সারি সারি সাজানো রহিয়াছে মেসিনারী পার্টস—সকলের অলক্ষ্যে উহারি ভিতর হইতে কয়টাকে লইয়া যাইতে হইবে বাহিরে—কিন্তু দীনেশের সন্দেহ হয়—সে কি লইয়া যাইতে পারিবে—

•

সন্ধ্যাবেলা দেখা হয় স্মিথ সাহেবের সঙ্গে। দীনেশকে দেখিয়া স্মিথ সোল্লাসে চীৎকার করিয়া ওঠে—"হ্যালো জেন্টলম্যান্, গুড নিউজ"—

দীনেশ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলে"—

—"ও হবে না সাহেব"—

—"হবে না? তার মানে?"—স্মিথ বলে।

—"তার মানে চুরি করতে আমি পারব না"—

—"আরে চুরি করতে তোমায় বলচে কে—এ তো শুধু হাত-সাফাই। তুমি যে বোকা নও, তারই পরিচয় দেওয়া। মনের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করিয়া দীনেশ বলে, "আমি বোকাই সাহেব—ও কাজ আমার দ্বারা হবে না। এর পর ঝুঁকি সামলাবে কি তুমি?"

স্মিথ হো হো করিয়া হাসিয়া ওঠে, বলে—"কাউয়ার্ডস ডাই মেনি টাইমস বিফোর দেয়ার ডেথ। আরে এখন হচ্ছে ওয়ার-টাইম—এই তো পয়সা উপার্জ্জন করার সময়। এখন একটু ট্রিকস খাটালেই পকেটে টাকা চলে আস্‌বে। দেখ না মার্চ্চেন্টরা কেমন পুলিশের চোখের সামনেই ব্ল্যাক-মার্কেট চালাচ্ছে, এণ্ড ইউ কাউয়ার্ড বেঙ্গলীজ...ভয়েই সারা হলে—হতে আমার মত ক্যানেডিয়ান—"

দীনেশ তবু মাথা নাড়ে।

এবার স্মিথের মুখ গম্ভীর হইয়া ওঠে। গম্ভীর স্বরে বলে—'লুক হিয়ার ম্যান" বলিয়াই পকেট হইতে একগোছা নোট বাহির করিয়া বলে—"হিয়ার ইজ ফাইভ হাণ্ড্রেড, মোর দ্যান সিক্স টাইম্‌স্ অফ ইওর স্যালারী...আর মাল আমার হাতে পৌঁছে দিলেই অ্যানাদার ফাইভ হাণ্ড্রেড—বি কারেজিয়াস এণ্ড ডু ক"—

দীনেশ হতবুদ্ধি হইয়া যায়। অবশ হইয়া গিয়াছে তাহার সমস্ত স্নায়ু, গরম কেন বোধ হয় তাহার হাত—

•

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দীনেশ তাহার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে এবং কাউয়ার্ড বেঙ্গলীজ—এই অপবাদ ঘুচাইতে সমর্থ হয়ই। ছোট ছোট তিনটি পার্টস্ দীনেশের টিফিন বাক্সের অন্তরালে আত্ম-গোপন করিয়া নিরাপদে পার হয় কারখানার লৌহদ্বার। স্মিথ সোল্লাসে লাফাইয়া উঠিয়া বলে—"আই থ্যু...আই থ্যু...আমি জানতাম তুমি পারবে। আর এ-টুকুও যদি না পারবে তো পারবে কি হে—অযোগ্যের জায়গা নেইকো বিংশ শতাব্দীর যান্ত্রিক পৃথিবীতে"—

—"তা তো হ'ল, কিন্তু"—দীনেশ বলে।

"এই নাও তোমার কিন্তু",—স্মিথ এক তাড়া নোট বাহির করিয়া দেয়।—"আই অ্যাম ক্যানেডিয়ান—ক্যানেডিয়ানদের কথার খেলাপ হয় না। তোমাদের মত আমরাও জানি যে—জবান ঠিক তো জনম ভি ঠিক—ভয় নেই, দরকার হলে আমি আবার তোমায় কল দেব"

অনিলাও সমর্থন করে স্মিথের যুক্তিকে বলে—নিশ্চয়, এটুকুও যদি না পারবে তো পারবে কি! বিয়ে করে কি শেষে আমায় গাছতলায় বসিয়ে অনশন ব্রতের তালিম দেবে—"

—"কিন্তু কতখানি ঝুঁকি ঘাড়ে নেওয়া বল তো"—দীনেশ বলে,—"একবার যদি ধরা পড়ি তো ব্যস, আর রক্ষা থাকবে না। তখন তোমায় নিয়ে সংসার পাতবার কল্পনা মাথায় উঠে যাবে—

অনিলা হাসে—শুধু হাসে না, সর্ব্বাঙ্গ ভরে হাসে। বলে—"বিপদ আছে বলেই তো তার আড়ালে রয়েছে সম্পদ্। তোমার মুখ দেখে তোমায় কেউ টাকা দেবে না। দেবে তোমার কাজ দেখেই। বলে, তোর পায়ে পড়ি না তোর কাজের পায়ে পড়ি। তোমার কাজের দাম হাজার টাকা, তোমার দাম নয় কো কানা কড়ি—

দীনেশ আশ্বস্ত হয়—চৌর্য্যাপরাধের জন্যে অনিলা তাহাকে ঘৃণা করার বদলে তাহার প্রতি সন্তুষ্টই হইয়াছে। সে নোটের গোছা তুলিয়া দেয় অনিলার হাতে।

রক্তলোলুপ বাঘ পাইয়াছে রক্তের আস্বাদ, সুতরাং সে তো ক্ষেপিয়া উঠিবেই। দিনের পর দিন দীনেশের হাত দিয়া পার হইতে থাকে বিভিন্ন জিনিষ। দীনেশ ডান হাতে জিনিষ দেয় বাঁ-হাতে নেয় টাকা। সহকর্ম্মীরা বলে, "আপনি সুরু করলেন কি মশায়—কোন দিন দেখচি সব ফাঁসিয়ে দেবেন, নিজে নিজে তো মারা পড়বেনই, আমাদের শুদ্ধ দফা মারবেন"—

দীনেশ তাচ্ছিল্য সহকারে হাসিয়া বলে—"ওয়েল ইওর ওন মেসিন স্যার...আমার দিকে অবহিত না হলেই খুশী হব—"

প্রথম প্রথম উৎসাহ দিলেও শেষ পর্য্যন্ত অনিলাও করে অনুযোগ, বলে, "একেবারে সর্ব্বনাশ না করে কি তুমি ছাড়বে না—"

দীনেশ শুধু হাসে, উত্তর দেয় না!

অনিলা বললে—"কে বলতে পারবে যে তোমার সঙ্গীসাথীরা হবে না ঘরভেদী বিভীষণ, নয়তো তাদের মধ্যে কেউ পঞ্চম বাহিনীর একজন"—

দীনেশ বলে—"তা সম্ভব নয়। আর একান্তই যদি তা সম্ভব হয় তো জেলের বাইরের সঙ্গী-সাথীরা সঙ্গী এবং সাথী হবে জেলের ভিতরেও। এই তো সেদিনও তিন পিপে স্পিরিট সরিয়ে দিলাম—

-তিন পিপে ?" বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া উঠে অনিলার আয়ত আঁখি।

—"কি করে সরালে"—

ঝেড়ে রিপোর্ট দিলাম ডিউ টু লিকেজ—কিন্তু সূচ বিঁধবার মতও লিক ছিল না পিপের গায়ে। তাই শেষ পর্য্যন্ত বলতে হল যে উপে গেছে—

অনিলা খিল খিল করিয়া হাসে।

—"আজও তো আধটন কপার সরিয়েছি"—

—"যাও, বাব্বা! সে তো চাড্ডি খানি কথা নয়, কি করে সরালে ?

—"সরাতে এখনও ঠিক পারিনি। এখনও কারখানার মধ্যে আছে, তবে দিয়েছি টানমেরে কারখানার ভিতরকার পুকুরের জলে ফেলে—এর পর সুবিধামত সরালেই চলবে"—

সশব্দে হাসিয়া উঠে অনিলা। দীনেশ চমকিত হয়। আজ যেন বড় বেশী হাসিতেছে অনিলা।

*

পুলিশে পুলিশে ছাইয়া গিয়াছে দীনেশদের কারখানা। সাড়ে সাতটায় হাজির হইতে গিয়া পথের প্রান্ত হইতে দীনেশ দেখিতে পায়—লাল পাগড়ীর শ্রেণী। বুকের ভিতর কাঁপিতে থাকিলেও সাহসে ভর করিয়া দীনেশ আগাইয়া যায়। কিন্তু গেট পার হইতেই পুলিশ-অফিসার দীনেশের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া জলদগম্ভীর স্বরে বলে, "মহামান্য সম্রাটের নামে আমরা তোমায় অ্যারেষ্ট করলাম"—

—হতবুদ্ধি হইয়া যায় দীনেশ। আমতা আমতা করিয়া বলে—"কিন্তু কারণটা কি জানতে পারি কি"—

নিশ্চয়ই পার, কারণ তুমি ফ্যাক্টরীর গো-ডাউন থেকে আধটন কপার সরিয়েছ—

—"আমি সরিয়েছি"—

—"সরাতে ঠিক পারনি, পুকুরের জলে লুকিয়ে রেখেছ, পরে সুবিধামত সরিয়ে ফেলবার সাধু উদ্দেশ্যে। ভয় নেই—মাল আমরা পেয়েছি—বলিয়াই অফিসার ডাকেন, "মিস অ্যালেন"—সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসে অনিলা। বিস্ময়ে দীনেশ বলিয়া ওঠে, "অনিলা এখানে"—

পুলিশ অফিসার গর্জ্জন করিয়া ওঠে, "শাট আপ, ইউ রোগ! মিস-চীভাস থীপ"—তারপরে মৃদু হাসিয়া বলে, "হ্যাঁ মাই ডীয়ার অনিলা—যাঁর সঙ্গে মধুচন্দ্রমা রজনীর ব্রত উদযাপন করবে ভেবেছিলে, পুলিসের লেডী ইনফর্ম্মার। মিস অ্যালেন যদি অনিলা না হয়, তা হলে কি আর তোমাদের মত সাধু পুরুষদের হাতে পাওয়া যায়" ?—

পুলিসের ইনফর্ম্মার—দম বন্ধ হইয়া আসে দীনেশের—বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে পৃথিবীর বাতাস—নিঃশ্বাস নিতে পারিতেছে না যেন সে—

অপরূপ

শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

কয়েছি অনন্ত কথা, কহি নাই পরম কথাটি,
গেয়েছি অসংখ্য গান, গাহি নাই পরম সঙ্গীত,
মন্থিয়া বিচিত্র বিশ্ব সীমাহীন সমুদ্র ও মাটি
অলক্ষ্যে পেয়েছি কত বহুরূপী বিচিত্র ইংগিত।

নানা বর্ণে আঁকিয়াছি নিত্য নব আলেখ্য কত না-
পরম ব্যঞ্জনাটুকু রূপে রসে পড়ে নাই ধরা,
যা গড়েছি তা, গড়িতে যা চেয়েছিনু তার মত না,
পাইনি পরম রং কত রঙ তুলী ছিল ভরা!

বাঁচিয়াছি কত কাল, শুনিয়াছি হৃদয়-স্পন্দন,
মানসের গূঢ় সত্তা দেখিনিতো সত্য কোনদিন,
জানিয়াছি কত বার্ত্তা, কত তার অর্থ অগণন—
পরমার্থ আজো তার অন্ধকারে রয়েছে বিলীন!

উদ্দীপ্ত কল্পনা কত, প্রাণের প্রগল্ভ আকুলতা,
অশান্ত হৃদয় ভরা উপলব্ধ কত অনুভূতি,
জীবনের চাওয়া পাওয়া, অন্তরের অদৃশ্য বারতা,
প্রত্যক্ষে পড়েনি ধরা আজো সেই স্বপ্নের আকৃতি।

মন দিয়ে চাই যাহা, তাব দিয়ে পারিনি ধরিতে,
কিনিতে চেয়েছি যাহা কিনেও তা আসে নাই হাতে,
চরিতার্থ কত আশা, তবু তৃষা রয়েছে নিভৃতে
অলক্ষ্য পড়েনি ধরা স্থিরলক্ষ্য নয়ন সম্পাতে।

কথায় যা বলা যায় তা হতে অনেকখানি দূরে
মনে হয় আছে কথা, সে কথা বলিতে চাহে ভাষা—
গানের শেষের সুর মিলায় সে মৌনতার পুরে
তাহারই অতলে আছে সে গানের লুকানো জিজ্ঞাসা।

রঙে যা আঁকিতে পারি তাহার অতলে আছে রূপ,
স্বপ্নে যা ধরিতে পারি তাহার আড়ালে আছে ছবি,
মূর্ত্তির সুদূরে আছে অমূর্ত্ত দেবতা অপরূপ,
কাব্য আছে অন্তরালে কবিতার যারে খোঁজে কবি।

বৈষ্ণব সাহিত্য

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

মহাপ্রভু হইতেই বঙ্গদেশে তথা ভারতবর্ষে বৈষ্ণবধর্ম্মের ব্যাপকভাবে প্রচার হয় এবং তাহারি পাশে পাশে বিরাট বৈষ্ণব সাহিত্যও গড়িয়া উঠে! কিন্তু এই নব সাহিত্যের অরুণোদয় নির্ম্মল উষার বিমল প্রাচীপটে হয় নাই, ইহা হইয়াছিল দেশের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক এবং নৈতিক অবস্থা যখন হইয়া উঠিয়াছিল মেঘমেদুর অম্বরের ঘনতমসায় সমাচ্ছন্ন ও ভয়াবহ। কাজেই,দেশের তৎকালীন পরিবেশের কথা একটু সংক্ষেপে বলিব। আশা করি, তাহা অবান্তর বিবেচিত হইবে না।

মহাপ্রভুর জন্মের পূর্ব্ব হইতেই নবদ্বীপ একটি সমৃদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত নগর ছিল; নবদ্বীপ ছিল তৎকালে সংস্কৃতশিক্ষার অন্যতম এক প্রধান কেন্দ্র।

নবদ্বীপের সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে।

... ...

সরস্বতী-দৃষ্টিপাতে সবে মহাদক্ষ।

... ...

সবে মহা অধ্যাপক করি গর্ব্ব ধরে।
বালকে হো ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে।
নানা দেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়।

... ...

রমাদৃষ্টিপাতে সর্ব্বলোক সুখে বসে।
—শ্রীবৃন্দাবন দাসের চৈঃ ভাঃ, আদি ২য়, ১৮পৃঃ

এ যেমন নবদ্বীপের সমৃদ্ধির কথা, তেমনি সেখানকার লোকের নৈতিক অবস্থার বর্ণনাও বৃন্দাবন দাস দিয়াছেন;—

ধর্ম্মকর্ম্ম লোক সব এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয় কেহ দিয়া বহু ধন।
ধন নষ্ট করে পুত্র-কন্যার বিভায়।

... ...

যে বা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব।
তাহারাও না জানয়ে গ্রন্থ অনুভব।
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।

... ...

গীতা ভাগবত যে জনাতে পড়ায়।
ভক্তির বাখান নাই তাহার জিহ্বায়।

... ...

সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে।
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণভক্তি নহি কারো বাসে।
বাশুলী পূজয়ে কেহো নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে।
নিরবধি নৃত্যগীত-বাদ্য-কোলাহলে।
—চৈঃ ভাঃ, আদি ২য়, ১৯ পৃঃ।

নবদ্বীপের বর্ণনা যে তাৎকালিক বঙ্গদেশেরও বর্ণনা, এ অনুমান ভুল নয়। নবদ্বীপের মত পণ্ডিতপ্রধান শিক্ষিত লোকের স্থানে যদি এতখানি নৈতিক অবনতি পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলে অশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত এবং কুশিক্ষিত জনসাধারণের অধ্যুষিত পল্লীঅঞ্চলে বরং বীভৎসতর অবস্থাই যে ছিল, ইহা সহজেই মনে করা যাইতে পারে।

মুসলমান-শাসিত বঙ্গদেশে তখন সাধারণ মুসলমানেরাও হিন্দুর উপর অকারণে যে সব অত্যাচার করিত, তাহারও বর্ণনা বহু পাওয়া যায়:

হুসেন শাহের প্রসাদভোগী বিজয়গুপ্ত তাঁহার পদ্মাপুরাণে লিখিয়াছেন—

ব্রাহ্মণে পাইলে লাগে পরম কৌতুকে।
কার পৈতা ছিঁড়ি ফেলে থুথু দেয় মুখে।

... ...

যাহার মস্তকে দেখে তুলসীর পাত।
হাতে গলায় বাঁধি লয় কাজির সাক্ষাৎ।
কক্ষতলে মাথা থুইয়া বজ্র মারে কিল।

... ...

চড় চাপড় মারে আর ঘাড় গোতা।

... ...

ঘরেতে গোময় না দেয় দুর্জ্জনের ভয়।
বাছিয়া ব্রাহ্মণ পায় পৈতা যার কাঁধে।
পেয়াদাগণ নাগ পাইলে হাতে গলায় বাঁধে।

জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলে আছে —

......যতেক যবন।
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ।
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কাঁধে।
ঘরদ্বার লোটে আর লৌহপাশে বাঁধে।

পরবর্ত্তী কালেও কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী তাঁহার চণ্ডীতে লিখিয়াছেন—

সে মানসিংহের কালে প্রজার পাপের ফলে
ডিহীদার মামুদ সরিফ।
উজির হলো রায়জাদা বেপারিরে দেয় খেদা
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হল্য অরি।
মাপে কোণে দিয়ে দড়া পনর কাঠায় কুড়া
নাহি শুনে প্রজার গোহারি।
সরকার হইল কাল খিল ভূমি লেখে লাল
বিনা উপকারে খায় ধুতি।

... ...

পেয়াদা সবার কাছে প্রজারা পালায় পাছে
দুয়ার চাপিয়া দেয় থানা।
প্রজা হইল ব্যাকুলি বেচে ঘরের কুড়ালি
টাকার দ্রব্য বেচে দশ আনা।

১৬শ শতাব্দীর শেষেও, মনসামঙ্গলের লেখিকা বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতী তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

ডাকাত দেশের রাজা পাতসায় না মানে।
উজার হইল রাজ্য কাজির শাসনে।
দৈছত পাইয়া সবে ছাড়ে লোকালয়।
ধনে প্রাণে মরে প্রজা চন্দ্রাবতী কয়।

—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৪৩৯

যে বিদ্যাপতি গৌড়েশ্বর নসীর শাহের কাব্যরসবোধে প্রীত হইয়া লিখিয়াছেন—

সে যে নসিরা সাহ জানে
যারে হানিল মদন বাণে।
... ...
চিরজীব রহুঁ পঞ্চগৌড়েশ্বর
—কবি বিদ্যাপতি ভণে।—প, ক, ত, ২১১।

সেই বিদ্যাপতি তাঁহার "কীর্ত্তিলতা" কাব্যে লিখিয়াছেন—

তুরুক তোখারহি চলল হাট ভমি ফেড়া মঙ্গই।
আডীঠীঠি নিহরি দবলি দাঢ়ী থুক বাহই।

[তুরস্ক ও তোখারেরা হাটে গিয়া বেড়াইতেছে ও ফেড়া (পার্ব্বণী) মাঙ্গিতেছে। আড় দৃষ্টিতে চাহিয়া দাড়ী মুছ্‌ড়াইয়া থুতু দিতেছে।]

কতহুঁ তুরুক বরকর।
বাট জাইতেঁ বেগার ধর।
ধরি আন এ বাঁভণ বড়ুআ।
মঁথা চড়াবএ গাইক চুড়ুআ।
ফোট চাট জনউ তোড়।
উপর চড়াবএ চাহ ঘোড়।
ধোয়া উড়িধানে মদিরা সাঁধ।
দেউর ভাঁগি মসীদ বাঁধ।
গোরি গোমঠ পূরলি মহী।
পএ রহু দেমা এক বাম নহী।
হীন্দু বোলি দূরহি নিকার।
ছোটিও তুরুকা ভবকী মার।

[কত জায়গায় জবরদস্ত তুরস্ক বাহির হইয়া রাস্তায় যাইতে বেগার ধরিতেছে। ব্রাহ্মণের বালক ধরিয়া আনিতেছে আর তার মাথায় গরুর রাঙ চড়াইয়া দিতেছে, তাহার ফোঁটা চাটিয়া লইয়া তাহার পৈতা ছিঁড়িয়া দিতেছে, আর তাহাকে (মুসলমান করিয়া) ঘোড়ার উপর চড়াইতে চাহিতেছে। ধোঁয়া উড়িধানে মদিরা তৈয়ার করিতেছে। আর দেউল ভাঙিয়া মসজিদ বাঁধিতেছে। গোরী (গোর) ও গোমঠে (মসজিদে) পৃথিবী ছাইয়া যাইতেছে। তুরস্ক ছোট হইলেও রাগ করিয়া হিন্দুকে মারিতে যাইতেছে।]

—মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বঙ্গানুবাদ, কীর্ত্তিলতা, দ্বিতীয় পল্লব (হৃষীকেশ সিরিজ নং ৬)।

তৎকালে পদস্থ মুসলমান রাজকর্মচারীদের সহিত হিন্দুদের ব্যবহারেরও একটি আইন ছিল :

When the Collector or the Dewan asks them (Hindoos) to pay tax they should pay it with all humility and submission ; and if the Collector wishes to spit into their mouths, they should open their mouths without the slightest fear of contamination so that the Collector may do so. The object of such humiliation and spitting into their mouths is to prove the obedience of the infidel subjects under protection and promote if possible the glory of Islam—the true religion and to shew contempt to false religions ; von Neori's Akbar.

আকবর এই আইন রদ করেন।

—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃঃ ৩৭৬।

দেশের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক দুরবস্থা যখন এমন, ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের উত্থান যখন চরম, তখন সাধুদিগের পরিত্রাণ হেতু এবং দুষ্কৃতদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত, তিনি আপনিই আপনাকে সৃষ্টি করিলেন : শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অভ্যুদয় ঘটিল।

শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে চৈতন্যযুগে দেশের রাষ্ট্র, রাজনীতি, ধর্ম্ম, আচার-ব্যবহার, ক্রিয়া-কর্ম্ম, শিক্ষা, মনোবৃত্তি প্রভৃতিতে যেমন এক যুগান্তর আসিয়াছিল, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেও তেমনি এক মহিমান্বিত দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারা দেখা দিয়াছিল। তাহার কারণ মহাপ্রভুর বৈষ্ণবধর্ম্মের ভিত্তি ছিল প্রেম, ভক্তি, মৈত্রী ও সেবা। মহাপ্রভুর ধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম, ভক্তির ধর্ম্ম, তাই ইহা সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্র গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ ছিল না! "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ"—হরি অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিই মহাপ্রভুর এই মহাধর্ম্মের প্রবেশ-পত্র, একমাত্র পরিচয় এবং জাতি।

গোবিন্দদাস তাঁহার কড়চায় চৈতন্যদেবের উক্তি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—

মুচি যদি ভক্তিসহ ডাকে কৃষ্ণধনে।
কোটি নমস্কার করি তাঁহার চরণে।

এ যে তাঁহার মৌখিক উক্তিমাত্রই নয়, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। তাঁহার পার্ষদগণের মধ্যে হরিদাস ছিলেন জাতিতে মুসলমান।

সর্ব্বজাতিসমন্বয়ে এই বৈষ্ণবধর্ম্ম তৎকালের ব্রাহ্মণ-শাসিত হিন্দুসমাজে এক তুমুল বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছিল।

জয়দেব, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলী চৈতন্যদেবের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তখন বৈষ্ণব কবি বলিতে মাত্র ঐ তিনজনই। কাজেই তাঁহার নিকট প্রতিনিয়ত ঐ ত্রয়ীরই কাব্য পাঠ, পদাবলীকীর্ত্তন এবং উঁহাদের রচনাবলীরই আলাপ-আলোচনা অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ও পঠন-পাঠন চলিত। কাজেই, উঁহাদের অনুপ্রেরণা

ও আদর্শে নব নব কবিগণ অনুপ্রাণিত হইয়া নব নব পদাবলী রচনা করিতে লাগিলেন।

শ্রীচৈতন্য-প্রভাবিত এই বৈষ্ণবসমাজে দেখিতে দেখিতে অসংখ্য পদকর্ত্তা ও পদাবলীর আবির্ভাব হইল। পদকল্পতরুতে সার্দ্ধ শতাধিক পদকর্ত্তার নামোল্লেখ আছে। পণ্ডিতেরা বলেন, এ তালিকাও অসম্পূর্ণ, উক্ত ১৫০ জন ছাড়া আরও বহু পদকর্ত্তা আছেন, যাঁহারা এখনও অনাবিষ্কৃত বা বিস্মৃত। এ অনুমান খুবই সত্য বলিয়া মনে হয়, কারণ শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িকই বহু পদকর্ত্তা ছিলেন এবং তাঁহার লীলাবসানের পরেও কিছুকাল পর্য্যন্ত বহু পদাবলী রচিত হইয়াছিল।

পদকল্পতরু, পদকল্পলতিকা প্রভৃতি পদসংগ্রহ-গ্রন্থে দেখা যায়—কাহারও কাহারও একটি বা দুইটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। যিনি পদ রচনা করেন, তিনি কি একটি-দুইটি করিয়াই শেষ করেন? তাঁহাদের অন্যান্য পদগুলি যেমন বিলুপ্ত হইয়াছে, তেমনি বহু পদকর্ত্তা এবং বহু পদাবলীও যে ঐরূপে লোকলোচনের অন্তরালে রহিয়া গিয়াছে, এরূপ অনুমান করিলে কি খুব অন্যায় হইবে?

স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে (পৃঃ ৩০০-৩০১) জানাইয়াছেন যে, খ্রীষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর শেষে বাবা আউল মনোহর দাস বৈষ্ণবপদাবলী সংগ্রহ করিয়া "পদ-সমুদ্র" নামে যে গ্রন্থ সঙ্কলন করেন, তাহাতে নাকি পনের হাজার পদ ছিল। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, বহু পদ এবং পদকর্ত্তার নাম অধুনা বিলুপ্ত হইয়াছে; কারণ ১৮শ শতাব্দীতে শ্রীবৈষ্ণবদাস সঙ্কলিত পদকল্পতরুতে এখন আমরা মাত্র তিন হাজারের কিছু অধিক পদ পাই; অথচ পদ-সমুদ্র হইতে পদ-কল্পতরুসঙ্কলনের কাল পর্য্যন্ত প্রায় ২০০ বৎসরের ব্যবধান। ইহার মধ্যেই প্রায় বার হাজার পদ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

এই পদকর্ত্তাদের মধ্যে বহু মুসলমান বৈষ্ণব কবিও ছিলেন। আকবর, আকবর শাহ আলী, কবীর, কাম্‌রালি, নশীরমামুদ, ফকির হবীব, ফতন, শালবেগ, শেখ জালাল, শেখ ভিক, শেখ লাল, সৈয়দ মর্ত্তুজা প্রভৃতি।

শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে সে সময়ে বহু রমণীও পদ রচনা করিয়াছিলেন: রসময়ী দাসী, মাধবী দাসী, রামী প্রভৃতি।

চৈতন্যপূর্ব্ব কবিগণ নিজ নিজ গ্রন্থমধ্যে নিজের সম্পূর্ণ পরিচয়, মায় গ্রন্থারম্ভ ও গ্রন্থশেষের তারিখ পর্য্যন্ত লিখিয়া যাইতেন। কিন্তু চৈতন্যপ্রভাবিত বৈষ্ণব কবি ও পদকর্ত্তাগণ বিনয়-নিবন্ধন নিজেদের নামও সম্পূর্ণরূপে লিপিবদ্ধ করিতেন না। তাহার ফলে, এখন অনেক কবির সঠিক পরিচয়ও পাইবার কোনও উপায় নাই।

বঙ্গভাষায় ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ১০ম হইতে ১৬শ শতাব্দীর মধ্যে অর্থাৎ সাতশত বৎসরে বাংলায় যাহা কিছু রচিত হইয়াছে, তাহাই পদ্যে এবং সেগুলি তৎকালে কল্পিত এক একটি লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্যকীর্ত্তনে। মাঝে মাঝে দুই একখানা সংস্কৃতগ্রন্থ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অনূদিতও হইয়াছে। এই দুই জাতীয় পদার্থ ছাড়া বঙ্গ সাহিত্যের ভাণ্ডারে এই দীর্ঘকালে বিশেষ কিছুই জমা হয় নাই।

কিন্তু শ্রীচৈতন্যপ্রভাবিত বৈষ্ণবযুগে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য নব নব সম্পদে শ্রীমন্ত ও সমৃদ্ধ হইয়াছে - যাহার অপূর্ব্ব দ্যুতি অদ্যাপি অপরিম্লান। এই শ্রী ও সমৃদ্ধির কারণ - শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং এবং তাঁহার নিত্যসহচরগণের প্রায় সকলেই ছিলেন বাঙ্গালী; তাঁহাদের বঙ্গভাষার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ, এবং এই সার্ব্বজনীন সার্ব্বভৌম ধর্ম্মের প্রচারের একমাত্র ভাষা ছিল বাংলা ভাষা। এই কারণে বঙ্গভাষা একটা অভূতপূর্ব্ব বেগ সঞ্চয় করিয়া বাংলার আপামর সাধারণ নরনারীর অন্তরে যে আবেগ সঞ্চার করিয়াছিল, তাহারই ফলে অবহেলিত বঙ্গভাষা একদিকে যেমন জন-সমাদর লাভ করিয়াছিল, অন্যদিকে তেমনি দিন দিন নব নব সাহিত্যের ঐশ্বর্য্যে সুসমৃদ্ধ হইয়া চলিয়াছিল।

চৈতন্যযুগে বঙ্গভাষার সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ্ অবশ্য বৈষ্ণবপদাবলী কিন্তু একমাত্র ইহাই সব নয়। বঙ্গভাষার প্রথম জীবনী-সাহিত্য রচিত হইয়াছে এই বৈষ্ণবযুগে। মহাপ্রভুর লোকোত্তর জীবন ও আদর্শচরিত্র বহু লোকের প্রাণে কবিত্বরস সঞ্চার করিয়া তাঁহাদিগকে এই মহিমময় জীবনচরিত রচনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। চৈতন্যদেবের সঙ্গে তাঁহার বহু পার্ষদের জীবনীও রচিত হইয়াছে। এই জীবনী-সাহিত্যের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থরূপে আমরা পাইয়াছি:- যদুনন্দন দাসের কর্ণানন্দ, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবত, কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, গোবিন্দদাসের কড়্‌চা, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, বৃন্দাবনদাসের নিত্যানন্দ-বংশাবলী, শ্যাম দাসের অদ্বৈত মঙ্গল, ঈশাননাগরের অদ্বৈত-প্রকাশ, লাউড়িয়া কৃষ্ণ-দাসের অদ্বৈতের বাল্যলীলা-সূত্র, নরহরি চক্রবর্ত্তীর ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তম-বিলাস, শ্রীনিবাস-চরিত, গৌরচরিতচিন্তামণি, নিত্যানন্দ-দাস (বলরাম দাস) এর প্রেমবিলাস, নরহরিদাসের অদ্বৈত-বিলাস, লোকনাথ দাসের সীতা চরিত্র ও রসিকানন্দের রসিকমঙ্গল প্রভৃতি।

এ যুগে অনুবাদ-সাহিত্যেও স্মরণীয় দান আছে:—চৈতন্যদেবের শ্যালক মাধবমিশ্র শ্রীমদ্ভাগবতের এক অনুবাদ করেন। এ গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল নামে পরিচিত। ধর্ম্মগ্রন্থ ছাড়া এ সময়ে বহু সংস্কৃত কাব্য-নাটকাদিও বাঙ্গলায় অনূদিত হইয়াছে:—যদুনন্দন দাস কর্ত্তৃক কৃষ্ণদাস কবিরাজের গোবিন্দলীলা-কাব্য, রূপগোস্বামীর বিদগ্ধমাধব ও বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের কৃষ্ণকর্ণামৃতকাব্য, প্রেমদাস কর্ত্তৃক কবি কর্ণপূরের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস কর্ত্তৃক বিষ্ণুপুরী ঠাকুরের রত্নাবলী কাব্য প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। কৃষ্ণদাস বাবাজী নাভাজী-রচিত হিন্দি ভক্তমাল গ্রন্থেরও বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন। বাঙ্গলা ভাষায় হিন্দি হইতে অনূদিত এইখানি দ্বিতীয় গ্রন্থ।*

মৌলিক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনাও এ সময়ে বড় কম হয় নাই:—শ্রীরূপ গোস্বামীর বিদগ্ধমাধব, উজ্জ্বলনীলমণি, হংসদূত, ললিত-

* প্রথম গ্রন্থ কবি আলোয়াল কর্ত্তৃক হিন্দি পদ্মাবৎ কাব্যের বঙ্গানুবাদ পদ্মাবতী।

মাধব, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু প্রভৃতি; শ্রীজীব গোস্বামীর ভাবার্থ সূচক চম্পু, হরিনামামৃত ব্যাকরণ, গোপাল-বিরুদাবলী, মাধব-মহোৎসব প্রভৃতি; সনাতন গোস্বামীর বৈষ্ণবতোষিণী টীকা শ্রীমদ্ ভাগবতের ১০ম স্কন্ধকে অদ্যাপি আলোকিত করিয়া আছে; দিক্ প্রদর্শনী নামে হরিভক্তিবিলাসেরও সুপ্রসিদ্ধ টীকা ইঁহারি রচিত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর গোবিন্দলীলা কাব্য। প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা গোবিন্দ দাসের সঙ্গীতমাধব নাটক ও কর্ণামৃত কাব্য। পরমানন্দ সেন (মহাপ্রভু যাঁহাকে কবি কর্ণপূর উপাধিতে বিভূষিত করিয়াছিলেন) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, গণোদ্দেশ-দীপিকা, আনন্দবৃন্দাবনচম্পু, কেশবাষ্টক, চৈতন্যচরিত প্রভৃতি কাব্য এবং অলঙ্কারকৌস্তুভ গ্রন্থ রচনা করেন।

এই কালে "কারিকা" নামে শ্রীরূপ গোস্বামী একখানি বাঙ্গলা গদ্যগ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। কারিকায় কৃষ্ণ-ভক্তি সম্বন্ধীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্বের আলোচনা ও বিশ্লেষণ আছে।

শ্রীচৈতন্যের লোকোত্তর মহিমা-প্রদীপ্ত এই বৈষ্ণব যুগে জয়দেবের প্রভাব কি সংস্কৃত কি বাঙ্গলা উভয়বিধ রচনাকেই প্রভাবিত করিয়াছিল। তাঁহার অনুপম সুমধুর পদবিন্যাস, অপরূপ সঙ্গীতমূর্চ্ছিত ছন্দ, সুললিত কান্ত ব্যঞ্জনা আজও যেমন কবিগণের আদর্শ ও অনুকরণীয়, তখনও এমনিই ছিল।

শ্রীরূপ গোস্বামী বাঙ্গালায় একখানা গদ্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা গেলেও আসলে কিন্তু তিনি ছিলেন সংস্কৃত ভাষার কবি। তিনি শ্রীজয়দেবের কাব্যরচনারীতির অনুকারী ছিলেন:—

কূজতি কিল কোকিলকুল
উজ্জ্বলকলনাদং।
জৈমিনিরিতি জৈমিনিরিতি
জল্পতি সবিষাদম্। উজ্জ্বলনীলমণি

শ্রীসনাতন গোস্বামীও ঐ পথেরই পথিক:—

কুসুমাবলিভিরুপকুরু তল্পম
মাল্যকামরমণিসরকল্পম্।
প্রিয়সখি কেলিপরিচ্ছদপুঞ্জম্।
উপকল্পয় সত্বরমধিকুঞ্জম্।—প,ক,ত ৩৫৭

... ...

কিমু চন্দ্রাবলিরনয়গভীরা।
অকৃণদমুং রতিবীরমধীরা।

... ...

কিমুত সনাতনতমুরলঘিষ্ঠম্।
রণমারভত সুরারিভিরিষ্টম্।
—প,ক,ত, ৩৬৪

বহু পদকর্ত্তা তাঁহাদের বাঙ্গালা পদাবলীর জন্যই সুপরিচিত, কিন্তু তাঁহারা কিছু কিছু সংস্কৃত পদ রচনা করিতেও ছাড়েন নাই। ইহার কারণ, আমার মনে হয় জয়দেবের অপ্রতিরোধ্য প্রভাব।

পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস, যাঁহার অনবদ্য পদাবলীতে বিদ্যাপতির প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট, সংস্কৃত পদ রচনায় জয়দেবের রচনাশৈলীরই অনুকারী:—

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশপঙ্কজকলিতম্।
ব্রজবনিতা-কুচকুঙ্কুম-ললিতম্।
বন্দে গিরিবরধরপদকমলম্।
কমলাকরকমলাঞ্চিতমমলম্। *

... ...

অতিলোহিতমতিরোহিতভাষম্। *
মধুমধুপীকৃতগোবিন্দদাসম্।
—প,ক,ত, ৩৭৭

[আগামীবারে সমাপ্য

তোমার জন্মদিন

শ্রীদিলীপ দে চৌধুরী

তোমার জন্মদিন ফিরে এলো আমাদের পাশে—
ফিরে এলো তরুশাখে ধরণীর ধূলি আর ঘাসে।
শাল বনে বাতাসেতে কথা কয় জন্মদিন তব—
সেই আলো, সেই ছায়া তবু যেন—তবু অভিনব।
মনে হয় দূরে ওই মেঘময় গাঢ় নীলিমাতে—
সজল কাজল ঘন ছোট দু'টি ভীরু আঁখি-পাতে:
চপল ডানায় কাঁপা উড়ে যাওয়া বলাকার স্রোতে,—
ভেসে আসা ঝড়ো-হাওয়া থেকে থেকে নদীতীর হতে,—
যেন কোন মায়া লাগা, ছোঁয়া লাগা অজানা হাতের—
মধুর স্বপন কোন ভুলে যাওয়া মাধবী-রাতের।

তোমার এ জন্মদিন আনে কি নোতুন কোন বাণী—
কোন নব পথিকের পধ্বনি দেয় নাকি আনি?'
আমি চেয়ে থাকি দূর বন-পথ, প্রান্তর মাঝে—
সেথা তব শুনি ভাষা, শুনি তব সুরগুলি বাজে।
ওঠে নব ছন্দের রিনিঝিনি তান বারে বারে,
ছোট ছুটি হাত দিয়ে ডাকে কেউ হৃদয়ের দ্বারে:
চুপি চুপি নিরালাতে ভীরুপ্রেম যেন কথা বলে—
ভরজের কলরোল পাহাড়ী নদীর নীল জলে।
শুনি কণ্ঠের দৃঢ় সত্যের বাণী সুনির্ভীক—
নব-বৈশাখ কেন্দ্র নোতুন কবিরে জয় দিক্।

কর্জ্জনার মাঠ

শ্রীসুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী

সারি সারি উটের গাড়ী চলিয়াছে। বিস্তীর্ণ বাদশাহী সড়কের দুধারে পাকা ধানের ক্ষেত মৌ মৌ করিতেছে। আলুলায়িত কুন্তল খেতগুলি ঢেউয়ের পর ঢেউ খাইয়া নাচিতেছে। সন্ধ্যার আঁধার ঘনাইয়া আসিয়াছে। সড়কের ধারে-ধারে ধানের সীমারেখা সন্ধ্যার আঁধারকে মায়াময় করিয়া তুলিয়াছে। লাল মাটীর সড়ক অস্তমান সূর্য্যের ছটায় রঙ ফিরাইয়াছে। গ্রামের পাশ দিয়া, পুকুরের পাড় ঘেঁসিয়া, বিলের ভিতর দিয়া, নদী ডিঙ্গাইয়া চলিয়াছে দুপাশের নির্দ্দিষ্ট সীমারেখা টানিয়া। এই সড়কের উপর দিয়া কত লোক চলিয়াছে, চলিতেছে, চলিবেও। কত বিবাহের বরযাত্রী, শ্মশানের শববাহী, ভ্রাম্যমান পথিক,গ্রাম্যচাষী, রাখালবালকের দল চলিয়াছে। কিন্তু সকলেই যেখানে আসিয়া একবার শঙ্কিত বক্ষে ভীরু নয়নে চাহিয়া যায়, এই সেই কর্জ্জনার মাঠ : একটা বিরাট পুষ্করিণীর পাড় ঘেঁসিয়া যেখানে বাদশাহী সড়ক নীচু হইয়া নামিয়াছে, চারিদিকে আমের বাগানে যে জায়গাটা সব সময় অন্ধকার হইয়া থাকে। অদূরে কোথাও গ্রামের কোন চিহ্নমাত্র নাই। বিশাল বিস্তীর্ণ মাঠ পড়িয়া আছে। দিক্‌চক্রবালের সীমারেখা টানিয়া এই কর্জ্জনার মাঠে না ঘটিয়াছে কি ?

ঘনায়মান সন্ধ্যার প্রাক্কালে সারি সারি উটের গাড়ী চলিয়াছে কর্জ্জনার মাঠের উপর দিয়া। কাটোয়া হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত এই সড়কের মধ্যে উটের গাড়ী যাত্রী লইয়া যাওয়া আসা করে নিত্য নিয়মিতভাবে। বর্দ্ধমানের উটপাড়া একদিকের আড্ডা। সেখানে একদল উট, সহিস, ভৃত্যেরা আড্ডা গাড়িয়া বসিয়াছে। সহরের বাইরে সড়কের ধারে একটা সীমা টানিয়া এই দল নিত্য নিয়মিতভাবে ব্যবসা চালাইয়া আসিতেছে। ওধারে কাটোয়ায় আর একটি আড্ডা। দিনমানটুকু সেখানে কাটাইয়া ঐ দল আবার বাহির হয় সন্ধ্যার মুখে। সমস্ত রাত্রি তাহাদের যাত্রা চলে। দুইধার হইতে দুই দল উটের গাড়ী সন্ধ্যার মুখে বাহির হইয়া তাহাদের যাত্রা সুরু করে এবং ভোরের মুখে তাহার অবসান হয়। দিনান্তের বিশ্রামের পর তাহাদের কর্ম্মজীবনের এই বৈচিত্র্য চলিতে থাকে নিত্য।

উটের গাড়ীগুলি দোতলা। উপরের যাত্রীরা কিছু বেশী ভাড়া দেয়। বাঙ্গালা দেশে ইহার অভিনবত্ব আছে। লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া উটের দল আপন মনে চলিতে থাকে ; যাত্রীদের মধ্যে কর্ম্মব্যবের অভাব নাই। ভিতরে বসিয়া একদল অপর দলের খোঁজ খবর রাখে। মধ্যে মধ্যে গল্প চলে :

বাপ্‌রে বাপ ! সে কী কাণ্ড ! ফট ফট করে লাঠির শব্দ ওঠে আর সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্ত্তনাদ উঠে পরে। তার পর সব চুপ চাপ ! নিশুতিরাতের আর্ত্তনাদ যে কী ভয়ঙ্কর সে তোমরা চোখে না দেখলে ভাবতেই পার না।

চোখের নিমিষে দুটো লাসকে ঐ পুকুরের পাঁকের মধ্যে পুঁতে ফেলে তারা চলে গেল। কে কার খোঁজ রাখে !

জীবে গোয়ালা হে, জীবা গোয়ালা ! সে পারে না এমন কাজই নাই। আমি ওপাশে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম। কাছে ডাকলে, কিন্তু যেতে পারলাম না। ছুটে এসে আমাকে বললে, নে এইগুলো। কথামত সেগুলো হাতে নিতেই চোখে পড়লো পুটুলিতে বাঁধা খানকয়েক পুজোর কাপড়, গামছা, গোটাকয়েক টাকা আর কিছু ফলমূল। ভাবলাম কোন পুজোরী বামুনের ভাগ্যে কী না ঘটে গেল। ভগবানের পুজো করে এসে তার ফলটা এই কর্জ্জনার মাঠে ভগবানই দিয়ে দিলে !

গাড়ী চলিতে থাকে। এক টানা ঘর্‌ ঘর্‌ শব্দের বিরাম নাই। সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ ঘনাইয়া আসিয়াছে। দূরে শৃগালের প্রহর গণার শব্দ ওঠে। বিস্তীর্ণ অনাবৃত মাঠের একটানা দীর্ঘশ্বাস পুকুরের মধ্য হইতে মৃতের নাভিশ্বাসের সঙ্গে ভাসিয়া উঠে। দূরে কর্জ্জনা গ্রামের আর কোন সাড়া শব্দ নাই। তাহাদের কেহ কেহ এই মাঠের মধ্যে। বলে :

কে যায় ? কে রে ?

দিগন্ত মুখরিত শব্দের আর কোন উত্তর নাই।

আবার শব্দ ওঠে—কোন্‌ শালা ! দাঁড়া !

ঠ্যাঙ্গাড়ে রঘু গয়লা মোটা লাঠি হাতে আগাইয়া যায়। কাছে যাইতেই তাহারা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে। ভয়ে তাহাদের মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। নির্ব্বাক ! রঘু গয়লা একে একে তাহাদের দুইজনের কাপড়চোপড় জিনিষপত্র কাড়িয়া লইয়া ছাড়িয়া দেয়। বলে, একটি কথা না ! সোজা এই দিকে চলে যা ! নইলে—

নির্ব্বাক্‌ স্বামী-স্ত্রী অর্দ্ধউলঙ্গ অবস্থায় সোজা চলিতে থাকে। সমস্ত কিছু হারাইয়াও যে তাহারা প্রাণে বাঁচিয়াছে এই ঢের।

পুরুষটি বলিল, বললাম তোকে, এই অবেলায় বাড়ী থেকে বেরুতে হবে না ! জানিস্‌তো বাপু এটা কর্জ্জনার মাঠ ! এই মাঠ পেরিয়ে ঘর যাওয়া সোজা কথা নয়। রাগে দুঃখে গজ গজ করতে থাকে সে।

মেয়েটি কাঁদতে থাকে ! উত্তর না দিয়ে স্বামীর গা ঘেঁসে দাঁড়ায়ে কাঁপতে থাকে। সর্ব্বস্বান্ত কৃষক-দম্পতি নিজেদের অদৃষ্টের কথা ভাবতে ভাবতে চলে যায়। রঘুগয়লা তখন অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

নির্মেঘ আকাশে চাঁদের হাসি ফাটিয়া পড়িয়াছে। তারার দল তাহার গায়ে গা মিলাইয়া ঝিক্‌ ঝিক্‌ করিতেছে। জ্যোৎস্না-বিধৌত মাঠে হাসি আর ধরে না। এই হাসি-কান্নায় রোমাঞ্চিত কর্জ্জনার মাঠে নিত্য হাসি-কান্নায় মুখরিত ঘটনার মায়াবৃত্ত ইতিহাস রাখে কে ?

বাঁকা বাঁশের ছোট পাবরি ছুটিয়া চলে বিদ্যুৎবেগে। গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া রঘু ছোঁড়ে সেই লাঠি। নিমেষে ছুটিয়া গিয়া আঘাত করে অদূরের চলিতপথের যাত্রীকে। যাত্রী সেখান হইতে চীৎকার করিয়া বলে, আমি, আমি।

কে কার কথা শোনে ? চলমান লাঠির সঙ্গে সঙ্গে রঘু ছুটিয়া যায়।

আমি! আমি! বাবা আমি! আমায় মেরো না! পথিক আঘাতে লুটাইয়া পড়ে। আঘাতের চরমতায় তাহার পা দুটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সে যন্ত্রণায় ছটফট্ করিয়া চীৎকার করিতেছে।

শালার বাবা সবাই হয়! এখন আর বাবা কেউ কার নয়।

আর একটা লাঠির আঘাত পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটা লাঠির শব্দ ওঠে, রঘুর সিদ্ধ হস্ত কাজ করিতে থাকে, চোখ কান তখন তাহার বন্ধ।

বাবা, বাবা কী করলে?

হঠাৎ রঘুর খেয়াল হয়। চমক ভাঙ্গিয়া দেখে তাহারই একমাত্র পুত্র অন্তিম শয্যায়। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া সে যাহা করিত, এবং আজ যাহা করিয়া বসিয়াছে তাহা তাহার অন্তরকে মুচড়াইয়া দিল। নির্ব্বাক, নিস্পন্দ হইয়া ভাবিতে লাগল! ভগবান এ কী ঘটাইল। কৃতকর্ম্মের ফল আজ তাহার হাতে হাতে ফলিয়া গেল।

কর্জ্জনা গ্রামখানি ছোট। ঘরকয়েক গোয়ালা, দুই-একঘর হাড়ি, বাগ্দি লইয়া এই গ্রাম। গ্রামের এ-ধারে ও-ধারে মাঠ-ছাড়া আর কিছুই নাই। দিগন্তবিস্তৃত উঁচুনীচু মাঠের মধ্যে এই গ্রামখানি অবজ্ঞেয় অবস্থায় স্বকাহিনীতে মহিমান্বিত। মাইলটেক দূরে সেই পুকুর ও আমবাগানের মধ্যে সড়কের গতিপথ। ভয় এই জায়গাতেই। ছায়াঘন আমগাছের মধ্যে লুকাইয়া থাকিয়া ঠেঙ্গাড়েরা পথিকদের মারিয়া সেই পুকুরের মধ্যে লাস ডুবাইয়া রাখে। জনহীন প্রান্তরের মধ্যে কি ঘটিল কেহই জানিতে পারে না।

গাড়ী হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল—যদি পেরুলি কর্জ্জনা,
নেয়ে ধুয়ে ঘর যানা।

এই গ্রামের কে না ডাকাত, ঠেঙ্গাড়ে! গ্রামের কথা বলতে গেলে গা-টা শিউরে ওঠে। সে-দিন এক সন্ন্যাসী এই গ্রামে গিয়ে এক গোয়ালার বাড়ীতে ওঠে। রাত্রিটা কাটিয়ে সে চলে যাবে। কাটোয়ার গঙ্গাস্নান করাই তার উদ্দেশ্য। বৈকাল হওয়ায় আর মাঠ পেরুতে ভয়ে সাহস হয় না। খেয়ে দেয়ে রাত্তিরে শুয়ে আছে। সকলেই ঘুমিয়েছে। গ্রামের কোন সাড়া শব্দ নাই। সন্ন্যাসী নিশ্চিন্তে ঘরের মধ্যে শুয়ে আছে। কিন্তু সকালে উঠে দেখে, কখন কোন ফাঁকে তার যথাসর্ব্বস্ব উধাও। বুদ্ধিমান সন্ন্যাসী—

পাশের যাত্রীটি হাসিয়া উঠিল। বলিল, তাহ'লে আর সন্ন্যাসীকে নেয়ে-ধুয়ে ঘর যেতে হ'ল না। সন্ন্যাসী মানুষের কিছুই নাই তো যাবে কোথায়? এ-প্রবাদ এখানে অচল।

সন্ন্যাসী কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়। সে এক কাণ্ড ক'রে বস্‌ল। রঘু ডাকাতকে ভুলিয়ে মন্ত্র দিয়ে গ্রামশুদ্ধ সকলকে শিষ্য ক'রে ফেলল।

তাহ'লে সন্ন্যাসী কর্জ্জনা না পেরিয়েই ঘরে যাবার ব্যবস্থা ক'রে ফেল্‌ল।

পর পর চারিখানা উটের গাড়ী সমান ব্যবধান রাখিয়া চলিয়াছে। একজন মামলাবাজ আছে প্রথম গাড়ীতে। স্বামী-স্ত্রী ও গুটিকয়েক ছেলেমেয়ে লইয়া আর একখানি গাড়ী ভর্ত্তি। একদল পরস্পর-অপরিচিত যাত্রী বেশ গল্প জমাইয়া চলিয়াছে আর একখানি গাড়ীতে। শেষ গাড়ীতে আছে একদল বরযাত্রী। হৈ চৈ, চীৎকার চলে এই গাড়ীতে বেশী। ইহারা স্থানীয় এবং এখানকার সব কিছুই জানে।

ঘনসন্নিবদ্ধ হইয়া সকলে চলিয়াছে যাহারা তাদের ভ্রাম্যমাণ জীবনের কথা ও কাহিনী কেবল কর্জ্জনার মাঠকে লইয়া সীমাবদ্ধ। একজন বললে:

একদিন দেখা গেল গ্রামখানি লাল পাগড়ীতে ছেয়ে গিয়েছে। পুলিশের আসায় কেউ যে সন্ত্রস্ত এ-কথা যেন বোঝাই গেল না। তাদের আসাই তারা আশা ক'রে থাকে। ক'ঘর লোকের সাহস কম নয়। রঘুকে ধরতেই এই তোড়জোড়। সকাল হতেই ঘরে ঘরে খানাতল্লাসী পড়ে গেল। সমস্ত তন্ন তন্ন ক'রে কোথাও রঘুকে পাওয়া গেল না। পুলিশের দল অগত্যা নিরাশ হয়ে ফিরছিল, হঠাৎ একজনের নজরে পড়্‌ল, একটা বাঁশবনের ভেতরে কে যেন ঢুক্‌ল। সন্দেহবশে তারা বাঁশবন ঘিরে ফেলল। দেখতে দেখতে জনকয়েক তার ভেতরে ঢুকে পড়ল। আশ্চর্য্য, বাঁশবনের ভেতরে একটা বড় গর্ত্তের মধ্যে ওপরটা বাঁশপাতা দিয়ে ঢেকে রঘু তার নির্জ্জনবাসের ব্যবস্থা ক'রে রেখেছে। এ যাত্রায় আর রঘুর নিষ্কৃতি হ'ল না। কিন্তু রঘুর নির্জ্জনবাসের কারিকুরিতে সকলেই আশ্চর্য্য বনে' গেল। বহু সঞ্চিত ধনের উদ্ধার লাভ হ'ল।

আর একজন বললে: কিন্তু কর্জ্জনার মাঠে শুধু এক রঘুই জন্মায় নি। এদের বংশগত মর্য্যাদা কি লোপ পেয়েছে। কবে কোন অতীত কাল থেকে এরা এইসব ক'রে আসছে। এখনও কি তার অবসান ঘটেছে! এক রঘু যায় আর একজন তার বদলে জন্মায়।

দিবারাত্রির কাব্য এই কর্জ্জনার মাঠ! কখনও বা শ্যাম আস্তরণ বিছাইয়া মাঠ তাহাকে অভিনন্দন জানায়। কখনও বা রুক্ষ, দীর্ঘ ফাটল শস্যহীন অনাবৃত মাঠ তাহাকে শোকগাথা জানায়। বর্ষা-প্লাবিত মাঠ যখন বিরাট বিভীষিকা লইয়া কর্জ্জনাকে গিলিতে যায়, তখনও তাহার অবসর নাই। হত্যা, লুণ্ঠন, অনাচার তাহার দৈনন্দিন কাব্যকে অনাদর করিবার অবসর পায়না।

উটের গলায় ঘণ্টা বাঁধা। টং টং করিয়া শব্দ করিতে করিতে তাহাদের দল চলে। চালক উপরে বসিয়া রসি ধরিয়া তাহাকে সংযত করিয়া চলে এবং হিন্দুস্থানী গান ধরিয়া পরিশ্রমের লাঘব করিতে চায়। তাহারা দলছাড়া চলে না। গ্রাম্য চলতি ভাষায় নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে। আর যাত্রীর দল উপরে, নীচে বসিয়া থাকে। খুসী খেয়ালমত সময় কাটায়। কিন্তু কর্জ্জনার মাঠে পড়িলেই সব চুপ-চাপ! একটা বিভীষিকা সকলেরই মনে ভাসিয়া উঠে।

ক্যাঁ কচ্ ক্চ্ কড়্ কড়াং! শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীগুলি থামিয়া গেল। ওদিকে তখন গাড়ীগুলি কর্জ্জনার মাঠের মধ্যে পুকুরের পাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে। কর্জ্জনার বহু বিচিত্র

লোমহর্ষণ ঘটনাই সকল যাত্রীর আলোচ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শোক-দুঃখের বিচিত্র ঘটনা সমাবেশের মধ্যে বহুজনের ভাব ভঙ্গিমা যে ধারা লইয়াছে, হঠাৎ এই অপ্রত্যাশিত শব্দ ও গাড়ীগুলির অকস্মাৎ গতি-বিরতির মধ্যে ভীষণ ত্রাসের সৃষ্টি হইল। সকলেই সমস্বরে হৈচৈ করিয়া উঠিল। কিন্তু গাড়ী হইতে কেহ নামিতে চায়না।

অবশেষে একে একে সকলেই নামিয়া পড়িল। সকলেরই মুখে চোখে ভয়ের রেখা সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে। জনবিরল, বিভীষিকাময় মাঠের মধ্যে কি বুঝি ঘটিয়া উঠে।

বন্ধনমুক্ত উটগুলিকে আমগাছের শিকড়ে বাঁধিয়া রাখা হইল। যাত্রিগণ একে একে নামিয়া জটলা পাকাইতে লাগিল। চালকের দল গাড়ী লইয়া মাতামাতি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। এই জনবিরল পথে, রাত্রে গাড়ী ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় যে কি বিপদ তাহা তাহারাই বুঝিয়াছে। গাড়ী মেরামত করা সম্ভবপর নয়, অথচ সেটাকে ফেলিয়া রাখাও সমীচীন নয়। তাহাদের সমস্যা জটিলতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

দেখিতে দেখিতে আলোয় আলোকীর্ণ হইয়া অন্ধকার ও জঙ্গলময় আমবাগান, পুকুর—কর্জ্জনার এই মর্ম্মস্থানে কলরব পড়িয়া গেল। যেখানে পা দিতে মানুষ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত, সেখানে আলোয়, জনসমাগমে, কলরবে হাট বসিয়া উঠিল। কর্জ্জনা মাঠের এই বৈচিত্র্যের অভিনবত্ব আছে। বহু লোক এই পুকুরের জল খাইয়া শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে। যাত্রীরা নিঃসঙ্কোচে এখন পুকুরে নামিয়া হাতমুখ ধুইতে লাগিল।

চাঁদ তখন মাথার উপরে জ্যোৎস্না ছিটাইতে ব্যস্ত। মাঠের উপর চাঁদনি আস্তরণ পড়িয়া কুহেলীময় করিতেছে। গভীর রাত্রির নগ্নতা ভেদ করিয়া একশ্রেণীর বন্যজন্তুর সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সুপ্তিমগ্ন কর্জ্জনার মাঠের কাহিনীতে এক নূতন অধ্যায় সুরু হইল।

লাল সড়কের সমান্তরাল টানিয়া লাইন পড়িবার কথা হইতেছে। পথিকদের তখন উটের গাড়ীর মুখ চাহিয়া থাকিতে হইবেনা। ছোট ছোট সরু সরু লাইনের উপর দিয়া ছোট ছোট গাড়ী ঘুচ্ ঘুচ্ করিয়া চলিতে থাকিবে। আর যাত্রীগুলি এই রাস্তা দিয়া কাটোয়া-বর্দ্ধমান যাতায়াত করিবে। কর্জ্জনার কাছে আসিয়া সকলেই একবার এই বিভীষিকাময় স্থানের কথা নিজেদের মধ্যে নানাভাবে রসিয়া রসিয়া বলিতে থাকিবে।—

নাঃ আর পারা যায় না। কবে যে ট্রেন চলতে থাকবে জানিনা। কথাতো অনেক দিন থেকেই শুনছি।

তাহলে এই খানেই হবে ষ্টেশন। নাম থাকবে কর্জ্জনা। ষ্টেশন মাষ্টার, চাপরাশি, কুলি, দোকানীতে সব সময় গম্‌গম্ করতে থাকবে। দেখতে দেখতে লোকজনের সমাগমে বাজারহাট, বাড়ীঘর সব একে একে বসবে! তখনকার দিনে এই পুকুর-বাগানের ভেতর দিয়ে লোকের বেড়াবার যায়গা হবে! আঃ কি মজা!

ঠ্যাঙাড়ে ব্যাটারা কি জব্দই না হবে তখন!

ওদের কিন্তু জব্দ করা সহজ নয়! একদিন এক ঠ্যাঙাড়ের [illegible] উপায় নাই। সমস্ত তন্ন তন্ন করে ফেরারী আসামীর পাত্তা পাওয়া গেলনা। অগত্যা তারা চলে গেল।

রান্নাঘরের সামনে একটা মাচা বাঁধা আছে। তাতে থাকে ঘুঁটে সাজান। চারিদিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সন্দেহ করবার কিছুই নাই। অথচ তার ভেতরে মাটির নিচে গর্ত্ত করা আছে। সেখানে থাকবার মত একটা জায়গা ক'রে সমস্তদিন থাকে লুকিয়ে। রাত্রি হ'লে সে বের হয়। পুলিশ আসবার সময় ঘরে ছিল। পুলিশ দেখেই সে তার ভেতর লুকোয়। অথচ সাধ্য নেই কারও সেটা সন্দেহ করে। বুদ্ধি বটে।

দীর্ঘ মেয়াদ ভোগের পর রঘু মুক্তি পাইল। তাহার আগমনে গ্রামময় আনন্দের রোল পড়িয়া গেল। উৎসাহী যুবকের অভাব নাই। তাহারা তখন ওস্তাদ ঠ্যাঙাড়ে হইয়া উঠিয়াছে। রঘুর শিক্ষায় তাহারা সমানে লুণ্ঠন, ইত্যাদি চালাইতেছে। কিন্তু রঘুর আর সে ক্ষমতা, উৎসাহ নাই। দীর্ঘকারাবাসে শুধু যে তাহার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তাহা নয়, সংসার-জীবনেও বৈরাগ্য দেখা দিয়াছে। এমন সময় সন্ন্যাসীর দেখা!

রঘু গিয়াছে কিন্তু তাহার অনুচরেরা এখনও তাহার লাঠির মর্য্যাদা ভুলে নাই।

রঘুর একমাত্র বংশধর রঘুবই হাতে কর্জ্জনার মাঠে মারা গিয়াছে। স্ত্রী নাই কিন্তু পুত্রবধূ স্বামীর শোক ভুলিতে পারে নাই। সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে গোপনে কর্জ্জনার মাঠে গিয়া শোকগাথা জানাইয়া আসে। স্বামীর এত বড় দুঃসংবাদ সে ভাবিতে পারে নাই।

রঘু সন্ন্যাসীর শিষ্য হয় এবং তাঁহার সঙ্গে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ায় তাঁহার চেলা হইয়া।

নির্ব্বংশ বাড়ীতে আবর্জ্জনা স্তূপ হইয়াছে। ঘর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। জলে জলে মাটির দেওয়াল মাটিতে মিশিবার উপক্রম করিতেছে। সর্ব্বত্র জঙ্গলে ভরিয়া উঠিয়াছে। গ্রামের লোকেরা তাহার কাহিনী দেশে দেশে রাষ্ট্র করিয়া বেড়ায়।

কর্জ্জনা মাঠের মর্ম্মস্থলে আর একদল গরুর গাড়ী আসিয়া জমিল। তাহারাও বর্দ্ধমান হইতে আসিতেছে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাহির হইয়া এখানে আসিতে রাত্রি দ্বিপ্রহর প্রায়। পূর্ণিমার চাঁদ এখন মাথার উপরে। হৈ চৈ আরও বাড়িয়া গেল। গাড়ীতে, গরুতে, উটে মানুষে একাকার। অনেকগুলি লণ্ঠনের আলোতে অন্ধকার বাগানটা আলোময় হইয়া উঠিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে কাটোয়া হইতে আর একদল উটের গাড়ী, একদল গরুর গাড়ী সঙ্গে বিস্তর লোক আসিয়া জুটিল। কলরবের সমারোহ পড়িয়া গেল।

ইতিমধ্যে গাড়ীর চাকা মেরামত করা হইয়া গেল। গলদঘর্ম্ম হইয়া চালকগণ অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা চীৎকার করিয়া এ কথা জানাইতে যাত্রীরা হৈ চৈ করিয়া উঠিল।

কর্জ্জনার মাঠের বহু প্রচারিত বিবিধ কাহিনীর যে সমাবেশ তাহার মর্ম্মস্থলেই আলোকিত হইল এ-কথা কে ভাবিতে পারে।

উটের গাড়ী যাত্রী লইয়া যথানির্দ্দিষ্ট পথের দিকে আবার চলিতে শুরু করিল। একটানা টং টং শব্দ, চাকার ঘর্ ঘর্ শব্দ এবং যাত্রীদের কলগুঞ্জন একত্রিত হইয়া সড়কের উপর দিয়া প্রতিধ্বনিত করিয়া চলিতে লাগিল।

ভারতের কৃষিতে হাড়ের মূল্য

শ্রীবীরেন্দ্রলাল দাস বি-এস্-সি, এগ্রি (ইউ. এস. এ.)

কৃষি ভারতের আদিম বৃত্তি, বর্ত্তমানে এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও ভারতের শতকরা ৭০ ভাগ লোক কৃষির উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া আছে। প্রত্যেক সভ্য দেশের কৃষকেরা নূতন নূতন পরীক্ষা ও প্রক্রিয়া দ্বারা কি ভাবে তাদের জমির উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করা যায়, তজ্জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। অল্প জমিতে অধিক ফসল উৎপন্ন করিবার জন্ত তাহারা নানা রকমের নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক সারের ব্যবহার করিতেছে এবং আশাতিরিক্ত ফলও পাইতেছে কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়—ভারতীয় কৃষকেরা এ-বিষয়ে বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে।

১৯৪১ সালের লোকগণনায় দেখা যায় ভারতের বর্ত্তমান লোকসংখ্যা ৩৮ কোটী ৯০ লক্ষ কিন্তু ১০ বৎসর পূর্ব্বে ছিল ৩৩ কোটী ৮০ লক্ষ। সুতরাং ভারতের লোকসংখ্যা যে বেশ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতের কৃষির সে অনুপাতে সামান্ত উন্নতিও পরিলক্ষিত হয় নাই। শুধু বিদেশী সরকারের উপর নির্ভর করিয়া ইহার প্রতিকার করা অসম্ভব। ভারতীয় নেতা ও বৈজ্ঞানিকেরা ইহার প্রতিকারের জন্ত এখন হইতেই বিশেষভাবে অবহিত না হইলে বাঙ্গালার পঞ্চাশের মন্বন্তরের মত দুর্ভিক্ষ ভারতের কোন না কোন প্রদেশে সর্ব্বদা লাগিয়াই থাকিবে।

ফসল জন্মাইবার জন্ত সারের প্রয়োজন যে কতখানি তাহা ভারতীয় চাষীরা যে জানে না তাহা নহে, তবে তাহারা এ-বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেয় না। কারণ, ভারতীয় কৃষকের জমিতে প্রতি বৎসর নানাভাবে কিছু না কিছু সার জমা হয়—যেমন বন্যার পলিমাটি পড়া, গরু-মহিষের পরিত্যক্ত হাড় ও জমির নানাবিধ ফসলের আবর্জনা, ডাল ইত্যাদি ফসল জন্মাইবার জন্ত জমিতে কিছু কিছু নাইট্রোজেন জমা হয় ইত্যাদি। এইভাবে ভারতের জমিতে অত্যাবধি কিছুটা উর্ব্বরতা এখনও অবশিষ্ট আছে কিন্তু তাহাও ধীরে ধীরে কমিয়া আসিতেছে। ফসলের পক্ষে যতখানি খাদ্য দরকার, তাহা জমিতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না। আবার বিশেষ সার (Special Manure) প্রয়োগ করিতেও ভারতীয় কৃষকেরা সেরূপ অভ্যস্ত নয়। তাই জমির ফসলের পরিমাণ ও উর্ব্বরতা ধীরে ধীরে কমিয়া আসিতেছে।

পরের কলমে কয়েকটী দেশের প্রধান প্রধান ফসলের একর প্রতি ফলন দেখান গেল।

ধান		তুলা	
ইতালি	৪০৩২ পাউণ্ড	মিসর	৫৩১ পাউণ্ড
জাপান	৩৩৬০ ঐ	আমেরিকা	২৬৭ ঐ
চীন	২৪৬৪ ঐ	সুদান	২১৭ ঐ
মিসর	২৯১২ ঐ	ভারতবর্ষ	৮৯ ঐ
ভারতবর্ষ	১২৯৯ ঐ		

ইক্ষু		গম	
হাওয়াই	৬৪.৮ টন	কানাডা	১০৪৫ পাউণ্ড
জাভা	৪৮·৩ ঐ	ইংলণ্ড ও ওয়েল্স্	২১২৩ ঐ
ফিলিপাইন	১৬·৮ ঐ	হল্যাণ্ড	২৬৮৩ ঐ
ভারতবর্ষ	১২·৩ ঐ	ভারতবর্ষ	৭০৮ ঐ

উহাতেই প্রমাণ পাওয়া যায়—ভারতীয় কৃষকেরা অন্যান্ত দেশের চাষীদের কত পশ্চাতে পড়িয়া আছে।

প্রত্যেক জমিরই উর্ব্বরতার একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। যখন ঐ সীমা অতিক্রম করে, তখন ঐ জমি একেবারেই অনুর্ব্বর হইয়া পড়ে। উহাতে আর কোন ফসল পাওয়া যায় না। সার প্রয়োগেই উহার প্রতিকার করা সম্ভব।

গত ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই প্রথম লোকে জানিতে পারে যে, ফসলের খাদ্য হিসাবে নাইট্রোজেন, পটাশ এবং ফস্‌ফরাস নামক রাসায়নিক পদার্থ জমিতে প্রয়োগ করা চলে। সুতরাং সে-সময় হইতেই এই সকল পদার্থ নানাপ্রকার অনুপাতে বিশেষ সার (Special Manure) নামে বিভিন্ন ফসলে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এই সকল সার তাড়াতাড়ি গাছেরা গ্রহণ করিতে পারে এবং জমিতেও গাছের যে-সকল প্রধান প্রধান খাদ্যের (Plant food) অভাব হইয়া থাকে এই সার তাহা পূরণ করে। সে-জন্ত এই সকল বিশেষ সারের কদর আজকাল অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। বৈজ্ঞানিক চাষীদের নিকট সাধারণ সার (General Manure) অপেক্ষা ঐ সকল সারের মূল্য বেশী। রাসায়নিক শিল্পে এই সকল বিশেষ সার তৈয়ারী করাকে একটা বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হইয়াছে। এই শিল্প সে-জন্ত অনেক আগাইয়াও গিয়াছে। সারা পৃথিবীতে কি পরিমাণ রাসায়নিক সার উৎপন্ন ও ব্যবহৃত হয়, তাহা নিম্নলিখিত তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

	নাইট্রোজেন ঘটিত রাসায়নিক সার (Nitrogenous Chemicals)	শুধু খাঁটি নাইট্রোজেন (টন)			
		১৯৩৩-৩৪	১৯৩৪-৩৫	১৯৩৫-৬৫	১৯৬৬-৩৭
উৎপাদন (Production)	সালফেট অব এমোনিয়া (Sulphate of ammonia	৫ ৯৫,৭০০	৬৩১,৩৬০০	৬৯৫,৯০০	৭০৩,২০০
	সায়েনামাইড (Cyanamide)	২০৪,০০০	২১৫,০০০	২৫০,০০০	২৮০,০০০
	নাইট্রেট অব্ লাইম ও অন্যান্ত প্রকারের নাইট্রোজেন	২১,৯০০	২২,০০০	১৫০,৮০০	১৯৮,৭০০
	চিলিয়ান নাইট্রেট অব্ সোডা (Chilean Nitrate of Soda)	৪৩৮,৫৯০	৪৬৭,৫০০	৪৯৯;৫০০	৩৯৮,৯০০
	সর্ব্ব মোট···	১,২৬০,১০০	১,৩৩৫৮,০০	১,৫২৩,২০০	১,৫৮০,৮০০
ব্যবহার (Consumption)	(ক) নানা আকারে সর্ব্বমোট নাইট্রোজেনের ব্যবহার	১,১৬০,০০০	১,৩৫০,৫০০	১,৪৪৪,২০০	১,৬১২,৭০০
	(খ) শুধু কৃষিকার্য্যের জন্ত ব্যবহার	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

উপরোক্ত তালিকা হইতে প্রমাণ হয় যে কি ভাবে পৃথিবীতে উত্তরোত্তর রাসায়নিক সারের ব্যবহার বাড়িয়াই চলিয়াছে, কিন্তু আমাদের ভারতীয় চাষীরা এই সকল সারের বিষয়ে অত্যন্ত অজ্ঞ। তাহারা একদিকে যেমন এই সকল সার ব্যবহার করিতে জানে না, অপর পক্ষে এই সার কিনিবার মত আর্থিক সচ্ছলতাও তাহাদের নাই। এই সকল সার বিদেশ হইতেই ভারতে আমদানী হয়। ভারতের নিজস্ব কোন রাসায়নিক সারের কারখানা নাই। নানাপ্রকার আইনের প্রতিবন্ধকতার জন্য এ-দেশে আজ পর্য্যন্ত কোন বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। ভারত সরকার নিজস্ব তত্ত্বাবধানে ঐরূপ একটী বৃহৎ রাসায়নিক সারের কারখানা স্থাপন করিবেন বলিয়া কিছুদিন পূর্ব্বে জানা গিয়াছিল। এ-দেশে ঐ সকল সার তৈয়ার হইতে পারিলে, বিদেশের আমদানী সার হইতে উহার দাম অনেক কম পড়িত। তাহাতে ভারতীয় কৃষকদের এই সার ব্যবহার করা অনেক সহজ হইত। ভারতে প্রতি বৎসর কি পরিমাণ রাসায়নিক সার আমদানী হয়, নিম্নের হিসাবে তাহা প্রমাণ পাইবেন।—

সার	বৎসর	পরিমাণ (টন)
নাইট্রেট অব সোডা (Nitrate of Soda)	১৯৩৪-৩৫	৮,৯৭৭
	১৯৩৫-৩৬	৮,৯৬৩
	১৯৩৬-৩৭	১১,৫৬৭
সালফেট অব এমোনিয়া (Sulphate of ammonia)	১৯৩৪-৩৫	২৫০১
	১৯৩৫-৩৬	৯,৭২৪
	১৯৩৬-৩৭	৭,৯১৮
মিউরিএট অব্ পটাশ (Muriate of potash)	১৯৩৪-৩৫	৭,২১৬
	১৯৩৫-৩৬	৮,৩০০
	১৯৩৬-৩৭	১০,২০৮

এই সকল সারের অধিকাংশই চা-বাগান ও সরকারী কৃষিক্ষেত্রগুলিতেই ব্যবহৃত হয়।

ভারতের নিজস্ব সার বলিতে খৈল ও গোবরই প্রধান। উহাই সাধারণতঃ ভারতীয় কৃষকেরা ব্যবহার করে, কিন্তু ইহা ছাড়া আরও যে কয়েকটী মূল্যবান সার কৃষকদের অবহেলায় ও অযত্নের ফলে অন্য দেশে রপ্তানী হইয়া যায়, তাহা তাহারা লক্ষ্য করেনা। উহার মধ্যে মাছের সার (fish manure) ও হাড়ই (Bones) প্রধান। এই সারের উপকারিতা ভারতীয় কৃষকদের চেয়ে অন্যান্য দেশের চাষীরাই বেশী জানে।

শুট্‌কী মাছের গুঁড়া (dry fish powder), মাছের আঁশ ইত্যাদি খুব ভাল সার। কখনও কখনও টাটকা মাছও পচাইয়া সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই মাছের সারও ভারতীয় কৃষকদের বিশেষতঃ বাঙ্গালী চাষীদের পক্ষে একটী সহজলভ্য সার। এই সারে পটাশ (potash) ও ফস্ফরিক এসিড (phosphoric acid) ছাড়া শতকরা ৬-১১ ভাগ এমোনিয়া নামক নাইট্রোজেন খাদ্য (Nitrogenous food) থাকে।

এখানে আমরা ভারতের মূল্যবান্ সম্পদ এই হাড়ের বিষয়ই আলোচনা করিব। ভারতের সর্ব্বত্রই এই হাড় পাওয়া যায়। প্রতি গ্রামের পথে, ভাগাড়ে, মাঠে সর্ব্বত্রই এই মূল্যবান হাড়কে অযত্নে পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। এই সকল হাড়ে কি পরিমাণ বৃক্ষ-খাদ্য বর্ত্তমান আছে, তাহা নিম্ন তালিকায় দেখা যাইবে।

	হাড়ের গুঁড়া (Raw Bone meal)	সিদ্ধ করা হাড়ের গুঁড়া (Steamed Bone meal)	মাছের গুঁড়া (Fish meal)
জল (moisture)	৯'১০	৬'৩০	৯'১০
জৈবিক পদার্থ (Organic matter)	৩৫'৯৬	১২'৯০	৬৫'৪৪
ফস্ফরিক এসিড	২২'০০	৩২'১০	৮'৮২
চূণ	২৯'২০	৪১'৯৭	১০'১০
মেগনেসিয়া ও অন্যান্য ক্ষার পদার্থ	২'৭৪	৬'৫৮	৩'৩২
অদ্রবণীয় বালুকণা ইত্যাদি (Insoluble siliceous matter)	১'০০	০'১৫	৩'২২
			১০০'০
জৈবিক পদার্থের নাইট্রোজেন	৪'২৭	১'৩৭	৭'২১
এমোনিয়ার মত নাইট্রোজেন	৫'১৮	১'৬৭	৮'৭৫

বঙ্গীয় কৃষিবিভাগের পরীক্ষার ফলে দেখা যায়, হাড়ের গুঁড়া দেওয়াতে আউস ধান শতকরা ২০ ভাগ, আমন ধান ১০-১৫ ভাগ, পাট ৫০ ভাগ, আখ ২৫ ভাগ, তুলা ৮-১০ ভাগ, তরিতরকারী (Vegetables) ১০-১৫ ভাগ অধিক ফসল দিয়াছে।

প্রতি বৎসর ভারতের এই অনাদৃত হাড় বিদেশে রপ্তানী হইয়া সে দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করে। এই হাড়ই ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে সুপার ফস্ফেট (Super Phosphate) নামক একটী মূল্যবান সারে পরিবর্ত্তিত হইয়া সে দেশের কৃষিকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ভারত হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ১ লক্ষ টন হাড়, ৫০ হাজার টন মাছের সার বিদেশে রপ্তানী হয়। এই সকল হাড় সাধারণতঃ নিম্ন শ্রেণীর লোকদ্বারা গ্রামের পার্শ্বস্থ ভাগাড় হইতে সংগৃহীত হইয়া নৌকা ও রেল যোগে হাড় গুঁড়া করিবার কলে (Bone crushing mills) নীত হয়। ডোম, চামার, সাঁওতাল, মুসলমান প্রভৃতি কয়েক শ্রেণীর লোকেরাই এই কাজে নিয়োজিত হয়। হাড়গুলিকে অন্য আর এক শ্রেণীর লোক দ্বারা পরিষ্কার করিয়া অথবা গুঁড়া করিয়া বিদেশে রপ্তানীর জন্য তৈয়ার করা হয়। গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারত হইতে কি পরিমাণ হাড় ও হাড়ের গুঁড়া বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে, তাহা দেখান গেল। এই

হাড় ব্যতীত গরু, মহিষ ইত্যাদির সিং, খুর ইত্যাদিও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হয়।

	হাজার টন	মূল্য (লক্ষ টাকা)
হাড়	৭০'১০	৫০'২০
হাড়ের গুঁড়া (Bone meal)	৩৫'৬০	১৯'৪০
খুর,সিং ইত্যাদি অন্যান্য দ্রব্য	২'২০	৩ ১০
সিং-এর গুঁড়া (Horn meal)	১'৯০	১ ৬০

ভারত সরকারের মার্কেটিং বিভাগের (Contral Agricultural Marketing Departmont) গত ১৯৪২-৪৩ সনের বিবরণীতে প্রকাশ যে, ভারতে প্রতি বৎসর প্রায় ১৩৯১ হাজার টন হাড় পাওয়া যায়। উহার মূল্য ১৬৫ লক্ষ টাকা। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই হাড়ের মাত্র ৩০ ভাগ অর্থাৎ ৪১৭ টন সংগৃহীত হয়, অবশিষ্ট ৭০ ভাগ অর্থাৎ ৯৭৪ হাজার টন সংগৃহীত হয় না। উহার মূল্যও প্রায় ৫৩৬ লক্ষ টাকার উপর।

যুদ্ধের পূর্ব্বে বেলজিয়ামেই ভারতের প্রায় একচতুর্থাংশ হাড় রপ্তানী হইত। হাড়ের গুঁড়ার প্রধান গ্রাহক ছিল ইংলণ্ড ও সিংহল। খুর, সিং ইত্যাদির বেশীর ভাগই জার্ম্মানী, নেদারল্যাণ্ড এবং ইংলণ্ডে রপ্তানী হইত।

পূর্ব্বে ভারতে হাড় গুঁড়া করিবার কল (Bone crushing mill) মোটেই ছিল না। এখন বাঙ্গালা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে সামান্য কয়েকটী কল স্থাপিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া বিহার, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি প্রদেশে ঐরূপ কল একেবারেই নাই বলিলেও চলে। সুতরাং ভারতের যুদ্ধোত্তর শিল্পে হাড়কে একটি বিশিষ্ট স্থান দেওয়া যাইতে পারে; এই হাড় হইতে একদিকে যেমন জমির একটি বিশিষ্ট সার তৈয়ার হইবে, অপরদিকে উহা হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মূল্যবান্ ফস্ফরাস ও ফস্ফরাস-ঘটিত বহু রাসায়নিক পদার্থ ও ঔষধ তৈয়ার হইবে। ইহা ছাড়াও হাড়,শৃঙ্গ ইত্যাদি হইতে বহু রকমারী জিনিষ (fancy articles) তৈয়ার হইতে পারিবে। যদিও কুটীর-শিল্প হিসাবে ঢাকা, যশোহর প্রভৃতি স্থানে এই সকল হাড় ও শিং হইতে বহু পরিমাণ ছোট খাট নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্য (fancy articles)—যেমন বোতাম, চিরুণী, খেলনা, কাগজকাটা ছুরি (Paper cutter), ছুরির ও ক্ষুরের বাঁট ইত্যাদি তৈয়ার হয়, কিন্তু এই শিল্পকে গড়িয়া তুলিবার মত বৃহৎ কারখানা অদ্যাবধি কোথাও স্থাপিত হয় নাই। শিল্পপতিরা যদি সুশৃঙ্খল ভাবে (Systematically) চালাইতে পারেন তবে উহার বহুল উন্নতি হইতে পারে। সেই সাথে সাথে ভারতের কৃষিরও যথেষ্ট উন্নতি হইতে পারে।

হাড়গুলি অযত্নে মাঠে পড়িয়া থাকিলে উহা ধীরে ধীরে পচিয়া সারের কাজ যে না করে তাহা নহে, কিন্তু উহা পচিয়া গাছের গ্রহণোপযোগী হওয়া যেমন বহু সময়-সাপেক্ষ আবার জমির সকল স্থানে উহা সমানভাবে না পড়ায়, উহাদ্বারা ফসলের বিশেষ উপকার হয় না। সে জন্য এই প্রক্রিয়াকে অবৈজ্ঞানিক (unscientific) পন্থা বলা হয়। আবার এইভাবে হাড়গুলি পচিতেও বহু সময় লাগে। একমাত্র ফলবান-বৃক্ষাদির গোড়ায় আস্ত হাড় দেওয়া যাইতে পারে। উহা বহু বৎসর পর্য্যন্ত গাছের খাদ্য যোগায়।

এই হাড়গুলিকে সহজভাবে ফসলের ব্যবহারোপযোগী (Seasoned) করিতে হইলে সংগৃহীত হাড়গুলি বাহিরে খোলা স্থানে রৌদ্র, বৃষ্টি ও বাতাসে এক স্থানে স্তূপীকৃত করিয়া রাখিতে হয়। তবে ঐ হাড়গুলি যাহাতে শৃগাল-কুকুরে অন্যত্র সরাইয়া ফেলিতে না পারে, সে জন্য চারিদিকে একটা ঘেরা দিতে হয়। কয়েকমাসের মধ্যেই হাড়ের সহিত সংলগ্ন মাংস ও তৈলাক্ত পদার্থ (grease) ইত্যাদি চলিয়া যায় এবং হাড়গুলিও বেশ শুকাইয়া যায়। তখনই উহারা বিক্রয়ের উপযুক্ত হয়। কেহ কেহ ঐ হাড়গুলি মাটীতে কয়েক সপ্তাহের জন্য পুতিয়া রাখে এবং তৎপর উপরে উঠাইয়া শুকাইয়া নেয়।

হাড়গুলি দুই ভাবে জমিতে প্রয়োগ করা যায়। এক প্রকার (১) বাষ্পসিদ্ধ (steamed) ও আর এক প্রকার (২) অবাষ্পসিদ্ধ (unsteamed)। অবাষ্পসিদ্ধ হাড়গুলি পরিষ্কার করিবার পর সালফিউরিক এসিড (sulphuric acid) নামক রাসায়নিক দ্বারা ভিজাইয়া দেওয়া হয়। তৎপর উহা যন্ত্রের সাহায্যে গুঁড়া করিয়া জমিতে প্রয়োগ করা হয়।

অন্য প্রকারে হাড়গুলি একটী আবদ্ধ স্থানে বাষ্পপ্রয়োগ করিয়া সিদ্ধ করিতে হয়। উহাতে হাড়গুলি সহজেই গুঁড়া হইয়া যায়। সুতরাং শেষোক্ত হাড় হইতে মিহি গুঁড়া (Bone Dust) করা সহজ। বাষ্পসিদ্ধ হাড়ে নাইট্রোজেন-এর ভাগ কম থাকে।

ভারতীয় কৃষকেরা হাড়ের গুঁড়ার উপকারিতা সম্বন্ধে যদিও সচেতন, কিন্তু হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার করিবার মত সামর্থ্য শতকরা ৯০ জন কৃষকেরই নাই। সে জন্য একদিকে সরকারকে যেমন অগ্রণী হইতে হইবে, অপর দিকে হাড়-শিল্পপতিরাও বিশেষভাবে অবহিত হইবেন—যাহাতে তাঁহারা যথাসম্ভব অল্পদামে এই সকল মাল সাধারণ চাষীদের নিকট বিক্রয় করিতে পারেন। এই সকল হাড় যদি ভারতের চাষীরা তাহাদের ফসলে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে তাহাদের ফসলের উন্নতির সাথে সাথে তাহাদের আর্থিক স্বচ্ছলতাও বাড়িয়া যাইবে।

দামী

শ্রীপ্রিয়লাল দাশ

জীবনের পণ্যশালে ডিগ্রী বড় দামী,
তার চেয়ে ধর্ম বড়—কহে ধর্মকামী।

কর্মী কহে, কর্ম বিনা ধর্ম কিছু নয়,
সবার চেয়ে অর্থ বড়—যুগধর্ম কয়।

আমার গল্প লেখা

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

আমার গল্প লেখার ইতিহাস বলব। কিন্তু কী ইতিহাস বলব? পেছনের দিকে তাকিয়ে যখন নিজের বিচিত্র স্বপ্নাতুর কৈশোর জীবনটাকে দেখতে পাই, তখন গল্প লেখার ব্যাপারটা নিজের কাছেই যেমন আকস্মিক তেমনি বিস্ময়কর বলে মনে হয়।

বাবা ছিলেন পুলিশের দারোগা। আজ নয়, ত্রিশ থেকে বিশ বছর আগে; এবং সে সময়ে ওই সম্প্রদায়টার সঙ্গে যাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল, সে দেবীটি আর যিনিই হোন, তিনি যে সরস্বতী নন, সে সম্বন্ধে বোধ হয় সাক্ষী প্রমাণ দরকার হবে না। শুনেছি সে যুগে বেশী পড়াশুনো বা ভালো ইংরেজি লেখার ক্ষমতাটা পুলিশ বিভাগে অযোগ্যতার নিদর্শন হিসেবে গৃহীত হত।

কিন্তু বাবা ছিলেন আশ্চর্য্য ব্যতিক্রম। কলেজে পড়াশুনো করেছিলেন, ভালো ছাত্র হিসেবে খ্যাতিও তাঁর ছিল। মনে পড়ছে, ত্রিশ মাইল দূর থেকে ডাকাতের আস্তানায় রেইড করে তিনি ফিরে আসছেন—মাঠের ওপারে সাদা আরবী ঘোড়াটার ওপরে দেখা যাচ্ছে ইউনিফর্ম্ম-পরা উজ্জ্বল গৌরবর্ণ একটি পুরো পাঁচ হাত মানুষ। সহিস ছুটে এসে ঘোড়া ধরল, জিনের ওপর থেকে সোজা লাফিয়ে নামলেন মাটিতে। কপালে ঘামের বিন্দু, সারা গায়ে উত্তর-বাংলার লাল ধূলো। কিন্তু ঘোড়া থেকে নেমেই তাঁর প্রথম প্রশ্ন:—ইংরেজী বইগুলোর ভিঃ পিঃ এসেছে?

বাবার চমৎকার লাইব্রেরী ছিল। মাসে মাসে বই আসত, বাংলা দেশের যত রকম দৈনিক, মাসিক আর সাপ্তাহিক পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন তিনি। শুধু গ্রাহক ছিলেন না—একনিষ্ঠ পাঠকও ছিলেন। বাড়ীতে আমাদের মতো ছোটোর দলের জন্যে আসত অধুনালুপ্ত খোকাখুকু, সন্দেশ, মৌচাক, শিশুসাথী। আজও আমার ভাবতে আশ্চর্য্য লাগে—এই লোকটি কেমন করে পুলিশের চাকরীতে সুনাম অর্জ্জন করেছিলেন! পড়াশুনো ছাড়া কোনো নেশা ছিল না—পান-তামাক অস্পৃশ্য বোধ করতেন এবং জন ষ্টুয়ার্ট মিল থেকে মিলটন, সেক্‌স্‌পীয়ার, ওয়ার্ডসওয়ার্থের নির্ভুল উদ্ধৃতি মৃত্যুর আগেও তাঁর মুখ থেকে শুনেছি।

সাহিত্য সম্বন্ধে আমার যা কিছু আসক্তি বা অনুরক্তি, একান্ত ভাবে বাবার কাছ থেকেই পেয়েছিলাম। ফলে, বর্ণপরিচয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অকালপক্কতাও অর্জ্জন করেছিলাম কিছুটা। খোকাখুকুর পাতায় আর মন বসত না, চুরি করে বাঁধানো ভারতবর্ষের পাতা থেকে পড়তাম 'শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী,' (গোড়াতে বইটার ওই নামই ছিল). দেশবন্ধু দাশের 'নারায়ণ' কাগজ থেকে পড়তাম 'স্বামী'। কতটুকু বুঝতাম? ঠিক জানি না, কিন্তু আশ্চর্য্য দোলা লাগত মনে। এখন শুধু চোখের সামনে ভেসে উঠছে উত্তর-বাংলার একটা ন-গণ্য গ্রাম। আমাদের বাসার সামনে রক্তমঞ্জরীতে কৃষ্ণচূড়ার কুঞ্জটা আকুল হয়ে আছে—তার ওপারে বয়ে যাচ্ছে আত্রাইয়ের নীল ধারা। তারও ওপারে গ্রাম ছাড়া রাঙা মাটির পথ—ঘন বাঁশ আর আমের বনের ভেতর দিয়ে কোথায় যে দিক্‌চিহ্নহীন দিগন্তে মিলিয়ে গেছে তা জানতাম না। আর সেই আশ্চর্য্য পটভূমিতে এই আশ্চর্য্য লেখাগুলো আমাকে যেন আচ্ছন্ন করে রাখত—মনে হত ওই অজানা পথটা আর এই লেখাগুলোর মধ্যে কি যেন নিবিড় একটা সাদৃশ্য আছে।

প্রথম যখন লিখতে সুরু করি, তখন আমরা মোটামুটি ভাবে স্থায়ী বাসা বেঁধেছি দিনাজপুরে এসে। ইস্কুলের ছাত্র এবং নীচু ক্লাসের ছাত্র। প্রথম সাহিত্যিকের আসক্তি জ্যামিতির নিয়মে কাব্যচর্চ্চার ওপরে গিয়েই পড়ল। কবিতা লিখতে আরম্ভ করলাম।

আমি চিরকাল নিরালা মানুষ—কবিতা লেখায় হাত দিয়ে নিজেকে আরো বেশি সংকুচিত করে ফেললাম। লেখা সম্বন্ধে যেমন সংশয় ছিল, তেমনি ছিল লজ্জা। অপরাধবোধ তো ছিলই। চোরের মতো লিখতাম, ছিঁড়ে ফেলতাম সঙ্গে সঙ্গেই। নিজের লেখার প্রতি এক বিন্দু দরদ ছিল না—ভাগ্যক্রমে সেটা আজও নেই।

নিভৃত সাধনার জন্য নিভৃত জায়গা দরকার। কোথায় পাওয়া যায় সেটা? খুঁজতে খুঁজতে চমৎকার একটা জায়গা বের করলাম—সে রকম সাহিত্যসাধনার রাজাসন পৃথিবীতে কারো ভাগ্যে জুটেছে বলে আমি জানি না।

বাড়ীর একপাশের বারান্দায় ভাঙাচুরো কাঠ কুটরো আর কেরোসিন কাঠের প্যাকিং বাক্সের একটা স্তূপ ছিল। শুধু স্তূপ বললে কম হয় সেটা প্রায় ছাদ পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছিল। তার নীচে বাগান থেকে সংগৃহীত কাঁঠালের একটা পিরামিড—তা থেকে নিঃসারিত হত অপূর্ব্ব সুরভি। বাক্সগুলোর তলায় ইঁদুর স্বেচ্ছাসুখে বিচরণ করতো—শব্দে এবং গন্ধে বেশ মনোরম একটি পারিপার্শ্বিক সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে আর সন্দেহ কী!

আমি খাতা আর কালি কলম নিয়ে সেই স্তূপশিখরে আরোহণ করলাম। বাড়ির লোকের নজরে সহজে পড়ত না, যদি হঠাৎ কেউ দেখে ফেলত, অনুমান করত কাঁঠাল খাচ্ছি। কাঁঠাল সম্বন্ধে বাড়ির লোকের কার্পণ্য ছিল না এবং ম্যালেরিয়া আর পেটের অসুখে ছেলেবেলায় এত ভুগতে

হয়েছিল যে, সকলে আমাকে ঈশ্বরের করুণার ওপরেই ছেড়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু কাঁঠালের চাইতে উঁচু দরের রসের সন্ধান পেয়েছি তখন। কেরোসিন কাঠের বাক্সে গলা অবধি ডুবিয়ে দিয়ে বেদব্যাসের কলম চলছে। কবিতা, গান, রাজকুমার মেঘেন্দ্রজিতের সঙ্গে রাজকন্যা সুবর্ণার প্রেম ও মহাযুদ্ধমূলক মহাকাব্য; একলব্যের গুরুভক্তিমূলক জ্বালাময়ী নাটক - তার খানিকটা গিরিশী ছন্দে। নিজে পড়ি, নিজে ছিঁড়ে আবার নতুন করে লিখি। রবিন্সন ক্রুসোর মতো নিজের আবিষ্কৃত জগতে সীমা-সংকীর্ণ হয়ে সৃষ্টি এবং বিলয়ের আনন্দ একাধারে উপভোগ করে যাই।

এর মধ্যে 'রহস্য লহরী' সিরিজের কতকগুলো রোমাঞ্চকর বই পড়ে ফেলেছিলাম। মাথার মধ্যে ক্রাইম নভেল একটা নতুন প্রেরণা এনে দিলে। আমার একক সাহিত্য-সংসার থেকে এবারে একটা কাগজ বের করলাম, তার নাম বোধ হয় 'চিত্র-বৈচিত্র্য'। কোয়ার্টার ফুলস্ক্যাপ সাইজের আট পৃষ্ঠা: আমিই একাধারে সম্পাদক, শিল্পী, লেখক, মুদ্রাকর ও পাঠক। তিনটে কবিতা, সম্পাদকীয় এবং রহস্য-রোমাঞ্চিত একটি উপন্যাস—প্রথম কিস্তিতেই দুটো ভয়াবহ নরহত্যা ঘটিয়ে দিয়েছিলাম। এই আমার প্রথম গল্প বা উপন্যাস।

আমাদের দিনাজপুরের সেই বাড়ীতে—যেখানে ঘন হয়ে আমের ছায়া পড়েছে, খিড়কির ওপার থেকে আসছে বাতাবী ফুলের মিষ্টি গন্ধ, উঠোনে ঠাকুরমার সারি সারি বোয়ামে ছত্রিশ রকমের আচার রোদে শুকোচ্ছে, ইদারার পাশে কানে মস্ত মস্ত রূপোর গয়না-পরা সাঁওতাল ঝি বুধনী বিকৃত মুখে বাসন মাজছে এবং বাইরে দাদার ঘর থেকে আসছে সঙ্গীত-সাধনার কর্ণভেদী কোলাহল, সেই সাধারণ—অতি সাধারণ বাঙালী গৃহস্থের বাড়িতে প্যাকিং বাক্সের দুরারোহ পর্ব্বতশিখরে বসে আমি ফুলস্কাপ কাগজের আড়াই পৃষ্ঠায় বন্দুক, বোমা, গুপ্তগৃহ এবং নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে চলেছি—ভাবতে পারেন? কিন্তু আমি লিখেই চলেছি—'কার সাধ্য রোধে মোর গতি?'

এমন সময় একদিন ধরা পড়ে গেলাম। রিপণের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ স্বর্গীয় রবীন্দ্র নারায়ণ ঘোষের একমাত্র ছেলে সুধীন ঘোষ (সুধীনও আজ বেঁচে নেই তার অকালমৃত্যুই বোধ হয় অধ্যক্ষ ঘোষের মৃত্যুর জন্যে অনেকটা দায়ী) ছিল আমার অন্যতম খেলার সঙ্গী। একদিন সে আমাকে ডাকতে এল মার্ব্বেল খেলার জন্যে। বললে, খেলবি চল্।

আমি বললাম, না, আমি গল্প লিখছি।

—গল্প!—সুধীন তো স্তম্ভিত। ঘটনাটা কিছুক্ষণ সে বিশ্বাসই করতে পারল না। বললে, কই দেখি গল্প?

আমি তাকে 'চিত্র-বৈচিত্র্য' থেকে উপন্যাসটা এক কিস্তি পড়ে শুনালাম! মুহূর্ত্তে Doubting Thomas-এর এ কি পরিবর্ত্তন! দেখি সুধীনের চোখ-মুখ আগ্রহে জ্বলছে, মার্বেল খেলার প্রসঙ্গ ভুলেই গেছে সে। সাগ্রহে বললে, তারপর? তারপর?

সম্পাদকীয় গাম্ভীর্য্য নিয়ে বললাম, পরের সংখ্যায় বেরুবে।

সুধীন বললে, তোর কাগজের বার্ষিক চাঁদা কত?

বললাম, নিয়মাবলী কাগজের পাতাতেই দেওয়া আছে। বিজ্ঞাপন এক পৃষ্ঠা দু-আনা, আধ পৃষ্ঠা এক আনা—বার্ষিক মূল্য স-ডাক চার পয়সা।

সুধীন তৎক্ষণাৎ প্যান্টের পকেট থেকে কেষ্টলালের হাতীভাজা খাওয়ার জন্যে সঞ্চিত একটা একআনি বার করে বললে, আমি গ্রাহক হবো।

তার পর থেকে কাজ বেড়ে গেল। হস্তযন্ত্র থেকে দু-কপি কাগজ মুদ্রিত হতে লাগল। কিন্তু রহস্যোপন্যাসটা সুধীনকে পাগল করে দিয়েছিল। তিন দিন পরে এসে বলল, না, বড্ড দেরী হচ্ছে। তোর কাগজকে সাপ্তাহিক করে দে।

আমি তখন নতুন উৎসাহে দৈনিক দু-সংখ্যা করে বার করতে পারি—সাপ্তাহিক তো কা-কথা। আমার প্রথম ভক্ত পাঠকের অনুরোধ উপেক্ষা করা গেল না। 'চিত্র-বৈচিত্র্য' সাপ্তাহিক হল।

কাগজ কতদিন চলেছিল কিংবা উপন্যাসটা শেষ হয়েছিল কি না, মনে নেই। কিন্তু সুধীন একদিন কল্‌কাতায় চলে এল—বাবার কাছে থেকে লেখাপড়া করবে। সেই সঙ্গেই বোধ হয় কাগজ আর উপন্যাস বন্ধ হয়ে গেল।

তারপর আর সুধীনের সঙ্গে দেখা হয় নি—খবরের কাগজে স্পোর্টস্‌ম্যান সুধীনের মৃত্যুর খবরও পড়েছি অনেক দিন পরে। কিন্তু আমার সেই প্রথম পাঠকটিকে আমি আজও ভুলি নি, ভুলতেও পারব না কোনোদিন। জীবনে বহু বন্ধু পেয়েছি—আমার লেখা ভালোবাসেন এমন দু'চার জনও হয় তো আছেন—কিন্তু বাল্যজীবনের সেই মুগ্ধ ভক্তটিকে আর খুঁজে পাবো না কখনো। আজ এই উপলক্ষে আমার লোকান্তরিত এই বাল্যবন্ধুটিকে অন্তরের প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতা জানাবার সৌভাগ্যলাভে কৃতার্থ বোধ করছি।

* * *

দিন কাটতে লাগল। কবিখ্যাতি তখন কিছুটা

পাড়ার ছেলেদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে; কবিতার পর কবিতা জন্মলাভ করছে—ভরে উঠছে পাতার পর পাতা। বড় জামাইবাবু শ্রীযুক্ত শরৎ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে উৎসাহিত আর অনুপ্রাণিত করছেন। বেশ

এমন সময় দ্বিতীয় গল্পের আবির্ভাব। বেশ নাটকীয় আবির্ভাব। দিনাজপুর মিউনিসিপ্যাল এম, ই, স্কুলের ক্লাস সিক্সে অঙ্ক কষানো হচ্ছে। ক্লাস নিচ্ছেন বাঘা মাষ্টার গোপী রায়—একাধারে অঙ্ক এবং ড্রিল মাষ্টার। নামজাদা খেলোয়াড় এবং প্রহারে প্রচণ্ড। ছাত্র-রাজ্যের বিভীষিকা!

অঙ্কে আমি অনবদ্য ছাত্র ছিলাম। তবু কেন জানি না, গোপীবাবু আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। হয় তো একান্ত ক্ষীণজীবী বলেই আমার গায়ে হাত তোলাটা পুরুষ-ব্যাঘ্রের আত্মসম্মানে বাধত। সহপাঠী মেজদা' ছিল ক্লাসের এবং অঙ্কের সেরা ছাত্র—তার খাতা থেকেই হোম টাস্‌ক্ টুকে নিয়ে দিনগত পাপক্ষয় চলত।

গোপীবাবুর পিরিয়ডে পেছনের বেঞ্চে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ব্ল্যাকবোর্ড থেকে অঙ্ক টুকবার নাম করে হোম টাস্‌কের খাতায় একদিন রামপ্রসাদের মতো গল্প লিখে ফেল্‌লাম। পাশে বসেছিল নরেশ চক্রবর্ত্তী, ন্যাড়া মাথা, কানে আংটি। অঙ্কে সে আমার মতোই পণ্ডিত। সে বোধ হয় গোলাপ ফুল আঁকবার চেষ্টা করছিল—কিন্তু হয়ে উঠছিল কোলা ব্যাং। হঠাৎ দেখি, ঘাড়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে সে বিমুগ্ধ মনে গল্প পড়ছে।

ক্লাস শেষ হল। নরেশ বল্‌লে, অতি চমৎকার গল্পটা তোর। আমাকে দে, বাঁধিয়ে রাখব।

চমৎকার গল্পকে কি হাতছাড়া করা যায়? দিলাম না। বাড়ীতে নিয়ে এসে ছোট বোনদের সংগ্রহ করে গল্প শোনাতে বসে গেলাম।

বেশ করুণ গল্প। নামটা মনে আছে: 'পাশাপাশি'। ফুলস্ক্যাপ কাগজের তিন পৃষ্ঠা। বিষয়বস্তু হচ্ছে: পাশাপাশি দুটি বাড়ী, একটিতে বড় লোক, একটিতে গরীবের আশ্রয়। একটি বর্ষার সন্ধ্যায় বড়লোকের বাড়ীতে যখন টি-পার্টি চলছে, তখন গরীবের ছেলেটি বিনা-চিকিৎসায় মরে গেল।

ছোট বোনদের চোখ যখন ছল ছল করবার উপক্রম, এমন সময় একটা বিরাট অট্টহাসিতে ছন্দঃপতন হয়ে গেল। কখন যে পিসতুতো ভাই ফুচুদা অর্থাৎ মহেন্দ্র বাবু এসে জুটেছেন, টেরও পাইনি। সাহেবী মেজাজের লোকটি, সুট পরে থাকেন এবং ঠোঁটে সর্ব্বদা জলন্ত সিগারেট বিরাজিত থাকে।

গল্পের মধ্যে এক জায়গায় ছিল মাংসের কচুরি খাওয়ার কথা। শুনে ফুচুদার হাসি আর থামে না। মাংসের কচুরি! তাও কি হয়? ননসেন্স অ্যাণ্ড অ্যাবসার্ড। রাবিশ!

মাংসের কচুরি তখনো খাই নি, নামটা বোধ হয় শুনেছিলাম। কাজেই আমি দমে গেলাম—নিদারুণ দমে গেলাম, মনে হল, এমন ছল-ছল করা গল্পটা নিতান্তই প্রহসন হয়ে দাঁড়াল। খাতা বগলে করে পালিয়ে গেলাম, লেখাটাকে কুটি কুটি করে উড়িয়ে দিলাম হাওয়ায়। অপমানে চোখ দিয়ে সেদিন জলও পড়েছিল, মনে আছে।

আজ জানি, মাংসের কচুরি হয় এবং ভালোই হয়। আপনাদের আশীর্ব্বাদে আমার গৃহিণী মাংসের কচুরি তৈরী করে অনেকবার খাইয়েছেন। কিন্তু সে দিনের সেই 'শব্দ' আমার গল্পরচনার উৎসমুখে পাথর চাপা দিয়ে দিলে। গল্প লিখতে বসলেই মাংসের কচুরি দুঃস্বপ্ন হয়ে আমাকে তেড়ে আসে। সুতরাং 'অব্যাপারেষু' মনে করে ও পথ ছেড়ে দিলাম।

* *

কবিতা লিখে চলেছি। 'মাস পয়লা' পত্রিকায় ছোটদের বিভাগে কবিতা লিখে পুরস্কার পেলাম, ভারী উৎসাহ হল। আস্তে আস্তে বয়স বাড়ল, ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করলাম। সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার পাতায় আমার কবিতাগুলো সাদরে পত্রস্থ হতে লাগল। 'দেশের' তৎকালীন সহ-সম্পাদক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্য-সংসারের universal পবিত্রদা' আমাকে নানাদিক দিয়ে উৎসাহ দিতে লাগলেন। তাঁর স্নেহের ঋণ আমার এ জীবনে অপরিশোধ্য।

বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে আই, এ পড়ছি। পবিত্রদা চিঠি লিখলেন: গল্প লিখো।

গল্প লিখব—কিন্তু কী লিখি। কিছুদিন আগে ফরিদপুরে থাকার সময় কিছু কিছু গল্পচর্চা করেছিলাম—কিন্তু সেগুলো নিতান্তই উদ্দেশ্যমূলক—শৃঙ্খলিত দেশমাতার দুর্গতি দূর করা সম্পর্কে রেখাচিত্রজাতীয় ব্যাপার। পবিত্রদার পত্রে বিব্রত হয়ে পড়লাম।

সেই সময় বাংলা সাহিত্য-জগতে যে সব লেখা আমার প্রাণ মন কেড়ে নিয়েছিল, সেগুলি অচিন্ত্যকুমারের গল্প, তারাশঙ্করের 'খড়্গ' বলে বিচিত্র একটি ফ্যান্টাষ্টিক রচনা, মনোজ বসুর 'বন-মর্ম্মর', নবাগত মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা'। শেষোক্ত লেখাটি ভারতবর্ষে ক্রমশঃ প্রকাশ্য ছিল। মপাশা আর বালজাকের গল্পও তখন গিলতে সুরু করেছি। আমার অতিপ্রিয় এই

সমস্ত লেখকের প্রভাব সম্মিলিত হয়ে আমার লেখার ওপরে পড়ল, দেশের পাতায় আমার প্রথম গল্প বেরুল: 'নিশীথের মায়া'। আমার বয়স তখন সতেরো থেকে আঠারোর মধ্যে। বয়স-সুলভ রোমান্টিকতার স্বপ্নময় অতীতের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে গল্প আকারে একটা ফ্যান্টাসি খাড়া করে তুলেছিলাম।

পবিত্রদা খুসি হলেন। গল্পের জোয়ার এল—কবিতার উৎস শুকিয়ে এল ধীরে ধীরে। 'দেশ' থেকে 'বিচিত্রা'—'বিচিত্রা' থেকে 'শনিবারের চিঠি', তার পর এখানে ওখানে। শুভার্থী পেলাম সজনীকান্ত দাসকে, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে। নিজের খেয়ালের আনন্দে লিখে চললাম। কোনো খ্যাতির আকর্ষণ আমাকে কখনো প্রলুব্ধ করেনি—আমার লেখা কে কী ভাবে গ্রহণ করেছেন, সে কথা ভাবিওনি কোনোদিন। নিজের আনন্দে লিখেছি—কাগজে বেরিয়েছে, যখন মূল্যহীন মনে হয়েছে, তখন তাকে আর স্বীকার করিনি। আমার বহু লেখাকেই আমি এইভাবে বিস্মৃতির বাতাসে ছড়িয়ে দিয়েছি—ফুরায় যা দে রে ফুরাতে; তার ধারা আজো চলেছে। আমার লেখা যাঁরা ভালোবাসেন, এর পরবর্ত্তী ইতিহাস তাঁদের অজানা নেই।

*

এই তো আমার গল্প লেখার ইতিহাস। এর ভেতরে ছোট খাটো অনেক সুখ দুঃখ, অনেক ঘাত-সংঘাত হয় তে মিশে রয়েছে, যার কথা আজ আর মনে করতে পারি না। কিন্তু এ ইতিহাস অত্যন্ত সহজ, অত্যন্ত সাধারণ। আমার পরিচয় যদি আপনাদের কাছে কিছু দেবার থাকে, তা হলে সে আমার জীবনে নয়, আমার গল্পে।

গল্প লিখি, উপন্যাস লিখি। তার কতটুকু দাম জানি না। অত্যন্ত পরিমিত শক্তি—যা করতে চাই, কিছুই করতে পারি না। আজকের সৃষ্টি দু'দিন পরেই হয়তো ধুলোয় মিলিয়ে যাবে। কিন্তু এইটুকুই শুধু বিশ্বাস করি, আমার দেশকে ভালো বাসি, মানুষকে ভালোবাসি। সেই ভালোবাসাকে যদি লেখার মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট করে তুলতে পারি, তাহলেই নিজেকে কৃত-কৃতার্থ বোধ করব। নিজের সীমানা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত থেকেও কবিগুরুর ভাষায় আমারও এই সান্ত্বনা:

আমার কীর্ত্তিরে আমি করি না বিশ্বাস।
জানি কালসিন্ধু তা'রে
নিয়ত তরঙ্গ-ঘাতে
দিনে দিনে দিবে লুপ্ত করি।…
…এ বিশ্বেরে ভালো বাসিয়াছি।
এ ভালোবাসাই সত্য, এ জন্মের দান।
বিদায় নেবার কালে
এ সত্য অম্লান হয়ে মৃত্যুরে করিবে অস্বীকার।

একা জেগে রয় পাণ্ডুর চাঁদ

শ্রীআশা দেবী

একা জেগে রয় পাণ্ডুর চাঁদ ম্লান আকাশের তলে
নীরব পাখায় নিশীথ মরাল উড়ে যায় দলে দলে।
অনাদিকালের বেদনা বাহিয়া একে একে দেয় দেখা
ইন্দ্রধনুর রঙ্গে যেন আঁকা স্মৃতির রক্ত-লেখা।

অখণ্ড কাল বিভাগ-বিহীন অপলক জাগরণ,
মহাকাল গলে অক্ষ-মালায় নিয়ত বিবর্ত্তন।
প্রলয় তিমিরে সহসা ফুটিল আলোকের শতদল,
রূপের মাঝারে অরূপ জাগিল মাতিল ধরণীতল।

নির্ম্মম আর কামনার বুকে অঙ্কুর হোয়ে ফুটি,
আলোর পথের যাত্রী আমরা তমোবন্ধন টুটি।
কোন সে মন্ত্রে অন্ধ জড়তা তাজে বন্ধন ঘোর,
কোন সে মন্ত্রে পাইনু চেতনা ছিঁড়ি' আবরণ ডোর।

হিমালয় বুকে টেরাইয়ের কোলে যেথায় ঘুমায় নদী,
সেথায় জাগিয়া শুক্লা রজনী রচে মৃত্যুর বেদী।
কল-ঝঙ্কারে পাগলা ঝোরার ধ্বনিছে রুদ্রতান,
শ্যামল শয়ানে বিহ্বলা মৃগী প্রিয়েরে শুনায় গান।

যৌবন সেথা আবরণহীন উদ্ধত উদ্দাম,
কর্ম্ম সেথায় মুখর চপল নাই সেথা বিশ্রাম।
স্নেহের বাঁধনে জড়ায়ে সেথায় আলেয়ার মোহ মায়া
নভোচারী মেঘ দূরে উড়ে যায়—নদী আঁকে বুকে ছায়া

সে পথে কি চলে একেলা পথিক ছিঁড়ে মোহ-বন্ধন,
"ফিরে চল ঘরে" বলে নাকি মন? বুকে জাগে ক্রন্দন?
মর্ম্মরব্যথা বাজে বনতলে—'ও-পথিক, ছাড় পথ,'
ছল ছল আঁখি জাগে বাতায়নে যাত্রী থামাও রথ॥

প্রার্থনা

শ্রীগৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

দে মা, সংসারের বোঝা নামিয়ে; নিজের গড়া শৃঙ্খল ভগ্ন করবার শক্তি তোমার দয়া ভিন্ন ফিরবে না। কতো জন্ম জন্মান্তরের আমিত্বের সংস্কার জ্ঞানকে কতো রকমে যে আচ্ছন্ন করেছে, তার সীমা নির্দ্ধারণ করার শক্তি আর নাই। তোমার পাদপদ্মে আমার আমিত্ব, শক্তি, কামনা, বাসনা সমস্ত অঞ্জলি দিচ্ছি। অজ্ঞানের আবরণ দুর্ভেদ্য—তোমার কটাক্ষপাত ভিন্ন সে-আবরণ অপসারণ করা অসম্ভব।

উপযুক্ত সময় হলে শুদ্ধচিত্তে তুমি স্ব স্বরূপে উদ্ভাসিত হবে; উপযুক্ত মুহূর্ত্ত কবে আসবে, তুমই জানো। সেই শুভ মুহূর্ত্তের কত বিলম্ব, তা আমার বদ্ধ জ্ঞান স্থির করতে পারে না।

ডাকের মত ডাকার শক্তি দাও, যে-প্রতিবন্ধক সে-ডাকে বাধা দেয়, তা' দূর করো।

স্মরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণপরায়ণা জগতের আধারভূতা শক্তি! আমাকে নিজ ঘরে ফিরে যেতে দাও।

মান, সম্ভ্রম, ধন, আত্মীয় কুটুম্বের ভালবাসার পশ্চাতে তুমিই নিজ পরিচয় দিচ্ছ; কিন্তু মমত্বের বন্ধনে স্বাধিকার ভ্রষ্টা ক'রে রেখেছ, মা।

সকল জীবের হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে বিকশিত হ'য়ে রয়েছ, কিন্তু মোহাচ্ছন্ন থাকায় সে-বুদ্ধি নিজ প্রসবিতাকে চিনতে দেয় না। আত্মাভিমানের ভারে অবসন্ন মন নিজেই নিজের বন্ধন বৃদ্ধি করছে।

তোমার দর্শনদ্বারের অর্গল তুমিই অপসারিত করো। প্রতি মুহূর্ত্তের শ্রদ্ধাঞ্জলির আকর্ষণে অস্থি-মাংস-সংঘাত দেহের প্রকৃত রূপ জ্ঞানে প্রতিফলিত হয়ে উঠুক; মুক্ত জ্ঞানে কল্পনাচ্ছন্ন চিত্তের জড়তার পরিবর্ত্তে চিদাকাশের উজ্জ্বল আলোকচ্ছটা এই চিত্তকে সাফল্যমণ্ডিত করুক।

শরীর ও মন তখন সৃষ্টিস্থিতি বিনাশের শক্তিভূতা সনাতনী জগন্মাতার অনুগ্রহে পরম সুখদ ব্রহ্মানন্দধারায় প্লাবিত হয়ে উঠুক। তোমার শক্তিতে অনুপ্রাণিত হয়ে আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত চৈতন্যের মহিমা বিকাশ উপলব্ধি ক'রে চিত্ত শান্ত হয়ে যাক। তোমার ভক্তের নাশ নাই—এই জয়ঘোষণার অধিকারী করো।

অভিমানী আত্মা

শ্রীজগন্নাথ মুখোপাধ্যায়

মানুষ চাহিল: অসীম শূন্যে কোথা তুমি ভগবান্!
মিলিল না সাড়া, যুগ যুগ তাই আত্মার অভিমান
আজও কাঁদে বলি প্রভু—
কাঁদে আর কাঁদে আপনা পাশরি,
সাড়া মিলে নাই কভু।
চাহিল না তারে—ধরার ধুলায় এসেছে সে যার লাগি,
যে তাঁহারে দিল চলিবার ভাষা, নিশি দিন রহি' জাগি;
স্বপনেতে যারে হেরি আপনার, তবু ডাকে ভগবান!
ধূসর ধূলায় তাই আজও কাঁদে আত্মার অভিমান।
আত্মরতির কাতর ব্যথায় শূন্যের অবতার
মানুষের পূজা পেতে রূপ নিলো প্রাণহীন দেবতার।
যুগে যুগে ভাসে পাষাণ দেবতা শত পূজারীর লোরে;
জীবনের বলি দিতেছে মানুষ সেই দেবতারই দোরে,
জাগে নাই ভগবান্!
ধূসর ধূলায় তাই আজও কাঁদে আত্মার অভিমান।

কালের গালেতে রক্ত আখরে পড়ে গেছে কত লেখা,
তবু সাড়া তার পেলনা মানুষ, পেল না তাহার দেখা;
মানুষের ক্ষুধা মিটাতে মানুষ মানুষে' শোষণ করে,
নিজেরে কেহবা দেয় বলিদান ক্ষুধা মিটাবার তরে;
অবমাননায় কাঁদে গুমরিয়া মানুষের দেবী যত,
ভ্রূণ-হত্যার স্বাক্ষর দেয় ইতিহাস অবিরত।
মানুষ তবুও চাহে কি মানুষে—শক্তির ভগবান?
ধরায় ধূলায় কাঁদে 'পরাজিত—
—আত্মার' অভিমান,
কোন অশরীরী আত্মার কথা পাষাণের মাঝে নাই—
মানুষ মরিলে যে কাঁদে একাকী
তাহারে খুঁজিনা ভাই.
মানুষের শব-গন্ধ যেদিন দোলাবে মানব-প্রাণ,
মানুষের মাঝে সেদিন জাগিবে
মানুষের ভগবান।

দেশবন্ধু—সুভাষ

ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

অবতরণিকা

১৯২১-এর জানুয়ারী আরম্ভ হইল বাঙ্গলার নব জাগরণের সাড়া লইয়া। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে নাগপুর কংগ্রেসে ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন ব্যবসা ছাড়িয়া দেশের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতেছেন — মুহূর্ত্তে সংবাদটা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল —বাঙ্গলায় আবার নূতন বন্যা প্রবাহিত হইল। সর্ব্বত্র সভা, আলোচনা—আর ছাড়িব ছাড়িব ভাব! একে চিত্তরঞ্জন অপরাজেয় ব্যারিষ্টার, বিরাট তাঁহার আয়, জ্যাকসন নর্টন গার্থ প্রভৃতি কৌন্সিলিও তাঁহার সহিত আঁটিয়া উঠেন না, বিচারপতিরা তাঁহার কথা শ্রদ্ধার সহিত শোনেন, অন্যদিকে আবার তিনি নিরহঙ্কারী, মাতৃভক্ত, অমিত-দানশীল এবং সাহিত্য-সেবী। ব্যবহারে, সহৃদয়তায় ও অপূর্ব্ব দান-শৌণ্ডতায় ইতিপূর্ব্বেই তিনি দেশবাসী আপামর সাধারণের হৃদয় জয় করিয়াছেন। তাই যখন সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া জনগণের মধ্যে আসিয়া তিনি দাঁড়াইলেন, সকলে তাঁহার আদর্শে অণুপ্রাণিত হইয়া দেশের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে ছুটিয়া আসিল। ছাত্রগণ পড়া ছাড়িল, উকীল ব্যারিষ্টার ব্যবসা ছাড়িল, বড় বড় চাকুরিয়াদের মধ্যেও অনেকে চাকুরী ছাড়িয়া তাঁহার পতাকাতলে

নেতাজী সুভাষ

সমবেত হইলেন। চিত্তরঞ্জন প্রকৃত দেশবন্ধু হইয়া উঠিলেন এবং সকলেই তাঁহাকে একমাত্র অবিসম্বাদী নেতা বলিয়া অভিনন্দিত

ঢাকা ক্যাচাটুরের বাংলোতে ১৯১১ সালে গৃহীত ছবি। উপবিষ্ট : দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, দণ্ডায়মান : ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

করিলেন। কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠান আবার নবভাবে বাঙ্গালায় গড়িয়া উঠিল।

ইতিমধ্যে দেশবন্ধুর প্রতি ময়মনসিংহ প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করা হয়। পূর্ব্ববঙ্গে কুলী ধর্ম্মঘট হয়, রেল-ষ্টীমার একসঙ্গে বন্ধ থাকে এবং ভীষণ-মূর্ত্তি পদ্মানদীর তরঙ্গরাশি উপেক্ষা করিয়াও তিনি সস্ত্রীক কেবলমাত্র নৌকার সহায়তায় গোয়ালন্দ হইতে চাঁদপুর পৌছিয়া কুলীদের আশ্বাস দেন।

ইতিপূর্ব্বেই ১১ নম্বর ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ফরবেস্ ম্যানসনে বহু টাকায় ভাড়া লইয়া কংগ্রেস আফিস ও গৌড়ীয় সর্ব্ববিদ্যায়তন

(National College) খোলা হয় এবং বহু কর্ম্মী সেখানে অবস্থান করেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রথম সভা হয় সেখানে ২৯এ জুন, ১৯২১। পুরাতন দল প্রায় অন্তর্হিত হয়, এবং দেশবন্ধুর উপরই সমস্ত কর্তৃত্ব-ভার অর্পিত হয়। অতঃপর নবগঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভায় (১২ জুলাই) বাঙ্গলার সমস্ত জিলার প্রতিনিধিই সমাগত হন। সভায় বিপুল উত্তেজনা পরিলক্ষিত হয় এবং কুলী-ধর্ম্মঘট, শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত ও বসন্ত মজুমদার প্রভৃতির জামিনে মুক্তিলাভ এবং আনুসঙ্গিক কয়েকটি বিষয়ে দেশবন্ধুর মত্ সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইলেও, প্রথম হইতেই কার্য্য পণ্ড করিতে উদ্যত একটি দলের আভাষ তিনি পাইলেন এবং সে জন্যই সময় সময় কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যেও অলক্ষ্যে দেশবন্ধুর প্রফুল্ল বদন মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতে দেখিতাম। ইহারই অব্যবহিত পরে নূতন কয়েকটি বিশিষ্ট কর্ম্মীর শুভাগমনে, তিনি আবার নূতন উদ্দীপনায় আশান্বিত হইয়া উঠিলেন। আবার ললাটের চিন্তারেখা অন্তর্হিত হইল। এই নবাগত কর্ম্মিগণের মধ্যে সুভাষচন্দ্র ও কিরণশঙ্করই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অতঃপর দেশবন্ধুর সংশ্রবে আসিবার পরে কিরূপে সুভাষচন্দ্র সম্পূর্ণরূপে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন এবং দেশবন্ধুর কথা বেদ-বাক্যের ন্যায় গ্রহণ ও অনুসরণ করিতেন, ক্রমে সেই আনুপূর্ব্বিক ও অপূর্ব্ব কাহিনী আমরা পাঠকগণকে উপহার দিতে প্রয়াস পাইব।

সুভাষচন্দ্রের পরিচয়

দেশবন্ধু যখন ব্যবসা ছাড়িয়া প্রথমে ছাত্র-আন্দোলনে হস্তক্ষেপ করেন, হেমন্ত সরকার নামে একটী কৃতী ছাত্র তাঁহার কার্য্যে খুব সহায়তা করেন। অসহযোগ ব্রত গ্রহণ করিবার পরে ইনিই হন দেশবন্ধুর প্রথম সেক্রেটারী। সমগ্র বাঙ্গালার ছাত্রগণের জাগরণে হেমন্তবাবুই প্রথমে দেশবন্ধুর দক্ষিণহস্তের মত কার্য্য করেন। অতঃপরে ক্ষিপ্রকর্ম্মী সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র আসিয়া দেশবন্ধুর যাবতীয় কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন।

হেমন্তবাবু নিজেও যশস্বী এম, এ। পরে বিলাত যাওয়ার জন্য ষ্টেট্ স্কলারসিপ পাইয়াও অসহযোগের সময় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্রব পরিত্যাগ করেন। এই সময়ে (১৯২১) তাঁহার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু তখন বিলাতে ছিলেন। তিনি সম্প্রতি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ইনিই এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকার নায়ক কর্ম্মবীর সুভাষচন্দ্র!

সুভাষচন্দ্রের পিতা ছিলেন কটকের খ্যাতনামা গভর্ণমেণ্ট উকীল ৺জানকীনাথ বসু। তাঁহার পিতৃভূমি কোদালিয়া গ্রামে। কোদালিয়া, হরিনাভি, চাংড়ীপোতা প্রভৃতি ২৪-পরগণার কয়টি গ্রাম পাশাপাশি অবস্থিত। গ্রামগুলি সংস্কৃতিপ্রধান। জানকী বাবুকে আলিপুরে দুই একবার দেখিয়াছি। আলিপুরের প্রসিদ্ধ উকিল বিজয়কৃষ্ণ বসু তাঁহার জ্ঞাতি, মোক্তার প্রিয়নাথ বসু নিজ জ্যেষ্ঠ সহোদর যদুনাথ বসু মহাশয়ের পুত্র এবং শ্রেষ্ঠ উকীল সুরেন্দ্রনাথ মল্লিকের সঙ্গেও আত্মীয়তাসূত্রে তিনি আবদ্ধ ছিলেন। সুভাষচন্দ্রের সহিত পরিচয় হওয়ার পূর্ব্বেই জানকীবাবুর মিষ্টি ব্যবহারের পরিচয় পাইয়াছি! তাঁহার কথাবার্ত্তায় তাঁহাকে খুব 'কালচার্ড' মনে হইয়াছিল। পরেও বরাবর তাঁহার ভদ্র ব্যবহার লক্ষ্য করিয়াছি।

সুভাষচন্দ্রের পুণ্যবতী রত্নগর্ভা জননীকে দেখিবার সুযোগও একবার হইয়াছিল। হরিপুর কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করিবার পরে, সুভাষচন্দ্রকে দেশবন্ধু বালিকা বিদ্যালয়ের কমিটি ও ছাত্রীবৃন্দ একটি
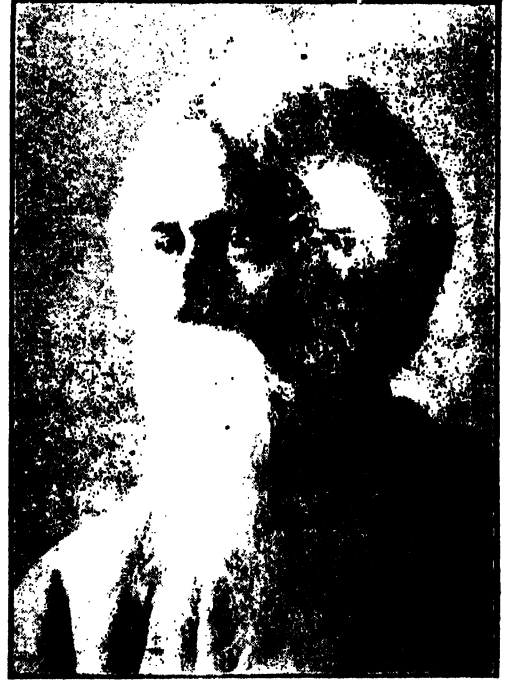
রবীন্দ্রনাথ

অভিনন্দন প্রদান করেন। তাহাতে তিনি বৃদ্ধা জননী, ভ্রাতৃবধূগণ, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্রীসহ স্কুলে পদার্পণ করিয়াছিলেন। সেই সাক্ষাৎ সুভদ্রারূপিণী জননীকে দর্শন করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছিলাম। যেমন শান্তমূর্ত্তি দেখিয়া ভাবমুগ্ধ হই, তেমনি তাঁহার মহানুভবতার কথা কটকের বহু লোকের কাছে শুনিয়াছি।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু (ব্যারিষ্টার এবং বঙ্গীয় আইন পরিষদের সভ্য) তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র, বাঙ্গালার জননায়ক শরৎচন্দ্র বসু (প্রখ্যাতনামা ব্যারিষ্টার এবং কেন্দ্রীয় পরিষদের নায়ক) দ্বিতীয় পুত্র, সুরেশচন্দ্র বসু (পূর্ব্বে ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এবং এখন ইমপ্রুভ-মেণ্ট ট্রাষ্টের এসেসার) তৃতীয় পুত্র, শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র বসু (জামসেদপুর কয়লাখনির বড় অফিসার) চতুর্থ, প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ও হার্ট-স্পেসালিষ্ট সুনীলচন্দ্র বসু পঞ্চম। সুভাষচন্দ্র ছিলেন ষষ্ঠ পুত্র।

সপ্তম শ্রীমান শৈলেশচন্দ্র বসুও ১৯২১ সালের স্বরাজ আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন এবং এখন বোম্বাইয়ের কোন একটি মিলে তত্ত্ব-বিশেষজ্ঞ। সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তোষকেও দেখিয়াছি। শ্রীমান কিছুদিন পূর্ব্বে ইহ সংসার ছাড়িয়া গিয়াছেন।

সাত বৎসর বয়সে সুভাষচন্দ্র কটকের প্রোটেষ্টাণ্ট ইউরোপীয় স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া ১২ বৎসর পর্য্যন্ত সেখানে অধ্যয়ন করেন। অতঃপরে রেভেন্‌স কলেজিয়েট স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া সেখান হইতেই ১৯১৩ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সহিত পাশ করিয়া সেই বৎসরের সকল পরীক্ষার্থীগণের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। সেবার প্রথম হইয়াছিলেন ৭০০-এর মধ্যে ৬১৩ নম্বর পাইয়া শ্রীযুক্ত প্রথমনাথ সরকার। বর্ত্তমানে ইনি সিটি কলেজ ও ইউনিভার্সিটি কলেজে অধ্যাপনা করেন। সুভাষ পান মোটে দুই নম্বর কম ৬১১। তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন সুপ্রসিদ্ধ লেখক ও ইউনিভার্সিটি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন, এম-এ, পি-আর-এস। ইনিও পান দুই নম্বর কম ৬০৯। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও সেবারেই কৃতিত্বের সহিত পাশ হন।

কটকের রেভেন্‌স কলেজিয়েট স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন বাবু বেণীমাধব দাস। ১৯১২ সালে ইনি কটক হইতে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে বদলী হইয়া আসেন, এবং হেমন্তবাবু তাঁহার নিকট পড়িয়াই ঐ ১৯১৩ সনেই কৃতিত্বের সহিত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। কি একটা কাজে হেমন্তবাবু ম্যাট্রিক ক্লাসে উঠিয়াই কটক আসেন। বেণীবাবুর চিঠি লইয়া আসিয়া তিনি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করেন ও কয়েকদিন তাঁহার সঙ্গেই অবস্থান করেন। উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব এমন গাঢ় হয় যে বহুদিন পর্য্যন্ত তাহা অটুট ছিল। হেমন্তবাবুর কাছে সুভাষচন্দ্রের বহু চিঠিপত্র দেখিয়াছি। এই চিঠিগুলি পড়িলে স্বতঃই মনে হয় যে, মাইকেল মধুসূদন দত্ত গৌরদাস বসাক মহাশয়কে অধিকতর আন্তরিকতার সহিত তাঁহার অমূল্য পত্রগুলি লেখেন নাই। এই সব চিঠিপত্র প্রকাশ পাইলে সুভাষচন্দ্রের তৎকালীন মানসিক গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করা সম্ভব হইবে।

সুভাষচন্দ্র এই সময়ে কটক কলেজের জনপ্রিয় প্রফেসার হেমচন্দ্র সরকারের প্রভাবে আসায় তাঁহার স্বাভাবিক সেবাবৃত্তি স্ফুরিত হইবার সুযোগ পায়। হেমবাবু কৃষ্ণনগর, কটক প্রভৃতি কলেজে অধ্যাপনা করিতেন। আমরাও তাঁহার প্রণীত বার্ক-এর Present Discontents-এর নোট পড়িয়াছি এবং চিঠিপত্রে পরিচয় ছিল। একবার কলিকাতা সাহিত্য-সম্মিলনীতে (১৯১৩) দেখাও হইয়াছিল। ছিপছিপে চেহারা, কিন্তু ছেলেদের লইয়া সর্ব্বদা থাকিতে এবং তাহাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করিতে ভাল বাসিতেন। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একটী ছেলের বাড়ীতে পুরীতে অসুস্থ হইয়া হেমবাবু সেখানে সপ্তাহ খানেক ছিলেন এবং তাঁহাকে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেন। বিভূতিবাবুর সঙ্গেও সুভাষচন্দ্রের কলেজ-জীবনে বিশেষ বন্ধুত্ব হয়। ইনিও ১৯১৩ সনে মেট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। গিরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে (ছেলেদের গিরিশদাদা) আর একটা ছাত্রও হেমবাবুর সাক্‌রেদ ছিলেন। সুভাষচন্দ্র কটক থাকিতেই এই হেমবাবুর প্রভাবে আসিয়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। এই সময় হইতেই বিবেকানন্দের আদর্শ-ই তিনি তাহার নিজের আদর্শ বলিয়া স্থির করেন।

১৬ বৎসর বয়সে* সুভাষচন্দ্র (১৯১৩ খৃষ্টাব্দে) কটক হইতে মেট্রিকুলেসন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে আসিয়া আর্টস ক্লাসে ভর্ত্তি হন। কলিকাতা হইতে মাঝে মাঝে প্রায় কৃষ্ণনগর যাইতেন। এবং ফার্ষ্ট ইয়ার ক্লাস হইতে সেকেণ্ড ইয়ারে উঠিয়াই সুভাষচন্দ্র হেমন্তবাবুর সঙ্গে সন্ন্যাসী হইবার জন্য কাহাকেও না বলিয়া গ্রীষ্মের ছুটির সঙ্গে সঙ্গে হিমালয় পর্ব্বতের দিকে চলিয়া যান। ১৯১৪ সনের জুন মাসের মাঝামাঝি আবার ফিরিয়া আসেন। স্নেহশীলা মাতার পুত্রের অদর্শনে প্রাণে কিরূপ আঘাত লাগিয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। পুত্র-বিচ্ছেদে তিনি প্রায় পাগলের ন্যায় হইয়াছিলেন। নানা স্থানে বিশেষতঃ হরিদ্বার, মায়াবতী রামকৃষ্ণ মিশনে টেলিগ্রাম পাঠান হইল, লোক মারফত খবর লওয়া হইল এবং বেলুড় মঠেও খোঁজ লওয়া হয়! কিন্তু কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। অবশেষে সুভাষচন্দ্রের এক মাতুল যান বৈদ্যনাথ ও দেওঘরের পাহাড়ে পাহাড়ে খোঁজ করিতে, কিন্তু তাঁহারও সব চেষ্টাই নিস্ফল হয়। সুভাষ ও হেমন্ত উভয়ে হরিদ্বার, হৃষিকেশ, লছমন ঝোলা, বৃন্দাবন, মথুরা, কাশী প্রভৃতি স্থানে সাধু খুঁজিতে খুঁজিতে কাহাকেও মনের মত না পাইয়া কলিকাতা ফিরিয়া আসেন। বাড়ীতে আসিবামাত্রই সকলের আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। মা কাঁদিয়া আকুল হইলেন। বাবাও কাঁদিতে লাগিলেন, তবে তাঁহার ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তির সহ্য করিবার শক্তি ছিল। সুভাষচন্দ্রও কাঁদিয়া ফেলেন। ইহার কিছুদিন পরেই সান্নিপাতিক (টাইফয়েড্) জ্বরে তিনি আক্রান্ত হইয়া ভুগেন।

আই, এ, পড়িতে পড়িতে সুভাষচন্দ্র কলেজের দুইটি প্রধান কাজে লিপ্ত হইলেন। প্রথমটি শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ভাইস-চেন্সেলার) ও শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (ঐ রেজিষ্ট্রার) প্রমুখ সিনিয়র ষ্টুডেণ্টস্‌দের সঙ্গে মিলিয়া সুভাষ সর্ব্বপ্রথমে প্রেসিডেন্সি কলেজ-ম্যাগাজিন বাহির করেন। এখনও সেই ম্যাগাজিন চলিতেছে। প্রিন্সিপাল জেম্‌সের (H. R. James) প্রতিকৃতি ও প্রাথমিক মন্তব্য সহ ১৯১৪ সালের নভেম্বর মাসে উহা প্রথম বাহির হয়। জেম্‌স হন প্রেসিডেণ্ট, গিলক্রাইষ্ট সাহেব হন সহসভাপতি, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দোপাধ্যায় হন সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত যোগেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় হন ম্যানেজিং এডিটার ও সেক্রেটারী। সুভাষচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এক শ্রেণীতেই পড়িতেন, তাঁহারা উক্ত ম্যাগাজিনের correspondent নিযুক্ত হন।

সুভাষচন্দ্র যে দ্বিতীয় কাজটির ভার নেন—তাহা রিলিফ

*সুভাষচন্দ্রের জন্ম ১৮৯৭ সালে, ২৩ জানুয়ারী। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক-জয়ন্তী-উৎসব, দুর্ভিক্ষ, প্লেগ, র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্টের হত্যা ও ভূমিকম্পে এই বৎসরটিকে বিশেষ স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। ভূমিকম্পের জন্য নাটোরে প্রাদেশিক (কংগ্রেস) সম্মিলনীর অধিবেশনই ভাঙ্গিয়া যায়।

সম্পর্কে। এই সময় বাঁকুড়া, নোয়াখালী, কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ হয়। জেম্‌স সাহেবকে সভাপতি করিয়া এবং সুভাষচন্দ্র ও ডক্টর হরিশচন্দ্র সিংহকে সেক্রেটারী করিয়া একটী রিলিফ কমিটী গঠিত হয়। সুভাষচন্দ্রকে এই জন্য অনেক পরিশ্রম করিতে হইত এবং প্রায়ই তিনি কাজকর্ম্ম সারিয়া চাঁদা উঠাইয়া দেরীতে ক্লাসে আসিতেন। ফলে আই এ, পরীক্ষায় (১৯১৫) কেবলমাত্র প্রথম শ্রেণীতে পাশ হন এবং যতদূর মনে হয় একশত সত্তর জন ছাত্রের মধ্যেও হইতে পারেন নাই।

কিন্তু সুভাষচন্দ্রের এই সময়ে কলেজে ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। একে অতিরিক্ত মেধাবী ছাত্র—তার উপরে সেবা-পরায়ণ; বড় লোকের ছেলে হইয়াও নিরহঙ্কারী-সন্ন্যাসী হওয়া কেবল তাঁহার ফ্যাসন নয়, বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণায় নিজ জীবন পরিচালনা করিতেন। বেদান্তের 'ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা' কেবল মুখস্থের মত বুলি আওড়ান না, উহা সত্যে পরিণত করিতে (realise) চেষ্টা করিতেছিলেন। আদর্শ ও Higher call সম্বন্ধে চিন্তা করেন এবং সম্প্রতি পরসেবায় যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন।

আই, এ, পরীক্ষা দিয়া সুভাষচন্দ্র কটকের বন্ধুগণ সহ চিল্কা হ্রদে বেড়াইতে যান। দেশভ্রমণকালে অনুরুদ্ধ হইয়া রবীন্দ্র-নাথের নিম্ন গানটি দ্বারা সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করেন—

অন্তর মম বিকশিত কর
অন্তরতর হে,
নির্ম্মল কর, উজ্জ্বল কর,
সুন্দর কর হে।

প্রমথবাবু, বিভূতিবাবু, হেমন্তবাবু কটকের বন্ধুগণ ও কলি-কাতার সঙ্গিগণ প্রভৃতির সঙ্গে আলাপে স্পষ্ট বলিতেন, "আমার জীবনের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে! আমি একটা বড় কার্য্যের জন্য আসিয়াছি। একটা নির্দ্দিষ্ট (Definite) মিশন আছে, এবং সেই মিশন আমাকে পূর্ণ করিতেই হইবে। লোকের ভালমন্দ বলার উপর ভ্রুক্ষেপ করিলে আমাকে চলিবে না—যে উর্দ্ধে আকাশের দিকে চাহে—সম্মুখের কুপ বা কণ্টকময় বনবাদাড় তাহার দৃষ্টিপথে পড়ে না। আর আমি পড়াশুনা করিতেছি ভারতের অতীত, জাগতিক বর্ত্তমান ও ভবিষ্য অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া। আমাকে Prophet of future হইতেই হইবে।"

সঙ্গীয়া তখনই ভাবিতেন, ইনিও ভবিষ্যতে বিবেকানন্দের অনুরূপ সন্ন্যাসী হইবেন। বস্তুতঃ ব্যবহারে, গাম্ভীর্য্যে, চেহারায় ও কার্য্যকলাপে প্রথম হইতেই ইনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন।

এই সময়ে দেশে নবজাগরণের সাড়া পড়িয়াছিল। স্বদেশী আন্দোলনের পরেই দেশের যুবকগণ যেন নবভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইউরোপের মহা সমর আরম্ভ হইল। নূতন ভারতের যুবকগণের প্রাণেও স্বাধীনতা প্রবৃত্তি জাগিয়াই উঠিয়াছিল। দেশে এখন বিপ্লব পন্থা 'অনুশীলন', 'যুগান্তর' প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সমিতি গ্রহণ করিয়াছে। ভ্রান্ত পথে চলিলেও যুবকগণ মৃত্যুভয় উপেক্ষা করিতে শিখিয়াছে। আবার কেবলমাত্র সন্দেহে ধৃত সহস্র সহস্র নির্দ্দোষ যুবকও অন্তরীণাবদ্ধ হইয়া তখন নির্জ্জনে দেশের কথা ভাবিতেছে। এই সময়ে সুভাষচন্দ্রের একখানি চিঠিতে তাহার মানসিক গতি উপলব্ধি হয়। চিঠিখানি হেমন্তবাবুকে লিখিত। সুভাষচন্দ্র ১৯১৬, ১লা ফেব্রুয়ারী লিখিতেছেন—

"ভারত এখন নবজীবনে পদার্পণ করিতেছে। তমোময়ী অমানিশার অবসানে আবার উষার আলোক ভারতের গগন রঞ্জিত করিতেছে। তাহা কোন্ ভারতীয় যুবক এখন না দেখিতেছে বা অনুভব করিতেছে? ধন্য আমরা যে এই শুভ সময়ে জন্মিয়াছি এবং বর্ত্তমান "অশ্বমেধ যজ্ঞ" সমাপন নিমিত্ত কাষ্ঠা-বহণের সুযোগ পাইয়াছি।"

"একবার জড়তা নৈরাশ্য ত্যাগ করিয়া নয়ন মেলিয়া দেখ পূর্ব্ব গগনে কি সুন্দর নবরাগের শোভা! চারিদিকে ভবিষ্যদ্রষ্টা

মিঃ এইচ, আর, জেম্‌স্ (প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ)

মহাপুরুষগণ উচ্চৈঃশঙ্খ নিনাদ করিয়া সেই আলোকময় ভবিষ্যতের আহ্বান করিতেছেন।"*

এই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বিপ্লবী দল সুভাষচন্দ্রের মত একটি রত্ন লাভ করিয়া নিজ নিজ দল পুষ্ট করিতে নানাদিক হইতে চেষ্টার ত্রুটী করে নাই। কত বুঝান হইয়াছে, যুক্তি দেখান হইয়াছে, বক্তৃতা হইয়াছে, কিন্তু বিবেকানন্দ-আসক্তিই তখন সুভাষচন্দ্রকে কার্য্যতঃ নিজ সীমাবদ্ধ গণ্ডীর বাহিরে যাইতে দেয় নাই। এই সময় ডাক্তার সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতায় মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে থাকিয়া মেডিকেল কলেজে পড়িতেন। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক ছেলেদের লইয়া বিবেকানন্দ সাহিত্য ও সেবাকার্য্য প্রসারে তিনিও বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। ফলে তাঁহারও একটি ছোট-খাটো দল গড়িয়া উঠিয়াছিল। সুভাষচন্দ্র এই দলে মিশিতেন এবং ডাক্তার সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তখন হইতেই সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা হয়। তবে প্রাপ্তবয়সে যখন উভয়কে অসহযোগ আন্দোলনে কার্য্যরত দেখিয়াছি, তখন বিশেষ

*হেমন্ত সরকার প্রণীত 'সুভাষচন্দ্র' পৃঃ ২৭।

ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করি নাই। যাহা হউক, এই সময়কার কলেজের ব্যাপারই একটী প্রধান উল্লেখনীয় ঘটনা।

প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বিতাড়ন

যে সময়ে হেমন্তবাবুর কাছে উক্ত পত্রখানি লিখিত হয়, কয়েকটি চাঞ্চল্যকর ঘটনায় সমগ্র বাঙ্গলা দেশের ছাত্র সমাজ তখন আলোড়িত। তখন আমার দাদা সম্পর্কীয় শ্রীযুক্ত তারক দাশগুপ্ত মহাশয় ময়মনসিংহের জমিদার শ্রীযুক্ত প্রমোদ রায় চৌধুরীর (তখন বালক) গৃহশিক্ষক হইয়া ছাত্রটির সহিত এক নম্বর চৌরঙ্গী লেনে বাস করিতেছিলেন। সেখানে অশ্বিনী রায় নামেও জমিদারের সম্পর্কীয় একজন ছাত্র থাকিতেন, প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি বি, এল, পড়িতেন। অশ্বিনী বাবুর কাছে প্রেসিডেন্সি কলেজের বিপিন দে, রবীন্দ্র ব্যানার্জ্জি (পরে আই. সি. এস) ও সুভাষবাবু প্রমুখ কয়েকজন ছাত্র সর্ব্বদাই আসিতেন। তারকবাবুর কাছে সপ্তাহে ২·১ বার যাইতাম। তাই সুভাষচন্দ্রকে তখন দেখিবারই সুযোগ হইয়াছিল, কিন্তু কোন-রূপ আলাপ হয় নাই! এই সময়ে শুনিলাম, প্রেসিডেন্সি কলেজের জনৈক অধ্যাপক কয়েকটি ছাত্র কর্ত্তৃক প্রহৃত হন। ইহাতে সর্ব্বত্র একটা হৈ চৈ পড়িয়া যায়। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ (Principal) ছিলেন তখন মিঃ এচ. আর. জেমস্—অন্যান্য অধ্যাপক ছিলেন মিঃ পীক (Peake) গিলক্রাইষ্ট, ওটেন, হ্যারিসন, ষ্ট্যালিং, হোমস্, স্যার জে. সি. বসু, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়, কয়াজী, মিঃ জে এন দাশগুপ্ত, ডাঃ আদিত্য মুখোপাধ্যায়, ডাঃ ডি. এন. মল্লিক, ডাঃ ফণী মুখার্জ্জি, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি। শেষাশেষি জেমস্ সাহেব স্থানান্তরিত হন—তিনি বিলাত চলিয়া যান। ওটেনকেও কিছুদিনের জন্য ভারতের বাহিরে থাকিতে হয়। পরে অবশ্য তিনি এখানকার শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টারও হইয়াছিলেন।

জেমস সাহেবকে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে পাটনা কলেজের প্রফেসার রূপে দেখিয়াছি। তাঁহার ছাত্রদের তিনি খুব ভাল বাসিতেন এবং তাহাদিগকে বন্ধুর মত ব্যবহার করিতেন। "তাঁহার ছাত্রদের"—কথাটি বলিবার কারণ আছে। ১৮৯৮ সনের গোড়ায় আমার একটি বন্ধু শোকহরণ দাশগুপ্ত খুব খাটিয়া পাটনা কলেজ ও বি, এন কলেজের ছাত্রদিগকে একত্র করিয়াছিলেন। সেই সভায় পাটনা কলেজের অধ্যক্ষ জনপ্রিয় সি, আর, উইলসন সাহেব সভাপতিত্ব করেন। মিঃ বি, এন, দাস প্রমুখ অন্যান্য অধ্যাপকগণও উপস্থিত ছিলেন। সভার কিছুক্ষণ পরে জেমস সাহেব খুব উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, "আমার ছাত্রদিগকে আমি অন্য কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে কেন মিশিতে দিব?" সেদিন সভায় কিছু স্থির না হইয়া সভা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সভার উদ্দেশ্য সেদিনকার মত ব্যর্থ হয় বটে, তবে জেমস সাহেবের নিজ কলেজের ছাত্রপ্রীতি দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হয়। অবশ্য ১৮৯৯ সনে আমরা যখন পাটনা কলেজে গিয়া ভর্ত্তি হই, তখন উইলসন সাহেব ও ব্রিজ সাহেবকে দেখিয়াছিলাম। ব্রিজ সাহেবও খুব ভদ্র ছিলেন। তবে মিঃ উইলসনের তুলনা ছিল না। তিনি ছাত্রদিগকে খুবই স্নেহ করিতেন। জেমস্ সাহেব অতঃপর প্রেসিডেন্সি কলেজে আসেন। এখানেও ছাত্রগণকে খুব ভাল বাসিতেন এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা খুব উচ্চ ছিল—তবে একবার অধ্যক্ষ এডওয়ার্ডসের সঙ্গে ঝগড়া হওয়ায় আবার পাটনা কলেজে যান। অনুমান পাঁচ সাত বৎসরের মধ্যেই আবার ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া ১৯০৭ সনে আসেন এবং ছাত্রদের পড়াশুনা, খেলা ধূলা, রিলিফ, ম্যাগাজিন ও সভাসমিতিতে খুবই যত্ন নিতেন, মাঝে মাঝে ছাত্রদিগকে চায়ের নিমন্ত্রণ করিয়াও আপ্যায়িত করিতেন। কিন্তু সময়ের প্রাবল্যে এই ভাবধারার অনেকটা পরিবর্ত্তন হয়।

পূর্ব্বে সাহেব হইলেই সকলের একটা ভয় ও সঙ্কোচের ভাব থাকিত, কিন্তু ১৯০৫ সনের পরে সে-ভাব অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল। এ-দিকে শ্বেতকায় প্রফেসরগণও দেশীয় আন্দোলন ও ছাত্র জাগরণকে অনেকটা ভীতির চক্ষে দেখিতেন। জেমস সাহেবের মত ভাল এবং ছাত্রবন্ধু অধ্যাপকও কোনও কোনও অনুষ্ঠান উপলক্ষে ছাত্রগণকে সর্ব্বদা Disloyalty অর্থাৎ রাজদ্রোহ হইতে দূরে থাকিতে উপদেশ দিতে শৈথিল্য করেন নাই। তিনি স্পষ্টভাবে উপদেশ দেন—

Patriotism in Bengal should not direct national spirit into an attitude of hostility to British Rule. Such attitude is patricidal.

His address on Aug. 25, 1915.

জেমস্ সাহেবের ভাব-পরিবর্ত্তনের আর একটু উদাহরণ দিতেছি। পুণ্যশ্লোক স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শিক্ষা সম্বন্ধে একখানি গভীর চিন্তা ও অভিজ্ঞতাপ্রসূত পুস্তক সঙ্কলন করেন। বইখানির নাম Education Problem in India; বইখানির চারিদিকেই আদর হয়।

এই বইখানির একটী সুদীর্ঘ সমালোচনা জেমস্ সাহেব করেন। অবশ্য সব বিষয়েই প্রশংসাসূচক মন্তব্য বাহির হয়, কেবল একটি বিষয়ে তিনি বিশেষ অনৈক্য দেখান।

স্যার গুরুদাস বলেন, "পূর্ব্বে বিলাতের অধ্যাপকগণ কেমন সহানুভূতিশীল ও ছাত্রদের অভিভাবক স্বরূপ ছিলেন! যেমন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন সাটক্লিফ্ সাহেব। ইনি ছাত্রদিগকে খুবই ভালবাসিতেন এবং প্রত্যেকের নাম জানিতেন। ক্লাসে কোন অঙ্ক বা জ্যোতিষবিদ্যায় প্রশ্ন দিয়াই নীরবে সকল ছাত্রগণকে উপস্থিত অনুপস্থিত লিখিয়া রাখিতেন। কোন ছাত্র ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞতায় অসম্মানকর কথা বলিয়া ফেলিলে, হাসিয়াই উড়াইয়া দিতেন। কাউএল সাহেবও তুল্যরূপ সহানুভূতিশীল ছিলেন। কিন্তু এখন সময়ের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখনকার অধ্যাপকরা আর সেরূপ নাই। পূর্ব্বের তাঁহারাও যে কঠোর না হইতেন তাহা নয়, তবে সে রূঢ়তা পিতৃসুলভ বিমল স্নেহের বাহ্যিক আবরণ মাত্র।"

জেমস্ সাহেব ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন, "আমিতো পুরাতন নূতন সব রকম অধ্যাপকই—টনি, ক্রফট, পেডলার অনেককেই দেখে আসছি, স্যার গুরুদাসের কথা ঠিক মনে করতে পারি না। অধ্যাপকগণ এখনও ছাত্রগণকে পূর্ব্বের

মতই স্নেহ করেন। তবে বর্ত্তমানে ছাত্ররা এমন বেশী sensitive; more exacting, less willing to give and take হয়ে পড়েছে যে, তাদের প্রতি যে যে স্থলে ভালবাসার অভাব দেখা যায় তার যথেষ্ট কারণ আছে বলেই মনে হয়।

"বর্ত্তমান ইংরাজ প্রফেসাররা দেখতে পায় যে, ছাত্ররা তাদের প্রতি শ্রদ্ধা সম্পন্ন নয়, সুতরাং তারাও সব সময় মেজাজ ঠিক রাখতে পারে না।"

"English man finding himself disliked and misinterpreted at times disliked a little in return."

এই প্রতিবাদের পরে প্রেসিডেন্সি কলেজেই এমন একটি ঘটনা হয় যে, স্নেহ-পরায়ণ হইলেও জেমস্ সাহেবের মনোভাব পরিবর্ত্তনের ফলেই যে বিচক্ষণতার সঙ্গে সব ঘটনার সমাধান করা যাইতে পারা যাইত, তাহা না হওয়ায় ভয়ানক অনর্থ সংঘটিত হয়। ঘটনাটি খুলিয়া বলিবার আগে আরেকটি অধ্যাপকের সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।

ইনিই এই অধ্যায়ের অন্যতম নায়ক ওটেন সাহেব (Mr. E.F. Oaten); ইনি ইতিহাসের খুব ভাল অধ্যাপনা করিতেন। সম্প্রতি বিবাহ করিয়া আসিয়াছিলেন এবং খেলাধূলায়ও ছাত্রদিগকে উৎসাহ দিতেন, কিন্তু মেজাজটা তাঁহার একটু প্রভুভাবসম্পন্ন (imperialistic) ছিল। আর ভারতীয়গণ সম্বন্ধে তাহার মনোভাব ছিল বড় অদ্ভুত। ১৯১৫ সনের শেষদিকে ইডেন হিন্দু হোষ্টেলের একটী সভায় সভাপতিত্ব করিতে গিয়া বক্তৃতায় বলেন, "অসভ্য ভারতীয়গণকে সভ্যতার আলোক দেওয়াই আমাদের কাজ"—কথাটা এইরূপ ছিল—

"As the mission of the Greeks was to hellenise the barbarian people with whom they came into contact, the mission of the English has been also to civilise the Indian people."

এই অসভ্য 'barbarian' কথাটা হোষ্টেলের তথা যাবতীয় ছাত্রদের প্রাণে যে খুব ব্যথা দিয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। যোগেশবাবু কলেজ ম্যাগাজিনেও ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ তাহার স্বভাবের বিশেষত্ব (idiosyncrasy) ছিল যে ইনি সামান্য 'টু' শব্দটিতে বিরক্তি অনুভব করিতেন। রাস্তা দিয়া ট্রাম যাইতেছে—ষ্টার্ট দেবার সময় ঐ শব্দে বিরক্তি সহকারে বলিয়া উঠিতেন,—'disgusting!' সামান্য গোলমাল বা উত্তেজনা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। ডক্টর পি. মুখার্জ্জি একবার তাঁহার ক্লাসে পড়াইতেছিলেন। ছাত্রেরা জিজ্ঞাসাবাদ করায় একটু গোলমাল হইতেছিল। মিঃ ওটেন ক্লাসে ঢুকিয়া বলেন, "এরা বড় গোলমাল চেঁচামেচি কর্চ্ছে, আপনি এদের অনুপস্থিত লিখে রাখুন।" ভাল মানুষ ডক্টর মুখার্জ্জি আর করেন কি, চক্ষুলজ্জায় অনুপস্থিতই লিখিয়া রাখিলেন। আরেক দিন পার্শ্বের একটী ক্লাসে গোলমাল হইতেছিল, তিনি গিয়া বলিলেন, "Don't howl like beasts" *পশুর মত চেঁচাইবে না।

সুতরাং ওটেন সাহেবের উপর সাধারণতঃ ছেলেদের কিরূপ শ্রদ্ধা থাকা সম্ভব তাহা সহজেই অনুমেয়। তবে ওটেন সাহেব আবার তাঁহার ক্লাসের ছাত্রদের বেশ ভালবাসিতেন এবং উপকার করিতে চেষ্টা করিতেন। বর্ত্তমান ভাইস্ চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রেজিষ্ট্রার যোগেশ বাবু তাঁহার অন্যতম প্রিয় ছাত্র ছিলেন।

এখন কলেজের একটি শাসন-পরিষদ আছে। তৎকালীন ভাইস্ চ্যান্সেলার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, ডাঃ প্রফুল্ল রায়, পীক সাহেব প্রভৃতি তাহাতে ছিলেন। স্বয়ং প্রিন্সিপ্যালও ছিলেন। এ ছাড়া ছাত্রদের প্রতিনিধি নিয়া একটী পরামর্শ সংসদ (Consultative Committee) ছিল। এখন ক্লাসের ৫ম বার্ষিক শ্রেণীর আর্টসের দুইজন, সায়ান্সের দুইজন, ষষ্ঠ

মিঃ সি. আর. উইলসন (পাটনা কলেজের অধ্যক্ষ)

বার্ষিকেরও এরূপ ৪ জন, ফার্ষ্ট হইতে ফোর্থ ইয়ার ক্লাস পর্য্যন্ত প্রত্যেক ক্লাসে আর্টস্-এ একজন, সায়ান্সে একজন, একুনে ১৬ জন ছিল। এতদ্ব্যতীত কমিটিতে তিনজন মুসলমান ছাত্র প্রতিনিধিও থাকিত। তখন সুভাষচন্দ্র বসু থার্ড ইয়ারের আর্ট সেকশনের প্রতিনিধি ছিলেন। ভোলানাথ রায় মহাশয় ছিলেন পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর আর্টসের প্রতিনিধি। ভোলানাথ বাবু আবার ঐ কমিটিরই সেক্রেটারীও ছিলেন। কর্ত্তৃপক্ষকে শৃঙ্খলা বিষয়ে সহায়তা করা এই কমিটির কার্য্য ছিল।

এখন আমাদের কথিত ঘটনাটি এইরূপ :

১০ই জানুয়ারী (১৯১৬) লর্ড কারমাইকেলের সভাপতিত্বে হিন্দু ও হেয়ার স্কুলের ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণ হয় বলিয়া, প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের মধ্যে যাহারা উক্ত স্কুলদ্বয়ের প্রাক্তন ছাত্র ছিল, তাহাদের ক্লাসে আসিতে দেরী হয়।

বাবু রবীন্দ্রনাথ ঘোষের তখন থার্ডইয়ার ক্লাসে পড়াইবার কথা, কিন্তু তিনি নিজেই উপরোক্ত কারণে ঠিক সময়ে আসিতে পারেন নাই। তাঁহার ক্লাস ছিল তেতলার এক নম্বর ঘরে, আর ওটেন সাহেব পড়াইতেছিলেন তেতলার দুই নম্বর ঘরে। এই ঘরের সংলগ্ন বড় বারান্দা দিয়া দুই নম্বর ঘরে যাইতে হয়। প্রফেসার ক্লাসে না থাকায় বাটজন ছেলের নিজের নিজের মধ্যে কথাবার্ত্তায়ও

*ইতিপূর্ব্বে একবার হ্যারিসনও এই কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু বিশেষ ত্রুটী স্বীকার করার ছেলেরা নিরস্ত হয়

যে গোলমাল হইতেছিল, ওটেন সাহেব তাহাতেই উত্যক্ত হইয়া ২।৩ বার বাহির হইয়া তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার পরে রবিবাবু ক্লাসে আসিয়া নাম ডাকিবার পরেই ঘণ্টা শেষ হইবার পরে ক্লাস ছাড়িয়া দেন। যখন রবিবাবু ও ছাত্রগণ বারান্দা (corridor) দিয়া যাইতেছিলেন, ওটেন সাহেব আসিয়া তাহাদিগকে বাধা দেন এবং 'প্রফেসার' পরিচয় পাইয়া রবিবাবুকে ছাড়িয়া দিলেও ছাত্রগণকে ধাক্কাইতে ধাক্কাইতে ক্লাসে লইয়া যান। একটি ছাত্রের পুস্তকগুলি নীচে পড়িয়া গিয়াছিল। সুভাষচন্দ্রেরও গায়ে ধাক্কা লাগে এবং তাহারও কয়েকখানি পুস্তক নীচে পড়িয়া যায়। ভারতীয়গণের জাতীয় চরিত্রের উপরও ইঙ্গিত করা হয়।

এই ব্যাপারে ছাত্রগণ বিক্ষুব্ধ হয় এবং বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ ক্রুদ্ধ হন্।

অতঃপরে ছাত্রগণ জেম্‌স্ সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে যান। তিনি ছাত্রদের গায়ে হাত দিয়া বুঝাইয়া প্রফেসারের সঙ্গে দেখা করিয়া মিটমাট করিতে অনুরোধ করেন: (Make up your differences)। ছাত্রগণ খুসী হইয়া বাহিরে আসিয়া অপর সকলকে এই সব কথা জ্ঞাপন করেন। এদিকে জেমস সাহেবও একটু চিরকুটে ওটেনকে অনুরোধ করেন যে, ছাত্রদের সঙ্গে মিটাইয়া ফেলিলেই সমীচীন ও ভদ্রতাসম্মত হইবে। জেমস সাহেবের সঙ্গে কথা কহিয়াছিলেন প্রতিনিধি ভাবে বিভূতিবাবু। কিন্তু তিনি বাহিরে আসিতে সব কথা শুনিয়া সুভাষবাবু বলেন—

"বাঃ, আমরা মার এবং গালিও খাইলাম! আবার তার কাছে গিয়া ক্ষমাও চাহিব! এ কিরকম ব্যবস্থা!"

তখন বিভূতিবাবু আবার মিঃ জেমসের কাছে গিয়া যখন বলেন, "Sir, it is then understood that we demand an apology from Mr Oaten"—অমনি জেমস সাহেব খুব বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠেন—Apology! Impossible, you are all rebels. Get out, know it for certain that I shall always help Mr Oaten"

ছাত্ররা জেমসের আকস্মিক রূঢ় ব্যবহারের উপরে খুবই ক্ষুন্ন ও বিরক্ত হইল, গত্যন্তর না দেখিয়া ১১ই তারিখে ক্লাস বন্ধ করিবে বলিয়া স্থির করে। ভোলানাথ বাবু প্রমুখ প্রতিনিধিরাও সকলেই ধর্ম্মঘট করিতে পরামর্শ দেন।

বারান্দা (corridor) দিয়া ছাত্ররা যেন গোলমাল না করে, এবিষয়ে কলেজের নিষেধাজ্ঞা ছিল। তবে একদিনে প্রায় ৮০টা লেকচার হইত এবং অনেক প্রোফেসার ঘণ্টা বাজিবার কিছু পূর্ব্বে ছুটি দিলে ছেলেরা বারান্দা দিয়া যাইত। অর্থাৎ ঐ নিষেধাজ্ঞার প্রতিপালন অপেক্ষা ভঙ্গের নিদর্শনই বেশী ছিল (the rule was observed more in breach than in performance) যাহা হউক. ১১ই জানুয়ারী তারিখে ছাত্ররা ক্লাস না করায় জেমস্ সাহেব আরও বিরক্ত হন। দ্বিতীয় দিনে দুই একটি ছেলে অভিভাবকের তাড়ায় ক্লাসে যাইতে বাধ্য হয় বটে, কিন্তু ছাত্রগণ কর্তৃক খুব অপদস্থ হন। ঐ দিন বৈকালে ডক্টর পি, সি, রায়, ডাঃ আদিত্য মুখোপাধ্যায়, Mr. C.W. Peake: Prof. Profulla Ghose, ও Prof. Hedayet Hossin হিন্দু হোষ্টেলে গিয়া ছাত্রদের দিক হইতে কি বলিবার আছে জানিতে চাহেন। এবং আদিষ্ট হইয়া ছাত্র প্রতিনিধি ভোলানাথ বাবু বলেন, "ওটেন সাহেবের উপযুক্ত শাস্তি হ'লেই ধর্ম্মঘট বন্ধ হ'তে পারে।" এই কথাটি জেমস সাহেবের কাণে যাওয়ায় তিনি আরও ক্ষুব্ধ ও রাগান্বিত হন। অতঃপরে জেমস সাহেব ধর্ম্মঘট করিবার জন্য প্রত্যেক ছাত্রকে ৫৲ করিয়া জরিমানা করেন। বিনা কারণে ক্লাসের যাবতীয় ছাত্রবৃন্দ অনুপস্থিত থাকিলে এইরূপ জরিমানা করা কলেজের নিয়মানুসারেই হইয়াছিল। এই দিন ওটেন সাহেব কলেজে আসিতে পারেন নাই।

যাহা হউক, ১২ই তারিখে ছাত্র ও অধ্যাপকবর্গের এক সভায় ওটেন সাহেব তাহাদের কাছে তাঁহার ব্যবহারের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। ছাত্ররাও স্বীকার করে বারান্দার কথা বলা উচিত হয় নাই—They were technically wrong. উভয়ের মধ্যে মিটমাট হইয়া যায় এবং ছাত্রগণ তাহাকে আনন্দসূচক সাধুবাদ প্রদান করে—(enthusiastically cheered); সব মিটিয়া যায়। ছাত্রগণ ক্লাসে যায়। এই দিনই ছাত্রদের অজ্ঞাতে জেমস সাহেব সমস্ত ইউরোপীয় প্রফেসারদের ডাকিয়া সাবধান করিয়া দেন যে, কেহ যেন কখনও কোন ছাত্রের গায়ে হাত না দেন। কারণ ইতিপূর্ব্বে এরূপ করায় নাকি কলেজ কর্তৃপক্ষকে ভীষণ অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল।

ইহার পরে ওটেন সাহেব আবার একটি মস্ত ভুল করিয়া ফেলেন। তাঁহার ক্লাসে যাহারা পূর্ব্বদিন আসে নাই, তাহাদিগকে তিনি ক্লাস হইতে বাহির করিয়া দেন। ইহাতে ছাত্রমহলে আবার বিষম বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। ওটেনের এই অবিবেকতায় জেমস সাহেবও খুবই দুঃখিত হন। তবে দরখাস্ত করা সত্ত্বেও ছাত্রদের জরিমানা তিনি মাপ করিয়া দেন নাই। যারা ধর্ম্মঘটের দ্বিতীয় দিনে আসিয়াছিল, অথবা যাদের অবস্থা স্বচ্ছল নয়, তাদেরই কেবল জরিমানা কতকটা মাপ হয়। মোটের উপর ওটেনের ব্যবহার ও কার্য্যে জেমস সাহেবের সহানুভূতি না থাকিলেও, ছাত্রদের সঙ্গে খোলাখুলিভাবে সহানুভূতির ভাবও তিনি দেখান নাই, বরং জরিমানা মাপ না করিয়া নিজ জিদই বজায় রাখিয়াছেন। এদিকে দ্বিতীয় দিন হইতে ধর্ম্মঘটও স্থায়ী অথচ কার্য্যকরী হইল না বলিয়া ছাত্রদেরও ক্ষোভ রহিয়া গেল। ইতিমধ্যে জেমস সাহেব ছাত্রদের আর ডাকেন নাই। তিনি কোন ক্লাসেও পড়াইতে যাইতেন না, কেবল অধ্যক্ষের কাজই করিয়া যাইতেন। তাই ছাত্রদের সঙ্গে আর দেখা হইবার সুযোগ হয় নাই।

ক্রমে স্নেহশীল সহানুভূতিসম্পন্ন জেম্‌স্ সাহেব এবং তরুণ যুবকদের মধ্যে পার্থক্য ধীরে ধীরে বাড়িয়াই উঠিল। ছাত্রগণ মনে করিলেন—"ইংরাজ অধ্যাপক আমাদিগকে নানাভাবে অপমান করিতেছে। জেমস্ সাহেব ওটেনকে কিছুই বলেন নাই, তাঁহার সহানুভূতি স্বজাতীয়ের উপরেই বেশী। আমরা এমন কি অন্যায় করিয়াছি! আমরা ধাক্কা খাইলাম, প্রতীকার পাইলাম না—আর আমরা প্রতীকারের জন্য কলেজ বন্ধ করিলাম, অমনি ৫৲ জরিমানা!" আর জেমসের মনে

হইল : "আমি ছেলেদের এত ভালবাসি, তারা দেরীতে ক্লাসে আসিল, গোলমাল করিল—না হয় প্রফেসার তো,—ওটেন সাহেব একটু বলপ্রয়োগই করিয়াছে, কিন্তু এই ছাত্রগণ সহানুভূতি, কৃতজ্ঞতা, সুবিধা সব ভুলিয়া প্রফেসারের সামান্য ত্রুটিতে কলেজে আসা বন্ধ করিল'—উভয় পক্ষের এই মনোভাব, ছাত্রগণ ও অধ্যক্ষের মধ্যে বিক্ষোভের গভীরতা ক্রমে আরও বৃদ্ধি পাইল।

এই প্রধূমিত বহ্নি মাসখানেক পরে আবার জ্বলিয়া উঠে। ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে লেবরেটারীতে একটা দুর্ঘটনা হওয়ায়, প্রফেসার পড়াইতে আসিতে পারেন নাই বলিয়া ফার্ষ্ট ইয়ারে অন্য একজন পড়াইতে আসেন ও পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে তিনি ছুটি দিয়া দেন। যখন ছেলেরা বারান্দা দিয়া যায় এবং কাহারও কাহারও কথাও শুনিতে পাওয়া যায়, ওটেন সাহেব তখন অন্য একক্লাসে পড়াইতেছিলেন। অসহিষ্ণু হইয়া তিনি একটু উত্তেজিতভাবে বাহিরে আসিয়া কয়েকটি ছেলেকে—"Donot chattor liko monkies"—বানরের মত কিচিমিচ করিবেনা,—বলিয়া ধমক দেন। তিনি ক্লাসে চলিয়া গেলে কমলা ভূষণ বসু (এখন ব্যারিষ্টার) নামে অল্পবয়স্ক একটি ছাত্র, 'পঞ্চানন' বলিয়া অপর একটি ছাত্রকে ডাকে। সে খুব স্বাভাবিক ভাবেই ডাকিতেছিল। ওটেন সাহেব মনে করিলেন, তাহাকে অপমান করিবার উদ্দেশ্যেই এরূপ উচ্চারণ হইয়াছে। অমনি সাহেব পুনরায় ক্লাসের বাহিরে আসিয়া কমলাকে গলায় ধরিয়া 'রাসকেল' বলিয়া গালি দিতে দিতে ষ্টুয়ার্ডের কাছে নিয়া জরিমানা করাইয়া দেন। এই ঘটনায় ছাত্রমহলে বিষম বিক্ষোভ হয়। অবশ্য ওটেন বলেন—তিনি রাসকেল বলেন নাই কেবল ধরিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

ছাত্রটি জেমস্ সাহেবের কাছে তৎক্ষণাৎ নালিশ করে। তিনি লিখিত দরখাস্ত দিতে বলেন এবং ৩টার সময় ওটেনকে তাঁহার ঘরে ডাকিয়া পাঠান। কিন্তু ওটেনকে কিছু বলিবার অবসর আর তাঁহার হয় নাই।

অনুমান ২৷৷০টার সময় ওটেন সাহেব কি একটা কাজে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে গিয়াছিলেন। এবং সিঁড়ির শেষ ধাপ হইতে ৩।৪ পদ অগ্রসর হইতেই একজন ছাত্র তাঁহাকে পিছন হইতে লাথি মারিয়া ফেলিয়া দেয় এবং পরক্ষণেই ১০।১২ জন পড়িয়া মারে আশে পাশেও মুহূর্ত্ত মধ্যে অসংখ্য ছাত্র জড়ীভূত হয়। খবর শুনিয়া অল্পক্ষণ মধ্যেই প্রফেসার গিলক্রাইষ্ট R. N. Gilchrist নামিয়া পড়েন এবং সেস্থানে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ছাত্রগণ স্ব-স্ব স্থানে চলিয়া যায়। পেছন হইতে লাথি মারিবার দরুণই ঘটনার সৃষ্টি হয়। পরের ঘটনা বোধ হয় পূর্ব্ব সঙ্কল্পিত না হইয়া আকস্মিক হওয়ার কথাই বেশী সম্ভব বলিয়া মনে হয়।

অল্পক্ষণ মধ্যেই গিলক্রাইষ্ট, দরোয়ান ও জনৈক ছাত্র ওটেন সাহেবকে ধরিয়া উপরে লইয়া যান। প্রহারে ওটেন সাহেব নাকের কাছে জখম হন এবং অল্পক্ষণের জন্য অজ্ঞানও হইয়া পড়েন।

জেমস্ সাহেব প্রহারের কথা শুনিয়া ভয়ানক চটিয়া গেলেন এবং "I want to see the blood of the culprits," বলিয়া ছাত্রগণকে শাসান।

এই ঘটনার পরে কলেজে একেবারে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। কে মারিয়াছে, কে এইরূপ বুদ্ধি করিয়াছে, কানাকানি চলিতে লাগিল। কিন্তু আসল আক্রান্তকারীর সন্ধান কেহ পাইল না। যিনি পেছন হইতে লাথি মারিয়াছিলেন তিনি এম-এ (সিকস্থ্ ইয়ার ক্লাসে) পড়িতেন। ইনি একজন ঈশান স্কলার। পরেও লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন কিন্তু ওটেন সাহেব তাঁহাকে দেখিতে পান নাই! লাথি মারায় তাঁহার কুচ্‌কি (glands) ফুলিয়া যায় ও ১নং চৌরঙ্গী লেনে সাতদিন শয্যাগত থাকেন। আর যাহারা পরে মারিয়াছে তাহারাও গিলক্রাইষ্ট সাহেব আসিবার পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছিল। সুতরাং প্রহারকারীর নির্ণয়তা সম্বন্ধে গভর্ণিং বডি বড়ই মুস্কিলে পড়িলেন। এ-দিকে কলেজ বন্ধ হইল, ইডেন হিন্দু হোষ্টেল বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, এবং বোর্ডারগণকে বাড়ী রওনা করিয়া দেওয়া হইল!

বংশী নামে কলেজের একটি দরোয়ান ছিল। সে শেষ দিকের ঘটনা দেখিয়াছিল। তাহাকে অনেক জিজ্ঞাসা করা হইল, কিন্তু সে ভয়ে কিছুই বলিতে পারিল না। কেবল বলিল, "হুজুর আমাকে মারিয়া ফেলিবে, আমি বলিবনা," পরে এক অভিনব পন্থা অবলম্বিত হয়। অধ্যক্ষের সে-ঘরে গভর্ণিং বডি বসিয়া বিচার করেন, একদিকে একখানি পর্দ্দা রাখিয়া তাহার ভিতরে বংশীকে বসাইয়া দেওয়া হয়। এক একজন ছাত্রকে ডাকা হইলে, কথাবার্ত্তার পর সে চলিয়া যাইতেই বংশীকে জিজ্ঞাসা করা হইত—"ইনি ছিলেন কিনা?" এইভাবে দুইজনকে সনাক্ত করা হয়। তাহাদের একজনের নাম অনঙ্গ মোহন দাম—আর একজনের নাম সুভাষ চন্দ্র বসু।

ছাত্রপ্রতিনিধি কলেজ ম্যাগাজিনের অন্যতম সংস্থাপক, রিলিফ্ কমিটির সেক্রেটারী সুভাস সংশ্লিষ্ট? জেমস সাহেবের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি গভর্ণিং বডির সভায় সুভাষকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন :

প্রঃ—সুভাষ তুমি প্রহার করিয়াছ?

উঃ—না, আমি প্রহার করি নাই—

প্রঃ—তুমি মারিবার সময় ঐখানে ছিলে?

উঃ—হাঁ ছিলাম।

প্রঃ—বল, কে কে মারিয়াছে?

উঃ—তাহা আমি বলিবনা।

প্রঃ—তুমি জান শৃঙ্খলা সম্বন্ধে কমিটির মেম্বর হিসাবে তুমি আমাকে সাহায্য করিতে বাধ্য?

উঃ—জানি—

প্রঃ—এক কথায় বল, তুমি দোষী কি না? আর—মারিবার জন্য সেখানে ছিলে কিনা?

উঃ—I wont say whether I am guilty or not guilty :—আমি বলিবনা—আমি দোষী কি নির্দ্দোষ।

এখন বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রমুখ অন্যান্য সকলেই বলিয়াছে "আমরা নির্দ্দোষ।" কিন্তু সুভাষচন্দ্রের এই কথায় প্রমাণ পাকা হইল মনে করিয়া তাঁহাকে শাস্তি দেওয়া স্থির হইল। তাঁহাকে ও অনঙ্গমোহনকে ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিবার অপরাধী

সাব্যস্থে চিরকালের জন্ম বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইল (Expelled)। সুভাষচন্দ্রের কলেজে পড়া আপাততঃ বন্ধ হইল।

কমলাভূষণ বসুরও একবৎসরের জন্ম পড়া বন্ধ হওয়ার আদেশ হইল। ইনি পড়িতেন 1st year I. Sc. আরেকটি ছাত্রের সাজা হইল নাম সতীশচন্দ্র দে; ইনি গিলক্রাইষ্ট সাহেবের সঙ্গে একটু ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া অভিযুক্ত হন। তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেন "X Y Z". কমলাভূষণ বসুকে আদেশ দেওয়া হয় প্রোফেসারের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনিবার জন্ম। তবে এনকোয়ারী কমিটি এই অভিযোগ মিথ্যা বলিয়া সাব্যস্থ করেন নাই। আর ছেলেটির নালিশ ও দরখাস্তে সেই কথাই ছিল, ভোলানাথ রায়কেও এই কলেজ হইতে চলিয়া যাইতে বলা হয়। তিনি স্কটিস চার্চ্চ কলেজে গিয়া ভর্ত্তি হন। ঘটনার সময় (১৫ ফেব্রু) তিনি বাঁকুড়া ছিলেন। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়কে কলেজ হইতে চলিয়া যাইতে বলা হয়। পরে ইনি একটি মিসনরী কলেজে ভর্ত্তি হইয়া সরস্বতী ফেলিবার প্রতিবাদ করায় আবার বিপদাপন্ন হন।

এখন বিবেচ্য এই যে, সুভাষচন্দ্র প্রকৃতই মারিয়াছেন কিনা! পিছন হইতে যিনি লাথি মারেন তিনি যে সুভাষ নহেন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পরের ঘটনা অর্থাৎ দশ বার জনের মধ্যে সুভাষ ছিলেন কিনা এ প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক। এ বিষয়ে আধ মিনিটের মধ্যে (ঊর্দ্ধ ৪০ সেকেণ্ডস) ব্যাপারটি হইয়া যাওয়ায় এক ওটেন সাহেব ছাড়া, কে কি অংশ গ্রহণ করিয়াছে বলা দুঃসাধ্য। কিন্তু ওটেন সাহেব সুভাষচন্দ্রকে সনাক্ত করেন নাই।

তবে ঘটনার সময়ে ছাত্রদের দলে তিনি ছিলেন এ বিষয়ে তিনি নিজেই বলিয়াছেন। সুভাষচন্দ্রের মত দীর্ঘাকৃতি উজ্জ্বল গৌরমূর্ত্তি ও অনঙ্গবাবুর মত বেঁটে ছাত্র সেখানে যে কোন সময়ে উপস্থিত থাকিলে সনাক্ত করিতে কাহারও ভুল হইতে পারেনা, তাহা বলাই বাহুল্য। প্রহার সম্বন্ধে কাহারা সংশ্লিষ্ট ছিল, কোন প্রকাশ্য অনুসন্ধানে কিছুই বাহির হয় নাই।

যাহাহউক পরে, অনুশোচনায়ই হউক বা ভয়েই হৌক দরোয়ান বংশীর মাথা খারাপ হইয়া যায় এবং কলেজের চাকুরী ইস্তফা দিয়া সে দেশে চলিয়া যায়।

এদিকে জেমস সাহেবের অবস্থাও বড়ই শঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল। যে সময়ে গভর্ণিং বডি বিচার আরম্ভ করেন, বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের এডুকেশন মেম্বার ছিলেন মিঃ পি, সি, লায়ন। ১৯০৫ সনের পূর্ব্ববঙ্গের ছাত্র দলনমূলক লায়ন সার্কুলারের কর্ত্তা। জেমস্ সাহেব অক্সফোর্ড হইতে এম্-এতে ইংরাজী ভাষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন, অন্যতম প্রফেসার হেলোয়ার্ড হন দ্বিতীয়। লায়ন সাহেবও একসঙ্গে পড়িতেন। এডুকেশন মেম্বর এই লায়ন সাহেব এই সময়ে একটি স্বতন্ত্র কমিটির গঠন করিয়া (১) কলেজের ১০ই জানুয়ারীর ষ্ট্রাইক এবং (২) ১৫ ফেব্রুয়ারী তারিখের ওটেন সাহেবকে প্রহার,—এই দুইটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া কলেজের স্বাভাবিক শৃঙ্খলা সম্বন্ধে উহার উপর এনকোয়ারী করিবার ভার দেন। এই কমিটির মেম্বার হন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, মিঃ হর্ণেল (W. W. Hornel), ডিরেক্টার অব পাবলিক্ ইনষ্ট্রাক্সন, প্রিন্সিপ্যাল জেমস্, Rev. জি, মিচেল বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, ও বাবু হেরেম্বচন্দ্র মৈত্র (সিটি কলেজের অধ্যক্ষ) কমিটি গঠনের আদেশ শুনিবামাত্র জেমস সাহেব ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি মনে করেন, ইতিমধ্যে লায়ন সাহেব ঈর্ষ্যাবশতঃ তাঁহার দাবী অগ্রাহ্য করিয়া হর্ণেল সাহেবকে ডিরেকটার করিয়াছেন। আর এবার এই কমিটি তাঁহার উপরে বসাইয়া তাঁহার কলেজের শৃঙ্খলা সম্বন্ধে বিচার করিবে!—তাঁহার অসহ্য হইল। অবিলম্বে তিনি গভর্ণমেণ্টকে লিখিলেন, "যে কমিটির সভাপতি স্যার আশুতোষ আমার উপর বিদ্বেষভাব পোষণ করেন, এবং যার মেম্বর হর্ণেল সাহেবের সহিত আমার সদ্ভাব নাই, সেই কমিটিতে আমি থাকিতে পারিনা।" গভর্ণমেণ্ট ইহার পরে তাঁহার স্থলে পীক্ সাহেবকে (C.W. Peake) মেম্বর করেন।

এইরূপ কমিটি করা সমীচীন হইয়াছিল বলিয়া আমরা মনে করিনা। তবে জেমস্ সাহেবও একটি মস্ত ভুল করিয়াছিলেন। জানুয়ারী মাসের ঘটনার পরে কলেজ ম্যাগাজিনে তিনি একটি প্রবন্ধে প্রফেসার, ছাত্র প্রভৃতির দায়িত্বহীনতার অভাব সম্বন্ধে এমন ভাবে একটি প্রবন্ধ লেখেন, তাহাতে যেন মনে হইয়াছিল কোথায় কি গলদ্ আছে (something was rotten in the state of Denmark) এই ভাবে গভর্ণমেণ্টকে শৃঙ্খলা সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে দেওয়ার সুযোগ দিয়া তিনিও ভুল করিয়াছেন।

জেমস্ সাহেব অতঃপর লায়ন সাহেবের সঙ্গে স্বয়ং দেখা করিয়া নাকি তাঁহাকে অপমান করিয়াছিলেন। অতঃপর গভর্ণমেণ্ট এক ইস্তাহারে প্রকাশ করেন, "জেমস্ সাহেব প্রিন্সিপাল থাকিবার অনুপযুক্ত, তাঁহাকে সাসপেণ্ড করা হইল। আর তাহার স্থলে (W.C. Wordsworth) অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন।"

২।৩ মাস মধ্যেই এনকোয়ারী শেষ হয় ও রিপোর্ট বাহির হয়। সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি ছাত্রগণ ও অধ্যাপকবর্গ সাক্ষী দিয়াছিলেন। রিপোর্টে জেমস সাহেব যে প্রকৃতই সহানুভূতি-সম্পন্ন এবং আগাগোড়া নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সমস্ত ব্যাপারটির মীমাংসা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, ইহাই প্রকাশ পায়। সুভাষচন্দ্র পূর্ব্বেই বিতাড়িত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে রিপোর্ট কিছু বলে নাই। তবে সে প্রহার করিয়াছে কিনা এবিষয়েও কিছু বলে নাই। কলেজের শৃঙ্খলা সম্বন্ধে কমিটি অনেক মন্তব্য করেন। তার মধ্যে দশ বৎসর পূর্ব্বের স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব, বর্ত্তমান বিপ্লবপন্থিগণের প্রভাব, খবরের কাগজ-ওয়ালাদের দায়িত্বশূন্য উক্তি প্রভৃতিও উল্লেখ করিয়া কমিটি মন্তব্য করে যে, প্রত্যেক ইংরাজী প্রফেসারের বাঙ্গলায় জ্ঞান থাকা একান্ত কর্ত্তব্য আর ইউরোপীয় ও ভারতীয় অধ্যাপকগণের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষা সমান থাকিলে চাকুরীর বিষয়ে কোন অসামঞ্জস্য না থাকে ও প্রিন্সিপ্যাল যেন ক্লাসে ক্লাসে পড়ান, রিপোর্টে এসব বিষয়ের উল্লেখ করা হয়।

'ষ্টেটসম্যান' কাগজখানির সম্পাদকের সঙ্গে জেমস সাহেবের সম্বন্ধ ছিল বলিয়া জেমস সাহেবের প্রতি পক্ষপাতপূর্ণ উক্তি উহাতে বাহির হয়, এদিকে অমৃতবাজার প্রভৃতি কাগজ ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল। অমৃতবাজারের মতিলাল ঘোষ মহাশয় বেশ রসাল ভাষায় কমিটির অনেক উক্তির প্রতিবাদ করেন। শিয়ালেরা একটার উপরে আরেকটা উঠিয়া যে ফল খাইয়াছিল —সে সম্বন্ধে বেশ একটা গল্প ছিল।

কমিটি মিঃ জেমসের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে প্রশংসাসূচক উক্তি করিলেও তাঁহাকে আর প্রিন্সিপ্যাল করা হয় না। তিনি প্রফেসাররূপে থাকিয়া যান। অপমানে জেমস সাহেব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিলাত চলিয়া যান। ওয়ার্ডসওয়ার্থ সাহেবও বেশ জনপ্রিয় ছিলেন। কয়েক বৎসর পরে ষ্টেপলটন প্রিন্সিপ্যাল হন, তখনও একবার ১৯২৬।২৭, আবার ব্যারোস সাহেবের সময়ে ১৯২৯ সনে গোলমাল হইয়াছিল। তাহার পরে আর সাহেব অধ্যক্ষ হয় নাই। মিঃ বি, এম, সেন প্রথম বাঙ্গালী অধ্যক্ষ।

ছাত্র আন্দোলন ও সুভাষচন্দ্রের দায়িত্ব সম্বন্ধে নানা জনে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। নানারূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা-সংগ্রামের নায়কের সাধারণ ঘটনার মত বিচার চলে কিনা এবং চলিলে সুভাষচন্দ্রের দায়িত্ব কতটুকু তাহা সম্যক ভাবে বুঝিবার জন্য ভবিষ্য ছাত্রবৃন্দের একান্ত আগ্রহ হইবে বলিয়া যাবতীয় ঘটনা ঠিক ঠিক যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহা সকলের নিকট উপস্থিত করিলাম। তবে এই ব্যাপার সম্বন্ধে কয়েকজন বিশিষ্ট জননায়কের উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য

তন্মধ্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সমস্ত অবস্থা শুনিয়া মন্তব্য করেন: "ছাত্রগণের শিক্ষকদিগকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তবে শিক্ষকবর্গকে মনে রাখিতে হইবে যে, প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ। কলেজের অবস্থা ছাত্রদের যুগসন্ধির অবস্থা। তখন তারা সর্ব্ববিষয়ে নিজেদের স্বাধীনতার আবহাওয়ায় উপস্থিত দেখে। এই সময়ে তাদের মনোভাব যারা বুঝবে, কেবল শাসনই যারা বুঝেনা, যারা ক্ষমা করতে জানে, এমন লোকের হাতেই তাদের শিক্ষার ভার থাকা কর্ত্তব্য।" সমস্ত প্রবন্ধটি পাঠক ১৩২২ চৈত্রের 'সবুজ পত্রে' পাইবেন। পরে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ংই ইংরাজীতে ঐ প্রবন্ধের অনুবাদ করিয়া ১৯১৬ এপ্রিল মাসের মডার্ণ রিভিউ-এ বাহির করেন। প্রবন্ধটির নাম "ছাত্রশাসনতন্ত্র"। আমরা কোন কোন স্থান হইতে তাঁহার সুচিন্তিত ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মতামত উদ্ধৃত করিলাম—

"প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের সহিত কোনো কোনো য়ুরোপীয় অধ্যাপকের যে বিরোধ ঘটিয়াছে সেই সম্পর্কে বিচার-সভা বসিয়াছে—

"ছেলেরা যে-বয়সে কলেজে পড়ে সেটা একটা বয়ঃসন্ধির কাল। তখন শাসনের সীমানা হইতে স্বাধীনতার এলাকায় সে প্রথম পা বাড়াইয়াছে এই সময়েই অল্পমাত্র অপমান মর্ম্মে গিয়া বিঁধিয়া থাকে।

"এই অবস্থায় যাদের উচিত ছিল জেলের দারোগা বা ড্রিল সার্জেন্ট বা ভূতের ওঝা হওয়া, তাদের কোনমতেই উচিত হয় না ছাত্রদিগকে মানুষ করিবার ভার লওয়া। ছাত্রদের ভার তারাই লইবার অধিকারী যারা নিজের চেয়ে বয়সে অল্প, জ্ঞানে অপ্রবীণ ও ক্ষমতায় দুর্ব্বলকেও সহজেই শ্রদ্ধা করিতে পারেন। যাঁরা জানেন শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা। যাঁরা ছাত্রকেও মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন না।—

"যারা নিজের বিদ্যা, পদ বা জাতির অভিমানে ইহাদিগকে পদে পদে অবজ্ঞা করিতে উদ্যত, তারা গুরুপদের অযোগ্য। ছাত্রদিগকে যারা স্বভাবতই শ্রদ্ধা করিতে না পারে, ছাত্রদের নিকট হইতে ভক্তি তারা সহজে পাইতে পারিবে না।

"আমার কথা এই, ছেলেরা যা-খুশী তাই কখনই করিবেনা, তারা ঠিক পথেই চলিবে, যদি তাদের সঙ্গে ঠিকমতো ব্যবহার করা যায়। যদি তাহাদিগকে অপমান কর, তাহাদের জাতি বা ধর্ম্ম বা আচারকে গালি দাও, যদি তারা দেখে তাহাদের পক্ষে সুবিচার পাইবার আশা নাই, যদি অনুভব করে, যোগ্যতা সত্ত্বেও তাহাদের স্বদেশীয় অধ্যাপকেরা অযোগ্যের কাছে মাথা হেঁট করিতে বাধ্য তবে ক্ষণে ক্ষণে তারা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিবেই—যদি না করে তবে আমরা সেটাকে লজ্জা এবং দুঃখের বিষয় বলিয়া মনে করিব।

"এদেশে প্রত্যেক ইংরেজই রাজশক্তি বহন করেন, ছাত্রকে কেবলমাত্র ছাত্র বলিয়া দেখা তাঁর পক্ষে শক্ত, তাকে প্রজা বলিয়াই দেখেন।—একে তিনি ইংরেজ তার উপরে তিনি ইম্পিরিয়েল সার্ভিসের অধ্যাপক, তার উপরে তিনি রাজার অংশ, তার উপরে বিশ্বাস তিনি পতিত উদ্ধার করিবার জন্য আমাদের প্রতি কৃপা করিয়াই এদেশে আসিয়াছেন, এমন সময়ে সকল অবস্থায় তাঁর মেজাজ ঠিক নাও থাকিতে পারে, তাই তিনি বাঙ্গালী ছাত্রদের সহিত বিশুদ্ধ অধ্যাপকের মতো ব্যবহার করিয়া উঠিতে পারেন না।

"আমাদের দেশের ছাত্রদের আমি ভাল করিয়াই জানি। ইহারা ভক্তি করিতে পাইলে আর কিছু চায় না। অধ্যাপকের কাছ হইতে একটু মাত্রও যদি ইহারা খাঁটি স্নেহ পায় তবে তাঁর কাছে হৃদয় উৎসর্গ করিয়া দিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। আমাদের ছেলেদের হৃদয় নিতান্তই সস্তা দামে পাওয়া যায়।

"ইংরেজ অধ্যাপকের সহিত বাঙালী ছাত্রদের সম্বন্ধ সরল ও স্বাভাবিক হওয়া বর্ত্তমানে বিশেষ কঠিন হইয়াছে। ইংলণ্ডে থাকিতে ইহা স্পষ্ট বুঝিয়া আসিয়াছি। রেলগাড়ীতে এক ইংরেজ আমার পাশে বসিয়াছিলেন। প্রথমটা আমাকে দেখিয়া তাঁর ভালই লাগিল। এমন কি তাঁর মনে হইল, ইংলণ্ডে আমি ধর্ম্ম-প্রচার করিতে আসিয়াছি। কিন্তু যখন শুনিলেন, আমি বাংলা-দেশের লোক, লাফাইয়া উঠিলেন। কোন দুষ্কর্ম্মই যে বাংলা-দেশের লোকের অসাধ্য নহে, তাহা তিনি তীব্র উত্তেজনার সঙ্গে বলিতে লাগিলেন। বাঙ্গালী আজ ইংরেজের কাছে বিশেষণ হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ ইংরেজ বাঙ্গালী ছাত্রের সম্বন্ধে ইহাই

মনে করিয়া থাকে 'এত করিয়াও বাঙালী ছেলের মন পাওয়া গেল না— কৃতজ্ঞতা বৃত্তি ইহাদের নাই।' এই ক্ষেত্রেও সেই অবস্থাই হইয়াছে।"

আর একটি উক্তি প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ বাবুর—

"...এ-স্থলে বরাবর এক পক্ষেরই উপর শাস্তির হুকুম হইয়া আসিতেছে। এক হাতে তালি বাজে না। যে অধ্যাপককে লইয়া এত হাঙ্গামা, তাঁহার কি কোন দোষ ছিল না? যদি দোষ ছিল, তাঁহার কি দণ্ড হইল? যদি দোষ না থাকে তাহা হইলে তাঁহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া ঘোষণা করা হইল না কেন? European professor can do no wrong—এমন কোন কথা নাই।

"প্রথম যখন অধ্যাপক ওটেনের সহিত ছেলেদের সংঘর্ষ হয়, তখন উভয় পক্ষ ক্ষমা প্রার্থনা করায়, বাহ্যতঃ মিটমাট হইয়া যায়। অথচ ছেলেদের জরিমানা পাঁচ টাকা করিয়া মাফ হইল না, তাহা দিতে হইল। অর্থাৎ তাহারা অধ্যাপকের ক্রটী ভুলিয়া গেল। কিন্তু তাহাদের ক্রটী শিকায় তোলা থাকিল, এবং জরিমানার আকারে তাহাদের ঘাড়ে পড়িল। ইহাতে তাহাদের পক্ষে এরূপ মনে করা অস্বাভাবিক নহে যে, তাহাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হইল। পরে যখন অধ্যাপক ওটেন কয়েকটি ছেলেকে পূর্ব্বের যে ব্যাপারের জন্য উভয় পক্ষের ক্রটী স্বীকার ও করমর্দ্দনাদি হইয়াছিল, তাহারই জন্য ক্লাস হইতে তাড়াইয়া দিলেন এবং তাহারা প্রিন্সিপ্যাল জেমসের নিকট গিয়া কোন প্রতিকার পাইল না, তখন ছেলেদের এই ধারণা সম্ভবতঃ বদ্ধমূল হইল যে, অধ্যাপক ও কর্ত্তৃপক্ষকে বিশ্বাস নাই। গুরু শিষ্যের মধ্যে মনের ভাব এরূপ হওয়া যে অত্যন্ত শোচনীয়, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু ছাত্রেরা বয়ঃকনিষ্ঠ, শিষ্য ও দুর্ব্বলপক্ষ বলিয়া এই শোচনীয় ব্যাপারের জন্য একমাত্র তাহাদিগকেই দায়ী করা যায় না। সম্ভবতঃ কিছু দায়ী হইলেও, তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা কম দায়ী"—প্রবাসী, চৈত্র--১৩২২ পৃঃ ৫৪৬।

সন্ধিক্ষণ

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

মলয় রান্নাঘরের চৌকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, মা, তোমার বুড়ো ধাড়ি ছেলেকে আজ বলে দিও—পারবো না রোজ রোজ আমি সাত তাড়াতাড়ি তাঁর অফিসের ভাত রেঁধে দিতে।

মলয়ের মা সামনের ঘরের মেঝে মুছিতেছিলেন, মুখটি অল্প একটু তুলিয়া মৃদু হাস্য করিলেন, কথা বলিলেন না। এই হাসিটুকুতে মলয় আরও জ্বলিয়া উঠিল; কণ্ঠস্বর আরও তীক্ষ্ণ করিয়া কহিল, না মা, তুমি হেসো না। বুড়ো ধাড়ি ছেলে, কাজ নেই কর্ম্ম নেই, একটা পয়সা রোজগারের চেষ্টা নেই, তোমরা খাও না খাও, বাঁচ মরো ভাবনা-চিন্তে নেই, দশটা বাজতে না বাজতে ভাত খেয়ে এর পুকুরে তার পুকুরে ছিপ ফেলে, তাস-পাশা খেলে নিত্যি তিনি মা বোনের মাথা কিনছেন।

মা আবার হাসিলেন। পিঠোপিঠি ভাই বোন, বাল্যকাল হইতে, একে অপরের বিরুদ্ধে নালিশ, দাঙ্গা, কৈফিয়ত করিতে কসুর করে নাই। বয়সের সঙ্গে এই দ্বন্দ্ব, বাদ-বিসম্বাদ হ্রাস না পাইয়া বরং বৃদ্ধিই পাইয়াছে। বোধ করি, সর্ব্বত্রই ঐ ভাব। কাজেই কোনও বাপ-মাই ইহাতে গুরুত্ব আরোপ করেন না। তাই স্বাভাবিক নিয়মেই মা হাসিলেন।

মলয়ের ধৈর্য্যের বাঁধ একেবারে ধ্বসিয়া পড়িল; তীক্ষ্ণ কণ্ঠকে কটু ও তিক্ত করিয়া কহিল, তোমার আস্কারা পেয়েই ত বাঁদর হয়ে উঠেছে। যুদ্ধের সময়ে, কোনও কালে যে লোক একটা পয়সা রোজগার করতে পারতো না, সে'ও মাসে এক শ' টাকা দেড় শ' টাকা রোজগার করছে। আর তোমার বুড়ো খোকার একটা পয়সা ঘরে আনা চুলোয় গেল, কোথায় খোল, কোথায় গাদ, কোথায় পাউরুটী, কোথায় সুতো-বঁড়শী—দুঃখের সংসার থেকে—"বলিতে বলিতে তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। "যাও, বলো তাকে, ভাত হবে না আজ"—বলিয়া ঝনাৎ শব্দে দরজাটা বন্ধ করিয়া, উঠান পার হইয়া অন্য একটা ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। মা আকাশের পানে চাহিয়া, সূর্য্যের অবস্থিতি দেখিয়া লইয়া, মনে মনে উদ্বিগ্ন হইলেন। হাতের কাজটুকু শেষ করিয়া, গামলা ন্যাতা উঠানের এক কোণে রাখিয়া, হাত-পা ধুইয়া যে ঘরে মলয় ঢুকিয়াছিল, সেই ঘরে আসিয়া দেখিলেন---মলয় শত ছিন্ন মলিন শয্যার উপরে উপুড় হইয়া শুইয়া আছে—বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, সে কাঁদিতেছে। তাঁহার বাসি কাপড়, বিছানা স্পর্শ করিতে পারেন না; হিন্দু-ঘরের বিধবা, আচারে বিচারে অত্যন্ত নিষ্ঠা! শয্যার কাছে দাঁড়াইয়া, আদর করিয়া বলিলেন, যা মা যা, এক মুঠো চাল চড়িয়ে দিগে যা; নইলে যে হনুমান, কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাঁধিয়ে দেবে।

মলয় কান্নার ফুলিতে ফুলিতে বলিল, দিক্‌গে, যা খুশী করুকগে।

মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, এখন ত বেশ বলছিস, যা খুশী করুকগে, সেদিনের মত না খেয়ে যখন চলে যাবে, তখন তুই-ই সারাদিন ঘুরে ঘুরে খুঁজে খুঁজে সারা হবি।

আমার দায় পড়েছে, বলিয়া মলয় বালিশটা টানিয়া লইল।

মা হাসিলেন; বলিলেন, সেদিন দায় পড়েছিল কেন লা?

মলয় গম্ভীরভাবে কহিল, আজ আর পড়বে না। বলিয়া এক মুহূর্ত্ত থামিয়া পুনশ্চ কহিল, সত্যি বলছি মা তোমাকে, আর তুমি আস্কারা দিও না ওকে। যা হোক্ একটা কাজ করুক;

নইলে ঐ-ই বা খাবে কি, আমরাই বা খাবো কি? এত লোক যুদ্ধের কাজ করছে, তোমার ছেলেই কেবল পারে না! যাক্, ও যুদ্ধে যাক্—আজই যাক্।

তুই পারবি প্রাণ ধ'রে ওকে যুদ্ধে যেতে দিতে?

পারবো না কে বলেছে তোমাকে!—বলিয়া যেন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; পরমুহূর্ত্তেই আবার ম্লান হইয়া কহিল, কত লোকই ত গেছে মা।—বলিতে বলিতে কণ্ঠ ভারী হইয়া উঠিল। চোখে জল আসিয়া পড়িতে চাহিল। পাছে দুর্ব্বলতাটুকু মা বুঝিতে পারেন, কঠিন হইয়া নিজেকে সংযত করিয়া বলিল, ভাত যে চড়াতে বলছো, চালের টিনটা দেখেছো কি?

মা সভয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্নস্বরে কহিলেন, নেই?

মলয় তীব্রকণ্ঠে কি একটা বলিতে যাইতেছিল, সামলাইয়া ফেলিয়া অন্যমনস্কের মত কহিল, গোটা পাঁচ ছয় পড়ে আছে। দেখগে না।

ওমা, তাই ত! কাল রাত্তিরে যে নন্দমাসী—বলিতে বলিতে তিনি শশব্যস্তে বাহির হইয়া গেলেন। চালের সন্ধানে নয়, ভাবিতে গেলেন; আর বুঝি বা চোখের জল গোপন করিবারও দরকার হইয়া পড়িয়াছিল। এমন করিয়া কতদিন আর চলিবে? দুটি কলমী-শাক ভাত, তাহাও যে বাছাদের মুখে জুটিতেছে না, মা হইয়া আর কতকাল সহ্য করিবেন? ধার—যেখানে যেখানে ধার পাইবার আশা ভরসা ছিল, সবই দেখা হইয়া গিয়াছে; সকলেরই এক দশা, এক মুঠার ভরসা কোথায়ও নাই। তবে কি শেষ পর্য্যন্ত ভিক্ষা করিতে হইবে? তাহাই কি অদৃষ্টের লিখন? স্নান সারিয়া ভাঁড়ার ঘরে ঢুকিয়া কোনও উপায় করা যায় কি-না তাহাই ভাবিতে ভাবিতে নদীতে চলিলেন। নদীতে তখনকার দিনে অনেক মৃতদেহ ভাসিয়া যাইতে দেখা যাইত। সেদিনে এত লোক মরিত যে, সৎকার করিবার লোক জুটিত না। কবরই বল আর অগ্নিসৎকারই বল,ঐ নদীই ছিল ভরসা। আজও একটি নারীর দেহ উজান স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল। দেখিবামাত্র মলয়ের মার মনে হইল, তাঁহার দেহও যদি ঐ রকম ভাসিয়া যায়, কাহার কি আসে যায়? পরমুহূর্ত্তেই মনে মনে শিহরিয়া উঠিয়া সিক্তবস্ত্রে, সিক্তনেত্রে গৃহে ফিরিয়া ডাকিলেন, মলয়, মলয় ওমা মলয়, ঘুমোলি না কি?

মলয় ঘরে ছিল না। দাদার উপর সন্তুষ্ট না থাকিলেও, এখনি বাড়ী আসিবে, এখনই ভাত চাহিবে, আর সে ভাত দিতে পারিবে না—ভাবিয়া তাহার চিত্তে সুখ ছিল না। বাড়ী-ঘর যেমন খোলা পড়িয়াছিল, তেমনই পড়িয়া রহিল, এক দৌড়ে সিধু মুখুজ্জের অন্তঃপুরে ঢুকিয়া ডাকিল, কাকীমা। কাকীমা নাতী-নাতনীদের ভাত বাড়িতেছিলেন, সাড়া দিলেন, কে রে? আমার মলয়-মা এলি?

মলয় রান্নাঘরের কাছে আসিয়া বলিল, বড্ড যে খিদে পেয়েছে কাকীমা

কাকীমা হাসিমুখে কহিলেন, ছেলেদের সঙ্গে বসে পড় না মা; যা হয়েছে দু'টো খেয়ে নে না।

তুমি একথালা ভাত বাড়ো ত, আমি আসছি—বলিয়া মলয় বাড়ীটা একবার প্রদক্ষিণ করিয়া লইল। এই বাড়ীর একটি ঘরে তাহার মন বহুকাল হইতে বাঁধা পড়িয়া আছে।

সে ঘর তাহারই হইত, সেই ঘরের যে অধিকারী, সে তাহাকে গৃহের অধীশ্বরী করিতে চাহিয়াছিল, ভাগ্যদোষে তাহাদের স্বপ্ন ভঙ্গ হইয়াছে। সমাজ কোথায় থাকে, কি করে, কেমন তাহার রূপ, কেমন তাহার প্রকৃতি কেহ জানে না; কোন কালে সমাজের দর্শন পাওয়া যায় না। কিন্তু সিধু মুখুজ্জের ছেলে সুধীন মুখুজ্জে যে-দিন ৺মৃন্ময় চাটুয্যের মেয়ে মলয়কে বিবাহ করিয়া সুখী হইতে চাহিল, সমাজ অকস্মাৎ আত্মপ্রকাশ করিয়া দু'জনের মাঝখানে দাঁড়াইয়া জজের ফাঁসীর হুকুম দেওয়ার মতো সংক্ষিপ্ত হুকুম দিল, হয় না। সিধু মুখুজ্জে মস্ত কুলীন; মৃন্ময় পতিত ও ভঙ্গ। সিধুর স্ত্রী বলিলেন, আমার ছেলে সুখী হইলেই হইল, আমি সমাজ-টমাজ মানি নে। মৃন্ময়ের বিধবা চুপ করিয়া রহিল। সমাজ বলিল, আচ্ছা, দেখা যাক্! সিধু ভয় পাইল, তাহার দুইটি মেয়ে অনূঢ়া রহিয়াছে। সুধীন মলয়কে বলিল, চলো পালাই; অন্য দেশে গিয়ে আমরা ঘর বাঁধবো। মলয় পিছাইয়া পড়িল; ভাবিল, কুলে কালী পড়িবে! সুধীন বলিল, চলো, আজই রাত্রে; মলয় ভাবিতে লাগিল, সদ্যোবিধবা মার দশা কি হইবে! সুধীন বলিল, কথার জবাব দাও না কেন? মলয় বলিল, কাল জবাব দেবো। সেই কাল আর আসিল না। ক'দিন সে লুকাইয়া রহিল; পদশব্দে সে চমকিয়া উঠিল; মা'র পানে চায় আর চোখের জলে মুখ ভাসিয়া যায়।

কয়েকদিন পরে মলয় শুনিল, সুধীন যুদ্ধে চলিয়া গিয়াছে। মলয় শানের মেজেতে মাথাটা ছেঁচিতে লাগিল। এ বাড়ীতে অবারিত দ্বার, কতবার কত ছলে আসিল গেল, কিন্তু যে দেখা দিবে না, তাহার দেখা কোথায় পাইবে?

এই সেই ঘর। মানুষ মনকে ধমক দিতে পারে, শান্ত হইতে বলিতেও পারে—তাহারা কথা রাখে কিম্বা না রাখে, সে-কথা আলাদা কিন্তু চোখের জল কথা শোনে না, বাধা মানে না। সুধীনের ঘরে ঢুকিয়াই মলয় বিছানায় আছড়াইয়া পড়িল। সুধীনের বোন সুনীলা কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া খপ্ করিয়া হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, চুপ কর পোড়ারমুখী। বাবা বাড়ীতে আছেন।

কাকীমা রান্নাঘর হইতে হাঁক পাড়িতেছেন, ও-মা মলয়, কোথায় গেলি মা, ভাত দিয়েছি যে, খাবি আয় না।

সুনীলা জিজ্ঞাসা করিল, ভাত খাবি বৌ?

এক বৌ সম্বোধনে ধরিত্রী যেন উলট-পালট খাইয়া গেল। মলয় সুনীলার গলা জড়াইয়া ধরিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সুনীলা তাহাকে শান্ত করিল, সান্ত্বনা দিয়া বলিল, খাবি বেশ ত', একসঙ্গে সব খাবো। আমি তাই বলে আসি মা'কে, কেমন? তুই বরং পরশুকার চিঠিখানা দেখ্ বৌ!—নে, ওঠ—সে চলিতে উদ্যত হইল।

আবার সেই বৌ সম্বোধন। মলয় তাহাকে বাধা দিতে চায়, কিন্তু কণ্ঠ ত' রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, শব্দ বাহিরায় না; এক হাত দিয়া সুনীলার বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া তাহাকে থামাইয়া বলিল, না, ভাত ক'টি আমি বাড়ী নিয়ে যাবো।

তা খাস্ যাবি। কিন্তু ফিরে এসে আমাদের সঙ্গে ব'সে খাবি বল্?—মলয় কথার উত্তর দেয় না দেখিয়া সে আবার বলিল, তবে চিঠি দেখতে পাবি নে, যা।—বলিয়া রঙ্গভরে সখীর পানে চক্ষু মেলিতে, তাহার চোখেই জল আসিয়া পড়িল। বলিল, না বৌ, ঠাট্টা করছিলুম, তুই ঠাট্টাও বুঝিস্ নে। এই নে, চিঠি নে!

মলয় চিঠিখানি লইয়া জামার মধ্যে বুকের ভিতরে রাখিয়া, বাষ্পপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, ভাতটা দিয়ে আসি নীলা।

আসবি ঠিক?

আসবো।

চিঠি ছুঁয়ে বলছিস বৌ—আসবি?

আবার এক ঝলক জল চোখে আসিয়া পড়িতেছিল, সামলাইয়া লইয়া মলয় বলিল, আসবো।

রান্নাঘরে আসিয়া বলিল, কাকীমা, আরও চাট্টি চাল চড়িয়ে দাও গো, এ-ক'টা দস্যি দানাটাকে দিয়ে এসে নীলা আর আমি একসঙ্গে বসবো, তুমি সেই ছেলেবেলাকার মতো আমাদের খাইয়ে দেবে। কেমন?

বেশ ত' মা বেশ ত! চাল আমার বেশী নেওয়াই আছে, হাসিয়া সিধু মুখুজ্জের স্ত্রী পার্ব্বতী দেবী মলয়ের হাতে ভাতের থালাটা তুলিয়া দিলেন বটে, কিন্তু চোখের জলও নিবারণ করিতে পারিলেন না; দীর্ঘ নিঃশ্বাসটিও গোপন রহিল না। তাঁহার সুধীন কাছে নাই, এই মেয়েটাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া সেই দুঃখ লাঘব করিবার জন্য হৃদয়ের এ-কি আকুলি বিকুলি! নাতী নাত্নীরা ভাত খাইতেছিল, সবাই ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে বড় যে, মঞ্জুষা, সে বলিল, দিদু, তোমার চোখে বুঝি ধোঁয়া লেগেছে?

দুই

মধ্যাহ্ন অতীত। নদী তীর সুনির্জ্জন। গৃহস্থ স্নান করিয়া, জল লইয়া বহুক্ষণ চলিয়া গিয়াছে; কৃষক তাহার বলদ দু'টিকে স্নান করাইয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া, নিজে স্নান করিয়া গৃহে গিয়াছে, নির্জ্জন নদীতীর, জনমানুষ নাই। মলয় নদীতীরে বুড়ো বটতলায় বসিয়া চিঠিখানা কতবার—কত—কতবার পড়িল। তিন চার দিন আগে আর একখানা চিঠি আসিয়াছিল, সুনীলা তাহাদের বাড়ীতে আসিয়া পড়াইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আজিকার এই পত্রখানা এমন, যেন গ্রাস করিয়া ফেলিলেও তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইবে না।

"আমাদের এই ক্যাম্পে কত মেয়ে আমাদের সেবা করিতে আসে। বাঙ্গালীর মেয়েও আছে; তোদেরই বয়সী। তাহাদের কত রকমের কাপড়, হাতে কত সুন্দর সুন্দর ব্যাগ, ঘড়ি, কলম। আমি আজ পর্য্যন্ত কারো সঙ্গে একটা কথাও কহি নাই; কাহারও মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছি বলিয়াও মনে হয় না।

"তারাও যুদ্ধের কাজ করিতেছে—যুদ্ধে কত রকমের কাজ আছে সে তোরা বুঝিতে পারিবি না। আমাদের ক্যাম্পের লোকেরা বলে এই মেয়েরা যদি না আসিত, তাহা হইলে জীবন মরুভূমি হইয়া যাইত। এই মেয়েগুলি যেন মরুভূমিতে পাদপ। একটি মেয়ে প্রায়ই গান গায়; ভারি মিষ্ট তার গলা। রবিবাবুর গান ভিন্ন অন্য গান সে গায় না। সে যে-দিন আসে ক্যাম্পে যেন মহোৎসব আরম্ভ হয়। কাল সে "তুমি সন্ধ্যার মেঘ, শান্ত সুদূর" গাহিল। আমার ভাল লাগে নাই। এই গান কি মিষ্ট করিয়াই না আর একজন গায়! আজও কানে বাজিতেছে।"

মলয় সেইখানে সেই মৃত্তিকা'পরে লুটাইয়া পড়িয়া আপনার মনে আপনি বলিতে লাগিল, সেই একজনকে আজও মনে আছে! তার গান আজও কানে বাজে!

তারপর? "তবে আর কি? তবে আর কেন? আর আমার দুঃখ নেই!" এই সব বলে আর ধুলায় গড়াগড়ি দেয়। সেক্সপীয়র জীবিত থাকিলে নূতন ওফেলিয়ার সৃষ্টি হইত। এই লেখক কবি হইলে আর একটি 'কাব্যে উপেক্ষিতা'র দর্শন মিলিত; আমি যদি চিত্রকর হইতাম, দুর্ব্বাসা সাজিয়া শাপ দিতাম না, ছবি লিখিয়া ধন্য হইতাম। আমার দুঃখ এই, আমি শুধুই ক্ষুদ্র গল্প-লেখক!

সুনীলা আসিয়া তাহাকে সেইখানে ধৃত করিল। সুনীলা, তাহার ছোট্‌দি বেনিলা, তাহাদের মা বাড়ীশুদ্ধ সকলে তীর্থের কাকের মত বসিয়া আছে মলয়কে লইয়া একসঙ্গে খাইবে বলিয়া, অথচ ইহার দেখা নাই।

সুনীলার এই সে-দিন হইল বিবাহ হইয়াছে। সব জানে, সব বুঝে। আসিয়াই মলয়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, বৌ, আজ একবার গাইবি গানটা?

মলয় তাকে দুই হাতে যত বল ছিল তাহা দিয়া বুকে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল, না নীলা না, ও-গান না। ও-গান সেই একজনেরই জন্যে তোলা থাক্, ভাই!

সুনীলা হাসিয়া বলিল, তা থাকে থাক্। এখন খাবি চল্ পোড়ারমুখী। বাড়ীশুদ্ধ সব বসে আছে।

চল্, বলিয়া উঠিল; আবার বলিল, গা-ময় ধুলোয় ধুলো হয়ে গেছে, তুই দাঁড়া নীলা, একটা ডুব দিয়ে আসি।

ভিন্নরুচির্হি লোকঃ, আমি তা জানি; তবু তোমাদের জিজ্ঞাসা করি, তোমরা সুন্দরী বল কাহাকে? গোরা সর্ব্বদোষহরা, তাহাই কি তোমাদের মত? তাই যদি হয়, মলয়ে তোমাদের মন উঠিবে না, তাহা আমি জানি। তাহার বর্ণ গৌর নহে, তোমাদের পরীক্ষায় সে পাশ করিতে পারিবে না, তাও বুঝি, কিন্তু এই মাজা মাজা রঙের মেয়েটি তাহার লীলায়িত ভঙ্গীতে যে পথ দিয়া যায় সেই পথ আমার চোখে আলোকিত হইয়া উঠে, দেখি। হ্যাঁগা, সে কি আমার চোখের দোষ? আমারই না হয় চোখের দোষ, সিধু মুখুজ্জের স্ত্রী পার্ব্বতী দেবীর চোখও কি খারাপ হইয়াছে? তাঁহার এম্-এ পাশ করা সুগৌর সুকুমার সুপুরুষ ছেলের জন্য তিনি এই মেয়েটিকেই বা পছন্দ করিলেন কেন? ছেলে যুদ্ধ হইতে ফিরিলে, সমাজের মুখে নুড়ো জ্বালিয়া দিতে হয়, সেও ভাল, মলয়কে তাঁহার গৃহলক্ষ্মী তিনি করিবেনই! আজ যে প্রতিবেশী-কন্যাটির পথ চাহিয়া, সমস্ত দুপুর অভুক্ত থাকিয়া, সেই যে ভাবী-গৃহলক্ষ্মীর রূপটি কল্পনা করিয়া কাটাইলেন, তাহাকে তোমরা কি বলিতে চাহ? আমার কথা কি জান? রঙে রূপ সম্পূর্ণ হয় না। রূপের পূর্ণাভিব্যক্তি শ্রীতে। শ্রী যাহার আছে সেই রূপবতী।

শ্রীতে নয়ন মোহিত হয়, মন মুগ্ধ হয়। তাই মলয় সেইদিন সন্ধ্যায় যখন কোটালপাড়ার শৈবালনলিনীর কাছে গিয়া আবেদন জানাইল, শৈবালমাসি, আমাকে একটা কাজ দিতে পার? তখন শৈবালমাসী ইহার এবং সেই সঙ্গে নিজের অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যতের যে মনোরম ও মহিমময় চিত্রখানি অন্তরলোকে অবলোকন করিলেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাহার তুলনা আছে বলিয়া তাঁহার মনে হইল না।

শৈবালমাসী ওয়াক-হ্বিঃ-র কর্ত্রী বিশেষ। শাড়ীর উপরে কোট, কোটের উপরে দড়ি-জড়া-তারা শিবির-তুরি আঁটিয়া তিনি যখন সৈন্য-আলোকিত করিতে যান, তখন যাত্রার দলের ছেলেরা বিন্দেদূতীর গান গাহিয়া মাঠ ঘাট সচকিত করিয়া তুলে, শৈবাল মাসী যতই রুষ্ট হৌন, মনে মনে কাঁচা মুণ্ড পাত করিতে থাকুন, রসিকজন কিন্তু তাহাতে দোষ ধরিতে পারে না। তবে মাসীরও একটা কাল ছিল। সেকালটা কিরূপ ছিল তাহা জানি না, তবে একালে দেখিতেছি, খর্জ্জুর বৃক্ষশিরে বজ্রাঘাত হইয়াছে। অন্ধ বজ্র, আক্কেলহীন বজ্র পড়িবার আর জায়গা পাইল না, মাসীর এই হাল করিয়া দিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

মাসী পুলকে ডগমগ হইয়া বলিলেন, তোর মা কি রাজী হবে?

মলয় কহিল, রাজী না হয়ে কি না-খেয়ে মরবে?

মাসী একটু দ্বিধা ভরে কহিলেন, আমার নিন্দে হবে না ত'

আমি কি কচি খুকী মাসি?

মাসী বিগলিত-হিয়া আনন্দিত-চিত্ত, কহিলেন, তাহ'লে কবে যাবি বল্?

আজ হয় না?

'ক্যাওলা, ভাত খাবি? না, হাত ধোব কোথায়?' মাসী 'খুব হয়' বলিয়া সাজ পোষাক করিতে লাগিলেন। মলয় অতি কষ্টে হাসি চাপিয়া রাখিতেছিল, সজ্জা সম্পন্ন করিয়া ক্যাপ্টেন শৈবালনলিনী যখন বেতের ক্ষুদ্র ছড়ি গাছি হাতে লইলেন, তখন আর হাসি চাপিতে পারিল না; আঁচলটা মুখের মধ্যে গুঁজিতে গুঁজিতে বলিল, মাসি, ওটা তোমার বেনু না ধেনু চরাবার পাচন বাড়ি?

ভাগ্যিস মনে করে দিলি, বাঁশীটে ভুলে যাচ্ছিলুম এখখুনি। বলিয়া মাসী বাঁশী লইলেন।

মলয় বলিল, মাসী

　　বাঁশী বাজে না

　　তাই ধেনু চরে না।

একবার বংশীধ্বনি করো না মাসী, শুনি।

শুনবি লো শুনবি ছুঁড়ি, অনেক শুনবি, বলিয়া আদরে সোহাগে গলিয়া ঢলিয়া মাসী—ক্যাপ্টেন শৈবালনলিনী সেন হেড কোয়ার্টার্সের উদ্দেশে চলিলেন। মনস্তত্ত্ববিদ কোন ব্যক্তি সেখানে ছিল না, থাকিলে দেখিত ও বলিত যে, মাসীর বিশুষ্ক যমুনায় আজ বান আসিয়াছে: মৃত তরু মুঞ্জরিয়াছে; তেপান্তরের প্রান্তরে পাপিয়া দোয়েল কোয়েল কলতান তুলিয়াছে! শৈবালনলিনী (হ্যাঁ গা, শৈবালে কি পদ্ম জন্মে?) আজ ক্যাপ্টেনীর মুখে ঝাড়ু দিয়া মেজরত্ব প্রাপ্তির সুখস্বপ্নে বিভোর, মাতোয়ারা।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বর্ণ পরিচয় প্রথম ভাগ লিখিয়া প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন; শৈবালনলিনী সেন-রচিত বর্ণ পরিচয় প্রথম ভাগের পরিচয় যাহারা অবগত আছে, তাহাদের কাছে তিনিও স্মরণীয় থাকিবার যোগ্য। স্বর বর্ণের পর ব্যঞ্জন বর্ণ, পর্য্যায়ক্রমে এক একটি পাঠ দেন আর মলয় আতঙ্কিত ও রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতে থাকে; বলে, ওসব কি বলছো মাসি? তাদের সঙ্গে সিনেমায় বা যাবো কেন, হোটেলে খানাই বা খাবো কেন?

মাসী বলিলেন, কেন লা, তাতে দোষটা কি? বাছাদের ঘর নেই, দোর নেই, আত্মীয়জন কেউ কাছে নেই, কোথায় কোন্ দেশের কল, রাজ্যের কল—কোন্ খানে এসে পড়ে আছে, ভাই বোনের মত থাকবি, খাবিদাবি, গল্প করবি, বেড়াবি, তাতে দোষটা কিসের? চল্ না দেখতেই পাবি, কত ভাল ভাল ঘরের মেয়ে কত বি, এ, এম, এ, পাশ করা মেয়ে কত বিয়েওলা, ছেলে মেয়ের মা রয়েছে, হাসছে, গল্প করছে, গান গাইছে, ঞ্যাক্টিং করছে। বাছাবাও কাউকে দিদি, কাউকে বোন, কাউকে মাসী, কাকী, জেঠি—

মলয় হাসিয়া বলিল, তোমায় তারা কি ব'লে ডাকে মাসি?—

মাসী বলিলেন, তোরাও যা বলিস, তারাও তাই বলে ডাকে।

মলয় বলিল, অর্থাৎ সবাই তোমার বোন-পো কেমন, তাই না?

মলয়ের মনটা হাল্কা হইয়া গিয়াছিল। সুশীলও সেই কথাই লিখিয়াছে, "একটি মেয়ে গান করিতে আসে; সে আসিলে ক্যাম্পে মহোৎসব পড়িয়া যায়।"

আচ্ছা মাসি—মলয় কি একটা প্রশ্ন করিতে গিয়া থামিয়া পড়িল; কিন্তু মাসী তাহাকে থামিতে দিতে পারেন না। অনেকদিন পরে এমন একটি 'ছাত্রী' জুটিয়াছে, ইহাকে মনের মত করিয়া গড়িয়া লইতে পারিলে, মাসী আখেরে গুছাইয়া লইতে পারিবেন। শৈবালনলিনী জহুরী লোক, জহরৎ চিনেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, কি লা, মাসী ব'লে কি বলতে গিয়ে থামলি যে! কি বলছিলি বল্ না, খটকা না রেখে সব খোলসা করে নেওয়াই ভাল না?

মলয় কি ভাবিয়া লইল; তারপর বলিল, আচ্ছা মাসি, তোমার বোনপোরা কি সব এক জায়গাতেই থাকে? না বদলী হয়?

মাসী আদরে গলিয়া গিয়া বলিলেন, ওমা, তা কি কখনও হয় না কি? তবে আর যুদ্ধের কর্ম্ম বলেছে কেন? আজ যে এখানে আছে, কাল চলে গেল আসামে। আবার যে আসামে আছে, সে চলে এল এখানে। সারা বছর ধরে এই ত হচ্ছে।

মলয় বলিল, যারা—ধর—এই ধর মিরাটে আছে, তারা এখানে আসতে পারে?

পারে বৈ কি! কাছে সরিয়া আসিয়া, কণ্ঠস্বর নীচু করিয়া কানে কানে বলিলেন—কেন, মিরাটে কেউ আছে নাকি লা?

না, তাই জিজ্ঞেস করছি।

হ্যাঁরে তুই ভাল ভাল গান জানিস্ না?—বলিয়া শৈবালনলিনী

আবার ঢলিয়া পড়িলেন। এই সকল তুচ্ছ, সামান্য কথাতেও যে মাসী পুনঃ পুনঃ গলিয়া পড়িতেছিলেন, তাহার কারণ আর কিছুই নহে, অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যতের সুখসমৃদ্ধিমণ্ডিত পরিকল্পনাটি মাসীকে মুহুর্মুহু আপ্লুত, অভিভূত করিয়া দিতেছিল। সেই যে সুখ-যমুনায় সুখ-তরঙ্গে সুখ-বায়ুভরে সুখস্রোতে সুখতরণীতে সুখযাত্রা বলিয়া একটা গালভরা সুখের হিল্লোল আছে, মাসীর তখন সেই অবস্থা।

গদাইচন্দ্র শঙ্খনিধির উদ্যান বাটিকায় ক্যাম্প। তখন চায়ের সময়। মাসীর বাছারা সবাই একটা মগ হাতে ভোজন-শালা হইতে ফিরিতেছে, মলয় সমভিব্যহারে ক্যাপ্টেন মিস্ সেনের শুভাগমনে ক্যাম্পে সমারোহ পড়িয়া গেল। ব্যক্তিগত ভাবে, দেশী বিদেশী প্রথায়, বোধ্য অবোধ্য ও বহুবিধ ভাষায় অভ্যর্থনার কলরব ভেদ করিয়া সম্মিলিত কণ্ঠের থ্রি চিয়ার্স ফর দি ইয়োলো ডাভ্ টাই ধ্বনিত হইতে লাগিল।

উপমাটা হয়ত অভদ্র, অসঙ্গত ও রুচিবিগর্হিত বোধ হইবে, কিন্তু উপমা না দিয়াও পারিতেছি না যে, ভাগাড়ে গরু পড়িলে আকাশমার্গে উড্ডীন শকুনিকুলের দৃষ্টি যেমন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছাড়িয়া সেই সুস্বাদু বস্তুটির প্রতিই নিবদ্ধ হয়, শৈবালনলিনী-মাসীর বহিন-পুত্রগণের দৃষ্টিও মলয়কে গোগ্রাসে গ্রাস করিতে লাগিল বলিলে অন্যায় হইবে না। মাসীত রোজই আসেন, থ্রি চিয়ার্স কবে পান্?

বোন্-পোদিগের মধ্যে একজন বয়স্ক ব্যক্তি ছিলেন। বয়সে বড় ত নিশ্চয়ই, পদবীতেও বড় হইবার সম্ভাবনা। তাঁহার স্কন্ধ, তাঁহার বক্ষঃস্থল যে পদাধিকার বলেই সুশোভিত, সেটুকু বুঝিতে পারিব না, আমরা কি এতই মূর্খ? তিনিই মাসীর পাশে পাশে চলিতে চলিতে বলিলেন, হেলেন রাহা সুইসাইড্ করলে কেন, বলতে পার মাসি?

মাসীর বদনমণ্ডল শুষ্ক—আম্‌সী হইয়া গেল; কণ্ঠতালু কাঠ ফাটিবার উপক্রম। অতিকষ্টে কহিলেন, সুইসাইড্!

কেন, তুমি শোন নি?

না। কবে? মাসীর পা দু'টি থরহরি কাঁপিতেছিল।

এতক্ষণ যিনি কথা কহিতেছিলেন, তিনি কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে, দুইজন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক বেশ জোর গলাতে বলিয়া উঠিল, হেলেন রাহা বেচারা সুইসাইড্ না ক'রে করেই বা কি! যতই যাই হোক্, বাঙ্গালীর ঘরের—

মাসী প্রথমাবধি বিচলিত হইয়াছিলেন, এখন চকিতে সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া—ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা হারাইয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন, ও সব কথা এখন কেন? এখন কেন? পরে হবে। বলিয়া মাসী মলয়ের একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিতে লাগিলেন। মাসীর বোন-পোরা গান ধরিয়া দিল

"এই যে ছিল
কোথায় গেল শৈবালনলিনী?"

আর এক দল বোন্-পো যাত্রা-দলের এ্যাক্টিং শুরু করিয়া দিল,

মাসী, তোরে করি রে বারণ
মোদের প্রাণে বধে—যেয়ো না অমন।

আর এক দল আর এক পর্দ্দা চড়াইয়া গাহিয়া উঠিল,

আমায় নাম হীরে মালিনী;
আমি থাকি রাধার কুঞ্জে,
কুব্জা আমার ননদিনী।

অপর একদল মাসীর হইয়া সকলের উক্তির জবাব দিল

নিত্যি নতুন রাজবাড়ী ফুল জোগাই কেমন করে?

মাসী চলিতেছেন, ইহারাও চলিতেছে, মাসী চরণের গতি বৃদ্ধি করিতেছেন, ইহারাও লম্বা লম্বা পা ফেলিতেছে। শেষ পর্য্যন্ত ইহারা যখন বিদ্যা-সুন্দর ছুঁড়িয়া মারিল, তখন মাসী—সম্ভব হইলে, পারিলে দৌড়াইতেন, কিন্তু সে ত আর সম্ভব ছিল না, প্রাণপণ শক্তিতে দ্রুততর চলিতে লাগিলেন! মলয়ের পক্ষে তাঁহার সহিত তাল রক্ষা করা অসাধ্য হইয়া পড়িতেছিল। সে অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে কহিল, ওরা অমন করছে কেন মাসী?

অগত্যা মাসীকে আবার মুখে হাসি আনিয়া, ন্যাকা সাজিয়া বলিতে হইল, আমাকে ওরা সব বড্ড ভালবাসে কি না?

এতক্ষণ খণ্ড খণ্ড দল খণ্ড খণ্ড ভাবে মাসীর সম্বর্দ্ধনা করিতেছিল, এবারে বোধ করি ঐক্যতান বাদন ও সমবেত সঙ্গীত জুড়িয়া দিল। এনামেলের মগগুলা হইল কাঁসি, চাবি হইল কাঠি, ঠং ঠং ঠং ঠং ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গীত ধ্বনিত হইল:

এমন কম্মো কে করেছে
মুচড়ে কলি—

মাসীর ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের ভাগ্য যে ঠিক এই সময়েই অল্প দূরে ক্যাম্পের অধিনায়ককে আসিতে দেখা গেল। সমবেত সঙ্গীত বন্ধ হইল। মাসী হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

অধিনায়ক অ-বাঙ্গালী, অধিকন্তু ভদ্রলোক। মলয়ের নাম ধাম বয়স ইত্যাদি এবং প্রভৃতি খাতায় লিখিয়া লইয়া, এগ্রিমেণ্ট সহি করিতে দিলেন। মলয় মাসীর পানে চাহিল। মাসী আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন, ও কিছু না কিছু না। একটা সই করে দাও; সবাই করে।

মলয় বলিল, পড়ে দেখবো না?

মাসী যেন ঈষৎ বিরক্ত, ঈষৎ ক্ষুণ্ণ; বলিলেন, পড়তে চাও পড়ো; কিন্তু কিছু নেই ওতে! এই সময় মত আসবো সময় মত যাবো, কথার অবাধ্য হবো না—

অধিনায়ক অ-বাঙ্গলায় মাসীকে কহিলেন, ক্যাপ্টেন সেন, উহাকে ঐটি পড়িতে দাও। ঐটি, উনি ইচ্ছা করিলে আজ বাড়ী লইয়া যাইতে পারেন কাল তখন—

ক্যাপ্টেন শৈবালনলিনীর মন ইহাতে সায় দিল না। মাসী বাস্তববাদী লোক। আজ যাহা করিতে পারা যায়, তাহা কালকের জন্য রাখিয়া দিতে তাঁহার প্রবল আপত্তি। বলিলেন, বাড়ী নিয়ে যাবার দরকার কি! এই খানে বসেই পড়ে নাও।

এমন ঘটনা পূর্ব্বেও ঘটিয়াছে, বাড়ীতে ঐ কাগজ খণ্ড লইয়া গিয়া মানুষকে মানুষই আর ফিরে নাই। মাসীর সে ভয় ছিল। কিন্তু তাহার প্রয়োজন হইল না। এই সময়ে, মলয়ের সমবয়সী, কেহ একটু বড়, কেহ বা একটু ছোট, টেনিস্ র‍্যাকেট হস্তে অধিনায়ক সকাশে আসিয়া আব্দারের স্বরে ইংরাজীতে কহিল, মহাশয় আমাদের আজও নূতন বল দেওয়া হয় নাই!—হ্যালো মোলোয়, হোয়াট ব্রিংস ইউ হিয়ার, এঞ্জেল?—গ্রাণ্ডিস্ হানা এই বলিয়

মলয়ের গলা জড়াইয়া ধরিল। জিজ্ঞাসা করিল, ভর্ত্তি হইবি? সে বেশ ত! হ' না।

মাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, গ্ল্যাডিস্ তুমি মিস চ্যাটার্জ্জিকে চেন নাকি?

গ্ল্যাডিস্ ইংরাজীতে বলিল, চিনি না? উই আর চম্স্! এক সঙ্গে ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছিলাম।

অধিনায়ক কহিলেন, কাল তোমরা অবশ্যই বল্ পাইবে; আমি ব্যবস্থা করিতেছি।

থ্যাঙ্কস্!—বলিয়া, গ্ল্যাডিস্ মলয়কে কহিল, বিকেলের দিকে কিন্তু ডিউটি নিস, বেশ এক সঙ্গে থাকবো। বলিয়া তাহারা যেমন নাচিতে নাচিতে আসিয়াছিল, তেমনই নাচিতে নাচিতে চলিয়া গেল; মলয় নিঃশব্দে কলম তুলিয়া এগ্রিমেণ্টে স্বাক্ষর দান করিল। গ্ল্যাডিস্ যানা যখন আছে, তখন ভয় কি! অধিনায়ক কহিলেন,থ্যাঙ্কস্। নিজে মলয়ের স্বাক্ষরের নিম্নে দস্তখত করিয়া হাসি মুখে কহিলেন, মিস্ চ্যাটার্জ্জি, আপনি আজ হইতেই কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। আপনার বেতন আশী টাকা, যুদ্ধ-ভাতা কুড়ী টাকা, স্থানীয় ভাতা কুড়ী টাকা—মোট একশত কুড়ি টাকা। তাহা ব্যতীত, আপনি ফ্রি রেশন পাইবেন। চাল, আটা, চিনি, ঘি—

মলয় মাসীকে বাঙ্গলায় বলিল, ও সব কবে পাব?

অধিনায়ক বাংলা না জানিলেও প্রশ্নটি বুঝিলেন; কহিলেন, প্রয়োজন থাকিলে আজই লইতে পারেন। ইচ্ছা করিলে আপনার মাহিনার কতকাংশও আজই অগ্রিম লইতে পারেন।

মলয়ের মাথা ঝিম ঝিম করিতেছিল। কথাগুলা বিশ্বাস করা কঠিন; মনে হয় যেন স্বপ্ন। তাহার চোখে বার বার জল আসিয়া পড়িতেছিল, অতি কষ্টে সে অশ্রুর গতিরোধ করিতেছিল।

মাসী এই সময়ে সদাশয় দয়ালু সরকার বাহাদুরের এক দফা প্রশস্তি গাহিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অল্পদূরমাত্র অগ্রসর হইয়াছেন, ক্যাম্পনায়ক মাসীকে থামাইয়া দিয়া মলয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন এ্যাডভান্স যদি পঞ্চাশ টাকা দেওয়া হয়, আপনি সন্তুষ্ট হইবেন ত?

মলয়ের চোখে আবার জল আসিয়া পড়িতেছিল, চক্ষু মুদিত করিয়া কহিল, আজ্ঞা হ্যাঁ।

মাসী বলিলেন, থ্যাঙ্কস বলতে হয় পাগলি।

বেশ, আপনি যাইবার সময় ক্যাশ হইতে টাকা লইয়া যাইবেন; আর আপনার রেসনও পাইবেন। কিন্তু মিস্ চ্যাটার্জ্জি রেসন লইবেন কিসে?

মাসী বলিলেন, সে আমি থলে টলে দেখে দেবো' খন।

ভাট্স্ অল রাইট, বলিয়া ক্যাম্পনায়ক মলয়ের করমর্দ্দন করিয়া, অন্য কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

মাসী মলয়কে লইয়া টেনিস লনে উপস্থিত হইতেই তৃতীয় অঙ্কে হৈ হৈ পড়িয়া গেল।

মাসীর একজন বোন-পো একেবারে ঘাড়ের উপরে পড়িয়া কহিল, ডার্লিং ইউ উইল বি মাই পার্টনার!

মলয় তিন পা পিছাইয়া গেল। বোন-পো আবার একটা কি কাণ্ড করিতে যাইতেছিল, মাসী তাহাকে ডাকিয়া কানে কানে কি কহিলেন; সে বলিল, আচ্ছা।

গ্ল্যাডিস্ সেখানে ছিল, বলিল, মলয়, খেলবি?

মলয় বলিল, আজ না, আজ এখন বাড়ী যাব।

মাসীর অন্য এক বোন-পো কহিল, এখনই বাড়ী যাবে? আমাদের প্রাণে মেরে বাড়ী গিয়ে কি সুখ পাবে বিধুমুখী!

মাসী তাহাকেও সরাইয়া লইয়া গেলেন; কি বলিলেন, সে বলিল, ও-কে!

কিন্তু আচ্ছা বলিলে কি হইবে! এত বড় একটা মহোৎসবে উল্লাস প্রকাশ না করিয়া কে থাকিতে পারে? মাসী কাহাকেও ডাকিয়া লইয়া গিয়া পরামর্শ দেন, কাহাকেও বা চক্ষু টিপিয়া নিরস্ত করেন, কাহাকেও দস্তুরমত ধমকে দেন। মলয়ের কিন্তু এই সকল কথায় মন দিবার মত অবসর ছিল না। কতক্ষণে টাকাটা পাইবে, চাল ডাল পাইবে—আর সে সমস্ত লইয়া গিয়া মা'র পায়ের কাছে নামাইতে পারিবে, সে তাহাই ভাবিতেছিল। মিনিট দশেক না কাটিতেই বলিল, মাসি, আজ আমি বাড়ী যেতে পারি না?

মাসী এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, বাড়ী যাবে? তা বেশ, চলো; তোমায় বার ক'রে দিয়ে আসি।

বোন-পো'র দল আর একবার কোলাহল করিয়া উঠিল, কিন্তু মাসী কঠিন মাষ্টার মহাশয়ের মত কঠোর হইয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিলেন।

ক্যাপ্টেন শৈবালনলিনী দক্ষ সৈনাধ্যক্ষ। যুদ্ধে কখন্ অগ্রসর হইতে হয়, কখন্ বা পশ্চাদপসরণ করিতে হয়, সিঙ্গাপুর হইতে কোহিমা ইম্ফল ষ্ট্রাটেজি মাসী ভালই বুঝেন। বুঝিলেন, প্রথম দিনে আর অধিক দূর অগ্রগমনের চেষ্টা না করাই সঙ্গত। মলয়কে বলিলেন, বাড়ী যাবি ত চল্ তোর রেশন টেশন ঠিক ক'রে দিই গে!

মাসী তাহাকে লইয়া অনারেব্লি রিট্রিট করিলেন। একটা পৈশাচিক অট্টহাস্য উঠিল বটে কিন্তু সে যেন কিছুই নয়, বর্ত্তমানের সহিত কোনই সংস্রব নাই, এইভাবে চলিয়া গেলেন। চলিতে চলিতে মলয় বলিল, মাসী লোকগুলো ভারি অসভ্য!

অসভ্য নয় রে, অসভ্য নয়, আমোদবাজ! আমোদবাজ! আমোদ আহ্লাদ ক'রেই কাটাতে চায়। ঘর নেই, দোর নেই, আত্মীয়স্বজন নেই, একটা মিষ্টি কথা বলবার কেউ নেই, অসুখ-বিসুখ হ'লে মাথায় হাত বুলিয়ে দেবার লোক নেই—

মাসীর কথাগুলা মলয়ের চিত্তপটে যেন চিরিয়া চিরিয়া কাটিয়া কাটিয়া প্রবেশ করিতেছিল। এই শৈবাল মাসী, এই ক্যাম্পটা হইতে তাহার মন তখন কতদূরে—বহু দূর দেশে এক অসুস্থ সৈনিকের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার মাথায় মুখে গায়ে হাত বুলাইতে বসিয়া গিয়াছিল। তাহার সমস্ত অসুখ, সমস্ত গ্লানি, সমস্ত যন্ত্রণা সে যেন তাহার পেলব কোমল করতল দিয়াই উপশম করিয়া দিতেছিল। আর কি সে তৃপ্তি, কি সে সুখ, কি সে আনন্দ! দুইটি চক্ষু আনন্দধারায় তাহার মুখখানিকে ভাসাইয়া দিতেছিল।

মা বলিলেন, কেন এমন কাজ করলি মা?

মলয় বলিল, তোমার কষ্ট যে আর চোখে দেখতে পারিনে মা!

সুনীলা হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ রে বৌ, যা শুনছি, সত্যি?

মলয় বলিল, সত্যি নীলা সত্যি! আজ সে আর আমি এক। আজ সেই গানখানা গাইতে ইচ্ছে হচ্ছে। আচ্ছা নীলা, বেতারে কত লোক গান করে, কত দেশের লোক তাই শোনে। আমি যদি গাই, সে শুনতে পাবে না?

সুশীলার বিদ্যায় এ কথার উত্তর কুলায় না; বলিল, কাল সকালে বলবো। তাহার স্বামী কলেজের প্রফেসার। আজ এখানে রাত্রি বাস করিবেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কাল বলিবে।

মা অত্যন্ত সঙ্কোচভরে, বড় ভয়ে ভয়ে যেন আপনাকে আপনি প্রশ্ন করিলেন, সুধীন শুনলে কি ভাববে আমি শুধু তাই ভাবছি মা! যাবার দিন বললে, ছত্রিশ জাতের ছোঁয়া খেয়ে জাতটা একটু খাটো করতে যাচ্ছি জ্যেঠিমা! বেশী দেরী হবে না! মাঝখান থেকে তুই এ কি ক'রে বসলি বাছা?

মলয় বলিল, আমার অনেক দোষ সে ক্ষমা করতে পেরে থাকে যদি, এটাও পারবে।

সুধীনের সঙ্গে সেই যে শেষ কয়দিন লুকাচুরি খেলছিল, সেই কথাগুলাই মলয়ের চিত্ত আড়ষ্ট করিয়া ফেলিতেছিল।

[আগামী বারে সমাপ্য।]

দেশপ্রেম

শ্রীসুবোধ রায়

ভীষণ সংঘর্ষ। রেল লাইনে নয়, ট্রেণে ট্রেণে নয়। ট্রেণের ভিতরে—মানুষে মানুষে—ভীষণ সংঘর্ষ!

মফঃস্বল শহরে বাস করি, কলকাতা থেকে ত্রিশ মাইলের মধ্যে। বাড়ী থেকে আপিস করি—ডেলি প্যাসেঞ্জার। আজকালকার দিনে রোজ ট্রেনে যাতায়াত—সে যে কি দুর্য্যোগ ও দুর্ভোগ, ভুক্তভোগী ভিন্ন বুঝবেন না। অধিকাংশ দিনই দাঁড়িয়ে আসতে হয়। সেদিন তাই ফেরবার পথে সাম্‌নের ট্রেনটা ছেড়ে দিয়ে পরের ট্রেনে উঠলাম। তখনও গাড়ি খালি—ধারের দিকে বেঞ্চির কোণ দখল ক'রে আরামে বসলাম। দেখতে দেখতে কম্পার্টমেণ্ট ভ'রে গেল। কেবল আমাদের বেঞ্চে তখনো একজনের মত জায়গা খালি। পাঁচ মিনিটের ঘণ্টা, তারপর ছাড়বার ঘণ্টা পড়লো। গার্ডের হুইস্‌ল ও ট্রেনের বাঁশী বাজলো—ট্রেন ন'ড়ে উঠ্‌লো। এমন সময়ে দু'দিকের দরজা দিয়ে দু'জন যুবক লাফিয়ে গাড়ীতে ঢুক্‌লো। দু'জনেরই শ্যেনদৃষ্টি একবার সমস্ত গাড়ীটায় চোখ বুলিয়ে নিলে। অভ্যস্ত চোখ—একসঙ্গেই ঐ খালি জায়গাটা দেখেছে। দু'জনেই একসঙ্গে ছুটে এলো দু'দিক্ থেকে। দু'জনেই সারা গাড়ি প্রকম্পিত ক'রে চীৎকার ছাড়লো—"জয় হিন্দ্"—আর জায়গাটি দখলের জন্য দিল লাফ্। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ সংঘর্ষ—কপালে কপালে। সে কি আওয়াজ! সবাই ভীত ও সন্ত্রস্ত—ভাবলে, বেল ফাটা হ'লো বুঝি দুটো মাথা!

দুজনেই সুস্থ, সবল, জোয়ান-চেহারার। দু'জনের কপালই সঙ্গে সঙ্গে সুপুরির মত ফুলে উঠেছে—এক জনের সামান্য রক্ত চোয়াচ্ছে। কিন্তু সেদিকে কারও ভ্রূক্ষেপ নেই। দুই যুদ্ধমান্ বলীবর্দ্দের মত পরস্পরের দিকে রোষ-কষায়িতলোচনে চেয়ে স্থির হ'য়ে রইলো দাঁড়িয়ে। তারপরই আরম্ভ হোলো—উভয়েরই কণ্ঠস্বর সপ্তমে: বলি, এর মানে কি?

আমিও ঐ কথাই জিজ্ঞাসা করতে চাই।

জয় হিন্দ্—জয় হিন্দ্। মানে বোঝো?

আমারও ঐ একই প্রশ্ন।

মুখে জয় হিন্দ্—এদিকে গাঁয়ের বন্ধুকে বসবার জায়গা ছেড়ে দিতে বুক ফাটে!

বুক নয়—মাথা!

বদমাইসী ক'রে আবার রসিকতা! আজ তোর রস নিঙড়ে বার ক'রবো।

লে, লে সব শা—ই সব করে!

শাট্ আপ—ডেভিল।

মুখ সাম্‌লে—সোয়'ইন্ কোথাকার। দু'জনেই সিংহবিক্রমে পরস্পরের ঘাড়ে লাফিয়ে প'ড়লো।

পাঁচ-সাতজনে মিলে ছাড়িয়ে নিয়ে দু'জনকে যখন আলাদা ক'রে বসানো হোলো, তখন দেখা গেলো দু'জনেরই জামাকাপড় ছিঁড়েছে।

আধ ঘণ্টা সব চুপচাপ। দু'জনে দু'দিকে চেয়ে সিগারেট খাচ্ছে। খবর নিয়ে জানলাম—একই গাঁয়ের একই পাড়ার ছেলে—দু'জনের বিশেষ বন্ধুত্ব।

যাঁরা ছাড়িয়ে দিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন এতক্ষণে কথা কইলেন,—দেখুন তো কাণ্ড! এই বাজারে না-হক জামাকাপড় সব ছিঁড়লেন!

তারপর, পাশেই যেটি ব'সেছিলেন, তাঁর জামার কাপড় পরীক্ষা ক'রে ব'লে উঠ্‌লেন—

এই বাজারে এত ফাইন ছিট পেলেন কোথায় মশাই?

উত্তর এলো অপর যুবকের কাছ থেকে—

ছিটের ভাবনা কি ওদের? জানেন! খুড়ো পোর্ট কমিশনারে চাকরী করে। এক একটা বিলিতী জাহাজ আসছে, আর থান থান বাড়ীতে ঢুকছে!

প্রতিপক্ষকে একবার বক্র দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে প্রশ্নকারীর দিকে চেয়ে পাশের যুবকটি বিদ্রূপের স্বরে বল্লে—

চালুনি আবার ছুঁচের নিন্দে করে! ওর দাদা রেলি ব্রাদার্সকে ফাঁক ক'রে দিলে মশাই, ফাঁক ক'রে দিলে। বাড়ী যান ওদের—একতলা থেকে তিনতলা দেখে আসুন। কাপড়, জামা, বিছানা, বালিশ—সব বিলিতী। এক টুকরো দেশী ছিট যদি বার ক'রতে পারেন তো কান কেটে ফেলে দেব।

দেশের ষ্টেশন এসে গেছ্‌লো—নেমে প'ড়লাম।

খাসিয়া পাহাড়ের কথা

শ্রীবিষ্ণুপদ কর

ভারতবর্ষের মধ্যে আসাম সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বরা ও শস্যশালী ভূমি। অহম্ জাতির নাম হইতে এই স্থানের নাম আসাম হইয়াছে। প্রাচীনকালে এই স্থানের নাম কামরূপ বা প্রাগ্‌জ্যোতিষ ছিল। মহাভারতে ইহা পরশুরামের তীর্থ "লোহিত্য" বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অতি প্রাচীনকালে ইহার সকল স্থানে কিরাত জাতির বাস ছিল; এবং মহারাজ নরক তাহাদিগকে তাড়াইয়া এই স্থান অধিকার করেন।

রেস্ কোর্স—শিলং

শিলং এই আসাম প্রদেশের রাজধানী। পূর্ব্বে শিলং খাসিয়া, চেরাপুঞ্জি ও জয়ন্তিয়া, পার্ব্বত্য প্রদেশের নগর ছিল। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৯০০ ফিট উর্দ্ধে, অক্ষাংশ ২৫°৩২´৩৯´´ উত্তরে ও দ্রাঘিমা ৯১ ৪৫´ ৩২´´ পূর্ব্বে এবং গৌহাটি হইতে ৬৪ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

ইংরাজী ১৮৬৩ খৃঃ এই সহরটী খাসিয়া নেতার নিকট হইতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ক্রীত হয়। ইংরাজী ১৮৭৪ খৃঃ আসামের রাজধানী শিলং-এ স্থানান্তরিত হয়। পূর্ব্বে মনুষ্য-পৃষ্ঠে আরোহণ

ডন্ বস্‌কো ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্কুল—মাইমোঞ্চা, শিলং

করিয়া শিলং-এ যাওয়া ছাড়া আর কোন গত্যন্তর ছিল না। বর্ত্তমানে শিলং পর্য্যন্ত বাসে যাতায়াতের সুবিধা হইয়াছে। স্থানটিকে সর্ব্বপ্রকারে বাসোপযোগী ও মনোরম করিবার নিমিত্ত সরকার বাহাদুর অজস্র অর্থব্যয় করিয়াছেন। পূর্ব্বে এই স্থানের দৈর্ঘ্য ৭ মাইল এবং প্রস্থ ১।০ মাইল ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে উভয়দিকেই এই সহরের বিস্তার লাভ হইয়াছে। সমীপবর্ত্তী পর্ব্বতনিঃসৃত ঝরণা হইতে সহরে পানীয় জল সরবরাহ হইয়া থাকে।

শিলং বেশ সুখ-শীতল মনোরম স্থান। উত্তাপ কদাচিৎ

ওয়ার্ড লেক—শিলং

৮০°র উপরে উঠিয়া থাকে। শীতকালে তুষারকণা জমিয়া থাকে কিন্তু কখনও বরফপাত হয় না। গড়ে বৎসরে ৮৭·৮৪´´ পরিমাণ বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে।

শিলং রাজধানীর অদূরে শিলং নামে একটী পর্ব্বত শ্রেণী আছে, ইহার সর্ব্বোচ্চ শিখর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৬৪৫০´ উচ্চ এবং এ দেশে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর স্থান আর নাই। ইহার শিখরদেশ অরণ্যে সমাচ্ছাদিত। প্রকৃতপক্ষে এই পর্ব্বতের নামই শিলং কিন্তু বর্ত্তমানে যে স্থান শিলং বলিয়া পরিচিত, তাহার প্রকৃত নাম লাবান্।

চেরাপুঞ্জি যাইবার পথে চেরাপুল

"Shillong Municipality lies partly in British Territory and partly in the Khasi State of Mylliem,

মউস্‌মাই জলপ্রপাত—চেরাপুঞ্জি

Although the exact area of the whole of the Khasi and Jaintia Hills is known the exact area

রোপ্‌ওয়ে—চেরাপুঞ্জি

of the British portion of the District and the area of the Khasi States portion are not known as the boundaries between the two have never been precisely defined"

পূর্ব্বে এই শিলং-এ ২৩টি স্বাধীন রাজা রাজত্ব করিত। ইহার লোক সংখ্যা ১১ লক্ষ, আয়তন ইংলণ্ডের সমান। এখানে ৬৪ টি প্রকারেরও অধিক ভাষা ব্যবহৃত হয়। ইহা একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। ১৮৯৭ খৃ: শিলং প্রবল ভূমিকম্পে সহরের অত্যন্ত ক্ষতি হওয়াতে আসামের সমস্ত বাড়ীগুলি জাপানী ষ্টাইলে কাঠের ফ্রেম, করগেট টিন, প্লাষ্টার ইত্যাদি দ্বারা প্রস্তুতের প্রথা প্রচলিত হয়। বাস্তবিকই শিলং শহরটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। পাণ্ডু হইতে ৭৫ মাইল পাহাড়ের উপর দিয়া বাসে করিয়া যাইতে হয়। সহরের মধ্যস্থলে পুলিশ বাজার নামে একটি স্থান আছে এবং ইহার নিকটেই Legislative Assembly Legislative Council বিল্ডিং অবস্থিত। এখানে শিলং ক্লাব নামে একটি প্রসিদ্ধ ক্লাব আছে। ইহার পার্শ্বেই সেক্রেটারিয়েট, সম্মুখে পোষ্ট আফিস ও ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক।

শিলং ক্লাব

পশ্চিমে ওয়ার্ড লেক নামে একটি প্রসিদ্ধ লেক আছে। সহরের দক্ষিণ পূর্ব্বে প্রায় ৫ মাইল দূরে 'হ্যাপি ভ্যালি' নামক একটি উপত্যকা আছে। ইহা একটি সুন্দর স্থান।

৫০০০´ উচ্চে শীতল পাহাড়ে পাইন ও নানাবিধ ফল ও ফুলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে শোভিত দেশটি সকলের নিকটই আনন্দদায়ক এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এ দেশীয় আদিম অধিবাসীদিগকে খাসি বলে। ইহাদের আচার ব্যবহার একটু অদ্ভুত ধরণের। স্ত্রীলোকেরা পুরুষ অপেক্ষা সর্ব্ববিষয়ে অগ্রগণ্য। স্বাস্থ্য ও গাত্রের বর্ণ অত্যন্ত নয়নমুগ্ধকর। ইহারা অত্যন্ত পরিশ্রমী। চাষ করাই ইহাদের প্রধান কাজ। ইহারা নিজেরাই বহুদূর হইতে পিঠে করিয়া তরী তরকারী ইত্যাদি বহন করিয়া বাজারে লইয়া আসে ও বেচাকেনা করে। দিনের বেলায় ইহারা কখনও স্বামীর সহিত পথে বাহির হয় না। ইহাদের বিষয়-সম্পত্তি বংশের ছোট মেয়ে পাইয়া থাকে। মেয়েদের সংখ্যা পুরুষ অপেক্ষা অনেক বেশী। পুরুষেরা তীর ধনুক লইয়া বাঁকে বাহির হয়। প্রায় সকলেই এখানে নিজে পরিশ্রম করে, কাজেই

হ্যাপি-ভ্যালি—শিলং

দুর্ভিক্ষ ও বেকার সমস্যা নাই বলিলেই চলে। মেয়েরা তাহাদের সন্তানাদি পিঠে বাঁধিয়া যাবতীয় ভারী কাজ সম্পাদন করে। এ দেশীয় মেয়েরা অত্যন্ত লাজুক। ইহাদের ভাষা, খাসি ভাষা। বুঝা অত্যন্ত শক্ত। আজকাল অনেকেই খৃষ্টান হইয়া যাওয়াতে কিছু ইংরাজী ভাষার চলন হইয়াছে। ১৮৪১ খৃঃ ওয়েলস ক্যালভিনিসটিক মেথডিষ্ট মিশন চেরাপুঞ্জী পাহাড়ে তাহাদের প্রথম প্রচার কার্য্য চালায়। খাসিয়া, জয়ান্তিয়া ইত্যাদি মিলিয়া প্রায় ১০৪৩০০ জন লোক উপস্থিত খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে।

Doctor Gordon Robert, C. I. E, শিলং-এ একটি অতি বৃহৎ মিশন হাঁসপাতাল করিয়া দিয়াছেন। অসংখ্য পার্ব্বতীয় খৃষ্টান এই স্থানে স্থান পায়। শিলং-এ Catholic Mission ১৮৮৯ খৃঃ স্থাপিত হয়। আসাম প্রদেশের শিলং সহরটি এই মিশনের Head Quarters। ১৯৩৬ খৃঃ পুরাতন Cathedral আগুনে পুড়িয়া যাওয়ায় নূতন Cathedral তৈয়ারী হয়। উহার উপর হইতে সম্পূর্ণ দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। Oratory

বড় বাজার—শিলং

গীর অত্যন্ত প্রসিদ্ধ, ইহা এই Cathedral-এর নিকটেই অবস্থিত। ইহা ছাড়া শিলং-এ Saint Mary Convent Saint Mary College, Loretta Convent, Saint Anthonis High School ও College, Saint Aidmandos European High School ও College, Donbosco Industrial স্কুল লাইমোখ্রা নামক স্থানে অবস্থিত।

লাবন্ একটি বেশ মনোরম স্থান। বাঙ্গালীর এই স্থানে বসবাস করেন। ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় মহাশয়ের একটী সুন্দর বাড়ী আছে এখানে। গ্রীষ্মের সময় প্রায়ই তিনি এখানে আসিয়া বাস করেন। শিলং-এ বহু জলপ্রপাত আছে। শিলং হইতে গৌহাটি যাইবার রাস্তায় 'বিডন বিশপ' নামে দুইটী জলপ্রপাতের সংযুক্ত স্থান হইতে সারা খাসিয়া পাহাড়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। এখানে একটী Race Course আছে।

শিলং-এর চিরাপুঞ্জী পাহাড়ে না গেলে খাসিয়া পাহাড়ের
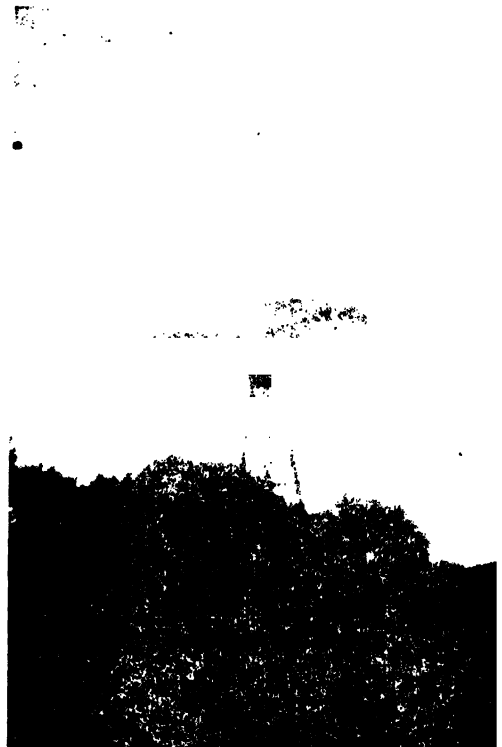
রোপ ওয়ে—চেরাপুঞ্জি

সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা যায় না। পথের দৃশ্য বাস্তবিকই অত্যন্ত সুন্দর। নানাবিধ ফলফুল ইত্যাদির গাছে পথটি শোভিত।

প্রসিদ্ধ চিরাপুঞ্জী পাহাড় শিলং হইতে .. মাইল।

সেণ্ট্ মেরী কলেজ—লাইমোখ্রা, শিলং

কাটিয়া রাস্তা তৈয়ারী আছে; বাসে করিয়া যাইতে হয়। পৃথিবীর মধ্যে এত অধিক বৃষ্টিপাত আর কোথায়ও হয় না।

গড়ে ৪২৯″ বাৎসরিক। ১৯৩৩ সালে ৬৩০″ ও ১৮৬১ সালে ৯০৬″ পর্য্যন্ত রেকর্ডে পাওয়া যায়।

চিরাপুঞ্জীতে একটি পোষ্ট আফিস আছে, এই পোষ্ট আফিসে বৃষ্টির রেকর্ড লওয়া হয়। পোষ্ট আফিসের নিকটে David Scott

রামকৃষ্ণ মিশন—শিলং

নামে একজন বিখ্যাত বৃটিশ অফিসারের মনুমেণ্ট আছে। ইনিই সর্ব্বপ্রথম খাসি নেতার নিকট সন্ধি স্থাপন করেন। পোষ্ট আফিসের সম্মুখে বহু প্রাচীন ইউরোপীয়ানদের কবর আছে। চিরাপুঞ্জীতে তিনটি Gorge (পাহাড়ের মধ্যে দিয়া সরু পথ) আছে।

১নং Nongpriang Gorge: ওয়েলস্ মিশন্ বাংলোর সম্মুখে Nonggawlia গ্রামের উপর হইতে ভাল ভাবে দৃষ্টিগোচর হয়।

২নং Mawsmai Gorge and Falls: পোষ্ট আফিস হইতে প্রায় আড়াই মাইল দূরে অবস্থিত। বর্ষার সময় প্রায় ২০০০ হাজার ফুট উচ্চ হইতে এই জলপ্রপাত আরম্ভ হয়। এই স্থানটি প্রায় অধিকাংশ সময়ে কুয়াশাচ্ছন্ন থাকে। ইহা পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় জলপ্রপাত বলিয়া খ্যাত।

৩নং Mawmluh Gorge: চিরাপুঞ্জির পুলিশ ষ্টেশনের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। এইস্থানে বহু কমলালেবুর চাষ হয়। দূর হইতে ইহার দৃশ্য অতি মনোরম।

এইস্থানে দুইটি প্রসিদ্ধ Cave আছে—Mawsmai Cave ও Damum Cave। Mawsmai Cave অত্যন্ত গভীর। Lt. Jule স্বচ্ছন্দে ৩০০′ ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিলেন পরে তৈলের অভাবে ফিরিয়া আসেন।

চিরাপুঞ্জী যাইতে হইলে সঙ্গে খাদ্য লইয়া যাওয়া উচিৎ, কারণ এইস্থানে কোন Canteen এর ব্যবস্থা নেই।

পুলিশ ষ্টেশনের সম্মুখে একটী ডাক বাংলা আছে। রাত্রে থাকিবার ব্যবস্থাও আছে। রামকৃষ্ণ মিশন ও স্কুল এইস্থানে একটী দেখিবার জিনিষ। বহু ছাত্র এখানে বসবাস করেন।

চিরাপুঞ্জী পাহাড় হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল তফাতে Rope-way নামে একটি Power Station আছে; ভোলাগঞ্জ হইতে (প্রায় ১৪ মাইল) পাহাড়ের উপর দিয়া নির্ম্মিত তার চলিয়া গিয়াছে। কয়লা, চাল, মাছ, তরীতরকারী ইত্যাদি এই Rope way দিয়া যাতায়াত করে। ইহা কোন এক আমেরিকান সাহেব ১৯৩০ খৃঃ সম্পূর্ণ করেন। ইহাও একটি দেখিবার জিনিষ। মোটের উপর খাসিয়া পাহাড়টি একটি অতি স্বাস্থ্যকর মনোমুগ্ধকর স্থান এবং ইহার মনোরম প্রাকৃতিক

ক্রোনাইল্ ফল্স্
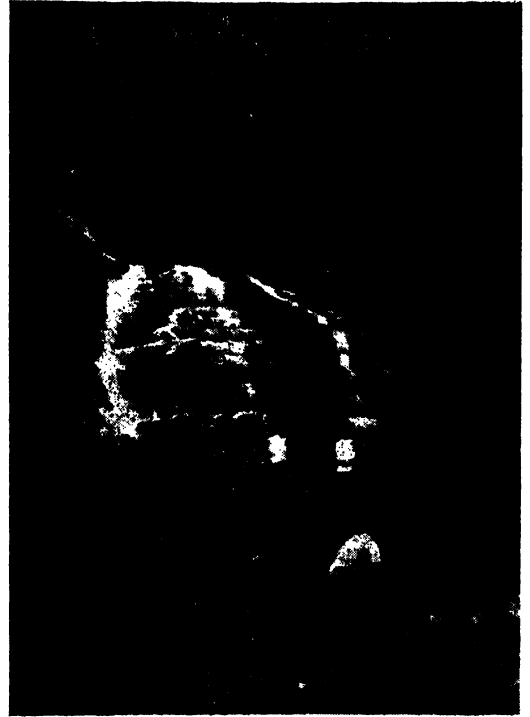
সৌন্দর্য্য দেখিয়া যে সকলেই মুগ্ধ হইবেন, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

(প্রবন্ধাগর্ত চিত্রাবলী লেখক কর্ত্তৃক গৃহীত।

শেষ অঞ্জলি

শ্রীরমেন মৈত্র

সন্ধ্যে হ'তে খুব বেশী আর দেরী নেই। শীতের বেলা সমাপ্তির দিকে দ্রুত গড়িয়ে যাচ্ছে। একটু পরেই রাস্তায়, দোকানে, বাড়ীতে, বাজারে জলে উঠবে আলো, মন্থর হ'য়ে আসবে নাগরিকের চলার গতি, স্বচ্ছ হ'য়ে আসবে ভিড় আর অস্ফুট হয়ে আসবে কোলাহল।

টাট্‌কা ফুলগুলো ঝুড়ি বোঝাই হয়ে জমীরের সামনেই পড়ে আছে। গোধূলির ম্লান আলো কোন্ একসময়ে উড়ে আসা একটা কালো মেঘের তলায় তলিয়ে গেছে। বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা। এলোমেলো হাওয়ায় ফুলের দল ও পল্লব কেঁপে উঠছে মাঝে মাঝে। শীতের প্রতাপটাই যেন সবচেয়ে বেশী। প্রতি দিনের মত দুপুর হ'তে বসে থেকেও জমীর কিছুটা ফুলও বিক্রী করতে পারে নি। আর বিক্রী করতে না পারা মানে ওর পক্ষে আজকের রাত আর কালকের সকালটা না খেয়ে থাকা। প্রত্যহের আয়ের ওপর যাদের নির্ভর করতে হয়, জমীরউদ্দিন তাদের মধ্যেই একজন।...ওর অনেকদিনের চেলা, ইয়ার সাদেক আলি অভয় দিচ্ছিল ওকে যে, ফুল বিক্রী হবেই।

জমীর হাস্‌লো, বল্‌লো, 'হোত, যদি সায়েব পাড়ায় যেতুম।' 'তবে তাই যা না।' বল্‌লো সাদেক, 'খাম্‌খা বসে থেকে লাভ কি।' একটা বিড়ি ওর দিকে এগিয়ে দিতে দিতে জমীর বল্‌লো, 'পাণি নামবে।' বলে একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে অনেকটা নিজের মনেই আবার বল্‌লো, 'কবরখানায় ফুল কি আর রোজ বিক্রী হয়! লোক আর মরছে ক'টা। জন্মাচ্ছেই শুধু।'

সাদেক উঠলো বাড়ী যাবার জন্যে। বল্‌লো, 'এখানে বেচ্‌তে না পারিস্ তো চ'লে যাস্ সায়েব পাড়ায়।'

'যাবো'খন।'

'একেবারে বেচ্‌তে না পারিস্ যদি আমার কাছেই চলে আসিস্। আজ ওখানেই থাকবি, বুঝলি।' সাদেকের কথায় আবদার ও আদেশ।

জমীরের অবস্থা ও জানে! উপবাসের কবল থেকে কতদিন ওকে বাঁচিয়েছে সে। কতবার উপদেশ দিয়েছে ফুল বিক্রী ছেড়ে অন্য ব্যবসা করতে। কিন্তু কোন উপদেশও জমীরের মনঃপূত হয় নি। ওর বাপ-ঠাকুর্দা যে ব্যবসা ক'রে জীবন কাটিয়ে গেছে, ও কি করে তা ছাড়তে পারে?

হয়ত তেমনি উপদেশ আবার শুনতে হোত, কিন্তু তা আর হোল না। একটা শবদেহ নিয়ে কারা এসে গোরস্থানে ঢুকলো। সাদেকের বাড়ী যাওয়া হোল না, দলটাকে লক্ষ্য করে সে ছুট্‌লো; জমীর কিছু ফুল যদি বিক্রী করতে পারে, তাহ'লে মন্দ কি। ঝুড়ির ফুলগুলো ঝেড়ে-চেড়ে জমীর বসলো ভালো করে। কাছাকাছি দ্বিতীয় ফুলওয়ালা কেউ নেই। ফুল যদি 'বকিয়ে যায় তো চড়া দামেই যাবে। ভাবনায় খানিকটা নিবৃত্তি তবুও। ওর বিশ্বাস কবর দিতে যারা আসে ফুল কেনাটা তাদের রীতি। এ-পদ্ধতিটা ও বরাবর লক্ষ্যও করে এসেছে। সাদেক ফিরে... এলো মুখে হাসি নিয়ে। বল্‌লে, 'বড়ো মক্কেল, বাছা বাছা ফুল চাই।'

'রজনীগন্ধা, গাঁদা, গোলাপ সবই আছে। ফুলের ভাবনা কি।' জমীরের খুসী আর যেন ধরে না।

'সবুরে মেওয়া ফলে, দেখলি তো।'

'দেখলুম।'

'চার পয়সার পিঁয়াজি খাওয়াস। বেজাউলের মতন মক্কেল আর পাবিনে।'

'শুনেছি পয়সা কড়ি আছে কিছু তার।'

'হ্যাঁ! বউটা ওর মারা গেছে দুপুর বেলায়।' বলে বস্‌লো সাদেক। একটা দম নিয়ে বল্‌লে, 'মরবে না আর। বউটার ওপর শাসন জুলুম কি কম ছিলো কিছু!'

'বলিস কি?'

'হ্যাঁ রে ভাই। চাবুক নিয়ে বউটাকে সে কি মার। কিন্তু মেহেরকে কেউ কোনদিন কাঁদতে দ্যাখে নি। মরেছে ভালোই হয়েছে।'

খানিকটা চুপ করে থেকে জমীর হঠাৎ বল্‌লে, 'ঠিক হয়েছে, বেশ হয়েছে, পয়সাওয়ালা লোকগুলো না মরলে আমরা পয়সা পাবো কি করে! মেয়েটার দেমাক ছিলো বড্ড বেশী। আল্লার বিচার। ওই যাঃ ভুলে গেছি। একেবারে একটা কথা।' থেমে গিয়ে জমীর সহসা বল্‌লে। সাদেক সচকিত হয়ে ফিরে দাঁড়ালো: 'কি কথা'।

'এক মেম সায়েবের কাছে ফুলের বায়না আছে। একবারে ভুলে গেছি, কি হবে?'

'হবে আর কি। এদের কিছু ফুল দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যা। এখনো সময় আছে, পাণি আসবে না। আজ চাঁদের রাত।'

'কিন্তু এর থেকে তো ফুল বিক্রী করা যাবে না। সব ফুলই তো তার চাই। তার মেয়ের না ছেলের যে জন্মতারিখ আজ।'

'তাইতো ফ্যাসাদে ফেল্‌লি। এ-কথাটা একটু আগে বল্‌লি নে কেন।'

'মনে ছিল কি ছাই? এক কাজ করা যাক্। ছাখ্, আমি এখান থেকে সরে পড়ি তারপর ওদের কাছে গিয়ে ব্যাপারটা খুলে বলে দে।' খানিকটা কি ভেবে সাদেক বল্‌লে, 'বেশ।'

জমীর আর দাঁড়ালো না। ফুলের ঝুড়িটাকে মাথার ওপর চাপিয়ে নিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারলো রাস্তায় নেমে মিনিট-খানেকের ভেতর মোড়ের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল। সাদেক বলছিল চাঁদের রাত—পাণি আসবে না। কিন্তু খানিকটা পথ অতিক্রম করে আসতেই হুড়মুড় করে বৃষ্টি নামলো। যে ক'টা লোক রাস্তার ওপরে ছিলো, চক্ষের নিমেষে তারাও আশ্রয় খুঁজে নিয়ে লুকিয়ে পড়লো। কেবল লুকালে না জমীর। ঝুড়িটাকে মাথার ওপর চাপিয়ে আগের মতই সে চলতে লাগলো। উদরের উগ্র ক্ষুধাকে যে অগ্রাহ্য করতে পারে, ঝড় বৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করাটা

তার কাছে কিছুই নয়। ওকে পথ অতিক্রম করে যেতে হবেই বৃষ্টির জলে তাজা ফুলগুলিকে মাথায় নিয়েও।

* * *

ওর বাবাও ফুল বিক্রী করতো। ওর মতনই ঝুড়ি বোঝাই ফুল নিয়ে সে যখন কবরখানায় যেতো, হাটে যেতো—যেতো সায়েব পাড়ায় আর সায়েবদের বাড়ীতে-বাড়ীতেও, তখনও বই খাতা নিয়ে স্কুলে গিয়ে আর পাঁচজন ছেলের মতই খেলাধুলো ও লেখাপড়া করতো। কিন্তু লেখাপড়া ওকে বেশীদিন করতে হয় নি। বুদ্ধিমান্ বাপ ওর স্কুল ছাড়িয়ে ওকে তার নিজের ব্যবসাতে টেনে নিলো। তারপর কালের চাকা আগের মতই ঘুরে চললো। আর সেই ঘুরন্ত চাকার তলায় ছাত্রজীবনের কান্নাহাসির দিনগুলো শৈশবের ছোটখাটো আবদার অভিমানগুলো চাপা পড়ে চূর্ণবিচূর্ণ হ'য়ে গেলো। ওর জ্ঞান হবার আগে থেকে ওর মা নেই, বাপও হটাৎ একদিন চক্ষু মুদিল।

কালের রথচক্রের ঘর্ঘর-ধ্বনি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু তাকে দেখা যাচ্ছে না। সেই ধ্বনি শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যায় জমীর। ফুল বিক্রী ক'রে শূন্য ঝুড়িটা নিয়ে শূন্য ঘরে ফিরে আসতে তার অনেকটা দেরীও হয়, তাই শুনতে হয় অভিযোগও।

'আজ বুঝি হাট-বার ছিলো?'

'হাট থাকবে কেন? কবরখানায় গেছলুম।' বলে জমীর।

'হেঁটে হেঁটে।'

'হ্যাঁ। গাড়ী ভাড়া দোব কোত্থেকে?'

'নাইবা গেলে কবরখানায়। ভয় করে না?'

'নাঃ, এখন বড় হয়ে গেছি ভয় নেই।' একটু থামে জমীর, তারপর আবার বলে, 'তা' ছাড়া কবরেই তো ফুল বেশী বিক্রী হয়। বাবাও তো যেতো।'

'তোমার বাবা যা করেছে তুমিও তাই করবে কেন?'

'করতে হয়। সে তুমি বুঝবে না।'

'একলা মানুষ তুমি। পয়সার দরকার তোমার এতো কেন?'

'এতোই।' বলতে বলতে অদ্ভুত এক ভঙ্গী ক'রে ঘরের ভেতর চ'লে যায় জমীর। মনে ওর দুষ্টু বুদ্ধি জাগে। একটা বড় লাল গোলাপ নিয়ে বেরিয়ে এসে বলে: 'শুনে যাও।'

'যাবো না তো। বুঝতে পেরেছি।'

'তর্ক আবার?'

'সত্যি রাত্তির হয়ে গেলে বাপজান ব'কবে।'

'মেহের!' ধমক দিয়ে ওঠে জমীর। মেহের তখন এক দৌড়ে বেরিয়ে গেছে।

টুকরো টুকরো স্মৃতি-বিজড়িত কিশোর বেলার দৌরাত্ম্য।

মেহেরউন্নিসাদের ইটের একতালা বাড়ীটা ছিলো ওদের ছোট কুড়ে ঘরটার পেছনেই। ওর পিতার কিছু সঞ্চিত অর্থও ছিলো আর ছিলো কিছু প্রতিপত্তি। ফুল দেওয়ার ব্যাপার নিয়েই আলাপ হয়েছিলো মেহেরের সঙ্গে। ছোটবেলার সাথী হলেও বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের মনে সাধারণতঃ যে ধরণের একটা কুণ্ঠিত ভাব এসে পড়ে, মেহেরউন্নিসার মনেও তাই আসছিলো ধীরে ধীরে। প্রথমটা ফুল নিতে ওর সঙ্কোচ হোত, কিন্তু মনের লোভ যেতো না কিছুতেই। শেষ পর্য্যন্ত লোভকেই প্রশ্রয় দিতে হোল দ্বিধাকে বিসর্জ্জন দিয়ে। দোদুল্যমান বেণীতে ওর, একদিন একটা মস্ত লাল গোলাপ গুঁজে দিলো জমীর। মেহেরের মুখ হ'য়ে উঠলো লাল। আর কালোর ওপর লালের বাহার চমকে দিলো জমীরের প্রাণ, দিলো ওকে সজাগ ক'রে। সেই জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে জমীরকে স্বীকার করতে হয়েছিলো যে, মেহের মুখের মতনই রঙীন হয়ে উঠেছে জমীরের সমস্ত তনুমন। তারপর সুরু হোল জীবনের সেই হঠাৎ সবুজ হয়ে ওঠা বনের পাতায় পাতায় প্রভাতের আলো-ছায়ার লুকো-চুরি। মনোরম কয়েকটা দিনের হিল্লোল। অনেক ভেবে জমীর স্থির করলো মেহেরকে সে সাদী করবে।

কিন্তু সাদী হওয়ার পথে বাধা অনেক। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলো। সাব্যস্ত হোল বিয়ে হ'তে পারে না। ফুলওয়ালার ছেলের সঙ্গে পয়সাওয়ালার মেয়ের বিয়ে হওয়াটা শুধু হাস্যকরই নয়, সামাজিক সভ্যতার বাইরে। পদ্ধতিটা অননুকরণীয় নিঃসন্দেহে। তাই জমীর দেখলো যে প্রাথমিক নির্য্যাতনের পরে মেহেরকে পাঠিয়ে দেওয়া হোল তার দৃষ্টি ও নাগালের বাইরে। ভারাক্রান্ত জীবনের কোলাহল-মুখরিত পথ জমীরের কাছে অত্যন্ত একটানা ও মামুলী। চারিদিকের এই কোলাহলের মাঝখান থেকে ওর কানে একদিন খবর এলো মেহেরের বিয়ে হয়ে গেছে।

পাড়াতেই ভালো ঘরে মেহেরের বিয়ে হয়েছে, ক্ষোভের কিছু নেই। মস্ত বড় একটা সুবিধে যে জমীরের সঙ্গে কোন কারণেও মেহেরের আর কোনদিন দেখা হবে না। জমীর কাজে মন দিলো। মাটি কোপালো, ফুল গাছের চারা কিনে এনে পুঁতলো, সকাল সন্ধ্যে সুরু করলো জল ঢালতে। দেখতে দেখতে বেড়ে উঠলো ফুলগাছ। নতুন পাতা হোল, কুঁড়ি ধরলো, অবশেষে ফুলও ফুটলো।

* * *

'ইস্! ভয়ানক ভিজে গেছে তো সর্ব্বাঙ্গ।'

একটু আগে সাদেককে সে ব'লে এসেছে যে, ফুল বিক্রী করতে সায়েব বাড়ী যেতে হবে। থমকে দাঁড়িয়ে ও ফিরে দেখতে চেষ্টা করলো সাদেক আসছে কিনা। দেখা গেল না। অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসে পৃথিবীর আলোকে গ্রাস ক'রে ফেলেছে। ও ফিরলো। সায়েব বাড়ী ও যাবে না। সাদেক ওর মিথ্যে কথাটা বুঝতেই পারেনি। তাকে ও ফাঁকি দিয়েছে আজ। আসলে ফুল আজ ও বিক্রীই করবে না কাউকে। কপাল থেকে জল ঝ'রে প'ড়ছে চোখের কোল বেয়ে গালের ওপর। সর্ব্বাঙ্গ হিম হ'য়ে যাবার মত শীত। বুকের মধ্যে কাঁপুনি লেগেছে ওর। পা আর চলতে চাইছে না। অদ্ভুত রকমের ক্লান্তিতে ওর দেহপ্রাণ আচ্ছন্ন। কিন্তু তবুও এখনও ওকে জলে ভিজতে হবে। আজ বিক্রীও হয়নি, উপার্জ্জনও হয়নি। না হোক ক্ষতি নেই। ফুল ও বিক্রী করবে না,

সাদেকের কাছেও যাবে না। শুধু ভিজবে। ক্ষুধা ওর নেই। অন্ততঃ আজকের রাতটা না খেলেও চ'লে যাবে ওর। অনশনে যারা মরে না, উচ্ছৃঙ্খলতায় তাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না। ওর ধারণা রোজ খাওয়ার অভ্যেস থাকাটা গরীবের ঠিক নয়। যে পথকে পেছনে ফেলে এসেছে, সেই পথকে ধ'রে আপাততঃ ওকে অনেকখানি হাঁটতে হবে আবার। সাদেক কি বুঝতে পারেনি ওর দুর্ব্বলতা একটুও!

জমীর চল্‌তে আরম্ভ ক'রে দিলো।

জনহীন গোরস্থানে ও যখন এসে পৌঁছোল, তখন বৃষ্টি থেমে গেছে, আর মেঘের মধ্যে দেখা যাচ্ছে ঘোলাটে চাঁদকে। সন্ধ্যের পরে এদিকটায় লোক চলাচল নেই একবারে। আস্তে আস্তে লুকিয়ে ও ঢুকে পড়লো কবরখানায়। একটা নিশাচর পাখী কিচিরমিচির শব্দ ক'রে ডানার ঝাপটে বিরক্তি জানিয়ে উড়ে গিয়ে আরেকটা গাছের ডালে বসলো। ঝিল্লীরব ছাড়া কিছুই শোনা যায় না। ঘুমন্ত আত্মাদের বুকে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে আছে গোরস্থান। অভিনয় শেষে পরিত্যক্ত মঞ্চের মত অবস্থা তার। চিরদিনের মত যারা ঘুমিয়ে পড়েছে, ওদের নিঃশ্বাস কি একটু শুন্‌তে পাওয়া যায় না? পাওয়া যায় না কি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে ওদের বুকের ওঠা-নামার শব্দ একটু শুন্‌তে! ঐ যেখানে একটা প্রদীপ জ্বল্‌ছে—যার তলায় কে যেন ঘুমিয়ে রয়েছে, তারও কি ঐ একই অবস্থা আর সকলের মত! কেন! কেন! জমীর এলো সেই প্রদীপের কাছে। দাঁড়ালো স্থানুর মত। এইটাই আজকের নতুন কবর এইটাই সেই মেহেরউন্নিসার। এ ছাড়া তো আর একটাও নতুন কবর নেই। পুরানোগুলো তো ওর চেনা। বল্‌তে গেলে সমস্ত গোরস্থানটাই তো ওর নখদর্পণে। এইতো। ওর ওপরে ফুল নেই। হয়ত মেলেনি, তাই প্রদীপ জ্বল্‌ছে। এরই তলায় ঘুমোচ্ছে মেহেরউন্নিসা। নতজানু হয়ে অতি সন্তর্পণে ঝুড়িটা উজাড় ক'রে ঢেলে ফুলগুলো ও বিছিয়ে দিলো কবরের ওপর। হয়ে গেলো প্রকাণ্ড পুষ্পশয্যা।

'কাঁদো, কাঁদো, মেহেরউন্নিসা। ঘুমের ঘোরে মানুষ যেমন হঠাৎ অদ্ভুতভাবে হেসে ওঠে, যেমন কথা কয়ে ওঠে, যেমন নড়ে ওঠে তেমনি ক'রে হাসো, কথা বলো, নড়ে ওঠো। ও কে! কে কাঁদে! আর্ত্তনাদ ক'রে! না, মেঘের ডাক! মেঘ কেন এখন ডাক্‌বে। আবার বৃষ্টি আস্‌বে বুঝি? আসে তো আসুক না।... এতো ফুল ছিলো ওর ঝুড়িতে! কত হ'তে পারতো এর দাম! ফুলগুলো যেন কাঁপছে কার স্পর্শ লেগে। মেহের ফুল ভাল-বাসতো। রেজাউল কি এখন ঘরে ব'সে চোখের জল মুছছে!'

আর তারপর জমীর যেন দাঁড়াতে পারলো না, হঠাৎ ব'সে পড়লো। ব'সে থেকেই শুনতে পেলো মেহের যেন কাঁদছে। ওর চোখেও জল এসে গেছে। সেকি ঠাণ্ডা বাতাস লেগে?

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীক্ষিতীশ দাশগুপ্ত

ঘুরিয়া ঘুরিয়া বছরের চাকা
পঁচিশে বোশেখ এলো,
খোঁপায় গুঁজিয়া টগরের কলি
ঝরা বকুলেরে এলো পায়ে দলি,'
চূর্ণ চিকুরে উন্মনা অলি
চাঁপার সুরভি পেল।

এই তো তোমারে ধরিয়া চরণ
ধরায় এনেছে করিয়া বরণ,
আজিকে আবার করিছে স্মরণ
মহান মহিমাময়ী।
মানব-স্রোতের আলোর ধারায়
শাশ্বত রবি রহিলে দাঁড়ায়ে,
তবুও ইহার নয়ন-তারায়
তিয়াসা মিটিছে কই?

তাইতো তোমার গাহি' জয় গান
স্নিগ্ধ করিব ক্ষুব্ধ পরাণ,
তব তিরোধান কাঁটার সমান
বিঁধিছে মরম তলে;

তোমার সৃজনী মায়ার পরশে
তৃষিত হৃদয়ে অমৃত বরষে,
পান করি সুধা বিষাদে হরষে
ভাসিচি নয়নজলে।

তোমারি প্রসাদে ভাষা ও ছন্দ,
সূক্ষ্মানুভূতি, পরমানন্দ,
অমল ভাবের কমল-গন্ধ
চিকচিত্ত অহরহ।
তাহারি কণিকা করি আহরণ
পূজিব তোমার রাতুল চরণ,
তুচ্ছ জনের অতি সাধারণ
অর্চ্চনাটুকু লহ।

গিরিশচন্দ্রের প্রফুল্ল

শ্রীকালিদাস রায়

বঙ্কিমচন্দ্র দেশীভাবাপন্ন অভিজাত-সম্প্রদায়ের, রবীন্দ্রনাথ উচ্চপাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের, শরৎচন্দ্র দরিদ্র অল্প শিক্ষিত বাঙ্গালীর সাহিত্যিক। আর গিরিশচন্দ্র মধ্যবিত্ত অর্দ্ধ শিক্ষিত সমাজের প্রতিনিধি সাহিত্যিক। বলা বাহুল্য, সাহিত্য সৃষ্টির উপাদান ও উপজীব্যের প্রাধান্যের দিক হইতেই এ-কথা বলিলাম। বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত গার্হস্থ্য জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখের কথা এত ব্যাপক ও বিস্তারিত ভাবে—এমন দরদের সহিত আর কোন প্রাক্তন সাহিত্যিকের রচনায় পাওয়া যায় না।

প্রফুল্ল নাটকের যোগেশ বলিয়াছে—

"আমার বিবেচনায় কলিকাতায় গৃহস্থ ভদ্রলোকমাত্রই দুঃখী, এই পাড়ায় দেখ চাকরি-বাকরি ক'রে আনছে নিচ্ছে, খাচ্ছে। যেই একজন চোখ বুঁজ্‌ল, অমনি তার ছেলেগুলি অনাথ হ'ল, কি খায় তার উপায় নেই।"

যোগেশ যাহাদের কথা বলিতেছে—গিরিশচন্দ্রের দরদ ছিল তাহাদের প্রতি অসীম। তাহাদের প্রাণের কথা তিনি নানা নাটকে রূপ দিয়াছেন। তাহাদের জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি সমস্ত খবরও তিনি রাখিতেন। সামাজিক নাটকে তিনি তাঁহার নিজস্ব অভিজ্ঞতার গণ্ডীর বাহিরে যান নাই। এই সতর্কতার যে সুফল তাহা তাঁহার সামাজিক নাটকগুলি পাইয়াছে। এই মধ্যবিত্ত সমাজের জীবনযাত্রায় এযুগে অনেকটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তাহার ফলে, গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলিকে বর্ত্তমান যুগের মধ্যবিত্ত সমাজের জীবনচিত্র বলা চলিবে না।

এই সমাজের লোককে আনন্দ দিবার জন্য, প্রধানতঃ তাহাদের জীবনযাত্রার মধ্যে যে-সকল অনাচার ও দোষক্রটী ছিল, গার্হস্থ্য জীবনে যে-সকল গলদ ছিল, সেইগুলির সংস্কারসাধনে পাঠক-গণকে সচেতন ও উৎসাহিত করিয়া সমাজহিতসাধনের জন্যই তিনি সামাজিক নাটকগুলি রচনা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর সমাজসংস্কার ও সমাজহিতসাধনে রঙ্গমঞ্চের দানের ও প্রয়াসের কথা বলিতে গেলে গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকগুলির নাম সর্ব্বাগ্রে করিতে হয়।

গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলির উপভোক্তাও ছিল প্রধানতঃ তাঁহার নাটকরচনার উপজীব্য সমাজের নরনারী। তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া, তাহাদের রুচিপ্রবৃত্তির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া গিরিশচন্দ্রকে নাটকগুলি রচনা করিতে হইয়াছে।

কবি, সমসাময়িক রুচিপ্রবৃত্তির প্রতি উদাসীন হইতে পারেন—ঔপন্যাসিক, অগ্রদূতরূপে পরবর্ত্তী যুগের সমাজের বার্ত্তা ঘোষণা করিতে পারেন। কিন্তু অভিনয়োপযোগী নাটকে নাট্যকার তাঁহার পারিপার্শ্বিক সমাজকে উপেক্ষা করিতে পারেন না। অভিজাতীয় বা অধি-জাতীয় সাহিত্যিকগণের রচনা সমসাময়িক সমাজের রুচিপ্রবৃত্তি ও নৈতিক আদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইতে পারে, কিন্তু জাতীয় সাহিত্যিকগণ যে সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, রুচিপ্রবৃত্তিকেই বাণীরূপ দেন, তাঁহাদের রচনা সে সমাজের রুচিপ্রবৃত্তি ইত্যাদির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং কতকটা পরিচ্ছিন্ন না হইয়া পারে না। গিরিশচন্দ্র ছিলেন জাতীয় কবি (National poet)। সেজন্য নাট্যরচনা তাঁহার নাট্যাভিনয়ের দর্শকগণের শিক্ষাদীক্ষা রুচিপ্রবৃত্তির দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত।

আপন সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ হিতসাধনকে লক্ষ্য করিয়া তিনি যে কয়খানি সামাজিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 'প্রফুল্ল' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গিরিশচন্দ্র তাঁহার চারিপাশের সমাজে যে-সকল নৈতিক অনাচার লক্ষ্য করিয়াছিলেন—তাহাদের মধ্যে তিনটিকে অবলম্বন করিয়া প্রফুল্ল নাটকে তিনপ্রকার চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। একটি—সুরাপান। যোগেশ-চরিত্রের মধ্যদিয়া তিনি সুরাপানের দারুণ কুফল দেখাইয়াছেন। তরলাগ্নির আঁচ লাগিয়া কেমন করিয়া 'সাজানো বাগান শুকাইয়া যায়'—তাহাই তিনি যোগেশ-চরিত্রের মধ্য দিয়া চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়াছেন। এমনও মনে হইতে পারে—অতিরিক্ত সুরাপানের বিষময় ফল দেখাইবার জন্যই প্রধানতঃ এই নাটকখানি রচিত।*

সে-কালের কোন কোন লোকের প্রফুল্ল নাটকে সুরাসক্তির শোচনীয় পরিণতি দেখিয়া চৈতন্য হইয়াছিল—এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয়।

তাঁহার সামসময়িক সমাজে বিলাতী আইনে দক্ষতা লাভ করিয়া অনেকে তাহার অপব্যবহার করিত। এই শ্রেণীর লোক সমাজে ও গার্হস্থ্য জীবনে নিশ্চয়ই একটা দারুণ উপদ্রব হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা আইনকেই অস্ত্রস্বরূপ আশ্রয় করিয়া বহু পরিবারের শান্তি, স্বস্তি নষ্ট করিত। ইহারা কৃতবিদ্য, কিন্তু "মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ।" আইনের খুঁটিনাটি জানিয়া বাঙ্গালী উকিল এটর্ণিরা দণ্ড এড়াইয়া কতদূর আইন ভঙ্গ করিতে পারিত—তাহা গিরিশচন্দ্র অতি প্রখর দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এই অভিনব উপদ্রবটিকে গিরিশচন্দ্র মূর্ত্তি দিয়াছেন রমেশে। রমেশের চরিত্র এতই কদর্য্য, এতই জঘন্য করিয়া গিরিশচন্দ্র অঙ্কন করিয়াছেন—যে পাঠক মাত্রেরই ঐ চরিত্রের প্রতি দারুণ ঘৃণা জন্মে। এইরূপ ঘৃণা ও জুগুপ্সার উদ্রেক করিয়া গিরিশচন্দ্র সমাজ-সংস্কারের দিকে পাঠকচিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছেন।

গিরিশচন্দ্রের সমসাময়িক সমাজে একান্নবর্ত্তিতা অতি সাধারণ ব্যাপার ছিল। এইরূপ পরিবারে অনেক সময় অন্ন-বস্ত্রের চিন্তা না থাকায় কোন কোন যুবক উন্মার্গগামী হইত, বিশেষতঃ যেখানে পরিবারের প্রধান উপার্জ্জক যদি উপার্জ্জনেই তদ্গত হইয়া থাকিতেন এবং আত্মীয়বাৎসল্যবশতঃ স্বজনপ্রতিপালক হইতেন। সেই পরিবারে পাকা গৃহিণী না থাকিলে কোন কোন যুবক স্বৈরাচারী হইয়া পড়িত। বিদ্যার্জ্জনে বিমুখতা, বেশ্যাসঙ্গ, সুরাপান ইত্যাদি এই শ্রেণীর যুবক-চরিত্রের অঙ্গ ছিল।

---

* 'অতিরিক্ত' কথাটা বলার উদ্দেশ্য—মাত্রানুযায়ী সুরাপানকে গিরিশচন্দ্র ততটা দূষণীয় মনে করেন নাই। 'মায়াবসানে'র কালীকিঙ্কর-চরিত্র গিরিশচন্দ্রের আদর্শচরিত্র। এই কালীকিঙ্কর মাত্রানুযায়ী সুরাপান করিয়াও গিরিশচন্দ্রের মতে মহাপুরুষ।

গিরিশচন্দ্রের সুরেশ এই শ্রেণীর চরিত্র। এইরূপ কর্ম্মবিমুখ অলস উন্মার্গগামী যুবকদের শোচনীয় পরিণতি দেখাইয়া গিরিশচন্দ্র সমাজের কল্যাণ সাধন করিতে চাহিয়াছেন।

একান্নবর্ত্তিতা বাঙলা সাহিত্যের একটি প্রধান উপজীব্য। সাধারণতঃ একান্নবর্ত্তী পরিবারে অশান্তি ও উপদ্রব ঘটায় বধূগণ ও তাহাদের শাশুড়ী, এই রূপই নানা গ্রন্থে চিত্রিত হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র প্রফুল্ল নাটকে দেখাইয়াছেন—প্রধানতঃ পুরুষদের মতিবুদ্ধির অনৈক্যই দুর্ঘটনা ঘটায়। হিন্দু-কুলবধূদের প্রতি গিরিশচন্দ্রের অগাধ শ্রদ্ধা এই নাটকে পরিস্ফুট হইয়াছে। একান্নবর্ত্তী পরিবারের পুরুষেরা যদি উপদ্রব না করে, তাহা হইলে একান্নবর্ত্তী পরিবারের শান্তিরক্ষা করিতে পারে আদর্শ গৃহিণী। প্রফুল্ল নাটকের সূত্রপাতেই নাট্যকার এই আদর্শ গৃহিণীর একটা পরিকল্পনা দিয়াছেন—

উমা—মা, এতদিন লক্ষ্মীর কৌটাটি আমার কাছে ছিল, আজ তোমায় দিলুম, তুমি যত্ন ক'রে রেখ, মা লক্ষ্মী ঘরে অচলা থাকবেন। তুমি এতদিন বৌ ছিলে, আজ গিন্নী হ'লে। দেওর দু'টিকে পেটের ছেলের মতো দেখো। সেজ বৌ-মাকে যত্ন ক'রো। মা, আপনার পর সব যত্নের, তুমি সেজ বৌ-মাকে যত্ন কর্‌লে তোমাকে মা'র মত দেখবে। আর নিত্যনৈমিত্তিক পাল-পার্ব্বণ বারব্রত যেমন আছে, সকলগুলি বজায় রেখ। এখন গিন্নী হ'লে সব দিক বুঝে চলো। বরং দু-কথা শুনো, তবু কাউকে উঁচু কথা বোলো না, কারো মনে দুঃখ দিও না। সকলের আশীর্ব্বাদ কুড়িও। আর কি বলব মা, পাকা চুলে সিঁদুর প'রে নাতির নাতি নিয়ে সুখে ঘরকন্না কর।

উমাসুন্দরীর মত অশিক্ষিতা অথচ স্বভাবতঃ সহৃদয়া হিন্দু-গৃহিণীর মুখে যে যে কথা যতটুকু স্বাভাবিক তাহাই দিয়া গ্রন্থারম্ভ হইয়াছে।*

যোগেশ চরিত্রের সামান্য অংশই আমরা দেখিতে পাই—তাহার অধিকাংশ সুরায় মগ্ন। যতটুকু আমরা দেখিতে পাই ততটুকুই বিচার্য্য।—অর্থাৎ যতটুকু Psychological গণ্ডীর মধ্যে ততটুকুই আলোচ্য—Pathology-র গণ্ডীতে যে অংশ পড়িতেছে—তাহা Rational Being-এর নয়। এই অংশই সমাজহিত সাধনে সহায়তা করিয়াছে। প্রকৃতিস্থ যোগেশের চরিত্রটিতে গিরিশচন্দ্রের চরিত্রাঙ্কন-ক্ষমতার ও অন্তর্দৃষ্টির প্রখরতার পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দু সংসারের সম্ভ্রান্ত গৃহকর্ত্তার একটা উদার আদর্শ আমাদের সমাজে বরাবর প্রচলিত ছিল। প্রকৃতিস্থ যোগেশ সেই আদর্শের প্রতীক। জননী উমাসুন্দরীর প্রতি যোগেশের সশ্রদ্ধ অনুযোগ তাহার চরিত্রের সংক্ষিপ্ত অভিব্যক্তি।

"প্রাণের জন্য? তুচ্ছ প্রাণ যেতই বা। না, তুমি কাঞ্চন ফেলে কাঁচে গেরো দিয়েছ। মান খুইয়ে প্রাণের দরদ করেছ। সমস্ত বেচে যদি আমার দেনা শোধ না হ'ত, আমি যদি জেলে যেতাম, যদি টাকার শোকে আমার মৃত্যু হ'ত, আমার মনে এই শান্তি থাক্‌ত—এ জীবনে আমি কারো সঙ্গে প্রবঞ্চনা করিনি। সে শান্তি আজ বিদায় দিয়েছি—আর ফিরবে না। বিশ্বাস ভঙ্গ ক'রে তার দোর খুলে দিয়েছি।"

এই পুরুষসিংহের পৌরুষ তাহার বিষয়-বুদ্ধিহীনতা ধ্বংস করে নাই,—ধ্বংস করিয়াছে সুরা।

যোগেশ যদি প্রকৃতিস্থ থাকিত, তাহা হইলে রমেশের ষড়যন্ত্র তাহার ক্ষতি করিতে পারিত, কিন্তু তাহাকে পথের ফকির করিতে পারিত না।

অপ্রকৃতিস্থ যোগেশ একটি composite character. অনেকগুলি মাতালের জীবনের খণ্ড খণ্ড অংশ যোগ দিয়া রচিত। সুরাপানের দুর্গতিতে Emphasis দেওয়ার জন্য এই composition.

রমেশও একটি composite character. অনেকগুলি আইনী-বিবরের সাপের বিষ একত্র করিয়া রমেশের দন্তে সঞ্চিত রাখা হইয়াছে। রমেশ একজন অর্ব্বাচীন এটর্ণি, আইনকে মারণাস্ত্র করিয়া প্রয়োগ করিবার এত দক্ষতা তাহার থাকিবার কথা নয়। রমেশ Individualistic character হইলে তাহার মধ্যে কিছু কিছু মনুষ্যত্ব থাকিত। কিন্তু সে বহু চরিত্রের কদর্য্যতার সমবায়। কেবল দুষ্টবুদ্ধি আইনজীবী নয়, খুনে, জালিয়াৎ ইত্যাদি ভীষণ প্রকৃতির লোকদের criminal propensity-ও তাহার মধ্যে সমাবিষ্ট করা হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র দেখাইয়াছেন—তথাকথিত বিদ্যা পৈশাচিক মনোবৃত্তিকে আরও শাণিতই করে—শমিত করে না।

এইরূপ অবিমিশ্র পৈশাচিকতা Romantic নাটকে অশোভন নয়—সামাজিক নাটকে কেবল কোন অবাস্তব উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই অবতারণা করা হয়।

বলা বাহুল্য সমাজসংস্কারক গিরিশচন্দ্র উদ্দেশ্যসাধনের জন্য এইরূপ চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। রমেশ কাপুরুষ, আইনের আশ্রয়ে ও অন্তরালে থাকিয়াই সে সমস্ত আক্রমণ চালাইয়াছে। তাহার দ্বারা বিষ প্রয়োগে খুনও অস্বাভাবিক নয়—কিন্তু অনেকের সাক্ষাতে পত্নীর গলা টিপিয়া মারা স্বাভাবিক নয়। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের মতে যে মানুষই নয়, হিংস্রজন্তু, তাহার পক্ষে কিছুই অস্বাভাবিক নয়।

নিদারুণ অর্থলোভ, নিজস্ব শক্তি-সামর্থ্যের দ্বারা অর্জ্জন করিতে না পারিয়া শঠতার দ্বারা পরস্বাপহরণের নেশা কেমন করিয়া মানবকে আত্মবিস্মৃত পিশাচ করিয়া তুলে, রমেশ-চরিত্রে নাট্যকার তাহা দেখাইয়াছেন। অর্থলোভ ও শঠতার জাল বিস্তারে কৃতিত্বের উৎসাহ রমেশের হৃদয়ের প্রত্যেক সুকুমার মনোবৃত্তি কবলিত করিয়াছিল—সুশীলা সুন্দরী পত্নীকেও সে ভালবাসিতে পারে নাই। Shylock-এর তবু Jessica ছিল, রমেশের অর্থ ছাড়া ত্রিসংসারে কেহই ছিল না। রমেশের চরিত্র নিরবচ্ছিন্ন পাপ

* সমস্ত নাটকের মূল সূত্র লক্ষ্মীর চাঞ্চল্য। লক্ষ্মী তাঁহার পেচকটিকে বাঁধিয়া চলিয়া গেলেন—এই কথাই নাটকের মূল কথা। উমাসুন্দরীর মুখে—"এতদিন লক্ষ্মীর কৌটা...অচলা হয়ে থাকবেন," এই বাক্যে নাটকের সূত্রপাত নাট্যকলাসঙ্গত। ইহাকেই বলে Classical Irony.

পরম্পরার নরকযাত্রা। এইরূপ চরিত্র কেবল নিরপরাধা প্রফুল্লর নয়, পাঠকের মনেরও শ্বাসরোধ করে।

প্রফুল্ল নাটকে আইন আদালতের বৈষয়িক (civil and criminal) জটিলতার অন্ত নাই। জানি না সেগুলি কত দূর যথাযথ—আইনজ্ঞ লোকেরা তাহার বিচার করিবেন। আমরা এ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্রের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দেখিয়া বিস্মিত হই।

সুরেশ চরিত্র স্বাভাবিক ভাবেই অঙ্কিত। তবে এ চরিত্র এখনো অপরিণত—তারুণ্যের জন্য সর্ব্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টি লাভ করে নাই। তাহাকে অবলম্বন করিয়া নাটকে জটিলতা বাড়িয়াছে—নাটকও অনেকটা আগাইয়াছে—কিন্তু সে নিজে সজ্ঞানে নাটকের বৈষয়িক জটিলতায় যোগ দেয় নাই—তাহার শক্তি ও বুদ্ধির অভাবে। নাটকের যৌগিকতায় সে অনেকটা catalytic agent-এর কাজ করিয়াছে। এই চরিত্রের বিন্যাসে Didactic Element-ই বেশী। সুরেশ জেলে যাইবার আগে তাহার বন্ধুকে উদ্দেশ করিয়া যে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছে—তাহার মধ্যেই didactic element-টা বিশেষ করিয়া পরিস্ফুট হইয়াছে। কথাগুলি বুদ্ধিহীন সুরেশের মুখের ঠিক উপযোগী নয়। এগুলি গিরিশচন্দ্রের নিজেরই মুখের কথা।

যোগেশের পত্নী জ্ঞানদা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক চরিত্র। স্বামী সুরাসক্ত ও বিপথগামী হইলে পতিব্রতা অশিক্ষিতা হিন্দু মহিলা যে কতদূর নিরুপায় ও অসহায় হইয়া পড়ে, গিরিশচন্দ্র তাহাই জ্ঞানদা-চরিত্রে দেখাইয়াছেন। হিন্দু সংসারে এই শ্রেণীর সাধ্বী-সতীদের এই দুঃখ সেকালে অনিবার্য্য ছিল—এ-কালেও তাহাদের দশা অনেকটা এইরূপ হয়। তবে অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মহিলারাও আপন আপন ভবিষ্যৎ কিছু কিছু বুঝিয়া সতর্ক হইতে শিখিয়াছে। যৌবনকাল হইতে নিজের সংসারে কর্ত্রীত্ব-লাভ না করিলে, এইরূপ বিড়ম্বনা ঘটাই স্বাভাবিক। যে সমাজে নারীগণ পুরুষের উপর সর্ববিষয়ে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল, গিরিশচন্দ্র সেই সমাজের কথাই বলিয়াছেন।

প্রফুল্লকে যে-ভাবে গিরিশচন্দ্র নাটকে অবতারিত করিয়াছেন—তাহাতে মনে হয় বয়স তাহার যাহাই হউক, সে এখনো একটি অশিক্ষিতা বালিকা মাত্র। রমেশের উপযুক্ত গৃহিণী হইতে পারিত জগমণির চরিত্রের সারাংশ দিয়া গঠিত কোন নারী।

প্রফুল্লের দুর্ভাগ্য তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র পুরুষের সহিত পরিণয়। প্রফুল্ল বুদ্ধিহীনা স্বভাবতঃই সরলা সুশীলা হিন্দুনারী। তাহার চরিত্রে কোন জটিলতা নাই। অথচ তাহার জীবনে ঘটিল দারুণ সমস্যা। এ সমস্যার সমাধান করিবে কি—সমস্যার গুরুত্বই সে বুঝিতেই পারিল না। তাহার ব্যক্তিত্ব নাই—আছে হৃদয়। সে বলির ছাগ মাত্র। প্রফুল্ল নাটকের নামও 'বলিদান' হইতে পারিত। প্রফুল্ল চরিত্রটি সুপরিণত চরিত্র না হইলেও গিরিশচন্দ্র তাহার নামে নাটকের নামকরণ করিয়া তাহাকে মর্য্যাদা দিয়াছেন। স্বামী সুরাসক্ত হইলে যেমন স্ত্রী নিরুপায়, স্বামী দানব-প্রকৃতির হইলেও স্ত্রী তেমনি নিরুপায়। পাতিব্রত্যের মর্য্যাদা কাঁটায় কাঁটায় রক্ষা করিয়া প্রফুল্লকে চলিতে ও বলিতে হইয়াছে। তাই তাহার জীবনে দারুণ সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র অতি সন্তর্পণে তাহাকে লইয়া অগ্রসর হইয়াছেন—পতিভক্তির মর্য্যাদা কিছুতেই ক্ষুণ্ণ না হয়, সে-দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাই সে কেবল হায় হায় করিয়াছে। তাহার ফলে প্রফুল্ল একটি সুপরিপুষ্ট ও জীবন্ত চরিত্র হইয়া উঠে নাই। এ যুগে দাম্পত্য জীবনের আদর্শ সমাজে ও সাহিত্যে অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এ যুগের সাহিত্যে গিরিশচন্দ্রের অবলম্বিত সতর্কতার প্রয়োজন হয় না। সকল চরিত্রই এ যুগে ব্যক্তিত্বে মণ্ডিত হয়। ব্যক্তিত্বের সহিত পাতিব্রত্যের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ ঘটে—তাহাতে পাতিব্রত্যের পরাজয়ও ঘটিতে পারে। ট্র্যাজেডিকে তাহাতেও এড়ানো যায় না—তবে ছাগ বলিদান হয় না—সংগ্রামেই পতন হয়। প্রফুল্লের আগে বঙ্কিমের ভ্রমরই ত পথ দেখাইয়াছে।

গিরিশচন্দ্র শেষ পর্য্যন্ত প্রফুল্লর মুখের কথায় ও আচরণে ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা না দেখাইয়া পারেন নাই, কিন্তু তাহা সেই চরম ও চূড়ান্ত অবস্থায়,—সেটা কেবল তাহার মৃত্যুবরণের অনিবার্য্য আয়োজন। প্রদীপের নিভিবার আগে একটা অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্যের মত।

এক পুত্র যখন অন্য পুত্রের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত, পুত্রে পুত্রে যখন দ্বন্দ্বসংঘর্ষ, তখন স্নেহশীলা জননীর যে অবস্থা হয়, উমাসুন্দরীর তাহাই হইয়াছে। দারুণ সঙ্কটের মধ্যে সে দিশা-হারা হইয়া পাগলিনী হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র তাহাকে উন্মাদিনী করিয়া রাখিয়াছেন—তাহার চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাত দেখাইবার আর প্রয়োজন হয় নাই।

সমস্ত চরিত্রগুলির মধ্যে সম্পূর্ণ normal বা প্রকৃতিস্থ চরিত্র পীতাম্বরের। রমেশের চরিত্রের antithesis দেখাইবার জন্য পীতাম্বরের চরিত্রের প্রয়োজন ছিল। পুরুষ মাত্রেই কেন্দ্রভ্রষ্ট বা পশু নয়, মানব সমাজ মনুষ্যত্বহীন নয়—গিরিশচন্দ্র দেখাইয়াছেন—ভ্রাতাও গলায় ছুরি দিতে পারে আবার একটা নিঃসম্বল ভৃত্যও প্রভুর জন্য প্রাণ দিতে পারে। সহজাত বন্ধনও উদ্বন্ধনে পরিণত হইতে পারে, বহিরাগত বন্ধনও চিরস্থায়ী হইতে পারে।

কাঙ্গালী ডাক্তারের কোন ব্যক্তিত্ব নাই—তাহার ব্যক্তিত্ব তাহার পুরুষভাবাপন্না স্ত্রী জগমণিই গ্রাস করিয়াছিল। কাঙ্গালী একটা উপকরণ মাত্র। জগমণির মত নারীচরিত্র সাহিত্যে বা সমাজে দেখা যায় না। সম্ভবতঃ ইহা গিরিশচন্দ্রের কল্পনা-প্রসূত। নারীর সর্ব্ববিধ সৌকুমার্য্য ও মাধুর্য্য নিঃশেষে হরণ করিয়া এমন কি তাহার নারীত্ব পর্য্যন্ত নিষ্কাশন করিয়া গিরিশচন্দ্র এই চরিত্রটি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেই জন্যই বোধ হয় তাহাকে আধা পুরুষ আধা নারীরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। জগমণির ব্যক্তিত্ব থাকিলেও সে রমেশের হাতে জীবন্ত উপকরণ মাত্র। জগমণি নাটকে জুগুপ্সা ও হাস্যরসের কিছু উপাদান যোগাইয়াছে। জ্ঞানদা ও প্রফুল্লর মনে সে যে জুগুপ্সার ভাব জাগাইয়াছে তাহা সুন্দর ভাবে চিত্রিত হইয়াছে।

মদন একটি পাগল তাহার চরিত্র আলোচনার বিষয়ীভূত

নয়। তাহাকেও রমেশ ও জগমণি উপকরণস্বরূপ ব্যবহার করিয়াছে। পাগল হইলেও সে একেবারে মনুষ্যত্ববর্জ্জিত নয়।

কলিকাতার সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজ ও নিম্নশ্রেণীর লোকদের ভাষায় গিরিশচন্দ্রের অধিকার ছিল অসাধারণ। ভাবপ্রকাশে কোথাও তাঁহার বাণীর অভাব ঘটে নাই। উচ্ছ্বাসের মুখে কোথাও কোথাও গিরিশচন্দ্র নিজস্ব ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে যাহার মুখে যে ভাষাভঙ্গী বা যে কথা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক তাহাই বসাইয়াছেন। এ বিষয়ে স্বাভাবিকতার সীমা কোথাও বড় একটা অতিক্রম করেন নাই। কলিকাতা অঞ্চলে যে সকল লক্ষ্যার্থক বাক্যাঙ্গ (idiom & slang) ব্যবহৃত হয়—তাঁহার ভাষায় তাহাদের ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। নাটকের রচনা-কৌশলের ইহাও একটী বিশিষ্ট অঙ্গ।

Sheridan এর The Rivals নামক নাটকে Mrs. Malaprop বলিয়া একটী চরিত্র আছে, সে অযথার্থ অর্থে শব্দের ভ্রান্ত প্রয়োগ করিত—উচ্চারণ সাম্যে এইরূপ ভ্রান্ত প্রয়োগ অনেকেই করিয়া থাকে। ইহাকে বলে 'Malapropism', গিরিশচন্দ্র একটি দৃশ্যে কাঙ্গালী চরণের মুখে এইরূপ শব্দ প্রয়োগের দ্বারা হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছেন ; যেমন—

"আপনাকে আমি যে দিন প্রদর্শন করেছি, সেই দিন অবধি আপনার প্রতি মন আড়ষ্ট হয়েছে। আপনি অতিসজ্জন ও প্রকাণ্ড অজ্ঞ। আপনার বন্ধুত্ব যাজ্ঞনা করি আপনার সৌহার্দ্দ জন্য আমি একান্ত সুললিত, আপনি ভদ্রলোক এবং বিশিষ্ট নষ্ট।...যাতে আপনি কিঞ্চিৎ অর্থ সংযম করে প্রদেশে গিয়ে বসতে পারেন, আর নিরুদ্বেগে কাঙ্গকবলিত হ'ন তার উপায় আপনাকে উদ্‌ভ্রান্ত করতে এসেছি।

উপন্যাসের অগ্রগতিতে যে মন্থরতা আছে—নাটকে তাহার অবসর নাই—নাটকের প্রবাহ দ্রুতসঞ্চারী। দ্রুতসঞ্চারী হওয়ার জন্য অনেক ফাঁক পড়িয়া যায়, অভিনয়ের দর্শক তাহা কল্পনার দ্বারা ভরিয়া লয়। উপন্যাসের তুলনায় নাটকের অনেক অঙ্গে Emphasis দিতে হয়—নতুবা দর্শকের অবধান অবসন্ন হইয়া পড়ে। দ্রুত সঞ্চারের ক্ষতিপূরণও হয় না। এই Emphasis এর মাত্রা দর্শকের শিক্ষা দীক্ষা ও রসবোধের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। মার্জ্জিত রুচি, সুশিক্ষিত নরনারী নাটকের উপভোক্তা হইলে অপেক্ষাকৃত অল্প Emphasis দিয়া রচনাকে যতদূর সম্ভব স্বভাবানুগামী করিলেই চলে, কিন্তু দর্শকশ্রেণী শিক্ষা দীক্ষা রস-বোধ ও বিচার বোধে অনুন্নত হইলে Emphasis এর মাত্রা বাড়াইতে হয়। অত্যুক্তি, অতিরঞ্জন ও বর্ণপ্রাখর্য্য ছাড়া তাহাদের চিত্তকে উদ্দীপিত করা যায় না—নাটকাঙ্গকে মর্ম্মস্পর্শী করা যায় না। গিরিশচন্দ্র তাঁহার দর্শকশ্রেণীর বিদ্যাবুদ্ধি, রস-বোধ ইত্যাদির পরিমাণ ও প্রকৃতি ভালো করিয়াই জানিতেন, সে জন্য তিনি অনেক অঙ্গেই অতিরিক্ত Emphasis দিয়াছেন। রমেশের দুষ্ক্রিয়া-পরম্পরায়, যোগেশের মত্ততা ও আত্মবিস্মৃতিতে, জগমণির কুবুদ্ধির ক্রিয়ায়, সুরেশের দণ্ডভোগে ও নির্য্যাতনে Emphasis এর মাত্রা সে জন্য খুব বেশি।

আজকালকার পাঠকের মন খুব বেশি critical হইয়াছে। দেশে উৎকৃষ্ট নাটকের সৃষ্টি না হইলেও সাহিত্যের অন্যান্য অঙ্গের অভাবনীয় শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। তাহার ফলে পাঠকদের বিচারবুদ্ধি শাণিত হইয়াছে—আগেকার পাঠকদের মত তাহারা স্বল্পে সন্তুষ্ট নয়—শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের কাছে অনেক কিছু প্রত্যাশা করে। তাহা ছাড়া, আগে যেমন বঙ্গসাহিত্যের বিবিধ সৃষ্টির মধ্যেই নিজেদের তুলনামূলক বিচার পরিচ্ছিন্ন রাখিত, এখন আর তাহা করে না। স্বদেশের বিবিধ রচনার মধ্যে কোন' রচনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেই আগে যথেষ্ট মনে করা হইত। লোকে এখন বিদেশের সাহিত্যের সহিত তুলনা করিয়া রচনার উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার করে। যে যুগের জন্য রচিত সাহিত্য নিজের মনকে ঠিক সেই যুগে প্রত্যাবর্ত্তিত করিয়া সে সাহিত্যকে উপভোগ করার মত উদার সংস্কৃতি অনেকেরই নাই। তাহারা—রচনা যে যুগেরই হউক, তাহাতে সার্ব্বজনীন আবেদন ও দেশকালাতীত ব্যঞ্জনার অনুসন্ধান করে। Romantic যুগ চলিয়া গিয়াছে, Romance এর প্রতি কাহারও প্রীতি নাই—Idealism ও ক্রমে ক্লান্তিকর হইয়াছে, পাঠকের মন দিন দিন Realism-এর পক্ষপাতী হইতেছে। অভিনয় বিদ্যার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, এই বিদ্যার মধ্যে Realism এর আধিক্যই এই উন্নতির ও তাহার সমাদরের কারণ। পাঠক নাটকের মধ্যেও বিশেষতঃ সামাজিক নাটকে বাস্তবনিষ্ঠতার প্রাধান্য দেখিতে চায়। কথা-সাহিত্যে Realism-এরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ; তাহাতে পাঠকের মন তাহার দ্বারা আবিষ্ট ও অভিরঞ্জিত। এই মনোভাবের দ্বারা নাটকেরও প্রত্যেক অঙ্গটি পাঠক পরীক্ষা করিয়া লইতে চায়। এখনকার পাঠক আকস্মিক পতন ও মৃত্যু, মৃত্যুর আগে বা হত্যার আগে ওথেলোর মত একটা বড় বক্তৃতা, শেষ দৃশ্যে সমস্ত জীবিত চরিত্রগুলির একত্র সমবায়, মৃত্যুর দ্বারা ট্রাজেডি ঘটানো অপ্রকৃতিস্থ চরিত্রের আধিক্য ও ঐরূপ চরিত্রের অসম্বদ্ধ উক্তি পরম্পরা, চরিত্রে অন্তর্দ্বন্দ্বের অভাব ইত্যাদিকে কলাসঙ্গত বলিয়া মনে করে না। আজকালকার পাঠক সারল্য চায় না, চায় জটিলতা, চায় বক্রিমা, চায় তরঙ্গায়িত গতি।

এই সকল কারণে বর্ত্তমান যুগে গিরিশচন্দ্রের প্রফুল্লর মত নাটকেরও সম্যক্ আদর নাই।

সৈনিক

শ্রীরণজিৎ কুমার সেন

(তৃতীয় পর্য্যায়)

শ্রীমন্তের পলাতক মনে নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই আজও যে-ভয় প্রতিমুহূর্ত্তে বাসা বাঁধিয়া আছে, আসলে অগ্নিকাণ্ডের রাত্রে অনুরূপ কোনো আশঙ্কিত ঘটনা বারোখাদায় ঘটে নাই। প্রতিদিন ষ্টেশন ঘরে ঘুমাইবার ব্যবস্থা বটে ছটু মান্নার, কিন্তু ঘটনার দিন অন্য কাজে তাহাকে সদরে যাইতে হয়, ফেরে পরদিন সকালে। পোড়া অঙ্গারখণ্ডগুলিতে তখনও অগ্নিশিখা ঝিকৃমিক্ করিতেছে।

ছটু মান্না ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া আতঙ্কে শুধু মাথায় হাত দিয়া বসিল না, ভগবানের অসীম করুণায় যে-মৃত্যুর মুখ হইতে সে রক্ষা পাইয়াছে, তাহার জন্যও দুরুদুরু বক্ষে মনে মনে সহস্র-কোটি প্রণতি জানাইল পরম বিধাতার উদ্দেশ্যে। কৈলাস চক্রবর্ত্তীকে কাছে পাইয়া কহিল, "যদি সদর থেকে ডাক না আস্‌তো, তবে যে শুধু নিজে মর'তাম, তা নয়, সাথে সাথে প্রকাণ্ড সংসারটাও আমার না খেয়ে ম'রতে ব'স্‌তো।"

দারিদ্র্য-পীড়িত জীবন ছটু মান্নার। সংসারে বিধবা মা, ছোট ছোট দুই ভাই ও বিবাহযোগ্যা এক বোন ক্ষেন্তি। বহু চেষ্টা করিয়াও অর্থাভাবে আজ পর্য্যন্ত ক্ষেন্তির বিবাহ দিয়া উঠিতে পারে নাই ছটু। সংসারে উপার্জ্জনশীল একমাত্র সে নিজে, তাহার মৃত্যু যে আজ এই বিরাট সংসারেরই মৃত্যু!

কৈলাস চক্রবর্ত্তী কহিলেন, "ভগবান যদি রক্ষা করেন, তবে কি কারুর সাধ্যি আছে মারবার! কিন্তু তুমিও এই জেনে রাখো ছটু, যে সব গুণ্ডা এম্‌নি ক'রে শুধু আমাদের এই রেল-কোম্পানীরই নয়, খাস সরকারী দপ্তরের পর্য্যন্ত ক্ষতি ক'রলো, তাদের আমরা সহজে রেহাই দেবো না। আজ বিষয়টা গ্রামে পরিষ্কার হ'য়ে গেছে যে, এই গুণ্ডামীর প্রধান পাণ্ডা ঐ মথুর ছোঁড়া ভিন্ন আর কেউ নয়। এখন ভাবচি, মিটিং-এর জন্যে সে-দিন এদের জায়গা ছেড়ে না দিয়ে কি বুদ্ধিমানের কাজটাই ক'রেছিলাম!"

কিন্তু কথাটায় যেন বড় বেশী সায় দিতে পারিল না ছটু মান্না। কিছুক্ষণ থামিয়া স্বর কতকটা দ্রুত-লয়ে টানিয়া কহিল, "যদি ওনাদের দিয়েই সত্যি সন্দেহ ক'রে থাকেন, তবে আমার মনে হয় কি বাবু, মিটিং-এর সম্মতি সে-দিন দেওয়াই উচিত ছিল আপনার। জাত-গোক্ষুর যারা, তাদের কি বেশী ঘাটাতে গিয়ে কোনো লাভ আছে?"

কথাটা আদৌ মনঃপুত হইল না কৈলাস চক্রবর্ত্তীর। কহিলেন, "আঃ—ঘাবড়াও কেন ছটু, লাভটা এবারে কতদূর গিয়ে দাঁড়ায় দেখ না? সদরে খবর গেছে কাল রাত্রেই, এতক্ষণে কি কিছু আর একটা 'ফোন' না গেছে ক'লকাতায়। সেখানেও শুনছি তুমুল গোলযোগ; ট্রাম পুড়িয়ে ছাই-ছাই ক'রে দিচ্ছে, টেলিগ্রাফের তার কেটে দিচ্ছে, হাওড়ায় নাকি দু'দিন ধ'রে গাড়ী এসেই ভিড়ছে না। তা' হোক্, কিন্তু এ বৃটিশ রাজত্ব, সূর্য্য অস্ত যায় না; গুণ্ডারা কি পালিয়ে রেহাই পাবে, ভেবেছ?"

ছটু মান্না সহসা কিছু একটা আর উত্তর করিল না।

হঠাৎ দূর হইতে ট্রেণের হুইসেলের শব্দ শোনা গেল। পোরম্যান যথানিয়মে যাইয়া তার কাজ সমাধা করিল। মুহূর্ত্তে একটা শব্দ হইল—হিস্-স্-স্‌···খট্ ঘটাং। সিগন্যাল ডাউন পড়িল। কিন্তু ট্রেণ আসিয়া প্রতি-দিনের মতো আজ আর ষ্টেশনে থামিল না। সকালের ট্রেণ। দুই একজন আফিস-বাবু ডেলি প্যাসেঞ্জারী করিয়া সদরের আদালতে যাইয়া কাজ করেন। ষ্টেশনে আসিয়া কঠিন আশঙ্কায় কালো মুখে তাঁহারা আবার ঘরে ফিরিলেন।—সম্ভবতঃ অতি প্রত্যুষেই তবে সদর হইতে কলিকাতায় 'ফোন' গিয়াছিল।—দ্রুতগতিতে ষ্টেশন ছাড়িয়া ট্রেণ চলিয়া গেল। ড্রাইভার শুধু একবার হাতের ইসারা করিয়া গেল মাত্র।

কৈলাস চক্রবর্ত্তীর মনে হইল, ইস্পাতের লাইনের উপর দিয়া নয়, ট্রেণ যেন আজ তাঁহার বুকের পাঁজরের উপর দিয়া চলিয়া গেল। কহিলেন, "শুন্‌লে হয়ত গুণ্ডারা আক্রমণ ক'রবে ছটু, কিন্তু সত্যি কথা ব'ল্‌তে কি, সরকার যে কিছু একটা মিথ্যে প্রচার ক'রেছেন, তা' নয়; স্বাধীনতা সকলেরই কাম্য, কিন্তু দেশশুদ্ধ এইসব গুণ্ডামী সত্যিই কি কেউ বরদাস্ত ক'রতে পারে? ষ্টেশন পুড়ে গেল, ট্রেণ থামল না, অসুবিধেটা তো এখানকার স্থানীয় লোকেরই; কিন্তু এতবড় ননসেন্স ফুলিস যে, এই সুবিধে-অসুবিধের কথাটুকুও তা'রা ভেবে দেখলো না।"

ছটু মান্না কহিল, "সাপ যখন কাম্‌ড়ায় বাবু, তখন কি সে আর ভেবে দেখে যে, তার দংশন-বিষে লোক মরে যাবে! ব'ললাম না, ও সব লোক হচ্ছেন গিয়ে ঐ সাপের জাত, একেবারে জ্যান্ত গোক্ষুর বাবু, ভাবাভাবির মধ্যে কি আর ওনারা আছেন!" তারপর থামিয়া কহিল, "তা না হয় গেল, এখন এখেনকার কি ব্যবস্থা ক'রবেন, কিছু স্থির করেছেন তো মাষ্টারবাবু?" জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া চাহিয়া রহিল ছটু মান্না কৈলাস চক্রবর্ত্তীর মুখের পানে।

কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিলেন কৈলাস চক্রবর্ত্তী, পরে কহিলেন, "আগে সদর থেকে এস. ডি. ও সাহেব আসুন, দেখে শুনে জেরা-পত্তর করে যান, তারপর যা-হয় করবো। রেলকর্ত্তৃপক্ষের সার্কুলারও মনে করি এসে যাবে দেখতে দেখতে।"

এদিকে গোয়ালন্দ হইতে ট্রেন বোঝাই হইয়া তখনও কিছু কিছু অবশিষ্ট বর্ম্মা-ইভ্যাকুই কলিকাতার দিকে চলিয়াছে। বিভিন্ন রিলিফ ক্যাম্পের পানীয় জল বিতরণের ছোট ছোট কাজ চলিয়াছে ষ্টেশনে ষ্টেশনে। আগে এই ষ্টেশনেও অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল, যাত্রীরা সংখ্যায় ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে বলিয়া সম্প্রতি কয়েকদিন হইল মাত্র বন্ধ হইয়াছে। ধীরে ধীরে মন্থর গতিতে ইভ্যাকুইদের একখানি স্পেশাল গাড়ী সাম্‌নে দিয়া চলিয়া গেল। ব্রহ্ম প্রায় জাপানীদের সম্পূর্ণ দখলে। এইসব যাত্রীরা এতদিন হয়ত আকিয়াবের জঙ্গল-পথে, চট্টগ্রামে আর কেন্দ্রীতে দিনের পর দিন অনাহারে অনিদ্রায় পড়িয়া ছিল। সর্ব্বশেষ জল পাইয়াছে হয়ত আজ [illegible] [illegible] [illegible]

শিবরামপুরে ; আবার সাম্‌নে যাইয়া হেড্‌কোয়াটার্স রাজবাড়ীতে জল আর খাবার। এখান হইতে আজ যেন সত্যিই জল একেবারে সরিয়া গিয়াছে, নইলে এতক্ষণেও জলন্ত অঙ্গারগুলি একেবারে নিঃশেষে নিভিয়া যাইবে না কেন ?

ছটু মান্না কহিল, "আমি তাহ'লে এখন একবার বাড়ীমুখো যাই বাবু। সওদা-পত্তর কিছু না ক'রলে ওদিকে আবার উপোসে কাটবে সবার।" তারপর মুখে মৃদু হাসির রেখা টানিয়া কহিল, "এস্‌-ডি-ও সাহেব যখন আসবেন ব'লছেন, তখন বিধিব্যবস্থা যা হোক্‌ ক'রে আদালতে গিয়ে দিন্‌ কয়েক নম্বর ঠুকে। এমন ক'রে সত্যিই বা ক'দিন আর ষ্টেশন ছাড়া বারোখাদা চলবে !"

কৈলাস চক্রবর্ত্তী কথা না বলিয়া নীরবে একবার মাথা ঝাঁকিলেন মাত্র।

ছটুমান্নাও আর অপেক্ষা না করিয়া ধীরে ধীরে বাড়ীর পথ ধরিল। নিজের হাতে বাজার করিবে, তবে বাসায় তাহার উনুনে রান্না চড়িবে।...

সৌদামিনী ততক্ষণে উনুনে ভাত চড়াইয়া দুই জানুতে খুলিয়া বসিয়াছে 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারী'। বাবা মারা গিয়াছেন বেশী দিন নয়, এই তো সবে কিছুদিনের কথা। রাজেন্দ্র সরকার : চমৎকার আত্মভোলা লোক ছিলেন তিনি। মারা যাইবার পূর্ব্বে তিনিই যেন কোথা হইতে বইখানি আনিয়া দিয়াছিলেন সৌদামিনীকে, বলিয়াছিলেন, 'প'ড়ে যদি আমাকে অর্থ ক'রে বুঝিয়ে দিতে পারিস, তবে বুঝবো--হ্যাঁ মায়ের আমার সত্যিই জ্ঞান হ'য়েছে বটে।' কিন্তু বাবা জীবিত থাকিতে তেমন কিছু একটা সত্যিই জ্ঞানের পরিচয় দিয়া উঠিতে পারে নাই সৌদামিনী। আজ যতই পড়িতেছে, ততই যেন পরিষ্কার হইয়া যাইতেছে অর্থগুলি ; মন যেন বাসা খুঁজিয়া বেড়ায় কথাগুলির মধ্যে :

'নারী একটা বাস্তবের পিণ্ডমাত্র নয়, এর মধ্যে কলাসৃষ্টির একটা তত্ত্ব আছে, অগোচর একটি নিয়মের বাঁধনে, ছন্দের ভঙ্গীতে সে রচিত, সে একটি অনির্ব্বচনীয় সুসমাপ্তির মূর্ত্তি। নানা কাজে খুঁটিনাটিকে সে মধুর নৈপুণ্যে সরিয়ে দিয়েছে, সাজে সজ্জায় চালে-চলনে নানা ব্যঞ্জনা দিয়ে নিজেকে সে বস্তুলোকের প্রত্যন্ত দেশে রসলোকের অধিবাসিনী ক'রে দাঁড় করিয়েছে।...সেবা হোলো হৃদয়ের সৃষ্টি, শক্তির চালনা নয়। যে-রাস্তায় চ'লবে, সেই রাস্তাটাকে স্পষ্ট ক'রে নিরীক্ষণ ক'রবার জন্যে পুরুষ তার চোখ দুটো খুলে রেখেছে, ওটাকে সে গম্ভীর ভাষায় বলে--দর্শনেন্দ্রিয়। মেয়ে সেই চোখে একটু কাজলের রেখা টেনে দিয়ে বলেছে—চোখ দিয়ে বাইরের জিনিষ দেখা যায়, এইটেই চরম কথা নয়, চোখের ভিতরেও দেখবার জিনিষ আছে, হৃদয়ের বিচিত্র মায়া।'

নিজেকে তিলে তিলে সেই পরম সত্যের সমুখে নিয়া দাঁড় করাইতে সৌদামিনী কি কম সাধনা ব্যয় করিয়াছে! বাবার কাছে সে-দিন উত্তর না দিতে পারায় এতটুকুও লজ্জা ছিল না, কিন্তু আজও যদি সে নারীত্বের সেই পরমতম শ্রীসম্পদে নিজেকে ভরিয়া লইতে না পারে, তবে তার মতো কি আর কিছু বড় ধিক্কার আছে জীবনে ? কিন্তু তাহার চাইতেও বড় ধিক্কার আছে দেশের এই শাসনব্যবস্থায় ; গ্রাম ছাড়িবার আগে মধুর দত্ত তাহার ভবিষ্যৎস্থিতি সম্পর্কে একটুকুও ইঙ্গিত করিয়া যায় নাই তাহাকে। তবু অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা হইতে সৌদামিনী এই কথাটা স্পষ্টই মনে জানিয়া রাখিয়াছে, পুলিশের হাতে সহজে ধরা দিবার লোক নয় মধুর দত্ত ; এমন কোনো নিভৃত অঞ্চলে সে নিশ্চয়ই লুকাইয়া আছে—যেখানে 'ভারত রক্ষা আইন' পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না। তাহাদের এই সংগ্রামকে জয়যুক্ত করিয়া তুলিতেই হইবে ; যে দারুণ নির্য্যাতনে প্রতিমুহূর্ত্তে আজ সমস্তটা দেশ মৃত্যুপাণ্ডুর-বেশে রুদ্ধশ্বাসে ধুঁকিতেছে, সেই দারুণ শৃঙ্খলকে নাড়া দিয়া ভাঙ্গিতে হইবে। তবেই তো তাদের এই ব্রত সার্থক। কর কর শব্দে পাতাগুলি উল্টাইয়া চলিল সৌদামিনী, তারপর আবার দ্রুত দৃষ্টিবিক্ষেপে পড়িয়া চলিল :

'ইংরেজের লোভ যে-ভারতবর্ষকে পেয়েছে, ইংরেজের আত্মা সেই ভারতবর্ষকে হারিয়েছে। এই জন্যেই ভারতবর্ষে ইংরেজের লাভ, ভারতবর্ষে ইংরেজের গর্ব্ব, ভারতবর্ষে ইংরেজের ক্লেশ। এইজন্যে ভারতবর্ষকে স্বাস্থ্য দেওয়া, শিক্ষা দেওয়া, মুক্তি দেওয়া সম্বন্ধে ইংরেজের ত্যাগ দুঃসাধ্য, কিন্তু শাস্তি দেওয়া সম্বন্ধে ইংরেজের ক্রোধ অত্যন্ত সহজ। ইংরেজধনী বাংলাদেশের রক্ত নেংড়ানো পাটের বাজারে শতকরা চার পাঁচশো টাকা মুনফা শুষে নিয়েও যে-দেশের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে এক পয়সাও ফিরিয়ে দেয় না. তারপর দুর্ভিক্ষে বন্যায় মারী-মড়কে যার কড়ে' আঙ্গুলের প্রান্তও বিচলিত হয় না, যখন সেই শিক্ষাহীন, স্বাস্থ্যহীন উপবাস-ক্লিষ্ট বাংলাদেশের বুকের উপর পুলিশের জাঁতা বসিয়ে রক্তচক্ষু কর্তৃপক্ষ কড়া আইন পাশ করেন, তখন সেই বিলাসী ধনী স্ফীত মুনাফার উপর আরামের আসন পেতে বাহবা দিতে থাকে. বলে, 'এই তো পাকা চালে ভারত শাসন'। - এইটেই স্বাভাবিক। কেন না, ঐ ধনী বাংলাদেশকে একেবারেই দেখতে পায় নি, তার মোটা মুনাফার ওপারে বাংলাদেশ আড়াল প'ড়ে গেছে। বাংলাদেশের প্রাণের নিকেতনে যেখানে ক্ষুধাতৃষ্ণার কান্না, বাংলা-দেশের হৃদয়ের মাঝখানে যেখানে তার সুখ-দুঃখের বাসা, সেখানে মানুষের প্রতি মানুষের মৈত্রীর একটা বড় রাস্তা আছে, সেখানে ধর্ম্মবুদ্ধির বড় দাবী বিষয়বুদ্ধির গরজের চেয়ে বেশী—এ-কথা জান্‌বার ও ভাববার মতো তার সময়ও নেই, শ্রদ্ধাও নেই। তাই যখনি দেখে—দরোয়ানীর ব্যবস্থা কঠোর করা হ'চ্ছে, তখনি মুনফা-বৎসলেরা পুলকিত হ'য়ে ওঠে। Law and order-রক্ষা হ'চ্ছে দরোয়ানীতন্ত্র, পালোয়ানের পালা ; Sympathy and Respect হ'চ্ছে ধর্ম্মতন্ত্র, মানুষের নীতি।—যদি শাসনকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমরা কি চাও না দেশে Law and order থাকে,' আমি বলি, 'খুবই চাই, কিন্তু Life and mind তার চেয়ে কম মূল্যবান নয়।' মানদণ্ডের একটা পাল্লায় বিশ পঁচিশ মণ বাটখারা চাপানো দোষের নয়, অন্য পাল্লাটাতে যে-মাল চপোনো হয়, তাতে যদি আমাদের নিজের স্বত্ব কিছু থাকে। কিন্তু যখন দেখি, এ-পক্ষের দিকটাতেই যন্ত্ররাজ্যের ইট-পাথর, আর মালের পনেরো আনাই হোলো অন্যপক্ষের দিকে, তখন ফৌজে-পুলিশে গড়া মানদণ্ডটা অপমানদণ্ড বলেই ঠেকে। নালিশ আমাদের পুলিশের বিরুদ্ধে নয়, নালিশ আমাদের ঐ ওজনের বিরুদ্ধে ; নালিশ, আগুন জলে ব'লে নয়, রান্না চড়ানো হয় না

ব'লে। বিশেষতঃ এই আগুনের বিল যখন আমাদেরই চোকাতে হয়।'...

ভাত ফুটিয়া ওদিকে ফ্যান গড়াইয়া পড়িতেছে ডেক্‌চি বাহিয়া। সৌদামিনীর সেদিকে লক্ষ্য নাই। ভাব্‌সা গন্ধে শোবার ঘর হইতে পিসীমা গলা উচাইয়া কহিলেন, "ভাত কি পুড়ে গেল নাকি মিনি?"

সৌদামিনীকে পিসীমা সংক্ষেপ করিয়া মিনি বলিয়া ডাকেন। সংসার হইতে মা-বাবা চক্ষু বুঁজিয়া চলিয়া যাইবার পর এই পিসীমার হাতেই সৌদামিনীর ভার পড়ে। বিধবা বৃদ্ধা, যতক্ষণ পারেন, মালা জপ করিয়া কাটান। ঠাট্টা-তামাসা রাগ-অভিমান তাঁহার যাহা কিছু আজ সৌদামিনীকে কেন্দ্র করিয়াই। মথুর দত্ত গ্রামে থাকিতে পিসীমাকে মাঝে মাঝে এ-কথায় সে-কথায় রীতিমত নাচাইয়া তুলিত। আজ পিসীমারও যে মাঝে মাঝে মথুর দত্তের কথা মনে না পড়ে, এমন নয়। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিয়া তেমন কিছু একটা সন্তোষজনক উত্তর পান না সৌদামিনীর কাছে। ভোরে সেই অন্ধকার থাকিতে চিরদিন উঠিবার অভ্যাস পিসীমার। আজও উঠিয়া বাহিরে কোথা হইতে একবার ঘুরিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন, 'মথুরের তো খোঁজ পাওয়াই যাচ্ছে না; মথুরের ঠাকুরমা যে-ভাবে অনবরত কেবল চোখের জল ফেলছেন, তা দেখে যে ঠিক থাকা যায় না মিনি!" উত্তরে সৌদামিনী বলিয়াছিল, "তাই বুঝি দেখে এলে? তবু তাঁকে আজ চোখের জল ফেলতে দাও পিসীমা, দেশের সবাই আজ এম্‌নি করেই চোখের জল ফেলছে; কিন্তু এ ব্যর্থ যাবে না, স্থির জেনো। যেদিন এম্‌নি করে লক্ষ লক্ষ মানুষের চোখের জলে সাগর ভেসে যাবে, সেদিন দেশের এই দাসত্ব-শৃঙ্খলও তারই অতলে ডুবে যাবে পিসীমা। সেদিন আবার ফিরে পাবো আমরা সবাইকে।" —সেকেলে লোক পিসীমা. কথাগুলি সোজা বলিয়া মনে হয় নাই তাঁহার কাছে, তাই দ্বিরুক্তি না করিয়া চুপ করিয়া আবার একদিকে হাঁটিয়া গিয়াছেন।

এবারে উত্তর না পাইয়া পুনরায় স্বর তুলিলেন পিসীমা: "বলি অ মিনি, একবার হাতা নেড়ে দেখ্‌ না, এরপর যে ভাত আর মুখে নিতে পারবি নে?"

বইয়ের পাতা হইতে সহসা এবারে চোখ তুলিল সৌদামিনী: "কেন, কি হোলো গো, এই তো দিব্বি ভাত ফুটছে।" বলিয়া ডেক্‌চির ঢাকনিটা তুলিয়া নামাইয়া নিল সৌদামিনী।

বেলা তখন ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছে।

পাশ দিয়া পথ-যাত্রীদের যাতায়াতের ছোট্ট রাস্তা। হঠাৎ কানে আসিল—বাজার ফিরতি কাহারা লঘু-গুরু স্বরে কী বলিতে বলিতে যাইতেছে।—

প্রথম ব্যক্তি কহিল, "হেস্তনেস্ত যা হোক একটা কিছু আজকেই তবে হয়ে যাবে, না কি বলো?"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, "হয়ে যাওয়াই ভালো, এস. ডি. ও সাহেব এসে পড়লেই রক্ষা। রেল কোম্পানীর কি কম ক্ষতিটা হোলো! এক টিকিটই পুড়েছে নাকি দেড় হাজার টাকার। তা ছাড়া খাস সরকারের ক্ষতি—"

পোড়া কাঠে জল ঢালার মতো সহসা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল যেন সৌদামিনীর বুকখানি। যদি তেমন কিছু হয়, তবে তো শেষ পর্য্যন্ত খানাতল্লাসী করিয়া ও-বাড়ীর ঠাকুরমাকে লইয়া গিয়া আবার হাজতে হাজির করিবে না পুলিশ?

আশঙ্কা মিথ্যা নয়। ধীরে ধীরে সকাল গড়াইয়া গেল। দুপুরে আসিয়া গ্রামে পৌছিলেন এস্‌-ডি-ও সাহেব। সঙ্গে আট দশ জন রুল-হাতে লালপাগড়িওয়ালা পুলিশ।

ভালোমন্দে মিশানো গ্রামের লোক। নানাজনের মুখে নানা কথা। সত্যি সত্যিই একসময় খানাতল্লাস হইল মথুর দত্তের বাড়ীতে। কিন্তু খড়-কুটোগাছটি ভিন্ন আর কিছু একটাও হাতে পাইল না পুলিশ। সাহেবি-পোষাকে বাঙালী সাহেব এস্‌. ডি. ও: প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া রীতিমত বিব্রত করিয়া তুলিলেন ঠাকুরমাকে। কিন্তু ঠাকুরমা কোনো প্রশ্নেরই যথাযথ উত্তর না দিয়া শুধু মাত্র বলিলেন, "আমাকে না ব'লে যে মথুর কোনদিন একতিলও কোথাও পা বাড়ায় নি। দিতে পারো সাহেব আমার মথুরকে আবার আমার কাছে এনে?"

পুলিশের সন্দেহ হইল—বৃদ্ধার হয়ত মাথায় দোষ আছে! ঠাকুরমার কথায় কোনরূপ কর্ণপাত না করিয়া এস্‌. ডি. ও সাহেব সাহেবী ভঙ্গীতেই একসময় গাত্রোত্থান করিলেন।

কিন্তু বাদ গেল যে সৌদামিনী, এমন নয়।

পুলিশের চোখ শকুনের চোখের চাইতেও শ্যেনতর। এক সময় এস. ডি. ও সাহেব সদলবলে আসিয়া হানা দিলেন সৌদামিনীদের বাহিরের ঘরে। পিসীমা আড়ালে একবার ভয়ে কাঁপিয়া উঠিলেন, কিন্তু নির্ভিক দৃঢ়-সংকল্প সৌদামিনী। সামনে চৌকাঠে পা দিয়া কহিল, "কি দরকারে এসেছেন, বলুন?"

চকিতে সৌদামিনীর দিকে চাহিতে গিয়া এস্‌. ডি. ও সাহেব প্রথমটা চোখ নামাইতে পারিলেন না, কাজের কথা বলিতে যাইয়া কেমন যেন কথা জড়াইয়া গেল। পরে পুলিশগুলির দিকে একবার দৃষ্টি ঘুরাইয়া লইয়া কহিল, "আপনি—মানে এ বাড়ীর—"

কথা শেষ হইল না। বাকীটুকু ইঙ্গিতে বুঝিয়া লইয়া সৌদামিনী কহিল, "হ্যাঁ, এ বাড়ীর মালিক একরকম আমিই, যদি কিছু দরকার থাকে, নিঃসঙ্কোচে বলতে পারেন।"

"ছাট্‌স গুড্‌, নমস্কার।" হাত আর অন্ততঃ সৌজন্যের খাতিরেও কপাল পর্য্যন্ত যাইয়া ঠেকিল না। এস্‌. ডি. ও সাহেব কহিলেন, "গ্রামের ওপরে কাল যে ব্যাপার ঘটে গেল, সে সম্বন্ধে আপনার কিছু জানা আছে?"

"আছে বৈ কি?" তড়িৎকণ্ঠে সৌদামিনী জবাব দিল: "দেখলাম, রেল কোম্পানী আর সরকারী মহলের একটা মস্ত বড় ক্ষতি হোল। যারা এ কাজ করেছে, তাদের বুদ্ধিমান বলতে হবে, যাই বলুন। চিরকাল নিজেরা ক্ষয় হতে হতে কিছুটা যে অন্ততঃ ক্ষয়কারীদের ক্ষতি করতে পেরেছে, এতে তাদের প্রশংসাই করতে হয় বটে।" পাতলা ঠোঁটের কোণে একবার হাসি টানিল সৌদামিনী। হাসির মধ্যে সে-ই যেন চিরাচরিত বিদ্যুত্তাতা।

এস. ডি. ও সাহেব কহিলেন, "কথা তা নয়। তবে সে যাই হোক, পার্‌ড্‌ন মি, দেখচি—আপনিও কিছু চরমপন্থী কম নন। তা যাক। এ সম্বন্ধে আমরা সন্দেহ করেছি এখানকার মথুর বাবুকে। সঙ্গে আরও দু'জন যাঁরা বিশেষভাবে জড়িত আছেন, তাঁদেরও খোঁজ আমরা পেয়েছি। এ সম্পর্কেই দু'একটি প্রশ্ন আপনাকে ক'রতে চাই।"

"করুন।" দৃঢ় দৃষ্টিতে দাঁড়াইল সৌদামিনী।

এস. ডি. ও সাহেব কহিলেন, "মথুর বাবুর সঙ্গে আপনাদের কতদিনের পরিচয়?"

"ধরুন এই কিছু কালের।"

"তাঁর এই-জাতীয় মনোবৃত্তির প্রকাশ কোনোদিন কি আপনারা লক্ষ্য করেছেন?"

"ক'রেছি বৈ কি, তবে মনোবৃত্তি নয়, মনোসমৃদ্ধি। তিনি এত বেশী সরল, স্বাভাবিক আর আদর্শে একনিষ্ঠ ছিলেন যে, তাঁকে শুধু লক্ষ্য করলে কম করা হতো; বলতে হয়—তাঁকে আমরা উপলব্ধি ক'রতাম।"

"আই সি—" একটা ভারী নিঃশ্বাস টানিলেন এস. ডি. ও সাহেব। বলিলেন, "গ্রাম ছেড়েছেন তিনি অগ্নিকাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গেই, এ তো বেশ বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু ঘটনার আগে কাল কি একবারও এসেছেন তিনি আপনাদের এখানে?"

সৌদামিনী কহিল, "শুধু কাল নয়, কিছুকাল ধরেই তিনি গ্রামে নেই, এই আমরা জানি। সুতরাং, কালকের ঘটনার মূলে তাঁকেই বা দায়ী ক'রতে পারেন কি ক'রে?"

"সেটুকু না হয় আমাদের হাতেই রইল।" বাঁকা চোখে হাসিলেন একবার এস. ডি. ও সাহেব, তারপর পুনরায় একবার নমস্কার করিবার ভঙ্গীতে কহিলেন, "প্লিজ ডোণ্ট্ টেক্ মি আদার-ওয়াইজ, এবারে উঠি। অন্যায় ভাবে আপনাকে এতক্ষণ কষ্ট দিলুম, ক্ষমা করবেন।"

"সে কি? বাড়ীতে এলেন, চা না খেয়েই উঠবেন।" অদ্ভুত কণ্ঠে সহসা যেন সময়োপযোগী মতোই কথাটা বলিয়া ফেলিল সৌদামিনী।

কিন্তু বোকা ন'ন্ এস্. ডি. ও সাহেব, আইন করিয়া খান; কথাটার ব্যঙ্গাত্মক আঘাতটা এবারে তাঁহাকে বিঁধিল, কহিলেন, "থ্যাঙ্ক্‌স্।" তারপর কিছুক্ষণ থামিয়া কহিলেন, "আপনার মেণ্ট্যালিটি অ্যাড্‌মিরেব্‌ল সন্দেহ নেই, কিন্তু আমাদের আপনারা ভাবেন কি বলতে পারেন?"

সৌদামিনীর মধ্যে এতটুকুও পরিবর্তন দেখা গেল না, কহিল, "ভাবি দু'টো জিনিষ; অতি-মানুষ অথবা ত্রাণকর্তা, আল্‌টিমেটে গিয়ে দাঁড়ায় একবচনেই। অর্থাৎ সমাজের অস্পৃশ্য।"

মাথা অনেকটা যেন নিজে হইতেই নিচু দিকে ঝুঁকিয়া আসিল এস্. ডি. ও সাহেবের। আদালত-কক্ষে অফিসারের সেই উদ্ধত শির যেন অনেকখানি ভারী মনে হইল। আইনজ্ঞ বিচারক প্রতিবাদের ভাষা খুঁজিয়া পাইলেন না গ্রামের এই সাধারণ মেয়েটির কাছে।

থামিয়া সৌদামিনী কহিল, "দেশের লোক তো আপনারাও। আপনারাই কি চান না দেশ স্বাধীন হোক্! কতকাল এই অচল সমাজ ব্যবস্থাকে আরও ঘুণে কাটিয়ে শাসকদের আইন-দণ্ডটাকে কলমের আঁচড়ে আঁচড়ে আরও পাকা করে রাখবেন? বাঙ্গালী হ'য়ে আজ এসেছেন আপনি বাঙ্গালীকেই এ্যারেষ্ট্ ক'রতে? দেশের হৃদয় থেকে আপনারা আজ কত দূরে প'ড়ে আছেন, দেখতে পাচ্ছেন? সমাজের অস্পৃশ্য ভিন্ন আর কিছু কি সত্যিই ভাবতে পারি আপনাদের?"

কিন্তু কথাগুলি যেন সৌদামিনী একরকম নিজের মনেই বলিয়া গেল। এস্. ডি.ও সাহেবের কাছে ইহা নিতান্ত প্রলাপ ভিন্ন কী? ধীরে ধীরে উঠিয়া তিনি সামনের পথে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

এতক্ষণে মুক্তভাবে একবার হাসিতে পারিল সৌদামিনী।

পিসীমা এতক্ষণ আড়ালে থাকিয়া সবই কান পাতিয়া শুনিতে-ছিলেন, আর নিজের মনেই মাঝে মাঝে শিহরিয়া উঠিতেছিলেন। এবারে কাছে আসিয়া কহিলেন, "মথুরকেই ওরা তবে সন্দেহ ক'রলো? আর তুই বা কেমন লা? অমন মরদ পুলিশের সাম্‌নে তোরই বা অত বাজে ব'কবার দরকার ছিল কি?"

মৃদুকণ্ঠে সৌদামিনী কহিল, "দরকারটা যে কি, তা তোমাকে বোঝাবো কেমন ক'রে পিসীমা? ইচ্ছে করে নিজের গায়ের মাংস নিজেই ছিঁড়ে খাই। ওই ওরাই তো দেশটাকে এমন ক'রে ডুবিয়ে রেখেছে! ওরা যদি কাজে জবাব দিয়ে অন্ততঃ একটা দিনও দেশের প্রাণের মাটিতে এসে দাঁড়ায়, তবে কি বিলেত থেকে রাতারাতি সাহেবরা এসে আইন চালাতে পারে! একদিনে এদেশ পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনে চ'লে আসে।"

পিসীমা এবারে যেন রীতিমত হিম্‌সিম খাইয়া উঠিলেন। কহিলেন, "তবে তুই ব'সে ব'সে এই সবই কর্ বাপু, আমি আর তোকে নিয়ে পারি না।"

পরদিন খবর বাহির হইল, ধরা পড়িয়াছে হারান ঘটক আর হরেন ঢাকী। ফেরারী আসামী হিসাবে ইণ্ডিয়া ডিফেন্স জারী হইয়াছে মথুর দত্তের নামে।

বৃদ্ধা ঠাকুরমা মথুর দত্তের; অত কিছু বোঝেনও না, চোখেও ভাল দেখিতে পান না। সৌদামিনীকে কাছে পাইয়া একসময় কহিলেন, "হ্যাঁরে, ওরা সব বলে কি?"

মথুর দত্তের সম্পর্কে তাঁহার ঠাকুরমাকে সৌদামিনীও ঠাকুরমা বলিয়াই ডাকে। কহিল, "ও কিছু নয়, পুলিশে সন্দেহ ক'রেছে, তাই। সাধ্য কি তাদের তোমার নাতিকে ধ'রবে ঠাকুরমা?"

"তাই বল্ মা, তাই বল্।" ঠাকুরমা কহিলেন, "খালি বাড়ীতে মথুর ছাড়া আমিই বা থাকবো কেমন ক'রে? একটি দিনও কি ওকে চোখের আড়াল করে থাকতে পেরেছি?"

"পারবে ঠাকুরমা, খুব পারবে।" ঠাট্টা করিয়া সৌদামিনী কহিল, "কর্ত্তাটিকে একবেলা না দেখেই এই অবস্থা তোমার, এরপর ভাবচি তেমন কেউ যদি সতীন জোটে, তবে তুমি কি ক'রবে!" তারপর কিছুটা থামিয়া চোখেমুখে অস্বাভাবিক একরকমের দৃশ্য টানিয়া কহিল, "তোমার কর্ত্তাকে কিন্তু আমি একটা নাম দিয়েছি ঠাকুরমা, চ'ট্‌বে না তো তুমি?"

অতি দুঃখেও এবারে ঈষৎ হাসির আভা দেখা গেল ঠাকুরমার দন্তহীন লোলচর্ম্মাবৃত ঠোঁটে। কহিলেন, "কি নাম দিয়েছিস্ রে?"

কানের কাছে মুখ আনিয়া অস্ফুট স্বরে সৌদামিনী কহিল, "শ্রীমন্ত।" তারপর আর একমুহূর্ত্তও সেখানে দেরী না করিয়া কোথায় একদিকে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।...

*   *   *

ভাগ্যের কথা, দীর্ঘ রাত্রি অবধি আলোচনা করিয়া বিমলা দেবীর এতটুকুও বায়ু চড়িতে দেখা গেল না; শুইয়া পড়িয়াই তিনি নাক ডাকাইতে সুরু করিলেন। কিন্তু শ্রীমন্তের কেন যেন বড় তাড়াতাড়ি ঘুম আসিল না। মাথার তেলোটা তাহারই হয়ত তবে কিছুটা তাতিয়া উঠিয়াছে। নির্জ্জন অন্ধকার ঘরে বিশ্রী একটা অস্বস্তিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া শুধু এপাশ-ওপাশ করিল। পাশাপাশি ঠাসাঠাসি চারিপাশের বেড়াগুলির মত এই দীর্ঘ বৎসরগুলির নানা কথা নানা ঘটনা অনবরত আসিয়া যেন তার স্মৃতির দুয়ারে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। মনে পড়িল একবার সদানন্দ বৈরাগীকে: তালমাহাটের সেই সদানন্দ বৈরাগী। দীর্ঘ, ঋজু, প্রশান্ত—ছয় ফুট লম্বা চেহারা, বুনোট্ চাটাই আর দরমার ঘেরা আখড়াখানিকে রীতিমত তৎগত শ্রীরূপের আশ্রম করিয়া তুলিয়াছে। উত্তর-পূব মাথায় ট্যাক্সি আর পায়ে হাঁটা পথে সদরের পথ-বরাবর প্রসিদ্ধ জমিদার চৌধুরী পরিবারদের খাস তালুক। প্রতি আষাঢে রথের মেলায় এখানে উৎসবের অন্ত থাকে না। জোড়াতালি দেওয়া জীর্ণ কাঠের রথ খানিকে ঘষিয়া মাজিয়া নতুন করিয়া প্রতিবৎসর জগন্নাথ ঠাকুরের পুষ্পাঞ্জলিতে সুরকির পথে টানিয়া আনেন চৌধুরীরা। এম্‌নিতরই এক রথোৎসবের দিনে একসময় পল্লীকবির কণ্ঠে বস্তুকাব্যের স্ফুরণ লক্ষ্য করিয়াছিলাম—

চৌধুরীদের রথ।

ডান দিকে তার ধুলায় ধূসর তালমাহাটের পথ।

সেই তালমাহাট। নিয়মিত সপ্তাহে হাট বসে প্রকাণ্ড। গৃহস্থ, আধা গৃহস্থ, বারুজীবী, তন্তুবায় আর জেলেদের লইয়া গ্রাম; আর আছে খামারের চাষীরা। সন্ধ্যায় সদানন্দের আখড়া সরগরম হইয়া ওঠে। জাতি বিচারের বালাই নাই। জব্বর সেখ হুকার মুখে ঠোঁট ভিজাইয়া দিলেও নির্ব্বিবাদে কল্কিতে ফুঁ দিয়া আবার ঠোঁট লাগায় চন্দর বিশ্বাস। তারপর কিছুক্ষণ চলে কথকতা, তার পর অধিক রাত্রি অবধি নামকীর্ত্তন। সারাদিন মাঠের বুকে কাস্তে চালাইয়া চাষীরা খানিক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আসিয়া এইখানে। [illegible]লে, "মক্কায় তো আর জীবনে যেতি পারলাম না, পুণ্যটা তোমার [illegible]খানেই ক'রে নিলাম বৈরাগী ভাই।"

শুনিয়া নিজের মধ্যেই সদানন্দ গদগদ হইয়া ওঠে। কিছুক্ষণ [illegible] দৃষ্টিতে একবার সকলের মুখের দিকে তাকায়, তারপর [illegible] স্পর্শে একতারায় সুর তুলিয়া [illegible] চঙে গান ধরে—

পাপ পুণ্য সব ঝুটা—যদি [illegible] জানতে পাই,

[illegible]...

হুঁকার ধোঁয়ায় [illegible] গতিতে নড়িয়া ওঠে চাষীরা। [illegible], "বাঃ ভাই বাঃ, খিধা-তেষ্টা আর মনে রাখতি দেবানা, দেখছি।"

মৃদু হাসিয়া পুনরায় সুর করিয়া তার উত্তর দেয় সদানন্দ:

এ যে ক্ষুধা বিষম ক্ষুধা, মহাজ্ঞানীর আর কি পেষা!

পরমাত্মার ক্ষুধার কাছে কি ছার বলো তাতের নেশা?

(আমি) সকল ক্ষুধা ভুলে এবার পরম খাদ্য তাঁরেই চাই।

তারপর লয়-তানের সঙ্গে পুনরায় গানের প্রথম চরণ আনিয়া যোগ দিয়া বলে—

পাপ পুণ্য সব ঝুটা—যদি গুরুর স্বরূপ জানতে পাই।

আপাত দৃষ্টিতে প্রথম প্রথম অনেকটা মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল শ্রীমন্ত সদানন্দের সংস্পর্শ লাভে। বেশ আছে লোকটা; শ্রীহরির নামে বেশ একটা সাম্য-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছে আখড়াখানিতে। পুলিশের চোখে ধূলা দিয়া শ্রীমন্তের নিজেরও একটা গা ঢাকিবার আড্ডা বটে। কিন্তু কিছুকাল অতিবাহিত হইতেই কেমন যেন আর ভাল লাগিল না। মনে হইল—সদানন্দ নিজ্জীব, আদর্শহীন তার ভিক্ষাবৃত্তির উপরে নির্ভরশীল এই আখ্ড়া। চাষী, তন্তুবায় আর জেলেদের হাত করিয়া অনায়াসে সে এখানে গড়িয়া তুলিতে পারে একটা নতুন গড়। আত্মরক্ষা আর স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে এ-কি কিছু একটা কম!

নাম কীর্ত্তনের ফাঁকে নিরালায় একদিন শ্রীমন্ত কহিল, "আমার মনে হয়, এ নিতান্ত ভুল পথ তোমার বৈরাগী ভাই।"

স্তম্ভিত বিস্ময়ে বহুক্ষণ সদানন্দ অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল শ্রীমন্তের মুখের পানে, তারপর ধীরকণ্ঠে কহিল, "দেখ্‌ছি, তোমার নতুন কথা ব'লবার ক্ষমতা আছে ভাই। আজ পুরো বারো বছর ধ'রে আমার এই সাধন-আখ্ড়ায় ব'সে নামকীর্ত্তন ক'রে চলেছি, কেউ এমন কথা কোনোদিন মুখ ফুটে ব'লতে পারেনি।"

"ব'লবার মতো এখানে কেউ লোক নেই, তাই।" শ্রীমন্ত কহিল, "ভগবানের এই সৃষ্টি-জগৎ, পরম-ব্রহ্ম—পরম শ্রী-সত্তা তিনিই, তাঁর নামে তোমাকে বাধা দেবে কে? কিন্তু কথা তা' নয় বৈরাগী ভাই। যখন দেখি, ভগবানের এই সুন্দর সৃষ্টিশালায় কুৎসিতের আর নরখাদকের অভিনয় চ'লেছে, তখন হাতে আর একতারা নয়, দৃঢ় মুষ্টিতে কঠিন কুঠার উঁচিয়ে ধ'রবার দরকার। ভগবানের নামে তুমি কি আজ এমন শপথ গ্রহণ ক'রতে পারো না—যাতে সেই কুৎসিতের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারো? এত তোমার ভক্ত র'য়েছে গ্রামে, তাদের মধ্যে তুমি এমন মন্ত্র রেখে যাও—যে মন্ত্রে মন শুধু সেই শ্রী-সত্তার পায়েই অর্ঘ্যরূপে নিবেদিত হবে না—তার সাথে সাথে দেশের এই ক্ষমাহীন অবিচারের বিরুদ্ধেও দৃঢ় শক্তিতে দাঁড়াবে?"

"কিসের ইঙ্গিত ক'রছো, বলো?" বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে বহুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া অস্ফুট স্বরে প্রশ্ন করিল সদানন্দ।

শ্রীমন্ত কহিল, "ইঙ্গিত আর কিছুর নয়, এই নির্বীর্য্য নির্য্যাতিত [illegible]।"

[illegible]

ঈষৎ উষ্মার কণ্ঠে শ্রীমন্ত কহিল, "এ জেয়ার কথা নয়, বৈরাগী ভাই। নির্ব্বিবাদে গ্রামের একান্তে শ্রী-রূপের আধ্যাত্ম ভাবে ম'জে আছ, দেশের অবস্থা তো বড় একটা দেখ্‌তে পাও না। পুড়ে পুড়ে দেশ যে শ্মশান হ'য়ে গেল।—"

মৃদু হাসিতে চেষ্টা করিয়া সদানন্দ বলিল, "তাইতো নাম-কীর্ত্তনের দরকার। শ্রী-রূপের 'অমৃত' প্রচার না ক'রলে দেশ মৃত্যুঞ্জয় হবে কেমন ক'রে?"

"আমিও তো তাই বলি বৈরাগী ভাই।" শ্রীমন্ত কহিল, "কিন্তু পন্থার পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। দেশকে মৃত্যুঞ্জয় ক'রে গ'ড়ে তুলতে হ'লে তোমার এই আত্মকেন্দ্রিক নীরব-পন্থায় সত্যিই কিছু কাজ হ'তে পারে কি? একটু ব্যাপকতর হ'য়ে সার্ব্বকেন্দ্রিক রূপে খানিকটা স-রব হ'য়ে ওঠ দিকি!"

সদানন্দের মুখে কথা ফুটিল না। নীরবে একদৃষ্টে চাহিয়া একই অবস্থায় সে বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ থামিয়া শ্রীমন্ত কহিল, "শুনেছ তো মুকুন্দ দাসের নাম? লোকে হয়ত ব'লতো যাত্রাওয়ালা, কিন্তু কী দারুণ সিংহ-বিক্রমে যে তিনি ঐ যাত্রার ছদ্মবেশে দল নিয়ে গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে গিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ ক'রে গেছেন জন-গণকে, তা ভাব্‌তে গেলে আপনিই শ্রদ্ধায় তাঁর পায়ে মাথা নত হ'য়ে আসে। কারাবরণ ক'রেছেন তিনি দেশেরই জন্যে, কারণ দেশকে তিনি স্থান দিতে পেরেছিলেন সবার ওপরে। এস না বৈরাগী ভাই, তোমার ঐ একতারা নিয়েই দলশুদ্ধ সবাই মিলে নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে গিয়ে এমন ক'রে বাজিয়ে যাই যে, মরা হাতে আবার যুব-হস্তী এসে ভর করে। কুড়ুল ধ'রতে না পারো, তোমার ঐ একতারাকেই আজ ক্ষুরধার কুড়ুল ক'রে নাও। ভগবানকে তাতে অস্বীকার করা হবে না, ভগবানের আদেশই বরং তাতে প্রতিপালিত হবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানোই না হচ্ছে ভগবানের আদেশ! তাই যদি না পারলে, তবে যে তোমার নাম-কীর্ত্তনে কলঙ্ক থেকে যাবে, পুণ্য সঞ্চার তো তাতে এক তিলও হবে না, বৈরাগী ভাই।"

এ-বারেও বহুক্ষণের মধ্যে কিছু একটা বলিতে পারিল না সদানন্দ। মনে হইল, তাহার এই নির্ব্বিরোধ সুদীর্ঘ বারো বৎসরের জীবনে কোথায় যেন মুহূর্ত্তে একটা ঝড়ের আভাস দেখা দিয়াছে। জীবন-বৃক্ষের পাতাগুলি যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া ঝরিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। প্রতি লোমকূপে অজ্ঞাতে কেমন যেন একটা শিহরণ খেলিয়া গেল সদানন্দের। শ্রীমন্তের কথার কোনোরূপ জবাব না দিয়া অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ উপরে নীচে কি লক্ষ্য করিল সদানন্দ, তারপর আপন মনেই মৃদুকণ্ঠে আবার সুর ভাঁজিল:

কখন্ যে কোন্ ভাব-সাগরে অন্ধ চোখে ডুবে মরি,
কূলহারা এই অকূল গাঙে ভিড়াও তোমার সত্য-তরী,
ওগো দয়াল—দয়াল হরি।

রক্ষণশীল ধর্ম্মভীরু রক্তের ফেনায়িত মূর্চ্ছনা। দুই হাত যুক্ত করিয়া সহসা একবার ললাটে স্পর্শ করিল সদানন্দ। তাহার সাত পুরুষের পরম দয়ালের পায়ে যাইয়া সেই প্রণাম পৌঁছিল কিনা, বলা শক্ত। কিন্তু গান শুনিয়া শ্রীমন্ত এবারে মনে মনে বড় হাসিল, কহিল, "দয়ালের স্বরূপই যদি গাইবে বৈরাগী ভাই, তবে তা' এমন্ ক'রে নাড়ী-শৈথিল্য-ভাববাদিতায় নয়, গাও:

রক্তবীজ যে চুষে নিলো—দেশের দশের রক্ত দয়াল,
বাহুতে দাও শক্তি এবার—তুলি ধরি বিজয়-মশাল।
ভেঙে দিল অশিব শিবা—চিত্ত সুরের যন্ত্রখানি,
শিখাও মন্ত্র—আগুন জেলে পুড়িয়ে ফেলি সকল গ্লানি।
রুদ্র তুমি সহায়—আমি ঝাঁপ দি' এবার বহ্নি-বানে,
কার দেশে হায় রাজত্ব কার—ঝালিয়ে দেখি গভীর প্রাণে।
সুর-যন্ত্রে যে আগুন জ্বলে—তাই কি আগে ছিল জানা!
মন্ত্র দে তুই -জ্বালিয়ে দি' এই ভৃত্যোচিত শাসন-মানা।"

সদানন্দ কহিল, "বড় কঠিন পথ ভাই, তৈরী হ'তে সময় লাগবে।"

প্রতিবাদের সুরে শ্রীমন্ত কহিল, "সময় নিয়ে যারা তৈরী হয়, তারা তৈরী হয় বটে, কিন্তু সময় আর থাকে না। তোমাকে তো লাঠি নিয়ে সাপ মারতে ব'লছি না; পায়ের সামনে সাপ পড়েছে, লোককে তা' শুধু দেখিয়ে দেওয়া। এস না, আজকেই খুলে দেই তেমন একটা যাত্রার দল। বেদীতে দাঁড়িয়ে গান গাইবে তুমি, আর পাঠ ব'লবো আমি।"

কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিয়া সদানন্দ কহিল, "কিন্তু আর-আর যন্ত্রপাতি, সাজপোষাক, টাকা—তারও তো জোগাড় দেখ্‌তে হবে!'

তার পরের কথাগুলি যেন ক্রমে ভাসা-ভাসা হইয়া আসিল শ্রীমন্তের মনে। ঘড়ির কাঁটায় কয়টা বাজিল ঠিক বোঝা গেল না। দূর হইতে এখনও সেই নিশাচর পাখীটার অতৃপ্ত নিনাদ ভাসিয়া আসিতেছে: কুপ—কুপ—কুপ। ধীরে ধীরে এক সময় চোখের পাতা বুঁজিয়া আসিল শ্রীমন্তের।

[আগামী সংখ্যায়—চতুর্থ পর্য্যায়]

রবীন্দ্র-দর্শন

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, আই. সি. এস্

এক

পুরাণে গল্প আছে—দেবতারা এক দৈত্যের মনোহরণ করবার জন্য সংকল্প করলেন, এমন একটি সুন্দরী নারী গড়বেন—তার তুলনা থাকবে না। সেই সংকল্প অনুসারে প্রতি দেবতা দিলেন তাঁর শ্রেষ্ঠরূপের কণাটুকু এবং এইরূপে তিল তিল করে অসংখ্য রূপের কণা সংগ্রহ ক'রে যে-নারীমূর্তিটি গঠিত হ'ল তার নাম হ'ল তিলোত্তমা; রবীন্দ্রনাথ তেমনি লেখকের রাজ্যে তিলোত্তমা—যিনি বিশ্বরচনা করে হাত পাকিয়েছেন তাঁর লেখক-রচনার পরাকাষ্ঠা। রবীন্দ্রপ্রতিভা লেখনীযোগে যে অতুল সৌধ রচনা করে গেছে, তার কোন অংশটুকুই বা সুন্দর নয়, নিখুঁতভাবে সুন্দর নয়? তা তিল তিল করে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।

একটা কথা আছে, ইংরেজদের কেউ যদি বলেন যে, হয় তোমাদের সেক্সপীয়র ছাড়তে হবে, না হয় সাম্রাজ্য ছাড়তে হবে, কোন্‌টায় তুমি রাজী? তবে, তার উত্তর সোজা এই হবে যে রাজ্য ছাড়ব, তবু সেক্সপীয়রকে নয়। সেক্সপীয়র ইংরেজদের কাছে যা রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালী, তথা ভারতের নিকট তার অনেকখানি বেশী। বাঙ্গালীর সাম্রাজ্য নাই যে তার বিনিময়ে রবীন্দ্রনাথের মূল্যের পরিমাপ করতে হবে। বাঙ্গালীর বলতে গেলে বলবার মত কোন সম্পদই নাই এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া। সে সম্পদ একাই সর্ব্ব গ্লানি, সর্ব্ব দুঃখ দূর করতে সমর্থ। এমনি তা মহার্ঘ্য। বাঙ্গালী প্রাণ বিনিময়েই তাকে রাখতে প্রস্তুত।

রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে বাঙ্গালীর গর্ব্ব করবার মত সম্পদ যে কিছু থাকে না, সে-কথা বেশ সহজেই বোঝা যায় রবীন্দ্রযুগের পূর্ব্বের কালে ফিরে গেলে। সে বড় আঁধারের যুগ ছিল। বাঙ্গালীর কৃষি-জীবনের যে মলিন ছবি রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন, তাই এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়া যেতে পারে।

"দেশ-বিদেশ হইতে অতীত বর্ত্তমান হইতে প্রতিদিন আমাদের কাছে মানবজাতির পত্র আসিতেছে, আমরা কি তাহার উত্তরে দুই চারিটি চটি চটি ইংরেজী খবরের কাগজ লিখিব? সকল দেশ অসীম কালের পটে নিজ নিজ নাম খুদিতেছে, বাঙ্গালীর নাম কি কেবল দরখাস্তের দ্বিতীয় পাতেই লেখা থাকিবে? জড় অদৃষ্টের সহিত মানবাত্মার সংগ্রাম চলিতেছে, সৈনিকদিগকে আহ্বান করিয়া পৃথিবীর দিকে দিকে শৃঙ্গধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছে, আমরা কি কেবল আমাদের উঠোনের মাচার উপরকার লাউ কুমড়া লইয়া মোকদ্দমা এবং আপীল চালাইতে থাকিব? বহুবৎসর নীরব থাকিয়া বঙ্গদেশের প্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহাকে আপনার ভাষায় একবার আপনার কথাটি বলিতে দাও। বাঙ্গালীকণ্ঠের সহিত মিলিয়া বিশ্বসঙ্গীত মধুরতর হইয়া উঠিবে।"(১)

সে-যুগে শিক্ষিত বাঙ্গালীর সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য দু'পাতা ইংরাজী শিখে চাকুরীর উমেদারীতেই পর্য্যবসিত হত। বিশ্বের কৃষ্টির ভাণ্ডারে বলার মত দান বাঙ্গালী জাতির কিছু ছিল না। বাঙ্গালীর সে দৈন্য, সে হীনতা, রবীন্দ্রনাথ যেমন গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন, তেমন করে আর কেউ করেছিলেন কি না। জানি না। তবে তিনি যে সে-গ্লানির জ্বালা কত তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন, তার পরিমাপ উপরে উদ্ধৃত রচনা হতেই পাওয়া যায়।

সেই জন্যই কি সেই গ্লানি মোচনের ভার রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তে নিয়েছিলেন? যদি তাই হয়, পৃথিবীকে বাঙ্গালীর নিজের বাণী শোনাবার ভার নেবার উপযুক্ত লোক আর কেউ হতে পারতেন না। এমন প্রতিভা কোথায়, এমন সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন লেখনী কোথায়? ফলে তাঁর লেখনী বাঙ্গালীর তরফ হতে বাঙ্গালীর নিজের ভাষায় যে কথা লিখল, তা বিশ্বসঙ্গীতকে যে মধুরতর করে তুলেছে তা সুনিশ্চিত।

এই আত্মনিয়োজিত কর্ম্ম এনে দিয়েছে আমাদের সেই বিরাট সাহিত্যসৌধ—যাকে বলি রবীন্দ্র সাহিত্য। তার ভাষার মাধুর্য্য, তার কল্পনার অভিনবত্ব, তার ভাবের গভীরতা, তার রসের প্রাণস্পর্শিতা, কোনটিরই যেন তুলনা হয় না। একটিমাত্র লেখকের এত বিরাট, এত বৈচিত্র্যপূর্ণ, এত দীর্ঘদিনস্থায়ী রচনা দ্বিতীয় আর দেখা যায় না। কেহ গীতিকবি হিসাবে বৈশিষ্ট্যলাভ করেছেন, কেহ নাটককার হিসাবে, কেহ রূপকথা বা উপন্যাস লিখে নাম করেছেন, কেহ বা প্রবন্ধ, কেহ অন্য কিছু। রবীন্দ্রনাথ কোন বিষয়ে রচনা যে লেখেন নি, সেইটাই ভেবে আবিষ্কার করবার বিষয়, আর যে-বিষয়ে লিখেছেন সে-বিষয়ে সে-রচনা উৎকর্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কোন্ শ্রেণীর রচনায় নৈপুণ্য যে তাঁর সর্ব্বাপেক্ষা বেশী তা কেউ বলতে পারবেন না। তাঁর প্রতিভা ও পরিশ্রম এই ভাবে এনে দিয়েছে বাঙালীকে রাশি রাশি, ভারে ভারে অমূল্য অনন্ত সাহিত্য-সম্পদ, যার তুলনা পৃথিবীর কোন সাহিত্যে মেলে না। বিশ্বের দরবারে বাঙালীর আত্ম-পরিচয় দানের উপযুক্ত একটি গুণ মিলেছে। তা

---

(১) রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী—পঞ্চম খণ্ড—বিচিত্র প্রবন্ধ।

বাঙালীকে আত্মগ্লানির অবসাদ ও অপমান হতে চিরকালের জন্য মুক্তি দিয়েছে।

এক দিকে এইরূপে বাঙালীর বর্ত্তমান হীনতার আত্মগ্লানি যেমন তাঁকে সাহিত্য-রচনার প্রেরণা দিয়েছিল, অপর দিকে সেই ভারতের অতীত জীবনের একটি সাধনালব্ধ মহারত্ন তাঁর মনকে একান্ত মুগ্ধ করেছিল। তা হল ভারতের অতীত দিনের মনীষী ঋষির সাধনালব্ধ দার্শনিক জ্ঞান—যে জ্ঞান উপনিষদের বাণীতে আত্মপ্রকাশ লাভ করেছে। সেই দর্শনের মূল ভাবধারা নানা ও বহুবিশ্লিষ্ট শক্তির মাঝখানে একের যোগসূত্র আবিষ্কার করেছে। সেই একত্ব-বোধ সেদিনকার মানুষের মনে এনে দিয়েছিল অবাধ শান্তি ও আনন্দ, আর এনে দিয়েছিল আত্মশ্লাঘার এমন প্রবল অনুভূতি যে সেদিন ভারতবাসী বিশ্বকে আত্মপরিচয় দিয়েছিল এই বলে যে তারা অমৃতের পুত্র!

ভারতের দার্শনিক সাধনালব্ধ কৃষ্টিগত এই মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে অতীত ভারতের জীবনের আদর্শের প্রতি কি গভীর শ্রদ্ধাবিষ্ট করেছিল, তা নিম্নে উদ্ধৃত বচনটি হতেই প্রকাশ পাবে।

"জড় পদার্থ অপেক্ষা মানুষ জটিল জিনিষ, জড়শক্তি অপেক্ষা মানুষের শক্তি দুর্দ্ধর্ষতর এবং বাহ্য সম্পদের অপেক্ষা সুখ অনেক বেশী দুর্লভ। সেই মানুষকে আকর্ষণ করিয়া, তাহার প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া, তাহার ইচ্ছাশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া যে সভ্যতা সুখ দিয়াছে, সন্তোষ দিয়াছে, আনন্দ ও মুক্তির অধিকারী করিয়াছে, সেই সভ্যতার মাহাত্ম্য আমাদিগকে যথার্থ ভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে।" (১)

অন্যত্র তিনি ভারতীয় কৃষ্টির এই বৈশিষ্ট্যের সহিত আমাদের বর্ত্তমান জীবনের যোগসূত্র সংরক্ষিত রাখবার প্রয়োজনীয়তা বেশ গভীর ভাবেই অনুভব করেছেন। আবার তাঁর নিজের ভাষাই এখানে উদ্ধৃত করি:

"পৃথিবীর সভ্য সমাজের মধ্যে ভারতবর্ষ নানাকে এক করিবার আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছে, তাহার ইতিহাস হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে। এককে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করিয়া সেই এককে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা, জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কার করা, কর্ম্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা, নানাবিধ বিপত্তি দুর্গতি সুগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে। ইতিহাসের ভিতর দিয়া যখন ভারতের সেই চিরন্তন ভাবটি অনুভব করিব, তখন আমাদের বর্ত্তমানের সহিত অতীতের বিচ্ছেদ বিলুপ্ত হইবে।"(২)

বর্ত্তমানের সহিত অতীতের এই সঞ্জীবনী ভাবধারা-সংযোগের প্রয়োজনীয়তা তিনি কত গভীর ভাবে অনুভব করেছিলেন, নীচের কাব্যাংশটি তার একটি পরিচয়!—

আর বার এ ভারতে কে দিবে গো আনি
সে মহা আনন্দ মন্ত্র, সে উদাত্ত বাণী।
সঞ্জীবনী, স্বর্গে মর্ত্ত্যে সেই মৃত্যুঞ্জয়
পরম ঘোষণা, সেই একান্ত নির্ভয়
অনন্ত অমৃত বার্ত্তা।
যে মৃত ভারত,
শুধু সেই এক আছে, নাহি অন্য পথ।(১)

এক দিকে যেমন বাংলার পক্ষ হতে বিশ্বকে কিছু শোনাবার ইচ্ছা সাহিত্যরচনায় তাঁকে প্রেরণা জুগিয়েছিল, সেইরূপ অতীতের ঋষির অমৃতবাণীকে নূতন করে জীবনে প্রতিফলিত করবার প্রয়োজনীয়তা বোধ, সম্ভবত, দর্শন রচনায় তাঁকে প্রণোদিত করেছিল! দর্শন রচনায়, অতীতের ঋষির চির ভাস্বর সেই বাণীই তাঁর প্রেরণা। উপরে উদ্ধৃত বচনগুলি এইরূপ মতকে সমর্থন করে। এটিই তাঁর দ্বিতীয় আত্মনিয়োজিত কর্ত্তব্যের সম্পাদন।

তাই বুঝি মুখ্যত তিনি সাহিত্যিক হলেও দার্শনিক অনুসন্ধানেও তাঁর রচনার এক বিশিষ্ট অংশ পরিব্যাপ্ত করে বসে আছে। এই দার্শনিক চিন্তা তাঁর রচনাবলীর কতখানি অংশ দখল করে বসে আছে, তার একটু পরিচয় এই স্থানে দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মুখ্যত যে তিনি কবি, সেই কথাটা আমাদের মনে অত মোটা করে ঠেকে, ফলে দার্শনিক আলোচনা সমগ্র দৃষ্টিতে তাঁর রচনায় কি বিপুল ক্ষেত্র দখল করে বসে আছে, তা আপাতদৃষ্টিতে ঠিক হৃদয়ঙ্গম হয় না।

এই দার্শনিক আলোচনা তাঁর গদ্যরচিত প্রবন্ধাবলীর একটি মূল আলোচ্য বিষয়। তাঁর ধর্ম্মশীর্ষক-প্রবন্ধগুলি, তাঁর শান্তিনিকেতন শীর্ষক প্রবন্ধগুলির প্রধান প্রেরণা দার্শনিক বিষয়। এ ছাড়া বিক্ষিপ্ত আকারে তাঁর সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধে, পত্রালাপে এবং এই ধরণের ছোট রচনায়ও তা এক মূল স্থান অধিকার করেছে। "মানুষের ধর্ম্ম" শীর্ষক তাঁর 'হিবার্ট' বক্তৃতা একটি অমূল্য দার্শনিক রচনা। তাঁর সমগ্র দর্শনখানিকে গুটিয়ে নিয়ে, নিজের মত করে এক জায়গায় বলবার চেষ্টা এমন করে আর কোথায়ও পাই না। এই পুস্তকে বর্ণিত অনেক কথার আলোচনা সেই কারণে, অন্যত্র বিক্ষিপ্ত আকারে যে সব দার্শনিক উক্তি তাঁর রচনায় পাই, তা হৃদয়ঙ্গম করতে সাহায্য করে। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে 'হিবার্ট' বক্তৃতার কর্তৃপক্ষ তাঁকে এমন একটি পুস্তক রচনায় প্রণোদিত করেছিলেন। তা না হলে তাঁর কবিজনলভ মনোভাব, এ ধরণের খাঁটি দার্শনিক রচনায় তাঁকে কোনদিন প্রবৃত্তি দিত কি না, তা বিশেষ সন্দেহের বিষয়।

অপর পক্ষে একথা আমাদের ভুললে চলবে না যে, তাঁর কাব্য রচনার অনেক অংশ দার্শনিক তত্ত্ব কণিকা বুকে ধারণ ক'রে আছে, দার্শনিক তত্ত্বই তাদের আধেয়! এই তত্ত্বকণিকা নানা কবিতায় মাঝে মাঝে খণ্ড আকারে যে শুধু ছড়ান আছে, তাই নয়। তেমন ভাবে যে কত কবিতায় তা পাওয়া যাবে, তার হিসাব করা সাধ্যাতীত। আরও বড় কথা এই যে, তাঁর অনেকগুলি সমগ্র কাব্য গ্রন্থেরই প্রধান প্রেরণার বস্তু হল দার্শনিক ভাবধারা। আরও বড় ভাববার কথা এই যে, যে কালে দেখি তাঁর কবিত্ব-

(১) রবীন্দ্র রচনাবলী—চতুর্থ খণ্ড—৪০৪
(২) রবীন্দ্র রচনাবলী—চতুর্থ খণ্ড—৩৮৪

(১) রবীন্দ্র রচনাবলী—অষ্টম খণ্ড—নৈবেদ্য—১৩

শক্তি চরম বিকাশলাভ করে পরিবর্দ্ধিততম আকারে দেখা দিয়েছে, তখনকার দিনের যে যুগান্তকর রসধারা তিনি যে কাব্যগুলিতে পরিবেশন করে গিয়েছেন, তাদের মূল এবং একটানা সুর হল একটী দার্শনিক ভাবধারা তাঁর গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি এই যুগের রচনা। গীতাঞ্জলির প্রকাশ তারিখ ১৩১৭ ও গীতিমাল্য ও গীতালির ১৩২১। এই দীর্ঘ কয়েক বৎসর ধরে কেবল মাত্র একটি মূল ভাবধারা কাব্যগ্রন্থের পরে কাব্যগ্রন্থ অবলম্বন করে অভিব্যক্তি লাভ করেছে। এমনটি অন্য কোন কবির জীবনে হয় নাই। আর সেই ভাবধারাটি সম্পূর্ণ দার্শনিক। কবির জীবনের অন্য অংশেও প্রায় সমগ্র বাক্যগ্রন্থ জুড়ে দার্শনিক আলোচনা বিকাশ লাভ করেছে, এমন ঘটনা আরও দেখা যায়। তাঁর নৈবেদ্য বা বলাকা এই সম্পর্কে উল্লেখ করা যেতে পারে।

অপর পক্ষে দেখি, নানা নাটকের মধ্যেও দার্শনিক ভাববিকাশ লাভ করেছে। বিসর্জ্জন এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে রূপক নাটকগুলির বিষয়বস্তু বেশ প্রকটরূপেই দার্শনিক শ্রেণীর। 'অরূপরতন', 'রাজা ও রাণী, 'অচলায়তন' প্রভৃতি নাটক এই শ্রেণীর।

উপরের এই আলোচনা হতে এটুকু হৃদয়ঙ্গম হবে যে দার্শনিক আলোচনা আমাদের এই কবির বড় কম আকর্ষণের বস্তু ছিল না। মুখ্যত তাঁর খ্যাতি—তিনি কবি। কিন্তু দার্শনিক ব'লে তাঁকে কেউ যদি বর্ণনা করবার দাবী করেন, সে দাবীর বল কিছু কম হবে বলে মনে হয় না। তাই যেন মনে হয় তিনি যেমন বাঙ্গালীর তরফ হতে বিশ্ববাসীকে কিছু বাণী শোনাতে চেয়েছিলেন, তেমনি ভারতের অতীতযুগের ঋষির সাধনালব্ধ বাণীকেও নূতন সুরে শোনাতে চেয়েছিলেন। প্রথম চেষ্টা হতে আমরা পেয়েছি আমাদের অমূল্য সম্পদ, রবীন্দ্র-সাহিত্য এবং দ্বিতীয় চেষ্টা হতে পেয়েছি পূর্ব্বকালের উপনিষদের বাণীর মতই অমৃতময়ী-সঞ্জীবণী বাণী, রবীন্দ্র-দর্শন। উভয়ই দুর্মূল্য বস্তু। প্রথমটি আমাদের বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আলোচনার বস্তু নয়। দ্বিতীয়টির আলোচনাই আমাদের বর্ত্তমান বিষয় বস্তু।

যদিও এই ভাবে দার্শনিক বিষয় তাঁর কবিতা ও অন্য রচনার একটি মূল প্রেরণার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তবু একথাটি আমাদের বিশেষ করে মনে রাখার প্রয়োজন হবে যে, মূলত তিনি দার্শনিক নন, তিনি কবি। তাঁর মানসিক গঠন সেই ধরণের যা কবির দেখা যায়। তা ভাবপ্রবণ, তা অনুভূতিপ্রধান, তা শুষ্ক, নীরস, সূক্ষ্ম বিতর্কমূলক, বিচারে পরাঙ্মুখ। মোটামুটি বলতে পারি, যাকে সাধারণত দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি বলি, তা তাঁর মাঝখানে নাই। কবিসুলভ মনোভাবই যে তাঁর বৈশিষ্ট্য এ কথাটি মনে রাখবার একটা বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। এই মনোভাবই জ্ঞানলাভের মার্গ সম্বন্ধে যে দার্শনিক সমস্যা জাগে, তার সমাধানে কবির মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। তা তাঁর সত্যানুসন্ধানের পদ্ধতি নিরূপণ করে দিয়েছে। সাধারণ দার্শনিক যে পথে সত্যানুসন্ধান করে থাকেন, সে পথকে তাঁর কবি মনের দৃষ্টিভঙ্গি অনুমোদন করতে পারে নি। কথাটা এইখানে আর একটু পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার।

সাধারণ দার্শনিকের সত্যানুসন্ধানের মার্গকে আমরা বিচার-মার্গ বলতে পারি। মানসিকযুক্তিই তাঁর প্রধান অস্ত্র। মনের যে অংশ চিন্তা করে, কেবল সেই অংশকেই অবলম্বন করে তিনি সত্যানুসন্ধান করেন। মনের অনুভূতি বৃত্তির সঙ্গে তাঁর কোন বলাই নাই। আপাতঃদৃষ্টিতে আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যা দর্শন করি, তাও দর্শন, কিন্তু দার্শনিকের দর্শন বিভিন্ন বস্তু। তিনি গভীরতর দৃষ্টির সাহায্যে বস্তুর অন্তরের সত্যকে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেন। এই চেষ্টায় বিচারমার্গই তার একমাত্র অস্ত্র। বৈজ্ঞানিকও এই বিচারমার্গ সত্যানুসন্ধানে অবলম্বন করে থাকেন। তবে বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার পদ্ধতির একটু বিভিন্নতা আছে। বৈজ্ঞানিকের গবেষণার বিষয় তুলনায় সীমাবদ্ধ, কাজেই সেখানে কৃত্রিম উপায়ে অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে গবেষণা সম্ভব হতে পারে। দার্শনিকের গবেষণার বিষয় কিন্তু যেমন অসীম তেমনি জটিল। সৃষ্টি সম্বন্ধে যা কিছু মৌলিক প্রশ্ন উঠতে পারে, সবই তাঁর আলোচনার বিষয়। কাজেই সেখানে গবেষণার ততটা সুযোগ নাই এবং কাজেই দার্শনিকের অধিক মাত্রায় কেবল যুক্তি এবং চিন্তার উপর নির্ভর করতে হয়। এই তাঁর অস্ত্র। অপর পক্ষে তাঁর যে দৃষ্টিভঙ্গি তার সহিত বিচারকের দৃষ্টিভঙ্গির বোধ হয় কিছু পরিমাণ তুলনা চলতে পারে।

এ সম্পর্কে একটী উদাহরণ নেওয়া যাক। দর্শনের একটী মূল প্রশ্ন হল, সৃষ্টির বা বিশ্বের গঠন কিরূপ! এ সম্পর্কে দুই ধরণের উত্তর উঠতে পারে। প্রথম, সৃষ্টি একই বস্তুর বিকাশ; দ্বিতীয় তা নয়, সৃষ্টি বহু বিভিন্ন বিশ্লিষ্ট বস্তুর সমষ্টি। এখন এর কোন উত্তরটি ঠিক বা কোনটীই বা ঠিক নয়, এই হল দার্শনিকের সমস্যা। তিনি এ প্রশ্ন সম্বন্ধে যত কিছু উত্তর দেওয়া হয়েছে বা হতে পারে জানবেন, তাদের সপক্ষে বা বিপক্ষে কি কি যুক্তি প্রয়োগ করা যেতে পারে, তাও জেনে নেবেন। তারপর চিন্তাশক্তির সাহায্যে যুক্তির তুলাদণ্ডে বিচার করে তিনি উত্তর দেবেন, এদের কোন সমাধানটি ঠিক, বা কোন এক তৃতীয় সমাধানের প্রয়োজন আছে কি না! এই হল দার্শনিকের সমালোচনা মূলক দৃষ্টিভঙ্গি। তাঁর কোন বিশেষ মতের প্রতি আগ্রহ নাই, বা কোনও পাল্টা মতের প্রতি বিদ্বেষ বোধ নাই। নিছক চিন্তা ও যুক্তির বিচারে যে মত উপযুক্ত প্রমাণিত হবে, তাকেই তিনি বরমাল্য দেবেন। তাঁর বিচার পদ্ধতিতে, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীতে, নিছক চিন্তাশক্তি ছাড়া অন্য কোন মানসিক শক্তির প্রয়োগের ক্ষেত্র নাই। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅবনীকান্ত ভট্টাচার্য্য

চার

প্রমোদ-বিলাসী মহিমারঞ্জনের জীবনে সম্পূর্ণ নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। ত্যাগের মন্ত্রে তাঁহার কার্য্যক্রম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, নিরর্থক দিনগুলি সার্থক হইয়া উঠিল। দেশের গণ-আন্দোলনের আহ্বানে তিনি সাড়া দিলেন। যে জন-চিত্ত-বিজয়ীর দল আমাদের এই দেশের স্বাধীনতার কঠিন সন্ধানে ছুটিয়াছিলেন জীবন-মৃত্যু পদতলে দলিত করিয়া, তাঁহাদেরই বিজয়-শঙ্খ ধ্বনিত হইয়া উঠিল তাঁহার কর্ণ-কুহরে। ধনের বোঝা, খ্যাতির নেশা, দুর্ভাবনার গুরুভার হেলায় ধূলিসাৎ করিয়া উদ্বেগ-শূন্য প্রাণে মহিমারঞ্জন জটিল সঙ্কট-পূর্ণ স্বাধীনতার সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করিলেন। এই নীরস নিষ্ঠুর পথে তাঁহার পায়ে ফুটিল কত কুটিল কাঁটা, বিঁধিল কত কঠিন কঙ্কর; তথাপি তিনি সকল তুচ্ছ করিয়া আরাম-বিশ্রামকে নির্ব্বাসনে পাঠাইয়া—পিছুর পানে আর ফিরিয়া তাকাইলেন না। সমুখ টানেই আগাইয়া চলিলেন। নিদারুণ দীর্ঘ কারাবাস তাঁহাকে ক্লিষ্ট করিতে পারে নাই, তাঁহার মনে নৈরাশ্য আনে নাই। আপনার রক্তদানে দেশ-মাতৃকার পদানত-মলিন বেদী ধৌত করিয়া দিতে তাঁহার তিল-মাত্র কার্পণ্য ছিল না। এই ভাবেই মহিমারঞ্জন দেশের মুক্তি-যজ্ঞে নিজেকে আহুতি দিলেন—কিন্তু তাঁহার প্রিয় দুহিতা ক্ষমার প্রাণে রাখিয়া গেলেন পিতৃ-মহিমার প্রোজ্জ্বল ইতিহাস।

মহিমারঞ্জন বাঁচিয়া থাকিতে ক্ষমা তাঁহার সর্ব্বকর্ম্মে সহায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মেয়েকে দেশের এবং দশের সহিত পরিচিত করিয়া দিবার জন্য বহু নিমন্ত্রণে, বহু সভা-সমিতিতে প্রায়ই সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন। এইরূপেই জমিদারপুত্র কণাদ রায়ের সঙ্গে তাঁহাদের অন্তরঙ্গতা বাড়িয়া ওঠে। কণাদ কয়েকদিন পরেই ক্ষমার পাণিপ্রার্থনা করিয়া মহিমারঞ্জনকে প্রস্তাব পাঠায়। কিন্তু মহিমারঞ্জন মেয়ের এ-বিবাহপ্রস্তাবে সায় দিলেন না। প্রথমতঃ তাঁহার ইচ্ছা ছিল না, পৈতৃক অর্থে ধনী কোন ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দেওয়া; দ্বিতীয়তঃ, কণাদ সগোত্র তাই অন্তর্বিবাহে তাঁহার অমত ছিল; বিশেষতঃ, এই কথায় তাঁহার ভগিনী বরদাসুন্দরী একেবারে বাঁকিয়া দাঁড়াইলেন।

মহিমারঞ্জন যখন শেষ নিঃশ্বাস ছাড়িলেন—কণাদ ক্ষমা লাভের আশায় আর একবার প্রাণপণ চেষ্টা করিল। কিন্তু বরদাসুন্দরীর সম্মতি সে কিছুতেই আদায় করিতে পারিল না। তারপরে একদিন হঠাৎ শুনিতে পাইল—ক্ষমার সহিত তাহারই এক সতীর্থের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পরাজয়ের গ্লানি-ভরে তাহার মাথা অবনত হইয়া গেল। আশা-ভঙ্গে তাহার জীবনের প্রত্যেকটী দিন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল। শেষ পর্য্যন্ত নিস্ফল আক্রোশে নিজের রূপ ও অর্থের মোহ ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া কণাদ হঠাৎ নায়িকা সাজা কত না মেয়ের ও মহিলার যৌবন ক্রয় করিল; কত বোকা মেয়েমহিলাকে নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইয়া ছিনিমিনি খেলিল। কিন্তু কিছুতেই কোনো মেয়ে মহিলার মধ্যে সে ক্ষমার আসন দেখিতে পাইল না। তাহার তরুণীর রূপ-যৌবন-আস্বাদ ক্রমে বিস্বাদ হইয়া পড়িল। একদিন হঠাৎ কাহাকেও কিছু না বলিয়া কণাদ গা-ঢাকা দিল। তাহার নারী মৃগয়ায় যবনিকা পড়িল। অবসাদ তাহাকে গ্রাস করিল; নির্জ্জনবাস তার ভাল লাগিতে লাগিল। ক্রমে কণাদ ভদ্র হইয়া উঠিল। মাঝে মাঝে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে ছাড়ো-ছাড়ো মেলা-মেশা আবার সুরু হইল। বারিদ-বরণের গৃহে সে সময়ে-অসময়ে আসিয়া জুটিতে লাগিল।

সে-দিন নিমন্ত্রণ পাইবামাত্র কণাদ সোজা আসিয়া যখন উপস্থিত হইল বারিদবরণের বাড়ী, তখন ক্ষমা একলা ছিল। নানা কথার সূত্রে তর্ক আরম্ভ হইল এবং তর্কের মধ্যেই হঠাৎ ছেদ টানিয়া দিয়া ক্ষমা ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে কণাদ অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

কণাদ কত চিন্তাই না করিতেছিল! ভাবনার দোদুল-দোলায় কণাদের মন যখন দোদুল্যমান, হাতে মিষ্টান্নের থালা লইয়া ক্ষমা ঘরে ঢুকিল, পেছনে চাকর আসিয়া এক গ্লাস জল রাখিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

ক্ষমা হাসিয়া বলিল: "নিন্—খান্ দেখান। গলাটা একটু মিষ্টি ক'রে ফেলুন।"

কণাদ চোখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল: "দাও খাই। তোমার দেওয়া কোনও জিনিষ প্রত্যাখ্যান করবার মত শক্তি আমার নেই।" নীরবে কণাদ মিষ্টিগুলি গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিল।

ক্ষমা টিট্‌কারী দিয়া বলিল, "কি! গলায় আটকাচ্ছে না তো?"

কান্নার মত হাসি হাসিয়া কণাদ উত্তর দিল: "না—তা নয়। তবে, একটা কথা বল্‌বো বল্‌বো—মনে কচ্ছি—কিন্তু, যা তোমার উগ্র রূপ দেখিয়েছ—বল্‌তে ভরসা পাচ্ছি না। আবার কি ভাববে হয় তো? মেয়েদের অভ্যেসই উল্টো বোঝা কি না!"

"আহাঃ অতো বিনয় কেন? বলেই ফেলুন না। কথা তো আর আমার গায়ে ফুটবে না—বরং বলে ফেললে আপনার ভারী মন কিছুটা অন্ততঃ হাল্কা হ'লেও হতে পারে। বলুন—নইলে আফ্‌শোষ করতে হবে।"

"আচ্ছা: তুমি যে জীবনটাকে বাঁধা-ধরা নিয়মে ঘানির বলদের মতন ক'রে তুলতে চাও—তা'তে কি জীবন চিনতে পারা যায়?—আমার মনে হয়, আরো অন্ধ, আর'ও জটিল হয়ে ওঠে।"

"বরং ঠিক তার উল্টো। এই বাঁধা-ধরা নিয়ম আছে ব'লেই—আমাদের জীবন আরও সহজ হয়ে ওঠে—কোনো ঘোর-প্যাঁচের বালাই থাকে না।"

গত ফাল্গুন সংখ্যার পরে

"তুমি কি এর একটুও ব্যতিক্রম পছন্দ করো না।"

"কোনো মতেই না।"

"ক্ষমা! তুমি অনিন্দ্য—তবু একেবারে গোঁড়ামির চূড়ান্ত,—এ-কালের যোগ্য নয়!"

"বিশেষণটার কোনো দরকার ছিল না, কণাদবাবু।"

"আমি নিজেকে চাপ্‌তে পারিনি। আমি সমস্ত সাম্‌লাতে পারি—কেবল পারি না প্রলোভনকে।"

"আপনি দেখ্‌ছি—দুর্ব্বলতার আধুনিকতম ভণ্ডামিটা বেশ আয়ত্ত ক'রে ফেলেছেন।"

"ভণ্ডামি ঠিক নয় ঘোষালদেবী, একে অনেকটা স্বাভাবিকতারই অভিব্যক্তি বল্‌তে পারেন।"

এই সময়ে সেই ঘরে দেউলিয়া যৌবনের মুখোস-পরা প্রসাধন-গর্ব্বিতা প্রৌঢ়া কাণিকা মৌলিক আসিয়া ঢুকিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে আসিল তাহার তরুণী কন্যা অগুরু—সাজিয়াছে যেন টেকা-কুমারী। কাণিকা সৌখীন-পাড়ার বাসিন্দা। সব্-জজের ঘরণী। এই দম্ভে, মাটিতে পা ফেলিতে তার লজ্জা করে।—ঘরে ঢুকিয়াই কণাদ ও ক্ষমাকে কথা কহিতে দেখিয়া কাণিকা থম্‌কাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ক্ষমা তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহাকে হাত ধরিয়া আনিয়া বসাইল;—কাণিকা মেয়েকে নিজের পাশে বসিতে ইঙ্গিত করিল।

কাণিকাই প্রথমে কথা কহিল। "ক্ষমা-মা! আজকে তোমাদের মিলন-তিথির উৎসব হ'চ্ছে শুনে খুব আনন্দ পেলুম। তোমায় দেখে আরও বেশী সুখী হয়েছি। হ্যাঁ!—আমার মেয়ে অগুরুকে মনে পড়ছে না? ও একটু বড় হয়েছে—এতোদিন মামার কাছে ছিল—এই ক'দিন হোলো এসেছে।" কণাদের প্রতি লক্ষ্য পড়িতেই যেন এতক্ষণ চিনিতে পারে নাই, এই ভাণ দেখাইয়া বলিয়া উঠিল; "ও-মা! কুমার বাহাদুর যে। আমি ভাব্‌ছিলাম আর কেউ। তা'—নেমন্তন্ন পেয়েই সাতসকালে সবার আগে হ্যাঙলার মতন ছুটে এসেছ যে, দেখ্‌ছি! আছো কেমন বলো! শরীর মন্‌টন্‌ ভালো তো?"

কণাদ ঈষৎ হাসিয়া কহিল: "ভালোমন্দর মাঝামাঝি হাকিম-সাহেবা। আপনি যে আপনার মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন না?"

"ও বাবা! তবেই হ'য়েছে। তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের চেনা করিয়ে দেব না—তাহ'লে তুমি ওর কাঁচা মাথাটা নাটুর মতন ঘুরিয়ে দেবে, তুমি বড্ড দুষ্টু কিন্তু।"

"ও অপবাদ দেবেন না, আপনি! দুষ্টু হ'তে গিয়েও আমি দুষ্টু হ'তে পারি নি—ও-দিক্‌টায় আমি একেবারে ফেল্। অনেক লোক অনেক কথাই আমার পেছনে বলে বটে, কিন্তু সত্যিকারের বল্‌তে কি. আমি কারও বিশেষ কোনো মন্দ করি নি!—এ-কথা সমর্থন করবার মত আমার স্বপক্ষেও অনেক লোক মিল্‌তে পারে।"

কণাদের কথায় কাণিকা হাসিয়া যেন গড়াইয়া পড়িল। পরে বলিল, "বলো কি, কুমার-বাহাদুর! বড়াই করতে দোষ নেই—তবে আমি আর বেশী কিছু বলবো না। তুমি হচ্ছো একটা ভৈরব। সত্যি নয় কি, বলো তো ক্ষমা!"—নিজের কথাতেই নিজে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, তারপর পুনরায় কহিল, অগুরু, এই রূপবান্ পুরুষটী কুমার-বাহাদুর কণাদ রায়। কিন্তু মনে রেখো—উনি খুব বড় শিকারী। ওঁর একটি কথাও বিশ্বাস কোরো না যেন।"

"বাঃ! আমার বেশ পরিচয় দিচ্ছেন তো মেয়ের কাছে। অগুরু, তুমি বিশ্বাস করো—তোমার মায়ের কথা?"

অগুরু চকিতে বক্তার দিকে একটি চোরা কটাক্ষ হানিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। লজ্জায় লাল মুখখানা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল।

ক্ষমা এই অবকাশে কহিল: "আপনাদের জন্যে চা আর মিষ্টির ব্যবস্থা করি। একটু বসুন এখানে—আমি এই আস্‌ছি।"

"না, না, মিষ্টি-টিষ্টি থাক—অতো ব্যস্ত হ'য়ে কাজ নেই বাছা। তবে, হ্যাঁ, একটু শুধু চায়ের কথা ব'লে দাও...মুখটা খারাপ হ'য়ে রয়েছে।"

...যা চা খাইয়েছে ধরণী গুপ্তদের বাড়ী—আরে রামো, সে আর ব'লে কাজ নেই...কি চা'য়ের ছিরি...নোন্‌তা তেঁতো...হবে না-ই বা কেন...চা আর চিনি যে ওদের জামাই যোগায় কি না—সে যে কোন্ সরকারী গুদামের বাবু...শ্বশুরবাড়ীর সুসার হবে ব'লে পচা বেদম-পুরাণো মালগুলো সরিয়ে নিয়ে আসে—নুন্-মেশানো চিনি—বাবা, এখনো গলা কিট্‌কিট্ করছে। আমি তো বাপু, কণ্টোলের ও-সব বাজে চিনি ভাঁড়ারে তুলিই না...গ্লুকোস্ দিয়ে চা-তৈরী হয়—আমার বাড়ীতে।...মানুষকে খেতে দিবি—এ-কি!"

"তা হ'লে, ভালো ক'রে একটু চা তৈরী ক'রে নিয়ে আসি।"

"না, না, তুমি বোসো। চাকরকে ডেকে ব'লে দাও। একটা কথা কইতে এলুম...ঐ দেখ না...মেয়ে আমার রাত্রিতে তোমার এখানে নাচ-গানের খুব বড় আসর হবে শুনে বেজায় নেচে উঠেছে।"

"বড় আসর আর কোথায়?" আমাদের বিয়ের দিনটিকে উপলক্ষ্য ক'রে সামান্য নাচ-গানের ব্যবস্থা হয়েছে—তা' আবার ঘরোয়া। বেশীক্ষণও হবে না—সে এমন কিছু বড় আয়োজনও নয়।"

কণাদ কৌতুক-মিশ্রিত স্বরে বলিয়া উঠিল,—"আজ্ঞে হ্যাঁ, খুব ছোটো, খুব অল্পক্ষণ, খুব বাছা বাছা লোক—এই হবে উৎসবের রূপ।"

কাণিকা কণ্ঠে আতিশয্য চড়াইয়া কহিল: "নিশ্চয়, বাছা বাছা লোকই তো চাই। আমি তো জানি—ক্ষমার বাড়ীতে এর অন্যথা হবে না। এত বড় কল্‌কাতা সহরে ক্ষমার বাড়ীর মতন ক'টা বাড়ী আছে—যেখানে স্বামী ছেলে-মেয়ে নিয়ে নিশ্চিন্তমনে যাওয়া যায়? অগুরুকে তো না বুঝে-সুঝে যে-কোনো নেমন্তন্ন বাড়ীতে যেতে দিই না. হাকিম-বাবুটীকেও না। দিনে দিনে সমাজ কি হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে—বলো দেখি। সর্ব্ব যায়গায় বদ্‌নামী লোকের ভিড়—কি মেয়ে, কি পুরুষ। এমন অনেক বর্ণচোরা—যারা ভদ্রসমাজে নাম ভাঁড়িয়ে ঢুকে পড়ছে চুপি চুপি,—তাদের

বাপ-মায়ের নাম-কুলুজির ঠিকানা নাও—তা'রা নয় ঢোক্ গিল্‌বে—নয়তো একটা যা হোক্ মিথ্যে বানিয়ে ব'লে দেবে। সত্যি:—এই অনাচারের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন করা খুব দরকার হ'য়ে পড়েছে। একে বাধা দেবার এমন কেউ কি নেই?"

ক্ষমা জোর দিয়া বলিল: "আমি বাধা দোবো—মৌলিক-খুড়িমা আমি কোনো বদ্‌নামী লোককে আমার বাড়ীর চৌকাঠ মাড়াতে দেবো না।"

কণাদ তাহাদের মাঝে বলিয়া ফেলিল: "দোহাই ক্ষমা দেবি! ঐ গোঁ যদি ধরো—তবে আমি তো এখানে কখনো ঢোক্‌বার অনুমতি পাবো না।"

হাকিম-গৃহিণী রায় দিল: "ওঃ—পুরুষদের কথা বাদ দাও। তবে মেয়েদের ব্যাপার আলাদা। অন্ততঃ আমাদের মতো যে ক'ঘর ভালো আছে—তারা যেন পুরোদস্তুর কোণ-ঠাসা হ'য়ে আস্‌ছে। এই আমরা—আমাদের তো ভালোই বল্‌তে হয়... আমাদের স্বামীগুলো কালের হাওয়ার দোষে আমাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলে যেত—যদি না আমরা তাদের ওপর আমাদের পুরোপুরি দাবী জানিয়ে দেবার জন্যে—সময়ে-অসময়ে খিটিমিটি না বাধিয়ে দিতুম। স্বামীকে সচেতন রাখতে হ'লে—স্ত্রীর উচিত—তার পিছনে সদা-সর্ব্বদাই লেগে থাকা—আর উঠতে বস্‌তে সব-কাজে কড়া নজর রাখা।"

কাশিকার এই উক্তির প্রতিবাদ-কল্পে কণাদ টিপ্পনিযোগে মন্তব্য করিল: "বিবাহের নামে যে জুয়াখেলা চলে—সেখানে একটা মস্ত বড় প্রশ্ন জেগে থাকে—বিবাহটাকে আমি জুয়োখেলাই বল্‌বো—এ-জিনিবটা সংক্রামক ব্যাধির মত দাঁড়িয়ে যাচ্ছে—হয়তো একদিন এ-রকম বিকার-কৌতুক আর চল্‌বে না—দাম্পত্য-জীবনের এই দেখা-বিন্তি-খেলায় স্ত্রীরা রঙের সবচেয়ে বড় তাসগুলি ধ'রে রাখে, আর জোর-পিঠ খেলার পর বিজোর-পিঠটিতে সবসময়েই হে'রে বসে।

হাকিম-গৃহিণী তীব্র স্বরে জবাব দিল: "তার মানে? বিজোর-পিঠ কোন্ পক্ষকে বল্‌তে চাও? সে কি স্বামী—কুমার সাহেব?"

কণাদ মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল: 'আজকালকার স্বামীর তাই-ই যোগ্য সংজ্ঞা বটে।"

কাশিকা ক্ষুব্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল: "কি কালো মন তোমার, কুমার-বাহাদুর! নিছক দুষ্ট প্রকৃতির লোক তুমি!"

ক্ষমা কণাদকে কটাক্ষ করিয়া কহিল: "কুমার-বাহাদুরের কথার কোনো দাম নেই। স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধে কথা-কওয়া ওঁর অনধিকার চর্চ্চা—এ-বিষয়ে উনি তুচ্ছ!"

কণাদ ঘা খাইয়া অনুযোগের সুরে কহিল:—"ক্ষমাদেবি! আমাকে অতখানি ছোটো করা আপনার অন্ততঃ উচিত হয়নি।"

ক্ষমা নিজের জিদ্ বজায় রাখিয়া বলিল,—"তবে আপনি এ-জীবন সম্বন্ধে এমন খোলা কথা কইতে ভরসা পাচ্ছেন কেন?"

কণাদ ধীর-ভাবে উত্তর দিল; "কারণ—জীবন-সম্বন্ধে আমার ধারণা সম্পূর্ণ অন্য ধরণের—তাই ভার দিয়ে কথা কইতে জানি না বা চাই না।"

হাকিম-গৃহিণী বোকার মত প্রশ্ন করিল: "ও বলে কি? আমি সরল সাদাসিদে মানুষ—ও-সব প্যাঁচ-দেওয়া কথা আমার মাথায় ঢোকে না। কথাটা কি, খুলে বলো দেখিনি কুমার-বাহাদুর!"

"বোধ করি, খুলে না বলাই ভালো। আজকাল সুস্পষ্ট কথা কওয়া মানেই হচ্ছে—নিজেকে ধরা দেওয়া...। নমস্কার, এখন উঠি...।"—ক্ষমার দিকে চাহিয়া কণাদ মৃদুহাস্যে কহিল: "আপাততঃ বিদায় নিচ্ছি। রাত্রির উৎসবে আসবার বাসনা রইল...প্রবেশাধিকার পাবো তো? বলো তো আসবো।"

ক্ষমা সাগ্রহে বলিয়া উঠিল: "নিশ্চয় আসতে হবে—আবার জিজ্ঞেস কচ্ছেন যে? হ্যাঁ, তবে একটা নিষেধ-জারী আছে আপনার ওপর—সকলের সামনে লোক-দেখানো বাজে কুটিল জিনিষ নিয়ে আলোচনা করতে পাবেন না. আপনি।"

কণাদ হাসিয়া ফেলিল—প্রত্যেক কথাটা ধীরে ধীরে কহিয়া গেল: "তুমি আমার দোষ শুধরে না দিয়ে ছাড়বে না, দেখছি। কিন্তু কাউকে সংশোধন করবার বিপদ আছে, ক্ষমাদেবি...চলি তা' হ'লে।"

কণাদ বাহির হইয়া যাইতে কাশিকা দেবী যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল: "চমৎকার চেহারা, চোস্ত ব্যবহার, টাকা-পয়সারও অভাব নেই, কিন্তু দুষ্টুর শিরোমণি! ওর টাকার গরম নেই বটে—তবে বড়লোকী বদ্‌খেয়ালটি বেশ পুষে রেখেছে। তবু ওকে আমার বেশ ভালো লাগে। এখন এখান থেকে ও চলে যেতে আমি বিশেষ খুসি হয়েছি।" তারপর ক্ষমাকে লক্ষ্য করিয়া কথা সুরু করিল: "তোমার রূপের মাধুরী আজকে যেন হাজার গুণে ফুটে বেরুচ্ছে। ঐ কাপড়টিতে তোমায় সুন্দর মানিয়েছে। সবই ভালো—কিন্তু একটা যায়গায় আট্‌কাচ্ছে। তোমার জন্যে সত্যই আমার দুঃখ হয়, ক্ষমা।" তাহার মেয়েকে সে স্থান হইতে সরাইয়া দিবার অছিলায় বলিল: "অগুরু, তুই আচ্ছা মেয়ে তো। ক্ষমাদিদির বাড়ীটা ভালো করে একবার দেখে শুনে আয়—কি চমৎকার সাজানো গোছান দেখ্‌লে চোখ জুড়িয়ে যাবে!"

অগুরু উঠিতেছিল; ক্ষমা তাহাকে ধরিয়া পুনরায় বসাইয়া দিয়া বলিল: "না—না—বোস: দু'চারটে কথা কই তোমার সঙ্গে। বাড়ী দেখার সময় অনেক আছে, খুড়িমার যেমন! হ্যাঁ খুড়িমা, অগুরুর বিয়ের ব্যবস্থা কিছু করছেন না কি?"

কাশিকা হাই তুলিয়া কহিল—"চেষ্টা তো চলছেই—মা! তবে যোগাযোগ—সেটা বরাত! আর, আজকাল হয়েছেও এমন যে—সৎপাত্র জোটা ভার।"

ক্ষমা সহাস্যে কহিল: "দেখো ভাই অগুরু: এই ভুক্তভোগী দিদিটির পরামর্শ শোনো। 'সুন্দর বর বিয়ে করবো'—এই কোট ধ'রে বসে থেক না যেন। বিয়ে করে যদি জীবনে সুখী হতে চাও—তবে দ্বিতীয় পক্ষের একটু বয়স্থ বরের গলায় মালা দিও।"

অগুরু ঠোঁট ওলটাইয়া বলিল: "কেন ক্ষমাদি, আপনি কি প্রথম পক্ষ পেয়ে অসুখী? বুড়ো বর নিজের যদি হতো—তা

হ'লে পরামর্শ-টা নিশ্চয়ই অন্য ধরণের হতো,—সুন্দর বর পেয়েছেন কি না—?"

ক্ষমার কৌতুক হাসিতে ঘরটি মুখরিত হইয়া উঠিল। কপট গাম্ভীর্য্যে ক্ষমা পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল, "আহা, তাই তো বলছি। অসুখী না হলেও—আমাদের কর্ত্তৃত্ব নেই আদবে—স্বামীর তাঁবে সব-সময়েই তটস্থ হয়ে ঘুরতে হয়। পতির পিছু পিছু সতী হয়ে ভয়ে ভয়ে তাঁর মন রক্ষে করে বেড়াই—স্বাধীনতার কোন বালাই নেই। দ্বিতীয় পক্ষের বুড়ো বরের বেলায় তা' নয়—সেখানে স্ত্রীর পেছনে পতি ছুটোছুটি করবে, যা চাইবে তাই পাবে—কত স্বাধীনতা তাতে। নইলে, আমাদের মতন হলে—তাঁর মেজাজের দাসী হয়েই মুখ গুঁজে জীবন কাটাতে হবে; তাঁর রূপের গরব, তাঁর পয়সার গরবের তাঁবেদারী করতে হবে। অতএব, বুঝলে অগুরু, সব দিক থেকে বিবেচনা করে বুড়ো বরই শ্রেয়ঃ—মনের সাধ যদি মেটাতে চাও, তা'হলে বুড়ো বরই বেছে নিও। এই ধর না, আমার যেমন স্বামীর খোসামোদ করতে করতেই প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ। বাইরের-টাকেই ওঁরা বেশী চেনেন।"—বলিতে বলিতে ক্ষমা হাসিয়া যেন ফাটিয়া পড়িল।

অগুরু কৌতুক অনুভব করিয়া বলিল, "যান্, আপনি বড্ড ঠাট্টা করেন। বুড়ো বর আবার কি—মা-গো।"

"কেন, টাকা পাবে, গয়না পাবে, গাড়ী পাবে, ঘোড়া পাবে, আদর পাবে, যত্ন পাবে, স্বামীকে নিজের ইচ্ছে মতো ওঠাতে বসাতে পারবে—সংসারে তুমিই হবে মুখ্য, তিনি হবেন গৌণ।"

"নিজের যদি হোতো—তা হলে এইতেই সুখ পেতেন ?"

"পেতুম ব'লেই তো মনে হচ্ছে, আর কিছু না হোক, নিজের ইচ্ছেটাকে খুব খাটাতে পারতুম। এখন তো আর উপায় নেই—যা হবার তা তো হয়ে গেছে—আগে জানলে—না হয়, একবার পরখ ক'রে দেখতুম।"

কাণিকা অন্যমনস্ক ছিল, হঠাৎ ক্ষমা-অগুরুর উচ্চহাস্যে আকৃষ্ট হইয়া বলিয়া উঠিল, "কি যে বলো, ক্ষমা। কিন্তু, তুমি যা বলেছ—সে-কথাটা ভারী শক্ত!—দেরী হয়ে যাচ্ছে—। তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল—। যা' তো মা অগুরু—একবার উৎসব-মণ্ডপটা একবার দেখগে, যা' না। যা বলছি—শোন না।"

অগুরু অনিচ্ছা সত্ত্বে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

কাণিকা অবসর খুঁজিতেছিল। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া গলায় সহানুভূতি ঢালিয়া বলিল: "ক্ষমা, সত্যি বলতে কি, তোমার জন্যে আমার বড্ড দুঃখু হয়।"

ক্ষমা ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "কেন, খুড়িমা ?"

কাণিকা তাহার কাছে আরো ঘেসিয়া বসিয়া কথায় ঝাঁজ দিয়া চাপা গলায় বলিল: "জানো না, সেই ভয়ানক স্ত্রীলোকটা—যে পুরুষ-ধরা ফাঁদ পেতে বসেছে—সে যে তোমার সর্ব্বনাশ করতে যাচ্ছে। তার আবার কত ঢঙ্—কত ছলা-কলা—সহরের কত পুরুষের যে মাথা চিবিয়ে খাচ্ছে—তার ঠিক-ঠিকানা নেই। তার নাম নেই, গোত্র নেই—তাকে ভদ্রসমাজে ঢুকতে দেওয়া কোনো মতেই চলতে পারে না। অনেক স্ত্রীলোকেরই অতীতের লুকোনো কেচ্ছা ঢাকা আছে, কিন্তু এই মেয়েমানুষটার তো কেলেঙ্কারীর সীমা-সংখ্যা নেই। দেখেও তাই-ই মনে হয়।"

আশ্চর্য্য হইয়া ক্ষমা কহিল: "কার কথা বলছেন আপনি ?"

"হা ভগবান, তাও জান না তুমি ? কাণেও যায় নি কথাটা ? অরণী দেবীর ব্যাপার শোন নি তা হ'লে ?"

"অরণী দেবী ? এ নামের কারু কথা তো আমি কোনোদিন শুনিনি, খুড়িমা! আর আমার দরকারই বা কি—তার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ ? কিন্তু এই স্ত্রীলোকটার বিষয় আমাকে শোনাতে চান কেন ?"

"ও মা! সারা-সহরে ঢি ঢি প'ড়ে গেছে—আর তুমি এর বিন্দু-বিসর্গ কিছুই খোঁজ রাখ না ? তুমি চোখ-কাণ বুজে থাক নাকি ? কালকেই—হাঁ, কাল সন্ধ্যাবেলা জজ-বিশ্বাসদের বাড়ী বলাবলি হচ্ছিল—এত বড় সহরের মধ্যে আর কোন লোক নয়, শেষ কালে বারিদবরণের মত লোক কিনা—এই রকম আচরণ করে বেড়াবে। ওঃ! ভাবতেও কষ্ট হয়। নিজের কাণে না শুনলে বিশ্বাসও করতুম না।"

"আমার স্বামী! ঐ প্রকৃতির কোনো স্ত্রীলোকের সঙ্গে আমার স্বামীর কি সম্বন্ধ ?"

"সেই তো হচ্ছে কথা মা! দিন নেই, রাত নেই—যখন তখন বারিদবরণ সেই মেয়েমানুষটার বাড়ী যাতায়াত করে। এক এক সময় সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতেও শোনা যায়।—আর মজা কোনখানে জানো—বারিদবরণ যতক্ষণ তার ঘরে থাকে, অন্য কোন লোক আমল পায় না। কারুর সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত করেন না সেই মেয়েছেলেটি। এই সব দেখে শুনে আমার মাথা খারাপের মতো হয়ে গেছে। এসে অবধি ছট্‌ফট্ কচ্ছি তোমাকে বলবো বলে। সংসারটা হোল কি ? কাউকে আর বিশ্বাস নেই। বারিদবরণকে আদর্শ স্বামী বলেই আমাদের সকলের ধারণা ছিল—কিন্তু আজকে তা' টুটে গেছে।"

"আপনি সত্যি জানেন ?"

"হাঁ ক্ষমা! এর এতটুকু মিথ্যে বা বাড়ানো নয়। কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই এতে। স্ত্রীলোকটা থাকে চৌরিঙ্গী টেরেসে—বারিদবরণের গাড়ী তার বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে অনেকে দেখেছে। ঐ ভদ্রপাড়ায় ঐ রকম নির্লজ্জ দুঃশীল স্ত্রীলোক বাস করতে পারে কেমন ক'রে—কার জোরে ? বারিদবরণের সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকে—তার গাড়ী হয়েছে যেন তারই নিজের—দু'জনকে গাড়ীর ভেতর পাশাপাশি বসে বেড়াতে যেতেও প্রায়ই দেখা যায়।"

"আমি এ-কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না। যত সমস্ত নিন্দুকের কুৎসা-রটান অভ্যেস!"

কাণিকা সান্ত্বনা দিবার ছলে কহিল, "এমন কথা শুনলে কার বিশ্বাস হয়—বলো ? বিশ্বাস করতে সত্যিই মন চায় না। কিন্তু মা, কার মুখে সরা চাপা দেবে ? এ কথা জানতে কে বাকী আছে ? আর, এ-ও ঠিক জেনো—বারিদবরণ স্ত্রীলোকটাকে মোটা টাকা দেয়, নইলে ও সব মেয়ে মানুষদের এতো দরদ কিসের

জন্মে ?" দুঃখে ক্ষোভে অপমানের জ্বালায় ক্ষমার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইয়া আসিল। বিচলিত স্বরে তাহার কথা চাপা দিয়া বলিয়া উঠিল: "খুড়িমা, খুড়িমা—এ অসম্ভব—অসম্ভব। আমাদের তো সবেমাত্র তিন চার বছর বিয়ে হয়েছে—এখনো যে ক্লান্তি আসেনি, খুড়িমা! আমাদের ছেলে যে এখনও শিশু।"

"দেখো দিকিনি—এই খানেই তো দুঃখু, মা! একেই বলে কর্ম্মফল! এমন যার রূপসী যুবতী স্ত্রী—এমন যার সোণার চাঁদ ছেলে—তাকে বাইরে কেন টানে বলতে পারো? অদৃষ্ট। সেই কুহকীর পাল্লায় পড়েই তো অমন কড়া-চরিত্রের মানুষ আগুনের কাছে ঘি-এর মতন গ'লে গেল।" এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি শেষ করিয়া, কাশিকা দারুণ বেদনাহতের ন্যায় মুখ ম্লান করিয়া বসিয়া রহিল।

ক্ষমা যেন আপনার মনেই আওড়াইয়া গেল, —"আমার স্বামীকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে—এতো বড়ো কুহক সেই স্ত্রীলোকের? যদি সত্যি হয়—দেখবো একবার শেষ পরীক্ষা করে—কার কত শক্তি।"

"ক্ষমা, আমি বলি—তোমার স্বামীকে নিয়ে বাইরে কয়েক মাস ঘুরে এসো—এ দুদিনের মোহ কেটে যাবে। সব দিকই রক্ষা হবে। মিথ্যে কেঁদে কোনো ফল হবে না। মা, কান্নায় এ রোগ সারবে না। কেঁদে কেঁদে সারা হবে—তবু কিছু সুরাহা হবে না। হয় তো একটা শক্ত ব্যামোয় পড়বে।"

"সে-ভয় নেই, খুড়িমা! আমি অমন কাঁদুনে মেয়ে নই।"

"হ্যাঁ, এ সব ক্ষেত্রে মেয়েদের শক্ত হওয়া চাই। সাধারণ মেয়েদের আশ্রয় হচ্ছে কান্না; কিন্তু যারা দুর্ব্বল উঁচু দরের মেয়ে কান্না তাদের অনিষ্ট করে।"

অগুরু ঝড়ের মতন প্রবেশ করিল। হাঁফাইতে হাঁফাইতে বসিয়া পড়িল। কাশিকা ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল: "কি অগুরু! হল কি? অগুরু চোখ কপালে তুলিয়া যাহা বলিল—তাহা এই যে, সে সিঁড়ে দিয়া নামিবার সময় একটা বড় ইন্দুর তাহার পায়ের উপর দিয়া লাফাইয়া গিয়াছে—ইত্যাদি। সকলে হাসিয়া উঠিল।

আর কোন কথা হইল না। কাশিকা বিদায় লইয়া ক্ষমাকে শেষ উপদেশ দিয়া গেল যে, এই ব্যাপারটার জন্য সে যেন ভাঙ্গিয়া না পড়ে। সময়ে সব ঠিক হইয়া যাইবে। আঁবে-দুধে মিল খাইবে—আঁটি যাবে গড়াগড়ি—সে জন্য ভাবনা নাই। তবে স্বামীটিকে লইয়া সত্বর বিদেশে যাইয়াই সুবুদ্ধির কাজ—এ ছাড়া আর অন্য কোন সদুপায় দেখা যাইতেছে না।

কাশিকা ও অগুরুকে বিদায় জানাইয়া ক্ষমা চিন্তিত মুখে সোফায় আসিয়া বসিল। তাহার তখন হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল—কণাদ রায় দুই স্বামী স্ত্রীর কাল্পনিক দৃষ্টান্ত দিয়া যে গল্প ফাঁদিয়াছিল, তাহার সারমর্ম কি?—এতোক্ষণে সে সে-মর্ম্ম খানিকটা উপলব্ধি করিল। ক্ষমা তাহার মনকে কিছুতেই বুঝাইতে পারিল না যে, তাহার স্বামী এক অপরিচিতা বাহিরের স্ত্রীলোকের জন্য এতো অর্থ অপব্যয় করে—তাহা কি সম্ভব!

[illegible] মিথ্যা যাচাই করিবার জ্বালায়, ক্ষমা উঠিয়া তাহার স্বামীর ষ্টাডি-টেবিলের ড্রয়ার খুলিল। এই ড্রয়ারের মধ্যেই স্বামীর ব্যাঙ্ক-বই থাকে—ক্ষমার জানা ছিল। প্রথমে সে ইতস্ততঃ করিল—স্বামীকে সন্দেহ করিতে তাহার মন চাহিল না। কিন্তু কৌতূহল এমনি জিনিষ—ক্ষমা স্ত্রীর অধিকার লইয়া চেক-কাউণ্টার-ফয়েল খুলিয়া পাতার পর পাতা অডিট করিয়া যাইতে লাগিল। বই মুড়িয়া যথাস্থানে আবার রাখিয়া দিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। তাহার আরক্ত অধর দু'টি মধুর তৃপ্তির হাসিতে ভরিয়া গেল—যেন শ্রাবণের এক পশলা জলের পরের আধ-মিঠে রোদ। নিজে নিজেই বলিয়া উঠিল: "আমার স্বামী কখনো অবিশ্বাসের কাজ করতে জানে না! সমস্ত মিথ্যা; একেবারে উপন্যাস।" চকিতে ক্ষমার চোখ পড়িয়া গেল আর একটা স্বতন্ত্র সিল মোহর-আটা প্যাকেটের উপর। উৎসুক চিত্তে ক্ষমা ছুরি দিয়া সেটিকে খুলিয়া ফেলিল। প্রথম কাউণ্টার-ফয়েলেই দেখিল—"শ্রীমতী অরুণী দেবী পাঁচশো টাকা"—তারপরেই "শ্রীমতী অরুণী দেবী—আট্‌শো টাকা"—তারপরেই "শ্রীমতী অরুণী দেবী—চারশো আশি টাকা"—আর দেখিতে পারিল না—চোখ বুজিয়া আসিল।—ক্ষমার মুখমণ্ডল ছাইয়ের মত সাদা হইয়া গেল—মাথা ঘুরিতে লাগিল—হাতড়াইয়া আসিয়া কোনও মতে একটি চেয়ারে বসিয়া পড়িল। রাগে তাহার সর্ব্বশরীরে জ্বালা ধরিল—দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিয়া উঠিল "তবে সত্যি—সমস্ত সত্যি! কি ভয়ানক!" প্যাকেটটা দূর করিয়া মেঝের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া দুই হাতে মুখ চাপিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই বারিদবরণ ঘরে ঢুকিয়া স্ত্রীর অশ্রু সজল মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। বারিদবরণ উদ্বিগ্ন স্বরে কহিল: "কি হয়েছে, ক্ষমা! কাঁদছ কেন?"

ক্ষমা ধরা গলায় উত্তর দিল: "না—কিছু নয়।"

"—না—বলতেই হবে। তোমো কি? হ্যাঁ, মণি বসানো চন্দনের মঞ্জরীটা পৌঁছে দিয়ে গেছে কি?"

"হ্যাঁ।"

বারিদবরণ তাহার স্ত্রীর ভাবান্তরের কোনো সদুত্তর না পাইয়া ভাবিল—হয়তো এই উৎসবের দিনে তাহার বাপ-মার কথা মনে পড়িতে অশ্রু রোধ করা সম্ভব হইয়া ওঠে নাই। তাই সেদিকে বিশেষ মনোযোগ না দিয়া বারিদবরণের লক্ষ্য ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল। বারিদবরণ দেখিল—সদ্য-সজ্জিত ঘরে যেন নব-শ্রী ফিরিয়াছে। তাহার লক্ষ্য গিয়া স্থির হইল পুষ্পমাল্যশোভিত তাহারই ছবিটার উপর—তাহার দৃষ্টি প্রসন্ন হইল।...পরক্ষণেই, নীচের দিকে তাকাইতেই বারিদবরণ যেন বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের ন্যায় লাফাইয়া উঠিল। ঘরের মেঝে হইতে ব্যাঙ্ক বইয়ের প্যাকেটটা তৎক্ষণাৎ কুড়াইয়া লইয়া ক্ষমাকে লক্ষ্য করিয়া গম্ভীর-কণ্ঠে কহিল:

"আমার এই সিলকরা প্যাকেটটা মেঝের উপর গড়াগড়ি যাচ্ছে কেন? কে এটাকে ছিঁড়ে খুলে ফেলেছে?"

ক্ষমা কঠিন অথচ শান্তস্বরে উত্তর দিল: "আমি"।

"তুমি, ছি—ক্ষমা! আমি ভাবতেই পারিনি যে—তুমি

এ-কাজ করবে? এতোদূর হাত বাড়ানো তোমার উচিত হয়নি, ক্ষমা, এ বড় অন্যায়—বড় ছেলেমানুষী ক'রে ফেলেছ!"

কণ্ঠে শ্লেষ দিয়া ক্ষমা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল: "কেন! তোমার আসল রূপটা ধরা প'ড়ে গেছে ব'লে নাকি? তাই অন্যায় হ'য়েছে—আমি ছেলেমানুষী ক'রে ফেলেছি!"

বারিদবরণ স্ত্রীর কথায় আশ্চর্য্য হইয়া একবার তাহার মুখের দিকে চকিতে চাহিয়া—মুহূর্ত্ত পরে ধীরস্বরে বলিল:

"হ্যাঁ, আমি একে অন্যায় মনে করি। স্ত্রীর অধিকারের একটা সীমা আছে—সেটা কি মানো? স্ত্রী যে স্বামীর উপর গোয়েন্দাগিরি ক'রবে—তা' আমি কোনোমতেই বরদাস্ত করব না।"

তীব্রস্বরে ক্ষমা বলিল, "আমার সে কাজ নয়—আর আমি গোপনে তোমার গতিবিধির খোঁজ রাখবার জন্যে গোয়েন্দাগিরি কোনও দিন করতে যাই নি—সে আমি ঘৃণা করি।...আমি এই স্ত্রীলোকটার অস্তিত্বের কথা আধঘণ্টা আগেও জানতুম না। আমার কোনো হিতাকাঙ্ক্ষী আমাকে দয়া ক'রে বললেন ব'লে তাই জানলুম—যা' সারা কলকাতার প্রত্যেকটী প্রাণী জানে—"

ক্ষমার মুখ হইতে কথা কাড়িয়া লইয়া বারিদবরণ ধৈর্য্য হারাইয়া বলিয়া ফেলিল—"কি জানে—কি জানে তারা?"

"জানে: চৌরিঙ্গী টেরেসে তোমার নিত্য গতায়াতের কথা, তোমার অন্ধ মোহের কথা, আর ঐ বদনামী ভ্রষ্টা স্ত্রীলোকটার পিছনে ভীষণ টাকা ওড়ানোর কথা..."

বারিদবরণের অপবাদভীত মন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। শান্ত-সংযত কণ্ঠে কহিল: "দেখো, ক্ষমা! অরণী দেবী সম্বন্ধে ও-ভাবে কটু-কথা ক'য়ো না! এ যে কত বড় অন্যায়—তা' তুমি জান না, জানলে ও-ভাবে বলতেও না।"

ক্ষমা তাহার স্বামীর মুখোমুখী ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া সতেজে বলিল: "গায়ে বেজেছে বুঝি? অরণী দেবীর মর্য্যাদা রাখবার জন্যে তোমার যে ভারী আগ্রহ দেখছি!...আমার কি আত্মসম্মান ব'লে কোনো জিনিষ নেই? আমার মর্য্যাদা রক্ষা সম্বন্ধে, কই, তোমার কোনো আগ্রহই তো দেখতে পাই না!"

"তোমার মর্য্যাদা ছোঁয় কে—ক্ষমা, সে যে অটুট—অম্লান রয়েছে। এক মুহূর্ত্তের জন্যেও মনে স্থান দিও না, ক্ষমা, তোমার স্বামী কোনো দোষের কাজ করতে পারে বা করেছে।"—এই কথা বলিয়া ব্যাঙ্কের প্যাকেটটী টেবিলের আধ-খোলা ড্রয়ারে তুলিয়া বারিদবরণ ড্রয়ার বন্ধ করিল।

ক্ষমার মুখ রাগে রাঙা হইয়া উঠিল। কিন্তু নিজেকে কতকটা সামলাইয়া লইয়া বলিল: "দোষের কাজ যদি বুঝতে—তা' হ'লে হয়তো করতে না। তুমি আশ্চর্য্য রকম টাকা খরচ করছ—বোধ করি! তবে, মনে ক'রো না যে, আমি সে-জন্য কুণ্ঠিত; একেবারেই না। তোমার টাকা, তোমার জিনিষ-পত্র—উড়িয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও, বানের জলে ভাসিয়ে দাও—যা' ইচ্ছে তাই করতে পারো—আমি সেখানে বলতে চাই না কিছু—আর বলবোও না, যখন এইমাত্র বললে, আমার অধিকারের সীমা আমি ছাড়িয়ে গেছি, বেশ! কিন্তু, আমার লেগেছে শুধু সেই-খানটায়—একদিন তো শালগ্রাম শিলা সাক্ষী ক'রে, অগ্নি সাক্ষী ক'রে আমায় ধর্ম্মপত্নী ব'লে গ্রহণ ক'রেছিলে—ভালোও বেসে-ছিলে, আমাকেও তোমায় ভালোবাসতে শিখিয়েছিলে—সেই তুমি কিনা আমার সঙ্গে কপটতা করলে, আমায় প্রতারণা ক'রলে—সেই ভালোবাসা স্নেহ-প্রীতি-মমতাকে পায়ে মাড়িয়ে—বাজার থেকে কেনা পণ্যে ম'জে গেলে! আমি ভাবতেও পারি না—কেমন ক'রে এ হয়! এখন, আমার মনে হচ্ছে—তুমি আমাকে শুধু ঠকিয়েছ—এ ক'টা মাস শুধু অভিনয়ই ক'রে এসেছ—আমার গায়ে খানিক কাদাই ছিটিয়েছ—পাকা খেলোয়াড় তুমি!"

"ক্ষমা, আমায় ভুল বুঝো না, এ পৃথিবীতে তোমায় ছাড়া অন্য কোনো দ্বিতীয় স্ত্রীলোককে আমি তোমার অধিকার দিই নি—তোমাকেই শুধু জীবনে চেয়েছি—তোমাকে সুখী করাই আমার জীবনের একমাত্র ব্রত—আর কাউকে না—কাউকে না!"

"—তবে, এ স্ত্রীলোকটার জন্য এতো টাকা ঢালছো কেন, তার কাছে যাও কেন, তার দরদে তুমি এতো দরদী কেন—"

"তার বিশেষ কারণ আছে, ক্ষমা—যা' শুনলে তুমি আমায় ক্ষমা করবে—আমার কাজে সায় দেবে...কিন্তু, ক্ষমা, সে কথা বলা আমার পক্ষে বড় কঠিন, বিশেষতঃ আজকের এই দিনে! তবে, এইটুকু জেনে রেখে দাও—ওঁকে যা' তুমি ভাবছ, উনি তা' নন! খুব ভদ্র-বংশে ওঁর জন্ম; মস্ত বড় লোকের ছিলেন উনি ঘরণী—সময়ের ফেরে, অভিমানের উত্তেজনায়—হ্যাঁ বলবো, নিজের ভুলের জন্যেই—আজ ওঁকে এই শাস্তি পেতে হ'চ্ছে—ওঁকে আজ পেতে হ'চ্ছে এই দুর্নাম, অপবাদ, কলঙ্ক!—অথচ, উনি কি দুষ্ট কাজ ক'রেছেন—কোনোও লোক তা' দেখিয়ে দিতে পারবে না, পারতে পারে না—কেবল কাণাকাণি আর সন্দেহের খেলা চলেছে।...যে মিথ্যাকে আমি জানি, সেই মিথ্যাকে মেনে নিয়ে, ওঁর ওপর অবিচার করা চলে না, অন্ততঃ, আমার পক্ষে সে অবিচার হ'তে দেওয়া কোনও মতে সম্ভব নয়। উনি আজ সমাজ হারিয়েছেন, স্বামী-সন্তান হারিয়েছেন—শুধু মাত্র একটী দিনের অভিমান-ক্লিষ্ট মনে প্ররোচিত দুর্ব্বুদ্ধির ফলে,...উনি এখন ক্লান্ত, অবসন্ন, অনুতপ্ত—কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য আগ্রহাতিশয্যে এখন ওঁর মন ভরপূর! উনি চান আবার আমাদের সমাজের মধ্যে ফিরে আসতে—তিনি তোমাকে চেনেন—বিশেষভাবে চেনেন। তোমার সুনাম, তোমার স্বভাব, তোমার ব্যবহারের কথা তাঁকে মুগ্ধ ক'রেছে। তোমার উপর তাঁর অগাধ আস্থা—অসীম স্নেহ-ভালবাসা! তিনি তোমার সাহায্য চান্। তুমি তাঁর সহায় হ'য়ে দাঁড়ালে, তিনি বুকে জোর পাবেন—আবার মানুষের মত বাঁচতে ভরসা পাবেন। তিনি ভিক্ষা চান্ তোমার কৃপা-কণা—তাঁরই হ'য়ে সে ভিক্ষা আমি তোমায় জানাচ্ছি—এ কৃপা-কণা বিতরণ করতে তোমার নারী-মন বিদ্রোহী হবে না—এ বিশ্বাস আমার আছে।"

"আমার কৃপা, আমার সহায়তা!"

"হাঁ তোমার, তোমার, ক্ষমা!"

ক্ষমা শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, "বড্ড আস্পর্দ্ধা যে দেখছি—এই স্ত্রীলোকটার! সে আমার ঘর না ভেঙে ক্ষান্ত হবে না!"

মিনতির স্বরে বারিদবরণ কথা বলিতে গেল—স্ত্রীর কাছে আগাইয়া গিয়া তাহার হাত দু'খানা কাতরে জড়াইয়া ধরিতে চেষ্টা করিল। ক্ষমা, ঝাঁকি দিয়া হাত মুক্ত করিয়া লইল! বারিদবরণ বলিল: "ক্ষমা, তুমি শান্ত হও। আমার একটা অনুরোধ তুমি রাখো! আমি তোমাকে বলবো বলবো মনে করছি, ক'দিন ধরেই! আমার ইচ্ছা—অরণী দেবীকে তুমি আমাদের আজিকার সন্ধ্যার এই উৎসবে নিমন্ত্রণ করে পাঠাও।"

"তুমি সত্যিই উন্মাদ হয়ে গেছ, দেখছি!"—এই কথা বলিয়া ক্রোধে রক্তবর্ণা ক্ষমা চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। বারিদবরণ তাহাকে অনুনয় করিয়া ডাকিয়া পুনরায় অনুরোধ জানাইল—"তোমার কাছে আমার এ প্রার্থনা ক্ষমা! ওঁকে নিমন্ত্রণের চিঠি পাঠিয়ে দাও। জানো না তুমি এ জগতে উনি কত একেলা, কত বড় দুঃখী তিনি! নারীর কাছ থেকে নারী সহানুভূতি পাবে না?"

স্বামীর উক্তিতে ক্ষমার সর্ব্বশরীর রাগে রাগে রি রি করিয়া উঠিল; তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ক্ষমা জবাব করিল, "আমার অনেক কাজ, ও সমস্ত বাজে ব্যাপারে সময় দেবার আমার ফুরসত নাই! আমার শুধু তোমার কাছে একটি অনুরোধ---ও ব্যাপার আমার কাছে আর উত্থাপন করো না, এইটুকু মাত্র করুণা কোরো।—তুমি ভেবেছ, আমার বাপ নেই মা নেই---এ জগতে আমার হয়ে দাঁড়াবার কেউ নেই—সে কারণে তুমি আমায় যা খুসী তা ব্যবহার করবে! সেখানটায়ই তোমার মস্ত বড় ভুল—আমার হিতকামী বন্ধুরও অভাব হ'বে না জেনো!"

"কি বোকার মত কথা কইছ তুমি, ক্ষমা! মাথা খারাপ ক'রো না—লক্ষ্মীটি!—যা বলি শোনো—অরণী দেবীকে তুমি নিজে নিমন্ত্রণ-চিঠি লিখে পাঠিয়ে দাও—আমি তাঁকে কথা দিয়ে এসেছি..."

"আমি তা' কিছুতেই পারবো না।"

"আমি তোমায় বলছি—একশোবার বলছি—এবার অনুরোধ নয়, মিনতি নয়, স্বামীর দাবী নিয়ে বলছি!"

"ও অন্যায় দাবী আমি মানি না—মানব না!"

"তাহ'লে তুমি রাজী নও!"

"মোটেই না—কিছুতেই না।"

"বেশ! আমি নিজেই তাঁকে নিমন্ত্রণ-চিঠি পাঠাচ্ছি এখুনি,"—বলিয়াই বারিদবরণ চীৎকার করিয়া বেয়ারাকে ডাকিয়া তাহার হাতে একটি চিঠি লিখিয়া দিয়া অরণী দেবীর ঠিকানায় পাঠাইয়া দিল।

ক্ষমা গুম্ হইয়া গেল—তাহার সমস্ত চৈতন্য যেন লোপ হইয়া গেল—ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি সকলই যেন বিকল। কিছুক্ষণ অসীম নিস্তব্ধতার পর সে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার সময় শুনাইয়া দিয়া গেল যে—অরণী দেবী এ-বাড়ীতে আসিলে তাহাকে অপমানিত হইয়া ফিরিতে হইবে—এ-ধ্রুব নিশ্চিত! যদি কুৎসার হাত হইতে রক্ষা পাইবার বিন্দুমাত্রও অভিলাষ থাকে—তবে অরণী দেবীকে আসিতে বারণ করিয়া এক্ষুণি লিখিয়া পাঠানো হোক্। বারিদবরণ অচল-অটল হইয়া বসিয়া রহিল।

ক্ষমা ঘর হইতে চলিয়া গেলে পর কয়েক মুহূর্ত্ত কাটিল—নিথর নিঝুম—যেন মধ্যরাত্রের সুষুপ্তি। আবার তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে কিছুতেই স্থির করিতে পারিল না—কি তাহার কর্ত্তব্য। তাহার নিজেরই অজ্ঞাতসারে মুখ হইতে কথা বাহির হইয়া আসিল।

"এ-কি সমস্যা ভগবান্—ক্ষমাকে কি করিয়া বলি? এই মহিলা যে কে—সে-কথা আমার স্ত্রীকে আমি কি করিয়া বলি? দুঃখে লজ্জায় ও যে মরমে ম'রে যাবে।"—দুই হাতে বারিদবরণ নিজের মুখ ঢাকিল; অনাগত অশান্তির আশঙ্কায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল।

[ক্রমশঃ

কলমীর ফুল

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

তুই তো একটা ভাসা কল্মীর ফুল,
আমাকে দেখিয়া হেসে হ'লি মসগুল!
বল্ না আমারে, নাইবা হ'লাম গুণী,
অদ্ভুত তোর মর্ম্মকথাই শুনি।
মুখভরা হাসি' কল্মীর ফুল বলে,
জলকন্যা যে আমরা ছিলাম জলে।

রাজপুত্তুর ময়ূরপঙ্খী চড়ি'
সখীরে আমার লয়ে গেল বিয়া করি'।
ফিরে এই দিকে আসিবে তরণী বেয়ে,
আছি প্রিয়ার আলাপথ চেয়ে।

বলিলাম আমি রাজপুত্তুর নই,
দিয়ে যাই চল হইবি প্রিয়ার সই।
জলে থেকে যাবো?—হেসে ফের ফুল বলে,
সতীনের খেদে মেয়েরা যে আসে জলে!

কবিবর নবীনচন্দ্র সেন

শ্রীসুধীরকুমার মিত্র

চুঁচুড়া ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান, ওলন্দাজগণ ব্যবসার জন্য এই স্থানে আসিয়া এই সহরের ভিত্তি স্থাপন করেন। মাত্র একশত তিরিশ বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানে ইংরাজশাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ভারতের প্রথম মুদ্রাযন্ত্র এই স্থানের অনতিদূরে হুগলীতে ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বঙ্গভাষায় প্রথম মুদ্রিত পুস্তকও এই স্থান হইতে সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। বঙ্গের প্রথম গদ্যপুস্তক 'প্রতাপাদিত্য' রচয়িতা স্বর্গীয় রামরাম বসুও এই

নবীনচন্দ্র সেন

চুঁচুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে এই স্থানের দান অসামান্য বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। তারপর ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠের' মহামন্ত্র 'বন্দে মাতরমের' জন্মস্থান হিসাবে এই স্থান ভারতবাসীর পবিত্র পুণ্য তীর্থ। তদুপরি মহাত্মা ভূদেব চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দানবীর হাজী মহম্মদ মহসীন, সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার, সুসাহিত্যিক দীননাথ ধর, সৈয়দ আমীর আলি প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় মনীষিবৃন্দের জন্মে কেবল এই ক্ষুদ্র স্থান নয়, সমগ্র বঙ্গদেশ যে গৌরবান্বিত তাহা কে অস্বীকার করিবে? সুতরাং এই সংস্কৃতিমূলক প্রসিদ্ধ স্থানে বঙ্গের অন্যতম প্রধান কবির শতবার্ষিকী উৎসব যে শোভন ও সমীচীন হইয়াছে, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

জগতের সমস্ত সাহিত্যের প্রথম উৎপত্তি হয় কাব্যে; বঙ্গসাহিত্যেরও প্রথম উন্মেষ হইয়াছিল কাব্যে। বঙ্গভাষার সে শৈশবের ইতিহাস, দুঃখের ইতিহাস। কারণ, তৎকালীন শিক্ষিত সমাজ এবং পণ্ডিতগণ বঙ্গভাষাকে অবজ্ঞার চোখে দেখিতেন, ঘৃণা করিতেন। কোন শিক্ষিত বাঙ্গালী বাঙ্গলা পুস্তক পড়িতেছেন যদি কেহ দেখিতে পাইত, তাহা হইলে তিনি এরূপ লজ্জিত ও মর্ম্মাহত হইতেন যে, সুরাপান করিয়া তিনি বার-বনিতার গৃহে যাইতেছেন দেখিলে বোধ হয় তত লজ্জিত হইতেন না। এই সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'লোকরহস্যে' যাহা লিখিয়াছেন তাহার কয়েক লাইন উদ্ধৃত করিতেছি—

স্বামী—তোমরা ছাইভস্ম বাঙ্গলাগুলো পড় কেন? সব immoral, obscene, filthy.

স্ত্রী পড়িলে কি হয়?

স্বামী demoralize হয় কি না, চরিত্র মন্দ হয়।

স্ত্রী—আপনি বোতল বোতল ব্রাণ্ডি মারেন, যাদের সঙ্গে বসিয়া ও কাজ হয়, তারা এমনই কু চরিত্রের লোক যে, তাদের মুখ দেখিলেও পাপ হয়। আপনার বন্ধুগণ ডিনারের পর যে ভাষায় কথাবার্ত্তা ক'ন, শুনিতে পাইলে খানসামারাও কানে আঙ্গুল দেয়। আপনি যাদের বাড়ি মুরগি মটনের শ্রাদ্ধ করিয়া আসেন, পৃথিবীতে এমন কু-কাজ নেই—যে তারা ভিতরে ভিতরে করে না। তাহাতে আপনার চরিত্রের জন্য কোন ভয় নাই—আর আমি গরীবের মেয়ে একখানা বাঙ্গলা বই পড়লেই গোল্লায় যাব?

স্বামী—আরে না-না, ওসব ছুঁয়ে হাত ময়লা ক'রো না।

ঠিক এই সময়ে যে সমস্ত মনীষী বঙ্গজননীর সেবা করিয়া বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে নব জাগরণের সাড়া তুলিয়াছিলেন, বাঙ্গলার ভাবরাজ্যে নব নব তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কবিবর নবীনচন্দ্র সেন তন্মধ্যে অন্যতম। এই সময় বঙ্গ-সাহিত্যের এক প্রচণ্ড বিবর্ত্তন দেখা গেল, বঙ্গবাসী ইংরাজী সাহিত্যের অনুশীলন পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গবাণীর সেবায় নিযুক্ত হইলেন এবং এক অচিন্তনীয় পরিস্থিতিতে বঙ্গভাষা ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে নবীনচন্দ্র চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত নয়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি বড় দুরন্ত ছিলেন, গ্রাম্য পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত করিয়া তিনি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন, এই সময় তিনি শিক্ষকের আদেশ অমান্য করিতেন বলিয়া Wicked the Great বলিয়া তিনি আখ্যাত হন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন এবং ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময় স্বর্গীয় প্যারীচরণ সরকার-সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেটে' তাঁহার কবিত্বপ্রতিভার প্রথম বিকাশ হয়। বি-এ পড়িবার সময় তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয় এবং স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অর্থ-সাহায্যে তিনি বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন।

সরকারী কার্য্যে যশোহরে অবস্থান কালে তিনি অমৃতবাজার

পত্রিকায় কবিতা লিখিতেন; বাল্যকাল হইতেই তিনি কবিতা-প্রিয় ছিলেন এবং উত্তরকালে সেই কবিতার বিকাশে বঙ্গসাহিত্য সমৃদ্ধিশালিনী হইয়াছিল। তিনি তেজস্বী ও স্বাধীন প্রকৃতির লোক ছিলেন; তাঁহার এই স্বাধীন ভাব তাঁহার প্রতি কাব্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। ইংরাজ জাতিকে তিনি "বানর ঔরসে জন্ম রাক্ষসীর উদরে" বলিয়া লিখিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহার প্রমোশন বন্ধ হইয়াছিল। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী তিনি চট্টগ্রামে দেহরক্ষা করেন।

সাহিত্য সত্যের প্রতীক; সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা সুন্দরে, কল্যাণে ও সৃজনে। একটী বলিষ্ঠ ভূমিকায় দণ্ডায়মান থাকিয়া নিজের ভাবকে ভাষায়, ছন্দে, সুরে রূপ দিলে যে সৃষ্টি সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইয়া পরিপার্শ্বে কল্যাণ বিতরণ করে, সত-স্ফূর্ত্ত প্রকাশের ঢেউ যখন একটা রূপ পরিগ্রহ করে, তখনই তাহা হয় সাহিত্য। সাহিত্য ঘটনাবলীর শ্রেণীবদ্ধ সন্নিবেশ নহে, স্বভাবের চিত্র নহে, সংবাদপত্রের সমালোচনাও নহে; শোক-তাপ-আনন্দ বিষাদ, চিত্তবৃত্তির দৈন্য ও ঐশ্বর্য্য ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত সাফল্য বা অকৃতকার্য্যতা যখন শক্তিমান্ লেখকের লেখনীশক্তিতে জাতীয় কল্যাণে বিকসিত হয় তখনই তাহা হয় সাহিত্য। সাহিত্যের বিভিন্ন কৃতিত্বের মধ্যে প্রধানতম কৃতিত্ব জাতি গঠন করা, জাতিকে সর্ব্ববিষয়ে উন্নত করা। মানুষের হৃদয়কন্দরে যে ভাব ঘনীভূত হইয়া উঠে, তাহাকে ভাষায় রূপ দিয়া যে সাহিত্য অপরের উল্লাস উৎপাদন করে সে-সাহিত্য চিরদিন অক্ষয় হইয়া থাকে নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' সেই ধরণের সাহিত্য।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে এই প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ক্যব্যগ্রন্থ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামে উৎসর্গীকৃত হইয়া প্রথম প্রকাশিত হয়। এই কাব্য পাঁচটী সর্গে বিভক্ত; ইহার প্রথম সর্গে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি পাঁচজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি শেঠেদের আগারে বসিয়া নবাব সিরাজদ্দৌলাকে রাজ্যচ্যুত করিবার পরামর্শ করিতেছেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রকৃত ধার্ম্মিক, তিনি জগৎশেঠের মত সাহসী বা রাজবল্লভের মত কূটভাষী নহেন; তাঁহার স্পষ্ট কথা কবির লেখনীশক্তিতে সাবলীল ছন্দে লীলায়িত হইয়া পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে। জগৎশেঠের নির্ভীক উক্তি হৃদয়কে বিচিত্র রসে সিক্ত করিয়া তোলে।

"মন্ত্রীবর!
সাধে কি বাঙ্গালী মোরা চির পরাধীন?
সাধে কি বিদেশী আসে দলি পদভরে
কেড়ে লয় সিংহাসন? করে প্রতিদিন
অপমান শত শত চক্ষের উপরে?
স্বর্গ-মর্ত্ত্য করে যদি স্থানবিনিময়,
তথাপি বাঙ্গালী নহে হবে একমত,
প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু, সাহসে দুর্জ্জয়!
কার্য্যকালে খোঁজে সবে নিজ নিজ পথ।"

রাণী ভবানীর উক্তি অতি সুন্দর, হৃদয়গ্রাহী এবং তাঁহার বাক্যই সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানগর্ভ। নবাব সিরাজদ্দৌলাকে ইংরাজের সাহায্যে দূর করিতে হইবে স্থির হইল। কিন্তু রাণী ভবানী ইহার বিরোধিতা করিলেন। তিনি বলিতেছেন—

"জ্ঞানহীন নারী আমি, তবু মহারাজা
দেখিতেছি দিব্য চক্ষে সিরাজদ্দৌলায়
করি রাজ্যচ্যুত, শান্ত হবে না ইংরাজ।
বরঞ্চ হইবে মত্ত রাজ্য-পিপাসায়।
যেই শক্তি টলাইবে বঙ্গ সিংহাসন,
থামিবে না এইখানে; হয়ে উগ্রতর
শোণিতের স্বাদে মত্ত শার্দ্দূল যেমন
প্রবেশিবে মহারাষ্ট্রসৈন্যের ভিতর।
হবে রণ ভারতের অদৃষ্টের তরে
কি ভীষণ! ভেবে মম শরীর শিহরে।"

"এই কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে কাটোয়ায় বৃটিশ সৈন্যের শিবির-সন্নিবেশ, তৃতীয় সর্গে পলাশীর ক্ষেত্রের বর্ণনা প্রসঙ্গে নবাব সিরাজদ্দৌলার অবস্থা বর্ণনা, চতুর্থ সর্গে পলাশীর যুদ্ধ এবং পঞ্চম সর্গে নবাব সিরাজদ্দৌলাকে মহম্মদ বেগ কর্তৃক হত্যার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

"এই নহে ভারতের রোদনের শেষ।
পলাশী যুদ্ধের নহে এই পরিণাম।
যেই শক্তি স্রোতস্বতী ভেদি বঙ্গদেশ
নির্গত হইল আজি, ভ্রমি অবিশ্রাম
হিমাচল হ'তে বেগে করিবে গমন
কুমারীতে লঙ্কাদ্বীপে লঙ্ঘি পারাবার।
প্রতিদিন ইহার বাড়িবে আয়তন,
হইবে তাহাতে ভীম ঝটিকা সঞ্চার।
যবে পূর্ণবলে ক্রমে হবে বলবতী,
কার সাধ্য নিবারিবে এই স্রোতস্বতী?"

কবির লেখনীশক্তি সাবলীল ছন্দে লীলায়িত হইয়া সিরাজের হত্যায় পাঠকের চক্ষুকে অশ্রুসজল করিয়া তোলে।

"সিরাজের ছিন্নমুণ্ড চুম্বিয়া ভূতল
পড়িল, ছুটিল রক্ত স্রোতের মতন।
নিবিল গৃহের দীপ; নিবিল তখন
ভারতের শেষ আশা—হইল স্বপন।"

সিরাজের মৃত্যুতে বীর মোহনলালের উক্তিও হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া তোলে।

"কোথা যাও, ফিরে চাও, সহস্রকিরণ!
বারেক ফিরিয়া চাও, ওহে দিনমণি!
তুমি অস্তাচলে দেব! করিলে গমন,
আসিবে যবনভাগ্যে বিষাদ-রজনী।
এ বিষাদ অন্ধকারে নির্ম্মম অন্তরে
ডুবায়ে যবন-রাজ্য যেও না তপন!
উঠিলে কি ভাব বঙ্গে নিরীক্ষণ ক'রে।
কি দশা দেখিয়া আহা! ডুবিছ এখন!
পূর্ণ না হইতে তব অর্দ্ধ আবর্ত্তন,
অর্দ্ধ পৃথিবীর ভাগ্য ফিরিল কেমন।"

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ সিরাজের চরিত্র বিকৃত করিয়া রঞ্জিত করিয়াছিল; নবীনচন্দ্র তাহাদের কথামতই সিরাজের চরিত্র পলাশীর যুদ্ধে চিত্রিত করিলেও, পরবর্ত্তী কালে যখন

মহাকবি গিরিশচন্দ্র 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকে সিরাজকে সত্যানুসন্ধান করিয়া সঠিকভাবে চিত্রিত করেন—তখন নবীনচন্দ্র গিরিশবাবুকে লিখিয়াছিলেন, "তুমি আমার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী, আমার অপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান্। আমি যখন পলাশীর যুদ্ধ লিখি, সিরাজের শক্রচিত্রিত আলেখ্যই আমার একমাত্র অবলম্বন ছিল।"* নাটকাকারে রূপান্তরিত করিয়া মহাকবি গিরিশচন্দ্র 'পলাশীর যুদ্ধ' ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে National Theatre-এ অভিনয় করিয়াছিলেন।

পলাশীর যুদ্ধ বঙ্গভাষায় প্রথম ঐতিহাসিক কাব্য এবং তাহার পূর্ব্বে হেমচন্দ্র ও রঙ্গলাল ব্যতীত সাহিত্যের মধ্য দিয়া আর কেহ জাতীয়তা প্রচার করেন নাই। সেই জন্য বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "পলাশীর যুদ্ধ" বঙ্গ-সাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান কাব্য।

তারপর কবির 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' এবং 'প্রভাস' নামক কাব্যগুলি প্রকাশিত হয়। রৈবতক কাব্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আদিলীলা, কুরুক্ষেত্র কাব্য মধ্যলীলা এবং প্রভাস কাব্য অন্তিম লীলা লইয়া রচিত। রৈবতকে কাব্যের উন্মেষ, কুরুক্ষেত্রে তাহার বিকাশ, এবং প্রভাসে তাহার শেষ। এই কাব্যত্রয়ে ভাষা, ভাব এবং চরিত্রসৃষ্টি কবি অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত করিয়াছেন।

রৈবতকে সত্যভামার সখি সুলোচনা একটি গোলাপফুলের মালা তাঁহার গলায় পরাইয়া দিলে, গোলাপফুলের কাঁটা লাগায় তিনি কৃত্রিম রাগ দেখাইয়া বলিয়াছিলেন যে, গোলাপফুলের মালা আমি ছিঁড়িয়া ফেলিব। তদুত্তরে সুলোচনা হাসিয়া ঠাট্টা করিয়া সত্যভামাকে যাহা বলিয়াছিলেন, কবির কথায় তাহা দেখুন—

"সত্যভামা-হার গলায় যাহার,
কি কাজ তাহার ফুলের মালা ?
আছে কোন ফুল সাজাতে এমন
ভূতলে অতুল রূপের ডালা ?"

কুরুক্ষেত্র নামক কাব্যগ্রন্থে অর্জ্জুন-মহিষী সুভদ্রার সহিত ধাত্রী সুলোচনার কথা-বার্ত্তায় নারীগণের শত্রু-মিত্র প্রত্যেককেই মাতৃস্নেহ দান করা কর্ত্তব্য বলিয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহা অতি চমৎকার। সুভদ্রা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আহত সৈনিকগণকে সেবা করিতেছেন বলিয়া সুলোচনা তাহা পছন্দ করিতেছেন না; সেই জন্য সুভদ্রা বলিতেছেন—

"আমরা নারী বিশ্বজননীর ছবি
আমাদের শত্রু-মিত্র নাই।
বরিষার ধারা মত অজস্র জননী প্রেম
সর্ব্বত্র ঢালিয়া চল যাই।
মিত্রকে যে ভালবাসে, সকাম সে ভালবাসা
সে তো ক্ষুদ্র ব্যবসার স্বার!
শত্রুমিত্র তরে যার সমভাবে কাঁদে প্রাণ,
সেই জন দেবতা আমার।
প্রেমধর্ম্ম এই দিদি! কালি কৃষ্ণার্জ্জুন মত
দেখিতাম সকল সংসার;
মাতৃস্নেহপূর্ণ বুকে আজি দেখিতেছি সব
অভিমন্যু উত্তরা আমার।

পিতা, মাতা, ভগ্নি ভ্রাতা পতি, পুত্র মহাবিশ্বে
এই প্রেম তৃপ্তি নাহি পায়।
অনন্ত এ-বিশ্ব ছাড়ি কি যে লো অনন্ত আছে,
প্রেমসিন্ধু সেই দিকে ধায়।"

প্রভাস কাব্যগ্রন্থে কবিশক্তির চূড়ান্ত নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়, কবি এই কাব্যে বাসুকি, দুর্ব্বাসা, জরৎকারু ও শৈল এই কয়টী চরিত্র সৃষ্টি এবং এরূপ সুন্দরভাবে কাব্যোপযোগী করিয়া পরিণাম ঘটাইয়াছেন যে, ইহাতে কবিপ্রতিভা কিছুমাত্র খর্ব্ব হয় নাই। ইহার ৭ম সর্গের মত ভয়ঙ্কর বর্ণনা বঙ্গভাষায় আর কোন কাব্যে দৃষ্ট হয় না। আমার মনে হয় Last Days of Pompeii উপন্যাসে পম্পি নগর ধ্বংসের চিত্রও এইরূপ ভয়াবহ ও ভয়ঙ্করভাবে বর্ণিত হয় নাই। একাদশ সর্গ ভাবে গভীর ও ভাষায় অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। নিম্নে কয়েক ছত্র উল্লেখ করিতেছি—

"দাঁড়াইয়া নাগরাজা ছিল চাহি শূন্য পানে,
সুমধুর কৃষ্ণনাম যেমতি, পশিল কানে
কহিলা আকুল কাঁদি—আহা কি মধুর নাম!
কে শুনাল জুড়াইল পাপীর তাপিত প্রাণ?
গাও নাম আর বার! গাও নাম শতবার!
সহস্র সহস্র বার! লও নাম গাও আর
গাও নাম-পারাবার! গাও নাম সমীরণ
গাও নাম চন্দ্র-সূর্য্য! গাও গ্রহ অগণন।
এমন মধুর নাম, পতিতপাবন নাম
এমন ত্রিতাপহর, শীতল শান্তির ধাম,
নাহি মর্ত্ত্যে, নাহি স্বর্গে এমন মধুর নাম
গাও মুখ! গাও চোক! গাও অঙ্গ! গাও প্রাণ!
গাও মুখ মধু স্বরে! গাও চোক অবিরাম
বরষিয়া প্রেমধারা! নামামৃত করি পান,
গাও প্রেমানন্দে তুমি গলিয়া পাষাণ প্রাণ।
নামামৃতে মত্ত অঙ্গ নেচে নেচে গাও নাম!
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে।

"অমিতাভ" কাব্যে কবি ভগবান্ বুদ্ধদেবের লীলা বর্ণনা করিয়াছেন, এই কাব্যটিও ভাবে গভীর এবং ইহার প্রতি লাইন কাব্যশক্তির অপূর্ব্ব নিদর্শন। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত এই কাব্য সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—"I have looked through the Amitava with the greatest pleasure and am certain it will sustain and enhance the high reputation which you have already won in the Literature of Bengal." এই কাব্যের শেষে ভগবান্ বুদ্ধদেবের তিরোধান বর্ণনা করিয়া কবি লিখিয়াছিলেন—

"যাও দেব লীলা শেষ! এসেছিলে তুমি
একবার যমুনার তীরে পুণ্যবতী—
দেখিয়াছি সেই লীলা কোমল-কঠোর!
আসিলে আবার তুমি কপিল নগরে
শৈলপতি হিমাদ্রির পুণ্যপাদমূলে—
দেখিলাম এই লীলা [illegible]

* বিবিধ-প্রতিভা—ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

রাজপুত্র মহাযোগী! আসিলে আবার
সরল মানবশিশু জর্দ্দানের তীরে—
দেখিয়াছি সেই লীলা আত্মবলিদান;
আরবের মরুভূমে, অমৃত-নির্ঝর
আবার আসিলে তুমি—নাহি ভাগ্য মম
দেখিব সে লীলা তব। আসিয়া আবার
পতিতপাবনীতীরে, পতিতপাবন
পাষাণ করিলে দ্রব প্রেম-অশ্রুজলে।"

'অমিতাভ' কবির শেষ রচনা; নিমাই-চরিত কাব্যের আখ্যান-বস্তু। এই কাব্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া তিনি গতাসু হন। নিম্নে উক্ত কাব্য হইতে কয়েক লাইন উদ্ধৃত করিতেছি—

"নিমাই নিমাই　　কাঁদিয়া জননী
কহিলা করুণ স্বরে
মা হইয়া তোরে　　করিব সন্ন্যাসী
সাজাব আপন করে।
প্রসন্ন বদনে　　হইতে সন্ন্যাসী
পুত্রেরে দিতে বিদায়।
পারে কি জননী?　　এমন পাষাণী
আছে কি জগতে হায়।
নয়টী সন্তান　　একে একে একে
হারায়ে পাষাণী আমি,
আছি রে বাঁচিয়া　　নিমাইরে! তোর
দেখি চাঁদমুখখানি।
কি যে তপস্যায়　　পাইয়াছি তোরে
ওরে তপস্যার ধন।
ঋতুতে ঋতুতে　　বিপরীত পথে
তপস্যা করি গ্রহণ।
নিদাঘ-খরায়　　বুকে অগ্নি জ্বালি
বরিষাধারায় ঘন
ভিজি নিশি দিন　　হেমন্ত-তুষারে
গঙ্গাগর্ভে অনুক্ষণ
আকণ্ঠ ডুবিয়া　　দিবানিশি বাপ!
তপস্যা করেছি কত।
দ্বাদশ মাসেতে　　করি উপবাস
করেছি দ্বাদশ ব্রত।
ত্রয়োদশ মাস　　ধরি গর্ভে তোরে
পাইয়া কতই ক্লেশ।
পাইয়াছি তোরে　　নিমাই আমার
এই দেহ করি শেষ।
ত্রয়োদশ মাস　　সাজিয়া যোগিনী
শিরে কেশ-জটাভার
ত্রয়োদশ মাস　　জপি হরিনাম,
করিয়া অম্বু আহার।
পাইয়াছি তোরে　　নিমাই আমার
তুই কি আমারে ছাড়ি
করিবি সন্ন্যাস　　অকরুণ প্রাণে
এ রূপে মড়াকে মারি?"
(অসম্পূর্ণ)

কবি নবীনচন্দ্র 'রঙ্গমতী' নামক একটি উপন্যাস কাব্যে রচনা করেন, উক্ত উপন্যাস তাঁহার জীবনের একটি বিষাদপূর্ণ অঙ্কের কাহিনী। এতদ্ব্যতীত তিনি যিশুখৃষ্টের জীবনী, গীতা প্রভৃতি কাব্যে রচনা করেন। পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ 'আমার জীবন' কবির সুবৃহৎ আত্মজীবনী, ইহা গদ্যে রচিত। এই গ্রন্থে তিনি অত্যন্ত নৈপুণ্যের সহিত বাঙ্গলার সমাজ-জীবন ও সাহিত্যজীবনের এক বৃহৎ অংশকে চিত্রিত করিয়াছেন।

কবি চট্টগ্রামকে বড় ভালবাসিতেন; তাঁহার ন্যায় দেশভক্ত বিরল বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। সামান্য চাকুরী করিয়াও কলিকাতায় বসবাস করিবার মোহ বাঙ্গালীকে আজ লক্ষ্মীছাড়া করিয়াছে; কিন্তু তিনি অবসর গ্রহণ করিয়া স্বীয় গ্রামেই বসবাস করিতেন। তাঁহার বড় ইচ্ছা ছিল যে পল্লীজননীর ক্রোড়ে যেন তিনি চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হন। ভগবান্ তাঁহার সে আশা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

মা! মা! মা!　　কত কাল পরে
ডাকিলাম মা গো পরাণ ভরে!
শৈল-কিরীটিনী　　সাগর-কুন্তলা
সরিৎমালিনী দেখিলাম তোরে।
বসি সিন্ধুকূলে　　বিন্ধ্যাচলশিরে
যমুনার তটে জাহ্নবীর তীরে
ভাবিয়াছি তোরে　　ভাসি অশ্রুনীরে
ডাকিয়াছি ও মা! দেশদেশান্তরে।
হৃদে নাহি রক্ত　　আছে নেত্রজল
প্রেমে উচ্ছ্বসিত পবিত্র শীতল
আশা বরষিয়া　　পদে অবিরল
ঘুমাইব বুকে চিরদিন তরে।"

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সম্বন্ধে 'বঙ্গদর্শনে' লিখিয়াছিলেন—নবীন বাবুর যখন স্বদেশবাৎসল্য-স্রোত উচ্ছলিত হয়, তখন তিনি রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানেন, না সেও গৈরিক নিঃস্রবের ন্যায়। যদি উচ্চৈঃস্বরে রোদন, যদি আন্তরিক মর্ম্মভেদী কাতোরোক্তি, যদি ভয়-শূন্য তেজোময় সত্যপ্রিয়তা, যদি দুর্ব্বাসা-প্রার্থিত ক্রোধ, দেশ-বাৎসল্যের লক্ষণ হয়—তবে সেই দেশবাৎসল্য নবীন বাবুর এবং তাহার অনেক লক্ষণ তাঁহার কাব্যমধ্যে বিকীর্ণ হইয়াছে।

ভক্ত কবি তুলসীদাসের দুই লাইন কবি নবীনচন্দ্র হিন্দী ভাষা হইতে নিম্নোক্তরূপ বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন—

"তুলসী কহে এ জগতে আসিলে যখন
জগত হাসিল, তুমি করিলে ক্রন্দন।
কর হেন কিছু, তুমি যাইবে যখন
কাঁদিবে জগত, তুমি হাসিবে তখন।"

আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, কবিবর আজ নিশ্চয়ই আমাদের দেখিয়া হাসিতেছেন।*

বন্দে মাতরম্।

* চুঁচুড়ায় কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের জন্মশতবার্ষিকী উৎসবে শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার মিত্রকর্ত্তৃক প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ। ১০ চৈত্র, ১৩৫২।

মাটি ও মানুষ

শ্রীমনোজ বসু

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রায়-বাড়ির সদর-উঠানে বনমালী গিয়ে দাঁড়াল। এত সহজে যে থামবে, কেউ ভাবতে পারেনি। সবাই তাজ্জব হয়ে গেছে। দোতলার ঘরের খড়খড়ি তুলে প্রভাবতী এবং জ্যোৎস্না অবধি তার দিকে দেখছে, উপরের দিকে ফিরে চেয়ে বনমালী বুঝতে পারল।

ইন্দ্রলাল উত্তেজনা প্রকাশ করলেন না। শান্ত কণ্ঠে বললেন, এত কাল নুণ খেয়ে এই কাজ করছ তুমি এখানে এসে? ছি-ছি!

হাসিমুখে বনমালী বলে, ভাল কাজই করছি রায়বাবু। দিনরাত ঠাকুরকে ডাকছি, সুবুদ্ধি হোক তোমাদের। মিলে মিশে সবাই শান্তিতে থাকো। ক'দিনের জন্য পিরথিমে আসা? পিরথিমে এত কি জায়গার অভাব হয়েছে যে ঝামেলা করে মাথা ফাটাফাটি করে সকলের মরতে হবে?

অভিলাষ এসে পাশে বসল। বনমালীর হাত ধরে বলে, তুমি বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলো ওদের। তুমি বললেই ঠাণ্ডা হবে। আমার কি মুশকিল দেখ, মেয়ে জামাই অবধি বাগ মানাতে পারি নে। কি মন্তোর তুমি শিখে এসেছ সর্দ্দার, তোমায় যা মানে তার সিকির সিকি আমায় আমল দেয় না।

বনমালী সগর্ব্বে বলে, সর্দ্দার কিনা আমি? চিরকাল ওদের উপর সর্দ্দারি করে এসেছি, ওদের মনের কথা বুঝতে পারি, বুঝে সুঝে ঠিকমত বলি, তাই ওরা মান্য করে। যে দিন তা পারব না, দেখবে কোন সম্পর্ক রাখবে না ওরা আমার সাথে।

ভিতরে ডাক পড়ল। রান্নাঘরের রোয়াকে আসন পেতে ভাত বেড়ে দেওয়া হয়েছে বনমালীর। প্রভাবতী সামনে বসে আগেকার দিনে—প্রভাবতীর যখন বয়স কম, রায়গ্রামেরই পুরোপুরি বাসিন্দা ছিলেন সকলে—তখন খানিকটা এইরকম রেওয়াজ ছিল। প্রভাবতী এটা সেটা দিতে ঠাকুরকে আদেশ করছেন, বনমালীকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন, এখনকার দৈনন্দিন জীবনের কথা। কথার ফাঁকে অনুনয়ের সুরে একবার বললেন, আচ্ছা, কি করেছি তোমার সর্দ্দার খশুর যে চাষা ক্ষেপিয়ে এইরকম আমাদের অপদস্থ করছ? কুটুম্বর সামনে মুখ দেখবার উপায় রাখলে না?

মুখ তুলে প্রভাবতীর দিকে চেয়ে বনমালী বলল, তোমার নিজের শ্বশুরের কি রকম অপমানটা করলে ভাবো দিকি মা?

বিস্মিত হয়ে প্রভাবতী বলেন, আমরা?

বনমালী বলে, স্বর্গ থেকে রায়কর্ত্তার চোখের জল পড়ছে, আমি মা চোখের উপর স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এতটুকু বয়স থেকে দু'জনে আমরা তোলপাড় করে বেড়িয়েছি এ অঞ্চলে। দেহের রক্ত ঢেলেছি তোমাদের জন্যে। তখন জানতাম, রায়কর্ত্তাও আমাদের চাষীদের একজন। যেন এক বাড়ির ভাই ভাই—রায়েরা আর চাষীরা। তারপর রায়কর্ত্তা নতুন চরের ফয়শালা করে গেলেন—দু-ভায়ের ভিতর আপোষে বাঁটোয়ারা হয় যে রকম। এখন শহুরে মানুষ তোমরা—দেদার খরচ,কুলিয়ে উঠতে পার না। ভাইয়ের মুখের ভাত কেড়ে না নিলে হাওয়াগাড়ি চলে না তোমাদের। তা কি করতে বলো আমায় শুনি? ওদের কি বোঝাব? বলব, রায়কর্ত্তা মিথ্যুক—মুখের কথায় যা দিয়েছিল তা ভুয়ো? এক উঠান লোকের মধ্যে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল আমাদের;—আজকে ওদের বলব,সে-সব ধাপ্পাবাজি, রেজিষ্টি-করা দলিল-দস্তাবেজই হল আসল?

প্রণব অপমানের জ্বালা ভুলতে পারে নি। জ্যোৎস্নাও স্বামীর সঙ্গে যোগ দিয়েছে। ছাড়া হবে না বুড়োটাকে। দুষ্টবুদ্ধির হাঁড়ি—ও না গেলে কুবুদ্ধি দেবার মানুষ থাকবে না, দু-দিনে সমস্ত ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

দুপুরের বিশ্রামের পর ইন্দ্রলাল উপর থেকে নেমে এলেন, বনমালী দেয়াল ঠেশ দিয়ে রোয়াকের উপর ঠায় বসে আছে। ইন্দ্রলালকে বলল, আর কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করবার থাকে তো শেষ করে ছেড়ে দিন আমায়। বেলা যাচ্ছে কাজকর্ম্ম আছে অনেক ওদিকে।

নকড়ি ঘরের ভিতর হাতবাক্সের সামনে কড়চার হিসাব তৈরি করছিল—ধানের দর কষে ওদের কার কাছে কত পাওনায় এসে দাঁড়িয়েছে। দরকার হলে দেওয়ানি মামলাও রুজু হবে, সহজে ছাড়বেন না ইন্দ্রলাল। সেখান থেকে নকড়ি বনমালীর উদ্দেশ্যে বলল, ঐ সব বেয়াড়া কাজকর্ম্মে তোমার গরজটা কি সর্দ্দার? বুড়ো হয়েছ, নিজের তো এককাঠা জায়গা-জমি নেই, কেন সাধ করে পড়ে থাকতে যাচ্ছ ওদের ঐ ভাঙা কুঁড়ির মধ্যে? ঘর-সংসার নেই—একটা মাত্র ছেলে, সে এখানে রয়েছে। তুমিও থাকো—বাপে বেটায় একসঙ্গে তোফাজে থাকবে,

সুখে থাকতে ভূতে কিলোয় কেন বুঝি না। যা বললাম সর্দার—বুঝলে, এখানেই থেকে যাও—

বনমালী ইন্দ্রলালের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, আপনারও ঐ ইচ্ছে নাকি রায় বাবু ?

হ্যাঁ, তা বই কি! একটু ইতস্ততঃ করে ইন্দ্রলাল জবাব দিলেন।

তার মানে থাকতেই হবে এখানে। নিজের ইচ্ছেয় না হলেও আপনাদের ইচ্ছেয়।

বনমালী হাসতে লাগল। হাসি থামিয়ে শেষে বলে, আগেই আমি আন্দাজ করেছিলাম। বেশ, তাই।

সন্ধ্যা হল, বনমালী ফেরে না। মুখ শুকনো নতুন চরের সকলের। কি করল ওরা বুড়োকে নিয়ে ? এক্ষুনি আসছি বলে ওদের সঙ্গে গেল, চুপচাপ ভুলে বসে থাকবার মানুষ সে তো নয়। লেঠেল-দাঙ্গাবাজের বিস্তর সমারোহ ওপারে। অনেক টাকা—দু-হাতে ওরা টাকা খরচ করছে। কথা দাঁড়াচ্ছে এখন শুধু নতুন চর দখল নিয়ে নয়—রায় ও ঘোষবাড়ির ইজ্জতের প্রশ্ন বিজড়িত এই সঙ্গে। এ অঞ্চলে ওদের অস্তিত্বের প্রশ্ন। এ-অবস্থায় রাগের বশে বনমালীকে খুন করে ওরা অষ্টবেঁকীর জলেই যদি ভাসিয়ে দিয়ে থাকে, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।

বনমালীর জ্যেঠতুত ভাই ত্রিলোচন প্রতিবাদ করে। না, অদ্দুর কখনো নয়। এতকালের ভালবাসাবাসি ওদের সর্দ্দারের সঙ্গে—

মুখে বলছে কিন্তু মনে মনে তারও অস্বস্তির অবধি নেই। বনমালী বুড়ো হয়ে গেছে, তবু যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে—জোর করে তাকে কেউ আটকাতে পারে না। মুক্তি-চেষ্টা করবেই, বেঁচে থেকে ঘাড় গুঁজে অত্যাচার সইবার লোক সে নয়। অন্ততঃ আগে তো ছিল না। লাঠিবাজি ছেড়ে আজকাল অহিংসার কথা বলছে, কিন্তু অহিংসা সেকেলে লাঠিবাজিরই একটা রকমফের—এমন কি, আরও জোরালো—একা ত্রিলোচনের নয়, নতুন চরের সকলেরই মনে ধীরে ধীরে এই উপলব্ধি আসছে।

ঘাড় নেড়ে যেন সজোরে মনের দুর্ভাবনা উড়িয়ে দিয়ে ত্রিলোচন বলল, খারাপ কিছু ঘটতেই পারে না। না, কখনো না। তার ছেলে অমূল্য আছে সে জায়গায়।

রাখাল ভ্রূকুটি করে বলে, মানুষ কি ওটা ? মানুষ নয় আদপে। সেও আরো দশ খানা করে লাগিয়েছে। সরিয়ে দিচ্ছিলাম তো কাঁহা-কাঁহা-মুল্লুক। ঘরশত্রু বিভীষণ—হবার জো আছে ?···কে ?

কেওড়াতলায় ছায়ান্ধকারে একজন দাঁড়িয়ে। হঠাৎ দেখতে পেয়ে রাখাল হাঁক দিয়ে উঠল, কে ওখানে ?

আমি অমূল্য—

ঐ দেখ, চরবৃত্তি করতে এসেছে। কেটে কুচি কুচি করে গাঙের জলে ভাসিয়ে দেবো ?

উত্তেজিত রাখাল দাওয়া থেকে লাফিয়ে পড়ল। কেওড়াতলার দিকে ছুটে যায় অমূল্যকে ধরবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু অমূল্য পালাল না, দৃঢ় পায়ে এগিয়ে এল। এসে সোজা দাওয়ায় উঠে যে মাদুরে মাতব্বরেরা বসে, সেইখানে সকলের মধ্যে চেপে বসল।

রাখাল বলে, কি জন্য এসেছ এখানে ?

অমূল্য হেসে জবাব দেয়, যা বললে—চর হয়েই এসেছি। আমায় ওরা নিজেদের লোক বলে ভাবে। গাঙ পার হয়ে তাই খবরটা দিতে এলাম।

ত্রিলোচন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করে, তার মানে ? গাঙ পার হতেও দিচ্ছে না নাকি ?

এপারে ওপারে ঝগড়া—গাঙের ঘাটে নজর রেখেছে বই কি। আর যাকে দিক, বাবাকে তো আসতে দেবে না কিছুতে পার হয়ে।

আটকে রেখেছে ?

হাঁ। হাতে পায়ে দড়ি নেই, তবু বেঁধে রাখা ছাড়া আর কিছু নয়। হেসে কথা বলছে সবাই সামনে এসে, সে আমলে বাবা কি করেছে না করেছে তার লম্বা ফিরিস্তি দিচ্ছে, খাওয়ার সময় রায়-বৌ এটা খাও সেটা খাও বলে খাতির জমাচ্ছেন—তবু এপারে তোমাদের মধ্যে আর আসতে দেবে না—বাবা জানে, আমরাও সবাই জানি।

রাখাল বলে, তাই সর্দ্দারকে বলছিলাম মার খেয়ে খেয়ে ওদের জব্দ করা যাবে না। ওরা সে পাত্রই নয়। ওদের মাথায় কিছু ঢোকে না, যতক্ষণ না মাথার উপর লাঠির বাড়ি এসে পড়ে।

আরও দু-চার জন মাতব্বর এসে জুটেছে, অমূল্যকে ঘিরে বসেছে, তাকে নানা রকম জিজ্ঞাসাবাদ করছে। রায়দের কথা, ঘোষদের কথা—কলকাতায় কি ভাবে থাকে তারা, শেষ অবধি তারা রফানিষ্পত্তি করবে কি না, কি রকম অনুমান হয় ? বিরক্ত হয়ে রাখাল কলকে হাতে উঠে পড়ল। রান্নাঘর থেকে কলকেয় আগুন তুলে নিয়ে চুপচাপ কিছুক্ষণ টানতে লাগল। কি ভেবে তারপর এ দিকে এসে কমবয়সী জন দুই তিনের হাত ধরে টেনে ইসারায় ডেকে নিয়ে চলল।

শোন, যাক প্রাণ রোক মান। যাওয়া যাক—ছিনিয়ে নিয়ে আসি বনমালী সর্দ্দারকে। না হয় ঘায়েলই হবো দু-দশ জন। সকলের চোখের উপর দিয়ে হিড় হিড় করে তাকে নিয়ে গেল, আর হাত-পা কোলে করে সবাই আমরা বসে রইব এমনি ?

অতুল বলে, অমূল্যকে ডাকো এখানে। খবর নেওয়া যাক।

অমূল্য এল।

লেঠেল ক-জন আছে ওখানে? এনেছিল তো একশ দেড়শ—সবাই আছে, না চলে গেছে কতক কতক? খাঁটি কথা বলো, ধাপ্পা দিও না।

আছে—মনে মনে হিসাব করে অমূল্য জবাব দেয়—ছয় আর দুই আট, আর এক, নয়। সব সুদ্ধ ন'জন…

মোটে?

টাকা-পয়সা হিসাব করে নিয়ে সন্ধ্যের আগে যে যার বাড়ি চলে গেল। অনেক দূরে বাড়ি বলে এরাই নাট-মণ্ডপে পড়ে আছে। রাতটুকু কাটিয়ে ভোর বেলা রওনা হয়ে পড়বে।

বলো কি? উৎসাহে অতুল লাফিয়ে ওঠে।

কি করতে থাকবে বলো? মারামারি তো নয়—শুধু এক তরফা মার। ক'জন মানুষ লাগে বলো তাতে?

রাখাল বলে, মিথ্যে বলে আমাদের ফাঁসাবার মতলব নেই তো? যদি সে মতলব থাকে, তুমিও মারা পড়বে কিন্তু। জামিন হয়ে আটক থাকবে তুমি এখানে—

যমুনা এসে কখন একপাশে দাঁড়িয়েছে, তাকে দেখিয়ে রাখাল বলে এবার ওর জিম্মায় নয়। বারোয়ারি ঘরের ভিতর দোরে শিকল দিয়ে লোক মোতায়েম করে রেখে দেব তোমায়।

যমুনা বলে, না—আমার কাছে এই বাড়িতেই থাকবে অমূল্য দা। সরিয়ে দিয়ে আসছিলে, ভারি কাজ করছিলে তোমরা। জীবন্ত রেখে চোখের উপর রেখে তিলে তিলে ওকে শাস্তি দিতে হবে। সর্দার জ্যেঠার কাজ ওরই কাঁধে তুলে দাও। ফেলে দিক, তারপর দেখা যাবে।

অমূল্য বলে, কিন্তু ব্যাপারটা কি বলো তো? ওপারে যাচ্ছ? খবরদার খবরদার! বাবা মানা করে দিয়েছে। জোর জবরদস্তি করতে যেও না।

রাখাল প্রশ্ন করে, যা বললে—ন-দশ জনের বেশি লেঠেল নেই তো? সত্যি কথা বলছ তুমি?

নেই। কিন্তু বাবা মানা করে পাঠাল আমায় দিয়ে। ও মতলব ছাড়। তা হলে সব ভেস্তে যাবে, বলে দিয়েছে।

[ক্রমশঃ]

সঞ্চয় ও বীমা

শ্রীপ্রভাকর মিত্র

যুদ্ধ যখন চলছিল তখন যুদ্ধজয়ের জন্ত সঞ্চয়ের এক বিরাট আয়োজন চলেছিল, শুধু টাকা-পয়সার সঞ্চয় নয়, এমন কি—এক টুকরা কাগজ বা একফালি ন্যাকড়া তাও যেন অপচয় না হয়। সেদিকেও প্রখর দৃষ্টি রাখা হয়েছিল। এখন যুদ্ধের অবসান ঘটেছে, মিত্রশক্তির জয়লাভ হয়েছে। তবে যুদ্ধের কলঙ্ক পৃথিবীর অঙ্গে অঙ্গে লেপে গেছে। এখন সেই ক্ষতচিহ্ন ও কলঙ্কের-দাগ পৃথিবীর অঙ্গ হতে মুছবার পালা। তখন সঞ্চয় করেছিলেন যুদ্ধজয়ের উদ্দেশ্যে, এখন সঞ্চয় করুন যুদ্ধদগ্ধ পোড়া-মাটীর পুনর্জ্জীবনের জন্ত। সঞ্চয় করা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম—কাহাকেও শিক্ষা করিতে হয় না। শুধু মানুষের কেন, অনেক জীবের মধ্যেও এই ধর্ম্ম বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে, যেমন পিঁপড়ে বা মৌমাছি। তবে সঞ্চয়-প্রণালী বা টাকা-খাটানোর প্রকার ভেদ আছে। গুপ্ত ধন-দৌলত রাখা ভারতবাসীর একটা অখ্যাতি আছে। এখনো শুনা যায় সুদূর পল্লী-অঞ্চলে অনেকে গুপ্তস্থানে ধনদৌলত লুকাইয়া রাখেন। এই অভ্যাসের মূল কারণ কি? পূর্ব্বে আমাদের দেশ বহুবার পরজাতি-আক্রমণ ও অরাজকতা ভোগ করছে। তারই ফলে ধন-বিনাশের ভয় দেশবাসীর মজ্জাগত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে, বর্ত্তমানে সুপ্রতিষ্ঠিত শান্তিশাসনে আর নানাদিকে নানারকমের খাটাইবার সুযোগ-সুবিধা থাকায় সেই অভ্যাস ক্রমশঃই ক্ষীণ হয়ে আসছে। আমাদের সঞ্চয়ের আর একটা অন্তরায় জানেন, আমাদের মনের গঠনে ধর্ম্মের প্রভাব। আমরা শিখি সবই মায়া. অর্থই অনর্থের মূল। আবার শুনে থাকবেন,অনেকে বলেন—টাকা রেখে কি হবে, ভাগ্যছাড়া পথ নেই, সুতরাং ঋণ করিয়াও ঘি খান। এ মন্দ কথা নয়। বর্ত্তমান পুরুষে যদি অযথা ব্যয় বাহুল্য না ক'রে যাহাতে বর্ত্তমান ও পরবর্ত্তী পুরুষের কল্যাণসাধন হয় সেইরূপ খরচ করেন, তাহাও মঙ্গলকর। তবে আমাদের দেশের মধ্যবিত্তের জীবন-যাত্রা প্রণালী বর্ত্তমানে অনেক প্রসার লাভ করেছে। অথচ সেই প্রশস্ত জীবন যাপনের তুলনায় তাঁদের আয় বিশেষ বৃদ্ধি লাভ করেনি, তাই যখন তাঁরা দেখেন যে আত্মসুখ জলাঞ্জলি দিয়ে দু'পয়সা এক পয়সা করে জমিয়েও তাঁদের জমান টাকায় বিশেষ কিছু সুসারই হয়ে উঠে না, তখন নিতান্ত ক্ষোভেই তাঁরা বলেন ভাগ্য ছাড়া পথ নাই। যকের মত ধন আগুলিয়ে থাকায় যেমন সমাজের কোন উপকার দর্শে না বিবেচনাহীন যথেচ্ছব্যয়েও সমাজের কোন- কল্যাণ-সাধন হয় না। আমাদের সমাজব্যবস্থায় অনেক যথেচ্ছব্যয় সাধিত হয়। মনুর অনুশাসনে ব্রাহ্মণপ্রধান সামাজিক অনুষ্ঠানে আমাদের ব্যয়বাহুল্য ব্যবস্থা

অনেক আছে। এই সামাজিক রীতিও আমাদের অর্থ সঞ্চয়ে বাধা সৃষ্টি করে। দেশের মোট-উৎপন্ন সামগ্রী হতে জনসাধারণের ভোগজনিত ক্ষয় বাদ দিলে অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহাই দেশের মূলতঃ সঞ্চয়। মানুষের ইতিহাসে সঞ্চিত থাকে তার আত্মপ্রকাশের প্রয়াস, যা যুগ হতে যুগান্তরের সভ্যতায় প্রতিফলিত হয়ে অগ্রসর হয়। এক যুগের সঞ্চয় পর যুগের মূলধন। সেই সঞ্চিত মূলধনের উপর পরবর্ত্তী মানুষ সৌধ গড়ে তুলে, নানা শিল্প কলায় বিশ্বভাণ্ডার পূর্ণ করে। বিভিন্ন জাতির আর্থিক গঠনে যে সৌষ্ঠব প্রকাশ পায় তা তাদের স্ব স্ব সঞ্চয়নীতির রূপান্তর মাত্র। ব্যক্তিগত জীবনে সঞ্চয়ের যেমন একটি বাস্তব মূল্য পাই, জাতির জীবনেও সঞ্চয়ের একটি অর্থ আছে। ব্যক্তিগত সঞ্চয় অল্পায়ুঃ, কিন্তু জাতীয় সঞ্চয় সুদূরপ্রসারী। সঞ্চয় ত্রিকালব্যাপী। অতীত হইতে পুষ্টিলাভ ক'রে বর্ত্তমানের অভাব পূর্ণ করা যেমন ইহার একটি অঙ্গ, ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখাও তেমনি ইহার একটি বিশেষত্ব। জাতীয় উন্নতি ভবিষ্যৎ পুরুষ গঠনের উপর অনেকখানি নির্ভর করে। ব্যক্তিগত সঞ্চয় যথাসম্ভব জাতিগতরূপে পরিকল্পিত হলেই জাতির অগ্রসর হবার গতি বৃদ্ধি পায়। এই ব্যক্তিগত সঞ্চয় কি ভাবে জীবনবীমায় সমাজগত জাতিগত রূপে পরিকল্পিত হয়, তাই আজ আপনাদের বলব।

বলা আবশ্যক হবে না যে, প্রস্তরপিণ্ডের মত ধন-দৌলত লোহার সিন্দুকে বা মাটির নীচে লুকাইয়া রাখায় যথার্থ সঞ্চয় হয় না; কারণ, এইরূপ সঞ্চয় গতিহীন, নিষ্ক্রিয়। গতিশীল প্রাণবন্ত সঞ্চয় যাহাতে নিজের ও প্রতিবেশীর আর দেশের মঙ্গল হয় সেইরূপ সঞ্চয়ই আসল সঞ্চয়। আচ্ছা, সঞ্চয় করিয়া আপনি কি চান। প্রথমতঃ চান যে, আপনার সঞ্চিত ধনের কোন বিঘ্ন না ঘটে, তার পরিমাণের বা গড় মূল্যের কোন কমতি না হয়। দ্বিতীয়তঃ আপনি চান যে, আপনার সঞ্চিত ধনের বিনিয়োগে বা হাতফের হেতু কিছু অর্থ বা সুদ আপনার হাতে নির্দ্ধারিত হারে নিয়মিত ভাবে আসে, তাতে যেন অন্যথা না ঘটে। আপনি যে আপনার সঞ্চয়ের বর্ত্তমান ফলভোগ হ'তে বিরত রহিলেন, তার দরুণ আপনি কিছু পুরস্কার বা সুদ আশা করেন। ধনটা অবশ্য আপনার নিজস্ব প্রাপ্য। আর তৃতীয়তঃ আপনি চান যে আপনার আবশ্যক হ'লে আপনি যেন সঞ্চিত ধন নিজের আবশ্যকে লাগাইতে পারেন; প্রধানতঃ আপনি এই তিনটী বিষয়ে সন্তুষ্ট হইলেই চলে।

সঞ্চয় বিনিয়োগেরও মূলনীতি ঐ তিনটীই। প্রথমেই বলে রাখি, বর্ত্তমান যুগে সঞ্চয় করা খুব সুবিধা, কারণ, দেশের চলতি মুদ্রাই হ'চ্ছে সর্ব্বমূল্যের স্বরূপ বা মূল্যাধার মুদ্রাই মূলধনের সাধারণ রূপ, সুতরাং মুদ্রা সঞ্চয় করিলেই আপনার বা দেশের সঞ্চিত যা কিছু সবার জন্তই সঞ্চয় করা হইবে। আমাদের দেশের ধনদৌলত গোপন রাখার প্রবৃত্তি বা অভ্যাস দূর করবার জন্য গভর্ণমেণ্ট যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রে আসছেন। তাঁদের এই দিকের প্রথম প্রয়াস হচ্ছে পোষ্ট অফিস সেভিংস্ ব্যাঙ্ক। তাহাতে নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা দিয়ে দেশের গুপ্তস্থান হতে অনেক টাকাকড়ি গভর্ণমেণ্ট বাহির ক'রে আনতে সমর্থ হয়েছেন। ১৯৩৭-৩৮ সালে প্রায় ৩৮ লক্ষ লোক পোষ্ট অফিস সেভিংস্ ব্যাঙ্কের মারফতে ৭৭ কোটি টাকা গভর্ণমেণ্টের ঘরে জমা রেখেছে। এই হ'ল দেশবাসীর সঞ্চয়ের প্রথম ধাপ। দ্বিতীয় ধাপে উঠে দেখি, তাঁহারা আরও অগ্রসর হয়েছেন, তাঁরা সাধারণ ব্যাঙ্কেও টাকা রাখতে শিখেছেন। ঐ ১৯৩৭-৩৮ সালে সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির মোট আমানত প্রায় ২৪১ কোটী টাকা। তৃতীয় ধাপে দেখা যায়, যাঁদের অবস্থা ভাল, তাঁদের সঞ্চয়ের প্রিয়বস্তু গভর্ণমেণ্ট কাগজ।

এই গভর্ণমেণ্ট কাগজের সাহায্যে দেশবাসীর হাত হতে প্রচুর অর্থ কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের ঘরে ফিরে গেছে। তার কারণ, দেশবাসীর গভর্ণমেণ্ট কাগজে অক্ষুণ্ণ বিশ্বাস। ভারতে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের "রুপিলোন" কাগজ যা আমাদের দেশের লোক ক্রয় করেছেন, তা ১৯৪০—৪১ সালের বাজেট অনুযায়ী প্রায় ৪৩৫ কোটী টাকা। এই গেল সাধারণ প্রথম তিন ধাপ সঞ্চয়ের কথা, এর পরে সঞ্চয়ের চতুর্থ ধাপে দেখা যায়—কোম্পানীর শেয়ারে টাকা খাটানো। যাঁহারা ব্যবসা বাণিজ্য বুঝেন তাঁরা আজকাল কোম্পানীর শেয়ার কিনেন মোটা লাভের আশায়। ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতে মোট ১০,৩৫৭টী জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী কাজ করেছে। তাদের মোট আদায়ী মূলধনের পরিমাণ প্রায় ২৮০কোটী টাকা। এই বিশাল অর্থও দেশবাসীর হাত হতে এসেছে। আমি ক্রমান্বয়ে চার ধাপ সঞ্চয়ের কথা বললাম। এবার পঞ্চম ধাপে জীবন বীমা সঞ্চয়ের কথা পাড়ি। যদিও আমার আলোচনার বিষয় "সঞ্চয় ও বীমা", তবু সঞ্চয় সংক্রান্ত জীবন বীমার কথাই বলব। তার কারণ সঞ্চয় বা মিতব্যয়িতার আদর্শ জীবন বীমায় যেরূপ কার্য্যকরী হয়েছে তেমনটী অন্য কোন বীমাতে হয়নি। জীবন সংক্রান্ত বীমাই সঞ্চয়ের পরিপোষক। অন্যান্য বীমা ব্যবসা-বাণিজ্য বা শিল্পের নানা প্রকার ঝুঁকি গ্রহণ করে। —আমরা বলি জীবন অমূল্য। কারণ একটী জীবনের স্থান দখল করার মত দুনিয়ায় দ্বিতীয় জীবন মেলে না। আমাদের মূল্য বিষয়ে ধারণা বস্তু নিয়মের সহিত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। জীবনের মূল্য নিরূপণের কথা উঠলে আমরা ততটা সঠিক বা সত্বর জবাব দিতে পারি না যতটা বস্তুর বেলায় পারি। অথচ বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে আমরা এক বিজ্ঞানের সন্ধান পেয়েছি যার দ্বারা পার্থিব বস্তুর ন্যায় আমাদের জীবনেরও মূল্য নিরূপণ করতে সমর্থ। এই বিজ্ঞানই জীবনবীমা। পার্থিব বস্তুর যেমন ক্ষয় বা সহসা ধ্বংস ঘটতে পারে, মানুষের জীবনেরও সেইরূপ। সম্পত্তিসংরক্ষণ ও তাহার মূল্য নিরূপণ সম্বন্ধে যেসব পদ্ধতির আবিষ্কার হয়েছে, সেই সব পদ্ধতির ব্যবহারবিধি জীবনমূল্য ব্যাপারেও ব্যবহৃত হয়। খনির ন্যায় ক্ষয়শীল সম্পত্তির সহিত জীবনের তুলনা করা চলে। খনির যে ভাবে মূল্য নিরূপণ করা হয় জীবনেরও সেইরূপে মূল্য নির্দ্ধারণ করা যায়। প্রকৃত পক্ষে জীবনের মূল্য কি? সমাজে ইহা যাহা উৎপাদন করে এবং যতদিন পর্য্যন্ত তা উৎপাদন করতে সমর্থ,

তার উপর নির্ভর করে। জীবন-মূল্য নির্দ্ধারণে দুইটী হিসাবের ব্যবহার কৌশলের প্রয়োজন।

প্রথমটী তার স্বাভাবিক আয়-ব্যয়ের হিসাব মৃত্যু-তালিকা হতে পাওয়া যায়। আর অপরটী চক্রবৃদ্ধি সুদের ব্যবহার। এই সুদের হিসাবের ফলেই জীবনের মূল্য অর্থের অঙ্কে গিয়ে পড়ে। ষ্টক কোম্পানী যেমন তাদের সম্পত্তির উপর বণ্ড বিক্রয় করে, সেইরূপ ভাবেই জীবন বীমা কোম্পানী জীবন-সম্পত্তির উপর বণ্ড ইস্যু করে, যা বাজারে জীবনবীমা পত্র বলে পরিচিত। সুতরাং সকল প্রকার জীবনেরই মূল্য নিরূপণ ক'রে তারা বণ্ড বা জীবন বীমাপত্র বিক্রয় করেন। প্রত্যেকের আয় ও বয়স অনুযায়ী জীবন বীমা-বণ্ড ক্রয় করতে পারা যায়। ক্রয়-বিক্রয়ের বা দাদনের যে সমস্ত পদ্ধতি এতাবৎকাল বাজারে চ'লে আসছে, তাদের মধ্যে জীবনবীমা বণ্ডই যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তা বলা বাহুল্য। একবার তুলনা করে দেখালাম, দাদনের প্রথম নীতি নিরাপত্তা। আগে বলেছি, আপনি টাকা সঞ্চয় করে প্রথম চান যেন আপনার সঞ্চিত অর্থ নিরাপদ থাকে। তার পরিমাণ বা মূল্যের যেন হ্রাস না ঘটে। এখানে দেখুন জীবনবীমা সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ। ১৯৩৮ সালের বীমা আইনে গভর্ণমেণ্টের যে কড়া নজর কোম্পানী-গুলির উপর আছে, তাতে জীবনবীমায় টাকা রাখলে আপনার বীমায় চলতি বয়স যত বাড়চে, তত আপনার বীমার মূল্যও বাড়তে থাকবে। এই গেল প্রথম নীতি।

দ্বিতীয় নীতি, আপনি সঞ্চিত ধনের বিনিয়োগ হেতু কিছু সুদ চান। এখানেও আপনার কিছু সুদ মিলবে। বীমা কোম্পানী যে সুদ দেয়, তা সাধারণতঃ বোনাস নামে পরিচিত। পূর্ব্বে কোম্পানীগুলি যথেষ্ট বোনাস দিয়ে এসেছে। বর্ত্তমানে যুদ্ধের বাজারে গভর্ণমেণ্ট কাগজের সুদ পড়ে যাওয়ায় এবং কোম্পানীগুলি আগের মত লাভ করতে না পারায় তেমন বোনাস দিতে পারে না। তথাপি আপনার কিছু সুদ ঘরে আসবে। এখানে বলে রাখি, জীবনবীমার মূল্য-রহস্য এই যে, আপনার সহসা মৃত্যু ঘটলে আপনার কিস্তি বা প্রিমিয়ম খেলাপ পড়লে আপনার বাকী কিস্তি আর দিতে হয় না। জীবনবীমা বণ্ডের পূরা টাকা আপনার উত্তরাধিকারী পাবেন। সুতরাং, এই যে জীবনের ঝুঁকি কোম্পানী হাতে নিবে, সেই ঝুঁকির অংশ ধরলে আপনার সুদের পরিমাণ কিছু কমতি হল না। আর তৃতীয়তঃ, আপনি চান যে, আপনার প্রয়োজন হলে আপনি যেন সঞ্চিত ধন নিজের কাজে লাগাতে পারেন। এখানেও সে সুবিধা বর্ত্তমান। আপনার যদি নগদ মূল্যের দরকার হয়, আপনি জীবনবীমা বণ্ড ফেরত দেন, কোম্পানী আপনাকে প্রত্যর্পণ মূল্য ফেরত দেবে। এই নগদ মূল্য ৩ বছরে যা পাবেন ৮ বছরে—আপনার বীমা চালু থাকলে তার—বেশী পাবেন। এর মূল্য বীমায় বয়স অনুযায়ী বেড়ে চলে। আর একটী বিশেষ সুবিধা বর্ত্তমান আইনে আছে যে, আপনার বীমা ২।৩ বৎসর চলতি থাকার পর যদি কোন কারণ বশতঃ আপনার কিস্তি দিতে দেরী হয়, আপনার বীমা নষ্ট হল না। আর যদি একেবারে কিস্তি না দেন, তা হলেও আপনি আনুপাতিক অনাদায়ী বীমা পাবেন, যার উপর আপনাকে আর কোন কিস্তিই দিতে হবে না। কড়ার মত আপনার মৃত্যু ঘটলে মেয়াদ অন্তে আপনি ঠিক পাবেন। সুতরাং দেখুন আপনার সঞ্চয়ের কোন অসুবিধাই নাই। বরঞ্চ যাতে আপনি ক্রমে ক্রমে বছর বছর কিছু কিছু সঞ্চয় করতে পারেন, তারই ব্যবস্থা জীবন বীমায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে বর্ত্তমান। শুধু তাই নয়। মানুষ ধাপে ধাপে সঞ্চয় করে যে শিখরে উঠতে চায়, তা সহসা এক ঘূর্ণিবাত্যায় মরলেও ধ্বংস করতে পারে না, এই হচ্ছে জীবন-বীমার রহস্য। আপনি যে শুধু সঞ্চয় করে চলেছেন তা নয়, আপনার সঞ্চয়ের পথে আপনি ভাগ্যহীন সহধর্ম্মীদের জন্য দানও করে চলছেন। এই জীবনবীমার আওতায় যাঁরা বাস করেন তাঁরা জ্ঞাতসারে, কি অজ্ঞাতসারে এক পরিবারভুক্ত হয়ে যান, একের জীবনের সাথে অন্যের জীবন এমন ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে ওঠে যে একের দুঃসময়ে অপর সকলে হাত বাড়িয়ে দেন। দিনে দিনে গোষ্ঠিবর্গের সংখ্যা বেড়ে চলে। যে পরিবার যত বড় হয়ে ওঠে সমবায়যোগে তার তত বিপুল ঐশ্বর্য্যের সৃষ্টি হয়, পরস্পরের বন্ধন তত সুদৃঢ় হয় ও বিশালতা লাভ করে। দিগ্বিদিক হতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়-ধারা আকৃষ্ট করে ভারতে যে সর্ব্ব-সমেত জীবন বীমার বিরাট সঞ্চয় সমুদ্র সৃষ্টি হয়েছে, তার আয়তন ভারতীয় ও অভারতীয় মিলে ১৯৪৪ সালের শেষে দাঁড়িয়েছে ১২৯ কোটী ৬৪ লক্ষ টাকা। যে সঞ্চয় ধারা এই বিশাল তহবিল সৃষ্টি করেছে, সেই মোট কিস্তির বহর ১৯৪৪ সালের শেষে দেখা যায় ২২ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা। এবারে ভারতবাসীর বীমা বিস্তারের নমুনা দি।

১৯৪৪ সালে ভারতে মোট ৪ লক্ষ ৫১ হাজারখানি নূতন বীমাপত্র কোম্পানীগুলির দপ্তর হতে বাহির হয়। তাতে মোট ১০৬ কোটী ২০ লক্ষ টাকার বীমা হয়েছিল, আর সেই বৎসরের শেষে দেখা যায় ৪৪২ কোটী ১৩লক্ষ টাকার বীমা ভারতে চালু ছিল। এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই, কারণ ভারতের মোট লোকসংখ্যার তুলনায় এ অতি সামান্য। আমাদের দেশে মাথাপিছু জীবনবীমা কত জানেন? প্রায় দশটাকা মাত্র। এখনো দেশে বীমা প্রসারের প্রচুর অবসর। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী বদলাতে হবে। আমরা সম্পত্তি সংরক্ষণে এতদূর অভিভূত যে, যে-জীবনের কার্য্যকারিতা বলে ঐ সম্পত্তির অধিকারী হই সেই জীবন সম্বন্ধেই আমরা বিস্মৃত হয়ে থাকি। তার মূল্য যে কতদূর তা ভেবে দেখিনা। এমনকি যখন বাজারে বা ঘরের দুয়ারে জীবনবণ্ড পাবার ব্যবস্থা আছে, তখনও তার সুযোগ গ্রহণ করি না। যে জীবনের কার্য্যকারিতার উপর আমার নিজের, আমার পুত্র-কন্যা-পরিবারের, আমার ব্যবসা এবং আমার দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে সেই জীবনের যথাযথ মূল্য নির্দ্ধারণ করে বণ্ড বা বীমা-পত্র ক্রয় না করলে আমার মনুষ্যোচিত কাজ করা হয় না। যে জীবনকে জড়িয়ে গৃহস্থের ভবিষ্যৎ ব্যবসায়ীর, ব্যবসা শিল্পীর শিল্প, পাওনা-দারের দেনা নির্ভর করে, তাকে নিয়ে জুয়া খেলা চলে না। বাড়ীর গৃহিণীদের মধ্যে খোঁজ করে দেখবেন, সকল বিধবাই জীবন বীমায় বিশ্বাস করেন।

আপনার সঞ্চিত সম্পত্তি ক্রয় করবেন কিস্তি দিয়ে।

আপনি যদি ব্যবসায়ী হন, আপনার জীবন-বীমার জন্য বাজারে আপনার সুনাম বাড়বে। অভাবের সময় ইহা আপনার ইজ্জৎ রক্ষা করিবে। আপনার অংশীদারের যদি হঠাৎ মৃত্যু হয়, আপনার ভয় নেই—জীবন বীমায় টাকা আপনার কারবারে এসে হাজির হবে। আপনার মন নিরুদ্বেগ হওয়ায় আপনার জীবনী-শক্তি বাড়বে। জীবন বীমা আপনি উইল করে যেতে পারেন। বর্ত্তমান আইনে তার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। আপনার পুত্র-কন্যার ভার, নিজের বার্দ্ধক্যের ভাবনা সহসা অকেজো হওয়ায় চিন্তা আর মৃত্যুর দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে নুয়ে পড়েন কেন? জীবনবীমা করে কিছু কিছু সঞ্চয় দিয়ে দায়গুলি যদি পরের হাতে তুলে দিতে পারেন, তার চেয়ে আর সুবিধার কি আছে! ভেবে দেখুন। সঞ্চয় করুন। শান্তিপর্ব্বে দেশের ও দশের কাজে আপনার সঞ্চয় সঞ্চালিত করুন। দেখুন, আপনার জীবনের নিছক আর্থিক মূল্য আছে। একমাত্র জীবন-বীমা আপনাকে সে মূল্য দিতে পারে; আপনি বাঁচুন বা মরুন, ভাগ্য যদি মানতে হয়, তবে জীবন-বীমা যে আপনার অবর্ত্তমানে ভগবানের আশীর্ব্বাদের মত এসে আপনার পরিত্যক্ত দায়িত্বগুলি মাথায় তুলে নিবে, সঞ্চয়ের এর চেয়ে বড় কথা আর নেই।

তরঙ্গ

শ্রীপ্রতিমা গঙ্গোপাধ্যায়

রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। সুমিতা বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। একটি গল্প। আজ রাত্রির মধ্যে তাহাকে একটি গল্প লিখিতেই হইবে। তাহার পরম স্নেহাস্পদা কোন সুদূর প্রবাস হইতে তাহার নিকট লেখা চাহিয়াছে, তাহার সেই যাচ্ঞা প্রত্যাখ্যান করিতে সুমিতার মন সরিতেছে না। তার সে চাওয়া, ছোট হউক, আর বড় হউক, তাহাকে সে প্রার্থনা পূরণ করিতেই হইবে।

কিন্তু সারাদিন সংসারের অজস্র কর্ম্মের মাঝখানে সুমিতার বসিবার অবসর হয় নাই। আজ সারাটি দিন সমস্ত কর্ম্মের মধ্যে এই একটি চিন্তা তাহার মনে জাগ্রত রহিয়াছে যে,আজ রাত্রির অবকাশে সুমিতা একটি ছোট সুন্দর নিপুণ গল্প রচনা করিবে। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে সেই রচনাটি। শয্যায় শুইয়া লিখিলে আজ চলিবে

সবাই যখন ঘুমাইবে, সেই শুদ্ধ নির্জ্জন পরিবেশের মাঝে সুমিতা যাইবে তাহার বসিবার ঘরে। ছোট গদী-আঁটা নীচু চেয়ারটায় বসিয়া ছোট টেবিলটা নিকটে লইয়া নীল শেডের মৃদু বাতিটা জ্বালিয়া দিয়া সুমিত লিখিতে বসিবে।

বাহিরে নিস্তব্ধ নীলাকাশে একফালি রূপালী চাঁদ কেবল জাগিয়া থাকিবে। আর ঘরের ভিতর জাগিয়া থাকিবে সুমিতা।

তাহার পর তাহার ঝরণা কলমের নিবের মুখে একটি একটি করিয়া ঝরিতে থাকিবে কথা। সুন্দর সুসম্পূর্ণ কথা। তাহার পর সেই কথার খণ্ডগুলি জুড়িয়া রচিত হইবে একটি সুন্দর কাহিনী। প্রেমের। নিবিড় গভীর ভালবাসা-গঠিত দুইটি হৃদয়ের একটি মিলন কাহিনী। নিবিষ্ট হইয়া সুমিতা ভাবিতে থাকে, এই দুঃখের-জগতে সুখের কাহিনী বিরল এবং তাহা লিখিতে পারাও শক্ত, তাই সুমিতা আজ সেই চেষ্টাই করিবে।

সেই নিস্তব্ধ অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়াইয়া নক্ষত্রখচিত নীলাকাশের পানে চাহিয়া চাহিয়া তাহার দুই চোখে চিন্তাভার ঘনাইয়া আসে। কোথায় কাহারা হাভাত হাভাত করিয়া দিনে দিনে শীর্ণ হইয়া অবশেষে জীবনটা নিতান্ত তুচ্ছবস্তুর মত ত্যাগ করিয়াছে নিরতিশয় অনিচ্ছার সহিত। সে-সব কাহিনী অজস্র লেখায় ফেনাইয়া ফুলাইয়া কাঁপাইয়া বাহির হইয়াছে। সুমিতা তাহা লিখিবে না।

না হইলে, এই তো সেইদিন সে মায়ের মুখে শুনিয়া আসিয়াছে গ্রামের কথা। যুদ্ধের বিষবাষ্প কেমন করিয়া তাহাদের ক্ষুদ্রগ্রামখানির অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিয়া কত শান্তিনীড় নষ্ট করিয়াছে, তাহারি করুণ কাহিনী।

তাহারি চোখের সম্মুখে ভাসিয়া ওঠে কুমোরদের বউ শ্যামলী। আহা হৃষ্টপুষ্ট শ্যামবর্ণ বধূটি। সুমিতা গালে হাত দিয়া ভাবিতে থাকে। ক্ষুদ্র তাহার গ্রামখানি, আনন্দপূর্ণ তাহার গৃহস্থালী ছিল। না খাইয়া না খাইয়া তাহার দেহ হইয়াছিল শুষ্ক রুক্ষ বিবর্ণ কাঠের মত। আপনাকে বঞ্চিত করিয়া সন্তানগুলির আহার যোগাইতে যোগাইতে সহসা একদিন বসিয়া বসিয়া মরিয়া গেল। হার্টফেল। হার্ট তাহার তখনও ছিল কি? মা এখনও দুঃখ করেন যে, জানিতে পারিলে আমি তাহাক অন্ন দিতাম।

সামর্থ্যযুক্ত ঘরের বধূ মরিয়া যায়, তবু মর্য্যাদা হারায় না। মা জানিবেন কি করিয়া?

যাক ও-কথা। ও-কথা ও-সব কাহিনী সে লিখিবে

নাঃ ভাতের কাহিনী, বস্ত্রের কাহিনী, আর অভাবের কাহিনী।

আজকাল যেন কি হইয়াছে? হাস্তকররূপে যুগ যেন বদলাইয়াছে। আগেকার দিনে প্রেমের জন্য লোকে জাত-কুল-মান বিসর্জ্জন দিত। আজকাল দু'টি ভাত সেইস্থান অধিকার করিয়াছে। সভ্যযুগ কি না! মানুষ দিন দিন 'সিভিলাইজড্' হইতেছে যে! কিন্তু থাক ও-কথা। সুমিতা ওই দুঃখ-দুর্দ্দশার উৰ্দ্ধে যুগোত্তর কাহিনী লিখিবে। যেমন আগেকার দিনের ভাত কাপড়ের চিন্তাবিহীন রোমিও জুলিয়েট, ওথেলো ডেসডিমেনা, দুষ্মন্ত শকুন্তলা, অথবা বিরহী যক্ষ ও যক্ষবধূ। সেই রকম কোনও সুন্দর কাহিনী।

সে লিখিবে। নির্জ্জন গভীর রাত্রি। তাহার ছোট পরিপাটি সজ্জিত রীডিং রুম। পাশে পাশে বুককেশে সুন্দর করিয়া বাঁধা রবীন্দ্র, শরৎ রচনাবলী। ইংরাজি সাহিত্যের বাছা কয়েকটি বই পাশের র‍্যাকে রহিয়াছে। পাশের ছোট চেয়ারে নরম গদীর মধ্যে ডুবিয়া বসিয়া ছোট টেবিলে মৃদু বাতিটি জ্বালাইয়া দিয়া শুভ্র ফুলস্কেপের বুকে তাহার ঝরণা কলমের মুখ হইতে ঝরিতে থাকিবে অজস্র ধারায় যে কথা, সেই কথা দিয়া সে গাঁথিয়া তুলিবে একটি প্রেম-সম্পূর্ণ সুন্দর কাহিনী।

গভীর সামাজিক সংঘাতের মধ্যস্থলে দুইটি তরুণ-তরুণী তাহাদের সর্ব্বজয়ী প্রেমের বলে সববাধা সরাইয়া দিয়া জয়ী হইবে। যতই রাত্রি গভীর হইয়া আসিবে, নিস্তব্ধ রাত্রির বুকে যতই ঝিল্লীরব স্ফুটতর হইতে থাকিবে, ততই তাহার কলমের গতি হইবে দ্রুততর এবং বাধাহীন, সে লেখায় বাজিবে আনন্দগীতি, অন্নবস্ত্রের হাহাকার তাহাতে থাকিবে না।

হাঁ, কাপড়ের জন্য নাকি একটি নারী আত্মহত্যা করিয়াছে। কলাপাতা দিয়া লজ্জানিবারণের প্রয়াস করিয়া কাপড়ের আশায় হতাশ হইয়া অবশেষে সে নাকি জলে ডুবিয়া মরিয়াছে—

কাহার উপর তাহার এই ব্যর্থ অভিমান কে জানে?

কাগজে একথা কিন্তু সত্যই প্রকাশিত হইয়াছে। জানা তো নাই যে, কাগজওলাদের সরকারের পেছনে লাগিবার জন্য এটা বাড়াইয়া লেখা কিনা!

হিষ্ট্রী যেটুকু স্মরণ হয় তাতে মনে পড়ে না তো যে কাপড়ের জন্য মানুষ এত ব্যাকুল হইয়াছে। তবে আবার এ কথাটাও তো ভাবিতে হইবে যে, ভারতবর্ষের লোকেরা তেমন সভ্য ছিল না, তারা বল্কল পরিয়াই কাটাইয়া দিত। কাজেই কাপড়ের অভাব তাহাদের—হইবে কি?

সুমিতা ভাবিল, আচ্ছা, আমাদের তো এতটা অভাব হয় না? তবে হ্যাঁ, যদি শুধু কন্‌ট্রোলের শাড়ী ধুতি পরিতে হইত, তবে গৃহের আটজন অধিবাসীর ভদ্রোপযোগী কাপড় জমিতে বৎসর তিনেক লাগিত। এবং অনেককেই নেংটী মাত্র সম্বল করিয়া ভারতের আধ্যাত্মিক ত্যাগ-রূপ প্রত্যক্ষ করিতে হইত। ভাগ্যে ব্ল্যাকমার্কেটের দুয়ার খোলা আছে।

আজকাল দাসী, ভৃত্য, বামুন, ভিখারী, অনুগ্রহপ্রার্থী সবাই যেন বেশী করিয়া কাপড় চায়। পুরাণো একখানি বস্ত্র পাইতে ইহারা সবাই যেন একটু বেশী রকম লালায়িত হইয়া থাকে।

আজকাল সবাইকার কাপড়ই যেন একটু বেশী রকম ছেঁড়া বলিয়া বোধ হয়। তবে তাই বলিয়া আত্মহত্যা? যেমন একটু বেশী রকম বাড়াবাড়ি, বেঙ্গলের লোকগুলো যেন একটু বেশী সেন্টিমেণ্টাল। যাকগে, অন্ধকার সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে সুমিতা ভাবিতে লাগিল—ওসব প্লট সে কিন্তু চিন্তাই করিবে না। সে লিখিবে একটি প্রেমের গল্প। দুঃখ-দুর্ভাবনাহীন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রেমের গল্প। সেটির নরম গদীর মধ্যে ডুবিয়া বসিবে সে।

তাহার ঝরণা কলমের মুখে অজস্র ধারায় ঝরিয়া পড়িবে দুঃখলেশহীন শুচিশুভ্র কথার খণ্ড। এই যুদ্ধভীতত্রস্ত ক্ষুধার্ত্ত পৃথিবীর কাহিনীর উর্দ্ধে থাকিয়া সে গাঁথিয়া তুলিবে একটি প্রেমের কাহিনী। অন্ধকার বদ্ধ গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চিন্তান্বিতা সুমিতা অন্যমনে রিং হইতে তালার চাবি খুঁজিতে লাগিল।—রীডিংরুমের তালার চাবি।

অতি দ্রুতগতিতে ভারত যে জলন্ত বিদ্রোহের সম্মুখে আগুয়ান হইতেছে, তাহা ২৭ কোটি বুভুক্ষু কৃষকের বিদ্রোহ। মনে রাখিবেন, তাহারা নির্দ্দোষ, নিরীহ, সংখ্যায় ২৭ কোটি এবং ক্ষুধার যাতনায় অস্থির হইয়া সারা সমাজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চলিয়াছে। কোন কামান-বন্দুক অথবা কূটনীতি এই বিদ্রোহ দমন করিতে পারিবে না। ২৭ কোটি কৃষক অন্নাভাবে বিদ্রোহ করিলে ভারতের বাকী ৮ কোটি লোক যে অতি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে অন্নাভাব পূরণ করিতে পারিবেন, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই।

[আশ্বিন—১৩৫২

গিরিশচন্দ্র

শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ

একদিনের স্মৃতি

১৯০৪ সালে আমি উকীল হই। সম্ভবতঃ ১৯০৭ সালের ঘটনা। একদিন বৈকালে ৫টার পর আমি বিডন উদ্যানে বসিবার উদ্দেশ্যে যাইতেছি, হঠাৎ দেখি, একটী সাদা সার্ট পরিয়া গিরিশবাবু মিনার্ভা থিয়েটারের পশ্চিমদিক্ হইতে বাহিরে আসিলেন। আমার সহিত খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না, তবে আলাপ ছিল। তিনি আমায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কোথায় যাইবেন? বলিলাম—এই বিডন-বাগানে। বলিলেন—চলুন, একটু বসিগে। দু'পা না যাইতে যাইতে চৈতন্য লাইব্রেরীর সম্পাদক ৺গৌরহরি সেন মিশিলেন। তিনজনে একত্রে গিয়া North Club এর পূর্ব্বাংশে একটী বেঞ্চের উপর বসিলাম।

সেইদিন বুঝিলাম—বিশ্রম্ভালাপে তাঁহার বাক্‌পটুতা। আমরা দুইজনে মাঝে মাঝে এক একটী প্রশ্ন মাত্র করিয়াছি, আর নির্ঝরিণীর ধারার মত তাঁহার কথায় অবগাহন করিয়াছি। হঠাৎ চমক লাগিল, রাত্রি অধিক হইয়াছে। তিনি টেঁক ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিলেন, ১০॥০। ৫ ঘণ্টা একেবারে তন্ময় ছিলাম। ষ্টার, এমারেল্ড, ক্লাসিক, মিনার্ভার ইতিহাস-কথা, সেক্সপীয়রের নাটকাবলী ও সমগ্র জীবন-কথা, বিলাতী ও ফরাসী নটদিগের অভিনয়নৈপুণ্য ভুনি (অমৃতলাল) বাবুর ও সাহেবের (অর্দ্ধেন্দুশেখরের) ব্যক্তিত্বের প্রতি তাঁহার সম্মান, তাঁহার বিজ্ঞানচর্চ্চা, হোমিও ঔষধের অধ্যয়ন ও বিতরণ ও সর্ব্বোপরি ঠাকুরের ও নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দ) কথা কহিতে কহিতে তিনি যে আমাদের কোন উচ্চতর লোকে লইয়া যান, তাহার স্মরণ করিয়া আজও অঙ্গে রোমাঞ্চ হয়। সিরাজের ও মীরকাশিমের মাল-মসলা যোগাড় করিতে যে কি পরিশ্রম করেন, তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের মধ্যে কখনও পাইলাম না। তাঁর সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশিম আজও বাঙ্গালীর কাছে অভিশপ্ত নাজিমুদ্দিন না হয় খোরাসান বা কুর্দ্দিস্থানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, কিন্তু ফজলুল হক ত খাস বাংলার লোক। দুইজনের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আসিল, কিন্তু বঙ্গের প্রতিভার অমূল্য দানকে বৈদেশিক ঈর্ষ্যার অভিশাপ হইতে মুক্ত করিবার মনুষ্যত্ব কি কাহারও মনে জাগিল না?

সেই দিনের দুইটী গল্প উপহার দিব।

(১) একদিন বেলা ৩টার সময় গিরিশবাবুর কাছে একখানি চিরকুটে একটি নাম গেল। কি—মণ্ডল এইটুকু তাঁর মনে ছিল। গিরিশবাবু ছোকরাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি চাও বাবু?" ছোকরা বলিল—"আমি অভিনয় শিখতে চাই।" "কি পড়েছ?" "আমি minor পাশ করেছি।" "বাঙ্গলা বই কি কি পড়েছ?" "পলাশীর যুদ্ধ, মেঘনাদবধ।" গিরিশবাবু নিজের মেঘনাদবধ দিলেন—প্রমীলা ও ইন্দ্রজিতের কথোপকথন পড়িতে বলিলেন, ছোকরা পড়িল চমৎকার, প্রত্যেক শব্দ স্পষ্ট স্পষ্ট উচ্চারণ, অর্থবোধ পরিস্ফুট, বচনবিন্যাসভঙ্গীতে ভাবশুদ্ধিও লক্ষ্য হইল। ২০ মিনিট শুনিয়া গিরিশবাবু খুব তারিফ করিলেন, বলিলেন—"তুমি ত' বেশ শিখেছ! তুমি অভিনেতা হবার উপযুক্ত।" এমন সময় একটা গুলিখোর চাকর একটী কলকেতে ফুঁ দিতে দিতে আসিল। একেবারে নিছক গুলিখোর—চোখ কোটরাগত, শরীর পাকতেড়ে, রং পোড়া কয়লা। কাপড়টা উরূন্নত তোলা। গিরিশবাবু লোকটাকে সামনে দাঁড় করাইলেন। ছোকরাকে বলিলেন—দেখ,তুমি আর একবার পড়, ধর এই (চাকরটা) প্রমীলা—তুমি ইন্দ্রজিতের কথাগুলো একে লক্ষ্য ক'রে প'ড়ে যাও। ছোক্‌রা হকচকিয়ে চাকরটার দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল. বলিয়া বসিল—"এ প্রমীলা?" গিরিশবাবু—"হাঁ হে, থিয়েটারে আর আসল প্রমীলা কোথা পাবে। একজনকে সাজতে হবে বই ত নয়।" ছোকরা বলিয়া বসিল—"আজ্ঞে ভদ্র লোকের ছেলে, অতটা পারবো না।" ছোকরা ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেল।

(২) একদিন বেলা ১০টা হইয়া গেছে। হঠাৎ দেখি, কে একটা পাগলী মেম থার্ড ক্লাস গাড়ী থেকে নামিল। একটু কাছে আসিতে চিনিতে পারিলাম—Sister Nivedita। তাঁর আলুথালু বেশ, কাঁদিয়া যেন চোখ ফুলিয়া গেছে, চলছে যেন পাগলী। আমি দৌড়াইয়া তার হাত ধরিয়া নিয়া আসিলাম। সে বলিল, Swamiji has ordered me to go back home বলিয়া রুমালে চোখ ঢাকিল। তার অবস্থা দেখিয়া দিদিকে ডাকিলাম। বলিলাম—একে চান করিয়ে দাও, খেয়ে দেয়ে ঠাণ্ডা হোক। রাখাল ওকে পাঠিয়ে দিয়েছে।

গিরিশবাবু নিবেদিতাদের সঙ্গে লইয়া বেলুড়ে গেলেন। বিবেকানন্দের ঘরের বাইরে নিবেদিতাকে বসাইয়া স্বামীজিকে বলিলেন—ও নরেন, কি করেচো কি? মেয়েটা যে পাগল হয়ে মরে যাবে? কি হয়েছে কি?

স্বামীজি বলেন—গিরিশবাবু, ও কাল সমস্ত দিন

ধ'রে (নাম করিলেন) এ মাগিটার সঙ্গে ঘুরেচে। গিরিশবাবু, আমি কি ঐ "অনাঘ্রাত পদ্মপুষ্পের" দল চটকাতে দিতে পারি? মায়ের বাছা মায়ের কাছে যায়। গিরিশবাবু তৎপূর্ব্বেই রাখাল মহারাজের কাছে শুনিয়াছিলেন—তাহারা কেহই Sister-এর কথা উত্থাপন করিতে ভরসা পর্য্যন্ত করেন নাই। গিরিশবাবু বলেন, ঠিক ত করেচো। ও মেয়ে ত বুকের গোলাপ নয়, ৺মহাপূজার পদ্ম। ওকে ছোবে কে? বলিয়া নিবেদিতাকে ডাকিলেন। নিবেদিতা দৌড়াইয়া স্বামীজির চরণে পড়িল। আদেশ প্রত্যাহৃত হইল।

যিনি এই সমস্ত ঘটনার সঙ্গে লিপ্ত, তিনিই জীবনে চারি রকম প্রকৃতির চারিটী অভিনেত্রীকে তাহাদের প্রকৃতির স্বভাবানুযায়ী গড়িয়াছিলেন। বিনোদিনী, তারাসুন্দরী, তিনকড়ি ও সুশীলা—চারিটী চার রকমের অভিনেত্রী। বিনোদিনীর সহিত এক প্রাতে ৭।৮ মিনিট আলাপ করিবার অবসর পাই।

কোনও এক প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের লেখা লইয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন আমায় বলেন—অমৃতবাবুকে বলুন—আর একখানা farce লিখতে হবে। রসরাজ তখন ছানি কাটাইয়া বসিয়া থাকেন। তিনি লেখাটি তাঁহার কাছে পড়িতে বলেন। পড়া শুনিয়াই বলেন—চিত্ত ঠিকই বলেছে—আর একখানা farce চাই।

রসরাজ ১৮৮৮ সালে যখন municipal Commissioner পদপ্রার্থী, তখন হইতে আমায় স্নেহ করিতেন। অমৃতবাবু বলেন—দেখ, তোমায় একটু কাজ করতে হবে। তোমরা মনে কর আমার লেখা farce-এর উক্তি সব আমার মাথা থেকে বার করা। একটাও নয়। সবই আমার সংগ্রহ, পাঁচফুলের মালাগাঁথা। তুমি এই লেখাটী অন্ততঃ ২০০ মেয়েদের শোনাবে। ৪০টার বেশী যেন স্কুলে-পড়া না হয়। বাকি সব নিরক্ষরা বউঝি, যে যা বলে ঠিক তাই লিখে আন্‌বে। গোটা ৫০।৬০ হতে না হ'তেই আমি বন্দী হই।

সেই উপলক্ষে আমি বিনোদিনীর বক্তব্য শুনি। অতি সম্ভ্রমের সহিত সে কুণ্ঠিত হয়। ৫।৬ মিনিট প্রশ্নের পর বলেন, ইনি যা চান তার জীবনে কিছুই পান নি।

অমৃতবাবু শেষ দিন পর্য্যন্ত বলিতেন, বিনি ঐ কথা বল্‌লে? উঃ! বিনির ভিতর এত বোধ জন্মালো? একদিন শ্যামবাজার স্কুলের সান্ধ্য বৈঠকে অমৃতবাবু বলেন—গিরিশবাবু বলতেন—বিনির চৈতন্যের অভিনয় দেখে যখন ঠাকুর ভাবে ভোর, তখনই বোঝা যায় ঠাকুর ওর উপর দয়া করচেন। তাইত সত্য হোল দেখছি।

বলা বাহুল্য, ঠাকুরকে গিরিশবাবু চিনিয়াছিলেন, ঠাকুরও গিরিশবাবুকে স্পর্শ দিয়াছিলেন। ঠাকুরের কথা কহিতে গিরিশবাবু যেন শূন্যলোকে ভাসিতেন।

বোধন

শ্রীপরিমল মুখোপাধ্যায়

আকাশের ময়দানে আলো আর আগুনের ঝড়,
পশ্চিমী সাইক্লোন!
আমাদের প্রেম তাই শামুক-তৎপর,
সংকোচে গুটায়ে রাখে হৃদয়ের কোণ।

তোমার নয়নে আর হেরি নাকো স্বপ্নের আভাস,
হেরি বিশ্বরূপ:
কোথায় চোলাই হয় রাজনীতি সাম্রাজ্য-লোলুপ,
কোথা বা লুকায়ে রয় আণবিক ক্রূর অক্টোপাস!

শোণিত-শানাই বাজে, প্রান্তিক দামামা!
ধরণীরে লিখে দিনু ওকালত-নামা—
এস আজ মনেরে শানাই,
নাই, সময় যে নাই।
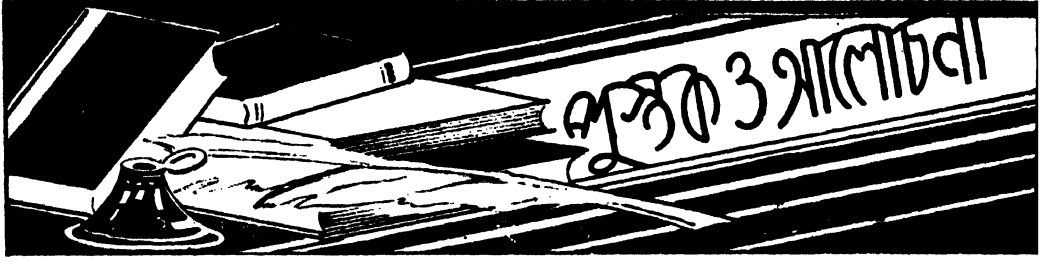
১। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ঃ ডক্টর শ্রীহেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক : বুক ষ্ট্যাণ্ড, ১১১২-এ বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য - ৫৲ টাকা।

এই পুস্তকখানি জাতীয় মহাসমিতির গত ৬১ বৎসরের ইতিহাসের উদ্যোগ ও প্রথম পর্ব্ব। রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া 'কালা' আইনের প্রতিবাদ, কৃষক কুলের সংহতি ও নীলকরের বিরুদ্ধে অভিযান, ইলবার্ট আন্দোলন, বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ প্রভৃতির সাধনা, স্বাধীনতা সংগ্রামে তিলকের সাহসিকতা, পেনেলের স্পষ্টোক্তি ও ন্যায় বিচার, সাম্রাজ্যদর্পী কার্জ্জনের দেশের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতি ও প্রথম হইতে কলিকাতায় কংগ্রেসের সপ্তদশ অধিবেশনের কথা আলোচ্য গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। জাতীয় কংগ্রেসের এই বিস্তৃত ইতিহাসের প্রথম পর্ব্ব আমরা পাঠ করিয়া "বাঙ্গালীর ইতিহাস নাই"—এই অভিযোগের সামান্য স্খলন হইল দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। গ্রন্থখানি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের শ্রীচরণে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। লেখক একদিন দেশবন্ধুর বিরাট ত্যাগের আদর্শে দেশমাতৃকার সেবাব্রতে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। উপযুক্ত ব্যক্তির হাতে রূপ পাইয়াছে বলিয়াই গ্রন্থখানি সার্থক-সৃষ্টি হইয়াছে। গ্রন্থখানি প্রণয়ন সম্পর্কে লেখকের গ্রন্থসম্বন্ধ 'নিবেদনটি' এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য।—

'কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অন্যতম বিশিষ্ট সভ্য ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া ইংরাজী ভাষায় একখানি কংগ্রেসের ইতিহাস প্রণয়ণ করিয়াছেন। পুস্তকখানি পড়িয়াই বাংলার প্রতি গ্রন্থকারের ঔদাসীন্য দেখিয়া আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি। মহামতি গোখেল যে বরাবর বলিতেন—'আজ বাঙ্গলা যাহা ভাবিবে, আগামী কল্য সমগ্র ভারত তাহা করিবে',—এ-কথার সত্যতা সম্বন্ধে কেহই সংশয় করিতে পারিবেন না। আর গোখেলের ন্যায় এতবড় প্রত্যক্ষদর্শী ও স্পষ্টবাদী দ্বিতীয় ব্যক্তি তৎকালে ভারতে ছিলেন কিনা আমি জ্ঞাত নহি। ইলবার্ট বিল আন্দোলনে বাঙ্গলার শক্তিতে প্রথমে কংগ্রেস অঙ্কুরিত হয়, পেনেল কর্জ্জনের কার্য্যে উহা সরসতা লাভ করে, আর বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনেই ভারতের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান বেশ একটি জীবন্ত সতেজ মহীরুহে পরিণত হয়।

'কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় তখন বাঙ্গলা এবং মহারাষ্ট্রের' অবদানই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। পরে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত নবজাগরণের ইতিহাসের কথা সর্ব্ববাদিসম্মত হইলেও, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বিরাট ত্যাগেই অসহযোগের যে প্রকৃত প্রাণ-সঞ্চার হয়, আর কংগ্রেসও প্রকৃতভাবে বলশালী হইয়া উঠে, তাহা বিস্মৃত হইলে ইতিহাস কেবল অসম্পূর্ণ নয়, বিকৃত হইবে বলিয়াই মনে করি। পরবর্ত্তী বৎসরে (১৯২১ খৃঃ) প্রথম আইন অমান্য আন্দোলনেও সমগ্র ভারতের বিশ হাজার রাজনৈতিক বন্দীর মধ্যে বাঙ্গলার অবদানই ছিল ষোল হাজার। বাঙ্গলার দেশবন্ধু-প্রদর্শিত নীতিই আজ ভারতের কংগ্রেসের প্রধান নীতি। এমতাবস্থায় বাঙ্গলা উপেক্ষিত হইলে প্রত্যেক জাতীয়তাবাদী ভারতবাসীর প্রাণে যে আঘাত লাগিবে, তাহা স্বাভাবিক। তাই ডাক্তার সীতারামিয়া রচিত ইতিহাসের সংশোধন হিসাবে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়া তখন উত্তর দিতে খুবই উদগ্রীব হইয়াছিলাম।'

গ্রন্থখানি সম্পর্কে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন। ঝক্-ঝকে ছাপা ও মনোরম প্রচ্ছদপটে গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। এই দিক হইতে প্রকাশকও বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ।

*

২। রায় রামানন্দের ভণিতাযুক্ত পদাবলী ঃ শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। সেন রায় এণ্ড কোং, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য—২৲ টাকা মাত্র।

পদাবলী সাহিত্য ও সঙ্গীতের প্রচলন বর্ত্তমানে একরূপ নাই বলিলেই চলে। অথচ এই পদাবলী সাহিত্যই একদিন বাংলা তথা ভারতের প্রাণকেন্দ্র ছিল। কথা-সাহিত্যের জন্ম মাত্র সেদিনের কথা। ভারতীয় ঐতিহ্য একদিন বিকশিত হইয়াছিল চৈতন্যচরিতামৃত, দোঁহা প্রভৃতি মহাকাব্য ও বিভিন্ন গীতিমাল্যের ভিত্তিতেই। রায় রামানন্দের ভণিতাযুক্ত পদাবলীও সেই প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যেরই সাক্ষিস্বরূপ। 'অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন

সেন মহাশয় প্রত্নতাত্ত্বিক ও পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি এই পদাবলী সাহিত্যের সঙ্কলন করিয়া ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তিতে বাংলা সাহিত্যের যে মহতী উপকার সাধন করিলেন, তাহাতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সেন সত্যই আজ দেশবাসীর ধন্যবাদার্হ।

*

৩। **নাগপাশ**ঃ শ্রীপ্রভাতকুমার গোস্বামী প্রণীত উপন্যাস। এস্, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, কলিকাতা। দাম—২৲ টাকা মাত্র।

বাংলা কথা সাহিত্যে 'নাগপাশ' ভীরু পায়ে আসিয়াছে। উপন্যাস ক্ষেত্রে প্রভাত বাবুর সম্ভবতঃ এই প্রথম বৃহত্তর দান। সাধারণ সাংসারিক ঘাত-সংঘাতে কাহিনী গড়িয়া উঠিলেও সমগ্র বইখানিতে এমন একটি স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্যে পড়ে—যাহা লেখকের একান্ত নিজস্ব। ঘটনাবৈচিত্র্যে শ্রীলেখা, কেতকী, বিজন, ললিত বাবু প্রভৃতি চরিত্রগুলি সার্থক হইয়াছে। প্রভাত বাবুর লেখনী জয়যুক্ত হউক।

*

৪। **নেতাজীর জীবনী ও বাণী**ঃ শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সিংহ প্রণীত। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, কলিকাতা। দাম—২৲ টাকা মাত্র।

নৃপেন বাবু বিশেষ ইতিহাসবেত্তা ব্যক্তি। ফাঁকা কাহিনীর উপরে স্বভাবতই তাঁহার লেখনী অগ্রসর হয় না। এই জাতীয় গ্রন্থ এপর্য্যন্ত যে-কয়খানি বাজারে প্রকাশিত হইয়াছে, সেইগুলি হইতে আলোচ্য গ্রন্থখানির স্বাতন্ত্র্য এই যে, আগষ্ট আন্দোলন, বাংলার দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি ঘটনাগুলিও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং কোনো ঘটনাই খাপছাড়া নয়। গ্রন্থের প্রচ্ছদপটটিও মনোরম।

*

৫। **শরৎ-সাহিত্যে নারী-চরিত্র**ঃ শ্রীক্ষীরোদ কুমার দত্ত, এম্-এ। বুক ষ্ট্যাণ্ড, কলিকাতা। মূল্য—৩৷৹ মাত্র।

বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যক্ষেত্রে ক্ষীরোদকুমারের আবির্ভাব যেমন আকস্মিক তেমনি দীপ্তিময়। আলোচ্য খণ্ডটি গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ। শরৎ-সাহিত্যের প্রধান প্রধান নারী-চরিত্রগুলিকে লইয়া লেখক বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। লেখকের মননশীল চিন্তাধারা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রন্থখানির রচনা সার্থক হইয়াছে। শরৎসাহিত্যের বিশেষভাবে নারীচরিত্র সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম এবং সার্থক। গ্রন্থখানি শরৎ-সাহিত্য-বোধে বিশেষভাবে সাহায্য করিবে।

*

৬। **সভ্যতার অভিশাপ**ঃ শিশু-নাটিকা। শ্রীশান্তশীল দাশ। সাগরিকা স্মৃতি-মন্দির, ঘুঘুডাঙ্গা, কলিকাতা।

গঠনশীল পটভূমিতে রচিত 'সভ্যতার অভিশাপ'। সাহিত্যক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত শান্তশীল দাশের আবির্ভাব সাম্প্রতিক। লেখকের প্রকাশভঙ্গী সাবলীল। তবে শিশুদের জন্য রচিত হইলেও অনেক ক্ষেত্রে নাটকখানি বয়ঃধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারে নাই। সাহিত্যের প্রতি একাগ্র সাধনা থাকিলে লেখক ভবিষ্যতে শিশু সাহিত্যে খাঁটি জিনিষ দিতে পারিবেন, মনে করি।

*

৭। **নেতাজী (নাটক)**ঃ শ্রীশৈলেশ বিশী। প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স, ৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম—১৷৹ মাত্র।

নেতাজীর জীবনী লইয়া আজাদ-হিন্দ্ আন্দোলন-উদ্যোগে এপর্য্যন্ত বহু লেখকের বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। কোনো একখানি গ্রন্থেই যে সুভাষচন্দ্রের জীবন-কাহিনী সার্থক রূপ পাইয়াছে, তাহা নয়। নেতাজীর প্রতি অনুরাগের অভিনয়ে অনেক লেখক ও প্রকাশক স্ফীত ব্যবসায়ের সুযোগ খুঁজিয়াছেন এবং ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী পাঠক-গোষ্ঠিকে রিপোর্টের কাটিং-এর বিনিময়ে দোহন করিতেও অকৃতকার্য্য হন নাই। আলোচ্য গ্রন্থখানি এই দিক হইতে স্বতন্ত্র। গ্রন্থকার আজাদ-হিন্দ্ সরকার প্রতিষ্ঠার গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া বিভিন্ন চরিত্রের সমাবেশে নাটকখানির আঙ্গিক-সৌষ্ঠব রচনা করিয়াছেন। নেতাজীর কাহিনীর ভিত্তিতে আজাদ-হিন্দ-শহীদ সম্পর্কে প্রথম সার্থক নাটক হিসাবে নাট্যকার শৈলেশবাবু অভিনন্দিত হইবার যোগ্য। বিপ্লবী নাট্য-সাহিত্য হিসাবেও বাংলা নাট্যক্ষেত্রে গ্রন্থখানির স্বতন্ত্র মূল্য থাকিবে।
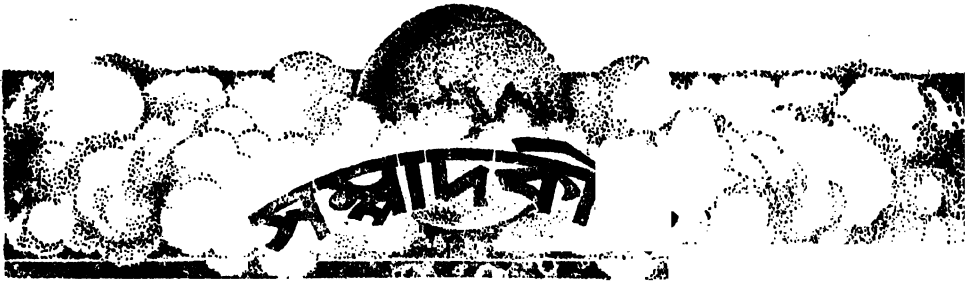
নব বৈশাখ

বর্ষচক্রে আবার নূতন বৈশাখ ঘুরিয়া আসিল। সমগ্র ভারতবাসীর প্রাণের নিভৃত নিকেতনে আসিয়া ডাক দিল নব বৈশাখ: 'ওঠ, জাগো, নবোদিত সূর্য্যের নব-আলোক সন্দর্শন কর'।...সেই চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেকার নব বৈশাখ—বরিশালের সেই শোণিত-যজ্ঞ। সেই—দিনের পর দিন বৎসরের পর বৎসর এমন করিয়াই হাঁকিয়া যায় শুভ বৈশাখ। আহ্বান করিয়া বলে: ভুলিও না তোমার ভারতবর্ষকে, ভুলিও না তোমার মাতৃভূমিকে। কিন্তু তবু ভুলি। কিন্তু আজ তো আর ভুলিলে চলিবে না। ভুলিতে কি পারি লক্ষ লক্ষ লোকের আর্ত্তনাদ, দুটি ভাতের জন্য হাহাকার, রাস্তায় রাস্তায় গলিতে গলিতে মৃত কঙ্কালের স্তূপরাশি, বঙ্গভূমির বক্ষে একদিকে দীনের করুণ ক্রন্দনধ্বনি, অন্যদিকে পিশাচের কি তাণ্ডবনৃত্যই না গিয়াছে! আর আজও কি তাহার শেষ আছে? জাগো ভাই, ঐ দেখ আবার কঙ্কালের আর্ত্তনাদ। দেখ ঐ অরুণোদয়, আর দেশবাসীর সেবায় আপনাকে আত্মনিয়োগ কর।

সেই বরিশালের কথা। রাষ্ট্রচেতনায় সেই যে যজ্ঞ পণ্ড হইল, তাহাতেই বাঙ্গালীর নবযুগের প্রথম শোণিত-তর্পণ। একদিকে কতিপয় যুবকের নির্ভীকতা, স্বদেশ-প্রেমের পরাকাষ্ঠা, বন্দেমাতরমের জন্য জীবন-উপেক্ষা—আর একদিকে সশস্ত্র পুলিশের লাঠি, বেটন, লগুড় আর বেয়নেট। কিন্তু কোন ভয় বা বিভীষিকা বাঙ্গালী যুবককে নিরস্ত করিতে পারে নাই। সে পুলিসের রক্তচক্ষু ভ্রূক্ষেপ করিল না। আঘাতের তীব্রতায় তাহার শোণিতে সরোবর-জলও রুধিরাক্ত হইয়া উঠিল। দানবের আঘাতে জীবন দানেও সে কাতর হইল না, তবু সে স্বাধীন ভাব বিসর্জ্জন দিল না। মুমূর্ষু চিত্তরঞ্জনকে সম্মেলনে বহন করিয়া নেওয়া হইল। সম্মেলনী ছত্রভঙ্গ হইল এবং ধীরপন্থী নেতাও ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন: "শেষ, শেষের আরম্ভ এই মহাপাতকের।" সেই দিন হইতেই বাঙ্গালী যুবক মৃত্যুঞ্জয়ী;—আর ইহারই পরে উদিত হইল বাঙ্গালী সহীদের দল। আজ এই শুভদিনে সকলের আত্মাই আমাদের কার্য্যে উৎসাহ হোক, এই আমাদের প্রার্থনা!

তারপর সেই জালিয়ানওয়ালাবাগের কালরাত্রির পরও আসিল ১৩২৬-এর পহেলা বৈশাখ। গেল সেই শহীদবাগের রক্তপ্রবাহ, আসিল আবার দুর্জ্জয় বন্যা। সেই পহেলা বৈশাখেই সমস্ত ভারতবাসী অত্যাচারের প্রতিরোধে ক্ষীতবক্ষে আসিয়া সমবেত হইল। মহাত্মা গান্ধী সম্মুখে আসিলেন অসহযোগের মন্ত্র লইয়া, অবতীর্ণ হইলেন দেশবন্ধু—ছুটিয়া আসিল লক্ষ লক্ষ যুবকের দল। ভুলিতে পারে না বাঙ্গালী ১৩২৮-এর পহেলা বৈশাখ। আজ তাই আমরা এই প্রভাতের স্বর্ণরশ্মিতে আবার আমাদের দেশবাসীকে বলি: ভাই ওঠ, জাগো, ভাইদের অন্নাভাব দূর কর, তাহাদের সেবায় আপনাকে আত্মনিয়োগ কর। আর নিজেকে ভুলিও না, প্রভুশক্তির দিকে আর তাকাইও না, দৃঢ় পণ করিয়া ওঠ, পরনির্ভরতা ছাড়, দেবীর বন্দনা কর। ঐ দেখ মা আমাদের নিরাভরণা, দেহ বিশীর্ণা, রুধিরলোলুপা এখন অনন্ত গর্ভে নিমজ্জিতা। এসো সকলে মিলিয়া ঐ কালস্রোতে ঝাঁপ দেই, ত্রিংশকোটি কণ্ঠে ঐ মায়ের ধ্বনি করি, দ্বিত্রিংশ কোটি ভুজে বহন করিয়া ঋষি বঙ্কিমের মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠা করি—যেন মাকে দেখিতে পাই দিগ্‌ভুজা দশপ্রহরণধারিণী শত্রুমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী, দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্ত্তিমতী সরস্বতী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ।

আজ এই নববর্ষে আবার এই মায়ের ধ্যানে যেন আমরা সমগ্র ভারতবাসী একমনপ্রাণ হই, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

বাঙ্গলায় কিরূপ মন্ত্রিত্বগঠন স্থায়ী হইবে?

আমরা বরাবর বলিয়াছি, মন্ত্রিত্বগঠনের আবশ্যকতা কেবল দলবিশেষের প্রাধান্য রক্ষার জন্য নয়, প্রদেশস্থ যাবতীয় নরনারীকে যথাসাধ্য ও যথাসম্ভব সুবিধা ও স্বচ্ছন্দতা প্রদান ও উহা বৃদ্ধি করিবার জন্য। যে দলেরই প্রতিনিধি মন্ত্রী মনোনীত হৌন না কেন, যদি উপরোক্ত উদ্দেশ্য সাধিত হয়, তবে আমাদের ক্ষোভের কারণ নাই। তাই আসাম, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ, পঞ্চনদ, বেহার, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতিতে কংগ্রেস অথবা সম্মিলিত কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, আমরা যে আনন্দিত, তাহার একমাত্র কারণ ইহাদিগকে সমদর্শিতা অবলম্বন করিয়া শাসনভার পরিচালনা করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অতীত অভিজ্ঞতার শিক্ষা এবং সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে সমদর্শিতা তাহাদের শাসন-কার্য্য যশোমণ্ডিত করিবে বলিয়া আমাদের দৃঢ় ধারণা। যদি কখনও কোন সম্প্রদায়ের প্রতি ভুল ক্রমেও বিন্দুমাত্র পক্ষপাতিত্বের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়, আমাদের ক্ষোভের পরিসীমা থাকিবে না। তবে সেরূপ আতঙ্কের কোন কারণ উপস্থিত হইবে না বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি। পক্ষান্তরে এইরূপ সাধারণ উদ্দেশ্য লইয়া যদি কোন প্রদেশে অন্য কোন দলের, এমন কি মুসলীম লীগের মনোনীত সদস্যদ্বারাও মন্ত্রিত্ব গঠিত হয়, তাহাতেও

আমাদের ক্ষোভের কোন কারণ নাই। লীগ-সভ্যগণও ভারত-বাসী। জাতিধর্ম্মবর্ণনির্ব্বিশেষে যাবতীয় অধিবাসিবৃন্দের মঙ্গল সাধন যদি তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তবে তাহাতে আপত্তির কি কারণ থাকিতে পারে ?

যাহা হউক, বর্ত্তমান অবস্থায় বাঙ্গলায় কিরূপ মন্ত্রিত্ব গঠিত হইবে ইহাই একমাত্র সমস্যার বিষয়। এখানে ২৫০জন প্রতিনিধির মধ্যে মুসলিম লীগ পাইয়াছে ১১২টি স্থান, কংগ্রেস ৮৬টি, ও ইউরোপীয়ান দলের সভ্য আছেন ২৪টি। এতদ্ব্যতীত এংলো ভারতীয় ৪টি, স্বতন্ত্র দল, কৃষকপ্রজা প্রভৃতিরও কিছু কিছু সভ্য আছে, হিন্দু মহাসভারও একজন আছেন। মুসলীম দলই সংখ্যা-গরিষ্ঠতায় সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম বিধায় গভর্ণর বাহাদুর স্যার ফ্রেডারিক বারোজ যে লীগ দলের নেতা শ্রীযুক্ত সহিদ সারওয়ার্দ্দিকে মন্ত্রীগঠনকল্পে আহ্বান করিয়াছেন, তাহা খুবই যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে কংগ্রেস দলকে আহ্বানের কোন প্রশ্ন আসিতে পারে না যেহেতু বৃহত্তম দলের নেতা মন্ত্রীগঠনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। যদি বৃহত্তম দল সে ভার না নিত, তবেই কংগ্রেসী দলের নেতাকে ডাকিবার আবশ্যকতা হইত, কিন্তু এই বৃহত্তম দলও যে অন্য কোন দল বিশেষের সহায়তা ভিন্ন একা মন্ত্রী গঠনে সমর্থ নয়, তাহা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। কারণ তাহাদের সংখ্যা অর্দ্ধেক অপেক্ষা ১২ জন কম আছে।

এখন প্রশ্ন এই, লীগ দল কোন দলের সম্পূর্ণ সহযোগিতা আশা করিতে পারেন ? অন্যান্য ক্ষুদ্র দল অধিকাংশই কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা করিবে। কারণ কৃষক প্রজা প্রভৃতি লীগের বিরুদ্ধেই দণ্ডায়মান হইয়াছিল। বাকী থাকে ইউরোপীয় দলের ২৪ জন ও অন্যান্য দলের কয়জন। লীগ ইঁহাদের কোন দলের সহযোগিতা পাইতে পারেন ইহাই বিবেচ্য বিষয়। গত ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত ঘটনার কথা পাঠককে স্মরণ করিতে বলি। কাপ্তেন রসিদের সাত বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হইবার পরে গত ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ডালহৌসি স্কোয়ারে একটী শোভাযাত্রা হয়। ইহাতে হিন্দু মুসলমান উভয়েই থাকে, আর ইহাদের উপর পুলিশের লাঠি ও গুলিচালনা হয়। পরে ১২ই ফেব্রুয়ারী হরতাল অনুষ্ঠিত হয়। বেলা একটার সময় মিঃ সারওয়ার্দ্দির সভাপতিত্বে একটি বিরাট সভা হয়। এবং তৎপরে তিনি এবং শ্রীযুক্ত সতীশ দাশগুপ্ত একটি শোভাযাত্রা বাহির করেন। এই শোভাযাত্রায় অহিংসার ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালিত হইলেও সহরে নানাস্থানে ৩।৪ দিনের বিক্ষোভে কিছু কিছু অনাচারও অনুষ্ঠিত হয়, আর তাহাতে ইউরোপীয়ানদের মুসলীম লীগের প্রতি উত্তেজিত হইবার যথেষ্ট আভাষ পাইয়াছিলাম। কারণ শ্বেতাঙ্গ দলের মুখপত্র ষ্টেটসম্যান গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী 'গুণ্ডারাজ' (Mob Rule) শীর্ষক প্রবন্ধে লীগ এবং কমিউনিষ্টের প্রতি উহার দায়িত্ব অর্পণ করিয়া যে বিষোদ্গার করে, তাহাতেই লীগের প্রতি উহার মনোভাব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। এই প্রবন্ধে কংগ্রেস রাষ্ট্রপতির প্রতিও তুল্যরূপ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকা-সম্পাদক পরাঙ্মুখ হয় নাই। আমাদের মনে হয়, গত অভিজ্ঞতার পরে ইউরোপীয় দল ষ্টেটস্‌ম্যান-আখ্যাত 'মব্'-নেতৃবৃন্দের সহিত একত্রে মিলিয়া তাহাদের শ্রদ্ধাভাজন রাষ্ট্রপতির অনুচরবৃন্দের বিরোধিতা করিবেন, এরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না। বস্তুতঃ কংগ্রেস, ইউরোপীয় দল, স্বতন্ত্র দল, উলেমা এবং কৃষকপ্রজা একত্র মিলিত হইলে যে পদে পদে লীগদল-ভুক্তদের প্রতিকার্য্য পণ্ড করিয়া দিতে পারে, এ-কথা সারওয়ার্দ্দি সাহেবের ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যক্তি যে চিন্তা করেন নাই, এরূপ ধারণা করিবার কোন কারণই থাকিতে পারে না।

পক্ষান্তরে গত ১২ই ফেব্রুয়ারী ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সভায় যে সারওয়ার্দ্দি সাহেব বলিয়াছেন, "যাহারা পাকিস্থান চায় না অথবা যাহারা অখণ্ড ভারতেরই পক্ষপাতী, উভয়দলকেই, যে-পর্য্যন্ত আমাদের (দেশীয়দের) হাতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরিত না হয়, নীরব থাকিতে বলি। স্বাধীনতা পাইলে হিন্দু মুসলমান আমরা আমাদের পরস্পরের বুঝাপড়া আমরা নিজেরাই করিয়া লইব। তৃতীয় পক্ষের প্রয়োজন হইবে না।" সে-দিন সারওয়ার্দ্দি সাহেব যাহা বলিয়াছিলেন, মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বা সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলও তাহাই বলিতেছেন।

বলিবেনই বা না কেন ? সারওয়ার্দ্দি সাহেবের রাজনীতিক্ষেত্রে প্রথম শিক্ষা হয় হিন্দুমুসলমানে সমদর্শী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের হাতেই। সারওয়ার্দ্দি সাহেবই কংগ্রেসপক্ষ-নির্ব্বাচিত কলিকাতা কর্পোরে-শনের প্রথম ডেপুটী মেয়র। সিরাজগঞ্জ রাজনৈতিক প্রাদেশিক সম্মেলনেও দেশবন্ধুর সহকর্ম্মী হিসাবে তাঁহার কম উৎসাহ পরি-লক্ষিত হয় নাই। তাই হিন্দু-মুসলমানের সমান উন্নতি ও আত্মনিয়ন্ত্রণের ভারণ আমরা কেবল অসার বক্তৃতার কথা বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারি না। সুতরাং তিনি যদি কংগ্রেসীদলের সহিত একত্র সম্মিলিত হইয়া মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করেন, তবে বিস্ময়ের কোন কারণই হইবে না। এবারে যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইতেছে, হয় তো বা তাঁহার বিবেক ও মনোবৃত্তির সহিত দলপতি জিন্না সাহেবের প্রবল মতের সংঘর্ষ হইতে পারে। কিন্তু তাঁহাকে সর্ব্বদাই ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, পরিষদকক্ষে অর্দ্ধেক সভ্য না থাকায় যদি কোন সময় কেবল তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ সহ গঠিত শাসনসৌধটি অবশিষ্ট সভ্যদের সম্মিলিত মতামতে ধূলিসাৎ হইয়া যায়, তবে তিনি ইতঃভ্রষ্ট স্ততোনষ্টই হইয়া পড়িবেন ; পক্ষান্তরে কংগ্রেসরাষ্ট্রপতি যখন লীগ-সহযোগিতায় মন্ত্রিত্বগঠনে ইচ্ছুক, তখন এ-কথা নিশ্চয় যে, স্থায়ী মন্ত্রিমণ্ডল একমাত্র কংগ্রেসের সহিত সম্মিলিত হইলেই হইতে পারে, অন্যথায় নয়। শ্রীযুক্ত সারওয়ার্দ্দিকে এই কথাটি আমরা বিশেষভাবে প্রণিধান করিতে অনুরোধ করি।

তৃতীয় বিষয়টিও বিশেষ ভাবিবার বিষয়। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত মহম্মদ আলি জিন্না বলিয়াছেন, পাকিস্থান হইলে শিখিস্থানও হইতে পারে। অর্থাৎ শিখদের জন্য পাঞ্জাব প্রদেশের এমন একটী স্থান স্বীকৃত হইবে যেখানে শিখসম্প্রদায়ের লোকের আত্ম-নিয়ন্ত্রণ চলিতে পারে। এখন পাঞ্জাবের মত বাঙ্গালাদেশও পাকিস্থানে পরিণত করিবার জন্য জিন্না সাহেব যদি জিদ করেন, তবে পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হেতু হয়তো পদ্মায় সীমানা

পর্য্যন্ত সমস্ত বাঙ্গলা দেশ কেবল হিন্দুদের জন্য দাবী করিতে পারেন, আর জিন্না সাহেবের শিখস্থানের অনুরূপ একটি দাবী প্রত্যাখ্যান করিবার কোন যুক্তি থাকিতে পারিবে না। যদি সেরূপ হয়, তবে ঢাকা-নিবাসী স্যার নাজিমুদ্দিন তাহাতে খুব আনন্দিত হইতে পারেন, কিন্তু মিঃ সারওয়ার্দ্দি তাহাতে আনন্দিত হইবেন না। কারণ তিনি তাঁহার জন্মভূমি মেদিনীপুর এবং কর্ম্মক্ষেত্র কলিকাতা ছাড়িয়া বর্ষায় জলপ্লাবিত পূর্ব্ববঙ্গে নিশ্চয়ই যাইয়া বসবাস করিবেন না। আর করিলেও স্যার নাজিমুদ্দিনের সহিত তিনি সেখানে কিছুতেই পারিয়া উঠিবেন না। এমতাবস্থায় হিন্দুর পরিবেষ্টনে পশ্চিম বাঙ্গালারও ক্ষমতা পাওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। পূর্ব্ববঙ্গেও ঠাঁই হইবে না। আর এখন কোয়ালিশন মন্ত্রিমণ্ডলীর দলপতি হইলে সমগ্র অখণ্ড বাঙ্গালা তাঁহার পরিচালনায় চলিবে আর সে অবস্থায় দেশবন্ধুর লেফটেন্যাণ্ট সারওয়ার্দ্দিকে সহায়তা করিতে কোন হিন্দু মুসলমানেরই বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বা সঙ্কোচ হইবে না। কোন্ অবস্থা তাঁহার পক্ষে সমীচীন, তিনি একটু বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখুন, ইহা আমাদের অনুরোধ।

সম্প্রতি জানিতে পারিলাম, শ্রীযুক্ত সারওয়ার্দ্দি সাহেব নাকি কংগ্রেসের সহিত কোয়ালিশন মন্ত্রী গঠনে আগ্রহান্বিত, এবং এই বিষয়ে তিনি নিশ্চয়ই জিন্না সাহেবের সঙ্গে বুঝা-পড়া করিতেছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই বিষয়ে ফলাফল কি হইবে বুঝা যায় না। তবে একথা নিশ্চয় যে, যদি বাংলার প্রধান প্রধান দল নিজ নিজ স্বার্থ বলি দিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, হিন্দু মুসলমান এক স্বার্থে আবদ্ধ, যদি ধর্ম্মবিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া পরস্পর পরস্পরের মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত হয়, সাধারণের মঙ্গলের সহিত আপনার মঙ্গল বিজড়িত জ্ঞান করে, তবেই সব অবস্থায়ই সমস্ত দলের মধ্যে পরস্পরের মিলন ও ঐক্য সম্ভব হইবে, বাঙ্গলা দেশেরও যথার্থ হিত হইবে। আমরা সারওয়ার্দ্দি সাহেবকে সেই দিক হইতেই বিষয়টি অনুধাবন করিতে বলি।

মিঃ সারওয়ার্দ্দি ও বাঙ্গালা

আমরা বরাবর বলিতেছি, অখণ্ড ভারতের ন্যায় আমাদের জন্মভূমি বঙ্গদেশও অখণ্ডত্ব অর্জ্জন করুক। বাঙ্গালা দেশ এখন দুটি বাঙ্গালা দেশ নাই। বাঙ্গালার লোকের ভাষা এক এবং সংস্কৃতি এক। বাঙ্গালী হিন্দুই হোক, মুসলমানই হোক, খৃষ্টানই হোক, তাহারা বাঙ্গালী—তাহারা এক। বাঙ্গালার ভাষাই ইহার প্রধান কৃষ্টি। বাঙ্গালার খৃষ্টান পূর্ব্বে হিন্দু ছিল, বাঙ্গালার মুসলমানও পূর্ব্বে হিন্দুবংশসম্ভূত ছিল। ধর্ম্মান্তর গ্রহণে বাঙ্গালার কৃষ্টির কোন ব্যত্যয় হয় নাই। অন্য দৃষ্টান্ত আর কি দিব? বাঙ্গালার লীগদলের সভাপতি মৌলানা আক্রাম খাঁকে আমরা ভালরূপে জানি। তিনি পূর্ব্বে বাঙ্গালার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। এখন লীগ দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার রাজনৈতিক মতের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। তিনি যে-মতবিশিষ্টই ছিলেন, কি আছেন, কি হইবেন তাহাতে কিছুই যায় আসে না। আমরা দেখিয়াছি, বাঙ্গালার কৃষ্টির তিনি একজন প্রতীক।: তাঁহার ভাষা খাঁটি বাঙ্গালীর, তাঁহার আচরণ প্রকৃত বাঙ্গালীর, বাঙ্গালার গৌরবে তিনি প্রকৃতই গৌরবান্বিত। আমরা সমগ্র বাঙ্গালীকে বলিতেছি, "ভাই, তুমি লীগই হও, কংগ্রেসই হও, হিন্দুই হও, মুসলমানই হও বাঙ্গালাকে যে ভালবাসে সেই বাঙ্গালার। কিন্তু এই বাঙ্গালা কি আজ এক অখণ্ড? বাঙ্গালা আজ পৃথক্। মানভূম, সিংহভূম, সাঁওতাল-পরগণা, ঝাড়কন্দ-রাজ্য, শ্রীহট্ট এবং শিলচর প্রভৃতি জিলার লোক বাঙ্গালা জানা সত্ত্বেও আমাদের সহিত পৃথক্। এই সমস্ত স্থান যদি বাঙ্গালার মধ্যে আবার অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে বাঙ্গালীর মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা বেশী হউক, কি মুসলমানের সংখ্যা বেশী হউক—ইহা আমাদের বিবেচ্য বিষয় নহে, আমাদের কেবল এই আনন্দ হইবে যে, বাঙ্গালী ভাই-ভগ্নীগণ আবার বাঙ্গালার বক্ষে স্থান পাইয়া আপনাদিগকে বাঙ্গালার সন্তান বলিয়া গৌরবানুভব করিবে। বাঙ্গালা আবার এক হইবে।

এই একত্বের দাবী প্রত্যেক যুক্তিমান্ ব্যক্তিই করিতেছেন। এই একত্ব চাহিতেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। এই একত্ব চায় জাতীয় কংগ্রেস, আর ইহারাই বঙ্গভাষা সংস্কৃতির জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। আজ শ্রীযুক্ত শহীদ সারওয়ার্দ্দিও খাটি বাঙ্গালীর ন্যায় তাহাই চাহিতেছেন। তিনি নির্ভীকভাবে মন্ত্রী মিশনে এই ভাষা ও সংস্কৃতিগত মিলনের উপর খুব জোর দিয়া বলিয়া আসিয়াছেন। তিনি বলেন, "মানভূম, সিংহভূম, সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি বাঙ্গলার অন্তর্ভুক্ত হউক।"

সারওয়ার্দ্দি সাহেবের এই উক্তির জন্য সমস্ত বাঙ্গালীর তাঁহাকে অভিনন্দন করা উচিত। যদি সারওয়ার্দ্দি সাহেব এই বিষয়টির উপর সম্পূর্ণ লক্ষ্য করিয়া সমস্ত বাঙ্গালা পরিচালনা করিতে পারেন, তবে তিনি সমস্ত বাঙ্গালী জাতির শ্রদ্ধার্জ্জন করিবেন। আমরা তাঁহাকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের যোগ্য সহকর্ম্মী হিসাবে সমর্থন করিতেছি এবং সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকেও সারওয়ার্দ্দি সাহেবের এই কার্য্যটিকে সমর্থন করিতে অনুরোধ করি। যদি সংস্কৃতি ও ভাষাগত অখণ্ড বাঙ্গালা এক হইয়া শিক্ষা, শাসন, অর্থনীতি প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের সমাধান করে, তবে এখানেই বাঙ্গলার খাটি স্বরাজ বা স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইবে। শ্রীযুক্ত সারওয়ার্দ্দি কি অন্যমুখাপেক্ষী না হইয়া বাঙ্গালী জাতিকে কার্য্যতঃ একসূত্রে গ্রথিত করিয়া মিলন দৃঢ় ও স্থায়ী করিয়া দিবেন না?

ব্রিটিশ মন্ত্রী-মিশন ও ভারত-সমস্যা

সম্প্রতি ভারতসচিব লর্ড পেথিক লরেন্স, স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রীপস্ এবং মিঃ এ. ভি. আলেকজেণ্ডার ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডলীর প্রতিনিধি হিসাবে এ দেশে শুভাগমন করিয়া নেতৃবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতেছেন। ইতিপূর্ব্বেই তিনি মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা আজাদ, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত মহম্মদ আলি জিন্না, শ্রীযুক্ত গোলাম হোসেন হেদায়েতুল্লা, মিঃ সৈয়দ, শ্রীযুক্ত মাষ্টার তারাসিং, জ্ঞানী কর্ত্তার সিং প্রভৃতি নেতার সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়াছেন। দেশীয় রাজন্যবর্গ এবং তাঁহাদের কোন কোন প্রতিনিধির সঙ্গেও আলোচনা করিয়াছেন।

ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত এট্‌লি যেরূপ স্পষ্ট ভাষায় ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনের কথা বলিয়াছেন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের মতাপেক্ষায় সংখ্যালঘিষ্ঠের দাবী কিছুতেই উপেক্ষিত হইবে না বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন—তাহাতে বস্তুতঃই আমরা খুব আশাই হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলাম যে, এইবার ব্রিটিশ প্রতিনিধিগণ কেবল মধুর কথায় আমাদের কর্ণকুহরে অমৃত বর্ষণ করিবেন না, নিশ্চয়ই কাজের মত একটা কাজ করিবেন। শ্রীযুক্ত এট্‌লি তো স্পষ্টভাবেই বলিয়াছিলেন "ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত অন্তর্ভুক্ত হইয়া ডোমিনিয়ান হইয়া থাকিবে, কি সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়া আমাদের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিবে—ইহা ভারতবাসীর ইচ্ছাধীন। মোট কথা, আমরা এবার তাহাদিগকে স্বাধীনতা দিবই।" গত পার্লেমেণ্টারী দৌত্যের প্রধান প্রতিনিধি প্রোফেসার রিচার্ড স্পষ্ট ভাবে দেশে গিয়া বলিয়াছেন—"আমরা যদি ভারত ছাড়িয়া না আসি, ভারতবর্ষ হইতে আমাদিগকে তাড়িত হইয়া আসিতে হইবে। If we dont quit India we shall be kicked out of India."

স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স্

ইহা যে কেবল শুভ ইচ্ছা পোষণ করা নয়, ইহার মূলে একটা প্রবল কারণ নিহিত রহিয়াছে—তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই মূল কারণ হইতেছে জন-জাগরণ। জাতি যদি জাগে কাহারও সাধ্য নাই, সেই জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা কোন প্রবল শক্তি বারণ করিয়া রাখিতে পারে। মদগর্ব্বিত সাম্রাজ্যদর্পী লর্ড কার্জ্জন যখন জাতির সমবেত ইচ্ছার বিরুদ্ধে বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত করিবার আদেশ দেন, সেই যে বন্যাপ্রবাহ আরম্ভ হইয়াছে, তাহা মাঝে মাঝে ক্ষীণকায় বা মন্থরগতি হইলেও ক্রমে আবার পূর্ণিমা-অমাবস্যার কোটালের মত বর্দ্ধিতকলেবর হইয়া চলিয়াছে। রৌলট আইন, জালিয়ানবাগের হত্যাকাহিনী, মহাত্মাজীর প্রবর্ত্তিত সত্যাগ্রহান্দোলন, অসহযোগ, দেশবন্ধুর বিরাট ত্যাগ, সহস্র সহস্র যুবকের কারাভোগ, লাঞ্ছনা, মৃত্যু, ভিন্ন ভিন্ন সময়ের আইন অমান্য, পরিশেষে ১৯৪২ সালের ভারত ত্যাগ প্রস্তাবে ভারতবক্ষে প্রবাহিত এই জলকল্লোল রোধ করিবার মত কোন শক্তিমান ঐরাবতের যে আবির্ভাব হইতে পারে না, তীক্ষ্ণধী ব্রিটিশ রাজনৈতিকগণ তাহা উপেক্ষা করিতে পারেন না। এই তো সেদিন ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতবাসীকে যুদ্ধে সহায়তা করিতে কত চেষ্টা ও আয়োজন করিয়া অন্যতম প্রতিনিধি ষ্টাফোর্ড ক্রীপ্‌স্‌কে পাঠাইয়াছেন, কিন্তু ঐ যে কটিবস্ত্রপরিহিত ক্ষুদ্র মানুষটী সমস্ত পৃথিবীর সম্মুখে নিজের তেজোদীপ্ত "যুদ্ধে সহযোগিতা করিব না" এই বাক্যটি তো কিছুতেই পরিত্যাগ করিলেন না। আবার যখন ভারতবাসীর সমস্ত ইচ্ছা, আশা, উন্নতি প্রতিহত করিয়া সাম্রাজ্যবাদ দম্ভভরেই সমানে পদক্ষেপ করিয়া চলিতেছিল—বাণী আসিল 'ভারত ছাড়'। এই বাক্য সেদিন ছিল দর্পিত ইংরাজ-প্রতিনিধি চার্চ্চিলের উপেক্ষার বিষয়, কিন্তু আজ আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হইয়া সাম্রাজ্য-প্রতিনিধিকে সেই বাণীই প্ররোচিত করিতেছে 'না পারিবে না! সর্প আহত হইয়াছে মাত্র, সুযোগ পাইলেই আবার ভীষণ ফণা ধারণ করিবে'। আর সেই ফণা আগ্নেয়াস্ত্র নয়, আণবিক বোম্বাও নয়, জাতির সংহত, সমাহিত, অহিংসা-পূত একনিষ্ঠ অসহযোগ। সুতরাং তখন ইংরেজের বাণী, চার্চ্চিলের মুখে যাহা মূর্ত্ত হইয়াছিল "কে মানে ঐ ল্যাংটা ফকিরকে" আজ সেই ইংরাজের বাণীই এটলির কাছে স্বপ্রকাশ করিয়া বলিতেছে "ওগো, দাও, দাও, দিতেই হইবে, জাতি জাগিয়াছে, একে রোধিতে পারিবে না, দেরী করিলে ঠকিবে"। এই জাতিজাগরণের পট-ভূমিকায়ই আজ বৃটিশ-কর্ত্তৃপক্ষগণকে ঘাড় নোয়াইতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, এই যে এত দিন আমাদিগকে ভাঁওতা দিয়া রাখা হইয়াছে—'তোমরা অকর্ম্মণ্য। তোমাদের হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য নাই।" কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজ আজ সাম্রাজ্যবাদীগণের নিরর্থক অছিলা একেবারে অসার করিয়া দিয়াছে। এই ফৌজের তিনজন মুক্ত সৈন্যাধ্যক্ষ শা নাওয়াজ, ধীলন ও সাইগলের কথায়, কার্য্যে ও ব্যবহারে আমরা জানিয়াছি—কর্ম্মক্ষেত্রে পড়িলে জাতির হিতসাধনে হিন্দু, মুসলমান, শিখ অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়। তাহারা বুঝিতে পারে—ভারত-জননীই আমাদের জননী। এখানে হিন্দু-মুসলমানে, খৃষ্টানে শিখে কোন ভেদ নাই। ভারতের গত কয়টি আন্দোলনও আমাদিগকে বরাবর শিক্ষা দিয়াছে যে একত্রীভূত হইলে আমাদের গঠনের শক্তিতে জগৎকে দিবারও আমাদের অনেক কিছু আছে। সুতরাং হিন্দু মুসলমান পার্থক্যের ছুতানেতায় আর আমাদিগকে কেহ নিরাশ করিতে পারিবে না। আর এই দেশে যে হিন্দু মুসলমানের প্রকৃত পক্ষেই খুব সম্প্রীতি আছে, স্বদেশী বিদেশীর নানারূপ ও নিরর্থক ভাঁওতাই যে স্থায়ী মিলনের অন্তরায়, মন্ত্রী মিশন তাহাও যেন উপলব্ধি করেন।

এখন প্রধান বাধা হইতেছে—প্রধানতঃ রাজনীতিক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান। আমাদের ভারতবর্ষে পূর্ব্বে হিন্দুরা শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং বাহুবলে প্রধান ছিলেন। কালক্রমে অন্য একটি জাতির অভ্যুদয় হইল। আচারে ব্যবহারে ভিন্ন হইলেও ইহারা ভারতবর্ষকে নিজ জন্মভূমি জ্ঞান করিয়া ইহার ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং ইহারা আর হিন্দুদের পর নয়। এবং এক মায়ের ছেলে হিসাবে ইহাদের সহিত পরস্পর একত্র থাকিতেই হইবে। ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি (কালচার) এই দেশে নিজ নিজ অবস্থা ও ধর্ম্ম হিসাবে পরিপুষ্ট হইবে—তাহাতে কী বাধা বা আপত্তির কারণ থাকিতে পারে? তাহা যে ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের অন্তরায় নয়, তাহা রামকৃষ্ণদেব নিজ জীবনে ও সাধনায় প্রকট করিয়াছেন—হিন্দু হিন্দু থাকিয়াও মুসলমান, মুসলমান থাকিয়াও

জন্মভূমির সেবায় যে পরস্পর অচ্ছেদ্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে পারে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাহা সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। আর সেই আদর্শই আমাদের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। সুতরাং যে মিলন মজ্জাগত, প্রকৃতপক্ষে যাহার কোন অভাব নাই, আরও যে-মিলনে মৌলানা আজাদ ও হাকিম আজমল খাঁ হিন্দুর এত প্রিয়, ব্যক্তিগত প্রাধান্যের জন্য যাহারা সেই ঐক্য বিনষ্ট করিতে উদ্যত হয়—তাহারা যে জাতির লোকই হউক না কেন, তাহাদের আত্মঘাতী নীতি প্রত্যেক ভারতবাসীর বুঝা একান্ত কর্ত্তব্য।

বস্তুতঃ তৃতীয় পক্ষ না থাকিলে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টানের আভ্যন্তরিক মিলের যে কোন অভাব নাই, এ-কথা কাহাকেও বলিতে হইবে না। আমাদের মনে হয়, ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার প্রতিনিধিগণও বোধ হয় তাহা বুঝিয়াছেন।

আজও জিন্না সাহেব যে পাকিস্থানের ধুয়া তুলিয়া বাধার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা যে নিতান্ত অসার তাহা বুঝিতে কাহারও বাকী নাই। চার্চ্চিলের এবং তখনকার মন্ত্রিগণের জিন্না-উত্থাপিত পাকিস্থানের প্রসঙ্গে কোন আপত্তি ছিল না—কারণ, ইহাতে হিন্দু মুসলমানের বিবাদ বেশ সজাগ থাকে, সুতরাং তাহাতে আপত্তি করা উচিত নয়। আবশ্যক হইলেই বলা যাইবে—"তোমরা নিজেরা নিজেরা ঝগড়া করিতেছ, আমরা কি করিব, আমরা তো হাত খুলিয়াই রাখিয়াছি।" আজ কিন্তু সে-কথা অচল বলিয়াই প্রধান মন্ত্রী এটলি বলিতেছেন "মাইনরিটি মেজরিটির আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিহত করিতে পারিবে না।"

জিন্না সাহেব বিচক্ষণ আইনব্যবসায়ী। কিন্তু আমরা আজ কয়েকটি বিষয়ে তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসু হইতে চাই। তিনি বলেন, "আমি ভারতবাসী নই।" তিনি যদি ভারতবাসী না হন, তবে তিনি কোথাকার লোক? হয় তিনি ইউরোপীয়, নয় তিনি এসিয়াবাসী বলিয়া দাবী করিবেন। কিন্তু যদিচ সম্পূর্ণ ইংরাজী চালেই তিনি চলেন, তথাপি বলিতে পারি, পোষাকে, কথাবার্ত্তায়, আচার-ব্যবহারে সম্পূর্ণ ইংরাজীভাবে চলিলেও তিনি ইংরাজ হইতে পারিবেন না। ইউরোপীয়েরা কিছুতেই তাঁহাকে নিজ দেশবাসী বলিয়া পরিগণিত করিবে না।

তবে তিনি কোথাকার লোক? তিনি বলিতে পারেন, তিনি এসিয়াবাসী। কিন্তু এসিয়াবাসীরা কি বাস্তবিকই তাঁহাকে চায়? আমরা দুইটি প্রধান স্থানের উল্লেখ করিব। একটি পশ্চিমের তুরস্ক দেশ—আর একটি পূর্ব্বপ্রান্তের ইন্দোনেশিয়া। এই দ্বিতীয় স্থানটির বীর সুকর্ণ ও ডাঃ সুলতান হাট্টা প্রভৃতি স্বাধীনতাকামী মুসলীমগণ দেশের স্বাধীনতার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। কত ত্যাগ স্বীকার যে তাঁহারা করিয়াছেন, কত দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইয়াছেন, কত দেশবাসীর প্রাণনাশ তাঁহারা চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু তাঁহারা তো স্বাধীনতাকামী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর দর্শনলাভেই উদগ্রীব হইয়াছেন, জিন্না সাহেবকে তো একবারও চাহেন নাই। ইহাতে কি মনে হয় না—তাহার সাম্প্রদায়িকতা অপেক্ষা এই জাগ্রত এশিয়াবাসিগণ জাতীয়তা ও আন্তর্জ্জাতিকতাই অধিকতর মূল্যবান জ্ঞান করেন?

দ্বিতীয় উদাহরণটি তুরস্ক দেশ সম্পর্কে। গত শুভেচ্ছামূলক দৌত্যে তুরস্কের কয়েকজন বিশিষ্ট সাংবাদিকও ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহাদিগকে মুসলীম লীগ হইতে অভিনন্দন দিতে প্রস্তাব হইলে উহা গ্রহণ করিতে উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা দৃঢ়স্বরে বলিয়াছিলেন—"আমরা আগে তুর্কী, তারপরে মুসলমান"। কি উদার মত এই সাংবাদিকগণের! কৈ, জিন্নাজীর মতানুবর্ত্তী মুসলমান তুরস্কে তো তিনি পাইলেন না, বরং তাঁহারা তো হিন্দু-মুসলমানভেদে সমস্ত বিশিষ্ট ভারতবাসীর সঙ্গেই সখ্য প্রদর্শন করিয়া চলিয়া গিয়াছেন! মোট কথা, কি পূর্ব্ব, কি পশ্চিম সকলেই এখন এশিয়ার অখণ্ডত্ব চায়, কেবল সাম্প্রদায়িক হিন্দু বা ইসলাম বা খৃষ্টানের জন্য নয়। বস্তুতঃ আজ সকলেরই এমন আত্মবোধ জন্মিয়াছে যে, দেশীয় খৃষ্টানগণও স্বদেশীয়কে ভুলিয়া সর্ব্বদেশীয় ভিন্নদেশীয় খৃষ্টানদের সঙ্গে মিলিত হইতে চাহেন না। আমরা শ্রীযুক্ত জিন্নার অনুবর্ত্তিগণকেও এই দৃষ্টিভঙ্গি লইয়াই ভারতের ঐক্যের জন্য 'এক' হইতে বলি।

মিঃ আলেকজেন্দার

আর জিন্না সাহেব যদি ভারতবাসীই না হন তবে ভারতের সমস্যায় কোন দলের নেতৃত্ব করিবার তিনি উপযুক্ত কিনা এবং সেই হিসাবে প্রতিক্রিয়াশীল অ-ভারতীয় ব্যক্তির মতের কোন মূল্য আছে কিনা তাহাও মন্ত্রী মিশনের সভ্যগণ নিশ্চয়ই কাশ্মীরের স্নিগ্ধ ও শীতল আবহাওয়ায় ভাবিয়া স্থির করিবেন।

এই জিন্না সাহেব ১৯২০ সালের নাগপুর কংগ্রেসের বিষয়-নির্ব্বাচন সভায় তাঁহার মিত্র মৌলানা মহম্মদ আলি কর্ত্তৃক তর্কে পরাজিত হইয়াও ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে যে বলিয়াছিলেন I am a Nationalist first, Nationalist second and Nationalist afterwards, ইনি কি সেই জিন্না?

দ্বিতীয়তঃ তিনি বলিয়াছেন, হিন্দুস্থানের মুসলমানরা যদি নবগঠিত 'পাকিস্থানে' না যায় তবে নাকি তাহাদের নাগরিক অধিকার থাকিবে না। কি ভয়ঙ্কর কথা—বাপ, দাদার ভিটা না ছাড়িলে নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হওয়া? মুসলমানদের ইহাতে কত অধিক ক্ষতি তাহা একবার তাহারা ভাবিয়া দেখুন। এক কথায় তিনি চাহেন অন্যান্য স্থানের মুসলমানদিগকে স্থানচ্যুত করিয়া পাকিস্থানে আনিতে। একবার এইরূপ আত্মঘাতী নীতির অনুসরণ করিয়াছিলেন দিল্লীশ্বর মহম্মদ তোগলক, আর তাহাতে পাঠান-সৌধ সমূলে বিকম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, কাজ-কর্ম্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য করিবার জন্য একস্থানের লোক কি একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইবে না এবং সেখানে বাড়ীঘর করিবে না এবং

বাড়ীঘর করিয়া সেস্থানে নাগরিক অধিকার হইতে কি বঞ্চিত হইয়া পড়িবে ?

জিন্না সাহেব নিজের জালে নিজেই যে আবদ্ধ হইয়া পড়িবেন, তাহার একটা উদাহরণ দিতেছি। তিনি নাকি শিখদের জন্ম একটা পৃথক্ স্থানের দাবী মঞ্জুর হইলে আপত্তি করিবেন না। অর্থাৎ স্থান-বিশেষ লইয়া 'শিখিস্থান' হইতে কোন আপত্তি নাই। পাকিস্থান সম্বন্ধে শিখদের সিদ্ধান্ত খুব সুস্পষ্ট। তাহারা কিছুতেই এই বিষয় হজম করিতে ইচ্ছুক নয়। আর তাহাদিগকে খুসী করিবার জন্ম মায়ের চেয়েও অধিক দরদের-ভাণে স্যার ফেরোজশা নুন খুব সহানুভূতি দেখাইয়াছেন। সুতরাং পাকিস্থান হইলে তাহাদিগকে শিখিস্থান দিতেই হইবে। বেশ, এখন বাঙ্গালার কথাই ধরা যাউক্। পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুরা যে সংখ্যাধিক্য বশতঃ পশ্চিম বঙ্গেই থাকিতে চাহিবে, ইহাতে কেহ বাধা দিতে পারিবে না। জিন্নাসাহেবও নাকি জেরায় মন্ত্রীমিশনের কাছে তাহা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। বাকী থাকে পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুরা। শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, বুদ্ধিতে এবং কার্য্যতৎপরতায় পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুরা যে ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। এখন এই হিন্দুগণ পূর্ব্ববঙ্গের কতকগুলি জিলা যদি চিহ্নিতনামা করিয়া পূর্ব্ববঙ্গ হিন্দুস্থান করিতে চায়, তবে শিখদের মত তাহাদিগের দাবী অপূর্ণ নিশ্চয়ই থাকিবে না। এই ব্যবস্থায় এক দেশও এক কৃষ্টি ছাড়িয়া মুসলমান ভ্রাতৃগণ কোণঠাসা হইয়া থাকিবে কি না স্পষ্টভাবে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় এবং কথার অস্পষ্টতা বর্জ্জন করিয়া হিন্দুপ্রধান স্থানের মুসলমানদিগকে যদি এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা যায় তবে তাঁহারা নিজেরাই ইহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিবেন। আমাদের মনে হয়, জিন্নাসাহেবের পরিকল্পনা ক্রমেই যেন তালগোল পাকাইয়া হাস্যাস্পদ (fantastic) হইয়া পড়িতেছে।

লর্ড পেথিক লরেন্স

পক্ষান্তরে ভাষা ও সংস্কৃতির ঐক্যে প্রত্যেক প্রদেশ যদি পুনর্গঠিত হয়, তবে আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস যে প্রদেশসমূহে অতিসত্বর স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইবে। এবং ধর্ম্ম ও আচারগত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া প্রত্যেক ভারতবাসীই যে ঐক্যবন্ধনে বাস করিতে পারিবে তাহাও নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। আমরা মন্ত্রীমিশনের সভ্যগণকে এই দিক হইতে লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতে অনুরোধ করি। হিন্দু-মুসলমান এক—ভারতবাসী এক—ভারত অখণ্ড, এই ভাবই ভারতের প্রাণবস্তু, ইহা বুঝিতে তাঁহারা যেন অক্ষম না হন।

এ পর্য্যন্ত পাকিস্থানের স্বপক্ষে বিপক্ষে অনেকে সাক্ষ্য দিয়াছেন। মৌলানা আজাদ, পণ্ডিত জওহরলাল, ডাক্তার খান সাহেব, সর্দ্দার প্যাটেল প্রভৃতি সকলেই অখণ্ড ভারত এবং একটি মাত্র শাসনতন্ত্র রচনার পক্ষপাতী। পক্ষান্তরে জিন্নাসাহেব দ্বিখণ্ড ভারত এবং দুইটী শাসনতন্ত্র রচনার জন্ম পীড়াপীড়ি করিতেছেন এবং যদি না হয়, তাহা হইলে তিনি সকলকে যুদ্ধে আহ্বান করিবেন এবং আবশ্যক হইলে প্রাণপাত করিবেন।

আমরা ইহা সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন মনে করি না, কারণ, মুসলমান সম্প্রদায়ের বহুলোক পাকিস্থানের যে বিরোধী তাহা গত নির্ব্বাচনেই স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে। এবং নির্ব্বাচনে যাহাই হউক, পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, মুসলমানদের পক্ষেই ইহা অহিতকর। যাহা প্রকৃতই অহিতকর তাহার সাধনকল্পে তাহারা কিছুতেই উদ্যোগী হইতে পারে না। ইতিমধ্যে স্যার নাজিমুদ্দিনের অভিপ্রায় বুঝা গিয়াছে। মুসলমান-সংখ্যাধিক্য স্থানের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গের স্যার নাজিমুদ্দিনের মত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কেন না, হিন্দুসংখ্যাধিক্য স্থানের স্যার সাদাউল্লাপ্রমুখ মুসলমান নেতাদের উক্তিতে সে প্রদেশস্থ সংখ্যাধিক হিন্দুগণের কিছুই যায় আসে না।· এই নাজিমুদ্দিন সাহেব বলিয়াছেন, "যদি হিন্দু, শিখ প্রভৃতির সহায়তা না পাওয়া যায়, তবে পাকিস্থান অসম্ভব"। এখন হিন্দু ও শিখেরা চাহিতেছে প্রদেশে সকলে একত্র হইয়া প্রদেশের হিত। সুতরাং জিন্নাসাহেবের পাকিস্থান এখানে অসম্ভব প্রমাণিত হইল। সীমান্ত প্রদেশের মুসলমান প্রতিনিধি পাকিস্থান চাহেন না। খিজির হায়াত খাঁ যেরূপ পাকিস্থান চাহেন, তাহা ঠিক কংগ্রেসের আত্মনিয়ন্ত্রণের অনুরূপ। সিন্ধুর সৈয়দ সাহেবও প্রদেশের প্রত্যেক নরনারীর হিত চান, সুতরাং জিন্নাসাহেবের মত হইতে তাঁহারা সকলেই পৃথক্ ও স্বতন্ত্র।

এদিকে দেশীয় রাজন্যবর্গ একমত হইয়া সমবেতভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে ভারতের অখণ্ডত্বই তাহারা চাহেন। ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান বাহাদুর স্যার সি, পি, রামস্বামী আয়ার স্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন "হৌক গৃহ যুদ্ধ পাকিস্থান অসম্ভব। আমরা কিছুতেই পাকিস্থান স্বীকার করিতে পারিনা।"

একদিকে সকলে, আর একদিকে জিন্না সাহেব। মন্ত্রি-মিশনের জেরায় সময় সময় তিনি নিরুত্তর হইয়াছিলেন বলিয়া হিন্দুস্থান টাইমস্ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার পরেই তিনি নির্ব্বাচিত লীগ সভ্যগণের সম্মেলন আহ্বান করেন। সত্য বটে, সেই প্রস্তাব সারওয়ার্দ্দি সাহেব উপস্থাপিত করিয়াছেন। কিন্তু ইনি সঙ্গে সঙ্গেই অন্যত্র যেরূপ ভাষাও সংস্কৃতিগত প্রাদেশিক পুনর্গঠন সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন এবং পাকিস্থান সম্বন্ধে ফেব্রুয়ারী মাসে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সভায় যেরূপ বলিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার কথায় ও কার্য্যে সামঞ্জস্য লক্ষিত হইতেছে না। ইহাতেই মনে হয়, হৃদয়ে হৃদয়ে পাকিস্থানের বিরোধী হইলেও বাধ্য হইয়া যেন তিনি কোন বৃহৎ হস্তের ইঙ্গিতে পদক্ষেপ করিতেছেন। সুতরাং এই ভাবটি তাঁহার কত দিন থাকিবে, বলা সুকঠিন।

জিন্না সাহেব যে সংগ্রামের ভয় দেখাইতেছেন তাহাও অসারের তর্জ্জন-গর্জ্জন মনে হইতেছে। প্রথমতঃ ক্যাপ্টেন রসিদের

কারাবাসের পরও তিনি অনুরূপ ভয় দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু যখন তাঁহার উপস্থিতিতে দিল্লীতে রসিদকে শৃঙ্খলাবদ্ধাবস্থায় লইয়া যাওয়া হয়, অন্য সভ্যগণ আপত্তি করিলেও তিনি দন্তস্ফুটও করেন নাই। ফেব্রুয়ারী মাসের গোলমালের সময় কলিকাতা আসিয়াও এই বিষয়ে কোনরূপ উচ্চবাচ্য করেন নাই। বোধ হয়, সারওয়ার্দ্দি সাহেব সতীশ দাশগুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে হাতে হাত মিলাইয়া যে বলিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়া আসে। ঠিক এইরূপ সম্প্রীতি তিনি যখনই দেখিবেন যে হিন্দু মুসলমান একত্র হইয়াছে, তখনই তাঁহার সেই অবস্থা হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাঁহার পাকিস্থানের স্বরূপ ঠিক ঠিক বুঝিলে হিন্দু মুসলমান কখনও এক না হইয়া পারিবে না।

তৃতীয়তঃ, মুসলমানদের নিকট হইতে কংগ্রেসের লোকের ভয় কি? কংগ্রেসের অহিংসানীতিই হিংসাত্মক কার্য্য বন্ধ করিয়া দেশে শান্তি-সংস্থাপন করিবে। যদি মুসলমান ভ্রাতাগণ হস্ত উত্তোলন করে, কংগ্রেস কর্ম্মিগণের সেবাকার্য্য আরও বৃদ্ধি পাইবে। জাতিধর্ম্ম বর্ণ নির্ব্বিশেষে সেবায় বাধ্য হইবেনা এমন ভারতবাসী কে আছে? প্রেমে কে বশীভূত না হইবে? সুতরাং লীগনেতার আস্ফালনে দেশের কোন আশঙ্কার কারণ নাই। এ সম্বন্ধে যেমন মন্ত্রিসভার প্রতিনিধিগণকে সাবহিত হইতে বলি, এই বিষয়ে আবার কংগ্রেস কর্ম্মিগণের সম্মুখে যে বিরাট কার্য্যভার উপস্থিত হইবে, সেই বিষয়েও তাহাদিগকে আমরা প্রস্তুত থাকিতে বলি।

শুনিতে পাই, মন্ত্রীমিশন একটু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন। যদি সিমলা সম্মেলনের মনোভাব লইয়া তাঁহারা এক্ষেত্রেও কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তবেই বিফলতা আসিবে। সাহসের সহিত অগ্রসর হইলেই সবদিক রক্ষা পাইবে। নতুবা নয়। বিভক্ত ভারতের প্রশ্নই পাপজনক; মহাত্মা গান্ধীর একথা বর্ণে বর্ণে সত্য। তবে যদি একান্তই ইহারা সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে অসমর্থন হন, আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনের নিকট বিচার ভার অর্পণ করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ হইবে। অন্যথায় ইহা মনে করা অস্বাভাবিক হইবে না যে তাহারা আদৌ সৎপ্রবৃত্তি লইয়া আসেন নাই।

নির্ব্বাচন ও শাসন-কর্ত্তাগণ

এবার প্রাদেশিক নির্ব্বাচনে অনেক স্থান হইতে সরকারী পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের সংবাদ পাইয়া আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি। বাঙ্গলা হইতে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, কৃষকপ্রজা, কমিউনিষ্ট প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে নির্ব্বাচন প্রার্থী দাঁড়াইয়াছিল। বাঞ্ছনীয় না হইলেও সামান্য সামান্য কথান্তর ও গোলমাল প্রতিপক্ষের সহিত লড়াইতে যুব-কোচিত উত্তেজনায় কখনও কখনও হইয়া পড়ে। সেইগুলি না ধরিলেও প্রফেসার হুমায়ুন কবীরকে গুরুতর প্রহার, মৌলানা নওশের আলি ও জালালুদ্দিন হোসেনের প্রতি জুলুম প্রভৃতি আচরণ এত গর্হিত হইয়াছে যে, সেগুলির আমরা তীব্র প্রতিবাদ করি। এই সমস্ত ব্যাপারে দেশবাসিগণ পরস্পর পরস্পরকে ক্ষমা করিলেও স্থানীয় রাজপুরুষগণ যে বৈষম্যমূলক আচরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা একান্ত অমার্জ্জনীয়। একাধিক দায়িত্ব-সম্পন্ন ব্যক্তির বিবৃতি হইতে আমরা এইরূপ অনাচারমূলক কাহিনীরই সংবাদ পাইয়াছি। রাষ্ট্রপতি আজাদ, মিঃ ফজলুল হক্, শ্রীযুক্ত আকসারুদ্দিন চৌধুরী প্রমুখ বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থানের নেতৃস্থানীয় সম্রান্ত মুসলীম ব্যক্তিগণ এক বাক্যে এই পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণের উল্লেখ করিয়া ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। বস্তুত, রাজপুরুষদের অসমাচরণের নিন্দা করিবার ভাষা আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না। তবে সৌভাগ্যের বিষয়, বাঙ্গলার নবনিয়োজিত গভর্ণর এবং অন্যান্য স্থানের গভর্ণরের নিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে কিছুই আমরা শুনি নাই। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ এবং সিন্ধু দেশের গভর্ণরের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণে আমাদের অত্যধিক ক্ষোভের কারণ হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি আজাদ সীমান্ত প্রদেশস্থ গভর্ণর কানিংহাম সাহেবের অসম ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া সংবাদপত্রের স্তম্ভে সমস্ত বিষয় বিবৃত করেন। কোন কোন বিষয়ে কানিংহাম প্রতিবাদ করিয়া তত্রস্থ বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রীর নামোল্লেখ করিয়া বলেন, "ইনি আমার বন্ধু, আমার পক্ষপাত হইলে ইনিই আপত্তি করিতেন।" কিন্তু মৌলনা আজাদ যে গভর্ণরের বিবৃতির প্রত্যুত্তরে সীমান্ত প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার খানের নিকটই সমস্ত সংবাদ পাইয়াছেন, একথার আর প্রতিবাদ হয় নাই। সীমান্তগান্ধী এবার ওখান হইতে কংগ্রেস মন্ত্রিত্বগঠনের পক্ষপাতিই ছিলেন না। সরকারের ব্যবহারের অসমতা ইহার মূলে আছে কি না,আমরা ঠিক বলিতে পারি না। তবে সিন্ধু প্রদেশের গভর্ণরের দায়িত্বপূর্ণ কাজে এত অসম ব্যবহার ও পক্ষপাত প্রদর্শিত হইয়াছে যাহা শুনিলে আর বৃটিশের বিচারপদ্ধার উপরেও শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না, আর গভর্ণমেণ্টের সংস্কার আইন কানুনেও বিতৃষ্ণা জন্মিয়া যায়। পাঠকের নিকট অবস্থাটি জ্ঞাপন করিতেছি।

ইতিপূর্ব্বে জানাইয়াছিলাম যে, সিন্ধুর ৬০ জন সদস্যের মধ্যে ৩ জন ইউরোপীয় ব্যতীত কংগ্রেস পায় ২২টি আসন, লীগ ২৭টি, স্বতন্ত্র দল ৪টি এবং মিঃ সৈয়দের দলের ৪টি। সৈয়দ পূর্ব্বে লীগদলের ছিলেন, কিন্তু লীগনেতা মিঃ জিন্নার সহিত মতভেদ হওয়ায় তিনি দলপতি হইয়া কংগ্রেস ও স্বতন্ত্রদল লইয়া একটি সম্মিলিত দল গঠন করিয়াছেন এবং ইহাদের সংখ্যা হয় শেষ পর্য্যন্ত ২৯। কারণ ইতিপূর্ব্বে স্বতন্ত্র দলের একটী লীগদলে যোগদান করে। পরে এই লীগদলের একজন সভাপতি হওয়ায় দল কমিয়া হয় ২৭। ইউরোপীয় দলটি তাহাদের কর্ম্মপন্থার আভাষ দিয়া বলেন, আমরা মন্ত্রীগঠিত হইলে মন্ত্রীর বিপক্ষে যাইব না। এ কথা আমরা বুঝিতে পারি, কিন্তু মন্ত্রীগঠনের পূর্ব্বে তাহারা কোন দলভুক্ত হইবে না। এই কথাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়াছিল, এবং তাহারাও বলেন নাই যে, মন্ত্রিমণ্ডলী গঠনের পূর্ব্বে তাহারা কোন দলের হইয়া কাজ করিবে। কিন্তু ফলে দাঁড়াইল, মিঃ সৈয়দকে না ডাকিয়া গভর্ণর ডাকিলেন লীগ নেতাকে। সম্মিলিত দলের ২৯ জনের দলপতিকে উপেক্ষা করিয়া লীগদলের ২৬ জনের দলপতিকে আহ্বান করিয়া ও তাহাকে মন্ত্রীগঠনের ক্ষমতা দিয়া গভর্ণর বাহাদুর ঘোর পক্ষপাতিত্ব করিয়াছেন বলিয়া সিন্ধু নেতা মিঃ গিডওয়ানী যে অভিযোগ করিয়াছেন, তাহা আমরা যুক্তিহীন

মনে করিতে পারি না। এই ভাবে যে সিন্ধু মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হয়, সরকারের অসম আচরণই ছিল তাহার মূলে। সৈয়দের ২৯ জন লইয়া মন্ত্রী গঠিত হইলে ইউরোপীয়গণের ৩ জনের সহায়তায় ৩২ : ২৭ হইয়া সর্ব্বদা মন্ত্রিত্ব স্থায়ী করিতে পারিত। কিন্তু গভর্ণরের স্বৈরাচারেই তাহা হয় নাই। যাহা হউক, অতঃপরে মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হয় এবং লীগ সভা স্যার গোলাম হোসেন হেদায়েতুল্লা হন প্রধান মন্ত্রী। যে অজুহাতে গভর্ণর মন্ত্রীগঠনের সম্মতি দেন তাহা বড় অদ্ভুত। তিনি বলেন, লীগ-দল সর্ব্বাপেক্ষা বড়, আর বলেন যে, উভয় দলে সমান সংখ্যক সভ্য আছে। এ কথা যে সত্য নয়, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; কারণ, ইউরোপীয়দিগকে বাদ দিলে সৈয়দের দলে হয় ২৯ জন আর লীগের দলে ২৭ জন। এই ২৭ জনের মধ্যেও লীগ সভাপতি গাজদার সাহেব ও আরও ২।১ জন মন্ত্রীদলের সততা সম্বন্ধে সাধারণের নিকট অভিযোগ করিতেন।

যাহা হউক, মন্ত্রীগঠনের পরে আরও ব্যাপার হয় অদ্ভুত। যেদিন বাজেট (আয় ব্যয়ের হিসাব) আলোচনা, সেটি ছিল ২৫শে মার্চ্চ। সকালে লীগদলের অন্যতম প্রধান সভ্য মিঃ বন্দে আলি খাঁ একটী বিবৃতিতে বলেন—"আমি চাহিয়াছিলাম, লীগ-দলের সভ্যগণ সততার সহিত সিন্ধু প্রদেশের দিকে লক্ষ্য করিয়া উহার হিতসাধন করিবে কিন্তু দেখিতেছি বিপরীত। সভ্যদের মধ্যে অনেকেই উৎকোচ গ্রহণ, অসততা প্রভৃতি দোষে অপরাধী, সুতরাং এই দলের কার্য্য সমর্থন করিতে পারি না।"

ইহার পরে বৈকালে ভোট দেওয়ার সময় ইনি সৈয়দের দলের সঙ্গে ভোট দিয়া দুই ভোটে মন্ত্রীদলকে পরাস্ত করেন। বক্তৃতার সময়ে প্রধান মন্ত্রী বন্দে আলীকে আখ্যা দেন—perfidious—বিশ্বাসঘাতক।

সেদিন আরও অনেক কাজ ছিল এবং আশা ছিল, বাজেটের সমস্ত দাবীই ভোটে বাতিল হইয়া যাইবে, কিন্তু স্পীকার কিছু সময় মুলতুবী রাখিয়া নিজ ঘরে বসিয়া অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন। ঠিক এই বিরতির সময়ে গভর্ণরের সেক্রেটারী আসিয়া স্পীকারের সঙ্গে দেখা করেন। ইহারই পরে নাটকের অদ্ভুত দৃশ্যের মত পরিষদ বসিতে বসিতেই তিনি অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য মুলতবী করিয়া দেন। কিন্তু বন্ধ করিবার কোন কারণ উদ্ভূত হয় নাই। মিঃ সৈয়দ মনে করেন, গভর্ণরের ইচ্ছাক্রমে স্পীকার এইরূপ করিয়াছে।

সম্মিলিত দলপতি ভোটে জয়লাভ করিয়া আশা করিতেছিলেন, কখন আহ্বান আসে গভর্ণরের বাড়ী হইতে, কিন্তু তাঁহার সেক্রেটারী ফারকী সাহেব সারা বৈকাল ও রাত্রি বন্দেআলী মীরকেই খুঁজিয়া বেড়ান। পরদিন সকালে ৯টার সময় দেখা হইয়া কথাবার্ত্তা হয়।

অতঃপরে মীর বন্দেআলি প্রধান মন্ত্রীর কাছে যান। এবং তিনিও একদিন পূর্ব্বে যাহাকে আখ্যা দেন বিশ্বাসঘাতক বলিয়া, তাঁহাকেই আইন ও শৃঙ্খলার (Law and order) দপ্তরের মন্ত্রী নিয়োগের জন্য সুপারিশ করেন আর গভর্ণরও সানন্দে তাঁহাকে গ্রহণ করেন। মিঃ সৈয়দ বলেন, এই সব কারসাজি গভর্ণরের। যদি প্রকৃতই তাহা সত্য হয় (ঘটনাস্রোত অবশ্য সেই ধারণাই আনে), তবে গভর্ণরের এবম্বিধ পক্ষপাত আচরণে মন এমন তিক্ত হইয়া উঠে যে, এরূপ ব্যক্তি শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে লিপ্ত থাকিলে তাঁহাকে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যে সময়ে ভারত-সচিব স্বয়ং ভারতে উপস্থিত, তাঁহারই বক্ষের উপরে একজন স্থানীয় শাসনকর্ত্তা এরূপ গর্হিত কার্য্য সংঘটিত করিতে পারেন। আরও আশ্চর্য্যের বিষয়, এখন পর্য্যন্ত তাঁহাকে স্থানচ্যুত না করিয়া স্বপদেই রাখা হইয়াছে। আমরা আর কি বলিব, এরূপ ব্যক্তির সংস্রবেই বৃটিশ সংস্রব এত আতঙ্কের জিনিষ হইয়া পড়িয়াছে।

আন্তর্জ্জাতিক শান্তি সম্মেলনে রুশ-ইরাণ সমস্যা

সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘে রুশ-ইরাণ সমস্যা একটা প্রহসনের মতই কৌতুকাবহ হইয়া উঠিয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়া কেবল ইংলণ্ড এবং তাহার মিত্র আমেরিকাকে টোপ খেলাইয়া লইতেছে, এদিকে আবার নিজের মতলব কিছুতেই পরিত্যাগ করিতেছেনা।

আমরা পূর্ব্বেই জানাইয়াছি তুরস্ক এবং ইরাণকে সম্পূর্ণভাবে (অর্থনীতি হিসাবেই হৌক বা রাজনীতির দিক্ দিয়াই হৌক) আয়ত্তাধীন করা রুশিয়ার একান্ত স্বার্থ। রুশিয়ার দক্ষিণ সীমানায় অবস্থিত এই স্থানটির প্রতি বহুদিন হইতে তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে। ঘটনাস্রোতও তাহাকে এপর্য্যন্ত অনেকটা সহায়তা করিয়াছে। পারস্যের উত্তর প্রদেশ আজারবাইজান এখন ইরাণের অগ্রগামী দলের আয়ত্তাধীন হইয়াছে। এই দলটি সোভিয়েট নীতি অনুসরণকারী, এবং সেখানকার শাসনতন্ত্র অনেকটা সোভিয়েটের অনুরূপে গঠিত! উপরন্তু রুশিয়া এই দলের জন্য অটোনমি বা স্বতন্ত্র পারস্য গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে বিশেষ অগ্রসর হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, ইংরাজেরও পারস্যে স্বার্থ রহিয়াছে ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে! বিশেষতঃ এখান হইতে তাহাকে তৈল সংগ্রহ করিতে হয়। সম্প্রতি রুশও পারস্য হইতে তৈল সংগ্রহ করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহশীল হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে এই তৈল সংগ্রহ বিষয়ে আমেরিকারও তুল্য ব্যগ্রতা দেখিয়াছিলাম।

তৃতীয়তঃ, রুশিয়ার সৈন্যের উপস্থিতি একটা ভয়ানক সমস্যার বিষয় হইয়াছে। ১৯৪২ সালে বৃটেন, রুশিয়া ও ইরাণের মধ্যে একটী সন্ধি হয় যে, ১৯৪৬ সালের ২রা মার্চ্চের মধ্যে সোভিয়েটের সৈন্যবাহিনীকে ইরাণ ত্যাগ করিতে হইবে। উহার পরও দুই মাস সময় অতিবাহিত হইয়াছে, কিন্তু রুশিয়া ইরাণতো ছাড়িয়া যায় নাই। ফলে ইংলণ্ডের অভিযোগের প্রধান কারণ যে রুশিয়া চুক্তিভঙ্গের অভিযোগে প্রকৃতই অপরাধী। অবশ্য ইতিমধ্যে ইংলণ্ডের পররাষ্ট্র-সচিব বেভিনের কথায় আমরা বুঝিয়াছি যে, ইংলণ্ডীয় সৈন্য ইতিপূর্ব্বে ইরাণ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। মোট কথা ইংলণ্ডের প্রধান গাত্রদাহের কারণ ইরাণের নবনির্ব্বাচিত মন্ত্রিসভায় রুশিয়ার পক্ষপাতী ব্যক্তিগণই অবস্থান করিতেছেন।

এই সব সমস্যায় রুশিয়ার সঙ্গে ইংলণ্ড ও আমেরিকার ঠিক খাপ খাইতেছেনা। ইতিপূর্ব্বে লণ্ডনে যে বৈঠক বসিয়াছিল তাহাতে রুশিয়া এবং পারস্য-সমস্যা, তাহারা নিজেরা মীমাংসা করিয়া লইবে এইরূপ স্থির করিয়াছিল। তাই তখন এক রকম বিষয়টি ধামাচাপা পড়িয়াছিল। আমেরিকায় এখন আবার প্রসঙ্গটি উহার প্রতিনিধি বারনেস (Byrnes) উপস্থিত করিয়াছেন।

রুশিয়ার বরাবর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তৈল সম্পর্কে চুক্তি স্থির করিয়া লওয়া। তাই—সোভিয়েট উক্ত চুক্তি স্থির হওয়া পর্য্যন্ত নিজ সেনাবাহিনী সরাইবার জন্য টালবাহানা করিলেও অপসারিত করিয়া লয় নাই। এখন তৈলের চুক্তি সম্বন্ধে পাকাপাকি বন্দোবস্ত হইয়াছে, সুতরাং সরাইয়া লইতে রাজী হইয়াছে। এখন সৈন্যবাহিনী অপসারণ করিতে তাহার ক্ষতি নাই বলিয়া উহা আর এই লইয়া সম্মিলিত জাতিদের বিশেষ নাকালই হইতে হইয়াছে। তবে এই অপসারণ সাময়িক বলিয়াই আমাদের মনে হয়—সৈন্য অপসারিত না হইলে পারস্যের নিয়মানুসারে কোন চুক্তি হইতে পারেনা, তাই রুশিয়া সৈন্য সরাইয়া লইতেছে। রুশিয়ার ইহার পর আরও গভীর উদ্দেশ্য আছে বলিয়াই মনে হয়। রুশিয়ার আনুপূর্ব্বিক আচরণ দেখিয়া এরূপ হইবে বলিয়াই মনে করি।

এখন পারস্যের তিনজন প্রধান ব্যক্তির সম্বন্ধে পরিচয় আবশ্যক। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের বৈঠক এখন নিউইয়র্কে হইতেছে এবং পারস্য দূত হোসেন আলা সেখানে উপস্থিত হইয়া প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি হইতেছেন প্রধান মন্ত্রী সুলতান। ইনি ইতিপূর্ব্বে মস্কো যাইয়া বেশ সমাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি হইতেছেন প্রিন্স ফিরোজ। তুর্কী গবর্ণমেণ্টের পক্ষে বলিবার অধিকার ও ক্ষমতা তাহাকেই দেওয়া হইয়াছে। ইনিও ইরাণের অন্যতম মন্ত্রী।

গত ১৯শে মার্চ্চ তারিখে নিরাপত্তা-পরিষদে পারস্য হইতে রুশিয় সৈন্য অপসারণের দাবীতে এক প্রস্তাব উপস্থিত হয়। রুশিয়ার প্রতিনিধি মিঃ গ্রোমিকো ১০ই এপ্রিলের পরে এই প্রস্তাব আনিবার দাবী করেন। উহা অগ্রাহ্য হওয়ায় তিনি সভা হইতে চলিয়া যান এবং এ পর্য্যন্ত আর উপস্থিত হন নাই।

গত ৩রা এপ্রিল আবার সেই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে সভ্য-গণের সাপে ছুঁচো গিলিবার মত অবস্থা হইয়াছিল—প্রেসিডেণ্ট ডাক্তার তাইকি রুশিয়ার প্রতিনিধি গ্রোমিকোর নিকট হইতে একখানি চিঠি ও পারস্য দূত হোসেন আলার আর একখানি চিঠি উপস্থিত করেন। হোসেন আলা বলেন, পারস্য হইতে রুশিয়ার সৈন্যাপসারণের কোন চিহ্নই পরিলক্ষিত হইতেছেনা। আমেরিকার প্রতিনিধি ও প্রধান সচিব মিঃ বারনেস এই কথায় খুব চাপিয়া ধরিলেন—তবে তো রুশিয়ার ভয়ানক অন্যায় হইতেছে! অমনি পড়া হইল রুশ প্রতিনিধি গ্রোমিকোর চিঠিখানি। তিনি স্বয়ং না আসিয়া লিখিয়াছেন—"রুশ সৈন্য ৬ই মে তারিখের পূর্ব্বেই সব চলিয়া যাইবে। আর ইতিমধ্যেই অপসারণ আরম্ভ হইয়াছে।" এই উত্তর শুনিয়া হোসেনের এডভোকেট বার্ণেশের একেবারে চক্ষুস্থির। তার আর বলিবার কিছু থাকেনা। কিন্তু ইরাণের প্রধান মন্ত্রী সুলতানার কাছে সোভিয়েট দূত যে ইতিপূর্ব্বে জানায়-বিশেষ অভাবনীয় কারণ উপস্থিত না হইলে ৬ই মে তারিখের মধ্যেই সব চলিয়া যাইবে," অবশেষে "কোন অভাবনীয় কারণ না ঘটিলে" কথাটিই ইয়াঙ্কে প্রতিনিধির সহায় হইল। এই কথার উপর নির্ভর করিয়া তিনি ৬ই মে তারিখে প্রকৃত পক্ষেই অপসারণ হয় কিনা দেখিয়া আবার আরজি পেশ করিবেন বলিয়া বসিয়া পড়েন। সুতরাং ব্যাপারটি কি, আর কেনইবা গ্রোমিকো সাহেব এত সুবোধ বালকের মত সব কথা স্বীকার করিয়া বলেন, আমরা নিশ্চয়ই অপসারণ করি, আর পারস্য দূত আলাহোসেনও একটা চাল চালিল কিনা তাহার কিছুই বুঝা গেলনা। এদিকে আবার তেহেরাণ হইতে প্রিন্স ফিরোজের উক্তি সকলের চোখে ধাঁধা লাগাইয়া দেয়। তিনি বলেন—

"হাঁ, রুশিয়া বিনা সর্ত্তে আমাদের এখান হইতে চলিয়া যাইতে প্রস্তুত আছে, দুই একখানি জাহাজ গিয়াছে, তবে আমাদের সঙ্গে অন্য বিষয়ের মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা কোন কথা বলিতে পারিনা। আর আজারবাইজান ব্যাপারটায় রুশিয়ার দোষ নাই, সেখানে তাদের সৈন্যও নাই, আর ইরাণের যে যে স্থান তাহারা ছাড়িয়া যাইতেছে, সেখানে আমাদের সেনাবাহিনী রাখিবার দরকার নাই। পুলিশের লোক রাখিলেই হইবে।

সুতরাং দেখা গেল প্রিন্স ফিরোজ প্রধান মন্ত্রী সুলতানা ও ইউনোতে (U. N. O) পারস্য দূত হোসেন আলা—তিন জনের বাহিরের কথার পরস্পর কোন ঐক্য বা সামঞ্জস্য নাই। তাই সকলের মনে সন্দেহ উপস্থিত হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, রুশ ইরাণের মধ্যে এই অপসারণ ব্যাপারে একটা রহস্য নিহিত আছে। যাহা হউক, এতদিনে সেই রহস্য সত্যই উদ্ঘাটিত হইয়াছে। প্রকৃতই রুশ ইরাণের মধ্যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর হইয়াছে এবং ইহার সর্ত্তগুলি এই যে, রুশিয়া সেনাবাহিনী সরাইয়া নিবে বটে, কিন্তু যে অংশে এতদিন কেবল ইংলণ্ডের একাধিকার ছিল, তাহা এখন রুশিয়ায় বর্ত্তিল, এইটি রুশিয়ার মস্ত লাভ আর তেলের ব্যাপার পাকা-পাকি স্থির না হওয়া পর্য্যন্ত রুশিয়া সৈন্যাপসারণে কেবল দরকষাকষিই করিয়াছে, কাহারও চোখরাঙ্গানি বা টেবিল চাপড়া-চাপড়িতেও নিরস্ত হয় নাই—পেট্রোলিয়ামের ক্ষমতায়ই এশিয়া খণ্ডে রুশিয়ার ক্ষমতা যে বৃদ্ধি পাইল, ইহাই তাহাদের পরমলাভ। তেহেরাণের দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিকগণ ইতিমধ্যেই বলিতেছেন, "It has given Russia everything it wanted"

এদিকে যে ব্রিটেন প্রতিনিধি বেভিন এবং বর্ত্তমানে ব্রিটেন বন্ধু আমেরিকার প্রতিনিধি, পারস্য ব্যাপারে এতটা উত্তেজনা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাদের সম্বন্ধে ইরাণের দক্ষিণ পন্থীদের সাধারণের মতামতও জানা গিয়াছে। 'তুদে' সংবাদপত্র বলিতেছে "বা! এদিকে সব হইয়া গেল, আর পারস্য ও ব্রিটিশ দূত বলিতেছে, "কিছুই জানি না, সরকারী মন্তব্য এখনও বাহির হয় নাই।" ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই ব্রিটেনেরও চাল আছে। ভিতরে ভিতরে ইংলণ্ডের বোধ হয় কারসাজি নাই, তবে রুশিয়া বস্তুতঃই টেক্কা মারিল।

দ্বিতীয় আবশ্যকীয় বিষয়টি আজারবাইজান সম্বন্ধে চুক্তিপত্রে স্থির হইয়াছে যে, এখানে এই স্থানবাসী লোকদের অভিমত, শাসনতন্ত্র শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হইবে। এবং এই জন্য এই স্থানের একটি প্রতিনিধি সঙ্ঘ তেহেরাণে শীঘ্রই উপস্থিত হইবে।

এই সমস্ত ব্যাপারই যে রুশিয়ার পক্ষে হিতকর, তাহা সহজেই অনুমেয়। আর পারস্য মন্ত্রী প্রিন্স ফিরোজও খুব খুসী হইয়া বলিতেছেন—"এই অত্যাবশ্যকীয় বিষয়টিতে আন্তর্জ্জাতিক শান্তি এবং ঐক্যই প্রতিষ্ঠিত হইল।" "This event of permanent importance will be welcomed by all our allies as a great contribution towards international peace and concord.",

কেবল তাহাই নয়, কাস্পিয়ান সমুদ্র হইতে পারস্যোপসাগর পর্য্যন্ত পারস্য সীমানায় গোপন চুক্তিতে রুশের আয়ত্তাধীন একটি রেল রাস্তা করিবার অধিকারও তাহার জন্মিয়াছে দেখিতেছি। ১৯৪৩-এর তেহরাণের সম্মিলন হইতে রুশ নায়কগণ কূটনীতির চালে এমন বন্দোবস্ত করিয়া লইতেছেন যে, ইংলণ্ড ও আমেরিকা কিছুতেই তাহার সহিত পারিয়া উঠিতেছে না। হয় তো শীঘ্রই আবার শুনিব যে জারের আমল হইতে এতদিন যাহা হয় নাই, পারস্য উপসাগরে একটী বন্দরও তাহার আয়ত্তাধীন হইয়াছে। যাহা হউক, এই তৈলখনির ব্যাপার ও অন্যান্য লাভ সম্বন্ধে আমাদের আজ কেবল বিখ্যাত ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'নিষ্কৃতি'র কথাই বারবার মনে হইতেছে। উকীল হরিশ বাড়ীর অংশ কিছুতেই খুল্লতাত ভাই—নিষ্কর্ম্মা, বিষয়বুদ্ধিহীন রমেশকে দিবে না, কত মামলা মোকদ্দমা করিল, জয় তাহার প্রায় করতলগত, অমনি কাহাকেও না জানাইয়া জ্যেষ্ঠসহোদর গিরিশ বাড়ী গিয়া দেশের বাস্তুখানি রমেশের স্ত্রী শৈলর নামে দানপত্র করিয়া দিয়া আসিল। এ-ক্ষেত্রে গিরিশের ন্যায় ইরাণমন্ত্রিগণও রুশের বরাবর চুক্তিপত্র করিয়া তাহার মত উচ্চহাস্যই করিতেছেন, আর বেচারা হরিশের মত বেভিনবাবনেসেরও কেবল কিল খাইয়া কিল চুরিই করিতে হইল। আর রমেশের মত রুশও মনেপ্রাণে হাসিতেছে, "কেমন পারলে?" আপাততঃ আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা হইতে রুশ ইরাণ অব্যাহতি লাভ করিল, ইতর জনের কেবল তাহাই তৃপ্তি। তবে এখনও বক্তৃতার শেষ নাই, গ্রোমিকো লিখিতেছেন,"এ-বিষয় তোমাদের বিবেচনাধীন হইতে পারে না"। অপর পক্ষ বলেন. 'নিশ্চয়ই পারে।' বক্তৃতার শেষ হইবে না, তবে রুশ ইরাণের নবমিলন কাহারও পক্ষে শল্যস্বরূপ হইবে বা কাহারও পক্ষে আপাতমধুর হইলেও পরিণামে বিষ হইবে অচিরেই আমরা তাহার পরিচয় পাইব।

স্থুলচক্ষে দেখিতেছি—রুশিয়ার পারস্য-নীতিতে এশিয়ায় তাহার যে ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইল, তাহাতে ব্রিটেন অচিরে আরও হীনবল হইয়া পড়িবে এবং এশিয়া খণ্ডের তুরস্ক প্রভৃতি দেশে অদূর ভবিষ্যতে আর কোন অধিকার থাকিবে কি না তৎসম্বন্ধে সন্দেহের কারণ রহিয়াছে।

কেন্দ্রীয় পরিষদে দুর্ভিক্ষের কথা

সেদিন কেন্দ্রীয় পরিষদের সভ্য শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক শেখর সান্যাল মহাশয় কলিকাতার বাহির হইতে আগত দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ব্যক্তিগণের মৃত্যুর বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য একটি মুলতুবি প্রস্তাব আনয়ন করিয়াছিলেন। প্রথমে গভর্ণমেণ্ট তরফ হইতে খুব আপত্তি হয়। কেন্দ্রীয় খাদ্য সচিব স্যার জ্বওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব এবং কেন্দ্রীয় খাদ্য দপ্তরের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বি, আর, সেন বলেন, 'বাঙ্গালার অবস্থা বিশেষ গুরুতর নয়, বাঙ্গালা সরকারই অবস্থানুরূপ কাজ করিয়া যাইতেছেন।" গত দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক সরকারের অবিবেচনায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও ইহারা যে কথাটা এক রকম উড়াইয়া দিতেছেন, তাহা বস্তুতঃই বিস্ময়ের বিষয়। যাহা হউক, অবশেষে মুলতুবী প্রস্তাবের যথোচিত আলোচনা হইয়া গিয়াছে।

গত ১৮ই জানুয়ারী স্যার জ্বওলাপ্রসাদ যেমন বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গলার কোন ভয় নাই, বাঙ্গালা এ বৎসর খাদ্যপূর্ণ থাকিবে," এখনও তাঁহারা নানারূপ অঙ্ক কষিয়া নানারূপ প্রলোভন দিয়া বলিতেছেন, "মাভৈঃ, বাঙ্গলার ভয় নাই।" অথচ দুর্ভিক্ষের পরে ৯৩ ধারা প্রয়োগ হইবার পরেও গভর্ণমেণ্ট যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা খুবই অকিঞ্চিৎকর। সেদিন কলিকাতা কর্পোরেশনের হেলথ্ অফিসার বিবৃতি দিয়াছিলেন, "খবরের কাগজে রাস্তায় কয়েকজনের মৃত্যু যে অনাহারে মৃত্যু বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাহা ঠিক নয়, তাহাদের উদরাময় প্রভৃতি পীড়ায় মৃত্যু হইয়াছে।" অনাহারে থাকিবার পরে লোক অসুস্থ হইয়াই পড়ে এবং তাহাদের উদরাময় রোগই সাধারণতঃ হইয়া থাকে, এবং তজ্জনিত মৃত্যুকে রোগজনিত মৃত্যু বলিলেই অনাহারে মৃত্যু হয় নাই বলা চলে না! যাহা হউক সম্প্রতি কর্পোরেশনের সুযোগ্য মেয়র শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় পল্লীগ্রাম হইতে অনশন-তাড়িত বহুলোকের আগমনের কথা উল্লেখ করিয়া দুর্ভিক্ষের একটী পরিষ্কার ছবির যে আভাষ দিয়াছেন,ইহাতেই আমরা গভর্ণমেণ্টকে বলি যে, কেবল কথায় ভুলাইলে দুর্ভিক্ষ নিবারিত হইবে না, পূর্ব্ব হইতে ব্যবস্থা করিতে হইবে। রেশনই দুর্ভিক্ষ নিবারণের একমাত্র উপায় নয়। রেশনের চাউল ১৫৲ টাকার কমে পাওয়া যায় না, তাহা কয়জন পাইতে পারে? তথাপি মধ্যবিত্ত লোকের সামান্য সুবিধা হয় বটে, কিন্তু গ্রাম ও পল্লীতে রেশন নাই চাউল অন্যত্র চলিয়া যাইতেছে। সেখানে লোক অনাহারেই মরিতেছে! আবার রেশন উঠাইলেই হইবে না, চাউল সংরক্ষিত রাখা চাই, এবং যাহাতে অন্য স্থান হইতে আসে, তাহা দেখা চাই। আর রেশন থাকিলেও মূল্য না কমিলে লোক অভাবের তাড়নায় অনাহারে মরিবে। সুতরাং গণায়ত্ত গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত না হইলে এ অবস্থার প্রতীকার নাই, ইহাই একমাত্র সত্য। খাদ্যের অভাবই যত বাদবিসম্বাদ দূর করিবে, এই কথা খাঁটি সত্য। কিন্তু এই খাদ্যের অভাব বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট নিবারণ করিতে পারিবে না এবং করিবারও ইচ্ছা আছে কি না ঠিক বলা যায় না। গণায়ত্ত গভর্ণমেণ্ট না হইলে খাদ্যের অভাব দূর হইবে না, আর খাদ্যের

অভাব দূর হইলেই সাম্প্রদায়িক বিবাদ বিসম্বাদ অনেকটা কমিয়া যাইবে।

বঙ্গশ্রীর অতি বড় দুর্ভাগ্য, খাদ্যাভাব দূর করিবার জন্য ঋষি-প্রদর্শিত মূল সূত্রটী উদ্ধার করিবার জন্য যে মনস্বী সচ্চিদানন্দ দিবারাত্রি পরিশ্রমে প্রাণপাত করিতেছিলেন, দুরন্ত কাল তাঁহাকে অকালে অপসারিত করিল। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও লোক-হিতৈষণা 'বঙ্গশ্রী'র পাতায় পাতায় প্রকটিত। ভারত যেন অন্ন-বস্ত্রের প্রাচুর্য্য লাভ করিতে পারে ইহাই ছিল তাঁহার গভীর ও ঐকান্তিক সাধনা। কিন্তু তাঁহার বহু যত্ন সত্ত্বেও বিদেশী গভর্ণমেণ্ট সেই সব সূত্রের সহায়তায় ভারতের প্রাচুর্য্য সম্পাদন এবং ভারতের সহায়তায় জগতেরও প্রাচুর্য্য সাধনে মনোযোগী হয় নাই। আমরা আশা করি, অচিরে গণায়ত্ত গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত হইলে উহা উপযুক্ত ব্যক্তির সাহায্যে স্বদেশের এই সূত্রগুলির অনুসন্ধান করাইয়া ভারতের তথা জগতের জনসাধারণকে ব্যাপক অন্নাভাব, দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পি-আর-এস, ব্যারিষ্টার-এ্যাট-ল মহোদয় সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারের পদ লাভ করায় তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

ছাত্র-জীবনের কৃতিত্ব তাঁহার অসাধারণ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কয়টি প্রধান প্রধান পরীক্ষাতেই তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিধারী। বিলাতে ব্যারিষ্টারী পড়িবার সময় তিনি গঠনমূলক আইনে এবং ফৌজদারী আইনে সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করেন। প্রায় ৩০ বৎসর যাবৎ শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং সিনেট ও সিণ্ডিকেটের মেম্বররূপে সংশ্লিষ্ট। স্যাড্‌লার কমিশন মারফৎ ভারতীয় অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিশেষভাবে পরিদর্শনের তিনি সুযোগ পান। ১৯২৯ সালে লণ্ডনে 'নিখিল ব্রহ্ম বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলন'-এর অধিবেশনে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে যোগ দান করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কলেজের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াও তিনি বাংলা সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি বিধান করেন, ১৯৩৭ সালে শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচিত হন এবং ১৯৪১ হইতে '৪৩ সাল পর্য্যন্ত রেভিন্যু, ব্যবস্থাপক, বিচার এবং অসামরিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন।

যে ছাত্রগণ সে-দিন পরীক্ষায় অনাচার প্রদর্শন করিয়া ছাত্র-নামে কলঙ্কারোপ করিয়াছে, যাহারা ভূতপূর্ব্ব ভাইস্-চ্যান্সেলারকে আক্রমণ করিয়া ধৃষ্টতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে, এই ছাত্ররাই আবার দেশের শৃঙ্খলাপুত বীরের ন্যায় গত ২১শে নভেম্বর বুলেট গ্রহণ করিতেও দ্বিধা করে নাই। একদিকে ছাত্রদের গুণ এবং দেশপ্রীতি, অন্যদিকে তাহাদের অমার্জ্জনীয় উচ্ছৃঙ্খলতা। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুযোগ্য নেতৃত্ব বাঙ্গালার ছাত্রগণকে একটি সঙ্ঘ-আদর্শজাত ছাত্ররূপে পরিণত করিতে যত্নের ক্রটী করিবেন না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নব্বই বৎসরব্যাপী সংগঠনে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রায় ইহার এক-তৃতীয়াংশ কালই ইহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন। সিনেটে তাঁহার ন্যায় অল্প বয়সের সভ্য পূর্ব্বে আর কেহ বোধ হয় নির্ব্বাচিত হন নাই। ১৯১৯ সাল হইতে

প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যবিভাগে এবং ২৫ বৎসর সিণ্ডিকেটের মেম্বর থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় কার্য্য সম্বন্ধেই তাঁহার অভিজ্ঞতা সুবিদিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই গত বাইশ বৎসরের মধ্যে একমাত্র ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ব্যতীত অন্য কোন ভাইস্‌চ্যান্সেলার এত অভিজ্ঞতা লইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করেন নাই।

ছাত্রদের সহিতও তাঁহার সম্প্রীতি প্রশংসনীয়। প্রেসিডেন্সী কলেজের ম্যাগাজিনের তিনিই ছিলেন প্রথম সম্পাদক (১৯১৪)। আবার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রবর্ত্তিত কলিকাতা রিভিউরও প্রথম সম্পাদক ছিলেন তিনিই। তারপরে আইন কলেজের অধ্যক্ষরূপে তাঁহার মধ্যে ছাত্রগণ একজন সুদক্ষ পরিচালকের সন্ধান পাইয়াছিল। আমাদের একান্ত ভরসা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার কর্ণধারত্বে প্রকৃতপথে চলিতে সমর্থ হইবে। সম্প্রতি বেশী দিকে লক্ষ্য না করিয়া তাঁহাকে দুইটি বিষয়ে অনুরোধ করা সঙ্গত বোধ করিতেছি।

প্রথম, স্বর্গীয় মনস্বী স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গবেষণামূলক শিক্ষাপ্রবর্ত্তনে প্রাণপাত করিয়াছিলেন। তাহা সর্ব্বজনবিদিত। তবে স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের পরলোক

করিয়া তাঁহাদের গভীর দায়িত্ব ও দেশাত্মবোধক কার্য্যের গরিমা হানি করিতে চাহেন না। আমরা মনে করি, সেইসব গবেষণানিরত ব্যক্তিগণের অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদিগকে সমুচিত পারিতোষিক প্রদান করা বিশ্ববিদ্যালয়ের একান্ত কর্ত্তব্য। ভরসা করি, শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয়ে অবহিত হইয়া স্যার আশুতোষের বিস্মৃত মহাকার্য্যের প্রসারে আত্মনিয়োগ করিতে কোনরূপ কুণ্ঠাবোধ বা শৈথিল্য করিবেন না। বাংলার ছাত্র শক্তিকে উপযুক্ত পথের নির্দ্দেশ দিতে তাঁহাকে কোমল ও কঠোর হইতে হইবে। ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করি, একদিকে তিনি তাঁহারা বহুমুখী কর্ম্মপ্রতিভা ও শিক্ষাব্রতে বঙ্গজননীর মুখোজ্জ্বল করুন, অন্যদিকে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গতানুগতিক পন্থা পরিত্যাগ করিয়া ইহার স্থায়ী হিতসাধন করুন। আমরা তাঁহার স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন কামনা করি। দেশবাসী হিসাবে আমরা সর্ব্বদাই বিশেষ উৎসাহের সহিত তাঁহার কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিব। আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিত ও গৌরবাকাঙ্ক্ষী।

দ্বিতীয়, যে ছাত্রগণ সে-দিন পরীক্ষায় অনাচার প্রদর্শন করিয়া ছাত্রনামে কলঙ্কারোপ করিয়াছে, যাহারা ভূতপূর্ব্ব ভাইস্‌-চ্যান্সেলারকে আক্রমণ করিয়া ধৃষ্টতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শণ করিয়াছে, এই ছাত্ররাই আবার দেশের শৃঙ্খলাপুত বীরের ন্যায় গত ২১শে নভেম্বর বুলেট গ্রহণ করিতেও দ্বিধা করে নাই। একদিকে ছাত্রদের গুণ এবং দশপ্রীতি, অন্যদিকে তাহাদের অমার্জ্জনীয় উচ্ছৃঙ্খলতা। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুযোগ্য নেতৃত্ব বাঙ্গালার ছাত্রগণকে একটি সঙ্ঘ-আদর্শজাত ছাত্ররূপে পরিণত করিতে যত্নের ত্রুটী করিবে না।

নবযুগের আভাষ

এই যুদ্ধ শেষ হইবার পরেই পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি অত্যন্ত বিপদে পড়িয়াছে। এত বিপদ তাহাদের দুই শতাধিক বর্ষ-ব্যাপী সাম্রাজ্যের জীবনে বোধ হয় আর কোন দিনই আসে নাই। আজ ভারত, কাল ইন্দোনেশিয়া ও ইন্দোচীন, পরশু ব্রহ্মদেশ, তার পরদিন মধ্যপ্রাচ্য—যতই দিন যাইতেছে ততই ঔপনিবেশিক রাজ্যগুলি ক্রমেই বারুদখানায় পরিণত হইয়া উঠিতেছে। আর স্থানীয় অধিবাসিগণ অবাধ্য হইয়া সাম্রাজ্যের কবলমুক্ত হইবার জন্য জীবনপণ করিবার উপক্রম করিতেছে। কারবারী সাম্রাজ্যবাদী বুদ্ধি এই অঘটনের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। সাম্রাজ্যবাদীরা ভাবিয়াছিল, এই যুদ্ধ বাঁধিয়াছিল শুধু নূতন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি পুরাতন সাম্রাজ্যবাদীদের গদিচ্যুত করিতে উদ্যত হইয়াছিল বলিয়া। অতএব যুদ্ধ বিজয়ের ফলে সেই নূতন সাম্রাজ্যাকাঙ্ক্ষা ধ্বংস হইয়া যাইতেই তাহারা পুরাপুরি নিষ্কণ্টক হইতে পারিয়াছেন। এবারে তাঁহারা পুনরায় মনের আনন্দে তাহাদের হৃতপ্রায় সাম্রাজ্যসুখ উপভোগ করিতে পারিবেন। কিন্তু তাহাদের আশায় বাদ সাধিয়া ইত্যবসরে পৃথিবীর ইতিহাস যে এক বৈপ্লবিকগতি প্রাপ্ত হইয়াছে, সে কথা তাঁহারা একেবারেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। বিপ্লব যখন একেবারে তাঁহাদের নিরাপদতম দুর্গের মধ্যেই গিয়া প্রবেশ করিয়াছে, তখন তাঁহাদের রক্ষণশীল টনকটা নড়িয়া উঠিয়াছে। এই বিলম্বে নড়া টনক সাম্রাজ্যবাদীকে একেবারে দিশাহারা করিয়া ছাড়িতেছে। কিন্তু দিশাহারা হইয়াও সাম্রাজ্যবাদ মূঢ়তা-হারা হয় না, সাম্রাজ্যবাদীদের এও এক বিশেষত্ব। এই মূঢ়তার বশেই সাম্রাজ্যবাদ পুরাতন গদিটাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিবার চেষ্টায় ঘটনার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিকে রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে আর মানুষের অমূল্য জীবন নিয়া দানব-নৃত্য শুরু করিয়াছে।

পুরাতন সাম্রাজ্যবাদের এই মূঢ় দানবনৃত্য আজ সমগ্র প্রাচ্যখণ্ড জুড়িয়া আরম্ভ হইয়াছে। ভারতবর্ষের আসরে বর্ত্তমানে এই নৃত্যাভিনয় একেবারে চরমাবস্থায় (ক্লাইমেক্সে) আসিয়া উপস্থিত। অবশ্য সাম্রাজ্যবাদের দানব-নৃত্য ভারতবর্ষে নূতন-ভাবে হইতেছে না। ১৯০৫ সাল হইতে বাঙ্গলা হইতে এবং ১৯২১ সালে সমগ্র ভারত হইতে এই নৃত্য বেশ জলদ্‌-লয়ে চলিতেছে। তখন হইতেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে শঙ্কিত হইয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতের জাতীয়তাবাদকে দুই হাতে পিটাইতেছেন, আর পিটাইতেছেন ভারতবাসীকেই দিয়া। সাম্রাজ্যবাদের এইটাই ছিল ভরসা। লর্ড মর্লি হইতে বলিতে শুরু হইয়াছে—Rally the moderates। তাঁহারা এই মনে করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, বে-সামরিক জনগণ যতই 'স্বাধীনতা—স্বাধীনতা' বলিয়া আস্ফালন করুক না, ভারতের সামরিক শ্রেণী ও পুলিশ বাহিনীকে তো তাঁহারা হাতের মুঠার মধ্যে রাখিয়াছেন। তাঁহাদের হাতে এই বাহিনীদ্বয় হইল ভারতের উপস্থিত শিল ও নোড়া। এই শিল ও নোড়াকে তাঁহারা কোন রকমে করায়ত্ত রাখিতে পারিলেই, তাঁহারা ভারতের দাঁতের গোড়া অনায়াসে চিরকাল ধরিয়া ভাঙিয়া খাইতে পারিবে।

শিল-নোড়া এবং তাঁহাদের ব্যবহারকারীদের সামান্য একটু পরিচয় আমরা একজন আমেরিকাবাসী সাংবাদিকের উক্তি হইতে উদ্ধৃত করিলাম :

"Indian troops are mostly illiterate infantry, men with little political training, and they fight as mercenaries pure and simple. Indeed the British emphasize it as an asset that the average Indian soldier, whether Hindu or Moslem, is not inspired by patriotic motives or political slogans, but by the traditions of his regiment, or tribe, or caste. That is why the British say, the Army cannot be affected by the political discontent of the Gandhian variety.

"The British also believe—rather whimsically, it sometimes seems that there still is a good deal of loyalty to the Crown in the Indian Army. This, as much as anything, lay behind the appointment of Lord Louis Mountbatten, a cousin of the king-

Emperor to the post of C-in-C of the East Asia Command."

(Edgar Snow, People on Our side, published in 1944 from Random House, New York)

"অর্থাৎ, ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশই নিরক্ষর। রাজনৈতিক শিক্ষা বলিতে তাহাদের নাই: বৃটিশের পক্ষ হইয়া তাহারা যুদ্ধ করে খাঁটি বেতনভুক হিসাবে। বৃটিশের বিশ্বাস, ইহারা তাহাদের সাম্রাজ্য-রক্ষার সম্পদ। হিন্দু হোক্, মুসলিম হোক্—কোনরূপ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বা শ্লোগানে ইহাদের কেহ কখনও বিচলিত হয় না—স্ব স্ব রেজিমেণ্ট অথবা নিজেদের বিভিন্ন সম্প্রদায় অথবা নিজের নিজের জাতির গৌরব হইতে ইহারা জঙ্গী অনুপ্রেরণা লাভ করে। এই কারণেই গান্ধীবাদের জাতীয় অসন্তোষের বার্ত্তা শ্রবণে ইহারা বখিয়া যাইতে পারে, এমন আশঙ্কা বৃটিশের নাই।

"বৃটিশ আরও বিশ্বাস করে যে, ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যে এখনও রাজার প্রতি ভক্তির পরিমাণটা প্রবল। অনেকটা এই বিশ্বাসের ফলেই বর্ত্তমান সম্রাটের খুল্লতাত-ভ্রাতা লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেন পূর্ব্ব এশিয়ায় জঙ্গীলাট-পদে বহাল হইয়াছেন।"

ভারতীয় সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে বৃটিশের উক্ত বিশ্বাস সম্ভবতঃ এতদিন নিঃসন্দেহেই ছিল, কিন্তু এই নিঃসন্দেহ বিশ্বাসের সহিত তাহারা যে এতাবৎ নিঃসন্দেহে নির্ব্বোধের অমরাবতীতে বিচরণ করিতেছিল, এ-কথাও স্বীকার করিতে হইবে। স্বীকার করিতে হইবে এইজন্য যে, মূর্খের দর্শনানুযায়ী তাহারা ভারতের সকল মানুষকে সর্ব্বকালের জন্য বোকা বানাইয়া রাখিতে চাহিয়াছিল। কালের পরিপূর্ণতায় বোকা মানুষও যে একদিন চোখা হইয়া ওঠে এবং শিল-নোড়ারাও যে মনুষ্যোচিত আত্ম-মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ হইতে দিতে অস্বীকৃত হয়, এই সহজ কথাটা তাহারা নিরুদ্বেগ সাম্রাজ্যের তক্তে বসিয়া ভুলিয়া গিয়াছিল এ ভুল এখনও তাহাদের ভাঙিয়াছে কিনা বলিতে পারি না,—কিন্তু তাহাদের হাতের শিল-নোড়ারা যে ক্রমশঃ জাতীয় মর্য্যাদার মূল্য দিতে অগ্রসর হইতেছে, এ-কথা সম্প্রতি প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। বহুদিক হইতেই এই প্রমাণ আসিতেছে, কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রমাণ দাখিল করিয়াছে ভারতের রাজকীয় নৌ-বাহিনী এবং বিমানবাহিনী।

ভারতের রাজকীয় নৌ ও বিমানবাহিনী বর্ত্তমান যুদ্ধের সৃষ্টি। নবীন সাম্রাজ্যাকাঙ্ক্ষীদের হাত হইতে সাম্রাজ্যকে রক্ষা করিবার জন্য ভারতের বাছাই করা তরুণদের নিয়া বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ এই দুই বাহিনীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য এই তরুণরা তাহাদের জীবন বিপন্ন করিয়া, অনেকে হয়তো জীবনও ত্যাগ করিয়া অত্যন্ত দুঃসাহসিকতায় তাহাদের কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়াছে। তাহাদের বিপন্ন জীবনের বিনিময়ে প্রভুদের সাম্রাজ্য রক্ষা হইয়াছে। কিন্তু তরুণ সৈনিকেরা তাহাদের এই দুঃসাহসিক কার্য্যের পরিবর্ত্তে প্রভুদের কাছ হইতে কেবলমাত্র শূন্যগর্ভ প্রশংসাবাণীর অতিরিক্ত বিশেষ কিছু পায় নাই। বেতনে আহারে এবং পরিচ্ছদে প্রভুদের কাছে তাহারা এতাবৎ সৎপুত্রের আচরণ লাভ করিয়াছে। উহার উপরে আবার গোদের উপর বিষফোড়া হইয়া আছে নিদারুণ বর্ণবৈষম্য এবং ইংরাজ অফিসারদের অসহনীয় দুর্ব্যবহার। বোম্বাইয়ে ক্যাসল্ ব্যারাকের তরুণ নৌসৈনিকেরা এই গোদ ও বিষফোড়া কোনটাই মুখ বুজিয়া সহ্য করিতে পারিতেছিল না। যন্ত্রণার চরমে উঠিতে তাহারা গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে এই উভয়বিধ অনাচার হইতে মুক্ত হইবার দাবী করিয়া একটি অহিংস শোভাযাত্রা সহ একটি ধর্ম্মঘট ঘোষণা করিয়াছিল। কিন্তু প্রভুশক্তি তরুণ নাবিকদের এই দাবী পূর্ণ করিতে অগ্রসর হইলেন প্রথমে লাঠি ও পরে বুলেট দিয়া। জনগণের ন্যায়সঙ্গত দাবীকে ইতিপূর্ব্বে তাঁহারা এই অব্যর্থ 'দাওয়াই' দিয়াই বহুবার ঠাণ্ডা করিয়াছেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে প্রভুরা এই দাওয়াইয়ের প্রয়োগে একটু ভুল করিয়া ফেলিলেন। সেই ভুলটা হইল এই যে, নাবিকগণ আর নিরস্ত্র সাধারণ জনগণ ঠিক সমপর্য্যায়ভুক্ত নয়। কেননা প্রভুরা নিজের গরজে এই বুলেটের ব্যবহার ধর্ম্মঘটীদের শিখাইয়াছেন। আর শুধু ব্যবহারই শিখান নাই, সেই বুলেট-সাহায্যে কি ভাবে আত্মরক্ষা করিতে হয়, তাহাও শিখাইয়াছেন। ইহার সহিত গান্ধীবাদের পাল্লায় পড়িয়া বখিয়া যাইতে না দিবার সযত্ন শিক্ষা তো আছেই। নাবিকেরা এই গুরুমারা বিদ্যা একদিনের অহিংস ধর্ম্মঘটেই ভুলিয়া যাইবে, এটা আশা করার অর্থ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিকে অস্বীকার করা। তরুণ ধর্ম্মঘটকারীরা সে বিদ্যা ভুলিতে পারিল না। কর্ত্তৃপক্ষ-নিযুক্ত সৈন্যবাহিনী যখন তাহাদের ক্যাসল্ব্যারাকে বন্দী করিয়া তাহাদের উপর গুলী ছুঁড়িল, তখন তারাও সেই গুলির উত্তর নিরুপায় হইয়া গুলী দিয়াই দিল। শুধু তাই নয়, তখন বয়সের স্বাভাবিক উত্তেজনায় তাহারা ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বোম্বাই বন্দরস্থ গোটা কুড়ি জাহাজও দখল করিয়া বসিল। এই উত্তেজনার সহিত তাহাদের হৃদয়ে এক নব চেতনার আবির্ভাব ঘটিল। এই নবাবির্ভূত চেতনার ফলে তাহারা বুঝিতে পারিল যে, সাম্রাজ্য-শোষণের দিক্ দিয়া তাহাদের ভাগ্য স্বাধীনতাকামী ভারতীয় জনগণের ভাগ্য হইতে অবিচ্ছিন্ন!

প্রভুদের মৌচাকে সাজ-সাজ রব পড়িয়া গেল। তাঁহারা সৈন্যবাহিনী ডাকিলেন, সাঁজোয়া-বাহিনী ডাকিলেন, বিমান-বাহিনী মোতায়েন করিলেন—একদিনের মধ্যেই বোম্বাই সহর একটি ছোট খাটো রণভূমে পরিণত হইল। কিন্তু তাহাতেও যেন প্রভুশক্তি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। ইংল্যাণ্ড হইতে খোদ প্রধান মন্ত্রী এই দুর্ব্বিনীত 'কালো' নাবিকদের ঠাণ্ডা করিয়া দিবার জন্য তিনখানা 'ক্রুজার' বোম্বাইয়ের পথে ছাড়িয়া দিলেন। ভারতের নৌ-সেনাপতি লর্ড-গড্ফ্রে হাওয়ায় তাল ঠুকিয়া ঘোষণা করিলেন যে, এই বিদ্রোহ দমন করিতে প্রয়োজন হইলে তাহারা তাঁহাদের বড় বড় আদরের ভারতীয় নৌ-বাহিনীকে পর্য্যন্ত ধ্বংস করিয়া ফেলিবেন।

পরের দিনের ঘটনা হইয়া দাঁড়াইল আরও সঙ্গীন। বোম্বাই সহরের বে-সামরিক জনগণও তাহাদের সামরিক ভাইদের বিক্ষোভে সহানুভূতি দেখাইতে বিমুগ্ধ হইয়া উঠিল। বিক্ষোভ বোম্বাই

হইতে করাচীতেও ছড়াইয়া পড়িল। সেখানকার ভারতীয় নাবিকরাও দুই একখানা জাহাজ দখল করিয়া ফেলিল এবং কিছু গোলাগুলীও ছুড়িল। তারপর এই বিক্ষোভ সারা ভারতেই ছড়াইয়া পড়িল। কলিকাতার নাগরিক জীবন পুরা একদিনের জন্য অচল হইয়া গেল। বি এণ্ড এ রেলওয়ের কর্মচারীরা ধর্মঘট করিয়া স্থানীয় ট্রেণ চলাচল বন্ধ করিয়া দিল। এখানেও ভারতীয় নাবিকেরা অহিংস ধর্মঘট করিল। দিল্লীতে নাবিকরা ২০শে তারিখেই ধর্মঘট ঘোষণা করিয়া গ্রেপ্তার হইয়াছিল। মাদ্রাজে ও আম্বালায় বিমান বাহিনীর সৈন্যরা কাজ বন্ধ করিল। সবশুদ্ধ মিলিয়া ১৪শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত মনে হইল, ভারতে পুনরাবর্ত্তিত হইয়া আবার বুঝি ১৮৫৭ সাল ফিরিয়া আসিয়াছে।

সৌভাগ্যের বিষয়, এই ক্ষুদ্র বিদ্রোহ বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। ধর্মঘটীরা তাহাদের বিক্ষোভের নিরসনের জন্য ভারতের নেতৃস্থানীয়দের শরণ লইয়াছিল। কংগ্রেসের তরফ হইতে সর্দার প্যাটেল ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া নাবিকদের কর্তৃপক্ষের কাছে নিসর্ত্ত আত্মসমর্পণ করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। নাবিকরা তাঁহার নির্দ্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছে। সারা ভারতে আবার শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। কংগ্রেসের যোগ্য হস্তক্ষেপে একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ নির্ব্বাপিত হইয়াছে। আমরা শান্তিই চাহিয়াছিলাম এবং সেই শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু বিস্ফোরণ নির্ব্বাপিত হইলেও ব্যাপারটা এখনও পুরাপুরি মেটে নাই। অবশিষ্ট কিছু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এখনও রহিয়াছে। যথোচিত যোগ্যতার সহিত ব্যবহার করিতে না পারিলে এই স্ফুলিঙ্গই আবার হয়ত প্রচণ্ডতর বিস্ফোরণে পরিণত হইবে। বলা বাহুল্য, এটারও জন্য দায়ী কর্তৃপক্ষের বিবেচনাহীনতা। নিজেদের ভুয়া কড়বের 'প্রেষ্টিজ' রক্ষার জন্য তাঁহারাই ব্যাপারটা সহজে শেষ হইতে দিতেছেন না। নাবিকদের এই বিক্ষোভের জন্য যাহারা দায়ী, সেই কল্পিত পাণ্ডাদের উপযুক্ত বিচারের জন্য তাহাদিগকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। সৈন্যবিভাগের শৃঙ্খলা নাকি তাঁহাদের বজায় রাখিতেই হইবে। অর্থাৎ আবার তাঁহারা আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার-প্রহসনের ন্যায় আর একটি প্রহসন অভিনয়ের ব্যবস্থা করিতেছেন, যে প্রহসন দেশবাসী বরদাস্ত করিতে প্রস্তুত নয়। পরম করুণাময় ঈশ্বর কর্তৃপক্ষকে রক্ষা করুন, তিনি তাঁহাদের সাম্রাজ্যবাদী মগজে এই বুদ্ধিটুকু প্রবেশ করাইয়া দিন যে, নাবিকদের এই বিদ্রোহ কোন পাণ্ডার প্ররোচনায় হয় নাই, হইয়াছে তাঁহাদের নিজেদের অত্যাচার ও অনাচারের জন্য আর যুগধর্ম্মে। কারণ 'বিপ্লবের সৃষ্টি করে আদর্শ ও অর্থ-নীতি' এই দুই উপাদান মিলিয়া। কিন্তু মূর্খ কর্তৃপক্ষ, যাহাদের দৃষ্টি তাহাদের স্বার্থ-বিরোধী সবকিছুরই প্রতি অন্ধ, সেই কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, বিক্ষোভকারীরাই হইল বিপ্লবের স্রষ্টা। অবশ্য একথা সত্য যে, বিক্ষোভকারীরা প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি বীতরাগ থাকে এবং সমাজব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সাধনে সচেষ্ট হইয়া কিছু কাজও করে। প্রতি বৈপ্লবিক যুগে দল বাঁধিয়া ইহাদের আবির্ভাব ঘটে। সমাজের বিরুদ্ধে যাহা অসন্তোষের কারণ, ইহারা হইল সেই অসন্তোষের সন্তান এবং আমরা মনে করি, এইরূপ বিদ্রোহ আত্মঘাতী। কিন্তু তাই বলিয়া একথা যেন মনে না করা হয় যে, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ নরনারী শুধু এই বিক্ষোভকারীদের প্ররোচনাতেই তাহাদের নির্দ্দেশ মানিয়া চলে। মানুষ তার সহজাত প্রবৃত্তির বশে নিরাপদ জীবনেরই খোঁজ করে। হাতের কাছে যাহা আছে মানুষ সাধারণতঃ তাহা লইয়াই জীবন কাটাইয়া দিতে চায়। আয়ত্তাতীত জিনিসের জন্য সে সেই হাতের জিনিবটাকে বিপন্ন করে না। কিন্তু জনসাধারণের আর্থিক কাঠামোটা তাহার যখন অসহনীয় হইয়া উঠে, তখন অতি দুর্ব্বলচিত্ত হইলেও এই মানুষই তাহার সর্ব্বস্ব পণ করে দূরাগত একটা অনিশ্চিতের জন্য।... (জওহর লাল নেহরু Glimpses of World History)

আশা করি, যুগের এই রূপকে কর্তৃপক্ষ অধিকতর বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া লক্ষ্য করিবেন এবং বিদ্রোহের কারণ মূলোৎপাটিত করিয়া শান্তি সংস্থাপনে অগ্রণী হইবেন। অন্যথায় মেকি প্রেষ্টিজ রক্ষা করিতে গিয়া তাহারা কেবল ভারতের নহে সমগ্র পৃথিবীরই শান্তিকে বিপন্ন করিবেন।

পরলোকে সুসাহিত্যিক রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

আমরা শ্রীমান্ রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়ের আকস্মিক ও অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছি। তিনি একজন প্রসিদ্ধ, গল্পলেখক ছিলেন। 'কলঙ্কিনীর খাল', 'পরস্ত্রী' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি তাঁহার সাহিত্য-জীবনের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তিনি বঙ্গশ্রীর পাঠকগণের নিকটও বিশেষভাবে সুপরিচিত। তাঁহার পিতা (শ্রীযুক্ত মাখনলাল গঙ্গোপাধ্যায়)-মাতা এখনও জীবিত। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পিতা-মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়গণের গভীর শোকে সমদুঃখ জ্ঞাপন করিতেছি। ভগবান্ তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ করুন, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

রয়্যাল এসিয়েটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের প্রথম মহিলা ফেলো

ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী, এম-এ, ডি-ফিল (অক্সন) সম্প্রতি রয়্যাল এসিয়েটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের ফেলো নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীমতী চৌধুরীই এই সোসাইটির সর্ব্বপ্রথম মহিলা-ফেলো হওয়ার সম্মান অর্জ্জন করিলেন। ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজের দর্শনশাস্ত্রের প্রধানা অধ্যাপিকা এবং স্বামী, অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর ডক্টর যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী সহ "প্রাচ্য বাণীর" যুগ্ম সম্পাদক। তিনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রী; আই, এ পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় স্থান এবং বি-এ অনার্স ও এম-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাঁহার রচিত নিম্বার্কদর্শন সম্বন্ধীয় তিন খণ্ড গ্রন্থ রয়্যাল এসিয়েটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার সুফী দর্শন ও বেদান্তদর্শনবিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থও সুধীবর্গের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে। ডক্টর শ্রীমতী

চৌধুরী জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম সভাপতি স্বর্গীয় আনন্দ-মোহন বসু মহাশয়ের পৌত্রী। এই আনন্দ মোহনই রোগশয্যায় শয়ান থাকিয়াও বঙ্গভঙ্গের দিন জীবন উপেক্ষা করিয়া মিলনমন্দিরের ভিত্তি প্রোথিত করিয়াছিলেন।

ডক্টর শ্রীমতী চৌধুরী আমাদের বঙ্গনারীর অন্যতমা প্রসিদ্ধ

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

লেখিকা। তাঁহার এই নূতন সম্মানলাভে আমরা তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব

বোম্বাইতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনের ১৫ই মার্চের বৈঠকে আসন্ন খাদ্যসঙ্কট প্রতিরোধের জন্য একটি ১৫ দফা কার্য্যক্রম রচিত হইয়াছে। কমিটি বিশেষ জোরের সহিত জানাইয়াছেন যে, 'যদি জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা না থাকে, তবে এই সঙ্কট-প্রতিরোধের জন্য অবলম্বিত কোন ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত ও ফলপ্রসূ হইতে পারে না।' ভারতের রাষ্ট্রিক অবস্থার দিক হইতে একথা যে আজ কত বড় সত্যের রূপ লইয়া দেখা দিয়াছে, তাহা নির্য্যাতিত ভারতের প্রত্যেকটি ব্যক্তিই আজ উপলব্ধি করিবেন। যতক্ষণ না ভারতের শাসন ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসীর হাতে আসিতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অন্যান্য সমস্যার মতো এই খাদ্য সমস্যারও সমাধান হওয়া সম্ভব নয়। গত দুর্ভিক্ষে এক বাংলা দেশেই যে ৫০ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইল—সেই ইতিহাস আজই ভুলিবার নয়। বৃটিশ সরকারের অব্যবস্থা ও সেই সরকারপুষ্ট সিভিল সাপ্লাইয়ের কর্ম্মচারী ও চোরাকারবারীদের যথেচ্ছ ব্যভিচারের ফলেই যে উক্ত দুর্ভিক্ষের উদ্ভব ঘটিয়াছিল, তাহা শুধু আমরা কেন, সরকার নিয়োজিত দুর্ভিক্ষ-তদন্ত কমিশন পর্য্যন্ত তাহা উচ্চ কণ্ঠে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছে। সেই দুর্ভিক্ষের পরে দুই বৎসরকালও গত হইতে না হইতে আবার দুর্ভিক্ষের আভাষ দেখা দিয়াছে। বিলাতে রাষ্ট্রধুরন্ধরদের বৈঠকে ইহা লইয়া বিশেষ আশঙ্কার সৃষ্টি হয় এবং দেখিতে দেখিতে কাগজপত্র এবং বুলেটিন মারফৎ সংবাদ প্রচার হইয়া পড়ে যে, এবারে শুধু বাংলায় নয়, সমগ্র-ভারতে এবং এমন কি পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বিশেষভাবে খাদ্যসঙ্কট দেখা দিবে এবং ব্যাপকতর দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব ঘটিবে। কিন্তু তাহার বহু পূর্ব্ব হইতে আমরাও দেখিয়া আসিতেছি, গত দুর্ভিক্ষের প্রেত এই দুর্ভাগা দেশের মাটি হইতে তিরোহিত হয় নাই। নগরের পথে আবার ধীরে ধীরে ক্ষুধার্ত্তের কান্না জাগিয়া উঠিয়াছে, উপযুক্ত সার ও সেচ ব্যবস্থার অভাবে গ্রামের আবাদী জমীগুলি বন্ধ্যার মত পড়িয়া আছে, কিছু চাউল যাহাও বাজারে ছিল, তাহাও ক্রমান্বয়ে সরকারী নির্দ্ধারিত মূল্যের ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। ভারতের অধিকাংশ অঞ্চল এবং বিশেষতঃ বাংলার প্রত্যেকটি নগর, গ্রাম ও জনপদে ১৯৪৩-এর পরে দুর্ভিক্ষ একটুকুও হ্রাস পায় নাই; একটা প্রবল কান্নার পর চাপা আর্ত্তনাদের মত তাহা শুধু বাংলার নিভৃত প্রাণ-সত্তার মধ্যে গুমরাইয়া মরিতেছে। সরকারী রেশন ব্যবস্থা তাহার বিন্দুমাত্রও প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে পারে নাই। কলিকাতা নগরীতে অবস্থা কথঞ্চিৎ সন্তোষজনক হইলেও পল্লীগ্রামবাসিগণের দুর্দ্দশার সীমা নাই।

এই মুমূর্ষ নিষ্পিষ্ট সময়ে তাই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে আলোচিত উক্ত ১৫ দফা কার্য্যক্রমে যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ আকার লইয়া দেখা দিয়াছে, তাহা ভারতবাসী মাত্রেরই চিন্তার বিষয়। কংগ্রেসের উক্ত অধিবেশনে ওয়ার্কিং কমিটির যে প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে, তাহা প্রসঙ্গক্রমে এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করা আবশ্যক মনে করি, যথা:

(ক) এই দুর্দ্দিনে প্রথম কথা হইতেছে, জনসাধারণ সাহস হারাইবেন না। প্রত্যেকেই তাঁহার ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য উপলব্ধি করিবেন এবং সাধ্যমত তাহা প্রতিপালন করিবেন। জনসাধারণকে এই বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে, যদি প্রত্যেকেই একই প্রকার কার্য্য করেন, তবে ভারতবর্ষ সাহস ও আত্মপ্রত্যয়ের সহিত সমস্ত বিপদ অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারিবে এবং সহস্র সহস্র দরিদ্র লোকের জীবন রক্ষা পাইবে। সুতরাং প্রত্যেক গ্রামবাসী ও প্রত্যেক সহরবাসী তাঁহার প্রতিবেশী ও নিজের জন্য যতটুকু পারেন, করিবেন।

(খ) যাহাদের জমি আছে, তাঁহাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ জমিতে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে যাহা কিছু ফসল ফলাইতে পারেন, ফলাইবেন। কোনো আবাদী জমি পতিত পড়িয়া থাকিলে দ্রুত তাহা আবাদ করিতে হইবে এবং গভর্ণমেণ্টকে ইহার জন্য প্রত্যেক সুযোগ সুবিধা করিয়া দিতে হইবে।

(গ) নিজের ন্যূনতম প্রয়োজন মিটাইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা অভাবগ্রস্ত অন্য লোককে প্রদান করিতে হইবে।

(ঘ) যেখানেই সম্ভব, অর্থকরী ফসলের পরিবর্ত্তে খাদ্যশস্য উৎপাদনকে প্রাধান্য দিতে হইবে।

(ঙ) যেখানেই জলাভাব আছে, সেখানেই জনসাধারণ কূপ ও পুষ্করিণী খনন করিবেন। এই উদ্দেশ্যে গভর্ণমেণ্ট ও স্বায়ত্ত-

শাসনশীল স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সর্ব্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা প্রদান করা কর্ত্তব্য।

(চ) ধনাঢ্য লোকদিগকে সাদাসিদাভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে এবং তাঁহাদের শক্তি ও অর্থ দুঃস্থদের দুঃখ লাঘবের জন্য গঠনমূলক কার্য্যে নিয়োগ করা কর্ত্তব্য।

(ছ) বিদেশ হইতে শস্য সংগ্রহের সর্ব্ববিধ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কোনো অবস্থায়ই যেন আমরা নিজেদের অসহায় বোধ না করি। ভারতবর্ষেই আমাদের যতদূর সম্ভব শস্য উৎপাদন করা উচিত এবং আমাদের যাহা সম্বল আছে, তাহা লইয়াই আমাদিগকে সমস্ত সঙ্কটের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, খাদ্যহীন স্থানগুলিকে যদি সময়মত সরবরাহ পৌছাইয়া না দেওয়া যায় ও তাহা সমভাবে বণ্টন না করা হয়, তবে বিদেশ হইতে অতিরিক্ত খাদ্য আমদানী করিয়া এবং অতিরিক্ত ফসল ফলাইয়াও কোনো ফল হইবে না।

(জ) সমস্ত খাদ্যদ্রব্য মিতব্যয়িতার সহিত ব্যবহার করিতে হইবে এবং বিবাহাদি উৎসবে ভোজ বাদ দিতে হইবে।

(ঝ) লভ্য সমস্ত ফলের কিছুমাত্র অপচয় না ঘটিয়া যাহাতে পূর্ণ সদ্ব্যবহার হয়, সেজন্য ব্যাপকভাবে বিশেষ পদ্ধতিতে টিনের কৌটায় ফল সংরক্ষণে উৎসাহ দিতে হইবে।

(ঞ) যেখানে আবশ্যক, সেখানেই খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও চালানের জন্য গবর্ণমেণ্টের হাতে সামরিক অসামরিক নির্ব্বিশেষে যত লোকবল, যন্ত্রবল ও কারিগরীবল আছে, তাহার সমস্তই নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। শস্য, খাদ্যশস্য, তিল, তিষি, সরিষা, তৈল, খইল, বাদাম, তৈল ও অন্যান্য আহারযোগ্য দ্রব্য বাহিরে চালান দেওয়া সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করিতে হইবে।

(ট) জল সরবরাহের জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজন মত গভীর কূপ খনন ও অন্যান্য ব্যবস্থা করিবেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যগণসহ সৈনাবিভাগ হইতে খারিজ ও বরখাস্ত ব্যক্তিগণকে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য।

(ঠ) কমিটি আশা করেন যে, দেশে দুঃখ-কষ্ট লাঘবের জন্য রেশনিং ও খাদ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রচিত কোন যুক্তিসঙ্গত পরিকল্পনা এবং মজুতদারী, চোরাকারবার ও দুর্নীতি নিবারণ কল্পে অবলম্বিত কোন ব্যবস্থাকে সফল করিবার জন্য জাতি সর্ব্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করিবে।

(ড) ইহা স্পষ্টই দেখা যায় যে, গভর্ণমেণ্টের সহিত সর্ব্বপ্রকারে সহযোগিতা করা জনসাধারণের যেমন কর্ত্তব্য, তেমনি গভর্ণমেণ্টেরও জনসাধারণের অপরিহার্য্য প্রয়োজনগুলি হৃদয়ঙ্গম ও পূরণ করা কর্ত্তব্য। জনসাধারণের হাতে যতক্ষণ না ক্ষমতা আসে, ততক্ষণ কোন ব্যবস্থার দ্বারাই সম্পূর্ণরূপে প্রতিকার করা যাইবে না।

(ঢ) বস্ত্রাভাব নিবারণের জন্য গ্রামবাসীরা যাহাতে নিজেদের চেষ্টাতেই পর্য্যাপ্ত খাদি উৎপাদন করিতে পারে, সেজন্য তাহাদিগকে সমভাবে গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করা কর্ত্তব্য। গভর্ণমেণ্টের উচিত—আবশ্যক মত তুলার সরবরাহ বা তুলা উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া এবং চাষের সাজ-সরঞ্জাম ও উপদেশ দিয়া সাহায্য করা।

(ণ) এই প্রস্তাবের অন্তর্গত সুপারিশগুলিকে কার্য্যে পরিণত করার সাহায্য করিবার জন্য কংগ্রেস কমিটিসমূহ ও কংগ্রেস কর্ম্মিগণকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইতেছে।

পুনরায় আসন্ন দুর্ভিক্ষের করালগ্রাস হইতে মুক্তি পাইবার মূলে উপরোক্ত ১৫ দফা কার্য্যক্রম ব্যবহারিক কার্য্যে পরিণত করিবার আশু প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এদিকে বিগত ১৮ই মার্চ্চ রাইটার্স বিল্ডিং-এ এক সাংবাদিক সম্মেলনে "অধিক খাদ্যশস্য ফলাও" আন্দোলন সম্পর্কে সরকারের কৃষি বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ এস. বসু একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। উহাতে প্রসঙ্গত বলা হইয়াছে, বর্ত্তমানে যেসব জমিতে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইতেছে, সে সব জমিতে অধিক পরিমাণে খাদ্যশস্য বাড়ানো কিভাবে সম্ভব হয়, সে সম্বন্ধে দুইটি প্রধান উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ অধিক সার ও পয়োপ্রণালীর সুযোগ। ১৯৪৫-৪৬ এবং ১৯৪৬-৪৭ সালের জন্য জমিতে কম মূল্যে যে পরিমাণ সার সরবরাহ করা হইয়াছে, তাহার হিসাব এইরূপ দেখা যায়, যথা :—

	১৯৪৫-৪৬	১৯৪৬-৪৭
হাড়ের গুড়া—	২৫,২৬৬ মণ	১৫০,০০০ মণ
খৈল (কেনা দামে)—	২৫৬,৪০৫ ,,	৫০০,০০০ ,,
রাসায়নিক সার—	১৯১,৩০০ ,,	২০৫,০০০ ,,

ইহা ছাড়া সার প্রস্তুত বৃদ্ধির জন্য দুইটি পরিকল্পনা অনুসারে কাজ আরম্ভ হইয়াছে। উহার ফলে সার আরও বেশী পরিমাণে বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে: (১) গ্রামের গোলাবাড়ীর আবর্জ্জনা হইতে কম্পোষ্ট সারপ্রস্তুত; (২) মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের আবর্জ্জনা ও ময়লা হইতে সার প্রস্তুত। প্রথম উপায়ে ১৯৪৬ সালের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ২১,১৫,৩০৮ মণ সার প্রস্তুত হইয়াছে, এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনানুসারে কয়েকটি সহরেই কাজ আরম্ভ হইয়াছে।—রেলপথের দুইধারে যে যায়গাগুলি পড়িয়া আছে, সেগুলিতে আবাদ আরম্ভ হইয়াছে। ১৯৪৪-৪৫ এবং ১৯৪৫-৪৬সালে ৬০০ একর জমীতে চাষ করার জন্য চাষীদের সঙ্গে বন্দোবস্ত হইয়াছে।

সরকারী পক্ষ হইতে অবশ্য মিঃ বসুর নজীর তুলিবার কোন-রূপ ত্রুটি নাই। কিন্তু আমাদের বক্তব্য হইতেছে এই যে, 'অধিক খাদ্যশস্য বাড়াও' আন্দোলন আজিকার নূতন নয়, গত দুর্ভিক্ষের সময়েই ইহার প্রথম উৎপত্তি। কিন্তু তাহার দ্বারা দেশের জনসাধারণের কি এতটুকুও উপকার সাধিত হইয়াছে? যখনই দেশের যুক্তি-দাবীর কাছে ঠেকিয়া পড়িতে হয়, তখনই সরকারী বিবৃতির ঘন ঘন প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু গত দুর্ভিক্ষেও যেমন কথায় চিঁড়া ভিজে নাই, এবারেও তাহাই। সরকারের এই জাতীয় নাটকীয় অভিব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনের কংগ্রেস বিশেষভাবে এবারে এই

খাদ্য-সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। এই দিকে শুধু জনসাধারণের নয়, গভর্ণমেণ্ট এবং জনসাধারণ উভয় পক্ষকে সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টি ও কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার আশু প্রয়োজন। এ সম্পর্কে আমরা তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

রামতনু লেক্‌চারার পদে ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ত্তমান বৎসরে ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রামতনু লাহিড়ী লেক্‌চারার'এর পদ লাভ করায় আমরা তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। গত সুদীর্ঘকাল যাবৎ তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করিতেছিলেন। বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী। তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও মরমী অনুভূতির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ 'বাংলা উপন্যাসের ধারা'। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের এমন গভীর ও ব্যাপক সমালোচনা বাংলায় যুগান্তকারী রচনা হিসাবে এই প্রথম। বাংলা সাহিত্যে তাঁহার এই অমূল্য দান তাঁহাকে চির-স্মরণীয় করিয়া রাখিবে। তিনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও গবেষণামূলক প্রবন্ধে আমাদের "বঙ্গশ্রী"র সমৃদ্ধিকল্পেও কখনও চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই।

আমরা তাঁহার এই সম্মানলাভ ও পদগৌরবে বিশেষ আনন্দিত। তবে আমাদের অনুরোধ বিশ্ববিদ্যালয়ে গতানুগতিক ভাবে কার্য্য সম্পাদন না করিয়া উপন্যাস, নাটক, ইতিহাস, জীবন-চরিত মৌলিক গবেষণায় সমভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া তিনি বঙ্গভাষাকে সংস্কৃতি-সমৃদ্ধ করেন এবং তাঁহার পরিচালনায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বঙ্গবিভাগের উত্তরোত্তর উন্নতি সাধিত হউক ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, যে-পদ অলঙ্কৃত করিবার জন্য
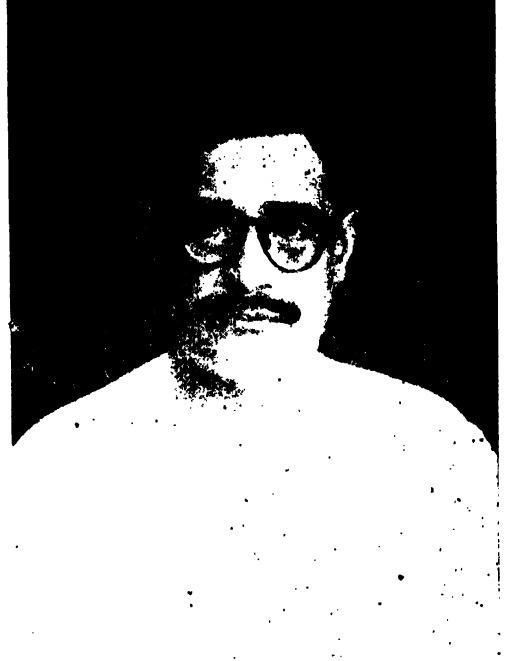
ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

তিনি নিয়োজিত হইয়াছেন, তাঁহার হস্তে উক্তপদের যেন যথাযোগ্য মর্য্যাদালাভ হয়। তিনি শতজীবী হউন।

[শিল্পী : শ্রীঅবনী সন

"লক্ষ্মীস্তং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"

ত্রয়োদশ বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ—১৩৫৩ { ২য় খণ্ড—৬ষ্ঠ সংখ্যা

অশ্বঘোষ ও তাঁহার কাব্য-দর্শন

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

সুবর্ণাক্ষীপুত্র অশ্বঘোষ শকাব্দ-প্রবর্ত্তক মহারাজ কনিষ্কের সমকালবর্ত্তী—এ বিষয়ে সাধারণের মনে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ না থাকিলেও মহারাজ কনিষ্কই যথার্থতঃ শকাব্দের প্রবর্ত্তক কি না—এ সম্বন্ধে অনেক প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ ইণ্ডো-পার্থিয়ান নরপতি গোণ্ডোফার্নেস্ বা গোণ্ডোফারেস (নামটি শুনিলেই মনে হয় পারসীক বা পার্থিয়ান নাম) দ্বিতীয় আজেস্-এর পরে কান্দাহার (আরাকোসিয়া), কাবুল ও তক্ষশিলার শাসনভার গ্রহণ করেন (খ্রীঃ ২০-৪৮)। ইঁহারই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজক সেণ্ট টমাস্ খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী থাকার অবস্থায় নিহত হন (মতান্তরে, মান্দ্রাজের নিকটবর্ত্তী মাইলাপুরে তিনি নিহত হইয়াছিলেন)।

খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১৭৪-১৬০ অব্দের মধ্যে যাযাবর য়ুএহ্-চি জাতি চীন হইতে বিতাড়িত হইয়া গোবি-মরুভূমিতে পলায়ন করে। যাযাবর অবস্থায় ইহাদিগের সহিত সকাই (বা শক) নামক আর এক যাযাবর জাতির সঙ্ঘর্ষ বাধে—তাহাতে শক জাতি পরাজয় স্বীকার করিয়া ভারতপ্রান্তে চলিয়া আসে। পরে বু-সুন নামে তৃতীয় এক যাযাবর জাতির সহিত সজ্ঘাতে য়ুএহ্-চি জাতিও পরাস্ত হয় ও ওক্সাস্ (কালিদাসের বঙ্ক্ষু বা বক্ষু) নদীতীরে পলাইয়া আসিয়া বসবাস করিতে থাকে। কালক্রমে ইহাদিগের যাযাবর-স্বভাব দূর হইয়া যায় ও ইহারা পাঁচটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়। প্রায় এক শতাব্দী পরে এই পাঁচ সম্প্রদায়ের মধ্যে কুষান-সম্প্রদায় প্রাধান্য লাভ করে। উহাদিগের অধিনেতা ছিলেন কুজুল-কর-ক্যাড়-ফাইসেস্ (বা প্রথম ক্যাড্ফাইসেস্)।

খ্রীষ্টীয় ৪৮ অব্দে গোণ্ডোফার্নেসের দেহাবসানের পর পার্থিয়ানগণকে বিধ্বস্ত করিয়া ইনি তক্ষশিলা অধিকার করেন। ইনিই ভারতের প্রথম কুষান রাজা। প্রায় অশীতিপর বর্ষে ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

ইঁহার পুত্র উইমা ক্যাড্ফাইসেস্ (বা দ্বিতীয় ক্যাড্ফাইসেস্) ভারতের দ্বিতীয় কুষান নরপতি। সম্ভবতঃ ইনিই শকাব্দ-প্রবর্ত্তক—ইহাই কোন কোন পণ্ডিতের মত।

খ্রীষ্টীয় ৮৭ অব্দে চীনের সেনাপতি পান-চাওয়ের সহিত যুদ্ধে ইয়ারকান্দের সমতলক্ষেত্রে দ্বিতীয় ক্যাড্ফাইসেস্ পরাস্ত হইয়া চীনকে কর দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

৮৯ হইতে ১০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতকে চীন-সম্রাট্ হো-টির নিকট মধ্যে মধ্যে উপঢৌকনাদি পাঠাইতে হইত বলিয়া চীনদেশের ইতিহাসে অদ্যাপি লিপিবদ্ধ আছে।

আনুমানিক ১১০ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় ক্যাড্ফাইসেসের মৃত্যু হয়। ইহার পর প্রায় ১০ বৎসর যে রাজা রাজ্য করিয়াছিলেন তাঁহার নাম পাওয়া যায় না—কিন্তু তৎকালীন প্রাচীন মুদ্রাতে তাঁহাকে 'সোটের মেগাস্' (বা প্রধান রক্ষক) উপাধি প্রদান করা হইয়াছে।

ইহার পর আসিলেন কনিষ্ক। ইনি ক্যাড্ফাইসেসের পুত্র নহেন। ইঁহার পিতার নাম ছিল বজেষ্ক। কনিষ্ক ক্যাড্-ফাইসেস্দ্বয়ের বংশধারা-সম্ভূত ছিলেন না। প্রথম ও দ্বিতীয়

ক্যাড্‌ফাইসেস্ ছিলেন য়ুএহ্-চি সম্প্রদায়ের বড় বিভাগে উৎপন্ন। আর কনিষ্ক ছিলেন ঐ সম্প্রদায়েরই ছোট তরফের লোক।

কনিষ্কের নিজপ্রবর্ত্তিত একটি অব্দের সন্ধান পাওয়া যায়; উহা শকাব্দ হইতে ভিন্ন। ঐ অব্দের তৃতীয় বৎসরে তিনি সারনাথ-প্রশস্তি প্রচারিত করেন। প্রায় ৯৯ বৎসর কনিষ্কাব্দ চলিয়াছিল। এই কারণে ভিনসেণ্ট্ স্মিথ, স্যার জন মার্শাল, অধ্যাপক ষ্টেন কোনো, অধ্যাপক আর্থার বেরিডেল কীথ প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে শকাব্দের প্রবর্ত্তক কনিষ্ক নহেন।

কনিষ্কের পুত্রদ্বয় বাসিষ্ক ও হুবিষ্ক। খ্রীষ্টীয় ১৬২ অব্দে হুবিষ্ক পিতার সিংহাসনে উপবেশন করেন। আনুমানিক ১৮২ অব্দে প্রথম বাসুদেব হুবিষ্কের সিংহাসন উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেন। খ্রীষ্টীয় ২২০ অব্দে তাঁহার মৃত্যুতে কুষান-সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটে।

সুদীর্ঘ ৪১ বা ৪২ বৎসর রাজ্যপরিচালনার পর কনিষ্ক যখন দেহত্যাগ করেন, তখন পাশ্চাত্ত্যে রোম-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন সুবিখ্যাত মনীষী সম্রাট্—মার্কাস্ অরেলিয়াস্।

মৌর্য্যসম্রাট্ অশোকের বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের ফলে চীন প্রভৃতি দেশে যখন তথাগতের ধর্ম্মমত প্রসার লাভ করে, তখনই (খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে) একজন য়ুএহ্-চি-বংশীয় সামন্ত বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন—আর তদবধি তাঁহার বংশধরগণ বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরাগ প্রকাশ করিয়া আসিতেছিলেন। কনিষ্ক সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া প্রকাশ্য ভাবে সৌগতধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে আরম্ভ করেন—অথচ হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহার যে বিদ্বেষ ছিল—এমন কোন প্রমাণও পাওয়া যায় না। তাই তাঁহার রাজসভায় একদিকে যেমন বৌদ্ধ কবি দার্শনিক অশ্বঘোষ পরম সমাদরে আসন লাভ করিয়াছিলেন, অপরদিকে তেমনই ঋষিকল্প হিন্দু ভিষগ্‌বর চরক রাজবৈদ্যের সম্মান লাভে বঞ্চিত হন নাই। আরও পরের যুগে হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের প্রারম্ভে কুষাণবংশে হিন্দুপ্রভাবই অধিক পরিলক্ষিত হইত। তাই কুষানবংশের শেষ শাসক প্রথম বাসুদেব হিন্দু-দেব নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ বিশ্বাস করেন যে, বাসুদেবের পূর্ব্বেই কুষানগণ বৌদ্ধধর্ম্মে আস্থা ত্যাগ করিয়া হিন্দুরূপে আপনাদিগের পরিচয় প্রদান করিতেন। আবার কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন যে, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী শাসক পার্থিয়ান্ গোণ্ডোফার্নেস ও কুষান ক্যাডফাইসেসের ন্যায় কনিষ্কও প্রথমতঃ একরূপ মিশ্র ও উদার জরথুশ্‌ত্র ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। উহার ফলে অন্য ধর্ম্মের দেবদেবীতে বিশ্বাস করার বাধা তাঁহার কোন দিনই হয় নাই। পার্থিয়ান্ নরপতি গোণ্ডোফার্ণেস্ ও য়ুএহ্-চি কুষান ক্যাড্‌ফাইসেস্ কেবল দ্বিভুজ শিবমূর্ত্তি নিজ নিজ মুদ্রাতে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। আর কনিষ্কের মুদ্রায় গ্রীক পরিচ্ছদে দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্ত্তি ও ভারতীয় প্রথায় উপবিষ্ট ধ্যানী বুদ্ধের মূর্ত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া, দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজ শিবমূর্ত্তি-অঙ্কিত মুদ্রারও অভাব নাই। জরথুশ্‌ত্র, গ্রীক, মিথ্রধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্মের বহু দেবদেবীর একটা অদ্ভুত সমন্বয়ের ফলে তাঁহার মুদ্রাগুলি বিশেষ মূল্যবান্। এই সকল ব্যাপার হইতে অনুমান করা যায় যে, ধর্ম্মমতগুলির উপর তিনি বিশেষ উদারদৃষ্টি-বিশিষ্ট ছিলেন। প্রথমে জরথুশ্‌ত্র-মতাবলম্বী থাকিবার পর তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে আনুষ্ঠানিক ভাবে দীক্ষিত হন—এরূপ মতও পোষণ করিবার মত লোক বিরল নহে। তবে সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা একথাও বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণের পরও তিনি খুব সম্ভবতঃ (ও তাঁহার পুত্র হুবিষ্ক ত নিশ্চয়ই) তাঁহার পূর্ব্বাশ্রম-ধর্ম্মের উপাস্য দেবগণের প্রতি সম্মান দেখাইতে কোন দিনই পরাঙ্মুখ হন নাই। মোটের উপর ইহা অতি সত্য যে, শেষ জীবনে কনিষ্ক বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ অনুরাগী ভক্ত পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, আর এই কারণে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারক পণ্ডিত লেখকবৃন্দ তাঁহাকে 'দ্বিতীয় অশোক' আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। মহামনীষী অশ্বঘোষ এই কারণেই তাঁহার আশ্রয় গ্রহণে সম্মত হন। আর এই হেতু অশ্বঘোষের আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষ পাদ হইতে দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল—ইহা বলা যাইতে পারে।

যদিও ঐতিহ্য অনুসারে অশ্বঘোষকে কনিষ্কের আশ্রিত বলিয়া ধরা হয়, তথাপি এ সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। যদি সূত্রালঙ্কার অশ্বঘোষের রচনা হয়, তাহা হইলে এমন দুইটি আখ্যানের সন্ধান পাওয়া যায়—যাহা হইতে বুঝা যায় যে, কবি কনিষ্কের রাজত্বকে অতীত ঘটনা বলিয়াই যেন উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে তিনটি বিষয়ের অনুমান করা যাইতে পারে—(১) হয়ত, কনিষ্ক অশ্বঘোষের পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন (কিন্তু ইহা প্রচলিত ঐতিহ্যের বিরোধী), (২) অথবা, এই আখ্যান দুইটিই আদ্যন্ত প্রক্ষিপ্ত, (৩) অথবা, ইহাতে যে কনিষ্কের নাম পাওয়া যাইতেছে, তিনি অন্য কোন প্রাচীন কনিষ্ক। আবার কনিষ্কের সমকালবর্ত্তী বলিয়া গৃহীত একটি শিলালেখে এক অশ্বঘোষরাজের উল্লেখ পাওয়া যায়—আর ইনিই আমাদিগের কবি হইতে অভিন্ন বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য একটি বিষয় এই যে, স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ পুণায় অনুষ্ঠিত প্রথম ওরিয়েণ্টাল কংগ্রেসে (১৯১৯) প্রচার করেন যে, অশ্বঘোষের পৃষ্ঠপোষক কনিষ্কের আবির্ভাবকাল খ্রীঃ ৩২০ অব্দ।

যাহা হউক, প্রচলিত ঐতিহ্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলে অশ্বঘোষ-কনিষ্কের সময় খ্রীঃ প্রথম-দ্বিতীয় শতাব্দী বলিয়া স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

ঐতিহ্য ইহাও বলে যে, অশ্বঘোষ প্রথমে ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ, পরে তিনি বৌদ্ধ সর্ব্বাস্তিবাদের অনুগামী হন। অবশেষে তিনি বৌদ্ধ-মহাযান-সম্প্রদায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অগ্রদূত-রূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। সুবিখ্যাত চীন দেশীয় পরিব্রাজক ই-চিং (I-tsing) খ্রীষ্টীয় ৬৭১ অব্দ হইতে ৬৯৫ অব্দ পর্য্যন্ত পরিভ্রমণকালে অশ্বঘোষকে একজন অতি প্রাচীন ও প্রধান আচার্য্যরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার সময়েও অশ্বঘোষের রচনাবলীর পঠন-পাঠন যে প্রচলিত ছিল—তাহার উল্লেখও পরিব্রাজকের বর্ণনায় পাওয়া যায়। কবির গ্রন্থাবলীর পুষ্পিকা-

সমূহ হইতে জানা যায় যে, অশ্বঘোষের মাতার নাম ছিল সুবর্ণাক্ষী, সাকেতে ছিল তাঁহার নিবাস ও তিনি 'আচার্য্য' ও 'ভদন্ত' নামে অভিহিত হইতেন। বৌদ্ধ শূন্যবাদের প্রচারক সুপ্রসিদ্ধ আচার্য্য নাগার্জ্জুনও প্রায় ইঁহার সমকালবর্ত্তী ছিলেন।

অশ্বঘোষের রচিত দুইখানি শ্রব্যকাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়—বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরনন্দ। দুইখানির মধ্যে বুদ্ধচরিতখানিই রচনাপরিপাট্যহেতু কবির পরিণত হস্তের রচনা বলিয়া অনুমান করা হয়। চীন ও তিব্বতে বুদ্ধচরিতের যে অনুবাদ আছে, তাহাতে কাব্যখানি ২৮ সর্গে বিভক্ত বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। চীনা অনুবাদের তারিখ খ্রী: ৪১৪-৪২১ অব্দ। ই-চিং এই অষ্টাবিংশতি সর্গাত্মক বুদ্ধচরিতের উল্লেখ করিয়াছেন। খুব সম্ভবতঃ, গাথা-শৈলীতে রচিত মিশ্রসংস্কৃতভাষাময় ললিতবিস্তরই বুদ্ধচরিতের উপজীব্য। কিন্তু উহার সংস্কৃত মূলের ত্রয়োদশ সর্গমাত্র বর্ত্তমানে লভ্য।—উহার সহিত আরও চারিটি সর্গ উনবিংশ শতাব্দীর অমৃতানন্দ নামক এক লেখক যোগ করিয়া দিয়া বারাণসীতে দীক্ষা দান পর্য্যন্ত ঘটনাবলী টানিয়া আনিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ বুদ্ধচরিতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাঁহাদিগের (ও তাঁহাদিগের স্তাবক প্রাচ্য পণ্ডিতগোষ্ঠীর) মত এই যে, কালিদাস বহুস্থলে (যথা—বুদ্ধচরিত ৩, ১৩-২৪ ও রঘুবংশ ৭, ৫-১২—অজের রাজধানী-প্রবেশ) অশ্বঘোষের নিকট সুস্পষ্ট ঋণী। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে এ বিচারব্যূহে প্রবেশ সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক মনে করি। তবে এ কথা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য, অশ্বঘোষের কবিত্ব অনন্য-সাধারণ ও তাঁহার কাব্যে প্রসাদগুণ ও স্বভাবোক্তির পরিচয় পদে পদে পাওয়া যায়। যদি অশ্বঘোষের নিকট কালিদাসের ঋণ একান্তভাবেই স্বীকার্য্য হয়, তবে রামায়ণ ও মহাভারতের বহুস্থলের ভাব-ভাষার প্রভাবও যে অশ্বঘোষের কাব্যের নানা অংশে (৫, ৯-১১, ৪৮-৭২ ; দ্বাদশ সর্গ ইত্যাদি) অবশ্য বিদ্যমান—ইহা কোনরূপেই অস্বীকার করা চলে না।

সৌন্দরনন্দ বিংশতি সর্গাত্মক আর একখানি মহাকাব্য। উহার শেষদিকে কবি কেন দর্শন ছাড়িয়া কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হইলেন তাহার কৈফিয়ৎ দেওয়া আছে। সাধারণ সংসারী জীব সুখের প্রত্যাশী—মোক্ষের নহে। তাই কবি—সুকোমল আবরণের মধ্য দিয়া নির্ব্বাণপ্রদ জ্ঞান বিতরণের উদ্দেশ্যে সৌন্দরনন্দ রচনা করিয়াছেন—তাঁহার বিশ্বাস, পাঠকবর্গ একবার আবরণ ভেদ করিয়া সারতত্ত্ব ধরিতে পারিলে উহার অসার কাব্য-আবরণ পরিত্যাগ করিয়া সারভূত তত্ত্বজ্ঞানেরই সমাদর করিবেন।

সৌন্দরনন্দের বিষয়বস্তু—বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দের দীক্ষা—মহাবগ্‌গে ও নিদানকথায় বর্ণিত হইয়াছে। সৌন্দরনন্দ মহাকাব্যের প্রথম সর্গে কপিলবাস্তু, দ্বিতীয় সর্গে রাজা শুদ্ধোদন ও সর্ব্বার্থসিদ্ধ ও নন্দের জন্ম ও তৃতীয় সর্গে সম্যগ্‌-সম্বুদ্ধ তথাগতের বিবরণ। তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দ নিজ পত্নী সুন্দরীর প্রেমে মাতোয়ারা। অথচ পত্নীর রূপ-যৌবনের আকর্ষণ ও অনুরোধসত্ত্বেও তিনি হইলেন ভিক্ষু—ফলে সুন্দরীর শোকের আর অবধি রহিল না (সর্গ ৪—৬)। ক্রমে নন্দের নিজেরও অনুতাপ আসিল ও নানা পূর্ব্বতন দৃষ্টান্তদ্বারা প্রেমের মহিমা বর্ণনপূর্ব্বক তিনি কান্তার সহিত পুনর্মিলনে উদ্‌গ্রীব হইলেন (৭ম সর্গ)। তাঁহাকে নিবৃত্ত করার জন্য বহু উপদেশ দেওয়া হইল—অবশেষে তাঁহাকে স্বর্গে প্রেরণ করিতে হইল। তথায় গিয়া তিনি বুঝিলেন—স্বর্গের দেবনারীগণ মর্ত্ত্যের সুন্দরীগণের অপেক্ষাও বহুগুণে অধিক সুন্দরী। ইহার পর তাঁহাকে বলা হইল—মর্ত্ত্যে কঠোর তপস্যার উদ্দেশ্যই হইতেছে—স্বর্গের অপ্সরোগণের প্রীতিলাভ (দশম সর্গ)। পরিশেষে আনন্দ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে স্বর্গের আনন্দও ক্ষয়শীল—নিত্য নহে। নন্দ এবার সদ্ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া বুদ্ধের নিকট অশেষ উপদেশলাভে ধন্য হইলেন (সর্গ ১২-১৮)।

সৌন্দরনন্দের ভাষা বুদ্ধচরিতের ভাষা অপেক্ষা জটিল ও কাব্য-সৌন্দর্য্যে অপেক্ষাকৃত হীন। কিন্তু বুদ্ধচরিতের ভাষার মত সরল ভাষায় রচনা করার অভ্যাস তাঁহার থাকিলেও কৃত্রিমতার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ পশ্চাৎপদ যে থাকিতেন না—তাঁহার 'গণ্ডীস্তোত্র-গাথা' তদ্বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ। একখণ্ড কাষ্ঠে মুষলাঘাত করিলে যে সকল শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহারা যে কি প্রকার ধর্ম্মোপদেশের প্রতীক হইতে পারে—তাহা বিচিত্র ছন্দোবদ্ধ কাব্যের মধ্য দিয়া প্রকাশ করা কৃত্রিমতার চূড়ান্ত নিদর্শন নহে কি? তবে সেই সঙ্গে কবির সঙ্গীতকলায় ও ছন্দোবৈচিত্র্যে যে অনন্যসাধারণ অধিকার ছিল—তাহাও স্বীকার না করিয়া পারা যায় না।

তাঁহার 'সূত্রালঙ্কার' গ্রন্থের সমগ্র সংস্কৃত মূল বর্ত্তমানে অপ্রাপ্য।—উহার চীন ও তিব্বতী ভাষান্তরমাত্র পাওয়া যায়। চীনা অনুবাদটির তারিখ খ্রী: ৪০৫ অব্দ। Huber সাহেব উহার ফরাসী ভাষায় পুনরনুবাদ করিয়াছেন। শ্রব্য-কাব্যের পদ্য ও গদ্য উভয়রূপের মিশ্রণে উৎপন্ন ভাষায় জাতক ও অবদানগুলির সারাংশ বর্ণনাই সূত্রালঙ্কারের বিষয়বস্তু। বর্ত্তমানে উপলভ্যমান পালি ধর্ম্মগ্রন্থ ও উত্তরভারতীয় বৌদ্ধশাস্ত্রাবলী যে শৈলীতে রচিত, অশ্বঘোষের সূত্রালঙ্কারও সেই শৈলীর অনুসরণ করিয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। আখ্যান কি ভাবে বৌদ্ধধর্ম্মের অনুকূলে প্রচারের উপায়ে পরিণত হইতে পারে—এ গ্রন্থখানি তাহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। আর একটি কথা—এই সূত্রালঙ্কারে বুদ্ধচরিত ও রামায়ণ-মহাভারতের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। আর উহা পাঠে মনে হয় যে, রামায়ণ-মহাভারতোক্ত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের শিক্ষা-দীক্ষার সহিত তিনি বিশেষরূপে পরিচিত ছিলেন।

শুনা যায় যে, 'মহাযানশ্রদ্ধোৎপাদসূত্র'ও তাঁহারই রচনা। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে—মহাযান-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বিজ্ঞানবাদের অনুরূপ একটি সূক্ষ্ম দার্শনিক-সম্প্রদায়ের তিনি প্রতিষ্ঠাতা ও ভাষ্যকার ছিলেন। এক হিসাবে অশ্বঘোষের দার্শনিক জ্ঞান পরবর্ত্তী যুগের বসুবন্ধু-দিঙ্‌নাগ প্রভৃতির জ্ঞান অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিল না।

অশ্বঘোষের 'বজ্রসূচী' বর্ণাশ্রমীদিগের সমাদৃত জাতিভেদ-প্রথাকে আঘাত দিবার উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছিল। তৎকালে ব্রাহ্মণগণ নিজেদের ক্ষত্রিয় অপেক্ষা উন্নত জ্ঞান করিতেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদিগের বিশেষ আক্রোশ ছিল এই কারণে যে, বুদ্ধদেব ক্ষত্রিয়বংশজাত হইয়াও বুদ্ধত্বলাভের পর ব্রাহ্মণগণকেও

উপদেশ দিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। কেবল এই একটিমাত্র কারণেই ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধ-ধর্ম্মের এতদূর বিরোধী হইয়াছিলেন। আর এদিকে অশ্বঘোষও তাঁহার অনন্যসাধারণ যুক্তিজালের সহায়তায় ব্রাহ্মণগণের দুর্ভেদ্য দুর্গস্বরূপ জাতিভেদ-প্রথাকে ধূলিসাৎ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন।

ইহাই হইল মহামনীষী অশ্বঘোষের আবির্ভাবের পটভূমিকা ও তাঁহার শ্রব্যকাব্য-দর্শনাদি-বিষয়ক রচনার সংক্ষিপ্ত পরিচয়। পরবর্ত্তী সংখ্যায় তাঁহার সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ বিবরণ ও তাঁহার অচিরাবিষ্কৃত নাট্যরচনাবলী সম্বন্ধে যথাসম্ভব পরিচয় প্রদানের ইচ্ছা রহিল।

বহ্নি-প্রেম

শ্রীরবীন্দ্রনাথ দাস

রেস্তোরাঁর ম্যানেজার পরিমলবাবুকে বললেন, "মশাই! আপনার সঙ্গে এসেছিলেন, এ হনুমানটী কে? দিয়েছিল লঙ্কাকাণ্ড বাঁধিয়ে। প্রত্যেক টেবিলের উপর এ্যাস্-ট্রে আছে। তাতে জ্বলন্ত সিগারেট না ফেলে, ফেলতে গেলেন কিনা আমার ওয়েষ্ট-পেপার বাস্কেটে। এখনই রেস্তোরাঁ পুড়ে ছাই হয়ে যেত। ভাগ্যে উপস্থিত ভদ্রলোকরা আর—ঐ ভদ্রমহিলা—সকলে মিলে আগুন নিবিয়ে দিলেন। তা না হ'লে ব্যাপার কি হ'ত বলুন দেখি।"

ভদ্রমহিলাটী কালো, মোটা, বয়স ত্রিশের উপর। তাঁর লেসের বডিস ও নেটের কাপড়ের ব্লাউস আবৃত বক্ষ তখনও ঘন ঘন আন্দোলিত হচ্ছিল। এক ভদ্রলোকের হার্ট দুর্ব্বল—তিনি বুকের বাঁ দিকে হাত দিয়ে এলিয়ে প'ড়লেন। ম্যানেজার তাঁর জন্য এক কাপ্ গরম কফির বরাদ্দ ক'রলেন—অবশ্য বিনামূল্যে।

পরিমলবাবু রেস্তোরাঁর বহু পুরাতন খদ্দের। পরিমলবাবু হেসে ব'ললেন, "ওর নাম মনোজ—আমার মাসতুত ভাই। আপনার রেষ্টুরাঁতে না আছে টেবল-হারমনিয়ম, না আছে আয়না-ওয়ালা ড্রেসিং টেবল। আজ কালকার তরুণেরা সাধারণতঃ এ সবার উপরেই জ্বলন্ত সিগারেট রাখে। অগত্যা আপনার ওয়েষ্ট-পেপার বাস্কেটে ফেলেছে। হ্যাঁ তবে একটা কথা প্রসঙ্গক্রমে না বলে থাকতে পারলুম না। আমরা যাকে দোষ বলি তা অনেক সময় গুণ হয়ে দাঁড়ায়। ধরুন্ মনোজের যেখানে সেখানে জ্বলন্ত সিগারেটের শেষ রেখে দেওয়া—মস্ত দোষ, স্বীকার করি, কিন্তু এই অভ্যাসের গুণেই সে এক জমিদারের একমাত্র সুন্দরী কন্যাকে বিয়ে করতে পেরেছে।"

"কি রকম!" বলে যাহারা আগুন নিভিয়েছিল, মায় মিস্ কারফরমা, পরিমলবাবুর টেবিলের চার দিকে নিজ নিজ চেয়ার টেনে এসে ব'সলেন।

পরিমলবাবু ম্যানেজারকে বললেন, "আমার খরচে এক এক কাপ্ চা'র অর্ডার করুন" ব'লে কথা আরম্ভ করলেন।

মনোজ যখন মেসে থেকে কলেজে পড়ত, তিন মেসে আগুন লেগেছিল। যাক্, সে পুরাণ কথা। এম্, এ পাশ করবার পর সে চাকরীর খোঁজে শিয়ালদার কাছে কোন একটা মেসে থাকতো। একদিন টাওয়ার হোটেলে বসে চা খাচ্ছে, এমন সময় এক বিংশ-বর্ষীয়া সুন্দরী তরুণী প্রবেশ করলে। শুধু সুন্দরী বললে তরুণীর উপর অবিচার করা হয়—তরুণী অপরূপ সুন্দরী, আর সযত্ন-নির্ব্বাচিত, আধুনিক পরিচ্ছদে সুন্দরীর রূপ শতস্থানে শতভাবে ফুটে উঠেছিল। মনোজ সুন্দরীকে দেখা মাত্রই তার প্রেমে পড়লো। জ্বলন্ত সিগারেট ফেলার ন্যায় এটাও তার আর একটী অভ্যাস ছিল—সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে প্রথম দর্শনেই তার প্রেম হ'ত—অবশ্য সুন্দরীদের প্রেম হ'ত কি না, জানি না। এবার সৌন্দর্য্যের অনুপাতে প্রেমটা একটু বেশী হ'য়ে পড়লো। তরুণীর সাথে বাক্যালাপ করবার জন্য এবং তার পরিচয় জানবার জন্য মনোজের প্রাণটা আকুলি বিকুলি করতে লাগ্‌ল। তরুণী ঘরে ঢুকে, চা-টোষ্ট ও অমলেটের ফরমাস্ করল। সঙ্গে সঙ্গে মনোজও আর এক কাপ চা আনতে বল্‌ল—তার তরুণীর সঙ্গে পরিচয় করা চাই-ই, অথচ অনর্থক ব'সে থাকলে দেখতে অশোভন হয়। ১০ মিনিট হয়ে গেল। তরুণীর চা-টোষ্ট ও অমলেট আসে না। তরুণী অধীরভাবে হাইহিলের খুট্ খুট্ শব্দ করতে লাগ্‌ল। আরও পাঁচ মিনিট গেল—তরুণীর ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করল। তরুণী উচ্চৈঃস্বরে ডাক্‌ল, "বয়"। শুনে মনোজ চমকে উঠ্‌লো। তরুণী তখন মনোজকে সম্বোধন ক'রে বলল, আপনি "নিশ্চয়ই এ হোটেলের পুরাণ খদ্দের। দয়া করে বয়টাকে একটু তাড়াতাড়ি করতে বলুন্। আমাকে আজই আবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার গাড়ীতে বাড়ী ফিরতে হবে।" মনোজ সিগারেটের পর সিগারেট ধরাচ্ছিল এবং জ্বলন্ত শেষটুকু নিজের অজ্ঞাতেই হোটেলের মেজে পাতা কার্পেটের উপর ফেলেছিল। একজায়গায় আগুন ধ'রে গিয়েছিল। মনোজ জুতোর চাপ দিয়ে আগুন নিবিয়ে দিয়েছিল। অথচ হোটেলের টেবিলের উপর একাধিক ছাই ফেলবার সুদৃশ্য পাত্র। এ-ব্যাপারটী তরুণী লক্ষ্য করছিল। তরুণী যেন আপন মনেই বলে চল্‌ল, "মাসে একটী দিন মাত্র কোলকাতা আসবার অনুমতি পাই। এক রাজ্যের জিনিসপত্র কিনতে হয়। আজ আমাকে কমলালয় ষ্টোর্স, ওয়াছেল মোল্লার দোকান, বেঙ্গল ষ্টোর্স, হোয়াইটওয়ে লেইড্‌ল, হল এণ্ড এণ্ডার্সন প্রভৃতি দোকানে যেতে হবে। তিনটার শো'তে "উদয়ের পথে" দেখতে হবে, তারপর সাড়ে ছ'টাতে গাড়ী ধরতে হবে। চায়ের জন্য এত দেরী হলে আমার চলবে না।" মনোজ এবার আলাপের সুযোগ পেল, বল্‌ল, "আজ ভোরেই বুঝি কলকাতা পৌঁছেছেন? কোত্থেকে আসছেন জিজ্ঞেস্ করতে পারি কি?"

তরুণী। আসছি কাঁচড়াপাড়ার কাছে হরিপুরা গ্রাম থেকে। সেখানে আমাদের বাড়ী। আমি আর বাবা থাকি। মা নেই কি না! বাবা আমাকে না দেখে থাকতে পারেন না।

মনোজ। আপনার বাবার নামটী জানতে পারি কি?

তরুণী। নিশ্চয়। বাবার নাম রায়বাহাদুর শিবশঙ্কর ঘোষ।

মনোজ। তিনি তো স্বনামখ্যাত পুরুষ—মস্ত জমিদার।

তরুণী। মস্ত এককালে ছিলেন বটে, এখন তো আর প্রজাদের থেকে খাজানা আদায় হয় না—সদর খাজানা ঘর থেকে দিতে হয়। এখন জমিদারী শুধু নামে।

মনোজ। তবু মরা হাতির দাম লাখ টাকা।

এমন সময় চা-টোষ্ট প্রভৃতি এসে উপস্থিত হ'ল। চায়ে ধীরে ধীরে চুমুক দিতে দিতে মনোজ জিজ্ঞাসা ক'রলো, "আপনার সঙ্গে কে এসেছেন?"

তরুণী। আমি একাই এসেছি—বরাবরই আসি। আমি বেথুন কলেজ থেকে বি-এ পাশ করেছি। একলা চলাফেরা করতে অথবা জিনিষপত্র কিনতে ভয় পাই না।

মনোজ। আমিও এম-এ পাশ করে চাকরীর উমেদারী করি। আজ সোমবার—তাহ'লেও আজ আমার কোন কাজ নেই। সমস্ত দিনব্যাপী অবসর।

তরুণী। (সাগ্রহে) তবে আসবেন আপনি আমার সঙ্গে Shopping এ সাহায্য করবার জন্য? কেনাকাটার পর চুংওয়া রেষ্টোরাঁতে ব্রেকফাষ্ট ও লাঞ্চ খেয়ে সিনেমা দেখব।

মনোজ। আমার মেস্ কাছেই। ৮৫ নং বৈঠকখানা রোডে। কাপড় বদলে আসব কি?

তরুণী। আপনার যে কাপড় পরা আছে, তাতেই চলবে। চলুন এখন বেরিয়ে পড়া যাক্।

এ-সময় মিস্ কারফরমা পরিমল বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তরুণী ও মনোজের মধ্যে যে-সব কথা হয়েছিল, আপনি তা' জানলেন কি করে?" পরিমলবাবু হেসে বললেন, "মনোজ বহুবার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমাকে ঘটনাটী বর্ণনা করেছে বলে।" মিস্ কারফরমা মিষ্টি হেসে বললেন, "তারপর বলুন।"

পরিমলবাবু বলে চ'ললেন:

ঐ দিন সাড়ে ছয়টার গাড়ীতে মনোজ তরুণীকে তুলে দিতে গিয়েছিল। তরুণী একটী ছোট্ট নমস্কার ক'রে মনোজকে ব'ললে, "আপনার নামটী জানতে পারি কি? আবার কোল্‌কাতা এলে যদি আপনার সাহায্যের দরকার হয়! আজকের সাহায্যের জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।"

মনোজ। কিছু না! আমার নাম মনোজ মোহন বসু। ঠিকানা তো আগেই বলেছি।"

তরুণী। আমার নাম তো সুটকেসের উপর দেখতে পাচ্ছেন।

মনোজ সাগ্রহে দেখলো "Miss মনোরমা ঘোষ B. A., P.O. হরিপুরা, ২৪-পরগণা।" গাড়ী ছেড়ে দিল।

দুই

বৃহস্পতিবার দুপুর বেলা মনোজ সুদৃশ্য খামে একখানি পত্র পেলে। শিরোনামটি সুন্দর পাকা মেয়েলী হাতের লেখা। পত্রখানা তাড়াতাড়ি খুলে পড়লো মনোজ। প'ড়বার পর মুখের যে ভাব হোলো, তার বর্ণনা করা দুরূহ—যুগপৎ বিস্ময়, হর্ষ, আশা আকাঙ্ক্ষা তার মুখে খেলা করতে লাগল। পত্রখানিতে লেখা ছিল—

Dear Mr. Basu.

আপনার যদি অবসর থাকে, তবে অনুগ্রহ করিয়া আগামী শুক্রবার হরিপুরাতে আমাদের গৃহে আগমন করিলে বাধিত হইব। আপনার কথা আমার পিতাঠাকুরকে বলিছি। তিনিও আপনাকে দেখিতে এবং আপনার সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। যদি শুক্রবার ৬॥ টার গাড়ীতে রওনা হন, ৮॥ টার সময় কাঁচড়াপাড়া পৌছিবেন। আমি ও বাবা ষ্টেশনে আপনার জন্য অপেক্ষা করিব। এখানে দর্শনীয় বহু জিনিষ আছে। সাক্ষাতে সমস্ত জানাইব।

যদি আসেন, একখানা তরুবি তার করিবেন। ইতি—

Yours Sincerely
মনোরমা ঘোষ।

চিঠিখানি বার দশেক প'ড়ে পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে শিয়ালদহে গিয়ে জরুরি তার ক'রে এলো মনোজ।

পাম্পশু জোড়া একটু পুরাণ হ'য়েছিল। একজোড়া নূতন Glace kid-এর পাম্পশু কিনলো। আর্জেন্ট মূল্য দিয়ে সিল্কের পাঞ্জাবীগুলি ইস্ত্রি করিয়ে নিল। Fountain pen-এর জন্য একটী নূতন রোল্ড গোল্ডের ক্লিপ কিনলো। চেরিকাঠের একটী সুন্দর ছড়ি কিনলো। Suit-case-এর উপর Mr. M. M Basu, M. A, Calcutta কথাগুলি লেখালো। কারণ তরুণীর Suit-case এর উপর ওর নাম ও ঠিকানা লেখা ছিল—

শুক্রবার আট আনার স্থানে দু'টাকা খরচ ক'রে সাহেবী দোকানে চুল কাটালো এবং দাড়ি কামালো। সঙ্গে মূল্যবান পাউডার, ক্রিম ও সেফটী রেজর সেট নিল। রোজ কামাতে হবে।

মেল গাড়ী—ঘণ্টায় ৪০ মাইল চলে। বারাকপুরে একবার মাত্র থামলো। মনোজের মনে হলো গাড়ীটা আরো বেগে চলে না কেন? যদি বিলেত বা আমেরিকা হোতো, ঘণ্টায় অন্ততঃ ৬০ মাইল ছুটতো। যাক্, ঠিক ৮॥ টায় গাড়ী কাঁচরাপাড়ায় পৌছলো।

দেখল প্ল্যাটফরমের উপর তরুণী দণ্ডায়মান। মুখে সস্মিত ভাব। পরিচ্ছদ পূর্ব্বাপেক্ষা পরিপাটী। তরুণী অগ্রসর হ'য়ে হাত বাড়িয়ে দিল। ব'ললো, আসুন, স্বাগত (Welcome) পথে কোন কষ্ট হয় নাই তো?

মনোজ। কিছু না! আপনার বাবা আসেন নি?

মনো। তার শরীরটা বড় ভাল নয়। তা ছাড়া, বাড়ীতে অনেক অতিথির আগমন হ'য়েচে কি না—তাঁদিগে ফেলে কি করে আসেন? কাজেই আমাকেই পাঠালেন।

মনোজ। তা আপনি যে কষ্ট করে এসেছেন সেজন্য ধন্যবাদ।

মনোরমা একাকিনী তাকে অভ্যর্থনা ক'রতে আসায় মনোজ

যেমন হর্ষবোধ ক'রেছিল, অতিথিদের নাম শুনে তেমনি বিষন্ন হোলো। টু-সিটার গাড়ীতে মনোরমার পাশে ব'সে মনোজ জিজ্ঞাসা ক'রলো—অতিথির কথা বলছিলেন, তাঁরা কারা?

মনো। তাঁরা সকলেই আপনার মত ইয়ংম্যান্—আপনারই বয়সী। মিষ্টার চাকলাদার, ব্যারিষ্টার; মিষ্টার তালুকদার, ইঞ্জিনিয়ার; ডাক্তার জোয়ার্দার, F. R.C.S.; মিষ্টার মিত্র—এড্‌ভোকেট; মিষ্টার গুহ, কণ্ট্রাকটার এবং মিষ্টার মজুমদার ইলেক্‌ট্রিসিয়ান্।

মনোজ। এ যে পূরো অর্দ্ধডজন। এঁদের স্ত্রীরা সঙ্গে আসেন নাই?

মনো। এঁদের কারও স্ত্রী নাই। কারণ ওঁরা বিয়েই করেন নি।

শুনে মনোজের মনটা দমে গেল। ভাবলো, লোকগুলো কি স্বার্থপর! এদের কি বাপ, মা, পিসীমা, ঠাকুরমা, কেহই নাই? এত বয়স পর্য্যন্ত ধরে বিয়ে করায় নাই।—মনের দারুণ অস্বস্তি গোপন ক'রে জিজ্ঞাসা করল, "এঁরা কতদিন থাকবেন?"

মনো। এঁরাও সোমবার প্রাতে চলে যাবেন। আজই বৈকালে এসে পৌঁছেছেন।

মনোরমা পাকা ড্রাইভার। দশ মিনিটে তিন মাইল পথ অতিক্রম ক'রে বাড়ীর দরজায় এসে পৌঁছলো।

বাড়ীটা প্রকাণ্ড। দ্বিতল। তিন মহল। বাড়ীটা অত্যন্ত পুরাণ—বোধ হয় একশত বৎসর পূর্ব্বে তৈরী হয়েছিল। কড়ি, বরগা, মেজে সবই কাঠের। দরজা জানালাগুলি বড় বড়, কিন্তু কাঠগুলি পুরাণ, ঝরঝরে—দেশলাইর কাঠের মত হয়ে গিয়েছে। দোতলায় অনেকগুলি বেলকনি ও রেলিং—বেলকনির ছাদগুলি পুরাণ কাঠের। বাড়ীর চারদিকে প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড—বাড়ীর সাম্‌নে নানাপ্রকার ফলের সযত্ন-রচিত বাগান। দুই পার্শ্বে ও পেছন দিকে নানা প্রকার ফলের গাছ, আম, জাম, কাঁঠাল, নারিকেল, সুপারি প্রভৃতি।

দরজার নিকট রায় বাহাদুর অপেক্ষা করছিলেন। মনোরমা ও মনোজ গাড়ী থেকে অবতরণ করা মাত্র, রায় বাহাদুর সাদরে মনোজকে অভ্যর্থনা ক'রলেন। মনোজ আভূমি নত হয়ে রায়বাহাদুরের পদধূলি গ্রহণ ক'রলো। রায়বাহাদুর বললেন, "দীর্ঘজীবী হও! এস বাবা। বৈঠকখানায় খানিকক্ষণ বসো। তারপর তোমাকে তোমার ঘর দেখিয়ে দেবো। পথে কোন কষ্ট হয় নি তো?"

মনোজ। কিছু না। বেশ আরামেই এসেছি।

মনো। আজকালকার রেলগাড়ীতে আবার আরাম!

ওদের কথাবার্ত্তা শুনে একে একে জন ছয়েক অতিথি আপন আপন ঘর থেকে বৈঠকখানার ঘরে এসে উপস্থিত হোলো। সকলেই মনোজের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করলো। কারণ এদের কাউকেও মনোরমা নিজে অভ্যর্থনা ক'রতে ষ্টেশনে যায় নাই।

খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তা ও মৌখিক আদর আপ্যায়নের পর যে যে যার যার ঘরে চ'লে গেল। রায় বাহাদুর মনোজকে ব'ললেন, "এস বাবা! তোমার ঘর দেখিয়ে দেই। তোমার সুটকেস্ পূর্ব্বেই চাকরেরা তোমার ঘরে নিয়ে গিয়েছে।"

প্রথম মহলের নীচের তলায় আটখানি বড় ঘর। তারই একটী মনোজের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল! বেশ পরিপাটীরূপে সাজান। একটী সিঙ্গল খাট। তার উপর দুগ্ধফেননিভ কোমল শুভ্র শয্যা। নেটের মশারি। একটী টেপয়, দুইখানি চেয়ার, একটী ইজিচেয়ার, বৃহৎ আয়নাযুক্ত ড্রেসিং টেবল, কাপড় রাখবার আয়না, একটী রাইটিং টেবল, একটী ওয়েষ্টপেপার বাস্কেট ও একটী আলমারি। টেপয়ের উপর একটীন মূল্যবান্ সিগারেট ও দু'টী টেক্কামার্কা ম্যাচ্ বাক্স। রাইটিং টেবিলের উপর একটী Writing pad এবং লিখবার জন্য এক প্যাকেট চিঠির কাগজ ও খাম।

রায় বাহাদুর প্রত্যেকটী আসবাব-পত্র মনোজকে দেখিয়ে বিদায় নিলেন। বললেন, "পাশেই বাথরুম। হাত মুখ ধুয়ে বিশ্রাম কর। ইচ্ছা করলে স্নানও করতে পার; ১০টার সময় খাওয়ার ডাক পড়বে।"

ঘরটী পূর্ব্বমুখী। দরজা ও জানালায় সুদৃশ্য পরদা টাঙান। রায় বাহাদুর উপরে চলে গেলেন। মনোরমা বৈঠকখানা থেকে উপরে চলে গিয়েছিল।

মনোজ প্রথমেই টীন খুলে একটী দামী সিগারেট ধরালো। সিগারেট্ শেষ করে সুট্‌কেস্ খুলে কাপড় জামা পরিবর্ত্তন ক'রে বাথরুমে স্নান ক'রলো। তারপর চিরুণী ও ব্রাস সহকারে চুলের পারিপাট্য বিধানে মনোযোগ দিল। পমেড ও পাউডারের ব্যবহারে কার্পণ্য করলো না। তারপর ইজি চেয়ারে বসে আর একটী সিগারেট ধরালো। এমন সময় পার্শ্ববর্ত্তী ঘর গুলি থেকে সোডা খুলবার শব্দ শুনলো। মধ্যে মধ্যে ফিস ফিস শব্দ শুনতে লাগলো; শুনলো একজন যেন আর একজনকে বলছে, "বেশী টানিস্‌নি। গন্ধ বেরুলে সব মাটী হবে।" ইত্যাদি।

যা হোক্, ১০টার সময় খাওয়ার ডাক পড়'লো। খাওয়ার ঘরটী বড়। মধ্যে বৃহৎ মেহেগনির টেবল—অবশ্য বেশ পুরাণ। চারদিকে বারখানি সুদৃশ্য চেয়ার। টেবলের একদিকে রায় বাহাদুর, অন্যদিকে মনোরমা। মধ্যের চেয়ারে সাত জন অতিথি। মনোজ দেখল, তার আসন মনোরমার আসনের নিকটে। ওর মনে নৈরাশ্যের মধ্যে একটু আশার আলো ফুটে উঠলো।

গ্রাম দেশ, তাতে রায়বাহাদুর জমিদার। খাওয়ার প্রচুর আয়োজন এবং দক্ষপাচক কর্ত্তৃক প্রস্তুত। পোলাও, মাছ, মাংস, চপ, কাটলেট, কোর্ম্মা, পুডিং, দই ও সন্দেশ—কিছুরই অভাব নাই। হাসি, গল্পে সকলেই আকণ্ঠ আহার করলো।

তারপর পান খেয়ে এবং রায়বাহাদুর ও মনোরমাকে যথা-যোগ্য অভিবাদন করে রাত্রি এগারটার সময় সকলে শয়ন করতে গেল।

সে দিন পূর্ণিমা রাত্রি। চাঁদ মনোজের ঘরের সম্মুখবর্ত্তী গাছের উপর উঠেছে। জানালার মধ্য দিয়ে জোছনা ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে। একে অপরিমিত আহার তারপর দারুণ

মানসিক উত্তেজনা ও উদ্বেগ। মনোজের কিছুতেই ঘুম আসছিল না। হঠাৎ তার মনে হোলো, কবিতা রচনা করবে, এমন চাঁদের আলো, এমন তরুণীর আহ্বানে আতিথ্য গ্রহণ—কবিতার প্রচুর খোরাক ; রাইটীং টেবলে বসে চিঠির কাগজে লিখতে আরম্ভ ক'রলো মনোজ। লিখলো—

মনোরমে ! প্রিয়তমে ! ভেবেছিনু মনে
আমাকেই শুধু তুমি করেছ আহ্বান।
আসিয়া দেখিনু অহো ! তোমার ভবনে
আধেক ডজন আরো লভিয়াছে স্থান ;
কি দুর্দ্দৈব !

না, এ কবিতা হ'ল না। এ তো মনের আক্রোশ প্রকাশ। মনোরমার রূপ বর্ণনা করতে হবে।—ব'লে কাগজ খানি ওয়েষ্ট পেপার-বাস্কেটে নিক্ষেপ করলো। তারপর মনোরমার রূপ-বর্ণনায় প্রবৃত্ত হোলো। কিছুতেই কবিতাটী মনঃপূত হচ্ছে না। একে একে চৌদ্দখানি চিঠির কাগজ নষ্ট ক'রে ওয়েষ্ট পেপার-বাস্কেটে ফেললো। শেষে লিখলো—

মনোরমে ! প্রিয়তমে ! কেমনে বর্ণিব
তোমার অনিন্দ্যরূপ ? কোথা লাগে চাঁদ
তোমার মুখের কাছে ? নিশ্চয় মরিব,
যদি না ধরিতে পারি পাতি' প্রেমফাঁদ।

ভাবিল এবার মন্দ হয় নাই। তারপর কাগজটি গুটিয়ে পকেটে রেখে দিল। ইতিমধ্যে মনোজ ১৭টী সিগারেট নিঃশেষ করেছে এবং পূর্ব্ব অভ্যাস বশতঃ সিগারেটের জ্বলন্ত শেষ ওয়েষ্ট-পেপার-বাস্কেটে নিক্ষেপ করেছে। লেখা শেষ করে ওর মনে হোলো—একবার চন্দ্রালোকে বাগানে বেড়িয়ে আসা যাক। দরজা খুলে বাগানে বার হোলো। বার হবার সময় দরজার পরদার এককোণ ওয়েষ্ট পেপার-বাস্কেটের উপর পড়লো। মিনিট পাঁচেক বাগানে বেড়াবার পর ঘরে ফিরবার জন্য মুখ ফিরাতেই দেখলো দরজার পরদায় আগুন ধরে গিয়েছে এবং দরজার চৌকাঠের স্থানে স্থানে আগুন জ্বলছে। মনোজ আর্ত্তস্বরে চীৎকার করে উঠল, "আগুন, আগুন"।

চীৎকার শুনে নীচের তলা থেকে চাকলাদার এণ্ড কোম্পানী বার হোলো। গেঞ্জি গায়ে রায় বাহাদুর কাছা আঁটতে আঁটতে নীচে নামলেন। একটু পরেই মনোরমা নাইট গাউনের উপর ড্রেসিং গাউনের কোমরবন্ধ বাঁধতে বাঁধতে নেমে এলো। উদ্বেগ ও উত্তেজনায় ওর গাল ঈষৎ রক্তিম। এ বেশে মনোরমাকে দেখে মনোজের মনের আগুন যে দ্বিগুণ জ্বলে উঠলো তা বলা বাহুল্য।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্রতিবেশিগণও উপস্থিত হোলো। গ্রাম দেশে ফায়ার-ইঞ্জিন নাই। ভৃত্যগণ বালতি নিয়ে এলো। চাকলাদার কোম্পানী ও প্রতিবেশিগণ বালতিতে করে পার্শ্বস্থ পুষ্করিণী থেকে জল এনে আগুন নেভাতে চেষ্টা ক'রলো।

এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন। মনোজ অনিচ্ছাক্রমে আগুন লাগাবার বিদ্যাটী আয়ত্ত করেছিল, কিন্তু আগুন নেভাবার কৌশল জানতো না। যখন অন্য সকলে বালতির জল ঢেলে আগুন নেভাতে ব্যস্ত, তখন মনোজ বালতির মধ্য দিয়ে ছুটাছুটী করতে লাগলো এবং দুই তিন বালতি জল তার পায়ে ঠেকে গড়িয়ে পড়লো। দুই তিনবার বালতি নিয়ে আগুন নেভাতে চেষ্টা করতে, বালতির জল আগুন স্পর্শ না করে চাকলাদার কোম্পানীর তিন চার জনকে অসময়ে স্নান করিয়ে দিল। চাকলাদার কোম্পানী ও প্রতিবেশিগণ জোর ক'রে মনোজকে বাগানে নামিয়ে দিল এবং আগুনের নিকটে আসতে নিষেধ করলো! অগত্যা মনোজ মনোরমা ও রায় বাহাদুরকে দেখতে লাগল! দেখলো উভয়ে তার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে এবং তাদের দৃষ্টি প্রশংসমান, বিরক্তিপূর্ণ নহে।

অবশেষে আগুন নিভলো। প্রতিবেশিগণ ও চাকলাদার কোম্পানী নিজেদের গৃহে ও বাসায় ফিরে গেল।

রায়বাহাদুর ও মনোরমা মনোজের ঘরের সম্মুখে বাগানে পায়চারি ক'রতে লাগলেন। মনোজ জানালার সম্মুখে চেয়ারে ব'সে তাঁদের কথা শুনতে পেল।

পিতাপুত্রীতে নিম্নলিখিত কথোপকথন হচ্ছিল।

পিতা। মনোজ ছেলেটী কি চমৎকার! কিরূপ বুদ্ধিমান্? দেখলি দুই তিন বালতি জল, ইচ্ছা করে অথচ যেন অসাবধানতায় ফেলে দিল। দুই তিন বালতি জলে আগুন না নিভিয়ে তোর এই গর্দ্দভ বন্ধুগুলিকে স্নান করিয়ে দিল। এই গর্দ্দভগুলিকে তুই কেন নিমন্ত্রণ করেছিলি? ওরা না থাকলে, আজই আমার কার্য্যসিদ্ধি হ'ত।

মনো। আগে যদি জানতুম যে ওরা এরূপভাবে আগুন নিভাবার জন্য উঠে প'ড়ে লাগবে, তাহ'লে কখনও নিমন্ত্রণ করতুম না। যাক্, সামনের উইক্ এণ্ড-এ শুধু মনোজবাবুকেই আসতে লিখ্‌ব।

পিতা। সে তো এক সপ্তাহ পর। আমার মতে মনোজকে ছেড়ে দিব না। সোমবার প্রাতে তোর গর্দ্দভ বন্ধুরা বিদায় নিলে মনোজকে আরও দুই চার দিন রাখ্‌ব। তারপর ওকে দিয়ে যা করাতে হয় করাব। আর এ-গ্রামে থাকতে পারি না। ফায়ার ইন্‌সিওরেন্সের লাখ টাকা পেলেই গ্রাম ছেড়ে বালিগঞ্জে বাসা ক'রে থাকব। আর গ্রামে ফিরব না।

মনো। আঃ, কি সুযোগটাই বৃথা হ'ল।

এতক্ষণে মনোজ প্রকৃত বিষয়টী হৃদয়ঙ্গম করলো। সে সন্তর্পণে দরজা খুলে বার হ'ল। রায় বাহাদুরকে বললো, "সোমবার পর্য্যন্ত বিলম্ব করবার আবশ্যক নাই। আজই শেষরাতে কাজ সারতে হবে। অনেক সময় আমরা মনে করি আগুন সম্পূর্ণরূপে নিভে গেছে, কিন্তু আবার জ্বলে ওঠে। লোকে মনে করে প্রথমবার আগুন নিঃশেষে নিভান হয় নাই, সেজন্যই আবার জ্বলে উঠেছে। এবার এরূপভাবে আগুন ধরাতে হবে যাতে চাকলাদার কোম্পানী ও প্রতিবেশিগণ শত চেষ্টা ক'রেও আগুন নিভাতে না পারে। আপনাদের ঘরে পেট্রল আছে, নিশ্চয়।

রায়বাহাদুর। সাবাস্ বাবা! বেঁচে থাক। ব্ল্যাকমার্কেট থেকে কেনা প্রায় দশ টিন পেট্রল ঘরে মজুত আছে।

মনোজ। যথেষ্ট। এখন রাত্রি প্রায় বারটা। ভোর চারটাতে কাজ শেষ কর্‌তে হবে। আপনি বিশ্রাম করুন; এ-ব্যাপারে চাকরদের বিশ্বাস করা উচিত নয়। আমি আর মিস্ ঘোষই সব বন্দোবস্ত কর্‌ব।

রায়বাহাদুর। বেশ, বাবা! আমি চল্লুম। বেশ বুঝে শুনে কাজ করো—শুধু আমার নয়, নিজের যদি কিছু কর্‌বার থাকে, তাও করো। ভাল কথা, বাগানে ফুলের গাছের গোড়ায় জল দেবার জন্ম আমাদের একটা হোজ্ (Hose) আছে। মা জানে, কোথায় আছে।

রাত ৪টার সময় সমস্ত বাড়ীটা দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠ্‌ল। কবাটে আগুন, চৌকাঠে আগুন, জানালার সারসীতে আগুন, কড়ি-বরগায় আগুন, দোতলার কাঠের মেজেতে আগুন, বাড়ীর চারিদিককার বেলকনির কাঠের ছাদে ও রেলিং-এ আগুন। এবার চাকলাদার কোম্পানী, প্রতিবেশিগণ ও ভৃত্যবর্গ—সকলের প্রাণপণ চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে গৃহটী ভস্মীভূত হ'ল।

এতক্ষণ পরে মিস্ কারফরমা মুখ খুল্‌লেন। পরিমল বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হোজ দিয়ে পেট্রল পাম্প করতে মনোরমার চার ঘণ্টা সময় লাগ্‌তে পারে না। বাকী সময়টা ওরা কি করলো?"

পরিমলবাবু হেসে বললেন, "সেটা মনোজ পরিষ্কার ক'রে বলে না। তবে সে-সময়টা যে বৃথা নষ্ট করে নাই, তা' সুনিশ্চিত।" শুনে মিস্ কারফরমার বুকখানি পূর্ব্বের স্তায় সঘন স্পন্দিত হ'তে আরম্ভ করলো।

আর সকলে জিজ্ঞাসা করলো—"তারপর?"

পরিমল বাবু ব'ললেন, "তারপর—

আমার কথাটী ফুরাল, নটে গাছটী মুড়াল।

রায়বাহাদুর ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর নিকট পুরোপুরি এক লাখ টাকা পেলেন। তন্মধ্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যে বালীগঞ্জে একটী সুন্দর ত্রিতল বাড়ী কিনে তথায় কন্যা মনোরমা ও জামাই মনোজের সঙ্গে একত্র বাস কর্চ্ছেন। আজ অনেক দিন পরে মনোজের সঙ্গে দেখা হ'ল। তাই ওকে এই রেস্তোরাঁতে চা খেতে ডেকেছিলুম। কি কাণ্ড! ক'রে বসেছিল, আপনারা জানেন। তাই বলি—

দোষ হ'য়ে গুণ হ'ল মোনার বিছায়।

ম্যানেজার বাবু, সকলের জন্য আর এক কাপ ক'রে চা আন্‌তে বলুন। *

(ইংরেজী গল্পের ছায়া অবলম্বনে)

মুক্ত-দ্বার

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

এইবার বুঝি যাবার ঘণ্টা—বাজিল।
প্রধান দরজা এতদিনে দ্বারী—খুলিল।
ফেলে রাখ্ তোর বাঁশী আর গান,
বন্ধ কোরে দে পূরবীর তান,
সকল দ্বন্দ্বের আজি অবসান—ঘটিল।
এতদিনে দ্বারী প্রধান দরজা—খুলিল।

দে রে ছিঁড়ে ফেলে যত ফুলমালা.
সাঙ্গ হোল রে আসরের পালা,
থাক্ পড়ে থাক্ বরণের ডালা,
উৎসব-আলো নিভিল।
যা'বার ঘণ্টা এইবার বুঝি—
বাজিল—বাজিল—বাজিল।

দূরে সরে যা রে তোরা এইবার,
মুখপানে চেয়ে থাকিস্ না আর,
স্নেহের দৃষ্টি ফিরা'য়ে নে সব—ফিরা'য়ে।
সকল বাঁধন ছিন্ন কোরে দে,
পারিবি না আর রাখিতে রে বেঁধে,
ছেড়ে দে এবার, রাখিস্ না আর জড়া'য়ে।
দ্বারী খোলে দ্বার সম্মুখে ওই দাঁড়া'য়ে।

এ-নাটকের হোল এইখানে শেষ—সহসা।
নিদাঘের মাঝে এল আজি এল—বরষা।
মেঘে-মেঘে ওই বাজিতেছে শাঁখ,
বন্ধ হোল রে যত হাঁক-ডাক,
যত কোলাহল—থামিল।
সাধের নাট্য-শালার আলোক
আজি রে নিভিল—নিভিল।

জমা-খরচের হিসাব আজি রে
বন্ধ করিয়া রাখ্।
দেনা-পাওনা যা' রয়েছে যেখানে,
সেইখানে পড়ে থাক্।

সারা জীবনের মিথ্যার মাঝে,
দেখা দিল যাহা সত্যের সাজে,
সেই মোর প্রিয় বন্ধু আমার—
শাশ্বত সনাতন।
আদিতেও সেই, অন্তেও সেই—
নিত্য-নিরঞ্জন।

রাজলক্ষ্মী ও কমললতা

ডক্টর শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

এক

ঢাকা জগন্নাথ হল হইতে প্রকাশিত 'বাসন্তিকা' পত্রিকার একবিংশ বার্ষিকী সংখ্যাটী সম্পাদক মহাশয়ের সৌজন্যে আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছে। এই সংখ্যা উপাদেয় ও চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ-সম্ভারে পূর্ণ। ইহার মধ্যে শ্রীযুক্ত বিশ্বরঞ্জন ভাদুড়ী লিখিত 'শ্রীকান্ত ও কমললতা' প্রবন্ধে উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধবৈশিষ্ট্যটী উপভোগ্য মৌলিকতার সহিত আলোচিত হইয়াছে। লেখক যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত বিষয়টীর আলোচনা করিয়াছেন তজ্জন্য তিনি শরৎ-সাহিত্য-পাঠকের ধন্যবাদার্হ। এই প্রসঙ্গে লেখক উক্ত বিষয় সম্বন্ধে আমার অভিমত উদ্ধার করিয়া আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন ও আমার সহিত তাঁহার মতভেদের কথা উল্লেখ করিয়া যুক্তি দেখাইয়াছেন। এই উপলক্ষে আমি এই বিষয়ে আমার পূর্ব্বমতটি পর্য্যালোচনা করিবার সুযোগ পাইলাম বলিয়া লেখকের প্রতি কৃতজ্ঞ। সাহিত্য-বিচারে মতভেদ অপরিহার্য্য ও ভুলভ্রান্তি এড়ানও সহজসাধ্য নহে। ইহার সমস্যাগুলি এতই বিচিত্র ও বহুমুখী যে ইহাদের কোন কোন দিক্ তীক্ষ্ণদৃষ্টি সমালোচকেরও বিচারবুদ্ধির নিকট ধরা পড়ে না। তা ছাড়া রসবোধের মানদণ্ডের যে বৈষম্য তাহা ত' অনতিক্রম্য। লেখক এই সমস্যার যে উপেক্ষিত দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন তাহাতে আমার পূর্ব্ব সিদ্ধান্তের আমূল বা আংশিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে পারে কি না দেখা যাউক।

রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে শ্রীকান্তের প্রেমে যে আদর্শ বিশুদ্ধির অভাব এ-সত্যটী বিশ্বরঞ্জন বাবু সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য। এ-বিষয়ে গ্রন্থকারের নিজের সমর্থন যখন তিনি পাইয়াছেন, তখন ইহাতে সন্দেহের কোন অবসর নাই। বাস্তবিক সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে রাজলক্ষ্মীর প্রেমে একটা আত্মপ্রতিষ্ঠার আতিশয্য, একটা জোর-জবরদস্তির ভাব আছে। এই প্রেমের অত্যাচার সাধারণ লোকের পক্ষে প্রণয়ের একটা আকর্ষণ বলিয়াই গৃহীত হয়। আমারই কল্যাণের জন্য, সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, প্রণয়াস্পদের দ্বারা আমার ইচ্ছার অভিভব—সাধারণতঃ ইহা প্রেমের নিবিড়তা ও নিশ্ছিদ্রতার চিহ্ন বলিয়াই আদরণীয়। কিন্তু তথাপি শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর প্রবল ইচ্ছাশক্তির এই ক্রিয়াকে ঠিক প্রসন্ন পরিতৃপ্ত স্বীকৃতির সহিত গ্রহণ করিতে পারে নাই—তাহার অন্তরের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম অতৃপ্তি, একটা উদাস, অসহায় আত্মসমর্পণের ভাবের দ্বারাই সে রাজলক্ষ্মীর প্রেমের দস্যুবৃত্তির প্রতি সাড়া দিয়াছে। কোন সাধারণ স্থূলরুচিসম্পন্ন ব্যক্তি এই সদা-জাগ্রত কল্যাণকামনা, ঐকান্তিক সেবা-পরিচর্য্যা, আদেশ-নির্দ্দেশের অলঙ্ঘনীয়তা ও আত্মবিসর্জ্জন তৎপরতার মধ্যে আদর্শ প্রণয়ের পূর্ণ পরিতৃপ্তির আস্বাদ পাইত। এমন কি, ধর্ম্ম-লুব্ধতার বিপরীত আকর্ষণে প্রণয়ের সাময়িক অভিভব ও উপেক্ষাও বিশেষ কোন বিরাগের সৃষ্টি করিত না। কিন্তু শ্রীকান্তের প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্যের জন্য, তাহার বন্ধন-অসহিষ্ণু, মুক্ত নির্লিপ্ত মনোভাবের জন্য, যাহা সাধারণের রুচিকর ও সুস্বাদু হইত তাহা তাহার

ও অবসাদে ভরিয়া তুলিয়াছে। যাহা অপরের কণ্ঠে স্বর্ণহার হইত, তাহা তাহার পায়ে লৌহনিগড়ের ন্যায় অনুভূত হইয়াছে। এইজন্য প্রণয়িনীর নিশ্ছিদ্র অভিভাবকত্ব, তাহার অসপত্ন অধিকারের দাবী—তাহার অন্তরের স্বাধীনতাস্পৃহাকে পীড়িত করিয়াছে। রাজলক্ষ্মী ধর্ম্মসংস্কারের ও আচারগত শুচিতার তাগিদে যাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, অধিকারলোপের ভয়ে আবার তাহারই পশ্চাদ্ধাবন করিয়া একটা হাস্যকর অসঙ্গতির সৃষ্টি করিয়াছে। তাই আমরা তাহাকে একবার পুঁটুর দ্বিতীয় বার কমললতার প্রতিদ্বন্দ্বিনীরূপে আসরে নামিতে দেখি। এই অশোভন প্রতিযোগিতায় তাহার যে মর্য্যাদাহানি হইয়াছে, তাহা তাহার অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতাকে গঞ্জনা দিবার জন্যই যে লেখকের অভিপ্রেত তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু গৃহিণীত্বের গৌরব যেমন স্বামীর সহিত ছোটখাট কলহবিরোধকে অনায়াসে পরিপাক করিয়া লয়, রাজলক্ষ্মীর প্রেমও তেমনি এই ছোটখাট অমর্য্যাদাকে অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছে। সমুদ্রের গহন গভীরতায় আলোকিত, অন্ধকার নিশীথিনীর গর্ভোদ্ভিন্ন, নানা দুর্য্যোগ ঝঞ্ঝাবাতে মার্জ্জিত-কান্তি এই প্রেমচন্দ্র তুচ্ছ লাঞ্ছনা কলঙ্কের চিহ্নগুলিকে নিজ রজত-শুভ্র কৌমুদী-প্লাবনের মধ্যে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে।

এ-পর্য্যন্ত বিশ্লেষণের ধারা অনুসরণ করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তাহা এই—শরৎচন্দ্র শ্রীকান্তের প্রতি রাজলক্ষ্মীর প্রেমে, বাঁধিবার আত্যন্তিক ব্যগ্রতা আছে বলিয়া, ইহাকে প্রেমের আদর্শরূপে গ্রহণ করেন নাই, এবং তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বকই ইহার সহিত কমললতার প্রেমের তুলনা করিয়া পরজাত হৃদয়-সম্পদটীরই শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন। এই যুক্তিধারা মানিয়া লইলে রাজলক্ষ্মীর প্রেমের অবমাননায় আমার বিস্ময় প্রকাশ বা প্রতিবাদ-জ্ঞাপন সমর্থনযোগ্য নহে। লেখক যাহা জানিয়া শুনিয়া খোলা চোখে যাহা করিয়াছেন তাহাতে আকস্মিকতার আরোপ সমালোচকের বিচার-বিভ্রম। কিন্তু প্রশ্নের এইখানেই মীমাংসা হয় না। লেখকের উদ্দেশ্য অবগত হইলে সেই উদ্দেশ্য কতদূর সিদ্ধ হইয়াছে তাহাও সমালোচকের বিচার্য্য। রাজলক্ষ্মীর অপেক্ষা কমললতার প্রেম যে শ্রেষ্ঠ তাহা লেখকের ব্যক্ত বা অব্যক্ত অভিপ্রায়ের উপর নির্ভর করিয়া মানিয়া লইলে চলিবে না, তাহা বিচারবুদ্ধির দ্বারা যাচাই করিতে হইবে। আদর্শের উৎকর্ষ যে সকল সময় সাহিত্যিক রূপায়ণের উৎকর্ষের হেতু তাহা নহে।

বিশ্বরঞ্জন বাবু কমললতার প্রেমকে বৈষ্ণব-সাধনার আসক্তি-বিহীন, অধ্যাত্মচেতনাপূর্ণ প্রেমের লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ প্রেম বাঁধিতে চাহে না, অধিকার প্রয়োগের প্রয়োজন অনুভব করে না, দৈহিক সম্পর্কের অপেক্ষা রাখে না—ইহা প্রেমাস্পদকে প্রীতিস্নিগ্ধ মানসস্পর্শে অভিষিক্ত করিয়াই কৃতার্থ; স্মৃতির অক্ষয় পাথেয় সম্বল করিয়াই ইহা চির অভিসারের অফুরন্ত পথে জয়যাত্রায় বাহির হয়। হয়ত লেখকের ইহাই মনোগত অভিপ্রায় ছিল; হয়ত কমললতাকে বৈষ্ণবের আশ্রম-প্রতিবেশে, বৈষ্ণব ধর্ম্মসাধনার অভ্যস্ত কর্ম্মপদ্ধতির মধ্যে স্থাপন করার ইহাই গূঢ় উদ্দেশ্য। শ্রীকান্তের বৈরাগী মনও ঠিক এই রকম প্রেমের মধ্যে তাহার জীবনব্যাপী অনুসন্ধান-আকুতির

চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে—বিশ্বরঞ্জন বাবু লেখকের এই অন্তর্নিহিত অভিপ্রায়টি চমৎকারভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—"শ্রীকান্তের হৃদয়-বাধিকা প্রেমের যে সার্থক রূপটী দেখিবার আশায় জীবনে যে দুর্গম অভিসারে যাত্রা করিয়াছিল, তাহার পরিপূর্ণ রূপটি দেখিয়াছে কমললতার মধ্যে।"

দুই

কিন্তু প্রশ্ন উঠে যে, কমললতার এই রূপক-প্রতিভাসে রহস্যানিবিড় প্রেমটী শরৎচন্দ্র কি ভাবে পাঠকের নিকট ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কোথায় ইহার অঙ্কুরোদ্গম; কোথায় ইহার পরিণতির ইতিহাস; কোথায় ইহার ঘাত-প্রতিঘাত-চঞ্চল, আনন্দ-বেদনায় দোলায়িত পরিপুষ্টির মধ্যবর্ত্তী স্তর; কোথায় বা ইহার শিরা-উপশিরায় সঞ্চরণশীল বেগবান রক্তপ্রবাহ ও নিগূঢ় মাধুর্য্যরস? ইহা যাদুকর-রোপিত বৃক্ষের ন্যায় নিমেষের মধ্যে শাখা-প্রশাখাবহুল ও পল্লবঘন হইয়া উঠিয়াছে—ঠিক ফলবান্ যে হইয়াছে এমন কথা বলিতে পারি না। বিশ্বরঞ্জন বাবু হয়ত আত্মপক্ষ-সমর্থনে বলিতে পারেন যে, রূপকের ইঙ্গিতই এখানে যথেষ্ট; সংবেদনশীল পাঠক এই ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়াই সমগ্র ইতিহাসটী মনশ্চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত করিতে পারেন। কিন্তু যে সার্থক তথ্যসমাবেশ ও তাহার মর্ম্মোদ্ঘাটন উপন্যাসের মূলনীতি, অর্দ্ধস্ফুট ইঙ্গিতের অনির্দ্দেশ্যতা কি তাহার সহিত খাপ খায়? যদিই বা তাহা সম্ভব হয়, তথাপি ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে শ্রীকান্তের পূর্ব্ববর্ত্তী খণ্ডগুলিতে যে রীতি অবলম্বিত হইয়াছে, চতুর্থ পর্ব্বে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। রাজলক্ষ্মীর প্রেম সম্বন্ধে লেখক ত এই অর্দ্ধ-প্রচ্ছন্ন অভিব্যক্তির ধাঁধাঁলাগানো উপায় অবলম্বন করেন নাই। সেখানে যে প্রেমটীকে আমরা চোখের সম্মুখে ধীরে ধীরে বিকশিত হইতে দেখি, তাহার মধ্যে ত' কোন ইন্দ্রজাল-সুলভ আকস্মিকতা নাই। ইহা শৈশব-সাহচর্য্যের স্মৃতির আশ্রয়ে উদ্ভূত হইয়া কলঙ্কিত যৌবনের পঙ্কস্তর হইতে নিগূঢ় জীবনীশক্তি আহরণ করিয়াছে—বাহিরের বাধা ও অন্তরের বিরোধের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া অজেয়ত্ব অর্জ্জন করিয়াছে; জীবনের নানা পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়া সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতা ও নিবিড় রসমাধুর্য্যে ভরিয়া উঠিয়াছে। সময় সময় ইহা মুহূর্ত্তের বিভ্রমে আপনাকে আপনি অস্বীকার করিয়াছে, কিন্তু প্রত্যেক বারেই এই আত্ম-অস্বীকৃতির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়ায় ইহা আরও দৃঢ়মূল ও আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। ধর্ম্মসংস্কারের মরুবালুকা ইহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিল; কিন্তু বালুকাগর্ভে ক্ষণিক আত্ম-নিমজ্জনের পর ইহার অমৃত-নির্ঝর আরও অজস্র ধারায় উৎসারিত হইয়াছে। এই প্রেমের গলদেশে আত্মহত্যার উদ্বন্ধন-রজ্জু শিথিল হইয়া পড়ে; ইহা আঘাতে মরে না, অপমানে গৌরব হারায় না, ভুলে লজ্জা পায় না। ইহার ললাটে অমরত্বের জ্যোতির্ম্ময় তিলকরেখা অঙ্কিত। শরৎচন্দ্র অপূর্ব্ব শিল্পকৌশলে রূপ মাধুরীর সমাবেশে প্রেমের যে প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, পরে চেষ্টা করিয়া তাহার ভিতরের খড়-মাটি উদ্ঘাটিত করিলেও ইহার রমণীয়তা কমাইতে পারেন নাই। এই প্রেম আদর্শ না হইতে পারে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'স্বর্গ হইতে বিদায়ে'র ভাবধারা অনুসরণ করিয়া আমরা এই মৃত্তিকালিপ্ত ভালবাসাকেই অভিনন্দন জানাই।

ইহার সহিত তুলনায় কমললতার প্রেমকে কি অমূলতরু বলিয়া মনে হয় না? উহার উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, শ্রীকান্তের নাম গহরের নিকট শুনিয়া কমললতা কিছুদিন হইতেই শ্রীকান্তের দর্শনাভিলাষিণী ছিল, এবং শ্রীকান্তের সহিত প্রথম সাক্ষাতেই তাহার ভালবাসা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। এই অকস্মাৎ-উদ্ভূত ভালবাসা অতি দ্রুতবেগে পরিচয়ের সমস্ত স্তরগুলি অতিক্রম করিয়া অন্তরঙ্গতার চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে। শরৎচন্দ্রের প্রেমবর্ণনার সমস্ত সুপরিচিত লক্ষণ-গুলিই—সেবাতৎপরতা, প্রিয়সম্বোধন, অর্থগূঢ় স্বল্পভাষণের সাহায্যে হৃদয়বিনিময়, আমরণ একনিষ্ঠতার আশ্বাস, ভাবগদ্গদ প্রেম-নিবেদন—এই নবজাত শিশু প্রণয়ের অঙ্গে বৈষ্ণব-অলঙ্কার-বর্ণিত স্বেদ-কম্প-পুলক প্রভৃতি সাত্ত্বিক চিহ্নের ন্যায় নিমেষে ফুটিয়া উঠিয়াছে। হয় ত' আধ্যাত্মিকতার অলৌকিক ভাবরাজ্যে শুষ্কতরু মুঞ্জরিয়া উঠিতে পারে। কিন্তু ঔপন্যাসিকের কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলারচিত, ক্রমবিকাশের সুনির্দ্দিষ্টস্তরবদ্ধ মন্থরগতি জগতে ইহাকে ঠিক স্বাভাবিক বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না। কমললতার প্রেমকে বৈষ্ণব-প্রেমসাধনার পর্য্যায়ে উন্নীত করিলে ইহার পক্ষে হয় ত' অসাধ্যসাধন সম্ভব, কিন্তু তাহা হইলে ইহাকে ঔপন্যাসিক বিশ্লেষণের বিষয় না করিয়া ইহাকে গীতি-কবিতার নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা দেওয়াই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ছিল। এই ভালবাসার ইতিহাসে উচ্চ আদর্শমূলক অনেক ভাবের আদান-প্রদান চলিয়াছে, এবং এই জাতীয় দুই একটা বাক্য উদ্ধার করিয়া বিশ্বরঞ্জনবাবু মৎকর্ত্তৃক উত্থাপিত 'সুলভ ভাববিলাসে'র অভিযোগ নিরসন করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু আমার অভিযোগ ঠিক এইরূপ অকস্মাৎ-উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগের দৃষ্টান্তের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। গভীর কথা অগভীর উৎস হইতে বাহির হইয়া আসিলেই ইহার ভাবগত উৎকর্ষ সত্ত্বেও ইহাকে 'সুলভ ভাববিলাসে'র সন্দেহ হইতে অব্যাহতি দেওয়া যায় না।—ইহার সুলভত্বই ইহার আতিশয্য-বিলাসের নিদর্শন। কমললতার প্রেমের সুস্থ আন্তরিকতা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়, যখন আমরা শুনি যে, গহরের প্রতি তাহার মনোভাব ঠিক এই সুরেই বাঁধা ছিল। শেলী তাঁহার Epipsychidion-এ তাঁহার ঊর্দ্ধগগনবিহারী কল্পনার আবেশে গাহিয়াছেন:—

> True love in this differs from gold and clay,
> That to divide is not to take away.

এবং অনুরূপ আধারনিরপেক্ষতা ধর্ম্মসাধনামূলক প্রেমের একটা বিশেষত্ব ও প্রশংসনীয় বিশেষত্ব। কমললতার প্রেম হয়ত এই কারণে গহর ও শ্রীকান্তের উপর তুল্যরূপে ক্রিয়াশীল হইয়াও কোন দ্বৈতভাবের সংশয়-দোলায় আন্দোলিত হয় নাই। শেলী উপন্যাস লেখেন নাই; লিখিলে তাঁহাকে তাঁহার উক্তির জন্য জবাবদিহি করিতে হইত। শরৎচন্দ্রও তাঁহার প্রেমকে ধর্ম্মাভিমুখী করিয়া, ও ধর্ম্ম-মহাসমুদ্রে একাধিক স্রোতস্বিনীর শান্তিপূর্ণ বিলোপের

ইঙ্গিত দিয়া, ঔপন্যাসিক বিশ্লেষণের দায়িত্ব হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারিবেন না।

তিন

এ সমস্ত বিতর্ক ছাড়িয়া দিয়া বিশ্বরঞ্জন বাবু যে বৈষ্ণবরস-সাধনার দোহাই পাড়িয়াছেন, তাহারই ঘনীভূত নির্যাস, পদাবলী-সাহিত্যেরই আলোচনা করা যাউক। সেখানে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা কি এইরূপ গূঢ়ার্থ ইঙ্গিতের দ্বারাই ব্যঞ্জিত হইয়াছে? সেখানে ত পদাবলী-রচয়িতারা ধর্ম্মসাধনার সাঙ্কেতিকতার অজুহাতে আমাদের তথ্যবিষয়ক কৌতূহল ও সৌন্দর্য্যরসবোধকে অপরিতৃপ্ত রাখেন নাই। বিশ্বরঞ্জন বাবু নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে, এই চিরকিশোর-কিশোরীর অনুপম প্রেম, ধর্ম্মের বিশেষ অধিকারের সুযোগ প্রত্যাহার করিয়া, অনুশাসনের ঔদ্ধত্য বিসর্জ্জন দিয়া, মানবহৃদয়ের সনাতন রসজ্ঞতা ও সৌন্দর্য্যানুভূতির প্রতি নিজ আবেদন জানাইয়াছে ও এই প্রীতি-স্নিগ্ধ, সরস পথ বাহিয়াই আমাদের অন্তরলোকে চিরন্তন প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। পদকর্ত্তারা ধর্ম্মোপদেষ্টার মুরুব্বিয়ানা সুরে, নিগূঢ় সাধনাতত্ত্বপ্রচারকের বক্রোক্তিপ্রবণ ভঙ্গীতে পাঠকের উপর অনুজ্ঞা জারী করেন নাই—"এখানে ধর্ম্মের কথা হইতেছে, রসের দাবী করিও না; রাধাকৃষ্ণের প্রেম যে আদর্শ আধ্যাত্মিক প্রেম তাহার প্রমাণ চাহিও না, তাহা আপ্ত বাক্যের মত স্বীকার করিয়া লও।" এরূপ পথ অনুসরণ করিলে বৈষ্ণব ধর্ম্মমতের প্রভাবহ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে পদাবলী-সাহিত্য সৌন্দর্য্যলোকের অক্ষয় স্বর্গচ্যুত হইয়া প্রাচীন মতবাদের জঞ্জালস্তূপবিকীর্ণ, ঊষর ভূমিখণ্ডে অর্দ্ধসমাধিস্থ অবস্থা প্রাপ্ত হইত। অধ্যাত্মমতবাদের সহায়তা কাব্যের সদ্যোজনপ্রিয়তা বৃদ্ধির কারণ হইলেও শেষ পর্য্যন্ত ইহার চিরন্তন আবেদনের পরিপন্থী হয়—যে ভাবের জোয়ারে ইহা সহজেই পাঠকের চিত্তভটসংলগ্ন হয়, ভাঁটার টানে তাহা হইতে বহুদূরে—প্রত্যাবর্ত্তনসম্ভাবনা-বিরহিত হইয়া অপসারিত হইয়া যায়। অবলীলাক্রমে উৎসারিত ভাবাবেগ প্রাচুর্য্য যে অশ্রুসিক্ত জলাভূমির ব্যবধান সৃষ্টি করে, পরবর্ত্তী যুগের পাঠকের রসবোধ তাহার উপর স্বচ্ছন্দবিচরণের দৃঢ় আশ্রয়-স্থল পায় না। বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদের মধ্যে যাঁহারা সত্যিকার কবি তাঁহারা যে ধর্ম্মাবেগের ক্ষণস্থায়ী আনুকূল্যের চোরাবালির উপর তাঁহাদের কাব্যের ভিত্তিভূমি রচনা করেন নাই, ইহাতে তাঁহাদের শাশ্বত রসজ্ঞান ও রসপিপাসু চিত্তের রহস্যজ্ঞতার পরিচয় মিলে।

এখন দেখা যাউক, রাধাকৃষ্ণের প্রেম কি উপায়ে আমাদের চিত্তক্ষেত্রে চির-নবীন সৌন্দর্য্যে মুকুলিত হইয়া উঠিয়াছে? ইহার প্রথম উন্মেষ হইতে চরম সার্থকতা ও চির-বিরহের মাধুর্য্য-বেদনা-মণ্ডিত পরিণতি পর্য্যন্ত প্রত্যেকটী স্তর আমাদের নিকট রেখায়, বর্ণে, পটভূমিকার অবকাশে, সুনিপুণ শিল্পীর দ্বারা অঙ্কিত চিত্র-পটের ন্যায় উজ্জ্বল, ক্রমপর্য্যায়-বিন্যস্ত, রসঘন নাটকের ন্যায় জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রতিদিনের কত খুঁটিনাটি কাহিনী, কত মান-অভিমান অনুরাগ-বিরাগের পালা, প্রণয়-লীলাভিনয়ের কত বৈদগ্ধ্য-চাতুর্য্য, কত হাস্য-পরিহাসে সরস, প্রচ্ছন্ন শ্লেষ-মার্জ্জিত উত্তর-প্রত্যুত্তর, হৃদয়াবেগের কত অনিবার্য্য উচ্ছ্বাস, ঘটনা-সংস্থানের কত অভিনব বৈচিত্র্য এই প্রেম-কাহিনীকে তথ্য-সমৃদ্ধ, রস-নিবিড় ও মনস্তত্ত্বজ্ঞানের সার্থক প্রয়োগের উদাহরণ-স্থল করিয়াছে। বাহিরের প্রতিবেশপ্রভাব ইহাকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ আত্মকেন্দ্রিকতা হইতে অপসারিত করিয়া সমাজ-জীবনের জটিল সংস্থিতি ও দুশ্ছেদ্য সম্পর্কজালের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। সখা-সখীর দৌত্য, সমবেদনা, সস্নেহ অনুযোগ ও তিরস্কার, গুরুজনের বিরাগ-ভীতি, সমাজ-বিধি উল্লঙ্ঘনের সঙ্কোচ-আশঙ্কামিশ্র দুঃসাহসিকতা, পিতামাতার স্নেহ-বাৎসল্য, গোপ-সমাজের আচার-ব্যবহার ও সাধারণ জীবন-যাত্রার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এই অনুপম প্রেমের পটভূমিকা রচনা করিয়া ইহাকে রসধারা ও জীবনীশক্তিতে পূর্ণ করিয়াছে। তাহার উপর, বহিঃ-প্রকৃতির পুঞ্জীভূত সৌন্দর্য্য-সমাবেশ এই প্রেমকে বল্প-লোকের আদর্শ-সুষমামণ্ডিত করিয়াছে। যমুনাতীরের শ্যামল বনানী-শোভা, ঋতুচক্রাবর্ত্তনের পরিবর্ত্তনশীল সৌন্দর্য্যসম্ভার, শরৎ-পূর্ণিমার কৌমুদী-প্লাবন, বসন্ত-রজনীর বিহ্বল মদিরতা, বর্ষার মেঘান্ধকার, বর্ষণমুখর নিশীথের ঘনীভূত বিরহবেদনা ও ব্যাকুল অভিসার যাত্রা, পুষ্প-সৌরভ ও বাঁশীর আকুল আহ্বান, নত্যগীত-বন-ভোজনের আনন্দ-হিল্লোল, রাস-দোল-ঝুলনের পুলকাবেশ এই ঐশী প্রেমের দেব-মন্দিরে রূপমুগ্ধ কবিকল্পনার পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যাভিষেকের অর্ঘ্য সাজাইয়াছে। আবার, যেমন সুদূর-বিসর্পিত দিক্‌চক্রবালের রহস্য-বিজড়িত শ্যামলিমা আমাদের সঙ্কীর্ণ প্রয়োজন-সীমার চারিদিকে এক উদার, উন্মুক্ত প্রসারের আভাস বহন করে, সেইরূপ এই সৌন্দর্য্যোপকরণের কবিতার ভাবমণ্ডলে আধ্যাত্ম-সাধনার সার্থক ইঙ্গিত আমাদিগকে রূপ হইতে অরূপের রাজ্যে লইয়া গিয়া, আমাদের অন্তরে অসীমের প্রতি আকুতি ও ভাব-তন্ময়তার উদার অনুভূতি জাগাইয়া তুলিয়াছে। কত ভক্ত, কত ভাবুক, কত দার্শনিক তাঁহাদের একান্ত ভক্তি সাধনার সমস্ত শক্তি, অশান্ত অনুশীলন ও অবিরত প্রচারের দ্বারা গঠিত গোষ্ঠী-মনোভাবের যৌথ প্রেরণার প্রয়োগ করিয়া, এই কবিতার মধ্যে ধর্ম্মোন্মাদনার ভাব বিহ্বলতার সঞ্চার করিয়াছেন; সমস্ত প্রথম শ্রেণীর কাব্য-সৃষ্টির উপরিকার বায়ুস্তরে যে অনন্তাভিমুখী অভীপ্সা অলক্ষ্যসঞ্চারী থাকে, তাহাকে প্রত্যক্ষ-ভাবে অনুভব করিয়া এই উভয় উপাদানের মধ্যে অন্তরঙ্গ সংযোগ সাধন করিয়াছেন; অসীমের ঊর্দ্ধ-গগন-বিহারের মোহে সীমার জগতের মাধ্যাকর্ষণ-প্রভাব উপেক্ষা করেন নাই; পরিচিত জীবনের প্রতিবেশে, পার্থিব প্রেমের রসানুভূতির মধ্য দিয়া, ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজালকে পূর্ণভাবে স্বীকার করিয়া, প্রাকৃত সম্ভোগকে ভক্তির প্রজ্বলিত অগ্নিতে দার্শনিকতার কটাহে ফুটাইয়া ও ইহাতে অধ্যাত্ম ভাব-গভীরতার কর্পূর সৌরভ মিশাইয়া ইহার রূপান্তর সাধন করিয়াছেন। বৈষ্ণব-কবিতার অন্তরশায়ী আত্মার সহিত ইহার রূপঘন বিগ্রহের এক আশ্চর্য্য রকমের সমন্বয় ঘটিয়াছে বলিয়াই ইহা একদিকে বস্তুতন্ত্রতার স্থূলতা, অপরদিকে আধ্যাত্মিকতার অশরীরী বায়ব্যতা (airiness), এই উভয়বিধ অতিরেক হইতে মুক্ত হইয়াছে।

চার

এখন বৈষ্ণবকবিতার লোকোত্তর উৎকর্ষের মানদণ্ডে শরৎ চন্দ্রের কমললতাকে বিচার করিলে সে কি এই তুলনামূলক

আলোচনার প্রতিদ্বন্দ্বিতা সহ্য করিতে পারে ? মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধা ও ভগবানের পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের মনোহারিত্ব ফুটাইবার জন্য যদি বৈষ্ণব-কবি-গোষ্ঠীর পক্ষে এরূপ বিপুল সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রয়োজন হইয়া থাকে, তবে শরৎচন্দ্র কি কেবল মাত্র এক অনায়াস-কল্পিত, অলক্ষ্যপ্রায় রূপক-প্রতিভাসে কমললতার প্রেমের নিগূঢ় মাধুর্য্য ও সাঙ্কেতিকতা ফুটাইতে সক্ষম হইয়াছেন ? বৈষ্ণব কবির অবিরত, পৌনঃপুনিক মন্থনে যে অমৃতরস উঠিয়াছে, শরৎচন্দ্র কি তাঁহার যাদুদণ্ডের বারেক মাত্র সঞ্চালনে অনুরূপ ফললাভের প্রত্যাশা করিতে পারেন ? বৈষ্ণব কবি যে অনুকূল প্রতিবেশ, ব্যাপক বাস্তব-চিত্রণ, ভক্তিরসাপ্লুত, নিঃসংশয় ধর্ম্মবিশ্বাস ও যুগধর্ম্মের সোৎসাহ সমর্থনের সহায়তায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, বিংশ শতাব্দীর ঔপন্যাসিক তাহা কোথায় পাইবেন ? শরৎচন্দ্র যদি কোন নিগূঢ় অন্তর্দৃষ্টিবলে কমললতার মধ্যে আসক্তি-বন্ধনহীন, নিষ্কলুষ বৈষ্ণব প্রেমের আদর্শের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহার রহস্যে তিনি পাঠকমণ্ডলীকে অংশভাক্ করেন নাই। রাজলক্ষ্মীর সহিত তাহার প্রেমের ধারার বিভিন্নতা স্বীকার করিয়া লইলেও, কি এইটুকু ভিত্তির উপর এত বড় একটা সম্ভাবনাকে দাঁড় করান যায় ? লেখক বাঁধন-লাগার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন নাই, বাঁধন-ছেঁড়ার মহিমা এত উচ্চকণ্ঠে খ্যাপন করিলে কি হইবে ? জলের তিলক কপাল হইতে মুছিয়া গেলে কেহ কি বিস্ময় অনুভব করে ? ব্রজধামের মোহন-লীলার পটভূমিকায় সন্নিবিষ্ট না হইলে কি মথুরা-প্রয়াণ এত মর্ম্মান্তিক করুণরসের প্লাবন ছুটাইয়া দিতে পারিত ?

যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাহার একটা সংক্ষিপ্ত সার-সঙ্কলন করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। রাজলক্ষ্মীর প্রেমে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার অতি আগ্রহ ও ধর্ম্মসংস্কারের দ্বারা ইহার অভিভব শ্রীকান্তের বন্ধন-বিমুখ মনের খুব রুচিকর হয় নাই ; এবং তাহার ক্লান্ত। নিরুৎসাহ আত্মসমর্পণ ও ব্যথাক্লিষ্ট দীর্ঘশ্বাস তাহার অন্তরের নীরব প্রতিবাদেরই পরোক্ষ সাক্ষ্য। কমললতার তথাকথিত প্রেমের অনাসক্তি ও বন্ধন-শিথিলতা শ্রীকান্তের প্রকৃতির অধিকতর উপযোগী ও সেইজন্যই তাহার হৃদয়াবেগের পূর্ণতর তৃপ্তিসাধন করিয়াছে। রাজলক্ষ্মীর প্রখর ব্যক্তিত্ব ও সদা-সতর্ক অভিভাবকত্বের নিকট শ্রীকান্ত যেন সর্ব্বদাই সঙ্কুচিত ; প্রতিদানহীন উপকার গ্রহণের গ্লানি যেন সর্ব্বদা তাহার দেহে মনে সংলগ্ন। রাজলক্ষ্মীর অপ্রসুপ্ত ও সময় সময় অতি-জাগ্রত ধর্ম্মসংস্কারের নিকটও সে নিজ অনাবশ্যকতা ও এমন কি অশুচিতা সম্বন্ধেও সংশয়াবিষ্ট। কাজেই সূর্য্যকিরণস্নাত পদ্ম যেমন তাহার সমস্ত দলগুলি সহজ আনন্দোচ্ছ্বাসের সহিত মেলিয়া ধরে, রাজলক্ষ্মীর প্রেমে অভিষিক্ত হইয়া শ্রীকান্তের প্রকৃতি সেরূপ সার্থকতায় উদ্বুদ্ধ হয় নাই। কমললতার সহিত কথাবার্ত্তায় তাহার সে সঙ্কোচ নাই ; গ্রহণ-প্রতিদানের মধ্যে ভার-সাম্য তাহাকে নিজ মর্য্যাদায় দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তাহার প্রণয়-নিবেদনের মধ্যে তাহার চিরাভ্যস্ত ভীরু অপটুতার পরিবর্ত্তে সক্রিয় সপ্রতিভতার ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে। শরৎচন্দ্র এই পরিবর্ত্তনের ইঙ্গিত দিয়া কমল-লতার প্রেমে আদর্শগত শ্রেষ্ঠত্ব আরোপ করিতে চাহিয়াছেন। এবং বিশ্বরঞ্জন বাবু সম্ভবতঃ লেখকের নিকট প্রত্যক্ষসূত্রে জ্ঞাত হইয়া এই প্রেমকে বৈষ্ণবধর্ম্ম-সাধনার প্রতীকরূপে পরিকল্পনা করিয়া ইহার তথ্যগত রিক্ততাকে সাঙ্কেতিকতার ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। বিশ্বরঞ্জনবাবু এ কথাও বলিয়াছেন যে, রাজলক্ষ্মীর প্রেম কমললতার প্রেমের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া তাহার ভবিষ্যৎ গতি নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে। ইহার প্রমাণ অবশ্য খুব সুপ্রচুর নহে। অন্ততঃ লেখক রাজলক্ষ্মীর এই নূতন শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রেমের কোন বর্ণনা দেন নাই। অবশ্য, রাজলক্ষ্মীর অনুপ্রেরণা যে কমললতার ভালবাসার উৎকর্ষের অবিসংবাদিত প্রমাণ তাহা বলা যায় না। রাজলক্ষ্মী অনেকবার অনেকের কাছেই পাঠ লইয়াছে—প্রথম, অভয়ার নিকট নির্ভীক বিদ্রোহ-ঘোষণার মহিমা সম্বন্ধে আলোক লাভ করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ পুঁটুর কাছেও যে তাহার শিখিবার কিছু ছিল না তাহা নহে। সেই হাস্যকর, অসঙ্গতিপূর্ণ বিবাহ-সম্বন্ধ হইতেও সে ধর্ম্ম-চর্চ্চার নেশায় প্রণয়াস্পদকে অবহেলা করার যে বিপদ সে বিষয়ে সচেতন হইয়াছে, ও শ্রীকান্তের প্রতি ব্যবহারের ধারা পরিবর্ত্তন করিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া অভয়ার প্রেম ও পুঁটির সহিত গাঁটছড়া বাঁধার প্রচেষ্টা যে রাজলক্ষ্মীর ভালোবাসা হইতে শ্রেষ্ঠ তাহা প্রমাণিত হয় না। রাজলক্ষ্মী হয়ত কমললতার নিকট নিষ্কাম প্রেমের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া থাকিবে—কিন্তু এই নবলব্ধ নিরাসক্তির সহিত তাহার নীড়-রচনার প্রচণ্ড আগ্রহের কিরূপ সামঞ্জস্য-বিধান হইল তাহা অনুমানের পর্য্যায়ে রহিয়া গেল।

তথাপি বিশ্বরঞ্জনবাবু যে এই প্রশ্নের একটা নূতন দিক্ উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, সে জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। আমি রাজলক্ষ্মীর প্রতি অবিচারকে যে লেখকের আত্মবিস্মৃতি-প্রসূত বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলাম, তাহা ঠিক নহে ; ইহা তাঁহার সুচিন্তিত ব্যবস্থা। কিন্তু ইহা স্বীকার করিলেও আমার মূল সিদ্ধান্ত অপরিবর্ত্তিত থাকে। আমি এখনও রাজলক্ষ্মীর সহিত তুলনায় কমললতার প্রেমকে উচ্চতর কলাকৌশলসম্মত বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। কেন পারিতেছি না তাহার সবিস্তার কারণ বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। অবশ্য, কোন প্রথম শ্রেণীর লেখকের রচনার অংশবিশেষে অপকর্ষের অভিযোগ খুব নিরাপদ পন্থার অনুসরণ নহে—বিশেষতঃ যেখানে অপর একজন সমালোচকের চক্ষে উক্ত অংশ রসোত্তীর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। নেতিমূলক (negative) সমালোচনা অপেক্ষা ইতিমূলক (positive) সমালোচনা নিঃসন্দেহ অধিকতর মূল্যবান, যদি এই উৎকর্ষ-আবিষ্কারের পিছনে সত্যিকার সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও বিচারবুদ্ধি থাকে। বিশ্বরঞ্জনবাবু মনে করেন যে, শ্রীকান্ত ও কমললতার মধ্যে সম্পর্কের যে আলোচনা আমি করিয়াছি, তাহা "বুদ্ধিবৃত্তি ও কলাশাস্ত্রের" সূত্রের অন্ধ আনুগত্যের জন্য ঠিক সমস্যার মর্ম্মস্থলে পৌঁছিতে পারে নাই। এই অভিযোগ সত্য হউক আর নাই হউক, ইহা ঠিক যে আমার রসবোধ এই সৃষ্টির পূর্ণ মাধুর্য্য আস্বাদনে কৃতকার্য্য হয় নাই—কোথায় কোন প্রতিবন্ধকের দ্বারা প্রতিহত হইয়াছে। এই প্রতিবন্ধকের প্রকৃতিটা যথাসাধ্য নির্ণয়ের জন্য যত্নবান্ হইয়াছি। যদি এই আত্মসমর্থন নিরপেক্ষ, সংবেদনশীল পাঠকের অনুমোদিত না হয়, তাহা হইলে আমার রসগ্রহণে অক্ষমতার বিষয়ে, পুনরায় স্বীকারোক্তি পেশ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিলাম।

জন্মান্তর

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

অযোধ্যাপ্রসাদের মুদিখানার দোকানটা ছিল ছোটবেলায় আমাদের কাছে স্বর্গ বিশেষ। কারণ ওর দোকানে পাওয়া যেত না এমন জিনিষই নেই—চাল, ডাল, আটা তুচ্ছ বস্তু, আমাদের ওদিকে লোভ ছিল না, মুড়ি-মুড়কি লজেঞ্চুস, বিস্কুট, মার্বেল, শ্লেট-পেন্সিল, তাস আরও কত কি মূল্যবান্ এবং প্রয়োজনীয় বস্তু যে ওর দোকানে থাকত তার হিসেব নেই। সব সময় আমরা কিনতে পারতুম না এটা ঠিকই, কিন্তু দোকানের সামনে খেলা করার নাম করে কাচ বসান টিনের কৌটার মধ্যে দিয়ে ঐ স্বর্গীয় বস্তুগুলি নিরীক্ষণ করারও একটা আনন্দ ছিল বৈ কি! আর ওখানে খেলা করার আর একটা আকর্ষণও ছিল, মনোহর ছিল আমাদের সহপাঠী—সে সুযোগ পাবামাত্র অযোধ্যার অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে বহুদিনই আমাদের বহু জিনিষ জুগিয়েছে বিনামূল্যে।

মনোহর অযোধ্যার শালীর ছেলে - ওদের নিজেদের ছেলেপুলে ছিল না বলে শালীর কাছ থেকে অযোধ্যা এই ছেলেটিকে চেয়ে নেয় এবং বোধ করি পুত্রাধিক স্নেহেই মানুষ করে। ওর একমাত্র আশা ছিল যে, মনোহর লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে অর্থাৎ কোন সাহেবের অফিসে চাকরী করবে, ওকে যেন আর দাড়ী পাল্লা ধরে দোকানদারী করতে না হয়। সেই জন্য নিজেরা বিহারী হয়েও সে মনোহরকে বাঙ্গালীর ইস্কুলে দিয়েছিল এবং অনেক টাকা মাইনে দিয়ে একটা মাষ্টার রেখে দিয়েছিল যাতে ওর লেখাপড়ায় অসুবিধে না হয়।

মনোহর অবশ্য ওর আশা খানিকটা পূরণ করেছিল ঠিকই—দাড়ীপাল্লা ধরে দোকানদারী সে কোনদিন করে নি, তবে লেখাপড়াটাও শিখে উঠতে পারে নি। ফলে বছর দুই ক্লাস সিক্স-এ এবং বছর দুই ক্লাস সেভেন-এ কাটাবার পর অযোধ্যা একদিন খুব বকাবকি করাতে সে যে সেই মেসোমশায়ের তবিল থেকে শ খানেক টাকা নিয়ে উধাও হল, আর ফিরে এলো না।

মনোহর যে অসাধারণ ছেলে এমন ধারণা আমাদের কারুরই ছিল না, সুতরাং ওর মাসী আর মেসো যত কান্নাকাটিই করুক, আর পাঁচটা পালিয়ে-যাওয়া-ছেলের মতই হাতের টাকাগুলো ফুরিয়ে গেলে বাড়ী ফিরে আসবে এই ছিল আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু মনোহর শেষ পর্য্যন্ত আমারেদ ধারণা মিথ্যা করে দিয়ে অদৃশ্য হয়েই রইল। অযোধ্যা ইংরাজী, বাঙ্গলা, হিন্দী সব রকম কাগজেই বিজ্ঞাপন দিল, মায় চুপি চুপি পুলিশের দারোগাকে দু'শ টাকা ঘুষ দিয়ে থানায় থানায় খবর নিবারও চেষ্টা করল; তবু কোন সংবাদই পাওয়া গেল না ওর। মনোহর নামক ষোড়শ বর্ষীয় বালকটী যেন ধরণীপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

ফলে মনোহরের মাসী মাস ছয়েকের মধ্যেই শয্যা নিলেন এবং আরও মাস-ছয়েক ভুগে একদিন পরলোকের পথে যাত্রা করলেন। অযোধ্যারও অবস্থা খারাপ হয়ে আসছে বুঝতে পেরে স্ত্রী মরবার পর সে দোকানটা বেচে দিয়ে প্রায় চল্লিশ বছর পরে সুদূর বিহারের এক পল্লী অর্থাৎ তার জন্মভূমিতে ফিরে গেল। সেখানে নাকি তার ভাই ভাতিজারা আজ আছে, গেলে অন্ততঃ টাকার লোভেও বুড়ো জ্যাঠার সেবা শুশ্রূষা করবে। কিন্তু মনোহর যে বুড়ো অযোধ্যার কতখানি তা বোঝা গেল ওর যাত্রার আগে—সে যাবার আগের দিন রাত্রে আমাদের পাড়ার মাতব্বর তারিণীবাবুর হাতে নগদ তিনটী হাজার টাকা সঁপে দিয়ে বলে গেল, দেশে গিয়েও আমি ওর খবর নেবার চেষ্টা করব, তবে যদি কোনদিনই ওর পাত্তা না পাই, তাহলে ছেলেটা পথে বসবে একেবারে। ভাতিজাদের হাতে টাকা পড়লে সে-যে তার এক পয়সাও পাবে তা মনে হয় না। পরকে ডেকে কে করে টাকা দেয় বাবু? যদি বেঁচে থাকে ত একদিন না একদিন আমাদের খবর নিতে এখানে সে আসবে, সেই সময় এই টাকা তাকে ডেকে দিয়ে দিবেন। বলে দেবেন যে, আমি তিনশ' টাকাতে ঐ মুদি-খানার দোকান করেছিলুম; তার দশগুণ টাকা তাকে দিয়ে গেলুম। তাতেও যদি সে নিজের খোরাক চালাতে না পারে ত আমার আর কোন দায়িত্ব রইল না।

তারিণী বাবু ব্যাকুল হয়ে বললেন, কিন্তু যদি সে কোনদিনই না ফেরে তা হলে এ টাকা নিয়ে আমি কি করব অযোধ্যা? এ কি ফ্যাসাদে আমাকে জড়িয়ে ফেললে? যদি আমি মরেই যাই?

কপাল হাতে ঠেকিয়ে অযোধ্যা জবাব দিলে, 'মরে যান ত ওর কপাল কর্ত্তাবাবু। আর যদি ও না আসে ষোল বছর অপেক্ষা করবেন, তারপর কোন তীর্থস্থানের হাসপাতালে দিয়ে দিবেন। আর যদি আমি খবর পাই ত ফিরে এসে টাকা নিয়ে যাব। মোদ্দা কোন চিঠিতে এ টাকা আপনি দেবেন না—হয় তাকে নয় আমাকে।'

এর পর বহুদিন চলে গেছে। অযোধ্যা বেঁচে আছে কি নেই সে খবর জানি না, খুব সম্ভব মরেই গেছে, কিন্তু মনোহরও আর ফেরেনি। তারিণী বাবুও দু-একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন ঐ টাকার সুদ থেকে—মুখে মুখেও যতটা খবর নেওয়া সম্ভব তা নিয়েছিলেন, যত লোক বিদেশে যেত প্রত্যেককেই তিনি বলে দিতেন, 'দেখো ত ভাই—ডান দিকের হাতে একটা বড় কাটা দাগ আছে আর বাঁ-হাতের কনুই-এর কাছে জড়ুল।' কিন্তু ঠিক খবর একটাও তিনি পান নি।

অবশ্য ভাসা ভাসা খবর একটা আধটা কানে আসত বৈ কি। একবার শোনা গেল—সে দিল্লীতে কোন এক হোটেলে গাইডের কাজ করছে। ভাল করে খবর নিয়ে জানা গেল যে, সে চাকরী ছেড়ে আজমীর চলে গেছে। সেখানে পানের দোকান করে। তার পর শুনলুম বিহারের কোন এক সহরে একা চালাচ্ছে। আরও কিছু দিন পরে খবর এল কোন্ এক ভবঘুরের দলের সঙ্গে নেচে বেড়াচ্ছে সহরে সহরে। একজন বললে, 'আমি দেখে এলুম তাকে কার্সিয়ঙএ প্রকাণ্ড মোটর হাঁকিয়ে বেড়াচ্ছে।' আর একজন শপথ করে

বললে, বি-এন-আর কোন এক ষ্টেশনে সে তাকে চা বিক্রী করতে দেখেছে।

কিন্তু তবু এর কোনটাতেই তাকে ধরা যায়নি। হয় ত এর সব গুলিই মিথ্যা, নয় ত এর অধিকাংশই সত্য, কিন্তু তারিণী বাবু তার দায় যে নামাতে পারেন নি এটা ঠিক। অবশেষে তারিণী বাবুও মারা গেলেন। তার বড় ছেলেটী খুব ধর্ম্মভীরু, তার কাছেই সুদ সুদ্ধ টাকাটা গচ্ছিত রইল—মারা যাবার ভয় নাই। কিন্তু সে বেচারা তার সংসার নিয়েই বিব্রত, খোঁজ খবর করে তাকে ধরে আনবে—সে সাধ্য বা ইচ্ছা তার কোনটাই নেই। ইতিমধ্যে আমরাও সে কথা ভুলে গিয়েছি, মনোহর বলে যে কেউ কোনদিন ছিল তা মনেও পড়েনা স্মৃতি থেকে তার নাম পর্য্যন্ত যেন মুছে গেছে।

এই যখন অবস্থা, এমনি সময়ে বাধল যুদ্ধ। খবরের কাগজের ভাষায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। মহাযুদ্ধের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগটা কি আগে তা বোঝা যায় নি। লোহা বেচে আর শেয়ারের বাজারে দু পয়সা হবে এই সুখস্বপ্নেই বিভোর ছিলুম। তারপর একটু একটু করে যুদ্ধ এগিয়ে এল ঘরের কাছে নিজেদের জীবনের প্রশ্ন উঠলো বড় হয়ে—বেঁচে থাকা মনে হ'তে লাগল বিড়ম্বনা। টাকা যারা করবার তারা করছে, আমরা শুধু আতঙ্কে আর আঘাতে স্তব্ধ এই সময়ে হঠাৎ একদিন ফিরে এল মনোহর—যেমন অতর্কিত ভাবে গিয়েছিল তেমনি আকস্মিক ভাবেই সহসা ফিরে এল! খুব বড় হয়েছে, লম্বা চওড়া জোয়ান, মুখ পেকে গিয়েছে। অত্যাচার আর অনিয়মের চিহ্ন মুখে স্পষ্ট, তবু তাকে চেনা গেল সহজেই। টাকার কথাটা সে যেন কার মুখে শুনেছিল আগেই সোজা গিয়ে তারিণীবাবুর ছেলে উপেনদার কাছে দাবী করল এবং টাকাটা বুঝে নিয়ে পরের দিনই আবার রওনা হয়ে গেল।

তবে এবার তার খবরটা আমাদের জানাই রইল। যখন আসাম থেকে সবাই পালাচ্ছে তখন সে আসামে গিয়ে ঠিকাদারীর কাজ হাতে নিলে। প্রথমটা সাহেবরা ওকে আমল দিতে চাননি—পাঞ্জাবী ও সিন্ধি মুসলমান ঠিকাদার এরা পাকা লোক, এদের সঙ্গে মনোহর পাল্লা দিতে পারবে কিনা এমনি একটা সন্দেহ ছিল তাঁদের। কিন্তু দু-একটা ছোটখাটো কাজ অত্যন্ত বেশী রকমের সুচারুভাবে ক'রে দিয়ে মনোহর প্রমাণ ক'রে দিলে যে সে কারুর চেয়ে কম নয়। একবার এক মেজর ঠাট্টা ক'রে তাকে ব'লেছিলেন, 'Bihar born and Behar bred, strong in the arm but thick in the head!' ও তৎক্ষণাৎ তাকে জবাব দিয়েছিল—'It may be sir, I'm not sure—but Behar born and Bengal bred thick in the arm and strong in the head—thus far I can assure you!'

আর বাস্তবিকই—ও সবাইকে প্রমাণ ক'রে দিলে যে বুদ্ধি এবং সাহস দুটোই তার আছে, আর এ যার আছে, সে পারে না এমন কাজই নেই। যখন ব্রহ্ম সীমান্ত থেকে নানারকম ভয়ের কারণ আশঙ্কা করছে লোকে, ও তখন সবচেয়ে সামনে এগিয়ে গিয়ে কাজ নেয়—চারগুণ পাঁচগুণ রেটে। অন্য ঠিকাদাররা যখন আসামের দিকে কুলি আনতে পারে না, ও তখন তাদের মোটা টাকা কবুল ক'রে, মদ ও স্ত্রীলোকের প্রলোভন দেখিয়ে টেনে নিয়ে যায় একেবারে সীমান্তে। তা' ছাড়া সে ঠিকা নেয় না, এমন কাজই নেই। কোথাও রাস্তা করে, কোথাও খড় বাঁশ দেয়—কোথাও বা সব্জী মাছ জোগায়।

কিন্তু শুধু ঠিকা পেয়ে যে পরিমাণ লাভ হয়—মনোহরের মতে, এত বড় যুদ্ধে সে-সামান্য টাকাতে খুশী থাকা কোন বুদ্ধিমান লোকের কাজ নয়। অতএব তার মতে বুদ্ধিমান লোকের যা কাজ অর্থাৎ কোন কাজ না ক'রে টাকা রোজগার, তাই সে সুরু করলে। সে একই মালদু-বার বিল করে। দেড়লাখ টাকার খড় আগুন লেগে পুড়ে গেছে, এই সংবাদ দিয়ে আবার সরবরাহ করে কাগজে-কলমে, অর্থাৎ সেই জমা করা খড়ই দেখিয়ে আর একবার বিল করে। কয়েক হাজার গ্যালন পেট্রোল কি ভাবে 'লিকেজ' দেখিয়ে গোপনে বেচা যায়, সে ফন্দী দেখায় সে-ই। খাবার মানুষের খাদ্যের উপযোগী নয় ব'লে ফতোয়া দেওয়ায় আবার ভাল খাদ্য সরবরাহের ঠিকা নিয়ে পুরোনো খাবারই চালাতে থাকে। মাটি দিয়ে ইট সাজিয়ে একবার দেওয়াল গাঁথার বিল আদায় ক'রে নেয়, পরে মেজর সাহেবরা যখন লাঠির খোঁচা দিয়ে সে পাঁচিল ভেঙ্গে দিয়ে আবার নতুন ক'রে গাঁথতে হুকুম দেন, তখন সে ঠিকাও মনোহরই নেয়।

অবশ্য এতটা সম্ভব হয় এইজন্য যে, এতদিনের ভবঘুরে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সে মানুষ চিনতে শিখেছিল। কে ঘুষ নেয় এবং কে নেয় না—এটা সে বুঝতে পারত একবার দেখেই। সুতরাং তার কিছুই আটকাত না। 'না' শব্দই ছিল না তার অভিধানে। যখন কোথাও বিলিতী মদ নেই, অর্থ বা ভালবাসা কিছু দিয়েই বস্তুটি মিলছেনা তখন সে একই রাত্রে প্রয়োজন হ'লে বিশ বোতল পাঠাত মনিবদের কাছে। নগদ টাকাও জুয়াখেলার মুখে সে জোগাতে পারত অকাতরে। যেখানে কোথাও মানুষ নেই, সেখানেও শুধু ইঙ্গিত বুঝে কোথাথেকে মেয়েছেলে হাজির করত। মদ থেকে আরম্ভ করে ঝি-চাকর জোগানো পর্য্যন্ত তার ঘুষ দেওয়ার অঙ্গ ছিল। ফলে চিনির বদলে বালি এবং টিঞ্চার আইওডিনের বদলে জল দিয়েও পার পেত সে। অবশ্য এ সবই আমাদের শোনা কথা—হয়ত এতটা ঠিক নয়, হয়ত সোজা পথেই সে টাকা রোজগার করেছে, তবে তার বড়মানুষীর পরিমাণ দেখে ঐ কুকথাগুলোই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা ক'রে।

কিন্তু সে যাই হোক্—যুদ্ধ থামবার কিছু আগেই সে ফিরে এল। ফিরে কেন যে এখানে এল, তা বলতে পারবনা, যে টাকা সে করেছিল তাতে সে পৃথিবীর যে কোন ভাল দেশে গিয়ে বাস করতে পারত। তা না ক'রে এই নগণ্য সহরতলীতে আসবার তার কোন কারণই আমরা খুঁজে পেলুম না, অনেক ভেবেও। বোধ হয় যারা তাকে ছোট দেখেছিল, যারা মুদী অযোধ্যাপ্রসাদের অকর্ম্মণ্য এবং অপদার্থ পোষ্যপুত্র রূপে দেখেছে, চিরকাল তাঁদের

চোখ ঐশ্বর্য্যের দীপ্তিতে ঝলসে দেওয়াই ওর কাছে অর্থ উপায়ের সব চেয়ে বড় সার্থকতা বলে মনে হয়েছিল।

এখানে আসবার আগেই মোড়ের মাথায় বড় বাড়ীটা কিনেছিল সে লোক পাঠিয়ে। তারও আগে কর্ম্মচারী পাঠিয়ে একটা কেরোসিনের কণ্ট্রোল ও একটা র‍্যাশন শপের ব্যবস্থা করে রেখেছিল। সুতরাং এলও কতকটা কাউণ্ট অফ মণ্টেক্রীষ্টোর মত—নিজের বাড়ী ও তৈরী ব্যবসায়ের মধ্যে একেবারে ফিরে এসে বসল।

আমরা এতদিন শুনেছিলুম, মনোহর পয়সা রোজগার করতে শিখেছে ভাল ক'রে—এবার দেখলুম যে বস্তুটি খরচ করতে হয় কী ক'রে সে শিক্ষাও সে পেয়েছে পাকা রকমের। এসেই সে স্থানীয় ইস্কুলগুলোকে মোটা মোটা টাকা দান করে হঠাৎ তাদের কর্ত্তাব্যক্তিদের মধ্যে একজন হয়ে বসল। লাইব্রেরীর বাড়ী উঠতে শুরু হয়ে গেল, একটা হাসপাতালেরও জল্পনা-কল্পনা চল্‌ছে। এধারে কী একটা উপলক্ষে প্রায় একহাজার দরিদ্রনারায়ণ পেট পুরে খেয়ে ফিরে যাবার সময় একখানা করে কম্বল নিয়ে গেল। এ সব নাকি 'কালো-বাজারের' উচ্ছিষ্ট, লাভেরও অতিরিক্ত এ সব, বিতরণ করবার আগে ভেবে দেখবারও দরকার হয় না তার।

আমরা, যারা এতদিন পর্য্যন্ত কিছু কিছু সন্দেহ পোষণ করছিলুম, তারা এইবার ঠাণ্ডা হয়ে গেলুম। মনোহর যে একটা কেষ্ট-বিষ্টু কিছু হয়ে এসেছে সে সম্বন্ধে সংশয় মাত্র রইল না। শুধু পয়সা রোজগারই করেনি—বুকটাও করে এনেছে যথার্থ বড় লোকদের মত। হ্যাঁ—মরদ কি বাচ্ছা বটে। এইসব আলোচনা করতে করতে আমরা সবাই একদিন ওর মোসাহেব শ্রেণীতে ভর্ত্তি হয়ে গেলুম এবং সবলেই একে একে গিয়ে জুটলুম ওর ছত্র-ছায়ায়। গ্রামের যে সব সম্ভ্রান্ত লোকরা এতদিন ওকে অত্যন্ত ছোট করে দেখে এসেছিল, তারাই এখন উঠে পড়ে লাগলেন এই বিশিষ্ট নাগরিকটিকে নিজেদের দলে টানবার জন্য।

কিন্তু তাদের চেষ্টা এবং মনোহরের নিজের যত ইচ্ছাই থাক সম্ভ্রান্ত হবার জন্য, ওর বৈচিত্র্যময় জীবনের অভিজ্ঞতা ও অভ্যাস ওকে টান্‌তে লাগল নীচের দিকে। ফলে এবারে সে যেমন পাড়ার সব বড় বড় ব্যাপারে চাই হয়ে বসল, তার অন্তরঙ্গতাটা হ'ল কিন্তু পাড়ার কতকগুলি ডাকসাইটে বকা লোকের সঙ্গে। তাদের মদের এবং ইত্যাদির খরচ জোগায় মনোহর—তারা ওকে দেয় ভাল ভাল মেয়ে মানুষের সংবাদ। মনোহর নিজে মদ খেতনা অন্ততঃ আমরা কোনদিন ওকে মাতাল অবস্থায় দেখিনি, কিন্তু তার চেয়েও বড় এই নেশাটা ছিল ওর প্রচুর। মাস ছয়েকের মধ্যেই সে পরিচয় পেয়ে আমরা শিউরে উঠলুম। যাদের সহজে পাওয়া যায়, যাদের দর কষাই আছে তাদের ওপর ওর লোভ নেই—ভদ্র পরিবারের দিকে ঝোঁক ওর। ও চায় তাদেরই যাদের পাওয়া কঠিন, আবরু ও আচ্ছাদনের মধ্যে থাকে যারা।

ওর সেই ক্ষুধার্ত্ত দৃষ্টির পেছনে যে কাঞ্চন—কৌলীন্য ছিল তার প্রলোভন সামলাতে পারলেনা অনেকেই। গ্রামের যে সব নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার যুদ্ধের ফলে অন্তঃসারশূন্য হ'য়ে পড়েছিলেন, অল্প আয়ের সঙ্গে সম্ভ্রম রক্ষার টানাটানিতে যারা ক্লান্ত ও অবসন্ন, তাদের অনেকেরই হঠাৎ অবস্থায় একটা চাক্‌চিক্য দেখা দিলে। যাদের পরিবারের সঙ্গেই মনোহরের হৃদ্যতা ও যাওয়া আসা একটু বৃদ্ধি পায়, তাঁদেরই কিছুদিনের মধ্যে স্বচ্ছলতা বাড়ে। এ নিয়ে বাকী সবাই কানাকানি গা-টেপাটেপি করে, আর যারা নিজেরা ঐ পর্য্যায়ে পড়েছে তারা চুপ করে থাকে। আমরা দেখেশুনে ভীত হয়ে পড়লুম, কিন্তু প্রতিকারের কোনও পথ খুঁজে পেলুম না। উপায় কি? যে এসে এই গ্রামে ছ'মাসের মধ্যেই লক্ষাধিক টাকা খরচ করেছে তার প্রতিষ্ঠা ক্ষুন্ন করা সহজ নয়! আর বলবারই বা আছে কি—একটু যাওয়া আসা, একটু ঘনিষ্ঠতা—যে আশৈশব এই পাড়ারই ছেলে, কাউকে দাদা, কাউকে কাকা, কাউকে মামা বলে—তার সঙ্গে যদি হয়েই থাকে ত আপত্তি করবে কে? দুই-একটি মেয়ে, যাদের অর্থাভাবে কিছুতে বিয়ে হচ্ছিল না, তাদের কারুর বিয়েও হয়ে গেল ওর আনুকূল্যে। তাছাড়া যা কেউ চোখে দেখেনি, যার কোন প্রত্যক্ষ প্রমান নেই তা নিয়ে ওর মত শক্তিমান লোকের সঙ্গে বিবাদ করাও যায় না। সুতরাং মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকা ছাড়া আর কোন উপায় রইল না আমাদের।

এইভাবে আমরা যখন বসে বসে প্রমাদ গণছি এবং ব্যর্থ বিদ্বেষে জল্‌ছি শুধু তখন হঠাৎ আমাদের তারকদা'র মেয়ে শান্তি মনোহরের জীবনে একটা ওলট-পালট ঘটিয়ে দিলে। কথাটা আমরা তখনই সব জানতে পারিনি, পরে একটু একটু ক'রে ঘটনাটা জুড়ে নিয়ে গল্পটা যা দাঁড়িয়েছে তা' এই—

তারকদা আমাদের অত্যন্ত নিরীহ মানুষ—যত গরীব তত ভদ্র। কোন এক বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানে চাকরী করেন, এই বাজারেও তাঁর মাইনে মাগ্‌গিভাতা নিয়ে মাত্র ছে-চল্লিশটি টাকা। তাঁর স্ত্রী নেই—প্রায় সাত বছর আগে গত হয়েছেন, অর্থাৎ সংসারে অপেক্ষাকৃত লোক কম এই একটা সুবিধা—তবু সতরো আঠারো বছরের আইবুড়ো মেয়ে শান্তী, আর তিনটি ছেলে, সংসার খুব ছোটও নয়। কোনমতে শাক-ভাত তাই এই বাজারে সবদিন জোটেনা তাঁদের। আরও দু'টি ছেলেমেয়ে ছিল, গত দুর্ভিক্ষের সময় একরকম না খেতে পেয়েই মারা গেছে তাঁরা। তবু তারকদার মুখে যে কোথা থেকে এত হাসি আসে তাই ভেবে আমরা অবাক হ'য়ে যাই। হাসি যেন লেগেই আছে সর্ব্বদা। সে প্রশান্ত ও হাস্যোজ্জ্বল মুখ দেখে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না যে, তাঁর এক পয়সার সঙ্গতি নেই—অথচ আইবুড়ো ধাড়ী মেয়ে আছে ঘরে সব দিন পেটপুরে ছেলেদের খেতে দিতে পারেন না, যে চালা ঘরটিতে থাকেন সেটা জীর্ণতার শেষ সীমায় এসে পৌচেছে—আসছে বর্ষায় বোধহয় পড়েই যাবে! শুধু নিজেই হাসেন না, রসিকতা ও ঠাট্টায় অদ্বিতীয়, হাসাতেও পারেন খুব। আর সবচেয়ে যেটা বড় কথা—নিজের এই অবস্থার জন্য, না ঈশ্বর না মানুষ—নালিশ নেই তাঁর কারুর বিরুদ্ধে। একদিন অদৃষ্টকে পর্য্যন্ত ধিক্কার দিতে শুনিনি। সেই ছিল আমাদের আরও বিপদ,

তাঁকে আশু সাহায্য করার প্রয়োজন আছে কিনা তা' তাঁর মুখ দেখে আমরা কিছুতেই অনুমান করতে পারতুম না।

এ হেন তারকদার মেয়ে মাস্তীর বাপের পয়সা না থাক্—ভগবান ওকে যৌবন (এবং কিছু কিছু শ্রীও) দিয়েছিলেন ওর দেহ ভরে। সামান্য কিছু পয়সা খরচ করলেই মেয়েটি যে ভাল ঘরে পড়ে, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ ছিল না, আমরা দু' একটা পাত্র খোঁজও ক'রেছিলুম, কিন্তু যৌতুক বা গহনা কিছু না দিলেও সামান্য যে ঘর খরচা প্রয়োজন সেটা করারও সঙ্গতি ছিল না ব'লে তারকদা চুপ ক'রেই থাকতেন—এ ব্যাপারে কখনও মাথা ঘামান নি। ঝি চাকর রাখা সম্ভব নয়—সংসারের সব কাজ ঐ মেয়েকেই ক'রতে হ'তো, সুতরাং স্কুলেও দিতে পারেন নি। লেখাপড়া নিজের চাড়ে সে কিছু কিছু বাপের কাছে শিখেছিল, কিন্তু উপার্জ্জন করার মত যথেষ্ট নয়। এক কথায় মেয়েটি দুই-এর বার হ'য়েছিল।...

হঠাৎ, একদিন রাস্তার কলে জল নিতে আসা উপলক্ষ্য ক'রে মাস্তীর ওপর মনোহরের নজর পড়ল। সাঙ্গপাঙ্গদের প্রশ্ন করতেই পরিচয় পাওয়া গেল। তাদেরও যে নজর পড়েনি এতদিন তা' নয়—তবে তারকদাকে আমরা সকলে ভালবাসি, এটা তা'রা জানত ব'লেই এতদিন কিছু ক'রতে সাহস করেনি। এবার মনোহরের উৎসাহে তা'রা বল পেলে—সুরু হ'ল নানারকম উপদ্রব। ইসারা, ইঙ্গিত, কুৎসিত ভঙ্গী, রাত দুপুরে জানলার কাছে গিয়ে নানারকম শব্দ ও মন্তব্য ইত্যাদিতে তারকদা এবং শান্তি বিব্রত হ'য়ে উঠল। তারকদা আটটায় আফিসে যান, ফেরেন সন্ধ্যা সাতটায় এই সময়টা, এক রকম বন্দী হয়ে থাকতে হয় মাস্তীকে। রাস্তায় একা বেরোতে সাহস হয় না। অথচ সব চেয়ে প্রয়োজন জলের। কাছে একটা পুকুর আছে, সেখানে বাসন মাজা, স্নান, কাপড় কাচা, সবই চলত এতদিন, সেটা ও বন্ধ করতে হল। ফলে ঘরে জলের খরচ আরও বাড়ল, কিন্তু রাস্তার কল থেকে আনে কে? ছোট ভাইদের দিয়ে ছোট ছোট ঘটি করে কতক জল আনে, বাকী জল অফিস থেকে ফিরে তারকদাকেই তুলতে হয়।

কিন্তু ইহাতেও নিষ্কৃতি নেই। বাঁদরামীটা ক্রমে উপদ্রবে এসে দাঁড়াল। তারকদার মুখেরও হাসি এই বার বুঝি ফুরিয়ে আসে। তিনি চিন্তাক্লিষ্ট মুখে এসে দাঁড়ান 'কি হবে ভাই?'

—কীইবা বলব ভেবে পাই না। যারা ভয়ে মুখের দিকে চোখ তুলে চাইতে পারত না তারা দিন দুপুরে মাতাল হয়ে বুক ফুলিয়ে চলে যায়। মনোহরের পয়সার জোর আছে তাদের পেছনে বদমাইসী গুণ্ডামীর পথও কোনটা অজানা নেই।

যাই হ'ক, অসহিষ্ণু মনোহর অপেক্ষা করবার লোক নয়। সেই একদিন রেগে বলে, দূত্তোর! তোদের কাজ নয় আমিই দেখ্‌ছি।

এর পর হঠাৎ একদিন দেখা গেল রাশি রাশি গোলপাতা এসে তারকদার বাড়ীর সামনে নামছে। তিনি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেন, 'এসব কী? কে পাঠালে?'

শোনা গেল—মনোহর রায়—।

তারকদার এতদিনে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল। তিনি তখনই মনোহরের কাছে গিয়ে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'মনোহর, ব্রাহ্মণ ছেলে মেয়ের হাত ধ'রে ভিটে ছেড়ে চলে যায়, এইটেই কি তুমি চাও?'

'ছি ছি, এসব কি বলছেন তারকদা?'

'নইলে এসব কী?

'ঘরটায় দেখলুম কিছুই নেই- সামনে ঝড় জলের দিন আসছে তাই—'

'এমন অবস্থা ত আরও অনেকের আছে ভাই, তাদেরই উপকার করোগে। আমাকে অব্যাহতি দাও। যখন ভিক্ষে করেই ঘর ছাইতে হবে তখন তোমার কাছে আসব।'

মনোহর মিষ্টি করে বললে, 'এটাকে ছোট ভাই-এর সাহায্য বলেই মনে করুন না দাদা?'

'না ভাই—মাপ করো? এ সাহায্য নেবার আমার অধিকার নেই, অন্তত আমার তাই বিশ্বাস।'

অগত্যা মনোহর তার লোক জন ডেকে নিলে। কিন্তু তবু হাল ছাড়লে না। শিগগিরই একটা প্রস্তাব এল যে, তারকদা যদি মনোহরের ঐ কেরোসিন কণ্ট্রোলের দোকানটার হিসাবপত্র দেখে দেন, তা'হলে সে তাঁকে মাসে পঞ্চাশ টাকা ক'রে দেবে। সন্ধ্যার পর এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা কাজ করলেই চলবে।

যার মাসিক সাতচল্লিশ টাকা আয় তার পঞ্চাশ টাকা উপরি—লোভনীয় প্রস্তাব বটে,কিন্তু প্রস্তাবের আড়ালে যে আসল প্রস্তাবটা রইল সেটার কথা ভেবে বিরক্তি ও ক্ষোভে তারকদার মাথা খুঁড়তে ইচ্ছে হয়। রেগে মেয়েকে বলেন, 'ভিখিরীর ঘরেই যদি জন্মেছিলি এমন চেহারা আনতে কে বলেছিল! কালো-কুচ্ছিত মর্কট হ'লে ত আমায় এমন ক'রে জ্বলতে হ'ত না!...

এধারে মনোহর ক্রমশঃ আরও অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। এদের চেয়ে অনেক ভাল অবস্থার ভদ্রপরিবারের মেয়েরা সহজে আত্মসমর্পণ করেছে—ভিখিরীর মেয়ের এত জেদ কেন?

শেষ পর্য্যন্ত সে সোজাসুজি প্রস্তাব করে পাঠালে—সে এখন এক হাজার টাকা নগদ, পরে ওর বিয়ের সব খরচ এবং তারকদার জন্য একটা বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা করতে রাজী আছে। যেটা সহজে পাওয়া যায় না—সেটাকেই মনে হয় অসাধারণ—মালতীকে না পেলে মনোহরের চলবে না, ক্রমে অমনি তার মনের অবস্থা এসে দাঁড়াল। একধারে এই প্রস্তাব করে অন্যদিকে সে তার তাল বেতালদের খোঁচা দেয়—উপদ্রব অত্যাচার অসহ্য হয়ে ওঠে। একদিন ত ঘরে আগুন লাগতে লাগতেই বেঁচে গেল অতিকষ্টে। ব্যাপার খারাপ দেখে আমরা তারকদাকে সবাই যুক্তি দিলুম, 'আপনি অন্তত দিন কতকের জন্যও অন্য কোথাও সরে যান। খরচা যা লাগে আমরা চাঁদা করে দিচ্ছি।'

এইসব দেখে, শোনে, আর মাস্তী দিন দিন পাথর হয়ে যায়। এর জন্য সে নিজেকেই অপরাধিনী মনে করে। এক এক সময়ে ইচ্ছা করে পোড়া আংরা মুখে আর দেহে চেপে চেপে ধরে দেহটাকে কুশ্রী ও ভয়াবহ করে তোলে। কিন্তু বাবার কথা ভেবে ওর সাহসে কুলোয় না। মুখে যাই বলুন, ওর বাবা ওকে বুক ভরা

রাসেন তা ও জানে। তিনি একেই নানা জ্বালায় জ্বলছেন—ঐ রকম একটা কিছু দেখলে বেদনায় দুঃখে হয়ত আত্মহত্যাই করে বসবেন।

অথচ কিছু একটা না করলেই নয়। সত্যিই হয়ত ঘরে কোন দিন আগুন লাগাবে। তা ছাড়া সবাই বাইরে যেতে বলছেন, কোথাও যে ওদের কোন আশ্রয় নেই তা মাস্তীর চেয়ে বেশী আর কে জানে। এ ঘরটি বাবার কত প্রিয়, কোথায় কার দোরে যাবেন তিনি নিজের ভিটে ছেড়ে? এত গরীব এবং বিপন্নকে কে-ই বা আশ্রয় দেবে?

ভেবে ভেবে হঠাৎ একদিন যেন মরিয়া হয়ে উঠল মাস্তী। বাবা অফিস গেছেন, ভাইয়েরা সব স্কুলে—ও একাই ছিল বাড়ীতে। যে ঝিটা ইদানীং মনোহরের প্রস্তাব পেশ করার চেষ্টা করছিল সে কাজ করে পাশের বাড়ীতে, ঘরের জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তাকে ডাকল মাস্তী, 'ননীর মা, ও ননীর মা শোন।'

ননীর মা তার মিষ্টি কণ্ঠস্বরে বিস্মিত হলো। কারণ কথাটা পাড়তে গিয়ে আগের দিনই সে লাথি খেতে খেতে বেচে গেছে। যাই হোক্—সে দৌড়েই এল, 'কী গো খবর কি?

মুহূর্ত্তখানেক ইতস্তত করে মাস্তী বললে, 'কাল দুপুর বেলা ওকে আসতে বলবি এখানে। বলবি আমি নিমন্ত্রণ করছি, এখানেই ও খাবে।'

এমন অকস্মাৎ আর সহজে যে কাজ হাসিল হবে সে আশা ইদানীং মনোহরের মোটেই ছিল না। এই নিমন্ত্রণে প্রথমটা তার একটু সন্দেহও হয়েছিল কিন্তু তারপর ভেবে দেখলে তাকে বিপদে ফেলতে পারে এমন কেউ নেই ওখানে—তা ছাড়া একবার যে সিদ্ধি ও স্বার্থকতার স্বাদ পেয়েছে, সে ভাবতেই পারে না বেশীক্ষণ যে, সে যা চায় তা পাবে না। সুতরাং সঙ্গীদের টিপে দিয়ে যত দূর সম্ভব পরিপাটি প্রসাধন করে এক সময়ে সত্যি সত্যিই তারকদার চালাঘরের সামনে উপস্থিত হ'ল।

তখন কেহই ছিল না—ভাইয়েরা সব স্কুলে চলে গিয়েছিল, ননীর মাকেও ডাকেনি মাস্তী। আর ত কেউ খবরই জানত না। মাস্তী নিজে এসেই দোর খুলে দিলে, বেশ সহজ ও মিষ্টি কণ্ঠে আমন্ত্রণ করলে, 'আসুন'।

দাওয়ায় একটি ভাল আসন পাতা ছিল। মনোহর জুতো খুলে কতকটা স্বপ্নচালিতের মতই এসে বসল। মাস্তী এর আগে তার বাসনাকে জাগিয়েছিল বটে কিন্তু এখন যেন ক্ষুধাটা অত্যুগ্র হয়ে উঠেছে। স্নান করে ভিজে চুল এলিয়ে দিয়ে মাস্তী একখানা রঙ্গীন শাড়ী পড়েছে, পায়ে আলতা—সুন্দর ললাটের ওপর একটি সিঁদুরের টিপ। সবটা জড়িয়ে যেন অত্যন্ত সুকুমার, অত্যন্ত সুশ্রী। সেদিকে চেয়ে মনোহরের চৈতন্য আচ্ছন্ন হয়ে এল—মাস্তী যে এত সুন্দর, এত লোভনীয় তা কে জানত!

মাস্তী এক সময়ে এক ঘটি জল নিয়ে এসে দাওয়ার ওপরই ওর পা ধুইয়ে নিজে হাতে পা মুছিয়ে নিয়ে গেল। মনোহর এ-সবের কোন অর্থ বুঝতে পারেনা। এ রকম সমাদর এত যত্ন এর আগে কেউ করেনি কখনও। সে কেমন বিহ্বল হয়ে পড়ে। এর প্রয়োজন কি, ভাবে সে কিন্তু ভালও লাগে। বিশেষতঃ হেঁট হয়ে পা মোছাবার সময় দুটি গোছা চুল স্খলিত হয়ে ওর পায়ের ওপর এসে পড়েছিল—

পা মোছাবার পর মাস্তী সহসা ঘরের মধ্যে চলে গেল, একটু পরে যখন আবার বেরোল হাতে একটা ছোট রেকাবিতে একটু চন্দন ও গোটাকতক ফুল। সামনে এসে কড়ে আঙ্গুলে করে একটু চন্দন তুলে নিয়ে মনোহরের কপালে ও তিলক এঁকে দিলে, তারপর ফুলগুলো ওর পায়ের ওপর রেখে গলায় আঁচল দিয়ে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করলে।

মনোহর কিছুই বোঝে না—শুধু একটা অস্বস্তি বোধ করে। এ আবার কী? এসব শুধু অপ্রত্যাশিত নয়—অপরিচিত-ও।

কিন্তু বোঝা গেল একটু পরেই। মাস্তী প্রণাম করে উঠে ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে বললে, 'দাদা, আপনার কপালে আমি ভাই ফোঁটা দিলাম। আজ থেকে আমি আপনার ছোট বোন।"

বিদ্যুৎগতিতে মনোহর আসনের ওপর উঠে দাঁড়াল। কেমন একটা স্খলিত, ভগ্নকণ্ঠে প্রশ্ন করলে, "কী, এসব?"

এবার বেশ সহজ ভাবেই উত্তর দিলে মাস্তী, "আপনারও বোন নেই, আমার ত দাদা নেই-ই। দুই অভাবই এতদিনে মিটল। এবার আর আমার কোন দায়িত্ব রইল না। ছোট বোনের মর্য্যাদা, সম্ভ্রম আপনার হাতেই নিঃশেষে সঁপে দিলুম দাদা, আপনি যদি বোনের অমর্য্যাদা করতে চান, করুন, বাধা দেব না; আমার ত কোথাও কেউ সহায় নেই—আপনিই আমার ভরসা।"

বহুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মনোহর। দাদা? বোন? এ সব কথা সে কোন দিনই কোথাও শোনেনি কিন্তু বড় মিষ্ট সম্পর্ক।

একটু অপেক্ষা ক'রে থেকে মাস্তী আবার বললে, 'আমার ওপর কি রাগ করলেন, দাদা?'

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে যেন তন্দ্রা থেকে জেগে উঠল মনোহর। ম্লান হেসে বললে, 'ছিঃ, বোনের ওপর কেউ রাগ করে? তাই হোক্ ভাই—তুমি নিশ্চিন্ত হও। আমার বোনকে আর কেউ অপমান করতে সাহস করবেনা।'

সে দোরের দিকে পা বাড়াল। মাস্তীর কিন্তু ভরসা অপরিসীম। সেও এগিয়ে এসে বললে, "কিন্তু দাদা, ভাই ফোঁটা দিলে ছোট বোনকে কিছু দিতে হয় আপনি ত কিছু দিলেন না।'

মনোহর বিস্মিত হয়ে তাকাল, 'কী চাস তুই বল।'

'আমাকে কথা দিন—শুধু আমি নয় সবাই নিশ্চিন্ত হবে আজ থেকে। আপনি এ সব ছেড়ে দেবেন।'

স্তম্ভিত হয়ে কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে মনোহর বললে, 'কিন্তু সে কি পারব ভাই?'

'নিশ্চয় পারবেন দাদা। আপনি সবই পারেন।'

আরও একটু চুপ করে থেকে মনোহর বললে, 'বেশ তাই হবে, তবে তুইও কথা দে, তোদের এই চালাটা আমাকে সারিয়ে দিতে দিবি? তোর বাবা রাগ করবেন না বল।'

মাস্তী আর একবার প্রণাম ক'রে বললে, 'আজ থেকে ত আপনি তাঁর সন্তান দাদা, তবে আর ভয় কি।"

সেদিন থেকে মনোহরের সত্যিই জন্মান্তর হয়েছে।

কবির সান্ত্বনা

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

যূথীর মালিকাখানি কিম্বা চন্দ্রমল্লিকার তোড়া
অভিষেক সমারোহ সমাদরে তাস্য কলরবে,
কি কাজ তোমার কবি আড়ম্বরে ভ্রান্তি আগাগোড়া,
তোমার কবিতাখানি তাই তব কণ্ঠে গাঁথা রবে।

অশোক কিংশুক জবা যৌবনের রক্তরাঙা রাগে
অভিনন্দনের লাগি না বাজিলে উৎসবের বাঁশী,
অভিমানী চিত্তে তব কেন মিথ্যা অনুযোগ জাগে ?
আজিকার ফোটা ফুল জান নাকি কালি হবে বাসি ?

সহস্র প্রদীপ দিয়া দীপালী রচনা করিল না,
ভয় হয় পাছে মৃত্যু যবনিকা টানে জীবনের,
পূর্ণচ্ছেদ অসম্পূর্ণে, অমৃতের বাণী পশিল না,
পিপাসিত কর্ণে তব মুগ্ধ স্তব সমালোচকের।

মরণের পরপারে বাণীর বরেণ্য লোকে গিয়া
কবি কি চাহিয়া রবে' এ নশ্বর পৃথিবীর পানে,
গণিবে কি সেথা হতে কয়জন শোকাচ্ছন্ন হিয়া,
করিবে তর্পণ তার চিত্রপটে পুষ্পমাল্য দানে ?

আলোক-আলেখ্য তব তৈলচিত্রে কি কাজ লিখিয়া,
তুমি লিখে রাখো বন্ধু অক্ষয় অক্ষর পরিচয়ে
সুরে নাট্যে গীতিকাব্যে সঙ্গীতে নূতন ছন্দ দিয়া
আজিকের রূপায়ণে রহিবে সে সাক্ষী তব হয়ে।

মাসে মাসে ঋতুচক্র ধরিত্রীর পুষ্পে ভরা থালি,
তুমি তার মালাকর তব করস্পর্শরস ভরা—
তোমার সমাধিক্ষেত্রে নক্ষত্রেরা জ্বালিবে দীপালী
গাহিবে বিহগ-বধূ 'চোখ গেল' বলে কলস্বরা।

পদ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

'পদ' বলে তারে ডাকে,
আপদ বিপদ সম্পদে মোর
পদে পদে চাই তাকে।
বৃষ্টি রৌদ্রে শিরে ছাতা ধরে'
আঁধার আগায় আলো ল'য়ে করে,
সে যেন তাহারে সারা প্রাণ দিয়া
অঘোরে আগুলি রাখে।

সাহসে সে দুর্জ্জয়,
কোথাও সে মাথা করে নাকো নত
কারেও করে না ভয়।
বচন তাহার চোখা চোখা বান,
অত্যাচারীকে দেয় না সে মান,
তার দারিদ্র্য তরে অনটন
হাসির আড়ালে ঢাকে।

বিশ্বাসী ভগবানে
তাহার গোপন মরম বেদনা
একজন শুধু জানে।
করে কি গভীর ভক্তি সে মোরে,
সাগরেতে ডোবে অনলেতে পোড়ে,
সুদীর্ঘ কাল সেবা করে আর
সঙ্গে আমার থাকে।

শক্ত তাহারে চেনা,
অভাবী সে বটে লক্ষ টাকায়
যায় না তাহারে কেনা।
নাই টাকা, নয় দেহ বলবান,
তবু বিদ্যুৎ ভরা তার প্রাণ,
কখনো কাহারো হিংসা করে না
শঙ্কা করে সে কা'কে ?

নাহি তার সংশয়,
যেথায় পাঠাই আনে সফলতা,
বহে নিয়ে আসে জয়।
ধন্য পেয়ে সে যেন মোর স্নেহ,
সেই ভাবে মোরে অমর অজেয়,
ভক্তিই তার কল্প ফল যে
ফলায় পলাশ শাখে।

গাঢ় অনুরাগে তার
অজয়ের জলে লাভ করিয়াছে
মাহাত্ম্য গঙ্গার।
তার নির্ভর আমার উপর,
আমিই কেবল জানি তার দর,
তাহার মতন খাঁটি লোক এক
ক্বচিৎ মিলে যে লাখে।

দেশবন্ধু—সুভাষ

ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

স্বরাজ-সংগ্রামে

বাম দিক হইতে:—সুধীরচন্দ্র, সতীশচন্দ্র, সুনীলচন্দ্র, পিতা জানকীনাথ বসু (কোলে শৈলেশ), সুভাষচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, সুরেশচন্দ্র।

কলেজ হইতে বিতাড়িত হইবার পরে বাড়ী হইতে সুভাষ বাহির হইতেন কম। বাড়ীতে শাসনও ছিল কিছু কড়া। পিতাও মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। কাহারও কাহারও নিকট ক্ষোভ করিয়া বলিয়াছেনও—"ছেলেগুলো সব কয়টিই ভাল। ওর কাছেও অনেক আশা করেছিলুম, কিন্তু এমন একটা কাণ্ড করে ফেলেছে, যে, লোকের কাছে মুখ দেখাতেও লজ্জা বোধ হয়।" আজ তিনি যে লোকেই থাকুন, তাঁহার আত্মা তৃপ্তিলাভ করিবে যে, জগতের দেশভক্তগণের ন্যায় তাঁহার এই পুত্রের স্থানও সকলের হৃদয়ে চিরাঙ্কিত রহিয়াছে। অবশ্য আরও আনন্দের বিষয়, জীবদ্দশায়ও ইহার কিছু কিছু পরিচয় তিনি পাইয়াছিলেন।

সুভাষচন্দ্র যে এই সময়ে বাড়ীতেই কেবল পড়াশুনা করিতেন, তাহা নয়। সঙ্গীদেরও পড়াশুনার সহায়তা করিতেন। একদিন তারক বাবু ও আমি রাস্তায় দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছিলাম, দেখিলাম, সুভাষ নগ্নপদে এদিকে আসিতেছেন। সামান্য দাড়িও উঠিয়াছিল। তারকবাবু বলিলেন—

"সুভাষ কোত্থেকে আসছ?"

সু—একটা সঙ্গীকে ফিলজফি পড়িয়ে এলাম।

ঠিক তেমনি হাসি ও সলজ্জভাব। তখনও আমার সঙ্গে আলাপ হয় নাই। চলিয়া যাইবার পরে তারকবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, খালি পায়েই চলাফেরা করিত। আর রবিবার রবিবার বাড়ী বাড়ী হইতে মুষ্টিভিক্ষা উঠাইয়া দুঃস্থ পরিবারের সাহায্য করিত। দুঃখের বিষয়, এরূপ সৎপ্রবৃত্তি যুবকদের মধ্যে তখন খুব বেশী ছিল, কিন্তু আজকাল ছেলেদের মধ্যে সে ভাবটি প্রায় দেখিতে পাই না।

কলেজের গোলমালের সময় অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের ওখানে ছাত্রগণ প্রায়ই যাইতেন। তিনিও তাহাদের সঙ্গে কথাবার্তায় বেশ আনন্দ পাইতেন। প্রথমে যখন বিপিন দে, অনঙ্গ দাম ও সুভাষচন্দ্র যান, তখন মতিবাবু কলেজের ঘটনাগুলি লিখিয়া দিতে বলেন। সুভাষচন্দ্র বিপিন বাবুর দিকে চাহিয়া তাঁহাকে লিখিতে ইঙ্গিত করেন। তাঁহার মনের ভাব এই যে বিপিনবাবু যখন উপরের ক্লাসের ছাত্র, তাঁহারই লেখা কর্তব্য। বিপিনবাবু বলেন—"না, না, আপনিই লিখুন"। সুভাষচন্দ্র অল্পক্ষণ মধ্যে না থামিয়া কয়েকখানা পাতায় তৎক্ষণাৎ লিখিয়া দিলেন। মতিবাবু খুসী হন, এবং ইহার পরে ইহারা আসিলেই আনন্দিত হইতেন। একদিন মতিবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—*

"সুভাষ, তুমি গান গাইতে পার?"

"হাঁ, কিছু কিছু পারি—"

"আচ্ছা একখানা গান গাও তো" সুভাষবাবু গান ধরিলেন—

"চিন্তয় মম মানস হরি
চিদ্‌ঘন নিরঞ্জন।"

এই গানটি স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণদেবের সম্মুখে গাহিয়াছিলেন।

মতিবাবু বলেন, "বাঃ, বেশ গান করতে তো তুমি পার; অভ্যাসটা বরাবর রাখবে!"

সুভাষচন্দ্র কলেজ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য, কিন্তু এক বৎসর অতীত হইলেই স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের অধ্যক্ষ আর্কুহার্ট সাহেবের সহিত তিনি পরিচিত হন। বিজ্ঞ সাহেব সুভাষচন্দ্রের সহিত আলাপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিজ কলেজে লইতে ইচ্ছুক হন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তখন আবার ভাইস্-চ্যান্সেলার হইয়াছেন। তিনি পূর্ব্বেও অনেকদিন এই অধিনায়কের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু আমাদের পূর্ব্বোক্ত ঘটনার সময় কিছুদিনের জন্য স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় ভাইস্-চ্যান্সেলার হইয়াছিলেন। আর্কুহার্ট সাহেব স্যার

* Memoirs of Motilal Ghose by Sj. Parmanand Dutt p. 255.

আশুতোষের সহায়তায় সুভাষচন্দ্রকে ১৯১৭, জুলাই মাসে থার্ড ইয়ারে নিজ কলেজে ভর্ত্তি করাইয়া লন। স্যার আশুতোষ মনে করেন যে, এই দুই বৎসরের পড়ার ক্ষতিতেই যথেষ্ট শাস্তি হইবে। অধিক আর আবশ্যকতা নাই। সুভাষচন্দ্র ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে স্কটিশ চার্চ হইতে মনোবিজ্ঞানে (Mental Philosophy) অনার্স সহ পাশ হন। অনার্সে সুভাষচন্দ্র হন দ্বিতীয়, সত্যেন্দ্র বসু (পরে আই. সি. এস) হন প্রথম।*

যতদূর মনে হয় স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্রাবস্থায় সুভাষচন্দ্র কিছুদিন ভলান্টিয়ার হইয়া যুদ্ধবিদ্যাও কিছু শিখিয়াছিলেন। ইংরাজ অফিসারগণ শিক্ষা দিতেন। প্রথমে কলিকাতা থাকিতে হইত। কিন্তু পরে বেলঘরিয়ায় ফিল্ড সার্ভিস করিতে হয়। এবং বৈশাখের ঝড়বৃষ্টিতে (১৩২৫) বেশ ভাল লাগিয়াছিল। পাইখানা প্রস্তুত করা, দূর হইতে পানীয় জল আনা, রাত্রিতে শান্ত্রীর বেশে পাহারা দেওয়ায় বেশ নূতনত্ব ছিল! তবে সেখানে সুভাষচন্দ্র প্রাইভেটই ছিলেন। অফিসার হইতে পারেন নাই। নির্ব্বাচনের দিনে বসন্ত হওয়ায় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই।

উক্ত কলেজে সন্তোষ মিত্র মহাশয়ও তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। তখন হইতেই উভয়ের মধ্যে মতদ্বৈধ লক্ষিত হয়।

পিতা ও আত্মীয়-স্বজনের আগ্রহে বি এ পাশ করিবার পরেই সিভিল সার্ভিস পাশ করিবার জন্য ইনি ১৯১৯ সনের ১১ই সেপ্টেম্বর বিলাত যাইবার জন্য জাহাজে রওনা হইয়া অক্টোবর মাসে কেম্ব্রিজে উপস্থিত হন। সেইখান হইতে মনোবিজ্ঞানে 'ট্রাইপোস' লাভ করিয়া পরে যথাসময়ে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। সুভাষচন্দ্র বিলাতে খুব গম্ভীরভাবে থাকিতেন। ভারতীয়গণের প্রতি ইংলণ্ডবাসীদের বিদ্বেষের ভাব তাঁহার মনে এমন ভাবে চিরাঙ্কিত ছিল যে, এই দরুণই তিনি ইহাদের সঙ্গে কখনও প্রাণ খুলিয়া মিশিতে পারেন নাই। কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গেও নিতান্ত আবশ্যক না হইলে মিশামিশি করা তো দূরের কথা, কথাই কহিতেন না। এই বিদ্বেষের ভাব আরও প্রকট হইল, একদিনের দুই একটি শ্বেতাঙ্গ মহিলার অশিষ্ট আচরণে। এই আখ্যানটি শ্রদ্ধাস্পদ নীরদচন্দ্র দাশগুপ্ত (প্রেসিডেণ্ট ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ট্রাইবুন্যাল) মহাশয়ের কাছে শুনিয়াছি। নীরদবাবু ও সুভাষচন্দ্র পূর্ব্বে প্রেসিডেন্সী কলেজে এক সময়ে অধ্যয়ন করেন। নীরদ বাবু এক ক্লাস উপরে পড়িতেন। বিলাতে সুভাষচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত দিলীপ রায় এক জায়গায় থাকিতেন, আর ইনি ও অধ্যাপক সোমনাথ মৈত্র একস্থানে থাকিতেন। একদিন সুভাষ ও দিলীপ, ইহারা যে বাড়ীতে থাকিতেন, সেখানে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে দিলীপ বাবুকে গান করিতে অনুরোধ করিলে তিনি একটা গান করেন। অমনি সেই স্থানে সমাগতা দুই একটি ইংরাজ-মহিলা উপহাসচ্ছলে নকলের সুরে চীৎকার করিয়া উঠিলে সুভাষের চিত্ত তিক্ততায় পূর্ণ হইয়া উঠে। বলিতে লাগিলেন, "দিলীপ কেন এখানে গান গাইলে? এ-জাতের সঙ্গে কোনভাবেই কো-অপারেট করতে নাই। এরা আমাদের ঘৃণা করে, এদের সঙ্গে আমাদের কিছুতেই মিল্‌তে পারে না।"

সুভাষচন্দ্রের এই ভাবটি যে একেবারেই প্রেজুডিস্‌ড্‌ নয়, রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতাও তাহারই জাজ্বল্য সাক্ষ্য দেয়।

আর একবার দিলীপ বাবুর সঙ্গে ফটো তুলিবার সময় দশ বৎসরের একটি মেয়েও সঙ্গে ছিল। সুভাষচন্দ্র ইচ্ছা করিয়াই যেন অপর দিকে তাকাইয়া রহিলেন। স্ত্রীলোক মাত্রের সঙ্গে এরূপ ভাব লক্ষিত হইত। কিন্তু একটি বিষয়ে তিনি বড় আনন্দ উপভোগ করিতেন। অনেক সময়ে বলিয়াছেন, সাদা চামড়ার জুতা পরাইয়া দিতেছে, জুতা পরিষ্কার করিতেছে, ভৃত্যের ন্যায় ফরমাস্ মত কাজ করিয়া যাইতেছে, ইহাতে ভারী আনন্দ হইত।

প্রেসিডেন্সী কলেজে তিক্ত অভিজ্ঞতার পরে সেখানকার প্রফেসারদের ব্যবহারে কিন্তু তিনি বিশেষ প্রীত হন।

বিলাতে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর বক্তৃতা শুনিয়া ভারী প্রীত হন। ভারতীয় রমণীদের বৈশিষ্ট্য দেখিয়া তিনি খুবই গর্ব্বানুভব করেন। আরও কয়েকটি ভারতীয় মহিলা দেখিয়াও তাঁহার শ্রদ্ধা হয়।

যাহা হউক, সিভিল সার্ভিস পাশ করিলেন বটে, কিন্তু কানে আসিল স্বদেশের 'নিনাদিত মহাপুরুষের শঙ্খনিনাদ'। চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন, ভারতাকাশে এক নূতন আভা দীপ্ত হইয়াছে, মহাত্মা গান্ধী জয়-দীপ বহন করিতেছেন আর শঙ্খ ফুকারিয়া চিত্তরঞ্জন দেশবাসীকে ত্যাগের পথে আহ্বান করিয়া মুক্তির মন্ত্র প্রদান করিতেছেন। সুভাষচন্দ্রও ইহাতে যোগদান করিয়া প্রাণের সঙ্গীত ঢালিয়া দিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন।

ইতিমধ্যে সুভাষচন্দ্র হেমন্ত বাবুকে একখানি পত্রে লিখিলেন, "হেমন্ত, শুনিয়া দুঃখিত হইবে, আমি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ করিয়াছি। এখন আমি কি করিব ঠিক করি নাই।"

ঠিক হইয়াই ছিল। হঠাৎ কিছু করিবার মত লোক তিনি ছিলেন না। ছেলে পাশ করিয়াছে, এখন Heaven-born service না করিয়া খদ্দর গায়ে দিয়া হৈ হৈ করিয়া বেড়াইবে, সে-সময়ে কোন আত্মীয় বা অভিভাবকই তাহা চাহিতে পারেন না। যাহা হউক সব ভাবিয়া ইনি অবশেষে নিজের পথই বাছিয়া লয়েন। সুভাষ বসুকে বহুবার অনেক গুরুতর বিষয় সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা করিয়া অনেক সময় একই উত্তর পাইয়াছি "ভেবে দেখি"। এই ভাবিবার ভাবটি তাঁহার চেহারায় সুস্পষ্ট প্রতিফলিত হইত। তাই মনে হয়, এ-বিষয়েও খুবই ভাবিয়াছিলেন।

এদিকে দেশবন্ধু তখন স্বরাজের নেশায় একেবারে বিভোর। দিবারাত্রি খাটুনি, বিশ্রাম নাই, নিদ্রা নাই, সহানুভূতি নাই। ঠিক এই সময়ে হেমন্ত সরকার দেশবন্ধুর কাছে সুভাষের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে কথা শুনিয়াই দেশবন্ধুর প্রাণ আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। মনে হইল যেন তিনি যাহার অভাব বোধ করিতেছিলেন, তাহা এখন পূর্ণ হইবে। অতঃপর আর একখানি পত্রও আসিল।

* শ্রীযুক্ত ভোলানাথ রায় মহাশয়ের সহিত সুভাষচন্দ্রের খুব সম্প্রীতি ছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি কয়েকটি বিষয়ে জোর দিয়া পড়িতে বলিয়াছিলেন। এবং কয়টি প্রশ্ন সেখান হইতেই আসে। এ বিষয়ে সুভাষ ভোলানাথ বাবুর কাছে চিঠির সহায়তার কৃতজ্ঞতা জানাইতে বিস্মৃত হন নাই।

তখন বাড়ীতে আনন্দ কোলাহল পড়িয়া গেল। নিশীথ সেন মহাশয় বলিলেন,"বড় তুখোড় ছেলে, ওটেন সাহেবকে শিক্ষা দিয়েছে. মনে নাই। পার্টির সৌভাগ্য।" দেশবন্ধুর বিষাদ অনেকাংশে দূরীভূত হইল, আমরাও সতৃষ্ণ নয়নে সুভাষচন্দ্রের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম।

ইতিমধ্যে সুভাষচন্দ্র কলিকাতা পৌঁছিয়া ষ্টেশন হইতে বরাবর দেশবন্ধুর কাছে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করেন। দেশবন্ধু তখনই বুঝিলেন, "হাঁ এর দ্বারাই আমার আসল অভাব দূর হবে।" তিনি তাঁহাকে কোন্ কোন্ কাজের ভার দিবেন সবই ঠিক করিয়া রাখিলেন।

ইতিমধ্যে কিরণশঙ্কর বাবুও ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া তাঁহার ৪৪ নম্বর ইউরোপীয়ান এসাইলাম লেনের বাড়ীতে আসিয়া বাস করিতেছেন। ইনি পূর্ব্বে অক্সফোর্ডে বি-এ পাশ করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ইতিহাসের প্রোফেসার হইয়াছিলেন। ২।৩ বৎসর কাজ করিয়া পরে আবার ব্যারিষ্টারী পাশ করিতে বিলাত যান। সেখানেই সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সৌহার্দ্য জন্মে।

একদিন প্রাতে দেখিলাম, কিরণবাবু সুভাষবাবু প্রভৃতির সঙ্গে দেশবন্ধু কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। যতদূর মনে হয়, সাবিত্রী বাবুও ছিলেন। জাতীয় শিক্ষা এবং গৌড়ীয় সর্ব্ববিদ্যায়তন সম্বন্ধেই কথা হয়। তবে সুভাষবাবু খুব কম কথা বলিলেও সব কথায়ই আন্তরিকতার সহিত যোগদান করিয়াছিলেন।

ইতিপূর্ব্বে দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটি সুগঠিত হইয়া ৬।১ মহিম হালদার ষ্ট্রীটে আমার বাসায় উঠিয়া গিয়াছে। এ-পর্য্যন্ত দেশবন্ধুর বাড়ীতে উহার আফিস ছিল এবং দেশবন্ধুর নেতৃত্বাধীনে আমার উপরই ভার পড়ে। গঠিত হইবার পরে উহার নায়কত্বও আমার হাতেই ছিল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনের পরে আফিসটি স্থানান্তরিত হইয়া এখানে আসে। দক্ষিণ কলিকাতা হইতে সেইবার ৭ জন সভ্য বি,পি,সি,সি'তে যান। তন্মধ্যে দেশবন্ধু ছাড়া বসন্তকুমার বসু, উর্ম্মিলা দেবী ও আমি ছিলাম। খিদিরপুরের দুইজন, ব্রজগোপাল গোস্বামী ও দুর্গাচরণ বসু ছিলেন। আর একজন কে ছিলেন মনে নাই।

পূর্ব্বোক্ত সাক্ষাতের ২।১ দিন মধ্যেই সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস আফিসে আসিয়া মহিম হালদার ষ্ট্রীটের বাসাস্থ কংগ্রেস আফিসটি অলঙ্কৃত করিয়া যান। অনেকক্ষণ বসিয়া কথা কহিতেছিলেন। দুই একটি কথা বেশ মনে আছে। তিনি বলেন, "আমাদের দেশের অনেক নেতার বহুদিন হইতে এই ভাবটাই বড় প্রবল যে, ভারত উদ্ধার যদি আমার দ্বারা হয় হোক, না হইলে হওয়ায় আবশ্যকতা নাই।"

এই দিনই আসিয়া দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির সভ্য হন। লোকটি যেমনি সুন্দর, হাতের লেখাও তেমনি সুন্দর। তখন বয়সের ঘরে লিখিলেন ২৫। সর্ত্ত (pledge) সহি করিলেন।

একবার আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম আপনার নাম সুভাষ না সুবাস। তিনি উত্তর করেন—সুভাষ। তাঁহার কথার কত শত লোক মন্ত্রমুগ্ধের মত আত্মসমর্পণ করিয়াছে। এইখানেই নামের সার্থকতা হয়।

ইহারই ৫।৭ দিন মধ্যে বি,পি,সি,সি'র কার্য্যকরী সভার অধিবেশন হয় ফরবেস ম্যানসনের নিম্নতলায়। কতকগুলি বোর্ড গঠিত হয়, যেমন স্বদেশী বোর্ড,প্রোপেগাণ্ডা বোর্ড,পাবলিসিটি বোর্ড, রিপ্রেসন এডভিসরি বোর্ড, ন্যাসনাল সার্ভিস বোর্ড, এডুকেসন বোর্ড ইত্যাদি। এইদিন সুভাষবাবু বা কিরণশঙ্করবাবু সভায় আসেন নাই, কারণ তাঁহারা বি, পি, সি, সি'র সভ্য তখনও হন নাই। উহার নির্ব্বাচন ইতিপূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে। এই সভায় কিরণবাবু হইলেন এডুকেসন বোর্ডের সেক্রেটারী, সুভাষবাবু পাবলিসিটি বোর্ডের সেক্রেটারী, সত্যেন্দ্র মিত্র ন্যাসনাল সার্ভিসের

১৯২২, জেল হইতে মুক্ত হইবার পর সুভাষচন্দ্র

সুনীতি চট্টোপাধ্যায় (পরে মিত্র) মহিলা বিভাগের সেক্রেটারী, সাতকড়িপতি রায় স্বদেশী বোর্ডের মদনমোহন বর্ম্মন প্রোপাগাণ্ডার আমি রিপ্রেসন এডভিসরি বোর্ডের। ইতিপূর্ব্বেই (১৩ই জুলাই) ফাইনান্স কমিটি হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ছিলেন দেশবন্ধু এবং নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র মহাশয় ব্যতীত আরও ২।১জন। কার্য্যকরী সমিতির এই সভা হয় জুলাই মাসে ২০শে তারিখে। সুভাষচন্দ্রকে পাবলিসিটি বোর্ডের সেক্রেটারী ও কলেজের অধ্যক্ষ করিবার সময় কয়েকজন আপত্তি করেন। ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ জিতেন্দ্রবাবু বলেন —

"সবে আই-সি-এস পাশ করেছে। দেখলাম না, কোন পরিচয় পেলাম না, একেবারে অজাতশত্রু! এতবড় গুরুতর দায়িত্ব এই অল্পবয়স্ক যুবকটির উপরে দেওয়া কি সমীচীন?"

দেশবন্ধু—আপনারা ভাববেন না, আমি লোক চিনি। এই দুইটী গুরুতর ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ এর দ্বারাই খুব হবে।

সুভাষচন্দ্র অধ্যক্ষ হইলেন এবং সর্ব্ববিদ্যায়তনের কাজ খুবই সুষ্ঠু ভাবে চলিতে লাগিল। তিনি ও কিরণবাবু পরামর্শ করিয়াই সব কাজ করেন। উভয়ের সংস্পর্শে কলেজের যেন আবার নূতন জীবন লাভ হইল। অন্যান্য অধ্যাপকের মধ্যে হেমন্ত সরকার, সুকুমার দাশগুপ্ত, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, বীরেন সেন প্রভৃতি ছিলেন। সুভাষবাবু দ্বিপ্রহরে রোজ কলেজে যান। কতকগুলি ছাত্র সেই বাড়ীতেই থাকিত, কতক বাহির হইতেও আসিত। সংখ্যা নিতান্ত কম ছিলনা, ছাত্রতে বাড়ী ভরিয়া যাইত। কলেজের একদিনের কি একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইয়াছিলাম, সেদিন সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও আসিয়াছিলেন। শরৎবাবু ভাবে গদগদ হইয়া বলেন,"এই যুবকগণ যে দেশের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেছে, তাতে আমার মনে হয় 'পল্লীসমাজ' লেখা সার্থক হয়েছে।" সুভাষবাবু ও কিরণবাবু উভয়েরই শরৎবাবুর প্রতি শ্রদ্ধা দেখিলাম। সেদিন সুভাষবাবু বলিয়াছিলেন,—

"গভর্ণমেণ্টের সহিত নন-কোঅপারেসন ভাল ভাবে করিতে নিজেদের মধ্যে খুব কো-অপারেসন আবশ্যক।"

৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে মহাত্মাজী ও মৌলানা মহম্মদ আলি সমাগত হইয়া দেশবন্ধুর বাড়ীতে ১০।১২ দিন থাকেন। তখন স্বদেশীর সময়। কোটি সভ্য, কোটি টাকা এবং বিশলক্ষ চরকার কার্য্যসূচী শেষ হইতে না হইতেই মহাত্মা বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জনের কর্ম্মসূচী দিয়াছেন। মহাত্মা আসিতেই সকলের উৎসাহ আবার এত বাড়িয়া গেল যে, লোকের স্বদেশীর প্রতি অনুরাগ শত মাত্রায় বর্দ্ধিত হইল।

মহাত্মার কাছে দেশবন্ধুর বাড়ীতে ২।৩ দিন কর্ম্মিগণ উপদেশ লইয়াছে, দেশবন্ধুও সেখানে থাকিতেন। মহাত্মা সকলের প্রশ্নের উত্তরই প্রদান করেন। তাঁহার কথাগুলি লিখিয়া রাখিবার ভারই পড়িল সুভাষচন্দ্রের উপর। সেই ২।৩ দিনের সভায় সুভাষচন্দ্রকে চুপ করিয়া থাকিতেই দেখিয়াছি। তিনি কচিৎ ২।১টি কথা কহিতেন।

দক্ষিণ কলিকাতায়ও একটী জাতীয় শিক্ষালয় হয়। দেশবন্ধু ইহা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে ইহা হয় নেপাল ভট্টাচার্য্য ষ্ট্রীটে। সেখানে সরস্বতী পূজার সময়ে দেশবন্ধুর সঙ্গে গিয়াছিলাম। ইহার পরে হয় জোড়াবাড়ীতে। সেখানে মাঝে মাঝে সুভাষচন্দ্র দেখিতে আসিতেন এবং সময় সময় পড়াইতেন। এখান হইতে যায় হরিশ মুখার্জ্জি রোডে।

যাহা হউক মহাত্মাজী চলিয়া যাইবার পরে অনুমান ১৭ই, ১৮ই সেপ্টেম্বর সুভাষচন্দ্র একদিন আমাকে বলেন "হেমেন্দ্রবাবু ৺শারদীয়া পূজা সম্মুখে, এবার বেচাকেনার পালা পড়িবে। আসুন দক্ষিণ কলিকাতার দোকানে দোকানে পিকেটিং করা যাউক। আমরা দক্ষিণ কলিকাতায়ই প্রথম আরম্ভ করিব।" আমিও সম্মত হইলাম। যে-দিন প্রথমে প্রাতে রসারোড দিয়া রসা থিয়েটারের (বর্ত্তমানে পূর্ণ) নিকটে চড়কডাঙ্গার মোড় হইতে বাহির হইয়া জগুবাবুর বাজার পর্য্যন্ত মার্চ্চ করিয়া যাই, তখন সুভাষবাবু এবং আমি ব্যতীত আর তিনটি কর্ম্মী মাত্র আমাদের সঙ্গে ছিল। কর্ম্মক্ষেত্রে এই প্রথম সুভাষচন্দ্রের 'মার্চ্চ'। আমরা কেবল বিনীতভাবে বিদেশী জিনিষ ক্রয় না করিতে ক্রেতাগণকে অনুরোধ করিতাম, দেখিলাম অনুরোধে সুফল ফলিল। ক্রমে কর্ম্মীর সংখ্যাও বাড়িয়া গেল, ৩।৪ জন হইতে আরম্ভ হইয়া ১৫।২০ দিনের মধ্যে আমরা দুইশত কর্ম্মীর সহযোগিতা লাভ করিলাম। যাহারা পূর্ব্বে তিলক স্বরাজ ফণ্ডের অর্থ সংগ্রহে সহায়তা করিয়াছে, তাহারাও আসিয়া জুটিল। সমস্ত দিন আমি থাকিতাম। সুভাষবাবু প্রাতে একবার আসিতেন, আর সন্ধ্যার পরে আসিয়া ২।৩ ঘণ্টা থাকিতেন। কিন্তু তাঁহার উপস্থিতিতে এমন উদ্দীপনার সঞ্চার হইল যে, এইখানেই বাঙ্গলার স্বাধীনতাকামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের বীজ প্রোথিত হইল। এমন চমৎকার পিকেটিং নাকি দক্ষিণ কলিকাতার লোক পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই, তাহারা সপ্ত আশ্চর্য্যের একটি (one of the seven wonders) বলিয়া ইহার আখ্যা দিলেন।

বৈকালে আসিয়া সুভাষচন্দ্র সব জায়গায়ই যাইতেন, কিন্তু তিনি নির্ব্বাক থাকিয়া বলিবার ভারটা রাখিতেন অন্যের স্কন্ধে।

ইতিমধ্যে একটি ঘটনা ঘটিল। সরকার ব্রাদার্স রসা রোডের অন্যতম প্রধান দোকান। একটি স্বেচ্ছাসেবকের প্রতি রূঢ় ব্যবহার করায়, ত্বরিতগতিতে দোকানটি বর্জ্জিত হইয়া গেল। দোকানে বেচাকেনা একেবারে বন্ধ। ভদ্রলোক যান সুভাষবাবুর কাছে; তিনি আবার বলেন, আমার সঙ্গে দেখা করিতে। এইরূপ বার বার চলিতে লাগিল। তাঁহার শৃঙ্খলায় সকলেই মুগ্ধ হইলেন। যাহার উপর কার্য্যভার আছে, তাহার মত না নিয়া কোন ব্যবস্থা করা উচিত নয়, এই নিয়মানুবর্ত্তিতা সকলেরই শিক্ষার বিষয়। পরে ভদ্রলোক আবার পূর্ব্বের ন্যায় বেচাকেনা করিতে লাগিলেন, তবে এবার স্বদেশী জিনিষই বেশী।

পদ্মপুকুর রোডে (বাজারের দক্ষিণ দিকে) রামরীক মাড়োয়ারীর একটি কাপড়ের দোকান আছে। দোকানে খুব বিক্রী। তাঁহার ছেলেরা কাপড় বিক্রী করিত। ইনি সন্ধ্যার পরে দোকানে আসিতেন। একদিন আমাকে বলিলেন, "ঐ হাকিম বাবুকে আমি একবার দেখিতে চাই। আমি বুড়া হইয়াছি, তাঁহাকে দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিব।" সুভাষবাবুকে দেখিয়া তিনি বস্তুতই ভাবে গদগদ হইয়াছিলেন।

১৫।২০ দিনের কার্য্যে এই যে একটি সেবকের দল গড়িয়া উঠিল, সুভাষবাবুর একটা প্রধান কাজ ছিল, ইহাদের নিয়া রাস্তা দিয়া বাহির হইতেন (march করিতেন), প্রতি সারিতে ২ জন করিয়া থাকিত। সর্ব্বাগ্রে থাকিতেন তিনি এবং আর একজন পরে পরে প্রায় ৫০।১০০, কখনও বা ২০০ স্বেচ্ছাসেবকের দল প্রায়ই বৈকালে বাহির হইত, কখনও দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস আফিস হইতে, কখনও দেশবন্ধুর বাড়ী হইতে, কখনও বা (কচিৎ) ফরবেস্ ম্যানসন হইতে।

ইতিমধ্যে আলি-ভ্রাতৃদ্বয় ধৃত হইয়াছেন। নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে তাঁহাদের উক্তির সমর্থন করিয়া সভা হইতে লাগিল। পীর বাদশা মিঞা, ক্যাপ্টেন সুরেশ বানার্জ্জি প্রভৃতিও ধৃত হইলেন।

ক্রমে ১৭ই নভেম্বর ১৯২১ ঘনাইয়া আসিল। যুবরাজ (Prince of Wales পরে সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ড) ১৭ই নভেম্বর বোম্বাই সহরে পদার্পণ করিবেন। কংগ্রেসের নির্দ্দেশ, কোন অভিনন্দন দেওয়া হইবে না। এবং যুবরাজের অভ্যর্থনাদির সহিতও কোনরূপ সহযোগিতা করা হইবে না। এই সম্বন্ধে নানাস্থানে সভা সমিতি হয়। সুভাষবাবুও দুই একটী সভায় যোগদান করেন। সেদিন বাঙ্গলা দেশের সর্ব্বত্র হরতাল অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া দেশবন্ধু নির্দ্ধারণ করিয়া দেন। কলিকাতায় এরূপ হরতাল পূর্ব্বে কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই। দোকান-পাট, বেচা কেনা একেবারে বন্ধ হয়। ট্রাম, গাড়ী, সাইকেল সবই বন্ধ হয়। দক্ষিণ কলিকাতার হরতালের ভার পড়ে এখানকার কংগ্রেস কমিটির উপরে এবং এখানকার কাজ আশাতীত ভাল হয়। তবে সমস্ত কলিকাতার অপূর্ব্ব নীরবতায় কংগ্রেস নির্দ্দেশিত শৃঙ্খলার অদ্ভুত নিদর্শন পাওয়া গিয়াছিল। দেশবন্ধু তাঁহার বাড়ী হইতে সর্ব্বক্ষণ সংবাদ লইতেছিলেন। বাড়ী হইতে বাহির হন নাই বটে, কিন্তু সর্ব্বদা মন ছিল এদিকে, কোনরূপ গোলযোগ বা হিংসার কার্য্যে অনুষ্ঠানটিতে যেন কালিমা স্পর্শ না করে। হইয়াছিলও অপূর্ব্ব। বোম্বাইতে রক্তগঙ্গা প্রবাহিত হইল, আর বাঙ্গলায় সম্পূর্ণ শৃঙ্খলা ও শান্তি।

কলিকাতার অপূর্ব্ব হরতাল এমন শান্ত ও অহিংসাপূত ভাবে অনুষ্ঠিত হয় যে, সেদিন নগরে পুলিসের কোন কাজ না থাকায় তাহারা যেন নির্ব্বিকারভাবে একদিকে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিল আর নগর রক্ষার ভার পড়িয়াছে যেন স্বেচ্ছাসেবকদের নেতাদের উপর। কোন হাঙ্গাম-হুজ্জুত নাই বলিয়া পুলিসের কোন কাজ নাই। আর স্বেচ্ছাসেবকদের কাজ বাড়িয়াছিল নানারকমে। রাস্তায় বা ষ্টেশনে কাহারও অসুবিধা হইয়াছে, স্বেচ্ছাসেবক সাহায্য করিতেছে। তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্র সমিতির সম্পাদক হিসাবে স্বর্গীয় বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নামে, খিলাফত কমিটির সম্পাদক হিসাবে মৌলভী মজিবর রহমানের নামে এবং প্রচার সমিতির সম্পাদক হিসাবে সুভাষচন্দ্রের নামেই হরতালের বিজ্ঞাপন বাহির হইত। হরতালের সময়কার কাজের সম্বন্ধে নবগঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রথম সেক্রেটারী বীরেন্দ্রনাথ শাসমল তাঁহার রচিত "স্রোতের তৃণে" উল্লেখ করিয়াছেন—২৯ পৃঃ—

"১৭ই নভেম্বর তারিখে কলিকাতায় কিরূপ হরতাল হয়েছিল তা কারো অজ্ঞাত নেই। কিন্তু একথা সত্য যে কলিকাতার সেই হরতালের সুবন্দোবস্তের জন্য আমার একেবারেই কোন হাত ছিল না বল্লেই হয়। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও কলিকাতা খেলাফতের কর্ত্তৃপক্ষ সেজন্য প্রাণপণ করে পরিশ্রম করেছিলেন"।

যাহারাই থাকুক, সুভাষচন্দ্র যে জেনারেল, তখনই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল। দেশবন্ধু অধিনায়ক আর সুভাষচন্দ্র সৈন্যাধ্যক্ষ। বৃদ্ধ এবং স্ত্রীলোক ও শিশুরা যান অভাবে ষ্টেশন হইতে বাড়ী ফিরিতে পারিতেছেন না—সুভাষচন্দ্র গাড়ী করিয়া তাঁহাদিগকে বাড়ী পৌঁছাইতে লাগিলেন। উপরে লেখা থাকিত, "জাতীয় সেবাকার্য্য On National Service"; কুলীরা কাজ করিবেনা, হরতালে যোগদান করিয়াছে, মাল পৌঁছাইয়া দিতেছে স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ! শিশুর দুগ্ধ জোগাইতেছেও তাহারাই। কলিকাতা সহরে সারাদিন সুভাষচন্দ্রের বিশ্রাম ছিল না। আমার কাজ ছিল দক্ষিণ কলিকাতায়-সারাদিনের কার্য্য শেষ হইলে রাত্রি ১১টার সময়ে দেশবন্ধুর বাড়ীতে আসিয়া সকলে সম্মিলিত হইলাম, তখন মোটে ৫।৬ জন ছিলাম, তন্মধ্যে সুভাষচন্দ্র ছাড়া আর একটী কর্ম্মীকে মনে পড়ে, দক্ষিণ কলিকাতার দেবেন্দ্রনাথ বসু—দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ

১৯২৭, অসুস্থাবস্থায় সুভাষচন্দ্র

কর্ম্মঠ যুবক, কিন্তু উপর্য্যুপরি নির্য্যাতনে নির্য্যাতনে অপরিণীত অবস্থায় তাঁহাকে উন্মাদাগারে আশ্রয় লইতে হয়। দেশবন্ধু বাড়ীতেই ছিলেন, কিন্তু এক মুহূর্ত্তও বিরাম ছিলনা, সমগ্র কলিকাতার খবর মিনিটে মিনিটে তাঁহার কাছে পৌঁছিয়া তাঁহাকে সর্ব্বদা সচকিত এবং সবদিকেই ওয়াকিবহাল ও কর্ম্মক্লান্ত করিয়া রাখিয়াছিল। সুভাষবাবু প্রমুখ ছয়জন কর্ম্মী যাইতেই দেশবন্ধুর তৎক্ষণাৎ হুকুম হইল, "ইহাদের খাইবার ব্যবস্থা কর।" হুকুমের এক ঘণ্টার মধ্যে লুচি, মুগডাইল, কপির তরকারী এবং পায়সান্ন। বাসন্তী দেবী নিজে বসিয়া খাওয়াইলেন। দাশ দম্পতির সেই যত্ন জীবনে বিস্মৃত হইবনা। সারাদিনের পর খাওয়ার জিনিষও মনে হইয়াছিল অমৃততুল্য। রাত্রি সাড়ে বারোটার পরে সুভাষবাবু প্রমুখ কয়জন বাসায় ফিরিয়া যাই। থাকিয়া থাকিয়া দেশবন্ধু কেবল এক কথাই বারবার বলিতেছিলেন—ওদের দু'জনকে না ধরলেই আজকার দিনটার সবই যেত ভালয় ভালয়। সেদিন মতিলাল ও রমেশ দে ধরা পড়িয়াছিল।

এই হরতালের সাফল্যে গভর্ণমেণ্টও ত্বরিত গতিতে চণ্ডনীতি প্রয়োগ করিতে তৎপর হইলেন। ১৯শে নভেম্বর খবরের কাগজ দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইল। বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল (১) "স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী বেআইনি বলিয়া ঘোষিত হইল।" (২) "এখন হইতে সভা, শোভাযাত্রা রাজদ্রোহকর বলিয়া নিষিদ্ধ হইল।"

প্রাতে আমরা সকলে দেশবন্ধুর সঙ্গে দেখা করিলে, তিনি

বলিলেন, "খবর পাইয়াছি শাসমল, সুভাষ ও মুজিবরকে ধরিবে! শাস্‌মল কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী; মুজিবর বেঙ্গল খিলাফত কমিটির আর সুভাষ পাবলিসিটি বোর্ডের। তবে আমি ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং-এ বোম্বাই যাইতেছি, মহাত্মার সঙ্গে বুঝিয়া আসিয়া যাহা করিতে হয় করিব—এ সময়টা তোমরা অপেক্ষা করিয়া থাকিবে"।

দেশবন্ধু বোম্বাই রওনা হইয়া গেলে, শ্যামসুন্দরবাবু, জিতেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মাখনলাল সেন মহাশয় সার্ভেণ্ট আফিসের ছাদের উপরে হুজুরীমল লেনে একটী সভা করেন। তাঁহারা তখনই আইন অমান্য করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আর শাসমল ও সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর আগমন প্রতীক্ষা করিবার জন্য পরামর্শ দিলেন। ভীরু, দুর্ব্বল প্রভৃতি অপবাদ স্কন্ধে লইয়াও শাসমল ও সুভাষচন্দ্রের নেতার বাক্যে বিশ্বাস ও নিয়মানুবর্ত্তিতা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। অতঃপরে বোম্বাইতে দেশবন্ধু ওয়ার্কিং কমিটির নির্দ্দেশ লইয়া এখানে আসিয়া বি, পি, সি, সি'র সভায় ভলাণ্টিয়ার বাহিনী গঠন সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তৃত্ব ও নিয়ামকতা প্রাপ্ত হন। তিনি এখানে চারি সম্প্রদায় হইতে চারিজন অধ্যক্ষ রাখেন। বাঙ্গালী মুসলমান স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য মৌলভী ওয়াহেদ হোসেন, অবাঙ্গালী মুসলমানদের অর্থাৎ কলিকাতা খিলাফত কমিটির কর্ম্মীদের উপরে আবদুল রৌফ বলিয়া মনে হয়, নামটা ঠিক মনে হইতেছে না। বাঙ্গালী হিন্দুদের জন্য হেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত (লেখক) এবং অবাঙ্গালী হিন্দুদের উপরে পদমরাজ জৈন এবং সর্ব্বোপরি সর্ব্বাধ্যক্ষ (জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং) সুভাষচন্দ্র বসু।

তাই দেখিতেছি সুভাষচন্দ্রের নেতাজীর আসন বাঙ্গলায় ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর তারিখ হইতেই পাকাভাবে স্থিরীকৃত হয়।

সত্যাগ্রহ

দেশবন্ধু যে বন্দোবস্ত করেন, তাহাতে ঠিক হয় যে ৫ জন স্বেচ্ছাসেবক এক এক দলে যাইবে। সকলের নিকট খদ্দর বিক্রয় করিবে এবং ২৪শে ডিসেম্বর হরতাল দিবস বলিয়া ঘোষণা করিবে। এই ২৪শে তারিখেই যুবরাজ এডওয়ার্ড কলিকাতায় পদার্পণ করিবেন বলিয়া এই তারিখে হরতাল অনুষ্ঠানের নির্দ্দেশ হয়। হিন্দুস্থানী এবং খিলাফত স্বেচ্ছাসেবক কলিকাতা হইতে আসিত, কিন্তু বাঙ্গালী ভলাণ্টিয়ার বহুদিন পর্য্যন্ত দক্ষিণ কলিকাতা হইতে সরবরাহ করিতে হয়। দক্ষিণ কলিকাতার সেবক বাহিনীর কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

তিন চারি দিন পর্য্যন্ত কেহই ধৃত হইলেন না, পুলিশের দয়া হইল না। স্বেচ্ছাসেবকগণ ব্যর্থ মনে ফিরিয়া আসিলেন। সকালে আমরা প্রতিদিন দেশবন্ধুর বাড়ীতে সমাগত হইতাম। শাসমল, সুভাষচন্দ্র, সত্যেন্দ্র মিত্র, হেমন্তবাবু প্রভৃতি সকলেই থাকিতেন। দেশবন্ধু জিজ্ঞাসা করিতেন—

"সুভাষ, কি অবস্থা, কাকেও ধরলো?—

সুভাষ—আজ্ঞে না।

দেশবন্ধু—ভলাণ্টিয়ার আসছে?

সুভাষ—বেশী নয়।

দেশবন্ধু—ভেবোনা, শীগগীরই খুব আসবে।

দ্বিতীয় দিনেও এইরূপ কথাই হইল। দেশবন্ধু তৃতীয় কি চতুর্থ দিনে সুভাষকে জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার মুখ দেখিয়া বলিলেন—Here comes our crying captain.

কথা শুনিয়া সভাসদও সহজ হাসি বাহির হইল।

যাহা হউক, ধরা পড়িবার এবং ভলাণ্টিয়ার আসিবার বাধা হইল না। ৬ই ডিসেম্বর তারিখে ৫ জন ধরা পড়ে, ৭ই তারিখে ভবানীপুরের ৫ জন ভলাণ্টিয়ার নিয়া দেশবন্ধুর একমাত্র পুত্র চিররঞ্জন যান ও ধৃত হন। ৭ই তারিখে শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী, ঊর্ম্মিলা দেবী এবং সুনীতি দেবী যান। সেই দিন তাঁহারা ধৃত হইলে বড়বাজার অঞ্চলে যে দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, তাহা কখনও বিস্মৃত হইবনা। সকলের মুখেই এক কথা "আমাকেও ধরুন।" তারপরে দলে দলে ভলাণ্টিয়ার আসিতে লাগিল আর সুভাষচন্দ্রের কর্ম্মও অতিরিক্ত মাত্রায় বৃদ্ধি পাইল। ১০ই তারিখে ডেপুটী কমিশনার কীড্ সাহেব বহু পুলিশ বাহিনী লইয়া দেশবন্ধু ও শাসমলকে তাঁহার বাড়ী (১৪৮ নম্বর রসারোড) হইতে ধরিয়া লইয়া যায়। পুলিশ সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধেও খবর লইয়াছিল।

মুহূর্ত্তে সমস্ত কথা ছড়াইয়া পড়িল, কলিকাতা উদ্বেলিত হইয়া উঠিল দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক আসিতে লাগিল, আবার আবাল-বৃদ্ধবনিতা দেশবন্ধুর গেপ্তারের কথা শুনিয়া বিষাদগ্রস্ত হইল। সমস্ত কথা সুভাষচন্দ্রের কানে পৌঁছিল। তখন তিনি কাজে বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন। সব কাজ সারিয়া আসিয়া সন্ধ্যার পরে সুভাষচন্দ্র ফরবেশ্ ম্যানসন হইতে পুলিশ আফিসে ফোন করিলেন—

"আপনারা কি আমাকে চান? আমি প্রস্তুত, আসিতে পারেন"—

সগর্ব্বে পুলিশ বাহিনী আসিয়া সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল।

প্রেসিডেন্সী জেলে যেখানে দেশবন্ধু ও শাসমল অবস্থিত ছিলেন, সুভাষও আসিয়া তাঁহাদের সহিত যোগদান করিলেন। ক্রমে মৌলনা আজাদ সাহেব প্রমুখ বহুলোক আসিয়া জেলখানার স্বরাজ্যদল পুষ্ট করিলেন। ২৪শে ডিসেম্বরের পূর্ব্বে পণ্ডিত মদন মোহন মালবীয় আসিয়া সেখানে অনেকবার বৈঠক করেন। গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে মিটমাটের কথা হয়, গভর্ণর জেনারেল লর্ড রেডিংও তখন কলিকাতায়। ২৪শে ডিসেম্বর হরতাল বন্ধ হইলে ভলাণ্টিয়ার আইনে দণ্ডিত সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইবে ও সংস্কারের জন্য একটি গোলটেবিল বৈঠক হইবে এইরূপই সিদ্ধান্ত হয়। দেশবন্ধুর খুব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু মহাত্মাজীর টেলিগ্রাম দেরীতে আসায় আর হইয়া উঠিল না।

সুভাষচন্দ্র ১০ই ডিসেম্বর ধরা পড়িয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিচার শেষ হয় দুই মাস পরে ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯২২, কয়েকবার আদালতে মোকদ্দমার শুনানীর তারিখ হয়, কিন্তু রায় বাহির হয় ঐ দিন। সেদিন দেশবন্ধু এবং শাসমলের মোকদ্দমারও শুনানী

ছিল। প্রত্যেকের মোকদ্দমাই আলাদা আলাদা হয়। সেদিন দেশবন্ধুকে আনিবার পূর্ব্বে সুভাষচন্দ্রের মামলার প্রথম ডাক হয়। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র সেনগুপ্ত, নিশীথ সেন, সুরেন হালদার প্রভৃতি সকলেই আদালতে উপস্থিত ছিলেন। সুভাষকে আনামাত্রই চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন,—You are sentenced to six months' simple imprisonment."

'আপনার বিনাশ্রমে ছয় মাস মেয়াদের আদেশ হইল'

সুভাষ (বিস্ময়ে)—মোটে ছয় মাস? only six months?

হাকিম—হাঁ, Yes.

সুভাষকে লইয়া যাইবার আদেশ হইল। আর ক্ষুণ্ণমনে সুভাষ বলিতে বলিতে গেলেন, "It is a matter of shame that I am given only 6 months"—লজ্জার কথা যে মোটে ছয় মাস জেলের আদেশ!"

অতঃপরে ধীরে ধীরে দেশবন্ধু আদালত গৃহে প্রবেশ করিলেন।

দেশবন্ধু, শাসমল ও সুভাষ যতদিন প্রেসিডেন্সী জেলে ছিলেন, তখন মালবীয়াজীর সঙ্গে যে বৈঠক হয়, তাহা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিতে পারিব না। কিন্তু ৮ই ফেব্রুয়ারী হইতে ৪ঠা আগষ্ট পর্য্যন্ত তাঁহাকে সেণ্ট্রাল জেলে খুব ঘনিষ্টভাবে দেখিবার সুযোগ হয়।

ইহার ৩ দিন পরে দেশবন্ধুও প্রেসিডেন্সী জেল হইতে সেণ্ট্রাল জেলে ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আসেন। দেশবন্ধুকে প্রথমে ফিমেল ওয়ার্ডে রাখা হয়। এটি জেল গেটের খুব কাছে। এঘরে শাসমল, সুভাষ, চিরঞ্জন, হেমন্ত প্রভৃতিও থাকিতেন। কয়েক মাস পরে দেশবন্ধুকে নেওয়া হয় এক নম্বর হাজত ওয়ার্ডে। উঁহারাও সকলে এখানে আসেন। এখানে অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় নামে একটী যুবক 'বাঙ্গলার কথা'র প্রিণ্টার হিসাবে ধৃত হইয়া এখানেই থাকেন। রান্নার সব কাজ ইনিই করিতেন এবং এবিষয়ে ইনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সুভাষচন্দ্রও দেশবন্ধুর একমনে সেবা করেন। জেলে থাকিতে সুভাষচন্দ্র আবশ্যকীয় কথা ছাড়া বিশেষ কিছু বলিতেন না। তবে দেশবন্ধুর সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, আর তাঁহার উপর অবিচলিত ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল। দেশবন্ধু যাহা বলিতেন ও করিতেন, তাহাই একমাত্র করণীয় বলিয়া সুভাষচন্দ্র মনে করিতেন। দেশবন্ধুর সেবাই তখন সুভাষচন্দ্রের প্রধান কাজ ছিল। পাছে সুভাষ এবং হেমন্তকে অন্যঘরে লইয়া যায়, এইজন্য একজন রহিলেন পাচক হিসাবে, আর একজন রহিলেন ভৃত্য (Servant) হিসাবে। এই প্রসঙ্গে বাঙ্গলা সরকারের শাসন পরিষদের অন্যতম সভ্য স্যার আবদুর রহিমের সঙ্গে বেশ একটু রহস্যালাপ হয়। উভয়েই পূর্ব্বে একসঙ্গে ব্যারিষ্টারী করিতেন। একদিন জেল পরিদর্শন কালে হাসিতে হাসিতে বলেন, "Das, you are a very costly prisoner. An I. C. S officer and a university professor are your attendants"—

দেশবন্ধুও তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "Because you have brought a costly prisoner here."

এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে, আমারও দক্ষিণ কলিকাতার ভলাণ্টিয়ার গঠনকর্ত্তা এবং কলিকাতার বাঙ্গালী ভলাণ্টিয়ার পরিচালক হিসাবে এক বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়। দেশবন্ধু, দেশপ্রাণ ও দেশগৌরব প্রভৃতি ধৃত হন ১৯২১-এর ১০ই ডিসেম্বর আমি ধৃত হই ১৪ই। তবে আমার বিচার এক দিনেই শেষ হয়! ১৫ই ডিসেম্বরই কারাভোগের আদেশ হয়। সুতরাং ইহাও আমার সৌভাগ্য যে দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে ও সাহচর্য্যে আমার জীবনের অন্ততঃ কিছুদিন অতিবাহিত হয়।

কেবল আমার নয়, ১৯২১ সনে জেলে গিয়া যাঁহারা দেশবন্ধুর সান্নিধ্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জীবনে এক অপূর্ব্ব সুযোগ ঘটিয়াছিল। এবং জেলে তাঁহাদের যে পরম শিক্ষা লাভ হইয়াছে, অতঃপরে এপর্য্যন্ত কাহারও ভাগ্যে তা হওয়া সম্ভব হয় নাই। অসুস্থতা একটু অন্তর্হিত হইলেই দেশবন্ধুর খাটুনি ছিল অবিশ্রান্ত। প্রথমতঃ, তিনি খাটিয়া ভারতে জাতীয়তার একখানি philosophy তত্ত্ব-শাস্ত্র লিখিতেছিলেন। যাহারা রচনার অংশ বিশেষ পাঠ শুনিয়াছে, তাহারাই মুগ্ধ বিস্ময়ে ইহা 'ন ভূত ন ভবিষ্যতি' মনে করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহাকে ইতিহাস বলা চলে, সাহিত্য, রাজনীতি সমাজতত্ত্ব সবই বলা চলে।

পি. সি. রায়

দ্বিতীয়তঃ, তখন তিনি কেবল কর্ম্মপন্থার কথাই ভাবিতেন। কি উপায়ে জড়তা দূর হইয়া আবার আবালবৃদ্ধবনিতা দেশে কাজে প্রবৃত্ত হইবে, এই চিন্তাই তখন দিবারাত্রি তাঁহাকে আবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল। সকলের সঙ্গে আলোচনা করিতেন, এবং জেলখানায়ও দেশের বিষয় চিন্তা না করিয়া বৃথা কেহ কালক্ষেপ করিতেছে ইহা তাঁহার প্রাণে বড় বাধা দিত। এই ভাবধারাও কর্ম্মীদের ভিতরে সঞ্চারিত হইত।

তৃতীয়তঃ, যে কারণে সেণ্ট্রাল জেল খাঁটি স্বরাজ আশ্রমে পরিণত হইয়াছিল, তাহা দেশবন্ধুর ঐকান্তিক সমদর্শিতার ফলেই হয়, এপর্য্যন্ত আমরা মুখে যতই হিন্দু মুসলমানের ঐক্যের কথা বলিনা কেন, বাহিরে হিন্দু মুসলমানকে 'নেড়ে' এবং মুসলমান হিন্দুকে 'কাফের' বলিয়া গালি দিতে কুণ্ঠিত হইত না। ইহার কারণ পরস্পর পরস্পরকে না বুঝিবার জন্য এবং জানিতে চেষ্টা না করিবার জন্য উভয়ে এইরূপ আলাদা হইয়া থাকিত। এখন তাহাদিগের পরস্পর পরস্পরকে জানিবার বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইল। এক বাড়ীতেই হিন্দুর পার্শ্বের ঘরে মুসলমান বাস করিতেছেন, মুসলমানের পার্শ্বের ঘরে হিন্দু বাস করিতেছেন। আর হিন্দুদের মধ্যে যেমন, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, জীতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র বসু, কিশোরীপতি রায়, বীরেন

শাসমল প্রভৃতি ছিলেন, অন্যদিকেও তেমন মৌলানা আজাদ, মৌলানা আক্রাম খাঁ, মুজিবর রহমান, ওয়াজেদ আলি পনি সামসুদ্দিন, আহমেদ আলি, ওয়াহেদ হোসেন প্রভৃতিও ছিলেন। ইঁহাদের সকলের শিক্ষা, সংস্কৃতি, আচার, ব্যবহার ছিল অতীব মার্জ্জিত ও উদার। আর সকলের উপরে ছিলেন দেশবন্ধু—যাঁর হৃদয় সাগরের ন্যায় এত উদার ও উন্মুক্ত ছিল যে, তাঁহার কাছে সকলেই সমভাবে সমান আন্তরিকতার সহিত আদৃত হইতেন। কি কথাবার্ত্তা, কি পান-ভোজনে, কি মেলামেশায় দেশবন্ধুর মধ্যে সামান্য ক্ষুদ্রতা পরিলক্ষিত হইত না। দেশবন্ধুর খাস কর্ম্মীদের মধ্যে এই উদার ভাব খুব বেশী পরিমাণে সঞ্চারিত হইয়াছিল। যে সমভাব আজ সুভাষ-গঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজের হিন্দু মুসলমানের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ছিল বলিয়া শুনিয়াছি, তাহাই তুল্য ভাবে সেদিন জেলখানারূপ স্বরাজ আশ্রমে নিজের চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। জেলে মে মাসে (১৯২২) মুসলমান ভ্রাতাদের একমাস রোজা পালন করিবার পরে শেষ ঈদ উপলক্ষে—একটী প্রীতি-ভোজ হয়। এই উপলক্ষে বাহির হইতে অনেকগুলি পাঁঠা খাসি আসে। আর উঁহাতে মুসলমান বন্দিগণ জেলের স্বরাজী হিন্দুগণকেও যোগদান করিতে আমন্ত্রণ করেন। সেখানে হিন্দু ও মুসলমানদের ভিন্ন ভিন্ন চৌকা বা রন্ধন-স্থান ছিল। এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে খাওয়ার ব্যবস্থা হইবে ঠিক হয়। কিন্তু দেশবন্ধু বলিলেন, "তাহা হইবে না, এই পবিত্র দিনে উভয় সম্প্রদায়ের হিন্দু মুসলমানকেই এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজন করিতে হইবে।" তাহাই হইল। দেশবন্ধু মাঝখানে বসিলেন। তাঁহার ডাইনে বাঁয়ে সামনে হিন্দু মুসলমান এক সমাজের লোকের মত বসিয়া একত্র ভোজন করিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। সে অপরূপ দৃশ্য জীবনে কখনও ভুলিব না। দেশবন্ধু বলেন,

"এই সুফল হয়েছে এই আন্দোলনের ফলে"।

এখনও সেদিনের আমোদের কথা মনে হইলে প্রাণ আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠে। দেশবন্ধুর এই হিন্দু-মুসলমান প্রীতি সুভাষচন্দ্রের হৃদয়ে যে কিরূপ রেখাপাত করিয়াছিল তাহা আমার কাছে তাঁহার লিখিত চিঠিখানিতে পাইবেন। দেশবন্ধুর সাম্যভাবে বরাবর সুভাষচন্দ্র সঙ্গীদিগকে বলিতেন, "হিন্দু-নেতাদের মধ্যে দেশবন্ধুর মত ইসলাম ধর্ম্মের এত বড় বন্ধু আর দ্বিতীয় নাই। তথাকথিত অস্পৃশ্যগণের প্রতি অশ্রদ্ধাও আমাদের অস্থিমজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে। জেলে বাধ্য হইয়া মাহিষ্য, পৌণ্ড্র প্রভৃতির হাতের জল খাইতে হইয়াছে। জেল আমাদের আভিজাত্য-গরিমা একেবারে মুচড়াইয়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। তাই বলিতেছি জেল কর্ম্মীদের কর্ম্মজীবনের যত সহায়ক হইয়াছে, তেমন বোধ হয় আর কিছুই হয় নাই।

দেশবন্ধু একটী পুরাতন দাগী কয়েদীকে খুব ভাল বাসিতেন এবং মুগ্ধভাবে তাহার সেবা গ্রহণ করিতেন। এই উদারতা, তাহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা এবং তাহাকে সৎপথে চালিত করিবার প্রবল আগ্রহ সুভাষচন্দ্রকেও প্রভাবান্বিত করিয়া এই বিষয়েও সকল শ্রেণীর লোকের প্রতি উদারতা দেখাইবার সুযোগ প্রদান করিয়াছে। উক্ত ব্যক্তির প্রতি দেশবন্ধুর ব্যবহারে কঠোরভাবাপন্ন সুভাষচন্দ্রকেও নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে দেখিয়াছি। দেশবন্ধুর জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার কর্ম্মিগণকে এমনিভাবে গড়িয়া পিটিয়া কোমল-কঠোর করিয়া দিয়াছে।

দেশবন্ধুর এই সমস্ত গুণ এবং তাঁহার প্রতি সুভাষচন্দ্রের ঐকান্তিক ভক্তি ক্রমে সুভাষকেও শ্রেষ্ঠ নেতা হইবার পক্ষে উপযোগী ও উদার করিয়া তুলিয়াছিল।

জেলে ঐ এক নম্বর হাজত ওয়ার্ডের ছেলেদের সহায়ে একটি অভিনয়ের আয়োজন হয়। ২ নম্বর হাজত ওয়ার্ডের কিশোরীপতি রায়, অমূল্য বসু প্রভৃতিও অনেকে ছিলেন। অভিনয় হয় গিরিশ ঘোষের 'প্রফুল্ল' নাটকের। জেলে সত্যিকারের জেলখানা দৃশ্যের অভিনয় একটি অভাবনীয় ব্যাপার। তবে হইয়াছিল হুবহু ঠিকই। দেশবন্ধুর আদেশও পাইয়াছিলাম, তবে তিনি নির্দ্দেশ দেন, যদি জেল-কর্ত্তৃপক্ষ আপত্তি করে তবে বন্ধ করিতে হইবে। কিন্তু জেল কর্ত্তৃপক্ষ কোনরূপ বাধা দেয় নাই। সুভাষচন্দ্র রিহার্সেলে খুব উৎসাহ দিতেন এবং অভিনয়ের স্থানে স্থানে "বাঃ বাঃ" করিয়া উঠিতেন। তবে তিনি, দেশবন্ধু ও শাসমল কেহই অভিনয় দেখিতে পারেন নাই। অভিনয় হইয়াছিল আগষ্ট মাসের শেষদিকে। ইহার পূর্ব্বেই তাঁহারা মুক্তি পাইয়াছিলেন। সুভাষচন্দ্রের অভিনয়প্রীতি সম্বন্ধে আর আমি কিছু জানিতাম না।

জেলে সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর তত্ত্বাবধান এবং সেবাশুশ্রূষার কাজ ছাড়া একটা চৌকা (Kitchen)-রও সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। অবশ্য এ-কাজে তিনি নামে মাত্র ছিলেন: যাহারা চার্জ্জে ছিলেন তাঁহারাও রাজনৈতিক বন্দী, চৌকার কাজ সুচারুরূপেই নির্ব্বাহ করিতেন। অমূল্য রায়চৌধুরী ছিল তাহাদের অন্যতম।

যে-ঘরে দেশবন্ধু প্রভৃতি থাকিতেন, তাহারই নীচের তলায় তখন ভবতোষ গুহ, শুভেন্দ্র বসু, প্রফুল্ল গুহ, সুরেন্দ্র সিংহ, যতীন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ক্ষীরোদ ভট্টাচার্য্য, অমূল্য রায় প্রভৃতি ফরিদপুর জেলার কয়েকজন থাকিতেন। একদিন কয়েকটি যুবকের সঙ্গে বরিশাল জিলার একটি যুবকের বচসা হয় এবং ক্রমে কলহ ঘুষাঘুষিতে পরিণত হয়। তবে মল্লযুদ্ধটা একটু অসম হইয়া পড়িয়াছিল। একদিকে একা সেই ছেলেটি। গোলমাল শুনিয়া সুভাষচন্দ্র আসিলেন এবং মুখ দিয়া বেশী কথা না বাহির হইলেও তাঁহার সেই গৌরকান্তি মুখখানি রক্তাভ হইয়া উঠিল। একবার একটি কথা বাহির হইয়াছিল, "If we cannot behave properly, how can we fight the Britishers with success."

জেলখানার কর্ম্মের মধ্যেও দেশবন্ধু সর্ব্বদা আলাপালোচনায় বেশ আনন্দ দিতে পারিতেন। এইসব কথা সুভাষচন্দ্র নিজেই লিখিয়াছেন। পাঠক সেই সব লক্ষ্য করিবেন। এই ভাবে কয়েকমাস কাটাইয়া সুভাষচন্দ্র ৪ঠা আগষ্ট মুক্তিলাভ করেন। দেশবন্ধু আসেন ৯ই আগষ্ট। দেশবন্ধু সুভাষচন্দ্রকে বাহিরে কি কি করিতে হইবে, কাহার সঙ্গে কোন কথা বলিতে হইবে ইত্যাদি সব ভাল করিয়া উপদেশ দিয়া দেন।

বাহিরে আসিবার পরে দেশবন্ধু স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য প্রথমে

যান দার্জ্জিলিং, পরে যান লাহোর এবং রাওলপিণ্ডি হইয়া মারী ও কাশ্মীর। তিনি ফিরিয়া আসেন নভেম্বরে। কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে দেশবন্ধুকে কলিকাতার তিন স্থান হইতে তিনটি অভিনন্দন দেওয়া হয়। সমগ্র কলিকাতা দেয় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে। দক্ষিণ কলিকাতা দেয় হরিশ পার্কে আর ছাত্রসমাজ দেয় কলেজ স্কোয়ারে; ছাত্রগণের অভিনন্দনের উত্তরে তিনি—যে প্রিয়ছাত্রগণ পড়াশুনা ছাড়িয়া তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিয়াছে, তিনি তাহাদের জন্য কিছুই করিতে পারেন নাই—এই কথা বলিতে বলিতে যখন অশ্রুরাশি নির্ঝরিণীর মত তাঁহার গণ্ডদেশ বাহিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল, ছেলেরাও তখন সমভাবে অশ্রুবিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারে নাই। তখনকার মর্ম্মান্তিক দৃশ্য সুভাষচন্দ্রকে খুবই অভিভূত করিয়াছিল। তিনি উহা এমন ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাহা আর কেহই সেরূপ পারেন নাই। পাঠক তাঁহার স্মৃতিকথায় * দেখিবেন।

৫ই সেপ্টেম্বর অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক মতিলাল ঘোষ মহাশয় পরলোক গমন করেন। সুভাষ শ্রদ্ধানতভাবে শবানুগমন করিতে বাগবাজার আসিয়াছিলেন।

অতঃপরে ১৬ই, ১৭ই, ১৮ই সেপ্টেম্বর নিখিল বঙ্গ যুব-সম্মেলনে নেতৃত্ব করেন। ইহার আফিস ছিল কলেজ ষ্ট্রীটের দিকে। সেখানেও মাঝে মাঝে যাইতেন; স্কুল, কলেজ, ক্লাব, মজলিস্, লাইব্রেরী সেবাসমিতির যাবতীয় যুবকবৃন্দ লইয়া এই সম্মিলন আহ্বান করেন আর্য্যসমাজ হলে, তিনি নিজে হন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—ডক্টর মেঘনাদ সাহা সভাপতি। ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলী প্রমুখ সঙ্গীত-সমাজের সভ্যগণ 'বন্দেমাতরম্' গান করেন।

তাঁহার অভিভাষণে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং শিক্ষা সম্বন্ধীয় যে সমস্ত বিষয় তিনি উল্লেখ করেন তাহা খুব সুচিন্তিত এবং যুবকগণের সম্বন্ধে বিশেষ উপযোগী। অমৃতবাজার লেখেন—In thought and language, in style and delivery it was worthy of the man from whom it came.

গণশিক্ষা যাহাতে খুব বেশী হয়, নাগরিক ও পল্লীর শিক্ষা স্বদেশী প্রসার, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রীবন্ধন, অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন, বাল্যবিবাহ-নিরোধ, বরপণ রহিত করা, সেবাধর্ম্ম, নিয়মানুবর্ত্তিতা ও নেতার প্রতি আনুগত্য, সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার প্রতি একান্তানুরাগ—এই সব বিষয়ের প্রতি খুব ঝোঁক দিয়া সুভাষচন্দ্র তাঁহার স্বরচিত অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন।

যুব-সম্মিলনীতে দেশের সমগ্র যুবকগণকে একীকরণ তাঁহার বরাবর চেষ্টা ও উদ্দেশ্য ছিল—কিন্তু এইবার তাহার প্রথম সূত্রপাত হইল।

অতঃপর এই সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে যুবকবৃন্দের অচিরেই একটা সুযোগ উপস্থিত হইল এবং সুভাষচন্দ্রই হইলেন জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং। ব্যাপারটি বলিতেছি।

সেপ্টেম্বর মাসের শেষদিকে আমিও জেল হইতে খালাস হইয়া বাড়ী গিয়াছি; দুই একদিন মধ্যেই শুনিলাম, উত্তর বাঙ্গলার জলপ্লাবনে অবস্থা বড়ই শঙ্কটাপন্ন হইয়াছে। গ্রাম, বাড়ী, কুটির জলে ভাসিয়া গিয়াছে। অসংখ্য মানুষ ও গবাদি পশু মরিয়া জলে ভাসিতেছে এবং বহু খাদ্য সামগ্রী একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বগুড়া, রাজসাহী, রংপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি জিলার দুর্দ্দশার অবধি ছিল না। অবিলম্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে সুভাষচন্দ্র ও ডাক্তার যতীন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত সেখানে প্রেরিত হইলেন। সাধারণ রিলিফ কার্য্যে সুভাষচন্দ্রই সর্ব্বোপরি কর্ম্মকর্ত্তা হইলেন, চিকিৎসা এবং তজ্জনিত সেবাকার্য্যের ভার রহিল ডাক্তার যতীন্দ্র দাশগুপ্তের উপরে।

সুভাষ সেখানে গিয়া তাঁহার পুরাতন সঙ্গিগণের সহযোগিতা কামনা করিলেন। সেই উপলক্ষেই আমাকেও বাড়ী ছাড়িয়া শান্তাহার রওনা হইতে হইল। জেল হইতে সবে বাড়ীতে গিয়াছি। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বেশ আমোদে দিন কাটিতেছিল, কিন্তু সুভাষচন্দ্রের আহ্বান, দেশবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাঁহার আহ্বান বলিয়াই মনে হইল। উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। অমনি রওনা হইয়া শান্তাহারে পৌঁছিলাম।

শান্তাহারে ষ্টেশনের পূর্ব্বদিকে দেখিলাম, তাঁবুর ছাউনিতে ভরিয়া গিয়াছে। সুভাষচন্দ্র টেবিলে বসিয়া লিখিতেছেন। সম্মুখে, দক্ষিণে, বামে বড় বড় মানচিত্র শোভা পাইতেছে। কংগ্রেস-কর্ম্মী, ছাত্র কর্ম্মী, যুবক কর্ম্মী সকলেই আসিয়া সুভাষচন্দ্রের নিকট হইতে নির্দ্দেশ নিতেছে। ধীরেন ঘটক, সতীশ সরকার, যতীন রায় প্রভৃতি অনেককে দেখিলাম। ক্রমে হেমন্ত সরকার (সিতলাই হাইস্কুলের হেড মাষ্টার), সুরেন ঘোষ, চণ্ডী বাড়ুয্যে প্রভৃতিও আসিলেন। কর্ম্মী প্রায় হাজার দুই আসিয়া সমবেত হন। আসিয়াই সুভাষচন্দ্রের নির্দ্দেশক্রমে গ্রামে গ্রামে চলিয়া গেলেন। বর্ত্তমান বি,পি,সি, সির প্রেসিডেণ্ট সুরেন ঘোষ ও বিপিন গাঙ্গুলীও আসিলেন, ইতিমধ্যেই সুভাষচন্দ্র নৌকায় করিয়া নসরতপুর, মদনপুরা, আক্কেলপুর, জামালগঞ্জ, কুহুন্বি, তালসুম, আদমদিঘি, বগুড়া প্রভৃতি ঘুরিয়া আসিয়াছেন। শান্তাহারকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন স্থানে সাহায্য প্রাপ্তিস্থান নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। বিভিন্ন স্থানে কর্ম্মী ও ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিয়োজিত হইয়াছে, কতকগুলি স্থানের বিভিন্ন পরিদর্শক পরিদর্শন করিয়া শান্তাহারে সুভাষচন্দ্রকে রিপোর্ট করিতেছে। দেখিলাম, এখানেও সুভাষচন্দ্রই জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং। সারাদিন খাটিয়া কেবল কাজই করিয়া যাইতেছেন। এখানেও অর্গানিজেসনে তিনি একেবারে সিদ্ধ-হস্ত।

এই উত্তরবঙ্গের সেবাকার্য্য পরিচালনার জন্য কলিকাতায় যে বেঙ্গল রিলিফ কমিটি হয়, তাহার প্রেসিডেণ্ট হন স্যার প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। আর আফিস থাকে বিজ্ঞান কলেজ মন্দিরে, ৯২নং আপার সার্কুলার রোডে। প্রেসিডেন্সী রিলিফ কমিটির সুভাষ যখন সেক্রেটারী ছিলেন, ডাঃ প্রফুল্ল রায় হইয়াছিলেন ট্রেজারার। সেই সম্পর্কে সুভাষকে তিনি খুব ভাল জানিতেন। কলিকাতার টাকা উঠাইবার সেক্রেটারী হন। সতীশ দাশগুপ্ত আর ঘটনা-স্থানের সেবাকার্য্যের সেক্রেটারী হন সুভাষচন্দ্র। আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র সুভাষচন্দ্রকে অনেক চিঠিপত্র লেখেন—একখানায় লিখিত হয়—"you are the sole master of the situation there—

* সেই স্মৃতি অতঃপর প্রকাশিত হইবে।

you have full powers to do anything you like"—তোমার সম্পূর্ণ ক্ষমতা—তুমি যাহা ভাল মনে করিবে, তাহাই করিবে, আমরা তোমার উপর সম্পূর্ণ ভার রাখিয়া নিশ্চিন্ত আছি।" চিঠিখানি নাই, তবে আমি উহা সে সময়ই দেখিয়াছি।

নানাস্থান হইতে প্রচুর কাপড়, চাউল, অর্থ সুভাষচন্দ্রকে পাঠান হয়। তিনিও তাহার সদ্ব্যবহার করেন। খাদ্য-দ্রব্যাদি ভাসাইয়া নিয়া যাওয়ায় রিলিফের কাজ অনেক দিন পর্য্যন্ত করিতে হয়। তবে সুভাষচন্দ্র অনুমান মাস সপ্তাহ ছিলেন। কারণ দেশবন্ধু তাঁহার নূতন কর্ম্মপন্থা লইয়া কলিকাতা আসিয়া পৌঁছিলেন।

দেশবন্ধু আসিবেন শুনিয়া সুভাষচন্দ্র আসিয়া সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু এখন সম্মুখে কত কাজ রহিয়াছে, সুভাষচন্দ্রকে সর্ব্বদাই দেশবন্ধুর দরকার। এদিকে সুভাষচন্দ্রেরও হঠাৎ আসা অসম্ভব হইল। একদিন দেশবন্ধু বলেন—"সুভাষ এখন আর কতদিন থাকিবে। এখানে যে বিশেষ প্রয়োজন"—

সুভাষ—আপনি আদেশ দিন, এখনই আমি চলিয়া আসিব। তখন দেশবন্ধু সে আদেশ দেন নাই। পরে দিয়াছিলেন কিনা ঠিক বলিতে পারি না—তবে সুভাষচন্দ্র ডাক্তার ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্তের প্রতি ভার দিয়া অচিরেই দেশবন্ধুর সঙ্গে আসিয়া সম্পূর্ণভাবে মিলিত হন।

ভাব-প্রবণ

শ্রীকানাই বসু

প্রবীণ এক ভদ্রলোক পথ দিয়া প্রায় ছুটিয়া চলিতেছিলেন। মোড়ের মুখে আসিয়া হঠাৎ প্রকাণ্ড একখানি চলন্ত মোটরগাড়ীর সামনে পড়িয়া থামিয়া গেলেন। মোটরও ব্রেক কসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে। ভদ্রলোক হাঁপাইতে হাঁপাইতে কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া থাকিয়া বোধকরি উপলব্ধি করিয়া লইলেন যে, তিনি এখনও জীবিত আছেন, এমনকি অক্ষত দেহেই আছেন। ততক্ষণে মোটর চালকও বিমূঢ়ভাব কাটাইয়া অচল গাড়ীকে সচল করিবার উদ্যোগ করিয়াছে। পথস্থ ব্যক্তি দুই তিন পদ অগ্রসর হইয়াছেন, বিপরীত মুখে গাড়ীও চলিতে সুরু করিল।

হঠাৎ রথস্থ ব্যক্তি ডাকিলেন—হরিমোহন না? এই হরিমোহন,—রামপাল রোকো, রোকো।

পথের লোক পুনরায় পদসম্বরণ করিলেন, রথের চালকও পুনরায় পদসংস্থাপন করিল ব্রেকের উপর। আরোহী বলিলেন—কি আশ্চর্য্য! হরিমোহনই তো! বাঃ! বলিতে বলিতে গদীর গভীরত্ব হইতে নিজের দেহকে তুলিয়া তিনি জানালার ধারে মুখ আনিলেন। বিস্মিত পথিক সেই অবকাশে তাঁহার মুখ দেখিতে পাইলেন, দেখিয়া তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইল—কে? ইন্দ্রনাথ বাবু না?

—আবার বাবু কেন ভাই? বলিয়া ইন্দ্রনাথ গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিয়া ডাকিলেন—এস, এস, উঠে এস গাড়ীতে।

হরিমোহন সেই খোলা দরজার উপর হাত রাখিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ইন্দ্রনাথ বাবু বলিলেন—কি দেখছ হে? অবাক্ হয়ে গেলে যে একেবারে। দেখছ বড্ড বীভৎস মোটা হয়ে গেছি, না? তা বটে।

—না না, মোটা হওয়ার জন্যে নয়।

ঈষৎ অপ্রতিভ সুরে হরিমোহন যোগ করিলেন—মানে—মোটা এমন কি আর হয়েছ। তাছাড়া, শরীর যেমনই হোক, মুখখানা কিন্তু তোমার অবিকল সেই আছে। তাই দেখছি। উঃ! কতদিন হয়ে গেল—

হা হা শব্দে হাসিয়া ইন্দ্রনবাবু কহিলেন—তা দেখ। ভাল করে দেখবে তো উঠে এস গাড়ীতে।

না না, গাড়ীতে আর যাব না। অনেক দূর যেতে হবে। তাও অন্য দিকে। বিশেষ কাজ রয়েছে। যাক্ কেমন আছ তুমি বল।

—আরে তাও কি হয়। কত দীর্ঘকাল পরে দেখা। এস এস। কোথায় তোমার কাজ আছে চল পৌঁছে দিচ্ছি। ওঠো হে ওঠো। পেছনে গাড়ী এসেছে। তাড়া লাগিয়েছে।

ইতিমধ্যে পিছনে একখানা মোটর গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, বার তিনেক তাহার শিঙা বাজাইয়া পথ ছাড়িয়া দিবার তাগাদাও জানাইয়াছে। সেই দিকে চাহিয়া হরিমোহন আর চিন্তা করিবার সময় পাইলেন না, গাড়ীর মধ্যে উঠিয়া আসিলেন। গাড়ী চলিতে সুরু করিল। ইন্দ্রনাথ বলিলেন—গাড়ী ঘুরিয়ে নাও রামপাল। কোথায় যেতে হবে বল।

গন্তব্য স্থানের নির্দ্দেশ বলিয়া হরিমোহন গাড়ীর কোমল গভীর আসনে সর্ব্বাঙ্গীণ আত্মসমর্পণ করিলেন। ইন্দ্রনাথ পকেট হইতে সিগারেটের সুদৃশ্য আধার খুলিয়া বন্ধুর সামনে ধরিলেন, হরিমোহন একটি তুলিয়া লইলে

স্বয়ং একটী ঠোঁটে ঝুলাইয়া সিগারেটের কৌটা বন্ধ করিয়া পকেটে পুরিলেন এবং একটি দেশলাই-কাঠিতে দুই সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করিয়া বলিলেন—তারপর ?

*　　*　　*　　*

গাড়ী ছুটিয়াছে।

দগ্ধাবশেষ আধখানা সিগারেট জানালাপথে নিক্ষেপ করিয়া ইন্দ্রনাথ কহিলেন—বটে ! তাহলে ত বড্ড জড়িয়ে পড়েছ দেখছি। তা ভেবো না। হয়ে যাবে 'খন ভাই, সব ঠিক হয়ে যাবে। মেয়ের বিয়ের ফুল যদি ফুটে থাকে তবে ঠিক হয়ে যাবে বিয়ে, দেখো। কোত্থেকে আসবে বেটা বর, কেমন করে জোগাড় হবে টাকাকড়ি—সে তুমি ভেবেই হদিস পাবে না।

মেয়ের বাপের দুশ্চিন্তা এই আশ্বাসে দূর হইল না। হরিমোহন বলিলেন—আরে ভাই, আগে তো আমিও ঠিক ওই কথাই বলতুম গিন্নিকে। সে তো উতলা হয়েছে আজ নয়। মেয়ে যখন তেরো পেরোয়নি, তখন থেকে খোঁচাতে সুরু করেছে। ষোলয় যখন কিছু করতে পারলুম না, তখন আমিই বলেছি—ফুল ফোটেনি, তাই হচ্ছে না। মিথ্যে আমাকে দুষছো কেন? আর আজ পাঁচ বছর পরে, সেই গিন্নিই আমাকে সান্ত্বনা দেন—অত ভেবে ভেবে মাথা খারাপ কোরো না। মেয়েছেলে করে যখন সৃষ্টি করেছেন বিধাতা, তখন তার বরও একটা আগেই সৃষ্টি করেছেন নিশ্চয়। তুমি ভেবে ভেবে একটা কাণ্ড করবে কি শেষে ? মানে, এদিকে আবার প্রেসারও আছে কিনা, একবার বিছানা নেওয়াও হয়ে গিয়েছে, সতীলক্ষ্মীর সেই ভয়।

ম্লান হাসিয়া হরিমোহন হাতের সিগারেটের দিকে চাহিলেন। তাহার আগুন প্রায় আঙ্গুলে আসিয়া ঠেকিয়াছে দেখিয়া অতি সাবধানে তাহা হইতে শেষ ধূম আহরণ করিয়া লইয়া সেটি ত্যাগ করিলেন। তারপর বলিলেন,—যাক, আমার কথা তো সব শুনলে। এখন তোমার খবর সব বল তো দেখি।

ইন্দ্রনাথ আসনের কোণ হইতে একটি রূপোর ডিবা আবিষ্কার করিয়া তাহা হইতে বন্ধুকে একজোড়া মিঠা-পানের খিলি দিলেন। নিজের মুখেও একজোড়া ফেলিয়া পকেট হইতে মিনা খচিত রূপোর ক্ষুদ্র এক জরদার কৌটা বাহির করিলেন। সে কৌটারও সদ্ব্যবহার হইল। অতঃপর আর একটী সিগারেট দান করিয়া ও ধরাইয়া, ইন্দ্রনাথ কহিলেন—আমার খবর ? আমার আর খবর কি ভাই। দেখতেই তো পাচ্ছ, চলেছে একরকম। এই আর কি।

মিঠাপানের স্বাদে, মূল্যবান্ জরদার রসে ও সৌখীন সিগারেটের সুবাসে এবং সর্ব্বোপরি সর্ব্বাঙ্গে দ্রুতগতি গাড়ীর আরাম উপভোগে, হরিমোহনের সাংসারিক দুঃখ-দুশ্চিন্তার চাপ ক্রমেই যেন হাল্কা হইয়া আসিতেছে। তিনি সিগারেটে দীর্ঘ টান দিয়া বলি-লেন—আরে ভাই, তোমাদের খবরই হ'ল আসল খবর। কিছু না হবে তো ২৫ বছর পরে দেখা। খবর আছে বই কি ! পড়ে আছি সেই অজ পাড়াগাঁয়ের ইস্কুলে, দেখাও নেই কারো সঙ্গে, শুনতেও পাই না কারও কথা. নাও বল শুনি। ছেলেমেয়ে ক'টি ? কোথায় সব বিয়ে-থা দিলে ? কে কি করছে বল। আর গিন্নির নথ-নাড়া খাচ্ছ কেমন, সেইটে আগে বল শুনি। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ···

তরল পানরসে ও হালকা ধোঁয়ায় প্রৌঢ় ইস্কুলমাষ্টার তাঁহার কাঠিন্য ও গাম্ভীর্য্য হারাইয়া তরল হাসিতে মুখর হইয়া উঠিলেন।

ইন্দ্রনাথের মুখেও হাসি ফুটিল। কহিলেন—বেশ, তোমার শেষ প্রশ্নের জবাবটাই আগে দি। নথ নাড়া খেতে হয় না আমাকে, ওটি থেকে রক্ষা পেয়েছি। থ্যাঙ্ক্ গড।

সহাস্যে হরিমোহন বলিলেন—তাও তো বটে। এ কি আমাদের পাড়াগাঁয়ে বড় গিন্নি যে নথ পরবে ? আমারই ভুল। যাক, নথ না থাক নাক তো আছে হে ? নাক নেড়েও তোমাকে উদ্ধার করছেন ? নাকি সহুরে বৌঠাকুরুণরা নাক নাড়তেও ভুলে গেছেন ?

ইন্দ্রনাথ কহিলেন—তা নিশ্চয়ই ভোলেননি। তবে আমার সে ভয়ও নেই। কারণ নথও নেই, নথের পিছনে যে নাকটা থাকে সেটাও নেই। এবং তার চেয়ে বড় কথা হল—নাকের পেছনে যে মাথাটা থাকে সেটারও অভাব।

বিস্মিত হরিমোহন প্রশ্ন করিলেন—তার মানে ?

ইন্দ্রনাথ মানে না বলিয়া ডাকিলেন—বাঁহাতি একবার ঘুরে চল, রামপাল। এলুম যখন এদিকপানে, একবার আশ্রমের ওখানে একটা কথা বলে যাই। এলুম যখন এদিকে—।

গাড়ী মোড় ফিরিল। ইন্দ্রনাথ নীরব। হরিমোহনও নীরবে কি যেন ভাবিতে লাগিলেন।

এককালে, সে বহুকাল পূর্ব্বে, দুই যুবকে অতি ঘনিষ্ঠ না হইলেও কিছু মেলা-মেশা ছিল। তখন সংসারের সহিত ছিল পাওনার সম্বন্ধ, এবং সে পাওনাও ছিল প্রীতিরই পাওনা। জীবনকে দর্শন করিবার চোখ তখন ছিল অন্যরকম, তখনকার জীবন-দর্শন তাই আজকার জীবন-দর্শন হইতে পৃথক্ ছিল। সেইকালে নবীন ইন্দ্রনাথের মধ্যে যে সরস, সতেজ ও সবল প্রাণ দেখিয়াছেন হরিমোহন, আজ এই মোটর গাড়ী, মিঠাপান ও দামী সিগারেটের পরিবেষ্টনীতে

প্রবীণদেহ হাস্যমুখ ইন্দ্রনাথের মধ্যে সেই প্রাণেরই লীলা অনুমান করিয়া পুরাণো দিনগুলির সেই সাধারণ বন্ধুত্বকে অতি নিবিড় করিয়া অনুভব করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

যতদূর মনে আছে, ধনি-সন্তান ইন্দ্রনাথের বিবাহের যে-সব কথাবার্ত্তা, ঘটক-ঘটকী, মেয়ে দেখা ইত্যাদির ঘনঘটা কানে আসিত সে-কালে, সে-সবের কিছুও যদি সত্য থাকে, তবে তাহার গোটাদশেক বিবাহ হইয়া থাকিলেও আশ্চর্য্যের কথা নয়।

গাড়ী আসিয়া থামিল একটি দ্বিতল বাটীর সামনে। চালক পিছনে হাত বাড়াইয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিল। ইন্দ্রনাথ দেহটাকে টানিয়া সম্মুখের দিকে আনিয়া খোলা দরজার পথে একটা পা ঝুলাইয়া দিলেন। তারপর দুই হাতে গাড়ীর দুই অংশ ধরিয়া আর একটা পা বাহির করিয়া টানিয়া টানিয়া যে ভাবে সমগ্র দেহটাকে নিষ্ক্রান্ত করিলেন, তাহা নিতান্ত অনায়াস-সাধ্য বলিয়া বোধ হইল না। নামিবার সময় বলিলেন—পাঁচ মিনিট ভাই, এক্স্‌কিউজ্‌ মি।

তাঁহার ভূমিস্থ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর ভিতর হইতে দুইটি বাবু ও একটি দ্বারবান ছুটিয়া আসিল। তাহাদের নমস্কার ও সেলামের মধ্যে হেলিয়া দুলিয়া ইন্দ্রনাথ বাবু বাটীর মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

হরিমোহন দেখিলেন, বাড়ীটীর দরজার পাশে শ্বেত-পাথরের ফলকে কী একটা আশ্রম লেখা আছে। থামের আড়াল পড়াতে আশ্রমের পুরা নাম দৃষ্টিগোচর হইল না। মোটর-চালককে জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু সে ব্যক্তিও হাতের কাছে নাই। মনিবের পিছনেই গাড়ী ত্যাগ করিয়াছে। পিছনের ফাঁক দিয়া দেখা গেল, সে অদূরে দাঁড়াইয়া বিড়ি ধরাইতেছে। এ দৃশ্য হরিমোহনের ভাল লাগিল। এ ব্যক্তি তাঁহাকে মনিবস্থানীয় জ্ঞান করিয়া সামনে ধূমপান করিতে সাহস করে নাই।

হরিমোহনের শিক্ষক' জীবনে ছাত্রদের কাছে যেটুকু খাতিরপ্রাপ্তি ঘটে, তাহার সহিত অনেকটা ভয়, কতকটা অভ্যাস মিশিয়া থাকে। আর, ছাত্রেরা সকলেই অতি পরিচিত, নেহাৎ বালক মাত্র।

কলিকাতার মত সহরে সবুজ বনাতের কোট-প্যাণ্টলুন পরিহিত, মাথায় টুপীতে পিতলের হরফ আঁটা, এতবড় একটা মোটরকারের কর্ণধার, একেবারে অচেনা ও পূর্ণবয়স্ক লোক, তাঁহাকে স্বেচ্ছায় সম্মান প্রদর্শন করিতেছে। ইহা ড্রাইভারের পক্ষে স্বাভাবিক হইলেও, ব্যাপারটা মোটের উপর বড়ই আনন্দজনক। দরিদ্র ও নগণ্য, কলিকাতায় আসিয়া পর্য্যন্ত নেহাৎ ভিড়ের মধ্যে একজন হইয়া চলাফেরা করিতেছেন, নিজের দৈন্য সম্বন্ধে সদাই সচেতন, এমন সময়ে অপরের চোখে নিজের সম্মানার্হরূপ দেখিয়া হরিমোহনের দুঃখ-দারিদ্র্যপূর্ণ জগত মিনিট দশেক আগে পর্য্যন্ত যতটা কালো ছিল, ততটা কালো এখন আর রহিল না।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরিয়া আসিলেন ইন্দ্রনাথ। সঙ্গে সেই দুইটি বাবু, সেই দ্বারবান, তাহাদের পশ্চাতে আর একটি বাবু, আরও একজন ভৃত্য। ইন্দ্রনাথ গাড়ীতে উঠিলেন, নমস্কার সেলামের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বাবুটি গাড়ীর দরজা বন্ধ করিলেন। এমন সময় এক অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোক আসিয়া গাড়ীর কাছে দাঁড়াইল। স্ত্রীলোকটি এতক্ষণ অদূরে দাঁড়াইয়াছিল। দ্বিতীয় বাবু ব্যস্তভাবে ছুটিয়া আসিল এবং বিরক্তকণ্ঠে বলিল—আঃ, আবার আপনি এসেছেন? আপনাকে কাল এত করে বলে-দিলুম, আপনি শোনেন না কেন?

অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে জবাব আসিল—কেন আর শুনি না বাবা, প্রাণের দায়ে শুনি না। নয় তো সখ করে কি—

প্রবীণ বাবু বলিল—আপনাকে তো বুঝিয়ে বললুম—আমাদের নিয়ম নাই, কি করব বলুন?

কাপড়-মোড়া মাথা হেলাইয়া সে জবাব দিল—আজ্ঞে হাঁ বাবা, তা আপনি সবই বলেছ। বুঝতেও পেরেছি বই কি। তাই আপনাদের কাছে তো আমি আসিনি, আমি এসেছি ঐ বাবার কাছে।

বাবুরা আরও কি বলিতে উদ্যত হইলেন, ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন—কি চাইছেন উনি সতীশ বাবু? বলুন, কি ব্যাপার! সতীশ বাবু যাহা বলিলেন, তাহা অতিশয় পুরাতন গল্প। মর্ম্ম এই যে—রমণীর বৃদ্ধ স্বামী কয়েক বছর হইতে রোগে শয্যাশায়ী। সংসারের উপার্জ্জনের কেহ নাই, আহার্য্য নাই ঘরে, কিন্তু আহার করিবার মানুষ ঘরে অনেক আছে। আর দিন চলে না। অতএব ছেলে দুইটিকে আশ্রমে স্থান দেওয়া হোক।

সতীশ বাবুর কথার শেষে রমণী যোগ করিল—এই বাবু বলতেছেন, এটা অনাথ-আশ্রম, বাপ মা আছে এমন ছেলেকে ঠাঁই দেবার নিয়ম নেই এখানে।

ইন্দ্রনাথ বলিলেন, উনি সত্যি কথাই বলেছেন। আশ্রম তো বড় নয়, যেসব ছেলেমেয়ের কেউ কোথাও নেই, নিতান্ত নিঃসহায়, তাদেরই আশ্রয় দেবার জন্যে এটা করা। বুঝতে পেরেছেন বোধ হয়? এখন আপনার অভাব আমি বুঝছি, কিন্তু একটা নিয়ম তো বজায় রাখতে হবে। তা আপনি এক কাজ করুন, এই টাকা পাঁচটা নিন, আপাততঃ—

বলিতে বলিতে ইন্দ্রনাথ বাবু মাণিব্যাগ খুলিয়া একখানি পাঁচটাকার নোট বাহির করিয়া ধরিলেন।

তখন সেই স্ত্রীলোক এক অদ্ভুত প্রস্তাব করিল। বলিল—বাবা, আর একটু দয়া কর। পাঁচটাকার নোট-খানা রেখে দাও। অত টাকা আমার দরকার নেই।

শুনিয়া ইন্দ্রনাথ বিস্মিত হইলেন। সতীশবাবু ও তাহার দারোয়ানের দল চঞ্চল হইল। স্পষ্টই মনে হইল, রমণী ব্যঙ্গ করিতেছে। ইন্দ্রনাথ বাবুর দয়া প্রত্যাখান করিয়া তাঁকে অপমান করিতেছে।

সামান্য পাঁচটাকায় তাহার মন উঠে নাই মনে করিয়া ইন্দ্রনাথ বলিলেন—এখন এই নিন, পরে আরও কিছু দেব এখন।

সতীশ বাবু দাঁতে দাঁত চাপিয়া কহিলেন—ঐ তো ওদের স্বভাব! যত পাবে, ততই ওদের—হুঁ।

স্ত্রীলোক কহিল, না বাবা, আর চাইতে আসব না। ওর চেয়ে বেশীও চাইছি না। আমাকে দু'টি টাকা দিন আপনি। ইতেই আমার কাজ হবে। আর—আর কাল একবার তোমরা গিয়ে বাপ-মা মরা ছেলে দুটোকে নিয়ে এসো, এনে আশ্রয় দিও, দুটো খেতে দিও, তারা বড় অভাগা—

বলিতে বলিতে অকস্মাৎ কান্নার আবেগে সে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া পড়িল। একহাতে মুখের মধ্যে আঁচল পুরিয়া দিয়া কান্না প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা পাইল ও অপর হাত বাড়াইয়া দিল টাকা দুইটির জন্য।

বিস্মিত ইন্দ্রনাথ ঈষৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন—আবার কোন ছেলে দুটি?

—এই হতভাগীরই বাবা, আর কার?

—আপনার ছেলে? তবে যে বললেন বাপ-মা মরা—

মুখের উপর হইতে কাপড় সম্পূর্ণ অপসারণ করিয়া রমণী বলিল—তাই হবে বাবা, তাই হবে। এই বুড়োবুড়ী না গেলে আশ্রয় দেওয়া চলবে না, তাই হবে। বাপ-মা তাদের কাল থাকবে না বাবা। দুটি টাকা দয়া করে দিন শুধু। নয় তো সঙ্গে আসুন, এখনও দোকান খোলা আছে, দু'ভরি কিনে দিন বাবা দয়া করে। বেঁচে থেকে পেটের ছেলেকে খেতে দিতে পারলুম না, এবার তোমরা দিও, তাই দেখি যেন।

সকলেই অবাক্ হইয়া শুনিতেছিল। সতীশের দলও কথা কহিতে সাহস করিল না। ধীরে ইন্দ্রনাথ কহিলেন—আপনাকে আপিঙ কিনতে হবে না, আপনি স্থির হোন মা। আপনার ছেলেদের ভার আমি নিলুম, আপনি নিশ্চিন্ত হোন। আর দিন কতকের মতো এটা রাখুন, তারপর যা হয় আমি করছি।

এই পরম আশ্বাসে রমণীর ক্রন্দন আবার উদ্বেল হইয়া উঠিল। তথাপি সেই ক্রন্দনের মধ্যে সে 'রাজা হও' ইত্যাদি কি সব বলিতে চেষ্টা করিল। ইন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি সতীশ বাবুর হাতে নোটখানা গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন—চল রামপাল।

মিনিট দুই তিন ধাবমান মোটরের মধ্যে চুপ করিয়া থাকিয়া ইন্দ্রনাথ বলিলেন—এই এক ফ্যাসাদ, কী করা যায় বল দেখি? অনাথ আশ্রমের নিয়ম একেবারে orphan ছেলেদের আশ্রয় দেওয়া। কিন্তু···বাপ তো একটা আছে নাম মাত্র—কি বল?

জবাব না পাইয়া বলিলেন কি হে, কি ভাবছো?

হরিমোহন বলিলেন—না, ভাবিনি কিছু। কিন্তু মৃণালিনী দেবী কে ছিলেন হে ইন্দর?

—ছিলেন একজন কেউ নিশ্চয়। নাও পান খাও, ধর।

খোলা ডিবা হইতে পান তুলিয়া লইলেন হরিমোহন। কিন্তু মুখে দিবার কথা ভুলিয়া গেলেন। ভাবিতেছি, না বলিলেও কী-যেন অস্পষ্ট চিন্তা মনের মধ্যে ঘুরিতেছে। ক্ষণকাল পূর্বের সেই আনন্দ-অনুভূতি অকস্মাৎ ধাক্কা খাইয়া বিপরীত রূপ লইয়াছে। গাড়ীতে ইন্দ্রনাথের ফিরিয়া আসিবার আগেই রামপাল নিজের আসনে আসিয়া বসে। কৌতূহলের বশে হরিমোহন জিজ্ঞাসা করেন, আশ্রমের কি নাম, কিসের আশ্রম। শুনেন, ইহা মিরণালিন আশ্রম আছে, মিরণালিন মাইজীর নাম ছিল—এইরকম রামপালের শোনা আছে। বাকি বহুৎ রূপেয়া পয়সা যে ইহাতে বাবু খরচা করেন, তাহা বহুত মালুম আছে।

পান মুখে পুরিয়া হরিমোহন প্রশ্ন করিলেন—হাঁ হে ইন্দর, মৃণালিনী দেবী গত হয়েছেন কতদিন?

ইন্দ্রনাথ সিগারেট ধরাইতেছিলেন। সে কার্য্য সমাধা করিয়া জ্বলন্ত দেশলাই কাঠিটি একদৃষ্টিতে দেখিলেন, তারপর সেটি নিবাইয়া গাড়ীর মধ্যে ক্ষুদ্র ভস্মাধারে ফেলিয়া বলিলেন—কে জানে অত মনে নাই।

অল্পক্ষণ পরে হরিমোহন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—কি রেখে গেছেন তিনি?

—ছেলেমেয়ের কথা বলছ? সেদিকেও খুব মিতব্যয়ী ছিলেন। একটি বছর দুয়েকের কন্যা দান করে গেছেন, সেটিকে পাত্রস্থ করেছি ভাই তোমাদের আশীর্ব্বাদে, নাতি-নাতনীর মুখও দেখেছি। ব্যস, নিশ্চিন্ত।

নিশ্চিন্ততা বুঝাইবার জন্যই যেন ইন্দ্রনাথ সিগারেটে একটা সুখটান দিয়া সশব্দে ধূম উদ্‌গীরণ করিলেন। সেই ফুৎকার-শব্দ হরিমোহনের কানে দীর্ঘনিঃশ্বাসের মতোই শুনাইল। তিনি বলিলেন—তা হলে সে তো

তোমার প্রথম বয়সের ব্যাপার হে তারপর আর সংসার করলে না? কী আশ্চর্য্য!

—আশ্চর্য্য আবার কি আছে এতে? নেড়া বেলতলায় একবারই যায় রে ভাই, দু'বার কি যেতে চায়?

হরিমোহন নেতিবাচক মাথা নাড়িতে লাগিলেন। ইন্দ্রনাথ বলিলেন—কি? মাথা নাড়ছ কি? বিশ্বাস হল না?

—বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা নয়। আমি ভাবছি মানুষকে বাইরে থেকে দেখে কত অল্প চেনা যায়। অল্প কেন, মোটেই চেনা যায় না। তোমাকে দেখে এই পনের মিনিট আগেই ভেবেছি—তোমার মত সুখী—যাক্ যাই ভেবে থাকি এখন দেখছি কতবড় ভুল করেছি। এত ধন-ঐশ্বর্য্য-ভোগ, বিলাসের মধ্যে উদাসী সন্ন্যাসী—

অত্যন্ত শশব্যস্তে ইন্দ্রনাথ বলিলেন—থামো, থামো হে থামো। করছ কি? আমি ভয়ঙ্কর বিষয়ী লোক, এই সারাদিন শেয়ার বাজার আর পাটের বাজার চষে এলুম পয়সা কুড়োবার জন্যে, দুটো মামলা ছিল আজ কোর্টে,—আমি কিনা উদাসী? কাকে কি বলছ হে?

কিন্তু আবার হরিমোহন ঘাড় নাড়িলেন ও সাহাস্যে বলিলেন—পয়সা কুড়োবার কথা বলে তুমি আমাকে ভোলাতে চাও? তবু যদি নিজের চোখে না দেখে আসতুম তোমার পয়সার লোভ। আজ সার্থক দিন রে ভাই, সার্থক এবার কলকাতায় আসা। তোমার মত একটা রাজর্ষির দেখা পেলুম।

ইন্দ্রনাথ ধমক দিলেন—নাঃ, তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি করলে দেখছি। নাও ধর, মুখটা বন্ধ কর দিকি।

—না, না, আর সিগারেট খাব না, অতটা অভ্যাস আর আজকাল নেই ভাই।

—নাই থাক, মুখটা বন্ধ করতো।

হরিমোহনের হাতে তিনি একটা সিগারেট ধরাইয়া দিলেন।

সিগারেট লইলেন, অগ্নি যোগ করিলেন, টানও দিতে লাগিলেন তাহাতে হরিমোহন। কিন্তু মুখ বন্ধ হইল না।

ইন্দ্রনাথের প্রবল তিরস্কার ও প্রতিবাদ কিছুই গ্রাহ্য না করিয়া তিনি বারম্বার বন্ধুর অন্তরস্থিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগীর উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে লজ্জিত ও বিব্রত করিয়া তুলিলেন।

পরিশেষে বলিলেন—তুমি যে আমার কথায় কেবলই কুণ্ঠা বোধ করছ, এই যে সইতে পারছ না, এতে করে' তোমার আরও বেশী প্রশংসা পাওনা হচ্ছে, তা জানো?

—তাইতো দেখছি। ইন্দ্রনাথ কহিলেন—এখন থামো তো বাপু, তুমি কলেজে কবিতা-টবিতা লিখতে, কর গুরুগিরি, পণ্ডিত মানুষ তুমি, আর আমি সেই আই, এ ফেল করে ইস্তক এই পয়সার গোলামী করছি। তোমার উচ্ছ্বাসের সঙ্গে পাল্লা দিতে আমি পারব না। কিন্তু বিশ্বাস কর ভাই, আমি নিতান্তই সাধারণ দীনহীন লোক, তোমার অত বড় বড় বিশেষণের একেবারেই যোগ্য নই। ওসব থামাও বাপু একটু সুস্থির হয়ে বসি।

হরিমোহন থামিলেন। কিন্তু সে কেবল নূতন করিয়া আক্রমণ করিবার জন্যই। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন—নাঃ, তোমাকে প্রশংসা করা সত্যিই ভুল। প্রশংসা করি বটে তোমার আদর্শের, কিন্তু কাজটা তুমি মোটেই ভাল করনি। ভেবে দেখছি, তুমি অতি অন্যায় করেছ। এত সেন্টিমেণ্টাল তুমি—তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

হাসিয়া ইন্দ্রনাথ বলিলেন স্বপ্নে তুমি আমার কথা ভাবতে বুঝি খুব।

—না না, ঠাট্টার কথা নয়। একটা লোকের স্মৃতি বয়ে তুমি সারা জীবনটা কাটিয়ে দিলে? জীবনের অপব্যবহার করেছ তুমি। অত্যধিক ভাবপ্রবণতা গৃহস্থাশ্রমে অপরাধ, তা জান?

গম্ভীর হইয়া ইন্দ্রনাথ কহিলেন—এখন জানলুম। হঁয়াই রাখ রামপাল।

রামপাল গাড়ী থামাইয়া দরজা খুলিয়া দিল। ইন্দ্রনাথ বলিলেন—আচ্ছা ভাই, আজকের মত আসি।...না না, তুমি থাক গাড়ীতে, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

—আর তুমি? তুমি চল্লে কোথায়? ইন্দ্রনাথ গাড়ী হইতে নামিয়া বলিলেন—আমি এই একটু পার্কে বেড়িয়ে টেড়িয়ে বাড়ী ফিরব। সারাদিনটা কাটে অফিসের চেম্বারে, নয় তো গাড়ীর গর্ভে। পা দুটোর ব্যবহার আর হয় না। সময়ও পাই না, এই সন্ধ্যের সময়টুকু একটু পায়চারী করে নিই। দেখছ তো, কী বিপর্য্যয়, মোটা হচ্ছি দিন দিন।

হরিমোহন হাত বাড়াইয়া সাগ্রহে বন্ধুর হাতখানা ধরিয়া বলিলেন, বড় আনন্দ হল ভাই তোমাকে এতদিন পরে দেখে।

ইন্দ্রনাথ বলিলেন—আমারই কি কম আনন্দ হল হে?

হরিমোহন বলিলেন—কি করব, কাল ভোরেই চলে যাচ্ছি, পুজোর মানতে এসেছি বুঝতে পারছ তো, নইলে তোমার বাড়ী যেতুম। কিন্তু বড় দুঃখও হল। এতদিন পরে কনডোলেন্স (শোকের সহানুভূতি) আর কি জানাব। কিন্তু বুঝতে পারছি, তোমার জীবনে কোন আনন্দ নাই

বাধা দিয়া ইন্দ্রনাথ ডাকিলেন—রামপাল একবার সঙ্গে এস তো।... এক মিনিট বস মোহন, কতদিন দেখা

হবে না, ছেলেমেয়েদের জন্য সামান্য একটু মিষ্টি পাঠিয়ে দিচ্ছি,—আরে তুমি হাত তুলছ কেন? তোমাকে দিচ্ছি নাকি? এস রামপাল। আচ্ছা, গুডনাইট্ ভাই।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। প্রতিরুদ্ধ আলোতে সহরের রাস্তার অন্ধকার দূর হয় নাই। একাকী গাড়ীতে বসিয়া সেই অন্ধকারের মধ্যে চাহিয়া সদাদয় হরিমোহন পুরাতন দিনের ভাবপ্রবণ দিনগুলির কথা ভাবিতে লাগিলেন।

* * *

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরের কথা। বীডন ষ্ট্রীটের কাছে এক অপ্রশস্ত গলির একটি ছোট বাড়ীর দোতলার সুসজ্জিত ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন ইন্দ্রনাথ। ঘরে কাহাকেও না দেখিয়া তিনি পাখার চাবিটি খুলিয়া ও আলোর চাবি বন্ধ করিয়া একখানা সোফায় দেহভার রক্ষা করিয়া চোখ বুঁজিলেন। অনতিকাল পরে এক সুবেশা সুশ্রী রমণী ঘরে ঢুকিয়া আলো জ্বালিয়া চমকিয়া বলিল, ওমা, তুমি? কখন এলে? এমন অন্ধকার করে রেখেছ কেন? এমনি চমকে গেছি আমি।

চক্ষু বুঁজিয়াই ইন্দ্রনাথ বলিলেন, চপলাই তো চমকে। নইলে তার শোভা কিসে হবে।

মধুর কণ্ঠে আরও মধু মিশাইয়া চপলা বলিল, বুড়ো বয়সে আর শোভা না ছাই। কিন্তু তোমার আজ এত দেরী হল যে? শরীর খারাপ হয়েছে? বলিয়া সে নীচু হইয়া ইন্দ্রনাথের কপালে হাত রাখিল।

ইন্দ্রনাথ কহিলেন, নাঃ শরীর টরীর নয়। দেরী করে দিলে এক পুরোনো বন্ধু! যত সব সেন্টিমেন্টাল ফুল্‌স্ (ভাবপ্রবণ মূর্খ)। এবার যে দিন দেখা হবে তার সঙ্গে, আনব টেনে তোমার ঘরে; দেখব কেমন হয় মুখখানা।

নীচে হইতে হার্মোনিয়ম যোগে মিহি কণ্ঠের গান ও তবলার ধ্বনি আসিল। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ইন্দ্রনাথ বলিলেন — তোমার নতুন ভাড়াটে বুঝি? সন্ধ্যা থেকেই জ্বালালে দেখছি!

তখন শিয়ালদহের আর্য্যনিবাসের এক কক্ষে হরিমোহনের স্ত্রী বলিলেন—মানুষের মতন মানুষ এখনও পৃথিবীতে আছে বই কি, দয়া-ধর্ম্মও আছে; সবই আছে। নইলে চন্দর সূর্য্যি কি এমনিই উঠ্‌ছে গা। আহা, কত তপিস্যে করে এমন সোয়ামী পেয়েছিল, তা ভাগ্যে নেই।

হরিমোহন কোন কথাই বলিতেছিলেন না। মূঢ়ের ন্যায় একখানা চেকের প্রতি দৃষ্টি তাঁহার নিবদ্ধ। গৃহিণী বলিলেন—নাও, আর বসে থেক না। বড্ড ভাবছিলে মেয়েটার জন্যে, তাই ভগবান্ এমন একটা বন্ধুর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিলেন। নাও ওঠো, ভোরের গাড়ীতেই কাল বাড়ী চল, আর দেরী কোরো না। মন্দিরতলায় ঐখানেই ঠিক করে এস, বুঝলে? আর নিজে এসে শুধু নেমন্তন্ন করা নয়, ধরে নিয়ে যাবে সঙ্গে করে। বলবে, না গেলে মেয়ের বিয়ে হবে না। কথাগুলো শুনছ?

হুঁ শুনছি তো। চেকখানি ভাঁজ করিয়া মানিব্যাগে রাখিয়া হরিমোহন বলিলেন—কিন্তু ও কি যাবে মনে করছ? একটা সুখ্যেতের কথা সইতে পারে না, নিজের গাড়ী থেকে নিজে পালিয়ে যায়, এমনই সেন্টিমেণ্টাল।

—সে আবার কি?

—মানে ভাবপ্রবণ। বরাবরই ঐরকম ওটা। বরাবর।

লও শাবল

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস এম-এ, ব্যারিষ্টার-এট-ল

লও শাবল
ভাঙ্ কারা,
হও সবল,
পায় দাঁড়া।
ঐ যারা
নিঃসহায়,
মৌন মূক
নগ্ন কায়!
অন্ন হীন,
ভিক্ষা চায়।

ভাই তোমার
ভাই তারা—
ক্রন্দনে
দাও সাড়া।
মিথ্যা দোষ
দাও কাহার?
ভিন দেশীর
অত্যাচার!

হও সবল,
শিরদাঁড়া—
হোক্ সোজা;
পায় দাঁড়া।
হীন ভেবে
ভিন্ পথে,
যায় যারা
ভুল করে—

আন তাদের
জয় রথে।
আন তাদের
তোর ঘরে।
ভাই তোমার
ভাই তারা,
লও কোলে
দাও সাড়া।

অস্থি চাই,
চাই রুধির:
হুঙ্কারে
কোন্ সাধক?
তান্ত্রিকের
শব-সাধন
সত্য হোক্
সত্য হোক্।

অন্যায়ের
পথ রুধি'—
বীর দাঁড়া,
শির খাড়া;
আয় মায়ের
ঋণ শুধি—
আয় তরুণ,
আন্ সাড়া।

পর্ত্তুগীজ ভারত

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

প্রাচীতে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নৌ-বিদ্যা-নিপুণ পর্ত্তুগীজ জাতি এক সময় যে প্রবল প্রযত্ন প্রয়োগ করিয়াছিল, তাহার ইতিহাস যেমন বিচিত্র, তেমনই চিত্তাকর্ষক। পর্ত্তুগাল যেরূপ ক্ষুদ্র দেশ, তাহার তুলনায় এই প্রাধান্যপ্রসারের ইতিহাস বিশেষ বিস্ময়জনক, সন্দেহ নাই। পর্ত্তুগীজ জাতি একদিন যে দুর্দ্দমনীয় উদ্যমের পরিচয় প্রদান করিয়াছে, তাহার ইতিবৃত্ত একান্ত রোমাঞ্চকর ও কৌতূহলোদ্দীপক, সন্দেহ নাই। প্রতীচ্য জাতিসমূহের মধ্যে প্রাচ্যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা পর্ত্তুগীজরাই বোধ হয় সর্ব্বাগ্রে করিয়াছিল। ওলন্দাজ, ইংরাজ, ফরাসী প্রভৃতি জাতি পর্ত্তুগীজদিগের পদাঙ্ক অনুবর্ত্তন করিয়াই একে একে আসিয়াছিল বলিলে ভুল বলা হয় না। স্পেন বৃহত্তর রাষ্ট্র হইলেও পর্ত্তুগালের ন্যায় প্রাচ্যে আধিপত্য বিস্তারের জন্য প্রবল প্রযত্ন করিতে তাহাকে দেখা যায় নাই। ফিরিঙ্গি বা পর্ত্তুগীজগণ এক সময় ভারতবর্ষে আসিয়া আধিপত্য প্রসারের জন্য বিশেষ অধ্যবসায় প্রয়োগ করিলেও তাহা শেষ পর্য্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে নাই। সর্ব্বশেষে ইংরাজ ও ফরাসী ব্যতিরেকে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে আর কেহ ছিল না। অবশেষে ফরাসীরাও সরিয়া দাঁড়াইলে ইংরাজরাজ্য অপ্রতিহতভাবে ভারতে প্রসারিত হইয়াছিল।

শাসনকর্ত্তার গৃহ, পাঞ্জিম (নূতন গোয়া)

নৌ-বিদ্যানিপুণ বলিয়া পর্ত্তুগীজরা স্থলপথ অপেক্ষা জলপথেই অধিক প্রতাপের পরিচয় দিতে পারিয়াছে। এক সময় পর্ত্তুগীজ জলদস্যুদল নিম্নবঙ্গের নর-নারীর মনে যে আতঙ্ক সঞ্চারিত করিয়াছিল, তাহার ইতিহাস অনেকেই অবগত আছেন। মালয় উপদ্বীপ হইতে ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূল পর্য্যন্ত এক সময় পর্ত্তুগীজ জলযানসমূহ বিজয়-বৈজয়ন্তী উত্তোলনপূর্ব্বক অবিরাম যাতায়াত করিত বলিয়া আমরা জানি। ভারত হইতে পর্ত্তুগীজ প্রাধান্য প্রায়ই সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার স্মৃতিচিহ্নরূপে পর্ত্তুগীজ ভারত বা গোয়া আজিও বিরাজিত রহিয়াছে। ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে পর্ত্তুগীজদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই নগরী একদিন প্রাচীর শ্রেষ্ঠ নগরসমূহের অন্যতম ছিল। ইহা প্রতীচ্য জাতিদের দ্বারা 'প্রাচীর রোম' আখ্যায় অভিহিত হইয়াছে। রোম্যান ক্যাথলিক মতবাদের কেন্দ্রস্থল রোম মহানগরের সহিত অনেক বিষয়ে গোয়া নগরীর বিস্ময়কর সাদৃশ্য। গোয়াকে কেন্দ্র করিয়াই এই মতবাদ প্রাচীতে প্রসারলাভ করিয়াছে। পর্ত্তুগীজরা বিশ্ববিজয়ী রোম্যান জাতির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই প্রাচীতে প্রাধান্য প্রসারে প্রযত্নপর হইয়াছিল।

পর্ত্তুগীজ ভারত কেবল গোয়া নগরীতে সীমাবদ্ধ না হইলেও, এই নগরীকে কেন্দ্র করিয়া ইহা অবস্থিত, এবং গোয়ার ইতিহাস এবং পর্ত্তুগীজ ভারতের ইতিবৃত্ত অভিন্ন। এই প্রাচীনা নগরীর গৃহগুলির সহিত পর্ত্তুগীজ ভারতের চিত্তাকর্ষক বিচিত্র কাহিনী ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট আছে। ষোড়শ শতকের ঐতিহাসিক আকাশে গোয়ার আবির্ভাব ধূমকেতুর মতই আকস্মিক ও বিস্ময়জনক। ইহার অভ্যুদয় ও পতনকেও আকস্মিক ও বিস্ময়কর বলা চলে। ইহা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে নাই, আলাউদ্দিনের মায়া-দীপের প্রভাবে সম্ভূত সৌধাবলীর ন্যায় সহসা আবির্ভূত হইয়াছিল এবং কতিপয় বৎসর ব্যাপিয়া বিচিত্র বিভা বিকীর্ণ করিয়া অকস্মাৎ কালের কোলে বিলীন হইয়াছিল বলা চলে। ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে, পর্ত্তুগীজ সেনাধ্যক্ষ আলবুকার্ক ভারতবর্ষীয় শাসনকর্ত্তাকে পরাজিত করিয়া গোয়া জয় করেন। অবশ্য তখন গোয়া সমৃদ্ধ নগররূপে গড়িয়া উঠে নাই। ইহা তখন সামান্য একটি জনপদ মাত্র ছিল। এই বিজয়ের ৭৫ বৎসর পরে গোয়া সমৃদ্ধির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়া এশিয়া এবং ইউরোপ উভয় মহাদেশকেই চমৎকৃত করিয়া তুলিয়াছিল। এই সমৃদ্ধির সমুচ্চ শিখরে সমাসীন হইবার ৭৫ বৎসর পরে গোয়ার পতনের অধ্যায় আরম্ভ হয়। এই পতনের পর বহুদিন চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু অতীতে অপূর্ব্ব অভ্যুদয়প্রাপ্ত গোয়া দোরাদা (Goa Daurada) বা 'স্বর্ণসম কীর্ত্তিকিরণে উদ্ভাসিতা নগরী' আজিও শত শত ভ্রমণকারীর মনকে আকর্ষণ করিতেছে। আমরা যখন দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বাহির হইলাম তখন এই নগরীর আহ্বান আমরাও শুনিতে পাইলাম। অবশ্য অনেক দিন হইতেই পর্ত্তুগীজ ভারত দর্শনের আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে সঞ্চারিত ছিল।

আমাদের পর্ত্তুগীজ ভারত ভ্রমণ যাঁহার জন্য সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল এবং যাঁহার সহিত বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ না হইলে আমার পক্ষে পরে পর্ত্তুগাল ভ্রমণ কখনও সম্ভব হইত না,—সেই স্বর্গীয় ফাদার দিয়াজের স্মৃতি আমাদের মনে সর্ব্বদা জাগরূক র'হবে। সর্ব্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতার বহু উর্দ্ধে বিরাজিত এই পর্ত্তুগীজ রোম্যান ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজক পর্ত্তুগীজ ভারত-ভ্রমণের সময় আমাদের সকল বাধা ও অসুবিধা এরূপভাবে দূর করিয়াছিলেন যে, আমরা ভাবিলে বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারি না।

ব্রাগাঞ্জা ঘাট হইতে আমরা যখন রেলপথে আগাইয়া চলিলাম তখন উভয় পার্শ্বের দৃশ্যাবলী আমাদের মনে অভূতপূর্ব্ব ভাবধারা সঞ্চারিত করিয়া তুলিতে লাগিল। ক্যাস্‌লরক ষ্টেশন হইতে মর্মুগাও পাঁচ ঘণ্টার পথ। এই পাঁচ ঘণ্টার পথে যে আশ্চর্য্য নৈসর্গিক ঐশ্বর্য্য দৃষ্টিপথে পতিত হয় তাহাকে অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পশ্চিমঘাট পর্ব্বতশ্রেণীর শীর্ষদেশ হইতে ট্রেণখানির অবতরণ এক অপূর্ব্ব ব্যাপার। রেল-রাস্তাটি আঁকিয়া বাঁকিয়া নীচে নামিয়াছে। প্রত্যেক বাঁকেই নয়নাভিরাম অভিনব দৃশ্য ভ্রমণকারীর মনকে মন্ত্রমুগ্ধের মত করিয়া তুলে বলিলে অত্যুক্ত হয় না।

যাঁহারা পাঞ্জিম বা নোভা গোয়া বা নব গোয়া যাইতে চান তাঁহাদিগকে জলযানযোগে আরও কিছুদূর যাইতে হইবে। যাঁহারা মর্মুগাও বন্দরে এক বা দুই রাত্রি থাকিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা তালাবনশ্যাম শৈলমালার পার্শ্ব দিয়া স্বল্প দূর আগাইলেই অবস্থানের উপযোগী স্থান প্রাপ্ত হইবেন। সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদের অধিকাংশই 'প্যালেস হোটেল' নামক বিশ্রামভবনে অবস্থান করেন। পূর্ব্বে এই গৃহটি একটি দুর্গ ছিল। ভাস্কো ডা-গামার পৌত্রকর্ত্তৃক দুর্গটি স্থাপিত হয়। পরে দুর্গটি হোটেলে রূপান্তরিত হইয়া বিচিত্র পরিণতির বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করে। এই হোটেলে দেশীয়দিগকে থাকিতে দেওয়া হয় না বলিলে চলিতে পারে। প্রভাবশালী এবং ইউরোপীয় পরিচ্ছদধারী হইলে অবস্থানের অনুমতি সময়ে সময়ে পাওয়া যায়। সমগ্র পর্ত্তুগীজ ভারতে ফাদার দিয়াজের অপ্রতিহত প্রভাব বলিয়া আমাদের পক্ষে দুই রাত্রি প্যালেস হোটেলে অবস্থান সম্ভব হইয়াছিল। অবশ্য আমার সঙ্গিগণের সকলেই ইউরোপীয় পরিচ্ছদ পরিয়াছিলেন। আমি নিজে গৈরিকধারী পরিব্রাজক। হোটেলের তত্ত্বাবধায়ক ফাদার দিয়াজের বন্ধু, সুতরাং আমরা বিশ্রামাবাসটিতে সাদরে অভ্যর্থিত হইয়াই প্রবেশ করিয়াছিলাম। ভাস্কো-ডা-গামা, আলবুকার্ক প্রভৃতির স্মৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া এই হোটেলটির ঐতিহাসিক গুরুত্বও উপেক্ষণীয় নয়। একবার গোয়ার পরিবর্ত্তে মর্মুগাওকে পর্ত্তুগীজ ভারতের রাজধানী করিবার কথা হইয়াছিল এবং শাসনকর্ত্তা ও অন্যান্য কর্ম্মকর্ত্তারা এই হোটেলের একটি কক্ষে বসিয়া ঐ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। যে কক্ষটির কোণে সুপ্রসিদ্ধ সাধু সেণ্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ারের মূর্ত্তি রক্ষিত রহিয়াছে, সেইখানেই উক্ত আলোচনা হইয়াছিল বলিয়া কথিত। এই ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন বিশ্রামাবাসে বাসকালে পর্ত্তুগীজ ভারতের অতীত ইতিহাসের পাতাগুলি একে একে আমাদের মানস-চোখের সম্মুখে প্রসারিত হইয়াছিল।

গোয়ার পাচকেরা রন্ধনবিদ্যায় অত্যন্ত নিপুণ। গোয়ানীজ পাচকগণ পশুপক্ষী এবং মৎস্যের মাংসকেই বিভিন্ন প্রণালীতে রন্ধন করিতে জানে। বিশেষ, সামুদ্রিক মৎস্য রন্ধনে তাহারা সমধিক দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া থাকে।

এরূপ উপাদেয় সামুদ্রিক মৎস্য নাকি অন্যত্র পাওয়া যায় না। এই সকল মৎস্য গোয়ানীজ পাচকদের পাক-কৌশলে এরূপ রুচিকর রুচির ভোজ্য পদার্থে পরিণত হইয়া থাকে যে, তাহার অশেষ প্রশংসা নাকি পঞ্চমুখ না হইলে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

দুই রাত্রি মর্মুগাওএ থাকিবার পর আমরা জলযান-যোগে কাবো নামক স্থানে পৌঁছিলাম। পৌঁছিতে প্রায় এক ঘণ্টা লাগিল। এই স্থানে বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, মর্মুগাও, কাবো প্রভৃতি স্থানগুলিকে বৃহত্তর গোয়ার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া অভিহিত করা যায়। প্রাচীন গোয়া, নবীন গোয়া প্রভৃতি স্বতন্ত্র শহর থাকিলেও গোয়া বলিলে সমস্ত পর্ত্তুগীজ ভারতকেই বুঝায়। কাবো হইতে সমুদ্রের দৃশ্য শুধু সুন্দর নয়—সুমহান্। গোয়ার শাসন-কর্ত্তা রাজধানী পাঞ্জিম অপেক্ষা কাবোতে অবস্থিত

রাজপ্রতিনিধিদের খিলান, (প্রাচীন গোয়ায় প্রবেশের তোরণ)

ভিলাতে থাকিতে ভালবাসেন। এই ভিলাটি পূর্ব্বে একটি মনাষ্টারী বা মঠ ছিল। চারিদিকে বিরাট মাঠ—মধ্যে এই প্রাক্তন মঠ। আমরা কাবোতে পদার্পণ করিবার পর একদল গোয়ানীজ আমাদিগকে যেরূপ সাদরে অভ্যর্থিত করিয়াছিল তাহাতে আমরা বিস্মিত হইয়াছিলাম। গোয়ানীজরা ভ্রমণকারীদের প্রতি অত্যন্ত ভদ্রতা দেখায়, ফাদার দিয়াজের এই উক্তির সত্যতা আমরা উপলব্ধি করিয়াছিলাম। আমরা পর্ত্তুগীজ ভারতের যেখানে গিয়াছি গোয়ানীজ নরনারী সর্ব্বত্রই আমাদিগকে সহাস্য মুখে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছে। আমরা কোন্ ভাষা-ভাষী, কোন্ প্রদেশবাসী, কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী তাহা তাহারা জানিতে চাহে নাই। আমরা গুণগ্রাহী মানুষ—এইটুকুই তাহাদের নিকট যথেষ্ট পরিচয়। রক্ষণশীল রোম্যান ক্যাথলিক হইলেও গোয়ানীজদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার লেশমাত্র আমরা দেখিলাম না।
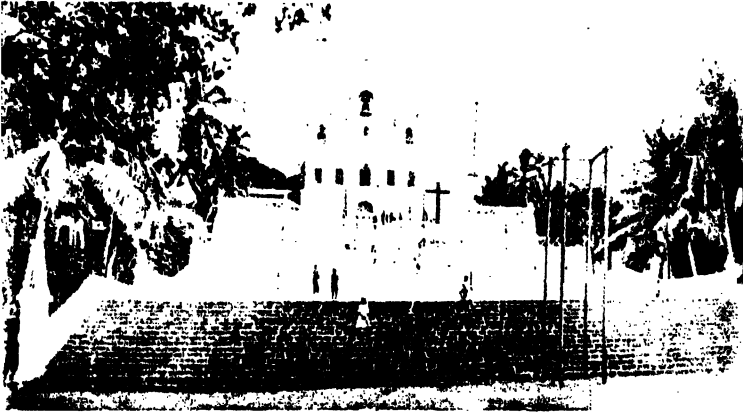
চার্চ্চ অফ আউর লেডি অব্ কন্সেপ্শান—পাঞ্জিম

কাবোতে পদার্পণ করিলে বুঝা যায়, আমরা প্রাচীর শহরসমূহের অন্যতম গোয়ানগরীর নিকটবর্ত্তী হইয়াছি। সুদূর পর্ত্তুগালের কথা পদে পদে মনে পড়িয়া যায়। যেমন ফরাসী চন্দননগরে বা পণ্ডিচেরিতে ভ্রমণকালে ফ্রান্সের কথা স্মৃতিপটে উদ্রিক্ত হয়, তেমনই গোয়া পর্ত্তুগালের স্মৃতি জাগ্রত করিয়া তুলে। উচ্চচূড় রোম্যান ক্যাথলিক অর্চ্চনাগৃহসমূহ 'গোয়া প্রাচীর রোম' এই উক্তির যথার্থতা উপলব্ধি করায়।

আমরা পাঞ্জিমে পৌঁছিয়া প্রথমেই গভর্ণরের প্রাসাদ পরিদর্শনে গমন করিলাম। এই প্রাসাদটীর আকৃতি আধুনিক প্রাসাদসমূহের ন্যায় নহে। বাংলো ধরণের বৃহৎ বাড়ীটি দক্ষ চিত্র-শিল্পীর অঙ্কিত আলেখ্যের মত একান্ত চিত্তাকর্ষক। এই বিচিত্রকায় প্রাচীন ভবনটীর প্রাকৃতিক পরিবেশও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। ইহার ঐতিহাসিক গুরুত্বও অসাধারণ। বিজাপুরের আদিলশাহী শাসকদের প্রাচীন প্রাসাদ এইস্থানেই অবস্থিত ছিল। আলবুকার্ক আদিলশাহী সুলতানদিগকে পরাজিত করিয়াই ভারতে পর্ত্তুগীজ-প্রধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। আদিলশাহী প্রাসাদের অবশেষ এখনও রহিয়াছে। পরে পর্ত্তুগীজ-নির্ম্মিত এই ভবনটিতে পর্ত্তুগীজ ভারতের সমগ্র ইতিহাস লিখিত নয়, অঙ্কিত আছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পর্ত্তুগীজ রাজপ্রতিনিধি ও শাসনকর্ত্তাদের চিত্তাকর্ষক চিত্রাবলী সারি সারি বিরাজিত রহিয়া ভবনটীর অভ্যন্তরভাগকে বিশেষ বিচিত্রদর্শন করিয়া তুলিয়াছে। ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে যখন ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তে আলবুকার্ক পর্ত্তুগীজ পতাকা প্রথম প্রোথিত করেন—সেই স্মরণীয় সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত যাঁহারা রাষ্ট্রতরীর কর্ণধারপদে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের আলেখ্য সযত্নে রক্ষিত থাকিয়া পর্ত্তুগীজ ভারতের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত আমাদের পুরোভাগে প্রসারিত করিয়াছে।

ষোড়শ শতকে ক্যামোয়েন্স গোয়া পরিদর্শনে আসিয়া যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে তদানীন্তন গোয়ার বিষয়ে অনেক কথাই আমরা অবগত হই। শুধু গোয়ার নয়, ক্যামোয়েন্সের বিচিত্র রচনায় আমরা তৎকালীন এশিয়ার যে চিত্তাকর্ষক চিত্র অঙ্কিত দেখি, তাহা কবির সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণশক্তির পরিচয় প্রদান করে। অবশ্য পর্ত্তুগীজ কবি যে চোখে বুদ্ধপ্রভৃতি বিশ্বজনয়িত্রী এশিয়াকে দেখিয়াছেন, তাঁহার অঙ্কিত বাক্যময় আলেখ্য তাহাই আমাদিগকে জ্ঞাপন করে। ক্যামোয়েন্স আলেকজেণ্ডার পোপের ন্যায় ব্যঙ্গচিত্র রচনায় অধিকতর দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। গোয়ানীজদের ভাল মন্দ দুই-এরই কঠোর সমালোচনা কবি তাঁহার কাব্যে করিয়াছেন।

গোয়ার ঐতিহাসিক পটভূমির দিকে চাহিলে আমরা তথায় সর্ব্বত্যাগী সাধু এবং প্রচণ্ড পাতকী উভয়কেই দণ্ডায়মান দেখি। আমাদের গাড়িখানি রিবাণ্ডার গীর্জ্জা-গৃহের পার্শ্বদিয়া সবেগে ধাবিত হইবার সময় আমাদের মনের পর্দ্দায় সেন্ট জেভিয়ারের শান্ত মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া উঠিল।

মালাকা হইতে আনীত হইবার পর এই প্রসিদ্ধ সাধুর পবিত্র শব সর্ব্বপ্রথম এই ক্ষুদ্র গীর্জ্জাটিতেই রক্ষিত হয়।

মালয় উপদ্বীপের অন্তর্গত মালাক্কা নগরে সেন্ট জেভিয়ার ইহলোক ত্যাগ করেন। পরে রিবাণ্ডার উপাসনাগার হইতে সাধুর শব জেসুইট সম্প্রদায়ের স্থাপিত সেন্ট পল গীর্জ্জায় লইয়া যাওয়া হয়। ইহা ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। সেণ্টফ্রান্সিস জেভিয়ার ধর্ম্মযাজক বা আচার্য্যরূপে এই গীর্জ্জায় কিছুকাল প্রচারকার্য্য পরিচালনা করেন। ১৬২৪ খ্রীষ্টাব্দে সাধুর পার্থিব তনু সম্পূর্ণ নূতন বম-জেসাস গীর্জ্জায় স্থানান্তরিত হয় এবং ইহাই উহার শেষ বিশ্রাম-স্থান। বম-জেসাস গোয়ার সর্ব্বাপেক্ষা চমৎকার অর্চ্চনাগার। এইরূপ গুরুগম্ভীর গৌরবান্বিত ভজনাগৃহ গোয়ায় আর নাই। এই রূপ গীর্জ্জা সমগ্র ভারতে অতি অল্পই আছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

বম-জেসাস পর্ত্তুগালের খৃষ্টীয় পুণ্যতীর্থ বম-জেসাস নামক স্থানের অনুকরণে স্থাপিত। পরে পর্ত্তুগালের এই তীর্থ দর্শনের সুযোগ আমাদের ঘটিয়াছিল। পর্ত্তুগালের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে, মিনহো এবং ডুয়ো নদীর মধ্যস্থলে ব্রাগা নগরী বিরাজিত। যেমন ইংলণ্ডের ক্যাণ্টারবারি, তেমনই পর্ত্তুগালের ব্রাগা। আজকাল পাশ্চাত্ত্য রেলপথ প্রস্তুত হওয়ায় আরোহণ সহজ হইয়াছে। পূর্ব্বে ধর্ম্মনিষ্ঠ খৃষ্টানগণ বহুকষ্টে বম-জেসাস তীর্থ দর্শনার্থ শৈল-শার্ষে আরোহণ করিতেন।
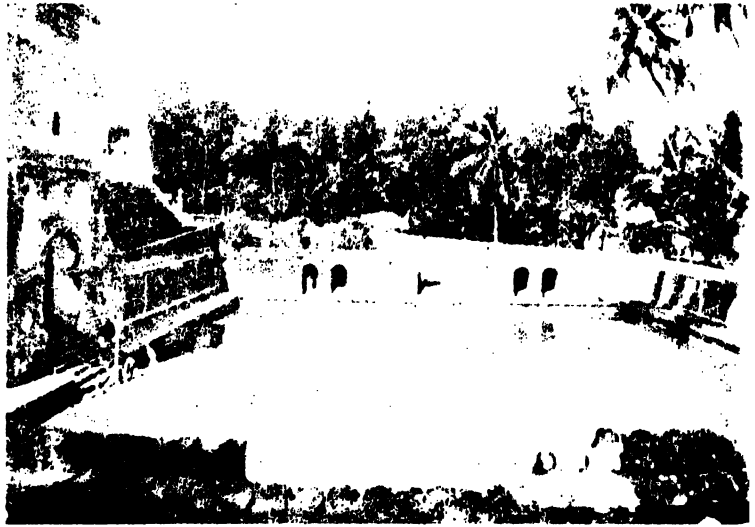
শ্রীম্যানওয়েক্যার মন্দির ও জলাশয়—'নূতন রাজ্য'

আমাদের গাড়ীখানি বম-জেসাস গীর্জ্জাগৃহের সম্মুখে দাঁড়াইলে আমরা ফাদার দিয়াজের অনুবর্ত্তী হইয়া অগ্রসর হইলাম। এই উপাসনা-গৃহ ও সমাধিমন্দিরের গাম্ভীর্য্য আমাদের মনে একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় সম্ভ্রম সঞ্চারিত করিল।

গীর্জ্জার অভ্যন্তরভাগে যেখানে সেন্ট ফ্রান্সিসের পূত তনু পরম রমণীয় রজতাধারে রক্ষিত, আমরা তথায় উপনীত হইলাম। ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ইটালীর টাস্কানি নামক রাজ্যের গ্রাণ্ড ডিউক এই রৌপ্যরচিত শবাধারটি উপহাররূপে দান করেন। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে ইটালীর বিখ্যাতনামা জেনোয়া নগরীর এক ধনাঢ্য ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি সাধু ফ্রান্সিসের একটি রজতমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া উহা পাঠাইয়া দেন। গুরুত্বে বা গৌরবে এই বিগ্রহটি সাধুর শবের অব্যবহিত পরে স্থান পাইয়াছে। বিগ্রহটিকে শবাধারের সম্মুখে স্থাপন করা হইয়াছে। আমরা ফাদার দিয়াজের অনুবর্ত্তী হইয়া এই সর্ব্বত্যাগী সাধুর দেহ ও বিগ্রহ উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিলাম। সেন্ট ফ্রান্সিস ভারতবর্ষের সন্ন্যাসীদের মতই পদব্রজেই দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন।

১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয়েরা গোয়া আক্রমণে উদ্যত হইলে তথাকার পর্ত্তুগীজ শাসনকর্ত্তা সেন্ট ফ্রান্সিসের রজতবিগ্রহের হস্তে রাজদণ্ড রাখিয়া শ্রদ্ধাবনত শীর্ষে প্রার্থনা করিয়াছিলেন—হে সাধুশ্রেষ্ঠ, আমাদের রক্ষণভার আপনিই গ্রহণ করুন। সকলে সেই রৌপ্যমূর্ত্তির সম্মুখে সমবেত হইয়া প্রার্থনা ও উপাসনা করিতে লাগিলেন। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, উপাসনা শেষ হইতে না হইতেই সুসংবাদ আসিল—মোগল সৈন্যদিগের জন্য মহারাষ্ট্রীয়েরা পলায়নে বাধ্য হইয়াছে। এই ঘটনার পর হইতেই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল প্রত্যেক শাসনকর্ত্তা সেন্ট ফ্রান্সিসের রজতমূর্ত্তিটির হাত হইতে রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়া শাসনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। স্বল্পকাল হইল, এই নিয়ম উঠিয়া গিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় সাধুর শব দীর্ঘকালেও কোনপ্রকার বিকার প্রাপ্ত হয় নাই। ইহা মিশরীয় মমী অপেক্ষাও অবিকৃত রহিয়াছে। দেখিলে, মনে হয়,যেন কোন সদ্য-মৃত মানুষের দেহ আমাদের সম্মুখে শায়িত রহিয়াছে। অশান্তির আলয় সংসার হইতে অনন্ত শান্তিনিলয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশের সময় সাধুর মুখ-

মণ্ডলে যে প্রশান্তি বা দিব্যকান্তি দৃষ্ট হইয়াছিল কতিপয় শতাব্দী ব্যাপিয়া প্রবাহিত কালস্রোত তাহা অপগত করিতে পারে নাই। সাধুর শব সন্দর্শনের সৌভাগ্য সকল সময়ে হয় না। বৎসরে এমন কয়েকটা দিন নির্দ্ধারিত আছে, যখন সাধুর শবের আবরণ উন্মোচন করা হয়। এই সময় দলে দলে দর্শনার্থীরা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ হইতে আসিয়া থাকে। সাধারণতঃ খ্রীষ্টীয় পর্ব্ব বা উৎসবসমূহেই রজতনির্ম্মিত শবাধারের আচ্ছাদনী উন্মোচিত করা হয়। নিষ্ঠাবান্ খৃষ্টানগণ মৃতদেহের চরণ চুম্বন করিয়া এই সর্ব্বত্যাগী সুপ্রসিদ্ধ সাধুর প্রতি তাহাদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া থাকে।

আমরা সাধুর শবদর্শনের পর গীর্জ্জায় হাই অলট্যার বা উচ্চ উপাসনা-বেদী দর্শন করিলাম। সুবিখ্যাত খ্রীষ্টীয় সাধু সেণ্ট ইগনেশিয়ান লয়োলার প্রকাণ্ড মূর্ত্তির দ্বারা মণ্ডিত এই বিরাট বেদীকে আমরা সসম্ভ্রমে শ্রদ্ধা নিবেদন করিলাম। এই মূর্ত্তিটিকে এমন ভাবে স্বর্ণে বা স্বর্ণবর্ণে মণ্ডিত এবং বহুমূল্য ঝালরে এবং অন্যান্য কারুকার্য্যে কমনীয় পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত করা হইয়াছে যে, দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এই সকল আড়ম্বর বা জাঁক-জমক, সাধুদের মূর্ত্তির প্রতি এই অনুরাগকে প্রোটেষ্টাণ্টরা পৌত্তলিকতা বলিয়া অভিহিত করেন। প্রতীকোপাসক আমরা, আমাদের চোখে ইহা ভাল লাগাই স্বাভাবিক। ইহার পর আমরা জেভিরীয়ান যাদুঘরে সেণ্ট ফ্রান্সিসের পবিত্র ও বিচিত্র জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বস্তু দর্শনান্তে 'আর্চ্চ অফ ভাইস্রয়েজ' বা 'রাজপ্রতিনিধিদিগের খিলান' দেখিতে গমন করিলাম। এই খিলানটি একটী প্রকাণ্ড তোরণ। এই তোরণ দিয়াই প্রাচীনা গোয়ানগরীতে প্রবেশ করিতে হয়। মঞ্জুল নারিকেলকুঞ্জ দুইদিকে দণ্ডায়মান রহিয়া এই তোরণটীকে অধিকতর চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিয়াছে। এই তোরণতলে দাঁড়াইয়া আমরা মানুষের ঐশ্বর্য্যের—শক্তি-সমৃদ্ধির অনিত্যতার কথা ভাবিতে লাগিলাম। আড়াইশত বৎসর পূর্ব্বে এই তোরণের তলদেশ দিয়া দলে দলে এশিয়ার নরনারী এশিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মব্যস্ত নগরীতে প্রবেশ করিত। গোয়া একদিন কি ছিল, তাহা বম-জেসাস গীর্জ্জা এবং উহার অতুলনীয় ঐশ্বর্য্য না দেখিলে উপলব্ধি করা যায় না। যে গোয়া দেখিয়াছে তাহার লিস্‌বন যাইবার প্রয়োজন নাই, ষোড়শ শতকে প্রচলিত এই প্রবচনটি গোয়ার অতীত সমৃদ্ধির বার্ত্তাই আমাদের নিকট বিজ্ঞাপিত করে। ভাস্কো-ডা-গামা এবং সেণ্ট ক্যাথারিণের মূর্ত্তি এই বিরাট তোরণটীর অন্যতম দর্শনীয়।

তোরণের নিকটে 'ক্যাথেড্রাল'। এই উপাসনা-গৃহটি সৌন্দর্য্যে ও ঐশ্বর্য্যে প্রায়ই বম-জেসাসের সমকক্ষ। এই উপাসনা-ভবনে রক্ষিত সম্পদসমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ একটি ক্রস বা ক্রুস। এই ক্রসটি প্রথমে সাড়ে চার গজ উচ্চ ছিল বলিয়া কথিত। পরে কোন অলৌকিক কারণে ইহার উচ্চতা সাড়ে ছয় গজে পরিণত হয়। এই ক্রসটীর উপরে ক্রুসবিদ্ধ ঈশার মূর্ত্তি বহুবার আবির্ভূত হইতে দেখা গিয়াছে বলিয়া কথিত। এই অর্চ্চনা-গৃহটী আলেকজেন্দ্রিয়া নগরীর সেণ্ট ক্যাথারিণের নামে উৎসর্গীকৃত। সেণ্ট ক্যাথারিণ একজন প্রসিদ্ধ সাধিকা ছিলেন। আলবুকার্ক ১৫১০ খৃষ্টাব্দের ২৫শে নভেম্বর সেণ্ট ক্যাথারিন্স ডে নামক পর্ব্ব দিবসে গোয়া-বিজয়ের জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবার পর সেণ্ট ক্যাথারিণের নামে উৎসৃষ্ট এই ক্যাথাড্রালটি স্থাপিত হয়। কুমারী মেরী এবং সেণ্টপীটারের সহিত সেণ্ট ক্যাথারিণও পৃষ্ঠপোষক সেণ্ট পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া খ্রীষ্টীয় জগতের পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন।

ক্যাথেড্রাল স্কোয়ার নামক মুক্ত স্থানের ডাইনে কতিপয় ভগ্ন স্তম্ভ ও কয়েক টুকরা ইমারত বিরাজিত রহিয়াছে। ইহারা অতীতের প্যালেস অফ ইন্‌কুইজিশানের ভগ্নাবশেষ বলিয়া জানা যায়। অনেকেই জানেন, প্রোটেষ্টাণ্ট প্রভৃতি অরোম্যান ক্যাথালিকগণের প্রতি রোম্যান ক্যাথালিকগণ অত্যন্ত কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিতেন। প্যালেস অফ ইনকুইজিশান হইতে এই শাস্তি ব্যবস্থিত হইত। ইন্‌কুইজিশান নামক এই নিষ্ঠুর প্রতিষ্ঠান স্পেনে নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে বলা চলে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশ পর্য্যন্ত গোয়ায় ইন্‌কুইজিশান-সম্পর্কিত এই প্রাসাদটি বিদ্যমান ছিল। ইন্‌কুইজিশানকে খৃষ্টীয় জগতের কদর্য্যতম কলঙ্ক বলিয়া অভিহিত করা চলে। দয়াবতার ঈশার অনুবর্ত্তী হইয়া যাহারা এরূপ নির্দ্দয়তা দেখাইতে পারে তাহারা নামেই খৃষ্টান, কার্য্যতঃ নহে। ইনকুইজিশান প্রাসাদের অবস্থান-স্থানে ভাস্কর্য্য কারুকার্য্যমণ্ডিত কয়েকখণ্ড ভগ্নাবশেষ আমরা দেখিতে পাইলাম। ধর্ম্মবিরোধীদিগের বিচারে জন্য স্থাপিত এই সকল ভবনের যেখানে বিচার অনুষ্ঠিত হইত উহাকে 'স্যাণ্টা ক্যাসা' আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে। গোয়ার স্যাণ্টাক্যাসার অভ্যন্তরে যে হৃৎকম্পকর ভয়াবহ ব্যাপার সম্পাদিত হইত তাহার বিবরণ 'ডেলন' নামক একজন ফরাসী লিপিবদ্ধ করিয়াছে।

১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে ডেলন ধর্ম্মবিরোধী বলিয়া ধৃত হয়। অপরাধীদিগকে শোভাযাত্রা সহকারে সেণ্ট ফ্রান্সিসের গীর্জ্জা পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়া প্রথা ছিল। এখানে বন্দী বা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের উপর ব্যবস্থিত শাস্তির বার্ত্তা বিঘো-

সিত হইত। সাধারণতঃ প্রায় সকলকেই পুড়াইয়া মারা হইত। গোয়ার প্রান্তবর্তী নদীতীরে শুষ্ক কাষ্ঠসমূহ সাজাইয়া রাখা হইত। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তথায় লইয়া গিয়া জীবন্তে সেই চিতায় চড়ান হইত। ডেলন কোন প্রকারে পলায়নে সমর্থ হন। তবে যথাসর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াই যাইতে হইয়াছিল। পরে তাঁহার উপর পাঁচ বৎসরের জন্য নির্ব্বাসনরূপ শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। এই পাঁচবৎসর তাঁহাকে 'গ্যালি স্লেভ' বা নৌবাহকের কার্য করিতে হইয়াছিল। বন্ধুবর্গের সাহায্যে ডেলন এই শাস্তি হইতেও অংশতঃ অব্যাহতি পান। পাঁচবৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই বন্ধুদের সহায়তায় তিনি জন্মভূমি ফ্রান্সে যাইতে সমর্থ হন।

যাহার কার্য্যাবলী কল্পনা করিতে রোমাঞ্চ সঞ্চারিত হয়, সেই স্যান্টা-ক্যাসার ধ্বংসাবশেষের ভিতর দিয়া আমরা চার্চ্চ অফ্ সেণ্ট ক্যাজেটানে গমন করিলাম। এখানকার কারুকার্য্য-কমনীয় সমুচ্চ অর্চ্চনাবেদী অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। এই বেদীর নিম্নদেশে অবস্থিত সোপান-শ্রেণী অবলম্বনে আগাইয়া যাইলে অতীতে হিন্দু নরনারীর দ্বারা ব্যবহৃত একটি প্রাক্তন স্নানস্থানে পৌছান যায়। খ্রীষ্টীয় উপাসনাগৃহের পার্শ্বে হিন্দু স্নানস্থান অনেককে বিস্মিত করিতে পারে। আলবুকার্ক হিন্দু ও খৃষ্টানদিগের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক প্রবর্ত্তিত করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। আকবর প্রভৃতি মোগল বাদশাহদিগের ন্যায় তিনি পর্ত্তুগীজ ও হিন্দু উভয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রবর্ত্তনে প্রযত্ন করেন বলিয়া জানা যায়।

গোয়া দূর অতীতে একটি হিন্দুতীর্থস্থান ছিল—তাহার প্রমাণ ভ্রমণ করিলেই পাওয়া যায়। বেটিম নামক স্থানে গমন করিলে কতিপয় প্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তি দেখা যায়। এইস্থানে ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে 'চার্চ্চ অফ্ দি ম্যাজাই'নামক গীর্জ্জা অতীতের বিঠোবা মন্দিরের ভিত্তির উপরেই প্রস্তুত হয়—এ বিষয়ে সংশয় নাই। ইহাই এই অঞ্চলের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গীর্জ্জা। বিজাপুরের সুলতানদিগের হস্ত হইতে এই রাজ্য জয় করিবার পর আলবুকার্ক এই স্থানেই সর্ব্বপ্রথমে উপস্থিত হন বলিয়া কথিত।

গোয়াকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করা হয়—"ভেলহাজকন কুইষ্টাস" বা প্রাচীন বিজিত রাজ্য এবং "নোভাজকন কুইষ্টাস" বা নবীন বিজিত রাজ্য। পুরাতন বিজিত অঞ্চল অপেক্ষা নূতন বিজিত অঞ্চল বনানী-বিমণ্ডিত ও পর্ব্বতবন্ধুর বলিয়া অধিকতর চিত্তাকর্ষক। আমরা একদিন এই অঞ্চলে ভ্রমণে গমন করিলাম। পশ্চিমঘাট পর্ব্বতশ্রেণী পর্য্যন্ত প্রসারিত এই অঞ্চলটি শিকারীদের স্বর্গ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

বাড়ীর খোঁজে

শ্রীগোপালদাস চৌধুরী

জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করায় কলিকাতা ছেড়ে সকলেই নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে ব্যস্ত। যাঁদের অর্থপ্রাচুর্য্য ছিল তাঁরা অনেকেই সাঁওতাল পরগণা, বীরভূম, মানভূম, ভাগলপুর, পাটনা, কাশী, এলাহাবাদ এমন কি সুদূর লক্ষ্ণৌ, কুমায়ুন, পাঞ্জাব প্রদেশে প্রবাস-বাসের জন্য ছুটেছেন। আর যাঁদের অর্থবল ছিল না তাঁরা বাধ্য হয়েই বাংলার পল্লী অঞ্চলকে চঞ্চল করে তুললেন। স্ত্রীর অসুখে মায়ের আদরের মতনই জাপানী-বোমার আশঙ্কায় আজ পল্লী-জননীর দরদ বেড়ে গেছে। দলে দলে লোক দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে ম্যালেরিয়া, মচ্ছলিস ও মিলিটারী—এই ত্রি-মকার-অধ্যুষিত পল্লীগ্রামে ছুটেছে। বাঙালী ভীতু এ-কথা আর বলবার যো নাই।

ব্ল্যাক্-আউটের মহড়া অনেক আগে থেকে চল্‌লেও এতদিন তাকে ব্রাউন-আউট বলেই উড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু সম্প্রতি যেরূপ দস্তুর মতন নিষ্প্রদীপ করা হয়েছে তাতে ব্ল্যাক্-আউট নামের সার্থকতা প্রকাশ পেয়েছে। পথচারীদের অতি ক্লেশে পা টিপে টিপে পথ চল্‌তে হয়, চিত্ত সদা সশঙ্কিত—কখন না জানি স্বচ্ছন্দ বিচরণকারী গো-মহিষাদি কিংবা আধমাতাল-চালিত ট্যাক্সি, বাস, মটরকার ঘাড়ের উপর এসে হুড়মুড় করে পড়ে। ভয়ে মন্থরগতি মন্থরতর হয়। আড়ষ্ট দেহমন আরো আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। তাতেও স্বস্তি নাই। এ. আর. পির তীব্র তাড়নায় তাড়িতালোকের ত' কথাই নাই, জোনাকীর জ্যেষ্ঠ হারিকেন আলোও অনুজ্জ্বল না করলে ধমকানি খেতে হয়। চল্‌তি জীবনযাত্রার বিশৃঙ্খলায় লোক উদ্বাস্তু হয়ে পঙ্গপালের মতন ঝাঁকে ঝাঁকে লাখে লাখে সহর ছেড়ে চলেছে। সহরের জনসমুদ্রে এমন এক-টানা ভাটি প্লেগের বার ছাড়া আর দেখা যায় নি। অজানা আতঙ্কে সকলেরই মন যেন দুরু দুরু করছে।

মৃদুলা তার ছেলেমেয়েদের নিরাপত্তার জন্য বড়ই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। সব দায়-দায়িত্বই যেন তার—বাপ যেন শুধুই ঢাকের বাঁয়া। আমার মটো ছিল ভবভূতির অনুভূতি—"সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্"। কাজেই আমার কোন কাজেই ব্যস্ততা ছিল না, কিন্তু মৃদুলা ঠিক আমার বিপরীত। বোমারু বিমানের প্রথম অভিযানের অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আনন্দানুভূতি সঞ্চয় না করে আমার এক পাও নড়বার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু মৃদুলার অতি ব্যস্ততায় তাহা সম্ভব হলো না। সহর ছেড়ে যাবার জন্য তীক্ষ্ণ কথার

ধারালো খাঁড়া উঁচিয়ে যতই সে আঘাত করতে চাইছিল আমাকে, আমিও নীরবতার ঢালে ততই আত্মরক্ষা করে চলছিলাম। কিন্তু সিঙ্গাপুরের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই ঢাল-খাঁড়ার অভিনয় শেষ হয়ে গেল—খাঁড়ার ধারে ও ভারে ঢাল টুকরা টুকরা হয়ে ভেঙ্গে পড়লো।

একদিন রবিবারের বৈকালে স্বর-মাধুর্য্যে ময়ূরের কেকাধ্বনিকে লজ্জা দিয়ে মৃদুলা গর্জ্জন করে উঠলো—বলি হাঁগা, তোমার আক্কেলটা কি শুনি? আমাদের বোমার পেটে না দিয়ে ছাড়বে না দেখ্‌ছি। সহর শুদ্ধ লোক পালাচ্ছে, আর তুমি বসে আছ কোন্ সাহসে বল তো!

সহাস্যে বল্‌লাম, "তোমার স্বামী" এই সাহসে। আগুনে যেন ঘি ঢেলে দিলাম। দপ্ করে জ্বলে উঠে বল্‌লে—আর দাঁত ছিরকুটে হাস্‌তে হবে না। বাইরে যাবে কি যাবে না তাই বল।

কি উত্তর দি! মালয়ের অবস্থাবিপর্য্যয়ে নিজেও ভড়কাইয়া না গিয়াছিলাম তা নয়। মৃদুলার কাছে নিজের দুর্ব্বলতা প্রকাশ করলে অধিকতর নিগ্রহ ভোগ ছাড়া বিশেষ কিছু লাভ হবে না। সহর ছেড়ে যাওয়ার মতলব ছিল না বলেই এতদিন বাইরে বাড়ীর খোঁজ-খবর করি নি। কাজটা নেহাৎই বেকুবি হয়েছে তাতে সন্দেহ নাই। তা বলে এখন ছোট্ বলতেই ত' আর ছুটতে পারি না। বাড়ীর খোঁজ করতে হবে ত'। আর বিদুরের ক্ষুদকণা যা-কিছু আছে তাও গোছগাছ করে রেখে যেতেও সময় চাই। তাই চতুর সেনাপতি সঙ্কটে পড়ে সুসময়ের আশায় প্রতিপক্ষের উপর যেমন ছলনা ও কৌশল বিস্তার করে, আমিও অনেকটা সেই ধরণেই মৃদুলাকে বল্‌লাম—যাব না বলছে কে? আগে পাঁজি পুঁথি দেখতে দাও। ঐ অ-দিন অ-ক্ষণে ত আর পা বাড়াতে পারবো না। আমার কথার মধ্যে তার পঞ্জিকা-প্রীতির ইঙ্গিত আছে সন্দেহ করে মৃদুলার ধৈর্য্য তাসের ঘরের মত একেবারে ভেঙ্গে পড়লো। দমের গদির উপর হতে একটা ভারী বস্তুর চাপ সরিয়ে নিলে সেটা যেমন তড়াক করে লাফিয়ে উঠে, সেও তেমনি হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠলো এবং তারছেঁড়া বাদ্যযন্ত্রের মত ঝঙ্কার দিয়া বল্‌লে—দিনক্ষেণ দেখি বলে কি আপৎকালেও দেখতে হবে! লোকে পালাবার সময় পাচ্ছে না—দিন আর ক্ষণে! আমি আর একদিনও থাকছি না। কালই তুফান মেলে ছেলেপুলে নিয়ে কাশী চলে যাব। থাক তুমি তোমার পাঁজিপুঁথি নিয়ে।

তিলার্দ্ধ দেরী না করে চল্লিশ মণ বোঝাই লরীর মতন বাড়ীঘর কাঁপিয়ে মৃদুলা কক্ষান্তরে গেল—রেখে গেল তার কথার ঝাঁঝটুকু ঘরময় ছড়িয়ে আমার মনকে দগ্ধ করতে। দাম্পত্য জীবনের পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতায় মৃদুলার স্বভাবটি আমার কাছে দিনের আলোর মতই স্পষ্ট ছিল। তার কথা বনাম কাজে কোন দিনই অসঙ্গতি দেখিনি। হক্ কথার না হলেও সে চিরদিনই এক কথার লোক। কাজেই তার এই প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসপূর্ণ চরম বাণীকে শুধু চিত্তবিক্ষোভের ক্ষণিক স্পন্দন মনে করতে পারলাম না। ভয় হলো—কথায় যা শাসিয়ে গেলো কাজেও বুঝি তাই করে বসে। আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মত হঠাৎ মনে পড়ে গেলো—মৃদুলা আর যাই হোক সে নরমের বাঘ নয়। অথই জলে ডুবে যেতে যেতে পায়ের তলায় মাটি পেলাম। মনে ক্ষীণ আশার সঞ্চার হ'ল। তখনি ছুটলাম তার সন্ধানে। স্তবে সদা-বিরূপ শনিঠাকুর পর্য্যন্ত তুষ্ট হন, মৃদুলার ত' কথাই নাই। বিনয়বাক্যের বহু বিনিয়োগে ভবিষ্যৎ শান্তির উদ্যোগাত্মক একটা সন্ধি স্থাপন করে সেই রাত্রেই থার্ম্মাস ফ্লাস্‌ক আর সুটকেস সম্বল করে হাওড়া ষ্টেশনের দিকে বেরিয়ে পড়লাম। বিদায় বেলায় মৃদুলার প্রসন্ন মুখ ও মন্দ-মধুর হাসিটি মেঘান্তরিত জ্যোৎস্নার মত আমার বিষন্ন মনে অপ্রত্যাশিত আনন্দ ঢেলে দিয়েছিল। তার উপর পথে বাহন পেয়েছিলাম ট্যাক্সি—। মনে হল একটা দমকা হাওয়ায় চেপে হাওড়ায় এসে হাজির হলাম।

ষ্টেশনের অবস্থা দেখে চক্ষু ত' আমার ছানাবড়া। কী জনতা আর কী হট্টগোল! এ কি ষ্টেশন না ঝটিকা-সংক্ষুব্ধ সমুদ্র। কুরুসৈন্য দর্শনে উত্তর গো-গৃহে বিরাট-নন্দন উত্তরের মত দশা হলো আমার। তৃতীয় পাণ্ডবের সাহায্য না পেলেও ঘণ্টা খানেকের অক্লান্ত চেষ্টায় একখানা মধ্যম শ্রেণীর টিকিট কিন্‌তে পেরে ঘাম দিয়া যেন জ্বর ছেড়ে গেল।

আমার ট্রেণ ছাড়তে বিলম্ব ছিল। তখনও পুরী এক্সপ্রেস ও দিল্লী এক্সপ্রেস্ ছাড়ে নি। এ-দু'টী গাড়ীর যাত্রীদের অবস্থা দেখে নিজের অবস্থা কি হবে সে চিন্তায় বুকটা কেঁপে উঠলো। দু'টী গাড়ীতেই লোক ঠাসা—তিল ধারণের জায়গা টুকুও ছিল না! প্ল্যাটফরমের উপর বিরাট জনতা—এ-যেন এক বিরাট মধুচক্র দৃঢ়সংবদ্ধ, গুঞ্জনরত ও তরঙ্গায়িত। অষ্টপাশী কলিকাতার বিরাট বাহুবেষ্টনের মোহ-পাশ হতে মুক্ত হয়ে চাকুরী, মজুরী, মিস্ত্রিগিরি ও ব্যবসা-বাণিজ্য ফেলে উড়িয়া, বাঙ্গালী, বেহারী, ভাটিয়া, পাঞ্জাবীরা অশেষ কষ্ট স্বীকার করে অসংখ্য গাঠরি বোচ্‌কা মোট-বিড়ার বিরাট বহর সঙ্গে নিয়ে মহা-কোলাহলে কোন আনন্দ-উৎসবে যোগ দিতে যেন চলেছে। যথাসময়ের যথেষ্ট পরে দু'টি ট্রেণই পর পর ছেড়ে গেলো। স্থানাভাবে বহু লোক উঠতে না পেরে পরবর্ত্তী স্পেশাল-এর প্রত্যাশায় প্ল্যাট্-ফরমে প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

আমার গাড়ী প্ল্যাটফরমে আসবার তখনও সময় হয় নি। তা হলে কি হয়, কম্পমান দেহে ও সশঙ্কচিত্তে চেয়ে দেখলাম প্রবেশপথের সম্মুখে এক বিশাল লোকারণ্য, তাদের মধ্যে অনবরত ধাক্কাধাক্কি, ঠেলাঠেলি, হাতাহাতি, গালাগালি চল্‌ছে—উচ্চ-নীচ শ্রেণীর মধ্যে বাছ-বিচার নাই—স্ত্রী-পুরুষ জ্ঞান নাই—কে কার আগে ঢুকবে তা নিয়েই হট্টগোল। এ-দিকে দ্বারী মহাশয় গাড়ী প্ল্যাটফরমে না আসিলে কাউকেও ছাড়ছেন না—জয়দ্রথের মত প্রবেশপথে পরাক্রম প্রকাশ করছেন। করলে কি হবে, বুদ্ধিমান্ যাত্রীদের মধ্যে কেহ কেহ এক অমোঘ উপায়ে পাশ-কাটিয়ে প্ল্যাটফরমে প্রবেশ করছিল। এতে জনতা আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল; কিন্তু তাতে আসে যায় কি? আমিও বেগতিক দেখে মহাজনদের পথই অনুসরণ করলাম। অবশ্য নিজের কাছেই বড় সঙ্কোচ বোধ হলো। কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করে দেখলাম আমার মত যারা সুশ্রীজনবিক্ষোভ্য সদুপায়ের সদ্ব্যবহার

করে আগে প্ল্যাটফরমে প্রবেশ করেছেন তাঁদের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। সিন্ধুর মধ্যে বিন্দুর মত আমি সেই জনসমুদ্রে মিশে গেলাম। সঙ্কোচের ভাবটা কেটে গেলো। দু'কাণ-কাটার মত স্বচ্ছন্দচিত্তে আমি প্লাটফরমে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ বাদেই দেখলাম আমাদের গাড়ীখানা ধীরে ধীরে প্ল্যাটফরমে আসছে। বাহিরে যাত্রিদের চীৎকার ও ধাক্কাধাক্কি ক্রমেই বেড়ে চলছিল। দ্বারী হঠাৎ দ্বার ছেড়ে দিলেন। জনসমুদ্র জোয়ারের বানের মত ঢেউ তুলে ভিতরে ঢুকে পড়লো। হঠাৎ প্ল্যাটফরমে ছুটোপাটি ও ছুটোছুটি পড়ে গেলো। যাঁরা আগে ঢুকেছিলেন এবং যাঁরা পরে ঢুকেছিলেন তাঁদের অনেকের মধ্যেই উল্লম্ফন-প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে গেছে। গাড়ীখানা তখনও স্থির হয়ে দাঁড়ায়নি। এরি মধ্যে যে যাকে পারছে ডিঙ্গাইয়া ঠেলে ঠুলে, কনুইয়ের গুঁতায় কাবু করে জানালা গলে কামরায় ঢুকে পড়ছে। যাঁরা বেশী চালাক, তাঁরা কিছু কিছু মাল-পত্রও তুলে ফেলছিলেন। এই নর-বানর-মনোবৃত্তি দেখে জীবশ্রেণীর উৎপত্তিতত্ত্বজ্ঞ চার্লস ডারউইনের বৈজ্ঞানিক বাণী মনের মধ্যে বিদ্যুৎস্ফুরণের মতই জ্বলে উঠে নিবে গেলো। যুবকদের ত কথাই নাই। আধবুড়াদের সে কি উল্লম্ফন উৎসাহ। এঁরাই আবার অন্য সময়ে একটু জোরে হাই তুললে বা হাঁচলে বুক-ধড়ফড়ানি, কোমর-কনকনানির জন্য ক্যাকটিনা পিল ও ওরিয়েণ্টাল বামের শরণ নিয়ে থাকেন। কিন্তু বিছানা বা ঐ রকমই যা হোক একটা কিছু বিছাইয়া দু'জনের জায়গা এক জনে দখল করবার সময় এঁদের মাংসপেশী সহসা অতিশয় দৃঢ় ও বলিষ্ঠ হয়ে উঠে। আমার মত যাঁরা বেকুব, তাঁরা বুদ্ধিমান্ যাত্রীদের কাছে একটু বসবার জায়গার জন্য কৃপাপ্রার্থী হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কেহ বা দয়া করে একটু নড়ে চড়ে বসবার ভাণ করে, জায়গা দিলাম এরূপ ভাব দেখিয়ে সহযাত্রীর কর্ত্তব্য শেষ করলেন। আর কেহ বা সত্য সত্যই একটু সরে বসে, মালপত্র একটু টেনে টুনে কিংবা স্ব লম্বিত শ্রীচরণযুগল একটু সঙ্কুচিত করে কোন রকমে একটু জায়গা করে দিয়ে অশেষ পুণ্যসঞ্চয়ও করলেন। অনেকেই স্থানাভাবে মালপত্রের উপর বসে কিংবা সোজা দাঁড়িয়ে যেতে বাধ্য হলেন। এমন কি, কয়েকজন মহিলাকেও এই দুর্ভোগ সহ্য করতে হলো। তাঁদের মধ্যে একজন আবার সবৎসা ছিলেন। ট্রামে ও বাসে স্থানাভাবে একটি ত্রয়োদশী কি চতুর্দ্দশীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে যারা "উঠুন, উঠুন" "মহিলাকে বসতে দিন" বলে পক্ককেশ বৃদ্ধদের পর্য্যন্ত আসনভ্রষ্ট করেন, তাঁরাই আবার ট্রেণের কামরায় প্রবেশ করে মেয়েদের ও মায়েদের অসুবিধা দেখেও দেখেন না।

গাড়ী ছাড়বার শেষ ঘণ্টা পড়তেই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটলো। কয়েকজন বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, মাড়োয়ারী প্রভৃতি হঠাৎ হুড়মুড় করে নেমে গেলেন ট্রেণ থেকে। পাশের ভদ্রলোকেরাও বেশ হাত-পা ছড়িয়ে সম্পূর্ণ স্থান দখল করে বসলেন। ব্যাপার বুঝতে বেশী বুদ্ধি খরচের প্রয়োজন হলো না। যাঁরা নেমে গেলেন তাঁরা সকলেই প্লাটফরম টিকেটের দৌলতে অনেক সাচ্চা যাত্রীর অসুবিধা করে নিজ নিজ আত্মীয়-বন্ধুদের সুবিধে করে করে দিয়ে গেলেন। আসল যাত্রীদের চেয়ে (তাহাদের) এই দরদী বন্ধুদের ঝাঁজ আরও বেশী।

বিরাট হট্টগোল। বহু হর্ষ-বিষাদের মধ্যে ট্রেণ ছেড়ে দিল। এবারও স্থানাভাবে বহুলোক পড়ে রইল। কিন্তু যাদের প্রতি ভাগ্য-দেবী হেসেছিলেন তাদের একজনের মুখ থেকেও পরিত্যক্ত যাত্রীদের দুঃখদুর্দ্দশার জন্য ক্ষুদ্র একটী "আহা" শব্দও বেরুল না। কি করে বেরুবে? দেখবার কি সময় ছিল কারো, পুরুষদের বেশীর ভাগই নিজেদের গাঁঠরী, বোঁচকা, বিছানাপত্র, বাক্স-পেটরা, ছাতি-লাঠি, হ্যাণ্ডিকেন ইত্যাদি গোণাগুণি করিতেছিলেন। সুবিধামত জায়গায় রাখবার জন্য অপরের মালপত্র টানাটানি ঠেলাঠেলি করছিলেন। ফলে অনেকের মধ্যেই বকাবকি না হলেও কথা কাটাকাটি বেশ চলছিল। মেয়েদের মধ্যে অনেকের হাতেই একটি করে ছোট সুটকেশ এত অসুবিধার মধ্যেও সেটি হাতছাড়া করে আরামে বসতে বা দাঁড়াতে রাজী নয়। কারো কারো হাতে পানের ডিবা, তার মধ্যে আবার wheel within wheels এর মত ছোট কৌটা—জর্দ্দা, দোক্তা, গুণ্ডীর গুদাম। গাড়ী ছেড়ে দিতেই তাঁদের মুখ খুলে গেলো—দোক্তা পানের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতীদের নিজ নিজ বাড়ীর শ্রীমানদের সঙ্গে বাগ-বিতণ্ডা বচসা চলছিল—তর্জ্জন-গর্জ্জন অশ্রু বিসর্জ্জনও না ছিল তা নয়। সাধারণের ব্যবহার্য্য যানে প্রকাশ্যভাবে একদিকে যেমন ঘর-গৃহস্থালীর অভাব-অভিযোগ মান-অভিমানের সবাক্ চিত্রের অভিনয় চলছিল আবার অপর দিকে একশ্রেণীর অতি-ভাষণপ্রিয় আরোহীরা পরস্পরের মধ্যে আলাপের আসর জমাইয়া জিহ্বার জড়তা ভেঙ্গে বাক্য-বাগীশত্বের পরিচয় দিচ্ছিলেন। তাঁরাই আলাপ করতে বেশী ব্যস্ত, যাঁরা আরামে শুয়ে বসে যাচ্ছিলেন। ঘুমের দফা সকলেরই রফা—কাজেই পান-বিড়ি-সিগার সিগারেট নস্য প্রভৃতি উপাদেয় বস্তুসমূহের হরদম শ্রাদ্ধ চলছিল। একজন পক্ককেশ বৃদ্ধ রসালাপশক্তির পরিচয় দিবার জন্যই যেন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন —মহাশয় এই সন্ন্যাসী বেশে কোথায় চলছেন? আমি বললাম—মধুপুরে। বৃদ্ধটি অধিকতর রসিকতার অভিপ্রায়ে পুনরায় মুখ খুললেন—মধুপুর! এই লোটা-কম্বল হাতে? আমি উত্তর দিবার আগেই অপর বেঞ্চি হতে একটী আকারে নবীন প্রকারে প্রবীণ যুবক গোপাল ভাঁড়ের বিখ্যাত দাঁতন গাছটির মতন একটী চুরুট ফুঁকতে ফুঁকতে বলে উঠলেন—লোটা কম্বলই বা কোথায় আর সন্ন্যাসীর বেশই বা কোথায় দেখলেন?

বৃদ্ধ মুখের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে হাসির রেখা টেনে বাধান হলেও মার্জ্জনাভাবে বাদামি রঙ্গের দন্তরাজি বের করে বললেন—আগেকার আমলের লোটা-কম্বল আর আধুনিক সুটকেশ ও ফ্ল্যাস্ক-এর মধ্যে কাজে কিছুই প্রভেদ নাই, যা প্রভেদ ঐ নামেই।

ইঁচড়ে পক্ক যুবক দমবার নয়—সে বললে—বেশ মশাই, তাই না হয় যেন হলো, কিন্তু সন্ন্যাসীর বেশ দেখলেন কোথায় ?

পরিণত পক্ক বৃদ্ধও হট্‌বার পাত্র নয়। হাসতে হাসতে বললেন—সে কি! এঁর সন্ন্যাসীর বেশ নয়! ইনিই সত্যিকারের সন্ন্যাসী। যাঁর সঙ্গে স্থাবর-জঙ্গম কোন লগেজ নাই—যিনি রিক্ত-বন্ধন, তিনি যদি সন্ন্যাসী নন, তবে কি আপনি আর আমি সন্ন্যাসী—যাদের সঙ্গে সচল অচল দু'রকম লট-বহরই রয়েছে। বৃদ্ধটির বাঁপাশে আধখানা ঘোমটা টেনে একটী কৃশাঙ্গী বৃদ্ধা ঈষৎ হাসছিলেন দেখে সকলেই তাঁকে বৃদ্ধের জঙ্গম লগেজ বুঝতে পেরে সশব্দে হেসে উঠলেন।' যুবক এতে আরো উত্তেজিত হয়ে বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলেন—ইনি যদি সন্ন্যাসী, গেরুয়া কোথায় ?

বৃদ্ধ বললেন শ্বেতাঙ্গ-শাসিত দেশ কি না, তাই গেরুয়া অচল হয়ে আসছে—গৃহী সন্ন্যাসীদের ত' কথাই নাই, ভেকধারীদের মধ্যেও অনেকে সাদারই ভক্ত।

অকালপক্ক যুবক বৃদ্ধকে বাগে পেল মনে করে সোৎসাহে বলে উঠলো—গৃহী-সন্ন্যাসী আবার কি মশাই ? - এ ত কথখনো শুনিনি। একি কাঁটালের আমসত্ব।

—বয়স ত বেশী নয়, আর এরই মধ্যে যখন চশমা পরছেন দৃষ্টিশক্তি নিশ্চয় দুর্ব্বল। আরো কিছুদিন গেলেই বুঝতে পারবেন কাঁঠালের আমসত্ব সংসারে না থাকলেও গৃহী সন্ন্যাসী বহু আছেন।

সকলে হেসে উঠে হাততালি দিয়ে বৃদ্ধের রসিকতাকে সরস করে তুলতেই ইঁচড়ে পাকা আসর জমাতে গিয়া "ফেল" করলে। আর টুপ্‌টুপে পাকা বুড় শির-পড়ুয়ারই মতো ট্রেণের এই বারো-ইয়ারী ক্লাসে প্রাধান্যের মৌরসী পাট্টা পেলেন। তিনি পরিতৃপ্তের ভঙ্গিতে আমার দিকে চেয়ে বললেন :—যাচ্ছেন ত মধুপুর। কিন্তু উদ্দেশ্য ?

বাড়ীর খোঁজে।

আমার উদ্দেশ্য শুনে সকলেই যেন অবাক্ হয়ে গেলেন। কামরায় মধুপুরযাত্রীও কয়েকজন ছিলেন। তাঁরা সমস্বরে জানিয়ে দিলেন কোন বাড়ীই খালি নাই সেখানে। হতাশ হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলাম—গিরিডিতে আছে কি? তথাকার যাত্রীরাও "নেতি" বাচক উত্তর দিয়ে দমিয়ে দিলেন। যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই বললেন, মিহিজাম হ'তে ঝাঁঝার মধ্যে কোথাও একটি বাড়ীও খালি নাই। মধুপুরের যাত্রীদের মধ্যে একজন স্বয়ম্ভিচ্ছু হয়ে বললেন, দেওঘর পাণ্ডাপাড়ায় খোঁজ করলে এখনও হয়ত দু' একখানা বাড়ী পেতে পারেন, বিলম্বে তাও পাবেন না। অনেকেই এঁর কথায় সায় দিলেন। আমিও মধুপুরের পরিবর্ত্তে দেওঘরে যাওয়াই স্থির করলাম।

ট্রেণ দু' ঘণ্টার উপর লেট্ ছিল। যশিডিতে গাড়ী বদলে প্রায় ১১টায় দেওঘরে নামলাম। অসময় হ'লেও পাণ্ডার অভাব ছিল না। সকলেই এক নিঃশ্বাসে বাড়ী-ঘর, গ্রাম, জিলা, ইষ্টি-গোত্র সকলের নাম জানতে চাইলো। জিলা ও গ্রামের নাম বলতেই একজন হৃষ্টপুষ্ট পাণ্ডা—পেটটি যেন পাঞ্চিং বল—আমাদের গ্রামের একজন ভট্‌চাজের নাম করতেই সংক্ষেপে পাণ্ডা পর্ব্ব শেষ করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা হ'লেও আমি বললাম, ভট্‌চাজ ম'শায় আমার দাদা হন। এতে অন্যান্য পাণ্ডারা স'রে পড়ল। আমি পুষ্ট পাণ্ডার হেপাজতে শিবগঙ্গার পারে এক গলির মধ্যে পাণ্ডার বাড়ীতে এসে উঠলাম।

দোতালা বাড়ী, অনেকগুলি ঘর এবং বেশ বড় বড়। প্রশস্ত ও লম্বা উঠানের এক পাশে দোতালায় উঠবার সিঁড়ির সম্মুখেই মস্ত-বড় ইন্দারা—পশ্চিমদেশীয়া কোন এক পুণ্যশীলার অর্থানুকূল্যে নির্ম্মিত। আর একপাশে একখানা টিনের চালা; তার একধারে অনেকগুলি পাতা-উনান যাত্রীদের রান্নাবান্নার জন্য। আর এক-ধারে চাকরের মারফতে চালিত পাণ্ডার দোকান। এখানে হাঁড়ি-পাতিল, চেলাকাঠ ইত্যাদি যাত্রীদের অবশ্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বাজার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চমূল্যে বিক্রি হয়। আমি ঘর দখল ক'রে পাণ্ডাকে পয়সা দিতেই চাকরে মাটির একটা ঘট ও এক কলসী জল দিয়া গেল। আমি প্রাতঃকালীন কৃত্যাদি অন্তে ঘরে এসে দেখি, আমার সন্ন্যাসীর অবস্থা দেখেই হয়ত পাণ্ডাঠাকুর একটা সতরঞ্চ ও বালিশ এনে বিশ্রামের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন। পাণ্ডা জিজ্ঞাসা করলেন—বাবুজি! শিবগঙ্গামে আস্নান হবে তো ? পূর্ব্বেই শিবগঙ্গার দর্শন সৌভাগ্য ক'রেছিল—তাই বললাম "না"।

তা বেশ, মার্জ্জন আস্নান ক'রেই বাবাকে দর্শন করবেন। পূজা না হয় কালই দিবেন। পাণ্ডাকে বুঝিয়ে বললাম—পূজা ও দর্শন দুইই কাল হবে। ক্ষিধে পেয়েছে বড্ড—এখন অগৌণে ডাল ভাতের যোগাড় চাই। হবে ত ?

টাকায় বাবুজি শেরকা দুধভি মিলে—আর ডাল-ভাত মিলবে না—ব'লে পাণ্ডাজী হেসে হাত পাতলেন। একটি টাকা দিতেই পাণ্ডা চ'লে গেলেন। পাণ্ডার হাতে একটী টাকা দিয়া আমি ইন্দারা-তলায় স্নানার্থী হ'লাম। কিন্তু, হ'লে কি হয়। স্নানের কোন সুবিধা দেখলাম না। বাড়ীটিতে স্থায়ী অস্থায়ী বহু লোক। স্নানের জন্য ঐ একটি ইন্দারাই সকলের সম্বল। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই স্নান করছিল কারো চোখেই লজ্জার পর্দ্দা ছিল না। বুড়া-বুড়ীরাই দেখলাম বেশী বেহায়া—তাদের ধারণা, লজ্জাটা যৌবনেরই ধর্ম্ম। বার্দ্ধক্যে তাহা সাপের খোলসেরই মত অকেজো। কোন রকমে স্নান সেরে উপরে গিয়ে পাণ্ডার প্রেরিত পেঁড়া আর দহিবড়ার সদ্ব্যবহার করে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘণ্টাখানেক বাদে পাণ্ডার লোক ডাল, ভাত, ভাজি ইত্যাদি নিয়ে হাজির হলো—খাদ্যের চেহারা দেখে খেতে আর ইচ্ছা হলো না। কিন্তু পেটে যে জঠরাগ্নি জ্বলছিল, তাতে না বসেও পারলাম না। খেয়ে কিন্তু খাদ্য সম্বন্ধে ধারণা বদলে গেলো—অতি উপাদেয় রান্না। অনেকেই হয়ত hunger is the best sauce বলবেন। আমার আপত্তি নাই—আহারে তৃপ্তি পেয়েছি ইহাই যথেষ্ট।

বিকালে পাণ্ডা একটা টাঙ্গা নিয়া আসতেই বাড়ীর খোঁজে

ছুটলাম। কার্সটেয়ার টাউন, উইলিয়ম্ টাউন, বম্পাস টাউন, বেলাবাগান, পুরাণন্দ মন্দন পাহাড়ের তল্লাট সবই তন্ন তন্ন করে খুঁজেও একটিও খালি বাড়ী পেলেম না। বাসায় ফিরতে রাত হ'ল ঢের। বাজারের পুরী তরকারী ও পাণ্ডার দেওয়া পেঁড়ায় ক্ষুন্নিবৃত্তি করে শুয়ে পড়া গেলো।

দুশ্চিন্তায় ভাল ঘুম হ'ল না—ভোর ভোর থাকতে উঠে হাত, মুখ ধুয়ে প্রাতর্ভ্রমণে বের হলাম। বেড়ান ও বাড়ীর খোঁজ করা এই দুই উদ্দেশ্যই ছিল। শিবগঙ্গার পশ্চিম পার দিয়া শ্মশান বাঁয়ে করে চলে হংসকূপ সম্মুখে রেখে ডাইনে ভেঙ্গে বিলাসী টাউনে এসে হাজির হলাম। তখন উষা ও অরুণ দুয়ের অবসান ঘটেছে—তরুণ তপন দেখা দিয়েছেন। দুই পাশে প্রত্যেক বাড়ীর দিকেই সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে চলেছি, যদি একখানি খালি বাড়ী পাই। কিন্তু কোন বাড়ীই লোকশূন্য কি "To Let" আঁটা দেখলাম না। মন ভারি দমে গেল—মৃদুলার গঞ্জনার ভয়ে আর নিজের দূরদৃষ্টি ও বিবেচনার অভাবে। হাঁটতে হাঁটতে শিব-গঙ্গার পূর্ব্বপারে এসে পড়েছি, সমুখেই একখানা চায়ের দোকান। লোক জমেছে দেখে আমিও এক পেয়ালার লোভে নড়বড়ে একটি বেঞ্চির এক প্রান্ত দখল করে বসলাম।

তখনও তৈরী হয়নি চা। চা-খোরেরা চুপচাপ বসে থাকতে পারে না, তারা আফিংখোরের গুরুভাই! গল্প-গুজব করা আর বাদসা-উজীর মারাই তাদের স্বভাব। এখানে কিন্তু তার ব্যতি-ক্রমই দেখলাম। একজন বক্তা, বাকী সবই মুগ্ধ শ্রোতা, শ্রীশ্রীচণ্ডীর আলোচনা হচ্ছিল। বক্তা একজন হৃষ্টপুষ্ট সদা-সহাস্যবদন দীর্ঘশিখাযুক্ত মধ্যবয়সী ব্রাহ্মণ। দেখলাম চণ্ডীখানা বেশ পড়া আছে এবং বাক্পটুতাও আছে। বক্তা আমাকে বসতে দেখে, একজন নূতন শ্রোতা পেয়ে যেন নূতন উৎসাহের সহিত বলে চললেন—হ্যাঁ, যা বলছিলাম, মহিষাসুর বলে সত্যই কোন অসুর ছিল না। শব্দটি হচ্ছে রূপক এবং মনুষ্যাসুরের অনুকল্প। আমরা মানুষমাত্রই এক একটি মহিষাসুর—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যের সমষ্টি। এই ভাবসমষ্টিকেই আবার আধারবস্তু হইতে আধেয় রূপে পৃথক্ করে দেখাবার ও বোঝাবার জন্য রক্তবীজ নাম দেওয়া হয়েছে। কারণ, রক্তে এদের জন্ম, পুষ্টি ও অস্তিত্ব। এদের রক্তের মধ্যে সহস্র সহস্র কাম ক্রোধাদি আসুরিক সত্তা রয়েছে—সুপ্ত বা অপ্রকট নয়—পূর্ণ জাগ্রত ও পূর্ণ-প্রকট। তাই রূপক-ছলে বলছেন—একবিন্দু রক্তপাতের সঙ্গে সঙ্গেই সহস্র সহস্র রক্তবীজের জন্ম। আর চণ্ড ও মুণ্ড বলে আপনারা যাদের জানেন, তারা আমাদের অহংজ্ঞান ছাড়া আর কিছুই নয়। সাহেবেরা যাকে Egoism বলেন—চণ্ড ও মুণ্ড হচ্ছে তারই প্রতীক।

কাম-ক্রোধাদিরই মত অহংজ্ঞানের জন্ম, বৃদ্ধি ও স্থিতিও আমাদের মর্ম্মে অর্থাৎ বক্ষঃস্থলে। তাই মহাশক্তি-রূপিণী, কালী-করালবদনী, খাণ্ডাখর্পরপ্রহরণধারিণী মা অসুরের যেখানে সেখানে আঘাত না করে কাম-ক্রোধ-অহংভাবাদির উৎপত্তিস্থল বুকে আঘাত করে বিনাশ করলেন। বেশ করে ভেবে দেখুন, এই অস্ত্র ও অস্ত্রাঘাত দুই-ই রূপক। অসি জ্ঞানের প্রতীক আর আঘাত জাগরণের প্রতীক। মানুষের মনে জ্ঞানের আলো জ্বেলে দিয়ে মা সমস্ত কাম ও কামনার বিনাশ করে দিলেন। অজ্ঞানের রাজ্যেই অসুরের বাস—জ্ঞানের রাজ্যে তার অস্তিত্ব নাই।

চণ্ডীতত্ত্বের এইপ্রকার অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ও ধর্ম্ম ও জ্ঞানের উন্নতিবিধায়ক উপদেশামৃত পান হয়ত আরো অনেকক্ষণ চলতো, কিন্তু চায়ের শুভাগমনে বক্তার চৈতন্য ফিরে এলো। বক্তা সর্ব্বাগ্রে হাত বাড়াইয়া এক কাপ গ্রহণ করলেন; অমৃতের লোভে দেবতাদের সমুদ্রমন্থনের মত চামচের সাহায্যে চায়ের সমুদ্রে তরঙ্গ তুলিতে তুলতে তিনি বলিলেন—দেখুন, এ-সব অতি দুরূহ তত্ত্ব, এক কথায় বোঝান যায় না—সময় ও সুযোগ-সাপেক্ষ। চণ্ডী সকলেই পড়ে কিন্তু বোঝে ক'জন।

সকলেই বক্তার পাণ্ডিত্য, গবেষণা, বাক্পটুতা এমন কি তাঁহার প্রচ্ছন্ন ঐশী-শক্তির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে চা-পান করতে লাগলেন। আমিও এক কাপ নিলাম। পান ত' দূরের কথা, চায়ের গন্ধেই আমার বুদ্ধি খুলে গেলো। মনে হ'ল—বাড়ীর সন্ধান যদি কেহ দিতে পারেন তবে এই চা-মজলিসের মেম্বরগণ। জিজ্ঞাসা মাত্রেই স্বয়ং বক্তা মহাশয়ই বলে উঠলেন:…বিলক্ষণ, বাড়ীর অভাব কি? আমারই একটি বাড়ী খালি আছে।

আমি যেন হাতে স্বর্গ পেলাম। বললাম—একবার দেখতে পারি কি?

বিলক্ষণ, কেন পারবেন না। চা-টা শেষ করে চলুন, এখুনি দেখাচ্ছি। ভাড়ার একটা আঁচ যদি আমাকে—কথাটা আমাকে আর শেষ করতে হলো না।

বিলক্ষণ, ভাড়ার কথাই ত আগেই হওয়া উচিত—বিশেষতঃ আজকালকার বাজারে। দেখছেন ত দশ টাকার বাড়ী চল্লিশ টাকায়ও পাওয়া যাচ্ছে না। আমার বাড়ীটা কোনদিনই খালি পড়ে থাকে না—কোন না কোন বন্ধু-বান্ধব স্বেচ্ছায় দখল করলে—ভাড়ার কোন কথাই উঠ্ত না। দশ পনের টাকা যে যা দিতেন হাসিমুখে হাত পেতে নিতাম; এবার সকলেই বাড়ীর জন্য লিখলেন—বাড়ী ত কুল্যে একখানি কিন্তু চিঠি এল একশ'খানা। সকলের আবদার রক্ষা করা ত সম্ভব নয়, তাই তাঁদের নিরস্ত করার জন্য বাড়ীভাড়া দশটাকার স্থলে আশী টাকা ধার্য্য করেছি। বাড়ী দেখে অপছন্দ হবে না—ছোট হলেও বেশ ছবিটীর মত সাজান-গোছান—বড় রাস্তার উপর। ফলফুলও যথেষ্ট হয়। হ্যাঁ, একটা কথা—আমার ঠাকুরসেবা আছে।—এই জন্যই ফল-ফুলের ব্যবস্থা। যেরূপ উৎসাহের সঙ্গে ধর্ম্মসুধা পান কচ্ছিলেন, আপনি কি আর ঠাকুরসেবায় না দিয়া নিজে ব্যবহার করবেন সে সব। না, মহাশয়, সে ভয় আমার নেই।

বাড়ীটা দেখে ত আমার চক্ষুস্থির। যতদূর ছোট ও জীর্ণ হতে হয় তাই। বহু ব্যয়সাধ্য অঙ্গরাগ না করে এ বাড়ীতে মৃদুলাকে এনে উঠালে সে নিশ্চয়ই রাগ করবে। দ্বিতীয় বাড়ীর অভাবে অপছন্দও করার যো নাই। ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়ার মত এ ক্ষেত্রেও পছন্দ-অপছন্দের প্রশ্ন উঠল না, ভাড়ার বৈধতা অবৈধতার কথাও উঠল না। যা হোক, এই দুর্দ্দিনে একটা বাড়ী যে পেলাম, এই পরম লাভ। বাড়ীর সংস্কার করে নিতে

পারলে অন্ততঃ মাথা গুঁজতে পারা যাবে—সে কাজটা নিজ ব্যয়ে করে নিতে হবে। কিন্তু বাড়ীর চেয়ে বাড়ীর মালিককে বেশী ভয়। আমার সামান্য বুদ্ধির কষ্টিপাথরে কষে যতদূর বুঝলাম তাতে তাকে কাট-খোট্টা বলেই ভয় হলো। আগে তাকে সংস্কার বা সৎকার করতে না পারলে আমার মাথা সুস্থ রাখতে পারব কিনা সন্দেহ। ভাড়া-বাড়ীর পাশেই তাঁর বাড়ী। যদি তিনি দয়া করে যখন-তখন পায়ের ধুলা দেন আর ততোধিক দয়া করে চণ্ডীর ব্যাখা করেন, তবেই ত গেছি। এক ভরসা—মৃদুলা দেবীর মৃদু ভাষণ। একবার তাঁর মধুরালাপের রসাস্বাদন করলে বক্তা মহাশয় হয়ত "শতহস্তেন বাজিবৎ" আমাদের সান্নিধ্য পরিত্যাগ করে চলবেন।

আপনারা শুনে খুসী হবেন—পরে কার্য্যতঃ তাহা সত্যে পর্য্যবসিত হয়েছিল। মৃদুলার রণচণ্ডী দাপটে বেচারা বাড়ীওয়ালাকে মহিষাসুরের মতই নিগ্রহ ভোগ করতে হয়েছিল। তারপর থেকে তিনি আর চণ্ডীতত্ত্বের ব্যাখা করেন নি।

ফতেহায়ে-দো-আজদাহাম

শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক

আরবের ঊষর মরুভূমি প্লাবিত করিয়া যে মহাপুরুষের দুর্ব্বার বাণী অধঃপতিত জগতের মানব-মনকে পূত সঞ্জীবনীধারায় নির্ম্মল ও সজীব করিয়াছিল, যে মহাপুরুষের ভাবধারার প্লাবন তার গতিরেখার আবেষ্টন শিক্ষা ও সাম্যে, সৌন্দর্য্যে ও সম্পদে, শক্তি ও ভক্তির গৌরবে ৬০ শতাব্দী ধরিয়া শোভিত করিয়াছিল, সেই মহাপুরুষের জন্ম ও তিরোধান দিবসে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া আমাদের জীবন প্রীতির মহামন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হউক।

"আল্ ইনসানু আখ্-ল্ ইনসানি হা'ববা আম্ কারিহা"—ভালবাসুক বা ঘৃণা করুক, সকল অবস্থাতেই মানুষ মানুষের ভাই।

"লা য়ুমিনু আহাদাকুম হাত্তা য়ুহি'ব্ব লি আখীহি মা য়ুহি'ব্ব লি নাফসিহি"—যে পর্য্যন্ত কেহ ভাইয়ের জন্য তাহা না ভালবাসিবে, যাহা সে নিজের জন্য ভালবাসে, সে পর্য্যন্ত সে ধর্ম্মবিশ্বাসী বা মুমিন হইবে না। সাম্যের এই উদার বাণী মানুষ যতদিন মনে-প্রাণে গ্রহণ না করিবে, ততদিন ভেদবুদ্ধিপ্রসূত ঘৃণার ও কলহের, মানুষে মানুষে স্বার্থ-সংঘাতের, রাজনৈতিক ও সামাজিক অপ্রাকৃত বৈষম্যের গ্লানিকর দুঃখ শেষ হইবে না। মানুষ ইহা ভুলিয়াছে বলিয়াই কবিকে আক্ষেপ করিতে হয়—

"What man has made of man!" সকল মানুষ সমান—কাহাকেও ঘৃণা করিও না। এই পরমপ্রীতি ও পারস্পারিক শ্রদ্ধা ব্যতীত সমাজ ও সভ্যতার কল্যাণ হইতে পারে না। কু-সংস্কার ও বৈষম্যের মরুরাজ্যে সাম্যের এই উদাত্ত বাণী মহাপুরুষ মহম্মদের কণ্ঠ হইতে বজ্র-নির্ঘোষে নিঃসৃত হইয়াছিল। সে বাণীর তরঙ্গ এখনও সঞ্চরমান। কিন্তু আমাদের ভক্তির aerial ভগ্ন, জ্ঞানবুদ্ধির battery নষ্টপ্রায়, তাই আমরা সে ভাবতরঙ্গ গ্রহণ করিতে ও প্রকাশ করিতে অক্ষম। দেহের বিকলযন্ত্রে বিকৃত ধ্বনিই শুধু উদ্গাত হয়—প্রীতির পরমসুর ঝঙ্কৃত হয় না।

যুগে যুগে মহাপুরুষগণ এই সাম্যের বাণী প্রচার করিয়া ভ্রান্তি-বিলাসী মানব-মনকে সতর্ক করিয়াছেন। মানুষ ভুলিয়া যায়। বিস্মৃতিই আনে অজ্ঞানতা ও বিভেদ! আনন্দময় জগতের মানুষ হইয়াও তাই আমরা অজ্ঞানতার অন্ধকারে এক হিংসাজর্জ্জরিত নারকীয় ভ্রান্তিস্থানের অভিশপ্ত অধিবাসী হইয়া আছি।

"মানব আপন সত্তা ব্যর্থ করিয়াছে দলে দলে,
বিধাতার সঙ্কল্পের নিত্যই করেছে বিপর্য্যয়
ইতিহাসময়।
সেই পাপে
আত্মহত্যা অভিশাপে
আপনার সাধিছে বিলয়।
হয়েছে নির্দ্দয়
আপন ভীষণশত্রু আপনার পরে।"

(রবীন্দ্রনাথ)

মহাপুরুষদের শিক্ষা আমরা ভুলিয়াছি। পরমপুরুষের আত্মীয়তা ভুলিয়াছি—তাঁহার প্রেরণা অজ্ঞানতার পুঞ্জীভূত জঞ্জালে মুহ্যমান আত্মজ্ঞানের শিক্ষাদীক্ষাহীন আত্মতৃপ্তি খুঁজিতে ছুটিয়াছি। ভোগদৃষ্টি স্বভাবতঃই খণ্ডদৃষ্টি। সমভোগবাদের হিংসা,-ভেদ ও স্থূলতা যতদিন আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীদ্বারা পরিশোধিত ও পবিত্রতর না হয়, ততদিন সাম্যের নামে স্বার্থসিদ্ধি, সভ্যতার নামে বর্ব্বরতা, স্বাধীনতার নামে দাসত্ব ও সত্যের নামে মিথ্যাই প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। আমরা ভুলিয়াছি যে, সর্ব্বভূতে আত্মজ্ঞান যার আছে, সেই অভেদী মহাপ্রাণই শ্রেষ্ঠ হিন্দু, শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ, শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব, শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ মুসলমান। আত্মতত্ত্বই আনে ঐক্যের সন্ধান এবং প্রীতিই হয় ব্রহ্মজ্ঞানের পরম পন্থা ও চরম প্রকাশ।

"তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্।
এতত্তো বেদ নিহিতং গুহায়াং
সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সোম্য।"

(মুণ্ডকোপনিষৎ)

অবিদ্যাগ্রন্থি ছেদন করিতে হইলে পরম অমৃত ও সর্ব্বস্বরূপ ব্রহ্মকে সকল প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত বলিয়া জানা চাই।

"অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মাঽস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্" (কঠোপনিষৎ)

এই জ্ঞানই আনিতে পারে সমভাব ও আনন্দ। আনন্দের আকরকে লাভ করিয়া সে আনন্দ উপভোগ করে—"স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধা।" এই ব্রহ্মজ্ঞান আনে সর্ব্বজীবে মৈত্রীভাব ও সাম্যভাব।

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাংজগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম।"
(ঈশোপনিষৎ)

মহাত্মা গান্ধী তাই বলেন—"As I have contended socialism, even communism is oxplicit in tho first verse of Ishopanishad."

সর্ব্বজীবে এই মৈত্রীভাবই বুদ্ধদেবের ব্রহ্ম বিহার। "মাতা যেমন প্রাণ দিয়াও আপন একমাত্র পুত্রকে রক্ষা করেন, এইরূপই সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি অপরিমাণ প্রেমভাব জন্মাইবে,—সর্ব্বলোকের প্রতি অপরিমাণ মৈত্রীভাব।" এই প্রেমভাবই আত্মজ্ঞানের ও ব্রহ্মজ্ঞানের কুসুমিত বিকাশ। ভালবাসুক বা ঘৃণা করুক মানুষ সকল অবস্থাতেই মানুষের ভাই। বিষ্ণু পুরাণে প্রহ্লাদের মুখেও আমরা ইহাই শুনি।

"বদ্ধ বৈরাণি ভূতানি দ্বেষং কুর্ব্বন্তি চেত্ততঃ
শোচ্যান্যহোঽতিমোহেন ব্যাপ্তানীতি মনীষিণা।"

শত্রুকেও দ্বেষ করা মোহেতে ব্যাপ্ত হওয়া। প্রহ্লাদই বলেন, "যখন জগন্ময় জগন্নাথ পরমাত্মা গোবিন্দ সর্ব্বভূতাত্মা, তখন আর শত্রু মিত্র কে? সকল মানুষকে না ভালবাসিলে, ভগবানকে ভালবাসা হইল না, আপনাকে ভালবাসা হইল না। "যতক্ষণ না বুঝিতে পারিব যে, সকল জনেতেই আমি, যতক্ষণ না বুঝিব যে সর্ব্বলোক আর আমাতে অভেদ, ততক্ষণ আমার জ্ঞান হয় নাই, ধর্ম্ম হয় নাই, প্রীতি হয় নাই।" (বঙ্কিমচন্দ্র—ধর্ম্মতত্ত্ব)।

গীতায় এই সাম্যের বাণী, প্রীতির বাণী, যোগের বাণী, নানারূপে নানাভাবে প্রকাশিত।

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শিনঃ॥
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥
(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—ধ্যানযোগ)

উপনিষদের "বিশ্বতঃ পরমং নিত্যং বিশ্বং নারায়ণম্ হরিম," শ্রীমদ্ভাগবতের "যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্॥

—বৈষ্ণবের প্রেমের বাণীতে ফুটিয়া উঠিল—
"ভক্ত আমা বান্ধিয়াছে হৃদয় কমলে।
যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা দেখয়ে আমারে॥
(চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যলীলা)

এই আত্মজ্ঞান ও প্রেম রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবশিব, জীবসেবা দেবসেবার কর্ম্মময় জীবনের মহামন্ত্রের উৎস।

"এবং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভক্তিরব্যভিচারিণী।
কর্ত্তব্যা পণ্ডিতৈর্জ্ঞাত্বা সর্ব্বভূতময়ং হরিং॥

—হরিকে সর্ব্বভূতে অবস্থিত জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তির সর্ব্বভূতের প্রতি অব্যভিচারিণী ভক্তি প্রয়োগ করা উচিত। জীবনের সর্ব্বপ্রধান কাম্য হইয়া উঠে—জীবনকে সর্ব্বভূতের সেবায় নিয়োগ করা। (ভক্তিযোগ বিবেকানন্দ) যিশুখৃষ্টের "Love thy neighbour as thyself"—এই সাম্য ও প্রীতিরই সহজ বাণী।

মহম্মদ সাম্যবাদের আচার্য্য—জাতি বা বর্ণ বিচার না করিয়া সকলের প্রতি সাম্যভাব প্রদর্শন ও ভ্রাতৃভাব পোষণেই ইসলামের মহৎ শিক্ষা। মুসলমান ধর্ম্মের এই সাম্য ও প্রীতির বাণী, এই জাতিভেদহীন জ্ঞানের বাণীই কবীর ও দাদূ প্রমুখ মধ্যযুগের ভারতীয় সাধকগণ প্রচার করিয়াছিলেন।

"অলহ রাম ছুটা ভ্রম মোরা
হিন্দু তুরক ভেদ কুছ নাহী
দেখৌ দর্শন তোরা।"

মহাত্মা গান্ধী এই সুরেই লিখিয়াছিলেন, "The forms are many but the informing spirit is one. How can there be room for distinctions of high and low where there is this all embracing fundamental unity underlying the outward diversity."

এই সমদৃষ্টি ও প্রীতির অভাবেই পৃথিবী যুদ্ধের হিংসাঘাতে ও বৈষম্যের কোলাহলে বিক্ষুব্ধ। মানুষের প্রয়োজন বোধ সকলকে গ্রহণ করিতে, মিলাইয়া তুলিতে অক্ষম। বর্ত্তমান সভ্যতার স্তূপীকৃত অক্ষমার আবর্জ্জনা দূর করিয়া জ্ঞানের আলোকে প্রীতির সম্মিলন যদি না ঘটে, তবে মানুষের বিপুল আয়োজন 'আত্মহত্যা অভিশাপে' ব্যর্থ হইতে থাকিবে আর মনুষ্যসমাজ সংঘাতবেদনায় দুঃসহ হইয়া উঠিবে। ভেদবুদ্ধির ভ্রম দূর করিয়া দিক সেই অমৃতবাণী—'আনলাম্ সও আসিয়াহ"—সকল মানুষ সমান। অবিদ্যা গ্রন্থিচ্ছেদনকারী জ্ঞানের আলোকে 'ভরম কী গাঠি' পার হইয়া মানুষ মানুষকে যেন 'নমো নারায়ণ" বলিয়া অভিবাদন করতে পারে।

"প্রাচীন ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, আমাদের দেশের নাম ছিল ভারতবর্ষ। যেদিন হইতে ভারতবাসী সম্যক্ ভাবে পতিত হইয়াছে, সেই দিন হইতে বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে এবং আমাদের দেশের নামকরণ হইয়াছে হিন্দুস্থান এবং আমরা পরপদানত ও পরাধীন হইয়াছি। 'হিন্দুস্থান' ও 'ইণ্ডিয়া' প্রভৃতি নামের সঙ্গে আমাদের পতনের স্মৃতি ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত। তাহা যত শীঘ্র মুছিয়া যায়, ততই মঙ্গলদায়ক নহে কি?"
—বঙ্গশ্রী, ভাদ্র—১৩৪৩

সৈনিক

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

(চতুর্থ পর্য্যায়)

সকালে আসিয়া বাহিরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া ডাকিল মকবুল আলী। তখনও ঘুমের জড়তা কাটে নাই। বেলা যে একেবারে কম হইয়াছিল, তাহা নয়। শরীরের স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিলে প্রতিদিন ইহার বহুপূর্ব্বেই শ্রীমন্ত উঠিয়া চাষীপাড়ার দিকে চলিয়া যায়। বাহিরে সূর্য্যতাপের দিকে চাহিয়া আজ নিজের মধ্যেই কিছুটা সঙ্কোচ বোধ হইল শ্রীমন্তের: কহিল, "কি খবর মকবুল ভাই, হঠাৎ—"

কথা শেষ করিতে হইল না। মকবুল আলী কহিল, "এক্ষুনি একবার আপনার না গেলি নয়, রায়বাবু। মজীদ মিঞার অবস্থা বড় সাঙ্ঘাতিক।"

"সে কি?" অবাক্ বিস্ময়ে কিছুক্ষণ একই দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া আহতকণ্ঠে শ্রীমন্ত কহিল, "দক্ষিণ পাড়ের মজীদ তো, কেন, কী হ'য়েছে তার?"

"এ-কথার আর কেন নেই রায়বাবু।" মকবুল আলী কহিল, "আমাদের মতো মানুষির যে কেমন ক'রে দিন চলে, আপনার মতো বিচক্ষণ ব্যক্তির কাছে তা তো অজানা নেই! হাটকেষ্টপুরের ন'বাবুর জমিতে কাজ করতো মজীদ। কর্ত্তা চক্ষু বুঁজে গেলেন চল্লিশ সনের ডিসিম্বর মাসে। গদিতে বসলেন তাঁর ছেলে এককড়ি বাবু। বলতে গেলে পাপ হয়, কিন্তু যেমন কড়া লোক তিনি, তেমনি অত্যাচারী। পোষাতে পারলো না তাঁর সাথে মজীদ। কাজ ছেড়ে দিয়ে বিঘে দু'এক জমি পত্তনি নিয়ে লাঙল ঠেললো। কিন্তু খোদার হিসেবে লেখা নেই, ঐ ক'রে পেট চ'ললো না। ঘরে একগুষ্টি ছেলেমেয়ে: বউটা ক'দিন ধ'রে ছেনা-কাপড় গিঁঠিয়ে গিঁঠিয়ে কোনরকমে গায়ে চেপে আছে! এও কি ছাই জানতে পারতাম। কাল সন্ধ্যায় যেয়ে দেখি, মজীদ খাস্ টানতি আছে। শুধুলাম—'হয়েছে কি?'—কিন্তু রা ক'রলো না। ব'ললাম, 'ব্যাপার সব খুলে বলো, নইলে বুঝবো কেমন ক'রে?' ব'ললো, 'চাল নেই, দু'দিন ধ'রে কয়েক মুঠ পচা চিঁড়া চিবিয়ে আছি, কিন্তু পেটের অবস্থা যা—আর বাঁচবো না।' ব'ললাম, 'বউটারই বা এ-অবস্থা কেন?' শুনে অতি কষ্টেও একবার হেসে উঠলো মজীদ, বললো, 'আজকাল তো আর দুনিয়ায় খোদার বিধান কিছু নেই ভাই, বিধান দিতিছেন সরকার। শাড়ীকাপড় ঘরে থাকলে তো প'রবে বউ! ঐ ত্যাকড়াটুকুই সম্বল।' শুনে আর কথা বলতি পারলাম না। এলাম আপনার কাছে, এসে দেখি ঘর বন্ধ। কিন্তু এখন না গেলি যে পরে যেয়ে আর মজীদকে দেখতি পাবেন না রায়বাবু! রাত থেকে বমি আর পাইখানা আরম্ভ হ'য়েছে। চীৎকার ক'রছে অনবরত পেটের যন্তরনায়।"

বিস্তৃত কাহিনী শুনিয়া মুখে এবারে আর কথা ফুটিল না শ্রীমন্তের। বহুক্ষণ ধরিয়া বজ্রাহতের মতো অপলক দৃষ্টিতে মকবুল আলীর মুখের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল। একটা অনস্বভূত বিক্ষুব্ধ বেদনায় সমস্ত হৃদয়খানি তাহার ভরিয়া গেল। প্রতিদিন সে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছে—পথে-প্রান্তরে, ঘরে-বাহিরে এখনও অশরীরী বেশে করাল দুর্ভিক্ষ মহা বুভুক্ষার মূর্ত্তিতে বিচরণ করিতেছে। অন্নের দেশে অন্নপূর্ণা উপবাসে ক্লিষ্টা, আর তাঁর সন্তানেরা নিষ্পিষ্ট কঙ্কালসার— এই আজ এই সোনার বাংলার রূপ!

মকবুল কহিল, "আর দেরী ক'রবেন না রায়বাবু।"

নিজের মধ্যে কিছুটা প্রকৃতিস্থ হইয়া লইল শ্রীমন্ত; তারপর একরকম উঠিতে উঠিতেই কহিল, "না আর দেরী নয়, চলো।"

আসিয়া দেখিল, ইতিমধ্যেই একেবারে অসাড় নিষ্পন্দ হইয়া গিয়াছে মজীদ মিঞা। বুকে মরা চামড়া ঠেলিয়া হাড় উঠিয়াছে, তাহারই নীচে মৃদু ধুকধুক করিতেছে হৃৎপিণ্ডটা। বাহিরের জগতের পঞ্চভূতে মিলাইয়া যাইবার জন্য অনবরত যেন সংগ্রাম করিতেছে হাড়ের সঙ্গে। একবার শেষবারের মতো ঈষৎ চক্ষু মেলিয়া তাকাইল মজীদ মিঞা; সেই অন্তিম দৃষ্টিতে কাহাকেও ঠিক চিনিয়া উঠিতে পারিল কি না—ঠিক বোঝা গেল না। অস্ফুটকণ্ঠে শুধু একবার কহিল, "দুনিয়ায় অন্যায়কারীদের কসুর তুমি কোনোদিন মাপ কোরো না খোদা।"—তারপরই চিরদিনের মতো কথা তার বন্ধ হইয়া গেল। অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও বেহেস্তে যাইবার আগে যেন মুহূর্ত্তকালের জন্যেই একটু উপশম পাইয়াছিল মজীদ। এ-ই হয়ত মানব-জীবনের প্রাকৃতিক ধারা।"

উচ্ছ্বসিত কান্নার চীৎকারে আছড়াইয়া পড়িল মজীদের স্ত্রী আর ছেলেমেয়েগুলি। বেদনায় দুঃখে শ্রীমন্ত আর মকবুল আলীও স্থির থাকিতে পারল না। সহসা অশ্রুভারে একবার চকচক করিয়া উঠিল তাহার চোখ। শ্রীমন্ত ভাবিল—নিঃসহায়, পরাধীনতার শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত বাঙালী এম্নি করিয়াই অন্নাভাবে বস্ত্রাভাবে দিনের পর দিন মরিতেছে। কর্ত্তৃপক্ষের পাকা চালে ভারত-শাসন অব্যাহত গতিতে চলিতে পারিলেই হইল, ব্যস; দেশের ক্ষুধাতৃষ্ণার বালাই লইয়া মাথা ঘামাইবার বড় একটা প্রয়োজন কি!

খড়ের ছোট্ট ছাউনি। কান্নায় ভরিয়া উঠিয়াছে ঘরখানি। মজীদের মৃত দেহটির দিকে কতক্ষণ যে নীরবে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল শ্রীমন্ত আর মকবুল আলী, বলা শক্ত। এই নগ্ন শাসনতান্ত্রিক সভ্যতার বিরুদ্ধে নালিশ জানাইয়া ওই মৃতদেহটির মধ্য হইতেই আর একবার যেন মজীদ কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "দুনিয়ার অন্যায়কারীদের কসুর তুমি কোনোদিন মাপ কোরো না খোদা।"—স্পষ্ট যেন এখনও মজীদের সেই কাতর স্বর শুনিতে পাইতেছে শ্রীমন্ত, অনবরত কেবল কানে বাজিতেছে কথাগুলি। মুক্তিপ্রয়াসী স্বাধীনচেতা ছিল মজীদ। একদিন তাই গোলামীর পরিবর্ত্তে নিজে স্বাধীনভাবে জমি পত্তনি নিয়া জীবিকার্জ্জনের পথ ধরিয়াছিল সে। কিন্তু ভাগ্যকে জয় করিয়া উঠিতে পারে নাই। তাই বলিয়া দারিদ্র্য কি কিছু একটা অপরাধের? মাঝখানে দীর্ঘদিন মজীদকে কাছে পায় নাই শ্রীমন্ত। কেন পায় নাই; সে-কথা অবান্তর। কিন্তু আজ এই মুহূর্ত্তে মনে হইতেছে,

তাহার শেষ নিঃশ্বাস ফেলিবার আগে অন্ততঃ আর একটিবারও যদি শ্রীমন্ত তাহাকে কাছে পাইত, তবে তাহাকে বুকে আলিঙ্গন করিয়া কহিত, "তোমার মধ্যে মুক্তির আগুন আছে মজীদ ভাই, তোমার মতো হাজার হাজার শহীদ পেলে আমি রাতারাতি এ-দেশকে স্বাধীন ক'রে ফেল্‌তে পারি। তুমি আমার অন্তরের অভিনন্দন গ্রহণ করো।"

সেই মুহূর্ত্তে মনের এই প্রদীপ্ত অবস্থার মধ্যে দাঁড়াইয়া আর একটি মৃত্যুনীল সময়ের কথাও বড় গভীর ভাবে মনে পড়িয়া গেল শ্রীমন্তের। এই মজীদেরই মতো আর একটি জীবনের সন্ধান পাইয়াছিল সে-দিন শ্রীমন্ত। ১৯৪৫-এর ১২ই নভেম্বর আজ। যে দুর্ভিক্ষ আজ পথের ধূলি-কাদায় বীজাণুর মতো মিশিয়া আছে, সেই দুর্ভিক্ষের ভৈরব নৃত্য চলিয়াছিল সে-দিন সমস্ত বাংলার বুকে। ১৯৪৩-এর সেই মন্বন্তর। পথে পথে এক ফোঁটা ফ্যান...এক মুঠো ভাতের জন্য মানুষের কাছে মানুষের কি বুকফাটা আবেদন! শ্মশানে শ্মশানে চিতার পর চিতা। বিপুলা এই বাংলার প্রাণসত্তা যেন সেই চিতাগর্ভে মিশিয়া যাইতে বসিল।

শ্রীমন্ত তখন অযোধ্যার চরে। নামে চর হইলেও আসলে গ্রাম। একসময় প্রকাণ্ড লাঠিয়াল ছিল এখানে অযোধ্যা সর্দ্দার। লাঠির মুখে দুই এক'শো লোকের দুর্ব্বৃত্ত-জনতাকে সে অনায়াসে ফিরাইয়া দিতে পারিত। সেই সর্দ্দারের স্মৃতিতীর্থ গ্রাম আজ এই অযোধ্যার চর। পাশাপাশি অনেকগুলি গৃহস্থবাড়ী। মাদার, বন ঝাউ আর ডুমুর গাছে ঘেরা গ্রামখানি। মাঝখানে কালভার্টের মতো কাঠ আর সিমেণ্টে মিলাইয়া ছোট্ট পুল। এদিক-টায় কিছু বনেদী পরিবার, ওদিকটায় কামার, কুমোর, তাঁতী, শীল আর কয়েকঘর রজক পরিবার। অযোধ্যা সর্দ্দার আজ আর না থাকিলেও তাহার নাতির ঘরের ছেলেপিলেরা এখনও পুলের ওদিকটার সমাজে পাকা মোড়লী করে। সারা গ্রামে এক লক্ষ্মণ সিকদারের খোলা ঝাঁপের নীচে কেরোসিনের দোকান, আর সত্যদাসের মুদীখানা। এই মুদীখানায়ই প্রথম আসিয়া বিশ্রাম নেয় শ্রীমন্ত। কিছুটা লেখাপড়া শিখিয়াছিল সত্যদাস। কী একটা বাংলা দৈনিক পত্রিকার সাপ্তাহিক সংস্করণ আসিত দোকানে। সেইদিকে দৃষ্টি পড়িতেই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে শ্রীমন্ত কহিল, "দেখি, দেখি।"

নতুন লোক, মার্জ্জিত দৃষ্টি। শ্রীমন্তের দিকে একবার দৃষ্টি ঘুরাইয়া লইয়া নীরবে তাহার দিকে কাগজখানি আগাইয়া দিল সত্যদাস।

নানা বিচিত্র ঘটনায় দুঃসহ...কণ্টকিত সংবাদগুলি।—দক্ষিণ-পূর্ব্ব রণাঙ্গণে নতুন রণসজ্জা, সর্টল্যাণ্ড দ্বীপে মার্কিন জঙ্গী বিমানের হানা, ভূমধ্য সাগরস্থিত ইতালীর দ্বীপ দখল,—রুশ সীমান্তে জার্ম্মানীর প্রধান ঘাঁটি ব্রিয়েনস্কের দিকে রুশসৈন্যের ক্রম অগ্রগতি, রেনডোভাতে জাপ জঙ্গী বিমান অধিকার, চীনের সালাউইন নদীর তীরে জাপ সৈন্যের অভিযান, ব্রহ্মের স্থল ও জল পথে বোমাবর্ষণ।—কিন্তু আরও বহুদূর আগাইয়া আসিয়াছে সেই বোমা: আসাম, আকিয়াব, চট্টগ্রাম, মণিপুর—সর্ব্বত্র ভীতত্রস্ত জনতা। কলিকাতার প্রাসাদ-প্রকোষ্ঠগুলির প্রতিটি ইঁট এখনও কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। কালো দাগ রাখিয়া গিয়াছে সেখানে জাপানীরা।

সত্যদাস কহিল, "মালপত্র ক'লকাতা থেকে শীগ্‌গির কিছু আস্‌বে তো এদিকে বাবু? দোকান যে বন্ধ ক'রবার অবস্থা হোলো।"

শ্রীমন্ত কহিল, "ট্রেণ কমিয়ে দিয়েছে, মালগাড়ী বন্ধ; ছিল না নৌকো সম্বল, তাও তো তোমরা রাখ্‌তে পারো নি, জাপানীদের ভয়ে সরকার লুটেপুটে নিল' নৌকোগুলো। মাল আস্‌বে কিসে বলো?"

মাথায় যেন বাজ ভাঙিয়া পড়িল সত্য দাসের। কহিল, "তবে চালাবো কি ক'রে? না খেয়ে যে ম'রতে হবে!"

ইতিমধ্যে লক্ষ্মণ সিকদার মাটির খেড়ো হাতে কি একটা সওদা করিতে আসিয়া সত্য দাসের কথার পৃষ্ঠে কহিল, "তুমি তো ম'রবে, আর আমি তো ম'রে গেছি ভাই। এক ফোঁটাও তেল নেই টিনে, সারা গাঁয়ের শিশি-বোতলগুলি এসে জ'মে আছে ঘরে। আমি তো ম'রেইছি, দুর্ভোগ পোয়াবে এবার গাঁয়ের লোকও। দিতে পারো দু' এক বোতল রেড়ি, পিদীম রাখ্‌তে পারি তবে ঘরে।"

শুনিয়া একবার কষ্টের হাসি হাসিল সত্য দাস, বলিল, "কুঁজো শোনে ঘোড়ার কথা। রেড়িই বা রাখতে পারলাম কই? দোকানে চাল নেই দু'মাস আগে থেকে, তারপর ফুরালো চিনি, আটা; এখন তো একেবারে নির্ব্বংশ হবার অবস্থা!"

ধীরে ধীরে ভাঁজ করিয়া রাখিল পত্রিকাখানি শ্রীমন্ত। সহসা একবার চোখে ভাসিয়া উঠিল তার নিজের গ্রামখানি—বারো-খাদা। সে-দিন বারোখাদায় সবেমাত্র দর বৃদ্ধির সূচনা দেখা গিয়াছিল চাউলের। আজ সেখানেও হয়ত চাউল একেবারেই উধাও।

অনুমানটা মিথ্যা নয়। সে-কথা পরে আসিবে।

লক্ষ্মণ সিকদার কহিল, "ভঞ্জ বাবুদের বাড়ীতে সকালে কে এক লোক এসেছেন ক'লকাতা থেকে। শুনলাম—পথে আর ভিখেরী ধরে না সেখানে।"

শুনিয়া সত্যদাস একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া গেল নিজের মধ্যে।

শ্রীমন্ত বলিল, "আজ আমরা সবাই ভিখিরী ভাই। শুধু ক'লকাতার খবরটাই ওই। তাড়াতাড়ি চোখে পড়ে ক'লকাতাকে, তাই—। নইলে, যদি ঘুরে ঘুরে দেখ্‌তে পারতে, তবে দেখ্‌তে—সারা বাংলা দেশের কোনো গ্রাম কোনো মহকুমা এই দুর্ভিক্ষ থেকে রেহাই পায় নি। তাই বলি, খুব হুঁসিয়ার।"

কিন্তু হুঁসিয়ার হইয়াই বা কাহার কি করিবার ক্ষমতা আছে আজ! অলক্ষ্য হইতে বিপুলশক্তি গলা টিপিয়া ধরিয়াছে সমস্ত দেশটার; শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে কাতর ক্রন্দন ভিন্ন আর কিছু কি শক্তি আছে আজ! রৌদ্রতাপে কঠিন চরের মতো খাঁ খাঁ করিতেছে মাঠগু'ল। ধানের বীজে গাছ গজায় না। এখানে ওখানে চুরি, ডাকাতি; ঘরে ঘরে রোগ।

দেখিতে দেখিতে ক্রমে তাহা ছড়াইয়া পড়িল। এতদিনে

প্রত্যক্ষভাবে দেখা দিল মন্বন্তর এই গ্রামেও। অনবরত এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি করিল শ্রীমন্ত।

হঠাৎ একদিন ভরা দুপুরে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল বিশীর্ণ একটি কঙ্কালসার লোক। সাথে তার ততোধিক বিশীর্ণ একটি আধবুড়ো গরু। কহিল, বাবুগো, তোমাকে ত তেমন চিনি না, তবু আমাকে রক্ষা কর্যে। গরুটা কিনে নিয়ে যা হয় ক'টা টাকা দাও। পেটের জ্বালা আর যে চেপে রাখ্‌তে পারি না।"

রীতিমত এবারে কান্না পাইল শ্রীমন্তের। কিছুক্ষণ মুদিত চক্ষে বসিয়া থাকিয়া পরে কহিল, "টাকা নিয়েই বা তুমি ক'রবে কি? জিনিষ কোথায়? গাঁ থেকে সব যে উধাও!"

লোকটি হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া গেল। শূন্য দৃষ্টি তুলিয়া ধরিয়া দূর আকাশে একবার যেন কি লক্ষ্য করিল। তারপর কতকটা অট্টহাসির মতই হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "তবে—তবে পারেন বাবু একটু বিষ দিতে, বিষ?"

"ছিঃ, জীবনটাকে এতও ছোট ভাবতে পারো?" শ্রীমন্ত আর নিষ্ক্রীয় থাকিতে পারিল না; কহিল, "এখানকার জমিদার ঐ ভঞ্জবাবুরাই তো?"

রুদ্ধশ্বাসে লোকটি কহিল, "আজ্ঞে হাঁ, গোলা ভর্ত্তি ওঁদের ধান। পাকা বাড়ীর ঐ পাকা দরজায় কেউ ঢুকতে পারে না!"

শ্রীমন্ত মুহূর্তে যেন কেমন কঠিন হইয়া উঠিল, বলিল, "কেন, তোমাদের মধ্যে কি এমন একটিও লোক নেই, যে ঐ দরজায় যেয়ে একবারও লাথি মারতে পারে?"

হঠাৎ যেন দীপ্তালোকে চকচক্ করিয়া উঠিল লোকটির চোখ দুইটি। বলিল, "আছে, আছে বাবু,—মহেন্দ্র সর্দ্দার। চিন্‌তে পারলেন না? অযোধ্যা সর্দ্দারের বংশধর। তিন ভাই ওরা, ওরা ছাড়া গাঁয়ে আর তেজী লোক একটিও নেই।"

কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিল শ্রীমন্ত, তারপর কহিল, "চলো, তার ওখানেই যাবো।"

কিন্তু বেশী দূর যাইতে হইল না। পথেই মহেন্দ্রের দেখা পাওয়া গেল। কোনো রকম ভূমিকার অবতারণা না করিয়াই শ্রীমন্ত কহিল, "সারা গ্রামের লোক আজ একসাথে ম'রতে ব'সেছে, তোমরা কাউকে বাঁচাতে পারো না?"

মহেন্দ্র কহিল, "যে অবস্থা, তাতে কারুর মাথায় লাঠি মেরে মাটির নিচে পুঁতে ফেল্‌তে পারি, কিন্তু বাঁচাবো কেমন ক'রে সারা গ্রামটাকে? সে ক্ষমতা তো দেব্‌তা দেন নি!"

"এতে কোনো খুন-খারাপির কথা আসচে না, মহেন্দ্র।" শ্রীমন্ত বলিল, "যেখানে দেখতে পাচ্ছ, লোকের মুখে ভাত জুটছে না, শ্মশান হ'তে চ'লেছে গ্রামটা, সেখানে কেউ যদি একমাত্র নিজেদের সুবিধের জন্যেই মণের পর মণ ধান-চাল আটকে রাখে, প্রয়োজন সেখানে—বুঝিয়ে হোক্, জোর ক'রে হোক্ সেই ধান-চাল জনসমাজের মধ্যে এনে বেঁটে দেওয়া! যার নামে এই গ্রামের পত্তন, সেই সর্দ্দারজীর শক্তি রয়েছে তোমাদের মধ্যে, সেই শক্তিকে ভুল পথে না খাটিয়ে বুদ্ধির পথে খাটাও। প্রয়োজন হ'লে জমিদার বাড়ী—"

কথা শেষ না করিতে দিয়াই মহেন্দ্র কহিল, "বলুন জ্বালিয়ে দিই।"

বাধা দিয়া শান্তকণ্ঠে শ্রীমন্ত কহিল, "এ-রকম উত্তেজিত হ'লে চ'লবে না। আগে তাঁদের কাছে আবেদন জানাও গ্রামের পক্ষ থেকে। যদি ফল কিছু না ফলে, তখন যা হয় ভেবে দেখ্‌বে—কি ক'রবে।"

"বেশ, তাই তবে দেখছি।" বলিয়া আর একমুহূর্ত্তও অপেক্ষা না করিয়া পিছনের পথ ধরিয়া হন্-হন্ করিয়া কোথায় আবার একদিকে অদৃশ্য হইয়া গেল মহেন্দ্র।

ধীরে ধীরে একসময় দুপুর গড়াইয়া বিকালের পর সারা গ্রামের বুকে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। এখানে-ওখানে ঝোপে-ঝাড়ে শৃগালের উচ্চ ডাক, পথচারী কুকুরগুলির বিচিত্র সুরে বিলাপ-কান্না। সারা গ্রামের বুকে জমাট কালো অন্ধকার। এক ফোঁটা তেল নাই গ্রামে। পথে দাঁড়াইয়া নিজেকেই ভাল করিয়া চেনা যায় না। দোকানের ঝাঁপে তালা আঁটিয়া সত্যদাস বিমর্ষ মুখে সামনের মাটিতে বসিয়া আছে; লক্ষ্মণ শিকদার ঝাঁপ খুলিয়াই ভাঙা একটা লম্বা কাঠের বাক্সের উপরে মাদুর বিছাইয়া কাৎ হইয়া পড়িয়া আছে। দূর হইতে ভঞ্জ বাবুদের দ্বিতলের ঘরে তখন আলো দেখা যায়: কেরোসিনের নয়, গ্যাসের। সহরের সাথে লেন-দেন তাঁহাদের সব সময়েব। নতুন অতিথিকে লইয়া তাঁহারা তখন মুখর হইয়া উঠিয়াছেন। অলক্ষ্যে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল শ্রীমন্ত। অন্ধকারের বুক ঠেলিয়া অনবরত সে সারা গ্রামটিকে প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়াছে। ক্ষুধাক্লিষ্ট বাংলার সত্যকার রূপটি প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার ব্যথাকাতর দুই চোখে আসিয়া বিঁধিতে লাগিল।

হঠাৎ এক সময় সামনের পথে কোথায় আসিয়া দিক হারাইয়া ফেলিল শ্রীমন্ত। কাছেই জলার মত কি একটা বোধ হইল। গ্রামের একেবারে নিবিড়তর শেষপ্রান্ত এটা। অন্ধকারে স্পষ্ট কিছু বোঝা যায় না। সেই অন্ধকারের মধ্যেই সহসা কোন্ একটি নারী-কণ্ঠের শব্দ শুনিয়া বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতোই শিহরিয়া উঠিল শ্রীমন্ত।

আরও কাছে আসিয়া শব্দ হইল: 'শুন্‌তে পাচ্ছেন?"

"কে?" থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল শ্রীমন্ত।

এবারে একেবারেই যেন কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল মহিলাটি। শ্রীমন্ত স্পষ্ট যেন তার উষ্ণ নিঃশ্বাস বোধ করিয়াই একরকম কিছুটা পিছনে সরিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করিল; কিন্তু পারিল না! মহিলাটিও আরও খানিকটা আগাইয়া আসিল, কহিল, "শেয়াল-কুকুর বা ভূত-প্রেত নই যে, এই অন্ধকারেও হঠাৎ স্বরূপ দেখে ভয় পেয়ে যাবেন! অন্ধকারই তো আজ আমাদের জীবনের পরম আশীর্ব্বাদ। দিনের বেলা সমাজ আছে, রাত্রে সে বালাই নেই। দেখ্‌তে পাচ্ছেন না, ভদ্র ঘরের একটু ছাপ আছে চেহারায়, কিন্তু সে পরিচয় দেবো না। শুধু একটু দয়া করুন, দারুণ অভাবের তাড়নায় আজ এই পথে এসে দাঁড়িয়েছি; কোথা থেকে যে এসেছি—তা নাই বা শুনলেন। কে যেন আমাকে এই পথে নিয়ে এসেছিল, কিন্তু সেও আর নেই। একে-

যাবে নিঃস্ব এখন। আপনি তো ভদ্রলোক, আপনি কি পারেন না আমাকে বাঁচাতে?" অনবরতঃ জোরে জোরে শ্বাস টানিতে লাগিল মহিলাটি।

শ্রীমন্তের মনে হইল, পায়ের নিচে হইতে মাটি যেন অনন্ত পাতালে মিশিয়া যাইতেছে। নিবিড় অন্ধকারের মধ্যেও একবার দৃঢ় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দেখিল—সত্যিই যেন মহিলাটির সর্ব্বাঙ্গে একটা আভিজাত্যের ছাপ আছে। সুন্দর সুশ্রী চেহারা। কহিল, "কোথায় আপনাকে আশ্রয় দিতে পারি বলুন? ঘরে ঘরে এখানে আজ মড়ক, তা ছাড়া নিজেরই যে আমার যায়গা নেই কোথাও। বরঞ্চ আপনার বাড়ী কোথায় বলুন, চেষ্টা করি পৌঁছে দিয়ে আসতে।"

কিন্তু মহিলাটি সে-কথায় আদৌ কর্ণপাত করিল না। সহসা শ্রীমন্তের একখানি হাত সজোরে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "মাথা গুঁজবার মতো একটা আস্তানা ছিল বটে, কিন্তু সেখানে আর ফিরে যাবার পথ নেই। এই পথেই আমাকে বাঁচতে হবে; বাঁচান আমাকে। যদি পারি, অন্ততঃ এতটুকুও প্রতিদান দিতে চেষ্টা ক'রবো।" কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ যেন কাঁপিয়া উঠিল মহিলাটির।

সাধক বিপ্লবী শ্রীমন্ত; কিছুক্ষণ নিজের মধ্যে কি চিন্তা করিল, তারপর কহিল, "অভাবের দুয়ারে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখতেও জানেন দেখ্‌চি। প্রতিদানই যদি দিতে পারবেন, তবে আপনার তেমন নিঃস্বতাই বা কোথায়? কি প্রতিদান আপনি দিতে পারেন?"

"কেন, বিশ্বাস হয় না?" মহিলাটি একরকম উচ্ছ্বসিত কণ্ঠেই বলিল, "সব চেয়ে বড় যে-বস্তু নারী দিতে পারে পুরুষকে, জীবনের বিনিময়ে সেই প্রতিদান কি এতই তুচ্ছ? এই দেহ, এটা কি কিছুই নয়?"—একরকম অতর্কিতেই মহিলাটি সহসা শ্রীমন্তের হাতখানি সজোরে টানিয়া আনিয়া নিজের অর্দ্ধ অনাবৃত বুকখানির মধ্যে চাপিয়া ধরিল।

কিন্তু আর একমুহূর্ত্তও বিলম্ব নয়, বিদ্যুৎগতিতেই একরকম নিজের হাতখানিকে সেই মুহূর্ত্তেই মুক্ত করিয়া নিয়া রাগে, দুঃখে, অবমাননায় শ্রীমন্ত নিজের মধ্যে রীতিমত জ্বলিয়া পুড়িতে লাগিল। কহিল, "ছিঃ, এই আপনার প্রতিদানের নমুনা, এই আপনার আভিজাত্যের ছাপ? এত নীচ আপনি?" সমস্ত শরীরটা যেন অনবরতঃ কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল শ্রীমন্তের।

কিন্তু মহিলাটি এতটুকুও দমিল না; কহিল, "দারিদ্র্য এমনি ক'রেই মানুষকে নীচ করে। মানুষের কাছে আবেদন ক'রে যখন আশ্রয় মেলে না, তখন নারীর আর দ্বিতীয় পথ নেই এ ছাড়া। আপনার মধ্যে যে ব্রহ্মচারী ব্যক্তিটি আছেন, তাকে আমার নমস্কার।" বিচিত্র কায়দায় একবার কপালের দিকে যুক্ত হাত তুলিল মহিলাটি, তারপর পুনরায় কহিল, "কিন্তু জেনে রাখুন, এরপরও আশ্রয় আছে, সে ঐ জলার শীতল জল। সমস্ত নীচতা, পাপ ওতেই ধুয়ে নিতে পারবো।"—ধীরে ধীরে কোথায় যেন অন্ধকারের মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া গেল মহিলাটি।

বহুক্ষণের মধ্যে কিছু একটা যেন আর ভাবিয়া উঠিতে পারিল না শ্রীমন্ত। যখন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল, মনে হইল—এই দুঃস্থ নিপীড়িত সমাজ আজ কোথায় দাঁড়াইয়া আছে? দিনে দিনে মেরুদণ্ড ভাঙিয়া পড়িতেছে সমাজের, আর সেই গুচ্ছ-গুচ্ছ প্রাণ-পরিত্যক্ত হাড়ে চাষের সার প্রস্তুত হইয়া চলিয়াছে ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া আর বৃটেনের খণ্ড খণ্ড কৃষি-প্রতিষ্ঠানে।... কিন্তু মহিলাটি? অন্ধকারের নিভৃতে তবে কি সত্যিই সে আত্মহত্যা করিবে? তার কি আর-কোন পথ ছিল না? আর কোনো পথ সত্যিই কি তবে নাই? এমন সব নারীকে উদ্দেশ করিয়াই তো মহাত্মাজী বলিয়াছেন: 'সংসারে সমাজে যাদের স্থান নেই, দুর্ব্বৃত্ত স্বামী আর অত্যাচারী মানুষের দ্বারা যে সব নারী লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত, তারা এস, হাতে তুলে নাও চরকা, নির্ভয়ে যোগ দাও সত্যাগ্রহে। কার সাধ্য তোমাদের নারীত্বকে ক'রতে পারে অবমাননা, ক'রতে পারে ক্ষুণ্ণ আর অমর্য্যাদা?'—এম্‌নিতর ভাগ্যের স্রোতেই যদি ভাসিয়া গিয়াছিল মহিলাটি, তবে—তবে সেও কি পারিত না এই গণআন্দোলনে যোগ দিতে? আরও কিছুটা আগাইয়া গেল শ্রীমন্ত। কিন্তু মহিলাটির আর সন্ধান মিলিলনা। জলার জলে তখনও প্রশান্ত নিস্তব্ধতা। অন্ধকারে আদৌ কিছু পরিষ্কার বোঝা যায় না। আকস্মিক কোনো কিছু একটা শব্দ শুনিবার আশঙ্কায় একবার সচেতন হইয়া দাঁড়াইল শ্রীমন্ত, তারপর একসময় আঁকাবাঁকা পথের মধ্যে সেও কোথায় একদিকে মিশিয়া গেল।

ভোর হইতেই খবর আসিল—ভদ্র বাবুদের সাথে মহেন্দ্র সর্দ্দারের খুব একপশলা কুরুক্ষেত্র হইয়া গিয়াছে: ভদ্রবাবুরা স্পষ্ট নাকি বলিয়াছেন: "ভগবান মানুষকে মারবেন, তা—আমরা কি করতে পারি? যে যার নিজের পথ দেখুক। কেউ কারুর জন্যে দুনিয়ার অন্নসত্র খুলে ব'সে থাকে না।"

প্রত্যুত্তরে মহেন্দ্র সর্দ্দার জোরগলায় বলিয়া আসিয়াছে, "ভগবানের দোহাই দিয়ে আপনারা পাপ ঢাকবেন, আজ আর তা' হ'তে দেবো না। সব থেকে দান বের করুন। সবাই মিলে একসাথে খেয়ে যে ক'দিন বাঁচতে পারি বাঁচবো, আর নিদেন যদি প্রতিবাদ করেন, যদি খাবেরর লোক আজ আপনাদের ভরি-ভোজনের সামনে না খেতে পেয়ে ম'রে যায়, তবে জানবেন—ম'রতে আর আপনাদেরও বেশী বাকী নেই। এক বেলা মাত্র সময় দিচ্ছি, ভেবে কাজ ক'রবেন।"

শুনিয়া শ্রীমন্ত কহিল, "সাবাস সর্দ্দার ভাই, সাবাস্। তুমিই ভাই পারবে তোমা। এই গ্রামকে বাঁচাতে।" তারপর থামিয়া কহিল, "কিন্তু এ সময়ে আরও কাজ আছে। কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহ ক'রে আজই জনকয়েক লোক নিয়ে একবার সহর ঘুরে এস; ধানের পরিবর্ত্তে সরকার বরাদ্দ ক'রেছেন 'জোয়ার' আর 'বজ্‌রা'র। যা পারো আর যে ক'রে হোক সংগ্রহ ক'রে ফিরবে।"

হাতের পেশীতে অনবদমিত শক্তি যেমন অপরিমেয়, মহেন্দ্র সর্দ্দারের হৃদয়-বৃত্তিও তেমনি অন্তঃসলিল...দুর্ব্বার। বিন্দুমাত্র আর দেরী না করিয়া তৎক্ষণাৎ সে লোকজন সহ সহরের দিকে ছুটিল।

কিন্তু ফল যে খুব বেশী একটা কিছু ফলিল, এমন নয়। সহরেও হাহাকার উঠিয়াছে, দোকানে দোকানে সার-বন্দী হইয়া দাঁড়াইয়াছে জনতা; কাহারও ভাগ্যে কিছু বা জুটিতেছে, কাহারও ভাগ্যে বা নয়।

রক্ষা পাইল না অযোধ্যার চর। ভঞ্জবাবুদের ধানের গোলা নিঃশেষ হইয়া গেল। কতক লোক গ্রাম ছাড়িয়া পলাইল, কতক তিলে তিলে ধুঁকিয়া মরিল। তারপর আসিল সংক্রামক ব্যাধি—ওলাউঠা। ঘরে ঘরে কান্না। ঘরে ঘরে মৃত্যু। শূন্য গৃহে স্বামীর মৃতদেহ বুকে জড়াইয়া পাথর হইয়া গেল আশ্রয়হীনা স্ত্রী, সন্তানকে হারাইয়া একা ঘরে বুক ভাঙিল কত মা, কত স্বামী স্ত্রী-পুত্রের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লুটিয়া অট্টহাসি হাসিল, তারপর কণ্ঠনালীতে নির্ব্বিবাদে পূরিয়া দিল তরল—উগ্র বিষ। এই মহামৃত্যু-যজ্ঞে সেদিনের সেই মহিলাটি কোথায় যে কবে কোন্ বিস্মৃতির গর্ভে লীন হইয়া গিয়াছে, শ্রীমন্তও তাহা ভাবিবার অবকাশ পাইল না। কিন্তু শক্তিব্যয়ে এতটুকুও কার্পণ্য করে নাই মহেন্দ্র সর্দ্দার। চিরদিনের মতো শ্রীমন্তের মনে অবিস্মরণীয় হইয়া রহিল মহেন্দ্র সর্দ্দার। এদেরই উর্দ্ধতন পুরুষ হইবার উপযুক্ত বটে অযোধ্যা। তাহারই নামকরণে গ্রাম, সার্থক এই সর্দ্দার-বংশ।

মজীদ মিঞার মৃতদেহের সামনে অশ্রুকাতর দৃষ্টিতে স্থাণুর মতো দাঁড়াইয়া থাকিতে যাইয়া এই মুহূর্ত্তে শ্রীমন্তের আজ আর একবার মনে পড়িল মহেন্দ্র সর্দ্দারকে। দুইজনের মধ্যেই শ্রীমন্ত খুঁজিয়া পাইয়াছে এক বিচিত্র বিদ্রোহীর সুর। বিপ্লবী-জীবনে দুই জনেই অনন্তকালের জন্য গাঁথা হইয়া রহিল শ্রীমন্তের মনে।

১৯৪৫-এর এই চলাপথ। এখনও মাটির প্রতিটি বিন্দুতে, প্রতিটি ধূলিকণা আর দুর্ব্বাদলে সেই মৃত জীবনগুলির শেষ নিঃশ্বাস মিশিয়া আছে। এখনও দারিদ্র্যে, বুভুক্ষায়, অনাহারে এমনিতরই কত মজীদ নীরবে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছে। আর একটা ভাবী দুর্ভিক্ষেরই পূর্ব্বাভাস নয় কি? এখনও কি মানুষ বৈষম্যমূলক এই প্রচলিত সমাজব্যবস্থা আর ভেদনীতিমূলক এই সরকারী দণ্ডনীতিকে একমাত্র ভগবানের বিধান মনে করিয়াই নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিবে? প্রতিবাদের সুরে এখনও কি মানুষ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে না?

পথে আসিয়া শ্রীমন্ত কহিল,—"এই দৃশ্য দেখাতেই কি তুমি আমাকে ডেকে এনেছিলে, মকবুল ভাই?

"মুখ্যু লোক আমরা, রায়বাবু।" মকবুল আলী কহিল, "গরীব চাষীদের দিকে মহাজনেরা ত কখনো ফিরে চান না। আপনি স্নেহ করেন, আশার কথা···বাঁচবার কথা—তা যে একমাত্র আপনার মুখেই শুনিছি। দুঃখের দিনে, বিপদের দিনে আপনার কাছেই তো তাই এসে দাঁড়াই।" তারপর থামিয়া পুনরায় কহিল, "আজ মনে হতিছে, দুর্ভিক্ষের বছর আপনাকে যদি কাছে পেতাম, তবে আমাদের আর এতটুকুও দুঃখ থাকতো না। আজ মজীদ মরলো, এইরকম তিপান্ন জন ম'রেছে তৃতীয় সনে। সে-দিরিশ্য চোখে দেখার নয়, রায় বাবু।"

চন্দ্রমুগরিয়ার বুকে সেই মৃত্যু-মহোৎসব দেখিবার মত অবশ্য সুযোগ ও দুর্ভাগ্য হয় নাই বটে সেদিন শ্রীমন্তের, কিন্তু যে-দৃশ্য সে স্বচক্ষে দেখিয়াছে সেদিন অযোধ্যার চরে, তাহার উপরে ভিত্তি করিয়া এখানকার অবস্থাটাও অনুমান করিয়া নিতে এতটুকুও বেগ পাইতে হইল না শ্রীমন্তের। যখন সে প্রথম এখানে আসিল, দেখিল—নতুন নিড়ানী আরম্ভ হইয়াছে, নতুন ঋতুতে মই পড়িয়াছে সবে মাঠে মাঠে। চেষ্টা করিয়া মিশিতে সুরু করিল শ্রীমন্ত চাষীদের সঙ্গে। নতুন পরিচয়ের মুখে প্রথমটা অবাক বিস্ময়ে হাঁ করিয়া থাকিল এই মকবুল আলী—মজীদ মিঞার মত সমস্ত চাষীরা, বলিল, "বেয়াদপী মাপ ক'রবেন কত্তা, এমন ক'রে যদি কাছে এলেন, কি ব'লে আপনাকে ডাকি, একবার মেহেরবাণী ক'রে ব'লে দিন। আমরা আপনার পায়ের নফর হ'য়ে থাকবো।" নামের আদি ভাগটা একরকম প্রয়োজনের খাতিরেই চাপিয়া গিয়া শ্রীমন্ত সেদিন বলিয়াছিল, "ইচ্ছে হোলে আমাকে 'রায় বাবু' ব'লেই ডাকতে পারো। কিন্তু ডাকার প্রশ্ন পরে; আগে নিজেদের অধিকার বুঝতে শেখো, সমাজে আগে নিজেদের দাবী প্রতিষ্ঠা করো।"

শুধু চাষীরা নয়, সেই হইতে পাট গুদামের বাবুরা—এমনকি কুলীরা ইস্তক শ্রীমন্তকে বিশেষভাবে 'রায়বাবু' বলিয়াই চেনে, যত্ন করে, খাতির করে।

কথা শেষ করিয়া কিছু একটা জবাবের প্রত্যাশায় অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল মকবুল আলী শ্রীমন্তের মুখের পানে।

কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিয়া শ্রীমন্ত কহিল, "তোমরা যে আমার কতখানি, সে কথা কি আজ আবার নতুন ক'রে বলতে হবে, মকবুল ভাই? আর দুর্ভিক্ষের কথা বলছো? সেদিন যদি কাছে থাকতুম, তবু দুর্ভিক্ষের ফল ঠিক অমনিই হোতো। যারা ম'রেছে, তারা ম'রতোই। চেষ্টা তো করেছিলাম অযোধ্যার চরেও, কিন্তু বৃথা। চোরাকারবারী,মহাজন, জমিদার আর সরকার —এরা সবাই মিলে একত্রে যদি ষড়যন্ত্র ক'রে সমস্ত দেশটাকে পিষে মারে, তবে তোমার আমার মত দু'একজনের কি ক্ষমতা আছে দেশকে রক্ষা ক'রবার।" থামিয়া কহিল, "তা যাক্। তুমি বরঞ্চ আর দেরী না ক'রে মজীদের ওখানেই আবার ফিরে যাও। যে অবস্থা দেখলাম, তাতে ক'রে তুমি কাছে না থাকলে মজীদের শবদেহকে মাটী দেওয়াই হয়ত হবে না। বাচ্চা বাচ্চা ছেলে-পিলেগুলিকে নিয়ে মজীদের স্ত্রীর খুব কষ্ট হবে। আমি চেষ্টা ক'রব সকলের কাছ থেকে চাঁদা তুলে তাদেরকে রক্ষা ক'রবার। চোখের সামনে দাঁড়িয়ে ঐ কান্না সহ্য ক'রতে পারি না, তাই চ'লে এলাম। তুমি আর দাঁড়িয়ে থেকো না, এক্ষুনি সেখানে যাও।"

কি যেন একটা বলিতে যাইয়া হঠাৎ কথার সূত্র হারাইয়া ফেলিল মকবুল আলী। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ চাহিল, তারপর ধীরে ধীরে আবার মজীদের ঘরের দিকেই পা বাড়াইল।

কেমন যেন একটা অবসন্নতায় সমস্ত শরীরটা আচ্ছন্ন হইয়া আসিল শ্রীমন্তের। অনেকখানি বেলা হইয়াছিল; একবার মনে করিল—কিছুক্ষণ ব্যাঙ্কে যাইয়া বসিয়া আসিবে। কিন্তু ভাল লাগিল না। একরকম টলিতে টলিতেই নিজের ঘরখানিতে আবার ফিরিয়া আসিল শ্রীমন্ত: তারপর কোনরকমে স্নান-খাওয়া দাওয়া সারিয়া পুনরায় বিছানায় আসিয়া বসিল। আর একবার ঘুম দিয়া উঠিলে যদি শরীরটা একটু হাল্কা—ঝরঝরে হয়। ভাতের একটা অদ্ভুত নেশা আছে। হাতের কাছে খুঁজিয়া পাতিয়া

এমন একখানিও বই পাইল না যে, সামান্য কিছুক্ষণ দৃষ্টি বুলাইয়া লইতে পারে। বাঁধান ডায়ারী খাতাখানিই আজ একমাত্র পথ-চলার সঙ্গী। নানা লেখন, অনুলেখন আর সমালোচনায় ক্রমশঃই ভরিয়া উঠিতেছে ডায়ারীর পাতাগুলি। ব্যক্তিজীবনের পূর্ণ অভিজ্ঞতার জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি, নিরালা জীবনের সুখদুঃখের মরমী স্মৃতিমালা এই ডায়ারী। গত কয়েকদিনের মধ্যে একবারও যেন পাতাগুলিকে খুলিয়া দেখে নাই সে! সস্নেহে পৃষ্ঠাগুলির উপর দিয়া এই মুহূর্ত্তে আজ আর একবার আঙুল বুলাইয়া নিতে যাইয়া একটি বিশেষ পৃষ্ঠায় আসিয়া শ্রীমন্তের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল। মনের কোন্ এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে সৌদামিনীকে উদ্দেশ করিয়া 'শ্রীময়ী'-সম্বোধনে লেখা সামান্য একটি পরিচ্ছেদ। কিছুদিন আগেকার লেখা। শেষ করিয়া আর দ্বিতীয়বার পড়িবার অবকাশ পায় নাই। পরম মমতায় প্রতিটি শব্দ একরকম উচ্চারণ করিয়া করিয়াই প্রাক্-নিদ্রার এই নিরালা অবসন্ন মুহূর্তটাকে নিজের মধ্যে ভরিয়া তুলিল শ্রীমন্ত। সুন্দর সুপটু হাতের মনোময় চিত্র :

শ্রীময়ী,

আজ তোমাকে যেন নতুন ক'রে অনুভব ক'রছি নিজের মধ্যে। মনে হচ্ছে, কাছে পাবার লোভটাই যেন সব চাইতে বড়ো ; নইলে—প্রতি মুহূর্ত্তে যেখানে পায়ে পায়ে বাধা, চলার পথে যেখানে অনবরত আতঙ্ক আর বিভীষিকা, যেখানে আত্মগত সমুদ্রমুখী মনের মধ্যে অফুরন্ত কল্লোল-প্রবাহ, তার মধ্যেও এমন অবসন্ন মানসপটে তোমার মূর্ত্তি কেন ভেসে উঠ্লো হঠাৎ! কারণ আছে। সেইটেই তোমাকে বলি।

কাল থেকেই সারা আকাশটা গুমোট মেঘে ভরা। এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই। ইংরেজের ভারত শাসনের মতোই একটা বিশ্রী রকমের গরম প'ড়েছে। ভোরে উঠেই তাই আড়িয়ালখায় গিয়ে নেমে প'ড়লাম স্নান ক'রবো ব'লে। অতর্কিতে আংটিটা আঙুল গলিয়ে হঠাৎ কেমন ক'রে জলের নীচে তলিয়ে গেল। শুধুই যদি আংটি হোতো, তা' হ'লে নির্ব্বিবাদে হয়ত এটা নদী-গর্ভেই মিশে থাকৃতে পারতো। কিন্তু তা' তো নয়, এ যে আংটিকে কেন্দ্র ক'রে রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছ তুমি। স্বর্ণকার এটাকে বানিয়ে দিয়েই খালাস হ'য়েছিল, কিন্তু তোমার মা? তাঁকে ভুল্বো কেমন ক'রে? তিনি যে ঐ মিনার উপরে নাম রেখে গিয়ে চির-জীবনের প্রীতি-চিন্তায় কতখানি ঋণের বোঝা বাড়িয়ে দিয়ে গেছেন, সেই কথাটা ভাব্তে গিয়েই মন একবার কেমন যেন আন্দোলিত হ'য়ে উঠ্লো! যুক্ত করে প্রণাম ক'রলাম তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে। তারপর তুমি। হাতখানি আমার টেনে নিয়ে সে-দিন তো আঙুলে শুধু তুমি আংটি পড়িয়েই দাও নি, দিয়েছিলে প্রতিশ্রুতি। সে-দিন থেকে এই আঙুলে আংটিটা এঁটে রইল রক্ষাকবচের মতো। যতবার মনে ক'রেছি, তুলে রাখি, ততবারই নিজের কাছে হার মেনেছি। মাঝে মাঝে মনে ক'রেছি, এতই বা কেন? কথা, সে কি কিছু নয়? কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই মনে হ'য়েছে—কথার অতীত-কথাও তো পৃথিবীতে বড় কিছু আছে, তাকেই বা অস্বীকার ক'রবো কি দিয়ে? পৃথিবীতে যত কিছু শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত—সব যে ঐ কথার অতীত-কথার কলাসৃষ্টিতেই সম্ভব। কথা যেখানে পরাজয় আনে, কথার অতীত-কথার মায়াজালে যে সেইখানেই দেখা দেয় জয়ের সূচনা। মনে হোলো, কথা দিয়ে যেটুকু তুমি আমায় কেড়ে নিয়েছ, তার চাইতে বেশী জয় ক'রে নিয়েছ যেন কথার অতীত এই আংটিটার যাদু দিয়ে। কাছে ব'সে আজ তো তুমি আর কথা কইছ না, কিন্তু অনন্ত কথা যেন কেবল নতুন থেকে আরও নতুন হ'য়ে রূপ নিচ্ছে আংটিটাতে। রূপকথা নয়, কিন্তু নয়ই বা বলি কী ক'রে? কিছু একটা ব'ল্তে যাওয়াই যে ঘটনাকে রূপ দেওয়া ; যে রূপের মধ্যে আমরা বিষিয়ে উঠেছি, যে বিদগ্ধ রূপ আমাদের মজ্জায় দিয়েছে আগুন জেলে, যে রূপের জগতে আজ আমরা বংশ পরম্পরায় আহুতি হ'য়ে চ'লেছি, সেই কি কিছু একটা রূপকথা কম! এই রূপের বিরুদ্ধে আমরা সারা জীবন সংগ্রাম ক'রবো, সংগ্রাম ক'রবো—যতদিন না আমাদের এই নির্মম বিদ্রোহী স্বরূপের কাছে আজকের এই প্রচলিত রূপ নতি স্বীকার না করে। এই রূপের বিরুদ্ধে স্বরূপের বিদ্রোহই তো তোমার আমার মিলিত সাধনা, তোমার প্রতিশ্রুতি। সেই প্রতিশ্রুতি যে নিত্য নতুন ক'রে বার বার জ্বলে উঠ্তে দেখেছি আংটিটায়। মিনার ভিতরে তাকাতে গিয়ে মনে হ'য়েছে, অলক্ষ্যে কখন কাছে এসে দাঁড়িয়েছ তুমি। দারুণ মূর্ত্তি তোমার, বল্ছো, 'পথের জঞ্জাল সব পুড়িয়ে পরিষ্কার ক'রে দিতে আজ সত্যিই পথে এসে নেমেছি। আর আমার ভয় বা লজ্জা নেই।' হাতে তোমার জ্বলন্ত মশাল, কাঁধে তোমার চামড়ার ফিতেয় বাঁধা ধারালো কুড়ুল। ব'ল্লাম, 'জঞ্জাল পরিষ্কার ক'রতে নেমেছ, ভাল ; কিন্তু তোমার এত বড় সাহিংস সংস্কার তো মহাত্মাজী অনুমোদন ক'রবেন না! পথে পথে কাঁটা গাছ গজালেও তার প্রাণ আছে। তার ওপরে স্বতঃ-প্রণোদিত আক্রমণ হিংসা-নীতির মধ্যে যেয়েই পড়ে।'—মিনাটা আরও খানিকটা উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্লো! তুমি ব'ল্লে, 'হাঁটবো কোথা দিয়ে, কাঁটায় কাঁটায় পা যে ছড়ে' গেছে! তার ওপরে মশাল আর কুড়ুল ধরা অহিংস পর্য্যায়েই পড়ে। তাই যদি না হবে, তবে গান্ধীজীর যত কিছু আন্দোলন—সবই হিংসামূলক। 'অহিংস' কথাটা ওপরের একটা আবরণ মাত্র। পেটে ক্ষিধে নিয়ে পৃথিবীতে কোনো দিন বড় কিছু একটা ত্যাগ ধর্ম্ম গ'ড়ে উঠ্তে দেখেছ? আমরা নারী, আদ্যা শ্যামাশক্তি আমাদের মজ্জায় ; কাঁটা-গাছ, কুটো-খড় তো তুচ্ছ, আমরা যদি একবার চ'ল্তে সুরু করি, তবে স্বয়ং মহাদেব পর্য্যন্ত পায়ের নীচে গুড়িয়ে যান। সেই শক্তি আজ নিজের মধ্যে চিনেছি।' কথা ব'ল্তে পারলুম না, অবাক বিস্ময়ে শুধু তাকিয়ে রইলুম। আংটির মধ্যে রূপ নিয়ে তুমি যেন নতুন হ'য়ে উঠেছ দিনে দিনে! এ কি শুধুই কথা, শুধু একটা আবেশ মাত্র! তা তো নয়, এই তো কথার অতীত-কথা, অচিন্ত্য...অপূর্ব্ব...অনন্য। এমন কথা যে তুমি ব'লেই তোমার আংটি ব'ল্তে পারে! তাইতো অনবরত ডুবিয়ে ডুবিয়ে চোখ দুটো লাল ক'রে তুল্লুম। এও একটা অসাধ্য সাধন। তর-তর বেগে স্রোত বইছে আড়িয়ালখায়। পাড়ে এসে আছড়ে প'ড়ছে ছোট ছোট ঢেউগুলি। বস্তু উদ্ধার ক'রলুম তো নয়,

নতুন ক'রে যেন উদ্ধার ক'রলুম তোমাকে! ডুবিয়ে ডুবিয়ে আবার হাতে পেলাম শ্রীময়ীকে। তারপর সোজা ঘরে এসে এই কলম ধ'রলুম। ভাবলুম, আজ যদি একে ডায়ারীর পাতায় গেঁথে না রাখি, তবে, আবার যে-দিন ফিরে গিয়ে তোমার সামনে দাঁড়াবো, সে-দিন হয়ত উন্মাদনার মুখে সমস্ত ঘটনার চাপে আজকের দিনের এত ছোট অথচ এত বড় ঘটনাটা বলতে গিয়ে একেবারেই হারিয়ে বসবো।

ভাবছি, কর্ত্তব্যের ডাকে আজ হয়ত তুমি আর সত্যিই ঘরে ব'সে নেই! সারা বাংলার উপর দিয়ে সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত যে দারুণ ঝড় বয়ে যাচ্ছে, তা দেখে অন্তত: তুমি চুপ ক'রে ব'সে থাকতে পারো না। জিজ্ঞেস্ ক'রবে তো আমার কথা? কিন্তু বলতে গেলে তা' রীতিমত একখানি উপন্যাস হ'য়ে দাঁড়াবে। সে ভারটা না হয় সাহিত্যিকদের উপরেই থাক্। শুধু একটা দারুণ দৃশ্য এখানে এঁকে রাখ্‌চি। যে-দিন দেখা হবে, পাছে এটুকু ব'লতেও ভুলে যাই, তাই শুধু দিনপঞ্জীর একটা ক্ষীণতম দাগ কেটে রাখা মাত্র।

এখানে-ওখানে ঘুরে যখন শেষটায় এই বন্দরে এসে পৌঁছলাম, মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম এর প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যে। কিন্তু এই বন্দরের মর্ম্মের দিকটাও দেখ্‌লাম কম নয়। নিম্ন-মধ্যবিত্ত আর চাষীরা দু' বেলা দু'টি পেট পুরে খেতে পাচ্ছে না. অথচ তারই আশে-পাশে দেখলাম—কী কঠিন ছলনাময় বিভীষিকার উপরে চ'লেছে লগ্নীকারবার, দালালী আর ব্ল্যাক-মার্কেটিং। কালো বাজারের এই মানুষগুলোকে চেনা কঠিন, অথচ কথা বলে হেসে—সময়ক্ষেপ করে না একবিন্দু। একদিন চোখের সামনে দেখ্‌লাম, সন্ধ্যার নিভৃতে এক পাউণ্ড কুইনাইন বিকিয়ে গেল চারশো টাকায়। বাজারে কুইনাইন নেই, সরকারের দান মেপাক্রিন—তাই বা কোথায়? এমন অবস্থায় চার টাকার জিনিষ চারশো'তে বিকিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক; নইলে উপায় নেই, লোক যে এ-দিকে মরে। কিন্তু ভাবলাম—এই কালো বাজারের কি দণ্ড নেই? কিন্তু কি জানো শ্রীময়ী, সত্যিই হয়ত এর দণ্ড নেই! নইলে কৈ, এদের তো দেখি না হাজতে যেতে, পুলিশ তো এদের বিরুদ্ধে কোনো ভারতরক্ষা আইন জারী করে না! এইতো এই যুদ্ধের অভিশাপ। সম্প্রতি জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন বটে নেতারা, কিন্তু দেশের আয়ু এতদিন আর এক-কণা অক্সিজেন পেয়েও বেঁচে রইল না। আসলে বাঁচিয়ে রাখ্‌তেই চান নি শাসন কর্ত্তারা। তাঁরা হয়ত চেয়েছিলেন ভাতে মেরে বাঙালীর মাথাকে একেবারে চিরদিনের মতো গুঁড়িয়ে দিতে। গুঁড়িয়েই গেছে বটে, তবে যারা মাথা দিয়ে কাজ করে, তা'রা নয়, মাথাকে যারা তৈরী করে, তা'রা। আর একটা দুর্ভিক্ষ ঘটাতে পারলেই শাসনকর্ত্তারা একেবারে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচতে পারবেন।

জানো শ্রীময়ী, কেবল কি ঐ লগ্নিকারবার, দালালী আর ব্ল্যাক মার্কেটের চোরই শুধু, কত যে ডাকাতের দল পর্য্যন্ত গত দুর্ভিক্ষের সুযোগ নিয়ে গ'ড়ে উঠলো—তারও যে ইয়ত্তা নেই। আমাদের এই সহরেই কি কম কিছু? ওদিকে তখন জাপানী বাহিনী দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার সমগ্র ভূখণ্ড অধিকার করে নিয়েছে; বাংলার পূর্ব্ব প্রান্ত থেকে আরও গভীরতর প্রত্যন্তে তাদের তখন সশস্ত্র অভিযান। রাজনৈতিক মহলে এক অপরিসীম অনিশ্চয়তার আভাষ তখন, একথা তুমিও জানো। গৃহবাসী প্রাণভয়ে প্রকম্পিত আর বিভ্রান্ত। এমন একটা সুন্দর সুযোগ কি মেলে লুণ্ঠতরাজের! গ্রামে গ্রামে, সহরের আনাচে কানাচে গ'ড়ে উঠ্‌লো ঐ ডাকাতের দল! এরা বঙ্কিমচন্দ্রের ভবানীপাঠকের গোষ্ঠি নয়, অভাবের তাড়না নেই এদের কোনো; ডাকাতিই ওদের চারিত্রগত পেশা। এমনিতর একটা দলই সেদিন এসে ভেঙে পড়েছিল শ্যামাপদদের বাড়ীতে। গভীর রাত্রি। ঘরে ঘুমুচ্ছিল নিশ্চিন্ত প্রশান্তিতে শ্যামপদ আর তার স্ত্রী নীরজা। ওপাশের ঘরে শ্যামপদর বাবা। নতুন বউ নীরজা। গায়ে অলঙ্কারের পারিপাট্য থাকা অশোভন কিছু নয়। ডাকাতেরা এসে দরজা ভাঙ্‌লো। ঘুম ভেঙে গেল নব দম্পতির। বাধা দিয়ে যে দাঁড়াবে—এমন শক্তিই বা কোথায় শ্যামাপদর! ডাকাতেরা দলে ভারী। চীৎকার ক'রে খুনের ভয় দেখিয়ে লুটে পুটে নিয়ে গেল মুহূর্ত্তের মধ্যে। অলঙ্কারাবৃত দেহশ্রী নীরজার, মুহূর্ত্তে নিরাভরন-জ্বালায় আর আতঙ্কে মেঝেতে লুটিয়ে প'ড়ে অশ্রু ভাসালো। গ্রামবাসী কেউ সেদিন এগিয়ে আসতে সাহস পায় নি। আমার কি মনে হয় শ্রীময়ী জানো, এমনিতর কতকগুলি ডাকাতের দল দিনের পর দিন তাদের মাংসল অস্তিত্ব বজায় রেখে চ'লতে পারছে শুধু সরকারী দৃষ্টিক্ষীণতার জন্য। পুলিশ ঘুষ নিয়ে এদের সুযোগ দেয়, থানায় এদের জায়গা নেই। মানুষের কাছে আবেদন ক'রে যখন এর কোন প্রতিকার পাই না, তখন একবার গলা ছেড়ে মানুষের বিধাতাকে ব'লতে ইচ্ছে হয়—'বাবা তোমার সৃষ্টিকে এমন ক'রে ক্ষতবিক্ষত ক'রে দিচ্ছে, এমন ক'রে কলুষ-পঙ্কিল ক'রে তুলছে তোমার সহজ-মৌন ধ্যানী সমাজকে, চোখ বুঁজে তুমি আর কতকাল তাঁদের সহ্য করবে বিধাতা? তোমার ন্যায়ের দণ্ড কি তাদের শিরে হানবে না? আবার কি তোমার সৃষ্টিজগৎকে সুন্দর লাবণ্যময় ক'রে তুলবে না?"

নিজের কাছে আজ যেন নিজেকে সত্যিই বড় একা ব'লে মনে হ'চ্ছে, শ্রীময়ী। যে স্বপ্ন আমাদের সমস্ত মনে বাসা বেঁধে আছে, আজ ভাবছি—আরও কত দীর্ঘকালই না যেন লাগবে সেই স্বপ্নে মঞ্জরী দেখা দিতে; তোমারও কি আজ এমনটাই মনে হয়? কিন্তু ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা আমাদের, দেখো—কোনো একবিন্দু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়েই যেন তা' কখনো ভেঙে না যায়! ভবিষ্যতের পুঁজি, তাই বা আমাদের কম কি? আজ এইখানেই কলম বন্ধ করি।—[একটি বিষণ্ণ প্রভাত: ১৯৪৫]

এক নিঃশ্বাসে পড়া শেষ করিয়া নিজের মধ্যেই কেমন যেন এক অভিভূত অবস্থায় আত্মনিমগ্ন হইয়া গেল শ্রীমন্ত। এ তো ডায়ারীর পাতায় দিনপঞ্জীর ঘটনা সংরক্ষণ নয়, এ-যেন প্রাণবন্ত একখানি মহাকাব্যের সুন্দরতম একটি অধ্যায়! সত্যিই যেন কেমন একটা অদ্ভুত দুর্ব্বলতা আসিয়া গিয়াছিল সে-দিন সমস্ত মজ্জায়, সমস্ত রক্তে!—ধীরে ধীরে চোখ বুঁজিয়া আসিল শ্রীমন্তের।

[আগামী সংখ্যায় পঞ্চম পর্য্যায়

রবীন্দ্র-দর্শন

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, আই. সি. এস্

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

দেখিতে পাওয়া যায়, দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গী বা দার্শনিকের অনুসন্ধানমার্গ কবির দৃষ্টিভঙ্গী বা অনুসন্ধানমার্গ হতে বিভিন্ন। কবি কল্পনাপ্রবণ, কবির মনের অনুভূতির বিকাশে পূর্ণতম সুযোগ মেলে। কবির আবেগ, কবির কল্পনা, কবির অনুভূতি, কবির ভাল লাগা না লাগা, এই সবই তার মত কোন্ ধরণের হবে, তা নির্দ্ধারণ করে দেবে। যুক্তি, তর্ক সেখানে মুখ্য জিনিষ ত নয়ই, গৌণ জিনিষও নয়, তা সেখানে সম্পূর্ণ নির্ব্বাসিত। আমার এই মতকে ভাল লাগে, এই মত মনকে আমার আনন্দ দেয়, অতএব তার গলায়ই আমি বরমাল্য দেব। কবির যদি যুক্তি কিছু থাকে, তা অনেকটা এই ধরণের। কবির মার্গ অনুভূতি, দার্শনিকের মার্গ যুক্তি।

ঠিক সেই কারণে, তাঁর মনে কবিভাবের প্রবাল্য হেতু আমরা দেখব যে, তিনি দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্জ্জন ক'রে, কবির দৃষ্টিভঙ্গীকে বরণ করেছেন। দর্শনের একটা মূল আলোচনার বস্তু আছে, জ্ঞান আহরণের মার্গ কি হবে! সেই প্রশ্ন সম্বন্ধে উত্তর রবীন্দ্র-দর্শনেও আমরা পাই। এ বিষয় যথাস্থানে আলোচনা করবার সময় আসবে। এখন লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এ সমাধান দার্শনিকের মনোমত না হয়ে কবির মনোমতই হয়েছে। এখানে তার বিস্তারিত আলোচনার ঠিক সময় আসে নি। তবে এইটুকু বললেই হবে যে, তিনি বিচার-মার্গকে উপেক্ষা করে অনুভূতিকেই সত্যের একমাত্র মানদণ্ড বলে গ্রহণ করেছেন।

যে-দৃষ্টিভঙ্গী তাঁকে অনুভূতি-মার্গের গলায় বরমাল্য দিতে প্রেরণা জুগিয়েছে, সেই দৃষ্টিভঙ্গীই তাঁর দর্শন সম্বন্ধে একটি বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি করেছে। সাধারণ দার্শনিকের আলোচনাপদ্ধতি বিচারমূলক ও যুক্তিমূলক। সেই কারণে যে কোন সমস্যা সম্বন্ধে যে তত্ত্ব তিনি প্রচার করবেন, তা সুসংবদ্ধ আকারে সাজিয়ে গুছিয়ে তিনি আমাদের নিকট পরিবেশন করবেন। কাজেই, দার্শনিকের রচনায় আমরা একটি পূর্ণাবয়ব সমগ্র মত, দার্শনিকের মনের মতন ক'রে সাজান অবস্থায় এমনিই পেয়ে যাব। তার পূর্ণতমরূপটিই সোজাসুজি আমাদের নিকট স্থাপিত হবে।

যে দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গী কবির অনুরূপ, যাঁর দর্শন ভূয়সী চিন্তা ও বিচারের উপর ভিত্তি করে একেবারে সমগ্রভাবে সৃষ্ট হয় নি, তাঁর দর্শনকে আমরা এমন সাজান গোছান অবস্থায় সোজাসুজি পেতে পারি না। তার কারণ, প্রধানতঃ তিনি কবি বলে। কবিকে যে ভাব যখন প্রেরণা দেয়, সেই ভাবই তখন তাঁকে পরিচালিত করে। ভাবগুলি কি ধারা অনুসারে আসবে বা আসবে না, তার কোন নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নাই। কবির খেয়ালই তার একমাত্র নিয়ন্তা। এ-ক্ষেত্রে নানা ধরণের ভাবকে, নানাস্থানে সংমিশ্রিত আকারেই আমরা তাঁর রচনার মধ্যে আবিষ্কার করব।

রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক রচনা সম্বন্ধে এই নিয়মের কোন ব্যত্যয় ঘটে নি। অনেক ক্ষেত্রে কবিতাপরম্পরা কোন বিশেষ দার্শনিক মতের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেখানে সম্পূর্ণ দার্শনিক মতটির আবিষ্কারের আশা আমরা করতে পারি না। বড় জোর একটি বা দুটি মূল ভাবধারার আংশিক বিকাশ আমরা অনুসন্ধান করে তাতে পেতে পারি। তার বেশী নয়।

এই নিয়মের কেবলমাত্র একটি স্থানে ব্যতিক্রম ঘটেছিল। সে-বিষয় ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তার কারণও সেখানে সুস্পষ্ট। কবিকে যখন তিনটি বক্তৃতা দিতে আহ্বান করা হয়, তখন তাঁর উপর ফরমাস হয়—তাঁর দার্শনিক মতকে সাজিয়ে গুছিয়ে স্থাপন করবার। সুতরাং সে-ক্ষেত্রে তিনি ঠিক কবির পদ্ধতি অনুসারে তাঁর আলোচনা করেন নি। সারা জীবন নানা অনুভূতির ভিতর দিয়ে তিনি যে দার্শনিক সত্যগুলি উপলব্ধি করেছিলেন তাই তিনি সাজিয়ে গুছিয়ে সেখানে লিখেছেন। সেই কারণেই সেখানে যা পাই তাকে তুলনায় একটি পূর্ণাবয়ব দার্শনিক রচনা বলা যেতে পারে। তবু দেখা যাবে—সেই পুস্তকের অনতিপ্রশস্ত বক্ষে তাঁর দর্শনের সকল ভাবধারাগুলিকে আমরা পাব না। তার পরেও তিনি দীর্ঘ দশ বৎসরকাল বহু রচনা করে গেছেন। তাদের মধ্যে যে দর্শন-কণিকা ছড়ান রয়েছে, তাদেরও আমরা বাদ দিতে পারি না। তা ছাড়া, অতীতের রচনায় ছড়ান গানে, কবিতায়, নাটকে, প্রবন্ধে যে বহু ভাবকণা ছড়ান রয়েছে, তাদেরও আমাদের বিচার করে দেখ্‌তে হবে। নূতন ভাবধারায় এখানে বাদ পড়ে গেছে, তাকেও নজরে আনতে হবে। এইরূপে সংগ্রহ করে করে তাঁর সকল দার্শনিক মন্তব্যগুলিকে সাজিয়ে গুছিয়ে পরস্পর-সন্নিবদ্ধ অবস্থায় স্থাপন করে' তবেই আমরা তাঁর সম্পূর্ণ দর্শন-খানিকে আয়ত্ত করতে পারি।

এইবার আমরা সেই অবস্থায় এসেছি, যেখানে, রবীন্দ্র-দর্শনে আলোচিত বস্তুগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা দিতে পারি। তা দুই বিষয়ে আমাদের সহায়তা করবে। প্রথমতঃ আমাদের আলোচ্য বিষয়ের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবো, দ্বিতীয়তঃ

সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গীতে রবীন্দ্রদর্শনের একটি পরিচয়ও আমরা লাভ করব।

এই সম্পর্কে দার্শনিক বস্তু হিসাবে যে সকল সমস্যা সাধারণত আলোচিত হয়ে থাকে, তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

সমগ্র দর্শনের আলোচ্য বিষয় বলতে আমরা তাই বুঝি, যা হ'ল সমগ্র বিশ্বের জ্ঞান সম্পর্কিত মূলগত সমস্যা। এই সম্পর্কে, বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোচ্য বস্তুর মাঝখানে যে সীমারেখা টানা হয়, তার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাতে কথাটা হৃদয়ঙ্গম করা অনেক সহজ হবে। বিজ্ঞানেরও উদ্দেশ্য হ'ল বিশ্বকে জানা, দর্শনেরও উদ্দেশ্য হ'ল বিশ্বকে জানা। তবে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর একটু পার্থক্য আছে। বিজ্ঞান বিশ্বকে কতকগুলি স্বাভাবিক অংশে ভাগ করে নিয়ে, সেই অংশগুলির প্রত্যেকটি পৃথক্ করে নিয়ে, তার আলোচনা করে। সেই অংশ সম্বন্ধে যা কিছু জানবার জেনে, সেই জ্ঞানকে সুসংবদ্ধ আকারে সাজিয়ে দেয়। এই হ'ল বিজ্ঞানের বিশেষ কার্য্যপদ্ধতি। এই ভাবে বিশ্বের একটি অংশসম্বন্ধে আমরা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভ করি। এইভাবে কোন বিশেষ বিজ্ঞান বিশ্বের মৌলিক উপাদান-গুলি ও তাদের সংমিশ্রণ সম্বন্ধে আলোচনা করে, আমরা তখন তাকে রসায়ন-বিজ্ঞান বলি। কোন বিজ্ঞান বিশ্বের মূল প্রকট শক্তিগুলির মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখে, যেমন আলোক, তাপ, বিদ্যুৎ ইত্যাদি। আমরা তাকে বলি পদার্থ-বিজ্ঞান। এইভাবে বিষয়ভাগ অনুসারে নানা বিভিন্ন বিজ্ঞান সম্ভব হয়েছে।

দর্শনের আলোচ্য বিষয়ও বিশ্ব; কিন্তু সে আলোচনা এমন খণ্ডভাবে নয়, সে আলোচনা সমগ্র বিশ্বকে ব্যাপকভাবে জড়িয়ে নিয়ে, এক ক'রে। এইখানে একটা উপমা প্রয়োগ করা যাক। আমরা সেই পাঁচ অন্ধব্যক্তি ও হাতীর গল্প এখানে উল্লেখ করতে পারি। গল্প হ'ল এই যে, পাঁচ অন্ধব্যক্তি হাতী সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করতে গেল। তাদের জ্ঞানের উপায় কেবল স্পর্শ-শক্তিতে সীমাবদ্ধ, কারণ, দৃষ্টিশক্তি তাদের কারও ছিল না। এখন প্রত্যেকে হাতীর এক একটি বিশেষ অঙ্গ স্পর্শ ক'রে, তার আকৃতি অনুসারেই তার সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করল। যে তার পদ স্পর্শ করেছে, সে বলল, হাতী দেখতে স্তম্ভের মত; যে কাণ স্পর্শ করল, সে ভাবল, হাতী কুলোর মত ইত্যাদি। এখন বিশ্লিষ্ট আকারে দেখতে গেলে, সেই গণ্ডীর মধ্যে তাদের প্রত্যেকের আহৃত জ্ঞান সত্য, কিন্তু ব্যাপক দৃষ্টি-ভঙ্গিতে দেখতে গেলে, হাতী সম্বন্ধে জ্ঞান তাদের কারও সঠিক নয়। এখন বিজ্ঞানের দৃষ্টি-ভঙ্গী আর দর্শনের দৃষ্টি-ভঙ্গীর সঙ্গে এই কথাগুলির আংশিক তুলনা চলে। এটা অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, এ তুলনা সম্পূর্ণ খাটে না, কারণ, কোন বৈজ্ঞানিক. কোন অংশ সম্বন্ধে জ্ঞানকে সমগ্র বিশ্ব সম্বন্ধে জ্ঞান ব'লে প্রকট করবেন, এমন অন্ধ নন। তাঁরা বিশ্লিষ্ট আকারে বিশ্ব সম্বন্ধে খণ্ড-জ্ঞান আহরণ করেন, খণ্ড-জ্ঞান হিসাবেই। এখন তার পরই আসে দার্শনিকের কাজের ক্ষেত্র। দার্শনিকেরই বিশেষ কর্ত্তব্য হ'ল ব্যাপক দৃষ্টি-ভঙ্গীতে বিশ্বের রূপ কেমনটি দেখায়, তাই ঠিক করা। যেখানে বৈজ্ঞানিকের কাজ হয় সারা, সেখানে দার্শনিকের কাজ হয় সুরু। পাঁচটি অন্ধ ব্যক্তির প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ অনুভূতি দ্বারা আহৃত জ্ঞানকে কোন ষষ্ঠ ব্যক্তি যদি নিরপেক্ষ মন নিয়ে আলোচনা করে' তার মধ্যে. সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করেন, তা' হ'লে হাতী সম্বন্ধে ব্যাপক দৃষ্টিতে সমগ্র জ্ঞান তাঁর আয়ত্ত হবে।

এই সম্পর্কে দার্শনিক হার্বার্ট স্পেনসারের এই বিষয়টির বিশ্লেষণমূলক একটি উক্তির উল্লেখ করলে আমাদের কাছে বিষয়টি আরও বোধগম্য হবে। তিনি সাধারণ মানুষের জ্ঞান, বৈজ্ঞানিকের জ্ঞান ও দার্শনিকের জ্ঞানকে পৃথক্ করেছেন এই ভাবে: সাধারণ মানুষের জ্ঞান হ'ল সম্পূর্ণরূপে অসামঞ্জসীকৃত জ্ঞান, বৈজ্ঞানিকের জ্ঞান হ'ল আংশিকভাবে সামঞ্জসীকৃত জ্ঞান এবং দার্শনিকের জ্ঞান হ'ল সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জসীকৃত জ্ঞান। সাধারণ মানুষ নিজের অভিজ্ঞতার ফলে যখন যে জ্ঞান আহরণ করে, তার সঙ্গে অন্য বিভিন্ন জ্ঞানের সামঞ্জস্য আনয়নের কোন চেষ্টা বা প্রয়োজন বোধ করে না। যেমন বিশ্লিষ্ট আকারে তাকে পায়, তেমনি বিশ্লিষ্ট আকারে তাকে সংরক্ষিত করে। অপর পক্ষে, বৈজ্ঞানিকের জ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্য করার চেষ্টা বহুল পরিমাণে বিদ্যমান। তিনি বিশ্বের যে বিশেষ অংশটিকে আলোচনা করেন, সেই বিশেষ অংশটি সম্পর্কিত যাবতীয় জ্ঞান আহৃত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে পরস্পরের সামঞ্জস্য যথাসম্ভব আনবার চেষ্টা করেন এবং আনেন। তবে আত্ম-স্থাপিত গণ্ডির বাহিরে তিনি যান না। তাঁর সামঞ্জস্য-সাধন অংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দার্শনিকের সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা আরও ব্যাপক ক্ষেত্রে কাজ করে। তিনি কোন অংশ-বিশেষের মধ্যে তাকে সীমাবদ্ধ রাখেন না। তিনি সমগ্র বিশ্বকে একত্রিত করে' সমগ্র বিশ্বের যা মূল সমস্যা, তার সম্বন্ধে সর্ব্ববিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করে, তার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করেন। কাজেই তাঁর দৃষ্টি-ভঙ্গী ব্যাপকতম এবং সেই কারণেই দার্শনিক জ্ঞানকে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জসীকৃত জ্ঞান ব'লে বর্ণনা করা হয়।

ঠিক এই কারণেই দর্শনের আর একটি সংজ্ঞা দেওয়া হয়ে থাকে এই যে, তা সমগ্র বিজ্ঞানগুলির সমষ্টি। তার অর্থ এই যে, বিজ্ঞানের কাজ যেখানে শেষ হয়, দর্শনের কাজ সেখানে সুরু হয়। বিজ্ঞান ও দর্শনের কার্য্যের সময় আসে বিভিন্ন অবস্থায়। বিজ্ঞান জগতকে কতকগুলি স্বাভাবিক ভাগে বিভক্ত ক'রে, সেই বিভাগের মধ্যে যা কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় আহরণ করে' তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য আনে। এইভাবে বিশ্লিষ্ট আকারে বিশ্বের নানা বিভাগ সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ সমাপ্ত হয়ে গেলে, তারপর সময় আসে দর্শনের কাজ করবার। দর্শন সেই বিজ্ঞানগুলির আহৃত তথ্যগুলি একত্র করে, বিশ্ব সম্পর্কিত যে সকল সাধারণ সমস্যা আছে, তার সমাধানে তাদের ব্যবহার করে। এই ভাবে তাদের সকলের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করে, তথ্যগুলিকে সাজিয়ে সেই সমাধানে নিয়োগ করে। এইভাবে মানুষের জ্ঞানের আমরা তিনটি অবস্থা পাই, সাধারণ মানুষের জ্ঞান, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দার্শনিক জ্ঞান। তাদের পার্থক্য, তাদের ব্যাপকতা সম্পর্কে, তাদের দৃষ্টির প্রসারের সম্পর্কে।

বিশ্বের মূলগত যে সমস্যা তাই হ'ল দার্শনিক সমস্যা। এই সমস্যাগুলিকে দুটি সাধারণ ভাগে ভাগ করতে পারা যায়। একশ্রেণীর সমস্যা আছে যারা আমাদের মানসিক অনুসন্ধিৎসা বা কৌতূহল-বৃত্তিকে তৃপ্ত করে। সেইখানেই তাদের কাজ শেষ হয়ে যায়, তাদের কোন ব্যবহারিক প্রয়োগের অবকাশ নাই। এই শ্রেণীর দার্শনিক সমস্যাকে আমরা মানসিক সমস্যা বলতে পারি। অপর পক্ষে আর এক ধরণের সমস্যা আছে, যার প্রয়োগ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে, যার সমাধানের প্রয়োজন আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে, আমাদের কর্ম্মপ্রবাহ কিরূপে চালিত হবে, তা নির্দ্ধারণের জন্য। এদের আমরা ব্যবহারিক সমস্যা বলতে পারি। সমস্যাগুলির পরিচয় হলেই, এদের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হয়ে আসবে। (১)

মানসিক সমস্যাগুলির সম্পর্ক বিশ্বকে জানা নিয়ে। কিন্তু এই বিশ্বকে জানার চেষ্টায় মানুষেরই মন একটি নূতন বস্তু সৃষ্টি করে, যাকে ভাল রকম করে জানাও মানুষের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই মনের সৃষ্ট বস্তুটি হল—যাকে আমরা বলি জ্ঞান। জ্ঞানের জন্ম মানুষের বিশ্বকে জানবার চেষ্টা হতেই হয়। খুব সহজভাবে এর ব্যাখ্যা করতে গেলে আমরা বলতে পারি যে, মানুষের মন বিশ্বের যে মানসিক ছবি গ'ড়ে তোলবার চেষ্টা করে, এ হল তাই। বিশ্বের সঙ্গে তার সম্পর্ক বর্ণনীয় বিষয় ও বর্ণনার সম্পর্ক। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে জ্ঞানের রূপ সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যার আমাদের প্রয়োজন নাই।

এইরূপে বাস্তব বিশ্ব ছাড়াও জ্ঞাননামে আরও একটি জটিল বস্তু আমাদের আলোচনার বিষয় হয়ে পড়ে। এই জ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয়ের চেষ্টায় যে সমস্ত সমস্যার উদয় হয়, সেগুলির সমাধানের ভারও দর্শনের উপর এসে পড়ে। এইভাবে মানসিক সমস্যাগুলিকে দুটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক শ্রেণী জ্ঞান-সম্পর্কিত প্রশ্নগুলির আলোচনা করে ও অন্য শ্রেণী বাস্তব বিশ্ব সম্পর্কিত প্রশ্নগুলির আলোচনা করে। প্রথমগুলিকে জ্ঞানতত্ত্ব-বিষয়ক সমস্যা বলতে পারি, দ্বিতীয়কে বস্তুতত্ত্ববিষয়ক সমস্যা বলতে পারি।

আমাদের ব্যবহারিক জীবনে যে সমস্যাগুলির নিত্য উদয় হয়, তাদের আমরা ব্যবহারিক সমস্যা বলে শ্রেণীবিভাগ করেছি। এই শ্রেণীর অন্তর্গত দুটি মূল সমস্যা আমাদের সকলেরই জীবনে জাগে। আমাদের ইচ্ছাধীন কর্ম্মগুলির লক্ষ্য হওয়া উচিত কি, তাদের কোন নীতি নিয়ন্ত্রিত করবে, এই প্রশ্ন আমাদের মনে প্রতি মুহূর্ত্তে উঠে। একেই আমরা নৈতিক সমস্যা বলে থাকি। জীবনের মূল লক্ষ্য কি হওয়া উচিত, পুরুষার্থ কি হওয়া উচিত, তাই হল এখানে প্রধান প্রশ্ন। অপর পক্ষে কোন না কোন প্রকার ধর্ম্মাচরণ-স্পৃহা মানুষের একটি কর্ম্মজীবন সম্পর্কিত স্বাভাবিক ও মৌলিক বৃত্তি। যে অপরূপ শক্তি এই বিশ্বের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছেন, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করব, এই হল সেই স্বাভাবিক বৃত্তি—যাকে ভিত্তি করে মানুষের ধর্ম্মবোধ গ'ড়ে উঠেছে। এই ধর্ম্মবোধের তৃপ্তির উপায় কি হবে, এই হল ধর্ম্মসম্পর্কিত ব্যবহারিক জীবনে মূল প্রশ্ন। এই প্রশ্ন উত্তর চায়, কি ধরণের ধর্ম্মাচরণ মানুষের মনকে সমধিক তৃপ্তি দেবে, মানুষের জীবনকে সর্ব্বাঙ্গীণ পূর্ণতা দান করবে। সুতরাং ব্যবহারিক জীবনে যে দুটি মূল সমস্যার উদয় হয়, তারা হল নৈতিক সমস্যা ও ধর্ম্ম-সমস্যা। এ দুটীও ব্যাপক দৃষ্টিতে দর্শনের আলোচনার গণ্ডির মধ্যে এসে পড়ে।

এখন এই দার্শনিক সমস্যাগুলির কোন্ কোন্ বিশেষ সমস্যা রবীন্দ্র-দর্শনে স্থান পেয়েছে এবং আলোচিত হয়েছে, তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করি।

রবীন্দ্র দর্শনে মানসিক ও ব্যবহারিক উভয় সমস্যাগুলির সমাধানের চেষ্টা হয়েছে। মানসিক সমস্যাগুলির মধ্যে দুইটি সমস্যা রবীন্দ্র-দর্শনে আলোচিত হয়েছে। প্রথম সমস্যাটি জ্ঞান সম্পর্কিত এবং দ্বিতীয় সমস্যাটি বিশ্বের গঠন-সম্পর্কিত।

জ্ঞান-সম্পর্কিত নানা প্রশ্নই দর্শনের আলোচনার বিষয় হয়ে থাকে, কিন্তু রবীন্দ্র-দর্শনে তাদের একটি প্রধান বিষয় মাত্র আলোচিত হয়েছে। এই প্রধান সমস্যাটি যাকে আমরা বলি জানবার মার্গ কি হওয়া উচিত, তাই বিশ্বের অন্তর্নিহিত সত্তাকে কোন্ প্রকৃষ্ট উপায়ে জানা যায়, এই হল এখানে সমস্যা। এই সম্পর্কে দুটি বিভিন্ন শ্রেণীর মত সাধারণতঃ দৃষ্টিগোচর হয়। এক-শ্রেণীর মত নিছক চিন্তাশক্তির সাহায্যেই কেবল পরম সত্তাকে জানা যায়, এই ধরণের মত প্রকাশ করে। অপর পক্ষে আর এক শ্রেণীর মত আছে, যারা চিন্তাশক্তির পারমার্থিক সত্তা সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণের যোগ্যতায় সবিশেষ সন্দেহ আসে। তাঁরা ভিন্ন উপায়ে তার জ্ঞান আহরণের ব্যবস্থা করেন। অনুভূতি বা প্রত্যক্ষ দর্শন বা ধ্যানশ্রেণীর কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। এই দুই শ্রেণীর মতের প্রথমটিকে আমরা জ্ঞানমার্গ ও দ্বিতীয়টিকে ধ্যান মার্গ বলতে পারি। আবার একটি তৃতীয় মতও এই হতে পারে যা কোন মার্গেতেই আস্থা স্থাপন করতে পারে না। সুতরাং তার মত এই দাঁড়ায় যে, পরম সত্তা জ্ঞানের গণ্ডির বাহিরে।

রবীন্দ্র-দর্শনে এই সমস্যার যা সমাধান পাই, তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে, এখানে এইটুকু বলা যায় যে, তিনি জ্ঞানমার্গের বিশেষ বিরোধী। জ্ঞান মার্গ যে একেবারেই নিরর্থক, তা তিনি বলেন না, তবে এই বলেন যে, জ্ঞানমার্গ আমাদের পরম সত্তার যে পরিচয় দেয়, তা বাহিরের পরিচয়, অন্তরের পরিচয় নয়, তা পরম সত্তার সহিত সম্পূর্ণ সংযোগ স্থাপন করতে অক্ষম। সম্পূর্ণ রূপে পরম সত্তাকে পেতে হলে চাই বিভিন্ন মার্গ, জ্ঞান বা চিন্তা-মার্গ সেকাজে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করে না।

এই সম্পর্কে তিনি, যাকে জানা ও যাকে পাওয়া বলে, তার প্রভেদ বিশ্লেষণ করেছেন। জ্ঞানমার্গের সাহায্যে আমরা যা পাই তা হল জানা, তা নিতান্তই বাহিরের জিনিষ। পরম সত্যকে জানা শুধু নয়, তাকে পেতে হবে, তাকে উপলব্ধি করতে হবে, তার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপন করতে হবে। সেই হল পাওয়া। এই পাওয়া জ্ঞানমার্গের নাগালের বাহিরে। এই সত্যকে পেতে, তিনি এইভাবে অনুভূতিজাতীয় এক নূতন

---

১ A genetic history of problems of Philosophy. Muralidhar Banerjee, Chap II.

ব্যবস্থার প্রয়োগ করেছেন। এ ব্যবস্থা যাকে যোগ বা ধ্যান বলি, ঠিক তাও নয়, যাকে নিছক অনুভূতি বলি, ঠিক তাও নয়। এ হল অনুভূতির যা শ্রেষ্ঠ বিকাশ, প্রেম শক্তি, তারই প্রয়োগ। পরম সত্তার সহিত প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন করে' তবেই তাকে সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায়। এই অভিনব পরিকল্পনার সবিস্তার পরিচয় না হলে, তাকে ঠিকমত হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। আবার তাঁর এই প্রেমমার্গের ভিত্তিই হল, তাঁর মূল দার্শনিক মতখানি। সুতরাং, রবীন্দ্র-দর্শনের মূল অংশের ব্যাখ্যার পূর্ব্বে তার সবিস্তার বর্ণনা সময়োপযোগী হবে না। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে যথাস্থানে এর সবিস্তার আলোচনা সন্নিবেশিত হবে।

মানসিক সমস্যাগুলির যে দ্বিতীয় সমস্যাটি রবীন্দ্রদর্শনে আলোচিত হয়েছে, তা হল বিশ্বের গঠনমূলক প্রশ্ন। অতি সহজ কথায় এই প্রশ্নকে এইরূপে স্থাপন করা যায়: বিশ্বের সংগঠক বস্তু মূলতঃ এক না বহু, বিশ্ব বহু বিশ্লিষ্ট উপাদান দিয়ে গঠিত, না তা একই ব্যাপক সত্তার আত্মপ্রকাশ? এই প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্র দর্শনে যে সমাধান পাই, তার মতে বিশ্ব বহু বিশিষ্ট বস্তুর দ্বারা গঠিত নয়, বিশ্ব একই বিরাট সত্তার প্রকাশ এবং সেই একক সত্তা ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট। এই সত্তাকে এইরূপ ব্যক্তিত্ব আরোপ আর কোন দার্শনিক করেছেন বলে জানা যায় না। এক্ষেত্রে, এই সমাধান সম্পর্কে এইটিই তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এর বেশী এই অধ্যায়ে বলবার প্রয়োজন নাই।

এখানে এইটি লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, আমরা যাকে মানসিক সমস্যা বলেছি, তার আলোচনার ক্ষেত্র অনেক ব্যাপক এবং কি জ্ঞান সম্পর্কে, কি বিশ্বের গঠন সম্পর্কে বা প্রকৃতি সম্পর্কে আরও অনেক মৌলিক প্রশ্ন আছে, যা সাধারণ দর্শনের আলোচনার বিষয়। সেই সকল প্রশ্নের বেশীর ভাগই রবীন্দ্র-দর্শনে আলোচিত হয় নি। কেবল যে দুটি হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপরেই দেওয়া হল।

অপর পক্ষে দর্শনের যা ব্যবহারিক সমস্যা, তার প্রধান দুটি সমস্যাই রবীন্দ্রদর্শনে সবিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। সে সমস্যা দুটি হল ধর্ম্মের সমস্যা ও নীতির সমস্যা। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যে সকল কর্ম্মগুলি আমাদের স্বেচ্ছাধীন, সেই সম্পর্কেই এই দুইটি সমস্যার উদ্ভব হয়। যে পরম শক্তি বিশ্বের নাট্যকে নিয়ন্ত্রিত করছেন, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের আকাঙ্ক্ষা মানুষের এক স্বাভাবিক বৃত্তি। মানুষের শৈশবের যুগ হতেই সে আকাঙ্ক্ষার অস্তিত্বের পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি। এই শ্রদ্ধা নিবেদন কিরূপ আকার গ্রহণ করবে, এই হল এ সম্পর্কে বিশেষ প্রশ্ন। কেউ বলবেন তা সাকার প্রতীককে অবলম্বন করে করা হক, কেউ বলবে না নিরাকার রূপেই তা সম্পাদিত হক, কেউ করবেন অন্য স্বতন্ত্র ধরণের কিছু ব্যবস্থা। রবীন্দ্রদর্শনে আমরা এই সমস্যার এক অভিনব সমাধানের চেষ্টা লক্ষ্য করতে পারি।

দর্শনের অপর ব্যবহারিক সমস্যা হল নৈতিক সমস্যা। আমাদের ইচ্ছাধীন যে কর্ম্মগুলির প্রভাব আমা ভিন্ন অপরে বর্ত্তায়, তাদের পরিচালিত করতে হবে, কোন্ নীতির দ্বারা—তাই হল নৈতিক সমস্যা। মোটামুটি মানুষের স্বার্থের সহিত, বিশ্বের স্বার্থের সংঘর্ষের সমাধান কিরূপে হতে পারে, এই প্রশ্নই এখানে আলোচনার বিষয়।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এখানে ধর্ম্ম-বিষয়ক সমস্যা এবং তথা নীতি-বিষয়ক সমস্যা, এই উভয় সমস্যারই এক সমাধান দেওয়া হয়েছে। উপাসনার পদ্ধতি কিরূপ হবে, তার উত্তরে আমরা যা পাই, তাই হল নীতি-বিষয়ক সমস্যারও সমাধান বটে।

যদিও বিশ্বের সর্ব্বত্রই তিনি এক পরম সত্তার আবিষ্কার আবির্ভাব করেছেন, তবুও তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, এই পরম সত্তা মানুষের নিকট একমাত্র মনুষ্যত্বের মধ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা সত্য-রূপে ও প্রত্যক্ষরূপে বিরাজমান। এই সম্পর্কে তিনি একটি উপমা প্রয়োগ করেছেন। কোন বিশেষ নারীর প্রকাশ নানারূপে। কোথাও তিনি কন্যা, কোথাও ভগিনী, কোথাও গৃহিণী, কিন্তু তাঁর সন্তানের নিকট তাঁর যে রূপটি সব থেকে প্রকট, সেটি হল তাঁর মাতৃরূপ। মাতৃরূপেই সন্তান তাঁকে হৃদয়ঙ্গম করে, অন্য রূপগুলি তাঁর কাছে বোধগম্য নয়। সেইরূপ মানুষের নিকট সেই পরম সত্তার প্রকটতম রূপটি হল বিশ্বমানব-রূপ। নিখিল মানুষের আত্মার মধ্যেই সেই পরমাত্মা নিকটতম অন্তরতমরূপে দেখা দেন। এইরূপে আসে রবীন্দ্রদর্শনে নর-দেবতার অপূর্ব্ব পরিকল্পনা।

এই নর-দেবতার সেবায় প্রতিদিনকার জীবনেই আমাদের সকল ইচ্ছাধীন কর্ম্মগুলিকে অবলম্বন করে তার শ্রেষ্ঠ উপাসনা-পদ্ধতির বিকাশ সম্ভব। কর্ম্মক্ষেত্রেই মানুষ সেই পরমাত্মার সঙ্গে অবাধ এবং পূর্ণতম মিলনের ও তাঁকে উপাসনার পূর্ণতম সুযোগ পায়। আমাদের কর্ম্মকে স্বার্থপরতা-দোষমুক্ত করতে হবে, তাকে বিশ্বজনীন করতে হবে। অর্থাৎ যা করব তার উদ্দেশ্য হবে, বিশ্বের সকল মানবের তা মঙ্গল আনুক। এই নীতির দ্বারা পরিচালিত কর্ম্মই হল বিশ্বজনীন কর্ম্ম এবং এই কর্ম্মই হল ব্রহ্মের উপাসনার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। বিশ্বজনীন কর্ম্ম অবলম্বনই তাঁর দর্শনে পূজাপদ্ধতির শ্রেষ্ঠ রূপ এবং নৈতিক জীবনের শ্রেষ্ঠ বিকাশ। এই হল নীতি ও ধর্ম্মের যুগ্ম সমস্যার একক সমাধান।

জয়পুর

শ্রীসুধীরকুমার মিত্র

জয়পুর রাজপুতানার অন্তর্গত একটি সুবিখ্যাত দেশীয় রাজ্য; ইহার উত্তরে বিকানীর ও পাতিয়ালা রাজ্য, পূর্ব্বে আলোয়ার ও ভরতপুর রাজ্য, দক্ষিণে গোয়ালিয়র ও উদয়পুর রাজ্য এবং পশ্চিমে যোধপুর ও বিকানীর রাজ্য। জয়পুর রাজ্য দৈর্ঘ্যে একশত আশী মাইল এবং প্রস্থে একশত কুড়ি মাইল; রাজপুতানার আরাবল্লী পর্ব্বত-মালা এই রাজ্যটিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া দিয়াছে ইহার পশ্চিম ভাগের বহুস্থানে বালুকাময় মরুভূমি ও পর্ব্বতশ্রেণী বিদ্যমান আছে। এই রাজ্যের পশ্চিম সীমায় 'ধুন্ধ' নামে একটি গিরি আছে, সেইজন্য প্রাচীনকালে এই স্থানকে 'ধুন্ধর' বলা হইত। 'ধুন্ধর' জনপদের তৎকালীন রাজধানীর নাম ছিল 'দেওসা' এবং বারগুজার রাজারা উক্ত স্থানে রাজত্ব করিতেন। তাঁহারাই রাজপুতনামে পরবর্ত্তী কালে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

জয়পুর রাজ্যের রাজধানী ও প্রধান সহরের নামও জয়পুর; সমগ্র রাজপুতানার মধ্যে এইরূপ সমৃদ্ধিশালী ও সুবৃহৎ নগর আর দ্বিতীয় নাই। ভারতের মধ্যে যতগুলি হিন্দুনগরী আছে জয়পুর তন্মধ্যে সুন্দর, মনোরম এবং সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্যস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। এইস্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্যও চমৎকার; সহরের তিনদিকে অত্যুচ্চ শৈলমালা এবং চতুর্দ্দিকের গাছপালার মধ্যে ময়ূর-ময়ূরীগণ নৃত্য করিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। বার্ষিক জলপাত চব্বিশ ইঞ্চি এবং তাপ সাধারণতঃ ছত্রিশ ডিক্রি হইতে একশত পনের ডিক্রি পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। 'রাজস্থানের' লেখক কর্ণেল টড্ লিখিয়াছেন—"বিদ্যাধর নামে একজন অদ্বিতীয় শাস্ত্রবিদ্ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ জয়সিংহের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, তাঁহারই পরামর্শানুসারে রাজা জয়সিংহ ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে স্বীয় নামে এই রাজধানী স্থাপন করেন। যে জয়পুর নগর আজ শোভাসৌন্দর্য্যে ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ মনোহর নগর বলিয়া প্রসিদ্ধ— তাহার আদর্শ মহানুভব বিদ্যাধর আঁকিয়া দিয়াছিলেন।"

জয়পুরের রাজারা আপনাদিগকে শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এই সম্বন্ধে প্রবাদ এইরূপ যে, কুশোয়া-বংশোদ্ভূত রাজা নল ৩৫১ সম্বতে এই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাদের 'পাল' উপাধি ছিল এবং বহুদিবস যাবৎ তাঁহারা এইস্থানে রাজত্ব করেন। রাজা নল হইতে তেত্রিশ পুরুষ পরে রাজা সুরসিংহ জন্মগ্রহণ করেন। সুরসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দুল্লাব রাও তাহার পিতৃব্যকর্তৃক রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হন। প্রবাদ এইরূপ যে, তাঁহার জননী পুত্রকে লইয়া 'ধুন্ধর' রাজ্যে অবস্থান করেন এবং পরবর্ত্তী কালে দুল্লাব রাও এই ধুন্ধর-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

মহারাজ দুল্লাব রাওয়ের ষষ্ঠ পুরুষে মহারাজ পুজন জন্মগ্রহণ করেন এবং দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের ভগিনীর সহিত তাহার বিবাহ হয়। পুজনের ত্রয়োদশ পুরুষে বেহারীমল্ল রাজা হন এবং তিনিই সর্ব্বপ্রথম বাবরের অধীনতা স্বীকার করিয়া এই বংশকে কলঙ্কিত করেন। তাঁহার পুত্র ভগবান্ দাস আকবরের বিশেষ বন্ধু ছিলেন এবং তিনি আকবরের পুত্র সেলিমের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দেন।

কোনার বাসের ইষ্টদেবতা 'শিলাদেবী' বিগ্রহের মূর্ত্তি—অম্বর

রাজা ভগবান্‌দাসের পূর্ব্বে কোন রাজপুত মুসলমানের হস্তে কন্যা দান করেন নাই।

ভগবানদাসের পুত্র মানসিংহ আকবরের প্রধান সেনাপতি ছিলেন এবং সম্রাট্ আকবরের জন্য বাঙ্গলা, আসাম ও উড়িষ্যায় যুদ্ধ করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন করেন এবং পরে তিনি বঙ্গ, বিহার, আসাম ও দাক্ষিণাত্যের শাসনভারও গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে জয়পুর রাজ্যের বহুবিধ উন্নতি হয়। মানসিংহ অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করেন বলিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র জয়সিংহ রাজা হন এবং তিনি

ঔরঙ্গজেবের পক্ষে মহারাষ্ট্রীর বীর শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার তৃতীয় পুরুষে 'সবাই' জয়সিংহ এই রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। মোগল সম্রাটের নিকট হইতে তিনি 'সবাই' উপাধি প্রাপ্ত হন। 'সবাই' অর্থাৎ অন্যান্য রাজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; এইরূপ উপাধি ভারতের অন্য কোন হিন্দু রাজা মোগল সম্রাটদের নিকট হইতে পান নাই।

তালপাহাড়ে হিন্দু মন্দিরের দৃশ্য

জয়সিংহ একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্‌, ও দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন ইঁহার রাজত্বকালে কাশী, দিল্লী, মথুরা, জয়পুর প্রভৃতি স্থানে মানমন্দির স্থাপিত হয়; অদ্যাপি উক্ত মানমন্দিরগুলি তাঁহার জ্যোতিষ ও গণিতশাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। জয়সিংহের বিদ্যাধর নামে এক বাঙ্গালী প্রধান মন্ত্রী ছিলেন; বিদ্যাধর শাণ্ডেল্য চক্রবর্ত্তীর বংশধর কি ধর্ম্মশাস্ত্র, কি স্মৃতিশাস্ত্র, কি জ্যোতিষ, কি ভূতত্ত্ব, কি পুরাণতত্ত্ব, কি যন্ত্রবিদ্যা, কি রাজনীতি—সকল বিষয়েই বিদ্যাধরের অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনিই জয়পুরের প্রাচীন রাজধানী 'অম্বর' হইতে স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া বর্ত্তমান 'জয়পুর' নামক স্থানে রাজধানী ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপন করেন এবং এই নূতন রাজধানী মহারাজ জয়সিংহের নামানুসারে জয়পুর বলিয়া অভিহিত করেন। এই নূতন সহরের রাস্তা-ঘাট এবং হর্ম্ম্যাদির পরিকল্পনা তিনিই করেন। জয়পুরের সৌন্দর্য্য ও নির্ম্মাণ-পারিপাট্য ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া জগতের প্রত্যেক ভ্রমণকারী স্বীকার করিয়াছেন। এই মনোহর নগরের আদর্শ যে একজন বাঙ্গালীরই মস্তিষ্কপ্রসূত এজন্য আমরা গৌরব অনুভব করি।

পুরাতন অম্বর সহর পরিত্যাগ করিয়া নবকলেবরে জয়পুর সহর প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কিম্বদন্তী এইরূপ যে, এই রাজপুত-বংশধরদিগকে ছয়শত বৎসরের অধিককাল এক স্থানে বাস করিতে নাই। সেইজন্যই মহারাজা জয়সিংহ মন্ত্রীর পরামর্শানুযায়ী পুরাতন রাজধানী বর্জ্জন করেন। বিদ্যাধর সকল বিষয়ে জয়সিংহের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন; রাজনীতি বিষয়ে বিদ্যাধরের বিচক্ষণতা অতুলনীয় ছিল। যখন উদয়পুরের রাণা জয়পুররাজ্য করতলগত করেন, সেই সময় বৃদ্ধ মন্ত্রী বিদ্যাধর অবসর ভোগ করিতেছিলেন; শত্রুসৈন্য দ্বারে উপস্থিত হইলে জয়পুরের রাজা ঈশ্বরীসিংহ আত্মহত্যা করেন। রাণীগণ এই বিপদে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বিদ্যাধরের শরণাপন্ন হন চলৎশক্তিরহিত বৃদ্ধ বিদ্যাধরকে ঝুড়ি করিয়া প্রাসাদে আনয়ন করা হইলে একমাত্র বুদ্ধিকৌশলে তিনি ঈশ্বরীসিংহের বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রীকে এবং উদয়পুরের রাণাকে বন্দী করিয়া ইচ্ছামত সর্ত্তে সন্ধি করিয়া লন। তাঁহার বুদ্ধিকৌশলে জয়পুর রাজ্য বিনা রক্তপাতে সেই সময় রক্ষা পাইয়াছিল।

জয়পুর সহর একটি শুষ্ক হ্রদের উপর স্থাপিত; সহরের উত্তরাংশ প্রাচীন রাজধানী অম্বর নগরের সন্নিকটবর্ত্তী। সমগ্র সহরটি কুড়ি ফিট উচ্চ ও নয় - ফিট প্রশস্ত প্রাচীরদ্বারা পরিবেষ্টিত; সেই প্রশস্ত প্রাচীর মধ্যে সাতটী বৃহৎ সিংহদ্বার আছে এবং প্রত্যেক সিংহ-দ্বারের উপর দুইটি করিয়া আরাম-গৃহ ও তোপ রাখিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রত্যেক দ্বারের বহির্ভাগে একটি দরজা এবং সহরের দিকে ভিতরে আর একটি দরজা আছে। রক্তবর্ণ প্রস্তর-নির্ম্মিত সুদৃঢ় প্রাচীর শত্রুর আক্রমণ হইতে সহরটীকে রক্ষা করিবার জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রত্যেক সিংহদ্বারের নিকট সশস্ত্র পুলিশ পাহারা দেয় এবং রাত্রি বারোটা হইতে প্রভাতকাল পর্য্যন্ত উক্ত সিংহদ্বারগুলি পূর্ব্বপ্রথানুসারে বন্ধ থাকে। সুতরাং রাত্রি বারোটার পরে সহরের ভিতর প্রবেশ করিবার কাহারও উপায় নাই। ইংরাজ-রেসিডেন্টের আবাস-ভবন সহরের বাহিরে নির্দ্দিষ্ট আছে বলিয়া তাঁহার গৃহে যাইবার একটি দরজা রাজাদেশে খোলা থাকে। সহরটী দৈর্ঘ্যে দুই মাইল এবং প্রস্থে বার মাইল, সহরের মধ্যস্থলে রাজপ্রাসাদ ও প্রমোদ উদ্যান অবস্থিত। নগরের মধ্য দিয়া ছয়টী প্রশস্ত রাস্তা আছে এবং প্রত্যেকটি রাজপথই বেশ সুপ্রশস্ত।

সহরের মধ্যে রাস্তাগুলির উপর যে সমস্ত অট্টালিকা আছে, সেগুলিকে এক একটি প্রাসাদ বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। প্রত্যেক গৃহ-নিম্নে সুসজ্জিত বিপণীশ্রেণী রাজপথের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। দুইটি প্রশস্ত রাস্তা যেস্থানে মিলিত হইয়াছে, সেইস্থানে পাষাণ-মণ্ডিত উৎসশোভিত কৃত্রিম জলাধার আছে এবং সেইস্থানেই চকের সৃষ্টি হইয়াছে। এই চক বাজারে ক্রেতাগণ

জিনিষপত্র খরিদ করিবার জন্য সমবেত হয়। রাস্তার দুইধারে ফুটপাত, তাহার পর গাড়ী-বারান্দা, তাহার পর বিপণীশ্রেণী। বিপণীগুলি শ্বেত-প্রস্তরের বাসন, প্রস্তরের দেবদেবীর মূর্ত্তি, বিভিন্ন জীবজন্তুর মূর্ত্তি, পিত্তলের রকমারী বাসন এবং রঙ্গীন কাপড়ের দ্বারা সজ্জিত আছে। এইরূপ প্রশস্ত রাজপথ এবং সজ্জিত বিপণীগুলি সহরের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করিয়াছে।

জয়পুরের রাজপ্রাসাদ সহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত; এবং এই প্রাসাদটী সহরের এক-সপ্তমাংশ স্থান অধিকার করিয়া আছে। ত্রিপোলিয়া ফটক অতিক্রম করিলে প্রাসাদ দৃষ্ট হয়। রক্তবর্ণ-প্রস্তরে নির্ম্মিত এই বিরাট প্রাসাদ একটি দর্শনীয় বস্তু; প্রাসাদের ফটকের দুইদিকের দুইটী রাস্তা মানমন্দির, হাওয়া মহল এবং রাজবাটীর দপ্তরখানার দিকে গিয়াছে।

প্রাসাদের প্রাঙ্গণের সম্মুখে 'চন্দ্রমহল' নামক অট্টালিকার শিল্পনৈপুণ্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ইহারই মধ্যে মহারাজের অন্তঃপুর অবস্থিত। চন্দ্রমহলের উপরিভাগের স্তম্ভচূড়া সমগ্র স্থানটীকে সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছে। চন্দ্রমহলের পশ্চাতে পুষ্পশোভিত উপবন এবং তাহার পার্শ্বে গোবিন্দজীউর মন্দির সমগ্র স্থানটীকে পবিত্র করিয়া দিয়াছে। মন্দিরের বামদিকে সুচিত্রিত অট্টালিকাগুলির মধ্যে রাজকর্ম্মচারীদিগের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট আছে।

চন্দ্রমহলের উত্তর দিকে দ্বিতলের অস্ত্রাগারে জয়পুরের রাজারা যে সমস্ত অস্ত্র ব্যবহার করিতেন সেগুলি সযত্নে রক্ষিত আছে। প্রাচীনকালের তীর-ধনুক, তলোয়ার হইতে আধুনিক কালের অস্ত্রাদি পর্য্যন্ত এইস্থানে দৃষ্ট হয়। মহারাজ মানসিংহের ব্যবহৃত তরবারিখানিও এইস্থানে দর্শকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অস্ত্রাগার অতিক্রম করিলে চিত্রাগারে রক্ষিত রাজাদের সুবৃহৎ চিত্রগুলি দেখিতে পাওয়া যায়।

'দেওয়ান-ই-খাস' ভবনে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অভ্যর্থনা ও রাজা মহারাজাগণের দরবার ও মন্ত্রণাকার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। এইরূপ সুসজ্জিত ও মনোমুগ্ধকর ভবন জয়পুরে খুব অল্পই আছে।

দরবার-হলের পূর্ব্বদিকে জয়পুরের মানমন্দির অবস্থিত। এই যন্ত্রের সাহায্যে বার,তিথি, নক্ষত্র জানিতে পারা যায়। মান মন্দিরের নিকটে অশ্বশালায় বিভিন্ন রংয়ের অশ্ব এক একটী আস্তাবলে রক্ষিত আছে। সাদা রংয়ের অশ্বগুলি একটী আস্তাবলে, কাল রংয়ের অশ্বগুলি অন্য একটী আস্তাবলে,—এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন রংয়ের অশ্ব বিভিন্ন স্থানে রাখা হইয়াছে এবং দুইটী ভিন্ন রংয়ের অশ্ব এক স্থানে কখনও দেখিতে পাওয়া যায় না।

'হাওয়া-মহল' জয়পুরের একটী দর্শনীয় অট্টালিকা; এই মনোহর অট্টালিকার নির্ম্মাণকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য গবাক্ষ-শোভিত ও বিভিন্ন রংয়ের প্রস্তর-সংযুক্ত এই সুবৃহৎ অট্টালিকা এই স্থানের সৌন্দর্য্য সহস্রগুণ বৃদ্ধি করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। অট্টালিকার মধ্যস্থিত কক্ষগুলিকে সুশীতল করিবার জন্য প্রত্যেক কক্ষের মধ্যস্থলে কৃত্রিম ফোয়ারা স্থাপিত আছে। ইহার সম্মুখে জয়পুর মহারাজার কলেজ অবস্থিত। ইহার অনতিদূরে মহারাজার 'সুখ-নিবাস' বিদ্যমান আছে।

রাজপ্রাসাদের নিকটে কাছারীবাড়ী অবস্থিত; এই স্থানে জয়পুররাজ্যের যাবতীয় দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচারাদি অনুষ্ঠিত হয়। জয়পুরের মহারাজা এই রাজ্যের প্রজাদিগের দণ্ডমুণ্ডের একমাত্র কর্ত্তা এবং যাবতীয় বিচার তাঁহার ইচ্ছাধীনে পরিচালিত হয়। শাসন-কার্য্যের সুবিধার জন্য জয়পুররাজ্যের চারিটী বিভাগ আছে—আইন-আদালত, রাজস্ব, সৈনিক ও বহির্বিভাগ; মহারাজার পরিষদের তিনজন প্রধান সদস্য উক্ত চারিটী বিভাগে কর্তৃত্ব করিয়া থাকেন। মহারাজা অহিফেন ও আবগারী ব্যতীত যাবতীয় পণ্যদ্রব্যের মাশুল তুলিয়া দিয়াছেন। যে সকল ষ্ট্যাম্প এই রাজ্যে বিক্রয় হয়, তাহা এইস্থানেই প্রচলিত; এতদ্ভিন্ন জয়পুরে প্রচলিত মহা-

হাওয়া-মহল—জয়পুর
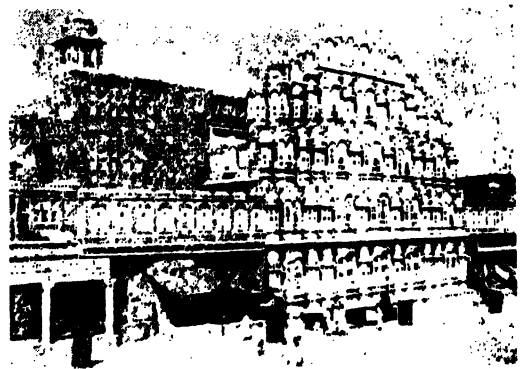
রাজার নামাঙ্কিত মুদ্রাদিও এই স্থানের টাঁকশাল হইতে বাহির হয়। পূর্ব্বে অম্বরে টাঁকশাল ছিল কিন্তু বর্ত্তমানে জয়পুরেই টাঁকশাল হইয়াছে।

· জয়পুরে গোবিন্দজীউর বিগ্রহ সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে বৃন্দাবন হইতে আনয়ন করিয়া এই স্থানে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা হয়। রূপ গোস্বামী বৃন্দাবনের যোগপীঠ নামক স্থানে গোবিন্দজীউর বিগ্রহ আবিষ্কার করিয়া প্রতিষ্ঠা

করেন। অম্বরের রাজা মানসিংহ বঙ্গবিজয়ের পূর্ব্বে পথিমধ্যে বৃন্দাবনে গোবিন্দজীউকে দর্শন করিয়া তাঁহার কোন সুন্দর মন্দির না থাকায় ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে নিজ-ব্যয়ে বৃন্দাবনে গোবিন্দজীউর অপরূপ কারুকার্য্যখচিত এক বিরাট মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। কথিত আছে যে, মন্দিরের চূড়ায় এক মণ ঘৃত দিয়া একটি বিরাট প্রদীপ প্রত্যহ জ্বালান হইত এবং উহার আলোকরশ্মি বহুদূর

এলবার্ট-হল -জয়পুর

হইতে দৃষ্ট হইত। বৈষ্ণবগণ প্রেমময় ভগবানের মন্দিরের আলোক দেখিয়া গোবিন্দপ্রেমে মুগ্ধ হইতেন।

১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ আওরঙ্গজেব আগ্রার ময়ূর সিংহাসনে আসীন হইয়া একদিন বৃন্দাবনে গোবিন্দজীউর মন্দিরের আলোকরশ্মি দেখিতে পাইলেন। অনুসন্ধানে উহা হিন্দুদিগের মন্দির শুনিয়া তিনি উহাকে মসজিদে রূপান্তরিত করিবার বাসনা করেন। তাঁহার অসৎ অভিপ্রায়ের ইঙ্গিত পাইয়া দরবারের হিন্দুগণ গোপনে বৃন্দাবনের গোস্বামীদিগকে সংবাদ পাঠাইলেন। তখন জয়পুরের রাজার সাহায্যে গোস্বামিগণ গোবিন্দজীউ,মদন-মোহন ও গোপীনাথের বিগ্রহগুলিকে জয়পুরে স্থানান্তরিত করিলেন। অনতিবিলম্বেই মোগলসেনা আসিয়া শ্রীবৃন্দাবন ধ্বংস করিল এবং হিন্দু মন্দিরগুলিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া বিজয়-উল্লাসে গোবিন্দজীউর মন্দিরকে মসজিদে রূপান্তরিত করিল ; ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট্ আওরঙ্গজেব উক্ত মসজিদে নামাজ পড়িয়া মুসলিম ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিলেন !

রাজা 'সবাই' জয়সিংহ উক্ত বিগ্রহগুলি এবং গোস্বামী-দিগকে যত্নের সহিত নিজ রাজ্যমধ্যে লুকাইয়া রাখেন এবং পরে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেবতাদিগকে প্রতিষ্ঠা করেন এবং গোস্বামীদিগকে বংশানুক্রমে পূজক নিযুক্ত করিয়া যান। তদবধি এই সমস্ত বিগ্রহের সেবক বাঙ্গালীগণই আছেন। রাজসরকার হইতে পূজা এবং সেবকগণের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য মহারাজা বহু জায়গীর প্রদান করিয়া যান। শ্রীরাধাগোবিন্দজীউর যুগলমূর্ত্তি রৌপ্যনির্ম্মিত পত্রপুষ্পশোভিত কুঞ্জবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত এবং উহা লম্বায় প্রায় পাঁচহাত হইবে। খালি মাথায় মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না এবং প্রণামী প্রদান করিয়া ভক্তগণ সাধারণতঃ ভোগ গ্রহণ করেন।

গোপীনাথজীউর মন্দিরও উদ্যানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। এই প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দিরের গাত্রে বিবিধ রংয়ের প্রস্তর খোদিত আছে। গোপীনাথ জীউর বিগ্রহ কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত এবং রাধিকার মূর্ত্তি ধাতুনির্ম্মিত। গোবিন্দজীউর মন্দির অপেক্ষা এই মন্দিরের গঠনপ্রণালী ক্ষুদ্র, কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এই দেবালয় দুইটির সৌন্দর্য্য বহু অংশে বৃদ্ধি করিয়াছে এবং আনন্দের বিষয় যে, অন্যান্য তীর্থস্থানের ন্যায় এই স্থানে কোনপ্রকার ভেট দিতে হয় না।

জয়পুরের পশুশালার একটী বিশেষত্ব যে, পশুশালার জীব-জন্তুদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয় না। ব্যাঘ্র, সিংহ, ভল্লুক, হরিণ, বনমানুষ, বনের প্রভৃতি জন্তুগুলিকে ছাড়িয়া রাখা হইয়াছে এবং পরিখা কাটিয়া উহাতে জলপূর্ণ করিয়া রাখা হইয়াছে বলিয়া তাহারা পলাইতে বা অন্য স্থানে যাইতে পারে না।

এই স্থানে 'রাম-নিবাস' নামক একটি সুন্দর উদ্যান আছে ভারতবর্ষে ইহার দ্বিতীয় নাই ; এইরূপ শিল্পকার্য্যময় উদ্যানকে উপবন বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। মহারাজ রামসিংহ এই উদ্যান নির্ম্মাণ করাইয়া সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য ইহা নির্দ্দিষ্ট করেন। তাঁহার নামানুসারে ইহা 'রাম-নিবাস' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এই উদ্যানের মধ্যে বিবিধ পত্র-পুষ্পের ও ফলের গাছ এবং কৃত্রিম ঝরণা, পুষ্করিণী, সেতু, লতাকুঞ্জ, অট্টালিকা মর্ম্মরমূর্ত্তি, খেলার মাঠ, যাদুঘর, হাঁসপাতাল প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে। উদ্যানের মধ্যে লর্ড মেয়োর একটী প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। দুইটি বৃহৎ অট্টালিকা উদ্যানের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে : একটী মেয়ো হাঁসপাতাল আর একটী এলবার্ট-হল। এলবার্ট হলের বারান্দায় চিত্রাগার প্রতিষ্ঠিত ; এই চিত্রাগারের 'দ্রোপদীর বস্ত্রহরণ' 'হনুমান কর্ত্তৃক লঙ্কা দগ্ধ' প্রভৃতি বৃহৎ সুন্দর তৈলচিত্রগুলি দর্শকগণের দৃষ্টি এবং চিত্ত উভয়ই যে আকর্ষণ করে, তাহা বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না।

এলবার্ট হলের মধ্যস্থলে জয়পুরের মিউজিয়াম অবস্থিত ; আয়তনে ইহা ক্ষুদ্র হইলেও ভারতের শিল্পজাত যাবতীয় দ্রব্য ইহার মধ্যে সংস্থাপিত আছে। মানুষের শারীরিক

গঠন প্রণালীর প্রতিকৃতিগুলি বিশেষ শিক্ষাপ্রদ এবং ধাতু-নির্ম্মিত দেবদেবীর মূর্ত্তিগুলিও দর্শন করিলে মোহিত হইয়া যাইতে হয়। এই মিউজিয়ামটী প্রতিষ্ঠা করিতে দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে বলিয়া স্মরণ হইতেছে; কিন্তু এই যাদুঘর উক্ত টাকায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নহে। যদি হইয়া থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, বিনা মজুরীতে নিশ্চয় লোক খাটান হইয়াছিল। আর এই যাদুঘরে পাম্পসু, সেলিমসু প্রভৃতি ভাল ভাল দেশী জুতা পরিয়া প্রবেশ নিষিদ্ধ; বুট জুতা বা ডার্বি, অক্সফোর্ড প্রভৃতি জুতা না পরিলে ইহার মধ্যে প্রবেশাধিকার পাওয়া যায় না। নগ্ন পদে প্রবেশ করা যায়। দেশী জুতার প্রতি এইরূপ আইনের তাৎপর্য্য কি বুঝিতে পারা যায় না। এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে তাহারা বলে যে, দেশী জুতার পেরেক লাগিয়া প্রস্তরের মেঝে খারাপ হইয়া যাইবে বলিয়া দেশী জুতা পরিয়া প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। অজ্ঞ দ্বারবানদিগের বোধ হয় বিশ্বাস যে বিলাতী জুতায় পেরেক থাকে না।

জয়পুর সহরের চার মাইল দূরে চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতমালা-বেষ্টিত একটী সুন্দর উপত্যকা আছে, ইহা 'গলতা' নামে প্রসিদ্ধ। প্রবাদ এইরূপ যে, গালব ঋষির এই স্থানে আশ্রম ছিল এবং তাঁহার নামানুসারে এই স্থানের নাম 'গলতা' হইয়াছে। এইস্থানে একটি সুন্দর সূর্য্যমন্দির আছে। 'গলতা' পাহাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; এই পাহাড়ের শিখরদেশের একটি প্রস্রবণ হইতে সত্তর ফিট নিম্নে জল একটী পুষ্করিণীর মধ্যে পড়িতেছে। ক্রীড়াশীল চঞ্চল গিরিনির্ঝর শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে পতিত হইতেছে দেখিয়া দর্শকগণের চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠে। এই জল হইতে দুইটী কুণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে এবং এই কুণ্ড দুইটী হিন্দুদিগের নিকট বিশেষ পবিত্র। গালব ঋষি প্রথম যে হোমাগ্নি জ্বালিয়াছিলেন অদ্যাবধি সেই হোমাগ্নি প্রজ্বলিত রাখা হইয়াছে এবং এই হোমাগ্নি চিরদিন জ্বালাইয়া রাখিবার ব্যবস্থাও রাজসরকার হইতে করা হইয়াছে। গলতা পাহাড় একটী দর্শনীয় স্থান ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

'অম্বর' জয়পুররাজ্যের প্রাচীন রাজধানী ছিল, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি; বর্ত্তমান জয়পুর শহর হইতে ছয় মাইল উত্তরে আরাবল্লী পর্ব্বতের মধ্যে অম্বর অবস্থিত। সর্ব্বপ্রথম কে এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন তাহা সঠিক জানিতে পারা যায় না। 'অম্বা' দেবীর নাম হইতে এই প্রাচীন সহরের 'অম্বর' নামকরণ হইয়াছিল। জয়পুরাধিপতি মহারাজ মানসিংহ এই নগর সুরম্য-প্রস্তরনির্ম্মিত অট্টালিকায় সুশোভিত করিয়াছিলেন। অম্বরের রাজপ্রাসাদ উচ্চ পর্ব্বতের নিম্নে একটী সমতল স্থানে নির্ম্মিত; প্রাসাদের পূর্ব্বদিকে সুবৃহৎ পুষ্করিণী প্রাসাদের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। পুষ্করিণীর পার্শ্বে সুদৃশ্য 'দিলারামবাগ', তৎপার্শ্বে রাজপথ। প্রাসাদের প্রত্যেক ঘরগুলির এক একটী নাম আছে, যথা, জয়মন্দির, সোহাগমন্দির, যশোমন্দির, সুখমন্দির প্রভৃতি। রাজপ্রাসাদের সৌন্দর্য্য আজও কিছুমাত্র ম্লান হয় নাই। রাজবাটীর দক্ষিণে উচ্চ পাহাড়ের উপর সুবিখ্যাত "জয়গড়"। এই স্থানে মহারাজ মানসিংহ তাঁহার বহুমূল্য সম্পত্তি তালাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন; সেই রত্নভাণ্ডার আজও সেইরূপ তালাবদ্ধ রহিয়াছে, কাহারও খুলিবার অধিকার নাই। সশস্ত্র পাহারা এই স্থানে সর্ব্ব সময়েই আছে এবং কিম্বদন্তী যে, এই রত্নভাণ্ডার খুলিলে রাজ্যের অমঙ্গল হইবে। এইস্থানে বঙ্গবিজয়ের চিহ্ন মানসিংহ স্থাপিত করিয়াছিলেন—তাহাও অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। অম্বর-দুর্গের প্রবেশপথ দেখিলে আগ্রার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

মহারাজ মানসিংহ বঙ্গবিজয়ের সময় কেদার রায়ের ইষ্টদেবী 'শিলা-মাতা'কে বিক্রমপুর হইতে ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে লইয়া যান, সেই দেবীপ্রতিমা আজও বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অম্বরে পূজিত হইতেছেন। বঙ্গদেশে এবং জয়পুরে এই প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, মহারাজ মানসিংহ যশোহরের বীর সন্তান দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম ভৌমিক

ত্রিপলী বাজারের প্রধান রাস্তার দৃশ্য—জয়পুর

মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করিয়া তাঁহার ইষ্টদেবী "যশোরেশ্বরী"কে অম্বরে লইয়া যান। এই সম্বন্ধে এমন কি, কবি ভারতচন্দ্রও লিখিয়াছেন—

"শিলা দেবী নাম ছিলা তাঁর ধাম
অভয়া যশোরেশ্বরী।
পাপেতে ফিরিয়া বসিলা রুষিয়া
তাহারে অকৃপা করি॥"

অথচ খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমায় 'ঈশ্বরীপুর' গ্রামে দেবী যশোরেশ্বরী এখনও বিরাজ করিতেছেন। দুই স্থানে যশোরেশ্বরী কি করিয়া বিরাজ করিতে পারেন, এই সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে খুলনার যশোরেশ্বরী নকল বলিয়াই বঙ্গবাসিগণ বিশ্বাস করিতেন। ১৩১১ সালে অধ্যাপক মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সর্ব্বপ্রথম প্রচার করেন যে, বঙ্গদেশ হইতে অম্বরে আনীত মূর্ত্তি বিক্রমপুরের কেদার রায়ের কুলদেবতা "শিলাদেবী", প্রতাপাদিত্যের "যশোরেশ্বরী" নহে। পরে ১৩১৩ সালে স্বর্গীয় নিখিলনাথ রায় এবং ১৩৩৭ সালে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মত সমর্থন করেন এবং ঐতিহাসিকগণের মতে অম্বরের বিগ্রহমূর্ত্তি কেদার রায়ের পাষাণময়ী "শিলাদেবী" বলিয়াই বর্ত্তমানে স্বীকৃত হইয়াছে।

অম্বর মহারাজা মানসিংহ-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই স্বাধীন বাঙ্গালা রাজার "শিলাদেবী" এবং তাঁহার মন্দির একটী

জয়পুরে আরাবল্লী পর্ব্বতশ্রেণীর দৃশ্য

বিশেষ দর্শনীয় বস্তু। মানসিংহ দেবীর সহিত বাঙ্গালী পূজারী ব্রাহ্মণ কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্যকে জয়পুরে লইয়া যান; কমলাকান্তের বংশধরগণ অদ্যাপি এই বিগ্রহের পূজক হইয়া আছেন।

শিলাদেবী অষ্টভুজা—মহিষমর্দ্দিনী-মূর্ত্তি; দেবীর কটিদেশ হইতে পদতল পর্য্যন্ত বস্ত্রালঙ্কারে এরূপ ভাবে আবৃত যে, নিম্নাংশে সিংহপ্রভৃতির মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না, অধিকন্তু সমগ্র মূর্ত্তিটী একটা ঘেরাটোপ দিয়া আবৃত বলিয়া মূর্ত্তির স্বরূপ বুঝা বড় কঠিন। দেবীর মস্তকের পিছনে একটী সুন্দর ছাতা আছে, উক্ত ছাতার কিনারায় পাঁচটী দেবমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। দক্ষিণ দিক হইতে মূর্ত্তিগুলি এইরূপে আছে—(১) গণেশমূর্ত্তি, (২) ব্রহ্মা-মূর্ত্তি, (৩) শিবমূর্ত্তি, (৪) বিষ্ণুমূর্ত্তি এবং (৫) কার্ত্তিকেয় মূর্ত্তি। বামদিকের হস্তে নিম্ন হইতে যথাক্রমে অসুরের কেশ, ধনু ও মহিষাসুরের জিহ্বা ধরিয়া আছেন এবং আর একটী হস্তে পূজক ফুলের তোড়া দিয়া থাকেন। দক্ষিণ দিকের হস্তে খড়্গ, ইহা মস্তকের পিছন দিয়া উপরে উঠিয়াছে; অন্যান্য হস্তে চক্র, ছুরিকা ও ত্রিশূল দিয়া যেন তিনি অসুরকে বধ করিতেছেন। মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি যেন আমাদের অভয় দিতেছেন বলিয়া মনে হয়। এই স্থান ব্যতীত জয়পুর রাজ্যের আর কোথাও পশুবলি হয় না।

মহারাজ মানসিংহ কেদার রায়ের প্রভাবতী দেবী নাম্নী এক কন্যাকে মহিষী করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। সম্রাট্ আওরঙ্গজেব-কর্ত্তৃক বৃন্দাবন লুণ্ঠিত হইবার সময় বহু বাঙ্গালী রাজপুতানার বিভিন্ন রাজ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন; জয়পুর তন্মধ্যে প্রধান। এই স্থানে বাঙ্গালীপ্রতিভার যে প্রথম হইতেই সম্যক্ আদর হইয়াছিল, তাহা বিদ্যাধরের নব-নির্ম্মিত জয়পুর শহর পরিকল্পনা হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীপদেও বাঙ্গালীদের মধ্যে তিনি প্রথম অধিষ্ঠিত হন। অতঃপর ২৪ পরগণার অন্তর্গত শ্যামনগরনিবাসী স্বর্গীয় কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হন। ১৮ ৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রথম জীবনে ইনি শিক্ষকতা করিতেন। জয়পুর স্কুলের উন্নতিসাধন মানসে তিনি জয়পুরে নীত হন এবং পরে জয়পুর রাজ-সরকারের অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হন। ক্রমশঃ তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হন এবং তাঁহার কর্ম্মকুশলতায় জয়পুর-রাজ্য বহুবার দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা পায়। ইঁহার মন্ত্রিত্ব কালে রাজস্ব ও শাসন-বিভাগে জয়পুররাজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। তিনি বহু বাঙ্গালীকে জয়পুরে আনাইয়া উচ্চপদে প্রতিষ্ঠা করেন এবং বাঙ্গালীগণ জয়পুরে যাইয়া তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিত। অতিথি-সৎকারের সেই পূর্ব্ব-রীতি আজও তাঁহার পুত্রগণ বজায় রাখিয়াছেন। তিনি ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। জয়পুরে কান্তিবাবুর 'বান্দা' প্রাসাদসম বিরাট অট্টালিকা এবং তাঁহার স্ত্রীর স্মৃতিসৌধ দর্শনীয় বস্তু।

তাহার পর স্বর্গীয় সংসারচন্দ্র সেনও প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হন। ইনি ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে আগ্রায় জন্মগ্রহণ করেন; উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া ইনি মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী হন এবং পরে মন্ত্রিত্ব করেন। ইঁহার মন্ত্রিত্ব-কালেও জয়পুররাজ্যের বহুবিধ উন্নতি হয় এবং তাহার ফলস্বরূপ তিনি ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে 'রাও বাহাদুর' এবং ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে 'সি-আই-ই' উপাধি লাভ করেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে জয়পুরে ইনি গতায়ু হন। জয়পুরে বাঙ্গালীটোলায় উচ্চপদস্থ বহু বাঙ্গালী বসবাস করেন এবং বাঙ্গালীদের নামে জয়পুরে কয়েকটী রাস্তাও

আছে—তন্মধ্যে 'সংসার সেন কো রাস্তা', 'মতি বাঙ্গালীকো রাস্তা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

জয়পুরে বাঙ্গালী গোস্বামীর গৃহে 'রাধাকৃষ্ণের' বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে; উক্ত ঠাকুর-বাড়ীগুলির জন্য কোনরূপ খাজনা লওয়া হয় না, অধিকন্তু বিগ্রহের সেবার জন্য রাজ-সরকার হইতে মাসিক বৃত্তি দেওয়া হয়। জয়পুরের রাজারা বহুদিন হইতে অনেক জায়গীর ও ব্রহ্মোত্তর এইরূপ দেব-সেবার জন্য দান করিয়া গিয়াছেন, উক্ত দানের পরিমাণ এককোটী টাকার উপর। জয়পুর রাজ্যের হিন্দু প্রজাগণ সকলেই নিরামিষাশী; যে সকল বাঙ্গালী রাজ সরকার হইতে বৃত্তি পান, তাঁহারাও মাছ-মাংস খান না, এমন কি তাঁহাদের গৃহে মাছ-মাংস প্রবেশ পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ। ময়ূর-ময়ূরীর নৃত্য জয়পুরের সমস্ত রাস্তায় দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু কেহ উহাদিগকে ধরিলে আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবেন। জীবজন্তু শীকার করাও নিষিদ্ধ; ছুঁৎমার্গ পরিহার করিতে হিন্দুগণ এখনও সমর্থ হন নাই এবং সেই জন্য মেথর, ধাঙ্গড় প্রভৃতিকে আজও ময়ূরের পালক গুঁজিয়া রাখিয়া রাস্তা দিয়া বিচরণ করিতে দেখা যায়। যদি কাহারও পালক না থাকে এবং কোন উচ্চবর্ণের হিন্দু তাহাকে ছুঁইয়া ফেলে, তাহা হইলে পালক না রাখিবার জন্য তাহার দণ্ড হয়। ছুঁৎমার্গ পরিহার করিতে পারিলে জয়পুর দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে সে শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিতে পারিবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। জয়পুরের প্রজাবৃন্দের ব্যবহার ও অতিথিপরায়ণতা চিরপ্রসিদ্ধ: এই হিন্দুরাজ্যের উত্তরোত্তর উন্নতি হউক, শ্রীবৃদ্ধি হউক ইহাই বঙ্গবাসীর কামনা।*

* প্রবন্ধের আলোকচিত্রগুলি শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ কর এবং শিলাদেবীর চিত্র শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ করের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

প্রিয়তমা তুমি নাহি ছিলে শুধু

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ সান্যাল, এম্-এ

প্রিয়তমা তুমি নাহি ছিলে শুধু—
ছিলে তুমি মোর গৃহিণী,
তোমারে হারায়ে সারাগৃহ মোর
হয়েছে আজিকে শ্রীহীন-ই!
যদিও গগনে উঠে শত তারা···
নাহি ফোটে তায় জোছনার ধারা,
ভুবন মগন হয় গো আঁধারে
চাঁদের কিরণ-বিহীন-ই।

প্রেয়সী আমার নাহি ছিলে শুধু—
ছিলে জীবনের সাথী গো,
সান্দ্র তিমিরে কণ্টক বনে
জ্বালায়ে রাখিতে বাতি গো!
ধূপের মতন নিজেরে দহিয়া
কত যে সুবাস ঢেলেছে ও হিয়া;
উজল করেছে নর্ম্ম লীলায়
আমার মাধবী রাতি গো!

গৃহিণী-সচিব লীলাসঙ্গিনী
সংসার-ক্লেশনাশিনী।
দ্বিতীয় হৃদয় ছিলে তুমি মোর
মৃদুল-মধুর হাসিনী।

হাসির উশীর প্রলেপ তোমার
করিত স্নিগ্ধ জীবন আমার,
বচনের সুধা হরে নিত ক্ষুধা
অয়ি অমৃতভাষিণী।

প্রিয়া তুমি মোর নহ আজি শুধু—
তোমারে বেসেছি ভিয়াৎে,
মূরতি তোমার ফুটাই আজিকে
কল্পনা-তুলি দিয়া সে?
নাহি আজি তব ব্যাধি আর জরা,—
চিরযৌবন রাজে তনুভরা।
মরণ পারে না করিতে হরণ—
নাহি পারে যেতে নিয়া সে।

সান্ধ্যক্ষণ

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

মলয় একরাশ বই, ছবি, ক্যাণ্ডবিল প্রভৃতি আনিয়াছিল। রাত্রে মা ঘুমাইলে, ধরিত্রী সুপ্তিমগ্না হইলে, মলয় আলো জ্বালিয়া সেগুলা লইয়া বসিল। একখানা কাগজ আলোর গায়ে জড়াইয়া দিয়া পাছে মা'র চোখে আলো লাগে, মার নিদ্রাভঙ্গ হয়, তাই আলো আড়াল করিয়া দিল। উদয়াস্ত—গভীর রাত্রি পর্যান্ত কি হাড়ভাঙ্গা খাটুনীই না মাকে খাটিতে হয়! কি সুন্দর চেহারা ছিল মা'র আর কি হইয়া গিয়াছে! মলয়ের চোখে জল আসিয়া পড়িতেছিল। চোখ মুছিয়া বইগুলা খুলিয়া পড়িতে বসিল।

আমার পাঠিকারাণি তুমি বিশ্বাস করিতে পারিবে কি না আমি জানি না, কিন্তু মলয়ের কচি বুক খানি যেন সুখে গর্ব্বে গৌরবে দশ হাত হইয়া উঠিতেছিল। তৃপ্তিতে বুক ভরিয়া উঠিতেছিল। মনে হইতেছিল এতদিনে তাহার জীবন সার্থক- সেও দেশের কাজ করিতেছে। দেশরক্ষাকাজে সেও অংশ লইতে পারিয়াছে। "স্বদেশ-রক্ষায় নারীর দানও অসামান্য"—ভাবিতে ভাবিতে মলয় যেন মোহাবিষ্ট হইয়া আসিতেছিল: দুটি পল্লব ভেদ করিয়া চোখে বারবার জল আসিয়া পড়িতে চায়। বাল্যকাল হইতে ছেলেদের বীরত্বের কাহিনী, সাহসিকতার গাথা যখন পড়িত বা লোকমুখে শুনিত তখন ভাবিত কেন তাহার নারীজন্ম হইয়াছিল। ছেলে হইয়া জন্মিলে সেও ত কত বড় বড় কাজ, সাহসের কাজ, বীরত্বের কাজ, শৌর্য্যের কাজ করিতে পারিত। ছার নারী জন্মে যে কিছুই করিবার নাই। ভাবিত আর মন খারাপ হইয়া যাইত। আজ এই কাগজগুলা এই বইগুলা পড়িতে পড়িতে তাহার সকল দুঃখ জুড়াইয়া গেল। "রাজপুত বীরাঙ্গনারা যুদ্ধযাত্রায় পুরুষকে উৎসাহ দিতেন, বর্ম্ম চর্ম্ম আঁটিয়া দিতেন ভারতের সে গৌরবময় দিনের কি চির অবসান হইয়াছে?" সঙ্গে সঙ্গে মলয়ের মনে হইল, না. অবসান হয় নাই! আমরা রাজপুত নারী না হইলেও ভারতের নারী, আমরা দেখাইব, ভারতের গৌরবরবি চিরউজ্জ্বল।

অন্তরের কোন না কোন সূক্ষ্মতন্ত্রী বোধ করি মানুষের অজ্ঞাতসারে দেশের কথায়, দেশের ব্যথায়, দেশের দুঃখে, দেশের বেদনায় ঝঙ্কৃত হইতে থাকে; মানুষ তাহা জানিতেও পারে না। হঠাৎ যেদিন সপ্তস্বরা বাজিয়া উঠে সেদিন তাহার আর বাধা বিপত্তি শুনিবার অবস্থা থাকে না; মাতালের মত, পাগলের মত ছুটিয়া বাহির হয়। মলয়ার আজ সেই দশা। কখন্ রাত্রি প্রভাত হইবে, কখন্ দেশসেবার প্রথম পাঠ লইবে—সে পাঠ কেমন, কেমন তার উন্মাদনা ভাবিতে ভাবিতে প্রহরের পর প্রহর কাটিতে লাগিল, না আসিল চোখে ঘুম, না বুঝিল ক্লান্তি।

মলয় এক একবার মা'র জীর্ণ সুন্দর সুপ্ত মুখখানির পানে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল আর ক্ষুদ্র স্বচ্ছ ও শান্ত একটী স্রোতস্বিনীর মত সূক্ষ্ম বারিধারা তাহার অন্তর প্রদেশ সিক্ত উর্ব্বরা করিয়া ধীরে বহিয়া যাইতেছিল, মার দুঃখ দূর করিতে পারিয়াছে ভাবিয়া তাহার হৃদয় যেন সন্তোষে ভরিয়া যাইতেছিল। কিন্তু চোখের জল কি আপদ। দুঃখের চিন্তাতেও তাহার বিরাম নাই, সুখের কথাতেও অবিরলধারে বুক ভাসিয়া যায়। এই চোখের জলে স্নান করিতে করিতেই বোধ করি একটু আলস্য আসিয়া পড়িয়াছিল, ক্ষণেকের জন্য। মলয় সজোরে তাহাকে দূরে ঠেলিয়া দিল। কিন্তু কি মধুর কি স্নিগ্ধ সেই স্বপ্নটুকু! মনে হইল পৃথিবীর আর এক প্রান্তে থাকিলেও সে আর সে এক। আজ তাহারা প্রাণে মনে এক হইয়া গিয়াছে কোথাও এতটুকু প্রভেদও আর নাই! মলয়ের সর্ব্বাঙ্গে পুলকের প্লাবন বহিয়া গেল; আর বসিয়া থাকিতে পারিল না। আলো যেমন জ্বলিতেছিল, তেমনই জ্বলিতে লাগিল: বই কাগজ যেমন ছত্রাকারে পড়িয়াছিল তেমনই রহিল। সে দ্রুত পদে শয্যায় ঢুকিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিয়া মা'র মুখে মুখ রাখিয়া শুইয়া পড়িল। মা'র ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মা বুঝিলেন, মলয় কাঁদিতেছে। মৃদু হস্তে, মেয়েকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিলেন; বলিলেন, কেন মা? কেন মা? কাঁদছিস্ কেন মা? মলয় কথার জবাব দিতে পারিল না; মুখটাকে মা'র বুকে আরও জোরে আরও বলে চাপিয়া ধরিয়া ফোঁপাইতে লাগিল। কথা কহিলে যদি সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়! চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া রহিল।

স্বপ্নে ও বাস্তবে কি এতটুকু মিলও থাকিতে নাই গা? যে কাজ করিয়া, তাহার অজ্ঞাত-অদৃষ্ট-আরাধ্য দেশের সেবা করিয়া জীবন ধন্য ও সার্থক করিতে পারিবে ভাবিয়া কিশোরী নীলাকাশের গায়ে লতায় পাতায় পুষ্পে শোভায় সৌন্দর্য্যে সমৃদ্ধ সুষমা অট্টালিকা গঠন করিয়াছিল, বাস্তবের সংস্পর্শে আসিয়া কি চূর্ণ বিচূর্ণই না হইয়া গেল! কোথায় তাহার সেই দেশ, কোথায় তাহার ভুবনমোহিনী দেশজননী? সে যে তাহার হৃদয়ের পুষ্পপাত্র ভরিয়া পূজার ফুল আনিয়াছিল, সে যে অন্তরের কমণ্ডলু পূর্ণ করিয়া জাহ্নবীর পূত বারি আনিয়াছিল, সে যে মনোবনের সুরভিত চন্দন কাষ্ঠে চন্দন ঘসিয়া, ধূপ-দীপ-আবীর-কুঙ্কুমে ডালা সাজাইয়া, নৈবেদ্য হাতে মন্দিরে ঢুকিয়াছিল, কোথায় সেই দেবী—সকল দেবীর প্রধানা দেবী তাহার জননী জন্মভূমি? মন্দিরের শুচিতা কোথায়, পবিত্রতা কই, শুদ্ধ শান্ত স্নিগ্ধ ভক্তিই বা কই?

সকলেই আসে, হাসে, খেলে, গান গাহে, গল্প করে; কলহ কোলাহল, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, স্বার্থের দ্বন্দ্ব, দ্বেষ বিদ্বেষ, অন্যশ্রীকাতরতা পৃথিবীর সর্ব্বত্র যেমন, এখানেও তাহাই। সেই জাতি বিরোধ, ধর্ম্মের বিভেদ, সাম্প্রদায়িক রেষারেষি, কই কিছুরই ত, অভাব নাই। অথচ মলয় শুনিয়াছে, শুনিয়াছে কেন, সত্যই ত ইহাদের মধ্যে অনেকে রণস্থলে গিয়াছে, নিজ নিজ চোখে যুদ্ধ দেখিয়াছে; আবার যে-দিন আহ্বান আসিবে, তন্মুহূর্ত্তে সেই মৃত্যু-মহোৎসবে যোগ দিতে যাইবে! দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে যাইতেছে, দেহের শেষ শোণিতবিন্দু পাত করিতে যাইতেছে! তাহাদের দেখিলেই আনন্দ হয়! মনে হয় ইহারাই ধন্য! ইহারাই দেশের সুসন্তান। দেশকে ইহারাই চিনিয়াছে, ভালবাসিয়াছে! বীরপ্রসবিনী ভারতবর্ষে আবার বীরপণা জাগিয়াছে! ভারতের দুর্দ্দিনের দুর্নামের অবসান ইহারাই করিয়াছে।

কিন্তু মলয় চারদিনের মধ্যেই হাঁপাইয়া উঠিল। সে কাজ খুঁজিয়া বেড়ায়, অন্যের কাজ যাচিয়া করিয়া দিতে চাহে; কিন্তু কাজই যে নাই তা করিবে কি? গ্ল্যাডিস হানা তাহাকে এড়াইয়া যায়, মলয় বেশ বুঝিতে পারে; কিন্তু কেন, তাহাই বোধগম্য হয় না। শৈবালনলিনী মাসীকে সে ঘৃণা করিতে সুরু করিয়াছে। তাহার কেবলই এক কথা, যা না! অমুকের সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আয় না। যা না অমুক ডিনারে ডাকছে, খেয়ে আয় না। ওরা দোলনা টাঙ্গিয়েছে, একটু আমোদ কর গে যা না বাছা। আরও বিতৃষ্ণা হইয়া গিয়াছে সেইদিন, যে-দিন মাসী অতীব সঙ্গোপনে সুখবর দিলেন যে মুরতি তোর জন্যে পাগল।

ছিঃ এমন জানিলে সে মরিতেও এখানে আসিত না।

একদিন, ক্যাম্পে ঢুকিতেই একজন আসিয়া বলিল, আমার একখানা চিঠি লিখে দিতে হবে। মলয় বিস্মিতনেত্রে তাহার পানে চাহিল; দেখিল, তাহার হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। বলিল, দোব।

তা' হ'লে আসুন, বলিয়া উভয়ে কয়েকপদ অগ্রসর হইতেই আর একজন ঝড়ের মত ছুটিয়া আসিয়া মলয়কে বলিল, আমি তোমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি। আমাদের কন্ট্রাক্ট ব্রীজে একজন পার্টনার কম পড়েছে, এসো। বলিয়া সে একেবারে হাত ধরিয়া হড় হড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। যে বেচারা চিঠি লিখাইয়া লইতে চাহিয়াছিল, মলয় তাহার পানে চাহিতে ব্যথা অনুভব না করিয়া পারিল না। তাহার কাতর করুণ মুখের পানে চাহিয়া বলিল, আমি ফিরে এসে আপনার চিঠি লিখে দোব। কেমন?

সে বেচারী কিছুই বলিল না; নীরবে চাহিয়া রহিল।

একটা বড় হল-ঘরে দুই দল ব্রীজে বসিয়াছে; অন্যত্র একদল পোকার খেলিতেছে; আর এক কোণে তিন চারটি মেয়ে ও চার পাঁচটি পুরুষ জটলা করিতেছে। মনে হইল তাহারা খবরের কাগজ বা বই পড়িতেছে কিম্বা ছবির বইর ছবি দেখিতেছে। মলয় ব্রীজ খেলা জানিত না; কণ্ট্রাক্টই বা কাহাকে বলে, তাহার নামও কোনদিন শুনে নাই। কাজেই যে খেলা সে জানে, সেই খেলায় বসিতে হইল। শৈবাল মাসীর বোনপোদের তাহাতে কোনই আপত্তি নাই; সময় কাটানো লইয়া কথা।

গ্ল্যাডিস্ কোথায় ছিল কে জানে। লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া মলয়ের পিঠে একটা থাপ্পড় বসাইয়া দিয়া বলিল, আ গেলো যা। আমি সারা ক্যাম্প খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছি আর তুই কিনা এখানে ব'সে তাস খেলছিস্! যাক্ দেখা হয়ে গেল, ভালই হোল; নইলে তোর বাড়ী ছুটতে হোত। শোন্, কাণে কাণে একটা কথা বলি।

মলয়কে একটু দূরে টানিয়া লইয়া গিয়া বলিল, আজ দলমা পাহাড়ে পিকনিক্, বিকেল পাঁচটায় যেতে হবে, তৈরী থাকিস্, তোর বাড়ী থেকে পিক্ আপ করবো।

কখন ফেরা হবে?

গ্লাডিস্ হাসিয়া বলিল, কেন লো, ফেরার খবর আগেই কেন? বলিয়া মলয়ের কাণের উপরে মুখ রাখিয়া আবার বলিল, আশাপথ চেয়ে সাঁঝের বেলা কেউ ব'সে থাকবে না কি?

দূর, তা নয়। মা ভাববেন না?

কচি খুকী আর কি, বলিয়া তাহার চিবুকটা ধরিয়া নাড়িয়া দিয়া গ্লাডিস্ চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে একটা বিরাট কলরব উঠিল। শৈবাল মাসীর বোনপোরা তারস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, আমাদের হিংসা হচ্ছে, আমাদের হিংসা হচ্ছে! গ্ল্যাডিস্ জানাই সুখী। গ্ল্যাডিস্ তাহার ঐ হাতখানা আমাদের বুকে ঘষে দিয়ে যাক্। আমরা ধন্য হয়ে যাই।

মলয়ের কেমন যেন ভয় করিতেছিল। এই বীভৎস অট্টহাস্যের পশ্চাতে আরও বীভৎসতা আত্মগোপন করিয়া আছে কি-না ভাবিতে ভাবিতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু অল্প কিছুক্ষণ পরেই সে ভাব কাটিয়া গেল। যেমন খেলা চলিতেছিল আবার খেলা চলিতে লাগিল।

ডিউটীর অবসানে সে যখন বাড়ী যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল, মেজর সরফুদ্দিন ইংরাজীতে কহিল, মলয়, আমাদের ট্রাক ঐ দিকেই যাচ্ছে, তুমি তাতেই বাড়ী যাও। তোমার বাড়ীটা আমাদেরও চিনে রাখা দরকার, বিকেলে তুলতে হবে।

মলয় বলিল, কিন্তু আমার দেরী হবে বাড়ী যেতে। দু' নম্বর ক্যাম্পে একখানা চিঠি লিখে তবে বাড়ী যাব।

দু' নম্বর ক্যাম্পে কার চিঠি লিখে দিতে হবে? ফ্রাঙ্কের? যার হাত অপারেসন হয়েছে ত! আরে! ও একটা বদ্ধ পাগল, কোন চুলোয় কেউ নেই ওর, অথচ রোজ দশখানা ক'রে চিঠি লিখতে হবে।—বলিয়া বক্তা প্রবল হাস্য করিল এবং তাহার সমর্থনসূচক বহু লোকের হাসিতে ঘর আবার অট্টহাস্যপূর্ণ হইয়া উঠিল। বক্তা কহিল, চিঠি থাক্, তুমি এই দিক দিয়ে বেরিয়ে চুপসে ট্রাকে উঠে পড়গে।

মলয় মাথা নাড়িয়া বলিল, আমি ওঁকে ব'লে এসেছি, চিঠি লিখে দিয়ে যাব। এই কথাগুলি এমনই দৃঢ়স্বরে সে উচ্চারণ করিল যে ঘরশুদ্ধ লোকের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে ইহার নির্দ্দিষ্ট পথ হইতে ইহাকে নড়ানো খুব সহজ নহে। বাহিরটা দেখিতে কোমল বটে, ভিতরটা লৌহসম কঠিন! মলয় নিঃশব্দে বাহির হইয়া গিয়াছিল। ইহারা তাহারই পানে চাহিয়া মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল। মলয় দৃষ্টি-চক্রের বহির্ভূত হইলে ইহারা একটা গোপন পরামর্শ সমিতিতে বসিয়া গেল।

ফ্র্যাঙ্ক এক ঘরে একা খাটিয়ায় শুইয়া পড়িয়াছিল। খাটের পাশে একটা জানালা। খোলা জানালা দিয়া যতদূর দেখা যায়, ধূ ধূ মাঠ—দ্বিপ্রহরের রৌদ্রদগ্ধ মধ্যাহ্নে মরুভূমির মত দেখাইতেছিল। ফ্র্যাঙ্কের দৃষ্টি সেই দিকেই নিবদ্ধ ছিল, মলয়ের আগমন সে জানিতে পারে নাই। মলয় যখন তাহার পার্শ্বে আসিয়া স্নেহস্বরে কহিল, "কৈ, কি চিঠি লিখতে হবে বলছিলেন যে"—ফ্র্যাঙ্ক চমকিত হইয়া উঠিল। শশব্যস্তে শয্যায় উঠিয়া বসিয়া বলিল, তুমি যে আসবে তা আমি ভাবিনি। বসো, আমি কাগজ কলম বার ক'রে দিই।

খাটের নীচে [illegible]াহার একটা বড় বাক্স ছিল, বাম হস্তে সেটাকে টানাটানি করিতেছিল, বাহির করিতে পারিল না দেখিয়া, মলয় বলিল, আপ[illegible]ি স[illegible]ন, আমি টেনে দিচ্ছি।

থ্যাঙ্কস্ বলিয়া ফ্র্যাঙ্ক সরিয়া দাঁড়াইল। ফ্র্যাঙ্ক মদ্র-দেশীয় ভারতীয় খৃশ্চান। দেশে তাহার মা, দু'টি ভাই ও একটি ছোট বোন্ আছে। আসিবার সময় মা'র নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া আসিয়াছিল, সম্ভব হইলে রোজ একখানি করিয়া চিঠি লিখিবে। তিন চার দিন চিঠি লেখা হয় নাই, তাহার হাত অপারেসন হইয়াছে। কয় দিনই সে অনেককে অনুরোধ করিয়াছে, সকলেই আসিবে বলিয়া গিয়াছে, কিন্তু আসে নাই। আমোদ-প্রমোদ, গাল-গল্প, খেলা-ধূলা ফেলিয়া কে আসিবে? সে বলিতে লাগিল, মলয় চিঠি লিখিল। শেষকালে লিখিল, "মা আমার হাতে একটি মস্ত ফোঁড়া হইয়াছিল। ডাক্তার অস্ত্র করিয়া দিয়াছে, তাই অগস্মার মত আমার একটি বোনকে দিয়া এই চিঠি লিখাইলাম। আমার এই বাঙ্গালী বোনটি ও অগস্মা—যেন দুই যমজ বোন।

চিঠি শেষ করিয়া মলয় জিজ্ঞাসা করিল, অগস্মা কে?

আমার বোন; ঠিক তোমারই মত।

তারপর বলিল, আর একখানা বাকী রহিল, থাক্, বৈকালে হইবে।

মলয় বলিল, বৈকালে আমি আর আসিব না। বলেন ত এখনই লিখি। না হয়—

কাল হইবে। কিন্তু আসিবে না কেন? আমি ভাবিতে-ছিলাম, বৈকালে তোমার সঙ্গে আমার বাড়ীর গল্প বলিব আর তোমার বাড়ীর গল্প শুনিব। তুমি আমায় বাঙ্গলা পড়াইবে? আমার ভারি ইচ্ছা বাঙ্গলা পড়ি।—কথাবার্ত্তা, বলাবাহুল্য ইংরাজীতেই হইতেছিল।

বেশ ত!

মিস্ চ্যাটার্জ্জি—দ্বারের বাহির হইতে কে হুঙ্কার ছাড়িল। মলয় তাড়াতাড়ি উঠিয়া যাইতেছিল, তখনি আবার মনে পড়িল যে, ইহার কাগজ কলম প্রভৃতি বাক্সে তুলিয়া রাখিতে হইবে। দরজার কাছে গিয়া বলিল, এক মিনিট আসছি। ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত গুছাইয়া রাখিয়া ফ্রাঙ্কের নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

ট্রাকে আসিয়া বসিতেই প্রশ্ন, পাগলার চিঠি লেখা হলো?

মলয় স্পষ্ট জবাব না দিয়া বলিল, বৈকালে হবে বলেছি।

এই আর যায় কোথায়! বৈকালে কি করিয়া হইবে! বিকালে যে পিকনিক পার্টি। তাহাকে বাদ দিয়া পার্টি অসম্ভব। ও পাগলা থাক্। ইত্যাদি।

নিমেষ লাহিড়ী যিনি এক্ষণে নিমস্ লেহারী বলিয়া খ্যাত, তিনি ঘোরতর আপত্তি করিয়া ইংরাজীতে কহিলেন, না, না, সে কিছুতেই হইবে না, আপনি না আসিলে সমস্ত আনন্দই পণ্ড হইবে।

সঙ্গে সঙ্গে জয়েস কহিল, আজকের পার্টির তুমি হচ্ছ হোষ্টেস। বুঝলে না? হ্যা হ্যা হ্যা করিয়া হাসিয়া উঠিল। জয়েসের পিতা মাতা তাহার নাম জয়চন্দ্র সেন রাখিয়াছিলেন। জয়চন্দ্র, সাহেব হইয়া সর্ব্বাগ্রে দেশী নামটার হত্যাসাধন করিয়া পরে অন্যান্য সাহেবিয়ানায় পাঠ লইতেছেন। জয়েস ইংরাজী জানে না লোকে বলে, কিন্তু সে যখন ইরাজী ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করিয়া যায়, তখন ইংরাজী সাহিত্যের সরস্বতী পর্য্যন্ত কবন্ধ ছাগবৎসের মত ছটফট করিতে থাকেন। জয়েসের ইংরাজীর নমুনা জানিতে কাহার না সাধ হয়? দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতে কি আমারই অসাধ?

ইউ সিং হার্ম্মোনিয়াম?

মলয় প্রশ্নটা না বুঝিয়া নীরব রহিল।

নো নট্? রাইট, ভিয়েলিন?

মলয় আরও নির্ব্বাক।

দ্যাট নো নট? অল রাইট, ইউ সিং শিওর?

তথাপি নিরুত্তর দেখিয়া জয়স্ বিরক্ত হইয়া কহিল, ইউ নো নো থিং। অল রাইট, ওন্‌লি ইউ নো ইট এণ্ড ড্রিঙ্ক। অল্ রাইট। ইট এণ্ড ড্রিঙ্ক—মেনি দেয়ার, বলিয়া রন্ধনশালা দেখাইল।

জয়েসের ফ্রেণ্ডস্-ইন-আর্ম্মস হাসিতে লাগিল, কারণ তাহারা তাহার অপরূপ ভাষাজ্ঞানের সহিত পরিচিত ছিল কিন্তু মলয়ের পক্ষে ইহার বিন্দু-বিসর্গের অর্থগ্রহ হইল না। একটি বর্ষীয়সী নারী-কর্ম্মী একপাশে বসিয়া টিপি টিপি হাসিতেছিলেন, মলয়ের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার বোধহয় দয়া হইল; তিনি বলিলেন, হাভিলদার জয়েস বলছেন তুমি গান-বাজনা কিছুই জান না, তবে কি শুধু খেতে জান!

ক্রোধে মলয়ের মুখ লাল হইয়া উঠিল। অসভ্য বর্ব্বরটা যেদিকে বসিয়াছিল, মলয় সেদিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল। বর্ব্বর তাহা বুঝিয়া অপূর্ব্ব ইংরাজীতে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতে বলিল, ডোণ্ট এঙ্গরী। মি ঢ় পাডন।

মলয় তবু এদিকে ফিরিল না। বর্ষিয়সী ব্যাখ্যা করিলেন, হাবিলদার জয়েস বলছেন, তুমি রাগ ক'রোনা; ক্ষমা ক'রো।

এই সময়ে ট্রাক্ বাড়ীর কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল, মলয় বর্ষিয়সীর উদ্দেশে কহিল, আমি এইখানে নামবো। কিন্তু মেজর সা বলিলেন, না, না, তা হবে না, আপনার বাড়ী আমরা দেখতে চাই, পাঁচটায় তুলতে হবে।

অগত্যা বাড়ীর দ্বারে গাড়ী থামাইতে হইল। মেজর সাহেব মলয়ের হাত ধরিয়া সুকৌশলে গাড়ী হইতে নামাইয়া বলিলেন, ঠিক ৫টা, বুঝলে?

তিন

পার্টিতে জয়েসের আদর-আপ্যায়নের চাপে পড়িয়া মলয়ের দম বন্ধ হইবার উপক্রম। মলয় চা খাইবে না, বেশী চা—সে কোনদিনই খায় না, জয়েস সরবৎ আনিয়া হাজির। কেকে ডিম থাকে, মলয় স্পর্শ করিল না, জয়েস রাউণ্ড বল্‌স লইয়া আসিল। পরে জানা গেল, দুপুরবেলা ট্রাকের মধ্যে তাহার ব্যবহারে মলয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, জয়েস এবেলায় প্রমাণ করিতে চাহে যে, তাহার উপর হইতে রাগ চলিয়া গিয়াছে। মলয় যখন বলিল যে সে রাগ করে নাই, তখন জয়েস আহ্লাদে ডগমগ হইয়া আরও অধিক—অত্যধিক আদর আপ্যায়নে নিরত হইল।

কিন্তু এ-কি হইল? মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে কেন? যেন পৃথিবী ঘুরিতেছে। যেন সে দেশ-দেশান্তরে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। যেন নূতন নূতন দৃশ্য, নূতন নূতন মানুষ, নূতন

নূতন ফুল, পাতা গাছ, যেন নূতন নূতন গান নূতন নূতন সুরে গীত হইতেছে। আবেশে তাহার চক্ষু মুদিয়া আসিতে চাহিয়াছিল: তবু জোর করিয়া চাহিয়া রহিল। গ্ল্যাডিস্ ফিরোজা রঙের আঙরাখার উপরে ফিরোজা ওড়না উড়াইয়া যখন নীলপরীর মত নাচিতে নাচিতে সভাস্থলে অবতীর্ণ হইল, তখন শত চেষ্টা সত্বেও মলয় আর চেয়ারে বসিয়া থাকিতে পারিল না। শৈবালমাসী নিকটেই ছিলেন।—তাই রক্ষা। নহিলে পড়িয়া গিয়া হাত-পা ভাঙ্গিতেও পারিত। মাসী ও আরও দু'তিন জন ধরাধরি করিয়া তাহাকে উদ্যান বাটিকার ভিতরে লইয়া গিয়া শোওয়াইয়া দিল।

ক্যাপ্টেন শৈবালনলিনী হরিতাল খুধু, সবই জানেন, সবই বুঝেন, সাহসও অনন্ত, উৎসাহ উদ্যমেরও অভাব নাই, তবু কি জানি কেন, ক্যাপ্টেনের মনের মধ্যে কেমন একটা টিপ্ টিপ্ শব্দ করিতেছিল। ভয় শব্দটির সহিত মাসীর জান্-পহ্চান না থাকিলেও আজ যেন ঈষৎ ভয় ভয় মনে হইতেছিল। মাসী মলয়কে আগলাইয়া বসিয়া থাকিবার বাসনাই করিয়াছিলেন, কিন্তু মেজর ও তাঁহার অন্তরঙ্গ সঙ্গীরা বারম্বার আশ্বাসিত করায় মাসী আনন্দ-সাগর সৈকতে ফিরিয়া চলিলেন। প্রস্থানকালে আধা রঙ্গে আধা ভয়ে কহিয়া গেলেন, সাবধান।

মলয়ের মনে হইতেছিল—সে এ 'কোর' হইতে সে 'কোর' - সে'কোর' হইতে অন্য 'কোরে' ঘুরিতে ঘুরিতে—ঘুরিতে শেষ পর্য্যন্ত সেই স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যেখানে সুধীন আছে। খুঁজিয়া পাওয়া কি সহজ? খুঁজিয়া পাইলেও দেখা করা কি ভয়ানক শক্ত। শেষ পর্য্যন্ত একজন সাহেব তাহার আগমনের কারণ জানিতে পারিয়া সাহ্লাদে সম্মত হইয়া সুধীনকে খবর দিয়া আনাইলেন এবং তাহার ফিয়াঁসির সঙ্গে নগর ভ্রমণের জন্য কয়েক ঘণ্টার ছুটিও মঞ্জুর করিলেন। সাহেব গল্পচ্ছলে বলিলেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তাঁহার প্রণয়িনী সুদূর সাউথ আফ্রিকায় গিয়া তাঁহাকে ধৃত করিয়াছিল। মলয়ের সঙ্গে তাহার খুবই সাদৃশ্য রহিয়াছে। তাঁহার প্রণয়িনী রেডক্রসের সঙ্গে গিয়াছিলেন। এই ভারতবর্ষীয় প্রেমিকা ওয়াক-সি'র বেশ ধারিয়া কান্ত সন্দর্শনে আসিয়াছে। সাহেব ভারি খুসী। ইঙ্গিতে গুড টাইম্ জ্ঞাপন করিয়া চলিয়া গেল। প্রস্থানকালে নদীতীরের শ্যামকুঞ্জবনটি দেখাইয়া দিল।

সুধীন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে-গানখানি সর্ব্বাধিক ভাল বাসিত, মলয় সুধীনের পার্শ্বে বসিয়া সুধীনের হাত ধরিয়া সুধীনের মুখের দিকে অপলকে চাহিয়া সেই গানখানি গাহিল। গান গাহিতে গাহিতে তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িতেছিল, বাষ্পাবেগে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, সুধীন তাহা বুঝিতে পারিয়া, মলয়কে টানিয়া তাহার মুখখানি নিজের মুখ দিয়া চাপিয়া ধরিল। এতক্ষণ যে বারিরাশি বিন্দু বিন্দু করিয়া ঝরিতেছিল তাহাই এক্ষণে উৎসাকারে প্রধাবিত হইতে লাগিল। কাঁদিয়া যে এত সুখ, এতই তৃপ্তি, ইহার পূর্ব্বে মলয় ত' কোনোদিন জানিতেও পারে নাই।

হঠাৎ মলয়ের মনে হইল, সুধীন যেন তাহাকে প্রাণপণ বলে চাপিয়া ধরিয়াছে। কৈ, আগে সুধীন এমন কাঠখোট্টা ছিল না। মিলিটারিতে ঢুকিয়াছে বলিয়া চিরদিনের স্বভাব ত্যাগ করিতে হইবে? মলয়ের মনে হইল, আস্তে আস্তে সুধীনের হাত দু'টা সরাইয়া দেয়। আবার ভাবিল, সুধীন যদি রাগ করে! তখনই মনে হইল, রাগ করিতে সে দিবে না। শুধু বুঝাইয়া দিবে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সামাজিক নিয়মে সে তাহার না হইতেছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত—ছি:!—বলিয়া মলয় তাহাকে একটু দূরে ঠেলিয়া দিয়া তাহার বেশবাস ভাল করিয়া সামলাইয়া লইল। সুধীন অভিমান ভরে কহিল, এই বুঝি ভালবাসা? এই বুঝি তুমি আমাকে ভালবাস? মলয় প্রথমটা কথা কহিতে পারিল না। সে সুধীনকে ভালবাসে কি-না সুধীন তাহাই জানিতে চাহিতেছে! আশ্চর্য্য বটে! সে যদি না তাহাকে ভালবাসিবে তবে এতদূরে আসিয়াছে কাহার জন্য? কাহাকে দেখিতে, কাহাকে পাইতে মলয় এই দূর অজানা অচেনা দেশে এত কষ্ট করিয়া, হাজার লোকের হাজার কথা, হাজার হাজার দৃষ্টি এড়াইয়া আসিয়াছে? আবার তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল: কথা কহিতে গিয়া দেখিল, কণ্ঠে স্বর নাই। মলয় সুধীনের বাম হাতখানি করপুটে তুলিয়া লইয়া অশ্রুসিক্ত-আননে সুধীনের পানে চাহিতে, তাহার সর্ব্বাঙ্গে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সুধীন কি এমনই পশুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে! মলয় তাহার হাতখানা সজোরে দূরে নিক্ষেপ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। লতাকুঞ্জ হইতে বাহির হইতে যাইবে ক্রোধভরে চলিতে গিয়া কিসে আঘাত লাগিয়া পড়িয়া গেল। ক্ষণপরে চক্ষু চাহিতে যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার হাত-পা মাথা সর্ব্বাঙ্গ ঝিম্ ঝিম্ করিয়া আসিল। পৃথিবী যেন পায়ের নীচে টলমল টলিতে লাগিল। কোথায় সুধীন? কোথায় সে তটিনীতীরের লতাকুঞ্জ? যে-লোকটা সেখানে ছিল, সে বলিল, উঠো না উঠো না, শুয়ে থাক আর একটু। তোমার শরীরটা ভাল নেই। আমি বরং তোমার গা-টায় হাত বুলিয়ে দিই। তুমি শুয়ে থাক।

বেশ আছি, বলিয়া মলয় উঠিয়া বসিয়া কহিল, আপনি এখানে কি করছেন? আর সকলে কোথায়?

লোকটা বেহায়া নির্লজ্জের মত বলিয়া ফেলিল, সকলেই ফুর্ত্তি করছে! তুমি আমার ভাগে পড়েছ।

মলয় চোখে অন্ধকার দেখিতেছিল। অসভ্য পশুটার কথাগুলো মনে মনে আবৃত্তি করিতে গিয়া তাহার জিহ্বা অগ্নিদগ্ধ হইয়া গেল।

লোকটা বলিল, ডার্লিং! শাড়ী, ব্রেসলেট, নেকলেস যা চাও, তাই দোব। আজই ফেরবার পথে সহরে গিয়ে কিনে দিয়ে তবে অন্য কাজ। বিশ্বাস না হয়, ওয়ালেট্‌টা তোমার কাছেই রাখ।—বলিয়া লোকটা পকেট হইতে ওয়ালেট্‌টা বাহির করিয়া খুলিয়া মলয়ের হাতে দিল। ওয়ালেট্‌টার ভিতরে গুচ্ছ গুচ্ছ নোট রহিয়াছে দেখা যাইতেছে। মৃদু হাসিয়া বলিল, নাও ধরো।

মলয় বলিতে গেল, আপনি কি ভেবেছেন—কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই, আর বলিতে পারিল না। রক্তক ঠোঁট দু'খানি কাঁপিল, চক্ষু দিয়া অগ্নি বিচ্ছুরিত হইল; কিন্তু একটি শব্দও বাহির হইল

না। মলয় বিস্ফারিত নেত্রে ঘরটা একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। ঘরের দ্বার জানালা সমস্তই বন্ধ।

লোকটা তাহার পাশেই দাঁড়াইয়াছিল; হাসিয়া—মলয়ের মনে হইল বুঝি পিশাচেও এমন হাসি হাসে না—বলিল, দর বাড়িয়ে আমার কাছে কোন লাভ নেই, ডার্লিং, আমি চিংড়ি মাছের খদ্দের নই যে দরদাম করবো। ওয়ালেট খুলে দেখ, দু'হাজার টাকার ওপর আছে। হারই বল, ব্রেসলেটই বল আর ব্যাঙ্গেলই বল—যথেষ্ট হবে। বরং তয়েও কিছু থাকবে। ভাল শাড়ী দু'চারখানাও হবে। আর বুঝতেই ত পারছ—কাকে বকে জানতে পারবে না। অন্য ভয়ও নেই, বিশ্বাস না হয় এই দেখ—বলিয়া লোকটা তাহার ট্রাউজারের পকেটে হাত পুরিয়া কি যেন হাতড়াইতে লাগিল।

মলয় ততক্ষণে তাহার মনোবল ফিরিয়া পাইয়াছে। মস্তিষ্ক যদিও দুর্ব্বল, তথাপি প্রাণপণ শক্তি সঞ্চয় করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, আপনি এই মুহূর্ত্তে যদি এখান থেকে না যান আমি অফিসার কমাণ্ডিংএর কাছে—

বা, ডিয়ার বাঃ! "বিজিয়া" প্লে দেখেছ?

—"করি যদি অঙ্গ পরশন
কি করিতে পার তুমি?"

মলয় কথা কহিতে পারিল না, ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

লোকটা হাসিয়া উঠিয়া বলিল, অফিসার কমাণ্ডিংএর কাছে যাবে! এই ত! তা' তর্কটা কষ্ট তোমাকে করতে হবে না। তিনি এই পাশের ঘরেই আছেন, বল ত আমিই ডেকে আনি। গ্লাডিসকে ত তুমি জান, সেই গ্লাডিসও আছে। বল ত ডাকি?

মলয় অবস্থাটা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছিল কি-না বলা যায় না, তবে এ সময়ে দুর্ব্বলতা দেখাইবে না—মনের মধ্যে এই দৃঢ়তা তাহার জন্মিয়াছিল, বলিল, আপনি যাবেন কিনা আমি তাই জানতে চাই?

যদি বলি, না?

আমি বলছি, আপনি এই মুহূর্ত্তে এখান থেকে দূর হোন! নইলে আপনার—বলিয়া যে ওয়ালেটটা শয্যার উপরে পড়িয়াছিল, সেইটা তুলিয়া লইয়া চীৎকার করিয়া বলিল, আপনি যাবেন না, যাবেন না? ভাল চান ত জান, নইলে আমি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে গিয়ে এই মণি ব্যাগ জমা দিয়ে বলবো—

আচ্ছা যাচ্ছি—ওটা দাও।

না। আপনি চলে যান আগে। তারপর বাহিরে গিয়ে সকলের সামনে এটা আমি আপনাকে দোব। আর না যান যদি—

লোকটা বোধ হয় ভয় পাইয়াছিল। শশব্যস্তে কহিল, যাচ্ছি, যাচ্ছি; ওটা দিয়ে দাও—চলে যাই।

বলেছি আমি, এখানে থাকতে আপনাকে ওটা দোব না।

পরে দেবে ত? বলিয়া এক গাল হাসিয়া লোকটা দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া গেল। মলয় ঘরের সমস্ত দ্বার জানালা খুলিয়া দিল। বাহিরে তখনও মৃদু আলো ছিল; ঘর অল্প আলোকিত হইতে দেখিল, দেওয়ালের গায়ে সুইচ বোর্ড। একটার পর একটা চাবি টিপিল, কিন্তু আলো জ্বলিল না। খোলা জানালা দিয়া দেখিল, ক্যাম্পের খানসামা চায়ের ট্রে লইয়া চলিয়াছে, ডাকিল, বয়।

বয় কাছে আসিলে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, অফিসার কম্যাণ্ডিং হইতে সকলেই এখানে আছেন, কেহই চলিয়া যান নাই। মলয় জিজ্ঞাসিল, ক্যাপ্টেন শৈবালনলিনী সেন আছেন? বয় অবজ্ঞাভরে কহিল, আছেন বৈ কি হুজুর, উনি থাকবেন না? বলিয়াই লোকটা মুখ টিপিয়া হাসিয়া ফেলিল! তারপর বলিল, মেম সাহেব, আপনি একলা যে!

প্রশ্নটির গুরুত্বপূর্ণ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে মলয়ের বিলম্ব হইল না। বলিল, আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, বয়।

বয় যে উত্তর দিল তাহা শুনিয়া মাথা কাটা যায়। বয় বলিল, ঘুমিয়ে ত পড়বেনই হুজুর। সরবতের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ দেওয়ার হুকুম আছে যে।—বয় একবার এদিক ওদিক সেদিক দেখিয়া লইল, কেহ কোথায়ও আছে কি-না; যখন দেখিল, নাই, তখন বলিল, ঘুমের মধ্যে কোন লোককে দেখতে পেলেন না হুজুর? কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই সে জিব কাটিল; পুনশ্চ কহিল, আমার দরকার কি সে সব কথায়! চা খাবেন হুজুর?

না বয়, আমার মাথাটা এখনও ঝিম ঝিম করছে, চা আমি খাবো না।

এক কাপ গরম চা খান হুজুর, মাথা খোলসা হয়ে যাবে। আপনি বসুন, আমি আনছি।

মলয় সেইখানে বসিয়া থাকা সঙ্গত বিবেচনা করিল না—কি জানি আবার কোন বিপদ উপস্থিত হয়! কিন্তু কোন্ দিকে বা কোথায় যাইবে স্থির করিতে না পারিয়া যে দ্বার দিয়া বয় ঢুকিয়াছিল এবং বাহির হইয়া গিয়াছিল সেই দ্বার ধরিয়া সামনের প্রাঙ্গণের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ষড়যন্ত্র যে কিরূপ গভীর এবং ইহা যে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার তাহাতেও কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। নিজের কাছেই নিজেকে যেন অত্যন্ত অশুচি মনে হইতেছিল। যদিও সে নিশ্চিত জানে—কলঙ্ক তাহাকে স্পর্শ করে নাই, তবু, তাহার দেহের উপর দিয়া নর্দ্দমার পোকা বেড়াইয়া বেড়াইতেছিল। বাড়ী গিয়া স্নান করিয়া মা'র পায়ের ধূলা মাথায় লইতে পারিলে, যদি অশুচি কাটে।

বয় চা লইয়া ফিরিয়া আসিল এবং কহিল, ক্যাপ্টেন সাহেব আসছেন হুজুর।

মলয়ের মুখ শুকাইয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ ক্যাপ্টেন সাহেব বয়?

কোন্ কাপ্তান আবার, সেই হারামজাদী—

লোকটা নিম্নজাতীয় মুসলমান, ঝোঁকের মাথায় কটু কথা উচ্চারণ করিয়া ফেলিয়াছে বটে, কিন্তু তখনি বুঝিতে পারিয়াছে যে অন্যায় করিয়াছে। বুঝিয়াই সে গালে মুখে চড়াইতে চড়াইতে কহিল, গোস্তাকি নেবেন না হুজুর। মাপি বড় নই! চোঙখর

সামনে যে কত ভাল ভাল ঘরের মেয়েকে —যাক্‌গে হুজুর।—হঠাৎ কথাটাকে ঘুরাইয়া লইয়া বলিল, নিন হুজুর চা নিন, বলিয়া চা-পাত্র হইতে চা ঢালিতে প্রবৃত্ত হইল। কথাগুলা বলা যে উচিত হয় নাই, তাহা বুঝিতে না বুঝিতে তাহার অন্তরাত্মা শুকাইয়া উঠিয়াছে। একটা বুড়ী কম দরে ক্যাম্পের লোককে ঘুঁটে বিক্রয় করে নাই এই অপরাধে, যুদ্ধের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ায় ঘুঁটে বিক্রেত্রীকে ছয় মাস সশ্রম কারাবাস ভোগ করিতে হইয়াছে। আর একটা লোক ক্যাম্পের সৈনিকদের সঙ্গে কলহ করিতে করিতে বলিয়াছিল, তোরা যুদ্ধ করতে যাচ্ছিস, না ঘোড়ার ঘাস কাটতে যাচ্ছিস? বেচারারও লাঞ্ছনার সীমা ছিল না। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছিল, যুদ্ধে প্রবৃত্ত সৈনিকদিগকে সে নিরুৎসাহ করিতে চেষ্টিত হইয়াছে। মাপিয়া এক শ হাত নাকে খৎ, ত্রেত্রিশবার কাণমলা, চুয়াল্লিশবার গালে চড় এবং পঞ্চান্নবার নাক ঘসিয়া তবে তাহার অব্যাহতি মিলিয়াছিল। ক্যাপ্টেন মাসীর কাণে যদি তাহার কথা কোন রকমে প্রবেশ লাভ করে, তাহা হইলে নুরুদ্দিন মিঞার কবরে ঢুকিতে অধিক বিলম্ব হইবে না। নুরুদ্দিন সতর্ক হইয়া পড়িল। তাই মলয় আর কোন কথাই শুনিতে পাইল না; তবে যতটুকু শুনিয়াছে তাহাই যথেষ্ট।

চা-পানান্তে, বাহিরে আসিয়া মলয় দেখিল, বৃক্ষতলে উজ্জ্বল আলোকে একটি ছোটখাট সভার মাঝখানে বসিয়া ক্যাপ্টেন শৈবালনলিনী বিবিধ অঙ্গভঙ্গী সহকারে বক্তৃতা করিতেছেন। মলয় নির্ভীক নিষ্কম্পপদে অগ্রসর হইয়া, মাসীর কাছে গিয়া বলিল, একটা কথা আছে, একবার এদিকে আসবেন?

মলয়ের গভীর কণ্ঠস্বরে মাসী একটু বিচলিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার বামকরধৃত চক্‌চকে ওয়ালেট্‌টি দেখিয়া সন্তোষ ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইল না। সরিয়া আসিয়া, একগাল হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, ভাব সাব হ'ল? মুরতি লোক খুবই ভাল, আমি জানি কি-না। তা' কি দিলে? ওলো, আমাকে বল্‌তে দোষ নেই লো!—মাসী কি একটা ছড়া কাটিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সহসা নিরস্ত হইয়া বলিলেন, বলি ছুঁড়ি, আমাকে লুকোলে ধর্ম্মে সইবে না লো, ধর্ম্মে সইবে না। বলি, এ-সব পেলি কার জন্যে, তাই ভেবে দেখ্‌না একবার। দেখি দেখি, কি দিলে?...বলিয়া মাসি সতৃষ্ণনয়নে ওয়ালেট্‌টার পানে চাহিতে লাগিলেন।

রোষে ক্ষোভে ঘৃণায় ও লজ্জায় মলয়ের বাকরোধ হইয়া গিয়াছিল। অন্ধকার না হইলে, মাসী তাহার চোখের অগ্নিদৃষ্টি দেখিতে পাইতেন। তাহার হাতে যে সেই ব্যাগটা আছে মলয় তাহাও ভুলিয়া গিয়াছিল। কেবল একটা কথাই তাহার মনে হইতেছিল, এই পাপপুরী হইতে কতক্ষণে মুক্তি পাইবে! বলিল, আমি বাড়ী যেতে চাই।

মাসী রঙ্গভরে কহিলেন, তা যাবি বই কি লো? কাজ আদায় হয়েছে আর কেন? কথাতেই বলে না, বামুন, বাদল, বান দক্ষিণে পেলেই যান্‌। তুই কি লো ছুঁড়ি, বামুন, না বাদল, না বান্‌? ঠিক ঠিক—মলয় চাটুয্যে, বামুনই ত' বটে।

মলয় কহিল, আপনি আমাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিন, নইলে—

মাসী হতভম্ব হইয়া পড়িতেছিলেন: সবিস্ময়ে কহিলেন, সে কি রে, এক্ষণি বাড়ী যাবি কি বল্‌, খাওয়া দাওয়া—

না।

মাসী খপ্‌ করিয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন, সরে আয়, সরে আয়, ওরা সব হাঁ করে চেয়ে রয়েছে আমাদের দিকে। কি হয়েছে বলবি আয় ত শুনি।

মলয় এক ঝাপটা দিয়া নিজের হাতখানা মুক্ত করিয়া লইয়া কহিল, আপনি গাড়ী ব'লে দেবেন কি না—

আমি গাড়ী কোথায় পাবো?

পেয়ে দরকার নেই, বলিয়া মলয় অন্যদিকে চলিয়া গেল। শৈবালনলিনী কয়েকমুহূর্ত্ত নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়া, "তাই ত, কি হ'ল বল ত'?" ভাবিতে ভাবিতে সভার উদ্দেশে পদচালনা করিয়া দিলেন।

কমান্ডিং অফিসার একজন গোরা। আর একজন গোরার সহিত বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। তাঁহাদের সম্মুখে ছোট একটি বেতের টেবিল। টেবিলে দুইটি কাচের গ্লাসে স্বর্ণবর্ণ পানীয় হইতে বিন্দু বিন্দু বুদ্বুদ উঠিতেছে। মলয় ঘরে ঢুকিয়াই আড়ষ্ট হইয়া গেল। সাহেবটি ভদ্রলোক: সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়েস্‌?

মলয়ের কণ্ঠের ধমনীও আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল, শব্দ বাহির হইল না। সাহেব বন্ধুর নিকট শিষ্টাচারসম্মত ক্ষমা চাহিয়া মলয়ের কাছে আসিয়া বিনীত কোমলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি আপনার জন্য কি কিছু করিতে পারি?

সাহেবের ভদ্র আচরণে মলয়ের সাহস ফিরিয়া আসিল, কথা ফুটিল: বলিল, একটা গাড়ী কিন্তু কথা শেষ করিতে পারিল না।

আফ্‌টার অল্‌! ইউ আর হিয়ার। লেট্‌ মি সি!

মুরতি আসিয়া মলয়ের হাত হইতে ওয়ালেট্‌টি ছিনাইয়া লইয়া অধ্যক্ষের পানে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, ভদ্রঘরের লোকেরাও আজকাল চুরি চামারি করিতে অভ্যস্ত হইতেছে তাহা ত জানিতাম না। সেই বিকালে আমার ওয়ালেট্‌টা হারাইয়াছে, আমি উহাকে কম করিয়া পাঁচবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি, ফি বারই অস্বীকার করিয়াছে। দু' মিনিট আগে, যখন আপনার ঘরে আসিতেছে, তখনও জিজ্ঞাসা করিলাম, বেমালুম 'না' বলিল! আশ্চর্য্য! ভাগ্যি ক্যাপ্টেন শৈবালনলিনী বলিলেন যে ২৬ নম্বরের শাড়ীর ভিতরে একটা ওয়ালেট্‌ চক্‌ চক্‌ করিতে তিনি দেখিয়াছেন, তাই ত' আমি সন্ধান করিয়া আসিতে পারিলাম। দাঁড়ান দেখি, সব ঠিক আছে কি না!—বলিয়া একখানা খালি চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া নোটের তাড়া বাহির করিয়া গণিতে আরম্ভ করিল। বার বার—তিনবার গণিয়া একবার মলয়ের পানে, একবার অধ্যক্ষের পানে চাহিয়া সন্দিগ্ধভাবে ঘাড় নাড়িতে লাগিল।

অধ্যক্ষ কহিলেন, ঠিক নাই?

মুরতি কহিল, একখানা এক শ' টাকার নোট যেন কম

হইতেছে। আর একবার দেখি, বলিয়া আবার গণিতে প্রবৃত্ত হইল।

অধ্যক্ষ মলয়কে বলিলেন, তুমি কি বলিতে চাও?

মলয় কথা কহিতে পারিল না। কথা কহিবে কি, সে যে সেখানে তখনও দাঁড়াইয়া আছে কিরূপে তাহাই তাহার নিকট দুর্ব্বোধ্য মনে হইতেছিল।

অধ্যক্ষ কঠোরস্বরে কহিলেন, সেই জন্যই কি সকলের আগে সরিয়া পড়িবার জন্য গাড়ী চাহিতে আসিয়াছিলে?

মুরতি নোট গণনা ফেলিয়া রাখিয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, তাই নাকি? সে চেষ্টাও হইয়াছে? স্কাউণ্ড্রেল ইন গাইস অফ এ—সে কথাটা শেষ করিল না।

অধ্যক্ষ কহিলেন, হোয়াট্‌স্ ইওর নম্বার?

মুরতি কহিল, টোয়েন্টি সিক্স—আই নো স্যার।

কাল সকালে তোমার রেকর্ড দেখিব: যাও:—অধ্যক্ষ মুরতিকে কহিলেন, ইউ রিমাইণ্ড মি মুর্ত্তি।—মলয় তখনও দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া সাহেব অত্যন্ত রুক্ষ স্বরে কহিলেন, গো ইউ।

মলয় যেন ছিট্‌কাইয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল। তাহার চোখের দৃষ্টি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল. আলো কি অন্ধকার কিছুই দেখিতে পাইতেছিল না···একটা দেওয়াল ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল: মনে হইতেছিল কে যেন সর্ব্বাঙ্গে আল্‌কাতরা মাখাইয়া দিয়াছে—এই মুখ. এই দেহ সে আর লোক সমাজে বাহির করিতে পারিবে না।

কতক্ষণ এইভাবে কাটিয়াছিল সে জানে না। কাহার উষ্ণ স্পর্শে তাহার চেতনা ফিরিয়া আসিল। সাপের উদ্যত ফণা দেখিবামাত্র মানুষ যেমন ভয়ে আধমরা হইয়া যায়, সেও সেইরকম হইয়া পড়িল। ঘৃণায় সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিতেছে, কিন্তু হাতটা যে ছাড়াইয়া লইবে সে শক্তিটুকুও তাহার ছিল না। যে-লোক হাত ধরিয়াছিল সে বলিল, চলো বাড়ী পৌঁছে দিই।

কথাগুলা কাণে গেল, কিন্তু অর্থবোধ হইল কি না বলা দায়। মলয় সাড়া দিল না। সেই লোকটি আবার বলিল, যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে. ওর জন্যে তোমার ভাবতে হবে না। আমি মনে করিয়ে দিলে তবে ত' তোমার কেস্ দেখবে, পাগল হয়েছ তুমি, আমি মনে করিয়ে দিতে যাচ্ছি আর কি! সবাই চলে গেছে, চলো তোমায় নামিয়ে দিয়ে যাই।

তথাপি নিশ্চল নিঃশব্দে দেখিয়া লোকটার বোধ হয় দয়া হইল: বলিল. তুমি ভয়ানক রাগ করেছ আমি বুঝতে পারছি। তা না হয় ক্ষমা চাইছি। সত্যি ক্ষমা চাইছি, এসো।—বলিয়া সে একরকম টানিয়া লইয়া চলিল। মলয় বাধা দিল না, চলিল। বুঝি বাধা দিবার শক্তিটুকুও তাহার ছিল না।

জিপ্ গাড়ী, সামনে ড্রাইভার, পিছনের সীটে মলয়কে তুলিয়া দিয়া মুরতি তাহার পার্শ্বে বসিয়া কত অনুনয় বিনয় কত মিনতি কাতরোক্তি করিল, কতবার হাত জুড়িল, কতবার মলয়ের পায়ে হাত দিল, তাহার হাত ধরিয়া নিজের মাথায়, বুকে ঠেকাইল. কিন্তু আশ্চর্য্য! বারেকের তরে একটি না কিম্বা একটি হাঁ মলয়ের মুখ দিয়া বাহির হইল না! মলয়ের বাড়ীর সামনে গাড়ী থামিলে মুরতি নিজে নামিয়া মলয়কে হাত ধরিয়া নামাইয়া লইয়া বলিল, কাল আস্‌ছ ত? মলয় সম্মতি জ্ঞাপন করিলে মুরতি আনন্দে ডগমগ হইয়া উঠিল; বুঝিল, রোষ দূর হইয়াছে; উত্তাপ শীতল হইয়া গিয়াছে। প্রেমিকের প্রেম-বাসনা যেন তুড়ি লাফ খাইয়া উঠিল। প্রেম ভরে মলয়ের হাতখানি ধরিয়া প্রায় মুখের কাছে আনিয়া প্রেমের চিহ্ন মুদ্রিত করিয়া দিতে গিয়া কি ভাবিয়া আস্তে আস্তে নামাইয়া দিয়া. মলয়ের মুখের পানে চাহিয়া মৃদু হাস্য করিল। আকাশের এক কোণে খণ্ডচন্দ্র অলস উদাসনয়নে চাহিয়াছিল, ঈষৎ হাস্য করিল। আস্তাকুঁড়ে একটা ঘেয়ো কুকুর শুইয়াছিল। গাড়ীর শব্দে জাগিয়া উঠিয়া আক্রমণ করিবে কি করিবে না ভাবিতেছিল. এক্ষণে কাছে সরিয়া আসিয়া সৌহার্দ্দ্য-জ্ঞাপনোদ্দেশ্যে ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে নিয়োজিত করিল। মুরতি বলিল, তাহ'লে কাল আবার দেখা হবে? মলয় আবার ঘাড় নাড়িল। সাহস পাইয়া বলিল, আর রাগ নেই ত? থ্যাঙ্কস্—গুড় নাইট।

মলয় দরজায় হাত দিতেই দ্বার খুলিয়া গেল। মা দ্বার অর্গলমুক্ত করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, মৃদু স্পর্শেই দ্বার খুলিয়া গেল। কিন্তু মা মেয়েকে দেখিয়া যেন দশ হাত মাটীর নীচে বসিয়া গেলেন। এ-কি মূর্ত্তি হইয়াছে? জ্বলন্ত চিতা হইতে উঠিয়া আসিলে যেমন চেহারা হয়, মলয়কে তেমনই দেখাইতেছে। মা ডাকিলেন, মলয়! মলয় মায়ের মুখের পানে চাহিয়া রহিল: কথা কহিল না। মা'র মনে সদাই ভয়, মেয়ের হাত ধরিতে চমকাইয়া উঠিলেন, গা যে পুড়িয়া যাইতেছে।

তখন ভোর হইয়াছে কি হয় নাই, পূর্বাকাশ পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করিয়াছে কি করে নাই, কাক কোকিলের সুপ্তিভঙ্গ হইয়াছে কি হয় নাই, ধরিত্রী জাগিবে কি জাগিবে না, অলসে আবেশে তাহাই ভাবিতেছে, সুশীলা আসিয়া একেবারে বিছানায় ঢুকিয়া শুইয়া পড়িয়া মলয়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া ডাকিল. বৌ, বৌ, আর কত ঘুমাবি বৌ, ওঠ।

মলয়ার মা বলিলেন, বড্ড জ্বর মা, সারারাত অজ্ঞান অচৈতন্য কেটেছে।

সুশীলা মলয়ের গালের উপর গাল রাখিয়া দুটি হাতে চোখের পাতা খুলিতে খুলিতে বলিল, কেন জ্বর করলি বৌ, কেন জ্বর করলি? তারপর কণ্ঠস্বর খুব মৃদু করিয়া কাণে কাণে কথা কওয়ার মত বলিল, দাদা সাতদিনের ছুটি নিয়ে এসেছে বিয়ে করে বৌ নিয়ে যাবে বলে; আর তুই পোড়ারমুখী জ্বর করে বসে রইলি! ওঠ পোড়ারমুখি হতচ্ছাড়ি, জ্বর ফেলে ওঠ। বাবা সকাল হতেই পুরুত বাড়ী যাবেন, দিন ঠিক করতে; মা দাদাকে সঙ্গে করে এখনই আসছেন, তোকে আশীর্ব্বাদ করতে! তুই জ্বর করে পড়ে থাকলে চলবে কেন বৌ?

সুশীলা নিজের মনেই বকিয়া যাইতেছিল, অন্যদিকে লক্ষ্য ছিল না। থাকিলে দেখিতে পাইত—আর একজন অল্প দূরে বসিয়া চোখের জলে বুক ভাসাইতেছেন।

বৈষ্ণব সাহিত্য

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

পদকর্ত্তা রাধামোহনও বাংলা পদাবলীর জন্য সুবিখ্যাত। সংস্কৃত রচনায় তিনি শুধু জয়দেবকেই অনুকরণ করেন নাই, গোবিন্দ দাসের পূর্ব্বোদ্ধৃত 'পদের' দুইটী চরণ পর্য্যন্ত আত্মসাৎ করিয়াছেন :

পশ্য শচীসুতমনুপমরূপং।
পণ্ডিতামৃত রস নিরুপম কূপম্॥

*

প্রকলিত পুরুষোত্তম সুবিষাদম।
কমলাকর কমলাঞ্চিত পাদম্॥ *
রোহিত বদনতি রোহিত ভাষং। *
রাধামোহন কৃত চরণাশং।--প, ক, ত, ৩৭৮

পদকর্ত্তা রামানন্দ রায়ও সংস্কৃত পদ রচনা করিয়াছেন :

কলয়তি নয়নং দিশিদিশি বলিতম্
পঙ্কজমিব মৃদু মারুত চলিতম্॥

*

জনয়তু রুদ্র গজাধিপ মুদিতম্।
রামানন্দ রায় কবিগদিতম্॥ —প, ক,ত ১০১৬

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবযুগ বঙ্গ-সাহিত্যের এক অপরাজেয় স্বর্ণযুগ। এ সময়ে রচিত পদাবলী, কাব্য, জীবনী ও নাটক প্রভৃতি যে সব অনুত্তম রচনা আজিও বঙ্গ সাহিত্যের মণিমঞ্জুষা পরিপূর্ণ করিয়া রহিয়াছে, সেগুলি দুই ভাগে বিভক্ত। কতক শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিষয়ক এবং অবশিষ্ট শ্রীচৈতন্যদেবের উদ্দেশ্যে এবং তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া বিরচিত। এই উভয়বিধ সাহিত্যই বৈষ্ণব সাহিত্য।

চৈতন্যযুগে বাংলার কাব্য-সাহিত্যে রস ও প্রেমের দিকটা যেমন সমুন্নত হইয়াছিল, তেমনি সঙ্গীতেরও একটা অভিনব রূপ ও ধারা সৃষ্ট এবং পুষ্ট হয়। এটি কীর্ত্তন। পদকর্ত্তাদের পদাবলীগুলি সঙ্গীতে রূপায়িত করিবার জন্য এই ধারা, ইহাই কীর্ত্তন এবং সঙ্গীত-জগতে এটি খাঁটি বাংলার বাঙ্গালীর এবং বৈষ্ণবগণের একটি বিশিষ্ট সমুজ্জ্বল দান। কীর্ত্তনের জন্য যেমন নব নব সুর, ভঙ্গী ও ঢং তৈরী হইয়াছিল, তেমনি কীর্ত্তনের সহযোগিতা করিবার জন্য নব নব বাদ্যভাণ্ডও আবিষ্কৃত হইয়াছিল। পদাবলীর কাব্য-মাধুর্য্য এবং বৈষ্ণবধর্ম্মের ঐশ্বর্য্য প্রকাশে ও প্রচারে কীর্ত্তনের শক্তি যে অপরিমেয় ও অনির্ব্বচনীয়, ইহাতে বাধ হয় আজ আর কাহারও কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীচৈতন্যদেব কর্ত্তৃক বঙ্গদেশে তথা সমগ্র ভারতবর্ষে ভাগবতোক্ত বৈষ্ণবধর্ম্ম যেমন অভিনব রূপে প্রথম প্রচারিত হইল, তেমনি তাঁহার প্রচারের সহায়তা করিতে সৃষ্ট হইল শক্তিশালী এক নূতন সাহিত্য, নূতন সঙ্গীত, নূতন সুর এবং নূতন বাদ্য-ভাণ্ড। দেশে জাগিল সাহিত্যে, সঙ্গীতে, সুরে ও প্রেমে এক নূতন উন্মাদনা।

এই ক্ষুদ্র পরিসরে সমস্ত পদকর্ত্তা বা সমগ্র পদাবলীর একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও দেওয়া অসম্ভব। ইহাও স্মরণীয় যে, ইঁহাদের ভক্তিতত্ত্ব, ব্যক্তিমাহাত্ম্য বা সাধনরহস্যের কথা আজও আমাদের আলোচ্য নয় এবং উক্ত কার্য্যে আমার এতটুকু অধিকারও নাই। আমাদের এ সাহিত্য-সভা; সুতরাং সাহিত্য-বিচারের জন্য আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে আমি যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই ভবাদৃশ পণ্ডিতজনসমীপে আমি সবিনয় নিবেদন করিতেছি। আমি বেশ ভাল করিয়াই জানি, এ বিষয়ে আমার জ্ঞান অতীব সঙ্কীর্ণ, কাজেই ভুল-ভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতি, অনবধানতা ও অজ্ঞান পদে পদেই লক্ষিত হইবে। যে অপার স্নেহে আপনারা আমায় এই অভাবিত সম্মান দান করিয়াছেন, সেই স্নেহেই আমায় মার্জ্জনাও করিবেন, এ বিশ্বাস আমার দৃঢ়।

চৈতন্যযুগে দেড়শোরও উপর পদকর্ত্তাদের মধ্যে, ভাবের অপূর্ব্বতায়, ব্যঞ্জনার মাধুর্য্যে, কবিত্বের চমৎকারিত্বে এবং কান্ত কোমল পদাবলীর ঐশ্বর্য্যে আমার মনে হয়, গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস, নরোত্তম দাস, রায় শেখর, রায় বসন্ত, বাসুদেব ঘোষ, বংশীবদন, ঘনশ্যাম, যদুনন্দন, বলরাম দাস, প্রেমদাস, শিবরাম দাস, রামানন্দ, বৃন্দাবন দাস, শশীশেখর প্রমুখ কয়েকজন কবিই শ্রেষ্ঠ এবং আমি মনে করি ইঁহাদের মধ্যে গোবিন্দ দাস জ্ঞানদাস ও নরহরি দাসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইঁহাদের পদাবলী বাংলার কাব্যে স্মরণীয়। ইঁহারা বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, ইঁহাদের কাব্য-পদাবলী আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় আজ পর্য্যন্তও স্থান পায় নাই। বাঙ্গালীর ছেলেরা ইঁহাদিগকে ভুলিতে বসিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কি বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রতি কোনও কর্ত্তব্য নাই? হয়ত তাঁহারা বলিবেন, সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের মধ্যে বৈষ্ণব সাহিত্য আছে। থাকা সম্ভব। কিন্তু আমি দেখিতেছি, এখানেও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদের সেই পূর্ব্বোক্ত "বৈষ্ণব" বিভীষিকা।

যাহাই হউক, দেখা যায় গোবিন্দদাসের সমগ্র পদাবলীতে বিদ্যাপতির ভাব, ভাষা ও ব্যঞ্জনার প্রভাব

সমধিক। বিদ্যাপতিই যে গোবিন্দদাসের কাব্যগুরু ছিলে, তাহার প্রমাণ তাঁহার রচনার সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির মৈথিল ভাষা ও তাঁহার ছ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছেন। বিদ্যাপতি আগাগোড়া স্বর মাত্রিক ছন্দে রচনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সর্ব্বত্র হ্রস্ব-দী স্বরের শুদ্ধ উচ্চারণরীতি রক্ষা করেন নাই; গোবিন্দদা এ ব্যাপারে পর্য্যন্ত গুরুকে অনুসরণ করিয়াছেন।

গোবিন্দদাসের রচনায় বিদ্যাপতি ছাড়া জয়দেবে প্রভাবও বড় কম নয়, কিন্তু খুবই আশ্চর্য্য মনে হয়, যখ দেখি, এই বাঙালী কবির রচনায় চণ্ডীদাসের কোন ছায়াপাত হয় নাই।

গোবিন্দদাস বিদ্যাপতিকে বন্দনা করিয়াছেন, কি জয়দেবকে করেন নাই:

বিদ্যাপতিপদ যুগল সরোরুহ—
নিস্যন্দিত মকরন্দে।
তছু মঝু মানস মাতল মধুকর
পিবইতে করু অনুবন্ধে॥
হরি হরি আর কিয়ে মঙ্গল হোয়।
রসিকশিরোমণি নাগরনাগরী
লীলা স্ফুরব কি মোয়॥
জনু বাওন করে ধরব সুধাকর
পঙ্গু চরব কিয়ে শিখরে।
অন্ধ ধাই ফিরে দশ দিশ খোঁজব
মিলব কলপতরুনিকরে॥
সো নহ অন্ধ করত অনুবন্ধ হি
ভকতনখর মণি ইন্দু।
কিরণ ঘটায় উদিত ভেল দশদিশ
হাম কি না পায়ব বিন্দু॥
সোই বিন্দু হাম যৈখনে পায়ব
তৈখনে উদিত নয়ান।
গোবিন্দদাস অতয়ে অবধারল
ভকতকৃপা বলবান॥—প,ক,ত, ১২,

জ্ঞানদাসের রচনায় বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের দ্বৈত প্রভাব পরিলক্ষিত হয়:

বিদ্যাপতির আছে—

কি কহব মাধব বুঝই না পারি।
কিয়ে ধনি বালা কিয়ে বরনারী॥
হামরা দুই জনে পথে একু মেলি।
সে আন জন সঞে করু আন খেলি॥
প,ক,ত, ৭৯,

জ্ঞানদাস লিখিলেন—

শুন শুন মাধব তুহুঁ সুচতুর।
কিয়ে বিধি পরসন্ন কিয়ে প্রতিকূল॥
আন পরথাই যাই যব পাশে।
আন সম্ভাষি আন পরিহাসে॥
অপর সে আন সঞে প্রিয় সখি সঙ্গে।
জ্ঞানদাস কহে বুঝল অনঙ্গে।—প,ক,ত, ৮১,

চণ্ডীদাসের আছে—

সে যে নাগর গুণের ধাম।
জপয়ে তোমার নাম॥
শুনিতে তোহারি বাত।
পুলকে ভরয়ে গাত॥
অবনত করি শির।
লোচনে ঝরয়ে নীর॥—প,ক,ত, ৯৪

জ্ঞানদাস লিখিয়াছেন—

শুন শুন গুণবতি রাই।
তো বিন আকুল কানাই॥
সো তুয়া পরশ কি লাগি।
ছটফটি যামিনী জাগি॥
পুছিতে কহয়ে আধ ভাখি।
নিঝরে ঝরয়ে দুটি আঁখি॥—প,ক,ত, ৯৫

জ্ঞানদাসের মধ্যে জয়দেবের ছায়া বিশেষ নাই।

নরহরিদাস জয়দেব ও চণ্ডীদাসের কাব্যশিষ্য, কিন্তু বিদ্যাপতির নহেন।

নরহরিদাসের বন্দনাই তাহার প্রমাণ:

জয় জয় জয় দেব দয়াময়
পিরিতি রতন খনি।
পরমপণ্ডিত পুজ্য গুণগণ-
মণ্ডিত চতুরমণি॥

* * *

রসিক শেখর সুখময় পদ্মা-
বতীর পরাণপতি॥

*

যার বিরচিত শ্রীগীতগোবিন্দ
গ্রন্থ সুকৌশল তাতে।
গোবিন্দ আনন্দে দেহিপদপল্লব
আদি বর্ণিলেন যাতে॥

*

জয় জয় চণ্ডীদাস দয়াময়
মণ্ডিত সকল গুণ।
অনুপম যার যশরসায়ণ
গাওত জগত জনে॥

*

চণ্ডীদাসপদে যার রতি সেই
পিরিতি মরম জানে।

পিরিতিবিহীন জনে ধিক রহু
দাস নরহরি ভনে।—প,ক,ত, ১৪

বৈষ্ণবপদাবলী আলোচনা কালে প্রথমেই দৃষ্টি পড়ে পদকর্ত্তাদের উপর জয়দেব চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির দুষ্প্রতিরোধ্য প্রভাব। কি সংস্কৃত কি-বাংলা উভয়বিধ রচনাতেই দেখা যায়, স্থানে স্থানে আদর্শ-কবিদের ভাব ভাষা এবং ছন্দ পর্য্যন্ত তাঁহারা ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। দুই একটি উদাহরণ দিতেছি:

(১) জয়দেব ও সনাতন:

প্রচুর পুরন্দর ধনুরণুরঞ্জিত
মেদুরমুদির সুবেশম্—জয়দেব।
প্রচুর পুরন্দর গোপবিনিন্দক
কান্তি পটল মসৃকুলম্—সনাতন।

(২) জয়দেব ও গোবিন্দদাস:

(ক) চন্দ্রকচূড় ময়ূরশিখণ্ডক
মণ্ডন বলয়িত কেশম্—জয়দেব।
চূড়ক চূড়ে ময়ূরশিখণ্ডক
মণ্ডিত মালতীমাল—গোবিন্দদাস।

(খ) নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণ মনু
বিন্দতি খেদমধীরম্।
ব্যাল নিলয়মিলনেন গরলমিব
কলয়তি মলয় সমীরম্॥—জয়দেব।
কিয়ে হিমকর কর কিয়ে নিরন্তর ঝর
কিয়ে কুসুমিত পরিযঙ্ক।
কিয়ে কিশলয় কিয়ে মলয়সমীরণ
জ্বলতহি চন্দন পঙ্ক॥—গোবিন্দদাস।

(৩) বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস:

বিদ্যাপতির প্রতি শ্রদ্ধানিবন্ধন, বিদ্যাপতির এক একটি চরণও নিজ পদশেষে উদ্ধৃত করিয়া, দ্বিতীয় চরণে নিজ নামের ভণিতা সংযুক্ত করিয়াছেন, এমন পদও গোবিন্দদাসের বহু দেখা যায়!

বিদ্যাপতি কহে মিছ নহ ভাখি।
গোবিন্দ দাস কহ তুহু তাহে সাখি॥ প,ক,ত ৯৩।
ভনয়ে বিদ্যাপতি গোবিন্দ দাস তথি
পূরল ইহ রস ওর।—প,ক.ত ২৬১
বিদ্যাপতি কহে ঐছন কান।
দাস গোবিন্দ ও রস ভান॥—প,ক,ত ৪০০
বিদ্যাপতি কহ কৈসন কাজ।
দাস গোবিন্দ রস ভান॥

এই পদটি বিদ্যাপতির ৫৫১ সংখ্যক পদ রূপে রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁহার বিদ্যাপতি গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু আসলে এটি গোবিন্দ দাসের মনে হয়।

বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব।
গোবিন্দ দাস রসপূর॥ প, ক, ত, ১১৪০

অন্যান্য পদকর্ত্তারাও নিজ নিজ প্রিয় কবির রচনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া এইরূপে তাঁহাদের ভাব ভাষা এমন কি অবিকল চরণ পর্য্যন্ত নিজ নিজ পদাবলীতে সংযুক্ত করিয়াছেন। কয়েকটি মাত্র উদাহরণ দিতেছি।

শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহু দল বলে ধনি দন্দ পড়ি গেল॥
—বিদ্যাপতি

শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহু পথ হেরইতে মনসিজ গেল॥
—কবি শেখর, প, ক, ত, ১০৬।

কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব।
একক ক্ষীণ আওকে অবলম্ব॥—বিদ্যা
কটিকে গৌরব পাওল নিতম্ব।
ইনকে ক্ষীণ উনকি অবলম্ব॥
—কবিশেখর ঐ

বচনক চাতুরী লোচন নেল।—বিদ্যা
চরণ চলন গতি লোচন পাব।
লোচনক ধৈরজ পদতলে যাব॥—কবিশেখর ঐ
সজনি ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘ মাল সঞে তড়িতলতা জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল।—
বিদ্যাপতি প, ক, ত, ১৯৫।
সজনি অপরূপ পেখলু বালা।
হিমকরমদন মিলিত মুখ মণ্ডল
তা পর জলধর মালা॥—রাধাবল্লভ প,ক,ত, ১৯৬
পুছয়ে কানুর কথা ছল ছল আঁখি।
কোথায় দেখিলে শ্যাম কহ দেখি সখি।
—চণ্ডীদাস
গদাধরে দেখি প্রভু করয়ে জিজ্ঞাস।
কোথা হরি আছেন শ্যামল পীতবাস॥
—চৈ, ভা, মধ্য।
ভরমে তোমার নাম ক্ষিতি তলে লিখি
—চণ্ডীদাস
ক্ষণে পৃথিবীতে লেখে ত্রিভঙ্গ আকৃতি
—চৈ, ভা, মধ্য।
তুলা খানি দিল নাসিকা মাঝে।
তবে সে বুঝিল শোয়াস আছে॥—চণ্ডীদাস
সূক্ষ্ম তুলা আনি নাসা অগ্রেতে ধরিল।
ঈষৎ চলয়ে তুলা দেখি ধৈর্য্য হল।—চৈ, চ, মধ্য

যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়।

—চণ্ডীদাস

প্রাণকৃষ্ণ বলি যদি দৈবে কেহ ডাকে।
ধেয়ে গিয়ে আলিঙ্গন করেন তাহাকে ॥

—গোবিন্দ দাসের কড়চা।

শ্রীরূপ গোস্বামীর বিদগ্ধমাধবে আছে—

অকারুণ্য কৃষ্ণো যদি ময়ি তবাগ: কথমিদং
মুধা মা রোদীর্মে কুরুকৃপরমিমা মুত্তর কৃতিম।
তমালস্য স্কন্ধে বিনিহিত ভুজা বল্লরিরিয়ং
যথা বৃন্দারণ্যে চিরমবিচলা তিষ্ঠতি তনুঃ॥

এই শ্লোকান্তর্গত ভাবটি বহু কবি আত্মসাৎ করিয়াছেন

রাখিহ তমালে তনু যতনে বাঁধিয়া

—নরহরি দাস

সব সহচরী দুটি বাহু ধরি
বাঁধিও তমালের ডালে—কৃষ্ণকমল
না পুড়িও মোর অঙ্গ না ভাসাও জলে।
মরিলে রাখিও বাঁধি তমালের ডালে॥

—কবিবল্লভ

তমালের কান্ধে মোর ভুজলতা দিয়া।
নিশ্চল করিয়া তুমি রাখিহ বাঁধিয়া॥

—যদুনন্দন দাস

কেনে গেলেমে জল ভরিবারে।
যাইতে যমুনার ঘাটে সেখানে ভুলিনু বাটে
তিমিরে গরাসিলে মোরে।

—জ্ঞানদাস প, ক, ত, ১২৮

সাথে গেলাম জল ভরিবারে।
তেমাথা পথের ঘাট সেখানে ভুলিনু বাট
কালা মেঘে ঝ্যাপাছিল মোরে।

—বংশীবদন প, ক, ত, ১২১

কিথেনে জলেরে গেলু কিরূপ দেখিয়া আইলুঁ
ঘরের আসিয়া হৈনু জরী।—অনন্ত প,ক,ত ১২৪

বৈষ্ণব সাহিত্য বলিতে কাব্যই প্রায় ষোল আনা, গদ্য রচনা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। এই কাব্য আবার জীবনী এবং পদাবলী এই দুই ভাগে বিভক্ত। এতন্মধ্যে পদাবলী সাহিত্যই জনসমাজে সমধিক প্রচলিত এবং সুপরিচিত।

বৈষ্ণবসাহিত্যই বাঙ্গালীর খাটি বাংলা সাহিত্য যাহাতে এতটুকু বৈদেশিকতা বা অবাঙ্গালীত্ব স্পর্শ করে নাই। সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্য খাটি বাংলা ভাষায় রচিত, ইহাতে বিদেশী শব্দ পর্য্যন্ত নাই।

বৈষ্ণব সাহিত্য প্রেমের সাহিত্য রসের সাহিত্য ভক্তির সাহিত্য নিত্যানন্দের সাহিত্য এ জন্য এ সাহিত্য সকল সাম্প্রদায়িকতার ঊর্দ্ধে একমাত্র ভাগবত সাহিত্য। শ্রীমদ্‌ভাগবত গোমুখীর মহাউৎস হইতে উৎসারিত ইহা পাবনী ভাগীরথী ধারা যাহার মধ্যে আমাদের ভা গী রথী হইয়া অর্থাৎ সংস্কৃতি বাণী এবং সমস্ত ঐশ্বর্য্য সন্নিহিত আছে।

আরণ্যক ঋষির ভাষায় বলা যায়—প্রতিবোধবিদিতং-মতং অমৃতত্বং হি বিন্দতে" বোধে বোধে প্রতিবোধে ইহাকে জানিলে তবেই ইহাতে অমৃতের সন্ধান পাওয়া যাইবে। "ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন" মেধার দ্বারা বা শ্রুতির দ্বারাও এ অমৃত লভ্য নয়। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" ইনি যাঁহাকে অনুগ্রহ করিয়া বরণ করিবেন, এ অমৃত তাঁহারই একমাত্র লভ্য।

সমাপ্ত

সুন্দরতম

শ্রীমন্মথনাথ সরকার

তুমি সুন্দরতম তাই তো তোমাকে চেয়েছি গো আমি প্রাণ ভরে।
কিবা নির্জন রাতি বল প্রিয়তম তুমি কেন মোরে রাখো ধরে'।
গরব বিহীন তুমি সুমহান
হৃদয় ভরিয়া শুনি তব গান
আজি গর্ব্বহীনের পরশপ্রসাদে গরবে এ-প্রাণ কেঁদে মরে।
অন্তর মম এ-কথা জানিতে
শুধু শঙ্কিত আশে রহে,
সুন্দরতম চাহে যারে বুকে
সে-কি সুন্দরতম নহে!
সুন্দরতমে হৃদে এঁকে পূজি
সুন্দরতম তাই আমি বুঝি,
মম অন্তরে বুঝি আপনারে পেয়ে আপন ভাবিয়া চাহ মোরে!

সংঘাত

(নাটিকা)

শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়

[জনবিরল সমুদ্রতীর। সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ গর্জন চারিদিকের নিস্তব্ধতা ও নির্জন রাত্রিকে ব্যঙ্গ করছে। আকাশে ঘনকালো মেঘ, চারিদিকে প্রগাঢ় অন্ধকার,যেন বিরাটাকার দৈত্য ডানা মেলে ধরেছে পৃথিবীর বুকের ওপর। একলা দাঁড়ালে সবল মনেও ভয়ের সঞ্চার হয়। মাঝে মাঝে কালো আকাশের বুকে বিদ্যুতের কষাঘাত, মেঘের ডাকে মনে হয় প্রকৃতি গুমরে গুমরে কাঁদছে]

ঘোষণা। অমাবস্যার স্তিমিত অন্ধকারে নির্জন সমুদ্রতীর। জনবিরল সমুদ্রতীরে কেবল ঢেউএর পর ঢেউ এসে পড়ছে : আজকের সমুদ্র উদ্দাম শব্দে যেন শুধু প্রবল শোকোচ্ছ্বাস। উত্তাল সাগরের ঢেউএ ঢেউএ আজ ধ্বংশের তাণ্ডব নৃত্য ভাঙনের নেশায় উন্মত্ত স্রোতরাশির শব্দে যেন স্তব্ধ হাহাকার, শূন্যতার বিরাট নিস্তব্ধ ক্রন্দন।

[সঙ্গীতের রেশ স্পষ্ট হ'য়ে উঠল, আবার অস্পষ্ট]

মহিলাকণ্ঠ। ভয় করছে...

পুরুষকণ্ঠ। ভয় কিসের আমি রয়েছি...

নারীকণ্ঠ—অন্যদিনের সমুদ্র শান্তিপূর্ণ, গম্ভীর, স্তব্ধ—

পুরুষকণ্ঠ—আর আজকের ?

নারীকণ্ঠ—ভয়ানক, ভয়ঙ্কর, অশান্ত, চঞ্চল—মনে হচ্ছে যেন বহুদিনের ক্ষুব্ধ অভিমানের বাঁধন ভেঙে ছুটে আসছে চারিদিকের সব কিছু গ্রাস করতে—আমাদেরও !

পুরুষকণ্ঠ—আজ অমাবস্যা কিনা, কালো জমাট-বাঁধা অন্ধকারে ভীতগ্রস্ত মন সচকিত —

নারীকণ্ঠ—কত রাত ?

পুরুষ—বারোটা সাতান্ন !

নারী—আশ্চর্য, চারিদিকে জমা-টবাঁধা অন্ধকার কিন্তু ঐ ওধারে বাড়ীর ঘরে আলো জ্বলছে !

পুরুষ—রোজ জ্বলে—অনেক রাত পর্য্যন্ত।

নারী—কেউ পড়াশুনা করে বোধ হয়।

পুরুষ—হবে !

বহুদূরে অস্পষ্ট শোনা গেল—হুঁসিয়ার—হুঁসিয়ার।

[সমুদ্রের গর্জন যেন সমতালে ফুঁসে উঠল।

নারী—পাহারাওয়ালা আসছে—রোজ রাত্রে এমনি ভাবে ও ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। হোটেল থেকে প্রায়ই দেখি—ভয় করেনা ?

পুরুষ—[হেসে উঠল]

নারী—হাসছ' যে ?

পুরুষ—ওর ভয় করার ভাবনা দেখে ! কাজই ওর এই। রোজ রাত্রে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় তীর ধরে ধরে। চিৎকার করতে করতে এমনি ভাবে।

নারী—ওর হ্যারিকেনের আলোয় সমুদ্র আরো কালো আরো ভয়ঙ্কর !

পুরুষ—ভয় করছে ? কাছে সরে এস'—

নারী—চল যাওয়া যাক্।

পুরুষ—একটু পরে !—দেখ বাড়ীর আলোটা দপ্ করে নিভে গিয়ে কেমন আবার জ্বলে উঠল। সমস্ত বাড়ীটায় আলো—দীপান্বিতা যেন !

দ্বিতীয় কণ্ঠ [দূর থেকে] কে ব'সে ওখানে ? কে ?

পুরুষ—আমরা !

দ্বিতীয়—আমরা কে ? [দূর থেকে]

পুরুষ—এদিকে এস, দেখে যাও !

দ্বিতীয়—কে আপনারা—এত রাত্রে এখানে কি করছেন ? চলে যান, চলে যান—চলে যান এখান থেকে।

পুরুষ—কেন ?

দ্বিতীয়—আজ অমাবস্যা।

পুরুষ—জানি !

দ্বিতীয়—আজ—আজ আপনারা চলে যান, শিগ্গীর চলে যান !

পুরুষ—কেন ?

দ্বিতীয়—সে কথা আমি বলতে পারব না।

পুরুষ—তোমার গলা কাঁপছে।

দ্বিতীয়—জানি।

পুরুষ—তুমি ভয় পেয়েছ—কি হয়েছে তোমার—

দ্বিতীয়—কিছুনা, সে আমি বল্‌তে পারব না—আমার সময় নেই—দাঁড়াতে পারছি না, আপনারা চলে যান—

পুরুষ—তার মানে ? তুমি তো পাহারা দাও সমস্ত রাত।

দ্বিতীয়—রোজ দি, আজ দেব' না বছরে এই একটি দিন আমার ছুটি ! আজকের দিনে. রাত একটার পর বাড়ীর বাইরে এখানে কেউ থাকে না

পুরুষ—থাক্‌লে কি হয় !

দ্বিতীয়—তারা আর বাড়ী ফেরে না।

পুরুষ—[হেসে উঠল]

দ্বিতীয়—হেসোনা, অমন করে হেসোনা—আজ পর্য্যন্ত অনেকে হেসেছে তোমার মতন, কিন্তু বাড়ী কেউ ফেরেনি—

পুরুষ—কি হয় ?

দ্বিতীয়—ঐ বাড়ী।

পুরুষ—কোন্ বাড়ী ?

দ্বিতীয়—ঐ যে, ফের আলো জ্বলছে—উই যে—পালাও, পালাও—সমস্ত আলো জ্বলে উঠেছে—পালাও, পালাও।

[হঠাৎ সঙ্গীত উচ্ছ্বসিত হ'য়ে কথা, চিৎকার ডুবিয়ে দিল সমতালে স্পষ্ট হ'য়ে উঠল চারিদিকের পৈশাচিক আবহাওয়া, উদ্দাম সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গশব্দ, মেঘের গর্জ্জন সব যেন এক সঙ্গে চিৎকার করে উঠল, বিদ্রূপ করল' পৃথিবীকে]

ঘোষক—হঠাৎ আকাশ বাতাস—ঐ নিবিড় নির্জনতা যেন

ঝড়ের আস্ফালনে কেঁপে উঠ্‌লো, প্রবল ঝড়ে যেমন ক'রে কেঁপে ওঠে পাইন গাছের প্রতিটি পাতা !

ঢেউগুলো গর্জন ক'রে উঠ্‌লো, সমুদ্র উত্তাল, উদ্দাম—অশান্ত, যেন বিভীষিকা—ক্রুদ্ধ দেবতার অভিশাপ নিয়ে গুরুগম্ভীর নিনাদে ধরণী কেঁপে উঠ্‌লো।

এল প্রবল ঝড়—পৃথিবীতে প্রলয়ের সঙ্কেত।

[ভয়সঙ্কুল শব্দে পৃথিবী সচকিত]

ঘোষক—এমনি এক বিভীষিকাময় রাত্রের একটি কাহিনী—কবে কোন্ দিন কত বছর আগে ঘটেছিল, কেউ জানে না—রাত একটা।

বৃদ্ধ—রাত একটা—

বৃদ্ধা—হ্যাঁ, একটা বাজ্‌লো,—রাত একটা।

বৃদ্ধ—শুয়ে পড়'।

বৃদ্ধা—না !

বৃদ্ধ—বাইরে সমস্ত পৃথিবী গর্জন ক'র্‌ছে—সমুদ্র আজ উদ্দাম, উত্তাল—স্রোতের পর স্রোত।

বৃদ্ধা—বক্ বক্ ক'রো না।

বৃদ্ধ—অনেক রাত হ'য়েছে।

বৃদ্ধা—জানি।

বৃদ্ধ—ঝড় উঠেছে,—অমাবস্যার অন্ধকার বাইরে—এমন রাত্রে জন-মানব বাইরে বের হয় না।

বৃদ্ধা—তাতে আমার কি !

বৃদ্ধ—এমন ভয়ঙ্কর রাতে কেউ সাহস পাবে না বাইরে বের হ'তে

বৃদ্ধা—থামো সে ভীরু নয়...

বৃদ্ধ—জানি; কিন্তু তবু···

বৃদ্ধা—তবু কি ?

বৃদ্ধ—এমন বিভৎস রাত্রে সে আসবে না...

বৃদ্ধা—যদি আসে

বৃদ্ধ—আস্‌বে না

বৃদ্ধা—কে বলেছে তোমাকে ?

বৃদ্ধ—কেউ নয়...আমার কেবলই মনে হচ্ছে

বৃদ্ধা—এমনি রাত্রে সে গিয়েছিলো...এমনি অন্ধকার...এমনি ছিল অমাবস্যা, এমনি জমাট বাঁধা অন্ধকারে...এমনি ছিল সে-দিন সমুদ্রের আস্ফালন...

বৃদ্ধ—গিয়েছিল, কিন্তু আসবে না !

বৃদ্ধা—যদি আসে, অন্ধকার ফিরে যাবে...কতদিনের ক্লান্ত...পথের কষ্টে জর্জরিত...অনাহারে অনিদ্রায় অবসন্ন···কতদিন কত রাত না খেয়ে আছে, কত সহস্র মাইলের ব্যবধান অতিক্রম করে সে আসবে কত যুগের...

বৃদ্ধ—সত্যিই তো...ক্লান্ত...অবসন্ন—জীর্ণ...দীর্ণ···

বৃদ্ধা—আসবে আজকে, না !

বৃদ্ধ—আস্‌তেও পারে...আলোটা ঐ-খানেই থাক, পথ দেখ্‌তে কষ্ট হবে না

বৃদ্ধা—খাবার ঘরের উনুনটা ভালো করে জালিয়ে দিয়ে এস' খাবারটা গরম থাকবে, ও-তো! কোনদিনও ঠাণ্ডা খাবার খায় নি···

বৃদ্ধ—আলোটা বাড়াও বাইরে ভয়ানক অন্ধকার...

বৃদ্ধা—দরজাটা...

বৃদ্ধ—বন্ধ আছে...

বৃদ্ধা—খুলে রাখ···

বৃদ্ধ—এই ঝড়ে ঘর দোর জলে ভেসে যাবে

বৃদ্ধা—যদি ও-দিক দিয়ে এসে দরজা ধাক্কা দেয়, আমরা শুনতে পাবো না !

বৃদ্ধ—ঠিক তো...

বৃদ্ধ—বাইরে ঝড়ের বেগ বাড়ছে...তাণ্ডব শুরু হয়েছে প্রকৃতির বুকে আকাশ ভেঙে পড়বে মাথার ওপর

বৃদ্ধা—[হেসে উঠল]

বৃদ্ধ—হাস্‌ছো কেন ?

বৃদ্ধা—আনন্দে...এ সবই তার আসার সঙ্কেত...এই তো তার আসা-যাওয়ার পদধ্বনি···যে-দিন গিয়েছিল সে-দিনও এমনি ধারা মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া ঝড়ের বোঝা মাথায় করে গিয়েছিল এমনি অন্ধকার রাত্রে চুপি চুপি, কাউকে না বলে...

বৃদ্ধ—কাউকে না বলে, আমাদেরও নয়...ভয়ানক অন্যায়...

বৃদ্ধা—সে আজ আস্‌বে না ?

বৃদ্ধ—আসবে আসবে পৃথিবী আজ মেতে উঠেছে আনন্দে, আকাশ-বাতাস আনন্দে আত্মহারা, রজনীর ওড়না গেছে উড়ে, তারারা সব মিলিয়ে গেছে নিবিড় আনন্দে দিশাহারা হ'য়ে...

বৃদ্ধা—তখন আসবে ?

বৃদ্ধ—বাইরের তাণ্ডব নৃত্য যখন প্রখর হয়ে...ঝড় যখন বনবাদাড় সমুদ্র পাহাড় পর্বত নদী সব ভেঙে তছনছ করে ছুটে চল্‌বে অনন্তের পানে, সমুদ্র যখন গর্জন করে উঠবে আত্মহারা হয়ে ঢেউগুলো যখন প্রবল প্রলয়ঙ্করী মূর্তি ধরে ছুটে ছুটে আসবে সাগর সৈকতে...তখন আসবে আমাদের রুদ্র বৈশাখ...আমাদের ভৈরব...আমাদের ছেলে···প্রলয় নাচনে নাচতে নাচতে

বৃদ্ধা—হ্যাঁ...তার মায়ের বুকে...

বৃদ্ধ—সে আসবে...সে আসবে...সে আসবে...ভৈরব হরষে সে আসবে...আসবে তাণ্ডব নৃত্যে ধরণী কাঁপিয়ে...

শব্দের শেষ নেই। সমতালে চলেছে সকলের চিৎকার, ভয়াই বিপদসঙ্কুল আর্তনাদ। ঝড়ের বধির ঝরা শব্দের মধ্যে অস্পষ্ট শোনা গেল।

আগন্তুক—দরজা খোল—কে আছো—দরজা খোল—শুন্‌ছ—কে আছো ভেতরে, দরজা খোল—

[শব্দ অস্পষ্ট হ'ল]

বৃদ্ধা—ঝড়ের মধ্যে যেন তার ডাক ভেসে আসছে আমার কানে দরজা খোল' দরজা খোল—।

বৃদ্ধ—সে আসবে—আজ সে আসবে—

বাইরে তুমুল ঝড়ের আর্তনাদ। তারই মাঝে অস্পষ্ট

'শোনা গেল দরজা খোল, দরজা খোল—কে আছো দরজা খোল—

বৃদ্ধ—[চিৎকার করে উঠল]—দরজা খোল—দরজা খোল'—সে এসেছে—দরজা খোল—দরজা খোল—।

বৃদ্ধা—সে এসেছে—সে এসেছে—দরজা খোল—দরজা খোল—।

[দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ঝড় ছুটে এল ঘরে সব ভেঙে চুরমার করে দেবে—যেন প্রলয় হচ্ছে প্রকৃতির বুকে ? দরজা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শব্দ আবার অস্পষ্ট হয়ে উঠল।]

আগন্তুক—বাইরে ভয়ানক ঝড়, পৃথিবীর বুকে প্রলয় হচ্ছে—আজ রাত্রের মতন আশ্রয়—।

বৃদ্ধ—তোমার জন্যেই তো আমরা বসে আছি

আগন্তুক—আমার জন্যে ?

বৃদ্ধা—হ্যাঁ, বাবা, তোমার জন্যে ! আমরা তো জানি তুমি আসবে—।

আগন্তুক—কি করে জানলেন ?

বৃদ্ধ—শোন' পাগল ছেলের কথা কি করে জানলেন ?—ওরে পাগল, আজ কুড়ি বছর আমরা দুজনে প্রতিদিন প্রতিরাত তোর পথ চেয়ে বসে আছি—জানালায় ঐ আলো, জানালার ধারে আমরা দুজন—ভেবেছি আজ আসবি—আজ মনে হল আসবি—।

আগন্তুক—এই ঝড় জলে !

বৃদ্ধা—হ্যাঁ বাবা এই ঝড়জলে—যে দিন জন্মেছিলে সেদিনও ছিল পৃথিবীর বুকে এমনি প্রলয় ঝড়ের এমনি তাণ্ডব নৃত্য—তোমার প্রত্যেক জন্মদিনে এমনি ঝড় ওঠে পৃথিবীর বুক কাঁপিয়ে—তারপর এখানে এই সমুদ্র তোমাকে যেদিন টেনে নিয়েছিল কুড়ি বছর আগে সেই দিনও এমনি ধারা প্রলয় নাচন নেচেছিল প্রকৃতি, আকাশে বাতাসে এমনি ছিল উন্মত্ত গর্জন, সমুদ্র এমনি বিভৎস রূপ নিয়ে ছুটে চলেছিল—ঢেউগুলো এমনি ভীষণ আর্তনাদে তীরের ওপর আছড়ে আছড়ে পড়েছিল—আমরা যে জানি আমাদের ছেলের আসা যাওয়ার সময়ই হল দুর্যোগের মধ্য দিয়ে—।

আগন্তুক—আপ—ছেলের—

বৃদ্ধ—দেখেছ—আমাদের চিনতে পারলে তো।

আগন্তুক—মানে—আমার নাম দীপক—

বৃদ্ধ—দীপক—দী কে—দীপক তুই যে আমারই দীপক—সমস্ত পৃথিবী জ্বালিয়ে দিবি তোর প্রবল আকাঙ্ক্ষা, বাসনা, কামনা দিয়ে—সেইতো তোর নাম রেখেছিলাম দীপক—তুই তো আমাদের প্রাণ বাবা, তোর মধ্যে দিয়ে পৃথিবী ত্রাণ পাবে—তাই তোর ঐ নাম।

বৃদ্ধ—খাওয়া দাওয়ার কি হল—

আগন্তুক—না খাবার দরকার নেই—

বৃদ্ধ—দরকার নেই মানে—সব তৈরী—কুড়ি বছর প্রত্যেক দিন রাত্রে তোমার খাবার তৈরী করা হয়েছে—কতদিন না খেয়ে আছো কে জানে—।

আগন্তুক—আমি শুধু রাত্রের জন্যে আশ্রয় চাই, আমি—

বৃদ্ধা—তার মানে কুড়ি বছর পরে এলে—এসেই বলছ কাল চলে যাবে বাবা, যাওয়ার জন্যেই কি তোমার আসা ? আবার এমনি করে কুড়ি বছর পরে চেয়ে বসে থাকতে হবে ?

আগন্তুক—আপনারা ভুল করছেন—আমি আপনাদের ছেলে নই—আমার পরিচয়—না সে আমি দিতে পারব না—সে অতি হীন কদর্য কিন্তু আপনারা ভুল করছেন—আমি আপনাদের ছেলে নই !

বৃদ্ধ—কি বললে ছেলে নও—তুমি আমাদের ছেলে নও ? পাগল—ভেবেছ বুঝি কুড়ি বছরের ব্যবধান বলে চিনতেও আমরা পারবোনা, ওরে পাগল ছেলে, ব্যবধান যদি কুড়ি বছরের না হয়ে দুশো বছরের হ'ত তবু তোকে আমরা চিনে নিতে পারতাম।

বৃদ্ধা—ঠিক তেমনি ঠিক তেমনি হাসি, তেমনি কথা বলা, তেমনি বিচিত্র চকিত দৃষ্টি ভঙ্গি।

বাবা তোমার মনে আছে চলে যাবার দিনটা—সেই কুড়ি বছর আগে—এমনি একরাত্রে তোমার বয়স তখন চার বছর—তোমাকে চাকরের কাছে শুইয়ে রেখে আমরা গেলাম উন্মত্ত সমুদ্রের অপরূপ রূপ দেখতে। সেদিন প্রকৃতির কি অনুপম রূপ, কালো অন্ধকার রাত্রি যেন ক্ষেপে উঠেছে—নটরাজ যেন তার জটাজুট এলিয়ে দিয়ে প্রকৃতির বুকে সতীর মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে নেমে এসেছে !—ফিরে এসে শুনলাম তুমি ঘুম থেকে উঠে ঐ ভীষণ রাত্রে আমাদের খুঁজতে বেরিয়েছ—চাকরটা অঘোরে ঘুমোচ্ছে—ভয় পেয়েছিলে বুঝি বাবা ? ভেবেছিলে আমরা আর ফিরে আসব না—তাই তুমি গিয়েছিলে খুঁজতে ? কি সাহস—কি অপূর্ব সাহস আমার চার বছরের ছেলের—।

বৃদ্ধ—তারপর থেকে তোমায় কত খুঁজেছি—পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত—দিনের পর দিন রাতের পর রাত—তারপর হঠাৎ একদিন মনে হোল তোমার দেখা মিলবে এই সমুদ্রতীরে—এমনি বিভীষিকাময় রাত্রে—সেইদিন থেকে তোমার মা আর আমি প্রতিরাত্রে এমনি করে তোমার পথ চেয়ে বসে আছি আলো জ্বালিয়ে—

আগন্তুক—আমিই যে আপনাদের সেই হারানো ছেলে—

বৃদ্ধা—ওরে পাগলা ছেলে মা তার ছেলেকে ঠিক চিনে নেই—সবই যে মিলে যাচ্ছে—কোথায় ছিলে বাবা এতদিন—

আগন্তুক—পথে পথে, পাহাড়ের গহ্বরে গহ্বরে—দেশ থেকে দেশান্তরে আমার ছুটে চলা, স্থিতি আমার কোথাও নেই—

বৃদ্ধ—বলত' বাবা তোমার কুড়ি বছরের ইতিহাস—

আগন্তুক—কোথায় জন্মেছিলাম জানিনা, কে আমার আত্মীয়-স্বজন তাও জানিনা—মানুষ হয়েছি কাশীতে, রামবাবার কাছে—শুনেছি, আমার উড়ে বাবা নাকি আমাকে রামবাবার কাছে গচ্ছিত রেখে চলে যায় কিছু টাকা নিয়ে—তারপর আর ফিরে আসেনা—সে আজ অনেকদিন আগেকার কথা—রামবাবার আশ্রয়ে বড় হয়ে উঠলাম—সেই আমার বাবা—যত বয়স বাড়ল—থাকগে ওসব অতীতের কলঙ্কময় ইতিহাস—

বৃদ্ধা—না না তুমি বল বাবা—শুনি তোমার জীবনের ইতিহাস, মিলিয়ে নি আমার মনের মানুষটির সঙ্গে—

আগন্তুক—কলঙ্কের কালো কালিমা দিয়ে কলঙ্কিত আমার

জীবন। রামবাবার আশ্রয়ে বড় হয়ে উঠলাম, সেই সঙ্গে বাড়ল আমার অর্থের আকাঙ্ক্ষা। প্রথমে ঋণ করলাম, তারপর বঞ্চনা, ক্রমে আরো বাড়ল আকাঙ্ক্ষা করলাম চুরী, ডাকাতি—অর্থের জন্যে। তারপর একদিন সকালবেলা দেখা গেল রামবাবাকে কে হত্যা করেছে সবাই বললে আমি আমি ভয়ে পালালাম··· অথচ আমি হত্যা করিনি, আমি জানি, আমি করিনি।

বৃদ্ধ—তুমি কেন হত্যা করতে যাবে?

আগন্তুক—সেও প্রায় তিন বছর আগেকার কথা। তখন থেকে চলেছে আমার ছুটে চলা, পথে প্রান্তরে, দেশ দেশান্তরে পুলিশের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা, আপনার ছেলে কি এরকম হীন নীচ কলঙ্কিত হতে পারে? এবার বুঝতে পারছেন যে আমি আপনাদের ছেলে নই।

বৃদ্ধা—তুমি নও! তুমি সে নয়?

আগন্তুক—না আমি নই, আমি সে নই, তবে আমিও খুঁজতে বেরিয়েছি তাদের যারা আমায় এ সংসারে এনেছিলেন—অথচ আমাকে আমার ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে ঠেলে দিয়েছে একলা পথে নিতান্ত ছেলেবেলায়।

বৃদ্ধ—রামবাবা তাহলে তোমার কে?

আগন্তুক—আমাকে লালন পালন করে অমানুষ করেছেন, মানুষ করতে পারেন নি।

বৃদ্ধা—কিন্তু তোমার চোখ মুখ তোমার দৃষ্টিভঙ্গি, তোমার কথা বলা সবই তো তার মতন, আমি যে দেখেই তোমাকে চিনেছি—আমার দেখা তো মিথ্যে হতে পারে না—না না তুমিই সেই···তুমিই আমার পথ হারানো ছেলে—তোমার জন্যেই আমার কুড়ি বছরের অপেক্ষা করার সাধনা।

বৃদ্ধ—তোমার জন্যে ঘর সংসার সাজিয়ে আমরা বসে আছি তোমার জন্যেই বাড়ী—দেখবে এসো, টাকা, অর্থ, সোনা, মোহর দেখবে এস।

বৃদ্ধা—হ্যাঁ বাবা, দেখবে এস।

[আবার বাইরের শব্দ স্পষ্ট হ'য়ে উঠল প্রকৃতির বুকে
প্রলয়ের শঙ্কেত সেই শব্দে।]

বৃদ্ধা—দেখলে তো বাবা, তোমার অপেক্ষায় কত আমাদের সাধনা—এই সব সম্পত্তি, অর্থ এই সব নিয়ে আমরা ব'সেছিলাম তোমার আসার আশায়—এইবার আমাদের মুক্তি।

বৃদ্ধ—হ্যাঁ গো তুমি কি সমস্ত রাত কথাই বলবে? ছেলে যে তোমার ভয়ানক ক্লান্ত, খাওয়া দাওয়ার কি হবে, ঘুমোবে না বুঝি ও!

বৃদ্ধা—ঠিক তো আনন্দে আমি সব ভুলেই গেছি। চল বাবা অনেক রাত হলো। তোমার খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করি।

[সঙ্গীত ঝড়: প্রলয় সময় চলেছে প্রলয়ের মধ্য দিয়ে]

বিবেক—ঘুমোলে নাকি?

আগন্তুক—কে? কৈ না তো, তুমি কে?

বিবেক—আমি তোমার বিবেক।

আগন্তুক—তোমার কণ্ঠস্বর এত কর্কশ কেন?

বিবেক—আমি বিকৃত,—তাই!—কি করছ?

আগন্তুক—ভাবছি।

বিবেক—কি ভাবছ?

আগ—অনেক কথা···

বিবেক—যেমন...

আগ—এরা কারা আমি কেমন কোরে এলাম এখানে আমিও তো হারাণো ছেলে এরা কি তবে আমার পিতা মাতা।

বিবেক—বোধ হয়।

আগ—কি করে জানলে?

বিবেক—তা' হলে বোধ হয় নয়।

আগ—কিন্তু কেন নয়, হ'তেও তো পারে।

বিবেক—হ্যাঁ হ'তেও পারে।

আগ—সন্দেহ কেন?

বিবেক—তুমিই বল?

আগ—এঁরা দেবতার মতন মানুষ, আমি দানব তাই সন্দেহ। এরা যুগ যুগ অপেক্ষা করে আছেন দেবতার মতন আমি ছুটে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি দানবের মতন।

বিবেক—তা' হলে নয়।

আগ—অথচ ঘটনা মিলে যাচ্ছে আমিও কুড়ি বৎসর আগে গৃহহারা, আমার বাবা মাকে আমি জানি না মাঝে মাঝে যখনই তাঁদের কথা মনে হয়েছে তখনই মনে হয়েছে যে তাঁরা আমাদের জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করে আছেন।

বিবেক—তা'হলে বোধ হয় এঁরাই।

আগ—তা'হলে থেকেই যাই।

বিবেক—থেকে যাও···

আগ—অন্য কেউ যদি হয়, সে যদি ফিরে আসে?

বিবেক—তা' হলে আবার তোমার পালানো জীবন।

আগ—সে কি করে হয়?

বিবেক—যেমন করে হয়েছিল!

আগ—বাঁচবার উপায় নেই?

বিবেক—ভেবে দেখ' উপায় নিশ্চয়ই আছে।

আগ—কি উপায়? সে নাও ফিরতে পারে।

বিবেক—যদি ফিরে আসে?

আগ—তা' হলে!

বিবেক—উপায় ভাব—

আগ—কি হ'বে ঐশ্বর্য—চলে যাই এখান থেকে সকাল হবার আগেই।

বিবেক—এই সম্পত্তি, অর্থ, আরাম, তাঁদের যত্ন ছেড়ে?

আগ—এত আরাম নয়।

বিবেক—কি করে জানলে?

আগ—আমি তো ছেলে নাও হতে পারি!

বিবেক—হতেও তো পারো!

আগ—তা হলে?

বিবেক—ভেবে দেখ' হাতের মধ্যে পেয়ে পায়ে ঠেলে দেবে?

আগ—উপায় কি!

বিবেক—ভেবে দেখ' নির্জন রাত, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা তুমি যুবক।

[সমুদ্রগর্জন ঝড়ের সঙ্কেত]

আগ—ওকি !

বিবেক—চমকে উঠলে কেন ? বাজ পড়ল।

আগ—বাজ ?

বিবেক—হ্যাঁ, বাজ...

আগ...বাজ ?

বিবেক—হ্যাঁ, বাজ...

আগ—না না আমি পারবো না !

বিবেক—কি পারবে না ?

আগ—নির্দয় হতে...আমি পালাই !

বিবেক...কাপুরুষ...

আগ—নির্দয় হবো ? নিষ্ঠুর...এত দয়া এত মায়াকে পদাঘাত করব ?

বিবেক—না কেন...কত লোক ত' করে !

আগ—বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দেব...

বিবেক—অর্থের প্রয়োজন...

আগ—বাড়ীর দলিলপত্র নিয়ে পালাব ?

বিবেক—কেন নয় ?

আগ—যদি ধরা প'ড়ি ?

বিবেক—এমনিতেও তো উপায় নেই...তুমি ত' পলাতক আসামী

আগ—তাহ'লে...

বিবেক—অর্থ পাবে...

আগ—আর...

বিবেক—সুখ, শান্তি...আনন্দ...বাড়ী, ধন, সম্মান—

আগ—আমি...পারবো...না...

বিবেক—পারবে, পারবে, পারবে...অর্থ সম্মান...সুখ

আগ—কি দরকার। আমি তো ছেলেও হতে পারি...

বিবেক—না-ও হ'তে পারো

আগ—সে না-ও ফিরতে পারে

বিবেক—ফিরতেও পারে...

আগ—এঁরা না-ও ফিরতে পারেন...

বিবেক—চিনতে পারেন...

আগ—আমার চাই না...

বিবেক—চাই...

আগ—না।

বিবেক...হ্যাঁ।

আগ—না না না।

বিবেক—হ্যাঁ...হ্যাঁ...হ্যাঁ...আগুন...আগুন...কেউ জানবে না ...বাজ পড়েছে ভাববে সকলে।

[আকাশ যেন ভেঙে পড়লো, প্রকৃতির বুকে মেঘের গর্জন, সমুদ্রের উত্তাল উদ্দাম উন্মাদনা পৃথিবী গুমরে গুমরে কেঁপে উঠল প্রকৃতির আর্তনাদে]

ঘোষণা—পরদিন সকালে উঠে সবাই দেখলে নির্জন সমুদ্র তীরে ঐ ছোট বাড়ী আগুনে পুড়ে শেষ হয়ে গেছে...সবাই বললে বাজ পড়েছে, কেউ জানলো না কেমন করে পুড়লো...কেবল দেখা গেল...তিনটি কঙ্কাল...আগুনে পুড়ে ঝলসে গেছে...দুটো সবাই চিনলো...তৃতীয়টি আজও সকলের অজানা, কেউ বললে ছেলে কেউ বললে দুশ্চরিত্র গুণ্ডা......কেউ বললে অশরীরি আত্মা... আজও বছরের এই একটি অমাবস্যা রাত্রে অন্ধকারে চলে ঐ বিচিত্র অভিনয়...হয়ত' সত্য, না হয় কেবলই মানুষের কল্পনা... কিম্বা বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার সংঘাত...

[শব্দ ও সঙ্গীতের আভাসই শুধু দেওয়া আছে। শব্দের সব কিছু লেখায় বোঝান অসম্ভব। পাঠক কল্পনায় শব্দ সৃষ্টি করে নিলে লেখার মধ্যে এই সব দোষ ও দৈন্য অনেকটা কম পড়বে।]

বিশ্বের বিস্ময়

গিরিধারী রায় চৌধুরী

কিছুকাল হোলো করাচীর সমুদ্রোপকূলে যে দারুণ প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় ঘটে গেছে, এমনকি যার ফলে প্রায় চার হাজার লোক প্রাণ হারিয়েছে আর প্রায় চল্লিশ হাজার লোক নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছে, বলে বিভিন্ন খবর কাগজে খবর দিয়েছে তারই বৈজ্ঞানিক আলোচনা করা এই প্রবন্ধের লক্ষ্য।

মূল ঘটনাটি জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানে বিপ্লব এনে দিয়েছে অর্থাৎ ইংরাজীতে যাকে বলে 'has exploded the astronomical science। কিছু আগে পর্য্যন্ত জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানীরা যে সব ধারণা পোষণ করতেন, সে সবগুলির কতক এখন ঘা খেয়ে পিছিয়ে গেল। তাঁরা দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে পর্য্যবেক্ষণ করে আর নানান গাণিতিক নিয়ম দেখিয়ে বলতেন যে, পৃথিবীর Satellite বা শাখাগ্রহ চাঁদ নেহাতই মৃত ; তাই তার নাম moon। সেহেতু মৃত, সেহেতু তার মধ্যকার জীবনীশক্তির পরিচায়ক যাবতীয় বস্তু নিঃশেষিত হয়ে গেছে—এই বোঝায়। জীবনীশক্তির পরিচায়ক বস্তু বলতে গলিত ধাতব পদার্থ বা Lava বোঝায়, যা অন্যান্য গ্রহে, শাখাগ্রহেও থাকা সম্ভবপর। পৃথিবী যে একটা গ্রহ, তারও গর্ভের মধ্যে রয়েছে ওই গলিত ধাতব পদার্থ। তারও পর কথা হচ্ছে যে, পোড়া চাঁদের নাকি বায়ুমণ্ডল বা atmosphere বলতেও কিছু নেই। কিন্তু সেদিন ২৮শে নভেম্বর, (১৯৪৫) রাত্রিশেষে আনুমানিক সাড়ে তিনটায় যখন চাঁদ আর পৃথিবী

ছুটেছে তফাত হয়ে—অর্থাৎ নবমীর চাঁদ যাচ্ছে অস্ত, আর পৃথিবী চলেছে সূর্য্যোদয়ের দিকে, সেই সময়ে করাচী-বন্দরের উপকূলস্থ আরব সাগরে দেখা দিল তুমুল আলোড়ন। ইতঃপূর্ব্বে সাধারণ লোকে হয়ত জানতই না যে, আরব সাগরের মধ্যে কোন নিমজ্জিত আগ্নেয় পর্ব্বত আছে ; বরঞ্চ দোষ দিত লোকে এশিয়ার পূর্ব্ব-দিককার প্রশান্ত-মহাসাগর, চীন সাগর ইত্যাদির। ভূ-তাত্ত্বিকেরা কার্য্য থেকে কারণ আর কারণ থেকে কার্য্য, এই উভয় নৈয়ায়িক বিধির ওপর নির্ভর করেই মত গড়ে তুলেছিলেন যে, সারা প্রশান্ত মহাসাগরটা—একেবারে কামস্কাটকা-আলাস্কার মোড় থেকে আরম্ভ করে জাভা বোর্ণিও মালাক্কা-সেলিবেসের কোল পর্য্যন্ত আগ্নেয় পর্ব্বতে ভর্ত্তি। আর তাঁদের এই মতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে গিয়েছে চাঁদের উদ্ভবের মতবাদটাও। এখন থেকে অনুমানিক বিশ লক্ষ বচ্ছর আগে পৃথিবীর জ্বলন্ত (flaming) বা অর্দ্ধতরল (liquid) অবস্থায় পূবদিকের খানিকটা (অর্থাৎ, এখন যেখানে প্রশান্ত-মহাসাগর অবস্থিত,) চ্যুত হয়ে বেরিয়ে যায়। Sir James Jeans এর সঙ্গে হয়ত একেবারে একমত হ'তে না পারলেও একথা প্রচার করতে দোষ নেই যে, পৃথিবী যেহেতু anti-clockwise motionএ অর্থাৎ ঘড়ির বিপরীত গতিতে, পশ্চিম থেকে পূবে ঘুরে যাচ্ছে সুতরাং গতিতত্ত্ব (Dynamics), ভরবেগ (momentum) ভার-সাম্য (balance) আর বিস্ফোরক পদার্থ (explosive materials), রঞ্জস-সরণকারী পদার্থ (Radio-active particles)-এর ধর্ম্মের দিকে লক্ষ্য রেখে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, জ্বলন্ত বা অর্দ্ধতরল অবস্থায়, ভারসাম্য বা * balance হবার আগেই পৃথিবীর পূব দিকের খানিকটা অংশ ছিন্ন হয়ে বেরিয়ে গিছল। এ রকম ব্যাপার বিশেষ ধরণের বিস্ফোরণের ফলই ; কোন সূর্য্য-তারা বা অন্য গ্রহের আকর্ষণ-বিকর্ষণের ফল নয়। পশ্চিম থেকে পূব দিকে ঘোরার মুখেই ভরবেগের ও ভার-সাম্য চ্যুত হওয়ার দরুণই এ রকমটা ঘটতে পারে। অবশ্য ভিতর থেকে বিস্ফোরক পদার্থের তাড়া বা রঞ্জস-সরণকারী পদার্থের সক্রিয়তা এবং পৃথিবীর জ্বলন্ত বা অর্দ্ধতরল অবস্থা ঘটনাটির সহায়তা করেছিল। আর, গাণিতিক গতি-নিয়মানুসারে (according to the mathematical laws of motion) পশ্চিম দিকের চাইতেও পূবদিকেই চাপটা বেশী পড়া উচিত। যদি মনে করা যায় যে, একবাটি কানায়-কানায় ভর্ত্তি তেল নিয়ে একজন নর্ত্তক লাটিমের ধরণে বিষম বেগে ঘোরে তবে তার একদিক থেকে অন্যদিকে ঘোরবার মাথায় তেলের বাটিটা উপছিয়ে খানিকটা তেল ছিটকে পড়া যেমন সম্ভব, চাঁদের উদ্ভব ব্যাপারটাও ঠিক তেমনি সম্ভব। এখন সূর্য্য থেকে গ্রহসৃষ্টির ধরণটা 'যেমনতরই হোক না কেন, পৃথিবী থেকে চাঁদ সৃষ্টির ব্যাপারটা তার অনুরূপ নাও হ'তে পারে। নিছক সূর্য্যকে বাদ দিয়ে সূর্য্য-পরিবারের সৃষ্টির যে রূপটা Sir James Jeans ধারণা করে বসে আছেন, সেটা একেবারে New tonic theory of gravitation এর classical-ideaর ওপর নির্ভর করেই, সুতরাং সেটা একরকমই অচল-কল্প।

সে যাই হোক্, এবার আমায় আমার প্রবন্ধের লক্ষ্যবস্তুতে আসবার চেষ্টা করতে হবে, ভারতের পশ্চিম উপকূলস্থ করাচী অঞ্চলের কাছ বরাবর ও আরও দক্ষিণে Adam's Peak-এর কাছ পর্য্যন্ত সমুদ্রজলে নিমজ্জিত আগ্নেয় পর্ব্বত থাকা সম্ভবপর। ভূমিপ্রান্তের বিবিধ লক্ষণ, আর উপকূল-গঠনের প্রকৃতি দেখেও এ-কথা মনে হয়। তা'ছাড়া আগ্নেয় পর্ব্বত আগে থেকে না থাকলেও পৃথিবীর যে কোন প্রদেশে বিস্ফোরণের ফলে আগ্নেয় পর্ব্বতের মাথা খাড়া করে দাঁড়ান সমান নিশ্চিত আর সমান অনিশ্চিত। তারপর ভূগর্ভে গলিত পদার্থের ধূম-পুঞ্জ বা বিস্ফোরক পদার্থের চাঞ্চল্য বশতঃ কিংবা রঞ্জস্-সরণকারী পদার্থের সক্রিয়তারূপ যে কোন কারণেই হোক পৃথিবীর বিভিন্ন স্তর ভেদ ক'রে, পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলসমূহ কাঁপিয়ে প্রচুর গলিত ধাতু-প্রস্তর ওপরে উঠে আসে ; তার ফলে দ্বীপও জন্মাতে পারে, আবার পর্ব্বতও গড়ে উঠ্তে পারে। সুতরাং এ-ক্ষেত্রে ২৮শে নভেম্বর রাত্রিশেষে চাঁদের আকর্ষণে পৃথিবীগর্ভে আলোড়ন বা পৃথিবীর আকর্ষণে চাঁদের গর্ভে আলোড়ন (Reflex action) দেখা দিয়েছিল এবং ওই দুইটির মধ্যে যে কোন একটির স্বতঃপ্রবৃত্ত বিস্ফোরণ ঘটেছিল বটেই। সুতরাং তারই অল্প সময় ব্যবধানে অন্যটিতে আলোড়ন-রূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল। এখন ঐ দুটি আকাশীয় বস্তুর মধ্যের সংযোগসূত্রটি এই প্রায় সমকালীন বিপর্য্যয়দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেছে ভারী বিচিত্ররূপে। এই বিচিত্রতার মর্ম্মকথা এবার খুলে বলি, তা'হলেই লক্ষ্যে গিয়ে পৌছান যাবে। রাত্রিশেষের ওই সময়েই "হিন্দুস্থান" নামক জাহাজ-এর ওপর থেকে জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী চাঁদের অবস্থা সম্বন্ধে যে বিবৃতি দিয়েছেন খবর কাগজের প্রতিনিধির কাছে, সেটা হচ্ছে এই যে, পৃথিবীগর্ভে আলোড়ন শুরু হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চাঁদের গায়ে এক রক্তিম কুহেলিকা দেখা দেয়, আর ভীষণ গর্জ্জন মুহুর্মুহুঃ শোনা যায়। এই রক্তিম কুহেলিকাটিও কিছুক্ষণ স্থায়ী হয়েছিল, sunstorm বা সূর্য্যের ঝড়ের মতই। চাঁদ আর পৃথিবী উভয়েই যখন সমান পিছিয়ে যাচ্ছে, তখন তাদের মধ্যের গড় দূরত্ব কমপক্ষে সওয়া দুই লক্ষ মাইল হওয়া উচিত। এটা পৃথিবীর ব্যাসের তিরিশ গুণ আর চাঁদের ব্যাসের প্রায় একশ' চারগুণ। সুতরাং এ রকম হতে পারে যে, চাঁদের মধ্যে চাঞ্চল্য আগে দেখা দেয় ও সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর ওপর তার প্রতিক্রিয়া শুরু হয়, এবং সেই প্রতিক্রিয়ার রেশই আবার চাঁদে অনুভূত হওয়ায় চাঁদের আলোড়নটা আরও কিছুক্ষণ স্থায়িত্ব লাভ করেছিল।

প্রকৃতপক্ষে বিপর্য্যয়ের ব্যাপারটা যে-রকমই হোক না কেন, এ-থেকে প্রমাণ হয়ে গেছে যে, চাঁদ একেবারে নির্জ্জীব হয়ে যায়নি—ঠিক যে-রকমটা জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ধারণা ক'রে বসেছিলেন। আরও কথা হচ্ছে এই যে, চাঁদের যে তিন চতুর্থ অংশ পৃথিবীর দিকে নিয়ত ঝুলে থাকে,সেখানে বায়ুমণ্ডলের কোন অস্তিত্ব খুঁজে না পাওয়া গেলেও; অপর এক চতুর্থ অংশে বায়ুমণ্ডলের অস্তিত্ব সম্ভবপর। তা' না হ'লে ঠিক পূর্ব্বোক্ত রকমের রক্তিম কুহেলিকার অস্তিত্ব লাভ বা চাঁদের দেহ ঘিরে ঘুরে যাওয়া অসম্ভব।

শ্রীঅবনীকান্ত ভট্টাচার্য্য

(পাঁচ)

বারিদবরণের অট্টালিকা ফুলে লতায়-পাতায় ও ইলেক্‌ট্রিক্ বাতির মালায় সাজিয়াছে। নহবত-মঞ্চে সানাই সুর ধরিয়াছে কামোদ-রাগিণী। উৎসবের মৃদু গুঞ্জন, খোঁপা আর কবরীর গ্রন্থি হইতে ফুলের গন্ধ, এবং সহস্র-ঝাড় দীপের আলো ও সুস্বর রাগ যেন প্রীতি-মিলনের ইন্দ্রলোক রচনা করিয়া তুলিয়াছে।

দোতালার মস্ত হল ঘরে অতিথিদের আনন্দ-মেলা বসিয়া গিয়াছে। ঘরে বাসন্তী-রঙের দেওয়ালের কোলে পলাশ-রাঙা জাজিম পাতা। হলঘরের দক্ষিণদিকে আলোকোজ্জ্বল একটি প্রশস্ত অলিন্দ। হলঘরের সামনে দালান—সেই দালানের বাম-পার্শ্বে প্রবেশদ্বার। সেখানে দাঁড়াইয়া ক্ষমা হাসিমুখে নিমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনা করিতে ব্যস্ত, কিন্তু তাহার মুখে একটা উদ্বেগ ও চঞ্চলতার চিহ্ন প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। নিমন্ত্রিতগণ একে একে প্রবেশ করিতেছে, প্রতিজনের হাতে শোভা পাইতেছে—একটি করিয়া রঙীন্ উৎসব-সূচীলিপি ও ক্ষুদ্রাকার পুষ্পগুচ্ছ।

কাশিকা মৌলিক-কন্যা অগুরুকে লইয়া ইতিমধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। মৌলিক-গৃহিণী কাহারও সহিত মুচকি হাসিয়া, কাহাকেও একটু মাথা নাড়িয়া, কাহারও গায়েপড়া হইয়া সাত গুষ্টির কুশল সংবাদ লইয়া, কাহাকেও আপ্যায়িত করিয়া, কাহারও মনস্তুষ্টির জন্য তাহার বিরাগ-ভাজন কোনো পরিবারের কুৎসা গাহিয়া নিজের দেমাকী গুরুত্ব জাহির করিয়া বেড়াইতেছে। অবশেষে ক্লান্ত হইয়া দালানের একধারে একটি কাউচে বসিয়া ক্ষমার দিকে আড় চোখে চাহিয়া চাপা গলায় অগুরুকে কহিল : "বারিদবরণকে এখানে দেখ্‌ছি না তো—আমার যেন অদ্ভুত ব'লে মনে হচ্ছে। যাক্‌গে পরের কথায় মাথা ঘামাবার দরকার কি! হ্যাঁরে অগুরু, প্রেমবর্দ্ধনের যে এখনো দেখা নেই—আসতে এতো দেরী হচ্ছে কেন, বল্ দেখি? প্রোগ্রামে নাচ রয়েছে তার!"

অগুরু উদাসভাবে বলিয়া উঠিল : "আমি কি জানি? আমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কি তিনি গতিবিধি ঠিক করেন?"

কাশিকা ঝঙ্কার দিয়া বলিল : "মেয়ের কথা ছাখো? আজ-কালকার বেহায়া মেয়ের মতো তুই বড় যা' তা' বলিস! আমি ও-রকম বেহায়াপণা পছন্দ করি না।"

অগুরু মুখ ঘুরাইয়া উত্তর দিল : "বেহায়াপণা কি দেখ্‌লে—মা? তাঁর সম্বন্ধে আমায় জিজ্ঞেস কচ্ছ—আমি জান্‌বো কেমন ক'রে? আর তিনি যখুনি আসুন না—তুমি অতো ব্যস্ত হচ্ছো কেন?"

"বেশ গো বেশ—এখন থামো!—আমার ব্যস্ত হ'বার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রোগ্রামটা খুলে দেখেছিস? প্রেমবর্দ্ধনের নাচ রয়েছে—তার সঙ্গে তুইও তো নাচবি! তা'র কাছে নাচ শিখেছিস—তা'র খোঁজ রাখা কি তোর পক্ষে অনুচিত মনে করিস?"

"তা' না মনে করতে পারি—"

"তবে?—এই খাপ ফর্দ্দটা—চখা-চখী বিরহ-নৃত্য, কথামালা-নৃত্য, পুতনা নৃত্য,...উঁহু—এ নাচটা বাদ দিতে হবে—ওর বদলে বাণ-বিদ্ধ হরিণী নৃত্যটাই ভালো,—আর যুগল মিলন নৃত্য। এ্যাতোগুলো নাচ নাচতে হবে—সেটা কি হুঁস আছে?—আমার ইচ্ছে গুরুশিষ্যার নাচ দেখে সকলের তাক্ লেগে যাক্,—আর যাবেও—আমার খুব বিশ্বাস।—মাগো, আজকাল যা' সব নাচে মেয়ে-মদ্দে মিলে—তার মাথামুণ্ডু নেই—যেন পুতুল-নাচ! তোর এই নাচগুলো সব ঠিক ক'রে রেখেছিস তো?"

"হ্যাঁ মা!"

"মনে রাখ্‌বি—প্রেমবর্দ্ধনের মতো ছেলে হয় না।—যদি তোদের দু' হাত মিলিয়ে দিতে পারি—তখন বুঝবি—ভাগ্যি কাকে বলে। কণাদ রায় কি আর কোনো ছেলে-ছোকরার সঙ্গে যেন হাসি ঠাট্টা কত্তে না দেখি।"

"আমি কি সকলের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা ক'রেই বেড়াই, দেখতে পাও?"

"এই দেখো—আবার কথার ওপর কথা! মেয়ের যেন সব সময়েই মিলিটারী মেজাজ! তোর যাতে একটা সুরাহা হয়—সেদিকে আমার দেখতে হবে না? যা' বলি—তাই মুখ বুজে ক'রে যা'—জীবনে দুঃখু পাবিনে।"

"তোমার কথা কোনোদিন ফেলেছি, মা?"

হলঘর হইতে উচ্ছ্বসিত হাততালির শব্দ আসিতে মা ও মেয়ের কথা বাধা পাইল। ইহার পরমুহূর্ত্তেই প্রেমবর্দ্ধন আসিয়া তাহাদের সামনে দাঁড়াইল, নমস্কার করিয়া সহাস্যে বলিল :—"আপনারা যে এখানে ব'সে রয়েছেন?"

মৌলিক গিন্নি প্রেমবর্দ্ধনকে দেখিয়া শশব্যস্তে উঠিয়া পড়িয়া একগাল হাসিয়া কহিল : "এই যে, আপনি এসেছেন, প্রেমবর্দ্ধন বাবু? এতো শীগ্‌গীর আসবেন—তা, আশা কর্‌তেই পারিনি। আপনার কত কাজ! জানি তো—সারা কলকাতার লোক আপনার পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছে—সকলের ভিড় ঠেলে আসা কি সোজা কথা? কি বলিস অগুরু?"

অগুরু একবার দৃষ্টি বিনিময় করিয়া মাথা নাড়িয়া সায় দিল।

প্রেমবর্দ্ধন টানিয়া টানিয়া বলিতে লাগিল—"আমার চমৎকার লাগছে কলকাতা! এবার এসে দেখছি—আজকাল চাল-চলন অনেকটা বদলে গেছে। মেয়ে-পুরুষের অবাধ মিলনে আর আগের মতন আঁটাআঁটি নেই। এই প্রগতির যুগে আগেকার সঙ্কীর্ণতা বাঁচতে পারে না—এ কথা আমি জানতুম।"

"তা তো বটেই, যুগ পালটে যাচ্ছে! আজকালকার মেয়েদের কি আর সেকেলের মেয়েদের মতন ঘরের চারটে

দেওয়ালের ভেতর মাথায় ঘোমটা দিয়ে ব'সে থাকা সাজে? তবে, গায়ে-পড়া কতকগুলো মেয়ে বেহায়াপণায় একেবারে সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে গেছে; তাদের লজ্জা-সরমের কোনো বালাই নেই। সেটা কি আপনি ভালো বলেন?"

প্রেমবর্দ্ধন হাসিয়া বলিল: "ও-রকম দাগী এক ক্লাশ থাকে—তাদের অভ্যেসই হ'চ্ছে বোকা পুরুষদের নাকে দড়ি দিয়ে বাঁদর-নাচ নাচানো।—কিছু আদায় ক'রে নিয়ে—দিন কয়েক ফূর্ত্তি ক'রে তারপর স'রে পড়া। এ-জাতের শিকারী মেয়েদের অঙ্গেরও কোনো দাম নেই, শ্লীলতা-জ্ঞানও নেই, তাদের হাত পালটানো স্বভাবে দাঁড়িয়ে যায়। এদের কথা বাদ দিন্। এরা এক জোড়া ভাল শাড়ী আর দু'টো ব্রেসলেট্ বা ইয়ার-রিং'এর জন্যে সব করতে পারে; উপরন্তু সিনেমা যাবার সুবিধেটা যদি থাকে—যে কোনো পুরুষকে অভ্যর্থনা করতেও এদের বাধে না। কথাগুলো একটু রূঢ় ঠেকছে বটে, কিন্তু এই হচ্ছে নিছক সত্যি। উড়িয়ে দেবার উপায় নেই—এ আমার অভিজ্ঞতা।"

"আপনি কত দরের লোক—তা' কি আমি জানি না! আপনি ছাড়া কে এমন কথা কইবে? আপনি সার বুঝেছেন, যেন আমার মনেরই কথা। আপনার মতন লোক এ-দেশে যত বাড়বে—এ-দেশ বর্ত্তে যাবে। জীবনটা আরো সহজ হ'য়ে উঠবে। জানেন, প্রেমবর্দ্ধন বাবু, আপনার কাছে অগুরু বোম্বাইয়ের গল্প শুনে সেখানে যাবার জন্যে ঝুঁকেছে, আমি বলি, ভগবান সুযোগ দেন, যাবি। আমারও কিন্তু বোম্বাইয়ের কথা শুনে সেখানে যাবার খুব লোভ হয়। যেমন চমৎকার জল-হাওয়া; তেমনি নাচে-গানে দেদার পয়সা আসে। এ পোড়া কলকাতার মতন যেন ঠিক একটা বড় প্যাক্-বাক্স। অগুরু আমাকে বায়স্কোপের কাগজ প'ড়ে শোনায় কিনা—তাই বোম্বাইয়ের ব্যাপার জানি। কলকাতার মত বহু পুরাণো শহর তো আর নয় বোম্বাই, নতুন শহর—তাই নয় কি?"

"না, না, বোম্বাইয়ের বয়স কলকাতার চেয়ে কম মনে করেন না কি?"

"তা আমি বেশী কেমন ক'রে জানবো?...আপনি এমন বুদ্ধিমানের মতন কথাগুলো বলেন—আপনার তুলনা আপনি নিজে। এখন আর আপনাকে আটকে রাখবো না। আপনার নাচ আছে।"

"হ্যাঁ, অগুরুও তো নাচবে! এসো অগুরু, সাজসজ্জা করতে হবে—আর বেশী সময় নেই।"

"দেখবেন—আমার হাবাগোচা মেয়েটির দিকে বিশেষ নজর রাখবেন----ওর আনন্দ হ'লে একটু বেশী কথা বলে! আপনার ওপরেই ভার। আমি এইজন্যে কারোর সঙ্গে মিশতে দেই না—সর্ব্বদাই কাছে কাছে দিয়ে ফিরি।"

প্রেমবর্দ্ধন বাঁকা হাসি হাসিয়া মৌলিক গিন্নিকে আশ্বাস দিয়া প্রস্থান করিল। অগুরুও সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হইয়া গেল। মৌলিক গিন্নি ভাবী আশার আনন্দ কল্পনায় যেন হাওয়ায় ভাসিতে ভাসিতে হলঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

অভ্যাগতদের হাস্যকৌতুকে, আর উৎসব-মণ্ডপ হইতে ভাসিয়া-আসা মধুর সঙ্গীতে সেই স্থানটীর আবহাওয়া আনন্দময় হইয়া উঠিল। কিন্তু ক্ষমা দ্বারের এক পাশে দাঁড়াইয়া একে একে প্রত্যেক নবাগতকে যন্ত্রচালিতের ন্যায় স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছিল, পরক্ষণেই তাহার সুন্দর মুখ হইতে হাসি মুছিয়া গিয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল গাম্ভীর্য্যের রেখা। কিছুক্ষণ পরেই কণাদ রায় আসিয়া পৌঁছিল—তাহার পেছনে মালির হাতে বিচিত্র পল্লব-সমন্বিত একঝাড় গোলাপের বৃহদাকার একটি বাসকেট্। কণাদ ঢুকিতেই ক্ষমা মৃদুহাস্যে আপ্যায়ন করিল। গোলাপের বাস্কেটটি হাতে লইয়া কণাদ ক্ষমার কাছে অগ্রসর হইয়া অভিনব ভঙ্গীতে কহিল: "ক্ষমাদেবী! এই গোলাপ মঞ্জরী সানুগ্রহে তুলে নিন। এই দীন গুণমুগ্ধ বন্ধুর এই ক্ষুদ্র উপহার। আপনার জীবন ফুলের মতই সুরভিময় হ'য়ে উঠুক—এই আমার আজিকার দিনের প্রার্থনা।"

ক্ষমা প্রশংসমান দৃষ্টিতে পুষ্পস্তবকের উপর চাহিয়াছিল, কণাদের সুগন্ধ উপহার পরিচারিকার হাতে দিয়া বলিল, "এই ফুলের বাসকেটটা সাবধানে নিয়ে যাও, আমার শোবার ঘরে সেই জানালাটার কাছে রেখে এসো।"—তারপর, কণাদের দিকে ফিরিয়া কহিল: "কুমার বাহাদুর আপনি উৎসব মণ্ডপে যাবেন না?"—কণাদ ক্ষণেক ইতস্ততঃ করিয়া হলঘরের দিকে চলিয়া গেল। [ক্রমশঃ]

নেই আপোষ

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

হাজার হাজার কোটি কোটি চোখে ফেলেছি জল,
ব্যর্থ জীবনে সহেছি কতনা চাতুরী ছল।
বুকের শোণিত-রক্তে ভেসেছে ধরণীতল!
ফেলেছি জল।
না-বলা কথায় বুকের বেদনা আরও ভারী,
সত্যের সাথে মিথ্যে করেছে মারামারি,

ছোট প্রাণ নিয়ে কেন কর এত কাড়াকাড়ি—
মারামারি?
যুগ যুগান্ত দ্বন্দ্বের বুঝি নেই আপোষ—
বিধাতার আঁকা অভিশাপ নয়, তোমারই দোষ—
নেভেনি কো তাই তোমার ওপরে আমার রোষ,
জেনে রেখো তাই—নেই আপোষ!

জয়লক্ষ্মী

শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

তোমার লীলার তূণে এত অগ্নি আছিল লুকানো ?
নশ্বর অধরে ছিল এমন পিপাসা ?
—অন্তরে ঘুমায়ে ছিল এত ভালবাসা ?
কালো আঁখি-মণিকায় এত আলো আছিল মাখানো ?

লাবণ্য-জোয়ারে ভরা যৌবনের বেলাভূমি 'পরে
ব্রীড়াচ্ছলে অন্যমনে খেলিতে খেলিতে
সহসা এল কি ঝড় সমুদ্র-সঙ্গীতে !
—মিথ্যা সে খেলার ঘর চূর্ণ হ'য়ে উড়িল অম্বরে।

কে জানিত একদিন রঙ্গময়ী, হে লীলাচঞ্চলে !
তোমার বরাঙ্গ ভরা ললিত লজ্জার
আনন্দ চটুল লাস্য, যৌবন সজ্জার
সর্ব্ব সুখ-আভরণ ছিন্ন হয়ে স্খলিত অঞ্চলে
লুটাবে ধূলার তলে। জীবনের সর্ব্ব আকিঞ্চন,
উদ্বেল অতৃপ্ত আশা, রোমাঞ্চিত সাধ,
তনুপাত্রে লাবণ্যের সুচারু প্রসাদ,
মধুময় প্রেমরস, অকাতরে ক'রবে সিঞ্চন
নির্ম্মম ভাগ্যের মূলে আপনারে দু'হাতে নিঙাড়ি' —
দুঃসহ দুঃখের তপে দহি' মনোভূমি,
দুশ্চর ত্যাগের ব্রতে পূর্ণ হবে তুমি
— অতীত জীবন-সত্তা দগ্ধ হবে আলোকে বিদারি' !
জাগবে নূতন সৃষ্টি ভস্মীভূত ইতিহাস হ'তে,
আলোকে উঠিবে জাগি' ইতিবৃত্ত নব,
দহনে প্রদীপ্ত শিখা জীবনের তব
উজলি' তুলিবে বিশ্ব মেঘমুক্ত আলোকের স্রোতে !

কে জানিত একদিন দুর্গমের যাত্রা হবে সুরু
উতল অনন্ত শূন্যে দুর্য্যোগের রাতে !
বাজায়ে জয়ের শঙ্খ অশনি সম্পাতে
তাণ্ডবের আশীর্ব্বাদ গুমরিবে গুরু, গুরু, গুরু !

নিরন্ধ্র তমসাপুঞ্জে ঝলকিত বজ্র বিভীষিকা
তোমারে দেখাবে পথ, আতঙ্ক নীরবে
চলিবে চরণ ঘিরি'—তবু জয়ী হবে ;

মৃত্যুর আরক্ত বহ্নি আঁকি দিবে গৌরবের টীকা
তোমার সীমান্ত পটে।—লীলাচ্ছলে ওগো নিঃশঙ্কিনী !
হেলায় ফেলিবে খুলি' কৌতুকে আকুল
কণ্ঠের কাঞ্চন মালা, কবরীর ফুল,
আছাড়ি' ভাঙিবে দূরে চরণের কনক-কিঙ্কিণী।
সদর্পে সম্মুখে আসি' নম্রশিরে দাঁড়ায়ে নীরবে
চকিতে তুলিয়া লবে শানিত কিরিচ,
স্কন্ধের বন্দুকে ভরি' মরণের বীজ
শঙ্কাহীন সাধনার যাত্রাপথে চলিবে গৌরবে !

দুরান্তে ঘনায়ে আসা রক্তরাগ মহাবিপ্লবের
আলোকে রাঙায়ে দিবে মাধবী রজনী,
সজ্জিতা লোহিতবাসে বিচিত্রা ধরণী—
আনিবে শোণিত গন্ধ ;—দিকে দিকে বিদীর্ণ শেলের
জ্বলন্ত দীপালিপুঞ্জে রচি' দিবে নব অভিসার !
অক্ষয় মৃত্যুর প্রেমে মনোকুঞ্জ ভরি'
জীবনের শ্যামরূপ উঠিবে সঞ্চরি'
মুক্তির পরম রসে সিক্ত করি' হৃদয় তোমার !

এ তব দুরন্ত আশা, দুর্নিবার জীবনের ব্রত,
উদ্ভ্রান্ত বিশ্বের চোখে এনেছে বিস্ময়,
তোমার জীবনপুঞ্জ শুধু তব নয়—
নিখিল বিশ্বের ধন, অমিতায়ু, ভুবনে অক্ষত।

হেথা মোর জন্মভূমি, অশ্রুমুখী দুঃখিনী বন্দিনী,
সে তোমারে বক্ষে ধরে হ'য়েছে শীতল,
গৌরবে মায়ের মুখ করেছ উজ্জ্বল,
চিরশৃঙ্খলিতা নারী, তব বরে হলো বিজয়িনী।
ভারতের ওষ্ঠপুটে উৎসারিত তোমার প্রণাম —
ভারতী প্রশস্তি পটে গাহিছে জীবনী,
ছিন্ন করি' নিয়তির অনন্ত বন্ধনী
স্বদেশের লক্ষ্মী মেয়ে পেলে তুমি জয়লক্ষ্মী নাম।

পুস্তক ও আলোচনা

প্রথম প্রণাম (উপন্যাস) : শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য। প্রকাশক—রবীন্দ্র পাব্লিশিং হাউস, কলিকাতা। দাম—২৲ টাকা মাত্র।

উনিশে আষাঢ় (উপন্যাস) : শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য। প্রকাশক—বিদ্যাসাগর বুক ষ্টল, কলিকাতা। দাম—২৷৷০ টাকা মাত্র।

শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য সাম্প্রতিক বাংলার স্বনামখ্যাত কবিদের মধ্যে একজন। তাঁহার 'সায়ন্তনী' 'নীরাজন,' 'মধুচ্ছন্দা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থগুলি তাঁহার কবি-জীবনের অন্যতম অবদান। অপূর্ব্ববাবুর অধিকাংশ কবিতার মধ্যেই আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি—একদিকে তাহা যেমন অতিরিক্ত রোমান্টিকধর্ম্মী, অন্যদিকে তেমনি বস্তুতন্ত্রসম্পৃক্ত। কিন্তু সেই বস্তুবাদও রোমান্টিক-ভাবের অতর্কিত প্রভাবে খাঁটি বস্তু হইয়া দাঁড়াইতে পারে নাই। কাব্য-সাহিত্য অপেক্ষাকৃত ভাবমুখী বলিয়াই তাহা উল্লেখ-যোগ্য বা দোষণীয় নয়। কিন্তু যখন দেখা যায়, বস্তুভাবের বিশেষ প্রয়োজন ক্ষেত্রেও সেই অহেতুক প্রভাব আসিয়া ভিড় করিয়াছে, তখন রচনাকারীকে শিল্পজগতে প্রথম শ্রেণীর আসন দেওয়া কঠিন হইয়া ওঠে। অপূর্ব্ববাবুর সাম্প্রতিক প্রকাশিত আলোচ্য উপন্যাস দুইখানিতেও তাঁহার সেই রোমান্টিক মনের উগ্র প্রকাশই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। নর-নারীর প্রেম চিরন্তনধর্ম্মী। বাহিরের জগতে যতই বোমা-ব্যারিকেডের সঞ্চারণ চলুক—অন্তর্জ্জগতে মানুষ চায় শান্তির আশ্রয়। যতকিছু সুকুমার বৃত্তির সেইখানেই প্রকাশ। কিন্তু সেই প্রেমধর্ম্ম যদি কোনো ক্ষেত্রে সংযমতার বাঁধ ভাঙিয়া বিশৃঙ্খল স্রোতাবর্ত্তে ডুবিয়া যায়, তাহা হইলে সাহিত্য কখনো সৎ-সাহিত্য হইয়া সমাজ-কল্যাণের ভার গ্রহণ করিতে পারেনা। অপূর্ব্ব বাবুর বিষয় নির্ব্বাচন ও ভাষার উপর আমাদের গোড়া হইতেই শ্রদ্ধা ছিল। আলোচ্য গ্রন্থ দুইখানি যদিও কবি-জীবনের প্রথম গদ্য-প্রয়াস, কিন্তু লেখকের শক্তিধর লেখনিকে এখানে বিপর্য্যস্তই দেখিতে পাই। সেই বিপর্য্যয়মুখী কথাসাহিত্য 'প্রথম প্রণাম' ও 'উনিশে আষাঢ়' কবির প্রতি আমাদের চিরন্তন শ্রদ্ধাকে অক্ষুন্ন রাখিতে পারে নাই। বাংলা সাহিত্যে আজ আন্তর্জ্জাতিক ও আন্তঃপ্রাদেশিক ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। বাংলা সাহিত্যের এই যুগ-সন্ধিক্ষণে রুগ্নমনোভাবাপন্ন নায়ক-নায়িকার ততোধিক রুগ্ন প্রণয়বিলাস যুগ-সাহিত্যের দিক হইতে অতীতের মৃত-কঙ্কালেই পর্য্যবসিত হয়। সেই দিকে সুক্ষ্ম দৃষ্টি রাখিয়া ভবিষ্যতে কথা-সাহিত্যে লেখনী ধরিলে অপূর্ব্ববাবুর সুনাম রক্ষা পাইবে বলিয়াই মনে করি।

চৌট্ (উপন্যাস) : ক্যারল ক্যাপেক। অনুবাদক : শ্রীমৃণাল সেন। পুস্তকালয়, কলিকাতা। দাম—দুই টাকা মাত্র।

ক্যারল ক্যাপেকের আলোচ্য বইটীর টেক্নিক অনবদ্য। কী চরিত্রবিশ্লেষণ, কী পদ-লালিত্য—নানা দিক দিয়া বইটি বিশ্ব-সাহিত্যে বিশেষ গৌরব লাভ করিয়াছে। বাংলা সাহিত্যে 'চৌটের' অনুবাদ অনুবাদকের সুরুচিরই পরিচয় দেয়। কিন্তু, সম্ভবতঃ লেখকের এই প্রথম রচনা, তাই অনুবাদ-সাহিত্যে যে প্রাঞ্জল গতিশীলতা ও শিল্পবোধের আবশ্যক, তাহা লেখকের মধ্যে মূর্ত্ত ও প্রস্ফুট নয়। লেখকের ভাষা সহজ ও সরল। আরও কিছুটা আত্মস্থ হইয়া রচনাকার্য্যে অবতীর্ণ হইলে লেখক বৃহৎ কৃতিত্বের অধিকারী হইতেন। তবে, সাধারণতঃ বাংলাসাহিত্যে অনুবাদ-গ্রন্থ আমরা যাহা পড়িয়া থাকি, তাহার মধ্যে 'চৌট'-এর অনুবাদক প্রথম শ্রেণীর শিল্পী বলিয়া দাবী করিতে পারেন।

মরু-প্রদীপ (গল্প-গ্রন্থ) : শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল, এম্-এ। প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, কলিকাতা। দাম—২৲ টাকা মাত্র।

চৌদ্দটি গল্প লইয়া 'মরু-প্রদীপ'-এর সলিতা সাজানো। প্রথম গল্পটি 'ইভাকুইজ ফ্রম রেংগুন'কে ঠিক গল্পের পর্য্যায়ে টানিয়া আনা যায় না। জাপানী-আক্রমণের সময়ে রেংগুন হইতে পলাইয়া পায়ে-হাঁটা-পথে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের কাহিনী ডায়ারীর আকারে গল্পের মত করিয়াই লেখক বর্ণনা করিয়াছেন। এবং আলোচ্য গ্রন্থের মধ্যে এই কাহিনীটিই বিশেষ ভাবে চিত্তাকর্ষক বলিয়া মনে হয়। লেখক প্রধানতঃ কবি, রচনার মধ্যেও তাঁহার সেই কবিধর্ম্মী মনের পরিচয় পাওয়া যায়; গল্প রচনায় তাহা অনেক সময় উচ্ছ্বাস-প্রধান হইলেও এক্ষেত্রে বর্ণনার গুণে রচনা হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। অন্যান্য গল্পের মধ্যে 'অন্ধের প্রেম,' 'মনের পরশ.' 'প্রেমের অভিশাপ,' এবং 'স্পাই' কাহিনী ও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের দিক দিয়া মন্দ নয়।

নিবেদন

বর্ত্তমান জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার সঙ্গে 'বঙ্গশ্রী'র ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ণ হইল। আগামী আষাঢ়ে বঙ্গশ্রী চতুর্দ্দশ বৎসরে পদার্পণ করিবে।

নানা সংঘাত ও ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া আমরা এই সুদীর্ঘ ত্রয়োদশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছি। যাঁহারা আত্মীয়ের মতো, বন্ধুর মতো, ভাইয়ের মতো প্রীতি, সহানুভূতি ও আন্তরিক সাহায্যদানে আমাদের এই দুর্গম ক্ষুরধার বন্ধুর পথে পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আজ আমাদের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও নমস্কার জ্ঞাপন করি। দাবী করি, চিরকাল তাঁহাদের সেই প্রীতি, সহানুভূতি ও আন্তরিক সাহায্য দিয়া আমাদিগকে যেন কর্ম্মের পথে নিত্য নব নব উন্মাদনায় তাঁহারা উদ্বোধিত করেন। এই প্রসঙ্গে আজ বিশেষ ভাবে আমরা অভাব বোধ করিতেছি মহাপ্রাণ সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের। দুর্দ্দিনের অন্ধকার পথ হইতে আলোকের স্বর্ণপথের দিকে গতি-বেগ লাভ করিতাম তাঁহার নিকট হইতেই। বঙ্গশ্রী ছিল তাঁহার সাধনার বস্তু, প্রাণ-সম্পদ্। কি ভাবে মানব-সমাজের সর্ব্ববিধ অভাব-দুঃখ দূর হইয়া নিরবচ্ছিন্ন শান্তি আসিতে পারে, কি ভাবে মানুষ জ্ঞানানুশীলনের মধ্য দিয়া মুক্তির পথ খুঁজিয়া পাইতে পারে, কি ভাবে এই বিশ্ববিধ্বংসী বিজ্ঞানের লোপ হইয়া সাত্যিকারের মানব-কল্যাণের বিজ্ঞান প্রস্তুত হইতে পারে এবং কি ভাবে জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া আপামর কৃষকসমাজ তথা সমগ্র বিশ্বের স্বাস্থ্যসম্পদ ও জীবনীশক্তি ফিরিয়া আসিতে পারে—ইহাই ছিল সচ্চিদানন্দের জীবনের একমাত্র সাধনব্রত। সেই ব্রতের মন্ত্রে উদ্বোধিত করিতেন তিনি আমাদিগকে। আজ কূটবুদ্ধি রাজনীতির আকাশে যখন ঝড় উঠিয়াছে, যখন নির্বীর্য্য নিশ্চল মুহূর্ত্তগুলির মধ্যে আত্মার স্বাভাবিক প্রকাশ দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে, আজ আর সেই মুহূর্ত্তে প্রাণের বাণী শুনাইতে তিনি আমাদের মধ্যে নাই। মহাকালের নির্ম্মম হস্ত তাঁহাকে আমাদের মধ্য হইতে কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে! তাঁহার স্মৃতিতীর্থের পথে আমাদের প্রণাম নিবেদন করি।

গত প্রায় দুই বৎসর যাবৎ কাগজ সঙ্কটের জন্য পত্রিকা পরিচালনে আমাদের যে দুঃখ ও বিপদের মধ্য দিয়া কাটাইতে হইয়াছে, তাহা আমাদের পাঠক পাঠিকারাও কথঞ্চিৎ জানেন। যতবারই আমরা এই দুঃসময় কাটাইয়া উঠিতে চেষ্টা করিয়াছি, ততবারই সরকারী আইনের চাপে পড়িয়া পিছাইয়া গিয়াছি। আশার কথা, আজ আমরা নূতন সূর্য্যোদয় লক্ষ্য করিতেছি আমাদের সম্মুখে। মনে করি, শীঘ্রই এই কাগজ সঙ্কট হইতে আমরা পরিত্রাণ পাইব এবং পূর্ব্বের স্বাভাবিক অবস্থার মধ্য দিয়াই আবার জন-সাধারণের সেবা করিতে পারিব।

আমাদের সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক, অনুগ্রাহক এবং বিজ্ঞাপনদাতাদের নিকট নিবেদন, তাঁহারা যেন আগামী নব বর্ষেও তাঁহাদের সর্ব্বাত্মক সাহায্য ও উৎসাহ দিয়া পূর্ব্বের মতই আমাদিগকে কর্ম্মের পথে অনুপ্রেরণা দেন এবং অধিকতর সেবার অধিকারী করেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্ব্বাচন

গত ২৮শে এপ্রিল সোমবার কলিকাতা কর্পোরেশনে অনুষ্ঠিত একটি বিশেষ সাধারণ সভায় মুসলিম লীগ মনোনীত মিঃ এস, এম, ওসমান কলিকাতার নূতন মেয়র পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ডেপুটি মেয়র রূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন শ্রীযুক্ত নরেশ নাথ মুখার্জ্জি। মেয়র মনোনয়নে 'কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েসন' নামক দলটি জাতীয়তাবাদী মুসলমান প্রার্থী সামসুল হুককে সমর্থন না করিয়া মিঃ ওসমানকেই সমর্থন করাতে কলিকাতার রাজনৈতিক মহলে কিছু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। নির্ব্বাচনের দিন বিদায়ী মেয়র শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি এই ঘটনাকে কটাক্ষ করিয়া বলেন, "বাংলা প্রদেশ সমেত সকল প্রদেশেরই ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে কোয়ালিশন প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু কলিকাতা কর্পোরেশনে এক অজ্ঞাত ঐন্দ্রজালিকের প্রভাবে সেই প্রচেষ্টা সার্থক হইয়া জাতীয়তাবাদী মুসলমান প্রার্থীর দাবী ভূলুণ্ঠিত হইয়াছে।"

বাংলার জাতীয়তাবাদী মুসলিম দলের বর্ত্তমান নেতা মিঃ ফজলুল হকও এই ঘটনায় বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। ৩রা মে তারিখে একটি সংবাদপত্র-বিবৃতিতে তিনি বলেন,—"যেই রাজনৈতিক বন্দী-মুক্তির সর্ত্তের উপর বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেস-লীগ কোয়ালিশন সম্ভব হইল না, সেই সর্ত্তেই কর্পোরেশনে কংগ্রেস ও লীগে এক অত্যাশ্চর্য্য মৈত্রী সম্ভব হইয়াছে। ইহা হইতে আমার বিশ্বাস জন্মিতেছে যে, বর্ত্তমানে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এই উভয় প্রতিষ্ঠানেই হামবড়া মনোবৃত্তির প্রাধান্য প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু এখন প্রশ্ন হইল, বাংলায় কংগ্রেসের কর্ণধার কাহারা? জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের সর্ব্বপ্রথমেই এই সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া প্রয়োজন যে, মুসলীম লীগের প্রতি কংগ্রেসের সত্যকার মনোভাব কী? কংগ্রেসীরাই যদি তাঁহাদের সুবিধামত লীগের সহিত যখন-তখন কোয়ালিশনে অগ্রসর হইতে

পারেন, তবে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের পক্ষে তাঁহাদের স্বসম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য লীগের সহিত যোগ দিবার বাধা কোথায় ?"

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায় জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের এই সন্দেহের নিরসন করিয়াছেন। পরের দিনই একটি বিবৃতিতে তিনি কংগ্রেস মিউনিসিপাল এসোসিয়েসনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করিয়া জানাইয়াছেন—"এ দলটি একটি স্ব প্রচারিত দল। সরকারী (official) কংগ্রেসের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই, কোনদিন কংগ্রেসের আনুগত্য পর্য্যন্ত ইঁহারা স্বীকার করেন নাই। এই সম্পর্কে স্মরণ থাকিতে পারে, গত কর্পোরেশন ইলেক্‌শনের সময় বঙ্গীয় কংগ্রেস কেন্দ্রীয় কংগ্রেস কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ায় কোনরূপ মনোনয়ন করিতে পারেন নাই। অতএব কংগ্রেসের সহিত মূলতঃ সকল সম্পর্ক বিরহিত কোন একটি বিশেষ দলের কার্য্যের জন্য কংগ্রেসকে কোনক্রমেই দায়ী করা চলে না।"

মাদ্রাজে মন্ত্রীসভা গঠনের অন্তরায়

গত ৩০শে এপ্রিল অনেক নাটকীয় পরিস্থিতির পর মাদ্রাজ ব্যবস্থা পরিষদের মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। নাটকীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল পরিষদে কংগ্রেসী দলের অধিনায়ক পদের নির্ব্বাচন নিয়া। মাদ্রাজ পরিষদে কংগ্রেসী দলে এখন মিঃ প্রকাশন সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ব্যক্তি—সুতরাং সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁহারই পরিষদে নায়ক হওয়ার কথা ঠিক হইয়াছিল। কিন্তু কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড মিঃ প্রকাশনের মনোনয়ন নামঞ্জুর করিয়া মাদ্রাজ আইন পরিষদের কংগ্রেসী দলকে ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী স্বনামধন্য মিঃ সি রাজাগোপালাচারিয়াকে নায়ক পদে বরণ করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু পরিষদদল হাইকম্যাণ্ডের এই গণতন্ত্র-বিরোধী নির্দ্দেশ সরাসরি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। চারিবার এই বিষয় নিয়া নির্ব্বাচিত সদস্যদের মধ্যে ভোট গ্রহণ করা হয়, চারিবারই সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়ে শ্রীযুক্ত প্রকাশন পরিষদের অবিসম্বাদী নায়করূপে সাব্যস্ত হন। অতঃপর কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট্ আজাদের নির্দ্দেশানুসারে পুনরায় ২২শে এপ্রিল আরেকবার ভোটগ্রহণ হয় এবং পঞ্চমবারের ইলেক্‌শনেও শ্রীযুক্ত প্রকাশন ৮২—৬৯ ভোটে মাদ্রাজ পরিষদের লীডার নির্ব্বাচিত হন। নির্ব্বাচনে তাঁহার প্রতিপক্ষ প্রার্থী ছিলেন মিঃ সি এন এইচ মুদালিয়ার। ইহার পর কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড আর স্থানীয় পরিষদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন নাই। শ্রীযুক্ত প্রকাশন মাদ্রাজে মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন। নবনিযুক্ত মন্ত্রিমণ্ডলীতে ছয়জন থাকিবেন তামিলনাদ হইতে, চারিজন অন্ধ্র হইতে এবং একজন কর্ণাটক হইতে। হরিজন এবং ভারতীয় খৃষ্টান সম্প্রদায় হইতে একজন করিয়া প্রতিনিধি মন্ত্রিসভার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন।

মাদ্রাজে ৯৩ ধারার অবসান হইয়াছে।

ভারতের খাদ্য পরিস্থিতি

বর্ত্তমান বৎসরে ভারতের খাদ্য পরিস্থিতি যে দিন দিন অতি ভয়াবহ আকার ধারণ করিতেছে, সেকথা বুঝিতে কাহারও বাকী নাই। ১৯৪৩-এর মত এবারে আর 'দুর্ভিক্ষ হইবে কি হইবে না'—এই নিয়া গবেষণা চলিতেছে না। এবৎসরে গবেষণা চলিতেছে ভারতে এবারের দুর্ভিক্ষে কতলোক অনাহারে জীবনপাত করিবে তাহার হিসাব নিয়া। পাকাপাকি হিসাব এখনও পাওয়া যায় নাই বটে, তবে নানাদেশীয় 'মৃত্যু-বিশেষজ্ঞদের' মতানুসারে এবারে ভারতের দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যুসংখ্যা হইবে ৫০লক্ষ হইতে দেড়কোটী, অর্থাৎ বাহির হইতে আমদানি খাদ্যের পরিমাণের উপরেই সম্ভাবিত 'মৃত্যু-বাজেটের' অঙ্ক ওঠানামা করিবে। কাজেই ভারতের খাদ্য-পরিস্থিতি সম্বন্ধীয় সকল আলোচনা এখন এই বাহির হইতে আমদানী খাদ্যের বিষয়েরই উপরে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে।

ভারতকে সম্ভাবিত দুর্ভিক্ষ ও মহামারী হইতে বাঁচাইবার সাধ্য ও সামর্থ্য ছিল সম্মিলিত খাদ্যবোর্ডের, তথা আমেরিকা ও আর্জ্জেন্টিনার। এই কারণে ভারত ওয়াশিংটনেরই দিকে চাতক-দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল। ভারত সরকার ওয়াশিংটনে একটি খাদ্য-ডেলিগেশনও প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমেরিকাও যেন প্রথম প্রথম ভারতকে তাহার আশানুযায়ী সাহায্যদান করিবার আগ্রহ দেখাইয়াছিল। গতমাসে আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট মিঃ হুভারের ভারত আগমনও নাকি এই আগ্রহেরই নিদর্শন। কিন্তু মিঃ হুভার ভারতে আসিয়া বিচলিত হইবার কোন কারণ দেখিতে পান নাই, কারণ তাঁহার মতে ভারতে দুর্ভিক্ষ এখনও দেখা দেয় নাই। সংবাদপত্রের বিবৃতি দানকালে তিনি বলেন, ভারতের দুর্ভিক্ষ বলিতে আমেরিকা বোঝে ব্যাপক মৃত্যু—ভারতে সেই ব্যাপকতা এখনও আরম্ভ হয় নাই। এই দুর্ভিক্ষ-দর্শন ব্যতীত তিনি খাদ্য প্রাপ্তির জন্য ভারতকে জাভা ও অষ্ট্রেলিয়ার কাছেই প্রধানতঃ ধন্না দিতে উপদেশ দিয়াছেন। আমেরিকা স্বয়ং ভারতকে কতখানি পরিমাণ খাদ্য দিতে সক্ষম হইবে, সেকথা তিনি অতি সুনিপুণতার সহিত এড়াইয়া গিয়াছেন। মিঃ হুভারের ভারত আগমনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রিকা Saturday Mail মন্তব্য করিয়াছেন: "Mr Hoover's purpose was to survey the ground for the penetration of American finance capital in India. That was his purpose in European tour as well; for immediately after it was over, Mr. Byrnes issued a proposal that all tariffs should be abolished in the European countries for five years"

আমেরিকার কাছে ভারত যে আশানুরূপ খাদ্য পাইবে না, সেকথা সম্প্রতি ভারতের খাদ্য-ডেলিগেটরাই স্বয়ং বিবৃত করিয়াছেন। গত ৩রা মে একটি সাংবাদিক বিবৃতিতে ভারতের খাদ্য-সচিব স্যার জওয়ালাপ্রসাদ বলেন, সম্মিলিত খাদ্যবোর্ড ভারতের প্রতি তাহাদের প্রতিশ্রুতি পালন করেন নাই।

সংবাদটির মূলকথা ইহার পরে ৭ই মে তারিখের সংবাদপত্রে আরও বিশদভাবে বর্ণিত হয়। খাদ্যবোর্ড প্রথমে ভারতের অংশে নাকি এপ্রিল মাসের জন্য ২৯২৫০০ টন গম বরাদ্দ করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে সরবরাহের সময় প্রথম কিস্তিতে শুধু ৬০০০০ টন পাঠান হইয়াছে। পরের কিস্তি সম্বন্ধে খাদ্যবোর্ড কোনরূপ নিশ্চিত আশ্বাস দিতে স্বীকৃত নন। সংবাদপত্রে আরও প্রকাশ যে, খাদ্যবোর্ড যে ভারতকে ১৯৪৬-এর প্রথম অর্দ্ধভাগে সর্ব্বসমেত ১৪০০০০০ টন খাদ্যশস্য সাহায্য করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, সেই প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত হইবে কিনা, ওয়াকিফ্‌হাল মহল সেই বিষয়েও সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। স্যার নানাবতি যিনি খাদ্য-বোর্ডে প্রেরিত ভারতের অন্যতম ডেলিগেট, তিনি ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রাক্কালে খেদ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—"আমেরিকানরা মনে করে, ভারতবর্ষে অনাহার ও দুর্ভিক্ষটা প্রতি বৎসরেই একটা মামুলী ঘটনা; অতএব এই বৎসরে দুর্ভিক্ষ একটু তীব্র ভাবে ঘটিলে এমন কি আর দুর্ঘটনা সংঘটিত হইবে?" অর্থাৎ ভারত সরকার স্বয়ংই আমেরিকার উপর আস্থা হারাইয়াছেন। এখানে সংবাদপত্রে প্রকাশিত আরও একটা ঘটনার উল্লেখ করার প্রয়োজন। আমেরিকা গতযুদ্ধের শত্রুপক্ষ জার্ম্মাণ ও জাপানে কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য পাঠাইতে কসুর করিতেছেন না।

যাহা হোক, ইহার পরেও আশার বাণী উচ্চারিত হইতেছে। সম্প্রতি বৃটীশ কমন্স সভায় বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারতের খাদ্যাভাব দূর করিবার জন্য বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট একটা চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না। আশা করি খাদ্য না মিলিলেও খাদ্য পাইবার আশার কথাতেই ভারতবাসী পেট ভরাইতে সক্ষম হইবে।

রেলওয়ে শ্রমিক ধর্ম্মঘটের আশঙ্কা

রেলওয়ে শ্রমিকদের দাবী অনুযোগের কথা অনেকদিন হইতেই দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হইতেছিল। শ্রমিকগণ তাহাদের দাবী পূরণের জন্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রথমে আবেদন জানান। বলা বাহুল্য, প্রবলের স্বভাবধর্ম্মে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের সেই দাবী তেমন গ্রাহ্য করেন নাই। তখন নিরুপায় হইয়া সমগ্র ভারতের রেলওয়ে শ্রমিকদের প্রতিনিধি অল্-ইণ্ডিয়া রেলওয়েমেন্‌স্ ফেডারেশন একটি ধর্ম্মঘট করিবার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু রেলওয়ে বিভাগের মত একটি সর্ব্বভারতীয় বিরাট প্রতিষ্ঠানে ধর্ম্মঘট পালন করা চট্ করিয়া সম্ভব নয়। কাজেই ফেডারেশন এই অবস্থার সম্মুখীন হইয়া একটি ষ্ট্রাইক ব্যালটের আয়োজন করেন। সম্প্রতি এই ব্যালটের ফলাফল প্রকাশিত হইয়াছে—শ্রমিকদের শতকরা প্রায় আশীজন কর্ত্তৃপক্ষের আচরণের প্রতিবাদ কল্পে রেলবিভাগে ধর্ম্মঘট পালনের পক্ষে ভোট দিয়াছেন। এবং সেই অনুযায়ী রেলওয়ে মেন্‌স্ ফেডারেশনের জেনারেল কাউন্সিল গত ৫ই মে স্থির করিয়াছেন যে, আগামী ২৭শে মে মধ্যরাত্রি হইতে ভারতের সর্ব্বত্র এমন কি দেশীয় রাজ্যগুলিতে পর্য্যন্ত রেলশ্রমিক ও কর্ম্মচারিগণ তাহাদের দাবীর সন্তোষজনক মীমাংসা না হওয়া অবধি অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ধর্ম্মঘট চালাইয়া যাইবে। কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ফেডারেশন নিম্নলিখিত দাবীগুলি পেশ করিয়াছিলেন:

(১) ছাঁটাই চলিবে না;

(২) বেতনের হারের সংশোধন—(ক) অপটু (unskilled) শ্রমিকদের ৩৫-৩-৪৫ টাকা (খ) অর্দ্ধপটু (half-skilled) শ্রমিকদের ৪০-৪-৬০ টাকা (গ) শিক্ষিত (skilled) শ্রমিকদের ৮০-৫-১০৫-১০-২০৭ টাকা—এই ত্রিবিধ ভাবে বেতন নির্দ্ধারিত করিতে হইবে।

(৩) রাউ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী উপযুক্ত পরিমাণে মাগ্‌গি ভাতার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৪) বোনাস হিসাবে তিন মাসের বেতন প্রত্যেক শ্রমিককে দিতে হইবে।

বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে রেলওয়ে শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মঘটে রেলবিভাগের কার্য্য বন্ধ হইয়া গেলে দেশের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হইবে। এই সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি আজাদ যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

আজাদ বলিয়াছেন—ভারতের রেলওয়ে কর্ম্মচারীদের একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাঁহারা জাতিরই একটি অংশ। সমগ্র জাতির ভাগ্যের সহিত তাহাদের ভাগ্যও অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়িত রহিয়াছে। তাঁহারা অবশ্যই সকলে অবহিত আছেন যে, আজ ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান সম্পর্কে ভারতবর্ষ এক অতি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় ব্যাপৃত রহিয়াছে। এ কথা তাহাদের সকলেরই অনুধাবন করা উচিত যে, ভারতের স্বাধীনতা ব্যতীত তাহাদের অভাব অভিযোগের সন্তোষকর মীমাংসা সম্ভব নয়। সর্ব্বোপরি দেশের নিদারুণ খাদ্য পরিস্থিতি সম্বন্ধেও তাঁহাদের বিশেষভাবে চিন্তা করিতে হইবে। মে-জুন মাসে ভারতকে এক ভয়াবহ জাতীয় সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে। এই সঙ্কটকালে যানবাহনের সামান্য শিথিলতাও হয় তো জাতির পক্ষে ধ্বংসাত্মক পরিণতিতে পর্য্যবসিত হইবে।

আশা করি, রেলওয়ে কর্ম্মচারিগণ রাষ্ট্রপতি আজাদের সতর্কবাণী হৃদয়ঙ্গম করিতে যথোপযুক্ত ভাবে সচেষ্ট হইবেন।

বাঙলার প্রাথমিক শিক্ষকদের দুর্গতি

"যাহারা জাতির ভবিষ্যৎ নাগরিকদের শিক্ষা ও চরিত্রের রক্ষক, সেই প্রাথমিক শিক্ষকদিগকে মাসিক মাত্র আট টাকা বা নয় টাকা বেতনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়—ইহার চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কী হইতে পারে?"

গত ১লা মে তারিখে নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলনের অধিবেশনে স্যার বি, পি, সিংহ রায় এই মন্তব্যটি প্রকাশ করেন। বাঙলা দেশের প্রায় একলক্ষ প্রাথমিক শিক্ষক দ্বারা নির্ব্বাচিত ২০০০ শিক্ষক প্রতিনিধি ৩০শে এপ্রিল হইতে এই সম্মেলনে সমবেত হন। সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এবং উদ্বোধন করেন বাঙলার নবনিযুক্ত প্রধান মন্ত্রী মাননীয় এইচ, এস. সুরাবর্দ্দী।

সম্মেলনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গভর্ণমেণ্ট এবং জনসাধারণের সমক্ষে পেশ করিবার জন্য একটি দাবী তালিকার খসড়া লিপিবদ্ধ করা হয় এবং স্থির হয় যে, এই দাবী-তালিকা পেশ করিবার পর আগামী ৩০শে জুনের মধ্যে যদি উক্ত দাবীসমূহের কোন সন্তোষজনক উত্তর না পাওয়া যায়, তবে শিক্ষকগণ আগামী ১লা সেপ্টেম্বর হইতে এক সপ্তাহের জন্য একটি 'টোকেন ষ্ট্রাইকে' যোগদান করিবেন।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের কংগ্রেসী সদস্যদলের নেতা শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় উপস্থিত থাকিয়া শিক্ষকদের দাবীর সহিত কংগ্রেসের পূর্ণ সমর্থন থাকিবে বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি বলেন…"বাঙলা সরকার জেল বিভাগের জন্য বৎসরে এক কোটি এগার লক্ষ টাকা এবং পুলিশ বিভাগের জন্য বৎসরে তিন কোটি উনচল্লিশ লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করেন, অথচ শিক্ষা বিভাগের জন্য সরকারের বৎসরে ব্যয় হয় মাত্র ৪৩ লক্ষ টাকা।" তিনি প্রস্তাব করেন যে, উক্ত দুই বিভাগের ব্যয় সঙ্কুচিত করিয়া শিক্ষা বিভাগের জন্য ব্যয়ের মাত্রা বৃদ্ধি করা উচিত।

১লা মে তারিখে শিক্ষকগণ 'ভুখা ব্যাজ' ধারণ করিয়া শ্রদ্ধানন্দ পার্ক হইতে একটি শোভাযাত্রা বাহির করেন। শোভাযাত্রাটি কলিকাতার বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমণ করে।

শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ও ভুলাভাই দেশাই

সম্ভবতঃ ১৩৫৩ সাল ভারতের পক্ষে বিশেষ দুর্বৎসর। বৎসরের প্রথম মাসেই ভারতের রাজনীতি-গগন হইতে দুইটি উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িয়াছে। গত ৪ঠা বৈশাখ লিবারেল দলের নেতা শ্রীনিবাস শাস্ত্রী এবং গত ২২শে বৈশাখ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ভূতপূর্ব্ব সদস্য ভুলাই দেশাই পরলোক গমন করিয়াছেন।

শ্রীনিবাস শাস্ত্রী রাজনীতিতে মডারেটপন্থী ছিলেন। প্রত্যক্ষ সংগ্রামে ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরিত হইবে, কংগ্রেসের এই আদর্শ তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। এই কারণেই ১৯১৮ সাল পর্য্যন্ত ভারতীয় রাষ্ট্রীয় কংগ্রেসের অন্যতম কর্ণধার থাকিয়াও পরবর্ত্তী কালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের কর্ম্মাদর্শের পরিবর্ত্তনে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া লিবারেল দল গঠন করেন। ভারতের বর্ত্তমান ইতিহাসে 'লিবারেল রাজনীতি' এমেচিয়ার রাজনীতি হিসাবে গণ্য, অর্থাৎ সখ হিসাবে যাঁহারা রাজনৈতিক জীবন গ্রহণ করেন তাঁহাদের রাজনীতি। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট এই রাজনীতি নিছক বিলাসের সামগ্রী ছিল না, ছিল একটি জীবন্ত বিশ্বাস, একটি ব্রত। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি এই ব্রত পালন করিয়া আসিয়াছেন।

ভুলাভাই দেশাই স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যে ছিলেন মডারেট, কিন্তু রাজনৈতিক আদর্শে তিনি কংগ্রেসের আদর্শকে পূর্ণ ভাবে বরণ করিয়াছিলেন। প্রথম জীবনে রাজনীতির সহিত তাঁহার বিশেষ কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। ভারতের বিদগ্ধ সমাজে তিনি তখন সুনিপুণ ব্যবহারজীবী হিসারেই বিখ্যাত হইয়াছিলেন। বারদোলি কৃষাণ সত্যাগ্রহের পর ক্রমফিল্ড্ কমিটির নিকট কৃষাণদিগের পক্ষ সমর্থন করিতে আসিয়া কংগ্রেসের কর্ম্মাদর্শের পরিচয় লাভে তিনি কংগ্রেসের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে প্রত্যক্ষ ভাবে রাজনীতিতে যোগদান করেন। এইজন্য তাঁহাকে দুইবার কারাবরণ করিতে হয়। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি কংগ্রেসের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বিচারে তাঁহার আসামী পক্ষ সমর্থন—ভারতের জাতীয় ইতিহাসের একটি অক্ষয় অধ্যায়।

আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীনিবাস শাস্ত্রী এবং ভুলাভাই দেশাইয়ের আত্মার সদ্গতি কামনা করি।

পারসিক সমস্যা

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বৈঠকে (U. N O.) গত মাস খানেক হইতে রাশিয়া, ইরাণ ও ইঙ্গ-আমেরিকার দ্বারা অভিনীত যে 'খিলার' নাটকখানির অভিনয় হইতেছিল, গত ৬ই মে তারিখে সেই নাটকখানির শেষ দৃশ্যের অভিনয় হইয়াছে আজের-বাইজানে। উপস্থিত মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নাটকখানিকে 'কমেডি' বলিতে কোন বাধা নাই।

নাটকের অভিনয় কোন্ ঘটনা অবলম্বনে সুরু হইয়াছিল সে কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে পাঠকদের নিকট বিবৃত করিয়াছি। সুতরাং এখন সেই কথার সবটা পুনরাবৃত্তি না করিলেও চলিবে। তবে ঘটনার আনুপূর্ব্বিকতা রক্ষার জন্য যেটুকু ঘটনাংশ উল্লেখ করা প্রয়োজন, তাহা এই: ইঙ্গ রুশ ও পারস্যের সন্ধির ফলে আজেরবাইজানে ইংরাজ ও রুশ সৈন্য মোতায়েন ছিল—সন্ধির সর্ত্তমত মার্চ্চ মাসে ইংরাজ সৈন্য সরাইয়া লওয়া হয়, কিন্তু রাশিয়া সন্ধির সর্ত্ত অমান্য করিয়া ইরাণে পূর্ব্ববৎ সৈন্য মোতায়েন রাখে—ইংরাজ ঠকিয়া গিয়া ক্রুদ্ধ হয়; ইরাণও 'ত্রাহি' রবে 'ইউ, এন, ও'র দরবারে আর্জ্জি পেশ করে রুশ সৈন্য সরাইয়া লইবার—ইংরাজ অকপট (?) ইরাণ-সুহৃদের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া বজ্রকণ্ঠে সোভিয়েটকে বলে-'কুইট আজেরবাইজান', আমেরিকাও তাহার সহিত যোগ দেয় - ইতিমধ্যে ইরাণ ও সোভিয়েটের মধ্যে কী এক রহস্যজনক সম্পর্কের সৃষ্টি হয়, ফলে পারসিক নাটক যখন সিকিউরিটি কাউন্সিলের নিউ ইয়র্ক রঙ্গমঞ্চে ক্লাইমেক্সে পৌঁছায়, তখন রাশিয়া ৬ই মে'র মধ্যে ইরাণ হইতে সৈন্য সরাইয়া লইতে রাজী হইলে ইরাণ রাশিয়ার বিরুদ্ধে মামলা উঠাইয়া লইবার প্রস্তাব করে—কিন্তু মায়ের চেয়ে দরদী ইরাণ-সুহৃদ ইঙ্গ-আমেরিকা মামলা উঠাইয়া লইতে অস্বীকার করিয়া বলে যে, ৬ই মে পর্য্যন্ত ব্যাপারটার একটা সদ্গতি না হওয়া পর্য্যন্ত মামলা তুলিয়া লইবার কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না—অবশেষে আসে ৬ই মে তারিখ।

৬ই মের পরের দিন ৭ই মে তারিখে তেহেরান হইতে ইরাণ সরকারের মুখপাত্র প্রিন্স ফিরোজ ঘোষণা করিয়াছেন—"সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী জানা গিয়াছে যে, পারস্য হইতে রুশসৈন্য সরাইয়া লওয়া সম্পূর্ণ হইয়াছে। আজেরবাইজানে প্রেরিত আমাদের বিশেষ পর্য্যবেক্ষক সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া আজি

রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন যে, গতকাল রুশসৈন্য কর্ত্তৃক একটি বিদায় প্যারেড্ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল; সৈন্যদল ট্যাঙ্ক এবং অন্যান্য 'সমরসজ্জা সহ সীমান্তের দিকে অগ্রসর হইয়াছে।"

"ইহার পর সরকারী বা বে-সরকারী এমন কোন রিপোর্ট পাওয়া যায় নাই যাহাতে সন্দেহ করা চলে যে, রুশ সেনাপসারণের সর্ত্ত ভঙ্গ করা হইয়াছে।"

সংবাদটি পরিবেশন করিয়াছেন ইউ-পি-এ এবং রয়টার। এই সংবাদেই আরও প্রকাশ যে, বৃটেন ও আমেরিকা এখনও রাশিয়ার প্রতিশ্রুতি পালন সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারে নাই। এই কারণে পারস্যের মামলা এখনও পর্য্যন্ত সিকিউরিটি কাউন্সিল হইতে উঠাইয়া লওয়া সম্ভব হইতেছে না। সুতরাং পারসিক নাট্যাভিনয়টি শেষ দৃশ্যে উপনীত হইয়াও উহার যবনিকা পতন হইয়াছে, একথা এখনও বলা চলিতেছে না। সংবাদভুক বিশ্ববাসী পরবর্ত্তী ঘটনার জন্য আগ্রহের সহিত অপেক্ষমান রহিয়াছে।

ব্রহ্মবাসীর সঙ্কল্প

অনেকদিন হইতে ব্রহ্মদেশের বিশেষ কোন সংবাদ এদেশে আসিয়া পৌঁছিতেছে না। কিছুদিন পূর্ব্বে মালয় সফর শেষ করিয়া ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে পণ্ডিত নেহরু যখন ব্রহ্মদেশ পরিদর্শনের জন্য ব্রহ্মকর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করেন, ব্রহ্ম কর্ত্তৃপক্ষ সেই আবেদনে কর্ণপাত করেন নাই। এই সব ঘটনা লক্ষ্য করিয়া কোন কোন সন্দিগ্ধ ব্যক্তি সংশয় প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, কর্ত্তৃপক্ষ ব্রহ্মদেশকে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি হইতে দূরে সরাইয়া রাখিতে চান। গত ৩রা মে ও ৬ই মের সংবাদপত্রে ব্রহ্মদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কিছুটা আভাষ পাওয়া গিয়াছে।

৩রা মে তারিখে এসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকার সংবাদদাতার নিকট অ্যান্টি ফ্যাসিষ্ট পিপলস্ ফ্রিডম লীগ-এর (Anti-Fascist Peoples' Freedom League) সভাপতি জেনারেল আউঙ সান বলেন—"দেশের (ব্রহ্মের) সর্ব্বত্র সরকারী কর্ম্মচারী মহল, কৃষক সম্প্রদায়, শ্রমিক সম্প্রদায়—সকল ক্ষেত্রেই অসন্তোষ বিরাজ করিতেছে। অ্যান্টি ফ্যাসিষ্ট লীগ জনসাধারণের বিচ্ছিন্ন জীবনযাত্রাকে পুনরুজ্জীবিত করিতে প্রয়াস পাইতেছে। গত চারি বৎসরে ব্রহ্মবাসিগণকে বহু ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছে। লীগ এই ক্লেশের কিছুটা লাঘব করিতে সমর্থ হইয়াছে বটে—কিন্তু তৎসত্ত্বেও জনসাধারণের অসন্তোষ দিন দিনই ব্যাপক হইয়া এমন তীব্র আকার ধারণ করিতেছে যে, অদূর ভবিষ্যতে এই অসন্তোষ বিরাট এক বিস্ফোরণে পরিণত হইতে পারে। সেই বিস্ফোরণের প্রকৃত চেহারা আমি কল্পনা করিতে পারিব না।"

উক্ত বিবৃতিতে বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের মনোভাব সম্বন্ধে জেনারেল আউঙসান বলেন—"আমি বিশ্বাস করিনা, যে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ব্রহ্মের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোনরূপ আন্তরিক মনোভাব পোষণ করেন—তাহাদের কথায় আমার এতটুকু আস্থা নাই।" তিনি আরও বলেন যে, কোন কোন রাজনৈতিক মহল ধারণা করিতেছেন, বৃটিশ ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করিলে চীনদেশ ব্রহ্ম আক্রমণ করিবে। আউঙসান বলেন, ব্রহ্মকে স্বাধীনতা না দিবার ইহা একটি ছল মাত্র। তাঁহার মতে ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নেও ঐরূপ ছলের আশ্রয় লওয়া হইয়াছে—সেখানে বলা হইতেছে, ভারত বৃটিশশূন্য হইলে রাশিয়া কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবে।

এই সংবাদের পর ৬ই মে তারিখের সংবাদপত্রে ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধে আর একটি খবর পাওয়া গিয়াছে। গত ৫ই মে রেঙ্গুনে নিখিল ব্রহ্ম মাইওচিট পার্টি (Myochit) নেতৃসম্মেলনের এক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ব্রহ্মের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী ইউ স' এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন। উক্ত সংবাদটি প্রধানতঃ তাঁহার বক্তৃতাকেই কেন্দ্র করিয়া রচিত। ইউ স' তাঁহার বক্তৃতার এক স্থানে বলেন: "বৃটেন ব্রহ্মকে স্বাধীনতা মঞ্জুর করিবার যে প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছে, আমি আশা করি বৃটেন অনতিবিলম্বে সেই প্রতিশ্রুতি পালন করিবে। অন্যথায় বৃটেনের প্রতিশ্রুতি পালিত না হইলে ব্রহ্ম অন্য কোন প্রতিবেশী শক্তির সহায়তা গ্রহণে ইতস্ততঃ করিবে না।"

উপরোক্ত সংবাদ দুইটি ব্রহ্মের নিষ্প্রদীপ রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর যে অনেকখানি আলোক সম্পাত করিতেছে, আশা করি একথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পাঠকবৃন্দের খুব বেশী কষ্ট হইবে না।

অপরাজেয় ইন্দোনেশিয়া

ইন্দোনেশিয়ার সংবাদও আজকাল যেন বিরল হইয়া উঠিতেছে। কালে-ভদ্রে যেটুকু তথ্য দৈনিক সংবাদ পত্রে আত্মপ্রকাশ করে, তাহাতে এইটুকু মাত্র বুঝা যায় যে, সেখানকার পরিস্থিতি আজও পূর্ব্বের মতই অমীমাংসিত রহিয়াছে। বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের মধ্যস্থতায় ডাচ কর্ত্তৃপক্ষ ও ইন্দোনেশীয়দের মধ্যে যে আলাপ আলোচনা চলিতেছে, তাহার ফলে হয়তো সেখানে একটা মধ্যবর্ত্তী শান্ত আবহাওয়া প্রবাহিত হইলেও হইতে পারে। অন্ততঃ সম্প্রতি বৃটীশ দূত স্যার আর্চিবল্ড ক্লার্ক কার্ স্বদেশে ফিরিয়া যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন, সেই রিপোর্ট পাঠে আমরা এই অবস্থারই আভাষ পাইতেছি। এই রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে—"The stubborn Dutch and fanatic Indonesians had found middle ground. Indonesia would become an autonomous, full and equal partner with Netherlands, Surinam and Curacoa, under the Dutch Crown" (Time,—April 22, 1946)

কিন্তু বস্তুতঃ এই 'middle ground'-এর প্রতিষ্ঠা আজও সম্পূর্ণ হয় নাই। ২রা মে হেগ্ হইতে ডাচ সরকারের বৈদেশিক মন্ত্রী প্রফেসার জে. এইচ. এ. লোগমান্ ঘোষণা করিতেছেন, সত্যকার মীমাংসার পথের সন্ধান মিলিলেও মীমাংসার পূর্ণতা সাধন আজিও সম্ভব হয় নাই।

অবশ্য কবে পর্য্যন্ত সেই সত্যকার পথে মীমাংসা সম্ভব হইবে বা আদৌ সম্ভব হইবে কিনা, এ বিষয়ের কোন প্রমাণযোগ্য ইঙ্গিত ভারতবাসী এখনও পায় নাই। বরঞ্চ এই মীমাংসা মোটেই হইবে না, ভারতবাসী এই কথাই মনে মনে বিশ্বাস করে। তাহার এই বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হইয়াছে লণ্ডন হইতে প্রচারিত ৪ঠা মে তারিখের একটী সংবাদে। এই সংবাদে ইউ. পি. আই.

নামক সংবাদ প্রতিষ্ঠানটি জানাইতেছেন যে, বৃটিশ কমনওয়েলথ কনফারেন্সে বৃটেন প্রস্তাব করে, দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় অংশে সাম্রাজ্য রক্ষার ঘাঁটিকে দৃঢ়তর করিবার জন্য ব্যানডিঅং, প্রভৃতি ইন্দোনেশীয় বন্দরগুলাতে বৃটেন ও অষ্ট্রেলিয়ার সম্মিলিত নৌঘাঁটি স্থাপন করা উচিত। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়া বৃটেনের এই প্রস্তাব সমর্থন করে নাই।

জানি না বৃটেন কী উদ্দেশ্যে এই পরিকল্পনা রচনা করিয়াছে। তবে এইটুকু আমরা দৃঢ়ভাবে বলিতে পারি যে, এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে ইন্দোনেশিয়ার সমস্যার কোন সমাধান হইবে না, বরং আরও জটিলতর হইবে। ইহার উপর সম্প্রতি আমেরিকা ডাচ গভর্ণমেণ্টকে ১০০,০০০,০০০ কুড়ি কোটি ডলার ঋণ মঞ্জুর করিয়াছে, সেই প্রচেষ্টাতেও ডাচ-ইন্দোনেসিয়া সম্পর্ককে জটিল করিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে, এ-কথা অনেক সংবাদপত্র খোলাখুলি ঘোষণা করিয়াছেন।

তবে একদিন সকল জটিলতারই অবসান হইবে, এ-কথা আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। সম্প্রতি বম্বের 'সানডে ষ্ট্যাণ্ডার্ড' কাগজের একটি প্রবন্ধে ডগলাস লকউড নামে জনৈক অষ্ট্রেলিয়া-বাসী লেখক একজন ইন্দোনেশীয় ডাক্তারের কথা বিবৃত করিয়াছেন। এই ইন্দোনেশীয় ডাক্তারটি একজন বিশিষ্ট যুব-নেতা। তিনি নাকি উক্ত ডগলাস লকউডকে বলিয়াছিলেন যে—"বৃটেনকে একদিন না একদিন ইন্দোনেশীয়া ত্যাগ করিতেই হইবে।... আমাদের আসল সংগ্রাম সুরু হইবে সেই দিন হইতে। আপনি ভাবিতেছেন, ডাচদের বিরুদ্ধে লড়াই করিবার মত উপযুক্ত অস্ত্র আমাদের হাতে নাই। কিন্তু আপনি ভুল ভাবিতেছেন। আমাদের হাতে সাতকোটি ছুরি মজুত আছে বৃটেন ইন্দোনেশিয়া ত্যাগ করিলেই আমরা সেই ছুরির ব্যবহার সুরু করিব। ইহার পরে ব্যানডিঅং, সেমারাং, সুরাবায়া প্রভৃতি বড় বড় সহরগুলির কোন রাস্তাই সন্ধ্যার পরে আর নিরাপদ থাকিবে না।"

আমাদের বিশ্বাস, ডাচ গভর্ণমেণ্ট ইন্দোনেশীয়দের দাবীর সম্মানজনক মীমাংসা না করিলে স্থানীয় ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষকে হয় তো অদূর ভবিষ্যতে এই ভয়াবহ অবস্থারই সম্মুখীন হইতে হইবে।

"প্যালেষ্টাইন দেশটা কাহার?"

প্যালেষ্টাইন দেশটা কাহার?—এই প্রশ্নটা নিয়া বহুবৎসর হইতে আরব ও জায়নিষ্টদের মধ্যে বিবাদের অন্ত ছিল না। বৎসর খানেক আগে পর্য্যন্ত এই বিবাদের মধ্যস্থতা করিত ইংরাজ সরকার। একবার আরবের পক্ষ সমর্থন করিয়া, আরেকবার ইহুদিদের দলে টানিয়া ইংরাজ সরকার মধ্যস্থতা করিবার এই দায়িত্বকে নিজের প্রয়োজনে চমৎকার ভাবে ব্যবহার করিয়াছে। ফলে আরব-ইহুদির বিবাদ কোন দিনই মিটে নাই, প্যালেষ্টাইনের মালিকানারও কোন সমাধান হয় নাই। গত বৎসর যুদ্ধ শেষ হইতে আরব ও ইহুদির বিবাদের মধ্যস্থতা করিতে আবার আমেরিকাও বৃটেনের সহিত যোগ দেয়—এবং প্যালেষ্টাইনের একটা সদগতি করিবার জন্য তাহারা মিলিত ভাবে একটি যুক্ত ইঙ্গমার্কিণ কমিটি গঠন করে। এই কমিটির প্রথম মিলন ঘটে বিগত জানুয়ারী মাসের ৪ঠা তারিখে। তার প দীর্ঘ চার মাস ধরিয়া কমিটি প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে সকল তথ অনুসন্ধান করিয়া গত ৩০শে এপ্রিল তাহাদের রিপোর্ট প্রকা করে। রিপোর্টটি আকারে একটি মহাভারত তুল্য। কাজে বর্ত্তমান আলোচনায় উহার বিস্তৃত বিবরণ সম্ভব নয়। রিপোর্টে মূল বক্তব্য যাহা তাহা মোটামুটি এইরূপ:

(১) প্যালেষ্টাইনে আরব বা ইহুদি কেহই রাজনৈতি প্রভুত্ব করিতে পারিবে না; উহা আরব বা ইহুদি কোন জাতি মাতৃভূমি বলিয়া গণ্য করা হইবে না; এবং এই দেশ শাসি হইবে একটি আন্তর্জাতিক অছির অভিভাবকাধীনে।

(২) নাৎসী সরকার কর্তৃক যে সব হতভাগ্য ইহু ইউরোপে উৎপীড়িত হইয়াছিল, সেইসব ইহুদিদের ১ লক্ষ জ অনতিবিলম্বে প্যালেষ্টাইনে স্থায়ী ভাবে বসবাস করিবার অনুম পাইবে।

ইহার পর উক্ত রিপোর্টে ঐ দেশের যাবতীয় সমস্যার এ সমস্যার সম্ভাবিত সমাধানের একটা বিস্তৃত বিবরণ উল্লিখি হইয়াছে। উপস্থিত আলোচনায় সেই বিবরণ আমাদের প্রয়ো নাই, কারণ প্যালেষ্টাইনের যাহা আসল সমস্যা ছিল, তাহা ঐ দুইদফা সমাধানেই পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। প্যালেষ্টাইন কাহার মাতৃভূমি?—এই নিয়া আরব ইহুদির মধ্যে বিবাদ ঘটি কারণ নাই। কেননা কমিটি নির্দ্দেশ দিয়াছে যে, ও দেশ কাহারই নয়। ওদেশের আসল স্বত্ব হইল ইঙ্গ-আমেরিকা ইঙ্গ-আমেরিকা প্যালেষ্টাইন সমস্যার মীমাংসা করিবারও দা গ্রহণ করিয়াছিল, সে দায়িত্ব তাহারা পালন করিয়াছে। কথামা সেই মর্কট বিচারকের মত তাহারা বিবদমান দুই মার্জ্জারের দ্বিভাজ্য আহার্য্যকে স্বয়ং আত্মসাৎ করিয়া সকল সমস্যার করিয়াছে।

কিন্তু ইঙ্গ-আমেরিকা করিলেও আরব জগৎ প্যালেষ্টা সমস্যার সমাধান এত সোজা উপায়ে করার পক্ষপাতী নয়। যু ইঙ্গ-মার্কিন কমিটির রিপোর্টকে আরব জগৎ বিশ্বাসঘাতকতা বলি গ্রহণ করিয়াছে এবং মধ্য প্রাচ্যের সমগ্র আরব-জগৎ তীব্রকণ্ঠে এ ব্যবস্থার প্রতিবাদ জানাইয়াছে। ইহার পর প্যালেষ্টাইনে অবলম্বন করিয়া মধ্য প্রাচ্যের পরিস্থিতি দিন দিন যে গতি অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে তাহাকে আর যে নামেই অভিহি করা যাক, 'শান্তিপূর্ণ' এই নামে কিছুতেই বর্ণনা করা চলে না।

আবার সিমলা বৈঠক

ভারতের অচল অবস্থার সমাধান মানসে বৃটীশ মন্ত্রী মিশনে সহিত ভারতীয় নেতৃবৃন্দের আলাপ-আলোচনা চলিতে চলি প্রায় অচল হইয়া পড়িয়াছিল। সম্প্রতি সেই অচলকে সচ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল সিমলায়।

দিল্লীতে ভাইসরয়-প্রাসাদে মন্ত্রীদের সমক্ষে ভারতের বিভি দলীয় প্রতিনিধিগণ যে বিভিন্ন ধরণের প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে

এবং সেই সঙ্গে উভয় পক্ষের মধ্যে যে নানাবিধ গোপন আলোচনা চলিতেছিল, সেই সংবাদের কিয়দংশ আমরা গতবারেই আমাদের পাঠকদের জ্ঞাত করিয়াছি। সেই সংবাদের অতিরিক্ত লিবার মত সুপ্রকট বিশেষ কোন তথ্য এখনও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় নাই—ইতিমধ্যে শুধু এইটুকু মাত্র জানা গিয়াছিল য, আলোচনা চালাইতে চালাইতে দিল্লীর গরমে এবং ভারতীয় সমস্যার উত্তাপে বৃটীশ মন্ত্রিগণের মাথাও গরম হইয়া ওঠে, এত গরম হইয়া ওঠে যে তাঁহাদের সেই উত্তপ্ত মাথা শীতল করিবার জন্য গত ইষ্টারের ছুটিতে মন্ত্রিগণকে কাশ্মীরের শীতল বায়ু সেবন করিতে ছুটিতে হয়। তারপর দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া পুনরায় আলোচনা চালাইতে না চালাইতেই আবার তাঁহাদের মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হইয়া পড়ায় আলাপ-আলোচনাকে সিমলায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। ফলে ৩রা মের পূর্ব্বে মন্ত্রিগণ এবং ভারতের বিভিন্ন দলের নেতাগণ গিয়া সেখানে উপস্থিত হন—সিমলায় একটি ত্রিদলীয় বৈঠকে সমবেত হইবার জন্য। আলোচনা-ক্ষেত্রের এই টানা-হেঁচড়ার মধ্যে সমস্ত বিষয় পর্দার আড়ালে সংঘটিত হইলেও একটি বিষয় কিন্তু খুব বেশী চোখে পড়িয়াছিল—তাহা এই যে, স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্স উক্ত আলোচনা কালে তাঁহার 'পাইপ শোভিত' সদাহাস্য মুখে বিভিন্ন দলের নেতাদের 'দুয়ারে দুয়ারে' "মিটমাট" যাচিয়া বেড়াইয়াছেন। আলাপ-আলোচনা ঠিক কী ভাবে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা অদ্যও [১৪-৫-৪৬] সকলের অজ্ঞাত। তবে সংশ্লিষ্ট পক্ষের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের 'টুকরা-টুকরা' বিবৃতি হইতে এবং সংবাদপত্রের 'দৈবজ্ঞ' প্রতিনিধিদের মারফৎ যে তথ্যটুকু প্রকাশিত হইয়াছে, সেই তথ্য-অনুসারে মন্ত্রীমিশনের আলোচনা নিম্নলিখিত পর্য্যায়ে ধাপে ধাপে অগ্রসর হইয়াছে:

(ক) কংগ্রেস অখণ্ড ভারতের ভিত্তিতে একটি অস্থায়ী একক জাতীয় ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাব করিয়াছিলেন—এই নিয়মে মাইনরিটি অঞ্চলগুলি পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার লাভ করিবে; (খ) সকল দল ও সম্প্রদায় এমন কি ভারতের রাজন্যবর্গও এই প্রস্তাবে ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন; (গ) মুসলীম লীগ এই প্রস্তাবে ঘোর আপত্তি করিয়া ঘোষণা করেন—"ও সব চালাকি চলিবে না, ইংরাজ লীগকে তাহার দাবী অনুযায়ী পাকিস্তান উপহার না দিলে 'মুসলীম-ভারত' "হিন্দু-ভারত"কে গৃহযুদ্ধে নাস্তানাবুদ করিয়া পাকিস্তান আদায় করিয়া নিবে; (ঘ) মিশন ইহার উত্তরে দুইপক্ষকেই সান্ত্বনা দিবার চেষ্টায় কুপল্যাণ্ড-পরিকল্পনার মত একটি 'ঠেকা-দেওয়া' "শাসন-কাঠামো'র আভাষ দেন। এই কাঠামোতে ভারতের প্রধান প্রধান ধর্ম্মের ভিত্তিতে ভারতকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করা হইবে, অংশগুলির হাতে আভ্যন্তরীণ শাসনের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইবে এবং এই বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে কোন প্রকারে পরস্পরের সহিত জুড়িয়া রাখার চেষ্টায় সেনাবাহিনী, যান বাহন প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় একটি শিথিল কেন্দ্রের জিম্মায় সমর্পিত হইবে।

দেশের জনসাধারণ এই সম্ভাবিত প্রস্তাবে মোটেই উৎসাহ প্রকাশ করে নাই, বরঞ্চ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। যে প্রদেশ-গুলিতে দুই, তিন বা তদধিক সম্প্রদায়ের বাস, সেই প্রদেশগুলিই সবচেয়ে অধিক চাঞ্চল্য প্রদর্শন করিতেছে। বাঙলা দেশ আবার নূতন বঙ্গভঙ্গের আশঙ্কায় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। বাঙলার নেতারা কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট আজাদ সাহেব এবং বল্লভভাই প্যাটেলকে তারের [illegible] করিয়া দৃঢ়ভাবে জানাইয়াছেন, কংগ্রেস এই ভাগবিভাগের প্রস্তাব যেন মানিয়া না লয়। ব্যাপার দেখিয়া কেহ কেহ আবার জোরগলায় বলিয়াই ফেলিয়াছেন যে, মন্ত্রীমিশনের ব্যাপারটি একটি পুরাপুরি রাজনৈতিক ধাপ্পা—যাহার আড়ালে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ধ্বংস করিবার আয়োজন সুসম্পূর্ণ করা হইতেছে। এই কথাটি বলিয়াছে বৃটেনেরই স্বতন্ত্র শ্রমিক দলের নেতা মিঃ ফেনার ব্রকওয়ে।

মোটকথা মন্ত্রীমিশনের সহিত ভারতীয় নেতৃবৃন্দের আলোচনার ব্যাপারটা হইয়া দাড়াইয়াছে রীতিমত সঙ্গীন। ৮ই মের সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হইয়াছে যে, সেই দিনটা নাকি আলোচনার পক্ষে সঙ্গীনতম দিন—most crucial day।" কিন্তু সঙ্গীন দিনে শেষ পর্য্যন্ত বৈঠক মূলতুবী রাখা হয়। পরের দিনও ৯ই মে উক্ত সঙ্গীন পরিস্থিতি যে ঠিক কোন্ অবস্থায় পৌঁছায় তাহাও ভাল করিয়া জানা যায় নাই। জানিবার মধ্যে এইটুকু সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, মন্ত্রীমিশন কেন্দ্রে একটি অন্তবর্ত্তীকালীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন করিয়া সুপারিশ করিবেন, অথবা এই প্রস্তাবের অকার্য্যকারিতায় ভাইসরয় নূতন করিয়া তাঁহার শাসন পরিষদ গঠন করিবেন। অর্থাৎ এক কথায় আসল কথাটাই দুজ্ঞেয় রহস্যালোকে বিচরণ করিতেছিল।

কিন্তু রহস্যের একাংশ সে-দিন আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সিমলায় মন্ত্রীমিশনের সহিত ত্রিদলীয় আলোচনার প্রথম বৈঠক ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। ১২ই মে তারিখে সিমলা হইতে প্রচারিত একটি সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ: "দুই দল (কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ) তাঁহাদের যে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিয়া মন্ত্রীমিশন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, আরও আলাপ-আলোচনা চালানো নিরর্থক; এইরূপ অবস্থায় বৈঠক শেষ করাই সঙ্গত। মন্ত্রী প্রতিনিধিদল দৃঢ়ভাবে জানিতে চাহেন যে, বৈঠক ভাঙ্গিয়া যাওয়ার জন্য কোন দলের উপরই দোষারোপ করা যায় না।"

সিমলার এই ব্যর্থতার পর এখন ভাইসরয় সম্ভবতঃ মন্ত্রী প্রতিনিধিদের নির্দ্দেশানুসারে কেন্দ্রে একটা নূতন শাসন পরিষদ গঠন করিবেন। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, জাতীয়তাবাদী হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ও শিখ লইয়া শাসন পরিষদ গঠিত হইলে ফলাফল আশানুরূপ হইবার সম্ভাবনা।

বাঙলার মন্ত্রিসভা গঠন

গতমাসে বাঙলা দেশের পার্লামেণ্টারি রাজনীতিক্ষেত্রে একটা দুর্ঘট ঘটিবার সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছিল—কংগ্রেস-লীগ মিলিত মন্ত্রিসভা। দিন কয়েক সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা গরম করিয়া এই বিষয়টি নিয়া বঙ্গীয় আইন পরিষদের নবনির্ব্বাচিত প্রধান দল দুইটির

নেতৃদ্বয়ের মধ্যে সবিশেষ ঘনিষ্ঠ আলাপ আলোচনা চলিল—সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাগুলি সেই আলোচনা কিছু সত্যের এবং কিছু অনুমানের আরকে মিশাইয়া অতি গুরুত্বপূর্ণ চালে সাধারণের নিকট পরিবেশন করিল—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াইল much ado about nothing, কোন বিষয়েই কিছু সুরাহা হইল না। সন্ধিকামী পার্টি দুইটির দলগত স্বার্থ ও দাবীর দ্বন্দ্বে কোয়ালিশনের সম্ভাবনা আত্মগোপন করিয়া

প্রকাশ, কোয়ালিশন গঠনের প্রস্তাব নাকি মুসলিম লীগই প্রথমে উত্থাপন করেন। লীগ-নেতা সুরাবর্দ্দি সাহেব বাংলা প্রদেশের শাসনকার্য্য জনপ্রিয় এবং সু-সচল করিবার মানসে নাকি কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়কে আলোচনায় আমন্ত্রিত করেন। এই সঙ্গে সংবাদপত্রে আরও একটি তথ্য প্রকাশিত হইয়াছিল যে, দিল্লীতে আহুত মুসলীম লীগ পার্লামেণ্টারি অধিবেশনে সুরাবর্দ্দি সাহেব প্রাণপণে হিন্দুসমাজের এবং তাহাদের প্রতিষ্ঠান 'হিন্দু-কংগ্রেসের' মুণ্ডপাত করিতেছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সুরাবর্দ্দি সাহেবের এই 'মহৎ প্রচেষ্টা' বাঙলা কোয়ালিশনের প্রতিবন্ধক বিবেচিত হয় নাই। বাঙলার বিশেষ অবস্থা বিবেচনা করিয়া সুরাবর্দ্দি সাহেব ও শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর রায়ের মধ্যে পত্র বিনিময় চলিতে থাকে। সেই সব পত্রগুলি যথা সময়ে দৈনিক সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রগুলিই আলোচনার দলিল পত্রের মত। এইগুলি হইতে বুঝা গিয়াছে যে, কংগ্রেস নিম্ন-লিখিত সর্ত্তসমূহে মুসলিম লীগের সহিত কোয়ালিশন গঠনে সম্মতি ছিল :

(১) অনতিবিলম্বে সকল রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে হইবে;

(২) কোয়ালিশন পার্টির ২।৩ অংশের সম্মতি ব্যতীত মন্ত্রিসভা কোনরূপ সাম্প্রদায়িক অথবা বিতণ্ডামূলক আইন পাশ করিতে পারিবেন না;

(৩) কংগ্রেসকে মন্ত্রিসভার অর্দ্ধ সংখ্যক আসনের অধিকার দিতে হইবে অথবা এই সংখ্যা কমাইতে গেলে কংগ্রেসপ্রার্থীকে স্বরাষ্ট্র ও বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবার অধিকার দিতে হইবে;

(৪) গভর্ণমেন্টের কার্য্যে দুর্নীতি নিবারণ কল্পে একটি সাব-কমিটি গঠন করিতে হইবে।

বলা বাহুল্য লীগনেতা সুরাবর্দ্দি সাহেব এই সর্ত্তগুলির কোনটিতেই রাজী হন নাই। ২০শে এপ্রিল লীগনেতার নিকট লিখিত পত্রে শ্রীযুক্ত রায় বলিয়াছেন, 'মুসলিম লীগের জবাব সন্তোষজনক নয়। কাজেই মুসলিম লীগের সহিত কংগ্রেস কোয়ালিশন করিতে সক্ষম নয়। মুসলিম লীগের মনোভাবের কোন পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইলাম না।'

কোয়ালিশন আলোচনার এই ব্যর্থতা সম্বন্ধে সহযোগী আনন্দবাজার পত্রিকা মন্তব্য করিয়াছেন যে—"মিঃ সুরাবর্দ্দি ভাবিয়াছিলেন, কংগ্রেসের মূলনীতির মর্য্যাদা তিনি খর্ব্ব করিতে সমর্থ হইবেন। তাঁহার এই অভিসন্ধিপূর্ণ অপপ্রয়াস দৃঢ়ভাবে ব্যর্থ করিয়া বাংলার কংগ্রেস দল আপনাদের এবং কংগ্রেসের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন।"

কোয়ালিশন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবার পর সুরাবর্দ্দি সাহেব বাংলা প্রদেশে একচ্ছত্র লীগ মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন। নবনিযুক্ত মন্ত্রিগণ গত ২৪শে এপ্রিল আনুগত্য শপথ গ্রহণ করিয়াছেন।
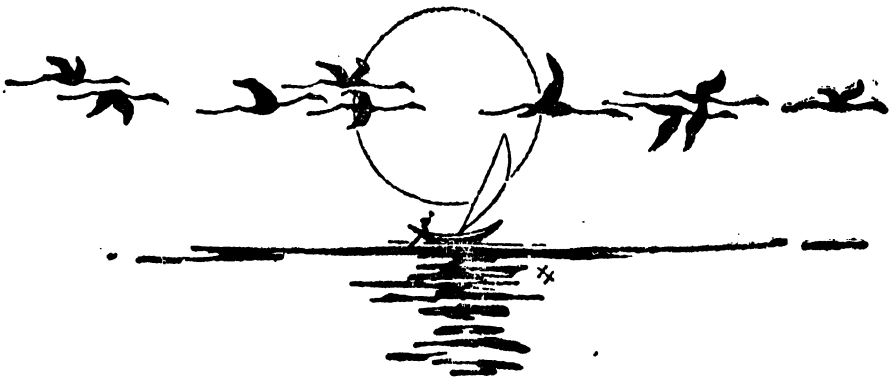
বঙ্গশ্রী
মাঘ ঃ ১৩৫২
২য় খণ্ড ঃ ২য় সংখ্যা
অপরাজিতা
মহোপকারী সুরভিত কেশতৈল
বিশিষ্ট আয়ুর্বেদীয় উপাদানে প্রস্তুত,
মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী ও কেশবর্দ্ধক।
এই অনুপম কেশতৈলটী আপনার
রুচির পূর্ণ তৃপ্তি সাধন করিবে।